সুলতানা রিজিয়া

শিল্পী—শ্রীযুক্ত মণিমোহন রায় চৌধুরী

ভারতবর্ষ

সূচিপত্র

ষোড়শ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড ; পৌষ, ১৩৩৫—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬

বিষয়ানুসারে বর্ণানুক্রমিক

চিত্রসূচি

পৌষ—১৩৩৫

বহুবর্ণ চিত্র

মাঘ—১৩৩৫

বহুবর্ণ চিত্র

ফাল্গুন—১৩৩৫

বহুবর্ণ চিত্র

চৈত্র—১৩৩৫

বহুবর্ণ চিত্র

বৈশাখ—১৩৩৬

পৌষ—১৩৩৫

দ্বিতীয় খণ্ড | ষোড়শ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

সাংখ্যের পুরুষ

শ্রীজানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য সাংখ্যতীর্থ এম-এ

হিন্দুর যাহা কিছু অতীত সভ্যতার সাক্ষ্য দিতেছে, তাহাদের মধ্যে আর্য্য দর্শন শিরোমণি স্বরূপ। হিন্দুর দর্শন যদি আজ বিলুপ্ত হইত, তাহা হইলে হিন্দুর জগতের কাছে পরিচয় দিবার মত বিশেষ কিছু থাকিত কি না জানি না। এই সকল দর্শনের মতবাদ শুধু কাগজে-কলমে লেখা হইত না। এই সকল দর্শনের মতানুবর্ত্তীরা বাস্তব জীবনে তাহার প্রত্যেক অক্ষর প্রতিপালন করিতে সচেষ্ট ছিলেন। অনেক মহাত্মা যোগী সেই সত্য উপলব্ধি করিতেন ও জগতের মঙ্গলের জন্য প্রচার করিতেন। যদিও এখন সে দল বিরল তাহা হইলেও দর্শনের আলোচনার প্রতি ভারতবাসীর অন্তরে শ্রদ্ধা কমে নাই। এই সকল সত্য পুরাতন হইলেও নূতন। একই সূর্য্য প্রত্যহই উঠে সত্য; কিন্তু একই দর্শকের মনে নিত্য নূতন ভাবের অভিব্যক্তি করায়। রামায়ণ মহাভারতের গল্প যতবারই শুনা যাক্ না কেন, কোন কালেই অরুচি জন্মে না। সেইরূপ, এই সকল সত্যের আলোচনা বহুবার হইলেও পাঠকবৃন্দ বিরক্ত হন না। এই সকল দার্শনিক তত্ত্বে আর একটী আশ্চর্য্যকর শক্তি নিহিত আছে। সেই শক্তিটী হচ্ছে—দার্শনিক প্রবন্ধে লেখকের লিপি-কৌশলের প্রয়োজন নাই; স্বতঃই তাহাতে অনুরাগীর মন আকৃষ্ট হয়।

সাংখ্য-শাস্ত্রে আত্মার অপর নাম হইতেছে পুরুষ। আত্মা শব্দের পরিবর্ত্তে পুরুষ শব্দের ভূরি প্রয়োগের অনুরোধে প্রবন্ধের নামকরণ হইল 'সাংখ্যের পুরুষ'। এই প্রবন্ধে অনতিবিস্তৃত ভাবে সাংখ্য শাস্ত্রের আত্মবাদের আলোচনা হইবে।

এই আত্মবাদে প্রায়ই প্রত্যেক দর্শনের মতের অনৈক্য দেখা যায়। অথচ এই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানিতে না

পারিলে দর্শনশাস্ত্র পড়া আর না পড়া একই হইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থায় আমরা কিরূপে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারিব? কিরূপেই বা নিশ্চিন্ত হইব যে এই দর্শনের আত্মবাদই শ্রেষ্ঠ? আমাদের শাস্ত্রে লিখিত আছে—

'নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলম্।
অতএব সংশয়োমাভূজ্ঞানং সাংখ্যং পরংমতম্॥'

'প্রকৃতি কি' 'পুরুষ কি' ও 'তাদের ভেদ কি' এই তত্ত্ব বুঝাইতে সাংখ্যের প্রতিকক্ষতা করিতে সমর্থ দর্শনশাস্ত্র আর নাই—এই আমরা পাইলাম শাস্ত্রের উক্তি ও অভিপ্রায়। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, আত্ম-তত্ত্ব নিরূপণে ও বিবেক-জ্ঞান সম্পাদনে সাংখ্য-শাস্ত্র অসাধারণ। আমরা যুক্তি ও তর্কের দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিব যে, শাস্ত্র-বাক্য মিথ্যা নহে।

প্রত্যেকের নিজের আত্মার মানস-প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কেহ কেহ আবার ইহাও অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু অপরের আত্মা যে প্রত্যক্ষ-যোগ্য নহে—ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। আত্মার অস্তিত্ব জানাইতে গেলে যুক্তি-তর্কের সাহায্য লইতেই হইবে। ইহা ব্যতীত আত্মবাদে আরও বিপ্রতি-পত্তি আছে। কেহ কেহ অব্যক্তকে (প্রকৃতিকে), কেহ বা বুদ্ধিতত্ত্বকে, কেহ বা ইন্দ্রিয়গুলিকে, কেহ বা ভূতগণকে আত্মা বলিয়া মনে করেন। সাংখ্য-শাস্ত্রে এই সকল সংশয় নিরস্ত করিবার জন্য এমন ভাবে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করা হইয়াছে, যাহাতে আত্মার স্বরূপ অনেকটা পরিস্ফুট হয়। অব্যক্ত, বুদ্ধিতত্ত্ব প্রভৃতি হইতে ভিন্ন আত্মা বলিয়া একটী অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করিতে হইবে। অব্যক্ত প্রভৃতি সংহত (মিলিত), আর সংহত পদার্থ মাত্রই পরের কাজে লাগে। যার (পরের) কাজে লাগে তিনিই হচ্ছেন আত্মা। যারা মিলিত তারা নিজের কাজে লাগে না—পরের জন্যই তাদের সৃষ্টি; যেমন ঘর, বাড়ী, শয্যা প্রভৃতি। কাহারও উপকার করিতে গেলে যাহার উপকার করা হইবে, তার অস্তিত্ব আবশ্যক। পুরুষ যদি না থাকেন, প্রকৃতি প্রভৃতি কাহার উপকার করিবে? অতএব পুরুষ আছেন। এখন একটা আশঙ্কা হইতে পারে এই যে, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, প্রকৃতি প্রভৃতি থেকে পৃথক্ অসংহত (অমিলিত) আত্মা থাকা চাই; কেন না, শয্যা প্রভৃতি নানা উপাদানে গঠিত; সুতরাং সংহত। কিন্তু তাহারা ত সংহত (সাবয়ব) শরীরেরই কাজে লাগে। আত্মাও সেরূপ সংহত হউন। এই আশঙ্কার সমাধানে বক্তব্য এই যে উদাহরণের সমস্ত অংশ লইয়া মিলাইলে চলিবে না। উদাহরণের উল্লেখে লোকে অভিপ্রেতাংশের সমর্থন করে। উদাহরণের সমস্ত অংশ লইলে সকলকেই উদাহরণের জন্যই বিফল-মনোরথ হইতে হইবে। এমন কি, যদি কোন নাগর তাঁহার প্রেয়সীকে চন্দ্রবদনা বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া আপ্যায়িত করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে প্রেয়সীর ক্রোধেরই বৃদ্ধি হইবে, আনন্দ আদৌ হইবে না। তিনি ভাবিবেন, 'কি, আমার এমন সুন্দর মুখকে গোলাকৃতি বলিল?' আর কবির দলকে ত নীরব হইতে হয়।

এ সকল যুক্তি হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, আশঙ্কার খুব জোর নাই। উদাহরণের অনভিপ্রেতাংশ গ্রহণের ফলেই এই আশঙ্কার উদয় হইয়াছে। আমাদের এখানে প্রতিপাদ্য হইতেছে যে, সংহত বস্তু পরের উপকারে লাগে; কিন্তু সেই পরের স্বরূপ সংহত কি অসংহত তাহা আদৌ বিচার্য্য নহে।

এক্ষণে পরের অস্তিত্ব সাব্যস্ত করিয়া সাংখ্যাচার্য্য দেখাইতেছেন যে, সেই পর অসংহত (অসমষ্টিভূত); যেহেতু, তিনি ত্রিগুণ হইতে ভিন্ন। পুরুষ ত্রিগুণের অতীত; কারণ, তাঁহার সুখদুঃখাদি ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। সাংখ্য মতে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী অভিন্ন। সুখাদি ধর্ম্ম যদি আত্মাতে থাকে, তাহা হইলে আত্মা হইবেন সুখদুঃখাদ্যাত্মক। আত্মা যদি সুখাদ্যাত্মক হন তাহা হইলে সুখদুঃখাদির ভোগ কোন কালে সম্ভবপর হয় না। সুখদুঃখাদির সুখদুঃখাদি ভোগ হয় না। এক কথায় কর্ত্তা ও কর্ম্ম এক হইতে পারে না। দাঁত আপনাকে দংশন করিতে পারে না। যাঁহার সুখদুঃখাদি নাই, তিনি ত্রিগুণ নহেন। যাহারাই ত্রিগুণ তাহারাই সংহত (সমষ্টি স্বরূপ); কেন না, তিনটী গুণ থাকিতে হইলেই সমষ্টির প্রয়োজন। যিনি ত্রিগুণ নহেন তিনি অসংহত। পুরুষ ত্রিগুণের অতীত; সুতরাং তিনি অসংহত।

পুরুষের অস্তিত্ব সাধক আর একটী যুক্তি দেখান যাইতে পারে। ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি জড়। জড় নিজে নিজেই কোন কাজ করিতে পারে না। প্রকৃতির পরিণাম হইতে গেলে চেতনের সাহায্য চাই। জড় রথ প্রভৃতি আপনা আপনি চলিতে পারে না; চেতন সারথি প্রভৃতির সাহায্য আবশ্যক। প্রকৃতিকে জগদ্রূপে পরিণত হইতে হইবে। জগৎ,

যখন পরিদৃশ্যমান, তখন বুঝিতে হইবে, প্রকৃতিকে পরিণত হইতে হইয়াছে। প্রকৃতি পরিণত না হইলে জগৎ দেখা যাইত না—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং চেতনের সাহায্য লইতেই হইয়াছে ও ভবিষ্যতে হইবে। যিনিই এই পরিণাম-ব্যাপারে সহায় তিনিই পুরুষ।

পুরুষের অস্তিত্ব-সাধক আরও একটী প্রমাণ দেখান যাইতে পারে। সুখদুঃখ প্রভৃতি হইতেছে ভোগের উপকরণ অর্থাৎ ভোগ্য। তাহারা নিজেরা ভোক্তা হইতে পারে না। সুখদুঃখ প্রভৃতি নিজেকে নিজেরা ভোগ করিতে পারে না। ভাল ছড়িগাছটী নিজেকে লইয়া বেড়াইতে পারে না। তাহাকে বেড়াইতে লইয়া যাইবার লোক চাই। সেই রকম সুখ দুঃখ ভোগ করার লোক চাই। যিনি ভোগ করেন তিনিই পুরুষ। আবার কেহ কেহ বলেন যে বুদ্ধি প্রভৃতি যাহা কিছু পদার্থ সে সমস্ত দৃশ্য অর্থাৎ জ্ঞেয়। জ্ঞেয় হইতে হইলেই জ্ঞাতার আবশ্যক। জ্ঞাতা না থাকিলে জ্ঞেয়ের কোন মানেই হয় না। যিনি জ্ঞাতা তিনিই পুরুষ।

পুরুষ মানার শেষ কথা এই যে সাংখ্য-শাস্ত্রে কৈবল্যের অর্থাৎ মুক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। এই মুক্তি হইতেছে ত্রিবিধ দুঃখের সমূলে উৎপাটন (আত্যন্তিক বিচ্ছেদ)। এইরূপ মুক্তি প্রকৃতির বা তাহার বিকারের হইতে পারে না। কারণ তাহারা সুখদুঃখ-মোহাত্মক। প্রকৃতি প্রভৃতিরা সুখ-দুঃখ-মোহ দিয়া গড়া। সুতরাং প্রকৃতির কাছ হইতে সুখ-দুঃখ-মোহ কেহই কাড়িয়া লইতে পারিবে না। আর দুঃখের নাশ না হইলে মুক্তিও হইবে না। আর শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা যে মুক্তির সত্তা প্রমাণিত হইয়াছে, সে মুক্তিকেও বাদ দেওয়া চলে না। কাজে কাজেই স্বীকার করিতে হয়, প্রকৃতি প্রভৃতি ছাড়া আরও কাহারও মুক্তি হয়। এই মুক্তি যাঁহার হয় তিনিই পুরুষ।

যদিও আগে প্রমাণ হয়ে গেছে যে ভূত প্রভৃতি থেকে আত্মা ভিন্ন তথাপি এখন জড়বাদের যুগ—দেহাত্মবাদের উপর বেশী লোকের আস্থা; সেই জন্য প্রাচীন দেহাত্মবাদী চার্ব্বাকের মত ভাল করে পরীক্ষা করা যাক্। দেহ-চৈতন্যবাদীরা বলেন যে চৈতন্য হচ্ছে দেহের বিকার-বিশেষ। দেহের অবয়বগুলির মিলন-বিশেষের ফলেই চৈতন্যের উদয় হয়। চৈতন্য বলে' আর স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করিবার দরকার নাই। সাংখ্যাচার্য্যগণ জিজ্ঞাসা করেন, 'প্রত্যেক অবয়বেই কি চৈতন্য আছে ?' যদি তাঁহারা ইহা স্বীকার করেন তাহা হইলে চৈতন্যকে অবশ্যই দেহের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলে স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে মরণ বা সুষুপ্তি কোন কালেই হইতে পারে না; কারণ চৈতন্যের লোপ না হইলে ত আর মরণ প্রভৃতি হয় না। আর অবয়বের ধর্ম্ম যদি চৈতন্য না হয় তাহা হইলে তাদের গড়া জিনিসে চৈতন্য আস্‌তে পারে না; কারণ, কারণের বিশেষ ধর্ম্মগুলির অধিকারী হচ্ছে কার্য্য। আর এক কথা—চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম হইতেই পারে না; কারণ, দেহের প্রত্যক্ষ-যোগ্য ধর্ম্মগুলিই বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। চৈতন্য প্রত্যক্ষযোগ্য ধর্ম্ম; আর চৈতন্য যদি দেহের ধর্ম্মই হয় অবশ্য অবশ্যই বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া পড়িবে। ইহা কোন দেহাত্মবাদীর অভিপ্রেত হইতে পারে না।

বৌদ্ধ দল এসে বলেন যে জ্ঞান বলে স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করিতেই হইবে; কিন্তু আত্মা জ্ঞানপ্রবাহ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের কাছে যে আত্মা স্থির বলে মনে হচ্ছে ওটা ভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা ভুল করে প্রদীপের শিখাকে এক বলে মনে করি। কিন্তু যুক্তির দ্বারা বুঝতে চেষ্টা করিলে বুঝিব যে, প্রদীপের শিখা প্রত্যেক ক্ষণেই পরিণামশীল,—কখনও এক হতে পারে না। সেই রকম জগতের সর্ব্ব পদার্থই ক্ষণিক সুতরাং জ্ঞানও ক্ষণস্থায়ী। আর এই বিজ্ঞানধারাই আত্মা। বৌদ্ধদের ক্ষণিকবাদ না বুঝলে জ্ঞানের ক্ষণভঙ্গুরতা ঠিক্ করে বুঝা যায় না। কিন্তু এই প্রবন্ধে ক্ষণিকবাদের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বোধে ক্ষণিকবাদের অনুকূল যুক্তি দেখান হইল না। সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনে এই ক্ষণিকবাদের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। সেগুলি সব বল্‌তে গেলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের আবশ্যক। এখানে তাঁদের যুক্তির দুই একটী দেখাইয়া বিরত হব। ক্ষণিকবাদে কারণ হইতে কিরূপে কার্য্যের উৎপত্তি হয় তাহা প্রতিপন্ন করা যায় না; কারণ, কার্য্য যখন হবে তখন কারণ থাকে না; আর কারণ যখন থাকে তখন কার্য্য কোথায়? কারণই কার্য্যাকারে পরিণত হয়। কারণই যদি না থাকিল তাহা হইলে আর কার্য্য হবে কি করে? ক্ষণিক-বাদই যখন যুক্তির আঘাত সহিতে অক্ষম, তখন তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের ক্ষণপ্রবণতা কি করে টি'কিবে? বিজ্ঞানগুলি যদি ক্ষণিক হয় তাহা হইলে তাহার স্থিতিদশায় অন্য বিজ্ঞান নাই,—সে তার আগেকার বা পরের

বিজ্ঞানের খবর জানে না; কারণ, কাহারও খবর জানিতে হইলে যাহার খবর জানিব তাহার সত্তা থাকা চাই। সে নিজেরও খবর জানে না; কারণ, আগেই দেখান হয়েছে যে, কর্ত্তা ও কর্ম্ম একই ব্যক্তি হতে পারে না। ফল হইল এই যে, ক্ষণিক বিজ্ঞান স্বীকার করিলে কোন কালেই জ্ঞান হইতে পারে না। এরূপ আত্মবাদ আমরা কি করে স্বীকার করিব—কি করে জ্ঞানের দ্বারা প্রমাণ করিব আমার জ্ঞান নাই। যদি বৌদ্ধেরা বলেন, আর একটী জ্ঞান স্বীকার করিব যাহার দ্বারা পূর্ব্বের জ্ঞান প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে আবার ঐই জ্ঞানের প্রকাশের জন্য আর একটী জ্ঞান, তার জন্য আর একটী জ্ঞান—এই ভাবে অবিরাম জ্ঞান-ধারাই স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞান নিজে প্রকাশিত না হইলে ত আর অপরকে প্রকাশ করিতে পারে না। এই অবিশ্রান্ত জ্ঞানধারার শেষও নাই, সকলের প্রকাশও নাই। সুতরাং তাঁহারা যে আঁধারে ছিলেন সেই আঁধারেই থাকিবেন। এই রকম অনন্ত জ্ঞানধারা স্বীকার করিলেও এই জ্ঞান জন্য এই স্মৃতি হয়েছে বলিবার উপায় নাই। কারণ অনন্ত জ্ঞানের কোন্‌টী কোন্ স্মৃতির জনক, ঠিক্ করে বল্‌তে চেষ্টা করা বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। সুতরাং আমাদের আত্মা ক্ষণিক হলে চল্‌বে না।

জৈনের দল এসে বল্লেন যে বৌদ্ধদের মত শুনিলে আরও অসুবিধা হয়। আমরা পরলোক ও পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাসী। আর এ কথাও যুক্তিসঙ্গত 'যে যেমন কাজ করে সে তেমন ফল ভোগ করে'। আত্মা যদি স্থায়ী নহেন তাহা হইলে তাঁর পুনর্জ্জন্ম কিরূপে সম্ভবপর হয়? আত্মা ভাল-মন্দ কাজের ফলে স্বর্গে বা নরকে যান। এক কথায়, আত্মার গতি আছে। আর এই গতি মানিতে হইলে আত্মার বিভু (সর্ব্বব্যাপক) পরিমাণ মানিলে চলিবে না। আর আত্মার অণু পরিমাণ হইলেও চলে না; কারণ, আত্মা দেহের সব জায়গায় সুখদুঃখ অনুভব করেন। দেহের বাহিরের সুখ-দুঃখ আত্মার অনুভবের বিষয় হয় না; সুতরাং আত্মাকে দেহ পরিমিত বলে স্বীকার করিতে হইবে। জৈনদের আত্মবাদের আরও অনেক বলিবার কথা আছে; কিন্তু প্রবন্ধে স্থান অল্প বলে প্রয়োজনীয় অংশমাত্র আলোচিত হইল। সাংখ্যের বলেন যে এই রকম মত আমরা স্বীকার করিতে পারি না। এই মতে আত্মা হলেন মধ্য-পরিমিত। আত্মার এই রকম পরিমাণ মানিলে বিনাশী বলিতে হইবে, কারণ এই রকম পরিমাণের সব জিনিসই বিনাশশীল—যেমন বাড়ী, ঘর, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি। আরও একটী অসামঞ্জস্য এই মতে আছে। সেটী হচ্ছে যে আত্মার জন্মান্তর স্বীকার করা হয়—আত্মা যে হাতী বা পিপীলিকা দেহ লইয়া জন্মিতে পারেন না তাহার কোন প্রমাণ নাই। বর্ত্তমান দেহও কখন এক আকারের থাকে না—রোগা মোটা হরহ হয়। আর দেহের বৃদ্ধি কে অস্বীকার করিতে পারে? এসব ক্ষেত্রে আত্মাকেও বড় ছোট হইতেই হবে। আত্মার অবস্থার পরিণাম হবেই। আত্মা পরিণামী হইলে চিরস্থায়ী হইতেই পারেন না, যেহেতু পরিণামী বস্তুমাত্রই বিনাশশীল। সুতরাং জৈন মতে আত্মাকে অনিত্য বলিতেই হইবে। আত্মা অনিত্য হইলে জৈনদের মুক্তিবাদ মানা আর না মানা একই হয়ে দাঁড়ায়। যাঁর মুক্তি হবে তিনিই যদি না থাকেন তাহা হইলে সে মুক্তি-বাদের মূল্য কি? সুতরাং আমরা জৈনবাদে সন্তুষ্ট হইতে পারি না।

বৈষ্ণব দার্শনিকেরা বলেন যে আত্মা নিত্য ও অণু পরিমিত। তাঁদের অবলম্বন শ্রুতি। এখানে শ্রুতিপ্রদর্শন নিরর্থক। সাংখ্যেরা বলেন যে আত্মার অণু পরিমাণ হলে চলে না। দেহের বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন সুখদুঃখের অনুভব যুগপৎ হইয়া থাকে। একই সময়ে মাথার যন্ত্রণার ও পায়ে শৈত্যের অনুভব হইতে পারে। ক্ষুদ্রতম আত্মা কি করে দুই বিভিন্ন জায়গার যাতনা ও শীতলতার অনুভব করিতে সক্ষম হইবেন। বৈষ্ণবেরা বলিতে পারেন যে একটী ক্ষুদ্র প্রদীপশিখা যেমন আপন রশ্মি বিস্তার করে সমস্ত ঘরে আলো দেয়, সেইরূপ ক্ষুদ্রতম আত্মা নিজ জ্ঞান-কিরণ বিস্তৃত করে সমস্ত দেহের সুখদুঃখ অনুভব করেন। এরূপ উত্তরের প্রতিবাদে বলা যেতে পারে যে আত্মা অবিকারী, তাঁর স্বরূপ হচ্ছে জ্ঞান, ও তাঁর বিকার জ্ঞান নহে। আত্মা বিকারী হলে তাঁর মুক্তি হতে পারে না তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, ন্যায় ও বৈশেষিক মতের আলোচনা প্রসঙ্গে আরও বিস্তৃত ভাবে প্রমাণ করা হবে যে আত্মা অবিকারী।

আমরা বৈষ্ণব মতে সন্তুষ্ট হতে পারিলাম না। এখন যুক্তি তর্কে সজ্জিত ন্যায় বৈশেষিক মতের আলোচনা করা যাক্। ন্যায় বৈশেষিক মতে আত্মা নবদ্রব্যের অন্যতম এই মতে আত্মা বহু, বিভু (সর্ব্বগত) ও নিত্য। এই

অংশে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের সহিত সাংখ্য দর্শনের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। নৈয়ায়িকদের মতে আত্মার বিশেষ গুণ সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, জ্ঞান প্রভৃতি। এক কথায়, আত্মা জ্ঞানস্বরূপ নহেন। জ্ঞানরূপ গুণের যোগে আত্মা জ্ঞানী হন। নৈয়ায়িকেরা আত্মাকে কর্ত্তা ও ভোক্তা বলে স্বীকার করেন। সাংখ্যমতে আত্মা ভোক্তা,—কর্ত্তা নহেন। সাংখ্যেরা বলেন যে ন্যায় বৈশেষিক সম্মত আত্মবাদ চরম নহে। এই বাদে আস্থাপরায়ণ ব্যক্তিরা আত্মবাদের প্রথম সোপানে মাত্র উঠিতে পারেন। শ্রুতি স্মৃতি গ্রন্থে স্পষ্টই লেখা আছে যে কামাদি মনের ধর্ম্ম, প্রকৃতিই প্রকৃত কর্ত্তা, আত্মা দ্রষ্টামাত্র, জ্ঞানস্বরূপ ও নিত্যমুক্ত।

শ্রুতিঃ—'তীর্ণোহি তদা ভবতি হৃদয়স্য শোকান্ কামাদিকং মনএব মন্যমানঃ সন্ ভৌলোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব, সযদত্র কিঞ্চিৎ পশ্যত্যনন্বাগতস্তেনভবতি।'

স্মৃতি :—'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানিগুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহংমিতিমন্যতে॥'
'নির্ব্বাণ ময় এবায়মাত্মা জ্ঞানময়োঽমনঃ।
দুঃখাজ্ঞানময়া ধর্ম্মাঃ প্রকৃতেস্তেতুনাত্মনঃ॥'

এখন দেখা যাক্ আত্মার প্রকৃত রূপ কি? আত্মা জ্ঞান স্বরূপ এই মত শুধু শ্রুতি স্মৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত, না যুক্তিরও প্রবণতা ওই দিকে?

সাংখ্যেরা বলেন যে আত্মা যদি প্রকাশ স্বরূপ না হন তাহা হইলে তিনি স্বভাবতঃ হইলেন জড়। জড়ের কোন কালে প্রকাশ দেখা যায় না—যেমন ইষ্টকাদি কোনকালেই সচেতন হতে পারে না। অতএব আত্মা সূর্য্যাদির ন্যায় প্রকাশস্বরূপ। এখন প্রশ্ন সততই মনে উদিত হয় যে আত্মা কি প্রকাশধর্ম্মা (অর্থাৎ আত্মার ধর্ম্ম কি প্রকাশ)? এই প্রশ্নের মীমাংসা করে সাংখ্যাচার্য্য বলিতেছেন যে আত্মা নির্গুণ, তাঁহার ধর্ম্ম চৈতন্য হইতে পারে না। আত্মাকে প্রকাশ স্বরূপ বলা হইয়াছে। এইরূপ বলায় লাভও আছে, কম কল্পনা করিতে হইয়াছে। আত্মার ধর্ম্ম প্রকাশ বলিতে গেলে অধিক পদার্থ মানিতে হইবে (আত্মা মানিতে হইবে, প্রকাশ মানিতে হইবে ও তাহাদের সম্বন্ধ মানিতে হইবে। এক কথায় আত্মা ছাড়া দুইটী অতিরিক্ত পদার্থ মানিতে হইবে। আর এ মানায় কোন ইষ্ট-সিদ্ধি নাই।) তেজ ও প্রকাশের ভেদ আমরা সহজেই বুঝিতে পারি; কেন না আমরা তেজের স্পর্শ করি, কিন্তু প্রকাশের স্পর্শ হয় না। সুতরাং তাহাদের ভেদ কল্পনা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু জ্ঞানরূপ প্রকাশের গ্রহণ না হইলে আত্মা গৃহীত হন না। অতএব আত্মা ও জ্ঞানের ভেদ সাধক যুক্তি কিছুই পাওয়া যায় না। আর আত্মা জ্ঞানস্বরূপ হইলেও দ্রব্য, কারণ আত্মার সহিত অন্য পদার্থের সংযোগ হয় ও আত্মাকে কাহাকে আশ্রয় করে বাঁচতে হয় না। সুতরাং ইনি নিত্য দ্রব্য।

আত্মা যে নির্গুণ সে পক্ষে আরও যুক্তি দেখান যাইতেছে। ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ কখনও নিত্য নহে; কারণ তাহারা জন্য (উৎপত্তিবিনাশশীল) বলে বেশ অনুভূত হয়। কোন ব্যক্তিই নিজের অনুভবের অপলাপ করিতে পারেন না। আত্মার অস্থায়ী গুণ স্বীকার করিলে তাঁকে পরিণামী বলিতেই হইবে। দুইটী আসল পদার্থের পরিণাম স্বীকার করিলে মহা গৌরবাবহ কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়। আর পরিণামের কথা ত বলা যায় না। কখনও অজ্ঞানরূপ পরিণাম হইতে পারে। সেইরূপ পরিণাম হইলে জ্ঞান ইচ্ছাদি বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়। জ্ঞানাদি যে আমার হইয়াছিল তাহা ঠিক্ করে মনে করিতে পারি না। মন সদাই সংশয়াচ্ছন্ন থাকে। কোন ব্যক্তি অজ্ঞান হইয়া যদি কিছুক্ষণ থাকেন তার পর সংজ্ঞা লাভ করিলে তিনি পূর্ব্বের কথাগুলি ঠিক্ করে মনে আনিতে পারেন না। তাঁর মনোরাজ্যে সন্দেহেরই অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে। সেই রকম আমাদের জ্ঞান হইতে হইতে যদি মাঝে মাঝে অজ্ঞান এসে উপস্থিত হয় তাহা হইলে পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানে সন্দেহ করা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। আমাদের এই রকম পরিণামশীল আত্মা স্বীকার করিতে হইলে মনে ভয়েরই উদ্রেক হয়। মনে হয়, নির্গুণ জ্ঞান স্বরূপ আত্মা স্বীকার করাই শ্রেয়ঃ।

নির্গুণ আত্মা স্বীকার করিলে আরও বিভিন্ন দিকে কল্পনার লাঘব হয়। ন্যায় বৈশেষিক মতে ইচ্ছাদির উৎপত্তি হইতে হইলে আত্মার, মনের ও আত্মমনঃ সংযোগের অস্তিত্ব বিশেষভাবে অপেক্ষিত। উক্ত তিনটীই বিশেষ কারণ। কিন্তু আমরা দেখি যে মন থাকিলেই ইচ্ছাদির উৎপত্তি হয় ও মন না থাকিলে ইচ্ছাদি হয় না। অতএব মনকেই ইচ্ছাদির কারণ রূপে স্বীকার করাই শ্রেয়ঃ। তাহা হইলে আত্মা যে নির্গুণ ইহাও যুক্তিসিদ্ধ। আরও দেখান যাইতে পারে যে

নৈয়ায়িকের মতে সবিকল্প প্রত্যক্ষ হইতে হইলে চারিটী পদার্থের প্রয়োজন (১) অন্তঃকরণ, (২) ব্যবসায় (ঘট এই প্রকার জ্ঞান), (৩) অনুব্যবসায় (এইটী ঘট এই আকারের জ্ঞান অর্থাৎ পূর্ব্বজ্ঞানটী এই জ্ঞানের বিষয়) ও (৪) আত্মা (ব্যবসায় ও অনুব্যবসায়ের আশ্রয়)। সাংখ্য পক্ষে মাত্র তিনটী পদার্থ স্বীকার করিতে হইবে (১) অন্তঃকরণ, (২) ব্যবসায় স্থানীয় অন্তঃকরণবৃত্তি ও (৩) অনন্ত অনুব্যবসায়স্থানীয় নিত্য জ্ঞানস্বরূপ আত্মা। সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থায় আত্মা বুদ্ধিবৃত্তিগুলি প্রকাশ করেন বলিয়াও তাঁহাকে অপরিণামী জ্ঞানস্বরূপ বলিতে হয়।

এখন দেখা যাক্ পুরুষের অন্যান্য রূপ কি। পুরুষ নিত্যমুক্ত। তাত্ত্বিক বন্ধন পুরুষের নাই। তাত্ত্বিক বন্ধন পুরুষের হইলে পুরুষ হইতেন বদ্ধস্বভাব। কেহ কখনও কাহারও স্বভাব (অন্তরের অন্তর) ছাড়িতে পারে না। তাহা হইলে মুক্তি কথার কথা হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং বলিতে হইবে পুরুষের বন্ধন আরোপিত মাত্র। বুদ্ধিরই মোহজালে আমরা পুরুষকে বদ্ধ বলে মনে করি। সুতরাং পুরুষ স্বভাবতই মুক্ত। এঁর কোন কালেই দুঃখের সম্পর্ক নাই। আত্মা হচ্ছেন নিত্য শুদ্ধ। ইনি পাপপুণ্যের অতীত। পাপপুণ্য ত্রিগুণের কার্য্য। আত্মা ত্রিগুণের অতীত, সুতরাং উহাদের সংস্পর্শশূন্য। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ পূর্ব্বেই প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং ইনি নিত্যবুদ্ধ। এঁর চৈতন্যের লোপ কোন কালেই হয় না। আত্মা নিত্য। কাল আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। আত্মা কালের অধীন হইলে পরিণামী হইতেন। পরিণামী হইলে আর জ্ঞানস্বরূপ হইতে পারিতেন না। আর জ্ঞানস্বরূপ না হইলে যে সকল দোষ দুষ্পরিহার্য্য তাহা আগেই দেখান হইয়াছে। আত্মা বিভু অর্থাৎ সর্ব্বগত। এক কথায়, ইনি দিকের অতীত। আত্মার যখন মধ্যম ও অণু পরিমাণ সম্ভবপর হয় না, তখন ইঁহার অবশ্যই বিভু পরিমাণ স্বীকার করিতে হইবে।

আত্মাকে নির্গুণ বলিতে কি বুঝি? আত্মার কি কোনই গুণ নাই, না আত্মার বিশেষ গুণ নাই? বাচস্পতি মিশ্রের কথার ভাবে বুঝা যায় যে, তাঁর বিনাশশীল কোন গুণ নাই; কারণ, তিনি আত্মাতে সংযোগ গুণের অস্তিত্বও স্বীকার করেন নাই। বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন যে আত্মা নির্গুণ বলিলে বুঝিতে হইবে যে আত্মার বৈরূপ্যসাধক কোন গুণ নাই। সংযোগ প্রভৃতি গুণ উৎপত্তিবিনাশশীল হইলেও বৈরূপ্যসাধক নহে; কারণ, তাহারা আত্মার রূপান্তর ঘটায় না। আত্মাকে সাক্ষী বলা হয়। আত্মা সব সময় সাক্ষ্য দেন না। বুদ্ধির বৃত্তি হইলে আত্মা প্রকাশ করিবেন। বুদ্ধির ত সকল সময় বৃত্তি হয় না। বুদ্ধির বৃত্তি প্রকাশ করার নাম হচ্ছে সাক্ষ্য দেওয়া। আত্মা কাজেকাজেই সবসময় সাক্ষী হইতে পারেন না। সুতরাং আত্মাকে পরিণামী বলিতে হয়।

এই আশঙ্কার উত্তরে এই বলা যায় যে স্বীয় বুদ্ধির সহিত আত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে। এই সমস্ত আছে বলিয়াই আত্মাকে সাক্ষী বলা হয়। অন্যের সহিত এই সম্বন্ধ নাই। এজন্য অন্যের পক্ষে আত্মা হচ্ছেন দ্রষ্টা। এই জন্যই আত্মাকে সাক্ষী ও দ্রষ্টা বলা হয়। ইহাই হইল সাক্ষী ও দ্রষ্টার শাস্ত্রীয় ভেদ।

আত্মাকে ভোক্তা বলা হয়। ভোক্তা বলিতে আমরা কি বুঝি? আত্মার ভোক্তৃত্বই বা কিরূপে সম্ভব হয়? মিশ্র মতে প্রকৃত পুরুষের ভোগ কি তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। উক্ত মতে বুদ্ধিরই প্রকৃত ভোগ হয়। পুরুষের যদি ভোগই না থাকিল তাহা হইলে ভোগ্যের সত্তার দ্বারা ভোক্তার সত্তা প্রমাণ করা নিষ্প্রয়োজন। ভিক্ষুর মতে আমরা বুঝিতে পারি প্রকৃত ভোগ কি। সুখদুঃখের পুরুষে প্রতিবিম্বপাতের নাম ভোগ। সুখদুঃখ গ্রহণের নাম ভোগ। সুখদুঃখ গ্রহণ বলিতে আমরা বুঝি সুখদুঃখের আকার প্রাপ্তি। পুরুষ অবিকারী। সুতরাং তাঁর সুখ-দুঃখের আকার প্রাপ্তি সম্ভবপর নহে। সুখদুঃখের প্রতি-বিম্বপাত ছাড়া আর কোন প্রকারে পুরুষের ভোগ সম্ভবপর নহে। এখন একটী আশঙ্কা হওয়া সম্ভব যে পুরুষ কর্ত্তা নহেন—অকর্ত্তার ভোগ কেন হইবে? ইহার উত্তরে সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন যে রাজা প্রভৃতি যেমন অন্যের দ্বারা প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোগ করেন সেইরূপ পুরুষও বুদ্ধির কর্ম্মের ফলভোগ করেন। পুরুষ বুদ্ধির স্বামী। বুদ্ধিতে পুরুষের স্বত্ব আছে। সুতরাং বুদ্ধির কর্ম্মের ফলভোগে কোন অবিচারের বা অন্যায্য কল্পনার ভয় নাই।

এখন দেখা যাক্ পুরুষ আনন্দ স্বরূপ কি না। সাংখ্য সিদ্ধান্তে পুরুষ আনন্দ স্বরূপ নহেন। ভোজরাজ ও বিজ্ঞান

ভিক্ষু বিশেষ বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন যে পুরুষের স্বরূপ সুখ নহে। পুরুষে সুখের অভাবই আছে। আনন্দ সুখের নামান্তর। অলৌকিক আনন্দ বলে কোন পদার্থ নাই; যেহেতু যুক্তি বা শাস্ত্রের দ্বারা অলৌকিক আনন্দের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। শ্রুতিতে আত্মাকে স্পষ্টই নিরানন্দ বলা হয়েছে। আত্মাকে যেখানে যেখানে আনন্দময় বলা হইয়াছে, সেইখানকার শ্রুতির তাৎপর্য্য অন্য প্রকার। সেইখানে দুঃখাভাবকেই আনন্দ বলা হইয়াছে। অদ্বৈত বেদান্তবাদের সহিত সাংখ্যের এখানেই প্রবল বিরোধ। এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে গেলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের আবশ্যক; সুতরাং অল্প বিচারেই ক্ষান্ত হইলাম।

আর একটী স্থলে সাংখ্যের সহিত অদ্বৈতবাদের স্থায়ী বিরোধ। সেই স্থলটী হইতেছে যে পুরুষ বহু। সাংখ্যেরা বলেন যে পুরুষের বহুত্ব মানিতেই হইবে। পুরুষ যদি এক হয় তাহা হইলে সংসারে ভোগ-বৈচিত্র্য হইতেই পারে না। একই সময়ে একজন সুখী অপর একজন দুঃখী হইতেই পারে না। একই কালে একজনের মরণ ও অপরের জন্ম হইতেই পারে না। আত্মা যদি একই হন তাহা হইলে একের মুক্তিতে সকলের মুক্তি হওয়া আবশ্যক। শাস্ত্রে প্রমাণ পাওয়া যায় বামদেব ঋষি মুক্তিলাভ করিয়াছেন। শাস্ত্র বাক্যে অদ্বৈতবাদীর অনাস্থা নাই; সুতরাং তাঁহাদের মতে বর্ত্তমান সংসারের অস্তিত্ব প্রমাণ করা দুঃসাধ্য। এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন যে উপাধির ভেদে একই আত্মা নানাকারে প্রতিভাত হন। একই আকাশ যেমন ঘট-পটাদি উপাধির ভেদবশতঃ ঘটাকাশ, পটাকাশ, প্রভৃতি নানা আখ্যায় আখ্যাত হয়। সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন যে এই মত সঙ্গত নয়; কারণ নানা উপাধি এককে বহু বিরুদ্ধ রূপে প্রতীত করাইতে পারে না। ঘরের একদেশে যদি একটী লোক থাকে তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি না যে এই ঘরে লোক আছে অন্য ঘরে লোক নাই।

আর এক কথা—আত্মার এক অংশ ধরিলাম মুক্ত হইল; কিন্তু সেই অংশে উপাধি আসিলে পুনরায় সেই অংশ বদ্ধ হইবে; সুতরাং অদ্বৈত মতে নিজ সিদ্ধান্তের বিরোধী কথা মানিয়া লইতে হয় যে মুক্তেরও বন্ধন হইতে পারে। অদ্বৈত সিদ্ধান্তে আরও স্ফুটদোষ দেখা যায় যে, উপাধি হইল বহু; কিন্তু তাহার দ্বারা উপাধি-বিশিষ্ট বহু হয় না। উপাধিবিশিষ্টকে অতিরিক্ত স্বীকার করিলে বহু উপাধিবিশিষ্ট বহু হয় বটে, কিন্তু উপাধির নাশ না হইলে মুক্তি হয় না। আর উপাধির নাশ হইলে বিশিষ্টেরও নাশ হয়। বিশিষ্টের নাশ হইলে মুক্তি হবে কাহার? সুতরাং মুক্তিবাদ আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক বাক্যে পর্য্যবসিত হয়।

সাংখ্যাচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষু প্রতিবিম্ববাদেরও বহু সমালোচনা করিয়া নিরাস করিয়াছেন। তাঁর প্রধান কথা—প্রতিবিম্ব বিম্ব হইতে ভিন্ন, অভিন্ন বা ভিন্নাভিন্ন। যদি প্রতিবিম্ব ভিন্ন হয় তাহা হইলে উহা জড় ব্যতীত আর কিছুই নয়; সুতরাং উহা আত্মাই হইতে পারে না ও উহার মুক্তি হইতে পারে না। যদি অভিন্ন হয় তাহা হইলে সকলের এক রকম ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী। আর ভিন্নাভিন্ন যদি হয় তাহা হইলে অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত থাকে না ও ভেদ ও অভেদের বিরোধও দুষ্পরিহার্য্য হয়। এক্ষণে অদ্বৈতবাদীরা শ্রুতির আশ্রয় লইয়া বলিতে পারেন যে একাত্মবাদই বৈদিকবাদ; কারণ, শ্রুতি স্পষ্টই বলিতেছেন যে 'একমেবাদ্বিতীয়ং তত্ত্বমিত্যাদি'। ইহার উত্তরে বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন যে শ্রুতি এখানে অখণ্ডাত্মবাদ বুঝাইতেছেন না; কিন্তু আত্মগণের যে বৈধর্ম্ম্য নাই ইহাই বুঝাইতেছেন। কারণ আরও বহু শ্রুতি আছে যেখানে আত্মার ভেদ স্পষ্টই বলা হয়েছে। শ্রুতি বলিতেছেন যে 'এবং মুনের্বিজানতঃ আত্মা ভবতি গৌতম নিরঞ্জন। পরমং সাম্যমুপৈতীতি'। উক্ত শ্রুতিতে মোক্ষ দশায় পরম সাম্য প্রাপ্ত হয় এই কথার দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, উক্ত শ্রুতির আত্মার স্বরূপতঃ ভেদ বোধনেই তাৎপর্য্য; কারণ তথায় সাম্যপদের প্রয়োগ হইয়াছে ও সাম্যপদ ভেদঘটিত। এ বিষয়ে আর অধিক লিখিয়া পাঠকবৃন্দকে ধৈর্য্যচ্যুত করিতে চাহি না। কেবলমাত্র, অদ্বৈতবাদের অসাধারণ সহায় মহাকাব্যগুলির সাংখ্য-পক্ষে কিরূপে ব্যাখ্যা হইবে, তাহার ইঙ্গিত স্বরূপ বিজ্ঞান ভিক্ষুর আদ্য শ্লোকটী দিয়া অদ্যকার প্রবন্ধ শেষ করিব।

"একোঽদ্বিতীয় ইতি বেদ বচাংসিপুংসি
সর্ব্বাভিমাননিবর্ত্তনতোঽস্য মুক্ত্যৈ।
বৈধর্ম্ম্য লক্ষণ-ভিদা বিরহং বদন্তি
নাখণ্ডতাং খ ইব ধর্ম্মশতাবিরোধাৎ॥"

ব্রতচারিণী

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১)

"জ্যোতি—"

ঠাকুরদাদার গুরুগম্ভীর আহ্বান জ্যোতির্ম্ময়ের কাণে গিয়া পৌঁছিল। সে তখন নিজের কক্ষে একখানা বই লইয়া অন্যমনস্কভাবে তাহার পাতা উল্টাইতেছিল।

এ আহ্বানকে ঠেকাইয়া রাখিবার সাহস তাহার ছিল না; তাই তাড়াতাড়ি বই ফেলিয়া সে উঠিয়া পড়িল।

ঠাকুরদাদা বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় ভারী রাশভারি লোক। এমন লোক ছিল না যে তাঁহ'কে ভয় না করিত। জ্যোতির্ম্ময় তাঁহাকে বড় ভয় করিত। কোন দিন তাঁহার আহ্বান সে উপেক্ষা করিতে পারে নাই। তাঁহার মুখের উপর একটা কথা কহিবার সাহস তাহার কখনও হয় নাই।

বিহারীলাল নিজের কক্ষে বিছানার উপর মোটা তাকিয়াটায় ঠেস দিয়া বসিয়া ছিলেন। সম্মুখে গড়গড়ার উপরে কলিকায় সদ্যসাজা অম্বরী তামাক পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছিল, সে দিকে তাঁহাব দৃষ্টি ছিল না।

জ্যোতিঃ দরজার বাহির হইতে একবার উঁকি দিয়া দেখিল, ঠাকুরদার মুখের ভাবটা কি রকম। বিহারীলালের মুখখানা স্বভাবতঃই গম্ভীর, হাসি তাঁহার মুখে খুব কমই ফুটিত। লোকে বলিত উহা জমীদারী চাল। কিন্তু চালই হোক অথবা প্রকৃতই হোক, সকলকেই তাঁহার সম্মুখে সঙ্কুচিত হইতে হইত।

জ্যোতির্ম্ময় লক্ষ্য করিয়া দেখিল—আজ ঠাকুরদার মুখখানা বড় বেশী রকম গম্ভীর,—প্রশস্ত ললাটে কয়েকটা রেখাও ভাসিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার আহ্বান নিতান্ত সাধারণ ধরণের ছিল না; তাহাতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যাহা মাথার মধ্যে গোল বাধাইয়া দেয়। অপরাধ করিয়া গোপন করিবার প্রয়াস ব্যর্থ করিতে, অপরাধীকে সম্মুখে আনিতে যে আদেশ প্রচারিত হয়, ইহা ছিল তাহাই।

ঠাকুরদার আদরের খানসামা রাখাল দাস কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া খোকাবাবুকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া সে কারণটা বুঝিয়া লইল। সে বেশ বুঝিল বাবুর আর একটা ডাক না আসিলে খোকাবাবুর এ জড়তা দূর হইবে না। সে নিজেই খোকাবাবুর কুণ্ঠা দূব করিয়া দিবার জন্য একটু উঁচু সুরেই বলিল, "এই যে খোকাবাবু এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ঘরে চলুন, বাবু অনেকক্ষণ হ'তে আপনার খোঁজ করছেন।"

জ্যোতির্ম্ময়ের ইচ্ছা হইতেছিল তাহার পরিপুষ্ট গণ্ডে ঠাস করিয়া একটা চড় বসাইয়া দেয়; কিন্তু তত্দূর পৌঁছিতে

তাহার সাহস হইল না। মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে সে ভিতরে প্রবেশ করিল।

কর্ত্তাকে অত্যন্ত অন্যমনস্ক দেখিয়া রাখাল মনে করাইয়া দিল, "বাবু, তামাক পুড়ে যায়—"

বিহারীলাল সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, এই যে নেই। জ্যোতি এসেছে ?"

জ্যোতির্ম্ময় বিনীতভাবে সম্মুখে সবিয়া দাঁড়াইল।

রাখাল উত্তর দিল, "এই যে খোকাবাবু,—"

বিহারীলাল চোখ তুলিয়া পৌত্রের মুখের উপর ধরিলেন,—"তাই তো,—কখন এসেছ তা আমি জানতে পারি নি। বসো এখানে, কথা আছে। বিশেষ কোন কাজ করছিলে না তো ?"

জ্যোতির্ম্ময় মাথা চুলকাইয়া অত্যন্ত বিনীতভাবেই উত্তর দিল,—"না, একখানা বই দেখছিলুম।"

"আজকালকার রাবিশ নভেল তো ?"

ঠাকুরদাদা ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন।

জ্যোতির্ম্ময় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না দাদা, আমার পড়ার বই। আমি নভেল পড়ি নে।"

খুসি হইলেও সে ভাব ঠাকুরদার মুখে ফুটিল না, বলিলেন, "হ্যাঁ, রাবিশ নভেলগুলো পড়ো না, ওতে মনের মধ্যে ক্লেদ জমিয়ে দেয়। বাস্তবিক দেখেছি—নভেলের মধ্যে এমন সব ব্যাপার থাকে যাতে ছেলেদের মাথা একেবারে খারাপ করে দেয়,—তাদের জীবনটাই তারা নভেল বলে মনে করে। যাক গিয়ে, দাঁড়িয়ে রইলে কেন,—বসো।"

কুণ্ঠিতভাবে জ্যোতির্ম্ময় ফরাসের এক প্রান্তে বসিয়া পড়িল।

ঠাকুরদা তেমনি গম্ভীর মুখে তামাক টানিতে লাগিলেন। দেয়ালের ঘড়িতে টক টক শব্দ করিতে করিতে বড় কাঁটাটী মিনিটের পর মিনিটের ঘর ছাড়াইয়া চলিল। কতক্ষণ যে জ্যোতির্ম্ময় বেচারাকে এমনভাবে চুপচাপ বসিয়া থাকিতে হইবে সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না।

যখন গড়গড়ার নল হইতে আর ধূম বাহির হইল না তখন তিনি নলটা নামাইয়া রাখিলেন। দুইটী চোখের তীক্ষ্ণ তীব্র দৃষ্টি জ্যোতির্ম্ময়ের মুখের উপর রাখিয়া কোন ভূমিকা না করিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনলুম তুমি না কি বিলাতে যাচ্ছো ?"

কথাটা বড় গোপনেই ছিল। বন্ধুমহলে এ কথা লইয়া বেশ ঘোট চলিতেছিল ; কিন্তু সে গণ্ডী ছাড়াইয়া সে কথা কেমন করিয়া যে এতদূরে এই পল্লীগ্রামে রুক্ষ-প্রকৃতি দাদার কাণে আসিল—ইহাই আশ্চর্য্য। সুযোগ জুটিয়াছিল, বন্ধুদের উৎসাহ ছিল। সাহস করিয়া সে এখনও এ কথা বাড়ীতে তুলিতে পারে নাই, পাছে একটা গণ্ডগোল বাধে, তাহার আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ সম্মান সে লাভ করিয়াছিল, বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই তাহাকে বিলাতে প্রেরণ করা হইতেছিল।

ঠাকুরদা ইহাতে রাগ করিবেন—কিন্তু তাহা কয় দিন থাকিবে ? দুদিনে সে রাগ পড়িয়া যাইবে, আবার তিনি যে মানুষ তাহাই হইবেন। তাঁহার এই দুদিনের বিরক্তির ভয়ে সে এমন সুযোগ ছাড়িয়া দিবে ?

শিক্ষার এমন সুযোগ সে ত্যাগ করিতে পারিবে না ; কারণ তাহার অন্তরে জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল।

কথাটা শুনানো হইতই, তবে এমন ভাবে নয়। দূরে থাকিয়া পত্র দ্বারা জানাইলে ভয় বিশেষ থাকে না, জ্যোতির্ম্ময় তাহাই সঙ্কল্প করিয়াছিল। আজ সামনাসামনি সেই কথা শুনিতে ও বলিতে হইবে ভাবিয়া সে ঘামিয়া উঠিয়াছিল। মাথা নত করিয়া সে ভাবিতে লাগিল কোন্ বিশ্বাসঘাতক এ সংবাদ এখানে আনিল ? বিহারীলাল তাহার বিবর্ণ মুখখানার পানে তখনও তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন ; সে যতবার মাথা তুলিতে গেল সেই তীব্র দৃষ্টির জন্য ততবারই মাথা নত হইয়া পড়িল।

বিহারীলাল বলিলেন, "কথার উত্তর দিতে পারছ না কেন জ্যোতি,—কথাটা কি সত্য ?"

কি বলিবে তাহা জ্যোতির্ম্ময় ঠিক করিতে পারিতেছিল না। জীবনে কখনও সে মিথ্যা কথা বলে নাই, আজও সে এই সত্যটাকে মিথ্যার আবরণ দিয়া ঢাকিতে পারিতেছিল না। সে নতমুখে বসিয়া রহিল, ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল, সে উত্তর দিতে পারিল না।

"জ্যোতি—"

অকস্মাৎ তীব্র কঠোর বাণীর পরিবর্ত্তে এই শান্ত কোমল আহ্বান সেই একই মুখে শুনিতে পাইয়া বিস্ময়ে জ্যোতির্ম্ময় মুখ তুলিল। ঠাকুরদাদার মুখের সে ভয়াবহ গম্ভীরতা

নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া গিয়া শান্ত কোমলতা বিরাজ করিতেছে।

"তুমি কি পাগল হয়েছ জ্যোতি? তুমি বিলাত যাবে এ কথা মুখে বললেও অন্তরে এ ভাব কখনও পোষণ করতে পার না, এই কথাটী বললেই তো ফুরিয়ে যেত দাদু। আমি আজ অজ্ঞাত হাতের পত্রখানা পেয়ে একেবারে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলুম,—এ কি কখনও হতে পারে? হিন্দু ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে তুমি, বিধবা মায়ের সন্তান, বুড়ো ঠাকুরদাদার চোখের তারা,—আমার বংশের দুলাল, আমার শ্রাদ্ধাধিকারী, তোমার দ্বারা কি এমন কায হতে পারে দাদা? একবার মুখ ফুটে শুধু সেই কথাটী বল দেখি ভাই,—এ কথা সম্পূর্ণ মিছে; খেয়ালের বশে কোন দিন মুখে আনলেও কাযে এ কখনই করতে পার না।"

বৃদ্ধ দেখিতেছিলেন—বয়ঃপ্রাপ্ত পৌত্র,—বলপ্রকাশে নিজের মান যাইবার সম্ভাবনা,—কৌশলে স্বকার্য্য উদ্ধার করিতে হইবে।

সমুদ্র পার হইলেই যে অহিন্দুর দেশ হয় এবং সেই দেশে গেলে হিন্দুর জাতিপাত হয়, ইহা দেশের প্রবীণদের মজ্জাগত ধারণা হইয়া আছে, তাহা জ্যোতির্ম্ময় বেশ জানিত। এই সব গোঁড়ামীর জন্যই জ্যোতির্ম্ময় হিন্দুধর্ম্মে শ্রদ্ধা হারাইয়াছিল।

জ্যোতির্ম্ময় ধীর কণ্ঠে বলিল, "বিশ্ববিদ্যালয় হতে আমায় পাঠাবার কথা হচ্ছে, বিজ্ঞান শিখবার—"

দীপ্ত হইয়া উঠিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "চুলোয় যাক তোমার বিশ্ববিদ্যালয়। যে ছেলে ভাল হবে তাকেই যে বিলাত পাঠাতে হবে এমন কোন কথা থাকতে পারে না। ওই যে তোমাদের মনে কি ধারণা জন্মে গেছে বিলেতে না গেলে যথার্থ শিক্ষা হয় না, এও কি একটা কথা হতে পারে? যারা মানুষ হতে চায় তারা এই দেশের শিক্ষাতেই মানুষ হতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস, যেমন বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, হেমচন্দ্র প্রভৃতি হয়েছেন। তুমি কি বলতে চাও এঁরা বিলেতে যান নি বলে যথার্থ শিক্ষা লাভ করেন নি? তোমরা বলবে—বিলেতে না গেলে সম্পূর্ণ ভাবে শেখা যায় না, এ সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। সব ছেড়ে দিয়ে আমি বলছি হাঁা, সে দেশে গেলে আর কিছু না হোক বিলাসিতা শেখা যায় বটে। এই যে হাজার হাজার বিলেত-ফেরত কালা-সাহেব আমাদের দেশে রয়েছেন, দেখাও এঁরা বিশেষভাবে কতখানি শিক্ষা পেয়েছেন। এঁরা যদি উপার্জ্জন করেন দৈনিক এক শিলিং, ব্যয় করে বসেন এক গিনি। এতেই বোঝা যায়, কতখানি আর কি শিক্ষা এঁরা পেয়েছেন। এঁরা আরও শিখেছেন—দেশকে—বিশেষ করে দেশবাসীকে ঘৃণা করতে। পল্লীগ্রামে যারা এককালে বাস করত, দুদিন সহরবাসী হয়ে তারা যেমন পল্লীগ্রামকে ঘৃণা করতে শেখে, পল্লীর জল হাওয়া আর তাদের সহ্য হয় না, পাকা সহরে চাল দেখায়,—এই সব বিলেত-ফেরতরাও দু' পাঁচ বছর বিলেতে কাটিয়ে এসে তেমনি—বা ততোধিক নিজেদের দেশকে ঘৃণা করে, দেশবাসীকে ঘৃণা করে। এরা এই দেশেরই টাকা নেবে, নিজেদের বিলাসিতায় তা খরচ করবে, অথচ এমন ভাব দেখাবে যেন এ দেশে বাস করে তারা এ দেশকে ধন্য করে দিচ্ছে। দেশের আচার ব্যবহারকে এরা অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে, প্রাণপণে এ সব এড়িয়ে চলে। ধর্ম্ম এদের কাছে ছেলেখেলার জিনিস, প্রচলিত ঠাকুর-দেবতার মূর্ত্তি হয় পুতুল, শালগ্রাম হয় পাথরের নুড়ি। দেবতার কাছে মাথা নোয়ানো দূরে যাক, পাছে দেখতে হয় এই ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে এরাই। ব্রাহ্মণের ছেলে পৈতা ফেলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। আহারে বিহারে, ব্যবহারে এরা খাঁটি ইংরাজকেও চমক লাগিয়ে দেয়! অনুকরণপ্রিয় বাঙ্গালী যতদিন না নিজেকে সংযত করতে পারবে, ততদিন তার ঘর ছেড়ে বাইরে যাওয়াই অন্যায়। তাই বলছি, যদি কোন দিন তুমি বিলেতে যেতে চাও, জেনো—কখনই আমি অনুমতি দেব না।"

ঠাকুরদার দীর্ঘ বক্তৃতায় জ্যোতি বাধা দিল না, কথা শেষ হইলে সে একটা কথাও বলিল না, যেমন চুপচাপ বসিয়া ছিল, তেমনি বসিয়া রহিল। বিহারীলাল শ্রান্তভাবে তাকিয়ার উপর ঠেস দিলেন; আবার বলিতে লাগিলেন, "তোমার পরে আমার কতটা আশা ভরসা আছে তা কি তুমি জানো জ্যোতি? বুড়ো হয়েছি, কবে মরে যাব তার ঠিক নেই। বড় আশা করে তোমার বাপ ও কাকাকে মানুষ করেছিলুম, নিজে তাদের শিক্ষার ভার নিয়েছিলুম, উপযুক্ত রকমে শিক্ষা দেওয়া আমার সার্থক হয়েছিল। এরা দু'ভাই একজন বি-এ, একজন এম-এ পাস করেই পণ্ডিত হয় নি, রীতিমত সংস্কৃত পড়েছিল, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র

পড়ে’ছল। এরা কেউ আজকালকার ছেলেদের মত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ গাঁজাখোরের তৈরী বলে উড়িয়ে দিত না। ভগবান আমার সকলে সুখে বাদ সেধেছেন জ্যোতি, তাই বড় ছেলে তোমার বাপকে যখন হারালুম, তখন আমার বয়স প্রায় পঞ্চাশ, তোমার বয়স মাত্র তিন। তারপর তোমার কাকা—আর, কয়দিনের কথা সে জ্যোতি, সেও আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে গেল। আমি সব শোক—সব দুঃখ ভুলে গেছি দাদু,—শুধু তোর দিকে চেয়ে, তোকে নিয়ে আমি সব ভুলে রয়েছি।”

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস তিনি কোন মতে দমন করিতে পারিলেন না।

ব্যথিত কণ্ঠে জ্যোতি ডাকিল, “দাদু, আমায় মাপ করতে হবে, আমি যাব না।”

শান্তমুখে বিহারীলাল বলিলেন, “হাঁ, তাই মনে রেখে দিয়ো ভাই। মনে রেখো, তুমি ছাড়া এই বুড়োর আর কেউ নেই। আর কয়দিন বাঁচব ভাই, প্রায় সত্তর বছর বয়েস হল, নেহাৎ সেকালের হাড় বলে এখনও বেঁচে আছে। মনে রেখো, আমার পিণ্ড তোমায় দিতে হবে, মুখঅগ্নি তোমায় করতে হবে, আর আমার কেউ নেই। যাও দাদা, আর আমার কথা নেই।”

নতমুখে জ্যোতির্ম্ময় বাহির হইয়া গেল। বিহারীলাল রাখালের পানে হাসিমুখে চাহিয়া বলিলেন, “আর এক ছিলিম তামাক দে রাখাল! বুঝলি রে, ও পত্রখানা একেবারে মিথ্যে লেখা। জ্যোতি না কি ব্রাহ্ম হবে ব্রাহ্মের মেয়ে বিয়ে করে বিলেত যাবে,—হাঁ রে, এ কখনও হতে পারে, বল দেখি? আমি আগেই জেনেছি—ও যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অতগুলি ছেলের মধ্যে ভাল হয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে ওর অনেক শত্রুর সৃষ্টি হয়েছে। এ পত্র ওর কোন শত্রুর লেখা, এ ঠিক বলে দিচ্ছি। আমি সব বুঝি রে, সব জানি। আমার সন্দেহ হচ্ছে এ পত্র আর কারও নয়, তাদের। যাই হোক, আমি বিশ্বাস করছি নে, সে জানা কথা।”

পরম শান্তিতে তিনি তামাক টানিতে লাগিলেন।

(২)

বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় নিকষ কুলীন ছিলেন। এখনও অনেক অতি বৃদ্ধ বৃদ্ধার মুখে কৌলিন্যের গৌরব শুনিতে পাওয়া যায়; বিহারীলালও নিজেদের কুলীনত্বের কথা ভাবিয়া গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিতেন। তাঁহার পিতা যে কয়েকটী বিবাহ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে যিনি ঘরণী গৃহিণী ছিলেন, বিহারীলাল তাঁহারই পুত্র।

কুলীন হইলেও বিহারীলাল পূর্ব্বপুরুষের পন্থানুসরণ করেন নাই; তিনি একটী মাত্র বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুইটী মাত্র পুত্রও ছিল,—জ্যেষ্ঠ জ্যোতির্ম্ময়ের পিতা প্রকাশ; কনিষ্ঠ প্রতাপ, তাঁহার একটীমাত্র কন্যা ইভা বর্ত্তমান।

জ্যোতির্ম্ময়ের মাতা ঈশানী বর্ত্তমানে এ সংসারের গৃহিণী, ইভার মাতা এখানে থাকিতেন না।

প্রতাপের বিবাহ হইয়াছিল কলিকাতায়; তাঁহার স্ত্রী বেশ শিক্ষিতা মেয়ে ছিলেন। পল্লীগ্রামে আসিয়া তিনি প্রথমবারেই হাঁপাইয়া উঠিয়াছিলেন, জানিতে পারিয়া বিহারীলাল পুত্রবধূকে সেই যে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন—আর আনেন নাই। পৌত্রী জন্মিয়াছিল সে সংবাদও তিনি পাইয়াছিলেন। মন বিচলিত হইয়া উঠিলেও তিনি পৌত্রীর জন্য পুত্রবধূকে আর এখানে আনেন নাই। প্রতাপ অতি কষ্টে অন্যকে দিয়া একবার কথাটা তুলিয়াছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ তাঁহাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, “আমার জন্যে তাঁকে এখানে এনে দরকার নেই প্রতাপ, জা নাই তো,—এখানে এলে বউমার ভারি কষ্ট হয়! তোমার মেয়েটীও মায়ের কাছে সেখানে থাক, ভগবান দিন দিলে যে কোন রকমে একবার তাকে দেখতে পাবই, সে জন্যে এখন ব্যস্ততা নিষ্প্রয়োজন। তুমি বরং মাঝে মাঝে সেখানে যেয়ো, তাদের দেখেশুনে এসো। আমি যে এখন পৌত্রীকে দেখতে পেলুম না এতে আমার একটুও দুঃখ নেই।”

দুঃখ যে নাই তাহা প্রতাপ জানিতেন। পিতার বুকটা অসহ্য বেদনায় ফাটিয়া গেলেও তিনি তাহা প্রকাশ করিবেন না, পুত্রের কাছেও নয়। পিতৃভক্ত পুত্র পিতার বিরক্তি ও দুঃখ উৎপাদন করিতে স্ত্রীকে আর এখানে আনিবার প্রস্তাব করেন নাই; কিন্তু ইভাকে একবার না দেখাইয়া থাকিতে পারিলেন না।

চতুর্থবর্ষীয়া বালিকা ইভা পিতার সহিত এক দিনের জন্য রামনগরে আসিয়াছিল। পদ্মফুলের মত মেয়েটীকে পিতামহ বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন, আনন্দে তাঁহার দুই চোখ দিয়া জলধারা গড়াইয়া পড়িল।

পিতার স্নেহ দেখিয়া প্রতাপের প্রাণ বিগলিত হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "ইভা এখানেই থাক না, বাবা, বউদির কাছে সে বেশ থাকতে পারবে এখন। জ্যোতির সঙ্গে ওর খুব আলাপ হয়ে গেছে, দুজনে বেশ খেলছে।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "না প্রতাপ, আমি তা পারব না, এতটুকু শিশুকে মাতৃহারা করবার মত সাহস আমার নেই। তুমি ইভাকে যেখান হতে এনেছ, সেইখানে রেখে এসো। বড় হয়ে স্বেচ্ছায় যদি আসতে চায় তখন আসবে।"

প্রতাপ বিকৃতমুখে বলিলেন, "বাবা, গোখরো সাপ কখনও বিষহীন ঢোঁড়া হয় না তা তো জানেন। বড় হয়ে ইভা যে শিক্ষা পাবে তা বুঝতে পারছেন তো, তবে কেন ওকে সেখানে পাঠাতে চাচ্ছেন? তাদের বাড়ীর আচার বিচার আলাদা, শিক্ষা আলাদা। সে সংসারে যে মানুষ হবে সে যে আমাদের সঙ্গে ঠিক মিলতে পারবে না, তা আপনিও তো জানেন বাবা। ইভা শিশুমাত্র, তাকে সে সংসর্গ ছাড়াতে পারলে আমাদের উপযুক্তভাবে গঠন করে নেওয়া যাবে। সে সংসর্গে বড় হলে,—যে শিক্ষা যে আচার ব্যবহার তার মনে প্রাণে বদ্ধমূল হয়ে যাবে, তা কি আর দূর করা যাবে? সেখানে রাখলে ঘরের মেয়ে যে একেবারেই পর হয়ে যাবে বাবা?"

বিহারীলাল শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "ভগবানের যদি তাই ইচ্ছা হয় তবে অবশ্যই তা হবে প্রতাপ, তুমি আমি চেষ্টা করলেই কি তা খণ্ডন করতে পারব? তাই বলে মায়ের বুক হতে জোর করে সন্তান কেড়ে নিয়ে যে নিজের কাছে রাখবে, তোমার বাপকে এমন নির্ম্মম পাষণ্ড মনে করো না।"

ইহার পর প্রতাপ ইভাকে তাহার মায়ের কাছে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলেন।

তিনি আরও দুই একবার স্ত্রীকে রামনগরে পিতার নিকটে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু জয়ন্তী কিছুতেই পল্লীগ্রামে আসিতে আর রাজি হন নাই, ইভাকেও আর আসিতে দেন নাই। অপমানিত ও বিরক্ত প্রতাপ নিজেই কলিকাতায় শ্বশুরালয়ে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন

কয়েক বৎসর পরে প্রতাপ অত্যন্ত কঠিন ব্যারামে পড়িলেন। তখন তাঁহার নিষেধ উপেক্ষা করিয়া বিহারীলাল পুত্রবধূকে সংবাদ দিলেন। দুই দিন পরে জয়ন্তী যেদিন কন্যাসহ রামনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সেইদিনই প্রভাতে প্রতাপ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। শব তখন শ্মশানে। বিহারীলাল পৌত্রকে সঙ্গে লইয়া পুত্রের সৎকার করিতে গিয়াছেন। কথাটা ভাবিতেও হৃদয় ফাটিয়া যায়,—পিতৃভক্ত উপযুক্ত দুইটী পুত্রই চলিয়া গেল,—মরণ-পথযাত্রী পিতা বাঁচিয়া রহিলেন, দুইটী পুত্রের সৎকার করিলেন!

সে আজ চার বৎসর পূর্ব্বের কথামাত্র, জ্যোতি তখন থার্ডইয়ারে উঠিয়াছে। প্রতাপের বড় ইচ্ছা ছিল জ্যোতিকে মানুষ করিয়া দেখিয়া শুনিয়া যাইবেন; কিন্তু নিষ্ঠুর কাল তাঁহার আশা পূর্ণ হইতে দিল না।

সেদিন সন্ধ্যার পরে দাহ শেষে বৃদ্ধ পিতা কিছুতেই বাড়ী আসিতে পারিতেছিলেন না,—জ্যোতির্ম্ময় তাঁহাকে অতি কষ্টে ধরিয়া আনিয়াছিল। বাড়ী আসিয়াই তিনি শুইয়া পড়িয়াছিলেন, আর উঠিতে পারেন নাই।

পরদিবস প্রাতে তিনি শুনিতে পাইলেন পুত্রবধূ ও পৌত্রী আসিয়াছে। তাঁহার মাথার মধ্যে দপ্ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল! অকস্মাৎ চেঁচাইয়া উঠিয়া তিনি বলিলেন, "বউমা, ওদের এখনি আমার বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বল; আমি আর ওদের মুখ দেখতে চাইনে, ওদের সঙ্গে আমার আর কোনও সম্পর্ক নেই।"

উষ্ণ-প্রকৃতি জয়ন্তী অভিমানে কাঁদিয়া তৎক্ষণাৎ কন্যা লইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। জ্যোতির্ম্ময়ের মাতা ঈশানী তাঁহার হাত দুখানা ধরিয়া শান্ত, সংযত কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি করছ কি ভাই ছোট বউ, ঠাকুরের কথা শুনে রাগ করে চলে যাচ্ছো কোথায়? ওঁর কি এখ মাথার ঠিক আছে,—এ রকম সময়ে কারও কি মাথার ঠিক থাকে ভাই? যাঁর বয়স সত্তর বছর হয়েছে,—উপযুক্ত দুটি ছেলে, নাতি, নাতনী রেখে কোথায় তিনি আজ যাবেন, তা না হয়ে সেই দুটী ছেলে গেল, তিনিই তাদের দাহ করে এলেন,—ভাব দেখি কি রকম তাঁর অবস্থা? এমন শোকে মানুষ যে পাগল হয়ে যায় বোন, ভাব দেখি। ওঁর দিকে একবার চাও, তার পরে রাগ করো।"

জয়ন্তী চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "শুধু তো ওঁর ছেলেই যায়নি দিদি, আমারও স্বামী গেছে, ইভুরও বাপ গেছে। শোক যে ওঁর একার শুধু নয়, আমাদেরও বটে, এই কথাটা একবার ভাবলে হতো না কি? না ভাই,

দিদি, আমায় এখানে তুমি থাকতে বল না; এ রকম অপমান সয়ে আর কেউ থাকলেও থাকতে পারে—আমি পারিনে। আমারই বা কি ভাই,—তাঁর যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ফুরিয়ে গেছে। মেয়েটীকে নিয়ে যেখানে সেখানে প'ড়ে থাকব;—বিধবার ভাবনাটাই বা কি, তুচ্ছ দুটো ভাত খাওয়ার জন্যে—যেখানে খুসি থাকলেই হল।"

ঈশানী আর কথা কহিতে পারিতেছিলেন না, নীরবে অঞ্চলে চোখের জল মুছিতে লাগিলেন।

তাঁহার সকল অনুনয় ব্যর্থ করিয়া অস্নাতা, অভুক্তা জয়ন্তী, তখনই কন্যাকে লইয়া গোযানে উঠিয়া বসিলেন। ঈশানী আর্ত্তভাবে কাঁদিয়া বলিলেন, "চললে ছোট বউ? এখনও নিজের ভালমন্দ বুঝতে পারলে না, কিন্তু এর পর এই কাযের জন্যেই তোমায় অনুতাপ করতে হবে।"

জয়ন্তী গোপনে চক্ষু মুছিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, "না দিদি, আমি জানি—এর জন্যে আমায় কোন দিনই অনুতাপ করতে হবে না। এখন বরং আমার এখানে থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল, আমার বুদ্ধিতে আমি এই বুঝছি।

সেই ঘটনার পর সুদীর্ঘ চারটী বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। জ্যোতির্ম্ময় এখন চতুর্ব্বিংশতিবর্ষীয় যুবক, ইভা পঞ্চদশবর্ষীয়া কিশোরী। জ্যোতির্ম্ময় কলিকাতায় বোর্ডিংয়ে থাকিত। সে স্থান হইতে ইভার মাতুলালয় খুব কাছে ছিল। প্রায় প্রত্যহই সে ইভার সহিত দেখা করিত। বিহারীলাল পুত্রবধূর উপর বিরক্ত হইয়া ইভার সহিত সকল সম্পর্ক উঠাইয়া দিয়াছিলেন, জ্যোতির্ম্ময় উঠাইতে পারে নাই, কারণ ইভাকে সে বড় ভালবাসিত। বাস্তবিকই ইভাকে যে দেখিত, সে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না।

ইভার মামা বড় ডাক্তার ছিলেন। তিনি বিলাত হইতে নিজের নামের পিছনে এম-ডি উপাধি জুড়িয়া আনিয়া দেশে জাঁকিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার দুইটী কন্যা, একটী পুত্র। পুত্র রবীন্দ্র জ্যোতির্ম্ময়ের সমবয়স্ক। উভয়ে একসঙ্গে এবার পরীক্ষা দিতেছে। পরীক্ষা সমাপনান্তে সে বিলাতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল।

প্রফেসর সুরেশ মিত্র জ্যোতির্ম্ময়কে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন অনেক সময় অনেক সাহায্য করিতেন। ইনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম ছিলেন। বিজ্ঞানে জ্যোতির্ম্ময়ের অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়া তিনিই বিশেষ করিয়া সকলের চক্ষু তাহার দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, এবং তাহাকে বিলাতে পাঠাইয়া শিক্ষা দেওয়ার সম্বন্ধে তিনিই বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন।

তিনি জ্যোতির্ম্ময়কে উৎসাহিত করিতেছিলেন, তাঁহার স্ত্রী, কন্যা দেবযানী সকলেই জ্যোতির্ম্ময়কে উৎসাহ দিতেছিলেন। দেবযানী সেকেণ্ড ইয়ারে পড়িতেছিল। জ্যোতির্ম্ময় সকল সময়েই প্রফেসরের বাড়ীতে যাতায়াত করিত এবং পড়ায়, অঙ্কে, দেবযানীকে সাহায্য করিত।

এই ব্রাহ্ম পরিবারের উৎসাহ পাইয়া জ্যোতির্ম্ময়ের মনের কুণ্ঠিত ভাবটা দূর হইয়া গিয়াছিল। সুরেশবাবু তাহাকে বুঝাইয়াছিলেন,—সে এতটা লেখাপড়া শিখিয়া পল্লীগ্রামে গিয়া তাহার দাদুর মত জীবন যাপন করিতে কখনই পারিবে না। জ্যোতির্ম্ময়ও তাহাই বুঝিয়াছিল, পল্লীগ্রামের উপর তাহার কেমন একটা বিসদৃশ ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছিল। তাহার পিতার কথা মনে ছিল না; কারণ, সে তখন মাত্র দুই বৎসরের। কিন্তু, কাকাকে সে দেখিয়াছিল, কাকার পরিচয়ও পাইয়াছিল। প্রতাপ বি-এ পাস করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তর নিস্পৃহ ছিল। পল্লীগ্রামে থাকিয়া পল্লীর হিতসাধন তিনি জীবনের ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিলাত যাইবার কথায় দাদুর মুখভাবটা কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, তাহা কল্পনায় আঁকিয়া জ্যোতির্ম্ময় সে কথা সাহস করিয়া এ পর্য্যন্ত কাহাকেও বলিতে পারে নাই। এতদিন সে এখানে আসিয়াছে,—কথাটা বলি বলি করিয়াও বলিতে পারে নাই, পাছে সে কথা কোন প্রকারে কঠোর প্রকৃতি দাদুর কাণে উঠিয়া পড়ে। দাদু যে কি প্রকৃতির লোক, একমাত্র হিন্দু ছাড়া আর সকল জাতিকে কতখানি ঘৃণার চক্ষে দেখেন, তাহা সে বেশ জানিত। ব্রাহ্মদের বিশেষ করিয়া তিনি দেখিতে পারিতেন না, এবং ইহাদের যে কোন ধর্ম্মই নাই, ইহা মুখে তিনি স্পষ্ট বাক্যে প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না।

এই কঠিন বিচারকের সম্মুখে আপনিই মাথা নত হইয়া পড়িত, কথা একটাও ফুটিত না। কাযেই ঠাকুরদার মনে যে ধারণা বদ্ধমূল ছিল তাহা দূর করার ক্ষমতা জ্যোতির্ম্ময়ের থাকিয়াও ছিল না।

(৩)

সন্ধ্যার ধূসর ছায়া ধীরে ধীরে গ্রামবক্ষে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। পশ্চিম গগনের আলো ক্রমে নিভিয়া আসিতেছে। দূরে দূরে অন্ধকার ঘন হইয়া আসিতেছে। এদিকে মাথার উপরে একটু পশ্চিম দিক হেলিয়া পঞ্চমীর চাঁদখানা শৃঙ্গাকারে ভাসিয়া উঠিয়াছে, তাহার আলো এখনও ধরার গায়ে ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। আকাশের গায়ে একটী দুইটী করিয়া নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিতেছে মাত্র, এখনও ভাল করিয়া ফুটিতে পারে নাই। সন্ধ্যার উতল বাতাস বাতাবী লেবুর ফুলের গন্ধ লুটিয়া লইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে।

নিস্তব্ধ গ্রাম্য নদীর তীরে খানিকটা বেড়াইয়া জ্যোতির্ম্ময় বাড়ী ফিরিতেছিল। মনটা তাহার দারুণ চিন্তামগ্ন। আজ তাহার মনে একটুও সুখ শান্তি ছিল না। দাদুর মুখে আজ যে কথা সে শুনিয়াছে, তাহাতেই তাহার উৎসাহ সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে।

গ্রাম্য বধূরা তখন গৃহে গৃহে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বলিতেছিল; প্রতি গৃহ হইতে সরু, মোটা মাঝারি—বিচিত্র স্বরে, একই সময়ে অনেকগুলি শঙ্খ নিনাদিত হইতেছিল। সেই শব্দে নীরব ব্যোমপথ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পথের দুই পার্শ্বে ঝোপে ঝোপে অন্ধকার বেশ ঘনভাবে সাজিয়া দাঁড়াইয়াছিল। পঞ্চমীর চাঁদখানা যখন পশ্চিমে ডুবিয়া যাইবে, তাহারা তখন সমস্ত স্থানটা জুড়িয়া রাজত্ব করিবে।

জ্যোতির্ম্ময় প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্য চোখে শুধু দেখিয়া যাইতেছিল, কিছুই আজ তাহার অন্তর স্পর্শ করিতে পারিতেছিল না। সবই যেন একঘেয়ে হইয়া গিয়াছে,—নূতনের বিশেষত্ব আজ যেন কিছুর মধ্যেই ছিল না। তাহার অন্তরের উচ্চ ধারণা বিলীনপ্রায়,—অন্তরে আশা লুটাইয়া কাঁদিতেছিল—হইল না, কিছুই হইল না, সবই ব্যর্থ হইয়া গেল। আর দশজন ছেলে যা, সেও তাহাই হইয়া রহিল, নূতন কিছু তাহার মধ্যে বিকশিত হইতে পারিল না, সে মানুষ হইতে পারিল না।

এবার যখন সে কলিকাতায় ফিরিবে—কেমন করিয়া কোন্ মুখে সে বলিবে সে যা তাহাই থাকিবে? সুরেশবাবুর কথার মধ্যে সে একটা আশার বাণী শুনিতে পাইয়াছে,—সেই আশায় তাহার সারা অন্তর পূর্ণ,—যে সে বিলাত হইতে ফিরিয়া দেবযানীকে বিবাহ করিতে পাইবে, তাহার জীবনের সুখস্বপ্ন সফল হইবে।

ব্যর্থ হওয়ার কষ্ট হয় তো তাহার বুকে এত লাগিত না যদি না মাঝখানে দেবযানী থাকিত। দেবযানীকে বিবাহ করিতে না পাইলে তাহার জীবন একটা দুঃখময় স্বপ্নে পরিণত হইবে মাত্র। দেবযানীকে পাইবার আশা করিলে তাহাকে বিলাত যাইতেই হইবে।

আজ সে মাতাকে সকল কথা খুলিয়া বলিবে ভাবিতেছিল। ঠাকুরদার কাছে সে একটী কথাও বলিতে পারিবে না। মাও কখনো তাঁহার সহিত অত্যাবশ্যক প্রশ্নোত্তর ছাড়া অন্য কথা নিজে যাচিয়া বলিয়াছেন তাহা মনে পড়ে না। মা যদি পুত্রের হৃদয়ের দুঃখ ভাবিয়া প্রস্তাবটা ঠাকুরদার কাছে তাহার অনুপস্থিতিতে করিতে পারেন, এই একটা তাহার লক্ষ্য ছিল। বিহারীলাল ঈশানীর কথার কখনও অন্যথা করিতেন না, একমাত্র ঈশানীর কথা ছাড়া তিনি আর কাহারও কথা কাণে তুলিতেন না। সাত বৎসরের মেয়েটীকে পুত্রের সহিত বিবাহ দিয়া তিনি গৃহে আনিয়াছেন। পিত্রালয়ে কেহ না থাকায় সেই পর্য্যন্ত ঈশানী এখানেই রহিয়া গিয়াছেন। এতটুকু বেলা হইতেই তিনি বড় শান্ত-প্রকৃতির ছিলেন, বেশী কথা বলা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল।

তিনি যাহাই হোন না,—জ্যোতির্ম্ময়ের তিনি স্নেহশীলা জননী। একমাত্র পুত্রের জীবনটা যে তিনি ব্যর্থ হইতে দিবেন না, ইহা জ্যোতির্ম্ময় বেশ জানিত।

বাড়ী পৌঁছিয়া সে বরাবর উপরে চলিয়া গেল। ঈশানী তখন পূজার ঘরে সন্ধ্যাহ্নিক করিতে বসিয়াছেন।

ভেজানো দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া জ্যোতির্ম্ময় ডাকিল, —"মা—"

ঈশানীর আহ্নিক তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল; তিনি ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়া বাহির পানে তাকাইতেই জ্যোতির্ম্ময়ের দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলিয়া গেল। সঙ্কেতে তাহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া তিনি নতজানু হইয়া প্রণাম করিলেন। গৃহদেবতা শ্রীধরের কাছে মনে মনে প্রার্থনা করিলেন,—"ঠাকুর, নিজের জন্যে কোন দিন কিছু প্রার্থনা করি নি, জ্যোতির জন্যে তোমার কাছে প্রার্থনা নিত্য করি। আজও তারই জন্যে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি ঠাকুর, তার মনকে ফিরাও, তাকে উচ্ছৃঙ্খল হতে

দিয়ো না, তাকে সংযত রাখো। ঠাকুর, এতকাল তার দীর্ঘজীবনই কামনা করে এসেছি, তার লেখাপড়ার কামনা করেছি,—তার ধর্ম্মের জন্যে তো প্রার্থনা করি নি দেবতা,—আজ সেই প্রার্থনাই যে করছি। দয়াময়, তাকে তার মায়ের বুক হতে ছিনিয়ে নিয়ো না, তাকে ভাসিয়ে দিয়ো না। সে তোমার ভক্তের বংশধর, সে যদি ভেসে যায়, সে যদি উচ্ছৃঙ্খল হয়, তা হলে তোমারই যে পূজা হবে না নারায়ণ।"

গৃহদেবতার সেবা হইবে না—এই কথাটা মনে করিতে তাঁহার দুই চোখ দিয়া দর দর ধারে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। বংশের প্রদীপ সে এমনি করিয়াই সকলকে ব্যথা দিয়া একেবারে পর হইয়া যাইবে? প্রভু, তুমি না কি বড় জাগ্রত দেবতা;—ওগো, যদি ঘুমাইয়া থাক তবে জাগো,—ওগো, জাগো,—তোমার ভক্তবংশ যেন লুপ্ত হইয়া না যায়।

হাঁ, লুপ্ত হইয়া যাওয়া বই আর কি। সে ব্রাহ্মণ-সন্তান হইয়া যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিবে, কায়স্থ কন্যা বিবাহ করিবে, ম্লেচ্ছের দেশে যাইয়া কদাচার করিবে। তাহার—সেই ধর্ম্মত্যাগী সন্তানের জলগণ্ডুষ কি পূর্ব্বপুরুষেরা লইতে পারিবেন, দেবতা কি তাহার সেবা লইবেন? তাহার পিতামহ ধর্ম্মত্যাগী পৌত্রকে ত্যাগ করিবেন, মা তাহাকে আর বুকের মধ্যে লইতে পারিবেন না, এ সব কথা মনে করিতেও যে মায়ের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে স্বর্ণ-সিংহাসনস্থিত শ্রীধরের পানে চাহিলেন,—"ঠাকুর, পাগলা ছেলের মনের গতি পরিবর্ত্তিত কর, জ্যোতির জননী তোমার পৃথক সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।"

দ্বিতলের কোন গৃহেই জ্যোতির্ম্ময়কে দেখিতে পাওয়া গেল না; জনৈকা দাসী বলিয়া দিল,—"খোকাবাবু ছাদে গেছেন।"

মায়ের প্রণাম করিতে অসম্ভব রকম বিলম্ব দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময় বিলক্ষণ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। একটা পাথরের নুড়ি বই তো নয়, ইহাকে এতটা ভক্তি লোকের আসে কোথা হইতে? ইহাদের অজ্ঞতা দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময়ের একটু যে দুঃখ হইত না তাহা নহে। বেচারারা জানে এটা সামান্য একটা পাথর মাত্র। দেবতা কিছু নির্দ্দিষ্ট একটা এতটুকু পাথরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারেন না। যিনি সমস্ত জগতে ছোট বড় সকল বস্তুর মধ্যে বিরাজমান, তিনি না কি কোন বস্তু বিশেষে আবদ্ধ থাকিতে পারেন। ইহারা জানিয়া শুনিয়া তবু নিত্য এই পাথরের নুড়িটাকে পূজা করিবে। মাটীর পুতুলকে কত বহুমূল্য বস্ত্র দিয়া সজ্জিত করিবে, দেখিলে হাসি রাখা দায়। সে যখন বালক ছিল, সকলের দেখাদেখি সেও এই মাটীর পুতুলকে অসীম ক্ষমতাশালী বলিয়া ভাবিত এবং প্রণাম না করিলে কোন একটা ভীষণ শাস্তির কল্পনা করিয়া শিহরিয়া উঠিত। বিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা সে এখন বুঝিয়াছে ভগবান বলিয়া কিছুই নাই, সব সেকালের কতকগুলি অশিক্ষিত লোকের কল্পনা মাত্র। তাহারা বাতাসকে রূপ দিয়াছে, জলকে রূপ দিয়াছে, এমন কি চন্দ্র সূর্য্য তারা প্রভৃতিকেও রূপ দিয়াছে। প্রাকৃতিক নিয়মে যাহা হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে, তাহার জন্য ভগবান বলিয়া একটা কিছু মানিয়া লইতে হইবে, ইহা প্রচার করে এই কুসংস্কারান্ধ হিন্দু, আর কেহ নয়।

বলা বাহুল্য—সে পূর্ণ নাস্তিক হইয়া গিয়াছিল। ভগবানে চির-আস্থাবান ঠাকুরদাদা এবং মায়ের স্নেহ ও শিক্ষায় শিক্ষিত ও লালিত পালিত হইয়াও সে একেবারে বিপরীতভাবে চলিয়াছিল। অধ্যাপক সুরেশ মিত্রের বাড়ীতে এক দিন এই বিষয় লইয়া ভীষণ তর্ক বাধিয়া গিয়াছিল। সুরেশবাবুর মতটা কতকটা এই ধরণের ছিল, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী কন্যার এ মত ছিল না। দেবযানী স্পষ্টই বলিয়াছিল,—"ঈশ্বর নেই এ কথা বলবেন না জ্যোতিবাবু, কারণ আপনি এমন কিছু পান নি, যার দ্বারা অতি সহজে প্রতিপন্ন করতে পারবেন ভগবান নেই। আপনার এতটা সাহস দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি, কেন না, এটা আপনার সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। শুনেছি আপনি যেখানে মানুষ হয়েছেন, সেখানে বিরাজ করছে ঘোর পৌত্তলিকতা। জোর করে আজ এ তর্ক তুললেই কি আপনি নিস্তার পাবেন? কে না বলবে—আপনার মনের মধ্যে সেই পারিপার্শ্বিকের ভাব লেগে আছে বলেই আপনি জোর করে প্রমাণ করতে চান আপনি নাস্তিক? এতটা বাড়াবাড়ি করতে যাবেন না জ্যোতিবাবু, এর পর কোন দিন আপনাকে ভেঙ্গে পড়তে হবে। তবে হ্যাঁ, পৌত্তলিকতা ছেড়ে দিতে পারেন। খড়, মাটী যার উপাদান, অথবা পাথরের মধ্যে যে সীমাবদ্ধ, তাঁকে আপনি ভগবান বলে না মানলেও

মানতে পারেন। তা বলে এ আপনাকে মানতেই হবে—প্রকৃতির পরে একটা স্থির শক্তি নিশ্চয়ই আছে, যার অস্তিত্ব আমরা বুঝতে পারি, অথচ ধরতে পারি নে। আপনাকে মানতেই হবে—এই শক্তি ভগবানের, এবং তিনি নিশ্চয়ই আছেন,—আমরা সকলের মধ্যেই তাঁকে পাই।"

জ্যোতির্ম্ময় তখনকার মত চুপ করিয়া গেলেও মনের ধারণা সে বিসর্জ্জন দিতে পারে নাই। বাড়ীতে পূজার্চ্চনার বিপক্ষে কোন দিন সে একটী কথা বলিতে পারে নাই,—যে যাহা বলিত বিনা প্রতিবাদে তাহাই শুনিয়া যাইত। মায়ের কাছে মনের ঝোঁকে ক্বচিৎ কখনও কোন কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলেও মা তাহা পাগল ছেলের পাগলামী বলিয়া বরাবর উড়াইয়া দিয়া আসিয়াছেন; পুত্রের কথা কোন দিনই তাঁহার মনে রেখাঙ্কন করিতে পারে নাই।

আজ ক্ষণিকের বিষদৃষ্টি স্বর্ণ-সিংহাসনে স্থাপিত পাথরের নুড়িটার উপরে ফেলিয়া জ্যোতির্ম্ময় দ্রুতপদে ত্রিতলের খোলা ছাদে চলিয়া গেল।

ছাদের চারিদিকে বুক সমান প্রাচীর। মেয়েরা দিনের বেলা ছাদে আসিলে সেই প্রাচীরের মধ্যস্থিত ছিদ্রপথে বাহিরটা দেখিতে পাইতেন,—উপর হইতে মুখ বাহির করিবার অধিকার ছিল না।

ছাদে ছিল একটী তরুণী; সে প্রাচীরের উপর ভর দিয়া অদূরস্থ নদীর পানে চাহিয়া ছিল। পঞ্চমীর চাঁদ তখন পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে, তাহার আলো তখনও পৃথিবীর গায়ে স্বপ্নের মত লাগিয়া আছে। অন্ধকার শিকারী ব্যাঘ্রের মত থাবা পাতিয়া বসিয়া আছে, তাহার গ্রাস করিবার সময় আসতেছে।

নদীর জলের উপর অস্তপ্রায় চাঁদের কিরণ তখনও ঝিকমিক করিতেছিল। নদী একটানা সুরে গান গাহিয়া চলিয়াছে। সে সুর নিস্তব্ধ রাত্রিতে বড় মধুর হইয়াই কাণে বাজিতেছে। তরুণী মুগ্ধ চোখে চাহিয়া ছিল,—হঠাৎ পিছনে জ্যোতির্ম্ময়ের অশান্ত চরণক্ষেপের দুপদাপ শব্দ শুনিতে পাইয়া সে বড় বেশী রকম চমকাইয়া মুখ ফিরাইল। সে আশা করে নাই—জ্যোতির্ম্ময় এমন সময়ে এমনভাবে ছাদে আসিয়া পড়িবে। অত্যন্ত সন্ত্রস্তভাবে সে অঞ্চলখানা গায়ে ভাল করিয়া জড়াইয়া সরিয়া আসিল।

জ্যোতির্ম্ময় তাহাকে দেখিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইল। সে এখানে থাকিবে অথবা নামিয়া যাইবে তাহা ভাবিয়া লইল। সে পিছন ফিরিবার পূর্ব্বেই তরুণী তাহাকে অতিক্রম করিয়া ক্ষিপ্রপদে নীচে নামিয়া গেল।

তরুণীটিকে জ্যোতির্ম্ময় আরও দুদিন মায়ের কাছে দেখিয়াছিল। তাহাকে দেখিলেই সে যে সন্ত্রস্তে সরিয়া পড়ে ইহাও সে জানিত।

তবুও সে বিস্মিতভাবে খানিক তাহার গমন-পথের পানে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর শ্লথপদে অগ্রসর হইয়া এক-স্থানে বসিয়া পড়িল। দেহ ও মন তাহার এলাইয়া পড়িয়াছিল, বেশীক্ষণ সে বসিয়া থাকিতে পারিল না। সেখানে শুইয়া পড়িয়া দুই হাতের মধ্যে মুখখানা রাখিয়া গভীর ভাবনায় সে নিমগ্ন হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

পদকর্ত্তা রাজা লছমীনারায়ণ

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

ছাতনা বাঁকুড়া জেলার একটী প্রসিদ্ধ স্থান। পূর্ব্বে এখানে রাজধানী ছিল,—সামন্তভূমের ভূমিপগণ ছাতনায় বাস করিতেন। এখনো রাজবাড়ী আছে, রাজ-বংশধর আছেন। কিন্তু ধনবল জনবল চিরকাল কাহারো থাকে না, সামন্তভূমিপতিরও নাই। স্বাধীনতার অন্যতম লীলাস্থলী, ধর্ম্ম ও সঙ্গীত-সাধনার পীঠ বিষ্ণুপুরের মহাশ্মশানে ছাতনাও আপনার চিতা রচনা করিয়াছে। সংসারে সব যায়, স্মৃতি থাকে। সামন্তভূমেরও আছে—অতীতের গৌরব-মণ্ডিত স্মৃতি! আমার এই ক্ষুদ্র নিবন্ধ সেই স্মৃতির উদ্দেশেই শ্রদ্ধার তর্পণাঞ্জলি।

পদকর্ত্তা লছমীনারায়ণ ছাতনার রাজা ছিলেন। তিনি একশত পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। আমরা ইঁহার রচিত পদাবলীর একখানি পুঁথি পাইয়াছি। পুঁথিখানি খণ্ডিত—কিন্তু শেষের দিকে নহে। গোড়ার দিকে এবং মাঝখানে পুঁথির কয়েকখানা পাতা নাই। আমি পুঁথির ছত্রিশখানি পাতায় একশত তেইশটী মাত্র পদ পাইয়াছি। তুলোট আকারের কাগজে লেখা পুঁথি, পাতায় গড়ে আট সারি হিসাবে লেখা। পুঁথির শেষে রচনার সন তারিখ আছে; গানের কোনো কলি কাটিয়া উপরে নূতন কলি লেখা আছে। কোন কথা ছাড় পড়িয়া গেলে উপরে তুলিয়া দেওয়া আছে। এই সব দেখিয়া মনে হয়, এ পুঁথি রাজার নিজেরই হাতের লেখা। বীরভূম-বিবরণ তৃতীয় খণ্ড লিখিবার সময় চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি যখন ছাতনায় যাই, সেই সময় প্রিয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে ছাতনার রাজবংশীয় কুমার শ্রীযুক্ত রামকিঙ্কর সিংহদেব মহাশয় বলেন যে 'আমাদের পূর্ব্বপুরুষ রাজা লছমীনারায়ণ একজন বিশিষ্ট পদকর্ত্তা ছিলেন; কিন্তু আমরা তাঁহার কোনো পুঁথিপত্র খুঁজিয়া পাই নাই, এমন কি কোনো পদও পাওয়া যাইতেছে না। আপনি তো পদাবলীর খোঁজ-খবর রাখেন, পুঁথি পাতা সংগ্রহ করেন, যদি পান' দেখিবেন'। আমি ছাতনা হইতে বিষ্ণুপুর হইয়া কাঁকিলায় যাই। কাঁকিলায় কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুঁথিখানি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া শুনিয়াছিলাম। সন্ধান করিতে গিয়াছিলাম,—কৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বিতীয় পুঁথি পাওয়া যায় কি না, অথবা কৃষ্ণকীর্ত্তনের কোনো পদ অন্য পুঁথিতে কেহ সংগ্রহ করিয়াছেন কি না? গ্রামে ঘুরিতে ঘুরিতে এক জায়গায় দেখিলাম একখানা বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে; তাহারই একাংশে মাটী-চাপা একঝুড়ি পুঁথি। সময়টা ছিল ভাদ্রমাস; অধিকাংশ পুঁথিই বৃষ্টির জলে পচিয়া গিয়াছিল, কিন্তু নীচের পুঁথিখানি দুইখানি কাঠের মলাটের মধ্যে প্রায় অবিকৃতই ছিল। আমি যত্নসহকারে তুলিয়া লইলাম। শুনিলাম এটী [illegible]ান ব্রাহ্মণের বাড়ী; তিনি অন্যত্র উঠিয়া গিয়াছেন। পুঁথির ঝুড়িটী যে অনেক দিন রান্নাশালায় ছিল, অবস্থা দেখিয়াই তাহা আন্দাজ করিয়াছিলাম। পুড়িয়া গেলে সবই [illegible]ইত, পচিয়া যাওয়ার মাঝে তবুও এই একখানি মিলিয়াছে।

পুঁথিতে— 'লছমীনারায়ণ নরপতি জান'

"লক্ষ্মী নারায়ণ নৃপতি বচন
নিরখি অরুণ ছাই"

'লছমী সখি', "লছিমীময় সখি," "লছিমীনারায়ণ", ইত্যাদি ভণিতা আছে। আবার "লছমীকান্ত রসহু ভেল ভোর" এইরূপ ভণিতাও আছে। কিন্তু পুঁথির কথা বলিবার পূর্ব্বে ছাতনার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করি। বিশ্বকোষ ও ছাতনার কবি রাধানাথ দাসের বাসলীমাহাত্ম্য পুঁথি এবং ছাতনার প্রচলিত জনশ্রুতি হইতে পরিচয় সংগৃহীত। কৃষ্ণকীর্ত্তনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বাসলীমাহাত্ম্য পুঁথিখানি ব্যবহার করিতে দিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

অনেকে বলেন সংখরায় ছাতনা রাজবংশের আদি-পুরুষ। ওমালী সাহেব অনুমান করেন ইনি ১৩২৫ শকে রাজা হইয়াছিলেন। ইঁহার পৌত্রের নাম হামির উত্তর রায়। বিশ্বকোষকার বলেন—"হামির রায় ও উত্তর রায় দুই রাজপুত সহোদর ছাতনায় আসিয়া রাজা হইয়াছিলেন"। ১৫৭৬ শকাব্দযুক্ত ছাতনার পুরাতন বাসলীমন্দিরের ইষ্টকে হামির উত্তর রায় ও উত্তর রায় এই নাম পাওয়া যায়। আমাদের মনে হয় হামির উত্তর ও উত্তর একই ব্যক্তি। উত্তর—হামির-উত্তরের সংক্ষিপ্ত রূপ। ইনিই ছাতনায় বাসলীদেবীর প্রতিষ্ঠা করেন।

স্থানীয় প্রবাদ এইরূপ—ছাতনার পূর্ব্বনাম সামন্তভূম। পঞ্চকোটের রাজা একটী ব্রাহ্মণ বালককে পালন করিয়াছিলেন; বালকের নাম ভবানী। রাজা একদিন মাধ্যন্দিন সন্ধ্যাবন্দনা সমাপনান্তে চন্দন দিয়া ব্রাহ্মণ বালকের ললাটে তিলক রচনা করিয়া দিতেছিলেন, এমন সময় রাণী আসিয়া বলিলেন, "করিলে কি? তোমার হাতের ললাটিকা,—ও যে রাজটীকা দেওয়া হইল। এখন উহাকে কোথায় রাজ্য দিবে—দাও।" বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পঞ্চকোটপতি তাহাকে সৈন্য সামন্ত দিয়া সামন্তভূমে পাঠাইয়া দেন। ভবানী সামন্তভূমের রাজাকে পরাস্ত করিয়া নিজে রাজা হন। পরাজিত রাজা অপরাপর সামন্তদের সঙ্গে মিলিয়া ভবানীকে বধ করেন এবং রাজ্য পুনরধিকৃত হয়। রাজ্য অধিকৃত হইল, কিন্তু একজনের থাকিল না। অপর এগার জন সামন্ত আর ভূতপূর্ব্ব রাজা, এই বারজনে মিলিয়া

পালা করিয়া এক একদিন গদিতে বসিতে লাগিলেন এবং রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বেশী দিন এমন ভাবে চলিল না, পরস্পরে ঝগড়া বাধিয়া গেল। এদিকে ভূতপূর্ব্ব রাজারও মৃত্যু হইল। রাজ্যে যখন এমনই গোলমাল—ঠিক্ সেই সময় পশ্চিম হইতে নৃশঙ্ক নামে একজন পরাক্রান্ত যোদ্ধা পত্নী পুত্র সঙ্গে ছাতনায় উপস্থিত হইলেন। নৃশঙ্কুর যুবক পুত্র উত্তর হামিরের বীরত্ব-ব্যঞ্জক মূর্ত্তি এবং অনিন্দ্যসুন্দর রূপ দেখিয়া সামন্তগণ যোগ্য পাত্র স্থির করিয়া রাজত্ব ও রাজকন্যা তাঁহাকেই দান করিলেন। বিবাদ মিটিয়া গেল, হামির ছাতনায় রাজা হইলেন।

অনেকে বারজন সামন্তের রাজ্য,—অতএব সামন্তভূম, এইরূপ ব্যুৎপত্তির সমর্থন করেন না। তাঁহারা বলেন ছাতনা বিষ্ণুপুরের অধীনে প্রধান সামন্ত-রাজ্য ছিল ; তাই ছাতনার নাম সামন্তভূম। আমি কাঁকিলায় মুন্সীদের বাড়ীতে একখানি খাতা দেখিয়া আসিয়াছি ; তাহাতে বিষ্ণুপুরের রাজারা কাহাকে কি ভাবে পত্র লিখিতেন তাহারই (পাঠ ও শিরোনামার পাঠের) একটা বয়ান লেখা আছে। খাতাখানি চৈতন্যসিংহের সময়ের। গভর্ণর জেনারেল, পঞ্চকোটের রাজা, ছাতনার রাজা ইত্যাদি কাহাকে কি পাঠ লেখা হইত, দেখিয়া বুঝা যায়, বিষ্ণুপুরের নিকট কাহার কিরূপ সম্মান ছিল। পাঠ দেখিয়া মনে হইল ছাতনার সঙ্গে বিষ্ণুপুর রাজের ব্যবহার সমানে সমানে ছিল না, ছাতনাকে তিনি অধীন রাজ্য বলিয়াই মনে করিতেন। অবশ্য ছাতনা রাজবাটীর কাগজপত্র না দেখিয়া এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না।

রাধানাথ দাস লিখিয়াছেন—বাসুলী দেবী এক বণিকের ছালায় শিলারূপে ছিলেন। দেবী ব্রাহ্মণকন্যার রূপ ধরিয়া রাজাকে বণিকের নিকট হইতে শিলা গ্রহণ করিতে বলেন। রাজা শিলা সংগ্রহ করিলেন, তাহার পর এক কর্ম্মকার আসিয়া শিলায় আঘাত দিতেই দেবী নিজমূর্ত্তি ধরিলেন। দেবী তখন ভোগাদির ব্যবস্থার কথা এইরূপ বলিলেন—

যদি অন্ন না পারিবে অষ্ট সের ভোগ দিবে
দুগ্ধ মৎস্য আদি যে কলাই
প্রত্যাবধি দিবে মোরে এই কহিলাম তোরে
এই সত্য কহি তব ঠাঁই ॥

আর বলিলেন—

"বাহুল্যা নগর ছাড়ি ছাতনা নগর বলি
এই নাম তুমি যে রাখিবে"

এই সব ব্যবস্থার পর দেবী তাহাকে নিজের খাঁ[illegible] দিলেন। রাজা হামির উত্তর মার' নাম করিয়া উত্তর পূ[illegible] দক্ষিণ পশ্চিম জয় করিয়া আসিলেন।

দেবীর মহিমা কে জানে ? কতদিন পরে দেশে বর্গী উৎপাত আরম্ভ করিল, দেবী নিজে যুদ্ধ করিয়া ব[illegible] তাড়াইয়া দিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে দেবীর বেশর হারাই[illegible] গিয়াছিল ; রাজা স্বপ্নাদেশ পাইয়া খুঁজিয়া আনিলেন। ইহা পূজারীর বিশেষ অপরাধ হইয়াছিল, তাই এই ঘটনার [illegible] তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। দাস মহাশয় লিখিয়াছেন-

কৌলিক পূজারী যেই অপরাধী হইল সেই
পুত্রশোকে হইল সন্ন্যাসী।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়িনী দেবীদাসে দেবীবাণী
সত্বগুণান্বিত মহাঋষি ॥
সঙ্গেতে গোপাল লয়ে যাইতে পশ্চিমালয়ে
ইতিমধ্যে দেবীদাসে কন।
তুমি মোর কর পূজা শুন বিপ্র বৃদ্ধ দ্বিজ
মোর বাক্য না কর লঙ্ঘন ॥
দ্বিজ তবে কহে বাণী শুন মাতা ত্রিনয়নী
তব প্রসাদ না খাব কখন।
অম্বিকা কহেন বাণী পিতা মোর হও তুমি
নিশ্চয় জানিবে যে বচন ॥

বর্গীর হাঙ্গামার সময় দেবীদাস নামক একজন ব্র[illegible] স্বপূজিত গোপাল লইয়া পশ্চিমাঞ্চলে পলাইতেছি[illegible] রাজার আদেশে বা দেবীর স্বপ্নাদেশে তিনি বাসুলীর [illegible] নিযুক্ত হন। কিন্তু গোপালের সেবক ইঁহার প্রসাদ করিতে সম্মত হন নাই। আজিও দেবীদাসের বংশধ[illegible] ভোগের চাউলের অতিরিক্ত সিধা পাইয়া থাকেন

পুঁথিতে অতঃপর দেবীর শাঁখা পরা, কাপড় [illegible] ভিক্ষা ইত্যাদির কাহিনী আছে। রাধানাথ দাস পু[illegible] শেষে ভনিতা দিয়াছেন—

দেখি রাধানাথ দাস মনেতে হয়ে উল্লা[illegible]
সদা ভাবে দেবীর চরণ

ছাতনাতে বাস করি সদা তব আশা করি
অন্তকালে দিও মা চরণ

কবি ছাতনার অধিবাসী ছিলেন।

যে ধ্যানে দেবীর পূজা হয় তাহা ধর্ম্মঠাকুরের আবরণ দেবতার ধ্যান। সুতরাং ইনি বৌদ্ধ দেবতা। আমরা দেবীর মূর্ত্তি দেখিয়াছি,—দেবী অসুরের উপরে প্রত্যালীঢ় পদে দাঁড়াইয়া আছেন। অবশ্য নানা রকমের বাসুলী মূর্ত্তি আছে, সুতরাং ধ্যানের সঙ্গে না মিলিলেও মূর্ত্তি সম্বন্ধে কোনো রূপ সন্দেহ প্রকাশ করা অন্যায়। বর্দ্ধমান জেলায় দাঁইহাট গ্রামে এইরূপ একটী মূর্ত্তি বিশালাক্ষী নামে পূজা পাইতেছেন। অনেক স্থানেই এইরূপ নামের গোলমাল ঘটিয়াছে। রামাই পণ্ডিত ধর্ম্মঠাকুরের পূজা প্রবর্ত্তন করেন। তিনি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর লোক। কিন্তু খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীরও পূর্ব্বে তন্ত্রে বাসলী দেবতার নাম ছিল, ইহার প্রমাণ আছে। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বলেন, অভিনব গুপ্তের শিষ্য ক্ষেমরাজ মালিনী বিজয় তন্ত্রে পূর্ব্ব-প্রচলিত তন্ত্র হইতে একটা বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে বাসলীর নাম আছে। তাঁহার অনুমান খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে বৌদ্ধগণ বাগীশ্বরীকে মঞ্জুশ্রীর শক্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেদে সরস্বতীর নিকট বলির ব্যবস্থা আছে। এখনো বাঙ্গালায় সরস্বতীর নিকট বলি অনেক স্থানেই দেওয়া হয়। বাসলীর নিকট এ বলি প্রদত্ত হয়।

মালিনী বিজয়ের শ্লোক কয়টী এই—

অথ প্রবক্ষ্যাম্যহং যা যা বিদ্যা মহীতলে।
দোষ জালৈর সংস্পৃষ্টা স্তাঃ সর্ব্বাহি ফলৈঃ সহ॥
কালী নীলা মহাদুর্গা ত্বরিতা ছিন্নমস্তকা।
বাগ্বাদিনী চান্নপূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ॥
কামাখ্যা বাসলী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী।
ইত্যাদ্যাঃ সফলা বিদ্যাঃ কলৌ পূর্ণ ফলপ্রদাঃ॥

হিন্দুদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থে যেমন সরস্বতী বাগ্‌দেবী নামে অভিহিতা হইয়াছেন, পুরাণে এই বাগেদবীর পূজাবিধি আছে, তেমনি বৌদ্ধদের মঞ্জুশ্রী বা বানীশ্বরের শক্তিরূপেও সরস্বতী বাগীশ্বরী নামে পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন। বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ হিন্দুদের নিকট হইতেই ইহাঁকে গ্রহণ করিয়াছেন।

বৌদ্ধগ্রন্থে অবলোকিতেশ্বরের পরেই মঞ্জুশ্রীর স্থান। মঞ্জুশ্রীর অপর নাম মাধুনাথ, মাধুঘোষ। ইনি চিরযৌবন, বিদ্যার অধিপতি বলিয়া ইহার আর একটী নাম বাগীশ্বর। ত্রিপিটকে, ললিতবিস্তরে বা দিব্যাবদানের গোড়ার দিকের বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে ইহার নাম নাই। সুখাবতী ব্যূহে ইহার নাম আছে, লঙ্কাবতার সূত্রের ইনি প্রধান বক্তা। "রত্ন করণ্ড ব্যূহ" ২৭০ খৃঃ চীনভাষায় অনুবাদিত হয়। তাহাতে ইঁহার নাম আছে, 'সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরীকে' ইনি প্রধান বোধিসত্ত্ব। কিন্তু এ সব গ্রন্থে ইঁহার কোনো শক্তির উল্লেখ নাই। পরবর্ত্তী 'মঞ্জুশ্রী বিক্রীড়িতে' লক্ষ্মী বা সরস্বতী বা উভয়েই ইহাঁর শক্তিরূপে গৃহীতা হইয়াছেন। ৩১৩ খৃঃ চীনাভাষায় এ গ্রন্থের তর্জ্জমা হইয়াছিল। সেকালে ভারতে চীনে জাভায় জাপানে জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি স্মৃতির দেবতা রূপে মঞ্জুশ্রীর পূজা হইত। পরবর্ত্তীকালে সরস্বতী বাগীশ্বরী নামে মঞ্জুশ্রীর প্রধানা শক্তিরূপে পরিগণিতা হইয়াছেন। সুতরাং ধর্ম্মঠাকুরের আবরণ দেবতা বাসলী বৌদ্ধ দেবতা হইলেও হিন্দুদের মঙ্গলচণ্ডী রূপে যেমন পূজা পাইতেছেন বলিয়া অনেকে মনে করেন, তেমনি সরস্বতী বা বাগীশ্বরী হিন্দু দেবতা হইলেও বৌদ্ধগণ তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও অনেক পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত। আজকাল আর চতুর্ভুজা, বীণা, পুস্তক, অক্ষমালা ও সুধা-কলস-হস্তা বা বীণা পুস্তক অক্ষমালা-শোভিতা, কিম্বা বীণা পুস্তক কমল ও অক্ষমালা ধৃত-করা সরস্বতী প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীন ধরণের বাগীশ্বরী মূর্ত্তি বীরভূম জেলায় নানুরে একটী, ঢাকা যাদুঘরে একটী এবং বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহালয়ে একটী আছে। বাগীশ্বরীর বাসলী নাম হিন্দু কি বৌদ্ধের তাহাও অনুমান করা শক্ত। বাগীশ্বরীর অপভ্রংশ বাসলী নাম যে কোনো সম্প্রদায়ই গ্রহণ করিতে পারেন। তথাপি যে কোনো কারণেই হউক ছাতনার রাজবংশ যে পূর্ব্বে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, অনেকে ছাতনার বাসলী মূর্ত্তি দেখিয়া এইরূপই সিদ্ধান্ত করেন। ছাতনার মূর্ত্তির যে ধর্ম্মঠাকুরের আবরণ দেবতার ধ্যানে পূজা হয়, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ছাতনার রাজগণ পরে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়।

ছাতনার রাজবংশ কবে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, অথবা বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুরাগী হইয়াছিলেন, ঠিক জানা যায় না। ১৪৭৬ শকাব্দে হামির উত্তর ছাতনা রাজধানীতে বাসুলীর মন্দির নির্ম্মাণ করেন। উত্তরই ছাতনা রাজবংশের পুনঃ-

প্রতিষ্ঠাতা। শকাব্দা ১৪৭৬ হিসাবমত ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দ হয়। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের তিরোধান ঘটিয়াছিল,—সুতরাং সে সময় দেশ গোরা-প্রেমে চঞ্চল। কিন্তু বিষ্ণুপুর ও ছাতনার বনময় প্রদেশে সে চাঞ্চল্য বোধ হয় তখনো আত্মপ্রকাশ করে নাই। তবে বীর হাম্বিরের সভায় ব্যাসাচার্য্যের ভাগবত পাঠের কথায় মনে হয়, দেশ একেবারেই নিশ্চল ছিল না। অনুমান করিতে পারি—বীর হাম্বিরের বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণের পর ছাতনা রাজও ধীরে ধীরে এইদিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুর নরোত্তম, আচার্য্য শ্রীনিবাস এবং প্রভু শ্যামানন্দ এদেশে মধুরভাবের উপাসনা-পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করেন। লছমীনারায়ণের পদাবলী পাঠে মনে হয় তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের মতানুবর্ত্তী ছিলেন। রাজা পদাবলীর শেষে এইরূপ সন তারিখ দিয়াছেন—

সুরাচার্য্য বাসরে কৃষ্ণা একাদশী তিথি।
বিত্তযুক্ত ভাদ্র তাথে পদ হইল ইতি ॥
ব্রহ্মপৃষ্ঠে আরোহণ লিখি আভাগণ।
সসোধর যুক্ত দেখি কুমার আনন ॥
সকাব্দে প্রমাণ এই করিল লিখন।
গণন করিয়া বুঝ সব বুধগণ ॥

সুরাচার্য্য—বৃহস্পতি, বিত্ত—নিধি,—৯, ব্রহ্ম এক আভা—বর্ণ ৭, শশধর এক, কুমার আনন ছয়, সুতরাং ১৭১৬ শকাব্দায় ৯ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার কৃষ্ণ একাদশীতে এই পদাবলী রচনা সমাপ্ত হইয়াছিল। ১৪৭৬ হইতে ১৭১৬ দুইশত চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান! পরিবর্ত্তনও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

রাজা যে বৈষ্ণব হইয়াছিলেন, পদ পড়িয়া সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। ইহা যে সখের রচনা নহে,—ভনিতায় নিজেকে সখী বলা, লীলারস উপভোগের আকাঙ্ক্ষায় রূপ-মাধুরী গুণমঞ্জরীকে প্রণাম ইত্যাদি হইতেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তবে বৈষ্ণব হইলেও তিনি যে বাসুলী বা বাসুলীকে বিস্মৃত হন নাই, রাজকার্য্যে দেবীর নামই সর্ব্বাগ্রে ব্যবহার করিতেন, তাঁহার প্রদত্ত সনন্দ দেখিয়া এইরূপই অনুমান হয়। আমরা রাজার একখানি সনন্দের নকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম! আমাদের গ্রামের নিকটবর্ত্তী খোসটীকরীর জমিদার-বাড়ীতে কতকগুলি সনন্দের মধ্যে ছাতনার রাজাদের কয়েকখানি সনন্দ পাইয়াছি। তিনখানি লছমীনারায়ণের ; একখানিতে বাসুলী লেখা আছে।

সনন্দ—

প্রবল প্রতাপাদীত প্রতাপ সংপূর্ন্ন শ্রীশ্রী৺বাসুলীদেবী চরণ শরণ সামন্তাবলীনাথ রাজা শ্রীশ্রীলছমীনারায়ণ দেব মহোগ্র প্রতাপানাং।

শ্রীশ্রী৺সাহেব সুচরিতেষু, পিরত্তর পট্টক মিদং কার্য্যঞ্চাগে মৌজে দুবসরা গ্রাম অজবগ্নর পতিত চতুশিমা আপনকাকে পিরত্তর দিলাম আমাকে দুয়া করিয়া গ্রাম মজকুরের আবাদ তয়দুত করিয়া পরম সুখে ভোগ করহ এ নিবন্ধে পিরত্তর পাট্টা দিলাম বাব হরবাব নাস্তি ইতি সন ১৬৯৬ সাল তাং ১৫ পৌষ।

এখানে সন ও সাল যাহাই থাকুক শকাব্দাই বুঝিতে হইবে। প্রত্যেক ছাড়পত্রেই শকাব্দা ব্যবহৃত হইয়াছে। পদাবলীর সন তারিখেও শকাব্দারই উল্লেখ আছে। মুসলমান রাজত্ব শেষ হওয়ার পরও ইংরাজের আমলের একজন হিন্দুরাজা মুসলমানকে সম্পত্তি দান করিতেছেন, ইহা দেখিয়া কি মনে হয়! কথায় শ্রদ্ধা নহে, প্যাক্‌টের প্রীতি নহে, চিরকালের জন্য জমির বা জঙ্গলের মালিকানা স্বত্ত ত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রদর্শন,—এ কালের মিলনপন্থীরা একটু ভাবিয়া দেখিবেন।

পদাবলী হইতে রাজার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। একটী পদে আছে—

"আনন্দধাম তনয় হিয় স্ফুর"

লছমীনারায়ণের পিতার নাম কি আনন্দধাম ছিল? পদে 'অনুপচান্দ' ভণিতা পাওয়া যায়। ভণিতার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়—তিনি রাজার গুরু ছিলেন।

"অনুপচান্দ প্রভু অবহুঁ মিলব যব
তব হাম জীবন পাই"

অনেকস্থলে অনুপ ভণিতা শ্লিষ্টশব্দেও প্রযুক্ত হইয়াছে। "গোকুল অনুপচান্দ মুখ তোর", "অনুপম কানুক কেলী বিলাস", "বহুবিধ বারুণী চমক সহিত। চামর বীজন অনুপ চরিত"।" চান্দ অনুপ ভণ কহই না পায়" এইরূপ ভণিতাও আছে।

পদাবলী সমাপ্ত হইয়াছিল বাঙ্গালা ১২০১ সালে, খোসটীকরীর শেষ ছাড়পত্রে ১৭১০ শকাব্দার অর্থাৎ ১১৯৫

সালের উল্লেখ নাই। তাহার পর সন ১২২৬ সালের ২৮ জ্যৈষ্ঠ বলরামনারায়ণদেব একখানি ছাড়পত্র দিয়াছেন। ইহা হইতে অনুমিত হয় বলরাম লছমীনারায়ণের পুত্র বা পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী, এবং তৎপূর্ব্বেই লছমীনারায়ণ লোকান্তরিত হইয়াছিলেন।

বাঙ্গালা ১২০১ সালের বৈষ্ণবপদ রচনায় একটু বৈশিষ্ট্য আছে। চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া শশিশেখরের পর এ পথে যশোলাভের আশা ছিল না বলিলেই হয়। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ বা চতুর্দ্দশ শতকের আরম্ভ ভাগ হইতে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত—তিনশত বৎসর ধরিয়া সে পদের ভাব ভাষা ছন্দ অলঙ্কার ইত্যাদির প্রায় চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তবুও অলস-বিলাসে কাল না কাটাইয়া এবং মঙ্গল-কাব্যের প্রভাব এড়াইয়া একজন জমিদারের পক্ষে পদাবলী রচনায় উৎসাহ, নিতান্ত প্রাণের টান্ বলিয়াই মনে হয়। ইহাই রাজার বিশেষত্ব। মঙ্গল-কাব্য বলিতে আমরা কষ্টমঙ্গল প্রভৃতির উদ্দেশ করিয়াছি। গ্রন্থের সমাপ্তিভাগে এইরূপ লিখিত আছে—"ইতি শ্রীরাধা-কৃষ্ণ লীলারসপদং বংশী সঙ্কেতাদি প্রাতিবিম্ব দর্পণং পুনঃ সম্ভোগ লক্ষ্মানারায়ণ আজ্ঞা কো জন বিরচিতং সমাপ্ত।" রাজা বাঙ্গালা এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করিয়াছেন। উদাহরণ দিতেছি—জ্যোৎস্নাভিসারের বর্ণনা।

"চান্দ নিরমল করয়ে ঝলমল, দোসর বিধুবর তোমুখ মণ্ডল ঐছে জামিনি কৈছে ভামিনি জায়বি কুঞ্জকি মাঝ গো।

বাহু ভুজগিনি ঐছে সাজলি চলিতে চালব কর কি লখমনি, নীল অম্বর তুরিতে পরিহর করহ সিত নিসি সাজ গো॥

সুগন্ধি চন্দন করহ লেপন ঝাঁপ দামিনি ঐছে সুবরণ কুন্দ বরমাল বেড়হ কুন্তল ভেটহ নাগর রাজ গো।

দসল কারণ করহ ভুসন সেত মনিগন খচিত কঙ্কন জৈছে অলকহি তিলক তৈছন ঐছে সমুচিত সাজ গো॥

ধৌত অম্বর ভুরিতে পহিরহ ঐছে নিলমনি হার সম্বর মুখর মঞ্জির অবহুঁ কর দুর বেকত হোয়ব কাজ গো।

ফুল মালতি পরহ দুহুঁ শ্রুতি ঐছে সমুচিত জৈছে বিধুরিতি লছিমি সখি ভন মন্দ মুখমল বিরমি কিঙ্কিনি বাজ গো॥

• ছন্দে, ভাষায়, মিশে রচনাটী সুন্দর বলিয়াই মনে হয়।

এইবার একটী বাঙ্গালা পদের উদাহরণ দিতেছি। পূর্ব্ব-রাসের পর মিলনের পূর্ব্বে দৌত্যে প্রেরিতা সখী ফিরিয়া আসিয়া শ্রীমতীকে পরীক্ষার জন্য বলিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ অন্যা নায়িকায় অনুরক্ত, তিনি আসিবেন না। তাহারই উত্তরে শ্রীমতী বলিতেছেন—

সুনিঞা নিঠুর সখির উত্তর কহে বিধুমুখি রাই।
জে কর সে কর পুরুস ভ্রমর তবু দরশন চাই॥
সখি গো কহিয়ে মরম তোয়।
নন্দের নন্দন বিনে এ জিবন সদা মুরুছিত হোয়॥
সেই মুখ চান্দ যুবতির ছান্দ জখন পড়য়ে মনে।
সুনিঞা মুরুলি হৃদয় কুন্ডলি প্রবেশে জাহার কানে॥
নারির ধরম কুলের ভরম সকলি কর‌য়ে নাস।
অতি ক্ষুদ্রতর বহু ছিদ্র তার কি মোহিনি জানে বাঁস॥
জেই চিত্রপট আমার নিকট দেখাইলি তোরা হরি।
তাহার বরণ জিনি নবঘন সেই পাসরিতে নারি॥
সুনি জার নাম নিকুঞ্জেতে ধাম তবহু হোয়ল মোর।
সে জে না মিলিল জিবনে কি ফল কেন কহ বচন ওর॥
সসিমুখ তার হৃদয় ভিতর সদত রহিল মোর।
সো ভাঙ্গ ভায়নি তেরছ চাহনি কি কহ তাহার ওর॥
এসব কহিঞা মুরুছিত হঞা ভুমিতে পড়িল রাই।
হেরি সহচরি লছিমিকিঙ্করি কোরেতে করল ধাই॥

এ সব পদে মৌলিকতার আশা করা অন্যায়। কবি বৈষ্ণব কবিগণের অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। আমরা আরো দুএকটী পদ উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি। রাজা একটী পদে ভনিতা দিয়াছেন—

রাই সহোদরি লাঙ্গ জছুনাম।
লছিমী নিরবই রাই পদ ধাম॥"

গৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকায় নিত্যানন্দ প্রভু যেমন বলরামের অবতার বলিয়া কথিত, তেমনি তিান লবঙ্গমঞ্জরীর মুর্ত্তি বলিয়াও অভিহিত হন। রাজা কি নিত্যানন্দ-শাখা-ভুক্ত ছিলেন? আমরা যে কোনো স্থান হইতে তিনটী পদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

(১)

নিরখি সখি কমলমুখি পুলক ভেল গাত গো।
ইসত হাসি বদন সসি কহ এ মন বাত গো॥

বিসাখ অব সুসাখ ভেল ললিত মনপুলিত গো।
চিত্র তব চিত্রা অব চম্প দেখি খুলিত গো॥
তুঙ্গ অব রঙ্গ দুঁহু পুলক ভেল অঙ্গ গো।
সুদেবি অব ভূদেবি ছোড়ি মিলহ পিয়া সঙ্গ গো॥
ইন্দুরেখ পরহু তেক অবহুঁ ভেল সোই গো।
কুসুম হাস অবহুরাস পুরুষ মত হোই গো॥
লঙ্গ মরি সহ-উদরি মিলহ পিয়া কোর গো।
সবহু সখি বিলস দেখি জতহুঁ যুথ মোর গো॥
রূপ রহু স্বরূপ মোর সাঙ্গ অরুপাঙ্গ গো।
লছিমি ভন চিরহু দিন মিলহ পিয়া সঙ্গ গো॥

(২)

বসন্ত কালে বাসন্তি ফুলে বগ্নে মধুকর তায়।
বরিখে বারি বিরিখ পরি বহু পিকুবর গায়॥
বরজ নারি বিহরে হরি বিমল যমুনা তীরে।
বারিজ পাতি বিকচ অতি বহয়ে পবন ধীরে॥
বিনদ চুড়া বকুল বেড়া বরিহা শোভিছে ভাল।
বদন সসী বিমল রাসী বিপিন কয়াছে আল॥
বর জোসিতে বীনার গীতে বলয়ে মধুর তান।
বল্লব পাসে বল্লবী ভাসে বাঁসীর মিলাও গান॥
বদনবিধু বচনমধু শুনিতে জুড়ায়ে কান।
লছিমি ভনে শুশুভ দিনে বিলসে গোপিকা কান।

(৩)

কাদম্বিনী অতি গগনহি ঘোর।
গরজত বরখত তঁহি নাহি ওর॥
কৈ হে অভিসারবি ইথে সুকুমারি।
চলিতে খলই পদ লখই না পারি॥
চপলা চমকত চমকিত প্রাণ।
তটিনী উছলয়ে কৈছে পয়ান॥
কুলিস আপাত নিপাত নাহি জান।
প্রেমকি সমুচিত মরণ বিধান॥
দাদুরি বোলত কঠিক সুতান।
পন্থহি বিষধর করল পয়ান॥
কৈছনে জায়বি কেলি নিকুঞ্জ।
ব্রজ কিরে কর্দ্দম তিমিরহি পুঞ্জ॥
অতিশয় দুর্জ্জয় অম্বুদ ধার।
নীলপট্টাম্বরে বারিক বার॥
লছিমি নারায়ন নরপতি ভাস।
কোন নিবারই ছুটল বাস॥

পুঁথির বানান অবিকল রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি। পুঁথির মধ্যে একই শব্দ বিভিন্ন বানানে লিখিত রহিয়াছে। শেষের পদটীতে "তড়কই দামিনি চমকই প্রাণ" কলির পরিবর্ত্তে 'চপলা চমকত চমকিত প্রাণ' উপরে লেখা আছে এবং ইহার পরবর্ত্তী কলিটী একেবারে কাটিয়া দিয়া উপরে লিখিত রহিয়াছে—"তটিনী উছলয়ে কৈছে পয়ান"। এই সব দেখিয়াই আন্দাজ করিয়াছি পুঁথি খানি রাজার নিজের হাতে লেখা। পুঁথির মধ্যে আর একটী লক্ষ্য করিবার বিষয়,—অভিসারের উপকরণের মধ্যে "বহুবিধ বারুনি চমক সহিত"। বারুণীর উল্লেখ বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে বিরল, নাই বলিলেও হয়। আমরা চণ্ডীদাসের "বেলি অসকালে দেখিনু ভালে" পদটীর 'বাম অঙ্গুলিতে মুকুর সহিতে কনক কটোরা হাতে" এই কলির একটী পাঠান্তর পাইয়াছি—"বাম অঙ্গুলিতে মদিরা সহিতে"। বলা বাহুল্য শব্দটী "মুদড়ী" অর্থাৎ আংটী, লিপিকর প্রমাদে মদিরায় পরিণত হইয়াছে। তবে মধু পানের উল্লেখ পদাবলীর অনেক পদেই পাওয়া যায়। এমন কি মধুপানের পুরাপুরী একটী পালাও আছে। স্পষ্টভাবে মদিরার উল্লেখ আছে বলিয়া স্মরণ হইতেছে না। আমরা এই নূতন পদকর্ত্তার প্রতি বাঙ্গালার সাহিত্য-রসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। অনুসন্ধান করিলে এমন কত যে অজ্ঞাতনামা পদকর্ত্তার নাম এবং রচিত পদ আবিষ্কৃত হইতে পারে পদকর্ত্তা রাজা লছমীনারায়ণের কথা তাহাই স্মরণ করাইয়া দেয়। আমরা এইরূপ প্রায় ত্রিশজন পদকর্ত্তার পদ সংগ্রহ করিয়াছি। ইহার মধ্যে কবিত্বপূর্ণ পদেরও অসদ্ভাব নাই।

ধাঁধা

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

বন্ধুরা কহিত, তোমার মধ্যে সাহিত্যের ব্যাসিলি আছে। বস্তুটা ভীষণ সংক্রামক।

এই ভীষণ ও সংক্রামক বস্তুটী বিবর্জ্জিত হইয়া একদিন সপ্তাহিকের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। বলা বাহুল্য, আমিই তার সম্পাদক। আক্রান্ত লোকগুলি শুধু টাকা জোগাইবেন।

তার পর, পক্ষকালের মধ্যে কলিকাতা সহরটাকে প্রায় চষিয়া ফেলিলাম—কোথায় একটা কার্য্যালয়ের উপযোগী ঘরে মেলে! মিলিলও একটা—ভবানীপুর অঞ্চলে।

লম্বা ব্যারাক। পূর্ব্বে যাহারা ইহার উপর ও নীচে-তলার ঘরগুলি অধিকার করিয়া ছিল তাদের সবকটাই না কি স্ত্রীলোক এবং কেহই কুলবধূ নয়। কিন্তু আজ সেখানে তাদের কেহই নাই। পাপ ও প্রলোভনের পসরা লইয়া কে কোথায় সরিয়া গেছে কে জানে!

প্রথমটা একটু আপত্তি করিয়াছিল সবাই। কিন্তু তাদের বুঝাইয়া দিলাম, আমার টাকা লওয়া হইয়াছে—অর্থাৎ আমি কৃতদার। সুতরাং, ভয়ের কারণ নাই।

কাজেই সেইখানেই আস্তানা পড়িল—দ্বিতলে, রাস্তার সামনেকার একটা ঘরে। কলিকাতার হোষ্টেল আর মেসেই এতকাল কাটিয়াছিল। প্রথম রাত্রেই এতবড় ও সেই অনুপাতে নির্জ্জন বাড়ীটায় দস্তরমত ভয় খাইয়া গেলাম। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুম আসিল না। দিনের বেলায় নীচেতলায় একজন কেরোসিন তেল, আর একজন বেগুনী ফুলুরীর দোকান পাতে—রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে তারাও বাড়ী গিয়াছে। সাপ্তাহিকের কথা মনেও ছিল না,—পড়িয়া পড়িয়া ভাবিতেছিলাম নিজের গ্রাম ও তাহারই ছোট একখানি গৃহের কথা। হঠাৎ পেছন দিকে কতকগুলি মনুষ্য-পদ-শব্দ শোনা গেল। তার পর সব নিঃশব্দ। সেই নিঃশব্দ অন্ধকারের মধ্যে মনে পড়িল, একদিন অসংখ্য রূপ-জীবিনী ইহার কক্ষে কক্ষে বিলাস ও ব্যভিচারের স্রোত বহাইয়া গেছে। সেদিনে এমনি নিশীথ-প্রহরে ঠিক এইখানেই হৃদয় লইয়া কত ছিনিমিনি খেলা চলিয়াছে, কথায় কথায় কত অভিমান ও অশ্রুর ধারা বহিয়া গেছে! পথ-ভোলা কত মেয়ে এই অন্ধকূপ-শ্রেণীর মধ্যে মর্ম্মাশ্রু নিষেক করিয়াছে কে জানে!. আনমনে তাদেরই কথা ভাবিতেছিলাম।

দুয়ার খোলাই ছিল। হঠাৎ চোখ পড়িয়া গেল—রাস্তার ওপারে, ঠিক সামনের বাড়ীর বারান্দায়। সন্ধ্যা হইতে মোটা চিক ফেলা ছিল; এখন বোধ করি সরানো হইয়াছে। খোলা বারান্দায় আঠারো উনিশ বছরের একটী মেয়ে—রেলিঙে বুক দিয়া উন্মনস্কের মত দাঁড়াইয়া আছে! বিছানায় পড়িয়াই মেয়েটীকে দেখিতেছিলাম। দু চোখে কী আকুল প্রতীক্ষা ও অগাধ নৈরাশ্য!

কাগজের নেশায় মাতিয়া এবার পূজায় বাড়া যাওয়া ঘটে নাই। প্রতি বার যাই। সেখানেও এমনি একটী মেয়ের বুকে বুঝি এমনই প্রতীক্ষা ও নৈরাশ্যের ভাঙা-গড়া চলিয়াছে……

প্রথম রাত্রিটা এই ভাবেই নানা সঙ্গত ও অসঙ্গত চিন্তার মধ্যে দিয়া কাটিয়া গেল। ভোরের বেলায় নীচে নামিতেছিলাম মুখ হাত ধুইবার উদ্দেশ্যে। দেখিলাম, খাকী কোট-পেন্টলুন আঁটা কতকগুলি লোক আমার আগে আগে চলিয়াছে। দেখিয়া মনে হইল, ট্রামের কণ্ডাক্টার। সত্যিই তাই। ভাবিলাম, ভাল! এমন স্থান ছাড়িয়া সাহিত্য-প্রচার চলিবে কোথায়!

নীচে নামিয়া ইহারাও কোট-প্যাণ্ট সমেত মুখে-চোখে জল দিতে লাগিল এবং তাহারই ফাঁকে একজন আমার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, আপনিই এই বাড়ীতে এলেন বুঝি?

বলিলাম, আপাততঃ।

লোকটী বিমর্ষ হইল। বেশী দিনের জন্যে নয় তা হ'লে?

কিন্তু থাকলে ভাল করতেন। এতবড় বাড়ীতে আমরা ভয়ানক একলা!

কহিলাম, আমি ততোধিক। আচ্ছা, দেখি কদ্দিন টি'কতে পারি।

বেশ, বেশ বলিয়া লোকটী কোটের হাতা দিয়া মুখের জল মুছিয়া লইল; বলিল, আমার নাম রাধাশ্যাম হুই। হেঁ, হেঁ···আপনি কি করেন?

এখনো কিছু করি না; তবে শীগ্‌গির একটা কাগজ করবার ইচ্ছে আছে।

হুই কহিল, কাগজ তৈরী করবেন? টিটেগড় পেপার মিল?

বলিলাম, অতদুর নয়,—যা হয় এইখানে বসেই করব। 'খবরের কাগজ' বোঝেন ত'?

রাধাশ্যাম বিজ্ঞতার হাসি হাসিয়া বলিল, হেঁ, হেঁ, তাও না কি জানিনে। হেঁঃ, কাগজ আমরা পিত্যহ পড়ি।

বলিলাম, যাক, তবে ত' জানেন।

রাধাশ্যাম শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সহিত কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। তার পর বলিল, আজ ভয়ানক বেলা হয়ে গেল। আজ থাক, আর একদিন আপনার সঙ্গে বিস্তর কথাবার্ত্তা হ'বে।—বলিতে বলিতে টুপিটী মাথায় তুলিয়া দিয়া হুই হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

পক্ষকাল পরে 'প্রদীপ' বাহির হইল। দেশের নাম-করা সমস্ত লেখকগুলিকে প্রদীপের প্রথম সংখ্যায় লিখিতে বাধ্য করিয়াছি, কাজেই কাট্‌তিও সুরু হইয়াছে খুব। এ' ক'য়দিন বেশ নিরুদ্বেগেই কাটিয়াছে। প্রথম রাত্রে একা বলিয়া যে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হইয়াছিল, হুই-প্রমুখ সহবাসীদিগের সহিত পরিচিত হওয়ার পর সেটুকু আর নাই। রাত্রি জাগিয়া 'লীডার' লিখি, নাম-করা লেখকের প্রবন্ধ লইয়া প্রুফ কাটি;—ইহাতেই সময় বেশ কাটিয়া যায়। মধ্যে মধ্যে চিক ফেলা বারান্দার উদ্দেশে চাহিয়া দেখি। কখনো মেয়েটীকে চোখে পড়ে, কখনো দেখাই হয় না। কিন্তু, এই অপরিচিতা, অনাত্মীয়া মেয়েটীকে প্রত্যহ দেখিবার এতখানি কৌতূহল কেন? কি জানি! আকাশের চাঁদ, মাটীর সদ্য ফোটা সুন্দর ফুলটীর প্রতি তো সবাই সমান কৌতূহলে চাহিয়া দেখে। এও হয়ত তেমনি!—আমার প্রবাস-আকাশের একটী তারা, আমার যৌবন-বসন্তের একটী অনাঘ্রাত ফুল।

প্রত্যেক সপ্তাহে 'প্রদীপ' নিয়মিত বাহির হইতেছে। কাট্‌তিও বাড়িয়া চলিয়াছে।

হঠাৎ একদিন হুই আসিয়া আপিসে হাজির! কহিল, আপনার 'প্রদীপ' আমি প্রত্যেক শনিবার কিনি—কিন্তু কিছু বুঝতে পারি না। দৈনিক বেশ লেখে—বোম্বাইয়ে ট্রাম ধর্ম্মঘট! প্রিন্স হুমকী চাঁদ ও রাজকুমারী সপ্পাবাইয়ের কেচ্ছা!—আপনি ত' ও-সব লেখেন না! কেবল, স্বরাজ, সি, আর, দাস—এই সব! আচ্ছা, আপনিই বলুন ত'—স্বরাজ এ' দেশে হ'বে? ইংরেজ পালাবে? আচ্ছা, যদিই তারা পালায়, তা হ'লে ট্রাম ত' আমরাই চালাবো?

বলিলাম, বেঁচে থাকলে অবশ্যই চালাবে। নইলে—

হুই আশ্চর্য্য নেত্রে কহিল, নইলে কী মশায়! আর একটা বৎসর বাঁচব না—এই ত' সবে ঊনত্রিশ!

মনে মনে হাসিলাম। কাগজে কে একজন বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, এক বৎসরের মধ্যে আমরা স্বাধীন হইব। এইটুকুই রাধাশ্যাম পড়িয়া আসিয়াছে; কি করিলে এক বৎসরে স্বাধীনতা আয়ত্ত করা যায়, সেটুকু পড়া বা বোঝা আবশ্যক মনে করে নাই।

হাসিয়া বলিলাম, তা হ'লে তুমি নিশ্চয় চালাবে। তখন তোমার বয়স হবে মোটে তিরিশ।

'তাই বলুন,—বলিয়া হুই হাত বাড়াইয়া আমার পায়ের ধূলা লইল। তার পর কহিল, একটা নিবেদন ছিল প্রকাশ-বাবু—বলিয়াই বিনয়ের ভঙ্গীমায় ঘাড় চুলকাইতে লাগিল।

বলিলাম, বেশ ত' বলো।

হুই হঠাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া কহিল, বেশ করে একবার ঠুকে দিন এই কণ্ডাকটার বেটাদের।

—অর্থাৎ তোমাদের। কিন্তু হঠাৎ—?

হঠাৎ নয়, প্রকাশবাবু, আমি নিজেও যে তাদের একজন; ভাল করেই জানি সব। সেদিন এক বুড়ো ভদ্দর-লোক চার পাঁচটী কচি কাঁচা, মোটপত্তর নিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে চীৎকার করচেন—রোখো, রোখো! কিন্তু কে কার কথা শোনে।·· তার খানিক পরেই এক ফিরিঙ্গি ছোঁড়া, এক বেটীর বগল ধরে, ছড়ি উঁচু করে ট্রাম থামাতে

বললে—অমনি গাড়ী নট-নড়ন-চড়ন !—সার্থক চাঁদ মুখ !—বলুন, নয় কি ?

কোনো উত্তর দিলাম না। মৃদু মৃদু হাসিতেছিলাম। ছুই কহিল, বলুন, সত্যি কি না ?

বলিলাম, সত্যি। এদেশের লোককে তবু লোকে রাজ-ভক্তি নেই বলে নিন্দে করে !

ছুই একেবারে নাচিয়া ফেলিল ; কহিল, ঠিক, ঠিক ! এই রকম করে দিন ত' কসিয়ে ঘা কতক—টিট্ হয়ে যাক সব !—আসচে হপ্তাতেই লিখে দেবেন।

বলিলাম, আচ্ছা।

ছুই খানিক চুপ করিয়া রহিল। সেই অবসরে একটা চুরুট জ্বালিলাম। ছুই কহিল, আরও একটা নিবেদন ছিল—

বলো।

একটী কবিতা দয়া করে নিতে হ'বে আপনাকে।

কার ? তুমি লিখলে না কি হে ?

আজ্ঞে না—তবে আমাদেরই রামশরণ পাঁড়ে—পচ্ছিম জেলার লোক। কলকাতায় ন্যাংটো-বেলা থেকে আছে। বাংলা আর হিন্দিতে সমান পোক্ত—আমরা ওকে পণ্ডিত বলি।

বেশ। কিন্তু কবিতাটী, হিন্দি—না বাংলা ?

বাংলা। এ ভাষা ওকে আমিই শেখাই কি না !

তাই বুঝি শিষ্যের হয়ে নিবেদন করতে এলে ?

হেঁ, হেঁ আজ্ঞে।—

ছুই পকেট হইতে বাদামী রঙের এক-টুকরা কাগজ বাহির করিয়া দিল। উড-পেন্সিলের লেখা। কিন্তু তেল-কালীর দৌরাত্ম্যে পাঠোদ্ধার একপ্রকার অসম্ভব !·· চশমার সাহায্যে বহুকষ্টে নামটুকু পড়িলাম, শাওন রাতে। যাক, হিন্দি-বাংলা দুই-ই আছে। তারপর এইরূপ—

"শাওন রাতে খোলা ছিল তোমার ঘরের জানলা
তুমি তখন ঘরের মাঝে দাঁড়িয়েছিলে একলা···
ঘাড় ফিরিয়ে আর্শির সামনে ··

তারপর আর পড়া যায় না।

বলিলাম, বেশ হয়েছে, খাসা !—কিন্তু এ ত আমার কাগজে চলবে না। কোনো নামী কাগজে পাঠাতে বলো—

ছুই অত-শত বুঝিল না। বন্ধু-গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া কহিল, তাই বলিগে। ওটি ওর দেড় বৎসর আগের লেখা। সাহস করে ছাপতে দেয়নি তাই—

ছুই প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছিল ; নিতান্ত কৌতুক-ছলেই জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, তোমার রাম-শরণকে জিজ্ঞাসা করো দেখি শ্রাবণ রাত্রে কোন্ বাড়ীর জানালা খোলা ছিল—

ছুই ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বিলক্ষণ ! তাও জানে না বুঝি ? ঐ ত' আপনার সামনের জানলা—ঐ খানেই,' ··

বুঝিলাম ইনি শুধু কবি ন'ন, প্রিয়া পিরীতির প্রতি-যোগীও বটেন !

বলিলাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ,—তারপর ?

রাধাশ্যাম কহিল, মাগী বেশ্যে, উনি গিছলেন ভালবাসা করতে ! তা মাগী কি বলেছিল জানেন ? বললে, আমার বাড়ী দারওয়ান থাকবি ?—পাণটা আস্‌টা এনে দিবি—বাবুদের ফাই ফরমাস—শুনেই বন্ধু সেই রাত্তিরে বয়েৎটা লিখে ফেললে !

তার শেষের কথাগুলোয় মনোযোগ দিতে পারি নাই। শুধু একটা কথাই বারবার কাণের দুয়ারে গুঞ্জন করিয়া গেল—ও বেশ্যা !

বলিলাম, আচ্ছা, তুমি এখন যাও,—আমার কাজ আছে।

ছুই বিমূঢ়ের মত নমস্কার জানাইয়া বাহির হইয়া গেল। কণ্ঠস্বর একটু উচ্চগ্রামে উঠিয়াছিল বোধ করি !

সামনের বাড়ীর দিকে চাহিলাম। জানালা তখন বন্ধ। প্রখর দিবালোকে এঁরা দেখা দেন না মলিন হইবার ভয়ে। আমিও দুয়ার বন্ধ করিয়া দিলাম। এ' দুয়ার এমনিই বন্ধ থাকিবে— যতদিন এখানে রহিব।

সে না হয় রহিল, কিন্তু সমস্ত নারী জাতটার উপর সেদিন এমনই অশ্রদ্ধা হইয়াছিল যে আজ সে কথা মনে পড়িলেও লজ্জার অন্ত থাকে না। সেদিন ভাবিয়াছিলাম, এই নারীকে পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্যের কোনোটার মধ্যে স্থান দেওয়া হয় নাই কেন ? সেই জল-ভার-নত দুটী চোখে এতখানি পাপ, এতখানি পঙ্কিলতা কেমন করিয়া লুকাইয়া আছে ? এদের সবাই কি এমনি ? এদের সবার কি মুখে হাসি, চোখে জল ?

তার পর, অনেক দিন গেছে। কিন্তু সে ধারণা আর নাই। কেন নাই, সেইটাই বলিব।

সেটা বড়দিনের মুখ। প্রদীপের একটা 'বিশেষ' এবং 'সচিত্র' সংখ্যা বাহির করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছি। অনেক দিন রাত্রে প্রায় ঘুমানোই হয় না।

দুয়ার তেমনি বন্ধই থাকে। জানালার দিকে আর তাকাইনা।

কিন্তু সামনের ওই ঘরটীতে কলরোলের আর অন্ত নাই! —এমনিই চলিয়াছে দিন কয়েক ধরিয়া। কাজের বড় ব্যাঘাত হয়; মাতালের দল বিনা-নোটীশে হঠাৎ এমন ভাবে চীৎকার করিয়া ওঠে যে সেই শব্দে সমস্ত ভাব, চিন্তা, মস্তিষ্ক-কোটর ছাড়িয়া অন্যত্র পলায়ন করে।

এমনিই দিন যায়। এমনি সময় অনেক কাল পরে সেদিন হুই আসিয়া ঘরে ঢুকিল। প্রণাম করিয়া বলিল,— সংবাদ আছে প্রকাশ বাবু। ছেপে দিন।

কি সংবাদ? জিজ্ঞাসা করিলাম।

হুই একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। তার পর বিজ্ঞতার ভঙ্গীমায় মাথা দুলাইয়া কহিল, মেয়ে-যাত্তারা আসচে—শুনেচেন?

উঁহু। কিন্তু এই কি তোমার সংবাদ—?

হুই উত্তেজিত হইয়া উঠিল; বলিল, সম্বাদ নয়—? বলি মেয়ে-যাত্তারা শুনেচেন কখনো?

স্বীকার করিতে হইল, সে সৌভাগ্য হয় নাই।

—তবে? দিন ছাপিয়ে, আর দেরী করবেন না— একদম টাট্‌কা খপর।—ঝপাঝপ কাগজ কাটবে।

বলিলাম, আচ্ছা দেখি। কিন্তু শুধু এইটুকু লিখলেই ত হবে না। কোথাকার দল, কোথায় আসচে, সব জানা চাই ত।

টেবিলে একটা প্রচণ্ড চড় হাঁকড়াইয়া হুই কহিল, এও জানেন না? হেঃ। বলি আসচে যে এইখানেই।

এইখানে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে আর বলচি কি? কোন এক বড়-মানুষের বাড়ী বায়না পেয়েছে, গাইতে আসচে। অনঙ্গ-মোহিনী অপেরাপার্টি। দিন লিখে।

কবে আসচে?

কবে কি! কাল, কাল সন্ধ্যে বেলা।—আর বলেন কি মশাই, আগে থাকতে জানতে পেলে কাপড়-চোপড়-গুলো ধুইয়ে রাখতাম। হাজার হ'ক তেনারা হ'লেন, স্ত্রী-জাত।

বলা বাহুল্য, এই বিস্ময়কর সংবাদটী প্রদীপের বিশেষ সংখ্যায় স্থান পায় নাই। কিন্তু, রাধাশ্যামের সংবাদ নির্ভুল। পরদিন সন্ধ্যাবেলাই অনঙ্গমোহিনী অপেরা-পার্টি সদলবলে এই প্রশস্ত ব্যারাকের কয়েকটা কক্ষ জুড়িয়া, আস্তানা পাতিয়া বসিল। তখনো 'প্রদীপের' সমস্ত কাপি জোগানো হয় নাই, রাত জাগিয়া কয়েকটা বিলাতী কাগজ ঘাঁটিয়া একটা প্রবন্ধ লিখিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম। রাত প্রায় বারটা। ওধারে অপেরা-পার্টির ঘরগুলিতে তখনো হারমোনিয়াম ও কণ্ঠ-সঙ্গীতের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ চলিতেছিল, —মহলা হয়ত! সেই সুতীক্ষ্ণ স্বরের আঘাতে চিন্তার সূত্র বারবার ছিঁড়িয়া যাওয়ায় এতদূর বিরক্ত হইয়া উঠিলাম যে শক্তি থাকিলে অনঙ্গমোহিনী যাত্রা-পার্টির সবাইকে এখনই গঙ্গা পার করিয়া দিয়া আসিতাম।

এমনি সময় ঘরে ঢুকিল একটী মেয়ে। পরণে চওড়া কালাপাড় শাড়ী; চোখের কোলে খানিকটা কালী জমিয়াছে; বয়স কুড়ি না হইলে, তিরিশ বা তদূর্দ্ধ হইতে পারে। অর্থাৎ দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই। মেয়েটী ঘরে ঢুকিয়াই কপালে হাত ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বলিল, আপনিই কাগজ বের করচেন, নয়?

বলিলাম, হ্যাঁ।

কদ্দিন এসেচেন এখানে? অর্থাৎ—এ-ঘরে—

প্রায় চার মাস।—

মেয়েটী দাঁড়াইয়া ঘরটীর চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তার পর, ছোট একটু নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আগে এই ঘরে থাকতুম।

আপনি?

হ্যাঁ—বলিয়া মেয়েটী একটু হাসিল। তার পর চোখে চোখে চাহিয়া বলিল, আপনাকে বিরক্ত করলাম অনর্থক। যাই—

বলিলাম, বিরক্ত অবশ্য হয়েচি—সে কথা অস্বীকার করব না; কিন্তু সে আপনার আসার জন্যে নয়, আপনাদের দলের ঐ সঙ্গীত-যুদ্ধের জন্যে।

মেয়েটী হাসিল। কহিল, আমরা যাত্রার দলের মেয়ে, জানেন ত ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, জানি। আপনাদের দল বুঝি আগে এই বাড়ীতে ছিল ?

—না। আমি একা ছিলুম এখানে। তার পর যাত্রার দলে যাই। আমরা কি তাও বোধ হয় আপনার জানতে বাকী নেই ?—মেয়েটী অনর্থক একটু হাসিবার চেষ্টা করে—পারেনা। দু'জনে মুখোমুখী নিঃশব্দে বসিয়া থাকি। ও-ধারের সঙ্গীত-সাধনা এইমাত্র থামিয়া গেছে। ঘরের মধ্যে কোথাও এতটুকু শব্দ নাই ; মোমবাতিটী পুড়িয়া পুড়িয়া শেষ হইয়া আসিয়াছে। রাস্তা দিয়া ক্বচিৎ কখনো দুই একটা মানুষ, একখানা খালি গাড়ী ছুটিয়া যাইতেছে।

মেয়েটী হঠাৎ মুখ তুলিয়া চাহিল। বলিল, আচ্ছা বসুন, উঠি এবার। মেয়েটী চলিয়া গেল। মোমবাতিটুকু নিবাইয়া দিলাম। স্পেকটেটার, টিট্‌-বিট্‌স, 'রিভিউ'—সব একাকার হইয়া গেল। শুইয়া পড়িলাম। ভারি অদ্ভুত লাগে এই মেয়েটীকে। কী জন্যে আসিয়াছিল ? এই ঘরে তার অনেক দিন ও রাত্রি কাটিয়া গেছে, সেদিনের স্মৃতি আজ হয়ত তার হৃদয়ে দোলা দিয়াছে···তাই···

কিন্তু এদের কি স্মৃতি বলিয়া কোনো বস্তু আছে,—কোনোদিন, কোনো নিরালা অবসর-ক্ষণেও কি ইহারা অতীতের পানে ফিরিয়া তাকায় ? তার জন্য এতটুকু দীর্ঘ শ্বাস গোপন করিবার চেষ্টা করে ?—

এমনি ভাবিয়াছিলাম সে রাত্রে।

পরদিন। উন্মনা মস্তিষ্কটাকে জোর করিয়া তখন আর একবার ইংরাজী সংবাদপত্রের গহন বনে প্রেরণ করিয়াছি। এমন সময় সবিনয়ে রাধাশ্যামের প্রবেশ।

অপরাধীর মত মিউ মিউ করিয়া বলিল,—লিখছেন বুঝি ?

কাজের সময় কেউ ঘরে ঢুকিলে আমার টেম্পারের টেম্পারেচার ঝাঁ করিয়া চড়িয়া যায়। তাই এই সকুণ্ঠ ভাব। তবু যথাসাধ্য স্বাভাবিক ভাবেই জিজ্ঞাসা করিলাম, কি খপর ?

আজ্ঞে না—পাঁড়ে বলছিল যে ওর কবিতাটুকু আপনাকে নিতে হ'বে।

চটিয়া গেলাম। বলিলাম, হিন্দি-ভাষায় হিন্দি-পাঞ্চে পাঠাতে বলগে। এখানে হ'বে না। আমার কাগজ ডাষ্ট-বিন্ নয়।

আজ্ঞে, তাই বলিগে।

কাজে যাওনি আজ ?

ক'দিন ছুটী নিলাম।

অপেরা-পার্টির খাতিরে নাকি ?

দুই হাসিয়া ফেলিল। কহিল, হেঁ হেঁ—তা নয়, তা নয় ; আচ্ছা, ওই মেয়েটীকে দেখেচেন—?

মেয়েত' ওদের সবাই।

তা নয়—ওই যে বিরাজসুন্দুরী নাকি···

নাম ত' গায়ে লেখা নেই, চেহারার বর্ণনা শুনলে বুঝতে পারি। কিন্তু সময় আমার অল্প,—সংক্ষেপে বলো।

দুই কিছুক্ষণ কুণ্ঠিত ভাবে বসিয়া থাকিল। তারপর হঠাৎ বলিয়া বসিল—ওই যে পাঁড়ে না কে বলছিল—আপনার ঘরে রাত্রে এসেছিলেন।

বিরাজসুন্দরী। নামটা সুবিধার নয়

বলিলাম, হুঁ·· তারপর ?

দুই ব্যস্ত হইয়া উঠিল ; বলিল, আর কিছু নয়—এমনি জিজ্ঞেসা করছিলাম।

তা সোজা কথায় জিজ্ঞেসা করলেই পারতে ?

দুই এ কথার উত্তর দিল না। দুইবার হেঁ, হেঁ করিয়া উঠিয়া গেল। বুঝিলাম, আরও কিছু ওর বলিবার ইচ্ছা ছিল, বলা হইল না। না হউক, আমি বাঁচিলাম। পুনরায় প্রবন্ধটা মনে মনে মক্‌স করিতে সুরু করিলাম।

কিন্তু সে প্রবন্ধ আজও লেখা হয় নাই। কারণ রাধা-শ্যাম প্রস্থান করিবার ক্ষণকাল পরেই 'প্রদীপ' কার্যালয়ে যিনি প্রবেশ করিলেন তিনি স্বয়ং বিরাজসুন্দরী। হাতে একটী বাঁধানো খাতা। হাসিয়া নমস্কার করিলেন।

বলিলেন, আপনার কাছে একটী অনুগ্রহের জন্য এসে-ছিলাম—

মনে মনে হাসিলাম !—মন্দ নয়। যে আসে—তারি অনুরোধ, নয় নিবেদন, নয়ত অনুগ্রহ-ভিক্ষা।—দুই হইতে এই অনঙ্গমোহিনী অপেরা-পার্টির বিরাজ-সুন্দরী পর্য্যন্ত—সকলেরই।

যাক্। বলিলাম, বেশত', বলুন—

হাতের খাতাখানি টেবিলের উপর রাখিয়া বিরাজ বলিল, এই লেখাটী আপনার কাগজে ছাপতে হ'বে।

হাসি প্রকাশ পাইলে অন্যায় হইতনা। কিন্তু, প্রদীপের সম্পাদক আমি; সেই পদ-মর্য্যাদার উপযোগী কণ্ঠে, গম্ভীর হইয়া প্রশ্ন করিলাম, কি বিষয়ে লিখেছেন? স্ত্রী স্বাধীনতা সম্পর্কে বোধ হয়?

বিরাজ বলিল, না। ইটি প্রবন্ধ নয়।—গল্প। পড়ে দেখবেন। মনোমত না হ'লে ধন্যবাদের সঙ্গে ফেরৎ দেবেন এবং আরও লেখবার জন্য উৎসাহিত করবেন।

বুঝিলাম, মেয়েটী সাধারণ নয়। সম্পাদক-সাধারণের প্রতি খোঁচাটুকুও বুঝিতে বাকী রহিল না। কহিলাম, এর আগে কোথাও লিখেছেন?

না। জীবনে আমার এই প্রথম ও শেষ গল্প। আমাদের অপেরা-পার্টিতে যে বইখানা প্লে হয় সেটা আমারই লেখা। কিন্তু, কাগজে লেখা দিতে আমার এর আগে সাহসই হত না। আপনাকে দেখে···

কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়াই বিরাজ হিহি করিয়া হাসিয়া উঠিল! হাসি থামিলে বলিল, তা বলে ভাববেন না যে এই লেখা দিয়ে আপনার সঙ্গে ভাব করতে এসেছি!

তারপর,—আবার সেই হাসি!

প্রবন্ধ লেখা পড়িয়া রহিল। বিরাজের লেখা গল্প লইয়া পড়িতে বসিলাম।

ছোট গ্রাম; তারই ছোট এক ঘরে স্বামী স্ত্রী দুইজনা। বাপ-পিতামহ সম্পত্তি হিসাবে শুধু ঘরখানিই দিয়া গেছেন, কাজেই অল্পবয়সী ব্রাহ্মণ সন্তানটীকে পূজা-অর্চ্চা করিয়াই দিন কাটাইতে হয়। কিশোরী বধূ স্বামী না ফিরিলে মুখে অন্ন দেয়না; দুপহরের রৌদ্র মাথার উপর গলিয়া পড়ে, বধূ স্বামীর পথ চাহিয়া বেড়ার পাশে দাঁড়াইয়া থাকে। তারপর ঘরে ফিরিলে সে কী নিরাবিল প্রেম-গুঞ্জনের পালা!—সমস্ত বিরহ তখন মধুর হইয়া ওঠে; ক্লান্ত দুপহরকে চন্দ্রালোকিত রাত্রি বলিয়া ভুল হয়।

এমনি দিন যায়। দু'জন লইয়া তাদের সংসার, দু'জন লইয়া তাদের পৃথিবী। রাত্রে ঘরে ফিরিয়া স্বামী দীপালোকে অধ্যয়নে বসে। সেই পাঠরত ক্লান্ত মুখের পানে চাহিয়া বধূর বুক ভরিয়া ওঠে। বলে, কী পড়ো? আমায় শেখাও না একটু—

তারপর, দু'জনেই পড়ে। দু'জনেই পড়া ভুল করে। ভুল করিয়া দু'জনেই একসঙ্গে হাসিয়া ওঠে। তারপর, দু'জনেই গম্ভীর হয়! এমনি করিয়া সময়ের স্রোতে রাত্রিদিবস অনন্তের উদ্দেশে ভাসিয়া যায়। কৈশোরের মালঞ্চে যৌবনের ফুল ফোটে।

সামনে পূজা। তেরো ক্রোশ তফাতের জমীদারবাড়ী হইতে পৌরোহিত্যের নিমন্ত্রণ আসে। বউটী দিনরাত কাঁদিয়া কাটায়। কেমন করিয়া একলা থাকিবে। কিন্তু থাকিতে হয়; সংসারের বিচিত্র পণ্য-শালায় পরম অসম্ভবটাই সহসা সম্ভব হইয়া ওঠে। বুক বাঁধিয়া থাকিতে হয়। টোলের বছর দশেকের একটা ছেলে বউটীকে আগলায়।

কিন্তু—

একটা বালক আর একটা মেয়ে কামাতুর পাষণ্ড দলকে প্রতিরোধ করিতে পারেনা। তাই একরাত্রে গৌরীর যৌবনের ফুল দিয়া তাদের কাম-দেবতার পূজা হয়।

যজ্ঞ-ধূমের মাঝখানে, জমীদার-বাটীতে দেবী হয়ত আড়ষ্টই হইয়া থাকেন, তাঁ'র চিন্ময়ী মূর্ত্তিতে চেতনার স্পন্দন এতটুকুও জাগেনা।

স্বামী ফিরিলেন। কিন্তু, স্বামীর চেয়ে বোধ করি সমাজ বড়, তাই সে স্বামী ও স্ত্রীর গতি-পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন দুইদিকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল। স্বামী তাঁহার অধ্যয়ন ও অর্চ্চনা লইয়া একা-ঘরে একা ফিরিয়া গেলেন। গৌরী নামিয়া গেল পাপের রসাতলে!···সেখানে সে কী উদ্দাম প্রতিক্রিয়া, বিলাসের বীভৎস উল্লাস!

তারপর যৌবন একদিন শুষ্কপত্রের মতই দেহ হইতে বিদায় লইয়া গেল। গৌরী আপনার পানে ফিরিয়া তাকায়!—কোথায় ছিল, আর আজ কোথায়! শূন্য হাহাকারে তার হৃদয় ভরিয়া ওঠে! স্বামী-গৃহের প্রতিটি কথা, প্রতিটী কাজ শতবার নির্জ্জনে বসিয়া স্মরণ করে স্বামীর মুখের প্রসাদটুকুর জন্য সেই সুমধুর কাড়াকাড়ি

প্রচণ্ড ক্রোধের মধ্যে সেই ভুল করিয়া হঠাৎ হাসিয়া ফেলা, হাসিতে হাসিতে চোখে জল !

সে সব আজ তার আয়ত্তের বাহিরে !

দেহকে একদিন সে জীবনের পায়ে বলি দিয়াছিল, সেই জীবন আজ দেহের কাছে হঠাৎ তুচ্ছ হইয়া গেল।

নির্জ্জন অবসরে বসিয়া গৌরী ভাবে, একটা দামাল, দুরন্ত ছেলে যেন তার পায়ে পায়ে ঘুরিয়া বেড়ায়, আঁচল ধরিয়া টানাটানি করে, ঘুমের মধ্যে হঠাৎ বুকের ওপর ঝাঁপাইয়া পড়ে।

কিন্তু···কোথায় কি ! দিনের আকাশে তারা যে থাকিয়াও নাই।

এমনি করিয়া গৌরীর মন পুরাতন শান্তি নীড়ে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ওঠে। কিন্তু, পথ নাই, যাইবে কোথায় ! তাই অতীত দিনের কাহিনী দিয়া স্মৃতির পসরা সাজায়। রূপের বেচাকেনা ভাল লাগেনা। তারপর হঠাৎ একদিন বাসা ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া যায়।

লোকে বলে, মেয়ে-যাত্রার দলে।

* * * *

ওইখানেই গল্পটীর শেষ। কিন্তু শেষ হইয়াও তার যেন শেষ নাই। মনে মনে কল্পনা করিয়া লই, এই গৌরীকে খুঁজিলে আজও অনঙ্গমোহিনী অপেরা-পার্টিতে দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই কিছুকাল আগেও সে খাতা হাতে আমার সুমুখে বসিয়া ছিল। এই ঘরে বসিয়াই একদিন এই গৌরী অনুতাপের অশ্রু ফেলিয়া স্মৃতির ডালা সাজাইয়াছে ও এইখানেই আজ তাহাতে আমাতে দেখা !

হারানো জিনিষ যেন ফিরিয়া পাই !

যে দুয়ার বহুদিন হইতে বন্ধ ছিল, সেটা খুলিয়া দিলাম। মনে মনে বলিলাম, মানুষকে যেন তার হাসি দেখিয়া কোনোদিন বিচার করিতে না যাই ; আর তার চোখের জলের দামটুকু যেন ষোলো আনা দিতে পারি।

দ্বিপ্রহরে

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

স্তব্ধ দুফুরেতে সকল কাজ ফেলে
ওধারে বসে থাকি জানলা রাখি মেলে ;
একটা বটগাছ একটা ডোবা আছে
তাদের মাঝখানে ধানের ক্ষেত নাচে,
সেখানে ছায়াতলে হরষ বুকে ছেয়ে
সারাটা দিন থাকে একটী ছোট মেয়ে।
সে আসে ভোর বেলা অশথতলা দিয়ে
বাঁশের লাঠি আর ছাগল-শিশু নিয়ে,
যেখানে বটগাছে দুইটী জটা নেমে
কে জানে কবে হ'তে জড়ায়ে আছে থেমে ;
সেখানে খেত দোল্ কেবল্ হেসে হেসে
বাতাস যেত খেলে ছড়ান কেশে বেশে।
ছাগল-শিশু ওর ডোবার পাশে পাশে
ফিরিত চরে চরে সবুজ ঘন ঘাসে ;
ছড়ান সাদা কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
আকাশ থেকে থেকে প্রকাশে আপনাকে ;
বটের গাছে বসে একটা ছোট পাখী
দূরের সাথীটিরে করিত ডাকাডাকি।
সূর্য্য নামে ধীরে আকাশ ধরে ধরে,
দুফুর কেটে গিয়ে বেলাটা যেত পড়ে।
স্নিগ্ধ মৃদু মৃদু বৃষ্টি যেত ঝরে
ধানের ক্ষেত আর বটের পাতা ভরে,
জলের কোলে তবে ফুটিত মৃদু হাসি
দুধারে সরে যেত শ্যাওলা রাশি রাশি।
মেয়েটী নেমে এসে ছাগল-শিশু নিয়ে
ঘরেতে ফিরে যেত মাঝের পথ দিয়ে ,
ধানের গাছগুলি শিহরি ওঠে ঝুকে,
লুটায়ে পড়ে যেত কোমল মুখে বুকে,
আমার বুক মাঝে কেবলি যেত ছেয়ে
ধানের ক্ষেত আর একটী ছোট মেয়ে।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে খেয়ালের স্থান

শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল

(২)

কি প্রকারে খেয়াল গান হইত, ক্রমে ক্রমে কি কি পরিবর্ত্তন হয়, এইবার তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথমে—খেয়াল গানে কি কি হওয়া উচিত বা হইতেই হইবে তাহা দেখা যাউক।

সর্ব্বপ্রথমে—আস্থায়ী গাওয়া হয়। এ স্থলে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম যে খেয়ালীরা আলাপ বা তোম্ তায় নোম্ করেন না। কদাচিৎ দুই একজন আলাপ করেন—তাহা অনুরুদ্ধ হইলে। মুস্তাফ্ হোসেন, বদল খাঁ, রাজাভাইয়া, শ্যামলালবাবু প্রভৃতি গুণী লোকদিগের নিকট শুনিয়াছি যে খেয়াল গায়কগণ আলাপ করেন না—অর্থাৎ না করিলে কিছু হানি নাই। ধ্রুপদ গায়কগণ আলাপ করেন। যাই হোক্—খেয়াল গায়কগণ যে আলাপ করেন না তাহা অসামর্থ্য হেতু নহে—অন্য কারণ আছে।

আস্থায়ী গাওয়ার পরই শুদ্ধ অন্তরা গাওয়া হইয়া থাকে এবং খেয়াল গানের মূল পত্তন হয়। তাহার পর "বহলাওবা" বা "বহলাও" হইয়া থাকে। ইহা "আ" স্বরবর্ণের সাহায্যে হয় এবং ঠেকার মাত্রা হিসাবে ও ছন্দোবদ্ধ ভাবে গীত হইয়া থাকে। ইহাকে আলাপের টুক্‌রা বলা যাইতে পারে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভিন্ন ভিন্ন গানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বহলাওবা কল্পিত হইয়া থাকে এবং হওয়া উচিত। কারণ—সব গানে একই প্রকার "বহলাওবা" কল্পিত হইলে ভিন্ন ভিন্ন গান করিবার প্রয়োজন কি? এবং ভিন্ন ভিন্ন গানে ভিন্ন ভিন্ন রস সৃষ্টি করিতে হইলে একই প্রকার বহলাওবায় কল্পনা করিলে কিরূপে তাহা সম্ভব হয়? বহলাওবা গুলির উদ্দেশ্য—আস্থায়ী ও অন্তরার রসোপযোগী Background তৈয়ার করা। সুতরাং ইমন কল্যাণের করুণ রসের গানে ও শৃঙ্গার রসের গানে উপযুক্ত Back groundও পৃথক হইবে। এই প্রকার রসবোধ থাকিলে সমস্ত গানটী সুচারু হয়। ইহাই খেয়াল গানের ভিতরকার কথা—যে যেমন গান তাহার তেমন বিস্তার।

পশ্চিমা নামী খেয়ালীগণ উক্ত প্রকার বহলাওবা করিয়া থাকেন এবং ভিন্ন ভিন্ন গানে ভিন্ন ভিন্ন বহলাওবা করিয়া রসবোধের পরিচয় দিয়া থাকেন। তবে মধ্যে মধ্যে গায়কগণ উত্তেজিত হইয়া এবং তথাকথিত সমঝদারের প্রশংসা লাভ করার জন্য এমন কর্ত্তব করিয়া থাকেন যে রসভঙ্গ হয়। (ভাগ্য যে খেয়ালগানের সমঝদারগণ খেয়ালগানের ভিতর রসের আকাঙ্ক্ষা করেন না!)

যাই হোক্—বহলাওবার ভিতর দিয়া Artistএর সুচারু কল্পনা, সামঞ্জস্য-জ্ঞান ও মাধুর্য্য সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

"বহলাওবা"র পর "ফিকিরফন্দী" তান আরম্ভ করা হয়। ফিকিরফন্দী অর্থ কৌশল ও চাতুরী; বলা বাহুল্য, এই কথাগুলি সাধারণ ভাবে চল্‌তি কথার মধ্যে পশ্চিমারা ব্যবহার করিয়া থাকে। আমি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি যে, ঐ কথাগুলি তরবারী খেলা ও কুস্তী খেলার সম্পর্কে বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হয়। মজার কথা এই যে, খেয়াল গানে সুরের মারপেঁচের সহিত তলোয়ার খেলার কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়; এবং যদি গায়কের মুদ্রাদোষ থাকে তবে ত কথাই নাই। এ কথা যদি স্বীকার করা যায় যে, মুসলমান গায়কই খেয়াল সৃষ্টি করিয়াছে এবং রাজপুতানা, গোয়ালীয়র ও দিল্লী যদি খেয়ালগানের স্থান হয়, তাহা হইলে খেয়ালগানের Demonstrative কর্ত্তব-এর মধ্যে তলোয়ার খেলার পেঁচের সাদৃশ্য থাকা আশ্চর্য্য নহে। "হরকৎ" "ফান্দা" "ঝট্‌কা" প্রভৃতি কথাগুলিও খেয়ালের Technique হিসাবে ব্যবহৃত হয়। "হরকৎ" অর্থ হঠাৎ আক্রমণ; "ফান্দা" অর্থ ফাঁদ; "ঝট্‌কা" অর্থ হঠাৎ বিপরীত কৌশল।

এই কৌশলগুলি গানের সময় শুনিলে মনে হয় যেন কোনও নিয়মের বশবর্ত্তী নহে, Artistএর খেয়াল অনুসারে হয়। বাস্তবিক তাহা নহে। এগুলি সাজাইবার কায়দা বা রীতি আছে। উদাহরণ স্বরূপ—একটি "সম্" হইবার পর—মুদারার সা কিম্বা গা হইতে তারার সা ও গা পর্য্যন্ত

একটি হরক্কৎ লওয়া হয়। তখন তারার "সা"র চারিদিকে ফান্দা, ঝট্‌কা প্রভৃতি কৌশলী কর্ত্তব করা হইয়া থাকে ;—অবশ্য এইগুলির অন্ত নাই এবং প্রকৃত Artist এই কাজগুলি মনোহারী ভাবে দেখাইয়া থাকেন। ইহার পরই একটি অবরোহী তান লইয়া "সা" তে ফিরিয়া আসা হয়। ইহার পরই আস্থায়ীর "সম"-এর মুখটি ধরিয়া সম দেখান হয়। এই সময়ে খেয়াল গান এক অপরূপ মূর্ত্তি ধারণ করে। ধ্রুপদ গানে যেমন রাগিণীর একটা Static সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায়, খেয়াল গানের মাঝামাঝি সময়ে রাগিণীর একটি Dynamic বা সঞ্চরণশীল সৌন্দর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়—যাহাতে মনে হয় যেন সুরগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

লক্ষ্য করিয়াছি—ঐ কর্ত্তবগুলি "Ligato" ভাবেই সম্পাদিত হয়। স্বরগুলি কাটাকাটা ভাবে, খণ্ড খণ্ড ভাবে উচ্চারিত না হইয়া যদি মোলায়েম ভাবে পরস্পর সম্বন্ধবদ্ধ হইয়া উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে "বে-জরব" তান (Ligato) বলে এবং খণ্ড খণ্ড (যেমন খাণ্ডারবাণী) ভাবে উচ্চারিত হইলে তাহাকে জরবদার তান বলে। জরব মানে—বীণকার বা রবাবীদের হাতে তার আঘাত করিবার লৌহখণ্ড বা কাষ্ঠখণ্ড বিশেষ। একবার আঘাত করিয়া যদি চার পাঁচটি সুর বাহির করা যায়, তাহাকে বেজরব তান বলে। এবং প্রত্যেক আঘাতে এক একটি করিয়া সুর বাহির করিলে জরবদার তান বলা হইয়া থাকে। এই দুইটি যন্ত্র-ঘটিত কর্ত্তব খেয়ালীগণ কণ্ঠস্বর দ্বারা নকল করিয়া থাকেন। দুইটিরই বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য আছে—যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারা বুঝেন।

ঐ কর্ত্তবগুলি Ligato ভাবে সম্পাদিত হইলে ক্রমে জরবদার তান আরম্ভ হয়। বলা বাহুল্য—খেয়ালের শেষের দিকে "হলফ্" তান নামক এক প্রকার তান করা হয়—তাহা Ligato ; কিন্তু এরূপ বিস্তৃত কণ্ঠস্বর দ্বারা ঐগুলি সম্পাদিত হয় যে Ligatoর মোলায়েম ভাব মোটেই থাকে না—পরন্তু, এক অদ্ভুত রসের সৃষ্টি হয়। সুচারু রূপে সম্পাদিত হইলে উহা এক রৌদ্র সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে ; নতুবা বিকট "হাউ" "হাউ" ধ্বনিতে পরিণত হইয়া সঙ্গীতের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া থাকে।

এই সময়ে গমক্ তান, হলফ্ তান ও সপাট্ তান দেখান হয়। গমক্ তান আর কিছুই নহে—প্রত্যেক সুরকে "গমক্" বা আন্দোলন সহকারে দেখান হয়। হলফ্ তানে পরপর দুইটি সুর কম্পিত হইতে হইতে অগ্রসর হয়। সপাট তান—শুদ্ধ আরোহণ ও অবরোহণ তান।

এইগুলির পর—"ফিরৎ" বা মোড়ফেরা (Turnings) চকিতের ন্যায় সম্পাদিত হয়। তার পর ছুট তান দেখান হয়। অর্থাৎ দুই তিনটি টুকরা কিয়দ্দূর ব্যবধানে ক্ষিপ্রকারিতার সহিত দেখান হয়। প্রকৃত Artistএর নিকট এই ছুট তান শুনিলে মনে হয়—যেন বিদ্যুৎ চমকাইতেছে।

ইহার পর—"মুস্কিলাৎ" অর্থাৎ বিপজ্জনক তান। (গান-বাজনা করা যে বিপজ্জনক হইতে পারে—ইহার পর আর কোনও সন্দেহ থাকিল না!)—অর্থাৎ সুরগুলি এরূপ অসাধারণ ভাবে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট করিয়া দেখান হয়, যাহাতে বোধ হয় যে রাগিণী অশুদ্ধ হইয়া গেল ; কিন্তু গায়কের কৌশলে রাগরাগিণীগুলি (এবং শ্রোতারাও) নানা বিপদের মধ্য দিয়া পার হইয়া স্বস্তিত হন।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়িয়া গেল। গান-বাজনার মধ্যে হাস্য-রসেরও অবতারণা করা যাইতে পারে—তাহার উদাহরণ প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীকৃষ্ণ বড়াজনের গান শুনিয়া পাইলাম। এই যুবকটি খেয়াল গানের মধ্যে ও শেষের দিকে অবলীলাক্রমে ও ছন্দোবদ্ধ ভাবে এরূপ "সারগম" এর খেলা দেখাইয়াছেন যে, উপস্থিত শ্রোতারা "সম্" এর সময় সকলেই স্মিত ও পূর্ণ হাস্য করিতেছিলেন। ঐ প্রকার ক্রীড়াগুলির এমন একটি Element of Surprise এবং চাতুরী ছিল যাহা কতকটা লুকোচুরী খেলার ন্যায়। ইহাও একটা সৌন্দর্য্য, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অবশ্য যাঁহারা গোঁড়া তাঁহারা স্মিতহাস্য করিতেছিলেন ; কিন্তু আমাদের মত অর্ব্বাচীনরা দন্তবিকাশ পূর্ব্বক হাস্য রসিকতার পরিচয় দান করিতে কুণ্ঠা বোধ করি নাই।

যাহা হউক—মুস্কিলাৎ তানের পর কেহ কেহ বোল্ তান ও জম্‌জমা নামক দুইটি তান ব্যবহার করেন। এ দুইটি টপ্পার অঙ্গীভূত। বোল্ তান অর্থাৎ প্রত্যেক শব্দের সহিত তান। জম্‌জমা মানে সন্নিহিত দুইটি সুরকে আন্দোলিত করিতে করিতে তান করা।

ইহার পর আস্থায়ী ও অন্তরা পুনর্ব্বার গান করিয়া খেয়াল শেষ করা হইয়া থাকে।

মোটের উপর—ঐ কর্ত্তবগুলি একটির পর একটি বিশিষ্ট ও সাজান ভাবে গান করিলে সমস্ত Presentationটি সুন্দর ও মনোহারী হয়। নচেৎ আস্থায়ীর পর হঠাৎ জরবদার তান বা ছুট তান খামখেয়ালী করিয়া করিতে গেলে বড়ই অতর্কিত ও শ্রুতিকটু বলিয়া বোধ হয়। এক কথায় খেয়াল গানে একটি Sequence আছে—ইহা একেবারেই খেয়াল নহে।

আধুনিক খেয়াল গানে উপরিউক্ত কতকগুলি কর্ত্তব করা হয়—যাহা হর্দ্দু হস্মু খাঁর আমলে ছিল না। ইঁহাদের সময়ে আস্থায়ী, অন্তরা বহলাওবা, হলফতান, ও সপাট তান ছিল। হর্দ্দু হস্মু ও নাথুখাঁর বংশধর মহম্মদ খাঁ, নিসার হুসেন ও রহমৎ খাঁ কিছুদিন আগে জীবিত ছিলেন। বদল খাঁ, শ্যামলাল বাবু প্রভৃতি গুণী লোকদের নিকট শুনিয়াছি যে উঁহারা আধুনিক কর্ত্তবগুলি করিতেন না। আধুনিক কর্ত্তবের মধ্যে "মুরকী," "চরখী তান" ও "চৌদুনী তানে"র নাম করা যাইতে পারে। আমি বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি যে এগুলিও প্রাচীন আমলে ছিল না।

উল্লিখিত কর্ত্তবগুলি যেমন এক দিকে খেয়ালের বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়াছে—অন্য দিকে অসমর্থ, রসজ্ঞান-বিবর্জ্জিত গায়কের হাতে পড়িয়া কতকগুলি শ্রুতিকটু ব্যাপার উৎপন্ন করিয়া সাধারণ লোকের মনে খেয়াল গানের সম্বন্ধে এমন একটি বদ্ধমূল ধারণা করাইয়াছে, যাহার স্পষ্টার্থ করিলে বুঝায়—খেয়াল গান সুমিষ্ট ও শ্রুতিসুখকর হইতে পারে না; এবং খেয়াল গানের কথার সহিত সুরের কোনও সম্বন্ধ নাই। এই ধারণার জন্য দায়ী অবশ্য বিকৃত-রুচি খেয়াল গায়কগণ, সন্দেহ নাই। (vide "এক ছিল শেয়াল, তার বাপ্ গাচ্ছিল খেয়াল্"—কথাটি যে খুবই মার্মিক সমঝদারের কথা তার আর সন্দেহ নাই। দ্রষ্টব্য এই যে শেয়ালটি যুবক —তার বৃদ্ধ বাপ্ হাউ হাউ করিয়া খেয়াল গানের কর্ত্তব করিতেছিলেন—পাছে যুবা শেয়ালটির গান যদিই বা ভালই লাগিয়া যায়—ইতি ব্যাখ্যা।)

এখনও কয়েকজন খেয়াল গায়ক (ও তদুপযুক্ত সমঝদার) আছেন, যাঁহারা সময়-স্রোতের উপর ভাসমান উন্নতিশীল সৃষ্টিকে মানিয়া লয়েন নাই। তাঁহারা একশত বর্ষ অতীত যুগের দ্রব্য-সম্ভার সযত্নে পোষণ করিতেছেন, অথচ নূতন সৃষ্টিগুলি আহরণ করিতেছেন না। ফলে তাঁহাদের জিনিষগুলি নষ্ট হইয়া যাইতেছে ও সজীবতা হারাইয়া ফেলিয়াছে। ইঁহাদের মুখের বুলি—"আহা. হর্দ্দুখাঁ কি গানই না গেয়ে গিয়েছেন, সেদিন কি আর হবে!" ইত্যাদি। হর্দ্দুখাঁর পরে যে কত কি নূতন হইয়া গেল তাহা হয়ত দেখিতে পান না—না হয় দেখিয়াও দেখেন না! ইঁহাদের মনের অবস্থা দেখিলে একটি গল্প মনে পড়ে—এক মৌলবীর ছেলের অসুখ হইয়াছিল। মৌলবী সাহেব অবস্থা দর্শন করিয়াই চীৎকার করিতে লাগিলেন—"হায়, লোক্‌মান নাই—লোকমান হাকিম মরা লোক বাঁচাইতে পারিত" ইত্যাদি। পাড়ার লোকে তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল "আরে মিয়া সাহেব, লোক্‌মান হাকিম কবে মারা গিয়াছে—তার জন্য কাঁদিলে কি হইবে; আপাততঃ পাড়ার ডাক্তারকে ত ডাকিয়া পাঠাও।" মৌলবী সাহেবকে অনেক কষ্টে বুঝান হয় যে, লোকমান নাই ত কি হইয়াছে; যাহারা আছে, তাহাদের কাজ ত এখন দেখ।

ইঁহাদের মুখেও সেই তানসেন ও মল্লারের গল্প, সেই বৈজুবাওরার গল্প, সেই গোপাল নায়কের গল্প, সেই হর্দ্দুখাঁর হাতী তাড়ানর গল্প!

বাঙ্গলাদেশের খেয়ালীয়াদের মুখে যেমন "বহলাওবা" বিশেষ শুনা যায় না, তদ্রূপ চৌদুনি তান, মুরফি, চরখি, বোল তানও শুনা যায় না। কিন্তু একটি জিনিষ বহুল ভাবে শুনা যায়—তাহা "বাঁট" বা "উপজ"। পশ্চিমা খেয়ালীদের গান যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে বাঁট এতই অল্প যে, খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। এখানে গান আরম্ভ হইতে না হইতেই তাহার দুনি, আড়, কুআড় প্রভৃতি বাঁট হইয়া থাকে; এবং অনেক সময়ে সেগুলি Mechanical বা তোতা পাখীর বুলি আওড়ানর মত শোনা যায়। ইহার একমাত্র কারণ—তবলার পরন্দ। অর্থাৎ পশ্চিমা গায়কের খেয়াল গাইবার সময়ে পশ্চিমা তবলা-বাদক শুদ্ধ ঠেকা দিয়া থাকে। এখানে তবলা বাদকের (প্রায়ই সৌখীন লোক) আঙ্গুলিগুলি গান আরম্ভ হইবামাত্রই—পরন্দ বাজাইবার জন্য কাতর হইয়া উঠে। গায়কের লয় পরীক্ষা করার vanityও ষোল আনা আছে (Judge ye not, that ye be judged!) কাজেই—গায়ক বেচারাও নিজের মান রক্ষা করিবার জন্য ছন্দ ও বেছন্দ, আড় ও কুআড়, দুন ও পরদুন করিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে থাকে।

এই প্রকার গায়কগণ ভুলিয়া যান যে, গান-বাজনা কসরৎ দেখাইবার জন্য হয় নাই। এবং খেয়াল গানের বিশেষত্ব বাঁট ও লয়ের কাজের উপর নির্ভর করে না। খেয়াল গানের সৌন্দর্য্য শুদ্ধ স্বর-বিন্যাস ও তাহার অপূর্ব্ব গতি ও ভঙ্গীর উপর প্রতিষ্ঠিত আছে। যাঁহারা এই প্রকার সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করিতে অক্ষম, তাঁহারা শুদ্ধ চাৎকার ও লয়ের "কাজ" দেখাইয়া বড় artist বলিয়া গণ্য হইবেন না।

খেয়াল গানে রাগরাগিণীরও কিছু বিশিষ্টতা আছে। একই রাগ বা রাগিণী ধ্রুপদের ধীর মন্থর গতিতে যে রূপ ধারণ করে, খেয়ালে অপেক্ষাকৃত দ্রুত লয়ে ও তান কর্ত্তব সংযোগে যে অন্য রূপ ধারণ করে, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই এবং দোষও নাই। ইহা ছাড়া খেয়ালীরা তান কর্ত্তবের সামঞ্জস্য রক্ষা ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিবার জন্য যে একটু-আধটু পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছেন, তাহা নিন্দনীয় নহে। একজন ধ্রুপদীয়ার সহিত এক দিন এ বিষয়ে তর্ক হয়। তিনি খেয়াল গানের উপর কৃপা করিয়া তাহার সুখ্যাতি করিয়াও বলিলেন যে, কিন্তু, খেয়াল গানে রাগের ধর্ম্ম বজায় থাকে না। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ধ্রুপদে কি রাগের ধর্ম্ম বজায় থাকে?

তিনি গোঁফে চাড়া দিয়া তৎক্ষণাৎ বলিলেন "হাঁ—নিশ্চয়ই।"

আমি—আপনারা ভীমপলাশীতে চড়া ধৈবৎ (শুদ্ধ ধৈবৎ) ব্যবহার করেন?

ধ্রুপদ গায়ক—হাঁ করি।

আমি—আপনি কি জানেন যে উত্তরা ধৈবৎ দিয়ে ভীমপলাশী গান করে?

ধ্রুপদ গায়ক—হাঁ—তা শুনেছি বটে।

আমি—দেশকার রাগিণী কি ভূপালীর ঠাটে গান করেন?

ধ্রুপদ গায়ক—হাঁ—তাই করি।

আমি—আপনি তানসেনের ঘরবানাকে authority মানেন?

ধ্রুপদ গায়ক—হাঁ মানি।

আমি—আপনি কি জানেন যে রামপুরে এবং পাঁছাও বাজিসেনী ঘরবানার বীণকার ও ধ্রুপদীয়ারা দেশকার পুরবীর ঠাটে গান করে?

ধ্রুপদ গায়ক—তা ত জানি না।

আমি—আপনি রামপুর ও গোয়ালিয়রে কখনও গিয়াছেন?

ধ্রুপদ গায়ক—না, যাই নাই।

আমি—বেশ—ঐ সব যায়গায় একবার দয়া করে যাবেন এবং তার পর বলবেন যে ধ্রুপদের একমত ও রাগের ধর্ম্ম বজায় থাকে। আপনি শুদ্ধ নিজের ওস্তাদের গান শুনেছেন এবং জানেন না যে রাগ-রাগিণী ধ্রুপদ গানেও অনেক ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে।

এই সব শ্রেণীর গোঁড়া ও অজ্ঞ লোকেরা কত স্পর্দ্ধার সহিত গান-বাজনার সমালোচনা করে—তাহা দেখিবার জিনিষ।

খেয়ালের বিচিত্র গতিভঙ্গী দ্বারা রাগিণীর রূপও যেরূপ সুপ্রকাশিত হয় আবার, একই স্বরে অনেকক্ষণ থাকিয়া একঘেয়ে হইবারও ভয় থাকে না। "Life is motion" কথার যদি সার্থকতা থাকে, খেয়াল গানের গতির মধ্য দিয়া রাগিণীর এমন একটি চলন্ত জীবনের সাড়া পাওয়া যায়—যাহা ঢিমাগতির ধ্রুপদে পাওয়া যায় না। ইহা দ্বারা ধ্রুপদকে ছোট করা হইতেছে না; এই মাত্র বলা হইতেছে যে ধ্রুপদের মধ্যে রাগরাগিণীর একটি Static মূর্ত্তি পাওয়া যায়—খেয়ালের মধ্যে সেটী সঞ্চরণশীল।

খেয়ালের জন্য যে সকল গান রচিত হইয়াছে, তাহা গান করিলেই খেয়াল গান করা হয় না। ইহা বিশেষ দ্রষ্টব্য। কারণ, জনসাধারণের মনে কতকগুলি চতুর-প্রকৃতির ওস্তাদ এমন ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছেন যে, শিক্ষার্থী যুবক মাত্র "ছাপমারা" গান লইবার জন্যই ব্যস্ত হইয়া পড়ে। খেয়াল একটি ঢং বিশেষ; ইহার ছাঁচে ফেলিয়া যে কোনও গানই খেয়াল গান করা যাইতে পারে। খেয়ালের বাজারে সদারঙ্গের ছাপমারা গানের মূল্য সমধিক—যদিও অনেক সময় দেখিয়াছি তাহার Composition হিসাবে মূল্য দুই কড়াও নহে এবং তাহার ভাষা বা বোল সদারঙ্গের সময়ের কি না, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ও উচিত সন্দেহ হয়। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে এই প্রকার গণ্ডগোলের মধ্য হইতে সত্য ও প্রকৃত জিনিষ বাছিয়া লওয়া দুরূহ। একমাত্র উপায়—উপযুক্ত শিক্ষক লাভ এবং মনোযোগ পূর্ব্বক ভাল ভাল খেয়ালীদের গান শুনা ও তাহার বিশ্লেষণ করা।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীত একটি অপূর্ব্ব কল্পতরু। খেয়াল ইহারই অন্তর্গত একটি অভিনব রসাল পল্লব। ইহাকে অবহেলা করিলে সঙ্গীতরসাস্বাদনের একটি দিক বাকী থাকিয়া যায়। যিনি প্রকৃত রসিক পুরুষ—তিনি একদর্শী হইয়া, ইহাই ভাল, বাকী সমস্ত ভুয়া এইরূপ অভিমান রাখেন না; বরং সর্ব্ববিষয় হইতে রস ও আনন্দ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

উত্তরায়ণ

শ্রীঅনুরূপা দেবী

১৫

অতুলবাবুর বাড়ীর পিছনে তাঁরই একটী কর্ম্মচারী ভূধর মুস্তোফির ছোট্ট বাংলো। বাড়ীতে মুস্তোফির স্ত্রী-পুত্র ভিন্ন মধ্যে মধ্যে তার বড় বোন মিস মাধবীলতা মুস্তোফিও আসা-যাওয়া করিত। মাধবী লেডী ডাক্তার, বয়স তার এখন চল্লিশের কাছাকাছি। চাকরী ছাড়িয়া দিয়া সে আজকাল কাশীতে প্র্যাক্‌টিস করিতেছে। দু' পয়সা রোজগার করিয়া নিজেরও গুজরাণ করে, ভাইএর সংসারেও অল্পসল্প কিছু কিছু সাহায্য পাঠায়।

মঞ্জুর জন্মকালে মঞ্জুর মা মাধবীকে আনাইয়া লইয়াছিলেন; তার হাতেই মঞ্জুর জন্ম। সেই হইতে মাধবী এই পরিবারের একজন আত্মীয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই দুঃসংবাদ শুনিয়া সে আপনিই ছুটিয়া আসিল।

মুস্তোফির চাকরী গিয়াছে, এখানকার বাস ইহাদের উঠাইতে হইবে, তাহারই উদ্যোগ চলিতেছে। মাধবী গিয়া আরতিকে উঠাইল, তার সঙ্গে একত্র বসিয়া অকৃত্রিম অশ্রুবর্ষণ করিল, অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন তা'হলে কি রকম হবে দিদি?"

আরতি এ পর্য্যন্ত এই কথাটাই শুধু ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। আর যত কথা—তার জ্ঞানোদয় হইতে যখন যা ঘটিয়াছে সবই—সে দিন-রাত এই কয়টা দিন ধরিয়াই ভাবিয়াছে,—শুধু তার নিজের কথাটাই ভাবিবার অবসর তার হয় নাই। প্রতিবেশীরাও তাহাকে এই প্রশ্ন করিতেছিলেন, পাওনাদারদের তো কথাই নাই। কিন্তু আরতির বিকল মনের ভিতর অতীতের গণ্ডী কাটাইয়া ভবিষ্যৎ এখনও নিজের বিকট মূর্ত্তি তাহাকে প্রদর্শন করিতে পারে নাই। তার গভীর শোকাহত চিত্তে কেবল এই একটী মাত্র আঘাতই হাহাশব্দে অহোরাত্র বাজিতেছিল,—তার বাবা চলিয়া গিয়াছেন,—ভগবানের অবিচারে নয়, মানুষের অত্যাচারে! এর চেয়ে বেশি করিয়া আর কিছুই যে তার ভাবিবার আছে, সে কথা তার পাওনাদারের দল, অথবা অসহিষ্ণু প্রতিবেশিগণ বারে বারেই মনে পড়াইয়া দিলেও, তার মনে পড়ে নাই। মাধবী আসিয়াও সেই কথাই বলিল।

বাড়ী বিক্রী হইয়া গিয়াছে। নূতন মালিক দশ দিন সময় দিয়াছিল। দশ ছাড়িয়া পনের দিন হইয়া গেল, আর না উঠিলেই নয়। পিতৃকৃত্য মাধবীর চেষ্টায় কোন মতে সে সারিয়াছে। এই সব কঠিন কর্ত্তব্যের মধ্যে পড়িয়া তার বিহ্বলতাও খানিকটা কাটিয়া আসিয়াছিল। বাড়ীওয়ালা নিতান্ত অভদ্র নয়,—অবস্থা বুঝিয়া আরও পাঁচ দিন সময় দিয়া গেল। বলিয়া গেল, এর পরে আর যেন তাহাকে অপ্রিয়ভাবে এ বিষয়ে কিছু না বলিতে হয়। আরতি সম্মতিসূচক মাথা হেলাইয়া জানাইল যে, তাহা হইবে না।

মাধবী বলিল "একটা কাজ করো না ভাই,—তোমার কাকাবাবু তো ধনী লোক,—তাঁকেই কেন চিঠি দাও না। তিনি হয় ত জানেন না।"

শুনিয়া আরতির মনটা সেই দিকেই ছুটিতে চাহিল; কিন্তু সে সন্দিগ্ধ স্বরে উত্তর করিল, "তাঁদের ভাল করে চিনিই না যে ভাই, বিশেষ কাকীমাকে!"

মাধবী বলিল, "তবু হাজার হোক নিজেরই কাকা তো, দু'দিন কাছে থাকলেই চেনা হয়ে যাবে কি না," বলিয়া সে আরতির নাম দিয়া নিজেই সব কথা বেশ করিয়া গুছাইয়া একখানা পত্র লিখিল, এবং ডাইরেক্টরী খুঁজিয়া ঠিকানা বাহির করিয়া চিঠি পাঠাইয়া দিল। আরতি ভাল-মন্দ কোন কথাই বলিল না। তার আজ হঠাৎ সলিলকে মনে পড়িল; এবং আরও মনে পড়িল, তার বাবা এই সলিলের উপরেই তাদের ভার ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া মরিয়াছেন,—কই, কাকার কথা তো একটীবারের জন্যও তিনি তাঁর সেই শেষপত্রে কোথাও উল্লেখমাত্র করেন নাই! আরতির মনের

মধ্যটায় কেমন একটা দারুণ অস্বস্তি জমিয়া উঠিতে লাগিল, সে তো কই তা'হলে পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিল না! সলিলকে তো কোন খবর দেওয়াই হয় নাই!

তার পর সহসা তার মনে পড়িল, কই তাঁরাও তো গিয়া অবধি একটা পৌঁছান খবর পর্য্যন্ত তাদের দেন নাই! একখানা তত্ত্ব বা একটা কার্ড পর্য্যন্ত সে দিক হইতে এ পর্য্যন্ত আসে নাই। ইহারই বা কারণ কি? তাহারা না হয় এখানে আসিয়া পর্য্যন্তই বিব্রত। কিন্তু তাঁরা তো এ-সব জানিতেন না। কথা ছিল—বাড়ী পৌঁছিয়াই সুন্দরা তাঁদের মায়ের অনুমতি লইয়া পত্র লিখিবেন। কিন্তু,—তার পর অসমাপ্ত চিন্তাস্রোতকে মধ্যপথেই থামাইয়া সে পুনশ্চ এই কথা ভাবিল, হয় ত বাবার কাছে চিঠিপত্র এসেই থাকবে,—তাঁর তো এসে অবধি মনের স্থিরতা ছিল না, নিশ্চয়ই অনুমতি পাওয়া চিঠি এসেছিল; না হলে আমার সম্বন্ধে অতখানি নিশ্চিন্ত কি হ'তে পারতেন?

তার চোখ দিয়া আবার ক্ষণ-প্রশমিত অশ্রু-স্রোত দ্বিগুণ হইয়া বহিতে লাগিল। হায়, হায়, যদি ওঁরা অনুমতি না দিতেন, যদি তার সঙ্গে সলিলের বিবাহের কথা না হইত, হয় ত তাদের নিরুপায় ভাবিয়া এমন করিয়া ফেলিয়া যাইতে পারিতেন না!

যে কান্নার কোন দিনই বিরাম নাই, যে অনুশোচনার কোন দিনই নিবৃত্তি নাই, সেই ক্রন্দনের ও হাহাকারের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া আরতির আরও তিন দিন কাটিয়া গেল। জন্মের মত তাদের শত সুখ-দুঃখের চির-নিকেতন ছাড়িয়া দিবার আর দুইটী মাত্র দিন তার বাকি।

সলিলকে তো সম্ভবই নয়, সুন্দরাকে পত্র লিখিবার কথা আরতির এ তিন দিনে অনেকবারই মনে পড়িতেছিল। কিন্তু কি বলিয়া আরম্ভ করিবে, কেমন করিয়া লিখিবে, এই কথাটা কোন মতেই সে স্থির করিতে পারিয়া উঠে নাই! মাধবীকেও এ সমস্ত কথা যে বসিয়া বসিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া বলিতে পারে, তত বড় মনের বলও তার মনের মধ্যে ছিল না। একটির বেশি দুইটা কথাই তার কহিতে ভাল লাগে না, গলা দিয়া বাহিরও সহজে হয় না।

মিষ্টার ভুবনেশ্বর গুপ্ত, বা বি, গুপ্ত—আরতির কাকা—পত্রোত্তর দিয়াছেন। তাহাতে ভাইএর অকাল-মৃত্যুর জন্য দুঃখ এবং বিরক্তি দুই-ই জানাইয়ছেন। এ কার্য্য যে তাঁর নিতান্তই কাপুরুষোচিত হইয়াছে, তাহাও লিখিতে ভুল করেন নাই। অবশেষে জানাইয়াছেন যে, আরতির কাকীমা এখন বিশেষ অসুস্থ; তাই তাদের ভার লওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আরতি ও মঞ্জু কোন বোর্ডিংয়ে থাকিলে তিনি তাদের জন্য মাসিক পঁচিশ টাকা করিয়া পাঠাইতে পারেন। পত্রের উত্তর পাইলেই টাকা আগাম পাঠাইতেও প্রস্তুত আছেন।

মাধবী বলিল, "পঁচিশ টাকা যে বাবুর খানসামারই মাইনে ছিল! পঁচিশ টাকায় তোমাদের দুজনের কখন চলে? ঢের টাকা তো মাইনে পান, কি বলে বল্লেন পঁচিশ টাকা করে দেবেন! তা' হ্যাঁ দিদি, কাকীর অসুখ তাতে তোমরা এমন কি ভিড় বাড়াবে যাতে বাড়ীতে জায়গা দেওয়া যায় না? হ্যাঁ ভাই! এ আবার কি রকম?"

আরতি শূন্য দৃষ্টিতে এক দিকে চাহিয়া ছিল। সে তেমনই থাকিয়াই উদাস কণ্ঠে কহিল, "হয় ত ভালই হলো,—আমারও এখন অত অচেনা লোকের মধ্যে থাকতে যেতে ভয় করছিল।"

তার আবার একবার সুন্দরাকে মনে পড়িয়া গেল, আঃ—সুন্দরাদিদি,—তার পর তার মনে হইল, যদি সলিলের সঙ্গে তার বিবাহ হইয়া যাইত! উঃ! এই কয়টা দিনও কেন তিনি পাওনাদারদের হাতে ধরিয়া সময় লইলেন না!

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে মাধবী ভাইয়ের বাড়ী ফিরিয়া গেল, পরদিন সন্ধ্যার ট্রেণে তারা এখানকার বাস উঠাইয়া দিয়া কাশী যাত্রা করিবে। আরতির কোন একটা ব্যবস্থা না হইলেই বা সে কেমন করিয়া তাহাকে ফেলিয়া যায়, ভাবিয়া ভাবিয়া তারও যেন মাথা খারাপ হইয়া যাইবার উপক্রম হইতেছিল। উঠিবার পূর্ব্বে নিশ্চেষ্ট আরতিকে আর একবার চেতাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া সে আবার বলিল, "আমি বলি, তুমি বরং খোকাকে নিয়ে কাকার ওখানে গিয়েই পড়ো, গেলে কি আর অযত্ন করতে পারবে? যতই হোক রক্তের টান তো আছে—"

আরতির রোদনারক্ত মুখ এই কথায় আরক্ততর হইয়া উঠিল। সে সহসা দৃপ্ত কণ্ঠে বাধা দিল,—"না মাধবীদি, সেখানে আমাদের জায়গা নেই। যেখানে প্রাণের টান নেই, সেখানে রক্তের টানে মায়া জাগিয়ে ঢুকতে পারবো না।"

মাধবী ক্ষুব্ধ চিত্তে ফিরিয়া গেল। এই ভিখারিণী রাজ-

কন্যাকে এরও পরে তার প্রকৃত অবস্থার চিত্র তুলিয়া দেখাইতে সে ভরসা করিল না,—মায়াও হইল।

প্রকাণ্ড জনহীন বাড়ীখানা আরতির বুকের মতই অহরহঃ হাহা শব্দ করিয়া উঠিতেছে। আলোর ঝাড় চারিদিকে নীরব ব্যথায় ঝুলিয়া আছে বটে, কিন্তু আলো কোথাও নাই। দাসদাসী, আর্দ্দালী সবাই বিদায় লইয়াছে, শুধু যাইতে পারে নাই, রামরূপ। ছেলেমানুষের মত সেও থাকিয়া থাকিয়া আরতির সঙ্গে কাঁদিতে বসে, আর সর্ব্বদা মঞ্জুকে লইয়া থাকে। বিচ্ছেদের দিন যতই অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, ততই যেন সে এই শিশুটীকে নিবিড় করিয়া বুকে টানিতেছিল।

এমন সময় সংবাদপত্রে এই দুঃসংবাদ পড়িয়া সলিল আসিয়া পৌছিল। সলিল যখন এলাহাবাদে আসিয়া পৌছিল, তখন অতুলবাবুর ঘর-বাড়ী, জিনিসপত্র সমুদায় নিলামে চড়িয়া গিয়াছে,—চারিদিক হইতে মৃত ব্যক্তির উপর গালিবর্ষণ করিতে করিতে যে যেটুকু পারে দখল করিয়াছে। আরতি ও মঞ্জুকে উঠাইয়া দিবার জন্য দিনের মধ্যে পঁচিশবার তাগিদ চলিতেছে, আরতি শুধু জোর করিয়াই সেখানে পড়িয়া আছে, এই সব সংবাদ সে ষ্টেসনে নামিয়াই পাইয়া আসিল।

পাড়াপ্রতিবেশীরা খোঁজ-খবর না লইয়াছেন এমন নয়। তবে এ-সব অবস্থাপন্ন সৌখীন গৃহস্থরা সেকেলে-ভাবাপন্নদের মতন পরের দায়ে মাথা খারাপ করিতে সময় ও সুবিধা পান না। কিন্তু আরতির নিশ্চেষ্টতার এবং দুঃসংবাদের নিন্দাটা সকলেই কম-বেশী করিতেছিলেন। সে যে কাকার ঘাড়ে জোর করিয়া গিয়া চাপিতে অসম্মত হইয়াছে, সে কথাটা এর মধ্যেই রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। সকলেই মনে মনে ভয় করিতেছিলেন,—হয় ত বা আগামী পরশ্ব বাড়ীর নূতন অধিকারী তাহাকে বাহির করিয়া দিলে, তাঁদের বাড়ীতেই বা সে আসিয়া চড়াও করিয়া বসে!

ইঁহাদের ভিতরেই কেহ কেহ মন্তব্য করিতেছিলেন, "বাব্বা, হীরের টায়রা, হীরের নেকলেশ বছর বছর মেয়ের জন্মদিনের উপহার! মেয়ে চলতেন যেন কোন্ জারের প্রিন্‌সেস্—এখন কে বাপু ঐ সৌখীন ভিকিরীকে জায়গা দিয়ে জায়গা জোড়া করবে?"

মঞ্জু ভাল করিয়া কিছুই বুঝে না, অথচ কিছু কিছু বুঝিতেও পারে। বাপের জন্য যখন-তখন বায়না ধরিয়া কান্নাকাটি করিতে থাকে। দিদির মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে বা বিরাগে কাছে যায় না! রামরূপ তার সকল উপদ্রব সহ্য করিয়া তাহাকে বুকে করিয়া বেড়ায়। সন্ধ্যার পর সে কাঁদিয়া রাগিয়া রামরূপকে মারিয়া মহা হুলস্থুল বাধাইয়াছিল। খাওয়া পছন্দ হয় না। দুধ খাইবে না। ডিম, চকোলেট্, আইসক্রীম কিছুই নাই, ছাই খেতে দেয়! তার পর কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িলে রামরূপ তাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া আসিয়া দরজার কাছে বসিয়া নিজেই নীরবে কাঁদিতেছিল, "কোই হ্যায়"—বলিয়া বাহিরের বারান্দা হইতে কেহ ডাক দিল।

সসঙ্কোচে রামরূপ আসিয়া ডাকিল, "দিদিমণি! একজন বাবু দেখা করতে চাইচেন।"—

নূতন কোন পাওনাদার হইবে মনে করিয়াই আরতি শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "বলে দাও কাল সকালে আসতে, আজ আর পারবো না।"

আবার তাহাকে কতকগুলো কথা কহিতে হইবে,—অনর্থক, অনাবশ্যক বাজে কথা—এই ভাবিয়াই তার মনটা ভয়ার্ত্ত হইয়া উঠিল।

রামরূপ বলিল, "আমি তাঁকে বলেছিলুম, দিদির শরীর ভাল নেই। তিনি বল্লেন, তিনি কলকাতা থেকে এসেছেন, এক্ষণই একবারটী দেখা করতে চান, বেশিক্ষণ বিরক্ত করবেন না।"

নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই পরা শাড়ীটাকে গুছাইয়া লইয়া আরতি রামরূপের পিছনে পিছনে সেই কালরাত্রির পরে এই প্রথমবার তাদের সুচারুরূপে সজ্জিত ড্রইংরুমে প্রবেশ করিল। ঘরে ঢুকিয়াই সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। পরিপূর্ণ গৃহসজ্জার একটী অবশেষও আজ ইহাতে পড়িয়া নাই! একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস তার আর্ত্ত চিত্তকে বিদীর্ণ করিয়া উত্থিত হইয়া আসিল।

ঘরের প্রায় মাঝখানে একজন একখানা টুলের উপর বসিয়া ছিল,—আরতি আসিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাথা ঝুঁকাইয়া তাহাকে নমস্কার জানাইল। আরতি প্রতিনমস্কার করিতে ভুলিয়া গিয়া শুধু একটুখানি অগ্রসর হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরে একটা ইলেকট্রিক লাইট জ্বলিতেছিল বটে, কিন্তু অনবরত কান্নায় কান্নায় তার চোখ

দুইটা এত বেশি ফুলিয়া উঠিয়াছিল যে, ভাল করিয়া আর চোখ চাহিবারও তার ক্ষমতা ছিল না, সে আগন্তুককে চিনিতে পারিল না।

আর একখানা টুল রামরূপ আরতির জন্য রাখিয়া গিয়াছিল। সেইটা হাত দিয়া একটু সরাইয়া দিয়া কোমল মমতা-মথিত ব্যথিত কণ্ঠে সলিল তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"বসো আরতি!"

এর আগে কোন দিনই সে তাহাকে তুমি বলিয়া বা নাম ধরিয়া ডাকিয়া কথা কহে নাই।

আরতি সলিলের গলার স্বর চিনিয়া চমকাইয়া উঠিল, এবং দেখিতে দেখিতে তার বেদনার উপর প্লিষ্টারের মতই আত্মচিন্তার দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণাটা এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তার ভগ্ন চিত্তকে গভীর ভারাক্রমণ হইতে মুক্তি দিয়া কোথায় যেন মিলাইয়া গিয়া তার প্রবল শোকোচ্ছ্বাসকে একেবারেই যেন বন্ধন-মুক্ত করিয়া দিল।

টুলের উপর নয়, সেইখানের গালিচাহীন মুক্ত শুভ্র মেজের উপর বসিয়া পড়িয়া আঁচলে মুখখানা চাপিয়া ধরিয়া আরতি তখন বাঁধভাঙ্গা নদীর মতই আকুল উচ্ছ্বাসে একেবারে অধীর হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সলিল অল্পক্ষণ তাহাকে কাঁদিবার অবসর দিয়াছিল। তার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া সে তার কাছে আসিল। মেঝের উপর তার পাশে বসিয়া নিজের অশ্রু পুনঃপুনঃ মুছিতে মুছিতে সে অকৃত্রিম স্নেহে, সহানুভূতিতে ও বেদনায় একান্ত ব্যথিত কণ্ঠে কহিল,—

"নিরুপায়! আরতি! কেঁদে তো কিছুই আর করতে পারা যাবে না। ওঃ কি যে হয়ে গ্যাল! কি হয়ে গ্যাল! আমার এখনও বিশ্বাস হচ্চে না।"

এমন করিয়া কেহই তো তাহাকে সহানুভূতি প্রদর্শন করে নাই! আরতির আর যেন কাঁদিবার শক্তি ছিল না, তথাপি সে আবার পূর্ণোচ্ছ্বাসে কাঁদিতে লাগিল। এ রোদনে তার অসহায় শূন্য চিত্ত যেন অনেকখানি লঘু, অনেকটাই শান্ত হইয়া আসিতেছিল। যতই যা হোক, আরতি তো নির্ব্বোধ নয়, একটী অপোগণ্ড শিশু লইয়া এই বয়সে একা অসহায় অবস্থায় সংসার-সমুদ্রে ভাসা যে কি, তার সবটা না হোক, কিছু তো সে বুঝিতে পারিতেছে! এখন তার এটুকু অন্ততঃ মনের মধ্যে জাগিতেছে সে আর একা নয়। তার বাপ তাকে যার হাতে দিয়া গিয়াছেন, সে তার ভার লইতে আসিয়া পৌছিয়াছে। সে আসিয়াছে!—

অনেকক্ষণ পরে সলিল ডাকিল—"আরতি!"

আরতি অনেক কষ্টে মুখের উপরকার অশ্রু-আর্দ্র আঁচলটা সরাইল, কথা সে কহিতে পারিল না।

"আমায় কেন আগেই খবর দাও নি? ঠিকানা তো তোমরা জানতে।"

আরতি নীরব রহিল। তার মনের মধ্যে কত কথাই গুমরিয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু বলিবার উপায় বা ভাষা খুঁজিয়া পাইল না যে বলে,—

'তোমায় কেমন করিয়া খবর দিব? কি সুবাদে খবর দিব? তুমি তো আমার সত্যকার কেহই নও যে খবর দিব! তবে মন আমার একমাত্র তোমারই পথ চাহিয়া ছিল, আমি মনে মনে জানিতাম, তুমি আসিবে। খবর না দিলেও আসিবে।'

তার অশ্রু-স্ফীত অরুণবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া সলিলের বুক বিদীর্ণ হইয়া গেল। সেই আনন্দময়ী বালিকা! তাদের সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাতের দিনের কথা তার মনে পড়িতে লাগিল। তার পর মনে পড়িল মঞ্জুর সেই গান—

"কত আশা করে, তোমারই দুয়ারে,
ভিখারীর মত এসেছি—"

সলিলের দু'চোখ দিয়া হুহু করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

রাত্রি গভীর হইতেছিল। রামরূপ অদূরে দেয়াল ঠেস দিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিল। ইহাকেই আরতির একমাত্র নিকটতম আত্মীয় বুঝিয়া সেও আজ অনেক দিন পরে ঈষৎ যেন আশ্বস্ত হইয়াছিল।

জনহীন পুরী স্তব্ধ, ঘর নিস্তব্ধ। শুধু সেই গভীর স্তব্ধতার মধ্যে সলিলের হাতে বাঁধা রিষ্ট ওয়াচের একটুখানি অতি ক্ষীণ ধ্বনি জাগিয়া উঠিতেছিল,—ঝিক্ ঝিক্—ঝিক্ ঝিক্।

"আরতি!" বলিয়া সলিল এবার তার হাত ধরিল,—

"কিছুই তো আর তাঁর জন্যে আমার করবার বাকি নেই, আরতি! এখন শুধু, তাঁর যেটুকু ইচ্ছা ছিল, সেইটুকু পূরণ আমায় কর্‌তেই হবে। কিন্তু এক্ষণই তো আর তা' হতে পারে না। তাই আমি ভাবচি, আপাততঃ আমার সঙ্গেই তোমাদের নিয়ে গিয়ে হয় দিদির বাড়ী—

না হয় অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা করে দিই গে। তার পর দেশাচার আর শাস্ত্র যে রকম মত দেয়,—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সলিল আরতির মুখের দিকে চাহিল। নিজের মনের শেষ দ্বিধাটুকুই হয় ত সেই একান্ত সকরুণ বিষাদ-বিকৃত মুখের ছবিতে বিসর্জ্জন দিয়া এবার দৃঢ় কণ্ঠেই সে তার কথা শেষ করিল,—

"যত শীঘ্র হয় তোমাকে আমার নিজের করে নিয়ে তাঁর যতটুকু পারি স্নেহের ঋণ শোধ করবো। তার পর মঞ্জু আমাদেরই,—"

একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া পুনশ্চ কহিল,—

"আমারও তো আর ভাই নেই।"

এইবার আরতি তার রক্তজবার মত চোখ খুলিয়া সলিলের স্নেহ-করুণ মুখের দিকে নীরবে চাহিল। তার সেই আরক্ত, স্তিমিত, রুদ্ধপ্রায় নেত্র হইতে একটা সুগভীর কৃতজ্ঞতার উষ্ণ ধারা সেইক্ষণে যেন উহার উদ্দেশে ঝরিয়া পড়িল। মঞ্জুকে সে যে এমন করিয়া লইতে চাহিল, এইটুকুতেই তার সমস্ত চিত্ত যেন কৃতজ্ঞতায় গলিয়া গেল। তার মনের মধ্যে হয় ত ঈষৎ সংশয় ছিল যে, হয় ত উহাকে সে গলগ্রহ বোধ করিবে। তার দুরন্ত আবদারে ভাইকে সে তো জানে।

আরতির হাত সলিলের হাতের মধ্যেই ধরা ছিল, সে কথা দুজনকারই মনে ছিল না। অনেকক্ষণ পরে সলিলই প্রথম সেটা জানিতে পারিয়া আস্তে আস্তে সেই ধৃত হাত ছাড়িয়া দিয়া ঈষৎ একটু সরিয়া বসিল। দুজনকার বুক চিরিয়া এক সঙ্গেই আতপ্ত দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইয়া আসিল। হয় ত একই কথা দুজনকার চিত্তে একসঙ্গেই উদিত হইয়াছিল,—যদি আজ তাহারা বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী হইত!

পিতার মৃত্যুর পর এই সর্ব্বপ্রথম আরতি রামরূপকে ডাকিয়া সলিলের জন্য বিছানা পাতিয়া দিতে আদেশ করিল। সলিলকে খাওয়ার কথা বলাও যে দরকার, তাহাও তার মনে পড়িল। কুণ্ঠিত হইয়া বলিল,—

"অনেক রাত হয়ে গেল, আপনার তো খাওয়া হয় নি।"

সলিল বলিল, "আমার জন্যে ব্যস্ত হয়ো না আরতি! আমি ট্রেণেই খেয়ে নিয়েছি, আমি এখন শুতে যাই; তুমি ঘুমোও। কাল পাঞ্জাব মেলেই আমরা বেরিয়ে পড়ি, কি বল?"

আরতির বুক যেন হঠাৎ চিড় খাইয়া ফাটিয়া গেল। এ বাড়ী তাহাকে ছাড়িতে হইবে সে জানা কথা; তথাপি সে যে এতই শীঘ্র ছাড়িতে হইবে, নিশ্চিতই ছাড়িতে হইবে, ছাড়িবার আর বিলম্বমাত্র নাই, এই মনে করিতে তার মন যেন আকুল হইয়া উঠিল। তার মা-বাপের স্মৃতিপূত এই বাড়ী! এ যেমনই ভীষণ, তেমনই মধুর! গরল এবং অমৃত এর মধ্যে যেন পাশাপাশি স্তূপীকৃত রাখা আছে, দুইই তার পক্ষে সমান লোভনীয়।

আমাদের প্রিয়জনের স্মৃতি—সে যত মর্ম্মান্তিকই হোক, তবু সে বিশ্বের সমুদায় আনন্দের চেয়ে লোভের বস্তু।

ক্ষণকাল পরেই আত্ম-সম্বরণ করিয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে উত্তর করিল,—

"আচ্ছা।"

সলিল তাহাকে যেন একটু দ্বিধাগ্রস্ত বোধ করিয়া তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিল "তোমার কোন অসুবিধা হবে না? তা হলে পরশুই যাবো।"

আরতির মনে পড়িল, পরশু তার বাড়ী ছাড়ার কথা। সে এবার অনেকটা সহজভাবেই বলিল—

"কালই যাব।"

"আচ্ছা, কালই যাওয়া যাবে।" বলিয়া সলিল আরতির কাছে বিদায় লইয়া রামরূপের সঙ্গে তার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরের উদ্দেশে চলিয়া গেল।

আরতির এই ক্লেশ-কাতর মূর্ত্তি, তার ভীষণ দুর্দ্দশাপন্ন অসহায় অবস্থা, তার প্রতি তাহার একান্ত বিশ্বস্ত নির্ভরতা সলিলের সংশয়াবর্ত্তে নিপতিত সংগ্রাম-বিধ্বস্ত চিত্তকে অধিকতর দৃঢ় রূপেই স্থির সঙ্কল্পের দিকে আকর্ষণ করিতেছিল। নতুবা এখানে আসার সময়েও সে মায়ের অসম্মতিতে এ বিবাহ করা সম্ভব মনে করে নাই। মায়ের কাছে এবার নিজেই অনুমতি চাহিতে গিয়াছিল। আরতিকে তার ভালবাসার কথা, আরতির পিতাকে বাগ্দান করার কথা, আরতিকেও তার আভাষ দেওয়ার কথা কিছুই সে মার কাছে গোপন করে নাই। তার পর সংবাদপত্রে প্রচারিত অতুলবাবুর সর্ব্বস্বান্ত হইয়া আকস্মিক আত্মঘাতের কথাও জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এতেও কি তুমি মত দেবে না? এখন যদি আমি তাকে বিয়ে না করি, তার কি অবস্থা হবে ভেবে দেখ ত।"

মহামায়া যুক্তি-তর্কে ভুলিলেন না, তিনি বলিলেন,—

"যতই যা হোক, আমি যে তীর্থস্থানে ঠাকুর-মন্দিরে বসে সত্য করলেম, সে আমার কি দিয়ে কাটাবো বলে দাও? আমার তো আর একটা ছেলে নেই যে তাকে গছাবো। তা—"

তার পর আবার বলিলেন, "তার পর এ'ও বলি সলিল! ওই যে রাজ্যের লোককে পথে বসিয়ে বিষ খেয়ে মরা, এই বা ইচ্ছাসাধে আমার বংশের রক্তে আমি ডেকে আনি কেন? এ কি ভীষণ জুয়াচুরি নয়?"

সলিল মনের মধ্যে এ কথায় আঘাত পাইল। অতুল-বাবুর স্নেহ স্মরণ করিয়া তাঁর এই শোচনীয় ও অকাল মরণে সে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিল। ব্যাকুল হইয়া বলিল, "না না, তিনি জুয়াচোর ক্লাশের লোকই ছিলেন না মা, আমার দুর্ভাগ্য যে তুমি তাঁকে দেখ নি। কাগজে যে রকম লিখেছে—টাকা শোধ করবার কোন উপায়ই তাঁর ছিল না, তাঁকে বাধ্য হয়েই মরতে হয়েচে। না হলে হয় ত জেলে যেতে হ'তো,—মানী লোক, অতটা সইতে পারেন নি।"

মহামায়া উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, "বলিস্ কি! শোধ না দিতে পারে দণ্ড সয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলে হতো,—ভীরুর মত মরে গিয়ে ফাঁকি দেওয়া! তার পর তোমরা উল্টে আবার আমার ছেলে-মেয়ের গতি কর! না—আমার মত নয়, আমি মত দোব না। বিশ্বাসঘাতক, কাপুরুষের মেয়ে আমার ঘরে আসবে না।"

শেষ আশা ভঙ্গে ক্ষোভে ও নৈরাশ্যে একান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া সলিল জীবনে এই প্রথমবার জননীর মর্য্যাদা লঙ্ঘন পূর্ব্বক ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল—

"বিয়ে না দেবে নাই দেবে, দিও না—তবুও আমায় একবার তাদের এতবড় দুঃসময়ে খবর নিতে যেতেই হবে! অনেক তারা আমায় যত্ন করেচে, তারও তো একটা শোধ আছে,—মানুষের চামড়া তো গায়ে আছে আমার"—

এই বলিয়া সে জোর পায়ে জুতার শব্দ বাজাইয়া চলিয়া গেল। মা পিছন হইতে শ্লেষ-গম্ভীর কণ্ঠে মন্তব্য করিলেন,—

"তুমি এখন সাবালক হয়েছ, নিজের ইচ্ছামত চলবে বই কি?"

কথাটা দুইটা আগুনে তাতানো লোহার শলার মতই সলিলের কাণ দুইটার মধ্যে গিয়া তাকে বেঁধার ব্যথা এবং পোড়ার জ্বালা একসঙ্গেই প্রদান করিল। এই যে শেষ কথাটা মা বড় দুঃখের সুরেই উচ্চারণ করিলেন, এর মধ্যে সলিলের সমস্ত জীবনের অতীত ইতিহাসটাই যে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

"তুমি এখন সাবালক হয়েছ, ইচ্ছামত চলবে বই কি!"

নির্ম্মম, কিন্তু সত্যের প্রত্যাঘাত! গভীর দ্বিধার দ্বন্দ্বে সলিলের সমস্ত মনটাই দুলিতে লাগিল।　　(ক্রমশঃ)

বৌদ্ধযুগে নর্ত্তকী ও বারবণিতা

ডাক্তার শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল, পিএইচ-ডি

নৃত্য-গীত-কুশলা নর্ত্তকীর উল্লেখ জাতকে পাওয়া যায়।১ রাজার আমোদ-প্রমোদের জন্য তাহারা নিযুক্ত হইত এবং রাজ-অন্তঃপুরেই অবস্থান করিত। কোনও কোনও নৃপতির ষোল সহস্র নর্ত্তকী ছিল।২ কুল্ল-পলোভন জাতকে ৩ নিম্নলিখিত ঘটনাটির উল্লেখ পাওয়া যায়—রাজপুত্র আমোদ-প্রমোদের প্রতি উদাসীন ছিলেন, রাজ্যের প্রতি তাঁহার স্পৃহা ছিল না, এবং কখনও তিনি স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসিতেন না। সুতরাং রাজপুত্রের এই উদাসীনতা দূর করিবার জন্য রাজা একজন নর্ত্তকী নিযুক্ত করিলেন। নর্ত্তকীটি বয়সে তরুণী, নৃত্যগীতে সুদক্ষা। তাহার সংস্পর্শে আসিলে যে কোনও লোককে সে বশীভূত করিতে পারিত। এই রাজপুত্রকেও সে অমৃতের ন্যায় সুমধুর সঙ্গীতের দ্বারা প্রলুব্ধ করিল। তাহার চিত্ত-বিমোহনকারী সঙ্গীত শ্রবণ

১ Fausboll, Jataka, II, p 328, V, p. 249.

২ Ibid, I, p. 437.　৩ Ibid, no.

করিতে করিতে রাজপুত্রের অন্তরে ধীরে ধীরে বাসনাসমূহ জাগ্রত হইয়া উঠিল। তিনি সংসারের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলেন এবং ভালবাসার আনন্দও তাঁহার অপরিজ্ঞাত রহিল না। অবশেষে এই নর্ত্তকীটির প্রেমে রাজপুত্র এমন ভাবেই ডুবিয়া গেলেন যে, তাহার কাছে অন্য কোন লোকের যাওয়া তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। এক দিন ছোরা হাতে রাস্তায় ছুটিয়া বাহির হইয়া পাগলের মত তিনি লোককে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইহার পর রাজা রাজপুত্রকে ধৃত করিয়া নর্ত্তকীটির সঙ্গে সহর হইতে নির্ব্বাসিত করেন। এই ঘটনাটি হইতে দেখা যায় যে, রাজপুত্র বিলাসের ভিতর বর্দ্ধিত হইয়াও নারীর ছলাকলা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন, নর্ত্তকীর মোহে পড়িয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছিল।

যৌবনের প্রারম্ভে গৌতমকেও এই ভাবে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছিল। যুবরাজকে আমোদ-প্রমোদে অভ্যস্ত করিবার জন্য বহু নর্ত্তকী নিযুক্ত করা হয়। তাহারা নৃত্য-গীতে বিশেষ পারদর্শিনী ত ছিলই; দেখিতেও দেবকন্যাদের ন্যায় সুন্দরী ছিল। অপরূপ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া মণ্ডলাকারে গৌতমকে ঘিরিয়া তাহারা বাদ্যযন্ত্র বাজাইত, মহানন্দে নাচিত ও গান করিত।৪ দীর্ঘ নিকার গ্রন্থে নাচের উল্লেখ পাওয়া যায়।৫ মহাবংশ (পৃঃ ২২৭) এবং ধম্মপদ-ভাষ্যে (৩য় অধ্যায়, পৃঃ ১৬৬ এবং ২৯৭) নর্ত্তকীদের উল্লেখ আছে।

বারবণিতা—তাহাদের জীবন ও চরিত্র

সাধারণ গৃহস্থের গৃহে যে সব রমণীর স্থান নাই, তাহাদের মধ্য হইতেই নর্ত্তকীদের উদ্ভব। পুরুষের বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করাই তাহাদের ব্যবস্থা ছিল। বারবণিতারূপে তাহারা তাহাদের জীবিকা অর্জ্জন করিত। যদিও তাহারা রমণী, তথাপি জীবিকার্জ্জনের জন্য তাহাদিগকে এমন সব ঘৃণ্য কাজ করিতে হইত, যাহার ফলে তাহাদের নারী-সুলভ গুণসমূহ নষ্ট হইয়া যাইত। মনোমোহিনী আকৃতি, স্বর, গন্ধ, স্পর্শ এবং আলিঙ্গন প্রভৃতি ছলাকলার দ্বারা মানুষকে প্রলুব্ধ করিতেই তাহারা অভ্যস্ত ছিল। তাহাদের স্বভাব বেণীবদ্ধ দস্যুর মত, বিষাক্ত পানীয়ের মত, আত্মপ্রশংসা-পরায়ণ ব্যবসায়ীদের মত, হরিণের বাঁকা শিংএর মত, বিষ-জিহ্ব সাপের মত, সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত গর্ত্তের মত, যে নরককে পূর্ণ করা যায় না সেই নরকের মত, যাহাকে সন্তুষ্ট করা যায় না সেইরূপ রাক্ষসীর মত, চির-ক্ষুধার্ত্ত যমের মত, সর্ব্বভুক অগ্নির মত, যে নদী সব ভাসাইয়া লইয়া যায় সেই নদীর মত, যদৃচ্ছ বহমান বাতাসের মত, অপরিমাপ্য মেরু পর্ব্বতের মত এবং চিরফলপ্রসূ বিষবৃক্ষের মত।৬ যাহাকে তাহারা ভালবাসে তাহাকে যেমন আদরে গ্রহণ করে, যাহাকে ঘৃণা করে তাহাকেও ঠিক তেমনি আদরেই বরণ করে।৭ জ্বলন্ত অনলে কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিলে তাহা যেমন ভস্মসাৎ হইয়া যায়, এই সব রমণী অর্থলালসা বা কামপ্রবৃত্তির প্রভাবে যে সব ধনী সন্তানকে আশ্রয় করে তাহারাও সেইরূপ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।৮ দুর্ব্বলচিত্ত মানুষকে প্রলুব্ধ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা তাহারা বিভিন্ন হাবভাব পরিগ্রহ করে এবং এইরূপে তাহাদিগকে তাহাদের পাপের ফাঁদে জড়াইয়া লয়। একবার ফাঁদে ফেলিতে পারিলে তারা নানা অসৎ উপায়ে তাহাদের অর্থ ও চরিত্র ধ্বংস করে। প্রতি রাত্রিতে প্রচুর অর্থ দিয়া যাহারা ইহাদিগকে পরিতৃপ্ত করে, এমনি অকৃতজ্ঞ ইহারা যে তাহাদিগকেও হত্যা করিতে দ্বিধা করে না।৮ কিন্তু নিম্নে উল্লিখিত কয়েকটি বারবণিতার জীবনী হইতে দেখা যায় যে, সমস্ত ক্ষেত্রেই তাহাদের চরিত্রের দুর্ব্বলতা আজীবন স্থায়ী হয় নাই। কোনও কোনও বারবণিতা বুদ্ধের ধর্ম্মের প্রভাবে তাহাদের জীবনের পাপপ্রবণ গতি-টাকেও ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছিল। প্রবৃত্তিকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া সাংসারিক জীবন পরিহার করিয়া ইহারা আদর্শ জীবনই অতিবাহিত করিয়া গিয়াছে। নির্ব্বাণ প্রাপ্তির জন্য সংগ্রাম করিয়া অবশেষে ইহারা অর্হত্ব লাভ করিয়াছিল। যৌবনের প্রারম্ভে পতিতা নারী রূপে তাহাদের যে জীবন আরম্ভ হয়, জীবনের শেষে তাহাই ঋষির ন্যায় পবিত্র হইয়া উঠিয়াছিল। জনসাধারণও তাহাদিগকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দান করিতে দ্বিধা করে নাই।

---

৪ Rhys Davids, Buddhist Birth Stories, p. 171.

৫ Dialogues of the Buddha I, pp. 5—7.

৬ Fausboll. Jstaaka, V, p. 425.

৭ Cowell, Jataka, V, p. 242.

৮ Fausboll, Jat ,' V, p. 452.

অম্বপালী

বৈশালীর রাজোদ্যানে, আম্রবৃক্ষের পাদমূলে অম্বপালীর জন্ম হয়। নগরের উদ্যান-পালক তাহার ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করেন। আম্রোদ্যান-পালকের কন্যা বলিয়া তাহার নাম হয় আম্রপালী। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত অঙ্গ অনিন্দ্যসুন্দর হইয়া উঠে—কোথাও এতটুকু খুঁত থাকে না। ইহার পর সে সভা-নর্ত্তকী হয়। কারণ, বৈশালীতে এই আইন ছিল যে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী কখনও বিবাহ করিতে পারিবে না—জনসাধারণের আনন্দের জন্য তাহাকে উৎসর্গ করা হইবে। অম্বপালী সুন্দরী, মহিমময়ী, মনোহারিণী এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট বর্ণ-সুষমার অধিকারিণী ছিল। নাচ, গান ও বীণাবাদনে তাহার তুলনা ছিল না। বহু পদ-মর্য্যাদাশীল গুণী লোক তাহার কাছে যাতায়াত করিতেন। এক রাত্রির জন্য তাহার দর্শনী ছিল ৫০ কহাপন।৯ মগধের রাজা বিম্বিসার বৈশালীতে তাহার গৃহে গমন করিয়াছিলেন এবং এক সপ্তাহকাল সেখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার ঔরসে অম্বপালীর গর্ভে এক সন্তান জন্মগ্রহণ করে। পরে এই সন্তান অভয় নামে পরিচিত হইয়াছিল।১০ এক দিন আম্রপালী জানিতে পারিল যে বুদ্ধ তাহার বৈশালীর বাগানে আগমন করিয়াছেন। সে বুদ্ধকে দেখিবার নিমিত্ত গমন করিল। বুদ্ধ তাহার নিকট ধর্ম্মপ্রচার করিলেন। বুদ্ধের বাণী শুনিয়া সে এতই আনন্দিত হইয়াছিল যে, সে বুদ্ধকে তাহার গৃহে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। ইহার পর লিচ্ছবিরা তাহাদের গৃহে বুদ্ধের আহারের ব্যবস্থা করিবার জন্য অম্বপালীর অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিল। কিন্তু অম্বপালী তাহাদের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এই বারবণিতার গৃহেই বুদ্ধ নানা উপচারে ভোজন করিয়াছিলেন। অতঃপর অম্বপালী তাহার "আরাম" বুদ্ধের ভিক্ষু-সঙ্ঘকে দান করে এবং বুদ্ধদেব সে দান গ্রহণ করিতেও দ্বিধা করেন নাই। বুদ্ধ এই আরামে দীর্ঘ দিন অবস্থান করিয়া বেলুব গ্রামে গমন করিয়াছিলেন।১১ ইহার পর অম্বপালী তাহার পুত্রকে ধর্ম্মপ্রচার করিতে দেখিয়া নিজেও দিব্যজ্ঞান অর্জ্জন করিতে চেষ্টা করে। স্বীয় দেহের ক্রমধ্বংসশীল প্রকৃতি তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়। পৃথিবীর সমস্ত জিনিষের নশ্বরত্বও সে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অবশেষে সে অর্হত্ব লাভ করিয়াছিল।১২

পদুমবতী

পদুমবতী উজ্জয়িনীর সভা-নর্ত্তকী ছিল। তাহার রূপের খ্যাতি শ্রবণ করিয়া রাজা বিম্বিসার তাহার নিকট গমন করেন এবং একরাত্রি তাহার সহিত অতিবাহিত করেন। পদুমবতী রাজাকে বলে যে, তাঁহার ঔরসে তাহার গর্ভ সঞ্চার হইয়াছে। রাজা তাহাকে বলেন "তোমার যদি পুত্র সন্তান হয় তবে বড় হইলে তাহাকে আমার নিকট প্রেরণ করিও।" এই বলিয়া তাহাকে একটি নিদর্শন দিয়া তিনি চলিয়া যান। যথা সময়ে একটি পুত্রই ভুমিষ্ঠ হইল এবং এই পুত্রের নাম রাখা হইল অভয়। পুত্রটির বয়স যখন সাত বৎসর, তখন তাহাকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, সে রাজা বিম্বিসারের পুত্র। অতঃপর তাহাকে রাজার গৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। রাজার স্নেহে রাজকুমারদের সহিত সে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সময়ে এই পুত্রটি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। পুত্রের মুখ হইতে ধর্ম্মের বাণী শ্রবণ করিয়া এক দিন মাতাও সংসার পরিত্যাগ করেন। ধর্ম্মের বাহিরের আবরণ এবং ভিতরের অর্থ আত্মস্থ করিয়া অবশেষে পদুমবতীও অর্হত্ব লাভ করিয়াছিল।

বারবণিতা পদুমবতীর জীবনী বৈশালীর বারাঙ্গনা অম্ব-পালীর জীবনীরই অনুরূপ। সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত সাদৃশ্য এই যে, একই লোকের অর্থাৎ রাজা বিম্বিসারের ঔরসেই উভয় নর্ত্তকী পুত্র সন্তান প্রসব করে এবং এই পুত্রদ্বয়ের নামও এক। উভয়ের নামই ছিল অভয়। তথাপি এই সাদৃশ্য হইতে উজ্জয়িনীর পদুমবতী এবং বৈশালীর অম্বপালীকে অভিন্ন বলিয়া মনে করা সম্ভবতঃ খুব যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

শালবতী

রাজগৃহে শালবতী নামে একটি সুদর্শনা, লাবণ্যময়ী, মনোহারিণী এবং অসাধারণ সুন্দরী রমণী ছিল। রাজগৃহেরই

৯। Vinaya Texts, pt. II, p. 171.

১০। অবদানকল্পলতার আম্রপাল্যাবদান দ্রষ্টব্য।

১১। দীর্ঘনিকায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৫-৯৮; বিনয় পিটক ১ম খণ্ড পৃঃ ২০১-২৩৩।

১২। Psalms of the Sisters, p. 125.

এক বণিক এই শালবতীকে বারবণিতার ব্যবসায়ে দীক্ষিত করে। নাচ, গান এবং বংশীবাদনে তাহার অনন্যসাধারণ দক্ষতা ছিল। এক রাত্রির জন্য তাহার দর্শনী একশত কহাপন। কিছুদিনের ভিতরেই শালবতীর গর্ভসঞ্চার হইল। শালবতী জানিত যে গর্ভিণী বেশ্যাকে কেহই পছন্দ করে না। তাই এই গর্ভাবস্থায় সে অসুখের ভান করিয়া কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিত না। যথা সময়ে সে এক পুত্র প্রসব করিল এবং প্রসবের পরেই পুত্রটিকে আবর্জ্জনা-স্তূপের ভিতর নিক্ষেপ করিল। প্রত্যুষে রাজার পরিচর্য্যার জন্য অভয় রাজকুমার যখন যাইতেছিলেন, তখন বায়স-পরিবৃত অবস্থায় তিনি এই শিশুটিকে দেখিতে পাইলেন। অনুচরেরা তাঁহাকে জানাইল যে শিশুটিকে কেহ সেইখানে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে এবং সে তখনও জীবিত আছে। ইহার পর যুবরাজের আদেশে শিশুটি প্রাসাদে নীত হয়। জীবিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া তাহাকে জীবক নামে অভিহিত করা হইত। রাজকুমারের দ্বারা প্রতিপালিত বলিয়া কেহ কেহ তাহার নাম দিয়াছিল কোমারভচ্চ (কোমারেন পোষাপিতো)। পরে এই জীবক কোমারভচ্চ তাহার সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। ১৩

সিরিমা বারবণিতা শালবতীর কন্যা ১৪ ও বিখ্যাত বৈদ্য জীবকের কনিষ্ঠা ভগিনী। সে অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না নর্ত্তকী ছিল এবং রাজগৃহে বাস করিত। কোষাধ্যক্ষ-পুত্র সুমনের স্ত্রী এবং কোষাধ্যক্ষ পুন্নকের কন্যা বুদ্ধের গৃহী-শিষ্যা উত্তরা প্রতিরাত্রি সহস্র মুদ্রা দর্শনীতে তাহার স্বামীর পরিতৃপ্তির জন্য এই সিরিমাকে একপক্ষ কালের জন্য নিযুক্ত করে। ১৫ এক দিন সে অন্যায় করিয়া উত্তরার বিরাগভাজন হইয়া পড়িল এবং পুনরায় সদ্ভাব স্থাপনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেও দ্বিধা করিল না। উত্তরা উত্তর দিল, ভগবান বুদ্ধ যদি তাহাকে ক্ষমা করেন, তবে তাহার ক্ষমা করিতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। ইহার পর এক দিন ভগবান বুদ্ধ শিষ্য সমভিব্যাহারে উত্তরার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভগবান যখন তাঁহার আহার শেষ করিয়াছেন, সিরিমা তখনই তাঁহার কাছে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বসিল। ভগবান ধন্যবাদ উচ্চারণ করিলেন এবং উপদেশ প্রদান করিলেন। সিরিমা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত এই উপদেশ শ্রবণ করিল। ইহার পর সে পবিত্রতার প্রথম স্তরে উপস্থিত হয়। অতঃপর সে আটজন ভিক্ষুকে নিয়মিত ভাবে ভিক্ষা দিয়া আসিয়াছে। ১৬ বিমানবত্থুভাষ্যে (পৃঃ ৭৫) দেখা যায় যে, একজন ভিক্ষু তাহার দান গ্রহণ করার পরেই সে কাতর হইয়া পড়ে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত্যুর পর সে অপ্সরারূপে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়া পাঁচশত সহচরী সঙ্গে বুদ্ধের পূজার জন্য আগমন করিয়াছিল। কিন্তু সুত্তনিপাতভাষ্যে (১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৪) যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায়, মৃত্যুর পর সিরিমা যামস্বর্গে সুযামের রাণীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সে যাহাই হোক, ধম্মপদভাষ্যের বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সিরিমার মৃতদেহকে দাহ করা হয় নাই ; কাকে ও কুকুরে যাহাতে ভক্ষণ করিতে না পারে সেজন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত করিয়া শবাগারে তাহা রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। রাজা বিম্বিসার তাহার মৃত্যুর কথা ভগবান বুদ্ধকে জ্ঞাপন করেন। বুদ্ধই মৃতদেহটি দাহ না করিয়া রক্ষা করিবার জন্য রাজাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। 'অশুভভাবনার' জন্য ভিক্ষুরা মৃতদেহটি প্রত্যহ দেখিতে পাইবে—ইহাই ছিল তথাগতের এরূপ অনুরোধের উদ্দেশ্য। ইহাকে প্রত্যহ নিরীক্ষণ করিয়া ভিক্ষুরা এ কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিল যে, যে-দেহ অনিন্দ্যসুন্দর তাহাও ধ্বংস হয়, কীটের দ্বারা ভুক্ত হয় এবং অবশেষে মাংস বর্জ্জিত হইয়া তাহার হাড়গুলিই কেবল পড়িয়া থাকে। সমস্ত নাগরিককেও সিরিমার এই মৃতদেহটি দেখিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। রাজা ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন, "এই মৃতদেহটি দেখিতে যে অস্বীকার করিবে তাহাকে আটখণ্ড মুদ্রা অর্থদণ্ড স্বরূপ দান করিতে হইবে।" নরদেহের সৌন্দর্য্য যে কত ক্ষণস্থায়ী তাহারই ধারণা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করাইবার জন্য এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল (ধম্মপদ ভাষ্য, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০৬-১০৯)।

১৩। Vinaya Texts, II, py. 172 174.

১৪। সুত্তনিপাত ভাষ্য, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৪

১ । ধম্মপদ ভাষ্য, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৮-৩০৯

১৬। ধম্মপদ ভাষ্য, পৃঃ ১০৪

শামা

শামা ছিল বারাণসীর বারবণিতা। তাহার এক রাত্রির দর্শনী ছিল সহস্র মুদ্রা। রাজার সে বিশেষ প্রিয়পাত্রী ছিল এবং তাহার পাঁচশত দাসী ছিল। একজন তরুণ বয়স্ক বণিক তাহার প্রেমে পড়িয়া তাহাকে প্রতি রাত্রিতে সহস্র মুদ্রা দান করিত। অবশেষে তাহার জন্যই এই যুবকটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এক দিন সে তাহার গৃহের জানালার ধারে দাঁড়াইতেই দেখিতে পাইল যে একটি দস্যুকে রাস্তা দিয়া ধরিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে। দস্যুটির সুন্দর, উজ্জ্বল, দেবতার ন্যায় দিব্য কান্তির দিকে দৃষ্টি পড়িতেই শামা তাহার সহিত প্রেমে পড়িয়া গেল। অতঃপর শামা শাসনকর্ত্তাকে জানাইল যে দস্যুটি তাহার ভ্রাতা এবং তাহার গৃহ ছাড়া তাহার আর কোনও আশ্রয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে সহস্রটি মুদ্রাও পাঠাইয়া দিল। শামার অনুরোধে শাসনকর্ত্তা দস্যুটিকে মুক্তি দিলেন। ইহার পর শামা আর কাহারও নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিত না এবং কেবল সেই দস্যুটির সঙ্গেই আমোদ-প্রমোদে সর্ব্বক্ষণ অতিবাহিত করিত। কিন্তু দস্যুটি মনে করিল, শামা যদি আর কাহারও প্রেমে পতিত হয়, তবে সে হয় ত তাহাকেও হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। তাই এক দিন শামাকে তাহার সমস্ত অলঙ্কার পরাইয়া দস্যুটি একটি উদ্যানে লইয়া আসিল এবং সেইখানে তাহাকে গলা টিপিয়া অজ্ঞান করিয়া ফেলিয়া দেহ হইতে সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া লইয়া পলায়ন করিল। চেতনা পাওয়ার পর শামা তাহার প্রিয়তমের আর কোনও সন্ধান পাইল না। ইহার পর কয়েকদিন সে অন্নজল পরিত্যাগ করিয়া অনশনে কাটাইয়া দিল। পরে যখন নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিল যে, সে আর ফিরিয়া আসিবে না, তখন শামা আবার তাহার পূর্ব্বের ঘৃণ্য জীবনযাত্রার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিল। ১৭

সুলসা

বারাণসীতে একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক বাস করিত। তাহার নাম সুলসা। বারবণিতা শামার ন্যায় তাহারও পাঁচশত সহচরী ছিল এবং এক রাত্রির জন্য তাহাকেও সহস্র মুদ্রা দিতে হইত। এক দিন জানালায় দাঁড়াইয়া সে যখন রাস্তার দিকে তাকাইয়া ছিল, তখন দেখিতে পাইল, একটি দস্যুকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া হইতেছে। এই দস্যুটির নাম সত্তুক। তাহার হাত পশ্চাৎদেশে নিবদ্ধ। প্রথম দৃষ্টিতেই সুলসা এই দস্যুটিকে ভালবাসিয়া ফেলিল। সে মনে করিল—"এই বলিষ্ঠ-দেহ যুবকটিকে যদি সে মুক্ত করিতে পারে তবে তাহাকে লইয়া সে ভদ্রভাবে জীবন যাপন করিবে, আর পাপ জীবনের ছায়া মাড়াইবে না।" নগরের প্রধান কোতয়ালকে প্রচুর অর্থ উৎকোচস্বরূপ প্রদান করায় দস্যুটিকে মুক্ত করিয়া আনাও কঠিন হইল না। ইহার পর সুলসা আনন্দে ও পরম প্রেমে দস্যুর সহিত বাস করিতে লাগিল। যে নারী বহু লোকের কাছে সময়ের অনুপাতে দেহ বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে, তাহার পক্ষে জীবনের ধারা এইরূপ ভাবে পরিবর্ত্তন করা অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। ঘৃণ্য অবস্থার ভিতর আছে বলিয়াই মানুষের মন তাহার জন্মগত স্বভাব হইতে বঞ্চিত হয় না। সুলসাও যে তাহার মনের মত মানুষের সঙ্গে সাধুভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল—নারীর জন্মগত সংস্কারই তাহার কারণ। নারী-হৃদয়ের চিরন্তন পরিচয়ই তাহার ভিতর দিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তিন চারি মাস পরেই দস্যুর মনে সুলসার হীরা জহরতের অলঙ্কারগুলি সংগ্রহ করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবার বাসনা জাগিয়া উঠিল। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে এক দিন সুলসাকে কহিল—"আমি যখন রাজার লোকদের দ্বারা বন্দী হই, তখন এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, মুক্তি পাইলেই পর্ব্বতের উপরিস্থিত একটি বৃক্ষ-দেবতার পূজা দিব।" সুলসা এই কথা শুনিবামাত্র তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, সমস্ত অলঙ্কার পরিধান করিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গে তাহার অনুগমন করিল। কিন্তু পর্ব্বতশৃঙ্গে উপস্থিত হইয়াই দস্যু জানাইয়া দিল—তাহার সমস্ত অলঙ্কার কাড়িয়া লইয়া হত্যা করিবার জন্যই তাহাকে সেখানে আনা হইয়াছে। সুলসা কহিল—"স্বামী, তুমি আমাকে কেন হত্যা করিবে? তোমার জন্য আমি একটি ধনীর সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়াছি। তোমার প্রাণরক্ষার জন্য অজস্র

১৭। Cowell, Jataka, III. pp. 40-42.

অর্থ ব্যয় করিতে আমি দ্বিধা করি নাই। প্রতিদিন আমি সহস্র মুদ্রা করিয়া উপার্জ্জন করিতে পারি; কিন্তু তোমার জন্যই আমি আর কাহারও দিকে ফিরিয়াও চাহি না। আমি তোমার এত উপকার করিয়াছি; সুতরাং তুমি আমার প্রতি সদয় হও—আমাকে হত্যা করিও না।" দস্যু তাহার প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল যে, সে তাহাকে হত্যা করিবার নিমিত্ত কৃতনিশ্চিত হইয়াছে। ইহার পর সুলসার প্রত্যুৎপন্নমতি জাগ্রত হইয়া উঠিল। সে দস্যুর কাছে শেষ আলিঙ্গনের একটা ভিক্ষা যাচ্ঞা করিল। দস্যু সে প্রার্থনা পূর্ণ করিতে আপত্তি করিল না। সুলসা অত্যন্ত ভক্তিভরে প্রণাম করিতে করিতে তাহাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিল এবং চুম্বন করিল। তাহার পর তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাহাকে নমস্কার করিবার ছলে ধাক্কা দিয়া তাহাকে উচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে নিম্নে নিক্ষেপ করিল। পতিত হইয়া দস্যুটির দেহ একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ সে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এইরূপে বিপদ-মুক্ত হইয়া সুলসা গৃহে প্রত্যাগমন করে। ১৮

কাশীর কোনও ধনী মহাজনের পরিবারে অর্দ্ধকাশীর জন্ম হয়। সে প্রথমে বারবণিতা হয়, পরে ধর্ম্মজীবন গ্রহণ করে। দীক্ষা গ্রহণের জন্য সে শ্রাবস্তীনগরে গমন করিতে মনস্থ করিয়াছিল; কিন্তু পথে দস্যুভয় আছে জানিতে পারিয়া ভগবান তথাগতের নিকট দূত প্রেরণ করে। ভগবান বুদ্ধ একজন জ্ঞানী এবং উপযুক্ত ভিক্ষুণী পাঠাইয়া তাহাকে উপসম্পদা দিবার জন্য ভিক্ষুদের প্রতি আদেশ করিয়াছিলেন। দিব্যজ্ঞান লাভের জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল এবং অনতিকাল মধ্যেই ধর্ম্মের অর্থ এবং তদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। (থেরী গাথা ভাষ্য, পৃঃ ৩০—৩৩)।

১৮। Cowell, Jataka, III. 260—263; Cf. Paramathedipain on the Petavatth, p. 4,

১৯। Vinaya Texts, III. pp. 360—361.

অন্তর বাহির

শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি সেবার দুম্‌কা বেড়াতে গিয়েছিলাম। দুম্‌কা ভারী সুন্দর ছোট্ট সহর। আশে পাশে ছোট ছোট পাহাড়। এই পাহাড়গুলির মধ্যে বড় পাহাড়ের গাম্ভীর্য্য নেই, আছে শিশুর দাম্ভিকতা। এ গুলি যেন প্রকৃতির সমতলতার বিরুদ্ধে মাথা উঁচু ক'রে রয়েছে। সহরের পাশ দিয়ে ময়ূরাক্ষী নদী বয়ে চলেছে। কোন্ শিব-সাধনায় এই গিরি-কন্যার বুকের সমস্ত রস শুকিয়ে গেছে—আছে শুধু বালুকার রাশি। মধ্যে মধ্যে ক্ষীণ ধারাস্রোত প্রাণের ক্ষীণ স্পন্দনকে জাগিয়ে রেখেছে। কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তেই সতীর গুপ্ত তেজের ভয়ে শঙ্কিত থাকতে হয়। কখন দুর্দ্দমনীয় জলধারা দুকূল ভাসিয়ে দিয়ে যাবে তার স্থিরতা নেই। তখন এই নদীটি সতীর মতই তেজ-গরিমায় মহিমময়ী। সহস্র বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ ক'রে প্রিয়তমের মিলন-উদ্দেশে উচ্ছৃঙ্খল গতিতে প্রবহমানা। স্বয়ং শিবও বোধ হয় তখন তার গতি রোধ করতে পারেন না। সমস্ত সহরটায় দেখবার বিশেষ কিছু না থাকলেও, এর মধ্যে এমন একটা মোহজনক আবেষ্টনী আছে, যাতে, যে একবার দেখেছে সে বারংবার দেখবার ইচ্ছায় প্রলুব্ধ হবে। তার রাস্তাঘাট, বন, বনানী, পাহাড়, নদী সমস্তর মধ্যেই এক অপূর্ব্ব শ্রী। এ যেন প্রকৃতি-রাণীর আদরের মেয়ে।

জেলের কয়েদী দেখবার ইচ্ছা হ'লো। এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে নৃশংসতার নরককুণ্ড আমার ভাল লাগল না। জেলখানাটা এ সহরে না হ'লেই যেন ছিল ভাল। চারিদিকে সবুজ শ্রী। তারই বুকের উপর পাষাণ কারা অগণ্য দস্যু নরঘাতককে বুকের মধ্যে পুরে রেখেছে। জেলের বাইরেটা যেমন রুক্ষ, ভিতরটা ততোঽধিক। খালি নিয়ম-শৃঙ্খলা,—ব্যতিক্রমে শাস্তি বৃদ্ধি।

আমার সঙ্গে ছিলেন জেলের ডাক্তার বাবু। তিনিই সব দেখাচ্ছিলেন। কয়েদীদের দোষের এবং শাস্তির বর্ণনাও

সঙ্গে সঙ্গে কর্‌ছিলেন। এদের অনেককেই দেখলাম বেশ প্রফুল্ল আর করিতকর্ম্মা। এরা না কি দাগী। জেলখানা আর শাস্তি এদের ভয়ের জিনিষ নয়, বরং এইখানেই ওরা থাকে ভাল—আশ্চর্য্য। আর কতকগুলোকে দেখলাম তা'রা কিছু ম্রিয়মাণ। তা'রা নবাগত—এখানকার হালচালে অভ্যস্ত নয়। পুরোনদের সঙ্গে সঙ্গে কলের পুতুলের মত কাজ কর্‌ছে। প্রায় সকলের মুখেই দোষীর ছাপ—এটা খুঁজে বের কর্‌তে হয়নি—প্রথম দৃষ্টিতেই চোখে পড়েছিল। এদের দলে আছে বালক থেকে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত—রমণীও বাদ পড়ে নি। সব থেকে আশ্চর্য্য বোধ হ'লো এইখানে। প্রকৃতির বিচিত্র বৈষম্য।

বেড়াতে বেড়াতে কতকগুলি জোর কুঠুরীর মত ঘরের সামনে এসে পড়লাম। শুনলাম যারা দ্বীপান্তর যাবে বা ফাঁসিতে ঝুল্‌বে তারাই কিছু দিনের জন্য এই সব ঘরে বিশ্রাম করে। তখন তারা অন্য কয়েদী হ'তে একটু স্বতন্ত্র হ'য়ে পড়ে। এই কুঠুরীর না আছে জান্‌লা, না আছে কিছু। আছে শুধু একমাত্র লোহার দোর, তাও সর্ব্বদা বন্ধ এবং বাইরে প্রহরী। কয়েদীর কাছে একটা ঘণ্টার দড়ি আছে। দরকার হ'লে সে সেই দড়িতে টান দেয়, আর প্রহরীর কাছে ঝুলান ঘণ্টা বেজে উঠে, প্রহরী এসে খবর নেয়। বারংবার বিরক্ত করলে ধমক দেয়। এই ঘরে ঢুকলেই কয়েদী বুঝতে পারে যে, দিন তার নিকট হ'য়ে আস্‌ছে—যে কোন উপায়েই হোক আত্মীয়-স্বজনকে তার চিরদিনের মত ছাড়তেই হবে।

চার পাঁচটা ঘরের মধ্যে তিনটে ঘরে মাত্র তখন কয়েদী ছিল। একটা কয়েদী তার স্ত্রীকে খুন করেছিল স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান হ'য়ে। মুখে তা'র দোষীর ছাপ বিশেষ খুঁজে পেলাম না—ক্ষণিক উত্তেজনায় কৃত কর্ম্ম বলেই বোধ হল। আর একজন চুরি কর্‌তে গিয়ে ধরা পড়ে। পালাবার চেষ্টা করাতে, যে তাকে ধরেছিল তাকে খুন করে। এই লোকটির ফাঁসি হবে। আর তৃতীয় ব্যক্তি না কি বিখ্যাত ডাকাত। সে কোম্পানিকে নাকের জলে চোখের জলে করেছে। তাকে ধরবার সমস্ত কৌশল সে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছিল। গোয়েন্দার চাতুরীও তার কাছে ব্যর্থ হয়েছিল। পুরস্কার ঘোষণাও কোন কাজের হয় নি। কিন্তু শেষে হঠাৎ এক দিন নিজে এসে ধরা দেয়—কেন তা সেই জানে। ওরও ফাঁসিতে সব শোধ যাবে।

এতগুলো রকম বে-রকমের কয়েদী দেখলাম; কিন্তু কাউকে দেখেই মনে কোন ভাবান্তর হয়নি। কিন্তু একে দেখেই কি জানি কেন মনের মধ্যে থেকে নিজের অজান্তে একটা আহা ঠেলে উঠল। এর চেহারার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, যেটা ঠিক বর্ণনা ক'রে বোঝান যায় না, যা স্বভাবতই মানুষের দৃষ্টিকে তার প্রতি আকর্ষণ করে। লম্বায় বোধ হয় ছ'ফুট হবে। বুকখানা চওড়া; চোখ দুটো অপূর্ব্ব ভাস্বর। রংটা যে আসলে কি ছিল তা বোঝা যায় না, এখন রোদে-পোড়া তামাটে। মুখে অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা। চুল-গুলো লম্বা লম্বা—মুখের উপর এসে পড়েছে। বয়স আন্দাজ করা কঠিন। যেন অত্যাচার উৎপীড়নে বয়সের খেই হারিয়ে গেছে। সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভিতর দিয়ে মর্ম্মান্তিক অন্তর্যাত-নার ও মর্ম্মন্তুদ গূঢ় বেদনার ছাপ ফুটে বের হচ্ছে। একে যেন নরঘাতক ডাকাত বলতে মন চায় না। তবু তো এ ডাকাত। এর জীবনের অন্তরালে যে, একটা গভীর দুঃখ, বেদনার কাহিনী লুকিয়ে আছে, এ আমার মনে কে যেন বল্‌লে।

এই লোকটা ব'সে ছিল, আমাদের দেখে সোজা হ'য়ে উঠল এবং দুটো হাত যোড় ক'রে কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার ক'রে বল্‌লে—ডাক্তার বাবু, আর কদিন পরে মুক্তি আস্‌বে আমার?

ডাক্তার বাবু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লেন—আরে আপীল হয়েছে, তাতে ফাঁসির হুকুমই যে বাহাল থাক্‌বে তাই বা তোকে কে বল্‌লে।

সে একটু ম্লান হেসে বল্‌লে—থাক্‌লেই ছিল ভাল। এ জীবনটাকে আর এমন করে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে বেড়াতে পারি নে। পরে একটু থেমে বল্‌লে—আচ্ছা, আমি তো সব খুলে স্বীকার করেছি, তবু হুকুম বদ্‌লে যাবে? পরে যেন নিজের মনেই বল্‌লে—না, এ হতেই পারে না। এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে একটু হেলান দিয়ে বস্‌ল। শুধু তার ভাসাভাসা চোখ দু'টো আমাদের মুখের উপর মেলে ধর্‌লে।

তার কাছ থেকে চ'লে আসার পর কি-জানি-কেন মন ভারাক্রান্ত হ'য়ে গেল।

পর দিন ডাক্তার-বাবুকে বল্‌লাম—দেখুন, ও লোকটা

হয় তো সত্যিই ডাকাত নয়। কোন দুঃখ কষ্টের তাড়নায় ও বাধ্য হয়েই এই ডাকাতি করছে। আমি একবার ওর সঙ্গে একলা কথা বল্‌তে চাই যদি সুবিধা করে দেন।

চল্‌তেচল্‌তে ডাক্তার বাবু বল্‌লেন—লোকটা মৃত্যুর খবর শোনার দিন থেকে অসম্ভব ওজনে বেড়ে যাচ্ছে। মন ভারী খুশী, আর মরতে ওর ভয় মোটেই নেই—বরং ভারী আগ্রহ। এত কয়েদী দেখিছি; কিন্তু সব থেকে আশ্চর্য্য এই লোকটা।

জেলারের অনুমতি পেলাম একলা দেখা করবার।

তার ঘরে ঢুকতেই সে 'আসুন' ব'লে নমস্কার ক'রে নিজের কম্বলটা ঝেড়ে বিছিয়ে দিলে। আমি ব'সে এ-কথা সে-কথার পর তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—ভাই, তোমার জীবনের এমন এক দিক আছে, যেটা তোমায় প্রতি মুহূর্ত্ত পীড়ন করছে। আমি সেইটুকুর খবর জান্‌তে চাই—বল্‌বে না আমাকে?

সে তার করুণা-মাখান চোখ দু'টো আমার দিকে মেল্‌লে। চোখ তখন তার অশ্রু-সজল হ'য়ে উঠেছে। মুখ তার বিস্ময়-আনন্দপ্লুত। কিছুক্ষণ পরে বল্‌লে,—মুখের উপর জোর ক'রে একটু হাসি টেনে এনে—বাবু, কি হবে আর তা শুনে। অতীতকে ভবিষ্যতের মধ্যে টেনে এনে আর সচেতন করা কেন। যা অতীত হ'য়ে গেছে তা অতীতের কোলেই মরে থাক্। তাকে টেনে এনে আর ভবিষ্যতের বাতাসকে কলুষিত করা কেন।

আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে যা বল্‌লে, তাই আমি নিজের কথায় বর্ণনা করবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু এর মধ্যে তার প্রাণের কাতরতা, ব্যাকুলতা, মর্ম্মবেদনার বুকভাঙা কান্নার ধারা ফোটাতে পেরেছি কি না জানি না—এ শুধু ক্ষীণ চেষ্টা মাত্র।

তার নাম মেঘুয়া। জাতে গোয়ালা। ময়ূরাক্ষী নদীর ওপারে সীতাহারী গ্রামে তার বাড়ী। সীতাহারী গ্রামের জমিদার নিকুঞ্জ রায়। মেঘুয়ারা দু'ভাই; সে বড় আর সুখুয়া ছোট। মেঘুয়া যখন বছর পোনের তখন তার বাপ মা মারা যায়। মেঘুয়াই সুখুয়াকে বুকে ক'রে মানুষ ক'রে তোলে; সুখুয়ার বয়স তখন মাত্র বছর তিন। মেঘুয়া ও সুখুয়ার মাঝে আরও কটি ভাইবোন হ'য়ে ছিল; কিন্তু সব কটিই গতায়ু হয়েছিল। মেঘুয়ার বাপ মা জীবিত থাকতেই তা'র বিয়ে হয়। তার স্ত্রী মঙ্গলাও প্রায় তার সমবয়সী—মাত্র বছর দুয়েকের ছোট।

মঙ্গলা ঠিক মূর্ত্তিমতী মঙ্গলদায়িনী। সে অতটুকু বয়সেই সুখুয়াকে বুকে তুলে নেয়। বাল্যে ভ্রাতৃস্নেহে এবং যৌবনে মাতৃস্নেহে মঙ্গলা সুখুয়াকে মানুষ ক'রে তোলে। তার পর যখন তার নিজের একটি ছেলে হ'য়ে মারা গেল, তখন হ'তেই সুখুয়াই যেন হোল তা'র প্রাণ। সন্তান হারানোর সমস্ত ব্যথা সে সুখুয়াকে বুকে চেপে ভুল্‌তে চাইতো। সুখুয়াও পরম নির্ভরে এই মাতৃসমা ভ্রাতৃজায়ার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে পরম আবেশ অনুভব করতো। মেঘুয়া দেখে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেল্‌তো এবং তার চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়্‌ত। মেঘুয়া চোখ্ মুছ্‌তে মুছ্‌তে সেখান হ'তে চ'লে যেত।

মেঘুয়ার পার্থিব সম্পত্তি খুব বেশী কিছু না থাকলেও তা'র যা ছিল তাতেই তার বুক পোরা ছিল। মেঘুয়ার বুক পোরা তৃপ্তি ছিলবোলেই সে কখন কিছুর মধ্যেই অভাব অভিযোগ অনুভব করতো না। আর ঠিক তেমনি ছিল মঙ্গলা। সে সকল দিক এমন সামলে চল্‌তো যাতে কোথাও এতটুকুও অভিযোগের ব্যবধান সৃজন করবার মত ফাঁক থাকৃত না। মঙ্গলা যেন তার ঘরে দেবতার মঙ্গল আশীর্ব্বাদের মত এসেছিল। মা বাপের শোক এবং ভাইকে মানুষ করার দুর্ভাবনার হাত থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছিল এই মঙ্গলাই।

মেঘুয়ার জোত জমা যদিও খুব বেশী কিছু ছিল না, তবুও যা অল্পস্বল্প ছিল তাতেই বেশ স্বচ্ছন্দে দিন গুজরান হ'তো। দু'দশ বিঘা জমি ছিল তাতেই ফসল হ'ত। চার পাঁচটা দুধাল গাই ছিল। দুধ হ'তে মঙ্গলা মাখন তৈরী করত, ঘি তৈরী করত। মেঘুয়া দুধ ঘি এবং মাখন হাটে বিক্রি করত। একখানা লাঙ্গল ছিল, দু'টো বলদও তার গোয়ালে থাকৃত।

শরতের শ্যামলিমা যখন সবুজ ধানের ক্ষেতে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করত, তখন মেঘুয়ার মন পুলকে নেচে উঠ্‌তো। সমতল সবুজ রংয়ের ক্ষেতখানি যেন প্রকৃতি-রাণীর বসনাঞ্চল। বাতাস যখন তাতে মৃদু দোলা দেয়, তখন এই চঞ্চল লীলায়িত অঞ্চলখানির অপূর্ব্ব হিল্লোল-শ্রী মনের মধ্যে সত্যই একটা আনন্দ জাগিয়ে দেয়। তার পর যারা বর্ষা, রোদ, ঝড় সহ্য ক'রে, নিজের বুকের রক্ত জল ক'রে এই ধান গাছগুলির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে, তারা যখন এই অপূর্ব্ব শোভা দেখে, তখন তাদের মনেও সমস্ত বৎসরের সফলতার আনন্দ স্পন্দিত হ'য়ে ওঠে। তার পর যখন ধানগাছগুলি নবীন ধানের মঞ্জরীর ভারে ও বাতাসের মৃদু সন্তর্পিত স্পর্শে

আভূমি নত হ'য়ে তাদের প্রাণদাত্রী ধরিত্রীকে প্রণাম ক'রে, তখন, তাদের পালক পিতারও মন নিজের অজান্তে হয় তো বিশ্বদেবতার উদ্দেশে বিস্ময়ে আনন্দে নত হয়।

মেঘুয়ার তৃপ্তিভরা বুক আর মঙ্গলার মঙ্গল হাতের স্পর্শে মেঘুয়ার ঘর অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হ'য়ে উঠ্‌ল। তার পর এক দিন স্বপ্নের ঘুম ভাঙার পর যেন পরম বিস্ময়ে মেঘুয়া দেখ্‌লে সুখুয়া হঠাৎ বড় হ'য়ে উঠেছে। যৌবন এসে তাকে ভাস্বর, চঞ্চল এবং সদা-প্রফুল্ল ক'রে তুলেছে। সেই দিনই যেন হঠাৎ তার মনে হ'লো সুখুয়া যেমন বলিষ্ঠ হয়েছে, তেমনি হয়েছে কর্ম্মিষ্ঠ। সে দাদার হাত থেকে সমস্ত কাজ নিজে কেড়ে নেয়—প্রফুল্ল মুখে মেঘুয়ার চেয়ে অল্প সময়ের মধ্যে সহজে সম্পন্ন ক'রে। মেঘুয়া প্রথমে সুখুয়াকে মৃদু অনুযোগে বারণ ক'রে; কিন্তু তার অনুযোগ খাটে না। তখন সে কর্ম্মরত সুখুয়ার দিকে সমস্ত আনন্দিত মন মেলে ধ'রে তাকে অন্তরের সঙ্গে আশীর্ব্বাদ করে। মঙ্গলা খুঁটি ধ'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে, খানিক পরে তার চোখ দিয়ে পুলকাশ্রু গড়িয়ে পড়ে। আনন্দের আতিশয্যে সেদিন আর তার কোন কাজই হয় না। নিরানন্দও কাজে বাধা দেয়; আবার বেশী আনন্দও কাজে বাধা দেয়। কিন্তু দু'য়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, প্রথমের বাধায় মনে অবসাদ আসে, আর দ্বিতীয়ের বাধায় অবসাদ আসে না, আসে পরম তৃপ্তির আনন্দ-উচ্ছ্বাস। এমনি করেই তাদের দিন্ চল্‌তে লাগ্‌ল।

সুখুয়া মঙ্গলাকে মা বলেই জান্‌ত। যদি কোন দিন তার খেলার সঙ্গীরা তাকে বল্‌ত—তুই কি রে, বৌদিকে মা ব'লে ডাকিস্! বৌদিকে কে আবার মা ব'লে ডাকে! তুই এমন বোকা কেন? সুখুয়া লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ত। সত্যই তো—এটা গভীর লজ্জার কথাই তো বটে। সে মনে মনে ঠিক কর্‌ত, না, আর কিছুতেই মঙ্গলাকে মা বলা হবে না। বাড়ী ফের্‌বার পথে সে সারাপথ বৌদি ডাক্‌টা মুখস্থ কর্‌তে কর্‌তে আস্‌তো। এই ডাক্‌টা মুখ ফুটে ডাক্‌তে তার কেবল লজ্জায় গলা শুকিয়ে উঠ্‌তো। তাই সে জোর করে নিজের মনে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আবৃত্তি কর্‌তে কর্‌তে বাড়ী আস্‌ত। কিন্তু মঙ্গলাকে সামনে পেলে সে কিছুতেই বৌদি ব'লে ডাক্‌তে পার্‌তো না। গলা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে যেত। তখন সে না পার্‌ত বৌদি ব'লে ডাক্‌তে, আর না পার্‌ত মা ব'লে ডাক্‌তে। উভয়ই তার মুস্কিল হ'তো। সে চুপ করে পাশ কাটিয়ে যেত। রাগ হ'ত তার সঙ্গীদের ওপর, কেন তারা তার মনের মধ্যে এমন করে দ্বিধা দ্বন্দ্বের ঝড় তুলে দেয়। সে আর তাদের সঙ্গে খেলা কর্‌তে যাবে না প্রতিজ্ঞা কর্‌ত। তারা তার মাকে পর কর্‌তে চায়। হোক মঙ্গলা বৌদি, সে তবু তার মা।

বৌদির মধ্যে জননীর বাৎসল্য, বোনের স্নেহ, বন্ধুর প্রীতি, সখীর সখ্য সব মিশিয়ে আছে বলেই তো এই সম্বন্ধ এত মধুর; আর তাকে যে-কোন সম্বোধনেই পরম তৃপ্তি পাওয়া যায়। তবু সুখুয়া মঙ্গলার মাতৃস্নেহের পরিপূর্ণ দিকটা অধিকার করেছিল বলে তাকে মা বলে তৃপ্তি পেত।

মঙ্গলা তার পালিয়ে বেড়ান দেখে তাকে ধ'রে জিজ্ঞাসা কর্‌ত—হ্যাঁরে সুখু, কি হয়েছে তোর? অমন করে বেড়াচ্ছিস কেন?

সুখুয়া মঙ্গলার বুকে মুখ লুকিয়ে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে বলত—ওরা বলে তুমি বৌদি, মা নও। কেন বলে ওরা।

মঙ্গলা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলত—তা বল্‌লেই বা, আমি তোর বৌদিও হই মাও হই।

সুখুয়া জোর দিয়ে বলত—না, তুমি মা।

মঙ্গলা হাসত, সঙ্গে সঙ্গে অশ্রু গড়িয়ে সুখুয়ার মাথায় আশীর্ব্বাদের মত বর্ষিত হত। মঙ্গলা বলত—আচ্ছা তাই।

মঙ্গলা মেঘুয়ার কাছে গল্প কর্‌ত, মেঘুয়া হেসে বলত—সত্যিই তো; তুমি ওর হৃদয়ে যে স্থান অধিকার করে ব'সে আছ, সেখান থেকে কেউ-ই তোমাকে বিচ্যুত কর্‌তে পার্‌বে না।

এমনি করেই তাদের আনন্দের সংসার অনাবিল আনন্দের মধ্যে দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ এক দিন আনন্দের রথের চাকা গভীর কাদায় ব'সে গেল।

সেবার সাঁওতাল পরগণায় দুর্ভিক্ষ কিছু ভীষণ ভাবেই এলো। সকলের ঘরেই হাহাকার উঠ্‌ল। মেঘুয়া ও সুখুয়া প্রাণপণে খেটেও অন্ন সংস্থান কর্‌তে পারে না। মঙ্গলার গায়ে যে দু' একখানা রূপার গহনা ছিল, মঙ্গলা তাই যেদিন বিক্রি কর্‌বার জন্য দিলে, সেদিন মেঘুয়ার চোখ ফেটে জল ছুট্‌ল। অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর সেগুলো আধা-দরে বিক্রি ক'রে দিন কতক সংসার কোন রকমে চল্‌ল। তার পর একেবারেই অচল হ'য়ে উঠ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে নানা রকমের রোগ দেখা দিলে। কতক লোক

না খেয়ে, কতক লোক রোগের কবলে পড়ে, মর্‌তে লাগ্‌ল। তাদের গ্রামটা প্রায় ফাঁক হ'য়ে গেল।

এদিকে যখন দুর্ভিক্ষ আর রোগ গ্রামের বুকের ওপর নির্ম্মম ভাবে চেপে বসেছে, ঠিক ঐ সঙ্গে সঙ্গে জমিদারের পাইক গোমস্তাও গ্রামের বুকে যমের দোসরের মত চেপে বস্‌ল। দুর্ভিক্ষ আর রোগ মানুষের বুকের রক্তের যেটুকু অবশিষ্ট রাখ্‌লে, জমিদারের লোক সেটুকু নিঃশেষে চুষে টেনে নিতে লাগল।

জমিদার কড়া লোক। তার জমিদারীর খাজনা পাই পয়সা বাকি থাক্‌বার উপায় নেই। লোকের ঘর পুড়িয়ে, ভিটে ছাড়িয়ে, জমী বাজেয়াপ্ত করে, হাল গরু বিক্রী করে, যেমন ক'রে হোক খাজনা আদায় করা চাই। এক প্রজা জমিদারী ছাড়্‌লে অন্য প্রজা আস্‌বে—জমিদারের জমি খালি থাক্‌বে না; কিন্তু খাজনা বাকি থাক্‌লে তা বাকিই থেকে যাবে। এই খাজনা আদায়ের জন্য একটু কড়া হ'তে হয় বই কি। লোকে কত কথা বলে তা'তে জমিদারের বিশেষ যায় আসে না। নিজের স্বার্থ আগে।

তাই যখন দুর্ভিক্ষের জন্য প্রজারা খাজনা দিতে অসমর্থ হ'লো, তখন জমিদার কড়া হুকুম দিলে যেমন ক'রে পার খাজনা আদায় করো। প্রজা তো মর্‌বেই, তা খাজনা বাকি রেখে মরে কেন। এই ছোট লোকগুলো অতি ছোট লোক। এরা নিজেরাও মর্‌বে এবং জমিদারকেও মার্‌বে। সব বেটাদের বজ্জাতি। জমিদার যদি হুকুম দেয় ধরে আন্‌তে, নায়েব গোমস্তায় বেঁধে আনে। এখানেও হ'লো তাই। এক দিকে রোগ দুর্ভিক্ষ আর যম লোককে নিয়ে টানাটানি কর্‌তে লাগল, আর অন্য দিকে খাজনা আদায়ের কড়া জুলুম। লোকে খেতে পায় না তা খাজনা দেবে কি ক'রে। কিন্তু শোনে কে। লোক ভিতরে ভিতরে গুমরে মর্‌তে লাগল। মুখে প্রতিবাদ কর্‌বার কোন উপায়ই নেই। মেঘুয়ার ওপরও জুলুম চল্‌তে লাগ্‌ল।

মেঘুয়ার অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। সুখুয়ার শরীর ভাল নেই। অনাহার আর খাটুনিতে ভেঙে পড়েছে। সুখুয়ার যে বুকের ছাতিখানা ছিল দেখ্‌বার মত, এখন তার প্রতি হাড়খানা গুণে নেওয়া যায়। মঙ্গলা জ্বরে বেহুঁস—বাঁচার আশা নেই বল্লেই হয়। অনেক দিন আগে হতেই সে নিজে একবেলা খেয়ে মেঘুয়া আর সুখুয়াকে দু'বেলা খাইয়েছে—এ কেউই জানতে পারে নি। যখন ধরা পড়্‌লো তখন আর কারোই একবেলা খাবারও সংস্থান নেই। মেঘুয়ারও শরীর ভেঙে গেছে।

সেদিন মেঘুয়া শেষ সম্বল মঙ্গলার পৈঁছেটা নিয়ে সহরে গিয়েছিল বেচতে। এই বিক্রয়লব্ধ অর্থে সে ডাক্তার এবং ওষুধ নিয়ে আস্‌বে মঙ্গলার জন্যে। সে সকালে বের হ'য়েছিল, কিন্তু ফির্‌তে তার সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। কারণ, তার এই পৈঁছে এত কম দরে সবাই কিন্‌তে চায় যে, বলা যায় না। সময় বুঝে, যাদের অনেক আছে, তারা গরীবের রক্ত শোষণ কর্‌তে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। তাই অনেক দোর ঘুরে, অনেকের খোসামোদ ক'রে যখন বিক্রি ক'রে নিয়ে ঘরে ছুট্‌ল তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে।

বাড়ী ঢুক্‌তেই বুকটা তার কেমন ছ্যাঁৎ ক'রে উঠ্‌ল। সে ক্ষীণ কণ্ঠে ডাক্‌লে সুখুয়া। কোন উত্তর নেই। তার স্বর শুনে মঙ্গলা তার রোগজীর্ণ ও অনশনক্লিষ্ট শরীরটাকে বাইরে টেনে এনে কাতরকণ্ঠে কেঁদে বল্‌লে—জমিদারের লোক সুখুয়াকে ধ'রে নিয়ে গেছে জমিদারের সদর কাছারীতে। বাছার জ্বর এসেছিল তা সত্বেও নিয়ে গেছে খাজনা বাকি আছে বলে।

মেঘুয়ার মাথা ঘুরে উঠ্‌ল। না-জানি কি নির্ম্মম ভাবে টান্‌তে টান্‌তে তারা সুখুয়াকে এই আট দশ ক্রোশ রাস্তা নিয়ে যাবে। তার হাতে এমন একটিও পয়সা নেই যা দিয়ে সে খাজনা মিটিয়ে সুখুয়াকে মুক্ত ক'রে আন্‌বে। তার শেষ সম্বল সে মঙ্গলার জন্য খরচ করেছে। সে উর্দ্ধশ্বাসে কাছারীর উদ্দেশে ছুটল—যদি কোন রকমে দয়ার উদ্রেক করে সুখুয়ার মুক্তি ভিক্ষা কর্‌তে পারে।

কিন্তু সব বৃথা। জমিদারের মনে কোন রকম দয়া তো হ'লোই না, উপরন্তু মেঘুয়াকে কাণ ধরে কাছারীর সামনে দৌড় করিয়ে ছেড়ে দিলে। রাগে ক্ষোভে মেঘুয়ার মত নিরীহ লোকেরও বুকের ভিতরটা ফুলে ফুলে উঠ্‌তে লাগল। আহত বাঘ যেমন শত্রুর উপর প্রতিশোধ নিতে অক্ষম হ'য়ে আঘাতের যন্ত্রণায় এবং রাগে নিজের লেজ হাত পা কাম্‌ড়াতে থাকে, মেঘুয়ারও ঠিক সেই রকম মনে হ'তে লাগল। সে নিজের চুলগুলো দু'হাতে টেনে ছিঁড়তে লাগ্‌ল। নিজেকে আঘাত করা ছাড়া আর কোন উপায়ই ছিল না তার। সমস্ত বুকটা তার ফেটে যাবার মত হ'তে

লাগ্‌ল। এ দিকে ঘরে মরণোন্মুখ মঙ্গলাকে একলা ফেলে এসেছে। সে যে কী অবস্থায় আছে তা ভগবানই জানেন। মেঘুয়া সেই রৌদ্রতপ্ত দুপুরে কাছারীর সামনেই হত্যা দিয়ে প'ড়ে রইল। সুখুয়াকে না নিয়ে বাড়ী যাবে না। সে একা বাড়ী ফির্‌লে মঙ্গলা কি বল্‌বে? সুখুয়া যে মঙ্গলার প্রাণ।

এমনি ক'রে সেদিনও গেল। তার পরদিনও প্রায় যায় যায় হ'লো। সন্ধ্যার কাছাকাছি যখন সুখুয়ার দেহটা বাইরে এনে ফেলে দিলে জমিদারের লোক, তখন রোগ ও অনশনক্লিষ্ট দেহটাই শুধু পড়ে আছে, আত্মা তার রোগ ও পার্থিব পীড়নের হাত হ'তে মুক্তি লাভ করেছে। মেঘুয়া চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল। জমিদারের বিশ্রামের ব্যাঘাত হ'লো। তার লোক এসে তাকে দূর ক'রে দিলে।

তার পর মেঘুয়া যে কী ক'রে বাড়ী এসেছে তা জানে না। চোরের মত লুকিয়ে অন্ধকারের আশ্রয় নিয়ে বাড়ী ঢুক্‌তে চেষ্টা কর্‌তেই মঙ্গলার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে রোগক্লিষ্ট দেহ নিয়েও সুখুয়ার মুক্তির প্রতীক্ষায় ব'সে ছিল। মেঘুয়া চীৎকার ক'রে উঠল—সুখুয়াকে তোর মুক্তি দিয়ে এলাম। আর সে এ জন্মে ফির্‌বে না। মঙ্গলা মূর্চ্ছাহত হ'লো।

তার পরের দিনগুলো যে কী ক'রে কেটেছে তা মেঘুয়াও ঠিক জানে না। পোকাগুলো আলো দেখ্‌লে যেমন আলোর কাছেই ঘুরে বেড়ায়,—গায়ে তাত লাগে, পুড়ে মরে, তবু তার কাছ হ'তে দূরে যেতে পারে না,—মরণ যেমন ঠিক নেশার মত তাদের পেয়ে বসে,—তেমনি মেঘুয়াকেও তখন মরণের নেশা পেয়ে বস্‌ল।

গ্রামের সকলেই রোগ আর জমিদারের উৎপীড়নে মরিয়া হ'য়ে উঠেছে। সকলে মিলে একটা ডাকাতের দল কর্‌লে। মেঘুয়া হ'লো তার সর্দ্দার। মঙ্গলার অনুনয় বিনয় সব ব্যর্থ হ'লো। মেঘুয়ার মন তখন খুনে হয়ে পড়েছে। তাকে বাধা দেবার ক্ষমতা তার নিজেরও ছিল না। প্রথম ডাকাতি হলো নিকুঞ্জ রায়ের বাড়ীতে। নিকুঞ্জর ছেলেকে যখন সবাই মার্‌লে তখন একবার মেঘুয়ার অন্তর কেঁদে উঠল, কিন্তু তখনই তার মনে হ'লো এর চেয়েও নির্ম্মমভাবে তারা তার সুখুয়াকে হত্যা করেছে। সে চীৎকার ক'রে উঠল—মেরে ফেল ওটাকে। কিন্তু তার পরই গভীর অবসাদে মন ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠল। সে দল বল নিয়ে চ'লে এলো।

কত দিন সে ভেবেছে,—বিশেষ ক'রে যখন মঙ্গলা বারণ করেছে, যে, না, হত্যা দিয়ে হত্যার প্রতিশোধ হয় না—এ কি কর্‌ছে সে। কিছুতেই আর ডাকাতি কর্‌বে না। কিন্তু আবার যখনই তার দলবল তাকে ডাক্‌তে এসেছে, তখনই সে, নেশাখোরের নেশার আস্বাদন পাবার লোভের আগ্রহের মত, ছুটে চ'লে গেছে। বড় লোকগুলোকে খুন করে সে অসীম আনন্দ পেতো,—কারণ, তার ধারণা ছিল, এদের প্রাণ নেই, প্রাণের বেদনা এরা বোঝে না। তাই এদের মেরে প্রাণের দাম বুঝিয়ে দিত। প্রথম তার হাত কাঁপতো, প্রাণ কাঁদতো; কিন্তু এখন প্রাণ জড় হয়ে গেছে, কোন সাড়া নেই। মঙ্গলা তার সঙ্গে কথা কয় না। মেঘুয়ার প্রাণ কেঁদে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণেই তার বেদনাহত অসাড় মন ব'লে ওঠে—না কথা বলুক, সে কাউকে চায় না, কেউ-ই তাকেও চায় না।

সে বুঝতে পারতো মঙ্গলার দিন নিকট হ'য়ে এসেছে,—ঘরে একলা ফেলে রেখে যাওয়া ঠিক নয়। তবু সে এই খুনের নেশা দমন কর্‌তে পার্‌তো না। সে পাকা ডাকাত,—খুন করাই শুধু তার খেয়াল।

সেদিন যখন ডাকাতি কর্‌তে বের হয় তখন মঙ্গলার অবস্থা খুব খারাপ। তার অন্তরাত্মা বারংবার তাকে যেতে নিষেধ কর্‌তে লাগ্‌ল; কিন্তু নেশা তার সকল নিষেধ উপেক্ষা করে বাইরে নিয়ে গেল।

ভোরে যখন সে ঘরে ফির্‌ল তখন মঙ্গলার নির্জ্জীব দেহ পড়ে আছে, মুখে লেগে আছে তৃপ্তির চিহ্ন।

মেঘুয়ার সমস্ত নেশা আজ হঠাৎ যেন কেটে গেল। সে মঙ্গলার দেহ কোলে নিয়ে খুব খানিকটা কাঁদলে, সমস্ত মন যেন তার সুস্থ হ'লো। সে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মঙ্গলার সৎকার করেই সেই অবস্থায় বরাবর থানায় এসে ধরা দিলে। জীবনে তার ধিক্কার এসেছে। আত্মহত্যা করা পাপ, তাই যাদের তাকে ধর্‌বার বড় আগ্রহ, তাদের কাছেই ধরা দিয়েছে। তারা তার মৃত্যুর হুকুমও দিয়েছে কিন্তু বড় বিলম্ব কর্‌ছে—দেরী তার সয় না,—সুখুয়া, মঙ্গলা যে তার অপেক্ষায় আছে।

চোখের জলে মেঘুয়ার বুক ভেসে গেছে। আমারও চোখ শুক্‌নো ছিল না।

লেজার কথা

(Leysin)

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

পাইন-ছাওয়া পাহাড়ের চূড়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে নীলাকাশের দিকে, যেন ধরিত্রীর একটি অঙ্গ সবুজ তরঙ্গের মত আকাশের দিকে উঠিয়া গিয়াছে পরিপূর্ণভাবে সূর্য্যালোক পান করিবার জন্য। পাকটি গড়াইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া একটি অধিত্যকার সৃষ্টি করিয়াছে, তার পর তলায় নামিয়া গিয়াছে। পাহাড়ের দক্ষিণ দিক বাহিয়া অধিত্যকা জুড়িয়া লেজাঁ, থাকে-থাকে সাজান স্যানাটোরিয়াম, ক্লিনিক, ভিলা, সুইস সালের (chalet) সারি। সুইজারল্যাণ্ডে যক্ষ্মারোগীদের চিকিৎসার জন্য যতগুলি স্থান আছে তাহার মধ্যে লেজা একটি প্রসিদ্ধ জায়গা। থেকে ছোট বৈদ্যুতিক রেলে করে প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে লেজাঁতে পৌছান যায়। রেল-লাইন পাহাড়ের গা দিয়া খাড়া উঠিয়া গিয়াছে,—দার্জ্জিলিং রেলওয়ের মত তাহা মাঝে মাঝে লুপ সৃষ্টি করিয়া ওঠে নাই। লেজাঁ চার হাজার হইতে চার হাজার পাঁচশ ফিট উঁচু; অর্থাৎ প্রায় কারসিয়াংএর সমান উঁচু। জায়গাটি যেমন পাহাড়ের গায়ে, তেমি তাহার পূর্ব্বে দক্ষিণে চারিদিকে আল্পসের পর্ব্বতশ্রেণী। সম্মুখে সুন্দর স্যামো-সেয়ার পাহাড় ধ্যান-মগ্ন যোগীর মত অটল গাম্ভীর্য্যে পরম মহিমায় বসে, পূর্ব্ব-উত্তর কোণে পিক দশি ও মঁন্দর পাহাড় দু'টির যুগল
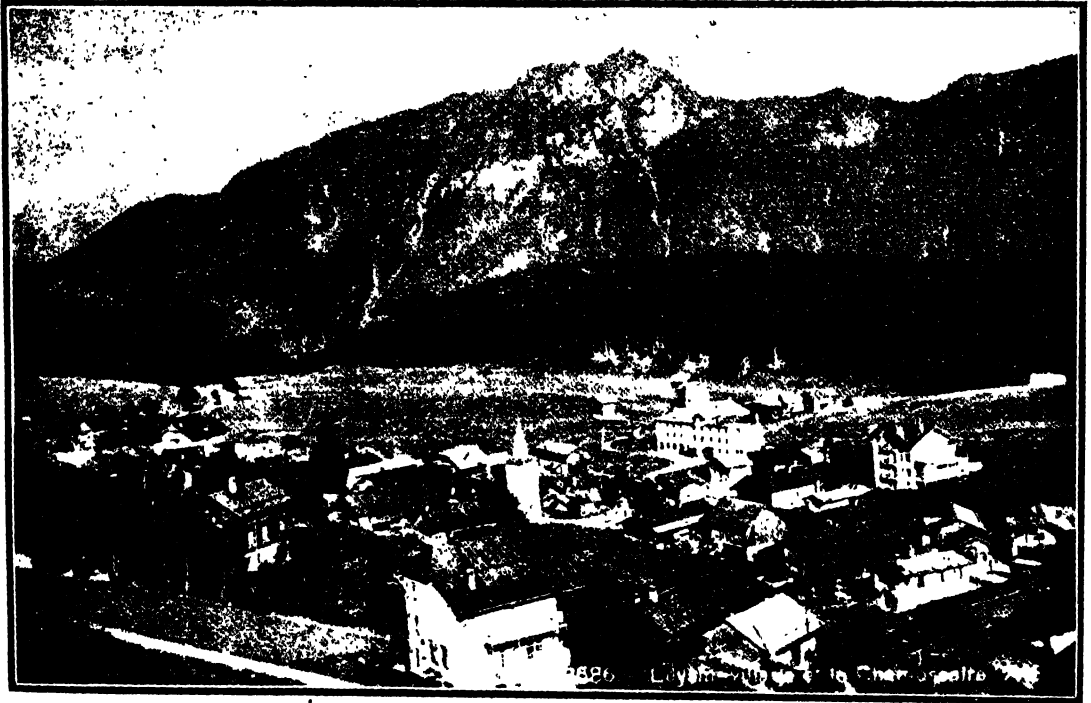
লেজাঁ ও স্যামোসেয়ার

বিশেষতঃ, ডাক্তার রোলিয়ের (Dr. Rollier) ক্লিনিকগুলির জন্য লেজাঁর নাম পৃথিবী-পরিচিত।

পারি হইতে যে রেললাইন ফ্রান্স পার হইয়া জেনেভা-হ্রদের ধার দিয়া রোননদীর পাশ দিয়া সিম্‌প্লন্ গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া ইতালীতে নামিয়া গিয়াছে, সেই রেল লাইনের ওপর জেনেভা হ্রদ ছাড়াইয়া এগ্‌ল্ (Aigle) বলে একটি ছোট ষ্টেসনে নামিয়া লেজাঁতে আসিতে হয়। লোজান (Lausanne) হইতে এগ্‌ল্ প্রায় দেড় ঘণ্টার পথ। এগ্‌ল্ চূড়া পৃথিবীর অন্তরের উচ্ছ্বসিত আনন্দের মত সূর্য্যালোকের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রোন্‌নদীর উপত্যকা, সুন্দর দিনে রোন্-নদী রূপার সাপের মত ঝিলমিল করে, উপত্যকার শেষে দাঁদ মিদি ও মঁক্লাঁ পাহাড়ের শ্রেণী। এইরূপ তিন দিক পাহাড়ে ঘেরা বলিয়া জায়গাটি যেমন সুন্দর, তেমি ঝড় বাতাস হইতে রক্ষিত।

লেজাঁ গ্রামটি অতি প্রাচীন। তেরো শতাব্দীতে তাহার নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে বরাবর লেজাঁ একটি ছোট নগণ্য

গ্রাম ছিল। বর্ত্তমান লেজ্যাঁ গত ত্রিশ চল্লিশ বৎসরে গড়িয়া উঠিয়াছে।

অতি স্বাস্থ্যকর স্থান রূপে লেজ্যাঁর বরাবরই নাম ছিল। এরূপ সুন্দর স্বাস্থ্যকর জায়গার উপযুক্ত ব্যবহার করা যাইতে পারে, এখানে যক্ষ্মারোগীদের চিকিৎসার জন্য স্যানাটোরিয়াম স্থাপন করা যাইতে পারে, ইহা বুঝিয়া লোজানের দুইটি প্রসিদ্ধ ডাক্তার ১৮৮৬ খৃঃঅব্দে, এ বিষয়ে উদ্যোগী হন। তাঁহাদের এই শুভ উদ্যমে কয়েকজন দূরদর্শী ধনী হোটেল পরিচালক যোগ দেন। এই ডাক্তার-সংঘ ও ধনী হোটেল-অধ্যক্ষের যোগাযোগ দ্বারাই লেজ্যাঁর প্রথম স্যানাটোরিয়াম স্থাপিত হইল এবং এই দুই দলের সহযোগেই লেজ্যাঁ গড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। ১৮৯২ অব্দে লেজ্যাঁতে যক্ষ্মারোগীদের জন্য প্রথম স্যানাটোরিয়াম খোলা হয়, তাহাতে ৮০ জন রোগী থাকিতে পারিবে। তাহার পর বৎসরের পর বৎসর স্যানাটোরিয়াম সংখ্যা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। ১৯০০ অব্দে এখানে রেল আসিল।

বরফ ঢাকা লেজ্যাঁ

লোজানের ডাক্তার-সংঘ ধনী হোটেলওয়ালাদের সহায়তায় যে স্যানাটোরিয়ামগুলি খুলিলেন, সেগুলি, বুকে যাহাদের যক্ষ্মা হইয়াছে সেই সব রোগীদের জন্য। এগুলি লেজ্যাঁর সব চেয়ে উঁচু জায়গায় পাইন-বনের ধারে স্থাপিত।

১৯০৫ খৃঃঅব্দে ডাক্তার রোলিয়ে (Dr. Rollier) লেজ্যাঁতে আসেন ও হাড়ে যক্ষ্মাক্রান্ত রোগীদের সূর্য্যকিরণ চিকিৎসা দ্বারা সারাইবার জন্য একটি ছোট ক্লিনিক লেজ্যাঁর তলায় অংশ পুরাতন গ্রামের কাছে খোলেন। কয়েকজন মাত্র রোগী লইয়া তিনি এ ক্লিনিক খোলেন। হাড়ে যক্ষ্মাক্রান্ত রোগীদের পক্ষে সূর্য্যকিরণ চিকিৎসায় বিশেষ উপকারিতা সম্বন্ধে সে সময় মতভেদ ছিল। সেই সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত শত শত যক্ষ্মারোগীকে সূর্য্যকিরণ চিকিৎসা (helio-therapy) অনুসারে সারাইয়া, ডাক্তার রোলিয়েই সূর্য্যকিরণ চিকিৎসার উপকারিতা সম্বন্ধে মত সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এখন পৃথিবীর চিকিৎসকমণ্ডলী ডাক্তার রোলিয়ের চিকিৎসা ব্যবস্থা বিশেষ উপকারী বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। ডাক্তার রোলিয়ে যখন তাঁর প্রথম ক্লিনিক খোলেন, তখন তখনকার ডাক্তারী শাস্ত্রমতে হাড়ে যক্ষ্মা হইলে তাহার চিকিৎসার প্রধান উপায় ছিল, যক্ষ্মাবীজাণু আক্রান্ত অংশ কাটিয়া ফেলা। এই অস্ত্রোপচার চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল বলিয়া, তাহার নাম দেওয়া হইত Surgical tuberculosis। হাড়ে যক্ষ্মার চিকিৎসার আর এক উপায় হচ্ছে, প্লাস্টার অফ্ পারিসের শক্ত আবরণ দিয়ে যক্ষ্মাক্রান্ত দেহের অংশটি মুড়ে রাখা, যাহাতে সে অংশটির কোনরূপে না নাড়াচাড়া হয়, তাহার পরিপূর্ণ বিশ্রাম হয়। এ চিকিৎসা ব্যবস্থাও বড় সহজ নয়।

অস্ত্রোপচার চিকিৎসা অথবা প্লাসটার অফ্ পারিস দিয়া চিকিৎসা, এ দুটির কোন চিকিৎসাই ডাক্তার রোলিয়ের মতে ঠিক নয়। রোগীকে অবশ্য স্থিরভাবে শোয়াইয়া রাখিতে হইবে, যক্ষ্মাক্রান্ত দেহে অংশের যাহাতে নাড়াচাড়া না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, কিন্তু রোগীর পক্ষে প্রথম দরকার, সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি।। সূর্য্য-কিরণ চিকিৎসা এ বিষয়ে বিশেষ সহায়ক। ডাক্তার রোলিয়ে তাঁর চিকিৎসা-প্রণালী অনুসারে শত শত রোগী সারাইয়াছেন। এখন তাঁহার তত্ত্বাবধানে ক্লিনিকের

সংখ্যা ত্রিশের ওপর। তাহাতে পৃথিবীর নানা দেশের নানা জাতির প্রায় বার শত রোগী আছে।

১৮৯০ অব্দে লেজাঁর জনসংখ্যা ছিল ৩৫০ জন, আর আজ এখানে সুন্দর সব স্যানাটোরিয়াম, ক্লিনিক, ভিলা, সুইস সালেতে তিন হাজারের ওপর লোক থাকে। তার মধ্যে দুই হাজার রোগী রাখিবার ব্যবস্থা আছে। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে যা একটি সামান্য ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল, আজ তাহা সুন্দর ছোট সহর। বর্ত্তমান সভ্যজীবনের সকল সুখ সুবিধাই এখানে পাওয়া যায়। বৈদ্যুতিক আলো, ব্যাঙ্ক, পোষ্টাফিস টেলিফোন, ড্রেণ পাইখানা, পাকা রাস্তা, ভাল দোকান, সিনেমা প্রভৃতি সবই এখানে আছে।

ডাক্তার রোলিয়ে

যক্ষ্মারোগীদের চিকিৎসার জন্য যে এরূপ একটি সুন্দর জায়গা গড়িয়া উঠিল তাহা কেবলমাত্র ডাক্তারদের চেষ্টায় বা চিকিৎসা-শাস্ত্রের জ্ঞানে সম্ভব হয় নাই। ডাক্তারদের সহিত ক্যাপিটালিষ্ট হোটেল অধ্যক্ষরা এ শুভ চেষ্টায় যোগ দিয়াছেন। সুইস গভর্ণমেণ্টও ইহাতে যথাসম্ভব সাহায্য করিয়াছেন। বস্তুতঃ ডাক্তার রোলিয়ে দু'তিনটি ক্লিনিকের মালিক [illegible] ক্লিনিকের বিভিন্ন মালিক। এই মালিকরাই ডাক্তার রোলিয়ের মত ও উপদেশ অনুসারে ক্লিনিক সব তৈরী করিয়াছেন। তাঁহারা রোগীদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন, ব্যবসা পরিচালনা সংক্রান্ত সকল দিকও তাঁহারা দেখেন। ডাক্তার রোলিয়ে ডাক্তার হিসাবে ক্লিনিকে আসেন, তাহার জন্য তিনি তাঁহার ফী পান। এরূপভাবে হোটেলের অধ্যক্ষ ও পরিচালকদের সহিত ডাক্তারের যোগাযোগ হওয়াতেই এরূপ একটি চিকিৎসার জায়গা গড়িয়া ওঠা সম্ভব হইয়াছে। পৃথিবীর নানা দেশ হইতে কত রোগী এখানে আসিয়া সুস্থ হইয়া আবার দেশে ফেরেন। এ জায়গাটি শুধু সুইজারল্যাণ্ডবাসীদের নয়, সমস্ত মানব সমাজের একটি কল্যাণের ক্ষেত্র। বস্তুতঃ এখানে বিদেশী লোকের সংখ্যাই বেশী। এখানে তিন শতের ওপর ইংরাজ, তিন শতের ওপর জার্ম্মান, এক শতের ওপর আমেরিকান, পঞ্চাশজন স্প্যানিশ ও পর্ত্তুগীজ, এইরূপ শুধু ইয়োরোপের নয়, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেরই রোগী আছে। ডাক্তার রোলিয়ের ক্লিনিকে চারজন ভারতবর্ষীয় রোগী আছেন; তার মধ্যে তিনজন বরাবর ভারতবর্ষ থেকে এখানে আসিয়াছেন চিকিৎসার জন্য।

ভারতবর্ষেও লেজাঁর মত সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর জায়গা অনেক আছে, কিন্তু সে জায়গাগুলি আমরা আমাদের সমাজের উপকারে কিছুই ব্যবহার করিতেছি না। সেখানে রোগীদের থাকিবার এমন সুন্দর ব্যবস্থা নাই।

এখানে ভারতবর্ষীয় রোগীদের মধ্যে একজন পাঞ্জাব হইতে আসিয়াছেন। তিনি আই-এম-এস ডাক্তার। তিনি একদিন আমায় বলিতেছিলেন, লেজাঁর মত সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর জায়গা হিমালয়ে খুব খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু যাতায়াতের সুবিধা ভাল ডাক্তার, ভাল খাবার, ভাল স্যানাটোরিয়াম বাড়ী, ভাল হোটেল-পরিচালক, বর্ত্তমান সভ্য জীবনের সকল সুখ সুবিধা ইত্যাদি যোগাযোগ না হইলে এরূপ জায়গা গড়ে উঠতে পারে না। ডাক্তাররা যে তাঁদের টাকায় জমী কিনবেন, স্যানাটোরিয়াম বাড়ী তৈরী করবেন, হোটেল চালাবেন, আবার চিকিৎসার দিকও দেখবেন, এত একসঙ্গে হয়ে ওঠা অসম্ভব।

বস্তুতঃ এরূপ উদ্যমে ডাক্তারদের সঙ্গে ক্যাপিটালিষ্ট হোটেল পরিচালক ও গভর্ণমেণ্টের বিশেষ সাহায্য দরকার।

ডাক্তার রোলিয়ে একজন সত্যিকার সূর্য্য-পূজারী। তাঁহার "How to fight against tuberculosis" বইতে তিনি লিখিয়াছেন, "আমার একুশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় ও দশহাজারের ওপর Surgical tuberculosis রোগীর চিকিৎসা করিয়া আমি বলিতে পারি, সূর্য্য-কিরণ চিকিৎসা (heliotherapy) নানাপ্রকার যক্ষ্মারোগ সারাইবার অতি প্রশস্ত উপায়। কোন উচ্চ পাহাড়ে জায়গায়, সূর্য্য-কিরণ চিকিৎসা ও তাহার,

সহিত বায়ু-চিকিৎসা যক্ষ্মারোগ সারাইবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। তাহাতে দেহের আত্মরক্ষার শক্তি বাড়ে, রক্তের অবস্থার উন্নতি হয়, পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি পায়।

"সূর্য্যের আলো দেহের চামড়ায় ওপর আশ্চর্য্যরূপ কাজ করে। সূর্য্যের আলো সেবন করিয়া যেমন সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, তেম্নি রোগাক্রান্ত অংশেরও বিশেষ উন্নতি হয়। সূর্য্যালোক সেবন করিয়া অনেক সময় ব্যথা চলিয়া যায়। বীজাণু ধ্বংস করিতে সূর্য্যালোক আদর্শ উপায়

নয়সাতেল কাণ্টনের স্বাস্থ্যানিবাস

সূর্য্য-বিদ্যালয়ের সামনে ছেলেমেয়েদের ব্যায়াম

"দেহের যে অংশেই ক্ষয়রোগ হউক না কেন তাহা কেবল সেই অংশেরই রোগ নহে। যক্ষ্মাবীজাণু দেহের কোন বিশেষ অংশে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে সমস্ত দেহের একটী সাধারণ দুর্ব্বলতা হয়, তাহাতে যক্ষ্মা-বীজাণুর সহিত সংগ্রাম করিবার শক্তি দেহ হইতে চলিয়া যায়। দেহকে আত্মরক্ষার জন্ম সংগ্রাম করিবার মত শক্তিমান করিয়া তোলা, যক্ষ্মার সহিত যুঝিবার মত বলশালী করাই যক্ষ্মারোগের প্রধান চিকিৎসা। যাহাতে স্বাস্থ্য দুর্ব্বল হয়, যাহাতে শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়ে, মুক্ত বায়ু ও সূর্য্যালোকের অভাব, সহরের উত্তেজনাকর অস্বাস্থ্যকর জীবন, কারখানাতে বা আফিসে অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে কাজ করা, অল্প ভোজন বা অতি ভোজন, মদ্য বা উত্তেজক দ্রব্য গ্রহণ, ব্যায়ামের অভাব বা অতিমাত্রায় পরিশ্রম ইত্যাদি অবস্থা যক্ষ্মারোগের সৃষ্টি করিতে বিশেষ সহায়তা করে।

তিন বৎসরের শিশুদের মধ্যে শতকরা ৩৩ জন ও চার বৎসরের শিশুদের মধ্যে শতকরা ৩৮ জন ও পাঁচ বৎসরের শিশুদের মধ্যে শতকরা ৫১ জন যক্ষ্মাবীজাণু দ্বারা আক্রান্ত। বয়স্ক লোকদের মধ্যে, গ্রামে শতকরা ৬০ জন ও সহরে শতকরা ৯৮ জন যক্ষ্মাবীজাণু দ্বারা আক্রান্ত। আমাদের সকলের শরীরেই কোন না কোন সময়ে যক্ষ্মারোগের বীজাণু প্রবেশ করিয়াছে।

"যক্ষ্মারোগের বীজাণু সাধারণতঃ নিশ্বাসের সহিত ফুসফুসে প্রবেশ করে। ফুসফুসে যদি যথেষ্ট বাধা না পায় তাহা হইলে রক্তের সহিত মিশিতে পারে। শরীরের জীবনীশক্তি, সংগ্রামশক্তি যদি প্রবল থাকে, তাহা হইলে বীজাণু হার মানে, আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে না। আর শরীরের সংগ্রাম করিবার শক্তি যদি দুর্ব্বল হয় তাহা হইলে, শরীরের

সূর্য্য চিকিৎসালয়ের সামনে ছেলেমেয়েদের খেলা

"এত দিন অনেকে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন যে যক্ষ্মা-বীজাণু আক্রান্ত দেহের কোন অংশ কেবলমাত্র দেহের সেই অংশেরই রোগ, তাহা অস্ত্র-চিকিৎসকের ছুরি দ্বারা কাটিয়া সারান যাইতে পারে। এ মস্ত ভুল। যক্ষ্মারোগের মূল কারণ হচ্ছে, রোগীর সাধারণ স্বাস্থ্যের অবনতি; এই দুর্ব্বলতা এই অবনতি হইয়াছে বলিয়াই যক্ষ্মারোগের প্রকাশ হইয়াছে। সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি করাই প্রধান কাজ। সুতরাং নির্ম্মল বায়ু সেবন করিয়া, রৌদ্রালোক সেবন করিয়া, স্বাস্থ্য অনুযায়ী আহার করিয়া শরীরের সংগ্রামশক্তিকে, জীবনীশক্তিকে বাড়াইতে হইবে।

"যক্ষ্মাবীজাণু যে শিশুকালেই শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে এ কথা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। দেখা যায় যে, এক বৎসরের শিশুদের মধ্যে শতকরা পাঁচজন, দু'বৎসরের শিশুদের মধ্যে শতকরা ১৫ জন,

দুর্ব্বলতা বাড়িতে আরম্ভ করে, ওজন কমে, ঘুসঘুসে জ্বর হয়, ক্ষিধে হয় না, সর্ব্বদাই ক্লান্ত মনে হয়—এগুলি, যক্ষ্মাবীজাণু যে শরীরকে আক্রমণ করিয়াছে ও শরীর যুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না তাহার প্রথম পরিচয়। তার পর সে বীজাণু শরীরের কোন বিশেষ অংশে, দেহের কোন দুর্ব্বলতর অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গে বসিয়া আপনার অধিকার জারী করে, ভীম রূপে প্রকাশিত হয়, কাহারও কিড্‌নীতে (Renal tuberculosis), কাহারও বা মেরুদণ্ডের কোন অংশে (Pott's disease), কাহারও বা রক্ষণসন্ধিতে (coxalegia), কাহারও বা হাঁটুতে, কাহারও বা গ্রন্থিতে (gland) ইত্যাদি নানা বিভিন্ন অংশে যক্ষ্মার প্রকাশ হইতে পারে।

সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য, যক্ষ্মাবীজাণুর বিরুদ্ধে শরীরের সংগ্রামশক্তি বাড়াইবার পক্ষে রৌদ্রকিরণ চিকিৎসা বিশেষরূপে সহায়তা

সূর্য্য-বিদ্যালয

ছোট ছেলেমেয়েরা বারান্দায় সূর্য্যালোকসেবন করিতেছে

করে। যাহাদের হাড়ে যক্ষ্মা হইয়াছে তাহাদের জন্যই বিশেষরূপে সূর্য্যকিরণ-চিকিৎসার ব্যবস্থা। যক্ষ্মা যাহাদের বুকে হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে সূর্য্যকিরণ চিকিৎসা অতি সাবধানে করা দরকার, জ্বর থাকিলে করা উচিত নয়। ডাক্তার রোলিয়ে, হাড়ে যক্ষ্মাবীজাণু দ্বারা আক্রান্ত রোগীদেরই বিশেষরূপে তাঁর ক্লিনিকগুলিতে গ্রহণ করেন ও তাঁদের সূর্য্যকিরণ-চিকিৎসা করেন।

সূর্য্যকিরণ চিকিৎসার জন্য লেজাঁ অতি উপযুক্ত স্থান। যক্ষ্মা-রোগাক্রান্ত রোগীদের জন্য সূর্য্যকিরণ চিকিৎসার স্যানাটোরিয়াম কিরূপ স্থানে হওয়া উচিত, এ বিষয় ডাক্তার রোলিয়ে তাঁর Heliotherapy গ্রন্থে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন, আল্পস্ পর্ব্বতের আবহাওয়ার রশ্মির অপেক্ষা অনেক বেশী। নগরে বা সমতলভূমিতে চারিদিকের বায়ুমণ্ডলের মলিনতার ও জলীয় বাষ্পকণা থাকার জন্য সূর্য্যের রশ্মির সেরূপ নির্ম্মলতা ও তেজ থাকে না। তার পর পাহাড়ে খুব বেশী গরম হয় না। যক্ষ্মারোগীদের অনেককে বৎসরের পর বৎসর বিছানায় শুইয়া থাকিতে হয়। গরম হইলে এরূপ শুইয়া থাকা বড়ই কষ্টকর।

সমতল ভূমি সম্বন্ধে ডাক্তার রোলিয়ে বলেন, তলাতে বড় বাতাস বয়; সেখানে ঋতুতে ঋতুতে তাপের বড় পরিবর্ত্তন হয়, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে বড় গরম হয়; সূর্য্যালোকে তেমন ultra violet rays পূর্ণ ভাবে পাওয়া যায় না; বাতাস বড় জল ভরা থাকে; চারিদিকের বায়ু ধূলিময় দূষিত থাকে, তাহাতে যক্ষ্মাবীজাণুর ধ্বংস সহজ হয় না।
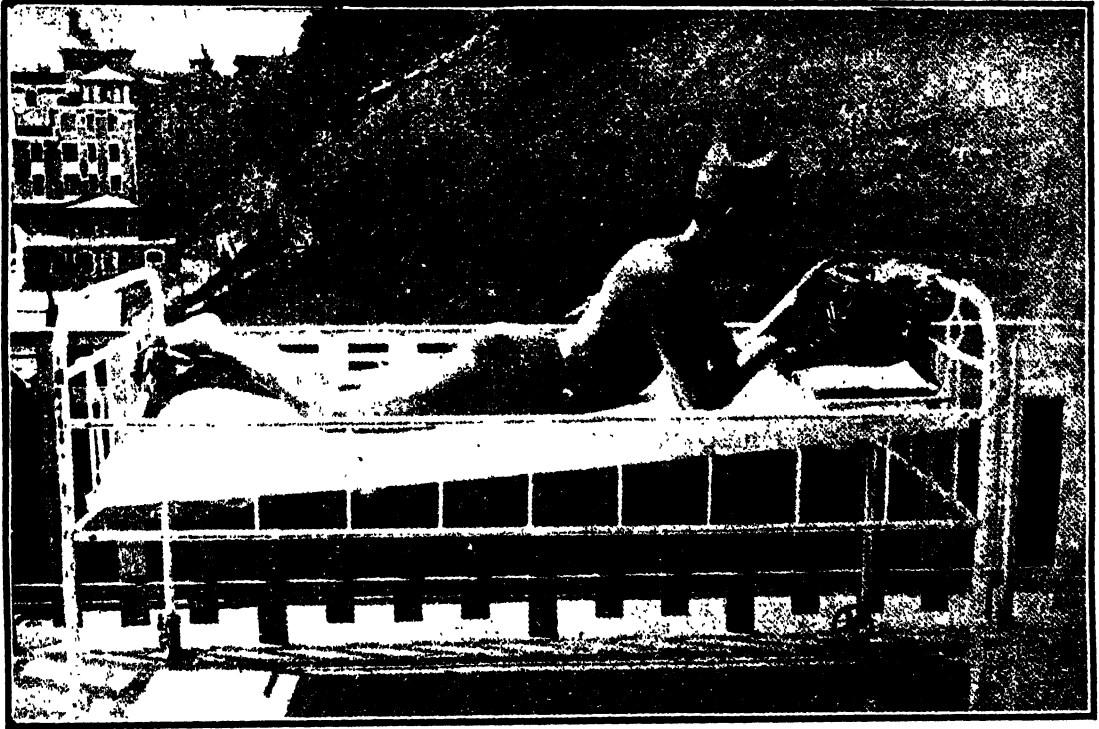
রৌদ্র সেবন করিতে করিতে রোগী টাইপ রাইটিং করিতেছে

মত আবহাওয়াযুক্ত স্থানই (Alpine climate) সবচেয়ে ভাল। তিনি বলেন, আল্পস্ পর্ব্বতের আবহাওয়াতে এই গুণগুলি দেখা যায়—

এখানে বায়ুমণ্ডলে চাপ কম। এখানে হাওয়া হতে রক্ষিত স্থান খুঁজিয়া পাওয়া যায় (যেখানে বেশী বাতাস বয় সে স্থান রৌদ্র চিকিৎসার পক্ষে ভাল নয়)। এখানে বাতাস জলে-ভরা নয়, বেশ শুক্‌নো। এখানে বেশী কুয়াসা হয় না। অনেক সময় দেখা যায়, পাহাড়ের ওপর বেশ সুন্দর রোদ, তলায় মেঘের সমুদ্র। বস্তুতঃ সমভূমির লোকেরা তখন রোদের মুখ দেখিতে পায় না—তাহাদের আকাশ মেঘে ছাওয়া। এখানে খুব বেশী বৃষ্টি হয় না। বৎসরের মধ্যে অনেক সময় সূর্য্য কিরণ পাওয়া যায়। তাছাড়া পাহাড়ের ওপর যে সূর্য্যরশ্মি পাওয়া যায় তাহা খুব নির্ম্মল ও

ডাক্তার রোলিয়ে সমুদ্রতীরকেও সূর্য্যালোক চিকিৎসার উত্তম স্থান বলিয়া মনে করেন না। তাঁহার মতে, যে পাহাড়ে বাতাস বয় না, বেশী বৃষ্টি হয় না, হাওয়া তেমন জল-ভরা নয়, প্রচুর রোদ পাওয়া যায়, সেই পাহাড়ে জায়গা সূর্য্যকিরণের চিকিৎসার পক্ষে সবচেয়ে ভাল জায়গা।

এখন সূর্য্য-কিরণ চিকিৎসার প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলি। ইহা কিছু আশ্চর্য্যকর বা রহস্যময় ব্যাপার নয়। সহজ ভাষায় এ হচ্ছে, খোলা শরীরে রোদ লাগান বা রোদ পোয়ান। তবে এই রৌদ্র-সেবন সম্বন্ধে নানা নিয়ম আছে। ধীরে ধীরে এই রৌদ্র-সেবন আরম্ভ করিতে হইবে, নিয়মিত ভাবে তাহা করিতে হইবে, শরীরে যেরূপ সহ্য হয় তাহা দেখিয়া রৌদ্রসেবনের সময় বাড়াইতে হইবে বা কমাইতে হইবে বা বন্ধ করিতে [illegible] রোগীর [illegible] একটু সূর্য্যকিরণ লাগাইয়াই জ্বর ওঠে,

রোগীরা রৌদ্রসেবন করিতে করিতে চুপড়ী তৈরী করিতেছে

ছেলেরদল নেংটি পরিয়া স্কি করিতে বাহির হইয়াছে

তাহার পক্ষে সূর্য্যকিরণ চ ক্ষনা বন্ধ রাখিতে হইবে। কোন রোগী বহুক্ষণ সূর্য্যকিরণ লইতে পারে, তাহার সেবন-মাত্রা শীঘ্র বাড়ান যাইতে পারে। পা হইতে রৌদ্র-সেবন আরম্ভ করিতে হয়। ডাক্তার রোলিয়ে তাঁর Heliotherapy বইতে কি ভাবে সূর্য্যকিরণ-চিকিৎসা আরম্ভ করা উচিত সে সম্বন্ধে এরূপ লিখিয়াছেন—পা হইতে সূর্য্যালোক লাগান আরম্ভ করিতে হইবে। প্রথম দিন দুই চরণে পাঁচ মিনিট মাত্র সূর্য্যালোক লাগাইবে। শরীরের অপর অংশ ঢাকা থাকবে। দ্বিতীয় দিন, চরণে দশ মিনিট, পায়ের তলার অংশে হাঁটু পর্য্যন্ত পাঁচ মিনিট সূর্য্যালোক লাগাইবে। তৃতীয় দিন, চরণে ১৫ মিনিট, পায়ের নিম্ন অংশে হাঁটু পর্য্যন্ত দশ মিনিট, সমস্ত পা'তে কটি পর্য্যন্ত পাঁচ মিনিট সূর্য্যালোক লাগাইবে। চতুর্থ দিন, দু'পদে বিশ মিনিট, পায়ের নিম্ন অংশে পনেরো মিনিট সমস্ত পা'তে দশ মিনিট ও পেটে পাঁচ মিনিট সূর্য্যালোক লাগাইবে। পঞ্চম দিন দু'পদে পঁচিশ মিনিট, পায়ের নিম্নাংশে কুড়ি মিনিট, সমস্ত পা'তে পনেরো মিনিট, পেটেতে দশ মিনিট ও বুকে পাঁচ মিনিট সূর্য্যের আলো লাগাইবে। তার পর প্রতি দিন প্রতি অংশে সূর্য্যালোক লাগানর সময় পাঁচ মিনিট করিয়া বাড়ান যাইতে পারে। তার পর পেছন দিক অর্থাৎ পিঠের দিকে এইরূপ ধরে ধীরে সূর্য্যালোক সেবন করাইতে হইবে। প্রতি দিন দুই হইতে চার ঘণ্টা সর্ব্বশুদ্ধ সূর্য্যালোক সেবন করিলে যথেষ্ট। তৃতীয় সপ্তাহে আর শরীরের বিভিন্ন অংশের জন্য বিভিন্ন সময় রাখিবার দরকার নাই। অবশ্য কে কতক্ষণ সূর্য্যালোক লইবে, কোন্ স্থানে বিশেষ করিয়া লইবে, তা প্রতি রোগীর স্বাস্থ্য, সূর্য্যালোক গ্রহণের শক্তি, ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে। এ বিষয়ে কোন সাধারণ নিয়ম করা যায় না। নগ্নদেহে সূর্য্যালোক লইতে হয় অবশ্য মাথা কোনরূপ টুপি দিয়া বা ছোট ছাতা দিয়া ঢাকিয়া রাখা দরকার।

সূর্য্যকিরণ-চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু লিখিলাম, তাহার কারণ, আমাদের দেশে প্রচুর সূর্য্যালোক ও যক্ষ্মারোগীরও অভাব নাই। অবশ্য বুকে যাহাদের যক্ষ্মা তাহাদের পক্ষে সূর্য্যকিরণ লাগান চলে না বটে, কিন্তু যাহাদের হাড়ে যক্ষ্মা তাহাদের পক্ষে এবং রিকেটস্ রোগাক্রান্ত ছেলে-মেয়েদের পক্ষে সূর্য্যকিরণ-চিকিৎসা দ্বারা আশাতীত ফল পাওয়া যায়। আমাদের দেশের ডাক্তাররা যদি এ বিষয়ে উদ্যোগী হন এবং তাঁহারা যদি ধনী হোটেলচালকদের সহায়তা পান তাহা হইলে আমাদের দেশে হিমালয় পাহাড় অঞ্চলে লেজাঁর মত যক্ষ্মারোগীদের জন্য রৌদ্র চিকিৎসার স্যানাটোরিয়াম সহজেই স্থাপিত হইতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় স্যানাটোরিয়ামে গ্যালারীতে যক্ষ্মারোগাক্রান্ত ছাত্র ছাত্রীরা এক প্রফেসরের বক্তৃতা শুনিতেছে

ডাক্তার রোলিয়ের ক্লিনিকগুলির কথা কিছু বলি। ছোট, বড়, বেশী দামের, কম দামের, কেবলমাত্র ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য, ক্লেরন-

বরফ ঢাকা মাঠে ছেলেদের স্কুল

মাত্র পুরুষদের জন্য, কেবলমাত্র নারীদের জন্য, পুরুষ নারী সকলের জন্য ইত্যাদি নানা রকমের নানা ধরণের ক্লিনিক আছে। তবে মূলতঃ সব ক্লিনিকেরই চিকিৎসা-ব্যবস্থা ও শাসনপ্রণালী এক। ক্লিনিকবাড়ীগুলির গঠনপ্রণালী মূলতঃ এক। প্রতি তলাতে দুই সারি ঘরের শ্রেণী, মাঝখানে একটি লম্বা 'করিডর', সামনের অর্থাৎ দক্ষিণ দিকের ঘরগুলি রোগীদের জন্য, পেছনের ঘরগুলি নার্সদের থাকবার বা রোগীদের আত্মীয় বন্ধুদের থাকবার জন্য বা অন্য কাজে ব্যবহৃত হয়। রোগীদের ঘরগুলির সামনে লম্বা বারান্দা। সস্তার ক্লিনিকগুলিতে লম্বা একটা বারান্দা সবাইএর জন্য। দামী

বিশ্ববিদ্যালয় স্যানাটোরিয়ামে—রৌদ্র সেবন করিতে করিতে একটি ছাত্র তার থিসিস পাঠ করিতেছে, অপর ছাত্র টাইপরাইট করিতেছে

ক্লিনিকগুলিতে প্রতি রোগীর জন্য ঘের বারান্দা বা balcony। রোগীদের শয্যা (bed) গুলি তলার চাকাওয়ালা, সুতরাং ঘর হইতে বারান্দায় সহজে লইয়া যাওয়া যায়। রোদ উঠিলে রোগীরা বারান্দায় বিছানাশুদ্ধ বাহির হইয়া রৌদ্র সেবন করে। কতকগুলি ক্লিনিকের পাকাবাড়ী। সেগুলিতে liftও আছে। তাহাতে রোগীরা বিছানাশুদ্ধ একতলা হইতে অপর তলায় যাইতে পারে, এক রোগী অপর রোগীর ঘরে বিকেলবেলা গিয়া দেখাশোনা করিতে পারে। কয়েকটি ক্লিনিকে সপ্তাহে এক দিন করিয়া কনসার্ট হয়, এক দিন করিয়া বায়স্কোপ হয়। তাহার জন্য বৃহৎ হল আছে। সেখানে রোগীরা শয্যাশুদ্ধ আসিতে পারে, লিফ্‌ট্ (lift) আছে বলিয়া সকল তলার রোগী এক জায়গায় আসিয়া

বিশ্ববিদ্যালয় স্যানাটোরিয়ামে ছাত্র ছাত্রীদের বিজ্ঞানের ক্লাস

জড় হইতে পারে। তাছাড়া, মাঝে মাঝে কোন প্রসিদ্ধ বেহালা-বাদক বা পিয়ানোবাদিনী লেজাঁতে আসেন। তাঁহারা ক্লিনিকের বড় হলে রোগীদের জন্য কনসার্ট দেন। মাঝে মাঝে কোন লেখক আসেন, তাঁহারা বক্তৃতা দেন। রোগীরা নিজেদের মধ্যেও প্রায়ই ছোট চা-পার্টি দেন, তাসখেলার পার্টি করেন। বস্তুতঃ, যক্ষ্মারোগ সারিতে কম করিয়া দু'তিন বৎসর লাগে। এত দিন এক ঘরে বন্ধ হইয়া পড়িয়া থাকা অসম্ভব। এরূপ নানা সরল উত্তেজনাহীন আমোদে রোগীদের সময় সহজে কাটিয়া যায়।

অনেকগুলি রোগী একসঙ্গে থাকার একটি সুফল আছে। তাহাতে রোগীদের মন অনেক প্রফুল্ল থাকে। রোগীরা পরস্পরের সহিত মিশিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে পারে, এক রোগীর উন্নতি দেখিয়া অপর রোগী আশান্বিত হয়, পরস্পরের সহানুভূতি পাইয়া মনে বল পায়। বাড়ীতে বা পরিবার লইয়া বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিলে রোগীর মনে তেমন প্রফুল্লতা বা আশা থাকে না,—তাহার চারি দিকে কর্ম্মরত, সুস্থ, আনন্দময় জীবন,—কেবলমাত্র সে বিছানায় শুইয়া পরিবারের ভার হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু স্যানাটোরিয়ামে নানা রোগীর মাঝে মনের প্রফুল্লতা, আশা আসে।

আমাদের দেশে যক্ষ্মা চিকিৎসার যে সব জায়গা আছে, সেগুলিতে সাধারণতঃ কটেজ-ভাড়া লইয়া রোগী লইয়া থাকিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এখানে ডাক্তাররা ওরূপ ব্যবস্থা মোটেই পছন্দ করেন না। ডাক্তার রোলিয়ে তাঁর কোন রোগীকে ক্লিনিকের বাহিরে থাকিতে দিতে চান না। লেজাঁতে অনেক বড়লোক রোগী আছে, তাহারা ইচ্ছা করিলে পরিবার পরিজন সমেত ভাল বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু ডাক্তার রোলিয়ে তা করিতে অনুমতি দেন না। তাহার প্রধান কারণ, অবশ্য স্যানাটোরিয়ামে যেরূপ নিয়মিত জীবন, ডাক্তারের উপদেশানুসারে সকল ব্যবস্থা পালন হইতে পারে, পরিবার-পরিবৃত হইয়া থাকিলে তাহা হইতে পারে না। তাছাড়া, পরিবারবর্গের অতি সহানুভূতি বা বিষণ্ণতার ভাব রোগীর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়। স্যানাটোরিয়াম-জীবনের আর একটি গুণ এই যে, তাহা রোগীর জীবনকে নিয়মবদ্ধ, স্বাস্থ্যনীতি চালিত,

পরিমিত করিয়া দেয়। একবার যাহার যক্ষ্মারোগ হইয়াছে তাহার রোগ সারিয়া গেলেও, সমস্ত জীবন তাহাকে সাবধানে থাকিতে হইবে, সমস্ত জীবন তাহাকে উত্তেজনাহীন স্বাস্থ্যনীতি নিয়মিত জীবন যাপন করিতে হইবে। ভবিষ্যৎ জীবন যাপন করিবার অভ্যাসও রোগী স্যানাটোরিয়াম-জীবন হইতে লাভ করে।

প্রতি দিন চল্লিশ পঞ্চাশ সুইস ফ্রাঙ্ক দামের ক্লিনিক (২৫ সুইস ফ্রাঙ্কে এক পাউণ্ড) হইতে সাত আট ফ্রাঙ্ক দামের ক্লিনিক—এইরূপ ধনী লক্ষপতিদের জন্য, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের জন্য, গরীব মজুরদের জন্য, সমাজের সকল স্তরের লোকদের জন্যই ক্লিনিকের ব্যবস্থা আছে। দু'তিনটি ক্লিনিক গরীব লোকদের জন্য আছে। সেখানে ডাক্তার কোন ফি নেন না। ক্লিনিকের খরচ সাধারণের চাঁদা হতে ওঠে, রোগীরা সামান্য কিছু দেয় মাত্র। গরীব রোগীদের ক্লিনিকগুলির জন্য টাকা তুলিতে মাঝে মাঝে চ্যারিটী বাজার (charity bazar) হয়। গরীব রোগীরা নানা জিনিষ তৈরী করিয়া পাঠায়। লেজ্যাঁর দোকানদাররাও নানা জিনিষ বিনামূল্যে দেয়। ধনী রোগীরা সে সব জিনিষ বেশী দামে কিনিয়া গরীব রোগীদের সাহায্য করে।

ডাক্তার রোলিয়ে কেবলমাত্র Sun-cure নয় তাহার সহিত Work-cure অর্থাৎ চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে কোনরূপ কাজ করার বিশেষ পক্ষপাতী। অবশ্য ভারী রোগীরা নয়, কিন্তু কিছু সুস্থ রোগীরা বিছানায় শুইয়া শুইয়া নানারূপ হাতের কাজ করিতে পারে। বেতের কাজ বা রাফিয়ার কাজ করা বেশ সুবিধার বলিয়া গরীব রোগীদের মধ্যে বেতের কাজের খুব চলন আছে। তাহাতে কেবলমাত্র যে মনের প্রফুল্লতা বা শরীরের রক্ত সঞ্চালন হয় তা নয়, কিছু টাকা রোজগারও হয়। রোগীদের তৈরী চুপড়ী বাস্কেট ইত্যাদি জিনিষগুলি বীজাণুমুক্ত করাইয়া (dis-infected) লেজ্যাঁতে ও সুইজারল্যাণ্ডের নানা সহরে বাজারে বিক্রি করিতে দেওয়া হয়। ডাক্তার রোলিয়ে কেবলমাত্র গরীব রোগীদের নয় ধনী রোগীদেরও কোনরূপ হাতের কাজ করিতে, অলস ভাবে বিছানায় পড়িয়া না থাকিতে, বার বার বলেন। চুপড়ী তৈরীর কাজ চামড়ার ব্যাগ তৈরী করিবার কাজ ইত্যাদি শিখাইবার জন্য তিনি বিশেষ লোক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। একটি ক্লিনিকে রোগীরা রোগের চিকিৎসা করাইতে করাইতে কিরূপ চুপড়ী ও অন্যান্য জিনিষ তৈরী করিতেছে, একটি মহিলা বিছানায় শুইয়া শুইয়া কত সৌখীন জিনিষ তৈরী করিয়াছেন, তাহার ছবিগুলি দিলাম।

ছেলেমেয়েরা তাহাদের ডেস্ক ও চেয়ার ঘাড়ে করিয়া স্কুল করিতে চলিয়েছে

যে সব গরীব রোগী সুস্থ রোগমুক্ত হইল, কিন্তু তাহাদের আবার নাগরিক জীবনে, কলকারখানাতে কাজ করিতে যাওয়া উচিত নয়, তাহাদের জন্য একটি সুন্দর ব্যবস্থা আছে। সেটি Workers' Colony বা 'মজুরদের উপনিবেশ'। এখানে প্রাগুক্ত রোগীরা ক্লিনিকের মত নিয়ম-চালিত জীবন যাপন করে,—বেতের কাজ, কাঠের কাজ ইত্যাদি নানা কাজ করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে। লেজ্যাঁর যে সব দোকান আছে, তার অনেক দোকানদার বা তাহার সহকারীরা এখানকার প্রাক্তন রোগী; ডাক্তার রোলিয়ের দু' একজন সহকারী ডাক্তারও এখানে রোগীরূপে আসিয়াছিলেন। বস্তুতঃ যাহারা একবার যক্ষ্মাক্রান্ত হইয়াছে, বিশেষতঃ যাহাদের বুকে যক্ষ্মা হইয়াছে, তাহারা সারিয়া উঠিলেও তাহাদের পক্ষে নগরের জীবন বা কলকারখানার জীবন

মোটেই ভাল নয়। তাহাতে আবার তাহাদের রোগ হইতে পারে।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, লেজ্ঁাতে কেবলমাত্র ডাক্তার রোলিয়ের হাড়ে-যক্ষ্মারোগীদের ক্লিনিক নয়, বুকে-যক্ষ্মারোগীদের জন্য অনেক স্যানাটোরিয়াম আছে। অবশ্য যক্ষ্মারোগ চিকিৎসার জন্য ডাভোস (Davos), আরোজা (Aroza) প্রভৃতি স্থানও প্রসিদ্ধ। কিন্তু অনেক রোগী ডাভোসের ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না, তাদের পক্ষে লেজ্ঁা অনেক ভাল। সেজন্য এখানে অনেক রোগী আসে।

কান্তন্ ভো (Canton Vaud) ও কান্তন্ নয়সাতেলের (Canton Neuchatel) গভর্ণমেণ্ট তাঁদের কান্তনের লোকদের জন্য লেজ্ঁাতে দুটি স্যানাটোরিয়াম স্থাপন করেছেন। এখানে সুইসরা আসিয়া অতি অল্প খরচে প্রতি প্রফেসার বৎসরে বিশ ফ্রাঙ্ক, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যানাটোরিয়ামের জন্য দেন। তাছাড়া গভর্ণমেণ্টের সাহায্য আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্র বা প্রফেসারের যক্ষ্মারোগ হইলে তিনি এই স্যানাটোরিয়ামে খুব শস্তায় (সুইস বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্র বা ছাত্রীকে দিনে ৬-৫০ সুইস ফ্রাঙ্ক দিতে হয়, তিনি যে কোন জাতির বা যে কোন দেশের লোক হউন। স্থান থাকিলে অন্য দেশেরও ছাত্র-ছাত্রী প্রফেসারদেরও নেওয়া হয়, তাঁহাদের ১২ ফ্রাঙ্ক দিতে হয়) থাকিয়া রীতিমত চিকিৎসা করাইতে পারিবেন। একজন ছাত্রের বা প্রফেসারের জীবনের দাম সমাজ ও জাতির কাছে বিশেষ মূল্যবান। আজিকার কোন যক্ষ্মারোগাক্রান্ত ছাত্র বাঁচিলে বড় বৈজ্ঞানিক বা সাহিত্যিক বা রাজনীতিক বা দেশসেবক হইতে পারে। সেজন্য যুবকপ্রাণ বাঁচাইয়া রাখা বিশেষ দরকার

গ্যালারিতে ছেলেরা রৌদ্র সেবন করিতেছে

থাকিতে পারে। যক্ষ্মারোগ হইলে সারিতে দীর্ঘ সময় লাগে। কিন্তু যক্ষ্মারোগ কেবলমাত্র ধনীদেরই হয় না। মধ্যবিত্ত ও গরীব লোকদের যক্ষ্মারোগ হইলে আমাদের দেশে চিকিৎসার অভাবে রোগী শীঘ্রই মারা যায়। বস্তুতঃ এই মধ্যবিত্ত ও গরীব রোগীদের জন্যই সুইজারল্যাণ্ডের এই দুই কান্তন্-গভর্ণমেণ্টের এই শুভ উদ্যোগ।

যক্ষ্মারোগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য লেজ্ঁার আর একটি মঙ্গলময় প্রতিষ্ঠানের কথা বলিতে চাই। সেটি হইতেছে Sanatorium Universitaire বা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যানাটোরিয়াম। সুইজারল্যাণ্ডে যতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় আছে তাহাদের শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য এই যক্ষ্মারোগের স্যানাটোরিয়াম। সুইজারল্যাণ্ড আয়তনে প্রায় ষোল হাজার বর্গমাইল (অর্থাৎ বাংলার প্রায় এক পঞ্চমাংশ)। এখানে সাতটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতি ছাত্র বৎসরে দশ ফ্রাঙ্ক ও কোন অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত প্রতিভা যদি যক্ষ্মার স্পর্শে মৃত্যুর অন্ধকারে লুপ্ত হয়, তাহার চেয়ে করুণ, বেদনাময় দৃশ্য কি আছে? মানবজাতির এই ভাবী আশাদের বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য এই 'বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যানাটোরিয়াম।' সুইজারল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পৃথিবীর নানাজাতির ছাত্র-ছাত্রীরা আসিয়া পড়ে। Saratorium Universitaireতে গেলে নানাদেশের নানাজাতির যক্ষ্মারোগাক্রান্ত ছাত্রছাত্রী দেখা যায়। তাহারা তাহাদের তরুণ মন ও আশা লইয়া যক্ষ্মার সহিত যুঝিতেছে।

আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যক্ষ্মারোগের প্রসার কিছু কম নয়। ছাত্রছাত্রীদের জন্য এরূপ একটি শস্তায় স্যানাটোরিয়াম বিশ্ববিদ্যালয় ও গভর্ণমেণ্টের সহযোগে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয় স্যানাটোরিয়ামে ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের চিকিৎসার সঙ্গে

সঙ্গে পড়াশোনাও করিতে পারে। সাধারণতঃ প্রতি ঘরে দু'জন করিয়া ছাত্র থাকিবার ব্যবস্থা। তাহাতে রোগী নিঃসঙ্গ বোধ করে না! তার পর প্রতি ঘরে দুই রোগীর জন্য দু'টি তার বিহীন বৈদ্যুতিক বার্ত্তাবহ যন্ত্র (wireless set) আছে। এই তারবিহীন যন্ত্র দ্বারা ছাত্ররা নানা সুইস বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনিতে পারে। তাছাড়া, প্রায় প্রতি সপ্তাহেই কোন অধ্যাপক বা লেখক আসিয়া নানা বিষয় বক্তৃতা দেন। সপ্তাহে একবার বায়স্কোপ দেখানরও ব্যবস্থা আছে; একটি ভাল পাঠাগারও আছে। এইরূপে স্যানাটোরিয়ামটিতে কেবল স্বাস্থ্যের উন্নতি নয় রোগীদের মানসিক উন্নতিরও ব্যবস্থা আছে। এরূপ লেখা-পড়ার চর্চ্চার ব্যবস্থা থাকাতে রোগীদের মনও সতেজ, আশাপূর্ণ থাকে।

আর একটি শুভ প্রতিষ্ঠানের কথা বলিয়া লেজাঁর কথা শেষ করিব। সেটি হচ্ছে, ডাক্তার রোলিয়ের প্রতিষ্ঠিত Sun-School বা 'সূর্য্য-বিদ্যালয়।' এ বিদ্যালয়টি লেজাঁ হইতে কিছু দূরে ও কিছু নীচুতে সেপে (Sepey) বলিয়া একটি সুন্দর জায়গায় প্রতিষ্ঠিত। ইহা যদিও ক্লিনিকগুলির মত নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু ইহা রোগীদের জন্য নয়। যে সব ছেলেমেয়ে দুর্ব্বল, যাহাদের যক্ষ্মা হইবার সম্ভাবনা, তাহাদের সুস্থ সবল করিয়া তোলাই এ স্কুলটির উদ্দেশ্য। এখানে ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনার সহিত সূর্য্যকিরণ সেবন করে, ব্যায়াম করে, খোলা জায়গায় খেলাধূলা, বিশ্রাম করে।

বর্ত্তমান ডাক্তারী শাস্ত্রমত অনুসারে আমরা প্রায় প্রত্যেকেই যক্ষ্মা-বীজাণুদ্বারা আক্রান্ত, শতকরা প্রায় ৯৫ জন ছেলেবেলায় যক্ষ্মাবীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। ছেলেবেলায় স্বাস্থ্য যদি ভাল না থাকে, শরীরের বৃদ্ধি যদি ভাল না হয়, শক্তি নিস্তেজ হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই যক্ষ্মাবীজাণু আত্ম-প্রকাশ করে। সে জন্য ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি প্রবল থাকা দরকার। যে সব ছেলে-মেয়েদের রোগবীজাণুদের সহিত যুঝিবার শক্তি কম, তাহাদের জন্যই এই সূর্য্য-বিদ্যালয়। রৌদ্রপূর্ণ দিন হইলে সকালে ছেলে-মেয়েরা কেবল একটি নেংটি পরিয়া ছোট সাদা টুপি মাথায় দিয়া খোলা মাঠে পড়িতে বসে। তার পর ব্যায়াম খেলা হয়। দুপুরবেলা খাওয়ার পর বিশ্রাম। বিকেলে আবার খেলাধূলা। প্রতি ছেলে-মেয়ের স্বাস্থ্য ও শক্তি অনুসারে তাহার ব্যায়াম, বিশ্রাম, খেলা ও পড়ার সময়, এবং খাওয়াদাওয়া নিয়ন্ত্রিত হয়।

সূর্য্য-বিদ্যালয়ের কতকগুলি ছবি দিলাম। পাঠক-পাঠিকারা একটি ছবিতে দেখিবেন, ছেলেরা বরফ ঢাকা মাঠে রোদে কেবল নেংটি পরিয়া বসিয়া ক্লাশ করিতেছে। বস্তুতঃ রৌদ্রকিরণ-চিকিৎসা বহুদিন করিয়া তাহাদের স্বাস্থ্য এত ভাল, তাহাদের শীত সহিবার শক্তি এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, তাহারা কেবল একটি নেংটি পরিয়া বরফের মধ্যে বসিয়া থাকিতে পারে। অবশ্য বেশ উজ্জ্বল রোদ থাকা দরকার। কেবল মাত্র নেংটি পরিয়া ছেলেরা বরফে স্কি-খেলা করিতেছে, তাহারও একটি ছবি দিলাম। আর একটি ছবিতে ছেলে মেয়েরা বিদ্যালয়ের সম্মুখে ব্যায়াম করিতেছে, তাহাদের শিক্ষয়িত্রী তাহাদের ব্যায়াম করাইতেছেন।

একটি মহিলা সূর্য্যালোক চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে নানা খেলনা সৌখীন জিনিষ তৈরী করিতেছেন

আমি এক দিন এই বিদ্যালয়টি দেখিতে গিয়াছিলাম। ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মান, আমেরিকান, পৃথিবীর নানা দেশের ছেলে-মেয়েরা এখানে আছে দেখিলাম। এমন কি, একটি কাফ্রী মেয়ে দেখিলাম। ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্যপূর্ণ আনন্দময় মুখ হাসিখুসি ভাব দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। ইহারা যখন আসিয়াছিল তখন শীর্ণ—যক্ষ্মারোগ আক্রমণের সম্ভাবনাপূর্ণ ছিল।

এখন সতেজ, আনন্দময় প্রাণের উচ্ছ্বাসে ভরা। ভাল আবহাওয়া, ভাল খাবার, সূর্য্যালোক-চিকিৎসা, স্বাস্থ্যনীতি ও নিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপনের গুণে তাহারা যক্ষ্মাবীজাণুকে জয় করিয়াছে, সদ্য-প্রস্ফুটিত তরুণ প্রাণগুলির উপর হইতে মৃত্যুর করাল ছায়া সরিয়া গিয়াছে,—সূর্য্যালোকের, জীবনশক্তির জয় হইয়াছে।

আমাদের দেশে মৃত্যুর হার যে কি ভীষণ, তা অন্য দেশের মৃত্যুর ছাড়িয়া দিই। কিন্তু এ দেশে শত শত যক্ষ্মারোগী সম্পূর্ণরূপে সারিতেছে, আবার সংসারের কাজে লাগিতেছে। ডাক্তার রোলিয়ে তাঁর Helio-therapy বইতে লিখিয়াছেন, যে, তাঁর তত্ত্বাবধানে চিকিৎসায় হাড়ে-যক্ষ্মারোগীদের মধ্যে শতকরা প্রায় নব্বইজনের সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ হইয়াছে বা উন্নতি হইয়াছে। অবশ্য বুকে-যক্ষ্মারোগীদের সারিবার হার এত অধিক না হইলেও অনেক রোগী ভাল চিকিৎসায় বেশ সারে।
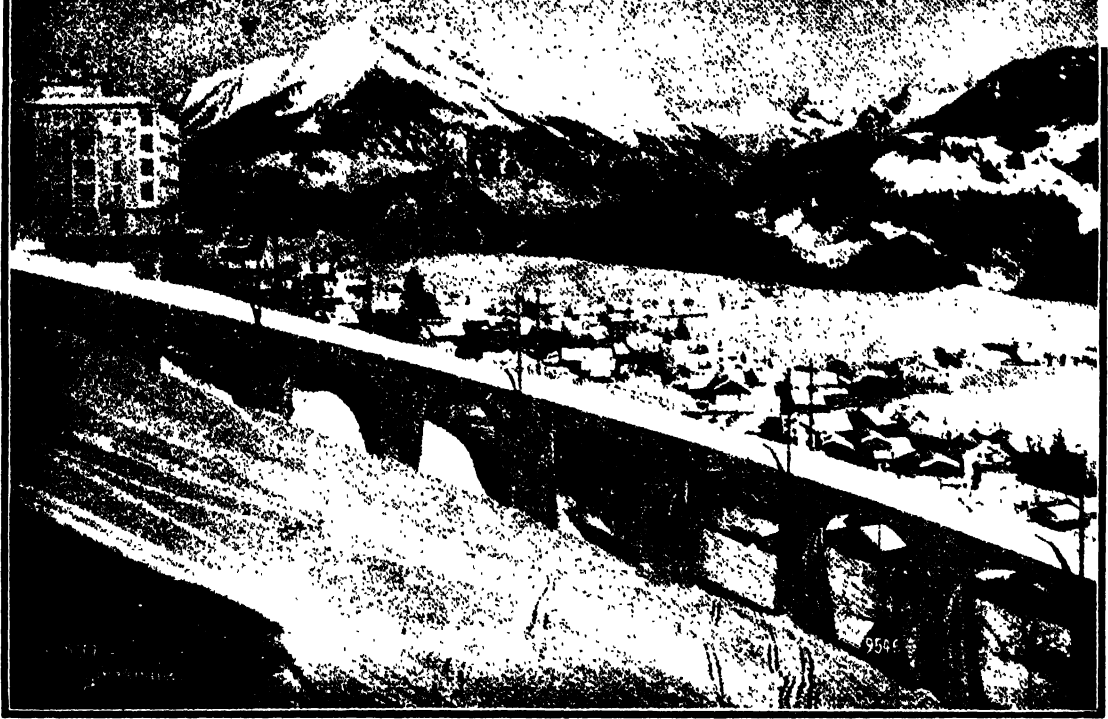
লেজ্যাঁ ও পিক সলি

হারের সহিত তুলনা করিলে বোঝা যায়। পাশ্চাত্য দেশে মৃত্যুর সঙ্গে যুঝিবার, রোগকে মানব-বিজ্ঞান দ্বারা জয় করিবার অক্লান্ত প্রচেষ্টা চলিতেছে। তাই মায়ের কোল হইতে সন্তানকে ছিনাইয়া লইয়া যাওয়া মৃত্যুর পক্ষে তত সহজ নয়। আমাদের দেশে প্রতি মিনিটে দুইটি করিয়া লোক যক্ষ্মায় মরিতেছে। কাহারও যক্ষ্মা হইলে তাহার সম্বন্ধে আমরা আশা

যক্ষ্মারোগের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করা আমাদের দেশের পক্ষে বিশেষভাবে আবশ্যক। সেজন্য লেজ্যাঁ সম্বন্ধে কিছু লিখিলাম। যাঁহারা ডাক্তার রোলিয়ের সূর্য্যকিরণ-চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষরূপে জানিতে চান, তাঁহারা "Heliotherapy by Dr. Rollier" বইখানি দেখিবেন।

ইতি

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এম-এ

...লাইয়ের বাক্সে কাঠি ছিল না, তাই মুখের নিবন্ত ...টা বাঁচিয়ে রাখ্‌বার জন্য গোটা চার-পাঁচ টান্ দিয়ে ...শ শুধোল—এখন কি উপায়, কৃতার্থ?

কৃতার্থ ঠোঁট উল্টে' বল্লে—উপায় একটা হবেই—

রমেশ ঘাড় নেড়ে বল্লে—কিন্তু গোঁফ-কামানো ছেলে ...মি নামাতে পার্‌বোনা বলে' রাখ্‌ছি।

কৃতার্থ বল্লে—তা আমি জোগাড় করে' দেব-ই। এ ...য়গাটায় বহু বছর আগে একবার এসেছিলাম। সাম্‌নের ...বাব্‌লা গাছটার ধার দিয়ে যে পথটা খালের দিকে এগিয়ে ...ছে—ঐ পথটা ভারি চেনা-চেনা। আপনি ঘাব্‌ড়াবেন না।

চুরুটের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, ছুঁড়ে' ফেলে দিয়ে রমেশ ...ল্লে—না ঘাবড়েই বা কি করি! জোগাড় করে' আন ...কটি। এ বিষয়ে ত' তোমার হাত আছে। কিন্তু খালি ...টালেই ত' চল্‌বে না, টাল্‌ও ত' সাম্‌লাতে হবে—

—আচ্ছা দেখি। বলে' কৃতার্থময় চাদরটা কাঁধে ফেলেই ...ক্ষুনি বেরিয়ে গেল।

একটি অখ্যাত ছোট শহর—আশে পাশে দু'দশ খানি ...গ্রাম,—ম্যালেরিয়ায় ঠাসা।

বড় দিনের ছুটিতে বড় শহর থেকে এক থিয়েটার পার্টি এসেছে,—বিনা নিমন্ত্রণেই। দু' রাত্রি থিয়েটার হবে বলে' ...আগেই রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল, —মালতী—শ্রীমতী চমৎকারিণী দাসী।—মানে, মেয়ের ...পার্টে যিনি নাম্‌বেন তিনি মেয়েই।

এ খবরে সারা শহরে ও গাঁয়ে হৈ চৈ পড়ে' গেছল,— ...ষ্টেজে দাঁড়িয়ে মেয়েমানুষ বইয়ের কথা গড়্‌ গড়্‌ করে' মুখস্ত ...বলে' যাবে—এ আশে পাশের গাঁয়ের লোকের কাছে একে- ...বারে অবাক কাণ্ড,—কিন্তু শহরের যাঁরা মাথা, মানে যাঁরা ...টাক ও টিকি, তাঁদের কেউ কেউ এ নিয়ে মহা গোল পাকিয়ে তুল্‌ছেন—বল্‌ছেন—ছেলেরা যাবে বিগ্‌ড়ে, মেয়েদের মন যাবে বিষিয়ে। বন্ধ করে' দাও।

রমেশবাবু বল্লে—আপনিই হয় ত' বন্ধ হ'য়ে যাবে। আপনাদের যা দেশ,—মশায়ই মশ্‌গুল। আস্‌তে আস্‌তেই আমাদের চমৎকারিণী দাসীর জ্বর-চমৎকার হয়েছে। আমরা নিজেরাই পাল গুটোব।

শহরের উকিল বগলাবাবু বল্লেন—তাই গুটোন্ মশায়; —হাওয়া উত্তুরে। মেয়েমানুষ নাবালে এক পয়সাও মিল্‌বে না আপনাদের,—চমৎকারিণীর ওষুধের খরচটি পর্য্যন্ত নয়। আমাদের এখানে বনের মশা আছে থাক্,—বিলাসের মশাল চাইনে। অভিনয় আমরা চাই বটে, কিন্তু অবিনয় নয়।

বগলাবাবুর আর যাই থাক্, গলা আছে বটে;— দেখ্‌তে, ও শুন্‌তে।

বগলাবাবু যেতে-না-যেতেই একখানা ছ্যাকড়াগাড়ী এসে দাঁড়ালো। দোর খুলে কৃতার্থ নাম্‌ছে। পেছনে একটি মেয়ে।

কৃতার্থ ঘরে ঢুকেই বল্লে—এনেছি মশাই, দেখুন বাজিয়ে এবার।

মেয়েটি ভারি ভীরু, ঘোম্‌টাটি একটু টেনে দেয়ালের সঙ্গে মিশে' রইল। দাঁড়াবার ভঙ্গিটিতে একটি কোমলতা আছে। প্লে-তে মালতীকে এমনি একবার দাঁড়াতে হবে,— রমেশবাবুর পছন্দই হ'ল হয় ত'।

বল্লে—তুমি যে আমাকে কৃতার্থ কর্‌লে হে! ব্যাপার?

বুক চাপ্‌ড়ে কৃতার্থ বল্লে—খালের পারে যে এমন কলি ফোটে কলিকালের পক্ষে এ একটা সৌভাগ্য, রমেশবাবু। বাৎ-চিৎ করে' হাল্-চাল্ সমঝে' নিন্। চল্‌বে? দু' এক পেগ্ পেটে যাওয়ার মতো একটু ঘোর-ঘোর লাগ্‌ছে না?

মেয়েটি ততই যেন মীইয়ে যেতে থাকে।

রমেশ শুধোল—তোমার নাম কি?

মেয়েটি ঘোম্‌টার ফাঁক থেকে জবাব দিল—সরলা।

স্বরটা একটু ভীতু বটে, একটু জোলো ;—কিন্তু ভারি স্পষ্ট।

কৃতার্থ বল্লে—ঘোম্‌টাটা একটু কমিয়েই আনো না, দিনের আলো কে এত ভয় কিসের ?

নিবিড় অন্ধকারের মতোই কালো দু'টি চোখ,—সরলা ঘোম্‌টা একেবারে মাথার ওপর তুলে আন্‌লে—কিন্তু দু'টি চোখেই যেন অন্ধকারের অগাধ স্নেহ মাখা। সমস্ত মুখে একটি ভারি মিষ্টি কমনীয়তা আছে, পাত্‌লা ঠোঁট দু'টি পরস্পরের সঙ্গে ভারি আল্‌গোছে ছোঁয়াছুঁয়ি করে' আছে, একটুখানি কপাল—রমেশের মনে হচ্ছিল মাপ্‌লে হয় ত' দু' আঙুলের বেশি হবে না, চিবুকটি একটু চ্যাপটা হ'য়ে গালের দু'দিকে ছড়িয়ে পড়াতেই মুখখানিতে এমন একটি পেলবতা এসেছে।

মেয়েটি যেন একটি লাবণ্যের নদী। খুব স্রোত নেই,—যেন বিকালের আলোয় টল্‌টল্ কর্‌ছে।

নাটকের নায়িকার সঙ্গে কল্পনায় যতবার রমেশের সম্ভাষণ হয়েছে—অম্‌নি তার মুখের ডৌলটি, ভাসা ভাসা দু'টি চোখে অম্‌নি একটি সস্নেহ কুণ্ঠা, শুধু দাঁড়ানোটিতেই অম্‌নি একটি নির্ব্বাক্ সুষমা! মেয়েটি বেশ।

রমেশ ঢোঁক গিলে বল্লে—তুমি পড়্‌তে জান ?

সরলা বল্লে—জানি একটু একটু। তবে কয়েকবার শুন্‌লেই মনে করে' রাখ্‌তে পারি।

রমেশ হঠাৎ উৎসাহিত হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠল—তোরা এখানে দাঁড়িয়ে কী দেখ্‌ছিস্ রে, নিমাই ? দে ঐ চেয়ার-খানা সরলাকে এগিয়ে।

তিন-চারখানা হাত বেরিয়ে এল একসঙ্গে।

চেয়ারের দরকার হ'ল না। সরলা মাটিতেই বস্‌ল।

রমেশ জিজ্ঞেস কর্‌লে—তুমি আমাদের সঙ্গে প্লে কর্‌বে ? প্লে মানে খেলা নয়, নাটক।

কৃতার্থ ভুরু কুঁচকে' বল্লে—ও, তা' খেলা-ই। কি বল হে—

ঠোঁটে হাসি ফুটতে না দিয়েই সরলা বিজ্ঞের মতো বল্লে—সংসারটাই ত' খেলা শুনেছি।

কৃতার্থ হাততালি দিয়ে বলে' উঠল—কেয়াবাৎ। সরলা শুধু আমাদের দর্শন দেনই না, শেখান্‌ও।

রমেশ বল্লে—পার্‌বে কর্‌তে ?

সরলা বল্লে—শিখিয়ে দিলে কেন পার্‌ব না ? আমাদের শুধু পাখা নেই, নইলে ত' আমরা পাখীই।

কৃতার্থ ফের ভুরু কুঁচকোল। বল্লে—পাখা নেই, কিন্তু উড়্‌তে জান খুব। তোমরা পোকাও।

সরলা বল্লে—আগুন দেখলেই উড়ে' পড়ি। তাতে আগুন নেভে না, পাখাই পোড়ে।

মেয়েটি দেখ্‌তে ভীতু, কিন্তু কথায় জিলিপি!

রমেশ বল্লে—ছোট্ট একটুখানি পার্ট, কিন্তু ভারি শক্ত। দু' তিন দিনে তৈরি করে' দিতে হবে। আমরা আস্‌চে শনিবারেই নামিয়ে দিতে চাই, আজ মঙ্গলবার—পার্‌বে ত' ? মোটে তিনটি সিন্।

সরলা ঘাড় অনেকখানি হেলিয়ে দিলে।

—আজ দুপুরেই তা হ'লে তোমাকে নিয়ে আস্‌ব। যার এই পার্ট করবার কথা ছিল, সে পড়েছে অসুখে,—তাই মুস্কিল যেমন মারাত্মক, তাড়াও তেম্‌নি। কেননা আস্‌চে হপ্তায় বগুড়ায় একটা বায়না আছে,—আগাম টাকা নিয়ে বসে' আছি। খেয়ে দেয়ে দুপুরে আস্‌বে ত' ? বাড়ির ভিড় এ দু'দিন একটু সরিয়ে দাও ;—এই নাও।

বলে' রমেশ মনিব্যাগ খুলে একখানা দশটাকার নোট সরলার দিকে প্রসারিত করে' দিল। সরলা আঁচলের খুঁটে নোটটি বেঁধে কোমরে ভালো করে' গুঁজে' নিলে। ওর দুই চোখ খুসিতে উছ্‌লে উঠেছে।

রমেশ বল্লে—গাড়ি করে' ওকে পৌঁছে' দিয়ে এস, কৃতার্থ।

সরলা বল্লে—গাড়ি কি হ'বে ? কতটুকুই বা পথ,—দু' কদম। হেঁটেই যাচ্ছি।

রমেশ ব্যস্ত হ'য়ে বল্লে—তবে যা নিমাই, ওকে একটু এগিয়ে দিয়ে আয়।

নিমাই পা বাড়াচ্ছিল, সরলা পেছন না চেয়েই বল্লে—দিনের বেলা লোক লাগ্‌বে কেন ? একলাই ত' যাওয়া-আসা করি,—আমি খুব যেতে পার্‌ব। আস্‌ব দুপুরে।

সরলার চলাটিও বেশ,—এক মুঠো ঝির্‌ঝিরে বাতাসের মত,—বেশ জিরিয়ে জিরিয়ে চলে। বাবলা গাছের গোড়া থেকেই পথটা বাঁক নিয়েছে। আর দেখা যায় না।

কিসের গাড়ি,—কিসের লোক!

সরলার সঙ্গে পৃথিবীর আজ নতুন করে' শুভদৃষ্টি,—মগডালের লাজুক হল্‌দে ফুলটির পর্য্যন্ত। খালে জেলেরা জাল ফেলেছে নৌকোর গলুইএ দাঁড়িয়ে, পারে কা'রা বেত চাঁছ্‌ছে, রোদ্দুরে খোলা পিঠ পেতে কা'দের বাড়ীর কনে-বৌ কলার পাতায় তেল মেখে বড়ি দিচ্ছে,—সরলার ইচ্ছা করে সবাইর সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা কয়। ওদের ছায়া মাড়ালে স্নান করে—ঐ যে পুরুতঠাকুর আস্‌ছেন তাঁকে দূর থেকে একটা সাষ্টাঙ্গ করে' বসে; কাউকে খামোকা জিজ্ঞেস করে—বাবুইহাটির এ রাস্তা দিয়ে নাক-বরাবর বেরিয়ে গেলে কত দূরে ঐ সবুজ মেঘটাকে মুঠির মধ্যে ধরা যায়—

সরলা ট্যাকে-গোঁজা নোট্‌টা বারে বারে অনুভব করতে কর্‌তে বাড়ি চলে।

বাড়ির উঠোনে পা দিয়েই সরলা ডাক ছাড়ে—ওলো ও ভুতি, কি করছিস্? দেখে যা শিগ্‌গির—আমি থেটার্ কর্‌ব। খোদ্ ফরিদপুর থেকে থেটারের দল এসেছে,—আমাকে পাট দিয়েছে। আমি রাণী সাজ্‌ব,—মাথায় মুকুট, গলায় মটরমালা, পায়ে সেই জুতো—ঐ যে ঘোড়ায় চড়ে' ছোটলাট এসেছিল, তার বিবির সেই খুর-তোলা জুতো দেখেছিলি, তেম্‌নি। রাজা আমার পায়ের কাছে পড়ে' কত কাঁদবে, কপাল কুট্‌বে,—আমি ঘাড়টা এম্‌নি করে' থাক্‌ব—

সরলা ঘাড়টা তেম্‌নি করে' দেখালো।

ভুতি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সরলার এ অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাসে একেবারে থ' হ'য়ে গেছ্‌ল। বল্লে—কি লো, ঘোড়দৌড় দেখে এলি নাকি?

সরলা বল্‌তে থাকে—এই ছাখ্ বায়না দিয়েছে দশ টাকা। দশ পয়সার বেপারি—দেখেছিস্ এম্‌নি কাগজ,—সবুজ নীল কালো কালি,—পড়তে পারিস্? দশ রূপেয়া! ক' আনা জানিস্? এক টাকায় ষোল আনা,—দশ টাকায়?

এবার সত্যিই ভুতির চোখ চড়ক-গাছ। দম নিয়ে বল্লে—সত্যি বল্‌ছিস্, সরি? পথে কুড়িয়ে পেলি নাকি লো? এত ভাগ্যি তোর?

—পথে আমার জন্যে সব মুক্তো ঢেলে রেখেছে, তোদের জন্য তেঁতুল-বিচি! পাঁচ মুখে পাঁচ হাটে আমার নাম বিকোয়,—কে জান্‌ত আগে? কোথা সে ফরিদপুর, সেখান থেকে আমার নাম শুনে এসেছে এই শহরে!—আমাকে তাদের দলে ভর্ত্তি করে' নেবে। ভারি শক্ত প্লে নিয়ে নেমেছে রে ভুতি,—সব চেয়ে শক্ত পার্ট পড়েছে আমার হাতে। কে আর কর্‌বে বল্? সঙ্গে নিয়ে এসেছিল একটাকে,—মুখ দিয়ে একটা রা বেরুল না,—আর আমাকে যেই বলা, দিলাম বলে' গড়্‌গড়্ করে'—প্রাণনাথ, রাখ তব পদতলে! বাবুদের সে কী তারিফ। বল্লে—সরলা, তোমার ছাড়া কারু আর সাধ্যি নয়।—বারে বারে হাঁটু গেড়ে'বস্‌তে বস্‌তে পা দু'টো ব্যথা হ'য়ে গেছে।

কি যে বল্‌বে সরলা ঠিক ঠাহর কর্‌তে পারে না। বলে—আস্‌ছে শনিবার সন্ধ্যায় হ'বে। তোদের দেখিয়ে দেব মাগ্‌না,—পাশ্ পাওয়া যাবে ঢের। দেখবি রাণীর পোষাকে কী মানায় আমাকে! রাজা—সে সেজেছে নবিগঞ্জের জমিদারের ছেলে—আমার পায়ের কাছে মুক্তো ঢাল্‌বে, মাথার মুকুট খুলে' রাখবে, রুমাল মুখে পুরে' কত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে,—আমি ঠায় সিংহাসনে বসে' থাক্‌ব, মাথা উঁচু করে' রাখ্‌ব।

বলে' সরলা মাথাটা কড়িকাঠের দিকে উঁচু করে' ধরে।

ভুতি বলে—মাগ্‌না দেখাবি তো সত্যি? ছাপানো কাগজ বিলি হবে না?

—হবে লো, সব হবে।

বলে' সরলা বারান্দার ওপাশে গিয়ে আবার ডাক ছাড়্‌ল—ও বাড়ীউলি-দিদি! বড় যে সেদিন ঘরভাড়ার পাওনা টাকা নিয়ে তম্বি কর্‌ছিলে, নাও তোমার টাকা,—সাড়ে পাঁচটাকা ফিরিয়ে দাও দিকিন্।

বাড়ীউলি নোট্‌টা হাতে পুরে' বল্লে—সাড়ে পাঁচ টাকা কি? সেদিন যে তোর অটলবাবু দু' পাঁইট্ মদ খেয়ে গেল—তার দাম কে দেবে?

সরলা বল্লে—তা আমি কি জানি? যে গিলেছে তার থেকে নেবে—

—তা তো বটেই লো, ছুঁড়ি। কে সে যে তাকে আমি সখ্ করে' মদ দিতে যাবো? তোরই পীরিতি পোড়ে বলে' না আমি—সে আমি বুঝ্‌ছিনে বাছা, হাতের কাছে কর্‌করে টাকা পেয়ে আমি ছাড়্‌ছিনে, নিতে হ'লে তুমি আদায় করে' নিয়ো—

সরলার মোটেই ঝগড়া করবার মন ও অবসর ছিল না; বল্লে—নাও, নাও, ঝামেলা রাখ, যা নেবার নিয়ে বাকিটা ফিরিয়ে দাও শিগ্‌গির। হিসেব-ফিসেব পরে হবে'খন। আমার ঢের কাজ।

খুচরো টাকা ক'টা নিয়ে যেতে যেতে সরলা বল্লে—অমন বাবুর মুখে ঝাড়ু!

বাড়ীউলি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে বল্লে—কার মুখে ঝাড়ু লো, ছুঁড়ি? লজ্জা করে না বল্‌তে? সেদিন ত' ঐ বাবুই জুতোর গোড়ালিটা দিয়ে বোঁচা নাকটা থেঁৎলে' দিয়েছিল! ঐ থেঁৎলানো নাক নিয়েই ত' সেই বমি-মুখো বাবুর মুখের সাম্‌নে পিক্‌দানি তুলে' ধরেছিলি!

পরে গম্ভীর হ'য়ে বল্লে—অত ছুটোছুটি ভালো নয় সরি, বাবুর কানে তুল্‌ব কিন্তু!

সরলা বল্লে—তুলো না! সরি এবারে সরে' পড়ছে,—বাবুর তোয়াক্কা আর সে রাখে না। পায়ের কড়ে' আঙুলের ডগায় বেঁধে রাখতে পারি—

বাড়ীউলি চাপা গলায় শুধু বল্লে—আচ্ছা।

সরলা ঝিকে পাক্‌ড়ালে। বল্লে—তোমাকে এক্ষুনি সাজোধোপার বাড়ি যেতে হবে, মাসি। পয়সা না পেলে কাপড় দেবে না বলে' শাসিয়েছে,—এই ছ'টা পয়সা ওর মুখের ওপর ছুঁড়ে' মেরে দিয়ে এস ত'। বলো,—এবার থেকে ছ' টাকা দিয়ে বিলেত থেকে কাপড় কাচিয়ে আন্‌ব। ও ভয় দেখায় কি? এক্ষুনি যাও, মাসি,—গঙ্গাজলিটা পরে' আমার এক্ষুনি আবার বেরুতে হবে। আর শোনো, এখন আর রাঁধ্‌বার সময় হবে না,—দু' পয়সার ফুলুরি নিয়ে এস,—আর, আর দু' পাতা আল্‌তাও কিনে এনো,—কতটুকুনই বা হাঁট্‌তে হবে,—যাও লক্ষ্মী! মোটমাট দশ পয়সা দিলাম,—কিছু ফির্‌লে আমাকে আর ফিরিয়ে দিতে হবে না, তোমার ছেলে হরির নামে নিয়ো—

ঝি বল্‌তে বল্‌তে যাচ্ছিল—ফির্‌বে তোমার মাথা—

সরলা আর একটা পয়সা ছুঁড়ে' দিয়ে বল্লে—নাও তবে আরেকটা।

সরলার চোখে নিজের ঘরটাই শুধু আজ বিশ্রী লাগ্‌ছিল। জান্‌লা দিয়ে রোদ এসে ঘরের সমস্ত কদর্য্যতা যেন বা'র করে' ফেলেছে। নোংরা বিছানা, ছেঁড়া বালিশ, আ-মাজা বাসন-কোসন, দেয়ালে ঝোলানো মাংসের ও মদের দাগ লাগা অটলবাবুর চুড়িদার আদ্দির পাঞ্জাবিটা। দিনের আলোয় ঘরটাকে যে এত বিরস এত বেমানান লাগে সরলার তা কোনোদিন চোখে পড়েনি।

সরলা জান্‌লাটা বন্ধ করে' খালের পারে এসে দাঁড়ালো। রোদ কতটা চড়া হ'লে ওখানে যাবার মতো দুপুর হবে মনে মনে ও তারই হিসেব করছিল। ছাই গাড়ি! ওর পা বেতো ঘোড়ার চেয়ে আগে যাবে।

ঝি এসে হিসেব দিলে। মোট এগারো পয়সাই লেগেছে।

বল্লে—দু' পয়সার ফুলুরিতে কি লোকের পেট ভরে?

সরলা বল্লে—তুমি কি বোকা, মাসি! আমি কি পেট ভরে খাবার জন্যে তোমাকে বাজারে পাঠিয়েছি নাকি? আমার যে আজ নেমন্তন্ন থেটার-পার্টিতে। আমি রাণী সাজ্‌ছি—সেখানে কত খাবার দেবে'খন। ক'টা না ক'টায় খাওয়া হয়, সেজন্যে ক্ষিদেটাকে একটু মেরে রাখ্‌বার জন্য দু'টো চিবিয়ে যাওয়া। ও আর আমি ছোঁব না মাসি, ও তোমার হরিকে নিবেদন করে' দাও গে। আর শোন,—আমি তোমাদের মাগ্‌না থেটার্ দেখিয়ে দেব'খন। তুমি যেয়ো হরিকে নিয়ে—বাপের বয়সে তোমরা তা' কখনো দেখনি।

সরলা তাড়াতাড়ি চান করে' নিলে। আয়নার কাছে বসে' বসে' অনেক কসরৎ কর্‌বার সময় নেই মনে করে' তাড়াতাড়ি চুলটা জড়িয়ে নিয়ে, ধোয়া শাড়ি সেমিজ পরে' পায়ে টাট্‌কা আল্‌তা আর কপালে কাঁচপোকার টিপ্ লাগিয়ে না খেয়েই বেরিয়ে পড়্‌ল। বড় রাস্তার উকিল-বাবুর বৈঠকখানায় ঘড়িটা দেখ্‌বার জন্য একবারটি নীচু হ'য়ে চোখ পেল না। যা হোক্ গে, একটু আগে যাওয়াই ভালো।

এখন কোচোয়ানরা সব খেতে গেছে, আড্‌গাড়ায় গাড়ি মেলাই ভার হবে। থেটারের বাবুদের শুধু শুধু কষ্ট দিয়ে লাভ কি? সরলা এমন কি নবাবের বেটি!

পথ যেন সরলার এক নিশ্বাসেই ফুরিয়ে গেল। পায়ের কাঁচা আল্‌তার দাগ তখনো শুকোয়নি, কাঁচা মাটির রাস্তায় ছোট ছোট দাগ লেগেছে।

শহরের এ বাড়িটা রমেশবাবুরই,—এতদিন পড়ে' ছিল।

পাশের মাঠে সকাল থেকেই ষ্টেজ্ খাটানো চলেছে,—এ পাড়ার সমস্ত ঘরামিই লেগে গেছে, হোগ্‌লা তেরপল বাঁশ দড়ি পাটাতন বেঞ্চিতে ঠাসা। ময়মন্‌সিং থেকে সিন্ এসে পৌঁচেছে। কে একজন সিন্‌গুলিকে তদারক কর্‌ছে, একটু একটু মেরামৎ কর্‌ছে,—ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের ভিড়,—একজন ধম্‌কে উঠ্‌লেই সবাই ছিট্‌কে পড়ে,—আবার গুটি গুটি এসে জড়ো হয়,—কোলাহলে বাতাস যেন টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে যাচ্ছে!

সরলা এসে দাঁড়ালো।

রমেশবাবু তখন ভেতরে কথা-বার্ত্তায় ব্যস্ত ছিল। শহরের কয়েকটি বয়স্ক ছেলে রমেশকে অভয় দিচ্ছিল—বগলাবাবুর গলাবাজিতে ভড়্‌কাবেন না, মশায়। আর যাই হোক্, গেঁজেল ছোঁড়াদের হেঁড়ে গলায় 'প্রাণনাথ' ডাক শুন্‌তে কক্ষনো পার্‌ব না আমরা—আত্মারাম খাঁচাছাড়া আর কি! চোখ বুজে' কানে আঙুল ঢুকিয়ে কতক্ষণ বসে' থাকা যাবে?

রমেশ হেসে বল্লে—সে ভয় আমাব নেই,—ঢের ঢের বগলাবাবু দেখেছি।

ছেলেদের থেকে একজন বল্লে—নীচু ক্লাশের টিকিট চার আনাই কর্‌বেন মশাই,—তাই জোটাতে আমাদের প্রাণান্ত।

রমেশ বল্লে—যতই কেন না উনি বগল বাজান্, আমাদের চমৎকারিণীকে দেখে ও তার য়্যাক্‌টিং শুনে উনি যদি বিস্ময়ে হাঁ হয়ে না যান্, ত কি বলেছি!

এম্‌নি সময় নিমাই উৎফুল্ল হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—সরলা এসেছে।

রমেশ তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে ছেলেগুলিকে বিদায় দেবার চেষ্টায় বল্লে—আচ্ছা, তাই কথা রইল। একদিন না হয় ষ্টুডেন্টদের হাফ্ করে' দেব।

—বেশ, বেশ, চমৎকার। বলে' ছেলেরা হাসিমুখে বিদায় নিল।

তেম্‌নি কুণ্ঠিত অবগুণ্ঠন টেনে সরলা এসে দাঁড়িয়েছে। ঘোম্‌টার তলা দিয়ে ভিজা চুলগুলি পিঠের দু'দিকে ঝেঁপে পড়েছে,—ফিন্‌ফিনে শাড়ীটি পরাতে সরলাকে যেন উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে,—সরলার কটিটি যেন মুঠির মধ্যে ধরে' নেওয়া যায়,—এম্‌নি হাল্‌কা! সমস্ত মুখে বিষাদের একটি স্তিমিত অপূর্ব্ব শ্রী!

রমেশ খুসি হ'য়ে বল্লে—তুমি এসেছ, সরলা? বেশ, বেশ। খেয়ে এসেছ ত'?

সরলা ঘোম্‌টাটা আল্‌গোছে একটু কমিয়ে আন্‌লে, বল্লে—খেয়েই এসেছি।

—তবে তুমি ওখানে একটু বোস, আমরা চান্ করে' খেয়ে নিই, পরে মহড়া সুরু হবে। ও নিমাই, সরলাকে একখানা বই এনে দে ত'! তুমি ত' পড়্‌তে পার একটু একটু,—এখন একটু চোখ বুলিয়ে নাও,—পরে হাত-পা নাড়া সব আমি শিখিয়ে দেব। মোটে তিনটি সিন্ তোমার,—লাষ্ট্ সিন্‌টার সমস্তই তোমার ওপর নির্ভর কর্‌ছে,—তুমি বেঁক্‌লেই সমস্ত বই বেফাঁস্। ঐটেই বেশ ভালো করে' কর্‌তে হবে। পার্টে তোমার নাম মালতী-মালা—জালন্ধরের রাজার একমাত্র মেয়ে। তুমি রাজ-কুমারী।

সরলা অবাক্ হ'য়ে রমেশের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল,—গলা যেন শুকিয়ে আস্‌ছে। জেগে জেগে রোদ্দুরের দিকে চেয়ে চেয়ে ও যেন স্বপ্ন দেখ্‌ছে। ওর সমস্ত জীবনের সঙ্গে বেখাপ্পা এই মুহূর্ত্ত ক'টি যেন সুমধুর মদিরায় ভিজে' গেছে। ও রাজকুমারী!

রমেশ একটু হেসে পাশের ঘরে চলে' গেল।

সরলা চেয়ারে না বসে' ঘরের একটি কোণে মাটির ওপর তেম্‌নি বসেছে—দেয়ালে পিঠ রেখে। নিমাই বই নিয়ে এল। পাতাগুলি উল্টোতে উল্টোতে কাছে এসে বল্লে—তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে তোমার প্রথম আবির্ভাব,—ষ্টেজে তুমি আর আমি। দু'জনে প্রগাঢ় প্রেম হচ্ছে। মাঝের দৃশ্যটাতে তুমি আমার প্রেমে সন্দিহান হবে,—শেষ দৃশ্যে একেবারে ক্ষেপে গিয়ে ছুরি নিয়ে মার্‌তে আস্‌বে,—কিন্তু—

ও ঘর থেকে রমেশ হেঁকে উঠ্‌ল—নিমাই!

নিমাই বল্লে—যাই।...কিন্তু আমাকে, আমাকে কি করে' মার্‌বে তুমি? কে আমার নাগাল পায়?...তোমাকে পেয়ে সরলা, সত্যিই আমার য়্যাক্‌টিং খুলে' যাবে, পিপের মতো মোটা চমৎকারিণীর সঙ্গে ষ্টেজে প্রেম করাও একটা প্রকাণ্ড দুর্ভোগ। ওর দু'পল্লা গলার চাম্‌ড়া দেখ্‌লে ভয়েই আমার গলা কাঠ হ'য়ে আসে,—প্রেমের বুলি বেরুবে কি ছাই!

মি এসেছ,—ভালোই হয়েছে। এম্‌নি একটি মেয়েই আমি য়েছিলাম,—দু'টি চোখে এমনি একটা লজ্জা,—তোমাকে পয়ে মনে হচ্ছে সমস্তগুলি সিন্ যেন একেবারে জীবন্ত হ'য়ে ঠ্‌বে,—গানের মতো, ছবির মতো!

সরলার দু চোখ কৃতজ্ঞতায় ভরে' এসেছে,—নিমাইর প্রতি অনির্ব্বচনীয় শ্রদ্ধায় ও স্নেহে ওর মুখের সমস্ত রেখাগুলি যন কোমল, কমনীয় হ'য়ে এল। কিছুই বল্‌তে পার্‌ল না, খালি একটি সপ্রেম কুণ্ঠায় নিমাইর মুখের দিকে চেয়ে চোখ নামিয়ে নিল।

ও ঘর থেকে রমেশবাবুর আরেকটা বিকট আওয়াজ াস্‌তেই নিমাই তাড়াতাড়ি বইখানা সরলার কোলের ওপর ফলে পিঠ দেখালো।

চমৎকার ছেলে এই নিমাই! উনিশ কুড়ির বেশি হবে া। ছিপ্‌ছিপে পাত্‌লা চেহারাটি, টানা টানা চোখ, কথায় যন মধু ঢালা। এর সঙ্গে প্রেম কর্‌বার সময় ষ্টেজে াড়িয়ে কি কি কইতে হবে জান্‌বার জন্য সরলা তাড়াতাড়ি বইয়ের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য খুলে বস্‌ল। একটু কষ্ট করে' করে' পড়্‌তে লাগ্‌ল,—চমৎকার!

প্রথমেই মালতী অর্থাৎ সরলা বল্‌বে—কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে,—জ্যোৎস্নায় আকাশ ধুয়ে যাচ্ছে! পিকগণ কলরব কর্‌ছে,—ফুলের গন্ধে, আকাশের নীলিমায় এত মধু! চল ছাতে যাই।

তার পর হিরণকুমার ওরফে নিমাই বল্‌বে—ছাত? ছাই ছাত,—এ গৃহই আমার আকাশ, আমার স্বর্গ, মালতী! তোমার মুখখানি আমার চাঁদ, তোমার কণ্ঠস্বরে লক্ষ পিকের কুহরণ, তোমার দু'টি পরিপূর্ণ অধরের রঙীন পেয়ালায় রঙীন মদিরা!...

সরলা আর পড়্‌তে পারে না, আবেশে সমস্ত গা যেন অবশ হ'য়ে আসে। কে যেন ওর দিকে দু'টি সকম্প সাগ্রহ বাহু বিস্তার করে' দিয়েছে,—কা'র কণ্ঠস্বরে যেন স্নেহপূর্ণ কাতর কাকুতি! শুধু কথার মধ্যে যে এত মাদকতা থাক্‌তে পারে সরলা কি তা জান্‌ত? নিমাই,—নিমাই ওকে এই সব বল্‌বে?...

তার পরে—

খাওয়া-দাওয়ার পর রিহার্সেল সুরু হ'ল।

দি ইয়ং ইণ্ডিয়া থিয়েট্রিক্যাল্ পার্টির প্রোপাইটার ম্যানেজার ও প্রধান অ্যাক্টার—সমস্তই রমেশবাবু। এমন কি জালন্ধর-পতন নাটকের লেখকও স্বয়ং উনিই। লোকটি চৌকোস।

যাই হোক্,—সুরু হ'ল রিহার্সেল। সবাইরই পার্ট তৈরি,—দু'বছর নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে জালন্ধর-পতনেরই অভিনয় চলেছে। তাই সমস্ত দিন-রাত্রি ভ'রে শুধু সরলার পার্টেরই মহড়া দিতে হবে।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য,—সরলা আর নিমাই! দূরে চাঁদ, কাছে নদী—দৃশ্যের পৃষ্ঠপট।

সমস্ত রাজ্যের লজ্জা যেন সরলাকে গ্রাস করেছে। দু'বার তিনবার চেষ্টা করে' সরলা যা বল্লে তার আর তুলনা হয় না। স্বাভাবিক লজ্জায় ওর কণ্ঠস্বরে যেন একটি অস্ফুট কোমলতা এসেছে, তা শুনে সবাই মুগ্ধ হ'য়ে গেল। সমবেত অভিনেতার তারিফ্ শুনে সরলার সমস্ত মন গভীর আনন্দে স্নান করে' উঠ্‌ল,—জীবনের এই আনন্দের আস্বাদ, যিনি ওকে প্রথম দিলেন, ওর ইচ্ছা হচ্ছিল ছুটে' সেই কৃতার্থবাবুর পায়ের ধুলো মাথায় নেয়,—রমেশবাবু, নিমাইবাবুরো।

আর নিমাই! সরলাকে পেয়ে ও যেন কাকে পেয়েছে। সরলা যেন ওর আত্মার আত্মীয়, হৃদয়ের প্রথম প্রতিবেশী। এই দু'বছরের মধ্যে নিমাই আর কখনো এত ভালো অভিনয় করেনি।

রমেশ সরলাকে মোশন্ দেখিয়ে দেয়, উচ্চারণের তারতম্য শেখায়, ষ্টেজে চলা-ফেরার ভঙ্গিতে সজুত করবার চেষ্টা করে। সরলা ঠিক ঠিক শিখে নেয়,—যেখানে যেটুকু ভুল করে সেই ভুলটুকুই যেন সবার চোখে সুষমামণ্ডিত হ'য়ে ওঠে।

কৃতার্থ বলে—কেয়াবাৎ! এই ঠিক!...

একেবারে একটি আন্‌কোরা মেয়ের পক্ষে এমন ষ্টেজ-ফ্রি হ'য়ে অভিনয় করে' যাওয়া—সবাই প্রশংসাসূচক বলাবলি করে। ততই সরলার মনে একটা আত্মবিশ্বাস আসে, তেজ আসে, নিমাইর প্রতি ওর সত্যিকার স্নেহ যেন ততই একটা প্রকাশ পাবার আশা কর্‌তে থাকে।

এই এক সিনেই সরলা দাঁড়িয়ে গেছে।

চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে আবার সরলার অভ্যুদয়,—

এবারে অন্য প্রকার মনোভাব নিয়ে। মালকানা-নগরের রাজপুত্রীর সঙ্গে হিরণকুমারের প্রেম হ'য়েছে মনে করে' মালতীর ক্রুর সন্দেহ, আহত অভিমান!

মালকানা-নগরের রাজপুত্রীর ভূমিকায় যে নেমেছে সে রোগা, চিম্‌সে—তার দিকে তাকালে সরলার রাগের চেয়ে করুণাই বেশি হয়।

সে সিন্‌টাও কোনো রকমে উৎরে' গেল,—চলনসই।

এবারে শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্য। রমেশবাবু কলমের খোঁচা মেরে এই দৃশ্যটিকে একেবারে জম্‌জমাট্ করে' তুলেছে—সব দৃশ্যকে টেক্কা মেরেছে এ।

কিন্তু এই সিন্‌টিতে এসে সরলা হাঁপিয়ে পড়্‌ল। কিছুতেই পার্‌ল না ফোটাতে।

এই সিনে মালতী হিরণকুমারকে হত্যা কর্‌বার জন্য হাতে বিষাক্ত ছুরিকা নিয়ে প্রবেশ কর্‌বে,—চোখে জ্বল্‌বে দীপ্তি, অধরে কুটিল হিংসা, ক্রোধে সমস্ত দেহ যেন একটি লালায়িত বহ্নিশিখা! সরলা কিছুতেই মুখে-চোখে সেই দৃপ্তভাব আন্‌তে পারে না,—মুখখানি তেম্‌নি সুকোমল ও সুকুমারই থেকে যায়।

ছুরি তোলা টিও ঠিক হয় না।

কৃতার্থ অবজ্ঞাসূচক শব্দ করে' বলে—না, হ'ল না। আমাদের চমৎকারিণী এ জায়গাটা কি চমৎকার কর্‌ত!

নিমাই প্রতিবাদ করে—প্রথম দিনে চমৎকারিণীর সাধ্যি ছিল না এমন উৎরোয়। দু' পাঁচবার দেখিয়ে দিলে সরলা চমৎকারিণীর ওপর ডবল প্রমোশান পাবে।

রমেশবাবু সরলাকে দেখিয়ে দেয়, গোঁফ জোড়া ফুলিয়ে মুখে একটা বিকটতা আনে, কণ্ঠস্বরকে হেঁড়ে করে' তোলে;—সরলা অনুকরণ করে বটে, কিন্তু মুখে কিছুতেই সে দৃঢ়তা আসে না। ওর নিটোল চিবুকটিই ওর মুখের এই কৃত্রিম অমানুষিক বন্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে,—ওর দু'টি চোখের সেই ব্রীড়ার কুয়াসা কিছুতেই কাটে না, কণ্ঠস্বর একটু তীক্ষ্ণ হয় বটে কিন্তু তার মৃদুতা ঘোচে না। হাতে ছুরি ত' নয়, যেন ফুলের মালা নিয়ে এসেছে।

কৃতার্থ মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলে—হবে না। কিন্তু এ সিন্‌টাই সব,—একে মার্ডার হ'তে দিলে প্লে-ই ফক্কা। এখানে চমৎকারিণীর কি আশ্চর্য্য রকম ডেলিভারি ছিল।

রমেশও হাল ছেড়ে দেয়। সরলার মুখ এতটুকু হ'য়ে আসে।

সরলা ঢোঁক গিলে বলে—একদিনেই কি আর হয়? অভ্যেস্ ত নেই—কালকেই দেখবেন ঠিক হ'য়ে যাবে।

নিমাই সায় দিয়ে ওঠে—নিশ্চয়ই। একদিনে ওর পার্ট্‌সের যা প্রমাণ পাওয়া গেল, কোচিং পেলে চমৎকারিণী ত' ছার, প্রভাও ওর কাছে ঘেঁস্‌তে পার্‌বে না। আচ্ছা, তার পরের টুকু হোক্।

সরলা উৎসুক হ'য়ে প্রম্প্‌ট্ শুন্‌তে লাগ্‌ল—এর পরে কি আছে!

মালতীমালা প্রথমে ত' ছুরি উঁচিয়ে হিরণকুমারকে খুন কর্‌তে এল,—এসে খুব খানিকটা স্বগত উক্তি করে' যেই সত্যি সত্যি ঘুমন্ত হিরণকুমারের বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে যাবে, দেখ্‌বে—হিরণকুমার আগেভাগেই বিষ খেয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে! তখন মালতীর কী সে অনুশোচনা!—ছুরি ফেলে দিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে কী কান্না সে,—হিরণকুমারের বুকের ওপর লুটিয়ে লুটিয়ে!

সেই কান্নার মধ্যেই যবনিকা-পতন।

নিমাইর মাথাটা কোলের কাছে টেনে এনে সরলা সত্যি সত্যিই কেঁদে ফেল্‌লে,—চোখের কোণ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। নিমাইর কোঁকড়ানো চুলগুলি নিয়ে ওর শীর্ণ আঙুল ক'টির কী সে আদর, যেন আঙুলের ফাঁক দিয়ে জলের মতো সমস্ত হৃদয় গলে' পড়্‌ছে!

নিমাই চোখ বুজে' স্তব্ধ হ'য়ে সরলার কোলের কাছে মাথাটা রেখে মড়ার মতো পড়ে' আছে। সরলার কান্না শুনে ওর নিজেরো চোখ ভিজে, উঠ্‌ছে। খালি ওর সেই দিদির কথা মনে পড়ে, যিনি ওর অসুখের সময় প্রাণপণ সেবা করেছিলেন সেবার।

সরলার কান্না ও কাকুতি শুনে সবাই মুগ্ধ হ'য়ে যাবে। একজন বল্লে—অডিয়েন্স্-এর বুক ফেটে' যাবে।

খালি কৃতার্থ ই যেন সর্ব্বান্তঃকরণে মান্‌তে চায় না। বলে—বুক ত' ফাট্‌বে, কিন্তু এর খানিক আগে যে ছুরি-হাতে দেখে হেসেই বুক ফেটে গেছে। ফাটা বুক আবার ফাটে কি করে'?

সেই লোকটা বল্লে—তবে ফাটা বুক জোড়া লাগ্‌বে, কৃতার্থবাবু।

প্রম্পট্ করতে করতে রমেশ এতক্ষণ ভাবছিল—জলন্ধর-রাজের পার্ট ছেড়ে হিরণকুমারের পার্টেই নেমে যাবে কি না! বল্লে—কিন্তু এই দেখো চমৎকার মানিয়ে যাবে, কৃতার্থ!

—তা মানিয়ে নিতেই হবে এক রকম করে'। কিন্তু চমৎকারিণী কি সুন্দর করে'ই যে কন্‌ট্রাস্টটা ফুটিয়ে তুল্‌ত! পড়্‌ল জ্বরে—

রমেশ তাড়াতাড়ি বল্লে—ওকে ওষুধ পথ্য দিয়েছিস্ ত' রে নেমা! সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে যে!

নিমাই ওষুধ পথ্য নিয়ে ও-ঘরে গেল। চমৎকারিণী বিছানায় শুয়ে ককাচ্ছে। জ্বরটা একটু কমেছে বিকেলের দিকে। উঠে বসে' কান খাড়া করে' সরলার রিহার্সেল শুন্‌ছিল।

বল্লে—কে নিয়েছে মালতীর পার্ট?

নিমাই উদাসীনের মতো বল্লে—চিনি না।

চমৎকারিণী বল্লে—পারছে না বুঝি! বোকার মতো হাপুস্‌হুপুস্ কি রকম কাঁদ্‌ছিল, একলা হাস্‌তে হাস্‌তে আমার কোমরে ব্যথা ধরে' গেছে—

নিমাই চটে' উঠে' বল্লে—তোমার চেয়ে ঢের ঢের ভালো করে। ওকে পেয়ে আমি যেন বর্ত্তে' গেছি। হাঁফ ছেড়ে যেন বেঁচেছি—

—বটে? হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছ? খাব না আমি ওষুধ, ডাক রমেশবাবুকে।

—ডাক্‌ছি। বলে' নিমাই সরে' পড়্‌ল।

রাত বাড়্‌ছে।

এক থালা খাবার ও এক পেয়ালা চা দু' হাতে করে' নিমাই সরলার কাছে এসে দাঁড়ালো। বল্লে—তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে, খেয়ে নাও খানিকটা।

সরলা অল্প একটু হেসে বল্লে—আপনার মুখও তো শুক্‌নো, আপনিও খান্।

—আমি খাব 'খন।

—আপনি না খেলে আমি খাব না।

ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু'জনে খাবারের থালাটা শেষ কর্‌ল।

রমেশ ডাক্‌লে—নিমাই!

নিমাই তাড়াতাড়ি চায়ের পেয়ালাটা সরলার হাতে নামিয়ে দিয়ে বল্লে—যাই।

রমেশ সরলার হাতে আবার একখানা দশ টাকার নোট্ গুঁজে' দিলে। বল্লে—গাড়ি ডেকে দি?

সরলা বল্লে—দরকার হবে না।

—কাল্‌কে ঘুম থেকে উঠে'ই এসো। এখানেই খাবে-দাবে। বুঝ্‌লে?

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে সরলা একা পথে বেরিয়ে পড়্‌ল।

বাব্‌লা গাছটার বাঁক ঘুরতেই সরলা অবাক হ'য়ে চেয়ে দেখ্‌লে সাম্‌নে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—নিমাই। বল্লে—গাড়িতে উঠে' এস, সরলা।

সরলা আপত্তি কর্‌ল না। গাড়ি খালের দিকে গড়ালো।

দু'জনে মুখোমুখি বসেছে। নিমাই বল্লে—তোমার দিকে টেনেছিলাম বলে' চমৎকারিণী ফণা তুলে' আছে। কিন্তু তোমাকে বলে' রাখ্‌ছি সরলা, তুমি না থাক্‌লে আমি কক্ষনোই এবারে প্লে কর্‌ব না, ডাঙায় নৌকো এনে ডুবিয়ে মার্‌ব ওদের।

সরলা যেন সমুদ্রের কূল দেখে, গর্ব্বে, সুখে ওর বুক ডগমগ করে' ওঠে!

নিমাই পকেট থেকে সিগারেট বা'র করে, বলে—খাবে?

সরলা সিগারেট্‌টাই খায়; তবু বলে—না। নিমাইর সাম্‌নে ওর সিগারেট্ খেতে ইচ্ছা করে না।

নিমাইও খায় না। বলে—ঐ সিন্‌টাতে খুন কর্‌তে আসাটাই বড়ো নয়, ভালোবাসার লোককে মরে' গেছে দেখে ছুরি ফেলে আর্ত্তনাদ করাটাই বড়ো কথা। কার্টেন্ পড়্‌বার সময় লোকের মনে খালি তোমার ঐ কান্নাই ঘুরে' বেড়াবে,—চোখের জলে ভেজা তোমার মুখখানিই তাদের চোখের তারায় আঁকা থাকবে।

সরলা বলে—আপনি পৃথিবীতে আর নেই, এ কথা মিথ্যিমিথ্যি করে' ভাব্‌লেও আমার কান্না পায়।

কিন্তু কথাটা শেষ কর্‌তে না কর্‌তেই সরলার ভারি লজ্জা পেল।

নিমাই ভাবে—সরলার ঐ আঙুল ক'টি আবার নিজের চুলের মধ্যে রাখে, কিন্তু হাত বাড়িয়ে ধর্‌বার পর্য্যন্ত সাহস হয় না। জান্‌লা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকে।

খালের কাছে গাড়ি এসে দাঁড়ায়। সরলা নিজেই কবাট্ খুলে' নেমে পড়ে। বলে—আসবেন? কিন্তু ব'লেই মনে মনে পীড়িত হ'য়ে ওঠে।

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ

মৃত্যু-শয্যায় রাজা রামমোহন রায়
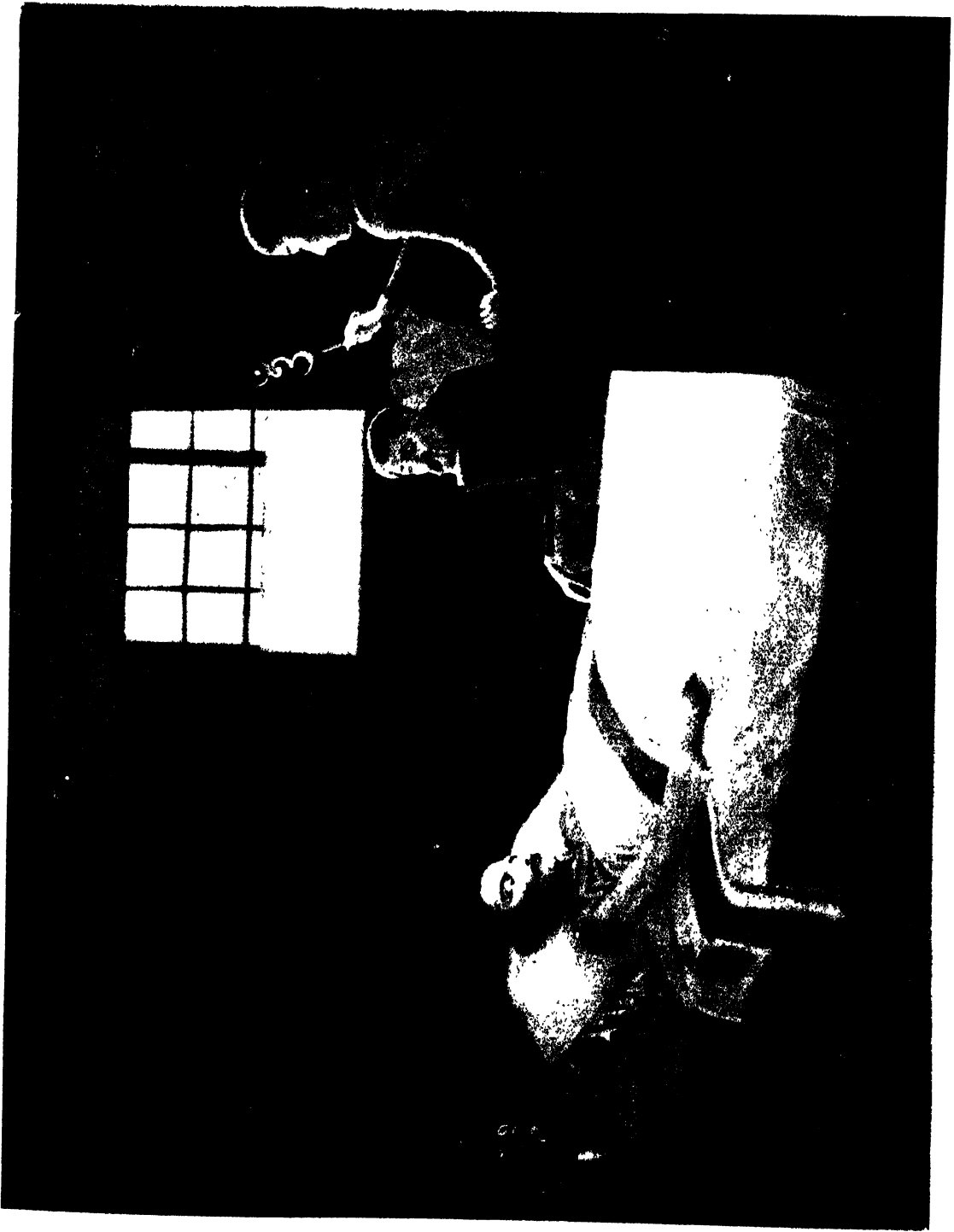
নিমাই বলে—কৃতার্থবাবু ওরা তোমাকে অপমান করেছে, কিন্তু তার শোধ আমি নেব। আচ্ছা, যাই।

নিমাই গাড়োয়ানকে বল্লে—শহরটার খানিক এদিক ওদিক ঘোরো। ডবল ভাড়া পাবে।

এবারে সিগারেট ধরায়।

সরলা ফাঁকে দাঁড়িয়ে থাকে,—গাড়িটা যে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে তার পর্য্যন্ত হুঁস্ নেই।

ভেতরের দাওয়ায় পা দিতেই বাড়িউলি খ্যা খ্যা করে' উঠ্‌ল—বলি, সরি এসেছিস্? তুই কেমনতরো মানুষ লো, ছুঁড়ি!—সারা দুপুর সন্দে টো টো করে' বেড়াবি, আর এখেনে যত রাজ্যের লোক এসে মুখ খারাপ করে' যাবে?

সরলা যেন গাড়ি থেকে এবারেই সত্যি নেমে আসে। ওর গতানুগতিক কদর্য্য বিরস জীবন ওর সঙ্গে মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়ায়। ফুলশয্যার ওপর কে যেন এক বোতল মদ ঢেলে' দেয়,—ওর গা ঘিন্‌ঘিন্ করে' ওঠে।

বলে—কি হ'ল বাড়িউলি-দিদি?

—কি হ'ল? সেই অটল ছোঁড়া বিকেলের দিকে এসেছিল কতগুলো চেলা জুটিয়ে। তোকে ঘরে না দেখে কি কেলেঙ্কারিটাই না করে' গেল! আমার থেকে তিন চার পাঁইট্ করে' দিশি বিলিতি চেয়ে নিয়ে বমি করে' গালাগালি দিয়ে জিনিসপত্র ছত্রকোট্ করে' লম্বা দিলে—একটি পয়সা দিয়ে গেল না। বল্লে—সরি দেবে।

সরলা ক্ষেপে' ওঠে—হ্যাঁ, সরিই ত' দেবে! কেন? সরি কি ওর জুতোর সুখতলা নাকি? খালি বোতলগুলো ওর মুখের ওপর ছুঁড়ে' মার্‌তে পার্‌লে না? এবারে আসুক না, ঝ্যাঁটাপেটা করে' যদি না তাড়াই ত' আমি বামুনের মেয়ে নই।

বাড়িউলি বলে—বামুনের মেয়ে বলে' আর দেমাক করিস্ নি ছুঁড়ি। কেন বাড়ি থাক্‌বিনে শুনি? বাঁধা লোকের টাকা খেয়ে আবার তার ওপরে চালবাজি! কেন সে গালাগাল কর্‌বে না?

সরলা বলে—রেখে দাও, অমন লোক বাজারে কাণা কড়িতে বিকোয়। ও রকম বাবু আমার চাইনে। আমি কালই এ-বাড়ি থেকে খসে' পড়্‌ব।

—থেটার-ফেটারের কথা সব তার কানে উঠেছে। বলেছে—থেটারে আগুন লাগিয়ে দেবে আর তোর মুণ্ডুটা আস্ত রাখ্‌বে না।

—তার হ'য়ে তুমি লড়্‌তে এসো না, বাড়িউলি-দিদি। আসুক সে. দেখি তার বাপের ঘাড়ে ক'টা মাথা। তার মুখে যদি নোড়াটা আমি না ঘসি. ত' কি বলেছি! কত টাকার মদ খেয়েছে সে? কত টাকা পেলে তুমি গলা থামাবে? বলে' সরলা আঁচলের খুঁট্ থেকে নোট্‌টা বাড়িউলির দিকে ছুঁড়ে' দিয়ে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে' দিল।

সব ঘর নোংরা, জিনিসপত্র এলোমেলো, কাচের গ্লাশ ভাঙা, টেবিল উল্টোনো,—বমির একটা উৎকট গন্ধ আস্‌ছে। সরলা অন্ধকারে থম্‌কে' রইলো,—দেশলাই জ্বালাবার পর্য্যন্ত যেন সামর্থ্য নেই।

বুকের মধ্যে সরলা যে গানের সুরটি নিয়ে এসেছিলো, যেন টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে গেল,—ও যেন আবার নরককুণ্ডে এসে পড়েছে, যেখানে সেই অটল আর সরলা, যেখানে না আছে মালতী, না বা হিরণকুমার!

সরলা ঘর থেকে বেরিয়ে খালের পারে এসে দাঁড়ালো। ওর মনে যেন একটি ঔদাস্য এসেছে।

পরে কি ভেবে আবার ঘরে গেল, ল্যাম্প জ্বালালে,—কোমরে কাপড় জড়িয়ে বাল্‌তি করে' জল এনে বমি কাচাতে বস্‌ল।

পঞ্চম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে নিমাইর মাথাটি কোলে নিয়ে যে হাতখানি দিয়ে ওর কপালে স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দিয়েছে সেই হাত দিয়ে ঘৃণ্য অটলের বমি নিকোতে গিয়ে ভেবে ওর চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে' জল পড়্‌তে লাগ্‌লো। ও সত্যিই আর এখানে থাক্‌বে না, থিয়েটারে ভিড়ে' যাবে,—যে-থিয়েটারে হিরণকুমার আছে, যে থিয়েটারে মৃত বন্ধুর উদ্দেশে কৃত্রিম শোক কর্‌তে গিয়ে সত্যি সত্যিই কান্না পায়।

ভুতি ঘরে এল। বল্লে—আজ কি হ'ল রে, সরলা?

সরলা বল্লে—কত! কত বড় শক্ত পার্ট যে হাতে নিয়েছি, সে দেখ্‌বি গিয়ে। ষ্টেজে খুন করতে হবে।

ভুতি যেন ভয়ে আঁৎকে' ওঠে, সরলাকে জড়িয়ে ধরে' বলে—বলিস্ কি লো?

সরলা হেসে অভয় দিয়ে বলে—সত্যি সত্যিই কি আর

খুন করব নাকি বোকা মেয়ে। পুলিশ নেই? খুন করতে যাব খাঁড়া উঁচিয়ে,—এম্‌নি করে'—চেয়ে ত্যাখ্, এমনি দাঁত খিচিয়ে—ত্যাখ্ ত' ঠিক মতো হচ্ছে কি না—

ভুতি অত শত বোঝে না, বলে—হ্যাঁ, হ্যাঁ হয়েছে,—তার পর কি হ'বে?

রসবোধের চেয়ে ভুতির কৌতূহল বেশি।

—তার পর যেই খাঁড়া চালাতে যাব, দেখ্‌ব হিরণকুমার আগেই বিষ খেয়ে ভবলীলা ঘুচিয়েছে। তারপরে অস্তর ফেলে' দিয়ে তার মাথাটা কোলে নিয়ে কাঁদ্‌ব। বল্‌তে বল্‌তে সরলার চোখে যেন ব্যথার কুয়াসা ঘনিয়ে আসে।

সরলা ভুতিকে ফের অভয় দেয়—সেই হিরণকুমার সত্যিই বিষ খাবেনা রে, পরে পর্দ্দা পড়ে' গেলে জেগে উঠ্‌বে। ··আমাকে খাবার খাইয়ে দিলে, গাড়ি করে' বাড়ি পৌঁছে' দিলে,—ভারি সুন্দর ছেলেটি, ভাই। মনের মতো। দেখিস্ এখন।

দোর-গোড়ায় কে একটি ছোট ছেলে এসে দাঁড়ালো,—ঝি-মাসির ছেলে, হরি।

হরি বল্লে—আমাকে আর মাকে সত্যি সত্যি মাগ্‌না থেটার দেখাবে, সরলা-দি?

সরলা হাসিমুখে বল্লে—দেখাবো। যাস্ তোরা।

হরি খুসিতে উছ্‌লে' পড়ে' বল্লে—তোমাদের হ'য়ে গেলে দেখো আমরাও একটা থেটার করব বাবুতলার মাঠে। কাগজ দিয়ে সব ভীমের গদা বানিয়েছি, বাঁশের ধনুক—। সেদিন তোমাদের নিয়ে যাবো। দেখ্‌বে—

ছুটতে ছুটতে চ'লে গেল।

ঐ সামান্য দু'টি মিষ্টি খেয়েই যেন সরলার পেট ভরে' আছে। ঝিকে বিদায় করে' দিল।

পাড়াটা নিঃঝিবিলি হ'য়ে এসেছে। সরলা দোর বন্ধ করে' দিয়ে ওর ছোট্ট আয়নাখানি বেড়ার গায়ে মানানসই করে' লাগিয়ে ছুরির অভাবে চিরুণীটাই ছুরির মতো বাগিয়ে নিজের মনে শেষ দৃশ্যের মহড়া দেয়। আয়নায় সমস্ত মুখের ছায়া পড়ে না দূর থেকে,—যেটুকু পড়ে তাতেই ও ওর মুখের চেহারার আন্দাজ করে' নিতে পারে। যতই ও ওর মুখ রুক্ষ কর্কশ বলদৃপ্ত করতে চায়, ততই ওর মুখের শীর্ণতা বীভৎসতর হ'য়ে উঠ্‌তে থাকে। গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে হিংসার কাঠিন্য মেশাতে পারেনা,—তাই দেখায় কুৎসিত, হাস্যকর! ও যেন অনুপায় হ'য়ে ওঠে। কি করে' যে মানিয়ে নেবে ভেবে উঠ্‌তে পারেনা।

অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে একটা ছেঁড়া বালিশ কোলে নিয়ে পার্টের বাকি অংশটুকুর মহড়া দেয়,—বালিশকে ভাবে হিরণকুমার; তার জন্য রাত করে' সরলা অনর্থক অশ্রুবর্ষণ করে।

এমন সুন্দর করে' সরলার জীবনে ভোর হয়নি। ভোর বেলাটি ওর কাছে অত্যন্ত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন লাগছে।

ঘুম থেকে ওঠা থেকেই সরলা ভাব্‌ছে,—কে যেন ওর কাছে আস্‌বে আজ। নিমাইকে ত' ও আসতে বলে' দেয়নি। কিন্তু না বলে' দিলে কি আসতে নেই? অটলকে তাড়িয়ে দিলেও ত' সে আসে।

বেলা বেড়ে চলে, কিন্তু সরলার ভারি খালি খালি লাগে। অদূরে রাস্তায় গাড়ির আওয়াজ পেলেই ওর বুক আশায় দুলে' ওঠে। কিন্তু পরে ভাবে,—ওর কাছে আস্‌বার এই একটিই ত' সদর রাস্তা নয়,—শুধু গাড়িই ত' তার বাহন নয়,—সে এসেছে তার ঘুমের মধ্যে, অজানতে ঘুম ভাঙার মধ্যে, মনের গোপন খিড়্‌কির দুয়ার দিয়ে।

যে আস্‌বে না, তার জন্যে এম্‌নি অনর্থক প্রতীক্ষা করে' থাক্‌বার মধ্যে যে দুঃসহ সুখ আছে, সরলা কোনোদিন তা জান্‌ত না।

রোদ উঠ্‌তে-না-উঠ্‌তেই সরলা বেরিয়ে পড়্‌লো।

নিমাইকে কাছে পেয়ে সরলা শুধোল—ভেবেছিলাম সকালবেলা আস্‌বেন।

নিমাই বল্লে—ম্যানেজারের হুকুম তামিল করতে করতেই সব গরমিল্ হ'য়ে যায়। আজ থেকেই ষ্টেজ-রিহার্সেল সুরু হ'বে। তোমার প্রবেশ-প্রস্থানগুলি ঠিক করে' নিতে হবে। মুখস্থ হয়েছে?

সরলা বল্লে—একটু একটু হয়েছে।

—ম্যানেজার বলেছিল পার্টটা তোমাকে লিখে দিতে,—আমার হাতের লেখা ত' আর বুঝ্‌বে না ছাই, তাই আমার বইখানাই তুমি নাও।

বলে' নিমাই পকেট থেকে ছেঁড়া জালন্ধর-পতন বইখানি সরলার হাতে গুঁজে' দিল।

নিমাই বল্লে—দেখো, আজ আরো ভালো হবে। তোমার হাতের আদর পাবার জন্য আমার কপালটা নিস্‌পিস্ কর্‌ছে। তোমার কান্না শুন্‌লে আমার মন কেমন করে' ওঠে।

সরলার ঠোঁট দু'টি শুধু একটু কাঁপে।

ষ্টেজ্ বাঁধা হ'য়ে গেছে,—বেড়া ও টিন্ দিয়ে চারদিক ঘেরা, পাড়ার ছেলেমেয়েগুলো ফুটো করে' উঁকি দিতে চায়, আর কে ওদের সব ভাগিয়ে দিতে থাকে। ঐখানে গানের আর নাচের মহড়া চলেছে,—এ পারে য়্যাক্‌টিং—ঐখানে সিন্ পেন্টিং, সিন্ সিফ্‌টিং চলেছে।

সমস্ত বাড়িটা গৈ গৈ কর্‌ছে,—যেন একটা উৎসব!

সরলা সব ভুলে' যায়,—খালপাড়ের সেই নোংরা ঘর, সেই শীতকালে রাত বারোটা পর্য্যন্ত ফাঁকে জবুথবু হ'য়ে বসে' থাকা, সেই একঘেয়ে বিশ্রী কথাবার্ত্তা, সেই অটল-বাবুর বীভৎস মুখ! ওর বন্দী পৃথিবী যেন হঠাৎ একটা অপরিমিত পরিধিলাভ করে। আকাশকে আজ যেন ওর খুব বড়ো লাগে,—সমস্ত অবকাশ যেন পূজার আনন্দে পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে। ভাবে, ও সত্যিই অটলের রক্ষিতা ক্রীতদাসী নয়,—ও সত্যই রাজকুমারী! ও ভালোবাসে, প্রেমিককে হারিয়ে ও বৈরাগিনী হয়েছে,—ওর দারিদ্র্য ওর বিরহের কি সুন্দর ব্যাখ্যা! সরলা সব ভুলে' যায়, মিথ্যার মাদকতা ওর ক্লান্তি ঘুচোয়,—ও নতুন ক'রে পৃথিবীতে জন্মলাভ করে।

শুধু দু'টি দিনের জন্যেই। তা হোক্।

আজ ভোরে চমৎকারিণীর জ্বর ছেড়েছে। শরীর দুর্ব্বল বটে, কিন্তু কাহিল নয়,—গড়াতে গড়াতে এসে একটা চেয়ার নিয়ে বস্‌ল। অভিনয় সম্বন্ধে টিপ্পনির তার আর শেষ নেই। কৃতার্থময় পেছনে দাঁড়িয়ে চমৎকারিণীর টিপ্পনিরই তারিফ্ করে।

রমেশ বলে—তুমিই আজ থেকে প্রম্পট্ কর হে, মধুসূদন। তোমারই ত' কাজ।

মধুসূদন বই হাতে করে।

আজকে একেবারে গোড়াগুড়ি থেকে। তৃতীয় অঙ্ক পৌঁছুতে পৌঁছুতে প্রায় বারোটা বাজে।

সুরু হ'ল তৃতীয় অঙ্ক। সরলা মাৎ করে' দিল। কিন্তু শেষ দৃশ্য আস্‌তেই সরলার আর হ'য়ে ওঠে না। মার্‌বার সময় এমন একটা ভাব হয়, যেন খুব শক্ত একটা দড়ির গেরো খুল্‌ছে মাত্র,—খুন করতে আস্‌ছে না। মুখ কিছুতেই কুঞ্চিত কর্কশরেখাসঙ্কুল হ'য়ে উঠ্‌তে পারে না। একটা বিশীর্ণ দৈন্য ফুটে ওঠে শুধু।

চমৎকারিণী মুখ টিপে টিপে হাসে। কৃতার্থ তার সঙ্গে তাল রাখ্‌তে গিয়ে হাসির সুর সপ্তম গ্রামে তুলে' দেয়। বলে—হবে না রমেশবাবু। লুডিক্রাস্!

রমেশ বলে—হবে না বল্‌লেই ত' হয় না। এ নিয়েই চালিয়ে দিতে হবে আপাতত।

চমৎকারিণীর হাসি কিছুতেই থামেনা। যেন মদের পিপের মুখ ছুটে' গেছে, তার থেকে ফেনিল উচ্ছ্বাস উঠ্‌ছে।

নিমাই একেবারে রুখে' ওঠে; বলে—চোখের সাম্‌নে অম্‌নি হাস্‌লে কে পার্ট করতে পারে? রইল আপনার থিয়েটার। চলে' এস, সরলা।

সরলা আয়ত চোখ মেলে নিমাইর দিকে তাকায়। ওর অপমানের বেদনা স্নেহে সুশীতল হ'য়ে ওঠে।

রমেশ হাঁকে—নিমাই! এ কি অন্যায় কথা তোর! পরের সমালোচনা কি করে' বন্ধ করবি? এগিয়ে এস সরলা, আবার চেষ্টা কর। অমন হাসাহাসি কোরো না, চমৎ! আমাদের এ-ই চালিয়ে নিতে হবে। জ্বরে পড়ে'ই ত' তুমি সব বিতিকিচ্ছি ক'রে দিলে।

—বিতিকিচ্ছি? নিমাই ফের প্রতিবাদ করে—সরলার সমস্ত শরীরে প্রেমের যে একটি সহজ লীলা ও পেলবতা আছে তা চমৎকারিণীর কোথায়? ওর স্বরে একটি স্বতোৎ-সারিত স্নেহ আছে,—কেমন চমৎকার মানায় ওকে! চমৎকারিণীকে খুনের পার্টেই বেশি খোলে—কিন্তু সরলা যেন মূর্ত্তিমতী সরলতা! আপনার বই থেকে ঐ খুনের অংশটুকু কাটা-প্রুফের মতো দিন্।

রমেশ এ-সব কথা কানেই তোলেনা। আবার পার্ট চলে। সরলা আবার ব্যর্থ হ'য়ে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে' যেতে চায়।

পরের টুকু আর আসে না। নিমাই বলে—ও যেম্‌নি হচ্ছে হোক্, বাকিটুকুতে কেঁদে সরলা আগের সমস্ত ত্রুটি ধুয়ে নিয়ে যাবে। দেখেছেন, একদিনে কেমন মুখস্থ করে' ফেলেছে,—চমৎকারিণীর লেগেছিল পুরো একটি বছর।

চমৎকারিণী চেঁচিয়ে ওঠে—আমাকে এম্‌নি ধারা

অপমান কর্‌লে আমি আজই চল্‌লাম কল্‌কাতায় ফিরে'।

কৃতার্থও চেঁচিয়ে ওঠে—মুখ সাম্‌লে নিমাই!

ঝগড়ার সম্ভাবনাটা কাটিয়ে ওঠ্‌বার জন্য রিহার্সেলটা খানিকক্ষণ বন্ধ থাকে।

রাত্রে সরলাকে গাড়ি করে' এগিয়ে দিতে দিতে নিমাই বল্লে—আমার যদি অনেকগুলি টাকা থাক্‌ত, তবে তোমাকে নিয়ে নতুন একটা থিয়েটার খুল্‌তাম। তোমাকে কো-য়্যাক্‌ট্রেস্ পেয়ে সত্যিই আমার ভেতরে একটা আবেগ আসে,—কাউকে দিয়ে খুব মিষ্টি করে' একটা প্রেমের গল্প লিখিয়ে নিতাম!

সরলা হেসে বলে—আপনি নিজেই ত' পারেন। পরকে খোসামোদের দরকার হয় না।

একটুখানি মাত্র পথ,—এক নিশ্বাসেই ফুরিয়ে যায়। সরলার ইচ্ছা করে, নিমাইকে ঘরে নিয়ে যায়, নিজ হাতে রেঁধে ওকে কিছু খাওয়ায়, ফর্সা চাদর বা'র করে' ওর জন্য নিজ হাতে নতুন একটি বিছানা পেতে দেয়, ও ঘুমিয়ে পড়্‌লে শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যের মতো ওর চুলগুলিতে আঙুল বুলিয়ে দিতে দিতে ওর কপালে দু'টি ফোঁটা চোখের জল ফেলে।

সরলা মুখ ফুটে' নিমন্ত্রণ করতে পারে না।

ভাবে, এই বন্ধ গাড়ির মধ্যেই শুধু দু'টি মুহূর্ত্তের জন্য ওর এই ছোট্ট ক্ষণিক সংসার,—নিমাইর সঙ্গে। সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন—মালতী আর হিরণকুমার।

গাড়িটা থাম্‌লে সরলা নামে, নিমাই হঠাৎ ওর আলোয়ানটা সরলার গায়ে জড়িয়ে দেয়, বলে—তোমার শীত কর্‌বে না হ'লে।

সরলা আপত্তি করে না, আলোয়ানটি আরো নিবিড় করে' জড়িয়ে পরিচিত ঘরে এসে ঢোকে। আজ আর কারু সঙ্গে কথা কয় না,—ভূতির সঙ্গেও না। আলোয়ানটা গায়ে দিয়েই ঘুমিয়ে পড়ে।

সরলার জীবনে আরেকটি পরিচ্ছন্ন রাত্রি কাটে, ঘুম থেকে জেগে পবিত্র প্রভাতকে মনে-মনে অভিবাদন করে।

শুক্রবার। কাল প্লে। আজ ড্রেস্ রিহার্সেল্।

পার্ট সরলার মুখস্থ হ'য়ে গেছে। ওর একাগ্র মনোযোগের দরুণই তা সম্ভব হ'ল। ছুরি মারার ভঙ্গিটিও এক রকম চলনসই করে' এনেছে।

ও এর মধ্যে নিজের ত্রুটির ব্যাখ্যা পর্য্যন্ত বা'র করে' ফেলেছে, বলে—এই অবস্থায় মালতীর মুখে খুব একটা হিংস্রতা আস্‌তেই পারে না, সেই হিংসা ও ক্রোধের সঙ্গে যে ওর একটি মমতা একটি শোক মেশানো আছে,—তাই মালতীর মুখে কোমলতাটা স্বভাববিরুদ্ধ নয়।

বলা বাহুল্য ভাষ্যকার স্বয়ং নিমাই।

সকালবেলা ছুটতে ছুটতে হরি এসে হাজির,—হাতে একখানা ছাপানো কাগজ। সরলার দোর-গোড়ায় এসে হাঁপাতে-হাঁপাতে বল্লে গাড়িতে করে' কাগজ বিলি হচ্ছে, সরলা-দি। আমাকে কি দেয়? বল্লাম—আমার সরলা-দি থেটার কর্‌বে, তখন দিলে। গাড়ির ছাতে বসে' সানাই বাজাচ্ছে,—আর কত লোক যে গাড়ির সঙ্গে ছুটছে সরলা দি! রামু ত' চাকার তলায়ই পড়ে গেছ্‌ল আরেকটু হ'লে!

গর্ব্বে আনন্দে সরলার বুক ফুলে ওঠে,—এত বড় একটা আনন্দব্যাপারে ওর কিছু অংশ আছে ভেবে ও ধন্য হ'য়ে যায়।

ভূতি কৌতূহলী হ'য়ে কাছে আসে। সরলা হরির হাত থেকে কাগজটা নিয়ে পড়ে' সকলকে বুঝিয়ে দেয়! মাঝখানে একটা ছবি আছে,—তার অর্থ করে।

বলে—এই হিরণকুমার বিষ খেয়ে শুয়ে আছে, আর আমি এম্‌নি ছুরি নিয়ে মার্‌তে আস্‌ছি।...

সমস্ত নাটকের মধ্যে এই ব্যাপারটাই সবচেয়ে লোমহর্ষক বলে' তারই ছবি ব্লক করে' বিজ্ঞাপনে ছেপে দেওয়া হয়েছে।

ভূতি ও আর-সব মেয়েরা ঈর্ষায় জর্জ্জর হ'য়ে সরলার পানে তাকায়। ভূতি বলে—কিন্তু এ ত' তোর ছবি নয়।

সরলা তা জানে। এ চমৎকারিণীর ছবি,—যেন নৃমুণ্ডমালিনী চামুণ্ডা;—হিরণকুমারকে ও কোনোদিন ভালোবেসেছিল তার কোনো প্রমাণই তাতে পাওয়া যায় না,—যেন বরাবরই ও একটা শাঁকচুন্নি। আর শুয়ে আছে—নিমাই, রুখ্‌খু চুল, চোখের পাতা বোজা,—একখানি হাত মাটির দিকে ঝুলে' পড়েছে।

সরলা হেসে জবাব দেয়—আমার ছবি কোথায় আর পাবে, বল্। এম্নি একটা এঁকে দিয়েছে। আমার অম্নি মোটা হ'লেই হয়েছিল আর কি! পার্ট থেকে নাকচ করে' দিত।

কিন্তু নিজের মনকে এই বলে' বোঝায়,—অনেক দিন আগে থেকেই এগুলি ছাপা বলে' মালতীর ভূমিকায় সরলার নামটা আর হ'য়ে ওঠেনি।

সরলা বলে—আজ সব পোষাক পরে' রিহার্সেল্ হবে,—এখুনি যেতে হবে।

হরি মিনতি করে' বলে—আমাকে টুপ্ করে' কোনোখান দিয়ে আজ ঢুকিয়ে দিতে পার্বে না, সরলা-দি? তোমাদের পোষাক-পরা নাটক দেখ্ব।

সরলা হেসে ওকে প্রবোধ দেয়—আজ কি, কালই ত' দেখ্বি। খুব ভালো জায়গায় বসিয়ে দেব'খন। মাকে নিয়ে যাস্।

হরির যেন স্বর সয়না, বলে—খুব ভালো জায়গা দেবে? বাঃ, কেয়া মজা! রামু ওরা ত' জায়গাই পাবে না।

হরি নাচ্তে নাচ্তে বেরিয়ে গেল।

সরলাকে এখুনিই বেরুতে হবে। ঘরে যেটুকু সময় থাকে—স্নান করা, একটু খাওয়া কি না খাওয়া—সব সময়েই অস্ফুটস্বরে পার্ট আওড়ায়। ও এই নিয়েই আছে। ওর তিনদিন আগেকার অতীত জীবনের সঙ্গে যেন ওর কোনোই সম্পর্ক নেই,—তাকে ও চেনেই না।

ড্রেস্-রিহার্সেল স্থরু। সবুজ রঙের শাড়ি পরে' জালন্ধর রাজকুমারী শ্রীমতী মালতীমালা ওরফে সরলাসুন্দরী যেন সবুজ মেঘের পরীর মতো পাখা মেলে এই শহরের মাটিতে নেমে এসেছে!

সরলার দিকে চেয়ে কে বল্বে ও সত্যিই একগাছি মালতীর মালা নয়?

পিঠে কালো পর্চুল মাটি ছোঁয়-ছোঁয়, শাড়ি পরার ভঙ্গিটিতে কি আশ্চর্য্য সুষমা! হাতে আভরণ! গলায় পুষ্পহার!

আর সমুখে হিরণকুমার,—রাজপুত্রের বেশে। মাথায় সোনার মুকুট, তাতে পাখীর পালক গোঁজা।

সমস্ত ষ্টেজ্ গম্গম্ করে' ওঠে,—ডে লাইটের সুতীব্র আলোতে পরস্পরের চোখে একটি বিহ্বল মুগ্ধতা আবিষ্কার করে' দু'জনে আবিষ্ট হ'য়ে পড়ে। অভিনয় শুনে সবাই তন্ময় হ'য়ে যায়।

কিন্তু শেষ দৃশ্যে আবার তেম্নি জলো হ'য়ে আসে। কৃতার্থময় কিছুতেই সায় দেয় না, দুর্ব্বল বলে' উচ্চহাস্য থেকে বঞ্চিত হ'য়ে চমৎকারিণী একটা বীভৎস কটু আওয়াজ করে।

নিমাই বলে—আর-আরদের অভিনয়ের প্যাঁচে কত যে গলদ থাকে তার কেউ খোঁজ করে না, এ বেচারির ছুরি ধরা ঠিক মত হয় না বলেই যত ঠাট্টা। আপনারা ত' ছাই• সমঝদার, দেখ্বেন লোকে কি রকম নেয়!

কৃতার্থ বলে—লোকে ত' আর তোমার মতো গাবর নয়,—তাদের রসবোধ বলে' একটা জিনিস আছে।

রমেশ মীমাংসার সুরে বলে—না না—এই আমাদের চালিয়ে নিতে হবে। বেশ হবে, সরলা। তুমি একটুও ঘাব্ড়িয়ো না।

রিহার্সেলের শেষে সরলা দামী পোষাক ছেড়ে' তার আটপৌরে শাড়িখানি পর্লে। সরলা যেন নিমাইর চোখে রহস্যময়ী হ'য়ে উঠেছে!

নিমাই বল্লে—দেখ্বে কি রকম ভিড় হবে, হাত-তালিতে প্রত্যেকটি কথা ডুবে যাবে, দেখো।

সরলা মনে মনে ছবি আঁকে,—বিপুল জনসমারোহের কূল-কিনারা করতে পারে না।

কিন্তু বাইরে বেরিয়ে এসে সরলা কারুর দেখা পায় না। গাড়ি নিয়ে কেউই বা লা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে নেই। সরলা ভাবে, হয় ত' গাড়ি আন্তে গিয়ে দেরি হচ্ছে;—একটু অপেক্ষা করে, কেউ আবার পাছে কিছু সন্দেহ করে এই ভয়ে বেশিক্ষণ দাঁড়াতেও পারে না। অন্ধকারে গা ছম্ ছম্ করে। এ কেম্নতরো লোক,—একটুও ভাবনা নেই? সরলা বুকের মধ্যে একটা অস্বস্তি নিয়ে বাড়ি ফেরে।

ভাবে, দোরের বন্ধ তালাটা খুল্লেই তার সঙ্গে দেখা হ'য়ে যাবে।

নিমাইর র্যাপারটা গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়ে। ভাবে, হয় ত তক্ষুনিই নিমাই গাড়ি নিয়ে এসে ঘুরে' গেছে।

রাতের মতো রাত একটা,—আশা-আকাঙ্ক্ষায় ভরা! ওর চোখের সমুখে রাশিকৃত লোক,—সবাই হাততালি

দিচ্ছে, মুগ্ধ হ'য়ে ওর মুখের ওর পোষাকের দিকে চেয়ে আছে। অটল যদি যায়, সেও হাঁ হ'য়ে যাবে, চিন্‌তেই পার্‌বে না। কেউ দিস্তা খানেক নোট্‌ নিয়েও আস্‌তে পারে, ও তা ছুঁড়ে' ফেলে' দেবে—ও হিরণকুমারের বাসনাবাসিনী প্রিয়া! তার জন্যেই ও গেরুয়া পর্‌বে।

..

শনিবার,—দিনের মতো দিন। পাঁজিতে এ দিনটি যেন সরলার জন্য রিজার্ভড্‌ ছিল।

চোখ মুখ ধুয়েই নিমাইর র‍্যাপারটি গায়ে জড়িয়ে সরলা রওনা হ'ল থেটার্‌-বাড়ি।

যাবার সময় ভুতিকে বলে' গেল—দুপুরে একবার এসে পাশ্‌ দিয়ে যাব তোদের।

সরলার সুখের আজ অন্ত নেই। ওর মধ্যে এত বড়ো শক্তি প্রসুপ্ত ছিল, এত বড়ো কাজের যোগ্যতা ছিল জান্‌তে পেরে ও গর্ব্বে একেবারে ফুলে' উঠেছে। নিজেকে আবিষ্কার করবার মতো অহঙ্কার বোধ করি আর কিছু নেই। ও এ ক'দিন একটা মাতালেরো মুখ দেখেনি, ওর সমস্ত আচরণে একটি ভদ্রতা এসেছে,—মনে যেন একটি বিশ্রামের সঙ্গে প্রশান্তির স্বাদ পাচ্ছে! কত ভালো লাগ্‌ছে ওর,—জীবনের বৃহৎ বৈচিত্র্যের আস্বাদ পেয়ে ও যেন ধন্য হয়েছে।

সত্যিই, আজ ও মালতীমালার মতো সন্ন্যাসিনী হ'য়েও যেতে পারে।

সরলা এসে পৌঁছুলো। সব ফিট্‌ফাট্‌। সব সিজিল্‌মিজিল্‌ হ'য়ে গেছে।

কিন্তু সবাই যেন কেমন উদাসীন। সরলাকে দেখে কারু ঔৎসুক্য নেই। নিমাই কই?

রমেশবাবুকে বল্লে—আজ রিহার্সেল হবে না?

রমেশ বল্লে—হ্যাঁ, দুপুরের পরে একবার হবে,—কয়েকটি সিন্‌।

সরলা কিছু বুঝে' উঠ্‌তে পারে না।

রমেশ আর যাই হোক্‌ মুখচোরা নয়; বুঝিয়ে দেয়। বলে —তোমাকে আর আমাদের প্লে-তে লাগবে না। চমৎকারিণী সেরে উঠেছে, সেই মালতীর পার্টে নাম্‌বে।

সরলা যেন বসে' পড়্‌লো। ওর তাসের ঘর দম্‌কা হাওয়ায় ছত্রখান হ'য়ে গেল।

রমেশ আরো খুলে' বল্লে—মার্ডারের সিন্‌টা তোমার কিছুতেই হ'ল না,—কৃতার্থ ওরা কিছুতেই রাজি হয় না। তা ছাড়া চমৎকারিণী ভালো হ'য়ে এই পার্টটা এখানে আবার কর্‌বার জন্য ভারি ঝুঁকে' পড়েছে। জানই ত' ও আমাদের দলের সেরা য়্যাক্‌ট্রেস্‌। ওকে ত' আর চটাতে পারি না।...

সরলা দু' হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, ছেলে-মানুষের মতো! এক মুহূর্ত্তে ও যেন একেবারে ফুরিয়ে গেছে।

রমেশ বৃথা প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে—তুমি কিছু মনে কোরো না, সরলা। বিকেলে তুমি এস থিয়েটার দেখ্‌তে। তোমাকে আর কয়েকটা টাকা দেব'খন, থিয়েটারের পরে কিম্বা কাল সকালে এসে নিয়ে যেয়ো।

রমেশ চলে' গেল।

সরলা কোথায় গিয়ে যে ওর এই কান্না লুকোবে, জায়গা খুঁজে' পাচ্ছে না। ওর কাছে পৃথিবী যেন সমস্ত জায়গা খুইয়ে বসেছে।

খানিকক্ষণ এ-দিক ও দিক নিমাইর খোঁজ কর্‌লে,—কোথাও অকে পাওয়া গেল না। খুঁজতে খুঁজতে পোষাকের ঘরে এল,—সেখানেও নিমাই নেই। মধুসূদন বাক্স থেকে পোষাক আর চুল খুলে দড়িতে ঝুলিয়ে রাখ্‌ছে। কাল রাতে সরলা ঐ সবুজ শাড়ীটি পরেছিল,—আর নিমাই ঐ মুকুটটা।

একজনকে জিজ্ঞেস কর্‌লে—নিমাইবাবু কোথায় বল্‌তে পারেন?

লোকটা যেন কি কাজে ব্যস্ত ছিল, বল্লে—জানি না।

চট্‌ করে' একটা কথা সরলার মনে পড়ে' গেল,—বোধ হয় নিমাই পালিয়েছে। নিমাই ওকে বলেছিল, যদি সরলাকে শেষ পর্য্যন্ত না নামায় তবে ও বেঁকে' বস্‌বে, পালিয়ে যাবে পারের কাছে নৌকো এনে ডুবিয়ে মার্‌বে!

ঠিক তাই। সরলাকে নামাবে না জেনে অভিমানে বেদনায় নিমাই বিবাগী হয়েছে।

সরলার মনে বল এল,—ধর্ম্মের জয় আছেই। এ প্রবঞ্চকদের সমুচিত শাস্তি দরকার! বেশ হ'বে। নিমাই না থাক্‌লে থিয়েটারই হ'তে পারে না,— হিরণকুমারের পা[illegible] আর কেউ তৈরি নেই।

নিমাইর প্রতি শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় সরলার মন ভ[illegible] ওঠে।

সরলা বিমর্ষ মুখে থিয়েটার-বাড়ি থেকে বেরিয়ে আ[illegible]

বাব্‌লা গাছটার তলায় বসে' ও চোখের জল আর চেপে রাখ্‌তে পারে না। জীবনে ও ঢের কেঁদেছে, এর চেয়ে ঢের ঢের বড়ো বেদনায়,—কিন্তু আজ্‌কের মতো নিজেকে কোনোদিন এমন ব্যর্থ মনে করে নি। ওর চোখের থেকে দিনের আলো যেন কে চুষে' নিয়েছে।

কিন্তু নিমাইকে আজ ওর চাই,—একান্ত করে' চাই। এ সংসারে ওই সরলার একমাত্র বন্ধু,—খালি ওকেই সরলার অপমান স্পর্শ করেছে। নিমাইকে আজ সরলা তার ছোট ঘরটিতে নিয়ে সমস্ত পৃথিবীর নাগালের থেকে আড়াল করে' রাখ্‌বে।

নিমাইকে কোথাও খুঁজে' পাওয়া যাচ্ছে না যে! বাজার, গাড়ির আড্ডা, অলি গলি কোথাও নিমাই নেই। নিমাই নেই। নিমাই দেশ-ছাড়া হয় নি ত'?

হঠাৎ মনে হ'ল, নিমাই হয় ত' ওরই বাড়ি গিয়ে বসে' আছে,—ওকে সঙ্গে করে' নিয়ে যাবার জন্য। সরলার সমস্ত শরীর আনন্দে শিউরে উঠ্‌ল।

সরলা তখুনি বাড়ি গেল। রোদ তখন বেশ চড়া হয়েছে। সরলার ঘরে কেউ আসে নি, কেউ ওর খোঁজও করেনি।

বাড়িউলি ঠাট্টা করে—আজ যে লোকের ওপর ভারি দরদ—

ভূতি তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, সরলার চেহারা দেখে থম্‌কে যায়। বলে—তোর কী হয়েছে, সরলা? কাঁদ্‌ছিস্‌ কেন?

সরলা বলে—এই মাত্র পার্ট করে' আস্‌ছি। আমার যে কাঁদ্‌বারই পার্ট।

মুখে ঠুন্‌কো হাসি ফুটোবার চেষ্টা করে' বলে,—সেই তখন থেকেই কাঁদ্‌ছি। নিজে কেঁদে পরকে কাঁদাব,—তাই বড়ো শক্ত রে। হ্যাঁ রে ভূতি, আমার কাছে কেউ আসে নি,—ঢ্যাঙাপানা ফর্সাপানা একটি ছেলে, গায়ে ফ্লানেলের পাঞ্জাবি? আসেনি? কেউ না?

সরলা ভগ্নোৎসাহ হ'য়ে বলে—যাই থেটার্‌-বাড়ি। তাকে খুঁজে' পাওয়া যাচ্ছে না,—তার সঙ্গেই আমার পার্ট। তাকে কোথাও না দেখে' সবাই ভারি ভড়্‌কে গেছে। কোথায় যে গেল!

বলে' সরলা ফের বেরিয়ে পড়্‌ল থিয়েটার-বাড়ির দিকে।

ভূতি বল্লে—আমাদের পাশ কই সরলা?

সরলা বল্‌তে বল্‌তে গেল—দরজায় গিয়ে আমার নাম কর্‌লেই ছেড়ে দেবে,—ভাবিস্‌নে।

সেখানে গিয়ে ফের নিমাইর খোঁজ নিলে,—কেউ কিছু জানে না। কিন্তু কারু মুখে লেশমাত্র উদ্বেগের চিহ্ন নেই। স্বয়ং রমেশবাবুও হাসিমুখে গল্পগুজব করতে করতে তদারক করে' বেড়াচ্ছে,—সরলার দিকে চেয়েও দেখ্‌ছে না।

ঠিক উচিত প্রতিশোধ নেওয়া হবে। হিরণকুমার মালতীর অপমান সইতে পারেনি, তার দণ্ড দিয়ে গেছে।

একজন বল্লে—নিমাই শহরের গণ্যমান্যদের বাড়িতে বাড়িতে উঁচু ক্লাসের টিকিট্‌ বেচ্‌তে গেছে।

টিকিট্‌ বেচ্‌তে গেছে? অসম্ভব!

অসম্ভবই বা কেন? হয় ত' এই অন্যায় পরিবর্ত্তনের খবর এখনো নিমাইর কানে ওঠেনি। তাই সরলার অভিনয় সবাইকে দেখাবার জন্য টিকিট্‌ বেচ্‌তে নিমাইর এত আগ্রহ! নইলে নিজে গা করে' টিকিট্‌ বেচ্‌বার মতো ছেলেই নয় সে!

সরলা যেন নিমাইর মনের সমস্ত গলি-ঘুঁজি চিনে ফেলেছে।

চল্‌ল ফের শহরের দিকে। যদি রাস্তায় দেখা হয়।

ক্ষুধায় শরীর টা টা কর্‌ছে,—সরলার হুঁস্‌ নেই। ও এই অবিচারের প্রতিবিধান চায়,—যে তার প্রেমিক, যে তার সর্ব্বস্ব,—তার কাছে।

কোথাও নিমাইর দেখা নেই। যদি গেলই, সরলাকে কেন সঙ্গে নিয়ে গেল না?

এই ভেবে সরলার কান্না আরো বেড়ে গেল। রাস্তার পুলের কাছে শ্রান্ত হ'য়ে সেই রোদে সরলা নিমাইর র‍্যাপার-খানা জড়িয়ে শুয়ে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই হরি আর তার মা সরলাদের বাড়ি এসেছে।

হরি বল্লে—আমাদের জন্য পাশ্‌ রেখে গেছে, ভূতি-দি?

হরি নতুন জামা-কাপড় পরে' এসেছে, হাতে একটা খেল্‌না রিষ্ট-ওয়াচ্‌ বাঁধা, মাথায় দিব্যি টেরি বাগানো। হরির মাও কাপড় কেচে' শুকিয়ে পরে' এসেছে।

ভূতি বল্লে—পাশ্‌ রেখে যায় নি। বলেছে, টিকিট্‌

নিতে দরজায় যে থাক্‌বে তাকে সরলার নাম কর্‌লেই বসবার জায়গা করে' দেবে।

হরি ব্যস্ত হ'য়ে বল্লে—তবে আগে-ভাগে চল, ভুতি-দি, জায়গা পাওয়া যাবে না। বেজায় ভিড় হ'য়ে যাবে। আর কাপড় বাছ্‌তে হবে না, একখানা এম্‌নি পরে' চল।

ভুতি ধম্‌ক দিয়ে উঠ্‌ল—এখনো আরম্ভ হ'তে দু' ঘণ্টা বাকি—

ভুতিও তার সাধ্যমত সেজে নিল। তিন জনে বেরিয়ে পড়ল,—হরি আগে আগে, বড় বড় পা ফেলে হাত দুলিয়ে দুলিয়ে যাচ্ছে। পথ ঘাট ওর মুখস্থ।

দারুণ সোর-গোল,- লোকে গিস্‌গিস্ কর্‌ছে। বগলা-বাবুর ভবিষ্যৎবাণী আংশিক রূপেও সফল হয় নি। হরি বল্লে—বড্ড দেরি হ'য়ে গেছে, ভুতি-দি। জায়গা পেলে হয়। মেয়েমানুষগুলো চল্‌তেই পারে না, কাপড় পর্‌তেই তিন ঘণ্টা।

থিয়েটার আরম্ভ হ'তে এখনো কিছু দেরি আছে। হরি দরজার সাম্‌নের লোকটিকে গিয়ে গম্ভীরভাবে বেমালুম বল্লে—সরলা-দিকে ডেকে দাও ত' ?

লোকটি বল্লে—কে সরলা-দি ?

হরি অবাক্ হবার ভাণ করে' বল্লে—কে সরলা-দি ? বাঃ,—তুমি নতুন লোক বুঝি ? সরলা-দি, যে য়্যাক্টো কর্‌ছে, কাগজে যার ছবি উঠেছে, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কাম্‌ড়ে সেই যে একটা মরা মানুষ খুন কর্‌তে ছুরি নিয়ে ছুটেছে—সেই সরলা-দি !

ভুতি বুঝিয়ে বলে—এই নাটকে মালতীর পার্ট নিয়ে যে নাম্‌বে আজ।

লোকটি বিরক্ত হ'য়ে বল্লে—সরলা-ফরলা বলে' এখানে কেউ নেই। মালতীর পার্টে যে নাম্‌ছে তার নাম চমৎ-কারিণী দাসী,—সরলা আবার কে ?

—বাঃ, আমাদের বলেছে গেটে এসে তার নাম বল্‌লেই আমাদের ছেড়ে দেবে, ভেতরে জায়গা করে' দেবে,—তার নাম সবাইর মুখে মুখে !

লোকটি বল্লে—তোমাদের সরলা-দিটি কিন্তু ভারি সৌখীন্। যাও, জায়গা ছাড়, অন্য লোকদের পথ করে' দাও।

হরি বিমর্ষ হ'য়ে বল্লে—ঢুক্‌তে দেবে না ? দেখ না ভেতরে গিয়ে, সরলা-দি বসে' আছে, হয় ত' সাজ্‌ছে। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, ভদ্রলোক, আমাদের ছেড়ে দাও।

ভদ্রলোক কথা গ্রাহ্য করে না।

ও দিকে ঘণ্টা পড়ে, সিন্ ওঠে, য়্যাক্টিং সুরু হয়।

হরি এবার গলা ছেড়ে কেঁদে ওঠে। হরির মা বলে—কি দারুণ মিথ্যুক্ এই ছুঁচো হারামজাদি,—কি ভীষণ চালবাজ ! এ যে জাঁহাবাজ ডাকাত বাবা,—একে পুলিশে দিতে হয়।

ভুতি দুম্ দুম্ করে' পা ফেল্‌তে ফেল্‌তে বলে—ফিরুক ও বাড়ি। ওর দেমাক আমি ভাঙ্‌ছি অটলবাবুকে দিয়ে।

হরি কিছুতেই আস্‌বে না, বেড়ার ফাঁকে চোখ রেখে ও কি দেখ্‌ছে ওই জানে। মা যত টানে ও ততই বেড়া আঁক্‌ড়ে' থাকে। শেষে মা'র হাতের চার পাঁচটা কিল্ খেয়ে হরি হেরে যায়। হরির চীৎকারে বাইরের অন্ধকার বিদীর্ণ হ'তে থাকে।

সরলার যখন ঘুম ভাঙে—তখন থিয়েটার আরম্ভ হ'বার সময় কাবার হ'য়ে গেছে।

নিশ্চয়ই এখনো নিমাই ফেরেনি,—রমেশবাবুর উদ্বেগ অশান্তির আর সীমা নেই। চমৎকারিণী খুব জব্দ হয়েছে। কৃতার্থের ফুটুনি ঘুচেছে। খুব মজা ! নিশ্চয়ই থিয়েটার আর হয় নি, লোকেরা খুব গালাগাল কর্‌ছে, রমেশবাবুকে বাধ্য হ'য়ে পয়সা ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে।

মজা দেখ্‌তেই হয় ত' সরলা ও দিকে পা চালালো। কিন্তু একটু কাছে আস্‌তেই ওর সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে ভারি শীত কর্‌তে লাগ্‌ল,—এত শীতেও পিপাসায় গলা কাঠ হ'য়ে এল। দূরে ডে-লাইট্ দেখা যাচ্ছে। থিয়েটার হচ্ছে বৈ কি !

সরলা গেল এগিয়ে। ওর দম বন্ধ হ'য়ে আস্‌ছে।

ছুটে' গিয়ে দরজার লোকটিকে বল্লে—নিমাইবাবু এসেছেন ?

—সে কখন্—

—তাঁকে একটু ডেকে দিতে পারেন ?

—বাঃ, এই তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য হচ্ছে। উনি য়্যাক্ট-কর্‌ছেন যে—

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য! সরলার চোখ ফেটে' জল পড়্তে লাগ্লো। সমস্ত দৃশ্যটি সরলার মুখস্থ! সেই সব কথাগুলি নিমাইকে আবার চমৎকারিণী বল্‌ছে—সরলা যা বলেছিল আগে! কণ্ঠস্বরে সেই আবেগ, স্পর্শে সেই উত্তাপ! তার মনের কথাগুলি যা বইয়ের আখরে সরলার অজান্‌তে প্রকাশ পেয়েছিল তা চমৎকারিণীর মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে!

তবু নিমাই বলেছিল—তোমাকে পেয়ে সরলা, আমার মনে ভাবের জোয়ার আসে, তোমাকে না নামালে আমি ওদের ডুবিয়ে মার্‌ব।

ঈর্ষায় অভিমানে অপমানে কেঁদে সরলা ধূলার সঙ্গে মিশে' যেতে চায়।

কানে কিছুই আসে না বটে, কিন্তু সরলা চোখের সাম্‌নে সমস্ত হাব-ভাব আঁকা দেখ্‌তে পায়। সেই মোটা বেঁটে চমৎকারিণী তার মৃত নিমাইকে কোলে নিয়ে আদর করবে ভেবে সরলা নিজে নিজের চুল ছেঁড়ে, হাত কামড়ায়, কপালে করাঘাত করে।

ইচ্ছা করে একটা ক্ষুধিত আর্ত্তনাদের মতো ষ্টেজের ওপর গিয়ে ফেটে' পড়ে। বিকট চীৎকার করে' অভিনয়ের সমস্ত লজ্জা ঢেকে দেয়।

ক্ষুধায় সমস্ত গা অবশ,—নিমাইর খোঁজে হেঁটে' হেঁটে' পা একেবারে ভেঙে' পড়্‌তে চাইছে।

আস্তে আস্তে থিয়েটার ভেঙে যায়। কোলাহল করতে করতে লোক সরে' পড়্‌তে থাকে। ততক্ষণ সরলা র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে চুপ করে' বসে' থাকে। সবাই চমৎকারিণীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে বাড়ি ফেরে। প্রত্যেকটি কথা সরলার কানে আসে।

—খুনের সিন্‌টা কি রকম কর্‌ল? ওয়াণ্ডারফুল্।

—কি সুন্দর! অথচ কি ভীষণ! ভয় লাগে, ভালোও লাগে! পয়সা সার্থক, ভাই।

সরলা আর বসে না, বাড়ি চলে। চল্‌তে আর পারে না। কেঁদে কেঁদে মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গেছে।

নিঃঝুম পাড়া,—সবাই ঘুমিয়েছে। ভুতিও হয় ত'!

সদর খোলা ছিল।

ওর ঘরে এসে দেখে মিট্‌মিট্ আলো জ্বল্‌ছে। ভেতরে অটল একা বসে' বসে' মদ খাচ্ছে। সরলার সমস্ত শরীর কালিয়ে এল।

অটল তথনো বেহুঁস্ হ'য়ে পড়েনি, সরলাকে দেখেই ওর রক্ত ফুটে' উঠ্‌ল। হাতের মুঠিতে ধরা ছিল মদের গ্লাশটা, তাই মার্‌ল ছুঁড়ে' সরলার মাথা লক্ষ্য করে'।

বল্লে—শালির আমার থেটার করা হচ্ছে,—তিন দিন ধরে' ঘুরে' ঘুরে' আমি হায়রান্ হ'য়ে পড়েছি—

সরলা 'বাবা গো' বলে' ঘুরে' পড়্‌লো। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটেছে।

এতেও অটলের তৃপ্তি হয় না, জুতোটা দিয়ে সরলার পিঠের খাল্ ছিঁড়ে' দেয়। বলে—বলে কি না থেটারের দলে ভিড়ে' যাব,...মদের দাম দেবে না, রাত্তির বেলা বাড়ি আসার নাম নেই...

বলে, আর লাথি জুতো চল্‌তে থাকে।

সরলা অটলের পায়ের নীচে পড়ে' একেবারে ভেঙে' গেছে। বাড়ীউলি প্রথম মনে মনে মজা দেখে, পরে অটলকে থামাতে আসে। ভুতিই মাথায় ব্যাণ্ডেজ্ করে' দেয়।

ভোরবেলা সরলার যখন জ্ঞান ফিরে' আসে, তখন সারা গায়ে বিষম ব্যথা, জ্বর, মাথা ছিঁড়ে' পড়্‌ছে,—যেন সারা বছর ও কিছু খায়নি। পায়ের কাছের জান্‌লা দিয়ে সূর্য্যোদয় দেখা যাচ্ছে।

এত দুঃখেও ওর স্বপ্ন কাটেনি। ভোরের আলোয় মনে হচ্ছে যেন ওর কাছে ওর হিরণকুমার আসছে,—মাথায় তার সোণার মুকুট, তাতে পাখীর পালক গোঁজা।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

কবীর-পরিচয়

শ্রীঅনাথনাথ বসু

কবীরের পুণ্য-জীবনীর আলোচনা করিব। তাঁহার সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বাংলায় কিছু আলোচনা হইয়া গিয়াছে; কিন্তু মধ্যযুগের ভারতীয় ধর্ম্ম-সাধনার ইতিহাসে কবীরের স্থান যতখানি উচ্চে, তাহার তুলনায় সে আলোচনার পরিমাণ অতি সামান্যই বলিতে হইবে; সুতরাং ভূমিকার প্রয়োজন নাই।

জনশ্রুতি এই যে, কবীর ছিলেন রামানন্দের শিষ্য। গুরু রামানন্দ ছিলেন রামানুজীয় আচারী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব এবং শিষ্য-পরম্পরা-ক্রমে রামানুজের চতুর্থ অধস্তন ও রাঘবানন্দের সাক্ষাৎ শিষ্য।

গুরু রামানন্দের জন্ম-কথা, তাঁহার জীবনের ইতিহাস বিশেষ কিছুই আজ ও পাওয়া যায় না। কেহ বলেন, তিনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন ও আবার কাহারও মতে তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক; কেহ বলেন তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে আগত দক্ষিণী ব্রাহ্মণ, কেহ আবার বলেন তিনি কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ, তাঁহার জন্ম প্রয়াগে, কাশী তাঁহার সাধনার ক্ষেত্র।

অনেক বাদ্‌বিতণ্ডার পর ঐতিহাসিকগণ স্থির করিয়াছেন শেষোক্ত মতই অধিকতর প্রমাণিত এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগের মধ্যে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

এ ত' গেল তাঁহার জীবনের সন তারিখের কথা। এখানে না হয় একটা কিছু স্থির করা গেল। কিন্তু রামানন্দের সাধনার, তাঁহার দার্শনিক মতবাদের কথা সাক্ষাৎভাবে আমরা আরও অল্প জানি। তাঁহার রচিত মাত্র একটী পদ পাওয়া যায় শিখদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ "গ্রন্থসাহেবে"। * ইহাই আমাদের নিকট তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয়ের একমাত্র নিদর্শন। কিন্তু রামানন্দ তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার যে অমর পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে মানুষটীকে ভুল করিবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই। চামার রুইদাস তাঁহার দীক্ষার গৌরব লাভ করিয়াছিল, জাঠ ধনা তাঁহার শিষ্য, মুসলমান জোলা কবীর তাঁহার সাধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী। ইহাই জনশ্রুতি এবং জনশ্রুতি সম্পূর্ণই মিথ্যা নহে।

মধ্যযুগের ধর্ম্ম-সাধনার ইতিহাসে কবীরের স্থান কত উচ্চে তাহা ঐতিহাসিকমাত্রেই জানেন। এই পরম স্থান তিনি যে গুরুর কৃপায় লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের রেখাদর্শন দ্বারা অধিকতর পরিচিত শিষ্যের জীবনকাহিনীর মুখবন্ধ করিলাম, শিষ্যের জীবনের কথাটী স্পষ্টতর করিয়া বুঝাইবার জন্য।

এহেন গুরুর শিষ্য ছিলেন কবীর। কালের যবনিকা যেমন আজ গুরুর জীবনের কাহিনীকে অস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে, শিষ্যের জীবনেও ঠিক তেমনি ঘটিয়াছে। কোন্ অখ্যাত শতাব্দীর কোন্ বিস্মৃত বর্ষের বিস্মৃত দিনে কবীর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহার পর কত দিন চলিয়া গিয়াছে। এই সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে কবীরের সেই জন্ম সন ও তিথি ইতিহাসের পত্রে একেবারেই মুছিয়া গিয়াছে। অথচ রামানন্দের তুলনায় কবীর জনসাধারণের নিকট অধিকতর পরিচিত; তাঁহার বাণী এখনও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের দীনদরিদ্রের কুটীর হইতে ধনীর বিলাস-ভবনে, মন্দির তপোবনের স্নিগ্ধ ছায়ায় উদাসীন সাধু-সন্ন্যাসীদের কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে; তাঁহার সাখীগুলি প্রবচনের গৌরব লাভ করিয়াছে এবং আজও বিশ লক্ষ নরনারী তাঁহাকে তাহাদের গুরুর আসনে বসাইয়া স্মৃতিপূজা করিতেছে। ইয়োরোপ হইলে এতদিনে তাঁহার জন্মমৃত্যুর স্থান পাষাণ-ফলকে পরিচিহ্নিত হইয়া যাইত, তাঁহার তুচ্ছ স্মৃতিচিহ্নটী পর্য্যন্ত সযত্নে রক্ষিত হইত; অথচ আমাদের এই ভারতবর্ষে তাঁহার জীবনের সকল কথাই রহস্যাবৃত রহিয়া গেল, তাঁহার জন্মের তারিখ, মৃত্যুর তিথি, সকলই অস্পষ্ট হইয়া রহিল। তাঁহার জীবন-কাহিনীর প্রতি ঘটনাটীর সত্যতা সম্বন্ধে মতদ্বৈধের অবকাশ থাকিয়া গেল—ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে?

কিন্তু ইহাই ভারতবর্ষের বিশেষত্ব। ভারতবর্ষ তাহার মহাপুরুষগণের জীবনের ধর্ম্মসাধনার ইতিহাস রাখিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছে, সন তারিখের কঠিন বাঁধনে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে চায় নাই। জনপ্রবাদের দ্বারা তাঁহারা জনসমাজের হৃদয়ে বাসা বাঁধিয়াছিলেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর লোকের কাছে জীবন অতি সুস্পষ্ট, তাহার কিছুই অস্পষ্ট থাকিলে চলিবে না, সুতরাং শুধু সাধনার কথাই নহে, মহাপুরুষদের জীবনের প্রতি কাহিনীটীই স্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে, বিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিকের প্রতি ইহাই জনসমাজের আদেশ। সে আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া মধ্যযুগের এই সাধকের জীবনের কাহিনীর পর্য্যালোচনা করা যাক্।

কবীরের জীবনের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিবার উপাদানগুলি মোটামুটি তিনটী ভাগে ভাগ করা যায়—

(১) কবীরের রচনাবলী (২) জনশ্রুতি (৩) তৎসম্বন্ধে পরবর্ত্তী যুগে লিখিত বিবরণগুলি।

* ১৩৩৩ স'লের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত মল্লিখিত "রামানন্দ" শীর্ষক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

জনশ্রুতি ত অনেক কথাই বলে; তাহাদের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সকলেই সন্দিহান; কিন্তু সন্দেহমাত্রেরই একটা ভিত্তি আছে, তাহা যতই জীর্ণ ও ক্ষীণ হউক না কেন। জনশ্রুতিকে একেবারেই উড়াইয়া দেওয়া চলে না। এই জনশ্রুতিগুলি সমসাময়িক জনসমাজের উপর কবীরের প্রভাবের পরিজ্ঞাপক।

গুরু রামানন্দই প্রথম ধর্ম্মের বাণীকে সংস্কৃতের কঠিন নিগড় হইতে মুক্তি দিয়া জনসাধারণের প্রতিদিনের ভাষার উদার ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কবীর গুরু রামানন্দের এই পথ অবলম্বন করিয়া স্বদেশের ভাষায় নিজের বাণীর প্রচার করিলেন। তাঁহার ধর্ম্ম সর্ব্বজনের জন্ম, উদার, সরল, সহজ; তাঁহার বাণীও সর্ব্বজনগ্রাহ্য, সহজবোধ্য, সরল ও উদার হইয়াছিল। মৃতপ্রায় দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃতের নাগপাশে তিনি তাহাকে বদ্ধ করিতে চাহেন নাই। এই জন্যই আজও জনসাধারণের কণ্ঠে সে বাণী গীত হইয়া তাহাদের অন্তরের ক্ষুধা মিটাইতেছে।

কবীর বলিয়াছিলেন—

'সংসকিরত হৈ কূপজল ভাষ বহতা নীর'—সংস্কৃত বদ্ধ কূপজলের মত, দেশের ভাষা স্বচ্ছসলিলা নদীনীরের মত প্রবহমান, প্রাণবান্।

কিন্তু যে বাণী জনসাধারণের কণ্ঠ আশ্রয় করিয়া চলে তাহার মধ্যে বহু কিছু আবর্জ্জনা আসিয়া পড়ে।

এইজন্যই কবীরের রচনাবলীর প্রামাণিকতা সম্বন্ধেও কোন কোন সমালোচক সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এ কথা সত্য—কবীর তাঁহার জীবনকালে কিছুই লিখিয়া রাখিয়া যান্ নাই। তিনি বলিয়াছেন—

মসি কাগজ ছুয়ো নহীঁ কলম গহো নহিঁ হাথ।
চারিউ জুগকা মহাতম কবিরা মুখহিঁ জনাঈ বাত।

—মসী লেখনী ছুঁইলাম না; কবীর মুখে মুখেই চারি যুগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া গেল।

তাঁহার বাণীগুলি পরবর্ত্তীকালে তাঁহার শিষ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও রক্ষিত হয়। কবীরপন্থীদের প্রামাণিক গ্রন্থ বীজক কবীরের শিষ্য ভাগোদাস কর্ত্তৃক গ্রথিত হয়। ইহার পরেই বোধ করি কবীরের বাণীর প্রাচীনতম সংগ্রহ শিখদের "গ্রন্থসাহেবে" পাওয়া যায়। "গ্রন্থসাহেব" ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে পঞ্চম শিখগুরু অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল। কবীরের জীবনকালে তাঁহার রচনাগুলি লিখিত হয় নাই বলিয়া পরবর্ত্তীকালে সংগৃহীত রচনাবলীর মধ্যে কিছু কিছু প্রক্ষিপ্ত রচনার নিঃসংশয় পরিচয় পাওয়া যায়। এইজন্যই কেহ কেহ এই সকল গ্রন্থাবলীর প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার সবটুকু স্বীকার করা যায় না।

মধ্যযুগে, কবীরের পরে তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে নাভাজীর ভক্তমাল ও প্রিয়াদাসজীর ভক্তমালের টীকাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নাভাজীর ভক্তমালে কবীরের সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপেই বলা হইয়াছে; প্রিয়াদাসজীর টীকায় কবীরের সম্বন্ধে অনেকগুলি কাহিনীর উল্লেখ করা হইয়াছে।

বিংশ শতাব্দীতে কবীর সম্বন্ধে যে সমস্ত আলোচনা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে Macauliffe কৃত Sikh Religion নামক গ্রন্থসাহেবের অনুবাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহাতে গ্রন্থসাহেবে প্রাপ্ত কবীরের রচনাবলীর ইংরেজীতে অনুবাদ করা হইয়াছে। কবীরের জীবনী ও ধর্ম্মমত সম্বন্ধে ইহার পূর্ব্বে যে সকল আলোচনা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে মনীষি উইলসনের The Religious Sects of The Hindus এবং ৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের বিখ্যাত গ্রন্থ ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দীতে কবীর "কসৌটী" নামক গ্রন্থটী জনৈক শিখ ভক্ত-কর্ত্তৃক লিখিত হয়; ইহাতে তৎকালে কবীরপন্থী ভক্ত ও সাধকদিগের মধ্যে কবীরের সম্বন্ধে যে সকল মতামত প্রচলিত ছিল সেইগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী সময়ের বহু লেখকই এই "কবীর কসৌটী" হইতে বহু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন।

এই সময়েই মৌলভী গোলাম সরবর খজিলত্-উল্-অস্‌পিয়া নামক উর্দ্দু গ্রন্থে কবীর সম্বন্ধে তাঁহার মুসলমান ভক্তগণের মতামত সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আধুনিক সময়ে বাংলাদেশে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন কবীরের বিষয় নানা ভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং চারি ভাগে এই ভক্ত কবীর মধুর বাণী সংগ্রহ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালী পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

ইহা ছাড়া কাশী নাগরী-প্রচারিণী সভা হইতেও পণ্ডিত অযোধ্যাসিংহ উপাধ্যায়ের সম্পাদকতায় "কবীর রচনাবলী" নামে কবীরের বাণীর একটী উৎকৃষ্ট সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে; গ্রন্থের বিস্তৃত ভূমিকায় সম্পাদক কবীরের সম্বন্ধে নানা কথার আলোচনা করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ হিন্দী সাহিত্যিক 'মিশ্রবন্ধু'ও তাঁহাদের "হিন্দীনবরত্নে" কবীরের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ রচনায় উল্লিখিত গ্রন্থগুলি হইতে নানাভাবে সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে; এজন্য প্রবন্ধ-লেখক সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছেন।

কবীরের সম্বন্ধে রচিত প্রাচীনতম গ্রন্থগুলিতে তাঁহার জন্ম মরণের ও জীবন-কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক বিবরণই পাওয়া যায় না। নাভাজী মাত্র ছয়টী পংক্তিতে কবীরের যে পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন তাহা শুধু তাঁহার সাধনারই পরিচয়, জীবন-কথার নহে। "ভক্তিহীন ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলিয়া কবীর প্রচার করিলেন; তিনি বলিলেন যজ্ঞ যাগ ব্রত দান ভজন বিনা সকলই মিথ্যা। অপক্ষপাত হইয়া তিনি হিন্দু ও তুরুককে তাঁহার শব্দ, রমৈনী ও সাখীগুলি দিয়া পথ দেখাইলেন।"

প্রিয়াদাস তাঁহার ভক্তমালের টীকায় কবীরের সম্বন্ধে যে সকল অলৌকিক কাহিনীর উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার রামানন্দের নিকট আত্মগোপন করিয়া দীক্ষাগ্রহণ, সেকেন্দর লোদীর অত্যাচার প্রভৃতি—সেইগুলিই সম্ভবতঃ পরবর্ত্তীকাল প্রচলিত সকল জনশ্রুতির প্রধান উপজীব্য হইয়াছিল।

কবীরপন্থীগণ বলেন কবীর এক বিধবা ব্রাহ্মণীর গর্ভে রামানন্দের আশীর্ব্বাদে জন্মগ্রহণ করেন। যুবতী লোকলজ্জার ভয়ে কাশীর অনতিদূর লহর সরোবরে বিকচ পদ্মদলের উপর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়

এবং কাশীর মুসলমান জোলা নীরু ও তাহার স্ত্রী নীমা তাঁহাকে কুড়াইয়া লইয়া গিয়া পালন করে।

কবীরের জন্মকথা এমনই রহস্যময়; কুড়ানো ছেলের জন্মকথা চিরদিনই রহস্যাবৃত থাকিয়া যায়; তাঁহার পিতামাতা, কুলপঞ্জী নির্দ্দেশ করা এক হিসাবে যেমন শক্ত অন্য হিসাবে তেমনই সহজ। কিন্তু কবীরের জন্ম-রহস্যের মধ্যে এইটুকু ঠিক পাওয়া যায় যে, জন্ম তাঁহার যেখানেই হোক্ না কেন, তিনি কাশীর এক মুসলমান জোলার ঘরে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এবং নিজের জীবনেও পালিত পিতার বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

মহাপুরুষকে নিজের ক্ষুদ্র পংক্তিতে বসাইয়া গৌরব বোধ করিবার লোভ সকলেরই আছে। কবীরের বর্ত্তমান শিষ্যগণ অনেকাংশে হিন্দু সুতরাং গুরুর ললাটে হিন্দুত্বের ও ব্রাহ্মণের আভিজাত্যের তিলক অঙ্কিত করিয়া দিবার লোভেই যে এই কল্পিত জনশ্রুতির জন্ম হয় নাই, এ কথা আজ নিঃসংশয়ে বলা যায় না; কারণ কবীর বার বার বলিয়াছেন—
(জনৈক ব্রাহ্মণের উদ্দেশে)

"তূ বামহন মৈঁ কাশীক জুলহা বুঝৌ মোর গিয়ানা"

—তুমি ব্রাহ্মণ আর আমি কাশীর (দীন) জোলা, আমার জ্ঞানের সীমা বুঝিতে পারিবে।—

এইরূপে কবীরের রচনার মধ্যেই তিনি যে নীচকুলজাত নিরক্ষর জোলা ছিলেন সে কথা বারবার পাওয়া যায়।...তিনি মুসলমানই ছিলেন এবং জোলাও ছিলেন।

কিন্তু কবীরের কুলপঞ্জী না হয় একরকম স্থির হইল। তাঁহার জন্মপঞ্জী—কোন্ সনের কোন্ শুভ দিনে তিনি কাশীর নীরু জোলার কুটীরে নীমার অঙ্কে জন্মলাভ করিয়া কুল পবিত্র এবং জননীকে কৃতার্থা করিয়াছিলেন, তাহার উদ্দেশ পাওয়া আরো কঠিন হইয়াছে। একে ত' কবীরের জন্মের সন তারিখ একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; তাহার উপরে আবার ভারতের সাধু-সন্ত কুলে যে একাধিক কবীর ছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এই কবীরনাম-ধেয় বিভিন্ন সাধু-সন্তের তালিকা Westcott তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং রহস্য আরো গভীর হইয়া উঠিয়াছে।

কবীর-পন্থীগণ বলেন, গুরুর জন্ম-সংবত ১২০৫ (খৃ ১১৪৯) ও তিরোভাব ১৫০৫ সংবতে (১৪৪৯ খৃঃ অব্দে)। এই সুদীর্ঘ পরমায়ু এই সংশয়বাদের যুগে কেহই হয়ত স্বীকার করিবেন না। কবীর কসৌটীতে লেখা হইয়াছে তাঁহার জন্মমৃত্যুর তারিখ সংবত ১৪৫৫ এবং ১৫৭৫। ভক্তিসুধাবিন্দুকার লিখিয়াছেন সংবত ১৪৫১ এবং সংবত ১৫৫২ই তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু সংবত। এমনই ভাবে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন হিসাব দিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের ঐতিহাসিকগণের মধ্যে Macauliffe তাঁহার Sikh Religion নামক গ্রন্থে ১৩৯৮ ও ১৫১৮ খৃষ্টাব্দকে কবীরের জন্ম ও মৃত্যু সন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। Kabir and the Kabirpanth নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের লেখক Westcottএর মতে ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম ও ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ভাণ্ডারকর মহাশয় তাঁহার Vaishnavism and Saivism নামক গ্রন্থে Macauliffeএর মতই গ্রহণ করিয়াছেন। ইংরেজ লেখকগণের অনেকেই দীর্ঘ পরমায়ুর সম্ভাবনা অস্বীকার করেন। সুতরাং সাধারণতঃ যে হিসাবে কবীরকে শতাধিক বৎসর পরমায়ু দান করা হয়, সে হিসাব তাঁহারা অপ্রামাণিক বলিয়াই মনে করেন; অথচ আমাদের দেশের সাধকদের এরূপ দীর্ঘ পরমায়ুর কথা এখনও শোনা যায় এবং এরূপ দীর্ঘজীবী লোক দেখিয়াছেন এমন লোকও বিরল নহে।

এ দেশীয় লেখকদিগের মধ্যে পণ্ডিত অযোধ্যাসিংহ উপাধ্যায় তাঁহার কবীর রচনাবলীর ভূমিকায় কবীর কসৌটীতে প্রদত্ত জন্ম-সন ও ভক্তিসুধা-বিন্দুস্বাদে প্রদত্ত মৃত্যু-সন প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মিশ্রবন্ধুও উপাধ্যায় মহাশয়ের মত গ্রহণ করিয়াছেন। কবীরের জীবনকালে সেকেন্দার লোদি দিল্লীর রাজতক্তে উপবিষ্ট; তাঁহার রাজ্যকাল ১৪৮৯ হইতে ১৫১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। সেকেন্দার লোদী ও কবীর সম্বন্ধে বহু জনশ্রুতিই দেশে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু সেকেন্দর লোদির ইতিহাস কবীরের সময়ের নিশ্চিত নির্দ্ধারণে বিশেষ সহায়তা করে না। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় ১৩৯৮ ও ১৫১৮ খৃষ্টাব্দকে কবীরের জন্ম ও মৃত্যু-সন হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

কবীরের মৃত্যু সম্বন্ধে নিম্নলিখিত দোহাটী সুপরিচিত—

পংদ্রহ সৌ পচ্হত্তর কিয়া মগহরকো গৌন।
মাঘসুদী একাদশী মিল্যো পৌন মেঁ পৌন॥

এখানে জনশ্রুতি একান্ত নিশ্চিতভাবে কবীরের মৃত্যু সন ও তিথি নির্দ্দেশ করিয়াছে। তাহাকে অস্বীকার করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই।

সুতরাং মনে হয় কবীরের জন্ম হয় ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে এবং মৃত্যু হয় ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে। তিনি জন্মলাভ করিয়াছিলেন মুসলমান জোলা নীরুর গৃহে যবনী মাতা নীমার অঙ্কে।

ইহা ছাড়া কবীরের সম্বন্ধে আর যাহা কিছু জানা যায়, তাহা একান্তই জনশ্রুতিমূলক।

তিনি রামানন্দের শিষ্য ছিলেন বলা হইয়াছে। সেকেন্দার লোদী না কি সে যুগের বিশিষ্ট মুসলমান সাধু সেখতকীর প্ররোচনায় তাঁহার উপর বহু অত্যাচার করিয়াছিলেন।

তাঁহার বিবাহের কথাও বলা হইয়াছে; বনখণ্ডী বৈরাগীর পালিতা কন্যা লোঈকে তিনি বিবাহ করেন এবং লোঈএর গর্ভে তাঁহার কমাল অর্থাৎ ভাগ্যের পরিপূর্ণতা ও কমালী নামে পুত্রকন্যার জন্ম হয়।

কবীরের বিবাহ ব্যাপারটীকে সকলে কিন্তু স্বীকার করেন না।

এই সকল বিচিত্র বিরুদ্ধ মতবাদের মধ্যে কোন একটীকে প্রামাণিক বলিতে পারাও যেমন কঠিন, তাহার যুক্তি পাওয়াও তেমনি কঠিন। যদি বলি, কবীর হিন্দু ছিলেন না, তাহা হইলেও ঠিক্ বলা হয় না; কারণ, রচনা লেখকের স্বরূপের পরিচয় দেয়, এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, কবীরের সাধনার ভিত্তি হিন্দু ধর্ম্মেরই উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার উপর মুসলমান প্রভাব অপেক্ষা হিন্দু প্রভাবই অধিকতরভাবে

পড়িয়াছিল। অথচ দেখি, তিনি নিজের রচনার মধ্যে বারবার বলিতেছেন "আমি জোলা"।

জোলার পুত্র বা পালিত পুত্র যে কিরূপে সে যুগের শ্রেষ্ঠ হিন্দু সাধক রামানন্দের প্রসাদ লাভ করিল, এবং সে ব্যাপার কিরূপে সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের প্রাণকেন্দ্র কাশীতেই ঘটিল, ইহাও বিস্ময়ের বিষয় হইয়া আছে।

রামানন্দ কবীরের গুরু ছিলেন, এ কথায় আর ভুল করিবার উপায় নাই; কারণ তাঁহার নিজের বাণীতেই পাই—

"কাশীমেঁ হম্ প্রগট ভয়ে হৈ রামানন্দ চেতায়ে" কাশীতে আমার জন্ম হইল, রামানন্দ আমাকে দিলেন চেতনা।—

এরূপে তাঁহার রচনার মধ্যে বহুবারই কবীর রামানন্দকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

মুহসীন ফনি দবিস্তানে লিখিয়াছেন—"কবীর ছিলেন একেশ্বরবাদী। জোলার গৃহে তাঁহার জন্ম। অধ্যাত্মসাধনার পথের সন্ধানে তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্ম্মের সাধুর নিকটে গেলেন; অবশেষে রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।"

কবীরপন্থীগণও রামানন্দকে কবীরের গুরু বলিয়া স্বীকার করেন।

সুতরাং Westcott প্রভৃতি কোন কোন লেখক যে কবীরকে সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত এবং সে যুগের বিখ্যাত মুসলমান সাধক সেখ তকীর শিষ্য বলিয়া মনে করেন, তাহার বিশেষ কোন কারণ নাই। কবীরের রচনার মধ্যে সুফীমতের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে এ কথাও কিছু পরিমাণে সত্য; কিন্তু এ কথাও ঠিক্—কবীরের সাধনার প্রতিষ্ঠা হিন্দু ধর্ম্মেরই উপর; এবং মধ্যযুগে ঠিক এই সময়টাতে ও ইহার কিছুদিন পর পর্য্যন্ত হিন্দু বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও মুসলমান সুফী ধর্ম্ম পরস্পরকে বহু পরিমাণে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল; এবং সম্ভবতঃ কবীরই এইপ্রকার মিলন-সাধনের প্রথম প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুতরাং আজ যে কবীরকে লইয়া হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কাড়াকাড়ি চলিবে তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই।

এই ভারতবর্ষে কয়েক শতাব্দী আগেও এমন একটা সময় গিয়াছিল, যখন ধর্ম্মসাধকের নিকট জাতিভেদ সাধনার চেয়ে বড় হইয়া উঠিতে পারে নাই। সেদিনও পিপাসু কবীর মুসলমান হইয়াও অন্তরের তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য হিন্দু সাধক রামানন্দের নিকট যাইতে পারিয়াছিলেন এবং রামানন্দও দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁহাকে আপনার বক্ষে স্থান দিয়া তাঁহার তৃষ্ণা মিটাইতে পারিয়াছিলেন। সেদিনও জাতিনামধর্ম্মহীন সাধক কবীরের সত্য-আহ্বানে হিন্দু মুসলমান একত্র মিলিতে পারিয়াছিল।

বাল্যকালেই কবীরের জীবনে ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও পিপাসা জন্মিয়াছিল। অন্তরের সত্যের জ্যোতিতে তিনি পথের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহার জন্য কোন সাধন-প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় নাই। যে জন পথের সন্ধান পাইল, ঘরের বিধিনিয়ম তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। জোলার ছেলে তাঁত ছাড়িয়া ধর্ম্মে মাতিল। মাতা নীমাও সহ্য করিতে পারিল না, লোকেও সহ্য করিল না। তাহারা বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

কবীরের উপর হিন্দুপ্রভাব এতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল যে, তিনি না কি কণ্ঠ-তিলক পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতেছিলেন; কাশীতে এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে।

ঘর ও পর যখন কবীরকে এমনভাবে বিদ্রূপ করিতেছিল, তখন কবীর বলিলেন "আমি সত্যের সন্ধান পাইয়াছি।"

লোকে বলিল—"তোমার কাছে যে মুক্তিমন্ত্রের দীক্ষা লইব—তুমি কে—তুমি যে 'নিগুরা।' যার গুরু নাই তার কোন গুণই আমরা মানিব না।"

তখন মুসলমান ধর্ম্মেও পুরামাত্রায় গুরুবাদ চলিতেছিল, হিন্দু ধর্ম্মে ত' ছিলই।

কবীর এই 'নিগুরা" হওয়ার অপবাদ ঘুচাইতে চাহিলেন; তিনি গুরুর সন্ধানে বাহির হইলেন। দবিস্তানে মহসীন ফনি বলিয়াছেন তিনি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই গুরুর সন্ধান করিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরের তৃষ্ণা মিটাইতে পারে—তাঁহার সাধনার যোগ্য হয় এমন কাহাকেও পাইলেন না। তখন রামানন্দের কথা তাঁহার মনে হইল; কিন্তু রামানন্দ কি তাঁহার মত বিধর্ম্মীকে শিষ্যত্বে দীক্ষা দিবেন? সহজে যে দিবেন না এ কথা সত্য; কিন্তু গুরু তাঁহাকেই করিতে হইবে; সুতরাং উপায় খুঁজিতে হইল।

মণিকর্ণিকার পাষাণ-বিছান তীর্থে রামানন্দ প্রতিদিন প্রত্যূষের অন্ধকারে স্নান করিয়া ফিরিয়া যাইতেন। সেই পাষাণের ছায়ার অন্তরালে কবীর নিজেকে গোপন করিয়া শুইয়া রহিলেন; তাঁহার অঙ্গে রামানন্দের পদস্পর্শ হইল; তিনি "রাম" "রাম" বলিয়া উঠিলেন। কবীর এই রামমন্ত্র গ্রহণ করিয়া নিঃশব্দে গৃহে ফিরিলেন; রামানন্দ কিছুই জানিলেন না।

এবার যখন লোকে কবীরকে 'নিগুরা' বলিল, কবীর বলিলেন, "আমি ত' গুরু পাইয়াছি—আমার গুরু যে রামানন্দ।" লোকে রামানন্দের কাছে ছুটিয়া গেল "তুমি না কি এক জোলাকে দীক্ষা দিয়াছ?" রামানন্দ বলিলেন "কই, জানি না ত'।" "সে যে বলে"; রামানন্দ, বলিলেন, "তাহাকে ডাক।" কবীর আসিলেন, তিনি বলিলেন "তুমিই আমার গুরু। তুমি যে আমায় মণিকর্ণিকার তীর্থে দীক্ষা দিয়াছ—আমার অঙ্গে পাদস্পর্শ করিয়া, মন্ত্র দিয়াছ 'রাম' 'রাম'। সব শুনিয়া রামানন্দ কবীরকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "তুমি আমারই শিষ্য।"

এই কাহিনীর মধ্যে রামানন্দ ও কবীরের নাম সংযুক্ত করিবার একটী বিশেষ চেষ্টা রূপ গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু তাহাতে রামানন্দ বা কবীর কাহারও চরিত্রের মহত্ত্ব বাড়ে নাই, বরং হয় ত একটু কমিয়াছে। কবীরের চরিত্রে আরোপিত শঠতার উদ্দেশ্য যাহাই হোক্ না কেন, তাহা শঠতাই এবং কোন উদ্দেশ্যই শঠতাকে মহৎ করিয়া তুলিতে পারে না। এই কাহিনীটাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে এই জন্য নানা দ্বিধা হয়। সুতরাং মনে হয় এ দুইর মধ্যে কবীর ও রামানন্দকে যুক্ত করিবার জনসাধারণের একটী ব্যর্থ চেষ্টা ফুটিয়া উঠিয়াছে। রামানন্দের দীক্ষা কবীর হয় ত' সহজেই পাইয়াছিলেন; কিন্তু লোকে ভাবিল, এই দীক্ষা-

গ্রহণের কাহিনী লইয়া কবীরের ধর্ম্মপিপাসার কথাটা আরো পল্লবিত করিয়া বলা যাইতে পারে ; এইভাবে কবীরের মহত্ত্ব বাড়াইবার চেষ্টায় তাহারা রামানন্দের চরিত্রে যে ক্ষুদ্রতা আরোপিত করিল, তাহার প্রতি দৃষ্টি দিবার অবসর জনসাধারণের ছিল না।

এ স্থলে এ কথাও বলা উচিত যে, কবীর ও রামানন্দের সম্বন্ধ রহস্যময়ই রহিয়া গিয়াছে। কবীরের রচনায় স্থানে স্থানে রামানন্দের নাম গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইলেও, রামানন্দ আজ যে রামাৎ সম্প্রদায়ের গুরু ও প্রতিষ্ঠাতারূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, সে সম্প্রদায়ের দীক্ষামন্ত্র এবং কবীর-পন্থীদের দীক্ষামন্ত্র এক নহে এবং কবীরের 'রাম' ও রামাৎ-সম্প্রদায়ের 'রাম' এক নহে।

তবে এ কথা নিশ্চিত ভাবে বলা যাইতে পারে, দীক্ষা-হিসাবে হয় ত কবীর রামানন্দের উত্তরাধিকার লাভ না করিলেও, কবীর রামানন্দের চিন্তা ও সাধনা-সম্পদের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

কবীরের মধ্যজীবনের ইতিহাস সম্বন্ধে নিশ্চিত ভাবে কিছু জানা যায় না। শুনা যায় নাকি সেখ তকীর প্ররোচনায় সেকেন্দর লোদী তাঁহার উপর বহু অত্যাচার করিয়াছিলেন এবং কবীর বহু অলৌকিক উপায়ে তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া বাদশাহকে পরাজিত করিয়াছিলেন। প্রিয়াদাসজীর ভক্তমালের টীকায় এরূপ কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ আছে। এখানে সেগুলির পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

কবীর জীবনে জোলার বৃত্তিই অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন ; কিন্তু সাধনার প্রথম অবস্থায় যখন অন্তরে প্রবল বৈরাগ্য আসিয়াছিল, তখন হয় ত কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার কর্ম্মে ঔদাসীন্য দেখা দিয়াছিল। গ্রন্থ সাহেবে সঙ্কলিত একটী সুন্দর পদে কবীরের সে সময়কার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

মুসি মুসি রোহৈ কবীরকী মায়।
এ বারিক কৈসে জীবহি রঘুরায় ॥
তমুনা বুননা সভ তজ্যো হৈ কবীর।
হরিকা নাম লিখি লিয়ো শরীর ॥
জব লগ তাগা বাহউঁ বেহী।
তব লগ বিসরৈ রাম সনেহী ॥
ওছী মাত-মেরী, জাতি জুলাহা,
হরি কা নাম লহ্যো মৈঁ লাহা ॥
কহত কবীর সুনহু মেরী মাঈ।
হমরা ইনকা দাতা এক রঘুরাঈ ॥

কবীরের মাতা কাঁদিয়া বলে, হায় রে, এ শিশু বাঁচিবে কেমন করিয়া। এ যে সকল কাজ ছাড়িয়া হরিনামের তিলকে অঙ্গ অঙ্কিত করিয়া দিল। কবীর বলিলেন, মাগো, যে সময়টুকু যায় বুনিতে, সে সময়ে আমি যে হরিকে ভুলিয়া যাই। (সেই সামান্য বিরহও আমি সহ্য করিতে পারিব না)। দুর্ম্মতি আমি, জাতিতে জোলা—হরিনামের মুক্তিমন্ত্র একবার পাইয়া ছাড়িব না। মাগো, শোন, আমাদের সকলেরই ক্ষুধা মিটাইবার ভার রঘুরায় লইয়াছেন, তখন আর ভাবনা কি ?

কিন্তু যখন কবীর অন্তরের সত্যের পরিচয় পাইলেন, তখন তাঁহার সকল মোহ কাটিয়া গেল। তিনি পৈত্রিক বৃত্তি গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে ভক্ত কবীরের দুঃখ দূর করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান কিরূপে ছদ্মবেশে তাঁহার গৃহে আসিয়া অর্থ দিয়াছিলেন, সে বিষয়েও কয়েকটী অলৌকিক কাহিনীর উল্লেখ প্রিয়াদাসজীর গ্রন্থে পাওয়া যায়।

কবীর সত্যের সন্ধান লাভ করিয়াছেন শুনিয়া বহু লোকে তাঁহার কাছে আসিতে লাগিল ; তাঁহার কুটীর জনতার কোলাহলে মুখর হইয়া উঠিল ; কবীরের তাহা ভাল লাগিল না ; ভগবান কি বিশ্বকে তাঁহার গৃহে আনিয়া সেই কোলাহলের অবসরে নিজে পলাইবেন? তখন বিশ্বকেই ত্যাগ করিতে হইল। তিনি বারবণিতাকে আমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনিলেন ; লোকে ধিক্কার দিতে দিতে ফিরিয়া চলিয়া গেল ; কবীরও শান্তি পাইলেন।

সাধনার পরবর্ত্তী অবস্থায় কবীরের আর এই নির্জ্জনতার ও বৈরাগ্যের প্রয়োজন রহিল না। তিনি গৃহ সংসারে ফিরিয়া তাহারই কোলাহলের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিলেন ; সমস্ত বিশ্বের বিচিত্র কোলাহলের মধ্যে তিনি অসীমের আহ্বান ও প্রকাশ দেখিলেন। কবীর তখন সন্ন্যাসকে অস্বীকার করিলেন। যে সাধকের নিকট জীবনের ছোট বড় সকল কাজ, সকল সম্বন্ধের মধ্যে বিশ্বেশ্বরের ওতপ্রোত প্রকাশ রহিয়াছে, এবং যাহার কাছে ধর্ম্মসাধনার পথ আমাদের প্রতিদিনের জীবন-যাত্রার পথ হইতে স্বতন্ত্র নহে, তিনি যে এভাবে সন্ন্যাসকে অস্বীকার করিবেন ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। কবীরের ব্রহ্ম সকল সীমাকে পূর্ণ করিয়াই সকল সীমার অতীত ; তিনি একান্ত সত্য ; সমস্ত জগতের বৈচিত্র্যের মধ্যে সেই অরূপের লীলা চলিতেছে। কল্পনার দ্বারা ব্রহ্মনিরূপণ করিতে হইবে না ; সর্ব্বত্র সমাহিত ব্রহ্মের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিতে হইবে ; তবেই ব্রহ্মরসের আস্বাদ পাওয়া যাইবে। কিন্তু এই আস্বাদনের জন্য বাহিরে যাইবার প্রয়োজন নাই, অন্তরের আবরণ উন্মোচন করিলেই তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে। এই আবরণ উন্মোচন করিবার জন্য কোন বিশেষ বাহ্য প্রক্রিয়ার প্রয়োজন নাই, নিজেকে সহজ করিয়া লইতে হইবে, নিরুপাধি হইতে হইবে। এই নিরুপাধি কথাটীর অর্থ নহে জগৎকে ত্যাগ করা, অস্বীকার করা। জগৎকে অস্বীকার করিলে যে জগৎ-কর্ত্তাকেও অস্বীকার করা হইবে।

ইহাই মোটামুটি কবীর-দর্শন। এরূপ যাহার চিন্তা সে লোক সন্ন্যাস ছাড়িয়া প্রতিদিনের জীবনের সুখ-দুঃখের মধ্যেই সাধনার পথ খুঁজিয়া পাইবে। তাই আমরা দেখি, কবীর পৈতৃক ব্যবসায় ছাড়িয়া গৈরিক গ্রহণ করেন নাই ; বরং তিনি বারবার বলিয়াছেন, আমি জোলা, সুতাবোনাই আমার কাজ।

যে মনোভাবের জন্য কবীর সন্ন্যাসকে অস্বীকার করিয়া সংসারকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং নিজের পৈত্রিক বৃত্তি অবলম্বনে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে অগৌরব বোধ করেন নাই, ঠিক সেই কারণেই হয় ত তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধে নিশ্চিত ভাবে কিছুই বলা যায় না। হয় ত' তিনি বিবাহিতই ছিলেন, এবং পরবর্ত্তী কালের

তাঁহার সাম্প্রদায়িক ভক্তগণ এই বিবাহের ব্যাপারটাকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন। ভারতবর্ষে চিরকালই সন্ন্যাসের গৌরব এবং এক বৈদিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিলে সকল সময়েই গৃহীসাধক ও ধর্ম্মদ্রষ্টাকে জনসাধারণ সন্ন্যাসাশ্রমী ধর্ম্মদ্রষ্টা অপেক্ষা হীনভাবেই দেখিয়া আসিয়াছে। সুতরাং কবীর যে সম্প্রদায়ের গুরুর আসন লাভ করিয়াছিলেন, সে সম্প্রদায় যে তাঁহার বিবাহ পুত্র-কন্যা লাভ প্রভৃতি সন্ন্যাসীজনানুচিত ব্যাপারগুলি নানা সম্ভব অসম্ভব কথা দিয়া চাপা দিবার চেষ্টা করিবে, ইহা স্বাভাবিক।

কবীরের নিজের পদাবলীর মধ্যে তাঁহার বিবাহের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। "নারী তো হম ভী করী"—আমিও নারীসঙ্গ করিয়াছিলাম, ইত্যাদি; অবশ্য কবীরপন্থের আচার্য্যগণ চিরকুমারই থাকেন, তাহাতে কবীরের বিবাহ-জীবনের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ হয়। Westcott কবীরকে মুসলমান সুফী বলিয়া মনে করিয়াছেন; সুতরাং কবীরের বিবাহ ও পুত্র-কন্যা লাভের মধ্যে তিনি বিশেষ কোন অসামঞ্জস্য দেখিতে পান নাই। এরূপ ক্ষেত্রে কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্ত না করিয়া এ সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায়, ততটুকুর উল্লেখ করাই যুক্তিসঙ্গত।

লোঈ নামে একটী মেয়েকে কবীর কাশীর উপান্তে নির্জ্জন বনখণ্ডে এক বনখণ্ডী বৈরাগীর কুটীরে পান; বৈরাগী কন্যাটীকে পালন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাহাকে দেখিবার কেহ রহিল না; কবীর যুবতীকে আপন কুটীরে আনিয়া সেইখানেই তাহাকে স্থান দিয়াছিলেন। সেইখানেই সে আজীবন কবীরের সঙ্গে বাস করিয়াছিল। কিন্তু শুনা যায়, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কোন দিনই স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ হয় নাই। কমাল ও কমালী সেই লোঈএর সন্তান; কিন্তু কমাল ও কমালীর জন্ম-কথা লইয়া নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। কমাল ও কমালী নাকি লোঈএর গর্ভজাত সন্তান নহে, দুইটী মৃত শিশুকে প্রাণ দিয়া কবীর না কি তাহাদিগকে নিজের কুটীরে লোঈএর কোলে স্থান দিয়াছিলেন, লোঈএর পুত্রাকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য, শূন্য বক্ষ পূর্ণ করিয়া দিবার জন্য।

যাঁহারা কবীরকে বিবাহিত ও উদাসীন গৃহস্থ বলেন, তাঁহারা বলেন লোঈ তাঁহার বিবাহিতা পত্নী এবং কমাল ও কমালী তাঁহার ঔরসজাত সন্তান। পুত্রের জন্মের মধ্যে তিনি ভাগ্যের পরিপূর্ণতা দেখিয়াছিলেন; তাই তাহার নাম দিয়াছিলেন কমাল অর্থাৎ ভাগ্যের পরিপূর্ণতা;- কন্যার নামও তাই দিয়াছিলেন কমালী।

লোকে কিন্তু বলিতে লাগিল—এ কি হইল! কবীরের যে সং নাশ হইল,

"বুড়া বংশ কবীরকা জব উপজা পুত কমাল।"

কেহ কেহ বলেন কমাল পিতার ধর্ম্মসাধনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, এই জন্যই এই প্রবচনের জন্ম।

এই প্রসঙ্গে এই কথাটী বলিয়া রাখা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় এবং উইলসনের গ্রন্থে কবীরপন্থের যে দ্বাদশ শাখার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে কমালকেও একটী শাখার প্রতিষ্ঠাতারূপে অভিহিত করা হইতেছে। কিন্তু এই দ্বাদশ শাখার সন্ধান পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানে কবীরপন্থীগণ দুইটী শাখায় বিভক্ত; একটী কাশীর কবীর-চৌরার মোহন্তের অধীন; অপরটী মধ্যভারতের ধর্ম্মদাস কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই দুইটী ছাড়া আর যে সকল শাখার উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলি কাল্পনিক।

কোন কোন লেখকের মতে "লোঈ" "কমাল" ও "কমালী" এই তিনটী শব্দই একার্থবোধক, কম্বল হইতে কমাল ও কমালী শব্দের উৎপত্তি। এক দিন প্রভাতে কম্বলাবৃত একটী শিশুর মৃতদেহ গঙ্গার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল; কবীর তাহাকে তুলিয়া আনিয়া প্রাণদান করিয়া লোঈএর শূন্য কোলে দিয়াছিলেন; শিশুর সেই কম্বলাবরণের স্মরণে তাহার নামকরণ হইয়াছিল কমাল; কমালীর জন্ম-কথাও এইরূপ। এইরূপে লোঈশব্দেরও এই ব্যাখ্যা করিয়া এই মতাবলম্বিগণ কবীরের বিবাহ-বৃত্তান্ত অস্বীকার করিয়াছেন।

কবীরের মধ্যজীবনের ইতিহাস ইহার বেশী আর কিছু নিশ্চিত ভাবে জানা যায় না। সেকেন্দর লোদীর অত্যাচারের কাহিনীর মধ্যে এমন অনেক কিছু অলৌকিক ব্যাপারের উল্লেখ আছে যে, সেগুলির এ স্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। জিজ্ঞাসু পাঠক প্রিয়াদাসের ভক্তমালের টীকায়, Macauliffe প্রভৃতির গ্রন্থে সেগুলি পাইবেন।

এই অল্পাহারী, শীর্ণ, সদানন্দ, ধ্যানমগ্ন, গৃহস্থ সাধুটী অত্যন্ত দীর্ঘজীবী ছিলেন। ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে একশত বিশ বৎসর বয়সে তিনি বস্তী জেলার অন্তর্গত মগহর গ্রামে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যু কাশীতে হয় নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কবীরের মৃত্যু-সন লইয়া মতভেদ রহিয়াছে। কিন্তু সমস্ত আলোচনা করিয়া মনে হয়, ১৫১৮ সনকেই কবীরের মৃত্যু সনরূপে গ্রহণ করা সমীচীন।

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে কবীর তাঁহার অতিপ্রিয় সাধনক্ষেত্র কাশী ত্যাগ করেন। ইহারও কোন নিশ্চিত কারণ জানা যায় নাই; কিন্তু তৎকালে রচিত কয়েকটী পদে মনে হয় তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই অনিচ্ছায় কাশীত্যাগ করিতে হইয়াছিল। হয় ত ধর্ম্মবিরোধীগণের চেষ্টাতেই ইহা ঘটিয়াছিল।

পরবর্ত্তীকালে কবীরের এই কাশীত্যাগ করিয়া মগহরে যাওয়াটাকেও কবীরের প্রেমের ও মহত্ত্বের পরিচয়রূপে দেখিয়া একটী কাহিনী রচিত হইয়াছিল। কবীর না কি বলিয়াছিলেন "কাশীতে মরণলাভ করিলে ত সকলেই মুক্তি পায়। এখানে মরিয়া মুক্তি পাইলে আমার সাধনার কি গৌরব রহিল? মগহরে মৃত্যুতে গর্দ্দভযোনি লাভ করে শুনিয়াছি; আমি সেই মগহরেই মরিয়া মুক্তি লাভ করিয়া আমার সাধনার, প্রেমের গৌরব রক্ষা করিব।"

কবীরের মরণের কাহিনী সুপরিচিত। হিন্দুগণ তাঁহাকে হিন্দু জ্ঞান করিত, মুসলমানগণ তাঁহাকে মুসলমান সাধক রূপে গ্রহণ করিয়াছিল। অথচ কবীর তাঁহার জীবনে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই বিদ্রূপ করিয়া উভয়কেই অস্বীকার করিয়াছিলেন।

অরে ইন্ দুহু রাহ ন পাঈ।
হিঁদুকী হিংদবাঈ দেখি,
তুর্কন কী তুরকাঈ।

হায় রে, এই উভয়েই পথ পায় নাই। হিন্দুর হিঁদুয়ানী দেখিয়াছি, মুসলমানের মুসলমানী দেখিয়াছি।

সংবত ১৫৭৫ এর মাঘের শুক্লা একাদশীতে মগহরে কবীরের আত্মা মরজগৎ ছাড়িয়া অনন্তের সহিত মিশিয়া গেল।

এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিরোধ মিটাইবার জন্য কবীরের এত সাধনা, সেই কবীরেরই মৃতদেহ লইয়া এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ বাধিয়া উঠিল। হিন্দু বলিল, গুরুর মৃতদেহের সৎকার করিতে হইবে। মুসলমান বলিল, সে কি হয়? মুসলমান সাধককে উপযুক্ত গৌরবে সমাধি দিতে হইবে। বিরোধ যখন প্রবল হইয়া উঠিল, তখন মৃতদেহের শুভ্রাবরণ তুলিয়া দেখা গেল, দেহ নাই—কতকগুলি ফুল পড়িয়া আছে; তাহারই অর্দ্ধেক লইয়া মুসলমানগণ মগহরে যে সমাধিরচনা করিল তাহা এখনও কবীরপন্থীগণের পবিত্র তীর্থ হইয়া আছে। হিন্দু ভক্তগণ ফুলের অগ্নিসৎকার করিয়া সেই ভস্ম আনিয়া কাশীতে সমাধি দিল; সেই স্থানই আজ কবীরচৌরা নামে সুপরিচিত এবং হিন্দু কবীরপন্থীগণের শ্রেষ্ঠ তীর্থ।

জীবনে কবীর হিন্দু-মুসলমানের মিলন সাধন করিতেছিলেন তাঁহার অমৃতময়ী বাণী দিয়া, মরণেও পুষ্প দিয়া সে মিলনের সাধনাকে তিনি মধুময় এবং অমর করিয়া রাখিয়া গেলেন।

কাব্যের কথা

শ্রীউমানাথ ভট্টাচার্য্য

ছন্দ চলার চঞ্চলতা—ছন্দ জগতের ধর্ম্ম। বিশ্বজগৎ তালে তালে চলিতেছে—'ছন্দে উদিছে তারা ছন্দে কনকরবি উদিছে'। ছন্দ সাগর-মন্দ্রে বাজিতেছে—ছন্দে মানবের হৃৎপিণ্ড অপরূপভাবে স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে। ছন্দ অনাদি; ছন্দ জগতের আদিম প্রাথমিক ভাবের সঙ্গে বিজড়িত। শব্দই ব্রহ্ম; শব্দগুণ আকাশে এই ধ্বনি অনাদি কাল রণিত হইতেছে—এই ধ্বনি বা শব্দ সৃষ্টির প্রাণের প্রথম অনুপ্রেরণা। যখন মানুষ ভাষা পায় নাই, ভাব প্রকাশ করিবার জন্য তখন তাহাকে শব্দের শরণ—কণ্ঠস্বরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইত। এই স্বর হইতে সুরের উদ্ভাবনা। পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভাবের ব্যাকুলতা মানুষ সুর বা সঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছে। এই গীতি ছন্দের জননী। ছন্দ বাণীকে সচল করে—ভাবকে চলচ্ছক্তি দেয়—কল্পনাকে আবেগের দোলায় দুলিয়ে দেয়। কথা শেষ হইলেও সুরকে শেষ হইতে দেয় না। বিশ্ব-প্রকৃতি ছন্দে ভরা। এই প্রকৃতি-ছন্দের সহিত মানুষের হৃদয়-ছন্দের একটা নিবিড় যোগ আছে। কবি সেই ছন্দের দ্রষ্টা তিনি কোমল-কান্ত পদে মানব-হৃদয় ও মানব-চরিত্রকে ফুটাইয়া তোলেন। তিনি মানব-হৃদয়ের গোপন অন্তরে যিনি প্রবেশ করিতে পারেন তিনিই কবি। শুধু আপনার মনে নয় পরের প্রাণের মধ্যেও তাঁহার যাওয়া-আসা থাকা চাই; কারণ, সত্য কবিতা চিরদিন হৃদয়-রহস্য লইয়া। মানুষের এই হৃদয় শাশ্বত; সেইজন্য কবিতা-উৎস চিরকাল অক্ষয় হইয়া থাকিবে। যতদিন মানুষ থাকিবে ততদিন কবিতাও পৃথিবীর বুক শ্যামল করিবে। যাঁহারা বলেন ভবিষ্যতে এমন একটা যুগ আসিবে যখন কবিতার কোন প্রয়োজন হইবে না—কোন কাব্যই রচিত হইবে না—আমি সে দলে নই। কবিতা জীবন-রহস্য লইয়া; জীবনের প্রবাহ অফুরন্ত।

'অবারিত-সঞ্চারক-হৃদয়—সংবাদ-ডাক'।

কিন্তু কাব্য কি? কাব্য যে কি তাহা বলা অতিশয় কঠিন; কবিতার বুঝি সংজ্ঞা নাই। কাব্য কি তাহা আমরা অনুভব মাত্র করিতে পারি—প্রকাশ করিতে পারি না। দর্পণকার বলিয়াছেন, রসাত্মক বাক্যই কাব্য। কিন্তু তাহাতে কি কবিতার স্বরূপ প্রকাশ পাইল? আমাদের অন্তর-কোণে বাক্য কি, রস কি, প্রভৃতি অসংখ্য প্রশ্ন কি ঘনাইয়া উঠিল না? মনে হইল সকল বলার পরও যেন অনেকখানি না বলা রহিয়া গেল। এই অনির্ব্বচনীয়তাই কবিতা। কিন্তু কবি কে?

কবি ক্রান্তদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিদ্যা-নির্ম্মাতা সূক্ষ্ম বিবেকী পরম পুরুষ। কবি সমদর্শী, পণ্ডিত, তত্ত্বজ্ঞ। ঈদৃশ কবি-প্রণীত পদ্যময়ী রচনাই কাব্য—যাহা মানব হৃদয়ের ধর্ম্মভাবের স্ফুট প্রকাশ; মনুষ্যত্বের ও সত্ত্বের উদ্দীপক। প্রাচীন ঋষিগণ কবি ও কাব্যের এবম্প্রকার লক্ষণ করিয়াছেন। এই কাব্য গৌণভাবে পরমজ্ঞান দর্শনেরই তত্ত্ব সকল শিক্ষা দেয়; সুতরাং এই শ্রেণীর কাব্য যে চতুর্বর্গ ফলপ্রদ তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু এই ধরণের কবিত্ব লোকে সুদুর্লভ। সাধনাহীন, তপস্যাহীন, অনার্য্য, অসর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি এই কাব্যের প্রণেতা হইতে পারেন না। আধুনিক যুগে ইহা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং আমরা লৌকিক কবির কথাই বলিতেছি, যিনি সংসারের ঘাত প্রতিঘাত লইয়া—জীবনের সুখ দুঃখ হাসি অশ্রুর গাথা রচনা করেন।

জানার মধ্যে অজানাকে নিয়ে, চেনার মধ্যে অচেনাকে নিয়ে এবং সীমার মাঝে অসীমকে নিয়ে যুগে যুগে কবিতার খেলা। কবিতা কবি-হৃদয়ে কত নব নব রূপে, কত নব নব বেশে লুকোচুরি খেলা করছে। সেই স্বপ্নময়ী গোপনচারিণীকে কে ব্যক্ত করতে পারে? তাই হৃদয়ের সব ভাব ভাষায় রূপ ধরতে পারে না—ভাষার কারায় ভাবাতীত ধরা পড়ে না। প্রকাশিতের চেয়ে অপ্রকাশিত, ব্যক্তের চেয়ে অব্যক্ত তাহাতে অধিক। আভাস-ইঙ্গিত ইসারা-উপমায় তাই এত ছল-কলা করতে হয়। পাঠককেও আপন মনের মাধুরী মিশায়ে অনেকটা পূর্ণ করে গড়ে তুলতে হয়।

যাহা ভাষা দিয়ে প্রকাশ হয় না, কবিতা তাহাকে প্রকাশ করে। অরূপকে রূপ দান, অব্যক্তকে ব্যক্ত এবং নিগূঢ়কে প্রকাশ করাই কবিতার ধর্ম্ম।

যখন একটা ভাব কবির হৃদয়ে আকুলি বিকুলি করে, যখন কুঁড়ির

ভিতরের গন্ধের ন্যায় সেই ভাব দুরন্ত আবেগে বাহিরিয়া আসিতে চায়, তখন সেই প্রেরণার মুহূর্ত্তে যাহা প্রকাশিত হয় তাহাই কাব্য এবং যে ভাষায় তাহা স্বতঃ বাহির হইয়া আসে তাহাই কবিতার ভাষা।

কবির ভাষা সহজ সরল হওয়া চাই; কারণ, তিনি যাহা লেখেন তাহা তাঁহার অন্তরে অন্তরে অনুভব করা। আমরা যাহা অনুভব করি তাহা প্রকাশ করিতে অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রয়োজন হয় না কষ্ট-কল্পনা, শব্দাড়ম্বর, অলঙ্কারের ঘটা তখনি আবশ্যক যখন হিয়ার দ্বারে কোন একটী বিশিষ্ট ভাব উকি না মারে—যখন বলিবার কিছুই নাই অথচ বলা চাই। বস্তুতঃ গড়ে-পিটে কবি হইবার উপায় নাই। সহজাত শক্তি চাই।

নদী ছুটিয়া চলে কারণ চলাই তার ধর্ম্ম; তাহাকে ছুটিতেই হইবে। কবি কাব্য লেখেন কারণ সেইজন্যই তাঁহার জন্ম। তাঁহাকে লিখিতেই হইবে। ভিতর হইতে কে যেন তাঁহাকে প্রেরণা দিতেছে। শুধু অনুভব করা নয়, রস সৃষ্টি করা—ভাব প্রকাশ করা চাই। কবি ত তিনি যিনি কাব্য লেখেন। নীরব কবি কথাটা অর্থহীন স্ববিরোধী। কবি নীরব থাকিতে পারেন না। ভগবান্ তাঁহাকে অপূর্ব্ব কণ্ঠ এবং স্বর্গীয় সুর দিয়াছেন—তাঁহাকে গাহিতে হইবে—মূক হইলে চলিবে না।

আমরা সৃষ্টিকর্ত্তাকে কবি বলে থাকি: বস্তুতঃ কবি কথাটার মানেই তাই। যিনি সৃষ্টি করেন, যিনি উদ্ভাবন করেন, যিনি জন্ম দেন, তিনিই কবি। সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ভাব ও রসসৃষ্টি কবির কাজ।

মানুষ কবিতা-রচনা শিখিয়াছে প্রকৃতির নিকট। জানি না সৃষ্টির কোন্ আদিম প্রভাত হইতে লীলাময়ী প্রকৃতি কি অপূর্ব্ব কবিতা লিখিতেছেন। ছন্দ তার কখনো মেঘমন্দ্রে কখনো সিন্ধুছন্দে, কখনো বা বিহগকুলের কলকণ্ঠে বাজিতেছে। পত্রের মর্ম্মরে, নির্ঝরের ঝর্ঝরে, তটিনীর কল্লোলে আমরা তার গান শুনিতেছি। প্রতি প্রভাতে সে কাব্য আকাশের ভালে স্বর্ণবর্ণে লেখা হইতেছে—প্রতি যামিনীতে নক্ষত্র অক্ষরে তাহা ফুটিয়া উঠিতেছে—আলো ছায়ার মোহন খেলায় সে কাব্য অপূর্ব্ব রেখা-সম্পাত করিয়া যাইতেছে। মানুষ সেই লিখন, রহস্যময়ীর সেই ভাষা নিরন্তর শিখিতে চাহিতেছে। প্রকৃতি-মনের গোপন বাণী কখনো কখনো নিমেষের মত কবি-মনে ধ্বনিত হইয়া উঠে—অনন্ত রূপসীর অরূপ-রূপ আঁখির পথে বিম্বিত হইয়া ওঠে—কাব্য সেই বাণী, সেই রূপ প্রকাশ করিবার প্রয়াস মাত্র।

বহিঃপ্রকৃতি তার শোভা সুষমা সঙ্গীত লয়ে, আলো ছায়া বর্ণ গন্ধ লয়ে নরনারীর হৃদয়ের দ্বারে আঘাত করছে। যাঁর কাণে সেই ডাক পৌঁছায়, যাঁর প্রাণে সে আহ্বান কি এক মধুর সুর বাজিয়ে দেয়, যিনি সেই প্রকৃতিকে সহজে বরণ করে লন এবং সহজে যাঁহার ওষ্ঠে প্রকৃতির স্তোত্র উদয় হয়, তিনিই কবি।

এই বাহিরের প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির কোথায় যেন মিল আছে। কবির কাছে আর্টিষ্টের কাছে উভয়ের বেশ সামঞ্জস্য ধরা দেয়। এই দুইয়ের মিলনেই চিত্রের উৎপত্তি—কবিতার উন্মেষ। কবিতা ও ছবি একই বৃন্তের দুটি ফুল; কেউ বা ছন্দে প্রকাশ পেয়েছে কেউ বা বর্ণে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কি শিল্পী, কি কবি, রঙে বা ছন্দে যথাযথভাবে প্রকৃতিকে প্রকাশ করেন না। উভয়েই বহিঃপ্রকৃতি হইতে উপাদান লয়ে হৃদয়বত্তার দ্বারা নিজ নিজ প্রতিভায় একটা অভিনব জগৎ সৃষ্টি করেন। মানুষের হৃদয়ের সুখ দুঃখ হর্ষ বিষাদ বহির্জগতের—রূপরস গন্ধ, এ দুয়ে মিশে আমাদের সাধের মনোজগৎ হইয়া উঠিতেছে। এই মানব-মনকে প্রকাশ করিবার জন্য মনুষ্যমাত্রেই ব্যাকুল। যুগে যুগে মানুষ চাহিয়াছে যে তাহারা যাহা অনুভব করিয়াছে যাহা চিন্তা করিয়াছে তাহা বিশ্ববাসী জানুক। নিজেকে ব্যক্ত করিবার এই যে অপূর্ব্ব আকুতি ইহা চিরন্তন। সত্যিকারের কবিই শুধু তাহার চিন্তার ধন বিশ্বজনের সাধারণ সামগ্রী করিয়া গিয়াছেন।

আপনাকে প্রকাশ করিবার এই যে ব্যাকুলতা, এই যে গূঢ় বেদনা—গীতিকাব্যে তাহা মূর্ত্তি ধরে। মহামানবের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা চিরন্তন অতৃপ্তি—কবিতায় তাহা ধরা দেয়। সুখ-সম্পদ ভোগ ঐশ্বর্য্যেও যে মানুষের তৃপ্তি নাই তাহার কারণ মানুষ চিরদিন তাহার প্রিয়তম অনন্ত-ব্রহ্মের বিরহে বিধুর। সকল পাওয়াকে ছাড়াইয়া সকল সুখকে ছাইয়া সেই বিরাট অসীম তাহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। আমাদের পিয়াসী আত্মা চিরদিন তাঁহার সহিত মিলনের সাধনা করিতেছে। সত্যদর্শী কবি এই সাধনার পথে মানব-সাধারণকে লইয়া যাইতেছেন। কবি কাব্য রচনা করিতেছেন—বৃহত্তর মহত্তর, জীবন উপলব্ধি করিবার জন্য. প্রতি দিনের তুচ্ছতা হইতে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের অনির্ব্বচনীয় রস উপভোগ করাইতে।

মানুষের হৃদয় যেন একটী বাঁশী। এই বাঁশীতে নিশিদিন ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে কত রাগিণী, কত সুর, কত কত অপূর্ব্ব সঙ্গীত। যে ছন্দে রবিশশী উঠিতেছে, যে গানে বিশ্বজগৎ তালে তালে নাচিতেছে—সেই সুর হৃদয়-বীণায়ও ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে। কে বাজায় জানি না! কিন্তু বড় প্রাণমাতানো, ভুবনভুলোনো তার রাগিণী; কাব্য ইহারই সঙ্গীতে ওতপ্রোত।

ভাবের সহিত ভাষার, দূরের সহিত নিকটের ও অতীতের সহিত বর্ত্তমানের মিলন কাব্যসাহিত্যের দ্বারা অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। বাস্তবিক সাহিত্যের মানেই ত মিলন। স্বপ্নবিলাসী কবি রূপের সহিত রসের, চিত্রের সহিত সঙ্গীতের, সম্ভোগের সহিত সংযমের ছন্দের সহিত গন্ধের মঙ্গল মিলন ঘটাইয়া কাব্য সৃষ্টি করেন। আমাদের প্রতিদিনকার চিরপরিচিত জগৎকে কবি নিত্যনূতন করিয়া আমাদের নয়নের সম্মুখে ধরিতেছেন। তিনি বলিতেছেন এ জগৎ শুধু অশ্রু দিয়ে গড়া নয়। দেখ এখানে সুখ আছে, স্মৃতি আছে, স্নেহ আছে, প্রীতি আছে। নিরাশ হইয়ো না।

কল্পনার সহিত বিচার-বুদ্ধির, সত্যের সহিত আনন্দের যোগ সাধন করা কবিতার ধর্ম্ম। কবিতায় চিন্তা গীতিময়ী কল্পনা মূর্ত্তিমতী হইয়া প্রকাশ পায়। আদর্শ সৌন্দর্য্য, আদর্শ প্রেম এবং আদর্শ আনন্দ সৃষ্টি করা কবির কাজ। আনন্দ হইতে জগতের উৎপত্তি, আনন্দ কবিতারও মূল কারণ। কবিতা সকল সত্যের সার—সত্য শিব সুন্দরের অভিব্যক্তি।

কবিতা মাধুরী। কিন্তু সে মাধুরী দর্শন করিবার চক্ষু, অনুভব করিবার মন এবং বর্ণনা করিবার প্রতিভা শুধু কবিরই আছে। যাহা পাওয়া যায় না তাহাকে পাইবার আকুতি—যাহা ধরা যায় না তাহাকে ধরবার আকুলতা—সুদূরের প্রেম—প্রেমের বিধুরতা এইগুলি কাব্যের উপকরণ।

কবিতা কবি-মন-কাননের কুসুম। কবির সকল চিন্তার, জ্ঞানের, আবেগ উচ্ছ্বাসের, কল্পনার ও সুখ স্বপনের সুষমা সুরভি লইয়া তাহার দল বিকশিত হয়।

ভাবই কাব্যের প্রাণ। ভাবহীন কবিতার কল্পনা অসম্ভব। সময়ে সময়ে এমন একটী ভাব কবি-মানসে উদয় হয় যাহার আবেশে কবি আপনাতে আপনি বিভোর হন; সমুদায় জগৎকে বিস্মৃত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় সুধাপানে রত হইয়া থাকেন। তখন তাঁহাকে রক্ত-মাংসের মানুষ বলিয়া বোধ হয় না—তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকে না। কবি ভাব-সাগরে তলাইয়া যান। সেই সময়ে তিনি যাহা অনুভব করেন, তাহাকে সুচারুরূপে ভাষায় ফুটান যায় না। কবিতার আধখানি তাই অস্পষ্ট রহিয়া যায়। ভাব-বিভোর কবি সুখস্বপনে যে সৌন্দর্য্য, যে সুষমা উপভোগ করেন। সম্ভোগের পর যে শক্তিবলে সেই সুখ সৌন্দর্য্য প্রতিমা কবি ভাষায় ফুটাইয়া তোলেন সেই শক্তিই কল্পনা। কল্পনা অমূর্ত্তকে মূর্ত্ত করিয়া তোলে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে রসঘন বাক্যই কবিতা। কিন্তু রস যে কি, তাহা বেশ পরিষ্কার করিয়া বলা চলে না। রসিক জন তাহা শুধু আপন মনের নিভৃত নিলয়ে উপভোগ করেন। বস্তুতঃ রস শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। যে রচনায় রস নাই, আনন্দ নাই, সে রচনা রচনাই নহে। রস লোকান্তর, চমৎকার প্রাণ। অলৌকিক আনন্দ বিশেষ। যে রচনা পাঠ করিয়া পাঠকের মনে অলৌকিক চমৎকার জাগিয়া ওঠে, চিত্ত-বিস্তার হয়, তাহাতে রস আছে। রস ব্রহ্ম লক্ষণে লক্ষিত। উপনিষদে যেমন ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ 'রসো বৈ সঃ' অর্থাৎ তিনি রস স্বরূপ, আনন্দই ব্রহ্ম প্রভৃতি বলা হইয়াছে, কাব্য-পুরুষকেও সেই সকল সংজ্ঞা দেওয়া হয়। এই রসাত্মক বাক্যই হ'ল কাব্য। এমন কোন বিষয় নাই যা দিয়ে রসোদ্রেক করা না যায়। কবির গৌরব তাঁর কল্পনা-শক্তিতে প্রতিভায়, তাঁর প্রজ্ঞায়; যার বলে অতি তুচ্ছ তৃণ ধূলি পর্য্যন্ত অমর হইয়া যায়। মানব মনের অঘটন-ঘটন পটিয়সী জাগ্রত স্বপ্নকে যিনি ছন্দে ভাবে ভাষায় মূর্ত্তি দিতে পারেন তিনিই কবি।

কবি প্রকৃতির শোভা দর্শন করেন। তাহার রূপরস, পত্রপুষ্প, আলো-আঁধার, আকাশ-বাতাস কবির চোখে অপূর্ব্ব বলিয়া বোধ হয়। সেই উপাদানগুলি লইয়া কল্পনা-বলে কবি অধিকতর আনন্দ-দায়ক শোভা-সুষমাময় জগৎ সৃষ্টি করেন—সেই জগৎ বাহিরের জগৎ অপেক্ষা অধিক মনোজ্ঞ বলিয়া বোধ হয়। প্রকৃতির ফুল নিমেষে ঝরে যায়, কবির ফুল চিরকালের। আনন্দ হইতে তাহার সৃষ্টি, আনন্দদানই তাহার উদ্দেশ্য। যে আলো, যে কিরণ বাস্তবজগতে নাই, কবি সে উজ্জ্বলতা দান করেন।

কবি সাধক; তাঁর বুকের মধ্যে যে আদর্শ, যে স্বপ্ন জাগছে, তাকে জগতের মঙ্গলের জন্য ফুটিয়ে তুলতে তিনি অহোরাত্র প্রয়াস পাইতেছেন। বহিঃপ্রেরণা কবির তত আবশ্যক নয়, অন্তঃপ্রেরণা তাঁহার কাছে যত প্রয়োজনীয়। কবির এই অন্তরস্বর্গ যে শিশির-সম্পাত করে তাহাতে অতি তুচ্ছ বিষয়ের গাথা'ও চিরউজ্জ্বল হইয়া ওঠে। এই প্রেরণা ও প্রজ্ঞা মিলে কবিতার জন্ম। যাহা অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে স্বতঃ উৎসারিত তাহাই সঙ্গীত।

কবিতা বেদনার গান, শোকের ভাষা। শোক হইতে ইহার জন্ম। তাই আদি কবি ইহার নামকরণ করিয়াছেন শ্লোক। যার সুর যত ব্যথা-ভরা বোধ করি তার গানও তত সুমধুর হয়। এই নশ্বর পৃথিবীর সকল বস্তুই ক্ষণধ্বংসী—চিরকাল কিছুই রয় না—এ মহানাটক বিয়োগান্ত। দুঃখের রাগিণী, করুণার গাথা তাই মানুষকে এত অভিভূত করে। বেণু দিয়ে যেমন বাঁশী তৈরি হয় ভগবান মানুষ দিয়ে সেই প্রকার কবি তৈরী করেন। এই অবস্থান্তর প্রাপ্তি অনেক দুঃখ অনেক বেদনা ভোগের ফলে হয়; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সাহিত্যে দুঃখও আনন্দমূর্ত্তিতে দেখা দেয়। জগতের এই tragedy কবির বুকে আনন্দের গান না তুলিলে সাহিত্য সৃষ্টি হইত না, কারণ সৃষ্টির মূলে আনন্দ। কবি জীবনপথে আনন্দের সাধনা করেন।

কবি ঐশিক প্রত্যাদেশে দিব্যদর্শন লইয়া চিরদিবসের ভাষায়, প্রতিভার ভাষায় পৃথিবীর অর্থ ব্যাখ্যা করেন। কাব্য বা সাহিত্য মানুষের অনুভব ও চিন্তার, আশা ও আকাঙ্ক্ষার, বিশ্বাস ও ভরসার, কল্পনা ও স্বপনের কথা প্রকাশ করে। মানবের সাধনা আরাধনা সাধ ও বাসনার ইতিহাসই কাব্য। কাব্যে কবির ব্যক্তিগত জীবনের অনুভূতিকে উপলক্ষ করে চিরমানবের অন্তরের কথা, হৃদয়াবেগ এবং জীবনের রাগিণী ঝঙ্কৃত হইয়া ওঠে। মাটির বুকে অনেক কালের অনেক কথা লুকানো আছে। সেই সমস্ত লুপ্ত ও গুপ্তবাণী কবির বীণায় বাজিতে থাকে। কবির কাব্যে বিশ্বমানবের হৃদ্‌পিণ্ড অপরূপ ছন্দে স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে। কবিতা শুধু কবির বাণী নয়—কবিতা বিশ্ববাণী, কবিতা দৈববাণী।

মানুষের মন ক্রমোন্নতিশীল। তাহা নিত্য নূতনকে বরণ করে। এই অভিনবকে কবি ব্যক্ত করেন। প্রত্যেক যুগের এক একটা অভিনব বলিবার কথা থাকে। এই যে যুগবাণী, সেই সেই যুগের শ্রেষ্ঠ কবির লেখনী তাহাকে প্রকাশ করে। কবির প্রধান লক্ষণ তাঁহার অপূর্ব্বতা, মৌলিকতা। যে কথা কেউ কখনো বলেনি, কবি সেই কথা বলেন। যেটা স্বপনের অগোচর, কল্পনারও অতীত ছিল, কবি সেটা প্রকাশ করেন। যাহা লোকে নাই, কবির অন্তরলোকে তাহা আছে। এই যে অপূর্ব্ব দর্শনশক্তি, এইটেই কবির সর্ব্বপ্রধান গুণ। কবি পুরাতনকেও নূতন রূপ দেন—প্রাচীনকে বিচিত্রভাবে বিকসিত করেন। মৃতকে সঞ্জীবিত করেন। তাঁর বলিবার ভঙ্গিমাটা হয় নূতন।

নূতনকে সুন্দর করিয়া বলা অথবা পুরাতনকে অপূর্ব্ব করিয়া প্রকাশ করায় কবির কবিত্ব। অশ্রুতপূর্ব্ব কথা অথবা চির-প্রাচীন তবু নিত্য

নূতনকে বিচিত্রবেশে চমৎকার ভঙ্গিমায় বলা প্রতিভার কাজ। কবিরা সে প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। অনেকে বলেন যে পৃথিবীতে নূতন বলিবার কিছু নাই—সকল বলা হইয়াছে। জানি না কেন আমার মন এ কথা স্বীকার করিতে চায় না। অনন্ত-কাল-সমুদ্রে মানুষের পরমায়ু বিন্দুমাত্র। এর মধ্যেই কি সব বলা হইয়া গিয়াছে? আর কি কিছু বলিবার নাই? বিপুলা পৃথিবী, নিরবধি কাল পড়িয়া রহিয়াছে; আর কি কখনো নূতন 'আইডিয়া' প্রকাশ পাইবে না? এ কথা কেমন করিয়া মানিয়া লই? যাঁহারা এ কথাটা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের বিশ্বাস ভঙ্গ আমি করিতে চাই না; শুধু বলিতে চাই, সত্য হইলেও কবি চিরন্তন সাহিত্যকে নূতন রূপ দেন; সাহিত্যের আত্মা চিরকাল অমর এবং এক হইলেও সাহিত্যরূপ যুগে যুগে জন্ম জন্মান্তরের ন্যায় নব নব দেহ নব নব নাম গ্রহণ করিতেছে। এইখানেই কবির মৌলিকতা। কাব্যকারের উদ্দেশ্য হইতেছে—মানবমনকে ভাবৈশ্বর্য্যে সম্পদশালী করা। রসভাণ্ডারে চিরকালের জন্য চিন্তারত্ন উপহার দেওয়া—অনুভূতি-রাজ্যে আরো কিছু পথ অগ্রসর হওয়া—নব নব আদর্শ নব নব সত্য আবিষ্কার করা। পাঠকের নয়নে এমন এক বিচিত্র চিত্র ধরা যাহাতে তাহারা অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া যায়—নূতন আলোক পাইয়া নব নব আশা-ভরসায় উদ্দীপিত হইয়া উঠে।

বলিয়াছি সীমার মাঝে অসীমকে লইয়া কবিতার খেলা। এই ক্রীড়াপ্রিয়তা মানুষের ধর্ম্ম। মানুষ নিরন্তর আপনার সীমাকে ছাড়াইয়া, সকল কূলকে ছাড়াইয়া, সকল জানাকে ছাড়াইয়া অসীম অকূল অনন্ত অজানার বুকের পরশ পাইতে চায়। গতিশীল জগতের ইহাই ধর্ম্ম। এর আর এক নাম যাত্রা। নূতনের কূলে কূলে অভিনবের হাত ধরে মানুষ চলেছে। চলার আনন্দে সে চপল চঞ্চলা তেজস্বিনীরই মত। অসীম পথের সে পান্থ, বুকে তার অতৃপ্ত তৃষা; জানার আগ্রহে পথিক চলেছে পান্থবীণা বাজায়ে। যে পথ দিয়ে সে গিয়াছে সে পথে তার পদচিহ্ন অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। মানুষের সাহিত্যে এই পান্থবীণার ঝঙ্কার, এই যাত্রার গান, এই পদচিহ্নের রেখা।

মানবের ভাষা কতদূর যে সুন্দর পবিত্র এবং পূর্ণ হইতে পারে, কবিতা তাহার নিদর্শন। সত্যকে প্রকাশ করিবার যে আগ্রহ—সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবার যে আকুলতা,—যা কিছু মহান্ এবং উচ্চ আদর্শের আছে তাহাকে বরণ করিবার যে সাধনা,—কাব্যে সে সকলের আভাস পাওয়া যায়। মানব-জাতির আদিম-সাহিত্য ধর্ম্মভাবের প্রেরণার ফল। এই ধর্ম্ম-পিপাসা দেশে দেশে মানুষকে দৃষ্ট হইতে অদৃষ্টে, সসীম হইতে অসীমে এবং জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাত অপ্রাপ্ত অপরিচিত অধ্যাত্ম লোকের ইঙ্গিত করিতেছে। প্রাচীনকালে ঈশ্বর-স্তুতিরূপে ইহা সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিল; অধুনা এই ভাবোপলব্ধি Mysticism বা দুর্জ্ঞেয় অস্পষ্টবাদ—ছায়াভাসের প্রচলন করিয়াছে। ভাষার ক্ষুদ্র সীমায় এই অসীম ধরা দেয় না, সেইজন্য এই রূপহীন মূর্ত্তিহীন ধূম্রাকার ভাবকে আবরণে আড়ালে ইসারা ইঙ্গিতে প্রকাশ করিতে হয়। বর্ত্তমানকালের Symbolism বা সাঙ্কেতিকবাদ এই অদৃষ্ট লোকের আভাস দিতেছে। ফলে যাহা দুর্জ্ঞেয় তাহা আজিও নয়নের আড়ালে রহিয়াছে—মানুষের out-look বা দৃষ্টিপথের দিগন্ত সীমা ক্রমেই বৃহত্তর হইতেছে।

নূতনের পিয়াসী আত্মা সীমার গণ্ডী মানে না। 'এই পর্য্যন্ত, আর নয়' কথাটা সজীব সবুজ মনের ধর্ম্ম নয়। মন কোন অবধির সীমা স্বীকার করে না। ইচ্ছার কোন কূলকিনারা নাই। মানুষের মন অনন্ত; কোথায় বা তা'র আরম্ভ, কোথায় তার শেষ? মানুষের স্বপ্নেরও কেহ সীমা পায় নাই। কাল্পনিক মন সৃজন করে চলেছে বাসনার আকাশ-কুসুম র'চে। জীবনকে সুখময় করিতে, পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করিতে কবিরা স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু আজ যা মনোজগতে রূপ পেয়েছে, ভাবী কালে বাস্তব জগতেও যে তাহার কোন সার্থকতা হ'বে না এ কথা কে বলতে পারে?

আমরা বলি,—

"রাখিস্ আশা, রাখিস্ চির আশা।"

যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

আমি তখন আমহার্ষ্ট স্ট্রীট্-এর সেই মেসটায় থাকি। সেই যে বাসি পাঁউরুটির রঙয়ের তে-তলা লম্বা বাড়িটা;—মেছোবাজার আর আমহার্ষ্ট স্ট্রীট্-এর মোড়ের কাছাকাছি; একটু এগুলেই সেণ্ট্ পল্‌স্ স্কুল;—উল্টোদিকের ফুটপাথ-এ একটা ছোটখাটো বেচারী-চেহারার পানের দোকান;—(কিন্তু সারা কলকাতার শহর ঢুঁড়লেও অমন পান আপনি কোথাও পাবেন না। আমার কাঁচা্বিচার্লা পাথ্না ।। বলা কোথাও সুপুরির প্রোপোর্শ্যান্ অদ্ভুত রকম পার্ফেক্ট!) নীচের ফুটপাথ-এ দালানের ছায়ায় বসে' কতকগুলো—রিক্‌শ-ওলা হ'তে পারে, তবে গুণ্ডা হওয়াই সম্ভব—এম্‌নি চেহারার লোক সারা দুপুর খইনি চিবোয় আর জটলা পাকায়। তেতলায় একটিমাত্র ঘর;—বেশ বড় ঘরটি, রাস্তার দিকে গোটা চারেক জানলা, দক্ষিণে একটা ও উত্তরে আধখানা;

বল্‌তে হ'বে। ঘরটি গোড়ায় থ্রী-সীটেড্‌ ছিলো, কিন্তু কি করে সে-ঘর আমার একারি হ'য়ে গেলো—সে-ও এক মজার ব্যাপার।

প্রথম রাত্তিরেই কাণ্ড হ'ল। দশটা বাজে। খাওয়া-দাওয়ার পর অন্য দু' ভদ্রলোক বিছানায় লম্বা হয়েছেন ;—একজনের মুখে বিড়ি, আর একজনের হাতে দু বছর আগেকার ই, আই, রেলোয়ের টাইম্‌টেব্‌ল্‌। আমি টেবিলে বসে' ছোট্ট একটি গেলাসে ব্র্যাণ্ডি ঢেলে একটু-একটু করে' খাচ্ছি। খাচ্ছি তো খাচ্ছিই। সবে একটু ঘোর আস্‌ছিলো, এম্‌নি সময় শুন্‌লাম, "মশায়ের বুঝি কোনো অসুখ টসুক আছে ?"

ফিরে' তাকিয়ে দেখি, একজনের বিড়িটে গেছে নিবে' ও অন্যজনের টাইম্‌-টেব্‌ল্‌খানা হাত থেকে বুকের ওপর নেতিয়ে এসেছে। দু'জনের মুখই মুর্গীর মুখের মত লাল ও গম্ভীর।

হেসে বল্‌লুম, "আজ্ঞে না, শরীর আপনাদের আশীর্ব্বাদে সুস্থই আছে। নেশা করার উদ্দেশ্যেই খাওয়া।"—পরে একটু ফাজ্‌লেমি করার লোভ সাম্‌লাতে না পেরে বল্‌লুম, "ইচ্ছে করেন ?"

বিড়িখোরটি এ-কথায় সটান্‌ উঠে' বস্‌লেন। রাগের ঝোঁকে আধ পোড়া বিড়িটে দাঁত দিয়ে চিবোতে-চিবোতে বল্‌লেন, "জানেন, এটা ভদ্রলোকের মেস্‌ ?"

এক চুমুক টেনে বল্‌লুম, "বুঝ্‌তেই তো পারছেন। না জান্‌লে কি আর আমি এখানে আসি !"

টাইম্‌ টেব্‌ল্‌ পড়ুয়াটি ততক্ষণে বিছানা ছেড়ে উঠে' আমার একবারে কাছে দাঁড়িয়ে বল্‌তে লাগলেন, "বুঝ্‌লেন, ও-সব ন্‌-নষ্টামির জায়গা এ নয়। আমি মিটিং কল্‌ করে' কালই আপনাকে না তাড়াচ্ছি তো কি বল্লাম। যত সব ইয়ে !…হয় আপনি যা'বেন, নয় আমরা…"

"তা'লে আপনারাই যান্‌। সুখের কথা।"

"বটে ?" ভদ্রলোক তেড়ে-মেড়ে কি যেন বল্‌তে চাচ্ছিলেন ; কিন্তু হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে আমার একটা হাঁচি এলো। সঙ্গে-সঙ্গে ভদ্রলোক দু'পা পেছিয়ে নিজের অজান্তেই বলে' ফেল্‌লেন, "ও বাবা !"…

পরের দিন সকালে ম্যানেজার বাবু এসে বিনীতভাবে সব কথা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আমাকে জানালেন যে, যে-হেতু মেস্‌-এর সব মেম্বরই এতে আপত্তি প্রকাশ করছেন, আমার পক্ষে এটা সুবিধের জায়গা হ'বে না ;—বরঞ্চ অন্য কোনো মেস্‌……

মাথাটা ধরে' ছিলো ; বালিশ থেকে মাথা না তুলেই বল্‌লুম, "অন্য কোনো মেস্‌-এ যেতে আমার কিছুই আপত্তি নেই ;—তবে কে আবার অত হাঙ্গাম করতে যায়, বলুন ? তা ছাড়া, আপনাদের এ ঘরটিতে আমার ভারি পছন্দ।"

ম্যানেজার বাবু মাথা চুলকোতে চুলকোতে বল্‌লেন, "কিন্তু আপনার রুম্‌-মেট্‌রা যে একেবারে ক্ষেপে গেছেন !"

বিছানা হাত্‌ড়ে একটা সিগ্রেট্‌ পাওয়া গেলো। ওটা জ্বালাতে-জ্বালাতে বল্‌লুম, "সুবিধেই হ'ল। ওঁদের সরতে বলুন।"

"কিন্তু ওঁরা যে অনেকদিনকার…"

"তা'লে তাঁদের এই মেস্‌-এই অন্য কোনো ঘরে চালান করুন।"

"কিন্তু এ-ঘরটা যে থ্রী…"

"এমন দু' ভদ্রলোককে এখানে পাঠান, যাঁদের অভ্যেস্‌-টভ্যেস্‌ আছে।"

"তেমন কেউ তো নেই।"

"নেই নাকি ? শুনে ভারি আনন্দ হ'ল।… তা'লে আর কি করা ? যাই, আপাতত আমার মামাবাড়িতেই গিয়ে উঠি। চাকরটাকে বলুন না kindly, আমার জিনিষ-পত্তরগুলো বেঁদে-ছেঁদে রাখুক্‌। আপনাদের এখানে ফোন্‌ আছে ?"

"না। কেন ?"

"তা'লে মামাবাড়িতে একটা খবর পাঠানো যেত।"

"আপনার মামা কি করেন ?"

"বিশেষ কিছু নয়। হাইকোর্টের জজিয়তি।—আমাকে এক পেয়ালা চা আনিয়ে দিতে পারেন ?"

"বিলক্ষণ ! পারি আবার নে ! দু'পা দূরেই তো বাঁকার দোকান। এক্ষুণি দিচ্ছি আনিয়ে। তা, আপনি এ বেলাই যাবেন ? দুপুরে খেয়ে-দেয়ে বরং বিকেলে…"

বিকেলে আমি গেলাম না ; গেলেন আমার যুগল-রুম্‌-মেট্‌। দোতলায় একটা ঘর খালি ছিলো ; স্থানবিশেষের সংলগ্ন বলে' সেটাতে কেউ থাক্‌তো না। তা-ই সই।

ফলে, আমি ও-মেসে যদ্দিন ছিলাম, ও-ঘরটায় একাই ছিলাম।

সেই মেস-এ থাকার সময় একটা ঘটনায় আমি তখনকার মত ভারি আমোদ পেয়েছিলাম। সেই কথাই আপনাদের বল্‌ছি।

অভিলাষ আমার অনেককালের বন্ধু। কলেজের ফার্ষ্ট ইয়ার্ থেকে ওর সঙ্গে আমার ইয়ার-পনা। বি-এ ক্লাশে উঠেই রোজ ক্লাশে এসে বসাটা আমার কাছে অতিমাত্রায় প্রিবিয়ান্ ঠেক্‌তে লাগলো; সঙ্গে-সঙ্গে এমন একটা—যা'কে বলা যেতে পারে ডিগ্রীফোবিয়া হ'ল যে, আমি মনে মনে শপথ কর্‌লুম যে আশু মুখুয্যে যতই না কেন চেষ্টা করুন্, আমি বাবা কিছুতেই ক্যাল্‌কাটা ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট্ হচ্ছি নে। সেই থেকেই পড়াশুনোয় ইস্তফা। বাবা বল্‌লেন, "বিলেত যা।" বল্‌লুম, "পড়্‌তে? কেম্ব্রিজের চেয়ে তা'লে ক্যাল্‌কাটাই ভালো, কারণ পাশ করা সোজা।" মা বল্‌লেন, "বিয়ে কর্।" বল্‌লুম, "বি-এই পাশ কর্‌তে পার্‌লুম না, আবার বিয়ে!" বোন্‌রা বল্‌লে, "তুমি এখন কি কর্‌বে দাদা?" উত্তর দিলুম, "লিখ্‌বো।"

সেই থেকেই লিখ্‌ছি। লেখাটা আমার সখ বল্‌তে পারেন, কিন্তু এ সখে আমি সুখ পাই, এই আমার সাফাই। সখ জিনিষটাই সুখের—নয় কি?

অভিলাষ কিন্তু নির্ব্বিঘ্নে ও নিরুদ্বিগ্নচিত্তে বি-এ পাশ কর্‌লো। তারপর একটা পোস্‌ট্-গ্র্যাজুয়েট্ স্কলারশিপ্ নিয়ে এম্-এতে ভর্ত্তি হ'ল; ল ক্লাশেও নাম রাখ্‌লো একটা। হাতের পাঁচ।

এতৎসত্ত্বেও অভিলাষের সঙ্গে আমার খুবই মাখামাখি। মুখে তো বটেই, মনেও। যদিও ওর সঙ্গে মিলের চাইতে আমার অমিলই বেশি। একটা উপমা দেবো? ধরুন্, ও যেন মিল্‌টনের একটি সনেট্—ঠাস-বুনোন্, পাকা কথা, কোথাও একটু ফাঁকা বা ফিকে নয়—আগাগোড়া জমাট্। ওর মধ্যে শিল্পের যে-স্বল্পতা, সেইটেই ওর গৌরব। আর আমি যেন রবীন্দ্রনাথের এক চতুর্থ শ্রেণীর অনুকারকের লেখা দীর্ঘ, অসম-ছন্দের কবিতা;—আগাগোড়া আলগা, বেজুত, নড়বড়ে; বেতালা মাতালের মত বেসামাল পা ফেলে-ফেলে চলেছে;—না আছে একটা বাঁধ, না কোনো বোধ। শস্তা সাবান একটু চট্‌কালেই যেমন অনেকগুলি ফেনা বেরোয়, তেম্‌নি খানিকটা খেলো উচ্ছ্বাস, ফেনার মতই হাল্‌কা, ফিন্‌ফিনে। মোটের ওপর কোনোই মানে হয় না।

এই উপমা যে কতখানি সার্থক, তা আপনারা একটু পরেই টের পাবেন।

অথচ অভিলাষকে আমার ভালো লাগ্‌তো। এখনো লাগে—তবে তখনকার ভালো-লাগাটা ছিলো অন্য-রকম। অভিলাষের চেহারা সেই জাতের, যা'কে সুন্দর বল্‌তে ঠেকে, কিন্তু সুদর্শন বলে' ভাব্‌তে আট্‌কায় না। রঙ্—সাধারণত এবং স্বভাবত বাঙালীদের যেমন হ'য়ে থাকে,—অর্থাৎ, ঈষৎ কালো; মাঝারি লম্বা, দোহারা গড়ন, দেহের পশ্চাদ্‌ভাগ বিশেষ ক'রে স্থুল। হাতের আঙুলগুলি মোটা-মোটা, নাক একটু নিম্ন, চোয়ালের হাড় দু'টো চোখে-পড়ার মত—এবং সেই জন্যই চোখ দু'টো দেখায় টানা-টানা, চিকণ। সব মিলে' মুখে একটু চীনে-চীনে ভাব। তবে, অভিলাষের গোঁফ ছিলো।

এইটুকু অভিলাষের বাইরেকার পরিচয়। ভেতরের খবরও এক্ষুনি পা'বেন। আর-একটা কথা এখানেই বলে'-রাখা ভালো। অভিলাষের হাস্‌বার ক্ষমতা ছিলো অদ্ভুত;—যে-কোনো সময়ে এবং যে-কোনো কারণে অত চেঁচিয়ে এবং অতক্ষণ ধরে' হাস্‌তে আমি আর-কাউকে শুনি নি। মনে পড়ে, ওর সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিনে কলেজের কমন্-রুম্-এ ওর ঐ হাসির আওয়াজ শুনে'ই আমি তখ্‌নি যেন গোটা মানুষটাকেই আন্দাজ করে' নিয়েছিলুম। ও ছিলো আমার হাসির গ্রামোফোন্; মনে যখনই মর্‌চে পড়ি-পড়ি কর্‌তো, তখনই ওকে চালিয়ে দিয়ে মন ঝালিয়ে নিতুম। যে-লোক এত হাসে তা'কে আপনারা নিশ্চয়ই খুব ফূর্ত্তিবাজ ভাব্‌ছেন; কিন্তু ওর অবস্থাটা শুনুন্।

যে-দিনের কথা বল্‌ছি, সে দিনটা পড়েছিলো অঘ্রাণের মাঝামাঝি। সময়, বিকেল। ডার্ব্বি জুতো মচ্‌মচ্ কর্‌তে-

কর্‌তে অভিলাষ এসে আমার ঘরে ঢুক্‌লো। আমাকে টেবিলের ওপর উবু হ'য়ে বসে' থাক্‌তে দেখে জিজ্ঞেস্ কর্‌লে, "কি লিখ্‌ছ ?"

আমি কলমটা রেখে দিয়ে চেয়ারটা ঘুরিয়ে ওর মুখোমুখী হ'য়ে বল্‌লাম, "গল্প লিখ্‌ছিলাম। কিন্তু তুমি যখন এলে, গল্প লিখ্‌বো আর না, কর্‌বো।"

অভিলাষ, আমার কথার শেষের দিকটা যেন শুন্‌তেই পায় নি, এম্‌নি ভাবে বল্‌লে, "গল্প লিখ্‌তে পারো না, তবু মিছিমিছি সময় নষ্ট করো কেন ?"

বল্লুম, "অন্য কোনো কাজ করে' সময় নষ্ট কর্‌তে কষ্ট হয় বলে'।"

কথাটা ওর মনে ধর্‌লো না। বল্‌লে, "গল্প লিখে' তোমার যতই না মনের বিরাম হোক্, সেগুলো পড়ে' লোকের ব্যারাম না হয়, সেদিকে নজর রাখ্‌ছো তো ?"

আমি বিনীতভাবে বল্লুম, "আমার গল্প কাগজ-পত্রে ছাপা হচ্ছে বলে'ই তো তোমার আপত্তি ? সে আমি কি কর্‌বো ? মামাতো বোন্‌কে দিয়ে নকল করিয়ে মামা বাড়ির ঠিকানা দিয়ে পাঠাই ;—দেখি, কোনো গল্পই ফেরৎ আসে না।"

"যেমন বাঙ্‌লা দেশ, তেম্‌নি হ্যাঙ্‌লা লিখিয়ে। আমি কোনো কাগজের সম্পাদক হ'লে তোমাকে মজা দেখাতাম।"

"আচ্ছা অভিলাষ, সত্যি কি আমি এতই খারাপ লিখি যে তা পড়া যায় না, বা পড়্‌তে বস্‌লেই মাথা-ধরা নিয়ে উঠ্‌তে হয় ?"

"ছোঃ ! ও-সব কি একটা লেখা ! তুমি লিখ্‌ছো, কারণ লেখাটা আজকাল এ-দেশে ফ্যাশনেবল্ হ'য়ে উঠ্‌ছে। তোমার পক্ষে গল্প-লেখা গোঁফ-কামানোর মতই একটা বাতিক।"

কথাটা মিথ্যে নয়। তাই চুপ করে' রইলাম।

অভিলাষ বল্‌তে লাগ্‌লো, "দেশের যে-হাল দেখ্‌ছি, তা'তে মনে হচ্ছে আর কিছুদিন পরে খবরের কাগজের প্রজাপতি-বৈঠকী বিজ্ঞাপনে পাত্রীর qualification-এর মধ্যে একটি থাক্‌বে, 'অল্প-অল্প কবিতা লিখিতে জানে।' কবিতা-লেখা কি চচ্চড়ি-রান্না না চরকা-চালানো যে সব্বারি তা না কর্‌লে জাত যা'বে ?·········এই তো তুমি বাগীশ,—কল্‌কাতায় বসে'-বসে' টুর্গেণিভ্ আর অস্কার্ ওয়াইল্ড্ কপ্‌চাচ্ছো, আর ভাব্‌ছো, বাঙ্‌লা সাহিত্য বুঝি তোমার ভার আর সইতে পার্‌ছে না। ওরে ইডিয়ট্, তোমার চেয়ে মণি বোস্‌ও যে ভালো ছিলো, ভাষায় তবু উড়িয়ে নিতো। তুমি তো বাঙ্‌লাও লিখ্‌তে জানো না ! তুমি গল্প লেখ্‌বার কে ? লিখ্‌বো আমি ! দেখ্‌তে, তা'লে কি-সব জিনিষ বেরুতো—যা কখনো হয় নি"—

"থাক্, আর 'বসুমতী'র বিজ্ঞাপনের ভাষা চুরি করে' একাধারে স্বদেশপ্রেম ও ভাষাজ্ঞানের পরিচয় দিয়ো না।—কিন্তু এতই যদি তোমার লেখায় হাত, তা'লে চুপ করে' আছ কেন ?"

এইখানে অভিলাষ হেসে ফেল্‌লো। ডান্ হাতের দু'টো আঙুল মুখের মধ্যে গুঁজে' ছেলেমানুষের মত খিল্‌খিল্ করে' হাস্‌তে-হাস্‌তে ও লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। একটু যেন লজ্জিত হ'য়ে বল্‌লে, "লিখ্‌বো, লিখ্‌বো। এখনো সময় হয় নি। আর একটা বছর সবুর করো।···কই, দেখি কি লিখ্‌ছিলে ? হাতের লেখাটাকে কিন্তু খুব বাগিয়েছো !"

অভিলাষের মনে কোনো রোষের সঞ্চার হ'লে ও সেটাকে বেশিক্ষণ টেনে রাখ্‌তে পারে না, এই ওর দোষ। একটুক্ষণ আগে ওর মনে যে উত্তেজনা শীতের বরফের মত (এ-উপমাটা একেবারে নরোয়ে থেকে আম্‌দানি ;—কসুর মাপ কর্‌বেন।) জমে উঠ্‌ছিলো, ওর হাসির চাপে তা গেলো ফেটে। হাসিকে পোষ মানাতে না পেরে ও আমার সঙ্গে আপোষ কর্‌তে এলো ; কিন্তু ওকে আবার উস্কে দে'য়ার জন্যে আমি ওর হাত থেকে কাগজের তাড়া ছিনিয়ে নিয়ে বল্লুম, "আচ্ছা অভিলাষ, তুমি মুখে তো এত বলো, একটা গল্প লিখে ফেলে আমাদের একবার দেখিয়েই দাও না যে বাঙলাদেশে একজন গর্কী—না, তোমার গড্‌ তো হার্ডি—একজন হার্ডি দেখা দিয়েছেন।"

অভিলাষ দু' হাত ছড়িয়ে একটা অত্যন্ত নিরুৎসাহকর ভঙ্গী করে' বল্‌লে, "যা—যাঃ ! বাজে বোকো না।" বলে'ই খামকা একটু হেসে ফেল্‌লো।

বুঝ্‌লুম, অভিলাষ লজ্জা পেয়েছে। ওকে যদি আপনি বলেন, "তুমি তো ঢের পড়াশুনো করেছো হে !" বা, ও যে বি-এ তে অল্পের জন্য ফার্ষ্ট হ'তে পারে নি, সে-কথা যদি কেউ ওকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তা'লে ওর পক্ষে যতটা লাস

হওয়া সম্ভব, ও তা হ'বে। নিজের প্রশংসা ও একেবারেই শুনতে পারে না। এখেনেও ও আমার উল্টো।

আমি গম্ভীরভাবে বলতে লাগলুম, "আমি যতই বাজে লিখি নে কেন, (যদিও তুমি আমার লেখাকে যত বাজে মনে করো, আমি নিজে ততটা করি নে), তবু তো আমি লিখি। তুমি তো তা-ও লেখো না! আমার নাম দু'দশজন লোকে জানে, পুজোর সময় আমি ছ'জন সম্পাদকের অনুরোধপত্র পেয়েছিলাম, এবং, শুনে' হাসবে, কাউকে নিরাশ করি নি। তুমি বলবে, এটা একটা third-rate facility. হ'লই বা। আমি খুব বেশি লিখতে পারি, সেটাই বা কম কথা কি? তুমি তো আজ অবধি এক কলমও লেখো নি। লোকে আমাকে লেখক বলে' মানে, তোমার নামও জানে না। এইখেনে আমারই জিৎ।"

এতখানি বকে'ও অভিলাষের মনটাকে যথেষ্ট শানিয়ে তুলতে পারলুম না। এত কথার উত্তরে ও শুধু বললে, "এখন সময় পাচ্ছি নে; কিন্তু I am seething with ideas;—হঠাৎ লোকের তাক্ লাগিয়ে দেবো।"

"আগে তোমার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হোক্, তবে তো তাক্ লাগাবে। তা যদ্দিন না হচ্ছে, আমাকেই তোমার চেয়ে বড় লেখক ব'লে মানতে তুমি বাধ্য। কেননা, আমি লিখেছি ও লিখছি, আর তুমি কখনো লেখো নি। আইডিয়া তোমার যতই থাক্ না, কি আসে-যায়? তোমার মাথাটা তো কাঁচের নয়, আর আইডিয়াগুলো তো হীরের কুচি নয় যে সবাই দেখতে পা'বে, তোমার ব্রেনের সবগুলো সেল্ এ লা'-খানেক আইডিয়া জ্বলজ্বল্ করছে। যতক্ষণ না সেগুলো কথায় গেঁথে বাইরে জাহির করতে পারছো, ততক্ষণ ও থাকা-না-থাকা সমান। আমার লেখায় হয়-তো কোনো আইডিয়াই নেই, কিন্তু তা'র প্রধান গুণ হচ্ছে এই যে তা চোখে দেখা যায়।···দ্যাখো, ও-সব 'মুট্ মিলটন্'-ফিলটনে আমি বিশ্বাস করি নে। মুট্ই যদি হ'ল, তবে আবার মিলটন্ কি? নীরব হ'লে আবার কবি কিসের? তুমি যদি আজ মরে' যাও, তা'লে এ-কথা কি কেউ ভাববে যে এ-লোক বেঁচে থাকলে হার্ডি হ'ত?"

"তা-ভাববে না; লোকে আমাকে একেবারেই ভুলে' যাবে। সেটা মন্দর ভালো; কিন্তু তোমায় মরতেও হ'বে না; দশ বছর পরে যখন আবার সাহিত্যের ফ্যাশান্ বদলাবে, তখন তোমার নাম নিয়ে সবাই হাসাহাসি করবে, এবং সে দৃশ্য তোমায় দেখতেও হ'বে। ট্র্যাজেডি তোমারটাই বড়। যদি কখনো কিছু লিখি, এমন কিছুই লিখবো, যা সময়ের সমবয়সী। সকালের ফ্যাশান্ বিকেলে বদলায়, কিন্তু আর্ট্ চিরকালের।"

অভিলাষের সঙ্গে তর্ক করছি দেখে আপনারা ভাববেন না যে ওর মতের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র বৈষম্য আছে। কিন্তু ওর সকল কথা সত্য বলে' জানা সত্ত্বেও আমি ওর সঙ্গে তর্ক করতে লাগলুম, কারণ তর্ক-করারই একটি সৌখীন সুখ আছে। বিশেষত যখন হার নিশ্চিত বলে' জানি, তখনই আমার মজা লাগে সব চেয়ে বেশি।

বললুম, "আর্ট্ জিনিষটে সকালের না বিকেলের না মহাকালের, সে আলোচনায় কোনো দরকার নেই। আসল কথাটা হচ্ছে এই যে তুমি এ-পর্য্যন্ত কিচ্ছু লেখো নি, কারণ লিখতে তুমি পারো না। যে লিখতে পারে, সে না লিখে' পারে না।"

অভিলাষ এতক্ষণ চেয়ারের পিঠে হেলান্ দিয়ে দিব্যি হাত পা ছড়িয়ে বসে' ছিলো; এই কথা শুনে' খাড়া হ'য়ে উঠে' বসলো। কথাগুলোতে বেশ জোর দিয়ে বললে, "পারি নে মানে? নিশ্চয়ই পারি। তোমার চেয়ে উনিশগুণ পারি—জানো?"

"তবে লেখো না কেন?"

"লি খি নে কে ন? কখন্ লিখবো? কি করে' লিখবো? কোথায় বসে' লিখবো? ভোর ছ'টা থেকে রাত বারোটা অবধি যে-কোনো সময়ে আমাদের বাড়ি যদি যাও, সোর শুনে' ভাববে, বাড়িতে আগুন লেগেছে বা নতুন জামাই এসেছে। রোজ সকালে বাজার করতে হয়; দুপুরে ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়ি, কেননা, বাড়িতে অসম্ভব, বিকেলে ল-ক্লাশের পর ট্যুসানি; তারপর বাড়ি ফিরে' তিন-চার ঘণ্টা অপেক্ষা করে' থেকে রাত বারোটা থেকে সকাল চারটা অবধি গল্প লিখতে বলো? দারিদ্র্য কথাটার মানে যে কি, তা তো জানো না!"

"কিন্তু এই দারিদ্র্যের আগুনে পুড়ে'ই তো মানুষ খাঁটি সোনা হয়।"

অভিলাষ টেবিলের ওপর প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দাঁতে

দাঁত ঘষে' অসহিষ্ণুভাবে বলে' উঠ্‌লো, "থাক্, থাক্,—ও-সব cant আউড়িয়ো না।"

আমি হেসে বল্‌লাম, "রাগ কোরো না, অভিলাষ, ও-কথাটা আমার নিজের নয়। কোন্ বাঙ্‌লা নভেলে যেন পড়েছিলাম—তোমার কাছে quote কর্‌লাম মাত্র।"

অভিলাষ চেয়ার ছেড়ে উঠে' অস্থিরভাবে পায়চারি কর্‌তে লাগ্‌লো। আমি মনে-মনে এই ভেবে খুসি হ'লাম যে লোকটাকে এতক্ষণে পথে আনা গেছে। ও এখন যে-সব কথা বল্‌বে, সেগুলো আঁচ করে' নিয়ে চোখা-চোখা জবাব আগে থেকেই শান দিয়ে রাখ্‌তে লাগলুম।

অভিলাষ চল্‌তে-চল্‌তে হঠাৎ আমার সুমুখে এসে থেমে বল্‌তে লাগ্‌লো, "দারিদ্র্য সম্বন্ধে কথা-বলার তুমিই উপযুক্ত লোক বটে—যে ইচ্ছে কর্‌লে একশো টাকার নোট্ দিয়ে নৌকো তৈরী করে' জলে ভাসাতে পারে। বাপ যা'র ব্যারিস্টার, মামা যা'র হাইকোর্টের জজ্, পার্ক্ স্ট্রীটে, দার্জ্জিলিঙে আর রাঁচিতে যা'র বাড়ি আছে, সখ্ করে' যে তিরিশ টাকার মেস্-এ থাকে, সময় কাটাবার জন্যে যে গল্প লেখে, দারিদ্র্যের আগুনে পুড়ে' মানুষ কতটা সোনা হয়, সে-কথা বিচার কর্‌বার অধিকার তা'রই তো আছে!"

"আহা—সোনা-টোনার কথা কি আমি বলেছি ছাই যে ও-কথা বলে' আমাকে জব্দ কর্‌ছো! আর, দুর্ভাগ্য-বশত গরীব হ'তে পারি নি বলে' যে এক-আধটা গল্পও লিখ্‌তে পার্‌বো না, এই বা কোন্ আব্‌দার?"

ততক্ষণে অভিলাষের মাথায় রক্ত চড়ে' গেছে; আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সে বলে' উঠ্‌লো, "আর সৌভাগ্য-বশত গরীব হয়েছি বলে'ই যে আমাকে গল্প লিখ্‌তেই হ'বে, এই বা কোন্ জুলুম?"

"এ-জুলুম তোমার ওপর কে খাটিয়েছে?"

"কেন? এই একটু আগেই তো তুমি বল্‌ছিলে যে আমি আদপেই লিখতে পারি নে; নইলে অ্যাদ্দিনে কিছু-না-কিছু বেরুতোই। তেতলার ঘরে ইজি-চেয়ারে শুয়ে'-শুয়ে' আকাশের দিকে তাকিয়ে এ-কথা ভাবা খুবই সোজা; —কিন্তু আমার অবস্থায় পড়্‌লে তুমি—গল্প-লেখা দূরের কথা—তল্পিতল্পা গুটিয়ে তিব্বতে পালাতে, কিম্বা তা না পার্‌লে আত্মহত্যে কর্‌তে।"

"তাই নাকি?"

"হাঁ, তাই। তুমি কি মনে করো আমি কখনো লিখ্‌তে বসি নি? কতবার যে বসেছি, হয়-তো অনেকদূর এগিয়েওছি,—হঠাৎ এমন একটা-কিছু ঘটে' বস্‌লো, যা'র পর পাগল হ'য়ে না যাওয়াটাই আশ্চর্য্য! কুচি-কুচি করে' সব ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে' এসেছি। কতদিন এমন হয়েছে—বাইরে থেকে মনে-মনে প্রায় আগাগোড়া একটা গল্প তৈরী ক'রে নিয়ে বাড়ি ফিরেছি—কাগজ-কলম নিয়ে লিখে' ফেল্‌লেই হয়;—বাড়িতে ঢুকে'ই শুনি তুমুল ঝগ্‌ড়া বেধেছে—মা-বাবায় বা বাবা-দাদায় কি বৌ-দি আর ছোট বোন্-এ। সারা বাড়ি তোলপাড়। কোথায় গেলো গল্প, আর কোথায় কি? বাড়িতে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই এম্‌নি ঝড় বইছে। ভাগ্যিস্ মানুষের ঘুমুতে হয়, নইলে রাতকেও ওরা রেয়াৎ কর্‌তো না। টাকার বিষম টানাটানি, তাই মেজাজ সবারি তিরিক্ষি। কেউ কখনো হাসে না, আস্তে কথা বলে না। যদি তুমি গিয়ে কাউকে মিষ্টি করে' কথা বলো, তোমাকে সন্দেহের চোখে দেখ্‌বে। এমন কি, বুড়ি ঝিটা পর্য্যন্ত সব সময় কারো না কারো মাথা চিবোচ্ছে। বাবা বুড়ো হয়েছেন; বাইশ বছর বয়সে তেত্রিশ টাকা মাইনেয় লাইফ-ইন্‌সিয়োরেন্স্-আপিসে ঢোকেন; ঠেল্‌তে-ঠেল্‌তে সাতান্ন বছর বয়সে এক শো-তে এসে ঠেকেছেন—এখানেই খতম! পয়লা তারিখে মাইনে পান;—দশুইর মধ্যে সব ফর্সা, একটি পয়সাও থাকে না। তবু দেনা দিন-দিন বেড়েই চলেছে। আমরা খাই কি, জানো? ভাত, ডাল, আলুসেদ্ধ—কচিৎ এক টুকরো মাছ। একদিন বিকেলে বাবার কাছে তিনটি পয়সা চেয়েছিলাম; তিনি জিজ্ঞেস্ কর্‌লেন, 'কি কর্‌বি?' বল্‌লুম, 'চা খাবো।' পয়সা তিনি দিলেন, কিন্তু রাত্তিরে শুন্‌লুম, মা-কে বল্‌ছেন, 'অভিলাষ এ-বেলা ভাত খেয়েছে? তা'লে চা খাবার জন্য পয়সা চেয়ে নিয়ে গেল কেনো?' শুনে' ইচ্ছে হয়েছিলো, গলায় আঙুল দিয়ে সব উগ্‌রে ফেলে দি।…

"অথচ আমার বাবা লোক খারাপ ছিলেন না। আমারই ছেলেবেলাতে তাঁকে অন্যরকম দেখেছি। মেজাজ খিট্‌খিটে হ'তে-হ'তে এখন তিনি একটি পাকা tyrant হ'য়ে উঠেছেন। হ'বেনই বা না কেন? আমাদের দেশে অন্য কোনো দেবতা মুখ তুলে' না চাইলেও মা-ষষ্ঠীর অনুগ্রহ প্রচুর। সব মিলে' আমরা ন' ভাইবোন্। বোন্ পাঁচটি।

আশা কুহকিনী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত গুরাম মাল্লইয়া

দু'জন নাকি এরি মধ্যে বড় হ'য়ে উঠেছে—আর বেশীদিন রাখা যা'বে না। ছোট দু' ভাই ইস্কুলে যায়; কারণ তারা ছেলে, বড় হ'লে আপিসে কলম-পেষা তা'দের পেশা করে' নিতে হ'বে। মেয়েদের কর্‌তে হ'বে বিয়ে, কাজেই বরকে চিঠি লেখ্‌বার মত বিদ্যে হ'লেই তাদের চলে। বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে' আমি সেই দু' বোন্‌কে ইস্কুলে দিয়েছি;—আমিই পড়াই এবং পড়ার সব খরচ চালাই। আর তিনটি বোন্ শিশু—তা'রা সুখে কাদায় গড়ায়, আর দুঃখে কাঁদে;—কুকুর-ছানার মত সে কী বিশ্রী, করুণ কান্না, ভাই। পড়ে'-পড়ে' মার খায়, ভালোমত জামা-টামাও পর্‌তে পায় না। মা বলেন, 'ওদের ঈশ্বরের নামে ছেড়ে দিয়েছি।' বেশ, তা'ই দাও।...আমি বি-এ পাশ করলুম পর বাবা কোন্ এক আপিসে আমার জন্যে পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনের এক চাক্‌রি ঠিক করে' এলেন। আমি তো কিছুতেই যাবো না, জোর করে'ই এম্-এতে ভর্ত্তি হ'লুম। বাবা বল্‌লেন, 'আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা।' গেলাম। কিছুদিন একটা মেস্-এ গিয়ে কাটালাম। ভালোই ছিলাম। শেষে একদিন মা নিজে গিয়ে আমাকে নিয়ে আসেন। পরে শুন্‌লাম, আমি বত্রিশ টাকা স্কলার্‌শিপ্ পেয়েছি শুনে' বাবার মন নাকি ভিজেছে।...এই টাকার খাঁকৃতি কি বাবার চিরকালই ছিলো? এই তো সেদিন দেনা শোধ কর্‌বার জন্য দাদার বিয়ে দিলেন, পেলেন নগদ দু' হাজার। কড়্‌কড়ে টাকা। অতগুলো টাকা কোথা দিয়ে কি করে' যে ফুটুরফাটুর হ'য়ে গেলো, কিছুই টের পেলাম না; অথচ এখনো দেখি, দেনার কথা বলে' বাবা দেয়ালে মাথা ঠোকেন। বাবার হাতে পড়্‌লেই টাকার যেন পাখা গজায়—অথচ সব টাকাই তাঁর নিজের হাতে খরচ করা চাই। মা-কে পর্য্যন্ত বিশ্বাস করেন না। আমার কাছ থেকে মাসে-মাসে স্কলার্‌শিপ্-এর সমস্ত টাকা গুণে নেন্। জানি যে বাজে খরচ হ'বে, তবু না দিয়েও পারি নে। আমি যে ট্যুশানি করি, তা বাবা জানেন না;—সে টাকা আমি গোপনে মা-কে দিয়ে দি;—বাবার অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমস্ত পরিবারের ঐ ক'টি টাকা মাত্র সম্বল।...আর-কেউ রোজগার করে না; দাদার লাট সাহেবী মেজাজ, কোনো কাজই নাকি তাঁর রোচে না। আই-এস্‌সি পাশ করার পর হেস্ত-নেস্ত হ'য়ে বেঙ্গল্ টেক্‌নিকেল্-এ ঢুকেছিলেন। পড়্‌ছিলেন তো পড়্‌ছিলেন, ফাইনেল্-এর বছর হঠাৎ কি মর্জ্জি হ'ল—দিলেন ছেড়ে। তারপর কিছুদিন শর্টহ্যাণ্ড, টাইপরাইটিং শিখ্‌ছিলেন;—সেখান থেকেও কা'র সঙ্গে যেন ঝগড়া-টগড়া করে' বেরিয়ে এলেন। গত ষোলো মাসের মধ্যে তিনি এক বিয়ে ছাড়া আর এমন-কিছু করেন নি, যা লোকের কাছে বলা যেতে পারে।...অথচ আজ শুন্‌লাম, বৌ-দি নাকি এরি মধ্যে—এরি মধ্যে—"

অভিলাষ কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে হঠাৎ থেমে গেলো। আমি বল্লুম, "এ আর আশ্চর্য্য কি, অভিলাষ? বরং না-হওয়াটাই অস্বাভাবিক।"

অভিলাষ বোমার মত ফেটে পড়লো: "হ্যাঁ, তুমি লাখ টাকার মালিক কিনা—তুমি তো এ-কথা বল্‌বেই! কিন্তু আমাদের কাছে—it means one more mouth to feed, বুঝলে? one more mouth,...তা-ছাড়া, এ আমি ভাব্‌তেও পারিনে বাগীশ,—বৌ-দি যে নিতান্ত ছেলেমানুষ!"

দেখ্‌লুম, একটু ওভারডোজ্ হ'য়ে গেছে। আমার উদ্দেশ্য ছিলো, অভিলাষের আঁতে একটু ঘা দিয়ে একটা ভয়ঙ্কর তর্ক জমিয়ে-তোলা;—কিন্তু ব্যাপার যেদিকে গড়ালো, তা'তে তর্ক চলে না; আর যদি বা চলে, তা-ও সু-তর্ক, এবং তা অত্যন্ত সতর্ক ভাবে চালাতে হয়। ও-সব ভেবে-চিন্তে কথা-বলা আমার ধাতে নেই। এদিকে আবার সন্ধ্যে হ'য়ে আস্‌ছে, মনটা উস্‌খুস্ কর্‌তে লেগেছে। কথার স্রোত ঘুরিয়ে দেবার জন্য একটা-কিছু বল্‌তে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমি হাঁ কর্‌বার আগেই অভিলাষ ধাঁ করে' বল্‌তে সুরু করে' দিলে:

"এর পরও তুমি আমাকে গল্প লিখ্‌তে বলো? আমি যে বেঁচে আছি, ভদ্দরলোকের মত চলাফেরা কর্‌ছি, তোমার সঙ্গে এতক্ষণ ধরে' যে কথা বল্‌লাম, এ-ই কি যথেষ্ট নয়? এতদিনে আমার কোথায় যাওয়া উচিত ছিলো, জানো? রাঁচিতে। হাওয়া বদ্‌লাতে নয়, পাগ্‌লা গারদে। তবে হাওয়া-বদল-ও হ'ত বটে। বাড়িতে বল্‌তে গেলে দু'টী মাত্র ঘর;—একটিতে মা-বাবা থাকেন—তা'রি মেঝেতে—যে দু'টি বোন্ ইস্কুলে পড়ে, তা'দের পড়াশুনো, শোয়া-বসা, গল্প-গুজব—সব। অন্য ঘরটির মাঝখানে পর্দ্দা খাটানো হয়েছে;—এক ধারে দাদা সস্ত্রীক প্রতিষ্ঠিত, অন্যদিকে

সবগুলি শিশু গড়াগড়ি করে। আমার নিজের একটি ঘর—নীচে, মাটির নীচেই বল্‌তে পারো। ছোট্ট একটা কুঠুরি—ঠাণ্ডা, অন্ধকার; ভিৎ রাস্তা থেকে এক আঙুলো উঁচু নয়;—হু'পাশে প্রচুর আবর্জ্জনা, ঘরের ভেতর মশা, মাছি, ছারপোকা, উই, ব্যাঙ, ইঁদুর—কিছুরি অসদ্ভাব নেই। সেখেনে একটি টেবিল, চেয়ার ও তক্তপোষ নিয়ে আমার এক্‌লার রাজত্ব। সরস্বতীকে ঐ ঘরেই আহ্বান কর্‌তে হ'লে গন্ধেই বোধ হয় তাঁর গা ঘিন্‌ঘিন্ করে' উঠ্‌বে। এমন কি, ও-ঘর আমার পর্য্যন্ত সয় না;—সারাটা দিন তাই বাইরে-বাইরেই থাকি;—বছরে দশ মাস ছাতে শুই, এবার ঠিক করেছি শীতকালেও শোবো।"

অভিলাষ যা'তে দেখ্‌তে না পায়—মুখটা একটু ঘুরিয়ে একটা হাই তুলে' ফেল্‌লুম: আমার কাছে ও এ-সব কথা বল্‌ছে কেন? ও যে কতক্ষণ ধরে' বল্‌ছে, তা-ও মনে নেই। আগে যা-যা বলেছিলো, সব ভুলে গেছি। পৃথিবী সূর্য্যের চারি দিকে ঘোরে, এ যেমন সত্য, সংসারে দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ, লাঞ্ছনা-যন্ত্রণা আছে—এ-ও তেম্‌নি। এ আর বলার দর্‌কার কি? চট্ করে' আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, "তোমার নিজের দোষেই তো এ-সব হচ্ছে, অভিলাষ। তুমি নিজে যা রোজগার করো, তা দিয়ে তুমি একা তো বেশ আরামেই দিন কাটাতে পারো! কেন তুমি বাড়িতে দাও? কেন তুমি সবার কথা ভাব্‌তে যাও?"

কি কুক্ষণেই কথাটা বলেছিলাম;—বিসুবিয়সের মুখে লাভার মত অভিলাষের মুখ দিয়ে কথা ছুট্‌তে লাগ্‌লো: "কেন ভাব্‌তে যাই? যে-হেতু তা'রা আমার মা, ভাই, বোন্, বাবা;—তা'রা যতই হীন ও হেয় হোক্, তারাই আমার আপন। যদি সবাইকে সুখী কর্‌তে না পারি তো আমার নিজের সুখের মুখে ছাই পড়ুক্। মা আজ বারো বচ্ছর হিস্‌টিরিয়ায় ভুগ্‌ছেন; এক একদিন যখন ফিট্ ওঠে, মনে হয়, এই বুঝি গেলেন! আমি না থাক্‌লে তাঁর দেখাশোনা করে কে? অভাবের তাড়নায় বাবা প্রায় পাগল হয়ে গেছেন; ছোট ভাইবোন্‌গুলোকে তাঁর অত্যাচার থেকে বাঁচাবার আমি ছাড়া কেউ নেই!...কিন্তু তুমি তো এ-কথা বল্‌বেই। তুমি বড়লোক, তুমি aristocrat, তুমি স্বার্থপর। তোমার মুখের দিকে কেউ তাকিয়ে নেই, তাই তোমারো কারো পানে তাকাবার দর্‌কার হয় না। তুমি রোজগার কর্‌লে তবে তা'র খাওয়া হ'বে, এমন যদি কেউ থাক্‌তো, তা'লে তুমি ও-কথাটা উচ্চারণ কর্‌তে পার্‌তে না। জানো, এ-পর্য্যন্ত তুমি সিগ্রেটে যত টাকা পুড়িয়েছ, তা'তে আমার মা-র চিকিৎসা হ'তে পার্‌তো; মদে যত টাকা ঢেলেছ, তা'তে আমার বোন্ দু'টির ভালো বিয়ে হ'তে পারে; মেয়েমানুষে যত টাকা উড়িয়েছ, তা'তে ছোট ভাইগুলোর এখন থেকে সুরু করে' বিলেত থেকে পাশ করে' আসা পর্য্যন্ত খরচ চলে। আমার মুখের দিকে তাকাতে তোমার লজ্জা করে না?...আর তুমি কি না আমাকে জিজ্ঞেস্ করো, আমি গল্প লিখি নে কেন?"

এতক্ষণ অভিলাষ অনবরত পায়চারি কর্‌ছিলো; এইবার ধুপ্ করে' ইজি-চেয়ারটার ওপর বসে' পড়্‌লো।

আমার ভয় হ'তে লাগ্‌লো, পাছে ও কেঁদে ফেলে। ও যে-সব কথা বলে' ওর বক্তব্যের উপসংহার কর্‌লে, তা'রো যে উত্তর না ছিলো, এমন নয়; কিন্তু এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে তার বাক্‌বিস্তার করা আমার কাছে নিরর্থক মনে হ'ল। ওকে সাম্‌লে নেবার জন্য একটু সময় দিয়ে আমি বল্‌লুম, "কথা কইতে-কইতে এক্কেবারে সন্ধ্যে হ'য়ে গেলো, দেখ্‌ছি। চলো হে, একটু বেরুই। বড্ড ক্ষিদে পেয়ে গেছে।"

অভিলাষ তাই বলে' সত্যি-সত্যি কাঁদছিলো না। ভাগ্যিস্! আমার কথা শোনামাত্র সে স্বাভাবিক কণ্ঠেই বল্‌লে, "যা বলেছো! দু' ঘণ্টা ধরে' আমার পেটটা চোঁ-চোঁ কর্‌ছে। চলো, বেরুনো যাক্।"

ক্ষিদেটা ওর জীবনের প্রকাণ্ড দুর্ব্বলতা। ওর সকল কর্ত্তব্যবুদ্ধি, সংসার-চিন্তা ইত্যাদি ক্ষিদের কথা উঠ্‌তেই এমন বেমালুম মিলিয়ে গেলো যে আমি একটু অবাকই হ'লাম। দেখা গেলো, ও এক সইতে পারে না ক্ষিদে, আর সাম্‌লাতে পারে না হাসি।

অভিলাষের সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তার যে-রিপোর্ট্ আপনারা এইমাত্র পড়্‌লেন, আশা করি তা থেকে আমার সঙ্গে ওর চরিত্রগত পার্থক্যটা বেশ সমঝে নিয়েছেন। এটা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য যে, যে-সরল বিশ্বাস ও আশা নিয়ে আমরা ভূমিষ্ঠ হই, কারো মনেই সেটা বেশীদিন তিষ্ঠোয় না;

অর্থাৎ আশা করে' নিরাশ হ'তে-হ'তে এক-সময় আমরা নিজেরাই অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠি; অভিলাষ তখনো সে-অবস্থায় পৌঁছায় নি; পিতামাতা, কর্ত্তব্য, বিবাহ প্রভৃতি বস্তুগুলির ওপর ওর আস্থা একেবারে অটুট; এমন কি, নিজের বুদ্ধি ও ঋদ্ধির ওপর ও পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাবান। আমার কাছে সেই লোকই সব চেয়ে বড় হেঁয়ালি, নিজকে যে বড় বলে' ভাবতে পারে। এক কথায় বল্‌তে গেলে, আমি সব জিনিষেরই futility বা'র করেছি, আর অভিলাষ utilityর ভার বইছে।

এ-হেন অভিলাষ আমাকে গোটা-কয়েক কড়া কথা শোনালে তা'তে দুঃখ পাওয়ার মত মূর্খতা আমার নেই; তথাপি মেছোবাজার দিয়ে কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের দিকে চল্‌তে-চল্‌তে ও আমাকে বল্‌লে, "ঝোঁকের মাথায় আজ কতকগুলো কথা তোমায় বলে' ফেলেছি"—

বাধা দিয়ে বল্লুম, "ঝোঁকের মাথায় লোকে যা করে, পরে তা'র জন্য অনুতাপ কর্‌তে হয়, এ convention এখনো কাটিয়ে উঠতে পার্‌লে না?"

"ঠাট্টা নয়, সত্যি। আমি ভেবে দেখ্‌লুম যে, আভিজাত্যের যে-অহঙ্কার, তা'র একটা মানে আছে, কিন্তু দারিদ্র্যের যে-অভিমান, সেটা তা'কে মানায় না, কারণ আসলে সেটা একগুঁয়েমি। দাদার ওপর রাগ করে' এসে তোমাকে ঐ সব কথা বলা—এ নেহাৎ বোকামি।"

"দয়া করে' এখুনি চুপ করো, অভিলাষ; নইলে একটু পরেই তুমি সেন্টিমেণ্টল্ হ'য়ে পড়্‌বে। আর, তুমি যা'কে বোকামি বল্‌ছো, তা যদি বা সইতে পেরেছিলাম, আমি যা'কে ন্যাকামি বলি, তা কিছুতেই সইতে পার্‌বো না। পারো তো চসার্-এর গ্রামার্-সম্বন্ধে আমাকে একটু enlighten করো।"

এই কথা শুনে' অভিলাষ হেসে ফেল্‌লো; এবং আমার কাঁধের ওপর হাত রেখে সেই ইতরজনবহুল, সঙ্কীর্ণ, নোঙরা ফুটপাথ্ দিয়ে চল্‌তে লাগ্‌লো।

আপনারা বোধ হয় বুঝ্‌তে পার্‌ছেন যে অভিলাষের মনটি হচ্ছে সেই ছাঁচের, কবিরা যা'কে বলে' থাকেন, "কোমল"। আমার মতে, ওর ঐ মমতাশীল হৃদয়ই ওর কাল হ'ল। কর্ত্তব্য-টর্ত্তব্য-সম্বন্ধে যে-সব বুলি ওর মুখে লেগে রয়েছে, সেগুলো হ'ল গিয়ে কথার কথা; আসল কথা হচ্ছে এই যে ওর মনটা বড্ড স্নেহ-প্রবণ; যুধিষ্ঠিরকে যে পরিজন-পরিত্যাগ করে' একাকী স্বর্গারোহণ কর্‌তে হয়েছিলো, পুরাণের এ-রূপকটি ও তলিয়ে দেখে নি। পরিবারের জন্য ওর এই অনাবশ্যক উৎকণ্ঠা তা'দের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিন্দুমাত্র বাড়াচ্ছে না, তথাপি ও তা'দের মুখের দিকে চেয়ে নিজের ভবিষ্যৎ দু'পায়ে মাড়াচ্ছে। তা'র কারণ, ভাই-বোন্ ইত্যাদির প্রতি ওর অপরিসীম স্নেহ। ও জানে না যে সব চেষ্টাই নিষ্ফল; ও যে তা'দের জন্য এতখানি কষ্ট গায়ে পেতে নিচ্ছে, এই চিন্তাতেই ও সুখ পায়। ভালোবাসা ভালো জিনিষ, কিন্তু মদেরো বাড়াবাড়ি কর্‌তে নেই।

কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্-এর মোড়ে এসে অভিলাষ শুধোলে, "কোথায় যা'বে?"

"চীনে-হোটেলে। সেখানে শস্তায় নানারকম অদ্ভুত খাবার পাওয়া যায়, অধিকন্তু—"

"বল্‌তে হ'বে না—বুঝেছি। তা-ই চলো।"

দেখ্‌তে-দেখতে অভিলাষ যেন অন্য একটি মানুষ হ'য়ে গেলো। ওর সমস্ত ঝাঁজ ও ঝাল কি করে' যে এত অল্প সময়ে গলে' জল হ'য়ে গেলো, আমি তা ভেবে পেলাম না। বাস্-এ আস্‌তে-আস্‌তে ও এমন লঘুচিত্ততার পরিচয় দিতে লাগ্‌লো যেন ও নতুন বিয়ে করে' এই প্রথম শ্বশুরবাড়ি চলেছে।

সবে সন্ধ্যা উৎরেছে, 'ক্যাণ্টন্'-এ তখনো ভিড় সুরু হয় নি। ছোট একটি ঘরে পাখার নীচে গিয়ে বস্‌তেই আমার মানসিক আব্‌হাওয়ার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেলো। অভিলাষের জন্য চা আর চিংড়ি-কাট্‌লেট্ অর্ডার্ দিয়ে আমি প্রথমে এক পেগ্ ব্রাণ্ডি খেয়ে সুস্থ হ'য়ে নিয়ে খাবারে মনোনিবেশ কর্‌লুম। অভিলাষ ইস্কুল-পালানো ছোট ছেলের মত বকর্‌বকর্ করে'ই চলেছে।

অভিলাষের প্লেটে সাবাড় হ'য়ে গেছে, কিন্তু আমার গেলাস তখনো কাবার হয় নি। শুধোলাম, "আর-কিছু খা'বে?"

অভিলাষ ঢেঁকুর তুলে' বল্‌লে, "নাঃ—আবার বাড়িতে গিয়ে ভাত খেতে হ'বে—নইলে মা ভাব্‌বেন, অসুখ করেছে।"

তারপর কি মনে করে' বলে' ফেল্‌লে, "দেখি, এক চুমুক দাও তো!"

গেলাসটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিলুম। ও সেটাকে মুখে তোল্‌বার আগে খানিকক্ষণ শুঁকে' বিতৃষ্ণভাবে মুখবিকৃতি কর্‌লে। গেল্‌বার সময় ওর চোখ-মুখের এমন চেহারা কর্‌লে, যেন ওর গায়ে কেউ পিন্ ফুটিয়ে দিচ্ছে।

বল্‌লুম, "তোমার খেয়ে কাজ নেই, অভিলাষ। দাও আমাকে।"

"ইস্!" বলে' ও ঢক্‌ঢক্ করে' গেলাসটা খালি করে' ফেল্‌লে।

আমার ঘাড়েও তখন বোধ হয় ভূত চেপেছিলো; আমি ওয়েটারকে ডেকে দু'টো 'পাঞ্চ'-এর অর্ডার দিলুম। অভিলাষও, দেখ্‌লুম, আপত্তি কর্‌লে না।

কিন্তু এক চুমুক খেয়েই ও নাসিকা কুঞ্চিত করে' বলে' উঠ্‌লো, "তেতো!"

আপনারা বল্‌বেন, আমার তখন উচিত ছিলো ওকে বারণ করা, বা দরকার হ'লে জোর করে' ওকে থামানো। কিন্তু আমি কেন থামাতে যাবো, বলুন? আমি তো ওকে খেতে বলি নি; এখন বারণই বা কর্‌বো কেন? ওর যা খুসি করুক্।

শুধু বল্‌লুম, "হ্যাঁ, একটু তেতো তো লাগ্‌বেই। বিয়ার্ আছে কিনা। Take some salad."

অভিলাষ যেমন-তেমন করে' ওটা শেষ করে' ফেল্‌লো। সবটারই একটা চক্ষুলজ্জা আছে। আমাকে অনায়াসে খেতে দেখ্‌ছে; অথচ ও যদি না পার্‌তো, তা'লে আমার চোখে ওর পৌরুষের হানি হ'ত। অন্তত ও তা-ই ভাব্‌ছিলো।

চেয়ার ছেড়ে উঠে' দাঁড়াতেই টের পেলুম, বেশ ধরেছে। অভিলাষের দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম, এরি মধ্যে ও টেবিলের ওপর মাথা রেখেছে। তখুনি মনে-মনে ভাব্‌লুম যে আমিও যদি বেহুঁশ হ'য়ে পড়ি, তা'লে অভিলাষকে নিয়ে একটা কেলেঙ্কারিই হ'য়ে যা'বে। তাই খুবই স্বাভাবিকতার ভাণ করে' অভিলাষের ঘাড়ে হাত দিয়ে বল্‌লুম, "এই, ওঠো। ঐ একটুখানি খেয়েছ—কিছুই হয় নি তোমার।"

ও-কথা বল্‌বার সময়ই মনে-মনে জান্‌তুম যে অভিলাষ বে-সামাল্ হয়েছে। হ'বারই কথা। কিন্তু ও-সব কথা বলে' ওর পৌরুষের অভিমানকে একবার চাড়িয়ে দিতে পার্‌লে ও চল্‌বে ঠিকমত।

ও মাথা তুলে' বল্‌লে, "কি?...হ্যাঁ, এই যে যাচ্ছি।"

আমরা ঘর থেকে বেরুচ্ছি, এমন সময় একটা সাহেব যথারীতি একটি মেম্‌কে বাহুপাশে আবদ্ধ করে' উল্টো দিকের ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লো। মেমের বয়েস কাঁচা, পায়ে মোজা আছে কি নেই বোঝা যায় না, স্কার্ট্ হাঁটুতে গিয়ে ঠেকেছে, বাহু দু'টি সম্পূর্ণ নগ্ন। যেমন আজকালকার দিনে হ'য়ে থাকে।

অভিলাষ বল্‌লে, "কী সুন্দর, দেখেছো?"

আমি কিছু না বলে' ওকে এক রকম ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগ্‌লুম।

রাস্তায় বেরিয়ে ও আবার বল্‌লে, "মেমটার কী চমৎকার পা, দেখেছিলে? আঙুলের ডগাগুলো ঝক্‌ঝক্ কর্‌ছে।... আজ রাত্তিরে আর বাড়ি ফির্‌বো না।"

না-বোঝ্‌বার ভান করে' বল্‌লুম, "বেশ তো। চলো না আমার মেস্-এ।"

"না, না। তোমার কোনো জানা'শোনা ইয়ে নেই? চলো না, রাতটা কাটিয়ে আসি।"

গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লুম, "না হে, আজ্‌কে থাক্।"

"কেন, থাক্‌বে কেন? চ—লো না!"

মিথ্যে কথা বল্‌লুম, "টাকা নেই যে।"

অভিলাষ আমার পিঠে বেশ জোরেই একটা চড় মেরে বল্‌লে, "টাকা? টাকা নেই? সে-জন্য ভাব্‌ছো? Never mind. I've got a tenner—or rather two..."

জিজ্ঞেস্ কর্‌লাম, "এ টাকা কিসের?"

"কাল্‌কে ট্যুশনির টাকাটা পেয়েছিলাম; পকেটেই রয়ে' গেছে।"

"এ তুমি খরচ কর্‌বে? তারপর?"

"তারপর আবার কি? Oh, I shall be able to manage, তুমি চলোই না!"

আমার নিজেরো তখন মাথার একটু গোলমাল হয়েছিলো বই কি! অভিলাষ মেয়েমানুষের পেছনে টাকা খরচ কর্‌তে যাচ্ছে, এ-কথা ভাব্‌তেই আমার নেশা যেন চারগুণ চড়ে' গেলো। হোটেলের দরজাতেই একটা ট্যাক্‌সি দাঁড়িয়ে ছিলো; দু'জনে তা'তে গিয়ে উঠে' পড়লুম।

ওখানে গিয়ে অভিলাষ প্রথম কি কথা বল্‌লে, জানেন? বুঝ্‌লে, "একটা বোতল আনিয়ে দাও না ভাই—বিলিতি। এই নাও।" বলে, মেয়েটির হাতে একটা দশ টাকার নোট্ গুঁজে' দিলে।

তারপর সারারাত যে-ঢলাঢলিটা হ'ল,—কখন্ যে ঘুমিয়ে পড়্‌লাম, ভোরের বেলা নিজে কি করে' উঠ্‌লাম, অভিলাষকেই বা কি করে' তুলে' টেনে হিঁচড়ে ট্যাক্‌সিতে তুলে' কত কষ্টে যে আমার মেস্-এ ফির্‌লাম—সে-সব না বলাই ভালো; সব মনেও নেই। এইটুকু বল্‌লেই যথেষ্ট হ'বে যে বেলা দশটার সময় স্নান করে', জামা-কাপড় বদ্‌লে', লাল চোখ ও বিষম মাথা-ধরা নিয়ে অভিলাষ যখন বাড়ির দিকে রওনা হ'ল, তখন তা'র পকেটে কুড়ি টাকার একটি কড়িও ছিলো না।

অভিলাষ সেই যে আমার মেস্ থেকে বেরুলো, তা'র পর আর তিন মাসের মধ্যেও ওর দেখা পাই নি। মাঝে একদিন শুধু ওর একটি ছোট ভাইকে দিয়ে আমার জামা-কাপড় পাঠিয়ে ওরগুলো নিয়ে গিয়েছিলো। আর খোঁজ-খবর নেই।

কেন যে ও আর আমার পথও মাড়ায় নি, তা'র কারণ আপনারা সবাই অনুমান কর্‌তে পার্‌ছেন; আমি ব'লে আর লজ্জা পেতে যাই কেন? কিন্তু ওর অনুতাপের জ্বর যে ক' ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠেছিলো, তা আমি শুন্‌লুম আর একটি ছেলের কাছে। ছেলেটির সঙ্গে মুখ-চেনা ছিলো; হঠাৎ একদিন ট্রামে দেখা। আমি জান্‌তুম, সে অভিলাষদের ক্লাশে পড়ে। গায়ে-পড়ে'ই আলাপ কর্‌লুম: "আপনি অভিলাষের খবর কিছু জানেন?"

"কেন বলুন্ তো?"

"এমনি। অনেকদিন ওকে দেখি নে। ও ভালো আছে তো?"

"হ্যাঁ, ভালোই তো আছে।"

"খুব পড়্‌তে আরম্ভ করেছে বুঝি? বাড়ি থেকে আর বেরোয়-টেরোয় না?"

"না, তেমন আর পড়্‌তে পার্‌ছে কই? সময়ই পায় না—আরো দু'টো ট্যুশনি নিয়েছে কিনা!"

"বলেন কি? সময় পায় কখন্?"

"দু'টোই সকালে। একটা সাতটা থেকে ন'টা, আর একটা সাড়ে ন'টা থেকে সাড়ে দশটা। একটা মাড়োয়ারির ছেলেকে ইংরিজি পড়ায়—ওরা টাকার কুমীর—চল্লিশ টাকা করে' দেয়। আর একটি মেয়ে প্রাইভেট্ আই-এ পরীক্ষা দেবে—তা'কে একনমিক্স্ শেখাতে হয়, ওখানে পায় তিরিশ। আছে বেশ।"

"বেশ বই কি। খালি ট্যুশনি ক'রেই তো শ'খানেক টাকা পাচ্ছে। তা'র ওপর স্কলার্‌শিপ্ তো আছেই।—কিন্তু এত খাটুনিতে ওর শরীর টিঁক্‌ছে তা?"

"তা টিঁক্‌ছে। ও রোজ পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে' ছাতে দশ মিনিট্ ম্যুলরের সিস্‌টেম্ করে। তার পর আদা আর ছোলা খেয়ে নিজের পড়াশুনো করে—যতক্ষণ না পড়াতে যাবার সময় হয়। · আচ্ছা, নমস্কার।"

ছেলেটি নেবে গেলো বলে'—নইলে আর একটা কথা জিজ্ঞেস্ কর্‌তাম, অভিলাষের বৌ-দির খবর কিছু জানে কিনা।

যাক্, ভালোই হ'ল। কুড়িটে টাকা গয়চা দিয়ে ও লাভ কর্‌লো ঢের। সেদিন ঐ কাণ্ডটা না ঘট্‌লে ও এখন টাকা রোজগার করার জন্য অমন উঠে' পড়ে' লেগে যেতো না নিশ্চয়ই। মনে-মনে ভেবে একটু ভালোই লাগ্‌লো, অ্যাদ্দিনে ওদের হাল হয়তো একটু ফিরেছে; অন্তত বাড়িটে বদল করেছে নিশ্চয়ই, ওর দাদা-বৌদি একটি আলাদা ঘর পেয়েছেন, ছোট মেয়েগুলো আর কাদায় গড়ায় না, ওর মা-রও বোধ হয় চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে।······ কিন্তু কুড়ি টাকার জন্য এতখানি প্রায়শ্চিত্ত!

এখানে যদি গল্পটা শেষ কর্‌তে পার্‌তাম, তা'লে আমার পরিশ্রম কম্‌তো, আপনারা খুসি হ'তেন, নীতি-টীতিগুলোও রক্ষা পেতো;—মোটের ওপর সব দিকই বাঁচ্‌তো। অভিলাষের চরিত্র যুবকদের আদর্শস্থানীয় বলে' কীর্ত্তিত হ'ত, অভিভাবকরা আমার বাহবা দিতেন, সমালোচকরা শত-মুখে প্রশংসা কর্‌তেন, মেয়েদের এ-গল্প লুকিয়ে পড়্‌বার দর্‌কার হ'ত না। কিন্তু আপনাদের, অভিলাষের এবং—সব চেয়ে বেশি—আমার দুর্ভাগ্য যে এ-গল্পের এখানে শেষ

নয়, আরো একটু আছে। আপনারা আমার ওপর চটতে পারেন, কিন্তু আমি নিরুপায়। পরে যা হ'ল, তা না বলে' আমি পারি নে। অবিশ্যি শেষের দিকটা যে আমি চেপে যেতে না পারতুম, এমন নয়; কিন্তু অভিলাষ গল্পটা এ-পর্য্যন্ত পড়ে' বলে' গেছে যে বাকিটুকু আমি না লিখলে ও নিজে লিখে' গল্পের সঙ্গে জুড়ে' দেবে। তাই,—যা থাকে কপালে—আমিই লিখে' ফেলি।

ফাল্গুনের শেষের দিক। কল্‌কাতায় গরম পড়ি-পড়ি করছে। দুপুর বেলা শুয়ে'-শুয়ে' কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে ভাব্‌ছি, এইবেলা দার্জিলিঙ্‌ পালাই। কথাটা ভাবামাত্র গরমটা যেন অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌লো। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে কল্‌কাতার আকাশ, বাতাস, পথ ঘাট, লোক-জন সব আমার চোখে ও মনে বিষিয়ে উঠ্‌লো। মনে হ'ল, আর এক দণ্ড এখানে থাক্‌লে মরে' যাবো। আজ্‌কেই দার্জ্জিলিঙ্‌ যাওয়া যায় না? কেন যায় না? যায় বই কি! আজ্‌কেই যাবো।

তক্ষুণি উঠে' সুট্‌কেস্‌টা গুছোতে বস্‌লাম। হঠাৎ পেছন থেকে কে বলে' উঠ্‌লো, "কোথাও যাচ্ছ নাকি?"

"এ কি? অভিলাষ?"

অভিলাষই। রোদে ঘেমে-টেমে এসে হাজির। এতদূর অবাক হ'লাম যে মিনিট দু'য়েক পর কথা বল্‌তে পার্‌লাম, "বে—শ। এসো, এসো। এই দুপুরের রোদে কোত্থেকে? অ্যাদ্দিন একেবারে ভুলে' ছিলে যা-হোক্!... হ্যাঁ, আজ দার্জিলিঙ্‌ যাচ্ছি। এইমাত্র ঠিক কর্‌লাম। বোসো। ভালো আছ তো?"

"আছি ভালোই।...উঃ, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।" বলে' কুঁজো থেকে নিজেই এক গ্লাশ জল গড়িয়ে খেয়ে পকেট থেকে একটা সিগ্রেট্‌ বা'র করে' ধরালে।

না বলে' পার্‌লাম না, "ও কি? তুমি আবার সিগ্রেট্‌ ধর্‌লে কবে থেকে?"

"আজ থেকে।"

সুট্‌কেস্‌টা ঠেসে বন্ধ করে' তক্তপোষের নীচে ঠেলে রেখে আমি নিজেও একটা সিগ্রেট্‌ ধরালাম।—"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ, অ্যাদ্দিন যে-কারণে খাই নি, আজ বুঝ্‌লাম সেটা কোনো কারণ নয়।"

"নয় নাকি? এ ক'মাসে কি তুমি এই শিক্ষা পেলে?"

"হ্যাঁ, এই শিক্ষাই পেলাম।...তা'র পর আমি আর আসি নি কেন, জানো? ভাব্‌লুম, একটা experiment করে' দেখা যাক্‌। কর্‌লুম।"

"তারপর?"

"তারপর আর কি?...এ তিন মাস আমি যত খেটেছি, একটা ধোপার গাধাও তত খাটে না। তিন-তিন্‌টে ট্যুশানি—ভদ্দলোকে কর্‌তে পারে? তবু মাসকাবারে যখন টাকা-গুলো পেতাম, মনটা ভালোই লাগ্‌তো। বাড়িতে মাসে-মাসে সওয়া শ' করে' টাকা দিতে লাগ্‌লাম। বাবাকে বল্‌লাম, 'এইবার বাড়ি-বদল করি।' বাবা ধমক দিয়ে বল্‌লেন, 'হ্যাঁ—বাবুগিরি করে' ফতুর হও আর কি! বোনেদের বিয়ে দিতে হ'বে, সে খেয়াল আছে?' বল্‌লুম, 'আচ্ছা বেশ, তা'লে মাসে একশো টাকা করে' ব্যাঙ্কে রাখুন্‌!' বাবা হুম্‌কি দিয়ে বলে' উঠ্‌লেন, 'কী আমার নবাবের পুত্তুর রে! ব্যাঙ্কে টাকা না রাখ্‌লে তাঁর মন ওঠে না! ইদিকে সবগুলো লোক না খেয়ে শুকিয়ে মরুক্‌!' জিজ্ঞেস্‌ কর্‌তে ইচ্ছে হ'ল, এই টাকা আস্‌বার আগে কে অনাহারে মরেছে? কিন্তু চুপ করে' রইলাম—ওদের যা ভালো লাগে করুক্‌।"

"সেই রাগেই বুঝি—"

"দূর ছাই—শেষ পর্য্যন্ত শোনোই না।...এক মাস গেলো, কিন্তু যেমনকে-তেমন। ছোট বোনগুলোর গায়ে একটা ভালো জামাও উঠ্‌লো না। উন্নতির মধ্যে, দেখলুম, এক চাকর রাখা হয়েছে—ওকে বাজারের জন্য রোজ একটি টাকা দে'য়া হয়;—তা'র আট আনাই বোধ হয় চুরি করে; যা আনে, তা-ও মুখে তোলা যায় না। শুন্‌লাম, এ মাসে নাকি মুদির হিসাব একেবারে কাবার করে' দে'য়া হয়েছে। যাক্‌, তবু ভালো। পরের মাসে চাকর তুলে' দিলাম; সমস্ত টাকা মা-র হাতে দিয়ে বল্‌লাম, 'তুমি একটু বুঝে'-সুঝে চালিয়ো। ওদের জন্য আগে কতগুলো জামা তৈরী করাও—তারপর অন্য খরচ।' নতুন জামা দেখে বাবা রেগে, পুরোণো খবরের কাগজ ছিঁড়ে', মুখ খারাপ করে' এক কেলেঙ্কারি বাধিয়ে তুল্‌লেন—আমরা

সবাই মিলে' নাকি তাঁর সর্ব্বনাশ কর্‌ছি। সে-ও সইলো। তারপর কয়েকটা দিন শান্তিতেই কাট্‌লো—সবার মুখেই একটু হাসি-হাসি ভাব, দু' টুক্‌রো করে' মাছ পাতে পড়ছে—যে দু'টি বোন্‌ ইস্কুলে পড়ছে, তা'রা দেখ্‌তে-দেখ্‌তে যেন সুন্দর হ'য়ে উঠ্‌লো! ভাব্‌লাম—যাক্‌,—সবি সার্থক। তৃতীয় মাসে শুনি, আবার নাকি মুদির দেনা জমেছে, কাপড়ের দোকান থেকে সাতদিনের মধ্যে টাকা না পেলে নালিশ কর্‌বে বলে' শাসিয়ে গেছে। শাসাক্‌ গে,—মা কে বল্‌লাম, ওদের যেন গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিয়ে দে'য়া হয়। বলে' আমার সারা মাসের রোজগার মা'র হাতে তুলে' দিলাম।

"পরের দিন সকালে দেখা গেলো, মা-র হাতবাক্সের ভেতর একটি পয়সাও নেই, আর নেই দাদা। বিনা কাজে বসে' বৌ-র সঙ্গে প্রেম কর্‌তে আর বোধ হয় তাঁর ভালো লাগ্‌ছিলো না, তাই আমার সারা মাসের রোজগার নিয়ে তিনি অবকাশ-যাপনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছেন। তারপর সে যা চ্যাচামেচি, কান্নাকাটি, হৈ-চৈ সুরু হ'ল—সে এক দেখ্‌বার জিনিষ! বাবা বল্‌লেন, 'ও-হারামজাদাকে আমি জেলে দেবো, এই চল্‌লাম থানায়।' জোর-জবরদস্তি করে' আমিই ঠেকিয়ে রাখ্‌লাম। ছেলের নামে নালিশ করা যে বাপের পক্ষে খুব গৌরবের কথা নয়, এ-কথা তখন তাঁকে বোঝায়, কা'র সাধ্যি! মা সেই যে ফিট্‌ হ'য়ে পড়্‌লেন—তিন দিনের মধ্যে তিনি একটিবার চোখ মেলেন নি। মনে-মনে প্রার্থনা কর্‌লাম, ও-চোখ যেন তাঁকে আর না মেল্‌তে হয়! কিন্তু এবারেও তিনি মর্‌লেন না। মর্‌লেই বাঁচ্‌তেন—তাই। ভালো হ'য়ে মা বারো দিন কিচ্ছু না খেয়ে ছিলেন,—এক ফোঁটা জলও না;—কত কষ্টে যে তাঁকে খাওয়ালাম! এদিকে এই সব তোলপাড় হওয়াতে বৌ-দিরো কাণ্ড হ'য়ে গেলো—সাত মাসেই। মরা একটা ছেলে, পুতুলের মত হাত-পা—চোখ তখনো ফোটে নি। ইচ্ছে হ'ল, ন্যাক্‌ড়ায় জড়িয়ে ডাস্ট-বিন্‌-এ ফেলে দি।

"যাক্‌—"one more mouth to feed' হ'ল না।

"আর, হ'লেও ক্ষতি ছিল না। যাঁহা বাহান্ন, তাঁহা তিপান্ন! · যাক্‌ গে। তুমি আজই দার্জিলিঙ যাচ্ছ? আর কয়েকটা দিন কাটিয়ে যাও না—তারপর একসঙ্গেই যাওয়া যা'বে।"

"তুমিও যা'বে নাকি?"

"হ্যাঁ, ইংরিজি মাসটা কাবার হ'তে দাও। থেকে যাচ্ছ তো?"

"তুমি যখন বল্‌ছো।··তারপর, তোমার দাদা আর ফেরেন নি?"

"ফিরেছেন বই কি। কাল। যা scene হ'বার, হ'ল। তারপর সব ঠাণ্ডা। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে' এসেছে বলে' মনে-মনে সবাই খুসি। দাদাকেও মোটেই লজ্জিত-ফজ্জিত দেখ্‌লাম না। বরং দেখলাম, সব ছেলে-পিলেদের কাছে ডেকে তাজমহলের গল্প কর্‌ছেন। আজ সকাল থেকে বাড়িতে আবার সেই সাবেকী জীবন সুরু হয়েছে—একঘেঁয়ে, মামুলি।···চলো, আজকে···" অভিলাষ পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বা'র করে' এক-চোখ টিপ্‌লে।

"দাদার সার্টের পকেট থেকে মেরে দিয়েছি। এখানাই বোধ হয় বাকি ছিলো;—আমারই তো টাকা!"

জেকোশ্লোভাকিয়া

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

জেকোশ্লোভাকিয়া নবগঠিত গণতন্ত্র রাজ্য—মধ্য-য়ুরোপে অবস্থিত। এই দেশে জেক্ বা বোহিমিয়ান, মোরাভিয়ান, জেক, রুথেনেস ও টিউটন্‌স্ প্রভৃতি নানা জাতীয় লোকের বাস আছে। দেশটি বিবিধ নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক বৈচিত্র্যে পূর্ণ ও সৌন্দর্য্যে বিভূষিত। পূর্ব্ব-পশ্চিমে ইহা ছয় শত মাইল দীর্ঘ, এবং প্রস্থে স্থানে স্থানে দুই শত মাইল। জেক জাতি প্রধানতঃ বোহিমিয়ার অধিবাসী। সেখানকার ৭০ লক্ষ অধিবাসীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জেক-জাতীয় লোক।

মোরাভিয়ানরা জেকজাতিরই একটি শাখা। ইহারা ও শ্লোভাকরা মূলতঃ শ্লাভিক জাতি হইতে উৎপন্ন। এই শ্লাভিক জাতি সুদূর পশ্চিমে বিস্তৃত হইয়া স্থানে স্থানে সেল্টিক বোয়াই জাতিকে বিতাড়িত করে, এবং কোথাও কোথাও তাহাদের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। খৃষ্টজন্মের বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই সেল্টিক বোয়াই জাতি ঐ অঞ্চলে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রথমে জার্ম্মাণ-জাতির অন্তর্গত মার্কোমান্নি জাতির নিকট পরাজিত হইয়া তাহারা তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করে। শ্লাভিক জাতি মার্কোমান্নি জাতিকেও যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাহাদের অধিকৃত দেশ পুনরধিকার করিয়া লয়। এই বিষয়ে ভারতের সহিত এই দেশের যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। প্রথমে আর্য্যগণ ভারতের আদিম অধিবাসীদিগকে পরাজিত করিয়া এই দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। আদিম নিবাসীরা কোথাও স্বতন্ত্রভাবে থাকে, কোথাও আর্য্যদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। পরে মুসলমানরা আর্য্যদের পরাজিত করিয়া এই দেশ অধিকার করেন। এক্ষণে ইংরাজরা মুসলমানদের পরাজিত করিয়া এই দেশ অধিকারপূর্ব্বক শাসন করিতেছেন।

শ্লাভিক জাতি যে দেশ অধিকার করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহা এলব নদী ও তাহার উপনদীগুলির জল-বিধৌত দেশ। ইহার পশ্চিমে এক পর্ব্বতশ্রেণী ইহার পশ্চিম সীমাস্বরূপ দণ্ডায়মান। নূতন জেকোশ্লোভাকিয়া গণতন্ত্রেরও পশ্চিম সীমায় এই সকল পর্ব্বতশ্রেণী অবস্থিত। ইহার উত্তর-পশ্চিমাংশের অধিবাসীরা প্রধানতঃ জার্ম্মাণ। এই পর্ব্বতশ্রেণীর পশ্চাৎভাগে যে দেশ আছে, তাহা খুব উর্ব্বরা। এই দেশের অধিকাংশ অরণ্যে আচ্ছন্ন। মধ্য-য়ুরোপের এই অংশে প্রধানতঃ বোহিমিয়ান জাতি ও তাহাদের আত্মীয় জাতিগণের বাস। ইহারা বহুকাল য়ুরোপের অন্যান্য অংশের সহিত অপরিচিত ও বিচ্ছিন্ন ভাবে বাস করিতেছিল। এইজন্য ইহাদের উপর জার্ম্মাণ প্রভাব ততটা বিস্তৃত হয় নাই। ইহারা যাহা কিছু সভ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে তাহা তাহাদের নিজস্ব। নবম শতাব্দীতে খৃষ্টধর্ম্ম ইহাদের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচারিত হয়। প্রেগ নগরের বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে স্থাপিত হয়। খৃষ্টধর্ম্ম ও প্রেগ বিশ্ববিদ্যালয় ইহাদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জন হুস নামক একজন সমাজ-সংস্কারক আবির্ভূত হইয়া বোহিমিয়ান জাতিকে পুনর্গঠিত করেন।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে প্রথমে শত্রুভাবে ইংরাজদিগের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। পরে এই সম্বন্ধ মিত্রতায় পর্য্যবসিত হয়। ক্রেসি নামক স্থানে ইংরেজদিগের সহিত বোহিমিয়ানদের একটা যুদ্ধ হয়। তখন বোহিমিয়ায় জন নামে একজন রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। ইনি ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় অন্ধ ছিলেন। ইংরেজরা এই যুদ্ধে জয়ী হন। কিন্তু বোহিমিয়ার অন্ধ রাজা জন পলায়ন করিতে অস্বীকৃত হইয়া বলিয়া উঠেন, 'বোহিমিয়ার রাজা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে জানে না।' এই কথাগুলি জেক জাতির মধ্যে প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে।

ইহার কিছুকাল পরে ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় রিচার্ড বোহিমিয়ার এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংলণ্ডরাজ প্রথম জেমসের কন্যা রাজকুমারী এলিজাবেথের সহিত বোহিমিয়ার রাজকুমা
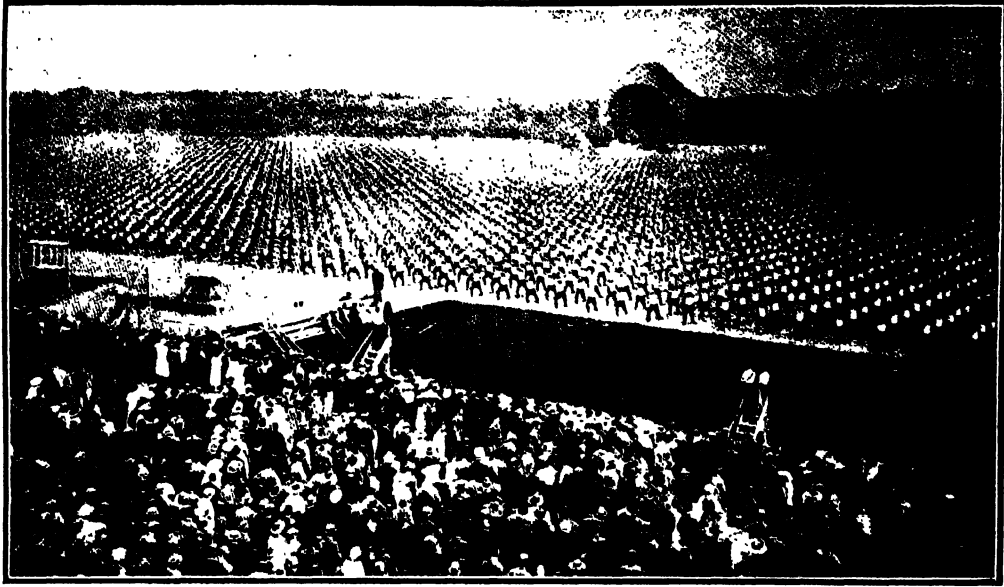
দ্বাদশ সহস্র সোকোল সদস্যের একইরূপ পরিচ্ছদে একত্র ব্যায়াম-ক্রীড়া।

ইলেক্টর প্যালাটাইন ফেডারিকের বিবাহ হয়। ইনি পরে বোহিমিয়ার রাজা হন। কিন্তু ১৬২১ খৃষ্টাব্দে হোয়াইট মাউণ্টেনের যুদ্ধের ফলে রাজ্যচ্যুত হন। এই যুদ্ধে জেক জাতি অষ্ট্রিয়ার অধীন হইয়া পড়ে। ইহাতে কিন্তু জেক জাতির উপকারই হইয়াছিল—অষ্ট্রিয়ানদের সংস্পর্শে আসিয়া জেকরা কর্ম্মকুশল আত্মনির্ভরশীল জাতিরূপে গড়িয়া উঠে। অষ্ট্রিয়ানদের কঠোর শাসনে জেকরা পরিশ্রমী হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের দেশ বিলক্ষণ উর্ব্বরা ছিল। অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের মধ্যে এই বোহিমিয়াতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শস্য উৎপন্ন হইত। এতদ্ব্যতীত জেকরা শিল্পকুশলতাও অর্জ্জন করিয়াছিল। বিদেশী শাসনের কঠোরতার ফলে তাহারা অত্যন্ত জার্ম্মাণ-বিদ্বেষী হইয়া উঠে। জেক নর-নারীর সহিত দুই-চারিটা কথা কহিলেই তাহাদের জন্মগত জার্ম্মাণ-বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায়। দেশের প্রধান অধিবাসী হইয়াও অষ্ট্রিয়ানদের আমলে যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জেকরা দেশ-শাসন ব্যাপারে বিশেষ কোন সুবিধা পাইত না। এক্ষণে জেক গণতন্ত্র স্থাপিত হওয়ায় জার্ম্মাণরা সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি উদার জেক জাতি সংখ্যালঘিষ্ঠ জার্ম্মাণদিগকে শাসন-ব্যাপারে সমান অধিকার দান করিয়াছে।

জাতীয় পরিচ্ছদে শ্লোভাকিয়ান তরুণী দল। ইহারা মান্ধাতার আমলের জাতীয় পরিচ্ছদের মায়া এখনও কাটাইতে পারে নাই; কারণ, এই পরিচ্ছদেই তাহাদের অতি সুন্দর দেখায়।

রুথেনিয়ান জাতীয় লোক—প্রাতঃকালীন উপাসনার প্রতীক্ষায় ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণের অপেক্ষা করিতেছে।

স্লোভাকিয়ান তরুণী

ছুটির দিনের সাজ-পোষাক

জেকোশ্লোভাকিয়ার পার্ব্বত্য ও আরণ্য দৃশ্য অতি সুন্দর—সহজেই নবাগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে এই দেশের অধিকাংশ জঙ্গলাবৃত ছিল। জেকরা দেশ অধিকার করিয়া জঙ্গল কাটিয়া মনুষ্যের আবাস স্থাপন করিয়াছে। বর্ত্তমান অরণ্য পূর্ব্বেকার বিরাট অরণ্যের তুলনায় আয়তনে তাহার একটা সামান্য অংশ মাত্র।

জেকদিগের পূর্ব্ব ইতিহাসের সহিত কিম্বদন্তী ও অলৌকিক উপাখ্যান এমনভাবে বিজড়িত যে, তাহা হইতে

শ্লোভাক হাট। কৃষক রমণীরা তাহাদের ক্ষেত্র-জাত শস্য বিক্রয় করিতে আনিয়াছে। প্রচণ্ড গ্রীষ্মেও তাহাদের অঙ্গে মেষচর্ম্মের পরিচ্ছদ। জিনিষগুলি সমস্ত বিক্রয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা সকল কষ্ট সহ্য করিয়া ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করিবে।

কার্পেথিয়ান রাখাল বালক

মা ও মেয়ে

সত্য ইতিহাস উদ্ধার করা অসম্ভব। জেকরা বলে তাহাদের আদি রাজার নাম ক্রোকাস বা ক্রোক। তাঁহার তিন কন্যা ছিল। সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যার নাম লিবুসা। রাজার মৃত্যুর পর প্রজারা লিবুসাকে তাহাদের রাণী নির্ব্বাচন করে। তাহারা তাহাদের নির্ব্বাচিত রাণীর উপর অনন্ত সাধারণ গুণাবলীর আরোপ করিয়া থাকে। একদা রাজ্যের দুইজন অভিজাত শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। রাণী এই বিবাদে মধ্যস্থতা করেন। তাঁহার বিচারে এক ব্যক্তি জয়লাভ করিলে পরাজিত ব্যক্তি রাণীকে অপমান করে। রাণী ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন, এই জাতি এমন হিংস্র,—নারীর শাসন ইহাদের শোভা পায়

শ্লোভাকিয়ান কৃষক পত্নী। এই নারী নিশ্চিন্ত মনে কৃষিকর্ম্মে নিরতা। পশ্চাতে তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা; এবং ঝোলার ভিতর তাহার নবজাত শিশু দিদির তত্ত্বাবধানে পরম আরামে নিদ্রিত।

উৎসব-বেশে শ্লোভাকিয়ান সুন্দরী

জাতীয় পরিচ্ছদধারিণী শ্লোভাকিয়ান রমণী।

শ্লোভাকিয়ান তরুণীর দল। কোন্ পরিচ্ছদে তাহাদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইবে, সে সম্বন্ধে তাহাদের

না। রাণী অতঃপর প্রজাদের সম্বোধন করিয়া বলেন, তোমরা একজন লোক বাছিয়া দাও, আমি তাহাকেই বিবাহ করিব, এবং তোমরা তাহাকেই তোমাদের রাজা বলিয়া গ্রহণ কর। প্রজারা বলে, রাণী একজন স্বামী

রক্ষণশীল মোরাভিয়ান জাতির গ্রাম্য দম্পতি।

জেকোশ্লোভাকিয়া নিবাসী য়িহুদী বালক।
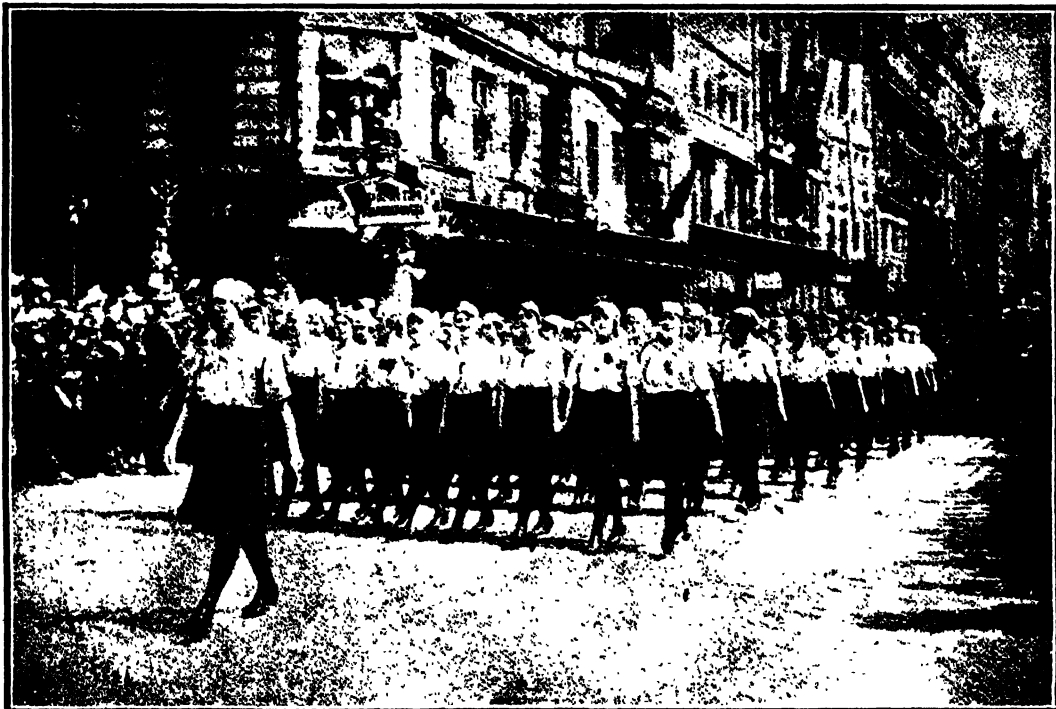
সোকোলের নারী-সদস্যার দল।

নির্ব্বাচন করিয়া লউন, তাঁহাকেই তাহারা রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবে। রাণী তখন এক কৃষক-বালককে স্বামী নির্ব্বাচন করেন। সেই কৃষক-তনয়ের বংশ বোহিমিয়ায় রাজত্ব করিতে থাকে।

গ্রাম্য কৃষক পরিবার ও তাহাদের মৃৎকুটীর

যাহাদের ঐতিহাসিক কিম্বদন্তী এইরূপ, সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, সে জাতি কল্পনাপ্রবণ, কর্ম্মী, কলাকুশল কৃষিজীবী। তাহারা স্বদেশানুরাগী ও স্বজাতি-বৎসল। বিশেষতঃ দীর্ঘকাল অষ্ট্রিয়ার অধীন থাকায় তাহাদের স্বদেশপ্রীতি অতি প্রবল। গৃহে তাহারা যেরূপ কর্ম্মনিপুণ, তাহাদের মধ্যে যাহারা স্বদেশ ত্যাগ করিয়া আমেরিকায় গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, তাহারাও আমেরিকানদিগের নিকট কর্ম্মা বলিয়া প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু আমেরিকাকে তাহাদের বাসভূমি বলিয়া গ্রহণ করিলেও তাহাদের স্বদেশপ্রীতির উৎস শুষ্ক হয় নাই—তাহা এখনও সমানভাবে নির্ঝরিত!
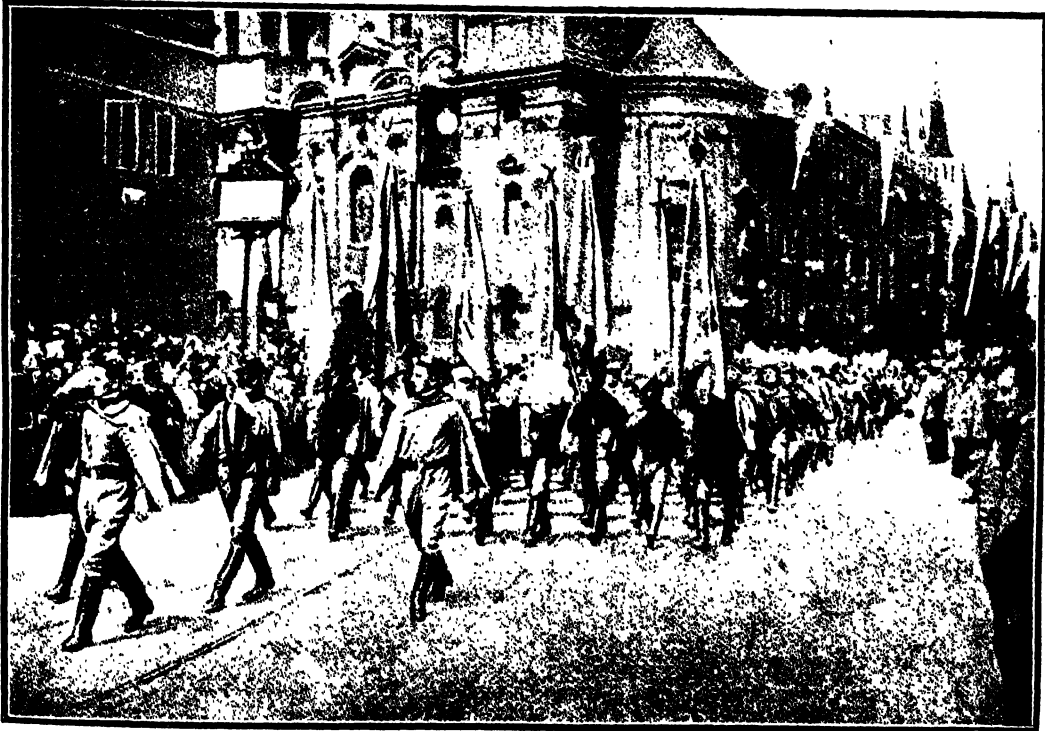
সোকোল-সদস্যের জয়যাত্রা।

কিন্তু জেকদিগের ধর্ম্মানুরাগ তাদৃশ প্রখর নহে। গণতন্ত্র স্থাপিত হইবার পর তাহারা অতি সহজেই তাহাদের প্রাচীন ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্মসংস্কার বর্জ্জন করিয়া নূতন জাতীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা ধর্ম্মের রহস্যবাদ পছন্দ করে না। তাহারা ঘোর প্রত্যক্ষবাদী। যাহা তাহাদের অপ্রত্যক্ষ, যাহা তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধির অগোচর, এরূপ ধর্ম্ম তাহাদের অনুমোদিত নহে।

সৌখিন গ্রাম্য পরিচ্ছদে শ্লোভাকিয়ান গ্রাম্য নারী

তাহারা সঙ্গীতপ্রিয় ও সঙ্গীতভক্ত। তাহাদের জাতিতে দুইজন বিশ্ব-বিখ্যাত সঙ্গীত-রচয়িতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রায় সর্ব্বসাধারণ সঙ্গীত-চর্চ্চা করিতে ভালবাসে। অপর জাতির সদ্‌গুণসমূহ তাহারা অতি সহজেই নিজস্ব করিয়া লইতে সমর্থ। ইহারা সেক্‌সপীয়ারের নাট্যাবলীর অকৃত্রিম ভক্ত। তাহাদের দেশে সেক্‌সপীয়ারের নাট্যাবলীর যতবার অভিনয় হইয়াছে, খাস বৃটেনে বোধ হয় ততবার হয় নাই। ইহা সত্ত্বেও তাহাদের নিজেদের মধ্যেও বিখ্যাত নাটক-রচয়িতার অভাব নাই। শিক্ষিত জেকরা কিন্তু ইংরাজী ও ফরাসী নাটকের ও সাহিত্যের অত্যন্ত অনুরাগী। তাহারা নিজ ভাষায় সমস্ত ভাল ভাল ইংরেজী ও ফরাসী গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছে। ইহা কেবল অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তার ফল নহে—নিজ জাতিকে উন্নততর করিবার মহদভিপ্রায়েই এই সকল বিদেশী সাহিত্য তাহাদের ভাষায় অনুদিত হইয়া থাকে।

ধর্ম্ম বিষয়ে জেকরা উদারপন্থী হইলেও তাহাদের আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদে তাহারা প্রাচীনপন্থী ও রক্ষণশীল। তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন জেলার ও দেশের বিভিন্ন অংশের পরিচ্ছদ বিভিন্ন প্রকার। তবে ইদানীং তাহারা পরিচ্ছদের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তথাপি, রাজধানী প্রেগ নগরে সকল জেলার লোক বাস করে বলিয়া বিভিন্ন প্রকার পরিচ্ছদধারী লোক সেখানে দেখা যায়। কেবল জাতীয় উৎসব উপলক্ষে সর্ব্বসাধারণ একই রূপ পোষাক পরিধান করিবার চেষ্টা করে।

সুদূর অতীত কালে বোহিমিয়ার রাজারা দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন। এইরূপে, এক সময়ে বিজয়ী বোহিমিয়ান সেনারা পোল্যাণ্ডের অধিকাংশ অধিকার করিয়াছিল, এবং দক্ষিণে করিনথিয়া পর্য্যন্ত তাহাদের অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিল। কিন্তু ইহা সম্ভবতঃ জার্ম্মাণ প্রভাবের ফল। প্রকৃত জেক জাতি প্রধানতঃ কৃষিজীবী ও শান্তিপ্রিয়; তাহারা তাদৃশ যুদ্ধানুরাগী নহে। কৃষিজীবী হইলেও কিন্তু তাহাদের শিল্পানুরাগ কম নহে।

গত মহাযুদ্ধের সময় জেক জাতির শতকরা ৩১ জন কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। তাহারা এমন কৃষি-নিপুণ যে, রাজপথের উভয় পার্শ্বে বাজে গাছ রোপণ না করিয়া তাহারা ছায়াবহুল ফলকর বৃক্ষ রোপণ করে; এবং ফলের সময় এই

সকল বৃক্ষ ফুল-ফল-ভারাবনত হইয়া রাজপথের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করে।

গ্রাম অঞ্চলে জেকদিগের গৃহ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। এই সকল কুটীরবাসী গ্রাম্য লোকেরা সর্ব্বদাই নিজ নিজ শিল্পকার্য্য—প্রধানতঃ পুঁতি নির্ম্মাণে নিযুক্ত থাকে। প্রতি কুটীরে সাধারণতঃ দুইটি করিয়া কামরা থাকে। তাহাই তাহাদের শয়নকক্ষ, বসিবার ঘর, কর্ম্মশালা, রন্ধনশালা রূপে ব্যবহৃত হয়। তাহারা অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাপ্রিয়। তাহাদের রন্ধন ও ভোজনপাত্র এবং গৃহস্থালীর ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি সংখ্যায় অল্প হইলেও বেশ মাজাঘষা, চক্‌চকে, ঝক্‌ঝকে।

বোহিমিয়ায় কয়েক প্রকার অল্প মূল্যের রত্নখনি আছে। উত্তরাঞ্চলের নগরগুলিতে এই সকল রত্ন কাটিয়া অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিবার অনেক কারখানা আছে। সেই সমুদায় কারখানায় রত্নশিল্পীরা পার্শ্বে ঝুড়ি বোঝাই রত্ন লইয়া কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে। তখন তাহা দেখিলে আলাদিনের রত্ন-ভাণ্ডার বলিয়া মনে হয়।

জেক জাতির শিক্ষানুরাগ অন্য অন্য জাতির অপেক্ষা অল্প নহে। তাহারা অনেক কাল পূর্ব্বেই শিল্প শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিল। সেই জন্য তাহাদের ছোট ছোট গ্রাম নগরেও এক বা একাধিক শিল্পবিদ্যালয় আছে—বড় বড় নগরের ত কথাই নাই। শিল্প শিক্ষার এরূপ সুযোগ থাকায় প্রত্যেক বালক বালিকা সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কোন-না-কোন রকম শিল্প শিক্ষা করিয়া থাকে। কাচ বা চীনা মাটীর বাসন জেকদের জাতীয় শিল্প। গ্রামে গ্রামে ইহার কারখানা আছে। বালক-বালিকারা সচরাচর এই শিল্প শিক্ষা করে। তবে নূতন নূতন শিল্প শিক্ষা করিয়া তাহার কারখানা প্রবর্ত্তিত করিতেও তাহারা পশ্চাৎপদ নহে। এইরূপে বীট পালঙের চাষ করিয়া তাহা হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার কারখানা তাহাদের দেশে নূতন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

অষ্ট্রিয়ার অধীন থাকার কালে বোহিমিয়ায় যখন জার্ম্মাণ প্রভাব বিস্তৃত হইতেছিল, তখন রক্ষণশীল জাতীয় নেতাদের চেষ্টায় তাহাদের জাতীয় ভাষা ও আচার ব্যবহার রক্ষা পায়; অথচ, জার্ম্মাণদের দৃষ্টান্তে তাহারা জাতিগত আলস্য পরিহার করিয়া যুবক যুবতী এবং বালক বালিকাদিগের মধ্যে ব্যায়াম চর্চ্চার প্রবর্ত্তন করিতেও ইতস্ততঃ করে নাই। ইহার ফলে কেবল যে তাহাদের শারীরিক উন্নতি হইয়াছে, তাহা নহে; তাহাদের নৈতিক উন্নতিও যথেষ্ট পরিমাণে ঘটিয়াছে। এই

শস্যের গোলার পার্শ্বে পার্ব্বত্য কৃষক ও তাহার কন্যা।

সময়েই তাহারা যুবক-যুবতীদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তুলে। সঙ্ঘের নাম তাহাদের ভাষায় "সোকোল"। পরবর্ত্তী কালে, অর্থাৎ গত মহাযুদ্ধের সময় এই "সোকোল"গুলিই জেক জাতির স্বাধীনতা লাভের প্রধান সহায় হইয়াছিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এই সকল "সোকোল" সর্ব্বপ্রথম গঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তৎপরে

থাকে। "আমরা বলবীর্য্যবান হইব" ইহাই এই সমুদায় সঙ্ঘের মূল মন্ত্র ছিল। আর সোকোলগুলি ঘোর সাম্যবাদী ছিল। যে কোন সামাজিক অবস্থার নরনারী সোকোলের সভ্য হইবার পর সকলে সমান এবং পরস্পরের ভ্রাতা ও খৃষ্টাব্দে ও ১৯২০ খৃষ্টাব্দে প্রেগ নগরে দুইবার এইরূপ মহাসম্মেলন হয়। পৃথিবীর সকল স্থান হইতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই মহাসম্মেলনে যোগ দিতে আসিয়াছিল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের মহামিলনে ১২০০০ লোক একত্র সম্মিলিত ভাবে
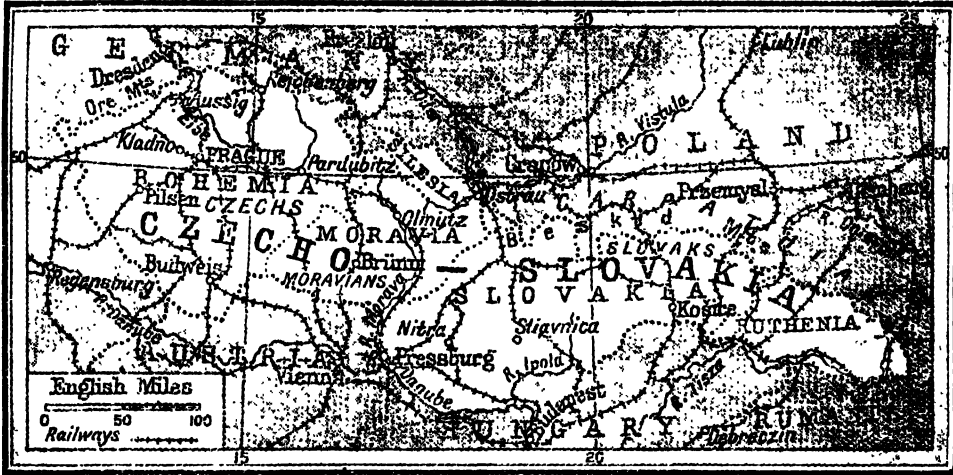
জেকোশ্লোভাকিয়ার মানচিত্র।

ভগিনীরূপে গণ্য হইত। প্রত্যেক জেক কেন্দ্রে একটি বা একাধিক সোকোল স্থাপিত হইয়াছিল। সোকোলের সদস্যরা সমগ্র বিশ্বে জেক জাতীয় লোকদের মধ্যে বিস্তৃত ছিল। মধ্যে মধ্যে ইহাদের মহাসম্মেলন হইত। ১৯১২ কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করে। সে দৃশ্য যে কিরূপ মহান্ হইয়াছিল, তাহার একখানি চিত্র এস্থলে সন্নিবিষ্ট হইল। সোকোলের সকল সদস্যের পরিচ্ছদ একই প্রকার।

ঊর্ম্মিলা

শ্রীউমা দেবী

ওগো উপেক্ষিতা বধূ ঊর্ম্মিলা সুন্দরী,
এ রূপ যৌবন তব আহা মরি মরি!
যাপিলে হেলায় সেই প্রাসাদের কোণে
জীবনের যৌবনের শ্রেষ্ঠতম ক্ষণে!
এসেছিলে স্বামীগৃহে অফোটা মুকুল—
কিশোরী বালিকা মেয়ে—কবে হ'লে ফুল?
বিকশিয়া দলগুলি যৌবন সায়রে,
কখন উঠিলে ফুটে সর্ব্ব অগোচরে?
সেইক্ষণে দুরান্তরে বনে, নিরজনে—
জাগেনি কি কোন স্বপ্ন লক্ষ্মণের মনে?
বারেকের তরে সেই সন্ন্যাসীর বুকে
জ্বলেনি কি তীব্রানল ঊর্ম্মিলার দুখে?
তখনো কি সেই বীর নির্লিপ্ত নীরব
সীতার চরণ দুটি করেছিল স্তব?
হায় বধূ, বৃথা তুমি সহিলে বেদন,
স্বামী যার বুঝিলনা—সেকি বিশ্বজন
বুঝিতে পারিবে কভু? তারা মূঢ় হায়—
তোমার বন্দনা গাথা গাহিতে না চায়!
তুমি যে ঊর্ম্মিলা শুধু—তুমি নও সীতা,
নও তুমি সতী লক্ষ্মী ত্রিদিব-বন্দিতা।

খেলার পুতুল

শ্রীনরেন্দ্র দেব

১৩

মণীন্দ্র এবার উচ্চকণ্ঠে হাস্য ক'রে উঠলো। বললে—একি তোর ছেলে মানুষী বল্‌তো? ও মেয়েটি—কি বললি ওর নাম—? সুহাস না? বাঃ নামটা বেশ ত!—আচ্ছা, ওই সুহাসের কাছে তোর নিজেকে এতো ছোট বলেই বা মনে হচ্ছে কেন?

অধীর হয়ে মন্দা বললে—সে তুমি বুঝতে পারবে না!—সে কথা তোমাকে বোঝাতে হ'লে আমার এই দশ বৎসরের বিবাহিত জীবনের ইতিহাস তোমাকে শোনাতে হয়। তাও হয়ত শোনাতে পারতুম, কিন্তু, তুমি যে সংসারী নও দাদা, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখের ইতিবৃত্ত সে তো তোমার ঠিক উপলব্ধি হবেনা। কেন যে আজ সুহাসের কাছে নিজেকে এত ছোট মনে হ'চ্ছে সে কথা তোমাকে স্পষ্ট ক'রে জানাবারও আমার কোনও উপায় নেই—

—চুলোয় যাক্‌। সে আমি জানতেও চাইনি। ব্যাপারটাকে তুই যেন ক্রমেই রহস্যময় করে তুলছিস! তবে, একটা কথা তোকে আমি না জিজ্ঞাসা করে থাকতে পারছিনি - আচ্ছা, সত্যেনের এতে অপরাধ কি, আমায় তুই বুঝিয়ে ব'লতে পারিস?

—না দাদা। তাও পারিনি। তার কারণ এ নয়—যে, সেটা কাউকে বোঝানো যায় না, বা আমি বোঝাতে অক্ষম—তার কারণ হচ্ছে—প্রকৃত পক্ষে এতে ওঁর কোনও অপরাধ নেই বলে।

বিস্ময়ে মণীন্দ্রের দুই চোখ বিস্ফারিত হ'য়ে উঠলো! সে শুধু বললে—তবে?

মন্দা বললে—তুমি আর আমায় কিছু জিজ্ঞাসা কোরোনা দাদা, কেবল এইটুকু জেনে রেখে দাও যে, এ শুধু আমার অদৃষ্টের পরিহাস—

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি! কিন্তু একটা কথা তোকে বলে রাখি শোন্‌—ভালবাসা সম্বন্ধে আমার কোনও

মণীন্দ্রের গম্ভীর মুখের দিকে বিরক্তি পূর্ণ নেত্রে ক্ষণেকের জন্য চেয়ে দেখে সত্যেন সে ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেল!

মন্দা তখন মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

মণীন্দ্র তাকে প্রবোধ দেবার জন্য বুঝিয়ে ব'লতে লাগলো—এমনও তো হ'তে পারে মন্দা যে, তোমার এ সন্দেহ সম্পূর্ণ মিথ্যে! হয়ত' তুমি কোথাও একটা কিছু গুরুতর ভুল ক'রে মনের মধ্যে এই অশান্তি পোষণ করছো? এ মেয়েটির মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে বটে, কিন্তু, সত্যেনকেও যে খুব ভালো করেই জানি ভাই। তার প্রকৃতি কখনই এত নীচ নয়, সে তোমার এ অন্যায় সন্দেহের অনেক উপরে বোন্‌।

মন্দা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললে—দাদা আমি কি তা জানিনি? তিনি যে কত বড়, কত মহৎ, সে কি আমার চেয়ে আর কেউ বেশী জানে? আর ওই যে মেয়েটিকে দেখলে—ওকে যতদিন দেখিনি ততদিন আমি মনে মনে ওর বিরুদ্ধে যে কি বিদ্বেষ পোষণ ক'রে এসেছি তা ব'লতে পারিনি, কিন্তু ওকে এই দুদিন কাছে পেয়ে বুঝিছি—কি ভুল ধারণাই না ছিল আমার ওর ওপর! ও যেমনি কোমল তেমনি কঠোর! আশ্চর্য্য ওর প্রকৃতি! আমি স্বামীকে সন্দেহ করে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছি, বটে, কিন্তু, শপথ ক'রে বলতে পারি ভাই, ওর ওপর আর আমার তিলমাত্র অবিশ্বাস নেই।

মণীন্দ্র এ-কথা শুনে একটু না হেসে থাকতে পারলেনা। বললে—তবে কেন তোর এ পাগলামী মন্দা?

মন্দা এ কথার তৎক্ষণাৎ কোনও উত্তর দিতে পারলে ন। ক্ষণকাল কি যেন ভাবতে লাগল—তারপর ধীরে ধীরে বললে—আমি যতই মনে প্রাণে বুঝতে পারছি যে আমি ওই সুহাসের পায়ের নখেরও যোগ্য নই, ততই নিজের উপর আমার ধিক্কার হ'চ্ছে,—আর—সমস্ত রাগ গিয়ে পড়'ছে ওর উপর।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই বটে, কিন্তু ওটাকে বোঝবার জন্য আমি ও-বিষয়ের অনেক রকম পুঁথি-পত্র হাতড়েছি—তাতে আমার এই শিক্ষা হয়েছে যে, যারা পরস্পরকে যথার্থ ভালবাসে, তাদের মধ্যে কেউ কাউকে আর অবিশ্বাস করতে পারেনা! ভালবাসা তাদের পরস্পরের প্রেমাস্পদর উপর এমন একটা সুদৃঢ় নির্ভরশীলতা এনে দেয়—এমন একটা গভীর বিশ্বাসের ভিত্তি গ'ড়ে তোলে যে, তার মধ্যে আর সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকেনা! তোর ব্যাপার দেখে কিন্তু আজ আমার মনে এই আশঙ্কাই হ'চ্ছে বোন যে, এই দশবৎসরের বিবাহিত জীবনের ইতিহাসটা তোর আর যাই হোক—প্রেমের পুণ্য-কিরণ-সম্পাতে তার একটি পরিচ্ছেদও এখনও এমন উজ্জল হ'য়ে উঠতে পারেনি যাতে এই শঙ্কা সন্দেহ দ্বিধা প্রভৃতি মনের ক্ষুদ্রতা ও দুর্ব্বলতা গুলো পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়! অন্ততঃ তোর কথা—আমি বেশ জোর ক'রেই ব'লতে পারি যে, তুই আজও প্রেমের আগুণে পুড়ে খাঁটি সোনা হবার সুযোগ পাসনি—

মন্দা মৌন নির্ব্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে অপরাধিনীর মতো নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল। তার অন্তরের অন্তর-তল ভেদ ক'রে তখন এই প্রশ্নটাই কেবলই উঠতে লাগল—তাই কি? তবে কি সত্যই তাই?

ফুলি ঝি এসে বললে—বড়মা! বাবু আপনাকে একবার নীচের কেতাব ঘরে যেতে বল'লেন—বিশেষ দরকার, এখনি যান, দেরী করবেন না।

মন্দা কথাটা শুনে যেন চমকে উঠলো। ফুলি ঝী চলে যেতেই সে একবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মণীন্দ্রের মুখের দিকে চাইলে।

মণীন্দ্র বললে—তোমার সন্দেহ-দগ্ধ উত্যক্ত মনের ঐ কালো ছায়াটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে যাও মন্দাকিনী। ওটা মানুষকে যত বেশী কদর্য্য ক'রে তোলে—কোনও ঘৃণ্য ব্যাধিও তাকে ততটা কুৎসিত করতে পারেনা!

মন্দার দুই চোখ আবার জলে ভরে উঠলো। রুদ্ধকণ্ঠে বললে—দাদা, কত দুঃখে যে মুখ দিয়ে ওসব নোংরা কথা বেরিয়েছে—যদি পারি তোমায় একদিন বুঝিয়ে বলবো—নইলে, ভেবোনা যে তোমার বোন্ এত নীচ—

মন্দা আর কিছু বলতে পারলে না, অঞ্চলপ্রান্তে চোখদুটি মুছতে মুছতে লাইব্রেরী-ঘরে চলে গেল।

মণীন্দ্র মন্দার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত হ'য়ে উঠলো! মিথ্যা সন্দেহের প্রশ্রয় দিয়ে মেয়েটা হয় ত একদিন নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই ডেকে আনবে! কি ক'রলে সে বিপদ থেকে ওকে রক্ষা করা যায় ভাবতে ভাবতে মনীন্দ্র ঘরের সেই চেয়ারখানায় বসে পড়ে একটা সিগারেট বার করে ধরালে—এমন সময় ফুল্লহাস্যে অধরপ্রান্ত রঞ্জিত ক'রে সুহাস সে ঘরে ঢুকে বললে—আচ্ছা জব্দ করেছিলে কিন্তু বৌদি! এমন সিঁদুর লাগিয়ে দিয়েছিলে যে কিছুতে আর উঠতে চায়না—শেষে সাবান ঘ'সে তুলতে হ'লো—

মণীন্দ্র বললে—আর্য্য ঋষিরা পুরাকালে বলে গেছলেন যে জড়েরও প্রাণ আছে, আপনার সীমন্ত অধিকার করে সিন্দূরের এই প্রাণপণে লেগে থাকবার চেষ্টাটা আমার মনে হয় শুধু সেই কথাটাই সপ্রমাণ করে দিলে—

—এ কি! আপনি বুঝি এখানে একলাটি চুপ করে বসে আছেন?

মণীন্দ্র তার হাতের সিগারেটটি সুহাসকে দেখিয়ে বললে—চুপ করে ব'সে নেই ত! এই দেখুননা—ষ্টীম এঞ্জিনের মতো সিগারেট টেনে টেনে ধূমোদ্গার করছি!—আর একলাটি থাকার কথা যা ব'ললেন, ওটা মোটে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়, কারণ সেই সুতিকাগার থেকে আজ পর্য্যন্ত একলা থাকাটাতেই আমি অভ্যস্ত হ'য়ে পড়েছি!

—একটু ক্লান্ত হ'য়েও পড়েছেন বোধ হয়!

কথাটা ব'লেই সুহাস যেন লজ্জিত হ'য়ে পড়লো; সামলে নেবার জন্য তাড়াতাড়ি বললে—নইলে, আপনার বোন্ আপনার একত্ব বিনাশের জন্য এমন উঠে প'ড়ে লেগেছেন কেন?—

হাতের সিগারেটটিতে খুব জোরে জোরে বার দুইতিন টান দিয়ে আকাশের দিকে ধোঁয়ার ফোয়ারা তুলে দিয়ে, মণীন্দ্র বললে—তা' দেখুন, 'ক্লান্ত' যে একেবারে কখনও হইনি তা নয়, দীর্ঘপথ যাকে একলা হেঁটে পার হ'তে হ'চ্ছে তাকে যে মাঝে মাঝে ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়তেই হয়—এ কথা অস্বীকার করা চলেনা, কিন্তু ক্ষণকাল বিশ্রামের লোভে ছায়াতরু অন্বেষণের জন্য আমার দিক থেকে মন্দাকে তো এ পর্য্যন্ত কোনও অনুরোধই করা হয়নি! তবু তার এ মাথাব্যথা কেন বলুন ত?

সুহাস মৃদু হেসে বললে—আপনি যে কি বলেন তার

ঠিক নেই! তার মাথাব্যথা হবেনা তো কি পাড়ার লোকের হবে? ভাইকে সংসারী করবার জন্য বোনেদের প্রচেষ্টার মধ্যে একটা স্নেহপ্রণোদিত কর্ত্তব্যের তাগিদ থাকে যে!

—দেখুন, আমার কি মনে হয় জানেন? কিছু মনে করবেন না, আপনারা—এই মেয়েরা—কোনও বিষয় বেশ গভীরভাবে তলিয়ে দেখে, বুঝে, বিচার করে যে কিছু করেন তা ঠিক বলা চলেনা—এই বিবাহের ব্যাপারটাই ধরুন না কেন—এটাকে আপনারা যেন একটা খেলা ও আমোদের ব্যাপার হিসেবেই বরাবর ধরে আসছেন! ছেলে মেয়ে ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই কবে তারা বড় হবে আর তাদের বিয়ে-থা' দিয়ে সংসারী করবেন—এই স্বপ্নটাই শুধু দেখতে থাকেন। বালিকা বয়সে কাঁচের পুতুল নিয়ে খেলা করে যে আমোদটুকু পেতেন, বড় হ'য়ে ছেলে মেয়েদের নিয়ে সেই খেলাই যেন আবার নূতন ক'রে খেলতে বসেন! এ কথাটা তখন আর কিছুতেই আপনাদের মনে থাকেনা যে—ছেলে মেয়ে আপনাদের বটে, কিন্তু তারা ঠিক খেলাঘরের কাঁচের পুতুল নয়—তারা সব জীবন্ত মানুষ!

সুহাসের মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল'—ভুল ভুল—মণিবাবু, জীবন্ত মানুষ এদেশে নেই—সব খেলার পুতুল!

মণীন্দ্র উত্তেজিত হয়ে উঠে বল্‌লে—আপনারাই তো ক'রে তুলেছেন—সেই পুতুল খেলার অভ্যাসটা এমনই মজ্জাগত হ'য়ে ওঠে আপনাদের যে, ছেলে মেয়ে—ভাই বোন্—আত্মীয় বন্ধু সবার বিয়ে দিয়ে শেষে পাড়াপ্রতি-বাসীদেরও ঘটকালী ক'রতে লেগে যান—এটা যেন তখন আপনাদের একটা নেশা হয়ে ওঠে! মন্দা যে সংসারপথে আমার গতি ফেরাবার জন্য এত ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে—এর মধ্যে তার ওই ঘটকালীর নেশার খেয়ালটুকু মেটানো ছাড়া আর কোনও বড় উদ্দেশ্য নেই!

সুহাস নতমুখে ব'লতে লাগলো—আপনার এ স্পষ্ট কথার জোর ক'রে কোনও প্রতিবাদ করবার আমার সাধ্য নেই; সত্যিই—একথা আমারও অনেকবার মনে হয়েছে—যখনই দেখেছি,—কোনও বাড়ীতে বউটি মারা যাবার পর একটা মাসও অপেক্ষা করবার মতো ধৈর্য্য রাখেন না অনেক মহিলা-অভিভাবকরা। তাড়াতাড়ি সেই ছেলেটির আবার একটি বিয়ে দেবার জন্য তাঁরা অতিমাত্রায় ব্যাকুল হ'য়ে ওঠেন! স্বর্গগত আত্মার এতবড় অপমান—তার প্রতি এতখানি অশ্রদ্ধা বোধ করি অন্য কোনও দেশে নেই! প্রকৃতিস্থ যে মানুষ—সে যে কেমন করে এ কাজ করতে পারে,—সে আমার ধারণাই হয়না,—নেশার খেয়াল ছাড়া এ অন্যায়ের আর কোনও সঙ্গত কারণ তো দেওয়া যায়না—

—আসুন, আসুন—হাতে হাত দিন—বলেই চক্ষের নিমেষে চেয়ার ছেড়ে উঠে-পড়ে মণীন্দ্র সুহাসের ডানহাতটি আপন হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে অত্যন্ত সৌহার্দ্দ্যের সঙ্গে করমর্দ্দন করতে করতে ব'লতে লাগলো—এতদিনে একটি মনের মতো বন্ধু পেলুম—আপনার সঙ্গে আমার মত একেবারে পয়েণ্ট, বাই পয়েণ্ট, মিলে যাচ্ছে—

এতো অপ্রত্যাশিত রূপে এবং এমন সহসা এই ব্যাপার ঘটে গেল যে, সুহাস একেবারে সম্পূর্ণ নিরুপায়ের মতই নিশ্চেষ্ট থাকতে বাধ্য হ'লো।

হঠাৎ কথা বলা বন্ধ করে এবং করকম্পন থামিয়ে মণীন্দ্র অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে সুহাসের পদ্মকুঁড়ির মতো ছোট্ট করতলখানি আর তার সেই রজনীগন্ধা ফুলের মতো শুভ্র সুন্দর আঙুলগুলি উল্টে পাল্টে দেখতে লাগল—

সুহাসের কেবলই মনে হ'তে লাগল হাতটা টেনে নেবে কিনা—কিন্তু, পাছে সেটা কোনও রকম কিছু অসভ্যতা হ'য়ে পড়ে এই বিলেত-ফেরত মানুষটির কাছে, এই ভেবে সে চট্ ক'রে তার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ ক'রে উঠতে পারলে না।

তার হাতখানি নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখতে দেখতে মণীন্দ্রের চোখে একটা সংপ্রশংস বিস্ময়ের দৃষ্টি ফুটে উঠেছে লক্ষ্য করে সুহাসের মুখখানি যেন একেবারে উষার অরুণ রাগে রঞ্জিত হ'য়ে উঠ্‌লো! সে ধীরে ধীরে খুব সন্তর্পণে তার হাতখানি মণীন্দ্রের হাতের ভিতর থেকে সরিয়ে নিয়ে ব্যাপারটাকে যেন সহজ ক'রে নেবার জন্যই বেশ একটু হাসতে হাসতে ব'ললে—কি দেখছিলেন? আমার দুরদৃষ্টের রহস্য জানবার জন্য কর-রেখার পাঠোদ্ধার করছিলেন বুঝি?—আপনি কি বিলেত থেকে 'হাত দেখা'ও শিখে এসেছেন—?

এ প্রশ্ন শুনে মণীন্দ্রও হাসতে হাসতে বললে—হাত দেখা শিখে আসিনি বটে; তবে হাত দেখে এসেছি অনেক, কিন্তু এমন ফাইন এমন ডেলিকেট্—এমন মোমের ছাঁচে গড়া সুন্দর হাত আমি কখনও দেখিনি!—সত্যি; আপনার হাত ঠিক—ঠিক বাঙালীর মেয়ের হাতের মতো নয়—কিন্তু!—

তবে কি উড়ে মেয়েদের মতো দেখলেন?—

এ কথায় একটু যেন ক্ষুব্ধ হ'য়ে বললে—আপনি ঠাট্টা মনে ক'রছেন—কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি সত্যিই ব'লছি—আপনার হাত—সর্ব্বদেশের রাণীর করতলকেও লজ্জায় রক্তিম করে দিতে পারে,—এ যেন তাজমহলের স্বপ্ন-জাগিয়ে-তোলা-মমতাজের হাত—!

সুহাস এবার নির্ঝরিণীর মতোই কলকণ্ঠে হেসে উঠলো। বললে—আপনি স্বপ্নই দেখছেন নিশ্চয়! মমতাজের হাত হলে এতে মেহেদীর মৃদুল রংটুকুর ছোপ্ লাগানো থাকতো—আর—হীরে-মতির জ্যোতি-ঠিকরে-পড়া আংটিও যে গোটাকতক থাকতো না এমন নয়—কিন্তু আপনি জানেন না বোধ হয়, এই হাতেই আমি রোজ একঝুড়ি বাসন মাজি—দু'বেলা রাঁধি—ঘর ঝাঁট দিই—রাজরাণীদের করতল তো তা'তে লজ্জায় রক্তিম হ'য়ে ওঠবারই কথা!—

মণীন্দ্রের দুই চোখ বিস্ফারিত হ'য়ে উঠলো। সে বললে—না-না—সেকি?—আমি ত' সে'ভাবে বলিনি—আপনি—আপনাকে—

সুহাস বললে—আমাকে 'আপনি' 'মশাই' বলবেন না। আপনি হ'চ্ছেন বউদির দাদা—আপনি যদি আমাকে—'আপনি' 'আপনি' বলে কথা বলেন—আমার ভারী লজ্জা করে—

মণীন্দ্র একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললে—তবে কি বলবো?—

—কেন?—বৌদি'কে যা বলেন—তুমি—তুই! "আপনি" বলাটাকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারিনি! ওটা যেন মানুষকে মানুষের কাছ থেকে কেবলই একটা তফাৎ—একটা ব্যবধান—একটা দূরত্ব—রেখে চলতে বলে!

—সেই জন্যই ত' ওটার প্রয়োজন রয়েছে! কেন-না—সংসারে সকল লোকের সঙ্গেই তো আর মানুষ অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠতে পারেনা। কারুর কারুর সঙ্গে সে বরাবরই একটু ব্যবধান রেখে দূরে দূরে তফাৎ হয়ে চলতে চায়, তখন ওই 'আপনি-মশাইয়ের' অল্প আড়ালটুকুই তাদের ঘনিষ্ঠতার ক্ষেত্রেও পরস্পরকে প্রয়োজনমত তফাৎ করে রাখতে অনেকখানি সাহায্য করে।

সুহাসের মুখখানি মুহূর্ত্তের জন্য বিবর্ণ হ'য়ে উঠলো। সে নতমুখে বললে—অবশ্য তা' যদি আপনার অভিপ্রেত হয়—তাহ'লে আপনি আপনার চারপাশের ওই ছিটে বেড়াটাকে আরও শক্ত ক'রে ও উঁচু করে বাঁধুন, আমার কোনও আপত্তি নেই—কিন্তু আমার মনে হয়—ঘনিষ্ঠতা যেখানে আপনি এসে উপযাচক হয়ে দাঁড়ায় এবং অন্তরঙ্গতার দাবীটা যেখানে উভয়ের অজ্ঞাতে অযাচিতই এসে পড়ে'—সেখানে ওই শিষ্টাচারের মিথ্যা অভিনয়টুকু যথাসম্ভব শীঘ্র বন্ধ করাটাই সুবিবেচনা নয় কি?

মণীন্দ্র আনন্দে দীপ্ত হ'য়ে উঠে বললে—তোমায় কি তবে আমি 'নাম' ধরে ডাকতে পারি!

সুহাস এবার প্রীতি-প্রফুল্ল মুখে বললে—ক্ষতি কি তাতে?—তার পর একটু উদাসভাবে বললে—তবে আপনার যদি নাম ধরে ডাকতে সাহসে না কুলোয় তাহ'লে একটু আগে যা বলেছেন—তাই বলেই ডাকবেন—

মণীন্দ্রের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হ'য়ে উঠলো, মুহূর্ত্তকাল কি ভেবে সে সহসা উল্লসিত হ'য়ে উঠে বললে—ও! হ্যাঁ—তোমাকে তবে 'মমতাজ'ই বল্‌বো?—কেমন?—সেই বেশ হবে—

সুহাস একটু যেন বিরক্ত হয়ে উঠে বললে—আপনি কি পাগল?—বিলেতে গিয়ে আপনার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে দেখছি—মমতাজ বলবেন কি?—

মণীন্দ্র ক্ষণকাল চুপ করে থেকে এবার হতাশভাবে বললে—তবে কি ব'লবো? আমার যে মনে পড়ছেনা—তুমিই বলে দাওনা—

সুহাস মণীন্দ্রের সেই হতাশ ও নিরুপায় মুখভাব দেখে একটু মুখ টিপে হেসে বললে—এইমাত্র ব'লেই এখনি ভুলে গেলেন বুঝি? নাঃ—আপনার স্মরণ শক্তির প্রশংসা করা চলেনা দেখ্‌ছি!

মণীন্দ্র অপরাধীর মতো বিনত কণ্ঠে বললে—আমার স্মরণ শক্তি বরাবরই একটু কম।

—তাহ'লে ডাক্তারীটা ফাঁকি দিয়েই পাশ করেছেন বলুন!

—না, বরং ঠিক তার বিপরীত! ওই প্রকাণ্ড ডাক্তারী পরীক্ষাটা ভালো করে পাশ ক'রতে গিয়েই আমার স্মরণ শক্তি অত্যধিক পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে!

সুহাস আবার হেসে উঠে বললে—তাহ'লে আর আপনার সে পরিশ্রান্ত স্মৃতিকে পীড়িত করে দরকার নেই—

মণীন্দ্র এবার যেন কতকটা অনুযোগের সুরে—কণ্ঠে বেশ একটু অধীর আগ্রহ ভরে নিয়ে বললে—কিন্তু, তুমি যে কিছুতে

বলতে চাইছোনা—দুষ্টুমী করে কেবলই আমাকে ভাবাচ্ছ—আচ্ছা—দাঁড়াও, একটা সিগারেট ধরিয়ে নিই, দু'তিন টানে ঠিক মনে পড়বে—

—দোহাই আপনার রক্ষে করুন—একটি সিগারেটের ধোঁয়াতেই ঘরের মধ্যে যে 'মেঘদূত' সৃষ্টি ক'রছেন সেই এখনও অলকায় উড়ে যাবার পথ খুঁজে না পেয়ে কড়িকাঠে বপ্রক্রীড়া করছে!—তার চেয়ে আমিই মনে করিয়ে দিচ্ছি—শুনুন—একটু আগে—আপনি বললেন না—যে—যে—একজন মনের মতো বন্ধু পেয়েছেন—

Oh—Yes—Yes—Yes! excuse me—a thousand thanks—বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে মণীন্দ্র সুহাসের করমর্দ্দনের জন্য আবার হাত বাড়িয়ে দিলে—

সুহাস সভয়ে তিন হাত পেছিয়ে গিয়ে বললে—মাপ করবেন, আমি মেমসাহেব নই, ওটাতে মোটেই অভ্যস্ত হ'তে পারিনি। আপনার প্রথম বারের 'হ্যাণ্ডশেকে'ই আমার আনাড়ী হাতটা একটু জখম হ'য়ে পড়েছে—! বেশ বুঝতে পেরেছি—আপনার গায়ের জোরের গল্পটা একেবারে নেহাৎ মিথ্যা আস্ফালন নয়!

মণীন্দ্র হো হো করে হেসে উঠে বললে—লেগেছে বন্ধু! I am so sorry! কিন্তু,—একটা কথা তোমায় শিখিয়ে দিই—'হ্যাণ্ডশেক্' করতে—refuse করাটা বিলেতে একেবারে ভয়ানক শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ—এক রকম অপমান করা—

—তাহোক্! এটাত' বিলেত নয় মণিবাবু! এখানে যে একজন হিন্দু বিধবার অবস্থা কী আপনি ভুলে গেছেন! একজন আত্মীয়র সঙ্গে করমর্দ্দন করা দূরে থাক্ আলাপ করলেও সে জন্য তাকে অত্যন্ত কঠোর সামাজিক দণ্ড পেতে হয়; এই যে আমি আপনার সঙ্গে এমন সহজ ভাবে আজ বন্ধুত্ব স্থাপন করলুম—এ যে তা'দের চোখে কত বড় অপরাধ সে হয়ত' আপনার ধারণাই নেই!

—কেন মমতাজ্!—এতে আবার অপরাধ কি?

সুহাস বিরক্ত হয়ে উঠে বললে—পুরুষ জাতটাই দেখছি বড় অবাধ্য!

মণীন্দ্র এ কথার অর্থ কি বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সুহাসের মুখের দিকে চেয়ে বললে—কেন?

—আমাকে 'মমতাজ' বলে ডাকাটা যে আপনার পক্ষে চন্দ্রাধিক্যের পরিচায়ক—একটু আগে আপনাকে সে কথাটা জানাইনি কি?

অত্যন্ত অপ্রতিভ হ'য়ে মণীন্দ্র কাতরভাবে বললে—ভুলে বলে ফেলেছি বন্ধু, আমায় মাপ করো।

সুহাস মৃদু হেসে বললে—এতো ভুলো মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রে আমি দেখছি মস্ত এক বিপদ ঘাড় পেতে নিলুম—

মণীন্দ্রের চোখে আবার সেই জিজ্ঞাসুর দৃষ্টি ভেসে উঠলো—মৃদু কণ্ঠে বললে—বিপদ কেন?

সুহাস উত্তেজিত ভাবে বল্লে—কেন শুনবেন? দেহে মনে বাক্যে ও আচরণে এ জাতটা আজ একেবারে হীনতা ও নীচতার চরম সীমায় এসে পৌঁছেচে বলে! যাদের সমাজে ছোট ভাই তার শ্রদ্ধেয় অগ্রজের সামনেও স্ত্রীকে রাখা নিরাপদ মনে করেনা—যেখানে পুত্রবধূর শ্বশুরের সঙ্গেও বাক্যালাপ নিষেধ—যারা মেয়েদের চিরকাল সর্ব্বলোক-চক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে রাখতে চায়—তাদের মনোবৃত্তি কি মহৎ মানুষের না ইতর পশুর?—বলুনতো?—এরা যদি কোনও অনাত্মীয় স্ত্রী পুরুষের মধ্যে এতটুকু অন্তরঙ্গতা দেখতে পায়—অমনি কি মনে করে জানেন? মনে করে তাদের মধ্যে নিশ্চয় একটা অবৈধ প্রণয় ঘটিত ব্যাপার আছে! কোনও স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যে নির্দ্দোষ বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভব—এই ইতর পশুগুলো তা কল্পনাও ক'রতে পারে না!

মহা উৎসাহিত হ'য়ে উঠে মণীন্দ্র বললে—আপনি যা ব'ললেন তার প্রত্যেক বর্ণ সত্য! সে দিন অনুকে আমি ঠিক এই কথাটাই বোঝাবার চেষ্টা করছিলুম. কিন্তু সে বড় একগুঁয়ে মেয়ে—বলে কি জানেন?—বলে—দিক্ লোকে কলঙ্ক—সে আমার ভূষণ হবে—

--অনু কে?

—ও! আপনি বুঝি অনিলাকে চেনেন্ না? সে মন্দার সই—আমাদের এক বাল্য-সঙ্গিনী! আহা, তার জীবন বড় দুঃখের! সে স্বামীকে নিয়ে সুখী হ'তে পারেনি।

—কেন?

—সে আপনি মন্দাকে জিজ্ঞাসা করবেন, আমার চেয়ে সেই তার ইতিহাস ভালো জানে।

—ও! আচ্ছা। কিন্তু, আপনি আমাকে আবার 'আপনি' বলতে সুরু করলেন যে!

—তুমি এখনও 'আপনি' বলা ছাড়ছো না দেখে আমার সাহস হচ্ছে না আর—

সুহাস একটু ম্লান হেসে বললে—এ কথা আপনি বলতে পারেন বটে, কিন্তু আমি কি ক'রে 'আপনি' ছাড়বো ?—আপনার বাল্য-সঙ্গিনী অনুর মতো আমি যে এখনও কলঙ্ককে ভূষণ করবার সাহস ও সামর্থ্য সংগ্রহ করতে পারিনি ! আপনি জানেন না, আমি বড় অসহায় !

—কই, সত্যেনকে তো তুমি 'আপনি' বলো না !

—না, তা বলিনি, তার কারণ দাদাকে আমি এত ভালো করে জানি যে দাদার সম্বন্ধে আর আমার কোনও আশঙ্কাই নেই, কিন্তু কিছু মনে করবেন না, আপনার সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হ'তে পারিনি ! আমার ভয় করে পাছে কেবলমাত্র এই বন্ধুত্বটুকুতে আপনি তৃপ্ত হ'তে না পেরে আরও বেশী কিছু দাবী ক'রে বসেন !

—অর্থাৎ, তোমার আশঙ্কা হ'চ্ছে যে পাছে কোনদিন হয়ত আমি তোমাকে প্রেম নিবেদন ক'রে ব'সবো—এই না ?

—হ্যাঁ, অনেকটা তাই বটে, কিন্তু ঠিক তাই নয় ! দেখুন, এ সম্বন্ধে আমার বড় তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। আমি যেখানেই শুধু এই বিশুদ্ধ বন্ধুত্বটুকু যাচনা করতে গেছি সেখানেই আমাকে বাধা দিয়েছে—ওই প্রেম-নিবেদন এসে !

মণীন্দ্রের মুখখানা আষাঢ়ের কালো মেঘের মতো অন্ধকার হ'য়ে উঠলো। সে আর একটি কথাও কইলে না। চুপ করে ব'সে কি ভাবতে লাগলো—

এই অপ্রিয় আলোচনাটা ঘুরিয়ে দেবার জন্য সুহাস বললে—আপনাদের অনুকে বড় দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে ! একদিন তাকে নিয়ে আসুন না !

—সে উপায় থাকলে অনুকে দেখবার জন্য তোমায় অনুরোধ ক'রতে হতো না বন্ধু ! মন্দা সব জানে, তাকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবে যে সে তার বর্ব্বর স্বামীর ভয়ে—আমার সঙ্গে পর্য্যন্ত দেখা করে লুকিয়ে, পত্র লেখে গোপনে !

সুহাস মৃদু সঞ্চালনে তার মাথাটি নেড়ে বললে—এটা কিন্তু, আমি—অনুমোদন ক'রতে পারলুমনা। গোপনতা বা লুকোচুরির আড়ালে কিছু করা উচিত নয় বলেই আমার মনে হয়—ওতে অকারণ কতকগুলো অভদ্র ও ইতর লোককে সন্দেহের অবকাশ দেওয়া হয়।

—আশ্চর্য্য ! আমিও ঠিক তাই মনে করি ! অনুকে চিঠিতে স্পষ্ট লিখেও দিয়েছিলুম তাই—কিন্তু, তার অবস্থা বুঝে এবং তার মুখ চেয়ে আমাকে এটা মেনে নিতে বাধ্য হ'তে হয়েছে !

সুহাস সাগ্রহে শুধু বললে—তাকে আমার এত দেখতে ইচ্ছে করছে !

মণীন্দ্র বললে—তথাস্তঃ, আমি মন্দাকে বলে তাকে দিয়ে অনুকে একদিন এখানে নিমন্ত্রণ করিয়ে আনাবো !

সুহাস এবার একটু দুষ্টুমীর হাসি হেসে বললে—আপনার এ অনুগ্রহের জন্য আমি আপনাকে অগ্রিম ধন্যবাদ দিয়ে রাখলুম। কিন্তু, এদের রকম কি বলুন তো ? দাদা আর বউদি কোথায় ডুব মারলে ? আমরা এতক্ষণ একলা বসে গল্প করছি, এটাও তো আবার এ পশু সমাজে উচিত এবং শোভন নয় কিনা—

—কে বলে ?

—আমাদের ফৌজদারী সামাজিক দণ্ড-বিধির এ যে একটা প্রধান ধারা—এওকি আপনি জানেন না ?—

মণীন্দ্র হেসে উঠে বললে—না, ও 'পেনাল-কোড্'-গুলো এখনও মুখস্থ করতে পারিনি !

সুহাস বললে—আপনি যে অন্তঃপুরের প্রজা নন্ কিনা ;—নেহাৎ একেবারে বাহিরবন্দরের লোক হয়ে আছেন, তাই জানেন না। বউদিকে জিজ্ঞাসা করে এ গুলো জেনে নেবেন—তাইত ; বউদি গেল কোথা ?

—তারা উপস্থিত নিজেদের একটা দাম্পত্য মামলার নিষ্পত্তি ক'রছে নীচেয় লাইব্রেরী ঘরে। ও শেখাটা বরং তোমার কাছেই সুরু করিনা—

—এই দেখুন একটা কতবড় পণ্ডশ্রম ওদের ! যা নিষ্পত্তি হবার নয় কোনও দিন, তাই মেটাবার জন্য ওরা চির-জীবনটা ধ'রে চেষ্টা করে, ফলে—বিরোধ আরও বেড়ে চলে। একপক্ষ নিঃস্বার্থভাবে ত্যাগীর মতো বার বার পরাজয় মেনে না নিলে এ-যুদ্ধে শান্তি স্থাপনা হওয়া কোনওদিনই সম্ভবপর হয় না—

—তা হ'তে পারে, তুমি যা বল্‌ছ হয়ত ঠিক্—আমি কিন্তু এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ! তোমার এ বিষয়ে তবু কিছুদিনের অভিজ্ঞতাও আছে—একবার বিয়ে করে নামটা

তুমি খণ্ডে রেখেছো। আমার কিন্তু একেবারে কোনও অভিজ্ঞতাই নেই!

সুহাস এ-কথার আর কোনও প্রতিবাদ করলেনা—শুধু একটুখানি ম্লান হেসে বললে—চলুন, আমরা নীচের গিয়ে ওদের দাম্পত্য কলহটা এখন কিছুদিনের জন্য মুলতুবী রাখিয়ে আসি—নইলে কি শেষটা একটা গুরুতর রকম কিছু হ'য়ে উঠবে—

—কোনও ভয় নেই, ও বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া!—চলো তবু একবার দেখে আসি যদি "আর্মিস্‌টিস্‌" হয়—

(ক্রমশঃ)

অশ্রু ফেলিয়ো না

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

সব শেষ হ'ল তবে? তা-ই হোক! অশ্রু ফেলিয়ো না।
জানো না কি, অশ্রুজল ওষ্ঠপুটে ঠেকে বড় নোনা—
বিষম বিস্বাদ?
যে-ওষ্ঠে রেখেছ এঁটে প্রণয়ের সম্পূর্ণ সম্বাদ॥

ও-নয়ন করোনা রক্তিম,—
কপোলে এঁকো না আর কলঙ্ক কৃত্রিম।
জানো না—চোখের জল,—বাসিমুখে শুধু চেয়ে-থাকা
আজিকে এমন দিনে ঠেকিবে যে বড় ফাঁকা-ফাঁকা!
যে-সমুদ্র দেখি নাই, তোমার নয়নে আমি তা'রে করেছিনু
আবিষ্কার।
যে-চন্দ্রে দেখেছি স্বপ্নে, তোমার কপোলে যে গো
লেগেছিলো পাণ্ডু আভা তা'র॥

তোমার যে-রূপ আমি দেখেছিনু, এঁকেছিনু বুকে,
সেই রূপে একবার দেখা দাও আঁখির সম্মুখে॥
আনো টেনে দুই ঠোঁটে সেই পুরাতন হাসিখানি
কপোলে সে সলজ্জ আভাষ,
তেমনি বলিতে থাকো আধো-ভোলা, আধো-বলা বাণী,
নয়নে নামুক্ সেই নীলিমা বিলাস,
রঙীন আঙুলে আনো সেই চঞ্চলতা,
কোমল চরণ-তলে স্পর্শ-ব্যাকুলতা॥

না-ই বা বাঁধিলে আর, খোঁপা যদি খুলে' গিয়ে থাকে,
অঞ্চল লুটালে ভূমে, ফিরে' আর তুলিয়ো না তা'কে।
একটি অলক তব উড়ে' এসে মোর মুখে পড়ে যদি কভু,
ফিরায়ে নিয়ো না মুখ তবু।
কখনো মনের ভুলে তব বাম বাহু যদি স্পর্শ করে' থাকে
মোর বুক,
সরিয়া যেয়ো না তবু রাঙা করি' মুখ।
চুম্বন না দাও যদি, ক্ষতি নাই; তবু একবার
অধরের কাছে এনো অধর তোমার॥

সব শেষ হ'ল বলে'—
আনিয়ো না অশ্রুজল ও সুন্দর নয়নের কোলে।
আজি সর্ব্ব সমাপ্তির দিন—
আজি শেষবার তবে তোমার রূপের স্বপ্নে আমার নয়ন
হোক্ লীন

নিখিল-প্রবাহ

ওজন কমাইবার যন্ত্র—

মোটা এবং চর্ব্বি বহুল লোকদের ওজন কমাইবার এক প্রকার ব্যায়াম যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। যন্ত্রের উপর বসিয়া দুইটি হাতল সামনে এবং পিছনে ক্রমান্বয় টানিতে এবং ঠেলিতে হয়। ইহার ফলে দেহের

ওজন কমান কল

সর্ব্বত্র ঝাঁকানি লাগে এবং দলাই-মলাইএর কাজ হয়। প্রত্যহ এক ঘণ্টা এই প্রকার করিলে অতি সত্বর দেহের অতিরিক্ত ওজন এবং চর্ব্বি কমিয়া যায়। আমাদের দেশের বহু লোকের এই প্রকার যন্ত্রের দরকার আছে বলিয়া মনে হয়।

সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট কাজ—

মিস্ ক্যাথারিণ ক্যাবানাহন নাম্নী একটি ভদ্রমহিলা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী লজেন্স-পরীক্ষক। দেশে যত রকম লজেন্স, চকোলেট এবং অন্যান্য মিষ্টি জিনিষ তৈয়ার হয়—এই ভদ্রমহিলা তাহা চাখিয়া

সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট কাজ

দেখেন এবং শ্রেণী বিভাগ করিয়া দেন। কাহার দাম কি হওয়া উচিত—এবং কোন্ জিনিষ বিক্রয় করিতে দেওয়া যায় বা যায় না—সবই ইনি ঠিক করিয়া দেন। ইঁহার কাজটি খুবই মিষ্ট। এই কাজ করিতে হয় ত কেহই আপত্তি করিবেন না।

কাগজের বর্ষাতি—

জাহাজে এবং অন্যান্য স্থলে যেখানে বেশী ভীড় ঠেলাঠেলি করিতে হয় না—সেই সমস্ত স্থলে কাগজের ওয়াটারপ্রুফের ব্যবহার শুরু হইয়াছে।

কাগজের বর্ষাতি

কাগজের বর্ষাতি হালকা—রবারের বর্ষাতি অপেক্ষা ঠাণ্ডা এবং দামে কম। কাগজকে বিশেষ পদ্ধতিতে ওয়াটারপ্রুফ করিয়া লইয়া বর্ষাতি প্রস্তুত করা হয়। অনেকে এই প্রকার কাগজের দ্বারা সাঁতার-পোষাক প্রস্তুত করিতেছেন।

লিণ্ডবার্গ টাওয়ার—

বিখ্যাত আমেরিকান বিমান-বীর কর্ণেল চার্লস লিণ্ডবার্গের নাম সকলেই জানেন। এই বীর সর্ব্বপ্রথম অতি অল্প সময়ে আমেরিকা হইতে ইয়োরোপে একেবারে এরোপ্লেনে করিয়া উড়িয়া আসেন। এই বীরের সম্মান এবং নাম চিরকাল রক্ষার জন্য একটি টাওয়ার নির্ম্মাণ করিব

উদ্যোগ হইতেছে। টাওয়ারটি ১২২০ ফিট উচ্চ হইবে। টাওয়ারের উপর প্রতি রাত্রে একটি অতি প্রকাণ্ড আলো জ্বলিবে। এই আলো ১,২০০, ০০,০০০ বাতির জোরের হইবে। এই আলো ৩০০ মাইল
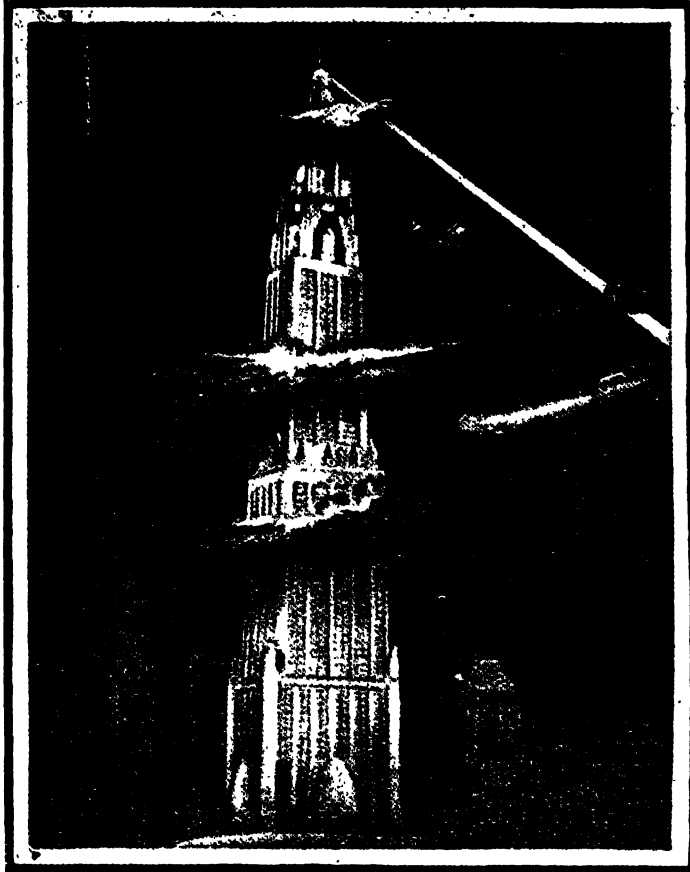
লিণ্ডবার্গ টাওয়ার

দূর হইতে দেখা যাইবে। টাওয়ারের উপর বড় বড় ডিরিজিবল বা আকাশ-জাহাজ আটকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা থাকিবে।

অভিনব বিজ্ঞাপন ব্যবস্থা—

আমেরিকার এক সহরের এক সুগন্ধিওয়ালার দোকানের সামনে একটি পাথরে তৈরী সিংহের মুখ দেওয়ালের গায়ে লাগান আছে। দোকানে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এই সিংহের মুখে যে কেহ রুমাল ঢুকাইয়া দিলে রুমালে সুগন্ধি দ্রব্য পাইতে পারে। এই সুগন্ধি বিক্রেতার দোকানে ভীড় বড় কম হয় না।
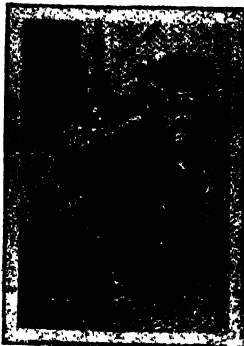
সাঁতারীর অদ্ভুত পাদুকা—

চিত্র দেখুন, একজন সাঁতারীর পায়ে একপ্রকার অদ্ভুত কাঠের পাদুকা আঁটা আছে। সাঁতার কাটিবার সময় ইহাতে খালি পা অপেক্ষা ঢের বেশী সুবিধা হয়।

সাঁতারীর পাদুকা
পা টানিবার সময় পাদুকার দুই অংশ লাগিয়া যায়—আবার ঠেলিবার সময় তাহা খুলিয়া যায়। ইহাতে জল ঠেলিবার জোর বেশী হয়। প্রত্যেক পাদুকার দুইটি অংশ কব্জা দিয়া লাগান আছে।

চামচ-কাঁটা—

একজন কাঁটা-চামচওয়ালা রান্নার সুবিধার জন্য চামচ-কাঁটা যুক্ত করিয়া

তৈয়ার করিয়াছেন। দরকার মত তরকারী বা ঝোলের পাত্র হইতে ইহার সাহায্যে জিনিস তুলিতে পারা যায়। দুইটি দ্রব্যের কাজ একই দ্রব্যে ভাল করিয়া চলিবে।

ফল পাড়া চাকাওয়ালা মই—

উঁচু গাছ হইতে ফল পাড়া কষ্টকর। সেই জন্ত একজন ফল-চাষী বৃক্ষ হইতে ফল সংগ্রহের জন্ত এক অভিনব চাকাওয়ালা মই তৈয়ার করিয়াছেন। মইএর উপরে ফল রাখিবার বেতের ঝুড়ি আছে। মইএর নীচে চাকা থাকায় অতি সহজে মই ঠেলিয়া লওয়া যায়। মই ঘাড়ে করিবার কষ্ট ভোগ করিতে হয় না।

ফল পাড়া মই-কল

রাস্তায় যান-বাহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণকারী কল—

আমেরিকার এক সহরে গাড়ীর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্ত এক অতি সুন্দর ব্যবস্থা হইয়াছে। বড় বড় রাস্তার মোড়ের মাঝখানে সাদা কাল রং করা বড় বড় কাঠের হাতল কলের সাহায্যে ওঠ' নামা দ্বারা গাড়ীর এবং পথিকের চলাচল শাসন করা যায়। যে দিকের গাড়ী চলিবে—সেইদিকে হাতল খাড়া হইয়া ওঠে—এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্ত দিকের হাতল নামিয়া যায়। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা রাস্তা পার হইবার সময়ও এইভাবে কল চলে। রাত্রে হাতলে বাতি জ্বলে। সমস্ত ব্যাপার কলের সাহায্যেই হয়।
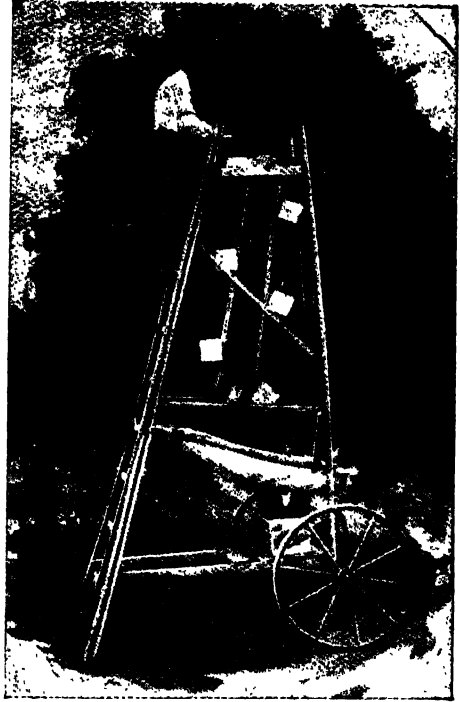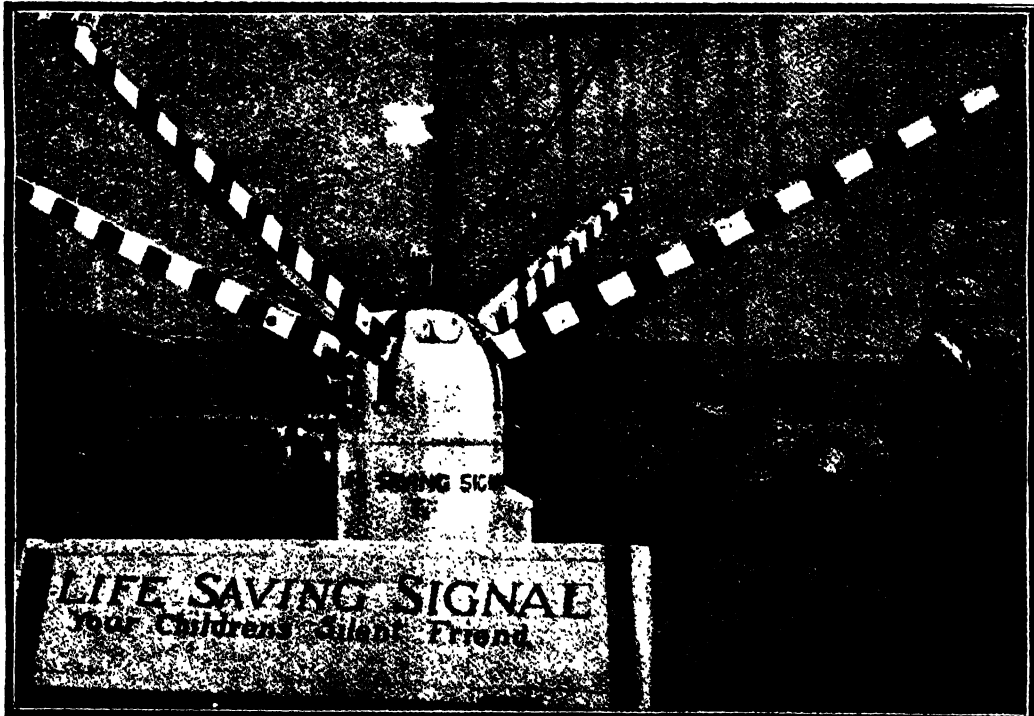
চলাচল নিয়ন্ত্রণকারী কল

আগ্নেয়গিরির ছবি—

বিসুবিয়াস আবার আগুন উদ্গার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার ফলে বহু গ্রাম জনশূন্য হইতেছে। বহু লোক গলিত ধাতুর স্রোতে প্রাণ হারাইয়াছে। বিসুবিয়াসের বিষম অগ্নি-উদ্গারের সময় একজন অসম-সাহসী বিমান-বীর বিসুবিয়াসের উপর উড়িয়া গিয়া একটি ফটো তুলিয়াছেন। ফটোর একটি নমুনা এইখানে দেওয়া হইল। ফটো তুলিবার সময় প্রাণ হারাইবার ভয় অতিরিক্ত পরিমাণে ছিল।

বিসুবিয়াসের রুদ্র মূর্ত্তি

জার্ম্মাণ পুলিশের কাজ—

বার্লিন সহরে একটি ফুটবল ম্যাচে দর্শকদল খেলার মাঠে আসিয়া পড়িতেছিল। পুলিশ তাহাদের প্রাণপণ করিয়া ঠেলিয়া মাঠের বাহির করিতেছিল। দর্শকদের নিকট কিল ঘুসি খাইয়াও তাহারা লাঠি বা রুল ব্যবহার করিতে পারে নাই বা করে নাই। এইরূপ ব্যবহার বার্লিন পুলিশের সভ্যতা, ভদ্রতা ও কর্ত্তব্য-পরায়ণতার পরিচায়ক।

জার্ম্মাণ পুলিসের ভদ্রজনোচিত কাজ

উচ্চতাজ্ঞাপক যন্ত্র

উচ্চতা-জ্ঞাপক যন্ত্র—

এরোপ্লেন আকাশে কত দূর তাহা ঠিক করিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র আছে। এরোপ্লেন আকাশ হইতে নামিয়া আসিলে যন্ত্রের সাহায্যে এরোপ্লেন ঠিক কত ফিট কত ইঞ্চি উঁচুতে উঠিয়াছিল—তাহা বলিয়া দেওয়া যায়। বৈমানিক আর যা তা বলিতে সাহস করিবে না। যন্ত্রের সাহায্যে তাহার কথার সত্যতা বুঝা যাইবে।

তিন বন্ধু

তিন বন্ধুর ছবি—

দুইটি মোরগ এবং একটি কুকুরের ছবি দেখুন। এই প্রকার কুকুর ও মোরগের বন্ধুত্ব বিরল। ছবি তুলিবার সময় তিন বন্ধুর ক্যামেরার সামনে এইভাবে থাকাও কম আশ্চর্য্যের ব্যাপার নয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতায় জীব-জন্তুর পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বের অনেক বিবরণ প্রাণী-বৃত্তান্তে পাওয়া যায়। এমন কি, একে অপরের বিয়োগ শোক সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে; এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। কিন্তু এক্ষেত্রে ইহাদের বন্ধুত্বের একটু বিশেষত্ব দেখা যাইতেছে। ইহারা মানুষকেও বন্ধু মনে করে, এবং নিজেদেরও মানুষের বন্ধু বলিয়া ভাবে। তাই স্থির ভাবে ফটো তোলাইতে আপত্তি করে নাই।

বেতের লাঠির কারুকার্য্য—

মিঃ পেলক নামক একজন আমেরিকান বেতের লাঠির উপর নানা প্রকার অদ্ভুত কারুকার্য্য করেন। একটি লাঠি তিনি বিশেষ ভাবে একটি

অভিনব বেতের লাঠি এবং শিল্পীর ছবি

কুকুরের স্মৃতি রক্ষার্থ তৈয়ার করিয়াছেন। এই লাঠিটি শেষ করিতে তাঁহার ১৭০০ ঘণ্টারও বেশী সময় লাগিয়াছে। লাঠির হাতলের দিকে কুকুরের মুখ খোদাই করা আছে।

হাজার বছরের পুঁতির মালা—

ওয়াসিংটন সহরের বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ডাঃ এ, ভি, কিডার নিউ-মেক্সিকোর এক স্থানে একটি কবর হইতে একটি ৪৮ ফিট লম্বা পুঁতির

হাজার বছরের পুরাণ পুঁতির মালা

মালা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই মালাতে ৫৭০০ পুঁতি আছে। ইহা ১০০০ বছরেরও পূর্ব্বেকার একজন ওঝার সম্পত্তি।

পঞ্জাবকেশরী পরলোকগত

লালা লাজপত রায়

কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেটের অনুগ্রহে

অশ্রুজল

শ্রীবীরকুমারবধ-রচয়িত্রী

(মহাত্মা লালা লাজপত রায়ের অন্তর্দ্ধানে)

১

সত্যই কি চলি গেছ পঞ্জাব-কেশরী!
ত্যাগী, যোগী, ধর্ম্মপ্রাণ,
বৃহস্পতি-বুদ্ধিমান,
ক্ষমতায়, যোগ্যতায় সহস্রাক্ষ স্মরি,
মাতৃভক্ত বীর ছেলে,
অকালে মায়েরে ফেলে,
চলি গেছ এ কি হয়? শুনিনু কি করি?
সত্যই কি ফাঁকি দিলে পঞ্জাব-কেশরী!

২

সত্যই যে দেশব্যাপী আর্ত্ত হাহাকার,
সত্যই যে অশ্রুজলে,
পঞ্চনদে ঢেউ চলে,
কোটি বুক ভেঙে চুরে হয় চুরমার!
সত্যই যে মা জননী,
হারাইয়ে রত্নমণি,
আকাশ অবনীময় হেরিছে আঁধার
সত্যই গিয়েছ তবে,
কালি আর নাহি রবে,
ও পবিত্র দেহ-জ্যোতিঃ, বাক্য সুধাসার!
সত্যই গিয়েছ করি সর্ব্বনাশ মা'র?

৩

যাও দেব! দিব্য-লোকে, বলিব কি আর?
যা থাকে কপালে হবে
তুমি তো আনন্দে রবে
চির আনন্দের ধাম শান্তির আগার;
নাহি সেথা দুঃখ-গীতি
নাহি দুর্জ্জনের ভীতি,
উথলিছে অবিরত পুণ্য-পারাবার!
হেথা তব পুণ্যে স্নেহে,
কোটি কোটি মৃত দেহে
হোক দীপ্তি, হোক নবজীবন-সঞ্চার!
কোটি বক্ষে বেঁচে থেক,
হোথা হ'তে চেয়ে দেখ,
ও প্রাণে অনুপ্রাণিত ত্রিশ কোটি মা'র।
নাহি হিংসা নাহি দ্বেষ,
চিত্তে নাহি কোন ক্লেশ,
"অহিংসা পরমধর্ম্ম" মন্ত্র সবাকার;
সবে ধর্ম্মে অনুরক্ত,
চিত্তজয়ী মাতৃভক্ত,
স্বর্গ মর্ত্ত্য মিলে মিশে হোক একাকার
ঘুচুক সকল দৈন্য আশীষে তোমার।

স্ত্রীশিক্ষায় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

(অপ্রকাশিত সরকারী কাগজপত্র-অবলম্বনে)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় নারীদিগের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার সরকার নিজেদের কর্ত্তব্যের অন্তর্গত বিষয় বলিয়া মনে করিতেন না। ইতিপূর্ব্বেই কিন্তু রাজা রাধাকান্ত দেব-প্রমুখ কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মহোদয় এবং খৃষ্টান মিসনরিগণ স্ত্রীশিক্ষার কিছু সূচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ভারত-হিতৈষী ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন কর্ত্তৃক একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি তখন হইতেই যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছিল। পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল—হিন্দু বালিকা-বিদ্যালয়; পরে 'বীটন নারী বিদ্যালয়'—এই নূতন নামকরণ হয়। গোড়া হইতেই বিদ্যাসাগরকে সহকর্ম্মী এবং উৎসাহী বন্ধুরূপে পাইবার সৌভাগ্য বীটন সাহেবের ঘটিয়াছিল। শিক্ষা-পরিষদের সভাপতিরূপে বীটন বিদ্যাসাগরের সহিত প্রথম পরিচিত হন। ঈশ্বরচন্দ্রকে একজন অক্লান্তকর্ম্মী গুণী ব্যক্তি বলিয়াই তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল, তাই তিনি বিদ্যাসাগরকেই বিদ্যালয়ের সম্পাদক-রূপে কাজ করিবার জন্য ধরিলেন (ডিসেম্বর ১৮৫০)। ইহার কিছুদিন পরেই বীটন পরলোকগত হন (১২ অগষ্ট ১৮৫১)। পরবর্ত্তী অক্টোবর মাস হইতে লর্ড ড্যালহাউসি বিদ্যালয়-পরিচালনার সমস্ত খরচ বহন করিতে লাগিলেন। লাট সাহেবের বিদায়-গ্রহণের (মার্চ্চ, ১৮৫৬) পর হইতে ইহা সরকারী-ব্যয়ে পরিচালিত সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত হইল, এবং বঙ্গের ছোটলাট ইহাকে সেসিল বীডনের তত্ত্বাবধানে স্থাপিত করিলেন। ১৮৫৬, ১২ই অগষ্ট তারিখের পত্রে বীডন সাহেব বাঙলা-সরকার সমীপে এক ব্যবস্থা পেশ করিলেন। এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি যাহাতে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের নজরে বিশেষ করিয়া পড়ে, এবং তাঁহারা যাহাতে এই বালিকা-বিদ্যালয়ে কন্যাদের পড়াইতে প্ররোচিত হন, এইরূপ ব্যবস্থার প্রস্তাব সেই পত্রে ছিল। একটি কমিটি করিবার প্রস্তাবও পত্রে ছিল। কমিটির সদস্যরূপে রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, রমাপ্রসাদ রায় এবং কাশীপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লিখিত হয়। বিদ্যাসাগরকে সম্পাদক করিয়া তাঁহার উপর স্কুলের তত্ত্বাবধানের ভার দিবার জন্য বীডন ব্যগ্র হইলেন। তিনি ছোটলাটকে লিখিলেন:—"কমিটির সম্পাদক-নিয়োগে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মাকেই উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতে পারেন। তাঁহার সামাজিক সম্মান ও স্কুলের সম্পাদক হিসাবে পূর্ব্ব পরিশ্রম তাঁহার যোগ্যতা সপ্রমাণ করে।" *

বাঙলা-সরকার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। বীডন সাহেব কমিটির সভাপতি, ও বিদ্যাসাগর সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন। †

ড্রিঙ্কওয়াটার বীটনের মত বিদ্যাসাগরও স্ত্রীশিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন; তিনিও মনে করিতেন স্ত্রীশিক্ষা ভিন্ন দেশের উন্নতি নাই। কিন্তু তাঁহার উৎসাহ ও কর্ম্মিষ্ঠতা শুধু বীটন স্কুলের কাজের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত পত্রে ও অন্যত্র বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষেরা স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার এক সমস্যা। সেই সমস্যা-সমাধানের উপায় বহুল পরিমাণে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বাঙলা দেশে হ্যালিডে সাহেব সেই কাজে হাত দিলেন। তিনি

* *Education Con.* 4 Sept, 1856, No. 166.

† Bengal Government to Vidyasagar, dated 30 Augt. 1856. *Ed. Cons* 4 Sept. 1856, Nos. 168 & 170.

বিদ্যাসাগরকে ডাকাইয়া, তাঁহার সহিত এ-সম্বন্ধে খোলাখুলি-ভাবে আলোচনা করিলেন। কাজ কেমন কঠিন সে কথা তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল না। সাধারণ বালিকা-বিদ্যালয়ে নিজেদের মেয়ে পাঠাইতে সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের মনে কতটা যে অনিচ্ছা আছে, তাহা তাঁহারা ভালরূপেই বুঝিতেন। যাহা হউক, বিদ্যাসাগরের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত কাজে লাগিলে এরূপ সৎকার্য্যে জনগণের সহানুভূতি আকর্ষণ করা খুব কঠিন হইবে না।

বিদ্যাসাগর অল্পদিনের মধ্যেই জানাইলেন, বর্দ্ধমান জেলার জৌগাঁতে তিনি একটি বালিকা-বিদ্যালয় খুলিতে পারিয়াছেন (৩০মে ১৮৫৭)। * ডিরেক্টর প্রতিষ্ঠানটির জন্য সরকারের কাছে ৩২৲ টাকা মাসিক সাহায্যের অনুমোদন করিয়া পত্র লিখিলেন।

দক্ষিণ-বঙ্গের স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টার প্র্যাট সাহেবের নিকট হইতে সাহায্যের জন্য তিনখানি আবেদন-পত্র আসিয়াছিল। ডিরেক্টর সেগুলি পূর্ব্বেই সরকারের দপ্তরে পেশ করিয়াছিলেন। হুগলী জেলার হরিপাল থানার অন্তর্গত দোয়ারহাটা ও বৈদ্যবাটী থানার অন্তর্গত গোপালনগর, এবং বর্দ্ধমানের নারোগ্রামে তিনটি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সেই তিনখানি আবেদন-পত্রে ছিল। ছোটলাট সকল দরখাস্তই মঞ্জুর করিলেন; প্রত্যেক স্থলেই পল্লীবাসীরা বিদ্যালয়-বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিবার ভার লইল। সাহায্য মঞ্জুর করিবার সময় ছোটলাট জানিতে চাহিলেন, বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টারদের নিকট হইতে ডিরেক্টর আর কোন আবেদন পাইয়াছেন কি না, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রার্থনাও তিনি পূর্ণ করিবেন। †

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বাঙলা-সরকারের ভাব বিদ্যাসাগরের কাছে ভাল বলিয়াই মনে হইল। তিনি পূর্ব্বেই বালকদের জন্য মডেল বাঙলা বিদ্যালয়গুলি কার্য্যকর ও সুশৃঙ্খল করিয়া তুলিয়াছিলেন। এইবার বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি ফিরাইলেন। মডেল বাঙলা বিদ্যালয়-সম্পর্কে তিনি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও তাহাই করিলেন। তিনি ধরিয়া লইলেন, সরকার তাঁহার মতলব সাধারণভাবে সমর্থন করিয়াছেন। এই ধারণার বশে তিনি নিজ এলাকাভুক্ত জেলাসমূহে অনেকগুলি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই-সব বিদ্যালয়-স্থাপনার সংবাদ তিনি যথাসময়ে ডিরেক্টর-অফ-পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাকশনের কাছে পাঠাইয়া মাসিক সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ডিরেক্টরও পূর্ব্বেকার আদেশ অনুযায়ী অন্যান্য আবেদন-পত্রের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পত্রগুলিও ছোটলাটের বিবেচনার্থ পাঠাইলেন।

১৮৫৭ নবেম্বর হইতে ১৮৫৮ মে—এই কয় মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর ৩৫টি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন; তন্মধ্যে হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রামে ২০টি, বর্দ্ধমান জেলায় ১১টি, মেদিনীপুরে তিনটি, ও নদীয়ায় একটি। বিদ্যালয়গুলির জন্য মাসে ৮৪৫৲ টাকা খরচ হইত; ছাত্রী-সংখ্যা ছিল প্রায় ১,৩০০। *

১৮৫৮, ১৩ই এপ্রিল বাঙলার ছোটলাট ভারত-সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠাইলেন,—পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বাঙলার বিভিন্ন স্থানে যে-সকল বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, তন্মধ্যে ২৬টি বিদ্যালয়ের সম্পর্কে ডিরেক্টর-অফ-পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাকশনের নিকট হইতে সাহায্যের জন্য দরখাস্ত আসিয়াছে। সরকারী সাহায্যদান-সম্বন্ধীয় (grant-in-aid) নিয়মাবলী আর একটু ঢিলা না হইলে তিনি দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে পারেন না। তিনি দেখাইলেন, ১৮৫৬, ১লা অক্টোবর তারিখের পত্রে বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ আশা দিয়া বলিয়াছেন যে, বালিকা-বিদ্যালয়গুলির ছাত্রীদের নিকট হইতে মাহিনা লওয়া হইবে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ছোটলাট মনে করেন, আরও কিছু করা দরকার। তাই তিনি প্রস্তাব করিলেন, যখনই বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য নি-খরচায় উপযুক্ত গৃহ এবং অন্তত কুড়িটি ছাত্রী ভর্ত্তি হইবে এমন একটা আশা পাওয়া যাইবে, তখনই স্কুল-পরিচালনার সমস্ত খরচ সরকার সরবরাহ করিবেন।

১৮৫৮, ৭ই মে তারিখের পত্রে ভারত-সরকার বালিকা-বিদ্যালয় সম্পর্কে সরকারী সাহায্যের নিয়মাবলীর ব্যতিক্রম

---

* Vidyasagar to D. P. I., dated 30 May 1857. *Ed. Con.* 22 Oct. 1857, No. 72.

† Govt. of Bengal to the Offg. D. P. I., dated 21 Octr. 1857.—*Ed. Con.* 22 Oct. 1857, No. 74.

* *Education Con.* 5 Augt. 1858, No. 16.

করিতে অস্বীকৃত হইলেন; বলিলেন, উপযুক্ত পরিমাণে স্বেচ্ছাদত্ত সাহায্য না পাওয়া গেলে এরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হওয়াই ভাল।

ভারত-সরকারের এইরূপ আদেশ বিদ্যাসাগরের কাজে একান্ত বাধা জন্মাইল। সরকারের অনুমোদন পাওয়া যাইবেই, এই মনে করিয়া বিদ্যাসাগর অনেকগুলি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। অবশ্য কথা ছিল, স্থানীয় অধিবাসীরাই উপযুক্ত বিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিবে, আর সরকার অন্য-সব খরচ যোগাইবেন। পণ্ডিত এখন বুঝিলেন, তাঁহার সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়াছে, এত কষ্টের স্কুলগুলি অবিলম্বে উঠাইয়া দিতে হইবে। আর এক সমস্যা—শিক্ষকদের বেতন। প্রতিষ্ঠাবধি স্কুল হইতে তাঁহারা মাহিনা পান নাই। ১৮৫৮, ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ধরিলে তাঁহাদের সকলের মোট পাওনা হয়—৩৪৩৯৵৫।

এই সম্পর্কে ডিরেক্টর-অফ-পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাকশনকে লেখা ঈশ্বরচন্দ্রের ২৪শে জুন তারিখের পত্রখানি পড়িলে ব্যাপারটা পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে। পত্রখানির মর্ম্ম দেওয়া গেল:—

"হুগলী, বর্দ্ধমান, নদীয়া এবং মেদিনীপুর জেলার অনেকগুলি গ্রামে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। বিশ্বাস ছিল, সরকার হইতে মঞ্জুরী পাওয়া যাইবে। স্থানীয় অধিবাসীরা স্কুল-গৃহ তৈয়ারী করাইয়া দিলে সরকার খরচ-পত্র চালাইবেন। ভারত-সরকার কিন্তু ঐ সর্ত্তে সাহায্য করিতে নারাজ, কাজেই স্কুলগুলি তুলিয়া দিতে হইবে। কিন্তু শিক্ষকবর্গ গোড়া হইতে মাহিনা পান নাই, তাঁহাদের প্রাপ্য মিটাইয়া দেওয়া দরকার। আশা করি, সরকার এই ব্যয় মঞ্জুর করিবেন।

"সরকারী আদেশ পাইবার পূর্ব্বেই, আমি অবশ্য স্কুলগুলি চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রথমে আপনি, অথবা বাঙলা-সরকার এ-বিষয়ে কোনরূপ অমত প্রকাশ করেন নাই; করিলে, এতগুলি বিদ্যালয় খুলিয়া এখন আমাকে এমন বিপদে পড়িতে হইত না। স্কুলের কর্ম্মচারীবর্গ মাহিনার জন্য স্বভাবতই আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে। যদি আমাকে নিজ হইতে এত টাকা দিতে হয়, তাহা হইলে সত্যই আমার উপর অবিচার করা হইবে,—বিশেষতঃ খরচ যখন সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য করা হইয়াছে।" *

ডিরেক্টর বাঙলা-সরকারের কাছে বিদ্যাসাগরের কথা জানাইয়া বলিলেন,—"পণ্ডিতের পত্রের সহিত সংযুক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণীর প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি; কেন-না স্ত্রীশিক্ষা-সম্পর্কে এই কর্ম্মচারীর স্বেচ্ছাকৃত এবং অনাড়ম্বর পরিশ্রমের কথা সরকারের না জানাই সম্ভব। দূরবর্ত্তী স্থানের অন্যবিধ কর্ত্তব্যের গুরুভার যাঁহার উপর ন্যস্ত, কর্ত্তৃত্বের বিশেষ উচ্চপদেও যিনি অবস্থিত নন, এমন একব্যক্তি কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতীতও গ্রাম-সমূহে যদি এতটাই করিয়া থাকিতে পারেন, সরকারের অনুমোদন ও সাহায্য পাইলে সেইদিকে কতটাই না তিনি করিতে পারিতেন? আর যদি আন্তরিক প্রচেষ্টাসত্ত্বেও ইহাতে সেই কর্ম্মচারীর অপমান ও আর্থিক ক্ষতিই স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে স্ত্রীশিক্ষার প্রচারে কি নিরুৎসাহের ভাবই না আসিয়া পড়িবে?" †

ছোটলাট ডিরেক্টরের অনুরোধ-পত্র সমর্থন করিয়া এবং "সংস্কৃত কলেজের অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও কৃতী অধ্যক্ষের আড়ম্বর-হীন উৎসাহের" কথা উল্লেখ করিয়া ভারত-সরকারকে ব্যাপারটা পুনরায় বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। (২২ জুলাই, ১৮৫৮) ‡

কোন আদেশ দিবার পূর্ব্বে ভারত-সরকার জানিতে চাহিলেন, "পণ্ডিত কেন ও কিরূপ অবস্থায় টাকা মঞ্জুর হইবে ধরিয়া লইয়া, বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনে এত ভারি রকমের খরচ করিতে উৎসাহশীল হইলেন। আর যে উৎসাহ পাইয়া পণ্ডিত বলিতেছেন, তিনি এই-সব কাজ করিয়াছেন, তাহার জন্য দায়ী কে? বাঙলা-সরকারের ১৮৫৮, ১৩ই এপ্রিল লিখিত পত্রের পূর্ব্বেই প্রায় অর্দ্ধেক বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা বাঙলা-সরকারের জানা ছিল কি না? থাকিলে, সে কথা উল্লেখ করা হয় নাই কেন?"

---

* Ishwarchandra Sharma, Special Inspector of Schools, South Bengal, to W. Gordon Young, D. P. I., dated 24 June 1858.—*Education Con.* 5 August 1858, No. 15.

† *Education Con.* 5 August, 1858, No. 14.

‡ *Ibid.*, No. 17

ভারত-সরকারের প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যাসাগর ডিরেক্টর-অফ-পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাকশনকে লিখিলেন :—

"সরকারের মঞ্জুরীতে পূর্ব্বেই এইরূপ ভিত্তির উপর কতকগুলি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। আমিও তাই বিশ্বাস করিয়াছিলাম সরকার সাধারণভাবে ইহা অনুমোদনই করেন। প্রত্যেক নূতন স্কুল প্রতিষ্ঠার সংবাদ যে মাসে খোলা হইল ঠিক তাহার পরের মাসেই আপনাকে জানাইয়া আসিয়াছি। যদিও কোন লিখিত আদেশ পাশ করা হয় নাই, তবুও স্কুলের ব্যয়-সংক্রান্ত আমার নিবেদন-পত্রগুলি সকল সময়েই গ্রাহ্য হইয়াছে। সরকারের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিতেছি—ইহাই আমার বিশ্বাস ছিল। সেই বিশ্বাস-বশে আমি এতদিন যে কাজ করিতেছিলাম তাহাতে কোনদিন আমাকে নিরুৎসাহিত করাও হয় নাই।" (৩০ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৮) *

ডিরেক্টর বিদ্যাসাগরের পত্রখানি বাঙলা-সরকারের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। মন্তব্য করিলেন,—"কলিকাতা হইতে আমার অনুপস্থিতিকালে পণ্ডিত ছোটলাটের সহিত সাক্ষাৎ-আলাপে এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেন,—ইহাই আমার জানা ছিল। আপনার ২১শে অক্টোবরের পত্র হইতে অনুমান করিয়াছিলাম যে সরকার তাঁহার কার্য্য সুদৃষ্টিতেই দেখেন; সেই হেতু পণ্ডিতের রিপোর্টগুলি সরকারকে পাঠাইতে বিলম্ব করি নাই, সেগুলির উপর কোন মন্তব্য করি নাই, কিংবা তাঁহাকে নিরুৎসাহও করি নাই। আমার অনুপস্থিতিতে মিঃ উড্‌রোও তাহাই করিয়াছেন।" (৪ অক্টোবর, ১৮৫৮)

ছোটলাট ভারত-সরকারের কাছে সমস্ত কথা পরিষ্কার-ভাবে খুলিয়া বলিলেন। তিনি দেখাইয়া দিলেন, "ব্যাপারটি আগাগোড়া এক ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত। ছোটলাট হইতে আরম্ভ করিয়া পণ্ডিত পর্য্যন্ত সকলেই একটি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়াছেন। সকল অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া ব্যাপারটিকে যেন একটু অনুগ্রহের চক্ষে দেখা হয়, এইটুকু তিনি আশা করেন।" (২৭ নবেম্বর, ১৮৫৮) †

সরকার পণ্ডিতের উপর সুবিচার করেন নাই এবং সরকারের কাজে যে আর্থিক দায়িত্ব তিনি নিজে লইয়াছিলেন, সে দায়িত্ব তাঁহার ঘাড়েই পড়িয়াছিল, সরকার তাহা পরিশোধ করিতে অস্বীকৃত হন,—এই গল্প বিদ্যাসাগরের জীবনী-লেখকগণই রচিয়াছেন। * ভারত-সরকারের ১৮৫৮, ২২শে ডিসেম্বর তারিখের পত্রে এ-সম্বন্ধে শেষ আদেশ প্রদত্ত হয়। বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে বিদ্যাসাগর যে ব্যয় করিয়াছিলেন, সেই টাকা যে সমস্তই পরিশোধ করা হইয়াছিল, এই পত্রই তাহার নিশ্চিত প্রমাণ। ভারত-সরকার লিখিতেছেন,—

"দেখা যাইতেছে পণ্ডিত আন্তরিক বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই এ কাজ করিয়াছেন, এবং এ কাজ করিতে উচ্চতম কর্ম্মচারীদের উৎসাহ এবং সম্মতিও তিনি পাইয়াছেন। এই-সকল কথা বিবেচনা করিয়া, এই বিদ্যালয়গুলিতে যে ৩, ৪৩৯ ৶৫ প্রকৃতপক্ষে ব্যয় হইয়াছে, সেই টাকার দায়িত্ব হইতে সপরিষদ বড়লাট সাহেব তাঁহাকে মুক্ত করিতেছেন। সরকার এ টাকা দিবেন, ইহাই তাঁহার আদেশ।

"পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়গুলির, অথবা সেগুলির পরিবর্ত্তে প্রস্তাবিত সরকারী বিদ্যালয়গুলির ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কোন স্থায়ী অর্থ সাহায্য করিতে কাউন্সিলের সভাপতি সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। সমস্ত চিঠিপত্র বিবেচনার্থ সেক্রেটারী-অফ-ষ্টেটের নিকট প্রেরিত হইবে। হুগলী, বর্দ্ধমান ও ২৪ পরগণায় বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনার জন্য অনধিক এক হাজার টাকার সাহায্যের জন্যও ইহাতে অনুরোধ থাকিবে। সেই টাকার কিয়দংশ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলির সাহায্যার্থ এবং কিয়দংশ সরকার-সমর্থিত কতকগুলি মডেল স্কুলের জন্য ব্যয় করা হইবে।" †

কিন্তু বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ সিপাই-বিদ্রোহের জন্য আর্থিক অনটনবশতঃ বালিকা-বিদ্যালয়গুলিতে কোন স্থায়ী সাহায্য করিতে অস্বীকার করিলেন ;—তবে আশা দিলেন, বিষয়টা ভবিষ্যতে বিবেচিত হইবে।

* *Education Con.* 2 Decr. 1858, No. 4.

† *Education Con.* 2 Decr. 858, No. 6,

* স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল সরকার, প্রভৃতি।

† *Education Con.* 20 Jany. 1859, No. 9.

মহাসাগরের নামহীন কূলে

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

এক

…কথাটা আজও ভাবি!

একটা দুঃস্বপ্নের মতো…

একটা হঠাৎ-শোনা করুণ বেহাগের মতো…আজও মনে পড়ে কারণে-অকারণে।

কথাটা অনেক দিনেরই…

গাঁয়ের স্কুল থেকে পাশ করে সেবার প্রথম কোল্‌কাতায় আসা…কাজেই কথাটা মনের ভেতর বেশ ছাপ রেখে দিয়েচে! স্মৃতির ছবি কোথাও ঝাপ্‌সা, অস্পষ্ট, মলিন হয়ে ওঠেনি…

বেশ নিখুঁত…স্পষ্ট!

গরীবের ছেলে…

পাশ করার পর পড়াশুনো আর করা হ'বে কি হ'বে না সেই সমস্যা নিয়েই বাদানুবাদ চল্‌ছিলো…কোল্‌কাতায় পড়া মানে টাকার আদ্যশ্রাদ্ধ না এমন একটা কি…এই কথাটা গাঁয়ের মুরুব্বির দল বেশ ভালো করেই সমঝে দিলেন! মনটা যখন এমনি করে নিরাশার খেয়ায় পাড়ি দিয়েছিলো, কাণ্ডারীর দেখা ঠিক সেই সময়েই মিল্‌লো!

চাঁদ অবশ্য কেউ হাতে পায় না…তবে না কি আনন্দের একটু মাত্রাধিক্য ঘটলে ঐ চাঁদ পাওয়ার মতই অবস্থা দাঁড়ায়। অসম্ভবকে সম্ভব হ'তে দেখলে আনন্দ হয় সবায়ের।

আমরাও খুসী হয়েছিলুম! বাচস্পোত-পাড়ার মথুরদা'র আজ পাঁচ বছর ধরে কোল্‌কাতায় যাওয়া-আসা চল্‌চে—বয়স বেশী নয়…তেইশ-চব্বিশ। কি জানি কিসের একটা ছুটী উপলক্ষ্যে তিনি সেবার হঠাৎ এসে হাজির।

নদীর ধারে আমাদের কিসের জটলা চল্‌ছিলো—সেখানেই হঠাৎ ধূমকেতুর মতো—

"—ধিন্‌তা ধিনা পাকা নোনা
(ও তোর) ঘুচ্‌লো ভবের আনাগোনা—আ"

গাইতে-গাইতে এসে হাজির। আমরা ত' মহা ব্যস্ত হ'য়ে উঠলুম। মানী লোক ত' বটে!

কথায় কথায় আমাদের সমস্যার কথা উঠ্‌লো—সব শুনে বল্‌লেন · আরে কি আশ্চয্যি! এর জন্যে আর ভাবনা কি? সোমবার তোরা সবাই দুগ্‌গা নাম করে বেরিয়ে পড়্‌। কী আশ্চয্যি! আমি রয়েচি। তোদের সব ব্যবস্থা করে দেব। সব বেশ সস্তার ভেতর হ'বে'খন। কাল আমায় সব ঠিক করে বল্‌বি! কি আশ্চয্যি!

কথাটা মনে লাগ্‌ল…

সাঁচ্চা লোক বটে…

যাওয়াই স্থির হোল…

তল্পীতল্পা আর মার চোখের জল সম্বল করে শুভদিন দেখে বেরিয়ে পড়া গেল। অজিত, অভয়, রতন আর আমি!

গাঁয়ের আমরাই ছিলুম সর্দ্দার। আমরাই সব কাজে গিয়ে পড়্‌তুম—কয় বন্ধু!

ছেলেবেলা থেকেই এক সাথে কেটেচে…মান, অভিমান, ঝগড়া, হাসি-কান্নার সঙ্গী এরা।

আজ আবার সুরু হোল জীবনের আর এক দিক—এদের সাথে।

দুই

গাঁয়ের ছেলে…খোড়ো ঘরে থাকাই অভ্যাস…মথুরদা' যা আস্তানা ঠিক্ কর্‌লেন, তা ঐ খোড়ো চালার একধাপ ওপরের…খোলার চালার বস্তির একটা ঘর। আশপাশে আরো অনেক ঘর, আর তারা তেম্‌নি বাসাড়ে—কেউ কলে কাজ করে, কেউ বা মুটে—কেউ গাড়োয়ান। আমরাই সব ভদ্দর।

রান্নাবান্নার কাজ পালা করে নিজেদেরই শেষ কর্‌তে হোত।

দিনকতক পরই বোঝা গেল—জায়গাটা আর যাই হোক, নেহাৎ ভদ্রলোকের আস্তানা নয়। কিন্তু কিছু বলা চলে না···অল্প পয়সায় চালাতে হ'বে ত'।

কলেজে ভর্ত্তি হ'বার পর কত রকমের ছেলের সঙ্গেই না আলাপ হোল। হোষ্টেলের ছেলেদের সঙ্গেও খুব আলাপ হ'য়ে গেল। তাদের ঘরে যেতুম আর তাদের জীবনযাত্রা দেখতুম। মনে পড়ে—একদিন একজনের ঘরে দেখেছিলুম, দেয়ালের গায়ে নীল পেন্সিলে বেশ বড় করে লেখা—

"আমি চঞ্চল হে সুদূরের পিয়াসী—"

ড্যাসটা বোধ হয় সুদূরের পরিচায়ক। ভেবেছিলুম কত তরুণই না জানি এমনি ভাবে মনের ব্যথা মনের মাঝে চেপে কায়-ক্লেশে জীবন যাপন করচে।

এমনই কাটত···

ট্রামে চলেচি—

যেতে হ'বে গ্রে ষ্ট্রীট, বন্ধুর বাড়ী—গাড়ীতে উঠে দেখলুম, এক বুড়ীর সঙ্গে কনডাক্টারের তুমুল বচসা—গাড়ীতে আর কেউ নেই—

কন্ডাক্টারকে কারণ জিজ্ঞাসা করতেই বুড়ীর বাক্য-স্রোতে ভেসে গেলুম—

বুড়ী বলতে লাগল···

দেখ্ ত বাবা, মুখপোড়াদের আক্কেল···খালি গাড়ী চলেচে, আর যেই উঠেচি, অমনি বলে কি না পয়সা দাও—আরে মড়ারা, তোদের খালি গাড়ী দেখেই ত' চড়লুম–পয়সা যদি দেব ত' ট্যারামারায় চড়্বো কেন, ভদ্দর লোকের মেয়ে ঘোড়ার গাড়ী চ'ড়েই যেতুম—ঘোষালদের বাড়ীর মেয়েদের কি চন্দর সুয্যিতে দেখ্তে পায়···আজই—

এইটুকু বলে পাছে 'চন্দর সুয্যি' দেখ্তে পায় সেইজন্যে ঘোম্টা হঠাৎ টেনে দিলেন—একটু বেশী করেই—

কি করি ছ'টা পয়সা নিজেই দিলুম···

কন্ডাক্টার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

হয় ত একটু অবাক হ'য়ে!

গ্রে ষ্ট্রীট্ চলেচি!

চল্লিশের পর একচল্লিশ এই রকম নম্বর দেখ্তে দেখ্তে হঠাৎ চোখ পড়্ল একটা বাড়ীর বারান্দায়···

স্কাই-ব্লু রঙের শাড়ী পরে দাঁড়িয়ে এক সুন্দরী—চমৎকার!

বেশ দেখা গেল আমাকেই ডাকে—চেনা বলেও বোধ হোল—

মুহূর্ত্তের ভেতর যাবো কি যাবো না স্থির করে ওপরে উঠে গেলুম···

গেটের দরোয়ান বাধা দেয়নি।

ওপরে উনি দাঁড়িয়ে ছিলেন—

ভালো করে দেখ্তেই চিন্তে পারলুম—আমাদেরই গাঁয়ের ঈশেনকা'র মেয়ে পুঁটিদি'।

একদিন নিশীথের অন্ধকারে উনি অকারণে গা-ঢাকা দিয়ে বেরিয়েছিলেন···

হয় ত বা কারণেই।

একটু অপ্রতিভ হ'য়ে গেলুম।

হেসে বল্লেন—কিরে নিমু! চিন্তে পারিস্!

ঘাড় নেড়ে বল্লুম—হুঁ, পারি!

তার পর ঘরে নিয়ে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে গেলুম বটে, কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তেই অন্তরের শুচিস্মান পুরুষটা সশঙ্কিত হ'য়ে উঠ্ছিলেন—নিজেও ঘেমে উঠ্ছিলুম।

ফ্যান চলতে লাগল···

নিজে একটা সোফায় বসলুম; আর একটায় উনি···

গল্প চল্তে লাগলো···

ভারতীর বিয়ে হ'য়েচে কি না, মেনকা না কি বিধবা হ'য়েচে? কৃষ্ণকলির মেয়ে কত বড় হোল···কাকাবাবু কেমন—আমি এখানে কেন···? কোল্কাতায় কতদিন—

গাঁয়ের পুজো কেমন হয়? দলাদলি কি তেমনই চলচে?—এমনি কত কথা—হঠাৎ দেখ্লুম ওঁর চোখ দুটো জলে ভরে এসেচে।

ঘরছাড়া পথিকের মনে হয় ত অতীতের সোণার স্বপন ভেসে এসেছিল।

আমার মনটাও একটু নুয়ে পড়্ল। ঘড়িতে একসঙ্গে টং টং করে বাজ্ল পাঁচটা—উঠে দাঁড়ালুম—

ধরা গলায় বল্লেন···

চল্লে? এসো ভাই মাঝে মাঝে—অভাগী আমরা—

কি জানি কি ভেবে বল্লুম···

এক গ্লাস জল দিন—

দাসী শুধু জল আনে নি, সঙ্গে এনেছিল আরো কি সব!

সিঁড়িতে নাম্‌তে নাম্‌তে মনে হয়েছিল, কতবার পূজোর সময় আরতি দেখ্‌তে গিয়ে দেব দেবীর মুখ দেখার পরিবর্ত্তে ওঁর মুখ দেখেচি—আরো কত অবান্তর কথা—

গাঁয়ের আন্দোলনও মনে পড়্‌ছিল!

গলির ফাঁকে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখলুম—তখনও চেয়ে আছে সেই ভাবে—

চোখে হয় ত তখনও দুফোঁটা জল ছিল···

বন্ধুর বাড়ী সেদিন আর যাওয়া হয়নি।

তিন

রান্নার পালা ছিল সেদিন আমার আর অজিতের—

একমনে অজিতকে সমস্ত বলে যেতে লাগ্‌লুম—

অজিত সমস্ত শুনে ব'লেছিল···পকেটের ছেঁদাটা অত বড়ো করো না হে—কোন্‌দিন নিজেকেই হারিয়ে বস্‌বে···

ভেবেছিলুম··তাই ত!

অজিতের বাক্যস্রোত সমানে চলে···অজিত বল্‌তে লাগ্‌ল···

প্রেসিডেন্সী কলেজের সাম্‌নে চ্যাটারটনের একটা কবিতার বই বিক্রী হচ্ছিল পুরানো দরে। অনেক দর-কষাকষি করে বারো আনা দিয়ে যখন কিন্‌লুম, তখন শুন্‌লুম, নতুনের দামই মোটে দশানা—

ও না কি ওর বন্ধুকে বলেছিল—বারো আনায় পেয়েচি এই ঢের। এর কি দাম আছে।

ডালটা সেদিন পুড়ে গেছল!

খাওয়া দাওয়ার সময় রোজ এসে বস্‌ত এক বুড়ী!

আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে বসে,···আমাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সে আমাদের তদ্বির কর্‌ত।

তার না কি ধারণা ছিল, আমরা সবাই বামুন; আর বামুনের সেবা করে পুণ্যির ছালাটা ভারী কর্‌বার একটা লোভও ওর ছিল!

জীবনে অনেক পাপই সে করেছে। বন্ধুরা কেউ তাকে বল্‌ত মা, আবার কেউ বল্‌ত মার ideal অতো নীচু! দূর—!

এমনিই কাট্‌ত মানুষের জীবনের নানা দিক দেখ্‌তে দেখ্‌তে···

জানতুম আশপাশ ভালো নয়। আর অনেক দিনই পাশের ঘরে গাড়োয়ান মুটে আর কলের কারিকরের মিশ্রিত সুরের গান শুনতুম—

> এক টানেতে যেমন তেমন
> দু টানেতে মজা—
> তিন টানেতে মদনমোহন,
> চার টানেতে রাজা!

রাজা হ'য়ে ওরা যখন কাল্পনিক রাজত্ব নিয়ে ব্যস্ত থাকৃত, আমাদের মন তখন সুদূরের পিয়াসী হয়ে ঘুরে বেড়াত—।

মাঝে মাঝে চঞ্চল-গতি একটা মেয়ে আমাদের বুড়ী বাড়ীউলীর সঙ্গে ঘুরে বেড়াত—একটা নির্জ্জীব বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের মতো। গাল তার ছিল নাস্‌পাতি-লাল—চুল তার ছিল রেশম-কোমল। যৌবন-স্রোত যেন হঠাৎ একটা খাদে পড়ে স্থির হ'য়েছে—

এমনই ছিল তার দেহের মাধুরী! নাম তার চিত্রা! নামটা হয় ত তার বাপ মায়ে দিয়েছিল—হয় ত বা স্বকপোল-কল্পিত—যাই হোক নামটায় তাকে মানাত বেশ···

মেয়েটা কখনো আমাদের অজ্ঞাতে আমাদের বিছানা ঠিক করে রাখত; কখনো বা বইগুলো। ধরা পড়লে যদিও তাকে জবাবদিহি কর্‌তে কেউ বল্‌তো না, তবু শুনিয়ে যেত—মার হুকুম।

একদিন তার ঘরেই

> "—যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চলি যাতা,
> তাঁহা তাঁহা ধরণী হই এ মঝু গাতা—"

এই কটা লাইন শুনে তার অন্তরের রাধার ওপর মনটা শ্রদ্ধায় ভরে গেছল···চম্‌কেও উঠেছিলুম একটু!

বুড়ী আমাদের তদ্বির কর্‌তে পেয়ে নিজেকে যতটা কৃতার্থ মনে কর্‌ত, মেয়েটা যেন তার বেশী মনে কর্‌তো। মাঝে মাঝে তা প্রকাশ পেত।

মেয়েটাকে যেন ঠিক এ পথের সাধারণ পথিক বলে মনে হোত না। অনেক নিদ্রাহারা রাতে তার গান শুনেচি··· আর গানের স্বর-নৈপুণ্যে, গান নির্ব্বাচনে—গানেরই ভেতর-কার করুণ সুরে সত্যি মনটা ব্যথিত হ'য়ে উঠত।

ভাবতুম ওর ভেতরে একটা রহস্য আছে। কি গোপন কামনা এই নারীর মনকে অহর্নিশ তুষানলের আগুনের মত জ্বালিয়ে রেখেচে—তা জানে কেবল ও, আর ওর মন।

কথাটা কাউকে জিজ্ঞেস কর্‌তে সাহস হয় নি।

জায়গাটা কিন্তু ভালো ঠেকে না। কেন কে জানে।

চার

ব্যাপারটা একদিন বেশ জানা গেল…।

সবাই খেতে বসেচি, আর শরৎচন্দ্রের নতুন উপন্যাসের নায়িকা-চরিত্র আলোচনা কর্‌চি! অভয়ের কথায় রতন কি প্রতিবাদ কর্‌তে যাচ্ছে, এমন সময় শুন্‌লুম…অজিত চেঁচিয়ে উঠল…এ কি, এ সব কি! কাছে বসে ছিল বুড়ী আর চিত্রা! সবাই দেখলুম—অজিতের পাতে খাবার একটু বেশী ভালো রকমের। আগে সেটা লক্ষ্য করি নি!

অজিত লাথি মেরে থালাটা ফেলে দিল—চেঁচাতে লাগল…শেষে বেশ্যার অন্ন খেতে হোল ছিঃ ছিঃ—!

ওর তখনকার চাউনীর সাম্‌নে মনে হোল—দোষী বুঝি ছাই হ'য়ে গেল।

বুড়ী চিত্রাকে গাল দিতে লাগল…মুয়াগুন, পিশাচী, শয়তানী, ডাইনী কোতাকার—নিজের ত' তিনকুল খেয়েচ একন এ কি সব—ভদ্দর নোক বামুনের ছেলে সব…

এ কি তোর পাঁচসিকের পাটের দালাল বাবু পেয়েচিস্‌—এরা সব নেকাপড়া জানা দেবতা।

কি ঘেন্না—! বেশ দেখলুম চিত্রার মুখটা সাদা হ'য়ে গেল মড়ার মুখের মত—হরিণের মত চোখ দুটো সত্যি চিক্‌ চিক্‌ কর্‌ছিল…

লাঞ্ছনা যে মানুষের হাতে মানুষের এ-রকম ভাবে হয় বা হতে পারে সে ধারণা ছিল না—সেদিন হোল!

রাগ ওর ওপর হয়নি—অজিতের ওপর রাগে মনটা বিষিয়ে উঠ্‌ছিলো! সত্যি, ওর তখনকার মুখটা দেখে মনটা ব্যথিত হ'য়েছিল…ওর গোপন অভিলাষটা একবার ছুটে গিয়ে জেনে আসি—এই কথাটা বার বার মনে হোল।

তার পর-দিনই অন্য মেসে চলে এলুম—কিন্তু খরচ একটু বেশী। ওদিকে আর যাবো না এই ইচ্ছে।

অজিতের সঙ্গে কলেজে দেখা হ'তে বল্লে—শুনেচিস, সেই বদ্‌মাইস মাগীটা ফুরিয়ে গেচে। ডাক্তার বলেছিল…হার্টফেল। …অজিত বল্‌ল…বদ্‌মায়েসী। আমি কিছুই বলি নি!

মনে হ'য়েছিল মহাসাগরের নামহীন কূলে সে হতভাগা ডিঙি হয় ত নির্ভয়ে বাসা নিয়েছিল—সেটা হঠাৎ বান্‌চাল হ'য়ে গেছে। মনে হোল ওর গোপন কথা গোপন রইল। জিজ্ঞেস করা হয়নি!

গ্রে ষ্ট্রীট একদিন গিছ্‌লুম—দরজায় চাবী লাগানো!

তার পর কথাটা কত ভেবেচি। দোষ-গুণ বিচার করেচি। নারীর মন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েচি। আজো কিন্তু কথাটা ভুলিনি—হয় ত ভুল্‌বো না—।

দেশ-কাল-সংহতি

(Space—Time—Continuum)

শ্রীশশধর রায় এম-এ, বি-এল্‌

আমরা জগতের যাহা কিছু জানি তাহা ঘটনামূলক। ঘটনার দ্বারাই জগতের পরিচয়। জগতে যাহা ঘটিতেছে তাহা জানা ব্যতীত জগৎকে জানিবার বুঝিবার অন্য কোন উপায় নাই। ঘটনা ঘটে কোথায়? ঘটনা ঘটে কখন? এই প্রশ্নের উত্তরে দেশ ও কাল আসিয়া পড়ে। ঘটনা কোন্‌ স্থানে এবং কোন্‌ সময়ে ঘটে। স্থান এবং সময়ের অপর নাম দেশ এবং কাল। এই দুইটাকে আমরা চিরদিন পৃথক পৃথক সত্ত্বা বলিয়া বোধ করিয়া আসিয়াছি; যেন উহাদিগের পরস্পরের সহিত কোন সংশ্রব নাই। দূরত্বের কথা বলিলে কালের কথা মনে হয় নাই; কালের কথা বলিলেও দূরত্বের কথা মনে আসে নাই। আকাশের দিকে তাকাইলে কেবল দেশই বুঝিয়াছি; ঘড়ীর দিকে তাকাইলে কেবল কালই বুঝিয়াছি। এইরূপে দেশ ও কালকে আমরা পৃথক করিয়া বুঝিয়া আসিতেছি। এতদুভয়ের সংহতি কাহাকে বলে তাহা আমরা কল্পনা করিতেও পারি না। আদি কাল হইতে দেশ ও কালকে পৃথক পৃথক ভাবিতে ভাবিতে দেশ

কালের সংহতি কি, তাহা ভাবিবার ক্ষমতাই মানবের নাই। এই এক কথা।

আর এক কথা আছে। এক ক্রোশ বলিলে সকল অবস্থাতেই এবং সকলের পক্ষেই উহা একটি নির্দ্দিষ্ট দূরত্ব,—ঐ দূরত্ব অবস্থাভেদে এবং ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন হইতে পারে না,—এইরূপই আমরা চিরদিন বুঝিয়া আসিতেছি। বেলা ১০টা বলিলেও সকলেই একটা নির্দ্দিষ্ট কাল বুঝিয়া আসিতেছি।

কিন্তু দেশ ও কালকে একত্র না করিলে ত জগতের কোন ঘটনারই সম্যক জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। অসংখ্য ঘটনার মধ্যে একটীও দেশ এবং কালকে একত্র না করিয়া মানব কোনদিনই বুঝিতে পারে নাই। একটী ঘটনার কথা বিবেচনা করুন। আমি সূর্য্যগ্রহণের কথা বলিব। যদি বলি "অমুক অমুক দেশে সূর্য্যগ্রহণ দেখা গিয়াছিল।" তাহা হইলে আমার শ্রোতা সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে পারিল না। কবে গ্রহণ হইয়াছিল, কোন্ সময়ে হইয়াছিল, ইহা না জানিলে শ্রোতা গ্রহণ বিষয়ে সকল কথা জানিতে পারিল না। সুতরাং ইহা অল্লায়াসেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, জগতের সমস্ত ঘটনাই দেশ ও কালকে, একত্র করিয়া বুঝিতে হয়; নচেৎ ঘটনার সম্যক্ জ্ঞান লাভ হয় না। এ স্থলে আমরা জড় জগতের কথাই বলিতেছি। জড় জগতের ঘটনা সম্বন্ধে দেশ ও কালের পৃথক অস্তিত্ব মানিয়া লইয়া ঘটনা-জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। ঈদৃশ জ্ঞান লাভ করিতে দেশ-কাল-সংহতিকে একটা অখণ্ড অবিভাজ্য সত্বা বলিয়া মানিয়া লইতে হয়।

পণ্ডিতপ্রবর আয়েন্‌ষ্টাইন্, যেদিন প্রথমে তাঁহার উদ্ভাবিত সম্বন্ধবাদ (Theory of relativity) প্রকাশ্য সভায় বুঝাইয়াছিলেন, সেদিন পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ Minkowski বলিয়া উঠিয়াছিলেন যে, "অদ্য হইতে দেশ ও কালের পৃথক অস্তিত্ব ছায়া মাত্রে পরিণত হইল। উহাদিগের সম্মিলনই একটী স্বাধীন সত্বা বলিয়া পরিগণিত হইল। (১) সে সত্বা প্রকৃত, কাল্পনিক নহে; সে সত্বা একটা সত্য পদার্থ।'

কাল হইতেই পৃথকভাবে দেশকেই একটা সত্বা মনে করিতে গেলে জগৎ অনন্ত ও অসীম হইয়া পড়ে। কিন্তু আমাদিগের শ্রুতি স্মৃতিতে জগৎকে ব্রহ্মাণ্ড বলিয়াছে। ইহাকে অণ্ডের সহিত তুলনা করিয়াছে। অণ্ড যত বড়ই হউক অসীম হইতে পারে না। উহার একটা সীমা থাকিবে। উহা সসীম হইবেই। কিন্তু সান্ত হইতে পারে না। অণ্ড সসীম কিন্তু অনন্ত। একটী গোলককে যদি ঝুলাইয়া রাখা যায়, আর একটী পিপীলিকা যদ্যপি গোলকের পরিধির উপর দিয়া বৃত্তাকারে বেড়াইতে আরম্ভ করে, তবে তাহাকে চিরদিন ঘুরিতেই হইবে, তাহার আর থামিবার স্থান হইবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে অণ্ড অনন্ত কিন্তু অসীম নহে (২)।

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলেই দেশ ও কালের সংহতি (continuum) স্বীকার করিতে হয়। উহাদিগের পৃথক সত্বা আর থাকে না।

সে জগৎ (ব্রহ্মাণ্ড) কেমন যাহাতে দেশ ও কালের সংহতি আছে কিন্তু পার্থক্য নাই? উত্তর—সে জগৎ সসীম কিন্তু অনন্ত। সে জগতের ঘটনানিচয় কি নিয়মে নিষ্পন্ন হইতেছে? আমরা ঘটনা মাত্রই বুঝিতে পারি। আমাদিগের জগৎ-জ্ঞান কেবল মাত্র ঘটনা-জ্ঞান,—ঘটনা বাদ দিলে জগতের আর আমরা কিছু জানি না। ঘটনাও গতি মাত্র। তাহা পরে বুঝাইব। কিন্তু ঘটনাই যখন আমাদিগের একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, জগতের ঘটনা সকল কেমন করিয়া হইতেছে!

জগতের ঘটনা সমস্তই শক্তির ক্রিয়া। শক্তিগুলির ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়াছি এবং তাহাদিগের কার্য্য-প্রণালীর ভিন্ন

(১) Space in itself and time in itself sink to mere shadows and only a kind of union of the two retains an independent existence.

Thus the continuum must be thought of as something real and objective. Ency : Brit : 13th. Edit;on vol. 3. p : 328 col : 2.

Also cf. Thirring's the Ideas of Einstein's Theory p. 65.

(২) The results of calculation indicate that if matter be distributed uniformly, the universe should necessarily by spherical (or illiptical). Since in reality the detailed distribution of matter is not uniform, the real universe will deviate in individual parts from the spherical i.e , the universe will be quasi-spherical. But it will be necessarily finite. Einstein The Theory of Relativity, p. 114.

ভিন্ন নিয়ম (laws) আবিষ্কার করিয়াছি। কতিপয় ঘটনা এক শক্তির নিয়মাধীনে নিষ্পন্ন হইতেছে দেখিয়া সে শক্তির নাম দিয়াছি মাধ্যাকর্ষণ। অন্য কতকগুলি ঘটনা অপর এক শক্তির নিয়মাধীনে ঘটিতেছে দেখিয়া তাহার নাম দিয়াছি তড়িৎ। এইরূপে আমরা মাধ্যাকর্ষণ, তড়িৎ শক্তি, চৌম্বক শক্তি, তাপ, আলোক প্রভৃতি বিবিধ শক্তির কল্পনা করিয়া জাগতিক সমস্ত ঘটনা বুঝিয়া লইতেছি। মাধ্যাকর্ষণ ব্যতীত অপর চারিটী শক্তি যে একই শক্তি মাত্র এবং অপর চারিটীর আবিষ্কৃত নিয়মাবলী যে একই পর্য্যায়ভুক্ত অথবা একই সূত্রে গ্রথিত, তাহা কিছুদিন হইল মানব বুঝিতে পারিয়াছে। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণকে এতদিন সে পর্য্যায়ভুক্ত, সে সূত্রে গ্রথিত করা যায় নাই। মাধ্যাকর্ষণের সহিত অপর শক্তিগুলির বিধিনিয়ম (laws) সমঞ্জস হইত না। সম্প্রতি আইনষ্টাইনের সম্বন্ধবাদ (relativity) অবলম্বন করিয়া অধ্যাপক H. Weyl দেখাইয়াছেন যে দেশ-কাল-সংহতিকে এক অখণ্ড সত্ত্বা বলিয়া গণ্য করিলে জড় জগতের সমস্ত শক্তিগুলির আবিষ্কৃত নিয়ম সকলকে এক সূত্রে গাঁথিয়া লওয়া যাইতে পারে; তাহার মধ্যে সমস্ত ঘটনাকেই ফেলা যাইতে পারে। আইনষ্টাইনের আবিষ্কৃত দেশ-কাল-সংহতি কেবল যে তথাকথিত মাধ্যাকর্ষণমূলক ঘটনা সকলই ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হয়, তাহা নহে; তড়িৎ ও চৌম্বকশক্তিমূলক ঘটনা সকলও ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ। সুতরাং ঐ সকল বিবিধ শক্তির কল্পনা করা আবশ্যক হয় না। মাধ্যাকর্ষণ, চুম্বক, অথবা তড়িৎ শক্তির কল্পনা করা নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে। (৩)

বহু ঘটনাকে এক করিয়া বুঝিবার নাম বিজ্ঞান। বহু নিয়মাবলীকে এক বিধানের অন্তর্গত করিয়া বুঝিবার নাম বিজ্ঞান। ব্রহ্মাণ্ডকে এক করিয়া বুঝিতে না পারিলে প্রকৃতপক্ষে বুঝাই হইল না। আইনষ্টাইনের উদ্ভাবিত অথবা কল্পিত "সম্বন্ধবাদ" দেশ-কাল-সংহতিকে স্বীকার করিয়া এতদিনের আবিষ্কৃত অথবা কল্পিত মাধ্যাকর্ষণ তড়িতাদি শক্তির নিয়ম সকলকে অনাবশ্যক দেখাইতেছে; এবং ঐ সংহতি হইতেই সে সমস্ত নিয়ম প্রতিপন্ন করিতেছে। সুতরাং ইহা বিজ্ঞানসম্মত। "সম্বন্ধবাদ" জটিল গণিত শাস্ত্রের বিস্তৃত গণনার উপর এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর স্থাপিত হওয়ায় বৈজ্ঞানিক সমাজে আদর লাভ করিয়াছে।

বলিয়াছি, জাগতিক ঘটনা সকল গতি মাত্র; অন্য কিছুই নহে। মানুষের পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়গ্রাহ্য যত ঘটনাই ঘটুক, সকলের মূলেই কোন না কোন প্রকার গতি আছে। বায়ুর গতিই হউক অথবা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জগদ্ব্যাপক ইথারের (৪) গতিই হউক,—অথবা আইনষ্টাইন যেভাবে বুঝাইতেছেন, সেই ভাবের অবস্থা-মূলক গতিই হউক, জগতের সমস্ত ঘটনাই গতি মাত্র। মূলতঃ গতিই আমাদের জ্ঞানগম্য, অন্য কিছু নহে।

গতি কি? গতির জ্ঞান আমাদিগের কি প্রকারে জাত হয়? ইউক্লিডের জ্যামিতি শাস্ত্রের এবং নিউটনের গতি-বিধান অর্থাৎ গতি বিষয়ক নিয়ম (laws of motion) গুলির সাহায্যে আমরা এতদিন বুঝিয়াছিলাম যে, দেশ ও কালকে পৃথক গণ্য করিয়া গতির জ্ঞান লাভ করিতে হয়। অত্যন্ত দ্রুত গতি ভিন্ন অপর সকল গতির জ্ঞানই আমরা ঐ রূপেই লাভ করি। সূর্য্যের আলোক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দ্রুত-গতি। অন্য কোন প্রকার গতিই ইহার ন্যায় বেগবান নহে। অন্য গতির বেগ যতই আলোকের গতির নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই তন্মূলক ঘটনা সকল, দেশ ও কালকে পৃথক করিয়া বুঝা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এ ক্ষেত্রে দেশ ও কালকে এক করিয়া লইয়া জাগতিক ঘটনার জ্ঞান লাভ করিতে হয়। আলোকের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ হাজার মাইল। ব্রহ্মাণ্ডের কোন বেগই এত অধিক নহে। সৌরজগতের গ্রহগুলির বেগও ইহার তুলনায় নিতান্ত অল্প। যে গতির বেগ, আলোকের বেগের যত নিকট, তন্মূলক ঘটনাগুলির জ্ঞান লাভ করিতে দেশ ও কালকে পৃথক পৃথক বিবেচনা করা ততই অসম্ভব। যে সকল ঘটনা নিতান্ত-অল্প-বেগ-যুক্ত

---

(৩) Prof. H. Weyl has pointed out that the continuum imagined by Einstein and found to be adequate to explain gravitational phenomena is not, in respect of its metrical properties, the most general type of continuum imaginable. A further generalisation is possible, and the new curvatures introduced must of necessity introduce new apperent forces other than gravitational. Weyl's investigation shows that these new forces would have exactly the properties of the electric and magnetic forces with which we are familiar. Ency : Brit : 13th. Ed : vol. 3. page 330, col. 2.

(৪) "সম্বন্ধ-বাদ" অনুসারে ইথার কল্পনাও অনাবশ্যক হইয়া উঠিতেছে।

গতির সহিত সংসৃষ্ট, সে সকল ঘটনার জ্ঞান লাভ করিতে ইউক্লিড্ এবং নিউটনের অনুসরণ করিয়া দেশ ও কালকে পৃথক মনে করা চলে। কিন্তু বস্তু পদার্থের অণু যে সকল ইলেক্‌ট্রণ (electron) দ্বারা গঠিত তাহাদিগের গতি অত্যন্ত দ্রুত। সে গতির ধারণা করাই অসম্ভব। তাদৃশ বেগযুক্ত গতিমূলক জাগতিক ঘটনার জ্ঞান লাভ করিতে হইলে দেশ-কাল-সংহতিকে একটী অখণ্ড সত্ত্বা অঙ্গীকার করিয়া গণনা করিতে হয়। এই সত্ত্বাকে আইনষ্টাইন space-time-continuum বলিয়াছেন।

অল্প-বেগ-যুক্ত গতির সম্বন্ধে নিউটনের গতি-বিষয়ক নিয়ম সকল অবলম্বন করিয়া ঘটনার যে জ্ঞান লাভ হয়, বিশেষতঃ কাল-বিষয়ক যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহার সহিত তুলনায় দেশ-কাল-সংহতি-মূলক জ্ঞানের প্রভেদ এত ক্ষুদ্র যে তাহা ইন্দ্রিয়-গোচর হয় না। কিন্তু অত্যন্ত দ্রুতবেগযুক্ত গতির সম্বন্ধে ঐ প্রভেদ মানব-জ্ঞানের নিকট ধরা পড়ে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ইলেক্‌ট্রণের ন্যায় অত্যন্ত দ্রুত-বেগ-মূলক ঘটনার স্থলে নিউটনের গতিবিধান গ্রহণ করিলে ভ্রম হইবে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত ন্যূন বেগযুক্ত ঘটনার স্থলে নিউটনের গতিবিধান অঙ্গীকার করিলে ভ্রম অতি যৎ-সামান্য হইবে; তাদৃশ ভ্রম উপেক্ষণীয়।

এখন দেখা যাউক যে ইউক্লিডের ক্ষেত্র-বিচার সুতরাং নিউটনের গতি-বিচার কি প্রকার জগতের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। আমরা জগৎ বুঝিতে চাই। যে প্রকার জগৎ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের ক্ষেত্র-বিচার ও গতি-বিচার প্রামাণ্য সে প্রকার জগৎ কিরূপ? ইহার উত্তর আমরা সকলেই জানি। সে প্রকার জগতে দৈর্ঘ্য আছে, প্রস্থ আছে, বেধ আছে। কেবলমাত্র দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বিবেচনা করিয়া যে স্থান অর্থাৎ দেশ বুঝা যায় তাহাকে সমতল বলি। এ ক্ষেত্রে বেধ না থাকা ধরিয়া লইতে হয়। কিন্তু বাস্তব জগতে এরূপ স্থান অর্থাৎ দেশ ত নাই যাহার কেবল দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ আছে কিন্তু বেধ নাই। বাস্তব জগতে সর্ব্বত্রই দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ, তিনই আমরা বিবেচনা করিয়া থাকি। ইউক্লিডের জ্যামিতি শাস্ত্র এবং নিউটনের গতিশাস্ত্র এ তিনকে অবলম্বন করিয়াই গঠিত হইয়াছে। তাঁহারা জগৎকে দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং বেধযুক্ত বিবেচনা করিয়াছেন। ঈদৃশ জগতে দেশ ও কাল পৃথক পৃথক।

দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং বেধকে ত্রিমাপ Three dimensional বলিব। ত্রিমাপ বিশিষ্ট জগৎ আমরা চিরদিন ধারণা করিয়া আসিতেছি, সুতরাং ধারণা করিতে পারি। ত্রিমাপের সহিত আর কোন মাপ মিলিত করিয়া ধারণা করা আমা-দিগের অসাধ্য। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ইত্যাদি মাপ (dimension) মানবের ধারণার বহির্ভূত। আইনষ্টাইনের চিন্তাধারা, শুধু চিন্তাধারা নহে, তাঁহার গভীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুশীলন-প্রণালী আমাদিগকে এই অচিন্তনীয় জগতের কথা বুঝাইতে অগ্রসর হইয়াছে। এ তত্ত্ব অচিন্তনীয় হইলেও আজি তাহা বৈজ্ঞানিক সমাজে আদর লাভ করিয়াছে। তিনি বুঝাইতেছেন যে, আমাদিগের জ্ঞানগম্য ঘটনানিচয় যে জগতে ঘটিতেছে, তাহাকে ত্রিমাপ বিবেচনা না করিয়া চতুর্মাপ (Four dimensional) গণ্য করিতে হয়। তাহা হইলে মাধ্যা-কর্ষণ, তড়িৎ, আলোক প্রভৃতি শক্তি সকলের যে সমস্ত নিয়ম (laws) আবিষ্কার পূর্ব্বক আমরা জাগতিক ঘটনা সমূহ এতদিন বুঝিয়া আসিতেছিলাম, সে সকল নিয়মের কোন প্রয়োজন হয় না। একমাত্র "সম্বন্ধবাদের" (Relativity) বিশেষ ও সাধারণ নিয়ম স্বীকার করিলেই জড়-জগতের সমস্ত ঘটনা একসূত্রে গ্রথিত করিয়া বুঝা যাইতে পারে। "সম্বন্ধ-বাদ" কি, তাহা ক্রমশঃ ব্যক্ত হইবে। ঐ বাদ যাহাই হউক, তাহা স্বীকার করিলে জগৎ ত্রিমাপের অতিরিক্ত হইয়া পড়ে। সে জগতে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ ব্যতীত আরও মাপ মানিয়া লইতে হয়। ঐ তিনটী মাপ (dimension) দেশের পরিচায়ক। সে জগতে উহার সহিত কালকে আর একটী মাপ অর্থাৎ চতুর্থ-মাপ অঙ্গীকার করিতে হয়। শুধু তাহাই নহে; আইনষ্টাইনের সম্বন্ধ-বাদ অবলম্বন করিয়া চারিমাপের অধিকও স্বীকার করিতে হয়। তাহাতে জগৎকে পরিণামে পঞ্চমাপ, ষষ্ঠমাপ……বহুমাপ (n. dimensional) গণ্য করিতে হয়। একমাত্র দেশেই সমস্ত জগৎ স্থিত সুতরাং সমস্ত ঘটনা নিষ্পন্ন হইতেছে, তাহা নহে। জগৎ দেশ-কাল-সংহতি-মূলক বহুমাপ-বিশিষ্ট। ঘটনানিচয়ও দেশ-কাল-সংহতি-মূলক বহুমাপ জগতে ঘটিয়া আসিতেছে।

কিন্তু ঘটনা ত গতি মাত্র। ঘটনা বুঝিতে গেলে গতির আলোচনা করা আবশ্যক।

আত্মারাম

আচার্য্য শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল্

বুড়ার ব্যথা উড়াতে কেউ পরশ-পাথর ছোঁয়ান্ কি ?
হইলে কেন আবার হেন আসে ফিরে জোয়ান্‌কি !
মনের কলের চাবির বলে জীর্ণ শরীর জীবন্ত ;
ফুটিয়ে আবার দিবার বিভা জ্বলে প্রদীপ নিবন্ত।
আবার তবে ছুট্‌ব ভবে রাখ্‌ব না ক' বাধার নাম ;
জেগে ওঠ প্রাণে ফোট ওগো আমার আত্মারাম।

মড়চে-পড়া ছাতা-ধরা আমাকে আজ ঝালিয়ে নি ;
দাগ্ধ-দাগা ঠাণ্ডা-লাগা ধরায় আগুন জ্বালিয়ে দি'।
দুঃখে-ভাঙা চেতন, তাজা প্রাণে দাঁড়াই উর্দ্ধশির।
তৃপ্তি-নাশা দীপ্ত আশায় রইব খাড়া মূর্ত্ত বীর।
ফুল্‌কি ওড়াই,—দাহে পোড়াই জরায় ভরা আঁধার ধাম।
দীপ্তি ভরে প্রাণের ঘরে জাগ তুমি আত্মারাম।

দুঃখ ঝেড়ে, পায়ে তেড়ে মৃত্যু-ভীতির প্রতিমায়
চল্‌ব পথে ; জীবন-ব্রতের উদ্‌যাপনী অসীমায়।
আজকে সাঁঝে অই যে বাজে দৃপ্ত ভেরী ঈশানের।
রক্ত-ফোটা হাতের মুঠায় দণ্ড ধরি নিশানের।
কর্ম্মে-তাজাই বিশ্বে রাজা ; পড়ুক পায়ে মাথার ঘাম ;
জাগিয়ে চিত্ত জাগে নিত্য অন্তরেতে আত্মারাম।

ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

কলিকাতার উপকণ্ঠে—উত্তরাংশে যে হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার এবং তাহার সংসৃষ্ট মেডিক্যাল কলেজের বৈশিষ্ট্য—এই দুইটি প্রতিষ্ঠানই বে-সরকারী এবং ইহাদিগের দ্বারাই প্রতিপন্ন হইয়াছে, মেডিক্যাল কলেজের ও হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন বাঙ্গালী সরকারী সাহায্য না লইয়াও করিতে পারে। ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর এই উভয় প্রতিষ্ঠানের স্রষ্টা এবং তাঁহার কার্য্যেই দেখা গিয়াছে—কাহারও আন্তরিক চেষ্টা নিষ্ফল হয় না।"

হাওড়া জিলার সাঁতরাগাছি গ্রামে রাধাগোবিন্দের পূর্ব্বপুরুষদিগের বাস ছিল। তাঁহার পিতা স্বনামপ্রসিদ্ধ দুর্গাদাস কর মহাশয় জ্ঞাতিদিগের সহিত মনোমালিন্য হেতু পৈত্রিক বাস ত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রতিভামাত্র সম্বল লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আইসেন। তিনি ডাক্তার হইয়া চাকরী গ্রহণ করেন এবং তিনিই প্রথম বাঙ্গালায় মেটিরিয়া মেডিকা রচনা করেন। যাঁহারা তাঁহার 'ভৈষজ্যরত্নাবলীর' প্রথম কয় সংস্করণ দেখিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন—উহা কেবল ইংরাজী 'মেটিরিয়া মেডিকার' অনুবাদ নহে, পরন্তু উহাতে এ দেশে চলিত বহু ঔষধের গুণাদি বিবৃত হওয়ায় উহা সমধিক মূল্যবান হইয়াছিল। উহার ভাষা এমন সরল ও ভাব-প্রকাশক্ষম যে তাহাতে সাহিত্যিক কৃতিত্বের পূর্ণ পরিচয় প্রকট ছিল।

দুর্গাদাসের সাহিত্য-প্রীতির অনেক প্রমাণ বিদ্যমান। তিনি যখন কার্য্যব্যপদেশে ঢাকায় ছিলেন, তখন দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং সেই পরিচয় অল্প দিনের মধ্যেই ঘনিষ্ঠতায় পরিণতি লাভ করে। দীনবন্ধুর কয়খানি নাটক রচনায় সময় যে বৈঠকে সেগুলির আলোচনা হয়, সে বৈঠকে দুর্গাদাসও থাকিতেন। কেহ কেহ বলেন—দীনবন্ধুর নাটকে "এলোচুলে বেণে বউ আল্‌তা দিয়ে পায়"

কবিতাটি দুর্গাদাসের রচনা। এই কথার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের এখন আর কোন উপায় নাই।

দুর্গাদাস স্বয়ং 'স্বর্ণশৃঙ্খল' নামক একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

দুর্গাদাস অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়েন এবং সেই অবস্থায় 'ভৈষজ্যরত্নাবলী' রচনা করেন। সাহিত্য সেবার আর কোন পরিচয় তিনি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

দুর্গাদাসের এই সাহিত্য-প্রীতি তাঁহার পুত্রগণ উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাগোবিন্দ বহু চিকিৎসা-গ্রন্থের গ্রন্থকার। তাঁহার মধ্যমপুত্র—রাধামাধব নাট্যশালায় অসাধারণ অভিনয়-নৈপুণ্য দেখাইয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। বিশেষ তাঁহার 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' বসন্তরায়ের অভিনয় অনমুকরণীয় ছিল। কিন্তু অনেকেই জানেন না, তিনি সেক্সপীয়রের 'রোমিও এণ্ড জুলিয়েট' নাটকের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কবি হেমচন্দ্র 'রোমিও এণ্ড জুলিয়েট' অনুবাদ করিবার বহুকাল পূর্ব্বে তিনি ইহা করিয়াছিলেন। তৃতীয় পুত্র—রাধারমণ কর পাটের ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি মিসেস উডের প্রসিদ্ধ 'ইষ্টলীন' উপন্যাস অবলম্বন করিয়া 'সরোজা' নাটক রচনা করেন। তাহা রঙ্গালয়ে অভিনীতও হইয়াছিল। চতুর্থ পুত্র রাধাকিশোর কবিতায় স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয়ক পুস্তক 'শরীর পালন বিধি' রচনা করেন। রাধামাধবের যৌবনে তাঁহার পৈত্রিক গৃহে (১০৭, শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে,) একটি বিরাট বৈঠকখানা ছিল। তাহাতে একদিকে দুর্গাদাসের মাতুল—কলিকাতা কর্পোরেশনের ভাইস চেয়ারম্যান গোপাললাল মিত্র থাকিতেন—আর এক দিকে থাকিতেন রাধাগোবিন্দ, রাধামাধব প্রভৃতি যুবকগণ। বঙ্গীয় নাট্যশালার সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু তাঁহার কোন কবিতায় এই বৈঠকখানার স্মৃতিরক্ষা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন

"———বসি কর-দ্বয়ে

লিখেছি হীরক-চুর্ণ প্রফুল্ল অন্তরে।"

রাধাগোবিন্দ চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য বিলাত গমন করেন এবং ফিরিয়া আসিয়া অল্পদিনের মধ্যেই সুচিকিৎসক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

এদেশে চিকিৎসকের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক ইহা রাধাগোবিন্দ অনুভব করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝেন, এই দরিদ্র দেশে চিকিৎসাবিদ্যা ব্যয়সাপেক্ষ করিলে সহজে চিকিৎসকের অভাব দূর হইবে না। এ দেশে—বাঙ্গালীরা কেন বিদেশী ভাষার সাহায্যে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিবে তাহা বুঝা যায় না। গভর্ণমেণ্ট প্রথমে ইহা বুঝিতেন বলিয়াই মনে হয়। সেই জন্যই যখন কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহার একটি দেশীয় বিভাগ ছিল। তাহা "ভার্ণাকুলার ডিপার্টমেণ্ট" নামে পরিচিত ছিল। পরে তাহা স্বতন্ত্র করিয়া "ক্যাম্পবেল স্কুলে" পরিণত করা হয়। কলিকাতা অবধি আর বড় জাহাজ আসিতে পারিবে না বলিয়া যখন মাতলায় সহর রচনার জন্য চেষ্টা হয়, তখনই মাতলার (পোর্টক্যানিং) লোক বাজার করিতে আসিবে বলিয়া কলিকাতায় যে বাজার বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল, সরকার তাহা ক্রয় করিয়া তাহাতে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন। ঢাকায় টেম্পল স্কুলেও বাঙ্গালায় পঠনপাঠন হইত। সেই ব্যবস্থা যে দেশোপযোগী ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য এবং তাহাতেই বাঙ্গালায় চিকিৎসা-সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। দুর্গাদাস, লালমাধব, জহিরুদ্দীন আমেদ প্রভৃতি বাঙ্গলা ভাষায় চিকিৎসা পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। বহুদিন পরে মহীশূরের দেওয়ান বাহাদুর জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় চিকিৎসাবিদ্যা সুলভ করিয়া দরবারের অধিকারে চিকিৎসকের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য এইরূপ চিকিৎসাবিদ্যাশিক্ষাদানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সরকারের চেষ্টায় দেশে চিকিৎসকের অভাব সহজে পূর্ণ হইতে পারে না বুঝিয়া যুবক রাধাগোবিন্দ বাঙ্গালা ভাষায় বিবিধ চিকিৎসাগ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন এবং একটি ডাক্তারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন।

তখন তাঁহার পক্ষে এই স্কুল প্রতিষ্ঠা অসমসাহসিকের কার্য্য বলা যাইতে পারে। তখনও তাঁহাকে চিকিৎসক হিসাবে পশার জমাইতে হইতেছে। তাহার উপর নূতন অনুষ্ঠানের জন্য অসাধারণ শ্রম অনিবার্য্য। তিনি অদম্য উৎসাহে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। এই কার্য্যে তিনি কোনরূপ লাভের আশা করেন নাই; কেবল লোকের হিতার্থ স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন।

দেখিতে দেখিতে তাঁহার চেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত হইতে লাগিল। ক্ষুদ্র কক্ষে আর স্থান সঙ্কুলান হয় না দেখিয়া

তিনি বন্ধুজনের সহিত পরামর্শ করিয়া আপার সাকু লার রোডের পার্শ্বে স্কুল স্থানান্তরিত করিলেন। সঙ্গে চিকিৎসশালা ও হাসপাতাল না থাকিলে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। তাই রাধাগোবিন্দ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় তিনি ডাক্তার ভোলানাথ বসুকে সহকর্ম্মী রূপে লাভ করেন। তিনি স্বয়ং কখন যশের কাঙ্গাল ছিলেন না, তাই স্বয়ং প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হইয়া কাজ করিতে লাগিলেন—সভাপতির সম্মান স্বেচ্ছায় অন্যকে প্রদান করিলেন। এই সময় তিনি আত্মীয়স্বজনের গৃহ হইতে ছিন্নবস্ত্র পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া হাসপাতালের অভাব মোচন করিতেন এবং সময় সময় নিশীথে শয্যা ত্যাগ করিয়া হাসপাতালে যাইয়া রোগীদিগের শুশ্রূষার কোনরূপ ত্রুটি হইতেছে কি না, দেখিয়া আসিতেন। নিঃসন্তান রাধাগোবিন্দের অপত্যস্নেহ এই প্রতিষ্ঠানই পাইয়াছিল।

অল্পায়ু রাজপুত্র এলবার্ট ভিক্টর যখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল. তাহা সর্ব্বাংশে ব্যয়িত হয় নাই। তাহার কারণ, টাউন হলে সাধারণ সভায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নাচ-তামাসায় অর্থব্যয়ের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বহু চেষ্টায় রাধাগোবিন্দ সেই টাকা স্কুলের হাসপাতালের জন্য প্রাপ্ত হয়েন এবং হাসপাতালের নাম—এলবার্ট ভিক্টর হাসপাতাল হয়। এই সময় বাঙ্গালার ছোটলাট সার জন এডবার্ণ একদিন প্রাতে অশ্বারোহণে বেলগাছিয়ায় স্কুল পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। স্কুলে ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের সহিত পরিচিত হইয়া তিনি বলেন, "আমি শ্যামবাজার হইতেই আপনার নামের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছি। আমি শ্যামবাজারের মোড় হইতে এই স্কুলের পথ জিজ্ঞাসা করায় কেহই বলিতে পারে নাই, সকলেই বলিয়াছে 'ঐদিকে কর সাহেবের স্কুল আছে।"

এখনও লোক বেলগেছিয়ার কার্ম্মাইকেল মেডিক্যাল কলেজকে "কর সাহেবের স্কুল" ও এলবার্ট ভিক্টর হাসপাতালকে "কর সাহেবের হাসপাতাল" বলে। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, দেশের সাধারণ লোক উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে—সে গুণে তাহারা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আদর্শস্থানীয়।

কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে সাহায্য প্রাপ্তিতে বিঘ্ন ঘটে। কারণ, বেলগেছিয়া তখনও কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর অধিকারভুক্ত হয় নাই। রাধাগোবিন্দের পিতৃব্যপুত্রীর পুত্র ও বন্ধু ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের চেষ্টায় সে বাধা দূর হয়। তিনি তৎকালীন গভর্ণর লর্ড কার্ম্মাইকেলকে অনুরোধ করায় তিনি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানকে বলিয়া হাসপাতালে কর্পোরেশন হইতে সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া দেন। সেই জন্য কলেজটি কার্ম্মাইকেল মেডিক্যাল কলেজ নামে অভিহিত করা হয়।

ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর এই প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি তাঁহার সর্ব্বস্ব এই প্রতিষ্ঠানে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পত্নীর মৃত্যুর পর তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি এই প্রতিষ্ঠানের হইবে। তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহাতে হাসপাতালের একটি অংশ তাঁহার নামে উৎসর্গ করিলেও তাঁহার নিকট হাসপাতালের ও কলেজের এবং বাঙ্গালীর ঋণ উপযুক্তরূপে স্বীকার করা হইত কি না সন্দেহ। যে দিন কলেজে তাঁহার আবক্ষ মর্ম্মরমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচিত হয়, সে দিন নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের নিকট বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতার ঋণের কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

কলিকাতা কর্পোরেশন এ কলেজের সম্মুখগামী রাস্তাটির নাম "ডাক্তার আর, জি, কর রোড" করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

তিনি যে সাধনা করিয়াছিলেন সেই সাধনার সিদ্ধি কার্ম্মাইকেল মেডিক্যাল কলেজে ও হাসপাতালে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিদ্যমান। তাহা বাঙ্গালীকে গৌরবান্বিত করিয়াছে।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

সপ্ততিতম জন্ম-মহোৎসব

বিগত ১লা ডিসেম্বর শনিবার ভারতের বিজ্ঞান-ঋষি আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের সপ্ততিতম জন্ম-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বসু বিজ্ঞান-মন্দির সংলগ্ন উদ্যানটি ভারতীয় প্রথায় পত্র-পুষ্প-দীপাবলী সজ্জিত করা হইয়াছিল। তোরণ-দ্বারে পূর্ণ কুম্ভ ও কদলী বৃক্ষ রক্ষিত হইয়াছিল। মাঙ্গলিক আলিপনায় ও ধূপ ধূনার পবিত্র গন্ধে সমগ্র উৎসব-ক্ষেত্র সেই অপরাহ্ণে আচার্য্য-ঋষিগণের তপোবনের পবিত্র স্মৃতি সমাগত ভক্তগণের নয়ন-সম্মুখে উদ্ভাসিত করিয়াছিল। এই উৎসব উপলক্ষে ভারতের ও ভারতের বাহিরের মনীষীগণ আচার্য্যদেবের দীর্ঘজীবন কামনা ও তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া যে সমস্ত বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন, উৎসব-ক্ষেত্রে তাহা পঠিত হয় এবং উপস্থিত স্বদেশীয় ও বৈদেশিক বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আচার্য্যদেবকে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিবার পর, আচার্য্যদেব একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন; তাহার পর একটী সঙ্গীত গীত হইয়া উৎসবের কার্য্য শেষ হয়। আমরা নিম্নে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাঞ্জলি ও আচার্য্যদেবের বক্তৃতার মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের

শ্রদ্ধাঞ্জলি

যেদিন ধরণী ছিল ব্যথাহীন বাণীহীন মরু
প্রাণের আনন্দ নিয়ে, শঙ্কা নিয়ে, দুঃখ নিয়ে, তরু
দেখা দিল দারুণ নির্জ্জনে! কত যুগ যুগান্তরে
কাণ পেতে ছিল স্তব্ধ মানুষের পদশব্দ তরে
নিবিড় গহন তলে। যবে এল মানব অতিথি,
দিল তারে ফুলফল, বিস্তারিয়া দিল ছায়াবীথি॥

প্রাণের আদিম ভাষা গূঢ় ছিল তাহার অন্তরে,
সম্পূর্ণ হয়নি ব্যক্ত আন্দোলনে, ইঙ্গিতে, মর্ম্মরে।
তার দিন রজনীর জীবযাত্রা বিশ্বধরাতলে
চলেছিল নানা পথে, শব্দহীন নিত্য কোলাহলে
সীমাহীন ভবিষ্যতে; আলোকের আঘাতে তনুতে
প্রতিদিন উঠিয়াছে চঞ্চলিত অণুতে অণুতে
স্পন্দবেগে নিঃশব্দ ঝঙ্কার-গীতি, নীরব স্তবনে
সূর্য্যের বন্দনা গান গাহিয়াছে প্রভাত পবনে॥

প্রাণের প্রথম বাণী এই মতো জাগে চারিভিতে
তৃণে তৃণে বনে বনে, তবু তাহা রয়েছে নিভৃতে,
কাছে থেকে শুনি নাই।

হে তপস্বী, তুমি একমনা,
নিঃশব্দেরে বাক্য দিলে; অরণ্যের অন্তর বেদনা
শুনেছ একান্তে বসি; মূক জীবনের যে ক্রন্দন
ধরণীর মাতৃবক্ষে নিরন্তর জাগাল স্পন্দন
অঙ্কুরে অঙ্কুরে উঠি, প্রসারিয়া শত ব্যগ্র শাখা,
পত্রে পত্রে চঞ্চলিয়া, শিকড়ে শিকড়ে আঁকাবাঁকা
জনম-মরণ-দ্বন্দ্বে, তাহার রহস্য তব কাছে
বিচিত্র অক্ষররূপে সহসা প্রকাশ লভিয়াছে॥

প্রাণের আগ্রহবার্ত্তা নির্ব্বাকের অন্তঃপুর হতে,
অন্ধকার পার করি' আনি দিলে দৃষ্টির আলোতে,
তোমার প্রতিভা-দীপ্ত চিত্ত মাঝে কহে আজি কথা
তরুর মর্ম্মের সাথে মানব মর্ম্মের আত্মীয়তা
প্রাচীন আদিমতম সম্বন্ধের দেয় পরিচয়।

হে সাধকশ্রেষ্ঠ, তব দুঃসাধ্য সাধন লভে জয়;
সতর্ক দেবতা যেথা গুপ্তবাণী রেখেছেন ঢাকি'
সেথা তুমি দীপ হস্তে অন্ধকারে পশিলে একাকী,
জাগ্রত করিলে তারে। দেবতা আপন পরাভবে
যেদিন প্রসন্ন হন, সেদিন উদার জয় রবে

আচার্য্য শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

ধ্বনিত অমরাবতী আনন্দে রচিয়া দেয় বেদী—
বীর বিজয়ীর তরে, যশের পতাকা অভ্রভেদী
মর্ত্ত্যের চূড়ায় উড়ে।

মনে আছে একদা যেদিন
আসন প্রচ্ছন্ন তব, অশ্রদ্ধার অন্ধকারে লীন,
ঈর্ষা-কণ্টকিত পথে চলেছিলে ব্যথিত চরণে,
ক্ষুদ্র শত্রুতার সাথে প্রতিক্ষণে অকারণ রণে
হয়েছ পীড়িত শ্রান্ত। সে দুঃখই তোমার পাথেয়,
সে অগ্নি জ্বেলেছে যাত্রাদীপ, অবজ্ঞা দিয়েছে শ্রেয়,
পেয়েছে সম্বল তব আপনার গভীর অন্তরে।

তোমার খ্যাতির শঙ্খ আজি বাজে দিকে দিগন্তরে
সমুদ্রের একূলে ওকূলে; আপন দীপ্তিতে আজি
বন্ধু, তুমি দীপ্যমান; উচ্ছ্বসিয়া উঠিয়াছে বাজি
বিপুল কীর্ত্তির মন্ত্র তোমার আপন কর্ম্ম মাঝে।

জ্যোতিষ্ক সভার তলে যেথা তব আসন বিরাজে
সহস্র প্রদীপ জ্বলে সেথা আজি দীপালি উৎসবে।
আমারো একটি দীপ তারি সাথে মিলাইনু যবে
চেয়ে দেখো তার পানে, এ দীপ বন্ধুর হাতে জ্বালা;
তোমার তপস্যা-ক্ষেত্র ছিল যবে নিভৃত নিরালা
বাধায় বেষ্টিত রুদ্ধ সেদিন সংশয়-সন্ধ্যাকালে
কবি হাতে বরমাল্য যে বন্ধু পরায়েছিল ভালে;
অপেক্ষা করেনি সে তো জনতার সমর্থন তরে।
দুর্দ্দিনে জ্বেলেছে দীপ রিক্ত তব অর্ঘ্যথালি পরে।

আজি সহস্রের সাথে ঘোষিল সে, ধন্য ধন্য তুমি,
ধন্য তব বন্ধুজন, ধন্য তব পুণ্য জন্মভূমি॥

আচার্য্যদেবের অভিভাষণ

ভারতে এবং ভারতের বহিরের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বন্ধুগণ আমার প্রতি যে যে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন, তদুত্তরে যথোচিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আমার পক্ষে কঠিন। আমি গবেষণাগারে যে তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত ছিলাম, আমার জীবনে সে তথ্য-রহস্য উদ্‌ঘাটন সম্ভবপর হইবে না, এরূপই আমার আশঙ্কা হইয়াছিল; কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। আমাদের জাতির ভাগ্যনিয়ন্ত্রণকারী নিয়তিকে প্রণাম করি।

জ্ঞানের সীমা বিস্তার দ্বারা জগতের বিদ্বৎসমাজে ভারতের জন্য যোগ্য আসন সংগ্রহ করিবার জন্য আমি গত ৪০ বৎসর যাবত সাধনায় নিযুক্ত আছি। জগত আজ শিক্ষাসভ্যতা ধ্বংসের জন্য সংগ্রামরত, নিখিলবিশ্বের মঙ্গলের জন্য শিক্ষা-সভ্যতার দিক দিয়া সাহায্য সহানুভূতি দ্বারা জগতকে এই ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করা যায়। ইহাই প্রাচ্যের বাণী; চীন হইতে আমি সম্প্রতি এই বাণীরই প্রতিধ্বনি শুনিয়াছি—মানবসভ্যতাকে ধ্বংসের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইলে বিশ্বমানবের আশা-আকাজ্ঞার মধ্যে ঐক্য বিধান করা দরকার। এই সংগ্রামক্ষেত্রে আমি একক ছিলাম না, আমাদের ভবিষ্যৎ যখন অন্ধকার ছিল—আমার চিরন্তন বন্ধু কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ আমার সঙ্গে ছিলেন। সেই আশঙ্কাপূর্ণ কালেও তাঁহার বিশ্বাস কিছুমাত্র স্খলিত হয় নাই।

আমার বহু প্রাচীন ছাত্রকে আমি জীবনের নানাক্ষেত্রে দায়িত্ব ও সম্মানের উচ্চাসনে আসীন দেখিতেছি, ইহাদের সাফল্য আমার গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে। আমার ছাত্রদের মধ্যে যাঁহারা যশঃ ও খ্যাতি অর্জ্জনে সক্ষম হইয়াছেন, আমি শুধু তাঁহাদের কথা বলিতেছি না, যাঁহারা নিঃস্বার্থ পবিত্র জীবনযাপন করিয়া দুঃখীর মনে আনন্দ উল্লাসের সঞ্চার করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা মনে করিয়াও আমি গর্ব্বানুভব করিতেছি।

আমি বহু বৎসরকাল যে সাহিত্য-পরিষদের সভাপতিত্ব করিয়াছি, ঐ পরিষদের পক্ষ হইতে আমাকে অভিনন্দিত করিতে দেখিয়া আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে অভিনন্দিত হওয়ায় আমি অতিমাত্র সন্তোষলাভ করিয়াছি. আমি ৬০ বৎসর কাল ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলাম। আমাদের বিশ্ব বিদ্যালয়কে জগতের চক্ষে সম্মানের পাত্র করিয়া তুলিবার জন্য আমি কিছুমাত্র সাহায্য করিতে পারিলে নিজকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিব। আমার বিজ্ঞানমন্দিরে গবেষণার জন্য ইউরোপের বিজ্ঞানজগতের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে আগমন করিতে দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। আমার বিজ্ঞানমন্দির যদি পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রগণকে কোন সাহায্য করিতে পারে, তাহা হইলে সে সাহায্য দানে আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত। অতীতের সহিত আমরা যুক্ত—বৃহত্তর ভারত পরিষদ তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছে।

শেষ প্রশ্ন

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১৬)

মোটরে বসিয়া কমল আকাশের দিকে চাহিয়া অন্যমনস্ক হইয়াছিল, গাড়ী থামিতে ইতস্তত: দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ কোথায় এলেন অজিতবাবু, আমার বাসার পথ তো এ নয়?

অজিত উত্তর দিল, না, এ পথ নয়।

নয়? তা'হলে ফিরতে হবে বোধ করি?

সে আপনি জানেন। আমাকে হুকুম করলেই ফিরবো।

শুনিয়া কমল আশ্চর্য্য হইল। এই অদ্ভুত উত্তরের জন্য যতটা না হোক্ তাহার কণ্ঠস্বরের অস্বাভাবিকতা তাহাকে বিচলিত করিল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সে আপনাকে সম্বরণ করিয়া হাসিয়া কহিল, পথ ভোলবার অনুরোধ তো আমি করিনি অজিতবাবু, যে সংশোধনের হুকুম আমাকেই দিতে হবে। ঠিক যায়গায় পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আপনার,—আমার কর্ত্তব্য শুধু আপনাকে বিশ্বাস ক'রে থাকা।

কিন্তু দায়িত্ববোধের ধারণায় যদি ভুল ক'রে থাকি কমল?

যদির ওপর ত বিচার চলেনা অজিতবাবু। ভুলের সম্বন্ধে আগে নিঃসংশয় হই, তারপরে এর বিচার কোরব।

অজিত অস্ফুট স্বরে বলিল, তা'হলে বিচারই করুন,—আমি অপেক্ষা করে রইলাম। এই বলিয়া সে মুহূর্ত্ত কয়েক স্তব্ধ থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, কমল, আর একদিনের কথা মনে আছে তোমার, সেদিন ত ঠিক এম্‌নি অন্ধকারই ছিল,—না?

হাঁ, এম্‌নি অন্ধকারই ছিল। এই বলিয়া সে গাড়ীর দরজা খুলিয়া নামিয়া আসিয়া সম্মুখের আসনে অজিতের পাশে আসিয়া বসিল। জন-প্রাণী হীন অন্ধকার রাত্রি একান্ত নীরব। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই কথা কহিলনা।

অজিতবাবু?

হুঁ।

কি ভাবচেন?

অজিতের বুকের মধ্যে ঝড় বহিতেছিল, জবাব দিতে গিয়া কথা তাহার মুখে বাধিয়া রহিল।

কমল পুনরায় প্রশ্ন করিল, কি ভাবচেন বলুননা শুনি।

অজিতের গলা কাঁপিতে লাগিল, বাক্য স্পষ্ট হইলনা, কহিল, কি ভাবচি তুমি বুঝতে পারোনি?

কমল বলিল, মেয়ে মানুষ হয়ে এর পরেও বুঝতে পারবোনা আমি কি এতই বোকা? পথ যখনি ভুলেচেন আমি তখনি বুঝেচি।

অজিত ধীরে ধীরে তাহার কাঁধের উপর বাঁ হাতখানি রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে বলিল, কমল, মনে হচ্চে আজ বুঝি আর নিজেকে আমি সাম্‌লাতে পারবোনা।

কমল সরিয়া বসিলনা, তাহার আচরণে বিস্ময় বা বিহ্বলতার লেশ মাত্র নাই। সহজ শান্ত কণ্ঠে কহিল, এতে আশ্চর্য্যের কিছুই নেই, অজিতবাবু, এম্‌নিই হয়। কিন্তু আপনি তো শুধু কেবল পুরুষ মানুষই নয়, ন্যায়নিষ্ঠ ভদ্র পুরুষ মানুষ। এরপরে ঘাড় থেকে আমাকে নামাবেন কি কোরে? ততখানি ছোট কাজ তো আপনি পেরে উঠবেননা অজিতবাবু।

অজিত বিগলিত কণ্ঠে কহিল, পারতেই হবে এ আশঙ্কা তুমি কেন কোরচ কমল?

কমল হাসিল, কহিল, আশঙ্কা আমার নিজের জন্যে করিনে অজিতবাবু, করি শুধু আপনার জন্যে। পারলে ভয় ছিলনা, পারবেননা বলেই ভাবনা। শুধু একটা রাত্রির ভুলের বদলে এতবড় শাস্তি আপনার মাথায় চাপাতে আমারি মায়া হয়। আর না, চলুন ফিরে যাই।

কথাগুলা অজিতের কানে গেল, কিন্তু অন্তরে

পৌঁছিলনা। চক্ষের পলকে তাহার শিরার রক্ত পাগল হইয়া গেল,—বক্ষের সন্নিকটে তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া লইয়া মত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমাকে বিশ্বাস করতে কি তুমি পারোনা কমল?

মুহূর্ত্তের তরে কমলের নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল, কহিল, পারি।

তবে কিসের জন্যে ফিরতে চাও, কমল, চল আমরা চলে যাই।

চলুন।

গাড়ী চালাইতে গিয়া অজিত হঠাৎ থামিয়া কহিল, বাসা থেকে সঙ্গে নেবার কি তোমার কিছুই নেই?

না। কিন্তু আপনার?

অজিতকে ভাবিতে হইল। পকেটে হাত দিয়া কহিল, টাকাকড়ি কিছুই সঙ্গে নেই,—তার তো দরকার।

কমল কহিল, গাড়ীখানা বেচে ফেল্‌লেই অনায়াসে টাকা পাওয়া যাবে।

অজিত বিস্মিত হইয়া বলিল, গাড়ী বেচ্‌বো? কিন্তু এ তো আমার নয়,—আশুবাবুর।

কমল কহিল, তাতে কি? আশুবাবু লজ্জায় ঘৃণায় গাড়ীর নাম কখনো মুখেও আন্‌বেননা। কোন চিন্তা নেই, চলুন।

শুনিয়া অজিত স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার বাঁ হাতখানা তখনও কমলের কাঁধের উপর ছিল, স্খলিত হইয়া নীচে পড়িল। বহুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া বলিল, তুমি কি আমাকে উপহাস কোরচ কমল?

না, সত্যিই বল্‌চি।

সত্যিই বোল্‌চ, এবং সত্যিই ভাবচো পরের জিনিস আমি চুরি করতে পারি? এ কাজ তুমি নিজে পারো?

কমল বলিল, আমার পারা-না-পারার ওপর যদি নির্ভর করতেন অজিতবাবু, তখন এর জবাব দিতাম। পরের জিনিস আত্মসাৎ করবার সাহস আপনার নেই। চলুন, গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে আমাকে বাসায় পৌঁছে দেবেন।

ফিরিবার পথে অজিত ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, পরের জিনিস আত্মসাৎ করার সাহসটা কি খুব বড় জিনিস বলে তোমার ধারণা?

কমল কহিল, বড়-ছোটর কথা বলিনি। এ সাহস আপনার নেই তাই শুধু বলেচি।

না নেই, এবং সেজন্যে লজ্জা বোধ করিনে। এই বলিয়া অজিত একটু থামিয়া কহিল, বরঞ্চ থাক্‌লেই লজ্জা বোধ কোরতাম। আর আমার বিশ্বাস সমস্ত ভদ্রব্যক্তিই এ কথায় সায় দেবেন।

কমল কহিল, সায় দেওয়া সহজ। তাতে বাহবা পাওয়া যায়।

শুধুই বাহবা? তার বেশি নয়? শিক্ষিত ভদ্র মন ব'লে কি কখনো কিছু দেখোনি?

যদি দেখেও থাকি, সে আলোচনা আর একদিন কোরব যদি সময় আসে। আজ নয়। এই বলিয়া সে এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া বলিল, আপনার তর্কের উত্তরে আর কেউ হলে বিদ্রূপ ক'রে বোল্‌ত যে কমলকে আত্মসাৎ করবার চেষ্টায় তো ভদ্র মনের সঙ্কোচে বাধেনি? আমি কিন্তু তা' বল্‌তে পারবোনা, কারণ, কমল কারও সম্পত্তি নয়। সে কেবল তার নিজেরই আর কারও নয়।

কোনদিন বোধ করি হতেও পারোনা?

এ তো ভবিষ্যতের কথা অজিতবাবু,—আজ কি কোরে এর জবাব দেবো?

জবাব বোধহয় কোনদিনই দিতে পারবেনা। মনে হয়, এই জন্যেই শিবনাথের এতবড় নির্ম্মমতাও তোমাকে বাজেনি। অত্যন্ত সহজেই সে তুমি ঝেড়ে ফেলে দিয়েচো। এই বলিয়া সে নিশ্বাস ফেলিল।

মোটরের আলোকে দেখা গেল কয়েকখানা গরুর গাড়ী। পাশেই বোধহয় গ্রাম, কৃষকেরা যেমন তেমন ভাবে গাড়ীগুলা রাস্তায় ফেলিয়া গরু লইয়া ঘরে গিয়াছে। অজিত সাবধানে এই স্থানটা পার হইয়া কহিল, কমল, তোমাকে বোঝা শক্ত।

কমল হাসিল, কহিল, শক্ত কিসে? ঠিক তো বুঝেছিলেন পথ ভুল্‌লেই আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

হয়ত, সে বোঝা আমার ভুল।

কমল পুনশ্চ হাসিয়া কহিল, পথ ভোলা ভুল, আমাকে ভোলাবার চেষ্টা ভুল, আবার নিজেরও ভুল? এত ভুলের বোঝা আপনার সংশোধন হবে কবে? অজিতবাবু, নিজেকে একটুখানি শ্রদ্ধা করতে শিখুন। অমন কোরে আপনার কাছে আপনাকে খাটো করবেননা।

কিন্তু নিজের ভুল অস্বীকার করলেই কি নিজেকে শ্রদ্ধা করা হয় কমল ?

না, তা' হয়না। কিন্তু অস্বীকার করারও রীতি আছে। সংসার তো কেবল আপনাকে নিয়েই নয়,—তা'হলে তো সব গোলই চুকে যেতো। এখানে আরো দশজনের বাস, তাদেরও ইচ্ছে-অনিচ্ছে, তাদেরও কাজের ধারা গায়ে এসে লাগে। তাই, শেষ ফলাফল যদি নিজের মনোমত নাও হয়, তাকে ভুল ব'লে ধিক্কার দিতে থাকলে আপনাকেই অপমান করা হয়। নিজের প্রতি এর চেয়ে বড় অশ্রদ্ধা প্রকাশ আর কি আছে অজিতবাবু ?

অজিত ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু যেখানে সত্যকার ভুল হয় ? শিবনাথের সম্পর্কেও কি তোমার আত্মানুশোচনা হয়নি কমল ? এই কি আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে বল ?

কমল এ প্রশ্নের বোধহয় ঠিক মত উত্তর দিলনা, কহিল, বিশ্বাস করা না-করার গরজ আপনার। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কারো কাছে কোনদিন ত আমি নালিশ জানাইনি।

নালিশ জানাবার লোক তুমি নও। কিন্তু ভুলের জন্যে নিজের কাছেও কি কখনো নিজেকে ধিক্কার দাওনি ?

না।

তা'হলে এইটুকু মাত্র বল্‌তে পারি তুমি অদ্ভুত, তুমি অসাধারণ স্ত্রীলোক।

এ মন্তব্যের কোন জবাব কমল দিলনা, নীরব হইয়া রহিল।

মিনিট দশেক নিঃশব্দে কাটিবার পরে অজিত সহসা প্রশ্ন করিয়া বসিল, কমল, এম্‌নি ভুল যদি আবার কালও ক'রে বসি, তখনো কি তোমার দেখা পাবো ?

কিন্তু যদির উত্তর তো যদি দিয়েই হয় অজিতবাবু। নিশ্চিত প্রস্তাবের নিশ্চিত মীমাংসা আশা করতে নেই।

অর্থাৎ, এ মোহ আমার কাল পর্য্যন্ত টিক্‌বেনা এই তোমার বিশ্বাস ?

অন্ততঃ, অসম্ভব নয় এই আমার মনে হয়।

অজিত মনে মনে আহত হইয়া বলিল, আমি আর যাই হই, কমল, শিবনাথ নই।

কমল উত্তর করিল, সে আমি জানি অজিতবাবু। আর হয়ত আপনার চেয়েও বেশি ক'রে জানি।

অজিত কহিল, জান্‌লে কখনো এ বিশ্বাস করতেনা যে আজ তোমাকে আমি মিথ্যে দিয়ে ভোলাতে চেয়েছিলাম। এর মধ্যে সত্য কিছুই ছিলনা।

কমল কহিল, মিথ্যের কথা তো হয়নি অজিতবাবু, মোহের কথাই হয়েছিল। ও দুটো এক বস্তু নয়। আজ মোহের বশে যদি কাউকে ভোলাতে চেয়ে থাকেন ত নিজেকেই চেয়েছেন। আমাকে বঞ্চনা করতে চান্‌নি তা' নিঃসংশয়ে জানি।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বঞ্চিত তো তুমিই হ'তে কমল। রাত্রের মোহ আমার দিনের আলোতে কেটে যাবে এ কথা নিশ্চয় বুঝেও তো সঙ্গে যেতে অসম্মত হওনি ? এ কি শুধুই উপহাস ?

কমল একটুখানি হাসিল, যাচাই ক'রে দেখ্‌লেননা কেন ? পথ খোলা ছিল, একবারও ত নিষেধ করিনি।

অজিত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যদি না কোরে থাকো তবে এই কথাই বোল্‌ব যে তোমাকে বোঝা বাস্তবিকই কঠিন। একটা কথা তোমাকে বলি কমল। নারীর ভাল-বাসায় যেমন বুদ্ধিকে অভিভূত করে, তার রূপের মোহও বুদ্ধিকে তেম্‌নি আচ্ছন্ন করে। করুক্, কিন্তু একটা যতবড় সত্য, আর একটা ততবড়ই মিথ্যে। সর্ব্বকালে সর্ব্বলোকে এ তত্ত্ব জানে। বুদ্ধি আমার আচ্ছন্ন হয়েছিল, কিন্তু তুমি তো জান্‌তে এ আমার ভালবাসা নয়, এ শুধু আমার ক্ষণিকের মোহ। কি কোরে একে তুমি প্রশ্রয় দিতে উদ্যত হয়েছিলে ? কমল, কুহেলিকা যতবড় ঘটা করেই সূর্য্যালোক আবৃত করুক, তবু সে-ই মিথ্যে। সূর্য্যই ধ্রুব।

অন্ধকারে ক্ষণকাল কমল নির্ণিমেষে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল, তারপরে শান্তকণ্ঠে কহিল, ওটা কবির উপমা অজিত বাবু, যুক্তি নয়, সত্যও নয়। কোন্ আদিম কালে কুহেলিকার সৃষ্টি হয়েছিল, আজও সে বিদ্যমান আছে। সূর্য্যকে সে বারবার আবৃত করেছে এবং বারবার আবৃত করবে। সূর্য্য ধ্রুব কিনা জানিনে, কিন্তু কুহেলিকাও মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়নি। হোক্ মোহ ক্ষণিকের, কিন্তু ক্ষণও ত মিথ্যে নয়। ক্ষণকালের আনন্দ নিয়েই সে বারবার দেখা দেয়। যুঁই ফুলের আয়ু সূর্য্যমুখীর ন্যায় দীর্ঘ নয় ব'লে তাকে মিথ্যে ব'লে কে উড়িয়ে দেবে ? আজ একটা রাত্রির

মোহকে প্রশ্রয় দিতে চেয়েছিলাম এই যদি আপনার অভিযোগ হয় অজিতবাবু, আয়ুষ্কালের দীর্ঘতাই কি জীবনে এতবড় সত্য ?

কথাগুলা অজিত ঠিকমত বুঝিতে পারিলনা, বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। কমল বলিতে লাগিল, এ কথা আজও বোঝবার দিন আপনাদের আসেনি। তাই শিবনাথের প্রতি আপনাদের ক্রোধের অবধি নেই, কিন্তু আমি তাঁকে সমস্ত অন্তর দিয়ে ক্ষমা করেচি। যা' পেয়েছি তার বেশি কেন পাইনি এ নিয়ে আমার এতটুকু নালিশ নেই।

অজিত বলিল, অর্থাৎ মনটাকে এম্‌নিই নির্ব্বিকার ক'রে তুলেচ। আচ্ছা, সংসারে কারও বিরুদ্ধে কি তোমার কোন নালিশ নেই ?

কমল তাহার মুখ পানে চাহিয়া মুচকিয়া হাসিল, কহিল, আছে শুধু একজনের বিরুদ্ধে।

কার বিরুদ্ধে শুনিনা কমল ?

কি হবে আপনার অপরের কথা শুনে ?

অপরের কথা ? যাই হোক্, তবু ত নিশ্চিন্ত হতে পারবো অন্ততঃ আমার ওপর তোমার রাগ নেই।

কমল পুনশ্চ হাসিয়া কহিল, একেবারে নিশ্চিন্ত হতে চান্ ? কিন্তু এখন আর সময় নেই, আমরা এসে পড়েচি। গাড়ী থামান্, আমি নেবে যাই।

গাড়ী থামিল। অন্ধকারে রাস্তার ধারে কে একজন দাঁড়াইয়া ছিল, কাছে আসিতেই উভয়ে চমকিয়া উঠিল। অজিত সভয়ে প্রশ্ন করিল, কে ?

আমার নাম রাজেন। হরেন্দ্র বাবুর বাসায় থাকি।

এত রাত্রে এখানে কেন ?

আপনাদের জন্যেই বহুক্ষণ অপেক্ষা করে আছি। আপনারা চলে আসার পরেই আশুবাবুর বাড়ী থেকে লোক গিয়েছিল খুঁজতে,—অর্থাৎ কিনা মিসেস্‌,—এই বলিয়া সে কমলের প্রতি চাহিল।

কমল কহিল, আমার নাম কমল। নাম ধরে ডাক্‌লে আমি অপরাধ নিইনে। আমাকে খুঁজ্‌তে যাবার হেতু ?

লোকটি কহিল, আপনি বোধহয় শুনেচেন চারিদিকে অত্যন্ত ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হচ্চে এবং অনেক ক্ষেত্রেই—

হাঁ শুনেচি, এবং অনেক ক্ষেত্রেই মারা যাচ্চে।

হাঁ। শিবনাথ বাবু অতিশয় পীড়িত। হঠাৎ ডুলি করে তাঁকে আশুবাবুর বাড়ীতে নিয়ে এসেচে।

তারপরে ?

আশুবাবু ভেবেছিলেন আপনি আশ্রমে আছেন, তাই ডাক্‌তে পাঠিয়েছিলেন। হরেনদাও সঙ্গে এসেছিলেন, তিনি এইমাত্র চলে গেলেন। আমাকে বলে গেলেন আপনি যখনি ফিরবেন তখনি যেন সঙ্গে করে নিয়ে যাই।

কোথায়, আশুবাবুর বাড়ীতে ?

হাঁ।

রাত এখন কত ?

বোধহয় তিনটে বেজে গেছে।

কমল হাত বাড়াইয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিয়া কহিল, ভিতরে আসুন, পথে আপনাকে আপনাদের আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে যাবো।

অজিত একটা কথাও কহিলনা। কাঠের পুতুলের মত নিঃশব্দে গাড়ী চালাইয়া হরেন্দ্রর বাসার সম্মুখে আসিয়া থামিল। রাজেন অবতরণ করিলে কমল দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া কহিল, আপনাকে ধন্যবাদ। আমাকে খবর দেবার জন্যে আজ আপনি অনেক দুঃখ ভোগ করেছেন।

এ আমার কাজ। প্রয়োজন হলেই সম্বাদ দেবেন। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। ভূমিকা নাই, আড়ম্বর নাই, সহজ কণ্ঠে শাদা কথায় জানাইয়া গেল এ তাহার কর্ত্তব্যের অন্তর্গত। আজই সন্ধ্যাকালে হরেন্দ্রর মুখে এই ছেলেটির সম্বন্ধে যতকিছু সে শুনিয়াছিল সমস্তই তাহার চক্ষের পলকে মনে পড়িল। একদিকে তাহার একজামিন পাশ করিবার অসাধারণ দক্ষতা, আর একদিকে সফলতার মুখে তাহা ত্যাগ করিবার অপরিসীম ঔদাসীন্য। বয়স তাহার অল্প, সবেমাত্র যৌবনে পা দিয়াছে, এই বয়সেই নিজের বলিয়া সমস্ত ভবিষ্যতের কিছুই নিজের হাতে রাখে নাই, পরের কাজে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছে।

অজিত সেই অবধি স্তব্ধ হইয়াই ছিল। কোন-কিছুতে মন দিবার শক্তি তাহার নাই, একটা কাল্পনিক অসম্বদ্ধ প্রশ্নোত্তরমালার আঘাত-অভিঘাতের নীচে আজিকার এই নিশীথ অভিযানের নিরবচ্ছিন্ন কুশ্রীতায় অন্তর তাহার কালো হইয়া রহিল। খুব সম্ভব কেহই কিছু জিজ্ঞাসা করিবেনা, হয়ত জিজ্ঞাসা করিবার ভরসাও কেহ পাইবেনা,

শুধু আপন আপন ইচ্ছা, অভিরুচি ও বিদ্বেষের তুলি দিয়া অজ্ঞাত ঘটনার আদ্যোপান্ত কাহিনী বর্ণে বর্ণে সৃজন করিয়া লইবে। আর ইহার চেয়েও বেশি ব্যাকুল করিয়াছিল তাহাকে এই লজ্জাহীনা মেয়েটার নির্ভয় সত্যবাদিতা। এই রহস্য-ময়ীর অন্তরের কোন সন্ধানই তাহার গোচর নয়, মুখের কথাও তেম্‌নি দুর্বোধ্য,—কেবল একটা বিষয় সে নিঃসংশয়ে জানে যে মিথ্যা বলার অভ্যাস তাহার নাই। তাহার শান্ত কণ্ঠের সহজ উক্তি এতই স্বচ্ছ যে মনেও হয়না যে ইহার চতুঃসীমানায় কোনদিন অসত্যের ছায়াস্পর্শও ঘটিয়াছে। শিবনাথের পীড়ার উপলক্ষে কে এবং কাহারা উপস্থিত হইয়াছেন সে জানেনা। এই মেয়েটিকে তাঁহারা প্রশ্ন করিতেছেন মনে করিয়াও অজিতের গায়ের রক্ত শীতল হইয়া আসিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল কমলকে সে ঘৃণা করে, এবং ইহারই লুব্ধ আশ্বাসে যে আত্ম-বিস্মৃত উন্মাদ মুহূর্ত্তের জন্যও জ্ঞান হারাইয়াছে তাহার কঠিন দণ্ডই হোক, এই বলিয়া সে বারবার করিয়া আপনাকে অভিশাপ দিল।

গেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তাহার চোখে পড়িল সম্মুখের খোলা জানালায় দাঁড়াইয়া আশুবাবু স্বয়ং। বোধহয় তাহারই প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন। গাড়ীর শব্দে নীচে চাহিয়া বলিলেন, অজিত এলে? সঙ্গে কে, কমল?

হাঁ।

মধু, কমলকে শিবনাথবাবুর ঘরে নিয়ে যাও। শুনেচো বোধহয় তাঁর অসুখ? বলিতে বলিতে তিনি নিজেই নামিয়া আসিলেন, কহিলেন, এই শরৎ কালটা এম্‌নিই বড় খারাপ, তাতে ব্যারাম স্যারাম হঠাৎ যা' সুরু হয়েছে লোকে মারা পড়্‌চেও বিস্তর। আমার নিজের দেহটাও সকাল থেকে ভালো নয়, যেন জ্বরো ভাব ক'রে রেখেচে।

কমল উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, তবে আপনি কেন জেগে রয়েছেন? এখানে দেখবার লোকের তো অভাব নেই।

কে আর আছে বল? ডাক্তার এসে দেখে শুনে গেছেন, আমাকে শুতে পাঠিয়ে মণি নিজেই জেগে বসে আছে। কিন্তু ঘুমোতে পারলামনা। তোমার আস্‌তে দেরি হ'তে লাগ্‌লো,—কমল, মানুষের রোগের সময়েও কি অভিমান রাখ্‌তে আছে? ঝগড়া-ঝাঁটি যে হয়না তা' নয়, কিন্তু তিন চার দিন কোথায় কোন্ বাসায় গিয়ে সে যে জ্বরে পড়েচে একটা খবর পর্য্যন্ত তো নাওনি? ছি মা, এ কাজ ভালো হয়নি, এখন একলা তোমাকেই ত ভুগ্‌তে হবে।

শুনিয়া কমল বিস্মিত হইল, কিন্তু বুঝিল এই সদানন্দ, সরল-চিত্ত বৃদ্ধ ভিতরের কোন কথাই জানেননা। সে চুপ করিয়া রহিল, আশুবাবু তাহার অভিমান শান্ত করিবার বাসনায় বলিতে লাগিলেন, হরেনবাবুর মুখে শুন্‌লাম তুমি বাড়ী নেই, তখনই বুঝেচি অজিত তোমাকে ছাড়ে'নি। নিজে সে ভয়ানক ঘুরতে ভালোবাসে, তোমাকেও ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু ভাবো ত এই অন্ধকারে হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা হলে তোমরা কি বিপদেই পড়তে।

অজিতের বুকের উপর হইতে যেন গুরুভার পাষাণ নামিয়া গেল। কোন-কিছুর মন্দ দিকটা যেন এই মানুষটির মধ্যে ঢুকিতেই চায়না, নিষ্কলুষ অন্তর অনুক্ষণ অকলঙ্ক শুভ্রতায় ধপ্ ধপ্ করিতেছে। স্নেহ ও শ্রদ্ধায় সে মনে মনে তাঁহাকে নমস্কার করিল, কিন্তু কমল তাঁহার সকল কথায় কান দেয় নাই, হয়ত প্রয়োজনও বোধ করে নাই। জিজ্ঞাসা করিল, উনি হাস্‌পাতালে না গিয়ে এখানে এলেন কেন?

আশুবাবু অবাক্ হইয়া কহিলেন, হাস্‌পাতাল? তবেই তো মা, তোমার রাগ এখনো পড়েনি।

রাগের জন্যে বল্‌চিনে আশুবাবু, যেটা সঙ্গত এবং স্বাভাবিক তাই শুধু বল্‌চি।

ওটা স্বাভাবিক নয়, সঙ্গত ত নয়ই। তবে এটা স্বীকার করি যে এখানে না এনে তোমার কাছে পাঠানোই মণির উচিত ছিল।

কমল কহিল, না, উচিত ছিলনা। মণি জান্‌তেন চিকিৎসা করাবার সাধ্য নেই আমার।

এই কথায় তাঁহার আর একটা কথা মনে পড়ায় তিনি অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া গেলেন। কমল বলিতে লাগিল, কেবল মনোরমাই নয়, শিবনাথবাবু নিজেও জানতেন শুধু সেবা দিয়েই রোগ সারেনা, ওষুধ-পথ্যেরও প্রয়োজন। হয়ত এ ভালোই হয়েছে যে খবর আমার কাছে না পৌঁছে মণির কাছে পৌঁচেছে। তাঁর পরমায়ুর জোর আছে।

আশুবাবু লজ্জায় ম্লান হইয়া মাথা নাড়িয়া বারবার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—ঐ কথাই নয় মা, সেবাই সব,

যত্নই সবচেয়ে বড় ওষুধ। নইলে ডাক্তার-বদ্যি উপলক্ষ মাত্র। তাঁহার পরলোকগত পত্নীকে মনে পড়িয়া বলিলেন, আমি যে ভুক্ত-ভোগী কমল, রোগ ভুগে ভুগে সে শিক্ষা হয়ে গেছে। ঘরে চল, তোমার জিনিস তুমি যা ভালো বুঝবে তাই হবে। আমি থাকৃতে ওষুধ-পথ্যির অভাব হবেনা মা। এই বলিয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন। অজিত কি করিবে না বুঝিয়াও তাঁহাদের সঙ্গ লইল। রোগীর গৃহ, পাছে গোলমালে বিশ্রামের বিঘ্ন ঘটে, এই আশঙ্কায় পা টিপিয়া নিঃশব্দে সকলে প্রবেশ করিলেন। শয্যার পার্শ্বে চৌকিতে বসিয়া মনোরমা রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিতে রোগীর বুকের পরে অবসন্ন মাথাটি রাখিয়া বোধকরি সে হঠাৎ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহার গ্রীবার পরে পরস্পর সম্বদ্ধ দুই হাত ন্যস্ত রাখিয়া শিবনাথও সুপ্ত। স্বপ্নাতীত এই দৃশ্যের সম্মুখে অকস্মাৎ পিতার দুই চক্ষু ব্যাপিয়া যেন ঘনান্ধকারের জাল নামিয়া আসিল, কিন্তু মুহূর্ত্তকাল মাত্র। মুহূর্ত্ত পরেই তিনি ছুটিয়া পলাইলেন। অজিত ও কমল চোখ তুলিয়া উভয়ের মুখের প্রতি চাহিল, তাহার পরে যেমন আসিয়াছিল তেমনি নিঃশব্দ পদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শোক সংবাদ

৺যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, ও প্রত্নতাত্বিক 'সমসাময়িক ভারত,' 'ইংরাজের কথা', 'অর্থনীতি' 'অর্থশাস্ত্র', 'গ্লোরিস্ অব্ মগধ', ইত্যাদি বহুবিধ গ্রন্থাদির প্রণেতা, পাটনা কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীমান্ যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার আর ইহজগতে নাই। দুই বৎসরাবধি কঠিন দুরারোগ্য বহুমূত্র ব্যাধিতে তিনি কষ্ট পাইতেছিলেন। গত ১৮ই নভেম্বর, রবিবার প্রাতঃকালে, তিনি চুনারগড়ে দেহরক্ষা করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৯ ছিল। ভারতবর্ষ পত্রিকার সহিত তিনি গভীর ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার সুলিখিত প্রবন্ধাদি প্রায় ২০ বৎসরাবধি নানাবিধ সংবাদপত্রে ও মাসিকপত্রে বাহির হইতেছিল। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বেও তিনি "সার আশুতোষ মেমোরিয়াল ভলুম" নামক প্রকাণ্ড পুস্তকের সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে তাহার নাম চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তাঁহার "সমসাময়িক ভারত" তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত রাখিয়াছে। কেবল ইতিহাসের গ্রন্থ লিখিয়া তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি গল্পসাহিত্যে প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহা পঞ্চবাণ ও ছদ্মনামে তাঁহার লিখিত আটআনা সংস্করণের অন্তর্গত, "চতুর্ব্বেদ" নামক গল্পগ্রন্থখানি যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার বহুমু প্রতিভার প্রভূত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন।
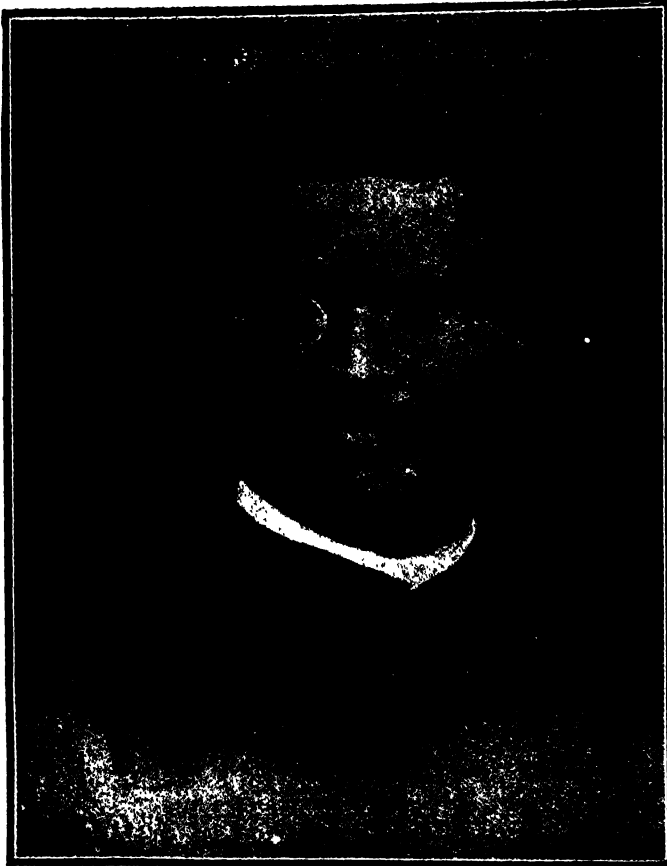
৺যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

বঙ্গবাসী ও প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা সম

করিয়া, যোগীন্দ্রবাবু প্রথমে টাঙ্গাইলে প্রমথ-মন্মথ কলেজে প্রবেশ করেন। তথায় কিছুকাল অধ্যাপকের কাজ করিয়া, হাজারিবাগ কলেজে এবং তৎপরে পাটনা কলেজে অধ্যাপকের কাজ করেন। যোগীন্দ্রনাথই বাঙ্গালী জাতির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম রয়াল হিষ্টোরিক্যাল সোসাইটীর, ও রয়াল ইকনমিক সোসাইটীর ফেলো নির্ব্বাচিত হয়েন।

যোগীন্দ্রবাবু পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। তাঁহার ৭৮ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ পিতা এখনও জীবিত। চারিটী পুত্র ও তিনটী কন্যা ও বিধবা স্ত্রীকে রাখিয়া যোগীন্দ্রনাথ শান্তিধামে গমন করিয়াছেন। ভগবান তাঁহার লোকান্তরিত আত্মার সদ্গতি করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

দিক্‌শূল

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(১৬)

যে-কথা রমাপদ সবিস্তারে সরযূকে জানালে, তার তাৎপর্য্য এই রকম:—যে-সব দরিদ্র শিশু এবং বালক-বালিকা পিতৃমাতৃহীন অনাথ, অথবা যাদের পিতামাতার আর্থিক অবস্থা এমন শোচনীয় যাতে যথোচিত প্রতিপালন করতে না পেরে তারা সন্তানদের বিলিয়ে দেয় অথবা পরিত্যাগ করে, কিম্বা অপরে প্রতিপালন করবার ভার নিতে চাইলে আপত্তি করে না. সেই সব অনাথ বালক-বালিকাদের প্রতিপালনের জন্য একটা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করবে। উপস্থিত-সঞ্চিত তিন শত টাকায় প্রতি মাসে একশত টাকা ক'রে যোগ হ'য়ে হ'য়ে হাজার টাকা জমলেই আশ্রমের কাজ আরম্ভ হবে। সে টাকাটা জমা থাকবে রক্ষিত পুঁজি (reserved fund) হিসাবে, অথবা খরচ হবে অত্যাবশ্যক প্রয়োজনে। আশ্রমের চল্‌তি খরচ নির্ব্বাহ হবে উপস্থিত মাসিক একশত টাকার চাঁদায়;—তারপর আশ্রমের প্রয়োজন অনুসারে এবং রমাপদর সামর্থ্য অনুযায়ী মাসিক চাঁদার তায়দাদ ক্রমশ বাড়বে। অনাথদের আশ্রমে গ্রহণ করা বিষয়ে জাতি-ধর্ম্ম ভদ্রাভদ্র বিচার করা হবে না, এবং আশ্রমের অধিনেত্রী হবে সরযূ। কথাটা শেষ ক'রে পরিশেষে রমাপদ সনির্ব্বন্ধে বল্‌লে, "এ আমার বড় আগ্রহের সাধ সরযূ,—এর ভার তোমাকে নিতেই হবে।"

যে জিনিসটা রমাপদর জীবনে দুষ্টব্রণের মত যন্ত্রণাদায়ক এবং অশুভকর, তার শুধু একটা দিক্ সে সরযূকে জানালে; অপর দিক্‌টা একেবারে চেপে গিয়ে দুঃখকে সে সাধ ব'লে ব্যক্ত করলে,—যে ব্যাপারকে বেদনার নির্গম-পথ করতে চায়, সরযূকে বোঝালে তা আনন্দের প্রবেশ-দ্বার হবে।

রমাপদর কথা শুনে ক্ষণকাল মনে মনে কি চিন্তা ক'রে সরযূ বল্‌লে, "হঠাৎ তোমার এ সাধ কেন হ'ল তা'ত কিছুই বুঝতে পারছিনে। একটা সাধ একেবারে টপ্‌কে আর একটা সাধ এমন ক'রে দেখা দিলে কি কারণে? যার নিজের স্ত্রী নেই, অপরের ছেলের জন্যে তার এত মাথা-ব্যথা কেন?"

রমাপদর গৃহ-সংসার, আত্মীয়-পরিজন ইত্যাদি বিষয়ে পরিচয় লাভ করবার যে স্বাভাবিক কৌতূহল সরযূর মনে ছিল, তা দিনাতিপাতের সঙ্গে উত্তরোত্তর বেড়ে উঠছিল তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সন্ধান না পেয়ে এমন কি চেষ্টা ক'রেও না পেয়ে। নিয়তির বিচিত্র বিধানে বিস্ময়কর ঘটনাবলীর প্রভাবে অকস্মাৎ যে অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে তার জীবন যাপন আরম্ভ হ'ল, সে বিবাহিত কি অবিবাহিত, তার বাপ মা পুত্র কন্যা আছে কি নেই, কোথায় তার বাড়ি, কি তার ইতিহাস, কেমন তার চরিত্র, এ-সব কথা জানবার, আগ্রহই শুধু নয়, প্রয়োজনও সরযূর কম ছিল না। কিন্তু তার উপায় সে খুঁজে পায় না। চাকর বামুনদের জিজ্ঞাসা করলে পাছে তারা সরযূর অজ্ঞতায় বিস্মিত হয়, এই ভয়ে সে তাদের কিছু জিজ্ঞাসা করে না। এম্‌নিই হয় ত' তারা সরযূকে—তাদের এই সালঙ্কারা সিন্দুরবিহীনা মাজীকে—একটি রহস্যের মত মনে করে; সে রহস্যকে দুরূহতর ক'রে

লাভ কি? মাঝে মাঝে সে ছলে-ছুতোয় রমাপদর কাছ থেকে জানবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু রমাপদ তার কোনো প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দেয় নি, তার পূর্ব্ব জীবনের কোনো কাহিনী কোনো রহস্যই সংযূর কাছে উদ্ঘাটিত করে নি। আজকে সুযোগ পেয়ে সরযূ সেই কথাই প্রকারান্তরে জানবার চেষ্টা করছে বুঝতে পেরে রমাপদ মৃদু হেসে বল্লে, "তোমার কথার মধ্যে অনেক গোল আছে সরযূ।"

সরযূ তার কৌতূহল-দীপ্ত নেত্রদুটি রমাপদর মুখের দিকে স্থাপিত ক'রে বল্লে, "কি গোল?"

রমাপদ বল্লে, "প্রথমত, আমার স্ত্রী আছে কি নেই সে বিষয়ে কিছু না জেনে আমার স্ত্রী নেই ধ'রে নিয়ে কোনো প্রশ্ন করা তোমার উচিত নয়।"

রমাপদর সতর্কতা দেখে হাস্যোদ্ভাসিত মুখে সরযূ বল্লে, "যার মূর্ত্তি চোখে দেখতে পাচ্ছিনে, যার সংবাদ কানে শুনতে পাচ্ছিনে, তিনি আছেন ব'লে কেমন ক'রে ধরে নিই! আচ্ছা, সে কথা যাক্—দ্বিতীয়ত?"

রমাপদ বল্লে, "দ্বিতীয়ত, তর্কের খাতিরে আমার স্ত্রী নেই স্বীকার ক'রে নিলেও অপরের ছেলের জন্যে আমার মাথাব্যথা করতে পারে না, এ কোনো যুক্তি নয়। অপরের স্ত্রী নিয়ে যার জীবন-যাত্রা আরম্ভ হ'ল অপরের ছেলের জন্যে মাথাব্যথা করবার বাধাই বা তার থাক্‌ল কোথায় বল?"

রমাপদর এ কথার উত্তরে সরযূর মুখ দিয়ে একটিও কথা বার হ'ল না, শুধু একবার রমাপদর প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে সে স্তব্ধভাবে আরক্তমুখে হীরাতাঁড় গ্রামের দিকে চেয়ে ব'সে রইল।

মুখের পাতায় সরযূর মনের সংবাদ পাঠ ক'রে স্নিগ্ধস্বরে রমাপদ বল্লে, "কথাটা যদি কোনো দিক্ থেকে শ্রুতিকটু হ'য়ে থাকে তা হ'লে বলি, নিজের স্ত্রী দিয়ে নিজের ছেলেকে প্রতিপালন করবার যার সুবিধে নেই, অপরের স্ত্রীকে দিয়ে অপরের ছেলে প্রতিপালন করবার তার বাধা কোথায়?" তারপর সহসা কণ্ঠের স্বর খুব খানিকটা গভীর ক'রে নিয়ে বল্লে, "তুমি জান না সরযূ, প্রতিদিন কত লোক এই মর্ম্মান্তিক দুঃখ ভোগ করছে! নিজের ছেলেকে খাওয়াতে পারে না, পরাতে পারে না, মানুষ করতে পারে না; রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে, পরকে বিলিয়ে দিচ্ছে, ধনবানে কিনে নিচ্ছে। যে ফুল আমার গাছে ফুটল বড় লোকের ফুলদানিতে তা শোভা পেলে, এ যে কত বড় দুঃখ তুমি তা বুঝবে না সরযূ! সে দুঃখ যে পায় সেই বোঝে! আমরা সাধ্যমত মানুষকে সেই দুঃখ থেকে মুক্ত করব।"

এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা ক'রে রমাপদ পুনরায় বলতে আরম্ভ করলে, "এ ত গেল, আমার দিকের কথা। তার পর কথাটা তোমার দিক থেকেও বিবেচনা ক'রে দেখ। আমি তোমার আত্মীয় নই, স্বজন নই, এই মাস চারেকের পরিচয় ছেড়ে দিলে পরিচিতও নই; আমি বিবাহিত কি অবিবহিত সাধু কি অসাধু দুশ্চরিত্র কি চরিত্রবান খল কি সরল কিছুই তুমি জান না। তুমি হিন্দুঘরের বিধবা, ঘটনার অপরিহার্য্য গতিকে আমার সংসারে এসে পড়েছ, যেখানে দ্বিতীয় স্ত্রী-লোক নেই, এমন কি দ্বিতীয় পুরুষও নেই, সবদিক চিন্তা করে সঙ্কোচের তোমার শেষ নেই; তাই মাঝে মাঝে সমাজের রক্তনেত্রের কথা মনে পড়ে, আর পালাতে চাও শ্বশুর বাড়িতে কিম্বা মামার বাড়িতে কিম্বা মাসীর বাড়িতে, যারা তোমাকে একদিনেরও জন্যে চায় না, যেখানে গেলে তোমার অবস্থা হবে আশ্রিতার আর জীবন হবে যন্ত্রণার। কিন্তু আমি বলি সরযূ, সমাজের কথা তুমিই বা কেন ভাব, আমিই বা কেন ভাবি? যে মহাজন আমাদের কর্জ্জ দেবে না, তাকে আমরা সুদ দিই কেন? এস, আমরা সমাজের বাইরে আমাদের সংসার বাঁধি সমাজেরই মঙ্গলের জন্যে। বাইরে থাকলে সমাজকে তুমি ভালবাসতে পারবে, সমাজের তুমি কাজ করতে পারবে, ভিতরে গেলে শ্রদ্ধা হারাবে। সমাজের তাড়নায় তুমি এত দূর ভীত যে আমার সঙ্গে মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ সম্পর্ক উপেক্ষা করে সমাজের কাছ থেকে একটা সম্পর্ক ধার ক'রে নিয়ে পাতাতে চাও। তাই একদিন চেষ্টা ক'রেছিলে আমাকে দাদা ব'লে ডাকতে। সেদিন এত হাসি আমার পেয়েছিল তোমার অকারণ উদ্বেগ দেখে! তুমি আমি ভাই-বোন কি ক'রে হ'তে পারি যখন আমাদের বাপ-মা কিম্বা খুড়ো-জেঠা এক নয়। তার চেয়ে অনেক সহজে তোমাতে আমাতে স্বামী-স্ত্রী হ'তে পারি কারণ বিধবা বিবাহকে সমাজ এমন কি হিন্দু-সমাজও স্বীকার করে। কিন্তু আমি বলি সরযূ, ও সব হাঙ্গামার দরকার কি? তুমি শ্রীমতী সরযূবালা দেবী আর আমি শ্রীযুক্ত রমাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সম্পর্কই কি যথেষ্ট নয়? এ তুমি স্বপ্নেও মনে কোরো না যে, তোমাকে আমি আমার আশ্রিত

ব'লে মনে করি। এ আমি আমার সহৃদয়তায় বলছি নে সরযূ—যা একান্ত সত্যি ব'লে জানি তাই বলছি। আমি জানি তুমি আমার জীবনে অনিবার্য্য ভাবে এসেছ—তোমার অসহায়তায় আসনি, আমার করুণাতেও আসনি। দেখলে না?—যেদিন এখানে এলাম সেই দিনই তোমাকে পেলাম—একদিনেরও সবুর সইল না। নিয়তি নিজের হাতে তোমার সঙ্গে আমাকে বেঁধে দিলে। এ ছাড়াও তুমি যদি আমাদের মধ্যে আর একটা কোনো সম্পর্কের বাঁধন চাও, বেশ ত গুটিকয়েক নিরাশ্রয় ছেলে-মেয়েকে আমাদের মধ্যে নিয়ে তা' গ'ড়ে উঠুক। মার মত তুমি যাদের মানুষ করবে, বাপের মত আমি তাদের খরচ জোগাব। একটি অনাথকেও আমরা যদি মানুষের মত মানুষ ক'রে দিতে পারি তা হ'লে বুঝব আমাদের দুজনের জীবন একেবারে অসার্থক হ'ল না। আশা করি আমার অনুরোধে রাজি হ'তে আর তোমার কোনো আপত্তি হবে না। কেমন রাজি ত?"

ক্ষণকাল স্তব্ধ হ'য়ে থেকে সরযূ একবার রমাপদর দিকে দৃষ্টিপাত করলে তারপর নত নেত্রে আর্দ্র ব্যথিত স্বরে বললে, "আমার পক্ষে যা একান্ত কামনার বস্তু হওয়া উচিত তাতে আমি রাজি নই, এ কেমন ক'রে বলি? তুমি বলছিলে আমার সঙ্কোচ দুশ্চিন্তার কথা। আমি নিজের জন্যে একটুও ভাবিনে—সে ভাবনা ত তুমি একেবারে হরণ করেছ। আমি ভাবি শুধু তোমার জন্যে।"

সরযূর কথা শুনে রমাপদ মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। বললে, "তাই যদি হয় তা হ'লে বেশ ত, তুমিও আমার ভাবনা হরণ কর। চ'লে যাবে ব'লে মাঝে মাঝে সে ভয় দেখাও তা আর দেখিয়ো না—আর আমি যে অনুরোধ তোমার কাছে করলাম তা রাখবে স্বীকার কর।"

রমাপদর দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে মৃদু হেসে সরযূ বললে, "আচ্ছা, তা না হয় করলাম; কিন্তু তার আগে তুমি আমার একটি কথার উত্তর দাও।"

"কি কথা?

"তোমার বিয়ে হয়েচে? স্ত্রী আছেন?"

সরযূর কথা শুনে রমাপদ হাসতে লাগল; বললে, "ভূতে যেমন মানুষকে পায় এই কথাটা তোমাকে তেম্‌নি পেয়ে বসেছে। কিছুদিন থেকে ছলে-ছুতোয় এই কথাটা জেনে নেবার জন্যে কত চেষ্টাই করছ। আচ্ছা, এ কেন বল দেখি সরযূ? ধর যদি আমার স্ত্রী থাকেই, তুমি ত তার স্থান জুড়ে বসো নি। তোমাকে ত' আর আমি বিয়ে করতে প্রস্তুত হইনি যে, সতীনের ভয় আছে কি না জেনে নেওয়া তোমার পক্ষে দরকার। তবে তোমার এ কৌতূহল কেন? তা ছাড়া সরযূ, কৌতূহল প্রবৃত্তি মানুষের মনের একটা দুর্ব্বলতা—বিশেষত যে ক্ষেত্রে কৌতূহল নিবৃত্ত করতে অপর পক্ষের আপত্তি থাকে।"

সরযূ বললে. "তা হ'লে বলবে না?"

"না।—রাজি ত?"

ভূমির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে চিন্তিত মুখে সরযূ বললে, "রাজি।"

"লক্ষ্মী!" ব'লে রমাপদ প্রসন্নমুখে উঠে প'ড়ে বললে, "তা হ'লে অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হবে স্থির হয়ে গেল—এবার সুবিধা মত কোনো সময়ে কল্পনাটি ভেবে চিন্তে পরামর্শ ক'রে গ'ড়ে তুলতে হবে। এখন আমি আমার আফিসের কাজ সারতে চল্‌লাম।"

রমাপদ প্রস্থান করলে রান্নাঘরে উপস্থিত হয়ে সরযূ বললে, "ঠাকুর, তোমার চিঁড়ের কথা বলছিলে, দুটি না হয় দাও; কিন্তু খুব অল্প।"

উপাধ্যায় তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠে প্রসন্নমুখে বললে, "বড় আনন্দ মাজী!" তারপর হাত ধুয়ে দ্রুতপদে চিঁড়ে আনতে প্রস্থান করলে।

সরযূ বুঝেছিল চিঁড়ে চাইলে উপাধ্যায় সুখী হবে।

[ক্রমশঃ]

সাময়িকী

আগামী বড়দিনের সময় কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। বিগত ৪২ বৎসর ভারতের নানা সহরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, কলিকাতাতেও কয়েকবার অধিবেশন হইয়াছিল। এবার ৪৩ বৎসরের অধিবেশন। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বোম্বাইতে হয়; আমাদের বাঙ্গালা দেশের তৎকালের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার অধুনা-পরলোকগত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (মিঃ ডবলিউ, সি, ব্যানার্জ্জি) সেই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথম অধিবেশন বলিয়া সেবার তেমন জন-সমাগম হয় নাই। তাহার পর বৎসরই কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়; সেই অধিবেশনে পরলোকগত দাদাভাই নৌরজী মহোদয় সভাপতি পদে বৃত হন। সেবারের কথা আমাদের এখনও মনে আছে। আমরা তখন মহা উৎসাহে সেই কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলাম। তাহার পর যেবার ভবানীপুরের মাঠে দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, সেইবার সভাপতি মহাশয় 'স্বরাজের' বার্ত্তা প্রথম ঘোষণা করেন। এই ৪২ বৎসর নানা বাধাবিঘ্ন, নানা আলোচনা আন্দোলন, নানা মত পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া কংগ্রেস এবার ৪৩ বৎসরের অধিবেশন এই কলিকাতা সহরেই করিতেছেন। দেশনায়ক শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহেরু মহোদয় এবার সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত মহোদয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছেন। আমরা এই মাতৃ যজ্ঞের পুরোহিতগণকে, নানা স্থান হইতে সমাগত দেশনায়কগণকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি।

কংগ্রেস মণ্ডপের অভ্যন্তর ভাগের দৃশ্য

কংগ্রেস মণ্ডপের বহির্দৃশ্য

কলিকাতার প্রান্তে বালিগঞ্জের নিকট পার্ক সার্কাস নামক বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে কংগ্রেসের অধিবেশনের বিপুল আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। কুড়ি হাজার লোকের সমাবেশ হইতে পারে, এমন সুবৃহৎ কংগ্রেস মণ্ডপ নির্ম্মিত হইতেছে; কংগ্রেস উপলক্ষে আরও অনেক সভা সমিতির অধিবেশন হইয়া থাকে; তাহার কয়েকটীর জন্য স্বতন্ত্র মণ্ডপ নির্ম্মিত হইতেছে, অবশিষ্ট কয়েকটীর অধিবেশন কংগ্রেস মণ্ডপেই হইবে। প্রদর্শনীর জন্যও প্রচুর আয়োজন হইতেছে। অনেক ব্যবসায়ী

নিজেরাই প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিতেছেন। অপরের জন্য প্রদর্শনীর কর্ত্তারাই প্রদর্শন-মণ্ডপ প্রস্তুত করিতেছেন। যেখানে বিস্তীর্ণ মাঠ ও জঙ্গল ছিল, সেখানে 'দেশবন্ধু নগর' স্থাপিত হইয়াছে। নানা স্থান হইতে যে সকল প্রতিনিধি আগমন করিবেন, তাঁহাদের অবস্থানের জন্য 'দেশবন্ধু নগরে' অসংখ্য আবাস নির্ম্মিত হইতেছে; স্বেচ্ছাসেবকগণ দলে দলে সেবাব্রত গ্রহণ করিতেছেন। কলিকাতায় একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। যাহাতে এবারের কংগ্রেস সর্ব্বপ্রকারে সুসম্পন্ন হয়, তাহার জন্য দেশ-সেবকগণ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। যে সকল কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই, পৌষমাসের প্রথম সপ্তাহে সে সমস্তই সম্পূর্ণ হইবে। আমাদের শ্রীমান সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায় এই 'দেশবন্ধু নগর' নির্ম্মাণের আরম্ভ হইতেই নানা দৃশ্যের আলোকচিত্র লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার গৃহীত মূল মণ্ডপ ও প্রদর্শনীর নির্ম্মাণ অবস্থার কয়েকখানি আলোকচিত্র আমরা প্রকাশিত করিলাম।

আগামী কংগ্রেস সপ্তাহে কোন্ দিন কি হইবে তাহার দিন-পঞ্জিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

২২-১২-২৮—সর্ব্বদল মহাসম্মেলন—মহাসম্মেলন মণ্ডপে;

২৩-১২-২৮—সর্ব্বদল মহাসম্মেলন—মহাসম্মেলন মণ্ডপে;

২৪-১২-২৮—সর্ব্বদল মহাসম্মেলন—মহাসম্মেলন মণ্ডপে;

২৫-১২-২৮—(১) সর্ব্বদল মহাসম্মেলনের বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতি—সভাপতির গৃহে; (২) কংগ্রেসের বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতি—নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির মণ্ডপে; (৩) অপরাহ্নে—সামাজিক সম্মেলন—অতিরিক্ত মণ্ডপে; (৪) যুব মহাসম্মেলন—মহাসম্মেলনের মণ্ডপে।

২৬-১২-২৮—(১) প্রাতে—সামাজিক সম্মেলন—অতিরিক্ত মণ্ডপে; (২) মহাসম্মেলনের বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতি—সভাপতির গৃহে; (৩) কংগ্রেসের বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতি—নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির মণ্ডপে; (৪) অপরাহ্নে—বৈশ্য সম্মেলন—অতিরিক্ত মণ্ডপে; (৫) সকালে ও বিকালে যুব-মহাসম্মেলন—মহাসম্মেলন মণ্ডপে।

২৭-১২-২৮—(১) সর্ব্বদল মহাসম্মেলন—মহাসম্মেলন মণ্ডপে; (২) প্রাতে—বৈশ্য সম্মেলন—অতিরিক্ত মণ্ডপে; (৩) অপরাহ্নে—মহিলা সম্মেলন—অতিরিক্ত মণ্ডপে।

২৮-১২-২৮—(১) সর্ব্বদল মহাসম্মেলন—মহাসম্মেলন মণ্ডপে; (২) মহিলা মহাসম্মেলন—অতিরিক্ত মণ্ডপে।

প্রদর্শনীর গৃহাদি

একটি প্রদর্শন-মণ্ডপ

২৯-১২-২৮—(১) প্রাতে—সার্ব্বজনীন উপাসনা-মহাসম্মেলন মণ্ডপে; (২) কংগ্রেস—কংগ্রেস মণ্ডপে।

৩০-১২-২৮—কংগ্রেস—কংগ্রেস মণ্ডপে।

৩১-১২-২৮—কংগ্রেস—কংগ্রেস মণ্ডপে।

অন্যান্য সভাসমিতির তারিখ এখনও স্থির হয় নাই।

'কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেটে'র চতুর্থ বার্ষিক সংখ্যা যেমন ভাবে বাহির হইয়াছে, সুদীর্ঘকালের মধ্যে এমন সুন্দর, এমন সুশোভন, এমন সুলিখিত প্রবন্ধ-সম্ভারে পূর্ণ, এমন চিত্র-প্রদর্শন আমরা দেখি নাই। ইহার জন্য সম্পাদক শ্রীমান্ অমল হোমই সমস্ত প্রশংসার অধিকারী। মনে পড়ে, বহু বাধা ও আপত্তির মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও শ্রীমান সুভাষচন্দ্র এই কাগজখানি বাহির করিয়াছিলেন। সে সময় অনেকে বলিয়াছিলেন, এ শ্রেণীর কাগজ চলিতেই পারে না, মিউনিসিপালিটীর কতকগুলি অর্থ নষ্ট হইবে। শুভানুধ্যায়ীদিগের ভবিষ্যদ্‌বাণী মিথ্যা হইয়াছে—'কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেট' আজ সগর্ব্বে চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিল, এবং এই চতুর্থ বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশিত করিয়া দেখাইয়া দিল যে, গেজেট এই শ্রেণীর কাগজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থানের দাবী করিতে পারে। আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, গেজেটের এই যে উন্নতি হইয়াছে, এই যে ইহার স্থায়িত্ব নিশ্চিত হইয়াছে, ইহা সম্পাদক শ্রীমান অমল হোমেরই কৃতিত্বের পরিচয়। শ্রীমান অমল এ কার্য্যে নূতন ব্রতী নহেন; তিনি সংবাদপত্র পরিচালনের অভিজ্ঞতা প্রথমে অর্জ্জন করিয়াছিলেন লাহোরের ট্রিবিউন পত্রের সম্পাদনে। তখন শ্রীমান অমলের বয়স মাত্র ২৫ বৎসর। তাহার পর তিনি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিপেন্‌ডেন্ট' পত্রের সম্পাদন করেন। এই সুশিক্ষিত, সুলেখক, অভিজ্ঞ, উৎসাহী ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ যুবককে সম্পাদক রূপে না পাইলে 'গেজেটে'র কি দশা হইত, বলিতে পারি না। তাই আমরা আজ গেজেটের সম্পাদক শ্রীমান অমল হোমকে অভিনন্দিত করিতেছি। আরও একটা কথা বলিবার আছে। শ্রীমান অমল ইংরাজী ভাষায় লিখিত পত্রের সম্পাদক হইলেও বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রেও অপরিচিত নহেন; ১৩৩৩ সালের মাঘ মাসের 'ভারতবর্ষে' তাঁহার লিখিত 'অতি আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্য' শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই এই দুই বৎসরের কথা-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা, আন্দোলন, বাদ-প্রতিবাদের সূচনা বলিয়া আমাদের ধারণা। এ জন্যও শ্রীমান অমল আমাদের আশীর্ব্বাদভাজন। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি শ্রীমান দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া সুধু ইংরাজী সংবাদ-পত্র নহে, বাঙ্গালা-ভাষা ও সাহিত্যেরও সেবা করিয়া যশঃ লাভ করুন।

শ্রীমান্ অমল হোম

আগামী কংগ্রেস সপ্তাহে কলিকাতা নগরীতে নিখিল ভারত যুব-সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। বোম্বাইএর খ্যাতনামা নেতা শ্রীযুত কে, এফ, নরিম্যান

সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তরুণের এই যে ব্যাপক জাগৃতি, ইহার সার্থকতা আজ আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না।—যেরূপে রূপায়িত হইয়া এই যুব-আন্দোলন পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা দিয়াছে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তরুণ-সমাজ যে জয়-যাত্রায় সজ্ঘবদ্ধ গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহা আজ জাতীয় গৌরবশ্রীকে করতলগত করিতে চায়, আন্তর্জাতিক মহামিলন-সঙ্গীতের সুর-ছন্দে ভরিয়া উঠিয়া সকলকে অনুপ্রাণিত করিতে চায়! ভারতের যুব-আন্দোলনকে আজ এই সুরের সঙ্গেই সুর মিলাইয়া জাতি ও বিশ্বমানবের কল্যাণ মানসে কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

কলিকাতার সেনেট হলে এ বৎসর নিখিল ভারত লাইব্রেরী সম্মিলনের অধিবেশন ২৬শে ও ২৭শে ডিসেম্বর বসিবে। বিশ্বভারতী লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইতে সম্মত হইয়াছেন। মান্দ্রাজ আডেয়ার লাইব্রেরীর প্রাণস্বরূপ শ্রীমতী আনি বেসাণ্ট মহোদয়া সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করিবেন। ভারতের বহুস্থান হইতে প্রতিনিধি আসিয়া লাইব্রেরীর সাহায্যে শিক্ষা-বিস্তার সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। তৎসঙ্গে একটি লাইব্রেরী-প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা হইয়াছে। এই প্রদর্শনী ২৪শে ডিসেম্বর হইতে সাতদিন খোলা থাকিবে।

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন—"প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশন আগামী ১১, ১২ ও ১৩ই পৌষ (২৬—২৮ ডিসেম্বর) ইন্দোরে হইবে স্থির হইয়াছে। এই সম্মেলনের নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। গত কয়েক বৎসরের মধ্যেই, সাহিত্য-চর্চ্চার ভিতর দিয়া, এই সম্মেলন প্রবাসী বাঙ্গালীর একমাত্র মিলন-কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে, এবং আমাদের সকলেরই প্রাণে একটা আশা ও আনন্দের সাড়া জাগাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে। আমরা প্রবাসী বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণকে এই সম্মেলনে যোগ দিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি। প্রবাসের বিভিন্ন স্থানের বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান-গুলি হইতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের নাম ও ঠিকানা যথাসম্ভব সত্বর আমাদিগকে জানাইলে অনুগৃহীত হইব। দূর প্রবাসে বাণী-পূজার এই আয়োজন যাহাতে সার্থক হয় সেজন্য বাংলার সাহিত্যিকবৃন্দেরও সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশের সাহিত্য ও কলা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিনিধিগণ এবং অন্যান্য সাহিত্যসেবিগণ এই সম্মেলনে যোগদান করিয়া ইহার গৌরববৃদ্ধি করিবেন এবং আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা। প্রতিনিধিগণের চাঁদা ৫৲ (পাঁচ টাকা) এবং ছাত্র-প্রতিনিধিগণের চাঁদা ২॥০ (আড়াই টাকা) ধার্য্য হইয়াছে। ঐ চাঁদা ২৯শে অগ্রহায়ণ (১৫ই ডিসেম্বর)এর মধ্যে কোষাধ্যক্ষ শ্রীপ্রমোদকুমার ঘোষ (পার্শী মহল্লা, ইন্দোর) মহাশয়ের নামে পাঠাইতে হইবে। প্রতিনিধিগণের বাসস্থান ও আহারাদির যথাসম্ভব সুবন্দোবস্ত অভ্যর্থনা-সমিতি করিবেন। অভ্যর্থনা-সমিতি সকলকেই সাদরে আমন্ত্রণ করিতেছেন। যদি কোন প্রতিনিধি কোন অনিবার্য্য কারণবশতঃ স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারেন, তবে তাঁহার প্রতিভূস্বরূপ প্রবন্ধ কবিতাদি পাইলেও কৃতার্থ হইব।"

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের আগামী অধিবেশনের সঙ্গে একটী শিল্প-প্রদর্শনী খোলা হইবে স্থির হইয়াছে। এ বিষয়ে সম্মেলনের এই প্রথম উদ্যম। বলা বাহুল্য ইহার সাফল্যের উপরই এই প্রদর্শনীর ভবিষ্যৎ স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে। এই প্রদর্শনীর আয়োজন সফল হইলে সম্মেলনের গৌরব এবং ইহার শিল্প-শাখার সার্থকতা বাড়িবে। এজন্য সহৃদয় শিল্পিগণের সাহায্য ও সহানুভূতি বিশেষভাবে প্রার্থনীয়। এই প্রদর্শনীতে চিত্র, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি সকল রকমের চারুশিল্পই সাদরে গৃহীত হইবে। নারী-শিল্প এবং প্রাচীন চিত্রাদিও প্রদর্শিত হইবে। কয়েকটী স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক এবং অন্যান্য পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকিবে। প্রদর্শনী-বিভাগের সম্পাদক মহাশয়কে পত্র লিখিলে বিস্তারিত বিবরণ সহ

অনুষ্ঠান-পত্র (prospectus) প্রেরিত হইবে। আশা করি শিল্পিগণ এবং শিল্পদ্রব্যের স্বত্বাধিকারিগণ এই প্রদর্শনীর জন্য দ্রব্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে পাঠাইয়া ইহার সাফল্য-সম্পাদনে সহায়তা করিবেন।

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের অনুরূপে প্রবাসী মহিলা-সম্মেলনের অধিবেশনও গত কয়েক বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই প্রথামত ঐ মহিলা-সম্মেলনের আগামী অধিবেশন ইন্দোরে হইবে। বর্ত্তমান নারী-জাগরণের দিনে এই সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করিবেন। প্রবাসের প্রত্যেক স্থান হ'তে বঙ্গমহিলা-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ এই সম্মিলনে যোগ দিয়া এবং প্রবন্ধ কবিতা প্রস্তাবাদি পাঠাইয়া একে সকল রকমে সফল ও সার্থক করিয়া তুলিবেন, এই আমাদের বিনীত প্রার্থনা। মহিলাগণের আহার ও বাসস্থানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইবে।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীঅনুরূপা দেবী প্রণীত "ত্রিবেণী" মূল্য—৩৲

শ্রীনিখিলনাথ রায় প্রণীত "পৃথ্বীরাজ" মূল্য—৩৲

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত "আর্য্য রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা" মূল্য—১৷৵৹

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক এম-এ, বি-এল প্রণীত "দুইচিঠি" মূল্য—১৷৹

শ্রীক্ষিতিনাথ দাস প্রণীত "রূপ-তৃষ্ণা" মূল্য—২৲

শ্রীমন্মথনাথ দে বি-এল প্রণীত "চরকা" মূল্য—১৲

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "তাপস কুমারী" মূল্য—১৷৹

শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম-এ প্রণীত "রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড" মূল্য—১৷৹

শ্রীকালিদাস রায় প্রণীত "বঙ্গ সাহিত্যের ক্রমবিকাশ" মূল্য—৷৹

শ্রীহরিলাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "বৈষ্ণব দর্পণ" মূল্য—১৲

কালনা মিশন-হাসপাতাল হইতে অনূদিত "হ্যাণ্ডবুক অফ নার্সিং ফর ইণ্ডিয়া" বঙ্গানুবাদ মূল্য—৫৲

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA.
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET CALCUTTA.

Printer—NARENDRANATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু

শ রাষ্ট্রীয় মহাসভার সভাপতি

ভারতবর্ষ

মাঘ—১৩৩৮

দ্বিতীয় খণ্ড | ষোড়শ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

পরম পুরুষ (১)

শ্রীঅরবিন্দ

সপ্তম অধ্যায়ে এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে আমাদের সাধনার নূতন প্রতিষ্ঠাটি খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাকে পূর্ণতর করিয়া তুলিবার সন্ধানও মিলিয়াছে। সংক্ষেপতঃ উহা এই, আমাদিগকে অন্তর্মুখী হইয়া এক উচ্চতর চৈতন্যের দিকে, এক পরম সত্তার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের পার্থিব প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ ভাবে বাদ দিতে হইবে না; কিন্তু এখন আমরা মূলতঃ বস্তুতঃ যাহা কিছু, সে সবেরই একটা উচ্চতর, একটা অধ্যাত্ম সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে।—কেবল আমাদের মর্ত্ত্যের অপরিপূর্ণতা ছাড়াইয়া দিব্যজীবনের পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে। এরূপ হওয়া যে সম্ভব তাহার কারণ,—প্রথমতঃ, মানুষের মধ্যে যে ব্যষ্টিগত আত্মা—জীবাত্মা রহিয়াছে, উহা মূল সনাতন সত্তার এবং মূল শক্তিতে পরমাত্মা ও ভগবানেরই স্ফুলিঙ্গ,—এখানে উহা ভগবানেরই প্রচ্ছন্ন আবির্ভাব, তাঁহারই সত্তার সত্তা, তাঁহারই চৈতন্যের চৈতন্য, তাঁহারই প্রকৃতির প্রকৃতি। কিন্তু এই দেহ মনের অজ্ঞানের মধ্যে আবদ্ধ, নিজের প্রকৃত সত্তা ও সত্য স্বরূপ সম্বন্ধে আত্মবিস্মৃত। দ্বিতীয়তঃ, জীবাত্মার আবির্ভাব হইয়াছে দুই প্রকৃতিকে ধরিয়া। মূল প্রকৃতিতে উহা উহার প্রকৃত অধ্যাত্ম

(১) গীতা সপ্তম অধ্যায় ২৯, ৩০; অষ্টম অধ্যায়।

সত্তার সহিতই এক থাকে, এবং নীচের প্রকৃতিতে উহা অহঙ্কার ও অজ্ঞানের বশে মোহগ্রস্ত হয়। এই শেষেরটিকে বর্জ্জন করিতে হইবে; এবং অধ্যাত্ম প্রকৃতিকে পুনরায় অন্তরের মধ্যে পাইতে হইবে, তাহার পূর্ণ বিকাশ করিতে হইবে, তাহাকে সচল ও সক্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। আত্মার অভ্যন্তরীণ বিকাশ সাধন করিয়া, এক নূতন জীবনের দ্বার উন্মোচন করিয়া, এক নূতন শক্তির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে ফিরিয়া যাই; এবং আমরা যে ভগবান হইতে এই মর্ত্ত্য রূপের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছি পুনরায় তাঁহারই অংশ হই।—

এখানে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, গীতা ভারতের তৎকালীন সমসাময়িক মতকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। এখানে জীবনকে অস্বীকার করিবার ভাব, 'নেতি নেতি'র ভাব কম, স্বীকার করার ভাবই বেশী। প্রকৃতির আত্মবিনাশের (a self-annulment of Nature) উপরেই ছিল সেই যুগের একান্ত ঝোঁক; তাহার পরিবর্ত্তে আমরা এক পূর্ণতর সমাধানের ইঙ্গিত পাইতেছি। পরবর্ত্তীকালে যে সব ভক্তিমূলক ধর্ম্মের বিকাশ হয়,—তাহাদেরও অন্ততঃ একটা পূর্ব্বভাস এখানে দেখিতে পাইতেছি। আমাদের সাধারণ জীবনের উপরে যে সত্য রহিয়াছে, আমরা যে অহং-ভাবের মধ্যে বাস করি—তাহার পশ্চাতে লুক্কায়িত যে সত্য, সে সম্বন্ধে আমাদের যাহা প্রথম অনুভূতি, গীতারও মতে তাহা হইতেছে এক বিশাল, নির্ব্যক্তিক, অক্ষর আত্মার শান্তি, তাহার সমতা ও ঐক্যের মধ্যে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের লোপ করি,—তাহার শান্ত পবিত্রতার মধ্যে আমাদের বাসনা ও রিপুর সমস্ত সঙ্কীর্ণ প্রেরণাকে বর্জ্জন করি।—কিন্তু, তাহার পর আমাদের দৃষ্টি যখন আরও পূর্ণ হয়, তখন আমরা দেখিতে পাই এক জীবন্ত অসীম সত্তা, এক দিব্য অপরিমেয় পুরুষ; আমরা যাহা কিছু সবই তাঁহা হইতেই উৎপন্ন, আত্মা ও প্রকৃতি, জগৎ ও জীব যাহা কিছু আমরা, সবই তাঁহার। আত্মায় যখন আমরা তাঁহার সহিত এক হই তখন আমরা লয় প্রাপ্ত হই না; বরং এই অনন্তের মহত্বে স্থিরপ্রতিষ্ঠ হইয়া তাঁহারই মধ্যে আমরা আমাদের প্রকৃত সত্তাকে ফিরিয়া পাই।— ইহা এক সঙ্গেই সাধিত

আমাদের অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মের ভিতর দিয়া সমগ্রভাবে আত্মার সন্ধান লাভ করা (an integral self-finding), (২) যাঁহার মধ্যে সব রহিয়াছে, যিনিই সব, সেই দিব্য পরম পুরুষের জ্ঞানের ভিতর দিয়া সমগ্র ভাবে আত্মস্বরূপে গড়িয়া উঠা (an integral self-becoming), এবং (৩) এই সর্ব্বময়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবানের প্রতি প্রেম ও ঐকান্তিক ভক্তির ভিতর দিয়া সমগ্রভাবে আত্ম সমর্পণ করা (an integral self-giving), আমাদের সকল কর্ম্মের প্রভু, আমাদের হৃদয়ের অধিবাসী, আমাদের সমগ্র জাগ্রত জীবনের আধার এই ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া।—তৃতীয়টিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং চরম-সিদ্ধিপ্রদ প্রক্রিয়া। যিনি আমাদের সবের মূল তাঁহাকেই আমাদের সব সমর্পণ করি। আমাদের অবিরত আত্ম-সমর্পণের দ্বারা আমাদের সকল জ্ঞান তাঁহারই জ্ঞানে পরিণত হয়, আমাদের সকল কর্ম্ম তাঁহারই শক্তির জ্যোতিতে পরিণত হয়। আমাদের আত্মসমর্পণে যে প্রেমের আবেগ তাহাই আমাদিগকে তাঁহার নিকটে পৌঁছাইয়া দেয় এবং তাঁহার স্বরূপের গভীরতম রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়।—এই যে ত্রিধা সাধনা, উত্তম রহস্যের দ্বার খুলিবার ত্রিধা শক্তি, প্রেমের দ্বারাই তাহা সম্পূর্ণ হয়, প্রেমের দ্বারাই তাহা পূর্ণতম সিদ্ধিলাভ করে।

আমাদের আত্মসমর্পণ কার্য্যকর হইতে হইলে প্রথমেই চাই যেন উহাতে পূর্ণ জ্ঞান থাকে। অতএব সর্ব্ব প্রথমেই এই পুরুষকে জানিতে হইবে তাঁহার দিব্য সত্তার সকল শক্তিতে ও সকল তত্ত্বে, তত্ত্বতঃ, সনাতন মূল স্বরূপে এবং জীবনলীলায়, সকলের পূর্ণ সামঞ্জস্যে। কিন্তু প্রাচীনদের নিকট এই জ্ঞানের, তত্ত্বজ্ঞানের, মূল্য কেবল এই ছিল যে, ইহার শক্তিতে আমরা মরজীবন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া এক পরম জীবনের অমৃতত্ব লাভ করিতে পারি। কিন্তু এই মুক্তিও উচ্চতমভাবে কিরূপে গীতার নিজস্ব অধ্যাত্ম সাধনার দ্বারাই পরিণামে লাভ করা যায়, গীতা এখন তাহাই দেখাইতেছে। গীতার কথার মর্ম্ম এই যে, পুরুষোত্তমের জ্ঞানই ব্রহ্ম সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যাহারা আমাকে তাহাদের আশ্রয় বলিয়া অবলম্বন করে,—শরণমাশ্রিত্য, তাহাদের দিব্য জ্যোতিঃ, তাহাদের

ভজনা করে,—যাহারা জরা ও মরণ হইতে, মরজীবন এবং ইহার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য অধ্যাত্ম সাধনায় আমার শরণাপন্ন হয়, তাহারা "সেই ব্রহ্মকে" জানিতে পারে, সমগ্রভাবে অধ্যাত্ম প্রকৃতিকে জানিতে পারে এবং অখিল কর্ম্মকে জানিতে পারে (২)। আর, যেহেতু তাহারা আমাকে জানে এবং সেই সঙ্গেই অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞকে জানে, সেইজন্য এই দেহের জীবন ছাড়িয়া যাইবার সন্ধিক্ষণেও আমার সম্বন্ধে জ্ঞান তাহাদের থাকে এবং সেই মুহূর্ত্তে তাহাদের সমগ্র চেতনাকে আমার সহিত যুক্ত করিয়া রাখে (৩)। সেই জন্যই তাহারা আমাকে পায়। মরজীবনে আর বদ্ধ না থাকায় উহারা উচ্চতম দিব্যপদ ঠিক তাহাদেরই ন্যায় লাভ করে যাহারা নির্ব্যক্তিক (impersonal) অক্ষর ব্রহ্মে তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তাকে লয় করে। এই নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত দিয়াই গীতা সপ্তম অধ্যায় শেষ করিয়াছে।

এখানে আমরা কয়েকটি কথা পাইতেছি, তাহাদের মধ্যেই ভগবানের জগৎলীলায় আত্মপ্রকাশ সম্বন্ধে প্রধান প্রধান মূল সত্যগুলি সংক্ষেপে রহিয়াছে। ভগবানের সৃষ্টিসূত্র ও কার্য্য-প্রণালীর সকল দিকই উহাদের মধ্যে আছে, জীবাত্মাকে পূর্ণ আত্মজ্ঞানে ফিরিয়া যাইতে হইলে যাহা কিছু প্রয়োজন সবই এখানে রহিয়াছে। প্রথমেই আছে, "সেই ব্রহ্ম,"—তদ্ ব্রহ্ম; পরে প্রকৃতিতে আত্মার মূল প্রকাশ,—অধ্যাত্ম; তাহার পর, অধিভূত এবং অধিদৈব যথাক্রমে বহির্জ্জগতের ব্যাপার এবং অন্তর্জগতের ব্যাপার; শেষে, অধিযজ্ঞ, ইহাই জাগতিক কর্ম্ম ও যজ্ঞের নিগূঢ় রহস্য। শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিলেন তাহা ফলতঃ এই,—"আমি পুরুষোত্তম (মাং বিদুঃ), আমি এই সকলেরই উপরে, তথাপি এই সকলেরই মধ্য দিয়া এবং ইহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের সহায়তায়ই আমাকে সন্ধান করিতে হইবে, জানিতে হইবে,—মানুষের চেতনা যে আমাকে ফিরিয়া পাইবার পথ খুঁজিতেছে, তাহার পক্ষে ইহাই একমাত্র পূর্ণ সাধনা।"

কিন্তু কেবল এই শব্দগুলি হইতেই ইহাদের অর্থ প্রথমে স্পষ্ট বুঝা যায় না, অন্ততঃ ইহাদের নানারূপ অর্থ করা যাইতে পারে। এই সকল শব্দের দ্বারা ঠিক কি বুঝাইতেছে, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে; এবং আদর্শ শিষ্য অর্জ্জুনও তৎক্ষণাৎ তাহাদের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সংক্ষেপে উত্তর দিলেন (৪)—শুধু তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করিতে গীতা কোথাও বেশীক্ষণ দাঁড়ায় নাই; গীতা কেবল ততটুকুই এমন ভাবে দিয়াছে যেন তাহাদের সত্যটি ধরিতে পারা যায়; এবং সাধক নিজেই অনুভূতি উপলব্ধি লাভ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে পারে। প্রতিভাসিক (the phenomenal) জগতের বিপরীত স্বপ্রতিষ্ঠ (self-existent) সত্তাকে বুঝাইতে উপনিষদ্ একাধিকবার "তদ্ ব্রহ্ম" এই বাক্য ব্যবহার করিয়াছে; মনে হয় এই বাক্যের দ্বারা গীতা আত্মার অক্ষর প্রতিষ্ঠাকে (the immutable self-existence) বুঝিয়াছে, ইহাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ আত্মাভিব্যক্তি এবং ইহারই অপরিবর্ত্তনীয় অনন্ততার উপরে বাকী সব,—যাহা কিছু চলিতেছে, বিকশিত হইতেছে সেই সব—প্রতিষ্ঠিত,—অক্ষরম্ পরম্। পরা প্রকৃতিতে জীবের যে আধ্যাত্মিক ভাব ও মূল প্রকাশের ধারা,—স্বভাব, গীতার মতে তাহাই অধ্যাত্ম,—স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।

গীতা বলিয়াছে, সৃষ্টির প্রেরণা ও শক্তিকেই কর্ম্ম বলা হয়,—বিসর্গঃ কর্ম্মসজ্ঞিতঃ। ঐ প্রথম মূল আত্মপ্রকাশ বা স্বভাব হইতে কর্ম্মই বস্তু সকলকে সৃজন করিতেছে, এবং এই স্বভাবের বশেই কার্য্য করিতেছে, সৃষ্টি করিতেছে, প্রকৃতিতে বিশ্বলীলা প্রকট করিতেছে। ক্ষরলীলার ফলে যাহা কিছুর আবির্ভাব হইতেছে, অধিভূত বলিতে সেই সমস্তই বুঝিতে হইবে,—অধিভূতং ক্ষরোভাবঃ। প্রকৃতিতে যে পুরুষ বিরাজ করিতেছেন,—প্রকৃতিস্থ আত্মা,—তিনিই অধিদৈব। তাঁহার মূল সত্তার যে সব ক্ষর ভাব কর্ম্ম প্রকৃতিতে প্রকট করিতেছে, পুরুষের চেতনায় সে সব প্রতিফলিত হইতেছে। অন্তর্যামী পুরুষ সেই সব দেখিতেছেন, উপভোগ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ

(২) জরা মরণ মোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্‌বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ॥ ৭।২৯

(৩) সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণ কালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্ত চেতসঃ ॥ ৭।৩০

(৪) অক্ষরং ব্রহ্মপরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৮।৩
অধিভূতং ক্ষরোভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৮।৪

বলিলেন, "কর্ম্মের ও যজ্ঞের অধিপতি,—অধিযজ্ঞ, -বলিতে আমাকেই বুঝায়। আমি ভগবান, বিশ্বদেব, পুরুষোত্তম—এখানে এই সব দেহধারীদের মধ্যে আমি গুপ্তভাবে বিরাজ করিতেছি। অতএব যাহা কিছু আছে,—সর্ব্বমিদং,—সবই এই কয়েকটি শব্দের সূত্রের মধ্যে পড়িয়াছে।

গীতা এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়াই জ্ঞানের দ্বারা অন্তিমে যে মুক্তিলাভ করা যায় তাহাই অবিলম্বে বুঝাইতে অগ্রসর হইয়াছে। পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে এইরূপ মুক্তিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অবশ্য পরে গীতা আবার এই কথার আলোচনা করিবে, এ সম্বন্ধে আরও এমন ব্যাখ্যা দিবে কর্ম্মের জন্য এবং অভ্যন্তরীণ উপলব্ধির জন্য যাহা আবশ্যক। ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা, এই সকল শব্দ বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, সেই সবের আরও পূর্ণ জ্ঞানের জন্য অপেক্ষা করিতে পারি। কিন্তু আর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে, এখানে এবং ইহার আগে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতেই এই সকল বস্তুর পারস্পরিক সম্বন্ধ যতটা বুঝা যায়, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। কারণ, এখানে বিশ্বলীলার ধারা সম্বন্ধে গীতার মতটি ব্যক্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ রহিয়াছে ব্রহ্ম,—ইহা উচ্চতম অক্ষর আত্মপ্রতিষ্ঠ (self-existent) সত্তা; দেশ-কাল-নিমিত্তের মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির যে খেলা চলিতেছে তাহার পশ্চাতে সর্ব্বভূতই বস্তুতঃ ব্রহ্ম। কারণ, ঐ আত্মপ্রতিষ্ঠা আছে বলিয়াই দেশ, কাল, নিমিত্তের থাকা সম্ভব হইয়াছে। ঐ অপরিবর্ত্তনশীল সর্ব্বব্যাপী অথচ অখণ্ড আধার যদি না থাকিত, তাহা হইলে দেশ, কাল, নিমিত্তের বিভাগ এবং নামরূপের খেলা সম্ভব হইত না। কিন্তু নিজে ঐ অক্ষরব্রহ্ম কিছুই করে না, কোন কিছুর কারণ হয় না, কোন কিছু সঙ্কল্প করে না। ইহা নিরপেক্ষ (impartial), সম, সকলকেই ধরিয়া আছে, কিন্তু কিছু বাছে না, কিছু উৎপাদন করে না। তাহা হইলে উৎপাদন করে কে, সঙ্কল্প করে কে, পরমপুরুষের দিব্য প্রেরণা দেয় কে? কর্ম্মকে যে পরিচালিত করে এবং অনন্ত সত্তা হইতে কালের মধ্যে কার্য্যতঃ বিশ্বলীলাকে প্রকট করে, সে কে? স্বভাবরূপে প্রকৃতি। পরাৎপর, ভগবান, পুরুষোত্তম রহিয়াছেন এবং তাঁহার অনন্ত অক্ষরতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার পরা অধ্যাত্ম শক্তির ক্রিয়াকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। ভগবান যে দিব্য সত্তা, চৈতন্য, ইচ্ছা বা শক্তির বিস্তার করিতেছেন,—যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ,—তাহাই পরা প্রকৃতি। ভগবান তাঁহার সত্তায় যাহা কিছু আপনা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া ধরেন এবং জীবের অধ্যাত্ম প্রকৃতি বা স্বভাবে প্রকট করেন, সে সবেরই মূল শক্তি ও সত্যটি আত্মা ঐ পরাপ্রকৃতিতে আত্মসম্বিতের আলোকেই দেখিতে পায়। প্রত্যেক জীবের অন্তর্নিহিত সত্য এবং মূল অধ্যাত্মতত্ত্ব, যাহা নিজেকে লীলার মধ্যে কার্য্যতঃ প্রকাশ করিয়া ধরিতেছে, সকলের মধ্যে যে মূল দিব্য প্রকৃতি সকল পরিবর্ত্তন, বিকৃতি, বিপর্য্যয়ের ভিতরেও নিত্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তাহাই স্বভাব।—স্বভাবের মধ্যে যাহা নিহিত আছে সে সব বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বিসৃষ্ট হইয়াছে, বিশ্বপ্রকৃতি যেন তাহা লইয়া পুরুষোত্তমের অন্তর্দৃষ্টির ছায়ায় যথাশক্তি ব্যবহার করে।—নিত্য স্বভাবের মধ্য হইতে, প্রত্যেক ভূতের মূল প্রকৃতি ও অধ্যাত্মসত্তার মধ্য হইতে, প্রকৃতি নানা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়া উহাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে,—নিজের নামরূপের সমস্ত পরিবর্ত্তনের খেলা, দেশ-কাল-নিমিত্তের পরিবর্ত্তনের খেলা প্রকট করিতেছে (৫)।

এই সব অভিব্যক্তি এবং অবস্থা হইতে অবস্থার পরিবর্ত্তন—ইহাই কর্ম্ম, প্রকৃতির ক্রিয়া। প্রকৃতিই কর্ম্মী, লীলাময়ী। স্বভাব যখন সৃষ্টিক্রিয়ায় নিজেকে বিস্তার করে (বিসর্গ), তাহাই কর্ম্মের প্রথম রূপ। সৃষ্টি দুই প্রকারের,—ভূত ও ভাব। সৃষ্টিতে যে সকল বস্তু আবির্ভূত হইতেছে, তাহারাই ভূত (ভূতকরঃ), এবং ঐ সকল বস্তু অন্তরে ও বাহিরে যে রূপ গ্রহণ করিতেছে তাহাই ভাব (ভাবকরঃ)। কালের মধ্যে নিয়ত এই সকল জিনিষেরই উৎপত্তি হইতেছে (উদ্ভব); কর্ম্মের সৃষ্টিশক্তিই এই উদ্ভবের মূল। প্রকৃতির শক্তিসমূহের পরস্পর সংযোগে এই সব পরিবর্ত্তনশীল লীলা প্রকট হইতেছে (অধিভূত)। ইহাই জগৎ, ইহাই জীবাত্মার চৈতন্যের বিষয়-বস্তু (the object of the soul's consciousness)। এই সমুদায়ের মধ্যে জীবাত্মাই দ্রষ্টা ও ভোক্তাস্বরূপ প্রকৃতিস্থ দেবতা। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের দিব্য শক্তিসমূহ,—জীবাত্মা আপন চৈতন্যময় সত্তার যে সকল শক্তির দ্বারা প্রকৃতির খেলাকে নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করে, তাহাদিগকে

---

(৫) দেশ ও কালের মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থার যে বিকাশ হইতেছে তাহাকেই আমরা নিমিত্ত (causality) বলি।

লইয়াই অধিদৈব। অতএব এই প্রকৃতিস্থ আত্মাই ক্ষর পুরুষ, ইহাই পরিবর্ত্তনশীল আত্মা, ভগবানের শাশ্বত কর্ম্মলীলা। এই আত্মা যখন প্রকৃতি হইতে সরিয়া ব্রহ্মে অবস্থিত, তখন ইহাই অক্ষরপুরুষ, অপরিবর্ত্তনশীল আত্মা, ভগবানের শাশ্বত নিষ্ক্রিয়তা। কিন্তু ক্ষরপুরুষের দেহ ও রূপের মধ্যে দিব্য পরম পুরুষ বাস করেন। মানুষের মধ্যে পুরুষোত্তম রহিয়াছেন, তাঁহাতে অক্ষর সত্তার শান্তি রহিয়াছে। আবার সেই সঙ্গেই তিনি ক্ষরলীলাও উপভোগ করিতেছেন। তিনি যে কেবল বিশ্বের অতীত এক পরম পদে আমাদের নিকট হইতে বহুদূরে রহিয়াছেন শুধু তাহাই নহে, তিনি এখানেও সর্ব্বভূতের দেহের মধ্যে রহিয়াছেন, প্রকৃতিতে এবং মানুষের হৃদ্দেশে বিরাজ করিতেছেন। এখানে তিনি প্রকৃতির কর্ম্মসমূহকে যজ্ঞরূপে গ্রহণ করিতেছেন এবং মানুষ সজ্ঞানে তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিবে সেই অপেক্ষায় রহিয়াছেন। কিন্তু সকল সময়ে, এমন কি মানুষের অজ্ঞান ও অহঙ্কারের মধ্যেও, তিনি মানুষের স্বভাবের অধীশ্বর এবং তাহার সকল কর্ম্মের প্রভু। তাঁহার অধ্যক্ষতাতেই প্রকৃতি ও কর্ম্মের ক্রিয়া চলে। তাঁহা হইতেই জীবাত্মা প্রকৃতির ক্ষরলীলায় আবির্ভূত হয়; অক্ষর আত্মপ্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া জীবাত্মা আবার তাঁহাতেই ফিরিয়া যায়, ভগবানের পরমপদ লাভ করে,—পরমং ধাম।

জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া মানুষ প্রকৃতি এবং কর্ম্মের ক্রিয়ার বশে জগৎ হইতে জগতান্তরে গমনাগমন করে। প্রকৃতিস্থ পুরুষ (Purusha in Prakriti), ইহাই তাহার সূত্র; তাহার মধ্যে আত্মা যাহা চিন্তা করে, যাহা ভাবে, যাহা করে সে সর্ব্বদা তাহাই হয়। পূর্ব্বজন্মে সে যাহা ছিল, যাহা করিয়াছে সেই সবের দ্বারাই তাহার বর্ত্তমান জন্ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আবার এই জন্মে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সে যেরূপ থাকিবে, যাহা ভাবিবে, যাহা করিবে সেই সবের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইবে যে, সে পরলোকে কি হইবে এবং পরজন্মেই বা কি হইবে। জন্ম যদি হয় "হওয়া" (becoming), তাহা হইলে মৃত্যুও "হওয়া," মৃত্যু কোন ক্রমেই ফুরাইয়া যাওয়া নহে। শরীর পরিত্যক্ত হয়; কিন্তু জীবাত্মা আপনার পথেই চলিতে থাকে (ত্যক্ত্বা কলেবরম্)। অতএব তাহার মহাযাত্রার সন্ধিক্ষণে সে কিরূপ থাকে তাহার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। কারণ যে-রূপ "হওয়া"র উপর তাহার চিত্ত মৃত্যুকালে নিবিষ্ট থাকে এবং মৃত্যুর পূর্ব্বেও সর্ব্বদা যাহার চিন্তায় পূর্ণ ছিল, তাহাকে সেই রূপই পাইতে হয়। যেহেতু প্রকৃতি কর্ম্মের দ্বারা জীবাত্মার চিন্তা ও শক্তি সকলের বিকাশ করে। বস্তুতঃ উহাই তাহার একমাত্র কাজ। অতএব, মানবাত্মা যদি পুরুষোত্তমের পদ লাভ করিতে চায়, তাহা হইলে দুইটি জিনিষের প্রয়োজন। দুইটি সর্ত্ত পূর্ণ করিতেই হইবে; তবেই উহা সম্ভব হইতে পারিবে। পার্থিব জীবনে তাহার সমগ্র অন্তর্জীবনকে ঐ আদর্শের দিকে গড়িয়া তোলা চাই; এবং মৃত্যুকালেও তাহার সেই আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষাকে ঐকান্তিক ভাবে ধরিয়া থাকা চাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "যে কেহ অন্তিমকালে আমাকে অনুস্মরণপূর্ব্বক তাহার দেহত্যাগ করিয়া গমন করে, সে আমার ভাব, অর্থাৎ পুরুষোত্তমের ভাব প্রাপ্ত হয়" (৬)। ভগবানের মূল সত্তার সহিত সে মিলিত হয়। তাহাই জীবাত্মার চরম গতি (পরো ভাব)। এইখানেই কর্ম্মের শেষ পরিণতি,—কর্ম্ম এখানে নিজের মধ্যে, আপনার উৎসে ফিরিয়া আসিয়াছে। বিশ্বলীলার মধ্যে আসিয়া জীবাত্মার মূল অধ্যাত্ম প্রকৃতি,—স্বভাব ঢাকা পড়িয়া যায়, তাহার চৈতন্যের অন্যান্য প্রতিভাসিক ভাবের বিকাশ হয়, —তম্ তম্ ভাবম্। জীবাত্মা যখন এই বিকাশের লীলা অনুসরণ করিয়া তাহার সকল প্রতিভাসিক ভাবের ভিতর দিয়াই চলিয়া আসিয়াছে, তখন সে তাহার সেই মূল প্রকৃতিতে ফিরিয়া যায়; এবং এইরূপে ফিরিয়া গিয়া তাহার প্রকৃত অধ্যাত্ম সত্তার—আত্মার, সন্ধান পায় এবং শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করে (মদ্ভাবম্)। এক হিসাবে বলিতে পারা যায় যে, সে তখন ভগবান হয়; কারণ, তাহার প্রতিভাসিক প্রকৃতি ও জীবনের চরম রূপান্তর সাধনের দ্বারা সে ভগবানের প্রকৃতির সহিতই মিলিত হয়।

এখানে গীতা মৃত্যুকালীন মনের ভাব ও চিন্তার উপর বিশেষ জোর দিয়াছে। গীতা কেন এইরূপ জোর দিয়াছে তাহা বুঝা কঠিন হইবে যদি আমরা চৈতন্যের আত্মসৃজনী শক্তি (self-creative power of consciousness) যাহাকে বলা যাইতে পারে সেই শক্তির পরিচয় না লই। চিন্তা, আন্তরিক ভক্তি, শ্রদ্ধা, পূর্ণ ও ঐকান্তিক সঙ্কল্পের

---

(৬) অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৮।৫

সহিত যাহার উপর নিবদ্ধ হয়, আমাদের অভ্যন্তরীণ সত্তারও তাহাতে পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা হয়। এই সম্ভাবনা নিশ্চিত শক্তিতে পরিণত হয় যখন আমরা সেই সকল উচ্চতর অধ্যাত্ম এবং আত্মবিকশিত অনুভূতিতে যাই যেগুলি আমাদের সাধারণ মনস্তত্ত্বের ন্যায় বাহ্য জিনিষের অধীন নহে (এই সাধারণ মনস্তত্ত্ব বাহ্যপ্রকৃতির অধীনতা-পাশে বদ্ধ)। সেখানে আমরা দেখিতে পাই যে, যাহাতে আমাদের মনকে নিবদ্ধ করিয়া রাখি এবং সর্ব্বদা যে দিকে উন্মুখ হইয়া থাকি, আমরা নিশ্চিতভাবে ক্রমশঃ তাহাই হইয়া উঠি। অতএব সেখানে চিন্তার কোন চ্যুতি, স্মৃতির কোন ভ্রংশতা হইলেই ঐ পরিবর্ত্তনের ব্যাঘাত হইবে, অথবা ইহার ক্রিয়ার কিছু অধঃপতন হইবে এবং আমরা যাহা ছিলাম আবার সেই দিকেই ফিরিয়া যাইব,—অন্ততঃ যতক্ষণ না মূলতঃ অনিবর্ত্ত্য ভাবে আমরা আমাদের নূতন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতেছি ততক্ষণ এরূপ অধঃপতনের আশঙ্কা আছে। যখন আমরা ঐরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছি, যখন উহা আমাদের সাধারণ অনুভূতি-উপলব্ধির বিষয় হইয়াছে, তখন উহার স্মৃতি আপনা হইতেই থাকে; কারণ, তখন উহাই হয় আমাদের চৈতন্যের স্বাভাবিক স্বরূপ। এই নরজীবন ছাড়িয়া যাইবার সন্ধিক্ষণে আমাদের মনের ভাব কিরূপ থাকে তাহার প্রয়োজনীয়তা এখন বুঝা গেল। কিন্তু সমস্ত জীবন মনে না করিয়া কেবল মৃত্যুকালে মনে করিলে, অথবা আমাদের সমস্ত জীবন ধরিয়া যথেষ্টভাবে প্রস্তুত না হইলে শুধু মৃত্যুকালীন অনুস্মরণ আমাদিগকে এইরূপ উদ্ধার করিতে পারে না। লৌকিক ধর্ম্ম সকল মুক্তিলাভের যে সব সহজ পথ দেখাইয়া দেয়, তাহাদের সহিত গীতার শিক্ষার সাদৃশ্য নাই। মৃত্যুকালে ধর্ম্মযাজক আসিয়া মুক্তির পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে, সারাজীবন পাপে কাটাইয়াও এইভাবে শেষকালে খ্রীষ্টানোচিত পবিত্র মৃত্যু ("Christian death") হইবে, অথবা পবিত্র কাশীধামে বা গঙ্গাতীরে মরিতে পারিলেই মুক্তিলাভের জন্য আর কিছুরই প্রয়োজন হয় না—এই সব অজ্ঞান কল্পনার সহিত গীতার শিক্ষা কোথাও মেলে না। যে দিব্য অধ্যাত্মভাবের উপর মনকে দৈহিক মৃত্যুর সময়ে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে,—যম্ স্মরন্ ভাবম্ ত্যজতি অন্তে কলেবরম্,—দৈহিক জীবনেও প্রতি মুহূর্ত্তে আত্মাকে অন্তরে সেই ভাবে গড়িয়া উঠিতে হইবে,—সদা তদ্‌ভাবভাবিতঃ (৭)। শ্রীগুরু বলিলেন—"অতএব সকল সময়ে আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর, কারণ যদি তোমার মন ও বুদ্ধি সকল সময়ে আমাতে নিবদ্ধ রাখিতে পার এবং আমাতে অর্পণ করিতে পার,—ময্যর্পিত মনোবুদ্ধিঃ,—তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি আমাতেই আসিবে। যেহেতু সর্ব্বদা যোগ অভ্যাসের দ্বারা অনন্যচিত্ত হইয়া তাঁহাকে ভাবিতে ভাবিতে লোক দিব্য পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হয়" (৮)।

এখানে আমরা এই পরম পুরুষের প্রথম বর্ণনা পাইতেছি,—ইনি ভগবান, ইনি অক্ষর অপেক্ষাও মহত্তর ও বৃহত্তর, গীতা পরে ইহাঁকেই পুরুষোত্তম নাম দিয়াছে। তাঁহার কালাতীত অনন্ততায় তিনিও অক্ষর এবং এই সব ব্যক্ত প্রপঞ্চের বহু উপরে; কালের মধ্যে আমরা তাঁহার সত্তার সামান্য আভাস মাত্র পাই নানা বিচিত্র রূপ ও ছদ্মবেশের মধ্য দিয়া (অব্যক্তোঽক্ষরঃ)। তথাপি তিনি শুধুই অরূপ অনির্দ্দেশ্য নহেন, অথবা তিনি কেবল এই জন্যই অনির্দ্দেশ্য যে, মানুষের মন যত বেশী সূক্ষ্মতার ধারণা করিতে পারে, তিনি তাহা হইতেও সূক্ষ্ম এবং ভগবানের রূপ আমাদের চিন্তার অতীত,—অণোরণীয়াংসম্ অচিন্ত্যরূপম্ (৯)। এই পরম পুরুষ পরমাত্মাই দ্রষ্টা, অতি পুরাতন। তাঁহার অনন্ত আত্মদৃষ্টি ও জ্ঞানে তিনিই সমগ্র বিশ্বের প্রভু এবং শাস্তা। তিনি তাঁহার সত্তার মধ্যে এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিয়াছেন,—কবিম্ পুরাণম্ অনুশাসিতারম্ সর্ব্বস্য ধাতারম্। বেদবিদ্‌গণ যে স্বয়ম্ভু অক্ষরব্রহ্মের কথা বলেন, এই পরমাত্মাই সেই ব্রহ্ম। যতিগণ তপস্যার দ্বারা মানসিক বিক্ষেপসমূহের উপরে উঠিয়া ইহাঁর মধ্যেই প্রবেশ লাভ করেন,—ইহাঁকেই পাইবার জন্য তাঁহারা

---

(৭) যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৮।৬

(৮) তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্য সংশয়ং ॥ ৮।৭
অভ্যাস যোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮।৮

(৯) কবিং পুরাণমনুশাসিতার
মণোরণীয়াং সমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ—
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৮।৯

ইন্দ্রিয়-সংযম অভ্যাস করেন (১০)। সেই অনন্ত সদ্বস্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গতি, স্থান, পদ (অতএব কালের মধ্যে জীবাত্মার যে বিকাশ হইতেছে, সেই বিকাশলীলার ইহাই পরম লক্ষ্য); কিন্তু ইহার মধ্যে কোন বিকাশের খেলা নাই, ইহা এক আদি, সনাতন, পরম অবস্থা বা স্থান,—পরমম্ স্থানম্ আদ্যম্।

যোগী অন্তিমকালে মনের যে ভাবে থাকিয়া জীবন হইতে মৃত্যুর ভিতর দিয়া এই পরম দিব্য স্থানে পৌছান, গীতা তাহারই বর্ণনা করিতেছে। অচঞ্চল মন, যোগবলে বলীয়ান্ আত্মা, ভক্তিতে ভগবানের সহিত যোগ, (জ্ঞানের দ্বারা নিরাকারের সহিত যোগ থাকে বলিয়া ভক্তিযোগ নিষ্প্রয়োজন হয় না, শেষ পর্য্যন্ত এই ভক্তি পরম যোগশক্তির অঙ্গরূপেই বিদ্যমান থাকে); এবং প্রাণশক্তি ভ্রূমধ্যে, দিব্যদৃষ্টির অধিষ্ঠানে সংগৃহীত (১১)। সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ হয়, মনকে হৃদয়ে নিরোধ করা হয়, প্রাণশক্তিকে বিক্ষেপ হইতে সংগ্রহ করিয়া মস্তকের মধ্যে সন্নিবেশিত করা হয়; বুদ্ধি ওম্ এই পবিত্র অক্ষরের উচ্চারণ এবং ইহার ভাব ধারণা করিতে এবং পরম পুরুষকে স্মরণ করিতে একাগ্র হয়, (মামনুস্মরণ্) (১২)। ইহাই দেহত্যাগের প্রচলিত যৌগিক পন্থা,—বিশ্বাতীত অনন্তের নিকট সমগ্র সত্তার শেষ সমর্পণ। তথাপি, ইহা কেবল একটি প্রক্রিয়া মাত্র; মূল প্রয়োজন হইতেছে, জীবনে, এমন কি, যুদ্ধ ও কর্ম্মের মধ্যেও, সর্ব্বদা অব্যভিচারী ভাবে ভগবানকে স্মরণ করা,—মাম্ অনুস্মর যুধ্য চ—, এবং সমগ্র জীবনযাত্রাকে বিরতিহীন যোগে পরিণত করা, (নিত্যযোগ) (১৩)। ভগবান বলিলেন, "যে ইহা করে সে অনায়াসে আমাকে লাভ করে; সেই মহাত্মাই পরম্ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় (১৪)।

এইরূপে জীব যখন দেহত্যাগ করিয়া যায়, তখন সে যে অবস্থায় পৌছায়, তাহা বিশ্বাতীত (Supracosmic) অবস্থা। বিশ্বপ্রপঞ্চে যে সকল উচ্চতম স্তরের জগৎ রহিয়াছে, সেখান হইতেও পুনর্জ্জন্মে ফিরিয়া আসিতে হয়; কিন্তু যে জীব পুরুষোত্তমে গমন করিয়াছে সে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য নহে (১৫)। অতএব জ্ঞানের দ্বারা অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া যে ফলই পাওয়া যাউক, অন্তর পূর্ণ উপাসনা জ্ঞান, কর্ম্ম ও প্রেমের সম্মিলনের দ্বারা সর্ব্বকর্ম্মের অধীশ্বর, সকল মানুষের ও সর্ব্বভূতের সুহৃদ স্বয়ম্ভূ ভগবানের উপাসনা করিয়াও সেই ফল পাওয়া যায়। তাঁহাকে এইরূপে জানায় এবং এইভাবে তাঁহার উপাসনা করায় পুনর্জন্মে বা কর্ম্মশৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হয় না; মরলোকের অনিত্য দুঃখময় অবস্থা হইতে (দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্) চিরন্তন মুক্তিলাভ করিতে জীবের যে আকাঙ্ক্ষা, জীব তাহা পূর্ণ করিতে পারে। জন্মান্তর-চক্র এবং সেই চক্র হইতে মুক্তিলাভ বিষয়ে আরও স্পষ্ট ধারণা দিবার জন্য গীতা এখানে জগৎচক্রের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতে যে মত সুপ্রচলিত ছিল তাহাই গ্রহণ করিয়াছে। অনন্তকাল ধরিয়া ক্রমান্বয়ে জগতের প্রকাশ ও লয় হইতেছে। জগৎ যে সময়ে প্রকট থাকে তাহাকে ব্রহ্মার দিবস বলা হয়, জগৎ যে সময়ে অপ্রকট থাকে তাহাকে ব্রহ্মার রজনী বলা হয়। কালের পরিমাণে উভয়েই সমান। ব্রহ্মার কর্ম্ম চলে সহস্রযুগ ধরিয়া, আবার ব্রহ্মার নিদ্রাও সহস্র নীরব যুগ (১৬)। দিবসাগমে ব্যক্ত বস্তু সকল অব্যক্তের মধ্য হইতে আবির্ভূত হয়, রাত্রি সমাগমে সকলে অদৃশ্য হয় বা অব্যক্তের

(১০) যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তৎ তে পদং সংগ্রহেন প্রবক্ষ্যে। ৮।১১

(১১) প্রয়াণকালে মনসাচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্। ৮।১০

(১২) সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্। ৮।১২
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।

(১৩) অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ। ৮।১৪

(১৪) মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ। ৮।১৫

(১৫) আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। ৮।১৬

(১৬) সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।

মধ্যে লীন হয় (১৭)। এইরূপে সর্ব্বভূত অবশভাবে প্রকাশ ও প্রলয়ের চক্রে ঘুরিতেছে ; পুনঃ পুনঃ তাহারা দিবসাগমে আবির্ভূত হইতেছে (ভূত্বা ভূত্বা), এবং অবিরত তাহারা রাত্রিসমাগমে অব্যক্তের মধ্যে ফিরিয়া যাইতেছে (১৮)। কিন্তু এই অব্যক্তই ভগবানের দিব্য আদ্য অবস্থা নহে। তাঁহার আর এক অবস্থা (ভাবোঽন্যঃ) আছে। বিশ্বের এই অব্যক্তাবস্থার উপরেও এক বিশ্বাতীত অব্যক্ত, তাহা অনন্তকাল স্বপ্রতিষ্ঠ, তাহা এই ব্যক্ত বিশ্বের বিপরীত অব্যক্ত নহে। কিন্তু ইহার বহু উপরে, ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, অপরিবর্ত্তনীয়, সনাতন,—সর্ব্বভূত বিনষ্ট হইলেও তাহা বিনষ্ট হয় না (১৯)। "তাঁহাকেই অব্যক্ত অক্ষর বলা হয়, তাঁহাকেই লোকে পরমাত্মা এবং পরমা গতি বলে। যাহারা তাঁহাতে পৌঁছায় তাহাদিগকে আর ফিরিতে হয় না ; তাহাই আমার পরম ধাম" (২০)। কারণ, যে জীবাত্মা সেখানে পৌঁছিয়াছে, সে বিশ্বের প্রকাশ ও প্রলয়চক্র হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছে।

জগৎ-চক্র সম্বন্ধে এই মত আমরা গ্রহণ করি আর না করি, ("অহোরাত্রবিদ্"গণের জ্ঞানের মূল্য আমাদের কাছে কতখানি তাহার উপরেই উহা নির্ভর করে) গীতা ইহাকে যেভাবে ব্যবহার করিয়াছে তাহাই দ্রষ্টব্য। সহজেই ধারণা হইতে পারে, এই যে সনাতন, অব্যক্ত সত্তা, যাহার পরম ভাবের সহিত বিশ্বের অভিব্যক্তি বা লয়ের কোনই সম্বন্ধ নাই বলিয়া মনে হয়, উহাই চির-অনির্দ্দেশ্য, অজ্ঞাত, নিরুপাধিক ব্রহ্ম ; এবং উহাতে পৌঁছিতে হইলে, জীবনলীলায় আমরা যাহা হইয়াছি, সেই সব বর্জ্জন করাই আমাদের পক্ষে প্রকৃত পন্থা। মনের জ্ঞান, হৃদয়ের ভক্তি, যৌগিক ইচ্ছা, জাগ্রত প্রাণশক্তি—এই সব সম্মিলিত ভাবে একাগ্র করিয়া উহার দিকে আমাদের সমগ্র আন্তর চেতনাকে লইয়া যাওয়া ঠিক পথ নহে। বিশেষতঃ যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সকল সম্বন্ধশূন্য, অব্যবহার্য্য, তাহার প্রতি ভক্তি প্রযুজ্য বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু, গীতা জোর দিয়াই বলিয়াছে, যদিও এই অবস্থা বিশ্বাতীত, এবং যদিও ইহা চির-অব্যক্ত, তথাপি "সেই পরম পুরুষকে অনন্য ভক্তির দ্বারাই লাভ করিতে হইবে, যাঁহার মধ্যে সর্ব্বভূত বিরাজ করিতেছে, যিনি এই সমগ্র জগৎকে বিস্তার করিয়াছেন (২১)।" অর্থাৎ এই পরম পুরুষ আমাদের মায়ার জগৎ হইতে দূরে অবস্থিত একেবারে সম্পূর্ণ সম্বন্ধশূন্য ব্রহ্ম নহেন। পরন্তু তিনি দ্রষ্টা, স্রষ্টা, এই জগৎসমূহের শাস্তা, কবিম্, অনুশাসিতারম্, ধাতারম্। তাঁহাকেই এক এবং সব, বাসুদেব. সর্ব্বমিতি, জানিয়া ও ভক্তি করিয়া, সকল বস্তু, সকল ঘটনা, সকল কর্ম্মে তাঁহার সহিত আমাদের সমগ্র চেতনাকে যুক্ত করিয়াই আমাদিগকে পরমা গতি, পূর্ণ সিদ্ধি, চরম মুক্তির সাধনা করিতে হইবে।

তাহার পরই আরও রহস্যময় এক সিদ্ধান্তের বর্ণনা। এইটি গীতা প্রাচীন বৈদান্তিক সাধকগণের (mystics) নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে। যোগী যদি পুনরায় মানবজন্ম গ্রহণ করিতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কোন্ সময়ে দেহত্যাগ করিতে হইবে, আর যদি পুনর্জন্ম এড়াইতে চান তাহা হইলে বা তাঁহাকে কোন্ সময়ে দেহত্যাগ করিতে হইবে, তাহারই বর্ণনা (২২)। অগ্নি ও জ্যোতিঃ, এবং ধূম বা কুহেলিকা, দিবস এবং রাত্রি, শুক্লপক্ষ এবং কৃষ্ণপক্ষ, উত্তরায়ন এবং দক্ষিণায়ন—এইগুলি পরস্পর বিপরীত। প্রথমগুলিতে দেহত্যাগ করিয়া ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, কিন্তু দ্বিতীয়গুলির দ্বারা যোগী চান্দ্রমস জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হন এবং পরে তাঁহাকে মানবজন্মে ফিরিয়া আসিতে হয় (২৩)। এই দুইটিই শুক্ল ও কৃষ্ণমার্গ। উপনিষদে এই দুইটিকে যথাক্রমে দেবযান ও পিতৃযান বলা হইয়াছে। যে

(১৭) অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে ॥ ৮।১৮

(১৮) ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ৮।১৯

(১৯) পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ৮।২০

(২০) অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৮।২১

(২১) পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ ৮।২২

(২২) যত্রকালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতবর্ষভ ॥ ৮।২৩

(২৩) অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়নম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ৮।২৪
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥ ৮।২৫

যোগী এই দুই মার্গের তত্ত্ব জানেন, তাঁহাকে আর কোন ভ্রমে পতিত হইতে হয় না (২৪)। এই তত্ত্বের পশ্চাতে জড়জগৎ ও মনোজগতের সম্বন্ধবিষয়ক যে কোন সত্য বা সঙ্কেত-সূত্রই থাকুক (২৫) (এই বিশ্বাস প্রাচীন সাধকদের যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে। তাঁহারা প্রত্যেক জড়বস্তুতে মনোজগতের প্রকৃত সঙ্কেত দেখিতেন। তাঁহারা সর্ব্বত্র ভিতরের সহিত বাহিরের, আলোকের সহিত জ্ঞানের, অগ্নির সহিত তপঃশক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া ও কতকটা ঐক্যও নির্ণয় করিতেন)—আমাদিগকে কেবল দেখিতে হইবে যে, গীতা এখানে কথাটিকে কি ভাবে ঘুরাইয়া শেষ করিয়াছে, "অতএব সকল সময়ে যোগযুক্ত থাক",—তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন।—

ফলতঃ, মূল কথা এই, সমস্ত সত্তাকে ভগবানের সহিত এক করা। এমন সমগ্র ভাবে এবং সর্ব্ব রকমে এক, যেন সর্ব্বদা স্বাভাবিকভাবে যোগযুক্ত হইয়া থাকা যায়। এবং এইরূপে সমগ্র জীবনটিকে, শুধু চিন্তা বা ধ্যানকে নহে, কিন্তু কর্ম্ম, প্রয়াস, যুদ্ধ সবকেই ভগবানের অনুস্মরণে পরিণত করা। "আমাকে স্মরণ কর আর যুদ্ধ কর", ইহার অর্থ অনন্তের নিত্য অনুস্মরণ যেন অনিত্য সংসারের দ্বন্দ্বের মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্যও হারাইয়া না যায়। এবং ইহা খুবই কঠিন, প্রায় অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। বস্তুতঃ ইহা কেবল তখনই সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হয় যদি অন্যান্য প্রয়োজনগুলি পূর্ণ করা হয়।—যদি আমরা আমাদের চেতনায় সকলের সহিত এক আত্মা হইয়া থাকি, সকল সময়ে আমাদের মনে থাকে যে সেই এক আত্মা ভগবান, এবং আমাদের চক্ষু ও আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বত্র ভগবানকে প্রত্যক্ষ ও অনুভব করে যেন কোন জিনিষকে কেবল বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বলিয়া কখনও ভুল করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়; পরন্তু ঐ বাহ্য রূপের মধ্যে ভগবানকে একই সঙ্গে প্রচ্ছন্ন ও ব্যক্ত দেখিতে পারি, এবং যদি আমাদের ইচ্ছা ভগবানের ইচ্ছার সহিত চেতনায় এক হয়, এবং আমাদের ইচ্ছার, মনের, শরীরের প্রত্যেক ক্রিয়া ঐ ভগবদিচ্ছা হইতেই আসিতেছে বলিয়া অনুভব করি,—উহা ভগবদিচ্ছারই ক্রিয়া, ভগবদিচ্ছায় অনুপ্রাণিত, অথবা তাহার সহিত একই বলিয়া উপলব্ধি করি, তাহা হইলে গীতা যাহা চাহিতেছে তাহা পূর্ণভাবে সম্পাদন করা যায়। তখন আর ভগবানের অনুস্মরণ মনের একটা সাময়িক ব্যাপার হয় না; পরন্তু তখন উহাই হয় আমাদের জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা এবং একভাবে আমাদের চেতনার সার বস্তু। তখন জীব তাহার স্বাধিকার লাভ করিয়াছে, পুরুষোত্তমের সহিত তাহার সত্য ও স্বাভাবিক সম্বন্ধ, অধ্যাত্ম সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে,—তখন আমাদের সমস্ত জীবনই যোগ, ভগবানের সহিত ঐক্য,—সে ঐক্য সিদ্ধ, আবার অনন্তকাল ধরিয়াই তাহা সাধিত হইয়া চলিয়াছে। (২৬)

(২৪) শুক্লকৃষ্ণে গতীহ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥ ৮।২৬
নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন॥ ৮।২৭

(২৫) যৌগিক অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় যে, এই তত্ত্বের পশ্চাতে জড়জগৎ ও মনোজগতের সম্বন্ধবিষয়ক একটা সত্য রহিয়াছে, যদিও তাহা সর্ব্বত্র খাটে না, যথা—অন্তরে আলোকের শক্তির সহিত অন্ধকারের শক্তির যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহাতে আলোকের শক্তিসমূহ বৎসরের এবং দিনের আলোর সময়ে অধিকতর প্রভাবশালী হয় এবং অন্ধকার শক্তিগুলির প্রভাব অন্ধকার সময়ে বর্দ্ধিত হয় এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত শেষ জয় লাভ না হয়, ততক্ষণ এইরূপ প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে।

(২৬) শ্রীঅরবিন্দের Essays on the Gita (Second Series) হইতে তাঁহারই অনুমত্যনুসারে অনুবাদিত। অনুবাদক—শ্রীঅনিলবরণ রায়।

ব্রতচারিণী

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(৪)

"এ কি জ্যোতি, শুধু ছাদে পড়ে রয়েছিস ? কাউকে বললে কেউ কি একটা মাদুরও দিয়ে যেত না ?"

মা কাহাকেও একটা মাদুর অথবা সতরঞ্চি আনিয়া দিবার আদেশ করিবার পূর্ব্বেই জ্যোতির্ম্ময় বাধা দিল, "থাক না মা, এই বেশ আছি। বেশীক্ষণ থাকব না, এখনই নেমে যাব। দরকার কি আর কিছু এনে। তুমি বস এখানে।"

ঈশানী বলিলেন, "কাঁকরগুলো যে গায়ে বিধছে বাবা ?"

জ্যোতির্ম্ময় হাসিয়া বলিল, "একটুও বিঁধছে না মা। তুমি এখানে বস, আমি তোমার কোলে মাথাটা রেখে খানিক চুপ করে শুয়ে থাকি।"

মা বসিয়া পুত্রের মাথা কোলে তুলিয়া লইলেন ; অন্য-মনস্কভাবে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। জ্যোতির্ম্ময় চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। আজ সন্ধ্যায় মাকে যে কথাটা নিশ্চয়ই বলিবে ভাবিয়াছিল, কেমন করিয়া সে কথা তুলিবে তাহাই সে ভাবিতে লাগিল।

মা শান্ত সুরে বলিলেন, "চাঁদ ডুবে গেল, অন্ধকার হয়ে এল জ্যোতি, আমার ঘরে চল না কেন ?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "না মা,...এই বেশ শুয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি। ও-দিকে বড় গোলমাল, ভাল লাগছে না। এখানে কোন গোলমাল নেই, বেশ নিশ্চিন্তে আছি।"

মা তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "আচ্ছা তবে আর খানিক থাক।"

জ্যোতির্ম্ময় একবার চোখ তুলিয়া দেখিল, মায়ের দৃষ্টি তাহারই মুখের উপর স্থাপিত। সে চোখ ফিরাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা মা, একটা কথা আজ কয়দিন জিজ্ঞাসা করব ভেবেছি, কিন্তু ভুলে যাই। যে মেয়েটি তোমার কাছে এসে আছে—"

বাধা দিয়া মা বলিলেন, "ওকে চিনিসনে জ্যোতি, কিন্তু নাম শুনেছিস তো, ওর নাম সীতা।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "তা আমি বুঝেছি। কিন্তু ও এখানে কেন এসে আছে মা, ওর কি কেউ নেই ?"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বেদনাভরা সুরে মা বলিলেন "কেউ থাকলে কি এখানে এসে থাকত জ্যোতি, হতভাগী সব হারিয়েছে, তোমার দাদু ওকে নিরাশ্রয়া দেখে নিয়ে এসেছেন।"

সীতার পরিচয় জ্যোতির্ম্ময় কতকটা জানিত, আজ বাকিটুকু শুনিল।

প্রকাশের বন্ধু ছিলেন বিনয় চট্টোপাধ্যায়। এই দুইটী বন্ধু পরস্পরকে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে ভালবাসিতেন। এই নিঃস্বার্থ ভালবাসার মধ্যে স্ত্রী পর্য্যন্ত স্থান পায় নাই। সেকালের গল্পের মত এই দুইটী বন্ধুর মধ্যে কথা ছিল, যাহার পুত্র হইবে, সে অপরের কন্যার সহিত বিবাহ দিবে। প্রকাশের বিবাহ বিহারীলাল পঠদ্দশায় দিয়াছিলেন। বিনয় পাঠ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই। প্রকাশ যখন মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন জ্যোতির্ম্ময় দুই তিন বৎসরের শিশু, বিনয়ের তখনও বিবাহ হয় নাই। ইহার তিন বৎসর পরে বিনয়ের বিবাহ হয় এবং কিছুদিন বাদে সীতা জন্মগ্রহণ করে। সীতা জ্যোতির্ম্ময়ের অপেক্ষা সাত আট বৎসরের ছোট ছিল।

প্রকাশ মৃত্যুকালে নিজের প্রতিজ্ঞার কথা পিতা ভ্রাতা ও স্ত্রীকে বলিয়া যান। প্রতাপ এই মেয়েটীকে জ্যোতির্ম্ময়ের ভাবী পত্নী রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সীতা যখন শিশু তখন তাহার মাতা মারা যান। বিপত্নীক বিনয় আর বিবাহ না করিয়া প্রতাপের ইচ্ছানুযায়ী কন্যাকে উপযুক্তরূপে শিক্ষা দিবার দিকে ঝুঁকিলেন। আজকালকার ছেলেরা শিক্ষিতা পত্নী পছন্দ করে, জ্যোতির্ম্ময়ও সেই দলের অন্তর্গত। সেকালের চালচলনে অভ্যস্ত বিহারীলাল প্রথমতঃ ভাবী নাতবউয়ের এরূপ শিক্ষায় আপত্তি তুলিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতাপ তাঁহাকে ভবিষ্যৎ বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিলেন।

সীতা যে বৎসর ম্যাট্রিক পাস করিল, সেই বৎসরই বিনয় ইহলোক ত্যাগ করিলেন। তিনি কলিকাতায় কোন আফিসে কায করিতেন,—আয় অপেক্ষা ব্যয় অনেক বেশী ছিল। দেশে পিসী মাসী প্রভৃতি যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সাহায্য পাওয়ার দাবী করিতেন, বিনয়ও যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। এই আয়ের অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্যই তিনি কন্যার জন্য দেনা ছাড়া আর কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। বিহারীলাল যে মুহূর্ত্তে এ সংবাদ পাইলেন, সেই মুহূর্ত্তে দেওয়ানকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন, এবং সমস্ত দেনা শোধ দিয়া সীতাকে রামনগরে লইয়া আসিলেন। মাত্র তিন মাস পূর্ব্বে এ ঘটনা ঘটিয়াছে। জ্যোতির্ম্ময় কলিকাতায় থাকিয়াও এ সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারে নাই। সে ও সীতা জন্মিবার পূর্ব্বে দুই বন্ধুর মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা সে পরে একটু আধটু শুনিয়াও হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। এবার এখানে আসিয়া আজকার মতই নিমেষের জন্য এই সুন্দরী তরুণীটিকে কয়েকবার সে সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়াছে, লজ্জায় সে কোন দিনই ইহার পানে ভাল করিয়া তাকায় নাই। ইহার সহিত তাহার বিবাহ দিবার জন্যই ইহাকে এখানে আনিয়া রাখা হইয়াছে মনে করিতে সমস্ত অন্তরটা তাহার বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। তাহাকে অভাগিনী ভাবিয়া পিতামহ ও মা দয়া করিতে পারেন, তাহাই বলিয়া জ্যোতির্ম্ময়ের সহিত যে তাহার বিবাহ দিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। যে বিবাহ করিবে তাহার দিকটাও দেখা দরকার।

মনে পড়ে—সীতাকে সে একবার দেখিয়াছিল, তখন সীতার বয়স খুবই কম। আজ সীতার কথা মনে করিতে মনে পড়ে সেই তখনকার আকৃতি। জ্যোতির্ম্ময় সবেগে মাথা নাড়িত,—না, তাই কি হয়, সীতাকে সে কিছুতেই বিবাহ করিতে পারিবে না।

ঈশানী অন্যমনস্ক ভাবে কোন দিকে চাহিয়া ছিলেন, জ্যোতির্ম্ময় একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কাত হইয়া শুইল। তাহার নিঃশ্বাসের শব্দে সচকিতা মাতা চক্ষু ফিরাইলেন। অন্ধকারে তখন চারিদিক পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। যে পথ দিয়া চাঁদ অস্ত গিয়াছে, সেই পথটী এখনও উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

"ঘরে চল জ্যোতি, বড় অন্ধকার হ'য়ে এল।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "অন্ধকার বেশ ভাল লাগছে মা, আলো দেখে চোখ যেন ঝলসে উঠেছে—তাই তো খানিক অন্ধকারে থাকব বলে এসেছি।"

উৎকণ্ঠিতা মাতা বলিলেন, "চোখ জ্বালা করে, চোখ ডাক্তারকে দেখাস নে কেন একবার?"

জ্যোতি হাসিয়া উঠিল। মায়ের হাতখানা চোখের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "ডাক্তারকে দেখালে ডাক্তার বলবে—চশমা নাও; চোখ খারাপ না হলেও বলবে চোখ খারাপ হয়েছে। তোমার ভয় নেই মা, আমার চোখ খারাপ হয় নি।"

মাতা বলিলেন, "তাই হোক। ভগবান তোকে ভাল রাখুন। তোর ধর্ম্মে মতি থাক, সব রকমেই তোর উন্নতি হোক, তাই আমি প্রার্থনা করি। আমার আর কি আছে জ্যোতি, তোকে ভাল দেখে যেতে পারলে আমি বাঁচি।"

তাঁহার গলার সুর ভারি হইয়া উঠিল।

দ্বিতল হইতে একটী অতি মধুর আহ্বান শুনা গেল, —"মা,—"

সচকিতা হইয়া ঈশানী বলিলেন, "ওই সীতা ডাকছে। সে প্রায়ই সন্ধ্যেবেলায় খানিকটা করে বই পড়ে। আজ তোর দাদু একখানা রামকৃষ্ণদেবের জীবনী এনে দিয়েছেন, সেইখানা পড়বে। তুইও চল না জ্যোতি, খানিকটা না হয় শুনবি।"

মাথাটা মায়ের কোল হইতে তুলিয়া উপুড় হইয়া দুইটা হাত সটান ভাবে রাখিয়া, তাহার উপর মুখখানা রাখিয়া শ্রান্তভাবে জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "তোমরা শোন গিয়ে মা, জীবনী পড়তে বা শুনতে আমার ভাল লাগে না। তোমার সঙ্গে আমার কয়টা কথা ছিল, ভেবেছিলুম আজ বলব, তা আর হয়ে উঠল না। থাক, এর মধ্যে একদিন বললেই হবে।"

উঠিতে উঠিতে উদ্বিগ্ন ভাবে মাতা বলিলেন, "তুই একলাটী এই অন্ধকারে ছাদে শুয়ে থাকবি?"

জ্যোতির্ম্ময় হাসিয়া বলিল, "তা হোক না মা, ভূতের ভয় যে করি নে তা তো জানো। তুমি যাও, আমি খানিক পরেই নেমে যাচ্ছি।"

চলিতে চলিতে পিছন ফিরিয়া ঈশানী ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "ভূতের ভয় না হয় নেই,—কিন্তু ওই কাঁকরের উপর শুয়ে থাকবি এমনি করে,—গায়ে বিঁধছে যে।"

"কিছু বিঁধছে না মা। আমি এখনই যাচ্ছি, তুমি যাও ততক্ষণ।"

মা চলিয়া গেলেন।

(৫)

দ্বিপ্রহরে নিজের ঘরের মেঝেয় একটা মাদুর বিছাইয়া ঈশানী শুইয়া পড়িয়াছিলেন। শেষ রাত্রির দিকটায় একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া মন বড় খারাপ হইয়া গিয়াছিল। আজ সকালে পূজায় বসিয়া অন্য দিনের চেয়ে সময় একটু বেশী লাগিয়াছিল। চোখের জলে পূজার ঘরের মেঝের খানিকটা তিনি ভিজাইয়া দিয়াছিলেন।

আজ তিনি অন্য দিনের চেয়ে অনেক বেশী কায করিতেছিলেন যাহাতে গত রাত্রের স্বপ্নের কথা মনে না পড়ে। [illegible]

জাগিতেছে, স্বপ্নটা সেই আশঙ্কারই রূপ প্রকাশিত করিয়াছে মাত্র।

তথাপি মন বুঝিতেছিল না,—তথাপি মনে হইতেছিল, ও যে শেষ-রাত্রের স্বপ্ন,—এ সময়কার স্বপ্ন প্রায়ই সত্য হয় যে।

কিছুতেই এ চিন্তাটাকে তিনি মন হইতে দূর করিতে পারিতেছিলেন না। 'ভাবিব না' ভাবিলেও, সেই চিন্তা মনে আসে।

তাঁহার বিষণ্ণ মুখখানা দেখিয়া সীতা অনেকবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তিনি তাহাকে স্বপ্নের কথা বলিতে পারেন নাই, বলিতে গিয়া তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

সীতা এতক্ষণ দাদুর মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিল, এটী তাহার প্রাত্যহিক কায। বিহারীলাল তাহার অপরিচিত ছিলেন না; বৎসরে যে দুই তিন বার তিনি কলিকাতায় যাইতেন, সীতার আতিথ্য তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইত। ছোটবেলায় সে প্রায়ই পিতার সহিত এখানে আসিত, বড় হইয়াও দু তিনবার আসিয়াছিল; জ্যোতির্ম্ময়ের সহিত বড় হইয়া তাহার আর দেখাশুনা হয় নাই। আগে ছোটবেলায় সে জ্যোতির সহিত খেলাধূলা করিত, অসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা বলিত। পিতার মৃত্যু সময়ে সে জ্যোতির সহিত নিজের বিবাহের কথা শুনিয়া লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর আশ্রয়ের জন্য তাহাকে এখানেই আসিতে হইল। লজ্জায় ঘৃণায় তাহার ক্ষুদ্র অন্তর তখন পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

সে আর জ্যোতির্ম্ময়ের সম্মুখে আসিতে পারে নাই, কথা বলা তো দূরের কথা। জ্যোতির্ম্ময় বাঁচিয়া গিয়াছিল। এবার বাড়ী আসিয়াই সীতাকে দেখিয়া তাহার চক্ষু স্থির হইয়া গিয়াছিল,—এইবারই বুঝি দাদু সীতাকে তাহার হস্তে সমর্পণ করেন। সে ভারি ভয়ে ভয়ে থাকিত, পাছে বিবাহের কথা উঠিয়া পড়ে।

সীতা একে একে কখন যে সংসারের সব কাজগুলি নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছিল তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। ঈশানীর নিত্য-নৈমিত্তিক কয়েকটী কায,—পূজার যোগাড় করিয়া দেওয়া, তাঁহার রন্ধনের যোগাড় করা—এ সব নিত্য সে ভোরে স্নান করিয়া নিঃশব্দে করিয়া রাখিত।

নূতন কয়েকটা কাযও সংসারে বাড়িয়াছিল, যথা,—আজকাল কেহ গায়ে মাথায় হাত না বুলাইয়া দিলে বিহারীলালের ঘুম আসে না। আহারের সময় ঈশানী বসিলে চলে না, সীতার বসা চাই,—আবার সে জেদ করিয়া না খাওয়াইলে সেদিনে তাঁহার পেট না কি ভরে না। সন্ধ্যাবেলা নিয়মিতভাবে রামায়ণ, মহাভারত, রামকৃষ্ণ কথামৃত, ভক্তিযোগ প্রভৃতি পড়া চাই; নহিলে সন্ধ্যা আর কাটে না। অথচ সীতা আসার আগে সব তাইতেই চলিত।

সীতা ভারি শান্ত প্রকৃতির মেয়ে ছিল। বেশী কথা সে কহিতে পারিত না, কিন্তু সুন্দর অধরোষ্ঠে হাসি তাহার সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকিত। বাড়ীর দাসদাসীরাও তাহাকে এই তিন মাসের মধ্যে গভীরভাবে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল, এটী শুধু তাহার সাম্যমূলক ব্যবহারের জন্য। সে বামুন ঠাকুরাণীর রন্ধনের তত্ত্বাবধান করিত, সকলের আহার্য্য সমানভাবে বণ্টন করিয়া দিত, কাযেই কেহ বেশী কেহ কম পাইত না। রাখাল এই মেয়েটীকে বড় ভালবাসিত। একদিন এই মেয়েটীই যে এই বিশাল সংসারের গৃহিণী হইবে অসঙ্কোচে সে এ কথা প্রকাশ করিত।

সীতা নহিলে বিহারীলালের একদণ্ড চলিত না। সীতার নিরুপম সৌন্দর্য্য, শিক্ষা, বিনয়, লজ্জা বিহারীলালের গর্ব্বের জিনিস ছিল। তিনি পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করিয়া সগর্ব্বে বলিতেন, "বুঝেছ হে, প্রকাশ আমার বড় বিচক্ষণ ছিল; ঠিক এমনিটী হবে জেনেই সে জন্মের আগে বিয়ের ঠিক করে রেখেছিল। সীতা নইলে আমার একটী দণ্ড চলে না তা তো তোমরা দেখতে পাচ্ছো। দিদির আমার শুধু রূপই নেই, গুণ রূপের চেয়ে অনেক বেশী। আমার অন্ধকার বাড়ীখানা তার হাসি দিয়ে সে উজ্জল করে রেখেছে।"

দাদুকে ঘুম পাড়াইয়া নিঃশব্দ-পদে সীতা দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিল। ক্ষমা দাসী কতকগুলা বাসন লইয়া, পাশ কাটাইয়া যাইতে গিয়া, দেয়ালে বাসনের গোছা লাগিয়া বাসনগুলি ঝন ঝন করিয়া পড়িয়া গেল। ক্ষমা অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি বাসন কুড়াইতে লাগিল। সীতা তাহাকে সাহায্য করিতে করিতে বলিল, "দুপুরবেলাটা একটু সাবধানে চলাফেরা করো, দাদুর খুব ঘুমটা এসেছে, নইলে এই শব্দে তাঁর ঘুম এখনি ভেঙ্গে যেত।"

ক্ষমা মুখখানা বিকৃত করিয়া ফেলিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। বিহারীলালের ঘরের দরজা একটু ফাঁক করিয়া সীতা দেখিল তিনি ঘুমাইতেছেন, বাসনের ঝন্‌ঝনানী শব্দেও তাঁহার ঘুম ভাঙ্গে নাই। নিশ্চিন্ত হইয়া সে ফিরিল।

ঈশানীর একটু তন্দ্রা আসিতেছিল, বাসনের শব্দে তাঁহার তন্দ্রা ছুটিয়া গিয়াছিল। সীতা গৃহে প্রবেশ করিতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পড়ে গেল মা?"

সীতা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া তাঁহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল, "ক্ষমা বাসন নিয়ে যেতে ধাক্কা লেগে সব পড়ে গিয়েছিল মা। আপনার বুঝি খুব ঘুম এসেছিল মা, শব্দে ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু দাদুর ঘুম এত শব্দেও ভাঙ্গেনি, খুব আশ্চর্য্য যা হোক।"

ঈশানী তাহার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া হাসিমুখে বলিলেন, "এমন ফুলের মত হাতের পরশ পেয়ে বাবার চোখে স্বর্গের ঘুম নেমে আসে, সে ঘুম কি সহজে ছোটে মা? থাক,—আমার গায়ে আর হাত বুলাতে হবে না;—এই একজনের সেবা করে এলে, এখন খানিকটা জিরিয়ে নাও।"

সীতা কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, মুখখানা তাহার লাল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "না মা, একে কি আর সেবা বলে? ভারি তো গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দেওয়া,—"

ঈশানী শান্ত হাসিয়া বলিলেন, "ভারি না হয় হাল্‌কাই হ'ল। তুমি এখন একটু বস মা, আমার গায়ে আর হাত বুলিয়ে দিতে হবে না, পাও টিপতে হবে না। তুমি সেলাই কর, আমি ততক্ষণ ঘুমাই।"

সীতা, একখানি খদ্দরের রুমাল সেলাই করিতেছিল। ইহাতে সে চারিদিকে সূতার ফুল তুলিতেছিল, সেগুলি বাস্তবিকই বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। স্কুলে সে নানাবিধ সূচীশিল্প শিক্ষা করিয়াছিল। এখানে এই তিন মাস আসিয়া শুধু গৃহকর্ম্ম করিয়াই সে নিশ্চিন্ত ছিল না, অবকাশ সময়ে অনেক জিনিস সে প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছিল। দাদুর রুমালের কষ্ট দেখিয়া সে তাঁহাকে কয়েকখানি রুমাল করিয়া দিবে প্রতিশ্রুত হইয়াছে, এই রুমাল তাহারই একখানি।

সীতা সেলাইয়ের বাক্স লইয়া ঈশানীর পার্শ্বে বসিল। ঈশানী অন্যমনস্কভাবে তাহার সেলাইয়ের পানে চাহিয়াছিলেন, কখন তাঁহার চোখ দুইটী আলস্য ভরে মুদিয়া আসিয়াছিল।

"মা—"

সেলাইয়ে নিবিষ্টমনা সীতা চমকাইয়া মুখ তুলিল,—সম্মুখে দরজার উপর দাঁড়াইয়া জ্যোতির্ম্ময়। সীতাকে দ্বিপ্রহরেও মায়ের কাছে থাকিতে দেখিয়া সে ভারি বিরক্ত হইয়াছিল। আশ্চর্য্য, কোন সময় মাকে তাহার নির্জ্জনে পাইবার যো যেন নাই। কোথা হইতে এই মেয়েটা আসিয়া তাহার মাকে যেন কাড়িয়া লইয়াছে।

তথাপি সে দাঁড়াইয়া রহিল, আশা ছিল—সীতা তাহাকে দেখিয়াই চলিয়া যাইবে।

সীতা সেলাই ফেলিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিতেছিল। ঈশানীর সামান্য তন্দ্রা ঘুচিয়া গেল, তিনি বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উঠে যাচ্ছো যে সীতা?"

উত্তর না পাইয়া তিনি মুখ তুলিতেই দরজার উপর দণ্ডায়মান জ্যোতির্ম্ময়কে দেখিতে পাইলেন। বলিলেন, "জ্যোতি এসেছে,—বেশ তো; ওকে দেখে তোমার ছুটে পালানোর তো দরকার নেই মা। মায়ের কাছে আসবার ওরও যেমন অধিকার আছে, মায়ের কাছে বসে থাকবার তোমারও তেমনি অধিকার আছে। আমি শুধু ওর একার মা নই মা, তোমারও মা। তুমি যেমন সেলাই করছো মা, তেমনি সেলাই কর। জ্যোতি এই দিকটায় বসবে, ওকে একখানা আসন দাও।"

সীতা তাহারই হাতের বুনা একখানা কার্পেটের আসন মায়ের অপর পার্শ্বে পাতিয়া দিয়া জড়সড় ভাবে তার এক-পার্শ্বে বসিয়া পড়িল।

জ্যোতির্ম্ময় আসনে বসিতে বসিতে কুণ্ঠিত মুখে বলিল, "তোমার সঙ্গে আমার দুটো কথা ছিল মা,—সে সব কথা আর কাউকে শুনানো আমার ইচ্ছা নেই,—গোপনীয় কথা।"

সীতা একবার চকিত দৃষ্টি ঈশানীর মুখের উপর ফেলিয়া নড়িয়া উঠিল; ঈশানী তাহার অঞ্চলটা হাতের মধ্যে লইয়া শান্তকণ্ঠে বলিলেন,—"এমন কিছু গোপনীয় কথা থাকতে পারে না জ্যোতি, যা সীতার সামনে বলা যায় না। তুমি অসঙ্কোচে তোমার কথা বল।"

জ্যোতির্ম্ময় নতমুখে অন্যমনস্কভাবে মায়ের পার্শ্বে মাদুরের উপর পতিত একটা কুটা অঙ্গুলী দ্বারা অল্পে অল্পে সরাইতে সরাইতে বলিল, "না মা, হতে পারে,—সীতার সামনে তোমার গোপন কথা কিছু না থাকলেও থাকতে পারে, তা বলে আমার এমন কথাও থাকতে পারে যা অসঙ্কোচে তোমাকেই বলতে পারি, আর কাউকে বলতে পারিনে।"

সীতার সমস্ত মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরের দিকে চলিয়া গেল।

ঈশানী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পুত্রের মুখের উপর ফেলিয়া বলিলেন, "এমন কি গোপনীয় কথা আছে জ্যোতি, যা আমি ছাড়া আর কেউ শুনতে পাবে না?"

কথাটা মুখে আসিতে আসিতে কতবার ফিরিয়া গেল, কিন্তু না বলিলেও যে নয়। এতদূর অগ্রসর হইয়া আসিয়া আর পিছাইতে পারা যায় না, পিছাইলে যে তাহারই দারুণ ক্ষতি।

সে একবার মুখ তুলিয়া মায়ের পানে চাহিল। মা অপলক দৃষ্টিতে তাহারই পানে চাহিয়া আছেন দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি চোখ নামাইয়া লইল। সকল জড়তা ঝাড়িয়া ফেলিয়া সঙ্কোচ লজ্জা দূর করিয়া ফেলিয়া দৃঢ়স্বরে সে বলিল, "তোমরা যে কেন পরের মেয়ে সীতাকে ঘরে এনে রেখেছ, আর কেন যে তার বিয়ে দিচ্ছ না, তা বুঝতে পারছিনে মা। আমার আশায় যদি তার বিয়ে না দিয়ে থাক, তবে ভুল করেছ; কারণ, আমি তাকে কখনই বিয়ে করতে পারব না।" কি সুস্পষ্ট অথচ সরল কথা। ঈশানী স্তম্ভিত ভাবে জ্যোতির্ম্ময়ের পানে তাকাইয়া রহিলেন। জ্যোতির্ম্ময় যে মায়ের সম্মুখে স্পষ্টভাবে এমন কথা বলিতে পারিবে, তাহা ঈশানী কখনও আশা করেন নাই।

"তুই কি বলছিস জ্যোতি, তোর কথা আমি কিছুমাত্র বুঝতে পারছিনে। যা বলবি—একটু স্পষ্ট করে খুলে বল।"

প্রথমটায় কোনও একটা কথা বলিতে যতটা সঙ্কোচ বোধ হয়,—একবার কোনও ক্রমে বলিয়া ফেলার পরে আর ততটা সঙ্কোচ থাকে না। জ্যোতির্ম্ময় প্রথম ধাক্কাটা সামলাইয়া লইয়া মুখ তুলিল,—শান্তভাবে বলিল,—"ভাল করেই তো বলছি মা, সীতাকে আমি বিয়ে করতে পারব না।"

আহতা জননী স্থির দৃষ্টি পুত্রের মুখের উপর রাখিয়া

বলিলেন, "কেন তাকে বিয়ে করতে পারবিনে,—তার মধ্যে কোনও ত্রুটী দেখতে পেয়েছিস কি ?"

জ্যোতির্ম্ময় মাথা নাড়িল, "কিছু না মা,—সে জন্যে যে আমি বিয়ে করব না তা তো না। তুমি তো জানো— আমি দাদার সামনে মোটে কথা বলতে পারিনে। তোমায় বলছি—তুমিই কথাটা দাদুকে বলো।"

ঈশানী বলিলেন, "আমি পারব না জ্যোতি,—এ কথা আমি তাঁর সামনে মুখে আনতে পারব না। তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ,—তিনি—আমার স্বর্গগত স্বামী তাঁর বাপকে যা বলে গেছেন মৃত্যু সময়ে,- তিনি সে কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন। তুমি জানো—তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন! বাবা জানেন—মৃতের প্রতিজ্ঞা তাঁকেই রাখতে হবে। আমার কথা বলবে? আমিও সেই আদেশ পালন করতে—"

তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

জ্যোতির্ম্ময় তেমনই শান্তকণ্ঠে বলিল, "সীতার বিয়ের জন্যে তোমাদের কাউকে কিছু ভাবতে হবে না মা। তোমরা অনুমতি দাও, আমি পাত্র ঠিক করে দিচ্ছি। আমাদের নিখিলেশ—এবারে সে স্কলারশিপ পেয়েছে,—যাতে সে সীতাকে বিয়ে করে আমি তার চেষ্টা করব। আমি কোন কারণে বিয়ে করতে পারব না মা; আমায় এজন্য মাপ কর।"

তাহার চোখ দুইটী ছল ছল করিয়া উঠিল।

মায়ের হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। তিনি কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "কিন্তু আমি যদি জানতে চাই কোন্ কারণে তুই সীতাকে বিয়ে করতে চাসনে, তা কি আমায় জানাতে পারবিনে জ্যোতি?"

জ্যোতির্ম্ময় মুখ ফিরাইয়া বলিল, "বলব মা, সমস্ত কথাই তোমায় আমি বলব। তোমার কাছে কখনও কোন কথা গোপন করিনি মা, আজও করব না। আমার বিলাত যাওয়ার কথা—"

ব্যগ্রভাবে ঈশানী বলিলেন, "তা'হলে এ কথা সত্য; কিন্তু এ কথা তো আমায় জানাসনি জ্যোতি!"

"না মা, বলিনি, বলতে সাহস করিনি—তাই। কিন্তু ভেবেছিলুম তোমায় সব কথা বলব, কারণ তোমায় না বললে—তোমার আশীর্ব্বাদ না পেলে আমি কোন কাযেই সিদ্ধিলাভ করতে পারব না। মনে করে দেখ মা,—আমি অনেক দিন আগে একদিন তোমার মুখে সীতাকে বিয়ে করবার কথা শুনে আপত্তি করেছিলুম, এ পর্য্যন্ত বরাবরই আপত্তি করে আসছি, কিন্তু আমার কথা তোমরা শুনেও শোননি। আজ আমি সাহস করে স্পষ্ট বলছি—সীতাকে আমি বিয়ে করব না, করতে পারব না। আমি স্বীকার করছি—সীতা সব বিষয়েই শিক্ষিতা, কিন্তু মা,—আমি সীতার উপযুক্ত নই।"

ঈশানী পুত্রের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "তুই তার উপযুক্ত নোস, এ কথা বলিসনে বাবা। আমি জানি—সীতার যদি কেউ স্বামী হওয়ার যোগ্য হয়,—তবে সে তুই। তোর মাথার মধ্যে অনেক কল্পনা ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওসব ছেড়ে দে জ্যোতি; ওতে নিজেও কষ্ট পাবি, আমাদেরও কষ্ট দিবি। হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্ম্ম নিয়ে, ব্রাহ্ম মেয়ে বিয়ে করে—"

"এ কথা যদি তুললে মা, তবে এর শেষ করে দেওয়াই ভাল,—"

জ্যোতির্ম্ময় মুখ তুলিল। কণ্ঠে জড়তা আসিয়াছিল, জোর করিয়া সে জড়তা দূর করিয়া সে বলিল, "অনেকটা সত্য মা, ওর মধ্যে মিথ্যে যদিও আছে—কিন্তু তা খুব কম। আমায় ক্ষমা কর মা,—আমি তোমার বড় অভাগা সন্তান, তোমায় বড় কষ্ট দিচ্ছি।"

মায়ের কোলের মধ্যে মুখখানা লুকাইয়া রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল, "মিথ্যা কথা বলতে কখনও শিক্ষা দাওনি মা, তোমার ছেলে কখনও মিথ্যা কথা বলেনি! যদি বিলাতে না যেতে পাই, তবে দেবযানীকে আমি বিয়ে করতে পারব না। আমার জীবনটাই যে তা'হলে মিথ্যে হয়ে গেল মা।"

আজ বড় দায়ে পড়িয়াই—যে কখনও বিবাহের কথা মায়ের সম্মুখে উচ্চারণ করে নাই, আজ সে নিজের গোপন ভালবাসার কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলিল। তাহার বিলাত যাওয়ার মূলে কি আছে তাহা জানিতে পারিয়া জননী শক্ত হইয়া গেলেন।

অনেকক্ষণ ঈশানী কথা বলিতে পারিলেন না। তাঁহার দৃষ্টি সম্মুখে দেয়ালের গায়ে বিলম্বিত রাধাকৃষ্ণের ছবির পানে পড়িয়াছিল। আর্ত্তভাবে প্রাণটা বুকের মধ্যে লুটাপুটি খাইয়া কাঁদিতেছিল,—এ কি পরীক্ষায় ফেলিলে ঠাকুর?—একদিকে পুত্রের সারা জীবনটা ব্যর্থ করিয়া

দেওয়া, এ কি কোন মায়ে জানিয়া-শুনিয়া পারে? অপর দিকে ও কি ভীষণ দৃশ্য,—কি ভীষণ কল্পনা!

তিনি আর চাহিতে পারিলেন না, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ফেলিলেন; তাঁহার মুদ্রিত নেত্রকোণ বাহিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রুজল ঝরিয়া জ্যোতির্ম্ময়ের মাথার উপর পড়িতে লাগিল। জ্যোতির্ম্ময় মায়ের শান্তিময় বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া নিঃশব্দে কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলিল। সামান্য দুই একটী কথার মধ্য দিয়াই তাহার অন্তরের নিরুদ্ধ আবেগ আজ সে মায়ের কাছে ব্যক্ত করিয়া ফেলিতে পারিয়াছে,—বেদনামিশ্রিত আনন্দে হৃদয়খানা ভরিয়া উঠিতেছিল।

"জ্যোতি,—"

জ্যোতির্ম্ময় চমকাইয়া মুখ তুলিল।

আর্দ্রকণ্ঠে ঈশানী বলিলেন, "আমায় আর কোন কথা বলিসনে বাবা। আমার সকল আশার শেষ হয়েছে, বেশ বুঝেছি—আমার সামনে জেগে আছে নিকষ-কালো অন্ধকার। নারায়ণ আমায় এ কি কঠিন পরীক্ষায় ফেলিলেন,—"

দুই হাতে তিনি মুখ ঢাকিলেন।

উত্তেজিত জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "নারায়ণ কি করতে পারবে মা? নারায়ণ কিছু দেয়নি—কিছু দেবে না, কিছু করেনি—কিছু করবে না—কারণ নারায়ণ নামটা থাকলেও আসলে কেউ নেই; ওসব তোমাদের মিথ্যে ধারণামাত্র।"

ঈশানীর মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিল, বিকৃত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "অমন কথা মুখে আনিসনে জ্যোতি। নিজে সকল বিশ্বাস হারিয়েছিস,—স্রোতের মুখে কুটোর মত ভেসে চলেছিস,—প্রবৃত্তি দমন করতে যে সংযমের আবশ্যক, তা তোর এতটুকু নেই। ঘর ছেড়ে বাইরের পানে লক্ষ্য রেখে পাগলের মত ছুটছিস,—আসল জিনিস পায়ের চাপে গুঁড়িয়ে ধূলো হয়ে যাচ্ছে। সামনে তোর তৃষ্ণার সুশীতল জল রয়েছে, তোর তৃষ্ণা তাতে মিটল না;—তুই সে দিকে না চেয়ে আকণ্ঠ তৃষ্ণা বুকে নিয়ে হাহাকার করে মরীচিকার পেছনে ছুটছিস,—জানি নে তোর এ তৃষ্ণা জীবনে সুদীর্ঘকালেও মিটবে কি না। সোণা ফেলে রাংতা কুড়াতে যাস নে রে,—আপনার জনকে দূরে ফেলে পরকে আপন করতে যাস নে। মনে রাখিস রক্তের টানই আসল, আর যা তা সবই মৌখিক। দুনিয়ায় আর কেউ আপন হবে না, কেউ আপনাকে নিঃস্ব করে তোকে ভরিয়ে রাখতে চাইবে না,—সবাই তোর কাছ হতে নিতে চাইবে—নেবেও তাই। যদি তোকে উচ্চশিক্ষা দেওয়ার সুযোগ না দেওয়া হতো, তা হলে নিজের ধর্ম্মকে, নিজের ঠাকুর দেবতাকে কি এমন করে অবিশ্বাস করতে পারতিস রে? তোর উচ্চশিক্ষা তোর জীবনে কিছুমাত্র সফলতা দিতে পারে নি, তোকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারে নি,—আমি দেখছি, তোকে দিন দিন অধঃপতনের পথে নিয়ে যাচ্ছে। যে শিক্ষা নিজের ধর্ম্মের ওপরে; দেবতার ওপরে বিতৃষ্ণা ধরিয়ে দেয়, আপনার জনকে পর করে দেয়, তাকে তোরাই উচ্চশিক্ষা বলতে পারিস, আমি পারি নে রে,—আমি পারি নে। এই শিক্ষাই মায়ের বুক হ'তে ছেলেকে কেড়ে নেয়, বুড়ো ঠাকুরদার একমাত্র অবলম্বনকে—"

বলিতে বলিতে হঠাৎ উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদিয়া ফেলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িয়া দ্রুত বাহিরে চলিয়া গেলেন।

আজ বড় আঘাত পাইয়াই তিনি অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন যাহা তাঁহার স্বভাবের বহির্ভূত ছিল। কখনও তিনি কাহারও সম্মুখে চোখের জল ফেলিতে পারেন নাই, লোকের সম্মুখে চোখের জল ফেলা তিনি বড় লজ্জার কথা মনে করিতেন। জ্যোতির্ম্ময়ের কথা শুনিয়া বুকে তিনি বড় আঘাত পাইয়াছিলেন। প্রথমটা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, তাহার পর নাড়া পাইয়া তাঁহার বেদনা মুখে হঠাৎ উছলাইয়া পড়িল। চোখের জল ফেলিব না ভাবিয়াও তিনি তাহা সামলাইতে পারিলেন না।

অভিমানে দুঃখে সারা হৃদয়খানা তাঁহার যেন শতধা হইয়া যাইতেছিল। কে সে দেবযানী, কতখানি শক্তি আছে তাহার? তাহার মোহাকর্ষণ কি এতই বেশী - যাহার কাছে মা, স্নেহময় দাদু, ধর্ম্ম—সবই তুচ্ছ, সবই হেয়? দেবযানীকে পাইবার জন্য সে মা, দাদু ও ধর্ম্ম সবই ত্যাগ করিতে প্রস্তুত?

হায় রে পুত্র! ইহারই জন্য তিনি অন্তরে এত ব্যাকুলতা, এত অস্থিরতা, এত বেদনা অনুভব করেন? এই পুত্রের পত্র পাইতে দুই দিন বিলম্ব হইলে তিনি চোখের জলে ঠাকুরঘরের মেঝে ভিজাইয়া দেন? কই,—সে তো তাঁহাকে চায় না; মায়ের চেয়ে সে যে দেবযানীকেই বেশী ভালবাসে!

"নারায়ণ,—"

ঈশানী বারাণ্ডার ধারে থামের আড়ালে বসিয়া পড়িয়া নিঃশব্দে চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন।

(৬)

কলিকাতা হইতে জরুরী পত্র আসিয়াছে, আগামী কল্য প্রভাতেই জ্যোতির্ম্ময়কে বাড়ী হইতে রওনা হইতে হইবে। অধ্যাপক সুরেশবাবু তাহাকে বার বার অনুরোধ করিয়াছেন,—তাহার কল্য পৌছান চাই-ই।

ঈশানীর মুখের হাসি আজ কয়দিন হইতে একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, বিষণ্ণতা তাঁহার মুখের উপর আজ কয়দিন হইতে সমভাবে জাগিয়া আছে। সীতা কয়েক বার তাঁহার বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—শরীর ভাল নাই বলিয়া ঈশানী তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

সমস্ত দিন নীরবে তিনি গৃহকর্ম্ম করিয়াছেন, পুত্রের আবশ্যক দ্রব্যাদি নিজের হাতে গুছাইয়া দিয়াছেন, তাহার পর সন্ধ্যার সময় কাপড় কাচিয়া আসিয়া পূজার ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন, এখনও বাহির হন নাই।

কাল সকালে কলিকাতায় যাইতে হইবে। এখানে থাকিয়া পরাধীনতার দুঃসহ কষ্ট জ্যোতির্ম্ময়কে অহরহ পীড়ন করিলেও—কাল হইতে সে যে আবার মুক্তিলাভ করিবে—ইহাতে যতটা আনন্দ পাইবার কথা, ততটা আনন্দ সে কিছুতেই পাইতেছিল না। আজ তাহার এই পল্লীগ্রাম, মায়ের কোল ছাড়িয়া যাইতে অন্তরের কোন নিভৃত স্থানে ব্যথা বাজিয়া উঠিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল—সে আর এখানে ফিরিতে পাইবে না, এই যেন তাহার একেবারে যাওয়া। পল্লীর বুকে তেমনি করিয়া প্রভাতে নূতন সৌন্দর্য্য ফুটিবে, বাতাস আসিয়া সবুজ পাতায় দোল দিয়া কৌতুক ভরে খেলিবে, এমনি করিয়া চাঁদের শুভ্র সুন্দর আলো পল্লীর বুকের উপর শুভ্র আচ্ছাদনের মত ছড়াইয়া পড়িবে, সে আর দেখিতে পাইবে না।

আজ শুক্লা চতুর্দ্দশীর রাত্রি; প্রায় পূর্ণাকারে শুভ্র চাঁদ আকাশের গায়ে ভাসিয়া উঠিয়াছে, তাহার উজ্জ্বল আলো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আজ বাড়ী হাসিতেছে, পথ হাসিতেছে, গাছ লতা ফুল সব হাসিতেছে; অদূরে বসন্তের নদীর বুকে আলোর তুফান আসিয়াছে। আজ সব আলো,—চাঁদের আলো যাহা কিছু স্পর্শ করিয়াছে তাহাই হাসিতেছে।

জ্যোতির্ম্ময়ের প্রাণে আনন্দ ছিল না,—বিরস মনে, উদাস চোখে সে শুধু দেখিয়া যাইতেছিল। বহুদূরে কোন্ কৃষকের কুটীর হইতে বাঁশীর সুর বাতাসে দুলিতে দুলিতে ভাসিয়া কাণে আসিতেছে। সে যেন বড় করুণ, যেন কাঁদিয়া কাহাকে বিদায় দিতেছে। এই চিরপরিচিত সব—সব থাকিবে, থাকিবে না শুধু একলা সে, কতদূরে—কোথায় সে চলিয়া যাইবে কে জানে। অন্তরে কে আঘাত করিতেছিল, কে ডাকিয়া বলিতেছিল, দেখিয়া লও,—তোমার আর দেখা হইবে না।

এ কাহার কথা,—কে গো অন্তরবাসী তুমি, এ কথা বলিতেছ কেমন করিয়া? তাহার ঘর এইখানে, তাহার মা এইখানে, তাহার দাদু এইখানে,—যাহা কিছু তাহার আপনার সবই যে এইখানে, সব বিসর্জ্জন দিয়া সে যাইবে—কোথায় যাইবে, কেন যাইবে?

কিন্তু না যাইলেও যে সব যায়। তাহার দেবযানী, সে অন্যের হইবে,—জ্যোতির্ম্ময় তাহা কেমন করিয়া সহ্য করিবে? যাহাকে সে পাইত—যে তাহারই জন্য প্রতীক্ষায় ছিল, তাহাকে সে এমন করিয়া হারাইবে?

অন্তরের পানে সে চাহিল। দেবযানীহীন জীবন—সে কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে? কোন আশা নাই, উন্নতি নাই,—জীবন্মৃত অবস্থায় বাঁচিয়া থাকা অসহ্য।

ফাল্গুনের মধুময় বাতাস—নীচে বাগানে প্রস্ফুটিত লেবু-ফুল, হেনা-ফুলের সুন্দর গন্ধ লইয়া মাতামাতি করিয়া বেড়াইতেছিল। দ্বিতলে সীতার ঘরে সেতারে ঝঙ্কার উঠিল। তাহার সহিত অতি কোমল একটু সুর মিশিয়া গেল। সে কণ্ঠস্বর সীতার।

সীতা গাহিতেছিল—

যতবার আলো জ্বালাতে চাই নিভে যায় বারে বারে,
আমার জীবনে তোমার আসন গভীর অন্ধকারে।

বড় করুণ সুরে সীতা গানটী গাহিতেছিল। সে সুর তাহার চোখের জলে সিক্ত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ঊর্দ্ধে উঠিতে-ছিল, কাঁপিতে কাঁপিতে নীচে নামিতেছিল।

সেতারটা বাড়ীতে অনেক কাল হইতে পড়িয়া আছে।

প্রতাপ বিশেষ সখ করিয়া এটী কিনিয়াছিলেন। বেশী দিন তিনিও ইহা ব্যবহার করিতে পান নাই। জ্যোতির্ম্ময় যখন বাড়ী আসিত, তখন মাঝে মাঝে ইহাতে সুর দিত। কিন্তু সে সুর দেওয়াই মাত্র,—কারণ, গান সে অত্যন্ত ভালবাসিলেও নিজে কখনও গাহিতে পারে নাই।

পল্লীগ্রামের নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—জ্যোৎস্নালোকে সীতার মধুর কণ্ঠে গানটী বড় সুন্দর শুনাইতেছিল। জ্যোতির্ম্ময় অলস ভাবে দেহখানা এলাইয়া দিয়া এক মনে গানটী শুনিতেছিল।

জ্যোতির্ম্ময় এখানে আসা পর্য্যন্ত সীতা একদিনও গান গাহে নাই,—আজ ঈশানীর একান্ত আগ্রহে সে সেতার লইয়া বসিয়াছে। গান গাহিবার মত শক্তি তাহার আজ ছিল না, কণ্ঠে সুর ফুটিতেছিল না, মুখে ডাক ফুটিতেছিল না, তবু সে জোর করিয়া গান গাহিতে গেল। আনন্দের গান গাহিতে গিয়া আজ বুক ভাঙ্গা বেদনার উচ্ছ্বাস বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া আসিল;—আত্মহারা সে গাহিতে লাগিল—

যে লতাটী আছে শুকায়েছে মূল,
কুঁড়ি ধরে যার নাহি ফল ফুল,
আমার জীবনে তব সেবা তাই বেদনার উপচারে।

গাহিতে গাহিতে তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল; ঈশানীকে গোপন করিবার জন্যই সে মুখখানা নীচু করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিল।

অদূরে ঈশানী একখানা আসনের উপর বসিয়া গান শুনিতেছিলেন। তাঁহার বুকের মধ্যে জমাটবাঁধা বেদনা—গান শুনিতে শুনিতে বিগলিত হইয়া উঠিতেছিল,—দুই চোখ দিয়া তাঁহারও জলধারা গড়াইতেছিল।

এই গানের মধ্যে প্রতি কথায় গোপন বেদনাই প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। প্রভু, এমন অদৃষ্ট দিয়াই পাঠাইয়াছ,—অন্ধকারে আলো জ্বালা আর হইল না। তোমার আসন অন্ধকারেই পাতা রহিল। অন্ধকারে পথ চিনিয়া আসিতে পারিবে কি গো? দূর হইতে এত অন্ধকার দেখিয়া হয় তো ফিরিয়া যাইবে,—তোমার সেবার জন্য এই যে বেদনাভরা উপচার—সব ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

ঘুরিয়া ফিরিয়া গানটা দুই তিনবার গাহিয়া সীতা চুপ করিল; সেতার থামিয়া গেল।

চোখ মুছিতে মুছিতে ঈশানী ডাকিলেন,—"সীতা!"

সীতা সজল চোখ দুইটী তাঁহার মুখের উপর রাখিয়া আর্দ্রকণ্ঠে উত্তর দিল, "কেন মা?"

"তুমি এ গান গাচ্ছো কেন মা,—এ গান তো তোমার উপযুক্ত নয়। এ গান আমারই অন্তরের কথা ব্যক্ত করছে।—যার সব শেষ হয়ে গেছে, যার ঘর বার সব অন্ধকার হ'য়ে গেছে, তারই কথা বলছে,—এ তো তোমার মত বালিকার উপযুক্ত গান নয় মা,—তোমার সামনে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল আলোতে পূর্ণ, তুমি সেই গান কর মা। এ রকম গান আর গেয়ো না,—এ সুর তোমার মুখে মানায় না, অন্য গান—যাতে মনে বেশ স্ফূর্ত্তি আসে সেই রকম গাও।"

অন্য দিকে চাহিয়া উদাসভাবে সীতা বলিল, "আর কি গান গাইব মা, আমি যে অন্য গান জানিনে।"

বড় গোপনে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে আবার সেতারে সুর দিল।

ঈশানী রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "যার যা তাই সাজে আমার বুকে বড় ব্যথা, তাই কথা বলতে গেলে ব্যথাই ফুটে বার হয়। আমার চারিদিককার আলো নিভে গেছে মা, আমার পেছনে অন্ধকার, সামনে অন্ধকার, ওপরে—নীচে সব অন্ধকারে ঘেরা; এই নিকষ-কালো অন্ধকারের মধ্যে একা আমি দাঁড়িয়ে। হাঁফিয়ে উঠছি—কিন্তু কেউ নেই যে আমায় আলো দেখায়, আমায় পথ চিনায়। কেউ নেই যে আমার হাত ধরে নিয়ে যায়। সময় সময় দুই হাতে এই বুকখানা এমনি করে চেপে ধরে আর্ত্তভাবে কেঁদে বলি—নারায়ণ, আর কত পরীক্ষা করবে,—আমার সকল শক্তি যে অন্তর্হিত হয়েছে গো। আর না—আমার ক্ষুদ্র জীবনটা একেবারেই শেষ করে দাও,—আমায় আর অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখ না।"

দারুণ মর্ম্মবেদনায় কণ্ঠরোধ করিয়া দিয়াছিল যাহাতে খানিকক্ষণ তিনি আর কথা বলিতে পারিলেন না।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বেদনাকে উড়াইয়া দিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া তিনি বলিলেন, "কিন্তু তুমি কেন মা, তুমি কেন ভাবছ তোমার সামনেও অন্ধকার তুমি মা পেছনে অন্ধকার ফেলে এসেছ সামনে তোমা

উজ্জ্বল আলোকময় ভবিষ্যৎ! তুমি তার দিকে চাও,—অন্তর তোমার সেই আলোকে ভরিয়ে ফেল। কেন তুমি সেই অতীতের অন্ধকারের পানে চাইবে?"

কেন? এ কেনর উত্তর দিতে গিয়াও যে দিতে পারা যায় না। সীতার অধরোষ্ঠ দুটি কাঁপিতে লাগিল। সে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইয়া সম্মুখে জানালা পথে বাহিরের জ্যোৎস্নাসিক্ত প্রকৃতির পানে চাহিল। চোখ ভরিয়া জল আসিয়াছিল, পলকের পর পলক ফেলিয়া সে চোখের পাতার জলটুকু শুষিয়া ফেলিল।

দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, কর্ত্তাবাবু দিদিমণিকে ডাকিতেছেন, এখনই যাওয়া চাই।

নিরানন্দের মাঝখানে আনন্দের গান গাহিবে কি করিয়া সীতা, তাই ভাবিতেছিল। এ যেন নিদাঘশেষে নব-বসন্তের আবাহন করা। দারুণ তাপে যখন গাছের ফুলের কুঁড়ি বিকশিত না হইতে খসিয়া পড়িয়াছে, সবুজ পাতা শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, তখন জোর করিয়া সেই গাছকে সবুজ পাতায় ও ফুলে সাজাইয়া দেওয়া। এ কি হয়? যে ফুল শুকাইয়া গিয়াছে, তাহাকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলা মানুষের কায নয়।

দাদু ডাকিতেছেন শুনিয়া সে মনে মনে ভারি খুসী হইয়া উঠিল। সেতার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "আগে দাদুর কথা শুনে আসি মা, নইলে তিনি রাগ করবেন। ফিরে এসে না হয় গান করব এখন।"

শুষ্ক হাসির ক্ষণিক রেখা মুখে ফুটাইয়া তুলিয়া ঈশানী শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, "তার পর তুমি যে গান করবে তা আমি বেশ জানি মা। বাবা আজ যখন এমন অসময়ে বাড়ীর মধ্যে এসেছেন, তখন নিশ্চয়ই একটা না একটা কিছু যে হয়েছে তা বুঝতে পারছি। অমনি এখনই যে তোমায় ছেড়ে দেবেন না এও জানা কথা। আচ্ছা মা, তুমি যাও—আমি ততক্ষণ শুয়ে পড়ি গিয়ে।"

সীতা বলিল, "এখনই শুতে যাচ্ছেন মা, জ্যোতিদার খাওয়া দাওয়া—"

"তার এখনও ঢের দেরী আছে, সে এখনি খাবে না। আজ আমার শরীরটাও বড় খারাপ বোধ হচ্ছে, খানিক ঘুমাতে পারলে একটু শান্তি পাব এখন। তুমি এসে আমায় যদি ঘুমাতে দেখ—ডেকে দিয়ো।"

তিনি উঠিয়া পড়িলেন, সীতাও বাহির হইল।

মুক্ত ছাদে জ্যোৎস্নালোকে জ্যোতির্ম্ময় দাঁড়াইয়া ছিল, সীতাকে দেখিয়া সে সরিয়া গিয়া গৃহের ছায়ায় অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইল। সীতা একবার চোখ তুলিয়া দেখিল, তখনই চক্ষু নত করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন এম-এ

ভারতবাসীর নিরানন্দ প্রকৃতি

ইয়োরোপে, বিশেষতঃ ইংলণ্ডে, এরূপ একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে যে, ভারতবাসী স্বভাবতঃ একটু অতিমাত্রায় উদাস, নির্ব্বিকার, বিমর্ষ-চিত্ত;—তাহার প্রাণে আনন্দ নাই, মুখে প্রাণ-খোলা হাসি নাই। ছোট-বড় অনেক ইংরাজ লেখক এ কথার পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়া ইহাকে একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ সত্যে পরিণত করিয়াছেন। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর লর্ড রোণাল্ডশেও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তিনি তাঁহার "ইণ্ডিয়া" নামক গ্রন্থে এ কথার কেবলমাত্র পুনরাবৃত্তি* করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই,—ভারতবাসীর এই বিচিত্র চিত্তবৃত্তির কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তিনটী সুদীর্ঘ পরিচ্ছেদ লিখিয়া ফেলিয়াছেন!

কথাটা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারিলেও,

* "A generalisation which has often been made is that a certain submissive sadness is characteristic of the people of India,......Writers upon India whose works are world-famed have given expression to this generalisation—Sir Edwin Arnold, for example, in the oft-quoted lines;

হয় ত আংশিকভাবে সত্য। রোগ, শোক, দৈন্য যাহাদের চিরসহচর, সমাজ ও রাজশক্তির বহুশতাব্দীব্যাপী কঠোর শাসনে যাহাদের জীবন নিষ্পেষিত, সেই সর্ব্বতোভাবে পরাধীন, মরণোন্মুখ জাতির প্রাণে যে আনন্দের নিতান্ত অভাব ঘটিবে তাহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু এই নিরানন্দ ভাব ভারতবাসীর প্রকৃতিগত বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। যে শ্রেণীর বিদেশী রাজপুরুষ ও পর্য্যটক এই তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, ভারতবাসীর চরিত্রের প্রকৃত পরিচয় পাইবার সুযোগ তাঁহাদের ঘটিতে পারে না। বিজাতীয় শাসক-সম্প্রদায়ের সমক্ষে প্রবল আত্মসম্মানজাত একটা কুণ্ঠিত ঔদাস্যের আবরণে পরাধীন জাতি তাহার নিজস্ব চরিত্রকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, এবং এই আবরণ সরাইয়া পরস্পরকে চিনিবার আগ্রহ কোন পক্ষেই দেখা যায় না।

বিরুদ্ধ মত

তথাপি যে কয়জন ইংরাজ ভারতবাসীর সহিত সরলভাবে অবাধে মিশিয়াছেন তাঁহাদের মত বিভিন্ন। এই শ্রেণীর মধ্যে একজনের নাম এখানে উল্লেখ করিতেছি। অধ্যাপক এডওয়ার্ড টম্‌সন বহুকাল এ দেশে থাকিয়া অধ্যাপকতা করিয়াছেন এবং বাঙ্গালীর ভাষা ও বাঙ্গালীর জীবন সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। ইনি বাঙ্গালা সাহিত্য সংক্রান্ত কয়েকখানি গ্রন্থ ও বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন এবং এক্ষণে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপকতা করিতেছেন। সেখানকার নব-প্রতিষ্ঠিত "India Society"র মুখপত্র "Indian Art and Letters" নামক সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত "Some Vernacular characteristics of Bengali Literature শীর্ষক প্রবন্ধে টমসন সাহেব প্রসঙ্গক্রমে উপরিউক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন।*

বিদেশীয়ের সমক্ষে ভারতবাসী আজ যে কৃত্রিম বিষণ্ণতা ও সঙ্কোচের মুখোস পরিয়া বাহির হয়, পূর্ব্বকালে তাহার প্রয়োজন ছিল না। তখন তাহাদের প্রাণে আনন্দ ছিল, আমোদ-প্রমোদের নানারূপ অনুষ্ঠান ছিল, এবং মুক্ত কণ্ঠের উচ্চ হাস্যে হৃদয়ের আনন্দ প্রকাশিত হইত।

আনন্দস্পৃহা মানুষের স্বাভাবিক

বস্তুতঃ মানুষ মাত্রেই সুখের কাঙ্গাল, সকলেই সুখের সন্ধানে নানাদিকে ছুটিতেছে। জীবনে রোগ, শোক, দুঃখের অভাব নাই; তাহারই ভিতরে যতটুকু অবসর পাওয়া যায়, আনন্দের আস্বাদ লইবার জন্য সকলেই ব্যগ্র। দর্শন-শাস্ত্রে যে আনন্দের বিশ্লেষণ ও বর্ণনা আছে তাহার কথা বলিতেছি না,—সংসারাবর্ত্তে ঘূর্ণ্যমান সাধারণ মানবের আয়ত্তাধীন যে পার্থিব আনন্দ তাহার কথা হইতেছে।

আনন্দের প্রকাশ হাস্যে

এই আনন্দের অনুভূতি হইলে, তাহা হাস্যের ভিতর দিয়া আত্ম-প্রকাশ করে। হাস্য মানুষের দেহ ও মনের স্বাভাবিক এবং সাধারণ ক্রিয়া। মানুষ মাত্রেই হাসিতে জানে এবং হাসিতে চায়। এমন কি, আনন্দের আতিশয্যে পশুদের মুখেও হাসি ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়। সুতরাং কোন জাতি বা সম্প্রদায়-বিশেষকে নির্দ্দেশ করিয়া বলা যায় না যে, তাহারা হাস্য রসে বঞ্চিত বা স্বেচ্ছায় পরাঙ্মুখ। অবশ্য এমন কোন-কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের পূর্ব্বে অভ্যুদয় হইয়াছিল, এবং হয় ত এখনও আছে, যাহাদের বিশ্বাস যে, হাস্য মাত্রেই রুচিবিরুদ্ধ এবং চপলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচায়ক। কিন্তু দেখা যায় যে এরূপ বিচিত্র ও কৃত্রিম মত প্রায় সকল স্থলেই সমাজ-প্রচলিত দুর্নীতি ও অনাচারের বিরুদ্ধে সাময়িক প্রতিবাদ রূপে গৃহীত ও প্রচারিত হইয়াছে,—তাহাতে মানব-চরিত্রের কোন স্থায়ী পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, ঘটিতে পারেও না।

The East bowed low before the blast
in patient, deep disdain;
Let the legions thunder past then
turned to thought again."
("India: A Bird's eye View" by the Earl of Ronaldshay, chap. xxii. P. 275.)

* "I cannot understand how the legend grew up ... The traveller who puts this statement in his book—who says, as one famous pilgrim to India has said, that you never see a smile from end to end of the country—cannot have ever been a man of any agility of movement. He cannot, for instance, have ever turned round quickly to see the people he had

এই হাস্যপ্রিয়তা অবশ্য সকল জাতির মধ্যে সমান পরিমাণে বর্ত্তমান নাই। প্রধানতঃ দেশের জলবায়ু এবং প্রকৃতির বিভিন্নতার জন্য হাস্যপ্রবণতার ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। শীত-প্রধান উত্তর ইয়োরোপ অপেক্ষা নাতিশীতোষ্ণ দক্ষিণ-ইয়োরোপের অধিবাসিগণ অধিক আমোদপ্রিয়,—এবং এই তারতম্যের হেতু সম্পূর্ণ নৈসর্গিক। ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজ-শক্তির প্রভাবও অল্প নহে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেও মানুষের হাস্য-প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটে। কোন জাতি যেমন ক্রমশঃ সভ্যতার উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিতে থাকে, ততই নানারূপ কৃত্রিম নিয়মের বেষ্টনে জাতীয় জীবন সংযত ও সঙ্কীর্ণ হইতে থাকে। ফলে সেই জাতির হৃদয়োচ্ছ্বাসের সহজ উদ্দাম গতি বাহিরের প্রতিবন্ধকে প্রতিহত হইয়া সঙ্কুচিত হইয়া যায়। স্বভাবের শিশু ভীল-সাঁওতাল যেরূপ আমোদে মাতিয়া আত্মহারা হইতে পারে, ইয়োরোপীয় সভ্যতার যন্ত্রচালিত নরনারী সে আনন্দে বঞ্চিত। কিন্তু সভ্যতার প্রভাবে এই যে ক্ষতিটুকু হয়, অপর দিক দিয়া তাহার পূরণ হইয়াও কিছু লাভ থাকে।

হাস্যের প্রকারভেদ

হাস্যের উদ্দীপনা দুই বিভিন্ন প্রকারে হইয়া থাকে। প্রথম, স্থূল বহিরিন্দ্রিয়ের অনুভূতির দ্বারা। নৃত্য, সঙ্গীত, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী বা মুখ-বিকৃতি, মাতাল বা পাগলের প্রলাপ প্রভৃতির দ্বারা প্রবল হাস্যের উদ্রেক হইতে পারে; এবং তাহা বালক-বৃদ্ধ স্ত্রী-পুরুষ, মূর্খ-পণ্ডিত সকলেই প্রায় সমান ভাবে উপভোগ করিতে পারে। গায়ে কাতুকুতু বা সুড়সুড়ি দিলেও তাহাই হয়। আবার বঙ্গ-পল্লীর শ্যালিকা-সম্প্রদায় যে সকল কৌতুককর কৌশলে (practical jokes) নূতন জামাতাকে বোকা বানাইয়া আমোদ উপভোগ করেন (যথা পানের কৌটায় তেলাপোকা রাখিয়া), তাহাও এই পর্য্যায়ভুক্ত।

হাস্যরস

দ্বিতীয় উপায়ে যে হাস্যের উদ্রেক হয়, তাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, মানসিক বৃত্তির সাহায্যে তাহার উপলব্ধি হয়। ইহাই প্রকৃত হাস্যরস (Humour)। যে ব্যক্তির মনোবৃত্তি সমধিক উন্নত, সাধারণ সামগ্রী, ঘটনা বা মানব-চরিত্র হইতে হাস্যের উপাদান সংগ্রহ করিবার উপযোগী সূক্ষ্মদৃষ্টি ও কল্পনা-শক্তি আছে, এবং ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা আছে, তিনিই হাস্যরসের সৃষ্টি করিতে পারেন। আর সেই ভাষার ভিতর দিয়া যিনি সহজে রসের সন্ধান করিয়া লইতে পারেন, তিনি প্রকৃত রসগ্রাহী। সাধারণ লোকের ভিতর রসসৃষ্টির শক্তি অতি বিরল। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির স্বাভাবিক উন্মেষ এবং অভিজ্ঞতা ও সংসর্গের ফলে সকলেরই রসগ্রহণের ক্ষমতা জন্মিতে পারে। তথাপি অনেক শিক্ষিত, বুদ্ধিমান লোকের মধ্যেও এই রসবোধের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বালক ও অশিক্ষিত ব্যক্তিও উচ্চ'ঙ্গের হাস্য-রসিকতার মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ।

প্রথম প্রকরণে যে সহজ হাস্যের সৃষ্টি হয়, সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্থূলতা প্রতিপন্ন হইয়া ক্রমশঃ তাহা অনাদৃত ও শিষ্টসমাজ হইতে যতদূর সম্ভব নির্ব্বাসিত হইতে থাকে, এবং উচ্চ রসজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হাস্যরস তাহার স্থান অধিকার করিয়া লয়। ইহাতে সভ্য মানব-সমাজের লাভ,—মানুষের রুচি পরিমার্জ্জিত হইয়া একটা শিষ্ট উন্নত রসজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা এবং সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি।

সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরস

বস্তুতঃ সকল উন্নত সাহিত্যেই হাস্যরসের স্থান অতি উচ্চে। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের মতে নবরসের মধ্যে হাস্য-রসের দ্বিতীয় স্থান,—শৃঙ্গার বা আদিরসের পরেই। কিন্তু মনে হয়, হাস্যরসকে এত উচ্চ স্থান দিয়াও তাহার মর্য্যাদা সম্যকরূপে রক্ষা করা হয় নাই। এই রসের উৎপত্তি, লক্ষণ প্রভৃতি সম্বন্ধে অলঙ্কার-শাস্ত্রে যেরূপ লেখা হইয়াছে, তাহাতে ইহাকে উচ্চ অঙ্গের রস বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। সাহিত্য দর্পণে আছে,—

"বিকৃতাকারবাগবেশচেষ্টাদেঃ কুহকাদ্ভবেৎ।
হাসো হাস্যস্থায়িভাবঃ শ্বেতঃ প্রমথদৈবতঃ॥"

—বিকৃত আকার, বাক্য, বেশ ও চেষ্টাদি কুহক হইতে হাস্যরসের উদ্ভব হইয়া থাকে; অর্থাৎ নট বাক্য, বেশ ও আকৃতি প্রভৃতির বিকৃতি করিয়া অভিনয় করিলে এই রসের উৎপত্তি হয়। কিন্তু ইহা ত কেবলমাত্র বহিরিন্দ্রিয়কে অবলম্বন করিয়া অতি স্থূলভাবে প্রাকৃতজনের মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টা মাত্র। যে হাস্য-রস-জ্ঞান (Sense of humour) হইতে রসসৃষ্টি হইয়া মানুষের অন্তরেন্দ্রিয়ে

ন্দর হিল্লোল তুলিয়া দেয়, এখানে তাহার স্থান ায় ?

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারে অমূল্য রত্নরাজির মধ্যে উচ্চ অঙ্গের হাস্য-রচনার নিতান্ত ব। কাব্য গ্রন্থগুলি আদি, বীর, অথবা করুণ-রস-ন; তাহাতে হাস্য রসের বিশেষ স্থান নাই। নাট্য-য় প্রয়োজন বশতঃ হাস্যরসের অবতারণা হইয়াছে কিন্তু তাহা প্রায় সকল নাটকেই একরূপ, বিশেষ কোন লকতা দেখা যায় না। এই রসের প্রবর্ত্তক রাজ-বয়স্য বা ষক দরিদ্র ব্রাহ্মণ, সুতরাং উদর-পরায়ণ। ভোজনের ন্দ এবং স্থূল গ্রাম্য রসিকতা ভিন্ন হাস্যরস-সৃষ্টির অন্য ন উপাদানই তাহার আয়ত্তাধীন নহে। বহু উদ্ভট বিতায় এবং অন্যান্য গ্রন্থের স্থানে স্থানে সরস কৌতুকের vit) অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু হাতে বিদ্যুৎ-দীপ্তির ন্যায় হাস্যরসের ক্ষণিক বিকাশ মাত্র খা যায়,—রসের স্থায়ী সঞ্চার ঘটিতে পারে না। সংস্কৃত হিত্যে হাস্যরসের এই দৈন্য কিরূপে ঘটিল, তাহার অনু-্ধান হওয়া আবশ্যক। এ প্রবন্ধে তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইয়া ড়, এবং লেখকেরও এ দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার াগ্যতা নাই। তবে এরূপ মনে হয় যে, অলঙ্কার-শাস্ত্রের ঠোর অনুশাসনের ভারে পীড়িত হইয়া কবি-প্রতিভার ব-নব রস-সৃজন-শক্তি সঙ্কুচিত, সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। াচীন হিন্দী সাহিত্যেরও যে এইরূপই পরিণাম ঘটিয়াছিল, াহারও স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

ভারতের অন্যান্য আর্য্যভাষার প্রাচীন সাহিত্যের কথা ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের যেরূপ প্রাচুর্য্য দেখা যায়, তাহাতে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। এই হাস্যরসের মিশ্রণে প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থগুলি সরস ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা করিলে তিনটী প্রধান লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা এই সাহিত্যকে একটা বিশিষ্টতা দান করিয়া অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্য হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। প্রথম গার্হস্থ্য-ভাব (Domestic হাস্যরস (Humour)। এগুলি কেবল সাহিত্যের লক্ষণ নয়, বাঙ্গালী জাতিরও লক্ষণ বটে। কারণ সাহিত্য জাতির চরিত্রের অভিব্যক্তি ভিন্ন আর কিছু নহে।

বাঙ্গালীর হাস্যরস-জ্ঞান

শেষোক্ত লক্ষণটীর আলোচনা করিলে বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রের একটা প্রধান অংশের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়,—তাহা বাঙ্গালীর হাস্যরস-জ্ঞান (Sense of humour)। হয় ত ইহাও তাহার সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা মাতৃভূমিরই স্নেহের দান। এমন ঐশ্বর্য্যশালিনী মায়ের সন্তান যে, তাহার কোন অভাব, কোন দুঃখই ছিল না। সংসারক্ষেত্র তাহার নিকট শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিত প্রমোদ-উদ্যানের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। এত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য তাহার জীবনকে সুখময়, হাস্যময় করিয়া তুলিয়াছিল। তাই তখন বাঙ্গালী প্রাণ খুলিয়া হাসিতে জানিত এবং নানা দিক হইতে নূতন নূতন হাস্যের উপকরণ সংগ্রহে অবসর-বিনোদন করিত। প্রধান অপ্রধান কোন ঘটনা বা বস্তুই তাহার কৌতূহলী দৃষ্টিকে এড়াইতে পারিত না। এই প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া বাঙ্গালী তাহার ভাষাকে এক নূতন আকারে গড়িয়া তুলিয়াছে। নিতান্ত সহজ সরল ভাবকেও এমন একটা শ্লেষ বা বক্রোক্তির দ্বারা ব্যক্ত করিবার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, যাহা বাঙ্গালা ভাষায় এক নূতন প্রকাশ-ভঙ্গীর প্রবর্ত্তন করিয়া তাহাকে সরস, সজীব করিয়া তুলিয়াছে। ব্যঙ্গ-প্রিয়তা যেমন বাঙ্গালীর মজ্জাগত, শ্লেষাত্মক রীতিও তেমনি বাঙ্গালা ভাষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বাঙ্গালীর চরিত্র ও সাহিত্যের এই লক্ষণ হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, তাহার দোষ-গুণ বিচার ও বিশ্লেষণ করিবার শক্তি আছে এবং তাহা প্রকাশ করিবার উপযোগী ভাষা আছে।

এই ত গেল উদ্দেশ্যহীন নির্দ্দোষ হাস্যের কথা। ক্রোধ, ঘৃণা, ঈর্ষা প্রভৃতি মনোভাব ব্যক্ত করিতেও কঠোর পরুষ ভাষার পরিবর্ত্তে শ্লেষাত্মক বিদ্রূপ-বচনের প্রয়োগে বিপক্ষকে এককালীন জর্জ্জরিত ও হাস্যাস্পদ করিয়া ছাড়িয়া দিবার কৌশলও বাঙ্গালীর নিতান্ত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অপরের দেহে অস্ত্রাঘাত করিতে গেলে তাহার বিনিময়ে আপন দেহেও আঘাত গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়,—ঢিলটী মারিলে পাটকেলটীও সহিতে হয়। ব্যঙ্গ-রূপ

তীক্ষ্ণ অস্ত্র-চালনা করিতে বাঙ্গালী যেমন শিখিয়াছে, তেমনি তাহা সহ্য করিতেও শিখিয়াছে।

টম্‌সন সাহেব পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে এই সকল কথার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"The Bengali intellect is in essentials remarkably like our own ; and in (one respect) …it is more like our own than any other in the world. I refer to the prevailing irony of Bengali literature.…Now, irony is so much prevalent in Bengali literature that it may almost be called *the* differentia of that literature.

"I suppose, since the world's beginning, there has never been a nation so consistently given to mischief ; even when they seem most angry and in earnest, as a rule fifty per cent. is genuine indignation and fifty per cent. just fun and sarcasm.…this irony can…give to literature that edge and salt which Indian literature so often lacks. It has always been present in Bengali literature.

"Now this prevailing irony means this, that in the national temperament there are the roots from which criticism can grow.… Where humour and irony are so abundant—where the people can so quickly see a joke, even a joke at their own expense,…—clearly the critical faculty must be abundant also."

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রেণী বিভাগ

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের নিম্নরূপ শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে :—

(১) অনুবাদ গ্রন্থ ; সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থাদির বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ,—যথা রামায়ণ, মহাভারত, মার্কণ্ডের চণ্ডী।

(২) মঙ্গল-গান ও দেবদেবীর কীর্ত্তি-গাথা ; যথা ধর্ম্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল, শিবের গান, সূর্য্যদেবের গান, লক্ষ্মী-চরিত, সরস্বতী-চরিত, সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

(৩) গীতিকথা ; অর্থাৎ ঐতিহাসিক বা কিম্বদন্তী-মূলক ঘটনা বা জীবনী অবলম্বনে রচিত গীতিকাব্য,—যথা গোরক্ষ-বিজয় বা মীনচেতন, গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্র রাজার গান।

(৪) বৈষ্ণব-পদাবলী ; অর্থাৎ চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রমুখ বৈষ্ণব মহাজনগণ-রচিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গীতি-কবিতা।

(৫) ধর্ম্মগ্রন্থ ;—শূন্যপুরাণ প্রভৃতি বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ, ভক্তি-রসাম্বিকা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতি বৈষ্ণব ধর্ম্মগ্রন্থ। চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব ভক্তগণের চরিতাবলীও এই শ্রেণীর ভিতর ধরা যায়।

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে হাস্যরসের পরিমাণ

এক্ষণে দেখা যাউক কোন্ শ্রেণীর গ্রন্থাবলীতে কিরূপ হাস্যরসের সমাবেশ হইয়াছে। উপরিউক্ত প্রথম ও পঞ্চম শ্রেণীর গ্রন্থ সমুদায় ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত। এরূপ গম্ভীর বিষয়ের আলোচনায় হাস্যরসের অবতারণা করিলে গ্রন্থের গৌরব ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। সেজন্য এই শ্রেণীর রচনাবলীতে হাস্যরসের প্রয়োগ অতি বিরল। তথাপি কৃত্তিবাস ও শঙ্কর কবিচন্দ্র তাঁহাদের রামায়ণে সুযোগমত মধ্যে মধ্যে কৌতুকপ্রদ ঘটনার উদ্ভাবন করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থদ্বয়কে সরস ও মনোরম করিয়া তুলিয়াছেন।

গীতিকথায়

গীতিকথাগুলি লোক-সাহিত্যের (Folk-literature) অন্তর্গত। গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণে রচিত রূপকথাও এই পর্য্যায়ভুক্ত। এগুলি জনসাধারণের মনোরঞ্জনার্থ রচিত হইয়া লোকমুখে প্রচারিত হইত,—বোধ হয় কখনও গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হইত না। তাই এই শ্রেণীর বহু কবিতা কালক্রমে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুখের বিষয় সম্প্রতি ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি সাহিত্য-কর্ম্মিগণের চেষ্টায় কিছু কিছু উদ্ধার হইতেছে। এই শ্রেণীর রচনাতে মধ্যে মধ্যে

শ প্রগাঢ় হাস্যরসের সমাবেশ দেখা যায়; কারণ ধারণের চিত্ত-বিনোদনের জন্য ইহা নিতান্ত আবশ্যক।

বৈষ্ণব-পদাবলীতে

চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্গত বৈষ্ণব পদগুলি পৃথক পৃথক গুকাব্য। ইহাদের ক্ষুদ্র পরিসরের ভিতর নানা রসের মাবেশ সম্ভবপর নয়। কিন্তু ইহাতে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলা নানারূপে বর্ণিত হইয়াছে, আর সেই রসিক চূড়ামণি শ্যাম টবরের নব-নব কৌতুক-উদ্ভাবনী-শক্তির সীমা নাই। তাই যে সকল পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গোপীগণের ছলনা বা সখীগণের হস্তে তাঁহার লাঞ্ছনার বর্ণনা আছে, হাস্য-রচনা হিসাবে সেগুলি অনুপম।

মঙ্গলগানে

প্রাচীন কবিগণের হাস্য-রসিকতার চরম বিকাশ ঘটিয়াছে মঙ্গলগানগুলিতে। এক একটী দেবতার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন-সূত্রে তাঁহাদের অসীম শক্তি ও প্রতাপের বর্ণনা এবং কিরূপে লোকসমাজে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা ও পূজার সূত্রপাত হয় তাহার বৃত্তান্ত ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই মঙ্গল-গানগুলি এক একটী উপাখ্যানকে কেন্দ্র করিয়া রচিত। এই উপাখ্যানগুলি কিম্বদন্তীমূলক এবং বহু পূর্ব্ব হইতে লোকমুখে প্রচারিত ছিল; পরে প্রতিভাবান লেখকের হস্তে কবিতাকারে গ্রথিত হইয়া ক্রমশঃ বর্ত্তমান আকার পাইয়াছে। এই গানগুলি দেবদেবীর পূজা বা উৎসবাদিতে উপর্য্যুপরি কয়েকদিন ধরিয়া সুরতাললয় সহকারে গীত হইত।

এই মঙ্গলগানগুলি সে সময়ে জনসাধারণের অশেষ মঙ্গলসাধন করিয়াছে; ইহাতে ধর্ম্ম ও নীতি-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য শ্রোতৃগণের চিত্তবিনোদন হইত। তাই প্রতিযোগিতার জন্য একই বিষয়ে একাধিক লেখক আপন আপন রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রত্যেকেই আপন আপন গ্রন্থকে অধিকতর মনোরম ও চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য নূতন নূতন চরিত্র-কল্পনা, পুরাতন চরিত্রের উৎকর্ষ-সাধন এবং হাস্যরসের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীন সাহিত্যে হাস্যরসের প্রকৃতি

এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাচীন কবিগণের হাস্য-রসিকতা আধুনিক পাঠক-সম্প্রদায়ের পক্ষে তেমন উপভোগ্য নয়। সেরূপ আশা করাও অন্যায়। সাহিত্যের ভাষা, ভাব বা রসের বিচার করিবার জন্য সর্ব্ব-কালোপযোগী কোন মাপকাঠী থাকিতে পারে না। সাহিত্যে সমাজেরই চিত্র প্রতিফলিত হয়; কিন্তু সমাজ যখন নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, তখন কোনও যুগের সাহিত্যের সহিত তাহার পরবর্ত্তী সময়ের সাহিত্যের সামঞ্জস্য থাকিতে পারে না। কালক্রমে সমাজের ক্রমোন্নতি হইয়া থাকে, এবং সেই সঙ্গে মানুষের ধ্যানধারণা ও রুচির পরিবর্ত্তন ও উৎকর্ষ ঘটিয়া থাকে। আবার প্রাকৃতিক নিয়মের বশে প্রাচীন সমাজের ক্রমিক অধঃপতন ঘটিলে উচ্চ আদর্শেরও অবনতি হয়। সাহিত্যের ভাষার কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল রসের দিক দিয়া দেখিলে এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, প্রায় সকল প্রাচীন সাহিত্যেই নানা কাব্য-রসের যেরূপ সমাবেশ দেখা যায়, তাহা আধুনিক কোন সমাজেরই সম্পূর্ণ তৃপ্তি ও আনন্দবিধান করিতে পারে না।

আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হস্তে গঠিত হয় নাই। চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম প্রভৃতি কয়েকজন ছাড়া প্রাচীন কবিগণের মধ্যে আর কেহই উচ্চ-শিক্ষিত ছিলেন না। সে সময়ে যাঁহারা সংস্কৃত-সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেন, তাঁহারাই উচ্চ-শিক্ষিত বলিয়া পরিগণিত হইতেন। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা বা সাহিত্যের প্রতি তাঁহাদের আস্থা ছিল না। বাঙ্গালা সাহিত্য জনসাধারণের শিক্ষা ও আনন্দবিধানের জন্য অল্পশিক্ষিত অথচ প্রতিভাবান লেখকগণের সৃষ্টি। তাঁহাদের নিকট হইতে মার্জ্জিত রুচি-সঙ্গত রচনা আশা করা যায় না। আর তাঁহারা যাহাদের মনোরঞ্জনের জন্য ইহা রচনা করিতেন তাহাদেরও রসজ্ঞান তেমন উন্নত ছিল না।

প্রাচীন সাহিত্যের নগ্ন সৌন্দর্য্য

সাহিত্যের প্রধান রস আদিরস। নর নারীর প্রেম ও মিলন যেমন জীব-ধারাকে প্রবাহিত রাখিবার মূল কারণ, তেমনি কাব্য-স্রোতেরও উৎস-স্বরূপ। তাই সকল দেশের সকল যুগের কবি-প্রতিভা এই আদিম ও সনাতন রসকে অবলম্বন করিয়া ইহার নব-নব রূপমাধুর্য্যের সন্ধানে ও আবিষ্কারে নিযুক্ত থাকিয়া ধন্য ও সার্থক হইয়াছে।

আর্কিমেডেস্ যেমন এক নূতন প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কারের আনন্দে আত্মহারা হইয়া "পাইয়াছি, পাইয়াছি" বলিয়া বিবস্ত্র অবস্থায় সিরাকিউজের রাজপথে ছুটিয়াছিলেন, তেমনি প্রাচীন কবিগণ যৌন প্রণয়ের অনির্ব্বচনীয়তা যখন প্রথম ভাষায় প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন, এবং জগতের সমক্ষে এই নূতন তথ্য প্রচার করিবার জন্য দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হইয়া ছুটিলেন,—তখন সেই তীব্র সৌন্দর্য্যের নগ্নতা আবৃত করিতে তাঁহাদের আদৌ মনে পড়ে নাই। প্রেম ও মিলনের চিত্র আঁকিতে বসিয়া তাঁহারা লজ্জা বা রুচির শাসন ভুলিয়া যাইতেন। চিত্র নিখুঁত করিয়া আঁকিতে গিয়া তাঁহারা প্রত্যেক রেখাটীকে ভাল করিয়া ফুটাইয়া তুলিতেন, কিছু বাদ দিতেন না। তাই সেই সকল চিত্রের মধ্যে, যে অংশে সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ, তাহা যে সাধারণের স্থূল দৃষ্টির সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া পশুভাবের উদ্রেক করা অপেক্ষা গোপন করিয়া রহস্যময় করিয়া রাখিলে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির উদ্দেশ্য অধিকতর সফলতা লাভ করে, প্রাচীন কবিগণের মনে এ কথা উদয় হইত না। প্রেম ও মিলনের যেখানে চরম পরিণতি, ততদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর না হইয়াও যে রসসৃষ্টির পূর্ণতা সাধিত হইতে পারে তাহা তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিতেন না।

রুচির বিভিন্ন আদর্শ

শ্লীলতা ও শালীনতার যে আদর্শ আধুনিক সমাজে ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেকালের সমাজে তাহা অজ্ঞাত ছিল। প্রাচীন কবিগণ সমসাময়িক সমাজেরই চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা সেই সমাজেরই উপযোগী এবং তাহাতে সেকালের লোকের তৃপ্তি ও আনন্দ সাধিত হইত। সুদূর ভবিষ্যতে রুচির আদর্শ কিরূপ দাঁড়াইবে, তাঁহারা তাহার হিসাব করিয়া কাব্য রচনা করেন নাই এবং তাহা সম্ভবপরও নয়।

আধুনিক রুচি

কিন্তু কেবল প্রাচীন কবিগণের দোষ দিলে চলিবে কেন? সুরুচির আদর্শ কি এখনই সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত বা সম্মানিত হইতেছে? সম্প্রতি এরূপ এক নবীন লেখক-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহাদের বিরুদ্ধেও কুরুচির অভিযোগ শোনা যায়। প্রাচীন কবিগণ সরল ভাবে নগ্ন চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, আর নব্য সম্প্রদায়ের লেখকগণ কৌশল সহকারে সেই নগ্নতার উপরে এমন সূক্ষ্ম আবরণ রচনা করিয়া থাকেন, যাহাতে আবরণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে। প্রাচীন কবিগণের অঙ্কিত নগ্ন চিত্র পূর্ণ আকারে প্রকাশিত, তাহাতে কিছুই গুপ্ত নাই, সমস্তই ব্যক্ত এবং স্পষ্ট; নূতন শ্রেণীর চিত্রে গুপ্তকে ব্যক্ত না করিয়া সুস্পষ্ট ইঙ্গিতের দ্বারা সেইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়। প্রাচীন কবির চিত্র সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই কল্পনা-প্রসূত, সকলের সমক্ষে একই রূপে প্রতীয়মান; নব্য-তন্ত্রের লেখক তাঁহার ধারকরা কল্পনাকে শেষ পর্য্যন্ত চালিত না করিয়া এমন এক স্থলে পৌঁছিয়া দর্শকের উত্তেজিত কল্পনাশক্তির উপর ছাড়িয়া দেন যে সে চিত্র পরিণামে অতি হীন কুৎসিত রূপ ধারণ করিতে পারে।

এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। আমার বক্তব্য এই যে, সাহিত্য-রসের কোনও চিরন্তন আদর্শ নাই। সুতরাং যাহাতে আমাদের তৃপ্তি হয় না, তাহাকে হীন ও অপদার্থ বলিয়া ঘৃণা করা সঙ্গত হয় না। আজ যাহা অনাদৃত, এক সময়ে তাহা আদৃত হইয়াছে, আবার ভবিষ্যতেও যে কখনও হইবে না তাহা কে বলিতে পারে?

হাস্যরসের প্রাচীন আদর্শ

আদিরসের সহিত হাস্যরসের সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অন্যান্য রসের সহিত ইহার সংযোগ হইলে রসভঙ্গ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে। আদিরসাশ্রিত রচনাতে হাস্যরসের অবতারণা স্বাভাবিক এবং তাহাতে উভয় রসেরই উৎকর্ষ সাধিত হয়। সুতরাং রুচি ও শালীনতা সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, হাস্যরসের পক্ষেও তাহাই খাটে। প্রাচীন কবিগণের হাস্যরসিকতা সকল সময়ে আমাদের তেমন রুচিকর না হইলেও তাহা যে শত শত বৎসর ধরিয়া আমাদের পূর্ব্বজগণের আনন্দ-বিধান করিয়া আসিয়াছে এই কথা স্মরণ রাখিয়া প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের স্বরূপ ও প্রকৃতির আলোচনায় আমরা পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রবৃত্ত হইব।

উত্তরায়ণ

শ্রীঅনুরূপা দেবী

১৭

ভোরের বেলা ঘুম ভাঙ্গিতেই আরতির সর্ব্বপ্রথম মনে পড়িয়া গেল, আজ তাকে এলাহাবাদ ছাড়িতে হইবে। তাড়াতাড়ি করিয়া সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। তার পর তার স্মরণে আসিল, এর আগে যতবারই সে তার বাবার সঙ্গে এলাহাবাদের বাহিরে গিয়াছে, সে সব যাত্রার সঙ্গে তার আজিকার দিনের এ যাত্রার একটু-খানিও মিল নাই।

সে সব দিনের সেই উৎসাহ-ব্যস্ততা, কর্ম্মোত্তেজনা, আর আয়োজনের বিপুলতা মনে পড়িতেই সে নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। ক্রমাগত মাল কমাইবার চেষ্টা করিতে-করিতেও তখনও তার চারটে ছোট-বড় সুটকেশ ও অ্যাটাসিকেশ, তার বাবার চার-পাঁচটা, মঞ্জুরই তিনটে,—তা' ছাড়া, হ্যাটবক্স, জুতার বাক্স, টেনিশ ও ব্যাড্‌মিণ্টন খেলার সরঞ্জাম, দু' তিনটে হোণ্ডঅল, টিফিন বাস্‌কেট্‌স্‌, টিফিনকেশ, আর ঘরকরনা পাতার কত কিই-না ছোট-বড় মোটে-ঘাটে বাঁধান-ভরাণ, তোলান করাকরিই করিতে হইয়াছে! আর আজ? কি আছে আর তাদের? তার সমস্ত গহনা, দামী শাড়ীগুলি পর্য্যন্ত সে তার বাপের পাওনাদারদের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। সাধাসিধা শাড়ী ব্লাউসের দুইটা পুরাতন সুটকেস আর মঞ্জুর কতকগুলি সুট—এই পড়িয়া আছে, যা তারা নিতান্ত দয়া করিয়া ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। আর আছে রান্না ও খাওয়ার যোগ্য তাদেরই বাছ-ফেলিয়া-দেওয়া দু'পাঁচখানা ফুটাফাটা বাসনপত্র। আরতির সমস্ত মন যেন সঙ্কোচে গুটাইয়া এতটুকু ছোট্ট হইয়া গেল,—এই কি তার শ্বশুরঘর করিতে যাওয়ার ঘরবসত! সে যে দুদিন আগে একজন লক্ষপতির মেয়ে ছিল!

একটা নিদারুণ ক্লান্তিকর নির্ব্বেদের বশে সে আর বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারিল না,—আবার গায়ের উপর চাদর টানিয়া দিয়া শুইয়া পড়িল। তার পর কান্না। এ কান্নার তো আর তার শেষ নাই!

মাধবী সেদিন সন্ধ্যার ট্রেণে কাশী যাইবে, অথচ আরতিকে এমন অসহায় দেখিয়া যাওয়াও তার পক্ষে একান্ত কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সংসারে এক একটা লোকের স্বভাবে এমন একটা জিনিষ থাকে, তারা পরের জন্য না ভাবিয়া থাকিতে পারে না। মাধবীরও সেই দশা ছিল। আজ ভোরের বেলাই সে আরতির কাছে ছুটিয়া আসিল। সে জানিত, ঘুম আরতির চোখে নাই। রাত্রেও সে প্রায়ই ঘুমাইতে পারে না।

মাধবী আসিয়া কাছে বসিল। তার মুখ একান্ত মলিন, দৃষ্টি প্রশ্নময়; কিন্তু জিজ্ঞাসা করিবার সাহস তার বুকে নাই। উত্তর যখন জানা থাকে, তখন প্রশ্ন করার বিড়ম্বনা বড় সহজ নয়, অথচ না করিলেও স্থির থাকা যায় না।

আরতি নিজে হইতে কোন দিন কথা কয় না,—আজ সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই কহিল,—

"মাধবীদিদি, আমরা আজকের পাঞ্জাবমেলেই কলকাতা যাচ্ছি ভাই,—তোমার সঙ্গে হয় ত আর কখন দেখাও হবে না।"

তার কণ্ঠে একটা আর্দ্র করুণতা ধ্বনিত হইয়া উঠিল। এবার আসিয়া পর্য্যন্ত এ-রকম স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর তার গলায় মাধবী একদিনও শুনিতে পায় নাই। সে ঈষৎ বিস্মিত এবং একটু আশ্বস্ত হইয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল,—

"কোথায় দিদিমণি? কাকা বুঝি তার করেছেন? বলেছি তো, যতই হোক আপনার লোক ত বটে! বেশ হয়েচে!"

আরতি মুখ নত করিয়া কহিল "না, কাকা কিছু লেখেন নি, সেখানে তো যাচ্ছি না।"

মাধবী জিজ্ঞাসা করিল "তবে কোথায় ভাই? মামার বাড়ী কি?"

আরতি কহিল, "মামার বাড়ী তো আমার নেই। মা দিদিমার এক সন্তান ছিলেন,—দিদিমাও তাই।"

মাধবী কহিল "তবে ?"

আরতি একটুখানি নীরব থাকিল। তার পাণ্ডু মুখে ঈষৎ রংয়ের আভাষ মৃদু হইয়া দেখা দিল। সে একটা ঢোঁক গিলিয়া নিজেকে ঈষৎ শক্ত করিয়া লইয়া ঈষৎ মৃদুকণ্ঠে উত্তর করিল "সলিলবাবু আমায় নিতে এসেছেন, বাবার একজন জানা লোক—"

মাধবী সবিস্ময়ে কহিয়া উঠিল—"কই, আগে' ত তাঁর কথা কিছু বল নি ? ভাল করে চেনো ত ?"

আরতির কয় দিনের সেই বর্ষাকাশের মতই যেন নিবিড় মেঘাচ্ছন্নবৎ মুখে একটুখানি মৃদু হাস্যরেখা ক্ষণেকের বিদ্যুতের মতই ফুটিয়া উঠিল। সে মাধবীর দিকে চাহিয়া ঈষৎ একটু হাসিয়া কহিল,

"খুব চিনি, বাবা তাঁর হাতেই আমায়—আমাদের দিয়ে গ্যাছেন !"

বলিতে বলিতেই তার গলা কাঁপিয়া স্বর ভাঙ্গিয়া আসিল ; এবং সেই এতটুকু হাসির স্থানে একটা ঝরণা-ধারার মতই খানিকটা তপ্ত জলের ধারা তার আকুল দৃষ্টিকে অন্ধ করিয়া দিয়া ঝরিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু অনেকখানি সুস্থির হইয়া ঘরে ফিরিতে পারিল মাধবী। সে সলিলের সঙ্গে দেখা করিয়া, তার অবশ্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, তার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় তৃপ্ত হইয়াই ফিরিয়া গেল। মনে মনে বলিল, "সত্যই কি আর ঈশ্বর নেই ?"

বেলা যখন প্রায় দশটা—সলিল বাহিরের যতটা সম্ভব এ কয় দিনের দেনা-পাওনা মিটাইয়া দিয়া, রামরূপের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় অতুলবাবুর শেষ সময়ের সমস্ত কাহিনী জানিয়া লইয়া, যাত্রার জন্য যেটুকু ব্যবস্থার অবশ্য প্রয়োজন সেগুলি সারিয়া, তার পর আরতির সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। রামরূপকে সে তার ঠিকানা দিয়াছিল, বাড়ীতে কিছু কাজকর্ম্ম সারিয়া রামরূপ তাদের কাছে গিয়াই থাকিবে স্থির হইয়াছিল,—নতুবা মঞ্জুর কষ্ট হইতে পারে।

আরতিকে আজ যেন কালকের অপেক্ষা একটুখানি সজীব বোধ হইল। তার শরীর মন সমস্তটাই যদিও শোকে যেন আচ্ছন্ন হইয়াই রহিয়াছে, তবু তার মধ্যেও একটু জীবনের নিবন্তপ্রায় জ্যোতির আভাষ সেই অশ্রুস্ফীত চোখে মুখে ক্ষণে ক্ষণে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছিল। সলিলকে দেখিয়া সে উঠিয়া বসিল, বলিল "আজই যাবেন ত ?"

সলিল তার খাটের কাছে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সস্নেহে উত্তর করিল,—

"যদি তোমার আপত্তি না থাকে।"

আরতি একটা দীর্ঘনিশ্বাসকে ছোট্ট করিয়া ফেলিল। ক্ষীণ হাস্যের সহিত কহিল,

"চলুন, আজই যাই—কাল তো আর থাকতে দেবেও না।" এবার একটা খুব বড় দীর্ঘশ্বাস আর তার সেই কৃত্রিম হাসির দুর্ব্বল বাধা মানিল না।

বেলা যখন প্রায় একটা,—অনেকখানি দ্বিধাকে দমন করিয়া ফেলিয়া, সমস্ত রাত্রি এবং এই সমুদায় দ্বিপ্রহর বেলার সকল দ্বন্দ্বকে জোর করিয়া আটকাইয়া রাখিয়া, এক সময় সলিল আসিয়া আরতিকে বলিল,

"আমার একটা কথা বলবার আছে আরতি! অনেক-বারই ভেবেছি এখন বলতে পার্ব্বো না ; কিন্তু হয় ত সে কথা তোমায় না জানিয়ে তোমায় আমার সঙ্গে নিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে একটু অন্যায় করা হবে। তাই মনে করচি, সব কথা তোমায় খুলে বলাই হয় ত আমার পক্ষে কর্ত্তব্য।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সলিল আপনার কথায় আপনিই যেন মনে মনে আহত হইয়া গিয়া থামিয়া পড়িল। ভূমিকার ধরণে আরতিরও বুকের মধ্যে ধক্ করিয়া একটা ধাক্কা লাগিল। তার হঠাৎ মনে হইল, আবার যেন তাকে তার বাপের সেই মর্ম্মান্তিক শেষ পত্রের মতই নির্ম্মম কোন কিছু একটা অকথ্য কথা শুনিতে হইবে! তার ভিতরটা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

সলিল তার দিকে না চাহিয়াই কোন মতে বলিতে আরম্ভ করিল,—

"আমার মার এ বিয়েতে মত হয় নি। তিনি বলেছেন, কিছুতেই তিনি মত দেবেন না। এমন কি, আর একজনের সঙ্গে ঠিকও করে রেখেছেন। তাই আমি তোমায় এখন তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পারবো না, দিদিও হয় ত রাজী হবে না। তাই সকালেই আমার এক বন্ধুকে বাড়ী ঠিক করতে তার করেছি। সেইখানে তোমায় রেখে, সেইখান থেকেই তোমায় বিয়ে করে, তার পর মার কাছে নিয়ে যাব। মা তাঁর একমাত্র সন্তানকে ত্যাগ করে নিশ্চয়ই থাকতে পারবেন না।"

আরতির বুকের সে কম্পন থামিয়া গিয়া তাহার স্থলে

গভীরতর একটা নিশ্চল স্তব্ধতা জাগিয়া উঠিয়াছিল। এবার দেখিতে দেখিতে তার ঈষৎ আশালোকে অনুরঞ্জিত শোকাচ্ছন্ন দীন মূর্ত্তি একটা স্তব্ধ গম্ভীর পাষাণ-মূর্ত্তির রূপ পরিগ্রহ করিতে লাগিল। তার সমস্ত ভবিষ্যতের সমুদায় মুক্ত দ্বারগুলা, যেথান দিয়া গত সন্ধ্যা হইতে আবার চন্দ্র-কিরণ ও উষালোক প্রকট হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, সহসা যেন এক নিমেষেরই একটা নিদারুণ ঝঞ্ঝাবাতে এক সঙ্গেই সবকটা প্রবল বেগে রুদ্ধ হইয়া গেল।

সলিল বলিতে লাগিল,—কি বলিবে, ভাল করিয়া গুছাইয়া বলিবারও শক্তি তার ছিল না, অপরাধীর মতই নত মস্তকে ভগ্ন ও জড়িত কণ্ঠে সে কোনমতে খাপছাড়া ভাবে শুধু যা-তা করিয়া বলিতে লাগিল,—

"দিদি যদি মার ভয়ে রাজী না হয়, তাই এ-রকম ব্যবস্থা করেছি। আমি অবশ্য সেখানে থাকবো না,—আমার মাষ্টার মশাই বুড় মানুষ, তিনিই তো তার কাছে আপাততঃ থাকবেন। আর এই রামরূপ তিন চার দিন পরেই যাবে। বেশি দিন তো নয়, তিন মাসেই হয় ত হতে পারবে। তখন মার কাছে,—মা তোমায় দেখলে রাগ ভুলে যাবেন, নিশ্চয়ই যাবেন। মা খুব ভাল, তবে ঐ কোথায় এক সত্য করে এসেই এতটা শক্ত হয়ে উঠেছেন। না হলে আর আপত্তি হতো না। তুমি কিছু মনে করো না আরতি, এর পরে দেখ, মা কি রকম স্নেহময়ী—কত যত্ন করতে জানেন। নিশ্চয় সে দিন আসবে।"

তার পর একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তার কুণ্ঠাভরা চিত্ত যেন আর এত বড় নিস্তব্ধতা সহ্য করিতে পারিল না। সে যেন মনের মধ্যে হাঁফাইয়া উঠিয়া একটা অছিলা করিয়াই উঠিয়া চলিয়া গেল। বলিয়া গেল,—

"যাই, গাড়ি এলো কি না দেখি গে—"

আধ ঘণ্টা পরে যাত্রার পোষাকে সাজিয়া আসিয়া সে আরতির ঘরে ঢুকিল। তার নিজের লজ্জাকে চাপা দিবার জন্য বিশেষ চঞ্চলতা দেখাইয়া, তখনও ঠিক সেই একই ভাবে উপবিষ্ট আরতির উদ্দেশে ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—

"এ কি! এখনও তৈরী হও নি? নাও, নাও—উঠে পড়ো আরতি! আর যে মোটে দেরি নেই,—একটা বেজে গ্যাছে,—ঠিক দুটোয় যে ট্রেণ ছাড়বে। একটা কিছু পরে তৈরী হয়ে নাও।"

আরতি এতক্ষণের পর তার সেই প্রস্তরীভূত দেহ-মধ্য হইতে তেমনই প্রায়-নিশ্চল চিত্তকে টানিয়া তুলিয়া, সলিলের আগ্রহ-ব্যস্ত মুখের উপর তার কয় দিনকার অবিশ্রান্ত রোদনের ফলে আরক্ত ও স্ফীত হইলেও এক্ষণে মেঘ-বিমুক্ত সূর্য্যের মতই তীক্ষ্ণ রশ্মিমান দুই নেত্রকে স্থির করিয়া রাখিয়া অকুণ্ঠিত কণ্ঠে উত্তর করিল,—

"আপনি যান, আমি যাবো না।"

সলিলকে এই উত্তর যেন এনার্কিষ্টের বোমার মতই অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত আঘাত করিল। সে সুস্পষ্ট চমকে চমকাইয়া উঠিয়া যেন ঘোর বিস্ময়ে এবং সাতঙ্কে উচ্চারণ করিয়া উঠিল,—

"অ্যাঁ, কি বল্লে আরতি? যাবে না? আমার সঙ্গে তুমি যাবে না?"

আরতি তার সেই দৃষ্টিকেই সমান স্থির রাখিয়া সহজ গম্ভীর স্বরে প্রত্যুত্তর করিল, "না,—"

সলিল এক মুহূর্ত্ত কাল স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। তার পর বাক্যোচ্চারণের শক্তি ফিরিয়া পাইলে, ব্যথিত ভর্ৎসনার সহিত কাতর কণ্ঠে কহিল, "আমার কি অপরাধ আরতি? আমায় তুমি কি দোষে ত্যাগ করতে চাইচো? ঠকিয়ে তোমায় আমি নিয়ে যেতে পারতুম আমার বিবেক তাতে সায় দেয় নি। কিন্তু সে যে সমস্যা, সে ত একা আমার,—তোমার তো নয়! তোমার বাবা তোমায় আমাকেই দিয়ে গেছেন, তুমি আমার, এই কি যথেষ্ট হলো না?"

আরতি একবারের জন্য ঈষৎ বিমনা হইল। পরক্ষণেই সেটুকু সে সামলাইয়া লইয়া পূর্ব্বের মতই সঙ্কল্প কঠিন স্বরে কহিল,

"আপনার মা যখন অন্যকে কথা দিয়ে সত্যবন্দী হয়েচেন, তখন আপনাদের পারিবারিক শান্তি ভঙ্গ করে সেখানে আপনাদের গলগ্রহ হ'তে যাব না। আপনি ফিরে গিয়ে তাঁকেই বিয়ে করে আপনার মাকে সুখী করুন।"

কথাগুলা সত্য হইলেও, বিশেষতঃ আরতির নিজের মুখে —যে আরতি কোন দিন লজ্জায় ভাল করিয়া মুখ তুলিয়া বেশি কথাই কহে নাই,—বড় বেশি কঠিন শুনাইল। সলিল আহতর ভাবে ত্বরিৎস্বরে কহিয়া উঠিল,

"আরতি! না—না, তুমি ঠিক বুঝতে পারচো না,—আমি তোমায় গলগ্রহ ভেবে নিচ্চি? এ কি কথা তুমি বল্লে?

এরই মধ্যে তুমি মুহূরির সব কথা কি ভুলে গেলে? তুমি আমার গলগ্রহ! কি বলচো আরতি? ছিঃ!"

অকথ্য তিরস্কারের সঙ্গে অব্যক্ত একটা যন্ত্রণার তরঙ্গ তার বুকে ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল—এত বড় অবিচার!

কিন্তু আরতি তাহা বুঝিতে চাহিল না। সে মৌন দৃঢ় নতমুখে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল,—কথাও কহিল না, কোনরূপ বিচলিততাও দেখাইল না। সলিল তার এই অবিচলতায় অস্থির হইয়া উঠিল। সে প্রাণপণে নিজের পক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু তার যুক্তি-তর্ক, বিচার-বিতণ্ডা কিছুতেই কিছু হইল না,—আরতির সেই একই কথা "আপনি যান, আমি যাবো না।"

অবশেষে তাহার এই একান্ত অবাধ্যতায় অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়া সলিল, রূঢ় হইবে জানিয়াও না বলিয়া পারিল না—"আমার সঙ্গে যাবে না তো এখানে থাকবে কোথায়? এরা তো কাল সকালেই বাড়ী দখল করতে আসবে।"

সে মনে করিয়াছিল আঘাতটা নির্ম্মম হইলেও নিশ্চয়ই এটা ডাক্তারের হাতের ল্যান্সেটের কাজ করিবে। অবাধ্য আরতি এই বিস্মৃত স্মৃতির নির্ম্মম স্মরণে নিশ্চয়ই পোষ মানিবে। কিন্তু ফলে তার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। যেমন ছিল ঠিক তেমনই অনমিত অচঞ্চল থাকিয়া দৃঢ় স্বরে আরতি উত্তর করিল,—

"সে আমার ভাবনা, আপনার নয়। আপনি ফিরে যান, আমার জন্ম ভাববেন না।"

আরতির এই অন্যায় অসঙ্গত জিদে ও অকৃতজ্ঞতায় এবার সলিলের মনের মধ্যে একটা অপমানিত ক্রোধের মৃদু তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে গেল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সে ঠোঁটের উপর দাঁত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইবার অবসর লইল। তার পর কতকটা কৃতকার্য্য হইয়া আবার সলিল তাকে মিনতি করিল,

"আচ্ছা বিয়ের কথা—সে পরেও তো হ'তে পারবে। আপাততঃ বন্ধু বলে, আত্মীয় মনে করে আমার সঙ্গে এসো। আমার বাড়ী না হোক, দিদির বাড়ীতেই আমি তোমায় পৌঁছে দিই গে, এইটুকু শুধু আমার দয়া করে করতে দাও, লক্ষ্মীটী! তার পর যা তুমি ভাল মনে করবে করো, যা আমায় হুকুম করবে আমি শুনবো। নিজে এ বিয়ের আমি তোমায় আর কিছুই বলবো না এই কথা দিচ্ছি। উঠে এস।"

আরতি কথা কহিল না।

সলিল তার দিকে ঠায় চাহিয়া ছিল। মুখের অপরিবর্ত্তিত ভাবে কোন আশাই সে দেখিতে পাইল না,—তবু আশার ভান করিয়াই কহিল,—

"সময় আর মোটে নেই,—এসো আরতি, আর দেরি করলে ট্রেন ফেল করতে হবে।"

আরতি নড়িল না, জবাবও সে দিল না। যেমন তেমনই রহিল।

সলিল তখন কাছে সরিয়া আসিয়া, তার সামনে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, একেবারে হতাশ ক্লান্ত করুণ মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল,—

"তোমার পায়ে পড়ি আরতি! দয়া করে আর কষ্ট দিও না! মিথ্যে ট্রেনটা ফেল হলে অসুবিধের একশেষ হবে, তা কি বুঝতে পারচো না? উঠে পড়ো। তোমার কাছে এইটুকু দয়া চাইচি, তাও আমায় করবে না?"

আরতি এমনই ভাবে চাহিয়া রহিল, যেন সে একটা মানুষের হাতে-গড়া পাথর-কাটা মূর্ত্তিই বা! মানুষের হাজার ডাকেও সাড়া দিবার ক্ষমতা তার যেন নাই, সে যেন নিরুপায়!

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া শেষকালে সলিল তার সেই নিতান্ত হীন অবস্থা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। তার মুখ তখন বিরক্তিতে, অপমানে রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। হাতটা তুলিয়া ঘড়ি দেখিল। তার পর আরতির দিকে চাহিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, "ট্রেন ছেড়ে গ্যাছে। যাক্, কতকগুলো বিড়ম্বনা ভোগ করা দুজনেরই ভাগ্যে আছে। হোক, তাহলে আজ থাকতেই হলো।" ..

বলিয়া অসন্তোষের সহিত সে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গিয়া ভাড়াটে গাড়ি দুখানাকে বিদায় করিয়া দিল। খানিকক্ষণ মনের অস্থিরতায় কর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইল। তার পর আবার আর একখানা গাড়ি রামরূপকে দিয়া ডাকাইয়া আনিয়া তাহাতে করিয়া বাহির হইয়া কোথায় চলিয়া গেল।

গেল সে প্রথমে অতুলবাবুর আফিসে। সেখানে সন্ধান লইয়া বাড়ীর নূতন ক্রেতার সঙ্গে দেখা করিয়া অনেক কষ্টে এই পর্য্যন্ত করিতে পারিল যে নগদ এক শত টাকা হাতে লইয়া সে তাহাকে তিনটী দিনের সময় দিল। এ তিন দিনের মধ্যে আরতির বিমুখ

চিত্তকে যেমন করিয়াই হো'ক জয় করিয়া ফেলিতেই হইবে, এই স্থির নিশ্চিত করিয়া সলিল যখন বাড়ী ফিরিল, তখন মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য্য অস্তাচলের অভিমুখে অনেকখানিই অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। বেলাশেষের তান মাঠে-বাটে, গৃহে-বাহিরে সর্ব্বত্র হইতেই বাদিত হইতেছিল। সমস্ত পৃথিবী তখনও গ্রীষ্ম সূর্য্যের উজ্জ্বলতায় দীপ্ত হইয়া আছে।

ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট শরীর মন লইয়া সে ফিরিয়া আসিয়া বারান্দার একমাত্র অবশেষ লোহার বেঞ্চিখানার উপর এলাইয়া বসিয়া পড়িল। অনিয়মে পরিশ্রমে তার সঙ্গে দুর্ভাবনায় তার সুখ-পালিত দেহ-মন যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। সঙ্কট তাকে যেন সব দিক দিয়াই ঘেরিয়া ফেলিতেছে! মায়ের দিকটাতেই সে সবচেয়ে প্রবল বাধা বোধ করিয়া একে ত যথেষ্ট বিপন্ন হইয়াই রহিয়াছিল, আবার তার ঠিক উল্টা দিক হইতেও যে তত বড় প্রচণ্ড আরও একটা ঝড় উঠিতে পারে, এ যেন তার ধারণাতেও ছিল না। এ যে যার জন্য চুরি করা সেই তাকে আজ চোর অপবাদ দিতে বসিয়াছে!

রামরূপ আসিয়া এক পেয়ালা চা আনিবে কি না জিজ্ঞাসা করিল।

"নাঃ, দরকার নেই",—বলিয়া সলিল, তার ক্ষুৎ-পিপাসা-পীড়িত শরীরটার উপরই সবাইকার অবিচারের শোধ তুলিতে চাহিয়া তাকে আরও একটুখানি পীড়ন করিতে চাহিল।

শোধ লইবার প্রকৃত পাত্রের উপর শোধ লওয়ার যখন সুযোগ পাওয়া যায় না, তখন নিরুপায় মানুষ নিজের উপরেই অন্যের অপরাধের শোধ তোলে, এ প্রায় দেখা যায়।

মঞ্জু ছুটিয়া আসিয়া এক সময় তাকে জড়াইয়া ধরিল, "সলিলদাদা! টই আমরা টো ডেলুম না?"

সলিলের এবার গলার কাছে একটা কি যেন ঠেলিয়া আসিল। সে মঞ্জুকে কাছে টানিয়া লইয়া তার পুরন্ত নরম গাল-দুটীতে হাত দিয়া আদর করিতে করিতে গাঢ়স্বরে উত্তর করিল,—

"না ভাই, আজ গেলুম না।"

"টাল ডাবো?"

"হুঁ"—বলিয়া সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া সলিল একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। নিশ্বাসের শব্দে মঞ্জু সাশ্চর্য্যে তার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। তার মুখ একটু ভার হইল। এই কান্না ও দীর্ঘশ্বাসের জ্বালায় দিদির কাছে সে তো যাইতেই ভয় পায়। আবার ইহাকেও সেই রোগে ধরিল না কি? এমন ধারাই যেন একটা অনুভূতি তার ক্ষুদ্র মনের মধ্যে হয় ত বা আসিয়া থাকিবে!

সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও বেশি গাঢ় হয় নাই। আরতি ধীর পদে আসিয়া তাহার পায়ের কাছে দূর হইতে একটা প্রণাম করিয়া উঠিয়া মঞ্জুর হাত ধরিয়া দাঁড়াইল।

সলিল চমকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তার মনের ভিতর ভাঁটার আশাস্রোত তীব্রবেগে প্রবাহিত হইয়া গেল। সে বিস্ময়-স্মিতমুখে মুখ তুলিয়া চকিত চঞ্চল স্বরে বলিয়া উঠিল,—

"এ কি আরতি! হঠাৎ প্রণাম কেন?"

তার বোধ হইল আরতি হয় ত প্রণামান্তে নিজের ভুল স্বীকারোদ্দেশ্যেই ক্ষমা লইতে আসিয়াছে।

আরতি ততক্ষণে মাথা তুলিয়াছিল। মুখ তুলিয়া সেই প্রায়ান্ধকারে সলিলের দিকে চাহিয়া সে শান্তকণ্ঠেই উত্তর দিল,—

"হঠাৎ নয় তো,—আমরা যাচ্ছি কি না, তাই আপনাকে বলে যেতে এলুম।"

অতিমাত্র বিস্ময়ে সলিলের গলা যেন বুজিয়া গেল,—

"তোমরা যাচ্চো! কোথায় যাচ্চ আরতি?"

সবিস্ময়ে এই প্রশ্ন দুটী করিয়াই সে অবাক হইয়া আরতির দিকে চাহিয়া রহিল। সন্ধ্যাছায়ার মধ্যে যতটুকু দেখা যায়, দেখা গেল, আরতির চোখে-মুখের আগের সেই শোকার্ত্ত ভাবটা আর যেন সেখানে মোটেই নাই। তার বদলে খুব স্পষ্ট একটা দৃঢ় সঙ্কল্পের রেখা কঠিন হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। সেটা যেন তার আসল মুখের উপর ঢাকা দেওয়া একটা লোহার মুখস্। সে বলিল,—

"কোথায় যাচ্চি, সে আপনার শুনে কাজ নেই। তবে মাধবী-দিদিদের সঙ্গেই যাচ্চি। আর দেরি করবো না, আমি চল্লুম।"

এই বলিয়া সে চলিয়া যায়,—সলিল ছুটিয়া আসিয়া তখন তার পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল।

"আরতি! আরতি! এত নির্ম্মম তুমি! কোথাকার

কে পর—তাদের সঙ্গে যাবে, তবু আমার সঙ্গে যাবে না? এই তোমার বিচার হলো?"

আরতি দাঁড়াইল। মঞ্জুর হাত ছাড়িয়া দিয়া তাকে আদেশ করিল "তুই ওদের ওখানে যা,—" তার পর সলিলের উত্তেজিত মুখের দিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিল,—

"আপনিই বা আমার এদের চেয়ে বেশি কিসে? কিন্তু সে সব কথা যাক। আমাদের জন্য আপনাকে অনেক কষ্ট পেতে হলো, ক্ষমা করবেন। এখন তাহলে আমি চল্লুম"—

হল-ঘরের যে দরজাটার সামনে পথ রোধ করিবার জন্তই সলিল দাঁড়াইয়া ছিল, সেটাকে পরিহার করিয়া আর একটা দরজা দিয়া আরতি ঘরের মধ্যে ঢুকিল। সলিল যে তার সঙ্গে আসিতেছে সে যেন তা দেখিয়াও দেখিল না।

"আরতি!" আবার সলিল আসিয়া তার পথরোধ করিয়া, সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

"না, না, এমন করে যেও না আরতি! আমি তোমার পর—আমার মুখ না চাও, না-ই চাইলে! নিজের কথা, মঞ্জুর কথা—সেও একটুখানি ভেবে দেখ। কি ভাবে তোমরা মানুষ হয়েছ, এর মধ্যে অত কষ্ট কি সইতে পারবে? কেন এমন অবুঝের মত কাজ করচো? কি অপরাধ আমি করেছি যে আমার সংশ্রবও সইতে পারচো না? যদি কোন দোষ করে থাকি, ক্ষমাও কি করা যায় না? এত কঠিন সে অপরাধ! এত কঠিন তুমি?"

আরতি নীরব রহিল।

উত্তেজিত কণ্ঠে সলিল জিজ্ঞাসা করিল, "বল, বলে যাও, কি দোষ আমি করেছি যে আমায় তুমি এমন করেই বর্জ্জন করচো? আচ্ছা, আরও একটা কথা বল,—কোন দিনই কি তুমি আমায় ভালবাসনি?"

এবার আরতি কথা কহিল, অনুত্তেজিত কোমল কণ্ঠে কহিল, "অপরাধ আপনার নয়। আমি যদি আপনাদের মধ্যে মনোমালিন্তের কারণ হই, আমারই অপরাধ হবে। তাই আমি সরে যাচ্চি। আপনিই বরং আমায় ক্ষমা করবেন।"

সলিল কঠিন কণ্ঠে কহিল "না, এর ক্ষমা নেই। এ অত্যাচার—এ দয়ার অত্যাচার আমার 'পরে না করে, শুধু একটুখানি দয়া করতেও তুমি ইচ্ছা করলে পারতে। অন্ততঃ আমার সঙ্গে গিয়ে, তার পর যে রকম হয়—"

আরতি হাসিল। অতি করুণ সে হাসি। কিন্তু হাসিয়াই সে উত্তর করিল, "তার পর আপনার দয়ার প্রত্যাশা ভিন্ন আর কিছুই বড় বেশি বাকি থাকতো না। আমি শুধু সেইটেই চাইনে। আমি বেশ থাকবো সলিলবাবু, আপনি নিশ্চিন্ত হোন। আমার ভার আমি নিজেই যখন নিচ্ছি, আপনার এত ভাবনা কেন? আমি ওদের কাছে খুব সুখেই থাকবো আমার বিশ্বাস, আর তা' আমি থাকবোই।"

অনেকক্ষণ নীরব থাকিবার পর সলিল একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন পূর্ব্বক অভিমান-গূঢ় প্রগাঢ় স্বরে কহিল, "তবে আমার আর কিছুই তোমায় বলবার রইলো না, নিজের সম্বন্ধে তুমি যখন এতই স্থির নিশ্চিন্ত হতে পেরেছ।"

সে ধীরে ধীরে হলটা পার হইয়া আবার সেই সামনের বারান্দাটায় ফিরিয়া চলিয়া গেল। সেখানে এখন আগের চেয়ে অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল। সেই লোহার বেঞ্চিখানার উপর তখনকার চেয়েও বেশি ক্লান্তভাবে সে নিজেকে নিক্ষেপ করিয়া অন্ধকার বাগানের পানে উদাস চক্ষে চাহিয়া রহিল। সেখানে কতকগুলা জোনাকী ঝিল-মিল করিতেছিল, আর সব অন্ধকার।

আরতি একা নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া এইবারে যেন একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িল। সলিলকে সে ত হাসিমুখেই বিদায় দিয়াছে। কিন্তু এখন সে দেখিল, এইবার চোখে তার জল ঠেলিয়া আসিতেছে। চোখের জল সে খুব দৃঢ় করিয়াই মুছিয়াছিল,—সহজে ফেলিবে না এই তার সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু তাহাকে আটকানোও তার সহজ বোধ হইল না। জীবনটা যেন তার তালে তালে চলিতেছে। এ অশ্রু একটুখানি আগের সেই হাসিটুকুর বিনিময়! এতদিন তার সুদিন ছিল বলিয়াই আজ এত বড় দুর্দ্দিনের অভ্যুদয় হইয়াছে। কিন্তু এর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইতে যদিই কখনও পারে, তবেই আবার তার মনুষ্যত্ব বাঁচিয়া উঠিবে, নতুবা এইখানেই সব শেষ!

(ক্রমশঃ)

তেলের খনি *

শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র সেন

(এনান্‌জঙ, আপার বায়র্মা)

ভোর পাঁচটার সময় অতি গুরুগম্ভীর স্বরে ভোঁ করিয়া বাঁশী বাজিয়া উঠে, আর চারদিকে জাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়। কুলী-মুটে মজুরের কোলাহলে, মোটর এবং লরি ইত্যাদির হর্ণের শব্দে ঘুমন্ত শহরটী সহসা সজাগ হইয়া উঠে। শ্রমজীবীরা ছুটাছুটি করিয়া চলে; সাহেব, কেরাণী, ওভারসিয়র ইত্যাদি পদস্থ কর্ম্মচারিগণ মোটার না হয় বাসে উঠিয়া যে যার গন্তব্য স্থানে চলিয়া যান। ঠিক ছয়টার সময় আবার অতি করুণ সুরে বাঁশী বাজিয়া উঠে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে তেলের খনিতে কাজ সুরু হয়। ছয়টা হইতে দশটা, আবার বারোটা হইতে চারটা, এই আট ঘণ্টা কাজের সময়। এই সময়ের এক মিনিটও হেলায়-খেলায় কাটাইবার যো নাই। তেলের খনির কাজ বড় পরিশ্রমের কাজ। রাত্রে যাঁহাদের কাজের পালা, তাঁহাদেরও আট ঘণ্টা করিয়া প্রহর জাগিতে হয়। দিনরাত কাজ চলিতে থাকে, কাজের আর বিরাম নাই।

আমাদের বাড়ী হইতে তেলের খনি দেখা যায়। বেশী দূরে নহে, মোটরে যাইতে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় লাগে। ছয়টায় বাঁশীটী বাজিবা উঠিবামাত্র আমি সারাদিনের জন্য প্রস্তুত হইয়া খনির দিকে ছুটি,—খনিতেই আমার কাজ।

ভূতাত্ত্বিক ও খনিজ্ঞ বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন, এনান্‌জঙ তেলের খনির নীচে কয়েক মাইল জুড়িয়া একটী তৈল-সরোবর আছে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে বর্ম্মা অয়েল কোম্পানী বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তেল উদ্ধার করিতেছে; তথাপি তেল নিঃস্রাব কমিতেছে না, বরং বাড়িয়াই উঠিতেছে। আরো কুড়ি বৎসর এই ভাবে তেল উঠিতে থাকিবে। যদি কোন দিন তেলের দুর্ভিক্ষ হয় তবে খনির নীচে বহুমূল্য পাথর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ধাতু পাওয়ারও সম্ভাবনা আছে,—সুতরাং তাঁহারা বলেন, নৈরাশ্য বা উদ্বেগের কোন কারণ নাই।

তাঁহারা আরো বলেন, এনান্‌জঙএর নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ ইরাবতীর জলতলেও ভূগর্ভে তেল লুক্কায়িত আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ইহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। ইরাবতীর তীর হইতে প্রায় ত্রিশ হাত দূরে জল মধ্যে আজকাল অনেকগুলি খনিস্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায় এবং সে সকল খনির তেল-উৎপাদিকা শক্তিও কম নহে। আরো একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এ অঞ্চলে ইরাবতীর জলে স্থানে স্থানে এত বেশী পরিমাণে তেল ভাসিতে থাকে যে, তাহা অতি কৌশলের সহিত সংগ্রহ করিবার জন্য ভীষণ প্রতিযোগিতা চলে।

ব্রহ্ম ভাষায় এনান্‌জঙ শব্দটীর অর্থ তেলের উৎস। এই 'তেলের উৎস' অর্থাৎ এনান্‌জঙ, রেঙ্গুন হইতে তিনশ' মাইল উত্তরে ইরাবতীর পূর্ব্ব তীরে।

সাত মাইল জুড়িয়া এই তেলের খনি। খনির চারদিক লোহার বেড়ায় ঘেরা। পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর, দক্ষিণ এই চারদিকে চারটী ফটক। প্রত্যেক ফটকে দুইজন করিয়া সশস্ত্র প্রহরী। অয়েল ফিল্ডের ভিতরেও স্থানে স্থানে বিশালবপু পাহারাওয়ালা।

খনিস্তম্ভগুলি দূর হইতে নৌকার মাস্তুলের মত দেখায়। (এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে প্রত্যেক তেলের কুয়ার উপরে একটা করিয়া স্তম্ভ (Derrick) থাকে; এবং তাহার গায়ে ঐ কুয়া বা খনির ক্রমিক সংখ্যা লেখা থাকে)। সন্ধ্যা হইয়া আসিলে প্রত্যেক স্তম্ভে একটী করিয়া বিজলী বাতি জ্বলিয়া উঠে। তিন হাজার খনির তিন হাজার স্তম্ভে বাতিগুলি যখন জ্বলিয়া উঠে, তখন একটী উজ্জ্বল দৃশ্য চোখের সামনে ভাসিতে থাকে।

এনান্‌জঙ শহরটী বেশ সুন্দর। একদিকে নদী আর তিন দিকে ছোট ছোট পাহাড়। পাহাড়ের উপর দিয়া রাস্তাগুলি আঁকিয়া-বাঁকিয়া উঁচু-নীচু হইয়া অয়েল-ফিল্ডের ভিতর দিয়া এদিকে-সেদিকে চলিয়া গিয়াছে। শহর-প্রান্তে কোথায়ও পাহাড়ের উপর, কোথাও পাহাড়ের কোলে বি, ও, সি'র সাহেবদের লত পাতা-ঘেরা পুষ্পতোরণ-শোভিত বাংলোগুলি শোভা পাইতেছে।

ধনৈশ্বর্য্যে এনান্‌জঙ ইদানীং ব্রহ্মদেশের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। বিদেশীয় বণিকদিগের আগমনের বহুকাল পূর্ব্বে বর্ম্মীদের মধ্যে যাঁহারা তেলের খনির অধিকারী ছিলেন, তাঁহারা 'টুইনজা' নামে অভিহিত। 'টুইন' অর্থাৎ তেলের কুয়া যাঁহার আছে তিনিই ঐ সম্মানজনক উপাধিটী পাইয়া থাকেন। এখনও তাঁহাদের অধিকারে অনেকগুলি খনি আছে কেহ কেহ দশ পনরো বছরের জন্য খনি বন্ধক রাখিয়া তেল কোম্পানী হইতে লাভের অংশ পাইতেছেন। টুইনজারা বেশ সৌখীন ও শান্তিপ্রিয়। এ দেশের রাজ-পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক

---

* শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র সেন আমাকে এই প্রবন্ধটী লিখিবার জন্য কয়েকটী তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিয়া সাহায্য করিয়াছেন এবং তাঁহার গৃহীত কয়েকখানি আলোকচিত্র দিয়াছেন।—লেখক।

বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার পঞ্চম নবাব নাজিম ও সুবেদার,

মনসুর-উল-মুল্ক সিরাজদ্দৌলা হায়বৎজঙ্গ

মুর্শিদাবাদ-প্রাসাদস্থিত মূল চিত্রের প্রতিলিপি

শেষ নবাব নাজিমের পৌত্র সৈয়দ সাদিগ আলি মীর্জা কর্ত্তৃক অঙ্কিত

সম্বন্ধ ছিল বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে আজকালও আমীরি চালচলন স্পষ্ট লক্ষিত হয়।

বর্ম্মা অয়েল কোম্পানী ছাড়া এখানে আরো কয়েকটী তেল কোম্পানী আছে। তাহাদের মধ্যে ইণ্ডো-বার্ম্মা পেট্রোলিয়াম, রেঙ্গুন অয়েল এবং নাথসিং অয়েল কোম্পানীই উল্লেখযোগ্য। নাথসিং কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতার নাম ঠাকুর শ্রীযুক্ত বৈজনাথ সিং। সিংজীর জন্মস্থান আগ্রা-অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশে। তাঁহাকে পুরুষসিংহ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভীষণ প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও তিনি পশ্চাৎপদ না হইয়া কৃতিত্বের সহিত কাজ চালাইয়া যাইতেছেন। তিনি ছাড়া আরো দুইজন ভারতবাসীর অধিকারে তেলের খনি আছে। তাঁহাদের একজন মিঃ মহম্মদ সুর্ত্তি, আর একজন শ্রীযুক্ত গোলাব সিং। ইঁহারা সকলেই পাকাপাকি বন্দোবস্তে ঘর বাড়ী করিয়া প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরিয়া এখানে বাস করিতেছেন। মিঃ মহম্মদ সুর্ত্তিই বি, ও, সি'কে পেট্রোলিয়ামের জন্মভূমি এনানজও সম্বন্ধে প্রথমে সংবাদ দেন। তার পরে তিনিই বি, ও, সি'র প্রথম এজেন্ট হন। বি, ও, সি, এখনো তাঁহাকে ঐ উপকারটুকুর জন্য বেশ বড় রকমের একটা মাসিক বৃত্তি দিয়া থাকে, এবং লোক মুখে শুনা যায়, এ বৃত্তি সুর্ত্তি-পরিবার পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে ভোগ করিতে থাকিবে।

অতীত যুগের বন্য পশুর বিচরণ-ভূমি এনানজও আজ সমৃদ্ধিশালী ও জনবহুল; তেলের খনিতে প্রায় ষোল হাজার লোক কাজ করিতেছে। তাহার মধ্যে বি, ও, সি'র শ্রমজীবী সংখ্যাই দশ হাজার; তা'ছাড়া কেরাণী, ইলেক্‌ট্রিশিয়ান, খননকারী (Driller) ইত্যাদি দুই হাজার; দেশী ও বিলাতী খননকারীদের মধ্যে আমেরিকান ড্রিলারই সাড়ে তিনশ'; আফিসের বড় সাহেব, ছোট সাহেব এবং খনির মাইনিং এঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি লইয়া মোট বেতনভোগী আটশত শ্বেতাঙ্গ।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে এনানজওয়ে দশ হাজার হিন্দু ও দুই হাজার মুসলমানের বাস। উড়িয়া, মাদ্রাজী, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, শিখ, গুজরাটী, সিংহলী, হিন্দুস্থানী এমন কি নেপালী অবধি নানা প্রদেশের ভারতবাসী এখানে কাজ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে বাঙালী হইবে এক হাজার, উড়িয়া আট হাজার। অবশ্য উড়িয়াদের ভিতরে বেশীর ভাগ লোকই শ্রমজীবী, দু'চারজন মাত্র কেরাণী। এসব দেখিয়া শুনিয়া এনানজওকে একটী "ভারতীয় শহর" বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। এখানকার ভারতবাসীদের ধর্ম্ম কর্ম্ম, আনন্দ উৎসব এবং দেবালয় প্রভৃতি দেখিলে এ স্থানটীকে 'হিন্দুস্থান' বলিয়াই মনে হয়।

এখানে ক্লাবের সংখ্যাও কম নহে। ক্লাবের অধিকাংশ সভ্যই তেলের খনিতে কাজ করেন। আমেরিকান ক্লাব, ইংলিশ ক্লাব, চাইনিজ ক্লাব, টুইনজা এসোসিয়েশন্ এবং সর্ব্বশেষে আমাদের বেঙ্গল সোশিয়াল ক্লাব বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে আমেরিকান ক্লাবেরই নাম কম বেশী প্রসিদ্ধ। কোন কোন সময়ে দলে দলে আমেরিকান টুরিষ্ট আসিয়া হাস্য পরিহাস, সরবৎ পান এবং বলনাচ ইত্যাদি দ্বারা ক্লাবটীকে আনন্দ-স্রোতে ভাসাইয়া দেয়।—তেলের খনির আমেরিকান খননকারীদিগকে দূর হইতে দেখিলেই চিনিতে পারা যায়। তাহারা যেমন লম্বা তেমন শক্তিশালী, যেন এক একখানি শাল কাঠ!

সাধারণতঃ পাহাড়ের আশে পাশেই তেলের জন্ম হয়। যে জমির নীচে তেল জন্মে,তাহার কালো পাথর ও কালো মাটি দেখিয়া ভূতাত্ত্বিকগণ একটী যন্ত্র বসাইয়া দেন; খুব বেশী পরিমাণে তেল থাকিলে যন্ত্রটী তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয় এবং বলিয়া দেয় কত ফুট নীচে তেল পাওয়া যাইতে পারে। নদীর স্রোতের মত ভূগর্ভে তেলস্রোত (Oil Current)

তেলের খনির ডুবুরি

প্রবাহিত হয় এবং বাহির হইয়া আসিবার পথ করিয়া দিলেই অতি বেগে তেল নিঃস্রাব হইতে থাকে।

তেলের খনি চার জাতীয়। প্রথম শ্রেণীর খনিগুলিকে বলা হয় রোটারী অয়েল ওয়েল। সাধারণতঃ ইহাদের গভীরতা চার পাঁচ হাজার ফিট; এবং স্তম্ভের উচ্চতা সাধারণ খনির প্রায় দ্বিগুণ। লৌহস্তম্ভ ঠিক করিয়া কপিকলের সাহায্যে এই খনিগুলি খনন করিতে কখন কখন আঠার

মাস (!) সময় লাগিয়া যায়। ড্রিলিং রড্ বা খনন খুঁটী উপর হইতে খনি-গহ্বরে ফেলিয়া খাদ্ করিবার জন্য স্তম্ভের প্রয়োজন। ঢেঁকির খুঁটি যে প্রকারে উপর হইতে নীচের দিকে পড়িয়া আঘাত দেয়, খনন খুঁটি-গুলিও সেইপ্রকারে স্তম্ভের চূড়া হইতে দুই হাজার ফিট নীচে যাইয়া

ডুবুরিকে হাত-খনিতে নামাইয়া দেওয়া হইতেছে

খনি-গহ্বরে সজোরে আঘাত দেয়। স্তম্ভ না থাকিলে খনন করিবার সময় জোর পাওয়া যায় না। সে জন্য প্রত্যেক তেলের কুয়া খনন করিবার পূর্ব্বে স্তম্ভ খাড়া হয়। যে আমেরিকান ড্রিলার এই রোটারী'ওয়েল খনন করেন,

অগ্নিকাণ্ড

তাঁহার মাসিক দক্ষিণা দুই হাজার না হইলেও অন্ততঃ দেড় হাজার হইবে। কোন কোন খনিতে দুই হাজার ফিট নীচে লুক্কায়িত পাহাড় (Hidden rock) বা পাথর দেখা দেয়। তাহা নানাপ্রকার লৌহযন্ত্র দ্বারা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে না পারিলে খনি-গহ্বরে এক প্রকার বোমা (Mining Bomb) নিক্ষেপ করা হয়। তাহাতে পাথর ফাটিয়া তেল উঠিবার পথ সুগম করিয়া দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে খনন কার্য্য চলিতে থাকে। তার পর খনির গভীরতা অনুসারে চার কি পাঁচ হাজার ফিট পাইপ (বড় মাঝারী এবং ছোট এই তিন প্রকারের পাইপ একটীর ভিতরে আর একটী) বসাইয়া দেওয়া হয়। বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে ছোট পাইপটী (Pumping-rod) একবার খনি-গহ্বরে চলিয়া যায় আবার উপরের দিকে উঠিয়া আসে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঐ পাইপের ভিতর দিয়া তেল নিঃস্রাব হইতে থাকে। প্রত্যেক খনির পাশে একটা করিয়া তেলাধার থাকে এবং সংযুক্ত পাইপের ভিতর দিয়া তাহাতে তেল আসিয়া জমা হয়।
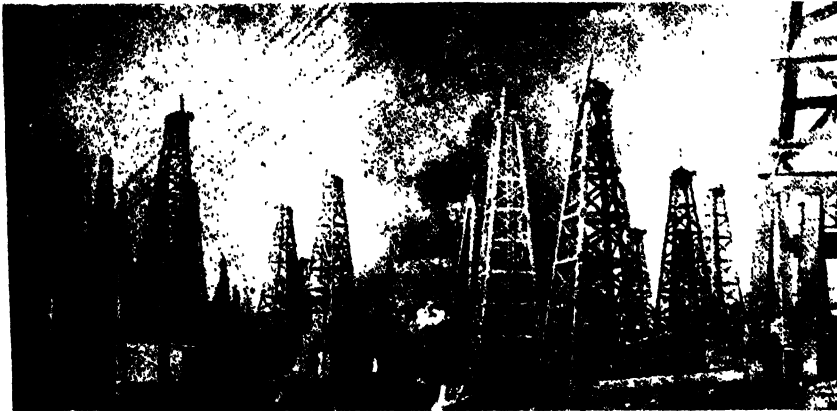
দ্বিতীয় শ্রেণীর খনিগুলিকে বলা হয় Standard oil well বা সাধারণ তেলের খান। এই জাতীয় খনির স্তম্ভগুলি কাঠের তৈয়ারী। ইহাদের গভীরতা দুই হাজার কি দেড় হাজার ফিট হইবে। এনান্জঙে অয়েল ফিল্ডে ইহাদের সংখ্যাই অধিক। ইহাদের খনন-প্রণালী রোটারী ওয়েলের মত। ইলেকট্রিক কারেন্টের যোগাযোগ না থাকিলে বয়লারের

সাহায্যে ষ্টীম এঞ্জিনের দ্বারা ইহাদের কাজ চলিতে থাকে। চট্টগ্রামের মুসলমানরাই এই বয়লারের কাজ চালাইবার জন্য বিশেষ ভাবে নিযুক্ত হন এবং তাঁহারা খুব উচ্চ হারে বেতন পাইয়া থাকেন। ইহাঁদিগকে বয়লার-ম্যান্ বলা হয়। সাধারণ খনির তেল নিঃস্রাবের উপরেই কোম্পানীর উন্নতি অবনতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

জায়গা নির্দ্দেশ করিয়া দিলে কূয়া খনন করা আরম্ভ হয়। গর্ত্তের পরিধি চার পাঁচ গজের বেশী নহে। যতদূর পর্য্যন্ত তেল দেখা না দেয়, ততদূর নীচের দিকে খন্তা এবং অন্য একটা লম্বা লৌহযন্ত্র দ্বারা খনন করা হয়। বর্মা খননকারীদের জীবন বিপন্ন হইবার কারণ থাকিলেও তাহারা ভয় পায় না। যে সকল কূপে গ্যাস পাওয়া যায়, সে সকল কূপ হইতে গ্যাস আটক

এনান্‌খঙ "অয়েল ফিল্ড" [সাম্‌নে প্রথম খনির স্মৃতিস্তম্ভ]

তৃতীয় শ্রেণীর খনিগুলিকে বলা হয় Shallow oil well। ইহাদের গভীরতা চারশ' কি পাঁচশ' ফিট। অয়েল ফিল্ডের ছবিতে তিনখুঁটী বিশিষ্ট যে খনিটী দেখা যায় তাহা তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। আজ কাল এক খুঁটীর দ্বারাই ইহাদের স্তম্ভ খাড়া করা হয়। এই জাতীয় খনিগুলির তেল নিঃস্রাবও খুব কম। রাত্রে অন্ততঃ দুই ঘণ্টা কাল 'পাম্প' করিয়া খনি গহ্বরে বায়ু পূরিয়া রাখা হয়; পরদিন সকাল বেলায় খনি সংলগ্ন পাইপের মুখটী খুলিয়া দিলে ভিতর হইতে জল, তেল ও গ্যাস প্রভৃতি বেগে বাহির হইতে থাকে।

চতুর্থ শ্রেণীর খনিগুলিকে বলা হয় Hand dug oil well বা হাত-খনি। বর্ম্মা টুইন্‌জাদের অধিকারে হাতখনির সংখ্যাই অধিক। ব্যয়াধিক্য বশতঃ তাঁহারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এঞ্জিন বসাইয়া তেল উদ্ধার করিতে পারিতেছেন না। তথাপি ইহাদের দ্বারাই তাঁহারা বিশেষ ভাবে লাভবান্ হইয়া থাকেন। জলের কূয়া হইতে যে প্রকারে জল তোলা হয়, এই হাত-খনি হইতেও ঠিক একই প্রকারে তেল তোলা হয়।—বর্ম্মাদের মধ্যেও অনেক খনি-বিশেষজ্ঞ আছেন। তাঁহারা

অয়েল গেট্

করিয়া রাখিবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়। এই হাত-খনিগুলি দুইশ' কি তিনশ' হাত গভীর। অনেক সময় কাদা জমিয়া তেল বাহির হইয়া আসিবার মুখ বন্ধ হইয়া গেলে, কাদা সরাইয়া দিয়া তেল চলাচলের পথ করিয়া দিবার জন্য ডুবুরির ডাক পড়ে। ডুবুরির কাজ বড় কঠিন কাজ। নিঃশ্বাস লইবার জন্য একটা রবারের পাইপ আছে; তথাপি বিষাক্ত গ্যাসের সংস্পর্শে কেহ কেহ অজ্ঞান হইয়া পড়ে। সুখের বিষয় ডুবুরিরা যেমন শক্তিশালী তেমনই সাহসী। অতি সহজেই তাহারা [illegible]

সঞ্চার হয়। ডুব দিবার পূর্ব্বে এবং ডুব দিয়া উঠিয়া তাহাদের কি হাসি!

অয়েল ফিল্ডের যেখানে সেখানে তিনটী উপদেশপূর্ণ বাণী (!) ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী ও ব্রহ্ম ভাষায় লিখিত আছে। প্রথমটী 'Smoking not allowed'—"তামাকু সেবন করিও না।" দ্বিতীয়টী 'Sleeping on

'পাওয়ার হাউস'

duty means dismissal'—"রাত্রে নিদ্রা দিয়ো না, চাকুরী থাকিবে না।" তৃতীয়টী 'Danger! Touch not!'—"বিজলী থাম! ছুঁইও না, ছুঁইলে বিপদ!"

আজ কাল অয়েল ফিল্ডের সীমানার ভিতরেই সমস্ত বড় বড় আফিস-গুলি লইয়া আসা হইয়াছে। শ্রমজীবিনিবাস ও ক্লার্কস্ কোয়াটারগুলি

নাথ সিং অয়েল রিফাইনারী

ফিল্ডের বাহিরে; কোম্পানীর পুলিশ ব্যারাকটী অতি নিকটে। সময় সময় গোরা-সৈন্য আসিয়া ঐ ব্যারাকটীতে কিছুকাল ধরিয়া বাস করে এবং 'বিউগলের' শব্দে শহরটীকে কাঁপাইয়া তোলে।

বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর তেল (crude oil) সংশোধন করিবার জন্য তেল চলাচলের জন্য এনানজ্‌ঙ হইতে সিরিয়াম অবধি তিনশ পঁচাত্তর মাইল লম্বা একটী পাইপ লাইন খোলা হইয়াছে। ঐ পাইপটী নদী গিরি বন মাঠ ঘাট পার হইয়া সুদূর রিফাইনারীতে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

তেলের খনিতে কাজ চালাইবার জন্য বি. ও. সি'র, যে ইলেক্‌ট্রিক পাওয়ার-হাউস আছে তাহা না কি পৃথিবীর সমস্ত তেলের খনির পাওয়ার-হাউসের চাইতে বড়। ইহা ছাড়া এই কোম্পানীর লেবরেটরী, গ্যাসোলিন প্ল্যাণ্ট, পাম্প ষ্টেশন, মেসিন শপ, রোপওয়ে ও ঝুলন সেতু প্রভৃতি দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। রোপওয়ে অর্থাৎ তার পথে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে একটী 'ক্যারিয়ার'এ করিয়া তেলের পিপা, ত্রিশ চল্লিশ মণ ওজনের পাইপ ও বড় বড় কাঠ এক কারখানা হইতে অন্য কারখানাতে চলিয়া যায়। লোক চলাচলের জন্য তেল-কুণ্ডের উপর দিয়া যে রোপব্রিজ বা ঝুলন সেতু আছে তাহা প্রায় আধ-মাইল লম্বা।—একজন ভ্রমণ-পটু আমেরিকান টুরিষ্টের ও এই সাত মাইল জোড়া তেলের খনি এবং বড় বড় কলকারখানা ইত্যাদি দেখিয়া লইতে অন্ততঃ এক সপ্তাহ সময় লাগে। যদি কেহ ব্রহ্মদেশ ভ্রমণে বাহির হন, এবং এনানজ্‌ঙ না দেখিয়া যান তবে তাঁহার ভ্রমণ যে কতকটা অসম্পূর্ণ থাকিবে, এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি।

আমরা কয়েক বছর ধরিয়া তেলের খনির দেশে বাস করিতেছি, তথাপি এত বড় বিস্তৃত ফিল্ডের এমন অনেক বিষয় আছে যাহা এখনও আমাদের জানা নাই।

পূর্ব্বে না কি এনানজ্‌ঙএর নাম ছিল নন্দাভূমি" *।—সোংচঙ বা সুবর্ণখালের জলস্রোতে চন্দনের গন্ধযুক্ত একপ্রকার তেলময় তরল পদার্থ ভাসিতে থাকিত; এবং টুইন্‌-গোন্' নামক স্থানে, যেখানে বর্ম্মা রাজাদের আমলে সর্ব্বপ্রথম তেল আবিষ্কৃত হয়, সেখানে একটী কুণ্ড ছিল। এখানকার আদিম অধিবাসীরা তাহাকে বলিত সেইথা কুণ্ডাটু" (সীতাকুণ্ড?)। "তাহার জলে দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়া ফেলিলে আগুন জ্বলিয়া

* 'নন্দাভূমি প্রেস' নামে এনানজ্‌ঙএ এখনও একটী ছাপাখানা

উঠিত। এখন সেই কুণ্ড স্থলে অসংখ্য খনিস্তম্ভ এক একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষের মত মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; দূর হইতে সেই স্থানটীকে বৃক্ষপরিপূর্ণ অরণ্যের মতই দেখায়।

যখন প্রথম তেল আবিষ্কৃত হয়, তখন মাটি ফাটিয়া, এমন কি পাহাড় ফাটিয়া, তেল প্রায় পঞ্চাশ হাত উপরে উঠিত। আজকাল স্বতঃপ্রবাহিণী খনিগুলির (Self-flowing oil well) তেলও সেইপ্রকার উপরের দিকে উঠিতে দেখা যায়। এমন অনেক সাধারণ খনি আছে যাহাদের গহ্বরে পাইপ বসাইবামাত্র, এঞ্জিন চালাইবার পূর্ব্বেই, অতিবেগে তেল উপরের দিকে উঠিতে থাকে। পাইপের মুখনিঃসৃত তেল ঠিক আলোক-রশ্মির মত দেখায়। সার জাতীয় যে কোন খনিই স্বতঃপ্রবাহিণী হইয়া দাঁড়াইতে পারে এবং তাহার তেল উপরের দিকে উঠিতে পারে, সুতরাং মাটি ফাটিয়া তেল উঠিবার কথা কিছুতেই অবিশ্বাস করা যায় না। পূর্ব্বে বর্মাদের কথা আজগুবী গল্পের মত মনে করিতাম; এখন সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, কোন কথাই ফেলিতে পারি না।

প্রথম আবিষ্কারের অনেক কাল পরে, দেশী নৌকাতে করিয়া ব্রহ্মদেশের স্থানে স্থানে, এমন কি চট্টগ্রাম, নোয়াখালী প্রভৃতি অঞ্চলেও মেটে তেল পাঠান হইত। আজকাল বি, ও, সি, সিরিয়াম হইতে Tank Steamerএ করিয়া সমুদ্রপথে কলিকাতা ও মান্দ্রাজে কেরোসিন, পেটোল এবং গ্যাসোলিন ইত্যাদি পাঠাইয়া থাকে।

তেলের খনিতে কাজ করিবার সময় যাহাদের অঙ্গহানি হয় অথবা মৃত্যু ঘটে তাহাদের স্ত্রীপুত্রদিগকে সাহায্য করিবার জন্য একটী আইন আছে এবং সমস্ত কোম্পানীই তাহা মানিয়া চলিতে বাধ্য। রোগীদের জন্য দুইটী হাসপাতাল আছে। শ্রমজীবীদের ভ্রাতা, ভাগিনেয় এবং পুত্রদের জন্য অবৈতনিক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। যুবক শ্রমজীবীদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় খুলিবার প্রস্তাব চলিতেছে। শুনা যায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে বায়োস্কোপও দেখান হইবে।
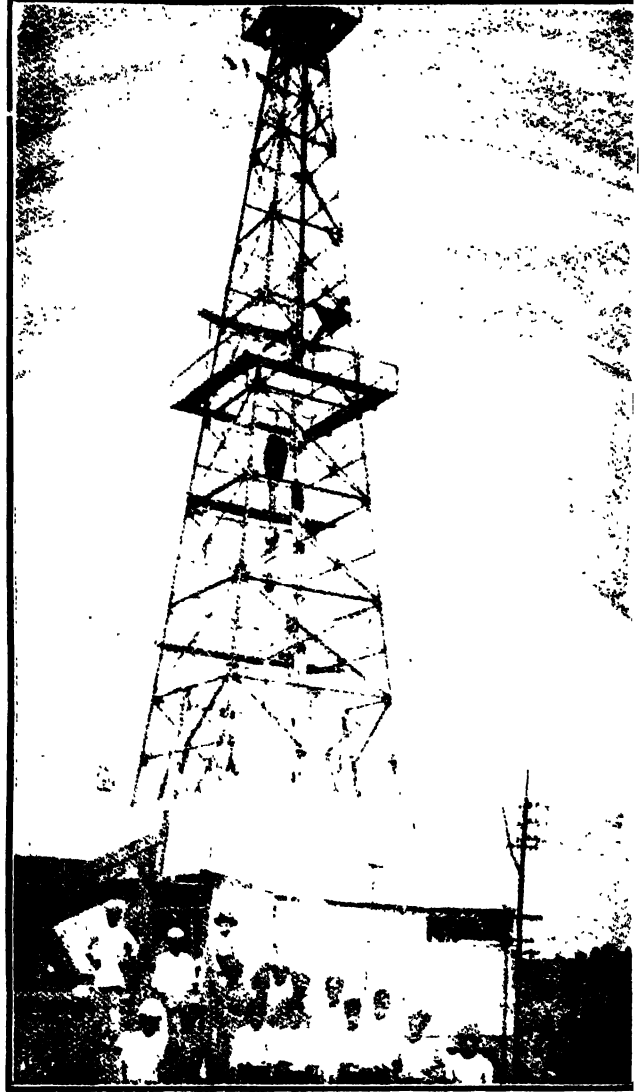
সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ খনি [রোটারী অয়েল ওয়েল)

রোপওয়ে ষ্টেশন

এনানজঙ অয়েল ফিল্ডের ঠিক কেন্দ্রস্থলে বি, ও, সি'র প্রথম খনিটীকে মাটি দিয়া ভরতি করিয়া তাহার উপরে একটী স্মৃতিস্তম্ভ রাখা হইয়াছে। তাহাতে লেখা আছে—

B. O. C. NO. I.
Started 1st November 1888.
Finished 5th March 1889
Depth 727 Feet
Initial Yield 800 Gls.
Driller L. Hickson.

ইহা হইতে বুঝা যায় ড্রিলার হিক্‌সন্ সাহেব ৪০ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম খনিটীকে খনন করিয়াছিলেন এবং বি, ও, সি, অন্ততঃ ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে আসিয়াছিল।
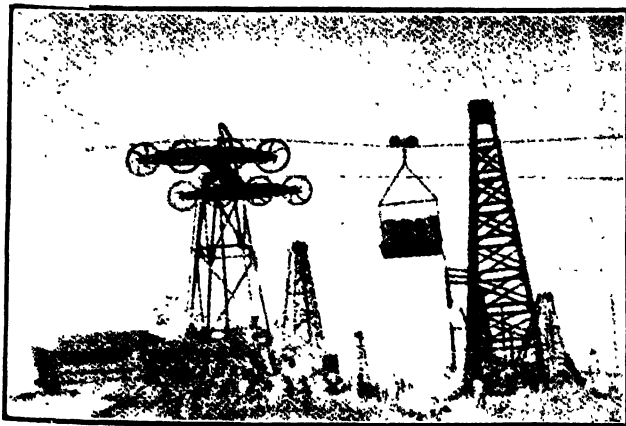
উড়িয়া শ্রমজীবিগণ ট্যাঙ্ক ও পাইপ বসাইয়া স্বতঃপ্রবাহিণীর তেল আটক করিতেছে

সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া এখানে আসিয়া কত দেশ বিদেশের লোক অতি অল্প সময়ের মধ্যে অবস্থা ফিরাইয়া লইয়াছে, কেহই বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায় নাই। যিনি এখানে একবার শুভ পদার্পণ করিয়াছেন তিনিই শ্রীযুক্ত হইয়াছেন।—এনানজঙএর স্থানীয় অধিবাসীরা দুর্ভিক্ষের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত নহে; খাওয়া পরার ভাবনা তাহাদের করিতে হয় না। শান্তির সাধনা-কুঞ্জে বসিয়া নীরবে জীবন যাপন করিতেই তাহারা ভালবাসে। সুতরাং কল-কারখানা এবং নানা ঝঞ্ঝাটের কাজ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের হাতে দিয়া তাহারা যে দূরে দূরে থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

তেলের খনিতে শান্তি রক্ষা এবং মামলা মোকর্দ্দমার বিচারভার ন্যস্ত রহিয়াছে একজন প্রবীণ সিভিলিয়ান কর্ম্মচারীর উপরে। 'Warden of the Yenang-yaung Oil Fields' নামে তিনি পরিচিত।

নানা কারণে দুই বৎসর পূর্ব্বে তেলের খনিতে ভয়ঙ্করভাবে আগুন ধরিয়াছিল।
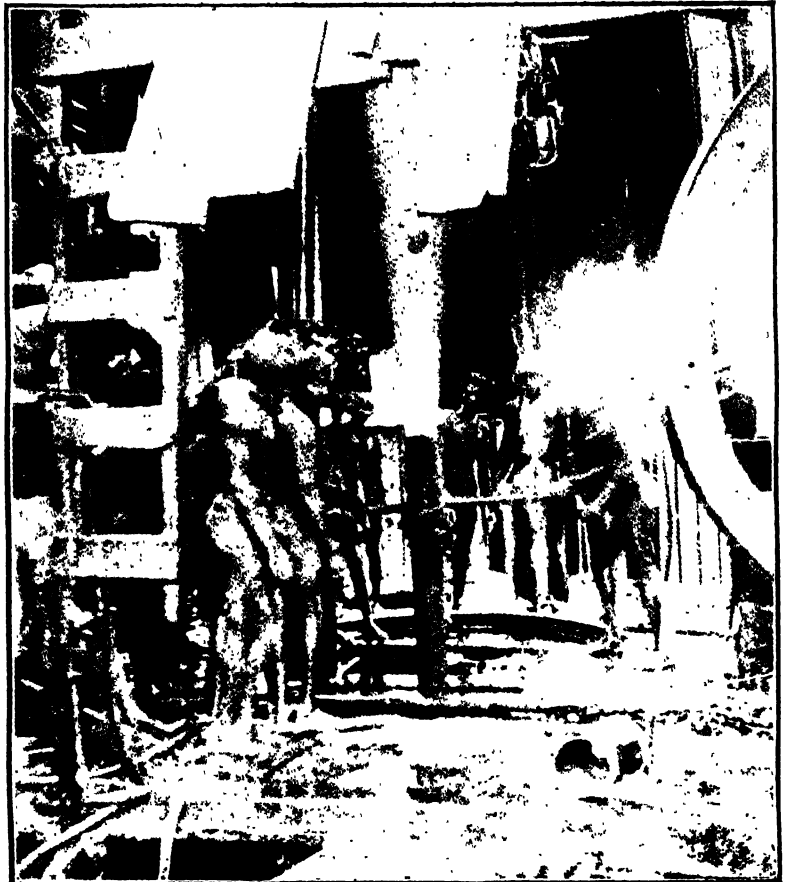
টাকা ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। বড়ই আনন্দের কথা যে, আগুন নিভাইবার জন্য এখন দমকলের বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে এবং ফিল্ডের যেখানে সেখানে মোটা মোটা জলের পাইপ আছে। আনন্দের কথা বলিলাম এই জন্য যে, দমকল থাকাতে বর্মাদের খনিগুলিও আগুনের হাত হইতে রক্ষা পাইতেছে। তেলের খনিতে আগুন ধরিলে আর উপায় নাই; চোখের নিমেষে পাঁচ সাতটা খনি পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। 'বিপদ-বাঁশী' (Danger-whistle) বাজিয়া উঠিবামাত্র তেল কোম্পানীর মুটে মজুর হইতে বড় সাহেব অবধি ছুটিয়া আসে। কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি এবং মোটর চলাচলের শব্দে শহরটা কাঁপিয়া উঠে।

মোটরের সংখ্যাও কম নহে। আট দশটী তেল কোম্পানীর সারি সারি লরি ও মোটরের চলাচলে প্রাণ হাতে করিয়া পথ চলিতে হয়। —চালকের অসাবধানতা বশতঃ কত লোক মোটর চাপা পড়িতেছে। সপ্তাহে তিন চারিটী 'পোষ্টমোরটেম্' তো আছেই।

এখানে আমাদের প্রবীণ বাঙালী ডাক্তার শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী দাদা এবং উকিল শ্রীযুক্ত মিত্রদাদার নাম উল্লেখ করাটা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হইবে না; তেলের খনিতে যত বাঙালী এবং ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের লোক কাজ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে সখ্যতা এবং সৌহৃদ্য স্থাপনের জন্য ইহাঁদের আয়োজনের ত্রুটি নাই। পূজা, থিয়েটার এবং সভা-সমিতির জন্য ইহাঁদের কী চেষ্টা! মিত্রদাদার একটী বিশেষ ক্ষমতা এই যে, তিনি যে-কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য জনগণের সহিত সহজভাবে মিশিতে পারেন এবং সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন।—বিদেশে এ-রকম দুইজন সোণার মানুষ পাইয়া আমরা বেশ আনন্দে আছি। বস্তুতঃ ইহাঁরা দুইজনেই অতি মহাশয় ব্যক্তি।

আমাদের বাসস্থান এই তেল শহরে যেমন শীত তেমনই গ্রীষ্ম। দু'য়েরই সমান প্রতাপ, সমান বিক্রম। বর্ষারাণী অল্প ক'দিনের জন্য আসিয়া কাঁদিয়া কাঁদাইয়া চলিয়া যান। বসন্ত কখন আসে, কখন চলিয়া যায়, টের পাওয়া যায় না। তথাপি লোকের প্রাণে অফুরন্ত স্ফূর্ত্তি! প্রাণ-খোলা হাসি, মিশ্রোলীন সহযোগে গান এবং মধু রজনীতে জ্যোৎস্না উপভোগ অবিরাম চলিতেছে।

ফুল ফোটা আর চাঁদ ওঠা

শ্রীরামেন্দু দত্ত

ফুলের যখন খেয়াল হ'বে আপনা হ'তেই ফুট্‌বে,
জোর ক'রে কে ফুটা'বে তায়, নিঙড়ে মধু লুট্‌বে ?

হুকুম করো উঠ্‌বে মাটি, কাঠুরে কাঠ কাট্‌বে—
হুকুম করো, চাকর তোমার তিরিশ মাইল হাঁট্‌বে;
কিন্তু হুকুম করো দেখি মেঘকে আকাশ ঢাকৃতে
কিংবা বল আমগুলোকে ফাগুন মাসেই পাকৃতে,
চাঁদাকে বল করযোড়ে, "দিনের বেলায় উঠ্‌বে ?"
জোর ক'রে ফুল ফুটিয়ে তোলার অম্‌নি খেয়াল টুট্‌বে!

মণ্ডা মিঠাই নয় যে কিনে আন্‌বে যত ইচ্ছে,
চাইলে যখন, মিল্‌লোনা ক, চাওনা যখন, দিচ্ছে!

কোন্ খেয়ালী ফুটোয় কলি, নাচতে শেখায় ফুলকে!
চাঁদকে বিলোয় চাঁদীর পোষাক, গাওয়ায় রে বুল্‌বুলকে
কা'র খুঁটে এই রং-মহালের চাবির গোছা ঝুল্‌ছে ?
ইচ্ছে-মত বন্ধ করে, ইচ্ছে-মত খুল্‌ছে ?
ইচ্ছে হ'লেই দিচ্ছে কত মুক্তো মণি স্বর্ণ!
আকাশ-যোড়া হীরের মালা, ইন্দ্র-ধনুর বর্ণ!
সেই খেয়ালীর খেয়াল-মত উঠ্‌চে পূর্ণ চন্দ্র,
কাজল মেঘে ফেল্‌চে ঢেকে অন্ধকারের রন্ধ্র!
সেই খেয়ালী খেয়াল-মত ফুলেরে কয় ফুট্‌তে,
কলির জীবন শেষ ক'রে তা'র সরম-বাঁধন টুট্‌তে!

নিখিল রূপের রূপ-কুমারীর লুটোয় আঁচল-প্রান্ত,
তা'র ছোঁওয়া যে ফুটোয় কি ফুল, নিজেই কি সে জান্‌ত ?
বুল-বুলিদের যেই ছুঁলে আর উঠলো গেয়ে এম্‌নি,
ফুল কলিরা আপনি ফোটে জো'স্না ওঠে যেম্‌নি!
রূপ-কুমারী রূপের পরী চৌদিকে যেই চাইলো,
অমনি রঙের উজল ধারায় দিগ্‌বধূরা নাইলো!
চোখ ফিরুলে ভুবন আঁধার, মরুর দশা পায় রে!
গুল্‌বাগে আর ফুল ফোটেনা, চাঁদ ওঠেনা হায় রে!

মায়াবী মণিকার এড্‌গার ওয়েলস্

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ চন্দ

এড্‌গার ওয়েলস্ একখানা বই লিখ্‌তে সত্যি করে কতটুকুন্ সময় নিয়ে থাকেন? উপার্জ্জনই বা তাতে কত হয় তাঁর?

"ডেলি মেলে"র একজন বিখ্যাত লেখক বল্‌ছেন যে, 'আপনি লণ্ডনের যেখানেই যান্ না কেন, এই প্রশ্নটা আপ্-নার কাণে এসে পৌঁছুবেই পৌঁছুবে। এক কথায়, ওয়েলস্ আলোচনা-সভার রাজা; যেখানেই একটু-আধটু সাহিত্যের সঙ্গত জমে, সেখানেই ওয়েলসের আত্মাটী এসে জোটেন।' "ডেলি মেলে"র লেখকটী আরও বল্‌ছেন যে, ডিনারের পর পর-পর তিন দিন তিনি একই আলোচনা শুনেচেন। একজন আর একজনকে বল্‌চে—"মিষ্টার সো-য়্যাণ্ড-সো, শুন্‌চো, ওয়েলস্ না কি এক হপ্তায়ই একখানা বই শেষ করেন, এ তুমি মান্‌তে রাজী আছ? বছর বছর না কি পকেটে তাঁর ৫০,০০০ পাউণ্ড্ আসে; সোজা কথা নয় হে!"...

মিঃ ওয়েলস্‌কেও না কি লোকে এই ধরণের প্রশ্ন করে থাকে। "ডেলি মেলে"র লেখকটীর কাছে তিনি এ কথাটী স্বীকার করেছেন। যখন কথাটা ওয়েলস্ নিজেই প্রকাশ কর্‌লেন, তখন বুদ্ধি খাটিয়ে লেখকটী সত্য কথা বের কর্‌বার উদ্দেশ্যে তাঁকে প্রশ্ন করলেন—'তা আপ্‌নি তাদের কি জবাব দেন?'

ওয়েলস্ চালাক আদ্‌মী; হেসে বল্‌লেন—"আমাকে কি বোকা পেয়েছো? আমি বলি, 'হ্যাঁ মশাই' আপনার উপার্জ্জন কত?' প্রশ্ন-কর্ত্তার মুখ শুক্‌নো হয়ে যায়, মাথা চুল্‌কোতে চুল্‌কোতে আম্‌তা আম্‌তা করে বলেন, 'আপনার মত অত নয়'! সুতরাং কথাটা স্রেফ্ ধামা-চাপা পড়ে যায়, আমিও রেহাই পাই।"

*   *   *   *

'ওয়েলসের কাছে কথাটা তোল্‌বার আগে তাঁর আয় সম্বন্ধে একটা সঠিক্ কাঠামো দাঁড় করাতে পারিনি। নানা কথাবার্ত্তার ভেতরে তিনি যা উপার্জ্জনের ফর্দ্দ পেশ্ কর্‌লেন, তা আমি লিখ্‌তে বসে বেমালুম্ ভুলে গেছি,'—"ডেলি মেলে"র লেখক লিখ্‌চেন; এবং সেইটেই স্বাভাবিক! প্রথমেই ওয়েলস্ বল্‌লেন যে, তিনি তাঁর বই কখনো বিক্রী করেন না পাব্‌লিশারের কাছে। সুতরাং তাঁর কত উপার্জ্জন হয়, সেটা আন্দাজ কর্‌তে এতটুকু অসুবিধে হয় না; কারণ তাতে net sale বা রয়াল্‌টির পারসেণ্ট্ ইত্যাদির বালাই নেই। লাভ-লোক্‌সানের সব ঝক্কি তাঁর নিজের ঘাড়ে—লাভ হলেও তাঁর, লোক্‌সান হলেও তাঁর! এদিক্ দিয়ে ওয়েলসের প্রচুর সাহস।

ওয়েলস্ বল্‌লেন—"পরের জন্যে খেটেচি অনেক দিন। একদিন হঠাৎ আমার মনে হল, নাঃ, নিজেই সব কর্‌ব,—পাব্‌লিশারের সঙ্গে ব্যবসাদারীর ঝক্‌মারী আমার পোষাবে না। তার পর থেকে আমার বই আমি নিজেই ছাপি। আমার প্রথম নাম-করা বই "দি রিঙ্গার" (The Ringer) বাজারে ঢের কেটেছে; ফ্র্যাঙ্ক্ কার্জ্জন সেখানা দিয়ে ২০,০০০ পাউণ্ড্ লাভ করেছেন। আমি তা থেকে মোটে ৬০০০ পাউণ্ড্ পেয়েছি—যেন অনুগ্রহের দান নিচ্ছি আর কি! মনে ভারি কষ্ট হল। লিখ্‌ব আমি, সব কর্‌ব আমি—টাকাটা শুধু যাবে পাব্‌লিশারের পকেটে—দুত্তোর্ আমার লেখা! তার পর আমি একাই এক কোম্পানী তৈরী কর্‌লুম্...আমি লেখক, আমি পাব্‌লিশার, আমি ম্যানেজার- আমি একাই একশো। তবে মাঝে মাঝে আমার স্ত্রী আমাকে সাহায্য কর্‌তেন, চেক্‌গুলোতে দস্তখত্‌ও অনেক সময় তিনিই দিতেন!"

*   *   *   *

লণ্ডনের ষ্টেজে সম্প্রতি ওয়েলসের তিন-তিন্‌টে নাটক চল্‌ছে; আর শুধু চলা নয়,—লোকে তা দেখবার জন্য হুড় হুড় করে টাকা ঢাল্‌ছে। ভেতরে কিছু না থাক্‌লে লোকে কি অম্‌নি টাকা দেয়? যে দেবতা, যে পরম পুরুষ সৃষ্টির অন্তরালে, লোক-লোচনের বাইরে তার নম্র নীড় নির্ম্মাণ করে চলেছেন যুগে যুগে, কালে কালে এই ধরণীর ফুলে

ফলে, তৃণে-জলে তাঁরই ইঙ্গিত চলেছে। ওয়েলস্‌ এই ইঙ্গিতকে তাঁর অভিনব তীক্ষ্ণ চক্ষু দিয়ে নিরীক্ষণ করে সাহিত্যের একটা অপরূপ নীলোৎপল সৃষ্টি করেছেন। সার্থক সে সৃষ্টি ! ··

ওয়েলসের ব্যবসা যদি ঠিক্‌মত কাজ করে তো এক সপ্তাহে তাঁর তিন হাজার কি চার হাজার পাউণ্ড্‌ উপার্জ্জন হয়। এ ছাড়া ছোট গল্প লিখে, প্রবন্ধ লিখে বা কাগজ চালিয়ে উপ্‌রি আয় তো আছেই! এ থেকে তাঁর উপার্জ্জনের একটা আইডিয়া করা শক্ত নয়। অবশ্য কথনো যদি কিছু ঘাট্‌তি পড়ে তো সে লোক্‌সানটাও হয় ওয়েলসের!···

ওয়েলস্‌ বলেন—"লোকে ভাবে, আমি না জানি কত উপার্জ্জন করি। কিন্তু তারা আমার খরচের বহরটা দেখে না একেবারেই। তারা ভাবে, আমি খালি দু হাতে টাকা লুটি; কিন্তু খরচের বেলায় শূন্য! Lyceumএ ছ'শো পাউণ্ড্‌ খরচ কর্‌তে হয়, Apolloতে সাত্‌শো; এবং ভ্রাম্যমাণ তিন্‌টে কোম্পানীতে সপ্তাহে আমাকে দু'হাজার এক্‌শো পাউণ্ড্‌ খরচ কর্‌তে হয়।"

তিনি "ডেলি মেলে"র লেখককে তাঁর লেখা সম্বন্ধে একটা সাধারণ হিসেব দিয়েছেন। নিম্নে তা প্রদত্ত হল—

(১) এক্‌শো চল্লিশ খানা উপন্যাস (হয় তো ডজন খানেক্‌ ভুলে যেতেও পারেন)

(২) কমপক্ষে ছ'খানা নাটক।

(৩) চার্‌শো ছোট গল্প (আনুমানিক হিসাব, বেশী হওয়াই সম্ভব)

(৪) মিস্‌লেনিয়াস্‌।

*   *   *   *

মিঃ ওয়েলস্‌ কিছুদিন হল ছুটী থেকে এসেছেন। বল্‌লেন—"হলি ডে উপভোগ কর্‌তে গিয়ে চারটী মাস কিছু কাজ কর্‌তে পারি নি। হলি ডে'টা হলিডে'ই হওয়া উচিত; তাতে হলিডে'র spirit থাকা চাই। যাক্‌, এক হপ্তার মধ্যেই আমাকে একখানা উপন্যাস শেষ কর্‌তে হবে। শীগ্‌গিরই আরম্ভ কর্‌ব ভাব্‌চি!"

"ডেলি মেলে"র লেখক প্রশ্ন কর্‌লেন—"সব চেয়ে কম সময়ে আপ্‌নি কোন্‌ কেতাবখানা লিখেছেন?"

ওয়েলস্‌ বল্‌লেন—"একদিন একজন পাব্‌লিশার এসে বল্‌লেন ৭০,০০০ শব্দের একটী উপন্যাস আমাকে দিন কয়েকের মধ্যে লিখ্‌তে হবে। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার,—বই দিতে হবে সোমবারে দুপুরের ভেতর! দিনে সতেরো ঘণ্টা খেটে, আমার স্ত্রীর সাহায্যে টাইপিষ্ট্‌কে দিয়ে ছেপে আমার "দি ট্রেঞ্জ্‌ কাউণ্টেস্‌"-খানা সোমবার ভোরবেলা দিতে পেরেছিলুম্‌ পাব্‌লিশারকে। কেউ যদি আমার খুসী বহন করে আনে এম্‌নি কিছু আমাকে উপহার দিতে চায় তো সে যেন আমাকে "দি ট্রেঞ্জ কাউণ্টেস্‌"-খানা প্রেজেণ্ট্‌ করে!"

*   *   *   *

"ডেলি মেলে"র লেখক ওস্তাদ্‌ লোক। সবটুকুন্‌ খবর আদায় করে তিনি ওয়েলস্‌কে ছেড়েছেন। তিনি প্রশ্ন কর্‌লেন ওয়েলস্‌কে—"দেখুন্‌, একটা ছোট গল্প লিখ্‌তে আপনি কতটুকুন্‌ সময় ব্যয় করেন?"

ওয়েলস্‌ মৃদু হেসে জবাব দিলেন—"ডিনারের পর আর লাঞ্চের আগের সময়টুকুন্‌ তো ঐ জন্যেই রেখেচি!"

ওয়েলস্‌ সত্যিকারের রসিক লোক। "The Gunner" "The Flying Squad", "The man who changed his name" প্রভৃতি তাঁর অপরূপ সৃষ্টি। এই ওস্তাদ্‌ ইংরেজ স্রষ্টাটীকে নম্র নতি জানাচ্ছি!

স্বপন-সায়র

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

বাঙ্গালায় একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে, 'গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না।' প্রবাদ হইলেও, অনেক প্রবাদের মত, দেখা যায়, এ প্রবাদও সত্য। আমি জানি, আমাদের মধ্যেই এমন সব লোক আছেন, যাঁহারা হিল্লী, ডিল্লী করিয়া বেড়াইয়াছেন, লক্ষ্ণৌ, কানপুরের প্ল্যান যাঁহাদের নখদর্পণে, অথচ তাঁহারাই হয় ত বাড়ীর কাছে বলিয়া কালীঘাট বা তারকেশ্বর দেখেন নাই। অনেককে আমি জানি, যাঁহারা লাহোরের পথে সেলিমের ভগ্নাবশেষ সমাধি-স্তম্ভ দেখিয়া ও তাহাতে অঙ্কিত লিপি পাঠ করিয়া বিপুল আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন, অথচ তাঁহাদিগকেই হিন্দুর গৌরবের শেষ চিহ্ন যে সপ্তগ্রামে কালের কালীতে মুছিয়া যাইতেছে, সেই সপ্তগ্রাম কোথায়, জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার খবরও তাঁহাদের জানা নাই।

সমগ্র বাঙ্গালার কথা দূরে থাক্, এই কলিকাতা সহরের কয়জন অধিবাসী খবর জানেন যে এই কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার মধ্যেই, এই কলিকাতার অধিবাসীদের অর্থে ও কলিকাতাবাসীর জন্যই, কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট সহরের প্রান্তে একটি কৃত্রিম হ্রদ বা লেক্ খনন করিয়া সহরের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছেন? যাঁহারা নদীমাতৃক বাঙ্গালাদেশের দীর্ঘিকাবহুল পল্লীগ্রামে বাস করেন, নিদ্রাভঙ্গে চক্ষু মেলিয়াই যাঁহারা আঙ্গিনার পারেই প্রান্তর দর্শন করেন, জলাশয় যাঁহাদের গৃহপ্রান্ত বেষ্টন করিয়াই আছে, শ্যামলতার স্নিগ্ধ পরশ প্রভাত-সন্ধ্যা যাঁহাদের অন্তর-বাহিরে আবেশ বুলাইয়া দিতেছে, তাঁহাদের কাছে এই কৃত্রিম হ্রদের বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য না থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদের মত সহুরে বাবু যাঁহারা, কর্পোরেশনের পার্ক দেখিয়াই যাঁহারা প্রান্তর কল্পনা করিয়া লইয়াই সন্তুষ্ট, হেদুয়া, গোলদীঘি দেখিয়াই যাঁহারা মুগ্ধ হইতে অভ্যস্ত, গড়ের মাঠের দুর্ব্বাবিরল উষর আস্তরণ দেখিয়াই যাঁহারা পরিতৃপ্ত, তাঁহাদের কাছে এই কৃত্রিম হ্রদ অভিনব ত বটেই, বুঝি আরও কিছু!

জ্যোৎস্না-রাতে স্বপন-সায়র

কিন্তু এ তো গেল, আমাদের কথা, অর্থাৎ কি-না পুরুষদের কথা! কলিকাতার বঙ্গসমাজের আমরাই ত সব নহি, অর্দ্ধেক সমাজ যাঁহাদের লইয়া গঠিত, জলাশয় বলিতে

যাঁহারা গৃহকোণে সুপ্রতিষ্ঠিত চৌবাচ্ছাটিই বুঝিয়া থাকেন শ্যামল প্রান্তর বলিতে ছাদে রক্ষিত টবে বা মালসায় রোপিত পুষ্পলতা দেখিতেই যাঁহাদের অভ্যস্ত, তাঁহাদিগের চক্ষুতে এই কৃত্রিম হ্রদটি যে আলাদীনের প্রদীপ অথবা আগ্রার তাজের মত শোভা বিস্তার করিবে, তাহাতে লেখকের কোন সন্দেহ নাই।

লেখক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেই এ-কথা বলিতেছেন। লেখক যেদিন তাঁহার "গৃহশোভা" ও অন্যান্য পরিজনগণকে লইয়া এই বিরাট জলাশয় দেখিতে গিয়াছিলেন, সেদিনের কথা তাঁহার স্মরণ আছে। সেদিন ছিল, শরতের এক শুভ্র পূর্ণিমা রাত্রি। লেকের তট বেষ্টন করিয়া শ্যামল-আস্তরণের উপর নীল জ্যোৎস্না-সুপ্ত, বৈদ্যুতিক আলোক-ছটায় হ্রদবক্ষ ঝলকিত,সে দৃশ্য ভুলিবার নহে। দেখিয়া মনে হয় নাই যে আমরা কলিকাতা সহরেই আছি; আমরা যেন কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়াই ছিলাম যে ধুলা-বালি-ধুঁয়ার সাম্রাজ্য কলিকাতার ভিতরেই এই নয়নাভিরাম স্থানটি অবস্থিত।

লেকটি দৈর্ঘ্যে আধ মাইলের কিছু কম হইবে, তার চতুষ্পার্শ্ব ভ্রমণ করিলে এক মাইলের বেশীও হইতে পারে। ইহার সব চেয়ে বিশেষত্ব, কৃত্রিম হইলেও ইহাকে স্বাভাবিকতা-মণ্ডিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কোন পুষ্করিণী বা দীর্ঘিকার অনুকরণে ইহার একটা বাঁধাধরা রূপ বা গতি নাই, যেন ইহা আপনার মনে, আপনার পছন্দমত আঁকিয়া বাঁকিয়া, আপনার গতি, আপনার পথ আপনি করিয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে দ্বীপ আছে, দ্বীপে তরুলতা আছে, 'তরুলতার' মধ্যে আবার আম, জাম, নারিকেল, কাঁঠাল 'গাছই' বেশী।

একটি দ্বীপের উপর একটি মস্‌জিদ আছে। ভূখণ্ড হইতে বারিভাগ অতিক্রম করিবার জন্য বহু ব্যয়ে একটি দোলন-সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে মসজিদের শোভা ও সৌন্দর্য্য কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া গিয়াছে, তাহা অনুমান করাও কঠিন, না দেখিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ইংরাজ সরকার প্রজার ধর্ম্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করেন না, ধর্ম্মমন্দির বিনষ্ট করেন না, এই নীতিতে আস্থাবান হিন্দু এই দৃশ্য দেখিবার সময় ভাবিয়া থাকেন, আহা, এটি যদি শিবমন্দির হইত; খৃশ্চান চিন্তা করেন, যদি ইহা তাঁহাদের গীর্জ্জা হইত! সংসারে "যদি"র কারবার বড় কম নহে, "যদি"তে অনেকখানি সুখ, অনেকখানি শান্তি, অনেকখানি তৃপ্তি অনেকেই পাইয়া থাকেন। আমার এক সৌন্দর্য্য-উপাসিকা বান্ধবী জ্যোৎস্না-বিধৌত মসজিদ-প্রান্তে দাঁড়াইয়া একদিন দুঃখ করিয়াছিলেন, তিনি "যদি" ইস্‌লাম-ধর্ম্মী হইতেন, এইখানে, এই মস্‌জিদেই জীবনাতিবাহিত করিতেন!
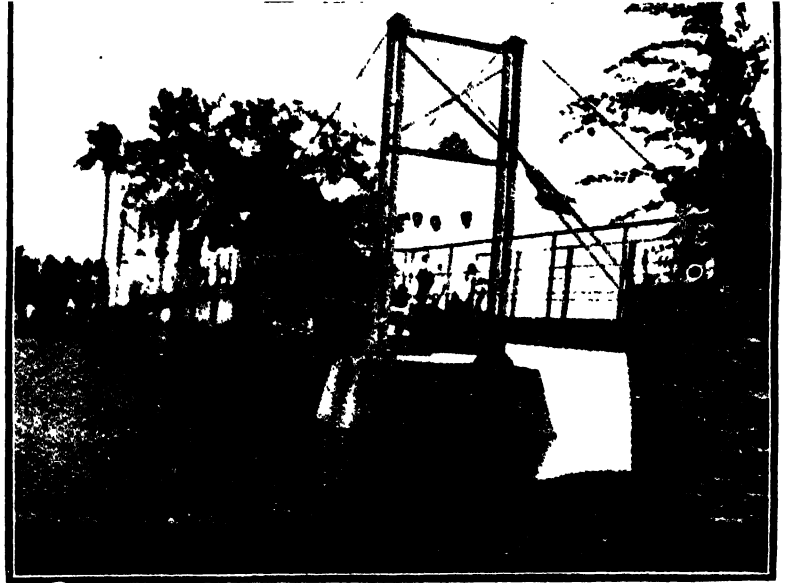
সেতুর দৃশ্য

ভগবানকে ধন্যবাদ, "যদির" তাঁহার কোন সম্ভাবনা নাই।

লেখকের সৌভাগ্যবশতঃ লেখকের পর্ণকুটীরখানি এই লেকের সন্নিকটেই অবস্থিত। প্রতি প্রভাত ও প্রতি সন্ধ্যায় লেখক এই 'নন্দন-বাঞ্ছিত' জলাশয়-তটে বিচরণ করিয়া থাকেন। আজ ইংরাজ নর-নারী কলিকাতার মাঠ, ঘাট, এমন কি ইডেন উদ্যান ত্যাগ করিয়া দলে দলে, হাজারে, হাজারে, কাতারে কাতারে এই কৃত্রিম হ্রদতটেই প্রাতঃসন্ধ্যা ভ্রমণ করিতে আসিয়া থাকেন। বাঙ্গালাদেশের 'সর্ব্বঘজ্ঞে সুর হরি' মাড়োয়ারী-প্রভুরাও তাঁহাদের পাকড়ী,

তাঁহাদের মহিলারাও মোটরে তিন পুরু পর্দ্দা ঝুলাইয়া, আবক্ষ ঘোমটা দুলাইয়া 'হাওয়া খাইয়া' যাইতেছেন, কিন্তু হাওয়া যাঁহাদের সবার বেশী দরকার, তাঁহারা কোথায়? আজ আমাদের বাঙ্গালী মেয়েদের স্বাস্থ্যের অবস্থা চিন্তা করিতে শিহরিয়া উঠিতে হয়। আজ বাঙ্গালীর মেয়ে "কুব্জ পৃষ্ঠ, ন্যুব্জ দেহ" হইয়া বছর বছর কতকগুলি অল্পায়ু ভগ্নদেহ সন্তানের জননী হইয়া শেষে হয় সুতিকায় না-হয় যক্ষ্মায় আক্রান্ত হইয়া সংসারগুলিকে দুঃখপিষ্ট করিয়া ফেলিতেছেন, তাঁহারা কি তাঁহাদের বদ্ধঘর আরও বদ্ধ করিয়া আরোও—আরোও থাকিতে চাহেন? প্রশ্ন হইতে পারে, কোথায় করিতে হইবে। যেদিন তাঁহারা ইহা পারিবেন, আমার স্থির বিশ্বাস, সেদিন তাঁহারা অনেক রকমেই অনেক উপকার দেখিতে পাইবেন। বিশদভাবে এই কথাটা আলোচনা করিবার স্থান আমাদের নাই, আলোচনা করিতে হইলে অনেক কথাই আসিয়া পড়িবে, তাহাও আজ অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা, তাহাতে আমরা নিরস্তই হইতেছি। তবে এ-কথা বলিতে আমার কিছুমাত্র দ্বিধা নাই যে আমার মত অনেকেই আজ পর্দ্দা ভাঙ্গিয়া বাহির হইতেই ইচ্ছুক।

লেক্‌টির অবস্থিতির কথা বলা দরকার। রসা রোড

দোলন-সেতু

বালীগঞ্জ, কোন্ সুদূর সেই ঢাকুরিয়া-লেক্, বাঙ্গালীর মেয়ে, যাঁহাদের গাড়ী নাই, মোটর নাই, তাঁহারা কিরূপে সেখানে যাইবেন? বায়ু-বিলাস করিবার মত সামর্থ্য সঙ্গতি কয়জনের আছে? কথাটা সত্য এবং চিন্তা করিবার মত। কিন্তু সমস্যার মীমাংসা যে নাই, তাহা নহে। বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালীর মেয়েদের গাড়ী-মোটর প্রভৃতি ব্যয়-বহুল যান পরিত্যাগ করাই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। অর্থনীতির দিক দিয়া সম্ভবতঃ কাহারও অপরিচিত নহে, কালীঘাট ট্রামডিপোর অদূরে রসা রোড হইতে ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট একটি সুন্দর, সুবিস্তৃত বর্ত্ম বাহির করিয়া বালীগঞ্জের দিকে লইয়া গিয়াছেন। এই রাস্তায় আজকাল বালীগঞ্জের ট্রাম চলিতেছে। ট্রাম পথ ধরিয়া তিন বা চারি মিনিট পথ অগ্রসর হইলেই ডানদিকে পড়ে, লেক্ রোড। এই রাস্তা ধরিয়া মিনিট দশ পনেরো চলিলেই লেক্ চোখে পড়ে।

ঢাকুরিয়া লেক, কেহ বলে 'বম্পাস' লেক্! বম্‌পাস সাহেবের মাথা হইতে ইহার পরিকল্পনা বাহির হইয়াছিল, বোধ হয় সেই কথা স্মরণ করিয়াই কেহ কেহ ইহাকে বম্‌পাস লেক্ আখ্যায় আখ্যাত করে। কেন জানি না, লোক ভ্রমণ

"যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ
এসো ওগো এসো মোর হৃদয়-নীরে!"

হয় ত চিত্তবিকার, হয় ত এ'ও একটা 'mania'; কিন্তু মনে হয়, সত্যই মনে হয়, যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে মনে

স্বপন-সায়রের দ্বীপপুঞ্জ

মসজিদ

করিবার সময় আমাদের যেন মনে পড়ে—"কার চোখ্ দু'টি কালো," এবং "কাহারে যেন গো বেসেছি ভালো!" লেকের বারিবক্ষ যেন সদাই ডাক দিয়া বলিতেছে—

হয়, যাহাকে ভালবাসিতে চাহি, তাহাকে মনে হয়! যমুনার মত কালো জল, বায়ুভরে নাচিতেছে, উপরে চন্দ্রমা হাসিতেছে, ম্লানচক্ষু তারার দল চাহিয়া আছে, চারিদিকে—

যেদিকে চাহিবে, শ্যাম, সুশ্যাম বৃক্ষলতাগুল্ম, স্নিগ্ধ, সুন্দর! মনে হয় যেন ইহার নাম Love Lake বা প্রেম-সায়র রাখিলেই ঠিক হয়! বাঙ্গালা সাহিত্যে যশস্বিনী একজন লেখিকা জ্যোৎস্না-রাত্রে ইহার শোভা সন্দর্শন করিয়া আমাদের কাছে বলিয়াছিলেন, ইহার নাম হওয়া উচিত, স্বপন-সায়র!

মস্‌জিদের অপর দৃশ্য

যাঁহারা নামকরণের মালিক, Christening করিবার অধিকারী, তাঁহাদের মধ্যে যদি কিছুমাত্র কবিত্ব থাকে, (থাকাই ত সম্ভব, নহিলে এমন স্বপ্নের রাজ্য সৃজন করিলেন কি করিয়া ?) তবে তাঁহারা নামটীও কবিত্ব-ভাব-মণ্ডিত করিতে ভুলিবেন না।

খেয়ালী

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

খেয়ালী, তোমার খেয়াল-বেলায়
জীবনসিন্ধু ক্ষণে উথলায়
ক্ষণে পাশরে,
রূপ প্রকাশের গভীর লীলায়,
সজল আঁখি কি মাধুরী বিলায়,
নয়ন হরে!
গোপন মায়ার গোধূলি বরণে
নিয়তি নিগড় পরায় চরণে
আপনি স'ধিয়া ডাকিয়া মরণে
বক্ষে লহ,
নিগূঢ় মর্ম্মে নিভৃত বেদনা
কেমনে সহ!

ক্ষণিকের ধনে খেয়ালের ঋণে
কত প্রাণ তুমি দিলে দিনে দিনে
মরণ জয়ে,
হে মোর মরমী, হে মোর নিঠুর,
কি করাল গীতি, কি মধুর সুর
মরি যে ভয়ে,
বুকের সোহাগ মরমে বুলায়ে,
মোহ-অঞ্জনে নয়ন ভুলায়ে,
আশা সন্দেহে হৃদয় দুলায়ে
যাও যে হেসে,
তোমার হাসির হাওয়ায় আমার
অশ্রু মেশে।

খেলার পুতুল

শ্রীনরেন্দ্র দেব

১৪

অত্যন্ত দ্বিধায় সঙ্কোচে শঙ্কায় বিজড়িত মন্থর পদে মন্দা যখন লাইব্রেরী-ঘরের দ্বারে এসে পৌঁছালো, সত্যেন্দ্র তখন তার দুই হাত পিঠের পশ্চাতে মুষ্টিবদ্ধ করে অধীর অপেক্ষায় ঘরের মধ্যে পাদচারণা ক'রছিল। তার চোখে মুখে একটা যেন কী দৃঢ় সঙ্কল্প ফুটে উঠেছে দেখে মন্দার বুকের ভিতরটা অকারণে কেঁপে উঠলো, ঘরের ভিতর ঢুকতে আর তার সাহসে কুলালো না। স্বামী তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন ব'লে সে ফিরে যেতেও পারলে না, সেইখানেই নিশ্চল পাষাণ মূর্ত্তির মতো স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সত্যেন মন্দাকে দেখতে পেলে না। তার আনত মুখের কঠিন দৃষ্টি বরাবর গৃহতলেই নিবদ্ধ ছিল।

হঠাৎ এক সময় 'ঝনাৎ' ক'রে একটা শব্দ হয়ে মন্দার চাবীর রিং-শুদ্ধ আঁচলটা মেঝের উপর খ'সে পড়লো। সেই শব্দে সচকিত হ'য়ে সত্যেন মন্দাকে দেখতে পেয়ে তাকে ঘরের মধ্যে আহ্বান করলে—

—শোনো, এদিকে এসো—

মন্দা সে ডাক শুনে বেশ বুঝতে পারলে যে সত্যেনের কণ্ঠস্বর আজ অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর। এমন ভারী গলায় সে আর কখনও স্বামীকে ডাকতে শোনেনি। তার ইচ্ছে হলো তখনি সেখান থেকে ছুটে কোথাও পালিয়ে যায়। কিন্তু পালাতেও সে পারলে না, অথচ সত্যেনের ডাক শুনে ঘরের মধ্যে যেতেও আর তার পা' সরল না। সেইখানেই সে দাঁড়িয়ে রইল বটে, কিন্তু তার মনে হ'তে লাগল যেন ঠিক চোরা-বালির মধ্যে তার পা' দুটো ক্রমেই নেমে যাচ্ছে!

সত্যেন এগিয়ে এসে সস্নেহে তার একটা হাত ধরে তাকে ঘরের মধ্যে আদর করেই টেনে নিয়ে এলো এবং নিজের মোটা পুরু গদীমোড়া আরাম কেদারাখানাতে তাকে সযত্নে বসিয়ে দিয়ে নিজে অপর একখানা চৌকী টেনে এনে মন্দার সামনে ঘেঁসে এসে বস্‌লো। তার হাত দুটি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে বললে—আমি জানতুম তুমি সুহাসকে সহ্য ক'রতে পারবে না, হয় ত একটা ভুল বুঝে কষ্ট পাবে—এই ভয়েই ওকে এতকাল আমার কাছে আনতে সাহস করিনি কোনওদিন।—

এই পর্য্যন্ত ব'লেই সত্যেন চুপ ক'রলে।

মন্দার লজ্জায় মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে হ'চ্ছিল। সেই যে ঘাড় হেঁট করে চেয়ারখানিতে এসে ব'সেছিল, তেমনি ক'রেই সে ব'সে রইল। মুখ তুলে আর সত্যেনের দিকে চাইতে পারলে না।

সত্যেন আবার বলতে লাগলো—দশ-বছর পরে আমি যেদিন তোমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'য়ে—'সু'কে আনতে পাঠিয়েছিলুম, সেদিন সে আসেনি। আমার গাড়ী, পাল্কী, লোকজন সবাইকে সে ফিরিয়ে দিয়েছিল—তা তো জানো? সেদিন ওর ব্যবহারে সত্যই আমি অন্তরে একটু ক্ষুব্ধ হ'য়েছিলুম, কিন্তু আজ বুঝতে পারছি আমার ডাকে না এসে সে ভালই করেছিল। নইলে, সেদিন তোমার চোখে আমার অপরাধ হয়ত আরও শতগুণ বেশী হ'য়ে উঠতো এবং এর চেয়েও তুমি তখন হয় ত আমার কোনও কঠোরতর দণ্ড বিধান ক'রতে—

সত্যেন আবার চুপ করলে। মন্দার মুখেও কোনো কথা ছিল না। সে নির্ব্বাক নিস্পন্দ হ'য়ে বসে ছিল। সত্যেনের কথা শুনে সে মরমে-মরে যাচ্ছিল। তার কেবলি মনে হচ্ছিল—মেদিনী দ্বিধা হও, আমি তোমার গর্ব্ভে প্রবেশ করি! এর চেয়ে স্বামী যদি তাকে ভৎর্সনা করতেন—অপমান করতেন—এমন কি লাঞ্ছনাও ক'রতেন—তাও হয় ত তার সইত' কিন্তু—এই সহানুভূতিভরা দরদীর মতো সস্নেহ বচন—এ যেন তীব্র লজ্জার তীক্ষ্ণ তীরের মতো তার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করছিল।

সত্যেন তার হাতের মুঠোর মধ্যে-ধরা-মন্দার হাত

দু'খানিতে যেন বেশ একটু সোহাগের চাপ দিয়েই বললে—তোমার বা আমার বিনা নিমন্ত্রণে ও যে এমন অযাচিত এখানে এসে পড়তে পারে, এ আমার সকল প্রত্যাশার অতীত ছিল মন্দা—সেই অঘটনই এমন করে ঘটে গেল দেখে আমি যেন আমার নিজের উপর সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে ফেল্‌ছি!—

বলতে, বলতে, সত্যেন যেন অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়লো; হঠাৎ কি একটা অকূল ভাবনার অতলে যেন তার বিচলিত চিত্ত নিমেষে তলিয়ে গেল।

মন্দার হাত দুটি যদিও তখন সত্যেনের হাতের মধ্যেই ছিল তবু সে সেই মুহূর্ত্তে যেন স্পষ্ট অনুভব করতে পারলে যে স্বামীর দৃষ্টি আর তার মুখের উপর নিবদ্ধ নেই। এই অবকাশে অতি সন্তর্পণে মন্দা একবার লুকিয়ে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে দেখে—একেবারে শিউরে উঠলো। সত্যেনের সেই শিবের মতো দীর্ঘায়ত সুন্দর চোখ দুটির কাণায় কাণায় এ কি ব্যথার অশ্রুজল আজ ভরে উঠেছে!—

একটা অসহ্য বেদনার আঘাতে মন্দার অন্তর যেন মথিত হ'তে লাগ্‌ল।

সত্যেন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে—অত্যন্ত উদাসকণ্ঠে বলতে লাগলো—সুহাস আমাকে কত যে ভালবাসে এ কথা তুমি আমার কাছে বহুবার শুনেছো, আমার মায়ের পর—

বলেই তখনি একটু থেমে, মন্দার দিকে ক্ষণকাল নির্নিমেষে চেয়ে দেখে আবার সত্যেন বললে—এবং তোমার আগে,—ওর চেয়ে আপনার জন আর আমার কেউ ছিল না। কিন্তু, আজ এই দীর্ঘ দশ বৎসর পরে ও যে এমন ক'রে তার সেই পুরাতন অধিকারের দাবী নিয়ে এত সহজ ভাবে আমার কাছে এসে দাঁড়াতে পারবে এ আমি কল্পনাও করিনি মন্দা! ওর এই অনাহূত আমার কাছে আসাতে আমি যে আজ শুধু চমৎকৃত হয়েছি তাই নয়, আমার এতদিনের একটা মহা ভুল টুটে গেছে!…

সত্যেন আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তার পর একেবারে উত্তেজিত হ'য়ে উঠে বললে—জানো কি মন্দা, কেন আমি তোমাকে এতদিন তোমার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে রেখেছি—? কতদিন 'তোমাকে সে কথা বলবো ভেবেছি—কিন্তু কিছুতেই বলে উঠতে পারিনি, পাছে সুহাস তাকে যতদিন দেখোনি—জানোনি—ততদিন তুমি ওর সম্বন্ধে যা বলেছো—বা ভেবেছো—আমি সে কথা তুলে আজ আর তোমাকে লজ্জা দিতে চাইনি। কিন্তু, আমার এই গা' ছুঁয়ে বলো দেখি তুমি—সত্য করে আজ—সুহাসকে তুমি কি এখনও সেই পূর্ব্বের মতো অবিশ্বাস ও সন্দেহ করতে পারো?

লজ্জায়-রাঙা-হ'য়ে-ওঠা মুখখানি তার ঈষৎ তুলে পলকের জন্য সত্যেনের মুখের দিকে চেয়ে মন্দা 'না' বলেই আবার তৎক্ষণাৎ মাথাটি নত ক'রে নিলে।

সত্যেন আনন্দে দীপ্ত হ'য়ে, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—যাক্! তুমি আজ আমার বুকের উপর থেকে কতবড় যে একটা গুরুভার নামিয়ে নিলে তা তুমি বুঝতে পারবে না হয় ত! এখন আমি অনায়াসেই সুহাসকে এখান থেকে চলে যেতে বলতে পারবো।

মন্দা এ-কথা শুনে চমকে উঠলো! সুহাসকে উনি চলে যেতে ব'লবেন? কেন? তারই জন্য কি? ছি ছি—সে কি এত নীচ যে—

সত্যেন বললে,—আজ রাত্রেই আমি ওকে পাঠিয়ে দিতুম মন্দা,—কিন্তু, তোমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া না করে কিছুতে তা পারলুম না! ও যে আমার এখান থেকে শুধু তোমার ঘৃণা, অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা বহন ক'রে নিয়ে যাবে—এইটে কোনমতেই আমি অনুমোদন করতে পারছিলুম না! কিন্তু, আর আমার কোনও বাধা নেই। আমি এখনই সব ব্যবস্থা করে ফেলছি, কাল বিদাপৎ, গোকুল আর সরকার মশাই ওর পাল্কীর সঙ্গে গিয়ে ওকে রেখে আসবে—

মন্দা আর চুপ ক'রে থাকতে পারলে না—অধীর হ'য়ে চেয়ার ছেড়ে একেবারে সত্যেনের পায়ের উপর উপুড় হ'য়ে পড়ে কাতরভাবে বললে—আমায় তুমি দয়া করো—ক্ষমা করো—আমি অন্যায় করেছি, সহস্রবার অন্যায় করেছি! তোমাকে—ঠাকুরঝীকে এবং নিজেকেও আমি অত্যন্ত অপমান করেছি—কিন্তু, সে যে কী জ্বালায় সে আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না! তার সমস্ত গ্লানিই আমাকে যেন আগুনের মত দগ্ধ করছে! তোমাকে যে দুঃখ দিয়েছি তা' চতুর্গুণ হয়ে আমারই বুকে ফিরে এসেছে—ওগো, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি—তুমি আর আমাকে

সত্যেন সাগ্রহে সন্নত হ'য়ে মন্দাকে পা'য়ের কাছ হ'তে অতি যত্নে তুলে ধরে বললে—কিন্তু মন্দাকিনী, ওর জন্য অকারণ তুমি ব্যথা পাচ্ছ—এটা যে আমাকে আজ অহরহ পীড়া দিচ্ছে! শাস্তি তো তোমার হবে—ওকে এখানে ধ'রে রাখাতেই! বরং বিদায় করে দিলেই তুমি শান্তি পাবে ব'লে আমার বিশ্বাস—

—না—নাগো—না—ভুল! ভুল! তোমার মস্ত ভুল!—

অধীর-ব্যাকুল কণ্ঠে মন্দা ব'লতে লাগল—কেন তুমি আমাকে এমন নীচ মনে করে—এত বড় ভুল করছো—ঠাকুরঝীর কাছে আমি যে আজ কত ঋণী—কতখানি কৃতজ্ঞ—তা তো তুমি জানো না! .....

মন্দার দুই চোখ জলে ভরে উঠলো—রোদন-রুদ্ধ কণ্ঠে সে বলতে লাগলো—দশ বৎসরের প্রাণপণ চেষ্টায় আমি তোমার এতটুকু নিকটবর্ত্তিনী হ'তে পারিনি। তুমি সদা সর্ব্বদা কাছে থেকেও চিরদিন আমার বহু দূরে ছিলে। তোমাকে আমি একটি দিনের তরেও আপনার করে নিতে পারিনি। কিন্তু, ঠাকুরঝী এসে আজ তোমাকে আমার সমীপবর্ত্তী করে দিয়েছে। তারই জন্যে তোমাকে আজ আমি যেন এই প্রথম আমার কাছে পেয়েছি!—খুব কাছে! নারীর সর্ব্ব আয়ুধে সুসজ্জিত হ'য়েও যাকে আমি এতদিন জয় ক'রতে পারিনি—সুহাস আজ যেন তাকে কোন্ মায়া-মন্ত্রে বন্দী করে আমার হাতে স'পে দিয়েছে!—তাকে আমি এ বাড়ী থেকে অপমান করে তাড়িয়ে দেবো—তুমি কি আমাকে এত বড় অকৃতজ্ঞ মনে করো?—

মন্দার মুখে এই সব কথা শুনে সত্যেন্দ্র যেন অতি মাত্র বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে প'ড়লো!

স্বামীর কাছে কোনও উত্তর না পেয়ে মন্দা আবার বলতে লাগল—আর তাই যদি নাই হ'তো—ঠাকুরঝীকে যদি সত্যই সহ্য করতে আমি নাই পারতুম—তবুও, তোমার সংসারের যে ভারটুকু পেয়ে আমি ধন্য হ'য়েছি—তুমি কি মনে করো আমি অতিথির অসম্মান ক'রে সেই অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করবো? বিশেষ—যেখানে এমন অতিথি—যিনি—গৃহস্বামীর পরমাত্মীয়! যাকে এতদিন আবাহন ক'রে আনতে সাহস করিনি আমি, তাকে আজ বিসর্জ্জন ক'রতে যাবো কোন স্পর্দ্ধায়?

ব্যগ্র বাহু-বেষ্টনে মন্দাকে বুকে টেনে নিয়ে, তার পিঠে, তার চুলে, তার মাথায়, তার ললাটে, তার কপোলে, তার চিবুকে, সাদর করস্পর্শ দিয়ে সত্যেন ব'ললে—এই—এই—এই রকমই তো তোমাকে আমি দেখতে চাই মন্দা! তুমি কখনই অত ছোট হ'তে পারো না। এই সব ক্ষুদ্রতায়—মিথ্যা-সন্দেহ বিদ্বেষের এই সব তীব্র গরল সংস্পর্শে—মানুষ এত হীন—এত হেয়—হ'য়ে পড়ে যে,—এই সুখ-দুর্লভ-সংসারে তারা শুধু অশান্তি ও অকল্যাণই বহন ক'রে বেড়ায়!—তুমি তোমার চিত্তের প্রসন্নতা হারিয়ে ফেলেছো দেখে—তোমার সম্বন্ধে আমার বড় আশঙ্কা হ'য়েছিল মন্দাকিনী। শেষে, আজ আমার মুখে সুহাসের প্রশংসাবাদ যখন তোমাকে উত্যক্ত করে তুললে দেখলুম—আমি দৃঢ় সঙ্কল্প করেছিলুম যে,—সুহাসকে আজই বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে তোমাকে যেমন ক'রে হোক্ রক্ষা ক'রতেই হবে! সুহাস আমার সহোদরাধিক—তার কাছে আমার কোনও লজ্জা নেই—কিন্তু, তবু—আমার বড় ইচ্ছে হয়েছিল যে তুমি যে তার চেয়ে এতটুকু কম নও এইটেই যেন সে জেনে যায়—! আমি তাকে দেখাতে চেয়েছিলুম যে তোমায় পেয়ে আমি আশাতীত সুখী হ'য়েছি—

মন্দার মুখটি শুকিয়ে গেল। ভ'য়ে ভ'য়ে বললে—কিন্তু ঠাকুরঝীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে তো তুমি ফাঁকি দিতে পারোনি! সে যে তোমাকে ধরে ফেলেছে—

অসহিষ্ণুর মতো সত্যেন বলে উঠলো—তা ফেলুক!—তাতে কোনও ক্ষতি নেই মন্দা,—আমার সে লজ্জাকে ঢেকে এই গৌরবটাই আজ সবচেয়ে বড় হ'য়ে উঠেছে যে—তোমাকে সে ছোট মনে ক'রতে পারেনি—

—কি করে তুমি জানলে—?

কুন্দ ফুলের মতো শুভ্র সুন্দর মুখখানি স্বামীর মুখের পানে তুলে ধরে সরলা বালিকার মতো তার ডাগর চোখ দুটিতে অজস্র কৌতুহল পুরে নিয়ে মন্দা এই প্রশ্ন করলে—

সত্যেন সেই মুখের পানে চেয়ে আজ যেন এই প্রথম মুগ্ধ হয়ে গেল! অপলক নয়নে তার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললে—আমার এমন দুর্লভ 'স্ত্রী'কে—আমি অবহেলা করি ব'লে সুহাস আমাকে ভৎর্সনা করছিল—

স্বামীর চোখের সে দৃষ্টির মধ্যে মন্দা আজ এমনই একটা নূতন আলোর সন্ধান পেলে—যার দীপ্ত শিখা আজ এই

দশবৎসরের চেষ্টাতেও সে কোনদিন সে বুকে আলাতে পারেনি।

স্বামীর বাহু-বেষ্টনের মধ্যে তার দেহ-লতা ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠতে লাগলো। দু'টি চোখের চপল চাহনীতে মোহ-মদিরার বিদ্যুৎ-চঞ্চল-লীলা বিকাশ করে, কণ্ঠে যেন নিবিড় সোহাগ ঢেলে দিয়ে মন্দা কোন্ তরুণী প্রণয়িনীর মতই অনুযোগের সুরে বললে—আমি তোমার অযোগ্যা স্ত্রী ব'লে সত্যই তো তুমি আমাকে চরণে ঠাঁই দাওনি! ঠাকুরঝী তো কিছু মিছে বলেনি—

মন্দার দৃষ্টিতে আজ এ কি সৃষ্টিছাড়া চাহনী—! কণ্ঠে তার এ কোন্ অমৃত-মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি—! এ তো সে কোনও দিন দেখেনি?—কোনও দিন শোনেনি?—বিস্ময়ে পুলকে সত্যেনের চিত্ত যেন প্রমত্ত হ'য়ে উঠলো!—নারীর স্পর্শ যে পুরুষের দেহ-মনে এমন একটা উন্মাদনা এনে দেয়—তার এই বিহ্বল-করা-আবেশের অনুভূতির সঙ্গে সত্যেনের এমন অন্তরঙ্গ পরিচয় আর কখনও হয়নি! নিমেষে যেন তার বহিঃসত্ত্বার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই সত্যেনের বলিষ্ঠ বাহুবন্ধন মন্দার দেহপ্রান্তে নিবিড়তর হয়ে উঠলে। মগ্ন চৈতন্যের সে কোন্ অপ্রতিহত প্রেরণায় পত্নীকে আপন বক্ষের উপর আরও নিকটতম করে টেনে নিয়ে একটা সুদীর্ঘ চুম্বনে সত্যেন যেন আপনাকে নিঃশেষিত ক'রে দিতে উদ্যত হ'ল—

ঠিক সেই সময় সুহাস সে ঘরে ঢুকে পড়ে যেন অকস্মাৎ পাষাণ-প্রতিমার মতো নিশ্চল হ'য়ে গেল—!

সুহাসের পিছু পিছু মণীন্দ্রও সে ঘরে এসে যখন ঢুকলো, তখন, সচকিত সত্যেন ও মন্দার মাথার ভিতর থেকে স্বপ্ন-লোকের সে ক্ষণিক নেশার আমেজটুকু কেটে গেছে! তারা তখন প্রকৃতিস্থ হয়েছে!

আপনার বিবাহিতা পত্নীকে সে আদর ক'রছিল, এটা কিছু তার পক্ষে অন্যায় বা অপরাধ নয়—তবু সুহাসের সামনে এটা ধরা প'ড়ে যাওয়াতে সত্যেন যেন অত্যন্ত লজ্জিত হ'য়ে পড়লো, মন্দার মনটি কিন্তু, তার এই নিবিড় স্বামী-সোহাগের সাক্ষী স্বরূপ সুহাসকে সামনে দেখতে পেয়ে গর্ব্বে ও খুশীতে ভরে উঠলো!

সুহাসের চোখ-মুখের সে কঠিন ভাব মন্দার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারলেনা—মন্দা দেখলে একটা বিস্মিত অপলক দৃষ্টি নিয়ে সুহাস সত্যেনের লজ্জানত মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। সে চোখ দুটির তারায় তারায়—কী যেন একটা অব্যক্ত প্রশ্ন জেগে উঠেছে—

মন্দা হাসতে হাসতে বললে—দেখলেত' ভাই ঠাকুরঝী তোমার দাদার কাণ্ড! যত বুড়ো হ'চ্ছেন তত যেন ভীমরতি বাড়ছে!—

এমন সময় সে সুহাসের পিছু পিছু মণীন্দ্রকেও আসতে দেখে ব'লে উঠলো—এই যে—দাদা আজ এখনও রয়েছো যে বড্ড! এই মশা ম্যালেরিয়ার রাজ্যে রাত্রে বেশীক্ষণ থাকা নিরাপদ নয় ব'লে, তুমি যেদিনেই এসো সন্ধ্যে হ'তে না হ'তেই পালাও। কতদিন সাধ্যসাধনা ক'রেছি—দাদা আর একটু বোসো ভাই—গরম গরম লুচি ভেজে দিচ্ছি খেয়ে যাও লক্ষ্মীটি, তা কাণেই তোলোনা—আর আজ যে দেখছি কলকাতায় ফেরবার নামটি নেই—

মণীন্দ্র বললে—আজ তোর খাওয়াবার আক্ষেপটা মেটাবার জন্যই রয়ে গেলুম—যা চটপট—গরম গরম লুচি ভাজার ব্যবস্থা ক'রগে যা—

মন্দা বললে—কী ভাগ্গি্য! আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম কে জানে? সূর্য্যি কি আজ পশ্চিমে উঠেছে নাকি?

বলতে বলতে হঠাৎ মন্দা থেমে গেল!—অকস্মাৎ মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের শুভক্ষণটুকুর কথা তার মনেপড়ে গিয়ে একটা কী যেন অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে সমস্ত অন্তরটি আপ্লুত হ'য়ে গেল! সত্যইত—আজ তার বড় ভাগ্য—আজ নিশ্চয়ই কোনও মঙ্গলময় মুখ দেখে সে শয্যাত্যাগ করেছে—আজ এতদিন পরে—তার গৃহ-বিমুখ স্বামীর তাকে ভালো লেগেছে—

মন্দা গলায় আঁচল দিয়ে তার দাদাকে একটি ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম ক'রে উঠে বললে—না—দাদা, ঠাট্টা নয়, আজ আমি তোমাকে কিছুতেই না খাইয়ে ছাড়বো না। তার পর হঠাৎ সুহাসের দুই হাত ধরে কাতর ভাবে বললে—বলো না ভাই ঠাকুরঝী তুমি একটু দাদাকে খেয়ে যেতে—

সুহাসের যেন চমক ভাঙলো। মণীন্দ্রের মুখের দিকে চকিতের ন্যায় একবার চেয়ে দেখে হাসি মুখে বললে—এটা আমার বাড়ী ব'লে উনি স্বীকারই করেন না; সুতরাং আমি ওঁকে এখানে খেয়ে যেতে ব'লবো কোন অধিকারে বৌদি?—বিশেষ গৃহস্বামী যখন একটি কথাও কইছেন না—এই বলে

সুহাস আর একবার সত্যেনের দিকে ফিরে তাকালে—তার চোখ থেকে বিস্ময়ের ভাবটা যেন তখনও সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায়নি!

সত্যেন যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে ওঠার মতো ধড়-ফড়িয়ে উঠে ব'ললে—সে কি! সে কি!—অতিথি-সেবা যে গৃহকর্ত্রীর ব্রত,—তিনিই যখন স্বয়ং আবাহন করছেন—তখন গৃহস্বামী সেখানে শুধু মৌন-সম্মতি ছাড়া আর তো কিছু ব'লতে পারে না—কি বলো মন্দা?—এই ব'লে সত্যেন একটু মন্দার দিকে এগিয়ে গিয়ে স্ত্রীর কাঁধের উপর অতি সন্তর্পণে একটি হাত রাখলে—

দাদার সামনে মন্দার এতে বড়ই লজ্জা করতে লাগলো—কিন্তু তবু কাঁধের উপর থেকে স্বামীর হাতখানি সরিয়ে দিতে তার কিছুতেই মন সরল না! এ যে তার আজ অপ্রত্যাশিত সম্পদ!—

একবার স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে দেখে সগর্ব্বে সে বললে—নিশ্চয়! আমি যখন নিমন্ত্রণ করছি তখন তোমাকে আবার আলাদা ব'লতে হবে কেন?

—এই বলে কে? বুড়ীকে তুমি বুঝিয়ে দাও ত' এ কথাটা যে,—তুমি আমি ভিন্ন নই!

সুগাস এ ব্যাপারে মণীন্দ্রের সামনে নিজেকে অত্যন্ত অপ্রতিভ বোধ ক'রতে লাগল। তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো সত্যেনের উপর। তার মনে হ'লো দাদা যেন ইচ্ছে ক'রেই তাকে অপদস্থ করবার জন্য মন্দার পক্ষ নিয়ে কথা বলছে!

মণীন্দ্র সুহাসের অবস্থা যেন কতকটা অনুভব ক'রে একটু এগিয়ে এসে সত্যেনকে বললে—তুমি একটি ইডিয়ট্—'সু' কি বলতে চাইছে তা বুঝতে না পেরে একটা যাচ্ছে তাই ভুল করছো! 'সু' ব'লতে চাইছে—যে কেবলমাত্র গৃহিণীর অনুরোধেই সে আমাকে নিমন্ত্রণ করবার দায়িত্ব নিতে পারে না যদি না গৃহস্বামীও তাকে সে অধিকার দেন—

সুহাসের শুষ্ক মুখখানি প্রফুল্ল হ'য়ে উঠলো, ডাগর চোখ দুটিতে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি ফুটিয়ে তুলে সে একবার মণীন্দ্রের মুখের দিকে চেয়ে দেখে স্মিত-হাস্তে বললে—আপনিই আমার কথাটা দেখ্‌ছি—ঠিক বুঝতে পেরেছে'ন—আসুন, আপনার সঙ্গে এইবার আমি—'শেকহ্যাণ্ড' করতে রাজি আছি—

মণীন্দ্র যখন সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিয়ে সুহাসের কোমল করপুট অতি সন্তর্পণে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে তার মৃণাল-ভুজ-বল্লরীতে খুব সাবধানে মৃদুল দোল দিচ্ছিল, সত্যেন একটু আশ্চর্য্য হয়েই জিজ্ঞাসা করলে—মণি কি এর মধ্যেই সুহাসকে 'তুমি' বলতে সুরু করেছো নাকি?

মণীন্দ্র এ প্রশ্নের কোনও উত্তর দেবার পূর্ব্বেই মন্দা বললে—তা নইলে কি আর ঠাকুরঝীর হ'য়ে দাদা অমন ওকালতী ক'রতে আসে? কেমন কথাটি ঘুরিয়ে দিলে! আমার মনে হয় দাদার ডাক্তার না হ'য়ে উকিল হওয়াই উচিত ছিল।

সুহাস যেন ওদের কারুর কথাই শুনতে পায়নি এমনি ভাবে মণীন্দ্রের মুখের দিকে চেয়ে বললে—মমতাজের হাতে আঘাত লাগবার ভয়টা এখনও ভোলেন নি দেখছি!

মণীন্দ্র একটু অপ্রতিভ হ'য়ে—সুহাসের হাতটি ছেড়ে দিয়ে বললে—এ বর্ব্বরের রূঢ় আচরণটুকু আশা করি, তুমি মনে রাখবে না? সত্যিই তোমার ওই ফুলের মতো নরম হাতে আমাদের এ কোদালের তুল্য হাত রাখতে ভয় করে—

সুহাস হেসে উঠে বললে—কিন্তু, পুরুষমানুষের হাত ঠিক মাখনের মতো নরম হওয়াটাও তো ভাল নয় ডাক্তারবাবু!

—না, তা' ভাল নয়।

—তা হ'লে হাত আপনার একটু কড়া ক'রে তোলবার চেষ্টা করুন—নইলে ও হাত নিয়ে বর্ব্বরতার স্পর্দ্ধা করা চলবে না।

মন্দা ব'ললে—কিন্তু ওকালতী করা চলবে দাদা—

সুহাস এবার মন্দার দিকে ফিরে বললে—সে অপরাধে তুমি যেন বৌদি, তোমার দাদার নিমন্ত্রণটা এবেলা বন্ধ ক'রে দিও না!

মন্দা স্বামীর দিকে একটা অর্থ পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললে—তাই তো! এ যে উকিলের ওপোর মক্কেলের বেজায় টান দেখছি!

সত্যেন ব'ললে—তাই না কি? না রোগীর উপর ডাক্তারের!···একেবারে আলাপ হ'তে না হ'তেই যখন 'তুমি' বলতে সুরু করেছেন—

মণীন্দ্র বুঝতে পারলে যে সুহাসকে 'তুমি' বলাতে সত্যেন ক্ষুণ্ণ হয়েছে—কৈফিয়ৎ স্বরূপ সে কি বলতে গেল—

সত্যেন বললে—কিন্তু, বড্ডই ভুল ক'রে ফেলেছো বন্ধু—সুহাস হয় ত তোমার এই অসভ্যতায় মনে মনে চটছে!

মণীন্দ্রের মুখখানি শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেল। একবার সত্যেনের দিকে, একবার সুহাসের দিকে সভয়ে চেয়ে দেখে মণীন্দ্র বললে—কিন্তু, চটবার তো কথা নয়—আমি তো অনুমতি পেয়ে—

সুহাস মণীন্দ্রের একটা হাত ধ'রে তাকে ঈষৎ টেনে একখানা আরাম-চৌকীর উপর বসিয়ে দিয়ে বললে—ও-সব বাজে কথায় কাণ দেবেন না, এইখানে একটু ব'সে একখানা বইটই কিছু পড়ুন, আমাতে আর বৌদিতে মিলে ততক্ষণ চট্ ক'রে আপনার খাবারটা তৈরী করে ফেলিগে—না খেয়ে যাওয়া হবে না কিন্তু,—

মণীন্দ্র ব'ললে—তোমার শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে একদিন পাত পেড়ে খেয়ে আসবো কথা দিচ্ছি—আজ বরং যাই, রাত হ'য়ে গেছে সু—

আমার শ্বশুরবাড়ী থাকলে আপনাকে আর বলতে হ'তো না—নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যেতুম আজই,—খাওয়াবার জন্য তাহ'লে এদের কি এতো খোসামোদ করতুম? আমি আছি—আমার একজন মাসশ্বাশুড়ীর গলগ্রহ হ'য়ে—সেখানে কি আপনাকে নিয়ে যেতে পারি? একমাত্র নিয়ে যাওয়া সম্ভব—যদি কখনও সাঙ্ঘাতিক রকম পীড়িত হয়ে পড়ি—কিন্তু, তখন ডাকলে কি আর আসবেন?

—না বাপু, তোমার অসুখও হয়ে—কাজ নেই—আমারও দেখতে গিয়ে কাজ নেই।

—বেশ! যা ভেবেছি তাই! অমনি ভয় পেয়ে গেলেন? ভাবলেন যে এবার থেকে বিনা পয়সায় চিকিৎসার লোভে কেবলই আপনাকে ডেকে পাঠিয়ে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট ক'রবো? ভয় পাবেন না,—আমি যদিই কখন রোগ-শয্যা থেকে আপনাকে ডাক দিই—তাহ'লেও আপনার ফী মারা যাবে না—সে আমি নিশ্চয়ই হাতে হাতে চুকিয়ে—দেবো জানবেন—

মন্দা রহস্যচ্ছলে ব'ললে—হাঁা, সে তুমি যে দেবে—তা' বেশ বোঝা যাচ্ছে—এই এখন থেকেই দাদার হাতে হাত দেওয়ার ঘটা দেখে—!

সুহাস এই কুৎসিত পরিহাসে কিছুমাত্র লজ্জিত বা কুণ্ঠিত না হ'য়ে মণীন্দ্রকেই সম্বোধন ক'রে বললে—শুনলেন তো? আপনার ভগ্নী আমার জামিন থাক্‌ছেন; এখন তবে চললুম,—আপনি কিন্তু পালাবেন না যেন—তারপর, মন্দার দিকে ফিরে বললে—এসো বৌদি, হাতে হাত দেবার পর পাতে হাত দেবার ব্যবস্থা করতে হয়—চল এইবার সেটুকু সেরে আসি—ত্রুটী থাকা ঠিক নয়।

সুহাস এক রকম জোর করেই মন্দাকে সে ঘর থেকে টেনে বার ক'রে নিয়ে চলে গেল। যাবার আগে একটিবার শুধু চকিতের ন্যায় সে সত্যেনের মুখের দিকে চেয়ে দেখেছিল। সত্যেনের সেই আত্মসমাহিত ধ্যানস্থ মূর্ত্তি দেখে সে যেন বেশ একটু খুসী হ'য়ে সবার অগোচরে মনে মনে খুব হেসেও নিয়েছিল! মন্দার সঙ্গে যেতে যেতে সুহাস ভাবছিল—তার উদ্দেশ্য তবে ব্যর্থ হয়নি!

মণীন্দ্রের সঙ্গে তার এই অকস্মাৎ অতিরিক্ত অন্তরঙ্গতা দেখে দাদা তাহ'লে বেশই একটু ভাবিত হ'য়ে পড়েছেন দেখা যাচ্ছে! ঠিক হয়েছে!—আমাকে আবার মিছে করে বলা হয়েছিল যে—মন্দাকে উনি ভালবাসতে পারেন নি—প্রথমটা এসে ওদের ব্যাপার দেখে শুনে—তাই মনে হ'য়েছিল বটে—কেমন যেন ছাড়া-ছাড়া আড়া-আড়ি ভাব! সে যে ওঁরা স্বামী স্ত্রীতে পরামর্শ ও ষড়যন্ত্র ক'রে—তাকে অপদস্থ করবার উদ্দেশ্য নিয়েই একটা অমিলের অভিনয় করছিলেন—তা' সে কি ক'রে জানবে?...আচ্ছা এর কি কোনও প্রয়োজন ছিল? সে তো তাদের এ মিলনের বিরোধী নয়, তবে কেন তারা এমন একটা বিশ্রী বিচ্ছেদের মুখোস প'রে আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে গেল?—ওরা তাকে কী ভেবেছিল? কেন-কেন—এ অপমান করা তাকে?—

হঠাৎ সুহাসের মনে হ'লো—কেন সতুদার এ ইচ্ছাকৃত অবহেলা?—তবে কি একদিন সে তাঁকে পতিত্বে বরণ করে নিতে নিজের অক্ষমতা জানিয়েছিল ব'লেই উনি এমনি ক'রে আজ তার শোধ নিতে চাচ্ছেন? সেদিন সে এ জগতের কি জানতো, জীবনের বিচিত্রগতির সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এক বালিকা—উনি কেন তার মুখের কথাটাকেই সেদিন সত্য ব'লে ধ'রে নিয়েছিলেন? তার অন্তরের কথা তো তাঁর কাছে অবিদিত ছিল না? আমি যদি আমার মন বুঝতে না পেরে—একটা ভুলই কিছু করে থাকি—উনি কেন আমার সে ভুল সংশোধন ক'রে দিলেন না?

সে কি আমার দোষ?……আজ যেমন ক'রে আমি সব বুঝতে পারছি সেদিন তো তেমন ক'রে আমি বুঝতে শিখিনি!……প্রেমের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন যদি ত্যাগ হয়—তবে আমার তো সে পরিচয় ছিল! আমার অপরাধ—আমি যাকে ছেলেবেলা থেকে বড় ভাই বলেই জান্‌তুম—চিরদিন তাকে অগ্রজের উচ্চ আসনেই প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছি—তাঁকে স্বামীত্বে বরণ ক'রে নিয়ে কিছুতেই আমি অপমান ক'রতে পারিনি! আমি সতুদার জন্য প্রাণ দিতে পারি—যেমন করে মা তার সন্তানের জন্য প্রাণ দেয়—কন্যা তার পিতার জন্য নিজেকে বলি দিতে কুণ্ঠিত হয় না—হয় ত' স্ত্রীও স্বামীর জন্য যতখানি ত্যাগ ক'রতে পারে—আমি জোর করে বলতে পারি তাদের সকলের তুলনায় আমি দাদার জন্য ঢের বেশী কিছু ক'রতে পারি।…কিন্তু, দাদা তো সে দেওয়ার মর্য্যাদা বুঝতে পারলে না—তিনি অমনি অভিমান ক'রে কাঞ্চনের পরিবর্ত্তে কাচ নিয়ে খেলতে গেলেন—আমার এ অপ্রমেয় ভালবাসা—তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারলে না—আচ্ছা,—কেন পারলে না? তবে কি মানুষের চেয়ে তার এই দেহটাই বড়?—এটাকে অধিকার করতে পারলে কি তার পাওয়ার আনন্দ ব্যর্থ ও অসম্পূর্ণ থেকে যায়?—কে জানে?—

মন্দার সঙ্গে সুহাস যখন মনে মনে এই ধরণের সব নানা কথা ভাবতে ভাবতে রান্না-মহলের দিকে চলে গেল—ঘরের মধ্যে নির্ব্বাক নিস্তব্ধ হ'য়ে বসে রইল—শুধু দুটি ক্ষুব্ধ-চিত্ত পুরুষ।

তারা উভয়ে উভয়ের খুব কাছাকাছিই বসেছিল বটে; কিন্তু তবু তারা কেউ কারুর কাছে ছিল না। তাদের মন ছিল তখন পরস্পরের কাছ থেকে অনেক দূরে—দু'টি অনন্ত ভাবনার বিভিন্ন রাজ্যে।

মণীন্দ্রের কাণে এবং হ ত তার প্রাণেও এই কথাটাই কেবলি ঘুরে ফিরে পীড়া দিচ্ছিল—'ভয় নেই আপনার স্ত্রী মারা যাবে না!'—যেন এই-ই তার জীবনের একমাত্র শ্রেষ্ঠ কাম্য! সুহাস কি সত্যই তাকে এতখানি ছোট ব'লে ধারণা করে নিলে? মণীন্দ্রের অহঙ্কারে আঘাত লাগলো। কে জানে কেন এ মেয়েটির মতামত সে আজ কিছুতেই উপেক্ষণীয় বলে মনে করতে পারলে না। আজ যেন তার মনে হ'তে লাগলো পৃথিবী শুদ্ধ লোক যদি তাকে ভুল বোঝে বুঝুক, তাতে তার কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, কিন্তু, সুহাস যেন তাকে ভুল না বোঝে!

পৃথিবীতে অনেক সময় এমন ঘটতে দেখা যায় যে পরস্পরের সম্পূর্ণ অপরিচিত দুটি মানুষের দৈবাৎ একদিন দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-পরিচয় হবামাত্র তাদের মনে হয় তারা যেন উভয়ের কতকালের পরিচিত! যেন কত যুগ-যুগান্তর, জন্ম-জন্মান্তর থেকেই তারা পরস্পরের একান্ত অন্তরঙ্গ! সুহাসের সঙ্গে আলাপ করে মণীন্দ্রের মনেও ঠিক এমনিতর একটা বহু-জন্মার্জ্জিত আত্মীয়তার ভাব জেগে উঠেছিল। এমন কি মাঝে মাঝে তার চিদাকাশে বিদ্যুৎ-চমকের মতো এ-কথাও ঝিলিক্ দিয়ে উঠেছিল যে—এরই অপেক্ষায় সে হয় ত' এতদিন তার এই নিঃসঙ্গ অনূঢ় জীবন বহন ক'রে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তখনই আবার তার সমস্ত অন্তরখানিকে বেদনায় বিধ্বস্ত ক'রে কে যেন আর্ত্তস্বরে ব'লে উঠ্‌ছিল—না—না—একি উন্মাদনা—ও যে—ও যে হিন্দুর বিধবা!

আর—সত্যেনের মনে তখন মন্দার প্রতি এতকাল অকারণে অন্যায় করার একটা তীব্র অনুশোচনা নিঃশব্দ-তুষানলের দহন-জ্বালার মতো ক্রমেই অসহ্য হ'য়ে উঠছিল! কেন যে সে এতদিন তার গৃহলক্ষ্মীর ঝাঁপীর মধ্যের এই কৌস্তুভমণিটিকে আবিষ্কার ক'রতে পারেনি—এই আক্ষেপটা তাকে বালকের মতো কাতর করে তুলছিল! কে যেন এতকাল তার সমস্ত বুকটি জুড়ে বসে তার দুই চোখে হাত চাপা দিয়ে রেখেছিল! সে কার হাত? হঠাৎ সত্যেন চমকে উঠলো—দুখানি কাচের চুড়ি পরা চেনা হাত দেখতে দেখতে তার মানস চক্ষে যেন নিরাভরণা হ'য়ে গেল!…সুহাস! সুহাস! এরই জন্য ত' এতকাল সে নিজেকে মন্দার কাছ থেকে এমন নির্ম্মম ভাবে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল! কিন্তু কেন? পাছে সুহাসের প্রতি অবিচার করা হয় এই ভেবে কি? কিসের অবিচার? তার গভীর প্রেমের? তার নিবিড় ভালোবাসার? কিন্তু, সে কই?—কোথায় তা? সুহাস তো কোনওদিন তাকে পতিত্বে বরণ ক'রতে চায়নি, এবং আজও সে নিজেকে সেই সোদরার সুদৃঢ় স্নেহ-বর্ম্মেই আচ্ছাদন করে রেখেছে—কোথায় তার সেই কৈশোর ও যৌবনের মধুর মানসী? ছিছি! কী একটা অসম্ভব মরীচিকার পিছুতে ছুটেই না সে

নিজের জীবনটাকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল! আর সেই সঙ্গে আর একজন নিরপরাধিনী নারীকেও সে চিরকালের মতো অসুখী করে রাখছিল!…

সত্যেন অস্থির হ'য়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে প'ড়লো। মন্দার প্রতি আপনার অন্যায় অপরাধের ভারে সে যেন নু'য়ে পড়ছিল। আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে সে সামনের বাগানটায় নেমে গেল। মণি যে ঘরের মধ্যে একলাটি ব'সে রয়েছে সে কথা তার মনেই হ'লো না। তখন শুধু এই একটা ব্যাপারই তার সমস্ত চিত্তকে সুহাসের প্রতি বিমুখ ক'রে তুলছিল যে—এত অল্প সময়ের মধ্যে এই অপরিচিত মণির সঙ্গে তার এতটা ঘনিষ্ঠতা সম্ভব হ'য়ে উঠলো—কেমন ক'রে?—সুহাস কি তবে এমনিই লঘুচিত্ত হ'য়ে পড়েছে!… কে জানে? স্ত্রীয়া চরিত্রম্ পুরুষস্য ভাগ্যম্—

সুহাস ঘরে ঢু'কে দেখলে মণীন্দ্র একলাটি একখানা চেয়ারে ব'সে তারই হাতলের উপর দুই হাত রেখে তাইতে মাথা গুঁজে পড়ে রয়েছে। সত্যেন সে-ঘরে নেই।

ক্ষণকাল ইতস্ততঃ ক'রে সুহাস ডাকলে—ডাক্তারবাবু!

মণীন্দ্র চম্‌কে উঠে মুখ তুলে সুহাসের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে। মণীন্দ্রের মুখে একটা যেন বেদনার ছায়া সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল!

সুহাস মৃদু হেসে বললে—আপনার বুঝি খুব ভূতের ভয় আছে ডাক্তারবাবু?

মণীন্দ্র বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—কেন?

—নইলে আমাকে দেখে অমন ক'রে চমকে উঠলেন কেন? আপনাদের খাবার দেওয়া হ'য়েছে।

মণীন্দ্র বললে—আমি খাবো না।

এবার সুহাস বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—কেন?

অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে মণীন্দ্র বললে—ডাক্তারবাবুরা পেশেণ্টদের বাড়ী খায় না, শুধু 'ফী' নেয়।

সুহাস এবার ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আরও একটু বেশী রকম হেসে উঠে বললে—আপনি তো আর এখানে রোগী দেখতে আসেন নি—নিন্ উঠুন—লুচীগুলো জুড়িয়ে যাচ্ছে—

মনীন্দ্র বললে—আমি যদি রোগী দেখতে না এসে থাকি তবে তুমি কেন আমাকে তখন থেকে কেবলই 'ডাক্তারবাবু' বলে আপ্যায়িত ক'রছো?

সুহাস কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে—আপনাদের বুদ্ধি-বিবেচনা বড্ড মোটা—এটা বুঝতে পারলেন না—যে আপনার অমন মূল্যবান নামটা অনবরত বাজে খরচ ক'রতে একটু কার্পণ্য বোধ করছি! আমরা হিঁদুর মেয়ে—আমাদের কি সবার নাম ধরতে আছে—?

সুহাসের মুখে এ-কথা শুনে মনীন্দ্রের মনটা সহসা একটা অকারণ খুশীতে ভরে উঠলো—সে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পড়লো—বললে—চলো—খাওয়াবে চলো—ভারী ক্ষিধে পেয়েছে সু—কিন্তু, দোরের দিকে একটু অগ্রসর হ'য়েই ফিরে এসে আবার সে চেয়ারে বসে পড়লো। বললে না, আমি খাবো না—তোমার হাতে জলস্পর্শ করবো না—তুমি আমার অপমান করেছো।

দুই চোখ কপালে তুলে সুহাস বল্লে—সে কি! অপমান? আপনার? আমি করিছি? কি বলছেন ডাক্তারবাবু? আপনার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে নিশ্চয়। আমরা তো শুধু অপমানিত হ'তেই আজন্ম অভ্যস্ত হ'য়েছি, অপমান ক'রতে তো শিখিনি এখনও।

অনুযোগের কণ্ঠে মণীন্দ্র বললে—তুমি কেন তখন বললে—ভয় নেই ডাক্তারবাবু, আপনার ফী মারা যাবে না—

সুহাস অতি কষ্টে হাসি চেপে রেখে কৃত্রিম বিরক্তির কণ্ঠে বললে—আঃ! আপনি ভারী বোকা! বললুম বলে কি সত্যিই আপনাকে ফী দিতে গিয়ে আপনার অমর্য্যাদা ক'রবো? এ দুঃখিনী দুর্ভাগিনীর রোগশয্যায় যদিই দয়া ক'রে কখনও আমাকে দেখতে যান—তাহ'লে আপনার সে একান্ত অনুগ্রহের দাম কি কেবল কটা টাকা ফী দিয়ে আমি ধার্য্য করবো আপনি মনে করেন?

—তবে তুমি বললে কেন ও-কথা?

—বল্লুম বলেই কি আপনি অমনি সে কথাটা বিশ্বাস করবেন?

মণীন্দ্র মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ হ'য়ে থেকে, হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে উঠে বললে—এই না বুদ্ধির গর্ব্ব করছিলে?—তোমার কোনও কথাই যে অবিশ্বাস করবার আর সাধ্য নেই আমার—এ-কথাটাও কি তোমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে?

—না—তা হবে না। এখন উঠে আসুন—চলুন, খাবে চলুন—আপনি আমার চেয়েও অভিমানী দেখছি!—

—হুর্‌রে! চলো যাই—আজ এমন খাবো যে মন্দার ভাণ্ডার নিঃশেষ হ'য়ে যাবে—

সুহাস একটু দুষ্টুমীর হাসি হেসে বললে—কিন্তু খেতে বসিয়ে যদি সেখানে না থাকি, তাহ'লে অমনি অনাহারেই ক্ষুন্নিবৃত্তি হ'য়ে যাবে না তো?—

মণীন্দ্রের মুখখানি মুহূর্ত্তে ম্লান হ'য়ে গেল। সে কিছু না ব'লে শুধু অবাক হ'য়ে সুহাসের মুখের দিকে চেয়ে রইল! তার মনের মধ্যে সহসা এই প্রশ্নটা উঁকি মেরে উঠলো—এই কি সৃষ্টির চিররহস্যময়ী দুর্জ্জেয় নারী?

সুহাস মণীন্দ্রের হাত ধরে অন্তঃপুরের দিকে টেনে নিয়ে চললো—যেতে যেতে একবার শুধু বললে—দাদা ঘরের ভিতর বসে রইল—আপনি আসবার সময় দাদাকে একবার ডাকলেনও না? আপনি তো ভয়ানক স্বার্থপর—

মণীন্দ্র বললে—তোমার দাদা সেই ছেলেই বটে। সে অনেকক্ষণ উঠে গেছে—গিয়ে দেখবে হয় ত' খেয়ে দেয়ে সে শুয়ে পড়েছে—

এবার সুহাসের মুখখানি শুকিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি মণীন্দ্রের হাত ছেড়ে দিয়ে বললে—দাদা ওঘরে নেই?—

তার স্বর যেন হতাশের আর্ত্তকণ্ঠের মতো!

তার পর—মণীন্দ্রকে খাবার যায়গায় নিয়ে গিয়ে সুহাস হঠাৎ একেবারে যেন রোগীর মতো বিবর্ণ হ'য়ে গেল—

সেখানে বাবুদের আহারের আয়োজনে ব্যাপৃতা মন্দার মাথার ঈষৎ অবগুণ্ঠনখানি বারম্বার খুলে দিয়ে ও অঞ্চল প্রান্তটি তার কাঁধের উপর থেকে কেবলই স্থানচ্যুত করে দিয়ে সত্যেন পত্নীর সঙ্গে পরমানন্দে খুনসুটি করছিল—

(ক্রমশঃ)

মালা

।প্রফুল্লময়ী দেবী

কণ্ঠে তোমার দুলছে পথিক
ও কার বুকের মালা?
কঠিন পথে যেতে যেতে
কি পেয়ে আজ উঠ্‌লে মেতে,
ও কার হাতের ফুলের গাঁথন
বুকের কাঁপন ঢালা—
ও কার পরশ প্রসাদ, পথিক
কোন্ সে অচিন্ বালা?

তিলেক তুমি দাঁড়িয়েছিলে
আজ কি পথের 'পরে?
আনমনা ওই নয়ন তুলে
কার পানে গো চাইলে ভুলে?
কোন্ সে বালা সাধের মালা
মৌন সোহাগ ভরে
খেলার ছলে দুলিয়ে দিলে
দোদুল হিয়ার পরে?

ধন্য যেন মানছো মালার
মদির পরশটিতে;
পুলকটুকু যায় যে দেখা
নীরব আঁখির পাতায় লেখা;
ক্ষণিক সুখাবেশের রেখা
কাঁপন লাগায় চিতে।
নবীন এ কোন্ নূপুর বাজে
মালার পরশটিতে?

কে জানে ওই মালার মাঝে
আছে কিসের জ্বালা!
হয় ত তিলেক সুধায় ভরা,
স্মৃতির আলোয় উজল করা,
রাতের মালা হয় ত প্রাতে
ফিরিয়ে নেবে বালা;
গুমরে তখন মরবে হিয়া—
সইবে কি সে জ্বালা?

কোলের দেশে

শ্রীঅক্ষয়কুমার গোস্বামী

আমাদের এই বৈচিত্র্যবিহীন একান্ত একঘেয়ে জীবনযাত্রার পথে সে একটা নূতন অনুভূতির আগমন। ব্যাপারটা এমন কিছু বিশেষ গুরুগম্ভীর না হলেও আমার পক্ষে সে একটা নূতন কিছু বটে।

ছোটনাগপুরের শৈলমালা-সমাকীর্ণ দিগন্ত-বিস্তারী গভীর অরণ্যানীর মধ্যে যে বিশ্বের কি সৌন্দর্য্য বা বীভৎসতা লুকান আছে, সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না।

এবার সেই সুযোগ লাভ করা গেল।

আর সে একেবারে সেই অপরিচিত রাজ্যের অন্তঃস্থলে, মায়াপুরীর মায়ালোকের অন্তরে।

সাধারণ বাঙ্গালী যে মহান উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে দিগন্তের কোলে মানবের অগম্য স্থানেও যেতে দ্বিধা বোধ করে না, সেই একই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়েই অবশ্য আমারও এ যাত্রা।

সে মহান উদ্দেশ্য, শিক্ষার চরম পরিণতি দাসত্বের লালসাময়ী মদির আলিঙ্গনে নিজেকে আবদ্ধ ক'রে দিয়ে সংসার প্রতিপালনের গতানুগতিক চেষ্টা করা।

শোনা গেল, ঘোয়ামুণ্ডী নামে একটী নূতন যায়গায় টাটা কোম্পানীর একটা নূতন লোহার খনি খুলেছে; আর সেখানে না কি চাকুরী মেলার আশা আছে। চাকুরী কাঙ্গাল বাঙ্গালীর পক্ষে এ সংবাদটী যে কত লোভনীয়, তার উল্লেখ করাই বাহুল্য। দেখা যাক, ভাগ্য-পরীক্ষার ফল কি হয়!

দেশ সম্পূর্ণ অপরিচিত। মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে আমার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অমূল্যকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ঐ একই উদ্দেশ্য নিয়ে সেখানে গেছেন এবং তাঁরই উপদেশ অনুসারে আমার সেখানে যাত্রা। তাঁর চিঠির মারফতে সেই অদ্ভুত দেশের ততোধিক সেখানকার অত্যদ্ভুত অধিবাসীদের কাহিনী আমার স্বভাবতঃ ভ্রমণাভিলাষী চিত্তকে সেই অপরিচিত দেশের সঙ্গে পরিচয় করতে উৎসাহিত করলে।

তদনুসারে একদিন,—সেদিন ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পরদিন; কারণ বন্ধুবর কেশবলাল ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন বিদায়-ভোজে পরিতৃপ্ত করে আমার প্রতি তার গভীর স্নেহের পরিচয় দিয়েছিল,—যাত্রা করা গেল।

রাত্রি ৮—৩৬ মিনিটের সময় নাগপুর প্যাসেঞ্জার হাবড়া থেকে ছাড়ে। সেই আমার গন্তব্য স্থানের কাণ্ডারী। এর পূর্ব্বে সুদূর মহারাষ্ট্র প্রদেশান্তর্গত দেশীয় রাজ্য রাজনান্দগাঁও যাত্রাকালেও এই নাগপুর প্যাসেঞ্জারেরই আতিথ্য স্বীকার করতে হয়েছিল। গন্তব্য পথ একই, সুতরাং আমদা ষ্টেসন পর্য্যন্ত এক রকম অভিজ্ঞতা আছে। সেখান থেকে শাখা লাইন, সভ্যজগতের সংস্পর্শ হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেই মায়াপুরীর বুক চিরে চলে গেছে।

পথে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু নাই। রাত্রের অন্ধকারে বহুদূর অতিক্রম করা গেল। তবে সুস্থির হয়ে নিদ্রা দেবীর শান্তিময় অঙ্কে আশ্রয় নেওয়া ঘটে উঠল না। তার কারণ দুইটী। প্রথম আমার স্বভাবের নিয়ম ট্রেণ যাত্রায়,—তা সে যতদূরই হো'ক,—নিদ্রাকে সাধ্যমত বঞ্চিত ক'রে পথের শোভা দর্শন ক'রে টিকিটের দাম উশুল করবার চেষ্টা করা—যদিও এ যাত্রায় তা ঘটে উঠল না; কারণ নৈশ প্রকৃতি গৃহস্থের ক'নে-বধূর মুখের অবগুণ্ঠনের মত তিমিরাবগুণ্ঠনে আবৃতা ছিল।

দ্বিতীয় কারণ যাত্রীর ভিড় এত বেশী যে স্বচ্ছন্দে বসবার স্থানই মিলে না—তার শয়নের কথা তো দূরের কথা।

স্বভাবতঃ মন্দগতি বি, এন, আরের গাড়ির ঝাঁকুনিও অন্য একটী কারণ বটে।

গালুডির পর পূর্ব্বগগনের শোভা বড়ই মনোমুগ্ধকর হয়। উষার গোলাপী আলো যেন সমস্ত পূর্ব্বাকাশকে ফাগে রাঙ্গিয়ে তুলেছে। আর অদূরস্থ শৈলমালার অন্তরালে মরীচিমালীর কৈশোর মূর্ত্তির প্রকাশ বড়ই চিত্তচমকপ্রদ হয়ে উঠেছে। ট্রেণ ছুটে চলেছে—তার কোন্ সুদূর গন্তব্যের উদ্দেশে। উভয় পার্শ্বে ক্ষুদ্র বৃহৎ শৈলমালা, জঙ্গল এবং উচ্চাবচ উন্মুক্ত মাঠ। মধ্যে লাইন। তার উপর দিয়ে এই বিরাট বাষ্পভোজী রাক্ষস তার বিপুল দেহকে টেনে নিয়ে বিরাট হুঙ্কারে ছুটে চলেছে। তার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই!

অনেক দূর আস'র পর, পথের পার্শ্বে দূরস্থ গ্রাম থেকে সাঁওতাল কুলিরেজার দলকে যেতে দেখে বোঝা গেল, টাটানগর ষ্টেসন সন্নিকটবর্ত্তী। ক্রমে ট্রেণ এ'সে থামল। সম্মুখে কারখানার বিরাট চিমনিগুলা গর্ব্বোন্নত শিরে দাঁড়িয়ে আছে। বহুদূর-বিস্তারী শব্দমুখর নানা কারখানা তাদের বিশালত্ব প্রমাণ ক'রছে। আমার গন্তব্য স্থান এই টাটারই অন্যতর লীলাভূমি। সুতরাং জামসেদপুর তথা টাটানগর রেল ষ্টেসনকে একটু সসম্ভ্রম অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিলাম। ট্রেণ আবার তার গন্তব্যের পথে চ'লল।

আমার এ লাইনের যাত্রাকাল শেষ হয়ে এসেছে। এর পর সিনি ও পরে আমদা ষ্টেশন। আমাকে আমদাতেই নামতে হ'বে।

আমদা ষ্টেসনে পৌঁছেই প্লাটফরমের অপর পার্শ্বে আমদা-গুয়া শাখা লাইনের গাড়িকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত-প্রায় দেখতে পেলাম। হাবড়া থেকে ১৮২ মাইল আসা হ'ল।

ট্রেণে উঠে স্থান অধিকার করে বসা গেল।

প্রায় ১॥০ ঘণ্টা কাল বাদে ট্রেণ গা-ঝাড়া দিলেন। আবার যাত্রা আরম্ভ হ'ল। এবার চ'লেছি সেই অজানা দেশের দিকে। প্রাণে বেশ একটী আনন্দ হিল্লোল বয়ে গেল। ট্রেণ ক্রমশঃই অগ্রসর হ'চ্ছে। সত্যই এবার সে একটা প্রহেলিকার রাজ্যে অগ্রসর হয়ে চ'লেছে।

সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে সর্ব্বত্রই অগণিত ক্ষুদ্র বৃহৎ শৈলরাজি এবং অনন্ত-বিস্তারী বনানীর প্রাণময়ী শ্যামলিমা প্রাণে এক বিচিত্র ভাবের লহরী নিয়ে আসছে।

নোয়ামুণ্ডি লৌহ-খনির ফোরম্যান—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

ধীর-মন্থর গমনে ট্রেণ সেই শৈলমালার মধ্য দিয়ে বক্র গমনে একের পর এক পাহাড়কে অতিক্রম করে চলেছে ত'র দুরধিগম্য গন্তব্যের উদ্দেশে। কোথাও বনের মধ্যে ছোট ছোট পল্লী দেখা যায়। মনে হয়, ঘর-কুড়ি লোকের বাস নিয়ে সেই গ্রাম। গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তো বটেই, বয়স্করাও এই অদ্ভুত জিনিষ দেখবার জন্য ছুটে আসছে। রোজ দেখছে তবুও আশা মেটে না। পথপার্শ্বেই কোথাও দেখা যায়, কাজলকাল নিটোল স্বাস্থ্যের নগ্নসৌন্দর্য্যময়ী গ্রাম্য যুবতীরা পাতার বোঝা বা জলের কলসী নিয়ে সহজ সরল লীলায়িত ভঙ্গীতে চলেছে। তাদের সাদা প্রাণের জংলী সুরে কাননকে মুখরিত ক'রে অথবা উচ্ছল হাস্যের কলকাকলীতে বনভূমিকে প্রতিধ্বনিত করে কুণ্ঠ চরণে গমন-ভঙ্গী আমার মনে এক অনাবিল আনন্দ জাগিয়ে দিলে। তাদের স্তব্ধ বিস্ময়ের সপ্রশংস চকিত চাহনি বেশ কৌতুক জাগায়। কি সুন্দর এই জাতি! স্বাধীনতার মূর্ত্ত প্রতীক, আনন্দের নির্ঝরধারা। কি অদ্ভুত ভাষা এদের। ট্রেণের সহযাত্রীরা প্রায়ই এদের দলভুক্ত। ডাঙ্গুওপোষি ষ্টেসনে এসে ট্রেণটা বেশ একটু লম্বা রকম বিশ্রাম নিলে। এ শাখার মধ্যে এই হ'ল বড় ষ্টেসন। এখান হ'তে নূতন এঞ্জিন জুড়া পর্য্যন্ত যায়। অল্পের মধ্যে ষ্টেসনটী বেশ সাজান। নোয়ামুণ্ডীর পোষ্ট-অফিস এখানেই। (এখন অবশ্য নোয়ামুণ্ডীতেই পোষ্ট অফিস হয়েছে।)

এক ঘণ্টা বাদে ট্রেণ নূতন এঞ্জিন নিয়ে অধিকতর দুর্গম প্রদেশে যাত্রা করলে। এর পরই নোয়ামুণ্ডী। আরও ৫২ মাইল আসা গেল।

ষ্টেসন মাষ্টার মহাশয় বাঙ্গালী। কয়জন টাটা কোম্পানীর ক্যাম্পের বাঙ্গালী সহযাত্রী ছিলেন; তার মধ্যে আমাদের ওভারসিয়ার তারাপদ বাবুও ছিলেন। সকলেই বেশ যত্ন করেই নিয়ে এলেন। কোংর ট্রলি প্যাসেঞ্জার আনতে যায়—সেদিনও ছিল; কিন্তু সেদিন একজন সাহেব থাকায় আমরা পদব্রজেই এলাম। এখন রোজই কোংর লরী যায়। এক মাইল দূরস্থ ক্যাম্পে যখন আসা গেল তখন বেলা ১টা।

নোয়ামুণ্ডি লৌহখনির ম্যানেজার মিঃ বি, মিত্র

চতুর্দ্দিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা, জঙ্গল দিয়ে ঢাকা এই যায়গাই আমাদের কর্ম্মস্থান। একটা পাহাড়ের নীচের খানিকটা সমতল যায়গার উপর খানকয়েক টীন ও খড়ের ছাওয়া ছিটেবেড়ার ঘরের সমষ্টিই বাবু ক্যাম্প। এরই মধ্যে নোয়ামুণ্ডীর বর্ত্তমান প্রবাসী টাটা কোংর ও ঠিকাদারের কর্ম্মচারীরা অবস্থান করেন। কয়জন সাবকনট্রাক্টরও আছেন। সকলের সমষ্টি প্রায় ৫০।৬০ জন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় এখানকার একচেটিয়া ঠিকাদার। সকল কাযই তাঁর হাতে। আমরা তাঁরই অধীনে। কোম্পানীর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্র মহাশয় অতি

দয়ালু ভদ্রলোক। সাধ্যপক্ষে কাহাকেও চাকুরী দিতে কসুর করেন না। ঠিকাদার কুমার বাবু ও তার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র কোঙার মহাশয়ও ঠিক সেই ধাতেরই লোক। বাকী কর্ম্মচারী যাঁরা ছিলেন, সকলেই বাঙ্গালী, সকলেই সমভাবাপন্ন। সকালে আপন আপন কাযে বাহির হয়ে যান; অনেকেই একেবারে সন্ধ্যায় বাসায় ফেরেন। তার পর কেবল আনন্দ। সকলে মিলে আনন্দ—ছোট বড় ভেদ নাই। সে এক উচ্ছল অনাবিল আনন্দ। ঠিক যেন চাকরীস্থান বলে মনে হত না। সকলেই প্রাণ খুলে সাধ্যমত কায করত; আর সকলের কাছে সেইমত সরল ব্যবহার পেতো। এই ছিল সে দিনের নোয়ামুণ্ডী। হায় রে সে দিন! এখন সেই অনাড়ম্বর জীবন যাত্রার পথ বদলে গিয়েছে।

নোয়ামুণ্ডি লৌহ-খনির এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার—মিঃ এন, মুখার্জ্জি

লোকাধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে সব বদল হয়ে গিয়েছে। আর চাকরীর কঠোরতাও বেশ বোঝা যাচ্ছে।

যায়গাটীর যে নোয়ামুণ্ডী নাম কেন হ'ল তা বলা যায় না। আসল নোয়ামুণ্ডী গ্রাম এখান হ'তে ২ পাহাড় দূরে (প্রায় ৩ মাইল)। ষ্টেসন যে গ্রামে সেখানকার নাম "মহুদি।" আমরা "সংগ্রামসাই" বাসীদের প্রতিবাসী। টাটার বর্ত্তমান স্থায়ী ক্যাম্প "বাজিঝরণ" গ্রামবাসীদের বিতাড়িত করে সেই স্থানে নির্ম্মিত হয়েছে। আরও দূরে "কোরতা" গ্রাম ছিল—তারাও বিতাড়িত হয়েছে।

টাটা কোম্পানীর এত বড় খনি না কি আর নাই। সাতটা ব্লক [illegible]। আবার এখান থেকেই কোম্পানীর মিটারগেজ লাইন যাবে আর একটী খনিতে—তার নাম "জোড়া"। এখান থেকে ১৪ মাইল দূরে দেশীয় রাজ্য "কেঁওঝোড়" এর সীমানায়। সবই গভীর জঙ্গলে ঢাকা। বাঘ, ভালুক, হাতী হরিণের লীলা ভূমি। একটী ঝরণা আছে—তার জলই আমাদের পানীয়। প্রকৃতিদেবী সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব সম্ভারে এ স্থানকে সাজিয়েছেন। সংপাহাড়ের উপর থেকে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করলে সৌন্দর্য্যের অনন্ত মাধুরী প্রাণকে আপনভোলা কি এক ভাবে বিভোর করে তোলে। নিকটে, দূরে, অতিদূরে, আরও দূরে হরিৎ, ধূসর, নীল ধূম্র শৈলমালা এবং দিগন্তবিস্তারী বনানীর শ্যামলিমা—সে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য। স্তরে স্তরে সমুদ্র। তরঙ্গের মত পাহাড়ের সারি—যতদূর দৃষ্টি যায় —দিগন্তের কোলে যেখানে নীল আকাশ ধরণী চুম্বন করছে, সেই দিক্-চক্রবালরেখার গায়ে নীলে নীলে মেশামিশি, জড়াজড়ি—অনন্ত সুষমার অনবদ্য মাধুরী প্রাণকে আবেগে আকুল ক'রে তোলে।

নীচের ঝরণা ধরে উপরের দিকে চলে গেলে, দুই ধারে দুর্ভেদ্য বনানী-সমাচ্ছন্ন সমুচ্চ শৈলমালা। তার মাঝে ঝিরঝির, কুলকুল তানে কোথাও বা প্রপাতের গম্ভীর নির্ঘোষে, বয়ে চ'লেছে এই পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী—এই শুষ্ক বন্ধুর পার্ব্বত্য প্রকৃতির পাদচুম্বন করে,এর সৌন্দর্য্যকে শতগুণে বর্দ্ধিত ক'রে। উভয় পার্শ্বে অত্যুচ্চ প্রস্তরাবলী মহান্ গম্ভীর ধ্যানমগ্ন যোগীর মত নির্ব্বিকার নিশ্চল। কোথাও বা বহু প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষের মত ভীম গম্ভীর ভাবে দণ্ডায়মান। গভীর অরণ্য সমাচ্ছন্ন, লতায় ফুলে পরিপূর্ণ, মালতী গন্ধে ভারাক্রান্ত, সূর্য্যালোক-প্রবেশ-রহিত কল্পনার কুঞ্জবন, প্রকৃতির স্বহস্ত-রচিত বনদেবীর রম্য নিকেতন। এখানে বিশ্বশিল্পীর সৃষ্টির মোহনা স্পর্শ শিল্পীর কল্পনা স্তব্ধ, মুগ্ধ বিস্মিত।

অতীত এবং বর্ত্তমান নোয়ামুণ্ডী সম্বন্ধে বক্তব্য এই খানেই শেষ।

ভবিষ্যৎ প্রবন্ধ লেখক পাবেন সে এক বিরাট কাহিনী—মানব-হস্তের কীর্ত্তিকলাপে পরিপূর্ণ, প্রকৃতির অনবদ্য সুষমায় বঞ্চিত সে কাহিনী। ভবিষ্যতে যে এর কত পরিবর্ত্তন হবে, তা কল্পনায় আনা যায় না। তবে হবে একটা বিরাট ব্যাপার। টাটা-কোংর খনি সমূহের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ডবস্ নোয়ামুণ্ডী সম্বন্ধে বড়ই উচ্চ কল্পনা পোষণ করেন। সকল রকম অদ্ভুত কিছুর প্রতিষ্ঠা করে তিনি নোয়ামুণ্ডীকে জগৎ-বিখ্যাত করতে চান। সেই জন্য তিনি যে Ore crushing machine আমদানি ক'রেছেন তা না কি জগতের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানীয়। প্রথমটী আছে আমেরিকায়।

কনষ্ট্রাকশনের আনুমানিক ব্যয়ের বরাদ্দও খুবই প্রচুর। এখন পর্য্যন্ত কোনও জিনিষই তৈয়ারী শেষ হয় নাই; কাযেই তার ঠিক পরিমাণ কত হ'বে বলা যায় না। আমাদের সংগ্রামসাই ক্যাম্প হ'তে প্রায় ৫০০ ফাট উচ্চে পাগড়ের পারে টাটা কোংর স্থায়ী ক্যাম্প তৈয়ারী হ'চ্ছে। বাবু লাইন, হাঁসপাতাল প্রভৃতিতে ২০টী ব্লক তৈয়ারী শেষ হয়েছে। প্রত্যেক ব্লকে বাবু-লাইনে ৬টী ক'রে এবং অপরগুলিতে ৮টী ক'রে ভাগ আছে। টাটার বাবুরা আমাদের ক্যাম্প পরিত্যাগ ক'রে নূতন ক্যাম্পে চ'লে গিয়েছেন। মাত্র সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন-পরায়ণ, উদার-হৃদয় মিশুক-প্রকৃতির শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায় (মাইনিং ইন্স্পেক্টর

এবং সহকারী ম্যানেজার) মহাশয় ও শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ বটব্যাল (ট্রাফিকের সহকারী লোডিং ফোরম্যান) মহাশয় এখনও আমাদের মায়া কাটাতে পারেন নাই। এছাড়া ব্রষ্টিং বিভাগের কয়জনও উপর ক্যাম্পে বড় দলের মধ্যে স্থান পান নাই বলেই আমাদের মধ্যেই পড়ে আছেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী স্বাস্থ্য পরীক্ষক বন্ধুবরও এই ক্যাম্পেই আছেন।

বাবু লাইন পাহাড়ের চূড়ায় ম্যানেজার বাবুর দ্বিতল বাংলো ও প্রস্পেকটিং বিভাগের একটী ডাকবাংলো ও ফিল্ড অফিসার মহাশয়ের জন্য একটী বাটীও তৈয়ার শেষ হ'চ্ছে। নোয়ামুণ্ডীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাংলো "ডিরেক্টরস রেষ্ট হাউস" আমাদের ক্যাম্প এর লেভেল হ'তে প্রায় ৬০০ ফাট উচ্চে একটা পাহাড়ের গায়ে ল্যাটারাইট পাথর তৈয়ারী হয়েছে। এর নির্ম্মাণ করার খরচের অঙ্ক খুবই প্রচুর। উচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত রক্তবর্ণ পাথরের তৈয়ারী এই বাংলো সকল অংশ থেকেই বেশ সুন্দর দেখায়।

ডিঃ বোর্ডের কটকগামী রাস্তার সঙ্গে সংলগ্ন কোম্পানীর সুপ্রশস্ত রাস্তা পাহাড়ের গা বেয়ে সমস্ত জায়গা জুড়ে সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ কাটামাটী বুরুর মাথা দিয়ে ৬নং পাহাড়ের শেষ সীমা পর্য্যন্ত চ'লে গিয়েছে। সেখান থেকে বন-বিভাগের রাস্তা ধরে দেশীয় রাজ্য কেঁউঝোড়ের হেডকোয়ার্টার চাম্পুয়া ও কেঁওঝোড়গড় পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। পানীয় জলের জন্য পূর্ব্বোক্ত ঝরণার উৎপত্তিস্থল কোরতা গ্রামের মধ্যে বাঁধ তৈয়ারী হয়েছে, এবং নলের সাহায্যে সেই জল সর্ব্বত্র সরবরাহ করা হয়। বাঁধের অবস্থান-স্থান, সংগ্রামসাই ক্যাম্প, উপরের স্থায়ী ক্যাম্প, এমন কি রেষ্ট হাউস ও ১নং পাহাড়ের প্রায় চূড়ায় অবস্থিত কোম্পানীর কারখানা ও অফিস থেকেও এত উচ্চভূমিতে অবস্থিত যে মানবকৃত কোন কৃত্রিম শক্তির সাহায্য ব্যতিরেকেও অবাধে আপন প্রবাহশক্তিতেই পূর্ণবেগে সর্ব্বত্র সকল সময়েই পর্য্যাপ্ত জল সরবরাহের কোন বাধা ঘটে না।

আমাদের ক্যাম্পের নিকট প্রতি সোমবারে হাট হয়। সেই-দিনই এখানকার দৈনিক হারের মজুরদের ও সাপ্তাহিক হারের বাবুদের বেতন বিলি হয়। কোং'র প্রায় বিভাগীয় প্রধানগণ ব্যতীত সকলেই সাপ্তাহিক রেটের অন্তর্ভুক্ত। জামসেদপুর হ'তে একজন ক্যাসিয়ার টাকা নিয়ে এসে বেতন বিলি করেন।
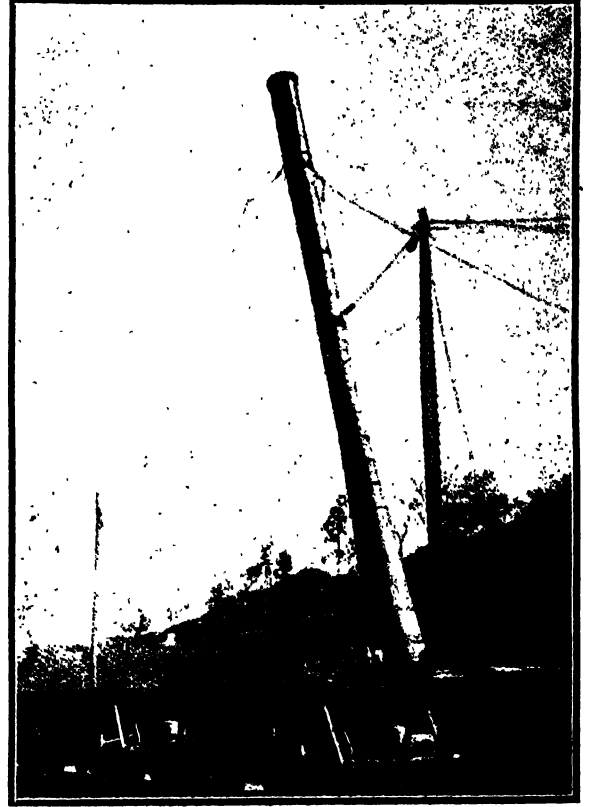
নোয়ামুণ্ডী লৌহ-খনির বয়লার গৃহ

হাটে তরকারী কিছুই প্রায় মেলে না। এদেশের লোক ও সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। জঙ্গলী গাছের পাতাই তাদের পরম রুচিকর উপাদেয় তরকারী।
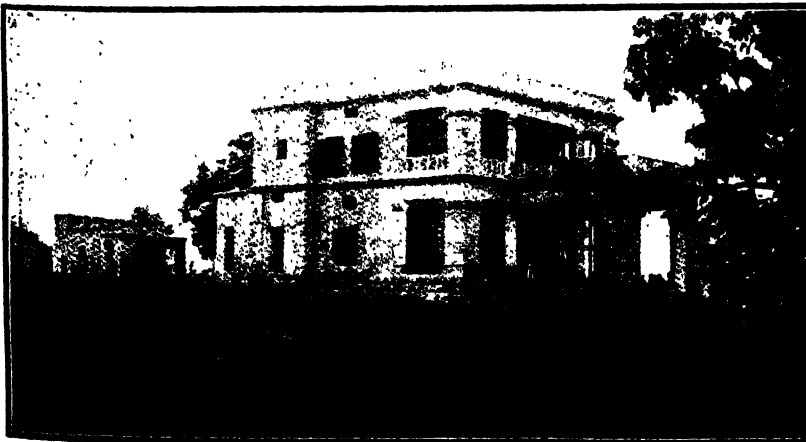
এখন বিদেশী ব্যাপারীদের দয়ায় অনেক জিনিষ আমদানী হতে আরম্ভ হয়েছে। স্থানীয় জঙ্গল প্রায় পরিষ্কার হয়ে এসেছে। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য স্বাস্থ্য-বিভাগের বেশ সুবন্দোবস্ত আছে। স্থানীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত জ্যোতীশচন্দ্র সেন মহাশয় এ বিষয়ে খুব যত্নশীল। ডাক্তার বাবু খুব সজ্জন ও দয়ালু ব্যক্তি। দুঃখের বিষয়, এত যত্ন সত্ত্বেও এখানকার সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল নয়। কয়মাস হতে Black water fever অনেককেই হৃতস্বাস্থ্য করেছে। বন্ধুবর কোং'র ওভারসিয়ার অনন্ত ঘোষ মহাশয়ের এই রোগে মৃত্যু সকলকেই যৎপরোনাস্তি

নোয়ামুণ্ডী লৌহখনির ম্যানেজারের বাংলো

বর্ত্তমানে ২টী পাহাড়ে খনির কাজ আরম্ভ হয়েছে। বৈদ্যুতিক পাওয়ার হাউস, বয়লার হাউস, ট্রেসল ও ক্রাসারের গঠনকার্য খুব জোরে চালান হচ্ছে। শেষেরটী ছাড়া সবই প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

ইতিমধ্যে এখানকার প্রবাসী বাসিন্দার সংখ্যা খুব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। চাকুরীর উদ্দেশ্যে ভারতের প্রায় সকল দেশের লোকই এসেছে। কার্য্যক্ষেত্রের প্রসারের জন্য ও উভয় ম্যানেজার মহাশয়দের

নোয়ামুণ্ডী লৌহ-খনির কর্ম্মচারিবৃন্দ

নোয়ামুণ্ডী লৌহ-খনির ২নং পাহাড়ের দৃশ্য

স্বাভাবিক সদয় হৃদয়ের জন্য কাহাকেও বিফল-মনোরথ হয়ে ফিরতে হয় নাই। তবে উপস্থিত টাটা কোম্পানীর প্রায় ৪ মাস ব্যাপী দীর্ঘ ধর্ম্মঘটের ফলে কায প্রায় বন্ধ হওয়ায় অনেক লোককে ছেড়ে দিতে হয়েছে। এখানে একটী ক্লাব স্থাপিত হয়েছে। তার অধীনে ফুটবল,

মাইনিং ফোরম্যান শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সম্পাদকত্বে "অগ্নিবাণী" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশ আরম্ভ হয়েছে। নিত্য-নূতন কনষ্ট্রাকশনের মহিমায় প্রকৃতির সে অনবদ্য সৌন্দর্য্যের হ্রাস হ'তে আরম্ভ হয়েছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য শত্রু মানুষের কঠিন হাতে আজ স্বভাবসৌন্দর্য্য বিধ্বস্ত, হতশ্রী। কালে আর এর কোন নিদর্শনই হয় তো পাওয়া যাবে না। এখন এখানকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে কিছু বল্লেই এই প্রবন্ধ শেষ হয়।

এখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের সকলেই প্রায় কোল। কিন্তু ভুঁইয়া ও এদেশীয় উড়িয়া ভাষাভাষী বিভিন্ন জাতিও আছে। তাদের ভাষা কতকটা ধরা যায়; কিন্তু "হো" আখ্যাধারী কোলদের ভাষা একেবারেই বুঝা যায় না। বর্ত্তমানে অনেকেই হিন্দী ও কিছু কিছু বাঙ্গালা শিখেছে। কিন্তু প্রথম প্রথম সে কি নিদারুণ বিড়ম্বনা ভোগই যে গিয়েছে, তা বলে বোঝান যায় না। ভুক্তভোগীরা অনুমান করতে পারেন। না বোঝে তারা আমাদের কথা, না বুঝি আমরা তাদের কথা। আমাদের তাদের দিয়ে কায করাতে হ'বে; কাযেই গরজ এ পক্ষেই বেশী। সুতরাং তাদের সঙ্গে মিশে স্বাধ্যায় নিরত হয়ে তাদের অপরূপ ভাষা আয়ত্ত ক'রতে হ'ল। যে দিন তারা স্বীকার ক'রলে যে "আম্ দো-হো'হন লেকা আলোঙা কাজি ইদু আ'দা নাম" (তুই তো কোলের ছেলের মতই আমাদের কথা খুব ভাল আয়ত্ত করেছিস্) সে দিন বাস্তবিকই সার্থকতার আনন্দে আনন্দিত হয়েছিলাম। আমাদের তিন বন্ধুর এই প্রশংসাবাদে অন্য বন্ধুরাও ঈর্ষান্বিত হয়েছিল।

বড় সরল আনন্দময় জাতি এরা। সারাদিন উপবাসে কঠিন পরিশ্রমে ক্লিষ্ট হ'লেও এদের মুখের হাসি ও প্রসন্নতা কখন মলিন হয় না। অধিকন্তু আমরা কেউ যদি হেসে কথা না বলি, তবে তাঁর অদৃষ্টে এদের সহানুভূতি লাভের আশা বড় অল্প। স্ত্রীলোকরাই অধিক পরিশ্রমী ও সদা প্রফুল্লস্বভাবা।

বর্ত্তমানে অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হ'লেও পূর্ব্বে এরা বাস্তবিকই পরম সুখী ছিল। ভগবানকে ফাঁকি দিয়ে জীবন যাত্রার পথকে সরল করতে এরাই পারত। কেন না অন্ন খাদ্য না জুটলে বনের পাতা এবং ঝরণার জলেই এরা বেশ চালাতে পারে। ঘরের জন্য কিছুই চিন্তার কারণ নাই। গাছের কয়টী ডাল কেটে বেঁধে নিলেই

একটা যা দাঁড়ায় তা রাজ-অট্টালিকার চেয়েও ওদের পরম তৃপ্তির জিনিষ। সামান্য একটু নেংড়াই পরিধানের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এখন "দিকু" (বাবু)দের আদর্শে এবং হিন্দুস্থানী ব্যাপারীদের দয়ায় সকল রকম বিলাসিতাই তাদের মধ্যে প্রবেশ করছে। সূক্ষ্ম সৌখীন কাপড় সায়া, সাবান, "বাসুলুম" (সুগন্ধ তেল) রকমারি মনোহারি দ্রব্য প্রভৃতি খরিদ করতেই, তাদের উপার্জ্জনের অধিকাংশ অর্থ সভ্যতার ব্যর্থ বাহ্যচাকচিক্যে ব্যয় করতেই ক্রমশঃ অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। এর উপর গভর্ণমেণ্ট, "অর্কি" শুঁড়িখানা বা চোলাই মদের ভাটি খুলে যেটুকু অভাব ছিল তা পূরণ করতে বাকী র'খেন নাই। পূর্ব্বে এদের "ডিয়াং" বা পচাই ধেনো মদই একমাত্র পেয় ছিল। সেটা এদের খাদ্যের সামিল। সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত যখন খুসী ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণ জন্য ডিয়াং পান করা চলে। সাধারণতঃ "দামান্তি" বা বাসীভাতই "বুলুং" বা লবণযোগে উদরস্থ করাই প্রধান আহার। পয়সার অভাব এরা এখনও অনুভব করে নাই। মাঝে মাঝে কায বন্ধ করে ঘরে বসে থেকে পরব "বাইতে" গিয়ে আমাদের বেশ বিপন্ন ক'রে। "বা" পরব (বসন্ত উৎসব) এবং "গামা" পরব (অবাধ স্ফূর্ত্তির উৎসব) এই দুইটাই বড় পরব। এতেই সব চাইতে জাঁক হয়। এছাড়া "হের" পরব (নিরাণ) "গামা" পরব (বর্ষা) প্রভৃতি বহু পরব আছে। সাধারণতঃ পরবের সময় ক্রমাগত তিন দিন স্ত্রীপুরুষ মিলে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে এক-পা আগে এক-পা পিছনে অগ্র-পশ্চাৎ করে করে নাচ, গান, এবং প্রধান কায "ডিয়াং" পানই হ'ল উৎসব।

সমবেত নাচগান দেখতে বেশ কৌতুকপ্রদ। নিজের গ্রামে শেষ হ'লে আবার পার্শ্বের গ্রামে গিয়ে পরব চালান হয়। "আন্দি সুন" বা বিবাহের নাচ হ'লে তো আর কথাই নাই। বিবাহের ব্যবস্থাও অদ্ভুত। বিবাহ এদের অনেকের জীবনেই ঘটে উঠে না। তার কারণ কন্যার অভিভাবকেরা কন্যার "গুনোম" বা দাম এত পেতে চায় যে তার ফলে বরপক্ষের তা যোগান অসম্ভব হয়ে পড়ে। কাযেই উভয় পক্ষকেই বিবাহ করবার ইচ্ছাকে মনেই রাখতে হয়। সাধারণতঃ ক'নের দাম ৬-১০টা গরু, ১০-১২টা ছাগল, ২০৲ টাকা এবং মুরগী ও ডিয়াং প্রচুর ধার্য্য হয়। যদি "কুই"-"বুগিন" হয় অর্থাৎ মেয়ে খুব ভাল হয়, তবে দামের মাত্রাও বেড়ে গিয়ে "উরি" বা গরু ২০ পর্য্যন্ত উঠে, "মেরম" বা ছাগলও হারাহারি-মতে এবং টাকা অন্ততঃ দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ায়। তার পর ডিয়াং ও "সিম," বা মোরগের আর কোন সংখ্যা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। বিবাহে বড় ছোট বয়সের কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। যার যখন candidate জুটবে সেই সঙ্গে "গুনোম" সম্পর্কেও কোন গোল না হ'বে তখনই বিয়ে হবে। এর জন্য যদি তার যৌবন বার্দ্ধক্যের সীমানা অতিক্রম ক'রতে যায়, তা'তেও কোন কথা নাই।
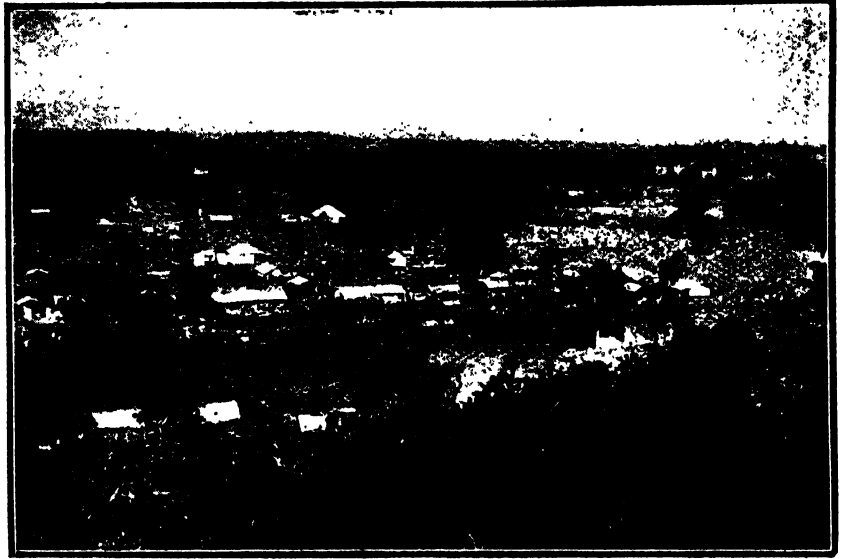
নোয়ামুণ্ডী লৌহ খনির সংগ্রামসই ক্যাম্প

নোয়ামুণ্ডী লৌহ-খনির দৃশ্য

কথাবার্ত্তা শেষ হ'লে বরপক্ষীয়রা এসে দাম দিয়ে যাবে। তার পর

দিন-স্থির হয়ে যাবে। নির্দ্দিষ্ট দিনের ৩,৪ দিন আগে থেকেই গ্রামের সমস্ত স্ত্রী পুরুষ মিলে নাচ গান ও পান চালাবে। ক'নে এই অবকাশে গ্রামে এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ "পয়সা কোয়তে সেনোয়া" অর্থাৎ সকলকে "জোহার" বা প্রণাম করবে ও সর্ব্বত্রই কিছু কিছু পয়সা পাবে। নির্দ্দিষ্ট দিনে পাত্রপক্ষীয় কয়েকজনের সহিত বরের গ্রামে যাবে। সেখানে বিরাট

নোয়ামুণ্ডা লৌহ খনির নং পাহাড়ের দৃশ্য

নোয়ামুণ্ডী লৌহ-খনির নূতন লাইন

নাচের ব্যবস্থা তাদের জন্য অপেক্ষা ক'রে। পারিপার্শ্বিক সকল গ্রামবাসীরাই সাগ্রহে নাচতে আসে। সারাদিন বিপুল আনন্দোল্লাস সহকারে ডিয়াং পান ও নাচ চালানর পর সন্ধ্যার সময় ক'নেকে বরের ঘরে দিয়ে সকলে ফিরে যায়। সাধারণতঃ বসন্তকালেই বিবাহ হয়। মাগে পরবের সময় অবাধ মেলামেশার সময় পাত্রপাত্রীর মধ্যে নির্ব্বাচন ও বিবাহের কথা-বার্ত্তা হয়। তখন মাঘমাস। তার পর যাই নববসন্তের পুলক-হিল্লোল প্রতি পাহাড়ের প্রতি বৃক্ষলতাকে পুলক-শিহরণে জাগিয়ে দিয়ে তাদের অঙ্গ ফুলে ফুলে ভরিয়ে দিয়ে সৌন্দর্য্যের মদিরতায় কাননভূমি প্লাবিত ক'রে তোলে, অমনি প্রকৃতির এই রম্য শিশুরা জীবনের সাথী দয়িতের সঙ্গলাভেচ্ছায় বিভোর হয়ে উঠে। তাই তাদের বিবাহের সময় বসন্ত কাল। বিবাহের আর একটী অনুকল্প ব্যবস্থা আছে—সেটার নাম "তি সাব তান," বা "হাতধরা"। পাত্রপক্ষ গুনোম দিতে অক্ষম হ'লে যদি বর-কনে উভয়ের প্রণয় খুব ঘনিষ্ঠ হয় এবং উভয়ের সম্মতি থাকে, তবে একদিন বর ক'নেকে নিয়ে গোপনে প্রস্থান ক'রে এবং উভয়ে স্বামী স্ত্রী রূপে বসবাস ক'রে। যদি অভিভাবকরা গুনোমের লোভ ত্যাগ করতে রাজী হয়, তবে একাগুভ বেই হয়—গোপনতার কালিমা লেপন করবার দরকার হয় না। এ প্রথা পাকা নয়। অতি অল্পেই এ বন্ধন ছেদন করা যায়। এজন্য এ ব্যবস্থা সামাজিক-প্রথা সম্মত নয়।

ব্যভিচার যে এদের মধ্যে নেই তা বলা যায় না। তবে সেটা বেশী নয় এবং তাদের মধ্যে অতি গোপনেই থাকে। লজ্জার বিষয় এই যে এদের নিটোল স্বাস্থ্যের নগ্ন সৌন্দর্য্যের অবাধ সুযোগ পেয়ে কোন কোন লম্পট বঙ্গ কলঙ্ক বাবুর কলুষ-দৃষ্টি ছলে বলে তাদের ব্যভিচারের কালিমা লিপ্ত করতে আরম্ভ করেছে। এ সব ব্যাপার প্রকাশ হ'লেই মুস্কিল। মেয়েরা জাতিচ্যুত হয়। আর বাবুভায়াকে তার আত্মীয়দের জাতিতে ওঠবার খরচ বাবদ বেশ মোটা টাকা দণ্ড দিতে হয়। অন্যথায় চাইবাসার কোর্ট।

কিন্তু এমনি সরল জাতি এরা যে এ সব সত্ত্বেও তারা বাবুদের প্রতি কিছুমাত্র বিদ্বিষ্ট নয় বা তাদের ঘৃণা করে না।

এদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রথাও বেশ অভিনব। গ্রামের মধ্যে কারও মৃত্যু হ'লে, গ্রামের সকলে মিলে কাঠ সংগ্রহ ক'রে মৃতের বাড়ীর উঠানে শবদাহ করবে, এবং অস্থিগুলি একটী হাঁড়িতে রাখবে। এক সপ্তাহ পরে গ্রামস্থ সকলে মিলে মৃতব্যক্তির বাড়ীতে ডিয়াং পানাদির পর, সেই অস্থি নিয়ে গ্রামের নির্দ্দিষ্ট একটী স্থানে খুব আড়ম্বরের সঙ্গে প্রোথিত করা হয়। তার পর সেই যায়গার উপর একখণ্ড সুবৃহৎ প্রস্তর স্থাপন করা হয়। গ্রামের বাহিরের এই সমাধিগুলি "এলিজে" ও "ডেজার্টেড ভিলেজের" বর্ণনা স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানকার বিচারবিধি আমাদের হ'তে ভিন্ন। এটা Nonregulated Province। চাইবাসা এখানকার হেডকোয়ার্টার। সেখানে একজন ডেপুটী-কমিশনর আছেন,—তাঁর বিচারই চরম। কোল্হান সীমানার জন্য একজন কোল্হান সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আখ্যাধারী ডেপুটী আছেন। গ্রামে গ্রামে "মুণ্ডা" আছে; তার উপরে কয়েকজন মুণ্ডার উপর একজন "মানকী" আছে। সকল অপরাধের প্রাথমিক তদন্তের মালিক তাঁরাই। মানকী মুণ্ডার ভয়ে সকলকেই সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। তাদের অসন্তোষ বড় সুবিধার বিষয় নয়। ইচ্ছা হ'লে এবং চেষ্টা ক'রলে তারা কোল্হান সীমানা থেকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাড়াবার ব্যবস্থা করতেও সমর্থ। এই সব নিরক্ষর মুণ্ডা ও কদাচিৎ-শিক্ষিত মানকী কোল মহাশয়দের এই অসীম ক্ষমতাশালিতার জন্ত বিদেশীদের বেশ একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই সতর্কভাবে কাটাতে হয়।

নোয়ামুণ্ডী লৌহ-খনির ২নং পাহাড়ের খনির প্রবেশ পথ

নোয়ামুণ্ডী লৌহ খনির ডাইরেক্টারগণের বাংলা

এ দেশের জমীতে বিদেশীর স্বত্ব নাই। বিদেশীর পক্ষে সেও বড় কম বিপদের কথা নয়। ডেপুটী কমিশনার বা কোল্হান সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের হুকুম হ'লে তৈয়ারী ঘর-বাড়ী ব্যবসা-বাণিজ্য সব ফেলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোলসীমানা ছাড়তে বাধ্য হ'তে হয়।

আরও এক হাঙ্গামা আছে। এ অঞ্চলটা গভর্ণমেণ্টের রিজার্ভ ফরেষ্ট সীমানার মধ্যে। জঙ্গলের গাছপাতা, জানোয়ার, কিছুতেই কারও হস্তক্ষেপ করবার অধিকার নাই। কোল ফরেষ্ট-গার্ডদেরও অগাধ ক্ষমতা। টাটা কোং পত্তনী সীমানার জন্য একজন "কুপমোহরার" আছে। কোন গাছপাতা প্রভৃতির দরকার হ'লে সে গভর্ণমেণ্টের মঞ্জুরী চিহ্নস্বরূপ মার্কিং হ্যামার দ্বারা চিহ্ন ক'রে দিলে তবে গাছ কাটা বা পাতা আনা যেতে পারে। পরে সেই সব জিনিষের জন্য তার হিসাবমত অর্থ কোম্পানির কাছ থেকে আদায় করা হয়।

খাস কোল বাসিন্দারা এত কঠিন বাঁধনে বাঁধা নয়। তাদের ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক গ্রামের চারিদিকে জঙ্গলের কতক অংশ ছাড় দেওয়া আছে। এই ভিলেজ ফরেষ্ট সীমানা থেকে তারা তাদের দরকার মত সব জিনিষই নিতে পারে। অবশ্য বিনা পয়সায়। পাহাড়েরা মাঝে মাঝে

যে উপত্যকা আছে তাতে ধান, মকাই, বাজরা প্রভৃতির চাষ হয়। "হটমালার" দেশ এটী—এখানকার বাসিন্দারা গাই বলদে চষে। গাই দোয়ার কোন প্রথা কোলদের মধ্যে নাই। মাত্র জমী চাষ করা আর আঁদি শুনোম দেওয়ার জন্যই তারা গরু প্রতিপালন ক'রে।

অল্প সংখ্যক উড়িয়া গোয়ালা বা মুষ্টিমেয় বিহারী এখানে আছে বলেই দুধ কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু তা গরীবের জন্য নয়; কারণ তা অগ্নিমূল্যে বিক্রী হয়।

পাহাড়ের গায়ে এদেশীরা সামান্য সামান্য "গাঙ্গাই" (ভুট্টা ও দেধান) "মানি" (সরিষা) "রামতিয়া" (সুরগুঞ্জা) ও কিছু কিছু কলাইএর চাষ ক'রে। পাহাড়ে মহুয়া গাছ অসংখ্য। ফসলের সময় সকল গৃহস্থই তাদের দরকার মত মহুয়ার ফুল ও ফল কুড়িয়ে রাখে। এই ফুল সারা বছর ধরে মদ চোলাই করবার জন্য ও শুধু খাবার জন্য ব্যবহার করা হয়। ফল থেকে তেল হয়। এ ছাড়া সশ বা তেল এবং কুসুম বীজও প্রচুর রাখে। তারও তৈল হয়। আ'লোর জন্য ও Lubricatingএর জন্য ঐ তৈল ব্যবহৃত হয়।

এই রকম করে এরা নিজেদের গ্রামের মধ্যে প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডারের অবিসংবাদী অধিকারী হয়ে উত্তরাধিকার-ক্রমে ভোগ দখল ক'রে আমোদ প্রমোদ করে দিন কাটিয়ে সহজ, সরল, সদানন্দময় জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু বাবুদের আদর্শ এবং সভ্যতা এদের পক্ষে নিদারুণ অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন বুঝতে না পেরে এরা অবাধে সেই সভ্যতাকে আলিঙ্গন করে নিচ্ছে। এর ফল যে তাদের পক্ষে কি বিষময় হয়ে দাঁড়াবে, তা ভেবে বাস্তবিকই দুঃখিত হ'তে হয়। কিছুকাল পরে প্রকৃতির সেই রম্য শিশু স্বভাব-সরল কোল জাতির কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না।

পাদরী মহাশয়দের দয়া এই জঙ্গলের মধ্যেও প্রবেশ ক'রে অনেক কোলকেই চলনসই লেখাপড়া শিখিয়েছে। কতকগুলি লোক বেশ ভাল লেখা পড়া শিখে গভর্ণমেণ্টের দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত আছে।

অনেক কোল অন্ধকার থেকে আলোকে আসবার বৃথা চেষ্টায় হাতড়ে বেড়িয়ে শেষে নিরুপায় হয়ে তাদের "মারাং বোঙ্গা" "সিঙ্গ বোঙ্গা" "বুরুবোঙ্গা প্রভৃতি বোঙ্গাদের দলে যীশুকেও ভিড়িয়ে নিয়ে এক অদ্ভুত রকমের হয়ে গেছে।

এখানকার সীমানার পরই "কেঁওঝোড়" দেশীয় রাজ্যের সীমানা। সেখানে আমাদের ক্যাম্প থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে দেওঝোড় গ্রামে একটী শিবালয় আছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের মনোহারিত্বে স্থানটীর শোভা চিত্ত-চমকপ্রদ। চারিদিকে বনাকীর্ণ সমুন্নত শৈলরাজি স্তব্ধ গম্ভীর ভাবে দণ্ডায়মান। কথিত কবির দেবাদিদেবের যোগাসন পর্ব্বতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই পরম শোভাময় পার্ব্বত্য নদীর প্রায় ৪৫ টী উচ্চ ভূমি হইতে পতিত জলপ্রপাতের নীচে ভগবান দেবাদিদেবের শান্ত সমাহিত মূর্ত্তি মনে এক অভাবনীয় ভাব নিয়ে আসে। দুই দিকের দুই পাহাড়ের মিলন স্থলে উচ্চ পাথরের উপর থেকে প্রবলবেগে ভীম গর্জ্জনে নিম্নস্থ প্রস্তরে আছড়ে পড়া নিঝরধারা জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে উপত্যকা ভূমির মধ্য দিয়ে পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীরূপে বয়ে চলেছে।

এরই উপরে প্রস্তররাজির মধ্যে প্রকৃতির স্বহস্ত-রচিত বেদীর উপর মহাদেবের আসন। পাথরের ফাটলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত জলধারা আপনি এসে মহেশ্বরকে প্রতিনিয়ত অভিসিঞ্চিত ক'রছে। বর্ত্তমানে একজন ঠিকাদার উপরে টীনের আচ্ছাদন এবং বেদী ও তন্নিম্নস্থ স্থানকেও পাকা করিয়ে দিয়ে প্রকৃতির নিরালা সৌন্দর্য্যের মধ্যে এক উৎপাত আমদানি করেছে। ঝরণার ধারে এমন কি পাথরের উপরেও কলা গাছ আছে। একটী প্রাচীন সাপ এখানে সর্ব্বদা থাকে। বাস্তবিক স্থানটীর সৌন্দর্য্য এমনি মনোমুগ্ধকর যে চপলমতি ও নাস্তিকের মনকেও স্থির ও আস্তিক-ভাবাপন্ন না ক'রে ছাড়ে না।

নোয়ামুণ্ডীর পর রেলপথে জামদা। এখানে Bird & Coর ম্যাঙ্গানিজ ও লৌহ খান আছে। তার পর "গুয়া"। Indian Iron & Steel Coর লৌহ খনি। সিংহভূম বাস্তবিকই রত্নগর্ভা। এর প্রতি গিরি-উপত্যকা খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ।

পশ্চিমের পথিক

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

(৩)

তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল নিয়ে এ পৃথিবীটা তৈরি,—এ সত্য এতদিন বইয়ে-পড়া সত্য ছিল; অর্থাৎ সে ছিল জানবার সত্য, বোঝবার নয়। ছাপার অক্ষর থেকে নেমে এসে আজ সে সত্য আমার চতুষ্পার্শ্বের দৃশ্যমান ভুবনে ছড়িয়ে গেছে,—সমুদ্রের ঢেউ থেকে আকাশের [illegible]

truth। এত বড় ভারতবর্ষের এক কোণ থেকে আর এক কোণে যেতে লেগেছিল দুটো মাত্র দিন। আর সমুদ্র বেয়ে দিনের পর দিন চলেইছি,—মনে হয় যেন কত মাস, কত বৎসর এ জাহাজে কেটে গেল; ঢেউগুলোর সঙ্গে যেন আজীবন বন্ধুত্ব, জাহাজটাকে যেন জন্মাবধি দেখে আসছি। পুরানো সেতারকে নূতন সুরে বেঁধে তোলবার প্রথম প্রয়াস [illegible] কথা। পিছন দিকে চাইলে যা চোখে

পড়ে, তার কতক ভাসাভাসা, কতক ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। ধোঁয়ার মধ্যে থেকেও যা ধোঁয়া নয়, সে স্নেহপ্রীতির বন্ধন, —সহরের বাইরে ক্রীপারে ঢাকা একখানা বাড়ী। স্বপ্ন না হোক্, তবু তো স্মৃতি,—"শুধু পটে লিখা।"

সবার মনে সহসা বিগতকে ফিরিয়ে আনল ভারতগামী একখানা যাত্রী-জাহাজ। জাহাজটা মারিতিমা ইতালিয়ানার, —অর্থাৎ যে কোম্পানির জাহাজে আমি চলেছি, তার। বহুদূর থেকে উভয়ে উভয়কে অভিনন্দন জানাল, আলোর মালায় সর্ব্বাঙ্গ সাজিয়ে। কাছে আসতেই দুই জাহাজ থেকে তুমুল আনন্দ-কোলাহল উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে ছুটল বিচিত্র আতসবাজি। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। আতসবাজির আলো যতক্ষণে আকাশ ছেড়ে জলে নামল, আমরা ততক্ষণে ছুটলুম পশ্চিমে, ভারতের জাহাজ ছুটল পূবে। কোনো পরিচয় নেই, তবু এ ছাড়াছাড়ির মধ্যে ব্যথা ছিল। জাহাজ দুটো যেন দুই ভাই,—তাদের পথ পৃথক্,—একের পথ অন্যের বিপরীত। ও জাহাজে যারা ভারতে ফিরছে তাদের কথা ভেবে মনে হল, ওদের চোখে সদ্য প্রত্যাবর্ত্তনের আনন্দ জ্যোতির মত জ্বলছে,—ওদের সমস্ত মন মৃদুগতি জাহাজটা ছেড়ে বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটেছে। জাহাজখানা ক্রমে অনেক দূরে চ'লে গেল,—দিগন্তের সিঁথায় শুধু যেন একটুখানি আলোর টিপ্।

এমন ভাবে দেখা হওয়ায় ক্ষণেকের আনন্দের সঙ্গে আছে বহুক্ষণের বেদনা। এতে মন যেন সাম্নে চলতে চলতে পিছনের টানে অকস্মাৎ তার গতিবেগ হারায়। তার দু'পায়ে পুনর্বার বেগসঞ্চার করবার প্রয়াস তখন প্রবল করতে হয়। তার চেয়ে এমন দেখা না হওয়াই ভাল। ছুটে চলেছে যে, পিছন ফিরে চাওয়া তার ভাল নয়; বিশ্রামে তার শ্রান্তি যায় না, বরং কুড়েমি আসে। আর মনের কুড়েমির মত দুর্নিবার শত্রু পথিকের দ্বিতীয় নেই। এ কুড়েমি হয় তাকে দেশে ফিরে পাঠায়, না হয় তার দৃষ্টিশক্তি হরণ ক'রে নেয়। শেষোক্ত অবস্থা যখন আসে, পথিক তখন দু'চোখ মেলে চারিদিকে চেয়েও কিছু দেখতে পায় না; প্রকৃতির অনাবৃত মুখ তার কাছে তখন ঘোমটায় ঢাকা,—রঙে রঙে আকাশ ভ'রে গেলেও সে আকাশ তার কাছে বর্ণহীন কালো। মানব-জীবনের বিচিত্র কল্লোল তার কাছে শুধু একটা অর্থহীন কোলাহল। সুদূর লক্ষ্যে যে যাত্রী চলেছে তার জীবনে এর চেয়ে ব্যথার বস্তু আর কি হতে পারে!

সুয়েজ থেকে পোর্ট্ সৈয়দ্ ৮৮ মাইল পথ। প্রায় ১০০ ফীট চওড়া একটা খাল, মানুষের হাতে তৈরি; এর মধ্যে দিয়ে লোহিত সাগরের জল ভূমধ্যে যাচ্ছে, ভূমধ্যের জল লোহিতে আসছে। এক পাশে আরব আর এক পাশে ইজিপ্ট্। একদিন এসিয়া এবং আফ্রিকা ছিল এক; ইউরোপ এসে মাটি কেটে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে নিজের পথ সোজা করবার জন্য। খালের যেদিকে আরব —সেদিকে শুধু একটা মরু-প্রান্তর দেখা যায়; ভাল লাগে না। এসিয়ার প্রান্তর ছেড়ে তখন আফ্রিকার তট-প্রান্তে ফিরে চাই, সেখানে খালের ধারে ধারে রাস্তা চলেছে, তার উপর কত নরনারী, কত সাইক্ল্ মোটরের আনাগোণা। তাদের দিকে চেয়ে আমরা হাত নাড়ি, আমাদের দিকে চেয়ে তারা হাত নাড়ে। রাস্তার পাশে রেলের লাইন, মাঝে মাঝে গাছপালায় ঘেরা বাংলো গোছের ছোটছোট ষ্টেশন,—তার সামনে গোলমোহরের গাছে অগ্নিবর্ণ ফুল ফুটেছে। এ দেশের লোকের রুচির পরিচয় পেয়ে মনে আনন্দ হল। রুচি আর নীতি যে এক নয়, তার চাক্ষুষ পরিচয় পাওয়া গেল আরো খানিক্ পরে। জাহাজ তখন সুয়েজের ওপারে পোর্ট্ সৈয়দে ভিড়েছে। সহর দেখতে নামলুম। মস্ত সহর, ছোট বাড়ী বড় একটা চোখে পড়ে না, চারদিক্ চমৎকার পরিচ্ছন্ন। বিদেশী দেখে ইজিপ্টের নানা জাতীয় মানুষ আমাদের ঘিরে দাঁড়াল। কেউ গাইড্ হতে চায়; কারো হাতে সে দেশের খাবার,— ছবি, সিগারেট, নানাবিধ পণ্যদ্রব্য। দু'চার মিনিট যেতেই বুঝলুম, রুচি যতই থাক্, নীতিজ্ঞান এদের বড় একটা নেই। রাতের আবরণে মানুষ তার ভিতরের পশুকে মুক্তি দিতে ভয় পায় না, কিন্তু এদের কাছে রাত দিন সমান। ক্লিওপেট্রার দেশে সুনীতি সুরুচির বোন্ নয়; এমন কি, এ দুইয়ের পরস্পর পরিচয় পর্য্যন্ত আছে ব'লে বোধ হল না। এরাই কিন্তু একদিন একটা বিশাল সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল, যার চিহ্ন পিরামিড, যার চিহ্ন টুটানখামেনের কবর। সে সভ্যতা বহুদিন হল ম'রে ভূত হয়ে গেছে; দেহটা এখনো mummy হ'য়ে আছে,

কিন্তু তাও আর দু'দিন পরে থাকবে না। এত বড় একটা সভ্যতা মরল কেমন ক'রে? প্রেতলোকে ঈজিপ্টের সাথী বিস্তর; উত্তরে সিরিয়া, বাবিলন্, পশ্চিমে গ্রীস্, রোম। একদিন এরা সবাই শুধু বেঁচে ছিল তাই নয়, বাঁচবার আনন্দ এরা যেমন জানত আমরা তা জানিনি। জীবনটাকে এরা আর্টে পরিণত করেছিল, আমরা তা পারিনি। তবু এদের মনের রক্তে যে বিষ ছিল সে বিষের ক্রিয়ায় উক্ত মনের শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল। পৃথিবীর ইতিহাসে ঈজিপ্টের মৃত্যু এক স্মরণীয় ঘটনা। একটা সভ্যতা যখন দিগ্বিজয়ী হয়ে ওঠে তখন সে গর্ব্বভরে ঘোষণা করে, চির-অজেয় আমি, আমি মৃত্যুহীন। নিয়তি সে কথা শুনে অদৃশ্যে সকৌতুক হাসি হাসে; তার পর একদিন সহসা নিয়তির মুখ কঠিন হয়, চোখে তার আগুন জ্বলে ওঠে, হাত থেকে মৃত্যুবাণ ছোটে। যত বড় দুর্দ্ধর্ষ সভ্যতা হোক্ না কেন, সে বাণ খেয়ে স্খলিতচরণে পথের ধূলায় লুটিয়ে পড়বেই। যে কোনো সভ্যতার জীবনেতিহাস খুলে দেখলে দেখা যাবে, তার পরিণতিই তার মৃত্যুবাণ হয়েছে। চরম বৃদ্ধিই মরণের বাহন,—সে মরণ মানুষের হোক্ বা জাতীয় সভ্যতার হোক্। খৃষ্টীয় সভ্যতা আজ অহঙ্কারের অচলে উঠেছে,—তার গৌরবের বাজ্‌না বাজ্‌ছে জল স্থল অন্তরীক্ষ জুড়ে। উক্ত গৌরবের শেষ দিন হয় তো দূরে, হয় তো সন্নিকট; কিন্তু সে শেষদিন এক সময়ে আসবেই, পুরাতনের মৃত্যু-মুহূর্ত্তে নূতনের জন্ম হবে,—নূতন যুগ, নূতন ক্রাইষ্ট, নূতন শক্তি।

(৪)

নেপ্‌ল্‌স্ বন্দরে ইটালির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। ঠিক আমাদের দেশের মতন এখানকার আকাশ,—প্রসন্ন, কিরণোজ্জ্বল। অন্ধকার ইয়োরোপের কবিরা আলোর সুধা পান করতে এখানে আসে। "আকাশ ব্যোম অপরিমাণ, ...মন্তসম করিতে পান" এ কথা ইয়োরোপে শুধু ইটালিতে এসে বলা চলে। এত বড় ইংরাজি সাহিত্যটা শৈশবে ইটালির মাতৃস্তন্যে পালিত হয়েছে,—কৈশোরে তার হাত ধ'রে পায়ে পায়ে চলতে শিখেছে। যৌবন যখন এল, তখন এ সাহিত্যের সেরা কবি শেলী, কীট্‌স্, বায়রণ, রসেটি ইটালির মুখের দিকে চেয়ে অন্তরের প্রীতি জানিয়েছে। ইটালির সরস্বতী শুধু ইংরাজি সাহিত্যের গায়ে সোনার কাঠি ছোঁয়ায়নি; সমস্ত সাহিত্যের যে ক'টা জিনিষ একেবারে গোড়ার উপাদান, তাও জুগিয়েছে। দান্তি জাগিয়েছে কল্পনা, পেত্রার্কা দিয়েছে রূপ (form), বোকাচিও দিয়েছে প্লট্। অন্যের মনের খাদ্য জোগাতে গিয়ে ইটালি নিজে কিন্তু সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে। গর্ব্ব করবার যা আছে সে অতীত; ঈজিপ্টের মতন এখানেও আত্মতৃপ্তি পেতে হলে মাটির তলার কবরের পূজা করতে হয়। লেখক যে নেই তা নয়। দ্য আন্নুন্‌জিওর লেখায় কল্পনা আছে, কিন্তু সে লেখায় শক্তির পরিচয় পাইনি, যেমন শক্তি আছে রোমা রোলাঁ বা শ'য়ের কলমে। এদের ধনুর্দ্ধর দার্শনিক বেনোদিতো ক্রোচের মধ্যেও অন্য দেশের দার্শনিকের গভীরতা আমার চোখে পড়েনি।

নেপ্‌ল্‌স্‌এর কাছেই পম্পিয়াইয়ের ধ্বংসাবশেষ; তার সাম্নে ভিসুভিয়াসের অগ্নিকুণ্ড। সহর ছেড়ে taxiতে কুড়ি মাইল পথ অতিক্রম ক'রে আমরা পম্পিয়াই পৌঁছলুম। মাটি খুঁড়ে এত বড় একটা কীর্ত্তি আবিষ্কার করা যায়, এ ধারণা আমার পূর্ব্বে ছিল না। স্থানটা বিশ্ববিশ্রুত; কিন্তু শুধু দু'চোখ দিয়ে দেখলে দেখা যায় এর পাথরের ভগ্নস্তূপ, যেমন দেখে আমেরিকান্ টুরিষ্ট্। পম্পিয়াই দেখতে হলে যা প্রয়োজন সে দু'চোখের পিছনে একটা মন।

ভিসুভিয়াসের দিকে চেয়ে দেখলুম; পাহাড়টা অহরহ ধোঁয়ার নিশ্বাস ফেলছে, মাঝে মাঝে ধোঁয়ার সঙ্গে আগুন। বজ্রগর্জ্জনেরও তার শেষ নেই। কল্পনায় দেখা যায়, দু'হাজার বছর আগে সহসা একদিন ও-পাহাড় থেকে কোটি কোটি বজ্র বেরিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকে ছুটল আগুনের নদী। সে নদীর স্রোতে একটা গোটা সহর পুড়ে ছাই হয়ে গেল। দু'হাজার বছর পরে চিতাভস্ম সরিয়ে এ যুগের মানুষ সে যুগের নগরের উদ্ধার সাধন করল, কিন্তু তাকে তার প্রাণ ফিরিয়ে এনে দিতে পারল না। বহুদিন মাটির তলায় বাস ক'রে রক্তমাংস নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, এখন যা আছে সে পম্পিয়াইয়ের কঙ্কাল। এই কঙ্কাল দেখতেই ছুটে আসে দেশবিদেশের লোক

নেপ্‌ল্‌স্‌ সহরটা আমরা নানা ভাবে দেখ্‌লুম ; ট্যাক্সিতে, ট্রামে, ক্যাবে, পদব্রজে। ইংরাজী এরা বোঝে না ; ফ্রেঞ্চের কিঞ্চিৎ চলন আছে। অর্দ্ধেক কথা ইঙ্গিতে ইসারায় সারতে হয়। মানুষের আদিম অবস্থার একটা দিক্‌ কতকটা উপলব্ধি করা যায়, বিদেশী সহরে ইঙ্গিতে কথা ব'লে। তখন ভাষার অভাব পুরণ করে ভঙ্গী। নিজেদের মধ্যে যা একান্ত হাস্যকর দেখায়, ও-ক্ষেত্রে সেই-সব ভাব-ভঙ্গীই সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক বোধ হয়।

ছোট-বেলার স্মৃতি

শ্রীহরিধন মিত্র

আমার দগ্ধ-দিনের ব্যথার মাঝে
দেয় গো যাহা প্রীতি,—
বেদনারি অন্ধকারে,
মোর হৃদয়ের বন্ধ দ্বারে,
উষার মতন আলোর আঘাত
দেয় গো নিতি নিতি,—

সত্যরে যা মিথ্যা ক'রে
ভুল টুটাতে চায়,
শেষ নিরাশার লতায় আমার
ফুল ফুটাতে চায়,
মরু-তপোবনের মাঝে
আজ যা আবার সবুজ সাজে
পথ-হারানো অবুঝ মাঠের
ঢেউ ছুটাতে চায় ;—
আজ যা আবার পাখীর গানে,
মর্ম্মরানো শাখীর তানে,
আঁখির পাতে কোন্‌ অতীতের
ছাপ উঠাতে চায়,—

সেই যে সেই নদীর চর,
বালুর-গাঁথা খেলাঘর,
কল্‌কে গাছের ডালে ডালে
হল্‌দে রঙের ফুল···
আজো তারা তেম্‌নি আছে
হয়নি কোন ভুল !

কাল যা ছিল নদীর চর,
বালুর-গাঁথা খেলাঘর,
আজ তা হ'ল এ সংসার—
বড় খেলার গৃহ,—
কাল যা ছিল 'আড়ি করা,'
অভিমানের পালা···
আজ তা আমার বিরহ,
আর বিচ্ছেদের-ই জ্বালা ;—
তারি মতন মনোরম,
তারি মতন প্রিয় !

কোথাও কিছু হয়নি ভুল,
হয়নি কিছুই 'ইতি' ;
মরণ শেষে উঠ্‌বে হেসে
ছোট-বেলার স্মৃতি !

স্ত্রীশিক্ষায় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

(অপ্রকাশিত সরকারী কাগজপত্র-অবলম্বনে)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(২)

১৮৫৮, নভেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর সরকারী চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। শোনা যায়, বালিকা-বিদ্যালয় সম্পর্কীয় ব্যাপারে ডিরেক্টর-অফ-পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশনের সহিত মতান্তরই না কি তাঁহার পদত্যাগের অন্যতম কারণ। মাসিক ৫০০৲ টাকার আয় হ্রাস, সরকারের সাহায্যদানে অসম্মতি,—এ-সব কিছুতেই তৎপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরকে নিরাশ করিতে পারিল না। বালিকা-বিদ্যালয়গুলির পরিচালনের জন্য তিনি এক নারী-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডার খুলিলেন। ইহাতে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ রায়-প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত দেশীয় ভদ্রলোক এবং উচ্চতন সরকারী কর্ম্মচারীরা নিয়মিত চাঁদা দিতেন। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে তাঁহার প্রচেষ্টা যে দেশবাসীর আনুকূল্য লাভ করিয়াছে, তাহা সার বার্টল ফ্রেয়ারকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রে প্রকাশ :—

"শুনিয়া সুখী হইবেন, মফঃস্বলের যে-সকল বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য আপনি চাঁদা দিয়াছিলেন, সেগুলি ভালই চলিতেছে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী জেলা-সমূহের লোকেরা স্ত্রীশিক্ষার সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মাঝে মাঝে নূতন নূতন স্কুলও খোলা হইতেছে।" ছোটলাট বীডন সাহেবও মাসিক ৫৫৲ টাকা সাহায্য করিয়া পণ্ডিতকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

আগেই বলিয়াছি, ১৮৫৬ অগষ্ট মাসে বিদ্যাসাগর বীটন-স্কুল-কমিটির সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৬৪, জানুয়ারী মাসে তিনি উক্ত কমিটির সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তাঁহাকে নানা কাজে ব্যাপৃত থাকিতে হইত, কাজেই সময় তাঁহার বেশী ছিল না, তবুও বীটন বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। ১৮৬২, ১৫ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর বাঙলা-সরকারকে বীটন বিদ্যালয়-সম্পর্কে একটি রিপোর্ট পাঠান। তাঁহার সম্পাদক থাকিবার কালে বিদ্যালয়ের অবস্থা কেমন ছিল, তাহার আভাস এই রিপোর্টে পাওয়া যায় :—

"পঠন ও লিখন, পাটীগণিত, জীবনচরিত, ভূগোল, বাঙলার ইতিহাস, নানা বিষয়ে মৌখিক পাঠ, এবং সূচিকার্য্য শিক্ষণীয় বিষয়। বাঙলা ভাষার মধ্য দিয়াই ছাত্রীগণকে শিক্ষা দেওয়া হয়। একজন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, দুইজন সহকারিণী এবং দুইজন পণ্ডিত—এই পাঁচজন বিদ্যালয়ের শিক্ষক।......

"কমিটির মত এই, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ হইতে···বিদ্যালয়ের ছাত্রী-সংখ্যা যেরূপ দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা দেখিয়া কমিটি বিশ্বাস করেন, যাহাদের উপকারের জন্য বিদ্যালয়টি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাজের সেই শ্রেণীর লোকের কাছে ইহা ক্রমেই সমাদরলাভ করিতেছে। বড়লোকেরা এখনও সাক্ষাৎভাবে বীটন বিদ্যালয়ের সুবিধা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হয় নাই; এই শ্রেণী হইতে অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রীই স্কুলে প্রবেশলাভ করিয়াছে। অনেক সম্পন্ন ঘরেই কিন্তু মহিলাদের জন্য গৃহশিক্ষার আয়োজন হইয়াছে,—ইহা দেখিয়া কমিটি আনন্দানুভব করিতেছেন। বিশেষভাবে বীটন স্কুলের হিতকর প্রভাবই যে ইহার কারণ—ইহাই কমিটির বিশ্বাস।"*

মিস মেরী কার্পেণ্টারের নাম এদেশে মানব-হিতৈষী কর্ম্মী ও ভারত-বন্ধু বলিয়া সুপরিজ্ঞাত। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি তিনি কলিকাতায় আসেন। ভারতবর্ষে নারী-

* Pandit Ishwarchandra Sharma, Hony. Secretary, Bethune School Committee, to the Hon'ble A. Eden, Offg. Secy. to the Govt. of Bengal, dated 15 Dec. 1862,—Education Con. Decr. 1862, Nos. A 59-62.

শিক্ষার প্রচার ছিল তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা। বিদ্যাসাগর যে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার কার্য্যে একজন বড় কর্ম্মী, একথা সুবিদিত। মিস কার্পেণ্টার কলিকাতা পৌঁছিয়াই পণ্ডিতের সহিত পরিচিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। ডিরেক্টর-অফ-পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাকশন য়্যাটকিনসন্‌ সাহেব একখানি বে-সরকারী পত্রে বিদ্যাসাগরকে জানাইলেন,—

"প্রিয় পণ্ডিত মহাশয়,—মিস কার্পেণ্টারের নাম শুনিয়া থাকিবেন। তিনি আপনার সহিত পরিচিত হইতে, এবং স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় জানাইতে ইচ্ছুক⋯(১৮৬৬, ২৭ নভেম্বর)।

ডিরেক্টর বীটন বিদ্যালয়ে মিস কার্পেণ্টারের সহিত পণ্ডিতের পরিচয় করাইয়া দিলেন। প্রথম আলাপেই উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। তিনি বিদ্যাসাগরের সহিত কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বালিকা বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করিলেন। ১৮৬৬ ডিসেম্বর মাসে ডিরেক্টর য়্যাটকিনসন্‌, স্কুল ইন্‌স্পেক্টার উড্রো এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত মিস কার্পেণ্টার উত্তরপাড়া বালিকা-বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান। ফিরিবার মুখে বিদ্যাসাগরের বগী গাড়ি উল্টাইয়া যায়। তিনি পড়িয়া গিয়া যকৃতে গুরুতর আঘাত পান। এই দুর্ঘটনার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। যে সাঙ্ঘাতিক ব্যাধি শেষে ১৮৯১, জুলাই মাসে তাঁহাকে মৃত্যুপথে লইয়া যায়, এই দারুণ আঘাতই তাহার মূল কারণ। কিন্তু বিদ্যাসাগর এই স্বাস্থ্যহানির দিকে মোটেই নজর দিলেন না,—প্রকৃত দেশহিতৈষীর ন্যায় দেশহিতের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।

একদল দেশীয় শিক্ষয়িত্রী গড়িয়া তুলিবার জন্য আপাততঃ বীটন বিদ্যালয়েই একটি নর্ম্মাল স্কুল স্থাপিত করিবার জন্য মিস কার্পেণ্টার সরকারকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ১৮৬৭, ১লা সেপ্টেম্বর একখানি দীর্ঘপত্রে বাঙলার ছোটলাট সার উইলিয়ম গ্রে এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। এ-প্রস্তাবে পণ্ডিত সম্মত হইতে পারিলেন না। তিনি উত্তরে ছোটলাটকে লিখিলেন,—

"আপনার সহিত শেষ সাক্ষাতের পর আমি বহু অনুসন্ধান করিয়াছি এবং ব্যাপারটি বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখিয়াছি। কিন্তু দুঃখের সহিত জানাইতেছি, বীটন বিদ্যালয়েই হোক বা স্বতন্ত্রভাবেই হোক, হিন্দু-সমাজের গ্রহণোপযোগী একদল দেশীয় শিক্ষয়িত্রী তৈয়ারী করিবার জন্য মিস কার্পেণ্টার যে উপায় অবলম্বন করিতে চান, তাহা কার্য্যে পরিণত করা কঠিন,—এ বিষয়ে আমার মত পরিবর্ত্তিত হয় নাই। বস্তুতঃ, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও দেশবাসীর মনোভাব এরূপ প্রতিষ্ঠানের পরিপন্থী; যতই ভাবিতেছি, আমার এ ধারণা ততই দৃঢ়তর হইতেছে। ইহা যে সাফল্যলাভ করিবে না, সে-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, সেইহেতু সরকারকে সাক্ষাৎভাবে এ কাজে নামিতে আমি কোনমতেই পরামর্শ দিতে পারি না। সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা অবরোধ-প্রথা ভঙ্গ করিয়া যখন দশ-এগারো বছরের বিবাহিত বালিকাদেরই বাড়ী হইতে বাহির হইতে দেয় না, তখন তাহারা বয়স্থা আত্মীয়াদের শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য গ্রহণ করিতে কেমন করিয়া সম্মতি দিবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। কেবল অসহায়া অনাথা বিধবাদেরই এ কার্য্যে পাওয়া যাইতে পারে। নৈতিক দিক দিয়া শিক্ষাকার্য্যে তাহারা কতদূর উপযুক্ত হইবে, সে বিচার করিতেছি না, তবে ইহা নিঃসন্দেহ যে, অন্তঃপুর ছাড়িয়া সাধারণ শিক্ষয়িত্রীর কাজে নামিয়াছে বলিয়াই তাহারা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের পাত্রী হইবে; ফলে এই অনুষ্ঠানের সাধু উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।

"সম্প্রতি সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত ভারত-গভর্মেণ্টের পত্রখানিতে এক প্রশস্ততর পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জনসাধারণের মনোভাব বুঝিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়—সাহায্যদান-প্রণালীর (grant-in-aid) প্রবর্ত্তন। দেশের লোক মিস কার্পেণ্টারের প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করিতে ইচ্ছুক হইলে সরকার তাহাদের সাহায্যার্থ যথেষ্ট বৃত্তির বন্দোবস্ত করিবেন। যতদূর বুঝিতেছি, হিন্দু-সমাজের অধিকাংশ লোকই এরূপ সাহায্যের সুবিধা গ্রহণ করিবে না; তবুও যাহারা ইহার সফলতায় অতিবিশ্বাসী, সত্যই যদি তাহাদের আন্তরিক আগ্রহ ও অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে, আশা করা যায়, তাহারাই অগ্রবর্ত্তী হইয়া সরকারী অর্থ-সাহায্যে এ-সম্বন্ধে ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবে।

"আমি স্পষ্ট স্বীকার করিতেছি, তাহাদের উপর আমার আস্থা নাই। কিন্তু ভারত-সরকার যে বিধি প্রচার করিয়াছেন তদনুসারে তাঁহাদের অভিযোগ করিবার কিছুই থাকিবে না। •

"মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যকতা যে

কতটা অভিপ্রেত এবং প্রয়োজনীয় তাহা আমি বিশেষ জানি,—একথা আপনাকে বলা বাহুল্য। আমার দেশবাসীর সামাজিক কুসংস্কার যদি অলঙ্ঘনীয় বাধারূপে না দাঁড়াইত, তাহা হইলে আমিই সকলের আগে এ প্রস্তাব অনুমোদন করিতাম এবং ইহাকে কার্য্যকর করিবার জন্য আন্তরিক সহযোগিতা করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। কিন্তু যখন দেখিতেছি, সাফল্যের কোনই নিশ্চয়তা নাই, এবং এ-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে সরকার অনর্থক অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়িবেন, তখন কোন মতেই আমি এ ব্যাপারে পোষকতা করিতে পারি না।

"বীটন বিদ্যালয়ের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, ফল তাহার অনুরূপ হয় নাই,—এ-বিষয়ে আপনার সহিত আমি একমত। কিন্তু তাই বলিয়া বিদ্যালয়টি একেবারে উঠাইয়া দেওয়া সঙ্গত মনে করি না। যে মানব-হিতৈষী মহাত্মার নামের সহিত বিদ্যালয়টির নাম সংযুক্ত, তিনি ভারতে নারীজাতির শিক্ষাবিস্তারকল্পে যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার স্মারক-রূপেও সরকারের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির ব্যয়ভার বহন করা অবশ্যকর্ত্তব্য। মফঃস্বলের বালিকা-বিদ্যালয়-গুলির পক্ষে আদর্শরূপে কাজ করিবে বলিয়াও এইরূপ শহরের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত এক সুব্যবস্থিত বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রয়োজন আছে। হিন্দু-সমাজের উপর এই বিদ্যালয়টির নৈতিক প্রভাব যথেষ্ট। চারিপাশের জেলা-সমূহে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের পক্ষে প্রকৃতপক্ষে ইহা পথ প্রস্তুত করিয়াছে; তাই আমার বিবেচনায় ইহার পিছনে বছরে বছরে যে বিপুল অর্থব্যয় হয়, তাহা সার্থক, বলিতে হইবে। কিন্তু একথাও সত্য, ব্যয়সঙ্কোচ ও উন্নতির যথেষ্ট অবসর আছে। কার্য্যকারিতার হানি না করিয়াও, বিদ্যালয়ের খরচ অর্দ্ধেক কমাইতে পারা যায়।

"স্বাস্থ্যলাভের আশায় দীর্ঘকালের জন্য উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বায়ু-পরিবর্ত্তনে যাইতেছি। বীটন বিদ্যালয়ের পুনর্গঠন-সম্বন্ধে যদি আমার মতামত জানিতে [illegible] হা হইলে কলিকাতায় আপনার ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে, ও সাক্ষাতে আলোচনা করিতে পারি।" (১ অক্টোবর, ১৮৬৭)

কিন্তু বাঙলা-সরকার মিস্ কার্পেণ্টারের কল্পিত ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেন। শীঘ্র ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগও ঘটিল।

ছাত্রী-সংখ্যা কমিয়া যাওয়াতে এবং অন্যান্য নানা কারণে ১০৬৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে বীটন-স্কুল-কমিটির মনে বিশ্বাস জন্মিল যে, বিদ্যালয়ের এ অবস্থায় এক বিশেষ অনুসন্ধানের প্রয়োজন। এই কারণে জুলাই মাসে কমিটির এক বিশেষ অধিবেশন হইল। অধিবেশনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ও প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীকে লইয়া এক সাব-কমিটি গঠিত হয়। অনুসন্ধানের ফল সাব-কমিটি একটি রিপোর্টে দাখিল করিলেন (২৪ সেপ্টেম্বর)। রিপোর্ট-পাঠে বীটন-স্কুল-কমিটি সিদ্ধান্ত করিলেন, যতদিন মিস্ পিগট অধ্যক্ষ থাকিবেন, ততদিন বিদ্যালয়ের উন্নতির আশা নাই। কমিটি এ-বিষয়ে বাঙলা-সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে বাধ্য হইলেন।

বাঙলা-সরকার মিস্ পিগটকে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর পদ হইতে সত্বর অপসারিত করিবার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু বীটন-স্কুল-কমিটিকে লিখিলেন:—

"ছোটলাটের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া কমিটি যেন অপর শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত না করেন। স্বর্গীয় বীটন তাঁহার বিদ্যালয়ের জন্য বাড়ীখানি দান করিয়া গিয়াছেন। রাজস্ব হইতেও বছরে বছরে বেশ মোটা টাকা সাহায্যার্থ দেওয়া হয়। ছোটলাট মনে করেন, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে বর্ত্তমান অবস্থায় যেরূপ করা হইতেছে, এই-সকল দানের এতদপেক্ষা অধিকতর সদ্ব্যবহার করা যাইতে পারে। স্কুলটি একটু ছোট করিয়া, তাহার সহিত শিক্ষয়িত্রীদের জন্য একটি নর্ম্মাল স্কুল যোগ করিয়া দিলে, ছোটলাটের বিশ্বাস, সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে।

"এইরূপ করাই যদি শেষে সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে সমস্ত অনুষ্ঠানটিকে শিক্ষাবিভাগের আরও ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে লইয়া যাওয়া বাঞ্ছনীয় হইবে। একজন ইংরেজের সভাপতিত্বে কমিটির দেশীয় সদস্যেরা এতদিন পর্য্যন্ত বীটন বিদ্যালয় পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু এই ভদ্রমহোদয়েরা বিভাগীয় স্কুল-ইন্‌স্পেক্টারের সহযোগিতায় পরামর্শ-সভার সভ্যরূপে কাজ করিতে রাজি আছেন কি না, ছোটলাট জানিতে চান।" (১৮৬৮, ৩রা মার্চ্চ) *

বীটন-স্কুল-কমিটি এই সর্ত্তে বিদ্যালয় পরিচালনা করিতে অস্বীকৃত হইলেন। *

ব্যয় সংক্ষেপ করা হইবে, কার্য্যকারিতাও বাড়িবে, এইরূপ প্রয়োজন-সাধনার্থ সরকার প্রস্তাবিত নর্ম্মাল স্কুল ও বীটন-স্কুল একই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগ করিয়া দিলেন। মাসিক তিন শত টাকা বেতনে তিন বৎসরের জন্য মিসেস্ Brietzche নামে এক মহিলা বীটন ও নর্ম্মাল স্কুলের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন। বীটন-স্কুল-কমিটি ভাঙিয়া গেল। ডিরেক্টর-অফ-পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শন্‌ কমিটির সদস্যদের—বিশেষভাবে কমিটির সুদক্ষ সম্পাদক বিদ্যাসাগরকে—তাঁহাদের অতীত সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ দিলেন।

বিদ্যাসাগর এই নূতন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ আশা পোষণ করিতেন না সত্য, কিন্তু চাহিবামাত্র কর্ত্তৃপক্ষকে সাহায্য করিতে ত্রুটি করিতেন না। ১৮৬৯, ২রা মার্চ্চ, স্কুল-ইনস্পেক্টার উড্রো সাহেব ডিরেক্টরকে লিখিতেছেন,—

"বীটন স্কুল-সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২৩শে [ফেব্রুয়ারী] আমার হাতে দিয়াছেন। তিনি বহুক্ষণ ধরিয়া আমার সহিত বিদ্যালয় গৃহে এবং সংলগ্ন জমিতে বেড়াইলেন এবং ইহা হিন্দুমহিলাদের থাকিবার পক্ষে উপযোগী করিতে হইলে কি কি দরকার, সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন।

"যতদিন কলিকাতায় থাকিবে, ততদিন নর্ম্মাল স্কুলটি যে বিশেষ ফললাভ করিবে, এমন আশা তিনি করেন না। কিন্তু তবুও নর্ম্মাল স্কুল-প্রতিষ্ঠায় তিনি আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।"

বিদ্যাসাগরের কথাই ফলিল। তিন বৎসর যাইতে-না-যাইতেই পরবর্ত্তী ছোটলাট সার জর্জ্জ ক্যাম্পবেল বীটন বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট নর্ম্মাল স্কুলটি তুলিয়া দিবার আদেশ দিলেন। এইরূপ অনুষ্ঠানকে সফল করিতে গেলে দেশের লোকের ধরণ ও সংস্কার অনুসারে যে তাহা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত করিতে হইবে, এ-বিষয়ে তাঁহার নিশ্চিত ধারণা হইয়াছিল।* ডিরেক্টরের নিকট নিম্নলিখিত আদেশ-পত্র প্রেরিত হইল :—

"সাধারণভাবে সমস্ত বিষয়টি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বেশ বোঝা যায়, তিন বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করিবার পরও ফিমেল নর্ম্মাল স্কুলটিকে সফল করিতে পারা যায় নাই। এ-সব বিষয়ে যাহারা বিশেষ অভিজ্ঞ, সেই-সব মহিলার সহিত ছোটলাট প্রায় একমত। তাঁহাদের মত এই, নারীদের ধর্ম্মসংশ্রবহীন শিক্ষা ও সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা দেওয়া বড়ই বিপদজনক। অতএব ১৮৭২, ৩১শে জানুয়ারী তারিখের পর ফিমেল নর্ম্মাল স্কুলটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হোক।" †

উপরের লেখা হইতে বুঝা যাইবে, বাঙলা দেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে বিদ্যাসাগরের কি উৎসাহ ও আগ্রহই না ছিল। ১৮৯১, জুলাই মাসে তাঁহার মৃত্যু হইলে, এক হিন্দু মহিলা-সঙ্ঘ বিদ্যাসাগরের স্মৃতিরক্ষার এইরূপ ব্যবস্থা করেন :—

"বীটন বিদ্যালয়ের কমিটি জানাইতেছেন, কলিকাতাস্থ মহিলা-অনুষ্ঠিত বিদ্যাসাগর-স্মৃতিরক্ষা-কমিটির সম্পাদকের নিকট হইতে ১,৬৭০৲ টাকা সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। কোন হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়া, প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক হইলে, পরবর্ত্তী দুই বৎসরের জন্য এই টাকার আয় হইতে তাহাকে একটি বৃত্তি দেওয়া হইবে।"

---

* *Ibid.*, July 1868, No. A 68-70.

* "মিস কার্পেণ্টারের অর্থে, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, বাবু কেশবচন্দ্র সেন এক প্রতিদ্বন্দী বিদ্যালয় স্থাপন করেন।...মিস কার্পেণ্টার ইহার পরিচালনে তাঁহার দেওয়া টাকা ব্যয় করিতে দিতে অস্বীকার করিয়াছেন, এবং তাঁহারই বিশেষ আপত্তিতে বাবু কেশবচন্দ্র সেন এই স্কুল উঠাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন।"—D. P. I. to Bengal Govt., dated 27 Dec. 1871. *Ed. Con.* Jany. 1872, Nos. A 30-36.

† *Education Con.* April 1872, Ncs. A 54-58.

আরঙ্গজেব

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

হে সম্রাট্, ক্রূর তোমা যে বলে বলুক,
আমি জানি তুমি সদাশয় ;
হিন্দুরে তুমিই শুধু হিন্দু রাখিয়াছ—
একেবারে মিথ্যা কথা নয়।
প্রীতির প্রলেপ নাই, প্রেমের বন্ধন,
পাত নাই মমতার ফাঁদ,
রচেছ জিজিয়া দিয়া দু'জাতির মাঝে
পার্থক্যের কি দুর্জ্জয় বাঁধ !
হিন্দুরে বলেছ তুমি, যত চেষ্টা কর—
হিন্দু বই আর কিছু নও ;
মুসলমান মুসলমান তুমি অনুক্ষণ
সতর্ক ও সুসজ্জিত রও।
পূর্ব্ব সে পূর্ব্বই রবে, পশ্চিম পশ্চিম ;
শুনিবে না, মানিবে না টান,
কোন্ সোহাগায় তা'রা মিলিতে যে পারে—
তুমি তার রাখনি সন্ধান।
বয়েছ ধর্ম্মের নামে উগ্র বর্ব্বরতা
অসংখ্য মন্দির চূর্ণ করি,
ভারতের অধীশ্বর তোমারে কি সাজে
অতীতের সে মামুদগিরি !
সেচিয়া মারিতে তুমি রূপ পারাবার
টাঙ্গাইলে হিংসা দুণী তব
বুঝিলেনা হে পণ্ডিত হে শাহানশাহা
গোবিন্দের মূর্ত্তি নব নব।

মুহ্যমান হিন্দুস্থানে প্রাণের সঞ্চার,
পুনর্ব্বার শক্তির স্পন্দন,
তুমিই করিলে বীর, ধন্য জাঁহাপনা,
অভিশাপ হলো যে খণ্ডন।
প্রেমহীন ধর্ম্মরাজ্য গড়িবারে গিয়া
হে কুশলী অতি-ব্যস্ততায়,
অখণ্ড এ ভারতের মহা সর্ব্বনাশ
করিয়াছ স্বকরে স্বেচ্ছায়।
স্ফটিকের গুম্ভ ভাবি নির্জ্জীব অসাড়
বারম্বার করি পদাঘাত,
জাগাইলে নরসিংহে মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর
হে গর্ব্বিত ওহে দিল্লীনাথ।
জাতি শমীকাষ্ঠ ঘষি জ্বালালে আগুন
খেয়ালের রোশ্‌নাই খাসা,
পুড়িল সমস্ত রাজ্য, ছত্র, সিংহাসন,
মোগলের ভরসা ও আশা।
আলাদীন দীপ সম সাম্য মৈত্রী ন্যায়,—
করিল যে রাজ্য সংস্থাপন
সে যে মিথ্যা, আরব্যের রম্য উপন্যাস
তুমিই তা বুঝালে রাজন্।
প্রলয়ের ঝঞ্ঝা তুমি, আদিত্য তেজের,
হে তীক্ষ্ণধী সংযমী মস্‌লিম্,
হে ধ্বংসের অগ্রদূত প্রতাপী বাদশাহ,
দীন কবি করিছে তস্‌লীম।

শৃঙ্খল

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

বিবাহের মন্ত্র ওদের হৃদয়-দুটীকে এক করতে পারেনি ; স্বামী-স্ত্রী দু'জনের মধ্যে অনেকখানি তফাৎ রয়ে গেছে।

অনাথ পসার-প্রতিপত্তিশালী উকীল ; বাপও যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চয় করে গিছলেন ; সুতরাং অর্থের অসাচ্ছল্য ছিল না। কিন্তু অপর পক্ষের কাছে ঐ জিনিষটা বোধ করি একেবারেই অপ্রয়োজনীয় ছিল।

রেবা লেখাপড়া-জানা মেয়ে। 'এ্যাল্‌জেব্রার' ক্লাসে সে বরাবর গরহাজির হয়েছে, আর ঠিক তেমনি নিয়মিত রূপে প্রথম হয়ে এসেছে ইংরিজী আর বাঙ্গলা সাহিত্যে। সেই শিশু বয়স থেকেই সে সাত-সমুদ্র-তের-নদী-পারের অজানা এক উদার শঠের স্বপ্ন দেখেছে, শেলী-ব্রাউনিঙের কবিতার পাতায় লুকিয়ে লুকিয়ে চোখের জল ফেলেছে ; আর নিজের দেহ-মন গড়ে তুলেছে ঠিক কাব্য-কাহিনীর সুকুমার নায়িকার মত করেই।

কিন্তু, এই স্বপ্ন, এই কাব্য হঠাৎ একদিন ভেঙ্গে পড়ল। সানাই-বাঁশীর চীৎকার, নানা মানুষের ভীড়ের ভেতর সেদিন যে লোকটীর সঙ্গে তার শুভ-দৃষ্টির বিনিময় হয়েছিল, সে ব্যক্তি অনাথ এবং তার মধ্যে কাব্য-লোকের কোনো ইঙ্গিত পর্য্যন্ত ছিল না।

রেবার অন্তর-লোকে একটী বিচিত্র স্বপ্ন-পুরী গড়ে উঠেছিল তার অজ্ঞাতে,—অনেক দিন আগে। সেই পুরীর মহলে-মহলে দুনিয়ার যত বিচিত্র নারী-পুরুষের ভীড়। তাদের হাসি অদ্ভুত, কান্নাও অদ্ভুত। কিন্তু যাকে সে জীবনের সাথী রূপে পেল, তাকে তাদের কোনো একটীর স্থানেও বসান গেল না। রেবার মনোলোকে সে গেল বাতিল হয়ে। কিন্তু, কারণ ছিল আরও।

রেবা অনাথের দ্বিতীয়পক্ষ এবং শুধু তাই নয়, অনাথের সদ্যঃ-মৃত প্রথমপক্ষের একটী শিশু-সন্তানের লালন-পালনের ভার পর্য্যন্ত এসে পড়ল তারই ঘাড়ে। কাব্য-লোকের পরের জায়গাটাই যে বিবাহ এবং সপত্নী-পুত্রের পরিচর্য্যা করা, এ কথা রেবার জানা ছিল না ; এবং এর জন্যে প্রস্তুত হ'বার সময়টুকুও সে পায়নি।

যে ঘরে ওদের কুসুম-শয্যা পাতা হয়েছিল, তার চারিপাশে ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল প্রথমপক্ষের বাঁধানো ছবির রাশ! রেবা ব্যাপারটাকে প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করতে পারেনি। এটা যে তার নারীত্বকে ব্যঙ্গ করবার একটা উপলক্ষ মাত্র তা' বোঝবার জন্যে তাকে বিস্তর পরিশ্রম করতে হয়নি।

সেই রাত্রেই সে অনাথকে জিজ্ঞাসা করেছিল, যে মানুষটী চলেই গেল, তাকে এমনি করে আট্‌কে রাখবার মানে কি?

ফুল-শয্যার রাত্রে, হঠাৎ এমন বিশ্রী ভাবে আক্রান্ত হ'বার প্রত্যাশা অনাথের ছিল না। আজকের এই কুসুমাস্তৃত শুভ্র শয্যায় শুয়ে তার কেবল মনে আসছিল আর একটি এমনি ফুল-শয্যার রাত্রি! সে দিন ছিল নূতন প্রাণ, নূতন আশঙ্কা, নূতন ভয়। আজ যেন সব পুরোনো, ফুরিয়ে যাওয়া, কৃত্রিম।

গোপনে ওর চোখে হয় ত জলই এসেছিল,—ঠিক সেই সময়, সেই স্মৃতিতেই রেবা করলে আঘাত। অনাথ বিগড়ে গেল। নারী-স্বাধীনতার সে ছিল একান্ত বিরোধী। হাকিমের সামনে 'কেস প্লীড' করতে-করতেও সে এ' সম্বন্ধে দু'চার কথা বলে বসত।

অনাথ উঠে বসল। বললে, এ তোমার অনধিকার-চর্চ্চা,—বুঝলে?

রেবা বললে, উঁহু। বুঝিয়ে দাও। তুমি ত' উকীল মানুষ, আশা করি নিজের কেস ভাল করেই 'প্লীড' করবে!

—তুমি কি ইংরিজী জান না কি!—চমকে উঠে অনাথ শুধোয়!—আমি ওটা ভালবাসি না।

রেবা বলে, আমি বাসি।—তুমি না পছন্দ করলেও, আমার তাতে কিছুমাত্র ব্যাঘাত হ'বে না জেনো।

এমনি করেই কেটেছিল রেবার অনেক দিনের স্বপ্ন-বোনা ফুল-শয্যার রাত। ওই একটী দিনেই ওরা পরস্পরকে এমনি অসংশয়ে চিনে নিয়েছিল যে, সেই দিন থেকে আর একটীবারের জন্যেও কেউ কা'রো নৈকট্য প্রার্থনা করেনি।

রেবা মাটীতে কম্বল বিছিয়ে শোবার ব্যবস্থা করলে, অনাথ বাধা দিলে না।

রেবা বলে, এ মাসে কি কি নতুন বই বেরুল, দোকানে খোঁজ নিয়ে এনে দিও।

অনাথ উত্তর দেয়, আমার শ্বশুরের যে বইয়ের দোকান নেই তা ত' জানি। ও সব হ'বে না।

রেবার চোখ দুটো হঠাৎ জ্বলে ওঠে, আবার হঠাৎ নিভে যায়। চোখের জল চেপে জিজ্ঞাসা করে, সমস্ত দু'পুরটা আমি কি করব?

অনাথ বলে, নভেল পড়া ছাড়া আর কাজ নেই না কি? খোকাকে খেলা দেবে, দুধ খাওয়াবে, কেঁথা সেলাই করবে··

এমনি অনেক কাজের ফর্দ্দ চোখের সামনে মেলে দিয়ে অনাথ কোর্টে বেরিয়ে যায়।

ছ'মাসের ছেলে,—মোম দিয়ে গড়া যেন! দোলনার বুকে পড়ে অসংযত হাত-পা মেলে খেলা করে। অসীম কৌতূহল-ভরা বোবা দুটী চোখ দিয়ে এই বহুকালের পুরানো, জরাজীর্ণ পৃথিবীর প্রতি চেয়ে চেয়ে দেখে!

রেবা এই একান্ত অসহায় ও মাতৃহীন শিশুটীকে সমস্ত বুক দিয়ে ঘিরে ধরল। বিশ বছর বয়স অবধি নিজের নিঃসঙ্গ যৌবনের বোঝা বয়ে সে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল; আজ সাথী জুটে গেল। তার পর থেকে ওই ছোট্ট শিশুটীকে নিয়েই তার দিন কাটতে সুরু হ'ল। কোথায় রইল চির-বিরহিণী শকুন্তলা-পত্রলেখার ব্যথা, কোথায় গেল কীটস্-রসেটীর কবিতা!

দিনের মধ্যে পাঁচবার সে খোকাকে পাঁচ রকম সাজে সাজায়, তার গোলাপ-পাতার মত কচি দুটি ঠোঁটে দিনের মধ্যে হাজারবার চুমু দেয়; উপর-ঝুঁটী করে ছেলের চুল বেঁধে দেয়, চোখে আঁকে কাজল, কপালে দেয় টিপ্! · ···

এমনি করে মাস-পাঁচ-ছয় নিরুপদ্রবেই কেটে যায়। মা ও ছেলের এই নিরবচ্ছিন্ন মিলনের মাঝখানে অনাথ বেচারার এতটুকু ঠাঁই মেলে না! তা'র নিষ্ফল কামনার মধু পচে পচে' মদ হয়ে দাঁড়ায়!

শীতের প্রভাত। মধুর রৌদ্রে পিঠ দিয়ে রেবা তখন ছেলে নিয়ে ছাতের উপর। হঠাৎ সেখানে অনাথ এসে হাজির! এটা তার আসবার সময় নয়,—মক্কেল আর নথি-পত্র নিয়েই ওর ব্যস্ত থাকা উচিত ছিল, কিন্তু আজ একেবারে ব্যতিক্রম!

অনাথ বললে, এটা আমি পছন্দ করিনে।

রেবা বললে, তুমি আমার কোন্‌টাই পছন্দ করো! কিন্তু 'এটা' যে 'কোন্‌টা' সেটুকু বুঝিয়ে বলা উচিত।

—এই খোলা ছাদের উপর পিঠ খুলে বসে থাকা।

রেবা বললে, কেউ আমায় দেখবার জন্যে দাঁড়িয়ে নেই। আর, যদিই বা থাকত, তাহ'লে নিজের আব্রু রক্ষা করবার জন্যে আমি তোমায় ডাকতে যেতাম না।

অনাথ আগুন হয়ে উঠল। বললে, এ' বাড়ীতে এ'সব চলবে না। এ কথা আজ তোমায় জানিয়ে দিয়ে গেলাম।

রেবা বলতে যাচ্ছিল, বেশ, এ' বাড়ীতে যদি ঠাঁই না হয়, অন্য যেখানে পারি যাব।·· হঠাৎ ওর চোখ পড়ে গেল অনুত্তপ্ত প্রভাত-রৌদ্রে সুপ্ত শিশুর মুখের ওপর। হঠাৎ যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। বললে, বেশ, নেমে যাচ্চি। তুমি তোমার কাজ দেখগে।

অসন্তোষের আগুন ধীরে ধীরে দুজনকেই খাক্ করছিল, হঠাৎ একটা দমকা বাতাসে সেটা দ্বিগুণ হয়ে উঠল।

উকীল তখন আদালতে। নিস্তব্ধ দু'পহরে খোকাকে পাশে নিয়ে রেবা কি একটা বইয়ের পাতায় মন দেবার চেষ্টা করছিল, কেবল খোকার হাত পা নাড়ার দৌরাত্ম্যে কিছুতেই মন স্থির করা সম্ভব হ'চ্ছিল না! এমন সময় ঝী এসে জানালে একজন বাবু তার সঙ্গে দেখা করতে এসেচে। রেবা মুস্কিলে পড়ল। বাড়ীতে পুরুষের মধ্যে অনাথই একা, সেও এখন আপিসে,····· এমন সময় ·····

রেবা বেশীক্ষণ ভাবলে না। তার ভিতরকার কলেজে-পড়া নারী হঠাৎ মাথা উঁচু করে দাঁড়াল।···কেন, দোষ কি এতে? বললে, কে এসেছে ডেকে আনগে ঝী।

যে এল সে অমিয়! এদেরি বাড়ীর ভাড়াটিয়া তার বাপ। ছেলেবেলা থেকে এরা দু'জনে একসঙ্গে ছুটোছুটি করেচে, একসঙ্গে পড়া তৈরী করেচে, এক গাড়ী চড়ে যে যা'র ইস্কুলে গেছে। কিন্তু অমিয়কে সে একেবারেই প্রত্যাশা করেনি। তারই বা হঠাৎ দেখা করবার কি প্রয়োজন হ'ল তাও সে অনুমান করতে পারলে না।

বললে, এসো। কিন্তু, এমন হঠাৎ যে!

অমিয় একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। বললে, আমরা এমনি হঠাৎই আসি রেবা,—আমাদের দেখা পাবার জন্যে কেউ নেমন্তন্ন করে পাঠায় না।

রেবা বললে, সত্যি, আমার ভারি অন্যায়! এবার থেকে তোমার রোজ নেমন্তন্ন রইল এখানে!

বলেই সে মনে মনে চমকে উঠল। অনাথ যদি আপত্তি করে? তখুনি আবার মনে হ'ল, এতে আপত্তি করবার আছে কি?

অমিয় বললে, রোজ রোজ নেমন্তন্ন খেলে শরীর খারাপ ত' হয়ই, তা ছাড়া জিনিষটার কোনো মানেই থাকে না! সুতরাং ক্বচিৎ কখনো আসাই ভাল। তাতে খাতির-যত্নের পরিমাণটাও থাকে প্রচুর এবং আহারও হয় গুরুতর! কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার ছিল রেবা, তুমি কি আমাদের একেবারে ভুলে গেলে?

রেবা উত্তর দিতে পারলে না। অপরাধীর মত মাথা হেঁট করে, খোকার দিকে চেয়ে রইল।

অমিয় বললে, তোমার ওপর আজ আমার কিছুমাত্র অধিকার নেই, তা আমি জানি। কিন্তু একদিন তোমার অমিয়দাকে না পেলে যে একদণ্ড চলত না—এ কথা কিছুতেই ভুলতে পারলাম না। তোমার কাছ থেকে কারণে-অকারণে আঘাতও বড় কম আসে নি, কিন্তু তার সবটুকুই যে কেমন করে সুধা হয়ে উঠল, তারও বিচার করবার সাহস আমার কোনো দিন হয়নি; কিন্তু মানুষকে ভোলা কি এতই সহজ রেবা?

রেবা মনে মনে কেঁপে উঠল!···সত্যিই, কি করে সে এই মানুষটাকে একেবারে ভুলে গেল! কে ভোলালে? অনাথ নয়, অনাথ নয়! ··তার কোলের এই ছোট্ট অবোলা শিশু!···রেবা চোখ মেলে অমিয়র মুখের দিকে তাকাতে পারে না! তার গায়ের নেবু-রঙের পাঞ্জাবী আর হাল্কা গোলাপী চাদরখানা মনে পড়তেই ওর ভয় হয় · ওতে যেন আগুন লেগে আছে!

অমিয় কতক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তার পর বললে, আজ কথাও কি হঠাৎ ফুরিয়ে গেল রেবা!

রেবা কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। বিস্মৃত কৈশোর ও প্রথম যৌবনের দিন-রাত্রিগুলো হঠাৎ তার মনের মন্দিরে ভীড় করে দাঁড়ায়!

কত কোজাগরী পূর্ণিমায় ওরা একসঙ্গে রাত জেগেছে; ফাগুনের অপরাহ্ণ-বেলায় কতদিন ওরা একসঙ্গে বসে কবিতা পড়েচে......কোথায় গেলো সেই দিন?......কে তাদের চুরি করে নিলে?

কখন ওর চোখের কোলে জল এসেছিল ও তা টেরই পায়নি। হঠাৎ একফোঁটা জল ঝরে পড়ল খোকার কপালে, খোকা চমকে উঠল! রেবারও যেন চমক ভাঙ্গল। কার কথা ভাবচে সে? এই ছোট্ট অবোধ শিশুও যদি সে কথা জানতে পারে, তাহ'লে এও ঘৃণায় ছি ছি করে উঠবে!

চোখের জল মুছে রেবা উঠে দাঁড়াল। বললে, অমিয়দা, তুমি ভুল করে কি ভেবেচো, তা তুমিই জানো·· ···কিন্তু সে সব কথা আর মনে রেখ না।

অমিয় চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। বললে, আমি কিছু মনে রাখিনি। শুধু তোমায় জানাতে এসেছিলুম, এমন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর মিথ্যা অভিনয় আর কেউ কখনো করেনি—এই মাত্র! নইলে, আমি বেশ জানি যে তার সবটুকুই ফাঁকি, ভুয়ো!

অমিয় চলে গেল। রেবা খোকাকে বুকে চেপে নিঃশব্দে অনেক কান্না কাঁদলে। অমিয় তাকে ভালবাসে, আর সে ভালবাসা যে কতখানি, কত উগ্র······তা' রেবার চেয়ে কে বেশী জানে?

কিন্তু·········

সন্ধ্যার পূর্ব্বে অনাথ আদালত থেকে ফিরে এল। মেয়ে মানুষ,—বিশেষতঃ স্ত্রীকে নিজের শাসনের মধ্যে আনবার মন্ত্র তার রীতিমত জানা ছিল। সেই মত বাড়ী ফিরেই সে ঝীকে নিয়ে প্রশ্ন করতে বসল।

বললে, আজ কেউ বাড়ীতে দেখা করতে এসেছিল—? এ' প্রশ্ন সে নিত্য করে ঝীকে—আদালতে যাওয়ার মত কোন দিন ভুল হয় না। কিন্তু যে উত্তরটা আজ সে ঝীয়ের মুখে শুনতে পেলে, তাতে তা'র উৎসাহ বিশেষ ভাবে বেড়ে গেল।

জিজ্ঞাসা করলে, ছোকরা বাবুটী তোর বৌ-দি'র কে হয় শুনেচিস্?

এ কথা ঝী শোনেনি। কাজেই অনাথকে উপরে উঠে এর তল্লাস নিতে হ'ল। রেবার সামনে দাঁড়িয়ে শুধোলে, তোমার বাপের বাড়ী থেকে কেউ দেখা করতে এসেছিলেন না কি?

রেবা বলল, না। কিন্তু, কিন্তু, মেয়েমানুষের পৃথিবী কি শুধু বাপের বাড়ী আর শ্বশুরবাড়ী নিয়েই—? আর কোথাও থেকে কেউ আসতে পারে না?

অনাথ বিব্রত হ'ল। বদমেজাজী হাকিমের সামনেও সে এতটা বিপদ বোধ করে না। বললে, না, তাই জিগ্গেস করছিলাম—

——বেশ ত', কিন্তু অতটা সঙ্কোচ করতে গেলে কেন? তোমাদের ও-রোগটা না থাকাই ভাল।

অনাথ আদৌ খুসী হয়ে ..ওঠেনি। বললে, আমাদের ভাল-মন্দ সম্বন্ধে আমি তোমার উপদেশ নিতে ইচ্ছে করিনে। যে লোকটী আজ নির্জ্জন দুপুরবেলায় তোমার গোষ্ঠে বাঁশী বাজাতে এসেছিলেন তাঁর নিবাস—?

এই কলকাতায়। কিন্তু নিবাসের দরকার কি? অনধিকার প্রবেশের দায় চাপাবে নাকি?

অনাথ একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। বললে, আবশ্যক হ'লে তাতেও কুণ্ঠিত হ'ব না। যাক্, সে পরের কথা। তাঁর নাম— ? তোমার সঙ্গে তাঁর কি সম্বন্ধ?

—তাঁর নামে তোমার দরকার নেই। সম্বন্ধটা শুনতে পারো, তিনি আমার বন্ধু। আমার কাছে এ' ছাড়া তাঁর অন্য পরিচয় নেই।

অনাথের পায়ের তলায় পৃথিবীটা হঠাৎ ঘুরতে সুরু করেছিল; মেয়েমানুষের বন্ধু!

বললে, ও-সব আমি ঢের আগেই অনুমান করেছিলাম। নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি না হ'লে কেউ তোমার মত ছোটলোকের ঘরের মেয়ে বিয়ে করতে যেত না।

রেবা বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল; স্বামীকে সে ভালবাসেনি,—এ কথা সত্যি। কিন্তু, তাই বলে, তিনি যে এত ছোট, তা' সে স্বপ্নেও ভাবে নি।

বললে, ছিঃ, তুমি না লেখাপড়া শিখেছ? তোমাদেরি হাতে না মানুষের ন্যায়-অন্যায় বিচারের ভার?...

রেবার চোখে জল আসছিল। সেই দুর্ব্বার কান্নার স্রোত প্রাণপণে নিরুদ্ধ করে বললে, আমি তোমার স্ত্রী; আমার ওপর তুমি যা খুসী করতে পারো। কিন্তু, মানুষে-মানুষে শুধু কি দেহের সম্পর্ক? তার চেয়ে বড় কিছু নেই?

অনাথ হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল। বাঃ, চমৎকার, খাসা! নভেলের নায়িকার মত বেশ বক্তৃতা করতে শিখেছ!—ওয়াণ্ডারফুল!—কিন্তু, এমন বক্তৃতা আমি ঢের শুনেচি, অন্য সম্পর্ক যে কী তাও আমার অজানা নেই। তবে, এ বাড়ীতে ওসব নটী-পনা চলবে না। এইটুকু তোমায় জানিয়ে রাখলাম।

সে রাত্রি রেবার কি করে কেটেছিল, তা সে একা জানে। ভূমি-শয্যায় দীর্ঘ-রাত্রি তার জেগে কেটে গেল। খোলা জানালার বাইরে তারা-চিহ্নিত কালো আকাশের দিকে চেয়ে বারবার মনে হ'ল, কি দরকার এই আত্ম-অপমানের বোঝা বয়ে বেড়ানোর? এখানে হৃদয়ের দাম নেই, মানুষ এ সংসারে খেলনার চেয়ে বড় নয়; পবিত্রতা এখানে মিছে কথা, প্রবঞ্চনা! অথচ এই সংসারের মধ্যেই মাথা গুঁজে তার অবশিষ্ট জীবন কাটবে! কিন্তু এই নাগপাশ থেকে মুক্তি পাবার উপায় কি?

নির্দ্ধারিত মরণের জন্য দিনের পর দিন এই জীবনের ডালা সাজিয়ে রাখা। তবু, এই জীবনের জন্যই, এত দুঃখ, এত লাঞ্ছনা!—কি দরকার তার? এই জীবনের শেষ আয়োজন কি সে নিজে করতে পারে না—? কা'র জন্যে তা'র বেঁচে থাকা!

তবু বাঁচতেই হ'ল। রেবার বঞ্চিত মাতৃত্ব তার কাণের কাছে মিনতি জানিয়ে গেল, একজনের জন্য তার বাঁচা চাই। সে অনাথ নয়, অমিয় নয়, আর কেউ।

পরদিন আদালতে যাবার আগে অনাথ বললে, আমি ফিরে না আসা অবধি তুমি তোমার ঘরের বাইরে বেরুবে না। নীচের দরজাও বন্ধ থাকবে,—বুঝলে?

রেবা উত্তর দিলে না। সে প্রবৃত্তি তার নেই।

অনাথ আবার বললে, ঝীকে বলে গেলাম, সে তোমার গতিবিধির উপর নজর রাখবে। আমার হুকুমের ব্যতিক্রম হ'লে, তোমায় অন্য আশ্রয় দেখতে হ'বে।

অনাথ চলে গেল। প্রতিবাদ করে লাভ নেই বলেই রেবা একটী কথা বলেনি। প্রকাণ্ড বাড়ীর একটী মাত্র ছোট্ট ঘরের মধ্যে তার সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়ে গেল—ভাবতেই তার ভয় হয়। কিন্তু ও-জিনিষটা এ বাড়ীতে শুধু অনাবশ্যকই নয়, আতিশয্যও বটে। তাই মুখ বুজেই রইল সে।

দিন যায়,—বৈচিত্র্যহীন, উৎসাহহীন! নতুন কিছু করবার নেই, ভাববারও না! অমিয় ঝড়ের মত একটি দিন,

একটীবার এসেই গা ঢাকা দিয়েছে। রেবার পৃথিবী হঠাৎ ছোট হয়ে গেছে, মনে হয় নিঃশ্বাস ফেলবারও জো' নেই !

কেবল এই একটানা একঘেয়ে জীবন-প্রবাহে মোহ আনে, খোকা। রেবার বঞ্চিত নারীত্ব একমাত্র তাকেই আশ্রয় করে তৃপ্তি পেতে চায়। ছোট্ট শিশু ক্রমে পুষ্ট হয়ে ওঠে। রেবা ভেবেই পায় না, এরি মধ্যে ও এতবড়টী হ'ল কেমন করে ! কিন্তু, মন তার আনন্দে থৈ থৈ করে ওঠে। খোকা চলতে গিয়ে পড়ে যায়। রেবা হাসিতে লুটিয়ে পড়ে তাকে বুকে টেনে নেয়। কখনো, অন্নপ্রাশনের ছোট্ট চেলিখানি খোকার কোমরে জড়িয়ে দিয়ে, হাততালি দিয়ে গাইতে সুরু করে,—

তোমার কটী-তটের ধটি কে দিল রাঙিয়া !
বিহান-বেলা আঙিনা তলে,
এসেছ তুমি কি খেলা ছলে,
চরণ দুটী চলিতে ছুটী পড়িছে ভাঙ্গিয়া !

এমনি করে রেবার দিন কাটে। স্নেহের উত্তাপে ·· অন্তরের বাষ্প তার জল হয়ে আসে।

সেদিন দুপুরের পর রেবা তখন শোবার উদ্যোগ করছিল। এমন সময় বাইরে থেকে অমিয়র গলা শোনা গেল। ঝী এসে জিগগেস করলে, দোর খুলে দেব বৌদিদি—?

রেবা যেন হঠাৎ ক্ষেপে গেল। বললে, ঢং করিসনে পোড়ারমুখী, বাবুর হুকুম মনে নেই না কি ?

ঝী হেসে সরে গেল। নীচে থেকে অমিয়র গলা শোনা যাচ্ছে—রেবা ! রেবা !

রেবার কাণে সে ব্যাকুল কণ্ঠস্বর আগুনের গোলার মত আঘাত করতে লাগল, তবু সে বসে রইল নিঃশব্দে, পাষাণের মত।

অমিয় বাইরে থেকে চীৎকার করে বললে, আজ আমি কোনো প্রার্থনা নিয়ে আসিনি রেবা ; এসেছিলাম দুটী আহার করে যেতে। ভেবেছিলাম, এটুকুতে তুমি বঞ্চিত করবে না। আমাদের বাড়ীর সবাই গেছেন বিদেশে,— নইলে তাও আসতাম না !

রেবা আর ভাবতে পারে না। অমিয়র ক্ষুৎ-পীড়িত মুখখানি মনে পড়তেই তার নারী-হৃদয় ব্যথায় ভেঙ্গে পড়ে। নিজের ঘরে, নিজের সামনে বসিয়ে অমিয়-দাকে খাওয়াবার সাধ যে তার কতদিনের !

রেবা নিজে নেমে গেল, দুয়োর খুলে দিলে।

কিন্তু অমিয় নেই, শেষ কথা ক'টী বলেই সে চলে গেছে।

উপরে এসে রেবা অবসন্নের মত শুয়ে পড়ল। এতবড় মুহূর্ত্ত তার জীবনে বহুবার আসেনি ; কিন্তু এও গেল বৃথা হয়ে।

আদালত থেকে ফিরে অনাথ সব কথাই শুনতে পেলে। আষাঢ়-আকাশের মত মুখখানা গম্ভীর করে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলে, নীচে নেমেছিলে কেন ?

—কেন তা তুমি জানো। কিন্তু, একজন উপবাসী মানুষ তোমার দুয়োর থেকে সাড়া না পেয়ে ফিরে যাবে, তুমি বসে বসে দেখ্‌তে পারো—?

বেশ। কিন্তু, নীচে নামতে গেলে কেন ? বাড়ীতে ঝী ছিল না—?

ছিল,···তবে ··

জানি। কিন্তু, এই শেষবার। এ সুযোগ তুমি আর পাবে না। পরশু রবিবার ; সেদিন তোমার বাবাকে সকল কথাই জানিয়ে আসব। আর, এ কথাও বলে আসব, যে তোমার মত নষ্ট-চরিত্র মেয়ের স্থান এ' বাড়ীতে নেই।

রেবা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। এই বিশ্রী ব্যাপার নিয়ে স্বামীর সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ করবার উৎসাহ তা'র ছিল না।

পরদিন। অনাথ কোর্টে গেছে। রেবা বসে বসে ভাবছিল, কাল রবিবার। অনাথ যাবে তার বাপের কাছে এই কদর্য্য ও সর্ব্বৈব মিথ্যা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে। কিন্তু, তার পর ? তার ছোট ভাই বোন, তার বুড়ো বাবা এ কথা শুনে কি করবে ? কী ভাববে ? ···তার আগে কি এই গৃহের সম্বন্ধ সে নিজেই শেষ করে দিতে পারে না ?····· রেবা বসে বসে কত কথা ভাবলে। তার পর হঠাৎ উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরে অমিয়দাকে ডাকলে।

অমিয় তখন বাড়ীতেই ছিল,—মিনিট কুড়ি পরেই এ-বাড়ীতে এসে পৌছল।

তার দু'চোখে অপ্রত্যয় ও বিস্ময়ের ভাষা। জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপার কি রেবা ? তোমার দুয়োরে দাঁড়িয়ে যেদিন দু'মুঠো ভাতের জন্যে চীৎকার করে গিয়েছিলাম, সে দিন ত ঘরে বসেও সাড়া দাও নি। আজ এ কি ?

রেবার মুখে তখন অদ্ভুত হাসি। বললে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই আজ। সুযোগ দেবে—?

রেবার ভঙ্গিমায় অমিয় মনে মনে কেঁপে উঠ্‌ল। বললে, কিসের সুযোগ?

রেবা অল্পক্ষণ চুপ করে রইল। তার পর মাথা তুলে, প্রসারিত দুই চোখ অমিয়র মুখের ওপর রেখে বললে, একদিন তুমি রেবাকে কত কি দিতে চেয়েছিলে; আমি নিইনি। আজ আমি ভিক্ষা চাচ্ছি, তুমি দাও।

কি, বলো।

আমায় নিয়ে চলো।

সে কী! কোথায়?

যেখানে তুমি নিয়ে যাবে,—যেখানে তোমার খুসী। এ কয়েদখানা আর আমি বরদাস্ত করতে পারচি না, আমার নিঃশ্বাস আটকে আসচে। এখানে সব ভুয়ো, সব ফাঁকি। আমায় নিয়ে চলো, নিয়ে চলো।

অমিয় কতক্ষণ চুপ করে রইল। তার পর বললে, এ আমার কত বড় সৌভাগ্য তা শুধু আমিই জানি। কিন্তু, তুমি তো জানো রেবা, আজও আমি স্বাধীন হ'তে পারিনি। আজও আমি পিতামাতার মুখাপেক্ষী!—তোমায় স্থান দেব কোথায়—

রেবা এসে অমিয়র হাত ধরলে। বললে, দু'দিন পরে তোমার অবস্থা আমারই মত হ'বে তা জানো অমিয়দা? উনি গিয়ে বলবেন—তুমি আর আমি····· ছি, ছি!···সেই মিথ্যা কলঙ্ক তুমি সহ্য করতে পারবে—?

অমিয় চুপ করেই রইল। রেবা বললে, ঐ কলঙ্কের হাত থেকে আমাদের নিষ্কৃতি নেই। কিন্তু যদি নিষ্কৃতিই নেই, তবে ঐ কলঙ্ক সত্য হ'লেই বা ক্ষতি কি! এই পুরোনো পচা সমাজ, শিখুক যে আমরাও শোধ নিতে জানি।···কিন্তু, আর ভাবনা নয়। আজ শনিবার, এখুনি তিনি এসে পড়বেন। তার আগেই আমাদের যেতে হ'বে।

আর তোমার ছেলে?

ও ধাপ্পা, বুজরুকী। ওই দিয়ে ওরা চায় আমাদের পায়ে ফাঁস পরিয়ে চিরকালের মত পঙ্গু করে দিতে। কিন্তু ও বন্ধন আজ আমি ছিঁড়ে এসেচি। ও কার ছেলে? আমার সঙ্গে ওর কিসের সম্বন্ধ? কিন্তু সময় আর নেই, তৈরী হয়ে নাও।

অমিয় ট্যাক্সি ডেকে এনেচে। রেবা তার নিরুদ্দেশ-যাত্রার জন্য তৈরী। ঝী এসে বললে, কোথায় চললে বৌদি? রেবা যেন তৈরী হয়ে ছিল, বিন্দুমাত্র চিন্তা না করেই বললে,

বাবার বাড়াবাড়ি অসুখ,—তাই যাচ্চি।

কখন ফিরবে?

হয় ত আজ নয়, কিম্বা দু'চার দিন পরে···

ঝী হাত বাড়িয়ে রেবার পায়ের ধূলো নিলে। বললে, আহা, সব ভাল দেখেই যেন ফিরে এস।

হঠাৎ উপর থেকে খোকার কান্না শোনা গেল।—ঘুম ভেঙ্গে গেছে।

ঝী বিস্মিত হয়ে বললে, এ্যাঁ! খোকা বুঝি উপরে!—কী ভুলো মন তোমার বৌদি!···দাঁড়াও, দাঁড়াও—ও গাড়ীঅলা, আমি ছুট্টে খোকাকে নিয়ে আসচি—

রেবার বুকের মাঝখানে কে যেন জ্বলন্ত একখণ্ড লোহা চেপে ধরলে। সে চীৎকার করে উঠ্‌ল, ওরে, না, না···

কিন্তু ঝী তখন উপরে পৌঁছেচে। মুহূর্ত্ত পরেই সে ফিরে এল।

রেবা তার দিকে চেয়ে বললে, কে আনতে বললে ওকে? নিয়ে যা। আমরা এক্ষুনি ফিরে আসব।

খোকার কিন্তু এ'সবের প্রতি দৃষ্টি ছিল না। ঝীর কোল ছেড়ে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল রেবার বুকে! কচি দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলে তার গলা।

রেবা একবার সলজ্জ চোখে অমিয়র প্রতি চাইল। তার পর প্রসন্ন উদ্ভাসিত মুখে মাথা তুলে বললে, এই গাড়ীতেই তুমি বাড়ী ফিরে যাও অমিয় দা। তোমার অনেক সময় আজ মিছিমিছি নষ্ট করলাম। আমি নিজেকে বুঝতে পারিনি—আমায় ক্ষমা করো। এ বাড়ী ছেড়ে এক মুহূর্ত্ত কোথাও যাবার ক্ষমতা আমার নেই!

নিখিল-প্রবাহ

কয়েদী-বাহী খাঁচা—

সাধারণতঃ অপরাধীদের ধৃত করে কোথাও চালান দিতে হ'লে সঙ্গে রীতিমত পাহারার দরকার হয়। বন্দী-দল যদি সংখ্যায় বেশী হয়, পাহারাও সেই অনুপাতে বেড়ে যায়।

কয়েদী-বাহী খাঁচা

ঝঞ্ঝাট এড়াবার জন্যে ও-দেশে এক নূতন রকম কয়েদী-বাহী গাড়ী বা খাঁচার আমদানি হয়েছে। এতে দশ জন কয়েদীকে বিনা পাহারায় অনায়াসে স্থানান্তরিত করা যায়। গাড়ীখানি চালাবার জন্যে একটী মাত্র লোকের প্রয়োজন হয়। আর বাতাস এর পেট্রোলের কাজ করে।

অভিনব টাফিক ডাইরেক্টার—

গাড়ী-ঘোড়ার দৌরাত্ম্যে ট্রাফিক পুলিশকে পথের মধ্যে সময় সময় বিপদে পড়তে হয়। এই অসুবিধা দূর করবার উদ্দেশ্যে বার্লিনের প্রুশিয়ান পুলিশ এই নূতন বন্দোবস্ত
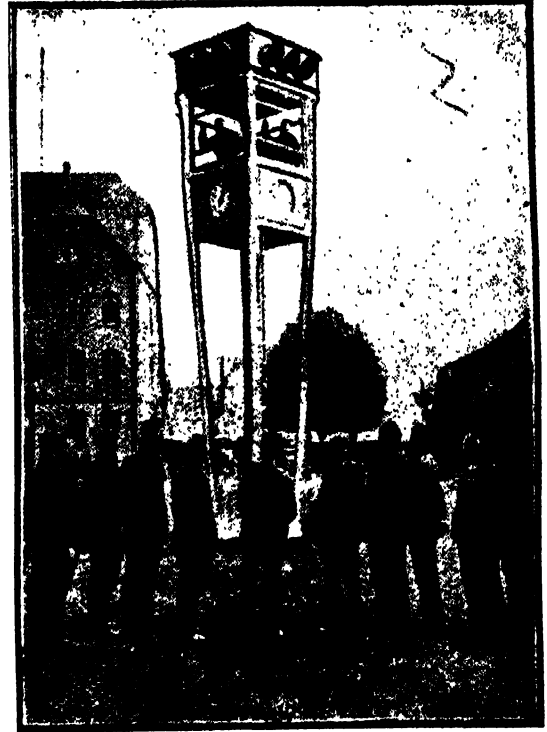
অভিনব ট্রাফিক ডাইরেক্টার

করেচে। এই মঞ্চের উপর হ'তে তারা নির্ব্বিঘ্নে গাড়ী-ঘোড়ার চলাচল নির্দ্দেশ করে।

মোটরে বৈচিত্র্য—

মোটর গাড়ী জিনিষটা আজ পুরানো হ'তে চলেছে। এবার বোধ হয় এরোপ্লেনের যুগ আসন্ন। বোধ করি তাই, মোটরে বৈচিত্র্য ও নূতনত্ব সৃষ্টি করবার জন্যে ও-দেশে ধুম পড়ে গেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে অলিম্পিয়ায় এক মোটর-প্রদর্শনী হয়ে গেল। তাতে দুটী সম্পূর্ণ বিস্ময়কর গাড়ীর আমদানি হয়েছিল। এদের একটীতে চালকের আসনের
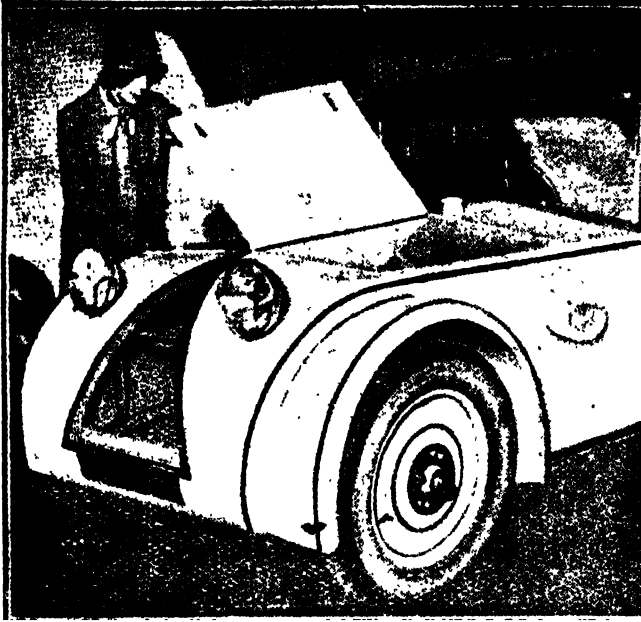
মোটরে বৈচিত্র্য

পাশে একটী হাতল আছে। সেটী ঘোরাবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর হুড্ বা মাথার আবরণখানি গুটিয়ে পিছনে গিয়ে পড়ে। অপরটীর সম্মুখভাগের আকার ও গঠন দেখলে সাধারণ গাড়ীর পিছনের অংশ বলে ভুল হয়।

মোটরে বৈচিত্র্য

মোটর-সজ্জা—

নীচের ছবিখানি দেখলে জাহাজ বলে ভুল হওয়া আশ্চর্য্য নয়। আসলে এটী মোটর গাড়ী। মাদ্রাজে মোটর সাজানোর এক প্রতিযোগিতায় এই গাড়ীখানি সজ্জা-কৌশলে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে।
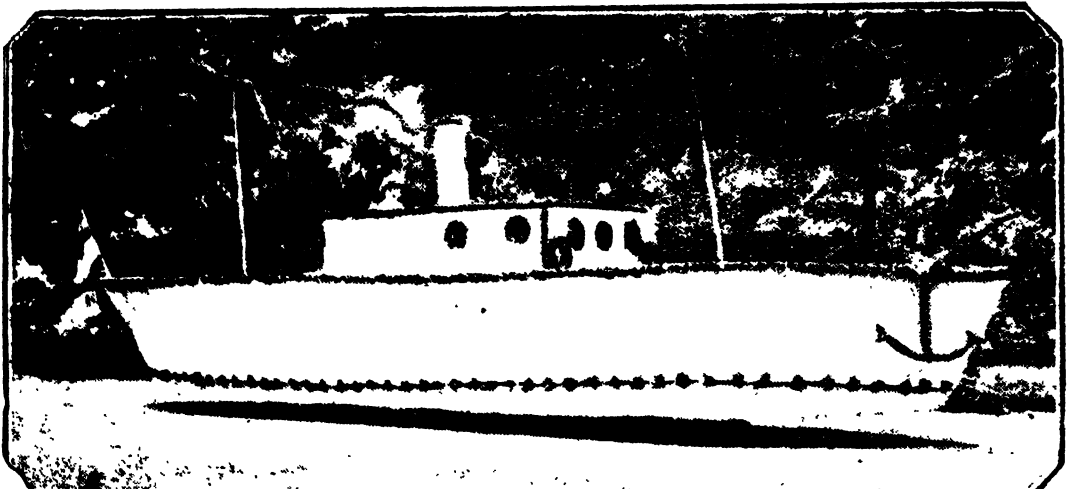
মোটর সজ্জা

খেলার মাঠে—

খেলার মাঠে—খেলোয়াড়দের যখন দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না, সেই সময় মাঝে মাঝে দু'একটা অপূর্ব্ব দৃশ্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এমনি হয়েছিল ও-দেশের এক মাঠে। আমরা তার ছবি দিলাম।

খেলার মাঠে

কুমারী এড্না রল্‌ফ—

ইয়োরোপের মেয়েরা কেবলমাত্র বিলাস ও সংসারের কাজ নিয়েই ব্যস্ত নেই। যাতে দৈহিক শক্তি ও সুষমার বিকাশ হয় সেদিকেও তাদের দৃষ্টি প্রখর। টেনিস, ব্যাডমিণ্টন ছাড়া, ঘোড়দৌড়, সন্তরণ প্রভৃতিতেও তাঁরা বারবার কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

কুমারী এডনা ও-দেশের সন্তরণকারিণীদের মধ্যে সুপরিচিতা। সম্প্রতি, সাতারের পূর্ব্বে, হাত ও পা দুটী একত্র করে তিনি এক নূতন ভঙ্গীমায় ঝাঁপ খেয়েছেন। আমরা তাঁর ছবি দিলাম।

কুমারী এড্না রল্‌ফ

পাঁউরুটী কাটা যন্ত্র—

ছুরি দিয়ে পাঁউরুটী কাটার কথাই আমরা জানি। সম্প্রতি ওয়েষ্টমিনিষ্টার প্রদর্শনীতে রুটী কাটার একটী নূতন যন্ত্র বের হয়েছে। এতে ইচ্ছামত, সরু ও মোটা অংশে পাঁউরুটী ভাগ করা যায়।

পাঁউরুটী-কাটা যন্ত্র

ঘোড়ার আগে গাড়ী—

এতদিন গাড়ীর আগে ঘোড়া যাওয়াই ছিল রীতি। সেদিন আমেরিকার কোনো এক ঘোড়দৌড়ের মাঠে দেখা গেছে, ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ে দেওয়া হয়েছে। নূতনত্ব সন্দেহ নেই!

ঘোড়ার আগে গাড়ী
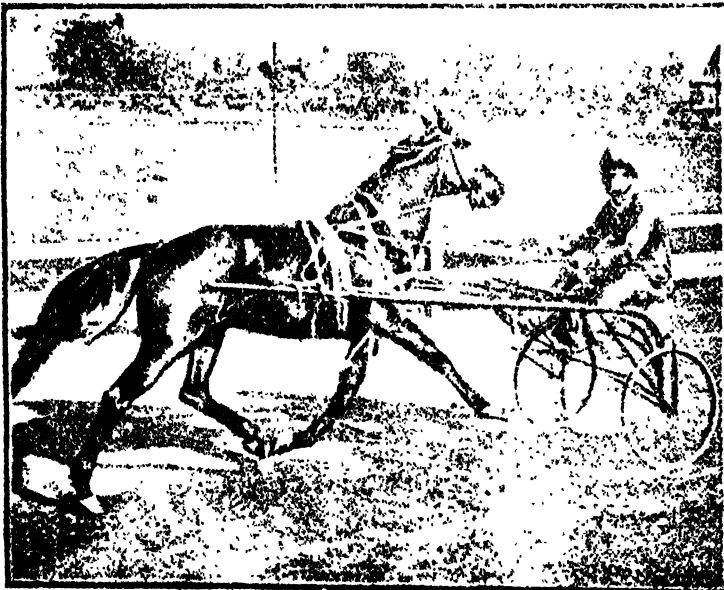
তুতানখামেনের মূর্ত্তি—

তুতানখামেনের নাম আজ জগতের সকল দেশের লোকে জানে। এই মৃত মানুষটীর কবরভূমি জগদ্বাসীর নিত্য-নূতন বিস্ময়ের খোরাক জোগাচ্ছে। সম্প্রতি সেইখানে তুতানখামেনের এক শায়িত মূর্ত্তি পাওয়া গেছে। মূর্ত্তিটী দৈর্ঘ্যে মাত্র ১২ ইঞ্চি; কিন্তু তার গঠন-সৌকর্য্যে সেখানকার লোক একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেচে। মূর্ত্তিটী ভগবান অসিরিশের আকৃতির অনুরূপ।

তুতানখামেনের মূর্ত্তি

ম্যাগগ্

ম্যাগগ্—

লণ্ডনের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ Great fireএর কাহিনী আমরা অনেকেই জানি। সেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর, এক অতিকায় ধাতু মূর্ত্তি "গাইল্‌ড হ'লের" উপর দাঁড়িয়ে পুরী রক্ষা করে। অনেকের বিশ্বাস, দুশো বছর পরে এই মূর্ত্তি হঠাৎ একদিন প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। এই মূর্ত্তির নাম ম্যাগগ্।

কেশ-বিন্যাসের মুকুট-

প্রকৃতি মানুষের দেহকে যেটুকু দিয়ে সাজাতে চেয়েছে, মাত্র সেইটুকু নিয়েই আজকের লোক সন্তুষ্ট থাকতে পারচে না। তাই নিত্য-নূতন বিলাসের উপকরণ সৃষ্টি হ'চ্চে।

এই সেদিন বিলাতে নারীদের কেশ-বিন্যাসের এক প্রকার নূতন যন্ত্র দেখা গেল। যন্ত্রটী আকারে 'হেলমেট' ধরণের। এটী মাথায় পরিয়ে দিলে কেশরাশি আপনিই সুবিন্যস্ত ও কুঞ্চিত হয়। এর গঠনে বিদেশীর জাতীয়তার আভাষ পাওয়া যায়।
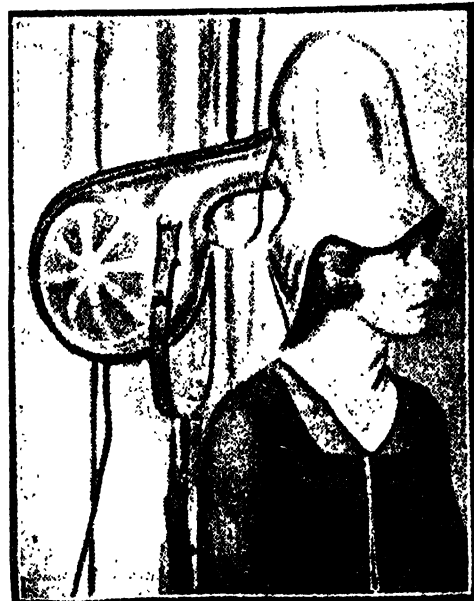
কেশ-বিন্যাসের মুকুট

অ্যাবিসিনিয়ার রাজ-মুকুট

আবিসিনিয়ার রাজ-মুকুট—

আবিসিনিয়ার নূতন রাজা তাঁর অভিষেক কালে যে উষ্ণীষ ব্যবহার করেছিলেন তার দাম এক লক্ষ পাউণ্ড।

এই উষ্ণীষ আবিসিনিয়ার বহুকালের গর্ব্বের জিনিষ। মাঝে এটী তাঁ'র হস্ত-চ্যুত হয়ে বৃটিশের কাছে গিয়ে পড়ে। গত ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে আবিসিনিয়ার বর্ত্তমান অধিপতি বৃটনের আতিথ্য স্বীকার করেছিলেন। সেই সময় সম্রাট এই মহামূল্য মুকুট তাঁকে প্রত্যর্পণ করেচেন।

নূতন প্যারাম্বুলেটার

নূতন প্যারাম্বুলেটার—

ছেলে-মেয়েদের বেড়াবার জন্যে ও-দেশে এক নূতন ঠেলা-গাড়ী বার হয়েছে। এর একটীতে দুখানি গাড়ীর কাজ হয় এবং তদুপযোগী আরোহীরও সঙ্কুলান হয়।

পার্ব্বত্য গৃহ

প্রাচীন পার্ব্বত্য গৃহ—

ফ্রান্সের পাহাড়ে এক শ্রেণীর বাসগৃহ দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি পাহাড়ের সংলগ্ন এবং পাথর কেটে তৈরী। এই শ্রেণীর গৃহ নিয়েই এক একটী গ্রাম গড়ে উঠেছে। শোনা যায়, এখানকার আদিম অধিবাসীরা 'গল্‌স' জাতীয় ছিলেন।

জ্যাক হিল্‌

জ্যাক হিল্‌

ফুটবল জিনিষটার আদর এখন সকল দেশেই। কিন্তু এই আদর বিদেশে মাঝে মাঝে কত উঁচুতে গিয়ে ওঠে, তার সংবাদ শুনে বিস্মিত না হ'য়ে থাকা যায় না।

জ্যাক হিল্‌ একজন নামকরা ফুটবল খেলোয়াড়। ইংলণ্ডের ফুটবল খেলোয়াড়রা এবার আন্তর্জাতিক খেলায় তার নেতৃত্ব স্বীকার করেছিল এবং তার জন্যে তাকে দেওয়া হয়েছিল মাত্র দশ হাজার পাউণ্ড। আমাদের দেশের খেলোয়াড়দের কাছে এ শুধু 'ডারবী টিকিটের' স্বপ্ন!

মুসোলিনী—

ইটালীর ভাগ্য-নিয়ন্তা মুসোলিনীর নাম আজ সবাই জানে। মুসোলিনীর অতীত জীবন কেটেছে অশেষ দুঃখের মধ্যে দিয়ে, এ কথাও আমাদের অবিদিত নেই। কিন্তু, আজকের এই সৌভাগ্য ও সুযশের মাঝখানেও মুসোলিনী

শস্য-ছেদন-রত মুসোলিনী

সেদিনের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হ'ন নি। বোধ করি তাই, সেদিন এক শস্য-আহরণের প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হ'ন নি। এই প্রতিযোগিতায় মুসোলিনী জয়ী হয়েছিলেন।

বরফের কবর—

মিসেস হাউডিনি কোনো বিখ্যাত যাদুকরের স্ত্রী। সেদিন তিনি কোনো এক ব্যক্তিকে বরফের মধ্যে বহুক্ষণ বন্ধ করে রেখেছিলেন। লোকটীকে যখন তুষাররাশি
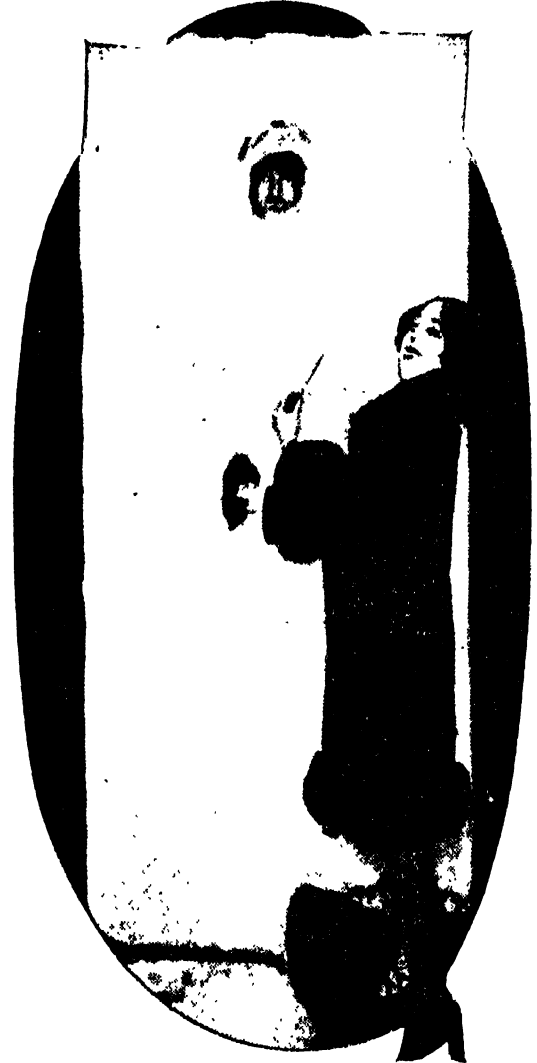
বরফের কবর

থেকে উদ্ধার করা হ'ল, তখনো তার কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় নি।

প্রেতাত্মা

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

'আমি স্বচক্ষে ভুত দেখেছি'—শচীন দৃঢ়তার সঙ্গে ব'ললো।

গঙ্গার ধারে ক্ষীণ প্রদীপের আলোকে ব'সে তখনও আধ্যাত্মিকতা, Telepathy, black-art সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হচ্ছিল। কেহ কেহ প্রসিদ্ধ হিপনটিষ্ট ডাঃ রায়, ডাঃ সেনের কথা ব'লে সান্ধ্য আসরটিকে বেশ জমিয়ে তুলেছিল। কেহ কেহ বা প্রাজ্ঞের মত হেসে ব্যাপারটিকে লঘু ক'রে দেবার চেষ্টা কর্‌ছিল। আবার একজন 'ব্ল্যাক আর্টটা খুব সোজা' বলে প্রতিবাদ করছিল। তারা মেস্‌মেরিজম্, হাত-সাফাই, নজর-বন্দী দিয়ে সমস্তই জলের মত ব্যাখ্যা করে যেতে লাগ্‌লো। তাদের ব্যাখ্যাগুলি অন্ধকারে দেশলাইয়ের কাঠির আলোকের মত একটু আলোক দিলেও রহস্যটি যেমন অন্ধকারে তেমন অন্ধকারেই থেকে গেল। শচীন চুপ ক'রেই ছিল। অন্য সকলে মৃত্যু-রহস্যটিকে অস্বীকার ক'রেই হোক্ আর ব্যাখ্যা ক'রেই হোক্, যখন চুপ ক'রলো, তখন সমস্ত বায়ু-মণ্ডলটা একটা অস্বচ্ছন্দতা অনুভব ক'রতে লাগ্‌লো।

তখন শচীন ব'লতে সুরু ক'রলো। দুই একজন বিদ্রূপ ক'রে তাকে অভিনন্দিত ক'রতেও ত্রুটি ক'রলো না—

"ভুত!—নিশ্চয়ই না? আমরা বুঝতে পেরেছি যে তুমি নিশ্চয়ই দেখেছিলে। রাণী ভবানীর প্রেতাত্মা বোধ হয়—তামাটে রংয়ের মাথাটা রূপলি কাপড় জড়ানো! তুমি তাকে জড়িয়ে ধরেছিলে—ভাল কথা, সে কি ব'লে দিল? দেখতে মেয়ে না পুরুষ—পেত্নীর মত?"

শচীন আর একটু সোজা হয়ে বসে সিগারেটের লাল আগুনটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ব'লতে লাগ্‌লো—

"না, না, আমি সত্যিই বলছি। এ সব ব্যাপার ও-রকম উড়িয়ে দেওয়া খুবই সহজ। বিশ্বাসই কর আর অবিশ্বাসই কর, কিন্তু সব তাতেই বেশ কিছু সাহসের দরকার হয়। আমি ত অন্ততঃ এগুলি অবিশ্বাস ক'রতে সাহস করি না। মন্ত্রশক্তি একটা ছেলেখেলা নয়। দুটো বেতার টেলিগ্রাফ ষ্টেসনের মধ্যে যেমন একটা অদৃশ্য ঢেউয়ের সংযোগ আছে, আমাদের জানা ও অজানা জগতের মধ্যেও সেই রকম একটা সংযোগ আছে। এটা একটা উদাহরণ—Explanation নয়। মোট কথা, আমি বিশ্বাস করি।"

যে কয়টি মহিলা শুন্‌ছিলেন তাঁরা ব'লে উঠ্‌লেন—'বলুন না!—তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা বলুন না!'

কল্পনায় তাঁরা যেন প্রেতাত্মার ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ পেয়ে জড়সড় হয়ে বস্‌লেন।

শচীন তাদের কাছেই ব'লতে লাগ্‌লো। মেয়েরা বুঝবার আগেই স্বভাবতঃ অনুভব ক'রে উঠতে পারেন বলেই মৃত্যু-রহস্যটিকে বিদ্রূপ ক'রতে সাহস করেন না। তাঁরা স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্যের জন্যেই একটু ভীত হয়ে উদ্‌গ্রীব ভাবে শুনতে লাগ্‌লেন।

দূরে কতকগুলি ব্যাং ডেকে ডেকে বৃথা ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়ছিল। নদীর ঠাণ্ডা হাওয়া রাত্রির নীরবতাকে যেন আরও গাঢ় ক'রে রেখেছিল। মাঝে মাঝে এক একটি উল্কা আকাশের তারার ভীড় থেকে খসে পড়ে চক্রবালের অন্তরালে বিলীন হ'য়ে যাচ্ছিল।

শচীন ব'ললো, "আমার একটি বন্ধু ছিল, তার নাম সত্যব্রত। বেশ সুগঠিত দেহখানি—চেহারায়ও বেশ একটা জৌলুস ছিল। পাথরের মত দুটো নিশ্চল চোখ। তার মনটা তার চোখের মতই খুব স্বচ্ছ ছিল; কিন্তু তার মনের চাঞ্চল্য, উদ্বেগ, আকাঙ্ক্ষা কোন দিনই বোঝা যেত না।

"আমরা একই বছরে পৃথিবীতে এসেছিলাম। কুমিল্লার একটি পল্লীগ্রামে। আমার বাপমা- সদর সহরে বাস ক'রতেন। সত্য ও তার মা গ্রামেই বাস ক'রতো। এক-খানা দেয়ালে ঘর—তার ভিতর তারা দুজন ও কতকগুলি পেঁচা চাম্‌চিকে বাস ক'রতো। ঘরে কতকগুলি অনাবশ্যক দরজা ছিল—সেগুলো একশো বছরেও খোলা হয়নি। টালির ঘরখানি একেবারে জরাজীর্ণ—একটু বাতাসেই প'ড়ে যাবে ব'লে মনে হয়; কিন্তু অসংখ্য লাউ-কুমড়ার

গাছে তাকে অনেকটা শক্ত ক'রে বেঁধে রেখেছিল। বাড়ীর পিছনেই একটা বড় জঙ্গল—আকাশের মেঘ পর্য্যন্ত তার সবুজ পাতা বিস্তার ক'রে কতকাল ধরেই না দাঁড়িয়ে ছিল।

"ক'লকেতা থেকে বি-এ পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী এসে সারাদিন একা একা ঘোড়ায় চড়ে না হয় শিকার করে কাটাত। বিকালে বেহালাখানি নিয়ে বাজাতে বাজাতে নিজেই বিভোর হ'য়ে প'ড়তো। একদিন কথায় কথায় সে আমাকে বলেছিল যে, এই প্রেততত্ত্ব জানবার জন্য তার একটু স্বাভাবিক আকর্ষণই ছিল। যথেষ্ট সময় ও Chance যদি পেত তবে শিখ্‌তে চেষ্টা ক'রতো। সে কোন দিনই আমাদের মত বাজে কথা ব'লতো না—একটু একগুঁয়েও ছিল; তথাপি তার প্রাণটা বড়ই সরল ছিল। নির্জ্জনতাটাকেই সে বেশী পছন্দ ক'রতো। তার মাও খুব ভাল লোক ছিলেন। তাঁর পোষা অসুস্থ কুকুর বিড়াল ও চাকরদের নিয়েই তাঁর সারাটা দিন কাট্‌তো। সত্য কোন দিনই তার মার কাজে সাহায্য ক'রতে যেত না—এ সমস্ত তার মোটেই ভাল লাগ্‌তো না।

"কিছুদিন পরে আমি বাড়ী ছেড়ে বিদেশে বেরিয়ে প'ড়লুম। সে প্রথমে নিয়মিতই চিঠি দিত - তার পর মাঝে মাঝে দুই একখানা দিত। তার পর আর বড় একটা চিঠি পত্র লেখা হ'য়ে ওঠেনি। ত ও আমাদের বাল্যবন্ধুত্বের অকালমৃত্যু ও হয়নি বা তাতে কোনরূপ শৈথিল্যও আসেনি। তবে যেমনটি করা দরকার ছিল ঠিক তেমন সরগরম হয় ত ছিল না। তখন মাঝে মাঝে তার কথা মনে প'ড়তো—তাদের বাড়ীতে যেয়ে কতদিনকত অত্যাচার করেছি, সব খুঁটিনাটি কথাই মনে প'ড়তো।

"একদিন কাকীমার কাছে শুন্‌লাম, তার বিয়ে হয়ে গেছে। তার স্ত্রীর নাম ইন্দিরা। বৌটি দেখতে, কাজে-কর্ম্মে খুবই ভাল হ'য়েছে। ভাল গানও না কি ক'রতে পারে। সত্যর মাকে যথেষ্ট সাহায্য ক'রতে পারে শুনে খুবই সুখী হলুম। সেও না কি সত্যর মতই অল্প কথা ব'লতো ও নির্জ্জনতাই বেশী পছন্দ ক'রতো।

"বিয়ের পরে তারা দেওঘরে বেড়াতে এসেছিল। তার পরের শীতে তার মা মারা গেলেন।

"তার বিয়ের সময় তাকে অভিনন্দন-পত্র লিখ্‌লাম, কিন্তু সে উত্তর দিল না। সে সুখে আছে ভেবে তার ত্রুটি ক্ষমা ক'রে নিলুম। তার পর কাকীমার কাছে তাদের সংবাদ পেয়ে কৌতূহল নিবৃত্ত ক'রতুম। তারা কেমন সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না ক'রতো, মাঝে মাঝে এদিক ওদিক বেড়াতে যেত, সবই জান্‌তে পারতুম। তার পরে একবার শুন্‌লুম সত্যর স্ত্রী মারা গেছে। তাকে সহানুভূতি জানিয়ে পত্র দিলুম, কিন্তু কোনই উত্তর পেলুম না। তার পর দিন কেটে যেতে লাগ্‌লো।

"তিন বছর পরে রাঁচি থেকে দেওঘরে বদলি হ'য়ে গেলাম। তখন কেবল বসন্তের বাতাস বইতে সুরু ক'রেছে। চারিদিকের সব লতা পাতা ঘাসের ভিতরেই একটা নবীন সজীবতা ফুটে উঠেছে।

"বেড়াতে বেড়াতে একটা বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে একটা পাথরের মূর্ত্তি দেখছিলুম। পাছের দিকে কে যেন অস্পষ্ট ভাবে বললো—'শচীন!'

"সন্ধ্যার অন্ধকারে তাকে চিন্‌তে যথেষ্ট সময়ই লেগেছিল। শোকে দুঃখে সে যেন মুস্‌ড়ে প'ড়েছে—যেন কত বুড়ো হ'য়ে গেছে!

"আমি একটু অস্পষ্টভাবেই বল্‌লুম 'সত্যব্রত!' তার সঙ্গে হঠাৎ এ রকম ভাবে দেখা হয়ে যে যথেষ্ট সুখী হ'য়েছি, তা তাকে জানালুম। সে ব'ললো—'তোর সঙ্গে দেখা হ'য়ে আমি কিন্তু খুব আশ্চর্য্য হইনি। একটু আগেই আমার মনে হচ্ছিল যেন তোর সঙ্গে আমার দেখা হ'বেই। এই মূর্ত্তিটার দিকে চেয়েই তোর কথা মনে প'ড়েছিল। তোর কথা ভাবতে ভাবতে ফিরেই তোকে দেখতে পেলুম।'

"আমি হেসে বল্লুম, 'ওটা telepathy।'

"সেও হেসে ওই কথাটারই পুনরুক্তি ক'রলো, 'হ্যাঁ, telepathyই বোধ হয়।'

"তার চিঠিপত্র না লেখার জন্যে যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে বল্লে, 'তোর সঙ্গে দেখা হ'য়ে প্রথমে খুবই সুখী হ'য়েছিলুম; শেষে আবার ততটাই হয় ত দুঃখের কথা ব'লতে হবে। ইন্দিরা দেওঘরে থাক্‌তে বড়ই ভালবাস্‌তো। দেওঘরে দিন কয়েক থেকে তাকেই যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম। আমিও যেন কেন হঠাৎ দেওঘরটাকে খুব ভালবেসে ফেলেছি।'

"ইন্দিরার সম্বন্ধে স্বাভাবিক ভাবে অনেক কথাই ব'ল্‌লো। তার কথাবার্ত্তায় শোক দুঃখের কোন আভাবই

ফুটে উঠ্‌লো না সত্য, কিন্তু তার অন্তরের নিবিড় দুঃখের কথাও সে চেপে রাখতে পারে নি।

"সত্য বল্লে, 'মরবার সময় ইন্দিরা মোটেই ভোগে নি। সেদিন সাদা জ্যোৎস্নায় বাইরের গাছপালাগুলোকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীরটা জুড়িয়ে যাচ্ছিল। আমি জানালার কাছে ব'সে বাইরের দিকে চেয়ে ছিলুম। হঠাৎ হৃদ্‌স্পন্দন থেমে যেয়ে তার মৃত্যু হ'য়েছিল। পিয়ানোতে একটা গান বাজাতে বাজাতে চাবির উপর আঙ্গুল রেখেই অসাড় হ'য়ে গেল। পিয়ানোর সুরও থেমে গেল, সেও চিরদিনের জন্য থেমেই থাক্‌লো। কিন্তু সে যাক্—আমি তাকে একেবারে হারাইনি বোধ হয়। এই পৃথিবীর উপরেই তাকে বোধ হয় আর একবার দেখ্‌তে পাব। একটা আশা এখনও আছে—সেটা নিশ্চিতই। না—সে কথা আর তোমার কাছে ব'লবো না, তুমি হয়ত হাস্‌বে—যুক্তি-তর্ক দিয়ে আমার একমাত্র আশাটাকে মিথ্যা প্রমাণ করে আমাকে পাগল সাব্যস্ত ক'রবে।'

"আমি বুঝিয়ে বল্লুম, 'কিন্তু ভাই, মৃত আত্মার সুখ-শান্তি ভঙ্গ করা ভাল নয়। যে গেছে তার কথা ভুলে যাও; মৃত্যুর অতীত নিয়ে বেশী কিছু ক'রতে যেও না—সবটাই বেশী বেশী কিছু ভাল নয়।'

"সে একটু বিদ্রূপ ক'রেই ব'ললো, 'তোমার উপদেশে বড়ই উপকৃত হ'য়েছি। তুমি হয় ত মনে ক'রছ যে তোমার একটি ধর্ম্মপ্রাণ বাল্যবন্ধু শোকে দুঃখে বিকৃত-মস্তিষ্ক হ'য়ে গেছে।—ভাল কথা, ডাঃ রায়ের সঙ্গে আজ সকালে আমার অনেক কথাবার্ত্তা হ'য়েছে।'

" 'নামজাদা ভুতুড়ে ডাঃ রায়! হ্যাঁ—আমিও শুনেছি, তিনি এখানেই আছেন।'

"'আমরা এক হোটেলেই আছি। তার সঙ্গে ও তার মিডিয়ম মীরা দেবীর সঙ্গেও আমার যথেষ্ট আলাপ হয়েছে। তুমি হয় ত মাথা নেড়ে হাস্‌বে—সে খুব সোজা। কিন্তু নিজের চোখে যদি দেখ্‌তে—'

"'কি?'

"'যে প্রেতাত্মার কথাটা তুমি অবিশ্বাস ক'রছো অথচ Explain ক'রতে পার না।'

" 'তিনি কি শরীরি প্রেতাত্মা দেখাতে পারেন?'

" 'নিশ্চয়ই পারেন। তিনি লোকও খুব ভাল—জুচ্চুরি, ফাঁকি জানেন না।'

" 'তাই না কি?'

" 'হ্যাঁ, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে।' বলে সে আমাকে টান্‌তে টান্‌তেই নিয়ে চ'ললো। তার এ-রকম উৎসাহ দেখে আমার মনটা বড়ই ব্যথিত হয়ে উঠ্‌লো। একটু দুঃখের সঙ্গেই তার পিছনে পিছনে চল্লুম—একটা কৌতূহল হল।...

"হোটেলে পৌঁছে ব'ললো, 'আমাদের এখানেই অপেক্ষা ক'রতে হ'বে। এ হোটেলে আজ আর কেউই বিশেষ নেই। দ্যাখ, ঘরটা কি রকম অভিনব ভাবে সাজানো।'

"ঘরের মেঝে দেয়াল বেশ সুন্দর রং করা। টেবিলের নীচে, ঘরের কোণে টবে ক'রে ছোট ছোট গাছ। দেয়ালে কখানা সেকেলে ছবি। ঘরের এক কোণে একটা পুরানো বীণা বৃথা প'ড়েছিল।

"আমি বল্লুম, 'এটা ত ভূতের আড্ডা ব'লে মনে হ'চ্ছে না—এ-রকম সাজানো-গোছানো ঘরে কি ভূত আসতে পারে?

"পিছন থেকে ডাঃ রায় শান্ত স্বরে ব'লে উঠ্‌লেন, 'এখনি হাস্‌বেন না। আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, কাল রাত্রেই ওখানে লীলাকে দেখেছিলাম। সে লীলা এ ঘরে কিছুদিন বাস ক'রে গেছে। তার বয়স এই ১৭।১৮ হবে। এ ঘরটা তার খুবই পছন্দ হ'য়েছিল। বিয়ের কিছুদিন পরেই তার মৃত্যু হ'য়েছিল। যদি লীলা আপত্তি না ক'রে, আজও আপনাকে দেখাতে পারি। সত্যব্রত বাবু হয় ত ঈর্ষান্বিত হ'চ্ছেন। লীলাকে না হয় আজ নাই আনলুম। ইন্দিরাকে এনে যে আপনাকে দেখাতে পারবো সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন।'

"সত্য ডাঃ রায়ের সঙ্গে আমাকে পরিচিত ক'রে দিয়ে ব্যগ্রভাবে মিডিয়ম মীরার কথা জিজ্ঞাসা ক'রলো।

"ডাক্তার হেসে ব'ললেন, 'সে একটু বিশ্রাম ক'চ্ছে—তারও ত একটু বিশ্রাম দরকার।'

"এই দুটো লোকের মাঝে বসে থাকতে যেন বড়ই অস্বস্তি অনুভব ক'রতে লাগলুম। তাদের ভিতর একটি যে পাগল সে বিষয়ে একরূপ নিঃসন্দেহই হ'য়েছিলুম। ডাঃ রায়ের বয়স কিছু বেশী হ'য়েছিল। তাঁর চেহারাটা স্বভাবতই

শ্রদ্ধা আকর্ষণ ক'রতে পারতো। তাঁকে Humbug বলে মনে করা একটু কষ্টকরই।

"ডাঃ রায়ের সঙ্গ পেয়ে সত্যব্রত যেন অনেকটা আনন্দিত হ'য়ে উঠ্‌লো। তার চেহারার স্বাভাবিক মলিনতাও যেন অনেক কমে গেল। কুমিল্লার পল্লীগ্রামের কোলের সত্যব্রতের সঙ্গে এই সত্যব্রতের তুলনা ক'রে মনে বড়ই কষ্ট হল—কি মানুষ কি হ'য়ে গেছে!

"আপনারা যেমন নানারূপ মত প্রকাশ ক'রলেন, তেমনি ডাঃ রায়ও অনেক রকম কথা বলে Telepathy, materialisation সম্বন্ধে নিজের মতামত প্রকাশ ক'রলেন। অনেকক্ষণ আলোচনা হল।

"মোমবাতি দুটো অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত নিঃশেষিত হয়ে গেছলো। চাকর এসে টেবিল পরিষ্কার করে দিয়ে গেল। ডাঃ রায়ের মিডিয়ম মীরা এসে কাছেই একটা চেয়ারে ব'সলো। একখানা কাল কাপড় পরা—হাতে একটা ফুলের বোকে। মীরার চেহারায়ও যথেষ্ট লাবণ্য ছিল—প্রকৃতই সুন্দরী।

"ডাঃ রায় ব'ললেন, 'মীরা, এখন পারবে ত?' মীরা ব'ল্লে, 'হ্যাঁ পারবো। একটু ঘুমিয়েছিলুম।' কপালে হাত দিয়ে কি মুছতে মুছতে বল্লে, 'সেই লীলা কাল রাত্রে আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে তবে ছেড়েছিল।'...

"সত্যব্রত কি ব'লতে যেয়ে তোতলার মত ক'রতে লাগ্‌লো। ডাক্তার তাকে কিছু ব'লতে বারণ করে ব'ললেন, 'এ-সব সময়ে কোন কিছু ব'লবেন না। যথেষ্ট সাবধান না হলে মৃত্যু পর্য্যন্ত হ'তে পারে। কেমন ক'রে যে সব অভাবনীয় বিপদ এসে হাজির হয় তা মোটে বোঝাই যায় না। মিডিয়মের দেওয়া শক্তি নিয়েই মৃত আত্মা শুধু শরীরি হতে পারে। মীরা খুবই পরিশ্রান্ত; তাকে নিয়ে সাবধানে কাজ ক'রতে হবে।"

"মীরা হেসে তার শক্ততার কথা প্রমাণ ক'রলো।

"সত্যব্রত সেই বীণাটা বাজাতে আরম্ভ ক'রলো। তার বাজনা আমাকে বড়ই উত্তেজিত করে তুল্‌লো। ডাক্তার আলো নিভিয়ে দিলেন। সত্য আমার কাছে এসে ব'সলো।

ঘর প্রায় অন্ধকার। বাইরের জ্যোৎস্নায় সামান্য একটু আবছায়া আলো ঘরে আস্‌তে লাগ্‌লো—মনে হ'তে লাগ্‌লো, যেন ঘরটা সহসা বাষ্পময় হ'য়ে উঠেছে। ঘরের বাতাস সহসা যেন কেমন ভারী হ'য়ে উঠ্‌লো। ঘরের ভিতর কি যেন একটা ঝড়ের মত ঘুরে ঘুরে নিস্তেজ হ'য়ে কোথায়ও বসে প'ড়লো। আমার চেতনা, অনুভূতি যেন আস্তে আস্তে কমে আস্‌তে লাগ্‌লো। ঘরটাকে বড়ই বীভৎস বলে মনে হ'তে লাগ্‌লো। মনে ক'রলুম, ঘর থেকে এক দৌড়ে বেরিয়ে যাই; কিন্তু কিছুতেই পারলুম না। একটা চীৎকার ক'রবারও ক্ষমতা হল না।

"মীরা ঘরের মাঝখানে বসে ছিল। আমাদের চেয়ার থেকে পাঁচ হাতের বেশী দূর নয়। অন্ধকারে তাকে মোটেই দেখা যাচ্ছিল না; কেবল মুখখানি ও ফুলের বোকেটা দেখা যেতে লাগ্‌লো। তার মুখখানি হঠাৎ যেন খুব ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল। একটু একটু কাঁপতে কাঁপতে সহসা একটা ঝাঁকি দিয়ে ঠিক হ'য়ে ব'সলো।

"ডাক্তার বললেন, 'ইন্দিরা এস, এস। মূর্ত্ত হ'য়ে পৃথিবীর উপর নেমে এস। ইন্দিরা, তোমাকে যে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে, সে শুধু তোমাকে একবার দেখবার জন্যই এখানে ব'সে আছে।'

"কোন দিক থেকে বাতাস আস্‌বার উপায় ছিল না। তবুও মুখের উপর যেন একটা ঠাণ্ডা নিশ্বাস কে ফেলছে ব'লে মনে হল। গায়ের সমস্ত লোম খাড়া হ'য়ে উঠ্‌লো। মিডিয়ম সহসা অসাড় হ'য়ে প'ড়লো—সত্যব্রতও একটু কেমন ক'রে উঠ্‌লো।

"ডাক্তার মিডিয়মের দিকে হাত এগিয়ে দিয়ে ব'ললেন, 'ইন্দিরা এসেছে।'

"যা দেখেছিলুম সত্যিই তাই আপনাদের কাছে ব'লছি। জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলোকে বাষ্প-দিয়ে-গড়া একটি সুকোমল স্ত্রীমূর্ত্তিকে দেখলুম।

"অল্পক্ষণের জন্যেই মূর্ত্তিটি ছিল। আমি ভয়ে পেছিয়ে আস্‌বার চেষ্টা ক'রলুম; কিন্তু সত্যব্রত হাত দুটো প্রসারিত করে এগিয়ে যেয়ে ব'ললো, 'ইন্দিরা, আমায় ডাক্‌ছো? তোমার হাতটা দেখি—আমিও যে তোমার সঙ্গে যাব।'

"সত্য ঝাপ্‌টে ধরতে গিয়ে দুম্ করে প'ড়ে গেল। আমার চেতনা আবার যেন ফিরে এলো।

বীণার বাজনা থেমে গেছে। সে স্ত্রীমূর্ত্তিও আবার বাতাসেই মিশে গেল। আমি তাড়াতাড়ি আলো জ্বেলে দিলুম।

"ডাঃ মিডিয়মকে ছেড়ে দিয়ে সত্যব্রতকে ধরবার জন্য আমাকে ডাক দিলেন।—সত্যব্রত পৃথিবী হ'তে বিদায় নিয়েছে।

"দ্বারে দ্বারে সাহায্য চাইলাম, সকলে ঔষধপত্র নিয়ে এলো; কিন্তু সবই বৃথা হ'ল। সত্যব্রত চিরদিনের জন্যেই ইন্দিরার কাছে চ'লে গেল; কিন্তু তখনও তার চোখে-মুখে একটা অপূর্ব্ব আনন্দের প্রলেপ লেগে ছিল।

"ডাঃ ব'ললেন, 'ওর heart খুবই দুর্ব্বল ছিল। ইন্দিরার মত ওরও হৃদ্‌স্পন্দন থেমেই মৃত্যু হয়েছে। ওর জন্যে বড়ই দুঃখ হয়, না?'

"আমি বল্লুম, 'না—সত্যর জন্যে মোটেই দুঃখ হয় না। ও যে-রকম ক'রে ম'রতে পেরেছে, তা খুব অল্প লোকের ভাগ্যেই জোটে। ও-রকম ক'রে বেঁচে থাকার চেয়ে ওর মৃত্যুই ভাল—'

"তার বিরহ-ব্যথিত অন্তরটা এই মিথ্যে ছায়া দেখেই হয় ত যথেষ্ট সান্ত্বনা পেতে চেয়েছিল!

"তার পর ডাঃ রায় না কি আর এ-রকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রতে যান নাই।"

* * * *

শচীন ব'ললো, "এই ত সে ঘটনা, আপনারা এখন বিশ্বাস করুন আর নাই করুন। আপনারা হয় ত বলতে পারেন—আমি মেস্‌মেরাইজ্‌ড্‌ হ'য়েছিলাম; ভুল দেখেছিলাম। কিন্তু আমি যা দেখেছি, শুধু তাই বললুম। আমি কিছু প্রমাণ ক'রতে চাইনি।"

মহিলা কয়জন আড়ষ্ট হ'য়ে বসেই ছিলেন—কোন কথাই কেউ বল্লেন না।

হঠাৎ সবই নীরব হ'য়ে গেল। দূরের ব্যাংগুলি তখনও ডেকে ডেকে বৃথা পরিশ্রান্ত হচ্ছিল। চাঁদ অনেক উপরে উঠে নিষ্প্রভ আলো বিতরণ করছিল। নদী কুল কুল করে হাসি তামাসা ক'রতে ক'রতে ব'য়ে যাচ্ছিল।

গৃহস্বামী ব'ললেন, "তোমার মিথ্যা গল্প আমাকে বড়ই দুর্ব্বল ক'রে ফেলেছে। আজ রাত্রে হয় ত ভূতের স্বপ্নই দেখবো। এখন অন্য কথাবার্ত্তা হোক্‌—" *

* ফরাসী গল্প হইতে—

গান

শ্রীরাসবিহারী ম

যখন তুমি খেলার ছলে
আমারে যাও ছুঁয়ে,
গানে ভরা প্রাণখানি মোর
আপনি পড়ে নুয়ে।
যুগে যুগে বিজন রাতে
হয় যে দেখা তোমার সাথে,
কোন্ রাগিণীর কী মোহিনী
মরমে যাও থুয়ে।

ওগো আমার বাঁশের বাঁশী
মনের বনে বাজে,
পুরানো সেই সুরের মালা
নতুন রঙে সাজে।
সেই মালা যে বঁধুর তরে—
রেখেচি মোর আঁধার ঘরে!
পায়ে তোমার জড়িয়ে দিব
চোখের জলে ধুয়ে।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

কবি ওমর খৈয়াম ও সুফী অদ্বৈতবাদ

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী বি-এ

স্বদেশে আপন জীবদ্দশায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতির্ব্বিদ ও দার্শনিক হিসাবে বিখ্যাত হইলেও দেশ-দেশান্তরের জন-সমাজে প্রায় হাজার বৎসরের কাল-তরঙ্গ ভেদ করিয়াও ওমর খৈয়াম আজ যে জন্য পরিচিত তাহা তাঁহার কবিত্ব-শক্তি মাত্র। স্তূপীকৃত জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের ভার আজ কাল-সাগরের অতলস্পর্শে নিমজ্জিত; কিন্তু জ্ঞান-চর্চ্চার ফাঁকে ফাঁকে বিরচিত কতকগুলি চতুষ্পদীর সমষ্টি একখানি মানব-হৃদয়ের আশা-ভালবাসা, সংশয়-বিশ্বাস ও আনন্দ-বেদনার কাহিনী বহিয়া আজ পর্য্যন্ত ভাষা হইতে ভাষান্তরে তাহার জয়যাত্রা অব্যাহত রাখিয়াছে।

যে ছন্দে কবি ওমর তাঁহার উক্তি ও যুক্তিগুলিকে মূর্ত্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম "রুবাঈ"। "চারি" অর্থবোধক এক আরবী শব্দ হইতে ইহা গৃহীত, যেহেতু এই ছন্দ চারিটী চরণে সীমাবদ্ধ। এই শব্দেরই বহুবচনান্ত রূপ "রোবাইয়াৎ"। প্রাচীন কাল হইতে পারসিকদিগের মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও, ওমারেরই অব্যবহিত পূর্ব্বে আবু সৈয়দ নামক কোনো কবি ইহাকে সর্ব্বজনগ্রাহ্য ও কাব্য রচনার অনুকূল করিয়া তুলেন। সুস্পষ্ট, সুতীক্ষ্ণ অথচ সংক্ষিপ্ত গঠনের এই ছন্দ পারসিক ধাতের সহিত বেশ খাপ খাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কেন না আজ পর্য্যন্ত জনসাধারণ্যে ইহার আদর অক্ষুণ্ণই রহিয়া গিয়াছে। এই চতুষ্পদীর চারিটী চরণের প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ পরস্পরের সহিত মিল রাখিয়া চলে; তৃতীয় চরণ স্বাধীন, তবে কখনও স্বেচ্ছায় মিলের অধীন হয়। সমগ্র চতুষ্পদীর ভাবটুকুকে ঘনীভূত করা এবং উহার গতিটীকে নির্দ্দেশ করাই চতুর্থ চরণের কার্য্য। পারসিকদিগের উদ্ভাবনা হইলেও এই ছন্দের মাত্রা আরবীর আদর্শ অনুসারেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে; কেন না আরব জাতি কর্ত্তৃক বিজিত হওয়ার পর পারসিকেরা যখন নিজেদের পহ্‌লবী ভাষাকে উহার চরম পরিণতির ছাঁচে ঢালিয়া লইতেছিল, এই ছন্দটী সেই সময়েরই সৃষ্টি। পাণ্ডিত্য-প্রদর্শক বৈয়াকরণিকের দল ঐ চারিটী মাত্র চরণ-সীমার মধ্যে চব্বিশ প্রকারের মাত্রা-প্রয়োগ-রীতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন বটে, তবে আসলে দুইটী মাত্রই বর্ত্তমান—যেহেতু বাকীগুলি শব্দ-সংখ্যার সঙ্কোচন বা প্রসারণের ফলে ঐ দু'টীরই প্রকরণভেদ মাত্র।

সমস্ত ছন্দই কবি ওমর খৈয়াম কাজে লাগাইয়াছেন এবং পারসিক চতুষ্পদী ছন্দের আকারে যত কিছু বৈচিত্র্য সম্ভবপর ওমারের রোবাইয়াতে তাহার সকলগুলিই বিদ্যমান আছে। পারিভাষিক শিল্পের দিক হইতে এবং উক্ত ছন্দের পক্ষে, ওমরের রচনা-রীতি এক দিকে যেমন কমনীয় ও নমনীয়, অপর পক্ষে আবার তেমনি লঘুভার ও সঙ্গীতময়। তাঁহার ছন্দের প্রয়োগ প্রায়শঃই মনোরম। তৃতীয় পংক্তিটী কখনও কখনও অপর চরণত্রয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছন্দে রচিত হওয়ায় অত্যন্তই চমকপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে। কাব্যের জন্য ওমর যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা শিক্ষানিপুণ সারল্যে পরিপূর্ণ। প্রকৃত পক্ষে ভাষার এই সরলতাই তাঁহার চতুষ্পদীগুলিকে সুশাণিত ও শক্তিসম্পন্ন করিয়া তাহাদিগকে বিস্ময়কর ও আকর্ষণের বস্তু করিয়া তুলিয়াছে। ওমরের কবিতার প্রত্যেক পংক্তিটী অনুভূতির সত্যতা ও চিন্তার গভীরতায় এতই সজীব যে পারস্য ভাষা ও সাহিত্যের যে সকল সমালোচক তাঁহাকে নিতান্তই সাধারণ শ্রেণীর কবি ভাবিয়া লঘু ভাবে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা কবির সর্ব্বপ্রধান গুণগুলিকেই লক্ষ্য না করিয়া তৎপ্রতি অবিচার করিয়াছিলেন বলিতে পারা যায়। অভিপ্রায়ের সারল্য ও উক্তির বেগবত্তাই সমস্ত মহৎ ও সৎগ্রন্থের অন্তর্নিহিত প্রাথমিক কার্য্যকরী শক্তি; এবং ওমর খৈয়ামে এই শক্তি সুপ্রচুর। অপরাপর কবি—বিশেষতঃ পারস্যের—কাব্য রচনায় অধিকতর শিল্পনৈপুণ্য ও যত্ন প্রদর্শন করিয়াছেন, কলা-বিজ্ঞানের রীতি-নীতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ করিয়াছেন, এবং ভাব ও ছন্দের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পারিপাট্য ও বিকাশের দিকে ঝুঁকিয়াছেন—কিন্তু এই পদ্ধতিপ্রিয়তার ফলে নিজেদের সহজ প্রেরণার পথ হারাইয়া অনেক স্থলেই কাব্যের আদর্শটীকে বাক্-নৈপুণ্যের অন্তরালে আচ্ছন্ন করিয়াও ফেলিয়াছেন। ওমরের সরল গতিবেগ, নির্ভীক ও ঋজুভাবে একেবারেই সার কথাটীর দিকে যাত্রা, সমস্ত ছাড়িয়া একান্ত মনে লক্ষ্যবেধ—এই বিশেষ ভঙ্গীটী কাব্য চতুষ্পাঠীর কোন্ পদ্ধতিপ্রিয় লেখক দিতে পারিয়াছেন? পারস্য কাব্যের সমগ্র ইতিহাসে ওমরের মত উলঙ্গচিত্তে কে কবে লিখিয়াছে—

> "বিস্ময়ে মোরে ভরিয়া দিল সে প্রথমতঃ হেথা আনি,
> কুড়ায়ু কেবল ক্ষীণ অনুমান টুঁড়িয়া জীবনখানি;
> চলি পুনরায় ঘুরণ হাওয়ায়; কেন আসা? বাঁচা? মরা?
> প্রশ্নই মনে জাগে ও মিলায়, উত্তর নাহি জানি!"

ওমরের চতুষ্পদীগুলিকে বিষয়ের দিক হইতে মোটামুটি ছয় ভাগে ভাগ করা চলে; যথা:—

১। অদৃষ্ট চক্রের নির্ম্মমতা, জগতের অবিচার, ও মানুষের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা ও ভাগ্য সম্বন্ধীয় অভিযোগ।

২। ধর্ম্মগুরুগণের বুজরুকী, সাধুজনের পাষণ্ডতা, পণ্ডিতগণের অজ্ঞতা এবং তাঁহার সমসাময়িক জনসাধারণের অশিষ্টতার প্রতি বিদ্রূপ।

৩। পার্থিব বা অপার্থিব প্রিয়তমের সহিত মিলনের আনন্দ ও বিচ্ছেদের বেদনা বিষয়ক প্রেম-কবিতা।

৪। বসন্তকাল, উদ্যান ও পুষ্প প্রভৃতির প্রশংসামূলক কবিতা।

৫। সৃষ্টির ভিতরকার পাপাদির জন্য সৃষ্টিকর্ত্তাকে দায়ী করিয়া ধর্ম্মবিরোধী ও তত্ত্ববিরোধী উক্তি; কোরাণে বর্ণিত স্বর্গ ও নরকের প্রতি

বিদ্রূপ ; সুরা ও সম্ভোগের জয়গান এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া "পানাহারের" এই বলিয়া আবশ্যকতা প্রচার যে, মৃত্যু কেশে ধরিয়া টানিতেছে।

৬। পাপের জন্য অনুতাপ ও ক্ষমার জন্য অনুনয় করিয়া কখনও বা সাধারণ অনুরাগের ভাষায় ভগবৎ-সম্ভাষ। আবার কখনও বা সুফী মরমীদিগের অনুরূপ রূপকের ভাষায় অহমিকা হইতে মুক্তির, ও পরমাত্মার সহিত মিলনের জন্য আকুলতা প্রকাশ।

প্রথম শ্রেণীর চতুষ্পদীগুলিকে কবির জীবনের পরিচিত ঘটনাগুলির সহিত জড়িত করা যাইতে পারে। স্বাধীন মতামতের জন্য তাঁহাকে সাধারণ্যে যে নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল, এই সকল অভিযোগ সম্ভবতঃ তাহারই ফল। কোরাণের উদ্দিষ্ট হুরী ও অপ্সরাপর পবিত্র বিষয়াদির প্রতি তাঁহার ব্যঙ্গোক্তি জনসাধারণকে কবির বিরুদ্ধে এরূপ উত্তেজিত করিয়াছিল যে নিশাপুর হইতে তিনি যে প্রাণ বাঁচাইয়া পলাইতে পারিয়াছিলেন, ইহাই বিস্ময়কর। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্রূপ কবিতাও ঐ একই কারণ-প্রসূত। তৃতীয় শ্রেণীর রুবাইগুলি এমন এক জাতীয় রচনার নমুনা, যাহা ওমরের পরবর্ত্তী কবিগণের মধ্যেই অধিকতর সাধারণ। তাহাদের অধিকাংশেরই অন্তরে কোন গূঢ় অর্থ নিহিত থাকাই সম্ভব। কারণ ওমরের ধাত যে প্রেম প্রভৃতি কোমলা-বৃত্তি-চর্চ্চার বড় বেশী অনুকূল ছিল, এমন মনে হয় না। "গোলাপী গণ্ড" বা "ললিত-তনু ভঙ্গীর" তিনি তারিফ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার সুন্দরী বান্ধবীগণের প্রতি কোনো গভীরতর আকর্ষণ অনুভব করিয়াছেন, এমন কোনো নিদর্শন তাঁহার কাব্যে দেখা যায় নাই।

চতুর্থশ্রেণীর প্রাকৃতিক-দৃশ্যাবলী-উপভোগমূলক কবিতাতেও ওমরের বিশেষত্ব বড় বেশী লক্ষিত হয় না। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর প্রাকৃতিক বিষয়গুলিই শুধু ওমরের চোখে পড়িয়াছে। ফুলের হাসি, পাপিয়ার গান, স্রোতস্বতীর তৃণাস্তীর্ণ তট, ছায়াময় উদ্যান প্রভৃতিই বন্ধুসভার আনুষঙ্গিক উপকরণ হিসাবে ওমরের মনে ছায়াপাত করিয়াছে। তবে কতকগুলি মৌলিক উপমা ও জীবন্ত অনুভূতি তাঁহার এই শ্রেণীর কয়েকটী চতুষ্পদীর ভিতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

ওমরের কবিতার অদ্বিতীয় বিশেষত্ব ও উল্লেখযোগ্য শ্রীসম্পদ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর রুবাইগুলিতে। একদিকে তত্ত্ব-বিদ্রোহী ও ধর্ম্মবিদ্রোহী উক্তির তীব্রতা আবার অন্যদিকে সাধুজনোচিত উচ্চাশা ও অনুশোচনা প্রভৃতির করুণ কমনীয়তা—পাশাপাশি এই পরস্পর বিরোধী চিত্ত-বৃত্তির জ্বলন্ত বিকাশ কবির পাঠকবর্গকে তাঁহার সম্বন্ধে নিতান্তই বিপরীত ভাবের ধারণায় অনুপ্রাণিত করিয়াছে। ওমরের সমসাময়িক এবং ইয়োরোপীয় বহু সমালোচক তাঁহাকে ধর্ম্মদ্বেষী,মাতাল ও অসচ্চরিত্র আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন ; অপর পক্ষে সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার সুস্পষ্ট 'চার্ব্বাক"পন্থী চতুষ্পদীগুলিরও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিয়াছেন। পারস্য ও ভারতবর্ষে এই শেষোক্ত প্রণালী অধিকতর সমাদৃত হইলেও, কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তিই চক্ষু বুজিয়া ঐ দ্বিবিধ পন্থার কোনোটিকেই সমগ্রভাবে গ্রহণ করিতে পারেন না। তর্কের খাতিরে যদিও ধরিয়া লওয়া যায় যে ওমরের সময়েও সুফী-সাধন-পদ্ধতির সঙ্কেতগুলি পরিচ্ছন্ন আকার লাভ করিয়াছিল, তথাপি সহজ-বুদ্ধির খাতিরেও আমরা এ কথা অস্বীকার করিতে পারি না যে, ওমরের সুরা ও সম্ভোগবিষয়ক রুবাইগুলি—যাহার সহিত লোক-নিন্দা ও অনুশোচনা জড়িত রহিয়াছে, যাহা পরিহার করিবার চেষ্টা ও পক্ষসমর্থনের বিবিধ যুক্তির ভিতর দিয়া বারংবার দেখা গিয়াছে—কোনো ভক্তি-গভীর অর্থের দ্যোতক।

এ কথা খুবই স্পষ্ট যে ওমরের রুবাইগুলি তাঁহার জীবনের কোনো বিশেষ বয়সে, কোনো সুনির্দ্দিষ্ট ভাবধারার বশে বিরচিত হয় নাই। জ্ঞান-চর্চ্চার অবসরে অবসরে আপন চিত্ত-বিক্ষেপের জন্য বা বন্ধুদের উপভোগের জন্য, বিশেষ বিশেষ মানসিক অবস্থায় এবং বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত্তের চিন্তা, মতিগতি ও বাসনাদির প্রভাবে উহারা আকারবদ্ধ হইয়াছিল। ওমরের সমসাময়িক সহরস্তানীর বিবরণে যদি তাঁহার উক্তরূপ মত পরিবর্ত্তনের বা ভাব-বিরোধের কোনো উল্লেখ থাকিত, তাহা হইলে আমরা ধরিয়া লইতে পারিতাম যে তাঁহার ধর্ম্মদ্রোহী ও সম্ভোগ-বিষয়ক কবিতাগুলি যৌবনকালের, এবং ভগবৎ-বিশ্বাসমূলক কবিতাগুলি পরিণত বয়সের রচনা। কিন্তু সহরস্তানীর বিবরণ দৃষ্টে এরূপ অনুমান যেমন অসঙ্গত ওমর খৈয়ামের কাব্য-পরিচয় হইতেও এরূপ ধরিয়া লওয়া তেমনি কঠিন। তিনি আগাগোড়া নিজের এই পরিচয় দিয়াছেন যে দু'টী বিরোধী মতের মাঝখানেই তিনি দোদুল্যমান। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত রুবাইটী উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

> এক হাতেতে কোরাণ কেতাব, অন্য হাতে মদ্য নিয়ে,
> মন্দ-ভালর মধ্য পথে দাঁড়িয়ে গেছি থম্-থমিয়ে।
> সুনীল আকাশ দেখছে মোরে কলঙ্কী এক মুসলমান
> দাঁড়াইনি কো যদিও ঠিক অধার্ম্মিকের পথে গিয়ে।"

বিচ্ছিন্ন ভাবে না দেখিয়া ওমরের এই পরস্পর-বিরুদ্ধ রচনাগুলিকে যদি ইতিহাসের আলোকে দেখা যায়, এবং সেই সঙ্গে তাঁহার মনের আভিজাত্য ও আবেষ্টনের বিদ্বজ্জন-মণ্ডলীর কথা স্মরণ করা হয়, তাহা হইলে ঐ বিরোধের অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক কারণ হয় তো ধরা পড়ে। যৌবনে ওমর সুন্নী-ভাগবতে ইমাম মওয়াফিক উদ্দিনের চরণতলে বসিয়া জ্ঞানচর্চ্চা করিয়াছিলেন। ইনি যে সম্পূর্ণরূপে "একমেবা-দ্বিতীয়ের" অথবা মহম্মদীয় ভাগবদ্বিজ্ঞানের ভাষায় "একমাত্র যথার্থ নিয়ামকের" ধারণায় অনুপ্রাণিত ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সর্ব্বত্র ও-সকল কার্য্যে এক অদ্বৈত সর্ব্বশক্তিমানেরই ক্রিয়ার বিকাশ উপলব্ধি করিতে যে সকল চিত্ত অভ্যস্ত, তাহাদের মধ্যে যে প্রকৃতি, ইচ্ছাশক্তি বা জগতের পাপ ভাবের জন্য দায়ী অপর কোনো দ্বিতীয় কর্ত্তার স্থান থাকিবে না ইহাই স্বাভাবিক ; যেহেতু ঐ "একমাত্র যথার্থ নিয়ামকই" তাহাদিগের মতে সকল ব্যাপারের দায়িত্ব স্বীকারে বাধ্য। ইহুদী রাজা সলোমনও বলিয়াছিলেন যে, অন্যায় ও অবিচারই জগতে চিরজয়ী হইয়া চলিতেছে। কারণ ভগবান (জিহোভা) সমস্ত ব্যাপারকেই বাঁকা করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদিগকে সোজা করিবার সাধ্য কাহারও নাই।

ইসলাম-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই এবং অদ্বিতীয় সর্ব্বনিয়ন্তার কার্য্যে পাপের অস্তিত্ব সমস্যা মোসলেম ভাগবতগণকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করে। তদুপরি পূর্ব্ব-বিধান (predestination) তথ্যের প্রয়োগে ঐ সমস্যা তাঁহারা আরও বেশী ঘোরালো করিয়া তুলেন। তাঁহাদিগের তর্ক-বিতর্কের একটী মূল বিষয় এই দাঁড়াইয়াছিল যে—ঈশ্বরের সুবিচার ও করুণার সহিত তাঁহার ঐ পূর্ব্ব-জ্ঞান বা প্রাক্‌-বিধানের সমন্বয় কেমন করিয়া ঘটানো যায়। কি হিসাবে তিনি যন্ত্রবদ্ধ প্রয়োজনীয়তার খাতিরে একজনকে উচ্চ, অপরকে হীন করার প্রাক্‌-বিধি প্রয়োগ করিতে, অথবা যাহা সত্যই ঘটে তাহা ছাড়া অপর কোনো ঘটনার ভাবী সম্ভাবনা নিরোধ করিতে পারেন। ওমর খৈয়ামের অদ্বৈত-বুদ্ধিও তাঁহাকে এই সমস্যায় ফেলিয়াছিল বলিয়াই বারংবার তিনি এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। তবে ইহুদী রাজার মত গম্ভীর মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া, তিনি নিতান্তই লঘুভাবে এটাকে তাঁহার রঙ্গ-কৌতুকের বিষয় করিয়া তুলিয়াছেন।

অপর পক্ষে, সুফী প্রভাবও যে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই পারস্য-প্রতিভার কেন্দ্রভূমি খোরাসানে জন্ম গ্রহণ করিয়া তিনি যে মোসলেম দার্শনিক অল্‌-কন্দী, অল ফ্যারাবী, আবু-সিনা, ইবনো রোশদ্‌ প্রভৃতি সুবিখ্যাত দার্শনিকগণের মতবাদের সহিত সুপরিচিত ছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। দর্শন-চর্চ্চার ফলে সংশয়-বাদী হওয়া এবং সুফীভাবাভিষিক্ত হওয়ার ফলে, ভগবদ্‌-নির্ভর মনোভাবের অধিকারী হওয়া তাঁহার পক্ষে যেমন সম্ভব, তেমনি স্বাভাবিক।

ওমরের কবি-প্রতিভার একটী বিশেষ স্ফূর্ত্তির দিক তাঁহার রঙ্গ-কৌতুকে ও রসিকতায়।—জাতি হিসাবে পারসিকেরা প্রায়ই মজলিসী ও রসালাপ-নিপুণ এবং তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত গল্প নাটকাদির ভিতর দিয়া বেশ একটী হাসির স্রোত প্রবাহিত দেখা যায়। কিন্তু এই জাতির কাব্য কণিকায় হাসির সুর বিরল হওয়া সত্ত্বেও ওমরের চতুষ্পদীর এইটীই যেন "জান্‌"। অনেক স্থলে মনে হয়, যেন জোর করিয়াই কবি আপন স্বভাবকে নিঙ্‌ড়াইয়া নিঙ্‌ড়াইয়া একটা অদ্ভুত রকমের কিছুতে দাঁড় করাইতে চাহিয়াছেন—যেন বা নিজের একটা কৃত্রিম চরিত্রই লোক-চক্ষে ধরিয়া দেওয়া খুব মজার জিনিস মনে করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ দু'একটী কবিতা উদ্ধৃত করা গেল ;—

"স্বর্গপুরীর হর্ম্ম্যে না কি দেদার হুরি বসত করে
সেথায় না কি অঢেল সুরার উর্ম্মি মুখর ঝর্ণা ঝরে ;
পুণ্যবানের কাম্য ভূমির মর্ম্ম যদি এমনতর—
দোষ কি তবে বরণ করার আগেই এদের মর্ত্ত্য 'পরে ?"

অন্যত্র—

"অন্য বুদ্ধিমানের মতই, সত্য বটে মদটা খাই,
কারণ, আমি ভালই জানি, খোদায় তাহে আপত্তি নাই ;
কালের যখন হয়নি জনম, তখনও তাঁর ছিল জানা
করবে ওমর মদ্য সেবন ; আমি কে—সেই প্রজ্ঞা এড়াই !"

"মদ্যপেরে দোষ দিও না সয় না যাদের মদ্য খেলে,
আমিও হতুম্‌ পান-বিরোধি জগন্নাথের আশীস্‌ পেলে ;
নিজের মাঝে তলাও যদি, দেখবে তবে ধর্ম্মাবতার
তোমার গোপন পাপের পাশে মাতালরা সব দুধের ছেলে !"

কবির রঙ্গ-রসিকতা শুধু যে তাঁহার কোরাণের প্রতি কটাক্ষ বা ভণ্ডামী বা বুজরুকীর প্রতি ব্যঙ্গোক্তিতেই প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নহে। ইহা ততোধিক—ইহা যেন জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধেও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গী। নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটীর ভঙ্গী লক্ষ্যস্থানীয়—

"ধৌত ক'রো মদ্য ধারায় যখন আমার মরণ হবে
নিখুঁত ক'রো ঊর্দ্ধদেহিক সুরেশ্বরীর একটী স্তবে ;—
নেহাৎ যদি খোঁজ পড়ে মোর শেষ বিচারের সাজার লাগে'
পানশালার এই ভীতের নীচে কবরটা তো বেঁচেই রবে।"

অন্যত্র এই একই রঙ্গের রংমশাল জ্বলিয়াছে—

"বাড়িয়ে দিয়ে নিজের গলা আমার সুরার বাঁধন পরি,
উজল তাহার হাসির লোভে জীবনটাকেও তুচ্ছ করি ;
ইতর জনে শোষণ করে সুরা-দেবীর জীবন-শোণিত
লোলুপ করে বোতলখানার মরাল গ্রীবা মটকে ধরি।"

নেশাখোর মাতাল শ্রেণীর সহিত ওমরের সুরা-বিলাসের পার্থক্য খুঁজিতে চাহিলে উদ্ধৃত চতুষ্পদীটী পাঠকের কাজে লাগিতে পারে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিচারপরায়ণ তার্কিকদের বিদ্রূপ করিয়া ওমর এ সম্বন্ধে অন্যত্র বলিয়াছেন—

"মদিরা পান দোষের, তবে সাবধানেতে সঙ্গী বাছো
চিন্তা ক'রো তুমিই বা কে, ওই বা কে যার প্রসাদ যাচো,
পানটি ক'রো স্বেচ্ছাসুখে ; এ তিন দফার বিধান মেনে
বিষম রকম বিজ্ঞ ছাড়া মদিরা কা'র রুচবে আঁচো ?"

এ বিষয়ে আর উদাহরণ বাড়ানো অনাবশ্যক। রুবাইএর পর রুবাই এইরূপ চাপা হাসির দীপ্তিতে উজ্জ্বল। প্রকৃত পক্ষে, এই রঙ্গ-প্রিয়তাই কবি ওমর খৈয়ামের রচনাবলীর প্রাণ স্বরূপ।

আসল কথা, চন্দ্রে কলঙ্কের মতন একাদশ শতাব্দীর পারসিক প্রজ্ঞার জীবন্ত বিগ্রহ ওমর খৈয়ামের চরিত্রে এ সকল ত্রুটী আমরা উপেক্ষার চক্ষেই দেখি—কিন্তু উহার অস্তিত্ব অস্বীকার করি না। কবি স্বয়ংও কোন প্রকার ভান করেন নাই।

সুরা ও সাকী-প্রীতিই অবশ্য ওমরের কবি-প্রতিভার সর্ব্বস্ব নহে। তাঁহার জগৎ-যোড়া কবি-যশের কারণ অবশ্য অন্যত্র খুঁজিতে হইবে। চিররহস্যময় জীবন-মরণের সমস্যা, ভগবান ও অমরত্ব, ইহজগৎ ও পরলোক প্রভৃতি গুরুতর বিষয়সমূহও তাঁহার কাব্যের উপাদানরূপে গৃহীত হইয়াছে—কিন্তু স্বভাবত: একটী স্বাধীন ও লৌকিক-প্রথা-নিরপেক্ষ চিত্তের অধিকারী হওয়ায়, ঐ সকল সমস্যায় যেরূপ সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হইয়াছেন, তাহা তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত মতামত ও সাধারণ ধর্ম্ম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে স্পষ্টই যেন সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিল। তাঁহার দার্শনিক মতিগতি দুঃখবাদপ্রবণ হওয়ায় প্রথমত: উহা সংশয়ে দুলিতে

থাকে, এবং ক্রমে ভগবৎ-বিধিকে যেন অস্বীকার করিতেই উদ্যত হয়। মানুষের জীবন-পরিচালনায় কোনো করুণাময় ভগবানের কল্যাণ-হস্ত অপেক্ষা কঠোর ভাগ্য ও অন্ধ অদৃষ্টই তাঁহার চক্ষে অধিক করিয়া পড়ে। সেই জন্যই স্বভাবতঃ পরলোক অপেক্ষা ইহলোক এবং ভবিষ্যৎ অপেক্ষা বর্ত্তমানই তাঁহার অধিকতর আলোচ্য হইয়া উঠে। এক কথায়, তাঁহার চিন্তার গতি সাধারণ গ্রাহ্য মোসলেম ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী হইয়া পড়ে। একমাত্র এই কারণেই, পারস্য সাহিত্যে হাফিজ ও ফির্দ্দোসীর নাম বারংবার সসম্মানে উল্লিখিত হইলেও, ওমরকে বহুকাল অবজ্ঞাতই থাকিতে হয়। ওমরের মৃত্যুর এক শত বৎসর পরে লিখিত নজমউদ্দিন রাজীর "মিরসাদ উল-বিলাদ" নামক সুফী ধর্ম্ম ব্যাখ্যানমূলক পুস্তিকায় ওমরের বিরুদ্ধে যে মন্তব্য আছে, তাহা হইতে বুঝা যায়, কোরাণের আলোকে যাঁহারা জগৎ-সংসার দেখিতেন, ওমরের বিরুদ্ধে তাঁহারা কিরূপ খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। সে মন্তব্যটী এখানে উদ্ধৃত হইল—

"নির্ম্মল, সমুন্নত ও অপার্থিব আত্মাকে সঙ্কীর্ণ পার্থিব আধারে আবদ্ধ করিয়া পুনরায় ঐ ছাঁচ হইতে বিচ্ছিন্ন করার মূলে যে কি গভীর জ্ঞান বিদ্যমান তাহা সুপরিজ্ঞাত। দেহকে ধ্বংস করিয়া শেষ বিচারের দিন উহার উপাদানগুলিকে বিক্ষিপ্ত ও আত্মাকে প্রাণবন্ত করিয়া তোলার উদ্দেশ্য যে মানুষকে "কোরাণ-নির্দ্দিষ্ট ভ্রান্তি" * এড়াইতে সাহায্য করা এবং যাহাতে "অজ্ঞানের যবনিকা" † পার হইয়া তাহারা আপন আপন রুচি ও অনুরাগকে সত্য পথে চালিত করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাদিগকে মনুষ্যত্বের উচ্চতর সোপানে উন্নীত করা, ইহাও সকলের জানা আছে। কিন্তু যে সমস্ত হতভাগ্য দার্শনিক ও জড়বাদী এই করুণাযুগল হইতে বঞ্চিত এবং মতিভ্রষ্ট, তাহারা এমন এক মহা মনীষীর সহিত নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে, যে আপন প্রতিভা, বিদ্যাবত্তা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিজ্ঞতার জন্য তাহাদের মধ্যে সুবিখ্যাত ছিল। সেই মনীষীর নাম ওমর খৈয়াম। সে যে কত বড় নির্লজ্জ ও নষ্টমতি, তাহার পরিচয় পাইতে হইলে তাহার রচিত বক্ষ্যমান শ্লোক দু'টীই পর্য্যাপ্ত হইবে—

"দেখছো যে এই গোলকখানা, মোদের আগম-নিগম গড়া
কোথায় এটার আরম্ভ আর কোথায় বা শেষ, যায় না ধরা ;
কেউ পারে না এই জগতে,—বাৎলে দিতে সহজ কথায়
কোত্থেকে হয় হেথায় প্রবেশ কোথায় বা হয় বেরিয়ে পড়া।"

* * * *

"স্রষ্টা যখন দিয়েছিলেন স্বভাবগতি নির্দ্ধারিয়া
হ্রাসের এবং নাশের অধীন করাটা তায় কেমন ক্রিয়া ?
কুরূপ যদি ইহার গঠন,—দায়ী কে সে খুঁতের লাগি ?
নিখুঁত যদি—ধ্বংস করা কেনই বা ফের কও তো মিঞা ?"

* "তাহারা জানোয়ারের দল—না—বুঝি বা তাহা অপেক্ষাও ভ্রান্ত"—সুরা ৭।৫।১৭৮

† তাহারা বর্ত্তমানের বাহ্য দিকই দেখে, কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিতান্ত অন্ধ। সুরা ৩০।৫।৬।

কিন্তু নজমউদ্দিন রাজীর নিকট কোরাণের গভীর জ্ঞান যতই সুপরিজ্ঞাত হউক না কেন, ওমর খৈয়াম অবশ্য উহার গোঁড়ার কথাই মানিয়া লইতে পারেন নাই। মানুষের সকল কর্ম্মের প্রাক্-বিধান যে গ্রন্থ প্রচার করিতেছে, সে আবার মানব-স্বভাবের "ভ্রান্তি" "অজ্ঞান" প্রভৃতির কথা তোলে কেন ? সে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ভগবানের "করুণা" হইতে কোনো কোনো "হতভাগ্য" বঞ্চিতই বা কেন ? নিজেদের দোষে ? একই বিশ্বাসে "প্রাক-বিধান" ও "মানুষের দায়িত্ব" স্বীকার করায় মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে যে যুক্তি-বিরোধ প্রকাশ পাইয়াছে, ওমরের দার্শনিক চিত্ত তাহা লক্ষ্য না করিয়া থাকিতেই পারে নাই ; সুতরাং এ হেন শাস্ত্রের অন্ধ সামন্তে তিনি কোনো সান্ত্বনাও পান নাই। ইহা খুবই সম্ভব যে তৎকালীন মোল্লা সম্প্রদায়ের বুজরুকি ও লোক-দেখানো ধার্ম্মিকতার ক্রিয়া-পদ্ধতি তাঁহার মনকে নিতান্তই তিক্ত করিয়া তুলিয়াছিল—অন্ততঃ তাঁহার জিজ্ঞাসু চিত্তকে ধর্ম্মান্ধ ইমামদিগের বাহ্য ধর্ম্মাচরণের বা সুফীদিগের রহস্য-গূঢ় সঙ্কেতের ভেল্কির সাহায্যে অভিভূত করা নিশ্চয়ই সম্ভব ছিল না। প্রচলিত সুফী দর্শনের মধ্যে তৃপ্তি পাইতে অথবা কোরাণের অপৌরুষেয়ত্বের বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে না পারিয়া এবং এতদুভয়ের ভিতর জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন গ্রহণযোগ্য অর্থারোপের চেষ্টাই না দেখিয়া তিনি তৎকালীন ধর্ম্মবিশ্বাস হইতে স্খলিত হইয়া পড়েন। কিছুই তাঁহাকে জীবন্মৃত্যুর বিপুল রহস্যভেদে সাহায্য করিতে না পারায় তিনি বিশ্বাসের আলোকিত দিকে আসিতে অক্ষম হন, এবং বারংবার তিক্ত অনুশোচনায় এই বলিয়াই আর্ত্তনাদ করেন যে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য সমস্ত হৃদয় পাতিয়া দিয়াও এইটুকুমাত্র তিনি দেখিতেছেন যে জগতে তাঁহার আগমনও যেমন উদ্দেশ্যহীন হইয়াছে, এখান হইতে নিষ্ক্রমণও সেইরূপ হইবে—

"বিশ্বভুবনখানির কোলে কোত্থেকে বা কোন্ কারণে
কিছুই নাহি বুঝতে পারি আস্‌ছি ভেসে স্রোতের টানে ;
শূন্য কার এ কোল আবার দমকা-হাওয়ার ঘূর্ণী বেগে—
বেরিয়ে যাবো কোথায়, কেন,—পাইনে রে তার কোনই মানে।"

পানোৎসব বা জীবনের আমোদ-প্রমোদে তাঁহার অন্তরের বেদনাময় শূন্য স্থান পূর্ণ হইবার নহে ; ফলে প্রাণের ঔৎসুক্য পরিতৃপ্ত করিবার উপায়াভাবে তিনি নিতান্তই অসুখী ও অশান্ত। হৃদয় নিশ্বাসপূর্ণ, অথচ ঐশী নিয়মকে ধরা-ছোঁয়া চলিতেছে না—এই ঘটনাই তাঁহাকে উত্তেজিত ও ক্লিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে, তাঁহার অধীত জগৎসমূহের মধ্যে মানুষের চিন্তা, অনুরাগ ও উদ্দেশ্যমূলক জগৎটী মাত্রই তাঁহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা সত্য—অথচ "কোথা হইতে" "কি জন্য" বা "কোন্‌খানের" সমস্যা-সমাধানে মানব চিত্ত যে শক্তিহীন, ইহা তাঁহার অসহ্য। জীবনের প্রতি বিস্ময়-দৃষ্টিপাত ছাড়া ইহা হইতে তাঁহার অন্য কোন লাভেরই আশা নাই। তাঁহার আসায়, বাঁচিয়া থাকায় বা যাওয়ায়, কোন সম্ভাব্য উদ্দেশ্যের ভরসা কোনো দিকেই দেখা যাইতেছে না। এরূপ অবস্থায় তাঁহার সমসাময়িক অনেকেই হয় তো রহস্য-বাদকেই চরম আশ্রয়-ভূমি করিয়া লইতে পারিত, অথবা তাহাই লইয়াছিল।—আবার কেহ বা হয় তো ভগবৎ-নির্দ্ধারিত

নিখিল চরাচরের নিত্যকালীন সম্বন্ধের উপর ইসলামধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ঘটে নাই জানিয়াও একটা লৌকিক ধর্ম্ম-জ্ঞানকেই আশ্রয় করিয়া খুসী থাকিতে পারিত; কিন্তু ওমরের স্বচ্ছ বিবেক-বুদ্ধি, এবং নিজের নিকট খাঁটী হৃদয় উক্ত পন্থা যুগলের কোনটীকেই অনুমোদন করে নাই।

আলোকের জন্য ওমরের গভীর অনুসন্ধিৎসার মূলে এই ধারণাই দৃঢ় ছিল যে, মানব মনীষার এমন কোন শক্তি থাকিতে পারে না, যাহা ভগবানের দেওয়া নহে, অথবা এমন কোন স্বাস্থ্যকর প্রবণতাও থাকিতে পারে না যাহা স্রষ্টার দান নহে। সুতরাং তাঁহার চিত্তের যে অনুসন্ধিৎসা একমাত্র ভগবানই তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত করিতে পারেন। যদি ভগবানের দেওয়া এই মানব বুদ্ধি ভগবানের উদ্দেশ্য বুঝিবার পক্ষে তাহার একটুও সহায় না হয়—অথচ এই উদ্দেশ্যটী বুঝিবার জন্যই ওমর খৈয়াম সর্ব্বান্তঃকরণে ব্যগ্র—তবে মানুষকে উহার অধিকারী করা কেন?

জগৎ সংসার একটী সুনিয়মিত উদ্দেশ্যজাল বিস্তার করিয়া চলিয়াছে এবং এই কার্য্য সাধন করিতে করিতে, যাহারা শুনিতে জানে, তাহাদিগকে যেন বলিয়াও চলিয়াছে যে, এ সমস্তের ভিতর এমন একটী আত্মা বিরাজমান—যাহা সমস্তই জানিতেছে, সমস্তই বিবৃত রাখিয়াছে। যাহারা দেখিতে জানে, তাহারা বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তরে যেন একটী ব্যক্তিত্বেরই সন্ধান পায়, জগতের সুশাসিত ও ধারাবাহিক অবস্থাটী তাহাদিগকে যেন ইহার কোনো স্রষ্টা বা চালকের অস্তিত্ব স্বীকারেও অনুপ্রাণিত করে। মানবাত্মা স্বতঃই একটী উচ্চতর আত্মার সঙ্গ খুঁজিয়া বেড়ায় এবং প্রকৃতিকেই প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ভগবান অন্বেষণের একটী উপায় হিসাবেই গ্রহণ করিতে চায়।

ওমর খৈয়াম নিজেকে বিশ্ব-প্রকৃতির বিবিধ প্রয়োজনীয় ও নয়নাভিরাম রূপরাজির মধ্যে অধিষ্ঠিত দেখিতেছেন—এত সুন্দর ও প্রয়োজনীয় যে, তাহার মধ্যে অপর উদ্দেশ্যও নিহিত না থাকিয়া পারে না; অথচ তাহারা এতই বিচিত্র যে মানব-চিত্তের ধারণা-শক্তি উহাদিগকে আয়ত্ত করিতেও অক্ষম। বিকশিত গোলাপ গুচ্ছ, বীণাকণ্ঠ বুলবুল, নদীতটস্থিত উদ্যান, বহু সন্তানের গরীয়সী জননী ধরিত্রী গর্জ্জনালোড়িত সাগর, সীমাহারা নীলাকাশ অসংখ্য উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক এবং সর্ব্বশেষ মানব স্বয়ং, এই সমস্তই এমনি একটী নিগূঢ় অস্তিত্বের আভাস প্রদান করিতেছে, যাহা সমস্তকেই ভরিয়া রাখিয়াছে, সমস্তকেই এক সম্বন্ধ সূত্রে বাঁধিয়াছে। কি উদ্দেশ্যে এই বিশাল বহির্জগৎ উন্মুক্ত গ্রন্থখানির মত পাঠক আকর্ষণ করিতেছে? উদ্দেশ্য আলোপে অনভ্যস্ত সুফী পদ্ধতির প্রতিকূলে ওমর এ সমস্তের অন্তর্নিহিত কারণ আবিষ্কার করিতে চাহিয়াছেন, একটী উদ্দেশ্যময় পরিকল্পনাকে হিসাবের ভিতর করিয়া পাইবার আশা রাখিয়াছেন এবং সেই গূঢ় অভিসন্ধিটী ব্যক্ত করিবার জন্য বারংবার ভগবানের উদ্দেশে দরবারও করিয়াছেন। মানুষের অসম্পূর্ণ শক্তি যে পরিণতিসম্ভাবনাহীন বীজের অনুরূপ হইতে পারে, এরূপ ধারণা তিনি হয়, তবে চিরন্তন ঐশী নিয়ম কেন না তৎসমূহের উপযোগী করিয়া সংঘটিত হইবে! কিন্তু জীবনে তিনি কি দেখিতে পাইতেছেন? জগতে কে যেন তাঁহাকে ছুট করাইয়া আনিল, আবার তেমনিই ছুট করাইয়াই জগতের বাহির করিয়া দিল—তাঁহাকে পছন্দ অপছন্দের কোনো অবকাশই দিল না; তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনখানির অভিপ্রায় স্পষ্ট হইতে না হইতেই জগৎ-জীবন হইতে তাঁহাকে ছিঁড়িয়া ফেলা হইল। কখনও আপনার দৌর্ব্বল্যের, কখনও বা শক্তির অনুভূতি ঘটিতেছে, অথচ এই পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের অধিকার থাকার সহিত ভগবৎ-মর্য্যাদার যোগাযোগটী বুঝিয়া পাওয়া যাইতেছে না বলিয়াই তাঁহার সমস্ত অন্তরাত্মা কাতর। ফলে, ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মের ভিতর মারাত্মক অপূর্ণতাই তিনি দেখিতেছেন—তবু এইটুকুই বুঝিতেছেন না যে নিজে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী না হইলে এরূপ অসম্পূর্ণতার অভিযোগ অসঙ্গত; যেহেতু সীমাবদ্ধ মানব কেমন করিয়া সীমাতীতের ধারণা আশা করিতে পারে? তবে, ঐশী নিয়মের কল্পিত ত্রুটীর বিরুদ্ধে তাঁহার আপত্তি প্রকাশের ভিতর কোনরূপ অশ্রদ্ধা বা রুক্ষ নাস্তিকতার যে আভাষ মাত্রও দেখা দেয় নাই, এইটুকুই ওমর খৈয়ামের বৈশিষ্ট্য।

"কারে শুধাই—এই দেশেতে এলাম ছুটে কোথ্‌থেকে সে?
কারে শুধাই—এ দেশ থেকে যাবেই বা কোন নিরুদ্দেশে?
পাত্র ভরি' পুনঃ পুনঃ নিষিদ্ধ ঐ সুরার ধারায়
ডুবাও স্মৃতির বেয়াদবি,—ভাবনা-ভীতি যাক রে ভেসে।"

পৃথিবীতে আসা যাওয়ার উপর যখন নিজের কোনই হাত নাই, এবং গোলকধাঁধাগুলির সমস্যা-সমাধানেরও কোনো সম্ভাবনা নাই, তখন সাকীর নিকট পিয়ালার দাবী করাই মন্দের ভাল। মহম্মদের নিকট আত্মপ্রকাশের ভিতর দিয়া আল্লা যখন সুরার বিরুদ্ধে নিষেধ-বিধিই প্রচার করিয়াছেন, অপর পক্ষে, মানুষের আত্মতৃপ্তিরও সুব্যবস্থা করিবার জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব নহেন—তখনি ভগবানের চক্ষে যাহা মন্দ ও নিষিদ্ধ, তাহাই সর্ব্বাগ্রে গ্রাহ্য করিয়া প্রতিশোধ লওয়া ছাড়া আর কর্ত্তব্য কি? ক্ষণিক উল্লাসের ভিতর দুশ্চিন্তাগুলি যত ডুবাইয়া রাখা যায় ততই ভাল। ইহা খুবই সম্ভব যে আইন ভঙ্গ করার উগ্র আমোদ ছাড়াও, ভাব-সাধকদের দশা-প্রাপ্তির চেষ্টাকে বিদ্রূপ করাও ওমরের উদ্দেশ্য। উপবাস ও নিদিধ্যাসনের ফলে যে অবস্থা তাঁহারা লাভ করিতে চান, ওমর যেন এই নিষিদ্ধ সেবন উন্মাদের সাহায্যেই তাহা প্রাপ্ত হইতে পারেন। সুফীরা যেমন ঈশ্বরের সহিত যোগ সাধনের উপযোগী একটী বিশেষ অবস্থার অনুশীলন করিয়া থাকেন, ওমরও তেমনি ঈশ্বরকে আমলে না আনিবার জন্য সেই একই অবস্থা লক্ষ্য করিবেন। ভাব-পন্থীগণের অভ্যাসের হাস্যজনক অনুকরণে তিনি যেন ভাব-সাধনা-ব্যাপারটীকেই হাসিয়া উড়াইবেন। ব্যঙ্গ, বিদ্রোহ ও হতাশাময় অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া সেই ভগবৎ-অস্তিত্বেরই নিশ্চয়তার জন্য অধিকতর ব্যগ্রতা তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছে, যে ভগবানকে অজ্ঞভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত মনে করিয়াও তিনি সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিতে অক্ষম। নৈরাশ্যের প্রচার-বাণীতে বা দুঃখের পীড়নে যে বিষাদ-গীতি বাজিয়া উঠে নাই, ওমরের এই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ বিদ্রোহী আত্মা

"ভুবন হ'তে বাজিয়ে সপ্ত-স্বর্গ-তোরণ-বিজয়-ভেরী,
ঊর্দ্ধলোকে শনৈশ্চরের সিংহাসনও এলাম ঘেরি ;
গমন-পথে কতই না সে রহস্যজাল ছিন্ন হ'ল ;
খুললো না কো শক্ত বাঁধন কেবল যা' এই অদৃষ্টেরি।"

ওমারের রুবাইগুলিতে সপ্ত তোরণ বা সপ্ত স্বর্গের উল্লেখ বহুবার দেখা যায়। ঊর্দ্ধতম স্বর্গে—তপোলোকে—ঈশ্বরের আসন রক্ষিত এবং ওমর খৈয়াম উপবাস ও প্রার্থনার সাহায্যে নিজেকে এই স্বর্গে উন্নীত করিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, চিত্তের একটী বিশেষ প্রকার ভাবান্তর সংগঠনের দ্বারা ভগবানের সহিত ঐহিক যোগ-সাধনের সম্ভাবনায় বিশ্বাস ভাব-সাধন-প্রণালীগুলির অঙ্গীভূত। বেদান্ত, অবশ্য, এই যোগ দু'টী বিভিন্ন অস্তিত্ব হিসাবে ভগবানের সহিত মানবের যোগ বলিয়া স্বীকার করেন না—বরং মানুষের যথার্থ স্বরূপেরই পুনঃপ্রাপ্তি বা ঈশ্বরত্বে মানুষের বিকাশ বলিয়া মানেন। তাঁহার মতে মায়িক অজ্ঞান বশতঃই এই স্বরূপ বুদ্ধি লুপ্ত বা সুপ্ত হইয়া থাকে। জ্ঞানানুশীলনের ভিতর দিয়া ওমর খৈয়ামও এক অজ্ঞাত উপায়ে ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন। সে রহস্যময় ভাব-মিলন দেহ-বন্ধের ভিতর হইতে বা দেহের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া, তাহা ওমর খৈয়াম বলিতে পারেন না। তবে এটুকু তিনি জানেন যে, অনেক মিথ্যার ও ভ্রমের বন্ধন তাহাতে ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং বহু বাধাবন্ধও তাহাতে দূরে সরিয়া গিয়াছিল। একটী পরমানন্দময় মিলনানুভূতিতে ক্ষণকালের জন্য তাঁহার আকারগত অস্তিত্ব যেন লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি যেরূপ আশা করিয়াছিলেন, সে মিলনের ফল সেরূপ হয় নাই। চরমতম রহস্যটীর মর্ম্মোদ্ধার করিতে পারিবার পূর্ব্বেই পৃথিবীতে তাঁহাকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়—সে রহস্য জীবনের, মৃত্যুর শাশ্বত-পুরুষের।

"দেখনু সে এক রুদ্ধ দুয়ার—গেল না তার চাবিই পাওয়া,
দুলছে কি এক কুহেলী-জাল যাহার পারে যায় না চাওয়া,
মুহূর্ত্তকাল "তোমার" "আমার" একটী দু'টি ক্ষণিক কথা—
তাহার পরে দোঁহার মাঝে বিস্মরণের বইল হাওয়া!"

যে যবনিকা রহস্য-রাজিকে আচ্ছন্ন করিয়া লম্বমান, তাহার আড়াল হইতে তোমার আমার একটু আলাপ ঘটিল—তার পর কোথায় তুমি—কোথায় আমি!

এই রুবাইটীর যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিবার জন্য সুফী কবি ফরিদউদ্দীন আত্তর হইতে দু'টী উদ্ধৃতি দিয়া ইহার উদ্দিষ্ট অদ্বৈতবাদকে কতক পরিমাণে বোধগম্য করা যাইতেছে।—

"রহস্য-যবনিকা পার হইতে জগৎ-স্রষ্টা দায়ুদকে বলিলেন, আমার প্রতীক মাত্র, যদি ইহা সেই আমি না হই, যাহার প্রতীক বা সমকক্ষ তুমি খুঁজিয়া পাইবে না। যেহেতু কিছুতেই আমার বিনিময় হইতে পারে না। সেজন্য আমাতেই বাস করা বন্ধ করিও না। আমিই তোমার অন্তরতম আত্মা। আমা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিও না। আমি অনিবার্য্য, তুমি আমার আশ্রয়-সাপেক্ষ, আমা হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কামনা করিও না।"

নিরবধিকাল আমিই তুমি এবং তুমিই আমি—আমরা উভয়েই এক। তুমিই আমি হও, অথবা আমিই তুমি হই, এ ব্যাপারে কোনো দ্বৈত আছে কি? হয় আমিই তুমি এবং তুমিই আমি, কিম্বা তুমি, স্বয়ং তুমিই। চিরদিনই যখন তুমিই আমি ও আমিই তুমি, তখনি আমাদের দুটী দেহ একই। এই শেষ কথা।"

এটী ভগবানের সহিত মিলনের, সুফী মতাবাদসুলভ একটী উদাহরণ এবং সম্ভবতঃ ভারতীয় বৈদান্তিক মতই ইহার উৎস।—এই মতের সহিত ওমর খৈয়াম নিশ্চয়ই সুপরিচিত ছিলেন, এবং সম্ভবতঃ উভয় পদ্ধতির মধ্যেই সত্যান্বেষণের চেষ্টাও করিয়াছিলেন। ভারতীয় উপনিষদের জ্ঞানাভাস ওমরের অনেক চতুষ্পদীতে স্পষ্ট লক্ষিত হয় এবং ছান্দোগ্য উপনিষদের "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" আনুষঙ্গিক উপদেশগুলি হইতেও প্রাচ্য অদ্বৈতবাদের মূল কথাটী এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে। আপন স্বাতন্ত্র্য ঘুচাইয়া পুনরায় ভগবানে পরিণতি লাভের জন্য, সাধকের আত্মহারা হওয়ার ঐকান্তিক লক্ষ্যের দৃষ্টান্ত জলালউদ্দিন রুমির প্রদত্ত এক উপভোগ্য উদাহরণ হইতে স্পষ্ট করিতেছি—

"একজন প্রিয়তমের (ঈশ্বরের) দ্বারে আসিয়া করাঘাত করিতে লাগিল। ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল, "দুয়ারে কে?" আগন্তুক উত্তর করিল,—"আমি"। ভিতরের স্বর বলিল—"এ বাড়ীতে তোমার ও আমার উভয়ের স্থান নাই।" দ্বার খুলিল না।

অতঃপর প্রেমিক (মানবাত্মা) নিরুদ্দেশে প্রস্থান করিল এবং নির্জ্জনে প্রার্থনা ও উপবাসাদিতে মন দিল।

বর্ষ পরে পুনরায় প্রিয়তমের রুদ্ধ দ্বারে আসিয়া সে করাঘাত করিল। ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল—"কে?" উত্তরে প্রেমিক বলিল—"তুমিই"। দুয়ার খুলিয়া গেল।

অবগুণ্ঠিতা প্রকৃতির কোলে, ওমরও জ্ঞানান্বেষণের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, কোনো এক সুলগ্নে এমনই এক ভগবৎ-সমাধিলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু অবগুণ্ঠন আবার স্বস্থান-লগ্ন হইয়া গেল—তুমি ও আমি পৃথক সত্তায় বিচ্ছিন্ন হইল;—অদৃষ্ট-রহস্য অনাবিষ্কৃতই রহিল। সসাগরা ধরণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া ওমর খৈয়াম কোনো উত্তর পাইলেন না। আবর্ত্তিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী নির্ব্বাক চাহিয়া রহিল—একাদশ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি স্তম্ভিত হইয়া গেল। অবশেষে নৈরাশ্যভরে,—

মৃৎ-পিয়ালায় মিলিয়ে দিলুম অধরখানি
রহস্যটীর অর্থটুকু প্রকাশ পথে আন্‌তে টানি',
ওষ্ঠে ওষ্ঠে বল্‌লে সে গো—"পান ক'র ভাই যাবজ্জীবন
বারেক ম'লে ফিরবে না আর এই কথাটীই আসল জানি।"

যেন বা একটী দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত অবোধ্যকে বুঝিবার আশা ক্ষণকালের জন্য ছাড়িয়া ওমর স্থির করিলেন—"আচ্ছা, চুলোয় যাও আপাততঃ; ফূর্ত্তির সাহায্যেই তোমাকে প্রমাণ করিব; অতএব "দে আও পিয়ালা!"

পিয়ালা অধর পরশের সঙ্গে সঙ্গেই সকল বদল হইয়া গেল—ওমরের মনে হইল;—

"উচ্চারিল ঐ কথা যে কুহরণের আভাস তাবায়—
ঐ পিয়ালাও ছিল সজীব দুঃখে, সুখে, ক্ষুৎপিপাসায়
হয় তো কোন অতীত যুগে ; শীতল তাহার এই অধরই
কতই চুমার আদান প্রদান করতো তখন দিবস নিশায়।'

বাক্যহারা প্রাণহীন বস্তুর প্রতি সহানুভূতির উদ্রেকে কল্পনা-শক্তি অন্তরতম প্রকৃতিকে আঘাত করিল। "বনস্পতি ওষধিতে দেবতার অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য" কথা তাঁহার স্মরণে জাগিয়া উঠিল—জগৎ ও জগদীশ্বরের ঐক্য বিষয়ক যে বিশ্বাস তাঁহার মধ্যে বহুকাল আছে তাহারই সুর সুরাপাত্রের ভিতর হইতেও বাজিয়া উঠিল। *

"ছন্দ-হিল্লোলের" প্রতিবাদ

শ্রীরামেন্দু দত্ত

শ্রীযুক্ত ভবানী মুখোপাধ্যায় মহাশয় অগ্রহায়ণের 'ভারতবর্ষে' "ছন্দ-হিল্লোল" নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি বলেছেন "হয় ত এটা ভারী সংক্ষিপ্ত।" বাংলা কবিতার ছন্দ সম্বন্ধীয় আলোচনা এখনও সংক্ষিপ্ত হ'লে ততটা দোষের হবে না ; কিন্তু এ প্রবন্ধে সংক্ষিপ্ততা ও অসম্পূর্ণতার সঙ্গে অনেকগুলি অসঙ্গতিও চোখে পড়লো ব'লেই আমার এই প্রতিবাদ।

আধুনিক (রাবীন্দ্রিক যুগের) কবিতার ছন্দ সম্বন্ধে কোনো ভাল বই এখনও রচিত হয় নাই। লোহারাম শর্ম্মার ব্যাকরণের শেষের কয়েক পৃষ্ঠা আর সুবল মিত্রের অভিধানের অন্তর্গত ছন্দ সম্বন্ধীয় কথা, যেমন আধুনিক বাংলা কবিতার ছন্দের কোনো ধারই ধারে না,—এতাবৎ বিভিন্ন মাসিকে, কবিতা লেখেন না এমন লেখকদের দ্বারা আলোচিত ছন্দ কথাও তেমনই কার্য্যানুপযোগী। যে চাবিকাঠিটি পেলে রবীন্দ্রনাথের ও তৎপরবর্ত্তী কবিদের কবিতার ছন্দ নিরূপণ করা সহজ হয়ে যায়, যেটি দিয়ে আধুনিক বাংলা কবিতার ছন্দ-রহস্যের সব ক'টি দরজাই উন্মুক্ত হ'তে পারে, সেই চাবিকাঠির সন্ধান, এগুলির কোনোটিতেই পাওয়া যায় না। স্কুল-কলেজের ছাত্র ও অছাত্র অনেক তরুণ কবিকে অনেক সময়ই প্রশ্ন করতে শোনা যায় "ছন্দ শিখতে হ'লে কোন্ বইটা পড়বো ?" বলা বাহুল্য, তাঁরা তাঁদের প্রশ্নের সদুত্তর পান না। সংস্কৃত "ছন্দোমঞ্জরী" পড়লে সংস্কৃত ছন্দ আয়ত্ত করতে পারা যায় ; কিন্তু বাংলা কবিতার ছন্দ আর সংস্কৃত কবিতার ছন্দ, এক নিয়মের অন্তর্গত নয়। 'ছন্দ শেখা' বলতে এঁরা এ-রকম একটা বই খোঁজেন্ যা' পড়লে যে-কোনো বাংলা কবিতার এঁরা যতিবিভাগ, ছন্দ-নিরূপণ, মাত্রা বা স্বরগণনা (Scan করা) প্রভৃতি করতে পারবেন ও নিজেদের কবিতাগুলিকেও নির্ভুল ছন্দে লিখতে পারবেন। লোহারাম শর্ম্মার ব্যাকরণে, সুবল মিত্রের অভিধানে অথবা মাসিকপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। এ-রকম ছন্দ শেখার জন্যে যে বইখানার দরকার হবে, তা'তে খুব বেশী কথা থাকবে না, হেঁয়ালী, বিজ্ঞতার ভান কিছুই থাকবে না। কারণ সমস্ত বাংলা কবিতাই, কি আধুনিক কি অতিআধুনিক, একটা অতি সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দ্দিষ্ট ছন্দ বিভাগের মধ্যে ধরা প'ড়ে যায়। সে ছন্দ-বিভাগটি যেমন সহজ-বোধ্য তেমনই সাধারণ।

মোটা মোটা কথা খুব আড়ম্বর ক'রে দামী ভঙ্গীতে আউড়ে গেলে গুরুগম্ভীর ছাঁদের প্রবন্ধ হ'তে পারে বটে, কিন্তু যাঁদের জন্যে এই সব প্রবন্ধ তাঁরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যা'ন! ছন্দে কবিতার বই লেখা আর কবিতার ছন্দ সম্বন্ধে বই লেখা এক কথা নয় ; কিন্তু আমার বরাবরই কেন যেন মনে হয়, যে একটা করে তারই অপরটায় হাত দেওয়া উচিত। নইলে শ্রীযুক্ত ভবানী মুখোপাধ্যায়ের মত, যাঁরা কবিতা লেখেন না, তাঁদের যে সমস্ত দোষ ও অসঙ্গতি থাকা স্বাভাবিক, তা' এ জাতীয় প্রবন্ধে থেকেই যাবে।

যাক, এবার ছন্দ হিল্লোলের মধ্যে যেখানে যেখানে আমার আপত্তি আছে, সেগুলির উল্লেখ ও আলোচনা করে আমার বর্ত্তমান বক্তব্য শেষ করি। মুখোপাধ্যায় মহাশয় ছন্দের যে শ্রেণীবিভাগ ক'রেছেন তা'তে আমার আপত্তি আছে। তিনি বাংলা ছন্দের যে দুটি প্রধান শাখা নির্দ্দেশ ক'রেছেন, তা এই—

১। সম বা যতিযুক্ত—'সম'-ছন্দ আর 'যতিযুক্ত' এক কথা নয়। সম ছন্দ অর্থে ভবানীবাবু, যে সব কবিতার এক চরণের সঙ্গে অন্য চরণের অক্ষর, মাত্রা অথবা স্বরের ঐক্য আছে, তাদেরই কথা বলেছেন ; ইংরাজিতে যাকে বলতে পারা যায় regular, সম-ছন্দ তাই। কিন্তু 'যতিযুক্ত' কথাটি এ ক্ষেত্রে নিরর্থক ; কারণ কবিতামাত্রেই যতিযুক্ত। 'যতি' হচ্ছে শ্লোক, কবিতাদি পাঠের সময় জিহ্বার ইষ্ট বিরামস্থান। সুতরাং কবিতামাত্রেই যতিযুক্ত হবে। না থেমে একটানা এক-নিশ্বাসে কোনো কবিতা পড়তে হয় ব'লে আমার জানা নাই।

২। অসম বা যতিহীন—'অসম'-ছন্দ কথাটা বোঝা যায়। যে সব কবিতার মধ্যে একটি চরণ অপরটি অপেক্ষা অক্ষর, মাত্রা অথবা স্বর সংখ্যায় বিভিন্ন, অর্থাৎ ইংরাজিতে irregular metre বলে, অসম-ছন্দ তা'-ই। কিন্তু 'যতিহীন' আবার কি? যতিহীন-ছন্দ বলা খুবই ভুল হয়, বরং অনিয়মিত যতি-বিশিষ্ট ছন্দ হ'তে পারে।

তার পর ভবানীবাবু ছন্দ বিভাগ করতে গিয়ে শ্রেণী-নির্দ্দেশক যে সব কথা ব্যবহার ক'রেছেন তা'তেও আমার আপত্তি আছে। যেমন, অক্ষরমাত্রিক না ব'লে অক্ষর-বৃত্ত, হ্রস্বদীর্ঘ না ব'লে মাত্রা-বৃত্ত ও স্বর-মাত্রা না ব'লে স্বর-বৃত্ত বলা-ই শ্রেয়। "রাবীন্দ্রিক হ্রস্ব দীর্ঘ" বলতে তিনি নতুন কি বোঝেন তা বোধগম্য হ'ল না। কারণ বাংলা কবিতার ছন্দের বাইরে রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতাই পড়ে না। কারণ তাঁর কবিতাগুলি বাংলা কবিতা এবং তাঁর কবিতার ছন্দ-বৈচিত্র্যেই বাংলা কাব্য-সাহিত্য ঐশ্বর্য্যশালী। আমি বাংলা ছন্দের যে শ্রেণীবিভাগ করবো তা' এমন সংপ্রসারণশীল ও সাধারণ হ'বে যে তা'র মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের যে-কোনো কবিতার ছন্দের হদিস্ পাওয়া যা'বে।

তার পর তিনি মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর ছন্দদ্বয়কে অসমছন্দের দুই

* লেখকের যন্ত্রস্থ গ্রন্থ "ওমর খৈয়ামের" এক পরিচ্ছেদ।

শাখা ব'লে ধ'রেছেন। যদিও অক্ষরবৃত্ত ছন্দের দুই শাখা ব'লে 'মিত্রাক্ষর' ও 'অমিত্রাক্ষর' পরিচিত ছিল, তথাপি যে কোনো অনিয়ম (irregularity), যথা শেষ অক্ষর ও উপান্ত্যস্বরের মিল না থাকা ও অনিয়মিত যতি-যুক্ততা, 'অসম'-ছন্দের লক্ষণ ধ'রে নিয়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দকে না হয় অসমছন্দেরই অন্তর্গত মনে করা গেল। কিন্তু তা' হ'লেও প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে যেখানে অসমছন্দের মধ্যে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত কবিতা প্রবেশ লাভ করেছে দেখা যা'বে। সুতরাং অসমছন্দের মধ্যে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত কবিতাকে না ধরলে ভুল হয়। ভবানীবাবু যে শ্রেণীবিভাগটি দাখিল ক'রেছেন, আমার মতে তা' এইরকম হবে—
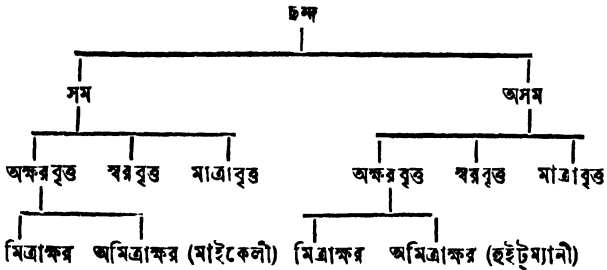
ভবানী বাবু এক জায়গায় একটী ভারী অদ্ভুত কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন—"স্বরান্ত কবিতাগুলোকে অক্ষর মাত্রা বলে।" 'স্বরান্ত কবিতা' বস্তুটা কি? একটা লম্বা কবিতার শেষ বর্ণটা স্বরবর্ণ অথবা তাঁর কথামত স্বরান্ত ধ্বনি 'বন-অ' (!) বিশিষ্ট হ'লেই কি কবিতাটি অক্ষর মাত্রিক (অক্ষরবৃত্ত) হ'বে? মুখোপাধ্যায় মহাশয় কি বলেন?

আচ্ছা, ধ'রে নেওয়া গেল যে স্বরান্ত কবিতা, তিনি স্বরান্ত-চরণ বিশিষ্ট কবিতাকেই বলেছেন। কিন্তু এর উদাহরণ তিনি যা দিয়েছেন তা' এই:—

> বাহিরে যখন ক্ষুব্ধ দক্ষিণের মদির পবন
> অরণ্যে বিস্তারে অধীরতা; যবে কিংশুকের বনে
> উচ্ছৃঙ্খল রক্তরাগে স্পর্দ্ধিয়া উদ্ধত,—

আর বলেছেন 'ইহাতে প্রত্যেক লাইনের শেষ কথার শেষ অক্ষরে স্বরান্ত-ধ্বনি আছে; যেমন 'বন-অ' ইত্যাদি"—কিন্তু উদ্ধৃত পংক্তি ক'টির মধ্যে 'বন-অ' ত কোথাও পেলাম না। আচ্ছা, "কিংশুকের বনে" কথাটা না হয় ছাপার ভুল, ওটা হ'বে "কিংশুকের বন"— কিন্তু কবিতাংশটি পড়বার সময় কেউ কি ওখানে 'বন' কথাটিকে অথবা 'পবন' কথাটিকে স্বরান্ত ক'রে পড়বেন? আর কেউ যদি না পড়েন, কেবল ভবানী বাবু নিজের কথার মর্য্যাদা রক্ষার জন্যেই যদি পড়েন, তবে স্পষ্টতঃ স্বরান্ত-চরণ বিশিষ্ট যে কবিতাংশগুলি নীচে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি, সেগুলি কি অক্ষর-মাত্রা (অক্ষরবৃত্ত) কবিতার পর্য্যায়ভুক্ত হ'বে?

১। আমি চঞ্চল হে
আমি সুদূরের পিয়াসী।
দিন চ'লে যায়, আমি আনমনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে…

২। ওগো বর, ওগো বঁধু,
এই যে নবীনা বুদ্ধি-বিহীনা
এ তব বালিকা বধূ।
তোমার উদার প্রাসাদে একেলা
কত খেলা নিয়ে কাটায় যে বেলা…

৩। ঐ দেখ মা আকাশ ছেয়ে
মিলিয়ে এল আলো;
আজকে আমার ছুটোছুটি
লাগ্‌লো না আর ভালো।…

তার পর ইনি 'হ্রস্বদীর্ঘ' ছন্দের কথা বলেছেন। মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে তিনি 'হ্রস্বদীর্ঘ' নামে অভিহিত করেছেন। 'মাত্রাবৃত্ত' না বলবার কারণ বোধ হয় এই যে তিনি বাংলা মাত্রার ঠিকানা ঠিক করতে পারেন নাই। সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার মাত্রা মেলে না দেখে, হ্রস্বদীর্ঘ—রাবীন্দ্রিক ইত্যাদি কতকগুলো এলোমেলো কথা coin করেছেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জানা নাই যে সংস্কৃতে হ্রস্বস্বরে এক মাত্রা ও দীর্ঘস্বরে দ্বি-মাত্রা ধরা হ'লে-ও বাংলায় তা হয় না; অথচ সংস্কৃতের মত বাংলা কবিতার মাত্রাগণনা ও মাত্রা-নির্দ্ধারণ-নীতি'র technique সুনিয়মিত (perfect)। এটা রাবীন্দ্রিক 'হ্রস্বদীর্ঘ' নয়, এটা বাংলা কবিতার মাত্রার নিয়ম। এ মাত্রার ব্যাপার, স্বরের নয়; সুতরাং 'হ্রস্বদীর্ঘ' বলাই ভুল। তার পর ইনি বলেছেন "রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন হ্রস্বদীর্ঘের গণ্ডী এড়িয়ে যথেচ্ছ হ্রস্বদীর্ঘের ছন্দে কবিতা লিখেছেন।" রবীন্দ্রনাথ যথেচ্ছ হ্রস্বদীর্ঘের ছন্দে কবিতা লেখেন নি। সংস্কৃত ও বাংলা যেমন এক ভাষা নয় তেমনই এই দুই ভাষার ছন্দ রীতিও এক নয়। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দ-রীতি অনুসারেই কবিতা লিখেছেন এবং সেগুলির কোনটিই যথেচ্ছ নয়; সকলগুলিই সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মের গণ্ডী'র মধ্যে ধরা পড়ে। বরং এ কথা বলতে পারা যায় যে বাংলা কবিতার ছন্দ-রীতি তাঁর প্রচুর রচনাবলীর মধ্যে দিয়ে আপনার সুনির্দ্দিষ্ট, সুনিয়মিত গতিপথ লাভ করেছে। বাংলা কবিতার ছন্দের সেই কল-কাঠির সন্ধান যাঁরা জানেন না তাঁরাই বলবেন যে রবীন্দ্রনাথ যথেচ্ছ ছন্দে কবিতা লিখেছেন।

আমরা আশ্চর্য্য হয়ে যাই, বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে এত অল্প জ্ঞান নিয়ে লেখক, ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাংশ উদ্ধৃত ক'রে সেখানেও অনিয়মিত যথেচ্ছ ছন্দের খোঁজ পাবার চেষ্টা করেন কোন্ সাহসে? প্রথম ত তিনি কবিতাংশটি সাংঘাতিক ভুল সহ উদ্ধৃত ক'রেছেন। 'অভ্রআবির' নামক সত্যেন্দ্রনাথের বইটিতে এই প্রসিদ্ধ কবিতাটি আছে; শিরোনামা:—গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি। ভবানী বাবু প্রথম দুই পংক্তি ও নবম দশম পংক্তি উদ্ধৃত করেছেন। এর মধ্যে 'মূর্ত্তি-মন্ত' কথার বদলে 'মূর্ত্তিমতী' আর 'দেখ্‌ছি গো' স্থলে 'দেখেছি গো' লিখে তিনি যথাক্রমে নিজের ব্যাকরণ ও ছন্দের জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। মূর্ত্তিমন্ত' কথাটি 'স্নেহ' শব্দের বিশেষণ, সুতরাং 'মূর্ত্তিমতী' হতে পারে না; কবির পুস্তকে কথাটি নির্ভুলই ছিল কিন্তু মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'মায়ের স্নেহ' দেখে 'স্নেহ' শব্দের বিশেষণ স্ত্রী-লিঙ্গ-বাচক শব্দই হওয়া উচিত [illegible]

বৃত কবির প্রতি একটা সম্মান দেখানো ত উচিত? সংশোধনটা অন্ততঃ সেজন্ত-ও, তিনি স্বচ্ছন্দে না করলেই পারতেন!!! তার পর 'দেখ্‌ছি গো' স্থলে 'দেখেছি গো' লিখে তিনি স্বরাধিক্য ঘটিয়ে যে ছন্দপতন ক'রে ফেলেছেন সে কথা বোধ হয় তিনি জানেন না——এই সব ক'রে শেষে রায় দিয়েছেন যে কবিতাটি 'অনিয়মিত যথেচ্ছ ছন্দে' লেখা। আমি কিন্তু দেখাবো যে ওটি সুনিয়মিত স্বর্ঠ্‌ ছন্দে লেখা। কবিতাংশটি এই—

৪—স্বর ৪—স্বর ৪—স্বর ৪—স্বর

ধ্যানে তোমার | রূপ দেখিগো | স্বপ্নে তোমার | মূর্ত্তি তুমি |
মূর্ত্তিমন্ত | মায়ের স্নেহ | গঙ্গা-হৃদি | বঙ্গভূমি |

* * * * *

৪—স্বর ৪—স্বর ৪—স্বর ৪—স্বর

দেখ্‌ছি গো রাজ | রাজেশ্বরী | মূর্ত্তি তোমার | প্রাণের মাঝে |
বিদ্যুতে তোর | খড়্গ ঝলে | বজ্রে তোমার | ডঙ্কা বাজে |

কবিতাটি আগাগোড়া স্বরবৃত্ত পূর্ণ চৌপদী ছন্দে রচিত। কোথাও ছন্দ-পতন নাই। প্রত্যেক পদে চারিটি ও চরণে ষোলটি ক'রে স্বর আছে; উপান্ত্য স্বর ও অন্ত্যবর্ণের মিল আছে—প্রতি চরণের সঙ্গে পরবর্ত্তী চরণের। সুতরাং কবিতাটি যথেচ্ছ ছন্দে রচিত নয়। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার ছন্দকে এত কাণ্ড ক'রে নির্ভুল ব'লে প্রমাণ করতে হোলো। তীক্ষ্ণ ধী কবি আজ বেঁচে থাক্‌লে কি করতেন বলতে পারি না; তবে একটা সান্ত্বনা এই যে, ছন্দ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ব্যক্তির কথা না ধরাই শ্রেয়। এঁর সমগ্র প্রবন্ধটি পড়লে কারো জ্ঞান-ভাণ্ডারের বিন্দুমাত্র বিবৃতি ঘটার ত সম্ভাবনা নাই-ই, বরং ভ্রান্ত ধারণা ধাঁধা লাগিয়ে নবীন শিক্ষার্থীদের পথভ্রষ্ট করতে পারে। প্রবন্ধের মধ্যে একটি জায়গা কেবল বড়ই ভালো লাগলো, সেটি হচ্ছে তৃতীয় অনুচ্ছেদ;—যেখানে লেখক, রবীন্দ্রনাথের কথা উদ্ধৃত ক'রে আমাদের উপহার দিয়েছেন।

সমগ্র প্রবন্ধটির প্রচুর উদ্ধৃতাংশসমূহের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বলাকা বা পলাতকার ছন্দের কথা বা তাহার কবিতার উল্লেখ দেখ্‌লাম না। অথচ অসম ছন্দ, হুইট্‌ম্যানী ছন্দ, প্রেমেন্দ্র—অচীন্ত্যজিতের বিশিষ্ট নতুন ছন্দ প্রভৃতি কত কথাই বলেছেন! বাংলা কবিতার ছন্দ-প্রসঙ্গে এই একটি সমৃদ্ধ শাখাকে বাদ দিলে চল্‌বে না; বা 'হুইট্‌ম্যানী' ব'লে জুজু-মন্ত্র আওড়ালে নবীন ছন্দ-শিক্ষার্থীরা গুরুদেবের পাণ্ডিত্যে স্তম্ভিত হয়ে গেলেও ছন্দসম্বন্ধে যাঁরা কিছু-ও জানেন, তাঁরা ভয় পাবেন না।

আর একটা স্থলের উল্লেখ ক'রেই আমার এ প্রতিবাদ শেষ করি; কারণ প্রতিবাদ না করলেও ভুলগুলি এমন প্রকট যে সমস্ত গুলি প্রমাণিত ক'রে দেখিয়ে দিতে হবে না।

ইনি ভুজঙ্গপ্রয়াত ও আরবী মোতাকারিব ছন্দের মিল খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের সঙ্গে বল্‌তে হচ্ছে যে মোতাকারিব ছন্দটি স্বর-বৃত্ত পর্য্যায়ভুক্ত, আর সংস্কৃত ভুজঙ্গপ্রয়াতটি বাংলা মাত্রাবৃত্তের মধ্যে চ'লে আসে। সুতরাং দু'টিতে ঐক্য খোঁজার চেষ্টা বৃথা। ভুজঙ্গপ্রয়াতের নিয়ম এই—প্রথম বর্ণ লঘু, পরবর্ত্তী দুইটি বর্ণ গুরু, এইরূপ তিনটি বর্ণে 'য' হয়। যে ছন্দের প্রত্যেক চরণে চারিটি 'য' থাকে তা'কে ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দ বলে। বাংলায় এই ভুজঙ্গপ্রয়াতের দৃষ্টান্ত প্রাচীন কবিদের রচনায় পাওয়া যায়:—

১। ভুজঙ্গ প্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতীদে সতীদে সতীদে সতীদে॥

২। মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥

আমাদের ভবানী বাবু বাংলা কবিতায় ভুজঙ্গপ্রয়াতের ভারী অদ্ভুত উদাহরণ-দাখিল ক'রেছেন—

সবুজ মাঠ ধূসর আজ ধূলির ধূম মহোৎসব।
জাগায় ভয় হঠাৎ খুব ঝড়ের ভীম উপদ্রব॥

উদ্ধৃত কবিতাংশটি স্বরবৃত্ত পূর্ণ-চৌপদী, প্রত্যেক পদে তিনটি স্বর ও চরণে বারটি স্বর আছে। স্বর (syllable) ও মান-মাত্রা (accent) এ ছন্দটিকে হুবহু ইংরেজি Trochee ছন্দের অনুরূপ ক'রেছে। যে মাত্রা সংখ্যার লঘুত্ব ও গুরুত্বের ওপর সংস্কৃত ভুজঙ্গ-প্রয়াত নির্ভর করে, এ কবিতার মধ্যে সে মাত্রাই নাই। সংস্কৃত ছন্দের সম্পূর্ণ অনুবর্ত্তী ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে লেখা কবিতা প্রাচীন বাংলা কবিদের রচনার মধ্যেই পর্য্যবসিত; আধুনিক বাংলা কবিতায় সে সব ছন্দ অচল।

এ ছাড়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় কতকগুলি অবান্তর প্রসঙ্গের আমদানী করেছেন। তাঁর কোন্ বন্ধুর 'চিত্র আঁকিবার অদ্ভুত ক্ষমতা', 'অনুপ্রাসের ক্ষমতা', 'বেদনার সুর সুন্দর ভাবে শোনানোর ক্ষমতা' তা আমাদিগকে জোর ক'রে শুনিয়ে দিয়েছেন! নইলে না কি ছন্দ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যায়! কবিতার ছন্দ ও অলঙ্কার এক বস্তু নয় এ কথা-ও কি মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বুঝিয়ে বলতে হ'বে? অনুপ্রাস, চিত্রাঙ্কন ও বেদনার সুরের ব্যঞ্জনার সঙ্গে ছন্দের কোনো সম্বন্ধই নাই; নতুবা সে সম্বন্ধে বিচারেও প্রবৃত্ত হওয়া যেত। তবে এতে বন্ধুপ্রীতির স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় এ কথা সত্য।

দীপশিখা

শ্রীহাসিরাশি দেবী

সমস্ত দিন তাস পাশা খেলিয়া ও পাড়ায়-পাড়ায় টহলদারী শেষ করিয়া গোকুল যখন শ্রান্ত দেহে বারান্দার উপরে বসিয়া পড়িল, তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে চতুর্দ্দিক ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। পল্লীবালাগণের সন্ধ্যারতির শঙ্খনিনাদ বহুক্ষণ পূর্ব্বেই থামিয়া গিয়াছিল।

বাড়ীর পার্শ্বের আমবাগানে, ছোট ছোট ঝোপের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া শৃগালকুল ঝিল্লীর সহিত কিছুক্ষণ পূর্ব্ব হইতেই যে সন্ধ্যারাগিণী ভাঁজিতে সুরু করিয়া দিয়াছিল, তাহা তখনও থামে নাই।

গোকুল ঘোষের প্রকাণ্ড বাড়ীটা উপস্থিত চূণবালি-খসা, ফাটল-ধরা এবং স্থানে স্থানে ভগ্ন হইলেও পাকা,—খড়ের-ছাউনি-দেওয়া মাটির-দেওয়াল-ঘেরা বাড়ীর চাইতে যে তাহার মান অনেক বেশী, এ কথাটা অস্বীকার করা যায় না। জাতিতে গোয়ালা হইলেও, কোন কালে না কি গোকুলেরই কোন এক পূর্ব্বপুরুষ ছিল এই রাঙামাটি গ্রামেরই প্রবল-পরাক্রান্ত জমীদার। কথাটা আজ "গালগল্প" হইয়া দাঁড়াইলেও, গোকুল ঘোষ্ আজিও বেশ একটু গর্ব্ব করিয়াই বলিয়া থাকে যে, সে যেমন-তেমন বংশের ছেলে নহে,—স্বয়ং মথুর ঘোষের নাতি, এবং নকুড় ঘোষের বেটা। সদর বাড়ীর প্রকাণ্ড শান-বাঁধান' উঠানটার পরেই পল্লীপথ। দূর হইতে দেখিয়া মনে হয়, কে যেন একটি গেরুয়া রংয়ের সরু লম্বা কাপড় বহুদূর পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

হয় তো কোন অতীত দিনে এই উঠানের পার্শ্বেই প্রাচীর-দেওয়া সদর-বাড়ীও ঘেরা ছিল, এখন কিন্তু তাহা নাই। সদরের কোনও ঘরে বসিলে, পথ বেশ স্পষ্টই দেখা যায়। তবে প্রাচীরের চিহ্নও যে না দেখা যায়, তাহাও নহে।

বাড়ীর ভিতরের দুতিনখানি ঘর ছাড়া আর সবগুলি হয় তো অনেক দিন হইতেই বন্ধ ছিল; তাই, অব্যবহারে তাহার সেগুণ কাঠের বড় বড় দুয়ারগুলিতে উইপোকা লাগিয়া "ঝাঁঝরা" করিয়া দিলেও, তাহার শিকলের গায়ে বিলম্বিত চাবি-বন্ধ ও মরীচা-ধরা বড় বড় তালা। জানালা-গুলিতেও উই লাগিয়াছে। ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট গাছ জন্মিতেও কসুর করে নাই; কারণ, বাড়ীর উপস্থিত যে একমাত্র মালিক, সে কিছুদিন পূর্ব্বে অন্দরের ঐ দুই তিনখানি ঘর ব্যবহার করিলেও, এখন তাহা চাবি বন্ধ করিয়া সদরের একখানি দক্ষিণ-দুয়ারী ঘরে আপনার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে। তাহার ব্যবহারে লাগিত এখন সেই ঘরখানি, আর বড় জোর, তাহারই সম্মুখস্থিত বারান্দাটুকু—আর কিছুই নয়। বাড়ীর ভিতরের দিক, অর্থাৎ অন্দর, বড় বড় ঘাসে এবং এমনিধারা আরও ছোট-বড় ঝোপে-ঝাড়ে ভরিয়া গিয়াছিল। শুধু সদর-বাড়ীটির অবস্থা যে তাহার চাইতে কিছু ভাল, এ কথা বলা যাইতে পারে; কারণ, ছোট-ছোট ঝোপে স্থানে স্থানে পূর্ণ হইলেও, সম্মুখের যে ঘরটিতে গোকুল থাকিত, সেই ঘর-বারান্দা হইতে সদর রাস্তা পর্য্যন্ত একটি সরু পথ ছিল। তবে একটা ভাঙ্গিয়া-পড়া "সিংদরজার" মধ্য দিয়া যাওয়া-আসা চলে। তাহার উভয় পার্শ্ব জঙ্গলে ভরা। কিন্তু তাহা হইলই বা, গোকুল তাহাতে কিছুমাত্র অসুবিধা মনে করে না। যাওয়া-আসা তো চলে,—না হয় একটু কষ্ট করিয়াই,—তাহা হোক্।

বড় থামটায় হেলান দিয়া গোকুল ক্ষণকাল নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার পরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিল। ঘর খুলিয়া—অপরিষ্কার তৈলশূন্য প্রদীপটায় আর খানিকটা তৈল ঢালিয়া জ্বালিল। পরে বাহিরে আসিয়া তামাক সাজিতে সাজিতে শ্রান্ত কণ্ঠে গান ধরিল—

"একুলে ওকুলে গোকুলে দুকুলে
কে আর আমার আছে—
রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে
বঁধুহে—
আমি দাঁড়াব কাহার কাছে—"

পথ হইতে উচ্চৈঃস্বরে ডাক আসিল—"গোকুল-দা, বলি, ও গোকুল-দা—"

গান থামাইয়া, গোকুল মুখ ফিরাইয়া পথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে একটা মানুষের আবছায়া ভিন্ন অপর কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিল না। কহিল—"কে ?"

উত্তর আসিল—"আমি নন্দ।"

গোকুল লাফাইয়া উঠিল—"আরে! অনেক দিনের পরে যে! আয় নন্দা, আলো ধরছি—"

সে প্রদীপটা উঁচু করিয়া ধরিয়া পথের প্রতি ব্যাকুল দৃষ্টিপাত করিল। বাঁক্-স্কন্ধে নন্দ ধীরে ধীরে পথ অতিক্রম করিয়া গোকুলের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল, বাঁক্‌টাকে নামাইয়া সে শ্রান্ত ভাবে বসিয়া পড়িল। প্রদীপটা নামাইয়া রাখিয়া গোকুলও বসিল, কহিল—"তার পরে, গিয়েছিলি কোথায় ?"

মুখ তুলিয়া নন্দ মলিন হাসিল, কহিল—"যাব আর কোন্ চুলোয় গোকুল-দা,—এই তোমাদেরই এখানের বাজারে এসেছিলাম দুধ বেচ্‌তে।" একটু হাসিয়া কহিল—"এখন বাড়ী ফিরে যাচ্ছিলাম এই পথ দিয়ে। যেতে যেতে তোমার গান শুনে ভাব্‌লাম খবরটা একবার নিয়ে যাই,—অনেক দিন তো তোমার সঙ্গে দেখাই হয়নি। কারও কাছে জিজ্ঞাসা করলে বলে তুমি তো গাঁয়েই আছ, অথচ তোমার পাত্তা পাওয়াই ভার। তার পরে, তোমার শরীর কেমন আছে শুনি।"

গোকুল উত্তর দিল—"ভাল—তোদের বাড়ীর সবাই ?"

তাহার শেষোক্ত প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়া নন্দ উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল "তা ভাল তুমি থাকবে নাই বা কেন ? তোমার তো আর আমাদের মত ঘর-সংসার নেই যে সেই সকাল থেকে উঠে এই সন্ধ্যে পর্য্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, না খেয়ে দেয়ে বাড়ী ফিরতে হবে!—ঘর ব'লে তোমার তাই কোনও টানও নেই। তুমি ভাল না থাকলে থাকবে কে, আমি ?"

প্রদীপের শিখায় হস্তস্থিত টিকার এক অংশ ধরাইতে ধরাইতে গোকুল একটু হাসিল,—উত্তর দিল না, তাহার কথার প্রতিবাদও করিল না।

মুখ তুলিয়া বিস্মিত স্বরে নন্দ প্রশ্ন করিল—"হাসলে যে ?" টিকা ধরান হইয়া গিয়াছিল। কলিকায় টিকা সাজাইয়া খেলো হুঁকার উপরে কলিকা বসাইয়া, গোকুল তাহা নন্দর দিকে আগাইয়া দিয়া কহিল—"তোর কথা শুনে—"

হুঁকা লইয়া, খুব জোরে গোটা-দুই টান মারিয়া নন্দ মুখ তুলিল—"আমার কথা শুনে ? তার মানে ?"

একটু হাসিয়া গোকুল উত্তর দিল "মানে আবার কি ? ছেড়ে দে তোর এই বাজে কথা। আমার কথার উত্তর দে,—বলি, বাড়ীর সবাই ভাল আছে ?"

হুঁকায় আর একটা টান দিয়া নন্দ অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিল "হুঁ—"

গোকুল কিছুক্ষণ নীরবে জলন্ত প্রদীপটার প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহার পরে মুখ তুলিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল—"নন্দা—"

নন্দ উত্তর দিল "কেন ?"

গোকুল ক্ষণকাল নির্ব্বাকে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল; পরে কহিল—"এ গাঁ ছেড়ে সবাই যে তোরা ও গাঁয়ে চ'লে গেলি,—আর এ গাঁয়ের বাড়ী-ঘর যে তোদের বার ভূতে লুটে' খাচ্ছে, সেটা বুঝি তোদের সবারই কাছে বড় ভাল লাগ্‌ছে ? আর শুন্‌ছি সেখানে তো তোরা না কি র'য়েছিস একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে—সত্যি ?"

নন্দ উত্তর দিল, "মিথ্যেও নয় গোকুল-দা। আর, এখানকার বাড়ীটার যে দশা পাড়ার লোকে ক'রছে, তা তো পেরতেক্ দিন স্বচক্ষে দেখে যাচ্ছি,—দেখ্‌লেই বা কি ক'রবো, তুমিই বল।"

গোকুল কিন্তু একটা কথাও বলিল না,—নীরবে, নত নেত্রে বসিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।

নন্দ কহিল—"আর তুমিও তো জান যে, দিদি কারও কোনও কথাই মানে না, তা সে স্বয়ং মহাদেবই হোন্ না কেন! দিদির যে বাক্যি একবার মুখ থেকে বের হবে, তা আর পাল্টাবার জো' কারও নেই। এ বাড়ী ছেড়ে যেতে যখন আপত্তি তুল্‌লাম, ব'ল্‌লাম, 'দিদি, আমার এই দুটো 'কাচ্চাবাচ্ছা' নিয়ে নিজের ঘরবাড়ী ছেড়ে কোথায় যাব' তখন দিদি কেঁদে কেটে যে কাণ্ডটা বাধালে তা তো তোমরা স্বচক্ষে দেখেছো। এমন কথা পর্য্যন্ত কাঁদতে কাঁদতে ব'ল্‌লে যে, 'তুই যদি না যাস্, আমি একাই এ গাঁ ছেড়ে চ'লে যাব, না হয় গলায় দড়ী দিয়ে ম'রবো, তবু যে গাঁয়ে এমন ধারা সব লোকের বাস, সে গাঁয়ে আমি আর তিল মাত্তর থাকবো না'—।" নন্দ একটু নীরব হইল, কিন্তু গোকুলের নত

মুখখানা যে মুহূর্ত্তের জন্য বিকৃত হইয়া উঠিল, তাহা সে লক্ষ্যও করিল না,—বলিয়া চলিল—

"তাই ভাবলুম, মায়ের পেটের বোন্ তো, হাজার হোক, —যখন রাগের মাথায় একটা কাণ্ড ক'রে ব'সবে, তখন তো আমার বোনই যাবে। থাক, বাড়ীঘর কাজ নেই আমার—। আচ্ছা তোমারই যদি একটা বোন এমনি একটা রোখ্ ক'রতো, তাহ'লে তুমি কি ক'রতে গোকুল-দা?—"

গোকুল হঠাৎ চমকিয়া মুখ তুলিল, কিন্তু উত্তর দিল না। নন্দর তামাকের তৃষ্ণাটা বোধ হয় মিটিয়া গিয়াছিল,—হুঁকাটা নামাইয়া রাখিয়া, বাঁকটা লইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। মুখ ফিরাইয়া কহিল "আজ রাত হ'য়ে গেল গোকুলদা, যাই। আবার দিদি হয় তো না খেয়ে, আমার ভাত নিয়ে ব'সে থাকবে এখন। এখনও এতটা পথ যেতে যেতেই তো রাত বাড়বে, তা আবার একটা আলোও আনিনি। যে অন্ধকার—"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সে বাহিরের ঘন অন্ধকারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। মুখ তুলিয়া গোকুল কহিল "আলো নিবি নন্দা?"

মুখ ফিরাইয়া নন্দ কহিল—"তোমার তো ঐ একটা পিদ্দিমই সম্বল গোকুলদা,—পাবে কোথায়?"

"সে যেখানে পাই, পাব, তাতে তোর কি?"

প্রদীপটা তুলিয়া লইয়া গোকুল কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল, এবং অল্পক্ষণ পরেই একটা মোমবাতি হস্তে বাহির হইয়া আসিল। প্রদীপের শিখায় বাতি জ্বালাইয়া, নন্দর হাতে তুলিয়া দিয়া কহিল, "নিয়ে যা এটা, তবু একটু পথও দেখতে পাবি, অতটা অসুবিধা হবে না।"

নন্দ বাঁক্ স্কন্ধে তুলিয়া, প্রদীপ হস্তে নামিয়া পড়িল। পশ্চাৎ হইতে গোকুল কহিল—"আবার এ গাঁয়ে এলেই, আমার এখানে আসবি, বুঝলি?"

মুখ না ফিরাইয়া চলিতে চলিতে নন্দ উত্তর দিল—"আচ্ছা—"

(২)

নন্দ চলিয়া গেল, কিন্তু গোকুল উঠিল না, হুঁকাও তুলিয়া লইল না। হুঁকাটাকে দেওয়ালের গাত্রে হেলান দিয়া রাখিয়া নিজেও সেই দেওয়ালে পিঠ রাখিয়া বসিল। সম্মুখে প্রদীপটা জ্বলিতেছিল, তাহার আলো উজ্জ্বল ভাবে চোখে আসিয়া লাগিলেও গোকুলের দৃষ্টি সেদিকে ছিল না,—ছিল অনেক দূরে, অন্ধকারের পানে।

অনেক দিনেরই কথা সে।

হয় তো দুই যুগই কাটিয়া গিয়াছে। অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত আমবাগানের ও-পার্শ্বে ছিল মাটির দেওয়াল-ঘেরা গোলপাতার ছাউনি-দেওয়া ছোট ছোট ঘর কয়খানা। তাহার চতুষ্পার্শে রাংচিতার বেড়া দিয়া ঘেরা। ঘর কয়খানির সম্মুখেই গোবর-লেপা ছোট তকতকে উঠানখানি,—কিছু ছড়াইয়া পড়িলেও হয় তো অক্লেশে কুড়াইয়া লওয়া যায়। ঐ বাড়ীখানিতে যাহারা বাস করিত, তাহারা গোকুলেরই স্বজাতি।

নকুড় ঘোষ ও তাহার স্ত্রী সৌদামিনী যেদিন তাহাদের নাবালক পুত্রটির সমস্ত ভার দূর-সম্পর্কীয়া পিসিমার হস্তে তুলিয়া দিয়া ওপারের পথের পথিক হইয়াছিল, সে আজ অনেক দিনের কথা।

তাহার পরে কয়েকটা বৎসর কাটিয়া যাইবার পরে, হয় তো একটি অশুভক্ষণেই গোকুলের অগ্রজের সহিত ঐ বাড়ীরই একটি পাঁচ বৎসরের ছোট ফুট্‌ফুটে মেয়ের বিবাহ দিয়া আনন্দ-কোলাহলের মধ্য দিয়াই গোকুলের ঠাকুরমা নাতি-বৌ বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। কিন্তু সেই আনন্দ-কোলাহল নীরব হইয়া গেল সেইদিন, যেদিন সেই ছোট মেয়েটিরই অঙ্গ হইতে এয়োতির সকল চিহ্ন মুছাইয়া তাহাকে স্নান করাইয়া আনিতে হইল।

এবাড়ী ওবাড়ী হইতে হয় তো ঐ সর্ব্বনাশী মেয়েটির কথা ভাবিয়াই ক্রন্দনধ্বনি উঠিল।

গ্রামের লোকে দুঃখ জানাইল—

"আহা! বিপ্নে ঘোষের মেয়েটা,—বড় অদেষ্ট মন্দ গো, বড় অদেষ্ট মন্দ। নইলে এই বয়েসে কেউ বিধবা হয়? পেরায় তিন চার কুড়ি টাকা খরচ করে সেদিন বিপ্নে মেয়েটার বে দিয়েছিল গো, তা কি কপালে সইলো?—একেই বলে 'বিধাতার মার, দুনিয়ার বার'। মানুষ ইচ্ছে ক'রলে যদি সবই ক'রতে পারতো, তা হ'লে আর ভাবনা ছিল না। হরি হে দীনবন্ধু! তোমারই ইচ্ছে—"

সংসারে বিপিনের একটি পুত্র নন্দ এবং কন্যা রাণী ভিন্ন অপর কেহ ছিল না। স্ত্রী তাহাদের ছোট রাখিয়াই মারা

গিয়াছিল, তখন হইতেই এই দুইটি পুত্র কন্যার সকল ভার বহন করিতে হইত বিপিনকে।

কন্যা রাণী ছিল বড়, এবং নন্দ তাহার অপেক্ষা বৎসর কয়েকের ছোট।

হৃদয়ে অনেকখানি আশা পোষণ করিয়াই হয় তো বিপিন ঘোষ বড়বাড়ীতে কন্যার বিবাহ দিয়াছিল। কিন্তু সেই কন্যারই যখন একদিন সংসারের সুখ শান্তির পথ চিররুদ্ধ হইয়া গেল, তখন প্রথমে বিপিনের মুখ হইতে একটা কথাও বাহির হইল না, চক্ষেও জল দেখা দিল না।

ক্ষণ পরে শুধু একটা অস্ফুট আর্ত্ত স্বর তাহার ওষ্ঠাধর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিল—"রাণী—!"

কন্যা বিধবা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বিপিন তাহাকে আপনার বাড়ীতে লইয়া আসিল বটে, কিন্তু বেশী দিন রাখিতে পারিল না। একদিন প্রায় রাণীরই সমবয়সী গোকুল আসিয়া কহিল—

"বাড়ী চল্ ভাজ-বৌ, আমি আর একা ও-বাড়ীতে থাক্‌তে পারছিনে। কেউ নেই, শুধু ঠাকুমা—একা। বাড়ী চল্ ভাজ-বৌ—"

রাণীর একখানা হাত হাতের মুঠোয় শক্ত করিয়া চাপিয়া কহিল—"এখনও দাঁড়িয়ে রইলে যে, যেতে ব'লছি না?"

খেলাঘর পাতিয়া রাণী মহানন্দে রন্ধনে ব্যস্ত ছিল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া রাগতস্বরে কহিল "দেখ্ গোকলো, ভাল হ'চ্ছে না কিন্তু—"

হাতটা আরও শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া, একটা ঝাঁকানি দিয়া গোকুল প্রশ্ন করিল "বাড়ী যাবিনে?"

দৃঢ়স্বরে রাণী উত্তর দিল "না—"

"বটে? যেতে ব'লছি যাওয়া হবে না, উল্টে চোপা?"

পদাঘাতে খেলাঘর ভাঙ্গিয়া ও দুই হাতে ভাজ্-বৌয়ের কান দুইটার গোটা দুই পাক দিয়া গোকুল লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া চকিতে অদৃশ্য হইয়া গেল, আর সেইখানে দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিল রাণী। সেই দিনই গোকুলের ঠাকুরমা আসিয়া রাণীকে ওবাড়ীতে লইয়া গেল, এবং তাহার ও বাড়ীতে থাকিবার সময়ও ঠিক হইয়া গেল—তিন্‌শো পঁয়ষট্টি দিন।

হাসিয়া গোকুল কহিল—"কেমন? এবার?—"

রাণী তাহার উত্তর বেশ কড়া করিয়া দিতে গিয়াই ঝর্‌ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, উত্তর দিতে পারিল না।

এমনি করিয়া শুধু একবারই তিন্‌শো পঁয়ষট্টি দিন নহে, অনেকবারই তিন্‌শো পঁয়ষট্টি দিন আসিয়া ফিরিয়া গেল, কিন্তু এবাড়ী ছাড়িয়া রাণীর আর ওবাড়ী যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না।

নন্দ মাঝে মাঝে আসিয়া প্রশ্ন করিত,—"ভাল আছিস দিদি?"

উত্তর দিতে গিয়া রাণীর ওষ্ঠাধরে ম্লান হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিত, হাতের কাজ করিতে করিতে নত বদনেই জবাব দিত "আছি—"

সন্তুষ্ট হইয়া নন্দ চলিয়া যাইত। পিতাকে জানাইত—

"দিদি তো ভালই আছে, বাবা, তবে কেন তুমি তার জন্যে অত ভাব বল তো?"

এ কথার উত্তর বিপিন দিতে পারিত না, শুধু শূন্য দৃষ্টিতে দূরান্তরের প্রতি চাহিয়া থাকিত। মনশ্চক্ষের সম্মুখে অনেক দিনের অনেক দৃশ্যই একে একে ভাসিয়া উঠিত; কিন্তু তাহা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না।

এমনি করিয়াই ধীরে ধীরে দিনের পরে দিন, মাসের পরে মাস, বৎসরের পরে বৎসর কাটিয়া চলিল এবং এমনি একটা দিনেই গোকুলের বৃদ্ধা ঠাকুরমারও ওপার হইতে ডাক আসিয়া উপস্থিত হইল, বড় যত্নের সংসার এবং দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির পৌত্রের সকল ভার রাণীর হস্তে সমর্পণ করিয়া সে চিরদিনের জন্যই নিশ্চিন্তে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

(৩)

শুধু "কাণাকাণিই" নয়, যেদিন মেয়েদের স্নানের ঘাটে অর্থাৎ প্রকাশ্যে কথাটা বেশ ফাঁপিয়া, খানিকটা বড় হইয়াই রাণীর কাণে আসিল, সেদিন সে আর আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না। পিতলের প্রকাণ্ড কলসীটাকে জলশূন্য অবস্থাতেই কক্ষে উঠাইয়া লইয়া সে দ্রুতপদে বাড়ী চলিয়া আসিল। কলসীটাকে উঠানে নামাইয়া দ্রুতপদে গোকুলের কক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্রোধ-কম্পিত স্বরে ডাকিল "ছোটকর্ত্তা!"

কোনও কারণে গোকুলের উপরে রাগ হইলে সে তাহাকে এই নামেই অভিহিত করিত এবং গোকুলেরও বুঝিতে বিলম্ব হইত না যে, কোনও কারণে রাণীর রাগ হইয়াছে।

আজ এই ডাকটা যখন আসিয়া গোকুলের কাণে বাজিল, তখন সে কক্ষ মধ্যে একাকী বসিয়া একটা বাঁশের বাঁশীতে ছ্যাঁদা করিতে করিতে আপন মনে গাহিতেছিল—

"মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব,
আমার, কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব।"

ডাক শুনিয়া গোকুল চমকিয়া মুখ তুলিতেই দেখিল, রাণী দুয়ারের উভয় পার্শ্বে হাত রাখিয়া গম্ভীর মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

শঙ্কা-জড়িত স্বরে গোকুল প্রশ্ন করিল—"কি ভাজ্-বৌ?"

ক্রোধ-কম্পিত স্বরে রাণী চীৎকার করিয়া কহিল—

"বলি, তুমি কি আমাকে এ-বাড়ীতে টিকতেও দেবে না ছোটকর্ত্তা? এইটাই যদি তোমার মনের ইচ্ছে হয়ে থাকে, তবে আমায় স্পষ্ট ক'রে এ কথাটা খুলে ব'ললে আমি তো তোমায় গিলে ফেলব না। স্পষ্ট ক'রে ব'ললেই তো সব ল্যাঠা মিটে যায়,—এত চক্ষুলজ্জাটাই বা তোমার কিসের, তাই শুনি? এখনও আমার বাপ ভাই বেঁচে আছে, আমায় একমুঠো খেতে আর মাসে একখানা কাপড় দিতে তারা খু—ব পারবে।"

হাতের বাঁশীটা মেঝের উপরে রাখিয়া দিয়া গোকুল সোজা হইয়া বসিল। তাহার দৃষ্টিতে ও মুখের উপরে বিস্ময়ের ছায়া সুস্পষ্ট ভাসিয়া উঠিল। কহিল—"কি হ'য়েছে তাই বল না আগে—"

রাণীর উভয় নয়ন সজল হইয়া উঠিল। বাম হাতের উল্টা পিঠে চোখ মুছিয়া ধরা গলায় কহিল—"বিধবা মানুষ আমি, সাতেও নই, পাঁচেও নই। অদেষ্ট যার মন্দ হয়, তাকে কি সবাই মিলেই এমনধারা ক'রতে হয়?—আমার গায়ে এ কেলেঙ্কারী মাখাবার কি দরকারটা ছিল গা তোমাদের! নেহাৎ তোমার বাড়ীর আর কেউ নেই, আমি না রেঁধে দিলে মুখে অন্ন উঠবে না,—এমন ক্ষমতাও তোমার নেই যে নিজে রেঁধে খাবে। সকালে উঠে একদিন না কাজে হাত দিলে, যেখানকার যে জিনিস সেইখেনে তা পড়ে থাকবে। একদিন যদি আমার অসুখ হয় তাহ'লে দুর্দ্দশার অন্ত থাকে না। তাই না তোমার এ বাড়ীতে আমার থাকা? নইলে, আমি একলা মানুষ, যেখানে গতর খাটাব, সেইখানেই আমার দিন কাটবে,—আমি তোমার এখানে থাকতে যাব কেন? আর আমার এই থাকা নিয়েই না গাঁয়ের লোকে এত ব'লবার সুবিধে পায়! কেন গা? আমিই বা এত সহ্য ক'রব কেন? কেই বা আমার এত আপনার জন তুমি গো? সোয়ামীর ভাই ছাড়া রক্তের সম্বন্ধ তো তোমার সঙ্গে আমার কিছু নেই? তোমার জন্যে কেন আমি এত—"

হঠাৎ উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদিয়া ফেলিয়া রাণী দ্রুতপদে সে স্থান হইতে সরিয়া গেল।

গোকুল রাণীর ক্রন্দন অথবা কথার অর্থ কিছুই তেমন-ভাবে বুঝিল না। শুধু এইটুকু বুঝিল, আজ যে কোনও কারণেই হোক্ না কেন রাণীর রাগের মাত্রাটা কিছু উপরে উঠিয়াছে। হাতের শিকটা মেঝের উপরে ফেলিয়া সে লোহার সিন্দুকটার গাত্রে হেলান দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সে ভাবনার না ছিল আদি, না ছিল অন্ত! কিন্তু অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া সে ভাজ-বৌয়ের কথার এবং হঠাৎ উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের কোনও হেতুই আবিষ্কার করিতে না পারিয়া, সমস্ত ঝাড়িয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। দূরে বনানী-শ্রেণী অন্ধকারে ঢাকিয়া গিয়াছে। শুক্লা তৃতীয়ার ক্ষীণ চাঁদ নীলাকাশের গাত্রে নিষ্প্রভ হইয়া দেখা দিয়াছিল।

গোকুল ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই দেখিতে পাইল, কলসীটা তখনও তেমনি উপুড় হইয়া উঠানের এক ধারে পড়িয়া আছে। বাড়ীতে আর কেহ আছে কি না, ভাল বুঝিতে পারিল না, ডাকিল "ভাজ্-বৌ—"

কেহ উত্তর দিল না।

গোকুল কিয়ৎক্ষণ সেইখানে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পরে ধীরে ধীরে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

বেড়ান শেষ করিয়া গোকুল যখন বাড়ী ফিরিল, তাহার বহু পূর্ব্বেই তৃতীয়ার চাঁদ ডুবিয়া গিয়াছে। সদর দরজা খোলাই ছিল, অন্ধকারে হাতড়াইয়া গোকুল আপনার কক্ষদ্বারে উপনীত হইল। ভেজান দুয়ার ঠেলিয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, অন্যান্য দিনের মত আজও তাহার কক্ষে প্রদীপ জ্বলিতেছে, বিছানা ঝাড়া, ঘর পরিষ্কার।

কিন্তু সকল নিয়মের ভিতরে একটির ব্যতিক্রম তাহার দৃষ্টি এড়াইল না,—উহা আহারের। অন্য দিন সে বেড়াইয়া আসিলে, রাণী নিজে বসিয়া তাহাকে খাওয়াইত। কিন্তু আজ সে রাণীর কোনও সাড়াই পাইল না। তবে দেখিতে পাইল, ঘরের একটা কোণের দিকে তাহার ভাত ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে।

অন্য দিন হইলে হয় তো গোকুল ভাতের থালাটা ভাঙ্গিয়া, দুয়ার ভাঙ্গিয়া, এবং এইরূপে আরও কিছু রাগের নিদর্শন রাখিয়া, বাড়ীর বাহির হইয়া যাইত। কিন্তু আজ রাত্রি এবং ক্ষুধার বৃদ্ধির সহিত তাহার আর রাগ দেখাইবার ইচ্ছা হইল না,—ভাতের ঢাকা খুলিয়া, চট্ করিয়া খাইতে বসিয়া গেল। কিন্তু দু'এক গাল ভাত গিলিতেই যেন কি একটা বিরক্তিতে তাহার মুখ পর্য্যন্ত বিস্বাদ হইয়া উঠিল। কতক খাইয়া এবং কতক পাত্রের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া সে উঠিয়া গেল; এবং ক্ষণ পরে হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া সশব্দে দুয়ার রুদ্ধ করিয়া দিল,—রাণী বাড়ী আছে কি না আছে, সে খবরটা লওয়াও সে আবশ্যক মনে করিল না।

সকালে দুয়ার খুলিতেই সর্ব্বপ্রথমে গোকুলের দৃষ্টি পড়িল সম্মুখে দণ্ডায়মানা রাণীর মুখের উপরে। সে প্রথমে কথা কহিল না। কিন্তু একটু হাসিয়া রাণী কহিল—"কাল্‌কে যে বড় রাগ ক'রেছিলে?"

গোকুলের মুখের উপরে বিরক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। উষ্ণস্বরে কহিল "বেশ ক'রেছি। তোমার তাতে কি শুনি?"

"আমার? না, আমার কিছু নয়,—তবু—"

তেমনি স্বরেই গোকুল উত্তর দিল,—"থাক্, আমায় আর বুঝাতে হবে ন—আমি সব বুঝি।"

—"বটে?"

রাণী উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

গোকুল এতক্ষণ মুখ নত করিয়া ছিল। রাণীর হাসির শব্দে সে চমকিয়া মুখ তুলিতেই রাণী দেখিতে পাইল, তাহার মুখের উপরে বেদনার গাঢ় ছায়া ভাসিয়া উঠিয়াছে।

গোকুল কহিল—

"জানি গো, তোমায় জানতে আমার এতটুকুও বাকি নেই। রাগ ক'রে একটা মানুষকে তুমি না খাইয়ে রাখতে পার বটে, কিন্তু, আমি তো তা ভুলতে পারিনে—"

তাহার কণ্ঠস্বর ভারি হইয়া আসিল।

চকিতের জন্য রাণীর মুখের উপরে কি একটা ছায়া ভাসিয়া উঠিয়াই অদৃশ্য হইয়া গেল। সে ক্ষণকাল গোকুলের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল—"মুখ হাত পা ধুয়ে খাবে এস ঠাকুরপো, আমি হেঁসেলে রইলুম"—বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া সে তাড়াতাড়ি সে স্থান ত্যাগ করিল।

খাওয়া শেষ করিয়া মুখ তুলিতেই গোকুল দেখিল, রাণী তাহার মুখের প্রতি সস্নেহে চাহিয়া আছে।

জলের ঘটী হইতে কয়েক ঢোঁক জল গলায় ঢালিয়া ঘটীটা নামাইতেই রাণী কহিল—"কালকের তখনকার আমার কথাটা যদি বেশ মন দিয়ে শুনতে, তাহ'লে তো আর আমার রাগ হ'তো না,—হ'লো তো তোমারই দোষে!"

উভয় চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত করিয়া গোকুল কহিল—

"আমারই দোষে? কি ব'লছো ভাজ-বৌ?"

হাসিয়া রাণী উত্তর দিল—"ব'লছি ঠিকই ভাই। এইবার তুমি নিজে দেখে-শুনে একটি বে'থা' ক'র—যে আমিও এই সংসারের দায় হ'তে মুক্তি পেয়ে বাঁচি। তার পরে, যেদিকে দুচোখ যায়, চ'লে যাই।" রাণীর কথা শুনিয়া গোকুল ব্যঙ্গস্বরে হাসিয়া উঠিল।

"ওঃ, এই তো তোমার কথা? আচ্ছা, সে হবে এখনি। তার জন্যে এখন তো এত ব্যতিব্যস্ত হবার দরকার নেই ভাজ-বৌ।"

সে উঠিয়া হাত মুখ ধুইতে বাহির হইয়া গেল।

(৪)

কোঁচার খুঁটে হাত মুছিতে মুছিতে গোকুল দুয়ারের উপরে আসিয়া দাঁড়াইল, ডাকিল—"ভাজ-বৌ—"

কি একটা কাজ করিতে করিতে রাণী নতমুখে উত্তর দিল—"কেন?"

দুয়ারের উপরে বসিয়া পড়িয়া গোকুল হাসিল, কহিল—"তার পরে?"

রাণী কহিল—"কি?"

"ব'লছিলে যে আমি বিয়ে-থাওয়া ক'রে সংসারী হ'লে পরে তুমি যাবে কোথায় ঠিক করেছো?—বাপের বাড়ী না কি?—"

রাণী মুখ তুলিল, কিন্তু হাসিল না। কহিল—"বাপের বাড়ী ছাড়া আর কোথাও কি যাবার জায়গা নেই ভেবেছো?"

"জায়গা অজায়গার কথা তো আমি ব'লছিনে ভাজ-বৌ, —ব'লছি, ঠিক তো একটা ক'রেইছো—? কোথায় তোমার সেই জায়গাটা, শুনাতে আর এমন কি দোষটা থাকতে পারে?"

"কেন, তীর্থধর্ম্ম ক'রবো—"

"তীর্থধর্ম্ম করবার সময় কি এখনই ব'য়ে গেল, যে—"

বাধা দিয়া গম্ভীর স্বরে রাণী কহিল, "নাই বা গেল, তবু তো—"

উত্তেজিত স্বরে গোকুল কহিল "তবু আবার কি শুনি"—

রাণী একটু হাসিল—"কি না মানুষের তো শুধু বয়সের সঙ্গে তীর্থধর্ম্মের সম্বন্ধ নয় ভাই—" একটু নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিল—

"আর বেড়াবারও তো ইচ্ছে হয়; চিরকালটা কি কেউ ঘরেই ব'সে থাকতে পারে?"

উপেক্ষার স্বরে গোকুল কহিল—"ওঃ, তবে সেইটাই আসল কথা। তবে তাই বল না কেন যে চিরদিন তোমরা ঘরে থাকতে পারবে না ব'লেই তীর্থধর্ম্ম ক'রবার নামে বেড়াতে বার হও?"

রাণীর মুখের হাসি হঠাৎ মিলাইয়া গেল, কিন্তু গোকুলের কথার উত্তর দিল না। ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া গোকুল ডাকিল—"ভাজ্‌বৌ—"

"কেন?"

"আর আমি যদি বিয়ে-থাওয়া না করি—তখন?"

হঠাৎ চমকিয়া রাণী গোকুলের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু তাহার চক্ষে শান্ত দৃষ্টি এবং ওষ্ঠাধরে হাসির একটু রেখা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইল না।

ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া দৃঢ়স্বরে রাণী উত্তর দিল,—"আচ্ছা, তখনকার ব্যবস্থা তখনই করবো, এখন নয়।" কিন্তু "ব্যবস্থা যখনকার, তখনই করিব" বলিয়া রাণী নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না, একদিন তাহার কয়েকখানা কাপড় গামছায় বাঁধিয়া লইয়া সে গোকুলের কক্ষদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, ডাকিল—"ঠাকুর পো!"

শীঘ্রই গ্রামের বারোয়ারী তলায় সুরথ-উদ্ধার গীতাভিনয় হইবে, কিছুদিন হইতেই তাহার আয়োজন পুরাদমেই চলিতেছে। গান গাহিতে পারে ভাল বলিয়া না কি গোকুলও পাগল দিবোদাসের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল; এবং দিনরাত্রির অধিকাংশ সময়ই আপনার কক্ষে বসিয়া দিবোদাসের গান কয়খানির সুর করিয়া গাহিত। সেদিনও তক্তপোষের উপরে তাল দিতে দিতে গাহিতেছিল—

এ আপন বুঝে চল এইবেলা—
ঐ বাস্ত শকুন উড়ছে মাথে গো
যুক্তি দিছে হাড়গিলা—আ আ আ—
আ আপন বুঝে—

হঠাৎ বাহির হইতে ডাক শুনিয়া সে গান থামাইল। দুয়ারের সম্মুখে মুখ বাড়াইয়া দেখিল—রাণী দাঁড়াইয়া আছে। হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িয়া গেল, ভাজ-বৌয়ের বেশের দিকে। একটু আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল—রাণীর পরিধানে অন্যান্য দিনের ছিন্ন, মলিন থান কাপড়খানির পরিবর্ত্তে, সেদিন তাহার পরিধানে একখানি ধোপ দেওয়া নূতন থান। মাথার অবিন্যস্ত, রুক্ষ চুলের ভারে আজ যেন একটু তৈল এবং চিরুণির স্পর্শ হইয়াছে। ক্ষণকাল তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া গোকুল প্রশ্ন করিল—

"—এ কি ভাজ্‌-বৌ?"

তাহার দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া আপনার দেহের উপরে দৃষ্টি পড়িতেই, রাণীর মুখখানার উপরে কে যেন চকিতে খানিকটা কালি ফেলিয়া দিয়া গেল। কি একটা কড়া উত্তর তাহার জিহ্বাগ্রে আসিয়াই থামিয়া গেল। একটা ঢোঁক গিলিয়া কহিল—"বাড়ী যাচ্ছি। তাই তোমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যেতে এলাম।"

বিস্মিত স্বরে গোকুল প্রশ্ন করিল—"বাড়ী!"

তেমনি স্বরেই রাণী উত্তর দিল—"হ্যাঁ বাড়ী, বাপের বাড়ী। বুঝেছো এবার?"

গোকুল যেন চমকিয়া উঠিল। ক্ষণকাল নীরবে রাণীর মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল—"কিন্তু কেন, শুনি?"

রাণীর মুখের উপরে বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিল। কহিল—"শুনাতে বাকি রেখেছি বলে তো মনে পড়ে না ছোটকর্ত্তা! আবার বার বার ক'রে শুনাতে আমি তোমায় পারিনে, আর অত ধৈর্য্যগুণও আমার নেই।" সে পশ্চাৎ ফিরিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইল।

রাণীর শেষের কথা কয়টি কাণে যাইতেই গোকুলের মুখের উপরের হর্ষের ছায়াটুকু কে যেন তুলির একটি টানে নিশ্চিহ্নে মুছিয়া লইল। তাহার মনে পড়িয়া গেল—গত দিনকার রাণীর সেই কথাগুলি। যেদিন সে বড় জোর করিয়াই হাসিয়া ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছিল—"আর আমি যদি বিয়ে-থাওয়া না করি ভাজ-বৌ, তখন?—"

একটু ভাবিয়া গোকুল ব্যথিত স্বরে ডাকিল—"ভাজ-বৌ—"

রাণী থমকিয়া দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইল—"কেন?"

গোকুল দ্রুতপদে তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল—"যাচ্ছ কেন?"

রাণী উত্তর দিল—"বলেছি তো—"

নীরবে কিছুক্ষণ নত মুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়া গোকুল মুখ তুলিল। একটু তীব্রস্বরেই কহিল—

"কিন্তু এ বাড়ীর চেয়ে কি তোমার সেই বাড়ীই বেশী আপনার, ভাজ-বৌ?"

রাণী উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, "সে জমা-খরচ তো তোমার কাছে নয়।" সে আর বিলম্ব করিল না, দ্রুতপদে দালান পার হইয়া উঠানে নামিয়া পড়িল।

গোকুল কিছুক্ষণ স্তম্ভিতভাবে সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পরে আপনার কক্ষে প্রবেশ করিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল। সেদিন আর সে উঠিলও না, কিছু খাইলও না।

দ্বিপ্রহরে বন্ধু শ্যামলাল আসিয়া ডাক দিল—"আখ্‌ড়ায় যাবিনে?"

মুখ না ফিরাইয়াই গোকুল উত্তর দিল "না—"

"কেন? আজ আবার তোর হ'ল কি? মান, না অভিমান?"

নিজের রসিকতায় উৎফুল্ল হইয়া সে হাসিতে লাগিল, কিন্তু গোকুল এ হাসিতে যোগ দিল না। গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল—"যা, যা শ্যামা, সব সময় ইয়ারকি ভাল লাগে না, জানিস্?"

ক্ষুব্ধ চিত্তে শ্যামলাল ফিরিয়া গেল, এবং গোকুলও উঠিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল।

(৫)

গোকুলের উপরে হয় তো অনেকটা রাগ বা অভিমান করিয়াই রাণী যাহার গর্ব্ব করিয়া এ-বাড়ী চলিয়া আসিল, সেই বিপিনই যখন একদিন এ পারের সহিত সকল সম্পর্ক চুকাইয়া দিয়া ওপারে চলিয়া গেল, এবং সমস্ত গ্রাম ঘুরিয়াও পিতার মৃতদেহ সৎকারের জন্য একজন স্বজাতিকেও সম্মত করিতে না পারিয়া নন্দ যখন শ্রান্ত দেহে বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখনও বিপিনের প্রাণশূন্য দেহখানা আগুলিয়া রাণী উঠানে বসিয়া ছিল।

শীতের বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে। সূর্য্য নদীপারের পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছিল, তাহারই শেষ সোণালী আলোকচ্ছটা আসিয়া নিকটের ও দূরের গাছের উপরে পড়িয়া চিক্‌চিক্ করিতেছিল। নন্দকে শুষ্ক বদনে একাকী ফিরিতে দেখিয়া রাণী প্রশ্ন করিল—"কি রে? কাউকে পেলি নে?"

নিরাশা-জড়িত স্বরে নন্দ উত্তর দিল "না—"

"কেউ এল না?"

নন্দর চক্ষে জল উছলিয়া উঠিল। ভগ্ন স্বরে কহিল—"আসবে কি ক'রে দিদি?—গোকুলদা যে তাদের সবাইকে টাকা খাইয়ে হাতের মুঠোয় রেখেছে। সে না কি বলেছে যে, 'মরেছে মরুক বিপ্‌নে ঘোষ, তাই বলে স্বজাত একটি প্রাণীকে আমি ও-বাড়ীমুখো হ'তেও দেব না, আর মড়া তুলতেও দেব না।'"

"কি?"

রাণীর চক্ষু দুইটা মুহূর্ত্তের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ডাকিল "নন্দা!"

"কেন দিদি?"

"একটু এখানে বস্ তো, আমি এখনই আস্‌ছি—"

উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া, উঠিয়া সে দ্রুতপদে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

নন্দ সভয়ে ডাকিল "দিদি—"

উত্তর আসিল না।

রাণী তখন দ্রুতপদে আম্রকাননের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল।

সিঁড়ির দুয়ার পূর্ব্বে ভেজানই থাকিত, সেদিনও ছিল। দুই হাতে দুয়ার ঠেলিয়া রাণী বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল। আর কোনও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া গোকুলের কক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তীব্র অথচ মৃদুস্বরে ডাকিল—"ঠাকুর পো—"

গৃহমধ্যে তখন পুরাদমে আসর জমিয়া উঠিয়াছে, বাঁয়া তবলার বেতালা চাঁটির সঙ্গে কাহার কণ্ঠের তেমনি একটা বেতালা, বেসুরা গান আসিয়া রাণীর কর্ণে প্রবেশ করিল—

মনের কথা রইল মনে বলা হ'ল না—
সে যে আসবে ব'লে গেল চ'লে ফিরে এল না।

সাধের সাধে সাধা, সার হ'ল কাঁদা—
দেখার আশা ভেসে গেল
হতাশ গেল না।

হঠাৎ, বাহিরের ডাকটির যাদুস্পর্শে ঘরটি যেন নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল। বাঁয়া তবলা ও ভাঙ্গা হারমোনিয়মের সুরের সহিত গানও থামিয়া গেল। ঘরের ওদিককার একটা কোণে গোকুল চক্ষু মুদিয়া, আধশোয়া অবস্থায়, এক হাতের তালুর উপরে অন্য হাতে তাল ঠুকিতেছিল। চিরপরিচিত ঐ কণ্ঠস্বরটি কাণে যাইবামাত্র সে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় চমকিয়া সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। বাহির হইতে পুনরায় ডাক আসিল—"ঠাকুর পো—"

গোকুল উঠিয়া আসিয়া দুয়ারের সম্মুখে থমকিয়া দাঁড়াইল—"এ কি? ভাজ-বৌ তুমি?"

দৃঢ়স্বরে রাণী উত্তর দিল—"হ্যাঁ আমিই। তুমি না কি আমার বাপের মড়া তুলতে একজন স্বজাতকেও আমাদের বাড়ী ঢুকতে দেবে না, এ কি সত্যি?"

গোকুল হঠাৎ উত্তর দিতে পারিল না,—বিহ্বল দৃষ্টিতে রাণীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রাণী মুখ ফিরাইয়া লইল। ঘৃণা-পূর্ণ স্বরে কহিল—"এতটা অধঃপাতে গেছ ব'লে কোনও দিন আমার বিশ্বাস হয়নি ছোটকর্ত্তা, কিন্তু আজ আমার সে ভুল তুমি নিজের হাতেই ভেঙ্গে দিলে। মনে করেছো, তোমার টাকা আছে, তুমি বড়লোক, তাই এত গর্ব্ব হয়েছে তোমার! কিন্তু তা মনে ভেব না ছোটকর্ত্তা, আমারও তাতে অর্দ্ধেক ভাগ আছে, সেটা ভুলে যেও না।"

চমকিয়া গোকুল ডাকিল "ভাজ-বৌ—"

তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু রাণী তাহার সে ডাকের উত্তর দিল না। পূর্ব্বের ন্যায় স্বরে কহিল—"তোমার ও কথা সত্যি? সত্যিই কি তুমি কাউকে আমাদের বাড়ী পর্য্যন্ত মাড়াতে দেবে না?"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া গোকুল মুখ তুলিল, দৃঢ় স্বরে উত্তর দিল—"না—"

"কি?"

রাণীর চক্ষু দুইটি যেন একবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, দৃপ্তস্বরে কহিল—"আচ্ছা, আমিও দেখে নিচ্ছি কে কেমন না যায়। আমার যা কিছু বিষয় বা সম্পত্তি আছে, সব বেচেও আমি আজ লোক জুটাব। চাইনে স্বজাত, আমি অন্য জাত দিয়েই মড়া তুলাব।"

যেমন দ্রুতপদে সে আসিয়াছিল, তেমনিই ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া গোকুল ধীরপদে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেই চারিদিক হইতে নানা প্রশ্ন আসিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল—"তোর ভাজ-বৌ এসেছিল বুঝি?"

"খুব ব'লে গেল তো—ঈস্, মেয়েমানুষ তো নয়, যেন লড়াইয়ের সেপাই রে—চেহারাখানাও তেমনি, না আছে তাতে মেয়েলি ছিরী, না আছে মেয়েলি ছাঁদ- "

বিরক্তিপূর্ণ স্বরে গোকুল কহিল—"চুপ্ কর তোরা—"

তাহারা এ কথার পরে চুপ করিয়া গেল বটে, কিন্তু গান বাজ্‌নার আসর আর তেমন জমিল না। কে যেন হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়ার মত আসিয়া তাহাদের আনন্দের উপরে একখানা কাল আবরণ টানিয়া দিয়া গেল। গোকুল তাহার পরিত্যক্ত স্থানটায় আবার আসিয়া বসিল, কিন্তু তেমন উৎসাহে আর উৎসবে যোগ দিতে পারিল না। শুধু, মাথাটাকে একবার সম্মুখে ও পার্শ্বে হেলাইয়া তাল দিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে যে আন্তরিকতার লেশমাত্রও ছিল না, তাহা সকলেই বুঝিল।

পরদিন প্রভাতে গ্রামের সকলেই শুনিল, গতরাত্রে বিপিন ঘোষের মৃতদেহ সৎকার হইয়াছে,—স্বজাতির দ্বারা নহে, এবং বিপিনের মেয়ে,—এ বাড়ীর বড়বৌয়ের গহনা-বিক্রয়-লব্ধ অর্থে।

গোকুলের কাণেও এ খবরটা আসিতে বিলম্ব হইল না। একটা নিঃশ্বাস শুধু তাহার বক্ষ কম্পিত করিয়া বাহির হইয়া গেল। এ সম্বন্ধে একটা কথাও সে বলিল না।

(৬)

রাঁধিতে রাঁধিতে রাণী ডাকিল—"নন্দা—"

নন্দ বারান্দার একটা কোণে বসিয়া কি একটা কথা ভাবিতেছিল।

উত্তর দিল—"হুঁ—"

রাণী কহিল,—"আর এ গাঁয়ে থাকব না নন্দা—"

"থাকবে না?—তাহ'লে যাবেই বা কোথায়?"

রাণী কহিল—"তুই পাশের গাঁয়ে একখানা বাড়ী ঠিক ক'রে ফেল,—সেইখানেই আমরা সবাই মিলে চ'লে যাই চল্।"

নন্দ মুখ তু্ । বিস্মিত দৃষ্টিতে দিদির মুখের প্রতি চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"সে কি দিদি ? কেন যাব এখানকার বাড়ী-ঘর ছেড়ে ?"

"থাক্ বাড়ী-ঘর

নন্দ কহিল—"আচ্ছা, আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু তোমারও তো এতবড় বাড়ী, ঘর, দোর র'য়েছে! বিষয়-আশয়ও তো কম নেই।—ও সমস্ত তো একলা গোকুলদারই নয়, তোমারও অংশ রয়েছে, ঠিক ওর সমান অর্দ্ধেক। কেন তা ছেড়ে তুমি যাবে ? তার চেয়ে বল তুমি,—ও যদি সহজে তোমার পাওনা-গণ্ডা কিছু না দেয়, তবে আমিও ওর নামে নালিশ ক'রবো।"

তরকারী নাড়িতে নাড়িতে হাতের খুন্তি ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া রাণী মুখ ফিরাইল। তীব্রস্বরে ডাকিল—"নন্দা!—"

চমকিয়া, মুখ তুলিয়া নন্দ দেখিল, রাণীর মুখের উপরে ভাসিয়া উঠিয়াছে গভীর যন্ত্রণার সুস্পষ্ট রেখা। তেমনি তীব্রস্বরে রাণী কহিল—"বলি, এ বুদ্ধি তোকে কে দিলে, তাই শুনি ?"

নন্দ উত্তর দিল না, নীরবে বিস্মিত দৃষ্টিতে রাণীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

আবার খুন্তিটাকে তুলিয়া লইয়া তরকারী নাড়িতে নাড়িতে রাণী তিরস্কারের স্বরে শুধু কহিল—"ছিঃ!"

নন্দ আর একটি কথাও কহিল না, নীরবে নতনেত্রে বসিয়া রহিল।

রাণী আর এ গ্রামে থাকিতে সম্মত হইল না, একদিন ভাই, ভাই-বৌ—ও তাহাদের দুইটি পুত্র-কন্যাকে লইয়া,—জিনিসপত্র গুছাইয়া রাণী এ গ্রাম হইতে পার্শ্বের একটা গ্রামে গিয়া আশ্রয় লইল।

দিন কাটিয়া যায়—

শীতের ভোর। চারিদিক কুয়াশায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। প্রাতঃস্নান সারিয়া সিক্ত বস্ত্রে কাঁপিতে কাঁপিতে রাণী বাড়ী ফিরিতেছিল,—হঠাৎ দুয়ারে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তির মুখের উপরে দৃষ্টি পড়িতেই তাহার মুখখানা উজ্জল হইয়া পরক্ষণেই মলিন হইয়া গেল। কপালের উপরের কাপড়টা আর একটু টানিয়া দিয়া প্রশ্ন করিল—

"তুমি যে ?"

যে সর্ব্বাঙ্গে একখানা চাদর জড়াইয়া দুয়ারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল, সে গোকুল। রাণীর কথার উত্তর না দিয়া, দুয়ারের একপার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া সে কহিল, "তুমি শীতে কাঁপছো যে ভাজ-বৌ,—আগে কাপড়টা ছেড়ে এস।"

রাণী দুই এ কপা অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, কহিল—"তা এই ঠাণ্ডায় এখানে ব'সে প'ড়লে কেন ? বাড়ীর ভেতরে চল।"

গম্ভীর স্বরে গোকুল উত্তর দিল—"ও আমার খুব অভ্যাস আছে ভাজ্‌বৌ!—তার জন্যে তোমায় আজ কিছু নতুন ক'রে ভাবতে হবে না, তুমি যাও।"

ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রাণী কি যেন ভাবিয়া লইল। তাহার পরে দ্রুতপদে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল।

কাপড় ছাড়িয়া সে যখন পুনরায় বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন কুয়াশা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে, পথ দিয়া দুই একজন মানুষও চলিয়াছিল। রাণী ডাকিল—"ঠাকুর পো—"

গোকুল উত্তর দিল।

ব্যঙ্গস্বরে রাণী কহিল—"এতদিন পরে যে বড় দেখা ক'রতে এলে ?

আড়াআড়ি ভাবে ঝগড়াঝাঁটি, দ্বেষাদ্বেষি চ'ল্‌লেও, সাম্‌না-সাম্‌নি হয়নি ব'লে আজ বুঝি সেটা মুখোমুখী হ'য়েই ঝালাতে এলে, নয় ?"

গোকুল নত মুখে বসিয়া একটা ঘাস অন্যমনে খুঁটিতেছিল,—কথাটা কাণে আসিয়া বাজিতেই সে চমকিয়া মুখ তুলিল।

হাসিয়া রাণী কহিল—"কেমন! এইজন্যেই তো তোমার এখানে আসা ?"

গোকুলের মুখখানা হঠাৎ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া সহজ স্বরেই উত্তর দিল—"না—"

"সে কি ? না ?—তবে ?—আমার খোঁজ নিতে যে এসেছো এতদূর, তাও তো মনে হয় না ঠাকুর পো!"

হাসিমুখে কথাগুলি বলিলেও রাণীর কণ্ঠে ব্যঙ্গ স্বরটাই স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। দৃঢ়স্বরে গোকুল উত্তর দিল—

"না,—তাও নয়।"

"তবে ?"

"তুমি আর বাড়ী ফিরে যাবে কি না, তাই জিজ্ঞাসা ক'রতে এসেছি।"

রাণী হাসিয়া উঠিল—"বাড়ী ? আমার বাড়ী কি এটাই নয় ?"

গোকুল হাসিল না, গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল—"আর যারই হোক, তোমার যে নয়,—তা তো আমার জানতে বাকি নেই।"

রাণীর মুখের হাসি মিলাইয়া আসিল। ক্ষণকাল নীরবে অন্যদিকে চাহিয়া থাকিয়া সহজ স্বরেই উত্তর দিল—"সে কথা জান বা না জান, তাতে আমার কিছু আসবে-যাবে না। তবে—আমার জিনিস, কি কার জিনিস, এ বিষয়ে যদি তোমার এত টন্‌টনে জ্ঞান হ'য়েই থাকে ছোটকর্ত্তা, তবে সেদিন যখন আমার অতবড় বিপদটা প'ড়েছিল, তখন বিষয় আশয় তো দূরের কথা, একটা পয়সা দিয়েও উপকার ক'রতে আসনি, কিম্বা, স্বজাতের একজ'ন লোককেও আমাদের বাড়ী মাড়াতে দাওনি, সে কথা তুমি ভুললেও আমি তো ভুলতে পারব না ছোটকর্ত্তা! সে সময়ের ব্যবহার যে আমার মনে চিরদিন জেগে থাকবে। সেদিনও যখন আমার উপকারের বদলে অনুপকারই ক'রেছিলে, তখন,—এখনও আমি তোমার কাছে কোনও উপকারের আশা রাখিনে, আর উপকার ক'রতে এলেও তা আমি চাইনে, এটা মনে রেখো।"

সে নীরব হইল।

গোকুলের মুখের উপরে একখানা কাল ছায়া মুহূর্ত্তের জন্য ভাসিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল। ব্যঙ্গপূর্ণ স্বরে কহিল "বটে ?"

রাণী কহিল—"হ্যাঁ—। তুমি বাড়ী গিয়ে তোমার বিষয়-সম্পত্তি ভোগ দখল করগে। আমার যখন দরকার হবে, তখন তোমার কাছে মীমাংসা ক'রে চাইতে যাব না,—তখন আমি নালিশ ক'রে আপনিই সব ভাগ-বখরা ক'রে নেব।"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া গোকুল একটু হাসিল। মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে কহিল—"আচ্ছা, তবে আমি চললাম ভাজ-বৌ, আর আসব না। তবে ব'লে যাই—যে কথা তুমি ব'ললে, তাইই ক'রো, বুঝলে ? আমিও তোমার বিপক্ষ হ'য়ে আদালতে দাঁড়াতে যে ভয় পাব না, সে কথাটাও এই সঙ্গে তোমায় জানিয়ে গেলাম।"

সে আর দাঁড়াইল না, দ্রুতপদে পথের বাঁক ঘুরিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

রাণী ক্ষণকাল স্তম্ভিত ভাবে গোকুলের চলিয়া যাওয়ার পথটার প্রতি নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল ; পরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাড়ীর ভিতরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল।

(৭)

বৎসর ঘুরিয়া গেল।

রাণীর খবর আর গোকুল লইল না, আসিলও না। কিন্তু রাণী প্রতিদিনই তাহার খবর পাইত,—শুনিত, প্রতিদিনই গোকুল কেমন করিয়া ধীরে ধীরে অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতেছে। তাহার এ অগ্রসরের বিরাম নাই,—যেন মরণের ক্রোড়ে আপনার শয্যা পাতিয়া লইতেই তাহার আগ্রহ বেশী।

প্রতিবেশিনীরা দুঃখ জানাইয়া রাণীকে কহিল—"কেন গা!—তোমারও তো শ্বশুরবাড়ীর বিষয়-সম্পত্তিতে আধা-আধি বখরা আছে! তোমার দেওর যে দু'হাতে এমন ক'রে সব বিষয়-সম্পত্তি উড়ুচ্ছে, তাতে তুমিই বা একবার আপত্তি কর না কেন ? তুমি বাছা বিধবা মানুষ,—তার ওপরে বয়েসও তো যায়নি,—ব'লতে নেই, তবু তুমি অনেক দিন বাঁচবে বাছা। কেন তুমি হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলবে ? গাঁয়ের দশজন ভদ্দর লোক ডেকে সমান ভাগ-বিলি ক'রে নাও গে।"

এ কথার উত্তর দিতে গিয়া রাণীর ওষ্ঠাধরে ম্লান হাসির রেখা ভাসিয়া উঠিল। শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিল—"ভাগ বিলি তো একদিন হবেই, এত তাড়াতাড়ি বা কিসের! ভগবান যে নেই, তা তো নয়! আমার জীবন যেমন ক'রে হোক কেটে যাবেই।"

কিন্তু ভাগ-বিলির কোনও উদ্যোগই পাড়ার লোকের চোখে পড়িল না! শুধু রাণীর মুখের কথা শুনিয়াই তাহাদের দিন কাটিতে লাগিল।

সেদিন রাত্রে ও-গ্রাম হইতে দুধ বিক্রয় করিয়া ফিরিয়া নন্দ কহিল—"আজ গোকুলদা'দের বাড়ী গিয়েছিলাম, দিদি।"

রাণী নত বদনে কি একটা কাজ করিতেছিল, চমকিয়া মুখ তুলিল—"কার বাড়ী ?"

নন্দ উত্তর দিল "গোকুলদা'দের।"

মুখ নত করিয়া রাণী কহিল—"হুঁ, তার পরে ?"

"দেখে এলাম—"

"কি দেখলি ?"

একটু হাসিয়া নন্দ কহিল—"চূড়ান্ত মাতাল। সারাদিন কোথায় প'ড়ে থাকে তার পাত্তাই পাওয়া যায় না। রাত্রে হয় তো বাড়ী ফেরে নয় তো ফেরে না,—কোথাও বেহুঁস হ'য়ে প'ড়ে থাকে।

রাণীর হাতের কাজ পড়িয়া রহিল, সে মুখ তুলিয়া বিস্ফারিত নয়নে নন্দর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। নন্দ হাতের হুঁকাটায় গোটা কতক টান লাগাইয়া, একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিল "বাড়ীর সমস্ত ঘরগুলো তো তালা-বন্ধ। শুধু একটা ঘরে থাকে, আর সব জঙ্গলে ভ'রে গেছে। ঘরের আসবাবপত্রও দেখতে কিছু আমার বাকি নেই। সে অবস্থা আর গোকুল ঘোষের নেই গো দিদি, নেই। মদ তাড়ি খেয়ে আর স্ফুর্ত্তি করে সব ফুঁকে দিয়েছে! এখনও 'ওর হ'য়েছে কি,—এর পরে ওকে দোরে দোরে হাত পেতে খেতে হবে, এই এক কথা তোমায় বলে রাখলুম দিদি, দেখে নিও। আর এ যদি সত্যি না হয় তো আমি—"

কি একটা কঠিন দিব্য করিতে গিয়া নন্দ তাড়াতাড়ি আপনার রসনাকে সংযত করিয়া ফেলিয়া হুঁকায় মুখ লাগাইল।

একটা দীর্ঘশ্বাস রাণীর বক্ষ কাঁপাইয়া ধীরে ধীরে নৈশ বাতাসে মিলাইয়া গেল। দৃষ্টি নত করিয়া সে পুনরায় কাজে হাত দিল।

বেশী দিন নয়—বোধ হয় সাত আট দিন পরের একটি সন্ধ্যায় ও-গ্রামের বাজার হইতে দুধ বিক্রয় করিয়া ফিরিয়া আসিয়া নন্দ যখন রাণীকে জানাইল—গোকুলের অত্যন্ত অসুখ, হয় তো তাহার জীবনের মেয়াদ ফুরাইয়া আসিয়াছে,—তখন রাণী তুলসীতলায় প্রদীপ রাখিয়া প্রণাম করিতেছিল। চমকিয়া উঠিয়া মুখ ফিরাইয়া প্রশ্ন করিল—"সে কি রে নন্দা ?

বাঁকটা দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়া রাখিতে রাখিতে নন্দ গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল—"সত্যিই দিদি।"

রাণী আর একটি কথাও কহিল না, প্রদীপটি তুলিয়া লইয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ পরে সে যখন ছোট একটি পুঁটুলি হাতে লইয়া বাহির হইয়া আসিল, তখন নন্দ বিস্মিত হইল, কহিল "এ কি দিদি ?"

ম্লান হাসি রাণীর ওষ্ঠাধরে ফুটিয়া উঠিল, উত্তর দিল—"শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছি নন্দা, আমার সঙ্গে একটু চল, পৌঁছে দিয়ে চ'লে আসিস।"

গামছাটা কাঁধে ফেলিয়া নন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল।

নন্দকে বিদায় দিয়া রাণী যখন আলো অন্ধকারের মধ্য দিয়া দ্রুত পদে গোকুলের কক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তখন রাত্রি হইয়াছে, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, শু ঝিল্লীর অবিশ্রান্ত ডাক কাণে ভাসিয়া আসিতেছিল।

ছিন্ন মলিন শয্যায় কঙ্কালসার-দেহ গোকুল শুইয়া ছিল। অদূরে কয়েকটি ইটের উপরে ধোঁয়ায় ধূসরবর্ণ একটি হ্যারিকেন ছিল, ম্লান আলো চারিদিকে বিতরণ করিতেছিল। দুয়ার ভেজান।

দুয়ার ঠেলিয়া রাণী কক্ষ মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল, কম্পিত স্বরে ডাকিল—"ঠাকুর পো—"

গোকুল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নির্জ্জীবের মত শয্যায় শয়ন করিয়া ছিল,—পরিচিত এই ডাকটি কাণে যাইতেই সে চমকিয়া চক্ষু চাহিল, ভগ্ন স্বরে প্রশ্ন করিল—

"ভাজ-বৌ—তুমি !"

রাণী ধীরে ধীরে তাহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিল,—ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া শান্ত স্বরে উত্তর দিল "হ্যাঁ আমি—"

গোকুল একবার মাত্র তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিল, তেমনি ভাবে থাকিয়াই কহিল—"কিন্তু আমি তো তোমায় ডাকিনি ভাজ-বৌ, কেন এলে তুমি ?"

রাণী চমকিয়া উঠিল। গোকুলের কণ্ঠস্বরে যে অভিমান ফুটিয়া উঠিল, তাহা তাহার বুঝিতে বিন্দুমাত্রও বিলম্ব হইল না,—উত্তর দিল,—"কিন্তু না ডাকলে কি আসতে নেই ?"

গোকুল ম্লান হাসিল,—কহিল "ও,—বলাটাই যে আমার অন্যায় হ'য়েছে ভাজ-বৌ, তা আমি আগে বুঝতে পারিনি। এ বাড়ীতে যে তোমার আধাআধি ভাগ, এ কথাটাও রোগের যন্ত্রণায় আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। যাই হোক, ক্ষমা ক'রো।"

রাণীর মুখের উপরে যে বেদনার গাঢ় ছায়া ভাসিয়া উঠিয়াই চকিতে অদৃশ্য হইল, তাহা গোকুল দেখিল না, কহিল—"যাই হোক, দয়া ক'রে আমার মরণের পরে এলেই বেশ ক'রতে।"

তিরস্কারের স্বরে রাণী ডাকিল "ঠাকুর পো—"

গোকুল হাসিল, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"আজও আমি হয় তো একটা আশা নিয়েই বেঁচে ছিলাম, কিন্তু কাল না থাকতেও পারি।" হঠাৎ সে চোখ মেলিয়া কাতর স্বরে ডাকিল—"ভাজ-বৌ—"

রাণী উত্তর দিতেই সে তাহার একখানা হাত আপনার হাতের ভিতরে টানিয়া লইয়া কহিল "কাল হয় তো আমি আর কিছু দেখতেও আসব না—দুনিয়ার দেনা-পাওনা কাল আমি হয় তো সবই শোধ ক'রে দেব।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় কহিল—"কিন্তু তা হোক, তাতে আমার দুঃখ নাই,—আমি বড় শান্তিতেই যাব, কিন্তু, ভাজবৌ, হয় তো তুমি শুনেছো, হয় তো কেন, নিশ্চয়ই শুনেছো যে আমি মন্দ পথে দাঁড়িয়ে সহায়-সম্পত্তি সব ঘুচিয়েছি। কিন্তু না ভাজ-বৌ, সহায় হয় তো ঘুচিয়েছি, কিন্তু সম্পত্তি যাই থাক্, তার এক পয়সাও ঘুচাইনি। সবই রইল ভাজ-বৌ,—আমি চললুম বটে, তবে কিছু নিয়ে নয়। সে সমস্তই তোমার নামে লেখাপড়া করিয়ে ঐ সিন্দুকে রেখে গেলাম, নিও।"

ঝর ঝর করিয়া শ্রাবণধারার ন্যায় রাণীর উভয় চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিয়া গোকুলের জ্বরতপ্ত ললাটের উপরে পড়িতেই সে চমকিয়া উঠিল—"ভাজ-বৌ—"

রাণী দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফেলিল, তাহার ওষ্ঠাধর ভেদ করিয়া অস্ফুট ক্রন্দন জড়িত স্বরে বাহির হইয়া আসিল—

"আমি তো তোমার কাছে এ চাইনি—।"

প্রেম

শ্রীল

মালা গাঁথি আনমনে,
মালা যায় শুকায়ে;
বাহিরেতে হাসি খুসি
কত কাঁদি লুকায়ে।

জ্বলে গেল পুড়ে গেল
এ বুকের কলিজে,
আগ্ জ্বেলে দিল যে গো
পেলে তারে, বলি যে।

সে যে গেছে পলাইয়া,
কোথা তারে খুঁজিব?
তারে পেতে হ'লে পরে
কোন্ দেবে পূজিব?

প্রেম ব'লে যারে ছোটে;
পায় ইহা ক'জনে?
প্রেমালোক যায় নিবে
নিরাশার পবনে।

কারো বুক ভেঙ্গে যায়,
চিতা জ্বলে পরাণে,
রূপে মজি কেহ পুন
রূপে প্রেম বাখানে।

রূপ-পূজা করে নর
প্রেম সে গো জানে না।
সে যে অতনুর দাস
প্রেম-ধারে ধারে না।

শুক্তি মাঝে জন্মে মুক্তা
জন্মে প্রেম নারীতে,
প্রেম-পুষ্প শুধু ফোটে
শুভ্র সাধ্বী চরিতে।

মাতৃজাতির ব্যায়াম-কথা

ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্‌-এম্‌-এ

ব্যায়াম করার প্রয়োজনীয়তা।

বিশিষ্টরূপে শ্রম করাকেই ব্যায়াম করা বলা যায়। স্বেচ্ছায়, কোনও অঙ্গ বিশেষকে পুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে শ্রমকার্য্য এতদর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। আমরাও কতকটা সেই অর্থে ব্যায়াম কথাটিকে ব্যবহার করিব ;—"সেজে-গুজে," উদ্দেশ্য বিশেষ লইয়া, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনাকেই আমরা লক্ষ্য করিব

ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা কি, তাহা বুঝাইতে হইলে, কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিলেই চলিবে। শিশুরা অনবরত উঠে-বসে, জিনিষপত্র ফেলে-ভাঙে, উঠায়-নামায়, কখনো দৌড়ায়, কখনো হামা-টানে,—ইত্যাকারে, যতক্ষণ তাহারা নিদ্রিত না হয়, ততক্ষণই কিছু-না-কিছু করে। তাহাদের এই অঙ্গসঞ্চালন নিরর্থক নহে; মাংসপেশীকে কতকটা খাটান ইহার উদ্দেশ্য, এবং কতকটা দ্রব্য-জ্ঞান সঞ্চয় করাও উদ্দেশ্য। গায়ে ব্যথা হইলে, অথবা দেহের কোনও যায়গার মাংসপেশী শুকাইয়া যাইলে ("ছিনা পড়িলে"), আমরা গা-হাত-পা টিপাই ;–উদ্দেশ্য, স্থানীয় মাংসপেশীগুলিকে নাড়া-চাড়া করা। গোড়ায়, "ক্যাংলা" গঠন লইয়া, যে যুবকরা সুধু কুচ-কাওয়াজ করিয়াই, অ্যাম্বুল্যান্স কোর হইতে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহাদের তখনকার দৈহিক উন্নতি কে না দেখিয়াছেন? তাঁহাদের ভোজন খুব মোটামুটি রকমেরই হইত, অথচ, তাঁহারা সকলেই ব্যায়ামে ফলে উপকৃত হইয়াছিলেন।

নিত্য ঘরদ্বার ঝাঁট দিলেও, সপ্তাহে বা মাসে সমস্ত জিনিষ নাড়া-চাড়া করিয়া, ঘর ঝাড়ার প্রয়োজন হয়; তাহা না করিলে, ঘর ভাল থাকে না। সেই রকম, নিত্য চলাফেরা ও দৈনিক কাযকর্ম্ম করার ফলে, মল, মূত্র, ঘাম দিয়া শরীরের মল কিছু কিছু বাহির হয় বটে; কিন্তু তাহার উপরে, বিশেষ রকমে শরীরকে নাড়া-চাড়া করিলে, দেহ আরো ভাল হয়। এটুকু ব্যায়ামের সুফল।

যখন কেহ ব্যায়াম করেন, দেহে তখন কি কি পরিবর্ত্তন ঘটে? যে গুলি ঘটে, সেগুলি এই :—

(১) সারা দেহে সজোরে ও দ্রুত রক্ত চলাচল করে। আমাদের দেহের মধ্যে রক্তের দুইটি কায—একটি হইতেছে দেহের সর্ব্বত্র পুষ্টি বহন করা; অপরটি হইতেছে, দেহের ময়লাকে সমগ্র ক্লেদ-নিষ্কাশন যন্ত্রাবলীতে বহিয়া আনা। তাহা হইলেই বেশ, বুঝা গেল যে, ব্যায়ামের প্রথম সুফল—দেহে পুষ্টির আধান করা ও দ্বিতীয় সুফল হইল, দেহের ময়লা দূর করা।

(২) শ্বাসকার্য্য দ্রুত হইতে থাকে। তাহার ফলে, প্রথমতঃ, দম বাড়ে, দ্বিতীয়তঃ, শরীর হইতে নিঃশ্বাসের সঙ্গে দেহের অনেক মল নিষ্কাশিত হয়, এবং তৃতীয়তঃ, রক্ত পরিষ্কার হয় (অর্থাৎ, উহার ক্ষারধর্ম্মের উপচয় ঘটে না)।

(৩) ১৩৩২ সনের কার্ত্তিক মাসের "ভারতবর্ষে," "বাস্তব-উপন্যাস" নাম দিয়া, দেহের মধ্যে এক জাতীয় যে গ্রন্থি নিচয় আছে, তাহাদিগের কথা খুব বিশদ ভাবেই বর্ণনা করিয়াছি। ঐ গ্রন্থিগুলির রস ফল্গুনদীর মত অন্তঃসলিলা, অর্থাৎ, দেহের মধ্যেই অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হয়,–এ কথা বলিয়াছি। উহাদের আরো বিশেষত্ব এই যে, এক জাতীয় রস স্রুত হইলে, তবে অপর কতকগুলি রস স্রুত হয়, অথবা অপর কতকগুলি গ্রন্থির রসস্রাব রুদ্ধ হয়, এ কথাও বলিয়াছি। প্রকৃষ্টরূপে অঙ্গ চালনার ফলে, ঐ সকল "অন্তঃসলিলা" রসের কার্য্য সম্যক প্রকারে বৃদ্ধি পায়। আমাদের দেহের উন্নতি বা অবনতি এই গ্রন্থিগুলির রসের উপরে বিশেষ ভাবে নির্ভর করে, এ কথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

(৪) শরীরে যেখানে যত পেশী আছে, সকল গুলিই দৃঢ় ও সবল হইয়া উঠে। তজ্জন্য দেহ হালকা বোধ হয়, পেশীগুলির কার্য্যকুশলতা বাড়ে, আপনা-আপনিই কোষ্ঠবদ্ধতা সারিয়া যায়।

(৫) দেহ সবল হইলে, তবে মনও আপনা-আপনি

উন্নত হয়; হীনতা একেবারেই মনোমধ্যে স্থান পায় না। ক্ষীণ দেহে, মনও দুর্ব্বল থাকে; বীরের মন সদাই উন্নত।

এক কথায়, দেহের উন্নতি সাধনের সনাতন ও প্রকৃষ্ট উপায়—ব্যায়াম-"সাধনা" করা।

স্ত্রীলোকদিগের ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা

দেহ ধারণ করিতে হইলেই, দেহ ভাল রাখিবার প্রয়োজন যে আছে, সে কথা আর বলিয়া দিতে হয় না, অন্ততঃ অপর দেশে। কিন্তু এই দুর্ভাগ্য দেশে, যেখানে স্ত্রীজাতি "রমণী" ও "গৃহিনী"—অর্থাৎ, যে দেশে বৎসরে-বৎসরে সন্তান জন্মান চাই, এবং যে দেশে শরীরটাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, "চুটাইয়া", সকলকে সেবা করাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—সে দেশে, বড়গলা করিয়া, "স্বাস্থ্য" বলিয়া যে একটা শারীরিক অবস্থা আছে, তাহা বারম্বার শুনান আবশ্যক; এবং ভীম ভৈরবনাদে, বজ্রনির্ঘোষে প্রচার করা চাই যে,—সেই স্বাস্থ্য পিতৃ-জাতির পক্ষেও যতটা আবশ্যক, মাতৃ-জাতির পক্ষে তদপেক্ষা অনেক বেশী আবশ্যক বৈ, কম নহে !!!

প্রকৃতির বেশ সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ এই যে, স্ত্রীজাতি পুরুষ-রক্ষকের অধীনে থাকিবে। কিন্তু তাই বলিয়া, জীবজগতে কোথাও ভগবান স্ত্রী-জাতিকে একান্ত "অবলা" করিয়া জন্মও দেন নাই, বা চিরকাল অবলা থাকিয়া যায়, এমন পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর মধ্যেও তাহাদিগকে রাখেন নাই। "সভ্য"-মানুষের সমাজেই স্ত্রীজাতি অবলাই—বিশেষ করিয়া, "ধর্ম্মক্ষেত্র-কর্ম্মক্ষেত্র-ভারতবর্ষের কুরুক্ষেত্রের-অপর-প্রান্ত-বাসিনী অর্থাৎ বঙ্গদেশবাসিনী স্ত্রীলোকরা! আর এ দুর্ভাগ্য দেশে বিশেষ করিয়া, বর্ত্তমান যুগের সৌখীন পুরুষরাও মেয়েলী ঢংএ চুল-রাখা ও আঁচড়ান, মেয়েলী ঢংএ সাজগোজ করা, মেয়েলী ঢংএ মিহিসুরে কথা কহাও শ্রেয়ঃ মনে করিয়া, কাজে ও সাজে, দেহে ও মনে, "অবলা" হইয়া পড়িতেছেন! যা'ক সে কথা।

দেহ সুস্থ থাকিলে, তবে সুস্থ সন্তানের জন্ম দেওয়া যায়, এবং সন্তানরা যথোপযুক্ত ভাবে লালিত ও পালিত হইতে অবসর পায়। স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে, মনও প্রফুল্ল থাকে; কাযেই, স্বাস্থ্যবতী মাতা কতদূর পর্য্যন্ত যে নিজ সন্তানের দেহের ও মনের উপরে নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

স্ত্রী ও পুরুষের ব্যায়ামের পার্থক্য

সভ্য সমাজে, পুরুষরা স্ত্রীজাতির রক্ষক ও পালক। অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্য ও আশ্রিতকে বিপদাপদ হইতে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য, যতটা সামর্থ্যের প্রয়োজন, পুরুষ-জাতিকে অন্ততঃ তদনুযায়ী আজীবন কায়িক শ্রম করিতে হয়। কিন্তু রমণীর শ্রমের সম্বন্ধে অনেক কথা আছে।

স্ত্রীজাতির জীবনে পাঁচটি বিশেষত্ব আছে। প্রথমতঃ, প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া, তাঁহাদের মাসিক রজোস্রাব ঘটিয়া থাকে; এই রজোস্রাবটি ঠিক্ রক্তস্রাব নয়; অর্থাৎ, এই রক্তটুকু ক্ষত না হইলে, অনেক স্থলে স্ত্রীলোকটির দেহ সুস্থ থাকে না এবং এই স্রাবের ব্যাপারটি সুধু জরায়ুর সঙ্গেই সম্পর্কিত নহে; অর্থাৎ, স্ত্রীলোকের পক্ষে, ঋতুকাল, তাবৎ দেহের, বিশেষ করিয়া স্নায়ুমণ্ডলীর সুস্থতার ও অসুস্থতার নিয়ামক। দ্বিতীয়তঃ, গর্ভকালীন, স্ত্রীলোকদের এমন ভাবে চলিতে ফিরিতে হয়, যাহাতে গর্ভস্থ শিশুর কোনও রকমে ক্ষতি না হয়; গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতির সহিত তাহার মাতার জীবন মরণের সম্বন্ধও বিজড়িত। তৃতীয়তঃ, শিশুর জন্মের পর হইতে, প্রায় ছয় মাস হইতে এক বৎসর ধরিয়া, স্ত্রীলোকদিগকে নিজ বক্ষের ক্ষীর দিয়া শিশুকে মানুষ করিতে হয়। চতুর্থতঃ, ৪৪—৫০ বৎসর বয়সের ঘনাঘুনি, স্ত্রীলোকদের ঋতু বন্ধ হইবার কাল; এই সময়টা, ও ১২ হইতে ১৪ বৎসর বয়স ঋতু আরম্ভের এই সময়টাও,—স্ত্রীলোকদের জীবনে অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন সময়। ঋতু আরম্ভ ও ঋতু শেষ হইবার কালটা, সত্য সত্যই স্ত্রী-লোকদের "কাল"—জীবন্মৃত্যুর সন্ধিব সময়। জরায়ুর পূর্ণত্ব প্রাপ্তি (ঋতু-আরম্ভ) ও জরায়ুব অবনতির সূত্রপাত (ঋতুবন্ধ কাল), সময়ে সুধু জরায়ুই যে বাড়ে বা কমে, তাহা নয়; সমগ্র দেহ ও মন তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া সমূহ ভাল বা মন্দ করিতে পারে। পঞ্চমতঃ, সাধারণ গৃহস্থের কথা ধরিলে, দেখা যায় যে, স্ত্রীলোকরা পর্দ্দানসীন, স্ত্রীলোকরা অবগুণ্ঠনবতী; বেশীর ভাগ সময়ে তাঁহাদিগকে জল, অগ্নির উত্তাপ ও ধোঁয়া লইয়া, কুঁজো হইয়া, কায করিতে হয়; এবং সকলের ভোজনের পরে, অসময়ে, অবেলায়, তাঁহারা গৃহস্থের তৃপ্তির সহিত ভোজনের পরে যাহা' অবশিষ্ট থাকে, তাহাই খাইতে পান।

ব্যায়াম করিবার সাধারণ নিয়ম

এ সম্বন্ধে, পূর্ব্বে বহুবার বিশদভাবেই আলোচনা করিয়াছি ("সংহতি" ও "স্বাস্থ্য") ; এ জন্য সংক্ষেপে প্রধান-প্রধান নিয়মগুলি বলিয়া যাইব।

১। রোগ না জন্মে, শরীরটা ভার বা বোঝা বলিয়া বোধ না হয়, নিত্য কার্য্য করিবার প্রচুর সামর্থ্য থাকে, ক্ষুধা, নিদ্রা ও মলমূত্র নিষ্কাশন যথেষ্ট পরিমাণে হয়, এবং দীর্ঘায়ুঃ লাভ হয়—এই কয়টিই "স্বাস্থ্যের" লক্ষণ। স্বাস্থ্যলাভই ব্যায়াম করিবার উদ্দেশ্য। মাংসপেশীগুলিকে ইচ্ছামত খেলাইয়া দর্শককে মুগ্ধ করিব (মাস্‌ল্‌-কন্ট্রোল), ২॥০মণ, তিন মণ ভার উত্তোলন করিব (ওয়েট্‌-লিফ্‌টিং), বা গুণ্ডামী করিব,—ইহার কোনটাই ব্যায়ামের উদ্দেশ্য নয়। সত্য কথা বলিতে গেলে, যাহারা এই গুলির দিকে প্রধাবিত হয়, তাহারা জীবনে এই ভ্রমাত্মক আদর্শের মাশুলও দিতে বাধ্য হয়।

। ব্যায়াম এমন ভাবে করিতে হয়, যেন, নিত্যই উহার সংখ্যা বাড়ান সহজসাধ্য হয় ; যেন ব্যায়াম করিতে করিতে, শরীর হাল্‌কা ও মন প্রফুল্ল হয় ; যেন আজীবন উহাকে ঐ ভাবে বজায় রাখা ব্যায়ামকারিণীর পক্ষে সম্ভবপর হয়। কারণ,

৩। খেয়ালের বশে ব্যায়াম করিতে নাই। সারা জীবন যেমন আহার করিতে হয়, তেমনি নিয়ম করিয়া সারা জীবনই ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা কয়েক দিন ব্যায়াম করিয়া উহা ছাড়িয়া দেন, তাঁহারা শরীরের অপকারই করেন। কাযেই, এমন ভাবে ব্যায়াম আরম্ভ করিতে হয়, যাহা আজীবন বজায় রাখা চলে। আমার মনে হয়, এক জোড়া স্প্রীং গ্রিপ্‌ ডাম্বেলই সকল গৃহস্থের পক্ষে সুবিধা-জনক। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এক জোড়া ডাম্বেলের ওজন ১॥ বা ২ সেরের বেশী কিছুতেই যেন না হয় ; এবং তাড়াতাড়ি স্প্রাংএর সংখ্যা বাড়ানর চেষ্টা করা ভুল।

৪। কুস্তি, লাঠিখেলা, সাঁতার শেখা, বক্সিং, জুজুৎসু, মোটর গাড়ী হাঁকাইতে শেখা, এমন কি, অল্প-স্বল্প ঘোড়ায় চড়া শিক্ষা করাও, বর্ত্তমান যুগে বালক-বালিকাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রকম দিন কাল পড়িতেছে, যে রকম নারী হরণ ও নারী-ধর্ষণের বহর বাড়িয়াই চলিয়াছে, তাহাতে লেখা পড়া ফেলিয়াও, এদিকে সকলেরই দৃষ্টি দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়িতেছে।

৫। সুবিধা হয় ত দুবেলাই ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য। একেবারে খালি পেটে, অথবা খুব ভরা পেটে, ব্যায়াম করিতে নাই।

৬। ব্যায়াম করিতে করিতে, যে মুহূর্ত্তে শরীর হাল্‌কা ও মনে স্ফূর্ত্তি বোধ আসে, সেই মুহূর্ত্তেই সে বেলার মত ব্যায়াম চর্চ্চা করা বন্ধ করিতে হয় ;—কারণ, অতিরিক্ত ব্যায়ামে, শরীরের ক্ষয় হয় এবং শরীর দুর্ব্বলই হইয়া পড়ে।

৭। খোলা যায়গাতেই ব্যায়াম করিতে হয়। ব্যায়াম কালীন জামা বা কাপড় যেন কোথাও শক্ত করিয়া পরা না থাকে ;—তাহাতে অপকার হয়।

৮। ব্যায়ামান্তে, পায়চারি করিয়া দম কমাইতে হয়। ব্যায়ামান্তে, কখনো শুইয়া পড়িতে নাই বা শরীরের কোনও অংশকে মুড়িয়া বা বাঁকাইয়া-চুরাইয়া বসিতে নাই। ব্যায়ামান্তে, তৎক্ষণাৎ হাওয়া খাওয়া বা স্নান করা নিষিদ্ধ ; যতক্ষণ দম বেশ্‌ স্বাভাবিক না হয়, এবং গা বেশ্‌ জুড়াইয়া না যায়, ততক্ষণ স্নান করিতে নাই।

৯। যে দিন স্নান করা হইবে না, সে দিন ব্যায়ামান্তে খস্‌খসে শুকনা তোয়ালে দিয়া সমস্ত গা রগড়াইয়া মুছিয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

স্ত্রীলোকদের ব্যায়াম সম্পর্কিত বিশেষ নিয়ম

(১) ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই শরীরটা যে সময়ে "বে-ভাব" হয়, তখন হইতে সম্পূর্ণ সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত, ৫।৬ দিন ব্যায়াম নিষিদ্ধ। ঐ সমস্ত সময়টা শুইয়া বিশ্রাম লইবার কথা।

(২) গর্ভের প্রথম তিন ও শেষের দুই মাস—নামে মাত্র ব্যায়াম করা যাইতে পারে। বাকী কয়েক মাসও সামান্য ভাবে ব্যায়াম করাই যৌক্তিক। ভ্রমণই গর্ভকালীন প্রকৃষ্ট ব্যায়াম।

(৩) প্রসবের পরে—এক মাস কাল ব্যায়াম বন্ধ রাখা কর্ত্তব্য। প্রথম ১০।১৫ দিন বাদ দিয়া, বেড়ান যাইতে পারে।

(৪) স্ত্রীলোকদের পক্ষে,—ডন, ভারী জিনিষ তোলা, বেশী লাফান-ঝাঁপান, অতি মাত্রায় বৈঠক করা নিষিদ্ধ।

[বাটনা বাটা, জল তোলা, বিছানা পাতা ও তোলা,

হাঁড়ি উঠান-নামান, কাপড় কাচা, বাসন মাজা প্রভৃতি শ্রমসাধ্য হইলেও, উহাদের দ্বারা দেহের গঠন-ক্রিয়া তাদৃশ হয় না। বরঞ্চ দেখা গিয়াছে যে, ঐরূপ অতি মাত্রায় করার ফলে, দেহের ক্ষয়ই হইয়াছে ।]

কাহার ব্যায়াম প্রণালী অবলম্বন করিব ?

স্যাণ্ডো, নাইডু প্রভৃতি বহু জনের বহু রকমের ব্যায়াম-প্রণালী বাজার-চলন হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ তাহা বলা যায় না। কাযেই, যাঁহার যেমন ইচ্ছা, সুবিধা বা রুচি, তিনি তাহাই অবলম্বন করিবেন। কোনও নির্দ্দিষ্ট বা প্রচলিত প্রণালী অবলম্বন না করিলেও ক্ষতি নাই। তবে, একটা প্রণালী ধরিয়া চলিলে, ভুল-ভ্রান্তির অবসর থাকে না। কিন্তু, এইটুকু মনে রাখিতে হইবে যে, যে ব্যায়ামটা যতবার করিবার কথা প্রণালী-বিশেষে লিখিত থাকে, তাহা অন্ধ বিশ্বাসে মানিতে নাই। নিজের "দম-সামর্থ্য" বুঝিয়া চলিতে হয়। গৃহ-চিকিৎসক কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়া, এবং মাঝে মাঝে তাঁহার পরামর্শ লইয়া, ব্যায়াম করাই শ্রেয়ঃ।

ব্যায়ামের বয়স

প্রথম বৎসর বয়ঃক্রম হইতে, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত, ব্যায়ামের বয়স। তবে, বয়স হিসাবে, ব্যায়ামের প্রণালী বিভিন্ন হওয়া উচিত। দশ বারো বৎসর বয়স হইতে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত, মুগুর ঘুরান বা ডাম্বেল ভাঁজা যায়। ব্যায়াম-চর্চ্চাটা একটা সাধনা। সাধনা করিতে হইলেই গুরু বা শিক্ষকের প্রয়োজন। বিনা গুরূপদেশে কোনও সাধনা সম্পূর্ণ বা সার্থক হয় না। অথচ, এ দেশে, বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকদের উপযুক্ত ব্যায়াম-শিক্ষয়িত্রী নাই। অচিরে, অনেক বিধবা এই কার্য্য করিয়া, জীবিকা উপার্জ্জনের পথ করিয়া লইতে পারেন। যতদিন তাহা না হইতেছে, ততদিন প্রত্যেক গৃহস্বামীর পক্ষে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া, বাটীর প্রত্যেক কন্যার, বধূর, ও অপর স্ত্রীলোকদের ব্যায়াম কার্য্য তদারক করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গৃহ-চিকিৎসক এ বিষয়ে পরামর্শ ও উৎসাহ দান করিয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ করিতে পারেন। সুধু প্রবন্ধ লিখিয়া নহে, চিকিৎসকরূপে, আমি অতি কষ্টে কয়েকটি বাড়ীতে মহিলা-মহলে ব্যায়ামের প্রবর্ত্তনা করিতে সমর্থ হইয়াছি বলিয়া গর্ব্বানুভব করি।

ব্যায়াম ও কমনীয়তা

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, স্ত্রীলোকরা ব্যায়াম করিলে, তাঁহাদের অঙ্গসৌষ্ঠব ও কমনীয়তার হানি হইতে পারে। এ ধারণা ভ্রান্ত। বস্তুতঃ ঠিক্ ইহার বিপরীতই ঘটিয়া থাকে।

উপসংহার

স্ত্রী-জাতির কল্যাণ কল্পে এ গুলির প্রতিও দৃষ্টি রাখা চাই :—

আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে,—

(১) স্ত্রীলোকরা কুড়ি বছরেই বুড়ী হইয়া পড়েন—এবং দু চারিটি সন্তানের জননী হইয়াই, অম্লের ব্যারাম (ডিস্‌পেপ্‌সিয়া), নাড়ীর দোষ প্রভৃতি দুরারোগ্য পুরাতন ব্যারামে জড়াইয়া পড়েন।

(২) ক্ষয়কাশ রোগের ক্রমশঃই অত্যন্ত প্রসার ঘটিতেছে। গৃহিণী হইয়া একেবারে সংসারের দুশ্চিন্তা ও পরিশ্রম, একান্নবর্ত্তিতার মূলোচ্ছেদ জনিত নিত্য অর্থাভাব, পর্দ্দানশীন অবস্থায় সঙ্কীর্ণ স্থানে বাস, আহারের নানারূপ ব্যভিচার ও যথেষ্ট সুখাদ্যের অভাব যে ইহার মূলে অনেকটা আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

স্ত্রীজাতি দুর্ব্বল ও হীনস্বাস্থ্য হইলে, সন্তানের (অতএব সমগ্র জাতির) অধঃপতন অনিবার্য্য। এবং এখন ঘটিতেছেও তাই। যতগুলি উপায়ে স্ত্রীজাতির স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটান যায়, ব্যায়াম তাহাদের মধ্যে অন্যতম। এই ব্যায়াম তাদৃশ কার্য্যকরী হয় না, যদি না তাহার সঙ্গে এই এই গুলিও যুক্ত থাকে ;—

(১) একান্নবর্ত্তিতা।—সুধু অর্থনীতির দিক দিয়া দেখিলেও, হিন্দু সমাজের পক্ষে ইহার তুল্য কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান আর কিছু আছে বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি না। যদি আবার আমরা একান্নবর্ত্তী হইতে পারি, তবে আমরা কি না করিতে পারি ? ইংরাজই ইহার দোষ দেখায় ;—কারণ বুঝা শক্ত নয়।

(২) প্রচুর পরিমাণে বায়ু ও রৌদ্র সেবন।—কতকগুলা জামা-জোড়া পরার চেয়ে ভুল আর নাই। যাহারা আঁচল গায়ে দিয়া বারোমাস কাটায়, তাহাদের স্বাস্থ্য, ও যাহারা বহু জামা-জোড়া গায়ে দেয় তাহাদের স্বাস্থ্য, তুলনা করিলেই বুঝা

যায় যে, যত কম জামা-জোড়া (বিশেষ করিয়া রঙ্গীনগুলি) পরা যায়, ততই মঙ্গল। সামান্য কারণে মাথায় ছাতি দেওয়া, সার্সি বন্ধ করিয়া থাকা, মাথা মুড়ি দিয়া শোয়া প্রভৃতি অন্যায়।

(৩) নিত্য টাট্‌কা খাদ্যই খাওয়া চাই। সহরে সে কার্য্য এক রকম অসম্ভব। ইংরাজের পড়ান বুলি শিখিয়া, আমরা মাংসকেই মাথায় তুলিয়াছি। তাহা করিলে চলিবে না। ঘরে গাভী পুষুন, গো-সেবা (প্রকৃত সেবা) করিয়া ধন্য হউন, প্রচুর পরিমাণে গো দুগ্ধ-পান করুন এবং টাট্‌কা ফলমূল ও তরীতরকারী প্রচুর পরিমাণে খান। খাদ্য সম্বন্ধে অনেকবার অনেক রকমে অতি-বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি বলিয়া, এখানে আর কিছু বলিব না।

কথিকা

শ্রীআশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এস্‌সি

ক

বেলা-শেষের শেষ পূরবীর সুর ধীরে ধীরে সন্ধ্যাকাশে মিলাইয়া যায়—শিল্পীর হাতের বাঁশীও ধীরে ধীরে খসিয়া পড়ে; দিগ্‌বধূরা বলে—

"ওগো শিল্পি—তুমি থামো কেন?"

চকিতে হাসিয়া আপন-ভোলা শিল্পী উত্তর দেয়—

"থামিবারই তো সময় হয়েছে বন্ধু।"

ভোরের ভৈরবীও এমনি থামে।

কারুর কথাই শোনে না—বধূরও না, বন্ধুরও না, প্রিয়ারও না।

রাত্রির সুর কিন্তু থামিতে চাহে না, ও কেবল গাহিয়াই চলে—তালে তালে, সুরে সুরে, মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায়।

গোধূলি আসিয়া বলে—

"শ্রান্ত শিল্পি, থামো না কেন?"

শিল্পী হাসিয়া উত্তর দেয়—

"আর একটু চলুক না বন্ধু।"

খ

এমনি করিয়াই শিল্পীর দিন কাটে। সময় নাই, অসময় নাই,—বাঁশীও বাজে। সারা দেশের লোকে বলে—

"পাগল—পাগল—পাগল"

রাজার কাণে সেদিন এই তরুণের বাঁশীর কথা পৌঁছল। রাজা ব'ল্লেন—

"ডাকো সেই শিল্পীকে তার বাঁশী শুনবো—তার গান শুনবো।"

"মহারাজ, সে তো কারুর ডাকেই আসবে না।"

"আস্‌বে—তাকে বলো রাজা ডেকেছেন।"

গ

হঠাৎ একদিন রাজসভা মুখর হ'য়ে উঠল। রাজ্যের যত লোক রাজসভায় দেখা দিল—কেউ বাদ রইলো না। উৎসবকে সম্পূর্ণ কর্ত্তে, উপরে পর্দ্দার আড়ালে এসে বস্‌লেন, রাণীমা আর তাঁর কিশোরী কন্যা। রাজসভা সার্থক সুন্দর হ'য়ে উঠলো।

ধীরে ধীরে শিল্পী এসে রাজার সম্মুখে দাঁড়ালো,—হাতে তার বাঁশী, দৃষ্টি তার উদাস, মন তার কোন্‌খানে কে জানে?

বনের হরিণীকে বাঁধা যায় সত্য, মনের হরিণীকে কে বাঁধে?

মুখর রাজসভাতে শিল্পী অভিভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। হঠাৎ নেপথ্য হ'তে এক ছড়া মালা এসে গলায় পড়লো। বিস্মিত তরুণ হাত যোড় করে প্রণাম জানালে—চকিতে দেখা কিশোরীর দিকে। রাজা হুকুম করেন—

"ওগো খেয়ালী! বাজাও তোমার বাঁশী যাতে করে তুমি হরণ করে নিয়েছো রাজ্যের মন। যদি পারো, রাজ্যের রাজার মনও হরণ কর।"

শিল্পী চুপ—সাড়া নাই, শব্দ নাই।

পাশ থেকে প্রধান অমাত্য ব'লে উঠ্‌লেন—

"গাও না কবি—তোমার উদাস পূরবী, সার্থক হোক তোমার গান, সার্থক হোক এ রাজসভা।"

তবু শিল্পী কথা কয় না, বাঁশীও বাজে না। হঠাৎ ওপর থেকে এসে পড়লো কিশোরী রাজকন্যার মণিময় হার। এ যেন এক সুমধুর প্রার্থনা, আকুল আহ্বান।

সার্থক শিল্পী গাহিয়া উঠিলেন—

"ওগো আমার অনাদি জনের প্রিয়া, তোমাকে চোখে দেখার সৌভাগ্য আজও আমার হয়নি, তবু বাঁশীর সুরে সুরে, গানের তালে তালে, কৈশোরের স্বপ্নে, যৌবনের সুমধুর উদ্দামতায় শুধু তোমাকেই আবাহন করেছি। এবার কি তবে সার্থক হ'লো এ বাঁশী,—এবার কি তোমার পাদস্পর্শে এ যৌবন মুকুলিত হ'য়ে উঠ্‌বে? আজকের রাতে তোমার এ গলার হারই রইলো আমার সম্বল,—হয় তো কাল্‌কে তোমার ঐ কিশলয় তনুই আমার অঙ্কশায়িনী হ'বে। আজকের মতো বিদায় দাও সখি!"

বিস্মিত রাজসভা নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলো।

মহারাজের কিন্তু ভিখারীর এই প্রেম-নিবেদন সহ্য হ'ল না। রাজরোষের পরিণাম হয় তো আপন-ভোলা তরুণ মনেও আন্‌লে না—কিন্তু রাজকুমারীর চোখের জল আর বাধা মান্‌তে চাইলো না।

রাজরোষে প্রাণদণ্ডের আদেশ শুনে অবধি শিল্পী শুধুই ভাব্‌ছিল—

"দুঃখ দিয়ে রাখেন তোমার মান"

তার অজানা প্রিয়া আজ তাহারই সন্ধানে বাহির হইয়াছে। দেরী করিলে হয় তো এ শুভলগ্ন পার হইয়া যাইবে, তাই কবি তার বাঁশী নিয়ে বসে রইলো, "কি জানি সে আসবে কবে।"

প্রিয়া তার আসে নাই সত্য, তবু মণিহার সে গলায়ই রাখিয়াছে।

ফাঁসির রক্তে মণিহারের বর্ণ-গৌরব বাড়িল কি না আমরা জানি না, তবে রাজকন্যার গোপন অশ্রুধারায় তার মরণ-যাত্রার মঙ্গলঘট যে পূর্ণ হইয়াছিল, এ আমরা জানি।

তমোলুক তাম্রলিপ্ত কি না?

শ্রীশ্রুতিনাথ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ বি-টি

গত অগ্রহায়ণ মাসের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের মহাশয় "তাম্রলিপ্ত ও কিরণ সুবর্ণ" প্রবন্ধে তাম্রলিপ্তের বর্ত্তমান অবস্থান সম্বন্ধে অতি অভিনব অনুমান উপস্থাপিত করত: সুধী-সমাজকে না হউক অন্তত: তমোলুকবাসিদিগকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। অনেক বড় বড় প্রত্নতাত্ত্বিকের বহুকালানুসৃত প্রামাণিক মত খণ্ডন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহাই বিশেষভাবে বিচার্য্য। আমরা বহুপুরুষ তমোলুকে বাস করিতেছি.—এতদিন প্রাচীন তাম্রলিপ্তের ভগ্নাবশেষের অধিবাসী এই গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি। সুরেন্দ্র বাবুর অনুমান, অন্তত: তৎপ্রদত্ত বর্ত্তমান তমোলুক সম্বন্ধে কয়েকটা সংবাদ এমন ভ্রান্তিপূর্ণ, যে, তৎসম্বন্ধে দুই চারিটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রত্নতাত্ত্বিকতা, বুদ্ধিমত্তা বা লেখনী-পরিচালন প্রভৃতি কোনও শক্তির বিন্দুমাত্র অভিমানের অধিকারী নহি। নিজের জন্মভূমি জননীর গৌরবহানির আশঙ্কা আমার ন্যায় শক্তিহীন মূককেও আজ বাচাল করিয়া তুলিয়াছে।

তমোলুকের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সমস্ত পৌরাণিক, ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক প্রমাণ প্রদর্শন করা বর্ত্তমান প্রতিবাদের লক্ষ্য হইতে পারে না। তাহা একখানি ইতিহাসের বিষয়। লেখক বা তাঁহার প্রবন্ধের পাঠকগণ যোগেশ বাবুর "মেদিনীপুরের ইতিহাস" ও ত্রৈলোক্য বাবুর "তমোলুকের ইতিহাস" পড়িলে অনেক প্রামাণিক তথ্য জানিতে পারিবেন। এক্ষণে সুরেন্দ্র বাবু নিজ অনুমান প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তমোলুক সম্বন্ধে যে সমস্ত সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার ভ্রমগুলি প্রদর্শন করাই এই প্রতিবাদের উদ্দেশ্য। তাঁহার প্রবন্ধে প্রথমেই বলা হইয়াছে যে "তমোলুকের কোনও জমি ১০০।৮০০ বৎসরের পূর্ব্বে সমুদ্রগর্ভ হইতে মস্তক উত্তোলন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা কোনও ভূতত্ত্ববিদই মনে করিতে পারেন না।" সুতরাং মহাভারতের সময় দূরে থাকুক চীন পরিব্রাজকদের আগমন সময়েও এই স্থানে তাম্রলিপ্তির অবস্থিতি সম্ভবপর ছিল না। এ কথাটীর ভিত্তি বিচক্ষণ ভূতত্ত্ববিদের অভিমত বা তমোলুক সহরটী উত্তমরূপ পরিদর্শনের উপর স্থাপিত কি না সন্দেহ।

যে দুইটী কারণের উপর এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি তাহা প্রকৃত নহে। জমির স্তর সকল রকম স্থানেই "১০০ বৎসরে ১ ফুট্ উঠিয়া থাকে" এ কথা সত্য বা অন্ততঃ সর্ব্ববাদিসম্মত নহে, এবং "সাগরের mean level হইতে এই প্রদেশস্থ জমিগুলি মাত্র ৫ ফিট হইতে ১০ ফিট উচ্চ" এই সংবাদটীও আদৌ ঠিক নহে; রূপনারায়ণ নদের পার্শ্ববর্ত্তী নূতন বা পুরাতন চর সম্বন্ধে এটী সত্য হইতে পারে; কিন্তু অভ্যন্তরে বসতজমির উচ্চতা অনেকস্থলে দ্বিগুণের অধিক হইবে। ৩৫।৩৬ বৎসর পূর্ব্বে তমোলুকে বর্গভীমা দেবীর মন্দিরের নিম্নেই রূপনারায়ণ নদের উপর ষ্টীমার লাগিত; অথচ এখন ঐ স্থান হইতে অর্দ্ধ হইতে এক ক্রোশ পূর্ব্বে নদের উপর ষ্টীমার দাঁড়াইবার মত জল পায় না। এই দূরত্বের মধ্যে যে চর পড়িয়াছে তাহাই কোথাও ৫।৭ ফিটের কম উচ্চ নহে। তাহাতে অনেক কৃষক স্থায়ী আবাদ নির্ম্মাণ করিয়াছে। রূপনারায়ণ নদের স্রোতের টান বা রূপের এইরূপ পরিবর্ত্তন প্রায়ই হইয়া থাকে। এইজন্য ইহার নাম রূপনারায়ণ বা রূপবতী বা রূপানদী। "এদেশের মৃত্তিকা এত নরম ও পিচ্ছিল যে, প্রকাণ্ডকায় হস্তী কেন, মানুষেরও অনেক সময় চলাফেরা করা কঠিন।" এই অদ্ভুত মন্তব্যও ঐ নদী তীরস্থ চরভূমির সম্বন্ধে বৎসরের কোনও সময় প্রযোজ্য হইতে পারে। অভ্যন্তরস্থ অন্য স্থানের লোক এই কথা শুনিলে উপহাস করিবে সন্দেহ নাই। কাশিজোড়া বা মহিষাদলের বৃহৎকায় হস্তী সকলকে এই স্থানে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করিতে দেখিয়াছি। অতএব এ সমস্ত ভ্রান্তিপূর্ণ অনুমান ত্যাগ করিয়া অন্য বহু বাস্তব প্রমাণসহ বিবেচনা করিলে স্বতঃই বিশ্বাস হয় যে শ্রীযুক্ত কানিংহাম, আর্ডেন উড্, হাণ্টার, ম্যাক্‌ক্রিণ্ডেল, রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় প্রভৃতির এই মতই ঠিক যে পুরাতন নগর সাময়িক সমুদ্র প্লাবনে ভূগর্ভসাৎ হইয়াছে, এবং বর্ত্তমানে তমোলুক সহর বা মহকুমার কতকাংশ উক্ত ধ্বংসের উপর অবস্থিত। এই মতের অনুকূলে অন্যান্য প্রমাণ এবং যুক্তি সুরেন্দ্রবাবুর অপরাপর উক্তির প্রতিবাদ প্রসঙ্গে ক্রমশঃ অবতারণা করা হইবে।

প্রবন্ধে পুনরায় বলা হইয়াছে যে "তাম্রলিপ্ত গঙ্গার তীরে অবস্থিত ছিল," কিন্তু তমোলুক "গঙ্গার তীরে অবস্থিত নহে।" বর্ত্তমান তমোলুক গঙ্গার তীরে অবস্থিত নহে ইহা সকলেই জানে। কিন্তু তমোলুক প্রাচীন তাম্রলিপ্তের একটী ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। পূর্ব্বদিকে তাম্রলিপ্ত বর্ত্তমান বেহালা বড়িষা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে জগমোহন পণ্ডিত সমস্ত ভারতের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত সম্বলিত "দেশাবলী বিবৃতি" নামক সংস্কৃত ভাষায় একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে দেখা যায় যে তখনও আদি গঙ্গার পশ্চিমে সমস্ত দেশকে লোকে তমোলুক বলিত। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ঐ সময়ে রচিত অপর একখানি গ্রন্থেও ঐরূপ কথা লেখা আছে। "আইন-ই আকবরীর মহাল বিভাগের মধ্যেও তমোলুকের নাম আছে।" "মাদলাপঞ্জীর দণ্ডপাঠ বিভাগের মধ্যে তমোলুকের নাম নাই।" ইহার কারণ বোধ হয় তখনও তাম্রলিপ্ত বা তমোলুক স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল; উহা উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল না। এই কয় শত বৎসরের পরিবর্ত্তনে নদীর গতি পরিবর্ত্তন ও খাত খনন আদির দ্বারা তাম্রলিপ্ত বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছে। তাম্রলিপ্তের পরিধি ১৫০০ লি বা ১২৫ ক্রোশ ছিল। ইহার মধ্যে তমোলুক নিশ্চিত একটী প্রধান অংশ ছিল; তবে উক্ত রাজ্যের রাজধানী বা প্রধান কেন্দ্র ছিল কি না তদ্বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে। গঙ্গার মোহানাতে ক্রমান্বয়ে পলি পড়িয়া চর হওয়াতে সমুদ্রের ধার পুরিয়া যাওয়ায়, রূপনারায়ণ নদের পুনঃপুনঃ ভাঙ্গনে এবং মধ্যে মধ্যে সমুদ্র-প্লাবন জন্য তমোলুক অংশের বর্ত্তমান অবস্থা হইয়াছে—এ কথা ধারণা করা বিশেষ কঠিন বা অসম্ভব মনে হয় না। তাম্রলিপ্তের দক্ষিণে সমুদ্র ছিল। বর্ত্তমান তাম্রলিপ্তের দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব অর্থাৎ তমোলুক মহকুমার দক্ষিণ ভাগ অধিকাংশই কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বেও সমুদ্র ছিল তাহা প্রমাণ করা সহজ। হুগলী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত সুতাহাটা থানার অন্তর্গত "দোরো" পরগণা কিছুকাল পূর্ব্বে "দরিয়া" ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। নন্দিগ্রাম থানার অবস্থাও ঐরূপ ছিল। কিন্তু নিজ তমোলুকে সেরূপ কোনও চিহ্ন দেখা যায় না। সুতরাং তাম্রলিপ্তের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমার দিক দিয়া বিচার করিলেও তমোলুক অনায়াসে তাহার অংশ বিবেচিত হইবে। এ স্থলে বিশ্বকোষ ধৃত বচনটীও উল্লিখিত হইতে পারে।

তাম্রলিপ্ত প্রদেশশ্চ বণিজশ্চ নিবাস ভূঃ।
দ্বাদশ যোজনৈর্যুক্তো রূপানদ্যাঃ সমীপতঃ॥

রূপনারায়ণ নদকেই গঙ্গা বলিয়া প্রাচীনগণের ভ্রম করা সম্বন্ধে মেদিনীপুর-ইতিহাসকার যোগেশবাবুর নিম্নলিখিত উক্তিও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বিবেচ্য। "খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে অঙ্কিত রেণেলের মানচিত্রে রূপনারায়ণ নদের নাম আছে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে এই নদী ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। গাশতল্ডির ১৫৬১ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রেও ১৫৬০ হইতে ১৬১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অঙ্কিত ডি ব্যারোর মানচিত্রে এই নদী গঙ্গা নামে উল্লিখিত হইয়াছে * * * * ভ্যালেণ্টিনের মানচিত্রে দেখা যায় যে, তৎকালে দামোদর নদের দুইটী শাখার একটী তমোলুকের দক্ষিণে রূপনারায়ণ নদের সহিত মিলিত ছিল, এবং অন্যটী পূর্ব্বাভিমুখীন হইয়া কালনার নিকট ভাগীরথীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। আমাদের মনে হয় এই সংযোগ থাকার দরুণই বৈদেশিক নাবিকগণের নিকট তৎকালে এই নদীটী ভাগীরথীর শাখা নদী বলিয়া অনুমিত হওয়াতে তাঁহারা ইহাকেও গঙ্গা নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।"

সুরেন্দ্রবাবু অভিজ্ঞতার অভাবে স্বীকার না করিলেও তমোলুকের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনেক স্থানীয় প্রমাণ পাওয়া যায়। পুষ্করিণী আদি খনন কালে ১৫।২০ ফিট মৃত্তিকার নিম্নে বহু সংখ্যক কূপ, প্রস্তর নির্ম্মিত ভগ্নাবশিষ্ট স্তম্ভাদি, মন্দির ও অট্টালিকার অংশ, বৌদ্ধদিগের সমকালীন প্রাচীন স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা এবং বুদ্ধদেব ও তৎসম্বন্ধীয় নানা প্রকার প্রতিমূর্ত্তি আদি যাহা পাওয়া যায়, তাহা ইহার প্রাচীনত্বের যথেষ্ট পরিচায়ক। বড় বড় জাহাজের কাষ্ঠখণ্ডও জীর্ণাবস্থায় অনেক সময় মৃত্তিকা নিম্ন হইতে পাওয়া যাওয়ায়, তমোলুকের সমুদ্রকূলবর্ত্তিতার প্রমাণ সুদৃঢ় হইয়াছে। প্রাপ্ত মুদ্রাগুলি এসিয়াটিক সোসাইটীর পরীক্ষায় অতি

যৌবনের ব্যথা

শিল্পী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার

প্রাচীন বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। স্থানীয় হ্যামিল্টন হাই স্কুলে (১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত) এরূপ অতি প্রাচীন কতকগুলি মুদ্রা ও মূর্ত্তি রক্ষিত হইতেছে। এ স্থানে একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত স্তম্ভের অংশও বিদ্যমান আছে। প্রস্তর বা ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহের চিহ্ন বেশী পাওয়া যায় না সত্য। তাহার কারণ এই যে বৃহৎ নদী বা সাগরোপকূলে অবস্থিত নগরগুলি প্রাচীনকালে মধ্যে মধ্যে জলপ্লাবন আশঙ্কায় অনেকাংশে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত হইত (Mc. Crindle's Ancient India)। বর্গভীমার মন্দিরটীও প্রাচীনত্বের সাক্ষী। ইহার বাহিরের গঠন প্রণালীটী উড়িষ্যা অঞ্চলের মন্দিরের ন্যায় হইলেও ভিতরের গঠন বৌদ্ধ বিহারের সদৃশ এবং বুদ্ধ গয়ার মন্দিরের অনুরূপ। প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে প্রধান বা মূল বিহারের অনুকরণে একটী ক্ষুদ্র বিহার রহিয়াছে। সম্ভবতঃ প্রধান বিহারে বসিয়া আচার্য্য শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদান করিতেন এবং চতুঃপার্শ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিহারে ভিক্ষুগণ নির্জ্জনে উপাসনা করিতেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন, পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধদের বিহার হিন্দুগণ অধিকার করিয়া উহাকে দেব-মন্দিররূপে নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছিলেন। দেবীর মন্দিরটী একটী অতি উচ্চ বেদীর উপর স্থাপিত নিকটে পর্ব্বতাদি কিছুই নাই, এবং তৎকালে এখনকার মত রেল ষ্টীমারেরও সুবিধা ছিল না। এজন্য মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় মনে করেন, উহা একটী বৌদ্ধ স্তূপ বা ঐরূপ কোনও ভগ্নাবশেষের উপর নির্ম্মিত ; অপরে মনে করেন, ভিন্ন স্থান হইতে বড় বড় কাষ্ঠ বা প্রস্তরখণ্ড আনাইয়া ঐ উচ্চ ভিত্তিটী প্রস্তুত করা হয়। ভিত্তিটী এত উচ্চ যে প্রবল জলপ্লাবনেও সহরের লোক ঐ স্থানে আশ্রয় পাইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। সুতরাং "বর্ত্তমান তমোলুক সহরটী এত ক্ষুদ্র ও বৈচিত্র্যহীন যে তাহা দেখিয়া তাহাকে পুরাতন কালের অশেষ গৌরবান্বিত তাম্রলিপ্ত বলিয়া কোনও প্রকারেই মনে করা যায় না।" সুরেন্দ্রবাবুর এই মন্তব্য কতদূর বিচারসহ তাহা পণ্ডিতগণ স্থির করিবেন। ভারতের অন্যান্য প্রাচীন গৌরবান্বিত তাম্রলিপ্তের সমসাময়িক নগরের ধ্বংসাবশেষ মৃত্তিকা-নিম্ন হইতে উদ্ধার করতঃ সেই সেই স্থানের গৌরবের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতেছে। সেগুলি সমুদ্র হইতে অতি দূরবর্ত্তী। সুতরাং প্রবল সমুদ্রের একেবারে উপকূলে অবস্থিত তাম্রলিপ্ত নগর যতই সমৃদ্ধি-শালী থাকুক না কেন তাহার ধ্বংসাবশেষ যে মৃত্তিকার বহু নিম্নে প্রোথিত থাকিবে, ইহা বিচিত্র কি ? হিউয়েন সাঙ নিজেই বলিয়া গিয়াছেন এই নগর সমুদ্রে ধৌত হইয়াছিল। এতদিনের কথা যাউক, বিগত ১৭৩৭ বা ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ভীষণ ঝটিকা ও জলপ্লাবন সম্বন্ধে যাহা শোনা গিয়াছে, তাহা হইতে অনায়াসে কল্পনা করা যায় যে বর্ত্তমান তমোলুক বহু মন্দির অট্টালিকাদির ধ্বংসাবশেষের উপর দণ্ডায়মান। তমোলুকের পানীয় জল লবণ স্বাদবিশিষ্ট হওয়ায় উত্তম পানীয় জল সরবরাহ জন্য সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় ৪৩০ ফিট গভীর একটী নলকূপ (Tube well) প্রোথিত হইয়াছে। নলগুলি মৃত্তিকা নিম্নে বসানর সময় যে সমস্ত মৃত্তিকাস্তর ও জল স্তর পাওয়া গিয়াছে তাহাও উপরিউক্ত মতের সমর্থন করে। বিভিন্ন মৃত্তিকা স্তরের নমুনা মিউনিসিপ্যাল আফিসগৃহে রক্ষিত আছে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ ঐ সমস্ত পরীক্ষা করতঃ গবেষণা করিলে পুরাতন তথ্য সুপ্রতিষ্ঠিত (বা নূতন তথ্য আবিষ্কৃত) হইতে পারে। সমুদ্রের উপর অবস্থিত সুন্দরবনের মাটির নীচে অট্টালিকা মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ দেখিয়া যদি অনুমিত হয় যে এককালে সেখানেও সমৃদ্ধ নগর ছিল, তাহা হইলে উক্ত প্রকার প্রমাণ ভিন্ন অন্য বহু প্রমাণ সত্ত্বেও কি তমোলুককে বিশাল তাম্রলিপ্তের ক্ষুদ্র অংশ নির্দ্দেশ করা মহামতি ক্যানিংহাম প্রভৃতির অযৌক্তিক হইয়াছে ? এক দিকে সুরেন্দ্র বাবুর স্বীয় বুদ্ধিপ্রসূত অনুমান মাত্র ; আর অপর দিকে বহু পণ্ডিতের লিপিবদ্ধ দৃঢ় কারণ-সম্বলিত ভূরি ভূরি প্রমাণ, কোন্‌টী গ্রাহ্য—সুধিগণ তাহার বিচার করিবেন।

তমোলুকের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সমস্ত প্রমাণ উপস্থাপিত করা এক্ষণে সম্ভবপর নহে। সুরেন্দ্র বাবু যে অনুমান করিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে যতটুকু বলা আবশ্যক মাত্র তাহাই বলিব। তিনি তমোলুককে বন্দর না বলুন ক্ষতি নাই, কিন্তু তমোলুকের নিকটে নৌকা যায় না এ কথা কি করিয়া বলিলেন জানি না। প্রায় ৫০ খানি নৌকা তমোলুক ঘাটে প্রত্যহ যাতায়াত করে বা অন্ততঃ তমোলুক ঘাটে প্রত্যহ মজুত থাকে। পার্শ্ববর্ত্তী খাল সমূহে আরও অনেক নৌকা যাতায়াত করে। পৌষ সংক্রান্তির সময় তীর্থস্নান ও মেলা উপলক্ষে প্রায় দুই তিন শত বৃহৎ নৌকা বিভিন্ন স্থান হইতে শত শত যাত্রী লইয়া তমোলুকে উপস্থিত হয়। রূপনারায়ণের রূপ পরিবর্ত্তন জন্য শঙ্কর আড়া খালের মুখে সম্প্রতি কিছু চর পড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে নৌকা যাতায়াতের অসুবিধা হয় নাই। তবে ষ্টীমার প্রায় ৩০।৩৫ বৎসর নিকটে আসিতে পারে না এ কথা সত্য। প্রবন্ধে আরও একটী নূতন তথ্য এই যে "এই কেন্দ্রটীতে কোনও দিক্ দিয়াই স্থলপথে উপস্থিত হওয়া যায় না।" তমোলুক হইতে মেদিনীপুর, ঘাটাল, কাঁথি প্রভৃতি যাওয়ার রাস্তা বরাবরই আছে। উড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোড্ (Orissa Trunk Road) ই পাঁশকুড়া থানার মধ্য দিয়া অন্যান্য কয়েকটী বহু-প্রদেশ-বিস্তৃত রাস্তার সহিত যুক্ত হইয়াছে। এক দিকে রূপবতী বা রূপনারায়ণ ও অপর দিকে কংসাবতী বা কাঁসাই পার হইলেই উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ, পশ্চিম সর্ব্ব স্থান হইতে তমোলুক আসা যায়। পূর্ব্বে বাংলা হইতে উড়িষ্যা যাইতে হইলে তমোলুক হইয়া স্থলপথে যাইতে হইত এবং উড়িষ্যার পণ্যদ্রব্য এই স্থান হইতে রপ্তানি হইত। ইংরাজ রাজত্ব আরম্ভ হইবার পরেও বাঙ্গলা হইতে উড়িষ্যা যাইতে হইলে তমোলুক হইয়া যাইতে হইত। সাঁওতাল যুদ্ধ ও উড়িষ্যা জয়ের সময়ে কোম্পানির সৈন্য সামন্তাদি জাহাজে এই স্থানে পৌঁছিয়া লালদীঘি নামক পুষ্করিণীর নিকটে সময়ে সময়ে ২১ দিন থাকিয়া পরে স্থলপথে মেদিনীপুর দিয়া গমন করিত। একবার সৈন্যদলের অবস্থিতি কালীন ১৭৯৩ খৃঃ ৬ই অক্টোবর বাঙ্গালার ভলাণ্টিয়ার প্রথম সৈন্যদলের লেফ্টেনাণ্ট আলেকজাণ্ডার ওহারার মৃত্যু হওয়ায় ঘাট পুষ্করিণীর পূর্ব্ব পারে তাঁহাকে গোর দেওয়া হয়, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ১৮৬৯ খৃঃ কেন্দ্রাপাড়ার খাল হইয়া উড়িষ্যার রপ্তানি বন্ধ হওয়ায় এখানকার বাণিজ্য ক্রমেই হ্রাস হইতেছিল। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরের খাল ও বাঁকার খালের (বর্ত্তমান গেঁওখালির এক মাইল উত্তরে) মুখ বন্ধ করতঃ গেঁওখালি দিয়া হিজলী খাল হওয়ায় এখানকার বাণিজ্য একেবারে অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে। একেবারে নদী খাল অতিক্রম করিতে হয় না, শুধু স্থলপথে বহু ক্রোশ একেবারে যাওয়া যায়, এমন কোনও প্রধান সহর বাংলা দেশে বা ভারতবর্ষের অন্যত্র আছে কি না সুরেন্দ্রবাবু বলিতে পারেন। তমোলুক-পাঁশকুড়া রাস্তা ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে ঠিক ছিল কি না জানি না, সুরেন্দ্র বাবুও নিশ্চিত জানেন না। তবে রাস্তাটী "বর্ষাকালে অনেক সময়ে অচল" এ কথা যাঁহারা বর্ষাকালে সত্যই রাস্তায় চলেন তাঁহারা কেহই স্বীকার করিবেন না। আরও কথা এই যে, যে বন্দর অর্দ্ধ আর্য্যাবর্ত্তের একমাত্র বন্দর, সেটী অতদূর দক্ষিণে তমোলুকে রাখিবার কোন উপযুক্ত কারণ নাই—এ কথা লেখার সময় সুরেন্দ্রবাবু আবার ভুলিয়া গিয়াছেন যে, তমোলুক যে বিশাল তাম্রলিপ্তের অংশমাত্র সেই তাম্রলিপ্ত পূর্ব্বদিকে তাঁহারই প্রস্তাবিত বর্ত্তমান কলিকাতা বন্দরের নিকট গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। সুতরাং উহাকে বন্দরে পরিণত করা তৎকালীন আর্য্যাবর্ত্ত-বাসিগণের আদৌ বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক হয় নাই।

রামগোপাল ঘোষ

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

আজ আমরা যে মহাত্মার সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা এবং বহুবর্ণ চিত্র 'ভারতবর্ষে'র পাঠক-পাঠিকাগণকে উপহার দিতেছি, তিনি সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী, শক্তিশালী রাজনীতিক, সফলকামা বণিক এবং প্রথিতযশা লোকশিক্ষক স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ মহোদয়। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগে যাঁহারা মহোৎসাহে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া প্রতীচ্যের নূতন আলোকে ভারতবর্ষকে নূতন করিয়া গঠন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, রামগোপাল ঘোষ মহাশয় ছিলেন তাঁহাদের অগ্রগণ্য। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যযুগের বাঙ্গলার রাজনীতিক ইতিহাসের সহিত যাঁহাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে, তাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ Black Acts বা কালো আইন-ঘটিত আন্দোলনের কথা সবিশেষ অবগত আছেন। এই আইন উপলক্ষে তদানীন্তন শ্বেতাঙ্গ-সমাজে ঘোর আন্দোলন ও কোলাহল উপস্থিত হইয়াছিল। রামগোপাল দেশীয় সমাজের পক্ষ হইতে আইনের সমর্থন করিয়া যে পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া শ্বেতাঙ্গ ও দেশীয় উভয় সমাজে ধন্য ধন্য রব উঠিয়াছিল। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর নিমতলার শ্মশান স্থানান্তর করিবার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া রামগোপাল যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহারও তুলনা নাই, এবং সেই বক্তৃতার ফলে মিউনিসিপ্যালিটী তাঁহাদের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হ'ন। আজ সেই রামগোপালের চিত্র ও জীবনী মুদ্রিত করিয়া 'ভারতবর্ষ'ও ধন্য হইল।

রামগোপাল যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ঘোষ বংশের আদি নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত বাগাটি গ্রামে। ই, আই, রেলের মগরা ষ্টেসন হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে ত্রিবেণীর কিঞ্চিৎ পশ্চিমে এই গ্রাম অবস্থিত। তৎপূর্ব্বে এই বংশ বাগাটির কিছু উত্তরে বন্দীপাড়ায় বাস করিতেন।

রামগোপালের জন্ম হয় কলিকাতা বেচু চ্যাটার্জ্জির ষ্ট্রীট মাতামহালয়ে। তাঁহার মাতামহের নাম দেওয়ান রামপ্রসাদ সিংহ। রামগোপালের পিতামহ জগমোহন ঘোষ কিং হ্যামিল্টন কোম্পানীর আপিসে কার্য্য করিতেন। বাগাটির এই ঘোষ বংশ ধার্ম্মিক, পূতচরিত্র, দশকর্ম্মান্বিত ছিল। বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ,—দোল, দুর্গোৎসব ইঁহাদের গৃহে নিত্য অনুষ্ঠিত হইত।

রামগোপালের পিতা গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের চীনাবাজারে সামান্য একখানি দোকান ছিল। তদ্ব্যতীত, তিনি কলিকাতায় কুচ্‌বিহার-রাজের এজেন্ট ছিলেন।

দুই বৎসর পাঠশালায় পড়িয়া পাঠশালা-সুলভ সকল বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া রামগোপাল তৎকাল-প্রসিদ্ধ শারবোরণ স্কুলে ইংরেজী শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হ'ন। তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গসন্তানগণের মধ্যে অনেকেরই ইংরেজী ভাষায় হাতে খড়ি এই বিদ্যালয়েই হইয়াছিল। কিছুদিন পরে রামগোপাল শারবোরণ স্কুল পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু কালেজে প্রবিষ্ট হ'ন।

রামগোপালের হিন্দু কালেজে প্রবেশ করিবার বেশ একটুখানি ইতিহাস আছে। রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর যখন হিন্দু কালেজে পড়িতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার বিবাহ হয়। কন্যার পরিবারের সহিত রামগোপালের পরিবারের আত্মীয়তা থাকায় রামগোপাল তাঁহার জননী ও পিতামহীর সহিত বিবাহ-বাটীতে গিয়াছিলেন। রামগোপালের বয়স তখন ১০।১২ বৎসর মাত্র। তিনি যে অল্প কিছুদিন শারবোরণ সাহেবের স্কুলে পড়িয়াছিলেন, সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে যতটুকু ইংরেজী তিনি শিখিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি এমন সুন্দর ভাবে বিশুদ্ধ উচ্চারণে ইংরেজী ভাষায় বরকে নানারূপ প্রশ্ন করিয়া রঙ্গরহস্য করিতেছিলেন যে, বালসুলভ চপলতার মধ্যেই প্রতিভার আভাষ পাইয়া হরচন্দ্র বিস্মিত হ'ন, এবং রামগোপালকে শারবোরণ সাহেবের স্কুল ত্যাগ করিয়া হিন্দু কালেজে ভর্ত্তি হইবার পরামর্শ প্রদান করেন। বাসর-ঘরেও হরচন্দ্র এই সুন্দর ছেলেটির সন্ধান লইয়া জানিতে পারেন যে, বালকের মাতা ও পিতামহী তথায় উপস্থিত আছেন। হরচন্দ্র তাঁহাদের কাছে রামগোপালের প্রশংসা করিয়া বলেন, হিন্দু কালেজে শিক্ষা লাভ করিলে রামগোপাল কালে গৌরব ও খ্যাতি অর্জ্জন

করিতে পারিবে। বিবাহ-বাড়ী হইতে নিজ গৃহে ফিরিয়া রামগোপাল, তাঁহার জননী ও পিতামহী তিন জনেই গোবিন্দচন্দ্রকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন যে, রামগোপালকে হিন্দু কালেজে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হউক। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের আর্থিক অবস্থা তাদৃশ সচ্ছল না থাকায় তিনি ইতস্ততঃ করিতে থাকেন। তখন পিতামহী নাতির স্কুলের বেতনের কিয়দংশ দিতে স্বীকার করায় অবশিষ্টাংশ গোবিন্দচন্দ্র দিতে স্বীকৃত হইয়া পুত্রকে হিন্দু কালেজে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। পরে, শুনা যায়, কিং হ্যামিণ্টন কোম্পানীর অন্যতম অংশী রজার্স সাহেব কিছুদিন রামগোপালের হিন্দু কালেজের বেতন দিয়াছিলেন। অবশেষে রামগোপালের মেধার পরিচয় পাইয়া ও তাঁহার পিতার আর্থিক অসচ্ছলতার কথা শুনিয়া মিঃ ডেভিড হেয়ার তাঁহাকে অবৈতনিক ছাত্র করিয়া লইলেন।

অপর একটি ঘটনাও এইখানে উল্লেখযোগ্য। রামগোপাল প্রথম হইতেই রামগোপাল ছিলেন না। গোড়ায় তাঁহার নাম ছিল গোপালচন্দ্র। যখন তাঁহাকে হিন্দু কালেজে ভর্ত্তি করিতে লইয়া যাওয়া হয়, তখন Mr. D' Austeme তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি থতমত খাইয়া গিয়া কেবল বলিলেন, "গোপাল"। Mr. D' Austeme জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার পূর্ণ নাম কি?—উহা কি রামগোপাল? বালক বলিল, হাঁ। Mr. D' Austeme বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বালক ভয় পাইয়াছে। তাই তাঁহাকে সাহস দিবার ও সাহায্য করিবার জন্য বলিয়াছিলেন, তাহার নাম কি রামগোপাল? বালক তখনও সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই; তাই সে না ভাবিয়া চিন্তিয়াই 'হাঁ' বলিয়া সায় দিয়া গেল। সেই হইতে গোপালচন্দ্র লইয়া গেল রামগোপাল। এই নামেই বালককে ভর্ত্তি করিয়া লওয়া হইল, এবং তাহাই স্থায়ী হইয়া গেল। নাম পরিবর্ত্তনের এইরূপ উপাখ্যান কিন্তু আরও কাহারও কাহারও নামের সহিত জড়িত আছে বলিয়া শুনা যায়।

হিন্দু কালেজে ভর্ত্তি হইতে পাইয়া বালক রামগোপালের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং শীঘ্রই প্রতিভাবান ছাত্র বলিয়া কি শিক্ষক, কি সতীর্থ সকলেরই নিকট পরিচিত হইয়া উঠিলেন।

রামগোপাল যখন চতুর্থ শ্রেণীতে (fourth form) অধ্যয়ন করিতেন, তখন তিনি এমন সুন্দর ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিতে পারিতেন যে, কালেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার উইলসন একবার তাঁহার রচিত একটি প্রবন্ধ এবং তাঁহার সতীর্থ দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও পিয়ারীমোহন দের এক একটি প্রবন্ধ প্রথম শ্রেণীতে লইয়া গিয়া, অমৃতলাল মিত্র, হরচন্দ্র ঘোষ এবং অপর দুই একজন ছাত্র বাদে শ্রেণীর অবশিষ্ট ছাত্রগণকে লজ্জা ও ধিক্কার দিবার জন্য ও তিরস্কার করিবার জন্য তাহাদের সম্মুখে প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলেন।

সেই অল্প বয়সেই, কেবল শিক্ষায় নহে, অন্যান্য সদ্গুণেও রামগোপাল প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সমবয়স্ক ছাত্রদের তিনি ছিলেন সর্দ্দার, এমন কি, মারামারির সময়ও তিনি তাঁহার দলকে পরিচালন করিতেন।

এই সময়ে হিন্দু কালেজে ডিরোজিয়োর অসীম প্রভাব। তাঁহার নেতৃত্বে হরচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, মাধবচন্দ্র মল্লিক, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি হিন্দু কালেজের শ্রেষ্ঠ ছাত্রগণ সপ্তাহে দুই দিন হরচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে একটি সভায় সমাগত হইয়া সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করিতেন। এই সভায় ইংরেজী গদ্য ও পদ্য সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়ই আলোচিত হইত। রামগোপাল অচিরে এই সভার সদস্য পদে নির্ব্বাচিত হইলেন। রামগোপালের ঝোঁক ছিল রাজনীতির দিকে, এবং ইতিহাস, বিশেষতঃ ভূগোল তাঁহার অতি প্রিয় বিষয় ছিল।

এই সময়ে মাণিকতলায় শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাটীতে (পরে যাহা ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউসন নামে পরিচিত হয়) এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েসন স্থাপিত হইলে রামগোপাল তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন, এবং তর্ক-যুদ্ধে শীর্ষস্থানীয় বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। চীফজাষ্টিস সার এডওয়ার্ড রায়ান, মিঃ ডবলিউ, ডবলিউ, বার্ড, মিঃ ডেভিড হেয়ার, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ এই সভায় তর্ক-বিতর্ক শুনিতে যাইতেন। একদা মিঃ বার্ড (ইনি পরে বাঙ্গলার ডেপুটি গবর্ণর হইয়াছিলেন) বালক রামগোপালের অনর্গল ইংরেজী বক্তৃতা শুনিয়া এতই প্রীতিলাভ করেন যে, তিনি সভাপতি মিঃ ডিরোজিয়োকে রামগোপালের সহিত তাঁহার আলাপ করাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন।

হিন্দু কালেজে হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিয়ো ছিলেন দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। রামগোপাল যখন ইঁহার শ্রেণীতে উন্নীত হ'ন তখন তিনি লক (Locke), রীড (Reid), ষ্টুয়ার্ট (Stewart) প্রভৃতি দার্শনিকগণের দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি ও Russelএর নব্য য়ুরোপ প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ পাঠ করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থ পাঠের ফলে তাঁহার বাগ্মিতার ও তর্কশক্তির বিলক্ষণ বিকাশ হয়। লকের গ্রন্থ পাঠ করিয়া রামগোপাল মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, লকের মস্তিষ্ক প্রবীণ কিন্তু রসনা শিশু; অর্থাৎ লক শিশুসুলভ প্রাঞ্জল ভাষায় দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বসমূহের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শিষ্যের এই বিশ্লেষণ-শক্তি দর্শনে গুরু ডিরোজিয়ো অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন।

ডিরোজিয়োর সহিত তাঁহার ছাত্রগণের ঘনিষ্ঠতা এতটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, সামাজিক ভাবে ছাত্রদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যাইতে লাগিল—তাঁহারা মদ্যপানে ও মাংসাহারে যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিলেন। ইহা দেখিয়া ছাত্রদের হিন্দু অভিভাবকগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হ'ন এবং ডিরোজিয়ো পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

ছাত্রাবস্থা হইতেই রামগোপাল সাহিত্য-চর্চা করিতেন, কিন্তু বক্তৃতা-শক্তিই তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের মূল। রসিককৃষ্ণ মল্লিক "জ্ঞানান্বেষণ" নামক একখানি সাময়িক পত্র প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। রামগোপাল এই কার্য্যে বন্ধুকে অনেক সাহায্য করিতেন। অল্পদিন পরে এই কাগজ উঠিয়া গেলে রামগোপাল "বেঙ্গল স্পেক্টেটর" নামক একখানি পত্র বাহির করেন। রামগোপাল স্বয়ং এবং তাঁহার বন্ধু প্যারীচাঁদ মিত্র সম্মিলিত ভাবে এই পত্র সম্পাদন করিতেন।

যখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৭ বৎসর, হিন্দু কালেজে যখন তিনি অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তখনই, শুনা যায়, সাংসারিক আর্থিক অসচ্ছলতা বশতঃ লেখাপড়া ছাড়িয়া রামগোপালকে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিতে হয়। এই সময়ে জোসেফ নামক একজন ইহুদি খৃষ্টান ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি কলভিন কোম্পানীর মিঃ এণ্ডারসনের নিকট হইতে একজন যোগ্য দেশীয় সহকারী যাচ্ঞা করেন। মিঃ এণ্ডারসন হেয়ার সাহেবের নিকট লোক চাহিলে মিঃ ডেভিড হেয়ার রামগোপালকে নির্ব্বাচন করিয়া পাঠান।

মিঃ জোসেফ প্রথমেই রামগোপালকে কয়েক দিস্তা কাগজ দিয়া বলেন, বাঙ্গলাদেশে কোন্ জেলায় কি কি কাঁচা মাল কি পরিমাণে উৎপন্ন হয়, দেশের কোথায় কোন্ জিনিস প্রস্তুত হয়, এবং এই উভয়বিধ দ্রব্য এ দেশে ব্যবহারার্থ কি পরিমাণে থাকে ও বিদেশে কি পরিমাণে রপ্তানী হয়, তাহার একটা হিসাব প্রস্তুত করিয়া দাও। রামগোপাল বলিলেন ইহা শ্রমসাধ্য কর্ম্ম এবং সময়-সাপেক্ষ। মিঃ জোসেফ রামগোপালের প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ অনুমোদন করিলেন। এই উপলক্ষে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া রামগোপাল যে সব সংবাদ সংগ্রহ করিলেন এবং যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলেন, ভবিষ্যৎ জীবনে যখন তিনি স্বাধীন ভাবে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হ'ন তখন যে তাহা তাঁহার অত্যন্ত কাজে লাগিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রভুর জন্য রামগোপালের প্রথম কার্য্য ঢাকায় গিয়া কুসুম ফুল ক্রয় করা। কুসুম ফুলের ব্যবসায়ে মিঃ জোসেফের প্রচুর অর্থলাভ হয়, এবং তিনি রামগোপালের উপর অত্যন্ত প্রীত হন। কয়েক বৎসর পরে মিঃ জোসেফ কিছুদিনের জন্য যখন বিলাতে গমন করেন তখন কারবারের ভার রামগোপালের উপর অর্পণ করিয়া যান। রামগোপাল এমন সুচারুভাবে আপিসের কার্য্য সম্পাদন করিতেন যে, মিঃ জোসেফ ফিরিয়া আসিলে তাঁহার কারবারে যথেষ্ট লাভ দেখাইয়া দিতে সমর্থ হন। কিছুদিন পরে মিঃ কেলসল আসিয়া মিঃ জোসেফের সঙ্গে যোগ দেন, এবং রামগোপাল মুচ্ছুদ্দির পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু শীঘ্রই অংশীদ্বয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিল। তাঁহারা উভয়েই রামগোপালকে সহকারীরূপে লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু রামগোপাল মিঃ কেলসলের সহিত যোগ দিলেন। কেলসল কোম্পানীর বেনিয়ানের কার্য্য করিয়া রামগোপাল প্রচুর অর্থলাভ করেন। ক্রমে বেনিয়ান হইতে রামগোপাল কেলসল কোম্পানীর অংশীর পদ গ্রহণ করিলেন। তখন ফার্ম্মের নাম হইল কেলসল ঘোষ এণ্ড কোং। কিন্তু কিছু কাল পরেই উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। রামগোপাল মিঃ কেলসলের নিকট হইতে এ যাবৎ যত কিছু উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইংরেজী কায়দা ও প্রথা অনুসারে তৎসমুদায় প্রত্যর্পণ করিলেন। পরবর্ত্তী ঘটনায় বুঝা গেল, কেলসল কোম্পানী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তিনি ভালই করিয়াছিলেন; কারণ, কেলসল কোম্পানী দেউলিয়া

হইয়া গেল। ভগবান রামগোপালকে উপযুক্ত সময়েই রক্ষা করিয়াছিলেন, নচেৎ তাঁহারও সর্ব্বনাশ হইত।

এই সময় হইতে রামগোপাল আর, জি, ঘোষ এণ্ড কোং নাম দিয়া স্বয়ং স্বাধীন ভাবে কারবার আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বন্ধু কলভিন কোম্পানীর মিঃ এণ্ডারসন বিলাত হইতে নানারূপে রামগোপালকে সাহায্য করিতেন, এবং অনেক ক্রেতা জুটাইয়া দিতেন। য়ুরোপের সহিত ভারতবাসীর স্বাধীন ও প্রত্যক্ষ ভাবে বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন এই প্রথম হইল। রামগোপালের পক্ষে যাহা সম্ভব হইয়াছিল, যাহা তাঁহার উন্নতির কারণ হইয়াছিল, বঙ্গবাসীরা আর কেন সে পথে অগ্রসর হইলেন না, তাহা বুঝা যায় না। ব্যবসায় বাণিজ্যে বাঙ্গালীর এরূপ উদাসীনতা কি তাহার আলস্য-পরতন্ত্রতা এবং দাস-মনোবৃত্তির ফল নহে ?

সত্যপরায়ণতা, বিবেক-বুদ্ধি রামগোপালের চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। কেলসল কোম্পানীর অংশীরূপে কার্য্য করিবার সময় ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে বাজারের অবস্থা মন্দা হইয়া পড়িলে রামগোপালের অনেক ক্ষতির সম্ভাবনা ঘটে। রামগোপালের বিষয়ী বন্ধুরা তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি বেনামী করিবার পরামর্শ দেন। রামগোপালের বিবেচনায় এরূপ কর্ম্ম উত্তমর্ণদিগকে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করা। তিনি বন্ধুগণকে উত্তর দিলেন, তাঁহার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াও ঋণ পরিশোধ করিবেন, কাহাকেও বঞ্চিত করিবেন না।

স্বদেশের বিষয়েও রামগোপাল উদাসীন ছিলেন না। শিক্ষাবিস্তারে তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। নেটিভ বেনেভোলেণ্ট ইনষ্টিটিউসন নামক এক দাতব্য সভার তিনি সম্পাদক ছিলেন। সভার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি নিজ ব্যয়ে নিজ গ্রাম বাগাটিতে একটি স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। মিঃ বেথুনের সহযোগিতায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারেও তিনি অনেক সহায়তা করেন। মিঃ বেথুন চেষ্টা করিয়া রামগোপালকে এডুকেশন কাউন্সিলের সদস্যপদে নিযুক্ত করাইয়া দেন। কথিত আছে, এডুকেশন কাউন্সিলের সদস্যরূপে তিনি যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তদনুসারে সরকার হইতে স্কুল-কালেজে সাহায্য দানের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি স্বয়ং মাসিক বৃত্তি, এককালীন সাহায্য, প্রাইজ, পুরস্কার, উপহার প্রভৃতি নানা উপায়ে বিদ্যার্থীদের সাহায্য করিতেন এবং শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে সরকারে কর্ম্ম যোগাড় করিয়া দিতেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের চারিজন ছাত্রকে চিকিৎসা বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভার্থ যখন বিলাতে প্রেরণ করা হয়, তখন তিনি তাহার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে জর্জ্জ টমসনকে সঙ্গে লইয়া আসেন। যৌবনে মিঃ জর্জ্জ টমসন দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করেন এবং ইহার সংস্রবে আমেরিকায় গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি প্রিন্স ঠাকুরের সহিত ভারতে আগমন করেন। এখানে নব্যশিক্ষিত যুবকদলের সহিত আলাপ পরিচয় হইলে টমসন ইহাদের লইয়া ফৌজদারী বালাখানায় বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপনপূর্ব্বক রাজনীতির আলোচনায় তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। এই সভার কল্যাণে রামগোপাল অচিরে অদ্বিতীয় রাজনীতিক বক্তা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিলেন।

তৎকালীন বড়লাট লর্ড হার্ডিং দেশীয়গণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহী ছিলেন। একদা তাঁহার সংবর্দ্ধনার জন্য টাউন হলে দেশীয় ও য়ুরোপীয়গণের এক সভা হয়। এতদুপলক্ষে যে অভিনন্দন রচিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কোথাও শিক্ষাবিস্তার কল্পে লর্ড হার্ডিংএর প্রশংসনীয় কার্য্যের কোন উল্লেখ ছিল না। এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য রামগোপালের পরামর্শে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় একটি মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিতে চাহিয়া একটি বক্তৃতা করেন এবং রামগোপাল তাহার সমর্থন করেন। সাহেবদের পক্ষ হইতে বলা হয় যে, মন্তব্যটি লিখিয়া দেওয়া হউক, উহা অভিনন্দনের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। মিঃ ব্যানার্জ্জি উহা লিখিয়া দিলে তাহার ইংরেজী ভাষার ত্রুটি ধরিয়া সাহেবরা হাসিয়া উঠেন। উত্তরে রামগোপাল বলেন, ইংরেজী তাঁহাদের মাতৃভাষা নহে, সুতরাং তাঁহাদের ইংরেজী সাহেবদের মত না হইলেও কিছু মাত্র লজ্জার বিষয় নহে। কিন্তু যদি প্রস্তাবটি সঙ্গত হয়, তাহা হইলে তাঁহারাই কেন উহা বিশুদ্ধ ইংরেজীতে লিখিয়া দিন না। সাহেবরা এরূপ সঙ্গত প্রস্তাব অস্বীকার করিতে পারিলেন না। তখন মিঃ কলভিন তাহা লিখিয়া দিলেন। রামগোপাল এইখানে ক্ষান্ত না হইয়া লর্ড হার্ডিংএর একটি পূর্ণ মূর্ত্তি স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। সাহেবরা তাহার প্রতিবাদ করিলে রামগোপাল

ওজস্বিনী ভাষায় এমন সুন্দর বক্তৃতা করিলেন যে, সমগ্র সভা একবাক্যে তাঁহার প্রস্তাবের অনুমোদন করিল, কেবল জন তিন চার ইংরেজ ব্যারিষ্টার ইহার বিপক্ষে রহিলেন। এই সময় হইতে রামগোপাল "ইণ্ডিয়ান ডিমস্থেনেস" নামে পরিচিত হইলেন।

ইহার পর "ব্ল্যাক এ্যাক্ট" আন্দোলন উপস্থিত হয়। ইহার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রামগোপাল এই আইনের সমর্থন করায় সাহেবরা তাঁহার উপর বিরক্ত হইলেন, কারণ, আইনে সাদা-কালার ভেদ রহিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। রাগ করিয়া তাঁহারা রামগোপালকে এগ্রি-হর্টি-কালচারাল সোসাইটির সহকারী সভাপতির পদ হইতে খারিজ করিয়া দিলেন। কিন্তু উদার প্রকৃতি নিরপেক্ষ ইংরেজও দুই একজন উক্ত সভার সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে মিঃ সিসিল বিডন রামগোপালের প্রতি এই অবিচারের প্রতিবাদ স্বরূপ সভার সদস্যপদ ত্যাগ করেন। আর একজন বাঙ্গালী—ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালও এই ঘটনা উপলক্ষে পদত্যাগ করিয়াছিলেন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ পুনরায় মঞ্জুর করা উপলক্ষে এ দেশে এক বিরাট সভা হয়। এই সভায় রামগোপাল যে বক্তৃতা করেন তাহার জন্য তিনি অজস্র প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বৃটিশ ভারতের রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করা উপলক্ষে এক সভা হইয়াছিল। এই সভায় রামগোপাল চমৎকার বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

প্রেসিডেন্সী কালেজের হাতার মধ্যে মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের যে প্রস্তর-মূর্ত্তি রহিয়াছে, উহা প্রধানতঃ রামগোপালের প্ররোচনায় ঘটিয়াছিল। তিনিই সর্ব্বাগ্রে নিজের এক মাসের আয় প্রদান করিয়া একটি তহবিল স্থাপন-পূর্ব্বক হেয়ার সাহেবের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণকে এক এক মাসের আয় প্রদান করিবার জন্য আহ্বান করেন। এই আহ্বান উপেক্ষিত হয় নাই—অচিরে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

শেষ জীবনে তিনি বিষয়কর্ম্ম ও সাধারণ কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি ছোট লাটের সভার সদস্য মনোনীত হ'ন। এই সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ন হয়। এইজন্য তিনি সভায় বিশেষ কোন কাজ করিতে পারেন নাই। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী ১২৭৪ সালের ১২ই মাঘ তিনি লোকান্তরিত হন।

জীবনে তিনি অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, ব্যয়ও তদ্রূপ করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তিন লক্ষের অধিক টাকা রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তন্মধ্যে এক লক্ষ তাঁহার স্ত্রী ও পোষ্যবর্গকে দিয়া যান, ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটির দেশীয় শাখার বহুকাল তিনি সভাপতি ছিলেন, এই সোসাইটিকে তিনি দশ হাজার টাকা দিয়া যান, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চল্লিশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করেন। আর আত্মীয় স্বজনকে যে সকল ঋণ দান করিয়াছিলেন, তাহার পরিমাণ প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা। খত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তিনি সকলকে ঋণমুক্ত করিয়া যান।

রামগোপালের দুই সংসার। প্রথমার গর্ভে হারা ও গোরা নামে দুইটি পুত্র ও হেমলতা নামে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র দুইটির শৈশবেই মৃত্যু হয়। নৈহাটির বাবু বীরচাঁদ মিত্রের সহিত হেমলতার বিবাহ হইয়াছিল। পিতার জীবদ্দশাতেই তাঁহারও মৃত্যু হয়। রামগোপালের তিনটি দৌহিত্র আছেন। জ্যেষ্ঠ বাবু শরৎচন্দ্র মিত্র বি-এল, মধ্যম কলিকাতা ছোট আদালতের উকীল বাবু কালীচরণ মিত্র বি-এল এবং কনিষ্ঠ হাইকোর্টের এটর্নি বাবু চারুচন্দ্র মিত্র।

দিক্‌শূল

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(১৭)

সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে কাশীতে যাত্রীর ভিড় অতিশয় বেড়ে উঠেছে। রাজঘাট আর ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে নিয়মিত এবং অতিরিক্ত ট্রেণগুলি ঘণ্টায় ঘণ্টায় হাজার হাজার যাত্রী এনে ছেড়ে দিচ্ছে,—তা ছাড়া, নৌকায়, একায়, গরুর গাড়ীতে এবং পদব্রজে চতুর্দ্দিক থেকে কত লোক আসছে তার সংখ্যা নেই। কাশীর জনাকীর্ণ পল্লী-সমূহের অপ্রশস্ত পথ-ঘাট আবর্জ্জনায় অব্যবহার্য্য, এবং স্বল্পকায় বায়ুমণ্ডল দুর্গন্ধে অস্বাস্থ্যকর, হয়ে উঠেছে। তার ফলে এরি মধ্যে আশঙ্কা-জনক মূর্ত্তিতে কলেরা দেখা দিয়েছে।

নরেশ বললে, "চল সুকু, এই বেলা কলকাতায় স'রে পড়া যাক্। গ্রহণ উপলক্ষে কাশীতে যমরাজ যে-রকম ব্যবস্থা ফাঁদচেন, তাতে রাহুর হাত থেকে সূর্য্যের মুক্তিলাভের আগেই ভব-যন্ত্রণার হাত থেকে অনেককেই মুক্তিলাভ ক'রতে হবে ব'লে মনে হচ্ছে। অতএব চল, কালবিলম্ব না ক'রে আজই কলকাতা রওনা হওয়া যাক্।"

সুকুমারীর প্রকৃতির মধ্যে গ্রহণের দিকটা যেমন প্রবল ছিল, বর্জ্জনের দিকটা ছিল ঠিক তেমনি দুর্ব্বল; তার ফলে সে নূতন পরিবর্ত্তনকে যেমন সহজে গ্রহণ করত, পুরাতন

সংস্কারকে তেমনি সবলে রেখে চল্‌ত। ডাক্তারের প্রদত্ত ব্র্যাণ্ডির উপকারিতায় যেমন অবলীলাক্রমে তার বিশ্বাস হ'ত, গ্রহাচর্য্যের দেওয়া জল-পড়ার উপর তেমনি তার বিশ্বাস অটল থাকত। নরেশের কথা শুনে প্রবলভাবে মাথা নেড়ে সে বল্‌লে, "তা কিছুতেই হবে না। দেশ-দেশান্তর থেকে লক্ষ লক্ষ লোক আসচে কাশীতে গ্রহণ-স্নান করবার জন্যে—আর আমি ছ'মাস কাশীতে ব'সে থেকে পাঁচ দিন আগে পালিয়ে যাব? তা ছাড়া ভিড় ত হচ্চে সহরের ভেতরে,—আমাদের এখানে তার জন্যে ভয় করবার দরকার কি?"

নরেশ বল্‌লে, "ন কোটি মাইল দূরে সূর্য্যকে রাহু গ্রাস করলে তোমার স্নান করবার দরকার হয়, আর দু-মাইল দূরে কলেরা হ'লে ভয় করবার দরকার নেই? তবু যদি রাহু সত্যিই রাহু হ'ত। গ্রহণ আসলে কি, তা যদি বুঝতে তা হ'লে সূর্য্যের জন্যে অনর্থক ব্যস্ত না হ'য়ে নিজেই কুসংস্কাররূপ রাহুর গ্রাস থেকে মুক্ত হ'তে, আর আমি তোমার মুক্তি দেখে আনন্দ-স্নান করতাম।"

সুকুমারী বল্‌লে, "সে স্নানে পুণ্যি না হয়ে তোমার পাপ হ'ত।"

নরেশ হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, "অভিধানে যদি পাপের মানে পুণ্যি লিখ্‌ত, তা হ'লে নিশ্চয় হ'ত।"

এম্‌নিভাবে কথাবার্ত্তা হ'তে হ'তে হঠাৎ এক সময়ে সুকুমারী ব'লে বসল, "তা বেশ ত' তোমরা সকলে কলকাতা চ'লে যাও,—গ্রহণের পর যদি বেঁচে থাকি ত' ঈশ্বরকে নিয়ে আমি কলকাতা যাব।"

নরেশ বুঝ্‌তে পারলে এঞ্জিন্ যে-পথে যাবার উপক্রম ক'রেছে সে পথে ভয় আছে, সুকুমারীর আপাত-সরল বাক্যের মধ্যে জটিলতার লাল আলো দেখে আর বেশি অগ্রসর হ'তে তার ভরসা হ'ল না; বল্‌লে, "তোমাকে বাদ দিয়ে 'তোমরা' হয় না—সুতরাং তুমি যদি থাক ত' সকলকেই থাকতে হয়। কিন্তু একটা কথা, গ্রহণে দুটি কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে, স্নান আর দান। সমস্ত দিন উপোস ক'রে থেকে বেলা তিনটের সময়ে তোমার স্নান করা হবে না। স্নানের ত্রুটিটা দান দিয়ে যত পার পুরিয়ে নিয়ো, তা'তে আমি আপত্তি করব না।"

সুকুমারী জানে অর্দ্ধেক পাওয়া পুরো পাওয়ার প্রথম ভাগ, প্রথমার্দ্ধ অর্জ্জিত হ'লে শেষার্দ্ধ অর্জ্জিত হওয়া সহজ হয়। বল্‌লে, "আগে দেখি আমার রাশিতে গ্রহণ দেখ্‌তে আছে কি না, তবে ত' স্নান।"

কিন্তু এ কথা নিরূপিত হ'তে বিলম্ব ঘট্‌ল না;—পরদিন প্রাতে আহূত হ'য়ে সত্যনাথ স্মৃতিরত্ন উপস্থিত হলেন, এবং বল্‌লেন, মিথুন কর্কট কন্যা তুলা ও মকর রাশির পক্ষে গ্রহণ দর্শন শুভ, বাকি অশুভ।

সুকুমারী উৎফুল্ল হয়ে বল্‌লে, "আমার কন্যা রাশি।"

নরেশের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে সত্যনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কি রাশি বাবাজী?"

নরেশ বল্‌লে, "আমার রাশি পড়েছে অশুভ রাশির ভাগে। আমার মেষ রাশি।"

নরেশের কথা শুনে এক মুহূর্ত্ত চিন্তা ক'রে সুকুমারী বল্‌লে, "তোমার মেষ রাশি?—কিন্তু আমার ত মনে হচ্চে তোমার রাশি মকর।"

সুকুমারীর দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রসন্ন স্বরে নরেশ বল্‌লে, "না, না, মেষ রাশিই।" তার পর কণ্ঠস্বর একটু মৃদু ক'রে নিয়ে বল্‌লে, "কি আশ্চর্য্য! তোমার প্রতি আমার আচরণ দেখেও বুঝ্‌তে পারো না যে, মেষ ভিন্ন অন্য কোনো রাশি আমার হ'তে পারে না?"

নরেশের কথা শুনে পার্শ্ববর্ত্তিনী সরমা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

ভ্রূভঙ্গী ক'রে চাপা গলায় সুকুমারী তর্জ্জন করলে, "যা-তা বোকো না বল্‌ছি!"

সত্যনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কি রাশি ছোটোমা?"

মুখ ফিরিয়ে মৃদুস্বরে সরমা বল্‌লে, "তা ত' জানি নে।"

নরেশ বল্‌লে, "আমি জানি। তোমার মীন রাশি।"

সবিস্ময়ে সরমা বল্‌লে, "কি ক'রে জান্‌লেন?"

"কি ক'রে জান্‌লাম উপস্থিত বিচারে সে কথার কোনো প্রয়োজন নেই। তোমার মীন রাশি হ'লেও নদীতে সেদিন ভারি উৎপাত—তাই তুমি নিষিদ্ধ রাশির দলে পড়েছ।"

নরেশের কথা শুনে সকলে উচ্চস্বরে হেসে উঠল।

সহাস্যমুখে সত্যনাথ বল্‌লেন, "মেষ আর মীনের যুক্তি বুঝেচি বাবাজী,—কিন্তু এর মধ্যে একটু গোলযোগ আছে। রাশির বাধায় গ্রহণ দর্শনই করতে নেই—কিন্তু স্নান ত' করতে হবে। শাস্ত্রের মতে গ্রহণ অদর্শনকারীর পক্ষেও

মুক্তি স্নান অবশ্য কর্ত্তব্য।" ব'লে উচ্চস্বরে হাস্তে লাগলেন।

সত্যনাথের হাস্য শেষ হ'লে নরেশ প্রশান্তমুখে বল্লে, "স্নান তা হ'লে করব। অবগাহন থেকে আরম্ভ ক'রে মন্ত্র স্নান, চিন্তা স্নান পর্য্যন্ত আট রকম স্নানের বিধি শাস্ত্রে আছে; তার মধ্যে একটা যা-হয় করলেই হবে।"

সত্যনাথ বল্লেন, "কিন্তু ফল যে বাবাজী, আটের চেয়ে অনেক বেশি রকমের আছে!" ব'লে হা হা ক'রে হাস্তে লাগলেন।

নরেশ বল্লে, "তা ত নিশ্চয়ই! লোকে কথায় বলে যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।" তার পর সরমার দিকে চেয়ে বল্লে, "তোমার দিদির ভাগ্যে আম কাঁঠাল, আর আমাদের কপালে বট বকুল,—এম্‌নি একটা কোনো ব্যাপার হবে বোধ হয় সরমা।"

আবার একটা উচ্চ হাস্যের রোল উঠ্‌ল।

গ্রহণ দিনের বিধি-ব্যবস্থা নিরূপিত ক'রে দিয়ে সত্যনাথ প্রস্থান করলে সুকুমারী সতর্জনে বল্লে, "আচ্ছা, তোমার কি রকম আক্কেল বল দেখি?—স্মৃতিরত্ন মশায়ের সামনে ঐ সব মেষ রাশি টাশির কথা বল্‌তে মুখে একটু বাধ্‌ল না?"

অপ্রতিভ মুখে মাথা চুলকোতে চুলকোতে নরেশ বল্লে, "আমার মুখে বাধ্‌লেই যে স্মৃতিরত্ন মশায়ের বুদ্ধিতে বাধ্‌বে এত নির্ব্বোধ তুমি ওঁকে মনে কোরো না সুকু। আমি যে মেষ-প্রকৃতি তা বুঝ্‌তে তাঁর একটুও বাকি নেই। দেখনা? কোনো একটা বিষয়ে আমার সঙ্গে বরাবর আলোচনা ক'রে শেষ বিচারের জন্যে তিনি তোমার মুখের দিকে তাকান? স্মৃতিরত্ন মশায় বেশ ভাল রকমেই জানেন যে যে-বিষয়ে আমি শ্রীমান তাল্লা, সে-বিষয়ে তুমি শ্রীমতী চাবী; কোনো রকমে তোমাকে আয়ত্ত করতে পারলেই আমি উন্মুক্ত। সুতরাং প্রকৃতি অনুসারে আমার রাশি যে মেষ রাশি হওয়া উচিত, এ কথা শুনতে পেলেও তিনি নতুন কোনো কথা শুন্‌তেন না।"

নরেশের কথা শুনে সরমা হাস্তে লাগল, এবং সুকুমারী রাগ করতে লাগ্‌ল।

নরেশ বল্লে, "তুমি অন্যায় রাগ করছ সুকু। আচ্ছা সরমা, তুমিই বল, আমার প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ ক'রে দেখ্‌লে আমাকে মেষ রাশি ব'লে মনে হয়, না, সিংহ কিম্বা বৃষ রাশি ব'লে মনে হয়?"

গ্রহণ দিনের সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হ'য়ে যাওয়ায় সুকুমারী অন্তরের অন্দর মহলে প্রসন্ন ছিল—সরমাকে কোনো কথা বল্‌বার অবসর না দিয়ে সহাস্যমুখে বল্লে, "আচ্ছা গো, আচ্ছা তোমার না-হয় মেষ রাশিই—এখন ওঠো। বাইরে কোন অফিস থেকে পিওন এসে এক ঘণ্টা ব'সে রয়েছে।"

"সত্যি—একেবারে ভুলে গেছি!" ব'লে নরেশ দ্রুতপদে প্রস্থান করলে।

এ ঘটনার পাঁচদিন পরে গ্রহণের দিন সুকুমারী দুবার গঙ্গায় স্নান করলে—একবার স্পর্শ স্নান আর একবার মুক্তি স্নান। সন্ধ্যার পর যে বুকে একটু একটু বেদনা বোধ কর্‌তে লাগ্‌ল, রাত্রে কম্প দিয়ে জ্বর এল—পরদিন ডাক্তার এসে বুক পিঠ পরীক্ষা ক'রে দেখে সন্দেহ করলেন ডবল্‌ নিউমোনিয়া।

যোড়শোপচারে ডাক্তারী চিকিৎসা আরম্ভ হয়ে গেল। য়্যান্টিফ্লজেষ্টিন দিয়ে সুকুমারীর সমস্ত বুক-পিঠ বেঁধে দিয়ে সুকুমারীর জ্বর-তপ্ত ডান হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধ'রে নরেশ বল্লে, "কাল দুবার স্নান করায় হয় ত' ঠাণ্ডা লেগেছিল সেই জন্যে আগে থাক্‌তে সাবধান হবার উদ্দেশ্যে ডাক্তার এই ব্যবস্থা করলেন।"

অপর হাত দিয়ে নরেশের হাত-খানা সজোরে চেপে ধ'রে ম্লানমুখে মৃদু হাসি হেসে সুকুমারী বল্লে, "বুঝেচি। শুধু বুঝ্‌তে পারচিনে গ্রহণের ফল ফল্‌ল, না, তোমার কথা না শোনার ফল ফল্‌ল। আমি কিন্তু গ্রহণের ফল চাই নে—তোমার কাছে বেঁচে থাক্‌তে চাই। আমাকে মরতে দিয়ো না—নিশ্চয়ই বাঁচিয়ো!"

সুকুমারীর দুই চক্ষের ধার দিয়ে ঝরঝর ক'রে জল ঝ'রে পড়ল।

দুই বাহুর মধ্যে সুকুমারীকে সযত্নে জড়িয়ে ধ'রে নরেশ বল্লে, "কোনো ভয় নেই সুকু, তোমার কোনো ভয় নেই।"

কিন্তু এই অভয় দান সত্ত্বেও নরেশের চক্ষের জলে সুকুমারীর মুখমণ্ডল ভেসে গেল। (ক্রমশঃ)

সাময়িকী

বর্ত্তমানে দেশের প্রধান ঘটনা—কংগ্রেস ও তাহার আনুষঙ্গিক সভা-সমিতিগুলির অধিবেশন।

প্রতি বৎসর বড়দিনের পরবর্ত্তী সংখ্যার ভারতবর্ষে কংগ্রেস ও অন্যান্য সভা-সমিতির কথার আলোচনা হইয়া আসিতেছে। এবারও তাই। তবে বিশেষ করিয়া কংগ্রেস এবার আমাদের আলোচ্য এই জন্য, যে, এবারকার কংগ্রেসের অধিবেশন কলিকাতায় হইয়াছে—কংগ্রেস বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রতি বৎসরই কংগ্রেসে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা একটি না একটি বিশেষত্ব থাকে। বিশেষত্ব-বর্জ্জিত কংগ্রেসের কল্পনা করাও সম্ভবপর নহে। এবারকার কংগ্রেসে কিন্তু একাধিক বিশেষত্ব ছিল, এবং এই বিশেষত্বের সংখ্যাধিক্যই কংগ্রেসের এবারকার বিশেষত্ব। আমরা ক্রমে ক্রমে তাহার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করিব।

১৯২৮-২৯ খৃষ্টাব্দের ত্রিচত্বারিংশৎ সংখ্যক ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসমিতির প্রথম বিশেষত্ব—সভাপতির অভ্যর্থনা। এ বৎসর সংযুক্ত প্রদেশের রাষ্ট্রনেতা পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু মহোদয় কংগ্রেসের সভাপতির পদে বৃত হইয়াছিলেন। ইনি পূর্ব্বেও (১৯১৯) একবার কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন; এবার দ্বিতীয়বার। আবার, তিনি অল্প দিন পূর্ব্বে কংগ্রেসের আদেশে সর্ব্ব দলের নেতাদের একত্র সম্মিলিত করিয়া ভারতীয় জাতীয় শাসনতন্ত্রের একটা আদর্শ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উহা 'নেহেরু-রিপোর্ট' নামে সাধারণ্যে পরিচিত। এই নেহেরু রিপোর্ট লইয়া কিছুকাল ধরিয়া দেশীয় ও য়ুরোপীয় মহলে, ভারতে ও বিলাতে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু যে কংগ্রেস-তরণীর কর্ণধার হইবার পক্ষে যোগ্যতম ব্যক্তি সে বিষয়ে কাহারও মনে সন্দেহের লেশ মাত্র ছিল না।

এহেন মহাশয় ব্যক্তিকে কংগ্রেসের নেতারূপে অভ্যর্থনা করিবার সুযোগ পাইয়া বঙ্গবাসী উল্লাসে-উৎসাহে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল। বাঙ্গলায় এরূপ উৎসাহ-উদ্যমের আনুষঙ্গিক আরও কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ অভ্যর্থনার উদ্যোগ আয়োজন করিতে গিয়া অভ্যর্থনা-সমিতি নানা দিক হইতে বিলক্ষণ বাধা পাইয়াছিলেন। এই বাধা পাওয়ার জন্য অভ্যর্থনার আগ্রহ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত সভাপতির কলিকাতায় পদার্পণের অনতিকাল পরেই সাইমন কমিশনের কলিকাতায় শুভাগমন করিবার কথা ছিল, এবং কমিশনের অভ্যর্থনার ভার লইয়াছিলেন—খোদ সরকার বাহাদুর।

সে যাহা হউক, কংগ্রেসের সভাপতির অভ্যর্থনার আয়োজন আশাতীত ভাবে সফল হইয়াছিল। বঙ্গবাসী কংগ্রেস-নেতাকে যে ভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছে, তাহা অপূর্ব্ব, অভাবনীয়, অতুলনীয়। যে যে পথ দিয়া সভাপতির ৩৪ অশ্ব-বাহিত যান গমনের কথা ছিল, সেই পথগুলি এবং তাহার উভয় পার্শ্বস্থ অট্টালিকাগুলি জন-সমুদ্রে পরিণত হইয়াছিল।

এবার কংগ্রেসের প্রধান বিচার্য্য বিষয় ছিল—নেহেরু রিপোর্ট। সেই নেহেরু-রিপোর্টকে কংগ্রেসে উপস্থাপন করিবার উপযোগী ভাবে প্রস্তুত করিবার ভার পড়িয়াছিল সকল দলের নেতৃ-সম্মেলনের উপর। সেইজন্য কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদল সম্মেলন বা কনভেনসনের অধিবেশনেরও বন্দোবস্ত হইয়াছিল, এবং কংগ্রেস বসিবার কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই কনভেনসনের বৈঠক চলিয়াছিল। বিষয়টির গুরুত্ব অনুযায়ী এই বৈঠকে কয় দিন ধরিয়া বিস্তর বাদানুবাদ হইয়াছিল।

এই নেহেরু রিপোর্টের উৎপত্তির গোড়ায় একটু ইতিহাস আছে। বর্ত্তমান সংস্কৃত শাসন এ দেশে প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্ব হইতে তাহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে দেশব্যাপী ঘোর আন্দোলন চলিতেছিল, এবং এখনও তাহার সম্পূর্ণ অবসান হয় নাই। এই আন্দোলন যখন বিলক্ষণ প্রবল হইয়া পড়িয়াছিল,
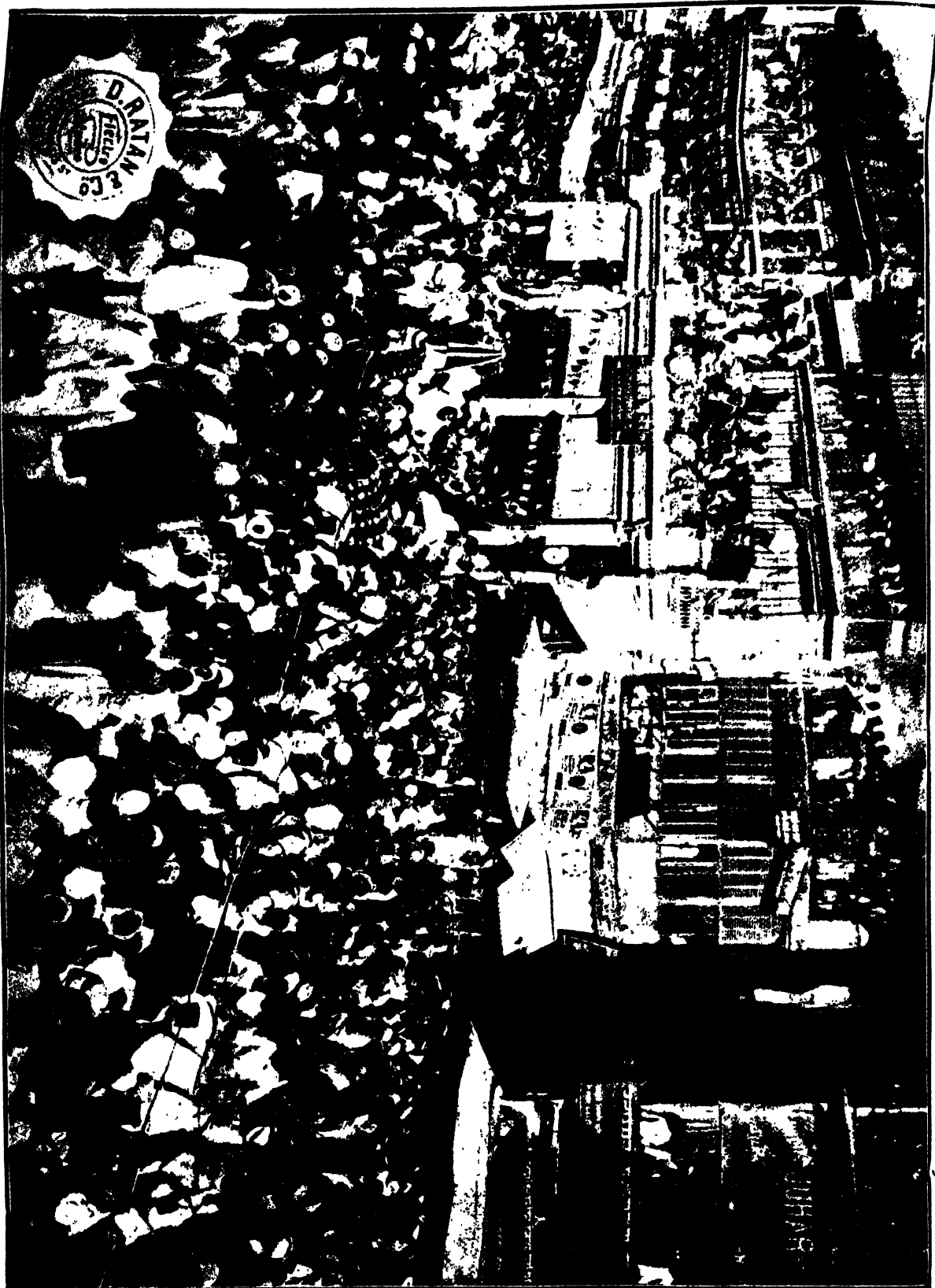
সভাপতির শোভাযাত্রা
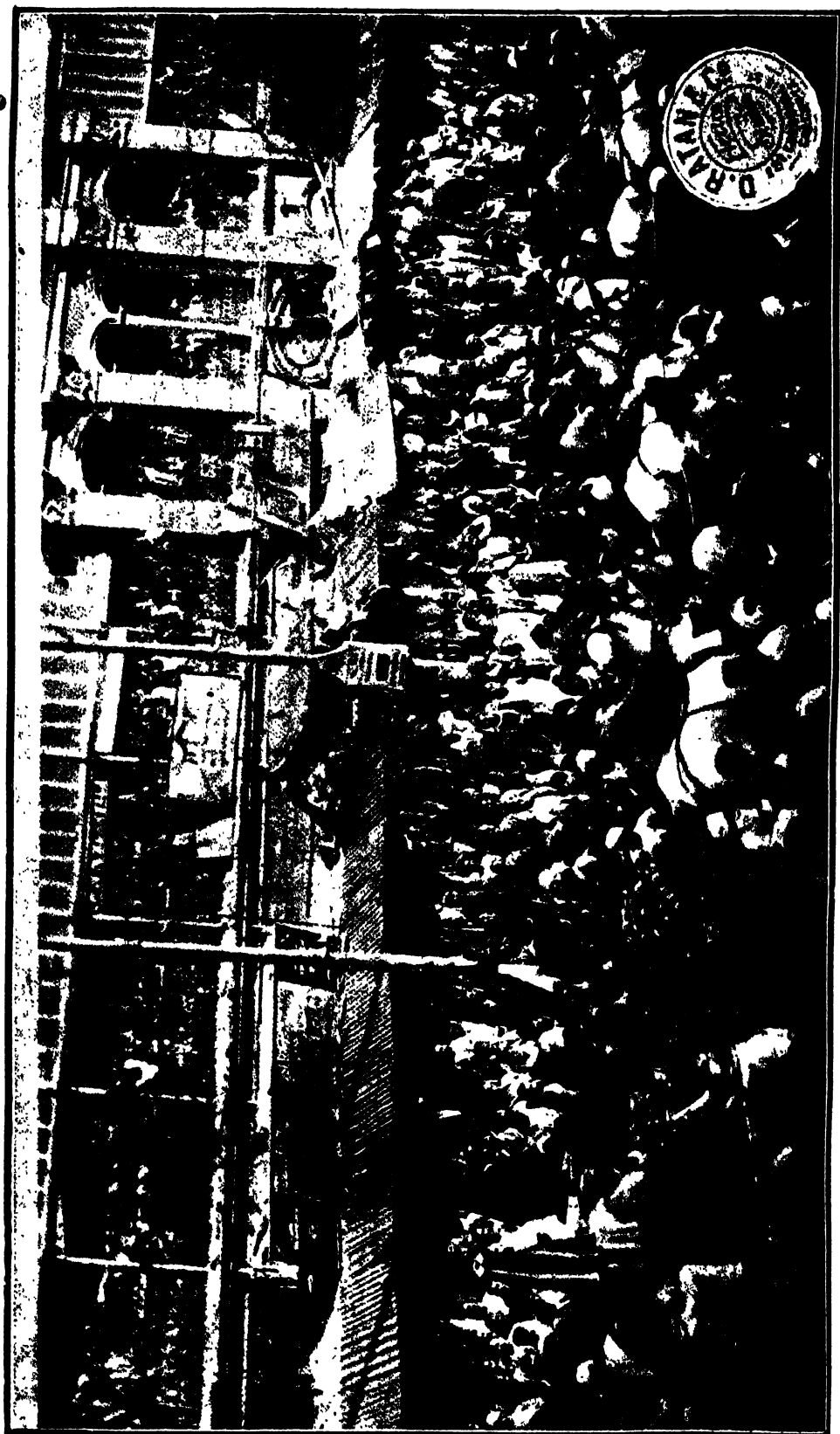
চৌত্রিশ অশ্ব-বাহিত যানে সভাপতি

তখন বিলাতের রাজপুরুষরা কিছু বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই সময় বরাবর অর্থাৎ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুলাই তদানীন্তন ভারত-সচিব লর্ড বার্কেনহেড পার্লামেণ্টের অভিজাত সভায় বলিয়াছিলেন, আমরা তোমাদিগকে যেরূপ শাসন দিতে চাহিতেছি, তাহা যদি তোমাদের দেশের এত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম, সম্প্রদায়, জাতি ও রাজনীতিক দলের পক্ষে কখনও সম্মিলিত ভাবে একমত হইয়া সর্ব্বজনগ্রাহ্য শাসনতন্ত্র রচনা করা সম্ভবপর হইবে না ভাবিয়াই বোধ হয় ভারত-সচিব মহাশয় পার্লামেণ্টে ঐরূপ উক্তি করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহারা ভারত-সচিবের উক্তির

জাতীয় পতাকা-তলে

মনোনীত না হয়, তাহা হইলে তোমরা কিরূপ শাসন চাও, বল। তোমরা ভারতের সকল জাতি-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়, এবং সকল রাজনীতিক দল মিলিয়া একমত হইয়া একটা শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রস্তুত করিয়া দাও, আমরা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিব। ভারতের নেতারা মনে করিলেন,—এ যথোচিত প্রত্যুত্তর দিবার আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন,—অর্থাৎ সর্ব্ব দলের সম্মিলন ঘটাইয়া সর্ব্ববাদিসম্মত একটা শাসনতন্ত্র খাড়া করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

—

অবশেষে ভারতের জন্য নূতন শাসন-বিধি প্রণয়নের

সময় আসন্ন হইয়া আসিল। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য ষ্ট্যাটুটরী কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া তাহার আলোচনা আরম্ভ হইল; সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় নেতৃগণের মধ্যে জাতীয় শাসন-ব্যবস্থা রচনার জন্য সাড়া পড়িয়া গেল। কংগ্রেসের আদেশে সকল দলের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইল। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু হইলেন তাহার কর্ত্তা। এই কমিটি বহু অনুসন্ধান ও অনেক বাদানুবাদের পর যে শাসন-ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেন, নেহেরু রিপোর্ট সেই ভিত্তির উপর গঠিত হইল। ইহাকেই কংগ্রেসের দ্বারা অনুমোদিত করাইয়া লইবার জন্য কলিকাতায় কংগ্রেসের সঙ্গে সর্ব্বদলের কনভেনসনের বন্দোবস্ত হইল। সকল দলের প্রতিনিধিরা কনভেনসনে সমবেত হইয়া নেহেরু রিপোর্টের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বাদানুবাদ মধ্যে মধ্যে এত প্রবল, এত তীব্র ও তিক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল যে, মনে হইতে লাগিল, বুঝি বা সব পণ্ড হয়, বুঝি বা কনভেনসন ভাঙ্গিয়া যায়। যাহা হউক, শেষ রক্ষা হইল—সকল দলই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করিয়া রিপোর্টটিকে সর্ব্বজনগ্রাহ্য করিয়া তুলিলেন—স্থির হইল, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন পাইলেই ভারতবাসী সন্তুষ্ট হইবে।

কিন্তু একটা গোল এখনও রহিয়া গেল। ইতঃপূর্ব্বে কংগ্রেস স্বাধীনতার দাবী করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার উপর 'পূর্ণ' কথাটি যোগ করিয়া তরুণ দল 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র দাবী জানাইয়া বলিতেছিলেন, ইহার কমে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিব না। কনভেনসনে তাঁহারা গোলযোগ বাধাইয়াছিলেন যে, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন আমরা চাই না, আমরা চাই পূর্ণ স্বাধীনতা। মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতৃগণ মধ্যস্থ হইয়া স্থির করিয়া দিলেন যে, পূর্ণ স্বাধীনতাই জাতির এবং জাতির প্রতিনিধি কংগ্রেসের চরম লক্ষ্য আছে এবং থাকিবে। কিন্তু প্রয়োজনের খাতিরে আপাততঃ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবী করিয়াই ক্ষান্ত হওয়া উচিত। নচেৎ সকলের একমত হওয়ার আশা নাই। কংগ্রেসে এ যাত্রা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়া থাকুক। এক বৎসর আমরা এই দাবী পূরণের জন্য অপেক্ষা করিব। এক বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের রাত্রি দ্বিপ্রহরের মধ্যে যদি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কংগ্রেস পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবী স্বচ্ছন্দে করিতে পারিবেন,—কেহ তাহাতে আপত্তি করিবে না; এবং এই এক বৎসরে পূর্ণ-স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন

পতাকা-উৎসব

চালাইতেও কোন বাধা থাকিবে না। তরুণ দল ইহাতে সম্পূর্ণ সন্তোষ লাভ করিতে না পারিলেও, অগত্যা কনভেনসনের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়া এক বৎসর অপেক্ষা করিতে স্বীকার করিলেন। ইঁহারাও অবশ্য ত্যাগ-মন্ত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, সর্ব্বদলের ঐক্যমত্য সাধনের

মহদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই মহাত্মাজার প্রস্তাবে সম্মতি দান করিয়াছিলেন। সেইজন্য কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধি কর্ত্তৃক ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রস্তাব উপস্থাপন করা সম্ভবপর হইয়াছিল।

—

ভারতেব রাজনীতি-ক্ষেত্রে এখন দুইটা প্রধান দল—প্রবীণ ও নবীন, প্রাচীন ও তরুণ; এবং দুইটা প্রধান মত—ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ও পূর্ণ স্বাধীনতা। প্রবীণ দল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া ঔপনিবেশিক তিনি ঐ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়াছেন কেবল মিলনের খাতিরে। অপর সকল দলের নেতারাও মিলনেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করিয়া একমত হইয়া বর্ত্তমান সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এইরূপ ত্যাগের ভাব ও মিলনের ইচ্ছা স্থায়ী হইলে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম্ম, সম্প্রদায়কে একত্র করিয়া ভারতে 'নেশন' গঠন করা একেবারে অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। ইহাই জাতীয়তার প্রধান ভিত্তি।

উৎসবের সূচনায় ডি, রতনের সৌজন্যে

স্বায়ত্ত-শাসন পাইলেই যথেষ্ট মনে করিবেন। আর তরুণ দল বৃটিশ-নিরপেক্ষ পূর্ণ স্বাধীনতার কমে কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবেন না। মতের এখানে খুবই পার্থক্য রহিয়াছে। কিন্তু এবারের কংগ্রেসে একটা শুভ লক্ষণ এই দেখা গিয়াছে যে, কেহই জিদের বশে নিজের মতকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার চেষ্টা করেন নাই। মিলনের ইচ্ছা সকলেরই মনে প্রবল দেখা গিয়াছিল। সভাপতির অভিভাষণে পণ্ডিত মতিলালজী স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, সর্ব্বদল কমিটি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেকগুলাই তাঁহার মতের বিরোধী। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও

এইরূপে বহু আয়াসে সকলকে সম্মত করিয়া অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইলে নেহেরু রিপোর্ট একটি প্রস্তাবের আকারে মূল কংগ্রেসে উপস্থিত করা হয়। মহাত্মা গান্ধী প্রস্তাবটি সভায় উপস্থাপন করেন। যথারীতি উহা পেশ হইবার পর, বাঙ্গলার স্বাধীনতাকামীদিগের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু একটি সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তখন আবার সভায় তুমুল বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। অবশেষে ভোট লওয়া হইলে দেখা গেল মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবের অনুকূলে ১৩৫০ ভোট এবং সুভাষ বাবুর প্রস্তাবের অনুকূলে ৯৭৩ ভোট হইয়াছে। তখন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের

প্রস্তাবটি সভায় গৃহীত হয়। প্রস্তাব গ্রহণের সর্ত্ত এই যে, এক বৎসরের জন্য এই প্রস্তাব গৃহীত হইল। ইহার মধ্যে পার্লামেণ্ট আমাদিগকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন দেন, ভালই। নতুবা এক বৎসর পরে অহিংস অসহযোগ পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইবে, টেক্স বন্ধ করা হইবে, এবং সরকারের সহিত কোন বিষয়ে কোন সংশ্রব রাখা হইবে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কংগ্রেসে এই প্রস্তাব পাশ করাইতে যাঁহারা অত্যন্ত

স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনী

আগ্রহান্বিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্পষ্ট বাক্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন পাইবে না তাহা তাঁহারা জানেন।

—

কংগ্রেস আরম্ভ করিবার পূর্ব্ব-সূচনা স্বরূপ একটি দৃশ্য বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সেটি পতাকা-উত্তোলন-উৎসব। জাতীয় পতাকা উত্তোলন কংগ্রেসের প্রথম অনুষ্ঠান। ইহাকে মঙ্গলাচরণ বলা যাইতে পারে। এই পতাকা-উত্তোলন রীতিমত একটি উৎসব। ইহা দেখিবার জন্য পনেরো হইতে বিশ হাজার লোক উৎসব-ক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্যদলের সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে অবস্থান অতি মনোরম দৃশ্য।

বর্ত্তমান বর্ষে কংগ্রেসে প্রবীণ দলের মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কংগ্রেস এখন নবীন দলের হস্তগত। সেইজন্য প্রবীণ দলের এক শাখা কংগ্রেস বর্জ্জন করিয়া লিবারেল দল নামে একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করিয়াছেন। এলাহাবাদে যথারীতি তাঁহাদেরও বার্ষিক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সার চিমনলাল শীতলবাদ সভাপতি হইয়াছিলেন। এই সভা কংগ্রেসের কিঞ্চিৎ নিন্দা করিয়াছেন,

কংগ্রেস-মণ্ডপে সভাধিবেশন

ফটোগ্রাফার—টি, পি, সেন

গবমেণ্টকে অনেক সদুপদেশ দিয়াছেন, সাইমন কমিশন বর্জ্জন করিয়াছেন, এবং ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন পাইলে তাহা গ্রহণ করিতে তাঁহাদের আপত্তি নাই জানাইয়াছেন। কংগ্রেসের সঙ্গে প্রধান প্রধান বিষয়ে লিবারেল দল যখন একমত হইতে পারিয়াছেন, তখন তাঁহাদের স্বতন্ত্র সম্মেলন করিবার আবশ্যকতা কি ছিল, তাহা বুঝা গেল না। বরং এবার যেমন সর্ব্বদল একমত হইয়া কংগ্রেসে যোগ দিয়া ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন, লিবারেল দলও সেইভাবে কংগ্রেসে যোগদান করিলে কংগ্রেসের বলবৃদ্ধি হইত, সকল দিক দিয়া দেখিতে শুনিতেও শোভন হইত সন্দেহ নাই।

ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ডাক্তার আনসারি

কংগ্রেস সম্পর্কে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা কংগ্রেসে শ্রমিক অভিযান। কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন আরম্ভ হইবার যে সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহার কিছু পূর্ব্বে লিলুয়া হইতে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র মিত্র প্রমুখ কয়েকজন শ্রমিক নেতার পরিচালনে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার শ্রমিক কংগ্রেস মণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হন। নেহেরু রিপোর্টে কৃষকদিগের সম্বন্ধে যেরূপ সুব্যবস্থা হইয়াছে, শ্রমিকদিগের
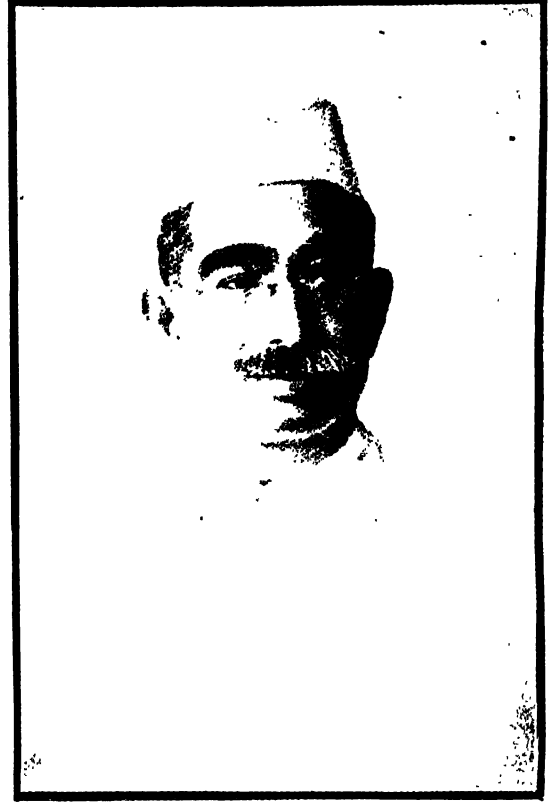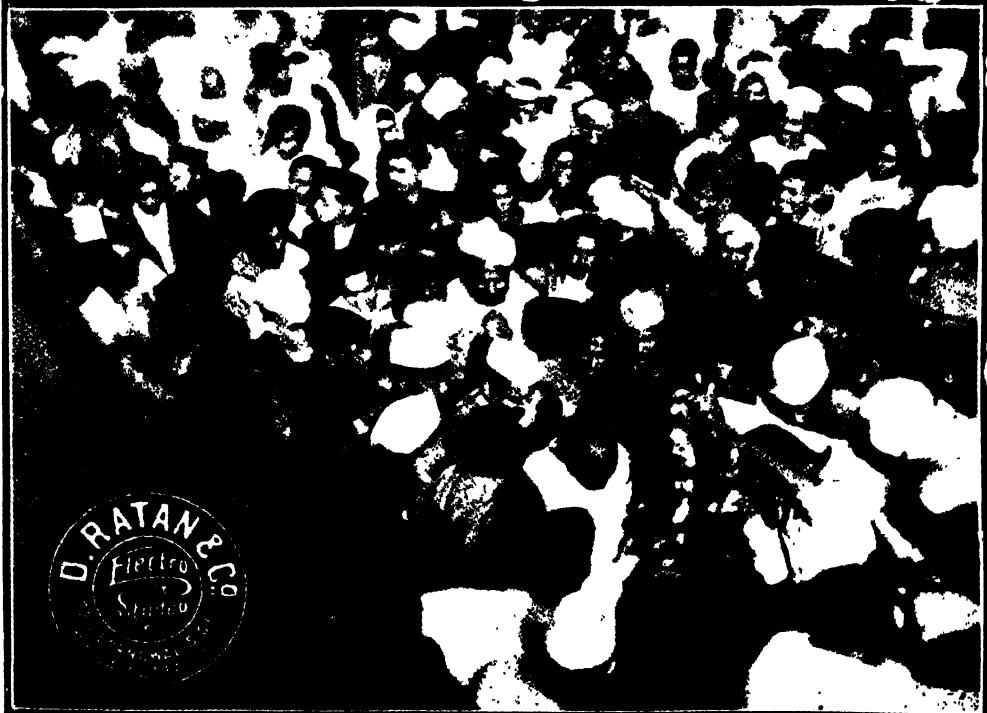
মহাত্মা গান্ধীকে হাবড়া ষ্টেশনে অভ্যর্থনা

স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী
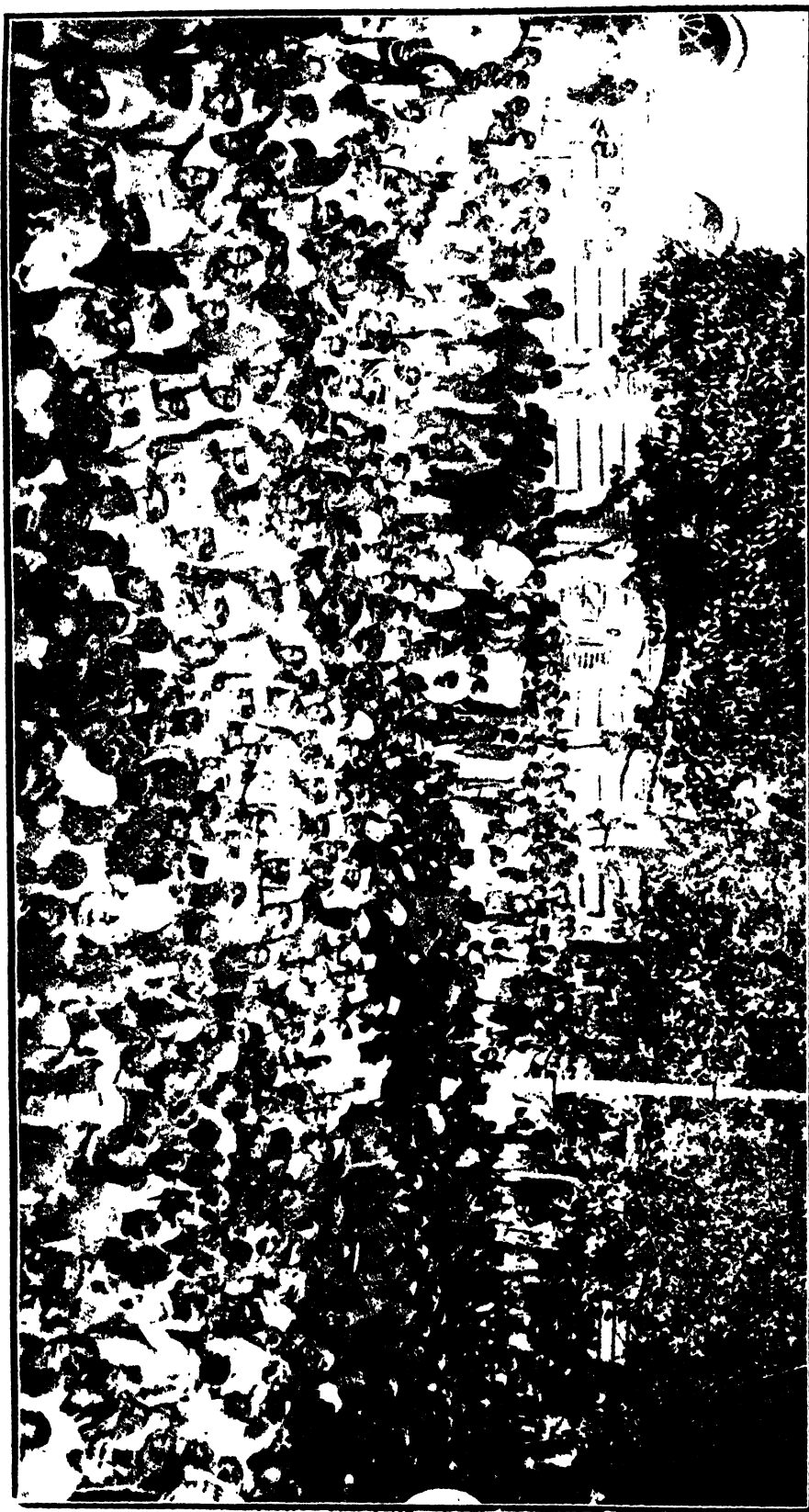
সম্বন্ধে তাহা হয় নাই। সেইজন্য তাঁহারা কংগ্রেসকে তাঁহাদের অভাব অভিযোগের কথা জানাইতে আসিয়াছিলেন। শ্রমিকগণ জাতীয় পতাকাতলে সমবেত হন, এবং আধ ঘণ্টার জন্য সভা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কর্তৃপক্ষ তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে তাঁহারা মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করেন এবং পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে তাঁহাদের সভাধিবেশন হয়। এই সভায় শ্রমিকরা পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। দেশের দাস-মনোভাব যে কিরূপ আশ্চর্য্য ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে, এই ঘটনা হইতে তাহা বেশ প্রতিপন্ন হইতেছে। ভারতের জনসাধারণ আপনাদের অবস্থা সম্বন্ধে পূর্ণ সজাগ হইয়া উঠিলে শাসন-ব্যবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইবার সম্ভাবনা।

জাগরণের লক্ষণ কেবল শ্রমিকদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না—নারী-জাগরণের লক্ষণও দেশবন্ধু নগরে সুপ্রকট হইয়াছিল। কংগ্রেস-মণ্ডপের নিকটে নিখিল ভারতীয় মহিলা সম্মেলনের জন্য একটি মণ্ডপ বিশেষভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মহিলা-মণ্ডপে যে মহিলা-সম্মেলন হইয়াছিল, তাহার অভ্যর্থনা সমিতির নেত্রী হইয়াছিলেন ময়ূরভঞ্জের মহারাণী সুরুচি দেবী; এবং ত্রিবাঙ্কুরের ছোট মহারাণী মূল সভার নেত্রী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়েরই অভিভাষণ অতি সুন্দর হইয়াছিল; বিশেষতঃ ত্রিবাঙ্কুরের ছোট মহারাণীর অভিভাষণে নারীজাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার অনেক কথা ছিল। অবরোধ প্রথা, বাল্য বিবাহ, বিধবা বিবাহ এবং সাধারণ ভাবে নারী-সমাজের পক্ষে হিতকর অনেক বিষয় এই সভায় আলোচিত হইয়াছিল। 'ভারতবর্ষে'র পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট সুপরিচিতা শ্রীমতী অনুরূপা দেবী অবরোধ প্রথা রহিত করাইবার উদ্দেশ্যে প্রচার কার্য্য দ্বারা লোকমত গঠনের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া একটি প্রস্তাব সভায় উপস্থাপন করেন। প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভায় গৃহীত হয়।

—

আলোক-স্তম্ভ
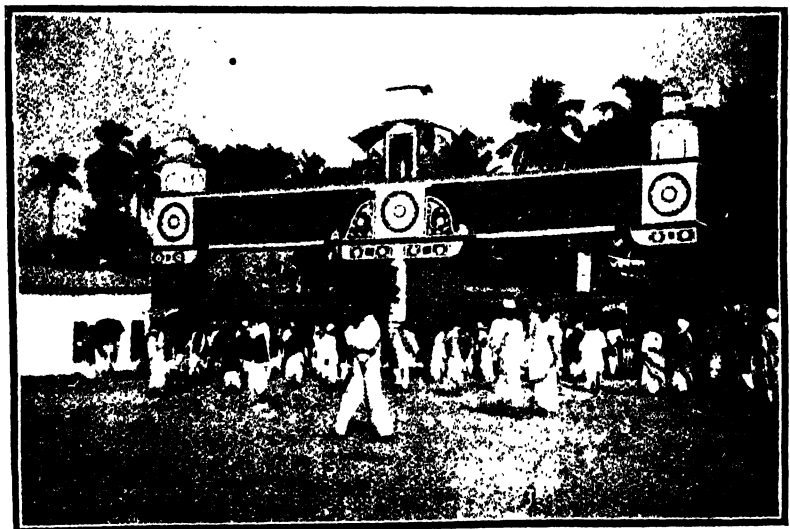
কংগ্রেসের প্রধান তোরণ-দ্বার ফটোগ্রাফার—টি, পি, সেন

২৯শে ডিসেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-মন্দিরে নিখিল-ভারত-পাঠাগার সম্মেলনের অধিবেশন হইবার কথা ছিল,

অধিবেশন হইয়াও ছিল, তবু যেন এই সম্মেলন তেমন সফল হয় নাই। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া, এবং নির্ব্বাচিত সভানেত্রী শ্রীমতী বেশাণ্ট কংগ্রেসের কার্য্যে ব্যস্ত থাকার জন্য, সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সুতরাং সভা যে কেমন জমিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। তবে সভায়

প্রদর্শনীতে সাধারণ বিভাগ

প্রদর্শনীর কলকারখানা বিভাগ, প্রথম দৃশ্য

লোক যথেষ্ট হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক রাধাকিষেণ সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সভার কার্য্য এক রকম করিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

কংগ্রেস উপলক্ষে কলিকাতা মহানগরীতে ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের সমাবেশের সুযোগে অন্যান্য সভা-সমিতি কত যে হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না; এবং সেই সকল সভা-সমিতির একটা সম্পূর্ণ তালিকা প্রদান করি, এমন স্থান আমাদের নাই। মোটের উপর বেশ বুঝা গেল, জাতি যে ধীরে ধীরে জাগিতেছে, তাহার কুম্ভকর্ণের নিদ্রা যে ভঙ্গ হইতেছে, স্থবির জাতির অসাড় দেহে প্রাণের স্পন্দন যে অনুভূত হইতেছে, এ সম্বন্ধে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কংগ্রেস উপলক্ষে স্বেচ্ছাসেবকদিগের কার্য্য অতি প্রশংসনীয় হইয়াছে। বাঙ্গলার আতিথেয়তা চির-প্রসিদ্ধ। কংগ্রেসে সমাগত ভারতীয় শীর্ষস্থানীয় মনীষী ব্যক্তিগণ আজ বাঙ্গলার আতিথেয়তার অজস্র প্রশংসা করিতেছেন, ইহা অত্যন্ত আনন্দের কথা। সভাপতির অভ্যর্থনার দিন হইতে একপক্ষ কাল কলিকাতা মহানগরী উৎসব-বেশ ধারণ করিয়াছিল; চারিদিকে প্রচণ্ড সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী জাতি সহজেই ভাবস্রোতে গা ভাসাইয়া দিতে পারে। তথাপি বলিতে হয়, এমন উৎসাহ-উদ্যম অল্পই দেখা যায়।

৪৩শ বার্ষিক কংগ্রেস যেরূপ সফলতা লাভ করিয়াছে, পূর্ব্ববর্ত্তী ৪২ বৎসরে ইহা কখনও এরূপ সফলতা লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এই সফলতার মূলে আছে একটি বিষয়। সেটি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে জাতীয়তা-বোধ। সকলেরই প্রাণে এই একই সুর ধ্বনিত হইতেছে। কাজেই ত্যাগ স্বীকার করা কাহারও পক্ষে কঠিন হয় নাই, মিলনও অসম্ভব হয় নাই। সর্ব্বদল সম্মেলনে নেহেরু রিপোর্ট, তথা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন, পূর্ণ স্বাধীনতা, হিন্দু-মুসলমানে মিলন, সকল দলের মিলন প্রভৃতি প্রসঙ্গে বাদানুবাদের তীব্রতা দেখিয়া অনেক সময়েই মনে হইয়াছিল, কংগ্রেসে

কার্য্য হয় ত পণ্ড হইবে; কিন্তু সকলেই জাতীয়তা-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া মিলন-প্রয়াসী ছিলেন বলিয়া সাংঘাতিক সন্ধিক্ষণ-গুলি ভালয় ভালয় কাটিয়া গিয়াছিল।

মিলন-প্রয়াস যে লোকের আন্তরিক, তাহার প্রমাণ বঙ্গের বাহিরেও দেখা গিয়াছিল। কংগ্রেস সপ্তাহে দিল্লীতে মাননীয় আগা খাঁর সভাপতিত্বে সর্ব্বদল মসলেম সম্মেলনের একটি অধিবেশন হয়। অন্যান্য বিষয়ে তিনি সাম্প্রদায়িকতার সমর্থন করিলেও মুসলমানদিগকে একটি অমূল্য উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ধর্ম্মের নামে, কোরবানির নামে গো-হত্যা করা মুসলমানের পক্ষে অবশ্য-কর্ত্তব্য নহে। ইব্রাহিম কর্ত্তৃক ইতিহাস-বিশ্রুত বলিদানের ব্যাপার স্মরণ করিয়াই কোরবানি অনুষ্ঠান করা হয়; কিন্তু ইব্রাহিম গোরু জবাই করেন নাই। কোরআনের কোথাও গো-হত্যা করিয়া কোরবানির আদেশ দেওয়া হয় নাই। সম্রাট বাবর তাঁহার পুত্র সম্রাট হুমায়ুনকে হিন্দুস্থানে গো-বধ করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন। পশুর রক্ত মাংস ভগবানের নিকট পৌছে না। আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব্ব ধর্ম্মপ্রাণ আমীর হবিবুল্লা গোহত্যার বিরোধী ছিলেন। কাশ্মীরের স্বধর্ম্মনিরত মুসলমানগণ জানেন যে, গোহত্যা মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন নহে। কোন মুসলমান যদি হজ তীর্থ করিতে যান,—সেখানে গোরু পাওয়া যায় না, তিনি কি করিয়া কোরবানি করিবেন···ইত্যাদি। ইহা মিলনের বাণী। কিন্তু এইরূপ মিলন-বাণী বড় স্থিতিস্থাপক। স্বদেশী যুগে অনেক মিলন-প্রয়াসী মুসলমান ভদ্রলোকের মুখে শুনা গিয়াছিল যে কোরআনে গো-কোরবানির ব্যবস্থা দেওয়া

কলকারখানা বিভাগ, অপর দৃশ্য

সাধারণ বিভাগ, ২য় দৃশ্য

খদ্দর বিভাগ

হয় নাই। আবার ঐ কোরআনের দোহাই দিয়াই অপর একদল মুসলমান ভদ্রলোক গো-কোরবানির সমর্থনও করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে দুই দলে বিলক্ষণ বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু মীমাংসা কিছুই হয় নাই। সেইজন্য ঐরূপ উক্তি স্থিতিস্থাপক বলিয়া মনে হয়,—উহার উপর সম্পূর্ণরূপে আস্থা স্থাপন [করা] যায় না। কারণ,
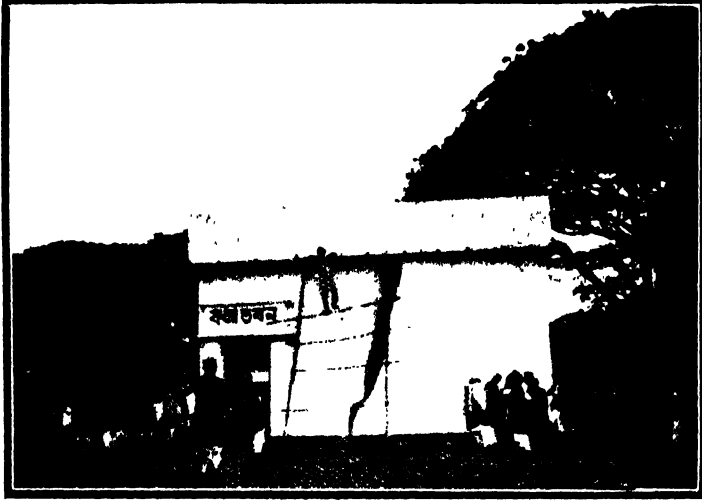
কলা ভবন

ঔষধ বিভাগ

প্রয়োজন হইলে আজ যাহা বলা হয়, অপর প্রয়োজনে কাল ঠিক তাহার উল্টা কথা বলিতেও বাধে না। সে যাহাই হউক, মাননীয় আগা খাঁ যে মিলনেচ্ছু হইয়াই মুসলমান শ্রোতৃমণ্ডলীকে ঐরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা আমরা বিশ্বাস করি, এবং সেজন্য তাঁহার অভিনন্দন করি।

———

নিখিল ভারত যুব কংগ্রেসে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রূপে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় যে সমন্বয়ের কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহা আমাদের বড় ভাল লাগিল। সবরমতী ও পণ্ডীচেরীর চিন্তাধারা যুব-সম্প্রদায় বর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করেন, করুন, তাহাতে আপত্তি নাই। বর্ত্তমান যুগে কর্ম্মবাদই যে প্রশস্ত তাহাতেও সন্দেহ নাই। তবে অতীতের সঙ্গে একটা সমন্বয় করিয়া লওয়া ভাল। অতীতের সবই যে মন্দ এবং বর্জ্জনীয়, তাহা নহে। যাহা প্রকৃত সৎ তাহা চিরন্তন, নিত্য সত্য। তাহা অতীতেও যেমন, বর্ত্তমানেও তদ্রূপ গ্রহণীয়। পক্ষান্তরে, আমরা বৈদিক যুগে যেমন ফিরিয়া যাইব না, তদ্রূপ য়ুরোপের অন্ধ অনুকরণও করিব না। আমাদের পক্ষে যাহা প্রয়োজনীয় তাহা আমরা নূতন করিয়া গড়িয়া লইব। ইহাই ত চাই।

কংগ্রেসের কথা এতক্ষণ ধরিয়া চলিল; কিন্তু একটা করিয়া শিল্প-প্রদর্শনী কংগ্রেসের অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে—সুতরাং প্রদর্শনীর কথাও আমাদের পক্ষে অপরিহার্য্য। অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও কংগ্রেসের সঙ্গে একটা প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে—কংগ্রেস একজিবিসন।

কলিকাতায় যখন কংগ্রেসের উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হয় তখন একটা কথা উঠিয়াছিল যে, কংগ্রেসের সঙ্গে যে প্রদর্শনী হইবে, তাহাতে বিদেশী জিনিস থাকিবে কি না। বলা বাহুল্য, এরূপ কোন কথা উঠিলেই যেমন দুইটা মত, দুইটা দল হয়, এক্ষেত্রেও তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই—দুই মতের দুইটি দল হইয়াছিল, এবং অনেক দিন ধরিয়া তর্ক বিতর্কও হইয়াছিল। তর্কের যেমন কোন মীমাংসা কোন কালেই হয় না, এ ক্ষেত্রেও, সেইরূপ, হয় নাই। তাই বলিয়া প্রদর্শনীর আয়োজন বন্ধ থাকে নাই।

অবশেষে কংগ্রেস বসিবার কয়েক দিন পূর্ব্বে কংগ্রেসের গত বৎসরের সভাপতি ডাক্তার আনসারি প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

ভারতীয় কোন প্রদর্শনীতে, বিশেষতঃ কংগ্রেস সংশ্লিষ্ট প্রদর্শনীতে, বিলাতী অথবা বিদেশী জিনিস থাকিবে কি না, সেটা একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা। দুই দিক দিয়া কথাটার বিচার করা যাইতে পারে। যদি অবস্থা এরূপ হয় যে, কংগ্রেস-প্রদর্শনীতে বিদেশী জিনিস দেখিয়া লোকে মনে করিতে পারে বিদেশী জিনিসের ব্যবহার কংগ্রেসের অনুমোদিত, অন্ততঃ বিদেশী জিনিষ ব্যবহার করিলে কংগ্রেসের কোন আপত্তি নাই, তাহা হইলে কংগ্রেস প্রদর্শনীতে বিদেশী জিনিস থাকা উচিত নয়। কিন্তু অবস্থা কি বাস্তবিক এইরূপ? বোধ হয় নহে। সংবাদপত্রে নানা লোকে নানা প্রকার বিজ্ঞাপন প্রচার করে। তাই বলিয়া ঐ সকল বিজ্ঞাপনের বিষয়ীভূত বস্তু বা ব্যক্তিরা সংবাদপত্রের অনুমোদিত, এইরূপ মনে করা যায় না। সেইরূপ, কংগ্রেসের প্রদর্শনীতে বিদেশী জিনিস থাকিলেই তাহা কংগ্রেসের অনুমোদিত বলিয়া মনে করিবে, দেশের লোক বোধ হয় এখন আর ততটা নির্ব্বোধ নাই। তবে কংগ্রেসের প্রদর্শনীতে কোন বিদেশী মাল প্রদর্শিত হইলে তাহার বিজ্ঞাপন প্রচারের কিছু সুবিধা হয়। সে দিক দিয়া দেখিলে কংগ্রেস প্রদর্শনীতে বিদেশী মাল থাকা উচিত নয়।

কিন্তু এক শ্রেণীর দেশী বিদেশী মাল পাশাপাশি প্রদর্শিত হইলে তাহার বিলক্ষণ উপকারিতা আছে। কলিকাতার বাজারে এরূপ দেশী ও বিদেশী মাল বহু পরিমাণে বিক্রীত হইতেছে; কিন্তু তাহাদের তুলনার সুযোগ নাই। অনেক সময়ে লোক উহাদের পার্থক্য, উৎকর্ষ বা অপকর্ষ, মূল্যের তারতম্য প্রভৃতি বুঝিতে না পারিয়া দেশী মনে করিয়া বিদেশী জিনিস ব্যবহার করিয়া থাকে। যেমন খদ্দর। এই শ্রেণীর লোকদিগকে দেশী-বিদেশীর পার্থক্য বুঝাইবার জন্য উভয় শ্রেণীর জিনিস এক স্থানে প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থা থাকা ভাল। তাহা না হইলেও, বিদেশী জিনিসের উৎকর্ষ ও শিশু দেশীয় শিল্পের অপকর্ষের তুলনায় সমালোচনার সুবিধার জন্য উভয় বস্তু এক স্থানে প্রদর্শন করার একটা সার্থকতা আছে। বিদেশী শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা যখন আমাদিগকে করিতেই হইবে, তখন আমাদের শিল্পের উৎকর্ষ সাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং তাহা করিতে হইলে বিদেশী শিল্পের সঙ্গে তুলনার সুবিধা পাওয়া চাই। তবে কোন্‌টা দেশী, কোন্‌টা

দেশবন্ধু হল

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগ

বিদেশী তাহা বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করিয়া দেওয়া উচিত, এবং অর্থনীতির দিক হইতে দেশীয় শিল্প ব্যবহার করাই যে সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য তাহা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিবার বন্দোবস্ত থাকা আবশ্যক। অন্য দেশের প্রদর্শনীর অবস্থা ও ব্যবস্থা যেমন হইবে, আমাদের ব্যবস্থা ঠিক সেরূপ হইলে চলিবে না। দেশের লোককে বিদেশী পণ্য হইতে সতর্ক করিবার জন্য উহা আমাদের প্রদর্শনীতে রাখিতে হইবে।

আর, কুটীর শিল্পের উপযোগী যন্ত্র-তন্ত্র আমাদের দেশের প্রদর্শনীতে থাকা খুবই উচিত। এরূপ দেশী যন্ত্র তন্ত্র প্রায় পাওয়া যায় না বলিলেই হয়। সেই জন্য, এই সকল যন্ত্র-তন্ত্র বিদেশী হইলেও তাহা আমাদের দেশের প্রদর্শনীগুলিতে রাখা উচিত, এবং তাহাদের ব্যবহার, লাভ লোকসান প্রভৃতি দর্শকদের বুঝাইয়া দিবার ব্যবস্থা থাকা উচিত। এইরূপ হইলেই প্রদর্শনী সার্থক হয়, যথার্থ প্রদর্শনী নামের যোগ্য হয়, লোকশিক্ষার সহায় হয়। এই হিসাবে কংগ্রেস প্রদর্শনী খুব যে সার্থক হইয়াছে, তাহা মনে করা যায় না।

কয়েকটি বিভাগের সাধারণ দৃশ্য

কংগ্রেস যখন সমগ্র ভারতীয় ব্যাপার, তখন তৎ-সংশ্লিষ্ট প্রদর্শনীও যে তাহাই, এরূপ মনে হওয়াই স্বাভাবিক। প্রদর্শনীর অবস্থা দেখিয়া কিন্তু তাহা মনে হয় না। এই কি নিখিল ভারতীয় প্রদর্শনী? নিখিল ভারত সম্পর্ক প্রদর্শনীতে দ্রব্য বস্তুর সমাবেশ আশাপ্রদ নহে। কংগ্রেসের সংস্রবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারেও অনেক প্রদর্শনী হইয়াছে। এই কলিকাতাতেই, একবার বিডন স্কোয়ারে, একবার ভবানীপুর জলের কলের কাছে, কংগ্রেস প্রদর্শনী হইয়াছিল। বর্ত্তমান প্রদর্শনীর কর্ত্তারা যদি তাহা নাও দেখিয়া থাকেন, তথাপি, সেই সকল প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত দ্রব্যসমূহের তালিকাগুলি ত এখনও একেবারে দুষ্প্রাপ্য হয় নাই। ঐ সকল কংগ্রেস প্রদর্শনীতে যে উৎসাহ লক্ষ্য করা যাইত, পার্ক সার্কাসের প্রদর্শনীতে সেরূপ উৎসাহ উদ্যম কিছুই দেখিলাম না। সংগৃহীত বস্তুর সংখ্যা যেমন যথেষ্ট নহে, তদ্রূপ, তাহারা উন্নত শ্রেণীরও নহে। এই প্রদর্শনীকে যদি ভারতবর্ষের দেশীয় শিল্পের প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হয়, ভারতের শিল্পোন্নতি

অন্তর্মৌণ

পিছন দিকে চলিয়াছে। নিখিল ভারতীয় প্রদর্শনী ত ইহাকে বলা চলেই না, নিখিল বঙ্গীয় বলাও চলে না। বিদেশী জিনিস বাদ দিলেও, এই কলিকাতা সহরেই যে সকল দেশী শিল্প রহিয়াছে, তাহাও কেন সংগৃহীত হইল না? হইলে, প্রদর্শনীর শ্রী আরও বর্দ্ধিত হইত নিশ্চয়ই। প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষ কি তাহাদের কোন সন্ধানই রাখেন না? রাখিলে ভালই করিতেন, অধিকতর সুচারুরূপে কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিতেন, প্রদর্শনীকেও অধিকতর শ্রী-মণ্ডিত করিতে পারিতেন।

—

প্রদর্শনী কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে,—যেমন, শিক্ষা বিভাগ, খদ্দর বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ···ইত্যাদি। প্রত্যেক বিভাগেই সংগ্রহের পরিমাণ যৎসামান্য। প্রথমে স্বাস্থ্য বিভাগের কথাই বলি। এই বিভাগে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক বস্তুর সমাবেশ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা অসম্পূর্ণ। প্রতি বৎসর কলিকাতায় মাতৃ-মঙ্গল ও শিশু-মঙ্গল সপ্তাহে যে প্রদর্শনী বসে, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কংগ্রেস প্রদর্শনীর স্বাস্থ্য বিভাগ দেখিবেন, তাঁহারাই উভয়ের পার্থক্য বুঝিতে পারিবেন। স্বাস্থ্য বিভাগের আয়তনও ছোট, তাহাও ফাঁক ফাঁক—সেই স্বল্পায়তন স্থানটুকু পূরণ করিবার মত বস্তুও সংগৃহীত হয় নাই।

—

খদ্দর বিভাগের অবস্থা মন্দ নহে—বঙ্গের বাহির হইতেও কেহ কেহ খদ্দরের ষ্টল খুলিয়াছেন। কিন্তু মাত্র দিন কতক পূর্ব্বে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বাঙ্গলার যে খদ্দর-প্রদর্শনী হইয়া গেল, তাহার তুলনায় কংগ্রেসের সমগ্র ভারতীয় খদ্দর-প্রদর্শনীকে সাফল্য বিষয়ে প্রশংসা করিতে পারা যায় না। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে যাঁহারা খদ্দর প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলে কংগ্রেস প্রদর্শনীতে আসিয়াছেন কি?

—

খদ্দর প্রদর্শনীতে একটি জিনিস দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছি। সেটি শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ মহাশয়ের পায়ে-চালানো চরকা-কল। এই কলটির এখনও নামকরণ হয় নাই বলিয়া ইহাকে চরকা-কল বলিলাম। ইহার তিনটি অংশ আছে। তিন অংশে ক্রমান্বয়ে তুলার তিন রকম পাইট হয়—(১) বীজ-নিষ্কাশন, (২) তুলা পেঁজা ও পাঁজ তৈয়ার করা ও (৩) ২০টি টাকুতে সুতা কাটা ও নলীতে জড়ানো। কলটির বন্দোবস্ত এমনই সুন্দর যে, গাছ হইতে যে অবস্থায় তুলা পাওয়া যায়, সেই ভাবে তুলা আনিয়া কলে দিলে একেবারে নলীতে জড়ানো অবস্থায় সুতা পাওয়া যায়। ইহার দুই অংশ পায়ে চলে—যেমন ভাবে সাইকেল চালাইতে হয়, ঠিক সেই রকম; আর মাঝেরটি হাতে চলে। এই কল নিখুঁত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই; তবে দুই চারি দিনের মধ্যেই তাহা হইতে পারিবে। সমগ্র প্রদর্শনীর মধ্যে এই জিনিসটি সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেস যদি ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করেন, তাহা হইলে আমাদের খদ্দর প্রচার ব্রত সহজেই উদ্‌যাপিত হইতে পারিবে বলিয়া বোধ হয়। সমগ্র ভারতে অন্য কোথাও অপর কেহ এরূপ হাতে-পায়ে-চালানো কল সংগ্রহ করিয়াছেন কি না, জানি না। করিয়া থাকিলে, চেষ্টা করিয়া, যে-কোন উপায়ে হউক তাহা নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস প্রদর্শনীতে আনা উচিত ছিল। এই ধরণের জিনিস প্রদর্শনীতে যতই প্রদর্শিত হয়, প্রদর্শনীও ততই সার্থক হইতে পারে।

—

খদ্দর প্রদর্শনীর মধ্যে এক স্থলে রেশমের গুটি হইতে সুতা খুলিয়া নাটাইয়ে জড়ানো হইতেছে দেখিলাম। দুইটি ছোট মেয়েও একটি বর্ষীয়ান পুরুষ এই কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। গৃহ-শিল্প যেরূপ হওয়া উচিত, ইহা তাহাই;—পরিবারের সকল লোকই কিছু না কিছু কাজ করিয়া যে শিল্প-সৃষ্টি করে, তাহাই প্রকৃত গৃহ-শিল্প।

—

প্রদর্শনীতে একটি মহিলা বিভাগ খোলা হইয়াছে; কিছু কিছু নারী-শিল্প সংগৃহীতও হইয়াছে বটে, কিন্তু নিতান্ত অপ্রচুর। বাঙ্গলার অন্তঃপুরে সুকুমার শিল্প কিরূপ দ্রুত উন্নতির পথে প্রধাবিত হইতেছে, প্রদর্শনীর কর্ত্তারা তাহার বিশেষ কোন সন্ধান রাখেন না দেখিলাম। চেষ্টা করিলে তাঁহারা যেরূপ উৎকৃষ্ট নারী-শিল্প-নিদর্শন সংগ্রহ করিতে পারিতেন, তাহাতে তাঁহারা নিজেরাই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইতেন। এই বিভাগে সংগৃহীত শিল্পগুলির মধ্যে মাহিষ্য মহিলাদের হাতের কাজ যেমন সুন্দর, তেমনি

পরিমাণে অধিক—দেখিয়া আনন্দ হইল। আর ওয়েসলীয়ান মিশনের প্রদর্শিত শিল্প বেশ নূতনত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অন্যান্য বিভাগের ব্যবস্থা নিতান্তই মামুলী ধরণের—উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। সর্ব্বশেষে আমোদ-প্রমোদ-বিভাগ। এই বিভাগে কর্ত্তৃপক্ষ কিছুমাত্র কার্পণ্য ত করেন নাই-ই, বরং কিছু মাত্রাধিক্য ঘটাইয়াছেন। মোমের পুতুল বেশ দ্রষ্টব্য বস্তু এবং শিক্ষণীয়ও বটে। কিন্তু আমোদ-প্রমোদের তালিকাভুক্ত করিয়া ইহার মর্য্যাদা হ্রাস করা হইয়াছে।

বিশেষ দুঃখ হইল কলাভবনটিকে আমোদ-প্রমোদের তালিকাভুক্ত হইতে দেখিয়া। চিত্র-সংগ্রহ মন্দ নহে—বাঙ্গলায় অনেক শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে। রংয়ের চিত্র, তৈলচিত্র, ব্যতীত 'পেন এণ্ড ইঙ্ক' ছবি, টাইপরাইটারে টাইপ-করা ছবি, পোসিলেনের উপর তোলা অপূর্ব্ব ঠাকুরের ফটোগ্রাফ, একখানি বাঙ্গলা কাগজের এক পৃষ্ঠার হাতে লেখা হুবহু নকল—ঠিক ফটোগ্রাফের মত, একখানি পোষ্ট কার্ডে ১২১ লাইন লেখা, একখণ্ড কাগজে অষ্টাদশ অধ্যায় সমগ্র গীতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সমস্তই বৃথা হইল ইহাকে আমোদ প্রমোদ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করিয়া। এক ভুল চালে কলা-শিল্প-গৌরবের অন্তর্জলি হইল, লোক-শিক্ষার উচ্চ আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইল—এত বড় জিনিস অর্থোপার্জ্জনের উপযোগী তামাসা মাত্রে পর্য্যবসিত হইল। বাঙ্গলার বড় বড় কলাশিল্পীরা কি এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইয়াছেন?

আমাদের শেষ কথা—এবারকার কংগ্রেস যতখানি সফল হইয়াছে, কংগ্রেস একজিবিসন ঠিক ততখানি ব্যর্থ হইয়াছে। ইহাকে মেলা, ফ্যান্সি বাজার, হাট বা দোকান বলা যাইতে পারে, কিন্তু লোক-শিক্ষক শিল্প-প্রদর্শনী বলিলে ভুল করা হইবে।

নাস্তিক সদানন্দ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ

পরিচ্ছেদ—এক

সদানন্দ পাত্র, রিপণ কি বঙ্গবাসী কলেজে এম-এ প'ড়তো। সুন্দর ছিপ্-ছিপে চেহারা; পাকা সোণার মত টক্‌টকে রং; ফিট্-ফাট্ সাজ-সজ্জা; সোজা টেরি; একজোড়া নম্বর গোঁফ,—রোজ সকালে উঠে গরম জল দিয়ে সেফ্‌টি রেজারে দাড়ি চেঁচে গালটি চক্‌চকে ক'রে দিত।

আমি অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকতুম। একে তো এসেচি কোন্ এক অজ্‌-পাড়া গাঁ থেকে, না জানি কেতা-মাফিক্ ড্রেস্ করতে, না জানি ষ্টাইল ক'রে চল্‌তে! আর আমিই প'ড়ে গেলুম এই এক নম্বর বাবুর সঙ্গে এক ঘরে!

ভয়ে ভয়ে থাক্‌তুম—পাছে সদানন্দ দাদার কাছে কোন রকম অপরাধ হ'য়ে পড়ে।

প্রথম দিনের কথা মনে পড়ে!—কলেজ থেকে এলুম,—কাঠের সিঁড়িতে উঠ্‌ছি—ধুম্ ধুম্ ক'রে শব্দ করতে করতে ...পাশের ঘর থেকে একজন বল্লে কে হে? হস্তী না কি? তার উত্তরে আর একজন বল্লে, সেই বাঁকুড়ো জেলার ধাঙড়টা!

বুকের মধ্যে ছুরির মত কথাগুলো গিয়ে বিঁধ্‌ল।

সদানন্দ-দা মুখ তুলে, সস্নেহ হাসি হেসে বল্লেন, যেখেনে একসঙ্গে পাঁচজনে থাক্‌তে হবে সেখেনে পরস্পরের সুখ-সুবিধে দেখে চ'লতে হবে ভাই...এ কথাটি মনে রেখো।

বাঁকুড়ো জেলার বুকড়ি চালের আধসের ক'রে ভাত খাওয়া যার অভ্যাস,—তাকে এক পোয়া বালাম্ চালের ভাত মেপে খাওয়ালে বেলা তিন্‌টের সময় তার কি অবস্থা হয় তা শুধু বাঁকুড়ো জেলার লোকই বুঝবে; কল্‌কাত্তিয়া বাবুরা কি বুঝবে তার?

মেজাজে কি মেজাজ ছিল? তাই বিছানার ওপর চিৎ হ'য়ে শুয়ে প'ড়ে বল্লুম, আর পারিনে বাবা!—কালই পালাবো এ দেশ থেকে!

সদানন্দ দা হেসে বল্লে, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, না?

শেষ রাত্রে কি একটা বিকট শব্দ শুনে ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সলুম বিছানার ওপর। দেখি, পেতলের ষ্টোভ্ থেকে নীল আলো বেরুচ্ছে, আর তার ওপর কেৎলি চড়িয়ে সদানন্দ দা চা তৈরী করছে।

আমায় দেখে বল্লে, একটু তোমার জন্যেও করি?

নাঃ, আমি কি রুগী যে চা খাব?

আমাদের দেশে লোকে কেঁপে জ্বর এলে চা খায়। আর সে কি দুধ চিনি দেওয়া? মহিষের রক্তর মত লাল টক্‌টকে, তাতে এক খাম্‌চ নুন! বাপস্, সে খেলে প্রাণ ওষ্ঠাগত; তার ওপর কম্বল চাপা দিয়ে এক ঘণ্টা প'ড়ে থেকে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়িয়ে দেওয়া!

তাই ব'লেছিলুম, আমি কি রুগী!

আড় চোখে দেখতে লাগলুম, কি তোয়াজ!—মিছরির মত চিনি, টিনের মধ্যে ক্ষীরের মত দুধ; টোষ্ট্ রুটি!

সদানন্দ দা একচুমুক চা খায়, একটু রুটি কাম্‌ড়ায়, আর প্রকাণ্ড একখানা বইএর পাতা উল্টে একমনে পড়ে যায়!

সাধ হলো অম্‌নি ক'রেই···কিন্তু বলে ফেলেছি, নাঃ আমি কি তেম্‌নি?

বিছানার ওপর আড় হ'য়ে পড়ে মিটিমিটি দেখ্‌ছি, যেন নদীর চরের ওপর কুমীর!

এদিকে রুপোর জিভছোলা হাতে ক'রে কি অদ্ভুত এক গন্ধ-মাজন আর বুরুস্ দাঁতে ঘ'ষতে ঘষ্‌তে সদানন্দ দা নীচে নেমে গেলো। ফিরে এলো, স্নান সেরে। মাথায় মাখলে লাল গন্ধ তেল! তারপর চিরুনি বুরুস্ দিয়ে সেই চমৎকার টেরিটি কেটে বার হ'লো ল আর এম-এ ক্লাশে হাজিরি দিতে।

শুয়ে শুয়ে ভাবলুম, চার বছর পরে ঠিক অমনি ক'রে যদি আমিও বেরুতে পারি তবেই বুঝব, · কি?

বাড়ীতে থাকতে সন্ধ্যা-আহ্নিক না ক'রে জল-স্পর্শ করার উপায় ছিল না। সঙ্গে ছোট কোশা-কুশিও এনেছিলাম; কিন্তু লজ্জা করে! কে কি বলে!

স্নানের পর কাচা-কাপড় প'রে, হাতে পৈতে জড়িয়ে মেল-স্পীডে ওঁ শন্ন সেরে নিতুম্; একদিন হঠাৎ কি মনে হলো কোশা কুশি বার ক'রে লাগিয়ে দিলুম পুরো দমে ঘরের এক কোণে ব'সে।

সেদিন বৃহস্পতিবার, রাতে ছিল হাঁসের ডিমের পালা; মরীয়া হ'য়ে আপত্তি জানালুম। কি করি? বাপের জন্মে ওটা আমি খাইনি, খেতে প্রবৃত্তিও হ'লোনা।

আর যাবি কোথায়? গা-টেপা-টিপি, টিট্‌কিরি, বট্‌কিরি সুরু হ'য়ে গেল।

একদিকে চুপ্-চাপ্ ব'সে খাচ্ছিল সদানন্দ দা; সবার সব মন্তব্য শেষ হলে সে কথা কইলে; আপ্ রুচি খানা··· মানুষের অভ্যাস, রুচি, প্রবৃত্তি, সংস্কার, এ সব একদিনে চ'লে যায় না···ওকে পরিহাস করা আমাদের অন্যায়... ফকির ছেলে মানুষ, তবুও ও যে জোর দেখিয়েছে তাকে আমাদের শ্রদ্ধা করা উচিত · উপহাস করা ঠিক হয় না···

সবাই সদানন্দ দার মুখের দিকে চেয়ে রইল, সদানন্দদা আরো বল্লে—হিন্দুর হিন্দুত্ব বজায় রাখা, ব্যক্তির নিজস্বের ওপর দাঁড়াতে পারা, · ছোট কথা নয়; ভারতবর্ষের ইতিহাসে সব চেয়ে বড় শেখার কথা ওইটে, শক্, হুন্, পাঠান, মোগল, ফরাশি, ইংরেজ—একের পর এক এসেছে, কিন্তু কেউ ঘোচাতে পারেনি হিন্দুর হিন্দুত্ব!···নিজের আচার আর ধর্ম্মের ওপর দাঁড়িয়ে আছি ব'লেই ··আজও আমরা আছি! · নইলে কোন্ অতলের তলে ডুবে শেষ হ'য়ে যেতাম!—ম্যানেজার, আমি বলি, ফকিরকে ডিমের বদলে রাবড়ি দিয়ে তার নিষ্ঠার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা দেখান উচিত, · তোমরা কি বল ভাই?

রাবড়ি খেয়ে পরিতৃপ্ত মনে,—সদানন্দ দার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা মনে-মনে জানিয়ে, সে রাত্রে বিজয়ী বীরের মতই শুয়ে পড়লুম। ভাবলুম, কি হতো আমার দুর্দ্দশা যদি মেসে সদানন্দ দার মত একজন লোক না থাকতো আমার পিছনে

৪

পাশের ঘরের গঙ্গানন্দের ছিল ম্যালেরিয়া জ্বর। জ্বর যখন আস্‌তো তখন সে ভীষণ চেঁচাত; গায়ে লেপের ওপর লেপ চ'ড়িয়ে, জন চারেক চেপে ধরেও তার শীত যেত না। গঙ্গা চীৎকার ক'রে হাঁক্‌তো, চ'লে আয় বঙ্কা, চ'লে আয় বঙ্কা···

বঙ্কাকে আমরা দেখেছিলুম, সে অদ্বিতীয় কুস্তিগির;··· গড়ের মাঠে, রহিম, কুতুবসিং, গোবর্দ্ধন—সব বড় বড় নামজাদা ওস্তাদদের হারিয়ে বঙ্কাই ফার্ষ্ট-প্রাইজ নেয়। সেই বঙ্কাকে গঙ্গা ডাক দিতো; ব'ল্‌তো এই বেটা জ্বরকে একবার তুলে আছাড় না মার্‌লে সে যাবে না·· কখ্‌খনো যাবে না···

সবাই মুখ টিপে হাস্‌তো।

কার্ত্তিক ডাক্তার ঠুসে কুইনাইন দিতেন। জ্বর দিন পনেরর জন্ম আবার গা-ঢাকা দিত।

গঙ্গা সেদিন শনিবার রাতে, দুজনের মাংস উড়িয়ে রাত তিনটের সময় পাড়া মাতিয়ে বমি করতে সুরু ক'রে দিলে। তার এক এক ওয়াকের শব্দে আমাদের অন্নপ্রাশনের ভাতটি পর্য্যন্ত যেন উঠে আসে আর কি!

কার্ত্তিক ডাক্তারের কুইনাইন সেবার বৃথাই হয়ে গেল; গঙ্গার জ্বর ঠেলে ওঠে একশো ছয়, একশো সাত।

কার্ত্তিক ডাক্তার বল্লেন, প্যারা টাইফয়েড! মেসের সকলের গেল মুখ শুকিয়ে···সর্ব্বনাশ!—একা টাইফয়েডে রক্ষা নেই,—তার সঙ্গে আবার প্যারা?

কি করা যায়? গঙ্গার বাড়ী টেলিগ্রাম ক'রে লাভ নেই, ···তার বিধবা মাকে কেবল অশান্ত করাই হবে।

সদানন্দ দা বল্লে, কবিরাজ ডাকো ··

কবিরাজ বল্লেন, বাত, শ্লেষ্মা, কফ, তিনই কুপিত ·· রক্ষা নেই···

শিউলি পাতার সঙ্গে বড় বড় বড়ি খলে ঘুঁটে গঙ্গাকে যত খাওয়ান যায়, গঙ্গা তত চেঁচায়,·· চ'লে আয় বঙ্কা!

গঙ্গার চিকিৎসার টাকা কে দেয়? ম্যানেজার রাগ ক'রে শ্বশুরবাড়ী চলে গেল।

সদানন্দ দা রেগে বল্লে, কাওয়ার্ড, স্বার্থপর!···সে নিজের হাতের আঁংটি বেচে, আর হারমোনিয়ম বাঁধা দিয়ে গঙ্গার চিকিৎসার এবং সৎকারের দেনা শোধ করলে।

পরিচ্ছেদ—দুই

হ্যারিসন রোডের শিরিষ গাছের গোলাপি ফুলের ফিকে গন্ধে বিকেলের আকাশটা একটু যেন উতলা ছিল, বোধ করি দু'একটা কোকিলও ডাক্‌ছিল; দখিণে হাওয়ার কথা ব'লব না, সে কোন্ কালেই বা বাদ যায় কল্‌কাতায়?

কোন কাজ নেই তবুও চলেছি হন্-হনিয়ে; আস্তে চলাটা আউট্-অফ-ফ্যাসান্—বিশেষ ছাত্র-মহলে।

পুরোনো বইএর দোকানে এসে দাঁড়িয়ে গেলুম। সেই চণ্ডুখোর মিঞা বসে আছে; বলে, নিয়ে যান বাবু, চার চার পয়সা দাম লাগিয়ে দিয়েছি,···নিয়ে যান্...

লোভ হয়। চার পয়সায় একটা বই, উঃ কি সস্তা! তুলে দেখি, বিচিত্র বই, বড় হরফে সায়েব-মেমের নাম লেখা; আহা, হয়তো তারা কেউ বেঁচে নেই!

গঙ্গানন্দের কথা মনে হয়; কি দুঃখই তার বিধবা মায়ের···

কিন্তু অবসর নেই ভাব্‌বার, একটা লোক বড্ড ঘেঁসে দাঁড়াচ্চে—বোধ হয় পিক্ পকেট। এগিয়ে চলি।

সাম্‌নে কালো বোর্ডের উপর লেখা, সন্ধ্যায় লেক্‌চার: স্পীরিট্ অফ্ ক্রীশ্চানিটি...কম্ অল্ · সবাই এসো। এখনো দেরি আছে ছটা বাজ্‌তে।

সায়েবের পোষাকে বেঁটে বাবুটি বল্লেন, আসুন, বাইবেল্ ক্লাশে, ডাক্তার হ্যারিশের লেক্‌চার হচ্চে ··

ব্যাপারটা দেখেই আসি না একবার!

এ কি! সদানন্দ দা? সায়েবের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিয়েছে!

ডাক্তার হ্যারিশ বলেন, মানুষের উদ্ধার নেই,—যীশুর সাহায্য ছাড়া·· আস্‌তেই হবে তাকে, একদিন তাঁর পায়ে···

সদানন্দ দা বলে, সে কি কথা সায়েব? ও তোমার অন্ধ বিশ্বাস···ও কিছুতেই সত্যি নয় · হ'তে পারে না···

অবাক্ হ'য়ে শুনি।

সনানন্দ দা বাইবেলে অগাধ পণ্ডিত ; লোকটা কি সব জান্তো ?

২

স্পীরিট্ অফ্ ক্রীশ্চানিটি লেক্‌চার বোঝার মত বিদ্যে আমার ছিল না।

বক্তৃতার সবটা না বুঝলেও বক্তার মুখের কোমল অথচ প্রদীপ্ত ভাবখানি দেখে মনে হ'লো সেদিনের সন্ধ্যাটা সার্থক হয়েচে।

বক্তৃতা শেষ হ'লে বাড়ী ফেরার পথে সদানন্দ দা বল্লে—চলো এক জায়গায় একটু দেখা ক'রে এক সঙ্গেই ফিরবো।

কাছাকাছি ; সেটাও একটা মেস কি বোর্ডিং ;··· ··· সদানন্দ দা যার নাম ক'রে ডাক্ দিলে, সে বাড়ী ছিল না ; কিন্তু আর একজন এসে হাত ধ'রে তাকে টেনে নিয়ে নিজের ঘরের মধ্যে বসালে। আমি একটা চেয়ারে, এক পাশে ব'সে চুপ ক'রে শুন্‌তে লাগ্‌লুম তাদের কথাবার্ত্তা।

সব কথা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারিনি ; কেন না অনেক কথাই সাঁটে চলে, বোঝা যায় না।

মোট এই বুঝলুম যে, যাকে সদানন্দ দা খুঁজতে গেছে—সে যে নেই তা তার ভাল ক'রেই জানা ছিল। সে কি যেন একটা কয়্‌তে কোন্ দূরদেশে গিয়েছে—তাও এদের জানা ছিল—আর তার কোন খবর না পেয়ে দুজনেই যেন বিষম ভাবিত হয়ে আছে।

বাড়ী ফেরার জন্যে আমি যেন একটু ব্যস্ত হলুম,—সে ভদ্রলোকটি সদানন্দ দাকে বল্লে, একটু কিছু খেয়ে যাও—

নাঃ গিয়েই তো খাবো হে······

না, না, একটু···ব'লে সে লোকটি একটা প্লেটের উপর কয়েক টুকরো রুটি আর চেপ্‌টা মত কি একটা বার করলে।······

আমার দিকে চেয়ে ভদ্রলোকটি বল্লে, ওঁকেও কিছু দি ?

সদানন্দ দা এক গাল হেসে বল্লে, ও হাঁসের ডিম খায় না,—আর এ যে রামপাখীর······না, না, যে যা ভাল ব'লে মানে তাকে তাই করতে দিতে হবে।

সমস্ত পথটা যে কেমন ক'রে এলুম তা জানিনে,—মনে হ'লো জাত গেল, জন্ম গেল, সদানন্দ দা মুর্গী খায় ?······ তার সঙ্গে এক সঙ্গে বসেই তো খাই ! ...

সদানন্দ দা খানিক এক সঙ্গে এসে হঠাৎ বল্লে, ফকির, তোমার মনটা দ'মে গেছে, না ?

কথার উত্তর না দিয়ে চল্লুম।

মুর্গী খাওয়াটা অন্যায় তা আমি মানি······

বল্লুম, তবে খেলে কেন ?

সদানন্দ দা হেসে বল্লে, তার অর্থ তুমি জান, একটু ভেবে দেখ্‌লেই বুঝতে পারবে......

আমি না-ভেবেই বল্লুম, লোভে প'ড়ে ?

কতকটা তাই বটে।·· ওটা খেতে আমার কোন আপত্তি নেই···ও সম্বন্ধে আমি সংস্কার-মুক্ত···

কিন্তু সদানন্দ দা ··

কিন্তু-মিন্তু নেই...কোন হিন্দুর ছেলেই ওকে সমর্থন করতে পারবে না ; তবে সংস্কার যার চ'লে গেল তার কাছে···ঠিক ওই মদ খাওয়ার মতই, বুজেছ কি না ?···

চুপ ক'রে রইলুম।

শাস্ত্রে মদ খেতেও খুব মানা...তবুও মদ খেলে তো জাত যায় না···কেন না, মদের বিষয়ে দেশের লোক সংস্কার-মুক্ত...তা ব'লে মদ খাওয়াকে পাঁড়-মাতালও সাপোর্ট করবে না।

রাত্রে একটুও চোখ বুজ্‌তে পারলুম না। সেইদিন প্রথম সদানন্দ দার সম্বন্ধে আমি কঠিন মনে অনেক কথাই আলোচনা ক'রেছিলুম। কিন্তু সে মনে-মনেই রয়ে গেল ! প্রকাশ করার ইচ্ছাও হ'লো না, সাহসও হ'লো না।

যাকে এত বড় শ্রদ্ধার আসন দিয়েছি তাকে ছোট ক'রে, খাটো ক'রে ভাব্‌তে যে মনে কত ব্যথা—মন যে কি রকম ক্ষত বিক্ষত হয়, তা' কে না জানে ?

৩

সেদিন কলেজ বন্ধ ছিল। মনে হ'লো কারুকে কিছু না ব'লে কালী দর্শন ক'রে আসিগে।

মেসের বাসায় থেকে যে সব অনিচ্ছাকৃত অনাচারে ধর্ম্মগ্লানি হচ্ছিল তার অপরাধ স্খালন ছিল বোধ করি, মনের নিগূঢ় উদ্দেশ্য ; যেটা আমার কাছেও খুব পরিস্ফুট নয়।

মনের অন্তরের মানুষটি বোধ হয় এমনি ক'রেই একটা শুদ্ধির ব্যবস্থা করে।

বাসার বামুণকে শুধু ব'লে গেলাম, সে-বেলা কিছু খাব না। বামুণ ঠাকুর, নিশ্চয় একটু বিস্মিত হয়েছিল। ঝি মুখ ফুটে বল্লে, সে কি দাদাবাবু, না খেয়ে দিন কাটাবে ?

এরা দুজনেই জান্‌তো আমি কল্‌কাতায় এসেছি এই সবে, একেবারে পাড়াগেঁয়ে; তাই তারাও একটু-আধটু ঠাট্টা-তামাসা ক'রলেও, স্নেহও করতো অনেকখানি। বিশেষ ক'রে আমার হিন্দুত্ব রক্ষার চেষ্টার দিকে তাদের সহানুভূতিটা আমি বেশ বুঝতে পারতুম্।

বাসা থেকে বেরিয়ে পড়লুম। পথে নিজের মনে হেঁটে চ'লেছি;—মনে-মনে ভাবচি, একেবারে অচেনা জায়গা, শুনেছি কালীঘাট গাঁট-কাটা জোচ্চোরে ভরা; পকেট না কাটে!

আপিস বন্ধ ব'লে ট্রাম তাড়াতাড়ি আস্‌চে না, মোড়ে ট্রামের অপেক্ষা করছি—কে কথা ক'য়ে উঠ্‌লো, কালীঘাট যাবে বুঝি ? ফিরে দেখি, ঝি।

হুঁ।

আমায় বলনি কেন দাদাবাবু ? আমি তোমায় নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আন্‌তুম, নতুন মানুষ তুমি, টাকাকড়ি সাম্‌লে নেও।

রাগ হ'লো; বল্লুম, কচি খোকা তো আর নই, তোমার অত ভাব্‌না কিসের ?

নাঃ তাই ব'লচি; একদিন আমারও যাবার ইচ্ছে ছিল, মাসীকে অনেকদিন দেখিনি······

রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঝির সঙ্গে আলাপ করতে লজ্জা হ'লো, তাই তাড়াতাড়ি একখানা ট্রামে উঠতে যাচ্চি,···ঝি বল্লে, ওটা না, ওটা যে হাইকোর্ট যাবে, এর পরের খানা যাবে কালীঘাটের দিকে...

হোক্ গে হাইকোর্ট—বলে ট্রামখানাতে চ'ড়ে বসলাম... মনে মনে বল্লাম, আগে তোর হাত হাত থেকে তো বাঁচি···

কালীঘাট, কালীঘাট! নেমে যাও...কালীঘাট!··· কালীঘাট! . শুনে তড়াক্ ক'রে নেবে প'ড়লুম। আরো দুচার জন নাম্‌লো। তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছি···মনে মনে ভাব্‌চি, না হয় আবার ফিরে যাবো···

কিছুদূর এগিয়ে যেতে একজন ব'ল্লে, কোথায় যাচ্চো বাবু ? চল মা কালী দর্শন করিয়ে দেবো...ভাবলুম, এ-একটা গাঁট কাটা···কথার উত্তর না দিয়ে এগিয়ে চলি।

পথের দুধারে ভিক্ষুকের দল কায়েমি বন্দোবস্ত ক'রে ব'সে ডাক্ ছাড়চে···ওগো একটি পয়সা বাবু, এই কানাকে দেখ্‌লুম, কানা চক্ষুষ্মান!

দূর থেকে মন্দিরের চূড়া দেখা যায়। মনটা নেচে উঠলো···আ' কি ?

আরো কাছে যেতে একজন ঝাঁ ক'রে আমার গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে কপালে সিন্দুরের টেরা দিয়ে বল্লে, এই দিকে এসো···

চোখ তুলে দেখি, আমাদের বিশু দা!

বিশুদা, তুমি ?

ফোকরে, তুই ?

অপূর্ব্ব মিলন! কালীঘাটের মুস্কিল এক নিমেষে আসান!

বিশু দাদা গ্রাম সুবাদে দাদা। গ্রামে তাকে আমরা ভয় ক'রে চলি, কেন না তার মত গোঁয়ার-গোবিন্দ পাড়ায় আর দুটি ছিল না। পড়া-শুনোয় তা'র একটুও মন ছিল না। গুণ্ডামিতে সে সিদ্ধিলাভ করেছিল; কিন্তু সভ্যতার যুগে সে বিদ্যার কোন প্রতিষ্ঠা নেই; বোধ করি কারুর মাথা ফাটিয়ে সে মা কালীর অঞ্চলের তলায় আশ্রয় নিয়েছিল। পুলিশের সঙ্গে বিশুদার আদায়-কাঁচকলায়।

বিশুদা বল্লে, চল্ আদি-গঙ্গায় স্নান ক'রে আস্‌বি। ঐ ময়লার নালাতে দেহ না ডোবালে মা-কালী প্রসন্ন হন্ না।

স্নান ক'রে পুজো সেরে বিশুদার বাসায় গেলুম। বৌদির শীর্ণ চেহারা—তার চেয়ে রোগা ছেলে মেয়ে গুলো; দেখেই বুঝতে পারা যায় যে বিশুদা নিজের উপার্জ্জনের বারো আনা নিজে খেয়ে অবশিষ্টতে ওদের ভরণ-পোষণ করে।

বৌদির অংশটা খেয়ে মনে সুখ পেলুম না। তাই ফাঁক বুঝে কিছু কলা-মূলো-নারকেল আর সন্দেশ কিনে দিয়ে বিশুদার কাছ থেকে বিদায় নিলুম।

বিশুদা বল্লে, চল্ তোকে ট্রামে তুলে দিয়ে আসি···

বল্লুম, না, তুমি আর আমার পিচনে সময় নষ্ট ক'রে না, আমি একটু ঘুরে ফিরে দেখ্‌বো চারিদিক।

বিশুদা লোকের ভিড়ের মধ্যে কোথায় চ'লে গেল।

ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পৌঁছলুম কালী-মন্দিরের পাশে, যেখেনে পাঁঠা বলি হয়।

সদ্য-কাটা পশুর রক্ত কাক্ ঠুক্‌রে খাচ্চে! দেখে গা শিউরে উঠে! একটা বিশ্রী গন্ধে সেখানে যেন থাকা যায় না। ফিরতে গিয়ে দেখি, দূরে, সিঁড়ির ধাপে ব'সে সদানন্দ দা; সে আমাকে তখনো দেখ্‌তে পায় নি।

তার দুচোখ যেন জলে ভরে টল্ টল্ করছে। এই মূক পশুদের উপর এতবড় অবিচারের মৌন প্রতিবাদ যেন দু চোখ ভরে উপ্‌চে যেতে চায়।

আস্তে আস্তে গিয়ে তার কাছে দাঁড়ালুম, কথা কইতে ইচ্ছা হয় না।

আমাকে দেখে সদানন্দ দা একটুও বিস্মিত হ'লো না; বল্লে, তুমি এসেছো সে খবর ঝি আমাকে দেয়; ভাবলুম, ঘুরে আসি·· ও লোকটি বুঝি তোমাদের দেশের কেউ?

বিশুদা? হুঁ।

ওর বাড়ীতেই খেলে বুঝি?

বুঝলুম, পাছে বিপদে পড়ি তাই সঙ্গে সঙ্গে এসেছে সদানন্দ দা। মনে কেমন একটা আরাম বোধ ক'রলুম!

নকুলেশ্বরতলায় গিয়েছিলে?

সে কোন্ দিকে?

চল, সেখেনে আমার একটু কাজ আছে।

পথে জিজ্ঞেস কল্লুম, সদানন্দ দা, রক্ত দেখে তোমার মন-কেমন করছিল, না?

ভাল লাগে না—ব'লে সদানন্দ দা পথ চ'লতে লাগলো।

নকুলেশ্বর শিবের মন্দিরের একদিকে এক সাধু ব'সে আছেন, চুপ্‌টি করে। মৌনী বাবা!

ব'সে ব'সে বিল্বপত্র চিবোচ্চেন। খালি গায়ে ছাই মাখা; মাথায় জটা। একপাশে একটি তানপুরো। বোধ হয় গান করেন।

সদানন্দ দা তাঁর পায়ের কাছে প্রণাম ক'রতে—তিনি সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

তারপর প্রায় আধ ঘণ্টা দুজনে দুজনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

আমার দিকে বাবা একবার ফিরেও চাইলেন না।

মৌনীবাবার এক পাশে এক রাশ বেল। সেগুলি মেয়েরা রেখে যাচ্চেন। তাঁদের বলাবলিতে বুঝতে পারলুম যে, বাবা যদি কখনো ক্ষুধার্ত্ত হন তো বেলই খান; নইলে ঐ বেলপাতাই তাঁর আহার। তিন বছর আর কিছুই খান্‌নি।

ভক্তিতে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল! তপ্ত কাঞ্চনের মত দেহ, মুখে উজ্জ্বল আভা, যেন স্বর্গের আলো প'ড়েছে!

ফেরার পথে সদানন্দ-দা বল্লে, উনি আমার বড় দাদা।

আর কিছু বল্‌তে হ'লো না। ঠিক্ এক চাউনি, দেহের গঠন এক—মাথার চুল এক!

হঠাৎ মনে হ'য়ে গেল সদানন্দ-দার মুর্গীর ডিম খাওয়ার কথা! মনে কিন্তু আর অভক্তি এলো না; বুঝলাম যে, সংস্কার-মুক্ত মন ওঁদের, ইচ্ছা করলে বছরের পর বছর অন্ন-ত্যাগ ক'রেও থাকতে পারেন; আবার হাতে তুলে খেতে দিলে মুর্গীর ডিমও প্রসন্ন চিত্তে খেয়ে ফেলেন।

গঙ্গা যেমন বন্ধুর উপত্যকা দিয়েও বইছেন—আবার সমতলের উপর তাঁর সচ্ছন্দ মন্দ গতি!

এঁরা বাইবেল পড়েন, বেদের অনুজ্ঞা মানেন, আবার পশুরক্ত দেখ্‌লে দুই চক্ষে ধারা বয়!

মুর্গীর ডিমের বিষ-তিক্ততা পান্‌সে হ'য়ে গেল। বিবেক বল্লে, লোভে প'ড়ে সদানন্দ-দা কিছুই করে না!

৫

ফিট্ ফাট্ সেজে সদানন্দ-দা বল্লে, কৈ যাবে না?

ঠিক তো! কলেজের অধ্যক্ষের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ মনে প'ড়ে গেল; বল্লুম, নিশ্চয় যাবো, ভাগ্যিস্ মনে করে দিলে তুমি!

একটু ভাল ক'রে সাজো—পোষাক ভাল হ'লে এগিয়ে জায়গা পাবে, নইলে বাইরে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হবে, ভয়ানক ভিড় হয় কিনা! সদানন্দ-দার মুখে চাপা হাসি।

বড্ড ভিড় হয়, না?

বড্ডো!

সবাই শুনতে চায়, না কি খুব ভাল বক্তৃতা হয় ওখেনে, শুনেছি। দেরি করা তাহ'লে ঠিক হয়নি, না?

কব্জির ঘড়িটা দেখে সদানন্দ-দা বল্লে, এখনো এক ঘণ্টা দেরি,…ঢের সময় আছে…তবে তুমি আর দেরি ক'রোনা ফকিরচন্দ্র…এই নাও, রুমালে একটু গন্ধ মেখে নাও…

এই বুঝি কুন্তলীন ?

দূর—সে যে তেল, এ হোয়াইট রোজ্…

কত দাম ?

অবজ্ঞাভরে সদানন্দ-দা ব'ল্লে, কিন্‌বে না কি ? আড়াই টাকা।

বাবারে—ওই একরত্তি শিশের দাম—আড়াই টাকা ? এক মাসের জলখাবার হয়ে যায় যে !

আর কেউ হ'লে ব'ল্‌তো, চাষাটা ; কিন্তু সদানন্দ-দা একটু সস্নেহ হাস্‌লে।

পথে যেতে জিজ্ঞেস করলুম, এত ভিড় কেন হয় ?

সদানন্দ-দা একটু হেসে বল্লে, চলেইছ তো, নিজে দেখে বোঝার চেষ্টা ক'রো ; যদি না ঠিক করতে পারো আবার জিজ্ঞেস ক'রো…

একটু রাগও হ'লো, তাও হলো।

ভিড় ব'লে ভিড় ! ওদিকের ফুট্‌পাত ঠেলে ট্রামের রাস্তা বন্ধ। পিছনে বেটন হাতে পুলিশ্ !

দেখেই আমাদের চক্ষু

তেমনি ক'রেই ছ'টা বাজ্‌লো। ভিতরে গান সুরু হ'লো ;

অন্ধ জনে দেহ আলো,

মৃত জনে দেহ প্রাণ !

চুপ্ ক'রে দাঁড়িয়ে শুন্‌তে লাগ্‌লুম আমরা।

ঘন লতার পাতার মধ্যে দিয়ে যেমন পূর্ণিমার চাঁদের আলো আসে, লোকের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে, গানের কথাগুলি অপূর্ব্ব সুরের স্পন্দনের উঠা-নামায় ঢেউএর মতই এসে পৌঁছতে লাগ্‌লো ! সমস্ত রাজপথ নিমেষে স্তব্ধ স্তম্ভিত হ'য়ে রইল !

গান থাম্‌তেই ভিতর থেকে লোক হুড়্ হুড়্ ক'রে বেরিয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো ! মিনিট পাঁচের মধ্যে ভিতরে যাওয়া সম্ভব হ'লো।

কিন্তু সদানন্দ-দা বল্লে, আমি আর যাবো না, ফকির, তুমি যাও।

আবার গান। এবারে দুজনেই যেন কিসের টানে গিয়ে ভিতরে ব'সলাম।

তারপরে কিন্তু কঠিন পরীক্ষা সুরু হ'লো।

একজন বুড়ো মানুষ ভাঙ্গা গলায় ভীষণ চীৎকার ক'রে যারা গান শুনেই পালিয়েছে তাদের বকতে লাগ্‌লেন।

সেই বকুনি শুনে আমরাও চম্পট দিলুম।

বেরিয়ে এসে বল্লুম, এখন বুঝেছি কিসের জন্য এই ভিড়, সদানন্দ-দা…

বেশ, ব'লে সদানন্দ-দা হন্ হন্ ক'রে হাঁটতে লাগ্‌লো—আমার কথা শোনার কোন আগ্রহই আর তার নেই। আমি প্রায় ছুট্‌তে ছুট্‌তে তার সঙ্গে চল্লুম।

খানিকটা এগিয়ে সে আমার দিকে ফিরে বল্লে, বাড়ী যাবে না কি ফকির ?

যা তোমার ইচ্ছে।

তবে চল এক জায়গায় নিয়ে যাই তোমাকে, নিরিবিলিতে কয়েকটা গান শোনা যাবে ; কি বল ?

বেশ তো, সে খুব ভাল হবে।

সদানন্দ-দা একটা গলির মধ্যে ঢুকে গেল।

৬

একটি সুন্দরী মেয়ে আমাদের খান-কয়েক গান শোনালে। মেয়েটির বয়স কত, আন্দাজ করতে পারিনি, তবে মনে হলো সব দিক দিয়ে সে আমার চেয়ে বড়। সদানন্দ-দার সঙ্গে সুন্দর ইংরিজিতে কথা কইলে, শুন্‌লুম ফ্রেঞ্চ জানে, আন্দাজ হ'লো, সদানন্দ-দার সঙ্গে এম-এ দেবে।

কোন্ দিক কখন যেন আমি এই মেয়েটিকে ভালবেসে ফেলেছিলুম। কিন্তু সে আত্মসাৎ করার ভালবাসা নয় যেমন চাঁদকে মানুষের ভাল লাগে ; যেমন গান শুনে মানুষের ভাল লাগে ; এ কতকটা তেম্‌নি ; আবার তা চাইতে বেশীও ; সমস্ত রাত্রি, তারপর ক'দিন, আমার সমস্ত মন জুড়ে রইল, ওরই কথা। মনে হয় সদানন্দ-দার সঙ্গে ওর কথা দুটো কই ; কিন্তু লজ্জা করে।

সেদিন সদানন্দ-দার এক বন্ধু এসেছিল ; দুজনে মেয়েটির কথাই ব'লছিল। আমি কাণ খাড়া করে শুন্‌তে লাগলুম।

সদানন্দ-দা ব'ল্লে, অতটা মুগ্ধ—বিচলিত হ'য়ে যাবার মত কিচ্ছু নেই ওর মধ্যে ··আসল কথা আমরা মেয়েদের সম্বন্ধে যে সংস্কার ক'রে রেখেছি—সেটাকেও ছাড়িয়ে গেছে ব'লেই আমাদের মনকে অতখানি স্পর্শ করে···

বন্ধুটি হাস্‌লে, বল্লে, বড়কে বড় বলায় আপত্তি কি তোমার ?

স। বড়টা কোথায় দেখিয়ে দাও ?

ব। আমাদের দেশে কটা মেয়ে বি-এ'তে দু'-তিনটে অনার নিয়ে পাশ ক'রেছে ?

স। কটা মেয়ের সে সুযোগ ঘটেচে ? ওর বাপ্ ব্যারিষ্টার ; মেয়েদের শিক্ষার মর্য্যাদা তিনি বোঝেন ; টাকা খরচ করতে পারেন, ··তাই সব দিক দিয়ে ওকে অমন সুন্দর ক'রে তুলেছেন···

ব। কিন্তু সব মেয়ে কি অমন হ'তে পারতো ?

স। সব ছেলে কি ব্রজেন্দ্র শীল হ'তে পারে ?

বন্ধুটি বল্লে, ভুল হয়েছিল তোমার সঙ্গে তর্ক করতে যাওয়া ; তুমি জন্মান্তর মান না ; ঐশ শক্তি মান না···একজন ঘোর নাস্তিকের সঙ্গে বাক্যালাপ করা উচিত নয়।

সদানন্দ-দা হাস্‌তে লাগ্‌লো···বেশ, বল না যে, পারলুম না ; আমার কুলুচি গাইবার দরকার ? নাস্তিক ব'লে আমাকে গাল দিচ্চো ; কিন্তু আমার চাইতে বড় নাস্তিক তোমরাই তো···

ব। কি রকম ?

স। আমি কি বলি ? বলি, মানুষের এই ছোট সংকীর্ণ বুদ্ধিতে যদি কোন ঐশ শক্তি ব'লে কিছু থাকে তো তাকে জানার উপায় নেই। বলি, ঈশ্বর আছেন কি নেই, তা জানিনে···জানি বলার ধৃষ্টতা আমার নেই—বস্ এই পর্য্যন্ত।

ব। নেই তো এই বিশ্ব-সংসার হ'লো কোত্থেকে ?

স। তিনিই বা হোলেন কোত্থেকে ?

ব। তিনি স্বয়ম্ভু ·

স। তবে জগতের স্বয়ম্ভু হ'তেই বা ক্ষতি কি ?······ বল না বাবা, সাফ্ কথা যে জানিনে···জানিনে···জানিনে···

ব। অমন বল্লে, মনকে তামসিকতায় আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে···

স। আর কিচ্ছু না-জেনে বল্লেই মন প্রদীপ্ত সাত্তিকতায় পূর্ণ হয়ে উঠে ! ধন্য লজিক তোমাদের।

ব'লে সদানন্দ-দা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে, চল, চল, তার চেয়ে চিড়িয়াখানা দেখে আসি তো সত্যিকার কাজ হবে।

৭

সদানন্দ-দার ওপর সমস্ত ভক্তি আমার চ'লে গেল।

উঃ, শয়তানের দোসর সে যে ঈশ্বর মানে না। তার সঙ্গে এক ঘরে বাস করছি ! গেল আমার ইহকাল-পরকাল। নাস্তিক, তার চাইতে হীন কে আছে, এই পৃথিবীতে !

অনেক ভেবে-চিন্তে স্থির ক'রলুম, যে কটা দিন আছি এই মেসে, ওর সঙ্গে কথা না ক'য়েই কাটাব।

ঘরে যতক্ষণ থাকি নিজের পড়াশুনো নিয়ে ; তা না হলে পথে পথে ঘুরে বেড়াই।

মনের মধ্যে তুমুল সন্দেহ জেগে উঠ্‌তে লাগলো, ঈশ্বর আছে কি নেই।

সন্ধ্যাবেলায় পুরোনো বইএর দোকানে গিয়ে চোখ বুজে একখানা বই তুলে নিয়ে মনে করলুম, যদি শেষ পাতা জোড় হয় তো ঈশ্বর আছেন, যদি বেজোড় হয় তো সদানন্দের কথাই ঠিক।

চোখ চেয়ে দেখি ৩৯৭। হাত কেঁপে বইটা পড়ে গেল।

কাণে-হাওয়া-ঢোকা ঘোড়ার মত ছুট্‌লুম গোলদীঘিতে ·· চারিদিকে পাক্ দিচ্চি·· মন কিছুতেই শান্ত হয় না···

মনে হলো আকাশে যদি বেজোড় তারা দেখ্‌তে পাই তো ঈশ্বর আছেন, যদি জোড় দেখি তো বুঝব, তিনি নেই···

এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, কৈ— আর তো দেখ্‌তে পাইনে · ওই, ওই না একটা ? হাঁ, বটে ওই তো !—নাঃ, ওই যে আর একটা ! দশটা !

মনের মধ্যে অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে ! কোথায় যাই, কি করি ! হে ভগবান এ কি করলে আমার ? পৃথিবীটা মরুভূমি ব'লে মনে হ'লো।

পরিচ্ছেদ—তিন

১

পরের বছর সেই বাড়ীটাতেই মেস হ'লো। আমি সেই ঘর দখল করলুম ; কেবল বাদ হ'লো সদানন্দ পাত্র।

খোঁজ ক'রে যে-খবর পাওয়া গেল তাতে পরিষ্কার

বুঝলাম যে, দুই আর দুই-এ চার হয়; পাঁচও হয় না, তিনও হয় না।

নাস্তিক, ও-ছাড়া আর গতি কি?

পুরোনো বামুণ ঠাকুর এসে জুটলো; সে বল্লে ঝিকে পাওয়া যাবে না। সে সদানন্দর চায়ের দোকানে থাকে।

চায়ের দোকান? বাঃ বাঃ, এম-এ দিচ্ছিলো না? বেড়ে ডিগ্‌বাজি কিন্তু...

মেসের সবাই মিলে হো হো ক'রে এক চোট হেসে নিলুম।

বাড়ীর সঙ্গে নিশ্চয় ঝগড়া হয়েছে। ও কীর্ত্তি করলে বাড়ী তো বাড়ী, দুনিয়ার সঙ্গেই যে বিরোধ বাধে; বাবা, ওপরে একজন মালিক আছেই—তুমি নেই বল্লেই সে উবে, লোপ পেয়ে যাবে? বোঝ ঠেলা এখন!

আর লুকোচুরি নেই; এখন টিকিটা বড় করে বাঁধি, সকালে উঠে রীতিমত গঙ্গা-জলে কোশাকুশির ঠংঠঙানিতে মেসের আর সবাইকে ত্রস্ত ক'রে তুলি। বামুনের ছেলে, ধর্ম্ম-কর্ম্মে লজ্জা কিসের?

মনে এমন একটা ভাব দাঁড়ালো যে সদানন্দই গেল বছরে দুহাত দিয়ে সবেতেই বাধা দিতো। গেছে আপদ গেছে, লেঠা চুকে গেছে।

কিন্তু এক-একদিন রাতে স্বপ্নে গঙ্গার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে সে ভারি তর্ক করে; বলে, সব ভুল, তোমাদের সব ভুল; টিকি কেটে চেষ্টা কর সদানন্দর মত হ'তে।

বাক্‌যুদ্ধ করতে করতে ঘেমে উঠি। ঘুম ভেঙ্গে ভয়ে গা ছম্ ছম্ করতে থাকে। তাই তো সদানন্দ কি তবে মুক্তি পায় নি? গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে আস্‌তে হবে না কি?

বামুন ঠাকুর নীচের ঘরে শুতে চায় না। বলে, সমস্ত রাত কে যেন তার মাথার শিয়রে পায়চারি ক'রে বেড়ায়।

সত্যি বামুণ ঠাকুর?

নিজের চোখে দেখে কেমন ক'রে অবিশ্বাস করি দাদাবাবু? একদিন আপনি শুন্ না...

মুখে বলি দুৎ; কিন্তু ভয়ে বুকের মধ্যে কাঁপ্‌তে থাকে।

একদিন বামুণ ঠাকুর শেষরাত্রে এসে দরজা ঠেল্‌চে। কি? কি? সে বলে, বাবু আমার হিসেব চুকিয়ে দাও, বাড়ী যাবো; এ বাসায় থাক্‌লে আমি বাঁচব না।

তাই তো, বাড়ী বদল কেমন ক'রে হয়; এক বছরের লিস্ দেওয়াতে অনেক কম টাকাতে যে ভাড়া পাওয়া গেছে।

মেসের আর সবাই হাসে, বলে ও-বেটা গাঁজাখোর, ওর কথা শোন কেন ফকির বাবু?

আমার গায়ে কাঁটা দেয়। আমি তো আর গাঁজা খাইনে? কাল রাতেও যে গঙ্গা এসে তর্ক ক'রে গেছে।

সদানন্দর চায়ের দোকান হ্যারিসন্ রোডের একটা গলির মোড়ে। অনেক দিন একটু তফাৎ রেখেই তার সাম্‌নে দিয়ে গিয়েছি বটে; ঢুক্‌তে ইচ্ছা কি সাহস হয়নি।

আজ মরীয়া হ'য়ে ঢুকে প'ড়লুম।

শান্ত হাসি; এসো ফকির, আজকাল চা খাচ্চ না কি?

নাঃ, বলে কেমন নর্ভাস হয়ে রইলুম; কি কথা বলি? কেন যে এলুম তাই নিজে জানিনে।

একটা ছোট লোহার চেয়ারে ব'সে দৈনিক কাগজ তুলে নিয়ে প'ড়তে লেগে গেলুম।

শরীর ভাল আছে, ফকির?

হুঁ; সেই আড়ষ্ট ভাব। তাই তো, এমন জান্‌লে যে আস্‌তুম না। কি কথা কই হঠাৎ গঙ্গার কথা মনে হ'লো।

বল্লুম, আচ্ছা সদানন্দ-দা, তুমি ঈশ্বর মানো না, ভূত মানো?

মানি বই কি, খুব মানি। কেন বল ত?

আমাদের মেসে যেন...

সদানন্দ বল্লে, বুঝেছি, আস্তে আস্তে কথা বল...

অর্থ না বুঝে অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইলুম তার মুখের দিকে; সদানন্দ চুপি চুপি বল্লে, গঙ্গার কথা তো?

মাথা নেড়ে বল্লুম, হুঁ...

স। কিছু আশ্চর্য্য নয়, তার আত্মা এখন বড় কষ্টে আছে...

তুমি জান?

কারণটা জানি কি না, তাই অনুমান করছি...ওটা হওয়া খুব স্বাভাবিক...

কি কারণ সদানন্দ দা?

ভারি গোপনীয় কথা, তুমি ছেলে মানুষ হজম করতে পারবে না ..

খানিকটা শুম্ভিত হ'য়ে বসে রইলুম।

কিন্তু...জান্‌তে বড় ইচ্ছে হয়...

সদানন্দ হাস্‌লে; বল্লে, কিন্তু ফকির, তোমার না জানাই ভাল; আমি তোমায় কিছু বল্‌তে চাইনে…

কি করি চুপ ক'রে ব'সে রইলাম। মনে ভয়টা দশগুণ বেড়ে গেল; মনে হ'লো রাত্রে কিছুতেই আজ আর আমার মেসের ঘরে শুতে পারবো না।

অনেকক্ষণ পরে বল্লুম, সদানন্দ-দা, আমাকে না বল্লে আমার আর রক্ষা নেই…আমি রাত্রে মেসের ঘরে থাকৃতে পারবো না…

দূর পাগল আর কি?…একটা স্পিরিট,…তোমার সে করবে কি?

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল; বল্লুম, সদানন্দ-দা, তুমি চল, নইলে আমি সে বাড়ীতে ঢুকৃতে পারবো না। ঠাকুরটা বোধ হয় এতক্ষণে পালিয়েছে…

সদানন্দ-দা উঠে গিয়ে ডাক্‌লে, মা, ও মা!

কি বাবা?

আজ রাতে হয় ত আমি আস্‌তে পারবো না…

আচ্ছা বাবা, তোমার খাবার যে তৈরি।

তবে দাও, দুটো ঠাঁই দিও, আমার এক বন্ধু আছে।

মাথা নেড়ে বল্লুম, খাবো না, খাবো না…

সদানন্দ দা হেসে বল্লে, ও, ভুলে গিয়েছিলুম; তোমার আবার বিদ্‌কুটে জাত-বিচার আছে না?

লজ্জায় যেন মরে গেলুম।

২

ঠাকুরটা পালায়নি; কিন্তু সে ঠিক ক'রে এসেছে যে রাত্রে ভুতো-বাড়ীতে থাকৃবে না।

সদানন্দ দা ঠাকুরকে সোজা জিজ্ঞেস করলে, স্বপ্নে দেখেছ, না জেগে?

জেগে, বাবু।

আমার দিকে ফিরে বল্লে, তুমি?

স্বপ্নে!

সদানন্দ-দা একটু হেসে বল্লে, এক কাজ কর না, ঠাকুর এসে এই ঘরে তোমার সঙ্গে থাকুক…

না, সদানন্দ-দা…তুমি থাক…

ক'দিন থাকৃবো? ও ছাড়া বাসায় ওঁরা দুজন স্ত্রীলোক…

উনি কি তোমার মা?

গম্ভীর কণ্ঠে সদানন্দ দা বল্লে, না, উনি গঙ্গার মা…

ভয়ে আমার জিভ্‌টা তালুতে এঁটে গেল। আর যেন কথা কইতে পারিনে। হাত পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো; প'ড়ে যাই আর কি!

সদানন্দ দা এক ধমক দিয়ে বল্লে, ছেলে-মানুষি ক'রো না বল্‌ছি ফকির · এ-সব ব্যাপারে অমন করতে নেই, বড় মুস্কিল হ'য়ে প'ড়বে…

আমি এক লাফে গিয়ে সদানন্দ-দার হাতখানা চেপে ধ'রে বল্লুম, দাদা, তোমার পায়ে পড়ি!

ছিঃ, তুমি যে বামুণ ফকির?…অমন উতলা হতে নেই… গায়ত্রী জপ কর…

গায়ত্রী যে ভুলে গেছি!

এক বর্ণও গায়ত্রীর কথা মনে আসে না!

হঠাৎ আমার মনে হ'লো যে এই বাসাতে থাক্‌লে আমি নিশ্চয়ই মারা যাবো; তাই জোড় হাত ক'রে বল্লুম, সদানন্দ-দা, আমাকে নিয়ে চল তোমার বাসাতে।

আচ্ছা, তবে তাই চল, ফকির।

৩

সদানন্দ-দার বাড়ীতে গিয়ে সেই রাত্রে আমার ভীষণ জ্বর হ'লো। সকালে কিছুই জ্ঞান রইল না।

এই অজ্ঞান অবস্থায় আমার মনের মধ্যে কিন্তু মহামারি ব্যাপার চল্‌তে লাগ্‌লো। দিন নেই, রাত নেই, অনবরত দেখ্‌ছি গঙ্গানন্দ আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বল্‌ছে, চল্ ফ'কৃরে বাড়ী চল্…

পরিত্রাহি চীৎকার কর্‌ছি, ওরে ছেড়ে দে রে গঙ্গানন্দ, ছেড়ে দে আমায়…সদানন্দ-দা, আমি গায়ত্রী ভুলে গেছি— ডাকো পুরোহিত ঠাকুরকে—তিনি…· ওঁ…ওঁ ওঁ · মনে হয় না রে…

এমনি ক'রে সাতদিন পরে আমার জ্বর ছাড়্‌লো। বাড়ী থেকে মামা এসেছেন।

একটু সারতেই বাড়ী পালিয়ে বাঁচি।

কিন্তু গঙ্গানন্দের মা আর বোনের সেবা আমার চিরদিন মনে থাকৃবে।

সদানন্দ-দা এই অসহায় পরিবারটার জন্যে কি না ক'রেছে!—চার দোকান তাদের জন্যে; এম-এ না দিয়ে

তিন্‌টে ছেলে পড়ান—তাও তাদের জন্তে ! আর আমরা ?··· সে কথা মনে করতে পাপ হয়। উঃ মানুষ কি পাজি !

পরিচ্ছেদ—চার

১

কল্‌কাতায় ফিরে সদানন্দ-দার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়াই হ'লো প্রথম কাজ। তার ঋণ প্রতিশোধ করা যায় না। আমার জীবনদাতাকে চ'খে দেখা; শুধু একবার মনের ক্ষুধা মেটানো।

চায়ের দোকানের পাত্তা নেই !

প্রকাণ্ড একজোড়া গোঁফ আর বড় বড় দুটো জল্‌জ্বলে চোখ মুচি ব'সে একমনে জুতো তৈরি করছে। কথার উত্তর ভাল করে দেয় না; শুধু আমার পায়ের জুতো দেখ্‌তেই সে ব্যস্ত।

সেই বাবু কাঁহা গিয়া ?

কোই বাবু নেহি হ্যায়।

বুকের অনেকখানি খালি নিয়ে বাসায় ফিরে এলুম। কিন্তু নিরাশ হলুম না; এত বড় সহরে ঘুরতে ঘুরতে একদিন দেখা হবেই হবে। কতদিন লুকিয়ে থাকবে তুমি, হে আমার মনের সত্যিকার দেবতা ?

এবারে ঢুকেছিলুম ক্যাম্বেল ইস্কুলে; বৈঠকখানা বাজারের পার্শ্বেই বাসা।

হাড় ভাঙ্গা খাটুনি। ফুরসৎ—নিশ্বাস ফেলারও নেই। তবুও ছুটি পেলেই ঘুরতে থাকি, মোড়ে মোড়ে চায়ের দোকানে ঢুকি, বলি, তোমরা কি সদানন্দ পাত্রের চায়ের দোকানের খবর জান ?

কে কাকে চেনে এই অনন্ত মানুষের হাটে ? তবুও মনে হয়, একদিন দেখা হবেই হবে। মনের টান ব'লে একটা মাধ্যাকর্ষণের শক্তির মত শক্তি, বুকের ভিতর যেন জগন্নাথের রথের কাছির মত উঁচু হ'য়ে উঠে; দুহাত দিয়ে যত পারি টান দিয়ে তার মনে মনে ডাকি, এসো, এসো, এসো !

কিন্তু কেউ তো আসে না ! রাত্রে শুয়ে ডাকি, ভোরে উঠে ডাকি; সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে ডাকি, একবারটি দেখা দেও, সদানন্দ দা !

২

হঠাৎ পিছন থেকে কে ডাকে ?

ফিরে দাঁড়ালুম; চিন্‌তে পার না, দাদাবাবু ?

এ যে ঝি আমাদের ! পানের দোকান করেছে !

কি ঝি, কি খবর ?

দোক্তার পিক্ ফেলে ঝি বলে, এই পানের দোকান করেছি দাদাবাবু; পান খেয়ে যান···

বেশ মোটা হ'য়েছে·· গায়ের রং আরো ফর্সা হয়েছে; মুখটা খুসীতে ভরা বলে, আপনি আমার পুরোনো মালিক···

সব কথা থামিয়ে দিয়ে বল্লুম, ঝি, সদানন্দ দা কোথায় রে ?

ঝি এদিক-ওদিক তাকিয়ে ব'ল্লে, তাঁর কথা ব'ল্‌বেন না, এই সদর রাস্তায়··

কাছে স'রে গিয়ে বল্লুম কেন ঝি, কেন ?

ঝি নিজের মনে ঘাড় হেঁট ক'রে সুপুরি কাট্‌তে লাগলো। সে কথার উত্তর দেবে না।···

খানিক পরে বল্লে, আপনার বাসা কোথায় ? সেখেনে যাব, একদিন···

একদিন নয়, আজই ঝি, আজই···

আচ্ছা আজই যাবো সন্ধ্যের পর।

সন্ধ্যার পর আর দেরি সয় না। কৈ, এখনো ঝি এলো না ? তাই তো ! একটা বই খুলে বসি; তাহলে মনটা একটু অন্ত দিকে গেলে, সময়টা কেটে যাবে।

ঘড়িতে আটটা বেজে গেল, মন ক্রমেই হতাশ হয়, এলো না সে আজ···উঃ ঠেকার দেখেছ ?·· হাতে পয়সা হয়েছে কি না ? এই তো দোষ সংসারের !

কিন্তু সদানন্দ-দার কথা ব'লতে ঝি কেন শিউরে উঠে···

ঘরে আর থাকতে পারিনে। বাইরে বেরিয়ে ছোট বারান্দায় বেড়াই···

সদানন্দ দা, আঃ, কেন তুমি নাস্তিক হ'তে গেলে ? সদানন্দ-দা···ঐ না কে দোর ঠেলে ? নেবে গিয়ে দোর খুলে দেখি কেউ নেই !

৩

সকাল বেলা গিয়ে দেখি দোকান বন্ধ। পাশের দোকানিকে জিজ্ঞেস করি, সে হাসে;·· ওরা ? সুখের

পায়রা · কত রাত পর্য্যন্ত আমোদ আহ্লাদ ক'রেছে···তার পরে উঠবে, চারটি রাঁধবে-বাড়বে···তবে তো আসবে···কেন বাবু, টাকা-কড়ি পাওনা আছে নাকি ?...

নাঃ এম্নি একটু দরকার ছিল···

আচ্ছা, এলে ব'লে দেব, কি নামটা আপনার ?

তার বাসাটা কোথায় ? ··

ছিঃ বাবু, আপনি ভদ্দর লোক, সেখেনে, সেই র‍্যালার মধ্যে কি করতে যাবেন ?

লজ্জা হ'লো···একদিকে চ'লে গেলুম·· দেখি সাম্নে হাওড়ার পোল ;—দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছি, জলের উপর দিয়ে সাঁ সাঁ ক'রে পান্‌সি ছুটে চলেছে···কাগজওয়ালারা হাঁক্‌চে, বাবু চাই ভারত-মিত্র, ষ্টেইস্‌ম্যান ·

চোখের উপর ভেসে চলেছে সব, কাণের মধ্যে দিয়ে ব'য়ে চলেছে···কিন্তু মন একই কথা নিয়ে তোলাপাড়া ক'রেছে... সদানন্দ-দা, সদানন্দ-দা···কি হ'লো সদানন্দ-দার ? ··

ইস্কুল যাওয়া মাথায় উঠ্‌লো ;...খাওয়া নেই, নাওয়া নেই...পথে পথে ঘুরে বেড়াই, ওগো, কেউ যদি একবার ব'লে দিতে পারতো !

ফিরে এসে দাঁড়ালুম ঝির দোকানে। আর্সিতে নিজের চেহারা দেখে অবাক্ হ'য়ে যাই ! ওই আমি ? কি চেহারা হয়েছে আমার ?

কৈ কাল গেলে না ঝি ?

না দাদাবাবু. কাল গা-গতরটা কেমন মশ্ মশ্ করতে লাগলো···গিয়েই শুয়ে পড়লুম...আর সকালে ঘুম ভাঙ্গলো··· আজ নিশ্চয় যাবো ··

আবার পথ ধরে চলি। কাণে আসে পাশের দোকানি ঠাট্টা করছে ··ফাঁসিয়েছিস্ ?

না গো না, বামুণের ছেলে, আমার পুরোনো মালিক... আড়ালে দাঁড়িয়ে শুন্‌লুম ঝি ব'লছে, যাবো তা' দুটো মিষ্টি হাতে ক'রে যাবো · কাল আর কিছুতেই পেরে উঠনু নি···

বাসায় গিয়ে শুয়ে রইলুম, শরীর ভাল নেই।

৪

ঝি এলো এক থাল খাবার নিয়ে, দাদাবাবু ঠাঁই ক'রে দি, তুমি ব'সে খাও আর আমি কথা কই···

বল্লুম, আচ্ছা, সে হচ্চে···তুই আগে বল সব খবর তোর···সদানন্দ-দার খবর···

ঝি ঠাঁই ক'রে আমাকে বসিয়ে দিলে। কি খাচ্চি তা জানিনে, শুন্‌চি তার কথা···

তিনি কি মানুষ, দাদা বাবু সেই গঙ্গা দাদা বাবুর মা, বোন্···তাদের নিয়ে কত ঝঞ্ঝাট্ !···সমস্ত দিন মাষ্টারি করেন···চায়ের দোকান ত আমিই চালাতুম···কত লোক আসে, কত লোক যায় ·কার মনে কি আছে ··সে ভগবান জানে ··একদিন শেষ রাতে এসে পুলিশে বাড়ী ঘেরাও ক'রেছে···মাগো আমি তো কেঁপে মরি···

পুলিশ ?

হাঁ গো, বলে কি না বোমা তৈরি ক'রে··মা গো ! মিন্‌সে গুলো কি চোয়াড়···ধরে নিয়ে গেল তাঁকে থানায় ··সাত দিন সাত রাত···আমরা তিনজন মেয়ে মানুষে কেঁদে বাঁচিনে ·· কি হবে তাঁর !···

নিখখল নির্দ্দোষ মানুষ, হাস্‌তে হাস্‌তে ফিরে এলেন। তারপর বাসা উঠিয়ে দিয়ে···ওঁদের নিয়ে কোথায় চ'লে গেলেন !···যাবার সময় দশ টাকার দশ খানা নোট দিয়ে আমায় বল্লেন, পানের দোকান করিস্ মাতু, আর যদি কোনদিন দরকার পড়ে, যাবি তো ?

যাব না ? নরকেও ও-মনিষ্যির সঙ্গে যেতে পারি ; উনি কি মানুষ ..দেবতা, দেবতা···তা আমি ব'লে দিচ্চি দাদাবাবু···

গলায় খাবার যায় না। মুখটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে · ঝি বল্লে, কই খাচ্চ না দাদাবাবু ?

খেতে আর পারব না···তারপর কি হলো ?

আর তাঁর দেখা নেই···পাপী আমি তাঁর দেখা কি আর পাব ?

বোমা কি সদানন্দ-দা সত্যি তৈরী করতো ?

পাগল ? সময় কৈ তাঁর ? ও সব নচ্ছার লোকের মিথ্যে লাগানি·· তুমি শোন কেন, দাদাবাবু ?···ঝি চ'লে গেল।

৫

বাইরের দিক দিয়ে যতই পৃথিবীটা সদানন্দের প্রতিকূলে যেতে লাগল, ততই যেন আমার মনের বিশ্বাস দৃঢ় এবং গাঢ় হ'য়ে চল্লো যে, সদানন্দ-দা নাস্তিক হ'লেও, লোক খুব মন্দ নয়। বিশেষ ক'রে ঝির কথা বিশ্বাসযোগ্য ; কেন না, সে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে কাছে থেকেই তাকে জেনেছে।

পুলিশ আর বোমা তৈরির গল্প আমার একটুও বিশ্বাস হয়নি ; সদানন্দ-দার আর যে কোন দোষই থাক্, সে এক-

দিনও বন্দেমাতরমের গোলে ভিড়ত না; তা হ'লে আমি তো জানতে পারতুম্। যে এক ঘরে, এক বছর রইল তাকে কি ফাঁকি দেওয়া চলে ?

ও সব বাজে কথা। আসল কথা ঐ গঙ্গানন্দের মা-বোন্‌দের নিয়ে আশ-পাশের লোকদের সন্দেহ হয়েছে—(সে কথা তো আমরাও শুনেছি)—তাই নিয়ে এই সব হাল্লা। তার পর সে কোন্ দূর বিদেশে গিয়ে আছে।··· ওদের বংশটাই সন্ন্যাসীর বংশ কি না ? ওই তো, ওর বড়-দাদা···এমনি ক'রে মনটা বুঝিয়ে দিন কাটাতে লাগ্‌লুম।

কিন্তু সদানন্দ-দাকে দেখার তীব্র ইচ্ছা এক তিলও কমে না। তাই ফিরে ফিরে যাই—পানের দোকানে; কি ঝি ? কি খবর ?

সেদিন দেখি, আমাদের সেই পুরোনো বামুণ ঠাকুর ব'সে আছে দোকানে।

কি গো ঠাকুর মশাই যে ?

হেঁ, হেঁ, দাদাবাবু,···ভালো আছেন ?

দু-একটা কথার পর সে বল্লে, দেখেছেন বোধ হয় কাগজে সদানন্দ বাবুর খবর ?

কৈ না ? কি হয়েছে ?

ঐ ঘাটশীলা না কোন্ জায়গায় একটা আশ্রম বানিয়েছিলেন··খুব ভাল আশ্রম, ছেলেদের তীর ধনুক ছুঁড়তে শেখাতেন, কুস্তি করতে শেখাতেন···আরো কি সব ছিল··· ঠিক জানিনে। একদিন পুলিশ···ব'লে ঠাকুর চারিদিকে চায়···হাঁ ওই ওনারা গিয়ে··সবাইকে ধরে; কিন্তু সেদিন সদানন্দ বাবু ছিলো না··তাই পুলিশে···ওই ওনারা না কি তাকে খুঁজে, গরু খোঁজা করছেন···

এ আবার কি নতুন খবর ? খবরের কাগজ উল্টাই; একে-ওকে জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না।

শান্ত হ'য়ে ভাবি নিজের ঘরে ব'সে, নাস্তিকতার সঙ্গে বোমা তৈরীর কি সম্পর্ক ?

আছে বই কি—আছে; এরা শক্তিমান, এরা নিজের শক্তির উপর অটল বিশ্বাস রাখে; তাই পরের কর্ত্তৃত্ব একেবারে সহ্য করতে পারে না।

ঈশ্বর থাকবে না, রাজা থাকবে না, সংসারে কর্ত্তা থাকবে না তো চ'লবে কি ক'রে, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সমাজ সংসার !

বুঝি, শক্তির আধার এই জগৎ; কিন্তু সে শক্তি কেন্দ্রীভূত না হ'লে তার কর্ম্মশক্তি কোথায়। শক্তির অপব্যয় শক্তির ব্যর্থতা ! এই সোজা কথা সদানন্দ-দা বোঝে না ? অসম্ভব।

দুই চোখ বিস্ফারিত ক'রে, দুই কাণ উন্মুক্ত ক'রে, বুদ্ধিকে ক্ষুরধার ক'রে, সতত জাগ্রত রেখে ঘুরে বেড়াই, শুধু জান্‌বার জন্যে বোঝবার জন্যে যে কেন মানুষ ঈশ্বর, কেন মানুষ রাজশক্তি মান্‌তে চায় না !

কে এ কথার উত্তর দেবে ? কাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করি !

এমনি ক'রে বীজের মধ্যে অঙ্কুর যেমন ক'রে ফেঁপে বড় হ'য়ে উঠে' বীজটাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ ক'রে খণ্ড খণ্ড ক'রে দেয়·· আমার মধ্যে জ্ঞানের তীব্র ব্যাকুলতা যেন অমাকে খণ্ড-বিখণ্ড ক'রে দেবার জন্যে উদ্যত হ'য়ে উঠ্‌লো !

পরিচ্ছেদ—পাঁচ

১

সদানন্দ-দার কোন খবর না পেলেও তার জন্যে আমার মনটা যে জেগে গেল, তাতে আর একদিকে বড় লাভ হ'লো আমার !

আমার সঙ্গে বুদ্ধিতে আর কেউ পাল্লা দিয়ে উঠ্‌তে পারে না; মনটা সত্য আহরণ করার জন্য নিত্যক্ষণ সচেতন র'য়েছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একখানা বইএর আগাগোড়া আলোচনা ক'রে ফেলি, ঘুমিয়ে যে তর্ক করি, যে মীমাংসায় এসে দাঁড়াই, তাতে না আছে ভুল ভ্রান্তি, না আছে না-বোঝার আবছায়া !

স্কুলে আমার ফল দেখে সকলে চমৎকৃত হ'য়ে গেল; বলে, এমন একটা ছেলে বহুদিন আসেনি।

আমার অধৈর্য্য—আমার কাজ সেরে ফেলার ব্যাকুলতা; কিন্তু সে কার জন্যে তা কেউ জান্‌লে না।

আমার যেন অহরহ মনে হয় আমার জীবনের সব চেয়ে বড় কাজই বাকি রয়েছে। আমাকে আমার কর্ত্তব্য শেষ ক'রে বেরিয়ে পড়তে হবে—সদানন্দ-দার খোঁজে !

রাত্রে স্বপ্নে দেখি—খুঁজতে খুঁজতে হিমালয়ের গুহার মধ্যে গিয়ে দেখি·· সদানন্দ-দার জটা পেকে সাদা হ'য়ে গেছে; তার দেহ থেকে দিব্য জ্যোতিঃ বার হচ্চে ! বলি সদানন্দ-দা, এত বছর ধরে কি করলে ? সদানন্দ-দা বলে, তাঁকে পেয়েছি, যাঁকে যৌবনে অবহেলা ক'রে দুর্গতির অবধি ছিল না;—তাঁকে বার্দ্ধক্যে পেয়ে জীবন সার্থক হ'লো, পূর্ণ হলো···আত্মা অব্যাহত মুক্তিলাভ ক'রলে !

আমার দুই চোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ে; আনন্দে যেন দম বন্ধ হয়ে যায়; বলি, তবে? তবে? কেন আমাকে ফাঁকি দিয়েছিলে?……

সদানন্দ-দা বলে, ফাঁকি আমি জীবনে কখনো কাউকে দিই নি; ওই তখন আমার বিশ্বাস ছিল, ওই তখন আমার মনের সত্য ছিল।

২

ছোকরা এসে বলে, মশাই একমাসের জন্যে কি সীট্ খালি পাওয়া যাবে, আপনাদের মেসে?

না, না…এই অসময়ে…

আজ্ঞে, যদি দয়া করতেন, বড় উপকার হ'তো…

কি উপকার শুনি?

আজ্ঞে, মাসখানেক থেকে, চিকিৎসা করাতেম…

কি অসুখ?

বুক ধড়ফড়ানি…

এই বয়সে?

অনেকদিন জ্বরে ভুগে…

তা হয় বটে; আচ্ছা, আমার এই ঘরে একটা সীট হতেও পারে…

বাড়ী কোন্ দেশে?

ওঃ! আমাদের সদানন্দ-দার গ্রামে?

তাঁকে আপনি চেনেন্…

বেশ,—এক সঙ্গে এক বছর…তিনি আমার পরম… আচ্ছা, সদানন্দ-দার খবর কি? বহুদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি…কোথায় তিনি এখন?…বটে, তোমার পরিচয়, নামটি কি হে?

আজ্ঞে, তারকব্রহ্ম দাস..

বাপস্…প্রকাণ্ড নাম যে তোমার, তারক…

হেঁ, হেঁ, তারক হাসে।

তার পর, সদানন্দ-দার কি খবর?

তিনি সেই ঘাটশীলায় আশ্রম ক'রেছিলেন, তার পর পুলিশ পেছনে লাগ্‌তে কোথায় চ'লে গেছেন, লোকে বলে…হিমালয়ে তপ করছেন…

তা কিছু আশ্চর্য্য নয়, বুঝেছ, তারক; কিন্তু তিনি… আট্‌কে গেল মুখের মধ্যে কথাটা!

তারক আমার মুখের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে রইল; কথা শেষ হ'লো না…ঠাকুর বল্লে, ভাত তৈরি…বাবু, শেষকালে রাগারাগি করবেন, এখন চলুন...

দেখ ঠাকুর, এই ছেলেটি আমাদের বাসায়…তারক, তুমি আজই থাকবে নাকি?

না, কাল থেকে;—কাল সকালে আসবো।

মনে একটু আরাম বোধ করলাম, নিজের লোক না হ'লেও দেশের লোক তো?…খবর-টবরগুলো পাওয়াও যেতে পারে—

তারককে সঙ্গে করে নিয়ে গেলুম, অধ্যক্ষের কাছে, তিনি বুক পরীক্ষা করে বল্লেন, নাথিং নাথিং,…আর একদিন আস্‌তে ব'লে দাও…আর একদিন পরীক্ষা করবো!

তারক বলে, দাদা, ফি না দিলে, ওই রকম বল্‌বে, ফি দিন্,…

তুমি গরীব মানুষ ফি পাবে কোথায়?…

তারক বিছানায় প'ড়ে ছট্‌ফট্ করে…বলে ব'সতে পারিনে।

ভারি দুঃখ হয় তার জন্যে, বলি, চল, আর কাউকে দেখাই…

না দাদা, আপনি আমার চিকিৎসা করুন, বড় বিশ্বাস আপনার ওপর…

সুখ পাই তার কথায়; মনে সাহস পাইনে কিন্তু নিজে চিকিৎসা করতে।

সেদিন তারক কোথায় গিয়েছিল।

জলখাবারওয়ালা এসে বল্লে, বাবু সেই পুলিশ বাবুটি কোথায়?

পুলিশবাবু?

সে তারকের সীট দেখিয়ে বল্লে, ঐ ঐখেনে যে বাবু থাকে…

পুলিশ ব'ল্‌ছো কেন?

সে হেসে বল্লে, ওকে আমি অনেকদিন জানি, পুলিশ ক্লাবে থাক্‌তো…ব'লে সে হাস্‌তে লাগ্‌লো…

তোমার ভুল হচ্চে।

না বাবু, ব'লে সে খেরোয় বাঁধা খাতা বার ক'রে একটা পাত দেখিয়ে ব'ল্লে, এই দেখো বাবুর হিসাব।

অবাক হ'য়ে রইলুম; তারকব্রহ্মের হাতের লেখা বটে; তবে নাম, বঙ্কুবিহারী দত্ত!

৩

তারকব্রহ্ম চম্পট দিল। তার বুক ধড়ফড়ানিটা একদম সেরে গেল—যখন আমি বল্লুম, আস্‌তে আজ্ঞা হোক্ বঙ্কুবাবু।

মানুষের হীনতার কুৎসিত পরিচয় দিতে ইচ্ছা করে না; মন সঙ্কুচিত হয়ে উঠে।

তবে এইটুকু বলি যে তারক আমাকে একদম সতর্ক করে দিয়ে গেল। আমি আর ভুলেও কারুর সঙ্গে সদানন্দের প্রসঙ্গ তুল্‌তুম না।

আর কোন দিন ঝির কাছে যাইনি। শুধু মনের একান্ত নিভৃতে দেবতার কাছে এই প্রার্থনাই জানিয়েছি যেন জীবনে একদিন তার সঙ্গে দেখা হয়।

এ জীবনে মানুষের সব সাধ কি পূর্ণ হয়? কে জোর ক'রে ব'লতে পারে, হয় না? তেমন ক'রে তাঁর কাছে চাইতে পারলে তিনি কাউকে বঞ্চিত করেন না!

এই কথা ব'লে কিন্তু মনে কোন তৃপ্তি পাইনে, যেন

মনে হয় সমস্ত আকাশ-বাতাস পূর্ণ ক'রে সদানন্দের বাণী উঠছে—সে বলছে, ফকির, আর নিজের হাতের তৈরী দড়িতে নিজের গলায় ফাঁস জড়িয়ো না :…সে যেন চীৎকার করে বলে, মানুষকে নিজের শক্তির উপরই দাঁড়াতে হবে, নিজের পায়ের জোরেই অগ্রসর হ'তে হবে…আর কেউ নেই তাকে এগিয়ে দিতে এ সংসারে!

কাণে আঙুল দিয়ে বলি, শুনবো না ও-কথা; কিন্তু ও যে বাইরের ধ্বনি নয়—আমার অন্তরের কোথায় যেন তার আসন পেতে সদানন্দ ব'সে আছে। সে দৃপ্ত, দাম্ভিক, সে বিদ্রোহী, সে বিজয়ী, কোন্ দুর্ব্বলতার ফাঁকে আমার মধ্যে তার অধিকার বিস্তার ক'রে গেছে!

সদানন্দকে অস্বীকার করলে নিজের অনেকখানিকে যে অস্বীকার করতে হয়; কিন্তু ঈশ্বরকে অস্বীকার করলে মানুষের কি অবলম্বন থাকে?

আমার বাণী উঠে মনের কন্দর থেকে, থাকে থাকে—সবই থাকে…মানুষ নিজেই যে ভগবান!

৪

পরীক্ষায় প্রথম হলুম।

অধ্যক্ষ পিঠ্ ঠুকে বল্লেন, তার পর? চাকরি? না, প্র্যাক্‌টিশ্? দিনকতক চাকরি ক'রে টাকা জমিয়ে নেও, তার পর নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করবে।

কিন্তু চাকরী পাই কোথায়, স্যর?

সায়েব হাসেন।

ও হাসির প্রকাণ্ড অর্থ; এক সপ্তাহের মধ্যে চাকরী জুটিয়ে নিয়োগপত্র আনিয়ে দিলেন।

বড় দূর দেশ, স্যর!

ফুঃ, আমরা আসতে পারি সাত সমুদ্র পার হ'য়ে…

তা বটে।

সায়েবের চিঠি নিয়ে রওনা হ'য়ে গেলুম। বাড়ীতে এই শুভ-সংবাদ দিলুম।

জেল সুপারিন্‌টেণ্ডেট্ দিল্-খোলা লোক, আমাদের সায়েবের বিশেষ বন্ধু—তাঁর কাছে চিঠি দিতে তিনি সঙ্গে ক'রে ঘুরিয়ে আন্‌লেন—সেই প্রকাণ্ড জেলখানার চতুর্দ্দিক। সমস্ত কর্ত্তৃত্বের ভার এলো আমার ছোট দুটি হাতের মধ্যে!

কয়েদিরা হাসে, বলে বাচ্চা ডাক্তার। জেলার বলে, সলুই, সায়েবের পেয়ারের লোক, ভয় করে; আমার সঙ্গে দোস্তি করে।

দিন এমনি ক'রে চলে যায়। ভাবি, কতদিনে এই কারাবাস থেকে উদ্ধার পাবো! কতদিনে একটা খোলা দেশের মুক্ত বাতাসে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে শিখ্‌বো।

কিন্তু সে আলেয়ার আলো, কোন দিন আর হাতের কাছে আস্‌বে না!

আত্মীয় স্বজন সব যেন মন থেকে স'রে গেল;—কয়েদী, আর রুগী; ওষুধ আর পথ্য! কাজের ভিড়—আর তার মধ্যে ফাঁকি দিয়ে হ'য়ে গেলুম, একটা ফোঁপরা, ফাঁকা, ফানুষ; মানুষ ব'লতে নিজেকে লজ্জা করে!

ওয়ার্ডার দৌড়ে এসে খবর দিলে, আলিপুর জেলের নতুন কয়েদি, ঘানি টান্‌তে টান্‌তে বেহুঁস্ হ'য়ে গেছে…

এ আর নতুন খবর কি? ধীরে সুস্থে গিয়ে পৌঁছলুম।

মাটিতে মুখ থবড়ে পড়েছে; বল্লুম, ষ্ট্রেচার লে আও, উঠাও, লে চলো…

কোন কিছুরই তাড়া নেই…ষ্টেচার এলো, নিয়ে চল্লো…

আঃ আর পারিনে! যদি ম'রে গিয়ে থাকে তো আবার পোষ্ট-মরটেমের হাঙ্গাম…

চেয়ারে ব'সে চম্‌কে উঠ্‌লুম। বোধ হয় চেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছিলুম ওয়ার্ডার ধরে ফেলে মাথায় হাওয়া করতে লাগলো…চারিদিকে ঘোর অন্ধকার, তার মধ্যে মধ্যে সরষে ফুলের মত কি যেন সব ঝিল্‌মিল্ করছে…

একগ্লাস বরফ জল খেয়ে মেজাজ ঠাণ্ডা হ'লো।

সর্ব্বনাশ! এ যে সদানন্দ-দা!

প্রাণটি কণ্ঠে এসে ধুক্‌ধুক্ করছে!

* * * *

হায়, শেষ দেখা!

উঃ ভগবান্, তুমি কি নিষ্ঠুর!

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত "তরুণের অভিযান"—১।৹

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী প্রণীত "দীপান্বিতা"—১।৹

শ্রীহেমচন্দ্র বক্সী বি-এ প্রণীত "লাজপত্রায়"—৸৹

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "পথের সন্ধান"—১।৹

শ্রীবিধুভূষণ বসু প্রণীত "বিষের বাতাস"—১।৹

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত "দিগ্বিজয়ী"—১।৹

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত "মধুপর্ক"—১।৹

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'ত্রিমূর্ত্তি'—।৹

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "কহ্লার"—৸৹

শ্রীশ্রীপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "স্বয়ম্বরা"—।৹

শ্রীনিশিকান্ত বসু রায় বি, এল, প্রণীত "পথের শেষে"—১৲

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA.
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.

Printer—NARENDRANATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

পরলোকে

৺কাশীর খ্যাতনামা জমিদার রায় বাহাদুর নীলরত্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৬৪ বৎসর বয়সে বহুমূত্র রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে ও একাদিক্রমে ৩৩ বৎসর যাবৎ মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের স্থলাভিষিক্ত থাকিয়া তিনি কাশীতে কলের জলের খরচ কমাইয়া ও অন্যান্য অনেক লোকহিতকর কার্য্য করিয়া তত্রত্য সকলের ধন্যবাদভাজন হন। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহার জীবদ্দশাতেই কাশীর টাউনহলে তাঁহার তৈলচিত্র স্থাপন করেন। রাণীভবানীর দেবোত্তর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়া যখন দেবসেবাদি অচল হইয়া পড়ে তখন তিনিই বহু মামলা মোকদ্দমার পর উহার উদ্ধার সাধন করিয়া দিয়া দেবসেবাদির সুব্যবস্থা করিয়া দেন।

ঔদার্য্য, তেজস্বিতা, অমায়িকতা ও অন্তরের সৌকুমার্য্যে তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। বিপদের দিনে কেহ তাঁহার সাধ্যমত সাহায্য হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

তাঁহার পিতা কলিকাতা সিমলানিবাসী ৺শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পশ্চিমাঞ্চলে বহুকাল ডিষ্ট্রিক্ট জজের পদে কাজ করিয়া খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন।
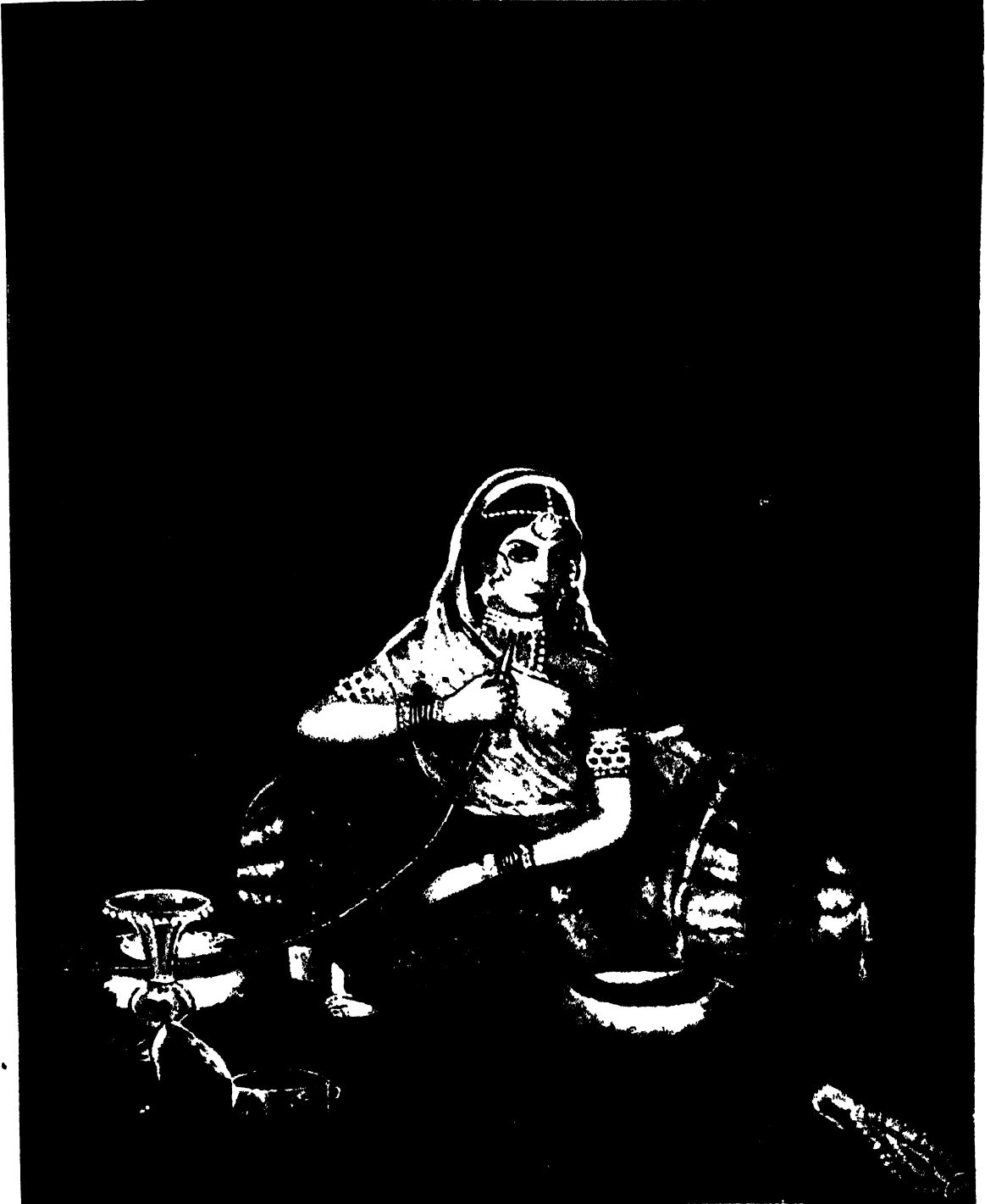
নবাব সিরাজদ্দৌলার প্রিয়তমা রাজপুত-মহিষী

লুৎফ-উন্নিসা বেগম

মুর্শিদাবাদ-প্রাসাদস্থিত মূল চিত্রের প্রতিলিপি

শেষ নবাব নাজিমের পৌত্র সৈয়দ সাদিগ আলি মীর্জ্জা-কর্তৃক প্রদত্ত

ফাল্গুন—১৩৩৮

দ্বিতীয় খণ্ড | ষোড়শ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাবসান

রায় বাহাদুর ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ডি-লিট্‌

গৌরাঙ্গ ভগবদ্ভক্ত, পূর্ণাবতার, কিম্বা অংশাবতার—সেই জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে আমরা চেষ্টা করিব না। যাঁহারা তাঁহাকে পূর্ণাবতার বলিয়া তচ্চরণারবিন্দে হৃদয় অর্পণ করিয়াছেন, জড়বাদীর কূট-তর্ক-জাল বিস্তার করিয়া তাঁহাদের ভক্তিতে হানা দিয়া লাভ কি? যাঁহারা ভক্তিমান, আধ্যাত্মিক রাজ্যের চাবি তাঁহাদের হাতে; তাঁহাদের বিশ্বাস ধ্বংস হয় ত করা যাইতে পারে, কিন্তু ভক্তির আবেশে তাঁহারা যে স্বর্গীয় শান্তি ও সান্ত্বনা পাইয়া থাকেন, তাহার স্থল আমরা কি দিয়া পূরণ করিব? হাতুড়ির কয়েকটা ঘা' দিয়া হয় ত তাজমহলটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম, কিন্তু শুষ্ক ও নীরস জড়বাদ কি তাঁহাদের আত্মার তৃপ্তি দিতে পারিবে?

এ সকল কথা যা'ক। চৈতন্য ভগবানই হউন বা ভগবানের অবতারই হউন, তিনি নর-দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দেহীর সম্বন্ধে প্রাকৃতিক যে সকল নিয়ম প্রযুজ্য হয়, তিনি সেই সকল নিয়মাধীন ছিলেন। গয়া গমনের পথে তাঁহার জ্বর হইয়াছিল, তাঁহার দেহ কণ্টক-বিদ্ধ হইলে সেই ক্ষত হইতে রক্তবিন্দু পড়িত—এই সকল নর-দেহ-সুলভ আধি-ব্যাধির হাত তিনি এড়ান নাই। তিনি শচীমাতার গর্ভ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আমাদের মতই তাঁহারও ভ্রাতা, ভগিনী, (১) স্ত্রী ও স্নেহময় পিতা ছিলেন। সুতরাং আমরা তাঁহার জীবনের ঘটনাগুলি লৌকিক লীলায়

(১) মহাপ্রভুর আটটি ভগিনী জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারা অতি শৈশবেই মৃত্যু-মুখে পতিত হন।

অন্তর্গতই মনে করিব। অবশ্য তাঁহার মধ্যে যে ভগবদ্ প্রেমের লীলা দেখিতে পাই, তাহা স্বর্গীয়,—তাহা অপূর্ব্ব,—জগতে তাহার তুলনা নাই। তাঁহার চক্ষের জল কোহিনুর-কৌস্তভ অপেক্ষাও মূল্যবান্, তাঁহার প্রেমোন্মাদ ইহ জগতের নহে। সেই ভাব-প্রবণতার বিশ্লেষণ করিলে আমরা তাঁহার মধ্যে এমন আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য,—প্রেমশতদলের এরূপ সুরভি পাইব, যাহা জগতের সম্মুখে স্বর্গের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখায়—অতীন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা তাঁহাকে দেহী বলিয়াই মনে রাখিব। তিনি বরাহরূপে হুঙ্কার করিয়াছিলেন, (২) ষড়ভুজ, অষ্টভুজ দেখাইয়াছিলেন (৩)—একদিনে আম্রবৃক্ষ রোপণ করিয়া তখন তখনই তাহার ফলোদ্গম করাইয়াছিলেন (৪)—তিনি এক এক গ্রাসে দ্বাদশজনের খাদ্য আহার করিয়া দামোদর-কল্প হইতে পারিতেন (৫—চৈতন্য-জীবনের বিবিধ ইতিহাসে এরূপ সকল কথা অতি শ্রদ্ধার সহিত বর্ণিত হইলেও আমরা সেই শ্রদ্ধার পাশ কাটিয়া যাইব—সে সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিব না। বৃন্দাবন দাসের জন্ম এক গূঢ় প্রহেলিকা-বিজড়িত, এজন্য কেহ কেহ তাঁহার নিন্দাবাদ করিতেন। ঠাকুর চৈতন্যের আদেশে তিনি পার্থিব নিয়ম অতিক্রম করিয়া অলৌকিক ভাবে উপজাত হইয়াছিলেন, এই কথা তিনি তার-স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন। যাঁহারা এ কথায় প্রত্যয় করেন নাই, তাঁহাদিগের মাথায় তিনি লাথি মারিবেন, এই ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন—এই সকল লাথি-গুঁতার ভয় দেখান বৃথা। আজকালকার দিনের শিক্ষিত যুবক তাঁহার এ সকল অলৌকিক তত্ত্বে আস্থাপরায়ণ হইবেন না।—তিনি আদেশ করিয়া চক্র আনয়ন পূর্ব্বক জগাই মাধাইয়ের শির কর্ত্তন করিতে দাঁড়াইয়াছিলেন, বিষ্ণু-চক্র আকাশে উক্ত দুই ব্যক্তির মাথার উপর ভোঁ ভোঁ শব্দে ঘুরিতেছিল—বৃন্দাবন দাস প্রত্যক্ষদর্শীর ন্যায় এই সকল কথা বলিয়াছেন। আমরা এ সকল কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছি না; কিন্তু এ কথাটা অবশ্য বলিব যে, যদি তিনি সত্যই বিষ্ণুর অবতার হইয়া থাকেন, তবে তিনি এই যুগে বিষ্ণু-চক্র দিয়া ভয় দেখাইতে আসেন নাই (৬) তাঁহার অপূর্ব্ব প্রেমাশ্রু দ্বারা জগজ্জয় করিতে আসিয়াছিলেন। এই উক্তির জন্য হয় ত গোঁড়া বৈষ্ণবরা আমাকে অপরাধী মনে নাও করিতে পারেন।

তাঁহার তিরোধান সম্বন্ধে কতকগুলি আজগুবি কথা বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত আছে,—আজ তাহাই আমার আলোচনার বিষয়। কোন কোন বৈষ্ণব বলেন, চৈতন্য-প্রভু জগন্নাথের অঙ্গে বিলীন হইয়া গিয়াছেন; আবার কেহ কেহ বলেন, তিনি গোপীনাথের উরুদেশে প্রবিষ্ট হইয়া সেই বিগ্রহের সঙ্গে লীন হইয়াছেন। গোপীনাথ বিগ্রহের ঘাগরার নীচে একটা স্বর্ণ-বিন্দু আছে। মন্দিরে ১।০ দান করিলে গোপীনাথের ঘাগরা খুলিয়া পাণ্ডারা সেই স্থানটি দেখাইয়া থাকেন। যাত্রীর অভাব নাই—এবং শ্রীচৈতন্য প্রভুর তিরোধানের এই ক্ষুদ্র পথি-চিহ্নটি দর্শন করিয়া দর্শকরা যেরূপ তৃপ্ত হন, পাণ্ডারাও প্রচুর লাভবান হইয়া তদ্রূপ যত্নের সহিত উহা তীর্থযাত্রীদিগকে দেখাইয়া থাকেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীচৈতন্য প্রভুর জীবন সম্বন্ধে যে সকল চরিতাখ্যান বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহাদের কোনটিতেই শ্রীচৈতন্যের তিরোধান সম্বন্ধে কোন কাহিনী বর্ণিত হয় নাই। অমৃতবাজার পত্রিকা আফিস হইতে মুরারি গুপ্তের "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচরিতামৃতং" কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সকল অংশ প্রামাণিক কি না বলিতে পারি না, যেহেতু ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তক রচিত হইয়াছে, অথচ তাহার পরবর্ত্তী অনেক ঘটনা ইহাতে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। এই চৈতন্যচরিত গ্রন্থে মহাপ্রভুর তিরোধানের উল্লেখ নাই। কবি কর্ণপুর মহাপ্রভুকে স্বয়ং দেখিয়াছিলেন, ১৫৭২ খৃঃ অব্দে তিনি চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক প্রণয়ন করেন। তিনিও মহাপ্রভুর তিরোধানের উল্লেখ করেন নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১৫৮২ খৃঃঅব্দে চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন; তিনিও মহাপ্রভুর তিরোধান সম্পর্কে নির্ব্বাক্। শুধু ১৪৫৫ শকে তিনি স্বর্গারোহণ করেন, এই কথাটি গ্রন্থারম্ভে লিখিত হইয়াছে। বৃন্দাবন দাস সম্ভবতঃ ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে চৈতন্য-ভাগবত রচনা করেন; তাহাতে মহাপ্রভুর তিরোধানের কথা

(২) বরাহ আকার প্রভু হৈল সেইক্ষণে। স্তব্ধ হৈলা মুরারি অপূর্ব্ব দরশনে।" চৈ, ভা, মধ্য ৩য়।

(৩) চৈ, ভা, মধ্য, ২য় ও ৩য়। (৪) চৈ. চ, আদি। (৫) চৈ. চ, মধ্য ১৫ পঃ ৯০ শ্লোক এবং মধ্য ৩য় পঃ ৪৯ শ্লোক।

(৬) "চতুর্দ্দশ শতাব্দান্তে পঞ্চবিংশতি বৎসরে। আষাঢ় সিত সপ্তম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ"

নাই। আনুমানিক ১৬৪০ খৃঃ অব্দে নিত্যানন্দ তাঁহার প্রেম-বিলাস ও ১৭০৮ খৃঃ অব্দে নরহরি সরকার তাঁহার প্রসিদ্ধ ভক্তিরত্নাকর মহাগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল পুস্তকের কোনটিতেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুর তিরোধানের কোন কথা নাই।

মনে হয় যেন বৈষ্ণব চরিতাখ্যায়িকারচকগণ একযোগে এ সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কোন মর্ম্মান্তিক কষ্টের কথা লিখিতে নাই, এই জন্যই কি এ ব্যবস্থা?—বৈষ্ণব শাস্ত্র তদ্রূপ শোকাবহ ঘটনা লিখিতে নিষেধ করিয়াছেন। এই জন্যই কি চৈতন্যের তিরোধান ইহাঁরা সকলে সংগোপন করিয়া গিয়াছেন? তবে চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস হরিদাসের মৃত্যু ও সমাধি বর্ণনা করিলেন কেন? চৈতন্য ভাগবত-লেখক জগন্নাথ মিশ্রের তিরোধান বর্ণন করিলেন কেন? ভক্তিরত্নাকরে দাসগোস্বামী, রূপ-সনাতন প্রভৃতি বহু বৈষ্ণবের তিরোধানের উল্লেখ আছে। মহাপ্রভুর তিরোধানেরও নামমাত্র উল্লেখ তাহাতে আছে—কিন্তু সেই মহা শোকাবহ ঘটনা কখন কি ভাবে হইয়াছিল তাহার কোন ইঙ্গিত নাই। এই মাত্র জানা যায়, চৈতন্য-চরিতামৃত ও অনেকগুলি দিগ্‌দর্শনী গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, ১৪০৭ শকে বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁহার জন্ম এবং ১৪৫৪ শকের আষাঢ়ী শুক্লপক্ষীয়া সপ্তমীতে তাঁহার তিরোধান। এই তিরোধান সংক্রান্ত সংগোপনের চেষ্টাটা যে মর্ম্মান্তিক কষ্টকর ব্যাপার বলিয়াই গ্রন্থকাররা অবলম্বন করিয়াছিলেন, এ কথাটা আংশিক ভাবে সত্য হইলেও সম্পূর্ণরূপে সত্য নহে। অন্যবিধ কয়েকটি কারণে তাঁহার তিরোধান রহস্যময় করিবার অভিপ্রায়ে গোঁড়া বৈষ্ণব-সমাজ শ্রীচৈতন্যের লীলাবসান গোপন করিয়াছিলেন। তাঁহার লীলা নিত্য,—সুতরাং তাহার শেষ বর্ণনা করা অপরাধ। "অদ্যাপি সে লীলা করে গোরা রায়। কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥" এই নিত্য-লীলার শেষ তাঁহারা কল্পনা করেন নাই। জনসাধারণ তাঁহাকে স্বয়ং জগদ্বন্ধু বলিয়া জানিত; তাঁহার জগন্নাথের অঙ্গে বিলীন হওয়ার কাহিনী পাণ্ডারা দেশ-মধ্যে প্রচার করিয়াছিল। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকাররা এই জনশ্রুতির বিরুদ্ধে কিছু লিখিয়া তাহাদের বিশ্বাসে হানা দিতে ইচ্ছা করেন নাই, অথচ সেই জনশ্রুতি সমর্থন করিয়া সত্যের অপলাপ করাও সঙ্গত মনে করেন নাই। বৈষ্ণব-সমাজ তখন স্বীয় আইন-কানুন লইয়া দৃঢ় ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা মহাপ্রভুর সম্বন্ধে মূলতঃ সকলে একই কথা বলিয়াছেন। বৃন্দাবনবাসী গোস্বামীরা পুস্তক দেখিয়া অনুমোদন করিয়া দিলে, তবে কোন পুস্তক সেকালে বৈষ্ণব জনসাধারণে প্রচারিত হইত। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, গোবিন্দদাসের করচা প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক সেই গণ্ডীতে পড়ে নাই; এইজন্য নানা ঐতিহাসিক অভিনব তথ্যবহুল হইলেও গোঁড়া বৈষ্ণব-সমাজে সেই গ্রন্থগুলি প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হয় নাই। চৈতন্য-জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি স্থূল সূত্র ছিল—বৃন্দাবনের গোস্বামীরা সেই সূত্র ও মত প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী ছিলেন; সুতরাং যে সকল পুস্তকে সেই মূল সূত্রগুলির প্রতি স্থির লক্ষ্য না থাকিত, সেগুলি তাঁহারা গ্রাহ্য করিতেন না। শ্রীচৈতন্যদেব ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন, নানাবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা এই তত্ত্ব প্রমাণ করার প্রয়োজন হইয়াছিল। বৃন্দাবন দাস প্রতি পদে চৈতন্য-জীবনের সঙ্গে কৃষ্ণ-চরিত্রের সমান্তরাল রেখা টানিয়াছেন; চৈতন্যচরিতামৃতকারও তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছেন। চৈতন্য শৈশবে ভীষণ অজগরের উপর শুইয়াছিলেন। (৭) তিনি অতিথী ব্রাহ্মণের নিবেদিত অন্ন বার'বার আসিয়া উচ্ছিষ্ট করিয়া গিয়াছিলেন (৮)। এক চোর তাঁহাকে লইয়া পলাইয়া যাইবার চেষ্টায় মোহাবিষ্ট হইয়া তাঁহারই ঘরে তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়াছিল—চৈতন্যের জীবনোক্ত এই সকল ঘটনা ভাগবতোক্ত শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের অবিকল প্রতিচিত্র। এমন কি বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের বাল্য-জীবনের শিক্ষক গঙ্গা-দাসকে শ্রীকৃষ্ণ-গুরু সান্দিপনীর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন(৯)—টোলে অধ্যাপনা-নিরত সশিষ্য চৈতন্যকে বৃন্দাবন দাস নৈমিষারণ্যে ঋষিগণ পরিবেষ্টিত কৃষ্ণের সঙ্গে উপমা দিয়াছেন। এই সমন্বয়ের প্রচেষ্টা যতই দূরপরাহত হউক না কেন, গোঁড়া বৈষ্ণবরা ইহাই শুনিতে চাহিতেন, এবং চৈতন্য-সঙ্গীরা যে রাধিকার সখীদেরই অবতার—তাহা কতভাবে সংস্কৃতে ও বাঙ্গলায় লিখিয়া কৃষ্ণতত্ত্ব ও চৈতন্যতত্ত্বের অভেদত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টিত ছিলেন।

বলা বাহুল্য, চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত এই দুই গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য প্রভুর অবতারত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য এইরূপে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের

(৭) চৈ, ভা, আদি ৪র্থ। (৮) চৈ, ভা, আদি, (৯) চৈ, ভা, আদি।

ঐতিহাসিক ভিত্তি শিথিল আমি এ কথা বলিতে চাহি না, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অবতার-বাদের যতটা প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, ঐতিহাসিক গুরুত্বের ততটা প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। পৃথিবীর যে সকল প্রধান প্রধান ধর্ম্ম-গ্রন্থ আছে, তাহাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব খুব তর্ক-যুক্তি-বিশ্লেষণসহ নহে। ইহাদের প্রত্যেকেরই লোকশ্রদ্ধার উপর দাবী কতকটা অন্ধ ধর্ম্ম-বিশ্বাসমূলক।

আমরা আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছি। শ্রীচৈতন্যের লীলাবসান সম্বন্ধে তিনটি জনশ্রুতি আছে। দুইটির কথা ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি—(১) জগন্নাথের অঙ্গে লীন হওয়া (২) গোপীনাথের সঙ্গে মিশিয়া যাওয়া। তৃতীয় বিশ্বাসটি অত্যন্ত আধুনিক। শ্রীচৈতন্য প্রভু সমুদ্রে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। এই বিশ্বাস কয়েকজন আধুনিক শিক্ষিত লেখকের চেষ্টায় দেশমধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। ইহা একান্ত ভিত্তিহীন। কোন কোন নব্য শিক্ষিত ব্যক্তি খুঁজিয়া দেখিলেন, চৈতন্য-লীলার অবসান কোন গ্রন্থেই বর্ণিত হয় নাই; অন্ততঃ তাঁহারা যখন বিষয়টির আলোচনা করিতেছিলেন, সেই সময় এতৎ সংক্রান্ত কোন দলীল বা কাগজপত্র তাঁহাদের হস্তগত হয় নাই। তাঁহারা চৈতন্যের জগন্নাথ বা গোপীনাথের দেহে বিলীন হওয়ার কথাটা অবশ্যই বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহারা যখন দেখিলেন যে, চৈতন্যচরিতামৃতের এক স্থানে বর্ণিত আছে যে, শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমোন্মাদ অবস্থায় বঙ্গোপসাগরের নীল জলে চন্দ্রলেখার দীপ্তি দেখিয়া মনে করিলেন রাইকানু তথায় লীলা করিতেছেন এবং তখনই সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া সেই লীলাতরঙ্গে আত্মনিমজ্জন করিতে প্রস্তুত হইলেন, তখন তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলেন,—চৈতন্য সমুদ্র হইতে আর উদ্ধার পান নাই, সেইখানেই তাঁহার লীলার শেষ হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু ঘটনাটি এইরূপ। কোন জ্যোৎস্নাস্নাত রজনীতে পুরীর সমুদ্র বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। চন্দ্রিকার দীপ্তি উর্ম্মিমালার মাথায় হীরার উষ্ণীষ পরাইয়া দিয়াছিল। সমগ্র নীলসমুদ্রটা যেন রাধাকৃষ্ণের লীলা-রস-তরঙ্গে উচ্ছলিত হইতেছিল। চৈতন্য ভাবিলেন এই তো গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের লীলা! কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে ভ্রম দৃঢ় হইল, কল্পনা মর্ম্মানুভূতিতে পরিণত হইল,—"মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে"—সেই রাধা-কৃষ্ণ লীলায় তিনি নিজকে সমর্পন করিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন।

স্বরূপ ও তাঁহার অন্যান্য ভক্তরা তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলেন না। তাঁহারা ভাবিলেন, তিনি হয় ত জগন্নাথ মন্দিরে কিম্বা অন্য কোন দেবালয়ে গিয়াছেন—হয় ত গুণ্ডাবাড়ীতে বা নরেন্দ্র-সরোবরে, অথবা "চটক পর্ব্বতে কিম্বা কোনার্কে" গিয়াছেন। পূর্ণিমা রাত্রিতে যখন মনোরম চন্দ্রিকাস্নরঞ্জিত প্রকৃতি তাঁহার চক্ষে রাধাকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র আঁকিয়া দেখাইত, তখন তিনি সারারাত্রি ঘুরিয়া সেই লীলা গাঢ়রূপে উপলব্ধি করিতেন, এমন কি কোনারক পর্য্যন্ত ছুটিয়া যাইতেন। কোন স্থানে তাঁহাকে না পাইয়া সমুদ্রের তীরে আসিয়া তাঁহারা ভাবিলেন, হয় ত বা সমুদ্রের জলেই তিনি ডুবিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু এক জেলে তাঁহাকে জালে ধরিয়া ফেলিয়াছিল। তাঁহার প্রেমোন্মাদের শেষের দিকে ভাবাবেশে তাঁহার অস্থিগ্রন্থি শিথিল হইত। এবারও তাহাই হইয়াছিল। জেলে তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই—সে বলিল "আমি প্রভুকে অনেকবার দেখিয়াছি, এ তো সেই সুদর্শন মূর্ত্তি নহে, এ যে বিকৃত রূপ!" কিন্তু স্বরূপ চীৎকার করিয়া হরিনাম করিলে তাঁহার শিথিল অস্থি-সন্ধি জোড়া লাগিল, তিনি জাগিয়া উঠিলেন। এরূপ হওয়াটা কিছু নূতন নহে,—শেষ জীবনে প্রায়ই তিনি ঐরূপ ভাবসমাধি প্রাপ্ত হইতেন। জাগ্রত হইয়া তিনি বলিলেন "আমার মনে হইল, আমি যমুনায় কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের রাস দেখিতেছিলাম।"

এই ঘটনা যে সময়ে ঘটিয়াছিল, তাহার পরেও আনুমানিক সার্দ্ধ দুই মাস তিনি জীবিত ছিলেন।

চৈতন্যচরিতামৃত এই ঘটনার পরবর্ত্তী অনেক কাহিনীর বর্ণনা করিয়াছেন। গৌরাঙ্গ ক্রমশঃ কৃষ্ণ-বিরহে অধীর হইয়া উঠিলেন। রাত্রিকালে গোবিন্দ ও স্বরূপ আর তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেন না। তাঁহারা ক্ষণমাত্র তন্দ্রাতুর হইলে তিনি ছুটিয়া যাইতেন; এক দিন আবার এক পুষ্পোদ্যানে যাইয়া হারাইয়া গিয়াছিলেন। কখন কোথায় যাইবেন, হরির নাম করিতে করিতে বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে ভাবের পাগল কোথায় যাইবেন, জলে জঙ্গলে কোথায় পড়িয়া জ্ঞান হারাইবেন, এই আশঙ্কায় ভক্তগণ নিতান্ত আশঙ্কান্বিত হইলেন। তখন শঙ্কর নামক এক

পণ্ডিত সারারাত্রি জাগিয়া তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিলেন। স্বরূপ, গোবিন্দ ও শঙ্কর, এই তিনজন অষ্ট-প্রহর তাঁহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন।

ইহার পর বৈশাখী পূর্ণিমায় তিনি এক রাত্রিতে জগন্নাথ-বল্লভ উদ্যানে যাইয়া জয়দেব কৃত "ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনমলয়সমীরে" গানটি স্বরূপকে দিয়া গাওয়াইয়াছিলেন ও সারারাত্রি আনন্দে বিভোর হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জগন্নাথ-বল্লভ নাটক, ও কর্ণামৃত এই সকল গ্রন্থ হইতে নিরবধি পদ আবৃত্তি করিতেন ও স্বরূপের নিকট সেই সকল পদের অর্থ করিতে করিতে রাত্রি কাটাইয়া দিতেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ এইখানে তাঁহার গ্রন্থের ইতি দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, মহাপ্রভুর লীলা অসীম,—তিনি কি করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিবেন? তাঁহার শক্তি সঙ্কীর্ণ, "বাণী অনিপুণা,"—তিনি আর বলিতে পারেন নাই। এইখানেই চৈতন্যচরিতামৃত শেষ হইয়াছে।

এখন দেখা যাইতেছে, জেলের দ্বারা রক্ষা পাওয়ার পরেও শ্রীচৈতন্য আরও অনেক লীলা করিয়াছিলেন। পুরী বা অন্য কোথাও এ প্রবাদ নাই যে সমুদ্রে পড়িয়া তিনি প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। নবশিক্ষিত লেখকরা মহাপ্রভুর জীবনাবসানের আর কোন ইঙ্গিত না পাইয়া স্থির করিয়া বসিলেন, মহাপ্রভু যে সমুদ্রে পড়িয়াছিলেন, সেই তাঁহার শেষ। শেষ কেন? যিনি সেই ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তিনিই লিখিয়াছেন, অবিলম্বে এক জেলে তাঁহাকে তীরে উঠাইয়াছিল এবং তাহার পরেও তাঁহার আরও অনেক লীলা তিনিই বর্ণনা করিয়াছেন। সেগুলি বাদ দিয়া এবং অপর সমস্ত কথা উড়াইয়া দিয়া যে সকল লেখক তাঁহাদের কল্পনানুযায়ী একটা কথা কুড়াইয়া তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন—সেই লেখকদের সম্বন্ধে আমরা আর কি বলিব? সত্যের পথের আধুনিক-পন্থী পর্য্যটকদের সত্য নির্দ্ধারণ করিবার পদ্ধতি এইরূপ! এই সমুদ্রে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগের কথাটাই এখন বেশ চাউর হইয়া পড়িয়াছে, অথচ ইহাতে বিন্দুমাত্র সত্য নাই।

এখন বাকী রহিল জগন্নাথ বা গোপীনাথে লীন হওয়ার জনশ্রুতি দুইটি।

গোপীনাথে লীন হওয়ার কথা আমরা কোন লিখিত গ্রন্থে পাই নাই। তবে মাঝে মাঝে এই দুইটি ছত্র বৈষ্ণবরা আবৃত্তি করিয়া থাকেন,

"কি করিব কোথা যাব বাক্য নাহি সরে।
গোরাচাঁদে হারাইলাম গোপীনাথের ঘরে॥"

কোন কোন বৈষ্ণব বলেন, গদাধর কোন মাঘীপূর্ণিমার দিন (সম্ভবতঃ চৈতন্য তিরোধানের সাত মাস পরে মাঘ মাসে) এক অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। যেন দিব্যজ্যোতিঃ চৈতন্যদেব আকাশ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক গোপীনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, এবং তাহার অব্যবহিত পরেই সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ গোপীনাথ বিগ্রহে লীন হইয়া গেল। এই অলৌকিক দৃশ্য গদাধরের নিকট এত স্পষ্ট, এত উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিয়াছিল যে, তিনি সত্যই মনে করিয়াছিলেন যে, চৈতন্য প্রভু পুনরায় দেখা দিয়া গোপীনাথ-বিগ্রহে লীন হইয়া গেলেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত পদটি এই উপলক্ষে গদাধর দাসের উক্তি বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

গদাধর জ্যৈষ্ঠ-মাসের অমাবস্যায় দেহ ত্যাগ করেন। তিনি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ, এমন কি শ্রীমতী রাধিকার অবতার বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। তিনি গোপীনাথ-মন্দিরে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। এদিকে চৈতন্যদেব স্বয়ং গোপীনাথের মন্দিরে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। গোপীনাথ-বিগ্রহের অঙ্গে মহাপ্রভুর লীন হওয়ার প্রবাদটি এই সকল কারণে প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কোন প্রাচীন গ্রন্থ বা দলিলপত্রে এ সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। গোপীনাথ মন্দিরের পাণ্ডারা মহাপ্রভুর জগন্নাথের অঙ্গে লীন হওয়ার জনশ্রুতিটাকে এইরূপ লাভজনক ব্যাপারে লাগাইয়াছিলেন। তৃতীয় প্রবাদ—মহাপ্রভুর জগন্নাথের দেহে লীন হইয়া যাওয়ার। যে সমস্ত বৈষ্ণব-চরিত্যাখ্যান বৈষ্ণব-সমাজে বিশেষভাবে আদৃত, তাহাদের অপেক্ষা কতকটা কম আদৃত, অথচ প্রায় চৈতন্যের সমকালবর্ত্তী কতকগুলি পুস্তক আছে,—যাহাদের দুইশত, আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন হাতের লিখিত পুঁথি বিদ্যমান—এমন তিনখানি পুস্তকে আমরা এই তৃতীয় প্রবাদটির কতক কতক সমর্থন পাইতেছি। ঈশান নাগর মহাপ্রভুর সুবিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন। তাঁহার রচিত অদ্বৈত-প্রকাশ গ্রন্থে উল্লিখিত আছে—একদিন মহাপ্রভু জগন্নাথের সমীপবর্ত্তী হন, তখন মন্দিরের কপাট আপনা আপনি বন্ধ হইয়া যায়। ভক্তগণ বাহিরে দাঁড়াইয়া আশঙ্কাতুর

ভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন "কিছু কাল পরে স্বয়ং কপাট খুলিল। গৌরাঙ্গাপ্রকট সবে অনুমান কৈল।" ১৫৬৮ খৃঃ অব্দে অদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থ শেষ হয়।

লোচনদাস ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। এই পুস্তকেও লিখিত আছে আষাঢ়ী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে রবিবার দিন (১৪৫৫ শকে) মহাপ্রভু জগন্নাথের সঙ্গে লীন হইয়া যান।

জয়ানন্দ ১৫৪০ খৃঃ অব্দে তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন. ইহাতেও উল্লিখিত আছে আষাঢ়ী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে চৈতন্য গুঞ্জাবাড়ীতে অদৃশ্য হইয়া যান।

সুতরাং তিনখানি প্রধান গ্রন্থে আমরা এই কথাটার আভাষ পাইতেছি। এবং এই তিনখানি পুস্তকই মহাপ্রভুর তিরোধানের বহুদূরবর্ত্তী সময়ে রচিত হয় নাই। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, ১৫৪০, ১৫৬৮, ১৫৭৫—এই তিন খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল, ঈশান নাগরের অদ্বৈত প্রকাশ এবং লোচনদাসের চৈতন্য-মঙ্গল বিরচিত হয়। মহাপ্রভুর অপ্রকটের সময় ঈশান নাগর ও জয়ানন্দ জীবিত ছিলেন। গৌরাঙ্গ ১৫৩৩ খৃঃ অব্দে দেহরক্ষা করেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল তাঁহার তিরোধানের মাত্র ৭ বৎসর পরে, ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ ৩৫ বৎসর ও লোচনদাসের চৈতন্য-মঙ্গল ৪২ বৎসর পরে বিরচিত হয়। সুতরাং জগন্নাথের নিকট মহাপ্রভুর অদৃশ্য হইয়া যাওয়ার জনশ্রুতিটি সেই শোকাবহ ঘটনার সম-সাময়িক—এবং তৎকালে এই জনশ্রুতি ছাড়া এতৎসম্বন্ধে আর কোন জনশ্রুতি ছিল না। এই জনশ্রুতি যতই অদ্ভুত বা অলৌকিক হউক না কেন,—ইহা বহু প্রাচীন, চৈতন্যতিরোধানের সম-সাময়িক,—সুতরাং ইহার মূলে কিছু না কিছু সত্য আছে—এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না।

মহাপ্রভুর এই ভাবে অদৃশ্য হওয়ার জনশ্রুতির সঙ্গে আরও কতকগুলি জটিল প্রশ্ন জড়িত আছে; আমরা তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

পূর্ব্বোক্ত তিনটি নজিরের দুইটিতেই লিখিত আছে যে, মহাপ্রভু ভিতরে প্রবেশ করিলে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়। লোচনদাস এবং অদ্বৈত-প্রকাশকার ঈশান নাগর উভয়েই এই কথা লিখিয়াছেন।

লোচনদাস লিখিয়াছেন, ভক্তরা সেই বদ্ধার্গল গৃহের দ্বারদেশে ভীড় করিয়াছিলেন, এবং পাণ্ডাদিগকে দরজা খুলিয়া দিবার জন্য সকাতরে অনুরোধ করিতেছিলেন। "বিপ্রে দেখি ভক্ত কহে শুনহ পড়িছা। ঘুচাহ কপাট প্রভু দেখি বড় ইচ্ছা॥" লোচনদাসের বর্ণনা পড়িয়া মনে হয়, ভক্তগণের মধ্যে শ্রীবাস, মুকুন্দ দত্ত, গৌরীদাস, বাসু দত্ত, শ্রীগোবিন্দ, কাশীমিশ্র প্রভৃতি কয়েকজন তথায় উপস্থিত ছিলেন।

জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—জগন্নাথের রথযাত্রা উপলক্ষে যখন চৈতন্য উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছিলেন, তখন তাঁহার পায়ে একটা ইট বিঁধিয়া যায়। ইহার পরের দিন নরেন্দ্র সরোবরে স্নান করেন, কিন্তু আষাঢ়ী শুক্লা ষষ্ঠীর দিন পায়ের বেদনা বাড়িয়া যায়। তখন তিনি উত্থানশক্তিরহিত হইয়া গুঞ্জা বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন রথযাত্রা, জগন্নাথ গুণ্ডিচায় (গুঞ্জাবাড়ীতে) ছিলেন। পরদিন সপ্তমী তিথি। লোচনদাস লিখিয়াছেন—মন্দিরের দরজা বন্ধ, বহু ভক্ত তাঁহার দর্শনেচ্ছায় তথায় ভীড় করিয়াছিলেন। কিন্তু পাণ্ডারা দরজা খোলে নাই। ঈশান নাগরও এই দরজা বন্ধ হওয়ার কথা লিখিয়াছেন। তার পরে লোচনদাস লিখিয়াছেন:—বহু আবেদন নিবেদনের পর দ্বার মুক্ত হইল—তখন এক পাণ্ডা আসিয়া বলিল "গুঞ্জা বাড়ীতে প্রভুর হৈল অদর্শন। সাক্ষাতে দেখিল গৌর-প্রভুর মিলন। নিশ্চয় করিয়া কহি শুন বিবরণ। এ বোল শুনিয়া ভক্ত করে হাহাকার। শ্রীমুখচন্দ্রমা প্রভুর না দেখিব আর।" জয়ানন্দ লিখিয়াছেন, ষষ্ঠীর দিনে পায়ের বেদনা বৃদ্ধি পাওয়াতে যখন মহাপ্রভু গুঞ্জা বাড়ীতে শয়ন করিলেন, তাহার পরদিন চারিদিক হইতে বিচিত্র পুষ্পমাল্য মন্দিরে আনীত হইল।

কিন্তু জয়ানন্দ এ কথা লেখেন নাই যে, মহাপ্রভু জগন্নাথের সঙ্গে মিশিয়া গেলেন। তিনি লিখিয়াছেন, স্বর্গ হইতে রথ আসিয়া তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেল। তিনি গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার আর একটি ছত্রের প্রতি আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি—তাহা এই "মায়া শরীর তথা রহিল যে পড়ি।" সুতরাং ইহাতে এ কথা তো প্রমাণিত হয় না যে, তিনি জগন্নাথের সঙ্গে লীন হইয়াছিলেন; বরঞ্চ স্পষ্ট করিয়াই তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার দেহ তথায় পড়িয়া রহিল। সেই প্রেমের চিন্ময়

বিগ্রহশ্রী—পবিত্র দেহ কোথায় গেল, জয়ানন্দ তাহা বলিলেন না।

তারিখ সম্বন্ধে কোন গোলযোগ নাই। ১৪৫৫শকের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে রবিবার দিনে মহাপ্রভুর তিরোধান হয়। লোচনদাস লিখিয়াছেন, ঐ তারিখে তিনি জগন্নাথের অঙ্গে লীন হইয়া যান, বহুক্ষণ গুঞ্জাবাড়ীর দ্বার অর্গল-বদ্ধ থাকে। অদ্বৈত প্রকাশ বলেন, ঐ দিন মহাপ্রভু জগন্নাথের গৃহে অদৃশ্য (অপ্রকট) হন। তাঁহার লেখা অনুসারেও জানা যায় যে, দরজা বন্ধ করিয়া রাখিবার দরকার হইয়াছিল। জয়ানন্দ বলিয়াছেন, ঐ দিন তিনি জগন্নাথের নিকট হইতে গরুড়ধ্বজ রথে চড়িয়া স্বর্গারোহণ করেন, কিন্তু তাঁহার মায়া শরীর তথায় পড়িয়া ছিল। এই সকল প্রমাণে এ কথাটা স্থিরীকৃত হইল যে, ১৪৫৫ শকে আষাঢ় মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে রবিবার দিনে তিনি জগন্নাথ-বিগ্রহের সান্নিধ্যে অদৃশ্য হইয়া যান। এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই। এই সময় জগন্নাথ গুঞ্জাবাড়ীতে ছিলেন,—তখন রথযাত্রার সময়—জয়ানন্দ-বর্ণিত রথারোহণে চৈতন্য প্রয়াণের পরিকল্পনার সঙ্গে তৎকাল-সংঘটিত রথ-যাত্রার কিছু সংস্রব আছে বলিয়া মনে হয়।

এখন জয়ানন্দ "টোটা" কথাটার উল্লেখ করিয়াছেন। এই টোটার দ্বারা গুণ্ডিচা-গৃহই অনুমিত হইতেছে; কারণ, তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, তখন রথযাত্রার সময়—জগন্নাথ গুণ্ডিচা-গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। যেদিন তাঁহার পদ-কমলে ইষ্টকাগ্র বিদ্ধ হয়, তাহার অব্যবহিত পরেই তিনি নরেন্দ্র-সরোবরে স্নান করেন। এই নরেন্দ্র-সরোবরও গুণ্ডিচা-গৃহের অদূরবর্ত্তী। "টোটা" অর্থে "বাগান" বা "বাগান বাড়ী।" প্রাচীন পুস্তকের অনেক স্থানে এই পুরীর টোটা-গুলির উল্লেখ আছে। গুণ্ডিচা-বাড়ী যেখানে, সে স্থানের নাম "আই টোটা" ছিল—'আই' অর্থে 'যূঁই ফুল।' ইহা ছাড়া "যমেশ্বর টোটা", "গোপীনাথের টোটা" প্রভৃতি আরও অনেক টোটা ছিল। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে আছে "শ্রীহরিদাস ঠাকুর রহিলা নীলাচলে। টোটা নির্ম্মাইয়া দিলা সমুদ্রের কূলে।" (জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, ১৫০ পৃঃ, সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ।) চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডে লিখিত আছে "এক টোটা হৈতে সমুদ্রে দেখে আচম্বিতে।" পুরী এক সময় "টোটার" দেশ ছিল, তথায় বহু উপবন ছিল। মুরারি গুপ্তের চরিতামৃতেও গুণ্ডিচা বাড়ী "পুষ্পবাটী" (টোটা) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। রথযাত্রার সময় গুণ্ডিচা বাড়ীতে জগন্নাথ ছিলেন, লোচনদাস এ কথা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন।

এখন চৈতন্যের তিরোধানের দিন, তিথি ও স্থান আমরা নিশ্চিতরূপে পাইলাম। এ সম্বন্ধে কোনও রূপ দ্বিধা বা সন্দেহের কারণ নাই।

কিন্তু ঠিক সময়টা সম্বন্ধে কিছু গোলমাল আছে। লোচনদাস লিখিয়াছেন, রবিবার দিন তৃতীয় প্রহরে তিনি জগন্নাথ বিগ্রহে লীন হন। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন, রবিবার দিন রাত্রি দশ দণ্ডের সময় তাঁহার তিরোধান ঘটে। লোচনদাসের মতে মহাপ্রভুর তিরোধানের সময় রবিবার বেলা ৪টা, এবং জয়ানন্দের মতে রবিবার রাত্রি ৯৷৷ টা। এই জটিলতার সমাধান আমরা পরে করিতে চেষ্টা পাইব।

এখন আমরা জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল হইতে স্পষ্ট জানিতে পারিলাম, আষাঢ় মাসের রথযাত্রা উপলক্ষে উন্মত্ত অবস্থায় নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার পায়ে ইষ্টক বিদ্ধ হয়। তৎপরে তিনি নরেন্দ্র-সরোবরে স্নান করার পরে বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এবং তিনি ষষ্ঠীর দিবসে তাঁহার আসন্ন তিরোধানের কথা সঙ্গীদিগকে বলেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের যে দুইখানি পুঁথি হইতে নগেন্দ্র বসু মহাশয় উক্ত পুস্তকের সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহার একখানি ২৫০ বৎসরের প্রাচীন, আর একখানি ২০৮ বৎসর পূর্ব্বের লেখা। এমতাবস্থায় এই সুপ্রাচীন নজিরকে অগ্রাহ্য করিবার কোন কারণই নাই। যাঁহারা সমস্ত বিষয়েই অলৌকিক একটা কাণ্ড-কারখানা পাইলে সন্তুষ্ট হন, তাঁহারা ইতিহাসকে তাহার উচিত মূল্য দিতে কুণ্ঠিত হইতে পারেন, কিন্তু অপক্ষপাত সমালোচক অবশ্য স্বীকার করিবেন যে, এ সম্বন্ধে সত্যের অপলাপ করিবার জয়ানন্দের কোনই স্বার্থ ছিল না।

এখন জগন্নাথ-বিগ্রহেই যদি ভগবান চৈতন্যদেব লীন হইয়া থাকেন, তখন এতগুলি প্রাচীন নজিরে যে দরজা বন্ধ করিবার কথা আছে, তাহার সার্থকতা কি? দেখা যায় যে বহুক্ষণ ব্যাপিয়া মন্দিরের দরজা অত্যন্ত সতর্কতার সহিত বন্ধ ছিল। ইহা বড়ই অদ্ভুত কথা! রথযাত্রার সময় গুণ্ডিচা-মন্দিরের সদর দরজা এ ভাবে কেন বন্ধ থাকিবে।

ইহাতে নিশ্চয়ই মনে হয় যে বহু সময় ব্যাপিয়া মন্দিরের মধ্যে সংগোপনে কোন ব্যাপার ঘটিতেছিল। সেই ব্যাপার কি? জয়ানন্দ বলিতেছেন, বহু পুষ্পমাল্য মন্দিরে (হয় ত খিড়কীর পথে) আনীত হইয়াছিল। তিনি আরও লিখিয়াছেন, তাঁহার স্থূল দেহ মন্দিরে পড়িয়া ছিল। সেই দেহের কি হইল?

এ কথাটা সহজেই মনে হয়, গুণ্ডিচা-মন্দিরেই তাঁহাকে সমাধি দেওয়া হইয়াছিল, নতুবা দীর্ঘকাল ভক্তগণকে মন্দিরের বাহিরে রাখা হইল কেন? যদি মহাপ্রভুর দেহ স্থানান্তরিত করা হইত, তবে তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যে করা যাইতে পারিত, এবং তাহা হইলে অল্প বিস্তর সমারোহ বা গোলমাল না হইয়া যাইত না। যে কোন স্থানেই তাহা স্থানান্তরিত করা হইত, সংগোপনের শত চেষ্টা সত্ত্বেও সেই খানেই কতকটা শোকের উচ্ছ্বাস এবং সমারোহ হইতই। সুতরাং মনে হয়, মন্দিরের মধ্যেই তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির সমাধি দিয়া সে স্থান পাথর চাপা দিয়া পুনরায় মেরামত করা হইয়াছিল, এইজন্যই এতটা সময়ের দরকার হইয়াছিল। তাঁহার লীলাবসানের সংবাদ অবশ্যই প্রতাপরুদ্রকে দেওয়া হইয়াছিল। হয় ত, তিনি গোপনে মন্দিরে উপস্থিত হইয়া এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর লীলা নিত্য। ঈশান নাগর লিখিয়াছেন "যদ্যপি চৈতন্যাপ্রকট নহে ভক্ত স্থানে। লোক সিদ্ধ মহা খেদ হৈল ভক্তগণে।" (সতীশ মিত্রের সংস্করণ, অদ্বৈত প্রকাশ, ২১শ অধ্যায়, ২৫৮ পৃঃ) এই নিত্যলীলার শেষ পরিকল্পনা করা বৈষ্ণবের প্রাণে অসহ্য। এজন্য তাঁহার অপ্রকট হওয়ার ব্যাপারটা সংগোপিত হইয়াছিল।

এখন গুণ্ডিচা-গৃহে যে মহাপ্রভুর সংগোপন হইয়াছিল, তাহার আভাষ কবিকর্ণপুর কৃত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে কিছু পাওয়া যায়। পরবর্ত্তীকালে রথযাত্রার সময় প্রতাপ-রুদ্রের ক্ষেদোক্তি মর্ম্মান্তিক। গুণ্ডিচাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতেছেন "সোহয়ং নীলগিরীশ্বরঃ স বিভবো যাত্রা চ সা গুণ্ডিচা। তে তে দিগ্বিদিকাগতাঃ সুকৃতিনস্তাস্তা। আরামাশ্চ ত এব নন্দন বন শ্রীনাং তিরস্কারিণঃ। সর্ব্বান্যেব মহাপ্রভুং বত বিনা শূন্যানি মন্যামহে।"

সংক্ষেপার্থ "এই সেই নীলগিরীশ্বর, সেই রথযাত্রা ও গুণ্ডিচা। তদুপলক্ষে দিক্ দিগন্তর হইতে পুণ্যাত্মা ভক্তগণ দণ্ডায়মান। নন্দনবন অপেক্ষাও শোভাশালী সেই উপবন। কিন্তু আজ মহাপ্রভুর বিরহে আমার সমস্তই শূন্য বোধ হইতেছে।" গুণ্ডিচার সঙ্গে মহাপ্রভুর নীলাবসানের স্মৃতি অতি নিবিড় ও করুণাত্মক ভাবে বিজড়িত। সেখানে যাইয়া প্রতাপরুদ্রের এইরূপ মনোভাব হওয়া স্বাভাবিক।

এখন আমরা চৈতন্যের লীলাবসান সম্বন্ধে কতকগুলি সিদ্ধান্ত পাইলাম যাহা অভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। তিনি আষাঢ়ী শুক্লা তিথিতে জগন্নাথের রথযাত্রায় নৃত্য করিতে করিতে পদে আঘাত পান। সেই আঘাত শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে সাংঘাতিক হইয়া পড়ে এবং তিনি শুক্লা সপ্তমী তিথিতে রবিবার দিন মহাপ্রয়াণ করেন। তাঁহার তিরোধানের বহুক্ষণ পর পর্য্যন্ত গুণ্ডিচার দ্বার রুদ্ধ ছিল। ভক্তগণ কাঁদিয়া কাটিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে পান নাই। অবশেষে যখন মন্দিরের দ্বার খুলিল, তখন পাণ্ডাদের কেহ কেহ বলিলেন, গৌরাঙ্গ জগন্নাথের দেহে বিলীন হইয়া গিয়াছেন, কেহ কেহ বলিলেন তিনি গরুড়ধ্বজ রথে চড়িয়া জগন্নাথদেবের সমীপে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এই সকল বর্ণনা হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হয় পাণ্ডারা সম্ভবতঃ প্রতাপরুদ্রের অভিপ্রায় অনুসারে গুণ্ডিচা-গৃহেই তাঁহার সমাধি দিয়াছিলেন, এবং সেই প্রেমময় দেহ সংগোপন করার পর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা সমাধি-স্থান মেরামত করিয়াছিলেন। তজ্জন্য মন্দিরের দ্বার বহু সময় পর্য্যন্ত অর্গলবদ্ধ ছিল। এখন কথা হইতেছে, লোচনদাস লিখিয়াছেন, রবিবার দিন বেলা চারটার সময় মহাপ্রভুর লীলাবসান হয়; কিন্তু জয়ানন্দ লিখিয়াছেন রাত্রি ৯॥টার সময় নবদ্বীপচন্দ্র অস্তমিত হন। এই বৈষম্যের সমাধান কি করিয়া হইতে পারে?

আমার মনে হয়, এই মতদ্বৈধ খুব একটা বড় ব্যাপার নহে, ইহার অতি সহজ উত্তর আছে। লোচনদাস জানাইয়াছেন শনিবার দিন পায়ের ব্যথা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়াতে মহাপ্রভু গুণ্ডাবাড়ীতে আনীত হন। পরদিন রবিবার প্রাতঃকাল হইতে তাঁহার অবস্থা শঙ্কটাপন্ন ছিল। তখন প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার লীলা-শেষ আশঙ্কা করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং বেলা চারটার সময় তাঁহার তিরোধান ঘটে। তৎপর তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করিয়া সেই স্থান মেরামত করিতে আরও ৫।৬ ঘণ্টা সময় অতীত হয়। সুতরাং এই

সকল কার্য্য নির্ব্বাহান্তে রাত্রি ৯॥টার সময় মন্দিরের দ্বার খোলা হয়। এখন যে সকল পাণ্ডা এ বিষয়ে ঠিক সত্যকার সংবাদ দিয়াছিলেন, তাঁহারা জানাইয়াছিলেন, বেলা চারটার সময় তাঁহার লীলাবসান হয়। কিন্তু যাঁহারা দরজা খোলার সময়টাই মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের সময় বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা লিখিয়াছেন ৯॥টার সময় তিনি গুপ্ত হন। এই কারণে তিরোধানের সময় সম্বন্ধে দুটি ভিন্ন রূপ সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। আমাদের মনে হয়, বেলা ৪টাই মহাপ্রভুর সংগোপনের ঠিক সময় এবং বেলা ৯॥টা তাঁহার সমাধি সমাপনান্তে মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটনের সময়।

এখন আর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য—তাঁহার সমাধি গুণ্ডিচা-মন্দিরের কোন্ স্থানে দেওয়া হইয়াছিল? যিনি জগদ্বন্ধুর সঙ্গে অভিন্ন, তাঁহাকে সমাধি দিয়া সেই স্থানটি কি একেবারে লুপ্ত করিয়া ফেলা হইয়াছে? তাহা হইলে যে শত শত সহস্র সহস্র যাত্রী অজ্ঞাতসারে তাঁহার সুপবিত্র দেহ-সমাধির উপর পা দিয়া চলিয়া যাইবে? যাঁহারা তাঁহাকে সমাধি দিয়াছিলেন, তাঁহারা কি চৈতন্যদেবের পবিত্র সমাধি-স্থানটিকে যার-তার পদধূলিতে কলঙ্কিত করিতে প্রস্তুত ছিলেন? সেই পুণ্য-সমাধির কি কোন নিদর্শনই তাঁহারা রাখেন নাই? আমি সেই মন্দিরে গিয়া দেখিলাম, দুইটি চন্দন কাঠের বৃহৎ সেতু তথায় রহিয়াছে। মাসীমাতা ঠাকুরাণীর বিগ্রহের পার্শ্বে জগদ্বন্ধুর সাময়িক অবস্থানের জন্য পাদপীঠের স্থান রহিয়াছে। কিন্তু মন্দিরের অভ্যন্তরবর্ত্তী ক্ষুদ্র গৃহটিতে মহাপ্রভুর কোন নিদর্শন নাই। ক্ষুব্ধ মনে ফিরিতেছিলাম, হঠাৎ দেখিতে পাইলাম সেই ক্ষুদ্র মন্দিরের দ্বারদেশের এক প্রান্তে শত-শতদলনিন্দিত অতি সুদৃশ্য মহাপ্রভুর চরণ-চিহ্ন বিরাজমান। উহা অভ্যন্তর গৃহের দ্বারের এক প্রান্তে এবং তাহার পরে গুণ্ডিচার বহু-স্তম্ভ-শোভিত বিরাট মণ্ডপগৃহ—সেই মণ্ডপ-গৃহের প্রকাণ্ড দ্বারদেশ রুদ্ধ করিয়া পাণ্ডারা তাঁহার সমাধি দিয়াছিলেন এবং সেই পদচিহ্ন তাঁহার সমাধির নির্দ্দেশক করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। যেখানে গরুড়-স্তম্ভের উপর হস্ত ন্যস্ত করিয়া মহাপ্রভু অষ্টাদশ বর্ষ কাল পুরী-মন্দিরে জগদ্বন্ধুর আরতি দর্শন করিতেন, সেইখানে তাঁহার পদচিহ্ন ছিল। এখন কোন কোন বৈষ্ণব সেই পদচিহ্নের গৌরব বাড়াইবার জন্য উহা সরাইয়া একটা স্তম্ভের উপর স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে ভক্তির মাহাত্ম্য কমিল কি বাড়িল তাহা বুঝিতে পারি না। যেখানে মহাপ্রভু অষ্টাদশ বর্ষ কাল প্রতি প্রাতে ও সন্ধ্যায় দাঁড়াইয়া ভগবানের আরতি দেখিতেন, তাঁহার পদচারণপূত সেই স্থানটির উপর যদৃচ্ছাক্রমে যাত্রীরা যাতায়াত করিতেছে। সেই চরণচিহ্ন তথায় থাকিলে কেহ সে স্থানে পদার্পণ করিত না। ঐরূপ চরণচিহ্ন গোপীনাথ মন্দিরেও আছে। সেখানেও চৈতন্য প্রভু দাঁড়াইয়া গোপীনাথের শ্রীমুখ দর্শন করিতেন।

আমাদের মনে হয়, এই গুণ্ডিচা-বাড়ীর চরণ-চিহ্ন তাঁহারই সমাধি-নির্দ্দেশক। পাণ্ডারা বলিয়াছেন, কোন অজ্ঞাত কারণে সহস্র সহস্র বৈষ্ণব গুণ্ডিচা-বাড়ীর ঐ চরণ-চিহ্নের উপর পড়িয়া লুটপুটি হইয়া অজস্র ধারে নয়নাশ্রু বর্ষণ করেন। যদিও মহাপ্রভুর সংগোপন অতি গূঢ় বিষয়,—তাহা লোকচক্ষু হইতে যথাসম্ভব অন্তরাল করা হইয়াছে—তথাপি ঐ চরণ-চিহ্নের উপর এতাদৃশ মর্ম্মান্তিক শোকাভিনয় কি কোন বিগত কালের লুপ্ত স্মৃতি সংস্কারকে ক্ষীণ অঙ্গুলী সঙ্কেতে নির্দ্দেশ করিতেছে। আমার বিশ্বাস, এই চরণ-চিহ্নই মহাপ্রভুর দেহাবশেষের শেষ নিদর্শনটিকে ক্ষীণ প্রদীপের মত উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছে। আমরা শুনিলাম বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি রামদাস বাবাজি গত বৎসর ঐ চরণ-চিহ্নের উপর পড়িয়া বহু অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। উহা কি তাঁহার অজানিত পূর্ব্বজন্মের সংস্কারের অভিব্যক্তি ঘোষণা করিতেছে? না উহা তাঁহার বৈষ্ণবোচিত স্বাভাবিক ভক্তির আতিশয্যের নির্ব্বিচার প্রকাশ?

আমার মনে হয় চৈতন্যপ্রভুর তিরোধান সম্বন্ধে কতকগুলি জটিল প্রশ্নের আমি সমাধান করিতে পারিয়াছি। এ সম্বন্ধে যদি কাহারও কোন মন্তব্য থাকে, তবে আমি তাহা লইয়া সর্ব্বদাই আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছি।

উত্তরায়ণ

শ্রীঅনুরূপা দেবী

(১৮)

সলিল চলিয়া যাইবার পর নিকটবর্ত্তী আসনটায় বসিয়া পড়িয়া আরতি নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। তার হাত দুখানি অবশভাবে দুপাশে ছিন্ন লতার মতই ঝুলিয়া পড়িল। তার অবসন্ন মাথাটা দেওয়ালের উপরে সে অলস-ভাবে লুটাইয়া দিল। এমন করিয়া আপনাকে একেবারে শিথিল অবসাদগ্রস্ত করিয়া দিয়া সে অনেকক্ষণ ধরিয়াই অনেক কান্না কাঁদিল। তার সুবৃহৎ পাষাণ-ভারের মতই প্রচণ্ড দুঃখের প্রকাণ্ড বোঝাটা এই কান্নার সঙ্গে এক-একটা অগ্নিগর্ভ ধূমায়মান দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা করিয়া যেন গলিয়া পড়িতে লাগিল। নতুবা এত বড় দুঃখে তার বুক হয় ত বা ফাটিয়া যাইত! তার সেই অশ্রুধারা অভিষেকান্ধ অজস্র বর্ষণক্লান্ত শ্রাবণ মেঘের মত গভীর কালো চোখের তারায় গভীর ব্যথার সঙ্গে ফুটিয়া রহিল একখানা মুখ, আর তাঁর চোখের সেই সকরুণ ব্যথাভরা শেষ মৌন দৃষ্টিটুকু।

কতক্ষণ পর্য্যন্ত আরতি তেমন করিয়াই বসিয়া রহিল। কি কঠিন, কি নির্ম্মম ব্যবহারই তাকে দিয়া আজ তার অদৃষ্ট-দেবতা করাইয়া লইলেন! সে কি কোন দিন তার এত বড় অকরুণচিত্ততার কল্পনাও করিয়াছিল?

সলিল,—সলিল তাকে যথার্থই ভালবাসে। হ্যাঁ, তার সেই হতাশাক্ষিপ্ত উদ্ভ্রান্ত মূর্ত্তিতেই সুস্পষ্ট এই কথা ব্যক্ত হইতেছে। এর মধ্যে শুধু দয়া বা আর কিছু নাই, এ নির্ম্মল পবিত্র প্রেমচিহ্ন! আরতি বারেক উতলা হইয়া উঠিল, তবে কি—কিন্তু না,—সলিলের মা যখন তাহাকে ঘরে লইতে অনিচ্ছুক, তখন সে তাঁহাদের মাতাপুত্রের মধ্যে বিরোধ জাগাইয়া দস্যুর মত মার বুক হইতে ছেলে ছিনাইয়া লইবে না। হোক, তার জন্য তার যত দুর্দ্দশা হয় হোক,—সলিলের ঐ কষ্ট চিরস্থায়ী নয়। দুদিন পরে সে তাহাকে ভুলিয়া যাইবে, তার নূতন-পাওয়া সুন্দরী স্ত্রীকে সে আরও বেশি করিয়াই ভালবাসিবে। আরতির এমন কিছু নাই যে, তার জন্য অমন একটা পুরুষ চিরবিরহাকুল হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু আজ যদি সে তার এই যৌবনোত্তেজিত জিদের মাথায় মায়ের অসম্মতিতে আরতিকে বিবাহ করে, দুদিন পরে যখন তাদের মধ্যে নূতন প্রাপ্তির মোহটা একটুখানি কমিয়া যাইবে, তখন নিশ্চয়ই তার মধ্যকার সন্তানের প্রাণ মার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, হয় ত মার মনে দুঃখ দিয়া আরতিকে লওয়ার জন্য মনে মনে সে অনুতপ্ত হইবে।—হয় ত তার সে অনুতাপ ক্রমে ঈষৎ বিরাগে পরিণত হইয়া উঠাও খুবই অসম্ভব বা অসঙ্গতও নয়।

আরতি মনে মনে বলিল, বিপদ তখনই যথার্থ তার রূপে দেখা দেয়, মানুষ যখনই আত্মশক্তিতে সচেতন হয়ে উঠে, অচেতন হয়ে পড়ে। মানুষের মনের মধ্যের ভালমন্দ শক্তিই তার মনুষ্যত্ব লাভের প্রধান সহায়। এই বিবেকের প্রকাশ

যেখানে যত কম, প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশও সেইখানে তত বাধা প্রাপ্ত। আমার তো সবই গেছে, এইটুকুই কেন বাকি থাকে।

যা হারিয়েছি তার কাছে এখন আমার আর কোন ক্ষতিই ক্ষতিবোধ হবে না;—দুঃখ যত আসে আসুক, আমার সইবে। শুধু নিজের দুঃখ যেন অন্যের ঘাড়ে চাপাতে না লুব্ধ হই!

মাধবীর ছোট্ট বাসাবাড়ীতে প্রথম দিন পা দিয়াই আরতি যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। এর আগে দূরে হইতেই সে অভাব ও দারিদ্র্য যতটুকু দেখিয়াছে, সেও এত কম যে, আজকের এর সঙ্গে তার একেবারেই মিল পাওয়া যায় না। সে নির্ব্বাক স্তম্ভিত হইয়া শুধু নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল। এতক্ষণে সে বুঝিল কেন মাধবী তাহাকে সঙ্গে না লইবার জন্য অত জিদ করিয়াছিল,—কেন তাহাকে আনিতে অতই কুণ্ঠিত হইতেছিল, কেনই সলিলকে ত্যাগ করিতে দুঃখিত এবং বিরক্তও হইয়াছিল!

কিন্তু পথ কই? এই অভাবগ্রস্ত পরিবারের অভাব বৃদ্ধি করিয়া এদের অন্নের অংশ গ্রহণ বাস্তবিকই অপরাধ, অথচ না করিলে সে করে কি? তার ভাগ্যই যে তাকে নির্দ্দোষ জীবন যাপন করিতে দিতে প্রস্তুত নয়, সে করে কি?

অত্যন্ত কুণ্ঠার সহিত সে মাধবীকে গিয়া বলিল,—"আমায় কোন রকম একটা চাকরীর জোগাড় করে দিতে পার না ভাই—"

মাধবী কহিল, "এই সেদিন পর্য্যন্ত আপনি রাজার মেয়ে ছিলেন, ইচ্ছে করলেই এখনই রাজরাণী হতে পারেন, আপনি চাকরী করবেন?"

আরতি নতনেত্রে কহিল, "কি ছিলুম, কি হতে পারি, তা মনে করলে ত আর পেট ভরে না মাধবী দিদি! তোমার উপর এত বড় সংসার পড়লো, আবার আমরা দুজন শুদ্ধ তো আর চেপে বসতে পারিনে,—"

বাধা দিয়া মাধবী কহিল, "অমন কথা বলবেন না, দিদিমণি। দুদিন যদি আমার এই কুঁড়েয় আপনারা দুটীতে থাকেন, তাতে আমি মারা যাব না; আর ভাইও তো চাকরী খুঁজচে, যা হয় একটা পাবেই। যদি আমাদের জোটে আপনারও দুমুঠো জুটবে। তবে আমার মনে হয়, উপায় থাকতে কেনই বা এত দুর্দ্দশা ভোগ করবেন; এত কষ্ট কি আপনাদের সুখী শরীরে বরদাস্ত হবে?—"

আরতি সজল চোখে অথচ কষ্টে আহরিত ঈষৎ হাস্যের সহিত প্রত্যুত্তর করিল, "খুব সইবে মাধবী দিদি! যখন এত সয়েছে তখন এই সামান্য খাওয়া-পরার কষ্টটুকু আর সইবে না!"

কিন্তু চিরদিনের সংস্কারকে জয় করা বড় সহজ নয়। আরতি মুখে যাই বলুক, মনের মধ্যে সে প্রতি পদেই অভাব ও দৈন্য অনুভব খুবই করিতে লাগিল; বিশেষতঃ মঞ্জুর জন্য। মঞ্জুর তো কথাই নাই! তার উপর আর একটা বিষয়ে সে পদেপদেই কুণ্ঠা বোধ করিতেছিল,—তাদের জন্য এই পরিবারের সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত পরিচর্য্যার ভাব দেখিয়া,—তাদের কাছে এদের সাধ্যাতীত সেবায়োজন পাইয়া। যে আত্ম-সম্মান রক্ষার্থ সে অত বড় স্বার্থত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, সেই যদি না বজায় রহিল, তবে আর তার ত্যাগের মূল্য কি রহিল?

অনেক চেষ্টা যত্নে আরতির একটা কাজ জুটিল। কাশীর বাঙ্গালীটোলায় কয়েকটী মহিলাশ্রম আছে, ইহার একটী হিন্দু অনাথা মহিলা শিল্পাশ্রমের শিল্প-বিভাগে সে সেলাই শিখাইবার জন্য নিযুক্ত হইল। মাহিনা কিন্তু এতই কম যে, সে কথা শুনিয়া প্রথমে আরতির ঠোঁটে ঈষৎ হাসি দেখা দিলেও শেষটায় তার চোখে জল ঠেলিয়া আসিল। আরতির গবর্ণেসের মাহিনা ছিল দেড়শো টাকা। সে বেচারী হয় ত স্বপ্নেও জানিতে পারিল না যে, তার কাছে শেখা তারই একটী ছাত্রী ১০৲ টাকা মাহিনায় একটী দৈন্যগ্রস্ত আশ্রমের দীনহীনা মেয়েদের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইতে বাধ্য হইল!

আরতি এ ছাড়াও রাত জাগিয়া রেশমের, পশমের ও পুঁতির কাজ তৈরি করিয়া আশ্রমের কর্ত্রীর হাতে বিক্রির জন্য দিতে লাগিল। এ কার্য্যে তার পরিশ্রমের উপযুক্ত লাভ কিন্তু হইল না। লোকে, বিশেষতঃ আমাদের দেশের লোকে বাজারে কেনা জিনিস বেশী দামে লওয়া সহ্য করিতে পারে, কিন্তু গৃহস্থ-কন্যার হাতে তৈরি যাচিয়া-পাওয়া জিনিস হাজার ভাল হইলেও 'গরজ' বুঝিয়া পয়সা দিয়া লইতে নারাজ হয়। দাম লইয়া একান্ত অভদ্রের মতই কষাকষি করিতেও বাধে না। খুব শস্তা পাইতেই মন চায়। কাজেই খরচ ও শ্রমের যোগ্য দাম ওঠে না।

তবুও আরতি নিজের দিকে না চাহিয়াই প্রাণপণ যত্নে রাতদিন খাটিয়া এদিক দিয়াও কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে লাগিল। নিজের কষ্ট ক্রমেই তার সহিয়া আসিতেছিল, কিন্তু মঞ্জুর কষ্ট সে কিছুতেই সহিতে পারিতেছিল না। যে ছেলে লক্ষপতি 'হা পুত্রে'র ঘরের দুলালরূপে আসিয়াছিল, সে আজ ভিখারীর মতই দুঃখ দৈন্যের অকরুণ চক্রতলে এই যে নিষ্পিষ্ট হইতে লাগিল, এ কি দেখা যায়?

ভাল সুটের জন্য সে নিত্য বায়না ধরে, সকালে বাসি রুটী ও ফিকা চা পাতে পড়িলে, চা বিস্কুট, চকোলেট কেক, রসগোল্লা সন্দেশ ও স্যাণ্ডউইচের জন্য হাঙ্গামা করে, ভাতের সঙ্গে মাংস মাছ ডিমের অভাব তাহাকে দিনের পর দিনই উপবাসী রাখিয়া দেয়, আরতির চোখের মধ্যে শুষ্ক অশ্রু আগুনের দাহ আনিয়া দেয়। এক এক দিন তার এ যন্ত্রণা এতই অসহ্য বোধ হইতে লাগিল যে, সলিলকে পত্র লেখার কথাও এক মুহূর্ত্তের জন্য তার মনে হইতে লাগিল। নিজের কষ্ট সে হাসিমুখে সহিতে পারে, কিন্তু মঞ্জুর দুঃখ তার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সে যেন দিশাহারা হইয়া উঠিতেছিল। দিন দিন বালক দুর্ব্বল কৃশ অস্থিসার হইয়া পড়িতেছে, নিত্য তার সর্দ্দি কাশি জ্বর পেটের অসুখ লাগিয়াই আছে, অমন সুন্দর পুষ্ট নধর কান্তি তার ছায়ামাত্র অবশেষ হইয়াছে। এমন করিয়া সে কি বাঁচিবে?

সলিলকে সেদিন সে সহজ অহঙ্কারেই বিদায় দিয়াছিল, কিন্তু এইবার সে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সে দেখিল, মঞ্জুর দিকে চাহিলেই চোখে তার জল ঠেলিয়া আসে। চোখের জল ফেলা তার স্বভাব নয়, সহজে সে ফেলেও না, কিন্তু তাহাকে আটকানোও তার কঠিন বোধ হইল।

জীবনটা যেন তালে তালে চলিতেছে, এই অশ্রু সেই হাসিরই বিনিময়। এতদিন তার সুদিন ছিল বলিয়াই আজ এই ঘোর দুর্দ্দিনের অভ্যুদয়। এর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া যদি কখনও জয়ী হইতে পারে, তবেই আবার তার মনুষ্যত্ব জয়যুক্ত হইয়া উঠিবে। নতুবা এইখানেই সব শেষ!

হ্যাঁ সব শেষ! জয়ী হওয়ার আশা তার যেন দিনে দিনেই শেষ হইয়া আসিতেছে। নিজের দুঃখ তার যত অসহ্যই হোক, সে সহিতে প্রস্তুত হইয়াছে; কিন্তু মঞ্জু—তার বাপ যে তারই উপর নির্ভর করিয়া মঞ্জুকে ফেলিয়া গিয়াছেন; সে মঞ্জুকে যদি সে না বাঁচাইতে পারে!

আরতি নিজেকে অত্যন্ত দুর্ব্বল ও একান্ত অসহায় বোধ করিতে লাগিল। নিজের উপর একবিন্দু বিশ্বাস আর তার রহিল না। এই মানসিক বিপ্লবের মধ্যে আত্মনির্ভরতা তার যেন সম্পূর্ণই ফুরাইয়া গিয়া একটা সুগভীর আত্মগ্লানিতে সমস্ত অন্তঃকরণ ভরিয়া উঠিল। কেন সে সলিলের সঙ্গে গেল না! যত বড় অপমান উহাতে নিহিত থাক, মঞ্জু তো ভাল থাকিত।

অবশেষে হৃতস্বাস্থ্য ভগ্নচিত্ত বালক কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হইল। আরতির প্রাণ উড়িয়া গেল। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, সিরিয়স টাইপের টাইফয়েড! যমের সঙ্গে যুদ্ধ করা যাহাকে বলে ঠিক তেমনই করিয়া শুধু অক্লান্ত সেবা দিয়া আর নিজেকে প্রায় সর্ব্বস্বান্ত করিয়া অবশেষে চল্লিশ দিনের চেষ্টায় মাধবীই তাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিল। আরতি শুধু কাঠের পুতুলের মত মাধবীর নির্দ্দেশ প্রতিপালন করিয়াই দিনের পর দিন, রাতের পর রাত রোগীর শিয়রে বসিয়া কাটাইল। তার মধ্যে এমন শক্তি ছিল না যে, সে এতবড় বিপদে নিজের মাথা, বুদ্ধির কোনই ব্যবহার করিতে পারে। শেষ যেদিন ডাক্তার মঞ্জুকে 'আউট অব ডেন্‌জার' বলিয়া মত দিলেন, সেইদিন আরতির চাপা দেওয়া জ্বর প্রবল মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকটিত হইল,—সে বিছানা লইল।

তিন দিনের দিন তার রোগ ভীষণতর হইয়া উঠিল। একসঙ্গে এতবড় দুইটী রোগী লইয়া মাধবী যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল।

মঞ্জুর রোগ এখন আরোগ্যের পথ ধরিয়াছে, সর্ব্বদা তাকে সযত্নে ও সাবধানে দেখা-শুনা, ঔষধ-পথ্য দেওয়ার একান্ত প্রয়োজন। কঠিন রোগের সহিত প্রাণান্ত সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ক্ষুদ্র বালকের ক্ষীণ প্রাণ একেবারেই ক্লান্তির চরমে পৌঁছিয়াছে। গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নের রৌদ্র-ঝলসিত চারা গাছটীর মতই তাহাকে ছায়ায় ঢাকিয়া অল্প অল্প জল সিঞ্চনে কোনমতে জীয়াইতে হইবে। আর ঠিক এই সময়েই আবার এতবড় আর একটা কাণ্ড! তার উপর মঞ্জুর এখন ঠিক অজ্ঞান বা সম্পূর্ণ সজ্ঞান অবস্থাও নয়, আবদার কান্নার তার যেন শেষ নাই; তার পর আবার কাঁদিতে গেলেই তার বিষম লাগে, কাশি আসে, চোখ কপালে উঠিয়া যায়!

মাধবী বড় বিপদে পড়িয়া প্রমাদ গণিল। অবস্থা তার সামান্য, ডাক খুব বেশী আসে না ; যা' আসে তা'তে কোনগতিকে দিনপাত হয়। সেই অবস্থায় এই সব ব্যাপারে তার ক্রমাগতই ডাক ছাড়িয়া দিতে হইতে লাগিল। সংসার চলা, রোগের খরচ দুই-ই অচল হইয়া উঠিল। ডাক্তারটী ডাক্তারের বাড়ী হিসাবে ভিজিট না লইয়া দেখিতেছিলেন, তবে বিনা ভিজিটে উপর্য্যুপরি দুটী বড় রোগী দেখায় ধৈর্য্য অটুট থাকা কঠিন, একটু ঢিলাঢিলি পড়েই। কিন্তু ওযুধ-পথ্য এসব তো আর বিনা পয়সায় পাওয়া যায় না। দিনে দিনে অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসির বিলের অঙ্ক মোটা হইতে মোটা হইতেই থাকিল।

মাধবীর শরীরও কষ্টে পরিশ্রমে ও দুর্ভাবনায় ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম করিল। সে যে কেমন করিয়া কি করিবে, তার কোন ঠিকানাই করিতে পারিল না।

অবশেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া সে আরতির কাকাকে এবং সলিলকে দুইখানা তার দিল। সলিলের ঠিকানা সে তাহারই মুখে শুনিয়া জানিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

জ্ঞানদাসের নূতন পদ

শ্রীগৌরীহর মিত্র বি-এ

বিশ্ব-বরণ্যে সাধক কবি জয়দেব ও চণ্ডীদাস প্রভৃতির ন্যায় অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন কবির ভগবৎ-প্রেমের পুণ্য প্রভাবে সমগ্র বঙ্গের চিত্ত-ক্ষেত্র কর্ষিত ও প্রেমামৃত-রসে অভিসিঞ্চিত হইয়া গেলে, শুভ অবসরে শ্রীমদ্ অদ্বৈত প্রভুর আকুল আহ্বানে, প্রেমের অবতার শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইল।

চৈতন্য মহাপ্রভুর ভাস্বর দীপ্তালোকের রশ্মিরেখা-সম্পাতে প্রেম-সরোবরে অগণিত শতদল যুগপৎ প্রস্ফুটিত হইয়া ভারতভুবন আলোকিত এবং স্বর্গীয় সৌরভে ক্ষুদ্র মানব-চিত্তকে একেবারে আত্মহারা ও প্রমত্ত করিয়া তুলিল—নিতাইচাঁদের স্নিগ্ধ রশ্মির সুখ-স্পর্শে শতশত কুমুদ দিগ্দিগন্ত সমুদ্ভাসিত করিয়া প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। গৌর-নিতাইয়ের প্রেম-পীযূষধারায় অভিসিঞ্চিত হইয়া চপলমতি ও ক্ষীণ-প্রাণ মানবের মুগ্ধ চিত্ত স্ফূর্ত্তিলাভ করিল—সমগ্র দেশময় গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে, একাধারে ভক্ত কবি ও প্রেমিকের উদ্ভব হইল। তাঁহারা এই দেশপ্লাবী প্রেমামৃত-বন্যায় অভিষিক্ত হইয়া, সেই প্রেম প্রকাশের চেষ্টায় অগণিত বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়া বঙ্গভাষার যে কিরূপ পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন, তাহা সহজে নির্ণয় করা যায় না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের তিরোভাব ঘটিলেও তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কাল বঙ্গ-সাহিত্যের পক্ষে এক অতুলনীয় পরম গৌরবের যুগ। কেন না, তাঁহাদের তিরোভাবের পর—

নিত্যানন্দ ছিলা যেই নরোত্তম হৈলা সেই
শ্রীচৈতন্য হৈলা শ্রীনিবাস।
শ্রীঅদ্বৈত যারে কয় শ্যামানন্দ তিঁহো হয়
ঐছে হৈলা তিনের প্রকাশ॥
সে তিনের অপ্রকটে এ তিনের আবির্ভাব
সর্ব্বদেশ কৈলা ধন্য দিয়া ভক্তিভাব।
—'প্রেমবিলাস,' ২০শ বিলাস

এই সাধকত্রয়ের অপূর্ব্ব পুণ্য প্রভাবে বঙ্গদেশ—বিশেষতঃ নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী সমগ্র মনোহরসাহী পরগণা মনঃ প্রাণ অর্পণ করিয়া তারস্বরে প্রেমের যে সুমধুর সঙ্গীত আলাপনে প্রবৃত্ত হইল, তাহার তুলনা নাই। এতদঞ্চলের এই অগণিত কবিবৃন্দের মধ্যে পদকর্ত্তা জ্ঞানদাস অপূর্ব্ব দীপ্তিপ্রভায় মহিমান্বিত হইয়া রহিয়াছেন। বলিতে কি, প্রাক্-চৈতন্য যুগে যেমন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস, চৈতন্যোত্তর যুগেও তেমনি জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস অপূর্ব্ব শক্তিশালী ভগবৎ-প্রেমিক সাধক কবি।

সুবিখ্যাত বৈষ্ণব-পদকর্ত্তা জ্ঞানদাস, বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত (পূর্ব্বে, বীরভূম) মনোহরসাহী পরগণা মধ্যে কেতুগ্রাম থানার অধীন, আহমদপুর-কাটোয়া রেল

লাইনের রামজীবনপুর ষ্টেসন-সংলগ্ন বড়কান্দরা নামক গ্রামে অনুমান ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এই কান্দরাগ্রাম কাটোয়ার ১০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

পদকর্ত্তা জ্ঞানদাস সর্ব্বজনমান্য মহা প্রতিভাবান ও অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তি-সম্পন্ন প্রেমিক কবি। তাঁহার কবি-প্রতিভার পরিচয় প্রদান করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার মুরলী-শিক্ষা, নৌকা-খণ্ড, গোষ্ঠ-বিহার, প্রশ্নদুতিকা, সখী-শিক্ষা, ষোড়শ গোপালের রূপবর্ণন, পূর্ব্ব-রাগ, মান, মাথুর প্রভৃতি বিষয়ক পদ বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্য মধ্যে উজ্জ্বলতম রত্নরূপে দীপ্তি পাইতেছে।

তাঁহার— সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥
সখি! কি মোর কপালে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেড়ল
মানিক হারানু হেলে॥ ইত্যাদি—

বা,—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥ ইত্যাদি

ইত্যাদি সখী-সম্বোধন বিষয়ক পদের তুলনা কোথায়?

বিবিধ পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া স্বর্গীয় রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়, প্রায় ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে জ্ঞানদাস রচিত ৩০১ টি পদ প্রকাশিত করিয়াছেন। তার পর প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য সংক্রান্ত অনুসন্ধান-কার্য্য বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। ইহার ফলে, বহু অপ্রকাশিত রচনা-সম্বলিত প্রাচীন পুঁথির উদ্ধার সাধন হইয়াছে। এই সকল পুঁথির মধ্যে জ্ঞানদাসের অনেক অপ্রকাশিত পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল পদাবলী একত্র সংগৃহীত হইয়া জ্ঞানদাসের সমগ্র রচনা অচিরে প্রকাশ করা একান্ত আবশ্যক।

আমাদের 'রতন' লাইব্রেরীতে যে চারি পাঁচ সহস্র প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত রহিয়াছে, তাহার মধ্যে বহু পদ-সংগ্রহ পুঁথিমধ্যে জ্ঞানদাসের অপ্রকাশিত পদের সমাবেশ রহিয়াছে। ২১৭৬নং পুঁথিতে কেবলমাত্র জ্ঞানদাসের পদাবলী সংগৃহীত আছে। এই পুঁথিখানি খণ্ডিত। ১১—২১=১১ পত্রে, ৫৪—১১০=৫৭টি পদ আছে। এই পদগুলির মধ্যে ১৭টি পূর্ব্বরাগ, ৪টি দান ও ৯টি রসো-দ্গারের পদ। ইহার মধ্যে ২৪টি পদ রমণীবাবুর পুস্তকে বা সতীশবাবুর অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী গ্রন্থ মধ্যে নাই; সুতরাং, এ যাবৎ অপ্রকাশিত। পদকর্ত্তা জ্ঞানদাসের সমগ্র পদ-সঙ্কলয়িতার কার্য্য-সৌকর্য্যার্থ আমরা এই স্থলে আপাততঃ মাত্র চারিটি পদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আবশ্যক হইলে, অন্যান্য পদাবলীও প্রকাশ করিতে প্রস্তুত রহিলাম।

ধানশী

(১)

পহিলহি নায়ক করল আরম্ভ।
সিন্দুর সুন্দর করিবর কুম্ভ॥
বিদগধি নায়রী অধিক সুজান।
চন্দন চাঁদ কয়ল নিরমাণ॥ ১॥
কি কহব রে সখি, রস অবিশেষ।
দোঁহাই বনায়ল দোঁহোজন বেশ॥
অঞ্জনে রঞ্জন খঞ্জন জোর।
নিজতনু ভরমে ভালে ভেল ভোর॥ ধ্রু॥
বিবিধ কুসুমে কুন্তল সাজ।
কবরী বনায়ল বিদগধ রাজ॥ ২॥
রতন জড়িম মণি কাঞ্চন দাম।
চূড়া চিক্কণ কয়ল অনুপাম॥
দোঁহো জন বেশে ভেল দোঁহো, ভোর।
জ্ঞানদাস কহ বৈদগধি ওর॥ ৩॥ ৭৩॥

শ্রীরাগ

(২)

যব মোহে পেখলু শ্যামর নাহা।
অমিয়া সরোবরে করু অবগাহা॥
অনিমিখ নয়নে হামারি মুখ হেরি।
তুয়া পরথার করল কত বেরি॥ ১॥

এ সখি এ সখি কি বলিব আন।
জানলু তুয়া দিল জীবন কান॥ ধ্রু॥
হরখে পূরল তনু রহ পরিপুর।
লোরে ভরল দুহু নয়ন দুকূল॥
এতদিন হামারি—আছল চিতে আন
কত কত শুনল তুয়া গুণগান॥ ২॥
কি কহব সুন্দরি তোহারি সোহাগ।
ধনি তুয়া ধনি পিয়া ধনি অনুরাগ॥
আজুকাল কি রে আওব নাহা।
জ্ঞানদাস কহ তব নিরবাহা॥ ৩॥ ৫৪॥

শ্রীরাগ

(৩)

চিরদিন না রহে কুসুমে মকরন্দ।
পহরে না পাইয়ে দ্বিতীয়াক চন্দ॥
অহনিশি না রহ চন্দন রেহ।
ঐছন জানিয়ে যৌবন এহ॥ ১॥
শুন শুন সুন্দরি কি বোলব আন।
গত ধন লাগি না বঞ্চহ কান॥ ধ্রু॥
জগমাহা জানএ মঝু ভোল মন্দ।
হিংসক জন সঙ্গে কভু নহে দ্বন্দ॥
যাচক বুঝিয়ো না করয়ে দান।
এথে বড় আছে কি ধনি ল অবজান॥ ২॥
নিজ মন মন্দিরে করহ বিচার।
জীবন নহ বিনু পর উপকার॥
এতএ জানি যদি হয়ে অবধান।
জ্ঞানদাস কহ জগতে বাখান॥ ৩॥ ৫৯॥

রসোদ্গার—ধানশী

(৪)

যব সখী চললহি আপন গেহ।
তব মঝু নিন্দে ভরল সব দেহ॥
সুতি রহল হাম করি এক চিত।
দৈব বিপাকে ভেল সব বিপরীত॥ ১॥
না বোলহ সই শুন স্বপন সম্বাদ।
হেরইতে কেহো জানি কহে পরিবাদ॥ ধ্রু॥
বিসদ পড়ল মঝু হৃদয়ক মাঝে।
তুরিতে ঘুচাইতে নিজ থল বাজে॥
এক পুরুখ পুন আনি দিল আগে।
কোপে অরুণ আঁখি অধরক দাগে॥
সে ভয়ে চিকুর চির আপহি গেল।
কপোলে কাজর মুখে সিন্দুর ভেল॥
এতএ করব কেহো অপযশঃ গাব।
জ্ঞানদাস কহ কো পতিয়াব॥ ৩॥ ৯৭

এই পুঁথির সহিত এ-যাবৎ মুদ্রিত বা প্রকাশিত পদের অনেক বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হইতেছে—স্থলবিশেষে আবার মুদ্রিত পুস্তকে অনেক স্থলে দুই চারি ছত্র নাই। এই সকল কারণে সকল পুঁথি মিলাইয়া পাঠান্তর-সহ নূতন পুস্তক সঙ্কলন করিতে হইবে। আমরা এই স্থলে এইরূপ পাঠান্তর ও ছত্র বাদ দেওয়ার উদাহরণ স্বরূপ একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

(রমণী বাবুর পুস্তকের পাঠ)

করুণ—একতালী

যতেক আছিল মোর মনের বাসনা।
ভুবনে রহল সভে অযশ ঘোষণা॥
সই কহিনু নিদান।
প্রেমের পরাণ সহে এতেক অপমান॥ ধ্রু॥
যারে দিনু তনু মন কুল শীল জাতি।
অঙ্গের ভূষণ কৈনু বড় অথেয়তি॥
সে জন কি লাগি এবে করে ভিন পর।
ঝাপন কূপে পড়ল নব চোর॥
গুরুয়া পিয়াসে ঝাঁপল সিন্ধুজলে।
অধিক পুড়িল অঙ্গ বাড়বা অনলে॥
না জানি পীরিতি বিরিখে হেন ফল।
জ্ঞানদাস শুনিয়া হারাইল বুদ্ধি বল॥ (পৃঃ ১৮৫)

(পুঁথির পাঠ)

সিন্ধুড়া

যতেক আছিল মোর মনের বাসনা।
ভুবনে রহল সবে অযশ ঘোষণা॥
বড় বলি কানুরে করিলু বড় লেহ।
আছুক আনের কাজ জীবন সন্দেহ॥ ১॥
সই কহল নিদান।
প্রেমের পরাণে সহে এতেক অবজান॥ ধ্রু॥
যারে দিলু তনু মন কুল শীল জাতি।
অঙ্গের ভূষণ কৈল বড় অথেয়তি॥

সে জন কি লাগি এবে করে ভিন্ন পর
ঝাঁপল কূপে নব পড়ল বনচর ॥ ২ ॥
গুরুয়া পিয়াসে ঝাঁপল সিন্ধু জলে।
অধিক পুড়িল অঙ্গ বাড়বানলে ॥
না জানি পিরিতি বিরিথ হেন ফল।
জ্ঞানদাস শুনি হারাইল বুদ্ধিবল ॥ ৩ ॥ ১০২

আর একটি পদের একঅংশ উদ্ধৃত করিয়া এইরূপ পাঠান্তর প্রদর্শনপূর্ব্বক এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি—

(রমণীবাবুর পুস্তকের পাঠ)

কামোদ

রূপকলা গুণ সব সম্পূরণ
ঐছন কানু বর মাহ।
আছিল আমার চিতে তুয়া সহ মিলাইতে
ভালে ভেল বিহি নিরবাহ ॥
সহিহে কাহে তুহুঁ মানসি লাজে।
বিহি পরসাদে সাধ সব পূরল
বুঝল মো অপরূপ কাজে ॥ ইত্যাদি

(পৃঃ ১০৪)

(পুঁথির পাঠ)

"সুহই"

রূপ কলাগুণ সব তোহে সমপণ
ঐছন কাহা রব নাহ।
আছিল হামার চিতে তুয়া সঙে মিলাইতে
ভালে ভেল ভাল নিরবাহ ॥ ১ ॥
সখিহে কাহে না মানসি লাজে।
বিহি পরসাদ সাধ তুয়া পূরল
বুঝল অদভূত কাজে ॥ ধ্রু ॥

ইত্যাদি ॥ ৩ ॥ ৮৮ ॥

ব্রতচারিণী

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(৭)

প্রকাণ্ড দালানটা অতিক্রম করিলে তবে বিহারীলালের শয়ন-গৃহ পাওয়া যায়। তাঁহার এই গৃহটীর সঙ্গে অন্দরের ও বাহিরের সমান যোগ থাকিলেও ঘনিষ্ঠতা কাহারও সহিত ছিল না। অন্দরের দিককার দরজাটা প্রায়ই বন্ধ থাকিত। যখন বিশেষ আবশ্যক পড়িত, এই দরজা খুলিয়া দিলে সীতা আসিতে পাইত।

বিছানার উপর বিহারীলাল শুইয়া পড়িয়াছিলেন। নিকটে আর কেহ ছিল না। রাখাল তামাক দিয়া বাহিরে দরজার কাছে যে কোন আদেশের প্রতীক্ষায় নিয়মিতভাবে বসিয়া ঝিমাইতেছিল।

সীতা প্রবেশ করিতে করিতে উদ্বিগ্নভাবে বলিল, "আজ এখনি যে ঘরে এসেছেন দাদু? রোজ আপনি তো রাত দশটার কমে বৈঠকখানা হতে ওঠেন না,—তাও কত ডেকে ডেকে—খাবার জুড়িয়ে যায় বলে আপনাকে ঘরে আনতে হয়। আজ না ডাকতেই এই সন্ধ্যে সাতটার সময়ে ভেতরে এসে চুপ করে শুয়ে পড়ে আছেন যে,—অসুখ-বিসুখ কিছু করে নি তো?"

দেয়ালের আলোটা অত্যন্ত মৃদুভাবে জ্বলিতেছিল। ঘরের মধ্যে আলো ও অন্ধকার দুইটা মিলিয়া সমান আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। সীতা আলো বাড়াইয়া দিল। তাহা[র] পর বৃদ্ধের ললাটে হাত দিয়া গায়ের তাপ পরীক্ষা করিল।

বিহারীলাল তাহার কোমল হাতখানা চোখের উপ[র] চাপিয়া ধরিয়া শ্রান্তভাবে বলিলেন, "না রে পাগলী, অসু[খ] হয় নি। বাইরে আজ বিশেষ কায কিছুই ছিলনা, আ[জ] একখানা পত্রও আজ বিকেলের ডাকে পেলুম। পত্রখান[া] সকালে আসার কথা, কিন্তু সকালে আজ পোষ্টম্যা[ন] ডেলিভারি করতে পারে নি, বিকেলে দিয়ে গেল। সেখা[ন] তোমাদের পড়াবার জন্যে তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। [ই] তোমার কাছে ছিলেন না?"

সীতা উত্তর দিল, "হ্যাঁ, মা ছিলেন। তাঁর শরীর আজ ভারি খারাপ করছে বলে তাড়াতাড়ি করে শু'তে চলে গেলেন। আমিও আজ বেশী পীড়াপিড়ি করি নি; কারণ বাস্তবিকই আজ কয় দিন হ'তে তাঁর শরীর খারাপ যাচ্ছে।"

বিহারীলাল বলিলেন, "তবে থাক, মাকে আজ ডেকে কোন দরকার নেই। কাল তুমিই মাকে এই পত্রখানা দিয়ো, তিনি নিজে যেন পড়ে দেখেন।"

বালিসের তলা হইতে তিনি এন্‌ভেলাপ-বদ্ধ একখানা পত্র বাহির করিয়া সীতার হাতে দিলেন। সীতা কভারে লিখিত ঠিকানা দেখিয়া লইয়া বলিল, "এ যে আপনার পত্র দাদু।"

বিহারীলাল শ্রান্ত দেহখানা বিছানায় এলাইয়া দিয়া বলিলেন, "আমার নামে বটে, কিন্তু ছোট বউমা সকলকে উদ্দেশ করেই লিখেছেন। তাঁর বিশেষ ইচ্ছা পত্রখানা তুমি, জ্যোতি, মা সকলেই দেখ। পড় মা,—আমি বলছি, কোন বাধা নেই, তুমি পড়।"

সীতা পত্রখানা সন্তর্পণে খুলিয়া পড়িতে লাগিল।

ক্ষুব্ধকণ্ঠে বিহারীলাল বলিলেন, "বুড়োরা হাজার শক্ত হলেও এক এক সময়ে ভারি দুর্ব্বল হয়ে পড়ে দিদি। ইভার পত্রখানা যেদিন পেলুম, সেদিন এই পাষাণ বুকে স্নেহধারা হঠাৎ উৎসারিত হয়ে উঠল,—একবার তাকে আমার কাছে পাওয়ার আশায় আমি পাগল হয়ে গেলুম। একবারের জন্যে তাকে আসতে বলেছিলুম, কিন্তু বউ মা আমায় জানিয়েছেন, এখন তা হতে পারে না। দিদি, উচ্চ মাথা আমার হেঁট হয়ে পড়েছে, আমার মুখে বউ মা কালি দিয়েছেন। এই পত্র পাওয়ার আগে পর্য্যন্ত আমি ভেবেছিলুম—ইভার ওপরে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে; কারণ, সে আমার পৌত্রী, আমার প্রতাপের মেয়ে। সে তার মামাদের নয়, সে তার মায়ের নয়, সে আমার,—একমাত্র আমার। কি মোহ আমার, উপযুক্ত শাস্তিও পেয়েছি। যতটুকু কোমল হয়েছিলুম, তার বেশী কঠিন হয়েছি। আমার কোমলতার কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করছি—এখনও করব। আজ মনে পড়ছে দিদি,—প্রতাপ আমায় বলে গেছে, বাবা সেও কেউটের ছানা,—তারও বিষ আছে, ফণা তার মায়ের মতই সে ধরতে জানে। সে কথা মিথ্যে নয়,—আজ বড় আঘাত পেয়ে আমার ভুল বুঝতে পেরেছি।"

ইভার মা অত্যন্ত নরমভাবে জানাইয়াছেন, ইভা এইবার ম্যাট্রিক একজামিন দিতেছে,—সেইজন্য পড়ার ক্ষতি হইবার ভয়ে সে এখন কোথাও যাইবে না। আর কয়টা দিন বাদে তাহার ফাইনাল আরম্ভ। তাহার পরে সে যদি ইচ্ছা করে তবে রামনগরে যাইবে।

সীতা পত্রখানা মুড়িতে মুড়িতে বলিল, "সত্যই দাদু, তার একজামিন সামনে,—এখন পড়ার ক্ষতি করে,—"

তীব্রস্বরে বিহারীলাল বলিলেন, "সে বেশ ভাল কথা, আমি তার জন্যে কিছু বলছিনে। ওই যে লিখেছে—যদি রামনগরে যেতে তার ইচ্ছা হয় সে যাবে—ওইখানেই যে কথা বাধছে দিদি! ছোট বউ মা এখানে এসে কয়দিন থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন, তাঁর কাহিল অবস্থা দেখে আমায় বাধ্য হয়ে তাঁকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিতে হয়েছিল। তাঁরই মেয়ে ইভা, সে কেউটের ছানা,—আগেই বলে বসবে—আমি পল্লীগ্রামে যাব না। ওরা যে সহরের জল-হাওয়ায় পুষ্ট, পল্লীগ্রামে এসে ওরা কি থাকতে পারবে বলে তুমি মনে কর? কিন্তু কি স্পর্দ্ধা প্রতাপের স্ত্রীর—সে আমার পত্রের উত্তর নিজে দিয়েছে, স্পষ্টই জানিয়েছে ইভা আসবে না।"

রাগটা তাঁহার অতিরিক্ত হইয়া গিয়াছিল। এতটা রাগের কারণ পত্র-মধ্যে ছিল না। কিন্তু তিনি এই পত্রখানা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আগেকার কথাগুলা মনে করিয়া এই পত্রের সামান্য ত্রুটীও খুব বড় করিয়া ধরিয়াছিলেন। সীতা পত্রখানা দশবার ভাঁজ করিতে লাগিল, দশবার খুলিতে লাগিল,—কি বলিবে তাহা সে ঠিক করিতে পারিতেছিল না।

বিহারীলাল কিছুক্ষণ নীরবে রহিলেন। তাহার পর ধীরস্বরে বলিলেন, "আমি বেশ বুঝছি—তুমি ভাবছ সীতা, এই সামান্য পত্রখানা পেয়ে আমি এতটা রেগে উঠলুম কেন? আমার বুকে অহরহ যে আগুন জ্বলছে দিদি, সে আগুনে আমার সব পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও এখনও আগুন নেভে নি। এই পত্রখানা সেই আগুনে ইন্ধন যুগিয়েছে। তুমিই এক দিন কথায় কথায় বলেছিলে সীতা, হয় তো আমার পত্র পায় না বলেই ইভার সাহস হয় না আসার কথা বলতে। তোমার কথা শুনে আমার উঁচু সুরে বাঁধা হৃদয়-তারটা হঠাৎ কোমল পর্দ্দায় নেমে

গেল। আগেকার সব কথা, বউ মার ব্যবহার, প্রতাপের মরণের কথা,—সব ভু'লে গেলুম। তখন মনে হল—ইভার সেই ছোট মুখখানি,—আধফোটা ফুলের মত টলটল করছে,—মনে হল তার সেই আধ-আধ কথা। যদি সে নিজে আমায় লিখত—আমি একজামিনের পরে যাওয়ার চেষ্টা করব,—এই এতটুকু মাত্র কথা সীতা—বেশী তো চাই নি আমি,—তা হলে আজ তো আমার এত দুঃখ হত না দিদি। বউ মা লিখেছেন, এতে জানাচ্ছে—আমি ইভার কেউ নই, তার ওপরে আমার এতটুকু দাবী নেই। এতে জানাচ্ছে—তিনি আমায় গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না,—মেয়েকে শিক্ষা দেওয়া, তার এখানে আসা—এ সবই তাঁর ইচ্ছার ওপরে নির্ভর করছে। ভারী সুন্দর সীতা,—স্বামীর প্রতি তিনি যা কর্ত্তব্য দেখিয়েছেন, বৃদ্ধ শ্বশুরের প্রতি দেখাচ্ছেন—এ শিক্ষিতাতেই সাজে,—আর তাই বুঝি আরও সুন্দর বলে মনে হয়।"

আবার খানিক তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। সীতার হস্ত বুকের উপর টানিয়া আনিয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, "কুক্ষণে প্রতাপের ওখানে বিয়ে দিয়েছিলুম। অনেকে নিষেধ করেছিল, তাদের কথা শুনি নি,—ভাবলুম, যেমন বড় বউমাকে পেয়েছি, তেমনি ছোট বউমাকেও পাব। গোড়াতেই বড় ভুল করেছিলুম,—সেই ভুলের শাস্তি আজীবনকাল আমায় ভোগ করতে হচ্ছে। এই তো পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল—যা মেয়েদের মাথা একেবারে বিকৃত করে দেয়। আর এরই জন্যে আমি মেয়েদের শিক্ষা দিতে চাই নে। অনেকে বলতে পারে, শিক্ষা দিলে মানুষের মন উন্নত হয়,—এই হিসাবে মেয়েদের মনের সঙ্কীর্ণতা দূর করবার জন্যে তাদের শিক্ষা দেওয়া ভাল। যারা বলে—তারা শিক্ষিতা হয়ে পরকে ভালবাসতে শেখে. পরকে আপন করে নেয়। তারা মর্ম্ম দিয়ে আমার মত এ কথার সত্যতা অনুভব করতে পারে নি ; তাই দু' কথা বলে যায়। আমার ছোট বউ মা শিক্ষিতা, আলো পেয়েছেন, তাই সহর হতে পল্লীতে এসে মুখ বিকৃত করেছেন। কিছুতেই তিনি এখানকার মেয়েদের সঙ্গে মিশতে পারেন নি। এদের কাছে এসেও তিনি নিজের মহত্ব নিয়ে অনেক দূরে সরে থাকতেন। তাঁর শিক্ষা তাঁকে যথার্থ শিক্ষিত স্বামীর সঙ্গে মিশতে দেয় নি,—মাঝখানে বিরাট ব্যবধানরূপে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর পাশ্চাত্য শিক্ষায় আমাদের দেশের সতী, সীতা, সাবিত্রী নেই, তাই তিনি জানতে পারেন নি—স্বামী যদি গাছতলায় বাস করেন, স্ত্রীকেও স্বর্গ মনে করে সেই গাছতলায় বাস করতে হবে। তিনি জেনেছেন—স্বামী দেবতা নয়—সংসারের সাথী মাত্র।—তাই যখন তিনি পল্লীগ্রামে থাকতে পারলেন না—চলে গেলেন, দুদিনের সাথীকেও ফেলে চলে গেলেন,—পাতিব্রত্য যে একটা ধর্ম্ম তা তিনি স্বীকার করতে পারলেন না। হতভাগ্য ছেলে আমার—কি আর বলব সীতা, স্ত্রী-কন্যা থাকতেও তার কিছু নেই জেনে এই বুড়ো বাপের কোলে মাথা রেখে—"

তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে কাঁপিতে রুদ্ধ হইয়া গেল। শুষ্কনেত্রে অন্যমনস্কভাবে তিনি কোন দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সীতা আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, একটী শব্দ তাহার মুখে ফুটিল না।

কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বৃদ্ধ পুনরায় বলিলেন, "সে কি আমারই কাষ ছিল দিদি? সে তার স্ত্রী-কন্যাকে দেখবার জন্যে অধীর ভাবে চারিদিকে চাহিল, একবার—শুধু একবার মাত্র তার মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা স্বর ফুটল—ইভু, তার পর সব নীরব, আর একটী কথা তার মুখে ফুটল না। কি হল বল দেখি দিদি! কোথায় আমার মাথা কোলে করে নিয়ে সে বসবে, তা না হয়ে আমি তার মাথা কোলে নিয়ে বসলুম, তার মুখে আমি জল দিলুম,—তার কানে আমি ভগবানের নাম ঢেলে দিলুম। সে কি আমার কাজ সীতা, সে কি কোন বাপে করতে পারে? কিন্তু পারলুম,—সব পারলুম সীতা,—জানিনে কে আমায় সে শক্তি দিয়েছিল, কে আমায় স্থির করে রেখেছিল! নিস্পলকে সেই মুখখানার পানে তাকিয়ে রইলুম, দেখলুম—ধীরে ধীরে তার দুটি চোখের পাতা কেমন মুদে এল, "বাবা" বলে ডাকতে ডাকতে তার স্বর বন্ধ হয়ে গেল, সব দেখলুম। তার পর শেষ যা তাও করলুম দিদি, সেই ছেলের সঙ্গে শ্মশানে গেলুম,—লোকে যেতে দিচ্ছিল না, বলছিল আমি তার মুখাগ্নি করতে পারব না। তা কি হয় রে,—এ বুক যে পাষাণে গড়া, এ কিছুতে ভাঙ্গে না। বৃদ্ধ বাপের সামনে শেষ একটীমাত্র ছেলের শব চিতায় উঠল!—জানিস দিদি, নিজের

হাতে তার মুখে আগুন দিলুম,—ধূ ধূ করে পুড়তে লাগল, ছাই হয়ে গেল। আমার সুসন্তান—আমার যোগ্য, পিতৃভক্ত ছেলের সব শেষ হয়ে গেল,—দাঁড়িয়ে দেখলুম। বাড়ী ফিরে এলুম, পরদিন সকালে শুনলুম—তারা এসেছে। আমার মাথায় দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল, শ্রাদ্ধের যোগাড় করবার অধিকার তাদের দিলুম না,—তাদের তাড়িয়ে দিলুম।"

এক একটী কথা যে কতখানি বেদনাভরা, তাহা সীতা অন্তর দিয়া অনুভব করিতেছিল। বিহারীলাল একটু চুপ করিবামাত্র সে অধীর ভাবে বলিয়া উঠিল, "থাক থাক দাদু,—আমি ও-সব শুনেছি, আর অনর্থক—"

বাধা দিয়া উত্তেজিত-কণ্ঠে বৃদ্ধ বলিলেন, "অনর্থক নয় সীতা, আমার মধ্যে অহরহ সেই কথাই জাগছে যে! শুনেছ কখনও—সত্তর বছরের বৃদ্ধ যুবকের মত অসীম উৎসাহ নিয়ে কেবল কাযই করে যায়, এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম নিতে চায় না? কেন বিশ্রাম নিতে চাইনে তা জানো? বিশ্রামের সময় মনে পড়ে প্রতাপের কথা। প্রতাপ যে প্রকাশের বিয়োগকে ভুলিয়ে রেখেছিল সীতা, তারই জন্যে আমি প্রকাশকে একটা দিন মনে করতে পারিনি। পুরাণে পিতৃভক্ত রামের কথা পড়েছ,—যে পিতৃ-আজ্ঞায় চৌদ্দ বছর বনবাসী হয়েছিল,—আমার ছেলে আমার জন্যে নিজের স্ত্রী-কন্যা পর্য্যন্ত ত্যাগ করেছিল। ছোট বউ মা এখানে থাকতে চান নি,—কিন্তু তিনি, তাঁর ভাই, প্রতাপকে নিজেদের কাছে রাখবার জন্যে চেষ্টার ক্রটী করেন নি। পিতৃভক্ত সন্তান আমার—কিছুতেই আমার সঙ্গ ত্যাগ করেনি। বউ মার—তাঁর ভাইয়ের সব পত্র সে আমায় দিয়েছিল, আমি পড়িনি,—সব ওই ড্রয়ারে পড়ে আছে। আমি কাউকে সে পত্রের কথা বলিনি, কাউকে দেখাইনি; আজ বড় মনের দুঃখে তোমাকে বললুম দিদি। একদিন ওই ড্রয়ার খুলে সে সব পত্র দেখো, জানতে পারবে আমারি বউ মা কি রকম প্রকৃতির মেয়ে, দিদি। সে আমার বড় কষ্টেই চোখের জল ফেলেছিল, সেখানকার সঙ্গে সব সম্পর্ক তুলে দিয়েছিল, তবু বাপকে ত্যাগ করে নি। এই তো শিক্ষার ফল দিদি, একেই আমরা সুশিক্ষা বলতে চাই। ইভাকে এই জন্যেই শিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা প্রতাপের ছিল না। এই কুশিক্ষা পেয়ে সেও তো একটী সংসারকে এমনি করে জ্বালিয়ে দেবে তবে এ শিক্ষার দরকার কি? যে শিক্ষা মানুষকে মানুষ করে তোলে, আমি সেই শিক্ষার পক্ষপাতী, সেই শিক্ষাই আমি চাই।"

দুই হাত চোখের উপর চাপা দিয়া তিনি হাঁফাইতে লাগিলেন। সীতা নিঃশব্দে তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বিহারীলাল চোখের উপর হইতে হাত নামাইয়া লইলেন। স্থির দৃষ্টি সীতার মুখের উপর রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জ্যোতি বুঝি কাল সকালেই কলকাতায় যাবে?"

সীতা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিল,—"হ্যাঁ—"

বিহারীলাল বলিলেন, "বিলেত যাওয়ার কথা তার কাছ হতে তোমরা কিছু শুনতে পেয়েছ কি?"

সীতার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল,—"আমি তো কিছু জানি নে দাদু।"

"জানো না—আচ্ছা—"

এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "রাত নয়টা বেজে গেল, এখন তুমি যাও দিদি। এই পত্রখানা নিয়ে যাও, কাল বউমাকে দেখিয়ে কারও হাতে দিয়ে আমায় বাইরে পাঠিয়ে দিয়ো। রাখালকে বলে যাও দরজাটা বন্ধ করে দিক, আমি এখন ঘুমাব।"

সীতা উঠিতে উঠিতে বলিল, "কিছু খাবেন না দাদু,—"

বিহারীলাল মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "কিছু খাব না, দিদি, আজ শরীরটা বড় খারাপ বোধ হচ্ছে। তুমি যাও, আমার বড় ঘুম আসছে।"

সীতা পত্রখানা লইয়া বাহির হইল, রাখালকে ডাকিয়া দাদুর আজ্ঞা জ্ঞাপন করিয়া সে চলিয়া গেল।

(৮)

জ্যোতির্ম্ময় চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীটা যেন নিরানন্দে ভরিয়া উঠিয়াছিল। ঈশানী এই কয়দিন শরীরে ও মনে শক্তি না পাইয়াও সংসারের কায নিয়মিত ভাবেই করিয়া যাইতেছিলেন,—জ্যোতির্ম্ময় চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন ভাঙ্গিয়া পড়িলেন।

অন্তঃপুরের সঙ্গে বিহারীলালের সম্পর্ক প্রায় ছিল না বলিলেই চলে। দুপুরে মাত্র অর্দ্ধ ঘণ্টার জন্য ভিতরে আসিয়া তাড়াতাড়ি স্নানাহার করিয়া আবার বাহিরে চলিয়া

যাইতেন। অন্য সকলে যে মধ্যাহ্ন সময়টা অলসভাবে ঘুমাইয়া বসিয়া কাটাইত, তিনি সে সময়টাও বৃথা নষ্ট হইতে দিতেন না,—সে সময় তিনি জমিদারীর কাগজপত্র দেখিতেন। লোকে বলিত, বৃদ্ধের জীবন-তরুর মূল যত শিথিল হইয়া আসিতেছে, তিনি ততই মাটী আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন। উপযুক্ত দুইটী পুত্র যাহার চলিয়া গিয়াছে, তাহার এত বিষয়ানুরক্তি বড় বিসদৃশ বলিয়াই বোধ হয়। এখন তাঁহার ধর্ম্ম কর্ম্ম, তীর্থভ্রমণ ইত্যাদি প্রশস্ত।

কে বুঝিবে—কেন তিনি ইহারই মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে চান? কর্ম্মশূন্য ধর্ম্মজীবনে চিন্তা-দুঃখের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না। তিনি আগে নির্জ্জনতা ভালবাসিতেন, এখন নির্জ্জনতা বড় ভয় করেন,—গোলমালের মধ্যে এখন লিপ্ত থাকিতে চান। প্রতাপ যতদিন বর্ত্তমান ছিলেন, সংসারের সব ভার তাঁহার উপর দিয়া বিহারীলাল দূরে দূরে থাকিতেন। প্রতাপের মৃত্যুর পর প্রায় বৎসরখানেক তিনি কিছুই করেন নাই। ভগবানের নাম করিতে গিয়াছেন, আরাধনা করিতে গিয়াছেন, সব ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। কর্ম্মহীন ধর্ম্ম তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিতেছিল। ছেলেদের কথা, পুত্রবধূ ও পৌত্রীর কথা মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিতে পারেন নাই। নির্জ্জনে থাকিলে তিনি পাগল হইয়া যাইবেন, তাই তিনি নির্জ্জনে থাকিতে পারিলেন না, আবার কোলাহলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। যতদিন বাঁচিতে হইবে, ততদিন কায করিয়া যাওয়া যাক; ইহারই মধ্যে যদি ধর্ম্ম সম্ভব হয়,—হোক।

বৃদ্ধের দৃষ্টি দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল, চলিতে চরণ কাঁপিত; সম্মুখের দিকে তিনি অনেকটা নত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তথাপি তিনি প্রাণপণে দুর্ব্বলতা ঠেকাইয়া রাখিতেছিলেন, যুবকের শক্তি লইয়া কায করিতেছিলেন। একটা না একটা লইয়া আর সব ভুলিয়া থাকা চাই। অতীতের দুঃখময় স্বপ্নে নিমগ্ন থাকিলে পাগল হইয়া যাইতে হইবে যে!

সমস্ত দিনটা তাঁহার বাহিরে কাটিয়া যাইত। আগে কোন দিন রাত্রি বারোটার কমে তিনি ভিতরে আসিতেন না; আহারান্তে শয়ন করিতে রাত্রি একটা বাজিয়া যাইত। সীতা এখানে আসিয়া তাঁহার ভারও গ্রহণ করিয়াছিল,—ঠিক দশটার সময় তাঁহার শয়ন করা চাই। নয়টার সময় ভিতরে আসিতে হইত। তাঁহাকে আহার করাইয়া, বিছানায় শয়ন করাইয়া, তাহার পর সীতা বিদায় লইত। তাঁহার চিরকালের নিয়ম ব্যতিক্রম করিয়া দিয়াছিল সীতা। এই স্নেহের শাসনটুকু বৃদ্ধের কাছে বড়ই মিষ্ট লাগিত।

সে দিন জ্যোতির্ম্ময়ের সহিত যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহার পর হইতে ঈশানী আর কিছুতেই শান্তি পাইতেছিলেন না। এ শেল-সম কথা তিনি কাহাকেও বলিতে পারিতেছিলেন না, সে কথা তাঁহার মনের মধ্যে গোপন রহিয়া গিয়াছিল। বিদায় মুহূর্ত্তে জ্যোতির্ম্ময় আসিয়া যখন তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল, তিনি তখন আগেকার মতই নারায়ণের ফুল ও তুলসী তাহার হাতে দিতে গেলেন। সে মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল, "আমায় তো স্পষ্টই চিনতে পেরেছ মা, জেনেছ—তোমার ছেলে নাস্তিক, সে কিছু মানে না,—তবু কেন মা জেনে শুনে এ ফুল তুলসী আমায় দিতে আসছ? আমার মন যা বলে মিথ্যা,আমি কোন দিনই জোর করে তাকে সত্য বলে মেনে নিতে পারিনে, পারবও না। এই ফুল তুলসী তোমার কাছে শ্রদ্ধাভক্তি পেতে পারে, আমি এদের সাধারণ হিসাবেই দেখছি মা,—এর মধ্যে বিশেষত্ব কিছুমাত্র নেই। দরকার নেই মা, ও আর আমায় দিয়ো না।"

মায়ের হাতের ফুল তুলসী হাতেই রহিয়া গেল, তাঁহার মুখ দিয়া আশীর্ব্বচন দূরে থাক,—একটা শব্দও ফুটিল না। তাঁহার চোখের জলে ঝাপসা চোখের সম্মুখ দিয়া জ্যোতির্ম্ময় চলিয়া গেল। হাতের ফুল তুলসী অজ্ঞাতে কখন হাত হইতে খসিয়া পড়িয়া গেল; তিনি আড়ষ্ট ভাবে শুধু দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হায় রে,—যদি কাঁদিতে পারিতেন, সেও যে ভাল ছিল। কিন্তু কাঁদিতে পারিলেন কই? বেদনা অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া বুকের মধ্যে লুটাপুটী খাইতে লাগিল, চোখ দিয়া একটী ফোঁটা জলও তো পড়িল না!

সেইদিন হইতে তাঁহার মনে হইতেছিল—জ্যোতির্ম্ময় একেবারেই চলিয়া গিয়াছে, -আর সে ফিরিয়া আসিবে না, আর সে মা বলিয়া ডাকিবে না। এই কথাটা ভাবিতে তাঁহার সারা বুকখানা টনটন করিয়া ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল।

আহারে বসিয়া বিহারীলালও আজ ভাল করিয়া আহার করিতে পারিলেন না। অদূরে উপবিষ্টা অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা মলিনমুখী পুত্রবধূর পানে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "জ্যোতি কবে আসবে তা কি কিছু বলে গেল বউ মা?"

গোপনে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঈশানী মাথা নাড়িয়া অর্দ্ধোচ্চারিত ভাবে উত্তর দিলেন, "কই, না।"

"বিলেত যাওয়ার কথাও বলে নি?"

তাঁহার অন্তরে এই কথাটাই জাগিয়া উঠিতেছিল। বাহিরে অতিরিক্ত গাম্ভীর্য্য, উদাসীনতা দেখাইলেও, অন্তর হাহাকার করিয়া ফাটিয়া যাইতে চাহিয়াছিল।

ঈশানী জীবনে কখনও পিতৃসম শ্বশুরের সম্মুখে মিথ্যা কথা বলেন নাই। প্রথমটা উত্তর দিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর জড়াইয়া আসিলেও, কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া তিনি বলিলেন, "তেমন কিছু বলে নি,—তবে—"

তিনি চুপ করিয়া গেলেন।

বিহারীলাল দুধের বাটীতে চুমুক দিতে দিতে বলিলেন, "কথাটা সে তবে তোমার কাছেও তুলেছিল, মা, তুমি নিশ্চয়ই তাকে বুঝিয়েছ যাতে সে বিলেতে—সেই অহিন্দুর দেশে না যায়?"

রুদ্ধকণ্ঠে ঈশানী বলিলেন, "বলেছি বাবা।"

অত্যন্ত খুসী হইয়া উঠিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "হ্যাঁ, তা বলবে বই কি মা, না বুঝিয়ে বললে ওরা কি বুঝতে পারে মা? পাঁচজন বন্ধু মিলে কথাটা তুলেছিল,—ভেবেছিল এটা খুব পৌরুষের কথা,—এ কথা যে আবার আমাদের কাণে এসে পৌছাবে তা আর ভাবে নি। কথাটা বলবামাত্র তার মুখটা ফেঁকাসে হয়ে উঠেছিল,—বেশ বুঝেছিলুম, সে ভয় পেয়েছে। হাজার হোক—ছেলেমানুষ তো,—এম-এ পড়েছে বলেই বয়েস তার বিশ বছর পার হয়ে যায় নি। আমাদের কাছে সে সেই ছেলেমানুষই রয়ে গেছে, অন্যের কাছে সে যতই জ্ঞানবান হোক না কেন। এই সামনে জ্যৈষ্ঠ মাসটা গেলে আষাঢ় মাসের প্রথমেই বিয়েটা দিতে পারলে বাঁচি। বৈশাখ মাস ওর জন্মমাস, না বউ মা?—জন্মমাসে বিয়ে হতে পারে না; জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যেষ্ঠ ছেলের বিয়ে দেওয়া চলবে না, কাযেই আষাঢ় মাস ছাড়া আর উপায় নেই। যাই হোক, ওর বিয়েটা দিয়ে, কায-কর্ম্মগুলো সব বুঝিয়ে দিই। তার পরে নিশ্চিন্ত হয়ে সংসার ছেড়ে বার হই। লোকে বলে—আমার মতিভ্রম হয়েছে,—নইলে দুই জোয়ান ছেলে হারিয়ে আবার আমি বিষয়-আশয় দেখছি কেমন করে? কেমন করে—আর কেন, এ প্রশ্নের উত্তর তাদের দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, কেন না, তারা নিন্দা করছেই, করবেও। ওরা না জানুক, আমি তো জানি—এ সব সে জ্যোতির বিষয়, আমি তাকে বুঝিয়ে দিয়ে ছুটী নেব। এবার আর সংসারে নয়,—একেবারে দেশ ছেড়ে যাব, বুঝলে বউমা। আষাঢ় মাসে বিয়েটা দিতে পারলে এখন আমি বাঁচি।"

সীতা পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিল। বিবাহের প্রসঙ্গ উঠিবামাত্র সে ধীরে ধীরে কখন সরিয়া গিয়াছিল। ঈশানী নতমুখে কেবল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন মাত্র।

জ্যোতির্ম্ময়ের পত্রের আশায় ঈশানী ব্যগ্র হইয়া পথপানে চাহিয়া ছিলেন। কয়েক দিন বাদে জ্যোতির্ম্ময়ের পত্র আসিয়া পৌছিল।

দাসী দুখানা পত্র আনিয়া ঈশানীর নিরামিষ রন্ধন-গৃহের দরজার কাছে রাখিয়া বলিল, "রাখাল পত্র দুখানা দিয়ে গেল। খোকাবাবু কর্ত্তাবাবুকেও পত্র দিয়েছেন, তিনি সেখানে ভাল আছেন সে বলে গেল।"

ঈশানী তখন ভাতের ফেন ঝরাইতেছিলেন,—সীতা তাঁহার তরকারী কুটিয়া দিতেছিল। পত্র দুখানা দেখিয়া, সে তাড়াতাড়ি বঁটি ফেলিয়া উঠিয়া, সে দুখানা কুড়াইয়া লইল।

ঈশানী জিজ্ঞাসা করিলেন, "জ্যোতির পত্র এসেছে কি?"

সীতা উত্তর করিল, "হ্যাঁ, এই কার্ডখানায় পৌছা খবর দিয়েছেন দেখছি।"

জ্যোতির পত্রে—শুধু সে পৌছিয়াছে এবং ভাল আছে এই দুইটী মাত্র কথা লেখা ছিল। অন্য বারে সে যখন কলিকাতায় যাইত, তখন তাহার দীর্ঘপত্র অনেক কথা বহন করিয়া মায়ের কাছে আনিত। এবারকার এই ক্ষুদ্র পত্রখানার পানে তাকাইয়া ঈশানী কোন মতে দীর্ঘশ্বাস রোধ করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

সীতা বুঝিয়াও বুঝিল না, জিজ্ঞাসা করিল, "এবার জ্যোতিদার এত ছোট পত্র কেন মা? আমি এখানে এসে পর্য্যন্ত তাঁর যে সব পত্র দেখেছি, সবগুলোই বড়, চার পৃষ্ঠা ভরা। বাড়ীর কাউকেই তিনি বাদ দেন না, মানুষ হতে আরম্ভ করে গরু, পাখী, বেড়াল, কুকুর, সবারই খোঁজ

নেন ; এবার এক কথায় সেরে দিয়েছেন—তোমরা কেমন আছ—ব্যস, সব শেষ হয়ে গেল। কলকাতায় যাওয়ার সময় জ্যোতিদার মুখ যেমন ভার দেখলুম, আপনার মুখও তেমনি ভার হয়েছিল। আপনি কি জ্যোতিদার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলেন মা ?”

ঈশানীর মলিন মুখে রেখার মত একটু হাসি ফুটিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল,—“ঝগড়া কেন হবে মা, কিছুই হয় নি। ও পত্রখানা কার দেখ তো ?”

কথাটাকে তিনি যে চাপা দিতে চান তাহা সীতা বেশ বুঝিতে পারিল। ঈশানী জানিতে পারেন নাই সেদিনকার কয়েকটী কথা সীতার অনিচ্ছাতেও তাহার কাণে গিয়াছিল। দেবযানীর নামটা কাণে আসিতেই সে থমকিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মুহূর্ত্তে সমস্ত ঘটনা তাহার কাছে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল। ঘৃণায়, লজ্জায়, সঙ্কোচে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল,—ছি ছি, সীতা কি জ্যোতির্ম্ময়ের স্ত্রী হইবার আশায় এখানে পড়িয়া আছে,—জ্যোতির্ম্ময় কি তাহাই ভাবিয়া রাখিয়াছে ? জ্যোতির্ম্ময় যখন তাহার বন্ধু নিখিলেশের সহিত সীতার বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল, তখন সীতার সমস্ত মুখখানায় সিন্দুরের আভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল,—সে দ্রুতপদে আপনার গৃহে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িয়াছিল।

জ্যোতির্ম্ময় যে কয়দিন এখানে ছিল, সে কয়দিন লুকাইয়া থাকিবার জন্য সীতা কি চেষ্টাই না করিয়াছে। ছি ছি, কি লজ্জা, কি অপমান ! না, সীতা আর এখানে কিছুতেই থাকিবে না, সে তাহার মাসীমার কাছে চলিয়া যাইবে। তাহার এক মাসীমা এখনও আছেন। পিতা বর্ত্তমান থাকিতে তিনি কতবার তাহাকে নিজের কাছে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। মাসীমার পুত্র প্রশান্ত কয়বার তাহাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিল , কিন্তু পিতা তাহাকে কোথাও পাঠাইতে পারেন নাই। এবার সে নিশ্চয়ই মাসীমাকে পত্র দিবে, মাসীমার কাছে গিয়া থাকিবে,—এমন লজ্জার মধ্যে জড়াইয়া সে এখানে থাকিতে পারিবে না। নিজের আত্মীয়ের সংসারে সে দাসী হইয়া থাকিবে সেও ভাল, তবু এখানে ইঁহাদের সংসারে কর্ত্রী ভাবে সে কিছুতেই থাকিবে না।

কথা ভাবা যতদুর সহজ, করা ততোধিক কঠিন হইয়া উঠে ; সেই জন্যই অনেকবার বলি বলি করিয়াও এ কথা সে তুলিতে পারে নাই। এই সংসারে আসিয়া এমন স্থানে সে আটকাইয়া পড়িয়াছে, যে স্থান হইতে সরিয়া পড়া একেবারেই অসম্ভব। বৃদ্ধ দাদুর ও ঈশানীর এক মুহূর্ত্ত তাহাকে না হইলে চলে না। ইঁহাদের এই স্নেহ-ভালবাসা কাটাইয়া সে যাইবে কি করিয়া ?

রাখাল আসিয়া ঈশানীকে ডাকিল, কর্ত্তাবাবু একবার তাঁহাকে ডাকিতেছেন।

মূলে কোন বিশিষ্ট কারণ না থাকিলে বিহারীলাল ডাকেন না, ইহা সকলেই জানিতেন। তাই শঙ্কিত ভাবে ঈশানী রাখালের পানে তাকাইলেন।

রাখাল তাঁহার সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিল, বলিল “খোকাবাবুর পত্র এসেছে, তিনি তাই নিজের মুখে আপনাকে বলতে চান মা, সেই জন্যে ডাকছেন।” আশ্বস্ত হইয়া ঈশানী সীতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “একটু বসো মা, ততক্ষণ তরকারী কোট, আমি এখনি আসছি। জ্যোতি যদিও আমাকে আলাদা পত্র দিয়েছে বাবা জানছেন—তবুও ওঁকে যে পত্রখানা সে দিয়েছে, সেখানা আমায় না দেখালে ওঁর শান্তি হবে না। এর পর আবার তোমাকেও ডাকবেন দেখো। যাকে যাকে উনি ভালবাসেন, তাদের সবাইকে ওই পত্রখানি না দেখালে বাবার কিছুতেই শান্তি হবে না।”

ঈশানী হাত ধুইয়া চলিয়া গেলেন।

উদাস দৃষ্টিতে সীতা জ্যোতির্ম্ময়ের পত্রখানার পানে তাকাইয়া রহিল। [ক্রমশঃ

বিশ্ব-সাহিত্য

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সানিনের মতবাদ

১৯০৫ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রুষ-সাহিত্যের একটী বিশিষ্ট ধারা ছিল—রুষ-বিপ্লবের দ্বার-প্রান্তে আসিয়া সে ধারা আপনার পরিপূর্ণতায় আপনি নিঃশেষিত হইয়া আসিল। গোগলের "ওভার-কোট" হইতে সে ধারা প্রবাহিত হইয়া সমগ্র রুষিয়ার চিত্ত-ভূমি প্লাবিত করিয়া আন্দ্রিভের সাহিত্যের মধ্যে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। ১৮৩৯ সালে গোগল তাঁহার বিখ্যাত গল্প "ওভারকোট" লেখেন,—১৯০৯ সালে আন্দ্রিভ তাঁহার "আনাথিমা" রচনা করেন। এই সত্তর বৎসরের পরিপূর্ণ ইতিহাসের মধ্যে রুষ কথা-সাহিত্য একটা পরিপূর্ণ রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠে। তাহার সাহিত্যের ভিত্তি-স্বরূপ একটা বিশিষ্ট দর্শন ছিল এবং এই সত্তর বৎসরের মধ্যে একটা বিপুল ভাব-বেগের ধারাবাহিকতাও অক্ষুণ্ণ ছিল। জগতের সাহিত্যে এই সত্তর বছরের সাধনা আজ এই অল্পকালের মধ্যেই ক্লাসিকের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে।

১৯০৫ সাল হইতে রুষিয়ার চেহারা একেবারে বদলাইতে সুরু করিল। রুষ সাহিত্যিকগণ এতদিন ধরিয়া যে বিপ্লবের কথা বলিয়া আসিতেছিলেন—১৯০৫ সালের পর হইতে তাহা রুষিয়ায় প্রকট হইয়া উঠিল।

যাঁহারা রুষ-সাহিত্যের একটী পাতারও সহিত পরিচিত, তাঁহারাই সাক্ষ্য দিবেন যে রুষিয়ায় জীবন কোনও দিন সুস্থ ও সুন্দর ছিল না। একটী দীর্ঘ শতাব্দী ধরিয়া একটা জাতি তিলে তিলে নিদারুণ অভাব ও অন্ধ অজ্ঞানতার বোঝা বহিয়া বিংশ-শতাব্দীর দ্বার-প্রান্তে আসিয়া মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়া গেল। তাহার মৃত-দেহের উপর আর এক নব-জীবনের ভিত্তি গড়িয়া উঠিতেছে। অতীতের অপমৃত্যু ও নব-জীবন-লাভের মধ্যে রুষিয়ার যে ভয়াবহ অবস্থা হইয়াছিল, তাহা এইচ, জি, ওয়েল্‌স্ প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়া লিখিয়াছিলেন যে, রুষিয়ায় নর-খাতকদের যুগ ফিরিয়া আসিয়াছে। অন্নাভাবে পিতা মৃত-পুত্রের দেহ কবর হইতে বাহির করিয়া খাইয়াছে। গ্রামের পর গ্রাম শুধু মৃত-দেহের শ্মশান হইয়া পড়িয়াছিল। রুষ-জাতির ভাগ্যবিধাতাদেরও কাহারও কাহারও কয়েক টুক্‌রো পোড়া রুটী ব্যতীত আর কিছুই জুটিত না।

জাতির এই পরম-দুর্দ্দৈবের সময় রুষ-জাতির মনোবৃত্তিও একেবারে বদ্‌লাইয়া গেল। চারিদিকে বর্ত্তমান জীবনের যে উদগ্র রূপ তাহাদের বায়ুস্তরের মত ঘিরিয়াছিল—তাহাকে ছাড়াইয়া উঠিয়া আর এক বৃহত্তর বোধের উপর সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠা করিবার কোনও শক্তি অথবা বাসনা জাতির ছিল না। বর্ত্তমানের বিষ-জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া তাহারা অতীতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল—অতীতের সমস্ত দর্শনবাদকে তাহারা অস্বীকার করিল। তাই ১৯০৫ সালের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত রুষ সাহিত্যের যে কয়খানি পুস্তকের সহিত আমরা পরিচিত হইতে পারিয়াছি, তাহাতে শুধু আমরা দেখিতে পাই একটা দর্শনবাদহীন দারিদ্র্য ও পাপের অসহায় আত্মবিকাশ। রুষ-সাহিত্য চিরকাল মানব মনের গহন-তম প্রবৃত্তিগুলিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে; আজও রুষ-সাহিত্যের মধ্য দিয়া মানব-মনের যে গহনতম প্রদেশগুলি লোক-চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহার অস্তিত্বের সম্ভাবনা সমগ্র মানব-ইতিহাসকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে। জাতির মনোবৃত্তির এই বিপুল ভাঙ্গা-গড়ার সময় কোনও সৃষ্টি কখনই একটা বিশিষ্ট রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে না—তাই বর্ত্তমান রুষ-সাহিত্যের সাহিত্য-মূল্য যাচাই করা নিরর্থক হইবে। তবে, এই সাহিত্য মানবতার যে-রূপকে আজ চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছে, তাহা শুধু ভয়াবহ নহে, প্রত্যেক সভ্য মানবের পক্ষে তাহার অস্তিত্ব চরম লজ্জাজনক। একদিকে মানব যখন সভ্যতার মিথ্যা-দম্ভ লইয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, তখন আর এক-দি'ক তাহাদেরই সহযাত্রী পারিপার্শ্বিকতার নিষ্পেষণে জীব-

বিবর্ত্তনের উল্টা পথে অসহায় ভাবে চলিয়াছে। "Flying Osip" এর গল্পগুলি, Arksybashev ও Kuprin এর লেখায় মানবতার যে ভয়াবহ রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাহাতে প্রত্যেক সভ্য মানবের লজ্জা অনুভব করা উচিত এবং এই লজ্জা যদি শুধু শ্লীলতার দোহাই দিয়া ক্ষুব্ধ মানবতার এই নিলর্জ্জ আত্ম-প্রকাশকে দাবাইয়া রাখাকেই একমাত্র কর্ত্তব্য মনে করে, তাহা হইলে, এ কথা নিশ্চিত যে, একদিন তাহারই ঘরের পাশে এই ভয়াবহ রূপ আত্মপ্রকাশ করিয়া উঠিবে। বিংশ-শতাব্দীর মধ্যাহ্ন-আলোকে আজ প্রত্যেক সহযাত্রী মানব-সমাজ বা জাতির অধঃপতনের জন্য অন্য সমাজ ও জাতি দায়ী। মানব-জাতির একটী অসহায় অংশের আত্মগ্লানির জন্য বর্ত্তমান মানবকে দেশে দেশে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। প্রত্যেক মানবকে এই দুঃখের, পাপের ও গ্লানির দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

বর্ত্তমান রুষিয়ার ভয়াবহ মূর্ত্তি যে দুইখানি বইএতে রীতিমত ভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে—তাহাদের একটীর লেখক Artsybashev ও অপরজন Kuprin. Sanin ও Tales of Garrison Life পড়িতে গেলে মনে হয় যেন দান্তের Infernoর আর এক নূতন সংস্করণের দেখা পাওয়া গেল। দান্তের চিত্রগুলি কল্পনা ও কবিতার পট-ভূমিতে আঁকা হওয়ার দরুণ তাহাদের বীভৎসতা অনেকখানি কমিয়া যায়; কিন্তু যখন ভাবা যায় যে, এই সমস্ত চিত্র আজ যাহা পড়িতেছি তাহাতে কাহারও কল্পনার ও কবিত্বের কোনও ছাপ নাই—সত্যই মানুষ এই রকম ভাবিতেছে, এই রকম করিতেছে; একই সময়ে, একই পৃথিবীতে তখন সাহিত্য হিসাবে সেই সমস্ত লেখাকে বিচার করিবার প্রবৃত্তি চলিয়া যায়—তাহার পরিবর্ত্তে মানবের ভাগ্য সম্বন্ধে এক গভীর সন্দেহ আসিয়া মনকে আচ্ছন্ন করে।

বর্ত্তমান জগতের ভাব-ধারার মধ্যে অতীতের নীতিবাদের বিরুদ্ধে যে-সমস্ত খণ্ড-বিদ্রোহ দেখা যাইতেছে—"Sanin" তাহার পরিপূর্ণ মূর্ত্তি। সমস্ত নিয়ম-কানুন, নীতি-বাদ ও সামাজিক বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শুধু প্রবৃত্তির প্রেরণায় জীবনকে লক্ষ-জিহ্বা দিয়া আস্বাদন করিবার যে-প্রবৃত্তি আজ দেশে দেশে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে, নীটসের দর্শন-বাদকে ও সমসাময়িক য়ুরোপের সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া যাহা বাংলার অলস জীবনেও আত্ম-প্রকাশ করিতেছে—"Sanin"এ তাহা পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে। একটা যুগের যত কিছু উদ্দাম কল্পনা, অতৃপ্ত যৌন-ক্ষুধার যতকিছু আত্মবিলাস, প্রবৃত্তিমূলক জীবনের সমস্ত দর্শনবাদ এই পুস্তকের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পুস্তকের নায়ক Sanin কোনও নীতিবাদ মানেন না—এমন কি যখন জানিতে পারিলেন যে, আপন ভগ্নী অন্য পুরুষের সহবাসে পুত্রবতী হইয়াছে, ভগ্নীকে তিরস্কার করা দূরে থাকুক, ভগ্নীর সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ দেখিয়া তিনিও ভগ্নীর প্রেমে পড়িলেন। এই বইএতে যে চারিটী নারী-চিত্র আছে, চারিজনই সানিনের আত্ম তৃপ্তি দর্শনবাদের শিষ্যা। সানিন টলষ্টয়কে ঘৃণা করেন—কেন না টলষ্টয় এই প্রবৃত্তিমূলক জীবনের বিরুদ্ধে বিপ্লব-ঘোষণা করেন। খৃষ্ট-ধর্ম্ম সম্বন্ধে সানিনের মতামত খুব স্পষ্ট—"মানবের ইতিহাসে খৃষ্ট ধর্ম্ম একটা কলঙ্কের কথা মাত্র! আরও বহু যুগ ধরিয়া যিশু খৃষ্টের নাম অভিশাপের মত মানবের ঘাড়ে চাপিয়া থাকিবে।"

সানিন বলেন, "জীবনের পরিচালনের জন্য কোনও মত বা নীতিবাদের কোনও প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর থাকুন বা না থাকুন্ তাহাতে কিছুই যায়-আসে না। তাঁহার অস্তিত্বের সঙ্গে আমাদের কিছুই যায় আসে না। মানুষের জীবন পাখীর জীবনের মত হওয়া উচিত। প্রত্যেক চঞ্চল মুহূর্ত্তের উন্মাদনায় জীবন অপ্রতিহত গতিতে চলিবে। শাখায় বসিবার বাসনা হইল—পাখী শাখায় বসিল; উড়িবার বাসনা হইল—পাখী আবার উড়িয়া চলিল। মদ্যপান অথবা অবাধ যৌন-সম্বন্ধে লজ্জিত হইবার মানুষের কিছুই নাই। যাহাতে আনন্দ পাওয়া যায়—তাহাতে পাপ নাই। এমনি কি পাপ বলিয়া কিছুই নাই। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে মানুষ যাহা করে, তাহা কখনই পাপ হইতে পারে না।"

এই "সানিন-মতবাদ" বিংশ-শতাব্দীর গতিমুখর পথ বাহিয়া নদ নদী কান্তার পার হইয়া জগৎ পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছে। পারিপার্শ্বিকতার চাপে এবং সাময়িক দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে এই মতবাদ আপনার স্থান করিয়া লইতেছে। অতৃপ্ত ক্ষুধার সম্মুখে অবাধ ভোগবাদের এই দর্শন ন্যায়ের অনুমোদনও পাইতেছে। বর্ত্তমান মানব-অন্তরের সমস্ত অভাবকে এক নূতনতর দর্শন দিয়া ঢাকিতে চাহিতেছে—Sanin পড়িয়া তাহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যে কেহ

ইহার বিরুদ্ধে যাইবে সেই Saninএর শত্রু। তাই টলষ্টয় সানিনের শত্রু।

আজ তাই মানুষের চিন্তাধারার দুই মোহানা আগ্‌লাইয়া দুইজন লোক দাঁড়াইয়া আছে—টলষ্টয় ও সানিন। যুগে যুগে, যেদিন হইতে মানুষ ভাবিতে শিখিয়াছে, মনে হয়, এই দুইজন লোকই দাঁড়াইয়া আছে—টলষ্টয় ও সানিন।

Kuprin সম্বন্ধে বলা যায় যে, জগতের কোন লেখক তাঁহার মত বেশী ব্যভিচারী নারীর চিত্র আঁকেন নাই। তবে Kuprin লেখার মধ্যে গত যুগের নিঃশেষিত ভাবধারার ক্ষীণ আত্মপ্রকাশ মাঝে মাঝে দেখা যায়! 'In Honour's Name' নামক নভেলে মাতাল Nasanski বলিতেছে, "নিশ্চয়ই সুসময় আসিতেছে—আমি সাগ্রহে আজ সেই অদূরাগত সুন্দরের জন্য অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। জীবনে আমি অনেক ভোগ করিয়াছি—জগতের অনেক কিছুও দেখিয়াছি। ছেলেবেলায় আমার কাণে কাণে দাঁড়কাকের মত গুরুজনেরা বলিতেন, 'প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসিবে; ঈশ্বরে ভক্তি, নম্রতা আর নিয়ত মাথা নত করিয়া থাকাই মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।' তার পর একদল উন্মাদ লোক এল—স্পষ্ট তাদের বাণী, নির্ভীক তাদের ভাষা। তারা প্রচার করিল, 'এসো আমাদের দলে, এসো আমরা অন্ধকারে ডুব দি—অনাগত মানবদের জন্য আলোর সন্ধানে।'

"কিন্তু তাদের কথায় বিশ্বাস হইল না। তিন হাজার বছর পরে কে মানুষ আলো পাইবে বলিয়া আমি কেন আজ দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া মরি? মানবতার প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেমের যে দীপ জ্বলিতেছিল, তাহা নিভিয়া অন্ধকারে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। আজ সেই নিঃশেষিত আলোকের পথ বাহিয়া আর এক নূতন ধর্ম্ম আসিবে—এই ধর্ম্মের মূলমন্ত্র হইবে অগাধ আত্ম-প্রেম! মানুষ তখন নিজের মস্তিষ্ক, শক্তি ও আনন্দকে বেশী শ্রদ্ধা করিবে—পরিপূর্ণ আত্মপ্রেমের মধ্যে এই নূতন ধর্ম্ম জন্মগ্রহণ করিবে"

এই নূতন ধর্ম্ম যে কি হইবে তাহা Nasanski জানে না—অন্য মানুষও জানে না। কিন্তু ইতিমধ্যে এই নূতন ধর্ম্ম অন্বেষণের সুবিধা লইয়া Sanin ও তাঁহার শিষ্যগণ জগৎ-জয়ে বাহির হইয়াছে!

মনে হয় গঙ্গার কূলে, বাংলার শ্যামলতার অন্তরালে, সানিনের জয়-যাত্রার পতাকা দেখা দিয়াছে!

বিমুখ

রায় শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর বি-এ, সি-এস্

আমি এসেছিনু তোমারি দুয়ারে,
　তুমি চাহিলে না ফিরে,
দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে, হতাশ হৃদয়ে,
　তাই ফিরে এনু ঘরে।
আমি ভেবেছিনু, যদি পড়ে মনে,
　তুমি ডাকিবে আবার;
ডাকিলে না তুমি, বাজিল না প্রাণে,
　বন্ধ করিলে দুয়ার।

বেলা গেল চলে; আমি ম্লান মুখে
　কাঁদি আপন কুটীরে;
তোমার প্রাসাদে, তুমি আছ সুখে,
　হায়! ভুলিয়া আমারে।
নামিল আঁধার, মুদে এল আঁখি
　ডাকিয়া কি হবে আর!
উড়িল এবার মোর প্রাণপাখী,
　লয়ে হৃদয়ের ভার।

জেকোশ্লোভাকিয়া

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

মোরাভিয়া

মোরাভিয়া জেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত। মোরাভিয়ার লোকসংখ্যা ২২৫০০০০। ইহাদের মধ্যে বোহিমিয়ান জেক জাতীয় লোক প্রধান হইলেও, শ্লাভ-জাতীয় আরও কয়েক সম্প্রদায়ের লোকও আছে। এই সকল সম্প্রদায় পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ। ইহাদের মধ্যে হোরাক্স ও হানাক্স জাতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ, এই দুই জাতি প্রাচীনপন্থী, অত্যন্ত রক্ষণশীল। ইহারা তাহাদের সেই প্রাচীন যুগের আচার ব্যবহার ও পোষাক পরিচ্ছদ এখনও আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। এই দেশটি পর্ব্বতসঙ্কুল, অসমতল। কিন্তু ইহার মালভূমির অংশ অত্যন্ত উর্ব্বরা। মোরাভিয়ার প্রধান নদী মার্চ্চ ইহার একদিকের সীমানা; অপর তিন দিকের সীমানায় পর্ব্বত রহিয়াছে। দেশের সিকি অংশ এখনও অরণ্যে সমাচ্ছন্ন। এই অরণ্যে ওক ও দেবদারু গাছই প্রধান। দেশের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী। অনেকের গোশালা আছে। তাহারা দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত বস্তুর ব্যবসায় করে। তবে কুটীর-শিল্পও ইহাদের মধ্যে অল্প-বিস্তর প্রচলিত আছে। কুটীর-শিল্পের মধ্যে বস্ত্রবয়ন ও কাঠের কাজ প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে।

শ্লোভাকিয়ার সম্ভ্রান্ত ঘরের তরুণী ঘরণী

বোহিমিয়ান জেক জাতীয় লোকদের মত মোরাভিয়ানরা অতটা অগ্রসর নহে। এই দেশ যখন অষ্ট্রিয়ার অধীন ছিল, তখন অষ্ট্রিয়ার অভি-জাত সম্প্রদায় এই দেশে তাহাদের পল্লীনিবাস নির্ম্মাণ করিত, ও বনে-জঙ্গলে শিকার করিয়া বেড়াইত। তৎকালে এই দেশের রাজনীতি জার্ম্মাণরা হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছিল; আর অর্থনীতির ভার লইয়াছিল ইহুদীরা। জার্ম্মাণ ও ইহুদীরা মোরাভিয়ার নগরগুলিতে কায়েমী ভাবে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহুদীরা সংখ্যায় অল্প হইলেও ব্যবসায়-বাণিজ্য তাহাদের হাতে থাকায় তাহাদের প্রভাব বড় অল্প ছিল না।

হোরাক্সরা উচ্চ ভূমিতে বাস করে। তাহাদের ঠিক পশ্চিম পার্শ্বে জেক জাতির বসতি। জেকরা খর্ব্বকায়, আর হোরাক্সরা দীর্ঘকায়। উপত্যকাবাসী হানাক জাতি উহাদের অপেক্ষা দৃঢ়কায়। মধ্য ইয়োরোপের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা মোরাভিয়ার লোকরা আদিম কালের পরিচ্ছদ এখনও বজায় রাখিয়াছে। এই সকল পরিচ্ছদ নানা

রকমের। এইরূপ পরিচ্ছদে মোরাভিয়ান নরনারীকে নাট্যশালার অভিনেতা ও অভিনেত্রীর মতন দেখায়।

মোরাভিয়ানরা দীর্ঘকাল ধরিয়া পরাধীন জীবন যাপন করিতেছিল। বহু শতাব্দী ধরিয়া তাহাদের প্রতিবাসী জাতিগুলির মধ্যে কোন না কোন জাতি তাহাদের দেশ অধিকার করিয়া তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিত। এক জাতির অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হইলে আর এক জাতি আসিয়া তাহাদের দেশ অধিকার করিত—ইহার আর বিরাম ছিল না। যে কোন বিজেতা জাতি যখনই তাহাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার
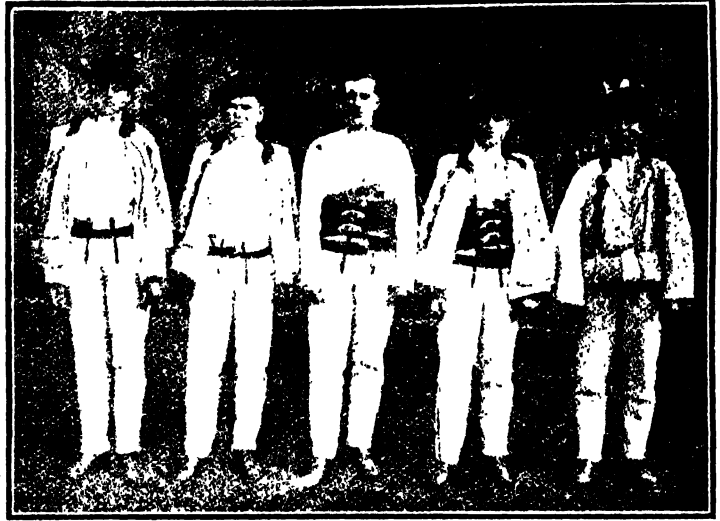
জাতীয় পরিচ্ছদে জেকোশ্লোভাকিয়ান

করিতে পারিয়াছে, তাহারাই মোরাভিয়ানদিগকে তাহাদের গৃহপালিত পশুর সমতুল্য ভাবে দেখিয়াছে ও সেইরূপ ব্যবহার তাহাদের সহিত করিয়াছে। সেইজন্য মোরাভিয়ানরা তাহাদের জেক ভ্রাতৃগণের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই—অনেকটা পিছাইয়া রহিয়াছে। তবে ইদানীং তাহাদের পরাধীন অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়ায় তাহারা শিক্ষা ও শ্রমশিল্পে উন্নতি লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। শ্রমশিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য এত কাল মোরাভিয়ার জার্ম্মাণ ও ইহুদী ঔপনিবেশিকদের হাতেই ছিল, এক্ষণে মোরাভিয়ানরা ক্রমে ক্রমে তাহা নিজেদের হাতে তুলিয়া লইতেছে।

মোরাভিয়ানদের কথোপকথনের ভাষা প্রধানতঃ জেক; তবে অন্য ভাষাও কিছু কিছু ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সাহিত্যের ভাষা সর্ব্বতঃ জেক। নব-প্রবর্ত্তিত শাসন-ব্যবস্থার ফলে অন্য ভাষাও সর্ব্বত্র জেক হইয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয়।

মোরাভিয়ানরা অবশ্য ধর্ম্মে খৃষ্টান; কিন্তু তাহাদের একটা বিশিষ্ট মত আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মোরাভিয়ায় হুসাইট আন্দোলন উপস্থিত হয়। তাহার ফলে সে দেশে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তিত হইয়া পশ্চিম ইয়োরোপ ও আমেরিকায় "মোরাভিয়ান চার্চ্চ" নামে পরিচিত হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি ভারতবর্ষে হইলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাবে এক সময়ে তাহা যেমন ভারতবর্ষে বিলুপ্ত হইয়া অন্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে, মোরাভিয়ান চার্চ্চ নামে

মূল্যবান পরিচ্ছদে জেকোশ্লোভাকিয়ান তরুণী

উৎসব দিনে জাতীয় নৃত্য

পরিচিত প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান ধর্ম্মমতও তদ্রূপ মোরাভিয়া হইতে বিতাড়িত হইয়া প্রথমে জার্ম্মাণী, পরে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় আশ্রয় লাভ করে।

জেকদিগের সহিত যে শ্লোভাকদিগের নাম সম্মিলিত হইয়া নূতন সংযুক্ত-গণতন্ত্রের নাম জেকোশ্লোভাকিয়া হইয়াছে, সেই শ্লোভাকিয়ানদিগের সংখ্যা ২৫০০০০। ইহাদের অধিকাংশ এই গণতন্ত্র রাজ্যের পূর্ব্বাংশে অবস্থিতি করে। কার্পেথিয়ান পর্ব্বতমালা ও তাহাদের উপত্যকা লইয়া এই প্রদেশ গঠিত। শ্লোভাক জাতি এই অঞ্চলের প্রধান অধিবাসী বলিয়া ইদানীং এই প্রদেশটি শ্লোভাক-ভূমি (শ্লোভাক-ল্যাণ্ড) বা শ্লোভাকিয়া নামে পরিচিত হইতেছে। ইতঃপূর্ব্বে এই প্রদেশের এরূপ স্বতন্ত্র কোন নাম ছিল না। তবে শ্লোভাক জাতি বরাবর তাহাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য কোন রকমে বজায় রাখিয়া আসিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, শ্লোভাকরা মূলতঃ জেক জাতির শাখা; পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাহারা তাহাদের জ্ঞাতি-ভাই শ্লাভজাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পশ্চিম দিকে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। আবার অপর কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে, তাহারা শ্লাভজাতির একটি বিশিষ্ট শাখা, জেকদিগের পূর্ব্বেই তাহারা পশ্চিম দিকে অভিযান করিয়াছিল। তাঁহাদের এইরূপ অনুমান করিবার কারণ—প্রাচীন শ্লাভোনিক ভাষার সহিত শ্লোভাকদিগের ভাষার অতিমাত্র সাদৃশ্য। শ্লোভাকরা

বস্ত্র শুভ্রীকরণ কৃষক রমণীরা নিজগৃহের আঙ্গিনায় শন গাছ রোপণ করে। সেই শন হইতে সুতা কাটে; সেই সুতায় নিজের ঘরে তাঁতে কাপড় বোনে। এই বস্ত্র লংক্লথের ন্যায় অতি দীর্ঘ। সেই কাপড় তাহারা নদীতীরে বিছাইয়া দেয়, এবং জল ছিটাইয়া ভিজাইয়া দেয়। অল্পক্ষণের মধ্যে তাহা শুকাইয়া যায়। অমনি আবার জল ছিটাইয়া ভিজাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপ কয়েকবার করিলেই বস্ত্রের থানটি শুভ্র হইয়া নির্ম্মল হইয়া উঠে।

শনগাছের অংশু—কৃষকরা শন পচাইয়া গাছ হইতে অংশু বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া মুগুরের সাহায্যে পিটিয়া শাঁস হইতে অংশু পৃথক করিতেছে।

বহু শতাব্দী ধরিয়া হাঙ্গেরীর অধীন থাকিলেও, হাঙ্গেরীয়ানরা তাহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে নাই, তাহারাই বরং হাঙ্গেরীয়ানদিগকে গ্রাস করিয়াছিল ; অর্থাৎ বিজেতা হাঙ্গেরীয়ানরা বিজিত শ্লোভাকদিগের আচার-ব্যবহার প্রভূত পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছিল। এইরূপে শ্লোভাকরা তাহাদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

শ্লোভাকরা প্রধানতঃ কার্পেথিয়ান পার্ব্বত্য প্রদেশ এবং দানিয়ুব নদীর তীরবর্ত্তী সমতল ভূমিতে বাস করে। গো এবং মেষ পালন তাহাদের সর্ব্বপ্রধান উপজীবিকা। তাহাদের আচার-ব্যবহার অতি সরল। তাহাদের মধ্যে অনেক প্রকার কুসংস্কার প্রচলিত আছে। শিক্ষা দীক্ষায় তাহারা বোহিমিয়া ও মোরাভিয়ানিবাসী জেকদিগের অপেক্ষা পশ্চাৎপদ। তাহাদের নিজস্ব একটা ভাষা থাকিলেও উল্লেখযোগ্য কোন সাহিত্য নাই। সাধারণতঃ তাহারা শান্ত, সমাহিত, দয়ালু, সন্তুষ্টচিত্ত এবং অত্যন্ত পরিশ্রমী। অধিকাংশ শ্লোভাকই কৃষিজীবী। বাঙ্গালার কৃষকদিগে ন্যায় তাহাদের জোতজমা অতি সামান্য—প্রত্যেকের জমি

শনের সুতার পাইট

শনের অংশুগুলি হইতে শাঁস পৃথক করিবার পর তাহা হইতে সুতা কাটিব পূর্ব্বে অংশুর পাইট করা হইতেছে। এইরূপে প্রস্তুত হইলে শনগুলি চরকায় ফেলিয়া সুতা কাটিবার উপযুক্ত হইয়া উঠে

শন পচানো—আমাদের দেশে যেমন পাট পচাইয়া পাট গাছ হইতে অংশু পৃথক করিয়া লওয়া হয়, রুথেনিয়ায় শনও সেইভাবে বাহির করা হয়। নদীতীরে জলে ভিজাইয়া শন পচানো হয়। ইহারা নদীর ভিতর শন পচাইয়া নদীর জল বিষাক্ত করে না।

পরিমাণ দুই দশ বিঘার অধিক নহে। তাহারা এখনও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় প্রাচীন মান্ধাতার আমলের প্রথাতেই চাষ-বাস করে। তবে ইদানীং কেহ কেহ আধুনিক উন্নত ধরণের কৃষি-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছে এবং নব্য ধরণের কৃষি-যন্ত্রাদি ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। যাহারা চাষ করে না, তাহারা প্রায় ফেরীওয়ালা। তাহারা তাহাদের পণ্য ফেরী করিতে করিতে অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, এমন কি, সুদূর দক্ষিণ রুষিয়ায় পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে। কলিকাতার রাজপথের ধারে পণ্য সাজাইয়া ফেরীওয়ালারা যেমন ভাবে তাহাদের কারবার চালায়,

শ্লোভাকিয়ান কৃষক—ইহার সমগ্র পরিচ্ছদ তাহা নিজের গৃহে উৎপন্ন মাল-মশলা দ্বারা নিজেদের পরিশ্রমে প্রস্তুত।

কৃষক-পত্নী—ইঁহার স্বামী ক্ষেত্রে কাজ করিতে গিয়াছেন। ইনি ক্ষুৎপিপাসা-কাতর স্বামীর আহার্য্য লইয়া যাইতেছেন—ঠিক আমাদের দেশের কৃষক-ঘরণীর মত

কার্পেথিয়ান পর্ব্বতে শীতের দিনে

শ্লোভাক ফেরীওয়ালারাও প্রায় তদ্রূপ কার্য্য করে। অনেক শ্লোভাক যুবতী ভিয়েনা ও অন্যান্য নগরে চাকুরী করিতে যায়। নার্সের কাজই তাহাদের প্রধান উপজীবিকা। অষ্ট্রিয়ার ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকরা ইহাদের বিলক্ষণ পছন্দ করে, এবং কর্ম্মে নিযুক্ত করে। জাতীয় পোষাক পরিধান করিয়া যখন তাহারা রাজপথে আনাগোণা করে, তখন তাহাদের সৌন্দর্য্য মুগ্ধ পথিকরা নির্লজ্জের মত ঠায় একদৃষ্টে তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকে।

শ্লোভাকরা বড় দরিদ্র। সহর অপেক্ষা পল্লীতেই অধিকাংশ লোক বাস করে। পল্লীর সরল জীবনযাত্র নির্ব্বাহ করিয়া তাহারা সন্তুষ্ট চিত্তে পরম সুখে বাস করে যখন পল্লীতে বাস করি‍য় তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনে ক্লেশ উপস্থিত হয়, তখ পল্লীর মায়া কাটাইয়া তৎপর তার সহিত কর্ম্মের সন্ধা বাহির হইয়া পড়িতে তাহাবা একটু ইতস্তত করে না।

গ্রাম্য গায়কের দল

আমাদের দেশে কংগ্রেস কনফারেন্স, সাহিত্য-সম্মেল প্রভৃতির নিমন্ত্রণ-পত্রে লে থাকে—বিছানা ও মশা সঙ্গে করিয়া আনিবেন ইহাদের দেশে বিবাহ প্রভৃ সামাজিক ব্যাপারে যেথা ভোজের ব্যবস্থা থাকে সেখানে নিমন্ত্রণ পত্রে লিখি দেওয়া হয়—তোমার নিজে দের থালা, গেলাস, বা ছুরি, কাঁটা, চামচ প্রভৃ

গির্জ্জায় যাইবার বিচিত্র পোষাক—রুথেনিয়ায় রবিবারে গির্জ্জায় উপাসনা করিতে যাইবার সময় শালের চোগা-চাপকান পরিয়া সাজিয়া গুজিয়া যাইতে হয়। এদের পোষাকগুলি যাত্রার দলের ঘুড়ির মত।

মোরাভিয়ার কৃষক-রমণীগণ

লইয়া আসিও ; তবে নিমন্ত্রণ খাইতে পাইবে ; আমরা কেবল খাদ্য সরবরাহ করিতে পারিব, বাসন দিতে পারিব না।” আমাদের দেশে ভোজের নিমন্ত্রণে কলাপাতা কিম্বা শাল-পাতা, মাটীর ভাঁড়, খুরী, গেলাস প্রভৃতি অল্প মূল্যের বস্তু ব্যবহার করিবার প্রথা থাকায় নিমন্ত্রিত অভ্যাগত ব্যক্তি-গণকে বাসন বহনের ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয় না। থালা বগলে করিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে যাইবার প্রথা হাঙ্গেরী দেশেরও পল্লী অঞ্চলে খুবই প্রচলিত।

জেকোশ্লোভাকিয়া দেশে সর্ব্বাপেক্ষা লোকের ঘনবসতি তাহার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে। এই দেশের বৃহত্তম নগর ব্রাটিসলাভায় হাটের দিন দেশের অধিবাসীদের সরল জীবন-যাত্রায় অনেক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। হাটের দিন পল্লীগ্রাম হইতে চাষীরা গোরুর গাড়ী শাকশব্জিতে বোঝাই করিয়া হাটে বিক্রয় করিতে আসে। কামার তাহার ছুরি, কাঁচি, বঁটি, কাঁটা চামচে লইয়া, কুমার তাহার হাঁড়িকুঁড়ি লইয়া, তাঁতি তাহার যন্ত্র লইয়া, এবং অন্যান্য শ্রেণীর শিল্পীরা নিজ নিজ পণ্য লইয়া হাটে আসিয়া হাজির হয়। হাটে কোনরূপ শৃঙ্খলা নাই ; তবে এক এক শ্রেণীর পণ্য-বিক্রেতারা দল বাঁধিয়া এক এক যায়গায় তাহাদের পণ্য সাজাইয়া বসে। কোন স্থানে সকল রুটি-বিক্রেতা নানা আকারের ও নানা রকমের রুটি সাজাইয়া রাখিয়াছে। কোথাও মুচিরা সমবেত হইয়া জুতা বিক্রয় করিতে বসিয়াছে। কোথাও বা কেবল বস্ত্রাদি বিক্রীত হইতেছে। ফলের যায়গায় কেবলই নানা জাতীয় ফল বিক্রয়ার্থ আসিয়াছে। শাকসব্জি, আনাজ-তরকারী এক যায়গায় বিক্রী হইতেছে। এ দেশে ফুটি, তরমুজ ও কাঁচালঙ্কা খুব জন্মে এবং লোকে খায়ও বিলক্ষণ। এই লঙ্কায় একটা সুন্দর সুমিষ্ট গন্ধ আছে। কিন্তু তাহার ঝাল কিরূপ বলা যায় না। অনেক চাষা অতি অল্প জিনিস, যেমন একমুঠা সিম, কিম্বা গোটা পঞ্চাশ বিলাতী বেগুন লইয়া হাটে বেচিতে আসিয়াছে। ইহাদের বিনিময়ে সামান্য দুই-চারিটা পয়সা পাইলেই তাহারা পরম পরিতোষ লাভ করে। কোথাও একদল কৃষকপত্নী বা কৃষককন্যা ছত্রক

নগর-সঙ্কীর্ত্তন। (কোন গ্রাম্য ঋষির সম্মানার্থ)

বা ব্যাঙের ছাতা বিক্রয় করিতে বসিয়াছে। ছত্রকের ব্যঞ্জন ইহারা খুব পছন্দ করে। বিক্রেয় পণ্য অতি সামান্য হইলেও, চাষার মেয়েদের সাজ-পোষাকের উজ্জ্বল বর্ণে চক্ষু ঝলসিয়া যায়। আর কিছু না হউক রঙীন পোষাক ইহারা পরিতে অত্যন্ত ভালবাসে।

গ্রাম্য হাট—কার্পেথিয়ান পার্বত্য প্রদেশে গ্রামে গ্রামে হাট বসে। সেই হাটে গৃহপালিত পশুপক্ষীর, প্রধানতঃ শূকরের, ক্রয়-বিক্রয় চলে। প্রায় প্রত্যেক কৃষকের আর কোন পশু না থাকুক অন্ততঃ দুই চারিটা শূকর আছেই। আর যাহার একটি মাত্র ঘর, সেই ঘরের এক কোণে তাহার শূকরের পালকে যায়গা দিতে হয়। অবশিষ্টাংশে কৃষক স্বয়ং সপরিবারে বাস করে।

কৃষকদের বিশ্রাম

আর প্রত্যেকের কাছে দুই-একখানা রঙীন রুমাল থাকা চাই।

উৎসব দিবসে গ্রাম্য লোকরা নিজ নিজ স্থানীয় পোষাক পরিচ্ছদে সজ্জিত হ'য়া বাহির হয়। শ্লোভাক পুরুষরা লম্বা চুল রাখে, কিন্তু দাড়ী গোঁফ কামাইয়া ফেলে।

শ্লোভাকরা দরিদ্র ও সরল বটে, কিন্তু বিলক্ষণ ভাব-প্রবণ, কল্পনাপ্রিয়, রোমান্টিক। তাহাদের এই ভাব-প্রবণতা বিশেষ করিয়া ধরা পড়ে যখন কোন বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত হয়। একদিন সন্ধ্যাকালে প্রণয়ী তাহার প্রিয়তম বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া তাহার প্রণয়িনীর বাড়ীতে আসিয়া দরজায় ধাক্কা দেয়। বাড়ীর লোকরা দরজা খুলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করে, কে হে তুমি, কি চাই? প্রণয়ী বলে, আমরা একটা তারা খুঁজিতে আসিয়াছি। বাড়ীর লোকরা বলে, ভিতরে আসিয়া খুঁজিয়া দেখ। তাহাদের আসিতে দেখিয়া প্রণয়িনী তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক কোথাও গিয়া লুকাইয়া থাকে। বর অমনি বলিয়া উঠে, ঐ যে তারা, উহাকেই আমরা খুঁজিতেছি। তাহার পর বর বলে, আমরা উহাকে খুঁজিতে পারি কি? কনের পিতামাতা খুঁজিবার অনুমতি দিলে লুকোচুরি খেলা আরম্ভ হয়। পরে বর কনেকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া ধরিয়া তাহার ভাবী শ্বশুর শ্বাশুড়ীর কাছে লইয়া আসে। বরের বন্ধু তখন বাবা আদম ও জননী ইভার আমল হইতে প্রবর্ত্তিত বিবাহ প্রথার উপর লম্বা এক বক্তৃতা ঝাড়ে। তৎপরে গুরুগম্ভীর ভাবে বাগ্‌দান সম্পন্ন হয়।

রুথেনিয়া

জেকোশ্লোভাকিয়ার পূর্ব্বাংশ অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত; এবং পোলাণ্ড ও রুমানিয়ার মধ্যে অবস্থিত। এই অংশের নাম রুথেনিয়া, এবং ইহার অধিবাসীদের নাম রুথেনেস বা রুথেনিয়ানস্। ইহাদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ। নিজেদের দেশ ইহারা নিজেরাই শাসন করে। ইহারা দরিদ্র ও অনুন্নত। এই জাতি প্রধানতঃ শ্রমজীবী। সমগ্র রুথেনিয়ার অধিবাসীদের তন্তুবায় সম্প্রদায় বলিলেও চলে; কারণ, ঘরে ঘরে চরকা ও তাঁত আছে, প্রত্যেক পরিবার গৃহশিল্প হিসাবে বস্ত্র বয়ন করে। ইহাদের মধ্যে যাহারা কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত

নাগরিক হাট—দূর গ্রাম হইতে গ্রাম্য লোকরা সহরে তাহাদের পণ্য বিক্রয় করিতে আনিয়াছে

তাহাদিগকে কাঠের কাজ—গৃহসজ্জা, আসবাব, কাগজ প্রস্তুত করিতে এবং নিজেদের কারখানা স্থাপন করিতে উৎসাহিত করা হইতেছে। এই জাতি শ্লাভ জাতীয় ইউক্রেইনিয়ান শাখার একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। সেই জন্য ইহাদিগকে কখনও কখনও ক্ষুদে রাশিয়ান বা লাল রাশিয়ান

বালখিল্য সৈন্যদল—কার্পেথিয়ান পর্ব্বতের এই সকল গ্রাম্যবালক ক্রীড়াচ্ছলে সৈন্য সাজিয়া সেনাদল গঠন করিয়াছে। ভবিষ্যৎ জীবনে ইহারাই প্রকৃত জাতীয় সেনাদল গঠন করিবে

শ্লোভাক বিয়ের কনে'র অবগুণ্ঠন

শ্লোভাক পুরুষ—ইহারা দাড়ী গোঁফ কামায়, এবং মেয়েদের মত চুল বড় রাখে ও মাঞ্চু চীনেদের মত বিনুনি বাঁধে। তাই বলিয়া তাহাদের স্ত্রীলোক বলিয়া মনে হয় না

বলা হইয়া থাকে। এই জাতীয় কতক লোক পোলিস গ্যালিসিয়া কিম্বা রুমানিয়ান বুকোভিনা প্রদেশেও বাস করে।

মহাযুদ্ধের ফলে এইরূপ বিভিন্ন জাতীয় লোক লইয়া জেকোশ্লোভাকিয়া গণতন্ত্র রাজ্য গঠিত হইয়াছে। ইহাদের আচার-ব্যবহার, সভ্যতা, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে পরস্পরের সঙ্গে ঘোর পার্থক্য রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বোহিমিয়ান জেক জাতি সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। ক্রমশ যত পূর্ব্ব দিকে যাওয়া যায়, অধিবাসীদের অবস্থা তত অনুন্নত। এই সকল বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও ইহারা একই মূল জাতি হইতে উদ্ভূত। স্বাধীনতা লাভের উগ্র আকাঙ্ক্ষায় ইহারা একত্র সম্মিলিত হইতে পারিয়াছে। আশা করা যায়, একই অবস্থায়, একই গবর্মেণ্টের শাসনে একই প্রকার শিক্ষা দীক্ষা, সভ্যতার অধিকারী হইয়া কালে ইহারা একই জাতিতে পরিণত হইতে পারিবে।

গত মহাযুদ্ধের শেষে অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়া কয়েকটি খণ্ড রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। জেকোশ্লোভাকিয়া তাহাদের মধ্যে একটি। ইহার দুই

অংশের মধ্যে বোহিমিয়া পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ ভাবে অষ্ট্রিয়ার অধীন ছিল এবং শ্লোভাক জাতির বাসভূমি হাঙ্গেরীর অধীন ছিল। শ্লোভাক জাতি হইতে অনেক বড় বড় লোক জন্মিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কোসুথ নামক এক ব্যক্তি ম্যাগিয়ার রাষ্ট্র-বিপ্লবের সর্ব্বপ্রধান পরিচালক ছিলেন। আর পেটোফি ও কোলার নামক দুইজন শ্লোভাক কবি অতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

পার্ব্বত্য কৃষক-রমণী

ইয়োরোপের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বলিয়া জেকো-শ্লোভাকিয়া নানা যুদ্ধবিগ্রহ, রাষ্ট্র-বিপ্লব, রাজনীতিক বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া গত মহাযুদ্ধের পরিণামে স্বাধীন গণতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। ইহার চতুর্দ্দিকে জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া ও পোলাণ্ড দেশ ইহাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত। সুতরাং ইহা এখনও ভাবী রাজনীতিক বিপ্লবের কেন্দ্রস্থানীয় হইয়াই রহিল। এই রাজ্যটি অষ্ট্রিয়ার ভূতপূর্ব্ব সামন্ত রাজ্য বোহিমিয়া, মোরাভিয়া, সাইলেসিয়া, এবং শ্লোভাকিয়া ও কার্পেথিয়ান রুথেনিয়া নামক হাঙ্গেরীয় অংশদ্বয় লইয়া গঠিত। রুথেনিয়ায় প্রাদেশিক স্বতন্ত্র শাসন প্রচলিত।

মল্লভূমিতে ব্যায়াম-চর্চ্চা

শাসন কার্য্যের সুবিধার্থ সমগ্র রাজ্যটি ২২টি জেলায় বিভক্ত হইয়াছে।

শাসন বিষয়ে এই দেশে গণমতই প্রবল। সেই জন্য ইহার গবর্মেণ্ট ডেমক্রাটিক রিপাব্লিক নামে পরিচিত। ইহার দুইটি রাষ্ট্র-সভা আছে। একটির নাম চেম্বার অব ডেপুটীজ; সদস্য সংখ্যা ৩০০। অপরটির নাম সেনেট; সদস্য সংখ্যা ১৫০। চেম্বারের সদস্য নরনারী, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সাধারণ ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়। দুইটি সভা সম্মিলিত ভাবে ৭ বৎসরের জন্য একজন করিয়া গণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করে। কেবল প্রথম প্রেসিডেণ্ট মাসারাইক যাবজ্জীবনের জন্য প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

সৈনিক বৃত্তি এ দেশে বাধ্যতামূলক। স্থায়ী সৈন্য-সংখ্যা দেড় লক্ষ।

এই দেশটি খনিজ সম্পদে পূর্ণ। স্বর্ণ, রৌপ্য, র‍্যাডিয়াম, সীসক, লৌহ, লিগনাইট, লবণ, ইত্যাদি এই দেশে পাওয়া যায়। নদ-নদীর জলস্রোতের শক্তি হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের বড় রকমের কারখানা এ দেশে আছে। কৃষি ও শ্রমশিল্প এ দেশে সমভাবে পরিচালিত এবং পরস্পরের সহযোগিতা করিয়া থাকে। এখানে কয়েকটি তুলার কল চলে। তাহাতে ৪০ লক্ষ চরকা বা টাকু আছে। এদেশের অনেক শিল্প-দ্রব্য, যথা কাচের জিনিস, পেনসিল প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানী হয়—কলিকাতাতেও অনেক জিনিস আসে। তদ্ব্যতীত তুলাজাত দ্রব্য, পশমী দ্রব্য, চিনি, কয়লা, কাষ্ঠ প্রভৃতিও রপ্তানী হয়।

এই দেশের রেলপথ ৮৫০০ মাইল দীর্ঘ। রেলের অধিকাংশই খাস সরকারের সম্পত্তি। তা ছাড়া ৬৫০০০ মাইল দীর্ঘ টেলিগ্রাফ লাইন ও ৫০০০০ মাইল দীর্ঘ টেলিফোন লাইন আছে। আর ৩৪০০০ মাইল প্রশস্ত মোটর চালাইবার উপযোগী রাজপথও আছে।

প্রধান প্রধান নগরের মধ্যে প্রেগ নগর রাজধানী, লোকসংখ্যা ৬৭৫০০০; ব্রাটিসলাভা প্রধান বন্দর; লোক-সংখ্যা ৯৩০০০।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন এম-এ

(২)

হাস্যরসের উপাদান

প্রাচী বাঙ্গালা কবিগণ সকল স্থান হইতে হাস্যরসের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রাত্যহিক জীবনের অতি ক্ষুদ্র এবং সাধারণ ঘটনাও তাঁহাদের নিকট হাস্যরসের আধার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মানব-চরিত্রের যেখানে যেটুকু দুর্ব্বলতা আছে, রহস্যস্থলে তাহা সমস্তই প্রচার করিয়াছেন; এমন কি উপাস্য দেবতাগণকেও অব্যাহতি দেন নাই।

দেবদেবীকে উপলক্ষ্য করিয়া কৌতুক

হিন্দুর দেবদেবী মানবরূপেই কল্পিত হইয়াছেন; তাঁহাদের জীবনের ধারা সাধারণ মানুষের ন্যায়। সুতরাং মনুষ্যসুলভ প্রায় সকল দোষগুণ তাঁহাদের চরিত্রেও আরোপিত হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালী কবিগণ এই সকল দোষগুণের সমালোচনায় যেরূপ হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের অসাধারণ সাহস এবং বাঙ্গালী-চরিত্রের জাতীয় বৈশিষ্ট্য রহস্য-প্রিয়তার পরিচায়ক। উপাস্য দেবতাকে ভয় ও ভক্তি করা সত্ত্বেও তাঁহাদের লইয়া এরূপ কৌতুক করিবার প্রবৃত্তি অন্য কোন দেশে আছে কি না জানি না।

শিব-ঠাকুর

প্রাচীন কবিগণের হাতে পড়িয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভুগিতে হইয়াছে বৃদ্ধ শিবঠাকুরকে। বৈদিক সাহিত্যে ইনি রুদ্র। তখন ইঁহার যে রূপের পরিকল্পনা হইয়াছে, তাহা ভয়ানক ও রৌদ্ররস-প্রধান,—হাস্যরস সেখানে ঘেঁষিতেই পারে না। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে তাঁহার আকার ও প্রকৃতির নানা রূপান্তর ঘটিতে থাকে। প্রায় সকল পুরাণেই তাঁহার উল্লেখ আছে এবং নানা নূতন নূতন গুণের বর্ণনা আছে। প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণ শিবের যে রূপ দাঁড় করাইয়াছেন, তাহা পুরাণাদি বর্ণিত এই ভিন্ন ভিন্ন গুণাবলীর সমন্বয়ে গঠিত।

শিব আদি-দেবতা, সুতরাং বৃদ্ধ। শিবপুরাণে তিনি কালান্তক সংহারকর্ত্তা, সেজন্য শ্মশানবাসী; চিতাভস্ম এবং অস্থিমালা তাঁহার অঙ্গের ভূষণ। মৎস্যপুরাণে বৃষরূপী ধর্ম্ম তাঁহার বাহন, তাহাই শেষে বুড়ো ষাঁড়ে পরিণত। ভবিষ্য-পুরাণে তিনি ধুতুরা ভক্ষক, স্কন্দপুরাণে মাদকপ্রিয়, তাহার উপরে তিনি অষ্টসিদ্ধির ঈশ্বর। সুতরাং পরবর্ত্তী কালে যখন সিদ্ধির অর্থ হইল ভাং, তখন সমস্ত আবগারি বিভাগটাই তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইল। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, শিব ও পার্ব্বতী অত্যন্ত দ্যূতাসক্ত। পার্ব্বতী একসময়ে পাশা খেলিয়া শিবের সর্ব্বস্ব জয় করিয়া লন এবং শিব ঋণ পরিশোধের জন্য ভিক্ষা করিতে বাধ্য হন;—ইহা হইতে তিনি চিরদরিদ্র এবং ভিক্ষাজীবী রূপে

কল্পিত হইলেন। শিব সর্ব্বব্যাপী বলিয়া তিনি দিগম্বর। কিন্তু যখন পাশা খেলায় সর্ব্বস্ব হারিয়া ভিক্ষায় বাহির হইলেন, তখন ত কৌপীনটী পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিতে হইয়াছিল,—সুতরাং শিব বস্ত্রহীন!

এইরূপে প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে বৈদিক রুদ্র হইয়া পড়িয়াছেন —ভাঙ্গড়, ভোলা, দিগম্বর। এরূপ বিচিত্র মূর্ত্তিকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বভাবতঃই যেরূপ হাস্যরসের সৃষ্টি হইতে পারে, প্রাচীন কবিগণ তাহার কোন ত্রুটি রাখেন নাই। কিন্তু ইহাতে যে দেবাদিদেব মহাদেবের মর্য্যাদা হানি হইয়াছে তাহাও বলা যায় না। বরং ভয় ও ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে একটু স্নেহ ও সমবেদনার মিশ্রণ হইয়া তাঁহাকে প্রিয়তর, নিকটতর করিয়া দিয়াছে। বৃদ্ধ পিতামহ পরিবারের মধ্যে প্রধান। বয়ঃজ্যেষ্ঠ এবং সকলের ভক্তি-ভাজন হইলেও নাতি-নাতিনীরা যেমন তাঁহার ঘনিষ্ঠ সাহচর্য্যে এবং সরস আলাপে আনন্দ লাভ করে এবং তাঁহার বার্দ্ধক্যজাত ছোট ছোট দুর্ব্বলতাকে উপলক্ষ্য করিয়া নিঃসঙ্কোচে রঙ্গ-কৌতুক করে, বাঙ্গালী হিন্দুর নিকট শিব-ঠাকুরও অনেকটা সেইভাবেই প্রতিষ্ঠিত।

শিবের বিবাহ, শিব দুর্গার কোন্দল, শিবের ভিক্ষা ও কৃষিকার্য্য প্রভৃতি প্রসঙ্গ অনেক প্রাচীন কাব্যেই আছে, বিশেষতঃ মঙ্গল-কাব্যে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, রামেশ্বরের শিবায়ণ, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, বংশীধরের পদ্মাপুরাণ, বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে এবং শিবের গান ও ছড়ায় প্রগাঢ় হাস্যরসের সমাবেশ আছে।

শিবের বিবাহ

শিব ঠাকুরের প্রথম সংসার অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। দক্ষযজ্ঞের তুমুল ব্যাপার এবং সতীর দেহত্যাগে মর্ম্মভেদী শোকের ভিতর দিয়া ইহার যেরূপ ভীষণ পরিসমাপ্তি হইল, তাহাতে হাস্য-রসের প্রবেশ পথ নাই। দ্বিতীয়বার সংসারী হইবার সূচনা হইতেই শিবের জীবনে একটু সরসতার সূত্রপাত হয়। গৌরী যখন তাঁহাকে পতিরূপে পাইবার জন্য কঠোর তপস্যায় নিরতা, তখন শিব তাঁহার তপে তুষ্ট হইয়া দেখা দিলেন। কিন্তু ভাবী পত্নীর সহিত একটু কৌতুক করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি আসিলেন সামান্য সন্ন্যাসীর বেশে। আসিয়া শিবের নানা দোষ কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন,—

তোমা হেন পদ্মিনী কি পাগলেরে সাজে।
বুড়া বরে মনে ধরে ছি ছি কোন্ লাজে॥
শম্ভুর স্বধন নাই নাহিক ভরসা।
তার ঘরে গেলে পরে ঘটিবে দুর্দ্দশা॥
তাই বলি বিধুমুখি না করিহ পণ।
তোর যোগ্য বর নহে ক্ষেপা পঞ্চানন॥
ইন্দ্র দেবরাজ যদি দেখা পায় তোরে।
তোমার মাথার দিব্য শচী ত্যাগ করে॥

* * * * *

না হয় তোমাকে আর বলি এক কথা।
আমিও একাকী মোর নাহিক বনিতা॥"

(দ্বিজ কালিদাসের কালিকা-মঙ্গল)

শিবনিন্দা শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া,

"কালী বলে হেন বাক্য না বলিও তুমি।
যেন তেন হৌক তেঁহ শিব মোর স্বামী॥"

(বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ)

এবং সখীকে "এথা হতে দূর কর নিন্দুক ব্রাহ্মণে" এই আদেশ দিয়া পুনরায় তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। তখন শিব নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন "আমি তোমার তপস্যায় তুষ্ট হইয়াছি, তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে, শীঘ্রই ঘটক পাঠাইতেছি।"

শিব তাঁহার ভাবী শ্বশুরের সঙ্গেও একটু রসিকতা করিতে ছাড়িলেন না। গিরিরাজের নিকটেও সন্ন্যাসীর বেশে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—

"দেখে তব গৌরী কন্যে জামাই হবার জন্যে
তব পুরে হইল আগমন॥
কথা শুনে হিমালয় আর রাগে অঙ্গ দয়
অতিশয় কোপেতে কম্পয়।

* * * *

কোপে কহে কিঙ্করে মুষ্টি ভিক্ষা দিএ এরে
ধাক্কা মেরে করহ নির্গত॥
হেসে বলে ত্রিপুরারি কিবা ভিক্ষা দিবে গিরি
অন্ন-ভিক্ষা-উপজীবী নই।
যদি হয় পুণ্যবান্ কন্যা-রত্ন কর দান
মর্ম্ম দুঃখে সাম্য তবে হই॥

হরের উত্তর শুনে গিরি মহাকোপ-মনে
হরে কটু ক'হে কত কব।
বলে বেটা এত জোর একটা চড় মেরে তোর
কাঁথা বাঘছাল কেড়ে লব॥
হাসি বলেন ত্রিপুরারি শুন শুন শুন গিরি
কাঁথা ঝুলি সব তুমি লয়।
ইহা আমি নাহি চাই কেবল হব জামাই
মম বামে গৌরীরে বসায়॥

(দ্বিজ কালিদাসের কালিকা-মঙ্গল)

অবশেষে হিমালয় এই ধৃষ্ট সন্ন্যাসীকে হাত-পা বাঁধিয়া ফেলিয়া রাখিলেন।

তাহার পর নারদ আসিয়া বিবাহ ঘটাইয়া দিলেন। যথাসময়ে শিব বিবাহ করিতে আসিলেন। কিন্তু তাঁহার বৃদ্ধ বয়স, অদ্ভুত বেশ এবং বিচিত্র বাহন দেখিয়া আত্মীয় পরিজন ত অবাক্! এত তপস্যা করিয়া গিরিরাজ-কুমারীর অদৃষ্টে শেষে এমন অযোগ্য বর জুটিল দেখিয়া সকলেই মর্ম্মাহত,—মেনকার ত কথাই নাই। তিনি বরকন্যার বয়স ও আকৃতিগত বৈষম্যের আলোচনা করিতে লাগিলেন,—

"পায়ে পড়ে আমার উমার কেশপাশ।
বুড়ার বিকট জটা পরশে আকাশ॥
আমার উমার দন্ত মুকুতা গঞ্জন।
বায়ে লড়ে ভাঙ্গা বেড়া বুড়ার দশন॥
উমার বদনচাঁদে পরকাশে রাকা।
বুড়ার বিকট মুখে দাড়ী গোঁফ পাকা॥" ইত্যাদি।

(ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল)

তাহার পর স্ত্রী-আচারের সময় বিষ্ণু-প্রমুখ বরযাত্রিগণের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া বর-বাবাজী যে কীর্ত্তি করিয়া বসিলেন, তাহা আজকালকার দিনে হইলে পুলিশের হাতে পড়িতে হইত;—

"কেশব কৌতুকী বড় কৌতুক দেখিতে।
নারদেরে কহিল কন্দল লাগাইতে॥
গরুড়ে কহিলা তুমি ভয় দেখাইয়া।
শিব কটিবদ্ধ সাপ দেহ খেদাইয়া॥"

(ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল)

বাঘছাল খসিয়া পড়িল। তখন মেনকা এবং এয়োগণের মধ্যে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল,—তাঁহারা প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া অন্ধকারে পলাইতে পথ পান না! কিন্তু শিব এদিকে হুঁসিয়ার আছেন,—সহজে ধরা পড়িবার পাত্র নহেন। যদি কেহ তাড়াতাড়ি পুলিশ ডাকিয়া আনিত, তাহারা আসিয়া দেখিত বর মদনমোহন বেশে দাঁড়াইয়া আছেন, আর এয়োগণ তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া প্রাণ ভরিয়া আপন আপন পতির দোষ-কীর্ত্তন করিতেছেন!

শিবের সিদ্ধিভক্ষণ

বিবাহের পর শিবের স্বভাবতঃই একটু নেশা করিবার ইচ্ছা হইল। তিনি তাঁহার অনুচরগণকে বলিলেন;—

"যদবধি এই সতী দক্ষযজ্ঞে গিয়া।
ছাড়ি গিয়াছিল মোরে শরীর ছাড়িয়া॥
তদবধি গৃহশূন্য সিদ্ধি নাহি জানি।
আজি হৈল ইষ্টসিদ্ধি সিদ্ধি দেহ আনি॥"

(ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল)

তাহার পর কি কি উপাদানে, কি প্রণালীতে সিদ্ধি প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহার বিস্তারিত উপদেশ দেওয়া হইল। সিদ্ধি পান করিয়া এবং সাঙ্গপাঙ্গদের বিতরণ করিয়া নকুলের (চাট্) জন্য শিব মহা উপদ্রব আরম্ভ করিলেন। গিরিরাজের রাজ-ভাণ্ডার নূতন জামাতাকে নেশার চাট্ জোগাইতে গিয়া হার মানিল।

শিব ঘরজামাই

বিবাহ ত হইয়া গেল, কিন্তু জামাই আর নড়িতে চাহেন না, শ্বশুরালয়েই মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া রহিলেন। কাজেই তিনি ঘর-জামাই রূপে শ্বশুরের রাজপরিবারভুক্ত হইয়া গেলেন। শিব চিরদরিদ্র এবং শ্রমবিমুখ, সুতরাং ঘর-জামাই হইয়া থাকিবারই যোগ্য। তাঁহার সুবিধাই হইল,—এখন তাঁহার কাজের মধ্যে নেশাটা-আস্‌টা করা, আর পার্ব্বতীর সঙ্গে দিবারাত্র পাশা খেলা। গৃহ-জামাতার অদৃষ্টে যেরূপ লাঞ্ছনা বঙ্গপরিবারে নিত্য ঘটিয়া থাকে, শিবের বেলায়ও তাহাই হইল। মেনকা জামাইয়ের আচরণে জ্বালাতন হইয়া, পরের ছেলেকে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে না পারিয়া আপন কন্যাকেই কঠোর ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন;—

"তোমা ঝি হৈতে মোর মজিল গিরিয়াল।
ঘরে জামাই রাখিয়া পুষিব কত কাল॥
দরিদ্র তোমার পতি পরে বাঘ-ছাল।
সবে ধন বুড়া বৃষ গলে হাড়মাল॥

'পান ক'রে দাও সাথী পানপাত্র মোর,
অক্ষয় হ'য়ে থাক স্বপনের ঘোর–

ওমর-খৈয়াম—শ্রীনরেন্দ্র দেব

প্রেত পিশাচ ভূত নিরবধি সঙ্গে।
অনুদিন কত আর কিনে দিব ভাঙ্গে।
লোকলাজে স্বামী মোর কিছুই না কয়।
জামাতা রাখিয়া হৈল ঘরে সাপের ভয়॥
যদি দুগ্ধ উতলায় নাহি দেহ পাণী।
পাশা খেল সবে মিলি দিবস রজনী॥
মিছা কাজে ফিরে স্বামী নাহি চাষবাস।
ভাত কাপড় কত আর যোগাব বারমাস।"
(কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

স্বামী হাজার অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ হইলেও সাধ্বী স্ত্রী তাঁহার নিন্দা সহ্য করিতে পারেন না। স্বামীর গৌরবেই নারীর গৌরব। তাই পার্ব্বতী স্বামীর মান বজায় রাখিবার জন্য তাঁহাকে এই অপমানকর অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, মাতার সহিত ঝগড়া করিয়া স্বামীসহ কৈলাশ যাত্রা করিলেন। সেখানে শঙ্কর ভিক্ষা করিয়া অতি কষ্টে সংসার পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহাদের দুটী পুত্র হইল। এইরূপে শিব বেশ সংসারী হইয়া পড়িলেন।

শিবদুর্গার কোন্দল

কিন্তু তাঁহার কষ্ট ঘুচিল না। প্রত্যহ ঝুলি কাঁধে করিয়া পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়ানো কি কম কষ্টকর? তাই তাঁহার একদিন ছুটি লইয়া গৃহে একটু আরাম করিবার ইচ্ছা হইল। সেদিন প্রভাতে গৌরীকে বলিলেন,—

"কালি ভিক্ষা করি দুঃখ পাইলুঁ ধামে ধামে।
আজি সকালে ভোজন করি রহিব বিশ্রামে॥
আজি গো গণেশের মা রান্ধিবে মোর মত।" (ঐ)

তারপর রসনাতৃপ্তিকর সৌখীন খাদ্য-দ্রব্যের তালিকা! পার্ব্বতী উত্তর দিলেন,—

"রন্ধনের তরে ভাল কহিলে গোঁসাই।
প্রথমে যে পাতে দিব সেই ঘরে নাই॥
কালিকার ভিক্ষায় নাথ উধার সুধিলুঁ।
অবশেষে ছিল তাহা রন্ধন করিলুঁ॥
আছিল ভিক্ষার কালি পালি দশ ধান।
গণেশের মুষাতে তাহা কৈলা জলপান॥
আজিকার মত যদি বান্ধা দেও শূল।
তবে সে আনিতে নাথ পারি হে তণ্ডুল॥ (ঐ)

শিব তখন ক্ষোভভরে গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন,—

"দেশে দেশে ফিরি　　কত ভিক্ষা করি
ক্ষুধায় অন্ন নাহি মিলে।
গৃহিণী দুর্জ্জন　　ঘর হৈল বন
বাস করি তরুমূলে॥
গুহার ময়ুর　　খাইতে বড় শূর
সর্প খেদাইয়া খায়।
হেন লয় মোরে　　এই পাপ ঘরে
রহিতে না জুয়ায়॥
করুণা করিয়া　　বাঘা বুলে ধায়্যা
দেখিয়া তাহার চাহনী।
বলদ দুর্ব্বল　　করে টলমল
নাহি খায় ঘাসপানী॥
আন বাঘছাল　　শিঙ্গা হাড়মাল
ডুম্বুর বিভূতি ঝুলি।
আইস হে নন্দী　　আমার সঙ্গী
ঘরে না রহিব শূলী॥" (ঐ)

শিব চলিয়া গেলেন। এদিকে গৌরী আপন অদৃষ্টের কথা ভাবিয়া খেদ করিতে লাগিলেন,—

"কি জানি তপের ফলে হর পায়্যাছি বর।
পাট পড়সি নাহি আইসে দেখি দিগম্বর॥
উন্মত্ত ল্যাঙ্গট জটা চিতা ধূলি গায়।
দাঁণ্ডাইতে মাথার জটা ভূমিতে লোটায়॥
একশয়নে শুইতে নারি সাপের নিশ্বাসে।
তারোধিক প্রাণ পোড়ে বাঘছালের বাসে॥
ময়ুর মুষিকে হয় সদাই কন্দল।
এই হেতু দুই ভায়ে দ্বন্দ্ব মোর কর্ম্মফল॥
বাপের সাপ পোয়ের ময়ুর সদাই কলকলি।
গণার মুষা ঝুলি কাটে আমি খাই গালি॥
বাঘ-বলদে সদাই দ্বন্দ্ব নিবারিব কত।
অভাগিনী গৌরীর প্রাণে সদাই উপহত॥
পায়ে ধরি উধার করি সুধিতে কন্দল।
পুনর্ব্বার উধার করিতে নাহি স্থল॥
দারুণ কর্ম্মের দোষে রহিলাঙ দুঃখিনী।
ভিক্ষার ধনে দারুণ বিধি করিল গৃহিণী॥" (ঐ)

এরূপ কোন্দল প্রায়ই হইত। দাম্পত্য কলহ অবশ্য

সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে। কিন্তু স্বামীর অকর্ম্মণ্যতা বা আর্থিক অভাব যে কলহের কারণ, তাহা দাম্পত্য-প্রেমের লীলামাত্র নহে,—তাহা দরিদ্র গৃহস্থের জীবনকে বিষময় করিয়া তোলে। শিব-দুর্গার এই কলহের চিত্র দারিদ্র্য-পীড়িত বাঙ্গালীর দুঃখের সংসারেরই অতি করুণ চিত্র। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নায়ক-নায়িকা সামান্য মনুষ্য নহেন, স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব এবং জগদ্ধাত্রী দুর্গা। আর তাঁহাদের এই কলহ দেবলীলার অংশ মাত্র। তাই বাঙ্গালী কবি তাহার বর্ণনায় হাস্যরসের অবতারণা করিতে পারিয়াছেন এবং আমরাও নিঃসঙ্কোচে তাহা উপভোগ করিতে পারি।

একদিন সদাশিব নিজ দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে সহসা তাহার প্রকৃত কারণ আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন,—

"পরস্পর পরম্পরা শুনি এই সূত্র।
স্ত্রীভাগ্যেতে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র॥"

(ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল)

সকল দোষের মূল যে পার্ব্বতী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই! তিনি যে কতদূর অলক্ষণা তাহার ত ভূরিভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। শিব বলিতেছেন,—

"তোমাকে বিভা করি আমার কোন দিন নাই সুখ।
আদি কথা কহিলে পাইবা বড় দুঃখ॥
যেদিন সম্বন্ধ হইল তত্ত্ব পাইনু মুই।
সেদিন হারাইল আমার ঝুলি সিয়া সুঁই॥
নিরীক্ষণ পত্র হইল যেহি দিন।
আচম্বিত হারাইল পরণের কৌপীন॥
যে দিন তোক বিভা করিয়া লইয়া আইনু ঘরে।
চৌদ্দ আটি ভাঙ্গ সেহি দিন নিল চোরে॥
যে দিন বৌভাত খাইনু নির্ব্বংশিয়ার বিটি।
সে দিন হারাইনু মোর ভাঙ্গ ঘোটা লাঠি॥"

(কবিজীবন মৈত্রের শিবায়ণ)

অকর্ম্মণ্য লোকের নিকট এইরূপই প্রত্যাশা করা যায়। নিজের দোষ কেহ দেখে না; অপদার্থ পুরুষও নিজের অক্ষমতা স্বীকার না করিয়া সকল দোষ পত্নীর স্কন্ধে চাপাইয়া একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকে। শিবও সেই পন্থাই অবলম্বন করিলেন। কিন্তু পার্ব্বতী এতবড় অপবাদ নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিবেন কেন? তিনিও মুখের মত জবাব শুনাইয়া দিলেন,—

"কড়া পড়িয়াছে হাতে অন্ন বস্ত্র দিয়া।
কেন স'ব কটু কথা কিসের লাগিয়া॥
অলক্ষণা সুলক্ষণা যে হই সে হই।
মোর আসিবার পূর্ব্বকালী ধন কই॥
গিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে।
গিয়াছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে॥
বুড়া গরু লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছ গাড়ু।
ঝুলি কাঁথা বাঘছাল সাপ সিদ্ধি লাড়ু॥
তখন যে ধন ছিল এখন সে ধন।
তবে মোরে অলক্ষণা কন কি কারণ॥
উহার ভাগ্যের বলে হইয়াছে বেটা।
কারে কব এ কৌতুক বুঝিবে কেটা॥
বড় পুত্র গজমুখ চারি খান।
সবে গুণ সিদ্ধি খেতে বাপের সমান॥
ভিক্ষা মাগি খুদ কণা যে পান ঠাকুর।
তাহার ইন্দুরে করে কাটুর কুটুর॥
ছোট পুত্র কার্ত্তিকেয় ছয় মুখে খায়।
উপায়ের সীমা নাই ময়ূর উড়ায়॥
উপযুক্ত দুটি পুত্র আপনি যেমন।
সবে ঘরে আমি মাত্র এই অলক্ষণ॥

(ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল)

অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! যিনি পতিনিন্দা সহ করিতে না পারিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনিই একবার যাত্রা বদলাইয়া আসিয়া এখন সেই স্বামীরই নিন্দায় পঞ্চমুখ। শিব তখন কি করেন, মনের দুঃখে কৈলাস ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

শিবের ভিক্ষা

বেচারী শঙ্করের অদৃষ্টে কিন্তু ঘরে বাহিরে কোথাও সুখ নাই। গৃহে ভার্য্যা অপ্রিয়বাদিনী, বাহিরে হীন ভিক্ষাবৃত্তি আর তাহাতেই কি শান্তি আছে? পথে বাহির হইলে বালকগণের হস্তে তাঁহাকে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়;—

"কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ॥
কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল।
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল॥
কেহ বলে ভাল করি শিঙ্গাটি বাজাও।
কেহ বলে ডমরু বাজায়ে গীত গাও॥

কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া।
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া॥"
(ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল)

শিবের শাঁখারি বেশ

এদিকে শঙ্করের হাতে পড়িয়া শঙ্করীর দুরবস্থা দেখুন! স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ অলঙ্কার-প্রিয়। কিন্তু অলঙ্কার ত দূরের কথা, একজোড়া শাঁখাও গৌরীর হাতে উঠে নাই। একদিন তিনি শিবকে মিনতি করিয়া বলিলেন,—

"তোমার নারী হয়ে আমার সাধ নাহি পোরে।
যেন বেশ্যা পতির কপালে পড়ে রমণী ঝোরে॥
দিব্য সোনার অলঙ্কার না পরিলাম গায়।
শ্যামের বরণ দুই শঙ্খ পর্‌তে সাধ যায়॥
দেবের কাছে মরি লাজে হাত বাড়াতে নারি।
বারেক মোরে দাও শঙ্খ তোমার ঘরে পরি॥"
(গ্রাম্য শিবের গান)

এমন করুণ কথাতেও ভোলানাথের মন গলিল না,—নিতান্ত বেরসিকের মত কৌতুক করিয়া বসিলেন ;—

ভেবে ভোলা হেসে কন শুনহে পার্ব্বতী
আমি ত কড়ার ভিখারী ত্রিপুরারি শঙ্খ পাব কথি?
হাতের শিঙাটা বেচ্‌লে পরে হবে না
একখানা শঙ্খের কড়ি,
বলদটা মুল করিলে হবে কাহনটেক কড়ি।" (ঐ)

নিজের অকর্ম্মণ্যতা ও দারিদ্র্যের জন্য লজ্জিত হওয়া ত দূরের কথা, ইহা যেন তাঁহার একটা গর্ব্বের বিষয়! কথা শুনিয়া পার্ব্বতীর পিত্ত জ্বলিয়া গেল, এবং এরূপ অবস্থায় সাধারণ স্ত্রীলোক যাহা করিয়া থাকে, তিনিও তাহাই করিলেন,—রাগ করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন।

ব্যাপার যে এতদূর গড়াইবে শঙ্করের তাহা আদৌ মনে হয় নাই। পার্ব্বতীকে সত্যসত্যই চলিয়া যাইতে দেখিয়া তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং নারদকে সম্মুখে পাইয়া আপনার গভীর মর্ম্মবেদনা জ্ঞাপন করিলেন,—

"রামেশ্বর বলে ঋষি বৈসে ভাব কি।
পাথারে ফেলিয়া গেল পর্ব্বতের ঝি॥"
(রামেশ্বরের শিবায়ণ)

নারীর নিকট পুরুষ চিরকাল পরাজিত, সুতরাং শিবকে মানভঞ্জন করিতে যাইতে হইল। কিন্তু তাহার জন্ত একটা কৌশল অবলম্বন করিলেন। বিশ্বকর্ম্মাকে দিয়া একজোড়া বহুমূল্য শাঁখা নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহা লইয়া শিব শাঁখারির বেশে পার্ব্বতীর নিকট উপস্থিত হইলেন। শাঁখা পছন্দ হইল, পার্ব্বতী তাহার মূল্য জানিতে চাহিলেন। কিন্তু ভোলানাথ পাকা ব্যবসাদার কি না, দর-দামের আলোচনা না করিয়া কহিলেন,—

"গৌরী,
ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ, হরের কৈলাশ, এ ত সবাই কয় ;
বুঝে দিলেই হয়।
হস্ত ধুয়ে পর শঙ্খ, দেরি উচিত নয়॥"
(গ্রাম্য শিবের গান)

তখন,

"গৌরী আর মহাদেব কথা হল দড়,
সকল সখী বলে, দুর্গা শঙ্খ চেয়ে পর।
কেউ দিলেন তেল গাম্‌ছা কেউ জলের বাটি,
দেবের উরুতে হস্ত থুয়ে বস্‌লেন পার্ব্বতী।
দয়াল শিব বলেন, শঙ্খ আমার কথাটি ধর,
দুর্গার হাতে গিয়ে শঙ্খ বজ্র হয়ে থাক।
শিলে নাহি ভেঙ শঙ্খ খড়্গে নাহি ভাঙ,
দুর্গার সহিত করেন বাক্যের তরঙ্গ।
এ কথা শুনিয়া মাতা মনে মনে হাসে,
শঙ্খ পরান জগৎপিতা মনের হরষে।" (ঐ)

শঙ্খ পরিয়া তাহার দাম দিতে গেলে শাঁখারি বলিল,—

"আমি যদি তোমার শঙ্খের লব তঙ্ক,
জগৎ মাঝারে মোর রহিবে কলঙ্ক!" (ঐ)

শাঁখারি মূল্য লইবে না শুনিয়া গিরিরাজ-কন্যা অপমানিত বোধ করিলেন। বলিলেন,—

"কেমন কথা কও শাঁখারি কেমন কথা কও,
মানুষ বুঝিয়া শাঁখারি এ সব কথা কও!" (ঐ)

এবার শাঁখারির মুখ ছুটিল,—

"না কর বড়াই দুর্গা না কর বড়াই,
সকল তত্ত্ব জানি আমি এই বালকের ঠাঁই।
তোমার পতি ভাঙড় শিব তা ত আমি জানি,
নিতি প্রতিঘরে ভিক্ষা মাঙেন তিনি।

এই কথা শুনি মায়ের রোদন বিপরীত,
বাহির করিতে চান শঙ্খ না হয় বাহির।
পাষাণ আনিল চণ্ডী শঙ্খ না ভাঙ্গিল,
শঙ্খেতে ঠেকিয়া পাষাণ খণ্ড খণ্ড হল।
কোনোরূপে শঙ্খ যখন না হয় কর্ত্তন,
খড়্গ দিয়ে হাত কাটিতে দেবীর গেল মন।
হস্ত কাটিলে শঙ্খে ভরিবে রুধিরে,
রুধির লাগিলে শঙ্খ নাহি লবে ফিরে।" (ঐ)

অবশেষে অন্য উপায় না দেখিয়া দুর্গা ধ্যানে বসিলেন। তখন,

"ধ্যানে পেলেন মহাদেবের চরণ দুখান।"

এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝা গেল, দেবতার কৌতুকের পরিসমাপ্তি হইল।

বীমার কথা

শ্রীবীরেন্দ্রভূষণ দত্ত

বড়ই সুখের বিষয় 'জীবন-বীমা' কথাটা বর্ত্তমানে আমাদের দেশে সম্পূর্ণ 'বিদেশী' নহে।

কেহ হয় ত নিজে জীবন-বীমা করিয়াছেন বা করিবার জন্ম কোন না কোন বীমা-কোম্পানীর এজেণ্ট দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়াছেন, কাহারও বা পিতা বীমা করিয়াছেন, কাহারও বন্ধুবান্ধব বীমা করিয়াছেন, কেহ বা নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার জীবন-বীমার উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশে জীবন-বীমার যত প্রসার হইয়াছে, আমাদের দেশে তার এক ক্ষুদ্রাংশও হয় নাই। মানুষের সুখ-সাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য, দুঃখ কষ্ট নিবারণের জন্ম যত প্রকার মঙ্গল-কর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে 'জীবন-বীমা' প্রতিষ্ঠানগুলিই সর্ব্বোত্তম, এ কথা একবাক্যে সর্ব্বদেশীয় চিন্তা-নায়কেরা স্বীকার করিয়াছেন। জীবন-বীমা দ্বারা আকাস্মিক বিপদ, আপদ, দুর্ঘটনা, দুর্ভাগ্য, এমন কি মৃত্যুভয় পর্য্যন্ত অনেক পরিমানে লাঘব হয়।

আমাদের 'সুজলা', 'সুফলা' 'শস্যশ্যামলা' দেশ যে প্রকার দ্রুতগতিতে হীনাবস্থার দিকে চলিয়াছে, তাহাতে অধিকাংশ লোকের ঘরে দারিদ্র্যের কালো ছায়া পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। সুসঙ্গত ভাবে অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিবারবর্গ প্রতিপালন করিতে অতি অল্প লোকই সমর্থ। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের মধ্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা এক সুকঠিন সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। পারিবারিক ও সামাজিক সকল প্রকার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া ভবিষ্যতের জন্ম কিছু সঞ্চয় করার মত উপার্জ্জন-শক্তি অনেকেরই নাই; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, উপার্জ্জনকারী নিজ আয়ের শেষ কপর্দ্দকটীও খরচ করিয়া ঋণজালে জড়িত হইয়া সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হয়েন। উপার্জ্জনকারীর অকস্মাৎ মৃত্যু হইলে বা কোন কারণে উপার্জ্জন বন্ধ হইলে পরিবারস্থ লোকের বিপদের ও দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। এই প্রকার আকস্মিক বিপদের হাত হইতে নিজেকে ও পরিবারবর্গকে রক্ষা করিবার জন্ম পাশ্চাত্য চিন্তা-নায়কেরা জীবন-বীমার সৃষ্টি করিয়া সভ্যজগতের ভক্তি ও শ্রদ্ধা-ভাজন হইয়াছেন। বর্ত্তমান সভ্য-জগতের সকল দেশেই জীবন-বীমার ছোট বড় অনেক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। আশা ও আনন্দের কথা, ভারতও আজ বীমার কার্যে একেবারে পশ্চাতে জগতের এক নিন্দিত কোণে পড়িয়া নাই। ভারতেও ছোট বড় কয়েকটী জীবন-বীমার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে—কয়েকজন দুরদৃষ্টি-সম্পন্ন ও জ্ঞানবৃদ্ধ দেশ-সেবকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে। আজ কালকার দিনে জীবন-বীমার প্রসার যতটা বৃদ্ধি হয় দেশের আর্থিক ও সামাজিক তত উন্নতি হইতেছে বুঝিতে হইবে। বিখ্যাত মনীষী লর্ড ব্রুহাম বলেন :—

"Associations for the insurance of lives ar[e] to be remarked among the noblest institution[s] of the civilized society, and their usefulness ca[n] be attested by thousands of happy and i[n]dependent families, rescued by their mea[ns] from the bitterness of poverty and degradati[on] of charity."

সুসাহিত্যিক Mr. Theodore Roosevelt বলেন ;—

"Life insurance increases the stability of the business-world, raises its moral tone and puts a premium upon those habits of thrift and saving which are so essential to the welfare of the people as a body" আমাদের দেশের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বীমা কোম্পানি Oriental Govt. Security Lifh Assurance Company ltd. এর Director বিখ্যাত ধনতত্ত্ববিদ্ স্যার পুরষোত্তমদাস ঠাকুরদাস মি, আই, ই ; এম্, বি, ই ; জে, পি ; এম্, এল, এ বলেন :—

"Life insurance is now recognised all over the world not as a luxury but as a necessity."

পাশ্চাত্য দেশের জনসাধারণ জীবন-বীমার উপকারিতা ও উপযোগিতা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেক উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি নিজ জীবনের উপর এক বা ত-তাধিক বীমা করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায় যে, পরিবারের কর্ত্তারা প্রচুর উপার্জ্জন করিলেও ভবিষ্যতের জন্য কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারেন না ; এবং সহসা তাঁহাদের মৃত্যু হইলে পরিবারবর্গের সম্বল কিছুই থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রবাসে থাকিলে সেখানকার প্রবাসী স্বজাতিয়েরা চাঁদা তুলিয়া মৃতের পরিবারবর্গের দেশে আসার খরচ যোগান। পরিবারবর্গ দেশে আসিলেন সত্য, কিন্তু তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় কি ? অনেকে বলেন, বিধবাদের যে প্রকারেই হউক দিন চলিয়া যায়। আচ্ছা, ধরিলাম বিধবাদের কোনো প্রকারে চলিয়া গেলো, কিন্তু পুত্রের বিদ্যাভ্যাস ও কন্যার বিবাহ দিবার পন্থা কোথায় ? এই সকল আর্থিক অভাব হইতে সমাজের বুকে নানাপ্রকার দুর্নীতির সৃষ্টি হইতেছে ও হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠতম বীমা-প্রতিষ্ঠান Prudential Assurance Co. of Londonএর General Manager সুবিজ্ঞ Sir Joseph Burn K. B. E. F. I. A বলেন :—

I believe that the country which is effectively insured has necessarily an overwhelming advantage over an uninsured country."

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না হইলেও তাঁহারা ভবিষ্যতের ও আকস্মিক বিপদের কথা চিন্তা করিয়া নিজেদের অতি সামান্য আয় হইতেও কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে পারেন সত্য ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভবিষ্যতের কথা অনেকেই ভাবেন না। আবার কেহ কেহ ব্যাঙ্কে মাসিক ২।৪৲ টাকা জমা রাখিয়া ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য-সাধন করিতেছেন ভাবিয়া সুখী থাকেন। অকস্মাৎ মৃত্যু হইলে ব্যাঙ্ক হইতে ঐ সামান্য জমা টাকা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। ইহা যথার্থ ই বলা হইয়া থাকে যে, "in case of death the Bank pays what you have saved—the Insurance company pays what you have hoped to save." অনেকে ভাবিতে পারেন, পূর্ণ-যৌবন ও স্বাস্থ্য থাকিতে ঐ 'অলক্ষুণে' অকাল-মৃত্যুর কথা ভাবিতে যাইব কেন ? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, বিশেষজ্ঞরা গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন যে আমাদের দেশের লোকের জীবনীশক্তি ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে।

আমাদের দেশের যুবকেরা অনাবশ্যক ব্যয়ে মাসিক কিছু না কিছু টাকা খরচ করিয়া থাকেন। তাঁহারা যদি মুহূর্ত্তের জন্য ভবিষ্যতের কথা ভাবেন ও মাসিক কিছু টাকা দিয়া একটী জীবন-বীমা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা চুক্তির সময় ফুরাইলে ১০০০ বা ততোধিক টাকা ও চুক্তির পূর্ব্বে মৃত্যু হইলে তাঁহাদের পরিবারবর্গ ১০০০ বা ততোধিক টাকা লাভ করিবেন। সকলপ্রকার জাগতিক মঙ্গলকর প্রতিষ্ঠান হইতে জীবন-বীমা প্রতিষ্ঠানের একটা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য আছে। জীবন-বীমা করার পর একটী মাত্র প্রিমিয়াম্ দিয়াও যদি বীমা-কারীর মৃত্যু ঘটে, তথাপি বীমা কোম্পানী মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গকে চুক্তির সকল টাকা প্রদান করে।

অনেকে মনে সন্দেহ করিতে পারেন, ভবিষ্যতে চুক্তি শেষ হইলে পর বা অকালমৃত্যু হইলে জীবন-বীমা কোম্পানী চুক্তির টাকা প্রদান করিবে কি না ? ১৯১২ সালে Indian Life Assurance Companies Act, VI of 1912 পাশ হইবার পর হইতে আজকাল সকল জীবন-বীমা কোম্পানীকেই গবর্ণমেণ্টের নিকট দুইলক্ষ টাকা জমা রাখিতে হয় ও ভারতগবর্ণমেণ্ট নিয়োজিত বিচক্ষণ একচুয়ারী (Government Actuacy) বীমা কোম্পানীর হিসাব-পত্রের দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। ভারতীয় বীমা

কোম্পানীর আইন পাশ হইবার পূর্ব্বে অনেকগুলি কোম্পানী দেশের অনেককে ঠকাইয়াছে সত্য, এবং সেই হইতে অনেকে জীবন-বীমা কোম্পানীর উপরে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হারাইয়াছেন। কিন্তু আজকাল আর ওরূপ হইবার কোন ভয় নাই। পূর্ব্বোক্ত আইন পাশ হইবার পর কেবলমাত্র জীবন বীমা কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া কোন কোম্পানী আজও দেউলিয়া হয় নাই বা ভবিষ্যতে হইবার কোন আশঙ্কা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

জীবন-বীমা সম্বন্ধে আমাদের দেশের কতকগুলি লোকের এখনো ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, বীমাকারী দীর্ঘজীবী হয়েন না। এই কুসংস্কারের বিপক্ষে পাশ্চাত্য মনীষীরা কি বলেন দেখা যাক :—

"Life Insurance is not only the first born of prudence and the mother of thrift, but a branch of mental hygiene which saves those who avail themselves of it from sleepless nights and anxious thoughts and confers tranquility and confidence thus contributing to the stability and health of the mind. (Sir James Creighton Brown M, D., F, R. S.)

"From whatever point of view I attempt to view this matter, it is impossible for me to understand how any true teacher of morality can fail to teach insurance. My belief is that what is needed at the present time is a great awakening of the nation's moral sense. Insurance should be taught in Schools, it shouled be preached from pulpits, it shonld be analysed and studied by professors, it should be trumpeted by the press and proclaimed by every possible means of publicity." (Sir Joseph Burn, K. B. E., F. I. A.)

সুতরাং দেখা যাইতেছে, আমাদের দেশের কুসংস্কার আমাদের জাতীয় জীবন-ধারাকে পঙ্গু করিয়া দিতেছে। আমাদের মনে হয় জীবন-বীমাকারী অল্পায়ু না হইয়া দীর্ঘায়ুই হইবার কথা ; কেন না আকস্মিক বিপদ হইলে পরিবারবর্গের জন্য একটা সংস্থান করা হইয়াছে বলিয়া বীমাকারীর শারীরিক ও মানসিক উন্নতি হইয়া থাকে। জীবন-বীমা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। সুযোগ ও সুবিধা পাওয়া মাত্রই বীমা করিয়া রাখা উচিত, কেন না কাহার কখন বিপদ আসিবে ও স্বাস্থ্য ভগ্ন হইবে, বলা যায় না। অবশ্য বিদেশী কোম্পানীতে বীমা না করিয়া আমরা আমাদের দেশীয় বীমা-কোম্পানীতে বীমা করিতে বলি। অনেকেই দেশীয় বীমা-কোম্পানীতে বীমা করিতে ভয় পাইয়া থাকেন, কারণ পরিচালকদের অপরিণামদর্শিতা ও অসাধুতার জন্য বহু সংখ্যক দেশীয় যৌথ কারবার নষ্ট ও দেউলিয়া হওয়াতে দেশীয় সর্ব্বপ্রকার যৌথ প্রতিষ্ঠানের উপরে জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস কমিয়া গিয়াছে, এমন কি নাই বলিলেও চলে। ১৯১২ ইং সালের পূর্ব্ববর্ণিত Indian Life Aasurance Companies Act পাশ হইবার পর হইতে আর ঐ ভয় নাই বলিলেও বাধা নাই ; কেন না গবর্ণমেণ্ট দেশীয় বীমা-কোম্পানীগুলির উপরে দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। কর্ম্মসচিবদের অপরিণামদর্শিতা ও অসাধুতাদি দৃষ্ট হইলেই তাহা সংশোধন করিয়া কোম্পানীকে সুচারুরূপে পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়। গবর্ণমেণ্ট নিয়োজিত একচুয়ারীর রিপোর্টে দেখা যায়, প্রায় সকল দেশী বীমাকোম্পানীই দাবীর টাকা অত্যল্প সময়ের মধ্যে মিটাইয়া দিতে সক্ষম। বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করিলে প্রিমিয়ামের সকল টাকা আমাদের দেশের বাহিরে চলিয়া যায়, বিদেশী শিল্প-বিজ্ঞানের উন্নতি-কল্পে ব্যয়িত হয়। আমাদের দেশে বীমার প্রতিষ্ঠান ছোট বড় অনেকটী গড়িয়া উঠিলেও ভারতীয় বীমা-কোম্পানীর আরো অধিক প্রয়োজন রহিয়াছে। বহুসংখ্যক বিদেশী কোম্পানী এখনো ভারতে বীমার কার্য্য করিয়া প্রতি বৎসর অনেক টাকা লইয়া যাইতেছে। এতদ্ব্যতীত দেশীয় বীমা-কোম্পানীতে বীমা করিলে প্রিমিয়াম বাবদে দেয় অর্থ আমাদের দেশেরই ব্যবসায়ে নিয়োজিত হয় বলিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের শিল্প-বিজ্ঞান ও ধনবৃদ্ধির সহায়তা করা হয়।

প্রবীণ চিন্তানায়ক পঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায় দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"It is an undoubted fact that the amount of money taken away by the foreign Insurance

companies constitute a large annual drain on the resources of India and it is the duty of Indian to check this drain and capture the Insurance business as far as practicable. I am told that it will be no exaggeration to say that at least 10 crores of rupees go out of India every year in the shape of premiums on all the different classes of Insurance business."

জীবনবীমা দ্বারা মহিলারাই সকল দেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকৃতা হয়েন। স্বামী মারা গেলে আমাদের দেশের মন্দভাগ্য বিধবাদের দুঃখ ও যাতনার অবধি থাকে না। আজকালকার দিনে অতি স্বল্পসংখ্যক স্বামীই স্ত্রীর নামে ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা জমা করিয়া রাখিতে সক্ষম হয়েন। স্বামীর জীবনবীমা থাকিলে স্বামীর অকস্মাৎ মৃত্যুতে বিধবাদের আর অসহায় পুত্রকন্যা লইয়া বা নিজের জন্য বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। অপরের কাছে হাত না পাতিয়া, পরভৃতিকার ন্যায় জীবনযাপন না করিয়া ঐ জীবন-বীমার টাকা সুচারু ও সুসঙ্গত রূপে ব্যয় করিলে দুঃখের সংসার একপ্রকার নিরুদ্বেগে চলিয়া যায়; মোটামুটি রূপে পুত্রের বিদ্যাভ্যাস ও সাধারণ ভাবে কন্যার বিবাহ দেওয়া চলে। নারীরা এই বিষয়ে একটু বিশেষ মনোযোগী হইলে বীমার প্রসার আশাতীত রূপে বৃদ্ধি পায় ও তাঁহাদের ভবিষ্যতের একটা সুসঙ্গত ব্যবস্থা হইয়া যায়। আমাদের দেশের পুরুষেরা ভবিষ্যতের ভাবনা একটা বড় ভাবেন না; নারীরা যদি তাঁহাদের ভবিষ্যতের বিষাদচ্ছবি স্মরণ করাইয়া সারাক্ষণ প্রেরণা দেন, তাহা হইলে পুরুষেরা অবশ্যই জীবন-বীমা করিবেন। নারীর প্রেরণা ছাড়া পুরুষেরা অনেক বড় কাজেও অবহেলা করেন। আজকাল অতি আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে নানা প্রকার বীমার পলিশি বাজারে বাহির হইয়াছে ও হইতেছে। এই সকল প্রণালীই যে অধিক জনপ্রিয় ও লাভজনক হইয়াছে, এমন বলা যায় না; তবে অনেকটিরই বাজারে বেশ চাহিদা আছে।

অনেক সময় দেখা যায় বীমাকারীর মৃত্যু হইলে বীমার টাকা লইয়া পারিবারিক কলহ-বিবাদের সৃষ্টি হয়। আইনতঃ উত্তরাধিকারীই বীমার চুক্তির টাকা পাইয়া থাকেন। স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রীই তাঁহার বীমার অধিকারিণী হইলে পরিবারস্থ পুরুষেরা (এমন নীচমনা পুরুষ আছেন, বলিতে লজ্জা ও দুঃখ হয়) অসহায় বিধবাকে ফাঁকি দিয়া বীমার টাকা ভোগ করেন, এমন ঘটনা বিরল নহে। এই সকল অপ্রীতিকর কলহের হাত এড়াইবার একমাত্র উপায় বীমার পলিশি স্ত্রীর নামে—এসাইনমেণ্ট (Assignment) বা হস্তান্তর করা। কোন কোন কোম্পানীতে এইরূপ এসাইনমেণ্ট করিতে সামান্য ফি লাগে, আর কোন কোন কোম্পানীতে স্ত্রীর নামে এসাইনমেণ্ট করিতে কোন ফি লাগে না। প্রত্যেক নারীর কর্ত্তব্য তাঁহাদের স্বামীর পলিশি তাঁহাদের নিজ নামে এসাইন করাইয়া লওয়া। অনেক বীমাকারী ভাবিতে পারেন, সম্মিলিত পরিবারে বাস করিয়া স্ত্রীর নামে পলিশি এসাইন করা ঠিক নহে; কিন্তু আমাদের মতে, ভবিষ্যতে অপ্রীতিকর কলহ-বিবাদের হাত হইতে মুক্তি পাইবার ইচ্ছা থাকিলে স্ত্রীর নামে হস্তান্তর করা অন্যায় নহে।

অধিকাংশ প্রথমশ্রেণীর বীমা-কোম্পানী মহিলাদের জীবন-বীমা করিয়া থাকে; তবে কোন কোন বিদেশী কোম্পানী আমাদের মহিলাদের জীবন-বীমা করে না। বিশেষজ্ঞরা নানারূপ গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত নারীদের মৃত্যুর গড় সাধারণতঃ পুরুষের তুলনায় অনেক বেশী। আমাদের দেশে অবরোধ, অবগুণ্ঠন ও সুশিক্ষিতা ধাত্রী প্রভৃতির অভাবে সন্তান প্রসব ও তজ্জনিত নানাপ্রকার রোগে নারী-মৃত্যুর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। সন্তান প্রসবের বয়স পার হইলে নারীদের মৃত্যুর সংখ্যা আশাতীতরূপে কমিয়া যায়। সন্তান প্রসবের বয়স উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত নারীদের জীবন নিরাপদ নহে; তাই সকল বীমা কোম্পানীই নারীদের জীবন-বীমাতে ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত কিছু অতিরিক্ত প্রিমিয়াম লইয়া থাকে।

জীবন-বীমার উপযোগিতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কদের সংক্ষিপ্ত মতামত উপরে দেখাইয়াছি; এক্ষণে কোন্ বীমা কোম্পানীতে বীমা করা কর্ত্তব্য তাহার একটা সামান্য আভাস এস্থলে দেওয়া বোধ হয় অবান্তর হইবে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রত্যেকেরই দেশীয় বীমা-কোম্পানীতে বীমা করা প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ দেখা যায়, বীমাকারীরা কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা, পলিশির সকল

সর্ত্ত, প্রিমিয়ামের হার ও দেয় বোনাসের একটা তুলনা-মূলক বিচার না করিয়া কোম্পানীর এজেণ্ট গিয়া উপস্থিত হইলে তাহারই নির্দ্দেশ-মত বীমা করিয়া থাকেন। প্রত্যেক কোম্পানীর এজেণ্টই নিজের কোম্পানীকে সর্ব্বোত্তম বলিয়া ঘোষণা করিবে ইহা শাশ্বত সত্য, সুতরাং এজেণ্টের কথায় না চলিয়া নিজে কয়েকটা প্রথম শ্রেণীর বীমা কোম্পানীর কাগজপত্র আনাইয়া একটা তুলনা-মূলক বিচার করিয়া দেখা অবশ্য কর্ত্তব্য ও বিধেয়। এইরূপ বিচার করিবার জ্ঞান বীমাকারীর না থাকিলে কোন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ লওয়া উচিত। ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক, "Indian life Assurance year Book" নামক পুস্তকে, ভারতে কাজ করে এইরূপ দেশী বিদেশী সকল বীমা কোম্পানীর বিশেষ বিবরণ প্রতি বৎসরে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই পুস্তক পাঠে সকল বীমা কোম্পানীর মধ্যে একটা তুলনা-মূলক বিচার করিতে পারা যায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, এইরূপ তুলনামূলক বিচার না করিয়া বীমা করিবার পর অনেকে অনুতপ্ত হইয়াছেন। মোটামুটি ভাবে কোন্ কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা কিরূপ, দাবীর টাকা মিটাইতে সক্ষম কি না ও কত বোনাস দেয়—দেখিয়া বীমা করা উচিত। যে-কোম্পানী দাবীর টাকা অনায়াসে মিটাইতে সক্ষম ও লাভ-সহ (with profits) পলিশিতে অধিক বোনাস দেয়, এইরূপ কোম্পানীই বেশী জনপ্রিয়।

একেবারে বীমা না করার চাইতে যে কোন কোম্পানীতেই হউক না কেন জীবন-বীমা করা উচিত, তবে ভাল ও শ্রদ্ধেয় কোম্পানীতে করা অধিক লাভজনক।

দেশবন্ধু-নগর

শ্রীযামিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত

কলিকাতা আজ ধন্য হইল পুণ্য নগরী ধরিয়া বুকে,
যথায় ধ্বনিল মুক্তিমন্ত্র দেশের প্রবীণ নেতার মুখে।
মগধ মদ্র মুম্বে প্রয়াগ সিন্ধ করাচী মিলিত বাণী,
গয়া বারাণসী সবাই যাহারে পরম তীর্থ লইল মানি।
শ্রেষ্ঠ মনীষী-চরণ পরাগে রঞ্জিত যার পথের ধূলি,
স্বরাজের যথা বিজয়-চিহ্ন ঘোষিল জাতীয় পতাকা তুলি।
যুবক বৃদ্ধ দেশের কর্ম্মে একই ভাবেতে দিয়েছে সাড়া,
ভূ-পতি কৃষক জ্ঞানী জ্ঞানহীন অভেদে যথায় আত্মহারা।
দীনের কুটীর স্বর্গ মানিয়া খড়ের শয্যা পাতিলা ধনী,
মায়ের সেবায় আকুল আবেগে দৈন্য কষ্ট কিছু না গণি;
ভারতের ভাবী সোণার চিত্র শোভি অহিংস মন্ত্র শুচি
শস্ত্রবিহীন অঙ্গুলি শুধু পাপ অনাচার লইতে মুছি;
গুর্জ্জর-গুরু বিস্মিত আঁখি তাহারি উপ্ত বীজের ফল
মুকুলিত প্রায় ছিন্ন ভারত মহামিলনের চাহিছে বল,
নরনারী আজ সম অধিকার লয়েছে চিনিয়া নিজের দেশ,
দিকেদিকে ছুটে কর্ম্ম-প্রবাহ হেথায় কাজের নাহিক শেষ।
দেশ-শিল্পীর হাতের পণ্য বিদেশের নাহি স্পর্শ লেশ,
সাগরের যেন রতন নিচয় বাড়ব আলোকে শোভন বেশ;
কল্লোল উঠে জনসমুদ্রে প্লাবন আনিছে সিকতা কূলে
দৈন্য ঘুচাতে ডাকেন জননী এতদিন যেন ছিলেন ভুলে।
দেশবন্ধুর বিরাট উদার পরাণের ছবি উঠিছে ভাসি,
স্বরাজ-স্বপ্ন বস্তু আকারে যেথানে হাসিছে মোহন হাসি।
সার্থকনামা নগরী বঙ্গে সে দেশে ধন্য জনম মম,
নমামি নগর চরণে তোমার ভূয়ো ভূয়ো ভূয়ো শতশ নম।
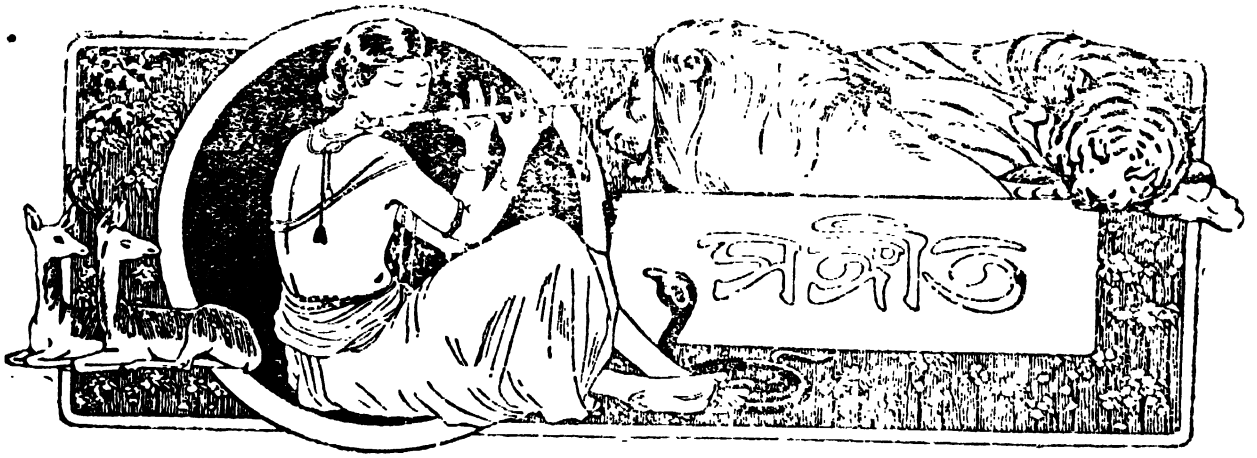
কথা ও সুর ঃ—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন। স্বরলিপি ঃ—শ্রীসাহানা দেবী

মিশ্রসিন্ধু খাম্বাজ—দাদ্‌রা

থাকিস্‌ নে বসে তোরা সুদিন আসবে ব'লে ;
কারো দিন যায় হরষে, যায় কারো বিফলে !
সুখের ছদ্মবেশে,
আসে দুখ হেসে হেসে,
জীবনের প্রমোদ-বনে ভাষায় আঁখি-জলে !
যেথা আজ শুষ্ক মরু
যেথা নাই ছায়া তরু
হয় তো তোদের নয়নজলে ভরবে ফুলে ফলে !
জীবনের সন্ধিপথে
খুঁজে পথ হবে নিতে
কেউ জানে না কোথায় যাবি, কেউ দিবে না ব'লে !
ভাঙ্গিলে বালির আবাস
বিষাদে হ'স্‌ নে হতাশ
আছে ঠাঁই বলে বাতুল রাতুল চরণ-তলে।

+
০ + ০ [সরা | ণ্া সরমা জ্ঞরসা |] ০
II II { া া সা | সা -া সা | -া -া রসা | জ্ঞা জ্ঞরাঃ সঃ | ণ্া ধ্া -া |
থা কি স্‌ নে ব - সে - - তো রা -

+ ০ + ০ +
ণ্া রা -া | রজ্ঞা মা মা | জ্ঞরা মজ্ঞরজ্ঞা সা | } { া া গা | গা গা
সু দি ন্‌ আ স্‌ বে ব'- লে - - - কা রো দি

[গমধা পধা পা] + • +
-া | গা -া মা | মগা পমা গমা | রমা জ্ঞরসা রা | জ্ঞা মা গমা |
ন্ যা য় হ র- যে- - যা- য় কা রো বি -

রা রমা জ্ঞরা | জ্ঞরা জ্ঞা সা | } II
ফ লে- - - - -

• + • [মপণা দা] • +
{ ।। সা | রা মা -া | পা -া পা | -া দা পা | ।। মা | মা পা -া |
সু খের - ছ - ন্দ - বে,শে - আ সে দু খ
যে থা আ জ্ শু - ষ্ক - ম রু - যে থা না ই
জী ব নে র্ স - ন্ধি - প থে - খুঁ জে প থ্
ভা ঙ্গি লে - বা লি র - আ বাস্ - বি ষা দে -

• + • +
মা মমা পদা | পা মজ্ঞরজ্ঞা সা | } { -া । গা | গা গা -া |
হে সে- - হে সে- - - - জী ব নে র
ছা য়া- - ত রু- - - - হয় তো তো দেয়
হ বে- - নি তে- - - - কেউ জা নে না
হ'স্ নে- - হ তা- - শ্ - আ ছে ঠাঁ ই

• [গমধা পধঃপঃ] + • +
গা মা -া | মগা পমা গমা | রা মজ্ঞরা সরা | জ্ঞা মা গমা |
প্র মো দ্ ব- নে- - ভা সা- -য় আঁ খি -
ন য় ন জ- লে- - ভ - - রবে ফু লে -
কো থা য় যা- বি- - কে উ দি বে না -
ব লে - রা তু- ল্ রা তু - ল্ চ র -ণ

• +
রা রমা জ্ঞরা | জ্ঞরা জ্ঞা সা | }II II
জ লে- - - - -
ফ লে- - - - -
ব' লে- - - - -
ত লে- - - - -

বেনামী

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

ছাপা ছবি হিসেবে ভারতমাতার একেবারে শিয়রে—যেখানে তিনি এলোচুল ছড়িয়ে আছেন উত্তর দিক থেকে সুদূর পূর্ব দিকে—

গৃহস্থের ঘর নয়, গাঁ নয়, সহরও নয়। পাহাড়-পর্ব্বত, উপত্যকা, গিরি-নদী, চিড় আর পাইনের জঙ্গল, বেওয়ারিশ মেওয়ার ক্ষেত,—পশুপক্ষীর যেখানে অবাধ রাজ-রাজত্ব!

বছরের এই সময়টায় তীর্থযাত্রীর ভিড় লাগে। দেখা যায় সানুদেশ অতিক্রম করে' পিপীলিকা-শ্রেণীর মত যাত্রীর দল পাহাড়ের জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করে। পায়ে পায়ে পথ তৈরী করে হেঁটেই যায় বেশি লোক। কেউ যায় উটের পিঠে, কেউ বা টাট্টু ঘোড়ায়। গরম কালের রোদে শীত একটুখানি কম; এ সময় বরফ গল্‌তে থাকে। পথে ঝড়-বৃষ্টি হওয়া বিপজ্জনক।

শরৎকালের প্রথমেই সকল যাত্রীর ফেরবার কথা। সরকারের তরফ থেকে যে পথটি বরফ কেটে যাত্রীদের জন্য তৈরী করে দেওয়া হয়েছে, সে পথে কিন্তু কয়েকদিন থেকে কোনো যাত্রীর তল্লাস পাওয়া যাচ্ছে না। লোকের সন্দেহ সত্যিই হলো। খবর এলো, ফেরবার পথে প্রচণ্ড বর্ষা হয়েছে; যাত্রীদের শুধু পথই বন্ধ হয়নি—কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ঠাণ্ডায় বরফ পড়ে গেছে প্রায় দশ ফিটের ওপর। এরই মধ্যে বহু যাত্রী অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সাজ সাজ রব পড়ে গেল।—

পাহাড়ের পথে যাওয়া-আসার কোনো সুবিধে নেই। নানাদিক থেকে সরকারি 'রিলিফ' ছুটোছুটি করতে লাগলো। সন্ধান মিললো অল্প লোকেরই। জায়গায় জায়গায় উত্তাপের জন্য আগুন জ্বলতে লাগলো। ঘোড়ার পিঠে কম্বলের বস্তা ছুটলো। সঙ্গে গেল গমের আটার রুটি, গরুর দুধ, আর আঙুর-চোঁয়ানো মদ।

পথের সরাইখানাগুলো একেবারে হাসপাতাল হয়ে উঠলো।

বেশির ভাগ লোকের পাত্তাই পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যেই বহু লোকের তুষার-সমাধি হয়ে গেছে। কম সে কম প্রায় তিন শো লোক ত বটেই।

মরণ-সমারোহের সে এক ভয়াবহ দৃশ্য!

ফিরে এলো যারা তাদের কেউ আধমরা, কেউ মর মর। কারো পক্ষাঘাত হয়েছে, কারো গলার আওয়াজ রুদ্ধ হয়েছে, কারো বা গায়ের রক্ত জমাট বেঁধে গেছে। দু চারটে পাগলও হয়ে গেছে বুঝি।

কয়েকদিন অক্লান্ত সেবায় যারা বেঁচে উঠলো, তাদের কারো হারিয়েছে বাপ, কারো মা, কারো বা সঙ্গী। হাহাকার করতে করতে সকলেই দেশে ফিরতে লাগলো।

গোলমালটা একটু কমে গেছে ঠিক সেই সময়টায়। জায়গাটার নাম ঠিক জানা নেই। পাথুরে রাস্তাটার খানিক নীচেই ঘরখানি। লতায় পাতায় ছাওয়া। মাটির ছাত। ছাতের ওপর নানারঙের ফুল ফুটে আছে। নীচে অগাধ গভীরতা,—ঘন জঙ্গলের রেখা তরঙ্গিত হয়ে নীচে নেমে গেছে।

ঘরখানি থেকে পা বাড়িয়ে মেয়েটি ডাকলে—শুনুন?

চমকে ওঠবারই কথা। রোগা লম্বা লোকটি হঠাৎ পেছন ফিরে এমন ভাবে তাকালো যেন সাপ দেখেছে।

কাছে যেতে মেয়েটি বললে—ঠাকুরের আশ্রমের লোক বুঝি আপনি? তা ত গেরুয়া দেখেই মনে হচ্ছে।

লোকটি প্রথমে কথা কয় না। মেয়েটি আবার বললে—আপনি বাঙালি?

হাঁ।

তা আগেই বুঝেছি। বাঙালি যতই খাঁটি সন্নিসি হোক, নেংটি সে কিছুতেই পরতে পারে না। আপনাদের আশ্রম কতদূরে?

লোকটির বিস্ময় বোধ হয় এতক্ষণে কেটে গেল। বললে—বাঙালির মেয়ে হয়ে আপনি এখানে?

বিধাতার অক্লান্ত দুটি হাত পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনশ্রী মেয়েটির সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিয়েছে। বললে—আমার নাম জয়া।

করুণ ঘটনা। বাপের সাথে তীর্থে এসেছিল। পাড়ার একটি স্ত্রীলোকও সঙ্গে ছিল। তুষারের মধ্যে বাপের সমাধি সে দেখেছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। স্ত্রীলোকটি আগেই নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল।

সব শুনে লোকটা বললে—আর আপনি ?

আমি অনেক কষ্টে একটা উঁচু গাছের ডালে উঠলাম। মুখে, চোখে, মাথায়, কাপড়ে বরফ পড়ে তখন ভারি হয়ে গেছি। সেই গাছের ওপর সারা রাত রইলাম। পরে কখন্ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছি জানিনে। চেয়ে দেখি আগুন জ্বলছে, গায়ে আমার একখানা কম্বল, পাশেই একটা পাহাড়ি লোক বসে বসে বেহালা বাজাচ্ছে।

এখানে এলেন কি ক'রে ?

সেই লোকটাই নিয়ে এল। লোকটা হিন্দু, ভারি ভালো লোক। কথাবার্ত্তা কিছুই তার বুঝতে পারিনে। মা বলে' আমায় ডাকে, তাই শুধু বুঝতে পারি। এখন কি করবো বলতে পারেন ?

মেয়েটি সজল কণ্ঠে পুনরায় বললে—একলা ছিলাম তাই সাহসও ছিল। আপনাকে দেখে এতক্ষণে মনে হচ্ছে আমি মেয়ে-মানুষ হয়ে কি করতে পারি!

লোকটি বললে—মানুষকে বাঁচানোই আমাদের কাজ। পরে সে কি করবে না করবে অত আমরা দেখিনে। আপনি বাঙালী বলে কিম্বা স্ত্রীলোক বলে বেশি সুবিধে পেতে পারেন না।

জয়া বললে—তার মানে আপনি কিছুই সাহায্য করবেন না—এই ত ? তা বেশ। সুবিধে পেলে আমি নিজেই সুবিধে করে নিতে পারবো। আমাকে শুধু আপনি পথ-ঘাট দেখিয়ে দিন্।

লোকটি বললে—কিন্তু—

কিন্তুর কথা আমি জানি—বোকা নই। বাবা আমাকে পয়সা খরচ করে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। কিন্তু মানে আমার এই দেহটা আপনাদের আশ্রমে গিয়ে ভারি গোল বাধাবে—কেমন ? ভয় কি! আপনারা একে সন্নিসি, তাতে আবার ঠাকুরের চেলা। মানে কামিনী আর কাঞ্চনের শত্রু! গোড়ায় গলদ না থাকলে আমার এই সামান্য উপকারটুকু ঠিক্ করতে পারবেন!

আপনি দেশে ফিরবেন ত ?

নৈলে কি আপনাদের আশ্রমে সংসার পাত্‌বো ? বরং দেশে ফেরবার সুবিধে পেলে আপনাদের ওখানে রাত্রি-বাসও করবো না। দাঁড়ান আসছি।

ঘরে ঢুকে পুরু কম্বলখানা গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে আসতেই সেই পাহাড়ি লোকটার সঙ্গে দেখা। জয়া বললে—আসি বাবা, অনেক কষ্ট দিয়ে গেলাম।

আশ্রমের লোকটি সরে' গিয়ে তার সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা বললে। লোকটার বোধ হয় একটু মায়া পড়ে গিয়েছিল। মেয়েটি যে আশ্রয় পেয়েছে, ও লোকটি যে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো—এ কথাও সে বুঝতে পারলো বোধ হয়। তার সেই গোঁফ-দাড়ির জঙ্গলের ভেতরে টকটকে রাঙা মুখখানায় একমুখ হেসে ঝোলাঝুলির ভেতর থেকে একটি বেহালা ও ছড়্ বার করে' বাজাতে বাজাতে সঙ্গে চলতে লাগলো।

কিছুই সে চায় না—শুধু সঙ্গে যাবে। জনবিরল পর্ব্বতের ধার দিয়ে যেতে যেতে সঙ্গীদের কানে সে শুধু অরণ্যের সুর শুনিয়ে দেবে।

সত্যিই তাই। অনেক দূর গিয়ে বাজনা থামিয়ে এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে প্রণাম করে লোকটা ফিরে গেল।

নিশ্বাস ফেলে তার পথের দিকে একবার চেয়ে জয়া বললে—অসময়ের আত্মীয়—কি বলেন ?

লোকটি বোধ হয় কি ভাবছিল। বললে—হুঁ।

আবার দুজনে চলতে থাকে। পাহাড়ি রাস্তায় হাঁটতে পা ভারি হয়ে আসে, কিন্তু সেদিকে কারো হুঁস নেই। পথের বাঁকে বাঁকে এক একটা অদৃশ্য ঝর্ণার ঝির্‌ঝির্ করে' শব্দ হতে থাকে।

জয়া এক সময় বললে—আপনাকে ডাকবো কি বলে ? নাম আপনার আকাশানন্দ কি বাতাসানন্দ, জেনে রাখা ভালো।

একটু থেমে লোকটি বললে—ভবানন্দ!

ও নামে ডাকা কিন্তু বিশেষ সুবিধে হবে না। নামটাও যেন গেরুয়া রঙে ছুপোনো। তার চেয়ে ঠাকুরের বংশধর আপনারা, স্বামীজি বলে ডাকাই ভালো। ওটাতে রসও আছে, সন্ন্যাসও আছে—কি বলেন ?

আশ্চর্য্য মেয়ে, অদ্ভুত। এ অবস্থায় স্ত্রীলোক হয়ে কেউ যে তামাসা কর্ত্তে পারে, আর সে তামাসা যে এমনি ইস্পাতের মত—এ ধারণার অতীত।

খানিক পথ চলে এসে জয়া আবার বললে—কতদিন আপনি এ দেশে আছেন?

তা বছর খানেক হল।

সংসার ছেড়ে দিয়ে এসেছেন, না সংসার না হওয়ার দুঃখে! বে থা হয়েছিল?

সে কথা আমাদের বলবার যো নেই।

যদি কেউ জিজ্ঞেসা করে? মিথ্যে কথা বলেন বুঝি?

আমরা উত্তর দিই নে।

নামটাও ত' ভাঁড়ানো দেখছি, আগে কি নামে চলতেন?

লোকটি কোনো উত্তর দিল না।

জয়া এবার হাসলে। হেসে বললে—তা হলে আট ঘাট বেঁধেই সন্নিসি হয়েছেন। এক চুল এদিক ওদিক হবার জো নেই। বেশ!

বাঁ দিকের ঢালু পথে নেমেই ডান দিকে আর একটা সরু রাস্তা। দুধারে বুনো-গোলাপের ক্ষেত। মাঝে মাঝে চামেলীর ঝাড়। একজায়গায় কতকগুলো কাঁচা আখ্‌-রোটের গাছ।

আগে আগে এসে ভবানন্দ আশ্রমে ঢুকলো। জয়াও এল পাশে পাশে। পেছন ফিরে একবার তাকাতেই জয়া বলে উঠলো—থাক্ থাক্, অভ্যর্থনা আর কর্ত্তে হবে না, ও ত্রুটি আমি নিজেই সেরে নেবো। শাঁখ বাজিয়ে অভ্যর্থনা করলে হয় ত আপনারাই বিপদে পড়বেন।

নারীর কণ্ঠস্বর শান্ত গাম্ভীর্য্যের মধ্যে যেন একটা তরঙ্গ তুললে। অবশ ও অসাড় আশ্রমের মধ্যে যেন প্রাণের স্পন্দন খেলে যেতে লাগলো।

আশ্রমবাসী কয়েকজন বেরিয়ে এল। তারা ত অবাক্। ভবানন্দ তাদের একে একে ইতিবৃত্ত বলতে লাগলো।

জয়া বেড়িয়ে বেড়িয়ে বললে—আঃ বাঁচলাম। কি ভাগ্যি আপনাদের এখানে ধুনির ধোঁয়া নেই! ভাঙ্-গাঁজার সেবাও বোধ হয় চলে না—না স্বামীজি?

একজন বললে—আজ্ঞে না, এখানে ওসব নিয়ম নেই।

বা রে, আপনিও যে বাঙালী দেখছি। ছেলেমানুষ বয়েসে আপনার আবার এ শাস্তি কেন? কই, আমাকে কোথায় ঠাঁই দেবেন দেখি?

একটি ঘর দেখিয়ে দেওয়া হল। ঘরের মধ্যে সন্ন্যাসীর চেয়ে গৃহবাসীর সরঞ্জামই বেশি। বিছানাপত্র, বাক্স, বই, লেখাপড়ার আস্‌বাব, মহাজনদের ছবি, তামা ও পিতলের বাসন—এমন কি ছোট একখানি আয়না পর্য্যন্ত।

দেখে দেখে জয়া বললে—মন্দ নয়! আপনাদের দলে ভর্ত্তি হতে ইচ্ছে হচ্ছে।

সকল কথার উত্তর দেয়া চলে না। তার চঞ্চল ভাব-ভঙ্গী দেখে সকলে মুখ চাওয়াচায়ি করে।

দুটি মাত্র বাঙালী সন্ন্যাসী। দ্বিতীয়টির নাম প্রেমানন্দ। সে বললে—ওই ঘরে থাকুন, যদি কিছু দরকার হয় তা হলে জানাবেন, আমরা ওই দিকটায় থাকি।

জয়া বললে—এ ঘরে কে থাকতেন?

যিনি থাকতেন তিনি কদিন ভ্রমণে বেরিয়েছেন।

তাই ভালো। আমি ভাবলাম আপনারাই কেউ হবেন বুঝি। ছল্ করে বার বার এ ঘরে আসবার জন্যেই আমাকে এ ঘরটি দিলেন!

লজ্জায় প্রেমানন্দ পালিয়ে গেল।

সন্ধ্যা হয়।—প্রেমানন্দ এদিক ওদিক ঘুরে রান্নার জোগাড় করে আনে। আটা, ডাল, ঘি, কয়েকটা তরকারী, কতকগুলি জ্বালানি কাঠ,—সবগুলি এনে এক জায়গায় নামায়।

ভবানন্দ বলে—এত সব আনতে গেলে কেন, আজ ত আর ভোগ নেই, নিজেদের মধ্যেই—

কেন যে এত সব আনা, সে কৈফিয়ৎ প্রেমানন্দ আর দিতে পারে না, শুধু জয়ার ঘরের দিকে একবার তাকায়। পরে বলে—কিছু কিছু নিয়ে ওঁর কাছে দিয়ে এসো।

ভবানন্দ বলে—তুমিই যাওনা হে। আমাকে আর—

ভবানন্দর বোধ হয় ভয় করে। জয়ার সঙ্গে দেখা হওয়াটাই যেন একটা ভয়ানক অন্যায় হয়ে গেছে। মেয়েটার আয়ত চোখ দুটো শুধু উজ্জ্বলই নয়, দৃষ্টিও ভারি তীক্ষ্ণ! মুখের দিকে চেয়ে কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত কখন্ কি আবিষ্কার করে ফেলবে তার ঠিক নেই!

ওই আসছে বুঝি—। ভবানন্দ ঘরে গিয়ে ঢোকে।

প্রেমানন্দ লাজুক কিন্তু সঙ্কোচ বিশেষ নেই। বয়স তার অল্পই, কিন্তু এরই মধ্যে অতি-সংযমের কর্কশ কাঠিন্য তার সর্ব্বাঙ্গকে ঘিরে ধরেছে।

জয়া বেরিয়ে এসে বললে—একটি কথা না বললে আর চলচে না, বুঝলেন ছোট ঠাকুর মশাই ?

কি বলুন না ?—প্রেমানন্দ মুখ তুলে বললে।

আপনাদের এখানে হিঁদুয়ানী দেখছিনে। মেয়েমানুষ হয়ে সেই কবে থেকে এক-বস্ত্রে আছি, একটা উপায় বলে' দিন্ ?

প্রেমানন্দ এদিক ওদিক তাকায়। গৃহস্থের ঘর নয় যে শৃঙ্খলা থাকবে। তবু বলে—দাঁড়ান দেখি।

ঘরে গিয়ে খানিক বাদে সে বেরিয়ে আসে। একখানি গেরুয়া থান মাটিতে নামিয়ে দিয়ে বলে—আজকের মত এখানা যা হ'ক করে'—

আ ছি ছি! একে থান, তাতে আবার সন্নিসি রঙের। জাত-ধর্ম্ম আমার আর কিছুই আপনারা রাখলেন না দেখছি। একবার আমার গায়ে উঠলে এ কাপড় বোধ হয় আপনারা আর ব্যবহার করবেন না ?

এ কথার উত্তর প্রেমানন্দর মুখে জোগায় না। হাসতে হাসতে কাপড়খানি নিয়ে জয়া ঘরে গিয়ে ঢোকে।

কাঠের গোছা হাতে নিয়ে সরে গিয়ে প্রেমানন্দ বলে—এই নিন্, উনুন ধরান, আমি সব এনে দিচ্ছি।

জয়া হঠাৎ খিল্ খিল্ করে' হেসে বলে—এবার যে গণ্ডীর মধ্যে ঢুকে এলেন, এ ত' আপনাদের নিয়ম নয় ?

মেয়েটার মুখে কিছুই আটকায় না।

কাছে এলে ভবানন্দ বলে—বলতে পারলে না যে, আপনাকে এখানে এনে গোড়াতেই নিয়মভঙ্গ করা হয়েছে ?

কিন্তু কেন যে বলতে পারে না, তা দুজনেই মনে মনে অনুভব করে।

খানিক বাদে কাঁচা তরকারি, আটা, নুন, মসলা প্রভৃতি হাতে নিয়ে প্রেমানন্দ গিয়ে বলে—এবার রাঁধতে বসুন, আলো জেলে দিচ্ছি—ওই যা, ঘি আনতে ভুলে গেছি।

আবার ছুটে গিয়ে প্রেমানন্দ ঘি নিয়ে আসে। আসতেই জয়া বলে—এ সব কি হবে ?

প্রেমানন্দর এইবার হাসি পায়। বলে—কিছু খাওয়া ত চাই ?

চাই বৈ কি, কিন্তু আমি রাঁধতে পারবো না, হাত-পা কামড়াচ্ছে।

কিন্তু তা হলে—

তা হলে কিছু নেই। ঝরণার জল খেয়ে আজকের মতন পড়ে থাকবো। আমাকে এখানে এনে আপনাদের নিয়মভঙ্গ করা উচিত হয়নি। আপনাকে আমি বলছিনে, যাঁকে বলছি তিনি ঠিক আমার কথায় কান পেতে আছেন।

ভবানন্দ বেরিয়ে এসে বলে—আপনি আসবার জন্তে আমায় অনুরোধ করেন নি ?

অনুরোধ আপনি শুনলেন কেন ? সন্নিসি হয়ে সামান্য অনুরোধটাও এড়াতে পারলেন না ? আরও যদি দু'একটা বেফাঁস অনুরোধ করে বসি, আপনি রাখবেন ?

নিজের কথায় জয়া নিজেই হেসে ফেলে। এবং তার সেই হাসি চাবুক মারতে মারতে ভবানন্দকে ঘরের মধ্যে নিয়ে যায়।

প্রেমানন্দ তার পথের দিকে তাকিয়ে চুপি চুপি বলে—রেগে গেছেন!

চুপি চুপি কথা বলা এই প্রথম। জয়াও চুপি চুপি উত্তর দেয়। বলে—ওঁর মতন লোককে সত্যিই আমার ভাল লাগে না।

জয়া পেছন ফিরে চলে যায়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রেমানন্দ তার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে। মনে হয়, গেরুয়া কাপড়খানার রঙ্ এবার সত্যিই খুলেছে!

শেষ পর্য্যন্ত প্রেমানন্দকেই রাঁধতে হলো বটে। জয়া বললে—বেশ ত! আপনাদের আশ্রয়ে এসেছি, একদিন না হয় রেঁধেই খাওয়ালেন! তা ছাড়া আপনাদের মতন যোগী-ঋষির পেসাদ পাওয়াই কি কম ভাগ্যের কথা!

আজ কেমন করে যেন প্রেমানন্দর মুখ খুলে যায়। কথা বলবার একটি অপরিচিত অবরুদ্ধ আবেগ তার কণ্ঠের কাছে এসে ঠেলাঠেলি করে। বলে—আপনি অতিথি, আপনার সেবা করা ত আমাদেরও ভাগ্যের কথা!

হেসে জয়া শুধু বলে—আমার সেবা করায় বিপদ আছে কিন্তু!

মাটির কলসী নিয়ে প্রেমানন্দ জল আনতে যায়। ঝরণার জলের বিরাম নেই, ঝর ঝর শব্দে জল পড়ছে। কলসীটা সে মুখের কাছে নিয়ে ধরে।

ভবানন্দ পেছনে এসে দাঁড়ায়। বলে—শুনচ হে ?

অন্ধকারে পেছন ফিরে প্রেমানন্দ বলে—কি ?

ওঁর সঙ্গে অত করে' কথা বলবার দরকার নেই।

তুমি আমি ত একা নই, এখানে অন্য লোকও আছে। এর পরে তাদের মুখে হাত চাপা দেওয়া যাবে না।

আমি ত এমন কিছুই,—শুধু বলছিলাম যে,

কি বলছিলে তা আমি শুনেছি। ও রকম স্ত্রীলোকের সঙ্গে,—বুঝতেই ত পারো। কালকেই ওঁর যাবার ব্যবস্থা করতে হবে!

বলেই ভবানন্দ অন্য পথ দিয়ে চলে গেল।

রান্নার জোগাড় করে নিয়ে বসতেই জয়া বললে—ছোট স্বামীজী, আপনি রুটি সেঁকতে থাকুন আর আমি তরকারি কুটে দিই—কি বলেন? তা হলে বোধ হয় দেখতে মন্দ হবে না!

কথা কইতে প্রেমানন্দর ভয় করে। কিন্তু জয়ার নিঃশব্দ হাসির দিকে চেয়ে এক সময় সে বলে—আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আমি নিজেই—

জয়া বলে—ভয় নেই। আমার ছোঁয়া আপনারা খাবেন না সে কথা জানি। মেয়েমানুষের কোনো দামই আপনাদের কাছে নেই। আচ্ছা, আপনি বুঝি লেখাপড়া ছেড়েই এ পথে এসেছেন?

প্রেমানন্দ কোনো উত্তর দেয় না। সলজ্জভাবে নিজের কাজ করে' যায়।

রান্নার পর অতি যত্নে খাবার সাজিয়ে সে ঘরের মধ্যে দিয়ে আসে। এই একান্ত যত্নটুকুই যেন তার সম্বল! এই মেয়েটি আপনার কথা-বার্ত্তায়, রসে-তামাসায় ভাবে-ভঙ্গীতে তাদের অনভ্যস্ত রুক্ষ জীবনে অল্প সময়টুকুর মধ্যে যে লাবণ্যের সঞ্চার করেছে—এই যত্নটুকু যেন তার শেষ প্রতিদান!

বলে—যা দরকার হয় চেয়ে নেবেন কিন্তু।

খেতে খেতে জয়া বলে—দরকার আমার অনেক। তা বলে' চাইবোই বা কার কাছে, দেবেই বা কে!

কেন?

মুখ তুলে হেসে জয়া আবার বলে—আপনারা ভারি বোকা! মেয়েমানুষ হয়ে পুরুষ মানুষের কাছে কি খাবার জিনিস চাওয়া যায়?

বাঃ সে কি, আচ্ছা তবে আমিই বুঝে নেবো।

ঠিক বলেছেন! তবে বুঝে নেবার শক্তি কি আর আপনাদের আছে? অনেক কাল আগেই সে শক্তি বোধ হয় আপনাদের শুকিয়ে গেছে।

প্রেমানন্দর মাথা যেন গুলিয়ে যায়। বাইরে এসে চুপ করে' সে নিবন্ত আগুনের দিকে চেয়ে বসে থাকে। মেয়েটা কথায় কথায় কোন্ পথ দিয়ে কোথায় নিয়ে যেতে চায়, তার কোনো কুল কিনারা নেই।

আশ্রমবাসী একে একে সকলেই আসে। চার পাঁচ জন হবে। সকলেই নিজের নিজের খাবার ভাগ করে' নেয়। একজন ত স্পষ্টই বললে—যা বললে তা অবশ্য বাঙলা ভাষাতে নয়।

এত পরিশ্রমের পরও রাতের বেলা কারো ঘুম আসে না। ভবানন্দ বলে—পিশু পোকার উৎপাতে চোখটি বোজবার যো নেই।

প্রেমানন্দ পাশেই শোয়—অন্য একটা 'চারপাই'তে। সে বলে—আজ বুঝি বেশি করে কামড়াচ্ছে? কম্বলগুলো রোদে দিলেই হতো।

আজ আর তেমন শীতও নেই—গরম! দরজা জান্‌লা খুলে রাখলেই চলে। তোমারও যে ঘুম আসচে না দেখছি।

প্রেমানন্দ বলে—এইবার আসবে! ঘুম এলে আমি আর চাপতে পারি না, ওই আমার দোষ।

আবার খানিকক্ষণ যায়। ভবানন্দ বলে—ঘুমুলে?

উঁহু।

খাবার জল এখানে বোধ হয় নেই? গলাটা শুকিয়ে গেছে।

এনে দেবো?—বলতে বলতেই প্রেমানন্দ উঠে বসে।

দাও।

জল খেয়ে ভবানন্দ বলে—উনি শুয়েছেন ভালো করে? একবার দেখে এলে হতো। না হয় আমিই যাচ্ছি।

প্রেমানন্দ হেসে বলে—যাও।

না না বাপু—থাক্, তুমিই যাও। উঠেছ যখন, তখন তুমিই যাও। মানুষটাকে ত আর ভয় করে না, মুখখানাকেই ভয়! কি বলবেন এখুনি তার ঠিক নেই!

প্রেমানন্দ গিয়ে দেখে আলোও জ্বলচে, জয়াও সেই থেকে বসে আছে। বললে—এখনো ঘুমোননি যে?

জয়া বললে—এ ত রাত্রে আমার ঘুম দেখতে এসেছিলেন নাকি? 'অতিথির ওপর এত' আপনাদের ভয়ানক অনুগ্রহ!

হঠাৎ লজ্জায় প্রেমানন্দ রাঙা হয়ে উঠলো। বললে—

তা নয়, বলছিলাম যে একটা বালিশ পেলে বোধ হয় আপনার সুবিধে হতো!

তা হতো! আপনারা বালিশও ব্যবহার করেন নাকি?

বালিশ আনতে গিয়ে সে দেখে দরজার কাছে ভবানন্দ ভূতের মত দাঁড়িয়ে। বললে—বালিশ চাই নাকি? এই নাও।

মানুষকে বোঝা ভার। প্রেমানন্দ একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে বালিশটা হাত থেকে নিয়ে জয়ার ঘরের দোরে এসে বললে—এই নিন্। কম্বল চাই?

না। এইবার আপনারা শুন্‌গে। কষ্ট করে' আর ঘন ঘন আমায় দেখে যেতে হবে না। আচ্ছা, স্বামীজি আমায় এখানে এনে সত্যিই কি একঘরে করে' দিলেন না কি?

না, উনি অমনিই শান্ত লোক। বিশেষ কারো সঙ্গে—

—তাহলে সংসারে আমিই শুধু বাচাল? যান্ আপনি ভারি দুষ্টু।

দুষ্টুর চেয়ে বোকাই বোধ হয় বেশি।—বলে প্রেমানন্দ সরে' এল।

গলা বাড়িয়ে জয়া বললে—আমারও তাই মনে হয়! স্বামীজিকে বলবেন, মেয়েদের ঠাট্টা বোঝবার শক্তিও তাঁর লোপ পেয়ে গেছে।

নিজের মাথার বালিশটি দান করে' অন্ধকারে দাঁড়িয়ে স্বামীজি তখন যা ভাবছিলেন, তা অন্ততঃ নিবৃত্তি মার্গের ভাবনা নয়!

সে রাত্রি প্রভাত হল বৈ কি।

কথাটা জয়া নিজেই বললে—আপনাদের উপকার ভোলবার নয়। তা বলে আমি ত আর এখানে ঘর কর্ত্তে আসিনি। দয়া করে এবার আমার একটা ব্যবস্থা করে দিন্।

প্রেমানন্দ বললে—ডাকঘর এখান থেকে অনেক দূরে। তা হোক, আপনি ঠিকানা দিন, আমি একটা তার করে' দিয়ে আসি।

এবারে আর ঠাট্টা তামাসা নয়। জয়া বললে—আপনারা কি ভেবেছেন যে আমার অঢেল আত্মীয়? খবর দিলেই সব ছুটে আসবে?

প্রেমানন্দ বললে—তা হলে—

কেউ আমার নেই, তা জানেন? বুড়ো বাপ শুধু ছিল, তাঁর যে এমন অপঘাত মৃত্যু হবে তা কে জানতো বলুন? তীর্থ করাতে এনেছিলেন, ভেবেছিলেন বুঝি তাঁর মেয়েটি ধর্ম্মপথে থাকলে অর্দ্ধেক রাতেও অন্ন জুটে যাবে,—বলতে পারেন আমি এখন কি করি?

ভবানন্দ আর চুপ করে থাকতে পারলে না। বললে—আপনার শ্বশুর বাড়ীতে ওখানে—

হঠাৎ তীক্ষ্ণ পরুষ কণ্ঠে জয়া হেসে উঠলো। সে হাসি যেন দম্‌কা হাওয়ার মত। বিদ্রূপের আঘাতে সে যেন নিজেকেও ছিন্নভিন্ন করে দিতে চায়। বললে—মাথায় সিঁদুরের চিহ্নটুকুও নেই, কাল থেকে আপনাদের গেরুয়া থান পরে আছি, তাই বুঝি ঠাট্টা কর্‌লেন? ওসব চুকে গেছে অনেক কাল, তেরো বছর বয়সের আগেই—বুঝলেন না? আমিও সে সব ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি।

তা হলে কি করবেন?

করবার মধ্যে এখন দেশে ফিরে যাবো। তারপর কপাল সঙ্গে যাবে। ঝি-গিরিও কর্ত্তে পারি, পরের বাড়ীতে রাঁধতেও পারি, আর সুবিধে যদি পাই তাহলে—

শেষ পর্য্যন্ত তাই ঠিক হলো। কোনো রকমে দেশে তাকে পাঠিয়ে দিতে হবে।

প্রেমানন্দ বললে—পঁচিশ মাইল এখান থেকে পাহাড় উৎরাতে হবে, তারপর মাঠ—তাও প্রায় ছ কোশ। তা' পর রেল ইষ্টিশান।

বেশ, আমাকে কেউ মাঠে নামিয়ে দিয়ে আসুন, তারপর আমি নিজেই যেতে পারবো। টাকা কড়ি ত আমার কিছুই নেই?

ভবানন্দ বললে—সে আমরা ঠিক করে দেবো। আমাদের আশ্রমের 'ফাণ্ড' আছে।

আড়ালে ডেকে পরম আগ্রহভরে প্রেমানন্দ বললে—এতটা রাস্তা, সঙ্গে করে' কে ওঁকে নিয়ে যাবে?

একটি রাত্রে ভবানন্দ যেন বদ্‌লে গেছে। স্পষ্টই বললে—তোমার যাওয়া চলতে পারে না। ঘণ্টা কয়েক লাগবে, আমিই ওঁকে মাঠে নামিয়ে দিয়ে চলে' আসবো।

লজ্জায় অপমানে ধিক্কারে প্রেমানন্দর মুখখানা একেবারে

কালো হয়ে এল। কোনো রকমে কি একটা উত্তর দিয়ে সে আড়ালে চলে' গেল।

যাবার সময় শুধু বললে—এই দুটি দিনের কথা হয় ত চিরকাল একটু একটু করে' মনে করবো।

তার বেদনাহত মুখখানার দিকে চেয়ে জয়া কি ভাবলে। পরে বললে - সন্ন্যাসীর মুখে ত এ কথা মানায় না ভাই ?

মুখ ঢেকে প্রেমানন্দ তখন পালাবার পথ খুঁজছে।

উঁচু পাহাড় সমতল ভূমিতে এসে ক্রমশঃ মিশে যায়। হাওয়া-গাড়ী ওধারে আর যায় না। দুজনে নামলো।

দুধারে ছোট ছোট গাঁ। পাহাড়ের আমেজ তখনও রয়েছে। দূরে দূরে গোরা-সৈন্যের 'ক্যাম্প' দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট সরাইখানা। দোকান-পাতি। ছোট লিক্‌লিকে নদীটি শুকিয়ে গেছে, পাথরের নুড়ির তলায় তলায় শুধু প্রাণটুকু ধুকধুক্ করছে। অনুর্ব্বর পাহাড়ের গায়ে গায়ে পাখীর দল উড়ে উড়ে বসছে।

এবার কোন্ দিকে স্বামীজি ? আপনিই ত এখন আমার—বাকি কথাটা শেষ না করেই জয়া হাসলে।

জয়ার মুখখানি রাঙা। রোদ লেগেছে। পথের কষ্ট-টুকু তার মুখের ওপর যেন একটি মধুর রূপ নিয়েছে।

ভবানন্দ বললে—এবার একটু হাঁট্‌তে হবে। খানিক গিয়ে আবার হাওয়া-গাড়ীতে উঠবো।

দুজনে তখন পথ হাঁটতে থাকে। প্রয়োজনের কথা ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু চুপ করে' থাকা জয়ার ধাতে লেখেনি। বললে—পথে এসে আপনার তবু মুখ ফুট্‌লো ; ছোট স্বামীজি থাকতে ত একেবারে বোবা মেরে গিয়েছিলেন।

ভবানন্দ শুধু হাসলে।

আপনি নেহাৎ রুক্ষুও নন্। সেদিন বেহালার বাজ্‌না শুনে আপনার মনটা যেন দুলে উঠেছিল মনে আছে। আমার ওপর কাল থেকে আপনি রেগে আছেন কেন ?

ব্যস্ত হয়ে ভবানন্দ বললে—না না, রাগ কি ! আমরা কারো ওপর রাগতে পারি না।

সরাইখানার পাশ ঘেঁসে চলছিল। লোকজন পেছন থেকে চেয়ে আছে। জয়া হঠাৎ বললে—ওরা কি মনে কর্চ্ছে বলুন ত ?

মুখ ফিরিয়ে ভবানন্দ বললে—কেন ?

আশ্চয্যি, আপনি আবার বলছেন, কেন ? উপবাস করে' করে' আপনারা বুদ্ধিটাকেও হজম করে' ফেলেছেন দেখছি।

ওঃ সেই কথা ! তা লোকে মনে করলে আমাদের ত কোনো ক্ষতি নেই !—ভবানন্দ বললে।

তার মানে আমাদের পথে আমরা ঠিক চলবো—এই না ?—খিল্‌খিল্ করে জয়া হেসে উঠলো।

এ হাসি যে ভাল লাগে না তা নয়, কিন্তু শুনলে সত্যিই ভয় করে। ভবানন্দ সবিস্ময়ে একবার তার মুখের দিকে তাকায়। এই দিশাহীন পথযাত্রার তীরে চলতে চলতে এমন করে যে হাসতে পারে, সে হয় সংসারের সকল উদ্বেগের ওপর, নয় ত এ দুনিয়ায় কিছুই সে গ্রাহ্য করে না। ধর্ম্ম সমাজ জীবন মরণ সবই যেন তার কাছে বিদ্রূপের বস্তু।

ভবানন্দ বললে—আমার আসবার বোধ হয় দরকার ছিল না, আপনি একাই চলে' আসতে পারতেন।

এসেছেন যখন, তখন সে কথা আর শুনে কি হবে !

ঘন জঙ্গলের সীমানাটা পার হয়ে ভবানন্দ বললে—ওই লালপটীর পাকা রাস্তা দেখা যাচ্ছে, ওইখান দিয়ে গাড়ী যাবে। আমার আর বেশিদূর যাবার দরকার হবে না।

হাসি জয়ার মুখে থেমে গিয়েছিল। কি ভেবে মুখ তুলে বললে—একলা আমাকে এতদূর যেতে হবে, তাই ভাবচি।

সে ত' আপনাকে যেতেই হবে।

আচ্ছা, মেয়েছেলেকে একলা রাস্তায় ফেলে রেখে চলে যেতে আপনার ভাল লাগে ?

সেই হেঁয়ালী ! মাথার ভেতর যেন গোলমাল লেগে যায়। ভবানন্দ বলে—আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারি না।

এবার জয়া হেসে বলে—আপনাকে ছেড়ে দিতে মন সরচে না—এবার বুঝতে পেরেছেন ? আর একটু সঙ্গে চলুন। কি আশ্চয্যি, আমি ত' আর ডাকাত নই যে অর্দ্ধেক রাস্তায় আপনার গলা টিপে মারবো। এত বড় জোয়ান লোক হয়ে আপনি সামান্য একটা তেইশ-চব্বিশ বছরের মেয়ের সঙ্গে পথ চল্‌তে ভয় পাচ্ছেন ? সন্ন্যাসীরা যে বাঘ-ভাল্লুককেও ডরায় না !

পাকা রাস্তা পর্য্যন্তই ভবানন্দকে আসতে হয়। বেলা পড়ে এসেছে। মাঠের হাওয়ায় শীত ধরে।

দূরে হাওয়া-গাড়ী দেখা যায়। ভবানন্দ বলে—অনেকটা চড়াই ভেঙে আমায় ফিরে যেতে হবে। এবার তা হলে—

মুখের ওপর হেসে জয়া বলে—তাহলে বিদায় নয়! আপনাকে সঙ্গে যেতেই হবে—অন্তত ইষ্টিশান পর্য্যন্ত।

দেখুন, কিন্তু—প্রেমানন্দ কি মনে কচ্ছে, এখুনি আমার ফিরে যাবার কথা।

গাড়ী এসে দাঁড়ায়। জয়া বলে—বেশ ত, তাই যাবেন। এখন গাড়ীতে উঠুন চট্ করে', দেরি করবেন না।

এর পর কোনো কথাই চলতে পারে না। শান্ত ছেলেটির মত ভবানন্দ গাড়ীতে ওঠে; জয়াও ওঠে পিছনে পিছনে।

পাশাপাশি দুজনে বসে। কম্বলটা এবার জয়া গায়ের ওপর ভালো করে জড়িয়ে নেয়। অন্যান্য যাত্রীরা সবিস্ময়ে তার দিকে এক একবার তাকায়।

অনেক রাস্তা। ফাঁকা মাঠ দিয়ে গাড়ী ছুটতে থাকে। মাঝে মাঝে ঝাঁকানি দেয়। দুজনের গায়ে গা ঠেকে। কয়েক দিনের ক্লান্তিতে জয়ার দীর্ঘায়ত কালো কালো চোখ দুটি আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। গাড়ীর দোল্‌নায় তন্দ্রা আসে।

মাঠের ওপারে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। এমন সূর্য্যাস্ত ভবানন্দর চোখে আর কোনোদিন পড়েনি। চারিদিকের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। সে আরক্ত আভাস পড়েছে জয়ার গ্রীবায়, এলো খোঁপার অসংলগ্ন চুলের গোছায়, তন্দ্রাচ্ছন্ন মুখখানির ওপর, অনাবৃত বাঁ হাতখানিতেও। জয়া যেন তার জীবনে একটি বিস্ময়—সৌন্দর্য্যের একটি প্রদীপ যেন তার জীবনের তীরে জ্বালিয়ে রেখে গেল!

এঃ, চেয়ে আছে দেখো হাঁ করে, মুখ ফেরাও ওদিকে।

গলার আওয়াজে জয়া জেগে উঠলো। বললে—ও হরি, আপনার গায়ের ওপরেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম!—কি হলো কি?

চেয়ে আছে দেখুন না ড্যাব ড্যাব করে,—অসভ্য!

ভালো হয়ে বসে জয়া বললে—অসভ্য কিন্তু অন্যায় নয়! দৃশ্যটি দেখবারই মতন। ভেতরের কথা যারা জানে না তারা বলবে, একটা মেয়ে একটা সন্ন্যাসীকে নিয়ে পালাচ্ছে, সন্ন্যাসীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

জয়া হেসে উঠলো। তার সমস্ত রূপ, সমস্ত যৌবনও যেন তার সঙ্গে হাসতে লাগলো।

ভবানন্দ বললে—এ কথা যারা ভাবে তারা নিতান্তই জানোয়ার!

জনহীন মাঠের মাঝখান দিয়ে গাড়ী তখন এগিয়ে চলেছে।

পথ ফুরিয়ে গেল। ইষ্টিশানে দুজনে নেমে জানতে পারলো, একটু আগে গাড়ী ছেড়ে গেছে। আবার গাড়ী আসবে ঘণ্টা দুয়েক পরে। জয়া এক পাশে গিয়ে বসলো। ভবানন্দ বললে—টিকিট করে' আনি।—বলে সে চলে গেল।

ইষ্টিশানে তখন চারিদিকে আলো জ্বলে উঠেছে। লোকজনের ভিড় বিশেষ নেই, টিম্‌টিম্ করছে। সম্প্রতি হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হওয়ায় কয়েকজন পুলিশ নতুন চাকরি পেয়ে ঘোরাফেরা করছে। জয়া থামের আড়ালে গিয়ে মুড়ি-সুড়ি দিয়ে বসলো।

ভবানন্দ খানিকক্ষণ পরে এসে বললে—এখানে বসে রয়েছেন? আমি তখন থেকে খোঁজাখুঁজি করছি। এই টিকিট নিন্। আজকের রাত আমাকে পথেই থাকতে হবে দেখছি। দিনের আলো নৈলে সে পথে যাওয়া চলতে পারে না। যাই হোক, আপনার একটা কিনারা ত হল! নিন্—টিকিট ধরুন।

কথাও কয় না, উত্তরও দেয় না—মুখও তোলে না। ভবানন্দ আবার বললে—শুনচেন? টিকিটখানা ভালো করে রেখে দিন্। কি হলো আপনার?

অবরুদ্ধ অশ্রুর চাপে জয়া এবার ফুলে ফুলে উঠলো। মুখ না তুলেই চোখের জল মুছতে লাগলো। ধরা গলায় বললে—টিকিট ত দিচ্ছেন। মেয়েমানুষ হয়ে কোথায় আমি যাবো? পথে ভয় নেই?—চোখের জল তার আবার গালের ওপর গড়িয়ে এল।

নারীর অশ্রু! সুন্দরীর অশ্রু! যুবতীর!

ভবানন্দ সেখান থেকে সরে গেল! কোথায়—কোনো ঠিক নেই। স্খলিত পদে সে এখানে ওখানে ঘোরাফেরা করতে লাগলো। দূরের অন্ধকার আকাশ আজ যেন তারও

চক্ষে মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। সেও যেন আজ অশ্রুর মধ্যে, ব্যথার মধ্যে কি কথাটি বলতে চায়।

একটু পরেই হুস্ হুস্ শব্দে গাড়ী এসে দাঁড়ালো। আর বিবেচনা করবার সময়ও নেই। ভবানন্দ আবার কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে—এমন করে কাঁদলে আমি কি করতে পারি বলুন?

জয়া ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। বললে—করবার কিই বা আছে! দিন্ টিকিট দিন্। যেমন করেই হোক ঠিক যাবো। এ ত' আর মগের মুলুক নয়!

টিকিটখানি নিয়ে সে আঁচলে বাঁধলে। একটু আগে চোখের জল ফেলে মুখখানি তখন তার ভারি হয়ে উঠেছে। বললে—গাড়ী বোধ হয় বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না, কম্বলখানা একবার ধরুন চট্ করে,' কাপড়খানা ভাল করে পরে নিই।

দ্বিধা-সঙ্কোচ কিছুই এ মেয়ে মানে না। কিন্তু এর লজ্জাহীনতা ইতরতার নামান্তর নয়,—এ সমস্ত নিতান্তই যেন এর পক্ষে স্বাভাবিক।

কাপড় পরে' কম্বলটা পুনরায় গায়ে জড়িয়ে হেঁট হয়ে একটি ছোট নমস্কার করে' জয়া উঠে দাঁড়ালো। বললে—অনেক কষ্ট দিয়ে গেলাম আপনাদের,—আসি তবে।

গাড়ী তখন ছাড়ে আর কি! ভবানন্দর মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না। সে তখন সত্যিই মাতাল হয়ে উঠেছে। পা টল্‌ছে। ক্ষুধাতুর জানোয়ারের মত চোখ দুটো অকারণে দপ্ দপ্ কচ্ছিল। এই অগ্নিময়ী রূপের দিকে তাকিয়ে মুহূর্ত্তকালের মধ্যে তার ইহকাল পরকাল যেন শিথিল হয়ে এল।

শুধু বললে—আচ্ছা।

জয়া গাড়ীতে উঠে গিয়ে বস্‌ল। তখন গার্ডের বাঁশী বাজছে।

ডাকগাড়ী ঘন ঘন দাঁড়ায় না। ছুটছে ত ছুটছেই। জানলার কাছে চুপ করে জয়া বসে রইলো। সে যেন মরিয়া। নিরুদ্দিষ্ট পথে চললো। কোন্ জাতীয় বিপদ ঘটবে কে জানে! না আছে টাকাকড়ি, না গহনাগাঁটি—তবু মেয়েমানুষের আর একটা ভয় আছে বৈ কি! বিশেষ তার!

জয়া চেপে-চুপে মুড়ি-সুড়ি দিয়ে বসে রইলো। বাইরে চাঁদনি রাত। আকাশ পরিষ্কার। তারা ফট্ ফট্ কচ্ছে। খাল বিলের ওপর চাঁদের আলো পড়ে মাঝে মাঝে ঝক্ ঝক্ করে উঠছে। দূরে পাহাড় প্রান্তর বনশ্রেণী ছোট ছোট গ্রাম, লোকালয়ের প্রদীপ-চিহ্ন—সমস্তই একে একে উল্টোদিকে ছুটে চলছে। জয়া ভাবছিল, এ জ্যোৎস্না রাত যেন না পোহায়, এ পথ যেন আর শেষ না হয়!

বড় একটা ইষ্টিশানে এসে গাড়ী থামলো। জয়ার হুঁস নেই। একদৃষ্টে একদিকে চেয়ে ছিল। চোখের মধ্যে সে যেন জ্যোৎস্নাময়ী আকাশকে ধরে এনেছে।

শুনচেন?

জয়া চমকে উঠে মুখ ফেরালে।—এ কি, স্বামীজি! আপনি যাননি তখন? সঙ্গে সঙ্গে এলেন বুঝি?

ভবানন্দ বললে—কি করি বলুন। এ অবস্থায় আপনাকে ছেড়ে দিয়ে—

তা ত সত্যি! হাজার হোক মানুষের মন ত! আসুন—ওপরে উঠে আসুন, গাড়ী হয়ত ছেড়ে দেবে এখুনি।

ভবানন্দ উঠে এসে সুমুখের বেঞ্চিতে বসলো। গাড়ীর মধ্যে তিন চারজন মাত্র লোক ছিল। তাদের দিকে চেয়ে হঠাৎ সে বললে—এখানেও তাই। বেটারা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে আছে দেখুন না!—ইতর কোথাকার!

জয়া হেসে বললে—ওটা পুরুষ মানুষের স্বভাব! মেয়েরাও কি দেখতে ছাড়ে! ঘোম্‌টার ফাঁক দিয়ে দেখে বলে তারা আরো বেশি দেখতে পায়।

ভবানন্দ বললে—আশ্রমের ওরা কি ভাবচে কে জানে!

জয়া হেসে বললে—কি যে ভাবচে তা হয় ত আমরা দুজনেই বুঝতে পাচ্ছি—কি বলুন?

তার উজ্জ্বল নিদ্রালস চোখ দুটির দিকে চেয়ে ভবানন্দ বললে—আপনাকে একা পথে ছেড়ে দিয়ে চলে' যাওয়া কিন্তু অন্যায় হতো। আপনি এতক্ষণ কি ভাবছিলেন?

কিছুই না।—জয়া বললে—রাত্রি বেলাকার আকাশের দিকে চেয়েছিলাম, চোখে হয় ত জল আসছিলো।—পরের ইষ্টিশানে নেমে আপনি চলে যান্। এমন করে' কতদূরই বা যাবেন আমার সঙ্গে?

ফিরতে ত হবেই। আপনার একটা কিনারা না করে দিয়ে যদি,—মাঝখানে আবার এক জায়গায় গাড়ী বদল কর্ত্তে হবে।

জয়া অন্য দিকে ফিরে হেসে বললে—প্রথম দিন আপনার

ব্যবহার দেখে মনে হয়েছিল আপনি খাঁটি সন্নিসি, কিন্তু আজ দেখছি আপনি সত্যিই আমাকে—আবার হেসে বললে—সত্যিই আমাকে স্নেহ করেন!

কোনো কথাই আর ভবানন্দর কাণে যায় না। সে এ সব ছাড়িয়ে গেছে। বললে—জায়গা এখানে অনেক আছে, ঘুমুতে পারবেন। বসুন, কিছু খাবার কিনে আনি।

কিন্তু ট্রেন ততক্ষণে ছেড়ে দিয়েছে।

সমস্ত রাত গাড়ী চলতে থাকে। মাঝে মাঝে থামে। আবার চলে। জয়া ঘুমিয়েছে। নিদ্রিত মুখখানিতে না আছে উদ্বেগ, না আছে চিন্তার রেখা। মাথার চুলগুলি গাড়ীর আলোয় চক্‌চক্‌ করছে। টানা টানা কালো দুটি ভুরু, কালো দুটি আঁখিপল্লব—নিদ্রার তীরে যেন ধ্যানে বসেছে। পাত্‌লা দুখানি ঠোঁট কমলকলিকার মত মাঝে মাঝে কাঁপছে।

সেই দিকে চেয়ে ভবানন্দ চুপ করে' বসে রইলো। রাত পুইয়ে কখন্‌ সকাল হয়ে গেছে কিন্তু তার দেখা আর শেষ হয় না।

জয়া জেগে উঠে বসলো। রোদ উঠেছে। দিনের আলো যেন আনন্দের রূপ নিয়ে এল। বললে—খুব ঘুমিয়েছি, আপনি সঙ্গে না থাকলে হয় ত এত ভালো ঘুম হতো না।

ভবানন্দ বললে—এর পরের ইষ্টিশানে গাড়ী বদ্‌লাতে হবে।

ও। আপনি বোধ হয় সেই গাড়ীতে আমায় তুলে দিয়ে ফিরে যাবেন?

একটু অসহিষ্ণু হয়ে ভবানন্দ বললে—ও কথা আর জিজ্ঞেসা করবেন না।

জয়া চুপ করে রইলো। খানিক পরে ছোট একটি নিশ্বাস ফেলে বললে—এ কিন্তু আপনার পক্ষে ভাল কথা নয়!

ভবানন্দ অন্য দিকে মুখ ফেরালো।

যাই হোক—পরের ইষ্টিশান কিন্তু এল অনেক দেরিতে। বেলাও তখন অনেক হয়ে গেছে। গাড়ী থেকে নেমে জয়া 'প্রতীক্ষা-গৃহে' গিয়ে মুখে চোখে জল দিল। ভবানন্দ খাবার আনলো।

গাড়ী আসতে কিছু বিলম্বই ছিল। জয়া বাইরের বেঞ্চিতে এসে বসে রইলো।

ভবানন্দ এমনি পায়চারি কচ্ছিল।

আরে সুরেশদা যে! বহুকাল পরে,—বলি এদিকে কোথায়?

ভবানন্দ চট্‌ করে ঘাড় ফেরালে। মুখে আর হাসি আসে না। বললে—অবনী যে, খবর কি?

খবর এক রকম। তুমি যে একেবারে সন্ন্যাসীই হয়ে গেছ সুরেশদা? কবে থেকে এ রকম মতিগতি হল? বেশ—বেশ, মাথাটি নেড়া, পরণে গেরুয়া, শুধু পা! বলি নেশাটেশা গুলো ছেড়ে দিয়েছ?

আঃ, কি হচ্ছে? চুপ কর! লোকে মনে করবে কি?

হো হো করে অবনী একচোট হেসে নিল। বললে—সুযোগ ছাড়তে পারিনে সুরেশদা,—আরে, উনি কে! বাঙালীর মেয়ে মনে হচ্ছে যেন!

উনি আমার সঙ্গেই আসচেন।

তাই নাকি! বিয়ে করেছ তা হলে? গেরুয়াই বরবেশ! বা রে সুরেশদা,—দাঁড়াও, বৌদিকে প্রণাম সেরে আসি।

থামো থামো,—তুমি ভারি ছট্‌ফটে। পৃথিবীতে সকলেই তোমার দিদি-বৌদিদি নয়।

মাঝপথে থেমে অবনী বললে—কে তা হলে? কোনো আত্মীয় কিম্বা—

ভবানন্দর তখন আর মাথার ঠিক নেই। বললে—কেউই নয়!

অবনী বেচারার হাসি বন্ধ হয়ে গেল। চুপি চুপি বললে—সে সব রোগ এখনও তোমার যায় নি? তা আর কি করা যায়। যাই হোক—আমার কাছে এক আধ দিন থেকে যাও? অনেক দিন বাদে দেখা হয়ে গেল!

ভবানন্দ বললে—তুমি যা মনে করছ তা নয় অবনী।—বলে সে জয়ার কাহিনী একে একে বলতে লাগলো।

অবনী সব শুনে হেসে বললে—সরস পরোপকার! যাই হোক, ডাইনের হাতে ছেলে থাকা ভাল নয়। চল, এখন আমায় একটু অতিথি সৎকার করতে দাও। কি বল?

তার সঙ্গে পথে এমন ভাবে দেখা হওয়াটা ভবানন্দর ভাল লাগলো না। বললে—থাকগে, অত ঝঞ্ঝাটে আর দরকার নেই অবনী, যা হোক করে আমরা—

একটা দিন বিশ্রাম নিতে পারতে!

ভবানন্দ কি ভেবে বললে—বিশ্রাম ত গাড়ীর মধ্যে হচ্ছেই, তা ছাড়া—

এবার জয়া উঠে এল। ভবানন্দ মহা আপত্তি জানিয়ে বললে—আপনি বসুন গে ওখানে, আমি একটি বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছি। অনেক দিন বাদে এঁর সঙ্গে—

তা ত দেখতেই পাচ্ছি। তা বলে বন্ধুত্ব করাটা আপনার একচেটে নয়। উনি আমারও বন্ধু হতে পারেন।—পরে অবনীর দিকে চেয়ে ছোট্ট একটি নমস্কার করে জয়া বললে—বৌদি বলে ভুল করেছিলেন বটে, তা বলে প্রণাম করলে বোধ হয় অন্যায় হতো না, কারণ আমি বামুনের মেয়ে এবং বয়সেও বোধ হয়—

অবনী তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে প্রণাম করলে। পরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলো—ঠিক বলেছেন, আপনি আমার দিদির মতন। কিন্তু তা নয়, আমি সে জন্যে—

ভবানন্দ আর চুপ করে থাকতে পারলে না। বললে—উনি বলচেন, ওঁর বাড়ীতে আজ আমরা অতিথি হই। আমার তাতে ইচ্ছে নেই, কারণ—

আপনার ইচ্ছে নেই কিন্তু আমার আছে। এক আধদিনের জন্যে আমাকে জায়গা দেবেন অবনীবাবু? ভয় নেই, আমার দ্বারা কোনো বিপদ ঘটবে না আপনার।

কি আশ্চর্য্যি, এ আমার সৌভাগ্য যে আপনার মতন লোক,—

ভবানন্দ মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছিল। জয়া তাকে লক্ষ্য করে বললে—সন্ন্যাসীর শিষ্যা হয়ে ঘোরাঘুরির চেয়ে এক আধদিন ছোট ভাইয়ের দিদি হওয়া ভাল! আপনার সুরেশদাকে বলুন, উনি বোধ হয় লজ্জিত হচ্ছেন।

অত্যন্ত রুক্ষস্বরে ভবানন্দ বললে—পথে এসে এমন আমার অবাধ্য হবার কথা ছিল না আপনার সঙ্গে!

তার মানে? আপনি কোন্ জাতের বাধ্য-বাধকতা চান্ আমার কাছে?

আমি? কি চাই? কিছুই না! আপনাকে একটা নিরাপদ জায়গায় রেখে চলে যেতাম—এই পর্য্যন্ত!

এবং তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো বেচারা অবনীর ওপর। বললে—তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ অবনী, এতটুকু বুদ্ধি নেই—এ রকম অবস্থায় অতিথি সৎকার না করলে কি আর তোমার চলছিল না?

অবনী বললে—দোহাই সুরেশদা, একটু প্রসন্ন হও। আজ সাগরের তীরে চলতে চলতে হঠাৎ রত্ন কুড়িয়ে পেয়েছি,—ভাল করে একটু—আসুন আমার সঙ্গে।—তুমিও এসো ভাই সুরেশদা।

জয়া হাসতে হাসতে তার পাশে পাশে চললো।

পিছনে পিছনে চলতে লাগলো বটে কিন্তু ভবানন্দর মুখখানা তখন রোষে, ক্ষোভে, হিংসায় একেবারে জর্জ্জরিত হয়ে উঠেছে।

পাশাপাশি তিন চারিটি ঘর—পরিষ্কার তকতকে। সুমুখে বেতের বেড়া দেওয়া একটুখানি বাগান,—গোলাপের চারা, রজনীগন্ধা, আর সূর্য্যমুখী মিতালি পাতিয়ে আছে।

ইষ্টিশানে কাজ করে। রাতে মাঝে মাঝে 'ডিউটি' পড়ে। ছেলেটির জীবনে এইটুকুই শুধু বাঁধন। অবসর সময় ভালো ভালো বই পড়ে। মাসিক পত্রে কবিতাও লেখে।

যেন অনেক কালের আত্মীয়তা।—

দেখছেন এইটি আমার পড়বার ঘর, ওটা বৈঠকখানা,—আর ওই যে ও-ঘরটি দেখছেন ওর জানলায় বসলে নদীর কিনারাটি দেখা যায়—সমস্ত আকাশটুকুও। আমি এমনি ভালবাসি—বুঝলেন? আর ওই দেখুন ফুলের বাগান ওদিকে—ওই দিকেই সূর্য্য অস্ত যায়। এবারে একটা বকুলের চারা দেবো ভাবচি।

'তুমি' বলাটা জয়াই প্রথমে সুরু করে। বলে—বিয়ে করনি কেন ভাই?

বিয়ে!—অবনীর মুখটি লাল হয়ে ওঠে। বলে—আজ্ঞে না!

শিশুর মত চোখ দুটি সরল—ভাসা ভাসা। চওড়া কপালে আজ অবধি মনে হয় সংসারের কোনো রেখাপাতই হয়নি।

জয়া আর কিছু বলে না। তার কথা যেন ফুরিয়ে গেছে। উদাসিনী বিধুরার মত সে খানিকক্ষণ ঘরগুলির মধ্যে পায়চারি করে বেড়ায়। অকারণে তার হৃদয়খানি উদ্বেল হয়ে ওঠে। মনে হয় পৃথিবীতে শুধু যেন তারই কোনো দাবি-দাওয়া নেই!

ভবানন্দ তাদের লক্ষ্য করে। কাণ পেতে দুজনের কথা শোনে। ঈর্ষায় তার সর্ব্বাঙ্গ রি রি করে।

হাল্কা পাখায় অবনী যেন উড়ে বেড়ায়—ধরিত্রীর উপবনে ছোট ছোট পাখীর মত।

বলে—দিদি, আমার শুক্‌নো নদীতে বান ডেকে গেল। তুমি আমার জীবনের সঞ্চয়।

জয়া বলে—বানটা থাকবে বোধ হয় চব্বিশ ঘণ্টা, কোটাল গেলেই সরে' যাবে। তুমি যে রকম যত্নটি আরম্ভ করেছ, তোমার সঞ্চয়টুকু ডাকাতি না হলে বাঁচি!—জয়া এইবার খিল্ খিল্ করে হাসে।

জয়া যেন তার অনেকখানি। জয়া যেন প্রথম সন্ধ্যা তারা, যেন জীবনের জ্যোৎস্না—জয়া যেন পৃথিবীর কোহিনুর। জয়া দিদি!

অবনী বলে—দিদি, তোমার দিকে চেয়ে চোখে জল আসছে, সত্যিই কি কাল চলে যাবে?

জয়া বলে—যদি না যাই?

যাবে না? তুমি যে যাবে না এ কথাও আমি ভাবতে পারি না। তুমি যাবেই। তোমার ঘর আছে, সংসার আছে, তোমার দায়িত্ব আছে—

বাইরের অন্ধকারের দিকে জয়া হঠাৎ মুখ ফেরায়। চোখে তার জল আসে। মনে হয় সে যেন ঝরা পাতা—যেন মাটির ঢেলা সে!

ভবানন্দ এসে ঘরে ঢোকে। এদের একলা রেখে সে যেন বাইরে থাকতেই পারে না। বলে—কাল সকালের গাড়ী, খেয়ে দেয়ে যেতে বোধ হয় আর সময়ই পাওয়া যাবে না। ঘুম থেকে উঠেই—

অবনী বলে—সুরেশদা, তোমাকে দেখলেই আমার ভয় করে—কেন বল ত? এতদিনের পর দিদিটিকে পেলাম, কিন্তু ভাই তুমি তাকে—

জয়া মুখ ফিরিয়ে বলে—ভয় পাওয়া অন্যায় নয়। ভবানন্দর ছদ্মবেশে ওঁকে মানায় না। কি বলুন স্বামীজি?

স্বামীজি বলে—আপনার কথা সব সময় বোঝবার জো নেই। যাই হোক, কাল সময় থাকতে তৈরী হয়ে নেবেন। —বলে সে বাইরে চলে যায়।

তার পথের দিকে চেয়ে জয়া বলে—সময়ের ত অভাব নেই, গাড়ীও সব সময় পাওয়া যায়। আপনি পরোপকার [illegible] ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেন?

কোনো সাড়া আসে না। জয়া বলে—উনি বোধ হয় আমার উপকার না করে' আর ফিরবেন না।

দুইজনেই হেসে ওঠে। সে হাসি ঘর দোর ছাড়িয়ে বাইরে পর্য্যন্ত শোনা যায়।

অবনী বলে—সুরেশদা রেগে গেছে আমার ওপর।

রাত্রি ক্রমশ ভারি হয়ে আসে। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। অবনী শোবার জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বলে—সুরেশ দা, এ ঘরে বেশ হাওয়া আছে, আলো জ্বালিয়ে দিলাম—

ভবানন্দ বলে—আমার জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নেই। তোমার দিদিটিকে এইবার ঠাণ্ডা হয়ে ঘুমুতে বলো। অসুখ বিসুখ হলে তখন আমাকেই—

অবনী এসে বলে—শুতে যাও দিদি, তোমার ঘুমোবার আদেশ হয়েছে—

দুজনেই আবার হেসে ওঠে। ভাই বোনের সে হাসি সহজে আর থামে না। তারপর গল্প সুরু হয়; নানা আলোচনা,—নানা দেশের কথা। পাশের ঘরে বসে ভবানন্দর কাণে যেন কাঁটা ফোটে। উঠে বাইরে এসে জানালার ফাঁক দিয়ে সে দুজনের দিকে চেয়ে থাকে। চোখ দুটো জ্বলে—নিষ্ফল আক্রোশে, ব্যর্থ বিদ্বেষে!

এদিকে তখন উঁচুদরের আলোচনা চলে—

বিয়ে না করাটা মানুষের গৌরব নয় ভাই।

আমার ত কোনো অভাব মনে হয় না দিদি?

বিয়েটা শুধু অভাব পোরাবার জন্যে নয় ভাই, বিয়ে মানে জীবনের বাকি আধখানাকে পাওয়া। নৈলে অমিল, ছন্দোপতন—নিজের মধ্যে প্রকাণ্ড বিশৃঙ্খলা।

অবনী হেসে বলে—আমি নিজেই সম্পূর্ণ।

জয়াও প্রথমে হাসে। পরে আবার বলে—না ভাই, বিয়ে না করা হচ্ছে নিয়মের বিদ্রোহ, বিধাতার বিপক্ষে বিদ্রোহ, সৃষ্টির অকল্যাণ!

বলে যাও, থামলে যে?—অবনী আবার হো হো করে হাসে।

জয়াও হেসে বলে—এবার যদি বলি, নিজের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করছ?

অবনী উঠে যেতে যেতে বলে—কি যে বল! ওসব দর্শন শাস্ত্র আমি বিশ্বাস করিনে। বললেই কি আর সত্যি হয়? কিছুতেই না—

নিস্তব্ধ রাত্রি বিদীর্ণ করে জয়া আবার তীক্ষ্ণকণ্ঠে হেসে ওঠে।

পায়ের শব্দ পেয়ে ভবানন্দ নিজের ঘরে তাড়াতাড়ি গিয়ে ঢোকে। বুকের মধ্যে তার যেন অশান্ত দ্বন্দ্বের ঝড় বইতে থাকে। সমস্ত রাত তার ঘুম আসে না। পিঞ্জরাবদ্ধ হিংস্র শ্বাপদের মত নিশ্বাস ফেলে আর মাঝে মাঝে বাইরে এসে দুজনের ঘরের কাছে পাহারা দেয়।

কিন্তু সকাল বেলা উঠেও জয়ার কোনো গা দেখা যায় না, সকল কাজেই সে যেন ঢিলে দিয়েছে। নিতান্ত অনুগ্রহ-প্রার্থীর মত তার অপেক্ষায় ভবানন্দকে বসে থাকতে হয়।

অনেক নীচে নেমে গেছে; নেমে যে গেছে একথা নিজেই জানে না। জানালার ফাঁক দিয়ে জয়াকে দেখতে থাকে,—উদ্দাম যৌবন জয়ার সর্ব্বাঙ্গে টল্‌টল্‌ করে। ভবানন্দর ব্যর্থ রোষ, ক্ষোভ, বিদ্বেষ যা কিছু সমস্তই উপবাসী একটা ক্ষুধিত পশুর লালসায় রূপান্তরিত হয়ে ওঠে।

সকাল বেলা উঠে অবনী বেরিয়েছিল। ফিরে আসতেই ভবানন্দ বললে—এ রকম ব্যবহার ভাল নয় অবনী। তুমি বন্ধু হয়ে—

কেন সুরেশদা?—অবনী অবাক।

ভবানন্দ একটু চাপা গলায় বললে—মেয়েমানুষের বুদ্ধিও নেই, দায়িত্বজ্ঞানও নেই, তাকে দুটো মিষ্টিকথা বলে ভুলিয়ে দেয়া সহজ,—কিন্তু—

অবনী এদিকের ইঙ্গিতগুলো বিশেষ বোঝে না। বললে—কখনই না, কিছুতেই নয় সুরেশদা, পৃথিবীতে কাউকেই ভোলাবার উপায় নেই, তারা এত বোকা নয়।

ওঁর একটা যা হোক হিল্লে করে' দিয়ে আমাকে আবার আশ্রমে ফিরে যেতে হবে জানো ত?

তুমি দেখছি সত্যিই সন্ন্যাসী হয়ে গেছ। দাঁড়াও, একটু কাজ আছে—ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই তোমাদের যাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এগারোটার গাড়ীতে—বলতে বলতে অবনী ঘরে গেল।

জয়া এল। বললে—আপনি যে সর্ব্বদাই তৈরী হয়ে আছেন দেখছি।

ভবানন্দ বললে—এখন আপনার ওপর নির্ভর করছে। সময়ের বেঠিক আমি করিনে। নিন্‌, তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে, সময় বড় অল্প। ওখানে গিয়ে আবার টিকিট কাটতে হবে। আজ যদি না যাওয়া হয়?

বাঃ সে কি, তা হতে পারে না। আমার ক্রমেই দেরি হয়ে যাচ্ছে। অবনীটা ভারি ছেলেমানুষ, ওর কাছে আসাই অন্যায় হয়েছে।

জয়া বললে—আপনার দেরি যদি হয় ত' চলে যান না?

তাই কি হয়? আপনি বুঝচেন না, আপনার ভালোর জন্যেই বলা, নৈলে আমার আর কি!

সত্যিই আপনার কিছুই নয়।—বলে জয়া সরে গেল।

পেছনে পেছনে উঠে গিয়ে ভবানন্দ বললে—আপনার কি যাবার ইচ্ছে নেই এখান থেকে? এসব কিন্তু আমি ভালবাসিনে।

ফিরে দাঁড়িয়ে জয়া বললে—আপনার ভালবাসা না বাসায় কিছু যায় আসে না জানবেন।

এ রকম ব্যবহার আপনার কাছে আশা করিনি।

সে আমি জানি। এখন আপনি ফিরে গেলেই আমি বাঁচি। আমার কপালে যাই থাকুক।

ভবানন্দর মনে হল, এ মেয়েকে ভোলানোও যায় না, কড়া কথা বলে এর ওপর শাসনও চলে না।

বললে—এবার বোধ হয় আপনার পায়ে ধরতে হবে! যদি তাই বলেন আমি তাতেও—

ছি ছি, আপনি না সন্ন্যাসী?—বলে জয়া লজ্জায় ঘৃণায় নাসা কুঞ্চিত করে চলে গেল।

অবনী কাগজ কলম নিয়ে কি লিখছিল। জয়া পিছনে দাঁড়িয়ে বললে—তোমার সুরেশদা ভারি অস্থির হয়ে উঠেছেন, আমার যাবার ব্যবস্থাই করে দাও ভাই। তাড়াতাড়ি কি লেখা হচ্ছে? নিশ্চয়ই প্রেমপত্র নয়!

ঠিক ধরেছ দিদি, এটা নিতান্তই ব্যবসায়ী চিঠি!

তোমার মাথায় তা হলে ব্যবসা-বুদ্ধিও আছে?

লোকে তাই ভেবে নিয়েছে। কয়েকজনে আমরা এখানে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেছি। সেখানে ছোট ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়াও শিখবে, অন্য কাজও শিখবে। তার জন্যে একটি শিক্ষক দরকার। অতএব খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন লিখে পাঠাচ্ছি।

জয়া বললে—শিক্ষক না হয়ে যদি শিক্ষয়িত্রী হয়?

তাহলে আরো ভালো। কারণ—

কি কি কাজ কর্ত্তে হবে?

এই ধর চরকা কাটা, সেলাই, কার্পেট না, পুতুল গড়া—

মাইনে দেবে—না অমনি ?

অবনী এবার হেসে উঠলো। বলে—শুধু মাইনে নয়, আহার এবং বাসস্থান!

জয়া বললে—বেশ! তাহলে আমি এখানেই রইলাম, ও কাজটা আমার চাই! দুঃখের দিকে চেয়ে আছো যে ?

অবনী একেবারে বিহ্বল! বললে—পারবে দিদি তুমি ?

মেয়েরা ত শক্তির বড়াই করে না ভাই! কাজ দিলেই বুঝতে পারবে।

অবনীর চোখে ততক্ষণে আনন্দাশ্রু জমে উঠেছে।

জয়া বললে—আর নয়! এবার আমার কাজ রান্নাঘরে। তুমি ভাই একবার বাজারে যাও।—জয়ার যেন নবজন্ম সুরু হলো।

কিন্তু রান্নাঘরে এসে বসে পড়ে সে আর নিজেকে সামলাতে পারল না, হঠাৎ অপরিমিত আনন্দের আবেগে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললে।

আনন্দ শুধু বেঁচে থাকার, শুধু আত্ম-প্রতিষ্ঠার!

আশাহত, অপমানিত—বিক্ষুব্ধ সাগরের মত! ভবানন্দকে যেন হত্যা করা হয়েছে,—সর্ব্বস্বান্ত করে ধুলায় লুটিয়ে দেয়া হয়েছে। গেরুয়া তার বাধা, গেরুয়া লজ্জা। অবনী তার লুণ্ঠনকারী—দস্যু অবনী!

পতিত সন্ন্যাসী সে; কিন্তু জয়াকে চাই। নারীকে তার প্রয়োজন!

জয়া আর সুমুখে এল না। বলে পাঠালো, সে থাকবে। সে আশ্রয় পেয়েছে, ভাই পেয়েছে, তার অন্ন জুটে গেছে। এই গাড়ীতেই স্বামীজি যেন চলে যায়।

ভবানন্দ বেরোলো। মলিন গেরুয়া গায়ে—ছিন্নভিন্ন! পথ যেন আজ বাধা, সন্ন্যাস যেন তার জীবনের গ্লানি। ইচ্ছা হল, আপনার আবরণ ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে এই মধ্যাহ্ন সূর্য্যালোকে নিজেকে প্রকাশ করে দেয়। উপবাসী তার আত্মা, বুভুক্ষার নতমুখ, লালসায় ক্লিষ্ট—জর্জ্জর!

ইষ্টিশানে গাড়ী এসে দাঁড়ালো; আবার চলে গেল। কোথায় যাবে সে! পথ নাই, নারীর দেহ তার সমস্ত পথ আড়াল করে আছে। নারীর সঙ্গে আজ নরের মত সে ব্যবহার করতে চায়। জয়া তার সকল মন, সকল দিক,—সর্ব্বাঙ্গ ছেয়ে আছে। যে কোনো নারীর মধ্যে জয়াকে তার চাই!

দিন গেল, সন্ধ্যা হল। ভবানন্দ তখনও ঘুরছে। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ঘরের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে।

রাত হল। পাড়ার তখন সব নিশুতি। ভবানন্দ দেখলে, অবনী বেরিয়ে এল, আলো হাতে নিয়ে জয়া পেছনে পেছনে। দুজনে রাস্তায় নামলো। বাগানের পাশ দিয়ে চলতে লাগলো।

সেই আদিম নরনারীর মত নিশ্চয় ওরা অভিসারে চলেছে! অবিবাহিত যুবক আর বিধবা নারী!

অবনী বলেছিল, রাতে ডিউটি' পড়ে। মিথ্যা কথা!

অবনী তার জীবনে কলঙ্ক। ব্যর্থ শিকারীর মত ভবানন্দ তখন ক্রোধে প্রতিহিংসায় থর থর করে কাঁপছে।

মনে হল সে এখনই একটা ভয়ানক চীৎকার করে উঠবে!

মরা রাত্রি—অসাড়। রুগ্না নিশীথিনী পুঞ্জ পুঞ্জ আবিল অন্ধকার উদ্গীর্ণ কচ্ছে। প্রেতিনী অমাবস্যা! কোথায় পেচক ডাকছে বুঝি। গর্ভিনী রাত্রি প্রভাত-শিশুকে জন্ম দেবার আগে যেন প্রসব-ব্যথায় আর্ত্তনাদ করছে।—

খোল খোলো, দরজা খোলো জয়া—শিগ্‌গীর।

জয়ার তন্দ্রা এসেছিল। ধড়মড় করে উঠে বসলো। আলো জলছে।

দরজা খোলো শিগগীর, দরকার আছে।

এ কি, আপনি যাননি এখনও ?

দরজায় ধাক্কা দিয়ে ভবানন্দ বললে—না যাইনি, খোল'।

ভীতা ত্রস্তা জয়া বলে ফেললে—না খুলব না—আপনি যান।—তার পা টলছিল। বললে—আপনাকে আর আমার বিশ্বাস নেই।

খুলবে না ?—জানালার কাছে ভবানন্দ এসে দাঁড়ালো। মাংস-লোভী ব্যাঘ্রের মত তার চোখ দুটো জলছে।

যে কোনো অন্যায়, যে কোনো পাপ করতেও সে আজ কুণ্ঠিত নয়!

জয়া বললে—না, যদি কিছু বলবার থাকে অবনীকে দিয়ে কাল সকালে বলে পাঠাবেন।

আবার অবনী! অবনীর নাম হয় ত তাকে পাগল করে দেবে! ভবানন্দ আবার চলে গেল।

আহত হিংস্র সর্প দংশন করবার আগে যেন ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে।—

জয়ার ঘুম আর এলো না। অবনী বাড়ী নেই। একা সে!

রাত তখন অনেক। কিসের যেন শব্দে জয়া আবার চমকে উঠে বসলো। মনে হল, দিদি বলে একটু আগে যেন কে ডেকেছে। না, কেউ না। অবনী এলে ঘরের কাছে এসেই ডাকত। জয়া আবার বসে বসে ভাবতে লাগলো। কতক্ষণ বাদে মনে হল, কোথা থেকে যেন একটা অস্বাভাবিক গলার আওয়াজ উঠছে। অচেনা জায়গা, বিদেশ; জয়া কি কর্ত্তে পারে! চীৎকার করলেও দূরে কাছে কোথাও সাড়া পাওয়া যাবে না। গভীর রাত্রি আজ যেন ভয়াবহ মূর্ত্তি নিয়ে ক্ষণে ক্ষণে তার চোখে দেখা দিতে লাগলো।

কিন্তু গোঙানির শব্দ মিথ্যা নয়। ক্লিষ্ট, আর্ত্ত, বেদনা-হত যেন কার কণ্ঠধ্বনি! জয়া আলোটা বাড়িয়ে দিল। কোনো জানোয়ার নয়—মানুষেরই আওয়াজ! আলোটা হাতে নিয়ে দোর খুলে সে বাইরে এল। বললে—কে!

নিস্তব্ধ নির্ব্বিকার রাত্রি যেন তারই কণ্ঠস্বরে তরঙ্গিত হয়ে উঠলো। কিন্তু পাশেই কোথায় যেন খস্ খস্ শব্দ হচ্ছে। সাহস করে জয়া সেদিকে এগিয়ে গেল। গিয়ে দেখে—কিন্তু দেখেই সে একেবারে আঁৎকে উঠলো।

হাতের ওপর ভর দিয়ে অবনী ওঠবার চেষ্টা করছে। সর্ব্বাঙ্গ তার রক্তে মাখামাখি। কথা কইতে পারছে না।

আলোটা রেখে ছুটে গিয়ে জয়া তাকে তুলে ধরলো। ভগ্নকণ্ঠে বললে—কি করে এমন হল, অবনী?

অবনী তখন তার হাতের ওপর নেতিয়ে পড়েছে। তুলে ঘরে নিয়ে এল। বিছানায় শুইয়ে দিল। গেরুয়া চাদর একখানা টাঙানো ছিল,—ঠাকুরের আশ্রম থেকে উপহার পাওয়া,—সেখানা টেনে নিয়ে জয়া অবনীর মুখের রক্ত মুছিয়ে দিল।

নিরপরাধ নিষ্পাপ আত্মার শাস্তি! জীবনে আজও বোধ হয় সে অন্যায় করেনি! জয়ার চোখে জল এল।—

শেষ রাতে জ্ঞান হল বটে। বললে জানিনে দিদি, অন্ধকারে পেছন দিক থেকে,—প্রকাণ্ড লাঠি! তার পর বোধ হয় আর জ্ঞান ছিল না।

বুকের কাছে অবনীর আহত মাথাটি টেনে নিয়ে জয়া নিঃশব্দে তখন সেই গেরুয়া চাদরখানার দিকে চেয়ে ছিল। রক্তে সেখানা একেবারে মাখামাখি!

লাহোর

শ্রীহরিহর শেঠ

পঞ্চনদের দেশ পঞ্জাবের রাজধানী রাবী-তীরে লাহোর নগরীতে যে আমি কোন দিন ভ্রমণের জন্য আসিব, এ কথা স্বপ্নেও মনে করি নাই। বিধাতার ইচ্ছায় আজ তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। লাহোরের খ্যাতি প্রতিপত্তির কথা অনেক দিন হইতেই শুনা ছিল, কিন্তু ইহা যে এমন সুন্দর সহর তাহা জানিতাম না। অল্পদিন বাস করিয়া লাহোরের ন্যায় [illegible]-বহুল দ্রষ্টব্য পূর্ণ একটা স্থানের যথাযথ বর্ণনা বা তাহার জ্ঞাতব্য সকল কথা বলা সম্ভবপর নহে, আমিও তাহা পারিব না। তথাপি ভ্রমণেচ্ছু দেশবাসীর সুবিধার জন্য, লাহোর ভ্রমণ স্পৃহা উদ্দীপ্ত করিবার জন্য কিছু লিখিতে ইচ্ছা হওয়ায় লিখিতেছি।

দেরাহুন হইতে আমরা * অতি প্রত্যুষে লাহোর ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানে জানাশুনা লোক কেহ আছেন কি না জানিতাম না, এবং জানিয়া আসিবার চেষ্টাও করি নাই। শুনা ছিল এবং ষ্টেশনে নামিয়া একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের কাছে জানিলাম, এখানকার প্রবাসী বাঙ্গালীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ী বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের স্বল্প প্রবাসের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক স্থান। আমরা বরাবর কালীবাড়ীতেই

* শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দে, শ্রীমান ভজকৃষ্ণ পাল ও শ্রীমান মনোরঞ্জন শেঠও আমার সঙ্গে ছিল।

আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানকার দেবীর পূজারি শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন পূজার কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তথাকার অন্ত একজন প্রবাসী বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমাদের একটি ঘর দেখাইয়া দিলেন। তথাকার ভৃত্যের দ্বারা মালপত্র কক্ষ মধ্যে উঠাইয়া লইয়া আমরা অবিলম্বে বাহির হইলাম। এই সময় পূজারী মহাশয়ের পুত্র পথে আসিয়া আমাদের আহারাদির ব্যবস্থা সেই স্থানেই হইবে তাহা জানাইয়া গেলেন।

পথে বাহির হইয়াই আমাদের চন্দননগরের শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসুর সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয় হইলে তাঁহারই সহিত অবস্থিত মহারাজা রণজিৎ সিংহের সমাধি-মন্দির, বাদসাহি মস্‌জিদ, অর্জ্জুন সিংহের সমাধি ও দুর্গ দেখিতে গেলাম। প্রথমেই যে বিরাট দর্শন সুউচ্চ দৃঢ় ইষ্টক-প্রাচীর বেষ্টিত একটি স্থান দৃষ্টিগোচর হইল। উহা এখানকার প্রাচীন দুর্গ। ইহার নিকটেই পাঞ্জাব-কেশরী মহারাজা রণজিৎ সিংহের সমাধি-মন্দির। ইহা এখানে অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে এবং এখানকার একটি প্রধান দ্রষ্টব্য। সর্ব্বপ্রথমে ইহা দেখিতে ভিতরে প্রবেশ করিলাম। অভ্যন্তরে বীর রণজিতের সমাধি ভিন্ন খড়্গ সিং ও তাঁহার পুত্রেরও সমাধি আছে এবং ভিতরেই সংলগ্ন স্বতন্ত্র একটি ছোট মন্দির মধ্যে গ্রন্থ সাহেব রক্ষিত হইয়াছে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে এই সুবৃহৎ সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হয়। উপযুক্ত সংস্কারাভাবে ইহার পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য অনেক হ্রাস প্রাপ্ত হইলেও, এখনও ইহা দেখিতে সুন্দর। গম্বুজের নিম্নদেশ আগ্রা দুর্গাভ্যন্তরস্থ শিশমহল ও অন্য কোন কোন স্থানের ন্যায় দর্পণখণ্ড দ্বারা সুসজ্জিত। পাথরের কাজও প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়।

মহারাজা রণজিতের সমাধি মন্দির

এই সমাধির দক্ষিণ পার্শ্বেই চতুর্থ শিখগুরু অর্জ্জুন সিংহের সমাধি বিরাজিত। আকারে বৃহৎ না হইলেও মন্দিরটি সুগঠিত। রাত্রে ট্রেণে নিদ্রা ভাল হয় নাই, তখনও মাথাটা বেশ যেন পরিষ্কার ছিল না, চক্ষুর ঘুম-ঘোরও যেন সব্বা অন্তর্হিত হয় নাই। জিনিষপত্র কালী-বাড়ীতে রাখিয়াই এখানে আসিয়াছি। সূর্য্য-কিরণপা'তে স্থানটি তখনও প্রখরোজ্জ্বল হয় নাই, দুর্গের ছায়াপাতে তখনও উহা স্নিগ্ধ। জনবিরল রণজিতের সমাধি-মন্দির হইতে আসিয়াই একেবারে এখানকার ভজন-গীত, তদনুরূপ বাদ্য-মুখরিত অবস্থা ও বহু সংখ্যক ভক্তিবিহ্বল-চিত্ত স্ত্রী নরনারীর একত্র সমাবেশ দেখিয়া আমি যেন বিস্মিত মুগ্ধ হইয়া গেলাম। মন্দিরের ভিতরে ও বাহিরে উভয় স্থানেই অতি সুন্দর সুরলয়-সম্বলিত সুমিষ্ট সঙ্গীত, আর শত শত শিখ বন্দুকহীন হইয়া বাহিরের জলাধারে পদ ধৌত করিয়া ভিতরে যাইতেছে, আবার অনেকে ভিতর হইতে বাহিরে আসিতেছে। ভিতরে শ্বেত-কৃষ্ণ মর্ম্মরমণ্ডিত প্রাঙ্গণ, তাহার সম্মুখে প্রস্তরময় সমাধি-মন্দির। মহাপুরুষের সমাধি-পার্শ্বে দুইটি সুন্দর বালক সুন্দর সজ্জায় সজ্জিত হইয়া গান গাইতেছে। দুই জন সারেঙ্গ বা ঐ রকম কি বাজাইতেছে; আর তাহার পার্শ্বে ও প্রাঙ্গণে লোক পরিপূর্ণ। কাহারও মুখে একটি কথা নাই; সকলে আসিতেছে, অবনত-মস্তকে প্রণাম করিতেছে, বসিতেছে বা চলিয়া যাইতেছে। প্রাঙ্গণের বামপার্শ্বে গ্রন্থ সাহেবের একটি অতি সুদৃশ্য অনতি-উচ্চ মন্দির। ঐ মন্দিরের মধ্যে পূজক বা পাঠক পাঠ করিতেছেন; নিকটে পাতিয়ালার যুবরাজ ও অন্যান্য বহু সংখ্যক লোক সেই পাঠ শ্রবণ করিতেছেন; কেহ বা ভূমিষ্ঠ হইয়া শুধু প্রণাম করিয়া যাইতেছেন। সে সময় এ দৃশ্য আমার মনের ভিতর যে ভাব আনিয়াছিল কাশী বৃন্দাবন পুরী প্রভৃতি বহু স্থানে জন-বহুল বহু দেবদেবীর মন্দির দেখিয়াও এমনটি আর কখন অনুভব করিয়াছি মনে হয় না। সহস্র সহস্র লোক পরিপূর্ণ সে সব মন্দিরেও বুঝি বা তেমন একটা প্রেমময় জীবন্ত ভাব অনুভূত হয় না।

ভিতরে এক পার্শ্বে একটি সোনার গিল্টি-করা উচ্চ স্তম্ভে একটি মিশান কোম্পানির দম্পতির স্মৃতি-রক্ষার্থ স্থাপিত আছে। মন্দিরের প্রবেশ পথে দ্বারের উপর খোদিত আছে Dehra Sahib of Guru Arjan Dev Ji. মস্তক আচ্ছাদিত অবস্থায় যেমন খৃষ্টানদের উপাসনা-মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ, অনাবৃত মস্তকে তেমনই এখানে প্রবেশ নিষেধ। পাদুকা

আমরা নিজেরাই খুলিয়া রাখিয়াছিলাম ; রক্ষীদিগের অনুরোধে আমরাও মাথায় একটু মাত্র বস্ত্র আচ্ছাদিত করিয়া ভিতরে গিয়াছিলাম। এখানে মাত্র আমরা চারিজন ভিন্নদেশীয়, ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলাম ; কিন্তু আমাদের প্রতি শিখদের সেই সময়ের সামান্য ব্যবহারে আমরা পরিতৃপ্তি বোধ করিয়াছিলাম।

প্রশস্ত পথের পরপারেই দুর্গ। এই দুর্গ সম্রাট জাঁহাগীর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ থাকিলেও সে কথা ঠিক নহে ; কারণ সম্রাট আকবরের দ্বারা দুর্গের সংস্কার সাধিত হইয়াছিল, উল্লেখ পাওয়া যায়। দুর্গের প্রধান প্রবেশ-পথ এখন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে ; এক্ষণে পার্শ্বের আর একটি দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। এই দ্বারের উপর ইংরাজিতে ১৮১৩ এবং তন্নিম্নে H. E. I. C. লেখা আছে। ভিতরে আফিস আছে তথায় প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট হইতে
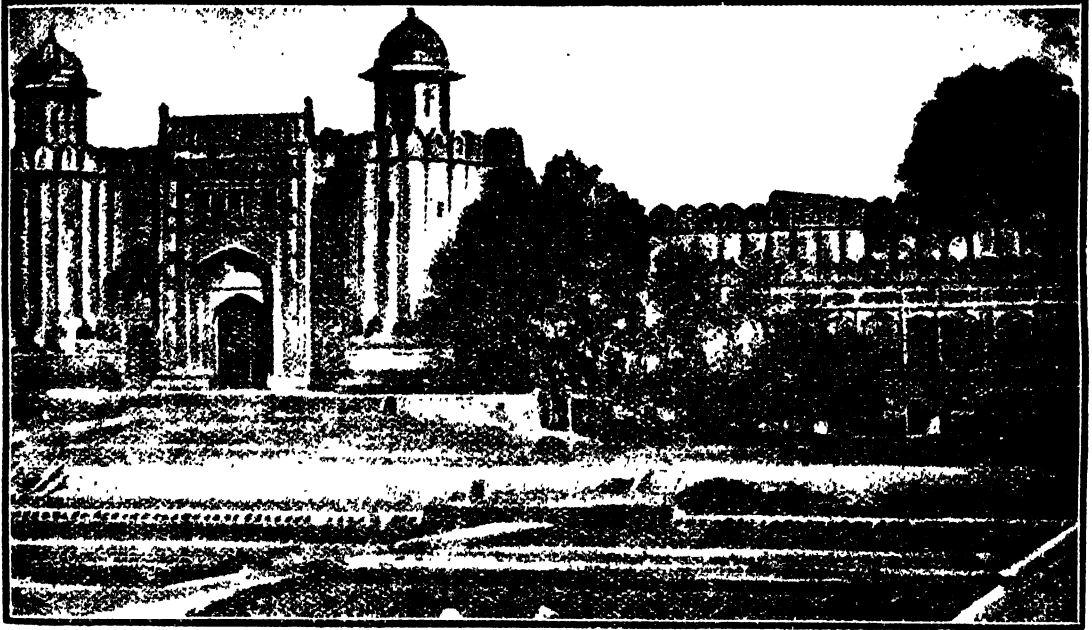
দুর্গের প্রধান তোরণ
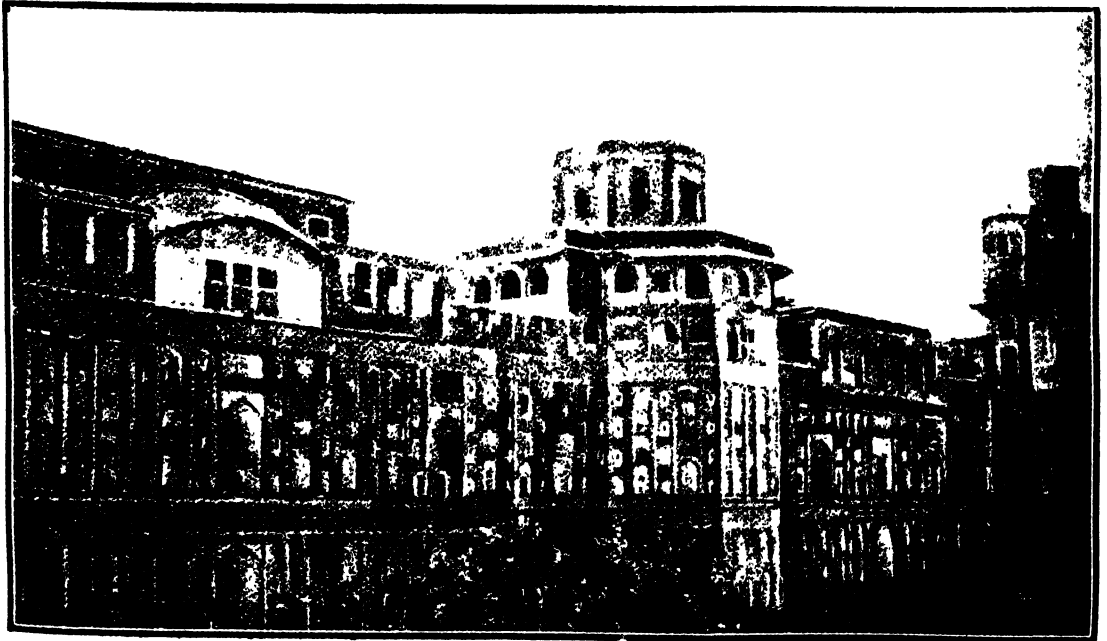
দুর্গের ভিতরের দৃশ্য

পাশ আনিয়া প্রবেশ করিতে হয়। দুর্গাভ্যন্তরে দেখিবার যাহা ছিল, তাহার অধিকাংশই এখন বিনষ্ট হইয়াছে। প্রথম ফটক পার হইয়াই দ্বিতীয় তোরণের পার্শ্বে সুদচ্চ বাহিরের দেওয়ালের গায়ে অনেক মিনার কাজ দেখা যায়, তন্মধ্যে হস্তীর লড়াই ও ঘোড়সোয়ার প্রভৃতির অনেক

দুর্গ-মধ্যে এখন দেখিবার যাহা আছে তন্মধ্যে শিশমহল, একটি অনতিবৃহৎ শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত মনোহর কক্ষ যাহা উপাসনার স্থান বলিয়াই মনে হয়, কয়েকটি চিত্র-বিচিত্র ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য দর্পণমণ্ডিত হর্ম্ম্যাবলী, একটি ঐ প্রকার কাজ-করা সুবৃহৎ দালান; উহার একদিকে
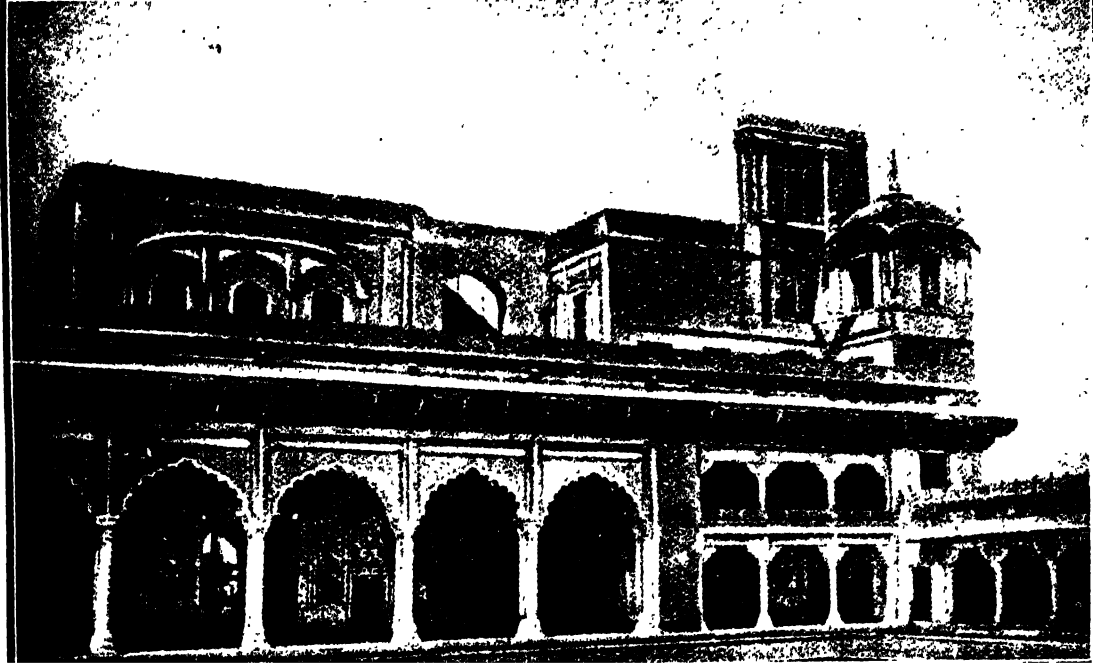
শিশমহলের বাহিরের দৃশ্য
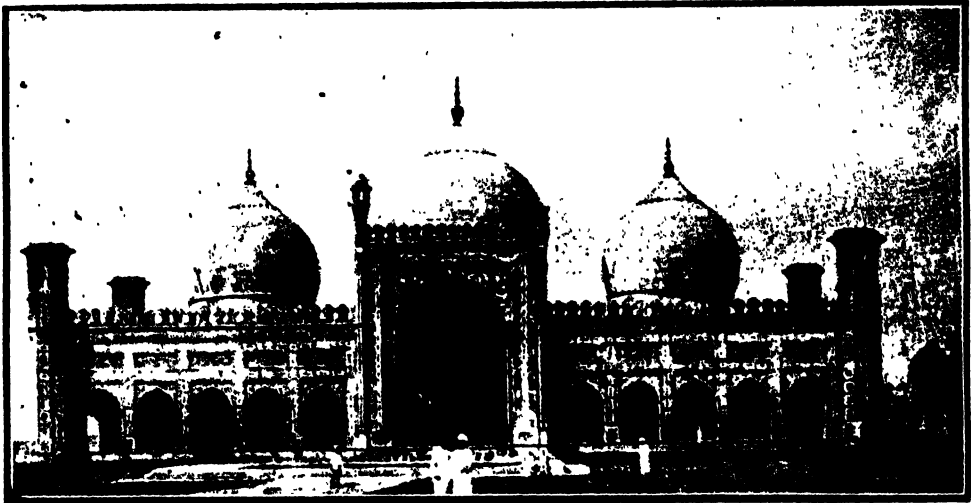
বাদশাহী মসজিদ

ছবি আছে। দুর্গ-বেষ্টনকারী পরিখা না দেখিতে পাওয়ায় একজন প্রাচীন লোককে প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, প্রথম প্রাচীরের পর দ্বিতীয় প্রাচীর পর্য্যন্ত স্থানটিতেই পূর্ব্বে পরিখা ছিল, উহা রাবীর জলে পরিপূর্ণ থাকিত। এখন কিন্তু তাহার কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না।

শ্বেত মর্ম্মরের পাঁচটি খিলান আছে এবং দেওয়ানী খাস, দেওয়ানী আ[ম] ও বারদুয়ারি। প্রথমোক্ত কক্ষটিতে যে সব বিবিধ বর্ণের মূল্যবা[ন] প্রস্তরের ফুল-লতা-পাতার কাজ ছিল, তাহার অনেক এখন নষ্ট হই[য়া] গিয়াছে। বারদুয়ারিটিও শ্বেত প্রস্তর দ্বারা প্রস্তুত। প্রদর্শকের কথা

সোণারি মস্‌জিদ্

শিশ-মহলের ভিতরের দৃশ্য
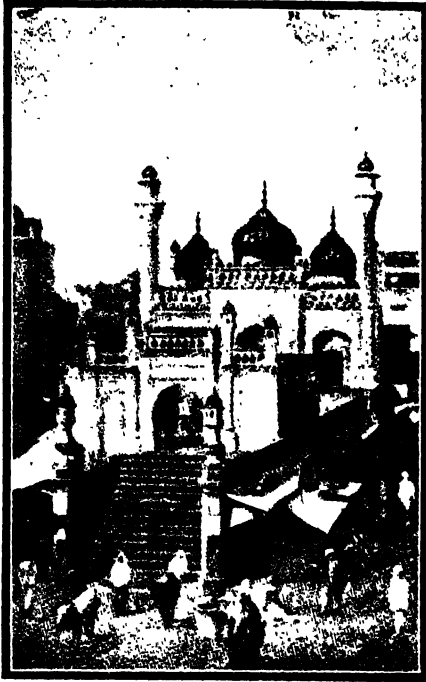
জানা যায়, এই সকল বিচিত্র কক্ষ মহারাজা রণজিতের সময় কোনটি শয়ন-কক্ষ, কোনটি ভোজন কক্ষ, কোনটি বিশ্রামাগার রূপে ব্যবহৃত হইত। অবশ্য এ সকলের সত্যতা নিরূপণ করা কঠিন।

একটি বহু-স্তম্ভবিশিষ্ট খুব প্রশস্ত কক্ষ দেখিলাম; সেটিকে প্রদর্শক দরবার-কক্ষ বলিল। কথিত আছে, এই স্থান হইতেই পঞ্জাবের স্বাধীনতারবি অস্তমিত হইয়াছিল। এই কক্ষে বসিয়াই মহারাজা দলীপ সিংহ পঞ্জাবের রাজ্যভার ইংরেজের হস্তে তুলিয়া দিয়াছিলেন। এই কক্ষের ছাদ সাধারণ লোহার কড়ির উপর কাঠের বরগা ও ইটের টালির দ্বারা নির্ম্মিত। দেখিলে বুঝা যায় উহা আধুনিক। জানি না সংস্কার দ্বারা এই অবস্থা হইয়াছে কি না। অপর সব মূল্যবান অংশ বিনষ্ট করিয়া এইটিকে সযত্নে রক্ষা করিবার চেষ্টা

ঝমঝমা তোপ
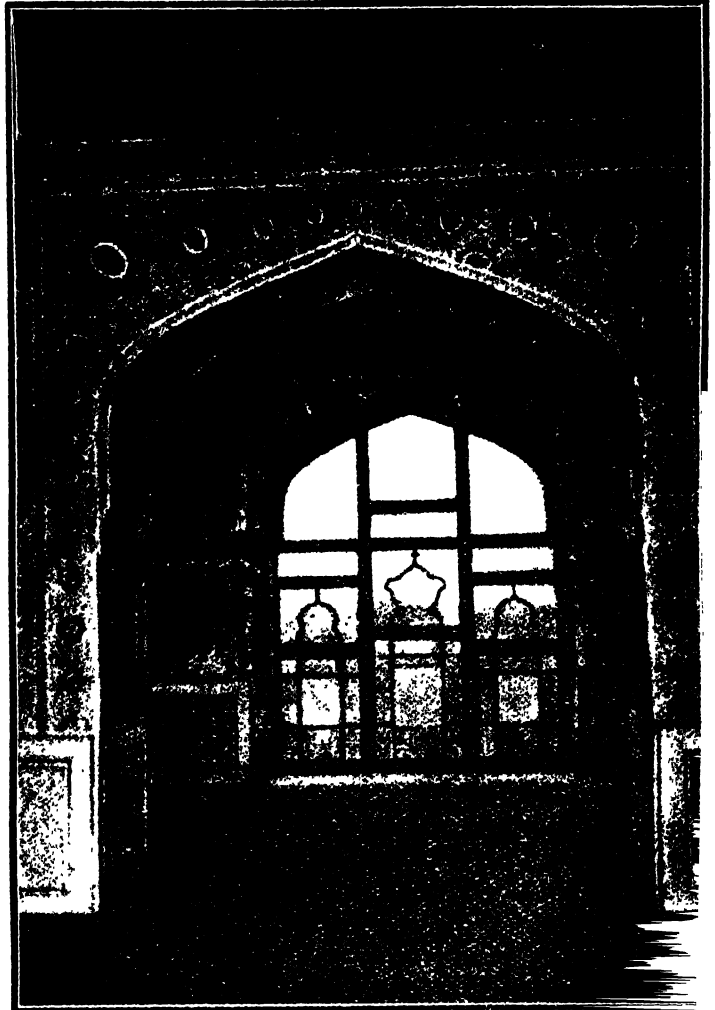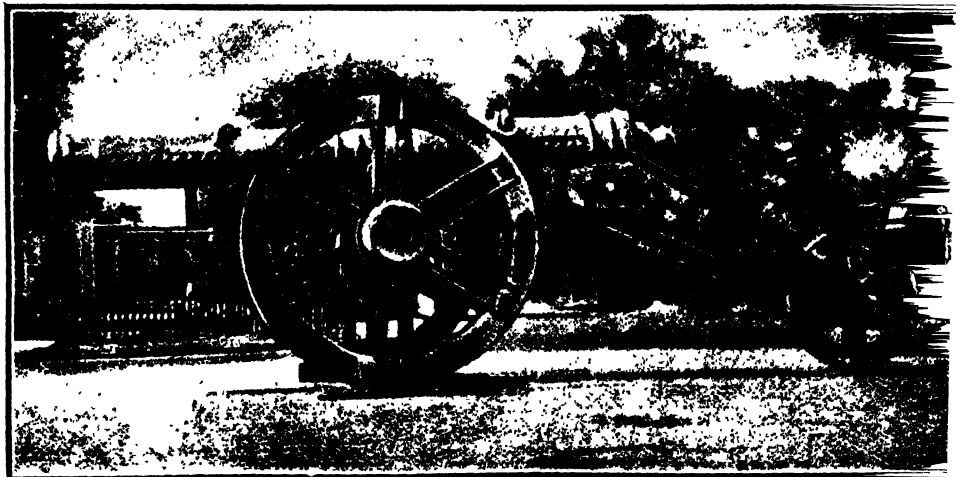
য়া বিচিত্র নহে। দুর্গ-মধ্যে একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ খনন করা হইতেছে দেখিলাম। লোকের অনুমান, যদি কোথাও গুপ্তধন লুক্কায়িত থাকে, তাহার সন্ধানেই এ কাজ করা হইতেছে।

কেল্লার মধ্যে যাহা কিছু দেখা যায় তাহার কোনটিই মনে যেমন একটা ছাপ দিয়া যায় না। যদি দেখিয়া মনে থাকিবার মত কিছু থাকে, তবে তাহা শিশমহল নামক স্থানের প্রাচীন অস্ত্র-শস্ত্র-বর্ম্মাদি-পূর্ণ প্রদর্শনী-কক্ষটি। শিখ বীরদের ব্যবহার্য্যে এখানকার বহুপ্রকার সুদীর্ঘ তরবারি, কৃপাণ, বন্দুক, পিস্তল, তীর, ধনুক, বিবিধ বিচিত্র বর্ম্ম পৃষ্ঠত্রাণ সামরিক পরিচ্ছদ, নিশান,ডঙ্কা, দামামা, রণশৃঙ্গ,তুরী, গুলি গোলা ও তাহা নির্ম্মাণের যন্ত্র, চোরদের অঙ্গুলি ছেদন করিবার যন্ত্র, কোন কোন মুসলমান সম্রাট ও শিখ মহারাজার ব্যবহৃত বিশিষ্ট তলোয়ারাদি, মিশ্রধাতুময় কতকগুলি কামান প্রভৃতি দেখিলে ভারতের অতীত গৌরবের স্মৃতি মনকে সমাচ্ছন্ন করে। বীর-প্রসবিনী পঞ্চনদের সে সব বীর শিখদের কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দীর্ঘকাল লিখিত থাকিবে; তাঁহাদের শৌর্য্য বীর্য্যের সাক্ষী এই সব অস্ত্রশস্ত্রাদিও হয় ত দীর্ঘকাল সঞ্চিত থাকিবে। কিন্তু সে জাতি কি ভারতের বুকে আর কখন ফিরিয়া আসিবে!

হজুরি বাগ

দুর্গ হইতে বাহিরে আসিয়া সম্মুখে একটি নাতিবৃহৎ রমণীয় উদ্যানমধ্যে শ্বেত-মর্ম্মর-নির্ম্মিত একটি দ্বি-তবক বসিবার স্থান দেখা যায়। ইহা মহারাজা রণজিৎ সিংহের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিভাবে ব্যবহৃত হইত এবং কি উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা ঠিকমত জানা যায় না। উহার
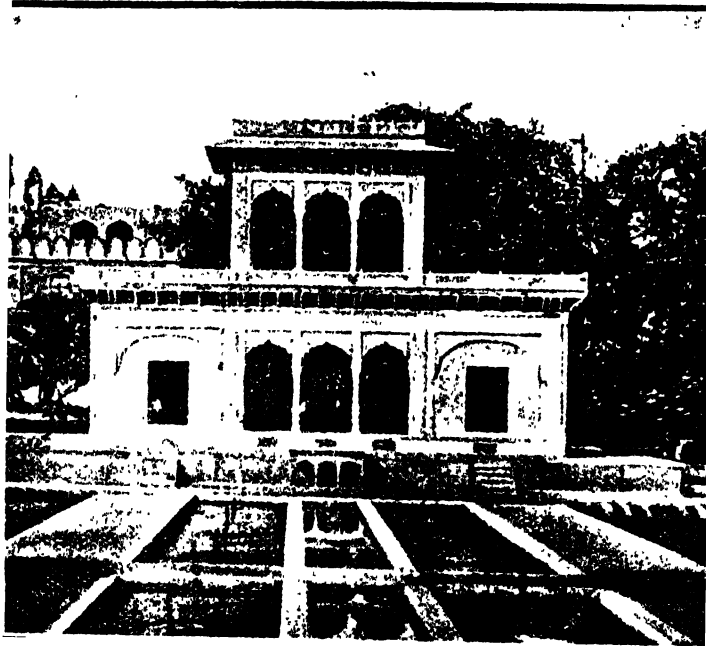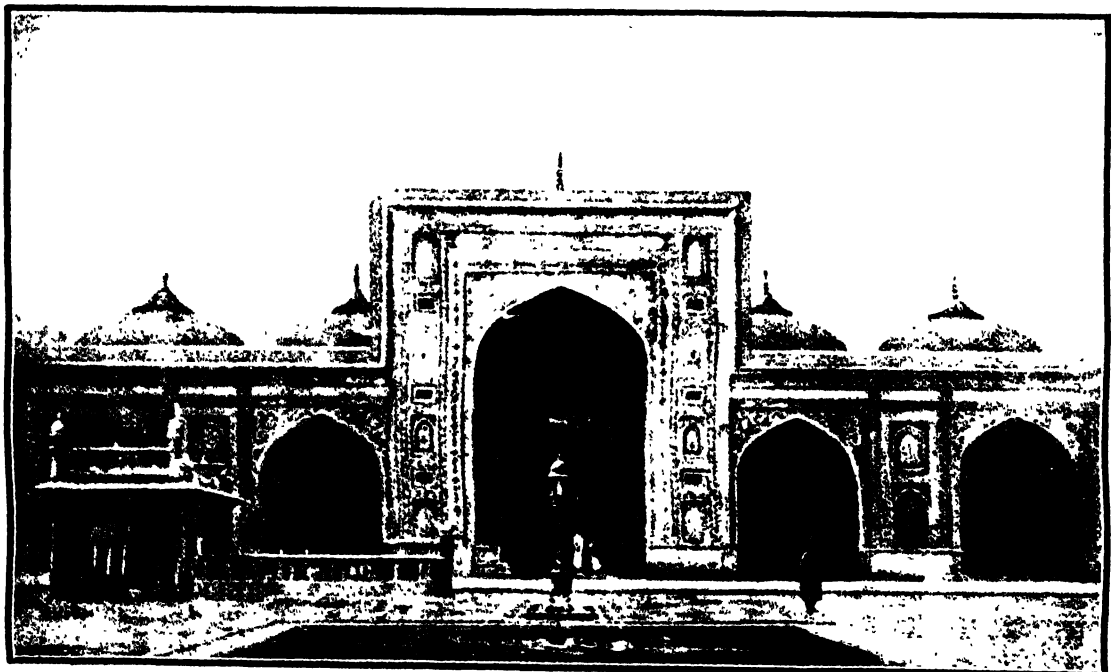
ওয়াজির খাঁর মসজিদ

নাম কেহ বলিল হজুরি, আবার কেহ বলিল বারদুয়ারি বা বারজুরি। ইহার ঠিক পশ্চাতেই সুপ্রসিদ্ধ বাদশাহি মস্‌জিদ। এই মস্‌জিদ আকারে, গঠনে, পারিপাট্যে দিল্লীর জুম্মা মস্‌জিদ অপেক্ষা হীন হইলেও ইহা যে একটি সুন্দর সুপ্রসিদ্ধ মস্‌জিদ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার প্রাঙ্গণ উক্ত মস্‌জিদ-প্রাঙ্গণ অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে ছোট হইলেও, প্র অধিক বলিয়াই মনে হইল। গম্বুজ তিনটি শ্বেত-মর্ম্মর দ্বারা গঠিত এ প্রাঙ্গণের ভিতর মস্‌জিদের বহির্দেওয়াল ও কোণের মিনার চতু লোহিত প্রস্তর-নির্ম্মিত। অভ্যন্তরের কাজ সমস্তই চুণের হইলেও
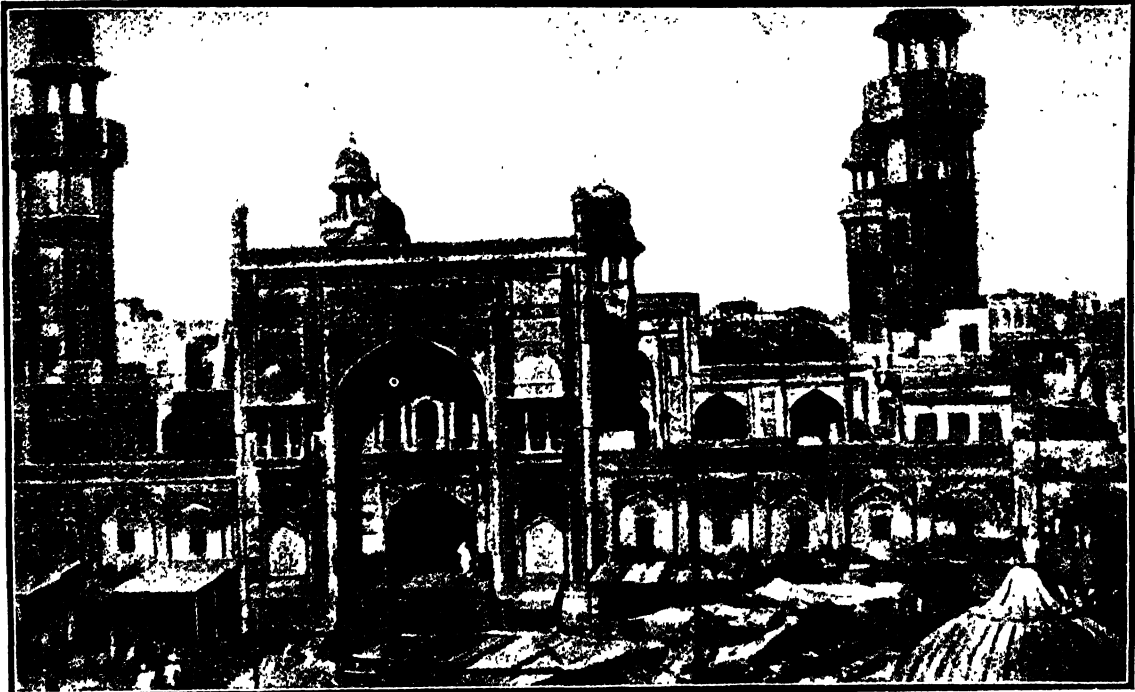
ওয়াজির খাঁর মস্‌জিদের ভিতরের দৃশ্য

দিল্লী গেট

কারুকার্য্যময়, কেবল মেজে ও প্রাঙ্গণ হটের থাগরি করা। অন্যান্য কাজের তুলনায় উহা আদৌ উপযোগী নহে মনে হইল। প্রাঙ্গণের তিন দিক ও প্রবেশ-তোরণে বহু-বর্ণের মিনার কাজগুলি এখনও অনেক স্থানে উজ্জ্বল রহিয়াছে। এই মস্‌জিদ সম্রাট জাঁহাগীর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। কারণে ইহা কখনও পবিত্র উপাসনাগার বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। কেহ কেহ সম্রাট আকবরকে ইহার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়াও থাকেন। এই মস্‌জিদের মিনারগুলির উপর হইতে সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি সুন্দর দেখা যায়।

মলের দৃশ্য

জাঁহাগীরের সমাধি-মন্দির

জন-প্রবাদ, ইহা নির্ম্মাণে যে ব্যয় হইয়াছিল তাহা তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে নিধনানন্তর যে সম্পত্তি হস্তগত হয় তাহা হইতেই দেওয়া হইয়াছিল। সেই

এ পর্য্যন্ত যে-গুলির কথা বলা হইল, তাহা সবই পাশাপাশি অবস্থিত; এই স্থানের নাম শাহদারা। সহরের এই পুরাতন অংশ-মধ্যে কাশ্মীরি

মণ্টগোমারি হল

বাজারে উজির খাঁর মস্‌জিদটিও বেশ বড় এবং সুন্দর। ইহার ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্রই বহু বর্ণের এনামেল-করা বৃক্ষ-লতা-পুষ্পাদির কাজ আছে এবং স্থানে স্থানে কোরাণের বয়েৎ সকল লেখা আছে। এই মস্‌জিদের বিশেষত্ব এই দেখিলাম যে, অধিকাংশ প্রাচীন কার্ত্তিগুলির মেজের ন্যায় ইহাও ছোট ইটের খাদরি, কিন্তু তাহা ঘর্ষিয়া পরিষ্কার করা। এ ভাবের এমন মসৃণ মেজে আর কোথাও দেখা যায় না। এই মস্‌জিদ ওয়াজির খাঁর কর্ম্মচারী হেদায়েতুল্লার পরিকল্পনায় ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়।

লাহোরে আরও কতিপয় সুবৃহৎ মস্‌জিদ আছে; তন্মধ্যে ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ভিখারী খাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মস্‌জিদটি উল্লেখযোগ্য। উহার নাম সোনারি মস্‌জিদ।
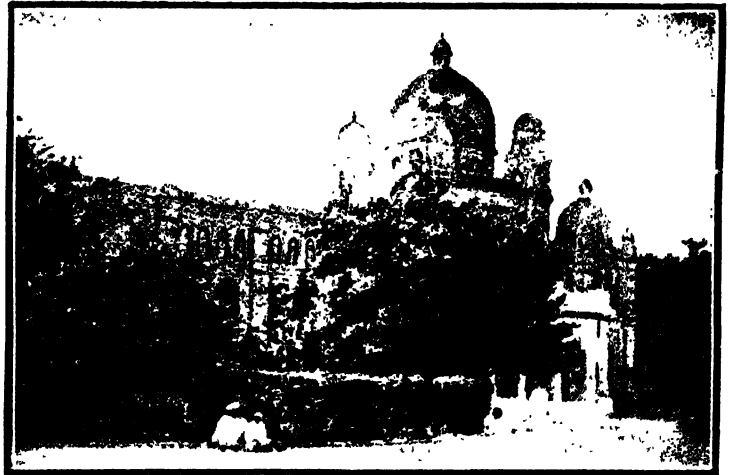
যাদুঘর

কাশ্মীরি বাজারের পর দোবী বাজার; তাহার পর হীরামণ্ডি। দিল্লী গেট হইতে হীরামণ্ডি পর্য্যন্ত এই স্থানটি বহু উচ্চ অট্টালিকাপূর্ণ ও ঘন-সন্নিবিষ্ট। এখানে পথের উভয় পার্শ্বে সমস্তই দোকান। দিল্লী-গেটের বাহিরে শাক-সব্জী, মাটীর বাসন প্রভৃতির অনেক দোকান আছে। ইহার নাম লুণ্ডা বাজার। এখানে তেমন বড় বা উচ্চ অট্টালিকা নাই। সহরের মধ্যে বহু জনপূর্ণ স্থান আরও আছে; তন্মধ্যে আনারকালী পথ বা বাজার সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এখানে বিবিধ-প্রকারের অনেক ভাল ভাল দোকান আছে। বৈকাল বেলায়, বিশেষ সন্ধ্যার সময় এখানে
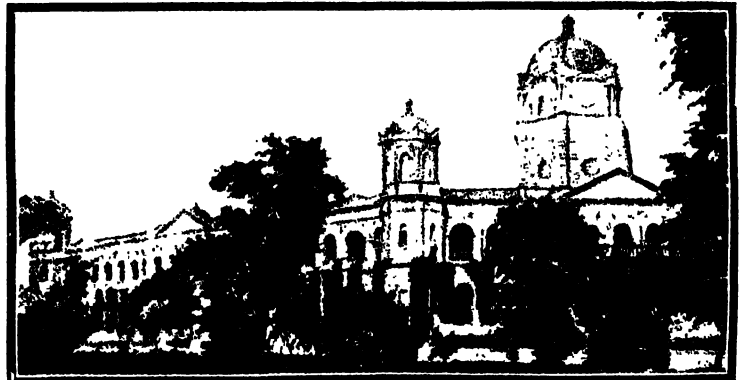
জেনারেল পোষ্ট অফিস

এত লোক-সমাগম হয় যে, তখন এই প্রশস্ত পথেও অবলীলাক্রমে চলা-ফেরা সহজ হয় না।

আনারকালী এখানকার একটা খুব প্রসিদ্ধ স্থান। ভিক্টোরিয়া গেট নামক ফটকের পর হইতে আনারকালী পর্য্যন্ত স্থানটি, বিশেষ মল্ নামে
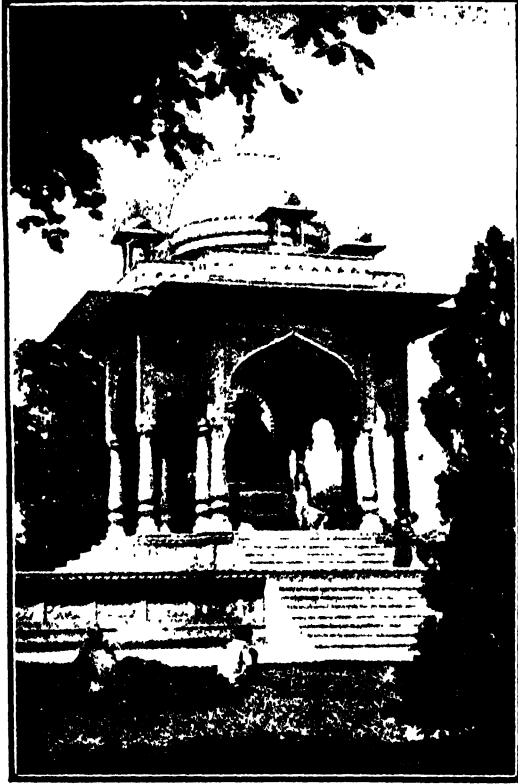
মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মর্ম্মরমূর্ত্তি

যতদূর অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা অতি মনোরম। এরূপ পরিচ্ছন্ন সুন্দর সুবিস্তৃত, উভয় পার্শ্বে তৃণ-সমাচ্ছন্ন পথ ও তাহার দুইধারে স্বতন্ত্র পথি-পার্শ্বে বড় বড় সৌধগুলির শোভা অতুলনীয়। এরূপ পথ ভারতের অন্ত প্রধান সহরগুলিতেও খুব কমই আছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার একটি সুন্দর পাষাণময়ী মূর্ত্তি এবং যে স্যার জন লরেন্সের এক হাতে লেখনী অপর হস্তে তরবারি-ধারী মূর্ত্তি, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেশমধ্যে ও সংবাদ-পত্রে একটি মহা আন্দোলনের বিষয় হইয়াছিল, সেই প্রসিদ্ধ প্রতিমূর্ত্তিটিও এই পথি-পার্শ্বেই বিরাজিত। ঝমঝমা বা ভাঙ্গিয়ানওয়ালি নামক সুবৃহৎ প্রসিদ্ধ তোপটিও এই পথের ধারে রক্ষিত আছে। উহা পিতলের দ্বারা নির্ম্মিত, লম্বে প্রায় ১৪।১৬ ফুট, ভিতরের ফাঁদের ব্যাস প্রায় ১০ ইঞ্চি। এই স্থানে লিখিত আছে, ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে উহা লাহোরেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই অসাধারণ তোপটি ইংরাজদের সহিত চিলেন-ওয়ালায় শিখদের যে যুদ্ধ হয় তাহাতে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

টলিংটন মার্কেট নামক মিউনিসিপ্যালিটির বাজারটিও এই পথি-পার্শ্বেই অবস্থিত। আকারে ইহা কলিকাতার কোন একটি ভাল বাজারের মত না হইলেও ইহা অপরিষ্কার নহে। একটু বিশেষত্ব দেখিলাম, ইহার ভিতরে প্রবেশের যে দ্বারগুলি আছে, তাহাতে স্প্রীং দেওয়া থাকায় কেহ প্রবেশ করিলেই পুনরায় তৎক্ষণাৎ আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায়। বোধ হয় রোগ-জীবাণু হইতে সাবধানতার জন্যই এই ব্যবস্থা, কিন্তু বাজারের পক্ষে ইহা বেশ সুবিধার বলিয়া মনে হইল না। টলিংটন নামক একজন ডেপুটি কমিশনারের নামে ইহার নাম-করণ হইয়াছে।

এখানকার যাদুঘর—যাহাকে স্থানীয় সাধারণ লোকে আজব্ ঘর বলিয়া থাকে, তাহাও এই পথি-পার্শ্বে অবস্থিত। যাদুঘরটি খুব বৃহৎ না হইলেও ইহাতে অনেক পুরাতন দ্রব্যাদি সংগৃহীত আছে। বহু
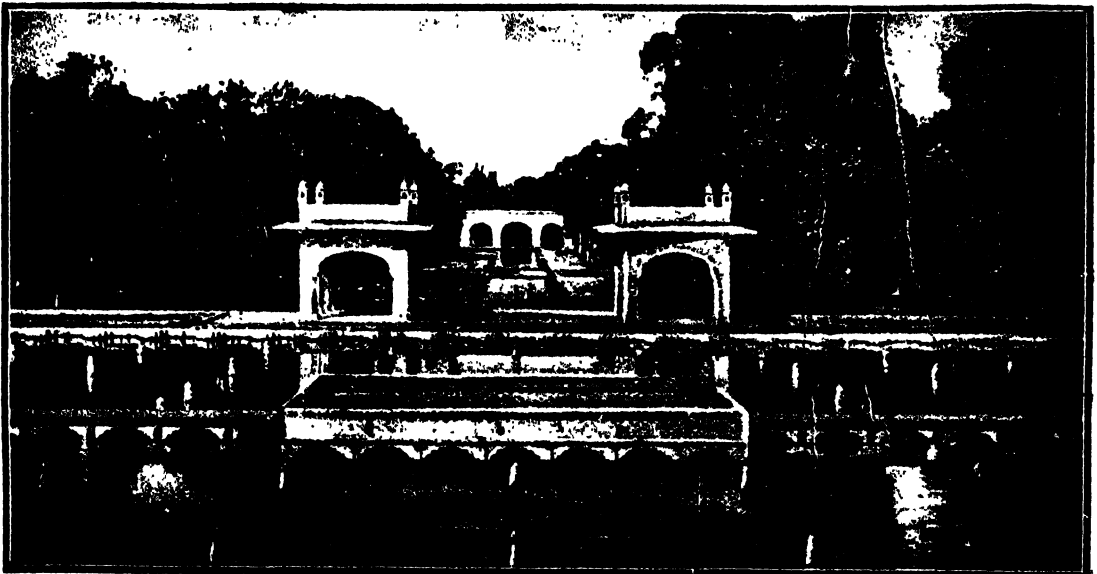
শালিমার বাগের এক অংশ

পুরাতন পৌরাণিক ও অন্যান্য চিত্র এবং অস্ত্রাদি এখানকার উল্লেখযোগ্য। প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক নিদর্শন ও প্রাচীন মুদ্রাদি সংগ্রহ করিয়া যে কক্ষে রক্ষিত হইয়াছে, তাহা সাধারণের জন্য বন্ধ থাকে। এই যাদুঘর প্রতি মাসের প্রথম সোমবার দিন স্ত্রীলোকদিগের জন্য নির্দ্ধারিত থাকে। এই সৌধ সংলগ্ন মেয়েদের হাতের কাজের একটি সংগ্রহ-কক্ষ আছে। উহা বন্ধ থাকায় আমাদের দেখিবার উপায় হয় নাই। যাদুঘরের বাড়ীটিও চমৎকার।

চিড়িয়াখানাও মলের ঠিক পরে ভিক্টোরিয়া গেটের অনতিদূরে অবস্থিত। ইহাও খুব বৃহৎ নহে। এখানে অনেক প্রকার হংস, ভল্লুক ও কতিপয় বিচিত্র জাতীয় পক্ষীর যে সংগ্রহ আছে, তাহা মন্দ নহে। এখানে চারিটি অতিবৃহদাকার কপোত-কপোতি দেখিলাম।

গির্জ্জা

শালিমার বাগের সুদৃশ্য চাঁদনি

চিড়িয়াখানার ঠিক পার্শ্বেই একটি অতি পরিপাটি সুবৃহৎ উদ্যান আছে। এই উদ্যান-মধ্যে মণ্টগোমারি হল্ নামে একটি সুবৃহৎ অট্টালিকায়
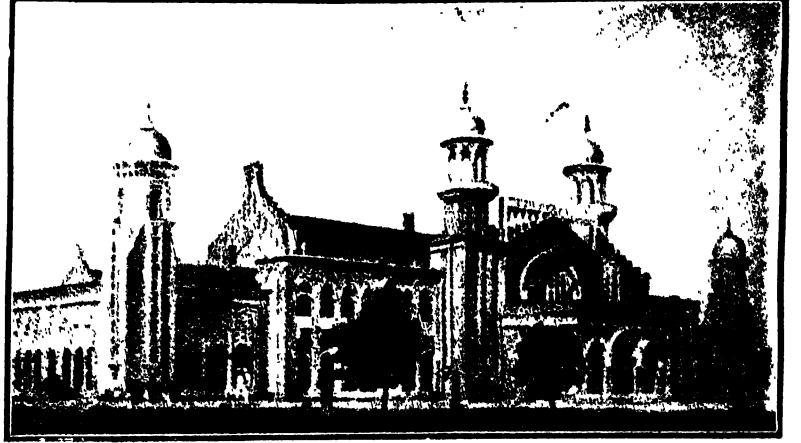
চিফ্ কোর্ট

সাহেবদের ক্লাব্। ক্লাবের বাড়ীটি বৃহৎ এবং সুন্দর। লাটসাহেবের বাড়ী এখান হইতে অধিক দূর নহে। ইহা আমাদের দেখিবার সুযোগ হয় নাই। বাহির হইতে প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানটি যাহা দেখা যায়, তাহাতে বুঝা যায় উহার সংলগ্ন জমি বহু-বিস্তৃত।

উক্ত সকল স্থান পথ ও নিকটবর্ত্তী কাশ্মীর রোড প্রভৃতি আরও কতিপয় রাস্তা বেড়াইবার পক্ষে বেশ উপযোগী। সরকারি ও বড় বড় সওদাগরি অফিস, ব্যাঙ্ক জেনারেল পোষ্ট অফিস্, চিফ্ কোর্ট প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ ও সুরম্য অট্টালিকা নিচয় এই সকল স্থানেই অবস্থিত। এ-সব পথই বেশ পরিষ্কার, কিন্তু তাহা হইলেও বলিতে হইবে, সন্ধ্যার পর যে আলো দেওয়া হয়, তাহা কাছে কাছে হইলেও স্থানের উপযোগী নহে। অন্যান্য প্রধান সহরের তুলনায় আলো কিছু কমই মনে হয়।

কাউন্সিল চেম্বার ও সরকারি দপ্তর ও রেকর্ড অফিস আনারকালীতে অবস্থিত। আনারকালীর সমাধি-মন্দিরের মধ্যেই রেকর্ড্ অফিস। ছুটির দিন ভিন্ন বেলা ১০টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত ওখাকার কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া উহাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়। সাইমন্ কমিশনের বৈঠক বসায় আমাদের কাউন্সিল চেম্বারের অভ্যন্তরাংশ দেখিবার উপায় হইল না।

আনারকালীর সমাধি-মন্দিরটি সম্পূর্ণ বিচিত্র আকারে গঠিত। এ প্রকারের সমাধি বা কোন অট্টালিকা কুত্রাপি দেখা যায় না। এই অপূর্ব্ব স্মৃতিমন্দির ও তৎমধ্যস্থিত সমাধির সহিত যে বিষাদময় ইতিহাস জড়িত আছে, সেরূপ আর কখন কোথাও শুনা যায় নাই।
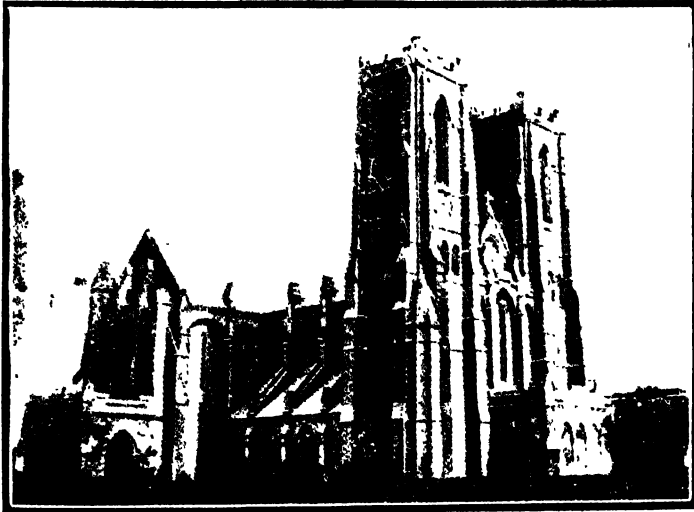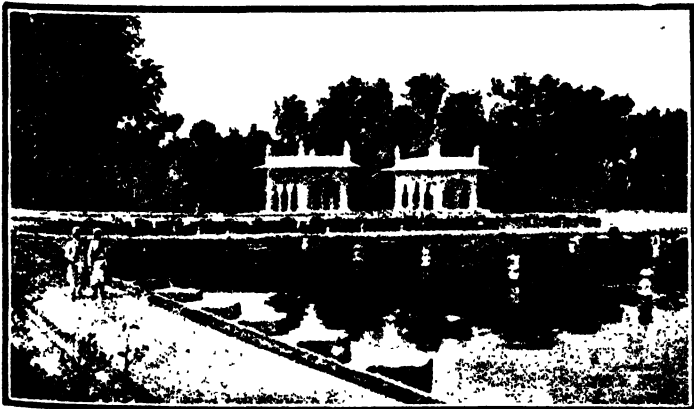
য়ুনিভার্সিটি হল
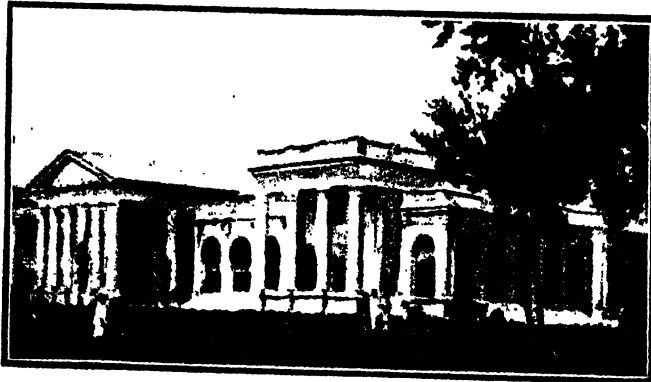
প্রণয়াস্পদের জন্য এমন আত্মাহুতি, প্রণয়ের এমন বিষাদময় পরিণাম কল্পনারও অতীত। আনারকালী একজন ইরাণ-দেশীয় রূপসী; সম্রাট আকবরের সময় বাঁদীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। যুবরাজ সেলিম্ তাহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহার প্রণয়পাশে আবদ্ধ হন এবং পরে গোপনে যুবতীর পাণিগ্রহণ করেন। ক্রমে ইহা বাদশার গোচরে আইসে; এবং একদিন দৈবক্রমে একখানি মুকুরের মধ্য দিয়া সেলিমের দিকে চাহিয়া ঐ সুন্দরীর ওষ্ঠে হাসিরেখা প্রতিফলিত হইতে দেখিয়া তিনি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া জীবিতাবস্থাতেই এই স্থানে তাহাকে কবর দিয়া সমাহিত করেন। সেই হইতেই এই স্থানের নাম আনারকালী। পরে সম্রাট জাঁহাগীর দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিয়া উক্ত সমাধির উপর এই সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং ঠিক সমাধির উপরে প্রস্তরে ভগবানের ৯৯টি নাম এবং—"হায় যদি আমার প্রণয়িনীর মুখখানি আর একটিবারও দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে আমার পরকালে সেই বিচারের দিনেও আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দিতাম।" লিখিয়া নিম্নে "আকবরের পুত্র সেলিম" খোদিত করিয়া দেন। ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ১৬১০এ সমাপ্ত হয়।

আনারকালীর উদ্যান

মোগল রাজাদের সময়ে এখানে অতি সুন্দর উদ্যান ও তাহার মধ্যে অন্যান্য অট্টালিকাও ছিল তখন রাবী ইহার পার্শ্ব দিয়া বহিয়া যাইত। এখন নদীও এখানে নাই, আর সে উদ্যান সৌধাদি চিহ্নও নাই। মুসলমান রাজত্বের পর ইহা প্রথম রঞ্জিৎসিংহের ব্যবহারে ছিল, তৎপরে জেনারেল ভেনটিয়ুরার বাস-ভবন রূপে ব্যবহৃত হয়। তাহার পর কতিপয় বৎসর শূন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে একণে ১৮৯১ হইতে সরকারি দপ্তরখানার কা

পঞ্জাব ক্লাব
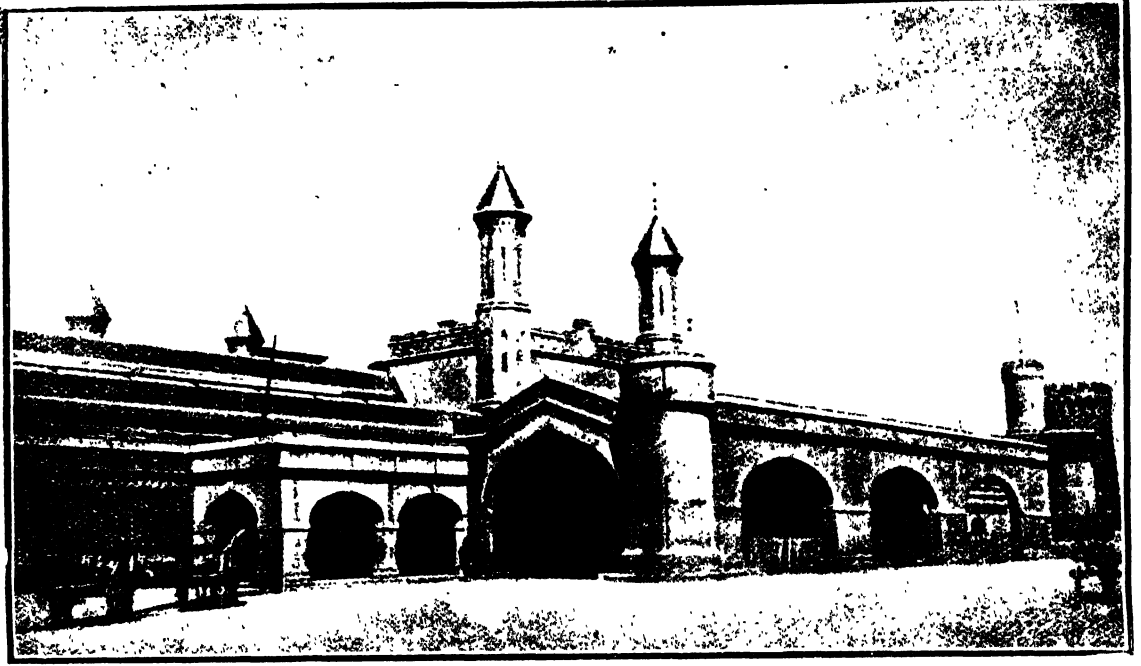
রেলওয়ে ষ্টেশন

ব্যবহৃত হইতেছে। এখানেও পুরাতন বহু চিত্র, দলিল, নক্সা এবং প্রাচীন অস্ত্র শস্ত্র ও মুদ্রাদি সংরক্ষিত আছে। ঐতিহাসিক গবেষণাপ্রিয় লোকদের পক্ষে এ ক্ষুদ্র প্রদর্শনীটি আদরের। এখানে অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য বহু চিত্রের মধ্যে "Pirze agents Extracting Treasure" নামক একখানি চিত্রে একজন ইংরাজ মুখের সম্মুখে পিস্তল ধরিয়া একজন ভারতীয়ের নিকট হইতে অর্থ লুণ্ঠন করিতেছে দেখিলাম।

লাহোরে অপর দর্শনীয়ের মধ্যে সম্রাট জাহাগীরের সমাধি অন্যতম। ইহা শাহদারাবাদ নামক স্থানে এক সুবৃহৎ উদ্যান-মধ্যে স্থাপিত। লাহোর হইতে তিন মাইল উত্তরে রাবীর লৌহ সেতু পার হইয়া এই সমাধি-ক্ষেত্রে যাইতে হয়। সেতু পার হইবার সময় স্বচ্ছ জলপূর্ণ রাবী নদী বেশ সুন্দর দেখায় এই সমাধি মন্দিরটি সুবৃহৎ; একটি মনোরম উদ্যান-মধ্যে লোহিত বর্ণের প্রস্তর দ্বারা ইহা নির্মিত; উপরে কোন গম্বুজ নাই। চারি কোণে চারিটি প্রায় পঞ্চাশ হাত উচ্চ স্তম্ভ আছে। গৃহকুট্টিম শ্বেত ও কয়েকপ্রকার বিচিত্র বর্ণের মার্বেল মণ্ডিত থাকায় অতি সুন্দর দেখায়। এরূপ প্রস্তর সচরাচর দেখা যায় না। মন্দিরের সমস্ত সমতল ছাদটিও মারবেল-মণ্ডিত। কথিত আছে পূর্ব্বে উপরে মর্ম্মরময় গম্বুজ দ্বারা ইহা শোভিত ছিল, পরে সম্রাট ঔরঙ্গজেব দ্বারা রূপান্তরিত করা হইয়াছিল। সম্রাজ্ঞী নুরজাঁহা পতি-ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ ১০৩৭ হিজরী সনে এই অপূর্ব্ব সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; আর ইহার রক্ষিগণ এখন

জাঁহাগীর বাদশাহের কবরের ভিতরের দৃশ্য

দর্শকগণকে উহা দেখাইয়া দুই চারিটা পয়সা ভিক্ষা করিতেছে। শুনা যায়, শাহদারার এই সমাধি-উদ্যানের পূর্ব্বে যে শোভা ছিল, এখন তাহার

কিছুই নাই; তাহা হইলেও বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট ইহাকে বৃক্ষলতাদিতে সাজাইয়া বেশ পরিষ্কার রাখিয়াছেন। এই উদ্যানের ঠিক পার্শ্বে নুরজাঁহার
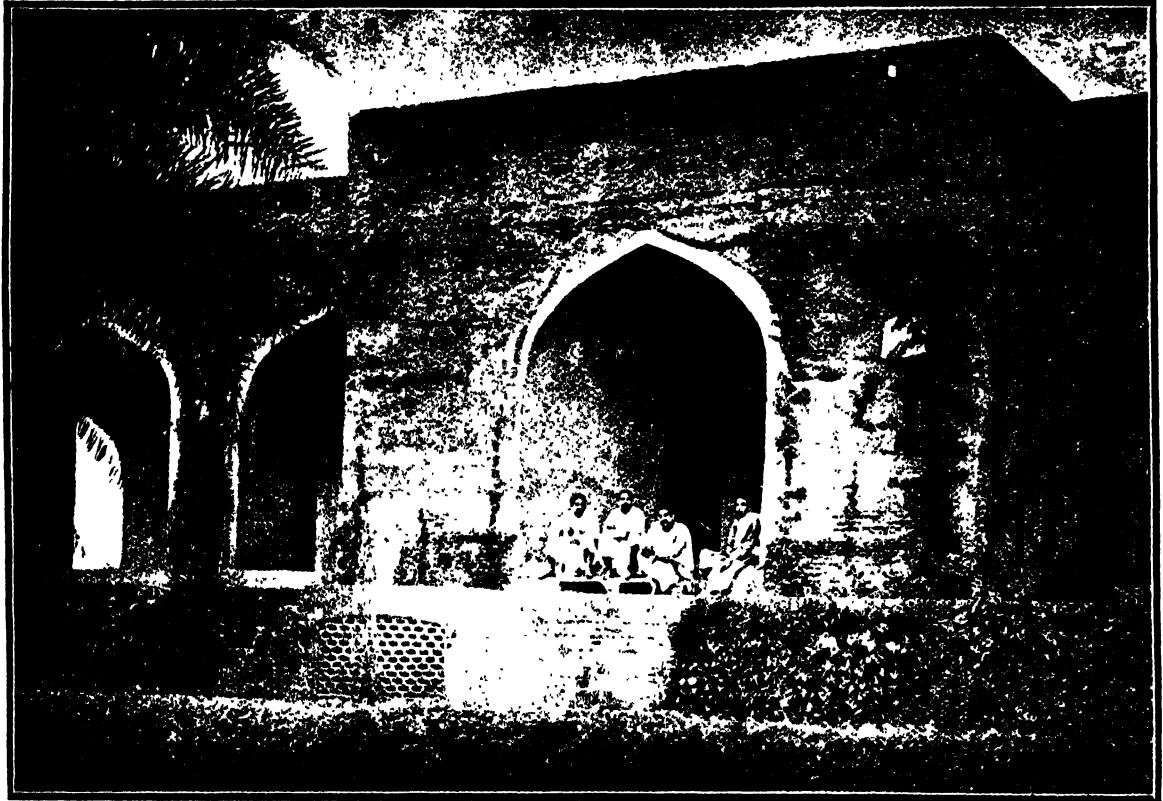
নুরজাঁহা বেগমের সমাধি

লোহারি গেট

ভ্রাতা আসফখার একটি পুরাতন অসংস্কৃত সমাধি দেখিলাম। কেহ কেহ বলেন উহা উজীর আমিন খাঁর সমাধি।

এই স্থান হইতে ফিরিবার সময় অদ্বিতীয়া সুন্দরী ভারতেশ্বরী নুরজাঁহার সমাধি দেখিতে গেলাম। ইহা একটি শ্রীহীন পতিত কানন-মধ্যে নিতান্ত শ্রীহীন অবস্থায় রহিয়াছে; এমন কি পাদুকা বাহিরে রাখিয়া যাইবার কথা বলিবার জন্যও এখানে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। কোন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, রাবীর প্রবল স্রোতে সমাধি-মন্দির এমন কি কবরস্থানটুকু পর্য্যন্ত ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। আমরা এ কথার সত্যতা বুঝিতে পারিলাম না, যে হেতু সমাধি-মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশপথে সরকারি কাষ্ঠ-পীঠিকায় স্পষ্ট করিয়া লেখা রহিয়াছে যে, ইহা সম্রাজ্ঞী নুরজাঁহার সমাধি। গৃহমধ্যে এই সমাধির পার্শ্বে প্রথম যে আর একটি সমাধি দৃষ্ট হয়, উহা তাঁহারই কন্যা লাড্‌লি বেগমের সমাধি।

লাহোর ছোট বড় অনেকগুলি উদ্যান দ্বারা সমৃদ্ধ। মণ্টগোমারি উদ্যান আনারকলী সাদ্দারা বাগ ও অন্য ছোট-বড় উদ্যানগুলি ভিন্ন দুর্গের অনতিদূরে মিণ্টোপার্ক নামে আর একটি পার্ক্ আছে। ইহার মধ্যে বিশেষত্ব কিছুই নাই। এখানকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্রষ্টব্য,—ভারতে অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—এখানকার শালিমার বাগ। সহরের বাহিরে প্রায় তিন মাইল দূরে ইহা অবস্থিত। শালিমার বাগ অর্থে আনন্দোদ্যান বুঝায়। এইরূপ কিম্বদন্তী, সম্রাট সাহজাঁহ একদিন স্বপ্নে স্বর্গের দৃশ্য দেখিয়া—মুসলমানদের স্বর্গ-কল্পনা সপ্তস্তর বিশিষ্ট সেই জন্য—সপ্তস্তরে ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। আমরা মাত্র তিনটি স্তর দেখিতে পাইলাম। প্রত্যেকটি প্রায় একতলা, নিম্নে সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া নামিতে হয়। শুনিলাম ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট কেবল নিম্নের তিন স্তর রাখিয়া উপরের চারিটি স্তর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ কোন পুস্তকে পাই নাই। ইহা কি সত্য? এই সুবিস্তৃত অতি অপূর্ব্ব উদ্যানের রচনা-কৌশল, ইহার সরসী, অগণিত কৃত্রিম উৎস, প্রস্তরময় চাঁদনী, বেদী, পাথরের কেয়ারির মধ্যে ফুলের গাছ, উদ্যান উপবনাদির শোভা শুধু দেখিবার সামগ্রী, বুঝাইবার নহে; কল্পনাও যাহার নিকটে পৌঁছিতে পারে না তাহার বর্ণনার প্রয়াস বাতুলতা মাত্র। এইমাত্র বলা যাইতে পারে, সমস্ত লাহোরের সমস্ত সৌখীন উদ্যানগুলি নির্ম্মাণে ইহার অর্দ্ধেক অর্থও ব্যয়িত হয় নাই। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট এই রম্য কাননটি আধুনিক ভাবে হইলেও যথাসম্ভব সুন্দররূপেই রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। উদ্যানের প্রথম স্তরের ভিতর পথের দক্ষিণ পার্শ্বে মহারাজা রণজিৎ সিংহের দ্বারা প্রস্তুত একটি কক্ষের দেওয়ালে লিখিত আছে যে, প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক উইলিয়ম্ মুরক্রফ্‌ট (William Moorcroft) ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে যখন মহারাজার দরবারে আগমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি এই গৃহে বাস করিয়াছিলেন। এখানে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উচিত, এই উদ্যান এক-সময় অনেকাংশে শ্রীহীন হইয়া গিয়াছিল, মহারাজা রণজিৎ সিংহের দ্বারাই ইহার পুনরুদ্ধার সাধিত হয়।

লাহোরের প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য যাহা কিছু, তাহা এই সকল হইলেও দেখিবার মত অনেকগুলি আধুনিক সৌধরাজি এখানে বিদ্যমান আছে; তন্মধ্যে মেডিক্যাল কলেজ, চিফ কোর্ট, লাট ভবন, সরকারি কলেজ, পঞ্জাব ইউনিভার্সিটি ও সেনেট্‌হল্, মেয়ো হাসপাতাল, পঞ্জাব ক্লাব, রোম্যান ক্যাথলিক গির্জ্জা, জেনারেল পোষ্ট অফিস, মণ্টগোমারি হল্, হাই স্কুল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। লাহোর ষ্টেশনটিও পরিষ্কার ও বৃহৎ। মোট কথা, প্রধান সহরে যাহা কিছু থাকিতে হয়, তাহার কিছুরই প্রায় অভাব দেখিলাম না। অধুনা প্রায় সকল পুরাতন সহরের পার্শ্বে যেমন নূতন সহর, পুরাতন বাটীর পরিবর্ত্তে যেমন নূতন বাটী, সংকীর্ণ আঁকাবাঁকা
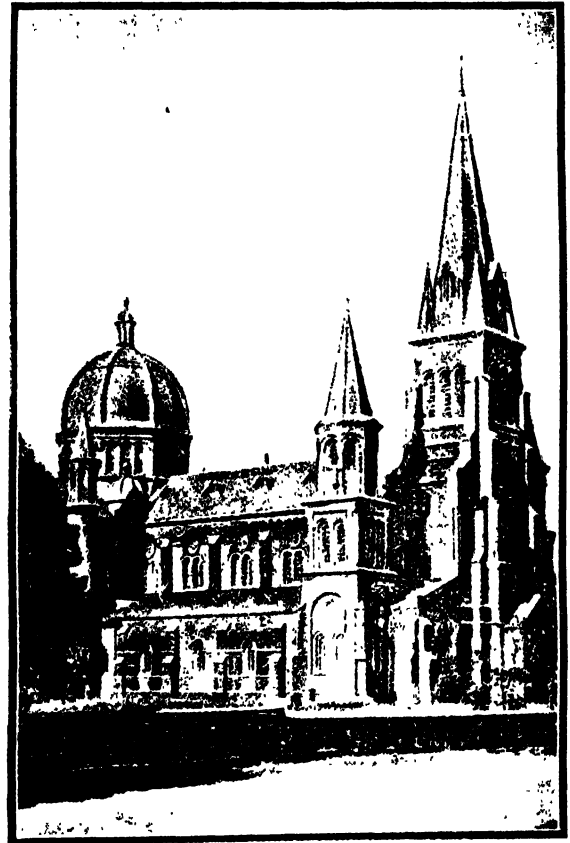
রোম্যান ক্যাথলিক গির্জ্জা

পথের পরিবর্ত্তে যেমন সোজা সুন্দর পথ সকল নির্ম্মাণ করা একটা পদ্ধতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এখানেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। নূতন সহরের মধ্যেই প্রায় সমস্ত সরকারি অফিস আদালত আছে। ইহার মধ্যে যে স্থানকে ডোনাল্ড্ টাউন বলে, তাহা বেশ পরিচ্ছন্ন। ভূতপূর্ব্ব লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর স্যার ডোনাল্ড্ ম্যাক্‌লিয়ডের নামানুসারে ইহার এই নাম দেওয়া হইয়াছে। এখানকার নবনির্ম্মিত সৌধাদির স্থাপত্যের একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়; অধিকাংশের উপরাংশ প্রায় শুধু ইট বাহির করা অর্থাৎ বালি চুণের কাজ নাই। পাথরের বাড়ী এখানে প্রায় নাই। অন্যান্য প্রাচীন সহরের ন্যায় লাহোরেরও চারিদিক উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত। বর্ত্তমান প্রাচীর

এক্ষণে ১৬ ফুট উচ্চ। উহা মহারাজা রণজিৎ সিংহের দ্বারা নির্ম্মিত। প্রথমে যে প্রাচীর ছিল, তাহার উচ্চতা ছিল ৩০ ফুট। পূর্ব্বে চতুষ্পার্শ্বে যে পরিখা ছিল, তাহার অধিকাংশই পরে ভরাট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন সে স্থান বিটপিশ্রেণীপূর্ণ রম্য কানন। নগর প্রবেশের জন্ম লোহারি গেট, দিল্লী গেট প্রভৃতি নামধারী তেরটি বড় বড় ফটক আছে।
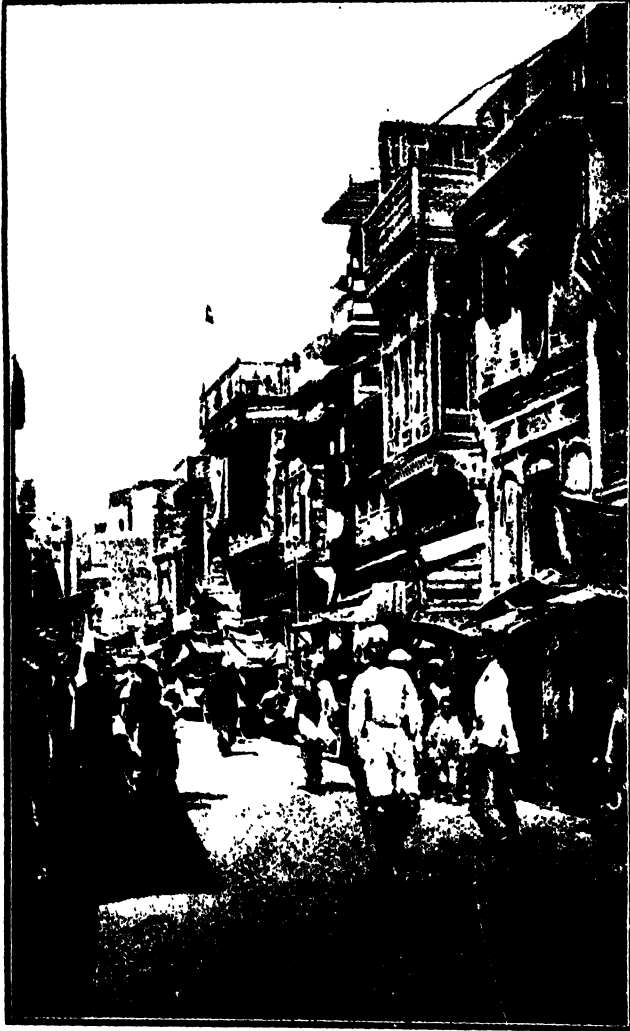
লাহোরের একটি পথ

সহরের অনতিদূরে সুপ্রসিদ্ধ মিয়ানমিরের ছাউনি। এখানে অনেক সৈন্ম থাকে। সর্ব্বদা বাহির হওয়া নিয়ম কি না জানি না, আমরা যে কয়দিন ছিলাম, প্রত্যহই শিখ বা গুর্খা পণ্টনদের বাদ্যসহকারে রাজপথ দিয়া মার্চ্চ করিয়া যাইতে দেখিয়াছি

নগরের বাহ্য সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে প্রশংসার কথা বলা উপলক্ষে এখানকার মিউনিসিপালিটির একটা ত্রুটির কথা বলি। পথগুলিতে ধূলা কিছু অধিক মনে হয়। পথে জল ও ঝাড়ু দেওয়ার যে ব্যবস্থা আছে, তাহা এই সুন্দর সহরটির পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে বলিয়াই মনে হয়।

সাধারণ দেশভ্রমণকারীর দৃষ্টিতে যাহা পড়ে, তাহাই সংক্ষেপে এখানে লিখিত হইল। লাহোরের পুরাতন ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। এই নগরী প্রতিষ্ঠা বিষয়ে হিন্দুদের একটা কিম্বদন্তী আছে যে, শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লব কর্ত্তৃক লাহোর এবং কুশ কর্ত্তৃক কাশুর এবং লোহাওয়ারাণা শব্দ হইতে লাহোর নামের উৎপত্তি হইয়াছে। পরে চৌহাণ বংশীয় নৃপতিদের ইহা রাজত্ব ছিল। সে সময়ের ইতিহাস বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। মুসলমান রাজত্বে বিশেষতঃ মোগল-দিগের সময়েই এই স্থান উন্নতির শিখরে উপনীত হইয়াছিল।

সম্রাট আকবরই প্রথম লাহোরের নগর-প্রাচীর নির্ম্মাণ করেন এবং দুর্গের সংস্কার ও পরিসর বৃদ্ধি করেন। তাঁহার সময়েই লাহোর ধনজনে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। বাদসা জাঁহাগীরও সর্ব্বদা এখানে বাস করিতেন এবং এই স্থানেই তাঁহার পুত্র খস্রু তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব-কালেই শিখগুরু অর্জ্জুন কর্ত্তৃক শিখ ধর্ম্মের আদিগ্রন্থ লিখিত হয়। জাঁহাগীর দ্বারাই লাহোরের প্রসিদ্ধি ও দুর্গের প্রাসাদাদির সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি হইয়াছিল। মতি মস্‌জিদ ও খাওয়াবগা অর্থাৎ নিদ্রাপ্রাসাদ তাঁহারই দ্বারা নির্ম্মিত হয়। সাহাজাঁহা কর্ত্তৃকও প্রাসাদ দুর্গাদির অনেক উন্নতি হইয়া-ছিল। সম্মন বুরুজ, শিশ্ মহল, খাওয়াবগার বামদিকের সৌধশ্রেণী এ সমস্তই তাঁহার দ্বারা নির্ম্মিত হয়।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবও এখানকার উন্নতি বিষয়ে যে মনোযোগী ছিলেন না তাহা নহে। বন্যার জল হইতে নগরের রক্ষাকল্পে রাবীতে তিন মাইল ব্যাপী যে বাঁধ আছে, উহা এবং সুপ্রসিদ্ধ বাদসাহি মস্‌জিদ তাঁহারই কীর্ত্তি; কিন্তু তাঁহারই সময় হইতে এখানকার স্থাপত্য ইতিহাসের পরিসমাপ্তি হইয়াছে বলিতে পারা যায়। তৎপরে সুদীর্ঘকাল মধ্যে এখানকার উন্নতি বলিতে প্রায় কিছুই হয় নাই; বরং নাদির সা, আহমদ সা প্রভৃতির আক্রমণে লাহোর একপ্রকার ধ্বংসের পথেই অগ্রসর হইতেছিল; শেষে মহারাজা রণজিৎ সিংহের আবির্ভাবের সহিত লাহোর আর একবার গৌরবগরিমায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। অবশ্য এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে, মহারাজা অমৃতসরের মন্দিরকে সমৃদ্ধ করিবার জন্ম এখানকার কোন কোন সুদৃশ্য সমাধি মন্দির হইতে মূল্যবান প্রস্তরাদি লইয়া এখানকার মন্দিরাদির সৌন্দর্য্যহানি করিয়াছেন: কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার দ্বারা শালিমার বাগের সংস্কার সাধন, সুন্দর বারদুয়ারি নির্ম্মাণ ও অন্যান্য সৌধাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়া ও সংস্কারাদি দ্বারা সহরের লুপ্ত সৌন্দর্য্য যে বহুলরূপে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাও বলিতে হইবে।

মহারাজা রণজিৎ সিংহের পুত্র মহারাজা দলীপ সিংহের সময়ে তাঁহার পিতার সমাধি-মন্দির ভিন্ন বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন কিছু নির্ম্মিত হয় নাই। এই হতভাগ্য দলীপের সময়েই ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে লাহোরে বৃটিশ

রাজপ্রতিনিধি সভা (British Council of Regency) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তে তিনিই ইহার শাসনভার অর্পণ করেন। তাহার পর হইতে আবার নবযুগের আরম্ভ হইয়াছে।

এখানকার শিল্পের মধ্যে শাল, রেশমী বস্ত্র, সোণালী ও রূপালী জরীর কাজ ও পাথরের খেলনাই উল্লেখযোগ্য।

এদিকের অন্য সকল স্থানের অপেক্ষা কার্য্যব্যপদেশে লাহোরে বাঙ্গালীর বাস অধিক। শুনিলাম উপস্থিত প্রবাসী বাঙ্গালীর সংখ্যা প্রায় সার্দ্ধ তিনশত। লাহোরে পূর্ব্বে যে সব খ্যাতনামা বাঙ্গালী সরকারি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তন্মধ্যে চিফ্ কোর্টের জজ স্যার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম সুপরিচিত। লাহোরের সুপ্রসিদ্ধ 'ট্রিবিউন" পত্রিকাও বাঙ্গালী শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায় দ্বারা সম্পাদিত হয়। প্রবাসী বাঙ্গালীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এখানকার কালীবাড়ীর কথায় পুনরুল্লেখ করিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিব। কালীবাড়ী হীরামণ্ডিতে অবস্থিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখানে প্রবাসী বাঙ্গালীদের স্বল্পকাল প্রবাসের জন্য ইহার মত আর দ্বিতীয় স্থান নাই। পাঞ্জাবি হোটেলের অবশ্য এখানে অভাব নাই, কিন্তু সেগুলিতে বাঙ্গালীদের বড় সুবিধা হয় না। কালীবাড়ীতে দুই চারি দিন পর্য্যন্ত বিনা ব্যয়ে আহার ও থাকিবার ব্যবস্থা আছে। এই কালী বাড়ীতে একটি বাঙ্গালা পুস্তকাগারও আছে। মন্দিরে প্রত্যহ দেবীর পূজা হইয়া থাকে। প্রবাসী বাঙ্গালীদের চেষ্টায় প্রতি বৎসর সমারোহের সহিত দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। এখানকার প্রবাসী বাঙ্গালীদের ইহাই একমাত্র মিলন বা কেন্দ্র স্থান বলিলেই হয়। এখানকার পূজারি ভট্টাচার্য্য মহাশয় যথাসম্ভব যাত্রিদের যত্ন করিয়া থাকেন। আম্বালা, দিল্লী, সিমলা প্রভৃতি আরও কতিপয় স্থানে এইরূপ কালীবাড়ী আছে; এ সবগুলিই প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের গৌরবের প্রতিষ্ঠান। ইহা তাঁহাদের অতিথি-সেবা ও স্বজাতি-প্রীতির পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মনে রাখা উচিত, ইহার স্থায়িত্ব বিধান ও উন্নতির জন্য বাঙ্গলার বাঙ্গালীদেরও এ দিকে দৃষ্টি রাখার আবশ্যকতা আছে। *

* এই প্রবন্ধের ঐতিহাসিক কথা ও কোন কোন তথ্যাদি "Imperial Gazetteer of India Vol. VI. ও "ভারতভ্রমণ" নামক গ্রন্থ হইতে পাইয়াছি। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দেও সংগ্রহ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন।

ফ্যালারামের কথামৃত

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

সবাই নীরব চিন্তিত ও অধোবদন। চক্কোত্তী মশাই তাঁর দীর্ঘ টেলিস্কোপ-প্যাটার্ণ গলাটি পেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে ধরিত্রীর দিকে অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে চেয়ে আনমনে হুঁকা টানছেন তো টানছেনই। ক্যাবলা—সেই মুখর চঞ্চল পরমোৎসাহী ক্যাবলাকান্ত অবধি দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ রেখে বিরহী যক্ষের কায়দায় বসে! বাজারের পয়সা নিতে এসে নেত্য ঝি বাবুদের রকম-সকম দেখে গালে হাত দিয়ে সেই যে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছে, এখনও সে তেমনি হেলে, তেমনি তন্মত ভাবে চিত্রার্পিতা সখীর ঢঙে দাঁড়িয়ে। কলিকাটার লোভে ঘরামী দামু কৈবর্ত্ত চাল ছাওয়া মুলতুবী রেখে সেই যে উঠানে উবু হয়ে বসেছে, তারও যেন ভাব লেগে গেছে। পৌষের শীতে উঠানের পাতাঝরা শ্রীহীন শিউলী গাছটাও উদ্গ্রীব ও তটস্থ; জল স্থল ব্যোম সব সচকিত, মৌন ও গম্ভীর।

ফোঁস্ করে একটা গভীর ও বড় রকম একটানা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ক্যাবলা মাথা তুললো; দামুও নেত্য ঝির দিকে একবার অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে আপন মনেই বিড় বিড় করে বলে চললো, "এর অষুধ কি, হ্যাঁ, এ রোগের দাবাই কি? ফুলের হার, ফুলের কঙ্কন বলয় বলে যা মানুষ এক দিন পরবে, তাই কি পরের যুগে শেষটা হয়ে দাঁড়াবে তার গলার ফাঁস, হাত-পায়ের শেকল, বেড়ি, হাতকড়ি, হ্যাঁ? এর অষুধ কি?"

চক্কোত্তী ঠাকুর হুঁকা থেকে মুখ তুলে ক্যাবলার দিকে চাইলেন; হাসিতে তাঁর দুই গালের আর চোখের কোণের চামড়া কুঁচকে রেখায় রেখায় ঠিক সেই রকম আবর্ত্তের সৃষ্টি করলো, দত্তদের পুকুরে কাদুর পাদপদ্ম-সন্তাড়িত কলসী-ডোবানো জলে যেমনটি হয়।

টিক্‌টিকির মত মাথা নাড়তে নাড়তে ফ্যালারাম বললেন, "আচ্ছা! তার মানে কি বল দেখি? রোগের দাওয়াই পরে, আগে রোগের কারণ কি, মূল কোথায়, তার diagnosis কর। চাও মুক্তি, আসে বন্ধন; শৃঙ্খলার জন্য সমাজ বাঁধো, রাজপাট গড়, তা কালে হয়ে দাঁড়ায় পায়ের শেকল, মাথার অঙ্কুশ। এর অর্থ কি

এই নয়, যে, তোমাদের ভেতরেই ঐ বাঁধন, ঐ ফাঁসী, ঐ ছাঁদনদড়ি গোদাবেড়ীর ভূত গা-ঢাকা দিয়ে আছে, ঐ সর্ব্বের মধ্যেই—ওর নাম কি—রয়েছে ভূত? সেই ভূতই সুবিধে পেলেই অলক্ষ্যে গুটি গুটি বের হয়ে এসে তোমার আজকের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সৃষ্টিটুকুকে কালকের মধ্যেই কদাকার, অঙ্গহীন ও ভয়াবহ করে তোলে; তোমার হাতের গড়া শিবই তোমার হাতে থাকতে থাকতেই তার চোরা ইঙ্গিতে বাঁদর বনে যায়; মানব-প্রকৃতির মধ্যেই এমন কিছু আছে, যা কল্যাণকে সুখকে শৃঙ্খলাকে ভাল ভেবে উৎকট কামনায় আঁকড়ে ধরতে গিয়ে চট্‌কে বিকলাঙ্গ পিণ্ডে পরিণত করে।"

নেত্য। ও বাবু, আমার বাজারের পয়সা কটা—

ক্যাব। যা বলেছেন, মানুষের অন্ধ বিশ্বাস না ঘুচলে বাঁধন কস্মিনকালে কাটবে না। দেখুন না, কি হিঁদুর মাঝে, কি মুসলমানের সমাজে আর কি খৃশ্চানের জীবনে ধর্ম্মের নামে পুরুত মোল্লা আর পাদ্রীতে মিলে মানুষকে কি জবুথবু ভূতই না বানিয়ে রেখেছে। জগতের যত দুঃখ অত্যাচার অনাচার অজ্ঞান এই থেকে, এই অন্ধ ধর্ম্ম-বিশ্বাস থেকে, এই অন্ধ-বিশ্বাসের মোহ থেকে। হ্যাঁ, একশোবার এই ঠিক ঠিক, এই-ই হচ্চে সব অনর্থের গোড়া।

নেত্য। ওগো, শুনছো? আমার পয়সা ক'টা দিয়ে কথা কও বাপু, হ্যাঃ। ছাখো দিকিন্ একবার গেরো, সেই থেকে ঠায় দাঁড়ি—

চক্কো। মানুষের দুঃখ মানুষের অজ্ঞানের ফল, এ কথা সত্যি। কিন্তু শুধু ধর্ম্মকে দোষ দেও কেন বাপু? সমাজও কি মানুষকে বিধি-নিষেধের সাত পাকে বেঁধে পঙ্গু ও জড়-ভরত করে নি? আর রাজনীতি? এত রক্তপাত, এত নরহত্যা, নারীর নির্য্যাতন, অশ্রুর বন্যা, মানুষের খর্ব্বতা বন্ধন ত্রাস আর কিসে এনেছে বল দেখি? ফরাসী-বিপ্লবে কাদের বিরুদ্ধে ওরা অমন মারমুখী হয়ে ক্ষেপে উঠেছিল? রাজার বিরুদ্ধে, রাজনীতিক পাণ্ডাদের বিরুদ্ধে, ক্ষুদে ক্ষুদে রাজা ঐ ধনী জমিদারদের বিরুদ্ধে নয় কি? রুষ জাতটাকে এত শতাব্দী ধরে কোন্ শক্তিতে পায়ের তলায় চেপে রেখে মনের আনন্দে দলেছিল? জারের রাজশক্তি নয় কি? গত যুগের প্রজাতন্ত্রের প্রতিক্রিয়া আর এ যুগের গণতন্ত্রের ঝঞ্ঝা তুফান এ সব আয়োজন কার হাতের শক্তি ও রাজদণ্ড কেড়ে নেবার জন্যে? রাজশক্তির বটে তো? তবু তোমরা স্থূল-বুদ্ধির মত কথায় কথায় বলবে ধর্ম্মের জন্যেই দেশ পড়ে। ধর্ম্ম ঐ সঙ্গে আছে অবিশ্যি, সমাজও আছে, অর্থনীতি বাণিজ্য সাহিত্য কলা সবই ওর প্রতিপোষক হয়েছিল; তার মানে এই যে, অত্যাচারী রাজশক্তিই পতিত দেশে যা হাতের কাছে পেয়েছে, তাই-ই তার মানুষ-দলন-যজ্ঞে লাগিয়েছে।

বাপু হে, মানুষ যখন পড়ে, তখন তার সবই পড়ে; তার ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি, তার বাণিজ্য অর্থনীতি সাহিত্য শিল্প, তার কলা নাটমঞ্চ বিধি ব্যবস্থা সবই পতিত ও ঘুণদষ্ট হয়ে যায়। তার দুঃখ ও বন্ধনটা আসে এই সমগ্র পতনটার দরুণই; কিন্তু সেই দৈন্য ক্লৈব্য ও নির্য্যাতনের প্রধান শক্তি থাকে ধনে জনে সৈন্য সামন্তে বলী রাজশক্তির হাতে; এদের সে সঙ্গের ডাকিনী যোগিনী করে নেয় মাত্র। তাই দেখ না, যখন যে জাতি যে দেশ আবার জাগে, আবার বেঁচে উঠতে থাকে, তখন শনৈঃ শনৈঃ তার সবই বাঁচে; তার ঐ পতিত ধর্ম্ম সমাজ রাজনীতি অর্থনীতি কলা সাহিত্য সবগুলিকেই তাকে টেনে তুলতে হয়, নব প্রেরণা দিয়ে বাঁচাতে হয়, ঢেলে সাজতে হয়।

নেত্য। না বাপু, আমি আর পারিনে ক, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ের নড়া ছিঁড়ে গেল। আলাপচারী করবার চোপর-দিনই তো পড়ে আচে, আমার যে ইদিকে বাজারের সময় বয়ে গেল। ও বাবু, শুনছো, ওগো, পয়সা কটা ফেলে দাও না চট্ করে—

ক্যাব। ছোঃ! তোমার কি আক্কেল ঝি? এমন একটা ভাল কথা চলছে, একটু মন দিয়ে শোন। তোমরা হচ্ছ গিয়ে দেশের নারী শক্তি, জাতির প্রাণ, আমাদের অর্দ্ধাঙ্গ, তোমরা এ সব সম্বন্ধে ভাববে না, বুঝবে না, তবে—

নেত্য। শোন একবার, কথার ছিরি শোনো, অর্দ্ধাঙ্গ কি গো, ওমা কি নজ্জার কথা। আর এই তোমাদের কচর-মচর—ওর বাপু মাথামুণ্ড নেই, শুনে শুনে হল্লাক হয়ে গেচি। বেরাহ্মণ হচ্চে গিয়ে দেবতা, তা সে তিনি যা করে তাই হ'ল গে ব্যবস্থা; আর রাজা তিনিও হলো গে দেবতা, বেরাহ্মণেরই পরে, দর্শন করলে পুণ্যি হয়। ও-সব নিয়ে কি ঘোঁট পাকাতে আচে, না, তা'তে কারু ভাল হয়? আমার পয়সা ক'টা ঝট্ করে ফেলে দাও, আমি যাই, মাথায় আগুন দে ছুটে দু'টো শাক-আনাজ নিয়ে আসিগে। কলতলায় এখনও

ছিষ্টির এঁটো-কাঁটা পড়ে, পেসাদীর মা এসে সেই এন্তক দাঁড়িয়ে, কখন রান্না চড়বে তার ঠিক নেই।

চক্কো। এই নাও ঝি, বার আনায় আজ চালিয়ে নিও। তোমায় পয়সা দিলে তার আধলাটা অবধি তো ফিরবে না—

ক্যাব। উহুঁ, উহুঁ, ওকে পয়সা দেবেন না, আগে কথাটা শুনে যাক, এরা না বুঝলো তা হ'লে আর হ'লো কি? আমাদের স্বরাজ কি তা'লে হবে শুধু বাবু-রাজা এদের সব বাদ দিয়ে? শোন নেত্য, ভগবান তাঁর বামে রয়েছেন স্বয়ং লক্ষ্মী, দুই মিলে জগত সৃষ্টি করছেন, একটিকে ছেড়ে আর একটি—

চক্কো। যাও, নেত্য, তুমি যাও। ওকে ছেড়ে দ্যাও ক্যাবলা, বাজারে যাক, হেঁসেল মুক্ত করুক, যার যা' স্বধর্ম্ম, ওর এ পরধর্ম্ম ভয়াবহ। তোমাদের সঙ্গে রাজনীতির মাঠে কুইক্‌ মার্চ্চ করবার জন্যে লেখাপড়া-শেখা বুদ্ধিমতী মেয়ে বহুত রয়েচে বাপু, ও-সব ঝি-নর্ত্তকী রূপ নারী-শক্তির আশা যো সো করে এখনও কয়েক বছর মুলতুবী থাক। তোমার রূপো মালী, দশরথ বেয়ারা, নাজীর শেখ গাড়োয়ানই দেশের সমস্যা বোঝে না, সঙ্গে চলে না, তো নেত্য ঝি। আমরা যতক্ষণ দেবকীর বুকের জগদ্দল পাথরটা একটু হাঁপ ছাড়বার মত নেড়ে রাখি, ততক্ষণ ওরা না হয় দু'টো কুটনো কুটে রেঁধে-বেড়েই দিক না। এখনি নেত্য ঝিকে না হ'লে দেশ উঠছে না, এমন তো হয়নি অবস্থা। সাধুদের পরিত্রাণে আর পাষণ্ড দলনে ঐ যে 'সম্ভবামি যুগে যুগে' সে কি বাপু নেত্য ঝি রূপে?

ক্যাব। কি বলেন আপনি, এঁরা হচ্ছেন সাক্ষাৎ জগদম্বার রূপ; এঁদের অজ্ঞানেই তো দেশ এমন করে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। এঁদের সঙ্গে না নিলে—

চক্কো। বাপু হে, জগদম্বার অনেক রূপ; তার মধ্যে তারা বগলা ধূমাবতী তো আছেনই, আরও উৎকট বীভৎস রূপ সব আছে। সব রূপ কিছু একই উদ্দেশ্যে নয়; কোনটাকে ধরে ওঠা যায়, আবার কোনটাকে ধরবামাত্র হিড় হিড় করে পাতালমুখো নিয়ে যায়। নারী ও পুরুষের মধ্যে বিদ্যার অংশ কল্যাণের দিকটাকে তুলে আগে এই সব ঘোরা তামসী শক্তির সংহরণ করাতে হবে, তবে তো ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন। সে যাক্‌, যা বলছিলাম, বলি। তোমরা 'ধর্ম্ম সব খেলে, ধর্ম্ম সব খেলে' বলে না হোক্‌ চীৎকার কর, কিন্তু পতনটা যে কি রকম চার-পোয়া পূর্ণ integral হয়েছিল, তা' তো ভেবে দেখো না। ধর্ম্ম মানুষকে বেঁধেছে, পঙ্গু করেছে বলে তোমরা আধুনিক তরুণরা ধর্ম্মের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ। কেন তবে ঐ গুখুরী রাজনীতিও ছাড় না? যা' করবে পুরোদস্তুর কর, be consistent, go the whole hog, কি বল? রাজনীতি যে মানুষ-মারার কি দুর্জ্জয় মারাত্মক কল তা' এই দেড়-দু'শ বছর ধরে ইংরেজের হাতে তার ব্যবহার এবং তার ফল দেখেই তো বুঝতে পার। এতবড় জাতিটা হস্তিমূর্খে পরিণত হ'ল, হৃতসর্ব্বস্ব দীন হা-ভাতে দশা পেল, অস্ত্র শস্ত্রে বঞ্চিত হয়ে পৌরুষ হারাল, পরের নকলবাজীই শুধু শিখলো সেটা ধর্ম্মের জন্যে, না, রাজনীতির চাপে? তবে এ হেন সর্ব্বনাশা রাজনীতি জোরসে চালাচ্ছ যে? ও পাপ ছাড়লেই পার?

তোমরা বলবে, "আমরা রাজনীতির রঙ বদলে দেব, তা আর রাজনীতি থাকবে না, হবে গণনীতি।" বেশ তো, তা হলে ধর্ম্মের রঙও বদলে দেও। তোমাদেরই মত যারা সুখ-সুবিধা সর্ব্বস্ব পণ করে আচার-ধর্ম্ম লৌকিক-ধর্ম্মের পচা গর্ত্ত থেকে পরমার্থকে উদ্ধার করছে, তাদের দেখে নাক বাঁকাও কেন? লাপ-ঝাঁপ করে না বলে, হাটুরে গলাবাজী তাদের নেই বলে কেন ভাব তোমরাই বেজায় কর্ম্মী, আর তারা নাসাগ্রদর্শী নিষ্কর্ম্মার দল?

ক্যাব। ধর্ম্মকে ডেকে আনলেই আবার গুটি গুটি তার সঙ্গে সব কুসংস্কার বন্ধন আসবে।

চক্কো। আর নতুন রাজনীতি তোমার পচবে না বলতে পার? গণতন্ত্র একদিন শক্তিমদে মানুষের মধ্যে সাঁওতালী নাচ নাচবে না তা' বুক ঠুকে বলতে পার? মানুষের মধ্যে দানো দৈত্য রাক্ষস পিশাচ পশু প্রেত সব নিঃশেষ হয়ে গেছে, মানুষকে অত উঁচুতে দেবতার কোঠায় তুলেছ?

ক্যাব। এটা আমাদের একটা খুব আশাপ্রদ experiment, খুব সম্ভব এবার মানুষ নিজেকে খুঁজে পাবে—

চক্কো। তাই পাক, তা'তে আর যারই থাক, এ শর্ম্মার কোন আপত্তি নেই। তা হ'লে তো বাঁচি। মানুষ যদি নিজেকে খুঁজে পায়, তা' হ'লে সে শুধু নিজের হাত পা সম্বন্ধে সজ্ঞান হবে না, সর্ব্বাঙ্গ নিয়েই সজ্ঞান হয়ে উঠবে। এই বিরাট দেশটা, আর তার সব আগে ভারতের হৃদয়রূপী

এই বাংলা দেশ যখন প্রথম নিদ্রা থেকে চোখ মেললো পাশ্চাত্যের হুড়ো খেয়ে, তখন দেখো আগে জাগলো তার ধর্ম্ম। রামমোহন এ দেশের প্রথম সচেতন সম্বিৎ, তার পর দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ এসেছেন, আজ অরবিন্দ যোগাসনে। তাই দেখো, আগে জাগলো ধর্ম্ম; তার পর বাণীর কমলবন দুলে উঠলো—ফলে মাইকেল হেমচন্দ্র বঙ্কিম; সেই পদ্মবনেই পরে পরে রবীন্দ্রনাথ শরৎ-চন্দ্রের আসা। তার পর এলো কলা ও শিল্প, রাজনীতি, এই সব। তা' তো হবেই; অসাড় অবস্থা থেকে, মূর্চ্ছা বা মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠতে হ'লে মানুষের প্রাণ স্পন্দন ও চেতনা জাগে আগে হৃদয়ে, তার পর মাথায় বুদ্ধি খেলে, তার পর হাত পা নড়ে। তোমরা তরুণ-দল এক-বগ্‌গা বলে বিলক্ষণ একটু কানা গোছের। মহামায়া যখন কাজের প্রকাণ্ড কুম্ভীপাকের মাপে মানুষ গড়েন, তখন বোধ হয় জ্ঞানের দিকটা চেপে দেন, ঐ রকম বনবরার গোঁ-ওয়ালা একবগ্‌গা মানুষই গড়েন, কারণ তাদের দক্ষযজ্ঞ নাশ করতে হবে কি না।

কিন্তু বাপু, এও আমি বলে দিচ্ছি, এই ধর্ম্মের ধুয়ার দেশে ধর্ম্মকেও যদি তোমরা না তোলো, তা' হ'লে জোর করে চেপে দেওয়া repress করা ঐ ধর্ম্মেরই বদ গ্যাস একদিন তোমাদের এত সাধের খাসা ইমারৎ ফাটিয়ে ধ্বসিয়ে চৌচির করে দেবে। মানুষের হাজার ক্ষুধার মধ্যে ধর্ম্মের ক্ষুধাও বড় কম নয়; ও-থেকে একদিন আবার কুঠার-হস্ত পরশুরাম বেরিয়ে পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করতে লেগে যাবে। সাবধান! ওরে দামু, যাস্ কোথা, তামাক খাবি তো কলকেটা সাজ্।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

খাদ্যপ্রাণ

অধ্যাপক শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল এম্-এস্‌সি, এম্-বি

হাত আছে, পা আছে, নাক মুখ কাণ সবই যেমন ছিল তেম্নি আছে; তবু যখন চোখ দেখতে পায় না, কাণ শুনতে পায় না, মুখ কথা বলতে পারে না, হাত পায়ের আর কোন কাজ কর্ম্মার ক্ষমতা নেই, আমরা বলি তার মৃত্যু হয়েছে, অথবা দেহে প্রাণ নেই। ঠিক একই ভাবে যখন দেখতে পাই, খাবার বেলা সব খাদ্যই উপযুক্ত পরিমাণে খাচ্ছি, কিন্তু কিছুতেই যেন পরিপুষ্টি লাভ হচ্চে না, অথবা শরীর দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে, অথচ রোগেরও কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন ধরে নিতে হবে, খাদ্যেও নিশ্চয়ই এমন কিছুর অভাব ঘটেছে যার অভাবে—চর্ব্ব, চোষ্য লেহ্য পেয়—নানা তথাকথিত পুষ্টিকর খাদ্যও কোন কাজে আসছে না, প্রাণহীন দেহের মত খাদ্যও প্রাণহীন হয়ে আছে। এই সব আছে—অথচ কিছুই নেই, যার অভাবে খাদ্যে এম্নি অবস্থা হয়ে থাকে, আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা তাকেই খাদ্যপ্রাণ অথবা ভিটামিন বলে থাকেন। উদ্ভিদ্-জগতেই খাদ্য-প্রাণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়—জীবদেহে তাহাদের পরিমাণ তত অধিক নয়। আজও বৈজ্ঞানিকেরা খাদ্যপ্রাণকে অন্যান্য খাদ্য হইতে পৃথক করিতে পারেন নাই। আশা করা যায়, উপযুক্ত কর্ম্মীদের কঠোর অনুসন্ধিৎসার ফলে, যথাসময়ে খাদ্যপ্রাণ স্বতন্ত্রীকৃত ভাবে আমাদের দেহপুষ্টির শ্রেষ্ঠ উপাদান আদর্শ খাদ্যরূপে পরিগণিত হবে।

শ্রেণী বিভাগ

১। চর্ব্বিজাতীয় পদার্থে দ্রবনীয় খাদ্যপ্রাণ 'এ'—অথবা শরীর বৃদ্ধি-কারক খাদ্যপ্রাণ।

২। জলে দ্রবনীয় খাদ্যপ্রাণ 'বি'—অথবা স্নায়বিক রোগের প্রতিষেধক খাদ্যপ্রাণ।

৩। জলে দ্রবনীয় খাদ্যপ্রাণ 'সি'—অথবা স্কার্ভি-প্রতিষেধক খাদ্যপ্রাণ।

৪। চর্ব্বি জাতীয় পদার্থে দ্রবনীয় খাদ্যপ্রাণ 'ডি'—অথবা রিকেট-প্রতিষেধক।

৫। " " " " খাদ্যপ্রাণ 'ই'—অথবা প্রজনন-শক্তি বৃদ্ধিকারক খাদ্যপ্রাণ।

৬। " " " " খাদ্যপ্রাণ 'এফ্'—অথবা সর্ব্ববিধ প্রতিষেধক খাদ্যপ্রাণ।

খাদ্যপ্রাণের আবিষ্কারের ইতিহাস

খাদ্যপ্রাণ বৈজ্ঞানিক জগতে বহুদিনের সুপরিচিত বস্তু নয়। কিঞ্চিন্ন্যূন পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে ডাক্তার লুনিনই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম এর অস্তিত্বের সন্ধান পান, কিন্তু তাও ঠিক খাদ্যপ্রাণরূপে নয়। তিনি দেখতে পান—যে সকল প্রাণীকে স্বাভাবিক খাদ্য বন্ধ করে নানা অস্বাভাবিক খাদ্য অথবা অতিরিক্ত ভাবে সংশোধিত খাদ্য দেওয়া হয়, তাদের অনেকেই অল্পকালের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন খাদ্যপ্রাণ সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকায় সকলে মনে করিতেন, খাদ্যের মধ্যে রকমারির অভাবে এবং খাদ্যের উপযুক্ত গন্ধ না থাকার দরুণ ঐ সকল জন্তুর ক্ষুধা নষ্ট হয়ে যায় এবং তারই ফলে তারা বেশীদিন বাঁচতে পারে না।

তার পরে প্রায় ত্রিশ বছর খাদ্যপ্রাণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জগৎ একরকম

নীরবই ছিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ওসবোর্ণ (Osborne) এবং মেণ্ডেল দেখতে পান, যে সকল ইঁদুর শুধু ময়দা, চিনি অথবা চর্ব্বি কিংবা লবণ মাত্র খেতে পায়, তারা বেশী দিন বাঁচে না। ঐ একই সময়ে ষ্টেপ (Stepp) প্রমাণ করেন যে সকল খাদ্য হইতে মদ ও ইথার দ্বারা কতকাংশ বের করে নেওয়া হয়, সে খাদ্য খেলে ইঁদুরগুলি মরে যায়—কিন্তু যদি তাদের খাদ্যে আবার বহিষ্কৃত অংশটুকু পূরণ করে দেওয়া যায়, তবে তাদের মৃত্যু ঘটে না। ১৯১১ খৃষ্টাব্দেই ফ্রেজার এবং ষ্টেন্টন্ গবেষণাক্রমে বাহির করেন যে, কলে-ভাঙ্গা অথবা পরিষ্কার চালে বাইরের পাতলা লালচে আবরণটুকু থাকে না; তাই ওগুলি খেলেই খাদ্যপ্রাণের অভাবে 'বেরিবেরি' নামক রোগ দেখা দেয়। শুধু তাই নয়, মুরগীদের পরিষ্কার কলে-ভাঙ্গা চাল খাইয়ে দেখা হয়েছে যে, কিছুকাল পরে তাদের দেহেও 'বেরিবেরি রোগের' ন্যায় নানাপ্রকার স্নায়বিক রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। যদি তাদের আকাঁড়া চাল, কি চালের কুঁড়ো—যা পরিষ্কার কর্ব্বার বেলা বাইরে ফেলে দেওয়া হয়, সেগুলি খেতে দেওয়া হয়, তা হোলে বেরিবেরি রোগও থাকে না, বা গবেষণা-ক্রমে জন্তুদেহে যে স্নায়বিক রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাও দূর হয়ে যায়। এই একই বৎসরে ফাঙ্ক (Funk) চালের গুঁড়ো, দুধ, লেবুর রস, এবং ষাঁড়ের মস্তিষ্ক হতে, একটি 'পাইরিমিডিন' শ্রেণীর রাসায়নিক বস্তুর অনুরূপ দ্রব্য বাহির করিতে সমর্থ হন এবং তাহাই '০২—'০৪ গ্র্যাম পরিমাণে ঔষধরূপে ব্যবহার করে কুক্কুটদেহের স্নায়বিক রোগ আরোগ্য করেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে হপকিন্স দেখান যে, বিশুদ্ধ আহারে বাচ্চা ইঁদুরগুলি অতি অল্পদিনই বেঁচে থাকে; তবে তাদের আহারে দুধ কি তাড়ি মিলিয়ে দিলে আর তারা মরে না। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ওসবোর্ণ ও মেণ্ডেল আবিষ্কার করেন যে, দুধের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর ও উপকারী সামগ্রী দুধ হইতে যে মাখন বের করা যায়—তাতেই চলে যায়। যখন ইথার দ্বারা চর্ব্বিটুকু বের করে নেওয়া হয়, তখন চর্ব্বির সঙ্গেই ঐ বস্তুটি সংযুক্ত হয়ে থাকে; দুধ ও মাখনে এই বস্তুটি থাকার জন্যও, তাহারা শরীর বৃদ্ধির যথেষ্ট সহায়তা করে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্‌কলাম এবং তাঁহার সহকারী ডেভিস্—মাখন, ডিমের কুসুম, এবং অন্যান্য খাদ্যসামগ্রীতে চর্ব্বিতে দ্রবনীয় খাদ্যপ্রাণ 'এ'র সন্ধান পান। তাঁহাদের মতে নানা চর্ব্বিজাতীয় পদার্থেই এই বস্তুবিশেষ সর্ব্বদা সংযুক্ত হয়ে আছে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁরাই খাদ্য হিসাবে চালের উপকারিতা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফলে, জলে দ্রবনীয় আর একটি খাদ্যপ্রাণের অস্তিত্বের কথা অবগত হন। সুতরাং তখন তাঁরাই খাদ্যপ্রাণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, যথা —(১) চর্ব্বিতে দ্রবনীয় 'খাদ্যপ্রাণ 'এ' এবং (২) জলে দ্রবনীয় খাদ্যপ্রাণ 'বি'। তাঁরা আরও প্রমাণ করেন যে, দ্বিতীয় খাদ্যপ্রাণও দুধে থাকে; এবং দুধে যে লেকটোজ নামক শর্করাজাতীয় পদার্থ আছে, তাহা হইতে উপরিউক্ত খাদ্যপ্রাণ অনেক চেষ্টার পর বের কর্ত্তে পারা যায়।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ফাঙ্ক অনুমান করেন, রিকেট কোন খাদ্যপ্রাণ সামগ্রীর অভাবে হয়ে থাকে। কয় বছর পরে মিলানবিই এই অনুমান সত্য বলে প্রমাণ করেন। পরবর্ত্তীকালে জলে দ্রবনীয় 'সি' খাদ্যপ্রাণ দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই খাদ্যপ্রাণ সম্বন্ধে হোলষ্টই প্রথম প্রমাণ করেন—অধিক-সিদ্ধ এবং শুকনো বিশুদ্ধ খাদ্য খেতে দিলে গিনিপিগদের স্কার্ভি-নামক রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। তিনি ইহাও প্রমাণ করেন যে, স্কার্ভি প্রতিষেধক সামগ্রী রান্নার পর অথবা খাদ্য শুকিয়ে নিলে নষ্ট হয়ে যায়। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে জিলভা (Zilva) প্রমাণ করেন, অম্লজান সংস্পর্শে এই খাদ্যপ্রাণ অতি সহজে নষ্ট হয়ে যায়। একই বৎসরে ক্রেমার প্রমাণ করেন, খাদ্যে 'এ' জাতীয় খাদ্যপ্রাণের অভাবে নানাবিধ চক্ষুরোগ, দৃষ্টিশক্তিহীনতা প্রভৃতি দেখা দেয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ডেভিড লিভিংষ্টোন ও ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মোরিও, খাদ্যের মধ্যে কফি, আরারুট প্রভৃতি বেশী থাকার দরুণ যে একপ্রকার চক্ষুরোগ দেখা দিতে পারে, তাহা অনুমান কর্ত্তে পেরেছিলেন। অতি অল্প দিন হলো বৈজ্ঞানিকেরা পূর্ব্বোক্ত খাদ্যপ্রাণ 'এ' হইতে আর একটি চর্ব্বিতে দ্রবনীয় খাদ্যপ্রাণকে টেনে বের করেছেন। ইহারই নাম খাদ্যপ্রাণ 'ডি' অথবা রিকেট-প্রতিষেধক খাদ্যপ্রাণ। সম্প্রতি দেখা গিয়েছে, ইঁদুরদের সকল রকমের আমিষ চর্ব্বি ও শর্করাজাতীয় খাদ্য এবং খাদ্যপ্রাণ এ, বি সি খেতে দিলে দিনকতক বেশ ভাল থাকে; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাদের প্রজনন-শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। এ রকম বন্ধ্যাত্ব আর কো[illegible] অবস্থাতে হয় না। ইভান্স, বিশপ ও শিয়র দেখিয়েছেন, খাদ্যে গম ওট, শাকসব্জি প্রভৃতি মিশিয়ে দিলে জন্তুরা উপরিউক্ত ভাবে বন্ধ্য হয় না, অথবা হলেও সে অবস্থা আর থাকে না। এ জন্যই বৈজ্ঞানিকে[illegible] পঞ্চম ভিটামিনকে প্রজনন-শক্তি বৃদ্ধিকারক অথবা বন্ধ্যাত্ব-প্রতিষেধ[illegible] খাদ্যপ্রাণ 'ই' নাম দিয়েছেন।

খাদ্যপ্রাণ সম্বন্ধে আজকাল অনেক বিজ্ঞানবিদ্ ও শরীর-তত্ত্ববিদই না[illegible] গবেষণা কচ্ছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখকও এ সম্বন্ধে দু চারি[illegible] নূতন তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন। দেহে যে সকল রোগ হয়, প্রা[illegible] বাহির হতেই হোক, অথবা ভিতরে সঞ্জাতই হোক, অথবা বী[illegible] দ্বারা সৃষ্টই হোক, যে কোন না কোন বিষেরই ক্রিয়ার ফল, তাতে সন্দে[illegible] নেই। ঐ সকল রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ কর্ত্তে হলে দেহে যথে[illegible] পরিমাণে জীবনীশক্তি থাকা আবশ্যক; তা না হলে দেহের বিন[illegible] অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং জীবনীশক্তির প্রাচুর্য্যহেতু রোগের সময়ই দেহে[illegible] মধ্যে বিষের প্রতিষেধক বস্তু প্রস্তুত হয়। ঐ বস্তুর গঠনে খাদ্যপ্র[illegible] অত্যাবশ্যক সামগ্রী। যক্ষ্মা প্রভৃতি ক্ষয় রোগে কডলিভার অয়েল অ[illegible] উপকারী, কারণ উহাতে খাদ্যপ্রাণ যথেষ্ট পরিমাণে আছে। [illegible] এ জন্য কোনও পৃথক্ খাদ্যপ্রাণই দায়ী, কি সকল খাদ্যপ্রাণ সমভাবে দা[illegible] তাহাই বিবেচ্য। অনেক অনুসন্ধানের ফলে আমার মনে হয়, স[illegible] খাদ্যপ্রাণ জীবনীশক্তি একভাবে বৃদ্ধি করে না এবং বিষের প্রতিষে[illegible] প্রস্তুত কর্ত্তে একটি পৃথক খাদ্যপ্রাণই সর্ব্বাপেক্ষা কার্যকর। এ[illegible] ইহার স্বরূপ অজ্ঞাত আছে। আশা করা যায় অদূর-ভবিষ্যতে ই[illegible] অস্তিত্বের প্রমাণ কোন বিজ্ঞানবিদ্ নিশ্চয়ই বাহির কর্ত্তে পার্ব্বেন।

উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদেহে খাদ্যপ্রাণের উৎপত্তি

সূর্য্যই যে পৃথিবীর সকল শক্তির মূলাধার—এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানি[illegible]

কলেই একমত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম বিশ বৎসরও এই ধারণাই লোকের মনে বদ্ধমূল ছিল যে, উত্তাপ আলোক প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি-নিচয়ই সূর্য্যের দ্বারা পৃথিবীর বুকে সঞ্জাত হচ্চে; তার সঙ্গে মানব অথবা প্রাণীদেহের কার্য্যক্ষমতার কোন সম্বন্ধই নেই! কিন্তু আজ সে ধারণা আর নেই। মানুষ ও প্রকৃতি, প্রাণীজগৎ ও জড়জগৎ একে অন্যের সঙ্গে দাতা ও গ্রহীতারূপে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ হয়ে আছে—কেউ কাউকে ছেড়ে বেঁচে থাকতে পারে না এবং সূর্য্যই প্রাণীদেহে ও প্রকৃতির বুকে সকল রকমের শক্তি ও কার্য্যক্ষমতার সৃষ্টি কচ্চে। তাই প্রমাণীকৃত হয়েছে খাদ্যপ্রাণের আবিষ্কার—খাদ্যপ্রাণের সঙ্গে মানুষের কার্য্যক্ষমতার নিকট সম্বন্ধ ও খাদ্যপ্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা নূতন নূতন গবেষণার ফলে।

১৯২১ হতে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ডাঃ. ক্যাথারিণ, এচ, কাওয়ার্ড সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কার করেন, সবুজ শাকসব্জী-লতাপাতার মধ্যে সূর্য্যের আলোকের সাহায্যেই খাদ্যপ্রাণ সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে জন্মে। বায়ুতে অম্লজান কি যবক্ষারজান না থাকলেও শুধু সূর্য্যের আলোকের প্রভাবেই খাদ্যপ্রাণ জন্মাতে পারে। আজ পর্য্যন্ত এমন কোন শাকসব্জি পাওয়া যায় নাই, যাতে সবুজ বর্ণের ক্লোরোফিলনামক রং নেই, অথচ ভিটামিন আছে। এ হতেই প্রমাণ হয় উদ্ভিদ-জগৎ ক্লোরোফিলের সাহায্যেই সূর্য্যের আলোকরশ্মি সমূহ ভিতরে টেনে নেয়, আর তা হতেই খাদ্যপ্রাণের সৃষ্টি হয়। এ-ভাবেই তরি-তরকারী, লেবু, বিলাতি বেগুন, ধান, গম, প্রভৃতির মধ্যে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ সঞ্চিত হয়ে থাকে। এমন কি সমুদ্র গর্ভে অনেক সবুজবর্ণ আগাছা জন্মায়; সমুদ্রের নীল জল ভেদ করে যে সকল আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মি সমুদ্রগর্ভ পর্য্যন্ত পৌঁছয়—তাদেরই সংস্পর্শে, তৎপ্রদেশস্থ আগাছাগুলির মধ্যেই খাদ্যপ্রাণ সঞ্চিত হতে থাকে। সমুদ্রের ছোট ছোট মাছগুলি তা খেয়ে নিজ নিজ দেহে খাদ্যপ্রাণ সঞ্চয় করে রাখে। কড্ নামক বড় বড় সামুদ্রিক মাছগুলি আবার ছোট মাছগুলিকে খেয়ে নিজের যকৃতে খাদ্যপ্রাণ সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে সৃষ্টি করে নেয়! ঐ যকৃৎগুলি যখন নিংড়ে নেওয়া যায় তখনই খাদ্যপ্রাণ এ এবং ডি-পরিপূর্ণ কডলিভার অয়েল বের হয়! সুতরাং দেখা যাচ্চে, এতে যে খাদ্যপ্রাণ আছে তা' সূর্য্যের আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মিরই নামান্তর। এজন্যই আজকাল চিকিৎসকেরা কডলিভার অয়েলের ছান্দোদীপক নামকরণ করেছেন 'Bottled Sunshine' অথবা বোতলের ভিতর ছিপি-আঁটা সূর্য্যালোক।

এ ত গেল কডলিভার অয়েলের কথা! সূর্য্যালোকের সাহায্যে সহজাত নানা খাদ্যপ্রাণ আগাছাগুলি হাঁস, প্রভৃতি জলচর পক্ষীদের প্রধান খাদ্য। তারা এই সকল উদ্ভিদ হতেই যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ পেয়ে বেড়ে উঠে, এবং পরিশেষে যখন ডিম প্রসব করে, তখন ঐ ডিমের অভ্যন্তরে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ সঞ্চিত হয়ে থাকে। ডিমের মধ্যে খাদ্যপ্রাণের প্রাচুর্য্যের ইহাই কারণ।

গরু ছাগল প্রভৃতি স্থলচর তৃণভোজী পশুরা সবুজ তরীতরকারী ধান, গম হতে শরীর পুষ্টির জন্য খাদ্যপ্রাণ পায় এবং এ ভাবেই তাদের দুধে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন থাকে। যে সকল জন্তু শুকনো ঘাস কিংবা খড় খায়, তাহাদের দুধে প্রচুর পরিমাণে থাকে না।

মানুষও যখন সূর্য্যালোক হতে মুখ্য অথবা গৌণভাবে সঞ্জাত খাদ্যপ্রাণ-পূর্ণ উদ্ভিদ অথবা ডিম কি মাংস অথবা দুধ খায়, তখনই স্তন-দুধে অধিক পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ থাকে। তাহাতেই মানব-শিশু নিয়মিত-রূপে বেড়ে উঠে এবং রিকেট, স্কার্ভি প্রভৃতি রোগের হাত হতে রক্ষা পায়।

খাদ্যে খাদ্যপ্রাণের আবশ্যকতা

বিভিন্ন খাদ্যপ্রাণ বিভিন্ন উপায়ে মানব দেহে কায করে। ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যপ্রাণের সঙ্গে তার উল্লেখ কর্ব্বো। মোট কথা—দেহের উপযুক্ত বৃদ্ধির জন্য এবং রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ কর্ত্তে হলে এবং রিকেট, বেরি-বেরি, স্কার্ভি, বন্ধ্যাত্ব, প্রভৃতির হাত হতে রক্ষা পেতে হলে খাদ্যপ্রাণ ছাড়া কখনই তা' সম্ভবপর নয়। সর্ব্বোপরি অন্তঃসার-পূর্ণ গ্রন্থিমগুলের যথোপযুক্ত কার্য্যের জন্য খাদ্যপ্রাণ একান্ত আবশ্যক। দেহে গলগ্রন্থি, উপগলগ্রন্থি, কটিগ্রন্থি, প্রভৃতি কতকগুলি প্রণালীবিহীন গ্রন্থি আছে। ইহাদের অভ্যন্তরে একপ্রকার অন্তঃসারপূর্ণরস সৃষ্টি হয়ে মানুষকে কার্য্যক্ষম ও বলশালী করে, ও দেহ বৃদ্ধি ও নানা রোগের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ব্বার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে থাকে। সুতরাং দেহের পক্ষে এইপ্রকার গ্রন্থিমগুলের অতীব প্রয়োজন। খাদ্যে যদি যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ থাকে, তবে তাহাই রক্তের সঙ্গে ঐ সকল গ্রন্থিমণ্ডলের মধ্যে সঞ্চালিত হয়ে, ঐ সকল গ্রন্থিকে সজীব করে রাখে এবং তাহাদের কার্য্যক্ষমতাকে উত্তেজিত এবং উদ্বুদ্ধ করে তুলে। সুতরাং এ বল্লে অন্যায় হয় না যে—দেহের পক্ষে যেমন অন্তঃসার-পূর্ণ গ্রন্থিমণ্ডলের প্রয়োজন—আবার ঐ গ্রন্থিমণ্ডলের পক্ষে খাদ্যপ্রাণেরই তেমি প্রয়োজন। আবার খাদ্যপ্রাণের পক্ষে সূর্য্যালোকও তেমি আবশ্যক। সুতরাং দেখা যাচ্চে—সূর্য্যালোকের সঙ্গে খাদ্যপ্রাণ, খাদ্যপ্রাণের সঙ্গে অন্তঃসারপূর্ণ গ্রন্থিমণ্ডল ঘনিষ্ঠভাবে অঙ্গাঙ্গী-রূপে সংশ্লিষ্ট। এক ছাড়া অন্যের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই বল্লেও অন্যায় হয় না।

সূর্য্যালোকের সঙ্গে মানব-দেহের নিকট সম্বন্ধ

খাদ্যপ্রাণের উৎপত্তি সম্পর্কেই যে শুধু মানুষ সূর্য্যের আলোকের কাছে ঋণী এমন নয়, গৌণভাব ছাড়া মুখ্য ভাবেও মানুষ সূর্য্যালোক হতে অনেক ভাবে উপকৃত হয়। রিকেট প্রভৃতি রোগ সহরে যে ভাবে হয়, গ্রামে কখনই সে ভাবে দৃষ্ট হয় না। তার প্রধান কারণ, গ্রামে সর্ব্বদাই যথেষ্ট পরিমাণে দুধ, ঘি, তরীতরকারী পাওয়া যায়; সুতরাং গ্রামের শিশুদের খাদ্যে খাদ্যপ্রাণের অভাব হয় না। সুতরাং রিকেট প্রভৃতি খুবই কম হয়। এর মূলে আরো একটি বিশেষ কারণ আছে; গ্রামের শিশুরা সর্ব্বদাই যথেষ্ট রোদ পায়—এবং তাহাতেই তাহাদের চামড়ার মধ্যে কলেষ্টেরল নামক একপ্রকার পদার্থ রিকেট রোগের প্রতিষেধকরূপে কার্য্যকরী হয়ে উঠে। শুধু তাই নয়,—যদি সূর্য্যের আলোকে রোজ কিছুক্ষণ শিশুদের বসিয়ে রাখা যায়, তা হ'লে তাদের খাদ্যের অতি অল্প খাদ্যপ্রাণই রিকেট রোগের আক্রমণ বন্ধ রাখতে পারে। এজন্যই বলা হয়—সূর্য্যালোক খাদ্যে অতি অল্পমাত্র খাদ্যপ্রাণের সাহায্যেই দেহ বৃদ্ধির

ক্ষমতা অনেকাংশে বাড়িয়ে তোলে! এজন্যেই আজকাল রিকেট রোগের চিকিৎসায় যেমন 'ডি' জাতীয় খাদ্যপ্রাণ—স্তন-দুধ, গো-দুধ, অথবা বোতলের সূর্য্যালোক খেতে দেওয়া হয়, আবার তেমি সূর্য্যালোক সাহায্যে চিকিৎসায় ব্যবস্থা করাও হয়; অথবা সূর্য্যালোকের অভাবে, পারদ-কোয়ার্জ বাষ্পপূর্ণ বাতির সাহায্যে—যে আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মির অনুরূপ রশ্মি পাওয়া যায়, তাহা দ্বারাও সময় সময় কাজ চালিয়ে নেওয়া হয়। সময় সময় সূর্য্যালোকের সাহায্যে—কলেষ্টেরলকে অধিকতর কার্য্যকরী করে নিলে—তাহা খেতে দিলে রিকেট রোগে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়।

যক্ষ্মারোগের সূর্য্যালোক দ্বারা চিকিৎসা আজকাল পৃথিবীর সর্ব্বত্রই চলছে।—তার কারণ প্রথমতঃ সূর্য্যালোকের দেহ মধ্যস্থ বীজাণু নাশের, বিষকে নির্ব্বিষ কর্ব্বার ক্ষমতা অপরিসীম বল্লেও অত্যুক্তি হয় না।—থুথুর মধ্যে নানা প্রকার অসংখ্য বীজাণু থাকে; দশ মিনিট কাল সূর্য্যালোকে রাখলে প্রায় সবগুলি বীজাণুই হয় একেবারে মরে যায়, নয় একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ে। আমার মনে হয়, যক্ষ্মা-রোগে যে কডলিভার অয়েল প্রভৃতি খেতে দেওয়া হয়, তাতে বিষের প্রতিষেধক যে খাদ্যপ্রাণ আছে, সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যালোকের ব্যবস্থা কর্লে—সূর্য্যের সুতীক্ষ্ণ করজাল ঐ খাদ্যপ্রাণের কার্য্যকারিতা অনেকাংশে বাড়িয়ে তুলে—তাতেই দেহে রোগের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ব্বার মত নূতন জীবনীশক্তির সঞ্চার হয়; এবং যক্ষ্মার মত রোগও আরোগ্য হয়।

প্রথম খাদ্যপ্রাণ অথবা খাদ্যপ্রাণ'এ'

সবুজ পাতার মধ্যেই অধিকাংশ পরিমাণে থাকে; বীজ এবং ফলে ততটুকু থাকে না। বীজের মধ্যে প্রায়ই চর্ব্বিজাতীয় একপ্রকার পদার্থের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকে। যখন তাদের মধ্য হতে চর্ব্বি বের করে নেওয়া হয়, তাতে প্রায়ই খাদ্যপ্রাণ থাকে না; কিন্তু বীজের অঙ্কুরকে প্রথম মদে ভিজিয়ে নিলে পর, ইথারের দ্বারা খাদ্যপ্রাণকে বের করে নেওয়া চলে। প্রাণীদেহে প্রায়শঃ অধিক পরিমাণে এই খাদ্যপ্রাণ সঞ্চিত হয়ে থাকে।

প্রকৃতি

(১) যে সকল তরল পদার্থে চর্ব্বি দ্রব হয়—এ খাদ্যপ্রাণও তাহাদের দ্বারা দ্রব করা যেতে পারে।

(২) অম্লজানের সঙ্গে রাসায়নিক সংশ্রব ঘটলে, শীগ্‌গির নষ্ট হয়ে যায়।

(৩) উত্তাপের দ্বারা সহজে নষ্ট হয় না, তবে চার ঘণ্টা পর্য্যন্ত ১০০ ডিগ্রিতে জ্বাল দিলে নষ্ট হয়ে যায়।

(৪) চর্ব্বিকে খাদ্যের উপযুক্ত কর্ত্তে হলে যে সকল উপায় অবলম্বন করা হয়, তাতে খাদ্যপ্রাণ আর থাকে না।

(৫) এলকেলি দ্বারা নষ্ট হয় না।

কোন্ কোন্ খাদ্যে আছে?

(১) চর্ব্বিজাতীয়; যথা—দুধ, মাখন, সর, ডিমের কুসুম, কড্‌লিভার অয়েল, ছানা এবং নানাপ্রকার প্রাণীদেহের চর্ব্বি ও তেল।

(২) শাকসব্জী—ফুলকপি, বাঁধাকপি, আলু প্রভৃতি।

(৩) ডাল প্রভৃতি—নানা ডাল, মটর, কড়াই, সিম প্রভৃতি,—সদ্যঃ অঙ্কুরিত ডালে অধিক পরিমাণে থাকে।

(৪) মাছ ও মাংস—যকৃৎ, মূত্রাশয়—হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি। ও ইলিস্, রুই, কাতলা প্রভৃতি বড় বড় মাছ।

(৫) স্তন দুগ্ধ, গরুর দুগ্ধ প্রভৃতিতে অধিক পরিমাণে থাকে।

কোন্ কোন্ খাদ্যে নাই?

(১) উদ্ভিদ হতে প্রস্তুত তেলে—যথা—সর্ষপ তেল, তিষির তেল প্রভৃতি।

(২) তাড়িতেও নেই।

(৩) প্রাণীদেহের চর্ব্বিতেও নেই।

(৪) বাজারে শিশুদের খাদ্যরূপে যে সকল পেটেন্ট ফুড পাওয়া যায়, তাতেও খাদ্যপ্রাণ একেবারেই থাকে না।

খাদ্যে ইহার অভাব

খাদ্যে এর অভাব হলে পরিণত-বয়স্ক লোকদের বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় না, তবে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে এ নিশ্চয়। তবে ছোট ছোট শিশুদের দেহ যথেষ্ট পরিপুষ্টি লাভ কর্ত্তে পারে না। প্রায়ই দেখা যায়, যে সকল ছেলেমেয়ে মায়ের দুধের পরিবর্ত্তে নানাবিধ বাজারের পেটেন্ট ফুড্ খেতে পায়, তারাই সবুজ উদরাময়, যকৃৎ প্রভৃতিতে ভুগে ও অনেকেই অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হয়। আমাদের দেশে অকালে শিশু-মৃত্যুর এই একটা মস্ত বড় কারণ। শুধু তাই নয়, খাদ্যে এই বস্তুর অভাবের জন্যই নানাবিধ দন্তরোগ ও টনসিল বড় হওয়া প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়। প্রথম শ্রেণীর খাদ্যপ্রাণের অভাবের জন্যই অকালে দৃষ্টিহীনতা প্রভৃতি নানাবিধ চক্ষুরোগ দেখা দেয়। সহরের অধিবাসীদের মধ্যে পাঁচ বছর বয়স হতে চশমা নেওয়ার প্রাচুর্য্যও এই কারণেই ঘটে থাকে। ইন্দোরের নিকটবর্ত্তী কোন কনভেন্টে অকস্মাৎ প্রায় শতাধিক বালকবালিকা নানাবিধ চক্ষু পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়ল; কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গেল, তাদের খাদ্যে খাদ্যপ্রাণের অভাবই এর একমাত্র কারণ। পরে যখন তাদের খাদ্যে বিশুদ্ধ দুধ দই, নানাবিধ শাকসব্জী ফলমূলের ব্যবস্থা করা হলো, তখন আর তাদের একজনেরও চক্ষুরোগ হলো না, একরকম বিনা ওষুধেই সেরে গেল।

শরীরের উপর কার্য্য

(১) দেহে চর্ব্বিজাতীয় পদার্থ হতে দেহ সংগঠনের উপযুক্ত দ্রব প্রস্তুতের জন্য এই খাদ্যপ্রাণ আবশ্যক।

(২) দেহমধ্যস্থ প্রত্যেক কোষের পরিপুষ্টি বিধানে এ খাদ্যপ্রাণ অত্যাবশ্যক।

(৩) শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখতে হলে এ খাদ্যপ্রাণ না হলে চলে না।

দ্বিতীয় খাদ্যপ্রাণ অথবা খাদ্যপ্রাণ 'বি'

প্রায়ই উদ্ভিদের বীজে অধিক পরিমাণে থাকে। পাখী ও মাছের ডিমের মধ্যেও আছে। প্রাণীদেহে এ খাদ্যপ্রাণ কখনই সঞ্চিত থাকে না।

প্রকৃতি

(১) জলে ও মদে একে দ্রব করা চলে, কিন্তু ইথারে হয় না।

(২) উত্তাপেও অল্পক্ষণ ঠিক থাকে। এক ঘণ্টা হতে দু ঘণ্টা পর্য্যন্ত ১০০°তে ঠিক থাকে কিন্তু ১২০°তে আধ ঘণ্টাতেই নষ্ট হয়ে যায়।

(৩) শুকিয়ে নিলেও অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকে, কিন্তু অম্লজানের সঙ্গে রাসায়নিক সংশ্রবে নষ্ট হয়ে যায়।

কোন্ কোন্ খাদ্যে পাওয়া যায় ?

(১) শস্যাদি—চাল ডাল প্রভৃতি, সদ্য: অঙ্কুরিত হলে বেশী থাকে।

(২) ডিম্বাদি—

(৩) শাকসব্জী প্রভৃতি—আলুতে আছে, কিন্তু বেশী নয়।

(৪) মাংসে—অল্প পরিমাণে আছে।

(৫) দুধে—পরিমাণ অল্প।

(৬) তাড়ি।

কোন্ কোন্ খাদ্যে নেই ?

(১) মাছে একেবারেই নেই। (২) চর্ব্বিতেও নেই (৩) কলে ছাঁটা বেশী পরিষ্কার চাল অথবা কলে ভাঙ্গা সাদা ময়দাতে থাকে না। (৪) যে সকল খাবার টিনে পুরে রাখা হয়, অথবা অধিক উত্তাপে একেবারে বিশুদ্ধ করে নেওয়া হয়, ত'তে একটুও থাকে না। (৫) ভাতে থাকে না, কারণ খাদ্যপ্রাণসমূহই ফেনের সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

খাদ্যে অভাব

এই খাদ্যপ্রাণের অভাবে ক্রম-বর্দ্ধমান শিশুদের আর বৃদ্ধি হয় না এবং ওজন দিন দিন কমতে থাকে। নানাবিধ উদরাময় দেখা দেয়। ছোট বড় সকল প্রকার জন্তুরই দেহে স্নায়বিক রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। খাদ্যে এইপ্রকার খাদ্যপ্রাণের অভাবই বেরিবেরি, এপিডেমিক, ড্রপ্সি প্রভৃতি রোগের কারণ। এর অভাবে ক্ষুধাহীনতা, অগ্নিমান্দ্য, বীর্য্যহীনতা শিরঃপীড়া, রক্তশূন্যতা, শরীরের তাপ হ্রাস ও নানাবিধ স্নায়বিক লক্ষণ প্রকাশ পায়।

শরীরের উপর কায

এই শ্রেণীর খাদ্যপ্রাণ মানুষের শরীরের স্নায়ুর উপর এবং অন্ত্রপ্রণালীর উপর কায করে এবং তাদের কাযের ক্ষমতাকে ঠিক রাখে।

তৃতীয় খাদ্যপ্রাণ অথবা খাদ্যপ্রাণ 'সি'

সপ্তদশ শতাব্দী হতেই স্কার্ভি নামক রোগ চিকিৎসা-জগতে পরিজ্ঞাত ছিল। অনেক কাল শুধু বাসি ও শুকনো খাবার খেলে যে এ রোগ হয় এবং কাঁচা শাকসব্জী এবং ফলের রস খেলে যে রোগ সেরে যায় হয়, তাই জানা ছিল না। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে হোলষ্ট এবং পরবর্ত্তী কালে লিষ্টার ইনষ্টিটিউট একই প্রকার গবেষণার ফলে স্থির করেন স্কার্ভির মূলে একটি বিশেষ খাদ্যপ্রাণের অভাব।

এ খাদ্যপ্রাণ অঙ্কুরিত ও মুকুলিত লতাগুল্মেই প্রচুর পরিমাণে থাকে। তা' ছাড়া ফলমূলের রসেও এর পরিমাণ বড় কম নয়।

প্রকৃতি

(১) শুকিয়ে নিলে অতি সহজেই ইহা নষ্ট হয়ে যায়।

(২) অতি অল্প উত্তাপেই এর অস্তিত্ব থাকে না। ৬০°তে প্রায় ৮০% নষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য ইহার চেয়ে বেশী উত্তাপে বিনাশের হার অতি অল্পই বেড়ে থাকে।

(৩) এলকেলি দ্বারা অতি শীঘ্রই নষ্ট হয়।

(৪) এসিড্ দ্বারা অনেক দিন ঠিক রাখা যায়।

(৫) জলে এবং মদে দ্রব হয়।

কোন্ কোন্ খাদ্যে পাওয়া যায় ?

(১) তাজা শাকসব্জী প্রভৃতি—যথা বাঁধাকপি, পেঁয়াজ, ফুলকপি, শালগম, ওলকপি, আলু ইত্যাদি।

(২) ফলমূল—যথা কমলানেবু, পাতিনেবু, বিলাতি বেগুন প্রভৃতি।

(৩) মাংসের সুরুয়া, দুধ ইত্যাদি—কিন্তু অধিক পরিমাণে নয়।

কোন্ কোন্ খাদ্যে নেই ?

শুকনো শাকসব্জী, শস্যাদি অথবা ডাল প্রভৃতিতে থাকে না। অধিক সিদ্ধ (১৫ মিনিটের বেশী) তরীতরকারী কিংবা ডালেও থাকে না। দুবার জ্বাল দেওয়া দুধেও যা' থাকে সব নষ্ট হয়ে যায়।

যদিও শুকনো শস্যাদি ও ডাল প্রভৃতিতে থাকে না, তবু যখন জলে ভিজিয়ে রাখলে অঙ্কুর গজিয়ে উঠে, তখন সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যপ্রাণও যথেষ্ট পরিমাণে দেখা দেয়।

শরীরের উপর কায

খাদ্যে এ ভিটামিনের অভাবে স্কার্ভি নামক রোগ হয়। খুব সম্ভব ধমনী ও শিরা উপশিরার অস্তরাবরণকে দৃঢ় করে—এবং তাতেই স্কার্ভি নামক রোগে দেহের নানা অংশে রক্তস্রাব হতে পারে না।

চতুর্থ খাদ্যপ্রাণ অথবা খাদ্যপ্রাণ 'ডি'

পূর্ব্বে খাদ্যপ্রাণ 'ডি' বলিয়া কিছু জানা ছিল না। বৈজ্ঞানিকদের মনে ধারণা ছিল খাদ্যপ্রাণ 'এ'র অভাবেই রিকেট রোগ হয়। প্রায়ই এ দুই খাদ্যপ্রাণ একত্র থাকে। অতি অল্পদিন হ'ল মাত্র, রিকেটের প্রতিষেধক খাদ্যপ্রাণ যে শরীর বৃদ্ধিকারক খাদ্যপ্রাণ হ'তে বিভিন্ন, তা প্রমাণীকৃত হয়েছে।

কড্‌লিভার অয়েল, নানা প্রাণীর চর্ব্বি দুধ প্রভৃতিতে এ খাদ্যপ্রাণ যথেষ্ট পরিমাণে থাকে।

পারের আশে

শিল্পী—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ বাগচী

প্রকৃতি

(১) চর্ব্বিজাতীয় পদার্থে দ্রব করা যায়।

(২) বায়ুর সংস্পর্শে এবং উত্তাপের সাহায্যে যখন খাদ্যপ্রাণ 'এ'র বিনাশ ঘটে, খাদ্যপ্রাণ 'ডি' যেমন ছিল তেমি থাকে।

(৩) সূর্য্যালোকের সাহায্যে এ খাদ্যপ্রাণের কার্য্যকারিতা অনেকাংশে বেড়ে যায়।

(৪) খাদ্যপ্রাণ 'এ'র মত এক ফোঁটা কডলিভার অয়েলে—১ c. c. arsenic trichloride মিশিয়ে নিলে যে সমুদ্রের জলের মত নীল রং দেখা দিয়ে—তা ক্রমে বেগুনি হয়ে—ক্রমে ক্রমে সকল রংএর চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়, খাদ্যপ্রাণ 'ডি'তে সে ভাবে হয় না। কারণ অম্লজানের সংস্পর্শে খাদ্যপ্রাণ 'এ' নষ্ট হয়ে যায় বলেই ওভাবে রং আর থাকে না—কিন্তু খাদ্যপ্রাণ 'ডি' নষ্ট হয় না বলে রং যেমন দেখা দেয় তেমি থাকে। অতি অল্পদিন হ'ল ড্রামণ্ড ও রোজেনহিম খাদ্যপ্রাণ 'এ'কে খাদ্যপ্রাণ ডি' হতে পৃথক কর্ব্বার এই উপায় উদ্ভাবন করার ফলেই, বৈজ্ঞানিক জগৎ এই স্বতন্ত্র রিকেট-প্রতিষেধক খাদ্যপ্রাণের অস্তিত্বের সন্ধান পেয়েছে।

কোন্ কোন্ খাদ্যে আছে ?

(১) কড্‌লিভার অয়েল।

(২) স্তনের দুধ—গরুর দুধ।

(৩) প্রাণীদেহের চর্ব্বি। (৪) মাখন, সর, ছানা প্রভৃতি।

কিসে নেই ?

দুবার জ্বাল দেওয়া দুধে থাকে না! যে সকল গরু বা ছাগল সারাবৎসর শুকনো ঘাস খেতে পায়—অথবা সারাবছর অন্ধকারে আবদ্ধ থাকে, তাদের দুধেও থাকে না।

খাদ্যে অভাব

খাদ্যে এর অভাব হলে রিকেট নামক রোগ দেখা দেয়, দাঁত উঠে না—হাড়গুলি বেঁকে যায়।—

শরীরের উপর কায

দেহের অস্থির উপরেই এ খাদ্যপ্রাণ কাজ করে বেশী! অস্থিকে পরিপুষ্ট ও তাহাকে দৃঢ় কর্ত্তে হলে এ খাদ্যপ্রাণের একান্ত আবশ্যক! অবশ্য দাঁতের উপরও এর কাজ হয়, তাইতে দাঁত অল্পবয়সেই যথেষ্ট শক্ত হয় এবং সহজে পড়ে না।

পঞ্চম খাদ্যপ্রাণ অথবা খাদ্যপ্রাণ 'ই'

প্রায় প্রত্যেক প্রাণীদেহেই এ খাদ্যপ্রাণ অত্যধিক মাত্রায় আছে—কিন্তু কোথাও খুব বেশী নেই।

প্রকৃতি

(১) চর্ব্বিজাতীয় পদার্থে দ্রব হয়।

(২) উত্তাপ, আলোক এবং বায়ুর সংস্পর্শে সহজে নষ্ট হয় না।

(৩) রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংশ্রবেও ঠিক থাকে।

কোন কোন খাদ্যে আছে ?

(১) শাকসব্জী মটর এবং চা পাতায় যথেষ্ট পরিমাণে থাকে।

(২) গম ও ওটে প্রচুর পরিমাণে আছে। এ হিসাবে মালবের গম প্রসিদ্ধ। এ জন্যই বোধ হয় প্রবাসে বাঙ্গালীদের ঘরে মা ষষ্ঠীর কৃপা একটু বেশী! গম থেকে যে তেল হয়—তাতে প্রায়ই এ খাদ্যপ্রাণপূর্ণ সারাংশ থাকে।

(৩) সদ্যঃপ্রসূত প্রাণীদেহে খুব অধিক পরিমাণে থাকে—তাই গর্ভাবস্থায়ই মার শরীর হতে ভ্রূণ পেয়ে থাকে। অনেক সময় এদের মাংস খেলে বন্ধ্যাত্ব দূর হয়।

কিসে নেই ?

আশ্চর্য্যের বিষয় কড্‌লিভার অয়েলে অন্যান্য সকল খাদ্যপ্রাণই অল্পাধিক পরিমাণে আছে, শুধু এই খাদ্যপ্রাণেরই একান্ত অভাব।

খাদ্যে অভাব

খাদ্যে অভাব হলে বাহ্যতঃ শরীরের স্বাস্থ্যহানির কোন লক্ষণ দেখা যায় না। তবে কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধ্যাদোষ জন্মে। গর্ভ যে না হয় এমন নয়—তবে গর্ভধারণের বার হতে বিশ দিনের মধ্যে ভ্রূণ জরায়ুর অভ্যন্তরেই মরে অসাড় হয়ে যায়।

শুধু তাই নয়—অসময়ে গর্ভ নষ্ট হওয়ার জন্য অনেক স্থলে খাদ্যে এই খাদ্যপ্রাণের অভাবই পরিলক্ষিত হয়। ইভান্স, বিশপ ও শিয়র দেখিয়েছেন, অনেক স্থলে মাংস, শাকসব্জী ও গম খেতে দিলে বন্ধ্যাদোষ দূর করা যায়। অতি অল্পমাত্রায় গম হতে প্রস্তুত তেল খেতে দিলেও বন্ধ্যাত্ব দূর হয়।

শরীরের উপর কায

এই খাদ্যপ্রাণ জরায়ু, স্ত্রীডিম্বকোষ প্রভৃতিকে সুস্থ রাখে ও গর্ভোৎপাদন হতে সন্তানের জন্মকাল পর্য্যন্ত জরায়ু মধ্যস্থিত ভ্রূণের দেহের পরিপুষ্টির সহায়তা করে।

ষষ্ঠ খাদ্যপ্রাণ অথবা খাদ্যপ্রাণ 'এক্স'

প্রথমেই বলেছি এ খাদ্যপ্রাণ এখনও নিশ্চিতরূপে বের হয়নি। কতকগুলি রোগের উপর খাদ্যের প্রভাব দেখে আমার মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, নিশ্চয়ই কোন কোন খাদ্যবিশেষে এমন কোন সার পদার্থ আছে যা আমাদের জীবনীশক্তিকে রোগের সঙ্গে সংগ্রামকালে বাড়িয়ে তোলে। কি ভাবে—তা এখনো ঠিক বলতে পারিনে ; তবে মনে হয় গলগ্রন্থি, কটিগ্রন্থি, উপগলগ্রন্থি প্রভৃতির অন্তরঙ্গকে উত্তেজিত করে তাদের দ্বারাই দেহকে সর্ব্ববিধ বিষয়ের সঙ্গে সংগ্রাম কর্ব্বার মত ক্ষমতা দেয়। আমার মনে হয় যক্ষ্মারোগে কডলিভার অয়েল, দুধ, ঘি, মাখন প্রভৃতি শরীরে এ খাদ্যপ্রাণ জুগিয়েই দেহের শক্তি ও সামর্থ্য বাড়িয়ে তোলে। অবশ্য সূর্য্যের উত্তাপে খাদ্যপ্রাণের কার্য্যকরী শক্তি আরো বেড়ে যায়। শুধু তাই নয়,—অনেক রোগী ও খরগোষ গিনিপিগ প্রভৃতি পশুকে দুধের বদলে দই খাইয়ে দেখেছি—এ হিসাবে দইএর ক্ষমতা দুধের চেয়ে অনেক বেশী। দুধের সঙ্গে Lactic acid নামক একপ্রকার

বীজাণু মিশিয়ে নিলে তবে দুধ দই হয়। ঐ বীজাণুর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই এই নূতন খাদ্যপ্রাণ সঞ্জাত হয়—তাতেই রোগে খাদ্যহিসাবে তার গুণ অনেক বেড়ে যায়। আমার অভিজ্ঞতায় এক কাশি ও সর্দ্দি ভিন্ন অন্য সকল প্রকার রোগে সদ্যঃপ্রস্তুত দই খেতে দিলে খুবই ভাল ফল পাওয়া যায়। এখনো এর প্রকৃত স্বরূপ অন্ধকারের গর্ভেই আছে; তাই উল্লেখমাত্র করেই শেষ করে নিচ্চি।

পরিশিষ্ট

যথার্থ বলতে গেলে গত পোনের বছরের মধ্যেই আমাদের খাদ্যসম্বন্ধে শরীর-বিজ্ঞানের পূর্ব্ব মত একেবারে বদলে গেছে। একটির পর একটি খাদ্যপ্রাণের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সঙ্গে দেহের নিকট সম্বন্ধের কত নূতন নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাচ্চে। কণামাত্র খাদ্যপ্রাণ অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে মিশে দেহের কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সাধন কর্ত্তে পারে—আবার তারই প্রভাবে দেহের কতদূর অনিষ্ট সাধিত হয় আজ বৈজ্ঞানিক জগৎ তার সন্ধান পেয়েছে। আমিষ, শর্করা, চর্ব্বিজাতীয় যত খাদ্যই খাওয়া হোক না কেন দেহ ধারণের পক্ষে তা পর্য্যাপ্ত নয়—যতক্ষণ না তাতে খাদ্যপ্রাণের সংযোগ ঘটছে। এদের সংমিশ্রণেই মানবের আদর্শ খাদ্য গঠনের অক্লান্ত চেষ্টা চল্‌ছে। হয় ত এমন এক দিন আসবে যে দিন—সারাদিনে শুধু আদর্শ খাদ্যের সার একটা সূচীমুখে দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলেই আর সারাদিন কিছু খাবার আবশ্যক পর্য্যন্ত থাকবে না। জানি না কবে সেদিন হবে—আর যদি হয় তবে শরীর-বিজ্ঞানের জগতে কি যুগান্তরেরই প্রতিষ্ঠা হবে। আজ পর্য্যন্ত খাদ্যপ্রাণ এ, বি, সি, ডি, ই র সন্ধান পেয়েই আমরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে আছি, যেদিন বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ফলে—X, Y, Z পর্য্যন্ত খাদ্যপ্রাণ আবিষ্কৃত হবে, সেদিনই বোধ হয় কবি Shakespear এর অমর কাব্য—

There are more things in Heaven and Earth, Horatio, than thy philosophy ever dreampt of.

এর যাথার্থ্য মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধ হবে। সেদিন যে খুব দূর তা নয়, ঐ এল বলে।

জগতের পরিণাম

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি-এল্

আমাদের শাস্ত্রে বলে এই জগৎ অনিত্য। ইহা চির-পরিবর্ত্তনশীল। আদিতে জগৎ এইরূপ ছিল না। বর্ত্তমানে ইহা যে-অবস্থায় আছে, ভবিষ্যতেও এই অবস্থায় থাকিবে না। জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। যাহা সৃষ্ট তাহার ধ্বংস আছে। জগতের ধ্বংসও অনিবার্য্য। আর্য্য ঋষিরা একবাক্যে বলিয়াছেন—সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। জগতের উৎপত্তি হইতেছে, ইহার ক্রমবিকাশ হইতেছে এবং পরিশেষে ইহার ধ্বংস হইতেছে। ধ্বংসের পর আবার নূতন সৃষ্টি হইতেছে। এই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের ভিতর দিয়া প্রকৃতির নিয়মে জগতের ক্রম-বিকাশ হইতেছে। বিশ্বরাজের ইচ্ছায় কোটি কোটি জগতের উৎপত্তি হইতেছে। এবং তাঁহারই ইচ্ছায় সেই সকল জগৎ কাল-স্রোতে বিলীন হইতেছে। আবার তিনি নূতন সৃষ্টির সূচনা করিতেছেন। অনন্তকাল হইতে এই ভাঙ্গা গড়া চলিতেছে, ইহাই সংক্ষেপে আর্য্য ঋষিদের সৃষ্টিতত্ত্ব।

আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদগণ অভিনব বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি সাহায্যে জগতের উৎপত্তি ও লয় সম্বন্ধে যে সকল তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত ঋষি-প্রচারিত সৃষ্টিতত্ত্বের কোনই পার্থক্য নাই।

আকাশে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, ধূমকেতু, উল্কা-নক্ষত্র ও নীহারিকা (Nebula) এই কয় প্রকার জ্যোতিষ্ক বর্ত্তমান আছে। ইহাদের সকলের নিজের আলোক নাই। সৌর-জগতের জ্যোতিষ্ক সকলের মধ্যে কেবল সূর্য্যই অসামান্য দীপ্তিশালী। সূর্য্যের আলোকেই চন্দ্র, পৃথিব্যাদি গ্রহ এবং ধূমকেতু সকল আলোকিত হয়। উল্কাগুলি দীপ্তিহীন প্রস্তরময় পদার্থ। উহারা যখন প্রচণ্ডবেগে ছুটিয়া পৃথিবীর দিকে আসিতে থাকে, তখন ভূ বায়ুর সংঘর্ষণে ভয়ানক তাপের উৎপত্তি হয়। সেই তাপে উল্কাপিণ্ডগুলি জ্বলিয়া উঠে। তখনই আকাশে আমরা উল্কাপাত দেখিতে পাই।

সৌর-জগৎ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অতি ক্ষুদ্র অংশ। আকাশের কোটি কোটি জগতের একটী জগৎ মাত্র। সৌর-জগতের বাহিরে আকাশে যে ক্ষীণ আলোকবিন্দুর মত নক্ষত্রগুলি দৃষ্টিগোচর হয়, উহাও স্বীয় আলোকে জ্যোতির্ম্ময়। পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে, আকাশের এক-একটী নক্ষত্র আমাদের সূর্য্যের ন্যায়ই বৃহৎ ও উজ্জ্বল। সূর্য্য হইতে বৃহত্তর নক্ষত্রও আকাশে অনেক আছে। নক্ষত্রগুলি অচিন্তনীয় দূরে অবস্থিত বলিয়া এত ক্ষুদ্র প্রতীয়মান হয়। 'আলকা-সেণ্টরাই' নামক নক্ষত্রটী পৃথিবীর নিকটতম। সূর্য্য পৃথিবী হইতে নয় কোটি উনত্রিশ লক্ষ মাইল দূরবর্ত্তী, আর আল্‌কা সেণ্টরাই প্রায় দুই পদ্ম ৬৫ নিখর্ব্ব মাইল দূরে অবস্থিত। আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল গমন করে। সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে মাত্র ৮ মিনিট সময় লাগে, কিন্তু নিকটতম নক্ষত্র আল্‌কা সেণ্টরাই হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে প্রায় ৪½ বৎসর লাগে। ধ্রুব নক্ষত্র হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে প্রায় ৪৬½ বৎসর লাগে। জ্যোতির্ব্বিদগণ বলেন, আকাশে এমন নক্ষত্র অনেক আছে যাহাদের আলোক পৃথিবীতে পৌঁছিতে একলক্ষ বৎসরের কম লাগিতে পারে না। এখন একবার ভাবিয়া দেখুন বিশ্বপতির বিশাল সাম্রাজ্য কত বিস্তৃত!

আকাশের নক্ষত্রের সংখ্যা একশত কোটীরও অধিক। এইগুলি সকলই এক-একটী প্রচণ্ড দীপ্তিশালী সূর্য্য। আমাদের সূর্য্য যেমন গ্রহ-উপগ্রহাদি পরিবেষ্টিত হইয়া সৌর জগতে রাজত্ব করিতেছে, তেমনি ঐ সকল দূরবর্ত্তী সূর্য্যও বোধ হয় এক একটী সৌর জগতের কেন্দ্রে অবস্থিত। ঐ সকল সৌর-জগতের কোন কোন গ্রহে হয় ত আমাদের ন্যায় জীব বাস করিতেছে এবং ঐ সকল জগতের অধিবাসীরাও ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে।

ভগবানের বিশাল সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই এক নিয়ম প্রচলিত। সাম্যই বিধাতার শাসন-প্রণালীর মূলমন্ত্র। আকাশের কোটি কোটি সৌর-

জগতের কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক মাধ্যাকর্ষণের বলেই পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া শূন্যে বিরাজিত আছে। যতদূর জানা গিয়াছে, সকল জ্যোতিষ্কের দেহই একই উপাদানে গঠিত। পর্য্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ ইহাও নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, আকাশের কোটী কোটী জ্যোতিষ্কের ক্রমবিকাশের ধারাও সম্পূর্ণ একরূপ।

প্রাণিগণ যেমন জন্মের পর যথাক্রমে শৈশব, বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, জ্যোতিষ্ক সকলেরও ক্রমবিকাশের ঐরূপ বিভিন্ন স্তর আছে। জ্যোতির্ব্বিদগণ জ্যোতিষ্ক-জীবনের ৬টী বিশিষ্ট স্তর (stage) নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

১ম—সৌরাবস্থা (Sun-stage)। জন্মের পর সকল জ্যোতিষ্কই সূর্য্যের ন্যায় প্রবল উত্তপ্ত ও অতিশয় উজ্জ্বল থাকে এবং আলোক বিতরণ করে। জ্যোতিষ্ক-জীবনে ইহাই অতিশয় শ্রেষ্ঠ ও গৌরবের অবস্থা। আকাশের কোটি কোটি নক্ষত্র ও আমাদের সূর্য্য বর্ত্তমানে জ্বলন্ত বাষ্পাবস্থায় আছে। বাস্তবিক সূর্য্যে ও নক্ষত্রে কোনই প্রভেদ নাই। সৌরাবস্থাই ক্রমবিকাশের প্রথম স্তর। তার পর জ্যোতিষ্কগণ যখন অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়া বাষ্পাবস্থা হইতে ফুটন্ত তরল (molten) অবস্থায় আইসে, তখন উহাদের জীবনের দ্বিতীয় স্তর। সৌর-জগতের বৃহস্পতি, শনি, ইয়ুরেনাস্, নেপচ্যুন এই চারিটী গ্রহ—বর্ত্তমানে দ্বিতীয় স্তরে অবস্থিত। সূর্য্যের ন্যায় আলোক দিবার ক্ষমতা না থাকিলেও ঐ সকল গ্রহের দেহ এখনও অতিশয় উত্তপ্ত রহিয়াছে। আকাশ হইতে বৃষ্টি ধারা ঐ সকল গ্রহ মণ্ডলে পতিত হওয়া মাত্র আবার বাষ্পে পরিণত হইয়া উর্দ্ধে উত্থিত হয়। তৃতীয় স্তরে জ্যোতিষ্ক দেহ আরও শীতল হইয়া উহার তরল উপাদানের উপর পাতলা আবরণ (Crust) গঠিত হইতে আরম্ভ করে। চতুর্থ স্তরে উপনীত হইলে জ্যোতিষ্ক-পৃষ্ঠের আবরণ (Crust) কঠিন মৃত্তিকায় পরিণত হয়। আমাদের পৃথিবী শীতল হইয়া এখন অগণিত জীবকুলের বাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু উহার অভ্যন্তর দেশ এখনও অত্যুষ্ণ রহিয়াছে। আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতই তাহার প্রমাণ। পঞ্চম স্তরে জ্যোতিষ্ক জীবনের বার্দ্ধক্য কাল। তখন উহাদের সুবিস্তৃত সাগরগুলি শুকাইয়া যায়। বৃক্ষলতাদি মরিয়া সর্ব্বত্র মরুভূমির সৃষ্টি হইতে থাকে। সৌর জগতের মঙ্গলগ্রহ বর্ত্তমানে বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হইয়াছে। সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ লাওয়েল্ (Lowell) প্রণীত Mars as the abode of life গ্রন্থখানি পাঠ করিলে আপনারা মঙ্গলের নৈসর্গিক অবস্থা বিশেষ ভাবে অবগত হইতে পারিবেন।

বার্দ্ধক্যের পর জ্যোতিষ্ক সকলের মৃত্যু। জ্যোতিষ্কের মৃত্যু কিরূপে হয়? তখন উহাদের দেহ একবারে শীতল হইয়া যায়, সমস্ত জলাশয় শুষ্ক হয়, জ্যোতিষ্ক সকল বৃক্ষলতাদি শূন্য বালুকাময় বিশাল মরুভূমিতে পরিণত হয়; উহাদের বায়ু মণ্ডল বিলুপ্ত হয়। এই সকল মৃত্যুর লক্ষণ। আমাদের চন্দ্র অনেক দিন হয় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। উহার কঙ্কালময় মৃতদেহটা শূন্যে ঘুরিতেছে। চন্দ্রের সমুদ্রগুলি জলশূন্য, আগ্নেয় গিরিগুলি নির্ব্বাপিত! চন্দ্রে জল নাই, বায়ু নাই! চারিদিকে বিশাল বালুকাময় মরুভূমি! চন্দ্রের নৈসর্গিক অবস্থা অতীব ভীষণ! প্রেমিক ও কবিরা যদি বৈজ্ঞানিকের চক্ষে চন্দ্রের মহাশ্মশানের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিতেন তবে তাহাদিগের হৃদয়ে বৈরাগ্যের উচ্ছ্বাস উদ্বেল হইত! আমাদের পৃথিবীর একটী চন্দ্র; মঙ্গলের ২টী, বৃহস্পতির ৭টী, শনির ১০টী, ইয়ুরেনাসের ২টী ও নেপচ্যুনের ২টী চন্দ্র। সকল গ্রহের চন্দ্রই এখন মৃত। মধ্যাকর্ষণে ধরা পড়িলে কাহারও সহজে মুক্তি নাই। তাই মৃত চন্দ্রের কঙ্কালময় দেহগুলি অবিশ্রান্ত গ্রহের চারিদিকে ঘুরিতেছে।

জ্যোতির্ব্বিদগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন একটী নীহারিকা (Nebula) হইতে একই সময়ে সূর্য্য ও গ্রহ সকলের জন্ম হইয়াছিল। আদিতে পৃথিব্যাদি গ্রহ সকলও সূর্য্যের ন্যায় জ্বলন্ত বাষ্পাবস্থায় ছিল এবং উহারাও আলোক বিতরণ করিত। সূর্য্যের তাপ ও উজ্জ্বলতা এখনও পূর্ব্বের ন্যায় প্রখর রহিয়াছে; কিন্তু গ্রহগুলি আলোকহীন হইয়াছে। ইহার কারণ নির্দ্ধারণ করা কঠিন নহে। যে জ্যোতিষ্ক যত বড় উহার পরমায়ু তত দীর্ঘ। সূর্য্য আয়তনে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। সেই অনুপাতে উহার তাপের ভাণ্ডারও বিপুল। গ্রহগুলি ক্ষুদ্র তাই ক্রমে ক্রমে তাপ বিতরণ করিয়া উহারা নিঃস্ব হইয়া যাইতেছে। সূর্য্যের তহবিল বৃহৎ তাই উহার তাপক্ষয়ের ফল এখনও বোধগম্য হইতেছে না। সে যত বড় ধনীই হউক না কেন, যাহার ব্যয় আছে কিন্তু ক্ষতিপূরণের উপায় নাই, তাহার তহবিল এক কালে শূন্য হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সূর্য্য অনন্ত আকাশে যে তাপ বিতরণ করিতেছে তাহার দুইশত কোটি ভাগের একভাগ মাত্র পৃথিবীতে পৌঁছে। এই তাপের জ্বালায়ই আমরা অস্থির হইয়া পড়ি। সূর্য্যের কত তাপ প্রতিদিন ক্ষয় হইতেছে তাহা অনুমান করাও দুঃসাধ্য। কোটি কোটি বৎসর যাবৎ সূর্য্য এইরূপ তাপ বিকীরণ করিতেছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সূর্য্যের তাপ হ্রাস হয় নাই। ইহার কারণ, সূর্য্যের অভ্যন্তর ভাগ দিন দিন শীতল হইয়া কঠিন হইতেছে, আর সূর্য্যদেহ ক্রমশঃ সংকুচিত হইতেছে; সূর্য্যের দেহ সংকুচিত হওয়ায় পরমাণু সকলের যে সংঘর্ষণ হয় তাহাতে তাপ জন্মে। সেই তাপ সূর্য্যের বিকীর্ণ তাপের ক্ষতিপূরণ করিয়া সমতা রক্ষা করিতেছে। জ্যোতির্ব্বিদগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, সূর্য্য প্রতি বৎসর ১৬" ইঞ্চি সংকুচিত হয়। সূর্য্য দেহ নাকি পূর্ব্বে নেপচ্যুনের কক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কোটি বৎসরের সংকোচনের ফলে উহা বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়াছে। সূর্য্যের দেহ সংকোচনেরও একটা সীমা আছে। এই সীমা অতিক্রম করিলে উহার দেহ কঠিন ও শীতল হইতে থাকিবে। কালে উহার তাপের ভাণ্ডার নিঃশেষ হইয়া যাইবে। তখন সূর্য্য নিষ্প্রভ হইয়া গ্রহ সকলের ন্যায় একবারে আলোকহীন হইবে। তখনই সূর্য্যের মৃত্যু ঘটিবে। সেই দিন সমগ্র সৌর জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যাইবে। কেবল তাহাই নহে, সূর্য্যের উত্তাপের অভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণী সকল মৃত্যু মুখে পতিত হইবে। সেজন্য আমাদের বিশেষ চিন্তিত হইবার কোনই কারণ নাই। এখন ৮।১০ কোটি বৎসরের পূর্ব্বে সূর্য্যালোক একবারে নির্ব্বাপিত হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

তাপ বিকীরণ হেতু উত্তপ্ত পদার্থের দেহ ক্রমশঃ শীতল ও দীপ্তিহীন

হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং আমাদের সূর্য্যের ন্যায় প্রভাময় নক্ষত্র সকলেরও মৃত্যু অনিবার্য্য। কত শত কোটি বৎসর যাবৎ সৃষ্টি-প্রবাহ চলিতেছে তাহা নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। জ্যোতির্ব্বিদগণ বলেন সৃষ্টির আদি হইতে এ পর্য্যন্ত বহু নক্ষত্রের মৃত্যু হইয়াছে। আকাশে যেমন কোটি কোটি উজ্জ্বল নক্ষত্র বিরাজমান সেইরূপ কোটি কোটি প্রভাহীন মৃত নক্ষত্রও আকাশে বর্ত্তমান আছে।

জ্যোতির্ব্বিদগণ বহু সংখ্যক জ্যোতিহীন মৃত নক্ষত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন আকাশে প্রদীপ্ত নক্ষত্র অপেক্ষা আলোকহীন নক্ষত্রের সংখ্যাই অধিক হইবার সম্ভাবনা। কালক্রমে স্বাভাবিক নিয়মে তাপ ক্ষয় হেতু আকাশের সকল নক্ষত্রই শীতল ও দীপ্তিহীন হইবে। তবে কি আকাশের সমুজ্জ্বল প্রদীপগুলি একে একে সব নিবিয়া যাইবে? ভগবানের বিশাল সাম্রাজ্য গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে? সৃষ্টির আদিতে যেমন 'আসীদিদং তমোভূতম্'—তেমনি ব্রহ্মাণ্ড আবার গভীর অন্ধকারে আবৃত হইবে? বিধির সৃষ্টি ধ্বংস হইবে?

জ্যোতির্ব্বিদগণ আমাদিগকে অভয় দিতেছেন,—জগতের চিরলয় হইবার কোনই আশঙ্কা নাই। বিধাতার সৃষ্টি অনন্তকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে। আকাশের কোটি কোটি সূর্য্য চির দিনের জন্য নির্ব্বাপিত হইবে না। ব্রহ্মাণ্ডের একদিকে যেমন সূর্য্যের পর সূর্য্য তাপ ক্ষয় হেতু দীপ্তিহীন হইতেছে অন্য দিকে তেমনি নূতন সূর্য্যের জন্ম হইতেছে।

অনন্ত আকাশে কোটি কোটি মৃত সূর্য্য বা নক্ষত্র আলোকহীন মাল গাড়ীর মত ছুটাছুটি করিতেছে। বড় বড় সহরে ও রেলপথে যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন সত্ত্বেও যেমন গাড়ীতে গাড়ীতে সংঘর্ষণ হইয়া থাকে তেমনি আকাশের কোটি কোটি মৃত নক্ষত্রের সংঘর্ষণ হইয়া থাকে। আমাদের পৃথিবী হইতে লক্ষ লক্ষ গুণ বড় দুইটী নক্ষত্রে সংঘর্ষণ হইলে যে কি ভীষণ ব্যাপার হইবে তাহা সম্যক উপলব্ধি করাও অসাধ্য।

নক্ষত্রগুলি আকাশে প্রতি মিনিটে ন্যূনাধিক ৩০০ মাইল গতিতে ছুটিতেছে। দুইটী বিরাট মৃত সূর্য্য যখন এইরূপ প্রচণ্ড গতিতে দুই বিপরীত দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া পরস্পরের উপর পতিত হয় তখন সংঘর্ষণে ভীষণ প্রলয়ের অগ্নি জ্বলিয়া উঠে। কোটি কোটি মাইল বিস্তৃত সেই অনলরাশির তুলনায় সহস্র সূর্য্যের প্রখর প্রভাও অতি অকিঞ্চিৎকর। সংঘর্ষণজাত প্রলয়াগ্নিতে উভয় সূর্য্যের দেহ উপাদানই প্রজ্জ্বলিত বাষ্পে পরিণত হয়। এই জ্বলন্ত বাষ্প রাশিকেই আমরা নীহারিকা বলি। লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে ঐ প্রজ্জ্বলিত বাষ্প বা নীহারিকা হইতে এক একটী নূতন সূর্য্যের অথবা সৌরজগতের জন্ম হইয়া থাকে। এইরূপে মৃত সূর্য্য পুনর্জীবন লাভ করে।

জ্যোতির্ব্বিদগণ দূরবীক্ষণ সাহায্যে আকাশে ঐরূপ অনেক নূতন সূর্য্যের জন্ম প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমাদের সৌরজগতেরও এইরূপে দুইটী মৃত নক্ষত্রের সংঘর্ষণে উৎপত্তি হইয়াছে। আমেরিকার জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত অধ্যাপক লাওয়েল (Lowell) লিখিয়াছেন—"So far as thought may peer into the past, the Epic of our Solar system began with a great catastrophe. Two suns met, What had been ceased what was to be arose. Fatal to both progenitors, the event dated a stupendous cosmic birth."

—Mars os the abode of life.

বর্ত্তমানে আকাশে হাজার হাজার নীহারিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্ণবীক্ষণ (spectroscope) সাহায্যে বৈজ্ঞানিকগণ অনেকগুলি নীহারিকা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিয়াছেন উহাদের দেহ জমাট বাঁধিয়া নূতন নূতন সূর্য্যে পরিণত হইয়াছে। বিধাতার সুবিস্তৃত শিল্পশালায় নূতন জগতের সৃষ্টি হইতেছে। ব্রহ্মাণ্ডের এক দিকে ধ্বংসের অভিনয় আর এক দিকে সৃষ্টির সূচনা হইতেছে।

আর্য্য ঋষির ভাষায়—

মন্বন্তরাণ্যসংখ্যানি সর্গঃ সংহার এব চ।
ক্রীড়ন্নিবৈতৎ কুরুতে পরমেষ্ঠী পুনঃ পুনঃ॥ (মনু)

মন্বন্তর অসংখ্য, সৃষ্টি প্রলয়ও অসংখ্য। পরমেশ্বর সৃষ্টি প্রলয়ের পুনঃ পুনঃ অভিনয় করিয়া লীলা করিয়া থাকেন।

সুতরাং জগতের পরিণাম সম্বন্ধে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য মনীষীরা একই রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন—জগতের পরিণাম ধ্বংস নয়। সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের ভিতর দিয়া জগতের ক্রম বিকাশ হইতেছে। জগৎ অনন্ত কাল থাকিবে; ভগবানের লীলাও অনন্ত কাল চলিবে।

একজন শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক লিখিতেছেন—"The entire scheme of things is cyclic in which there is birth, maturity, decay and rejuvenescence in planets, suns and sidereal systems. * * the cosmic whole being infinite and immortal,"

খেলার পুতুল

শ্রীনরেন্দ্র দেব

১৫

সে রাত্রে সুহাসের চোখে আর কিছুতেই ঘুম এলোনা।

নিজের মনের সঙ্গে সে একটা বোঝাপড়া করে নেবার চেষ্টা করছিল। এখানে এসে সে যখন দেখলে যে সত্যেন মন্দাকে গ্রহণ ক'রতে পারেনি, তখন সত্যই সে একটু ক্ষুণ্ণ হ'য়ে পড়েছিল। অন্তরের মধ্যে কেমন যেন একটু কুণ্ঠা বোধ করছিল। মন্দার মতো এমন সর্ব্বগুণময়ী স্ত্রীকে অবহেলা ক'রতে দেখে সত্যেনকে সে একদিন মৃদু তিরস্কার না ক'রেও থাকতে পারেনি। অথচ আজ সেই সত্যেনই যখন তার বিবাহিতা পত্নীকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে আদর করছিল, সোহাগ ক'রে স্ত্রীর সঙ্গে সে খুনসুটি করছিল, সুহাস সে দৃশ্য ঠিক সহ্য ক'রতে পারছিল না। যখনই তাদের স্বামী-স্ত্রীর এই একান্ত মিলন তার চোখে পড়ছিল, সুহাস যেন মনের মধ্যে কোথায় একটা কিসের আঘাত পেয়ে বেশ একটু কাতর হ'য়ে পড়ছিল।

এই নিশীথ রাত্রে, নির্জ্জন শয্যাটি আশ্রয় ক'রে সে এখন ঘুমের আবাহনের পরিবর্ত্তে অন্তরের মধ্যে এই প্রশ্নটারই একটা সদুত্তর খুঁজে পাবার চেষ্টা করছিল যে—কেন এটা তার কাছে এমন অসহনীয় বোধ হ'চ্ছে? সত্যেন যাতে স্ত্রীকে নিয়ে' সুখী হ'তে পারে, এইটেই তো ছিল তার সব চেয়ে বড় কামনা! কিন্তু তার সেই ইচ্ছাটুকুই আজ এমন করে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠছে দেখে সে কেন এমন আহত হ'য়ে পড়'ছে? এ কি তবে মন্দার প্রতি তার অন্তরের প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা?

সুহাস নিজেই নিজের উপর বিরক্ত হ'য়ে উঠলো। তার এ অকারণ ঈর্ষার অর্থ কি? সত্যেন তো তাকে এ অধিকার দিতে চেয়েছিল, কিন্তু সেই তো তা নিতে পারেনি, তবে কিসের এ দুর্জ্জয় অভিমান তার? সে যাকে এতদিন বড় ভাইয়ের মতই ভালোবেসে এসেছে, যাকে স্বামী ব'লে কল্পনা ক'রতেও সে লজ্জায় শিউরে উঠেছিল একদিন,—তার সমস্ত ভালবাসাটুকু চিরদিন একলা দখল ক'রে থাকবার দুরাকাঙ্ক্ষা তো সুহাসের কোনও দিনই ছিল না তবে কেন আজ তিনি, মন্দাকে ভালবেসে তৃপ্ত হ'চ্ছেন দেখে সে এমন অধীরা হ'য়ে উঠছে?

আপন অন্তরের এই দুর্ব্বলতাটাকে তার যেন অত্যন্ত নীচতা বলে মনে হ'তে লাগলো! নিজেকে নিজে চোখ রাঙিয়ে সে বারম্বার বলতে লাগল—ছি-ছিঃ! মন্দার সৌভাগ্যের ঈর্ষা করা তার পক্ষে অন্যায়—অন্যায়—খুবই অন্যায়!

নিস্তব্ধ রাত্রির সূচীভেদ্য অন্ধকার ঘরের মধ্যে যেন মস্ত একটা কালো পাহাড়ের মতো স্তূপাকার হ'য়ে উঠেছিল! সেই বিপুল ঘন আঁধারভার সুহাসের বুকের উপর প্রকাণ্ড একখানা পাথরের মতোই চেপে বসেছিল! অন্ধকার—অন্ধকার—চারিদিকে অন্ধকার! যতদূর দেখা যায়—এ জীবনে তার বর্ত্তমানও অন্ধকার—ভবিষ্যৎও অন্ধকার! সুহাসের অন্তরে বাহিরে নিরাশার নিকষ কালো তিমির রাশি যেন পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠছিল। আলোর ক্ষীণ রেখাটুকুও কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। সে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে তমসাচ্ছন্ন সুহাসের যেন শ্বাসরোধ হ'য়ে আসছিল।

অস্থির হ'য়ে বিছানা থেকে সে উঠে পড়ল। আস্তে আস্তে গিয়ে মাথার দিকের জানালাটা খুলে দিলে।

জানালাটা খুলেই কিন্তু সে চম্‌কে উঠলো! এক ঝলক্ জ্যোৎস্না হঠাৎ যেন ফিক্ ক'রে হেসে উঠে জানালা গলে তার ঘরে ঢুকে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ল। সুহাসের মনে হ'লো এই তরুণী সুন্দরী যেন এতক্ষণ তার রুদ্ধ বাতায়নের পাশে সঙ্গোপনে দাঁড়িয়ে তার মনের সব কথা আড়ি পেতে শুনছিল! এখন ধরা পড়ে গেছে বলে এমন হেসে গড়িয়ে যাচ্ছে!

ঘরের মেঝেয় এক কোণে একখানা মাদুর পেতে ফুলি ঝী অগাধে ঘুমুচ্ছিল। জানালা খোলার শব্দে তার ঘুম

ভেঙে গেল। সে মাথাটা তুলে দেখে বললে—কে—পিসীমা নাকি? ওমা! এর মধ্যে উঠে জানালা খুলে দিচ্ছ কি? রাত যে পোয়াতে এখনও ঢের দেরী পিসীমা।—

সুহাস বললে—গরমে আমার ঘুম হচ্ছে না ফুলি, তাই উঠে জানালাটা একটু খুলে দিলুম।

ফুলি অপ্রতিভ হয়ে বললে—মাপ করো পিসীমা, কনকনে ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া ঝড়ের মতো ঘরে এসে ঢুকছে দেখেই আমি সব দোর-জানলাগুলো বন্ধ ক'রে দিয়েছিলুম। আকাশে মেঘ করেছিল, ঝড় বৃষ্টি হবে বলে মনে হ'য়েছিল কি না! তার পর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি আর খুলে দিতে মনে নেই।…তাই ত পিসীমা তোমার ঘুমটা ভেঙে গেল! তা আমি একটু বাতাস করছি, তুমি এসে শোও দেখি—এখনি ঘুম আসবে ঠিক্ –

সুহাস ব্যস্ত হ'য়ে বললে—না না ফুলি, তুমি শুয়ে থাকো, তোমার আর উঠে বাতাস ক'রতে হবেনা—জান্‌লা দিয়ে বেশ হাওয়া আসছে, মিছে কেন কষ্ট ক'রবে?

ফুলি প্রতিবাদ ক'রে ব'ললে—ওমা! কষ্ট আবার কিসের? ও আমার গা সওয়া হয়ে গেছে! বড় মাকে ত বারোমাসই পাথার বাতাস দিয়ে ঘুম পাড়াতে হয়। কি দিনের বেলা—কি রেতের বেলা!

সুহাস একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'ললে—কিন্তু কই, আমি এসে পর্য্যন্ত তো একদিনও তোমায় বৌদিকে বাতাস করতে দেখিনি ফুলি!

ফুলি বললে—এ ক'দিন যে বাবু সকাল করে শু'তে আসছেন মা! নইলে, ওদিকে তো আর রাত একটার আগে তিনি উপরে উঠতেন না। লাইব্রেরী ঘরে বসে কেবল গোছা গোছা বই পড়তেন আর লিখতেন। যখন শুতে আসতেন, তখন বড়মা'র অর্দ্ধেক রাত!

এই আলোচনার মধ্যে সুহাস কী যেন একটা নূতন তথ্যের সন্ধান পেলে!

অনেকক্ষণ নিশ্চলভাবে জানালার ধারে পাষাণ-প্রতিমার মতো সে দাঁড়িয়ে রইল। ফুলি বললে—শোওনা এসে পিসীমা, বাতাস করি। দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

সুহাস অন্যমনস্ক ভাবে বললে—অতো রাত ক'রে শুতে আসতেন তবু বৌদি কিছু বলতেন না! সেই জন্যই দাদা এমন রোগা হ'য়ে গেছেন!

ফুলি বললে—বড়মার দোষ কি পিসীমা, বাবু কি কারুর কথা শোনেন—না মানেন? মনিব যে আমার ভারী একগুঁয়ে।

সত্যেনের এ পরিচয় সুহাস খুব ভালো রকমই জানে। তাই সে আর কোনও কথা না ক'য়ে চুপ ক'রে রইল।

ফুলি বললে—একটু বাতাস করি না পিসীমা—

সুহাস ব'ললে—না না, তুই ঘুমো—আর বকিস্‌নি। আমি একটু প'রে শোবো অখন।

ফুলি এ কথা শুনে যেন নিশ্চিন্ত হ'য়ে পাশ ফিরে শুলো এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আবার ঘুমিয়ে পড়লো!

সুহাস তার এই নিদ্রার আশ্চর্য্য সাধনা দেখে মনে মনে প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারলেনা। তার পর খোলা জানালার ধারে গিয়ে সামনের আকাশের দিকে চেয়ে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বিস্তীর্ণ নীলাকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ নক্ষত্র যেন পরস্পরের সঙ্গে তখন নিজ নিজ দীপ্তির প্রতিযোগিতা করছিল।

সুহাস নিজের চিত্তকে দৃঢ় ক'রে নিয়ে এই কথাটা তার অশান্ত মনকে বোঝাবার চেষ্টা ক'রতে লাগল যে,—যে সম্পদ সে অঞ্চলে পেয়েও পথে ছড়িয়ে দিয়ে চলে এসেছে একদিন—তাকে আজ এতকাল পরে ফিরে এসে কুড়িয়ে নেবার লোভ যেন মুহূর্ত্তের জন্য তার অন্তরে না উঁকি মারে! আজ যদি ভাগ্যবশে আর কোনও পথিক সে রত্ন তুলে নিয়ে তার কণ্ঠহার করে থাকে—সে যেন প্রসন্ন হৃদয়ে সেই সৌভাগ্যবতীর শুভ-কামনাই ক'রে যেতে পারে! আপন বিদগ্ধ জীবনের স্ফুলিঙ্গ যেন আর কারুর শান্তিময় সংসারে না আগুন ধরিয়ে দিয়ে যায়! যার নিজের ভবিষ্যৎ জীবন চিরতমসাচ্ছন্ন সে যেন আর অন্যের জ্যোৎস্নালোকিত জীবনে অভিশপ্ত আঁধারের কালো ছায়া না টেনে আনে।

হঠাৎ জানালা দিয়ে সুহাস অন্দরের বাগানের মধ্যে দেখলে, সত্যেন মন্দাকে নিয়ে জ্যোৎস্নালোকে ধীরে-ধীরে পাদচারণা ক'রছে।

দু'জনে দু'জনের গা-ঘেঁসে পরস্পরের হাত-ধরাধরি ক'রে বেশ আরামে বেড়াচ্ছে আর গল্প ক'রছে।

সুহাসের বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। এতরাত্রে ওরা বাগানে এসে বেড়াচ্ছে কেন? তবে কি ওদেরও চোখে আজ আর ঘুম নেই? তাই কি দু'জনে পরামর্শ

ক'রে এই নিশীথ রাত্রে চাঁদের আলোটুকু একান্তে উপভোগ ক'রতে এসেছে ?

ওদের মধ্যে কী-এতো হাসি-গল্প হ'চ্ছে জানবার জন্য সুহাসের যেন একটা অদম্য কৌতুহল জেগে উঠলো। খুব সন্তর্পণে জানালাটি বন্ধ করে দিয়ে নিঃশব্দে খড়খড়ীর একটি পাখী তুলে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে সুহাস ওদের কথা শোনবার চেষ্টা ক'রতে লাগলো, কিন্তু ওরা এত আস্তে কথা কইছিল যে, অনেকক্ষণ কাণ খাড়া ক'রে থেকেও সুহাস ওদের সব কথা ধরতে পারলে না, শুধু এইটুকু বুঝতে পারলে যে, আলোচনাটা ওদের মধ্যে যা হ'চ্ছে সেটা তার ও মণীন্দ্রের সম্বন্ধে!

সুহাসের কৌতুহল দ্বিগুণ বেড়ে উঠলো, কথাগুলো স্পষ্ট শোনবার জন্য সে এবার একেবারে উৎকর্ণ হ'য়ে জানালার ধারে চেপে ব'সে রইল।

ক্ষণকাল পরেই কিন্তু, জানালা থেকে সে পক্ষাঘাত-গ্রস্ত রোগীর মতো অতি কষ্টে উঠে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লো। ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে কথার আলোচনা হ'চ্ছিল তার কিয়দংশ সুহাসের কাণে এসে পৌঁছাতেই তার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হ'য়ে গেল! তার মনোজগতে একটা যেন বিপ্লব বেধে গেল! সে আর জানালার ধারে ব'সে থাকতে পারলে না।

শয্যার আশ্রয়ে ফিরে এসে সে কেবলই সত্যেনকে ধিক্কার দিতে লাগলো। ছি ছি, উনি কি ব'লে মন্দার ওই কথায় সায় দিচ্ছেন? হ্যাঁ, মণীন্দ্রের সঙ্গে সে একটু অসঙ্গত ব্যবহারই ক'রেছে বটে, সে-কথা মিথ্যা নয়, কিন্তু, সে কি শুধু ওদেরই এই মিলন-টুকুকে সার্থক ও সুন্দর ক'রে তোলবার জন্যই নয়? তার মধ্যে সুহাসের নিজের স্বার্থ কি কিছু ছিল? মন্দা তাকে এই নূতন দেখছে; তার পক্ষে না-হয় তার মতিগতি ও চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়াটা খুব একটা অপরাধ না হ'তে পারে, কিন্তু, সতুদা' তো সুহাসকে ছেলে-বেলা থেকেই জানেন, তিনি কি ব'লে বিশ্বাস করছেন যে, মণীন্দ্র সম্বন্ধে সত্যই তার মনে কিছু—

হঠাৎ সুহাসের যেন চমক ভাঙলো! সে ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে অকস্মাৎ হাসতে হাসতে শয্যার উপর একেবারে লুটোপুটি খেতে লাগল! এই সময় বাইরের কোনও লোক তাকে দেখলে নিশ্চয় মনে ক'রতো যে, সে পাগল হ'য়ে গেছে! অথচ যথার্থ-পক্ষে তখনই সে ঠিক প্রকৃতিস্থ হ'লো। তার মনে পড়ে গেল যে, মণীন্দ্রের সঙ্গে তার এই অন্তরঙ্গতা যদি সতুদা'র মনে কোনও দাগই না কাটতে পারতো, তাহ'লে ওই সন্দিগ্ধমনা মন্দার সাধ্য কি ছিল যে, সে তা'র দাদার প্রণয়-লাভে ধন্য হ'তে পারে! অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হ'লেই যে সংসারে সকল স্ত্রীর ভাগ্যে তার স্বামীর প্রণয়ভাগিনী হবার সৌভাগ্য ঘটেনা, এ অভিজ্ঞতা সুহাস তার এই পঁচিশ বৎসরের জীবনে সঞ্চয় করতে পেরেছিল।

তার উদ্দেশ্য যে এমন আশাতীতরূপে সফল হ'য়েছে, এ দেখে সুহাসের আনন্দ একেবারে অপরিসীম হ'য়ে উঠলো। এই দশ বৎসরের না দেখার সুযোগটুকুর উপর নির্ভর করে সে তার সতুদা'র জীবনকে যে-পথে ফেরাতে চেয়েছিল, আজ এত অল্প আয়াসেই নিজেকে সে-কাজে কৃতকার্য্য হ'তে দেখে তার আনন্দ আর ধরছিল না বটে, কিন্তু তবু তারই মধ্যে একটা কী-যেন ক্ষোভের গোপন কাঁটাও তার চিত্তকে তলে তলে বিকল ক'রে তুলছিল!

অবশেষে নিজেকে যথাসাধ্য দৃঢ় ক'রে তুলে সুহাস মনে মনে স্থির ক'রলে যে—যে-ক'দিন সে এখানে আছে, মণীন্দ্রর সঙ্গে এমন ব্যবহার করবে যে সত্যেন আর তার মুখদর্শন পর্য্যন্ত ক'রতে চাইবেনা।

কিন্তু তার পর? তার পর সে কি করবে? মণীন্দ্র যদি তার এই খেলার মর্ম্ম বুঝতে না পেরে একটা কিছু ভুল ক'রে বসে! তার কি উপায়?

সুহাস অনেক ভেবে স্থির ক'রলে যে মণীন্দ্রকে যখন সে বন্ধু ব'লে গ্রহণ ক'রেছে তখন এসব কথা তাকে বিশ্বাস ক'রে আগে থাকতে জানিয়ে রেখে দেওয়াই তার পক্ষে উচিত ও কর্ত্তব্য। এমন কি, সুহাস ঠিক ক'রে ফেললে যে, কাল মণীন্দ্র এলে তার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সে তার ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে একটা কিছু পন্থা নির্ণয় করবারও চেষ্টা করবে। মণীন্দ্রকে সত্যই তার খুব ভালো লেগেছে। সরল উদার মানুষটি! কোনও রকম সঙ্কীর্ণতা নেই, কুসংস্কার নেই—কেমন দরাজ বুক, খাসা উঁচু মন, বেশ লোকটি! তার মতের সঙ্গে নিজের মতামতের অদ্ভুত সাদৃশ্য, সুহাসকে বিশেষ ক'রে মণীন্দ্রের পক্ষপাতী ক'রে তুলেছিল।

সুহাসের এ-কথাও মনে হ'লো যে, সতুদা'কে সুখী

করবার জন্য সে যদি সতুদা'র সহানুভূতি হারায় সেও স্বীকার; তবু নিজের সুনাম ও স্বার্থ রক্ষা করবার দুরাকাঙ্ক্ষা এ ক্ষেত্রে যেন তাকে এতটুকু বাধা দিতে না পারে। আর মণীন্দ্র যদি প্রকৃত বন্ধুর মতো এ-কাজে তাকে সহায়তা ক'রে, তাহ'লে আজীবন সে এই মানুষটির কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

শিশুর মতো অকলঙ্ক-চিত্ত এই যুবক! কত অল্পক্ষণের আলাপ-পরিচয়েই সে যেন তাকে পরমাত্মীয়ের মতো গ্রহণ ক'রেছে। তার সঙ্গে এই অন্তরঙ্গতা যে মোটেই তাকে চেষ্টা ক'রে ক'রতে হয়নি, সেটা যে তাদের মধ্যে আপনা-আপনিই একটা সহজাত বস্তুর মতো স্বাভাবিক রূপেই গড়ে উঠেছে এটা অন্তরে অন্তরে অনুভব করে সেই সর্ব্বশক্তিমান অদৃশ্য নিয়ন্তাকে একাধিকবার ধন্যবাদ জানাতে জানাতে কখন যে সুহাস ঘুমিয়ে প'ড়লো তা সে জানতেই পারলেনা।

সকালবেলা ফুলি-ঝীর ডাকাডাকিতে যখন সুহাসের ঘুম ভাঙলো, তখন বেশ বেলা হ'য়ে গেছে। ঘরের ভিতরে এবং বিছানার ধারে কাঁচা সোণার মতো সকালের টাটকা রোদ এসে পড়েছে।

সুহাস ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে বললে—ওমা! এতখানি বেলা হ'য়ে গেছে, আর আমি প'ড়ে প'ড়ে ঘুমুচ্ছি! ভোর-বেলা আমায় ডেকে দিলিনে কেন ফুলি?

ফুলি দুই চক্ষু কপালে তুলে ব'ললে—সে কি পিসীমা, কাল সারারাত গরমে তোমার ঘুম হয়নি, জানালার ধারে জেগে বসেছিলে, এ জেনেও কি ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে একটু ঘুমিয়ে পড়েছো দেখে তোমায় ডেকে ডেকে তুলতে পারি? আর এখনই কি ছাই তুলতুম, এই জরুরী চিঠি-খানা তোমায় দেবার জন্য বাইরে থেকে বাবু যদি না পাঠাতেন, আর গোকুলো মুখপোড়া এ চিঠি যদি তোমাকে এখুনি দেবার জন্য হুমকী দিয়ে না যেতো, তাহ'লে তুমি না জেগে ওঠা পর্য্যন্ত এ-চিঠি আঁচলে বেঁধে নিয়ে অপেক্ষা করতুম।

সুহাস নিদ্রালিপ্ত চক্ষেই চিঠিখানা নিয়ে খুলে প'ড়তে সুরু ক'রে দিলে। গৌরমোহন লিখ্ছে—

ভাই রাঙা বৌদি', একটা ভারী সুখবর আজ তোমায় এখনি পাঠাবার লোভ আমি কিছুতেই সম্বরণ ক'রতে পারলুম না! এখন শোনো তবে বলি তোমায়, কাল রাত্রে হরিচরণ রাঁচী থেকে বাড়ী ফিরে এসেছে! সঙ্গে এনেছে একটি টুকটুকে রাঙা বউ!—মাসীমা ব'ললেন—হরির এ মেয়েটিকে ভারী পছন্দ হ'য়েছিল, তাই একেবারে ছেলের বিয়ে দিয়ে নিয়ে এলুম! আমাদের খবর দিয়ে আয়োজন ক'রতে গেলে দেরী হ'য়ে যাবে, এবং তার মধ্যে পাছে আবার বিবাগী হরির মত বদ্‌লে যায় এই ভয়ে তিনি না কি শুভ-কার্য্য সত্বর সুসম্পন্ন ক'রে ফেলেছেন! মেয়েটি বেশ বড়সড়, দেখতেও ভালো, নাম শুনলুম সুহাসিনী! তুমি শুনলে সুখী হবে কি রাগ করবে জানিনি, মা তাকে আদর ক'রে 'ছোট-সুহাস' ব'লতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু মাসীমা তাতে ঘোরতর আপত্তি ক'রছেন, ব'লছেন ও অলক্ষণে অপয়া নাম ধ'রে ডাকলে না কি হরির আমাদের অকল্যাণ হবে! অগত্যা তোমার চেলা বিজলী নূতন বউমার নামের আদ্যন্ত বাদ দিয়ে তাকে শুধু 'হাসি' ব'লতে আরম্ভ করেছে। মা ও মাসীমা দেখ্ছি এই নামটা অপছন্দ করেননি!

মা ব'লছেন—গৌর,—হরির আমার বউ এলো, পাড়ার পাঁচজনকে পায়ের ধুলো দিতে ব'লে আয়। বউভাতের একটা নিয়ম রক্ষা তো করা চাই! আমি মা'কে বুঝিয়ে দিয়েছি যে, তুমি না এলে ও-সব কিছু এখন হ'তে পারেনা। তাই মা আর মাসীমা দু'জনেই ব্যস্ত হ'য়েছেন, তোমাকে নিয়ে আসবার জন্য। কবে তোমার আসবার সুবিধা হবে জানলে আমরা কেউ গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা ক'রবো।

তোমার শরীর-গতিক কেমন লিখো। সত্যেনবাবু কেমন আছেন, বউদি' কেমন আছেন, তাঁদের সকলকে আমার প্রণাম দিও এবং তুমি নিও। ইতি

তোমার স্নেহের—

কালো ঠাকুরপো।

পুঃ—

বিজলীর অবস্থা খুব ভালো নয়, দিন এগিয়ে এসেছে বলে সবাই আশঙ্কা ক'রছেন, সুতরাং এ-সময় তোমার উপস্থিতি না কি একান্ত প্রয়োজন, অতএব আশা করি, শীঘ্র ফেরা সম্বন্ধে তুমি আর অন্যমত করবেনা।

—কালো—

চিঠির পিছনদিকে সুহাস দেখলে, বিজলী তার আঁকা-বাঁকা অক্ষরে লিখেছে—শ্রীচরণেষু। দিদি, তুমি চলে গিয়ে পর্য্যন্ত একা-একা এ বাড়ীতে আর একদণ্ড ভালো লাগছেনা। তুমি নেই—এ-বাড়ী যেন অন্ধকার! সম্প্রতি একটি নূতন অতিথি এসেছে, একে লাগছে মন্দ নয়, কিন্তু তুমি নেই বলে তেমন আমোদ হ'চ্ছেনা ভাই! চৌধুরীদের কমলা, বদ্যিদের বীণা, বামুনদের বিমলা, সবাই যেন তোমার জন্যে হেদিয়ে উঠেছে দিদি! কবে আসবে লিখো, শীঘ্র এসো, মনে থাকে যেন—আর একটি ছোট্ট অতিথি আসছেন, তার সব ভার তুমি নেবে বলে প্রতিশ্রুত হ'য়ে আছো! কী-যে হবে! আমার তো ভাই বড্ড ভয় ক'রছে! মরি-বাঁচি—তোমাকে যেন তখন কাছে দেখতে পাই, এইটুকুই শুধু প্রার্থনা—আজ তবে আসি। ইতি—

তোমার 'কালো' মেঘের বিজলী।

পত্র দু'খানা পড়ে হঠাৎ বাড়ী ফেরবার জন্য সুহাসের মনটা যেন উতলা হ'য়ে উঠলো! কিন্তু, পরক্ষণেই তার মনে পড়লো বাড়ী আর তার কোথায়? এও যা—সেও তাই! পরের বাড়ী—পরের ঘর! একটা সুদূর সম্পর্কের সূত্র ধ'রে সেখানে গিয়ে ঢুকেছে বই ত নয়—কিন্তু সেখানে থাকবার তার অধিকার কোথায়? তাদের অন্ন মুখে তোলবার মূল্য ধরে দিতে হয় তাকে প্রতিদিন! ····

আচ্ছা···নিজে স্বাধীনভাবে জীবিকা-উপার্জ্জন করে থাকবার কোনও উপায়ই কি নেই এ দেশের মেয়েদের? হয় বাপ-মার—নয় ভায়েদের—নয় স্বামীর বা তাঁর অবর্ত্তমানে ভাশুর বা দেবর—বা আর-কারুর গলগ্রহ হ'য়ে থাকা ছাড়া কি এ দেশের মেয়েদের আর অন্য কিছু গতি নেই? ··

দাদাকে যতবার এ প্রশ্ন করেছে সে—ততবারই ডাক এসেছে—"আমার কাছে চলে আয়!" দাদা এটা বোঝেন না কিছুতে যে, তাঁর কাছে এসে থাকা মানে বউদির বাঁদিগিরি করা! সুহাস সব পারবে—শুধু ঐটি পারবে না।

ওখানে বড়মাসীমা, কালো ঠাকুরপো, বিজলী, ন'ঠাকুর-পো সবাই তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখে—তাই সে কোনও রকমে টিঁকে আছে—নইলে সে যে কী ক'রতো ভগবান জানেন! মাসীমার বাক্যবাণ তাকে বিদ্ধ করে বটে, কিন্তু তাঁর অবস্থা যে এ অভাগীর চেয়েও শোচনীয় এইটে স্মরণ করেই সে এই বুদ্ধিহীনার সকল অপরাধ বরাবর ক্ষমার চক্ষে দেখে এসেছে।

কিন্তু, সে যাই হোক্, ভবিষ্যৎ তার যত অন্ধকারেই তলিয়ে যাক্‌না কেন, ঠাকুরপোর বউভাতে গিয়ে তাকে আমোদ আহ্লাদ ক'রে আসতেই হবে। শুধু যে তাদের বাড়ী এতদিন থাকা ও খাওয়ার ঋণ হিসাবে, তাই নয়, ওদের সবার এই স্নেহ-ভালবাসা ও প্রীতি-শ্রদ্ধার প্রতিদান হিসাবেও বটে।

সুহাস স্নানান্তে তার রাশিকৃত কালো চুল পিঠের উপর এলিয়ে দিয়ে গৌরমোহনের চিঠিখানা সত্যেনকে দেখাতে গেল। সত্যেন তখন ড্রয়িং রুমে বসে চা পান করছিল এবং মন্দা খানকয়েক গরম শিঙাড়া ভেজে নিয়ে এসে সত্যেনকে চায়ের সঙ্গে খাবার জন্য অনুরোধ করছিল। সুহাসকে ঘরে ঢুকতে দেখেই মন্দা তার মাথার কাপড়টা বাঁহাতের তালু দিয়ে চেপে একটু সামনে দিকে টেনে দিলে।

সুহাস মন্দার এই রকম দেখে হেসে উঠে বললে—বৌদি! তুমি বাপু আর আমাকে দেখে দাদার সামনে অমন ক'রে মাথায় কাপড় দিওনা। আমি তো আর তোমার সেকেলে দিদিশাশুড়ী নই যে নিন্দে করবো। দিনরাত এই মাথায় কাপড় দিয়ে থাকাটা আমার তো ভাই যেন এক শাস্তি বলে মনে হয়! এখানে এসে এই ক'দিন আমি বেশ মনের সাধ মিটিয়ে মাথার কাপড় খুলে বেড়াচ্ছি। অবশ্য শ্বশুরবাড়ীতেও নিরবিলি যখন নিজের ঘরটিতে গিয়ে ঢুকি তখন সবার আগে মুক্তি দিই আমার মাথাটাকে এই ঘেরাটোপ থেকে।

মন্দা মৃদু হেসে বললে—তা যা বলেছো ঠাকুরঝী! ওটা আমারও কেমন বরদাস্ত হয় না। শাশুড়ী ননদ কি শ্বশুর ভাশুর নিয়ে ত' ঘর ক'রতে হয়নি কোনদিন, তাই ও ঘোমটা টানাটায় আমি তেমন রপ্ত হয়ে উঠতে পারিনি! আর তোমার গুণধর দাদাটিও ওটা পছন্দ করেন না! দেখলে তো সেদিন নিজের চোখেই রান্নাঘরে এসে ঢুকেছিলেন আমার মাথার কাপড় খুলে দিতে!

সত্যেন মন্দার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—বুড়ির তো দেখছি রাত্রি প্রভাত না হতেই স্নান শেষ হ'য়ে গেছে, ওকে জলটল খাবার কিছু খেতে দিয়েছো কি?

সুহাস ব'লে উঠলো—দোহাই দাদা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, বৌদিকে আর লেলিয়ে দিওনা! ব'লে একে মনসা

তার ধুনোর গন্ধ! ওঁর খাওয়ানোর ঠেলায় আমাকে পালাই পালাই ডাক ছাড়তে হ'য়েছে! উনি মনে ক'রেছেন ভাইটি যখন এমন একটি ভোজন-বিলাসী, তখন বোনটীও কোন না একটি মস্তবড় পেটুক হবেন!

সত্যেন হাসতে হাসতে বললে—কথাটা নেহাৎ মিথ্যে বলিসনি বুড়ি, মন্দির আমাকে একটা প্রকাণ্ড 'খাদক' বলেই মনে ক'রে বটে! এই দেখনা তার সাক্ষী—সক্কাল বেলা এক প্লেট গরম শিঙাড়া ভেজে নিয়ে এসেছে—এমন জিনিস মুখে দেবার লোভ কি সহজে ছাড়া যায়? আমি তো আর শুকদেব গোস্বামী হ'য়ে উঠিনি!—বলতে বলতে মন্দার হাতের কাচের প্লেটখানি থেকে একটি গরম শিঙাড়া তুলে নিয়ে তাতে একটি কামড় দিয়ে সত্যেন তাপ, সহনের জন্য ঘন ঘন ফুঃ ফাঃ শব্দ ক'রতে ক'রতে চর্ব্বণ সুরু করে দিলে।

মন্দা বললে-ওঁর কথা একটিও বিশ্বাস কোরোনা ঠাকুরঝী! আহার নিদ্রা প্রায় জয় করে সিদ্ধপুরুষ হ'য়ে উঠছিলেন আর কি—ভাগ্যে তুমি এসেছিলে, তাই এটা সেটা দেখছি দয়া ক'রে মুখে তুলছেন। নইলে ওঁকে আমার 'পাবাহারী স্বামী' বলা যেতে পারতো!

সত্যেন খুব উৎসাহের সঙ্গে আর একখানা শিঙাড়া মুখে পু'রে বললে—চমৎকার শিঙাড়া তৈরি করেছে মন্দা। তুই একখানা খেয়ে দেখ বুড়ি—

বাধা দিয়ে মন্দা বললে—ঠাকুরঝীর জন্যে আলাদা ক'রে নিরামিষ হেঁসেলে খানকয়েক তুলে রাখিয়েছি। এ ক'খানা তুমিই খেয়ে ফেলো, তোমারই নাম করে এনেছি।

সত্যেন দুষ্টুমীর হাসি হেসে বললে—তাই বুঝি এ থেকে একটু কোণ ভেঙেও তুমি কাউকে দিতে দেবেনা?

সুহাস মন্দার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার চেয়ে দেখে বললে—আর ভাই তোমার এখানে আমার খাওয়া এইবার উঠলো। গোয়ালে ফেরবার ডাক পড়েছে—একেবারে জোর-তলব। এই চিঠি পড়ে দেখো!—

সত্যেন বাঁহাতে চিঠিখানা নিয়ে ডানহাতে আর একখানা শিঙাড়া খেতে খেতে চিঠির উপর চোখ বুলিয়ে দেখে ব'লে উঠলো—সে কি! এর মধ্যেই ডেকে পাঠালে চলবে কেন?

সুহাস বল'লে—কি করবে? বাড়ীতে যে নতুন বউ এসেছে! একটু বউভাতের আয়োজন তো ক'রতে হবে?

সত্যেন বললে—তা' সেটা দিনকতক প'রে ক'রলে হয় না বুড়ি?—

সুহাস তার চোখে-মুখে একটা বিস্ময়ের ভঙ্গী ফুটিয়ে তুলে বললে—তোমার কি মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে? বউভাত নববধূকে নিয়েই করতে হয়। ও কি আর ভবিষ্যতের জন্য মুলতুবি রাখা চলে?

সত্যেন হতাশভাবে বললে—না, তা রাখা চলেনা বটে! তা তুই কবে যেতে চাস বুড়ি?

সুহাস সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে—আজই কি কোনও যাবার উপায় হ'তে পারেনা?

মন্দা এতক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে এদের ভাইবোনের আলাপ শুনছিল, কিন্তু, আর সে চুপ ক'রে থাকতে পারলেনা। একেবারে উত্তেজিত হ'য়ে উঠে বললে—কি রকম? আজই যেতে চাইছো কি বলে ঠাকুরঝী? তোমারই অনুরোধে আমি আজ অনিলাকে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েছি, সুনীলও আসবে—দাদাও আসবেন, তোমার দুই দেওরকেও বলা হ'য়েছে। একটা ছোটখাটো যজ্ঞির আয়োজন করিছি, আর তুমি কি না আজই পালাবার মতলব ক'রছো? বেশ মজার লোক ত' দেখছি!

সুহাস অপ্রতিভ হ'য়ে বল'লে—ওমা! তুমি বুঝি এর মধ্যে এত কাণ্ড ক'রে বসে আছো বউদি! তবে আর আজকে কি ক'রে যাওয়া হবে—

সজোরে ঘাড় নেড়ে মন্দা বললে—কিছুতেই আজকে হ'তে পারে না! যাবেই তো চলে জানি। চিরদিন কিছু আর তোমায় ধ'রে রাখতে পারবোনা, কিন্তু, আজকে যাওয়ার কথা তুমি একেবারে ভুলে যাও—

—অনিলা কখন আসবে ব'লেছে বউদি?

—এখনি এলো ব'লে। আমি তাকে এইখানে এসেই সে স্নান করবে ভাত খাবে ব'লে পাঠিয়েছি—

সুহাস সত্যেনের মুখের দিকে চেয়ে বললে—তাহ'লে আজ আর হ'লোনা দাদা। তুমি কিন্তু কাল আমার যাবার সব ব্যবস্থা করে রাখো—

সত্যেন উদাস ভাবে বললে—আচ্ছা, সে কালকের ব্যবস্থা কাল হবে। হাঁ, ভালো কথা—মণিটা আজ কখন আসবে বলে গেছে মন্দা? কালরাত্রে বিশবার যেতে মানা করলুম—তা কিছুতেই শুনলেনা!—

মন্দা বল্‌লে—সকালেই উঠে কিছু বাজার ক'রে নিয়ে এখানে আসতে বলে দিয়েছিলুম তো, এখন কি করবেন সে তিনিই জানেন। যে খামখেয়ালি মানুষ।

—এঃ! তুমি বুঝি তার ঘাড়ে আবার কিছু বাজার হাটের বোঝা চাপিয়েছো? তবেই সে আর এসেছে! আমি তাকে শুধু তার বাঁশিটি নিয়ে আসতে ব'লে দিয়েছিলুম। অনেকদিন শুনিনি! আচ্ছা বুড়ি! তোর গানটানগুলো কিছু মনে আছে—না গাইতে একেবারে ভুলে গেছিস? গলার অবস্থা কি রকম?—অনেকদিনই তো ও সব চর্চ্চা ছেড়ে দিয়েছিস শুনেছি—

সুহাস বললে—শুনেছো ঠিকই, ও-সব চর্চ্চা নেই বহুকাল। তবে নেহাৎ যদি আমার গলায় একটু গানের ভ্যাংচানি শোনবার ইচ্ছা জেগে থাকে তোমার—আমি একটু আধটু চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি।

—লক্ষীটি বোন্—একখানা ভৈরবী গেয়ে যদি এই সকাল বেলাটাকে ভরিয়ে দিতে পারিস—তাহ'লে আজকে মন্দাকিনীর এই বান্ধব-সম্মিলনটা সার্থক হ'য়ে ওঠে!

সুহাস আর দ্বিরুক্তি না ক'রে আস্তে আস্তে অর্গ্যানটার কাছে এগিয়ে গেল এবং ডালাটি খুলে মিউজিক টুলখানিতে বসে মন্দার দিকে চেয়ে বললে—বৌদি, ননদের হাড়ি-চাঁচা গলা শুনে যেন হেসনা ভাই! গাইতে জানলে কখনই এক কথায় আমি বাজনার কাছে এসে বসতুম না জেনো! গলাটা আজ ভালো নেই, সর্দ্দি হ'য়েছে, শরীরটা খারাপ, মনটা ঠিক নেই—ইত্যাদি গায়কজন-সুলভ নানাপ্রকার মামুলি আপত্তি করতুম। কিন্তু, ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে জানোতো—"The fool rushes in where the Angel fears!" তাছাড়া, গাইতে জানি বা না জানি—দাদার কাছে চেঁচাতে আমার কোনও লজ্জা নেই, কিন্তু, লজ্জা ক'রে ভাই তোমাকে, তুমি তো শুধু নতুন মানুষ নও—একজন পাকা সমজদার—গান শুনে এখনি হয়ত তার ভালমন্দর সমালোচনা ক'রতে ব'সবে—

বাধা দিয়ে মন্দা বললে—ইনি তোমায় গান শোনাতে ব'লেছেন ঠাকুরঝী, বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করেন নি। তবে আমার সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারো—কারণ বারোআনা বাঙালীর মেয়ের মতোই গানে আমার বিদ্যে একেবারে চতুষ্পদ! রাগরাগিণী দু' একটার নাম শুনেছি বটে, কিন্তু তাদের রূপ কি তা চিনিনি। সুতরাং সমালোচনার কোনও আশা রেখোনা ভাই আমার কাছে। তবে, আমার বাবুকে যদি তুমি গান শুনিয়ে খুশী করতে পারো তাহলে বাঈজী, তোমাকে আমি খুব ইনাম দেবো—

—যো হুকুম বিবিজান! ব'লে হেসে বাঈজীদের ঢংয়েই একটি সুললিত সেলাম ঠুকে সুহাস বাজনার দিকে ফিরে চেয়ে দু'হাতে তার বুকে যেন স্বর্গের সুর ঢে'ল দিলে—

তারপর কখন যে সেই সুরের সঙ্গে নিজের মধু কণ্ঠের অমৃত ঝঙ্কার মিশিয়ে দিয়ে সেদিন কাজলগাঁয়ের প্রভাত আকাশটিকে সে দণ্ডকালের জন্য মুখরিত ক'রে তুললে তা সে নিজেই বুঝতে পারলেনা।

সুর-তান-লয়ের ত্রিবেণী-সঙ্গমে অবগাহন করে সুহাসের সঙ্গীত যখন সুছন্দ সোমে সমাপ্ত হ'লো, ঘরের চারিদিক থেকে উচ্চ প্রশংসার ধ্বনি উঠে তাকে সচকিত ক'রে তুললে! তার মধ্যে মণীন্দ্রের গলাটাই যেন সবচেয়ে বেশী করে তার কাণে এলো।

সে সহাস্যমুখে চারিদিকে তার সন্ধানে ফিরে চাইতেই ঘরের মধ্যে একাধিক স্ত্রী-পুরুষের অপরিচিত মুখ তার চোখে পড়লো।

সবার পিছনে দেখে বাঁশীটি হাতে ক'রে তার নবীন বন্ধু দাঁড়িয়ে!

সুহাস হাতছানি দিয়ে মণীন্দ্রকে কাছে ডাকলে। তার বাঁশীটি চেয়ে নিয়ে একটু হাতে করে নেড়ে চেড়ে দেখে মণীন্দ্রকে ফিরিয়ে দিয়ে বললে—বাজাও একটু শুনি।

অন্যান্য শ্রোতারা ঘোরতর আপত্তি ক'রে বললে—না, না, আপনি গান করুন আরও! আপনার গান শুনতে চাই আমরা!

তাদের এই অসভ্যতায় বিরক্ত হ'য়ে সুহাস ব'ললে—কিন্তু, আমি আর গান শোনাতে চাইনা, আমি একটু বাঁশী শুনতে চাই—

সকলে সমস্বরে ব'লে উঠলো—না না বাঁশী পরে হবে, আপনি আর একটা গান ধরুন—আপনাকে আমরা ছাড়বোনা—

সুহাসের চোখে মুখে তৎক্ষণাৎ একটা কিসের যেন দৃঢ় সঙ্কল্প ভেসে উঠলো। সে আর একটী কথাও না ব'লে বাজনার ডালা বন্ধ ক'রে উঠে পড়লো এবং ঘরের ভিতরের

সমস্ত লোককে অবাক্ ক'রে দিয়ে মণীন্দ্রর হাত ধরে সে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল!

বিস্ময়ের প্রথম চমকটা কেটে যেতে না যেতেই সব প্রথম সুশীল বলে উঠলো—কি স্কাউণ্ড্রেল! এতগুলো লোকের আমোদ মাটি ক'রে দিয়ে ওঁকে বাইরে তুলে নিয়ে চলে যাওয়াটা কি ডাক্তারের ভদ্রতা হ'লো?

অনিলা চুপি চুপি এ কথার প্রতিবাদ ক'রে মন্দাকে ডেকে ব'ললে—তোমার ননদ-ঠাক্‌রুণই ত' মণিদা'কে টেনে নিয়ে বাইরে উঠে চলে গেলেন—এতে আর ওঁর অপরাধটা কি হ'লো?

মন্দা ফিস্ ফিস্ করে সত্যেনকে বললে—তোমার বোনের কিন্তু এ কাজটা তেমন ভাল হ'লো না বাপু!

সত্যেন উদাস ভাবে ব'ললে—ও বরাবরই ওম্‌নি একগুঁয়ে। কিছু গ্রাহ্য করে না।

অনিলা আবার মন্দার কাণে কাণে ব'ললে—তা ওঁর রাজরাণী বোনটি কি আমাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতেও ঘৃণা বোধ করেন। একবার তো কারুর দিকে ফিরে চেয়েও দেখলেন না—!

মন্দা বল'লে—যা বলবার ওঁকে তুমি কেন নিজে সামনা-সাম্‌নিই বল'না ভাই। আমি আর তোমার দোভাষীর কাজ করতে রাজি নই—

মন্দার কথাগুলো সত্যেনের কাণে আসতেই সে উঠে সুশীলকে মন্দার কাছে টেনে নিয়ে এসে বল'লে—ইনি আমার স্ত্রী—শ্রীমতী মন্দাকিনী—আপনার পত্নীর বাল্যবন্ধু—আপনাদের মধ্যে আলাপ না থাকাটা অন্যায় কিন্তু—

সুশীল সহাস্যমুখে মন্দাকে একটি নমস্কার ক'রে বললে—ওঁর পরিচয় আমার স্ত্রীর মুখে প্রায় প্রতিদিনই পাই, সুতরাং ওঁকে জান্‌তে আর আমার কিছু বাকী নেই—চাক্ষুষ পরিচয়-টুকুই এতদিন শুধু বাকী ছিল—আজ তা লাভ ক'রে ধন্য হলুম—

মন্দা সুশীলকে প্রতিনমস্কার ক'রে ব'ললে—

চাক্ষুষ পরিচয়ের পথ যে এতদিন আপনিই বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়েছিলেন সুশীলবাবু। অনিলা আপনার হুকুম না পেলে কিছুতেই দত্তমশায়ের সামনে বেরুতে বা আলাপ ক'রতে রাজি হয়নি, তাই আমাকেও আপনাদের মতো অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছ থেকেও বাধ্য হয়ে আড়ালে থাকতে হ'য়েছিল।

সুশীল মন্দার রূপ দেখে আকৃষ্ট হ'য়েছিল, এখন তার কথা শুনে মুগ্ধ হ'য়ে গেল!

তাড়াতাড়ি হাতজোড় ক'রে বল'লে—অপরাধ হ'য়েছে স্বীকার করছি; কিন্তু, সত্যেনবাবুর মতো সাধু ও সচ্চরিত্র লোকের সামনে বেরুতে বা তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রতে আমি কোনও দিনই আপনার বন্ধুকে নিষেধ করিনি।—তবে হ্যাঁ—ওই বিলেত-ফেরতদের আমি বড় ভয় করি। আপনি কিছু মনে ক'রবেন না,—আপনার দাদার সম্বন্ধে আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছু বলছিনি—আমি বলছি ওই দলটাকে! ওঁরা কি এক-রকমের যেন! হিন্দু সমাজটাকে ওঁরা লণ্ডনের একটা ফ্যাশানেবল্ সোসাইটি ক'রে তুলতে চান্! বিশেষ বন্ধু-বান্ধবের স্ত্রীর সঙ্গে এমন বিশ্রী ব্যবহার করেন যেন তারা বন্ধুদের রক্ষিতা স্ত্রীলোক—বিবাহিতা পত্নী ন'ন!—এইটে ওঁদের আমি সহ্য ক'রতে পারিনি, তাই নির্ব্বিচারে সবার সঙ্গে মিশতে নিষেধ ক'রেছি। কিন্তু সত্যেনদা'র কথা স্বতন্ত্র—উনি দেবতুল্য লোক—

অনিলা ঝঙ্কার দিয়ে ব'লে উঠলো—ক'টা বিলেত-ফেরতের সঙ্গে উনি মিশেছেন জিজ্ঞাসা করো তো ভাই? মিছিমিছি কতকগুলো পচা পুরোনো ধারণা নিয়ে কেবল নিজের মনটাকেই যতদূর সম্ভব কলুষিত ক'রে ব'সে আছেন। এ সব লোককে বিলেতে পাঠিয়ে দিয়ে' একটু মেজেঘষে সাফ্ ক'রে আনা দরকার—তবে যদি কোনও কালে ওরা আমাদের মণিদা' প্রভৃতির মতো একজন 'হায়ার প্লেনের' মানুষ হ'তে পারেন! নইলে ওঁকে নিয়ে ঘরকরা তো আমার পক্ষে দিনদিন অচল হ'য়ে উঠছে দেখছি!—

—ওই শুনুন! আপনি ওর সব কথাবার্ত্তা শুনছেন কি?—এর পরও কি বলেন-স্ত্রী-স্বাধীনতা ভালো—সকলকার সঙ্গে তাদের মিশতে দেওয়া উচিত!—ফল তো হাতে হাতেই দেখছেন—স্বামী বেচারা পড়ে গেলো একেবারে লোয়ার প্লেনে! আর জগতের সমস্ত পরপুরুষ একেবারে চড় চড় করে' উঠে পড়লো—'হাইয়ার প্লেনে!' অতএব—এখন আমার সঙ্গে ঘর করা ওঁর পক্ষে তো অচল হ'য়ে উঠবেই!—নয় কি?—

এই ব'লে সুশীল প্রথমে সত্যেনের দিকে—তার পর

মন্দার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে উত্তরের অপেক্ষা ক'রতে লাগলো!

তাদের এই স্বামী স্ত্রীর মনোমালিন্যের মধ্যে পদক্ষেপ করবার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি মন্দা বা সত্যেন কারুরই ছিলনা, কাজেই তারা দু'জনে চুপ ক'রে রইল। কিন্তু মন্দার এক-একবার প্রবল লোভ হ'তে লাগলো যে বলে—একহাতে কখনও তালি বাজেনা!

সুশীল এবার সত্যেনের দিকে ফিরে ব'ললে—আপনি কি বলেন? এ কি ভালো?

সত্যেন গম্ভীরভাবে ব'ললে—ভালো কি মন্দ সে তর্ক আমি করতে চাইনি সুশীলবাবু—আমি শুধু এইটুকু জানি ও মানি যে—কোনও মানুষেরই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবার আমার অধিকার নেই—

বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে সুশীল বললে—বলেন কি আপনি?—নিজের স্ত্রী পুত্রকেও শাসনে রাখবার অধিকার থাকবে না আমার?—

—না সুশীলবাবু, স্ত্রী যদি অশিক্ষিতা বালিকা না হয়, পুত্র যদি অপ্রাপ্ত-বয়স্ক না হয়, আপনার কোনও অধিকার নেই তাদের উপর জুলুম করবার—

মন্দা হাসতে হাসতে বললে—সেখানে বরং বন্ধুবান্ধবদের উচিত আপনাদের একটু শাসন করা—

সুশীল কিছুতেই এ কথাটা স্বীকার ক'রে নিতে পারলে না! নিজের স্ত্রীকে শাসন করবার অধিকার নেই—এরা বলে কি?—পাগল! পাগল! কড়া শাসনে না রাখলে কি কখনও মেয়েমানুষ ঠিক্ থাকে? ওই তো ওঁর ভগ্নী—শুনলুম বিধবা—কিন্তু বেশভূষায় তো দেখলুম— একেবারে বিবি! বল নাচের যে কোনও মেমসাহেবকেও হারিয়ে দিতে পারেন! গায়ে শায়া সেমিজ, পরনে ধোপদস্ত সাদা ধুতি তা আবার হাল ফ্যাসানের ঘাগরা করে ঘুরিয়ে পরা—চুল তো মাথায় যেমনকার তেমনি—কোঁকড়া চামরের মতো থানকে-থান বজায়। পিয়ানো হারমোনিয়াম নিয়ে গান বাজনাও ক'রে থাকেন—দিল্লীর বাইজীই বা কোথায় লাগে!—আবার দাদার সম্বন্ধীর হাত ধ'রে ঘর থেকে নিরিবিলিতে বেরিয়ে যাওয়াও আছে!—এসব চাল কি আমরা বুঝিনি?—বয়স তো বেশী নয়—রূপেও সবাইকে টেক্কা দেয় দেখছি! না, বাবা, এ সুযোগ কিছুতে ছাড়া হ'বেনা! একবার বেয়েচেয়ে দেখতেই হ'চ্ছে!—উনি যে একলা স্ফূর্ত্তি লুটবেন তা সইবেনা প্রাণে! সাধে কি আর লোকে ব'লে—বড় ঘরের বড় কাণ্ড!

হঠাৎ বাঁশীর সুরের ঝরণা-ধারা তাদের কাণে যেন কোন্ যাদু-মন্ত্রের এক প্রবল আকর্ষণ নিয়ে এল—

অনিলা ব্যস্ত হয়ে উঠে মন্দাকে জিজ্ঞাসা ক'রলে—কোথায় বাঁশী বাজছে ভাই?

মন্দা বললে—এ নিশ্চয় অন্দরের বাগানে ঘাটের ধারের সেই মালতী কুঞ্জটার ভিতর থেকে আসছে। ঠাকুরঝীর সেই জায়গাটা ভারী পছন্দসই। বলে, ছেলেবেলায় সারা দুপুর আমি ওর নীচেয় খেলা করতুম। দাদাকেও বোধ হয় ওইখানেই টেনে নিয়ে গেছে।

অনিলা সাগ্রহে বললে—চলোনা একটু যাই, বাঁশী শুনে আসি—

সুশীল অনিলার রকম দেখে বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বললে—আহা! শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরী শ্রবণে শ্রীরাধা যেন ব্যাকুলা হ'য়ে উঠেছেন!—নিয়ে যান, নিয়ে যান সখী, নইলে শ্রীমতী হয়ত' এখনি মূর্চ্ছিতা হ'য়ে প'ড়বেন!—

মন্দা হাসতে হাসতে বললে, তা যেন নিয়ে যাচ্ছি—কিন্তু, আয়ান ঘোষ মশাই শেষে মাথায় লাঠি বসিয়ে দেবেন না তো?—

বলতে বলতে সে অনিলাকে নিয়ে চলে গেল—ঘরের সমস্ত শোভা সৌন্দর্য্য ও আলো যেন সুশীলের চোখের সামনে দপ্ ক'রে নিভে গেল!

ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে সে একবার সত্যেনের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। তার মনে হ'লো সত্যেন যেন উৎকর্ণ হ'য়ে প্রভাতের হাওয়ায় ভেসে আসা সেই বাঁশীর সুরটিই শুনছে!

তখন একটু ছটফট্ ক'রে উঠে, খানিকটা ন'ড়ে চ'ড়ে সুশীল বললে—তবে আর শ্রীদাম সুদামই বা প'ড়ে থাকে কেন? চলুন না গোষ্ঠে যাওয়া যাক্—শ্যামের বাঁশীই শুনিগে—

—এঁ্যা কি বলছেন—?

স্বপ্নোত্থিতের মতো চমকে উঠে সত্যেন এই প্রশ্ন করলে। পরে সুশীলের অভিপ্রায় অবগত হ'য়ে গোকুলকে ডেকে ব'লে দিলে বাবুকে অন্দরের বাগানে পৌঁছে দিয়ে এসে আমার ক'লকেটা ব'দলে দিয়ে যা—

সুশীল ভাবলে—হাজার হোক্ নিজের বোন্ তো, তার বেহায়াপনা বড় ভাই হ'য়ে আর কি ক'রে দেখতে যাবে? তাই বোধ হয় সত্যেন আর গেলনা—

—এ বরং ভালই হ'লো—এই ভেবে সুশীল বেশ স্ফূর্ত্তির সঙ্গেই গোকুলের পিছু পিছু অন্দরের বাগানে চলে গেল।

একটু পরেই গোকুল তামাক দিয়ে গেল। সত্যেন গুড়গুড়ির নলটা মুখে দিয়ে অলসভাবে টানতে টানতে ভাবছিল কাল রাত্রের কথা। মন্দার সঙ্গে তার সেই প্রথম ঘনিষ্ঠ মিলনের সুখস্মৃতি নয়। সত্যেন ভাবছিল তার দুঃখিনী বোন্—সুহাসের কথা। অকস্মাৎ মণীন্দ্রের সঙ্গে তার এই অন্তরঙ্গতা দেখে মন্দা সুহাস সম্বন্ধে যে সন্দেহ ক'রছে সত্যেন তার কোনও উপযুক্ত কৈফিয়ৎ দিতে পারছে না। তার উপর আজ এইমাত্র সে যে কাণ্ডটা ক'রে বসলো, তাতে, মন্দার মুখ বন্ধ করবার তো আর কোনও উপায়ই রইলনা!

এমন সময় উচ্ছ্বসিত তরল হাসিতে মন্দা তার মদনের ফুলধনুর মতো অধরোষ্ঠ রঞ্জিত করে এসে বললে—এখানে বসে কি করছো?—চলো চলো একবার যুগল-মিলন দেখে চক্ষু সার্থক করে আসবে চলো! মালতীর ঝোপে বসে আমার দাদাটি বাঁশী বাজাচ্ছেন, আর তোমার বোনটি সেই সুরে সুর মিলিয়ে গান ক'রছেন! অথচ আমরা যখন এত খোসামোদ করলুম আর একখানি গান শোনাবার জন্য, রাজরাণী সে কথা কানেই তুললেন না—

সত্যেন এবার গুড়গুড়ির নলটিতে জোরে জোরে গোটাকতক টান দিয়ে বললে—সেটা কি একটা খুব মস্তবড় অপরাধ মন্দা? এই তো একটু আগে এই ঘরে বসে সবার সামনে সে যখন গাইছিল, তোমার দাদা এসে তো পিছন থেকে সমানে তার সঙ্গে বাঁশী বাজাচ্ছিল, তাতে কেউ ত কিছু মনে করেনি। আর যেই তারা একটু নিরিবিলিতে গিয়ে সঙ্গীত চর্চ্চা ক'রছে—অমনি সেটা একেবারে 'যুগল-মিলনে' দাঁড়িয়ে গেল! ছিঃ মন্দা—তোমার মুখ থেকে আমি এ-রকম কথা কখন শুনবো আশা করি নি।

মন্দার মুখখানি রাঙা হ'য়ে উঠ্‌লো—সে বললে—সবার সামনে গান করা এক—আর আড়ালে গিয়ে দুটিতে গান বাজনা করা অন্য। এ যে শুনবে সেই বলবে! ঠাকুরঝী দাদাকে ডেকে নিয়ে উঠে গেল কেন?—

—উঠে গেল, তার কারণ সে বেণাবনে মুক্তা ছড়াতে রাজি নয়! একটি মাত্র গুণী ও সমঝদার এ আসরে ছিল—কাজেই বুড়ি তাকে ডেকে নিয়ে একটু নিরালায় গেল—তোমাদের মতো সব আনাড়ীর গণ্ডগোল থেকে তার সুরের সাধনাটুকু রক্ষা করবার জন্য।

এ কথার জবাবে মন্দা কি একটা কড়া কথা বলতে যাচ্ছিল; কিন্তু সেই সময় গোকুল এসে খবর দিলে—দিদিমণির শ্বশুরবাড়ী থেকে গৌরবাবু আর হরিবাবু এসেছেন—

সত্যেন তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে মন্দাকে বললে—যাও বুড়িকে খবর দাওগে, আর ওদের সব এখানে ডেকে নিয়ে এসো—

মন্দা চলে গেল। সত্যেন নিজে গিয়ে খুব খাতির যত্ন করে ওদের দু'ভাইকে ওপরে ডেকে নিয়ে এসে বসালে।

একটু পরেই মণীন্দ্রের সঙ্গে সুহাস সে ঘরে এসে ঢুকলো। গৌরমোহন ও হরিমোহন সুহাসকে প্রণাম করলে। সুহাস হরিমোহনকে জিজ্ঞাসা করলে—কেমন আছো গো ন' ঠাকুরপো? শুনলুম রাঁচী থেকে নাকি একেবারে একটি বউ নিয়ে এবার সস্ত্রীক বাড়ী ফিরেছো! তা বেশ করেছো ভাই, কিন্তু এ কাজ লুকিয়ে করবার কি কোনও দরকার ছিল? আমাদের বললে কি আর আমরা তোমার একটি ভালো দেখে বউ করে দিতে পারতুম না?—

হরিমোহন লজ্জায় ঘাড় হেঁট করে আছে দেখে গৌরমোহন ব'ললে—তা ওর দোষ কি রাঙাবউদি? মাসীমার পীড়াপীড়িতেই ওকে এ কাজ করতে হ'য়েছে।

—হ্যাঁ, এখন ও কথা বলা ছাড়া আমাদের মান বাঁচাবার আর উপায় কি বলো কালোঠাকুরপো? তা ন'ঠাকুরপো যা করেছে—সত্যি কথা ব'লতে কি—আমি এতে খুব খুশী হ'য়েছি। দেখো, জীবনের অনেক কাজ হয়ত' অন্য লোকের মারফৎ হ'তে পারে, কিন্তু, এই বিয়ে করাটা তৃতীয় ব্যক্তির সাহায্যে সুসম্পন্ন করার আমি মোটেই পক্ষপাতী নই। ও নিজে দেখে শুনে নেওয়াই ভালো!

—নিশ্চয়! আমিও তোমার এ মত সম্পূর্ণ অনুমোদন করি সু! কি বলো সত্যেন! তোমার কি মত?—এই বলে মণীন্দ্র সত্যেনের দিকে ফিরে চাইতেই গৌরমোহন তার রাঙাবউদিকে চোখের ইঙ্গিতে প্রশ্ন ক'রলে—ইনি কে?

—ওঃ তোমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে ভুলে

গেছি—ইনি হ'চ্ছেন মণীন্দ্রবাবু, বউদির বড় ভাই এবং আমার বিশেষ বন্ধু—একজন বিলেত-ফেরত মস্ত ডাক্তার—আর ইনি গৌরমোহনবাবু ওরফে আমার কালোঠাকুরপো, আর ইনি হরিমোহনবাবু ওরফে আমার ন'ঠাকুরপো।

মণীন্দ্র ইংরাজী আদবকায়দায় ওদের দুই ভা'য়ের সঙ্গে 'শেকহ্যাণ্ড' ক'রে হাসতে হাসতে বল্লে—বেশ! বেশ!—আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ ক'রে ধন্য হলুম!

এই সময় মন্দা এসে ঘরে ঢু'কলো এবং গৌরমোহনকে অভ্যর্থনা ক'রে ব'ললে—আপনি ত' বেশ লোক! মাঝে মাঝে বেড়াতে আসবেন ব'লে সেই যে ডুব মারলেন আর দেখাই নেই! ভাগ্যিস—নিমন্ত্রণ করে' পাঠিয়েছিলুম, তাই আজ পায়ের ধূলো পড়লো! কিন্তু, সে কথা যাক্, আপনার সঙ্গে আমার একটা ঝগড়া আছে। আপনি বলে গেলেন সেদিন ঠাকুরঝীকে আমরা যতদিন ইচ্ছে রাখতে পারি; কিন্তু শুনছি' নাকি কালই ওঁর বাড়ীতে ফিরে না গেলেই নয়!

গৌরমোহন বিনীতভাবে ব'ললে—কি করবো বলুন, আমার এই ছোট ভাই হরিমোহন সম্প্রতি একটি বিবাহ ক'রে ফেলাতে সব ওলোট-পালট হ'য়ে গেল! এই হপ্তার মধ্যেই 'বউভাত' করা চাই, আর বউদি না গেলে সে হবারও জো নেই—ও!

এইটি বুঝি আপনার ছোট ভাই?

হরিমোহন ভূমিষ্ঠ হ'য়ে মন্দাকে একটা প্রণাম ক'রলে।

এই সময় সত্যেন মন্দাকে সুশীল ও অনিলার কথা জিজ্ঞাসা করলে। মন্দা বললে'—'অনি' তো এতক্ষণ মালতী ঝোপের আড়াল থেকে লুকিয়ে দাদার বাঁশীর সঙ্গে ঠাকুরঝীর গান শুন্‌ছিল—

হরিমোহন ও গৌরমোহন এ কথা শুনে দুই ভাইই এক সঙ্গে একই মুহূর্ত্তে একবার সুহাসের মুখের দিকে চেয়ে দেখে তারপরই নিজেরা পরস্পরের মুখের দিকে ক্ষণেকের জন্য অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে' দেখলে।

সুহাসের মুখে কিন্তু কোনই ভাবান্তর দেখা গেল না।

মন্দা যেন তা লক্ষ্যই করেনি এমনি ভাবে বলে যেতে লাগল—কিন্তু সুশীলবাবু তো সেখানে ছিলেন না? আমি চলে আসবার সময় তাঁকে বাগানের মধ্যে খিড়কীর পুকুর ঘাটটার ওদিকে যেন একবার দেখেছি'লুম বলে' ম'নে হ'চ্ছে।

মণীন্দ্র বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ সেই যে ঘাটটা'তে পাড়ার মেয়েছেলেরা এসে গা ধুচ্ছে, স্নান করছে, জল নিচ্ছে—সেইদিকে তাকে যেন দেখেছি। আচ্ছা, দাঁড়ান, ডেকে আন্‌ছি ব'লেই সে চকিতের মধ্যে বেরিয়ে গেল।

সুহাস ব'ললে—বৌদি, এঁরা অনেকদূর থেকে এসেছেন,—এঁদের একটু গরম চা—আর কিছু মিষ্টি—

মন্দা শশব্যস্ত হ'য়ে উঠে' ব'ললে—ওমা, সে যে ফুলিকে আমি অনেকক্ষণ ব'লে এসেছি' পাঠাবার জন্য,—দাঁড়াও দেখে আসি কি' ক'রছে ছুঁড়ী—

হরিমোহন ও গৌরমোহন ব'লে উঠলো—না না, থাক্, সেজন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না—

মন্দা উঠে গিয়ে দে'খে—জলখাবার ঘরে ব্রীড়াবনত নববধূর মতো লজ্জারুণ মুখে ফুলি হেঁট হ'য়ে ব'সে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসছে—এবং সুশীল সেখানে উবু হ'য়ে ব'সে চা' খেতে খেতে তার সঙ্গে অত্যন্ত অশ্লীল ভাষায় রসিকতা ক'রছে—

মন্দার সাড়া পেয়ে সুশীল উঠে পড়'ল, ফুলিও সংযত হ'লো। মন্দা তাদের কাউকে কিছু না বলে দু' প্লেট খাবার তুলে নিয়ে চলে এলো এবং পথে গোকুলকে দেখতে পেয়ে, তাকে বলে দিলে—দু' কাপ চা' নিয়ে আসবার জন্য।

এদিকে মণীন্দ্র সুশীলকে খুঁজতে গিয়ে দেখে সেই মালতী-কুঞ্জের পিছনদিকে ব'সে অনিলা যেন একটি ছোট মেয়ের মতোই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে!

অত্যন্ত আশ্চর্য্য হ'য়ে মণীন্দ্র তার কাছে গিয়ে প্রশ্ন ক'রলে—এ কি! অনু? কি হ'য়েছে তোমার? কাঁদছ কেন এমন ক'রে?—

মণীন্দ্রের গলা পেয়ে অনিলা আঁচলে চোখের জল মুছে তাড়াতাড়ি প্রকৃতিস্থ হবার চেষ্টা ক'রে ব'ল্‌লে—না, কিছু না। কই, কাঁদিনি তো?

মণীন্দ্র একটু ম্লান হেসে বল্‌লে—তা' বেশ, তুমি যদি আমার কাছে থেকে তোমার এই কান্না ও কান্নার কারণটুকু গোপন রাখতে চাও—আমার কোনও আপত্তি নেই তাতে। আমি আর দ্বিতীয়বার প্রশ্ন ক'রে তোমাকে বিরক্ত ক'রবোনা।

কিন্তু, একটা কথা শুধু তোমাকে এখানে জানিয়ে রাখা উচিত যে,—যদি বলো—তবে সাধ্যায়ত্ত হ'লে আমি তোমার চোখের জল মুছিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রতে এতটুকু ত্রুটী করবো না।

এবার অনিলা হাসলে। তার চোখ দুটি কিন্তু ততক্ষণে আবার অশ্রুজলে কাণায় কাণায় পূরে উঠেছিল। হাসি-কান্নার মাঝখান থেকে সে একরকম করুণ কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—সত্যি ব'লছো মণিদা'—সাধ্যায়ত্ত হ'লে তুমি—এর প্রতিকার করবে—

মণীন্দ্র অধিকতর বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে—সে কি অনু?—আমাকে কি তুমি বিশ্বাস ক'রতে পারছো না? আশ্চর্য্য! অথচ সেদিন—

বাধা দিয়ে অনিলা বল্লে—তোমাকে অবিশ্বাস করবার মতো স্পর্দ্ধা আমার কোনওদিন ছিল না, কিন্তু, আজ আমার মনে হ'চ্ছে, তুমি এখন এমন একজনের দেখা পেয়েছো, যার কাছে তুমি আর তোমার কোনও কিছু গোপন রাখতে পারবে না!

মণীন্দ্র কথাটা শুনে যেন চমকে উঠলো! থতমত খেয়ে প্রশ্ন ক'রলে—তার মানে! তোমার কথা আমি ঠিক অনুধাবন করতে পারলুম না অনু!

অনিলা ভারী-গলায় ব'ল্লে তুমি তো মিছে কথা ব'লতেনা কখনও মণিদা, তবে কেন আমাকে এমন ক'রে কষ্ট দিচ্ছ?

মণীন্দ্র অত্যন্ত লজ্জিত হ'য়ে পড়ল, ব'ললে—ঠিক,—ঠিক বলেছো অনিলা,—আমি মিথ্যার আশ্রয়ই নিতে গেছলুম—কিন্তু, তোমার স্নেহ-দৃষ্টিকে দেখছি ফাঁকি দিতে পারিনি; সত্যেনের এই বোনকে আমার সত্যই যেন আশ্চর্য্য রকম ভ লো লেগেছে! তুমি হয় তো জানো না—আমি এই ডাক্তারী সম্পর্কে য়ুরোপের অনেক জায়গা ঘুরেছি—ভিয়েনা, বার্লিন, প্যারি, ব্রাশেলস, টোকো, লণ্ডন, অনেক জায়গায় অনেক রকম মেয়ের সম্পর্কে আসবার আমার সুযোগ ঘটেছিল—

—হ্যাঁ, মন্দাকিনী আমায় চিঠিতে লিখেছিল বটে যে, দাদা এখন য়ুরোপে ক'নে বাছাই ক'রছেন, শীঘ্রই একটি গাউন-পরা বিলিতি বউদি' সঙ্গে ক'রে নিয়ে হাজির হবেন!

—কথাটা কিছু সে মিছে ব'লেনি, অনু! সে একরকম ক'নে বাছাই করাই বটে! কিন্তু, একজনও তাদের মধ্যে বেশ মনের মতো মেয়ে পেলুম না! অগত্যা একলাই। ফিরে আসতে হ'লো। ও সাদায় কালোয় ঠিক মেলে না!

অনিলা বললে—কালোয় কালোয়ও যে সব সময় মেলে তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই মণিদা!—

—হ্যাঁ, আমি মন্দার মুখে, তোমার জীবনের ব্যর্থতার কথা কতক কতক শুনেছি বটে। তোমার জন্যে খুবই দুঃখ হয়—একটা গভীর সহানুভূতি বোধ করি—

বিদ্রূপাত্মক পরিহাসের কণ্ঠে অনিলা বললে—

—ওঃ! তাই নাকি? আমার জন্য তোমার দুঃখ-বোধ হয়? সহানুভূতি বোধ করো? সত্যি? আমার আন্তরিক ধন্যবাদ নাও! এতখানি সৌভাগ্য আমি আশা করিনি!—কিন্তু, মন্দার নিজের কথা কিছু জানো কি? সত্যেন বাবু যে আজও তাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ ক'রতে পারেনি সে খবর কি পেয়েছো?—

মণীন্দ্র অবাক্ হয়ে ক্ষণকাল অনিলার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—কেন অনিল? মন্দার অপরাধ কি?—

অনিলা হেসে বললে—অপরাধ, সে ঐ তোমার অসামান্যার আগে এসে এ বাড়ীতে পৌঁছতে পারে নি! সত্যেনবাবুর হৃদয়রাজ্য তৎপূর্ব্বেই ওই সুধাকণ্ঠি সুহাসের সুকর কবলিত হয়ে গিয়েছিল—তিনি তোমার মতো য়ুরোপ জয় ক'রে আসেন নি!

মণীন্দ্র তার মাথার বড় বড় চুলের মধ্যে ডান হাতটা ঘন ঘন সঞ্চালন ক'রতে করতে একটু দ্বিধার সঙ্গে বললে—কিন্তু সত্যেন বলছিল যে, সে ওর আপন সহোদরার তুল্য—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, উনি মন্দাকেও ওই কথা ব'লে বোঝাবার চেষ্টা করেন—অথচ সুহাস ব'লতেও অজ্ঞান হ'য়ে পড়েন দেখি!—পাড়ার মেয়ে বই ত' নয়!—সম্পর্ক ত' কিছুই নেই—এই ঠিক তোমার আমার মতই আর কি? আমি তোমায় যেমন মণিবাবু না বলে মণিদা' বলি, ও-ও তেমনি সত্যেন বাবুকে সতুদা' ব'লতো। আজকাল শুনছি 'সতু' বাদ গিয়ে শুধু 'দাদা'তে দাঁড়িয়েছে।

মণীন্দ্র অনেকক্ষণ কি ভাবলে তারপর উদাসভাবে বললে—সত্যেন যদি সুহাসকে পেয়ে মন্দাকে উপেক্ষা ক'রে

থাকে তাহ'লে আমি সত্যেনের খুব বেশী দোষ দিতে পারিনি অনু—

এ কথা শুনে অনিলা মনে মনে বললে—আর যত দোষ দেবে বুঝি তোমরা যদি এই পোড়ারমুখী অনি তার অযোগ্য স্বামীকে উপেক্ষা ক'রে আর কাউকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবেসে ফেলে! কিন্তু মুখে বললে—

—কেন ?

—প্রথমতঃ দেখো—ওদের উভয়ের এ প্রীতি আশৈশবের। দ্বিতীয়তঃ—ওরা দুজ'নে পরস্পরের যথার্থ যোগ্য ব'লে আমার মনে হয়।

তীব্রকণ্ঠে অনিলা বললে—

—তাহ'লে তুমি কেন আর ওদের মধ্যে অনধিকার-প্রবেশ করতে যাচ্ছ মণিদা'—আর তোমাদের ওই বেঁটে বদমাইস—সুশীল বাবুই বা কোন্ সাহসে আমাকে এসে বলে যে, তুমি ওকে একদিন নিমন্ত্রণ ক'রে বাড়ীতে নিয়ে আসতে পারো যদি—তাহ'লে আমি তোমাকে তোমার ওই স্কাউণ্ড্রেল মণিদা'র সঙ্গেও একদিন দেখা করবার অনুমতি দিতে রাজি আছি। আমি নিজে সঙ্গে ক'রে তোমায় তার কাছে নিয়ে যাবো, তোমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করছি—কিন্তু মোদ্দা ওকে একদিন যোগাড় করা চাই—

এ কথা শুনে রাগে মণীন্দ্রর দেহের মাংসপেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠলো। অতিকষ্টে আত্মসম্বরণ করে সে বললে—

—তোমার স্বামী তো দেখছি অত্যন্ত নীচ ও অসচ্চরিত্র!

ম্লান হেসে অনিলা বললে—

—কিছু মনে কোরো না মণিদা,—কোনও পুরুষকেই আর আমার সচ্চরিত্র বলে বিশ্বাস নেই! চোখের জল কি [illegible] পড়ছিল মণিদা'—এই নরকের পশুকে নিয়ে নিত্য [illegible]মায় ঘর ক'রতে হয়! কিন্তু আর আমি পারছিনি ভাই, [illegible] বলছি তোমাকে, এ আমার অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। [illegible]মি এখন মুক্তি চাই। এই জানোয়ারের হাত থেকে [illegible]মাকে বাঁচাবার তোমরা যদি কোনও উপায় ক'রতে না' [illegible]রা তাহ'লে আমি আত্মহত্যা ক'রে এ জ্বালা থেকে [illegible]তি লাভ করবো!

ঠিক এই সময়ে সুশীল সেখানে এসে উপস্থিত। মণীন্দ্রের [illegible] অনিলাকে নির্জ্জনে বাক্যালাপ ক'রতে দেখে সে একটা [illegible]সিত হাস্য ক'রে উঠে মণীন্দ্রকে বললে—এই যে!—বাঃ জিতা রহো বাবা! হ্যাঁ, ক্ষণজন্মা পুরুষ বটে! ঠিক্ ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছেন দেখ্‌ছি! আমি কাল থেকে আপনার একটু' ক'রে পাদোদক খাবো—আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবো যে, এবার ম'লে যেন আপনার মতো চেহারাবাজ হ'য়ে জন্মাতে পারি! সার্থক বাঁশী সেধেছিলেন বটে আপনি!—এই কলিযুগেও গোপিনীদের—ওর' নাম কি—কিছু আর বাকী থাকছে না! কিন্তু এটা কি' উচিত হ'চ্ছে দাদা! একলা এমন ক'রে আগলে' থাকলে চলবে কেন? আরও তো' সব দেবীর ভক্ত পূজারীরা রয়েছে। তাদের কি একবারও আরতির অবকাশ দেবেননা।—

মণীন্দ্রর ইচ্ছা হচ্ছিল একটি বজ্র মুষ্টিতে ওই অমানুষটার কদাকার মুখখানাকে এখনি গুঁড়িয়ে দেয়—তার বলিষ্ঠ দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ হ'য়ে উঠেছিল কিন্তু, অনিলা সে মুঠোকে তার কোমল করস্পর্শে আলগা ক'রে দিয়ে কাণে কাণে বল্লে'—এদের' বাড়ীতে কিছু যেন কেলেঙ্কারী ক'রে বোসো না'—আমরা সবাই নিমন্ত্রিত, ভুলো না।—

মণীন্দ্র শুধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার সুশীলের মুখের দিকে চেয়ে তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ ক'রে চলে গেল।

সুশীল তখন অনিলাকে বললে—তুমি দাঁড়িয়ে রইলে যে! পিছু পিছু ছুটে যাও, নাগর যে রাগ ক'রে চলে গেল!

অনিলাও তা'র এ বিশ্রী কথার কোনও উত্তর না দিয়ে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে চলে গেল।

সুশীল অনিলার এ ব্যবহারে অত্যন্ত চটে উঠে তাকে খুব শক্ত কথা কি একটা ব'লতে যাচ্ছিল, এমন সময় সত্যেন তাকে পিছন থেকে ডেকে বললে—ও সুশীলবাবু, আপনাকেই যে তখন থেকে খুঁজ্‌ছি মশাই! আসুন, এঁদের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই—

সত্যেনের সঙ্গে হরিমোহন ও গৌরমোহন দুই ভাই ছিল। সত্যেন তাদের বাড়ী ও বাগান দেখিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল।

সুহাস এই অবকাশে একবার রান্নাবাড়ীর দিকে' চলে গেছল, মন্দাকে অতিথিসৎকারের আয়োজনে সাহায্য করবার জন্য।

হরিমোহন ও গৌরমোহনের পরিচয় পেয়ে তারা যেন সুশীলের কতকালের বন্ধু ও নিকটতম আত্মীয়, এমনি ভাবে

সে দুই ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে তাদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেললে।

সত্যেন একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। চিরদিন একলা থেকে তার স্বভাবটি হ'য়ে গেছে বড় আত্মসমাহিত। আজ সকাল থেকে এই বিভিন্ন চরিত্রের একাধিক মানুষের সঙ্গে মেলা মেশা করে সে যেন ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল। এসব গোলমাল সে ভালোবাসে না এবং সহ্য করতেও পারে না। মন্দার একান্ত আগ্রহে আজকের এই আয়োজন। ব্যাপারটা যদিও সুহাসের আগমন উপলক্ষ করেই হ'লো. কিন্তু, মন্দা সত্যেনকে বার বার ব'লেছে - এটা আজ আমার তোমাকে পাওয়ার আনন্দোৎসব! তোমার ভগ্নীর অভ্যর্থনা নয়।

হরিমোহন ও গৌরমোহনকে সুশীলের হাতে সমর্পণ ক'রে সত্যেন পালিয়ে এলো। বলে এলো—আপনারা তা'হ'লে গল্প করুন, আমি একটু দেখে আসি' ওদিকে কতদূর কি হ'লো।

সত্যেন পিছন ফিরতে না ফিরতে সুশীল অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে তাদের দু'ভাইকে ব'ললে—দেখুন, একটা বড় নোংরা কথা আপনাদের ব'লতে হ'চ্ছে, কিছু মনে করবেন না। আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে ব'লে তো আমি আর পাঁচজনেরও ঘরে আগুন লাগতে দিতে পারিনি। বিশেষ, আপনারা যখন আমাদের বন্ধু এবং আপনার লোক। আপনাদের ঘর আমাকে রক্ষা করতেই হবে। ওই যে বিলেত-ফেরত ডাক্তারটিকে দেখলেন—নব কার্ত্তিকের মতো চেহারা—উনি আজও' আইবুড়ো কার্ত্তিক হ'য়েই আছেন! বিয়ে' কিছু করেন নি। বিলেত থেকে এক নতুন বকামী শিখে এসেছেন—ভদ্রলোকের স্ত্রী, কন্যা, বা ভগ্নীর সঙ্গে অবৈধ প্রেম করা! আমি তো তাঁর এ বিদ্যা' জানতুম না—বিশ্বাস করেই স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে দিয়েছিলুম। ফলে স্ত্রীটি এখন ওঁর কথাতেই ওঠেন বসেন! আমাকে আর দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। এখানে এসে দেখছি মহাপ্রভুটি আপনাদের বাড়ীর ওই সাধ্বী সতী সুন্দরী বিধবাটির সর্ব্বনাশ করবার ফিকিরে ঘুরছেন। উনি খুব শক্ত মানুষ, তাই তেমন সুবিধে ক'রে উঠতে পারেন নি এখনও, কিন্তু, সরল স্বভাবের স্ত্রীলোককে ভোলানো তো খুব বেশী কঠিন নয়, তাই ওঁর কাছে ছুঁচোটা নেহাৎ ভাল মানুষ সেজে ভদ্রমহিলাকে প্রায় বাগিয়ে এনেছেন—উনি দেখছি এখন সকলের চেয়ে ওই বিলিতি বদমায়েস্‌টাকেই বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছেন খুব বেশী রকম। কিন্তু ওই হচ্ছে' সর্ব্বনাশের গোড়া! বুঝেছেন!—খুব সাবধান! ওই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়েই সে আমার স্ত্রীকে মাটি ক'রেছে। আপনারা বিশেষ সতর্ক থাকবেন। ও জীবটিকে কিছু'তে যেন বাড়ীতে মাথা গলাতে দেবেন না। আপনাদের বউদিদি হয়ত' সরল বিশ্বাসে ওঁকে নিয়ে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করবেন। ও লোকটিও হয়ত হঠাৎ একদিন অযাচিত গিয়েও উপস্থিত হবে;—এই রকমই ওর স্বভাব কিন্তু, খবরদার—আপনারা কিছুতে ওকে আমল দেবেন না—আস্কারা দিয়েছেন কি মরেছেন! মনে রাখবেন—ওটি শয়তান! খুব হুঁসিয়ার! আর আমি যে আপনাদের সাবধান করে দিয়েছি এ কথা ঘুণাক্ষরে যেন প্রকাশ না হয়—তাহ'লে, আপনাদের বড় বিপদে পড়তে হবে। কেন না—

এই সময় কার পায়ের শব্দ পেয়ে, সুশীল তার বক্তৃতা বন্ধ করলে। ওরা দু'ভাই অবাক্ হয়ে, পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। একটু পরেই মন্দা সেখানে এসে ব'ললে—আসুন আপনারা সব স্নান করবেন—বেলা যে ঢের হ'লো।

হরিমোহন ও গৌরমোহন তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ল। মন্দা তাদের নিয়ে আগে আগে যাচ্ছিল। সুশীল সবার পিছনে—মন্দার সুঠাম দেহলতার স্বচ্ছন্দ গতিভঙ্গীটুকু লোলুপ দৃষ্টিতে উপভোগ করতে করতে চল্‌লো। এই সময় মেঘদূতের একটা লাইন তার কেবলই মনে পড়তে লাগল—

"শ্রোণী ভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং"

* * * *

সকলের স্নানাহার চুকতে বেলা তিনটে বেজে গেল। দিনের অবশিষ্ট অংশটুকু হাসি, ঠাট্টা গল্প-গুজব ও আমোদ-প্রমোদে কাটিয়ে দিয়ে—সন্ধ্যের আগেই হরিমোহন ও গৌরমোহন বিদায় নিলে। মণীন্দ্রও একটা বিশেষ প্রয়োজনে শহরে ফিরে গেল। যাবার সময় সুহাস তাকে বিশেষ ক'রে ব'লে দিলে—কাল আমি শশুরবাড়ী চলে যাবো। যদি পারেন তো সকালের দিকে একবার আসবেন। আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে। আজকে আর এ গোলমালের ভিতর জিজ্ঞাসা করে নেবার সুবিধা হ'লো না।

মণীন্দ্র 'আসবো' বলে প্রতিশ্রুত হয়ে গেল। সুনীল এ ব্যাপারটার দিকে ওদের দু'ভায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ভুললে না। সারাদিনের মধ্যে আরও অনেক কিছুর দিকে সে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে! ফেরবার পথে হরিমোহন তাই গৌরমোহনকে ডেকে যখন বললে—দাদা, সুনীল বাবু যা ব'লছেন তা দেখ্‌ছি নেহাৎ মিথ্যে নয়' ওই বিলেত-ফেরত ডাক্তারটিকে একটু এড়িয়ে চ'লতে হবে।

গৌরমোহন এ কথার উত্তরে শুধু গম্ভীরভাবে একটা 'হুঁ' বলা ছাড়া আর কিছু জবাব খুঁজে পায়নি।

মন্দার পীড়াপীড়িতে অনিলা ও সুনীল রাত্রের মতো কাজলগাঁয়েই রয়ে গেল। সন্ধ্যের পর সুহাসকে একবার নিরিবিলি পেয়ে সুনীল বিশেষ করে ধরলে তাকে একটি গান শোনাতেই হবে। এ লোকটিকে দেখে পর্য্যন্ত সুহাসের একটুও ভালো লাগেনি। সারাদিনের মধ্যে সে একবারও এর সঙ্গে ভালো করে দুটো কথা বলেনি। এই মানুষটার উপর প্রথম থেকেই তার মনে কেমন যেন একটা অহেতুক বিরাগ উপস্থিত হ'য়েছিল। কাজেই, সুহাস যখন নানা ছুতো ক'রে তার গান গাইবার অনুরোধ উপেক্ষা করলে, তখন সুনীল আর চুপ করে থাকতে না পেরে বলে ফেললে—ডাক্তার চ'লে না গেলে আমি তাকে দিয়েই অনুরোধ করাতুম, মণিবাবুর অনুরোধ আপনি নিশ্চয় উপেক্ষা করতে পারতেন না।

সুহাস অসহিষ্ণুর মতো একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলে ঘরে আর কেউ আছে কি না? দেখলে—কেউ নেই। সুহাস চুপ করে রইল, সুনীলের কথার কোনও উত্তরই দিলে না সে।

এবার সুনীল একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ব'ললে—আপনার এমন অমূল্য জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে দেখে আমার কিন্তু ভারী কষ্ট হচ্ছে। আপনি যে রকম রূপে রসে সর্ব্বগুণে গুণবতী, তা'তে যে কোনও লোকের সংসারে আপনি নন্দন-কানন সৃষ্টি করতে পারতেন! আপনার এ সন্ন্যাসিনীর জীবন শোভা পায় না! স্বর্গরাজ্যের শচীরাণী হ'তে পারতেন আপনি!

সুহাস মৃদু হেসে ব'ললে—কিন্তু আপনাদের মতো প্রেতের নৃত্যে কি সে স্বর্গ বেশী দিন টিঁকৃতো!

সুনীল মুচকে হেসে ব'ললে—আপনার সুমধুর রসিকতা আমার ভারী মিষ্টি লাগে! আপনাকে যতই দেখছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি!

সুহাস বললে—সে আপনার অনুগ্রহ!

অত্যন্ত একটি ব্যগ্র কৌতূহল দেখিয়ে সুনীল জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা, আপনার কি দেশভ্রমণের সাধ হয় না? আমি তো শীঘ্রই অনিলাকে নিয়ে সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ ক'রতে বেরুবো—আপনি যাবেন?—আমাদের সঙ্গে চলুন না—গেলে বড় সুখী হ'বো।

সুহাস উঠে পড়ে বললে—আমি ফুলি ঝীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—তার বড় তীর্থ দর্শন করবার সাধ! শুনলুম আপনি তাকেও নিয়ে যাবেন ব'লে আশ্বাস দিয়েছেন! কোথায় কোথায় যেতে হবে ফুলি ঝীর সঙ্গে এইবেলা নিরিবিলিতে পরামর্শ করুন—বলেই সুহাস ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

ক্রোধে ক্ষোভে লজ্জায় অপমানে সুনীল যেন একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হ'য়ে উঠলো।

(ক্রমশঃ)

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

স-বাক্ চলচ্চিত্র—

এতকাল আমরা নির্ব্বাক চলচ্চিত্রাভিনয়ের সঙ্গেই পরিচিত ছিলাম; কিন্তু, এতকাল পরে সম্প্রতি চলচ্চিত্রও হঠাৎ কথা কইতে সুরু করেছে। ও-দেশের চলচ্চিত্র-সঙ্ঘের কর্ণধাররা এখন এই প্রশ্নটাই মীমাংসা করতে চাইচেন যে, স বাক্ নির্ব্বাকের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে কোন্‌টা দাঁড়াবে? ঐ প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাবার আবশ্যক আমাদের হয় ত নেই; কারণ, আমাদের নির্ব্বাক্ চলচ্চিত্রই আজ অবধি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হয়ে উঠতে পারলো না। সে যাই হ'ক্, এই স-বাক্ চলচ্চিত্র কেমন করে প্রস্তুত হয়, তা আমরা অনেকেই জান না। এ বিষয়ে আমরা যতটুকু জেনেচি তা আপনাদের জানালাম। দু' রকম উপায় আছে। হয়, গ্রামোফোন

স-বাক্ চলচ্চিত্রের গ্রহণ প্রণালী

রেকর্ডের মত নাটকের স্বরানুসরণ ক'রে, নয়ত ছবির সঙ্গে সঙ্গেই বাক্যাংশগুলি পর্য্যন্ত আয়ত্ত করে। এখানে যে ছবিটী দেওয়া হ'ল, সেটী রেকর্ড প্রণালীর ছবি। এক রীলের বাক্যাংশ নিয়ে এমনি একটি রেকর্ড তৈরী হয়।

পিক্যাডিলি টিউব ষ্টেশন—

পৃথিবীর অতীত দিনের সৌন্দর্য্য-সম্ভারগুলি উদ্ধার করবার জন্যে ভূতত্ত্ববিদের যেমন চেষ্টার ক্রটী নেই, ঠিক তেমনিই ক্রটীহীন উৎসাহে এগিয়ে চলেচেন জগতের বৈজ্ঞানিক দল পৃথিবীকে নিত্য নূতন সামগ্রীতে বিভূষিত করবার পথে। নূতন নূতন যন্ত্রের উৎপত্তি হ'চ্চে—নব নব যুদ্ধাস্ত্রের। বন কেটে সহর বসচে, সেই সহরকেই আর পঞ্চাশ বৎসর পরে চেনবার উপায় পর্য্যন্ত থাকচে না।

পিক্যাড়িলি লণ্ডনের এক আধুনিকতম সভ্যতার পরিচয়-স্থল। সম্প্রতি সেখানে এক ভূ-মধ্য ষ্টেশন (Underground Station) নির্ম্মিত হয়েছে। গত ডিসেম্বরে ওয়েষ্টমিনষ্টারের মেয়র এর উন্মোচন কার্য্য শেষ করেচেন সেই দিন থেকেই অসংখ্য যাত্রী এই পথে যাতায়াত সুরু করেচে। এই বৃহৎ ব্যাপারের অনুষ্ঠাতাদের মতে ৫০,০০০,০০০ এবং তদূর্দ্ধ সংখ্যার লোক এই পথে প্রতি বৎসর যাতায়াত করচে।
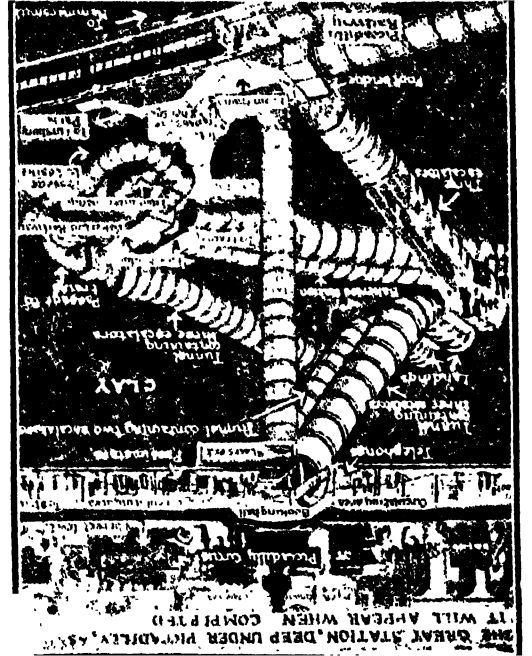
পিক্যাডিলি 'টিউব ষ্টেশন'

ষ্টেশনটি নির্ম্মিত হতে চার বৎসর সময় লেগেচে

খরচ হয়েচে ৫০০,০০০ পাউণ্ড। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, সমস্ত পৃথিবীতে এত বড় ভূ-মধ্য ষ্টেশন আর নেই। উপর থেকে নীচে নামবার জন্য অনেকগুলি সিঁড়ি আছে এবং উপরের রাস্তায় একটিমাত্র রন্ধ্র-পথেই সমস্ত যাত্রীদলের চলাচল নির্ব্বাহ হয়। উপরের গাড়ী ঘোড়া বা যাত্রীদের এর জন্যে কিছু মাত্র অসুবিধা ভোগ করতে হয় না।

অথচ, তিরিশ বছর আগে পিক্যাডিলি ছিল লণ্ডনের এক অতি সাধারণ স্থান!

এমনি একটা ব্যাপারেই নয়—জীবনের প্রায় সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই আজকের দিনে প্রচুর সৃষ্টি-শক্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এতকাল সে যা পেয়েচে, তাই নিয়েই সে চিরকাল সন্তুষ্ট থাকতে পারচে না; পারেও না। এই বিচিত্র সৃষ্টি-শক্তির যথা-সাধ্য আভাষ দেবার চেষ্টা করলাম।

অতীতের কথা—

ভূতত্ত্ববিদ বলেন, পৃথিবী এক দিন সূর্য্যের দেহ-লগ্ন ছিল। কিন্তু সে কত কাল আগে? এবং তার কত কাল পরে পৃথিবীতে প্রাণী-জন্ম সুরু হ'ল? এ-সব প্রশ্নের উত্তর কেউ জানে না। আজ পর্য্যন্ত কোনো নির্ভর-যোগ্য প্রমাণ মেলেনি। কিন্তু মেলেনি বলেই বৈজ্ঞানিক চুপ করে বসে নেই। যেটুকু প্রমাণ তাঁরা খুঁজে পেয়েচেন, তার সঙ্গে তাঁদের কল্পনার রং মিশিয়ে তাঁরা আদি ধরিত্রীর অনেক কথাই লোক-লোচনের সামনে প্রকাশ করতে পেরেচেন। কেউ বলেন, পৃথিবীর জন্মের ১,০০০,০০০,০০০ বৎসর পরে প্রাণী-জন্মের সুরু। কিন্তু তখনো না কি বিবর্ত্তন সুরু হয়নি, যাতে করে তারা ক্রমোন্নতির দিকে এগোতে পারে। কেউ বলেন, পৃথিবীর ৫,০০০,০০০,০০০ বৎসর পরে প্রাণী-জন্মের সুরু। আসল কথা, এ নিয়ে বাদ-বিতণ্ডা আজও থামেনি; কোনো দিন থামবে কি না তাও বলা যায় না। সে যাই হ'ক, কল্পনা-প্রমাণে মিশিয়ে তাঁদের দু' একজন যে কয়টী সংবাদ আমাদের কাছে এনেচেন, তাদের মূল্যও কোনো দিক দিয়ে কম নয়।

চার্লস নাইট বিখ্যাত বিজ্ঞান-বিদ্ শিল্পী। ছবির

অতিকায় সরীসৃপ

আনুমানিক ১২০,০০০,০০০ বৎসর পূর্ব্বে এরা পৃথিবীতে বিচরণ করত।

মধ্যে দিয়ে তিনি প্রাচীন পৃথিবীর রূপ আমাদের সামনে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন। সেই সব দিনের কাহিনী,

অতিকায় সরীসৃপ—আনুমানিক ১২০,০০০,০০০, বৎসর পূর্ব্বে এরা পৃথিবীতে বিচরণ করত।

যখন মানুষের গড়া সভ্যতা পৃথিবীর কুমারী বুকে কলঙ্কের ছাপ আঁকেনি, যখন পথে ও পাহাড়ে জীব-জন্তুর দল নির্ভয়ে ছুটে বেড়াত। নিখিল-প্রবাহের কৌতূহলী পাঠকের কাছে নিখিলের অতীত দিনের ছবি-গুলি আমরা প্রকাশ করলাম। চিকাগোর প্রাকৃতিক ইতিহাসের যাদুঘরে এগুলি সাদরে রক্ষিত আছে।

হালকা মোটর-বোট—

মাত্র একশ' ষাট পাউণ্ড ওজনের এবং সম্পূর্ণ কার্য্যকরী এক রকম মোটর বোট ও-দেশে প্রচলিত হয়েচে। বোট-খানি কাঠের এবং এত হাল্‌কা ও এমন কৌশলে নির্ম্মিত যে, বিনা পরিশ্রমে এটাকে মোটর বা অন্য কোনো গাড়ীর ছাতে তুলে স্থানান্তরিত করা যায়। ছ' ঘোড়ার শক্তিশালী ইঞ্জিনে এর কাজ চলে এবং এই বোট ঘণ্টায় তিরিশ মাইল পর্য্যন্ত ছুটতে পারে।

হাল্‌কা মোটর বোট

সুড়ঙ্গ-পথে যান-বাহন পরিচালনা—

নিউ ইয়র্ক আর জার্সী সহরের মাঝে হাডসান নদী। এই নদীর নিম্নে, সুড়ঙ্গ-পথে প্রত্যহ হাজার হাজার মোটর
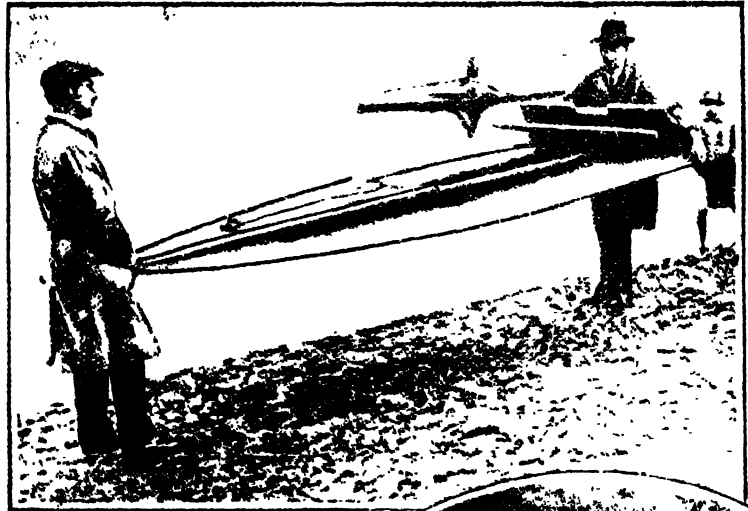
যাতায়াত করে। এইগুলি পরিচালিত হয় মাত্র দুটি বোর্ডের সাহায্যে। এইবোর্ডগুলির গায়ে থাকে হলদে আর নীল-রঙের আলো। মোটরে মোটরে সংঘর্ষ লাগলে কিম্বা পথে অন্য কোনো দুর্ঘটনা উপস্থিত হ'লে এই আলোক-বিন্দুগুলি জ্বলে ওঠে। যে লোকটি সর্ব্বদাই এই বোর্ড-গুলির সামনে

যান-বাহন পরিচালনা

থাকে, ওই আলোক ক্রিয়ার সাহায্যে যান-বাহনের অবস্থা সে অতি সহজেই জানতে পারে এবং তখনই বাধা-বিঘ্ন দূর করবার ব্যবস্থা করে। এই বোর্ডের গায়ে আরও একটি যন্ত্র আছে, যার দ্বারা, সুড়ঙ্গ-পথে দূষিত বায়ু সঞ্চারিত হ'লে, তৎক্ষণাৎ তা দূর করা যায়।

পাঁচটী আরোহী-বাহী মোটর-সাইকেল—

বার্লিন পুলিশ তাদের কাজের সুবিধার জন্যে পাঁচটি আরোহী বহন করবার উপযোগী একপ্রকার মোটর-সাইকেল তৈরী করেচে। অন্ধকার দূর করবার জন্যে একটি তীব্র 'সন্ধানী-আলো' (সার্চ্চ-লাইট), আকস্মিক দুর্ঘটনার পক্ষে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং একটি অতিরিক্ত চাকা সর্ব্বদা গাড়ীর সঙ্গে থাকে। মূল গাড়ীর সংলগ্ন 'সাইড কারটিতে' তিনজনের উপযোগী স্থান থাকে এবং অপর একজনকে বসতে হয় চালকের পাশে। সাধারণ মোটর সাইকেলের চেয়ে এরা দ্রুত ছুটতে পারে।
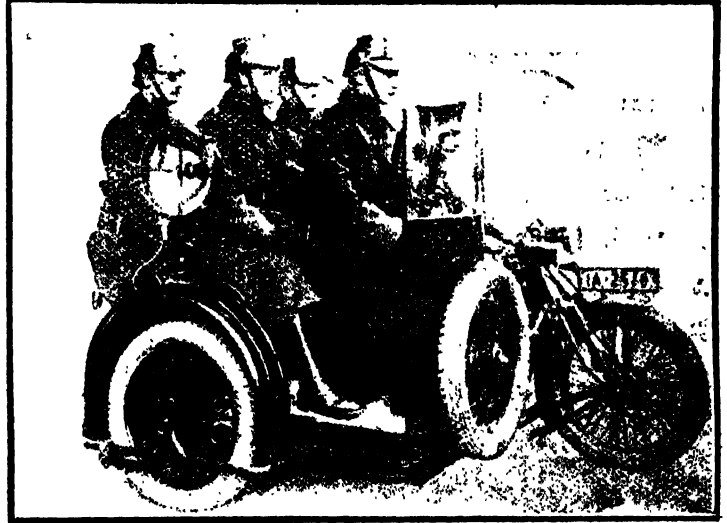
পাঁচটি আরোহী-বাহী মোটর সাইকল

বৈদ্যুতিক বাতি-যুক্ত আয়না—

ক্ষৌর-কর্ম্মের সুবিধার জন্য এক প্রকার আয়নার আমদানি হয়েচে। এই আয়নার পিছন দিকে একটি

বৈদ্যুতিক বাতিযুক্ত আয়না

বৈদ্যুতিক বাতি সংযুক্ত থাকে। এই আলো ইচ্ছামত মুখের যে-কোন স্থানে এনে ফেলা যায়। রাত্রে বা অন্ধকারে কামানোর পক্ষে এর সুবিধা প্রচুর।

প্রবাহ রোগীর দেহের সূক্ষ্ম-তম অংশগুলিতে প্রবেশ করে' সর্দ্দির বীজাণুগুলি বিনষ্ট করে।

বৃহত্তম সঙ্কেত-গৃহ—

ইংলণ্ডের দক্ষিণাংশে প্রত্যহ দু'হাজারের ওপর ট্রেণ যাতায়াত করে। এই দু'হাজার গাড়ীর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে লণ্ডনব্রিজে একটী 'সঙ্কেত-গৃহ' বা 'সিগন্যাল হাউস' স্থাপিত হয়েচে বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় এই বহু সংখ্যক ট্রেণগুলিকে সঙ্কেত জানানো হয় এবং তারাও নির্ব্বিঘ্নে যাতায়াত করে। এত বড় সঙ্কেত-গৃহ পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

বৃহত্তম সঙ্কেত-গৃহ

সর্দ্দি নিবারণের বৈদ্যুতিক যন্ত্র

সর্দ্দি নিবারণের নূতন বৈদ্যুতিক যন্ত্র—

ফরাসী দেশের কোনো এক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সর্দ্দি সারাবার এক নূতন বৈদ্যুতিক যন্ত্র আবিষ্কার করেচেন।
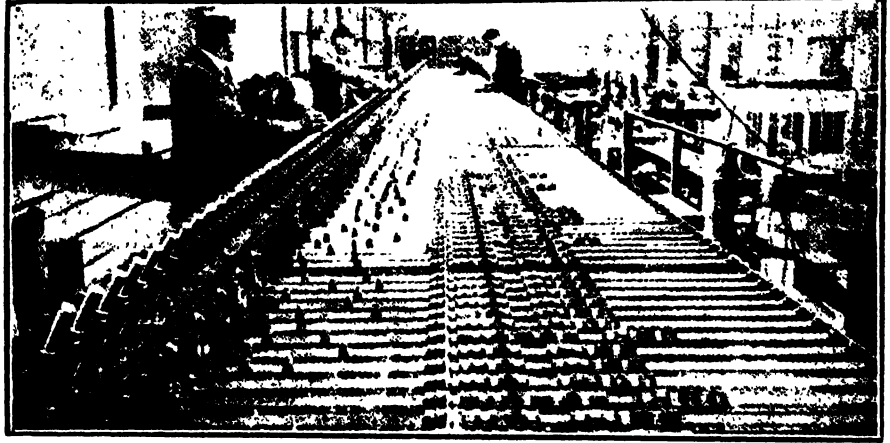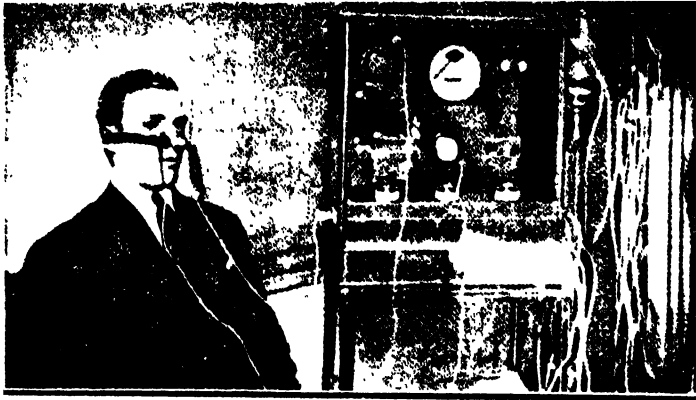
ঘুম পাড়ানি কল—

ছেলে-বয়সে দিদিমা ঠাকুমার মুখে ঘুম-পাড়ানি গান আমরা অনেক শুনেচি। ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়ানোর ব্যবস্থাও অনেক দিন থেকে প্রচলিত হয়েচে। সম্প্রতি বার্লিনের ডাক্তার হান্স সোলোমান ঘুম পাড়ানোর একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেচেন।

ঘুম পাড়ানি কল

এতে ঔষধের চেয়ে শীঘ্র ফল পাওয়া যায়। এই ছবিতে দেখানো হয়েচে যে, একটি মেয়েকে ঘুমুবার ওষুধ দেওয়া সত্বেও তার ঘুম আসেনি, অথচ ডাক্তার হান্সের যন্ত্রের প্রয়োগে আর একটি মেয়ে অচিরে নিদ্রিত হয়েচে।

রন্ধনশালার স্থান-সংক্ষেপ

স্থান সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে ও-দেশের গৃহিণীরা এই নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করেচেন। এই আলমারীর ডালায় দুটী পায়া জোড়া থাকে এবং এই দুটির সাহায্যে ডালাটিকে একটি সুদৃশ্য টেবিলে পরিণত করা যায়। এই ছোট্ট আলমারীটির মধ্যে অন্ততঃ পঞ্চাশটী কাপ, ডিস প্রভৃতি রাখবার স্থান আছে। কাজ শেষ হ'বার পর পায়া দুটি গুটিয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আলমারি বন্ধ করে ফেলা যায়।

রন্ধন-শালার স্থান-সংক্ষেপ

মধ্যভারত

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

বছর দুই আগে একদিন এক হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসীর শুভাগমন আমাদের বাড়ীতে হয়েছিল। আমার এক ছেলে সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করেছিল "স্বামীজি, কোন্ কোন্ তীর্থ ভ্রমণ হয়েছে।" এই প্রশ্ন শুনে সন্ন্যাসী মহাশয় এক নিঃশ্বাসে ভারতবর্ষের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিমে যত তীর্থ আছে, তার সকলগুলির নাম করেছিল। তার এই উক্তি সত্য কি না, পরীক্ষা করবার জন্য আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম "সাধু, অমরনাথ যেতে হ'লে কোন্ পথে যেতে হয়।" সন্ন্যাসী নিঃসঙ্কোচে আমাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছিল— "অমরনাথ চন্দ্রনাথ তীরথকা এক শো মিল উত্তরমে—ও বড়া কঠ্ঠিন তীরথ্ বাবা!" এর থেকেই সন্ন্যাসীজির ভ্রমণের দৌড় যে কতদূর, তা বুঝতে পেরেছিলাম। অনেক তীর্থ ভ্রমণ না করলে পাকা সাধু হওয়া যায় না,— সুতরাং 'সেরভর আটা দেলায় দে রাম!' ও হয় না।

এখন, আমি যদি বলি যে, এবারকার বড়দিনের সময়, পনর দিনের মধ্যে ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশের প্রায় সমস্ত 'তীরথ' দর্শন করে এসেছি—আর সেই পনর দিনের মধ্যে পাঁচদিনই কেটেছিল ইন্দোর রাজধানীতে—তা হ'লে হয়ত অনেকেই ব'লে বস্‌বেন "এঁরাও দেখ্‌ছি 'সেরভর আটা দেলায় দে রামে'র দলে। চন্দননগর বেড়িয়ে এসে ত ভ্রমণ-কাহিনী লেখা হয় না, তাই উজ্জয়িনী, অজন্তা, এলোরা ইত্যাদি ইত্যাদি তীর্থের নাম করা হচ্চে।"

এই সকল পাঠকের কাছে নিবেদন এই যে, বিগত বড়দিনের সময় আমরা পনর দিনের মধ্যে সত্যসত্যই অনেক

স্থান বেড়িয়ে এসেছি এবং তার সাক্ষ্য-সাবুদের যদি দরকার হয়, তা'ও দিতে পারি।

ব্যাপারটা হয়েছিল এই। বিগত বড়দিনের সময় মধ্য-প্রদেশের ইন্দোর রাজধানীতে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশন হয়েছিল। এই অধিবেশনের চার পাঁচ মাস পূর্ব্বে অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে এক পত্র লিখে জানালেন যে, তাঁদের এই অধিবেশনের সাহিত্য-শাখার সভাপতির পদ আমাকে গ্রহণ করতে হবে। তখন আমার শরীর বড়ই অসুস্থ ছিল; আমি সেই কথা নিবেদন ক'রে অব্যাহতি লাভের আরজী পেশ করেছিলাম। কিন্তু, আমার ইন্দোরের বন্ধুগণ সে আরজী নামঞ্জুর করলেন। তখন ভারতবর্ষের স্বত্বাধিকারী শ্রীমান হরিদাস ও সুধাংশু-শেখর চট্টোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয়ের পরামর্শ-অনুসারে ইন্দোরের সভাপতির পদ গ্রহণ করে সেখানে সম্মতিসূচক পত্র লিখলাম।

পদ ত গ্রহণ করলাম; যেন-তেন-প্রকারে না হয় একটা অভিভাষণও লিখতে পারব; কিন্তু ইন্দোর ত বড় কম দূরের পথ নয়, আর পৌষ মাসের শীতও ভয়ঙ্কর। এ অবস্থায় একেলা এতটা পথ এই বৃদ্ধ বয়সে অতিক্রম করতে একটু দ্বিধা বোধ হোলো—শেষে কি নির্ব্বান্ধব পথে শীতেই জমাট হয়ে যাব। তখন এঁকে, ওঁকে, তাঁকে সঙ্গী হবার জন্য অনুরোধ করতে লাগলাম। ইন্দোরের অভ্যর্থনা-সমিতিও বাঙ্গালা দেশের অনেক সাহিত্যিককে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠালেন। প্রথম প্রথম দুই চার জন আমার সঙ্গী হ'বেন ব'লে আশ্বাস দিলেন; কিন্তু সময় যত এগিয়ে আস্তে লাগল, ততই সঙ্গীরা অদৃশ্য হ'তে লাগলেন; সুধু একজন টি*কে গেলেন। তিনি আমার পরম স্নেহ-ভাজন, 'ওমার খৈয়ামে'র কবি শ্রীমান্ নরেন্দ্র দেব। তাঁর মত কষ্ট-সহিষ্ণু, সেবাপরায়ণ, ভ্রাতৃবৎসল সঙ্গী পেয়েছিলাম ব'লেই পনর দিনের মধ্যে সত্যসত্যই অসাধ্য-সাধন করতে পেরেছিলাম। যাঁরা ঐ অঞ্চল বেড়িয়ে এসেছেন, তাঁরা আমাদের ভ্রমণের কাহিনী শুনে সত্যসত্যই অবাক্ হয়ে গিয়েছেন যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন সুদীর্ঘ পথ আমরা কেমন করে অতিবাহন করেছি—বিশেষতঃ আমার মত সত্তর বছর বয়সের রুগ্ন সঙ্গী নিয়ে!

মার্ব্বল পাহাড়ের একটি দৃশ্য

গৌরচন্দ্রিকা এখানেই শেষ করা যাক্। ইন্দোরে প্রবাসী-সাহিত্য-সম্মেলনের দিন স্থির হয়েছিল ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে ডিসেম্বর। সেখানকার বন্ধুগণ আমাকে লিখেছিলেন, আমি যেন ২২শে ডিসেম্বর বোম্বাই মেলে কলিকাতা থেকে যাত্রা করি; তা হলে ২৪শে তারিখে পূর্ব্বাহ্ণ দশটার সময় ইন্দোরে পৌছিতে পারব। ২৪শে, ২৫শে দুইদিন এই দীর্ঘ ভ্রমণের পর বিশ্রাম করে ২৬শে থেকে সম্মেলনে যোগ দেব। আমরাও সেই প্রস্তাবই অনুমোদন ক'রে স্থির করলাম, ২২শে ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যা সাতটা চৌত্রিশ মিনিটে হাবড়া থেকে যে বোম্বাই মেল ছাড়ে, তাতে উঠে সেই যে বিছানা পেতে শয়ন করব, আর পরের দিন রাত্রি দুইটার সময় খাণ্ডোয়া নেমে পাশের প্ল্যাটফরমেই ইন্দোরগামী যে গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকবে, তাতে উঠে আবার লেপ চাপা দিয়ে শয়ন করব। বড়দিনের সময় এক ভাড়ায়

যাতায়াত করা যায়; কিন্তু সকল রেলের কর্ত্তারাই এ অনুগ্রহ করেন না। জি, আই, পি রেলপথ এ অনুগ্রহ করেন নাই। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলপথের চেটকি ষ্টেসন থেকেই জি, আই, পি রেল আরম্ভ। পূর্ব্বে কিন্তু জব্বলপুর পর্য্যন্ত ই, আই, রেলের অধিকারভুক্ত ছিল; এখন আর তা নেই। হাবড়া থেকে ইন্দোর পর্য্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর যাবার ভাড়া একান্ন টাকা কয়েক আনা; আমাদের তার অনেক বেশী দিয়ে যাওয়া-আসার বড়দিনের রিটার্ণ টিকিট কিনতে হয়েছিল—আমাদের লেগেছিল রিজার্ভের খরচাশুদ্ধ গুটিকয়েক পয়সা কম বাষট্টি টাকা। রিজার্ভ করা, টিকিট কেনা সাতদিন আগে ব্যবস্থা করা, এ সব ঝঞ্ঝাট আমাদের মোটেই ভোগ করতে হয় নাই—সে ভার নিয়েছিলেন শ্রীমান্ হরিদাস ভায়া। সাতদিন আগেই আমাদের গাড়ী রিজার্ভ হয়েছিল। রিজার্ভ করবার সময় টিকিট কিনতে হয়, আমাদের তা করতে হয় নাই। ২২শে তারিখের বোম্বাই মেলে একটা 'কুপে' (coupe) গাড়ী আর অন্য একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে একটা আসন ঠিক রিজার্ভ ছিল। 'ভারতবর্ষে'র অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীমান সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় ভায়ার আমাদের সঙ্গী হওয়ার কথা ছিল; তাই আমরা তিনটা বার্থ রিজার্ভ করেছিলাম; কিন্তু যাওয়ার দুইদিন আগে তাঁর শরীর অসুস্থ হওয়ায় যাওয়া হোলো না; আমরা বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হলাম। ও-দিকে রেলের তৃতীয় বার্থ টা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে খালিই চলেছিল। এই পনর দিনের সুদীর্ঘ ভ্রমণের মধ্যে যখনই যা সুন্দর দেখেছি, তখনই মনে হয়েছে, আহা, সুধা এলে কত আনন্দ হোতো।

১১শে ডিসেম্বর শনিবার অপরাহ্লে আমার একটী হোল্ড অল, আর একটী সুটকেস শ্রীমান নরেন্দ্রের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলাম—এখন যে বিছানাও চাই, কাপড়-চোপড়ও চাই, অনেকগুলো শীতবস্ত্রও চাই; একখানি কম্বল আর একটা লাঠি-সম্বল নিয়ে ভ্রমণে বের হওয়া—তেহি নো দিবসাঃ গতাঃ! সে দিন আর নেই রে ভাই!

সন্ধ্যা ছটার সময় বাসা থেকে বেরিয়ে শ্রীমান নরেন্দ্রের বাড়ীতে গিয়ে দেখি, সে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে; জিনিসপত্র সব মোটরে তোলা হয়েছে, আমার জন্যই অপেক্ষা। তখন আমরা তিনজন হাবড়া ষ্টেসন অভিমুখে যাত্রা করলাম,—আমি আর নরেন্দ্র ব্যতীত এই তৃতীয় ব্যক্তি হচ্চেন শ্রীযুক্ত স্বামী অমৃতানন্দ। তিনি আমাদিগকে গাড়ীতে তুলে দিবার জন্য সঙ্গী হয়েছিলেন। ষ্টেসনে গিয়ে দেখি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন শ্রীমান নির্ম্মল দেব, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ
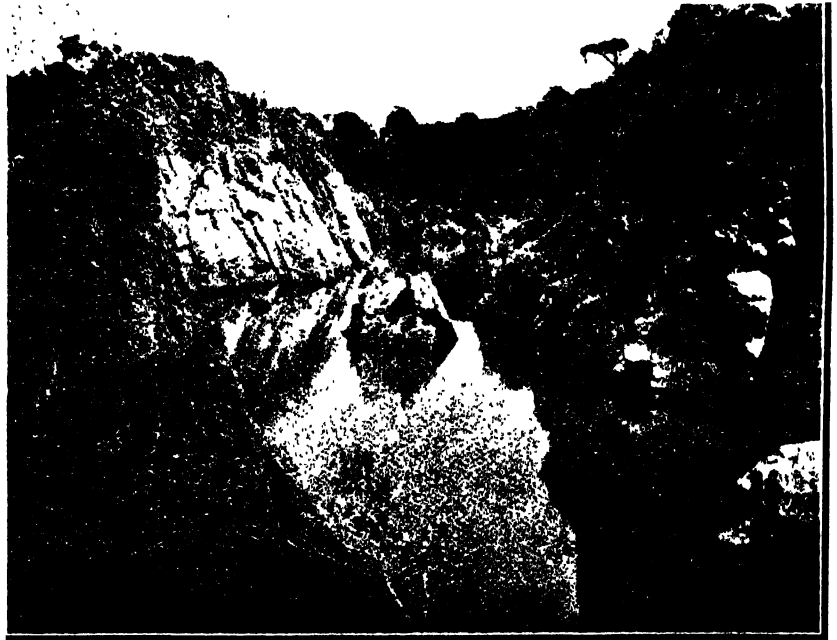
মার্ব্বল পাহাড়ের অপর দৃশ্য

সেন এবং আমার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান অনিলকুমার। আমাদের রিজার্ভ গাড়ী তাঁরা আগে থাকতেই খুঁজে রেখেছিলেন।

গাড়ীতে জিনিসপত্র তোলা হ'লে আমি একবার অন্য গাড়ীগুলি দেখতে গিয়েছিলাম। মিনিট দুই তিন পরে ফিরে এসে দেখি, এক তুমুল কোলাহল আরম্ভ হয়েছে। দেখি একদিকে আমাদের সঙ্গীরা, আর একদিকে ধুতি-জামা-পরা একটী ভদ্রলোক, আর তাঁর সঙ্গী একজন গোরা সার্জ্জন আর একজন খাকি পোষাক-পরা পুলিশ ইনস্পেক্টর। সেই ধুতিজামাপরা ভদ্রলোকটী আমাদের

রিজার্ভ করা 'কুপে' উঠে বসেছেন; আমাদের দল তাতে আপত্তি করছেন, এবং ইংরাজী বাঙ্গালা হিন্দীতে উভয় পক্ষ থেকে আইন কানুন দেখানো হচ্ছে; স্বদেশ, স্বরাজ, ভাই-ভাই মন্ত্র পর্য্যন্তও টেনে আনা হয়েছে। ভদ্রলোকটীও অন্য গাড়ীতে যাবেন না, কারণ তাঁকে যাঁরা তুলে দিতে এসেছেন তাঁরা একেবারে মূর্ত্তিমান পুলিশ—একজন শ্বেতাঙ্গ, অপরটী কৃষ্ণাঙ্গ; আমাদের দিকেও চারিটী তরুণ আর একটী সন্ন্যাসী। আমি এসে দেখি মুখোমুখি ছেড়ে তখন হাতাহাতির মত অবস্থা হয়েছে। আগন্তুক ভদ্রলোকটী, শুন্‌লাম যাবেন ব্যাণ্ডেলে। আমি বল্‌লাম, এই আধঘণ্টার দখলে হোলো। এ সুবিধার জন্য আমরা হরিদাস বাবুর কাছে ঋণী। আর শ্রীমান্ সুধাংশু ভায়ার কাছে একটী উপদেশের জন্য এইখানেই ঋণ স্বীকার করে রাখি। আমরা স্থির করেছিলাম, একটানা একেবারে ইন্দোরে যাব; ওদিকের সব দেখাশুনা শেষ করে ফিরবার সময় জব্বলপুরে নেমে মার্ব্বল পাহাড় ও নর্ম্মদা প্রপাত দেখে আস্‌ব। শ্রীমান্ সুধাংশুশেখর বলেছিলেন 'দাদা, সে কিছুতেই হয়ে উঠ্‌বে না। অত ঘুরে আস্‌তেই ক্লান্ত হয়ে পড়বেন; তখন আর জব্বলপুরে নামা সম্ভবপর হবে না, মার্ব্বল পাহাড়ও দেখা হবে না। তার চাইতে যাওয়ার সময়ই ওটা সেরে যান।"

মার্ব্বল পাহাড়ের মধ্যস্থ প্রস্তর খণ্ড

ব্যাপার নিয়ে কেন তোমরা গোল করছ। ভদ্রলোক এখানেই থাকুন, আমরা না হয় ব্যাণ্ডেল পার হয়েই বিছানা পাতব। তখন বিবদমান দুই পক্ষই নিরস্ত হলেন কিন্তু নীরব হলেন না,—আইন-কানুন, ভদ্রতা প্রভৃতির জের চল্‌তে লাগল। শেষে প্রণাম নমস্কারাদির পর গাড়ী ছাড়ল। আমাদের যাত্রা সুরু হোলো।

ব্যাণ্ডেল ষ্টেসনে ভদ্রলোকটী নেমে গেলে আমরা বিছানা পেতে নিলাম। 'কুপে' মাত্র দুইজনের স্থান থাকে, আমরাও দুইজন; সুতরাং সে কামরাটী আমাদেরই সম্পূর্ণ আমাদের হাতেও সময় ছিল; ২৪শে ইন্দোরে পৌছিবার কথা ছিল; ২৫শে পৌছিলেও কাজের কোন ক্ষতি হবে না। তাই, আমরা যাবার সময়ই জব্বলপুর নেমেছিলাম। শ্রীমান্ সুধার উপদেশ গ্রহণ না করে যদি চলে যেতাম, তা হলে সত্যসত্যই ফেরবার সময় জব্বলপুর কেন, স্বর্গপুরে যেতে বল্‌লেও আমরা সম্মত হতুম না—তখন ক্লান্ত দেহে, প্রায় শূন্য-পকেটে বাড়ীমুখো বাঙ্গালী।

বর্দ্ধমান ষ্টেসনে না পৌছান পর্য্যন্ত আমরা শয়ন করলাম না; বর্দ্ধমান থেকে পরদিন প্রাতঃকালের চা-যোগের সঙ্গে

সঙ্গে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন যোগ করবার জন্য বর্দ্ধমানে কিছু মিহিদানা সংগ্রহ করার অভিপ্রায় ছিল। বর্দ্ধমান থেকে গাড়ী ছাড়লেই শয়ন ও নিদ্রা। ভোর পাঁচটায় মোগলসরাইয়ে একবার একটু মাথা তুলেছিলাম মাত্র, তারপর পুনরায় নিদ্রা। এ নিদ্রাভঙ্গ হোলো চেউকিতে গিয়ে। হাতমুখ ধুয়ে চা ও মিষ্টান্ন যোগ করা গেল। নরেন্দ্র ভায়া পুনরায় শয়ন করলেন। এখান থেকেই জি, আই, পি রেলপথ আরম্ভ হোলো, শেষ হবে বোম্বাই গিয়ে। মাণিকপুর ষ্টেসনে শ্রীমান নরেন্দ্র মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা করে এলেন; সাটনা ষ্টেসনেই আমরা আহার শেষ করে সব বেঁধেছেঁদে থাকবেন। আমরা সেই তেরো মাইল গিয়ে যদি সেখানে স্থান না পাই, তা হ'লে ভারি বিপন্ন হয়ে পড়ব, সেই ভয়ানক শীতের রাত্রিতে কোথায় আশ্রয় পাব। এই সব মনে ক'রে আমরা স্থির করেছিলাম ষ্টেসনের কাছেই জব্বলপুরের প্রধান ধনী গোকুলদাসের যে ধর্ম্মশালা আছে, সেখানেই আশ্রয় নেবো এবং পরদিন খুব ভোরে উঠে মার্ব্বল পাহাড় ও নর্ম্মদা জলপ্রপাত দেখে ফিরে আড়াইটার সময় আবার বোম্বাই মেল ধ'রে ইন্দোর যাব। ষ্টেসনে নেমে কুলীদের জিজ্ঞাসা করে জান্‌তে পারলাম যে ঐ ধর্ম্মশালা অতি নিকটে এবং সেখানে থাকবার বেশ সুবিধা হবে। ধর্ম্মশালায় গিয়ে

নর্ম্মদা-তীরে স্নানের ঘাট

জব্বলপুর নামবার জন্য প্রস্তুত হলাম। আড়াইটার সময় জব্বলপুর ষ্টেসনে বোম্বাই মেল থেকে নেমে পড়লাম। শ্রীযুক্ত হরিদাস বাবু ব'লে দিয়েছিলেন, আমরা জব্বলপুর ষ্টেসন থেকেই যেন একখানি ট্যাক্‌সি নিয়ে তেরো মাইল দূরে ভেড়াঘাট ডাকবাংলায় গিয়ে উঠি। সেই ডাকবাংলার নীচেই মার্ব্বল পাহাড়। আমরা কিন্তু সে উপদেশ প্রতিপালন করি নাই। আমরা মনে করলাম, বড়দিনের সময় আমাদেরই মত অনেক লোক, অনেক সাহেব বিবি মার্ব্বল পাহাড় দেখতে এসে থাক্‌বেন। তাঁরা হয় ত ডাকবাংলা দখল করে দেখ্‌লাম সে একটা রাজপ্রাসাদের মত সুন্দর জায়গা। চারিদিকে পুষ্পোদ্যান, মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকা। আমরা দ্বিতলের একটা কক্ষ অধিকার করলাম। শোনা গেল ধর্ম্মশালা-সংলগ্ন যে ভোজনাগার ছিল, তা উঠে গেছে, কারণ এখানে যারা আসে তারা নিজেরাই রেঁধে-বেড়ে খায়। আমরা সে ব্যবস্থা করতে অসমর্থ। শ্রীমান নরেন্দ্র তখন আমাকে ধর্ম্মশালায় রেখে রাত্রির আহারের ব্যবস্থা এবং পরদিন ভোরে মার্ব্বল-পাহাড় দেখ্‌তে যাওয়ার যান-বাহনের বন্দোবস্ত করতে চলে গেলেন।

আমি একেলা ধর্ম্মশালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি; এমন সময় সুমুখের পথ দিয়ে দুইটী বাঙ্গালী যুবক সাইকেলে চড়ে যাচ্ছিল। আমাকে ধর্ম্মশালার বারান্দায় দেখে তারা তাদের সাইকেলের গতিবেগ যে কম করল, তা বেশ বুঝতে পারলাম। দুইজনে যেন কি কথা হোলো। তার পরই তারা যে দিকে যাচ্ছিল, সেদিকে না গিয়ে সাইকেল ফিরিয়ে ধর্ম্মশালার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল এবং সিঁড়ি দিয়ে উপরে এসে দুইজনেই আমাকে নমস্কার করল। যে যুবকটী বয়সে বড়, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল "আপনার নাম কি জলধর বাবু?" আমি বল্লাম "ঐ নামই আমার বটে।" তখন সে তার সঙ্গীর দিকে চেয়ে বল্ল "কেমন, আমি ঠিক ধরিনি।" আমি বল্লাম "আমি কিন্তু আপনাকে চিন্‌তে পারছি নে।" যুবক হেসে বল্ল "আপনি আমাকে কি ক'রে চিন্‌বেন; আমি আপনাকে চিনি।" তার সঙ্গের যুবকটী তখন বল্ল "আপনি ক'ব এখানে এসেছেন?" আমি বললাম "এই আধ ঘণ্টা হোলো এসেছি। এখানে ত কাউকে চিনিনা; আর থাকাও এই রাতটা; কা'ল সকালেই মার্ব্বল পাহাড় দেখে বোম্বাই মেলে ইন্দোরে যাব। আমার সঙ্গে একটী বন্ধু আছেন। তাঁর নাম শ্রীনরেন্দ্র দেব। তিনি সব ব্যবস্থা করবার জন্য এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন।" ছোট ছেলেটি বল্ল "তা এখানে থাক্‌বেন কেন? আমাদের বাড়ীতে চলুন।" আমি বল্লাম "সে আর হয় না, একটা রাত বৈ ত নয়,—এখানেই কাটিয়ে দেব।" বড় যুবকটী বল্ল "আমার নাম শ্রীললিতমোহন ঘোষ। আমি নাগপুরে একাউন্‌টেণ্ট জেনারেল আফিসে চাকরী করি। আমিও মার্ব্বল পাহাড় দেখবার জন্য এখানে এসেছি। এঁদের বাড়ীতেই আজ সকালে এসে উঠেছি। কা'ল মার্ব্বল পাহাড় দেখে, কা'লই কলিকাতায় যাব।" সঙ্গী ছেলেটীকে দেখিয়ে বল্ল "ইনি এখানকার স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত মণিমোহন চৌধুরীর ছেলে। এঁর নাম শ্রীঅবনীমোহন চৌধুরী।" অবনীমোহন বল্ল "আপনাদের কিছুতেই ছাড়ছিনে। বেশ, জিনিসপত্র এখানেই থাক; রাত্রিতে আমাদের বাসায় আহার করে এসে এখানে শুয়ে থাক্‌বেন।" আমি ভাবলাম যে রকম গতিক দেখ্‌ছি, তাতে রাত্রিটা দোকানের পুরী খেয়েই কাটাতে হবে, নরেন্দ্র অন্য কোন উপায়ই করতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে এমন নিমন্ত্রণ অস্বীকার করতে নেই। আমি বল্লাম "বেশ, তাই হবে। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমার সঙ্গী এখনই আসবেন। তিনি কি বলেন শোনা দরকার।" অবনী বল্ল "আর শোনামেলা নয়। আমি বাড়ী চল্‌লাম।" ললিতকে উদ্দেশ করে বল্ল "তুমি থাক, নরেন্দ্রবাবু এলে এঁদের নিয়ে আমাদের বাসায় যাবে। আমি আগে গিয়ে বাবাকে খবর দিই।" এই ব'লে ছেলেটী যেই সিঁড়ির দিকে যাবে, সেই সময় নরেন্দ্র এসে উপস্থিত। এসেই তাড়াতাড়ি বললেন, "দাদা, কা'ল সকালে মার্ব্বল

রাণী দুর্গাবতীর মদন-মহল

পাহাড় আর নর্ম্মদা প্রপাত দেখতে গেলে ফিরে এসে বোম্বাই মেল ধরা যাবে না। তাই আমি টঙ্গা নিয়ে এসেছি। এখনই যেতে হবে। টঙ্গাওয়ালা বলেছে সে দেড় ঘণ্টায় ভেড়াঘাটে পৌঁছে দেবে। এখন তিনটে বেজেছে। সাড়ে চারটায় পৌঁছলে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে খুব ভাল দেখা যাবে। আর বিলম্ব নয়, ঘরে চাবিবন্ধ করি।" আমি বল্‌লাম "তার পর রাত্রির আহার।" নরেন্দ্র বল্‌লেন "আজ বাজারের পুরী তরকারীই বিধাতা মাপিয়েছেন।" তার কথা শুনে ছেলে দুইটী হেসে উঠ্‌ল। আমি বল্‌লাম "আজ বিধাতা এখানকার মাষ্টার মশাই মণিমোহন চৌধুরীর বাড়ীতে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন।" অবনীকে দেখিয়ে বল্‌লাম "ইনিই মণিবাবুর ছেলে অবনীমোহন চৌধুরী।" নরেন্দ্র অবাক্। আমি তাঁকে সব কথা বল্‌লাম, বিধাতা যে আমাদের জন্য বিশেষ চিন্তিত ছিলেন এবং দুইটী জীবকে রাত্রির উপবাস থেকে রেহাই দিয়েছেন, সে কথাও বুঝিয়ে দিলাম। নরেন্দ্র বল্‌লেন "আমরা যে এখনই মার্ব্বল পাহাড় দেখতে যাব।" অবনী বল্‌ল "সে পথও আমাদের বাড়ীর সুমুখ দিয়ে। চলুন, বাড়ীটা দেখিয়ে দেব; তারপর ফিরবার সময় আমাদের বাড়ীতে আহার করে এখানে এসে বিশ্রাম করবেন। ললিতবাবুও পাহাড় দেখতে এসেছেন, উনিও আপনাদের সঙ্গে গিয়ে আজই দেখে আসুন না।"

তাই ঠিক হোলো। আমি আর নরেন্দ্র টঙ্গায় উঠলাম। অবনী সাইকেল ছুটিয়ে আগে চ'লে গেল, ললিত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল নিয়ে চল্‌ল। মাইল খানেক গিয়েই মণিবাবুর বাসা। তিনি রাস্তায় এসে অভ্যর্থনা করলেন, চা পান করে বেরুতে বল্‌লেন। তা হোলে বিলম্ব হয়ে যাবে ব'লে আমরা আর অপেক্ষা করলাম না। মণিবাবু আমাকে বল্‌লেন "আমার একটু পরিচয় দেবার আছে। আমি নন্দীপুর স্কুলে আপনার ছোট ভাই শশধরবাবুর কাছে পড়েছি। সুতরাং আজ আমার গুরুসেবার সৌভাগ্য হোলো।"

আর বিলম্ব না ক'রে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। টঙ্গা-ওয়ালা যা বলেছিল, তাই করল। ঠিক সাড়ে চারটায় আমাদের গাড়ী ভেড়াঘাটে পৌঁছিল। পথের মধ্যে দুইটী দ্রষ্টব্য স্থানের উল্লেখ টঙ্গাওয়ালা করেছিল—একটী চৌষট্টি যোগিনী, আর একটী ইতিহাস-প্রসিদ্ধা রাণী দুর্গাবতীর মদন-মহল। কিন্তু ঐ দুইটী তখন দেখতে গেলে আর মার্ব্বল-পাহাড় সে দিন দেখা হয় না। তাই দূর থেকেই অভিবাদন করে আমাদের দর্শন-বাসনা সংবরণ করতে হোলো।

মার্ব্বল-পাহাড় দেখতে গেলে নৌকা ভাড়া করে যেতে হয়। ওখানকার জেলা বোর্ড দর্শকদের জন্য দুইখানি বোটের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। প্রত্যেক বোটের ভাড়া এক টাকা দশ আনা। এর জন্য একটা আফিস আছে। আমরা সেই আফিসে গিয়ে টাকা জমা দিয়ে রসিদ নিয়ে প্রায় পঞ্চাশ ষাটটা সিঁড়ি নেমে জলের কিনারায় এলাম। সেখান থেকে বোটে উঠে মার্ব্বল পাহাড়ের মধ্যে প্রবেশ করলাম। নর্ম্মদার একটী ক্ষুদ্র শাখার দুই পার্শ্বে মার্ব্বল পাহাড়। জলও খুব গভীর। এই শাখা নদীটা একটা খালের মত। কোন স্থানে দশ হাত, কোন স্থানে পনর কুড়ি হাত প্রশস্ত। দুই দিকে নানা রঙের মার্ব্বল পাহাড় মাথা উঁচু করে আকাশের দিকে চেয়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে। সে যে কি দৃশ্য তা আমি বর্ণনা করতে পারব না—সুধু বলতে পারি এ দৃশ্য পরম রমণীয়—এ দৃশ্য অপূর্ব্ব! এমন আর কখন দেখিনি। আমার সঙ্গী কবি নরেন্দ্র দেব এবং যুবক ললিত-মোহন একেবারে তন্ময় হয়ে গেলেন; তাঁরা সুধু বলেন—কি সুন্দর! আমি এইমাত্র বল্‌তে পারি, যাঁরা জব্বলপুরের এই মার্ব্বল পাহাড় দেখেন নাই, তাঁদের একটা দেখবার মত জিনিস দেখা হয়নি। ভাষায় এ পাহাড়ের সৌন্দর্য্য ব্যক্ত করা যায় না—কবির ভাষায় বল্‌তে হয়—

Gaze and wonder and adore.

যিনি এই অতুল সৌন্দর্য্যের আধার মার্ব্বল পাহাড় দেখতে চান, আমি তাঁর সঙ্গী হয়ে দেখিয়ে আনতে পারি, কিন্তু সে দৃশ্যের বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। কয়েকখানি আলোকচিত্র সংগ্রহ করেছিলাম, তাই এই প্রবন্ধের সঙ্গে জুড়ে দিলাম।

সন্ধ্যার অন্ধকার যখন নেমে আস্‌তে লাগল, তখন আমাদের তরী ঘাটে এল—তার আগে কেবলই কবির এই কয় লাইন মনে আস্‌ছিল—

"চৌদিকে রাঙ্গা মেঘ করে খেলা।
তরণী বেয়ে চল নাহি বেলা॥"

সন্ধ্যার সময় ভেড়াঘাটে নেমে সিঁড়ি ভেঙ্গে আর উঠতে

পারিনে! সেই কোন্ ভোরে একটা ষ্টেসনে চা খাওয়া হয়েছিল; তার পর বেলা দশটায় দুটো নামমাত্র আধপেট ভাত খেয়েছিলাম—আর এখন সন্ধ্যা ছয়টা; এর মধ্যে জলবিন্দুও পেটে পড়েনি—শরীরের অপরাধ কি? ধীরে ধীরে অতি কষ্টে সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠে ডাক বাংলার দিকে গেলাম। রাস্তায় কিন্তু মনে হয়েছিল সেখানে এক পেয়ালা চা-ও মিল্‌বে না, একপাল শ্বেতাঙ্গ নরনারী হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌বে। কিন্তু ডাক-বাংলায় গিয়ে দেখি জন-প্রাণীও নেই। অনেক ডাকাডাকির পর খানসামা এল। লোকটা বড় ভাল। আমরা ক্ষুধার্ত্ত শুনে বল্‌ল, সে তখনই চা, বিস্কুট আর ডিম-সিদ্ধ তৈরী করে দিতে পারে; তার ভাণ্ডারে আর কিছু নেই; সহর থেকে এই সন্ধ্যাবেলা আনিয়ে নেওয়াও অসম্ভব। যা আছে তারই অর্ডার দিয়ে আমরা ডাকবাংলার বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লাম। সেখান থেকে মার্ব্বল-পাহাড়ের দৃশ্য আরও সুন্দর। কিন্তু রাত্রি বেড়ে আস্‌তে লাগল—দৃশ্যও অদৃশ্য হতে লাগ্‌ল। এ দিকে তখনও নর্ম্মদা জলপ্রপাত দেখা হয় নাই।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চা, বিস্কুট ও ডিম-সিদ্ধ এসে হাজির হোলো। আমি তিন পেয়ালা চা ও এক ডজন বিস্কুট খেয়ে ফেল্‌লাম। সঙ্গীদ্বয় চা ও বিস্কুটের সঙ্গে দশ বারোটা ডিম দেখ্‌তে দেখ্‌তে উদরস্থ করলেন, আমি ডিম খাই না—আমার ভাগটা ওঁরা দুজনে বেঁটে নিলেন।

নর্ম্মদা জলপ্রপাত সেখান থেকে তিন মাইল দূরে। সেদিন কি তিথি বল্‌তে পারি না, তবে অন্ধকার তত গাঢ় ছিল না। একজন পথিপ্রদর্শক সঙ্গে নিয়ে সেই ধূলিময়, প্রস্তরখচিত পথে অতি সন্তর্পণে চল্‌তে লাগলাম। নর্ম্মদার তীরে গিয়েও প্রায় আধ মাইলের উপর পাথর ভেঙ্গে প্রপাতের কাছে গেলাম! তেমন শোভা কিছুই নেই। শীতকাল, জল বেশী নেই, কাজেই প্রপাতেরও তেমন জোর নেই, সামান্য একটু উপর থেকে ঝর ঝর করে জল পড়ছে। এই তিন মাইল হেঁটে আসার মজুরী পোষালো না। সেখান থেকে ফিরে যখন টঙ্গার কাছে এলাম, তখন রাত্রি সাড়ে আটটা। মণিবাবু বারবার ক'রে বলে দিয়েছিলেন আটটার মধ্যে যেন ফিরি। বড়ই বিলম্ব হয়ে গেল, উপায় নেই। মণিবাবুর বাড়ী যখন পৌছিলাম, তখন রাত্রি দশটা বেজে গেছে। আহারাদি শেষ করে গৃহস্বামীকে ধন্যবাদ দিয়ে প্রায় সাড়ে এগারটায় ধর্ম্মশালায় ফিরে এলাম। টঙ্গাওয়ালাকে বলে দেওয়া হোলো, সে যেন প্রাতঃকালে আটটার সময় আসে, আমরা গোয়াড়ি-ঘাটে নর্ম্মদায় স্নান করতে যাব। গোয়াড়ি ঘাট সহর থেকে পাঁচ মাইল। এখানেই যাত্রীরা স্নান পূজা তর্পণাদি করে।

রাত্রিটা বেশ কাটল। সকালে উঠে সন্ধান নিয়ে জান্‌তে পারা গেল যে, এখানে বারণ-কোম্পানীর বাঙ্গালী-বাবুদের একটা হোটেল আছে; সেখানে মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থা হতে পারে। যথাসময়ে টঙ্গাওয়ালা হাজির; আমরা কাপড় গামছা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। টঙ্গাওয়ালাকে ব'লে দেওয়া হোলো, আগে যেন বারণ-কোম্পানীর বাঙ্গালী-বাবুদের বাসায় যায়। সেখানে আহারের ব্যবস্থা ঠিক করে স্নানে যাওয়া যাবে। টঙ্গাওয়ালা বারণ কোম্পানী পর্য্যন্ত বুঝেছিল। সে প্রায় তিন মাইলের উপর টঙ্গা চালিয়ে বারণ কোম্পানীর কারখানায় গিয়ে হাজির। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, বাঙ্গালী বাবুরা সেখানে থাকেন না, সহরে ষ্টেসনের নিকট ধর্ম্মশালার কাছে তাঁদের বাসা, অর্থাৎ আমরা যে ধর্ম্মশালায় আছি, তারই নিকটে কোথাও তাঁরা থাকেন। বোঝা গেল, বিধাতা বিগত রাত্রের অপ্রত্যাশিত নিমন্ত্রণের শোধ এ বেলা নেবেন। যাক্, নর্ম্মদায় স্নান করে ত আগে পুণ্য সঞ্চয় করা যাক, তার পর বিধাতার সঙ্গে বোঝাপড়া করা যাবে।

নর্ম্মদার তীরে গিয়ে স্নানাদি শেষ করতে প্রায় এগারটা বেজে গেল। তার পর তাড়াতাড়ি টঙ্গা চালিয়ে সহরে এসে বারণ কোম্পানীর বাঙ্গালী বাবুদের আড্ডার খোঁজে যাওয়া গেল। আড্ডা পাওয়া গেল, কিন্তু শোনা গেল, তাঁরা হোটেল তুলে দিয়েছেন। তখন ধর্ম্মশালার দুয়ারে আমাকে নামিয়ে দিয়ে নরেন্দ্র পুরী তরকারী কিন্‌তে গেলেন।

আমি ধর্ম্মশালার সিঁড়িতে উঠ্‌তেই দেখি অবনী ও আর একটী ছেলে সিঁড়িতে বসে আছে। কি ব্যাপার! অবনী বল্‌ল, তারা সেই বেলা সাড়ে আটটা থেকে আমাদের অপেক্ষায় বসে আছে। তার এই সঙ্গীটি এখানকার উকিল শ্রীযুক্ত বিবেকরঞ্জন সেন এম-এ, বি-এস্‌সি, এলএল-ডি মহাশয়ের ভ্রাতা। আমাদের এবেলা তাঁর বাড়ীতে আহার করতে হবে। সেখানে সমস্ত প্রস্তুত। আমরা দুইটার মেলে যাব বলে তিনি এগারটার মধ্যেই

সব ঠিক করে রেখেছেন। ক্রমাগত লোক পাঠাচ্ছেন। ভাল কথা—বিধাতা তা হ'লে আজও প্রচুর ব্যবস্থা করেছেন। নরেন্দ্র ষ্টেসনের কাছে খাবারের দোকানে পুরী কিন্‌তে গিয়েছে শুনে অবনী ষ্টেসনের দিকে দৌড়িল এবং অনতিবিলম্বে নরেন্দ্রকে পাকড়াও করে নিয়ে এল। তখন বারটা বেজে গেছে। আমাদের সেই টঙ্গাওয়ালাকেই নিয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত বিবেকরঞ্জন বাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণ খেতে গেলাম। বিবেক বাবুর বয়স এই পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হবে; জুনিয়ার উকিল হ'লেও পসার যে হয়েছে, তা তাঁর ঘরদ্বার, আস্‌বাবপত্র ও আহারের প্রচুর অপেক্ষাও প্রচুর আয়োজন দেখেই বুঝতে পারা গেল। মোটামুটি ভদ্রতা-সঙ্গত কথাবার্ত্তা ব'লেই আমরা আহার করতে গেলাম, কারণ সময় অতি অল্প—আড়াইটায় ট্রেণ।

আহার করতে বস্‌লাম। বিবেকবাবুর স্ত্রীই পরিবেশন করতে লাগ্‌লেন। নানা রকমের সুখাদ্য। আমি আহার করতে করতে বিবেক বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম "আচ্ছা বিবেক বাবু, আপনারা কি বৈদ্য?" তিনি বল্‌লেন "না, আমরা বৈদ্য নহি, আমরা কায়স্থ।" "কায়স্থ! আপনাদের বাড়ী কোথায়?" "হুগলী জেলায় কুমীরমোড়া।" আমি একেবারে লাফিয়ে উঠ্‌লাম—"আরে, কুমীরমোড়ার সেনেরা যে আমার জ্ঞাতি। আপনি রাজেন্দ্র বাবুকে চেনেন? সত্যরঞ্জন বাবুকে চেনেন?" বিবেক বাবু বল্‌লেন "রাজেন্দ্রবাবু আমার কাকাবাবু, সত্যরঞ্জন আমার জ্যেঠামশাইয়ের ছেলে।" তখন আর কি—পরিচয় হয়ে গেল; আমি বিবেকরঞ্জনের জ্যেঠামশাই। বিবেকের স্ত্রী এসে বল্‌লেন "আমরা যে সাহিত্যিক ভোজন করাতে বসেছিলাম, জ্যেঠামশাইকে ত নিমন্ত্রণ করি নাই। পরিচয় যখন হোলো, তখন জ্যেঠামহাশয়কে না খাইয়ে ত ছাড়তে পারিনে।" কি করি, ফিরবার সময় যদি পারি, তা হলে নামব, বল্‌লাম। সাহিত্যিক হিসাবে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলাম এক সম্পূর্ণ অপরিচিত বাঙ্গালী যুবকের বাড়ী; শেষে কি না ফিরতে হোলো জ্যাঠামশাই হয়ে! এরই নাম ভাগ্য!

প্রায় দেড়টার সময় এই নবপরিচিত অথচ নিকট জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র ও বধূমাতাকে আশীর্ব্বাদ করে তাড়াতাড়ি ধর্ম্মশালায় ফিরে এলাম এবং বিছানাপত্র বেঁধে নিয়ে ষ্টেসনে হাজির। ষ্টেসনে দেখা হোলো কাশী-হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে। তিনিও ইন্দোর যাচ্ছেন, প্রাতঃকালের গাড়ীতে এসে এখানে এক বন্ধুর গৃহে উঠেছিলেন।

যথা-সময়ের আধঘণ্টা পরে মেল গাড়ী এলো। বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি প্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা মহাশয় একটী দ্বিতীয় শ্রেণীর কক্ষে ছিলেন। তাঁর আহ্বানে সেই কক্ষেই আমরা স্থান গ্রহণ করলাম। সেখানেই একজন ইন্দোরগামী সাহিত্যিকের কাছে শুন্‌লাম, আমাদের কেদারদাদা (স্বনামধন্য কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) অন্য কক্ষে আছেন। তিনিও ইন্দোর যাচ্ছেন। তখন গাড়ী ছেড়ে দিবার বিলম্ব ছিল না; তাই কেদারদাদার কাছে যেতে পারলাম না। পরের ষ্টেসনেই তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম।

রাত তিনটায় খাণ্ডোয়ায় অবতরণ; শীতে হি হি করতে করতে ইন্দোরগামী গাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ, ২৫শে ডিসেম্বর বেলা দশটায় ইন্দোর দাখিল। এবার এই পর্য্যন্তই।

দুর্গম

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(১)

সাঁঝ এলো নেমে, পথ দুর্গম গহন ;
তাই কি এ শঙ্কা—পূর্ণ মনোরথ মন
পাছে নাহি হও ভাবি—পূরবীর সুরে
তাই কি গাহিছে হৃদি বেদন-বিধুর এ ?
সাথে তার নীল উর্ম্মি মিলায়ে কাতর
শ্বসিত শীকর দীর্ঘ ধ্বনিছে প্রান্তর ;
নীলিমায় চাহি তারা বহিয়া কি বাণী
আনে আজি অশ্রুসিক্ত নাহি তাহা জানি !

(২)

তবু মনে হয় ছিল জানা কোনো দিন
কি পিপাসা বহে হৃদে ও চির-নবীন
আবছা চাঁদিনি আঁখিপাত ছাপি বেলা—
তটপ্রান্ত ভাসাইয়া কম্প্র অশ্রু ভেলা
ফেনরূপী ! ছিল চেনা শত আবেদন
নীরদে বারিধি-বক্ষে চাঁদিমা মিলন !—
আনে বহি আজি হৃদে কোন্ ভোলা স্মৃতি,
কোন্ যেন আধপথে-থেমে-যাওয়া গীতি !
বিস্মৃত জননী-মূর্ত্তি—শুধু সে কোলের
স্বাদ জেগে আছে যেন মাঝারে প্রাণের !
সহসা কোলের স্বাদ ফিরে আসে মুখে
খেলা মাঝে—ভোলা মুখ উঠে জেগে বুকে !

(৩)

কেন হেন হয় ? কোন্ বেদন মানবে
আকুলিয়া তোলে ঘরছাড়া বাঁশী-রবে ?
পেয়ে কেন হয় হৃদি ছাড়িতে ব্যাকুল ?
সুগম পন্থার স্বস্তি ছাড়িয়া বিপুল
গহন কান্তার অরণ্যানী মাঝে পথ
খোঁজে কেন ?—যদি না পূরিবে মনোরথ ?

(৪)

মনোরথ ? কি বা তাহা ? কার বা এ মন ?
কেন বা বাসনা ? ভাঙা-গড়ার মতন ?
কা'ল যাহা পেয়েছিনু আজি দলি তারে
চাহি যেতে কোন্ অলক্ষের অভিসারে ?
রাজে যদি গূঢ় বর অন্তরের তলে
কেন খুঁজি চারিধারে—তিতি অশ্রুজলে ?
অরূপ রতন ধরে রত্নাকর যদি
কোন্ সে রতন লাগি ধায় নিরবধি
ধূ ধূ বেলা পানে ?—পাণ্ডুর নক্ষত্রমালা
মরতের পানে কোন্ উৎসর্গের ডালা
তরে চাহে প্রতি রশ্মি চাহনির পাতে
নভোনীল কোলে বসি কেন নিত্য রাতে
চাহে বস্তুসার জড় ধরণীর পানে
মাটির পিপাসা জাগে কি অলকা-প্রাণে ?
ত্রিদিবও জানেনা বুঝি কোথা সার্থকতা,
তাই করে বরণ সে মৃত্তিকার ব্যথা ?

(৫)

এই যদি সত্য হয়, কেমনে ধরার
মানব আপন প্রাণে নিভৃত সুধার
খনির সন্ধান পাবে ?—কেমনে জানিবে ?
বিরাট অজ্ঞান যদি—তুচ্ছে কি করিবে ?
কি গানে উঠিবে জাগি সুপ্ত হৃদিপুর ?
কি সে চাহে কেমনে বা জানিবে বিধুর
অজ্ঞাত পিয়াসী ভগ্নস্বপ্ন এ পরাণ—
যদি এ নিখিলে নাহি বাজে প্রাপ্তি গান
ইন্দ্রিয় নেপথ্যে উদ্ভাসিত রাজ্যে কোনো
যদি কেহ নাহি বলে "কাণ পেতে শোনো

(৬)

তাই কি গো শ্রবণ উৎসুক মোর প্রাণ
নিমগ্ন নিরাশ নাহি শুনি সেই গান
যে গানের ঠাটে তার সুরতন্ত্রী বাঁধা
হ'য়েছিল ? হৃদবীণ কম্পনেতে সাধা ?
সে গানের হারাপথ চায় বা খুঁজিতে ?
তাই কি দুর্গম বর্ম্ম মনে হয় চিতে ?

(৭)

না না বুঝি প্রাণ তুই বেসেছিলি ভালো
বলি ওঠে জেগে আজো লুপ্তপ্রায় আলো
সে সুখ-স্মৃতির—সেই আনন্দ মন্থন
পাওয়ার জাগায় চিতে ক্ষয়ের বেদন ?
ঝলি ওঠে স্মৃতি গন্ধে সেই হারানোর
অনির্দ্দেশ্য ব্যথা—তাই ঝরে আঁখিলোর ?
যতখানে যত তুই পেয়েছিলি স্নেহ
তখন বুঝিস্ নি ক মূল্য তার—গেহ
আজি ত্যজি মনে হয় নিরালা অঙ্গনে
স্নেহপ্রীতি সেবাচ্ছায়ে স্নিগ্ধ সে ভবনে
কত ছোট দুঃখ সুখ তুচ্ছ গল্প হাসি
সর্ব্বোপরি তারি সাথে ভালবাসাবাসি।
হারানো আনন্দমাঝে লুপ্ত স্নেহ হৃদি
পারিস না যেতে তাই শ্বসিস্ বারিধি
সম ঐ অদূরের—শূন্যেরে আঁকড়ি
তাই কিছুতেই মন ওঠে না ক ভরি?

(৮)

না না—স্নেহ প্রীতি প্রেম লুপ্ত তরে নহে
তোর হৃদি কুঞ্জ হ'তে—আজিও ত' বহে
শত পুরাতন স্মৃতি তেমনি মধুর
শত তুচ্ছ ভাঙাগড়া দুখসুখ সুর
তেমনি সে রেশে অপরূপ ভরি তোর
তোলে না কি হৃদি মাঝে ? ভালবাসা ডোর
তেমনি অটুট যদি নাহি থাকে আজি
একটি স্মৃতির দোলে সারা বক্ষ বাজি
ওঠে কেন টনটনি ? কেন দীর্ঘশ্বাস
আকুলিয়া তোলে ঐ শান্ত নীলাকাশ ?
হৃদয়ের নিলয়ের নিভৃত সে কোণে
প্রেম যদি এখনও আশা নাহি বোনে
অনুক্ষণ বিছাইয়া স্বপ্নজাল তার
শত শত গন্ধে বর্ণে বিচিত্র সম্ভার
বহন করিয়া আনি—তবে প্রিয় আজি
প্রিয়তম বেশে বল কেমনে বা সাজি ;
এসেছ কুসুমবাসে মোহ রঙ্গিমায়
আজি—যাহে প্রাণ মোর আছাড়িতে চায়
তোমার চরণে নিবেদিয়া তার সবে
সার্থকতা রক্তরাঙা হইয়া গরবে ?

(৯)

না না—নহে নহে পথ দুর্গম বলিয়া
নহে শুধু আঁধারে বারেক ঝলকিয়া
দেখাইতে কত গাঢ় আজি রশ্মিপাত,
এ নহে এ হৃদয়ের তমিস্রার রাত,
চিরদিন তরে যেথা স্রোত গেছে থেমে
যেথায় শূন্যতা স্তব্ধ আসিয়াছে নেমে
স্পন্দহীন, বেগহীন, সময়ের পার
অন্তহীন ছন্দে—নহে এ তাহার ভয়
নহে ক এ হৃদয়ের অজস্র সঞ্চয়
খোয়াইতে অপচয়ে হেন অভিযান
উন্মত্ত প্রাণের—নিমেষেতে শতখান
করিতে সে অশ্রুভরা গড়ার বেদন
নহে আজি রিক্ততার নিষ্ঠুর নর্ত্তন
হিংস্র প্রকৃতির সম—ইহা বিবর্ত্তন

(১০)

গাওয়া গান ছাড়ি গাহিতে অশ্রুত গীত
চলে হৃদি অভিসারে চির পিপাসিত
এ দুর্গম কাঁটাপথ করিয়া বরণ
কেন ?—অলক্ষের পানে আত্মনিবেদন
করিতে যে চাহে হৃদি যুগ যুগান্তর
ধরি—তাই ছোটে নর কান্তার প্রান্তর
অতিক্রমি নাহি গণি ক্রূর ঝঞ্ঝাবাতে
নাহি গণি ঘরছাড়া তামসিনী রাতে
উষার আলোক পানে রহি ঊর্দ্ধমুখ
ছাড়ে সে সাঁঝের শান্ত স্নিগ্ধ দীপটুক
একান্ত নিরালা কোণে—মন নাহি ভরে
তাহে স্নিগ্ধতার মাঝে নির্ভর নিগড়ে
নিশ্চিন্তে না চায় যে সে বিলম্ব না সয়
চলা তার ব্রত—এ যে মানব হৃদয়।

রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর সি-আই-ই

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

বাঙ্গালাদেশে শিক্ষাবিস্তারে যে সকল মনস্বী ব্যক্তি ইংরেজী-শিক্ষার মধ্যযুগে আত্মবিনিয়োগ করিয়াছিলেন, পরলোকগত রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। তৎকালে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারেই সাধারণতঃ লোকের সমধিক উৎসাহ দেখা যাইত। রাধিকাপ্রসন্ন কিন্তু একটু বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্র নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি মাতৃভাষার সাহায্যে নব্যতন্ত্রের শিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি ইংরেজী সাহিত্য হইতে উপকরণ আহরণ করিয়া বাঙ্গলা ভাষায় বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়ন পূর্ব্বক শিক্ষার্থীদিগের মহোপকার সাধন করেন। আমরা বাল্যকালে তৎপ্রণীত "স্বাস্থ্যরক্ষা" "প্রাকৃতিক ভূগোল" প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিয়া ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়াছিলাম। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থ অধ্যয়নকালে আমাদিগকে যে সকল গ্রন্থ পাঠ করিতে হইয়াছিল এবং নানা বিষয়ে যে সকল শিক্ষালাভ করিতে হইয়াছিল, ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পর হিন্দুস্কুলে ভর্ত্তি হইয়া তাহার সুবিধা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম। বস্তুতঃ তৎকালে ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর পরীক্ষার্থীদিগকে যে সকল বিষয় যে পরিমাণে অধ্যয়ন করিতে হইত, তাহা তৎকালীন এণ্ট্রান্স-পরীক্ষার্থীর, ইংরেজী-সাহিত্য ও ব্যাকরণ ব্যতীত অপর সকল বিষয়ক পাঠ্য অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। সুতরাং আমাদের এণ্ট্রান্স পড়িবার সময় ইংরেজী সাহিত্য ব্যতীত নূতন করিয়া কিছু পড়িবার ছিল না। সেই সুব্যবস্থা কেন উঠিয়া গেল তাহা ভাবিয়া পাই না। আমার পুত্রগণের বিদ্যারম্ভের কাল উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে ছাত্রবৃত্তি পড়াইবার আমার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সহরে একটিও ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয় খুঁজিয়া পাইলাম না। পূর্ব্বে যতগুলি ছাত্রবৃত্তি স্কুলের কথা আমার জানা ছিল, সন্ধান করিতে গিয়া দেখি, সে সমস্ত স্কুলের 'পদোন্নতি' ঘটিয়াছে, তাহারা ছাত্রবৃত্তি হইতে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হইয়াছে। ইহাতে বিদ্যালয়ের কি সুবিধা হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না; তবে শিক্ষার্থীর যে যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে, তাহাতে সংশয় নাই। ইংরেজী শিক্ষার মোহ আমাদিগকে এতটাই অভিভূত করিয়াছে যে, প্রকৃত শিক্ষা হইতে আমাদের দৃষ্টি অপসারিত হইয়াছে; বস্তু ত্যাগ করিয়া আমরা ছায়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছি। এবং এরূপ বিকৃত শিক্ষার ফল কিরূপ ফলিতেছে তাহাও সকলেই নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছেন। বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষা বিধানের জন্য যে মনস্বিবর্গ বাঙ্গলা ভাষায় শিশুপাঠ্য গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া শিক্ষাবিস্তারে সহায়তা করিয়াছিলেন, রাধিকাবাবু তাঁহাদের অন্যতম বলিয়া আমাদের নমস্য, এবং আজ 'ভারতবর্ষে' তাঁহার জীবনী আলোচনার সুযোগ পাইয়া আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত গোস্বামী দুর্গাপুর গ্রামে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট, সন ১২৪৫ সালের ৭ই ভাদ্র রাধিকাপ্রসন্নর জন্ম হয়। ইঁহার পিতা অন্নদাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় নীলকুঠীতে কর্ম্ম করিয়া যেমন বহু ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ প্রচুর দানও করিয়া গিয়াছিলেন।

শিক্ষালাভে বাল্যকাল হইতেই রাধিকাপ্রসন্নর অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে যে সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা হয়, তাহাতে বাঙ্গলার সমস্ত কলেজের সকল পরীক্ষার্থীর মধ্যে রাধিকাপ্রসন্ন সর্ব্বপ্রথম স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি সার চন্দ্রমাধব ঘোষ, রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ এই পরীক্ষায় রাধিকাপ্রসন্নর সহযোগী পরীক্ষার্থী ছিলেন। পরীক্ষার ফলে রাধিকাপ্রসন্ন বৃত্তি ও পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন।

অনন্তর রাধিকাপ্রসন্ন সরকারের শিক্ষাবিভাগে কর্ম্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রেসিডেন্সী সার্কেলে চৌদ্দ বৎসর কাল স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টরের পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দ্বাদশ বৎসর কাল তিনি ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ব্বিসের মেম্বার ছিলেন। এতদ্ব্যতীত দীর্ঘকাল তিনি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। তৎকালীন সেণ্ট্রাল টেক্সটবুক কমিটির তিনি ছিলেন সদস্য ও সম্পাদক; ইডেন হিন্দু হোষ্টেল কমিটিরও সদস্য ও সম্পাদকের পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহা ছাড়া বোর্ড অব ভিজিটর্স, শিবপুরের সিবিল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সদস্যরূপে তিনি অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রয়োজনীয় সাহিত্য সমিতির (Useful Literature Society) তিনি আজীবন সভ্যরূপে শিক্ষাপ্রচারে অনেক সহায়তা করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি Net Grant Committeeর সদস্য হন। তৎপর বৎসর স্কুলসমূহে সরকারী সাহায্য দান সংক্রান্ত নিয়মাবলীর পরিশোধন ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারার্থ যে পরামর্শ সভার সৃষ্টি হয়, তাহার সদস্য ও সম্পাদকের পদে বৃত হইয়া রাধিকাপ্রসন্ন এই দুই বিষয়ে অনেক স্মরণীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ১৮৯৯—১৯০০ খৃষ্টাব্দে এ দেশে বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষা বিস্তারের 'স্কীম' সংশোধনের জন্য একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। রাধিকাপ্রসন্ন এই সভারও সদস্য ও সম্পাদক ছিলেন এবং এই সূত্রে তাঁহার চেষ্টায় ছাত্রবৃত্তি, মাইনর, উচ্চ ও নিম্নপ্রাথমিক এবং মধ্যছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয় সমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই সকল বিদ্যালয়ে পঠন পাঠনার জন্য তিনি কিছু কিছু পাঠ্য পুস্তকও বাঙ্গলা ভাষায় প্রণয়ন করেন, সে কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ হেনরী উডরো এম-এ সাহেবের স্মৃতিরক্ষার্থ একটি তহবিল স্থাপিত হইলে রাধিকাপ্রসন্ন তাহার অবৈতনিক সম্পাদক হন। তাঁহার চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়-মন্দিরে উডরো সাহেবের একটি মর্ম্মর-নির্ম্মিত অর্দ্ধ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে "উডরো বৃত্তি" নামে একটি বৃত্তি স্থাপিত হয়। এইরূপে শিক্ষা-বিভাগের অপর অধ্যক্ষ মিঃ চার্লস্ এইচ, টনি এম-এ, সি-আই-ই সাহেবের স্মৃতিরক্ষা কল্পে স্থাপিত তহবিলের অবৈতনিক সম্পাদকরূপে রাধিকাপ্রসন্ন সেনেট হাউসে টনি সাহেবের একটি মর্ম্মর অর্দ্ধ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন ও টনি মেমোরিয়েল প্রাইজ স্থাপন করেন।

রাধিকাপ্রসন্ন অনেকগুলি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহিতও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান-সভার (Indian Association for the Cultivation of Science) তিনি আজীবন সভ্য ছিলেন। দুস্থ ব্যক্তিগণকে বৃদ্ধাবস্থায় সাহায্য করিবার জন্য এবং তাঁহাদের লোকান্তরের পর তাঁহাদের নিরাশ্রয় পরিবারবর্গের সাহায্যার্থ বাঙ্গলায় যে প্রথম প্রতিষ্ঠান সৃষ্ট হয়, রাধিকাপ্রসন্ন তাহার প্রতিষ্ঠাতৃবৃন্দের অন্যতম ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটি অধুনা হিন্দু ফ্যামিলি এন্যুয়িটি ফাণ্ড নামে পরিচিত এবং বিশেষ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। রাধিকাপ্রসন্ন বহুকাল ইহার ডাইরেক্টার ছিলেন। তিনি গোঁসাই দুর্গাপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক; এবং ইহার গৃহনির্ম্মাণ ও গ্রন্থাগার তহবিলে তিনি দশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি নদীয়া জেলার নানা স্থানে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারার্থ বালিকা বিদ্যালয়-সমূহ স্থাপন করিয়া বহুকাল ধরিয়া পরিচালন করিয়াছিলেন।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার "স্বাস্থ্যরক্ষা" পুস্তক প্রথম প্রকাশিত হয়। কোন ভারতীয় ভাষায় স্বাস্থ্য বিষয়ক পুস্তক এই প্রথম। অবশ্য ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "শরীর পালন" ও "সরল শরীর পালন" পুস্তক দুইখানিও প্রায় এই সময়ে প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গলা স্কুলের নিম্নশ্রেণীর অন্যতম পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু রাধিকাবাবুর স্বাস্থ্যরক্ষা পুস্তকখানি অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীর বালকদিগের পাঠ্য ছিল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে রাধিকা বাবু "ভূবিদ্যা" বা প্রাকৃতিকভূগোল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এখানিও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদের পাঠ্য ছিল। Notes on Hindi নামক গ্রন্থে রাধিকাপ্রসন্ন বিহারের আদালত সমূহে পার্শী ভাষার পরিবর্ত্তে কায়েথি ভাষার প্রবর্ত্তনের পরামর্শ দেন, এবং বহু যুক্তি-তর্ক সহকারে নিজের মতের সমর্থন করেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তক প্রথম প্রচারিত হয়। তৎপরে রিপোর্ট অব দি ইণ্ডিয়ান এডুকেশন কমিশনের ক্রোড়পত্ররূপে এই পুস্তক সরকার কর্ত্তৃক পুনর্মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। রাধিকা বাবু ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে বার্ষিক সাধারণ বিবরণী রচনায় শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষগণকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

রাধিকাপ্রসন্ন ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে সরকার কর্ত্তৃক রায় বাহাদুর উপাধি-ভূষিত হন। ভারত সচিব মহোদয় রাধিকা বাবুকে বিশেষ একটি বৃত্তি দান প্রসঙ্গে তাঁহার কর্ম্মদক্ষতার উচ্চ

প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি সি-আই-ই উপাধি প্রাপ্ত হন।

সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের পরও রাধিকা বাবু শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে সরকারকে সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। এ জন্য বঙ্গের তৎকালীন ছোটলাট সার ষ্টুয়ার্ট বেলী, এবং শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ সার আলেকজাণ্ডার পেডলার উচ্চকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় গবর্মেণ্টের ন্যায় ভারত গবর্মেণ্ট হইতেও রায় বাহাদুর রাধিকাপ্রসন্ন উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার সার টমাস র‍্যালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন উপলক্ষে একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার কল্পে রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের অক্লান্ত পরিশ্রমের তুলনা হয় না।

সার আলফ্রেড ক্রফটের মুখে আমরা জানিতে পারি যে, রাধিকাপ্রসন্ন সাঁওতাল পরগণার আদিম জাতিসমূহের শিক্ষা-বিধানার্থ নূতন এক প্রকার শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার চেষ্টায় স্ত্রীশিক্ষা এদেশে যথেষ্ট বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী—সন ১৩০৯ সালের ১০ই ফাল্গুন রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর লোকান্তরে গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর গুণগ্রাহী জনসাধারণ চাঁদা তুলিয়া তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে কিছু অর্থ প্রদান করেন। এই টাকার আয় হইতে প্রতি বৎসর একটি স্বর্ণপদক ও অন্যান্য পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

রাধিকাবাবুর ভ্রাতা রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল একাধারে কবি, দার্শনিক ও গ্রন্থকার ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় গবর্মেণ্টের অধীনে অনুবাদকের পদে কার্য্য করিতেন।

রায় বাহাদুরের চারিটি পুত্র ছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র রায় সাহেব স্বর্গীয় অভিলাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিহার ও উড়িষ্যায় আবগারী বিভাগের ডেপুটী কমিশনারের পদে সুদীর্ঘ কাল কার্য্য করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পুত্র স্বর্গীয় পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় "হেয়ার প্রেস" স্থাপন করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত তিনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটও ছিলেন।

তৃতীয় পুত্র রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি-এ বিহার ও উড়িষ্যায় একমাত্র বাঙ্গালী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। কিছু দিন তিনি উক্ত প্রদেশের বোর্ড অব রেভিনিউর সেক্রেটারীর পদেও কার্য্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি মানভূমের ডেপুটী কমিশনার। কবিতা রচনা ও বাঙ্গলা সাহিত্য-চর্চ্চাও তিনি করিয়া থাকেন।

সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাংবাদিকের কার্য্য করেন।

স্বপ্ন

অধ্যাপক রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর এম-এ

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'ভারতবর্ষে' স্বপ্নদর্শন নামে কতকগুলি চিত্তাকর্ষী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেগুলি পরিমার্জিত হইয়া এই পুস্তকে নিবদ্ধ হইয়াছে। ইতর প্রাণীর স্বপ্ন নামে এক নূতন পরিচ্ছেদ যুক্ত হইয়াছে।

বইখানি দর্শনডালী হইয়াছে। পুরু কাগজে পাইকা টাইপে ছাপা। স্বপ্ন-রাজ্যের পথ-প্রদর্শক সিগ্‌মুণ্ড্ ফ্রয়েড সাহেবের একখানি সুন্দর চিত্র আছে। চিত্রকলাবিৎ শ্রীযুত যতীন্দ্রকুমার সেনের অসামান্য নৈপুণ্যে চিত্রখানি ফটো মনে হয়। আমি এমন চিত্র দেখি নাই। বায়ুরোগ চিকিৎসা করিতে গিয়া ফ্রয়েড সাহেব স্বপ্ন তত্ত্বে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। ভূমিকায় এ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ভূমিকার পর গ্রন্থ-সূচী থাকিবার কথা। এই পুস্তকে সূচী নাই, বস্তু-নির্দেশ ও পরিচ্ছেদ পাইতেছি না। পুস্তকে নির্ঘণ্ট আছে, সূচী নাই। কিন্তু একের প্রয়োজন অন্য দ্বারা সিদ্ধ হয় না। একটি ব্যাস, অপরটি সমাস ; একটি ব্যাকরণ, অপরটি সঙ্করণ। বইখানি স্বপ্ন-ব্যাকরণ ; গ্রন্থকার শ্রীযুত বসু মনোব্যাকরণবিৎ। হয়ত তিনি এখানে অজ্ঞাতসারে তাঁহার অভ্যাসের পরিচয় দিয়াছেন।

সূচীতে দেখিতাম, বইতে এই এই পরিচ্ছেদ আছে।—উপক্রমণিকা, স্বপ্ন কি, স্বপ্ন কেন হয়, স্বপ্নের অর্থ কি, অবাধ-ভাবানুষঙ্গ-ক্রম, জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ইচ্ছা, ইচ্ছা কেন অজ্ঞাত হয়, রুদ্ধ ইচ্ছার প্রকাশ, অজ্ঞাত ইচ্ছার প্রকাশ, স্বপ্নের বিশেষত্ব, মনের প্রহরী, স্বপ্নের রুদ্ধ ইচ্ছা, স্বপ্নের উপাদান

স্বপ্নে বাল্যস্মৃতি, সার্ব্বজনীন স্বপ্ন, স্বপ্ন-প্রতীক, স্বপ্নে অতিপ্রাকৃত বিষয়, স্বপ্নে ভাবী ঘটনার আভাস, স্বপ্নে মৃত ব্যক্তির আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার, স্বপ্নে প্রত্যাদেশ, স্বপ্নে দ্রব্য লাভ, ইতর প্রাণীর স্বপ্ন।

অতএব বইখানিতে স্বপ্ন-তত্ত্ব অর্থাৎ স্বপ্নের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কোন পদার্থের স্বরূপ ব্যাখ্যা কঠিন কর্ম, দার্শনিকের যোগ্য। বইখানির নাম স্বপ্ন-দর্শন রাখিলে মন্দ হইত না। তবে, স্বপ্ন দর্শন বলিলে মন-গড়া স্বপ্ন বৃত্তান্ত, কিংবা শূন্য-দৃষ্টি গা-হেলানো নিষ্কর্মার রাজা-উজীর মারার খেয়াল মনে করার শঙ্কাও ছিল।

আর এক শঙ্কাও আছে। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, এবং গ্রন্থ পড়িলে দেখাও যাইবে, ফ্রয়েড সাহেব অনেক স্বপ্নের মূলে কামজ ইচ্ছার সন্ধান পাইয়াছেন। এই পুস্তকের প্রবন্ধগুলি যখন 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়, তখন কেহ কেহ গ্রন্থকারকে জানাইয়াছিলেন, স্বপ্নে কামজ ইচ্ছার প্রভাব অতিমাত্রায় বর্দ্ধিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বলেন, স্বপ্ন বিশ্লেষণ করুন, তার পর মাত্রা নির্ণয় করিবেন। অর্থাৎ বুঝিলাম, মাত্রাটা অতি হয় নাই। কিন্তু এমন তর্কও উঠিতেছে, যে সত্য গুপ্ত আছে তাহার প্রকাশ কর্ত্তব্য অর্থাৎ জনহিতকর কি না। তার পর, 'বাঙলা'র আব্-হাওয়া খারাপ হইয়াছে, পচা ডোবা হইতে দুর্গন্ধ ও মেলেরিয়ার মশা উড়িতেছে। গল্পে ও চুট্‌কী সুরে কানু বিনে গীত নাই; এমন কি মরা-বাঁচার কুঁজি-কাঠি কন্‌গ্রেসের মেলাতেও নাই। গ্রন্থকারের অভিপ্রায়, প্রকাশ করাই হিতকর, মনের তথা স্বপ্নের লুকা-চুরিই অধিক অনিষ্টকর। ভূত-প্রেতের স্বরূপ জানিলে শ্মশান ভূমির বটগাছ তলা দিয়া যাইবার সময় গা ছম্ ছম্ করে না, যদি সেখানে অপদেবতাই থাকে লৌহাস্ত্র সঙ্গে রাখিব, অপদেবতা ঘাড় মট্‌কাইতে পারিবে না। এটা কিন্তু তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর কথা। সকল পাঠক সেরূপ নয়। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, বইখানি নাটকী ছাঁদে লেখা নয়। এখানি বৈজ্ঞানিক বই। বিজ্ঞানের রচনায় ছলা-কলা থাকে না।

গ্রন্থকার স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু কাজটি যে ভারি গাঢ়। আমরা সকলেই স্বপ্ন দেখি, কিন্তু যাবজ্জীবন দেখিয়াও ইহার প্রকৃতি ও উৎপত্তি ধরিতে পারি না। বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম, স্বপ্ন অ-মূলক চিন্তামাত্র। কিন্তু তাও কি হয়? কার্য আছে কারণ নাই, এ কথা কল্পনাতেও আসে না। কেহ বলে পেট গরম হইলে স্বপ্ন দেখি, কেহ বলে মাথা গরম হইলে দেখি। কিন্তু দাদপানি চালের অন্ন ভোজন করি, আর ঘটী ঘটী মধ্যম নারায়ণ তৈল মাথায় ঢালি, নিদ্রার সহচর সঙ্গ ছাড়ে না। যদি বলি, স্বপ্ন নিষ্ফল চিন্তা মাত্র, তাহাতেও বাধা আছে। সু-স্বপ্ন দেখিলে মন প্রফুল্ল হয়, দুঃস্বপ্ন দেখিলে চিন্তাক্লিষ্ট হয়। বিকটাকার স্বপ্ন দেখিয়া কেহ কেহ গোঁ গোঁ করে, কেহ কেহ চেঁচাইয়া ওঠে। স্বপ্নের ফল এই ত, সন্ত-সন্ত। কেহ স্বপ্নে দুরূহ অঙ্কের ফল, বিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্ন জানিতে পারিয়াছে। অতএব সকল স্বপ্ন নিষ্ফলও নয়। যদি স্বপ্নের প্রকৃতি ও উৎপত্তি জানিতে হয়, বৈজ্ঞানিক মার্গ ধরিতে হইবে। এই মার্গের তিন পাদ আছে। প্রথম পাদে নানা লোকের অনুভবের যথাযথ বর্ণনা সংগ্রহ, দ্বিতীয়ে লক্ষণ নিরূপণ, তৃতীয়ে সিদ্ধান্ত। যিনি এই মার্গে চলিতে না শিখিয়াছেন, তিনি পদে পদে ভ্রান্ত হইবেন। তর্ক-বিদ্যার কঠোর শাসনে বুদ্ধি সংযত হইতে পারে, লক্ষণ নিরূপণের সূক্ষ্ম দৃষ্টিও থাকিতে পারে, কিন্তু প্রথম পাদেই যে গোল। স্বপ্নের যথাযথ বর্ণনা পাওয়াই কঠিন, নিজের অনুভূত স্বপ্নেও মিথ্যা আসিয়া পড়িতে পারে। নিষ্কামনা চিত্ত-ভূমি দুর্লভ। নিজেরই মন জানি না, পরের মন ত দূরের কথা, সব অনুমান। মুখে হাস, বুকে ছুরী, বাইরে সাধু ভিতরে চোর, সবই দেখিয়াছি। জড়-বিদ্যায় গ্রাহ্য জড়ের মন নাই, গ্রাহক পরীক্ষক নিজের মন ঠিক রাখিতে পারিলেই হইল। মনো-বিদ্যায় কামচারী মন গ্রাহ্য হয়, কভু হয় না। স্বপ্নের মন একেবারে নটী।

জাগিয়া থাকি, কি ঘুমাইয়া পড়ি, মনের খেলার বিরাম নাই। দেহ নিদ্রিত হয়, মন কদাচিৎ নিদ্রিত হয়, প্রায়ই হয় না। স্বপ্ন না দেখিলে বলি, সুষুপ্তি। তখন মন হয়ত খেলা করে, আমরা ভুলিয়া যাই; হয়ত করে না, শান্ত থাকে। জাগরণে কাজের গতিকে ও কর্ত্তব্যবোধে মনের লাগাম টান থাকে, মন অশ্বকে যেদিকে চালাই সেদিকে চলিয়া থাকে। নিদ্রাকালে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বৃত্তি রুদ্ধ থাকে, মন বাহ্য-বন্ধন মুক্ত হইয়া স্ব ইচ্ছায় খেলিতে থাকে। বোধ হয়, 'ঘুম' শব্দের ব্যুৎপত্তি এই। মন 'ঘুমতে' থাকে, ভ্রমণ করিতে থাকে। কিন্তু টো-টো করিয়া বৃথা ঘোরে না। (কে বা ঘোরে?) এইটিই ফ্রয়েড সাহেবের অপূর্ব আবিষ্কার। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "আমাদের যে সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই, বা হইবার পথে বাধা আছে সে-সব ইচ্ছা স্বপ্নে কাল্পনিক ভাবে পরিতৃপ্ত হয়।" অবশ্য বাস্তবে হইতে পারে না, পথ ঘাট রুদ্ধ; গ্রাম্য উপমায়, মনে মনে মন-কলা খাওয়া হয়। গ্রন্থকার বলেন, স্বপ্ন তিন প্রকার। কোন স্বপ্ন আমাদের স্ব স্ব কর্মের ও ভাবনার অনুরূপ। বোধ হয়, আমরা এই প্রকার স্বপ্ন অধিক দেখি। কি স্তু মনে থাকে না। কখন কখনও এই স্বপ্ন ভাবনার অনুবৃত্তি। তখন স্বপ্নে আঁক কষা চলে। দ্বিতীয় প্রকার স্বপ্ন স্বতন্ত্র, কিন্তু খণ্ডগুলি অসম্ভব নয়। তৃতীয় প্রকার স্বপ্নের সবই অদ্ভুত। প্রথমটিতে দিনের সূত্র রাত্রেও থাকে, দ্বিতীয়টিতে বিচ্ছিন্ন সূত্র যুক্ত হয়, তৃতীয়টিতে সূত্রই অদৃশ্য।

সূত্র ছেঁড়ে জোড়ে কেন, অদৃশ্যই বা হয় কেন, অল্প কথায় ইহার উত্তর নাই, বইখানি পড়িতে হইবে। কিন্তু গ্রন্থকার যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাতে পাঠক চম্‌কাইয়া উঠিবেন। আমাদের মন কি চায়, আমরা ভাবি, আমরা জানি। গ্রন্থকার বলেন, কিছু জানি, বেশীর ভাগ জানি না। কেন জানি না? কারণ সে সব দূষণীয়, ধর্ম্মজ্ঞানের বিরোধী। আমাদের শিশু ও বালক কালে সে সব ইচ্ছা অবদমিত হইয়াছে; ক্রমে রুদ্ধ হইয়াছে, ক্রমে অজ্ঞাত হইয়াছে।

শিশুকাল হইতে হিংসা-প্রভৃতি নিগ্রহ বা দমন করিয়া করিয়া সেটাকে মনের অন্তঃপুরের এক গুপ্ত কোণে ঠাসিয়া রাখিয়াছি। দিনের বেলা সে দস্যুর দেখা দিবার জো রাখি নাই। কিন্তু রাত্রে খিড়্‌কী দিয়া বাহির হইয়া যাকে চায়, তা-কে মারিতে ছোটে। অর্থাৎ মন যা চায়, যে গতিকে হউক, নেবেই। জাগরণে সু-মতির জয়, নিদ্রায় কু-মতির। নিদ্রায় সু-মতি থাকে না, এমন নয়; থাকে, কিন্তু কু-মতির দাসী হইয়া

থাকে। আমার মন আমার বশে নয়, ইহার তুল্য শোকের বিষয় আর কিছুই নাই।

ফ্রয়েড বলেন, প্রথম প্রকার স্বপ্নে মনটি শিষ্ট সুবোধ বালকের ন্যায় কাহারও গায়ে হাত তোলে না। শ্রীযুত বসু বলেন, দুষ্টামিই তার স্বভাব। মাথায় জটা, গায়ে বিভূতি, পরণে গৈরিক, দেখিলেই সন্ন্যাসী ভাবিবেন না। ঠাকুরটি নাইবার ঘাটের পথে বসেন কেন? কেবল কি ভোজ্যপ্রাপ্তির ইচ্ছায়? কি জানি কেন।

কয়েক বৎসর হইল এক নূতন মনোবিদ্যার উদ্ভব হইয়াছে। এই বিদ্যা জ্ঞাত মন অতিক্রম করিয়া অজ্ঞাত মনের সন্ধানে ফিরিতেছে। কথাটা শুনিলেই অসম্ভব মনে হয়। কারণ, যে মন জানি না, সে মন আছে, বলি কোন্ যুক্তিতে। মনের অগোচরে পাপ নাই, ইহাই প্রসিদ্ধি। ফ্রয়েড বলেন, মনের অগোচরে পাপ-প্রবৃত্তি আছে, আর এমন প্রবলভাবে আছে যে মন-পক্ষী অভ্যস্ত সংস্কারের পিঞ্জর বদ্ধ থাকিলেও দেহে ও বাক্যে ও ভাবনায় উঁকি মারিতে থাকে। নিদ্রাকালে মন এলাইয়া পড়ে। জাগ্রৎকালে যদি মন এলাইয়া দিই, নিভৃত মনোগহ্বরে নিহিত বীজ বাহির হইয়া পড়ে। যাঁহারা বীজ চিনিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা অ-বাধ মনের গুপ্ত-স্থল হইতে উত্থিত বীজে আমাদের অজানা ভাবনা দেখিতে পান। ফ্রয়েড বলেন, কাম-বাসনার তুল্য বলবতী আর একটি নাই, এত বহুরূপী, এত ছলা-ময়ী আর একটি নাই। নিদ্রিত মানুষের সু-মতি-প্রহরী না থাকিলে সে স্ব-রূপে দেখা দিত। প্রহরীর ভয়ে তাহাকে নানা ছদ্ম করিতে হয়, এবং এই হেতু স্বপ্ন অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত হয়।

এই নূতন বিদ্যা, অজ্ঞাত ইচ্ছা-বিদ্যা। শ্রীযুত বসু ইহাকে নির্জ্ঞান-বিদ্যা বলিতে চান। এই বিদ্যার অধিকরণ কি? মন। জ্ঞাত মন নয়, অ-জ্ঞাত মন। করণ কি? বি-আকরণ, বা বিশ্লেষণ। আমরা বলি, কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম। কিন্তু ইচ্ছা ও কর্মের মধ্যে দুইটা ধাপ আছে, প্রাচীনেরা বলিতেন, বাসনা-বশে প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তি বশে প্রযত্ন, প্রযত্ন বশে কর্ম। তাহা হইলে, বাসনাই মূল। স্বপ্ন-বিৎ বলেন, কামই আদি-বাসনা। ভক্তি শ্রদ্ধা দাস্য সখ্য বাৎসল্য প্রভৃতি প্রশংসার্হ ভাব, সব কান্ত কান্তার কামের রূপান্তর। রূপান্তর না বলিয়া পরিণাম বলা ঠিক। কিংবা আদি-বাসনা হইতে উদ্ভূত। স্বপ্ন-লেখককে এই কথা বহু স্থলে আনিতে হইয়াছে। বোধ হয় এই হেতু পাঠকের মনে হয়, তিনি কাম-ইচ্ছা অতিমাত্রায় বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু যদি অধিকাংশ স্বপ্নের মূলে এই ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে চারা কি? আসল কথা, তিনি বিশ্লেষণ করিয়াছেন, সংশ্লেষণ করেন নাই; ভাঙ্গিয়াছেন, গড়েন নাই। যখন জীববিদ্যাবিৎ বলেন, 'হে মানব, তুমি বানরের বংশধর', তখন চটিয়া উঠি। যদি বলেন, 'তুমি কিন্নরের বংশধর,' তখন ভাবি 'হ'তেও পারে'। আর যদি বলেন, 'তুমি পূর্ব-জন্মে সভ্য ছিলে না, এ জন্মে হইয়াছ, তখন বলি, 'তাতে আর আশ্চর্য্য কি? ছিলাম মৌলিক, এখন যে কুলীন, তাতে সন্দেহ কি? এই ত দর্প। এ বা কি দেখ্‌ছ! দেখ্‌বে, মহা-কুলীন হব।' মানুষের এই যে ঊর্দ্ধগতি, তাহার আভাস নাই বলিয়া সু-দৃশ্য কাচের হাতা দিয়া হউক, আর ধাঙ্গড়ের দাঁড়া-কোদাল দিয়াই হউক, দুর্গন্ধ বাহির করা কেন। সে পাঁকে কত কমল ফুটিয়াছে, সে সৌগন্ধ, সে সুষমা মানুষই উপভোগ করিতে পারে, বানরে না, কিন্নরেও না। জানি, পুরাণে আছে, সৃষ্টির আদ্যে ব্রহ্মা কয়েকজন ঋষি সৃষ্টি করিলেন। ইঁহারা মানস ঋষি, সৃষ্টিতে মন দিলেন না, তপস্যায় চলিয়া গেলেন। তখন ব্রহ্মা কাম সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে জগতের আধিপত্য দিলেন। এত বড় ঐশ্বর্য্যলাভ কামের বিশ্বাস হইল না। তিনি সত্য কি না, দেখিতে গিয়া ব্রহ্মার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ব্রহ্মা ভয়ে আকুল। জীববিদ্যাবিৎ বলেন, জীবজগতে আহার ও বিহার, এই দুই তত্ত্ব। যত কিছু সংগ্রাম, এই দুই তত্ত্বের। প্রত্যেক জীব অমর হইতে চায়, প্রথমে দেহ পূর্ণ করে, পরে সন্তানে আপনাকে রক্ষা করে। দেহের পূর্ণতা গৌণ, সন্তান-সৃষ্টি মুখ্য। কল-কাঠি কামের বাণ। ভক্তি শ্রদ্ধা প্রীতি প্রভৃতি, সে বাণের কমল পুষ্প।

কিন্তু স্বপ্নবিৎ স্বপ্নে ইচ্ছার প্রকাশ দেখেন, ইচ্ছার উৎপত্তি ও পরিণতি অন্বেষণ করেন না। স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টা কোথাও না কোথাও থাকে, পূর্বানুভূত বিষয় জোড়া-দিয়া নিজের অবাধ ইচ্ছা পরিতৃপ্ত করে। কিন্তু যত মানুষ তত ইচ্ছা নাই, তত বিষয় নাই, কর্মও নাই। কাজেই বহু লোকে একই রকমের স্বপ্ন দেখে। গ্রন্থকার বলেন, যথা, উড়িয়া যাওয়া, উঁচু হইতে পড়া, নগ্ন অবস্থায় বেড়ানা, দাঁত তুলিয়া ফেলা, প্রস্তুত না হইয়া পরীক্ষা দেওয়া, চোর-ডাকাত দেখা, জীবজন্তুতে তাড়া করা, সাপ দেখা, জলে ডোবা বা জল হইতে তোলা, প্রিয় পরিজনের মৃত্যু, ইত্যাদি। আমার মনে হয়, এখানে স্বপ্ন বিদেরা একদেশ-দর্শী হইয়াছেন, কিংবা দার্শনিক হইয়া বিলোম আরোহণ যথেষ্ট করিতে পারেন নাই। বিলাতের লোকের জীবন-যাত্রা আর আমাদের জীবন-যাত্রা এক নয়; কলিকাতাবাসী ইংরেজী শিক্ষিতের যে অনুভব, বন-চর কোল ভীলের সে অনুভব নাই। সভ্যতার অর্থ কৃত্রিমতা। সভ্য-দেশে দাঁত তুলিয়া ফেলা সাধারণ, এদেশে অসাধারণ। ইস্কুলে যে পরীক্ষা দেয়, সে পড়া তৈয়ার করে! পুরাণে নানাপ্রকার স্বপ্নের বর্ণনা আছে। সে সব আজকাল শুনিতে পাই না, অন্যপ্রকার হইয়াছে। পর্বতে আরোহণ, রক্তমাল্যধারণ, খর কিংবা মহিষপৃষ্ঠে গমন, ইত্যাদি স্বপ্ন দ্বারা মন যে ইচ্ছা পূর্ণ করে, সে ইচ্ছা এখনও আছে, এদেশে আছে, বিদেশে আছে। কিন্তু অনুভবের পরিবর্তন হেতু স্বপ্নের উপকরণ ভিন্ন হইয়াছে। গ্রন্থকারও স্বীকার করেন, উলঙ্গ বেড়ানা ও দাঁত তুলিয়া ফেলার স্বপ্ন এদেশে কম। ইংরেজীতে উক্ত স্বপ্নগুলি Typical dreams। ইহার বাঙ্গালায় 'সার্বজনীন' শব্দ ঠিক হয় নাই। Type শব্দের বাঙ্গালা 'জাতি', typical dreams স্বপ্ন-জাতি। তাহা হইলে বলিতে পারি, কতক স্বপ্ন দাঁত-তোলা জাতীয়। দেহ হইতে কিছুর স্খলন, এই জাতির লক্ষণ। আমি স্বপ্ন-বিদ্যা জানি না, স্খলন ও বিসর্জনের স্বাপ্নিক অর্থ এক কি-না এবং মোচনের ও আহরণের অর্থ বিপরীত কি না, শ্রীযুত বসু বলিতে পারেন। আরোহণ ও

আয়োজনের সদ্ভাব ও অসদ্ভাব কর্ম-নিষ্পত্তির অনুকূল ও প্রতিকূল। পাঠের পরীক্ষায় 'ফেল' বা 'পাস', এই জাতির একটা উদাহরণ। পাঠের পড়ুয়ার পাসএর চিন্তা, দিল্লী-যাত্রীর ট্রেণ-এর চিন্তা, অনূঢ়া কন্যার পিতার অর্থ চিন্তা, সব এক জাতীয়। দেশ কাল পাত্র ভেদে স্বপ্নের অবান্তরে (details) বহু ভেদ ঘটিতে পারে, কিন্তু সামান্যে ভেদ হইবে না।

গ্রন্থকার সার্বজনীন স্বপ্নের অর্থ দিয়াছেন, কিন্তু লিখিয়াছেন "এরূপ স্বপ্নের কোন কোনটির দুই তিন রকম অর্থ বাহির হইয়াছে। তবে সকল ক্ষেত্রেই যে তাঁহারা [বহু মনোবিৎ] যথার্থ অর্থ নির্দ্দেশ করিতে পারিয়াছেন, একথা বলা চলে না।" এই উক্তি হইতে বুঝি, স্বপ্ন-বিদ্যা এখনও ত্রিমার্গের দ্বিতীয় মার্গে ঘুরিতেছে, অবিনাভাবী সম্বন্ধ খুঁজিয়া পান নাই। প্রাচীনেরা বলিতেন, এবং আমরাও বলি, এই স্বপ্নের এই ফল। ইহার অর্থ এমন নয় যে, অনুভূত স্বপ্নটি কারণ, অনুমিত ফলটি 'কার্য'। যদি স্বপ্নে কেহ পক্ষীর ন্যায় উড়িয়া যায়, কিংবা মাটিতে পা না ফেলিয়া শূন্যে ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া যায়, তাহা হইলে বুঝি তাহার মনে এমন এক কারণ আছে যাহার ফলে সে এই রকম স্বপ্ন দেখিয়াছে। বুঝিতেছি, লোকটি মাটির মানুষ নয়, মাটি ছাড়িয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে চায়। প্রাচীনেরা বলিতেন, উড়ার স্বপ্নের ফল, বিফল। যদি বিজয়-লাভে মন একাগ্র হয়, এবং একাগ্র না হইলে স্বপ্ন হইত না, তাহা হইলে লোকটি দিগ্‌বিজয় না করুক পল্লী বিজয় করিবে। পুরাণে উড্ডয়ন-স্বপ্ন নাই; আছে পর্বতে আরোহণ, দুষ্কর, কর্ম। গ্রন্থকার বলেন, উড়িবার স্বপ্ন কামভাবের দ্যোতক। তিনি কতকগুলি স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন সে কাম-ভাব গুরুজনের প্রতি। কাম-ভাব যে আছে তাহার এক সাক্ষী চলিৎ কথায় পাইয়াছেন, কাহারও চরিত্র দোষ দেখিলে লোকে বলে "যে আজকাল উড়্‌তে শিখেছে।" আমি উড়্‌তে শেখার এই বিশেষ অর্থ স্বীকার করি না। আমি বুঝি সে পক্ষীর ন্যায় শূন্যমার্গে চলিয়া অন্যের ধরা-ছোঁয়ায় না থাকিয়া গোপনে কিছু করিতেছে। এই 'কিছু' লাম্পট্য হইতে পারে, গাঁজা-খোরের আড্ডায় ঢোকা, জুয়াড়ীর দলে মেশা প্রভৃতি অন্য ব্যসনও হইতে পারে। করিৎ-কর্মা বলিয়া জানা পড়িলে তাহাকে আর উড়্‌তে হয় না। ফেরেব-বাজ ও ধড়ী বাজ লোকও ওড়ে, আর স্থির-মতি হইয়া ভবিষ্যৎ ভাবিয়া টাকা খরচ না করিলে টাকাও ওড়ে।

বইখানিতে এইরূপ বহু দুরূহ প্রশ্ন উঠিয়াছে। বাহ্যে লঘু কিন্তু পারদ তক্ তক ঢল্ ঢল্ করিলেও গুরুভার। একটা উদাহরণ তুলি। পরকে মারা অন্যায় মনে করি কেন? ধর্মজ্ঞান বা সদসৎ বিবেক-বুদ্ধি বলে, অন্যায়। কিন্তু এই বিবেক-বুদ্ধির উৎপত্তি কি? গ্রন্থকার বলেন "বিরুদ্ধ ইচ্ছা হইতেই বিবেকের উৎপত্তি। পরকে মারিব, এই ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইচ্ছা—নিজে মার খাওয়া। মার খাইবার ইচ্ছা মনে সুপ্ত থাকায়, তাহার অস্তিত্ব আমরা জানিতে পারিব না; কিন্তু ইহাই 'পরকে মারিব'—এই ইচ্ছাকে বাধা দেয়। আর এই জন্যই আমাদের মনে পরকে মারা অন্যায় বলিয়া জ্ঞান জন্মে।"

ব্যাখ্যাটি সম্পূর্ণ নূতন, কিন্তু অনেকের নিকট গাঢ় বোধ হইবে। রাম হরিকে প্রহার করিতে চায়, কিন্তু প্রহার করে না, যেহেতু রাম হরি দ্বারা প্রহারিত হইতে চায়। রাম প্রহারিত হইতে চায়? গ্রন্থকার বলেন, হাঁ, চায়, কিন্তু জানে না। কারণ এক ইচ্ছার প্রতিদ্বন্দ্বী ইচ্ছা না থাকিলে রামের হাত উঠিতই উঠিত। জয়ী প্রতিদ্বন্দ্বীই সদসৎ বিবেক, এবং তাহাই দিনে ও রাতে প্রহরী হইয়া আছে। গ্রন্থকার মনের কথা মন দিয়া বুঝাইতে চান, দেহের ইষ্টানিষ্ট চিন্তা আনেন নাই। তিনি ইচ্ছা-বৈপরীত্য দেখাইয়া চুপ করিয়াছেন, ইহার বিদ্যমানতার হেতু অন্বেষণ করেন নাই। মরিবার ইচ্ছার বিপরীত বাঁচিবার ইচ্ছা। কিন্তু বাঁচিবার ইচ্ছা জয়ী হইবে কেন? অতএব বিরোধী ইচ্ছাদ্বয় সমান বলবান্ নয়। কার ইচ্ছায় একটি প্রবল অপরটি দুর্বল হইল? সাংখ্যকার বিশ্লেষণ করিয়া করিয়া দুইটিতে গিয়া ঠেকিয়াছেন, পুরুষ ও প্রকৃতির উপরে উঠিতে পারেন নাই। কথার মার-পেঁচ ছাড়িয়া দিলে কোনও দর্শনকার পারেন নাই। কিন্তু শেষে একের জয় স্বীকার করিতে হইয়াছে, নইলে জগৎ অচল। প্রহরী শিবময় কি-না, স্বপ্নের গ্রন্থকার সে তর্ক তোলেন নাই, কিন্তু নানা স্থানে শিবময়ত্বের আভাস দিয়াছেন।

ইচ্ছা বৈপরীত্য অবশ্য স্বীকার্য যদিও সর্ব্বত্র বুঝিতে পারি না। দেখি, রাম কেন হরিদ্বারা প্রহারিত হইতে চায়। রাম হিংসার দ্বারা পরিপূর্ণ সুখ চায়। হরিকে কিলাইল, হরি টুঁ করিল না। ইহাতে রামের মন তৃপ্ত হইল না। সে কীলের পর কীল বসাইতে লাগিল, হরি কাঁদিতে লাগিল, রাম খুসী। কিন্তু দুঃখের পরিমাণ করিতে পারিল না, কান্না মিথ্যা হইতে পারে। হরি তাহাকে কীলাক্, রাম বুঝিতে চায় কীলাঘাতে কেমন দুঃখ। শৈশবে ও বাল্যে বহুবিধ দুঃখের অনুভব ঘটে। সে সব মনে লীন হইয়া অজ্ঞাত থাকে। কদাচিৎ রাম হরিকে বলে, 'মার্ দেখি কেমন মার্‌তে পারিস্।' 'দ্বেষ' পরিবর্ত্তে যদি 'রাগ' ধরি, কথাটা ধরিতে কষ্ট হয় না। রাম হরিকে ভালবাসে। ইহাতে সে তৃপ্ত নয়। সে চায়, হরি তাহাকে ভালবাসুক। ইহাদের পরস্পর প্রীতি সমাজ-বিধির বিরোধী নয়, রামকে তাহার ইচ্ছা লুকাইতে হয় না, দিনে না, রাতেও না। ইচ্ছা রুদ্ধ হয় না, স্বপ্নও দেখে না। মানুষ সুখ চায়, দুঃখও চায়। দুঃখানুভবের দ্বারা সুখানুভব করে। যদি কেহ ভগবানের কাছে দুঃখ প্রার্থনা করেন, তখন বুঝি তিনি সুখে আছেন, কিন্তু মাত্রা বুঝিতে পারিতেছেন না। সে সম্পদ্ সম্পদ্ই নয়, যাহা লাভ করিতে বিপদে পড়িতে হয় না। উপকথায়, রাজপুত্রকে নাকের জলে চোখের জলে ফেলিয়া তাহাকে রাজকন্যা ও অর্দ্ধেক রাজত্ব দেওয়া হয়। সুখ-দুঃখ দ্বন্দ্বের যুগপৎ বিদ্যমানতা যেমন স্বীকার করি, প্রত্যেক ইচ্ছা-জাতি সম্বন্ধেও তেমন। জানি না স্বপ্ন-লেখক এই ব্যাখ্যায় সম্মতি দিবেন কি না।

গর্হিত ইচ্ছাই রুদ্ধ হয়, স্বপ্ন রচনা করিয়া তৃপ্ত হয়। কিন্তু ছদ্মবেশে, সাধু সাজিয়া। অতএব তাহার করণ, ও উপকরণ, সবই প্রহরীর অজ্ঞাত থাকা চাই। কোনক্রমে জ্ঞাত হইয়া পড়িলেই তাহার মায়া-জাল ছিন্ন হয়, তাহাকে নূতন মায়া রচনা করিতে হয়। গ্রন্থকার স্বপ্নের ছেঁদো করণকে রুদ্ধ ইচ্ছার প্রতীক বলিয়াছেন। যেমন, স্বপ্নে গৃহ, দেহের প্রতীক। তিনি লিখিয়াছেন, প্রতীকের অর্থ সহজে ধরিবার জো নাই।

কিন্তু প্রতীক সার্বজনীন, এবং একার্থ। সকলের স্বপ্ন একই অভিপ্রায়ে এক প্রতীক আশ্রয় করে। এই আশ্চর্য ব্যাপারের উৎপত্তি অজ্ঞাত। যখন ফ্রয়েড আদি স্বপ্নবিৎ হারি মানিয়াছেন, তখন অন্যের সে আলোচনা ধৃষ্টতা। তথাপি জানিতে ইচ্ছা হয় অসত্য ও সত্যের. বিশেষতঃ স্বপ্নবিদের প্রতীক এক কি না। মনে হয়, প্রতীকে করণের সাদৃশ্য থাকেই থাকে। সাদৃশ্য না থাকিলে রূপক হয় না ; প্রতীক রূপকের ভাই। প্রভেদ এই, প্রহরী স্বপ্ন রঙ্গ-মঞ্চের বিকৃত পট-সজ্জার মাঝে রূপক চিনিতে পারে না, কিংবা পাগলামি মনে করে। স্বপ্নের গৃহ যদি দেহের প্রতীক হয় তাহা হইলে অন্ততঃ এই স্থলে রূপক ও প্রতীক একই। গ্রন্থকারও লিখিয়াছেন, প্রতীক যে বস্তু নির্দেশ করে, সে বস্তুর সহিত তাহার অনেক বিষয়ে মিল থাকে। "অনেক ক্ষেত্রে রূপক ও প্রতীকের তারতম্য করা কঠিন।" রূপক নাই তাব নাই, আর সাদৃশ্য দেখিয়া কত শব্দের অর্থ সম্প্রসারণ হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই কারণে "ভাষাতত্ত্ব, পুরাণ, প্রবাদবাক্য ইত্যাদির আলোচনা দ্বারা প্রতীকের অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে হয়।"

কেহ কেহ বিশ্বাস করে, কোন কোন স্বপ্ন ফলিয়াছে, স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছিল পরে তাহা ঘটিয়াছে। কত লোক 'প্রত্যাদেশ' আশা করে, রোগের ঔষধ পাইবার নিমিত্ত দেবতার দুয়ারে হত্যা দেয়। গ্রন্থকার বলেন, বিশ্বাস, বিশ্বাস। তাহাতে মনের শান্তি হইতে পারে কিন্তু বিশ্বাস প্রমাণ নয়। এ কথা ঠিক। বিজ্ঞানবিৎ কদাচ বলেন না, 'হইতে পারে না' ; বলেন 'হইতে দেখি নাই'। সত্য-নির্ণয় ভারি কঠিন। যে যাহা ভাবে বা দেখে বা শোনে, তাহা সত্য নাও হইতে পারে। অধিকাংশ স্থলে সত্য নয় তাহা সামান্য লোকেও বুঝিতে পারে। কেহ কেহ সাধুভাবেই বুজরুক হন, লোক ঠকাইবার অভিপ্রায় তাহার (জ্ঞাত) মনে থাকে না। আর বহু বহু প্রতারিত হইতে চান। মানুষ আপনাকে এত অসহায় জ্ঞান করে। এই দলে কে নাই, কে আছে, বলিবার জো নাই। এবিষয়ে উচ্চশিক্ষা, নিম্নশিক্ষায় ভেদ নাই। বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকেও হারি মানিতে দেখা গিয়াছে। মানুষের মন এক অদ্ভুত পদার্থ। বাসনা কতক দৃষ্ট, কতক অ-দৃষ্ট, পূর্বসঞ্চিত। এই অ-দৃষ্ট বাসনার নির্বাস করিতে মুনি-ঋষিরা কঠোর তপস্যা করিতেন, তারপর বিক্ষিপ্ত চিত্তে শান্তি আসিত। 'স্বপ্ন' পড়িয়া মনে হইতেছে, বুঝি বা কমেভ্যো নমঃ বলাই ঠিক।

এই পুস্তক প্রকাশের পূর্বে গ্রন্থকার 'ভারতবর্ষে' ছাপা প্রবন্ধগুলি আমায় পড়িতে দিয়াছিলেন। তখন পড়িয়া আমি যে মন্তব্য করিয়াছিলাম, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া স্বপ্ন' দর্শন শেষ করি।

'স্বপ্ন-দর্শন' দ্বিতীয়বার পড়িলাম। এবারও চমৎকার লাগিল। স্বপ্ন কে না দেখে, আর কে না স্বপ্নের উৎপত্তি প্রকৃতি অর্থ জানিতে চায় ? বিষয়টি বিস্ময়-রসের আধার। ফ্রয়েডকে ধন্য। আর আপনাকেও ধন্য বলিতেছি। আপনার যত্নে সে রসের স্বাদ পাইলাম। আপনার ভাষাও চমৎকার। কঠিন বিষয় নূতন বিষয়, জলের মত স্বচ্ছ হইয়াছে। আমি কিছুই জানিতাম না ; কত যে জানিলাম, অক্লেশে জানিলাম, কে জানাইতে পারিত।

এক পক্ষে আমার না জানা ভাল হইয়াছে। আমি বুঝিতে বসিয়া যুক্তির দোষ, ব্যাখ্যার দোষ সহজে ধরিতে পারিয়াছি। * * * আমি আমার বুদ্ধির দোষ স্বীকার করিব না, লেখকের দোষে বুঝিতে পারি নাই।"

এই মন্তব্য চারি বৎসর পূর্বের। এখন দেখিতেছি, দুর্বোধ্য অংশ সুবোধ্য হইয়াছে। যেখানে এখনও দুর্বোধ্য মনে হইল, সেখানে টিপ্পনী করিতে ছাড়িলাম না। মোটের উপর বলিতে পারি, মন দিয়া বইখানি পড়িলে পাঠকের অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যাইবে।*

* 'স্বপ্ন' শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু প্রণীত। কলিকাতা, ১৩৩৫। বাঙ্গালা ও ইংরেজী নির্ঘণ্ট সহ ১৫৬ পৃষ্ঠা। ভূমিকা ।/০ পৃষ্ঠা। মূল্য পাঁচ সিকা।

সেই ভালো

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ চন্দ

১

সেই ভালো
তোমার নয়নে আমার নয়ন নাই বা মিলালো—
প্রতিদিন আকাশের অন্ত হীন তারকার দেশে
যেথা গন্ধে আর গানে আঁখি-জল নিত্য মোর মেশে,
সেইখানে হবে দেখা—
থাক্, থাক্ তবে এই লেখা !

২

সেই ভালো
তোমার চুম্বনে আমার লুণ্ঠন নাই বা হারালো—
জীবনের যতটুকু যায় দেখা সে তো শুধু ছায়া,
ধরণীর ফুলে-ফলে তৃপ্তির ছলে যেথা মৃদু মায়া
সেথা তুমি তুলো আঁখি—
বিশ্বের বাতায়নে দুই হাত রাখি !

৩

সেই ভালো
তোমার শ্মশানে আমার শর্ব্বরী নাই বা ঘুমালো—
হেথাকার ভুল চুক্ ভুল করে নিয়োনা'ক বয়ে,
বিদায়ের দিনে এই মুখ চিনে যেয়ো সব সয়ে,
হেথা আর আসিওনা—
যেথা রহে হাসি আর অশ্রুনোনা

অ্যানা প্যা'লোভা

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

রাজহংসী প্যা'লোভা

স্রষ্টা যাহাকে নির্জ্জনে গড়িয়াছিলেন, অনুপম রূপ গুণ- বিভূষিত করিয়া ধরায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, শিক্ষা যাহার সার্থক, সাধনা যাহার সফল, বিশ্ববাসী যাহার রূপ-গুণের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, বিশ্বের রস-পিপাসু মানব যাহার পরিবেশিত রসপরমান্ন 'পানে' পরম পরিতৃপ্ত —বিশ্ববন্দিতা নর্ত্তকী-রাণী অ্যানা প্যা'লোভা কয়েকদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। স্থানীয় এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে তাঁহার নৃত্যের আসর বসিয়াছিল। প্যা'লোভার মত গুণী বিশ্বে বড় বেশী নাই—কয়জন আছেন, তাহাও আমাদের জানা নাই—আমরা জানি এই বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগের যে অংশেই তিনি তাঁহার রসের পশরা লইয়া দার্পণ করিয়াছেন, সেইখানেই তিনি

বিজয়িনী আখ্যায় বিভূষিত হইয়াছেন; সেখানেই রস-পিপাসু জন শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন। ইয়োরোপের সর্বত্র অ্যানা প্যা'লোভাকে "অনুপমা অ্যানা" বলা হইয়া থাকে। যাঁহারা নৃত্যময়ী অ্যানাকে দেখিয়াছেন, তাঁহার অপূর্ব-সুন্দর ভঙ্গী, লীলাচঞ্চল পদক্ষেপ দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন, অ্যানার তুলনা অ্যানা,—অন্য উপমা তাঁহার নাই।

পুরাণে পড়িয়াছি, দেবেন্দ্র সভায় স্বর্গ-নর্ত্তকী উর্বশী নৃত্য করিতেন, বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে দেবগণ তাহা দেখিতেন। আর মর্ত্ত্যে দেখিলাম, মঞ্চের উপর এই বিদেশিনী নারী নৃত্য করিতেছেন, এম্পায়ারের মত বিস্তীর্ণ প্রেক্ষাগৃহ জনারণ্যের রূপ ধারণ করিলেও সূচি-পতনের শব্দটিও শুনা যায়।

অ্যানা প্যা'লোভা কেবলমাত্র নর্ত্তকী নহেন, অসামান্যা নর্ত্তকী বলিয়া তাঁহাকে অভিহিত করিলেও অনেকখানি অব্যক্ত থাকিয়া যাইবে। তিনি নর্ত্তকী, তিনি শিল্পী, তিনি কবি, তিনি স্রষ্টা। যাঁহারা তাঁহার সঙ্ঘের ব্যালে (ballet) অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন তাঁহার সঙ্ঘের অভিনয়ে ভাষা কোথাও স্থান পায় নাই। ভাষা বর্জিত অভিনয়ে যে ভাব, যে ভাষা, যে কল্পরাজ্য, স্বপ্নরাজ্য, মায়ারাজ্য সৃজিত হয়, তাহা দেখিলে বিস্ময়ে হতবাক্ হইতে হয়। মানবচরিত্র যাঁহারা নখদর্পণে দেখিতেন, তাঁহারা বলিয়াছেন, মানব হৃদয়ের ভাবরাজি ভাষার সাহায্যে কতটুকু প্রকাশ পাইতে পারে? ভাব যেখানে পরিপূর্ণ, ভাষা চিরদিন সেখানে মূক। অ্যানা প্যা'লোভার সঙ্ঘের অভিনয় দেখিতে দেখিতে সত্যই মনে হয়, ভাষা বর্জন করিয়া ভালই করিয়াছেন, ভাবের সাগর যেখানে উদ্বেলিত, ভাষার সেখানে একান্তই প্রয়োজনাভাব।

তিনরাত্রি আমরা এই সৌন্দর্য্যময়ী ভাবময়ী নারীর নৃত্য দেখিয়াছি। "অমরিলা", "ঝরাপাতা", "মোহন বংশী", "তুষারকণা", "রূপকুমারী" প্রভৃতি একাঙ্ক ব্যালে গুলির অভিনয় আমরা দেখিয়াছি। প্রত্যেক-খানিতেই প্যা'লোভার প্রতিভার ছাপ অঙ্কিত আছে। সকলগুলিতেই তিনি নৃত্য করেন নাই বটে, যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহারই যোগ্য সহচর বা সহচরী। তন্মধ্যে মিস্ রাথ ফ্রেঞ্চ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। নৃত্যের আদর্শে, সৌন্দর্য্য-প্রকাশের ভঙ্গিমায়, দেহের প্রত্যেক লীলা-বিভঙ্গে তিনি প্যা'লোভারই সমকক্ষ। পুরুষ নর্ত্তকদের মধ্যে পীয়ারে ভ্যাডিমিরফ সর্বশ্রেষ্ঠ। পীয়ারে ভ্যাডিমিরফ দ্বৈত-নৃত্যে প্যা'লোভার সঙ্গেই নৃত্য করেন; সুতরাং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব যে অবিসংবাদী, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। প্যা'লোভার সঙ্ঘে ন্যূনপক্ষে বিশটি নারী ও বিশটি পুরুষ আছেন। সকলেই নৃত্য

মিস্ রাথ ফ্রেঞ্চ

করেন। স্রষ্টা যেমন নিখুঁত করিয়া, সর্বশোভার ও গুণের আধার করিয়া অ্যানাকে সৃজন করিয়াছেন, অ্যানা তেমনই নিখুঁত দেখিয়া বাছিয়া বাছিয়া সম-রূপ, সম গুণ-সম্পন্ন পুরুষ নর্ত্তক ও নর্ত্তকী দ্বারা তাঁহার সঙ্ঘ গঠন করিয়াছেন। এই সঙ্ঘ-গঠন-সৌন্দর্য্য দেখিলে অ্যানাকে স্রষ্টা বলিয়া অভিনন্দিত করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা থাকে না।

রঙ্গমঞ্চের নাট্য-অভিনয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া প্রম্পটার যেমন অভিনয়-সাফল্যের মূল-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া

দ্বৈত-নৃত্যে পীয়ারে ভ্যাডিমিরফ ও নর্ত্তকী-রাণী প্যা'লোভা

সঙ্গত-অধ্যক্ষ হাইডেন

থাকেন, প্যা'লোভা ও তাঁহার সঙ্ঘের ভাষাহীন নীরব নৃত্যাভিনয় যিনি সফলতা মণ্ডিত করিয়া থাকেন, তাঁহার কথা না বলিলে রসবোধে আঘাত লাগিবে। আমরা আগেই বলিয়াছি, প্যা'লোভার নৃত্যাভিনয়ে ভাষা সর্বথা পরিত্যক্ত হইয়াছে ; নৃত্যের ললিত ভাব-ভঙ্গীই ভাষার অভাব মোচন করিয়া থাকে। সেই নৃত্যের সঙ্গে যে Music, সঙ্গত বা বাদ্য ধ্বনিত হয়, তাহার অপরিসীম মাধুর্য্য নৃত্যকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলে। এই মিউজিকে যিনি নেতৃত্ব করেন, তাঁহার নাম ওয়ালফোর্ড হাইডেন। অ্যানার নৃত্য-আসর যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহাও লক্ষ্য করিয়াছেন, নৃত্যের ভাবকে সঙ্গতের ভাষার সাহায্যে এই দক্ষ শিল্পী কি মধুর করিয়া দর্শক-চিত্তে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন।

কিন্তু অন্য কথা যাক্। এই অসাধারণ নারীর কথাই বলি। প্যা'লোভার বিশ্ববিজয়িনী শক্তির মূলে কি মন্ত্র নিহিত আছে, তাহা অন্বেষণ করিলে দেখা যায় যে, সৌন্দর্য্যের প্রতি মানবের যে চিরন্তন অনুরাগ, সেই সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াই তিনি সর্বদেশের, সর্বকালের, সর্বসমাজের, সর্ব-মানবের চিত্ত জয় করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি পদক্ষেপে, তনুলতাখানির লীলা-বিভঙ্গে নৃত্যের সর্বোত্তম কারু বিকশিত হয়—সৌন্দর্য্য লুটাইয়া পড়ে। "তুষার কণা" ব্যালেতে আমরা সর্বপ্রথম প্যা'লোভার দর্শন পাই। তুষারাচ্ছাদিত পার্বত্য প্রদেশ, ঘন তুষার ভেদ করিয়া ধীরে—অতি ধীরে বসন্ত বিকশিত হইতেছে, বাতাসের সঙ্গে তখনও তুষারকণা ভাসিয়া আসিতেছে, ঝরিয়া পড়িতেছে, মৃদু চন্দ্রালোক ধরণীর উপর স্বপ্ন সৃজন করিতেছে, এই স্বপন-বিজড়িত দৃশ্যের মাঝখানে একখানি 'জীবন্ত'-স্বপ্নের মত, স্বপ্ন-দৃষ্ট প্রতিমার মত, এক ঝলক জ্যোৎস্নার মত সুন্দরী প্যা'লোভা আসিয়া নিঃশব্দে নৃত্য করিলেন, রঙ্গগৃহখানিতে পুলকের বন্যা বহাইয়া দিয়া, চক্ষুর পলক পড়িতে না পড়িতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন—দর্শক করতালি-ধ্বনিতে, সুউচ্চ আনন্দ-রবে অভিনন্দিত করিতে লাগিল। বেলাপহত সমুদ্র-তরঙ্গের মত নর্ত্তকী-রাণী আবার আসিলেন, নৃত্যের ভঙ্গীতে, অপূর্ব-শ্রী দেহখানিকে অবনমিত করিয়া প্রত্যাভিবাদন করিলেন, আবার চলিয়া গেলেন, আবার আসিলেন, আবার নতজানু হইলেন, সঙ্গীতের ছন্দের মত, গানের গমকের মত লীলায়িত দেহের শোভা বিকীরণ করিয়া অদৃশ্য হইলেন। নৃত্য-নাট্যের পরিকল্পনায়, তাহার বাহ্য-প্রকাশে

এবং অনুপম রূপদানে তাঁহার যে প্রতিভার পরিচয় সর্বথা পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাকে কবি-শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিনন্দিত করিতেই ইচ্ছা জাগে।

"রাজহংস" নৃত্যে রঙ্গমঞ্চে তিনি যে রূপের সৃষ্টি করেন, তাহা জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরও কামনার ধন। অর্থপূর্ণ মুখভঙ্গী, ভাবরাজ্য-মথিত করা বঙ্কিম দৃষ্টি যে কোন দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সাধনার বিষয়।

অ্যানা হিন্দু—ভারতীয় নৃত্যও দেখাইয়াছেন। সে নৃত্যের পরিকল্পনা অবশ্য হিন্দু-নারীর। শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় সে নৃত্যের ভাব ও সুর সংযোজনা করিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিবার দরকার আছে।

পীয়ারে ভ্যাডিমিরফ

অ্যানা প্যা'লোভার নাম আমরা বাল্যাবধি শুনিয়া আসিতেছি; অনেক ইয়োরোপ প্রত্যাগত বান্ধব-বান্ধবীও বলিয়া থাকেন, তাঁহারাও পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্বে ইয়োরোপে Swan Princessএর নৃত্য দেখিয়া ও অসামান্য খ্যাতির কথা শুনিয়া আসিয়াছেন। কাজেই অনুমান করা কঠিন নয় যে অ্যানার 'বয়স' হইয়াছে। কত যে বয়স তাহা অবশ্য কাহারও জানা নাই, কিন্তু পঞ্চাশোর্দ্ধ যে হইয়াছে তাহাতেও কাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা নৃত্যময়ী অ্যানাকে নৃত্য করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন, বয়স, জরা তাঁহার কাছেও ঘেঁসিতে পারে নাই। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন :—

"যুগযুগান্তর হ'তে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী
হে অপূর্ব্ব শোভনা উর্ব্বশী,
মুনিগণ ধ্যান ভাঙ্গি' দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষাঘাতে ত্রিভুবন যৌবন-চঞ্চল,
তোমার মদিরগন্ধ অন্ধ বায়ু বহে চারিভিতে,
মধুমত্ত ভৃঙ্গ সম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধ চিতে,
উদ্দাম সঙ্গীতে।
নূপুর গুঞ্জরি' যাও আকুল-অঞ্চলা
বিদ্যুৎ-চঞ্চলা॥"

অ্যানা প্যা'লোভার সম্বন্ধে সেই কথাই বলা যায়। সৌন্দর্য্য-জগতে যাঁহার বাস, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি যাঁহার জীবন-সাধনা, সৌন্দর্য্য তাঁহার অঙ্গে চঞ্চল না হইয়া অচঞ্চল হইয়াই অবস্থান করিতেছে। দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেই স্রষ্টা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আছে। তটিনীর মত হিল্লোলিত তনুলতাটি যেন বায়ুভরে কাঁপে, বায়ুভরে নাচে, বায়ুতে ভাসিয়া বেড়ায়। প্যা'লোভার বেশীর ভাগ নৃত্যই দুই পায়ের বুড়া আঙ্গুলের উপর নির্ভর করে। শব্দ নাই—অথচ উদ্দাম গতি; ভাষা নাই—কিন্তু ভাষার সাগর! প্যা'লোভার নৃত্য দেখিতে বসিয়া মনে হয় না যে কোন শরীরী মানবী নৃত্য করিতেছে—মানুষের দেহ যে এমন নিতুই নব ভঙ্গিমায় ভাঙ্গিয়া পড়ে, এলাইয়া পড়ে, লীলায়িত হয়, পদ্মের প্রতিটি কোরকের মত সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করে, তাহা কল্পনা করাও শক্ত; চক্ষুতে দেখিলেও বিশ্বাস করা

শক্ত হইয়া পড়ে। শুধু মনে হয়, ধন্য সেই শিক্ষা, ধন্য সেই সাধনা, ধন্য সেই তপস্যা, যাহা মানুষকে এই অমানুষী শক্তির অধিকার দিতে বাধ্য হইয়াছে।

আর ধন্য সেই জাতি, যে জাতি নর্ত্তকীকেও রাণীর সম্মান দিবার ঔদার্য্য দেখাইতে পারিয়াছে! কথাটা বলিতে খুব বেশী সাহসের প্রয়োজন হয় না যে ইয়োরোপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই অ্যানা প্যা'লোভা আজ 'অনুপমা

উর্ব্বশী অ্যানা

অ্যানা' বলিয়া বিশ্বের বন্দনা-গান শুনিতে পাইতেছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা একটি সম্ভ্রান্ত বংশীয় বাঙ্গালী-তরুণীর নামোল্লেখ করিতে পারি, তরুণ বয়সে অপরূপ নৃত্য-কারু প্রদর্শন করিয়া যিনি বাঙ্গালী ভদ্র-সমাজে সুপরিচিতা হইয়া পড়িয়াছেন। এম্পায়ার মঞ্চে সম্ভ্রান্ত-সমাজের তরুণ-তরুণী সংগঠিত "আলিবাবা" অভিনয়ে স্বর্গীয় রজত রায়ের কনিষ্ঠা কন্যা কুমারী সুনীতা রায় "মর্জ্জিনা"—অংশের অভিনয়ে যে শিল্পোৎকর্ষ দেখাইয়াছেন, তাহার তুলনা বাঙ্গলাদেশে ত নয়ই, ভারতের অন্য কোন প্রদেশেও আছে কি-না সন্দেহ! আমরা শুনিয়াছিলাম, এই তরুণী প্যা'লোভা-সঙ্ঘে যোগ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু যত সম্ভ্রান্ত সমাজের মেয়েই তিনি হোন-না-কেন, যত উচ্চ শিক্ষাই তিনি লাভ করুন না-কেন, বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর সমাজ তাঁহাকে সম্ভ্রমের আসন দিতে পারিত বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

প্যা'লোভা ভারতীয় নারীদের সহিত পরিচিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কলিকাতা কর্পোরেসনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা মিষ্টার জে, সি, মুখার্জ্জী মহোদয় সে ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। শ্রীমতী বাঙ্গালার নারীর নম্রতা, মধুরতার অজস্র প্রশংসা করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি, তিনি এমন কথাও বলিয়াছেন, বঙ্গ-ললনার ললিত পেলব নারীত্ব তাঁহার মনে যে আসন বিস্তার করিয়াছে, তাহা কখনই লুপ্ত হইবে না। প্যা'লোভা হয়ত জানেন না, মার্কিণ-কুমারী কেথারিণ মেয়ো এই বঙ্গললনার

মুখে কলঙ্ক লেপনের কি আপ্রাণ চেষ্টাই না করিয়াছেন। উভয়েই বিদেশিনী, উভয়েই স্বল্পকাল ভারত প্রবাস করিয়াছেন, অথচ কি প্রভেদ! একজন কেবল ভারতের নর্দামাই ঘাঁটিয়াছেন, অপরা সৌন্দর্য্যের উপাসিকা, মানব-হৃদয়ান্তঃপুরবাসিনী—ভারতের সৌন্দর্যই অবলোকন করিয়াছেন! উভয়েই নারী, কিন্তু নরক ও স্বর্গের ব্যবধান!

এই নারীত্ব, নারীত্বের এই আবেদন, এই শ্রী, সৌন্দর্য্য ও সুষমা লইয়া আসিয়াছিলেন বলিয়াই অ্যানা অল্পকাল মধ্যে ভারতবর্ষের শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করিয়া যাইতে পারিয়াছেন।

এই বিদেশিনীর সম্বন্ধে ব্যক্তিগত আর একটি কথা আমরা জানি, যাহা আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণকে শুনাইতে ইচ্ছা করি। কলিকাতা-সমাজের কোন এক সম্ভ্রান্ত পুরুষকে অ্যানা একটি অনুরোধ-ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ইচ্ছাটি এই. "জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধীর একখানি ফটোগ্রাফ ও তাঁহার স্বহস্তের একটি স্বাক্ষর!" অ্যানা বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ আমাকে আদর করিয়াছে, স্নেহ করিয়াছে, সম্মান দিয়াছে। ভারতবর্ষের নিকট আমার মাত্র একটি যাচ্ঞা আছে, তাহা ঐ—"ভারতের শ্রেষ্ঠ মানবের একটি হস্তাক্ষর!" ভাবময়ী নারী ভাব-গদগদচিত্তে বারবার করিয়া এই অমূল্য বস্তুটি সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন; লণ্ডনের Ivy Houseএর ঠিকানাও দিয়া গিয়াছেন।

পরিশেষে আমরা সুন্দরী শিরোমণি অনুপমা প্যা'লোভার উদ্দেশে আমাদের মুগ্ধ হৃদয়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলি, হে বিশ্ববন্দিতা অনিন্দিতা অ্যানা, যুগ-যুগান্ত ধরিয়া তুমি বিশ্ববাসীর হৃদয়ে-মনে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া সুন্দরী ধরণীর বক্ষে সুন্দরী রমণী তুমি, স্বপ্নলোকের আনন্দ বিতরণ করিতে থাক। নশ্বর জগতে তোমার নাম, তোমার শিল্পসৌন্দর্য্য অবিনশ্বর হইয়া থাকুক। হে বিশ্ববিজয়িনী, হে মর্ত্ত্য-উর্ব্বশী, তুমি আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ কর।

দুর্জ্ঞেয়

শ্রীসুরুচিবালা রায়

কেমিষ্ট ডাক্তার সেনের ল্যাবোরেটারিটীর প্রতি তাঁহার চেয়ে তাঁহার পত্নী শ্রীমতী চারুলতার যত্ন যে কিছু কম ছিল, তা বলা যায় না। স্বামীর নিত্য নব নব উদ্ভাবনাশক্তির পরিচয়ে চারুলতা অন্তরে অন্তরে যে গর্ব্ব অনুভব করিত, সমগ্র সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞীর গর্ব্বও তুলনায় তাহার বেশী ছিল না।

চারিদিকে ঔষধপত্র, শিশি, বোতল, রং এবং বহির স্তূপের মাঝখানে স্বামী তাঁহার নিত্য নতুন গবেষণায় মগ্ন হইয়া থাকিতেন, চারু মুগ্ধচিত্তে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহাকে দেখিত, এবং কাগজে কাগজে বা লোকজনের মুখে মুখে স্বামীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিয়া শুনিয়া আনন্দে গর্ব্বে আত্মহারা হইয়া উঠিত।

কাজের ভিতর হইতে তন্ময় স্বামীটিকে ডাকিয়া তুলিয়া তাঁহাকে স্নান করানো এবং খাওয়ানো চিরদিনই চারুর সবচেয়ে বড় কাজ ছিল। তাহার স্বামী যে তাহার অন্য বন্ধুদের স্বামীদের মত ছোট ছোট কাজ করিয়া সংসার প্রতিপালন করেন না, বাজার খরচ বা চাকর ঠাকুর ঝি'র মাহিনা হিসাব করার মত অতি তুচ্ছ কাজ নিয়া ব্যস্ত থাকেন না,—চারুর ইহাতে নিজের ভাগ্যের প্রতি কৃতজ্ঞতার আর অন্ত ছিলনা। সংসারের সহস্র সৃষ্টির ভিতরে তাহার এই অপূর্ব্ব স্বামীটিকে সৃষ্টি করিয়া ভগবান যে তাঁহার সৃষ্টিকুশলতারই পরিচয় দিয়াছেন, এহেন একটী কথাও চারুর গোপন অন্তরে মাঝে মাঝে উঁকি দিয়া যাইত।

ল্যাবোরেটারীর সকল কিছু কাজ চারু নিজ হস্তেই সম্পাদন করিত। বুকভরা প্রবল আগ্রহে, পরম যত্নে যে কাজটিই চারু করিয়া দিত, তাহা সর্ব্বদা নিখুঁতই হইত। কৃতজ্ঞতার একটুখানি মিষ্ট হাসি হাসিয়া সামান্য দুইটী কথায় বা নীরব ভাষাতেই স্বামী যাহা চারুকে উপহার দিতেন, তাহাতেই চারুর পরিতৃপ্তির আর সীমা থাকিতনা।

নিত্য নতুন গবেষণার ফলে ডক্টর সেনের কাজও বাড়িয়া

চলিয়াছিল, স্বামীর সঙ্গে সঙ্গেই ল্যাবোরেটারীতে ঢুকিয়া চারুরও নিত্য নৈমিত্তিক কাজ অক্লান্ত ভাবেই দিনের পর দিন পরম দক্ষতার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া চলিতেছিল, মনে বা প্রাণে তাহার কোনও অবসাদ কখনও না আসিলেও, দেহে তাহার মাঝে মাঝে যে ক্লান্তিটা আসিত, হাসিয়া, আনন্দ করিয়া চারু সর্ব্বতোভাবে সেটাকে গোপন করিতে চাহিলেও ডক্টর সেনের চোখে তাহা আর অধিকদিন গোপন রহিল না। ডক্টর চিন্তিত হইয়া তাঁহারই এক অনুগত শিষ্যকে ল্যাবোরেটারীর কাজে সাহায্য করিবার জন্য ডাকিয়া আনিলেন। চারু মুখে কোন কথাই বলিল না, তবে এটুকু বুঝিতে বাকী রহিলনা যে চারু রাগ করিল, অভিমান করিল, দুঃখিতও হইল ; কিন্তু সে রাগ, দুঃখ বা অভিমান ভাঙ্গিতে কোন পক্ষেরই অনেকক্ষণ সময়েরও দরকার হইলনা।

(২)

শিষ্যের নাম, ব্রতীন। যোগ্য গুরুর যোগ্য শিষ্য সে! কাজ করিবার এমন বিশাল ক্ষেত্রটী এবং এই অপরিমিত সুযোগ পাইয়া ব্রতীনের উৎসাহ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে কেবল বাড়িয়াই চলিতেছিল, কেমন করিয়া ধীরে ধীরে এবং কত সহজেই যে চারুর জন্য ভাগ করা কাজগুলিও ব্রতীন আপনারই আয়ত্তে টানিয়া নিল, তাহা কেহই বুঝিলনা,—কবে একদিন চারু লক্ষ্য করিয়া দেখিল, যে কাজগুলি করিতে তাহাকে কত পরিশ্রমই করিতে হইত, ব্রতীন হাসিয়া, গল্প করিয়া, স্ফূর্ত্তি করিয়া কত সহজেই সেগুলি সারিয়া নিতেছে! চারু কাজ করিতে আসিলে হাসিয়া ব্রতীন কহে,—থাক্-না ও, আমিই সেরে নোব'খন, কেন আর আপনি কষ্ট কর্বেন!

চারু খানিকক্ষণ বসিয়া বসিয়া সকলের অজ্ঞাতে, বোধকরি নিজেরও অজ্ঞাতে একটী দীর্ঘশ্বাস মোচন করিত—তাহার পর উঠিয়া যাইত।

এইদিকের কাজ কমিয়া যাওয়াতে চারুর অনবসর চিত্ত রান্নাঘরের পানে ঝুঁকিয়া পড়িল, কাজের ফাঁকে মাথা তুলিয়া রাসায়নিক দু'টি যথাসময়ে সম্মুখের টেবিলটিতে চা'এর পেয়ালায় সজ্জিত ট্রে'টি দেখিয়া পুলকিত হইয়া উঠিতেন। চা ও জলখাবার আগেও আসিত এখনও আসে, কিন্তু এখনকার প্লেটগুলি চারুর নিপুণ হস্তের বিবিধ পরিচয় নিয়াই প্রতিদিন হাজির হয়, প্রত্যেকটী জিনিষই মুখে তুলিয়া তুলিয়া ব্রতীন তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসাতে চারুর গৌর মুখখানিতে আনন্দের রক্তাভা ফুটাইয়া দেয় ; ডক্টর সেন কাজ এবং আহারের ফাঁকে ফাঁকে মুখ তুলিয়া পরিপূর্ণ তৃপ্তির সহিত তাহা উপভোগ করেন। সংসারের সকল কাজে, সকল কিছুতেই চারু যে সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা প্রশংসা পাইবার যোগ্য, তাহা চিরদিনই তিনি অন্তরে অন্তরে প্রবলভাবে অনুভব করিতেন।

চা খাইয়া এবং খাওয়াইয়া চারু উপরে চলিয়া যায়। মাঝে মাঝে প্রায়ই তখন উপর হইতে বেহালার করুণ ক্রন্দনের কাতর একটা ক্ষীণস্বর শুধু ভাসিয়া আসিত—চা খাইয়া ধূমপান করিবার ছলে ব্রতীন বাগানে চলিয়া যাইত—গাছের নীচে যে কোন একটা বেঞ্চে বসিয়া বসিয়া চক্ষু দুটী মুদিয়া ব্রতীন আরামে ধূমপান করে, এবং হাওয়ায় ভাসিয়া আসা সে-করুণ তানটী প্রাণের পাতাখানিতে মনের লেখনী দিয়া লিখিয়া লয়।

সিগারেটের পর সিগারেট পুড়াইয়া ব্রতীন যখন কাজে ফিরিয়া আসিত, কাজ হইতে মাথা তুলিয়া ডক্টর সেন কহিতেন, 'কিহে ব্রতীন, কোথা ছিলে?'

ব্রতীন কহিত, 'বাগানে বসে ভায়োলিন শুনছিলুম।'

ডক্টর বিস্মিতভাবে চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন মাত্র। ভাবটা যেন, ও একটা শুনিবার মত জিনিষ নাকি আবার?

'কিন্তু চমৎকার, কে বাজালেন? মিসেস সেন ত?'

'হাঁ, কলেজে পড়াবার সময় আমার শ্বশুর ও জিনিষটাও ভালো করেই শিখিয়েছিলেন, নিজে তিনি প্রফেসার ছিলেন, গান বাজনাও জান্‌তেন ভালো।'

ব্রতীন কথা কহিলনা, আলো জ্বলিয়া উঠার পরও বহুক্ষণ কাজ করিয়া বিদায় লইবার জন্য কোটটী গায়ে দিতেই চারু বাগান ঘুরিয়া একরাশ ফুল লইয়া উপরে উঠিবার পথে সহসা দাঁড়াইয়া কহিল,—'মিষ্টার ঘোষ, এখনো আপনি যান নি দেখ্‌ছি, কিন্তু রাত ত আজ বড় হয়নি, এখন বোর্ডিংএ গিয়ে কতকগুলো ঠাণ্ডা ভাত খাবেন ত? দরকার কি! আমাদের রান্না হয়ে গেছে, এখানেই দু'টি খেয়ে গেলে'—

অত্যন্ত খুসী হইয়া, এবং খুব হাসিয়া নিয়া সেন কহিলেন, 'তাইত হে ব্রতীন, তুমি এখনও খাওনি? সে খেয়াল

আমারও ছিলনা ত,—তা এতক্ষণ আমায় বল্‌তে হয়, ও আতিথেয়তাটা ত আমিও কর্ত্তে পার্ত্তুম তোমায়!'

কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া চারু কহিল, 'বেশ লোক তুমি, কাছে বসে কাজ কর্চ্ছেন, দেখ্‌তে পাচ্ছোনা, ঢাক ঢোল বাজিয়ে খুব সোরগোল করে তবে বুঝি উনি তোমায় জানাবেন, যে আমি এখনও খাইনি।'

অত্যন্ত সহজ সরল সুরে সেন উত্তরে কহিলেন, 'বাঃ, বোর্ডিংএর ভাতটা ঠাণ্ডা হয়ে যায় রাত্তিরে, সে কথাও ত আমায় জানাতে পার্ত্তে।'

ব্রতীন হাসিল, মুখ ফিরাইয়া চারুও হাসি গোপন করিল, তারপর কহিল, 'উনি ঐ একরকম। ভাত জুড়িয়ে বরফ হয়ে যাওয়া কেন, ভাত আজ সেখানে রান্না হয়নি শুনলেও উনি যে আজ খেয়াল করে আপনাকে খেতে বল্‌বেন এখানে, সে আপনি ভুলেও মনে কর্ব্বেন না।'

ডক্টর হঠাৎ একটা কাজে বিশেষ রকমের একটু নিবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, মাথা না তুলিয়া অন্যমনস্কভাবেই খুব হাসিতে লাগিলেন—যেন যা-খুসী বলিবার অধিকার সকলের থাকিতে পারে; না শুনিবার, অথবা শুনিলেও তাহাতে বিচলিত না হইবার অধিকারও লোকের আছে।

চারু কহিল, 'তোমার কি খেতে যেতে দেরী হবে?'

ডক্টর কহিলেন, 'না, না, দেরী আর কি, এই মিনিট দশ পনেরো হবে আর কি,—তা ততক্ষণ তুমি তোমার বাগানখানি ব্রতীনকে ঘুরে দেখাওনা,—তোমার সেই—সেই—কি যে কি গাছটা—আহা, নামটাও মনে থাকেনা, ওহে ঘোষ, আমাদের উনি অনেক যত্নে অনেক কষ্টে—সে গাছটায় ফুল ফুটিয়েছেন, দেখে এসো হে, যাও।' বলিয়া হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

ব্রতীন হাসিয়া চারুর পানে চাহিয়া কহিল, 'কি গাছ?' স্বামীর ব্যবহারে চারুর রাগ হইতেছিল, মুখ লাল করিয়া কহিল, 'গাছ! ভারি ত একটা গাছ! ছোট্ট একটা হাস্নু-হানা—

ব্রতীন বলিল—'আমার কৌতূহল মাপ কর্ব্বেন মিসেস্ সেন! হাস্নু-নো-হানার বাঙ্গালা নাম কি?'

চারু বক্তার মুখের পানে একটীবার মাত্র চাহিয়া, গম্ভীর-মুখে ভাবিতে লাগিল; তারপর বলিল—'জানিনে ত! কি নাম?'

ব্রতীন বলিল—'আমিও জানিনে। তবে আমায় যদি কেউ ওর নামকরণ করতে বলে, রজনীগন্ধার অনুকরণে আমি ওর নাম করি—নিশীথ-সুষমা!'

চারু চিন্তা করার ভাবে টানিয়া টানিয়া উচ্চারণ করিল—'নি=শী=থ সু=ষ=মা! বাঃ বেশ নামটি হয়েছে ত! সত্যি ওর যা কিছু সুষমা, রাত্রে! বিশেষ করে জোছ্‌না রাত্রে!'

ব্রতীন কহিল, 'চলুন আপনার নিশীথ-সুষমা দেখে আসি।'

একটু ইতস্ততঃ করিয়া, দু' একবার স্বামীর পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে চারু কহিল, 'চলুন।'

সেইদিন শয়নকক্ষে ইজি-চেয়ারে বসিয়া স্বামী কি একটা বহি পড়িতেছিলেন, পানের ডিবাটী টেবিলের উপর রাখিয়া, একটী পান চিবাইতে চিবাইতে চারু আসিয়া গম্ভীরমুখে কহিল, 'যাও, তুমি কিন্তু ভারি ইয়ে।'

'ইয়ে—ইয়ে কি! কেন, কেন বল ত?'

'হাঁ, তুমি কি বলে, সত্যি—হ্যাঁ, আমার লজ্জা করেনা বুঝি?'

'ওঃ সেই ব্রতীনের খাবারের কথা। কি পাগল!'

স্বামী হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

চারু রাগ করিয়া শয্যা প্রান্তে গিয়া শুইয়া পড়িল, কত রাত্রি হইয়াছে ডাক্তারের সে হিসাব মনেই ছিলনা,—তিনি তখন এমনই একটি রাসায়নিক গবেষণায় মগ্ন ছিলেন যে, যদি কোন দিন তাঁহার কল্পনাকে তিনি রূপ দিতে পারেন তবে সে গবেষণার ফল যে শুধু তাঁহার দেশের শিল্পের উন্নতির সোপান বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহা নহে; পরন্তু তাঁহার গবেষণার সূত্র ধরিয়া দেশের লোক যদি সেই শিল্পের অনুশীলন করে, তবে দেশের বহু অর্থও বিদেশে না গিয়া দেশেই থাকিতে পারিবে।

(৩)

কিন্তু চারুর দিন আর কাটে না। ল্যাবোরেটারীর কাজ কেমন করিয়া কত ধীরে ধীরে যে তাহার কাছ হইতে সরিয়া গিয়াছে, চারু যেন তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। সংসারের কাজ কত কম, ঝি চাকর দাস দাসীতে যথাসময়েই তাহা সম্পন্ন করিয়া রাখে, মাঝে মাঝে কাজে কামাই করিলে তাহাদের দরও যা-হোক্ বুঝা যায়, কিন্তু

অপ্রয়োজনীয় চারুর সংসারে তাদের কোনও দরই যেন রহিল না ; কাজের ফাঁকে ফাঁকে চারু আগে তবু স্বামীকে কাছে কাছে পাইত, কিন্তু এখন দিনে দিনে স্বামীও যেন তাহার কত দূর দূরান্তরে চলিয়া যাইতেছেন,—চারু অন্তরে বাহিরে ছট্‌ফট্ করিয়া মরিতে লাগিল।

ল্যাবোরেটারীর পার্শ্বস্থ ছোট কক্ষটী দিয়া উপরে উঠিতে নামিতে চারু প্রতিদিনই দেখিত, ব্রতীনের টুপিটী কোটটী ব্র্যাকেটের উপর ঝুলিতেছে, পাশের ছোট টেবিলটীতে কখনও কখনও দুই একটা মাসিক বা সাপ্তাহিক কাগজ কিছু, কখনও বা ঝক্‌ঝকে নাম লেখা চকচকে মলাটের ইংরাজী নভেল কিছু পড়িয়া আছে ;—কর্ম্মহীন নিতান্তই একাকী চারুর সেই বহি ক'খানির উপরে একটা অদম্য লোভ জন্মিত,—কিন্তু ট্রামের বা গাড়ীর বিরক্তিকর দীর্ঘ অবসর কাটাইবার জন্য যিনি ঐ বহি হাতে করিয়া আসিতেন, তাঁহার কাছে সেই বহি চাহিয়া নিতে চারুর সঙ্কোচ বোধ হইত।

সেদিন অপরাহ্ণে চা পানের পর, উপরে উঠিয়া যাইবার পথে সহসা চারু নিতান্ত অন্যমনস্কভাবেই টেবিল হইতে বহিখানি তুলিয়া নিয়া সসঙ্কোচে কহিল, 'বইখানা কি আপনি এনেছেন ?'

বাগানে নামিবার পথে সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া ব্রতীন কহিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি পড়বেন ?'

'না, আপনি এনেছেন পড়তে, পড়ুন, আপনার শেষ হোক্ না, তার পরে পড়ব'খন।'

'না, না, হাতে করে রাখা আমার একটা অভ্যেস, তাই চল্‌তে ফিরতে বই একখানা হাতেই থাকে খালি, পড়ি আর নাই পড়ি! নিন্ না, আপনি পড়ুন, দরকার হয়ত আমার ত আরো বই রয়েছে, পড়বো'খন।'

অসীম কৃতজ্ঞতার সহিত একবার মাত্র চাহিয়া, নীরবে হাত দুইটী যোড় করিয়া, ক্ষুদ্র একটী নমস্কার করিয়া নিঃশব্দে চারু সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

খানিকক্ষণ সিঁড়িতেই দাঁড়াইয়া থাকিয়া, সিগারেটটা অন্যমনস্কভাবেই খানিকক্ষণ মুখে রাখিয়া, তারপর দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া আবার ব্রতীন ল্যাবোরেটারীতে ফিরিয়া আসিল।

পরদিন, সারাদিনে চারুকে আর ল্যাবোরেটারীতে দেখা গেল না, ব্রতীন নিঃশব্দে নিজের কাজ করিয়া গেল, যথানিয়মে বিকালে 'বয়ের' হাতে চা-এর ট্রে সাজাইয়া বহিখানি হাতে নিয়া ধীরে চারু ঘরে প্রবেশ করিল।

চায়ের টেবিলে মিনিট কয়েক গল্প করিয়া ডক্টর সেন আবার নিজের কাজে ফিরিয়া গেলেন, চারুর সঙ্গে সঙ্গে ব্রতীনও উঠিয়া দাঁড়াইল। চারু একটু হাসিয়া, একটু দ্বিধা করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, 'বইখানা শেষ হোল,—আপনার সঙ্গে আর আছে কি ?' উৎসাহিত ব্রতীন কহিল, 'হ্যাঁ! আছে বৈ কি,—পড়ুন না আপনি, যত চান, আমি এনে দোব, বইএর আবার অভাব!'

বহির অভাব সত্যই হইল না, উৎসাহিত ব্রতীন নিজের ইচ্ছামত ভালো ভালো বহি পছন্দ করিয়া আনিত, এক একটী দীর্ঘ দিনে ও দীর্ঘ রাত্রিতে সে বহি শেষ করিয়া চারু ফিরাইয়া দিত। একদিন চারু কহিল, 'একখানা বই দেখ্‌তে দেখ্‌তেই শেষ হয়ে যায় মিঃ ঘোষ,—দু'খানা দিতে পারেন না কি ?' চায়ের পেয়ালা নামাইয়া চক্ষু দুটি তুলিয়া ব্রতীন কহিল, 'কি আশ্চর্য্য, একদিনে একখানা বই শেষ করে আরো বই পড়তে চান মিসেস্ সেন, এত সময় পান কি করে ?'

'আমার সময় ?'—

বলিয়া চারু ম্লান মুখে হাসিল, একটু পরে কহিল, 'সময় আমার আরো কিছু কম থাক্‌লেই বোধ হয় ভালো হোত মিঃ ঘোষ,—অন্ততঃ আমার ত তাই মনে হয়।'

ব্রতীন জোর করিয়া একটু হাসিয়া কহিল, 'কিন্তু আমরা সময়ের পেছনে ছুটে ছুটে হাঁপিয়ে মরলেও তাকে ধরতে পারিনে, মিনিটে মিনিটেই সে আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালায়,—খাওয়াটা আর ঘুমটা দিনের প্রোগ্রাম থেকে বাদ দিতে পারলে কতকটা সুবিধে তবু কর্ত্তে পার্ত্তুম বোধ হয়! সময়ের মধ্যে এক রাত্তির,—রাত্তিরের সময়টা—সেটা আপনি কি করেন,—ঘুমটা ত বর্জ্জন করা চলে না।'

'কিন্তু দেখুন, কি যে আমার হয়েছে, প্রায় বেশীর ভাগ রাতটা জেগেই কাটাই, কি যে বিশ্রী লাগে আমার! মনে হয়, সে সময়টা বই টই পেলে বোধহয়, তবু কিছু ভালো লাগবে।'

'বেশ আমি বই এনে দোব কাল, কিন্তু সময় কাটাবার আর—'

ব্রতীন কথাটা আরম্ভ করিয়াছিল ভাল, কিন্তু কি ভাবে শেষ্ করিবে তাহা না বুঝিয়া থামিয়া পড়িল। শেষ করার প্রয়োজনও কিছু ছিল না, কারণ চারু কথাটা বুঝিল; উত্তরও দিল। 'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, বই ছাড়া কিচ্ছু আর ভালোও লাগেনা আমার, মনে হয় জীবনটা দিনের পর দিন কি দীর্ঘই হয়ে পড়ছে যেন, কি করে যে এটাকে বয়ে নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াবো, জানিনে।'

নিমেষের জন্য কেমন যেন একটু বিচলিত হইয়া ব্রতীন চারুর মুখের পানে তাকাইল, গৌর মুখখানি তাহার কি গভীর একটা শ্রান্তির অবসাদে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে, কৃষ্ণতার আয়ত চক্ষু দুটিতে কি ভয়ানক হতাশের ভাব,—নির্ব্বাক ব্রতীন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

পরদিন দুইখানি বহি হাতে নিয়া ব্রতীন কোট খুলিতে পার্শ্বস্থ কক্ষটীতে প্রবেশ করিল;—কিন্তু দ্বার প্রান্তে গিয়াই স্তব্ধ হইয়া তাকাইয়া দেখিল, একরাশ ফুল সম্মুখে রাখিয়া চা'য়ের টেবিলের ফুলদানী দুইটী চারু গভীর মনোযোগের সহিত সাজাইতেছে। পদশব্দে সচমকে পশ্চাতে তাকাইয়া চারু সহসা একটু বিব্রত হইয়া পড়িল। ঘোমটা খোলা মাথায় তাহার একরাশ ঘন কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ এলো খোঁপার আকারে গ্রথিত হইয়া কাঁধের উপরে আসিয়া একপাশে একটু এলাইয়া পড়িয়াছে,—দুইহাতে তাহার ফুলের গোছা, শাড়ীর লাল পেড়ে আঁচলখানি তাহার কাঁধের উপর হইতে খসিয়া গিয়া নীচে মেঝের উপর লুটাইতেছে,—ব্লাউসটীর গলায়-হাতে চারুর নিজেরই চারু-শিল্পের কৃতিত্ব জরির কাজ ঝলমল্ করিতেছে, মুহূর্ত্তকাল দাঁড়াইয়া সপ্রতিভ ভাবেই ব্রতীন কহিল, 'এই যে আপনি নীচেই আছেন আজ,—নমস্কার,—নমস্কার—আপনার বই দু'খানি এনেছি,—দেখুন ত' পড়েছেন কি?'

ফুল-যোড়া হাতেই চারু অপ্রস্তুতভাবে নমস্কারটা সারিয়া লইয়া কহিল, 'দিন, কিন্তু দশটা কি বেজে গেছে?' মনে মনে ব্রতীন একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল, বিশেষ কোন কাজ না থাকিলে ব্রতীন দশটার পূর্ব্বে কখনও আসে নাই, আজ কে জানে কেন মনটা এমনই চঞ্চল ছিল, কে জানে কেন আজ সে আসিবার আগে সময়ের দিকে দৃক্পাতও করে নাই,—কিন্তু সে লজ্জাটা চাপা দিবার জন্যই তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিল, 'না, না, দশটার দেরী আছে, সকালে উঠে এধারে আমার একটু কাজ ছিল আজ, ভাব্‌লাম এত কাছে এসে আবার ফিরে যাবো!'—

'না, না, বেশ করেছেন, আসুন না, আসুন—দিন্ না আমার তোড়া দুটো আপনিই আজ সাজিয়ে।'—

'আমি?' ব্রতীন হো হো করিয়া উচ্চৈঃস্বরে খুবই হাসিতে লাগিল, তারপর কহিল, 'মালা গাঁথা,—তোড়া সাজানো, এসব কি আমাদের কাজ মিসেস্ সেন? না আমরা তা পারি? এই সব শিশি বোতল তৈরী করার হাতে?' 'তবে আপনি বসুন, দেখুন আমি সব সাজাই।'

চটপট করিয়া দ্রুতহস্তে চারু তাহার কাজ সারিয়া নিল, তার পর দু' একটা কথা কহিয়া উপরের সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইতেই ব্রতীন বহি দু'খানি হাতে করিয়া কাছে আসিয়া কহিল, 'এই বই দু'খানা।'

'হ্যাঁ দিন্, ধন্যবাদ!'—বলিয়া একটীমাত্র সোপান অতিক্রম করিয়া আবার এদিকে চাহিয়া গম্ভীর-করুণ কণ্ঠে কহিল,—'মিষ্টার ঘোষ, আমি আপনার কাছে যে কত কৃতজ্ঞ, আমি তা বল্‌তে পারিনে।'—বলিয়া মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা না করিয়া, কৃতজ্ঞতার বিনিময়ে কাহারও কিছু বলিবার থাকিতে পারে কিনা তাহা চিন্তা না করিয়াই সে দ্রুতপদে উঠিয়া গেল। এবং যেখানে দেখিবার কেহ ছিল না, জানিবার কেহ ছিল না, শুনিবার কেহ ছিল না, সেইখানে, সেই বহি দু'খানা বিছানায় ফেলিয়া, তাহারই উপর মুখ রাখিয়া চারু কাঁদিয়া ফেলিল।

(৪)

গল্প চলিতেছিল,—নিতান্তই একটা বাজে বিষয় লইয়া,—সময়টী বর্ষা কাল,—এ কালে কাজের গল্পের চেয়ে বাজে গল্পেই মন লাগে বেশী,—ডাক্তার সেনের ল্যাবোরেটারীর পাশে চায়ের ঘরটীতেও তেমনি একটা বাজে গল্পই চলিতেছিল,—বক্তা ছিল ব্রতীন, এবং শ্রোতা ছিলেন সেন-দম্পতী, বাহিরে টিপি টিপি বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট কর্দ্দমাচ্ছন্ন হইয়া আছে। কলিকাতার রাস্তায় কাদা হয় না, এ ধারণা মফঃস্বলের অনেকেরই আছে, কিন্তু সে, কলিকাতা সহরের এ ভাগে নয়, সে চৌরঙ্গীর আশে পাশে—জনবিরল পথে মাঝে মাঝে দুই চারিজন লোক দেখা যাইতেছে, কাহারও মাথা ছাতায় ঢাকা, কাহারও মাথায় কিছুই নাই, ছোট

ছোট কয়েকটী ছেলে বগলদাবায় বহি ক'খানি, হাতে জুতা জোড়াটী, এবং অন্য হাতে শ্লেটে মাথাখানি ঢাকা দিয়া কাদা ছিটাইয়া, জল ছিটাইয়া আমোদ করিতে করিতে স্কুল-ফেরত বাড়ী ফিরিতেছে—জানালার সার্সি খানিকটা খুলিয়া চারু তাহাই দেখিতেছিল, এবং মাঝে মাঝে ভিতরের গল্পেও যোগ দিতেছিল,—গল্প চলিতেছিল নিতান্তই একটা বাজে বিষয় লইয়া—বিষয়টী খিদিরপুরের ডক্,—কিন্তু তাহারই সেই বিশাল কারখানা, আশ্চর্য্যজনক লোহার সব কল, অগণিত কুলী মুটে মিস্ত্রির কথা শুনিয়া শুনিয়া চারু স্বামীকে কহিল,—'চলনা, একদিন দেখে আসি।'

স্বামী কহিলেন, 'বেশত, দেখবে? হ্যাঁ দেখবার জিনিষ বটে! তা সে ত ভালো কথা, যাও না। ব্রতীন দেখিয়ে আন্‌বে'খন।'

'বাঃ রে, তুমি যাবে না?'

'আমি? না-ই বা গেলাম আমি, তাতে আর কি হয়েছে, একটা দিন আমার মিছামিছি নষ্ট হবে গেলে, সেটা কি ভালো? তুমি যাও, ব্রতীন তোমায় দেখিয়ে আন্‌বে, কিহে ব্রতীন, পার্ব্বে ত?'

ব্রতীন সম্মতি জানাইল, কিন্তু চারুর উৎসাহ কমিয়া গেল, মনের ক্ষুণ্ণ-ভাব মুখে ফুটিয়া উঠিয়া চারুকে হঠাৎ একটু গম্ভীর দেখাইতে লাগিল।

ঐ কথাটা, ঐখানে ঐভাবে থামিয়া গেল—যেন নিষ্পত্তি কিছু হইল না, আবার যেন সব-শেষ নিষ্পত্তিও হইয়া গেছে, এই ভাব! স্বামী যাইবেন না শুনিয়া, পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য দেখিবার আগ্রহও চারুর রহিল না, কিন্তু কথাটা এমনভাবে আগাইয়া গিয়াছে, ব্রতীনও আগে-ভাগেই সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছে, এখন না-যাওয়ার কথাটা যেন উঠিতেই পারে না। চারু স্বামীর পানে চাহিয়া দেখিল, পরম নিশ্চিন্তভাবে তিনি একটা টিউব পরীক্ষা করিতেছেন এবং ব্রতীন নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাহারই পানে চাহিয়া বসিয়া রহিয়াছে। সে দৃষ্টিতে চারু কি দেখিল তাহা চারুই জানে; কিন্তু না যাওয়াটা যে তাহার পক্ষে একেবারেই সম্ভব নহে, তাহা সে বুঝিতে পারিল এবং আগেকার দ্বিধা সঙ্কোচ পরিহার করিয়া সেও নিশ্চিন্ত হইয়া বসিল।

* * * *

আকাশে মেঘ কি ভাবেই যে ঘনাইয়া আসিতেছে, অন্যমনস্ক চারু বা ব্রতীনের সেদিকে কিছুমাত্র খেয়ালই ছিল না, পাশাপাশি হইলেও মাঝখানে যথেষ্ট ব্যবধান রাখিয়া, উভয়েই বসিয়া, বাহিরের জনবহুল পথের পানে তাকাইয়া গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন ছিল। সহসা ঠাণ্ডা বোধ হওয়াতে উভয়েই যখন সচমকে ফিরিয়া তাকাইল, দিক্‌দিগন্ত কালো করিয়া, বাহিরে তখন প্রবলভাবে বর্ষা তাহার তাথৈ নৃত্য সুরু করিয়া দিয়াছে,—বৃষ্টির জোর এবং হাওয়ার বেগ দেখিয়া গাড়ীর শিখ ড্রাইভার চিন্তিত ভাবে উঠিয়া 'সিডানে'র দোর জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া স্বস্থানে আসিয়া বসিল, ব্রতীন চিন্তিত হইয়া কহিল, 'তাইত বিপদে ফেল্‌লে যে।'

ব্যস্তভাবে ঘাড় ফিরাইয়া চারু কহিল, 'কেন, বলুন ত, বিপদ কিসের?'

হাতঘড়ি দেখিয়া ব্রতীন কহিল, 'ওঃ এখনো অনেক দেরী পৌঁছুতে, কিন্তু মিসেস সেন, দেখুন ত ঝড় বাড়ছেই না খালি?'

'ঝড় বাড়ছে? তাই ত বাড়ছেই ত, কিন্তু তাতে কি আমাদের অসুবিধে কিছু হবে মিষ্টার ঘোষ?'

'কি জানি, দেখি ড্রাইভার কি বলে।'

কিন্তু ড্রাইভারকে আপনা হইতে খুলিয়া কিছু আর বলিতে হইল না। প্রতিকুল বায়ুতে গাড়ী পূর্ব্ব হইতেই তাহার আপত্তি জানাইয়া চলিতেছিল, এখন সহসা পথেরই উপর প্রবল জলস্রোতে ভয়ানক ভাবে বাধা পাইয়া একেবারে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ড্রাইভার কুণ্ঠিত ক্লান্তভাবে সম্মুখে বসিয়া পাগড়ী খুলিয়া মুখ মুছিতে লাগিল, বিমূঢ় ব্রতীন স্তব্ধ গভীর নৈরাশ্যের সহিত ড্রাইভারের মুখের পানেই তাকাইয়া রহিল।

চারু ঘটনাটা ঠিক বুঝিতেছিল না, কিন্তু অজানা একটা ভয়েই তাহার হাত পা কেমন অসাড় হইয়া আসিল, মৃদুস্বরে কহিল, 'কি হোল মিষ্টার ঘোষ, গাড়ী থাম্‌লো কেন?'

কেন থামিল—সে কথা ব্রতীন সাহস করিয়া বলিতে পারিল না, সসম্মানে এবং সসম্ভ্রমে ড্রাইভারই সে কথা প্রভু-পত্নীকে জানাইয়া দিল।

* * * *

কাছাকাছি আত্মীয় স্বজনের বাড়ী এক-একটার কথা মনে পড়িলেও চারু কোথাও যাইতে সম্মত হইল না, ব্রতীন

কহিল, তবে চলুন হোটেলে যাই, একটু কষ্ট কর্ত্তে হবে, একটু জলে ভিজে হাঁট্‌তেই হবে, তার আর উপায় কি!

কিন্তু চারু তাহাতেও সম্মত হইল না, বলিল—দরকার কি? ঘণ্টাখানেক এমনিই কাটিয়া গেল, কিন্তু বন্ধ গাড়ীর ভিতর বসিয়া বসিয়া চারুর কেবলই কান্না পাইতে লাগিল, ব্রতীন সামনের সিটটীতে মাথাটি রাখিয়া, চক্ষু মুদিয়া বসিয়া ছিল, পায়ের নীচে তাহাদের প্রবল বন্যা,—এবং উর্দ্ধে মাথার উপরে ভাঙ্গা আকাশখান হইতে বিপুল বর্ষণ—

আকাশ সে রাত্রে ফাটিয়াই বুঝি পড়িতেছিল, বৃষ্টির বেগ মিনিটে মিনিটে কি দ্রুতবেগেই বাড়িয়া চলিল, জন-মানব-হীন নিঝুম পথে গ্যাসপোষ্টের দীর্ঘ-কম্পিত ছায়ার পানে সার্সির ভিতর দিয়া তাকাইয়া তাকাইয়া, চারু ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল। সহসা বিদ্যুতের ঝিলিকে পথে ঘাটে একটা চমক লাগিতে লাগিতেই কড় কড় শব্দে ভীষণভাবে মাথায় আকাশ বুঝি ভাঙ্গিয়াই পড়িল,—চমকিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে প্রায় জ্ঞানহারা চারু সম্মুখে এলাইয়া পড়িতেই দুইটি দৃঢ় সবল হাতে ব্রতীন তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

জ্ঞান যখন ফিরিয়া আসিল—শেষরাত্রের অস্ফুট আলোকে বাহিরটা তখন একটু পরিষ্কার হইয়াছে, ব্রতীন জানালা খুলিয়া নীরব ইঙ্গিতে ড্রাইভারকে গাড়ী চালাইবার চেষ্টা করিতে বলিল, এবং দুই ঘণ্টার রাস্তা চারি ঘণ্টায় অতিক্রম করিয়া বাড়ীর দ্বারে আসিয়া গাড়ী যখন থামিল, চাকর বাকর দ্বারোয়ান সকলকে জাগাইয়া তুলিয়া ডাক্তার সেন তখন মহা হৈ চৈ বাধাইয়া তুলিয়াছেন।

* * * *

সকাল বেলা চায়ের টেবিলে বসিয়া হা হা করিয়া খানিকটা হাসিয়া চারুর স্বামী চারুর পানে তাকাইয়া কহিলেন—'কিন্তু চারু, এমন ভুলটা তোমার কেমন করে হোল, এ'ত তোমার কখনো হয় না, কাল বেস্পতিবারের বারবেলাতে বেরিয়েছিলে বাড়ী থেকে, সে কথা তোমার একবারটীও মনে ছিল না—কি রকম!'

ম্লানমুখে চারু কহিল, 'তুমি আমায় মনে করিয়ে দিলে না কেন?'

'আমি কেন মনে করাবো, আমি ভাবলুম তোমার বুঝি উন্নতিই হোল এদ্দিক দিয়ে অন্ততঃ।'

এমনই করিয়া খুব হাসিয়া, খুব গল্প করিয়া এবং বার-বেলার উপর সকল দোষ চাপাইয়া দিয়া, ডক্টর সেন খুব সহজে জিনিষটাকে হালকা করিয়া দিলেন।

(৫)

শীত কাটিয়া গিয়া বসন্তের আভাস একটু একটু দেখা দিতেছে, মধ্যাহ্নটা কেমন একরকম বিশ্রীভাবে কাটিয়া গিয়া অপরাহ্ন দেখা দিতেই ট্রে সাজাইয়া বয় আসিয়া চা'য়ের ঘরে দেখা দিল। চা আসিল, বয় আসিল কিন্তু প্রতি দিনকার মত শান্ত-শ্রী গৃহকর্ত্রীকে আজ আর পশ্চাতে দেখা গেল না। চা খাওয়া সেদিন খুব নীরবেই সম্পন্ন হইয়া গেল, ব্রতীন পেয়ালা নামাইয়া মুখ মুছিতে মুছিতে সহসা একবার জিজ্ঞাসা করিল, আজ দুদিন মিসেস্ সেনকে দেখিনি। তাঁর অসুখ বিসুখ করেনি ত কিছু?

'অসুখ! না, অসুখ বিসুখ হয়নি ত কিছু, ভালই ত আছেন দেখেছি। মাসীর ওখানে যাবে যাবে কর্চ্ছে, তাতেই ব্যস্ত আছে বোধ হয়।'

সন্ধ্যার পর বিজলী বাতি জ্বালাইয়া ট্রাঙ্ক বিছানা চারি দিকে ছড়াইয়া ফেলিয়া ছোট চাকরটার সাহায্যে চারু যেখানে গোছ গাছ নিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া আছে, ব্রতীন সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। ইতিপূর্ব্বে এমনভাবে একেলা সে কোনদিন দ্বিতলে উঠে নাই! উঠিলেই পারে, কেন উঠে না, কেন আসে না, কেনই বা, কিসেরই বা তার, কিসের তরেই বা তার এত দ্বিধা, চারুর মনে কতদিন এ প্রশ্ন জাগিয়াছে, নিরুত্তরে আবার মনেই লীন হইয়াছে। তাই আজ এসময়ে তাহাকে একাকী একেবারে ঘরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া চারু বিস্মিত যথেষ্টই হইল। চমকিয়া চারু একবার মাত্র তাকাইয়া যেন বিস্মিত হয় নাই এভাবেই আবার গোছানতেই ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ব্রতীন খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া খানিকক্ষণ নীরবেই তাকাইয়া তাকাইয়া ধীর প্রশান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাচ্ছেন? কেন যাচ্ছেন?"

'এম্‌নি।'

'এম্‌নি! কারণ কিছু নেই?'

'ভালো লাগছে না, মনটা খারাপ'—

'কেন খারাপ?'

'কেন আবার কি? সব কিছুরই কি কারণ থাকে?'

'তা ঠিক ; থাকে না,—বই দু'খানি পড়েছিলেন ?—

'না, বই-ও আর ভালো লাগে না।'

খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ব্রতীন নীচে নামিয়া গেল। চারু বলিতে গেল, ঐ যে বই দু'খানা—কিন্তু যাহাকে বলিবে, সে তখন অনেক দূরে চলিয়া গেছে।

গঙ্গার পারে ছোট গ্রামখানি বনে জঙ্গলে পানাপুকুরে ঢাকা, কিন্তু নামটি কাঞ্চনতলা। এই কাঞ্চনতলারই একটি সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ ঘরের গৃহিণী চারুর মাসী, চারু সেখানেই আসিল। বিস্তৃত বিশাল শূন্য বাড়ীতে মাসী একাকী বহু শোক দুঃখ তাপে ঝলসিয়া উঠিয়াছেন, দুই চারিটী দাসী বাকী মাত্র তাঁহার বৃদ্ধাবস্থার দুর্ভোগ বহন করিয়া চলিতেছিল। তাঁহারই এই বোঝা-নামানো-ভারগ্রস্ত গৃহে চারু তাহার মনের বোঝা নামাইতে আসিল।

মাসী হাসিলেন, কাঁদিলেন, ভগিনী-দুহিতাকে বুকে তুলিয়া আয়ুষ্মতী হইবার আশীর্ব্বাদ করিলেন, প্রকাণ্ড বাড়ীখানির প্রকাণ্ড গৃহ ক'খানিতে একাকী কন্যা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল ; মনের বোঝা তাহার কিছুতেই কোথাও নামিল না।

দোতলায় মাসীর শয়ন কক্ষের পশ্চাৎদিকের যে সিঁড়িটী আঁকিয়া বাঁকিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া একেবারে মাসীর 'আয়না-দীঘির' জলে গিয়া ডুব মারিয়াছে, চারু মাঝে মাঝে সেখানে আসিয়া বসিত। এ 'আয়না-দীঘির' জলে এ সংসারের কত বড় স্মৃতি একটা যে জড়ানো আছে, জলের মৃদু স্রোতের পানে চাহিয়া একে একে সে সব কথা চারু মনে করিত, এই আয়না-দীঘির জলে বাতাসের হিল্লোলে আজ যেখানে স্রোতের মৃদু কম্পন দিবানিশিই চোখে পড়ে, চিরদিনই কিছু এখানে এ জলধারা চোখে পড়িত না। একদিন ছিল, সে কিছু দীর্ঘদিনের কথা নহে, প্রকাণ্ড প্রাসাদ একটি গড়িয়া তাহার মেসোমশাই এখানে দিনের পর দিন জীবনের কত নব নব লীলাই করিয়া গিয়াছেন, কত দুঃখিনী, কত অনাথা অভাগীর চোখের জল সেই 'আয়না মহলে'র ধূলি বালুতে তখন মিশিয়া গিয়াছে,—কত বিলাসিনী নর্ত্তকীর চটুল চরণের চপল নৃত্যের মৃদুল নূপুর শিঞ্জিনী, নিশুতি নিঝুম রাতের স্তব্ধ বাতাসকে কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া, এই আয়না মহলেরই দেয়ালের গায়ে গায়ে বাধা পাইয়া থামিয়া গিয়াছে, চারুর কাছে সেগুলি গল্পের মত মনে হইত। চারুর মনে হইত, মাসীমার জীবনটা কি ব্যর্থই হইয়া গিয়াছে, কিন্তু খালি কি মাসীমারই ?—জীবন ব্যর্থ হইয়াছিল মেসোমশায়েরও। কলেজে পড়িবার সময় মেসোমশা'য় তাহার, মনে মনে যাহাকে তাঁহার মানসী রূপে অন্তরের অন্তরালে বরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন—জাতির এবং ধর্ম্মের কঠোর বিধান তাহার সঙ্গে তাঁহাকে মিলিত হইতে দেয় নাই, সেই দুঃখ তিনি জীবনে ভুলিতে পারেন নাই, ব্যর্থ জীবনটা ব্যর্থ হইয়াই ছিল, সেই ব্যর্থতা ভুলিয়া থাকিবারই জন্য তাঁহার এই যে দিবানিশি মদে ডুবিয়া থাকিবার ব্যাকুল প্রয়াস ছিল, সে কামনা তাঁহার পূর্ণ হইয়াছিল কতখানি কে তা জানে ?—

চারু ভাবিত, কেন এমন হয়, সৃষ্টির প্রাক্কালে ভগবান জোড়া মিলাইয়াই সৃষ্টি করেন, সে ঠিক, কিন্তু সংসারে আসিয়া প্রায়ই সে মিলনে বিপর্য্যয় ঘটিয়া যায় কেন ? সে ভুল কি মানুষের না ভগবানের ? কিন্তু ভুল যাহারই হৌক, সংসারে তৃপ্ত ইহারা কেহই হয় না,—চারুর মাসীমাও হন নাই, নীরবে নির্ব্বিবাদে সকল কিছু সহিয়া যাওয়াই হিন্দু নারীর লক্ষণ, মাসীমাও নির্ব্বিবাদেই সকলই সহিয়াছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ যখন ঘোরতর অত্যাচারে স্বামী তাঁহার অসময়েই একদিন চক্ষু মুদিলেন, চক্ষু মুছিয়া ভূমিশয্যা ছাড়িয়া পত্নী উঠিয়া সেই দিনই লোক লাগাইয়া সেই আয়না মহল ভাঙ্গাইয়া ফেলিলেন, তারপর ধীরে ধীরে সেই প্রেতপুরীর সেই ভগ্নস্তূপ ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া গিয়া, সেখানে এই পুকুর গড়িয়া উঠিল, আয়না মহল আয়না-দীঘি হইল, যে আয়না মহলে পত্নী কোন দিন প্রবেশ করেন নাই, সেই আয়নাদীঘির পাড়ে বসিয়া কেমন অনিচ্ছাতেও কেমন মায়ার জালে জড়াইয়া পড়িতেন। গভীর নিশীথে জ্যোছনায় বসিয়া দুর্ভাগিনী পত্নী মাঝে মাঝে দেখিতেন, মৃদু স্রোতে রূপালী ঢেউয়ের মাথায় মাথায় অতীতের কোন্ রূপসী নর্ত্তকী তাহার অবগুণ্ঠনের জড়োয়া আঁচল খানি হাওয়ায় উড়াইয়া দিয়া জলের কল-কল্লোলের তালে তালে পা ফেলিয়া ধীরে ধীরে তাঁহারই কাছে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে,—আর তিনি তাকাইতে পারিতেন না, আঁচলে চক্ষু মুছিয়া, মুখ ঢাকিয়া কম্পিতপদে ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া যাইতেন। ইদানিং রোগ এবং জড়তা আক্রমণ করায়—শরীর তাঁহার প্রায় অথর্ব্বই হইয়া পড়িয়াছিল, সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া, এই আয়নাদীঘির উজ্জ্বল তরঙ্গে তরঙ্গে সেই আয়না মহলের

পিয়াসী আত্মাদের নিশুতি রাতের জলকেলি দেখা তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। সে স্থান তাঁহার আসিয়া অধিকার করিয়া লইয়াছিল চারু। রাতের পর রাত কাটিয়া যাইত, প্রহরের পর প্রহর কাটিত, চারুর স্বপ্নজাল বোনার তবু কিন্তু বিরাম ছিল না।

এম্‌নি সময়ে একদিন পূর্ণিমার এক রাতে, চারু যখন এমনই এক স্বপ্নজাল বোনায় নিমগ্ন ছিল, সহসা কাহার পদশব্দে শিহরিয়া উঠিয়া পশ্চাতে তাকাইল,……কল্পনায় অনেক সময়ই, অনেক চিহ্নকে কাম্য বলিয়া ভাবা যায়, কিন্তু বাস্তব জীবনে প্রায়ই তাহাদের সংঘটন মানুষের সহে না, চারুরও সহসা তাহাই হইল,—পশ্চাতে আসিয়া যে দাঁড়াইয়াছে, তিনি মাসীমা নন, মাসীমার বাড়ীর দাসী বাঁদীরাও কেহ নহে, এবং এ জগতে, এ সংসারে যাঁহার আসার,—এবং তাহার পার্শ্বের স্থান অধিকার করিবার একমাত্র যাঁহার অধিকার তিনিও নন—যে আসিয়াছে—সে ব্রতীন।—

(৬)

ব্রতীনের এই আসার পশ্চাতে ছোট একটী ইতিহাস ছিল, খুব সামান্য হইলেও, সেটা জানা একটু দরকার। চায়ের টেবিলে বসিয়া গুরু শিষ্যতে পল্লীগ্রামের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছিল, সহসা ব্রতীন কহিল, 'আমাদের মিসেস্ সেনও ত এইবার অনেকদিন গিয়ে পাড়াগাঁয়ে রইলেন, কেমন সে গ্রামটা আপনি গেছেন কি কক্ষনো?'

'না, যাই নি, তবে শুনেছি বেশ, তুমি যাবে? যাওনা ঘুরে এসো না দিন দুই।'

মাথাখানি হেঁট করিয়া মুহূর্ত্তকাল পরে ব্রতীন কহিল, 'না, কি করে হয়ে উঠ্‌বে, আপনি একলাটি, নূতন কাজ কতগুলো—'

'তার আর কি হয়েছে, এ'ত আর আর আফিসের বাঁধাবাধি কাজ কিছু নয়—যাও দিন দুই ঘুরে এসো গে।'

'আজই যাবো কি? আজ কি আর গাড়ী আছে?'

'বোধ হয় আছে'—দেওয়ালের গায় বড় ঘড়ীটির পানে তাকাইয়া কহিলেন 'আর ঘণ্টাখানেক পরে যে গাড়ীটা আছে, সেটায় বেরোও যদি, রাতের আগেই গিয়ে পৌঁছে দেবে, সেইটাতেই ।'

'আপনিও চলুন না।'

খুব খানিকটা হা হা করিয়া হাসিয়া ডক্টর কহিলেন, 'আমি? আমি যে বন্দী! আমার কি কোথাও বেরুবার যো আছে আর? তা বোল গিয়ে মিসেস্ সেনকে বুঝলে? বোল, যে পারলে আমি ঠিক যেতুম।'

* * * *

দিন দুই থাকিয়া একদিন সন্ধ্যাবেলা ব্রতীন কলিকাতার গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। যাইবার সময় কহিল, 'একলাটি ফিরে যাবো? আপনি যাবেন না? চলুন'—

'না,'

'কেন না?'

'ভালো লাগে না।'

'ওখানে ভালো লাগে না, এখানে কি খুব ভালে লাগ্‌ছে?'

'না, না—তাও না।'

'তবে?'

'তবে আবার কি! ভালো আমার আর কিছুতেই লাগে না, কোন কিছুতেই না।'

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া মৃদুস্বরে ব্রতীন কহিল 'খানকতক বই এনেছিলুম রেখে যাবো?'

'না, না, বইও চাই না।'

'কিন্তু আগে ত বইই ভালো লাগ্‌ত!'

'তা লাগ্‌তো, এখন লাগে না, পড়তে পারিনে, পড়বার ধৈর্য্য থাকে না।'

'কেন এত অধৈর্য্য? কেন এত মন খারাপ?'

চারু কথাটা না শুনিবার ভান করিয়া জানালার পাশে দাঁড়াইয়া বাহিরের পথের পানে চাহিল।

খানিকক্ষণ ঘরে পাদচারণা করিয়া সহসা ব্রতীন দ্বারের দিকে রোয়ানা হইল, একবার একটুখানি দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে মুখ রাখিয়াই কহিল, 'কিন্তু তাঁকে গিয়ে কি বলবো?'

'যা ইচ্ছে।'

'আচ্ছা—' ব্রতীন আর পশ্চাতে না তাকাইয়াই দ্রুতপদে ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল।

দিন দুই পরে, সন্ধ্যার পর ব্রতীন কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল, বাগানের ওপ্রান্তে একখানা গাড়ী আসিয়া

থামিল, অন্যমনস্ক ব্রতীন সেদিকে তাকাইতেই দেখিল, গাড়ী হইতে নামিল—চারু !

প্রথম বিস্ময়টুকু কাটিয়া যাইতেই, সম্মুখে সরিয়া আসিয়া ব্রতীন কহিল, 'আপনি ! খবর কিছু না দিয়ে ?'

স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া চারু কহিল, 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু কেন এমন হঠাৎ ?"

'ভালো লাগ্‌লে না, সেখানেও যেন অসহ্য হয়ে উঠ্‌লো।'

'কিন্তু, কিন্তু এখান থেকেও পালিয়ে গেছলেন, ভালো লাগছিলো না বলে,—'

কথাটিও না কহিয়া স্থির দৃষ্টিতে চারু মুখ তুলিয়া তাকাইল মাত্র।

উপরের আকাশে মেঘ-ঢাকা আধখানি চাঁদ, পদতলে বাগানখানি ঘেরাও করা, সন্ধ্যা মালতীর শ্রেণীবদ্ধ অগণিত গাছ,—হর্ণ বাজাইয়া বাজাইয়া মোটরখানি ঘুরিয়া ঘুরিয়া কখন যেন দ্বারের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। রাস্তায় ফিরি-ওয়ালা যুঁই ফুলের মালা ফিরি করিতেছে।

সহসা ব্রতীন সরিয়া আসিয়া কহিল, 'চারু'—

শিহরিয়া চারু মুখ তুলিয়া তাকাইল এবং একেবারে যেন কাঁদিয়া ফেলিল।

ব্রতীন কাছে আসিয়া চারুর একখানা হাত হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া গাঢ়স্বরে কহিল,—'এখানেও ভাল লাগবে না, চল, আমার সঙ্গে, যাবে ?'

'যাবো।'

'তবে আমি প্রস্তুত হয়ে নিই গে, রাত বারোটায় গাড়ী, তখন এইখানেই আমি আসবো, কেমন ?"

বুদ্ধিহারার মত চারু শুধু তাকাইয়া রহিল ; ব্রতীন কহিল, 'চল চারু আমার সঙ্গে, রাত বারোটায় আমি আসবো, তখন আমার সঙ্গে তুমি যাবে—কেমন !'

শূন্যদৃষ্টি চারু ঘাড়খানি শুধু একপাশে হেলাইল মাত্র।

* * * *

বিষের ক্রিয়ায় কম্পিত পদে চারু শয়নকক্ষে ঢুকিয়া বিছানায় আছড়াইয়া পড়িল,—কাঁদিল না, শব্দ করিল না, ছট্‌ফট্‌ করিল না ; কিন্তু তবু যেন অনেকখানি অনেক কিছুই করিল।—চক্ষু ভরিয়া জল আসে মনে হয়, কিন্তু পড়ে না, বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছে মনে হয়, কিন্তু ভাঙে না, দেহ যেন অবশ হইয়া গিয়াছে মনে হয়, তবুও শ্বাস বহে, স্পন্দন জাগায়! চারু যেন না মৃত না জীবিত! ঢং ঢং করিয়া ঘড়িতে আটটা বাজিল, চারু গণিল, চাহিয়া দেখিয়া মনে মনে কি যেন হিসাব করিয়া, শিহরিয়া উঠিল, আবার বিছানায় মুখ ঢাকিল।

হঠাৎ কাহার পদশব্দে শিহরিয়া চারু শশব্যস্তে উঠিয়া ঘড়ির পানে চাহিল, নাঃ, বারোটা নয়, ন'টা—চারু দ্বারের দিকে চাহিল, ডক্টর সেন বিমর্ষ মুখে ঘরে ঢুকিয়া শয্যাপার্শ্বে বসিলেন, হঠাৎ আসা সম্বন্ধে চারুকে দুই একটা ক্ষুদ্র প্রশ্ন করিয়া, গম্ভীর ভাবে উঠিয়া ঘরের ভিতরই ধীরে ধীরে পাদচারণা করিতে লাগিলেন এবং আপন মনেই কহিলেন, 'ব্রতীন যে এমন কর্ব্বে কে তা জান্‌তো, আমার দশ বছরের কাজ পিছিয়ে দিলে, জীবনটাই যেন পিছিয়ে দিলে দশটা বছর,—'

চারু সভয়ে স্বামীর মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

ডক্টর সেন আপন মনেই কহিতে লাগিলেন 'আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য !'

'ব্রতীনের উপর আমার বিশ্বাস ছিল খুব, এমন করে যে ঠক্‌বো,—তা তা—'

স্বামীর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া চারু শয্যা ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, 'কি হয়েছে, কি হয়েছে, খুলে বল, খুলে বল, ওগো খুলে বল, আমি যে আর পারি নে, তুমি এমন করে…'

ডক্টর সেন কহিলেন, 'কাজে অন্যমনস্ক,—অঙ্কে ভুল,—ও-রকম ত আগে ছিল না, ক'দিন ধরেই দেখছি বড় অন্যমনস্ক,—ভয়ানক অন্যমনস্ক! যেন কর্ত্তে হয় তাই করে যায়, কিন্তু এ কাজ কি তেমন করে কর্ল্লে হয় ; তুমিই বল ত চারু, তুমিও ত করেছ ও-কাজ, আমার সঙ্গে ত' তুমিই করেছ এতদিন,—এ কাজে কি অন্যমনস্ক হওয়া যায় ?—একটা ভুল মানে দশটা বছর!—এই ত মানুষের পরমায়ু,—তার দশ দশটা বছর যদি এম্‌নি ভুল করে নষ্ট হয়, বল ত' কি থাকে !'

চারু কথা কহিতে পারিল না, কিন্তু স্বামীর অন্তর্গূঢ় ব্যথা অনুভব করিয়া, সে যেন তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেই চাহিতেছিল। স্বামী বলিলেন, 'দশ দশটা বছর বাজে গেল চারু, দশ দশটা বছরই আমার বাজে গেল, আবার আমাকে গোড়া থেকে সব আরম্ভ কর্ত্তে হবে। একদিনের ভুলে দশ বছর বৃথা গেল !'

চারু এতক্ষণে যেন চেতন পাইল; সবলে সজোরে সস্নেহে স্বামীকে আকর্ষণ করিয়া কহিল,—'যাক্ গে বৃথা! যাক্ গে—আবার তুমি কর্ব্বে, আবার কর্ব্বে তুমি! বড় উত্তেজিত হয়েছ, এসো, আমি তোমার গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিই, একটু বিশ্রাম কর, একটু ঘুমোও, আমার কোলে মাথা রেখে একটু তুমি শোও!' বলিয়া চারু জোর করিয়াই তাঁহাকে শোয়াইয়া দিয়া, কোলের উপর মাথা লইয়া চক্ষু দুটি চাপিয়া ধরিয়া রহিল।

* * * *

দ্বিপ্রহর রাত্রির চাঁদ আকাশে হাসিতেছিল, সন্ধ্যা-মালতীগুলি লাল চেলিটি পরিয়া নতমুখে নত-মস্তকে ভূতলে তাকাইয়া আছে, বাগানে মাঝে মাঝে এখানে ওখানে ফুলে ঢাকা শিউলির গাছ। ব্রতীন আসিয়া বাগানে দাঁড়াইল। রুদ্ধ-দ্বার, রুদ্ধ-বাতায়ন প্রকাণ্ড প্রাসাদখানি জ্যোছনা সাগরে শুদ্ধ স্নাত হইয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে,—না আছে এর প্রাণ, না আছে চেতনা, এ যেন ঘুমন্ত মানবেরই বিশাল এক ছায়া মাত্র!

ব্রতীন আবার রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। সারা রাত্রি কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় পাগলের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়', প্রায় চেতনাহীন অবস্থাতেই যখন প্রতিদিনকারই মত ডক্টর সেনের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, বাড়ীর নিত্যকার কাজ তখন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

অন্যমনস্কভাবে কখন কে জানে নিজেরই অজ্ঞাতে বাগানের প্রান্তভাগে আসিয়া দাঁড়াইতেই চোখে পড়িল—

সেই বহুপূর্ব্বেকারই মত ডক্টর সেনের পত্নী শ্রীমতী চারুলতা তাহারই পরিত্যক্ত কাজে আসিয়া ঢুকিয়াছে—হাতে একটি স্পিরিটের শিশি এবং সম্মুখে তাহার কতকগুলি রংএর বোতল।—

পুস্তক-পরিচয়

গোপেশ্বর-গীতিকা।—বঙ্গের প্রসিদ্ধ গায়ক সঙ্গীত-নায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

এই পুস্তকখানিতে সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ৬৫টি হিন্দু দেবদেবী বিষয়ক বাংলা গান স্বরলিপি সহ প্রদত্ত হইয়াছে। গানগুলি গ্রামোফোণ রেকর্ডে প্রায়ই গীত হয়ে থাকে, সুরগুলি খাঁটি রাগরাগিণী সম্বলিত—অতএব স্বরলিপিসহ পুস্তকাকারে একত্র পাওয়ায় শিক্ষার্থীদের যে বিশেষ উপকারে আসিবে তাহা না বলিলেও চলে। খাঁটি সুরে বাংলা গান আজকাল দুর্লভ বলিলেই হয়—এই পুস্তকের দ্বারা সেই অভাব কিয়ৎ পরিমাণেও দূরীভূত হইলে, লেখকের পরিশ্রম সার্থক। স্বরলিপি সুন্দর হইয়াছে। এইবার লেখক সম্বন্ধে দু একটি কথা সাধারণের নিকট বলিতে চাই। সঙ্গীতবিদ্যা যে ইঁহাদের বংশানুক্রমে পৈত্তিক সম্পত্তি তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। ইনি বিষ্ণুপুরের প্রখ্যাত সঙ্গীতগুরু ৺অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্র। তিনি ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন। শ্রীমান রমেশচন্দ্র, গোপেশ্বর বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র। শিশুকাল হইতেই ইনি পিতার নিকট রীতিমত গান শিক্ষা করিয়া এক্ষণে গায়কসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ময়ূরভঞ্জাধিপতি মহারাজ পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জ দেব বাহাদুর এই পুস্তক মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। তিনি আমাদের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই। তিনি এই সময়ে সঙ্গীতপুস্তকের মুদ্রণব্যয় বহন করিয়া আপনার সঙ্গীতানুরাগ ও গুণগ্রাহিতারই পরিচয় দিয়াছেন। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি। —শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্।

ফুল্লরা।—শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য একটাকা।

ফুল্লরা কালকেতুর উপাখ্যান—বাঙ্গালী মাত্রেরই সুপরিচিত। মহাকবি মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে ফুল্লরার কাহিনী সুললিত ভাষায় বিবৃত আছে। খ্যাতনামা নাট্যকার শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সেই সুপরিচিত উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া এই নাটক লিখিয়াছেন। তাঁহার অনন্য-সাধারণ লিপি-কুশলতায় আখ্যায়িকার চরিত্রগুলিতে নবপ্রাণের সঞ্চার হইয়াছে; আধুনিক বঙ্গসমাজ যে ভাঁড়ুদত্তকে ভুলিতে বসিয়াছিল, অপরেশ বাবু তাহাকে আবার সজীব করিয়া তুলিয়াছেন; সমস্ত চিত্র যেন জ্বলজ্বল করিতেছে। অপরেশ বাবু বলিয়াছেন, নাটক ও গীতি-নাটকের মাঝামাঝি যাহা, ইহা তাহাই। আমরাও তাহাই বলি। গানগুলিতে নাট্যকারের কবিত্বশক্তির প্রকৃষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে। অপরেশ বাবুর অন্যান্য নাটকের ন্যায় এখানিও যে রঙ্গমঞ্চে ও পাঠকসমাজে বিশেষ আদর লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

অমরনাথ।—শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য দুই টাকা।

এই সুবৃহৎ উপন্যাসখানি শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিণত বয়সের লেখা। তিনি পূর্ব্বে আরও অনেক উপন্যাস লিখিয়াছেন, কিন্তু আমাদের মনে হয় অমরনাথ তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে। এখানি যখন পত্রান্তরে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছিল, আমরা তখন হইতেই এই সুন্দর উপন্যাসখানির ক্রম-পরিণতি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলাম। সুধী গ্রন্থকার আমাদের আশা-পূর্ণ করিয়াছেন;

তাঁহার লেখনী অমরনাথকে সজীব চিত্রে পরিণত করিয়াছে। আমরা এই উপন্যাসখানির প্রচার-সাফল্য কামনা করি।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ।—শ্রীমন্মথনাথ দে প্রণীত, মূল্য দুই টাকা।

গ্রন্থকার পত্রান্তরে এই ভ্রমণ-কাহিনী ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা তখন হইতেই প্রতিমাসে এই কাহিনী পড়িয়াছি এবং আমাদের পূর্ব্ব-দৃষ্ট স্থানগুলির বর্ণনা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়াছি। এখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ায় আরও একবার পড়িলাম। সুলেখক মহাশয় কোথাও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন নাই, যেখানে যাহা দেখিয়াছেন এবং যে ইতিহাস ও কিম্বদন্তী সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা অতি সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এ শ্রেণীর ভ্রমণ কাহিনী যত অধিক প্রকাশিত হয়, ততই ভাল।

ভ্রষ্টলগ্ন।—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সরকার প্রণীত। মূল্য ১৸৹ এক টাকা বারো আনা।

আনন্দবাজার পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সরকার মহাশয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত। গত বৎসর তাঁর প্রথম উপন্যাস "অনাগত" কথা-সাহিত্যে যে নূতন সুর ধ্বনিত ক'রে সাধারণকে চমৎকৃত করেছিল, তাঁর এই দ্বিতীয় উপন্যাস 'ভ্রষ্টলগ্নে' আমরা সেই সুরটিকেই পরিণত ও মধুরতর রূপে পেয়েছি। প্রফুল্ল বাবুর উপন্যাসের প্রধান বিশেষত্বই হ'চ্ছে, তা জাতীয়তার সমস্যামূলক। বাংলার বিপ্লববাদী তরুণদলের কাহিনী অনেকেই নানাগ্রন্থে প্রকাশ করবার চেষ্টা ক'রেছেন, কিন্তু সেগুলি হয়েছে অনেকটা শুষ্ক নীরস ইতিহাস মাত্র। কিন্তু প্রফুল্লবাবু সেই বিপ্লববাদীদের বিচিত্র জীবনের নানা রহস্যময় ঘটনাকে এমনভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে উপন্যাসের আকারে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন যে, সে রূপে রসে ভাবে ভাষায় একান্ত হৃদয়গ্রাহী হ'য়ে উঠেছে। 'ভ্রষ্টলগ্ন' পড়লে বিপ্লবপন্থী যুবকগণের জীবনের এমন একটা দিক আমরা দেখতে পাই যেটা সাধারণের কাছে চিরদিনই যবনিকার অন্তরালে গোপন ছিল। দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ স্বদেশ-প্রেমিক সর্ব্বস্বত্যাগী এই দুঃসাহসী তরুণের দল কেন যে তাদের মহাব্রত উদ্‌যাপনে বার বার অকৃতকার্য্য হ'য়েছে, সেই দুর্জ্ঞেয় ব্যাপারের সন্ধানটুকু আমরা প্রফুল্লবাবুর এই 'ভ্রষ্টলগ্নে'র মধ্যে সুস্পষ্ট দেখতে পাই। তাঁর লিখনভঙ্গী, ভাব-নৈপুণ্য, চরিত্র-চিত্রণ ও ঘটনার পর ঘটনার অপূর্ব্ব সমাবেশ বইখানিকে অতি সুপাঠ্য ও উপভোগ্য ক'রে তুলেছে। নারী-চরিত্রের দুর্ব্বলতার দিকটি ইনি এমন সুরুচি সঙ্গত ক'রে দেখিয়েছেন যে, এঁর কলা-কৌশলের প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না। এই মেরুদণ্ডহীন জাতির বিকৃত সাহিত্যের যুগে এমনিতর সুস্থ সবল কথাসাহিত্যের বহুল প্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয়।

মধুপ।—শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী রচিত। মূল্য এক টাকা চার আনা।

প্রবাসী বাঙালীর মুখপত্র "উত্তরার" সহকারী সম্পাদক এবং বয়সে তরুণ হ'লেও সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবীণ শ্রীযুক্ত সুরেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বাংলায় ও বাংলার বাহিরেও অনেকের নিকট সুপরিচিত। "রহমৎথার দুর্গোৎসব" প্রভৃতি তাঁর কয়েকখানি বই পূর্ব্বেই দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাঁর এই আলোচ্য গ্রন্থ "মধুপ" অধুনা-বিলুপ্ত 'বিজলী' পত্রিকায় যখন 'কালো ও আলো' নামে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হ'য়েছিল, তখনই আমরা প্রতিবার আগ্রহের সঙ্গে তা পাঠ করেছি এবং পাঠ ক'রে মুগ্ধ হ'য়েছি। তাঁর চমৎকার ঝরঝরে ভাষা; লেখার ধরণটিও খাসা এবং গল্পটিও বেশ চিত্তাকর্ষক। গ্রন্থের নায়ক—বিবাহ-বন্ধনে ধরা না দিয়ে চিরদিন 'কুমারী-হৃদয় পদ্ম'-মধুপানে তৃপ্ত হ'তে চেয়েছিলেন, কিন্তু লেখকের ভাষাতেই বলি—"একদা সে তার চির অভ্যাসমতো বেলাশেষের সঙ্গে সঙ্গে ফুলের যে আপনাকে উজাড় ক'রে দেওয়া মধু নিঃশেষে পান ক'রে আর পালাবার পথ খুঁজে পেলেনা!" গ্রন্থের 'মধুপ' নামকরণটি অত্যন্ত উপযোগী হ'য়েছে। এবং বইখানির ছাপা যেমনি সুন্দর বাঁধাইও তেমনি চমৎকার। সুরেশবাবুর 'মধুপের' অন্তরে বাহিরে একটা নূতনত্বের ছাপ পাওয়া যায়।

পাঁকের ফুল।—শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায় রচিত। মূল্য ১।৹ দেড়টাকা।

'ফুলের ব্যথার' সুকবি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায় কথা-সাহিত্যেও যে কত-বড় শিল্পী, সে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ঝড়ের দোলা' পড়েই সাধারণে অবগত হয়েছেন। তাঁর আর নূতন ক'রে পরিচয় দেবার কোনও প্রয়োজন নেই। 'পাঁকের ফুল' তাঁর পরিণত লেখনীর অনবদ্য সৃষ্টি। যে ফুল পঙ্কের মধ্যে বিকশিত হ'য়ে ওঠে, তার ঐশ্বর্য্য উপভোগ ক'রতে গেলে অনেক লোককে হয়ত একটু আধটু পাঁক ঘাঁটতেই হয়! কিন্তু হেমেন্দ্র বাবু আজ কথা-সাহিত্যের সরোবরে সন্তরণ করে যে পঙ্কজ প্রসুন তু'লে এনে আমাদের উপহার দিয়েছেন - তা বাণীপূজার অর্ঘ্য হবারই সম্পূর্ণ উপযুক্ত। রূপদক্ষ শিল্পীর মতোই তিনি তাঁর গ্রন্থের পাত্র পাত্রীগুলিকে তাদের স্ব স্ব প্রকৃতি অনুযায়ী বিচিত্র বরণে চিত্রিত করেছেন। তাঁর তপ-সিদ্ধ সাধনার গুণে তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টি সজীব ও মধুময় হ'য়ে উঠেছে! প্রেমের জন্য সর্ব্বহারা মিনতি, সন্ন্যাসী সমীর, সৌন্দর্য্য-পিয়াসী শিল্পী, নির্য্যাতিতা নার্স, দুরন্ত জিপ্‌সি সর্দ্দার ও তাদের কেড়েনিয়ে আসা মেয়ে, পথের মণি মীনা, মুশৌরীর লাল-বাড়ীর মেয়ে আনন্দময়ী, ইলা, এরা সবাই যেন পাঠকের মনে কোন্ স্বপ্ন-পুরীর ইন্দ্রজাল রচনা ক'রে দিয়ে যায়! হেমেন্দ্র বাবু কবি, তাই কবির মতো সুললিত ভাষাতেই তিনি এই গল্পগুলি বলেছেন। 'পাঁকের ফুল' তাঁর সুকুমার রচনার গুণে ও ভাবের সুষমায় যেন একখানি অপূর্ব্ব প্রসাদ-গুণ সমন্বিত গদ্য-কাব্য হ'য়ে উঠেছে!

দীপান্বিতা।—শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী রচিত। মূল্য ১৷৹ টাকা

নবযুগের সাহিত্য-গগনের পূর্ব্বদ্বারে যে কজন তরুণ কবির কাব্য-প্রতিভা পুনরায় এক নবীন উষার রক্তিম আভা ফুটিয়ে তুলেছে, কবি হেমচন্দ্র বাগচী তাঁদেরই মধ্যে একজন। 'প্রবাসী, 'কল্লোল, 'উত্তরা' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রের পাঠকেরা কবি হেমচন্দ্রের কাব্য-সম্পদের সঙ্গে বিশেষ ভাবেই পরিচিত। তাঁর গত পাঁচ বৎসরের সঞ্চিত রচনাবলী থেকে মাত্র ছত্রিশটি কবিতা চয়ন করে তিনি এই 'দীপান্বিতা'র আরতি-প্রদীপ সজ্জিত ক'রেছেন। এর প্রত্যেকটি কবিতা রূপে রসে ভাবে

ব্যঞ্জনায় ছন্দমাধুর্য্যে ও কল্পনার ঐশ্বর্য্যে অপরূপ হ'য়ে উঠেছে! কবির এই 'দীপান্বিতা' পড়ে যথার্থ ই ব'লতে ইচ্ছে করে—

"তোমারে হেরেছি কিশোরী বালিকা ;—দীপের মালিকা পরেছ গলে ;
সুনিবিড় কালো বুকের তলে
যে বাণী মূরছি ছিলো গো একদা. আজি সে রুচিরা মাতুরা বড়
কোমল মাধুরী মধুরতর।
কালো কেশপাশে অনাদি আঁধার নিবিড় তর।
কোথা সে তরুণ বল্লভ তব, শীত সমীরের পরশ প্রীতা
মিলন-ব্যাকুলা দীপান্বিতা!"

পুস্তকখানির ছাপা বাঁধাই আকার ও প্রচ্ছদপট যেন যুগ-শিল্পের বররুচি বহন ক'রে নিয়ে এসেছে - এমনিই সুন্দর ও পরিপাটি এর পরিকল্পনা!

দাম্পত্য রহস্য—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী রচিত। মূল্য ২॥• টাকা।

য়ুরোপীয় সাহিত্যে যৌনবিজ্ঞান সম্বন্ধে নানা ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হ'য়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ দেশের সাহিত্যে যৌনবিজ্ঞান সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত একখানিও উৎকৃষ্ট ও প্রামাণ্য গ্রন্থ রচিত হয়নি। যা দু' একখানি আছে তা' অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর এবং অশ্লীল সাহিত্যে'র অন্তর্ভুক্ত। জ্ঞানেন্দ্রবাবু এই "দাম্পত্য রহস্য" রচনা ক'রে বাংলা দেশের সেই অভাব দূর করবার চেষ্টা করেছেন। এই বইখানির ভূমিকায় ডাক্তার সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় যথার্থ ই বলেছেন যে "বিদেশে যাত্রাকালে লোকে নানারূপ 'গাইড্‌বুক' সঙ্গে নেয় এবং যাঁরা সেদেশে পূর্ব্বে গেছেন তাদের উপদেশ গ্রহণ করে। বিবাহিত জীবন-পথে যাত্রা বিদেশ যাত্রা অপেক্ষাও গুরুতর, কারণ দম্পতির ও ভবিষ্যৎ সন্তানের স্বাস্থ্য এবং জাতি ও সমাজের কল্যাণ এরই উপর নির্ভর করছে। জ্ঞানবাবুর 'দাম্পত্য রহস্য' এই চির-রহস্যময় জীবনে বিশ্বস্ত পথপ্রদর্শকের কাজ করবে!" তাঁর এ উক্তি যে কতখানি সত্য তা এই 'দাম্পত্য রহস্যের' প্রত্যেক পাতায় জানতে পারা যায়। 'হিন্দু' প্রভৃতি একাধিক সাময়িক পত্রিকা'র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও 'ভালোবাসা' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা বঙ্গবাণীর ও স্বদেশের একনিষ্ঠ সাধক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় যেরূপ প্রভূত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় ক'রে এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করেছেন তাতে বাঙ্গালী মাত্রেরই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হ'য়ে থাকা উচিত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।—শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ; মূল্য দুই টাকা।

এখানিতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, আধ্যাত্মিক ও সাধারণ অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক মহাশয় সুদীর্ঘ ভূমিকায় গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার যে উপযোগিতা দিয়াছেন, তাহা যেমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ, তেমনি বিশদ : ইহাতে লেখক-মহাশয়ের অধ্যাত্মদর্শন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ইতঃপূর্ব্বে গীতার অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা সম্বলিত আরও দুইচারিখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে ; কিন্তু এখানিতে যে বিচার ও বিশ্লেষণ আছে, তাহা পরম উপাদেয়। এই সুন্দর ব্যাখ্যা পাঠ করিলে পাঠক বিশেষ উপকৃত হইবেন বলিয়া আমাদের আশা হয়।

ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ।—শ্রীযামিনীকান্ত সোম প্রণীত, মূল্য বারো আনা।

এ যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী রবীন্দ্রনাথ, গানের রাজা রবীন্দ্রনাথ, জগৎ কবি-সভার মুকুটমণি রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মূর্ত্তি সুন্দর, তাঁর বাক্য সুন্দর, তাঁর কাব্য সুন্দর। শিশু-সাহিত্য রচনায় যশস্বী শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সোম মহাশয় এই সুন্দর রবীন্দ্রনাথের সুন্দর জীবন-কথা ছেলেদের জন্য অতি সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বইখানি ছেলেদের জন্য লিখিত হইলেও ইহাতে এমন অনেক বিবরণ আছে, যাহা বর্ষীয়ানগণেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। যামিনী বাবু অতি মনোহর ভাষায় রবীন্দ্রনাথের জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা শিশু-পাঠ্য সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

প্রেমের পূজা।—শ্রীমতী রাধারাণী দেবী প্রণীত ; মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীমতী রাধারাণী বাঙ্গালা উপন্যাসক্ষেত্রে সুপরিচিতা না হইলেও আমরা তাঁহাকে বিশেষ ভাবে জানি, চিনি এবং তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয়ও আমাদের অজ্ঞাত নহে। এতদিন পরে তিনি যে এই সুন্দর গার্হস্থ্য উপন্যাসখানি লইয়া সাহিত্য সমাজে দর্শন দিলেন, ইহাতে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। এই উপন্যাসখানি আগা-গোড়া পড়িয়া কোন স্থানে লেখিকার প্রথম চেষ্টার জড়তা দেখিলাম না ; ভাষা যেমন সুন্দর, বর্ণনা-ভঙ্গীও তেমনি মনোহর, আর চরিত্র-চিত্রণেও কাঁচা হাতের কোন নিদর্শন নাই। আমরা আশা করি, লেখিকা প্রথম প্রচেষ্টায় যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাতে এই 'প্রেমের পূজা'ই তাঁহার শেষ দান হইবে না, আমরা তাঁহার কাছে আরও কিছু আশা করি।

মালঞ্চের ফুল।—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রণীত, মূল্য একটাকা।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিশু সাহিত্যিক শ্রীযুত কার্ত্তিক চন্দ্র দাশগুপ্তের নিপুণ হস্তে বিচিত্র ছোট গল্পের বই মালঞ্চের ফুল উপহার পাইয়া বেশ একটু আনন্দ অনুভব করিলাম। উপন্যাসের চেয়ে গল্পের একটা বিশেষত্ব এই যে উপন্যাসের বহু ঘটনার ভিতরে মানবীয় চরিত্রের সকল দিক ফুটিয়া না উঠিতে পারে ; অথবা সকল সময়ে তাহার আবশ্যকতাও হয় না। কিন্তু গল্পের যে দিকটা লইয়া তৈয়ারি হয় সে দিক্‌টায় সম্পূর্ণ বিকাশ হওয়া নিখুঁত গল্পের লক্ষণ। আমাদের মনে হয় কার্ত্তিক বাবু এ বিষয়ে সার্থকতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা ও ভাবধারা স্বচ্ছন্দ গতিতে বাধাহীন উজ্জ্বল আলোক রশ্মির ন্যায় ছুটিয়া চলিয়াছে। আমরাও প্রবীণ সাহিত্যিক দীনেশ বাবুর সঙ্গে এক মত। মালঞ্চের ফুল গল্পটি লেখকের বেশ নিপুণ হস্তের কারুকার্য্য। মানবীয় চরিত্রের ভীষণত্ব, মধুরত্ব একনিষ্ঠ এবং সামাজিক চিত্রগুলি খুনী, কেরাণীর স্ত্রী, চাঁদের কলঙ্ক বরের দান ও প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি গল্পে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা কার্ত্তিক বাবুর নিপুণ হস্তের লেখনী প্রসূত লেখা আরও আশা করি।

বেদে—উপন্যাস শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত। মূল্য ১॥•

বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের উদয়াচলে যে ক'জন শক্তিমান তরুণ সাহিত্যিকের নবীন প্রতিভার রক্তচ্ছটা অপূর্ব্ব দীপ্তিতে বিকীর্ণ হ'চ্ছে, কবি অচিন্ত্যকুমার তাঁদের মধ্যে একজন। এঁর গল্প, কবিতা ও উপন্যাস আজ বাংলার শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্রগুলিতে সাদরে স্থান পাচ্ছে। 'বেদে' অচিন্ত্যবাবুর প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাসখানি যখন "কল্লোল" পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ হ'চ্ছিল, তখনই এটিকে অনেকে সাগ্রহে পড়েছিলেন এবং একে তাঁর বিকাশোন্মুখ প্রতিভার অন্যতম দান বলে স্বীকার করেছিলেন। সুতরাং 'বেদে'র বিস্তারিত বিবরণ ও বিশদ পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন ব'লে মনে করি। যে চির-চঞ্চল মানবাত্মা জীবনের বিচিত্র স্পন্দনের মধ্যে প্রতিনিয়ত নিরুদ্দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে অথচ জীবনের কোনও বাঁধনই যাকে বেঁধে রাখতে পারে না, সেই নিরুদ্দেশ-যাত্রী মানব-প্রাণের একটি মূর্ত্তরূপ বাঁধনহারা জীবনের নিত্য নব-কাহিনীর ভিতর দিয়ে সুন্দর পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। এই নূতন যুগের উপন্যাস-খানি একটি অভিনব ধারায় বিরচিত। এর ভাষা নূতন, রচনাভঙ্গী নূতন, বর্ণনা ও ভাব-বিন্যাস এবং ঘটনা সমাবেশও নূতন। এই নূতনত্বের বৈচিত্র্য যে বইখানিকে হৃদয়গ্রাহী ক'রে তুলেছে সে-কথা বলাই বাহুল্য! আমরা শুধু লেখকের কয়েকটি কষ্ট-কল্পিত উদ্ভট উপমা ও যৌন-ব্যাপারের বর্ণনার দিকে অতিরিক্ত ঝোঁকের প্রশংসা করতে পারলুম না।

দিক্‌শূল

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৮

দুদিন সুকুমারীর অসুখ হ্রাস-বৃদ্ধি না হ'য়ে প্রায় সমভাবে কাট্‌ল; কিন্তু তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পর থেকে সহসা দ্রুতবেগে বৃদ্ধির পথে অগ্রসর হল। ব্যস্ত হয়ে নরেশ সেই রাত্রেই দুজন বড় ডাক্তার আনালে। দীর্ঘকালব্যাপী রোগী-পরীক্ষা এবং পরামর্শের পর সেবা, চিকিৎসা এবং পথ্যের ব্যবস্থা ক'রে প্রস্থানোদ্যত হ'য়ে ইংরাজ-ডাক্তার নরেশকে অন্তরালে নিয়ে গিয়ে বল্‌লে, "আপনার স্ত্রীর অবস্থা আশঙ্কা-জনক নিশ্চয়ই; তবে আশাহীন, তা আমি বলি নে।"

সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের মুখ থেকে এই আশ্বাসের বাণী শুনে নরেশের প্রাণ উড়ে গেল; ত্রস্ত স্খলিত কণ্ঠে সে বল্‌লে, "সে কি কথা! তবে কি প্রাণের আশা নেই?"

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে ডাক্তার বল্‌লে, "আমি ত' সে কথা বলি নি,—আমি বলেছি, প্রাণের আশা নেই বলা যায় না।"

হতাশভাবে নরেশ বল্‌লে, "ও ত' একই কথা ডাক্তার!"

নরেশের কাঁধে ডান হাতখানা স্থাপিত ক'রে শান্ত কণ্ঠে ডাক্তার বল্‌লে, "আমরা চিকিৎসা-ব্যবসায়ীরা কিন্তু তা মনে করি নে। আমরা জানি আমাদের আশা-নৈরাশ্যের যত বার ঠিক হয় তার চেয়ে বেশিবার ভুল হয়। সে যাই হ'ক, আশা করা যাক্ আপনার স্ত্রী ভাল হ'য়েই উঠবেন।"

নবাগত ডাক্তার দুজন প্রস্থান করলে নরেশ দৃঢ়ভাবে তার গৃহচিকিৎসকের হাত চেপে ধ'রে বল্‌লে, "সে আমি কিছুতেই শুনছি নে ডাক্তার মশায়, এ রোগ আপনাদের সারাতেই হবে! তার জন্যে যে ব্যবস্থা করবার দরকার করুন, যত টাকা খরচ করতে হয়, হ'ক; কিন্তু সুকুমারীকে বাঁচানো চাই-ই!"

নরেশকে যথাসম্ভব সাহস এবং সান্ত্বনা দিয়ে যাতে বিলম্ব না হয় সে জন্যে ডাক্তার স্বয়ং প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌গুলি নিয়ে ওষুধ আন্‌তে গেলেন—তারপর ওষুধ-পত্র নিয়ে এসে একজন তরুণ-ডাক্তার এবং দু-জন নর্সকে রাত্রের সমস্ত ব্যবস্থা বুঝিয়ে দিয়ে যখন তিনি প্রস্থান করলেন তখন রাত্রি প্রায় বারোটা।

সরমা সুকুমারীর পাশে ব'সে তার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল; নরেশ বল্‌লে, "রাত অনেক হয়েচে সরমা, তুমি গিয়ে একটু কিছু খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়। একটু আগে খিণ্টু কাঁদছিল।"

নূতন ডাক্তারটি নরেশের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "আপনিও যান মিষ্টার ব্যানার্জি। আমরা তিন জনে সমস্ত রাত জেগে কাটাবো; সেবা-যত্নের কোনো ত্রুটি হবে না,—সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন।"

মৃদু হেসে নরেশ বল্‌লে, "ত্রুটি হবে না, তা জানি,—কিন্তু নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার্‌ব না। কোনো অসুবিধে হবে না আমার—ঘুম পেলে ওই ইজি-চেয়ারটায় একটু শোবো অখন।"

কিন্তু সুকুমারী তা হ'তে দিলে না; ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌ল; বল্‌লে, "যাও শুয়ে পড় গে, ভোর বেলা আবার এসো। তুমি জেগে ব'সে থাক্‌লে আমার ঘুম হবে না।"

ডাক্তার বল্‌লে, "দেখ্‌লেন ত' মিষ্টার ব্যানার্জি, আপনার থাকা কিছুতেই চল্‌বে না। আপনি থাক্‌লে রোগীর পক্ষে অসুবিধে, আমাদের পক্ষেও সুবিধে নেই।"

ডাক্তারের কথার কোনো উত্তর না দিয়ে নত হ'য়ে সুকুমারীর দক্ষিণ হাতটা চেপে ধ'রে নরেশ জিজ্ঞাসা করলে, "এখন কি রকম বোধ করছ?"

সুকুমারী বল্‌লে, "একটু ভাল।"

সুকুমারীর যন্ত্রণা-কাতর মুখের দিকে তাকিয়ে সকলেই বুঝ্‌তে পারলে এ নিতান্তই সান্ত্বনা দেবার অভিপ্রায়ে অসত্য কথা। এমন প্রশ্নেরও কোনো মূল্য নেই, উত্তরেরও কোনো মূল্য নেই—তবুও লোকে প্রশ্ন করে এবং উত্তর দেয়।

সুকুমারীর কপালের উপর কয়েক গুচ্ছ চুল এসে

পড়েছিল; হাত দিয়ে সেগুলোকে ধীরে ধীরে যথাস্থানে সরিয়ে দিয়ে নরেশ বল্‌লে, "আচ্ছা, তা হ'লে চল্‌লাম, কিন্তু কোনো দরকার হ'লেই আমাকে ডেকে পাঠিয়ো।"

নরেশের আহারের প্রবৃত্তি একেবারেই ছিল না, কিন্তু সরমার উপরোধে একবার বসতে হ'ল।

নরেশের কাছ থেকে একটু দূরে ব'সে চিন্তিত হয়ে সরমা জিজ্ঞাসা করলে, "ডাক্তার সাহেব দিদির বিষয়ে কি ব'লে গেলেন জামাইবাবু?"

ক্ষণকাল নীরবে থেকে চিন্তা ক'রে নরেশ বল্‌লে, "যা ব'লে গেলেন তা'তে তোমার এবং আমার দুজনেরই প্রস্তুত হওয়া উচিত।"

সরমা অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌ল, "সে কি কথা জামাইবাবু!"

নরেশের মুখে দিবালোকে তড়িৎ-প্রভার মত একটা ক্ষীণ সকরুণ হাসি ফুটে উঠ্‌ল; বল্‌লে, বুঝ্‌তে পারছ না সরমা, তোমার দিদিতে গ্রহণ লেগেছে—তিন-পো গ্রাস হ'য়ে গেছে, এক-পো বাকি।"

সরমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বার হ'ল না, শুধু দুই চক্ষু দিয়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে অশ্রু ঝ'রে পড়তে লাগল।

আহার-পাত্রের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে নতমুখে নরেশ বল্‌লে, "তোমার দিদি কড়া মহাজন সরমা, যা-কিছু দিয়েছে সুদে আসলে আদায় ক'রে নিয়ে দেউলে ক'রে দেবার মতলব। কাশীনাথেরই কাছে শেষ পর্য্যন্ত ইনসল্‌ভেন্সি ফাইল করিয়ে না ছাড়ে!"

আহার-সামগ্রী সামান্য একটু নেড়ে-চেড়ে মুখে দিয়ে নরেশ তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল, সরমাও আর কোনো আপত্তি বা উপরোধ অনুরোধ করলে না।

প্রত্যূষে ঘুম ভাঙ্গতেই সরমা ব্যস্ত হয়ে সুকুমারীর ঘরে উপস্থিত হয়ে দেখ্‌লে নরেশ ইজি-চেয়ারে অবসন্ন ভাবে জেগে শুয়ে রয়েছে; প্রাতঃকৃত্য সেরে এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আস্‌বার জন্যে ডাক্তার বাড়ি গেছে, একজন নর্স সুকুমারীর পাশে শয্যার উপর ব'সে আছে, অপর নর্স রোগীর সমস্ত রাত্রের সাধারণ বিবরণ লিখ্‌তে ব্যস্ত। ঘণ্টাখানেক পরে দুজন নূতন নর্স এলে, এরা দুজনে সমস্ত দিন বিশ্রামের জন্য মুক্তি পাবে।

"আপনি কতক্ষণ এসে ন জামাইবাবু?"

"আধ ঘণ্টাটাক্ হ'বে।"

"দিদি কেমন ছিলেন রাত্রে?"

"সমস্ত রাত্রি ঘুম হয় নি—ভোরবেলা ঘণ্টাখানেক হ'ল ঘুমুচ্ছে। রাত্রে অস্থিরতা, নিঃশ্বাসের কষ্ট—এ সব খুব হয়েছিল।"

"টেম্পারেচর?"

"বেড়েছে। এক শ তিন পয়েণ্ট সাত।"

রোগীর দিক থেকে মৃদু কুন্থন-ধ্বনি শোনা গেল। নর্স ইঙ্গিতে কথা কইতে নিষেধ করলে; সুকুমারীর নিদ্রা ভঙ্গ হয়েচে।

নরেশ ও সরমা ব্যগ্র হয়ে সুকুমারীর সম্মুখে উপস্থিত হ'ল। এক রাত্রির মধ্যে সুকুমারীর আকৃতির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য ক'রে নৈরাশ্যে ও আতঙ্কে উভয়ের মন অবসন্ন হয়ে গেল;—রাত্রি অবসানের সঙ্গে দিনের আলোয় মনের মধ্যে যে-টুকু আশা ও আশ্বাসের সঞ্চার হয়েছিল তা লুপ্ত হ'ল একেবারে সমূলে। সমস্ত রাত্রি কষ্টে নিঃশ্বাস টেনে টেনে মুখ হয়ে গেছে বিশীর্ণ, ওষ্ঠাধর নীলাভ, বর্ণ মলিন এবং দৃষ্টি পরিশ্রান্ত! সমস্ত দেহাবয়বের মধ্যে এমন একটা অবসন্নতা খিন্নতা যে দেখ্‌লেই মনে হয় জীবন-বৃন্ত নিশ্চয়ই একটু আল্‌গা হয়েচে। দেহ লাবণ্যের উপর এমন একটা অশুভ ছায়াপাত, যা অসংশয়িত ভাবে জীবন-সায়াহ্নের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

মনের আর্ত্ত অবস্থা অতি কষ্টে প্রচ্ছন্ন রেখে নত হয়ে সুকুমারীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে নরেশ জিজ্ঞাসা করলে, "কেমন আছ সুকু?"

ক্ষণকাল বিমূঢ় ভাবে নরেশের মুখের দিকে চেয়ে থেকে ক্ষীণকণ্ঠে সুকুমারী বল্‌লে, "কি বল্‌ছ, স্পষ্ট ক'রে বল।"

উচ্চ স্বরে নরেশ বল্‌লে, "আজ কেমন আছ, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

পুনরায় বিহ্বলভাবে একটু চুপ ক'রে থেকে সুকুমারী বল্‌লে, "কেমন আছি?—ঠিক বুঝতে পারছিনে; বোধ হয় একটু ভাল।" তারপর সরমার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় ক্ষণকাল নির্নিমেষে তাকিয়ে থেকে নিজের দুর্ব্বল দক্ষিণ হাতটি তার দিকে ধীরে ধীরে প্রসারিত ক'রে দিলে।

সরমা শয্যার উপর উপবেশন ক'রে সুকুমারীর ক্ষীণ হাতখানি নিজের দুই হাতের মধ্যে গ্রহণ ক'রে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে অতি কষ্টে উদ্গত অশ্রু রোধ ক'রে রইল।

"সরো—"

মুখ ফিরিয়ে নত হ'য়ে সরমা ব্যগ্র কণ্ঠে বল্‌লে, "কি দিদি ?"

"আমাকে ক্ষমা করিস ভাই,—"

সুকুমারীর কথা শুনে সরমা নিজেকে আর সংযত রাখ্‌তে না পেরে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কাঁদতে লাগ্‌ল।

সিনিয়র নর্স দ্রুতপদে ছুটে এসে বল্‌লে, "এ আপনারা কি করছেন ? রোগীকে এমন ক'রে উত্তেজিত করবেন না। এখন একটু বাইরে যান, পরে আস্‌বেন।"

সুকুমারীর নিষ্প্রভ চক্ষুদুটির ভিতর ভ্রুকুটি দেখা দিলে। উত্তেজিত হ'য়ে নর্সের দিকে দৃষ্টিপাত করে সে বল্‌লে, "যান্‌, আপনারা দুজনে একটু বাইরে যান, আমার কিছু কথা বলবার আছে।"

নরেশ সযত্নে সুকুমারীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বল্‌লে, "এঁর ওপর রাগ কোরো না সুকু। তোমার ভালর জন্যেই ইনি ব্যস্ত হয়েচেন।" তারপর নর্সের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "আপনারা অনুগ্রহ ক'রে মিনিট পাঁচেকের জন্যে একবার পাশের ঘরে গিয়ে বসুন। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, কোনো রকমে আমরা এঁকে উত্তেজিত করব না,—বরং যে-টুকু উত্তেজনা হয়েচে তা যাতে যায় তারই চেষ্টা করব।"

নর্সরা কক্ষ ত্যাগ করলে নরেশ বাম বাহুর দ্বারা সুকুমারীকে অর্দ্ধবেষ্টিত ক'রে ধ'রে হাসিমুখে বল্‌লে, "একেই ত' তোমার অসুখ আর কষ্ট দেখে সরমা কাঁদ-কাঁদ হয়ে আছে, তার ওপর যা-তা কথা ব'লে তাকে এমন ক'রে কাঁদিয়ে দেওয়া কি ভাল হয় সুকু ? নিজেদের জাতের কথা জান ত ?—কাঁদবার জন্যে তোমরা ত সর্ব্বদাই প্রস্তুত—একবার যা হয় একটা ছুতো পেলেই হয়।"

কথোপকথনকে সহজ ধারায় চালনা করবার অভিপ্রায়ে নরেশের কথা কইবার এই যত্ন-কৃত সকৌতুক ভঙ্গী শুধু ব্যর্থই হ'ল না, গভীর ভাবে সুকুমারীর চিত্তকে আলোড়িত ক'রে তুললে। কষ্টে একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে নরেশের প্রতি অলস অবসন্ন দৃষ্টি জোর ক'রে স্থাপিত ক'রে সুকুমারী বল্‌লে, "বুঝতে পারছ না ?"

একটা প্রচণ্ড অমঙ্গলের আশঙ্কায় নরেশের মন কাঠ হয়ে উঠ্‌ল ; সভয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, "কি ?"

"আমি বাঁচ্‌ব না ?"

ঠিক যে অশুভ কথাটা শোনবার আশঙ্কায় নরেশ ও সরমার মন আতঙ্কিত হ'য়েছিল, সুকুমারীর মুখ থেকে সেই কথাটা নির্গত হওয়ায় উভয়ে স্তম্ভিত হ'য়ে ব'সে রইল, কা'রো মুখ দিয়ে প্রতিবাদের একটা কথা পর্য্যন্ত বার হ'ল না।

একটু অপেক্ষা ক'রে সুকুমারী বল্‌লে, "ভাল করতে গিয়ে সরোর আমি যথেষ্ট অনিষ্ট করেছি,—কিন্তু তুমি তাকে কখনো ত্যাগ কোরো না। সে ভারি অভিমানী, তার অভিমানের মর্য্যাদা রেখো। তার সমস্ত ভাল-মন্দর ভার আমি তোমার হাতে তুলে দিলাম।"

এবার শুধু সরমারই নয়, নরেশেরও সংযমের বাঁধ ভেঙে চোখ দিয়ে টপ্‌ টপ্‌ ক'রে অশ্রু ঝ'রে পড়তে লাগল।

উন্মুক্ত জানালা দিয়ে শরৎকালের উদাস প্রভাত বীতরাগ সন্ন্যাসীর মত অনুৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল এই বিচ্ছেদ-আশঙ্কা-বিধুর তিনটি প্রাণীর দিকে।

বেলা নটার সময় ডাক্তারেরা সমবেত হ'য়ে রোগী পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌লেন, অবস্থা রাত্রির চেয়ে অনেক মন্দ ;—শ্বাস দ্রুততর এবং কষ্টদায়ক, টেম্পারেচর অনেক বেশি, ফুসফুস অধিকতর আক্রান্ত, এবং হৃদয় অতিশয় দুর্ব্বল। তখন ষোড়শোপচারে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ হ'য়ে গেল,—তার কোনো অস্ত্র, কোনো উপায় উপেক্ষিত হ'ল না ;—অক্সিজেন, ইন্‌জেকশন, য়্যান্টিফ্লজেষ্টিন্‌, তাপ, সেক, ব্র্যাণ্ডি, ঔষধ, পথ্য—সমস্ত মিলিত হয়ে রোগের বিরুদ্ধে একটা তুমুল সংগ্রাম বাধিয়ে তুল্‌লে। কিন্তু কোনো ফল হ'ল না ; সমস্ত বাধাকে অবহেলার সহিত উপেক্ষা ক'রে রোগ দৃঢ়-পদক্ষেপে অনিবার গতিতে বৃদ্ধির দিকে এগিয়ে চল্‌ল। অপরাহ্ণের দিকে সুকুমারীর কথা বন্ধ হয়ে গেল এবং সন্ধ্যার পর অপচীয়মান চৈতন্য একেবারে বিলুপ্ত হ'ল।

সংবাদ পেয়ে স্মৃতিরত্ন-মশায় এসে ফুল-নৈবেদ্য-তুলসী-বিল্বপত্র এবং ধাতুখণ্ডের সাহায্যে কুপিত গ্রহের বৈগুণ্যশান্তির জন্য গ্রহযাগ আরম্ভ করলেন ;—কিন্তু আবেদন-নিবেদন স্তুতি-মিনতি স্তব-স্তোত্র কোনো উপকারে এল না,—হোমানলের সঙ্গে সঙ্গে রুষ্ট গ্রহের রোষানল বেড়ে উঠ্‌ল ; ধোঁয়ায় স্মৃতিরত্ন মশায়ের চক্ষু যত না লাল হয়, ক্রোধে গ্রহদেবের চক্ষু ততোধিক আরক্ত হ'য়ে ওঠে।

পরদিন প্রাতে যখন অ্যালোপ্যাথরা পরাভব স্বীকার করলেন, তখন ক্ষুদ্র শিশির মধ্যে ক্ষুদ্র বটিকা নিয়ে এলেন হোমিওপ্যাথ; বন্যার মুখে এক মুঠো বালির মত তা' অবলীলার সহিত ভেসে গেল। তারপর খল আর সূচিকা-ভরণ নিয়ে উপস্থিত হলেন কবিরাজ। অবশেষে বেলা বারোটার সময় এলেন যমরাজ—যিনি এরূপ ক্ষেত্রে সর্ব্বশেষেই আসেন এবং অপরাজেয় দক্ষতার সঙ্গে রোগীকে রোগমুক্ত করেন।

সুকুমারীর মৃত্যু হ'ল। অক্সিজেনের সীলিণ্ডার, হোমিওপ্যাথীর শিশি, আর কবিরাজের খল মগ্ন অপ্রতিভ হ'য়ে পরস্পরের প্রতি চেয়ে রইল।

যে কথা ভেবে সকলে অতিশয় শঙ্কিত হয়েছিল, তার কারণ একেবারেই ঘট্‌ল না—এমন শুব্ধ স্থির অচল হয়ে নরেশ সুকুমারীর মৃতদেহের পাশে ব'সে রইল যে, তাকে ধরাধরির প্রয়োজন ত' দূরে থাক্‌ একটা সান্ত্বনার বাক্য পর্য্যন্ত বল্‌তে কারো সাহস হ'ল না।

অদূরে ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হ'য়ে সরমা ক্রন্দন করছিল; নরেশের কথা মনে পড়তে ফিরে চেয়ে শোকের নীরব গভীর মূর্ত্তি দেখে আতঙ্কে তার আর্ত্তনাদী শোক মূক হ'য়ে গেল!

* * * *

দশদিন পরে সুকুমারীর শ্রাদ্ধ সমাপন ক'রে একখানা সেকেণ্ডক্লাস কম্পার্টমেণ্ট রিজার্ভ ক'রে সরমা ও ঘিণ্টুকে নিয়ে নরেশ কলিকাতা রওয়ানা হ'ল।

গাড়িতে উঠে নরেশ বল্‌লে, "সরমা, তুমি ত আমার চিরদিনই আপনার;—কিন্তু তোমাকে কত বেশি আপনার সুকু ক'রে দিয়ে গেছে তা আর কি বলব! তোমাকে আমি আমার নিকটতম আত্মীয় ব'লে গ্রহণ করেছি—আমার বাড়ি, আমার টাকা-কড়ি, ধন দৌলতে আমার যা অধিকার, তোমার ঠিক সেই অধিকার। সে ত' তোমার চিরদিনের জন্যেই রইল—কিন্তু উপস্থিত তোমাকে আমি খড়িয়ায় রমাপদর কাছে রেখে যাব। তোমার যা একান্ত শুভ, চিরদিনের জন্যে তোমার পক্ষে যা একান্ত কল্যাণকর, তার দিকে দৃষ্টি রেখে—আমি যে বিবেচনা করেছি, লক্ষ্মী ভাই, তা'তে তুমি স্বীকৃত হও। তোমার দিদি বলেছিলেন, তুমি অভিমানী, তোমার অভিমানের মর্য্যাদা আমি যেন রাখি। পরে যদি আবশ্যক হয় তোমার অভিমানের মর্য্যাদা রাখ্‌তে এক মুহূর্ত্ত আমি দ্বিধা করব না; কিন্তু তার আগে তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি হও। পরে যেন কেউ আমাদের এ দোষ দিতে না পারে যে, যা করা উচিত ছিল তা আমরা করি নি। কেমন, আমার কথায় রাজি ত?"

ঠিক এই সমস্যাটাই নানাদিক দিয়ে গত দশদিন ধ'রে সরলাকে বিহ্বল ক'রে তুলেছিল; অকস্মাৎ প্রয়োজনকালে তার একটা সমাধান লাভ ক'রে সে আর নিজের যুক্তি প্রবৃত্তি দিয়ে তা পরীক্ষা ক'রে না দেখে নরেশের কর্ত্তব্য-জ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস করলে; বল্‌লে, "আপনি যখন বলছেন, তাই হ'ক।"

প্রসন্ন হয়ে নরেশ বল্‌লে, "বেশ কথা।" (ক্রমশঃ)

বিশ্বনাথ

("ঐসা লো নাই তৈসা লো"—কবীর)

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

এখানে?—সেখানে?—তিনি কোন্‌খানে?
কেমন দেবতা তিনি?
এমন?—তেমন?—সেরূপ কেমন?
স্বরূপ কেমনে চিনি?
ভিতরে কি তিনি?—বাইরে যে হায়,
বৃহৎ বিশ্ব লাজে মরে' যায়;
'বাহিরের তিনি' বলিলে যে কাঁদে
হৃদয়-অধিবাসিনী!

ভিতরে-বাহিরে চেতনাচেতনে
পাদপীঠ-বেদী তাঁর,
গোচরাগোচর যুগপৎ তিনি—
বাক্যে বুঝানো ভার।
জল-ভরা ঘট যেন জল-তলে—
ভিতর বাহির ভরা তার জলে;
সব ঠাঁই তিনি সকলের মাঝে
সবার দেবতা যিনি!

শেষ প্রশ্ন

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১১)

যাতায়াতের পথের পাশেই একটা ঢাকা বারান্দা, রোগীর গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া অজিত ও কমল সেইখানে থামিল। একটা খর্ব্বাকৃতি ঘষা-কাঁচের লণ্ঠন ঝুলিতেছে, তাহার অস্পষ্ট আলোকেও স্পষ্ট দেখা গেল অজিতের মুখ ফ্যাকাশে। আচম্বিতে ধাক্কা লাগিয়া সমস্ত রক্ত যেন হঠাৎ সরিয়া গেছে। সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি কেহ নাই, তথাপি সে অনাত্মীয়া ভদ্র-মহিলার উপযুক্ত সম্ভ্রমের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি এখন বাসায় ফিরে যেতে চান? চাইলে আমি তার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি।

কমল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। অজিত বলিল, এ বাড়ীতে আর তো আপনার এক মুহূর্ত্ত থাকা চলে না।

আপনার থাকা চলে?

না, আমারও না। কাল সকালেই আমি অন্যত্র চলে যাবো।

কমল কহিল, সেই ভালো, আমিও তখনই যাবো। আপাততঃ, এই চেয়ারটায় বসে বাকি রাতটুকু কাটাই, আপনি বিশ্রাম করুন গে।

সেই ক্ষুদ্রায়তন চৌকিটার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, অজিত ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, কিন্তু—

কমল বলিল, কিন্তুতে কাজ নেই অজিতবাবু, ওর অনেক ঝঞ্ঝাট। এখন বাসায় যাওয়াও সম্ভব নয়, আপনার ঘরে গিয়ে ওঠাও সম্ভব নয়। আপনি যান, দেরি করবেন না।

তাহার কড়া কথায় অজিত আশ্চর্য্য হইয়া গেল। শুধু যে কটু তাই নয়, ইহার ইঙ্গিত যেমন অভদ্র তেমনি অপমানকর। বিশেষ করিয়া কণ্ঠস্বরের শেষের দিকটায় অকারণ রুক্ষতায় যেন কলহের সুর ধরিল। অজিত দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া প্রস্থান করিল। সকালে বেহারা আসিয়া অজিতকে আশুবাবুর শয়নকক্ষে ডাকিয়া লইয়া গেল। তিনি শয্যা ছাড়িয়া তখনও উঠেন নাই, অদূরে চৌকিতে বসিয়া কমল, ইতিপূর্ব্বেই তাহাকে ডাকাইয়া আনা হইয়াছে।

আশুবাবু বলিলেন, শরীরটা কাল থেকেই ভালো ছিলনা, আজ মনে হচ্ছে যেন,—আচ্ছা, বোস অজিত।

সে উপবেশন করিলে কহিলেন, শুনলাম আজ সকালেই তুমি চলে যাবে, তোমাকে থাকতে বলতেও পারিনে, বেশ, গুড্‌বাই। আর কখনো যদি দেখা না হয়, নিশ্চয় জেনো, তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে আমি আশীর্ব্বাদ করেচি,—যেন, আমাদের ক্ষমা ক'রে তুমি জীবনে সুখী হ'তে পারো।

অজিত তাঁহার মুখের প্রতি তখনও চাহিয়া দেখে নাই, এখন জবাব দিতে গিয়া বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিল। নির্ব্বাক বলিলে ঠিক বলা হয় না, সে যেন অকস্মাৎ কথা ভুলিয়া গেল। একটা রাত্রির কয়েক ঘণ্টা মাত্র সময়ে কাহারও এতবড় পরিবর্ত্তন সে কল্পনা করিতেও পারিল না।

আশুবাবু নিজেও মিনিট দুই তিন মৌন থাকিয়া এবার কমলকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, তোমাকে ডেকে আনিয়েছি, কিন্তু তোমার সঙ্গে চোখো-চোখি করতেও আমার মাথা হেঁট হয়। সারা রাত্রি মনের মধ্যে যে কি করেচে, কত-কি যে ভেবেচি, সে আমি কা'কে জানাবো?

একটু থামিয়া কহিলেন, অক্ষয় একদিন বলেছিলেন, শিবনাথ নাকি তোমার ওখানে প্রায়ই থাকেন না। কথাটায় কান দিইনি, ভেবেছিলাম, এ তার অত্যুক্তি, এ তার বিদ্বেষের আতিশয্য। তুমি টাকার অভাবে কষ্টে পড়েছিলে, তখন তার হেতু বুঝিনি, কিন্তু আজ সমস্তই পরিষ্কার হয়ে গেছে,—কোথাও কোন সন্দেহ নেই।

উভয়েই নীরব হইয়া রহিল; তিনি বলিতে লাগিলেন, তোমার প্রতি অনেক ব্যবহারই আমি ভাল করতে পারিনি, কিন্তু সেই প্রথম পরিচয়ের দিনটিতেই তোমাকে ভালবেসে-

ছিলাম, কমল। আজ তাই আমার কেবলি মনে হচ্চে, আগ্রায় যদি আমরা না আস্‌তাম। বলিতে বলিতে চোখের কোণে তাঁহার এক ফোঁটা জল আসিয়া পড়িল, হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া শুধু কহিলেন, জগদীশ্বর!

কমল উঠিয়া আসিয়া তাঁহার শিয়রে বসিল, কপালে হাত দিয়া বলিল, আপনার যে জ্বর হয়েছে আশুবাবু।

আশুবাবু তাহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিলেন, তা' হোক্‌। মা কমল, আমি জানি তুমি অতিশয় বুদ্ধিমতী,আমার কিছু একটা তুমি উপায় ক'রে দাও। আমার বাড়ীতে ঐ লোকটার অস্তিত্ব যেন আমার সর্ব্বাঙ্গে আগুন জ্বেলে দিয়েচে।

কমল চাহিয়া দেখিল, অজিত অধোমুখে বসিয়া আছে। তাহার কাছে কোন ইঙ্গিত না পাইয়া সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, আমাকে আপনি কি করতে বলেন, বলুন। কিন্তু জবাব না পাইয়া সে নিজেও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল, পরে কহিল, শিবনাথবাবুকে আপনি রাখতে চাননা, কিন্তু তিনি পীড়িত। এ অবস্থায় হয় তাঁকে হাঁসপাতালে পাঠানো, নয় তাঁর নিজের বাসাটা যদি জানেন পাঠাতে পারেন। আর যদি মনে করেন আমার ওখানে পাঠিয়ে দিলে ভালো হয়, তাও দিতে পারেন। আমার আপত্তি নেই, কিন্তু জানেন তো, চিকিৎসা করাবার শক্তি নেই আমার; আমি প্রাণপনে শুধু সেবা করতেই পারি, তার বেশি পারি নে।

আশুবাবু কৃতজ্ঞতা ও ভাবের উচ্ছ্বাসে অভিভূত হইয়া পড়িলেন, কহিলেন, কমল, কেন জানিনে, কিন্তু এম্‌নি উত্তরই ঠিক তোমার কাছে আশা করেছিলাম। পাষণ্ডের জবাব দিতে গিয়ে যে তুমি নিজে পাষাণ হতে পারবে না এ আমি জানতাম। তোমার জিনিস তুমি ঘরে নিয়ে যাও, চিকিৎসার খরচের জন্যে ভয় কোরোনা মা, সে ভার আমি নিলাম।

কমল কহিল, কিন্তু এই ব্যাপারে একটা কথা সকলের আগে পরিষ্কার হওয়া দরকার।

আশুবাবু তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিলেন, তোমার বল্‌বার দরকার নেই কমল, সে আমি জানি। একদিন সমস্ত আবর্জ্জনা দূর হয়ে যাবে। তোমার কোন চিন্তা নেই, মা, আমি বেঁচে থাক্‌তে এতবড় অন্যায়-অত্যাচার তোমার ওপরে ঘট্‌তে দেবনা।

কমল তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া স্থির হইয়া রহিল, কথা কহিলনা।

কি ভাবচো মা?

ভাবছিলাম আপনাকে বলার প্রয়োজন আছে কি না। কিন্তু মনে হচ্চে প্রয়োজন আছে, নইলে, পরিষ্কার কিছুই হবেনা, বরঞ্চ আবর্জ্জনা বেড়ে যাবে। আপনার টাকা আছে, হৃদয় আছে, পরের জন্যে খরচ করা আপনার কঠিন নয়, কিন্তু আমাকে দয়া করবেন এ ভুল যদি আপনার থাকে সেটা দূর হওয়া চাই। কোন ছলেই আপনার ভিক্ষে আমি গ্রহণ কোরবনা।

আশুবাবুর সেই সেলাইয়ের কলের ব্যাপারটা মনে পড়িল, ব্যথিত হইয়া কহিলেন, ভুল যদি একটা করেই থাকি মা, তার কি ক্ষমা নেই?

কমল কহিল, ভুল হয়ত তখন তত করেননি যেমন এখন করতে যাচ্চেন। ভাবচেন শিবনাথবাবুকে বাঁচানোটা প্রকারান্তরে আমাকেই বাঁচানো,—আমাকেই অনুগ্রহ করা। কিন্তু তা' নয়। আমার তিনি কেউ নয়, তাঁর বাঁচা-মরায় আমার ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই, এই সত্যটাই আপনার নিঃসংশয়ে জানা আবশ্যক। এর পরে আপনি যেমন ইচ্ছে ব্যবস্থা করুন আমার আপত্তি নেই।

আশুবাবু মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, এম্‌নি রাগই হয় বটে মা, এ তোমার অস্বাভাবিকও নয়, অন্যায়ও নয়। বেশ, আমি শিবনাথকেই বাঁচাতে চাচ্চি, তোমাকে অনুগ্রহ করচিনে। এ হলে হবে তো?

কমলের মুখে বিরক্তি প্রকাশ পাইল। কহিল, না, হবেনা। আপনাকে যখন আমি বোঝাতে পারবনা তখন আমার উপায় নেই। ওঁকে হাঁসপাতালে পাঠাতে না চান্‌, হরেন্দ্রবাবুর আশ্রমে পাঠিয়ে দিন। তাঁরা অনেকের সেবা করেন, এঁরও করবেন। আপনার যা' খরচ করবার তা' সেখানেই করবেন। আমি নিজেও বড় ক্লান্ত, এখন উঠি। এই বলিয়া সে যথার্থই উঠিবার উপক্রম করিল।

তাহার কথায় ও আচরণে আশুবাবু হঠাৎ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু আপনাকে সম্বরণ করিয়া বলিলেন, এ তোমার বাড়াবাড়ি হচ্চে কমল। তোমাদের উভয়ের

কল্যাণের জন্যে যা' করতে যাচ্চি তাকে তুমি অনাবশ্যক বিকৃত করে দেখ্‌চ। একদিক দিয়ে যে আমার লজ্জার অবধি নেই এবং এ কদাচার অঙ্কুরে বিনাশ না করলে যে আমার অন্যায় ও গ্লানির সীমা থাকবেনা সে আমি জানি, কিন্তু আমার কন্যা সংশ্লিষ্ট বলেই যে আমি কোনমতে একটা পথ খুঁজে বেড়াচ্চি তাও সত্য নয়। শিবনাথকে আমি নানামতেই বাঁচাতে পারি, কিন্তু কেবল সেটুকুই আমি চাইনি। যাতে দুঃখের দিনে তোমার অন্তরের সেবা দিয়ে তাঁকে তেম্‌নি কোরেই আবার ফিরে পাও, সেই কামনা করেই আমি এ প্রস্তাব করেচি, নিছক স্বার্থপরতা বশেই করিনি।

কথাগুলি সত্য, সকরুণ এবং আন্তরিকতায় পূর্ণ। কিন্তু কমলের মনের উপর দাগ পাড়িতে পারিলনা। সে প্রত্যুত্তরে কহিল, ঠিক এই কথাই আপনাকে আমি বোঝাতে চাচ্ছিলাম আশুবাবু। সেবা করতে আমি অসম্মত নই, চা বাগানে থাকতে অনেকের অনেক সেবা করেচি, এ আমার অভ্যাস আছে। কিন্তু ফিরে পেতে ওঁকে আমি চাইনে। সেবা করেও না, সেবা না করেও না। এ আমার অভিমানের জ্বালা নয়, মিথ্যে দর্প করাও নয়। ও আমি করিইনে। সম্বন্ধ আমাদের ছিঁড়ে গেছে, তাকে জোড়া দিতে আমি পারবনা।

তাহার বলার মধ্যে উষ্মাও নাই, উচ্ছ্বাসও নাই, নিতান্তই সাদাসিধা কথা। ইহাই আশুবাবুকে এখন স্তব্ধ করিয়া দিল। মুহূর্ত্ত পরে কহিলেন, এ কি কথা কমল, স্বামী ত্যাগ করবে কি? এ শিক্ষা তোমাকে কে দিলে?

কমল নীরব হইয়া রহিল। আশুবাবু বলিতে লাগিলেন, ছেলেবেলায় এ শিক্ষা তোমাকে যেই কেননা দিয়ে থাক্‌, সে ভুল শিক্ষা দিয়েছে। এ অন্যায়, এ অসঙ্গত, এ গভীর অপরাধের কথা। যে গৃহেই তুমি জন্মে থাকো তুমি বাঙ্‌লা দেশেরই মেয়ে, এ পথ তোমার আমার নয়, এ তোমাকেই ভুলতেই হবে। জানো কমল, এক দেশের ধর্ম্ম আর এক দেশের অধর্ম্ম। আর স্বধর্ম্মে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ। বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চক্ষু দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং কথা শেষ করিয়া যেন তিনি হাঁপাইতে লাগিলেন। কিন্তু যাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইল, সে লেশমাত্র বিচলিত হইলনা। তেম্‌নি শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, এক দেশের ধর্ম্ম আর এক দেশের অধর্ম্ম হবে কেন? আপনি কারণ তো কিছু দেখালেননা?

আশুবাবু কহিলেন, নানা কারণ আছে কমল, নানা কারণ আছে। এই মোহই একদিন আমাদের রসাতলের পানে টেনে নিয়ে চলেছিল। কিন্তু এ ভ্রান্তি সহসা জন কয়েক মনীষীর চক্ষে ধরা পড়ে গেল। দেশের লোককে ডেকে তাঁরা বারবার শুধু এই কথাই বল্‌তে লাগলেন, তোমরা উন্মাদের মত চলেছো কোথায়? তোমাদের কোন দৈন্য, কোন অভাব নেই, কারও কাছে তোমাদের হাত পাত্‌তে হবেনা, কেবল ঘরের পানে একবার ফিরে চাও। পূর্ব্ব-পিতামহরা সবই রেখে গেছেন, শুধু একবার হাত বাড়িয়ে তুলে নাও। বিলেতের সমস্তই তো স্বচক্ষে দেখে এসেচি, এখন ভাবি, সময়ে সে সতর্ক-বাণী যদি না তাঁরা উচ্চারণ করে যেতেন, আজ দেশের কি গতি হোতো! ছেলেবেলার কথা সব মনে আছে তো উঃ—শিক্ষিত লোকদের সে কি দশা! এই বলিয়া তিনি পূর্ব্ব-পিতামহদের প্রতি ভক্তিতে শ্রদ্ধায় বিগলিত চিত্তে দুইহাত কপালে ঠেকাইয়া উদ্দেশে নমস্কার করিলেন।

কমল মুখ তুলিয়া দেখিল অজিত মুগ্ধচক্ষে তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছে। কল্পনার আবেশে যেন তাহার সংজ্ঞা নাই,—এম্‌নি অবস্থা।

কমলের ঠোঁটের কোণে অল্প একটুখানি হাসির আভাস দেখা দিল, কিন্তু সে চুপ করিয়াই রহিল।

আশুবাবুর ভাবাবেগ তখনও প্রশমিত হয় নাই, কহিলেন, কমল, আর কিছুই যদি তাঁরা না করে যেতেন, শুধু কেবল এই জন্যেই দেশের লোকের কাছে তাঁরা চিরদিন প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাক্‌তেন।

শুধু কেবল এই জন্যেই তাঁরা প্রাতঃস্মরণীয়?

হাঁ, শুধু কেবল এই জন্যেই। বাইরে থেকে ঘরের পানে তাঁরা চোখ ফেরাতে বলেছিলেন।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, বাইরে যদি আলো জ্বলে, যদি পূর্ব্বদিগন্তে সূর্য্যোদয় হয় তবুও পিছন ফিরে পশ্চিমের স্বদেশের পানেই চেয়ে থাক্‌তে হবে? সেই হবে দেশপ্রীতি?

কিন্তু এ প্রশ্ন বোধ করি আশুবাবুর কানে গেলনা, তিনি নিজের ঝোঁকে বলিতে লাগিলেন, আজ দেশের ধর্ম্ম, দেশের পুরাণ-ইতিহাস, দেশের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি যা'

বিদেশের চাপে লোপ পেতে বসেছিল, তার প্রতি যে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা ফিরে এসেছে এ তো শুধু তাঁদেরই ভবিষ্যৎ দৃষ্টির ফল। জাতি হিসেবে আমরা যে ধ্বংসের রাস্তায় চলেছিলাম কমল, এ বাঁচা কি সোজা বাঁচা? আবার সমস্ত ফিরিয়ে আনতে না পারলে আমরা যে কোনমতেই রক্ষা পাবোনা, এ বোধশক্তি আমাদের দিলে কে বলো ত?

অজিত উত্তেজনায় অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, এ সব চিন্তাও যে আপনার মনে স্থান পেতে পারে এ কখনো আমি কল্পনাও করিনি। আমার ভারি দুঃখ যে এতকাল আপনাকে চিন্‌তে পারিনি, আপনার পায়ের নীচে বসে উপদেশ গ্রহণ করিনি। সে আরও কত কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বাধা পড়িল। বেহারা ঘরে ঢুকিয়া জানাইল যে হরেন্দ্রবাবু প্রভৃতি দেখা করিতে আসিয়াছেন, এবং পরক্ষণেই তিনি সতীশ ও রাজেন্দ্রকে লইয়া প্রবেশ করিলেন। কহিলেন, খবর নিয়ে জানলাম শিবনাথবাবু ঘুমোচ্চেন। আসবার সময় ডাক্তারের বাড়ীটা অম্‌নি ঘুরে এলাম; তাঁর বিশ্বাস অসুখ সিরিয়স্ নয়, শীঘ্রই সেরে উঠবেন। এই বলিয়া তিনি কমলকে একটা নমস্কার করিয়া সঙ্গীদের লইয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

আশুবাবু ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি ছিল অজিতের প্রতি। এবং তাহারই উদ্দেশে বলিলেন, আমার সমস্ত যৌবনকালটা যে বিদেশেই কেটেছে এ তোমরা ভোল কেন? এমন অনেক বস্তু আছে যা কাছে থেকে দেখা যায়না, যায় শুধু দূরে গিয়ে দাঁড়ালে। আমি যে স্পষ্ট দেখ্‌তে পেয়েচি শিক্ষিত-মনের পরিবর্ত্তন। এই যে হরেন্দ্রর আশ্রম, এই যে নগরে নগরে এর ডাল-পালা ছড়াবার আয়োজন, এ কি শুধু এইজন্যেই নয়? বিশ্বাস না হয় ওঁকেই জিজ্ঞাসা কোরে দেখো। সেই ব্রহ্মচর্য্য, সেই সংযম সাধনা, সেই পুরাণো রীতি-নীতির প্রবর্ত্তন—এ সবই কি আমাদের সেই অতীত দিনটির পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্যম নয়? তাই যদি ভুলি, তারই প্রতি যদি আস্থা হারাই, আশা করবার আর আমাদের বাকি থাকে কি? তপোবনের যে আদর্শ কেবল আমাদেরই ছিল, পৃথিবী খুঁজলেও কি আর কোথাও এর জোড়া মিলবে অজিত? আমাদের সমাজকে যাঁরা একদিন গড়েছিলেন, আমাদের সেই প্রাচীন শাস্ত্রকর্ত্তারা ব্যবসায়ী ছিলেননা, ছিলেন সন্ন্যাসী; তাঁদের দান নিঃসংশয়ে, নতশিরে নিতে পারাই হ'ল আমাদের চরম সার্থকতা; এই আমাদের কল্যাণের পথ কমল, এ ছাড়া আর পথ নেই।

অজিত স্তব্ধ হইয়া রহিল, সতীশ ও হরেন্দ্রের বিস্ময়ের পরিসীমা নাই,—এই সাহেবী চাঁল-চলনের মানুষটি আজ বলে কি! এবং রাজেন্দ্র ভাবিয়া পাইলনা, অকস্মাৎ কিসের জন্য আজ এই প্রসঙ্গের অবতারণা। সকলের মুখের পরেই একটি অকপট শ্রদ্ধার ভাব নিবিড় হইয়া উঠিল।

বক্তার নিজের বিস্ময়ও কম ছিলনা। শুধু বলিবার শক্তির জন্যই নয়, এমন করিয়া কাহাকেও বলিবার সুযোগও তিনি কখনও পান নাই,—তাঁহার মনের মধ্যে অনির্ব্বচনীয় পরিতৃপ্তির হিল্লোল বহিতে লাগিল। ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া স্নেহের কণ্ঠে কহিলেন, বুঝলে মা কমল, কেন তোমাকে এ অনুরোধ করেছিলাম?

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

না? না কেন?

কমল কহিল, বিদেশী শিক্ষার প্রভাব কাটিয়ে আবার সাবেক ব্যবস্থায় ফিরে যাবার চেষ্টা শিক্ষিতদের মধ্যে প্রচলিত হচ্চে, এই খবরটাই আপনি পরমানন্দে শোনাচ্ছিলেন। আপনার বিশ্বাস এতে দেশের কল্যাণ হবে, কিন্তু কারণ কিছুই দেখাননি। অনেক প্রাচীন রীতি-নীতি লোপ পেতে বসেছিল, তাদের পুনরুদ্ধারের যত্ন চলেচে। এ হয় ত সত্যি, কিন্তু তাতে ভালোই যে হবে তার প্রমাণ কি আশুবাবু? কই, সে তো বলেননি?

বলিনি কি রকম?

না, বলেননি। যা বল্‌ছিলেন তা সংস্কার-বিরোধী পুরাতনের অন্ধ স্তাবক মাত্রেই ঠিক এম্‌নি কোরে বলে। লুপ্ত বস্তুর পুনরুদ্ধার মাত্রই যে ভালো তার প্রমাণ নেই। মোহের ঘোরে মন্দ বস্তুরও পুনঃপ্রতিষ্ঠা সংসারে ঘট্‌তে দেখা যায়।

আশুবাবু উত্তর খুঁজিয়া পাইলেননা, কিন্তু অজিত কহিল, মন্দকে উদ্ধার করবার জন্যে কেউ শক্তি ক্ষয় করেনা।

কমল কহিল, করে। মন্দ বলে নয়, পুরাতন মাত্রকেই স্বতঃসিদ্ধ ভালো মনে কো'রে করে। একটা কথা আপনাকে প্রথমেই বল্‌তে চেয়েছিলাম আশুবাবু, কিন্তু আপনি কান দেননি। লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানই হোক্ বা পারলৌকিক ধর্ম্ম-কর্ম্মই হোক্, কেবলমাত্র দেশের বলেই আঁকড়ে থাকার

স্বদেশ-প্রীতির বাহোবা পাওয়া যায়, কিন্তু স্বদেশের কল্যাণের দেবতাকে খুসি করা যায়না। তিনি ক্ষুণ্ণ হন।

আশুবাবু অবাক হইয়া শুধু কহিলেন, তুমি বলো কি কমল? দেশের ধর্ম্ম, দেশের আচার অনুষ্ঠান ত্যাগ করে বাইরে থেকে ভিক্ষে নিতে থাক্‌লে নিজের বল্‌তে আর বাকি থাক্‌বে কি? জগতে আপনার বলে পরিচয় দিতে যাবো কোন্ পরিচয়ে?

কমল কহিল, পরিচয়ের প্রয়োজন হবেনা। আপনার জন বলে বিশ্ব জগৎ তখন বিনা পরিচয়েই চিন্‌তে পারবে।

আশুবাবু ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, তোমাকে তো বুঝ্‌তে পারলামনা কমল।

বোঝবার কথাও নয় আশুবাবু। এম্‌নিই হয়। এই চলমান সংসারে গতিশীল মানব-চিত্তের পদে পদে যে সত্য নিত্য নূতন রূপে দেখা দেয়, সবাই তাকে চিন্‌তে পারেনা। ভাবে এ কোন্ অদ্ভুত বস্তু কোথা থেকে এলো। সেদিন তাজমহলের ছায়ার নীচে শিবানীকে মনে পড়ে? আজ কমলের মাঝখানে তাকে আর চিন্‌তে পারাও যাবেনা। মনে হবে সে যাকে দেখেছিলাম কোথায় গেল সে। কিন্তু এই মানুষের সত্য পরিচয়,—এম্‌নি ভাবেই লোকের কাছে যেন চিরদিন পরিচিত হতে পারি আশুবাবু।

একটুখানি থামিয়া বলিল, কিন্তু তর্ক-বিতর্কের ঝোড়ো-হাওয়ায় আমাদের খেই হারিয়ে গেল,—আসল ব্যাপার থেকে সবাই সরে গেছি। আমি কিন্তু অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েচি, এখন উঠি।

আশুবাবু নিরুত্তরে বিহ্বলের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। এই মেয়েটিকে কোথাও তিনি অস্পষ্ট বুঝিলেন, কোথাও একেবারেই বুঝিলেন না; শুধু ইহাই মনে হইতে লাগিল এই-মাত্র সে যে ঝোড়ো-হাওয়ার উল্লেখ করিয়াছিল, সেই প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা-মুখে তৃণ-খণ্ডের ন্যায় তাঁহার সর্ব্বপ্রকার আবেদন নিবেদন ভাসিয়া গেল।

কমল উঠিয়া দাঁড়াইল। অজিতকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিয়া কহিল, সঙ্গে কোরে এনেছিলেন, চলুননা পৌঁছে দেবেন।

কিন্তু আজ সে সঙ্কোচে যেন মুখ তুলিতেই পারিলনা। কমল মনে মনে একটু হাসিয়া আগাইয়া আসিয়া সহসা রাজেন্দ্রর কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া বলিল, রাজেন বাবু, তুমি চলোনা ভাই আমাকে রেখে আসবে।

এই আকস্মিক আত্মীয় সম্বোধনে রাজেন্দ্র বিস্মিত হইয়া একবার তাহার প্রতি চাহিল, তাহার পরে সেও হাসিল, কহিল, চলুন।

দ্বারের কাছে আসিয়া কমল হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আশুবাবু, আমার প্রস্তাব কিন্তু প্রত্যাহার করিনি। ঐ সম্বে ইচ্ছা হয় পাঠিয়ে দেবেন আমি যথাসাধ্য ক'রে দেখ্‌বো। বাঁচেন ভালোই, না বাঁচেন আমার কপাল। এই বলিয়া হাসিয়া খেঁলাচ্ছলে ললাটে করাঘাত করিয়া বাহির হইয়া গেল। ঘরের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া সকলে বসিয়া রহিলেন,—অসুস্থ গৃহস্বামীর চোখের সম্মুখে প্রভাতের আলোটা পর্য্যন্ত যেন বিবর্ণ ও বিষাদ হইয়া গেল।

অর্দ্ধেক পথে রাজেন্দ্র বিদায় লইল, বলিয়া গেল ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই সে কাজ সারিয়া ফিরিয়া আসিবে। কমল অন্যমনস্কতা বশতঃই বোধ করি আপত্তি করিলনা, কিম্বা, হয়ত আর কোন কারণ ছিল। দ্রুতপদে বাসায় আসিয়া দেখিল সিঁড়ির দরজায় তখনো তালা বন্ধ, ঘর খোলা হয় নাই। যে নীচ-জাতীয়া দাসীটি তাহার কাজ-কর্ম্ম করিয়া দিত, সে আসে নাই। পথের ওধারে মুদীর দোকানে সন্ধান করিয়া জানিল দাসী পীড়িত, তাহার ছোট নাতিনী সকালে আসিয়া ঘরের চাবি রাখিয়া গেছে। ঘর খুলিয়া কমল গৃহ-কর্ম্মে নিযুক্ত হইল। একরকম কাল হইতেই সে অভুক্ত; স্থির করিয়া আসিয়াছিল তাড়াতাড়ি কোনমতে কিছু রাঁধিয়া খাইয়া লইয়া বিশ্রাম করিবে, বিশ্রামের তাহার একান্তই প্রয়োজন; কিন্তু আজ ঘরের কাজ আর তাহার কিছুতেই সারা হয়না। চারিদিকে এত যে আবর্জ্জনা জমা হইয়াছিল, এতদিন এম্‌নি বিশৃঙ্খলার মাঝে যে তাহার দিন কাটিতেছিল সে লক্ষ্যও করে নাই। আজ যাহাতে চোখ পড়িল সে-ই যেন তাহাকে তিরস্কার করিল। ছাদের পুরাণো চুণ-বালি আসিয়া খাটের খাঁজে খাঁজে জমিয়াছে—মুক্ত করা চাই; চড়াই পাখীর বাসা তৈরির অতিরিক্ত মাল-মস্‌লা বিছানায় পড়িয়াছে, চাদোর বদলানো প্রয়োজন; বালিশের অড় অত্যন্ত মলিন, খুলিয়া ফেলা দরকার; চেয়ার টেবিল স্থানভ্রষ্ট, দরজার পা-পোষটায় কাদা জমাট বাধিয়াছে, আয়নাটার এমনি অবস্থা যে পঙ্কোদ্ধার করিতে একটা বেলা লাগিবে, দোয়াতের কালি শুকাইয়াছে, কলমগুলা খুঁজিয়া পাওয়া দায়, প্যাডের ব্লটিং কাগজগুলার চিহ্নমাত্র নাই,—এমনিধারা যেদিকে

চাহিয়া দেখিল অপরিচ্ছন্নতার আতিশয্যে, তাহার নিজেরই মনে হইল এতকাল এখানে যেন মানুষ বাস করে নাই। নাওয়া-খাওয়া পড়িয়া রহিল, কোথা দিয়া যে বেলা কাটিল ঠাহর রহিলনা। সমস্ত শেষ করিয়া গায়ের ধূলা-মাটি পরিষ্কার করিতে যখন সে নীচে হইতে স্নান করিয়া আসিল তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। এতদিন সে নিশ্চয় জানিত এখানে সে থাকিবে না। থাকা সম্ভবও নয়, হয়ত উচিতও নয়। মাসের পর মাস বাসার ভাড়া যোগাইবেই বা কোথা হইতে? যাইতেই হইবে, শুধু যাওয়ার দিনটারই যেন সে কেমন করিয়া নাগাল পাইতেছিলনা—রাত্রির পর প্রভাত ও প্রভাতের পর রাত্রি আসিয়া কিছুতেই তাহাকে পা বাড়াইবার সময় দিতেছিল না।

গৃহের প্রতি মমতা নাই, অথচ আজ কিসের জন্য যে এতটা খাটিয়া মরিল, অকস্মাৎ কি ইহার প্রয়োজন হইল, এম্‌নি একটা ঘোলাটে জিজ্ঞাসায় মনের মধ্যে তাহার যখনই ঘুলাইয়া উঠিতেছিল, কাজ ছাড়িয়া বারান্দায় আসিয়া সে শূন্য চক্ষে রাস্তায় চাহিয়া কি যেন ভুলিবার চেষ্টা করিয়া আবার গিয়া কাজে লাগিতেছিল। এম্‌নি করিয়াই আজ তাহার কাজ এবং বেলা দুই শেষ হইয়াছে। কিন্তু বেলা তো রোজই শেষ হয়, শুধু এম্‌নি করিয়াই হইতে পায় না। সন্ধ্যার পরে সে আলো জ্বালিয়া রান্না চড়াইয়া দিল, এবং কেবল সময় কাটাইবার জন্যই একখানা বই লইয়া বিছানায় ঠেস দিয়া পাতা উল্টাইতে বসিল। কিন্তু শ্রান্তির আজ আর তাহার অবধি ছিলনা, কখন বইয়ের এবং চোখের পাতা দুই-ই বুজিয়া আসিল সে টের পাইল না। যখন টের পাইল তখন ঘরে দীপের আলো নিবিয়াছে, এবং খোলা জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের অরুণালোকে সমস্ত গৃহ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বেলা হইল, কিন্তু দাসী আসিল না। অতএব খোঁজ করিয়া বাসাটা জানিয়া লইয়া তাহার অসুখের সংবাদ লওয়া প্রয়োজন, এই মনে করিয়া কমল কাপড় ছাড়িয়া প্রস্তুত হইয়া বাহির হইতেছিল, এমনি সময়ে নীচের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাইয়া তাহার বুকের মধ্যে ধড়াস্‌ করিয়া উঠিল।

ডাক আসিল, ঘরে আছেন? আসতে পারি?

আসুন।

যিনি প্রবেশ করিলেন তিনি হরেন্দ্র। চৌকি টানিয়া উপবেশন করিয়া বলিলেন, কোথাও বেরুচ্ছিলেন না কি?

হাঁ। যে বুড়ো স্ত্রীলোকটি আমার কাজ করে সে পীড়িত খবর পেয়েচি। তাকেই দেখ্‌তে যাচ্ছিলাম।

বেশ খবর। ও ইনফ্লুয়েঞ্জা ছাড়া কিছু নয়। আগ্রাতেও এপিডেমিক ফর্মেই বোধ করি সুরু হ'ল। বস্তীগুলোতে মরতেও আরম্ভ করেছে।

মথুরা-বৃন্দাবনের মত সুরু হলে হয় পালাতে হবে, না হয় মরতে হবে। এ বুড়ী থাকে কোথায়?

ঠিক জানিনে। শুনেচি কাছাকাছি কোথায় থাকে, খোঁজ ক'রে নিতে হবে।

হরেন্দ্র কহিলেন, বড্ড ছোঁয়াচে, একটু সাবধান হবেন। এ দিকের খবর পেয়েছেন বোধ হয়?

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

হরেন্দ্র তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, ভয় পাবেন না, ভয় পাবার মত কিছু নয়। কালই আসতাম, কিন্তু সময় ক'রে উঠ্‌তে পারলাম না। আমাদের অক্ষয়বাবু কলেজে আসেন নি, শুনলাম তাঁর শরীর খারাপ, আশুবাবু বিছানা নিয়েছেন সে তো কাল দেখেই এসেছেন,—ওদিকে অবিনাশদার কাল বিকেল থেকে জ্বর, বৌদির মুখটাও দেখলাম শুক্‌নো শুক্‌নো। তিনি নিজে না পড়লে বাঁচি।

কমল চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। এ সকল খবরে সে যেন ভালো করিয়া মন দিতেই পারিলনা।

হরেন্দ্র কহিলেন, এ ছাড়া শিবনাথবাবু। ইনফ্লুয়েঞ্জার ব্যাপার,—বলা কিছু যায়না। অথচ, হাসপাতালে যেতেও চাইলেননা। কাল বিকেলে তাঁর নিজের বাসাতেই তাঁকে রিমুভ করা হ'ল। আজ খবরটা একবার নিতে হবে।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, সেখানে আছে কে?

একটা চাকর আছে। উপরের ঘরগুলোতে জনকয়েক পাঞ্জাবী আছে,—ঠিকেদারী করে। শুন্‌লাম তারা লোক ভালো।

কমল নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে কহিল, রাজেন বাবুকে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দিতে পারেন?

পারি, কিন্তু তাকে পাবো কোথায়? আজ ভোর থাকতেই বেড়িয়ে পড়েছে। ঐ দিকের কোন্‌ একটা মুচীদের

মহল্লায় নাকি জোর ব্যারাম চলেছে, সে গেছে সেবা করতে। আশ্রমে খেতে যদি আসে তো খবর দেবো।

তাঁকে রিমুভ করলে কে? আপনি?

না, রাজেন সঙ্গে ছিল। তার মুখেই জান্‌তে পারলাম পাঞ্জাবীরা যত্ন নিচ্চে। তবে, তারা যাই করুক, ও যখন ঠিকানা পেয়েছে তখন সহজে ক্রটি হতে দেবেনা,—হয়ত নিজেই লেগে যাবে। একটা ভরসা ওকে রোগে ধরেনা। পুলিশে না ধর্‌লে ও একাই একশ'। ভায়া ওদের কাছেই শুধু জব্দ, নইলে ওকে কাবু করে দুনিয়ায় এমন তো কিছু দেখ্‌লাম না।

ধরার আশঙ্কা আছে নাকি?

আশা তো করি। অন্ততঃ আশ্রমটা তা'হলে বাঁচে।

ওঁকে চলে যেতে বলে দেননা কেন?

ঐটি শক্ত। বল্‌লে এম্‌নি চলে যাবে যে মাথা খুঁড়লেও আর ফিরবেনা।

না ফিরলেই বা ক্ষতি কি?

ক্ষতি? ওকে তো জানেন না, না জান্‌লে সে ক্ষতির পরিমাণ বোঝা যায়না। আশ্রম না থাকে সেও সইবে, কিন্তু, ও-ক্ষতি আমার সইবে না। এই বলিয়া হরেন্দ্র মিনিট-খানেক চুপ করিয়া প্রসঙ্গটা হঠাৎ বদ্‌লাইয়া দিল। কহিল, একটা মজার কাণ্ড ঘটেছে। কারও সাধ্য নেই সে কল্পনাও করে। কাল সেজদার ওখান থেকে অনেক রাত্রে ফিরে গিয়ে দেখি অজিতবাবু উপস্থিত। ভয় পেয়ে গেলাম ব্যাপার কি? অসুখ বাড়লো নাকি? না, সে-সব কিছু নয়, বাক্স বিছানা নিয়ে তিনি এসেছেন আশ্রম-বাসী হতে। ইতিমধ্যে সতীশের সঙ্গে কথা পাকা হয়ে গেছে,—আশ্রমের নিয়মে আশ্রমের কাজে জীবন কাটাবেন এই তাঁর পণ, এর আর নড়-চড় নেই। বড়লোক হলে আমাদের ভালই হয়, কিন্তু শঙ্কা হোলো ভেতরে কি একটা গোলযোগ আছে। সকালে আশুবাবুর কাছে গেলাম, তিনি শুনে বল্‌লেন সঙ্কল্প অতিশয় সাধু, কিন্তু ভারতে আশ্রমের তো অভাব নেই, সে আগ্রা ছাড়া আর কোথাও গিয়ে এ-বৃত্তি অবলম্বন করলে আমি দিনকতক টিক্‌তে পারতাম। আমাকে দেখ্‌ছি তল্পি বাঁধ্‌তে হোল।

কমল কোনরূপ বিস্ময় প্রকাশ করিলনা, চুপ করিয়া রহিল।

হরেন্দ্র বলিলেন, তাঁর ওখান থেকেই এখানে আস্‌চি। ভাব্‌চি ফিরে গিয়ে অজিতবাবুকে বোল্‌ব কি।

কমল বুঝিল শিবনাথকে স্থানান্তরিত করার উপলক্ষে অনেক কঠিন বাদ-প্রতিবাদ হইয়া গেছে। হয়ত; প্রকাশ্যে এবং স্পষ্ট করিয়া একটা কথাও উচ্চারিত হয় নাই, সমস্তই নিঃশব্দে ঘটিয়াছে, তথাপি কঠোরতায় সে-যে সর্ব্বপ্রকার কলহকে ছাপাইয়া গেছে ইহাতে সন্দেহ করিবার নাই। কিন্তু একটা কথারও সে উত্তর করিলনা, তেম্‌নিই নীরবে বসিয়া রহিল।

হরেন্দ্র কহিতে লাগিলেন, মনে হয় আশুবাবু সমস্তই শুনেছেন। শিবনাথের আপনার প্রতি আচরণে তিনি মর্ম্মাহত। একরকম জোর করেই তাকে বাড়ী-থেকে বিদায় করেছেন। মনোরমার বোধ হয় এ-ইচ্ছে ছিলনা, শিবনাথ তাঁর গানের গুরু, কাছে রেখে চিকিৎসা করাবার সঙ্কল্পই ছিল, কিন্তু সে হতে পেলেনা। অজিতবাবু বোধ হয় এ-পক্ষ অবলম্বন করেই ঝগড়া করে ফেলেছেন।

কমল একটুখানি হাসিল, কহিল, আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু শুন্‌লেন কার কাছে? রাজেন বল্‌লে?

রাজেন? সে পাত্রই ও নয়। জান্‌লেও বল্‌বেনা। এ আমার অনুমান। তাই ভাব্‌চি, মিট্‌মাট তো হবেই, মাঝে থেকে অজিতকে চটিয়ে লাভ কি? চুপ্‌ চাপ থাকাই ভালো; যতদিন সে আশ্রমে থাকে যত্নের ক্রটি হবেনা।

কমল সহাস্যে কহিল, সেই ভালো।

হরেন্দ্র কহিল, কিন্তু এখন উঠি। সেজ্‌দার জন্যেই ভাব্‌না, ভারি অল্পে কাতর হ'ন। সময় পাইতো কাল একবার আস্‌বো।

আস্‌বেন। কমল উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল, কহিল, রাজেন্দ্রকে পাঠাতে ভুল্‌বেননা। বল্‌বেন, বড্ড দায়ে পড়ে তাঁকে ডেকেচি।

দায়ে পড়ে ডাকচেন? হরেন্দ্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন, দেখা পেলে তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দেবো, কিন্তু আমাকে বলা যায়না? আমাকেও আপনার অকৃত্রিম বন্ধু বলেই জানবেন।

তা জানি। কিন্তু তাঁকেই পাঠিয়ে দেবেন।

দেবো, নিশ্চয় দেবো, এই বলিয়া হরেন্দ্র আর কথা না বাড়াইয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

অপরাহ্ণ বেলায় রাজেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাজেন্, আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।

তা' দেবো। কিন্তু কাল নামের সঙ্গে একটুখানি 'বাবু' ছিল, আজ তাও খস্‌লো?

বেশ ত হাল্‌কা হয়ে গেলো। না চাও তো বল জুড়ে দিই।

না, কাজ নেই। কিন্তু আপনাকে আমি কি বলে ডাকবো?

সবাই ডাকে কমল বলে, তাতে আমার সম্মানের হানি হয়না। নামের আগে-পিছে ভার বেঁধে নিজেকে ভারি করে তুল্‌তে আমার লজ্জা করে। 'আপনি' বলবারও দরকার নেই, আমাকে আমার সহজ নাম ধরে ডেকো।

রাজেন্দ্র এই অনুদার স্পষ্ট জবাবটা এড়াইয়া গেল, কহিল, কিন্তু কি আমাকে করতে হবে?

আমার বন্ধু হতে হবে। লোকে বলে তুমি বিপ্লব-পন্থী। তা' যদি সত্যি হয় আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব তোমার অক্ষয় হবে।

এই অক্ষয়-বন্ধুত্ব আমার কি কাজে লাগবে?

কমল বিস্মিত হইল, ব্যথিত হইল। একটা সংশয় ও উপেক্ষার সুস্পষ্ট সুর তাহার কানে বাজিল, কহিল, অমন কথা বল্‌তে নেই। বন্ধুত্ব বস্তুটাই সংসারে দুর্লভ, আর আমার বন্ধুত্ব তার চেয়েও দুর্লভ। যাকে চেনোনা তাকে অশ্রদ্ধা করে নিজেকে খাটো কোরোনা রাজেন। কিন্তু এ অনুযোগ রাজেন্দ্রকে কুণ্ঠিত করিলনা, সে স্মিতমুখে সহজ ভাবেই বলিল, অশ্রদ্ধার জন্যে নয়,—এর প্রয়োজন বুঝিনে তাই শুধু জানিয়েছিলাম। আর যদি মনে করেন এ বস্তু আমার কাজে লাগ্‌বে, আমি অস্বীকার কোরবনা। কিন্তু কি কাজে লাগ্‌বে তাই ভাব্‌ছি।

কমলের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। কে যেন তাহাকে চাবুকের বাড়ি মারিয়া অপমান করিল। সে অতি শিক্ষিতা, অতি সুন্দরী ও প্রখর বুদ্ধিশালিনী। সে পুরুষের কামনার ধন, এই ছিল তাহার ধারণা, তাহার দৃপ্ত তেজ অপরাজেয়, ইহাই ছিল অকপট বিশ্বাস। সংসারে নারী তাহাকে ঘৃণা করিয়াছে, পুরুষে আতঙ্কের আগুন জ্বালিয়া দগ্ধ করিতে চাহিয়াছে, অবহেলার ভান করে নাই তাহাও নয়, কিন্তু এ সে নয়। আজ এই লোকটির কাছে যেন সে তুচ্ছতায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল। শিবনাথ তাহাকে বঞ্চনা করিয়াছে, কিন্তু এমন করিয়া দীনতার চীরবস্ত্র তাহার অঙ্গে জড়াইয়া দেয় নাই।

কমলের একটা সন্দেহ প্রবল হইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, আমার সম্বন্ধে তুমি বোধ হয় অনেক কথাই শুনেচো?

রাজেন বলিল, ওঁরা প্রায়ই বলেন বটে।

কি বলেন?

রাজেন্দ্র একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, দেখুন, এ সব ব্যাপারে আমার স্মরণশক্তি বড় খারাপ। কিছুই প্রায় মনে নেই।

সত্যি বোল্‌চ?

সত্যিই বল্‌চি।

কমল জেরা করিল না, বিশ্বাস করিল। বুঝিল, স্ত্রীলোকের জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে এই মানুষটির আজও কোন কৌতূহল জাগে নাই। সে যেমন শুনিয়াছে তেম্‌নি ভুলিয়াছে। আরও একটা জিনিস বুঝিল! 'তুমি' বলিবার অধিকার দেওয়া সত্বেও কেন সে গ্রহণ করে নাই,—'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। তাহার অকলঙ্ক পুরুষ-চিত্ত-তলে আজিও নারী-মূর্ত্তির ছায়া পড়ে নাই,—'তুমি' বলিয়া ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবার লুব্ধতা তাহার অপরিজ্ঞাত। কমল মনে মনে যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। খানিক পরে কহিল, শিবনাথবাবু আমাকে পরিত্যাগ করেছেন জানো?

জানি।

কমল কহিল, সেদিন আমাদের বিয়ের অনুষ্ঠানে ফাঁকি ছিল কিন্তু মনের মধ্যে ফাঁক ছিলনা। সবাই সন্দেহ ক'রে নানা কথা কইলে, বল্‌লে এ বিবাহ পাকা হোলোনা। আমার কিন্তু ভয় হোলোনা; বল্‌লাম, হোক্‌গে কাঁচা, আমাদের মন যখন মেনে নিয়েছে তখন বাইরের গ্রন্থিতে ক'পাক পড়্‌লো আমার দেখ্‌বার দরকার নেই। বরঞ্চ ভাব্‌লাম এ ভালই হল যে স্বামী বলে যা'কে নিলাম তাঁকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিনি। তাঁর মুক্তির আগল যদি একটু আল্‌গাই থাকে তো থাকনা। মনই যদি দেউলে হয়, অনুষ্ঠানকে মহাজন খাড়া করে সুদটা আদায় হতে পারে কিন্তু আসল তো ডুব্‌লো। কিন্তু এ সব তোমাকে বলা বৃথা, তুমি বুঝ্‌বেনা।

রাজেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। কমল কহিল, তখন এই কথাটাই শুধু জানিনি যে তাঁর টাকার লোভটা এত ছিল! জান্‌লে অন্ততঃ লাঞ্ছনায় দায় এড়াতে পারতাম।

রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, এর মানে ?

কমল সহসা আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইল, বলিল, থাক্‌গে মানে। এ তোমার শুনে কাজ নেই।

কিছুক্ষণ সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, ঘরের মধ্যে সন্ধ্যার ছায়া ঘন হইয়া আসিল। কমল আলো জ্বালিয়া টেবিলের এক-ধারে রাখিয়া দিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া বসিল। কহিল, তা হোক্, আমাকে ওঁর বাসায় একবার নিয়ে চল।

কি কর্‌বেন গিয়ে ?

নিজের চোখে একবার দেখ্‌তে চাই। যদি প্রয়োজন হয় থাক্‌বো। না হয়, তোমার ওপরে তাঁর ভার রেখে আমি নিশ্চিন্ত হব। এই জন্যই তোমাকে ডেকে পাঠিয়ে-ছিলাম রাজেন, তুমি ছাড়া এ আর কেউ পারবেনা। তাঁর প্রতি লোকের বিতৃষ্ণার অবধি নেই। বলিতে বলিতে সে সহসা বাতিটা বাড়াইয়া দিবার জন্য উঠিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল।

রাজেন কহিল, বেশ, চলুন, আমি শীঘ্র একটা গাড়ি ডেকে আনিগে। এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া রাজেন্দ্র বলিল, শিবনাথবাবুর সেবার ভার আমাকে অর্পণ করে আপনি নিশ্চিন্ত হতে চান, আমিও নিতে পারতাম; কিন্তু, এখানে আমার থাকা চল্‌বেনা,—শীঘ্রই চলে যেতে হবে। আপনি আর কোন ব্যবস্থার চেষ্টা করুন।

কমল উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, পুলিশে বোধ করি পিছনে লেগে অতিষ্ঠ করেছে ?

রাজেন্দ্র কহিল, তাদের আত্মীয়তা আমার অভ্যাস আছে,—সেজন্যে নয়।

কমল হরেন্দ্রের কথা স্মরণ করিয়া বলিল, তবে আশ্রমের এঁরা বুঝি তোমাকে চলে যেতে বল্‌চেন ? কিন্তু পুলিশের দৌরাত্ম্যে যাঁরা এমন আতঙ্কিত, ঘটা কোরে তাঁদের দেশের কাজে না নামাই উচিত। কিন্তু, তাই বলে তোমাকে চলে যেতেই বা হবে কেন ? এই আগ্রা শহরেই এমন লোক আছে যে স্থান দিতে এতটুকু ভয় পাবেনা।

রাজেন্দ্র হাসিমুখে কহিল, সে বোধ করি আপনি স্বয়ং। কথাটা শুনে রাখলাম, সহজে ভুল্‌বনা। কিন্তু এ দৌরাত্ম্যে ভয় পায়না ভারতবর্ষে তেমন লোকের সংখ্যা বিরল। থাক্‌লে দেশের সমস্যা ঢের সহজ হয়ে যেতো।

একটুখানি থামিয়া বলিল, সে যে দেখেচে সে ভুল্‌বেনা। কেবল উৎপাতের জন্যেই উৎপাত,—ঐ তো ওদের অস্ত্র। কিন্তু আমার যাওয়া সে জন্যে নয়। আশ্রমকেও দোষ দিতে পারিনে। আর যারই হোক্, আমাকে যাও বলা হরেনদার মুখে আস্‌বেনা।

তবে যাবে কেন ?

যাবো নিজেরই জন্যে। দেশের কাজ বটে, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমার মতেও মেলেনা, কাজের ধারাতেও মেলেনা। মেলে শুধু ভালবাসা দিয়ে। হরেনদার আমি সহোদরের চেয়ে প্রিয়, তার চেয়েও আত্মীয়। কোনকালে এর ব্যতিক্রম হবেনা।

কমলের দুর্ভাবনা গেল। কহিল, এর চেয়ে আর বড় কি আছে রাজেন ? মন যেখানে মিলেচে, থাক্‌না সেখানে মতের অমিল; হোক্‌না কাজের ধারা বিভিন্ন; কি যায় আসে তাতে ? সবাই একই রকম ভাব্‌বে, একই রকম কাজ করবে, তবেই একসঙ্গে বাস করা চল্‌বে এ কেন ? আর পরের মতকে যদি শ্রদ্ধা করতেই না পারা গেল তো সে কিসের শিক্ষা ? মত এবং কর্ম্ম দুই-ই বাইরের জিনিস রাজেন, মনটাই সত্য। অথচ, এদেরই বড় করে যদি তুমি দূরে চলে যাও, তোমাদের যে ভালবাসার ব্যতিক্রম নেই বল্‌চিলে তাকেই অপমান করা হয়। সেই যে কেতাবে লেখে ছায়ার জন্যে কায়া ত্যাগ, এ ঠিক তাই হবে।

রাজেন্দ্র কথা কহিলনা, শুধু হাসিল।

হাস্‌লে যে ?

হাস্‌লাম তখন হাসিনি বলে। আপনার নিজের বিবাহের প্রসঙ্গে যখন মনের মিলটাকেই একমাত্র সত্য স্থির করে বাহ্যিক অনুষ্ঠানের গরমিলটাকে কিছুনা বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেটা সত্য নয় বলেই আজ আপনাদের সমস্ত অসত্য হয়ে গেল।

তার মানে ?

রাজেন্দ্র বলিল, মনের মিলনটাকে আমি তুচ্ছ করিনে, কিন্তু ওকেই অদ্বিতীয় বলে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করাটাও হয়েছে আজকালকার একটা উচ্চাঙ্গের পদ্ধতি। এতে ঔদার্য্য এবং মহত্ত্ব দুই-ই প্রকাশ পায়, কিন্তু সত্য প্রকাশ পায়না। সংসারে যেন শুধু কেবল মনটাই আছে, আর তার বাইরে সব মায়া, সব ছায়াবাজি। এটা ভুল।

একটুখানি থামিয়া কহিল, আপনি বিভিন্ন মতবাদকে শ্রদ্ধা করতে পারাটাকেই মস্তবড় শিক্ষা বল্‌ছিলেন, কিন্তু

সর্ব্বপ্রকার মতকেই শ্রদ্ধা করতে পারে কে জানেন? যার নিজের কোন মতের বালাই নেই। শিক্ষার দ্বারা বিরুদ্ধ মতকে নিঃশব্দে উপেক্ষা করা যায়, কিন্তু শ্রদ্ধা করা যায়না।

কমল অতি বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিল। রাজেন্দ্র বলিতে লাগিল, আমাদের সে নীতি নয়, মিথ্যে শ্রদ্ধা দিয়ে আমরা সংসারের সর্ব্বনাশ করিনে,—বন্ধুর হলেও না,—তাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিই। এই আমাদের কাজ।

কমল কহিল, একেই তোমরা কাজ বলো?

রাজেন্দ্র কহিল, বলি। কি হবে আমার মনের মিল নিয়ে, মতের অমিলের বাধা যদি আমার কর্ম্মকে প্রতিহত করে? আমরা চাই মতের ঐক্য, কাজের ঐক্য—ও ভাব-বিলাসের মূল্য আমাদের নেই। শিবানি—

কমল আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, আমার এ নামটাও তুমি শুনেচ?

শুনেচি। কর্ম্মের জগতে মানুষের ব্যবহারের মিলটাই বড়, হৃদয় নয়। হৃদয় থাকে থাক্, অন্তরের বিচার অন্তর্য্যামী করুন আমাদের ব্যবহারিক ঐক্য নইলে চলেনা। ওই আমাদের কষ্টিপাথর—ঐ দিয়ে যাচাই করে নিই। কই, দুজনের মনের মিল দিয়ে তো সঙ্গীত সৃষ্টি হয়না, বাইরে তাদের সুরের মিল না যদি থাকে। সে শুধু কোলাহল। রাজার যে সৈন্যদল যুদ্ধ করে, তাদের বাইরের ঐক্যটাই রাজার শক্তি। হৃদয় নিয়ে তাঁর গরজ নেই। নিয়মের শাসন সংযম,—এই তো নীতি। একে খাটো করলে হৃদয়ের নেশার খোরাক যোগানো হয়। সে উচ্ছৃঙ্খলতারই নামান্তর। গাড়োয়ান রোকো রোকো,—শিবানি, এই তাঁর বাসা।

সম্মুখে জীর্ণ প্রাচীন গৃহ। উভয়ে নিঃশব্দে নামিয়া আসিয়া নীচের একটা ঘরে প্রবেশ করিল। পদশব্দে শিবনাথ চোখ মেলিয়া চাহিল, কিন্তু দীপের স্বল্পালোকে বোধ হয় চিনিতে পারিলনা। মুহূর্ত্ত পরেই চোখ বুজিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

সাময়িকী

ভারতের প্রতিবেশী আফগানিস্থান রাজ্য এখন অরাজক; অথবা, সত্য কথা বলিতে গেলে—বহুরাজক। আফগানিস্থানের নব্যতন্ত্রী রাজা আমানুল্লা খান সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা এনায়েৎউল্লাকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া যান।

রাজা আমানুল্লার পিতা আমীর হবিবুল্লা খান গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হইলে তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে আমানুল্লা খান সিংহাসন অধিকার করেন। আমানুল্লা রাজা হইয়া যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন—কঠোর হস্তে দুর্দ্ধর্ষ আফগান জাতিকে শাসনে রাখিয়াছিলেন। রাজ্যের প্রাচীনপন্থী মোল্লা সম্প্রদায় তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ছিল না। সম্প্রতি কিছুদিনের জন্য রাজা আমানুল্লা ইয়োরোপে ভ্রমণ করিতে গমন করেন। রাণী শৌরীয়াও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ইয়োরোপের প্রবাসকালে রাণী শৌরীয়া পর্দ্দা ত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজা আমানুল্লাও জাতীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া ইয়োরোপীয় বেশ ধারণ করিয়াছেন।

স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের পর রাজা আমানুল্লা সামাজিক ও রাষ্ট্রনীতিক সংস্কার প্রবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হ'ন। আমানুল্লার পিতার আমলে কিম্বা তাঁহারও পূর্ব্ব হইতে আফগানিস্থানে রেলপথ, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি নব্য-বিজ্ঞানসম্মত রাষ্ট্রের উন্নতিকর বিষয় সকল প্রবর্ত্তনের বহু চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু মোল্লা সম্প্রদায়ের বাধায় তাহা হইতে পারে নাই। রাজা আমানুল্লা প্রজার মঙ্গলসাধন-কল্পে পূর্ব্বেই কয়েকটি সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। উচ্চশ্রেণীর কলেজ স্থাপন, তুরস্ক হইতে সুদক্ষ সেনাপতি আনাইয়া আফগান সেনাগণকে ইয়োরোপীয় প্রণালীতে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দান, রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ স্থাপন, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি সংস্কার তিনি আফগানিস্থানে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি আফগানিস্থানে সম্পূর্ণরূপে পর্দ্দা প্রথা রহিত করিবার এবং পারশি বর্ণমালার পরিবর্ত্তে লাটিন বর্ণমালার প্রবর্ত্তনে প্রয়াসী হইলেন। এই সকল সংস্কার ও পরিবর্ত্তনের প্রচেষ্টা প্রাচীনপন্থী মোল্লাদের অসহ্য হইল। তাহারা অশিক্ষিত জনসাধারণকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করিতে লাগিল। মোল্লাদের প্ররোচনায় শিনওয়ারী নামক উপজাতি বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করিয়া জালালাবাদ ও ডাকা আক্রমণ করিল।

বিনা রক্তপাতে বিদ্রোহ প্রশমনের জন্য রাজা আমানুল্লা বিদ্রোহীদিগকে বুঝাইয়া-পড়াইয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। তাহারা সংস্কার-বিরোধী বলিয়া তিনি সংস্কার-প্রয়াস আপাততঃ স্থগিত রাখিতে সম্মত হইলেন। এমন কি যে সকল আফগান রমণীকে তিনি তুরস্কে ও ইয়োরোপে উচ্চশিক্ষা লাভার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিতেও সম্মতি দান করিলেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা দাবী করিয়া বসিল যে রাণী শৌরীয়াকে বর্জ্জন করিতে হইবে। পত্নীবৎসল রাজা প্রজারঞ্জনের জন্য পত্নীত্যাগাপেক্ষা সিংহাসন ত্যাগ শ্রেয়ঃ মনে করিলেন।

এই সকল সামাজিক কারণ ব্যতীত আফগান রাষ্ট্র-বিপ্লবের কতকগুলি গুরুতর রাজনীতিক কারণও রহিয়াছে বলিয়া সংবাদপত্রে আলোচনা চলিতেছে। রাজা আমানুল্লা দৃঢ়চিত্ত রাজা। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর ইংরেজ গবর্মেণ্টের সহিত তাঁহার নূতন করিয়া সন্ধি হয়। ইতঃপূর্ব্বে আফগানিস্থানের সহিত ইংরেজ গবর্মেণ্টের সন্ধি অনুসারে আফগান রাজ বৃটিশ গবর্মেণ্টের মত না লইয়া স্বাধীন ও প্রত্যক্ষভাবে পর-রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ স্থাপন করিতেন না; এবং এইজন্য বৃটিশ গবর্মেণ্ট আফগান-রাজকে বার্ষিক কয়েক লক্ষ টাকা উপঢৌকন দিতেন। নূতন সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে আমানুল্লা এই টাকা ছাড়িয়া দেন, এবং পররাষ্ট্রের সহিত স্বাধীন ভাবে সন্ধি-বিগ্রহের অধিকার লাভ করেন। পূর্ব্বে আফগানিস্থানের অধিপতিরা আমীর নামে অভিহিত হইতেন ও সামন্তরাজের তুল্য সম্মান পাইতেন। এই সময় আমানুল্লা খান স্বাধীন ভূপতি বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করেন। আমানুল্লা রাজা হইয়া কঠোর হস্তে প্রজা শাসন করিতে লাগিলেন, এবং উদার চিত্তে রাজ্য মধ্যে ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধুনিকতার প্রবর্ত্তন করিয়া রাজ্যের ও প্রজার মঙ্গল সাধনে মনোনিবেশ করিলেন। একদল (ভারতীয় ও ইয়োরোপীয়) সংবাদ-পত্র বলিতেছেন, বৃটিশ গবর্মেণ্টের প্ররোচনায় আফগান মোল্লারা আফগানিস্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছে। বৃটিশ গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে পার্লামেণ্টে এই অভিযোগের বিরুদ্ধে স্পষ্টাক্ষরে ঘোষিত হইয়াছে যে, ইংরেজ গবর্মেণ্ট এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ আছেন। আর একদল সংবাদপত্র বলেন, রুষীয় সোভিয়েট তলে তলে থাকিয়া কোন রাষ্ট্রনীতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আফগান বিদ্রোহীদিগকে অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেছেন।

আমানুল্লার সিংহাসন ত্যাগের পর ইনায়েৎউল্লা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মাত্র তিন দিন রাজত্ব করেন। তিনি তাঁহার অসামর্থ্য বুঝিয়া কাবুল ত্যাগ করিয়া কান্দাহারে ভ্রাতা আমানুল্লার নিকট গমন করিলে বিদ্রোহী নেতা ভিস্তিওয়ালা বাচ্চা-ই-সাক্কো কাবুলের সিংহাসন অধিকার করেন।

আফগানিস্থান রাজ্যটি এমন দুর্জ্ঞেয় রহস্যপূর্ণ, আফগান-বিপ্লবের অবস্থা এমন জটিল ও বহুমুখী, আফগানিস্থান হইতে যে সকল সংবাদ বিলাত ঘুরিয়া আসিতেছে, তাহা এত সংক্ষিপ্ত ও পরস্পর-বিরোধী যে, তাহা হইতে সত্য নিষ্কাশন পূর্ব্বক প্রকৃত অবস্থার উপলব্ধি করা সহজ নহে। মধ্যে এলাহাবাদ হইতে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, আফগান রাজপরিবারভুক্ত সর্দ্দার মহম্মদ ওমর খাঁ এলাহাবাদ হইতে সহসা নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। ইনি এলাহাবাদে নজরবন্দী অবস্থায় দীর্ঘকাল সপরিবারে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইনি পরলোকগত সর্দ্দার ইয়াকুব খানের অন্যতম পুত্র। দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের পর হইতে সর্দ্দার ইয়াকুব খাঁ বৃটিশ অধিকারে আটক ছিলেন। তাঁহার ছয় পুত্র এলাহাবাদে নজরবন্দী ছিলেন। স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি না লইয়া তাঁহাদের অন্যত্র গমনের অধিকার ছিল না। সর্দ্দার ওমর খাঁ ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি না লইয়া গত ২০শে ডিসেম্বর তারিখে অন্তর্দ্ধান করেন। অনেকে অনুমান করেন যে, আফগানিস্থানের এইরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থায় হয় ত তিনি সিংহাসনের লোভে আফগানিস্থানের অভিমুখে গমন করিয়া থাকিতে পারেন। এই ব্যাপারটিও অল্প রহস্যময় নহে। সর্দ্দার ওমর খাঁর সকল ভ্রাতাকে গ্রেপ্তার করিয়া রেঙ্গুনে প্রেরণ করা হইয়াছে।

এ দিকে কান্দাহারে রাজা আমানুল্লা নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া নাই। তিনি সরকারী ভাবে সিংহাসন ত্যাগ প্রত্যাহার

করিয়া পুনরায় আপনাকে আফগানিস্থানের একমাত্র রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কান্দাহারে রাজা আমানুল্লা প্রত্যহ তাঁহার মন্ত্রীদের লইয়া যুদ্ধ-মন্ত্রণা সভার বৈঠক করিতেছেন। দরবারও প্রত্যহ হইতেছে, এবং স্থানীয় উপজাতি সকলের নেতারা দরবারে হাজিরা দিতেছেন। কান্দাহার অঞ্চলের প্রধান অধিবাসী দুরাণী, ঘিলজাই প্রভৃতি প্রবল পরাক্রান্ত উপজাতি সকল রাজা আমানুল্লার অনুরাগী। শিনওয়ারীরাও ভিস্তিপুত্র গাজি হবিবুল্লা বা বাচ্চা-ই-সাক্কোর অধীনতা চাহেন না, এ দিকে কান্দাহারে ও গজনীতে রাজা আমানুল্লার পক্ষে বিপুল বাহিনী সজ্জিত হইতেছে। রমজান মাস শেষ হইলে সম্ভবতঃ কাবুল অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করা হইবে। সংস্কার-প্রয়াসী রাজা আমানুল্লার পতনে উদারপন্থী, জাতীয়তাবাদী হিন্দু ও মুসলমান অনেকেই দুঃখিত, এবং তাঁহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। ভারত হইতে আফগানিস্থানে মেডিকেল মিশন এবং রাজা আমানুল্লার সাহায্যার্থ স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী প্রেরণের কল্পনাও হইতেছে।

—

আফগানিস্থানের সিংহাসনের জন্য আরও কয়েকজন উমেদার আবির্ভূত হইয়াছেন। জেনারেল নাদির খাঁ পূর্ব্বে আফগান-বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ইদানীং তিনি ফ্রান্সে বাস করিতেছিলেন। প্রকাশ, অনেকের অনুরোধে কাবুলের সিংহাসন লাভের চেষ্টা করিবার জন্য ফ্রান্স হইতে উড়োজাহাজে তিনি মস্কো নগরে উপস্থিত হ'ন। সেখান হইতে তিনি কান্দাহারে আসিয়া পৌঁছেন। পরে প্রকাশ পায় যে, তিনি রাজা আমানুল্লার সমর্থন করিতেছেন এবং বাচ্চা ই-সাক্কোর বিরুদ্ধে সসৈন্যে কাবুল অভিমুখে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছেন। নির্ব্বাসিত ইয়াকুব খাঁর পলাতক পুত্র সর্দ্দার ওমর খাঁ যদি আফগানিস্থানে পৌঁছিতে পারিয়া থাকেন, তবে তিনিও সিংহাসনের একজন উমেদার, এইরূপ অনেকের ধারণা। কাবুলের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা সর্দ্দার আহমদ আলি জানও বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বাচ্চা-ই-সাক্কোর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন। আজব খাঁ নামক আর এক ব্যক্তি নিজেকে আফগানিস্থানের আমীর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। বাচ্চার সৈন্যদের সঙ্গে আজব খাঁর একটা যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহাতে বাচ্চা পরাজিত হইয়াছে। আজব খাঁ কাবুলে অভিযান করিবার উদ্যোগ করিতেছে। সে কাবুলের সন্নিহিত বিদ্যুতের কারখানা অধিকার করিয়া তার কাটিয়া দেওয়ায় কাবুল, পাগমান, বাবারবাগ প্রভৃতি স্থান অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। দিন দিন আরও নূতন নূতন উমেদারের আবির্ভাব হইতেছে। পেশোয়ারের একটি সংবাদে প্রকাশ যে, আলি আহমদ জান বহুসংখ্যক লস্কর (স্বেচ্ছাসেবক সৈন্য) সহ জালালাবাদ হইতে বাচ্চার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনি থাকি জব্বর নামক স্থান অধিকার করিয়া বন্দিবাজি নামক স্থানে বাচ্চার সেনাদলকে পরাস্ত করেন। বাচ্চা-ই-সাক্কো অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের সম্ভাবনায় কাবুলের রাজকোষ হইতে ধনরত্ন এবং অস্ত্রাগার হইতে অস্ত্রশস্ত্র তাহার নিজগ্রাম কোহিদামনে স্থানান্তরিত করিতেছে। খাদ্যাভাবে তাহার অধিকাংশ সৈন্য অস্ত্রশস্ত্রসহ নিজ নিজ গ্রামে প্রস্থান করিয়াছে। বাচ্চার সৈন্য সংখ্যা এক্ষণে মাত্র পাঁচহাজার। সিবিল মিলিটারী গেজেট সংবাদ দিতেছেন যে, আলি-আহমদ জান সরকারী-ভাবে প্রচার করিয়াছেন যে, তিনি রাজা আমানুল্লার অনুরক্ত, তাঁহার জন্যই তিনি কাবুল অধিকারের চেষ্টা করিতেছেন। অতিরিক্ত শীতের জন্য বরফ পড়িয়া রাস্তাঘাট বন্ধ হওয়ায় কাবুল অভিযানে বিলম্ব ঘটিতেছে।

—

রাজা আমানুল্লার পুত্র প্রিন্স হিদায়েতুল্লা প্যারী নগরে শিক্ষালাভ করিতেছিলেন। তিনি পিতার আহ্বানে বার্লিনে আসিয়াছেন। তথা হইতে তিনি মস্কো হইয়া কান্দাহারে আগমন করিবেন। পারস্যের একখানি সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, পারস্য সরকার একটি সৈন্য-বাহিনী আমানুল্লার সাহায্যের জন্য আফগানিস্থানে প্রেরণের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। লাহোরের "জমিদার" পত্রের চীনস্থিত প্রতিনিধি সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ সৌকত বেগ ও মীর রহমতুল্লা সহ মস্কোর পথে কান্দাহারে যাত্রা করিয়াছেন।

—

ভারতবাসী স্বায়ত্ত-শাসনের পথে কতদূর যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে, মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কারের অধিক অধিকার তাহাদিগকে দেওয়া যাইতে পারে কি-না, তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য বিলাতের পালিয়ামেণ্ট স্যার জন সাইমন সাহেবের নেতৃত্বে এক কমিশন ভারতবর্ষে

মাঠের পথে—পার্শ্বে লাট-উদ্যান ;

প্রেরণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষ পার্লিয়ামেণ্টের এই ব্যবস্থা নতমস্তকে গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাই, এই রয়াল কমিশন সাক্ষ্য গ্রহণোদ্দেশ্যে যখনই যে প্রদেশে গিয়াছেন, সেই প্রদেশই হরতাল করিয়া মিছিল পরিচালনা করিয়া দেশের বিরুদ্ধ মনোভাব কমিশনের সদস্যদিগকে জানাইয়া দিয়াছে। ইহার ফলে কোন কোন প্রদেশে দেশের জনসাধারণে ও পুলিশে সংঘর্ষও ঘটিয়াছে। লাহোরে এমনই একটি সঙ্ঘাতের ফলে পাঞ্জাব-কেশরী জননায়ক লাজপৎ

পুলিসের অশ্বারোহী সৈন্যদল

সাইমন কমিশনের আগমনে কমিশন-বর্জ্জন মিছিল।
(কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট "ভারতবর্ষ" কার্য্যালয়ের সম্মুখের দৃশ্য)

লক্ষাধিক লোকের মিছিল—হ্যারিসন রোডের দৃশ্য

রায় আহত হইয়াছিলেন; অল্প দিন মধ্যে লালাজীর মৃত্যু ঘটিয়াছিল। সাইমন কমিশন লক্ষ্ণৌয়ে পদার্পণ করিলে যে সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়, ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি পণ্ডিত মতিলালজীর পুত্র পণ্ডিত জহরলালজীও তাহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গত ১২ই, জানুয়ারী সাইমন কমিশন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ঐ দিন বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির উদ্যোগে কলিকাতায় হরতাল ও কমিশন বিরোধী আন্দোলন করিবার আয়োজন হইয়াছিল।

—

কিন্তু কমিশন রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া উল্টা পথে কলিকাতায় আগমন করেন এবং সতর্ক ও সশস্ত্র পুলিশ-সৈন্য বেষ্টিত অবস্থায় লাট-ভবনে উপস্থিত হইতে বাধ্য হ'ন। কাজেই সেদিন দেশবাসী তাঁহাদের বিরোধিতা জ্ঞাপন করিতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হন নাই, যদিও শিয়ালদহ ও হাবড়া দুই স্থলেই জন-সমাগম হইয়াছিল; কিন্তু শেষরাত্রির অন্ধকারে কমিশনের সদস্যগণ কলিকাতার এই বিরোধী আন্দোলনের প্রকৃত দৃশ্য দেখিতে পান নাই। গত ১৯শে, জানুয়ারী শনিবার তারিখে পুনরায় কলিকাতাবাসী লক্ষাধিক লোকের এক বিরাট মিছিল পরিচালিত করিয়া সাইমন কমিশনকে জানাইয়া দিয়াছেন, এখানেও তাঁহারা অনাহূত অতিথি। এই বিরাট মিছিল যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন, শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ও নিয়মানুগ থাকিয়া জন-আন্দোলন পরিচালিত করিবার ক্ষমতা বঙ্গদেশবাসীর আছে। সরকারের সতর্ক ও সশস্ত্র পুলিশ সর্ব্বত্র মিছিলের সঙ্গ গ্রহণ করিয়া থাকিলেও কোথাও যে কোনরূপ দ্বন্দ্ব সঞ্জাত ঘটে নাই, ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে জন-আন্দোলন শক্তিশালী ও শান্তিপূর্ণ হইয়াছিল।
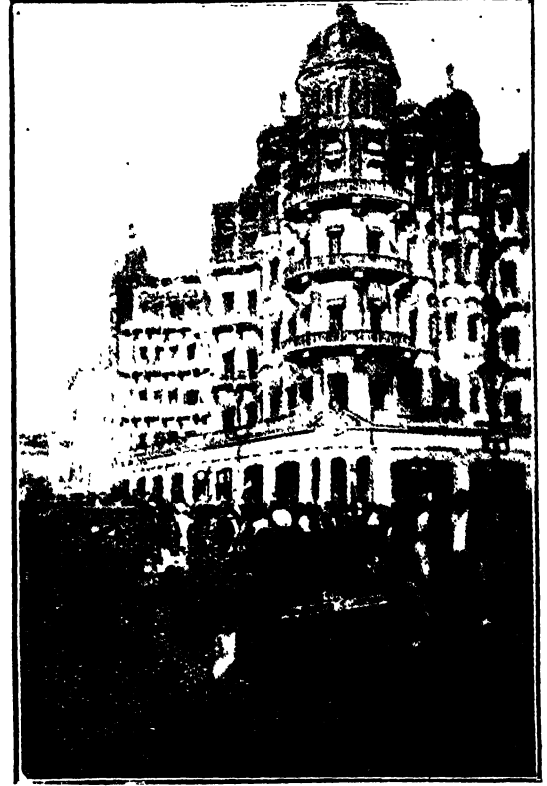
শ্রমিকদিগের মিছিল—গড়ের মাঠের দিকে বড় মিছিলের সঙ্গে মিলিত হইতে যাইতেছিল। (লাট-ভবন ও এস্প্ল্যানেড ম্যানসনের মধ্যকার দৃশ্য)

কলেজ ষ্ট্রীটে যান-বাহনাদি বহুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল

বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির এই নেতৃবর্গ বিরাট মিছিল পরিচালিত করিয়াছিলেন। মিছিলের সঙ্গে কৃষ্ণবর্ণের হাজার হাজার পতাকা,—প তা কা য়

কমিশন নিয়োগে দেশবাসীর অসন্তোষ-প্রকাশক লিপি বাহিত হইয়াছিল। অপরাহ্ণ বেলা ৩ ঘটিকায় চিত্তরঞ্জন এভেনিউস্থিত হ্যালিডে পার্ক হইতে বাহির হইয়া এই মিছিল যথাক্রমে হ্যারিসন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, এস্প্ল্যানেড ইষ্ট ধরিয়া গড়ের মাঠে অক্টারলোনী মনুমেণ্টের নীচে সমবেত হয়। মিছিল যে পথে গিয়াছে, সেই পথেই বহুক্ষণ যান চলাচল বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। যে বিরাট মিছিল ও সমবেত জনসভার কথা আমরা উপরে বলিলাম, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা ইহা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রয়াণ, পণ্ডিত মতিলালের কলিকাতা আগমনের দিনের পর বা পূর্ব্বে এমন বিরাট জন-সভা ও শোভাযাত্রা কখনও দৃষ্ট হয় নাই জাতি যখন ক্ষুব্ধ হয়, ভিতরের ক্ষোভ যখন অসহ হয়, তখন তাহার প্রকাশ এইরূপ বিরাট, গম্ভীর হইয়া থাকে। আমরা এতৎ সঙ্গে মিছিলের কতকগুলি আলোকচিত্র সন্নিবেশিত করিলাম।

কলেজ ষ্ট্রীটের দৃশ্য
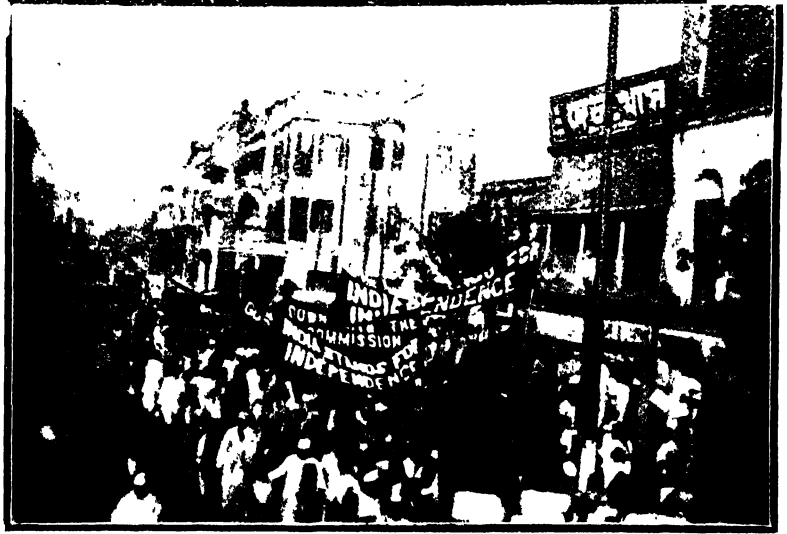
মনুমেণ্টের নীচে বিরাট জনসভা ; দূরে চৌরঙ্গীর গৃহসমূহ দেখা যাইতেছে

সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল-সমিতি দেশে একটি বিরাট জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছিল। দেশের সমগ্র মানব সমাজের অর্দ্ধেক অংশ নারীজাতিকে—শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, সামাজিক উন্নতিতে, আর্থিক স্বচ্ছলতায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাহাদের নিজেদের চেষ্টায় সঙ্ঘবদ্ধভাবে, সমিতিবদ্ধ প্রণালীতে সমগ্র বাংলাদেশে এবং তাহার বাহিরেও এই প্রতিষ্ঠান অসংখ্য মহিলা-সমিতি গঠন করিতেছেন। চারি বৎসর পূর্ব্বে মাত্র সাত আটটি সমিতি লইয়া এই নারীমঙ্গল-সমিতির কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। বর্ত্তমানে তাহার স্থানে সমিতির সংখ্যা ২২২টি হইয়াছে। বাংলাদেশে এমন একটিও জেলা নাই, যেখানে এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত একটি বা ততোধিক মহিলা সমিতি নাই। সমিতির সুশিক্ষিত প্রচারকগণ বঙ্গদেশের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া মহিলা-সমিতি গঠন করিবার জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। মফঃস্বলের মহিলা সমিতিগুলির সভ্যগণকে শিল্প শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য কেন্দ্র-সমিতি ১৩ জন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন। কেন্দ্র-সমিতি কলিকাতায় একটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ শিল্পবিদ্যালয়,

পরিচালন করেন। মহিলাদের এইরূপ একটি শিল্পবিদ্যাশ্রম হওয়াতে দুঃস্থা ও বিধবা নারীগণের স্বাবলম্বী হইয়া জীবিকা উপার্জ্জনের পথ পরিষ্কার হইয়াছে। গত তিন বৎসরের মধ্যে এই শিক্ষালয়ে ৪শত মহিলা শিক্ষালাভ করিয়াছেন। শিক্ষালয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হয়:—সেলাই ও ছাঁটকাটের কার্য্য, নানাপ্রকার চিকণ ও জরির কাজ; কার্পেট প্রস্তুত, নানা প্রকার লেস ও ফিতা বোনা, রাফিয়ার কার্য্য, রেশমের সূতা কাটা, পাটের দড়ি প্রস্তুত, মণিপুরী তাঁতে তোয়ালে বোনা, বেতের কাজ, সঙ্গীত এবং সাধারণ শিক্ষা। শিক্ষালয় সংলগ্ন একটি ছাত্রী-নিবাস আছে। মহিলা সমিতি আন্দোলন বাংলাদেশে আরম্ভ হইয়াছিল; এক্ষণে বাংলার বাহিরে বেহার, উড়িষ্যা, নাগপুর, বেরার, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালীদের মধ্যে মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিশেষ আনন্দের বিষয় গত ডিসেম্বর মাসে লণ্ডন নগরে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কয়েকজন ভারতীয় মহিলা সমিতির কার্য্যপ্রণালীর সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া কেন্দ্র সমিতিকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিবার জন্য একটি শাখা-কমিটি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সমিতির মাসিক ব্যয় কিঞ্চিতধিক চারি সহস্র টাকা। তন্মধ্যে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টর শিল্প-বিভাগ এগার শত টাকা এবং কলিকাতা করপোরেসন মাসিক পাঁচশত টাকা সাহায্য করেন।

সমবায় পদ্ধতিতে ব্যাঙ্ক পরিচালনা সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার জন্য স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন বঙ্গীয় সমবায় প্রতিষ্ঠানের হস্তে ১০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। ঐ টাকার ৫০০৲ ও ৩০০৲ টাকার এক একটি এবং ১০০৲ টাকার দু'টী পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রবন্ধের বিষয়—কিরূপে সমবায় আন্দোলন ভারতে বেকার সমস্যার সমাধান করিতে পারে এবং দেশময় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারে।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি এল, প্রণীত উপন্যাস "দুষ্টগ্রহ"—২৲

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত রহস্য লহরী সিরিজের "রূপসী সর্ব্বনাশী" ও "উড়ো জাহাজের হুড়ো" প্রত্যেক ৷৵ আনা

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ইতিহাস "মগনাদ"—১৷৵০

শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত উপন্যাস "পূজার অর্ঘ্য"—১৷০

শ্রীক্ষীরোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, প্রণীত "বর্ত্তমান বেগ ও উদ্বেগ"—২৲

শ্রীশশিভূষণ দাস প্রণীত উপন্যাস "পূজার তত্ত্ব"—১৷০

অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ সরকার প্রণীত India through the ages—১৷০

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত "দাম্পত্য-রহস্য"—২৷০

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA.
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET CALCUTTA

Printer—NARENDRANATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

শিল্পী— শ্রীযুত পূর্ণেন্দু চক্রবর্ত্তী

চৈত্র—১৩৩৮

দ্বিতীয় খণ্ড | ষোড়শ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

সাংখ্যে ঈশ্বর

অধ্যাপক শ্রীজানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য সাংখ্যতীর্থ এম-এ

পূর্ব্বে পুরুষ সম্বন্ধে অল্প বলা হইয়াছে। সেশ্বর সাংখ্য-শাস্ত্রে (পাতঞ্জল দর্শনে) পুরুষ-বিশেষই ঈশ্বর আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছেন। সুতরাং ঈশ্বরের আলোচনা না করিলে পুরুষের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে। অতএব এই প্রবন্ধে ঈশ্বর সম্বন্ধে অল্প আলোচনা করা হইবে।

অন্ধকার না থাকিলে আলোর শোভা হয় না; সেইরূপ নিরীশ্বরবাদ না থাকিলে ঈশ্বরবাদ আলোচ্যই হইত না। একই সাংখ্যশাস্ত্রের দুই শাখায় ঈশ্বর-বিষয়ক দুইটী বিভিন্ন মত দেখা যায়। কপিলের সাংখ্যসূত্রে ঈশ্বরের স্থান নাই। কিন্তু পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রে যুক্তির দ্বারা ঈশ্বরের সত্তা প্রমাণিত হইয়াছে। নব্য-সাংখ্য-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন যে, কপিলের সাংখ্যের ঈশ্বর-প্রতিষেধের খুব মূল্য নাই। সাংখ্যশাস্ত্র বিবেক জ্ঞান সম্পাদনেই প্রমাণ রূপে গৃহীত হইবে। যে শাস্ত্র যে উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে, সেই শাস্ত্রের সেই বিষয়ের তাৎপর্য্য বর্ণনে সার্থক্য। সাংখ্যশাস্ত্র ঈশ্বর-নিষেধ বিষয়ে অপ্রমাণ হইলেও তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের হানি হয় না। কিন্তু সাংখ্যের যদি ঈশ্বর-নিষেধাংশ প্রকৃত বর্ণনীয় হয়, তাহা হইলে বেদান্তশাস্ত্র অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। বেদান্তশাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম। পরব্রহ্মই যদি না থাকেন, তাহা হইলে বেদান্তশাস্ত্র শশশৃঙ্গ বর্ণনে পর্য্যবসিত হয়। অথচ সাংখ্যশাস্ত্র ঈশ্বর-প্রতিষেধাংশে দুর্ব্বল হইলেও উদ্দেশ্যহীন হইয়া পড়ে না। বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে সাংখ্যশাস্ত্রে নিরীশ্বরতা প্রচারের দুইটী কারণ আছে। প্রথম হেতু হইতেছে যে, পাপীরা সহজে জ্ঞানলাভ না করুক

ভারতবর্ষ

চৈত্র—১৩৩৮

দ্বিতীয় খণ্ড	ষোড়শ বর্ষ	চতুর্থ সংখ্যা

সাংখ্যে ঈশ্বর

অধ্যাপক শ্রীজানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য সাংখ্যতীর্থ এম-এ

পূর্ব্বে পুরুষ সম্বন্ধে অল্প বলা হইয়াছে। সেশ্বর সাংখ্য-শাস্ত্রে (পাতঞ্জল দর্শনে) পুরুষ-বিশেষই ঈশ্বর আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছেন। সুতরাং ঈশ্বরের আলোচনা না করিলে পুরুষের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে। অতএব এই প্রবন্ধে ঈশ্বর সম্বন্ধে অল্প আলোচনা করা হইবে।

অন্ধকার না থাকিলে আলোর শোভা হয় না; সেইরূপ নিরীশ্বরবাদ না থাকিলে ঈশ্বরবাদ আলোচ্যই হইত না। একই সাংখ্যশাস্ত্রের দুই শাখায় ঈশ্বর-বিষয়ক দুইটী বিভিন্ন মত দেখা যায়। কপিলের সাংখ্যসূত্রে ঈশ্বরের স্থান নাই। কিন্তু পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রে যুক্তির দ্বারা ঈশ্বরের সত্তা প্রমাণিত হইয়াছে। নব্য-সাংখ্য-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন যে, কপিলের সাংখ্যের ঈশ্বর-প্রতিষেধের খুব মূল্য নাই। সাংখ্যশাস্ত্র বিবেক জ্ঞান সম্পাদনেই প্রমাণ রূপে গৃহীত হইবে। যে শাস্ত্র যে উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে, সেই শাস্ত্রের সেই বিষয়ের তাৎপর্য্য বর্ণনে সার্থক্য। সাংখ্যশাস্ত্র ঈশ্বর-নিষেধ বিষয়ে অপ্রমাণ হইলেও তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের হানি হয় না। কিন্তু সাংখ্যের যদি ঈশ্বর-নিষেধাংশ প্রকৃত বর্ণনীয় হয়, তাহা হইলে বেদান্তশাস্ত্র অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। বেদান্তশাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম। পরব্রহ্মই যদি না থাকেন, তাহা হইলে বেদান্তশাস্ত্র শশশৃঙ্গ বর্ণনে পর্য্যবসিত হয়। অথচ সাংখ্যশাস্ত্র ঈশ্বর-প্রতিষেধাংশে দুর্ব্বল হইলেও উদ্দেশ্যহীন হইয়া পড়ে না। বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে সাংখ্যশাস্ত্রে নিরীশ্বরতা প্রচারের দুইটী কারণ আছে। প্রথম হেতু হইতেছে যে, পাপীরা সহজে জ্ঞানলাভ না করুক

এই জন্ত শ্রুতি-বিরুদ্ধ বিষয় লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, লোকে যদি পরিপূর্ণ নির্দ্দোষ ঐশ্বর্য্য চিন্তনেই তন্ময় হইয়া পড়ে, তাহা হইলে বিবেকাভ্যাসে শিথিলতা আসিবে—জীবের মুক্তির পথ রুদ্ধ হইয়া পড়িবে। অতএব সাংখ্যশাস্ত্রে নিরীশ্বরবাদই শ্রেয়ঃ। বিজ্ঞান ভিক্ষুর প্রথম যুক্তিটী পৌরাণিক। যাঁহাদের পুরাণের উপর আস্থা নাই, তাঁহাদের কাছে উক্ত যুক্তিটী গল্প ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু দ্বিতীয় যুক্তিটী বেশ হৃদয়গ্রাহী। বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে সাংখ্য দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বরবাদী, কিন্তু নিরীশ্বরবাদের প্রচারক নহে। যদি সাংখ্য নিরীশ্বরবাদের পোষক হইত, তাহা হইলে 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' এই সূত্রের পরিবর্ত্তে 'ঈশ্বরাভাবাৎ' এই সূত্র থাকিত। প্রৌঢ়বাদের অনুরোধেই সাংখ্যে নিরীশ্বরতার ছায়াপাত হইয়াছে। যাহা হউক, প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্যগণ নিরীশ্বরবাদই সাংখ্যের সিদ্ধান্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু নব্যদল সেই মত স্বীকার করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেছেন। তাঁহাদের মতে সাংখ্যশাস্ত্র প্রচ্ছন্নভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে।

প্রথমে নিরীশ্বরবাদের আলোচনা করা যাউক্। এই নিরীশ্বরবাদের আলোচনায় আমরা শুধু সাংখ্যসূত্রের মধ্যে আবদ্ধ থাকিব। কারণ, জৈন, বৌদ্ধ ও মীমাংসকদের গ্রন্থে নিরীশ্বরবাদের যে আলোচনা হইয়াছে, সে সমস্ত বলিতে গেলে ভিন্ন প্রবন্ধ আবশ্যক। নিরীশ্বরবাদিগণের প্রথম কথা হইতেছে যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সাধক কোন প্রমাণ নাই। প্রত্যক্ষের দ্বারা ঈশ্বরবিষয়ক আমাদের কোনও জ্ঞানই হইতে পারে না। ঈশ্বর চক্ষুরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নন; কারণ, তাঁহার রূপ নাই। তিনি ত্বগিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নন; কারণ, তাঁহার স্পর্শ নাই। তিনি নাসিকা-গ্রাহ্য নন; কারণ, তাঁহার গন্ধ নাই। তিনি জিহ্বার অগোচর; কারণ, তাঁহার রস নাই। তিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ের অতীত; কারণ, তাঁহার শব্দ নাই। তিনি অনুমান-প্রমাণ-গণ্যও নহেন; কারণ, অনুমান করিতে গেলে ব্যাপ্তি-জ্ঞান আবশ্যক। হেতু ও সাধ্যের নিয়ত সম্বন্ধের নাম ব্যাপ্তি। এমন কোন বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় না, যাহার সহিত ঈশ্বরের নিয়ত সম্বন্ধ আছে। আর পূর্ব্বে ঈশ্বরের জ্ঞান না থাকিলে জানা যায় না যে উহার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ আছে কি না। সুতরাং ব্যাপ্তি-জ্ঞান সুদুষ্কর; আর ঈশ্বরসাধক অনুমান নির্ম্মূল আম্রবৃক্ষে উৎপন্ন আম্র আস্বাদন ভিন্ন আর কিছুই নয়। এখন বিশ্বাসীর দল বলিতে পারেন যে, 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর'—আমাদের শ্রুতি-স্মৃতি বাঁচিয়া থাক্, আমরা শ্রুতি-স্মৃতির সাহায্যে ঈশ্বরের সত্তা প্রমাণিত করিব,—যুক্তির কচকচির কি প্রয়োজন। ইহার উত্তরে নিরীশ্বরবাদীরা বলিবেন যে, শ্রুতি-স্মৃতির সাহায্যে সৃষ্টি ছাড়া ঈশ্বর মানা যায় না। এমন ভাবে ঈশ্বর মানিতে হইবে, যাহাতে অতি সাধারণ তর্কের সহিত বিরোধ না হয়। ফল কথা এই যে, শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত যে ঈশ্বর—ইনি বদ্ধ না মুক্ত? যদি ইনি বদ্ধ হন, তাহা হইলে ইনি আমাদের ন্যায় সাধারণ জীব ব্যতীত আর কিছুই নন। আর যদি ইনি মুক্ত হন, তাহা হইলে ইঁহার রাগ বা অভিমান নাই। রাগ বা অভিমান না থাকিলে, ইনি স্রষ্টা হইতে পারেন না,—এক কথায়, কোনই কাজে আসিতে পারেন না। এরূপ একটী কিম্ভূতকিমাকার ঈশ্বর মানিবার কি প্রয়োজন? এখন আপত্তিকারীরা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, তাহা হইলে শ্রুতি-স্মৃতির কি দশা হইবে? ইহার উত্তরে নিরীশ্বর-বাদীরা বলেন যে, এই সব শ্রুতি-স্মৃতি দ্বারা মুক্তাত্মাদের অথবা হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জীববৃন্দের স্তুতি করা হইয়াছে; আর এই স্তুতির ফলে সাধকবৃন্দের সাধনমার্গে আস্থা দৃঢ় ও বদ্ধমূল হইবে। সেশ্বরবাদীরা আর একটী অভিনব যুক্তির অবতারণা করেন। তাঁহাদের মতে, কর্ম্ম নিজে নিজের ফল দিতে পারে না; যিনি কর্ম্মের বিচার করিয়া ফল দেন, তিনিই হচ্ছেন ঈশ্বর। প্রতিবাদী বলেন যে, কর্ম্মই তাহার ফল দিবে; তাহার জন্য ঈশ্বর স্বীকারের আবশ্যকতা নাই। কারণ, অধিষ্ঠাতা নিজের উপকারের জন্যই অধিষ্ঠাতা হন, ইহাই সচরাচর দেখা যায়। এরূপ হইলে ঈশ্বরের কোন না কোন উপকার সাধিত হয় ইহাই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ঈশ্বরের উপকার হয় ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তাঁহাকে সংসারী জীব ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। ঈশ্বর যদি সংসারী হন তাহা হইলে তিনি দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন না। যদি বলা যায় এইরূপই ঈশ্বর স্বীকার করিব, তাহা হইলে এই বলিতে হয় যে, আপনাদের 'ঈশ্বর' এই আখ্যাটী জীববিশেষের সংজ্ঞামাত্র; কারণ, তিনি যখন উপকারপ্রার্থী তখন অপূর্ণ-কাম। আর এক কথা—সংসারী জীবের কখনও ইচ্ছা অপ্রতিহত হইতে পারে না; সুতরাং তাঁহার নিত্য ঐশ্বর্য্যও থাকি পারে না

এক কথায় ঈশ্বর বলিতে যাহা বুঝা যায়, তিনি তাহা নন। কোন বিষয়ে উৎকট ইচ্ছা না থাকিলে লোকে সেই বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হয় না। আর যার তাদৃশ ইচ্ছা আছে তাহাকে মুক্ত বলা চলে না। ঈশ্বরের যদি রাগ না থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে কর্ম্মের ফলদাতা বলা চলে না। আর রাগ থাকিলে তাঁহাকে মুক্ত বলা চলে না। আর ফলদাতারূপে স্বীকার না করিলে তাঁহাকে মানিবার কোন যুক্তির সন্ধান মিলে না। শ্রুতি স্পষ্টই প্রধানের সৃষ্টি-কর্তৃত্ব ঘোষণা করিতেছেন; তখন ঈশ্বর মানা নিতান্ত অসঙ্গত। এখন আপত্তি হইতে পারে যে, কোন কোন শ্রুতি বেশ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, চেতনই জগতের কারণ। সেই সকল শ্রুতির গতি কি হইবে? ইহার উত্তরে নিরীশ্বরবাদীর বক্তব্য এই যে, সেই সকল শ্রুতি মহত্তত্ত্বোপাধিক মহাপুরুষের জন্য জ্ঞানের সাক্ষ্য দিতেছেন। এই হইল প্রাচীন নিরীশ্বর সাংখ্যবাদীদিগের অভিপ্রায়।

এখন সেশ্বর সাংখ্যের কথার আলোচনা করা যাউক্। সেশ্বর সাংখ্যবাদীরা এখন অনুমানের সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাধন করিতেছেন। তাঁহাদের মতে, যে সকল পদার্থের তারতম্য আছে তাহাদের কোন একটী ব্যক্তি উৎকর্ষের চরম সীমা প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানের তারতম্য দেখা যায়; যেমন, কাহারও জ্ঞান বর্ত্তমান দ্রব্যবিষয়ক, কাহারও জ্ঞান বর্ত্তমান ও অতীত দ্রব্যবিষয়ক, কাহারও জ্ঞান স্থূলবিষয়ক, কাহারও সূক্ষ্মবিষয়ক, কাহারও অতীন্দ্রিয়বিষয়ক, কাহারও ত্রিকালের অল্পদ্রব্যবিষয়ক ইত্যাদি। প্রত্যেক মনুষ্যেরই তম-এর পরিমাণ বিভিন্ন; সুতরাং প্রত্যেকেরই জ্ঞান তারতম্য-যুক্ত। পরিমাণের তারতম্য দেখা যায়; এবং পরিমাণও বৃদ্ধির চরম সীমা লাভ করিয়াছে; যেমন পরম মহৎ পরিমাণ। জ্ঞানও চরম উৎকর্ষ লাভ করিবে। যাঁর জ্ঞান হইবে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তিনিই হইবেন ঈশ্বর। এইরূপ অনুমানের বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে, গুরুত্ব প্রভৃতি গুণও এইরূপ হউক্। ইহার উত্তরে মিশ্র বলিতেছেন যে, গুরুত্ব প্রভৃতি গুণের তারতম্য হয় না। কারণের গুরুত্ব ও কার্য্যের গুরুত্ব একই; সুতরাং অনুমানের কোনরূপ দোষ সম্ভবপর হয় না। দেখা গেল যে, অনুমান দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়। অতএব আপত্তিকারীর প্রথম আপত্তি বিচারসঙ্গত নহে যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সাধক কোন প্রমাণ নাই। এখন নূতন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বুদ্ধ আর্হত কপিল প্রভৃতি সর্ব্বজ্ঞ থাকিতে পৃথক্ ঈশ্বর স্বীকারের আবশ্যকতা কি? সেশ্বর-বাদী ইহার উত্তরে বলিবেন, বুদ্ধ ও আর্হতকে আমরা সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া মানিতে পারি না; কারণ, তাঁহাদের ক্ষণিকবাদ, নৈরাত্ম্যবাদ, স্যাদ্বাদ প্রভৃতি আমাদের কাছে বিচারসহ বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহাদের প্রোক্ত আগম আমাদের ভাষায় আগমাভাস। কপিলের সর্ব্বজ্ঞতা লাভ যাঁহার দয়ায়, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহাকেই আমরা ঈশ্বর বলি। এই ঈশ্বরবিষয়ক অনুমান দ্বারা আমরা তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারি না, শুধু সামান্যভাবে জানিতে পারি। বিশেষ ভাবে তাঁহার সম্বন্ধে জানিতে হইলে আমাদের শাস্ত্রের শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন আর কোন উপায় নাই।

বায়ুপুরাণে মহেশ্বরের ছয় প্রকার অঙ্গের কথা বলা হইয়াছে; যথা—সর্ব্বজ্ঞতা, তৃপ্তি, অনাদিবোধ, স্বতন্ত্রতা, অলুপ্তশক্তি ও অনন্তশক্তি। সেখানে তাঁহার দশ ঐশ্বর্য্যেরও সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে অনুমান বা প্রত্যক্ষের প্রবেশ নাই। অকুণ্ঠশক্তি শাস্ত্র যাহা বলিবেন, তাহাই অবনত-মস্তকে মানিয়া লইতে হইবে।

এখন দ্বিতীয় আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন যে, প্রাণীর উপকারই ঈশ্বরের প্রধান লক্ষ্য। শব্দাদির উপভোগ ও বিবেক-সাক্ষাৎকার দ্বারা জীবজাত যাহাতে মুক্ত হয় তাহার জন্যই বিশ্বেশের এই বিশ্ব-রচনা। ভগবান্ নিত্য-তৃপ্ত; সুতরাং তাঁহার নিজের অভিলষিত বস্তু প্রাপ্তির জন্য এই বিশ্ব-রচনা নহে।

এখন একটী আপত্তি হইতে পারে যে, ঈশ্বর যদি এই দুঃখ-বহুল জগৎ সৃজন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কিরূপে দয়ার আধার হন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, চিত্তের বিবেক সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত জীবকে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। ভগবান্ সেই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির জন্য শাস্ত্রোপদেশ দেন ও সুখ-দুঃখ ভোগ করাইয়া মুক্তির পথে লইয়া যান। শব্দাদির উপভোগ ও বিবেক-সাক্ষাৎকার উভয়ই অবশ্য কর্ত্তব্য। বিজ্ঞান ভিক্ষু বিজ্ঞানামৃত ভাষ্যে সেশ্বরবাদের আরও গূঢ় রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন। সেইগুলির দুই একটীর আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তাঁহার মতে, জগৎ-সৃজনে ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও তিনি জগৎ সৃজন করিয়াছেন।

এই জগৎ-সৃজন তাঁহার উন্মত্ততার প্রকাশ নহে, কিন্তু লীলার জ্ঞাপকমাত্র। লোকে যেমন কোন কিছুর অভাব না থাকিলেও কখনও কখনও কাজ করে, ঈশ্বরের বিশ্ব-রচনাও এইরূপ। ঈশ্বর অশরীরী; সুতরাং তাঁহার কোনরূপ চেষ্টার সম্ভবই নাই। তাহা ছাড়া তাঁহার কৃতিও নিত্য।

আর একটী সংশয় সততই মনে উদিত হয় যে, ঈশ্বর জগতে কাহাকেও সুখী, কাহাকেও দুঃখী করিয়াছেন; সুতরাং তিনি পক্ষপাতশূন্য ও করুণাপরায়ণ হইতে পারেন না। এক কথায়, তাঁহার রাগ ও দ্বেষ নাই বলা অসম্ভব। ইহার সমাধান এই যে, ঈশ্বর জীবের কর্ম্মানুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করান। সুতরাং রাগ ও দ্বেষের কথা উঠিতেই পারে না। তাহা ছাড়া, পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, তাঁহার কৃতি নিত্য; সুতরাং সৃষ্টি-কার্য্যে রাগ-দ্বেষের কোনও স্থান নাই। এখন আর এক নূতন বিপত্তির আবির্ভাব দেখা দিতেছে যে, ঈশ্বর যদি কর্ম্মের সাহায্যে সৃষ্টি-কার্য্যে ব্রতী হন, তাহা হইলে তিনি পরাধীন হইয়া পড়েন—তাঁহার স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, সেই কর্ম্মটীও তাঁহার কার্য্য ও শক্তি-স্বরূপ; সুতরাং তাহার সাহায্য লইলে তিনি পরাধীন হন না। এরূপ উত্তর দিলে প্রশ্নের মীমাংসা হয় না; বরং পূর্ব্বকার প্রশ্নই থাকিয়া যায় যে, ঈশ্বর নিরপেক্ষ ও দয়াময় নহেন। কারণ, তিনি ওইরূপ কার্য্য না করাইলেই পারিতেন। ইহার উত্তরে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, কর্ম্মপ্রবাহ অনাদি; সুতরাং ফলদায়ী কর্ম্মের পূর্ব্ব কর্ম্মের সাহায্য লইয়া তিনি এই কর্ম্ম করাইয়াছেন। আর কর্ম্ম-প্রবাহ অনাদি না স্বীকার করিলে, কৃতের বিনাশ ও অকৃতের আগমন রূপ দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। আর এক কথা—রাজা যেমন সেবাপরায়ণ ভৃত্যের অনুগ্রহ ও দুষ্টের নিগ্রহ করিয়া স্বতন্ত্র হইয়া থাকেন, সেইরূপ ঈশ্বরও ভক্তের পালন ও অশিষ্টের শাস্তি বিধান করিয়া স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন রাখেন। এখন দেখা গেল যে, সেশ্বরবাদও বেশ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। নিরীশ্বরবাদের যুক্তিহীনতা উক্ত বাদের সমালোচনার সময় বেশ পরিস্ফুট হইবে।

এখন দেখা যাউক্, পাতঞ্জল দর্শনের ঈশ্বর কিরূপ। যাঁহার অবিদ্যা প্রভৃতি ক্লেশ, সুখ-দুঃখ-দায়ক কর্ম্ম, জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ এবং জাত্যাদির অনুকূল বাসনার সহিত ত্রিকালেও সম্পর্ক নাই, সেই পুরুষ-বিশেষই ঈশ্বর। বস্তুতঃ, কোন পুরুষেরই উক্ত বিষয়গুলির সহিত সম্বন্ধ নাই। তাহা হইলে এরূপ একটী পুরুষ স্বীকার নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সত্য বটে, কোন পুরুষেরই সহিত অবিদ্যাদির পারমার্থিক যোগ নাই; কিন্তু আরোপিত সম্বন্ধে অবিদ্যাদির সহিত জীবের আছে, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরের এই আরোপিত সম্বন্ধও নাই। ইহাই হইল বৈশিষ্ট্য। আর মুক্তাত্মাদের পূর্ব্বে এরূপ আরোপিত সম্বন্ধ ছিল কিন্তু ঈশ্বরের অতীতেও ছিল না, বর্ত্তমানেও নাই এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে না—ইহাই হইল পার্থক্য। সংক্ষেপে বলিতে হইলে, ঈশ্বর সর্ব্বদাই মুক্ত ও সদাই ঈশ্বর।

এখন দেখা যাউক্, ঈশ্বরের জ্ঞানক্রিয়াশক্তি সম্পদৈশ্বর্য্য কিরূপে সম্ভবপর হয়। চিচ্ছক্তি অপরিণামী—তাহার পরিণাম জ্ঞানক্রিয়া বলা যাইতে পারে না। বাধ্য হইয়াই বলিতে হয় যে জ্ঞান ও ক্রিয়া রজস্তমোগুণরহিত বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ পরিণত চিত্তের আশ্রিত। ঈশ্বরের অবিদ্যাজনিত উৎকৃষ্ট চিত্তসত্ত্বের সহিত স্বস্বামিভাব সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। অবিদ্যার সহায়তা ব্যতীত চিত্তসত্ত্বের পরিণাম হইতে পারে না। আর নিত্যমুক্ত ঈশ্বরের সহিত অবিদ্যার কোনরূপ সংস্পর্শ হইতে পারে না। কিরূপে ঈশ্বরের চিত্ত সম্ভবপর হয়? আর এই চিত্ত না থাকিলে সংসার-দুঃখত্রয়-মগ্ন জনগণকে জ্ঞান ও ধর্ম্মের উপদেশ দিয়া উদ্ধার করা ভগবানের পক্ষে অসম্ভব। জ্ঞান ও ক্রিয়ার যদি সামর্থ্য মন্দ হয়, তাহা হইলেও উপদেশ নিরর্থক হইয়া পড়ে। আর জ্ঞান ও ক্রিয়ার উৎকৃষ্ট সামর্থ্য বিশুদ্ধ সত্ত্বময় চিত্ত গ্রহণ ভিন্ন হয় না। সুতরাং ভগবান্ বিশুদ্ধ সত্ত্বমাত্র গুণময় চিত্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন। এইরূপ চিত্ত গ্রহণের ফলে ভগবান্ অবিদ্যাক্রান্ত হন না; যেহেতু, যাহারা অবিদ্যার স্বরূপ জানে না তাহারাই অবিদ্যাক্রান্ত হয়। ভগবান্ অবিদ্যার স্বরূপ জানেন এবং অবিদ্যাভিমানীর ন্যায় কার্য্য করেন। যেমন কোন নট রামচন্দ্রের অভিনয় দেখাইবার সময় আপনাকে প্রকৃত রাম বলিয়া মনে করে না। এখন আর একটী জটিল সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে যে, ভগবান্ জগদুদ্ধারের ইচ্ছায় চিত্ত গ্রহণ করেন; কিন্তু চিত্ত গ্রহণ না করিলে ত আর সেই ইচ্ছা উদিত হয় না; কারণ ইচ্ছা চিত্তের ধর্ম্ম। দেখা যাইতেছে, এই বলিলে পরস্পরাশ্রয় রূপ দোষ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। ফল কথা, এইরূপ দোষ সংসারকে আদি বলিয়া স্বীকার

করিলে ঘটে বটে, কিন্তু সংসার-প্রবাহ অনাদি—পূর্ব্বকল্পের ধ্বংসকাল উপস্থিত হইলে ঈশ্বর ইচ্ছা করেন যে, এই প্রলয় কালের অবসানে আগামী কল্প-সৃষ্টির অব্যবহিত পূর্ব্বে যেন বিশুদ্ধ সত্ত্বময় চিত্ত পরিণত হয়। ঈশ্বরের প্রণিধানের ফলে সেইরূপ চিত্তও পরিণত হয়; যেমন কোন বালক রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে যদি প্রণিধানপূর্ব্বক ভাবে যে তাহাকে কাল প্রাতে উঠিতেই হইবে, তাহা হইলে সে প্রণিধান সংস্কারের বলেই প্রাতে উঠে। ঈশ্বরের চিত্তেরও প্রকৃতিতে লয় হয়, কারণ প্রলয় কালে কোন প্রাকৃত বস্তু প্রকৃতি লয় ব্যতীত থাকিতে পারে না।

এখন দেখা যাউক্ ঈশ্বরের এই উৎকর্ষের কোনও প্রমাণ আছে কি না। যদি বল শাস্ত্র, তাহা হইলে শাস্ত্রের প্রামাণ্য কিরূপ ভাবে জানিতে পারা যায়? ইহাও বলিতে পারা যায় না যে, শাস্ত্র ঈশ্বর-নির্ম্মিত বলিয়া প্রমাণ; কারণ, রচয়িতার নিজ-রচিত গ্রন্থে নিজের গুণ খ্যাপন অতিশয় বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, মন্ত্রায়ুর্ব্বেদের প্রামাণ্য অস্বীকারের উপায় নাই; কারণ, সকলেই সেই সমস্ত শাস্ত্রোক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ও প্রেপ্সিত অর্থ প্রাপ্ত হয়। এই সকল গ্রন্থ মনুষ্যের দ্বারা লেখা সম্ভবপর নয়; কারণ, লতা-গুল্মের পরস্পর সংযোগে-বিভাগে কিরূপ ফলাফল হয়, তাহা মনুষ্যে সহস্র সহস্র বৎসর-ব্যাপী চেষ্টার ফলেও অধিগত হইতে পারে না। সুতরাং ভগবানের রচিত বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। ভগবান্ উৎকৃষ্ট সত্ত্বগুণশালী; সুতরাং তিনি প্রবঞ্চক বা ভ্রান্ত হইতে পারেন, এইরূপ একটী শঙ্কা মনে উদিত হয় না। এই শাস্ত্র ও চিত্তপ্রকর্ষের সম্বন্ধ অনাদি। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের সমকক্ষ ঐশ্বর্য্য আর জগতে নাই। কারণ, দুইটী ঐশ্বর্য্য থাকিলে একের দ্বারা অন্যের পরাভব হইতে পারে; অথবা দুইজনের ইচ্ছা সমবল হইলে, ও বিরুদ্ধ ইচ্ছা স্থলে, কোন কার্য্যেরই উদয় হইবে না। সুতরাং দুইজন ঈশ্বর স্বীকার করা চলে না। আর দুই জনের একই ইচ্ছা সর্ব্বদা হইলে দুইটী ঈশ্বর স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। এইরূপ বহুঈশ্বরবাদও যুক্তিসঙ্গত হয় না। যদি বল যে, ঈশ্বরেরা মিলিত হইয়া কাজ করেন, তাহা হইলে কাহাকেও ঈশ্বর বলা চলে না; যেমন বারওয়ারীর পূজা একের বলা চলে না। আর এইরূপ বহু ঈশ্বর স্বীকারের স্বপক্ষে কোনই যুক্তি পাওয়া যায় না; সুতরাং ঈশ্বর একই। ঈশ্বরই জগতের আদিতে বৃদ্ধ গুরুদের শিক্ষা দেন; কারণ তিনি কালের প্রয়োজনের অতীত।

এই ঈশ্বরের প্রতি কায়িক, বাচনিক ও মানসিক ভক্তি করিলে সমাধিলাভ অতি সত্বরই হয়। তাই এই ঈশ্বর চিন্তন করিলে আত্মলাভ সহজসাধ্য হয় ও আত্মলাভের অন্তরায় বিদূরিত হয়। পাতঞ্জল দর্শনে ঈশ্বরের স্থান আছে সত্য; কিন্তু তাহা অতিশয় অপ্রশস্ত। ঈশ্বর-জ্ঞান মুক্তির অন্তরঙ্গ নহে, বহিরঙ্গ মাত্র।

তাহা হইলেও নিরীশ্বর সাংখ্য অপেক্ষা সেশ্বর সাংখ্যবাদ শ্রেয়ান্; কারণ, আমরা বুঝিতে পারি না যে, অচেতন প্রকৃতি কিরূপে চেতনের সাহায্য ভিন্ন নিপুণ শিল্পীর কল্পনার অতীত এই বৈচিত্র্যময় জগৎ প্রসব করে। মৃত উর্ণনাভের তন্তু-বয়ন কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি? চেতনের সহায়তা ব্যতিরেকে অচেতন প্রকৃতির কিরূপেই বা প্রবৃত্তি সম্ভব হয়। জড়-রথ অশ্ব প্রভৃতি চেতনের সাহায্য ব্যতিরেকে কখনও স্পন্দনশীল হয় না। যদি বলা যায়, জল যেমন আপনিই নিম্নগামী হয়, গরুর দুধ যেমন আপনি বৎসের পুষ্টির জন্য ক্ষরিত হয়, তেমনই প্রকৃতির প্রবৃত্তি হয়, প্রকৃতি সেইরূপ স্বতঃই জগৎ প্রসব করে,—ইহাও বলা চলে না, কারণ উক্ত দৃষ্টান্তগুলিই অপর পক্ষের বিবাদের স্থল। সুতরাং ঐগুলির দ্বারা দৃষ্টান্তকার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। প্রধান একাকীই জগতের কারণ হইতে পারে না। কারণ, বহু কারণ-সমূহ সংগ্রহ করিয়াই কুম্ভকার ঘটাদি নির্ম্মাণ করে। দুগ্ধ প্রভৃতিও বাহিরের শৈত্যাদি কারণকে অপেক্ষা করিয়া পরিণত হয়। সুতরাং অসহায় প্রধান পরিণত হইতে পারে না। ধেনুপভুক্ত তৃণাদিও স্বতই দুগ্ধাকারে পরিণত হয় না—ধেনু প্রভৃতিকে অপেক্ষা করে; কারণ ষণ্ডোপভুক্ত তৃণাদির কোনই পরিণাম দেখা যায় না। প্রধান ব্যতিরিক্ত অন্য কোন কারণ স্বীকার করিলেও প্রধান পরিণত হইতে পারে না; কারণ অচেতনের নিজের কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না। যদি বলা যায়, উটেরা যেমন প্রভুরই জন্য ভার বহন করে, সেইরূপ প্রকৃতিও পুরুষের জন্য পরিণত হয়, তাহা হইলে ইহা বলা যাইতে পারে যে, উটেরা শুধুই প্রভুর জন্য ভার বহন করে না; কিন্তু তাহাদেরও স্বার্থ আছে—চালকের প্রহারের হাত হইতে বাঁচা। ধরা গেল, প্রকৃতির পরার্থই প্রবৃত্তি; কিন্তু তাহা

হইলেও বুঝা যায় না, সত্বাদি গুণ কিরূপে আপনাআপনিই অঙ্গী হইয়া মহদাদি রূপে পরিণত হয়। এইরূপ পরিণাম স্বীকার করিলে সদা সর্ব্বদাই পরিণামের স্রোতঃ চলিবে। যাহা হউক, পরমেশ্বরকে বাদ দিয়া প্রকৃতির প্রবৃত্তি ও পরিণাম অসম্ভব।

এখন দেখা যাউক্, যোগ-দর্শনের ঈশ্বরবাদ আমাদের রুচিসঙ্গত হয় কি না। যোগ-দর্শনে ঈশ্বরের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ সত্বময়। ইহা কিরূপে সম্ভবপর হয়? কারণ, প্রকৃতির কার্য্যমাত্রই ত্রিগুণাত্মক। করণযুক্ত আত্মামাত্রই বদ্ধ। ঈশ্বর করণযুক্ত হইলে অবশ্যই বদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবেন। জীবের প্রলয়কালে বিনাশ হয়; কারণ, তখন বুদ্ধি প্রকৃতিতে লীন হয়। ঈশ্বরের বুদ্ধিও প্রকৃতিতে লীন হয়; সুতরাং ঈশ্বরেরও নাশ স্বীকার করিতে হয়। ঈশ্বরের কৃতি বা ইচ্ছা নিত্য বলা যায় না; সুতরাং প্রলয় কালে থাকে না। কি করিয়া সেই ইচ্ছা সৃষ্টির পূর্ব্বে অভিব্যক্ত হয় ও ঈশ্বরের অন্তঃকরণের আবির্ভাব সম্পাদনে সমর্থ হয়? কখনও কেহ কর্ত্তা হইতে করণের উৎপত্তি হইতে দেখে নাই। সুতরাং ঈশ্বরের করণ পাওয়া দুর্ঘট। ঈশ্বরের প্রলয় কালে কোন জ্ঞান থাকে না; সুতরাং তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন না। সর্ব্বজ্ঞ না হইলে তাঁহাকে আমাদের মত জীব ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। এইরূপ ঈশ্বর করিলে আরও বিপদ্ আছে—শ্রুতির সহিত বিরোধ অপরিহার্য্য। শ্রুতি বলেন, 'ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে' ইত্যাদি। ঈশ্বরের করণ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। অতএব দেখা গেল, পাতঞ্জল-দর্শনের ভোগী ঈশ্বর ক্লেশকর্ম্মাদির অপরামৃষ্ট হইতে পারেন না।

শিশু

শ্রীবিমলা দেবী

নিশিদিন মোর গৃহ আঙ্গিনার পরে
চঞ্চল চরণ কার নূপুর ঝঙ্কারে;
চপল দখিণা বায়ু সৌরভ চঞ্চল
এসে এসে ফিরে যায় স্খলিত অঞ্চল;
কোমল দুখানি কর ছোট মুটিখানি
সর্ব্ব কর্ম্মে অবসরে করে টানাটানি;
মনে যেন হয় কোন কাকলী ঝঙ্কার
শিশু-কণ্ঠ ঝঙ্কারিত অচেনা আমার
অনাগত অতিথির। তৃষিত হৃদয়
শূন্য ক্রোড় শুদ্ধ গৃহে ফিরে ফিরে চায়।
ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া একাকী
কোলের দেবতা মোর ফিরে যায় ডাকি
যদি কোন শুভলগ্নে। যদি আনমনে
চরণের ধ্বনিখানি না বাজে শ্রবণে।
বসন্ত সৌরভ মুগ্ধ উতলা বনানি
তারি আগমনী ভাষা করে কানাকানি?
তাহারই বারতাখানি পড়িছে কি লেখা
শূন্য নভঃস্থল দীপ্ত সুবর্ণের রেখা!
রাতুল চরণ তার পরশের তরে
শেফালী বকুল আজি ধূলার উপরে
মরিয়া ঝরিয়া আছে; হে শিশু দেবতা,
বিশ্বের সকল ছন্দ সকল বারতা
তব আশা-পথ চাহি উঠিছে গুঞ্জরি
ব্যাকুল বসন্ত বায়ু ফিরিছে মর্ম্মরি
চরণের চিহ্ন খুঁজি। ব্যাগ্র আলিঙ্গন
স্বপ্ন হ'তে স্বপ্নে ফিরে ব্যর্থ অন্বেষণ॥

উত্তরায়ণ

শ্রীঅনুরূপা দেবী

১৯

হৈমন্তিক মধ্যাহ্নে চারিদিক সুপ্রসন্ন, অপ্রসন্ন শুধু একমাত্র সলিলের মুখখানা। উজ্জ্বল রৌদ্রে গা মেলিয়া দিয়া পশু-পক্ষী, এমন কি, সমস্ত উদ্ভিদ-জগৎটা-শুদ্ধ যেন নিশ্চিন্ত আরামে নাতিশীতোষ্ণ দিনটাকে অন্তর দিয়া উপভোগ করিতেছিল। বড় বড় গাছগুলা ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে আকাশের কিরণোজ্জ্বল মৃদু সঞ্চরমান মেঘগুলাকে দেখিতেছে। তাদের পায়ের কাছে তাদেরই দীর্ঘ দেহের অনতিদীর্ঘ ছায়া, আর তারই মধ্যে লম্বা চৌকা, গোল, বাদামী, ত্রিভুজ ইত্যাদি নানা আকারের জমিতে লাল নীল হলদে সাদা পাটকিলা এই সব এবং আরও অনেক রকম মিশ্র রঙের রং-বাহারে শীতের মরসুমি ফুল অপর্য্যাপ্ত পরিমাণেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাদের কোনটার গড়ন প্রজাপতির মতন, কোনটার নক্ষত্রের আকারে, আবার কেহ কৃত্রিম মোমের ও সোলার ফুলের মতই হাল্কা ও বৈচিত্র্যপূর্ণ।

সলিল গভীর নৈরাশ্যভরা এবং একান্তরূপে ভারাক্রান্ত চিত্ত লইয়া বাগানের বুকচেরা সরল দেবদারুর অনিবিড় ছায়াচ্ছন্ন পথটার উপর দিয়া অন্যমনস্ক ভাবে অনবরত যাওয়া আসা করিতে লাগিল। তার মনের মধ্যটা যে কতটাই বিপর্য্যস্ত হইয়া রহিয়াছে, তার এই চিন্তাচ্ছন্ন বিহ্বল মূর্ত্তিটাই তার সর্ব্ব প্রধান সাক্ষী স্বরূপ হইয়া রহিয়াছিল।

আমরা যাহাকে চাই তাহাকে পাইবার আগেই নিজে তার কাছে ধরা দিয়া ফেলি,—সে আমার না হইতে আমি তার হইয়া যাই। তাই যখন জানিতে পারি যে, সে আমার এই দুর্ব্বলতার ফাঁক পাইয়া আমায় ফাঁকি দিয়াছে,—আমাকে সে ত কিছুই দেয় নাই, এমন কি, আমার দানগুলাকেও সে কোন দিনই হয় ত তুলিয়া লইয়াও তাদের সার্থকতা দেয় নাই,—তখন সব চেয়ে বেশি করিয়া আমরা বিস্মিত হই যে, এত বড় ফাঁকিটা কেমন করিয়াই আমাদের চোখ এড়াইয়া গেছে!

সলিল অনেকবার বারে-বারেই এই কথাটা মনে করিয়াছে। আরতি তাকে হয় ত কোন দিনই ভালবাসে নাই। যে সব কথা সে শুনিয়াছিল, সে সকল হয় ত তার দিদিরই মনের কল্পনা মাত্র! সম্ভব,—তাই সম্ভব, খুবই এটা সম্ভব বটে! সুন্দরা আরতিকে নিজে ভালবাসিয়াছিল, সেই ভালবাসার চক্ষে সে তার সবই ভাল দেখিয়াছিল,—ভাল দেখিতে চাহিয়াছিল। আসলে সত্য সত্যই সে অত ভাল নয়। না নিশ্চয়ই না,—ভাল যদি হইত, সলিলকে ভাল যদি সে সত্যই বাসিত, এত বড় দুঃখ তাহাকে সে দিতে পারিত না। নিজেকে এমন করিয়া বিপদ-সমুদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া দিয়া তার উপরে প্রতিশোধ তুলিতে

পারিত না। কখনও পারিত না। সে কি বুঝিতে পারিল না যে, কতবড় প্রচণ্ড আঘাত সে তাহাকে দিল ?

সলিল একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করিল। এই জন্যই পুরাণ-কালের শাস্ত্রবিধিতে নারীর স্বাতন্ত্র্য নিষিদ্ধ। আরতি এর আগের দিনের মেয়ে হইলে এমন করিয়া স্বাতন্ত্রিকতার ভরসা করিত না,—সে আর একটুখানি সেকেলে হইলে নিশ্চয়ই তার বাপের বাগ্‌দানকে গ্রাহ্য করিয়া নিজেকে সলিলেরই স্ত্রী মনে করিত। সলিলকে সে কোনমতেই ত্যাগ করিবার কথা ভাবিতে পারিত না। হায় রে সেকাল! সলিল ও আরতি যদি সেকালের মানুষ হইত!

সাইকেলে চড়িয়া লাল-পাগড়ী-বাঁধা একটা টেলিগ্রাফ পিওন গেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। ভ্রাম্যমান গৃহস্বামীকে দেখিতে পাইয়া, সে কাছে আসিয়া, তার হাতে একখানা টেলিগ্রামের খাম দিয়া, রসিদ সই করার জন্য পেন্সিল বাহির করিল।

সই দিয়া খাম ছিঁড়িয়া সলিল টেলিগ্রামে যে খবর পাইল, তাহা এই—

আরতি এবং মঞ্জু এক সঙ্গে কঠিন টাইফয়েডে শয্যাগত, জীবনের আশা কম, যদি অনুগ্রহ করিয়া একবার আসেন।

তলায় মাধবী মুস্তোফির নাম ঠিকানা দেওয়া ছিল।

সলিলের সমুদায় চিন্তাধারা এক মুহূর্ত্তেই যেন তাদের গতিপথ বদলাইয়া ফেলিয়া ভিন্নমুখী হইয়া দাঁড়াইল। আরতি কঠিন রোগে শয্যাশায়ী! জীবনের আশা তার কম! হয় ত সেই তাকে মাধবীর মধ্য দিয়া ডাকিয়া পাঠাইয়াছে! আরতি! আরতি! সেই যদি ডাকিলে দুদিন আগে কেন ডাকিলে না? এখন কি এই ক্ষীণআশাময় জীবনের সন্ধিক্ষণে—না না এখনও হয় ত সময় আছে, এখনও হয় ত সলিল তাকে প্রাণপণ যত্নে সেবায় সাহচর্য্যে বাঁচাইয়া জীয়াইয়া তুলিতে পারিবে! হ্যাঁ পারিবে বই কি! নিশ্চয় পারিবে। যদি না পারে, তার এই বুকভরা প্রাণঢালা অকৃত্রিম প্রেমই মিথ্যা!—

মাকে গিয়া বলিল, "বিশেষ দরকারে পশ্চিমে একবার যেতে হচ্চে, আজই বেরুতে হবে। ফিরতে হয় ত দিন পনের হ'তে পারে।"

কোথায় এবং কেন, এই দুটি অবশ্য-জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন মাও জিজ্ঞাসা করিলেন না, ছেলেও বলিল না; কিন্তু এই না বলা ও না বলানর মধ্যেকার অপরাধ ও অভিমান দুজনকেই সমান করিয়া পীড়ন করিল। এর আগে কোন দিনই তাদের মাতাপুত্রের মধ্যে অতি তুচ্ছ কথারও একটা আড়াল ছিল না, আর আজ এত বড় ব্যবধানের সৃষ্টি বেশ সহজেই হইয়া উঠিতে পারিয়াছে, এ দেখিয়া দুজনেই মনের মধ্যে সমান ভাবেই বিস্ময় এবং বেদনা বোধ করিলেও, একজনও ইহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চেষ্টা বা যত্ন করিল না। সলিল নিজের মনের অশান্তিতে মুহূর্ত্ত পরেই সে ভাবনা ভুলিয়া গেল, আর মহামায়া নিবিড় অভিমানে নীরবে দগ্ধ হইতে থাকিলেন।

সলিল যখন মাধবীর ক্ষুদ্র বাসাবাড়ীতে গিয়া পৌঁছিল, আরতির তখন মানুষ চেনার শক্তি লোপ পাইয়াছে। প্রবল জ্বরের ঘোরে অর্দ্ধ-আচ্ছন্ন অর্দ্ধ-চেতনবৎ থাকিয়া সে অনর্গল প্রলাপ বকিতেছিল। চোখ দুটী তার তন্দ্রাচ্ছন্নের মত আধ-খোলা আধবোজা হইয়া আছে। কখনও কখনও সে তার মাতালের মত ঘোলা ও রাঙ্গা চোখ খুলিয়া ভয়ার্ত্ত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া যেন কাহাকে খুঁজিতেছিল। মধ্যে মধ্যে সেই সঙ্গে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছিল,—

"ও বাবা! এ কি ঠাণ্ডা হয়ে গ্যাছো! বাবা! বাবা! এ কি করে গেলে?"

কখনও চীৎকার করিয়া বলিতেছিল—"মঞ্জু! মঞ্জু! তুইও আমায় ফেলে চলে গেলি! তোকে যে বাবা আমার হাতে দিয়ে গেছলেন, আমি তো রাখতে পারলুম না!"

কখনও আর্ত্তস্বরে কাঁদিতে থাকে—"ওরে আমার মাণিক! ওরে আমার সোনা! কত দুঃখ পেয়েই যে তুই চলে যাচ্চিস্! আমি এমনই অভাগী দিদি তোর, তোকে শুধু দুঃখ সইতে দিয়ে মেরে ফেল্লুম! আমি কি করে মরবো গো! মঞ্জুর আগে আমি কি করে মরবো!"

সলিল আড়ষ্ট কাঠের মত বসিয়া আরতির মাথায় আইসব্যাগ ধরিয়া থাকিয়া স্পন্দিত বেদনায় স্তব্ধ হইয়া তার এই বিলাপময় প্রলাপ শুনিত; আর তার চোখ দিয়া আপনা হইতেই হুহু করিয়া জল পড়িতে থাকিত। মাথা তার এক দণ্ড বালিসে থাকে না, অস্থির চাঞ্চল্যে সমস্ত দেহ ক্ষণে ক্ষণে আকুঞ্চিত, ক্ষণে ক্ষণে প্রসারিত হইতে থাকে। সমস্তক্ষণ সে কখনও কাঁদে, কখনও বকে। স্থির এক দণ্ডও হয় না।

মধ্যে মধ্যে আপন মনে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে আরতি যখন গান গায়, সলিলের বুকের মধ্যে যন্ত্রণার আঘাত যেন তার সঙ্গে

তাল বাজায়। সে গান কি? সেই মুহুরির বড় সুখের দিনেরই সেই পূর্ব্বশ্রুত সঙ্গীত!

"বঁধু হে! ধর হে পর হে—" "এসেছি তোমারে বঁধু দিতে উপহার" আবার কখনও বলে—"দিয়ে ত ছিলেম, আজও তো দিয়েই রেখেছি আমি,—তুমিই তো নিতে পারলে না, আমার কি দোষ! না না,—সে হবে না। সে আমি পারবো না, ওঃ মার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে, তাঁর অভিশাপ মাথায় করে, অসম্ভব! কাঙ্গাল হয়েছি, ইতর তো হই নি।"

আবার সহসা কাঁদিয়া উঠিয়া বলে, "কিন্তু তাহলে মঞ্জুকে আমি বাঁচাবো কেমন করে? তাঁকে দুঃখ দিয়ে বিদায় দিয়েছি, তাই বুঝি ভগবান আমায় তার শোধ দিচ্চেন? ওগো তুমি ফিরে এস, আমি কি ইচ্ছে করে তোমার সঙ্গে যাই নি? আমার কি তোমায় ত্যাগ করতে বুক ভেঙ্গে যায় নি? শুধু তোমার জন্যেই তোমায় ছেড়েছি যে।"

সলিলের আর সহ্য করার শক্তি রহিল না, সে তার হাতের বরফ-ভরা থলিটা ফেলিয়া দিয়া দুই হাতে রোগিনীর প্রবল-জ্বরোত্তপ্ত শীর্ণ হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া গভীর স্বরে কহিয়া উঠিল—"আরতি! আরতি! এই যে আমি এসেছি,—তুমি আমায় ত্যাগ করলেও আমি করিনি,—তুমি ভাল হয়ে ওঠো, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

আরতি ঈষৎ যেন বুঝিল। সে তার আচ্ছন্ন অলস নেত্র মেলিয়া বারেক পূর্ণ চক্ষে তাহার মুখের দিকে চাহিল। ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া তার পর ঈষৎ শান্ত প্রসন্ন ভাবে মৃদু হাসিয়া আত্মগতই কহিল,—

"স্বপন তো ক্রমাগতই দেখি,—কিন্তু যখনই দেখি, সেই কাতর করুণ মুখই দেখতে পাই,—দেখে এত কষ্ট হয়,—আজ কিন্তু সে রকম নয়।"

সলিল ব্যগ্র হইয়া কহিল,—"স্বপ্ন নয় আরতি, আমি সলিল। আমি তোমার কাছে ফিরে এসেছি। আমায় চিনতে পারচো না?"

আরতি অবাক্ নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া মৃদু মৃদু হাসিল, ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "চিনতে পেরেচি বই কি,—তুমি তো মিঃ সেন নও, মিঃ গুপ্ত,—তুমিই তো সেদিন রাত্রে সেই গানটা গাইছিলে না?—'I love you love you dear Fanny.' Fanny না আরও কেউ! সে যে কার উদ্দেশের গান সে না কি আর আমি বুঝতে পারিনি?"

উচ্ছ্বসিত আবেগে এবার দুখানি হাত দু হাতে চাপিয়া ধরিয়া সলিল রুদ্ধকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "সবই যদি বুঝে থাক, তবে জেনে বুঝে অনর্থক কেন এত দুঃখ দিলে, কেন এত দুঃখ পেলে আরতি? যাক্, যা হ'বার হয়ে গ্যাছে,—এবার ভাল হয়ে আর আমায় তাড়িয়ে দিও না।"

আরতি আবার বাঁচিয়া উঠিবার পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল। সলিলের চেষ্টা-যত্ন, অকাতর সেবা ও অর্থ-ব্যয় ব্যর্থ হইল না। শ্রমক্লান্ত মাধবীকে সে অনেকখানিই বিশ্রাম দিয়া দুজন সুশিক্ষিতা নার্স রাখিল,—নিজেও তার যথাসাধ্য রোগশয্যার সান্নিধ্য ত্যাগ করিত না। ডাক্তার ও ঔষধ পথ্যের কোনই অপ্রতুলতা সে রাখিতে দেয় নাই। গরীব মাধবীর গৃহে লক্ষপতি সলিলকুমারের ভাবী পত্নীর উপযুক্ত ভাবেই সেবা ও চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

আরতির রোগ আরোগ্যের দিকে ফিরিল বটে, কিন্তু তার মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতায় তার বুদ্ধি বৃত্তি বেশ সতেজ হইতে যথেষ্ট সময় লাগিতে লাগিল। ডাক্তারেরা ভয় করিতে লাগিলেন, হয় ত উন্মাদ না হইলেও তার মাথার দোষ একটু থাকিয়া যাওয়াও অসম্ভব নয়, যদি না এই সময় হইতে তাকে খুব বেশি স্বাস্থ্যকর স্থানে রাখিয়া খুব বেশি সেবা-যত্ন এবং বিশ্রাম দেওয়া হয়।

সলিল মাধবীকে গিয়া ধরিল, বলিল, "আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে,—আমি মনে করচি আসানপুরে গঙ্গার উপর আমাদের যে বাংলোখানা আছে, তাইতেই আমি দিনকতক আরতিকে নিয়ে থাকবো। সেখানে শীতের সময় স্বাস্থ্যও খুব ভাল হবে, আর নির্জ্জনও খুব—বিশ্রামেরও কোনরূপ ব্যাঘাত হবে না। কিন্তু আপনি না গেলে মঞ্জুকে কে দেখবে বলুন?"

মাধবী এ প্রস্তাব অনুমোদন করিল না, সে কহিল,—"মঞ্জু একেই দুর্দ্দান্ত, তার উপর অসুখ থেকে উঠে দেখছেন ত কি রকম কাঁদুনে আর আবদারে হয়ে উঠেছে! ওকে সঙ্গে রাখলে আরতিদিদিকে সারিয়ে তোলা অসম্ভব। ও বরং আমার কাছে এখানেই থাকুক, আপনারা যান।"

সলিল হিসাব করিয়া দেখিল, মাধবীর কথা যুক্তিসিদ্ধ বটে, মঞ্জুর হাঙ্গামা আরতি একটু ভাল থাকিলে তার উপর গিয়া পড়িবেই; অথচ ডাক্তারের মতে তার জন্য সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে মঞ্জুকে তার সঙ্গে না লওয়াই সঙ্গত। অথচ এদিকে মঞ্জুর দিকে দেখিতে গেলে

তার পক্ষেও মাধবীর এই অস্বাস্থ্যকর গৃহ এবং সামান্য ভাবে থাকায় তার দ্রুত স্বাস্থ্যোদ্ধার হওয়া অসম্ভব। ভালরূপ দেখাশোনার অভাবে এখনও সে মোটেই সারিয়া উঠিতে পারে নাই। আজ ঘা, কাল ফোড়া, পরশু পেটের অসুখ, সর্দ্দি কাশি জ্বর তার রোজই লাগিয়া আছে। সর্ব্বদা খাই খাই করিয়া সকলকে অস্থির করে, বকুনি খায়, কাঁদিয়া চেঁচাইয়া অস্থির হয়। সলিলের করুণ চিত্ত বেদনায় টন টন করিতে থাকে। আহা, সেই আদরের দুলাল, ধনীর কুমার, স্নেহের পুতুল!

এমন সময় সুন্দরার পত্র আসিয়া তাহাকে উভয় সঙ্কট হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া বাঁচাইল।

সুন্দরা লিখিয়াছিল,—

"সব জানিলাম। আরতির সম্বন্ধে আমার কোন সাহায্য করার উপায় নেই সে তো তুমিও জানো, তার কোন খবর আমায় দিও না ভাই লক্ষীটী। তবে মঞ্জুর বিষয়ে আমি স্থির করেছি যে, যদি তুমি দরকার মনে করো, তাকে আমার কাছে কারুকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলে আমি তার সমস্ত ভার গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি। আমি মনে করবো আমারই সে পেটের ছেলে।"

শুনিয়া মাধবীও খুসী হইল। সে বলিল, "তাহলে সেই ভাল, একসঙ্গেই আমরা যাই চলুন, আমি বরং মঞ্জুকে দিদির কাছে পৌছে দিয়ে আসবো, আর আপনারা সেখানে যাবেন।"

সলিলের অনেক অনুনয়েও মাধবী কিছু দিনের জন্য তাদের সঙ্গে থাকিতে সম্মত হইল না। থাকিলে তার চলিবে না, ভ্রাতৃজায়া আসন্ন প্রসবা, তা'ছাড়া, পেসেণ্টরাও বিরক্ত হইবে। এ ছাড়া মাধবীর মনে আরও একটা ভয় ছিল—সেটা এই যে, তাহাকে সঙ্গে পাইলে নির্ব্বোধ আরতি হয় ত আবারও কি করিতে কি করিয়া বসিবে, তার চেয়ে তাকে সম্পূর্ণরূপে সলিলের হাতে ফেলিয়া দেওয়াই সঙ্গত। সলিলের চরিত্র ও আচার দেখিয়া তার সম্বন্ধে মাধবীর খুব বেশি উচ্চ ধারণাই জন্মিয়াছিল। তাই তাহার সঙ্গে আরতিকে একা পাঠাইতে সে দ্বিধামাত্র করিল না।

২০

অনেক দিনের পুরানো, কিন্তু সুসংস্কৃত পরিচ্ছন্ন বাংলোখানির অনতিদূরে গঙ্গার বালুময় তীরভূমি রূপার পাতের মতই ঝকঝক করিতেছে। সলিলের পিতামহের আমলে যখন দার্জ্জিলিং, সিমলা, জাপান, জার্ম্মানী বা ইংলণ্ডে এ দেশের ধনীকুলের হাওয়া খাইবার আস্তানা হইয়া উঠে নাই, তখন গঙ্গাতীরের এই সকল স্থানেই ধনীরা তাঁদের এক একটী বাগানবাড়ী তৈরি করিয়া রাখিতেন। কখন কখন সপরিবারে, কদাচ বা একা একা দু এক মাস এই সকল স্থানে থাকিয়া তাঁরা হাওয়া বদলাইয়া যাইতেন। রেলপথ যখন হয় নাই, এবং হওয়ার পরেও কিছুকাল পর্য্যন্ত, তাঁরা ট্রেনের পরিবর্ত্তে বজরা করিয়া জলপথেই প্রায় এ সব দিকে গমনাগমন করিতেন। নৌবিহারটাই তখনকার দিনের বিলাসী বড় লোকদের একটা প্রধানতম বিলাস ছিল। এর জন্য অবস্থা এবং রুচি অনুযায়ী মস্ত বড় বড় বজরা এবং তার সাজসজ্জারও তারতম্য হইত। দেবী চৌধুরাণীর বজরার সাজের কথা স্মরণ করিলেই এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত জ্ঞান লাভ করিতে পারা যাইবে। সেটা একেবারেই নিছক কল্পনা নয়।

আরতিকে লইয়া সলিল এইখানে আসিয়াই আশ্রয় লইল। সঙ্গে আসিল মাধবীর দেওয়া নূতন ঝি রজনী। এখানে আসিয়া স্থানীয় ডাক্তারের সাহায্যে সলিল সদর হইতে দিন পনেরর জন্য একটী নার্স আনাইয়া লইল। এমনই করিয়া তাদের ঘরকরণা আরম্ভ হইল।

অবস্থায় একজন মানুষই কতরকম হইয়া দাঁড়ায়। কাল যে রাজ্যেশ্বর রাজা ছিল, দশজনকে প্রসাদ, পুরস্কার বিতরণ করিয়া ধন্য করিয়াছে, আজ সে যদি পথের ভিখারী হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে সেই আবার অন্যের দ্বারে আঁচল পাতিয়া ভিক্ষার মুষ্টি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। কাল যে উগ্রমূর্ত্তি বিচারক বিচার-আসনে বসিয়া জ্বলন্ত দৃষ্টিতে অপরাধীর হৃদকম্প উপস্থিত করিয়াছিল, কাল সেই যদি অপরাধীর কাঠরায় শৃঙ্খল পরিয়া দাঁড়ায়, সেও তখন তেমনই করিয়াই বিচার-দৃষ্টির তলায় নত-মস্তকে দাঁড়াইয়া কম্পিত হইয়া উঠিবে। বস্তুতঃ মানুষ তার অবস্থা এবং ভাগ্যের হস্তেই নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে, সে তাকে যেমন করিয়া যে দিন গড়ে সেই মতই সে গঠিত হয়।

আরতির উপর দিয়া শোক ও রোগের যে প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া গিয়াছে, তাহাতে তাহাকে যেন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছিল। এখানের নূতন আশ্রয়ে সলিলের যত্নের প্রচুরতায়

সে আবার ধীরে ধীরে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতে লাগিল বটে, কিন্তু তার যে সুখ-সৌভাগ্যের দিন চির-অস্তমিত হইয়া গিয়াছিল, তার সেদিনকার প্রকৃতিকে এত ভোগ-সুখের মধ্যেও আর সে ফিরাইয়া পাইল না। তার দুর্ব্বল দেহ অতি ধীরে যেন মৃদু কুণ্ঠিত অনিচ্ছায় তার হৃত স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিতে লাগিল, কিন্তু ভাঙ্গা মনকে যেন কিছুতেই আর] সে জোড়া লাগাইতে পারিল না। সলিলের সকল চেষ্টা ও যত্ন সেখানে ব্যর্থ হইয়া যাইতে লাগিল।

মঞ্জুর কথা আরতি মুখে কিছুই বলে নাই, মনের মধ্যে কিন্তু তাহারই কথায় তার বুক ভরিয়া রহিয়াছিল। মঞ্জুকে যে সুন্দরার আশ্রয়ে রাখা হইয়াছিল, সে কথা সে জানিত না। সলিল সে কথা তাহাকে বলে নাই, কেন বলে নাই বলা যায় না। হয় ত বলিতে তার মনে পড়ে নাই, না হয় ত মঞ্জুর সম্বন্ধে আরতিকে আপনা হইতে কোন কথাই উত্থাপন করিতে না দেখিয়া এ সম্বন্ধে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া কথা কহিতে তার ভরসা হয় নাই। কে জানে, যদি তার ফলে মঞ্জুর কথা স্মরণে আসিয়া আরতির দুর্ব্বল শরীর মনে চাঞ্চল্যের আবেগ কুফল ফলাইয়া তোলে! তার চেয়ে সে যখন নিজ হইতে নীরব আছে, তখন সে সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট থাকাই ভাল।

আরতি কিন্তু ভুল বুঝিল। সে দেখিল, সলিল তার জন্য প্রাণপণ করিতেছে, তার স্বাস্থ্য, তার স্বাচ্ছন্দ্য যাহাতে অব্যাহত হয়, তার জন্য তার অর্থ ব্যয় এবং চেষ্টার এক বিন্দু ত্রুটী নাই; কিন্তু তার সেই অসহায় অনাথ ভাইটীকেও সে কি এই সঙ্গে আনিয়া এর মধ্য হইতে একটী বিন্দু অংশ দিলেও দিতে পারিত না? যখন এখানে তাহাকে আনা হয়, তার মাথার ঠিক ছিল না। তা যদি থাকিত, নিশ্চয়ই সে এমন অবিচারের দান গ্রহণ করিত না,—তার দুঃখী ভাইটীকে বুকে চাপিয়া সেইখানের মাটী কামড়াইয়াই পড়িয়া থাকিত। আহা, অত বড় রোগের হাত হইতে তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিয়া, এই যে তাকে তার একটী মাত্র আপনার জন হইতেও বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইল, এর নাম কি সুবিচার? একদিন এই সলিলই না বলিয়াছিল মঞ্জুকে সে নিজের ছোট ভাইয়ের মতই আদর করিয়া গ্রহণ করিবে? এই বুঝি সেই পণরক্ষা? উঃ! মানুষ এতবড় স্বার্থপর! এই ভাবিয়া আরতি গভীর অভিমানের আগুনে নীরবে দগ্ধ হইতে লাগিল। মুখ ফুটিয়া একটী কথাও সে বলিল না। কেবল তার বুকখানা তার জগতের এই একটীমাত্র প্রিয়তমকে হারাইয়া সেই বিচ্ছেদের দহনে ভস্ম হইয়া যাইতে লাগিল এবং সলিলের এত যত্ন, স্নেহ, আত্মত্যাগ সব কিছুকেই সেই দহনজ্বালার ইন্ধন স্বরূপ গ্রহণ করিতে থাকিয়া তার মনের মধ্যে বিরাগের আগুনকে প্রবলতর করিয়া তুলিল। সলিল কিন্তু তার এ মনোভাবের কিছুই জানিল না। সে শুধু অনুভব করিল, যে দৈব দুর্ব্বিপাক আরতির উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, আরতি আজও তাহার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। গভীর বিষাদের কালিমায় তার ললাট আজও মেঘাচ্ছন্ন হইয়াই রহিয়াছে। তার এত স্নেহ, এই অক্লান্ত পরিচর্য্যা, অপরিসীম আত্মত্যাগ কিছুই যেন তার সেই মেঘবাষ্পাচ্ছন্ন চিত্তদ্বারে পৌঁছিতেই পারিতেছে না।

সেও তাই বড় সন্তর্পণে, অতি সাবধানে আত্মসংযত হইয়া, যথাসাধ্য দূরে দূরেই রহিল। ঘুণাক্ষরেও সে তার অতুল ভালবাসার কথা, তার নিত্য-প্রতীক্ষিত আশাময় ভবিষ্যতের কথা কিছুই তার কানের কাছে তুলিয়া ধরিল না, পাছে সে মনে করে, তার এই শোক ও রোগের আক্রমণের আঘাত না সারিতেই স্বার্থপর পুরুষ তাহাকে নিজের আয়ত্তগত করিয়া ফেলিতে চায়। তাই সে বিপুল বলে নিজেকে সম্বরণ করিয়া রাখিয়া নীরব ধৈর্য্যে শুধু সময়ের প্রতীক্ষা করিতে থাকিল।

কিন্তু ইহারও ফল হয় ত ঠিক ভাল ফলিল না। রোগের ফলে এবং রোগজাত দুর্ব্বলতায় আরতির মস্তিষ্ক-শক্তিও যথেষ্ট দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। যে ভাবটা তার মনের মধ্যে প্রবেশ করে, সেটা সেখানে স্থায়ী হইয়া পড়ে। সহসা তার মনে হইল, সলিল কি তবে তাকে নিজের আয়ত্তগত দেখিয়া তার সম্বন্ধে পূর্ব্বসঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিয়াছে? অসম্ভবই বা কি? মায়ের অনিচ্ছায় তাকে বিবাহ করা তার পক্ষে যখন একপ্রকার অসম্ভবই, তখন অন্যপ্রকারে তাহাকে লাভ করিতে পারিলে সে কেন করিবে না! তার পরে? একটা মোহের ভাব যে তার ছিল সেটা তো নিশ্চিতই; এবং এখনও সে ভাবটা যে যায় নাই, তাহা তার সকল ব্যবহারেই পরিস্ফুট হইতেছে।

এই চিন্তাটা মনে আসিতেই আরতির সমস্ত অন্তঃকরণ প্রবলভাবেই সলিলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সলিল

যে অত হীন চক্রান্ত করিতে পারে না, এমন কথা তার একবারও মনে পড়িল না। তার রোগ-দুর্ব্বল মস্তিষ্ক একটা মিথ্যা কল্পনার বশে তার সমস্ত সুভদ্র আচরণেরই একটা অভদ্র কদর্থ করিতে লাগিল। তার মনে হইল, তাহাকে মাধবীদের বাড়ী হইতে লইয়া আসা, এই অপরিচিত জনবিরল বিজনালয়ে তাহাকে আনিয়া রাখা, সবার উপর মঞ্জুর সহিত তাহাকে বিচ্ছিন্ন করা, এ সবকেই তার যেন একটা গূঢ় উদ্দেশ্যপূর্ণ জঘন্য অভিনয়ের পূর্ব্বাভাস বলিয়াই ধারণা জন্মিতে লাগিল। মাধবীর প্রতিও তার মনে ক্ষমার লেশমাত্র রহিল না। নারী হইয়া কোন্ হিসাবে সে তার আশ্রিতা অসহায়া অর্দ্ধচেতনা তাহাকে এই অনাত্মীয় অনূঢ় পুরুষের হাতে এমন করিয়া সঁপিয়া দিল! জগতে অর্থবলই কি তবে সত্যসত্যই প্রধান বল? এর কাছে কি মানুষের কোন মনুষ্যত্বই স্থির থাকে না? তাদের লইয়া বিপন্ন হইতে হইয়াছিল বলিয়াই মাধবী তাহাকে অর্থ বিনিময়ে সলিলের কাছে বিক্রি করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে!

সলিল তার বিরুদ্ধে আরোপিত এতবড় অকথ্য অভিযোগের কিছুই জানিল না। পাছে আরতি কোনরূপে মনে করে যে তার আশ্রয়ে আসিতে হইয়াছে বলিয়া সলিল এই স্বাধীনতাটুকু লইতে ভরসা করিল, তাই সে তার অন্তরের উৎসারিত অজস্র স্নেহাভিব্যক্তিকে সাবধানে নিরোধ করিয়া মাত্র স্নেহময় আত্মীয়ের মত ব্যবহারটুকুই দেখাইয়া চলিতেছিল। মনে সহস্রবারই উত্থিত হইতে থাকিলেও মুখ ফুটিয়া সে তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটী ইঙ্গিতও কোন দিনই প্রকাশ করে নাই, পাছে সে মনে করে তার এই শোকে-রোগে জীর্ণ দেহটাকে দখল করবার জন্য সে লুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

এমন করিয়া দিনের পর দিন কাটিয়া গেল। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে এবং সলিলের সেবা যত্নের অব্যর্থ ফলে আরতি তার মানসিক নিদারুণ বিপ্লব সত্ত্বেও ধীরে ধীরে সবল ও সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিল। তার হৃত শক্তি, নষ্ট স্বাস্থ্য পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইল, তার রক্তহীন পাণ্ডু কপোল নবীন রক্তিমায় আরক্ত হইয়া উঠিল। সলিল উল্লসিত নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল, মনে মনে জগদীশ্বরকে সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিল। তার সকল শ্রমের, সকল সহিষ্ণুতার ফল এইবার তার করতলায়ত্ত হইতে চলিল।

প্রথম শীতের বাতাস প্রকৃতির সঙ্গে শিহরণ তুলিয়া বহিতেছিল, সুন্দর সূর্য্যকরোজ্জ্বল দিবস। সলিল স্থির করিল, সেই দিনই আরতির কাছে সে তাদের বিবাহের দিন স্থির করার কথাটা উত্থাপন করিয়া ফেলিবে।

আরতিকে খুঁজিতে আসিয়া সে দেখিল, আরতি তার নিজের ঘরের বিছানায় তখনও সেই অসময়ে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছে। সলিলের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল,—"ও কি! এমন সময় শুয়ে কেন আরতি? শরীর ভাল আছে ত?"

আরতি মুখ তুলিল না, তেমনই লুকানো-মুখে গাঢ় রুদ্ধকণ্ঠে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, "হুঁ"—

"হুঁ কি আরতি? ভাল আছ? তবে এ সময় শুয়ে কেন? উঠে আসবে? বাইরের বারান্দায় একটু বেড়াবে? নদীর ধারে বেড়াতে যাবে?"

আরতি বালিসের পাশে মুখখানা আর একটুখানি গুঁজিয়া দিয়া চাপাস্বরে উত্তর করিল,—"না"—

সলিল এই উত্তরে ঈষৎ দুঃখিত হইল, একটুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "কেন আরতি? এ সময়টা বাইরের বাতাসে একটু বেড়ান ভাল ত। যদি কষ্ট বোধ না হয়, একটু উঠে এসো না,—মাথা নাড়চো, যাবে না? তুমি বড্ড কুঁড়ে হয়ে যাচ্চো, না সত্যি, অত আলসেমী ভাল নয়, উঠে পড়। না হ'লে আমি হাত ধরে টেনে তুলবো।"

এবার আরতি বালিসে মুখ ঘষিয়া মুখের উপরকার রোদনচিহ্ন মুছিয়া ফেলিল। তার পর সবেগে তার আরক্ত মুখ তুলিয়া তীব্র দৃষ্টিতে সলিলের মুখের দিকে তাকাইল,—"আমার বেড়াতে যাবার ইচ্ছে নেই, আমি যাবো না। আপনি যান।"

সলিল সহসা এই তীব্র ভর্ৎসনায় ভর্ৎসিত হইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। তার পর তার মনে হইল, এখনও আরতি প্রকৃতিস্থ হইতে পারে নাই। এখনও তাকে সময় দিতে হইবে, এখনও তাকে বলার সময় আসে নাই। সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। তখন আরতি আকুল অশান্ত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। তার মনে হইল, সলিল তাহাকে একেবারেই আয়ত্তগত বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছে। তার মা তাহাকে চাহে না, অথচ সে যে তাকে পাইতে চাহে, এ অবৈধ, এ অন্যায়,—অথচ এছাড়া তার পথই বা কই?

নদীর ঠিক উপরেই এই বাংলো বাড়ীর একটা লম্বা টানা বারান্দায় কয়েকখানা চৌকি ও বেঞ্চ পাতা ছিল, সেদিন দুজনে পাশাপাশি সেই নদীর ধারের বারান্দাটায় আসিয়া বসিল। তখন সূর্য্যের উত্তাপ মৃদু হইয়া গিয়াছিল। ফিকা রংয়ের সবুজ পাতাওয়ালা একটা গাছের ঝোপের উপর পড়িয়া আলোর রং দিয়া পাতার রং যেন বদলাইয়া গিয়াছিল। নদীর তীরে একদল পাম্পপাদপের শ্রেণী সমানভাবে দাঁড়াইয়া রোমন্থনকারী গাভীগুলিকে ছায়া প্রদান করিতেছিল। নদীর নীরে বিমানচারী শুক্তিশুভ্র মেঘপুঞ্জের ছায়া সচল রূপে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। সলিল আসিয়া একখানা ভাল চৌকীর পিঠের কাছে একটা নরম কুশন আনিয়া দিয়া বলিল,-

"বস আরতি"

আজ অনেক করিয়া মনকে সে বাঁধিয়া আনিয়াছিল,—যেমন করিয়াই হোক, নিজেদের বিষয়ে একটা কিছু আলোচনা সে আজ করিবেই। বাড়ী হইতে বৈষয়িক কর্ম্মকায সংক্রান্ত তাগিদপত্র তার কলিকাতার বাসা হইতে ঠিকানা কাটিয়া কাটিয়া বারম্বার তাহাকে তার বিস্মৃত কর্ত্তব্যের অধ্যায়কে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। শেষ পত্রে কলিকাতা হইতে তার নায়েব সরকার জানাইয়াছে, হাইকোর্টে তাদের যে মকদ্দমা চলিতেছিল, তার জন্ত তার সেখানে পৌছান বিশেষ প্রয়োজন। সলিল নিজেকে বিপন্ন বোধ করিল। এদিকে মা কাশীযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, দেওয়ানের পত্রে সে খবরও নিত্য আসিতেছে। আর এমন করিয়া নীরব নিশ্চিন্তে দিন কাটাইবার অবসর সে যে পাইবে না, তাহা জানা গিয়াছে। অথচ আরতি আজও সেই যথাপূর্ব্ব, নির্লিপ্ত নীরব, শোকসংবিগ্নমানা,—এর কাছে স্বার্থ-সূচিত কোন কথা বলিতে গেলে পাছে তার আহত চিত্ত ব্যথা পায়।

বহুক্ষণ নীরবেই কাটিয়া গেল। অনেকবার অনেক রকম ভাঙ্গা-গড়া, তোল পাড় করিয়া অবশেষে সলিল দেখিল, যাহা সে বলিবে স্থির করিয়াছিল, তাহা বলিবার সাধ্যে তার কুলাইবে না। তখন সে এই বলিয়া মন স্থির করিল যে, কলিকাতা হইতে একেবারেই বিবাহের দিন স্থির প্রভৃতি করিয়াই ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে জানাইবে। মাধবীকেও সে সেই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া সকল সংবাদ জানাইল, এবং এই মঙ্গল-কার্য্যে তাহার সাহায্য চাহিয়া পাঠাইল।

কলিকাতা-যাত্রার পূর্ব্বক্ষণে আরতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়া গেল,—

"আমি যত শীঘ্র পারি ফিরে আসবো, আরতি,—ফিরে এসে নিশ্চয় তোমায় আরও সুস্থ, আরও সুন্দর দেখতে পাবো।"

আরতি তাহাকে কোনই বিদায়-সম্ভাষণ জানাইল না।

২১

সেদিন অকাল-বাদলে সমস্ত প্রকৃতির মূর্ত্তিই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। সারাদিন প্রবল বেগে বৃষ্টি পড়িয়াছে,—বাড়ীর সামনের রাস্তাটা জলে ডুবিয়া পাশের ড্রেনের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছিল। জানলার উপর জলের যে ঝাপটা আসিয়া পড়িতেছিল, তার মূর্ত্তি ও বেগ ঝরণার মতই প্রবল। অপরাহ্নের দিকে বাতাসও বেশ জোর করিয়া উঠিল। সেই জোর বাতাসে বড় বড় গাছের মাথাগুলা একেবারে নত হইয়া পড়িতে লাগিল; এবং তার শাখা হইতে অজস্র কাঁচাপাকা পাতার রাশি বৃষ্টিজলের ধারার সহিত মিশিয়া উড়িয়া পড়িতে লাগিল। সুদূর হইতে অজস্র জলের ধারা প্রাপ্তে বর্দ্ধিত-কায়া এবং বায়ু তাড়িত স্রোতোহত নদীর আকুল কল্লোল শুনা যাইতে লাগিল।

সন্ধ্যার কাছাকাছি হাওয়া আরও জোর করিয়া রীতিমত ঝড়ের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। পুরাতন পত্রাবলী সবই নিঃশেষ হইয়াছিল, নূতন পত্রও প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে! এবার ছোট বড় ডালগুলাকেই মড় মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া গাছের তলায় আশে পাশে স্তূপীকৃত করিল। যেগুলা ভাঙ্গিল না, তাহারা তাদের পত্রহীন অনাবৃত দেহ নাড়া দিয়া যেন পরস্পরের সহিত ঘোর যুদ্ধ বাধাইয়া রাখিল। ঘোর দুর্য্যোগের মধ্যে অদূর এবং সুদূর হইতে দেবায়তনের সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসরের বাজনা বর্ষণ-মুখর ঝটিকা-গর্জ্জনের মধ্য দিয়া অর্দ্ধস্ফুট হইয়া কাণে আসিতে লাগিল। নিকটস্থ মসজেদে ঝড়ের তাণ্ডব ছাপাইয়া প্রস্ফুট হইয়া উঠিল—

"আল্লাহু অক্‌বর! লা আল্লাহো ইল্লিল্লা"

গত রাত্রে সলিল চলিয়া গিয়াছে। ভোরের দিক হইতেই এই বাদল নামিয়াছে। সারারাত্রিই আরতি জাগিয়া আছে। চোখে তার ঘুমের লেশ মাত্র নাই। ঘুমান ছাড়িয়া একবারের জন্তও সে তার জ্বালাভরা চোখ দুটাকে বুজিতে পর্য্যন্ত

পারে নাই, এমনই সমস্ত শরীর এবং মন তার আলোড়িত হইতেছিল।

যতক্ষণ সলিল তার কাছে ছিল, কাছে কাছে ঘুরিত, শত অছিলায় তার এতটুকু স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যগ্র হইয়া ফিরিত, তখন সে বিমুখতায় তার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিত না। কিন্তু আজ যেমন সে চলিয়া গিয়াছে, আরতির রুদ্ধদ্বার চিত্ত সবেগে তার বদ্ধ দুয়ার খুলিয়া ফেলিয়া যেন ঝড়ের বেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল। সে যে তার কতখানি, কতখানি যে এই সুযোগে তার জুড়িয়া লইয়াছে, তাহা আজই প্রথম সে ভাল করিয়া জানিতে পারিল। এ জানায় সে ত সুখী হইতে পারিল না, বরঞ্চ তার কুণ্ঠিত চিত্ত শঙ্কাকুল ও বেদনায় পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। তার মনে হইল, এখন আর সে কোনমতেই সলিলকে ছাড়িতে পারে না। তার সমস্ত জীবন মরণ, ইহলোক এবং পরলোক একমাত্র তাহারই উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। সে যদি তাহাকে এখন ছাড়িতেও চায়, আরতি আর তাহা পারিবে না। তখন আরতি সলিলের কথা ভাবিতে লাগিল। সেই প্রথম দিনের সাক্ষাৎ হইতে আরম্ভ করিয়া এই শেষ বিদায়ের ক্ষণ অবধি সকল কথাই সে মনে মনে আলোচনা করিয়া দেখিতে দেখিতে আকুল আবেগে কাঁদিয়া ফেলিল। তার মনে হইল, সলিলের এত ভালবাসার সে যেন যোগ্য নয়। সে তার জন্য যা করিয়াছে, ক'জন পুরুষ ক'জন নারীর জন্য তাহা পারে। অথচ প্রতিদানে,—প্রতিদানে সে তার নিকট হইতে কি পাইয়াছে?

আরতি উগ্র-ব্যাকুলতায় দৃঢ় করিয়াই মনে মনে বলিল, না পান নাই, কিন্তু আজ হতে আমরণ—যদি মরণেরও পর কিছু থাকে তবে এ জীবনের যা কিছু সবই তাঁর পায়ে দিলাম—"

সহসা তার মুখ শুকাইয়া গিয়া শব-শুভ্র হইয়া গেল,—"কিন্তু যদি—ও: কিন্তু যদি তিনি তাঁর মায়ের অনিচ্ছায় আমায় তাঁর স্ত্রী করতে না চান তবু কি আমি—ও: ভগবান! না না—কিন্তু তাহলে আমার গতি কি হবে? আমি কেমন করে তাঁকে ছেড়ে থাকবো? কোথাও গিয়েই তো আর থাকা সম্ভব নয়, আমার কি হবে?"

এই 'আমার কি হবে?' প্রশ্নের কোন উত্তরই সে তার বিনিদ্র যামিনীর নিঝুম স্তব্ধ বক্ষ-পঞ্জর হইতে বাহির করিয়া লইতে পারিল না। এই দুশ্চিন্তা-বিরস, শঙ্কা, উদ্বেগ ও হতাশাচ্ছন্ন রাত্রিশেষে প্রভাতের দিকে তার অন্তরেরই বহিঃ প্রকাশ রূপে এক ঘোর দুর্যোগের অবতারণা করিল। তার বুকের অব্যক্ত ভাষা বাহিরে যেন প্রাণবন্ত হইয়া দেখা দিল। বাতাসের আর্ত্ত বিলাপে নিজের অন্তরের আর্ত্তনাদকে মিলাইয়া লইয়া সে আকুল আচ্ছন্নই হইয়া কাঁদিয়া কাটাইল।

রজনী আসিয়া কাছে বসিল, "দিদিমণি, একাটী রয়েছ, ভয় করচে না? আমি একটু কাছে থাকি? আহা বাবুর লেগে প্রাণটায় সুখ নেই কি না, মনটী বিরস হয়ে রয়েছে।"

আরতি নীরব হইয়াই রহিল,—রজনার সহানুভূতিতে তার রুদ্ধ অশ্রু আবার বাঁধ ভাঙ্গিবার উপক্রম করিতেছিল।

রজনী তাহা অনুভব করিয়াই সান্ত্বনা দিতে চাহিয়া কহিতে লাগিল, "আহা হবে না গা, বাবুর মতন এত যত্ন এত ভালবাসা যে লোকে বিয়ে-করা সোয়ামীর কাছকেও পায় না গো! অমন মনিবের মতন বাবু কি আর কোথাও আছে।"

আরতির পতনোদ্যত অশ্রু, সূর্য্যের উত্তাপে শিশির-বিন্দু যেমন করিয়া শুকাইয়া ওঠে, তেমন করিয়াই শুষ্ক হইয়া গেল। তার অন্তরের অশ্রু-আর্দ্র কোমলতাকে নিমেষে রুক্ষ, শুষ্ক, কঠিন করিয়া তুলিয়া একটা তীব্র জ্বালাভরা বিদ্বেষের আগুন দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এই তবে তার প্রকৃত পরিচয়? এই তবে তার যথার্থ পরিণাম? নিদারুণ আক্রোশে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়া সলিলের বিরুদ্ধে অক্ষমনীয় অপরাধের অভিযোগকে সে একান্ত করিয়াই দেখিল। এই উদ্দেশ্যেই তবে সে তার সঙ্গে এতবড় চাতুরী খেলিয়া চলিয়াছে? এই উদ্দেশ্যেই মঞ্জুকে সে তার বুক হইতে ছিনাইয়া দুঃখদুর্দ্দশার মধ্যে ঠেলিয়া দিয়া তাহাকে তার একান্ত অসহায় অবস্থাতেই চুরি করিয়া আনিয়াছে? ধিক্, ধিক্ তার পুরুষত্বে, শত ধিক তার মনুষ্যত্বকে!

সমস্ত দিন ধরিয়া ঝড়ের হাওয়া অশান্ত কলরোলে আর্ত্তনাদ ও দাপাদাপি করিয়া ফিরিতে লাগিল। সমস্ত দিন ধরিয়া আরতির অন্তরের মধ্যেও ততোধিক অশান্তির আর্ত্তরোল উদ্দাম হইয়া রহিল। এতবড় অত্যাচারের বোঝা বহিয়া এ জীবনকে বহন করা তার পক্ষে যেন অসম্ভব এবং অসঙ্গতই ঠেকিতে লাগিল। তার আহত বিদীর্ণ চিত্ত আর্ত্তনাদ করিয়া কহিতে লাগিল, আমি মরলেম না কেন? কেন আমার মরণ হলো না?

সন্ধ্যার পরেই ঝড়ের বেগ এবং বৃষ্টির প্রবলতা হঠাৎ হ্রাস পাইয়া গেল। মনে হইল, সারাদিনের মাতামাতির পর যেন দুরন্ত দজ্জাল ছেলে সহসা শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। রজনী আসিয়া একখানা চিঠি দিয়া গেল, এইমাত্র ডাকের পিওন এতবড় দুর্য্যোগকেও উপেক্ষা করিয়া বাবুর চিঠি লইয়া আসিয়াছে। বকশিষের বিষয়ে মুক্তহস্ততা সলিলকে বিশেষ করিয়াই এ সব শ্রেণীর শ্রদ্ধাভাজন করিয়া রাখিত।

আরতি চিঠিখানা অন্যমনস্কে হাতে লইয়া অনাগ্রহে ফেলিয়া রাখিতে গিয়া হঠাৎ চমকিয়া উঠিল, এ লেখা যে সুন্দরার! তার সমস্ত দিনের বিদ্রোহের তাপে তপ্ত মনপ্রাণ সেইক্ষণে যেন একমুহূর্ত্তেই ধারাস্নিগ্ধ তপ্ত মরুর মতই জুড়াইয়া আসিতে চাহিল। তার বুক ঠেলিয়া একটা অতি প্রবল অশ্রুর উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

সঙ্গত অসঙ্গত সকল হিসাব ভুলিয়া গিয়া সে তৎক্ষণাৎ দ্বিধাহীন চিত্তে চিঠিখানা খাম ছিঁড়িয়া বাহির করিয়া লইয়া পড়িল। সে পত্রে সুন্দরা এই কথা লিখিয়াছে—

"* * * মঞ্জু ভালই আছে। সুজিত রঞ্জিতদের সঙ্গে সে সমানভাবে মিশে গ্যাছে। তার জন্যে তুমি একটুও ভেবো না। তুমি এখন থেকে মনে করো, সে তোমার দিদিরই আর একটী ছেলে। আমি তাকে কিণ্ডারগার্ডেন প্রণালীতে একটু একটু অক্ষরও চেনাচ্চি। বেশি চাপ দিই না। নিজের ইচ্ছায় যেটুকু শিখতে চায় শুধু সেইটুকু। চেহারা তার সেই আগের মতন—মুসুরি পাহাড়ের মতনই হয়ে গ্যাছে। শীঘ্রই তার নূতন তোলা ফটো একখানা তোমায় পাঠিয়ে দোব,—দেখলে মনেও পড়বে না, এই ছেলে আবার সেই রকম অস্থিসার কঙ্কালমাত্র হয়ে গেছলো!

সে যা হোক সলিল! যতই নির্লিপ্ত থাকবো মনে ভাবি না কেন, আমার এই আটাশ বছরের মনকে তো আর নূতন করে আজ গড়তে চাইলেও গড়তে পারচিনে। তোমার কথা ভেবে আমি তো কোন কুলকিনারাই খুঁজে পাচ্চিনে। কি হবে বল্ দেখি? মা না কি কাশী না গিয়ে কিছুতেই ছাড়বেন না। দেওয়ানজী সে দিন এসেছিলেন, বল্লেন, মাঠাকুরুণকে আমিও কত বুঝোলাম, বল্লাম, দাদাবাবু যাকে চান, তাঁকেই পেতে দিন—তাঁর কি আর পছন্দ নেই, ভালই হবে। তা বল্লেন, 'বেশ তো, তোমরা দাও না, আমি তো মানা করচিনে। তবে আমার কথা আলাদা, আমার কাছে সত্যের মর্য্যাদা ছেলের চাইতেও বড়, আমি সে বিয়ের বউকে স্বীকার করবো না, আমি জানবো সলিলের বিয়ে হয়নি।' কি বিপদ! মার মনের এ অবস্থায় তোমার যে কি কর্ত্তব্য তাও কিছুই ভেবে পাইনে! মা যে তোমায় অনেক দুঃখে মানুষ করেছেন, সেও আমাদের ভোলবার কথা নয় ভাই! এর যে কি উপায় ভগবানই জানেন।"

আরতি চিঠিখানা পড়া হইয়া গেলেও নির্নিমেষ নেত্রে সেইখানারই উপর শতচক্ষু হইয়া চাহিয়া রহিল। একটা গভীর বেদনাভরা অনুতপ্ত লজ্জায় এবং অপরিসীম সুখে তার বিহ্বল চিত্ত যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। উঃ! কি অকরুণ হৃদয়হীনা পাষাণী সে,—কি ঘৃণ্য হীন চিত্ত তার! এই এতবড় সহৃদয়তার, ভূয়োদর্শনের, আত্মত্যাগীর প্রতি এতবড় অবিচার! না না—বুঝি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই!

রজনী আসিয়া তাহাকে তদবস্থাতেই দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবুর পত্তর এলো বুঝি দিদিমণি? আহা বাবুর কি দরদ গো, একটী পা নড়েচেন কি অমনি সাথে সাথে পত্তরটী দে'ছেন। মনটী তো ঐখানেই ফেলে রেকে গ্যাচেন কি না।"

রজনীর এই দুষ্ট ইঙ্গিতেও এ সময়ে আর আরতির হর্ষোচ্ছ্বসিত চিত্ত সঙ্কুচিত হইল না। সে উৎফুল্ল স্মিতমুখে মুখ ফিরাইয়া কহিয়া উঠিল,—

"হ্যাঁ রজনী, বাবুরই চিঠি, আমায়ও যেতে হবে।"

রজনী বিস্ময়ধ্বনি করিয়া উঠিল "কোথায় গা? বাবুর কাছকে?..."

"হুঁ"—বলিয়া আরতি তার ঈষৎ লজ্জারুণ মুখ নত করিয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"উনি তো শিগ্‌গিরই আসচেন বলে গেলেন, তুমি হঠাৎ আবার যাচ্চো যে? আর কার সঙ্গেই বা যাবে?"

আরতি ঈষৎ বেগের সহিত কহিয়া উঠিল—"সে ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না, আমি কি কচি খুকি যে আমার সঙ্গে দশটা লোক চাই? যা' আমার জন্যে একটু গরম জল করে দে, গা হাত ধুয়ে নোব।"

রজনী আবারও বিস্ময় প্রকাশ করিল, "সারাদিন অসুখ বলে কিচ্ছু খেলে না, এখন গা ধোবে কি গো? অসুখ যে বেড়ে যাবে।"

আরতি ব্যগ্র হইয়া কহিয়া উঠিল, "তোর সাবধানের

জ্বালায় আমি গেলুম। নারে বাবু, কিচ্ছুই আমার হবে না, তুই যা।”

রজনী মনে মনে বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। এ বয়সের মেয়েদের সকলই না কি সৃষ্টিছাড়া! এই তো একটা দিন মাত্র ছাড়াছাড়ি হইয়াছে, এর মধ্যে কান্নাকাটি, অনাহার, আবার যেমন চিঠি পাওয়া অমনই সব বদলাইয়া গিয়া স্ফূর্ত্তির প্রবলতায় অনাসৃষ্টি অঘটন!…

আরতি সারাদিনের পর স্নানাহার সারিয়া শান্ত হইয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল। টেবিলের উপর লিখিবার উপকরণ সাজান আছে। এ পর্য্যন্ত এ সকল বস্তু তার স্পর্শ করার প্রয়োজন বোধ হয় নাই। আজই প্রথম সে ঐ নূতন প্যাড্‌খানা হইতে একসিট কাগজ ছিঁড়িয়া লইয়া একখানা পত্র লিখিল। লেখা হইয়া গেলে, খামে সেখানাকে মুড়িয়া রাখিয়া, সে ধীরপদে উঠিয়া আসিয়া, বারেকমাত্র ইতস্ততঃ করার পর, তাহার পার্শ্বের কক্ষে সলিলের শয়নাগারে প্রবেশ করিল। এই ঘরের মধ্যে এর আগে কোন দিনই সে প্রবেশ করে নাই, আজ কি ভাবিয়া আসিল সেই জানে; অথবা সেও হয় ত তা' ভাল করিয়া জানেও না। ঘরের জানালা দরজা সমস্ত বন্ধ, নেয়ারে ছাওয়া খাটের উপর বিছানা পাতা, মশারি দিয়া তাহা ঢাকাই আছে। উভয় গৃহের মধ্যস্থ মুক্ত দ্বারপথে আরতির গৃহস্থিত আলোকের রশ্মি আসিয়া পড়িয়া এই নির্জ্জন শয্যাগৃহকে আলোছায়াময় মায়া-লোকের মতই রহস্যময় বোধ হইতেছিল। আরতি যেন মন্ত্র সম্মোহিতের মতই একপা একপা করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে অবশেষে সেই খাটের কাছে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। নবোঢ়া বধূ তার প্রথম স্বামী-শয্যায় প্রবেশ করিতে যে রকম কুণ্ঠা বোধ করে, সেও ঠিক যেন তেমনই একটা আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া রহিল; এবং পরিশেষে যেন প্রবল দ্বিধা ও লজ্জাকে জয় করিয়া লইয়া, সে কম্প্রমান বক্ষে ও আরক্ত মুখে কম্পিতহস্তে মশারি উঠাইয়া, সেই পূর্ব্ব-উপভুক্ত পরিত্যক্ত শয্যাতলে খাটের পাশে নতজানু হইয়া বসিয়া সন্তর্পণে নিজের মাথা রাখিল।

ভক্ত দেবমন্দিরের মৃত্তিকায় যেমন করিয়া নিজের নীরব ভক্তিসম্ভার নিবেদন করিয়া দেয়, তেমনই করিয়াই সে তার অন্তরের পূজার অর্ঘ্য আজ এই তার দেবমন্দিরে নিঃশব্দে নিবেদন করিয়া দিল।

এই বিছানার মধ্যে এখনও সলিলের গায়ের গন্ধ, তাহার অঙ্গের স্পর্শ প্রচুর হইয়া রহিয়াছে। আরতির সর্ব্বদেহ যেন পুলক-লজ্জায় শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার চেতনাকে যেন তাহা আচ্ছন্ন অবশ করিয়া রাখিল। তার পর বহুক্ষণ পরে সেখান হইতে সুখাবেগ-স্পন্দিত অথচ বেদনাশ্রু-পরিপ্লুত মুখ তুলিয়া সে মনে মনে এই কথা বলিতে লাগিল, “তুমি তো জান্‌তেও পারবে না, তুমি তো কল্পনাও করতে পারবে না যে, এই আমার জীবনের অভিশপ্ত, এই আমার প্রার্থিত মহাতীর্থে আমার চোখের জল, বুকের নিশ্বাস কতখানিই আমি রেখে গেলাম! তোমায় পাওয়া আমার এ জন্মের কপালে লেখা নেই, আমায় পাওয়া তোমার পক্ষে এ জন্মে সুখের হবে না। তবে মিথ্যা কেন মরীচিকার পিছনে ছুটে বেড়ানো? যেদিন থেকে আমাদের মধ্যে এ মিলনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, সেই দিন থেকেই আমাদের জীবনে যতকিছু বিপৎপাতের অভ্যুদয় হয়েছে। কাজ নেই,—এত ত্যাগ স্বীকার করে, মার মনে দুঃখ দিয়ে আমায় পেয়ে তোমার কি হবে? কি আমি এমন তোমায় দিতে পারবো, যাতে এ ক্ষতির তোমার পূরণ হবে? তার চেয়ে আমিই তোমার জীবন থেকে চিরদিনের মতন বিদায় নিয়ে সরে যাই। আমায় না পেলে, আমার প্রতি তোমার ভালবাসায় আঘাত পেলে, তুমি তোমার নিজের পথে চলতে পারবে, সুখী হবে। কালক্রমে আমায় ভুলেও যাবে।”

আরতি অসম্বরণীয় আবেগে কাঁদিতে কাঁদিতে সলিলের মাথার বালিসের উপর তার অশ্রুপ্লুত মুখ রাখিয়া গভীর প্রেমে তাহা চুম্বন করিল। তার পর অতি ধীরে সন্তর্পণে যথাযথভাবে সমস্ত সন্নিবেশিত করিয়া পুনশ্চ সাবধান-ন্যস্ত পদে ধীরে ধীরে নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। রাত্রি তখন গভীর হইয়া গিয়াছে। পাশের ছোট ঘর হইতে রজনীর নাসিকা-ধ্বনি শ্রুত হইতেছিল। চাকর বামুনেরও কোন সাড়াশব্দ নাই। একখানা মোটা আলোয়ানে গা-মাথা ঢাকিয়া, খরচের টাকা হইতে দশটামাত্র টাকা লইয়া, তাহার স্থানে নিজের আঙ্গুলের আংটীটা রাখিয়া দিয়া, সে ধীর-পদে বাহির হইয়া গেল।

অন্ধকার রাত্রি। ষ্টীমার-ঘাটে লোক বেশি নাই। আলোর বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত না থাকায় আস-পাশের অন্ধকার একেবারেই ঘুচাইতে পারে নাই। আরতি যাত্রীপথের

একটুখানি পাশ কাটাইয়া চলিল। যদি কেহ তাহাকে দেখিতে পাইয়া কোন প্রশ্ন করে, এই ভয়টাই তার মনে পদে পদে জাগিয়া উঠিতেছিল।

টিকিট সে চাহিবামাত্রে ষ্টেশন মাষ্টার ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত তাহার অর্দ্ধ-প্রচ্ছন্ন মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। তার পর একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট তার হাতের দিকে বাড়াইয়া দিতেই সে নিজের হাত সরাইয়া লইয়া দ্রুত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "আমি থার্ড ক্লাসের টিকিট চাইচি।"

ষ্টেশন মাষ্টার তখন যেন কোন একটা বিষয়ে নিঃসন্দেহ-চিত্ত হইয়া টিকিট বদলাইয়া দিল।

আরতি একটা মৃদুশ্বাস সন্তর্পণে মোচন করিয়া ধীর-কম্পিত পদে জাহাজের গ্যাংওয়ের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। এতক্ষণ পরে যাত্রীদলের ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া পড়িতে পাইয়া তার চকিত-চঞ্চল চিত্ত ঈষৎ যেন সুস্থির হইতে পাইল। সারাদিন ঝড় বৃষ্টির জন্য ষ্টীমার ছাড়া বন্ধ ছিল বলিয়া আজ এত রাত্রেও লোকের অভাব ছিল না।

পরপারে ষ্টেশনে পৌঁছিয়া সে কলিকাতার টিকিট কিনিয়া থার্ড ক্লাস গাড়ির কামরায় চড়িল। কখন অভ্যাস নাই, নোংরা-কাপড়-পরা, লাঠিসোঁটা কুন্দাবান্দারী বাহিকা কলহপরায়ণা যাত্রিনীদের দাপটে, কড়া তামাকুর তীব্র ধোঁয়ায় ও গন্ধে তার প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল। বেঞ্চিতে অনেকেই হাত-পা মেলিয়া শুইয়া বসিয়া আছে, সে বসিতে যাইতেই আরোহিনীরা হাঁ হাঁ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। ভয়ে শুকাইয়া গিয়া সে আর না বসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সারাক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকাও যায় না। অনেকক্ষণ পরে এবার সে বেঞ্চে বসিতে চেষ্টা না করিয়া একজনের একটা মোটের উপর বসিতে গেল। অমনই মোটের অধিকারিণী চীৎকার শব্দে গালি দিয়া উঠিল,—"এই অন্ধা! তেরা আঁখ নেহি হ্যায়? দেখ্‌তা নেই ইস্‌মে হামারা নয়া ডালিয়া বাঁন্‌হা হ্যায়, টুট যায়েগা।"

তার চোখ ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল—ওঃ, এই কঠিন কর্কশ পৃথিবীতে আত্মত্যাগ করা কি এত বড় কঠিন ব্যাপার? আবার তার সেই মাধবীর গৃহ মনে পড়িতে লাগিল। তবু সেও তো ঢের ভাল ছিল। ? এতবড় অনিশ্চিততার মাঝখানে সে কোথায় যে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে চলিল, তার ভাগ্যবিধাতাই শুধু সে কথা জানেন! কোথায় যাইবে? কি করিবে? কিছুই তো সে ভাবিয়া আসে নাই! সুন্দরার কাছে? আঃ, তা যদি পারিত! শুধু তাই যদি সে পারিত! কিন্তু তা হয় না। যতই লোভের হোক, সে পথে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব! সুন্দরা যে মঞ্জুর সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়া তাহাকে এ জন্মের মত মুক্তি দিয়াছে, সেই যথেষ্ট! তার এই দুর্গ্রহময় জীবনের শিলাভার তাহার উপরে চাপাইয়া তার সুখের সংসারে দুরন্ত রাহুগ্রাস ফেলিবার জন্য সে সেখানে নিশ্চয়ই যাইবে না। তাছাড়া সেখানে গেলে আর আসানপুর ত্যাগ করার প্রয়োজন কি ছিল? সলিল কি তার দিদির বাড়ীতে যাইতে জানে না?

শিয়ালদা ষ্টেশনে নামিয়া আরতি স্তম্ভিত হইয়া গেল। এইবার তার গতি যে কোন্ পথে সে যেন তার কোন কূল-কিনারাই খুঁজিয়া পাইল না। ট্রেন হইতে নামিয়া সে চুপ করিয়া একটা লাইট-পোষ্টের খুঁটি ধরিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া পড়িল। তার চারিদিককার লোকারণ্যের দিকে চাহিয়া সে যেন দিশাহারা হইয়া পড়িতেছিল। এর মাঝখানে সে কোথায় ভাসিতে আসিয়াছিল। তার মনের মধ্যে এক মুহূর্ত্তে আরও অনেক কথাই চকিতের মধ্যে চমকিয়া গেল। তার মতন কম বয়সের মেয়েদের পক্ষে এসব স্থান তো নিরাপদও নয়। তার মনে হইল, এর চেয়ে রজনীকে সে যদি সঙ্গে আনিত তো ভাল করিত।

"ম্যাডাম্!" বলিয়া একটী সাহেবী-পোষাক-পরা ভদ্রলোক আসিয়া তার সামনে দাঁড়াইলেন। লোকটীর চোখের দৃষ্টি সতেজ এবং তীক্ষ্ণ মুখের ভাবে একটী স্বতঃ-চ্ছুরিত প্রতিভার উজ্জ্বলতা দেদীপ্যমান রহিয়াছিল। তিনিই আরতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কথা কহিতে লাগিলেন,—

"ম্যাডাম! আপনাকে আমি অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছিলেম। মনে হচ্চে যেন আপনি কোন না কোন রকমে বিপন্ন! আপনার সঙ্গে আর কারুকেই দেখচিনে, অথচ স্বাধীন মেয়েদের মত সহজ ভাবও আপনার নয়! কি হয়েছে বলুন তো? টিকিট হারিয়েছেন?"

আরতি নীরব বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া লোকটীকে দেখিল। পদস্থ লোক, চেহারায় বেশ একটু বৈশিষ্ট্য আছে। অদূরে ফার্ষ্ট ক্লাস কামরায় একটা আর্দ্দালী কুলির মাথায় সুটকেশ প্রভৃতি চাপাইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। মুখের দিকে চাহিয়া

আরতির কুণ্ঠিত চিত্ত ঈষৎ যেন আশ্বস্ত বোধ করিল। এ মুখ যেন ক্রূরকর্ম্মী প্রতারকের মুখ নয়। তথাপি সে ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া নীরব রহিল।

তাহার কুণ্ঠা বুঝিয়া লোকটী পুনশ্চ কহিলেন, "হতে পারে আমার অনুমান ভিত্তিহীন, আপনি বেশ সুস্থচিত্তে এখানে দাঁড়িয়ে কারুর প্রতীক্ষা করচেন ; তবে যা আপনাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল, আমি অকপটে বল্লেম। যদি সেটা সত্য হয়, তাহলে আমায় আপনি অনায়াসে খুলে বলতে পারেন। আমার নাম নীরদবরণ সেন, আমি একজন ডাক্তার, বিশেষ করে মেয়েদেরই ডাক্তার। আপনি স্বীকার করুন, আর নাই করুন, আপনি নিশ্চয়ই বিশেষরূপে বিপন্ন।"

আরতি এবার অত্যন্ত আশ্চর্য্যানুভব করিল, সঙ্গে সঙ্গেই এই মানব-চরিত্র-লেখা-পাঠ-সমর্থ অভিজ্ঞ চিকিৎসকের প্রতি একটা শ্রদ্ধাও সে অনুভব না করিয়া পারিল না। তার উদ্বিগ্ন কাতর চিত্ত যেন ভিতর হইতে বলিয়া উঠিল, "এই তো ভগবানের দান তোমার সম্মুখে! এ পাওয়াকে অপমান করতে তুমি পারো না।"

প্রকাশ্যে যোড়হাতে প্রণাম জানাইয়া সে ডাক্তার সেনকে তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বলিল "আপনি হয় ত অন্তর্যামী! সত্যই আমি বিপন্ন, আমি নিরাশ্রয়। আমায় আপনি যদি ক্যাম্বেলে ভর্ত্তি করিয়ে দেন, আমি ধাত্রীর বা নার্সের কাজ শিখতে চাই।"

ডাক্তার স্মিতমুখে উত্তর করিলেন, "অনায়াসে। আচ্ছা তাহলে আপনি আমার সঙ্গে আসুন, এক্ষণই আমি আপনাকে ওখানে নিয়ে যাচ্ছি।" (ক্রমশঃ)

ইতিহাসে দৃষ্টিকার্পণ্য

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

ইতিহাসকে একটু বড় করিয়া দেখা দরকার। মানবাত্মার নিতুই-নব সাজ-পোষাকের ইতিহাস গাড়ীগাড়ী লেখা হইয়াছে বা হইতেছে। সাজ-পোষাক আমাদের অনাবশ্যক বোঝা বা জঞ্জাল সব সময়ে নহে ; অনেক সময় সাজ দেখিয়া, যে সাজিয়া বেড়াইতেছে, তার কতকটা ধাঁজ-ধরণও আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু সাজ অনেক সময় ছদ্মবেশও হইতে পারে। যে ঘটনাবলীর ভিতর দিয়া একটা দেশের প্রাণ আমরা বুঝিতে চাহিতেছি, হয় ত,বাহ্য দৃষ্টিতে, সে ঘটনাবলী সেই প্রাণের স্বরূপটিকে ঢাকিয়াই ফেলিয়াছে—আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও অনেক কাজের ভিতর দিয়া আমরা জাহির না হইয়া যেমন ঢাকা পড়িয়া যাই। যে ব্যক্তি আমাদিগকে খাঁটি ভাবে জানে, সে হয় ত তেমন কাজ আমাদের করিতে দেখিয়া অবাক্ হইয়া যায়। এই জন্য, শুধু সাজ-পোষাক বা ঘটনার ক্যাটালগ বানাইয়া ইতিহাস লেখা যায় না। কোনও একটা বড় কাটা-কাপড়ের দোকানে বহু লোকের মেলা অর্ডারি পোষাক মজুদ রহিয়াছে দেখিয়া আমাদের ইহা ভাবিলে চলিবে না যে, পোষাকের খোদ মালিকরাই খাসা আলমারি-জাত হইয়া বাস করিতেছে। অবশ্য, পোষাকের মধ্য দিয়াই তাহাদের রুচি, এমন কি প্রকৃতিও কিছু না কিছু ধরা ছোঁয়া দিয়াছে। আমরা যাহা কিছু স্পর্শ করি, তাহারই উপর আমাদের প্রকৃতির ছাপ কিছু না কিছু লাগাইয়া দিই, এ কথা এই অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনের যুগেও নির্ভয়ে কহা যাইতে পারে।

প্রধানতঃ তিন কারণে শুধু ঘটনা অবলম্বন করিয়া সত্য ইতিহাস লেখা যায় না। প্রথমতঃ, বিশেষ সাবধান হইয়া সমীক্ষা করিলেও, ঘটনাপুঞ্জের সবখানি, এমন কি আসলটাই, আমরা না জানিতে পারি—বিশেষতঃ ঘটনাপুঞ্জ যেখানে বর্ত্তমান নহে, আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই। বড় বড় ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি এমনই জটিল (লক্ষণেও নিদানে), যে অনেক সময়ই দেখা যায়, কোনও একটা বড় ঘটনার বিবৃতি ও ব্যাখ্যা দিতে গিয়া একজন যাহা বলিলেন, আর একজন ঠিক তাহা বলিলেন না, এমন কি, হয় ত কতকটা বিরুদ্ধই বলিলেন। সাত কানার হাতী দেখার মত, তাঁরা ঘটনাটির বিভিন্ন অঙ্গে হাত বুলাইয়াছেন মাত্র। একজন

যে দিক্ (angle) হইতে দেখিয়াছেন, অপরে ঠিক সে দিক্ দিয়া দেখেন নাই। হয় ত এক দিক্ দিয়া দেখিয়াও একজনে যে সব প্রত্যঙ্গে (feature-এ) মনোযোগ করিয়াছেন, অপরে ঠিক সেই সব যায়গাতেই তেমন খেয়াল করেন নাই। আমাদের রোজকার রোজ জীবনেও, ছোটখাট দেখা-শোনায়, আমাদের সাক্ষ্য গরমিল হইতে দেখা যায়। ভারতে বৌদ্ধযুগ অথবা ফরাসি বিপ্লব—এই রকম একটা প্রকাণ্ড জটিল ঘটনা-পরম্পরার বেলায় (বিশেষ যেখানে ঘটনাস্থলে আমরা স্বয়ং হাজির থাকিতে পারি না সেখানে) গরমিল না হওয়াই আশ্চর্য্য। অভিজ্ঞ বিচারক হয় ত অনেকের সাক্ষ্য মিলাইয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সে সিদ্ধান্ত জাবদা—তাহাতে একান্ত নির্ভর করা যায় না।

ঘটনার অবিশ্বাসিনী হওয়ার দ্বিতীয় কারণ এই যে, যতখানি উদার অপক্ষপাত লইয়া ঘটনার জটলা আমাদের ঘাঁটিতে যাওয়া উচিত, ততখানি অপক্ষপাত আনিয়া ফেলা সব সময় সম্ভবপর হয় না। স্বাভাবিক রাগদ্বেষ ত আছেই; তার উপরে আবার বদ্ধমূল সংস্কারের বেমালুম শাসন ও প্রিয় থিওরির সোহাগের অত্যাচার। সংস্কারের ঠুলির চারিভিতে দেখার সাধ্য সাধারণতঃ আমাদের নাই; থিওরির ফরমাইস মতন আমাদের চলিতে হইবে। "বেদ চাষার গান"—এই থিওরি স্কন্ধে চাপিয়া থাকিলে, আমরা বেদের সৈকত ভূমিতে পাথর-নুড়ি কুড়াইতেই আজীবন ব্যস্ত রহিব; দেখিব না, জানিব না যে, সে রত্নাকরের অগাধ জলে কত গভীর, কত অপূর্ব্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের হীরা-জহরতের খনি থরে থরে সাজান রহিয়াছে। চাষার গানেরই সমজদার রহিয়া গিয়া আমাদের প্রাচীন পুণ্য তপোবনের অপূর্ব্ব গৌরব-মণ্ডিত, ভাব, ভাষা ও ছন্দে অতুলনীয় বেদগাথা শুনিয়া তারিফ করিবার কাণটাই আমরা খোয়াইয়া বসিয়া আছি। আরও এক কারণে ঘটনা বা তথ্য সামনে পাইয়া, তাহার উপর, ভিতরকার ভাব (purpose) ও নিগূঢ় অর্থ (meaning) সম্বন্ধে অনুমান গড়িয়া তোলা চলে না। তথ্যের উপকরণ যাহা আমরা সচরাচর হাতে পাইয়া থাকি, তাহা যথেষ্ট (suffi ien..) নহে, সম্ভবতঃ পক্ষপাতাদি-দোষ-লেশ-শূন্য নহে। ইংরাজি ন্যায়শাস্ত্রের ভাষায় যাহাকে mal-observation (দুষ্ট দর্শন) এবং যাহাকে non-observation (অদর্শন) বলে, সেই দ্বিবিধ ত্রুটিই আমাদের সংগৃহীত তথ্যের মাল-মসলায় বিদ্যমান থাকা সম্ভব। এ ছাড়া আবার এমনও হইতে পারে যে, যেটাকে সত্যের সন্দেশ-বাহী তথ্য বলিয়া আমরা আদর করিতেছি, সেটা হয় ত সত্যের দিক্ দিয়াও ঘেঁসে নাই, হয় ত সেটা একটা ছদ্মবেশ, একটা মরীচিকা; আমাদিগকে ভিতরে ভাবের ঘরে, মর্ম্মপুরীতে লইয়া না গিয়া বাহিরে ঘুরাইয়া বিভ্রান্ত ও অবসন্ন করিয়া দিতেছে। আমাদের দেশের এবং ঈজিপ্ট, ব্যাবিলন প্রভৃতি অপরাপর দেশের প্রাচীন ধর্ম্মানুষ্ঠানের অনেক "অঙ্গ" হয় ত "তথ্য" হিসাবে সাহেব পণ্ডিতদের কাছ হইতে বিবৃতি যাহা পাইয়াছে, তাহাতে মোটামুটি কাহারও আপত্তির কারণ নাই; কিন্তু গোল বাধিয়াছে তখনই, যখন তাঁরা তথ্যের পিছনে "তত্ত্ব"টিকে, অনুষ্ঠানের মূলে ভাবটিকে আবিষ্কার করিতে গিয়াছেন। তথ্যটিই এমন যে, তাহা গবেষণাটবীর মাঝখানে তত্ত্বের পথে অভিসারিকা তাঁহাদের মনীষাকে ফাঁকি দিয়া পথ ভুলাইয়াছে; তত্ত্বের সন্ধান না পাইয়া পণ্ডিতেরা অনেক ক্ষেত্রেই এ সকল অনুষ্ঠানকে এনিমিজম, শ্যামানিজম, টটেমিজম, ম্যাজিক, সর্‌সারির কোঠাতেই ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। এ কথা স্থির যে, প্রাচীনেরা অনেক তথ্য প্রহেলিকার আকারে, রূপক প্রতীকের আকারে সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন; অনেক সময় যেটি বলিতে চান, তার উল্টাটিই যেন বলিতেছেন; যেন সঙ্কেতাভিজ্ঞ ছাড়া আর কেহ সহসা তাঁহাদের ভাব ধরিতে না পারে। শুধু বলাতে নয়, করাতেও তাঁরা যেন ভিতরের কোনো কোনো ভাবকে বা তত্ত্বকে গুপ্ত ধনের মতন গোপনই করিতে চাহিতেন।

কেন চাহিতেন তার কৈফিয়ৎ আছে। তত্ত্ববিদ্যা তাঁদের কাছে "রহস্য" ছিল, "গোপ্য" ছিল—হাটে-বাজারে সওদা করার মাল ছিল না। কৌলোপনিষৎ বলিতেছেন—"আত্মরহস্যং ন বদেৎ। শিষ্যায় বদেৎ"। অন্যত্র "প্রাকট্যং ন কুর্য্যাৎ"। প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক টীকাকার ভাস্কর রায় এ সম্বন্ধে লিখিতেছেন—"প্রাকট্যাপত্তের্মিত্রায়াপি ন বদেদিত্যর্থঃ। অতএব "কর্ণাৎ কর্ণোপদেশেন সম্প্রাপ্তমবনীতলমিতি স্মৃতঃ।" গুরু মুখ হইতে শিষ্যের কর্ণে এই তত্ত্ব কথা প্রবেশ করিত। সাধকের পক্ষেও অন্তঃস্থিত ভাবটি গোপন রাখিবারই হুকুম ছিল। কৌলোপনিষৎ পুনশ্চ বলিতেছেন—"অন্তঃ শাক্তঃ। বহিঃ শৈবঃ। লোকে বৈষ্ণবঃ। অয়মেবাচারঃ।" শেষ সূত্রটির উপর ভাস্কর

রায় লিখিতেছেন—"সন্তোন্তেঽপি কৌলিকানামাচারাস্তন্ত্রেষু বিহিতাস্তেষাং সর্ব্বেষাং মধ্যে প্রাকট্যাভাব রূপাচার এবাতীব মুখ্য ইত্যর্থঃ।" তন্ত্রে কৌলিকের অনেক আচারের কথাই আছে বটে, কিন্তু সেই সকল আচারের মধ্যে "প্রাকট্যাভাব রূপ," অর্থাৎ, নিজের ভাবটি গোপন করা রূপ আচারটি অতীব মুখ্য। এখন প্রকট্যের যুগ পড়িয়াছে; যে যাহা লিখিতেছে তাই ছাপাইয়া বাজারে ছাড়িতেছে; যাঁরা আবার "কেষ্ট বিষ্ণু"র মধ্যে, তাঁদের লেখা কেন, মুখের কথাটিও, রেডিও সাহায্যে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া ভূমণ্ডলময় ছড়াইয়া পড়িতেছে। প্রাচীনদের এটা দস্তর ছিল না। তাঁরা বিদ্যা কোথায় গোপন করিলে শ্রেয়স্করী এবং কোথায় প্রকাশ করিলে ভয়ঙ্করী হইয়া থাকে; তাহা বিলক্ষণই বুঝিতেন। প্রাচীনদের ধারণায় একটা খুব বড় কথা এই—বিদ্যা মজুদ রহিয়াছে ত সব। খাঁটি তত্ত্ব কথা জগতে নূতন করিয়া আবিষ্কার করার কিছুই নাই। কোন্ যুগে তাহাদের কোন্‌টি গোপন থাকিবে, কোন্‌টি বা কথঞ্চিৎ প্রকাশ পাইবে—সে বিষয়ে একটা নৈসর্গিক ব্যবস্থা রহিয়াছে। যুগ-প্রবর্ত্তকেরা সে ব্যবস্থা মানিয়া চলেন। যুগ-বিশেষের যতটুকু অধিকার বা যোগ্যতা, ততটুকুই তার আদায়। অন্যায় আদায় করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইয়া থাকে। এই জন্য সকল সময়, সকল দেশে অথবা সকল পাত্রে সব রহস্য ভাঙ্গা চলে না, অথবা স্বাভাবিক নিয়মেই নিজেকে ভাঙ্গিতে দেয় না। এটা খুব প্রয়োজনীয় কথা।

প্রধানতঃ এই তিন কারণে, শুধু ঘটনা সাজাইয়া ইতিহাস লেখা চলে না। জটিল ঘটনাপুঞ্জের এক অংশেই হয় ত আমরা হাত বুলাইয়াছি; আমাদের মগজের থিওরি-গুলা হয় ত সেই অংশটুকু সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটিকেও যথার্থ হইতে দেয় নাই; হয় ত আবার সেই অংশটুকু, গোটা তথ্য অথবা তন্নিহিত তত্ত্বটি সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে উল্টা ধারণাই জন্মাইয়া দিয়াছে। এ অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটির সম্ভাবনা হালের "বৈজ্ঞানিক পুরাণকারে"রা যে আদৌ দেখিতে চান না এমন নহে। অনেকের জবানবন্দি বা এজেহার মিলাইয়া দেখার (Comparing notes) একটা প্রথাও বড় বড় পরিষৎ বা সোসাইটীগুলির অজ্ঞাত নহে। কিন্তু বিজ্ঞানা-গারে পরীক্ষা-ফলটি অনেককে "চাকিয়া" দেখাইবার পর তাদের "রায়ের" (Verdictএর) যেমনধারা একটা গড় কষিয়া লইবার ব্যবস্থা আছে, তেমনধারা গড় কষিয়া লওয়া ইতিহাসের জটিল ব্যাপারের বেলায় সম্ভবপর হয় না। কুরুক্ষেত্র সমর কবে হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে নানা পশ্চিমে মুনি নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন। কোলব্রুক্ সাহেবের মতে খৃঃ পূর্ব্ব চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই যুদ্ধ হইয়াছিল; উইল-সন সাহেব ও এল্‌ফিনষ্টোন—তথাস্তু; উইলফোর্ড সাহেব বলেন—১৩৭০ খৃঃ পূর্ব্ব অব্দে; বুকাননের মতে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে; প্রাট দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে; ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন এই সকল গণনার গড় কষিয়া কি আমাদের কুরুক্ষেত্রের নষ্ট-কোষ্ঠী উদ্ধারের উপায় দেখিতে হইবে? কেবল অনুমান বা সিদ্ধান্ত বলিয়া নহে, তথ্য বা Facts সম্বন্ধেও গড় কষিয়া ঐতিহাসিক পাকা সত্যটিকে বাহির করিয়া লওয়ার উপায় নাই। তবে কি এ জাতীয় প্রত্নতত্ত্বের কোনও দাম নাই? আছে। উপরের খোসা লইয়াই বেশির ভাগ প্রত্নতাত্ত্বিকের কারবার সন্দেহ নাই; কিন্তু খোসাটাও ফেলিবার সামগ্রী নহে। খোসার ভিতরেই শাঁস থাকে; এবং সব সময়ে না হউক কোনো কোনো সময়, পুরাপুরিভাবে না হউক আংশিক ভাবেও, খোসা দেখিয়া ভিতরের শাঁসের অবস্থাটা আন্দাজ করা চলে। তবে জিনিস অনেক সময় বর্ণচোরা হইয়া থাকে; অন্তঃকৃষ্ণ বহিঃগৌর হইয়া থাকে। সেখানে খোসাতেই লাগিয়া মজ্‌গুল হইয়া থাকা চলে না। খোসা ও শাঁসের কথায় আমাদের ভাল করিয়া খেয়াল রাখিতে হইবে।

"তথ্য" বা "ঘটনা" কথাটা একটা মোটা কথা। বৃহদারণ্যক বা ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদে ঋষিরা কি ভাবে, কিরূপ চিন্তার মধ্য দিয়া, বায়ু, আকাশ, প্রাণ প্রভৃতির ভিতরে অমৃতের অন্বেষণ করিতেন, তাহা আমরা দেখিতে পাই। ইহা একটা তথ্য। আবার যজুর্ব্বেদীয় শতপথ তৈত্তিরীয়, ঋগ্‌বেদীয় ঐতরেয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণে একটা যজ্ঞ কি কি অনুষ্ঠান করিয়া করিতে হয়, তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেখিতে পাই। ইহাও একটা তথ্য। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃশ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"—এ উপদেশও বৃহদারণ্যকে আছে; আবার হোম করিতে গিয়া চমস, ইধ্ম প্রভৃতি চারিটি পাত্রই যে উডুম্বর দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে হইবে; দশটি গ্রাম্য ধান্য, অন্যান্য ওষধি সকল এবং যজ্ঞীয় ফল সকল যে যথাশক্তি সংগ্রহ

করিয়া দধি, মধু ও ঘৃত দ্বারা সিঞ্চিত করিয়া হোমোপযোগী করিয়া লইতে হইবে;—এ ব্যবস্থাও বৃহদারণ্যক দিতেছেন। পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণে কে কার "রস" বা সার তাহা চমৎকারভাবে বলিতেছেন—"এষাং বৈ ভূতানাং পৃথিবী রসঃ পৃথিব্যা আপোঽপামোষধয় ওষধীনাং পুষ্পাণি পুষ্পাণাং ফলানি ফলানাং পুরুষঃ পুরুষস্য রেতঃ।" তার পরবর্ত্তী অংশে সেই শ্রেষ্ঠ রসটিকে কি ভাবে রক্ষা করিতে হইবে, এবং প্রজা-সৃষ্টির জন্য কি ভাবে তার ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার অনুষ্ঠানগুলি, মায় মন্ত্র সহিত, বর্ণিত হইয়াছে। এ সকলই তথ্য। সবই তথ্য হইলেও "একদরের" তথ্য নহে। কোনোটায় মানবাত্মার একেবারে অন্তরঙ্গ সাধনের এবং শ্রেষ্ঠ অনুভূতির কথা; কোনোটায় বহিরঙ্গ সাধন এবং অপেক্ষাকৃত নিম্নতর অনুভূতির কথা। এ সকল তথ্যকেই এক পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে না।

তথ্যরাজিকে একটা ক্রমোন্নত ভঙ্গীতে বিন্যস্ত করিয়া লইতে হইবে। প্রাচীনেরা কেমন করিয়া উল্কি কাটিতেন, এলুন-আলপণা দিতেন—এগুলি এক থাকের তথ্য; তাঁদের সামাজিক জীবন কেমনধারা ছিল, রাষ্ট্র কেমন ছিল, বাণিজ্য-ব্যবসায় কিরূপ ছিল, বাড়ী-ঘর-দুয়ার কেমন ছিল, এগুলি উপরের থাকের তথ্য; তাঁদের সাহিত্য, সঙ্গীত, নীতি, ধর্ম্ম-বিশ্বাস কেমনধারা ফুটিয়া উঠিয়াছিল—এগুলি আরও উপরের থাকের তথ্য; তাঁরা সনাতন তত্ত্বগুলির কতখানি পরিচয় ও আস্বাদ পাইয়াছিলেন, এবং এ-সম্বন্ধে তাঁদের অনুভূতিকে কি পরিমাণে তাঁরা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের গঠনে ও পরিচালনে নিয়োগ করিতে পারিয়াছিলেন, এবং তার ফলে কতখানি শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ সত্যভাবে তাঁরা অর্জ্জন ও আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এইটিই হইল সর্ব্বোচ্চ থাকের তথ্য। আমরা তথ্যগুলিকে সাজাইবার মোটামুটি একটা নক্সা দিলাম। উল্কি-তিলক কাটা হইতে পরমাত্মায় জীবাত্মার আহুতি, এ-সবখানি লইয়াই পূর্ণ মানবের সত্যকার জীবন। নিতান্ত "তুচ্ছ" হইতে পরম মহান্—এ-সবেরই সত্যকার জীবনে স্থান আছে, প্রয়োজন আছে। একভাবে না একভাবে এ-সকলই মানুষের জীবনে পাশাপাশি ঘরকন্না করিয়া থাকে। হক্‌স্‌লি সাহেব উল্কি কাটিতেন কি না, এ সংবাদ আমরা রাখি না; কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে অবশ্য গলায় নেকটাই বাঁধিতেন, জুতায় ফিতা আঁটিতেন। লর্ড কেলভিন এক ভাবে মাথার চুল কাটিতেন; রবীন্দ্রনাথ আর এক ভাবে কাটেন। এ তথ্য অবশ্য নিতান্তই খোলসের তথ্য। কিন্তু দরকারী। ভগবান্ খোসাটা বাদ দিয়া ফল রচিতে নারাজ হইয়াছেন। তবে খোসাটা তার গর্ভে খানিকটা ফাঁকা পুরিয়া রাখুক, এটাও তাঁর অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না।

ব্যাপক দৃষ্টিতে "তুচ্ছ" বলিয়া কিছু নাই। প্রাচীনেরা এই গোটা জীবনটাকেই ধর্ম্ম-সাধন বলিতেন। তাঁদের ধর্ম্মশাস্ত্রে কেমন করিয়া টিকি বাঁধিতে হইবে, তিলক কাটিতে হইবে, ইহা হইতে সুরু করিয়া কেমন করিয়া সত্য-জ্ঞান-আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে হইবে,—এ সকল বিধিই নিঃসঙ্কোচে পাশাপাশি ঠাঁই পাইয়াছে। কেন না, এ সবখানি লইয়াই একটা অখণ্ড, বিচিত্র তথ্য—The fact of life. এখনকার পণ্ডিতেরা তাঁদের অভ্যাসমত ছুরি চালাইয়া এই অখণ্ড সামগ্রীটিকে কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়াছেন, এবং আপনাদের হিসাব মাফিক্ তাদের এক একটা দর কষিয়া দিয়াছেন। উল্কি-তিলক তাঁরা নিজেরা কাটেন না; যারা কাটে, তারা তাঁদের বিবেচনায় বর্ব্বর। সুতরাং প্রাচীনদের (এবং কোনো কোনো "আধুনিক"দের) উল্কি-তিলকের তথ্যটিকে তাঁরা সমজদারের মত বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া বাজে জঞ্জালের মাঝে ঝাঁটাইয়া রাখিয়াছেন। মানুষের নিজেকে সাজাইবা'র সহজ সংস্কার (decorative instinct), এনিমিজম্‌-টটেমিজম্‌-ম্যাজিক্—এই সকল মুখরোচক কথায় কত কত পুরাতন রহস্য তাদের "মরমকথা" হারাইয়া মূক বনিয়া রহিয়াছে। প্রাচীনেরা কেমন করিয়া মদ খাইতেন, কেমন সব রঙীন ফুলকাটা পাত্রে মদ রাখিতেন; কেমন কাপড় চোপড়, গহনা-পাতি পরিতেন; কেমন তাঁদের ঘর দুয়ার ছিল, সমাজ ছিল, ব্যবসা-বাণিজ্য, শাসন-পদ্ধতি ছিল; এ সকল তথ্যের অনেকগুলি অবশ্য সকল যুগেই এবং সকল দেশেই প্রয়োজনীয় তথ্য। কারণ এই গুলিই আমাদের আটপৌরে জীবন। হালের পণ্ডিতদের অনেকে এসব তথ্য বিস্তর সংগ্রহ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। খুব ভাল কথা। কিন্তু এদের মর্ম্ম গ্রহণে (interpretationএ) তাঁরা কেহ কেহ দুই দফা ভুল করিয়া থাকেন।

তাঁদের দৃষ্টি (stand-point) তে সে তথ্যগুলি দেখিতে

অপারগ হইয়া ইঁহারা তাদৃশ জীবনের সকল অংশে সঙ্গতি দেখিতে পান না; তথ্য-রাজির মধ্যে প্রচ্ছন্ন প্রাণের সম্বন্ধটি তাঁরা ধরিতে পারেন না। যে ঋষি অরূপ অক্ষর আত্ম-তত্ত্বের উপদেশ করিতেছেন, তিনিই আবার উল্কি কাটার ব্যবস্থাও দিতেছেন; যিনি নীতিশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ আদর্শ নিষ্কাম কর্ম্মের কথা বলিতেছেন, যিনি জ্ঞান-যজ্ঞ, পুরুষ-যজ্ঞ, সাধ্যায়-যজ্ঞের উপদেশ দিতেছেন, তিনিই আবার, দেবগণ ও মনুষ্যগণ যাহাতে পরস্পরকে "ভাবনা" করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে বৈদিক দ্রব্য যজ্ঞেরও বিধি দিতেছেন;—এ সকল ব্যাপার হালের বহু সমালোচকের দৃষ্টিতে বড়ই অসঙ্গত, বড়ই আজগবি ঠেকিয়াছে। এ অসঙ্গতির কৈফিয়ৎ তাঁরা সহজে দিতে যাইলেও, কৈফিয়ৎ সকল সময়ে সফল হয় নাই।

প্রথম কৈফিয়ৎ এই যে, সে অনুন্নত যুগে মানুষের জ্ঞান কোন কোন বিষয়ে বেশ বিকাশ প্রাপ্ত হইলেও অনেক বিষয়ে অপরিণত ও অপরিপুষ্টই ছিল। মোটের উপর দার্শনিক চিন্তা (metaphysic) প্রাচীনকালে যাহা ছিল, তাহাতে কাহারও লজ্জিত হইবার কারণ নাই। কিন্তু ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা বড়ই সঙ্কীর্ণ, গোল-মেলে ও ভাসাভাসা রকমের ছিল। সেখানে তাঁহারা রহস্যের কুয়াসার (mysticism) ভিতর দিয়া সত্যের চেহারাখানি ভাল করিয়া দেখিতে পান নাই। জড়-বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, শারীরবিদ্যা, এ সকল বিশ্বাস-যোগ্য হইতে পারে নাই। ইতিহাসে গল্প ও রূপকথা নির্ব্বিবাদে সত্য ঘটনাবলির পাশেই ঘর-কন্না করিতে পাইত। এই কারণে, যে ঋষি আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে খুব উঁচু কথা আমাদের শুনাইয়া বিস্মিত করিলেন, তিনিই আবার পর মুহূর্ত্তে পৃথিবী, গ্রহ-তারকা, মেঘ-বিদ্যুৎ, এমন কি আমাদের নিজেদের শরীর সম্বন্ধেই নিতান্ত "খেলো" ও আজগুবি কথা বলিতে-ছেন। যিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জন্য ধ্যান ধারণার উপদেশ দিতেছেন, তিনিই আবার "ভূত প্রেত" তাড়াইবার জন্য "মন্তর তন্তর" জুড়িয়া দিতেছেন। সে অনুন্নত যুগে মানুষের মগজে স্বতন্ত্র কুঠারিতে এ-সব পাশাপাশি বাস করিতে পাইত। এখনও, যেখানে যেখানে "অনুন্নত মধ্যযুগ" জোর করিয়া টিকিয়া আছে, সেখানে ইহারা পাশাপাশি বাস করে।

পশ্চিমের ভাবুক লেখকেরা এ দেশে বেড়াইতে আসিয়া এই ব্যাপারটি দেখিয়া অনেক সময় বিস্মিতও হইয়াছেন, আমোদ অনুভবও করিয়াছেন। এডওয়ার্ড কারপেণ্টার কয়েক বৎসর আগে এ দেশে বেড়াইতে আসিয়া "From Adam's peak to Elephanta" নামে একখানা বই লেখেন (১৮৯২; দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯০৩)। অনেক তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিমত্তার পরিচয় তিনি এই বইখানির যায়গায় যায়গায় দিয়াছেন। পরমগুরু স্বামী নামে একজন ভাল যোগীর কথা ইনি খুব ফলাও করিয়া লিখিয়াছেন। যোগীটির আকৃতি ও আচার ব্যবহার সুন্দর; তাঁর তত্ত্বকথা খুবই উচ্চ এবং খুবই গভীর। অবশ্য সে-সব তত্ত্বকথা শুনিয়া ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশের বিচিত্র ধর্ম্ম-বিশ্বাস বা সাধন সম্বন্ধে জাবদা কথা বলিবার সাহস হওয়া কাহারও উচিত নয়। সাহেব স্থানে স্থানে সে সাহস করিয়াছেন। ইষ্ট এবং ওয়েষ্ট-এর ধাতের পার্থক্য দেখাইতে গিয়া সাহেব লিখিয়াছেন—"Thus in the East the Will constitutes the great path; but in the West the path has been more especially through Love—and probably will be" ইত্যাদি। অবশ্য, "ওয়েষ্ট" মানে এখানে যীশুখৃষ্টে-সমর্পিত-মনঃ-প্রাণ ওয়েষ্ট। সাহেব এখানে "গোটা হাতীর" অঙ্গ-বিশেষেই হাত বুলাইয়াছেন। তবে তিনি ভারতবর্ষের অন্তঃপ্রকৃতির যেটুকু দেখিয়াছেন, সেটুকুই বা কয়জন দেখিয়াছে? ভারতবর্ষের এই হাজার বছরের গোলামির বহর দেখিয়া আমরা অনেকেই ভাবি যে, ইচ্ছাশক্তির (Willএর) গলা টিপিয়া মারাই ভারতীয় সাধনার খাঁটি নিজস্ব বাহাদুরী। সে যাহাই হউক, সাহেব "পরমগুরুর" জ্ঞান দেখিয়া যতখানি বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাঁর "অজ্ঞান" দেখিয়া ততোধিক বিস্মিত হইয়াছিলেন—"I am not a stickler for modern science myself, and think many of its conclusions very shaky; but I confess it gave me a queer feeling when I found a man of so subtle intelligence and varied capacity calmly asserting that the earth was the centre of the physical universe and that the sun revolved round it!" তার পর, সুমেরুর কথা; লোকালোক পর্ব্বতের কথা; রাহু কেতুর কথা, ইত্যাদি ইত্যাদি। জ্ঞানের প্রবীণতা ও শৈশব

কেমনধারা বেমালুম পরস্পরের গায়ে গা দিয়া রহিয়াছে! সাহেবদের এইটিই প্রথম কৈফিয়ৎ।

দ্বিতীয় কৈফিয়ৎ এই যে, পুরাতন পুঁথিগুলি এখন যে আকারে আমাদের হাতে উপস্থিত হইয়াছে, সে আকার তাদের মৌলিক আকার নহে। সেগুলি অনেক ক্ষেত্রেই পাঁচমিশালি জিনিস। বেদব্যাস মহাভারত রচিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান মহাভারত যে কতখানি "বেদব্যাসী" তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা শক্ত। সে যুগে বঙ্কিমবাবু তাঁর "কৃষ্ণ চরিত্রে" এ প্রশ্নের বিচার করিয়াছেন, এবং বিচারের কয়েকটা মূলসূত্রও মানিয়া লইয়াছেন। বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র পশ্চিমের বিগত শতাব্দীর "যৌক্তিকতাবাদ" (Rationalism) এর প্রভাবে কতকটা অভিভূত না হইয়া পারেন নাই। সেই "Culture myth," "Solar myth" প্রভৃতির দিনে তিনি যে মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্‌ভাগবত ইত্যাদির "অতি প্রাকৃত" ভাগগুলিকে অলীক ও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। এখন পশ্চিমের বিজ্ঞান জগতে নূতন বিপ্লব উপস্থিতির ফলে, সে দেশেরই চিন্তার হাওয়া এবং বিশ্বাসের কম্পাসের কাঁটা দিক্ বদলাইতেছে। এখন দেশের বড় বড় মাথা শ্রদ্ধার পাল তুলিয়া তাঁদের পরীক্ষার জাহাজটিকে জীবনের পরপারে প্রেতলোকের ঘাটে পাড়ি দেওয়াইতেছেন। বড় বড় নামজাদা বৈজ্ঞানিকদের সেই কঠশ্রুতির বালক নচিকেতার মত বিশ্বাস ও সাহস দেখিয়া সত্যই খুব আহ্লাদ হয়। এখন প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃতের মাঝখানে সেই অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীর মনগড়া থানাটি ক্রমশঃ ভরাট হইতে চলিল। ম্যাজিক, সয়্সারি, ভূতপ্রেতে বিশ্বাস—এ সবের ব্যাখ্যায় সেই সাবেকি এনিমিজম, টটেমিজম্, স্যামানিজম্ প্রভৃতি থিওরি আর "হালে পানি" পাইতেছে না। নূতন তথ্যসমূহের আবিষ্কারের ফলে, এ সকল থিওরি লইয়া লম্ফ-ঝম্প কতকটা ছেলেমির সামিল হইয়া পড়িয়াছে। সে যাহা হউক, বড় বড় "স্যাভাণ্ট" (মনীষী) গণ তাঁদের চিন্তা ও পরীক্ষার মানমন্দিরে দাঁড়াইয়া ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য "লোকায়ত" জগতের চক্রবালের অন্তরালে যে নূতন রশ্মি-রেখাগুলি দেখিতেছেন, সে রশ্মিরেখা অবশ্য এখনও "প্রত্নতাত্ত্বিকের" গবেষণার পাতাল-মন্দিরে—ভূগর্ভ-নিহিত অতীতের সমাধি-কক্ষগুলিতে—লব্ধ-প্রবেশ হয় নাই। সেখানে "New thought" এর এখনও সাড়া পৌছায় নাই। সেই কারণে, এখনও সেখানে ম্যাজিক, সয়্সারি, প্রক্ষিপ্তবাদ প্রভৃতি নিঃসঙ্কোচে বাস করিতেছে। বিপ্লবের ঢেউ সেখানে পৌছায় নাই। অতীত যুগকে অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীর যৌক্তিকতাবাদের (যাহাকে সময়ে সময়ে Higher Criticism ও বলা হইত) কষ্টিপাথরে কষিতে গিয়া আমরা তাহার মধ্যে যতখানি খাদ বাহির করিয়াছিলাম, সত্যসত্যই ততখানি খাদ তাহাতে আছে কি না, ইহা এক্ষণে বিচার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে কষ্টিপাথরখানিতেই আমরা এখন আগেকার মতন আস্থাস্থাপন করিতে নারাজ।

সে সকল তথ্যকে আগে "Legend" (গল্প) "Myth" (রূপকথা) ইত্যাদি আখ্যা দিয়া ঠেলিয়া রাখা হইত। এখন আমরা ক্রমে বুঝিতেছি, সে সকল তথ্য একেবারে আষাঢ়ে গল্প না হইতেও পারে। রূপক বা প্রতীক (symbol) হিসাবে তাহাদের মূল্য আমরা আগেও একটু আধটু স্বীকার করিতাম, যদিও অধিকাংশ স্থলেই, উপরের গল্পের খোসাটিতে দন্তস্ফুট করিয়া ভিতরকার তত্ত্বের শাঁসটি আমরা বাহির করিতে পারিতাম না। গল্প অনেক সময়ই নিতান্ত অলীক, অসম্বদ্ধ, অর্থহীন, এমন কি, অশ্লীলতা বর্ব্বরতা প্রভৃতি দোষে দুষ্ট বলিয়াই আমাদের ঠেকিয়াছে। আমাদের বেদে, পুরাণে, তন্ত্রে উদাহরণের অসদ্ভাব নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে বিবৃতি বা উপাখ্যানের অপেক্ষাকৃত স্থূল ইঙ্গিতটি আমরা ধরিতে পারিলেও, সূক্ষ্ম তত্ত্বের ত্রিসীমানা দিয়াও তেমন যাইতে পারি নাই। বেদে একাধিকবার পণিঃ অসুরের দ্বারা দেবতাদের সাদা সাদা গরু চুরির গল্প আছে। পাশ্চাত্য ভাষ্যকারদের দৃষ্টিতে ইহা "সৌর-উপাখ্যান"—Solar myth বই,—খুব জোর ফিনীসীয় বণিকজাতির সঙ্গে সংঘর্ষের উপাখ্যান বই, - আর বড় বেশি কিছু নয়। রাত্রির অন্ধকার সূর্য্যের আলোকপুঞ্জকে কেমনধারা গুহার মধ্যে পুরিয়া রাখে; সূর্য্য কেমনধারা উষা বা সরমার সাহায্যে সেই গুহাবদ্ধ "গাভীগণ"কে মুক্ত করিয়া দেন; এই দৈনন্দিন নৈসর্গিক তথ্যটি হেঁয়ালির ভাষায় ঐ ঋকগুলিতে বলা হইয়াছে মাত্র। যদি আবার ম্যাক্সমূলারের মত কোনও পণ্ডিত এই বৈদিক মিথের সঙ্গে গ্রীসের মহাকবি হোমরের পারিস-হেলেনা উপাখ্যানটিকে মিলাইয়া দিতে

পারিতেন, তবে আর আমাদের আস্ফালনের সীমা-পরিসীমা থাকিত না। কিন্তু এরূপ লম্ফ-ঝম্ফ করার সৌভাগ্য সকল সময়ে আমাদের ঘটিত না। বেদের রাশি রাশি সূক্ত ও ঋকের মহারণ্যে আমরা কখন কখন "বনের পাখীর গান" এবং অনেক সময় কিচির-মিচির, শুনিতে পাইলেও, এবং অন্ধকারে সত্যের পথ খুঁজিতে খুঁজিতে কচিৎ কদাচিৎ আমাদের দৃষ্টির সাম্‌নে একটু আধটু আলোকরশ্মিরেখা-সম্পাত হইয়া থাকিলেও, মোটের উপরে আমরা শ্রুতিগহনে পথহারা, দিশেহারা হইয়াই ছিলাম।

কেবল আমাদের দেশ বলিয়া নয় অন্য দেশেরও অতীতের প্রেতাত্মার ঐতিহাসিক শ্রাদ্ধ এই ভাবেই কিছুদূর গড়াইয়াছে। ব্যাবিলনের সেমেটিক্ (বঙ্কিম বাবুর ভাষায় "সীমীয়") সভ্যতা খুব পুরাতন। কিন্তু সেটাও আবার প্রাচীনতর সুমের-আকাডের অসীমীয় (non semitic) সভ্যতার অঙ্কেই লালিত, পালিত, বর্দ্ধিত। পারস্যোপসাগরের মাথায় যেখানে ইউফ্রেটিস্ নদী আসিয়া পড়িয়াছে, সেইখানে এরিডু (Eridu) নামে এক প্রাচীন নগর ছিল। কত প্রাচীন তাহা ঠিক করিয়া বলা শক্ত। টাইগ্রেস্ ইউফ্রেটিসের মোহনায় পলি পড়ার ধরণ হইতে গণিয়া অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে অন্ততঃ খৃঃ পূঃ চারি হাজার বৎসর আগে ঐ নগর পারস্যোপসাগরের উপকূলবর্ত্তী ছিল। এবং অধ্যাপক সাইস্ সাহেব লিখিতেছেন—"There must have been a time when Eridu held a foremost rank among the cities of Babylonia, and when it was the centre from which the ancient culture and civilization of the country made its way." পাদটীকায় লিখিতেছেন—"The decay of Eridu was probably due to the increase of the delta at the head of the Persian gulf, which made it an inland instead of a maritime city, and so destroyed its trade." এখন এই Eriduর এক প্রাচীন উপাখ্যান (সাহেবী ভাষায় "culture-myth") আমাদের বলিতেছেন, কি ভাবে সমুদ্র হইতে "অর্দ্ধমীন অর্দ্ধমানব" এক দিব্যপুরুষ উত্থিত হইয়া সমগ্র ব্যাবিলোনিয়ায় অসভ্য বর্ব্বর সমাজে জ্ঞানালোক ও সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন। অধ্যাপক মহাশয় লিখিতেছেন—"Ancient legends affirmed that the Persian gulf—the entrance to the deep or ocean-stream—had been the mysterious shot from whence the first elements of culture and civilisation had been brought to Chaldea." Berossesএর ইতিহাস হইতে তিনি ঐ দিব্য পুরুষের অভ্যুত্থানের গল্পটিও আমাদের শুনাইয়াছেন। গ্রীক্ ভাষায় ঐ দিব্যপুরুষের নাম হইয়াছে (Oannes) ওয়ানেস্। তিনি পুরাতন সুমেরের জ্ঞান-দেবতা Ea হইতে অভিন্ন। সে যাহা হউক, এই ক্যালডীয় মৎস্যাবতারের রহস্যের "আমিষ" গুলিই আমরা হাত বুলাইয়া সংগ্রহ করিতে পারিলাম। আমাদেরও পুরাণে ভগবান মৎস্যরূপী হইয়া প্রলয়-পয়োধি জলে বেদ সকলকে ধারণ করিয়াছিলেন। ইহার ভিতরে গভীর তত্ত্ব আছে।

বলা বাহুল্য, প্রত্নতাত্ত্বিকেরা প্রায়ই সে তত্ত্বের আবিষ্কারে তেমন যত্ন করেন নাই। গভীর তত্ত্বের ভাবনা চিন্তা সাধারণতঃ সভ্যতা বিকাশের অর্ব্বাচীন যুগেই হইয়াছে, প্রাচীন যুগে হয় নাই—এই থিওরি তাঁদের স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়া থাকায় তাঁদের দৃষ্টি প্রায়ই বহির্মুখী হইয়াছে। ভিতরে গল্প, ম্যাজিক, অন্ধ বিশ্বাস ছাড়া আর বড় কিছু নাই—এই বিশ্বাসে তাঁরা প্রাচীন সভ্যতার অন্দর মহল (inner court) টি তেমন মনোযোগের সহিত খোঁজ-তল্লাস করেন নাই। ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ "ত্রেধা নিদধে" ঋকে সায়ণাচার্য্য বিষ্ণুর বামনরূপে পাদত্রয়-বিক্ষেপের কথা বলিয়া কি ঝকমারিই করিয়াছেন! Vedic grammar, Vedic Mythology প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা অধ্যাপক ম্যাক্‌ডনেল এ জাতীয় ব্যাখ্যায় অসহিষ্ণু হইয়া বলিতেছেন, "Thus Sayana considers the dwarf incarnation of Vishnu to be referred to in R. V. 1. 22. 16. ff; yet Yaska (XII. 19) seems to know nothing of that incarnation, which in any case can be shewn to have been a mythological development of the post-Rigvedic period" এইরূপ, ঋগ্বেদে রুদ্র কোন মতেই পুরাণ-কারের পার্ব্বতীবল্লভ রুদ্র হইতে পারেন না। এ জাতীয় "mythological

development" এর "শাক" দিয়া সকল সময়ে বেদের অর্থ গৌরবের আমিষ-খণ্ডটিকে ঢাকা চলিবে না।

এখন, এরিডুর মীনাবতারের প্রাচীন গাথা হইতে অধ্যাপক সাইস মসিয়ে ল্যার্ঁমা প্রভৃতি Assyriologist-গণ সাব্যস্ত করিলেন কি? "আধা মাছ আধা মানুষ"—এটা টেইলর সাহেবের মানসপুত্র এনিমিজম্এরই বংশাবতংশ টটেমিজ্ম ("টটেম্"—অথবা পশুপক্ষী সরীসৃপকে দেবতা বানাইয়া পূজা করা) বই আর কি হইবে? তবে নীললবণাম্বুরাশি হইতে তাহার অভ্যুত্থান? ইহার মধ্যে অবশ্য একটা মস্ত বড় দরকারী ঐতিহাসিক তথ্য লুকানো রহিয়াছে। প্রাচীন ক্যালডীয় সভ্যতা অর্ণব-পথে দূর দেশ হইতে আসিয়াছিল। এক দিকে ইজিপ্ট ও সিনাই উপত্যকা, অন্য দিকে ভারতবর্ষ—এই দুই দেশের সঙ্গে স্মরণাতীত কাল হইতেই ক্যালডীয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত। তাহার অনুরূপ পাকা নিদর্শনও আছে। তন্মধ্যে একটা এই—ভারতের "সিন্ধু" নামক বস্ত্রও সব দেশে আমদানী হইত; গ্রীক্, হিব্রু, ব্যাবিলোনীয় ভাষায় "সিন্ধু" কথাটা সামান্য রূপান্তরিত হইয়া রহিয়া গিয়াছিল; পারস্যের মধ্য দিয়া স্থল পথে সিন্ধু শব্দটি, শব্দের অভিধেয় পদার্থের সহিত, যাত্রা করিলে "স" "হ" হইয়া যাইত; কিন্তু তাহা হয় নাই। অতএব সরাসরি কালাপানি পার হইয়াই গিয়াছিল। পক্ষান্তরে স্বর্গীয় লোকমান্য তিলকের অনুমান এই যে, ঋগবেদের "মনা" শব্দটি ভারতীয় আর্য্যেরা ক্যাল্‌ডীয়দের কাছ হইতে কর্জ্জ করিয়াছিলেন। শব্দটি ফিনীসীয়, গ্রীক্ লাটিনে সামান্য একটু চেহারা বদ্‌লাইয়া বিদ্যমান ছিল দেখা যায়। এ, বি, কিথ্ প্রমুখ পণ্ডিতেরা লোকমান্যের যুক্তিতে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়াছেন।

ব্যাবিলোনীয়ার মীনাবতারের উপাখ্যান হইতে এইটুকু ঐতিহাসিক তথ্য নিঙড়াইয়া বাহির করিয়া পণ্ডিতেরা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কোথায় কবে কি হইয়াছিল, কে কার আগে, কে কার পিছে, কে উত্তমর্ণ কে অধমর্ণ—এই সব লইয়া বাদানুবাদই যেন ইতিহাস। প্রাচীন সভ্যতা ও সাধনার প্রাণটা সেই রূপকথার রাজকন্যার মত পালঙ্কে মরার মতন এলাইয়া পড়িয়া আছে; শয্যাপার্শ্বে মরণ কাঠি ও জীওন কাঠি দুইই পড়িয়া আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু পণ্ডিতেরা, কার অভিশম্পাতে বলিতে পারি না, জীবন কাঠিটা অনেক সময় খুঁজিয়া না পাইয়া, মরণ কাঠির সাহায্যেই রাজকন্যার সাজ-পোষাক, আস্‌বাব-পত্র—এ সবের মাপ লইয়া এক অফুরন্ত অসামাল, তস্যাবহ ক্যাটালগ তৈয়ারি করিয়া যাইতেছেন।

প্রোফেসার বার্নার্ড বোসাঁকে (Bernard Bosanquet) তাঁর "Social and International Ideals" (1917) নামক গ্রন্থে "Atomism in History" নামক তাঁর দেওয়া বক্তৃতাটি অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। বক্তৃতাটি উপাদেয়। আমরা যাকে "ক্যাটালগ" তৈয়ারি করা বলিতেছি, তিনি সেইটাকে "method of slips" বলিয়াছেন। Anatole France ঐ পদ্ধতির (অবশ্য অপব্যবহারের) "শ্রাদ্ধ" করিয়াছেন। বোসাঁকে "Agathon"এর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া ফরাসী Faculty of Letters (Sorbonne)র অবস্থা জ্ঞাপন করিতেছেন:—Every research begins with a collection of slips, and they esteem you at the Sorbonne according to the number of your slips. He is a great savant, worthy of your respect, who has before him thousands of these coloured bits of pasteboard, the infinitesimal dust of knowledge." এই টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দেখার পদ্ধতির অতি প্রকোপে সমগ্র, অবিচ্ছিন্ন তথ্য ও তত্ত্বের পরিচয় ("দর্শন" শাস্ত্রের যেটা কাজ) অসম্ভব হইয়া পড়িতে পারে। গোটা ও জীবন্ত তথ্যের পরিচয়ের জন্য যে পদ্ধতির অনুসরণ আবশ্যক, সেটিকে বোসাঁকে "The method of context, of pervading life" বলিয়াছেন। অনুক্রমণিকা এবং ঘটনা বিশেষের সঙ্গে "বৈশ্বানর" প্রাণের সংযোগটি পুরাপুরি লক্ষ্য করিয়া, তবে চলিতে হইবে। সামাজিক ইতিহাসে এবং ভাবাভিব্যক্তির ইতিহাসে এই নীতির অনুসরণ করা ছাড়া সাচ্চা "মূল্যবান্ ফল" পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই।

ব্রতচারিণী

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(৯)

একবার বিহারীলালের কাছে গেলে সহজে যে আর নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না, তাহা সীতা বেশ জানিত। সে নিরামিষ রন্ধনের যোগাড় করিয়া দিয়া আমিষের গৃহে গিয়া দেখিল, পাচিকা ঠাকুরাণী বৃহৎ ভাতের হাঁড়ি উনান হইতে নামাইতে অপারগ হইয়া পড়িয়াছেন।

"সর, আমি ভাত নামিয়ে দিচ্ছি,—"

কোমরে কাপড় জড়াইয়া সীতা ভাতের হাঁড়ি ধরিল ও অবলীলাক্রমে নামাইয়া দিল। বৃদ্ধা ক্ষ্যান্ত ঠাকুরাণী ভারি খুসি হইয়া বলিল, "হয়েছে, এইবার সর দিদিমণি, আমি ফেণ ঝরাচ্ছি।"

সীতা বলিল, "তুমি ততক্ষণ ডালের হাঁড়ি চড়াও, আমি ভাতের ফেণ ঝরিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। বুড়ো মানুষ, এত বড় হাঁড়ি নামাতে পার না, আমায় একবার ডাকলেই পার। না হয় বাড়ীতেও তো লোকের অভাব নেই, কেউ না কেউ হাঁড়িটা নামিয়ে দিলেই পারে।"

বৃদ্ধা সজল চোখে বড় করুণ সুরে কি বকিয়া যাইতে লাগিল, সীতা তাহাতে কাণও দিল না। ভাতের ফেণ ঝরাইয়া হাত ধুইয়া বাহিরে আসিতে দেখিল, আত্মীয়া সম্পর্কীয়া মামীমার ছোট ছেলেটী এক ঘড়া জল কাত করিয়া ফেলিয়া, সেই জলের উপর পড়িয়া আছড়াইতেছে,—মা কোথায় কর্ম্মান্তরে ব্যস্ত রহিয়াছেন, পুত্রের খোঁজ লইবার অবকাশ নাই। সীতা ছেলেটীকে উঠাইয়া গা মুছাইয়া দিল। ছেলেটীকে শান্ত করিয়া, সে তাহার মাতাকে খুঁজিয়া ছেলে দিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, ঈশানী সেইমাত্র ফিরিয়া আসিয়া রন্ধন চড়াইতেছেন। তাঁহার মুখের সে মলিনতা কাটিয়া গিয়াছে, স্বাভাবিক শান্ত প্রফুল্ল ভাব ফিরিয়া আসিয়াছে দেখিয়া সীতা ভারি আরাম পাইল।

সীতাকে দেখিয়া ঈশানী বলিলেন, "এই যে মা, কোথায় গিয়েছিলে? এ পত্রখানা পড়ে রইল, পড়।"

সীতা এনভেলাপবদ্ধ পত্রখানা হাতে লইয়া বলিল, "দাদু কি বললেন মা?"

ঈশানী শান্ত হাসিয়া বলিলেন, "যা বলেছি তাই। জ্যোতির পত্র এসেছে, দাদুর মুখের আর বিশ্রাম নেই। সেই এক কথা—সে কি কখনও বিলেত যেতে পারে,—দৈবাৎ বলে ফেলেছিল। আমিও তাই ভাবছি মা, সত্যিই কি সে যেতে পারে? ক্ষণিক একটা খেয়ালের ঝোঁক উঠেছিল—বিলেত যাবে, সুরেশবাবুর মেয়েকে বিয়ে করবে,—তাই কি হয় কখনও? হাজার হোক বামনের ছেলে, জন্মকালের সংস্কার কখনও ত্যাগ করতে পারে? তার পর ব্রাহ্ম মেয়ে বিয়ে করলে আর আমাদের এ বাড়ীতে মাথা ঢুকাতে পারবে না; বিলেত যাওয়া তো আলাদা কথা। ও সব খেয়াল মা,—দুদিনে খেয়াল মিটে গেলে ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরে আসবে। যাক গিয়ে ও সব, ও পত্রখানা কার?"

এনভেলাপের উপর সুন্দর ইংরাজীতে ঈশানীর নাম লেখা ছিল; সীতা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আপনার নামের পত্র মা, আপনি পড়ুন।"

ঈশানী বলিলেন, "তুমিই পড় মা। এ জগতে আমায় পত্র দিতে জ্যোতি আর ছোট বউ ছাড়া আর কেউ নেই। জ্যোতির পত্র দেখলুম, এ পত্র ছোট বউ ছাড়া আর কেউ দেয় নি।"

সীতা কভার ছিঁড়িয়া পত্র বাহির করিল। প্রথমেই সে নীচে নামের পানে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া, অন্যমনস্ক দৃষ্টি সমস্ত পত্রখানার উপর বুলাইয়া গেল।

তাহার মুখখানা নিমেষে বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইল; এ পত্র পড়িবার মত সাহস তাহার ছিল না। আস্তে আস্তে পত্রখানা ঈশানীর পার্শ্বে রাখিয়া সে সরিয়া যাইতেছিল, ঈশানী ডাকিলেন, "চলে যাচ্ছো কেন মা, পত্রখানা আমায় পড়ে শুনাও।"

নিজে তিনি অতি সামান্য লেখাপড়া জানিতেন। মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পুস্তক কোনক্রমে পড়িতে পারিতেন। পত্রাদি আসিলে ভারি মুস্কিলে পড়িতে হইত; কেন না, হাতের লেখা তিনি বুঝিতে পারিতেন না। সীতা আসা পর্য্যন্ত তিনি বাঁচিয়া গিয়াছিলেন,—সে তাঁহাকে পত্রাদি পড়িয়া শুনাইত।

সীতা ফিরিয়া আসিল, পত্রখানা তুলিয়া লইল। তাহার হাত কাঁপিতেছিল, গলার মধ্যে কি একটা ঠেলিয়া উঠিয়া স্বরটাকে বড় বিকৃত করিয়া তুলিতেছিল। একবার সে ঈশানীর শান্ত মুখখানার পানে তাকাইল। তাহার পর চোখ ফিরাইয়া পত্রের উপর রাখিল। কয়েকটা ঢোঁক গিলিয়া কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক অবস্থায় কতকটা ফিরাইয়া আনিয়া সে পড়িতে লাগিল।

জয়ন্তী এই দীর্ঘ পত্রখানি লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"দিদি,

তোমরা কেউ আমার খবর না নিলেও, আমি যে তোমাদের খবর রাখি, তা হয় তো তোমরা জানো না। জ্যোতির্ম্ময় আমাদের বাড়ীর পাশেই থাকে। সে প্রায়ই এ বাড়ীতে আসা-যাওয়া করে। আমি তার মুখে তোমাদের সব খবরই পেয়েছি এবং এখনও পাই।

তার মুখে শুনতে পেলুম বাবা না কি আমার পত্র পেয়ে অত্যন্ত রাগ করেছেন। আমি তোমায় শুধু এই কথাটী জিজ্ঞাসা করছি দিদি, তাঁর এই রাগ করাটা কি উচিত হয়েছে? ইভার সামনে একজামিন, এখন তাঁর আদেশ মাত্রই যে তার একজামিন না দিয়ে ওখানে ছুটে যেতে হবে এমন কোন কথা থাকতে পারে না। দুদিন বাদে তার একজামিন আরম্ভ, একটা দিন এ সময় উপস্থিত হ'তে না পারলে তার একটা বছর নষ্ট হয়ে যাবে। এই একটা বছর তার পড়ার খরচ আবার কে টানবে বল তো? আমার দাদা নেহাৎ দয়া করে বোনের, ভাগনীর সকল খরচ বহন করছেন। কিন্তু এ তো বইবার কথা নয়, তুমিই ন্যায্য বিচার করে দেখ, তার পর উত্তর দাও। আমার বিয়ে হয়ে পর্য্যন্ত শ্বশুর-বাড়ীর একখানা কাপড়ও পাই নি, টাকাকড়ি তো দূরের কথা।

তোমরা বলবে, সে তো আমারই দোষ—আমি সেখানে থাকতে পারি নি বলে তোমরা রাগ করে আমায় ভাইয়ের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছ। থাকতে পারা বা না পারা, তার জন্যে আজ কোন কথা বলতে আসি নি ভাই দিদি। তবে এইটুকু মনে কোরো, আমায় যে শিক্ষিতা বলে তোমরা ঠাট্টা-তামাসা করেছ, সেই শিক্ষাটুকু না থাকলে খোরাক পোষাকের দাবী আমিও করতে পারতুম।

তোমার দেবর—আমার স্বামী স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী ছিলেন, সে শুধু তাঁর বাপের জন্যে। এই যে শ্বশুর মহাশয় সেদিন ইভাকে লিখেছেন—স্ত্রী-শিক্ষা অধঃপতনের মূল,—এটী কতদূর নীচ মনের উপযুক্ত কথা সেটী একবার মনে করে দেখ। ইভা কখনও তাঁর কাছ হতে কিছু পেয়েছে কি—কখনও একখানা কাপড়,—একখানা গহনা? তাঁর বিশাল সম্পত্তি, অগাধ অর্থ; কিন্তু ইভা একটী পাইও পাবে কি? বলবে ইভা হিন্দুর মেয়ে, লেখাপড়া শিখলেও তাকে বিয়ে করতেই হবে। ভাল কথা, কিন্তু বিয়ের পরে যদি সে বিধবা হয়? বিধবা হ'লে তার মায়েরই মত তাকে পরের গলগ্রহ স্বরূপ জীবন কাটাতে হবে তো? আমার তবু একটী ভাই আছে। তোমরা সব সম্পর্ক উঠাতে পারলেও, ভাই সম্পর্ক উঠাতে পারে নি। কিন্তু তার কি হবে? তার ভাই নেই যে তাকে আশ্রয় দেবে। কাজেই, বাধ্য হয়ে তাকে তার ভবিষ্যতে জীবিকার্জ্জন করার মত শিক্ষা আমায় দিতে হচ্ছে। হ্যাঁ, সে নিজের জীবিকার্জ্জন করবে; তবু যিনি একদিন তার মাকে ও তাকে কুকুরের মত দুয়ার হ'তে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁরই সেই দুয়ারে একমুঠো ভাতের প্রত্যাশায় কিছুতেই যাবে না।

স্ত্রী-শিক্ষা অধঃপতনের মূল, এ কথা তিনিই বলতে পারেন, যিনি মেয়েদের নিতান্ত ঘৃণার চোখে দেখেন,—মেয়েরা চিরদিন তাঁদের করুণা-প্রার্থিনী হয়ে থাক, তাঁরা এদের ওপরে যথেচ্ছ ব্যবহার করেন, এইটাই যাঁরা চান। মেয়েদের শিক্ষায় তাঁরা দোষ ধরবেন বই কি,—মেয়েরা যে তা হলে মুখ ফুটে সত্য কথা বলতে পারবে। তোমার কথা দিয়েই বলছি দিদি, তুমি এই যে মুখটী বুজে পড়ে আছ,—কত কথাই না তোমায় শুনতে হয়েছে, কত নির্য্যাতন না সইতে হয়েছে। হয় তো আজ তুমি আমার এ কথা হেসে উড়িয়ে দেবে, বলবে—না, আমায় এঁরা খুব যত্ন করেন, খুব ভালবাসেন, দেবীর মত শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু আমি কখনও এ কথা বিশ্বাস

করি নে যে, বিধবাকে লোকে ভালবাসে, আদর করে। হতে পারে—তুমি আদর পেতে পার, যত্ন পেতে পার, তাই বলে সকল বিধবা যে পায় না, এ আমি ঠিক জানি। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি এ দেশের বিধবাদের লাঞ্ছনা, এদের চোখের জল,—এদের দীর্ঘনিঃশ্বাস কাণে আসছে। এই সব মেয়েদের যদি শিক্ষা দেওয়া যেত, তবে কি এরা এমন করে আত্মীয়ের সংসারে ক্রীতদাসীর মত জীবন-পণে আবদ্ধ থেকে এ রকম ভাবে লাঞ্ছনা গঞ্জনা সইত, চোখের জলে ভেসে অহরহঃ মৃত্যু প্রার্থনা করত?

ইভার মামা যে চিরকাল তার ভার বইবেন, এমন কোন কথা নেই; অথবা তাকে যে তাঁর গলগ্রহ হয়ে থাকতে হয় আমি সে ইচ্ছা করি নে। যখন তার কিছু নেই, সে পরের কৃপায় মানুষ হচ্ছে, তখন তার ভবিষ্যতের জন্যে নিশ্চয়ই বেশী রকম লেখাপড়া শেখা দরকার।

যাক, এ সব কথায় আর দরকার নেই, এখন অন্য কথা বলি। যা বলবার জন্যে পত্র লিখতে বসেছি তার একটাও বলা হয় নি, ইভার কথা এসে পড়ল। এ সব কথা বাবাকে জানানো উদ্দেশ্য; কিন্তু তাঁকে লিখতে পারলুম না। তোমায় সব জানাচ্ছি, তুমি তাঁকে জানাতে পার।

তোমার ছেলে এখানকার একটী মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। শুনলুম তার কথা তোমায় সে বলেছে। দেবযানী ওদের প্রফেসার সুরেশ মিত্রের মেয়ে। হয় তো খুব আশ্চর্য্য হবে যে, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থে বিয়ে হবে কি করে? কারণ, কায়স্থ ব্রাহ্মণের চেয়ে অনেক ধাপ নীচে। আমাদের সমাজে যখন রাঢ়ী বারেন্দ্রে বিয়ে হতে পারে না, তখন কায়স্থ-কন্যা ও ব্রাহ্মণ-পুত্রের বিয়ে কোন্ সমাজানুমোদিত হতে পারে? এর আগে তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি—সুরেশবাবু ব্রাহ্ম, এবং ব্রাহ্ম সমাজে জাতিভেদ বেশী নেই। ব্রাহ্মণ উচ্চবর্ণ; কিন্তু কায়স্থও অস্পৃশ্য নয়। আজকাল এ রকম বিয়ে অনেক জায়গায় চলন হয়ে গেছে, হচ্ছেও অনেক। তবে তোমরা সহর হতে বহু দূরে থাক,—হয় তো এ সব বার্ত্তা তোমরা কখনও পাও নি, তাই শুনবামাত্র আকাশ হতে পড়বে, আগেই মাথা নাড়বে,— এ বিয়ে হবে না, হতে পারবে না।

তুমি বেশী লেখাপড়া জানো না; নইলে জানতে পারতে, এ রকম বিয়ে আমাদের দেশে এই নতুন নয়,—বহু পূর্ব্ব যুগে এ রকম বিয়ে প্রচলিত ছিল। প্রমাণ দেখতে চাও—রাজা যযাতি ব্রাহ্মণ-কন্যা দেবযানীকে বিয়ে করেছিলেন, লোপামুদ্রা ক্ষত্রিয়-কন্যা হয়ে ব্রাহ্মণকে বিয়ে করেছিলেন। সে সব বিয়ে যদি তখনকার দিনে সমাজানুমোদিত বলে গণ্য হয়ে থাকে, তবে এখনই বা না হবে কেন? তোমার ছেলে কায়স্থ-কন্যা দেবযানীকে কেন না বিয়ে করতে পারবে, তার কারণ তবে আমায় দেখাও।

আমি জানি, সে দেবযানীকে কতখানি ভালবাসে। সে নিজের মুখে বলেছে, দেবযানীকে না পেলে সে আর বিয়ে করবে না। জানো না দিদি,—এ রকম হতাশ হয়ে ছেলেরা আত্মহত্যা পর্য্যন্তও করে থাকে। তার খুব আশা সে দেবযানীকে বিয়ে করবে, বিলাত যাবে—একটা মানুষ হয়ে ফিরে আসবে। আমি এও জানি, বাবা এতে কখনই মত দেবেন না; কারণ, তিনি গোঁড়া হিন্দু, সেকালের প্রথামত বাঁধা গৎ ঝাড়বেন। দেশে থেকে মেয়েদের সামান্য শিক্ষায় যিনি এক মুহূর্ত্তে ভবিষ্যৎ দেখে ফেলেন, জ্যোতির এই বিয়ে আর বিলাত যাওয়ার নামে তিনি যে পাগল হয়ে যাবেন, তাতে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই।

আর দেবযানী? আমি যতদূর জানি—সেও জ্যোতিকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। সে সব রকমেই জ্যোতির উপযুক্ত পাত্রী। আমি জ্যোতিকে ছেলের মত ভালবাসি। জানি নে আমার এ কথা তোমরা বিশ্বাস করবে কি না; কারণ তোমরা না কি শিক্ষিতা মেয়েদের ভালবাসা, স্নেহ, ভক্তি প্রভৃতি হৃদয়ের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলোও নিক্তি দিয়ে ওজন করে দেখ।

শুনলুম—জ্যোতির সঙ্গে বিয়ে দেবে বলে' তোমরা একটি মেয়েকে বাড়ীতে এনে রেখেছ। তার কথা আমি আগে হতে জানলেও তাকে কখনও চোখে দেখি নি। তবু এ কথা বলতে পারি, তোমরা তোমাদের চোখ দিয়ে যা শিক্ষা সৌন্দর্য্য বলে দেখ, তোমাদের জ্ঞানে যা গুণ বলে' ধারণা কর, তা অতি তুচ্ছ; অন্ততঃ, জ্যোতি তাকে তুচ্ছ বলে [illegible] করবেই। ধরে বেঁধে বিয়ে দিতে পারবে না; কারণ, সে এখন শিশু নয়,—নিজের হৃদয়ের পানে চেয়ে ভালমন্দ বিবেচনা করার শক্তি তার আছে। এই চেষ্টা করার ফলে [illegible] হবে যে, তুমি তার ভক্তি-শ্রদ্ধা হারিয়ে বসবে,—ভবিষ্যতে [illegible] নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে তার অন্তরটা ভক্তিতে [illegible] উঠবে না,—তার চোখ দুইটী ছল ছল করে আসবে না।

তার সারা অন্তরটা ঘৃণায় ভরে উঠবে। একটীমাত্র সন্তান তোমার, তার বুকে তোমার আসন অটুট রেখো,—মা ডাক শুনতে ইচ্ছা করে বঞ্চিতা হয়ো না।

আমি তোমার চেয়ে বয়সে ছোট, সম্পর্কে ছোট হয়েও তোমায় যে উপদেশ দিতে সাহস করছি, এর জন্যে আমায় মার্জ্জনা কর। আমিও সন্তানের মা। সন্তানের মুখের মা আহ্বানটা কাণে শোনাই আমাদের নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা। সেই মা ডাক হতে বঞ্চিতা হওয়া যে নারী-জীবনে কতবড় অভিশাপ, তা তো বুঝতে পারি দিদি! তাই তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি। শুধু বর্ত্তমান দেখো না,—ভবিষ্যৎ ভাবতে, ভবিষ্যৎ দেখতে চেষ্টা কর।

তুমি মনে কর না, আমি জ্যোতির কাছ হতে সব কথা শুনে লিখছি। সে আমায় একটা কথাও বলে নি,—আমি তার মলিন মুখ দেখে সব বুঝতে পেরেছি। তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বড় মলিন হাসি হেসে শুধু বললে, "আমার বিলেত যাওয়া হল না," আর একটী কথা সে বলে নি। বড় ব্যথা সে পেয়েছে, কিন্তু মুখ ফুটে একটী কথা বললেনা। হায় দিদি, তুমি মা, তাই জিজ্ঞাসা করছি—তোমার ধর্ম্ম বড়, তোমার ওই সমাজ বড়, না—তোমার সন্তান বড়?

আশা করছি, তোমরা ভাল আছ। যে মেয়েটীকে এনে রেখেছ, তার বিয়ে দিয়ে দাও,—বড়ঠাকুরের প্রতিজ্ঞা রক্ষা হবে।

সব কথাই বললুম দিদি। বেশ ভাল করে সব কথা বিবেচনা করে দেখ, তার পর যা ব্যবস্থা হয় কর। আমার মতে যা ভাল তাই বললুম, এখন তোমার যা ইচ্ছা। যদি ইচ্ছা হয়—রাগ না করে থাক, একখানা পত্র দিয়ো। প্রণাম নিয়ো।

সেবিকা ছোটবউ।"

তরকারীর কড়াটা উনানে বসানো ছিল, ঈশানী তাহা নামাইয়া ফেলিয়া হাত ধুইলেন। নিঃশব্দে বড় মলিন মুখে তিনি আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেলেন।

প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত তরুণী সীতা আড়ষ্ট ভাবে পত্রখানা হাতে করিয়াই দাঁড়াইয়া ছিল। যখন তাহার চমক ভাঙ্গিল, তখন সে দেখিল, তরকারীসুদ্ধ কড়াখানা উনানের ধারে পড়িয়া রহিয়াছে,—ঈশানী কখন চলিয়া গিয়াছেন।

পত্রখানা ফেলিয়া রাখিয়া সে ঈশানীর রুদ্ধ দ্বারে গিয়া আঘাত করিয়া বিকৃতকণ্ঠে ডাকিল, "মা—"

গৃহমধ্য হইতে উত্তর আসিল না।

সীতা আবার দরজায় আঘাত করিয়া ডাকিল, "মা, রান্না ফেলে চলে এলেন যে—"

ঘরের মধ্য হইতে কান্নাভরা সুরে ঈশানী উত্তর দিলেন, "ওসব বামনঠাকরুণকে নিয়ে যেতে বলে দাও মা। আমার আজ শরীর বড় খারাপ করছে, কিছু খাব না।"

সীতা খানিক দরজায় ভর দিয়া চুপ করিয়া অন্যমনস্ক দৃষ্টি কোন দিকে ফেলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে তাহার বড় বড় চোখ দুইটী অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। হঠাৎ কখন চোখ ছাপাইয়া ঝর ঝর করিয়া আরক্তিম গণ্ড দুইটী ভাসাইয়া স্রোত ছুটিল। ধীরে ধীরে সে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

একখানি পত্র আসিয়া বাড়ী মধ্যে যে এত গোল বাধাইয়া তুলিয়াছে তাহা বিহারীলাল জানিতে পারিলেন না। যে দুইটী নারী পত্রের কথা জানিয়াছিল, তাহারা ইহার কথা একেবারেই গোপন করিয়া গেল।

(১০)

বিহারীলাল দিন গণিতেছিলেন—কবে জ্যোতির্ম্ময় আবার ফিরিয়া আসিবে, কবে তাহার বিবাহটা দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে তীর্থযাত্রা করিতে পারিবেন। তাঁহার সকল আশাই এখন ঘুচিয়া গিয়াছে, এই একটী আশা লইয়া তিনি এখনও বাঁচিয়া আছেন।

ম্যানেজার সুশীলবাবু অল্পদিন মাত্র এই ইষ্টেটে কার্য্য লইয়াছেন। ইঁনি সীতার পিতা বিনয়ের সম্পর্কীয় ভ্রাতুস্পুত্র ছিলেন। তিনি বিহারীলালের কার্য্যে দু'দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় গিয়াছিলেন, রাত্রির ট্রেনে ফিরিয়া সে দিন তিনি প্রভুর সহিত দেখা করিতে পারিলেন না।

সকালবেলা বিহারীলাল নিত্যকার মত বৈঠকখানায় বসিয়া জমীদারীর কাগজপত্র দেখাশুনা করিতেছিলেন, নীচে মেঝেয় কয়েকটী প্রজা অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে বসিয়া ছিল। ইহারা গোমস্তার অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রভুর নিকট নালিশ করিতে আসিয়াছে। অনেক দিন হইতে তাহাদের উপর অনেক অত্যাচার চলিতেছিল। এত দিন তাহারা ভয়ে কর্ত্তাবাবুর নিকট নালিশ করিতে আসিতে পারে নাই,—বড় অসহ্য হওয়ায় আজ তাহারা চলিয়া আসিয়াছে।

সুনীলবাবুকে ডাকিবার জন্য প্রত্যুষে লোক পাঠান হইয়াছে। অনেক দিন জ্যোতির্ম্ময়ের কোন সংবাদাদি পাওয়া যায় নাই, বিহারীলাল অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিহারীলাল দুইখানি পত্র দিয়াও তাহার উত্তর পান নাই। সেইজন্য তিনি সুনীলবাবুকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, যেন তিনি আগে জ্যোতির্ম্ময়ের সংবাদ নেন।

সুনীলবাবু আসিতেই তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন, "এই যে তুমি এসেছ সুনীল। আমি কাল রাত্রেই তোমার কাছে লোক পাঠাব ভেবেছিলুম,—বউ মা বারণ করলেন, তাই আর কাউকে পাঠাইনি। আজ ভোরে তাই তোমায় ডাকতে লোক পাঠিয়েছি। তুমি হয় তো মনে ভাবছ বুড়ো পাগল হয়ে গেছে, তার এক ঘণ্টা দেরী সইছে না।"

স্নিগ্ধ সকৌতুক হাসিতে তাঁহার মুখখানা ভরিয়া উঠিল।

সুনীলবাবু ফরাসের এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। বৃদ্ধ এখনই পৌত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন,—তিনি তখন কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়া উঠিয়াছিল।

কাগজ দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক ভাবে বিহারীলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল রাত্রে তুমি এসেছ,—না?"

সুনীলবাবু উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ। আমিও রাত্রেতেই আসবার চেষ্টা করেছিলুম; কিন্তু বৃষ্টি এসে পড়ল—"

বিহারীলাল বলিলেন, "ভালই করেছ। তেমনি কিছু দরকার ছিল না যে তখন সেই বৃষ্টিতে এসে না বললে চলত না।"

তেমন কিছু দরকার যে ছিল না, তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়া ও কথার ভাবেই বুঝা যাইতেছিল।

বিহারীলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "জ্যোতির কাছে গিয়েছিল, সে বেশ ভাল আছে তো? বলেছিল, তাদের কি একটা পরীক্ষা বাকি আছে, সেটা হয়ে গেছে কি?"

সুনীলবাবু অন্যদিকে চাহিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, খোকাবাবু বেশ ভালই আছেন দেখলুম। সে পরীক্ষাটা হয়ে গেছে শুনতে পেলুম।"

উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "পরীক্ষা হয়ে গেলেই তার বাড়ী আসার কথা ছিল; হয়ে গেল তবে সে এল না কেন?"

সুনীলবাবু মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

যে কথা তিনি শুনিয়া আসিয়াছেন, তাহা কোনরূপে তিনি মুখে আনিতে পারিতেছিলেন না। বৃদ্ধ যে অনেক আশা লইয়া পথপানে চাহিয়া আছেন, পরীক্ষা দিয়া পৌত্র ফিরিয়া আসিবে। তিনি গৃহদেবতা শ্রীধরের ভোগ মানিয়াছেন, গ্রাম্য দেবী চণ্ডীর পূজা মহাসমারোহে দিবেন স্থির করিয়াছেন, সে সকল আশা তাঁহার ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। তিনি কেমন করিয়া জানাইবেন সে আর আসিবে না, অথবা সে আসিলেও বিহারীলাল তাহাকে এ গৃহে আর স্থান দিবেন না!

তাঁহাকে নীরব দেখিয়া সন্দিগ্ধ ভাবে বিহারীলাল মুখ তুলিয়া তাঁহার পানে চাহিলেন। সে দৃষ্টির সম্মুখে নিজেকে স্থির রাখিতে না পারিয়া সুনীলবাবু অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

কাগজপত্রগুলি এক পার্শ্বে সরাইয়া রাখিয়া উদ্বিগ্ন ভাবে বিহারীলাল বলিলেন, "আমি বেশ বুঝতে পারছি তুমি আমায় কি একটা কথা গোপন করবার চেষ্টা করছ; কিন্তু তোমার এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। সত্তর বছর বয়েস হ'ল, সে সংসারের অনেক দেখে শুনে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, সে কথা নিশ্চয়ই তুমি ভুলে যাও নি সুনীল। বল,—যতই অপ্রিয় সত্য হোক না কেন, তা প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হয়ো না,—মিথ্যে কতকগুলো কথা দিয়ে তাকে চাপা দিতে চেয়ো না। জেনো—এ বুক বড় শক্ত, অনেক আঘাত পেয়েছে, তবুও যখন ভাঙ্গে নি,—আরও অনেক আঘাত সইতে পারবে, তবু ভাঙ্গিবে না।"

সুনীলবাবু রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "জ্যোতি—"

তিনি থামিয়া যাইতে বিহারীলাল বলিলেন, "কি করেছে সে তাই বল।"

সুনীলবাবু বলিলেন, "সে অধ্যাপক সুরেশ মিত্রের মেয়েকে বিয়ে করছে শুনলুম। আমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল, সে অনেক——"

"থাক থাক, শুনেছি—বুঝেছি সুনীল"—এমন তীক্ষ্ণ সুরে তিনি কথা কয়টী বলিয়া গেলেন যে, সুনীল বাবু থতমত খাইয়া নীরব হইয়া গেলেন।

বৃদ্ধ খানিকটা গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর কাগজপত্রগুলা আবার সম্মুখে টানিয়া আনিয়া তাহার উপর

চোখ রাখিলেন। চশমার কাচ ঝাপসা হইয়া উঠিয়াছিল; তাই চশমা খুলিয়া কাচ দুইখানা একবার মাজিয়া লইয়া আবার চোখে দিলেন।

সুশীলবাবু বিস্মিত ভাবে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, এ সংবাদ শুনিয়া বৃদ্ধ না জানি কি কাণ্ড করিয়া বসিবেন! দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন যে, তাঁহার মুখখানা একবার মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র বিকৃত হইয়া তখনই আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিল।

বিহারীলাল প্রজাদের প্রদত্ত আবেদন-পত্রখানা গভীর মনোযোগের সহিত পড়িয়া গেলেন। চোখ তুলিয়া প্রজাদের প্রধান মণ্ডল রতনের পানে তাকাইয়া শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "আচ্ছা, আজ তোমরা যাও। সোমবারে দীননাথ গোমস্তার সদরে আসবার কথা আছে, তোমরাও সেই দিনে আসবে, আমি সেই দিনে তার বিচার করব। তোমরা না এলে —"

রতন মণ্ডল ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া করযোড়ে বলিল, "হুজুর মা বাপ; তিনি বলেছেন—যদি আমরা আপনার কাছে কোন কথা জানাই, তা হলে তিনি আমাদের ঘর জ্বালিয়ে দেবেন, আমাদের জরু গরু—"

বিহারীলাল গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "সে ভার আমি নিচ্ছি, তোমাদের সে ভয় করতে হবে না। আমি বলছি, তোমরা কয়জনে সোমবারে অবশ্য আমার কাছে আসবে, আমি তার বিচার করব,—আজ তোমরা যাও।"

সসম্ভ্রমে নতজানু হইয়া প্রণাম করিয়া তাহারা বিদায় লইল।

আবেদন-পত্রখানা পার্শ্ববর্ত্তী বাক্সের মধ্যে রাখিয়া বাক্স রুদ্ধ করিয়া বিহারীলাল সুশীলবাবুর দিকে ফিরিলেন। তাঁহার মুখে চোখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া একটু হাসিলেন, বলিলেন, "তুমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছ সুশীল, যে আমার একমাত্র বংশধর,—সে ধর্ম্মত্যাগী হল—আমি সেটা শুনে সহ্য করে গেলুম! কিন্তু তুমি জানো না সুশীল,—চোখে না দেখলেও যে এক বছর তুমি এখানে এসেছ এর মধ্যে নিশ্চয়ই শুনেছ—এর চেয়ে কত বড় আঘাতও আমায় সইতে হয়েছে। বিচলিত হই নি এমন কথা বলতে পারি নে; কারণ, আমিও মানুষ, দেবতা নই। প্রথম যখন স্ত্রী গেল, তখন আমার কাছে পৃথিবী মরে গেল,—প্রেতের মত এই পৃথিবীর বুকে আমি রইলুম। তার পর ধীরে ধীরে আমার বুকে আবার স্পন্দন অনুভব করলুম, সুখ-দুঃখ আবার বোধ করলুম, যাতে জানলুম—আমি মরিনি, আমি বেঁচে আছি। আমার যোগ্য ছেলে প্রকাশ চলে গেল, ক্রমে তার শোকও ভুলে গেলুম। প্রতাপ গেল—তার স্ত্রী-কন্যা আমার পর হয়ে গেল। আমি জগতের আর কারও ওপরে এতটুকু ভরসা করি নি, জানি—কেউ আমার থাকবে না,—আমায় ফেলে একে একে সব চলে যাবে। উৎসব ফুরিয়ে গেছে সুশীল, তার চিহ্ন বুকে নিয়ে আমি শুধু বেঁচে আছি। ফুলের মালা শুকিয়ে গেছে, একে একে আলো সব নিভে গেছে, আমি যাই নি—আমি আছি। কি শক্ত বুক দেখেছ, অনেক আঘাত সইতে পারি; কিন্তু তোমরা হলে তোমাদের বুক শতধা হয়ে যেত। সব যাক—সব যাক, আমার দেবতা তো যাবেন না। অকৃতজ্ঞ মানুষ ছাড়তে পারে, সব ভুলে যেতে পারে, দেবতা তো প্রতারণা করতে পারেন না। ভুল বুঝেছিলুম, ভুল আমার ভেঙ্গে গেছে। সংসার ত্যাগ করে আবার সংসারে জড়িয়ে পড়েছিলুম, এ তারই শাস্তি। নারায়ণ জানালেন—সব মিথ্যে—একমাত্র তিনিই সত্য।"

ইতস্ততঃ ছড়ানো কাগজপত্রগুলি একত্র গুছাইয়া, তাহার উপর এক খণ্ড লৌহ চাপা দিয়া, চশমা খুলিয়া তিনি উঠিলেন। একটু আগে রাখাল তামাক সাজিয়া দিয়া গিয়াছিল, সে তামাক পুড়িয়া ধোঁয়া উঠিতেছিল, সে দিকে বিহারীলালের দৃষ্টি ছিল না।

"আচ্ছা, আজ তবে এসো সুশীল, আমায় এখন একবার বাড়ী মধ্যে যেতে হবে।"

খড়ম জোড়া পায়ে দিয়া তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন।

সীতা পূজার যোগাড় করিতেছিল, খড়মের শব্দ পাইয়া সচকিত হইয়া উঠিল। পাড়ার একটী ছোট মেয়ে প্রত্যহ পূজার সময় আসিয়া জুটিত। পুরোহিত আসিয়া পূজা করিয়া যাইতেন, সে প্রত্যহ প্রসাদ পাইত।

সীতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কে আসছে মিনি, ঠাকুর মশাই নাকি রে?"

মিনি দেখিয়া কিছু বলিবার আগেই বিহারীলাল দরজার উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন; ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়া বলিলেন, "এই যে দিদি, তুমি পূজোর যোগাড় করছ। আমি আজ শ্রীধরের পূজো করব, এখনি স্নান করে আসছি।"

তিনি চলিয়া গেলেন।

আজ হঠাৎ তাঁহার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া সীতা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে আজ কয় মাস এখানে আসিয়া রহিয়াছে, বিহারীলালকে এক দিনও সে পূজার ঘরে দেখিতে পায় নাই। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তরুণ বয়স হইতে ঠাকুরের পূজা করিয়া আসিতেছেন,—বিহারীলাল তাঁহার উপরে এ ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলেন।

স্নানান্তে ফিরিয়া আসিয়া তিনি পূজার আসনে বসিলেন। সীতা বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া আছে দেখিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ভাবছ সীতা, আমি হয় ত পূজা করতে জানি নে। যাকে নিয়ত বিষয়-কর্ম্মে নিবিষ্ট থাকতে দেখেছ, সে যে পূজো করতে আসবে, এ যেন তোমার কাছে একেবারেই অসম্ভব বলেই ঠেকে। দিদি, সত্তর বছর বয়েস হয়েছে, এখনও পাথেয় এতটুকু সঞ্চয় করতে পারলুম না। আশা ছেড়ে দিয়েও কি মিথ্যে আশায় ভুলে ছিলুম, আজ তাই ভাবছি। সব হারানোর পথ বেয়েই যে চলেছি দিদি,—আমার যে নিজেকে পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলবার সম্ভাবনা আছে, তাও আমি ভুলে গিয়েছিলুম। যখন দারুণ বাতাস বইতে সুরু করেছিল, তখন আমি তাসের ঘর তৈরী করছিলুম। বাতাসে সে ঘর একটা একটা করে ভেঙ্গে পড়ছিল, আমি আবার তাকে গড়ে তুলতে প্রাণপণ চেষ্টা আর যথেষ্ট সময় ব্যয় করছিলুম। আজ দেখছি—একেবারে সব ভেঙ্গে পড়েছে। আর ভুলব না ভাই। যা গেছে তা যাক, এ ব্যর্থ প্রয়াসের আর দরকার নেই,—আমায় এখন মুখ ফিরিয়ে সরে দাঁড়াতে হবে। হায় রে, সোনা ফেলে যে শুধু রাংই কুড়িয়েছি, তা এতকাল জানতে পারি নি, আজ জেনেছি,—সব দিয়ে আসার পথে তবু কি কুড়িয়ে নিতে চেয়েছিলুম, কার জন্যে তবু সঞ্চয় করতে চেয়েছিলুম—ভেবেছিলুম যতক্ষণ জীবন আছে তার জন্যে খেটে যাই—শুধু খেটে যাই? লোকে পাগল বলেছে, উপহাস করেছে,—অজ্ঞাতে সে কথা কাণে এসেছে, হেসে সব উড়িয়ে দিয়েছি। সব ফুরাল দিদি,—সব ফুরিয়ে গেল। সঞ্চয়ের বাসনা দূরে থাক,—আজ মনে হচ্ছে, এতদিন রক্ত জল 'করে' দিন-রাত খেটে যা বাড়িয়ে এসেছি, সেই সব যদি দুহাতে বিলিয়ে দিতুম, তাও যে ভাল হত দিদি।"

তাঁহার সুর কান্নায় ভিজিয়া উঠিয়াছিল, তিনি চোখ ফিরাইয়া সিংহাসনস্থিত বিগ্রহের পানে চাহিলেন।

তাঁহার মনে যে কতখানি ব্যথার গ্লানি জমিয়া উঠিয়াছিল, তাহা সীতা বেশ বুঝিয়াছিল। তাহার বুকখানা দলিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে বিহারীলাল বলিলেন, "সে যে এমন করে আমার বুকে ব্যথা এঁকে দিয়ে যাবে, তা তো কখনও ভাবি নি দিদি। বউ মা বুদ্ধিমতী, তিনি আগেই তার মানসিক গতির পানে দৃষ্টি করেছিলেন; তাই তিনি আমায় তাকে বেশী পড়াতে, বেশী দিন কলকাতায় রাখতে বারণ করেছিলেন। আমি তাঁর কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলুম। তারই ফল আজ আমায় পেতে হচ্ছে। আবার ভাবছি—এ বেশই হয়েছে,—নারায়ণ তাঁর ভক্তকে এমনি করে পরীক্ষা করছেন,—দেখছেন, তবু আমি বিশ্বাস হারাই কি না,—তাঁকে ছাড়ি কি ধর্ম্মত্যাগী পৌত্রকে ছাড়তে পারি। আমি এই ভেবে তাঁকে এই মুহূর্ত্তে ধন্যবাদ দিচ্ছি—এর আগে আমার মৃত্যু হয় নি। তোমরা বলবে, এর আগে আমার মরা ভাল ছিল,—আমায় তা হলে এ আঘাত সইতে হতো না। কিন্তু আমি এক একবার দুঃখে অধীর হলেও, সময় সময় সত্য জ্ঞানে বুঝতে পারছি—এই সব দেখবার জন্যই আমার বেঁচে থাকার দরকার। তাই তিনিই আমার জীবনী-শক্তি বর্দ্ধিত করে দিয়েছেন। আমি যদি এর আগে মরতুম, আমার সকল সম্পত্তি সে এতদিন হাতে পেত; কারণ, সে এখন সাবালক হয়েছে। সে এই মেয়েটীকে বিয়ে করত, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করত এবং বিলাতেও যেত,—এই কষ্টার্জ্জিত অতুল সম্পত্তি হাতে পেয়ে সে যথেচ্ছাচার করত। বিধর্ম্মীর পায়ের স্পর্শে আমার পবিত্র ভিটে কলঙ্কিত হতো, বিধর্ম্মীর হাতে আমার পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত শ্রীধরের লাঞ্ছনার শেষ থাকত না। এই জন্যেই আমি মরি নি, এখনও বেঁচে আছি বলেই এর প্রতিবিধান আমি করতে পারব,—আমার পবিত্র ভিটে, আমার শ্রীধর—আমি রক্ষা করতে পারব। যেটা হোতই তা এখন আমি বেঁচে থাকতে আমার চোখের সামনেই যে হল, এ আমার সৌভাগ্য দিদি। আজ হতে যত দিন বাঁচবো, আমার শ্রীধর আমারই হাতে থাকবেন। আর তেমন আন্তরিকতার সঙ্গে জমীদারি দেখবার—এ বাড়িয়ে তোলবার কি দরকার ভাই। যা নেহাৎ না করলে নয় তাই মাত্র করে যাব, আর কিছু নয়।"

বিহারীলাল পূজায় বসিলেন। সীতা খানিক স্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত (গোবিন্দ বাবু)

ইমন কল্যাণ—ঢিমে তেতালা।

মেঘের সাথে ঘনিয়ে এল
আমার মনের সকল ব্যথা।
ব'লতে গিয়ে পায় গো বাধা
কি যেন এক গোপন কথা॥
বিরহীর অশ্রুধারা
ঝরে' ঝরে' হল সারা,
সেই সাথে যে ঝ'রলো বারি
ধুইয়ে আমার নয়ন-পাতা॥
সকাল থেকে মেঘের ছায়ে
গড়লো আঁধার ধরার বুকে,
তার সনে যে হৃদয় আমার
উঠ্‌লো কেঁদে গভীর দুঃখে;
মর্ম্ম ভাঙ্গা দীর্ঘ শ্বাস
মানে না যে কোন পাশ,
উঠ্‌ছে জেগে হৃদয় মাঝে
বিষাদ মাখা বেদন গাথা॥

II র্সা র্সা না না | হ্মা ধা পা পা | হ্মা -া গা -া | মা -া গা -া I
মে ০ ঘে র সা ০ থে ০ ঘ নি য়ে ০ এ ০ ল ০

রা গা রা -া | ন্‌া রা সা -া | সা রা গা হ্মা | গহ্মপা ধপহ্মা পা -া I
আ ০ মা র ম ০ নে র স ০ ক ল . ব্য ০ ০ ০ ০ ০ থা ০

র্সা -া র্সর্রর্গা র্গা | র্রা -া র্সা -া | না -া ধা -া | পা হ্মা গা -া I
ব ল তে ০ ০ ০ গি ০ য়ে ০ পা য় গো ০ বা ০ ধা ০

জ্ঞা জ্ঞা না -া | ধা পা মা গা | মা -া গা রা | ন্া র্া সা -া II
কি • যে • ন • এ ক গো • প ন ক • থা •

II পা -া জ্ঞা গা | মা -া গা -া | পা -া না -া | নর্সা -া নধা -া I
বি • র • হী ০ র • অ • শ্রু ০ ধা • রা •

ধা -া না -া | সা র্গা র্রা -া | র্মা -া র্গা -া | না র্রা র্সা -া I
ঝ ০ রে • ঝ ০ রে • হ ০ ল • সা ০ রা •

র্সা -া র্গা র্পা | র্মা র্গা র্রা র্রা | র্সা -া না র্রা | র্সা না ধা -া I
সে • ই • সা থে যে ০ ঝ র ল ০ বা • রি ০

জ্ঞা ধা পজ্ঞগা গা | মা -া গা -া | রা গা রা -া | ন্া রা সা া II
ধু ই য়ে০০ • আ ০ মা র ন ০ য় ন পা • তা •

II সা -া ধ্া -া | সা -া রা -া | গা -া -া -া | ন্া রা সা -া I
স ০ কা ল থে • কে • মে • ঘে র ছা • য়ে •

পা -া জ্ঞা গা | মা -া গা -া | রা গা রা -া | ধ্া ন্া সা -া I
গ ড় ল • আঁ ০ ধা র ধ • রা র বু ০ কে •

ন্া রা রা সা | ন্া -া ধ্া -া | প্া ধ্া ন্া -া | সা -া গা -া I
তা • র স নে • যে • হৃ ০ দ য় আ ০ মা র

পা -া জ্ঞা গা | মা -া গা -া | সা গা রা -া | ধ্া ন্া সা -া I
উ ঠ ল • কেঁ • দে ০ গ • ভী র দু • খে •

পা -া জ্ঞা গা | মা -া গা -া পা -া না -া | নর্সা -া ধা -া I
ম র্ ম • ভা ং গা ০ দী র্ ঘ ০ শ্বা ০ স ০

ধা -া না -া | র্সা র্গা র্রা -া | র্মা -া র্গা -া | না র্রা র্সা -া I
মা • নে ০ না • যে ০ কো ০ ন ০ পা ০ ০ শ

র্সা -া র্গা র্পা | র্মা র্গা র্রা -া | র্সা -া না র্রা | র্সা না ধা -া I
উ • ঠ্ ছে জে ০ গে ০ হৃ ০ দ য় মা ০ ঝে ০

জ্ঞা ধা পজ্ঞগা গা | মা -া গা -া | রা গা রা -া | ন্া রা সা -া IIII
বি ০ ষা০০ দ মা ০ খা • বে ০ দ ন গা ০ থা ০

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন এম-এ

শিবের স্ত্রৈণ অপবাদ

এইরূপে মধ্যে মধ্যে হর-পার্ব্বতীর কোন্দল হয় এবং শেষে শিবকেই নানা উপায়ে মানভঞ্জন করিতে হয়। কিন্তু সেজন্য তাঁহার দোষ দিলে চলিবে কেন? দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর আবদার ও অভিমান একটু অধিক হইয়াই থাকে। তাহার উপর স্বামী বৃদ্ধ হইলে ত সোনায় সোহাগা! এ অবস্থায় পত্নীকে মাথায় করিয়া রাখিতে হয়। শিব-ঠাকুর তাহাও বাকী রাখেন নাই;—গঙ্গাকে সত্য সত্যই চিরকাল মাথায় বহন করিয়া বেড়াইয়াছেন। তাই স্ত্রৈণ বলিয়া তাঁহার বড় অপবাদ। এমন কি তাঁহার নিজের মেয়ে পর্য্যন্ত খোঁটা দিতে ছাড়েন না। শিবের কন্যা পদ্মাবতী (মনসা) যখন চাঁদ সদাগরের নৌকা ডুবাইবার উদ্যোগ করিলেন, তখন চণ্ডী-রূপিণী দুর্গা ভক্তকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। পদ্মার রাগটা গিয়া পড়িল শিবের উপর, কারণ তিনিই ত পত্নীকে প্রশ্রয় দিয়া এতদূর স্বেচ্ছাচারিণী করিয়া তুলিয়াছেন! তিনি যাইয়া পিতাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন,—

> "ভাঙ্গ ধুতুরা খাও সদায় জ্ঞানহীন।
> দেবের দেবতা হৈয়া স্ত্রীর অধীন॥
> স্ত্রী অধীন পুরুষ যে ভোগে সে নরক।
> চণ্ডী আগে তুমি যেন ঘরের সেবক॥"
>
> (বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ)

শিব আশুতোষ, অথচ কথায় কথায় ক্ষেপিয়াও উঠেন। পদ্মার ভৎর্সনায় সহসা চণ্ডীর উপর তাঁহার ক্রোধ হইল। ভালমন্দ কিছুই বিচার না করিয়া তিনি চণ্ডীর উপর ঝাল ঝাড়িতে চলিলেন। চণ্ডীকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন "স্ত্রী হৈয়া স্বতন্ত্র তুমি দেবে উপহাস,"—পত্নীর আচরণে দেব-সমাজে তাঁহার মাথা হেঁট হইয়া গেল! কিন্তু পার্ব্বতী ত কখন তাঁহার নিকট কথায় হারেন নাই। এবারও,—

> "চণ্ডী বলে ভাঙ্গড়ারে তোর লাজ নাই।
> যে তোরে দেবতা বলে তার মুখে ছাই॥
> আপনার মাথা কাটি পূজিল রাবণে।
> তারে বিনাশিলা তুমি কেমন পরাণে॥
> বুকের রক্তেত চান্দ পূজে নিরবধি।
> তার ধন নষ্ট কর তোমার কি বুদ্ধি॥" (ঐ)

শিব অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু

> "এত বলি চণ্ডিকারে বুঝাইতে না পারে।
> হাতে ধরি তুলিলেন বৃষের উপরে॥
> চণ্ডীকে লইয়া শিব গেলেন কৈলাসে।" (ঐ)

শিবের চরিত্রদোষ

শিবের বিরুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা সাঙ্ঘাতিক অভিযোগ এই যে তিনি অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরবশ এবং সে বিষয়ে তাঁহার কোন বাছ-বিচার নাই। তন্ত্রশাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে শিব কোচবধূর সহিত তান্ত্রিক সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে এই দুর্নাম রটিয়া গেল যে তিনি কোচ-বধূগণের প্রতি আসক্ত, সুযোগ পাইলেই কোচ-পটিতে যাইয়া মাদক সেবন এবং কোচ-বধূদের লইয়া কুৎসিত রঙ্গ-তামাসা করেন। পার্ব্বতীর নিকট হাতে-নাতে ধরাও পড়িয়াছেন, তথাপি তাঁহার লজ্জা নাই। রামেশ্বরের শিবায়ণ ও গ্রাম্য শিবের গানের অন্তর্গত বাগ্দিনীর পালা, কুচনীপাড়ার পালা প্রভৃতিতে শিবঠাকুরের অনেক কীর্ত্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে।

পার্ব্বতীর ডোমনী বেশে শিবকে ছলনা

সর্পের দেবতা মনসা বা পদ্মাবতীর জন্মও এইরূপ অবৈধ আসক্তির ফল বলিয়া কথিত হইয়াছে। একদা শিব চণ্ডীকে নিদ্রিত অবস্থায় রাখিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। প্রভাতে চণ্ডী শিবকে না দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। এমন সময়ে নারদ আসিয়া সংবাদ দিলেন যে শিব পদ্মবনে এক পদ্মিনীকে বিবাহ করিতে গিয়াছেন। চণ্ডী তৎক্ষণাৎ সেই দিকে ছুটিলেন, এবং শিবকে অতিক্রম করিয়া কিছুদূর যাইয়া দেখিলেন, নদীতে এক ডোমনী খেয়া দিতেছে। তিনি

শিবকে ছলনা করিবার জন্য ডোমনীকে আপনার রত্নালঙ্কার দিয়া এবং তাহার পিত্তলের অলঙ্কার নিজে পরিয়া নৌকায় বসিয়া রহিলেন। শিব আসিয়া ডোমনী-রূপিণী চণ্ডীর রূপে মুগ্ধ হইলেন এবং সেই নৌকায় নদী পার হইয়া ডোমনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহার গৃহে প্রবেশ করিলেন ; এবং

"কামে হত চিত্ত শিব অন্য নাহি মন।
হাতে ধরি ডোমনীকে দিলা আলিঙ্গন॥"

(নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল)

বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলের শিব ইহার উপর এক কাঠী সরেশ। তাঁহার আর ডোমনীর গৃহে যাইবার বিলম্ব সহিল না। যাহা হউক চণ্ডী অবশেষে আত্মপ্রকাশ করিয়া শিবকে বহু ভৎ‍র্সনা করিলেন।

বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে তবু একটু ভদ্রতা রক্ষা হইয়াছে। পার্ব্বতী তাঁহার দুই সখী জয়া ও বিজয়াকে মায়াবলে নৌকা ও নদীতে রূপান্তরিত করিয়া স্বয়ং ডোমনী সাজিয়া সেই নৌকায় বসিলেন। তাহার পর শিব আসিলেন এবং

"দেখিয়া চণ্ডীর রূপ ধায়্যা পঞ্চানন।
থাপা দিয়া ধরিলাইঁ গায়ের বসন॥
না ছুঁও না ছুঁও মোরে আমি ডোমনারী।
তুমি ভাল জটাধারী ভাল ব্রহ্মচারী॥
* * * *
আঁচল ছাড়িয়া শিব ধরিলেন হাত।
সেইক্ষণে মহামায়া হইলা সাক্ষাত॥
দেখিয়া লজ্জিত হৈলা দেব ত্রিলোচন।
অষ্টভুজা ত্রিনয়নী প্রথম যৌবন॥
দুপাশে দাঁড়ায়্যা সখী জয়া বিজয়া।
কোথা নদী কোথা নৌকা দূরে গেল মায়া॥
হেট মুণ্ড রহে শিব হইয়া লজ্জিত।"

(বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ)

পার্ব্বতীর বাগ্‌দিনী বেশে শিবকে ছলনা

আর একবার পার্ব্বতী বাগ্‌দিনী বেশে শিবকে ছলনা করিতে গিয়াছিলেন। ভোলানাথ তখন কৃষিকার্য্যে মাতিয়া পার্ব্বতীকে ভুলিয়া আছেন। নারদ সেই সুযোগে আসিয়া এই বলিয়া ঈর্ষার আগুন জ্বালাইয়া দিলেন—

"মামাকে করেছে বশ গোটা দশ মেয়ে।
রাত্রি দিন বুলে মামা তার পিছু ধেয়ে॥
তার মধ্যে এক মাগী আছে বড় কালা।
ভ্রূভঙ্গে ত্রিভুবনে দিতে পারে টেল্যা॥"

(রামেশ্বরের শিবায়ণ)

তখন শিবের পরীক্ষার্থে বাগ্‌দিনী রূপ ধারণ করিয়া পার্ব্বতী শিবের নিকট গিয়া দেখা দিলেন। ভোলানাথকে রূপে মুগ্ধ করিতে তাঁহার অধিক বিলম্ব হইল না, কিন্তু বহু সাধ্য-সাধনায় ধরা দিলেন না। অবশেষে প্রেমের নিদর্শন-স্বরূপ শিবের অঙ্গুরী চাহিয়া লইলেন এবং বলিলেন,—

"প্রথমতঃ প্রীত করি খোলা দিব হাতে।
সেঁচাইব জল মাছ বহাইব মাথে॥
পাটা পাড়ি হাটে বসে মাছ বেচ্‌ব আমি।
গোমস্তা হইয়া কড়ি গণ্যে লবে তুমি॥" (ঐ)

শিব অগত্যা এই সর্ত্তে সম্মত হইয়া বিলের জল ছেঁচিয়া দিলেন। তাহার পর বলিলেন,—

"অতঃপর আলিঙ্গনে অনুকূলা হও!
বাগ্‌দিনী বলে সয়া বিদগধ নও *॥
কলেবরে কাদাগুলা ধুয়ে আসি আমি।
ততক্ষণ বাসর নির্ম্মাণ কর তুমি॥" (ঐ)

এই বলিয়া পার্ব্বতী সরিয়া পড়িলেন।

বাগ্‌দিনী আর ফিরিল না দেখিয়া শিব গৃহে ফিরিয়া আসিতেই পার্ব্বতী তাড়া দিয়া উঠিলেন,—

"বাগ্‌দির লাজ নাই ঘরে ঢুকে মোর।
ছেলে পুলে ছুঁইলে ছুতুক হবে ঘোর॥
ভাল যদি চায় তো এখান হতে যাক্।
যেখানে রাখিয়া আইল বাগদিনী মাগ্॥
হর বলে মোর বাগদিনী মাগ্ কে।
সই হয়ে সেই জল সেঁচাইলে যে॥
বাসরে বিকল করি বাগদীর বালা।
ভাল ভুলাইয়া গেল হাতে দিয়া খোলা॥" (ঐ)

ধরা পড়িয়াছেন বুঝিয়াও শিব সাফাই গাহিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহা জেরায় টেঁকিল না। পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাণিক অঙ্গুরী দিলা কারে?" এ প্রশ্নে কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া,

"হর বলে হায় তাহা হারাইনু আমি॥
এক দিন সিদ্ধি খেয়ে বুদ্ধি গেল নাথে।
নিড়াতে নিড়াতে ক্ষেতে হারা হৈল তাতে॥" (ঐ)

* বিগদ্ধ (পণ্ডিত) নও, অর্থাৎ তুমি অতি মূর্খ।

অবশেষে পার্ব্বতী সেই অঙ্গুরী বাহির করিয়া দেখাইলেন। তখন,

"সাক্ষাতে অঙ্গুরী দিতে হৈল হেঁট মাথা।"

এখানেও নিয়তির সেই নিষ্ঠুর পরিহাস! যিনি এক-সময়ে মদনভস্ম করিয়া কামজয়ী হইয়াছিলেন, বাঙ্গালী কবি-গণের হস্তে পড়িয়া আজ তাঁহার কি অধঃপতন!

শিবের কৃষিকার্য্য

ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা যখন শিবের সংসার চলে না, স্ত্রীপুত্রের অশেষ দুর্গতি, তখন তাঁহার ভক্তগণ পরামর্শ দিল, —

"আহ্মার বচনে গোসাঞি তুহ্মি চষ চাষ।
কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস॥
*　　*　　*　　*
ঘরে ধান্য থাকিলে পরভু সুখে অন্ন খাব।
অন্নর বিহনে পরভু কত দুঃখ পাব॥
কাপাস চষহ পরভু পরিব কাপড়।
কতনা পরিব গোসাঞি কেওদা বাবর ছড়॥"

(রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ)

গৃহে পার্ব্বতীও সেই কথা বলেন। কিন্তু শ্রমবিমুখ অকর্ম্মণ্য লোকের মত শিব নানা আপত্তি তোলেন। পার্ব্বতী কিন্তু নাছোড়বান্দা। তখন উভয়ে পরামর্শ আরম্ভ হইল। পার্ব্বতী শিবের শূল ভাঙ্গিয়া লাঙ্গলের ফাল গড়াইতে বলিলেন। শুনিয়া শিব ত চটিয়া লাল,—তাহা হইলে যে তাঁহার শূলপাণি নাম লোপ পাইবে! পার্ব্বতী বলিলেন, "তোমার ত ষাঁড় আছে, যমের মহিষটা চাহিয়া লও, তাহারা লাঙ্গল বহিবে।" ভূতনাথ কিন্তু এক অদ্ভুত প্রস্তাব করিলেন,—

"যমে মোরে মহিষ মাগিতে কেন বল।
বাঘে আর বলদে কি বহে নাহি ভাল॥
বিমলা বলেন প্রভু বাঘা বড় রাড়।
ভেঙ্গে রাখে পাছে বুড়া বলদের ঘাড়॥
দাগাবাজ বাঘা সব বসে বসে শুনে।
চাক পারা চক্ষু করি চায় বৃষ পানে॥
আড়ম্বর করি উঠে ফুলাইয়া অঙ্গ।
দড়বড় দড়ি ছিঁড়ে বৃষ দিল ভঙ্গ॥"

(রামেশ্বরের শিবায়ন)

যাহা হউক, এইরূপ জল্পনা কল্পনার পালা শেষ হইলে, মহা আড়ম্বরে শিবের কৃষিকার্য্যের উদ্যোগপর্ব্ব আরম্ভ হইল। ইন্দ্রের নিকট হইতে রীতিমত পাট্টা করিয়া চাষভূমি দখল করা হইল। বিশ্বকর্ম্মা আসিলেন লাঙ্গল গড়িতে, পাণ্ডুপুত্র ভীম কৃষাণ হইয়া আসিলেন। ভিক্ষান্নেও যাঁহার উদরপূর্ত্তি হইত না, এবার তাঁহার ঐশ্বর্য্যের ঘটা দেখুন;—তাঁহার চাষের জন্য "সোনার যে লাঙ্গল কৈল রূপার সে ফাল।" আবার "চাষ চষিতে চাই সোনার পাচন বাড়ি।"

(রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ)

কৃষাণ নিযুক্ত করিয়া শিব তাহাদের খুব খাটাইতে লাগিলেন,—

"ক্ষেতে বসি কৃষাণে ঈষাণ দিলা বলে।
চারি দণ্ডে চৌদিক চৌরস কৈল চেলে॥" (রামেশ্বর)

ঈষান কিন্তু কৃষাণদের কেবল বসিয়াই খাটান না। তিনি পাকা লোক, "খাটে খাটায় লাভের গাঁতি" ইত্যাদি কথা তিনি ভালরূপই জানেন। তাই কৃষাণদের সহিত "হাঁটু পাতি ঈষাণেতে আরম্ভে নিড়ান।" আর এমন কড়া পাহারা তাঁহার যে কাহারও ফাঁকি দিবার জো নাই,—

"বাদ নাহি বাধ যেন বসি থাকে বুড়া।
সান্ধ্য যামে সারি উঠে শত শত কুড়া॥" (ঐ)

শিব এইবার কৃষিকার্য্যে খুব মন দিলেন, অলস ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া তাঁহার যে অখ্যাতি ছিল তাহা কাটিয়া গেল। কিন্তু ইহাতেও হিতে বিপরীত হইল। কৃষিকার্য্যে শিব এমন মাতিয়া গেলেন যে সংসার-ধর্ম্ম সব ভুলিয়া বসিলেন। পার্ব্বতী নিজেই জোর করিয়া তাঁহাকে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন, এখন দেখিলেন তিনি আর গৃহে আসেন না, মাঠে মাঠেই তাঁহার সময় কাটে। এই কাল কৃষিকার্য্য যেন তাঁহাদের দাম্পত্য-সুখের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। তখন নারদের পরামর্শে এক উপায় বাহির হইল। শিবের কৃষি-কার্য্যে বিঘ্ন ঘটাইবার জন্য পার্ব্বতী শিবের ক্ষেত্রে যথাক্রমে মাছি, মশা, ডাঁশ, এবং অবশেষে জোঁক পাঠাইয়া তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন। যখন তাহাতেও কিছু হইল না, তখন পার্ব্বতী বাগদিনী রূপে যে কৌশলে শিবকে গৃহে ফিরাইয়া আনিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

মহাদেবের ভীরুতা

শিব বৈদিক সাহিত্যে রুদ্রদেব। "এই রুদ্র দেবতাটিকে লোকে ভয় করিত। ইঁহার বাণকে সকলে ভয় করিত।

এমন কি, স্পষ্ট করিয়া ইঁহার নাম উচ্চারণে সকলে সাহসী হইত না। উগ্র, ভীম, কপর্দ্দী প্রভৃতি বিশেষণে ইঁহার স্বভাবের পরিচয় পাইবেন।"* কিন্তু বঙ্গীয় কবিগণ ইঁহার নামেও ভীরুতার অপবাদ দিতে ছাড়েন নাই। বোধ হয় বৃদ্ধ, মাদকসেবী এবং স্ত্রৈণ বলিয়া তাঁহার এই অপযশ।

দক্ষযজ্ঞের সময় সতী যখন পিত্রালয়ে যাইবার অনুমতি চাহিলেন, তখন

"যত কন সতী শিব না দেন আদেশ।
ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ॥
* * * *
দেখি ভয়ে মহাদেব গেলা এক ভিতে।
ভৈরবী হইয়া সতী লাগিলা হাসিতে॥"

(ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল)

শ্রীধর নামে ইন্দ্রের নর্ত্তক ভগবতীর শাপে কামদল বাঘ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। একদা কামদল পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া ভগবতীকে স্মরণ করিলে দেবী শঙ্করের সহিত তথায় আসিলেন এবং বাঘকে বর দিয়া তাহাকে পিঞ্জর হইতে মুক্ত করিলেন।

"বর পেয়ে বার হৈল বাঘ বীরবর।
বাড়িল বিক্রমে কোপে কাঁপে গরগর॥
* * * *
শঙ্করের সাজ দেখি তাড়া দিয়া যায়।
কাঁকালি ভাঙ্গিল দেবী বামপদ ঘায়॥
তথাপি বিক্রম করে ধরিবার আশে।
তিরোধান হর গৌরী গেলেন কৈলাসে॥"

(ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল)

এইরূপে শিব পলাইয়া সে যাত্রা প্রাণ বাঁচাইলেন।

আর একবার এক অসুরের হাতে পড়িয়া তাঁহার যে দুর্গতি হইয়াছিল তাহা তাঁহার নিজের মুখেই শুনুন,—

"বৃত্রাসুর † বিক্রম সদাই পড়ে মনে॥
অনেক দিবস উগ্র তপস্যা করিয়া।
বর মাগে অসুর আমারে ভুলাইয়া॥
আজি হতে আমি যার শিরে দিব হাত।
অবনীমণ্ডলে তার অবশ্য নিপাত॥
না বুঝিয়া বর দিয়া ঠেকিনু বিপাকে।
পরীক্ষা করিতে চায় আমার মস্তকে॥
তাড়া দিয়ে তিনলোক করালে ভ্রমণ।
আপনি বৈকুণ্ঠনাথ রাখিল জীবন॥"

(ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল)

তখন, "স্মিতমুখী শুনে বলে এত বড় রঙ্গ।
মৃত্যুঞ্জয় হয়ে মৃত্যু ভয়ে কেন ভঙ্গ॥"

(রামেশ্বরের শিবায়ণ)

শিবের ভোজন

শিব যে কিরূপ ভোজনপ্রিয় পূর্ব্বে তাহার একটু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। পুত্র দুটীও তাঁহার হাত রাখিয়াছেন। তিনজনে যখন একসঙ্গে আহার করিতে বসেন, তখন অন্নপূর্ণাও অন্ন ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতে গিয়া বিব্রত হইয়া পড়েন। এখন আসুন, তিন পিতাপুত্রকে ভোজনে বসাইয়া আমরা শিব-ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণ করি।

"তিন ব্যক্তি ভোক্তা এক অন্ন দেন সতী।
দুটি সুতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি॥
তিন জনে একুনে বদন হৈল বার।
গুটি গুটি দুটি হাতে যত দিতে পার॥
তিন জনে বার মুখ পাঁচ হাতে খায়।
এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায়॥
দেখি দেখি পদ্মাবতী বসি এক পাশে।
বদনে বসন দিয়া মন্দ মন্দ হাসে॥
* * * *
কার্ত্তিক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য হয়ে খা॥
মুষগ মায়ের বোলে মৌন হয়ে রয়।
শঙ্কর শিখায়ে দেয় শিখিধ্বজ কয়॥
রাক্ষস ঔরসে জন্ম রাক্ষসীর পেটে।
যত পাব তত খাব ধৈর্য্য হব বটে॥
হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে।
ঈষদুষ্ণ সূপ দিল বেসারির পরে॥
লম্বোদর বলে শুন নগেন্দ্রের ঝি।
সূপ হৈল সাঙ্গ আন আর আছে কি॥

* রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—"যজ্ঞকথা।"

† বৃত্রাসুর নয়, বৃকাসুর হইবে। এই উপাখ্যান রামেশ্বরের শিবায়ণে আরও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

দড় বড় দেবী এনে দিল ভাজা দশ।
খেতে খেতে গিরিশ গৌরীর গান যশ॥
সিদ্ধিদল কোমল ধুতুরা ফল ভাজা।
মুখে ফেলে মাথা নাড়ে দেবতার রাজা॥

* * * *

খরবাত্যে সুপন্থে নর্ত্তকী যেন ফিরে।
সুরস পায়স দিল পিষ্টকের পরে॥
হরবধূ অম্ল মধু দিতে বার বার।
খসিল কাঁচলি হৈল পয়োধর ভার॥

* * * *

উদর হইল পূর্ণ উঠিল উদ্গার।
অবশেষে গণ্ডূষ করিতে নারে আর
হট করি হৈমবতী দিতে আনে ভাত।
শার্দ্দূল ঝম্পনে সবে আগুলিল পাত॥"

(রামেশ্বরের শিবায়ণ)

বিষ্ণু

হরের পর হরি। কিন্তু তিনি ক্ষীরোদ সমুদ্রে অনন্ত-শয্যা রচনা করিয়া কমলার অঙ্ক-শয়নে শায়িত। সেখানে চিরশান্তি বিরাজিত, কোনরূপ চাঞ্চল্য বা ঘটনা-বৈচিত্র্য নাই। সৃষ্টিরক্ষার জন্য তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া ধরায় অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে বটে, কিন্তু মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ এবং নৃসিংহ অবতারে তিনি কেবল নীরস কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন। কপিল, ব্যাস প্রভৃতি রূপে দর্শনশাস্ত্র এবং মহাভারত লইয়াই ব্যস্ত থাকিয়াছেন। জমদগ্নি-পুত্র পরশুরাম রূপে পিতার আদেশে মাতা রেণুকার শিরশ্ছেদ করিয়াছেন, একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া পিতৃবধের প্রতিশোধ লইয়াছেন এবং রশেষে রামচন্দ্রের নিকট হতদর্প হইয়া ব্রাহ্মণোচিত তপস্যায় নিযুক্ত থাকিয়াছেন। রাম অবতারে রাজপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও জীবনে সুখের মুখ দেখিতে পান নাই। সুতরাং এই কয়েক জন্ম ধরিয়া বিষ্ণুর জীবন নিতান্ত শুষ্ক, নীরস,—তাহাতে আদি বা হাস্যরস ঘটিত সুকুমার ভাবের রসাস্বাদন তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই।

শ্রীকৃষ্ণ

এই অভাবটুকু কিন্তু এক কৃষ্ণ-অবতারেই সুদে-আসলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মহাভারতাদিতে শ্রীকৃষ্ণ কূট রাজনীতিজ্ঞ ধর্ম্মোপদেশক এবং প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি রূপে বর্ণিত হইলেও, কি জানি কেন, তাঁহার বৃন্দাবন-লীলার প্রতিই সাধারণের দৃষ্টি অধিক আকৃষ্ট হইয়াছে। বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় রাধাকৃষ্ণের প্রেম ও মিলনকে ভগবদ্-প্রেমের রূপক বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহার যেরূপ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং বৈষ্ণব কবিগণ তাহাই অবলম্বন করিয়া যে মধুর পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আপামর সাধারণের নিকট শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের অবতার রূপেই পরিচিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাই বাঙ্গালায় 'কানু ছাড়া গীত নাই', বাঙ্গালা সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সর্ব্বজনপ্রিয় চরিত্র আর দ্বিতীয় নাই।

গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের চাতুরী

এই রসরাজ নট-চূড়ামণির অনন্ত লীলা-বৈচিত্র্যে বাঙ্গালা বৈষ্ণবসাহিত্য অসীম সমৃদ্ধিশালী। রাধিকা ও গোপিকা-গণকে লইয়া বৃন্দাবনের কুঞ্জ-কাননে তিনি যে নব নব রঙ্গ-কৌতুকের অবতারণা করিয়াছেন তাহা আদিরসের আকর ত বটেই, সেই সঙ্গে হাস্যরসের অপূর্ব্ব সমাবেশে সরস। গোপিকাদের বিব্রত ও বিপন্ন করিয়া একটু আমোদ উপভোগ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কত বিচিত্র কৌশলই অবলম্বন করিয়াছেন! কখনও যমুনার ঘাটে দানী বেশে তাহাদের পথরোধ করিয়া দধির পসরা লইয়া টানাটানি করিয়াছেন, কখনও তাহাদের লইয়া যমুনা তরঙ্গে নৌকা ডুবাইবার যোগাড় করিয়াছেন, এমন কি তাহাদের বস্ত্র হরণ করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই।

রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-বৈচিত্র্য

রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-স্রোতে নিত্য জোয়ার-ভাটা খেলে। কখনও শাশুড়ী-ননদীর ভয়ে রাধা কৃষ্ণের দর্শন সুখে বঞ্চিতা, বিচ্ছেদ-জ্বরে তাঁহার জীবন-সংশয় উপস্থিত- কৃষ্ণ বৈদ্যবেশে আসিয়া দেখা দিয়াছেন, নাড়ী পরীক্ষার ছলে রাধার কর-পল্লব স্পর্শ করিয়া মৃতকল্প দেহে জীবন সঞ্চার করিয়াছেন। কখনও দুর্জ্জয় মানভরে রাধা কৃষ্ণের সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছেন, আর রসিকরাজ কত প্রকার ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া কত কৌশলে মানভঞ্জন করিয়াছেন। যিনি সকল জীবের প্রাণ-স্বরূপ, তাঁহাকে অপরের অনুরাগী দেখিয়া রাধার হৃদয় ঈর্ষায় ভরিয়া গিয়াছে,—সখীগণ তীব্র বিদ্রূপবচনে কৃষ্ণকে জর্জ্জরিত করিয়াছে। আবার অবস্থার ফেরে কখনও

তাঁহাকে কাঁদিয়া, পায়ে ধরিয়া মানভিক্ষা করিতে হইয়াছে, কখনও দাসখত লিখিয়া দিয়া তবে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন।

এইরূপ নানা কৌতুককর প্রসঙ্গ বৈষ্ণব কবিগণ-রচিত অসংখ্য পদাবলীতে অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। এখানে তাহার বিস্তৃত আলোচনার স্থান নাই; তাই দুই একটী দৃষ্টান্ত মাত্র দেওয়া গেল।

গোরখ জাগাই শিঙ্গা ধ্বনি শুনইতে জটিলা ভিখ আনি দেল।
মৌনী যোগেশ্বর মাথা হিলায়ত, বুঝল ভিখ নাহি নেল॥
জটিলা কহত তব কাঁহা তুঁহু মাগত, যোগী কহত বুঝাই।
তেরা বধূ-হাত ভিখ্ হাম লেয়ব, তুরঁ তহি দেহ পাঠাই॥
পতিবরতা ভিখ লেই ঘর, যোগীবরত না হোয় নাশ।
তাকর বচন শুনিতে তনু পুলকিত, ধাই কহে বধূ পাশ॥
দ্বারে যোগীবর, পরম মনোহর, জ্ঞানী বুঝিনু অনুমানে।
বহুত যতন করি, রতন থারি ভরি, ভিখ দেহ তছু ঠানে॥
শুনি ধনি রাই 'আই' করি ওঠল, যোগী নিয়ড়ে নাহি যাব।
জটিলা কহত, যোগী নহে আনমত, দরশনে হোয়ব লাভ॥
গোধূমচূর্ণ পূর্ণ থারি পর, কনক কটোরি ভরি ঘিঁউ।
করযোড়ে রাই 'লেহ' করি ফুকারই, তাহে হেরি থরথরি জীউ॥
যোগী কহত, হাম ভিখ নাহি লেয়ব, তুয়া মুখ বচন এক চাই।
নন্দনন্দন পর যে অভিমানসি, মাপ করহ ঘরে যাই॥
শুনি ধনি রাই, চীরে মুখ ঝাপল, ভেকধারী নটরাজ।
গোবিন্দদাস কহ, নটবর শেখর, সাধি চলত নিজ কাজ॥
(গোবিন্দদাস)

এই পদটী ব্রজবুলি নামক প্রাচীন বৈষ্ণব ভাষায় রচিত বলিয়া পাঠকপাঠিকার সুবিধার জন্য সরল ভাষায় ইহার তাৎপর্য্য দেওয়া গেল। রাধার মান হইয়াছে,—কৃষ্ণকে আর দেখা দেন না। এদিকে তিনি অন্তঃপুরিকা, স্বয়ং না আসিলে তাঁহার দেখা পাওয়া অসম্ভব। তাই যোগীবেশ ধারণ করিয়া কৃষ্ণ একদিন রাধার বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইলেন। যোগীর শিঙ্গাধ্বনি শুনিতেই জটিলা (রাধার শাশুড়ী) ভিক্ষা আনিয়া দিল। যোগী নীরবে কেবল মাথা নাড়িলেন,—জটিলা বুঝিল যোগী ভিক্ষা লইবে না। তখন সে কহিল,—তবে তুমি কি চাও? যোগী বুঝাইয়া বলিল,—তোমার বধূর হস্তে ভিক্ষা লইব, শীঘ্র পাঠাইয়া দাও। সধবা এবং পতিব্রতার নিকট ভিক্ষাগ্রহণে আমার ব্রত নষ্ট হয় না। একথা শুনিয়া জটিলা আনন্দিত হইয়া বধূর নিকট গিয়া বলিলেন—পরম মনোহর এক যোগী দ্বারে উপস্থিত, তাঁহাকে জ্ঞানী বলিয়াই অনুমান হয়, তাঁহাকে সযত্নে ভিক্ষা দিয়া আইস। শুনিয়া রাই বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন; বলিলেন,—যোগীর নিকট যাইব না। জটিলা কহিল,—যোগী তেমন নয়, অতি সাধুপুরুষ, তাঁহার দর্শনে লাভ আছে। তখন রাই থালা ভরিয়া গোধূমচূর্ণ এবং সোনার বাটীতে করিয়া ঘৃত লইয়া গিয়া করযোড়ে দাঁড়াইল, কিন্তু যোগীকে দেখিয়া কাঁপিতে লাগিল। যোগী কহিল —আমি ভিক্ষা লইব না, তোমার মুখের একটী কথা চাই। নন্দনন্দনের উপর যে অভিমান করিয়াছ তাহা ক্ষমা কর, আমি গৃহে ফিরিয়া যাই। শুনিয়া রাই বস্ত্রে বদন ঢাকিল, কারণ এই যোগী-ভেকধারী আর কেহই নয়,—স্বয়ং নটরাজ! এইরূপে নটবর-শেখর স্বকার্য্য সাধন করিয়া চলিয়া গেলেন।

এখানে কিরূপে প্রগাঢ় হাস্যরস ফুটিয়া উঠিয়াছে পাঠক-পাঠিকা ভাবিয়া দেখুন। শাশুড়ী স্বয়ং দূতী হইয়া বধূকে নাগরের নিকট একপ্রকার জোর করিয়াই পাঠাইয়া দিতেছেন। আবার বধূর সতীত্বের এতবড় একটা প্রমাণ পাইয়া শাশুড়ীর কি আনন্দ! এদিকে নটরাজ যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে নায়িকার সহিত নির্জ্জনে আলাপ করিবার সুযোগ ঘটিল, আর রাধার অভিমানজনিত গাম্ভীর্য্যের বাঁধ হাস্যের ক্ষীণ স্রোতের সম্মুখে মুহূর্ত্তে ভাসিয়া গিয়া অনুরাগের প্রবল বন্যা বহাইয়া দিল।

খণ্ডিতা

এমন চতুর-চূড়ামণিকেও কিন্তু এক এক সময় ধরা পড়িয়া লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে। একবার অন্য নায়িকার কুঞ্জে যামিনী যাপন করিয়া তিনি প্রভাতে রাধিকার কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত। রাধিকা তাঁহার চেহারা দেখিয়াই ধরিয়া ফেলিয়াছেন। তাই মধুর বচনের সহিত তীব্র ব্যঙ্গ মিশাইয়া বলিতেছেন;—

ভাল হল্য আরে বঁধু আইলা সকালে।
প্রভাতে দেখিলুঁ মুখ দিন যাবে ভালে॥
* * * *
কে সাজাল হেন সাজে হেরি বাসি দুখ॥
* * * *
আই আই পড়্যাছে রূপে কাজরের শোভা।
ভালে সে সিন্দুর তোমার মুনির মনলোভা॥

নীল পাটের শাড়ী কোঁচার বলনী।
রমণীরঞ্জন হিয়া বঞ্চিলা রজনী॥

*　　　*　　　*　　　*

চারি পানে চাহে নাগর আঁচলে মুখ মোছে।
চণ্ডীদাস বলে লাজ ধুইলে না ঘোচে॥

(চণ্ডীদাস)

অবস্থা যে কিরূপ সঙ্গীন দাঁড়াইয়াছে পাঠকপাঠিকা তাহা বুঝিয়া বলুন, বেচারি কৃষ্ণের লজ্জা রাখিবার স্থান কোথা? আর এমন হাতে-নাতে ধরা পড়িয়াই ত কৃষ্ণনামের কলঙ্ক আজও ঘুচিল না!

নারদের মন্তব্য

দেবর্ষি নারদ এই কলঙ্কের কথাই বেশ একটু সরস ব্যঙ্গের ভিতর দিয়া কৃষ্ণের মুখের উপর বলিয়া ফেলিয়াছেন। বাণাসুরের কন্যা উষার সহিত কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের স্বপ্নে মিলন ঘটিয়াছিল। পরে অনিরুদ্ধ বাণ রাজার অন্তঃপুরে আনীত হইয়া নারীবেশে উষার সংসর্গে বাস করিতে থাকেন এবং অবশেষে ধরা পড়িয়া বাণ কর্ত্তৃক নাগপাশে বদ্ধ হন। অনিরুদ্ধ নিরুদ্দেশ হওয়ায় দ্বারকায় কৃষ্ণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছেন, এমন সময়ে নারদের আগমন হইল। কৃষ্ণ তাঁহাকে, তিনি অনিরুদ্ধের সংবাদ জানেন কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ কাহারও খাতির রাখিয়া কথা কহেন না। তাই,

দেব ঋষি বলে এই দেখে আসি তারে॥
গোবিন্দের রোগে গেল গোবিন্দের নাতি।

(রামেশ্বরের শিবায়ণ)

তাহার পর অনিরুদ্ধের সংবাদ সবিস্তারে জানাইয়া বলিলেন—

তোমার গোষ্ঠীকে বাপু মোর পরিহার।
ভাল মেয়ে ভুবনে রহিল নাহি আর॥ (ঐ)

চিরন্তনী

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

আজিও বোঝ'নি তুমি কা'রে চাও, নিত্য কা'রে চাও—
ক্ষণে ক্ষণে দিনে দিনে পরিচয়—কোথা' পরিচয়?
যে-জন এলো না দ্বারে, তা'রি লাগি' অপার বিস্ময়
মরমে মরমে ফিরে। মরমিয়া, মরণে লুকাও।
নিখিলের নর নারী তো'রি পিছে ছুটিবে উধাও;—
সোণার হরিণ তুমি, মেঘে-বনে পলকে বিলয়;
মেঘল দিনের রবি—এই আছে, এই ক্ষণে লয়;—
অদৃশ্য বাঁশীতে তাই পলাতক সুরটিরে গাও।

একটি মূরতি শুধু,—লাবণির নবনীতে গড়া—
সুঠাম সুন্দর মুখ,—সুমধুর ভাবনার দান,—
কভু সে তমালতলে, কভু মেঘে, যায় না যে ধরা;
লক্ষকোটি প্রাণ তা'রে চিরযুগ করিছে সন্ধান!
যখনি দাঁড়ায় আসি, মনে হয়, এই মনোহরা—
দেখে লই, বুকে লই—এরি লাগি' ঝুরিছে পরাণ!

সিংহল দ্বীপ

কুমার শ্রীমুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়

কলম্বো বন্দর

কলম্বোয় আসিয়া কলম্বো বন্দরের ব্রেক্-ওয়াটার (Break-water) বা বারিভঙ্গের প্রাচীরের উল্লেখ না করিলে কলম্বোর বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। প্রাচীরটী হইতেছে অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। এই সুদৃঢ় প্রাচীরের অনুকম্পায় বন্দরস্থিত জাহাজগুলিকে আর সদা সন্ত্রস্তভাবে থাকিতে হয় না। সাগরের যত আক্রোশ গিয়া পড়িয়াছে এই প্রাচীর-

কান্দীর সম্ভ্রান্ত মহিলা

গুলির উপর। এই কৃত্রিম বাধা সরাইবার জন্য প্রাচীরের বহির্ভাগের সাগরোচ্ছ্বাস কি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে! সদা তরঙ্গের উপর তরঙ্গ সমুদ্র-বক্ষ আলোড়ন বিলোড়ন করিয়া ফিরিয়া যাইতেছে ; আবার সতেজে আক্রমণ করিতেছে। নিষ্ফল-প্রয়াস হইলেও অহর্নিশ অবিশ্রান্ত যুঝিতেছে—বুঝি অনন্ত কাল ধরিয়া এইরূপ আস্ফালন ও উদ্দাম ঘাত-প্রতিঘাত চলিতে থাকিবে! কি অদম্য অধ্যবসায়!

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড যুবরাজরূপে যখন সিংহলে আসেন, সেই সময় তিনি এই বারি-ভঙ্গ প্রাচীরের প্রথম ভিত্তি-স্থাপন করেন। প্রথমে দক্ষিণ পশ্চিম ভাগের প্রাচীর, তাহার পর উত্তর-পূর্ব্ব ও উত্তর-পশ্চিম প্রাচীর নির্ম্মিত হয়। ৩৭ বৎসর কাল পরিশ্রমের পর ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রাচীর-নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। সমুদ্রস্থিত মোট ৬৪৬ একর স্থান বন্দরের জন্য প্রাচীর দ্বারা ঘিরিয়া লওয়া হইয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিমের প্রাচীর দৈর্ঘ্যে ৪,২১২ ফিট - নির্ম্মাণের ব্যয় পড়ে সাত লক্ষ পাউণ্ড। এটী পরে আরও ২০০০ ফিট বাড়াইয়া লওয়া হয়—তাহার ব্যয় পড়ে চারি লক্ষ পাউণ্ড। উত্তর-পূর্ব্ব প্রাচীর দৈর্ঘ্যে ২,৬০০ ফিট ও উত্তর-পশ্চিমে ১,১০০ ফিট। তাহাতে ব্যয় হয় ৪৭৯,৯০৫ পাউণ্ড। এ-সব ছাড়া জাহাজ মেরামতের জন্য একটী বড় ডক্ আছে—১৮টী কয়লার জেটী ও একটি সুবৃহৎ তৈলাধার প্রতিষ্ঠিত আছে। কুড্ সাহেব (Sir John Coode) প্রথমে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রাচীরটীর মতলব দেন এবং ইঞ্জিনিয়ার কাইল্ সাহেবের (Mr. John Kyle) তত্ত্বাবধানে উহা নির্ম্মিত হয়। কুড্ সাহেবের মৃত্যুর পর কুড্ সন্ ম্যাথুস্ কোম্পানীর নির্দ্দেশানুযায়ী ইঞ্জিনিয়ার বষ্টক্ (Mr. J. H. Bostock) প্রাচীর নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করেন। কলম্বো বন্দরে সকল জাতির জাহাজই দেখিতে পাওয়া যায়। জগতের সকল দেশের লোকের কলম্বো এক মহামিলনক্ষেত্র।

অধিকাংশ কলম্বো-যাত্রী গ্রাণ্ড্ ওরিয়েণ্টাল হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এটী সাহেবী হোটেল—দুর্গ-সীমানার মধ্যে অবস্থিত থাকায় কেনা-বেচার পক্ষে বড়ই সুবিধাজনক। আর যাঁহারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ থাকিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে গলফেস্ হোটেলই উপযুক্ত। সমুদ্রোপকূলে অতি মনোরম স্থানে এই সাহেবী হোটেলটী অবস্থিত। একমাত্র এই হোটেলে সমুদ্রজলে সন্তরণের স্নানাগার (Swimming Bath) আছে। ইলেকট্রীক্ ট্রাম ও মোটর বাস্ গ্রেট্ ওরিয়েণ্টাল হোটেলের নিকট হইতে রওনা হইয়া থাকে। অল্প ব্যয়ে সহর দেখিতে যাঁহারা অভিলাষী, তাঁহারা ট্রাম বা বাসেই ভ্রমণ করিয়া থাকেন। এক দিনে গোটা সহর ভাল করিয়া দেখা চলে না। তবে যে সব জাহাজ কয়লা লইবার জন্য কলম্বোয় কয়েক ঘণ্টার জন্য আটক থাকে, তাহাদের যাত্রীরা এই অবসর মধ্যে যে টুকু সময় পান তাহাতে সাধারণতঃ যে কয়েকটী স্থান দেখিয়া ফিরিয়া যান, তন্মধ্যে দারুচিনি উদ্যান, গবর্ণর সার উইলিয়াম গ্রেগরী-প্রতিষ্ঠিত যাদুঘর ও কেলনা নদীর উপর ১৯০১ খৃষ্টাব্দে

প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের নাম করা যাইতে পারে। এই তিনটী প্রায় সকলেই দেখিয়া থাকেন। যাদুঘরের অন্যান্য দ্রষ্টব্য মধ্যে মালদ্বীপের সংগৃহীত দ্রব্যগুলি উল্লেখযোগ্য। প্রবাল-শৈলপূর্ণ মালদ্বীপ সিংহল হইতে ৩৫০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। দ্বীপটী সিংহলের ঔপনিবেশিক গবর্ণমেণ্টের অধীন করদ রাজ্য। একজন সুলতান সেখানে রাজত্ব করেন। প্রতি বৎসর

কান্দীর রাজবংশীয় সর্দ্দার

সেপ্টেম্বর মাসে কর স্বরূপ মাদুর শঙ্খ শম্বুকাদি সহ মালদ্বীপের দূত সিংহলে আসিয়া থাকে। স্বর্ণমণ্ডিত লোহিতবর্ণের পরিচ্ছদ ভূষিত পুরাকালের অদ্ভুত লস্কোরিন ব্যাণ্ড, বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে দূতের সমভিব্যাহারে গবর্ণরের প্রাসাদে গমন করে। লাস্কোরিন ব্যাণ্ড, কান্দীয়ান সৈন্যের শেষ নিদর্শন— উহা এখনও বজায় রাখা হইয়াছে।

যাঁহাদের ২।৪ দিন কলম্বোয় থাকিবার সুযোগ ঘটে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সহর হইতে আট মাইল দূরে লাবিনিয়া পর্ব্বতে অন্ততঃ এক দিন কাটাইয়া আসেন। সাগরতীরে এরূপ সুদৃশ্য পর্ব্বত অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। পর্ব্বতটীর সিংহলী নাম "গল্‌কিস্ব"। গবর্ণর সার এডওয়ার্ড বার্ণস এখানে সপ্তাহান্তে অবস্থান করিবার জন্য ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার মেমের নামে পর্ব্বতটীর নাম দেওয়া হয় "লাবিনিয়া"। ঔপনিবেশিক গবর্ণমেণ্ট কিন্তু লাটের খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য এই প্রাসাদের খরচ মঞ্জুর না করায় নামমাত্র মূল্যে তাহা বিক্রীত হয়। এখন সেই বাটীতে প্রাণ্ড হোটেল স্থাপিত হইয়াছে। সমুদ্র ভ্রমণের কষ্ট স্বীকার না করিয়াও এই পর্ব্বতে অবস্থান দ্বারা নয়নানন্দকর অনুপম দৃশ্যে সমুদ্র ভ্রমণজনিত কেবল বিমল আনন্দটুকু বেশ অনুভূত হয়। এখানে সমুদ্র স্নানেরও সুন্দর বন্দোবস্ত আছে।

মহাকবি কালিদাসের সমাধি-সৌধ

সিংহলে মহাকবি কালিদাসের শোচনীয় মৃত্যুর কথা অনেকেই জানেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সিংহলের রাজা ছিলেন কুমার ধাতুসেন। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ, সুকবি ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি একবার ভারতবর্ষে তীর্থ ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। বুদ্ধগয়ায় বোধিদ্রুম তলে পূজার্চ্চনা করিয়া তিনি মৃগদাবে গমন করেন। মৃগদাবই পুণ্যভূমি বারাণসীর সান্নিধ্যে অবস্থিত বর্ত্তমান সারনাথ। সারনাথ হইতেই বুদ্ধদেব ষাটজন প্রিয় শিষ্যকে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ এসিয়া মহাদেশের নানা স্থানে প্রেরণ করেন। সারনাথে অবস্থান কালে কালিদাসের সহিত কুমার ধাতুসেনের পরিচয়

নিম্ন প্রদেশীয় সিংহলী স্ত্রীলোক

হয়। ক্রমে তাঁহারা পরস্পর সৌহৃদ্যসূত্রে আবদ্ধ হন। সিংহলে প্রত্যাগমন কালে ধাতুসেন কবিবরকে তাঁহার সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়া স্বীয় রাজ দরবারে প্রধান পণ্ডিত পদে বরণ করিয়া লন। তখন সিংহলের রাজধানী ছিল অনুরুদ্ধপুরায় অর্থাৎ নূতন সহরে। ইহার পূর্ব্ব নাম ছিল মহীয়ানগণ—মহাবংশের প্রথম ও শেষ অধ্যায়ে এই নামেই স্থানটীর

সিংহলী পল্লী পরিবার

উল্লেখ আছে। প্রাচীন কালের সংস্কৃত নাটকাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়, নৃত্য-গীতাদি-কুশলা বারবণিতাদের মধ্যে কেহ কেহ বিদুষী থাকিত —রাজানুগৃহীতাদের গৃহে বিদ্বজ্জন সম্মিলনও হইত—কতকটা ক্লাবের মত ছিল,—তাহা তখনকার কালে তত দুষ্য বিবেচিত হইত না। সিংহলেও ভারতের আদর্শে এইরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল। রাজা ধুতুসেনের অনুগৃহীতা জনৈক সুন্দরী বিদুষী নাম্নী ছিল। তাহার গৃহে রাজার সহিত মধ্যে মধ্যে পণ্ডিত সমাগমও হইত। কবিবর কালিদাসেরও এই সুন্দরীর গৃহে যাতায়াত ছিল। সুন্দরীর গৃহসংলগ্ন উদ্যান মধ্যে একটী মনোরম সরোবর ছিল। একদিন সেই সরোবর-তীরে কুঞ্জবনে বসিয়া রাজা সুন্দরীর সহিত বিশ্রম্ভালাভ করিতে করিতে দেখিলেন, একটী কমল-কোরকে এক মধুমক্ষিকা প্রবিষ্ট হইয়া তাহার মধ্যে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে। কিন্তু বাহিরে আসিতে পারিতেছে না। রাজা ভাবিলেন, তিনিও তো মধুমক্ষিকার মত এই সুন্দরীর মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছেন—তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। এই দৃশ্যে রাজকবির হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল—তিনি সুন্দরীর গৃহ-প্রাচীর-গাত্রে একটী অর্দ্ধসমাপ্ত কবিতা লিখিয়া বাকী কয়েক চরণ পূরণকারীকে লক্ষমুদ্রা পুরস্কার দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি জানিতেন এক কালিদাস ভিন্ন অপর কেহ তাহা পূরণ করিতে পারিবে না। ঘটিলও তাই। সুন্দরীর এক সুচতুরা দাসী ছিল। রাজা চলিয়া যাওয়ার পর সে কবিবরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া কবিতাটী তাঁহার দ্বারা সম্পূর্ণ করিয়া লইল। অতিরিক্ত আদর-যত্ন
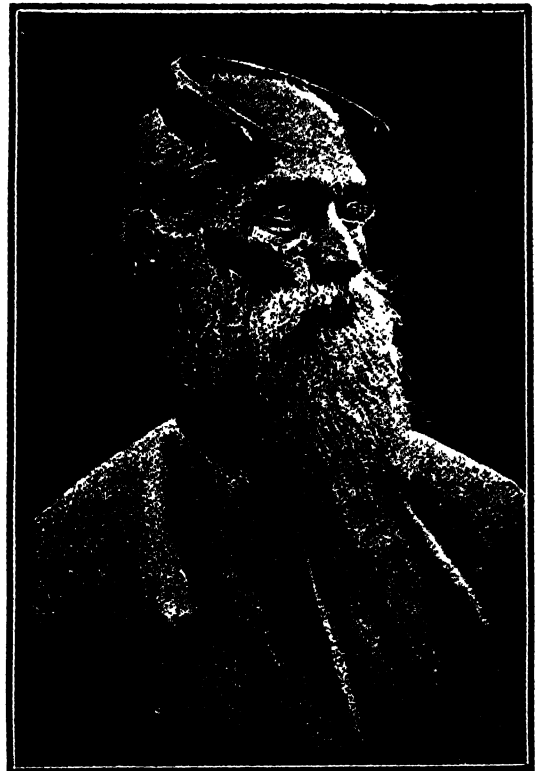
নিম্নপ্রদেশীয় সিংহলী পুরুষ

নিশীথে কালিদাস নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময় সেই পিশাচী অর্থলোভে তাঁহাকে হত্যা করিয়া প্রকোষ্ঠান্তরে তাঁহার শব-দেহ লুকাইত

সিংহলী সাপুড়ে

রাখিল। পরদিন যথাকালে রাজা আসিলে কবিতা পূরণ করিয়াছে বলিয়া সুন্দরী তাঁহার নিকট লক্ষ মুদ্রা প্রার্থনা করিল। রাজা দেখিলেন, শেষ কয়েক পদের সংযোগে সমগ্র কবিতাটী সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ উচ্চ ভাবব্যঞ্জক সুললিত রচনা বিদুষী হইলেও সামান্য গণিকায় কখনও সম্ভবে না। একমাত্র কালিদাসেই তাহা সম্ভবে। সেদিন কালিদাস রাজসভায় উপস্থিত হন নাই—বহু অনুসন্ধানেও তাঁহাকে পাওয়া যায় নাই—রাজার মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইল। রাজা কহিলেন "এ তো কালিদাসের রচনা—কালিদাস কোথায়? তাহাকে বাহির করিয়া দাও"। রাজার ভাবগতিক দেখিয়া সুন্দরী ভীতা হইয়া, দাসীর প্ররোচনায় সে যে নৃশংস কার্য্যের সহায় হইয়াছিল, তাহা নিজ মুখে ব্যক্ত করিল। তখন রাজার অনুশোচনার সীমা রহিল না। রাজ-সম্মানের সহিত কালিদাসের সৎকারের ব্যবস্থা হইল। মহাবলী গঙ্গা তীরে যখন কালিদাসের চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—রাজা শোকাতিশয্যে বিহ্বল হইয়া সেই প্রজ্বলিত হুতাশনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন। সেই স্থানে সমাধি-সৌধ নির্ম্মিত হইল। কালের কঠোর নিষ্পেষণে সে সৌধ বিনষ্ট হইলেও সেই অসাধারণ সৌহৃদ্যের স্মৃতি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

রাজধানী আলুতনুয়ারা প্রাচীন বিনতেনো প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল—অনুরাধাপুরে রাজধানী স্থাপনের বহু পূর্ব্বে সেখানে প্রথম দাগোবা নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে স্থানটী অতুলনীয়। এই প্রদেশেই অধিকাংশ বন্য বেদ্দ অর্থাৎ দ্বীপের আদিম অধিবাসী যক্ষ বা রাক্ষসগণ বাস করিয়া থাকে। এখানকার উচ্চ বাঁধ-বিশিষ্ট কৃত্রিম হ্রদটী প্রসিদ্ধ। বাঁধটি ৫০ হইতে ৭০ ফিট উচ্চ—প্রস্থে দুইশত ফিট। হ্রদটীর নাম হোরাবোরা বা শোরাবোরা। বেদ্দগণ এই হ্রদ ও মহাবলী গঙ্গার উদ্দেশে একটী গান গাহিয়া থাকে। তাহার মর্ম্মার্থ হইতেছে—"ঐ যে ওখানে কত বিস্তৃত শোরবর হ্রদ রহিয়াছে—হে হ্রদ! তোমার স্বচ্ছ বারিতে নীলপদ্মের রাণী কেমন ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছেন। হে বলী গঙ্গা! অশ্রান্ত কুলুকুলু রবে কোথায় ছুটিয়া চলিয়াছ—তোমার বিমল বারির কি অন্ত নাই।"

এখানকার জঙ্গলে ও ভগ্নস্তূপে সর্পের বাহুল্য দেখা যায়। তাহাদের অধিকাংশই বিষধর। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস—সর্প যতই হিংস্র হউক না কেন—তাহার অনিষ্ট না করিলে সে কাহারও ক্ষতি করে না। সেদেশে মনসা পূজার ন্যায় কোনও অনুষ্ঠান না থাকিলেও, লোকে সর্পকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকে—তাহার যথেচ্ছ বিচরণে বাধা দেয় না। এমন কি শয়ন-কক্ষে বিষাক্ত সর্পের আবির্ভাবে লোকে অতিরিক্ত বিচলিত হয় না। প্রস্তর-নির্ম্মিত "নাগ পকুমা"র

সিংহলী ধীবর

(পকুর = পুষ্করিণী বা বড় চৌবাচ্ছা) উপর একাধিক সর্পফণ দ্বারা আচ্ছাদনের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তাহা সর্পের প্রতি শ্রদ্ধাব্যঞ্জক বলিয়াই মনে হয়। সম্প্রতি বিলাতের 'সাণ্ডে রেফারী" (Sunday Referee) পত্রে সার্ কেনেথ্ মেকেঞ্জী (Sir Kenneth Mackenzie) সাহেব সিংহলে সর্পঘটিত একটী ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—"সিংহলী বিষধর সর্প শিশু ও গর্ভিণীর হিংসা করে না। তবে তাহার অনিষ্ট করিলে স্বতন্ত্র কথা। এক সময় এক বাংলার ভিতর শয়নপ্রকোষ্ঠে খাটের উপর একটী শিশু অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিল—শিশুর জননী জনৈক ইংরাজ মহিলা সেই কক্ষে প্রবেশমাত্র শয্যা-পার্শ্বে খাটের উপর

সিংহল-প্রবাসী মুসলমান স্ত্রীলোক

একটী বিষধর সর্প দেখিতে পান। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সর্প ফণা উত্তোলন করে। অতিশয় ভীতা হইয়া তিনি প্রকোষ্ঠের বাহিরে আসিলেন। তিনি পরিচারিকাকে ডাকিয়া সর্পটীকে দেখাইলেন ও সকাতরে শিশুর প্রাণ রক্ষার উপায় করিতে বলিলেন। তাঁহাকে অভয় দিয়া সে তৎক্ষণাৎ আপ্পুকে (বেহারা) ডাকিয়া আনিল। আপ্পু কক্ষে প্রবেশ করিয়া সর্পের উদ্দেশে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিয়া তাহাকে গৃহের বাহিরে চলিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। সর্প তাহার অনুরোধ রক্ষা করিল। সর্প ধীরে ধীরে খাট হইতে নামিয়া সেই কক্ষের বাহিরে আসিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল—কাহারও কোন অনিষ্ট করিল না। চক্ষের সমক্ষে এই ঘটনা দেখিয়া সকলে অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন।" আমাদের দেশে মেয়েরা সর্পভীতি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নাগ-পঞ্চমীর ব্রত করিয়া থাকেন—সিংহলে সেরূপ ব্রত কেহ পালন করে বলিয়া শুনি নাই। আমাদের মালেরা যেখান-সেখান হইতে বিষধর সর্প বাহির করিতে অদ্বিতীয় ছিল—তাহারা সর্পদংশনের ওঝাগিরিও করিত—ঝাড়ান ঝোড়ান করিয়া মৃতপ্রায় মানুষকে বাঁচাইয়া তুলিত। এখন ভাল ওঝা দুর্লভ হইয়াছে। তবে এখনও স্থানে স্থানে ভাদ্র সংক্রান্তির দিন ঝাপান হইয়া থাকে—মালেরা সেদিন সর্প সংগ্রহ করিয়া তাহা গলায় হারের মত ঝুলাইয়া নানারূপ খেলা করে—ঔষধগুণে অথবা মন্ত্রপূত

সিংহলের পানওয়ালী

থাকায় সর্প তাহাদের অনিষ্ট করিতে পারে না। সিংহলেও শুনিলাম বন্য বেদগণ সর্পকে যাদুবলে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে—সর্প তাহাদিগকে এড়াইয়া চলে।

জাতি-ভেদ

সিংহলে বহু পূর্ব্বকাল হইতে জাতিভেদ-প্রথা প্রচলিত আছে। সিংহল-বিজয়ী বাঙ্গালী বীর বিজয়সিংহের সঙ্গে সঙ্গে ভারত হইতে সিংহলে জাতিভেদ গিয়াছিল কি না তাহা প্রকাশ নাই। সিংহলে

চারিটী প্রধান জাতি আছে—তাহা হইতে বহু শাখা-প্রশাখা বাহির হইয়াছে প্রধান হইতেছে সূর্য্যবংশোদ্ভব রাজ-জাতি। তাহার পর ব্রাহ্মণ বংশ। বৈশ্যের স্থান ব্রাহ্মণের পরেই। তাহারা দুই ভাগে বিভক্ত—সো-বংশ বা কৃষক ও "নীল মকর" বা মেষপালক বংশ। তাহার পর কুশদ্র বংশ—তাহারা আবার ষাট শ্রেণীতে বিভক্ত। সিংহলে সম্ভ্রান্ত বংশের মধ্যে অনেক রাজবংশীয় আছেন। তাঁহাদের সামাজিক স্থান

সিংহলের রোদীয় স্ত্রীলোক

সিংহলের তামিল স্ত্রীলোক

ব্রাহ্মণের উপরে। উভয় শ্রেণীর ব্যাপীয় বৈশ্যগণ উচ্চ জাতি মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। উভয় বংশ মধ্যে 'সো-বংশ'ই অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের মধ্যে বহু সম্ভ্রান্ত লোক, ধর্ম্মোপদেষ্টা ও পুরোহিত দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ উচ্চ রাজকর্ম্মচারীও সো-বংশসম্ভূত। সেকালের দেশীয় সৈন্য এই বংশ হইতে সংগৃহীত হইত। প্রত্যেক পরিবার হইতে দুই এক জন করিয়া সৈন্যের যোগান রাখিতে হইত। রাজপথ নির্ম্মাণ বা সংস্কার, সরোবর খনন প্রভৃতি জনহিতকর কার্য করিবার জন্য সকল জাতিকেই বৎসরে পনর দিন বেগার খাটিতে হইত। বেগারে বদলী দেওয়া চলিত। অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ বদলী দ্বারা কাজ সারিতেন। "নীল মকর" বংশ বর্ত্তমান কালে "সো-বংশে"র সহিত একরূপ মিশিয়া গিয়াছে। এই বংশে অনেক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী আছে। কুশদ্র জাতি অনেকটা আমাদের দেশের নবশাখ জাতির মত। শিল্পী,

সিংহলের তরিতরকারীর দোকান

সিংহলের আঁশ ছাড়ানর কারখানা

সিংহলের কোকো বাছাইয়ের কারখানা

নক, দোকানদার, কারিগর ও ভৃত্যাদি কুশধ্র জাতি হইতে ভূত। নিম্নশ্রেণীর এই ষাটটি জাতি এখনও পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য য় রাখিয়াছে। বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়া নিজ নিজ গণ্ডীর ধ্য আবদ্ধ রাখিয়াছে। উপরিউক্ত চারিটী প্রধান জাতি ভিন্ন

রাজাদেশ অমান্য করিয়া তাহারা নিষিদ্ধ গো-মাংস ভক্ষণ করিত। এই সকল কারণে তাহাদিগকে নিকৃষ্ট ও অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল। সেই সময় হইতে তাহাদের বৌদ্ধ মঠ বা দেবমন্দিরে প্রবেশ, প্রাচীর-বেষ্টিত গৃহে বাস এবং ভূমি গ্রহণ বা কর্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়।

সিংহলে গাছ হইতে রবার নিষ্কাশন

সিংহলে ক্ষেত্র হইতে চা সংগ্রহ

আরও দুইটী অস্পৃশ্য জাতি আছে—গওরু ও রোদীয়া। রোদীয়ার সংস্পর্শ এমন কি নিঃশ্বাসের সান্নিধ্য সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। রাজার বিরাগভাজন হইলে যাহারা জাতিচ্যুত হইত—তাহাদিগকে শ্রেণীভুক্ত করা হইত। রাজার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলে তাহারা আবার স্বীয় সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিতও হইতে পারিত।

রোদীয়গণ ব্যাধজাতীয়। তাহারা পূর্ব্বে রাজবাটীতে শিকার-লব্ধ মাংস যোগাইত। একবার এক বড় ভোজ উপলক্ষে বহু মাংসের প্রয়োজন হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন শিকার-লব্ধ মাংস তাহারা অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করিতে পারে নাই। রাজরোষের আশঙ্কায় তাহারা পশু মাংসের দ্বারা বক্রী মাংস পূরণ করিয়া । ভোজনান্তে এই কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে। রাজা অতিশয় রুষ্ট হন। তাহার উপর

সিংহলের বনবাসী বেদ্দ

সিংহলের পথের ধারে ফল-বিক্রেতা

এখনও তাহারা সেই নিয়ম মানিয়া আসিতেছে—অতি জঘন্য কুটীর এখনও তাহাদের আবাসস্থান। কোনও উচ্চ জাতীয় লোকের সহিত পথে সাক্ষাৎ হইলে রোদীয়গণ দূর হইতে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে ও পথ ছাড়িয়া দেয়। সঙ্কীর্ণ পথ হইলে সে পেছু হাঁটিয়া অন্য দিকে চলিয়া যায়। যে কেহ তাহাদের উপর অত্যাচার করিতে পারিত; তাহার প্রতিকার তাহারা পাইত না। এমন কি কোনও রোদীয়কে হত্যা করিলে হত্যাকারীর কোনও দণ্ড হইত না। তাহাদের জীবন ইতর জন্তুর মত এত সুলভ ছিল। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে জনৈক সম্রান্ত পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ রাজদ্রোহের অপরাধে জাতিচ্যুত হন। তাঁহাদিগকে রোদীয় জাতিভুক্ত করা হয়। লোকে এরূপ জাতিভ্রষ্ট হওয়া অপেক্ষা প্রাণদণ্ড সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিত। রোদীয়গণ এখনও পূর্ব্ববৎ অস্পৃশ্য জাতিরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নরহত্যা অপরাধে দুইজন রোদীয়কে ধরিবার জন্য ইংরাজ আদালত হইতে ওয়ারেণ্ট জারী করা হয়। স্পর্শে কলুষিত হওয়ার আশঙ্কায় পুলিশের লোক তাহাদিগকে ধরিতে অস্বীকার করিয়া বলে, দূর হইতে তাহারা রোদীয় আসামীদ্বয়কে গুলি করিয়া মারিতে পারিবে; কিন্তু কোনমতেই তাহাদের স্পর্শ করিতে পারিবে না। সেজন্য তাহারা চাকুরীতে ইস্তফা দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। এখনও রোদীয়গণের ভূমি গ্রহণ বা চাষ করিবার অধিকার নাই। লোকের বিশ্বাস, রোদীয়গণ যাদুবিদ্যায় দক্ষ—ইচ্ছা করিলে যাদুমন্ত্র প্রভাবে তাহারা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট করিতে পারে। সেই আশঙ্কায় সকলেই তাহাদিগকে ধান্যের কিঞ্চিৎ অংশ দিয়া থাকে। তাহাতে তাহাদের কতক অন্নের সংস্থান হয়। পূর্ব্বে তাহাদিগকে হস্তী বন্ধনের জন্য চর্ম্মের রজ্জু করস্বরূপ দিতে হইত সে রজ্জু কেহ হাতে হাতে লইত না। তাহারা রজ্জুগুলি নদীর জলে ভাসাইয়া দিত—সে সময় রোদীয় সর্দ্দারকে সেখানে হাজির থাকিতে

সিংহলের পদ্ম নৌকা

হইত। রাজার লোক বাঁশে করিয়া রজ্জুর পরিমাণ ঠিক আছে কি না বুঝিয়া লইত—তাহার পর সর্দ্দার ছুটী পাইত। রোদীয়গণ আমাদের দেশের বেদীয়া ও য়ুরোপের জিপ্সীদের মত এক স্থানে বার মাস থাকে না—এদেশে সেদেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। মেয়েরা গানবাজনা দ্বারা ও পুরুষেরা ভেল্কীবাজী দেখাইয়া অর্থার্জ্জন করে। কান্দীতে একটী প্রবচন প্রচলিত আছে; তাহার মর্ম্ম—রাস্তার কুক্কুরী ! আর রোদীয়া নারী জন্মাবধি ব্যভিচারিণী।

বন্য বেদ্দগণ গহন বনে বৃক্ষ কোটরে বা পর্ব্বত-গুহায় বাস করে। শিকারলব্ধ মাংসে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। শিকারের অপ্রতুলতা ঘটিলে তাহারা এক বন হইতে বনান্তরে গিয়া বাস করে। বনবাসী বেদ্দগণ সভ্য মানবের সংস্পর্শ এড়াইয়া চলে। এমন কি গ্রামবাসী বেদ্দগণের সহিত মেলামেশা করে না. পরস্পর বিবাহাদিও চলে না। স্বীয় ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে তাহারা আবদ্ধ হইয়া আছে। পরিধানে তাহারা কৌপীন মাত্র সার করিয়া থাকে—তাহাদের জটাজটযুক্ত রুক্ষ কেশ, অপরিচ্ছন্ন শ্মশ্রু ও গুম্ফ দেখিলে বন্য জীব বলিয়াই মনে হয়। তাহারা বৃক্ষ-কোটরে মৃত্তিকার প্রলেপ দিয়া তন্মধ্যে মধু রক্ষা করে—তাহাতে মাংস ডুবাইয়া রাখে। সেজন্য না কি মাংস বহুদিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে—নষ্ট হয় না। তাহারা বন্য হস্তী ধরিতে অদ্বিতীয়। হস্তীদন্ত ও মৃগমাংস তাহাদের প্রধান পণ্য। তীক্ষ্ণাগ্রভাগযুক্ত তীরের ফলা সংগ্রহ করিবার জন্যই তাহাদের এই ব্যবসা। তাহাও গ্রাম্য বেদ্দগণের হাত দিয়া করিয়া থাকে—নিজেরা বাহিরের লোকের সংস্পর্শে আসে না। গ্রাম্য বেদ্দগণ বৃক্ষত্বক দ্বারা কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। তাহাদের কিছু কিছু আবাসও আছে। তাহাদের বিবাহাদি অতি সহজ ও অনাড়ম্বরভাবে নির্ব্বাহ । বিবাহার্থী যুবক পাত্রীর পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলে সেইদিনই অথবা কোনও নির্দ্দিষ্ট দিনে তাহার হস্তে কন্যা সমর্পণ করা হয়। অন্য কোনও রূপ ক্রিয়াকলাপ অথবা ধর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যক হয় না। কাহারও মৃত্যু হইলে তাহারা মৃতদেহ জঙ্গলে ফেলিয়া দেয়, দাহ বা সমাধিস্থ করে না। বেদ্দরা পূর্ব্বপুরুষগণের আত্মার কল্যাণ জন্য, গ্রহ ও উপগ্রহের ... কামনায় এবং দুষ্টাত্মার সন্তোষ বিধানার্থ পূজা দিয়া থাকে। সাবেক কালে তাহারা কান্দীর রাজাকে হস্তীদন্ত, মধু ও মোম করস্বরূপ দিত। ইহারা শান্তিপ্রিয় জাতি, হিংস্র নহে। বহু পুরাকালে তাহারা এরূপ বনবাসী ছিল না। এককালে এই যক্ষ বংশ সিংহলে রাজত্ব করিত। বিজয়সিংহ যখন সিংহল অভিযানে আসেন, তখন ইহারাই ছিল দ্বীপের রাজা।

সে আজ প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। তখন 'জগতে বাঙ্গালী অধম জাতি' ছিল না। শৌর্য্য বীর্য্যে তাহারা অতুলনীয় ছিল—বাঙ্গলার নৌ-শিল্পি-নির্ম্মিত সুবৃহৎ ডিঙ্গা ভাসাইয়া নির্ভীক বাঙ্গালী দুস্তর সাগর পার হইতে ইতস্ততঃ করিত না। কোথায় রোম আর কার্থেজ—আর কোথায় সুমাত্রা যবদ্বীপ কম্বোজ আর সুদর্শন দ্বীপ—ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুল মহাসমুদ্রে নৌ-বাহিনী চালাইতে তখন বাঙ্গালী মাঝিমাল্লার হৃৎকম্প

সিংহলের মৎস্যধরা নৌকা
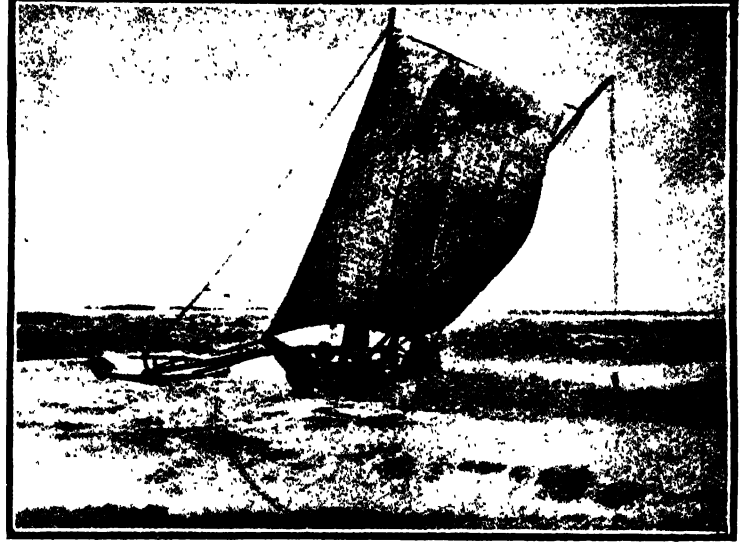
সিংহলের গো-যান

উপস্থিত হইত না। সে কি এক শুভ যুগ গিয়াছে। লাঢ় বা রাঢ়ের স্বাধীন নৃপতি সিংহবাহুর রাজধানী ছিল হুগলী জেলান্তর্গত সিংহপুর বা সিঙ্গুরে। যুবরাজ বিজয় সিংহ যৌবনে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠেন—পিতার কঠোর শাসন তাঁহার পক্ষে অসহনীয় হইয়া পড়ে। তাহার ফলে তিনি পিতৃরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হন। সাত শত বীর সঙ্গীসহ তিনি স্বদেশ হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করেন। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" হইলে কি হয়—বিজয় সিংহ যে মাতৃ ক্রোড়ে স্থান পাইলেন না—দূরে নিক্ষিপ্ত

হইলেন। অন্য কেহ হইলে তাহাতে মুহ্যমান হইয়া পড়িতেন। বীর যুবকের হৃদয় তাহাতে বিচলিত হইল না—সাগর পারে পিতৃরাজ্য অপেক্ষা বৃহত্তর রাজ্য স্থাপন করিয়া তথায় রাজত্ব করিতে তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। সাধু যাহার উদ্দেশ্য ঈশ্বর তাহার সহায়। ডিঙ্গা প্রস্তুত হইলে ভাগ্য পরীক্ষার্থ তিনি সঙ্গীসহ অকূল সমুদ্রে ভাসিয়া চলিলেন। যখন সিংহল

সিংহলী মেয়ে লেশ্ বুনিতেছে

কান্দীর তাঁতি বস্ত্র বয়ন করিতেছে

দ্বীপে পৌঁছিলেন, তখন তাঁহাদের আহার্য্য দ্রব্য সব নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। বিজয় সিংহ আহার্য্য সংগ্রহের উদ্দেশে বনে বনে ছুটিতে ছুটিতে রাজধানী লঙ্কাপুরীর উপবনে আসিয়া পৌঁছিলেন। ক্ষুৎপিপাসায় অতিশয় কাতর হইয়া বিশ্রামার্থ তিনি এক তরুতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন—ক্লান্তি বশতঃ তিনি তৃণশয্যায় শয়ন করিবামাত্র নিদ্রাগত হইলেন। নিদ্রাভঙ্গে তিনি দেখিলেন, এক সুন্দরী যুবতী তাঁহার শিয়রে বসিয়া তাঁহাকে পাখার বাতাস করিতেছে ও তাঁহার মুখের উপর যে কীটপতঙ্গ বসিতেছিল তাহা তাড়াইয়া দিতেছে। বনমধ্যে এই অভাবনীয় ব্যাপারে তিনি অতিশয় বিস্মিত হইলেন। রাজকুমার উঠিয়া বসিলে তাঁহাকে তাহার অনুসরণ করিতে বলিয়া যুবতী অগ্রসর হইতে লাগিল। যুবতী তাঁহাকে তাহার পিতার নিকট লইয়া গেল। যুবতী ছিল রাজকুমারী কুবেণী ; আর তাহার পিতা ছিল সিংহলের রাজা। অতিথি বৎসল রাজা স্বীয় আবাসে বিজয় সিংহকে রাখিয়া অতি যত্নের সহিত অতিথি সৎকার করিতে লাগিলেন কয়েকদিন পরে বিজয় রাজকুমারী পাণিপ্রার্থী হইলেন। পাত্রের যথায পরিচয় লইয়া রাজা সানন্দে তাঁহাে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বিবাহ-বন্ধে আবদ্ধ হইবার সময় তদ্দেশের প্রচলি প্রথানুযায়ী বিজয় দেবতাদের স্মর করিয়া শপথ করিলেন—যতদিন কুবে জীবিত থাকিবে ততদিন তিনি অ পত্নী গ্রহণ করিবেন না। যদি কর অভিশাপ গ্রস্তের ফল ভোগী হইবে ক্রমে তাঁহার সঙ্গীদের অন্যান্য যক্ষ কন্য সহিত বিবাহ হইয়া গেল। বিজয় সিংে মনোগত অভিপ্রায় ছিল ছলে বলে কৌশ যে প্রকারেই হউক সিংহলের রা সিংহাসন অধিকার করা। সেই উদ্দে সাধন জন্য তিনি সুযোগের অপেক্ষ রহিলেন। দেখিতে দেখিতে সে সুযো উপস্থিত হইল। জনৈক সম্ভ্রান্ত য সর্দ্দারের কন্যার বিবাহোপলক্ষে ক্রমা সাত দিবস ব্যাপী আনন্দোৎসব হইবে তখন সকলেই নিরস্ত্র অবস্থায় আ প্রমোদে মত্ত থাকিবে। বিজয় ি সঙ্গীদের সহিত পরামর্শ করিয়া যথাক স্থির করিয়া ফেলিলেন। সাত শত সঙ্গীসহ বিজয় সিংহ অতর্কিত অ উৎসবানন্দে প্রমত্ত সর্দ্দারগণের উপর আপতিত হইয়া তাহাদিগকে বিখণ্ড করিতে লাগিলেন। তাহারা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিল না। রাজা ও প্র প্রধান সর্দ্দারগণ নিহত হইলেন—হঠাৎ বিপৎপাতে কিংকর্ত্তব্য হইয়া অন্যান্য যক্ষগণ প্রাণভয়ে পলায়ন করিল—বিজয়ী সেনাকে কেহ প্রদান করিল না। এইরূপে বিজয় সিংহ "হেলায় করিল লঙ্কা জয়"

রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া বিজয় কুবেণীকে বর্জ্জন করিলেন। বিবাহকালীন প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়া তিনি ভারতবর্ষ হইতে রাজকুমারী আনাইয়া পুনরায় বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন ও তাঁহাকে রাণী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কুবেণীর কু-গ্রহ—সে নূতন রাণী দেখিবার জন্য রাজধানী লঙ্কাপুরে গমন করে। পথে বিজয় সিংহের জনৈক সহচরের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটে। রাজান্তঃপুরে গিয়া কুবেণী অশান্তি ঘটাইতে পারে ভাবিয়া তাহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য সে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করে। কুবেণী তাহার কথায় কর্ণপাত না করায় সে জোর করিয়া তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে যায়। ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া কুবেণী রাজপথে সজোরে পড়িয়া গেল। তাহাতে তাহার মস্তক চূর্ণ হইয়া যায় ও সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবিয়োগ ঘটে। কুবেণীর গর্ভে বিজয়ের একটী পুত্র ও এক কন্যা জন্মিয়াছিল—তাহারা এতদিন মাতুলালয়ে বাস করিতেছিল। কুবেণীর এরূপ শোচনীয় মৃত্যু সংবাদে অতিশয় বিচলিত হইয়া তাহার খুল্লতাত শিশুদ্বয় এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনসহ বনমধ্যে আশ্রয় লয়। তদবধি যক্ষগণ বনবাসী। এখন তাহাদের বংশধরগণ বেদ্দ নামে পরিচিত। তাহারা শঠতাপূর্ণ সভ্য-সমাজ হইতে দূরে থাকিতে ভালবাসে। যতদুর সম্ভব তাহার সংস্পর্শে আসিতে চাহে না। বিজয় সিংহ পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইয়া শেষ জীবন অতি কষ্টে অতিবাহন করেন। সিংহলবাসীর ধারণা—কুবেণীর আত্মা এখনও দ্বীপের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়া থাকে এবং মধ্যে মধ্যে ভূমির উৎপাদিকা-শক্তি নষ্ট করিয়া দেয়। কু-গ্রহের মত কুবেণী যুগে যুগে আবির্ভূতা হইয়া বিজয়সিংহের অপর বংশধরগণের অনিষ্ট সাধন করিয়া আসিতেছে। মেতেলীর নিকট এক নির্জ্জন স্থানে মানবাকৃতির অনুরূপ "কুবেণী-গল্" নামে এক পর্ব্বত আছে। তাহা দেখিতে বিচিত্র ও অনুর্ব্বর. সিংহলীদের বিশ্বাস, যতদিন পর্ব্বতটী ধরাপৃষ্ঠে বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন তাহাদের শুভগ্রহ নাই—অমঙ্গলের পর অমঙ্গল ঘটিতে থাকিবে। বেদ্দগণ তাহার সন্তানগণের বংশধর বলিয়া কুবেণী নাকি তাহাদের উপর সদয়। তাহাদের উপকার সাধন তাহার প্রধান লক্ষ্য।

সিংহল-প্রবাসী তামিল ভদ্রলোক
লেখকের বন্ধু—Mr. V. M. Muttukumarn

সমর্পণ

শ্রীশচীশ চট্টোপাধ্যায় বি-এ

তোমায় সকলি দিয়ে রিক্ত হয়ে আজ
শূন্য মনে বসে আছি নাহি কোন কাজ।
বাহিরকে দিব ব'লে কিছু রাখি নাই
সুমধুর গৃহ-কোণ বাছিয়াছি তাই।
অন্তরের তন্ত্রীগুলি বাজিয়া বাজিয়া
কম্প্রসুর ধীরে ধীরে গিয়াছে থামিয়া।
নেমে আসে কর্ম্মহারা নয়নপল্লব
পূর্ণ সাধ, দিছি মোর সকল বৈভব।

মোর 'আমি' তব মাঝে বাসনা হইয়া
আকুলি ব্যাকুলি ছুটি' গিয়াছে মিশিয়া।
বলিবার কিছু নাই, গাহিবার নাই,
কোন ভাষা কোন গান নাহি মোর ঠাঁই।
সকলি তোমারে আমি দিয়েছি সাজায়ে,
সব কাজ শেষ—বৃথা রেখো না বসায়ে।

খেলার পুতুল

শ্রীনরেন্দ্র দেব

১৬

হরিমোহন একটু যেন বিব্রত হ'য়েই গৌরমোহনের কাছে এসে ব'ললে—দাদা, যা ভেবেছিলুম তাই!—এই দেখো রাঙাবৌদি বউভাতে যে নিমন্ত্রণের ফর্দ্দ ক'রে দিয়েছে—তাতে ওই মণি ডাক্তারের নাম দিয়েছে!

গৌরমোহন যেন কথাটা শুনেও শুনলেনা এমনিভাবে নিজের কাজ করতে লাগল।

হরিমোহন একটু অপেক্ষা করে আবার ব'লতে সুরু করলে—এবার যেন কতকটা আপন মনেই—

—আমি তখনই বুঝিছিলুম; যেদিন কাজলগাঁ থেকে আসবার সময় রাঙাবৌদি পাল্‌কীতে না এসে ওই মণি ডাক্তারের সঙ্গে তার 'টু-সিটার' মোটরে চ'ড়ে এলো, সেইদিনই বুঝিচি লক্ষণ ভাল নয়! সুশীলবাবু সেদিন যা' বললেন তা' একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে দেখছি!—হাজার হোক্ কলকাতার ছেলে তো, ওরা টপ্ ক'রে এসব ধ'রে ফেলতে পারে—

গৌরমোহন গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা ক'রলে—তোমার কি মণিবাবুকে বলবার ইচ্ছা নেই?

এ প্রশ্নের উত্তরে হরিমোহন খানিকটা ভেবে ব'ললে—তুমি কি বলো? এ-রকম ব্যাপারে কি ওটাকে বলা উচিত? গাঁয়ের লোকেরা সেদিন থেকেই না-১ কথা বলাবলি করছে—

গৌরমোহন ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে—কিন্তু, না বলাটাও তো ঠিক হবেনা, বিশেষ রাঙাবৌদি যখন নিজে ফর্দ্দে নাম ধ'রে দিয়েছেন।

হরিমোহন তার কণ্ঠস্বর এবার যথাসম্ভব নীচু ক'রে বললে—সেই জন্যই তো আমি ওটাকে ব'লতে চাইছিনি। রাঙাবৌদির এতটা আগ্রহ তো ভালো নয়। কোথাকার কে হরির খুড়ো মাধাইদাস—তাকে কেন নিমন্ত্রণ ক'রে আনা? লোকে শুনলেই বা বলবে কি? এর মধ্যেই তো পাড়ার চারিদিকে কাণাঘুসো চলতে সুরু হয়ে গেছে। রাঙাবৌদি সেদিন ডাক্তারকে যেরকম খাতির যত্ন করলেন তাতে মাসী ত' একেবারে রেগে অগ্নিশর্ম্মা! তিনি ব'লেন—দাদার সম্বন্ধীকে নিয়ে অতটা ঢলাঢলি করা নাকি বৌ'য়ের খুবই বাড়াবাড়ি হ'য়েছিল। তবু, বৌদির দাদা যে তাঁর নিজের ভাই নন এ কথা মাসী এখনও শোনেনি। শুনলে কি আর রক্ষে রাখবে?

গৌরমোহন বললে—রাঙাবৌদি যদি জানতে পারে যে তুমি ডাক্তারকে বলোনি—তাহ'লে হয়ত' ক্ষুণ্ণ হবে—

হরিমোহন অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে—তখন না হয় বলা যাবে যে ভুল হ'য়ে গেছে! মেয়েমানুষের খেয়ালকে প্রশ্রয় দিলে ত' চলবেনা—মান ইজ্জৎ বাঁচাতে হবেত' আগে?

—যা ভালো বোঝো করো—বলে গৌরমোহন আবার নিজের কাজে মন দিলে।

হরিমোহন হাতের নিমন্ত্রণ ফর্দ্দখানা আর একবার পড়ে দেখে বললে—এটা কিন্তু ভারী অন্যায় দাদা—রাঙাবৌদি সুশীলবাবুর নাম দেননি ফর্দ্দে! তাঁকে কি বাদ দেওয়া উচিত?

গৌরমোহন বললে—বোধ হয় ভুলে গেছেন, তা' তুমি তো কলকাতায় যাবেই, অমনি তাঁকেও বলে এসো—

সুহাস এদের দু'ভায়ের এ সব পরামর্শ কিচ্ছুই জানতে পারেনি। বৌভাতের দিন সবার আগেই অনিলাকে নিয়ে সুশীল এসে উপস্থিত হ'লো দেখে সে ভয়ানক আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। কর্ম্মবাড়ীর এক ফাঁকে সে হরিমোহনকে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'রলে—ন'ঠাকুরপো, সে নিমন্ত্রণের ফর্দ্দখানা তোমার কাছে আছে কি? একবার দিও তো দেখবো—

হরিমোহন আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বললে—হাঁ সেখানা—না, বৌদি—সে বোধ হয় হারিয়ে গেছে—

সুহাস বললে—ডাক্তারবাবুকে বলে এসেছো তো?

হরিমোহন একটু মনে মনে মৃদু হেসে মুখে অত্যন্ত অপ্রতিভের ভান করে বললে—সেইটেইত' ভুল হয়ে গেছে বৌদি। ফর্দ্দখানা হারিয়ে যাওয়াতে তাঁর কথা একেবারেই মনে ছিলনা।

সুহাস ক্ষণকাল কি চিন্তা করে ব'ললে—তা' যাকৃগে—কিচ্ছু ক্ষতি হবেনা। আমি তাঁকে চিঠিতে আসবার জন্য বিশেষ করে অনুরোধ করেছি। তিনিও আসবেন ঠিক্। তবে আমি তাঁকে লিখিছিলুম যে—নঠাকুরপো গিয়ে তোমায় নিমন্ত্রণ ক'রে আসবে—সে কথাটা দেখছি আর রইলনা।

হরিমোহন অতিমাত্র বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হ'য়ে প্রশ্ন ক'রলে—তিনি কি আসবেন ?

সুহাস বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বললে—নিশ্চয়, তিনি খুব ভালোমানুষ। তুমি না যেতে পারলেও আমার চিঠি পেয়ে ঠিক্ আসবেন দে'খো। তাঁর অত কেতা-দোরস্ত—'ফর্ম্যালিটি' নেই।

এমন সময় কে এসে খবর দিলে—সুহাসের দাদা আর বৌদি এসেছেন।

সুহাস চলে গেল তাদের খাতির যত্ন ক'রতে। হরিমোহন মনে মনে ব'ললে—তাইত! এতদুর এগিয়েছে! চিঠিপত্র লেখালেখিও চলছে! তাহ'লে উপায় ?

হরিমোহন গিয়ে সুশীলকে মুরুব্বী ধরলে—এর একটা বিহিত করবার জন্য।

সুশীল সব শুনে বললে হুঁ, বলিছিলুম তো দাদা! এখন দেখছো তো বন্ধু! গরীবের কথা বাসি হ'লেই মিষ্টি লাগে! সেদিন উনি যখন এলেন, আমি আমার স্ত্রীর নাম করে বললুম—চলুন, আমার গাড়ীতে—অনিলা আপনাকে পৌছে দিয়ে আসবে, কিন্তু তা উনি এলেন না; উনি এলেন সেই বদমাইস্ ডাক্তারটার গাড়ীতে—সবই বুঝলুম, কিন্তু কথাটি কইনি ভাই!

হরিমোহন অধীর হ'য়ে ব'ললে—তাতো সব আমিও বুঝলুম, কিন্তু এখন এর কি বিহিত করা যায়—তাই বলুন।

সুশীল বললে—আজ যদি শয়তানটা আসে, তাকে আপনারা স্পষ্টই ব'লে দেবেন যে, এ বাড়ীতে যেন আর বিনা নিমন্ত্রণে সে না আসে।

হরিমোহন জিভ্ কেটে বললে—না—ছিঃ! তা কি হয়? ভদ্রলোক আমাদের বাড়ীতে এলে তাঁকে কি ও-কথা বলতে পারি ?

সুশীল গম্ভীরভাবে বললে—বেশ, আপনারা না পারেন অন্য কাউকে দিয়ে বলান, মোট কথা—একটা ইঙ্গিত করা চাই-ই কিন্তু ওই মর্ম্মে! এবং তা এই বেলা—নইলে এরপর—

বাধা দিয়ে হরিমোহন বললে—তবে সে ভারটা আপনার উপরই রইল।

সুশীল একটু ক্ষীণ আপত্তি ক'রে বললে—তা' হয়ত' ভারটা নিতে পারি, কিন্তু, আমার তো বাড়ী নয় যে, আমি তাকে আস্তে নিষেধ করবো—তবে তোমরা যদি আমার সঙ্গে সায় দাও তাহ'লে অবশ্য ব'লতে পারি—

হরিমোহন তৎক্ষণাৎ এতে রাজি হ'য়ে গেল—এমন সময় রাস্তা থেকে একখানা মোটরের 'হর্ণ' শোনা গেল। একটু পরেই দেখা গেল—মোটরখানা তাদেরই বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো, এবং তার ভিতর থেকে মণি ডাক্তার নামলো!

সুহাস মণীন্দ্রকে ভিতরে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে—এত দেরী হোলো যে আপনার আসতে ?

মণীন্দ্র বললে—একটা 'কেস' নিয়ে ভারী মুস্কিলে পড়েছিলুম—আমাদের হাঁসপাতালে 'নার্শ' বড় কম। এক একজনকে অনেকগুলো রুগীর চার্জ নিতে হয়—একটাকে ভুল ক'রে একজন অন্য ওষুধ খাইয়ে দিয়েছিল—

সুহাস দুই চোখ কপালে তুলে বললে—কী সর্ব্বনাশ! তারপর ?—

মৃদু হেসে মণীন্দ্র বললে—এতক্ষণ তাকে নিয়েই পড়েছিলুম! নার্শের সেই ভুলটা শোধরাতে অনেকখানি সময় নিলে।

সুহাস অনুযোগের সুরে ব'ললে—ব'ললুম আপনাকে সেদিন গাড়ীতে আসতে আসতে যে, আমাকে হাঁসপাতালের একজন নার্শ ক'রে নিন্—তা আপনি কিছুতেই শুনলেন না। আমি নার্শ হ'লে কখনই ও-রকম ভুল করতুমনা।

মণীন্দ্র বললে—কী যে বলো। তুমি 'নার্শ' হবে কি ?

—নইলে কি চিরকাল এই পরের বাড়ীতে পরান্নভোজী হ'য়ে দাসীবৃত্তি করবো ?

—দাসীবৃত্তি করবে কেন ? তুমি জন্মেছো রাণী হ'য়ে—শুধু হুকুম করবে—আর লোকে তাই তামিল করবে! তুমি—'নার্শ' হবে কি ?

সুহাস মৃদু হেসে বললে—কিন্তু, রাণীর হুকুম লোকে তামিল ক'রছে কই? এত বলেও তো একটা নার্শের কাজ বাগাতে পারলুমনা—

—আচ্ছা, শুধু শুধু 'নার্শ' হবার সখ হ'লো কেন বলো তো তোমার?

—কতবার ব'লবো যে—আমি স্বাধীনভাবে নিজের জীবিকা অর্জ্জন ক'রে থাকতে চাই—

—কেন, কী দুঃখে? শ্বশুরবাড়ী থাকতে না চাও—অমন রাজা ভাই রয়েছে—

বাধা দিয়ে সুহাস বললে—আপনি কেবল 'রাজা' আর 'রাণীর' স্বপ্ন দেখছেন! বলি, ভায়ের বাড়ীতে গিয়ে থাকলেও তো সেই আপনারই বোনের দাসাবৃত্তি ক'রতে হবে?—সেই পরের বাড়ী থাকা—পরান্ন ভোজনের গ্লানি—

মণীন্দ্র বললে—কিন্তু, 'নার্শ'!—তুমি 'নার্শ' হবে—এ যে আমি কল্পনাও ক'রতে পারছিনি!—

সুহাস বললে—কেন? আপনার কল্পনাশক্তি দেখছি তাহ'লে নেহাৎ ক্ষীণ! মেয়েদের পক্ষে ওর চেয়ে উপযুক্ত ভালো কাজ আর কি হ'তে পারে? রোগীর সেবা—আর্ত্তের শুশ্রূষা—এ সব তো—এই আমাদের মা'য়ের জাতেরই করা উচিত! আমার তো মনে হয় ওটা বেশ সম্মানজনক উপজীবিকা হবে—

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে মণীন্দ্র বললে—না—কেন, ওর চেয়েও ভালো কাজ ত' মেয়েদের রয়েছে!

—কি?

—মেয়ে-ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী!

সুহাস একটু ভেবে বললে—কিন্তু সে কি আমি পারবো?—লেখাপড়া শিখিনি যে মোটে! এই সামান্য বিদ্যের পুঁজি নিয়ে মাষ্টারী করতে যেতে সাহস হয়না বন্ধু!

তোমাকে কিছুই ক'রতে যেতে হবেনা—এখন খাবার তৈরী হ'লো কি না দেখো—আমার ভয়ানক ক্ষিধে পেয়েছে।

সুহাস তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরুতেই—দেখলে এধার—ওধার—থেকে দু'তিন জন মেয়েপুরুষ ফস্ ফস্ করে আশে পাশে সরে গেল। বেশ বোঝা গেল যে তারা এতক্ষণ কৌতূহলী হ'য়ে বাইরে থেকে তাদের কথাবার্ত্তা সব আড়ী পেতে শুনছিল!

তাদের এই অসভ্যতায় সুহাস মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হ'লো বটে, কিন্তু মুখে কিছু বললেনা। একটু পরেই ফিরে এসে মণীন্দ্রকে ডেকে নিয়ে গেল—পাতা হ'য়েছে। খাবার তৈরী—চলুন—

মণীন্দ্র খেতে যেতে যেতে বললে—'তাই ত, পংক্তির ভিতর ঠেলে দিলে সু? আমি মনে করিছিলুম নিরিবিলি তোমার ঘরে বসে যা' হোক্ কিছু মুখে দিয়ে পালাবো—

এই সময় মন্দা এসে পথের মাঝে ঢিপ করে মণীন্দ্রকে এক প্রণাম করে বললে—ঠাকুরঝী চলে আসবার পর থেকে আর আমাদের বাড়ী একবারও যাও নি কেন দাদা?—

মণীন্দ্র হেসে বললে—তাই তো বলি মন্দাকিনী না হ'লে এতবড় দেড়গজী পেন্নাম আর কে ঠুকবে! যেতে পারি নি ভাই, হাঁসপাতালে কাজ পড়েছে বড্ড, সময় পাই নি মোটে—

মন্দা একটু রাগ করেই বললে—যত সময় পাওনা তুমি আমার বাড়ী যাবার বেলা—এদিকে ঠাকুরঝীকে দেখতে তো এখানে এসেছিলে তুমি এর মধ্যে দু'তিন দিন শুনলুম!

মণীন্দ্র বিস্মিত হ'য়ে সুহাসের মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখলে—

সুহাস ততোধিক বিস্মিত হ'য়ে মন্দার মুখের দিকে চেয়েছিল—

গৌরমোহন এসে বললে—চলুন ডাক্তার বাবু, আপনার জন্য সবাই অপেক্ষা ক'রছে, কেউ বসতে পারছে না—

মণীন্দ্র হতবুদ্ধির মতো গৌরমোহনের সঙ্গে সঙ্গে চ'ললো—

সুহাস গম্ভীরভাবে মন্দাকে প্রশ্ন করলে—এ অদ্ভুত সংবাদটি বৌদি'র কোথা থেকে সংগ্রহ হ'লো শুনি?—

মন্দা বললে—তোমার মাসশাশুড়ী ব'লছিল,—আরও অনেকের মুখে অনেক কথাই শুনলুম। দাদাকে না কি এরা কেউ বলতে যাইনি, তুমিই নিমন্ত্রণ করে এনেছো—

—হ্যাঁ, সেটা ঠিকই শুনেছো—বলে মন্দা অন্য কাজে চলে গেল।

পংক্তিতে ঠিক্ সুনীলের পাশেই মণীন্দ্রের জায়গা খালি রাখা হ'য়েছিল। মণীন্দ্র এসে বসতেই—সুনীল খুব খাতির করে অভ্যর্থনা জানিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে—আপনার ওখানে হরিমোহন কখন গেছলো মণিবাবু?—

প্রশ্নটা সে বেশ চেঁচিয়ে সকলকে শুনিয়েই করলে।

মণীন্দ্র বললে—কই, ওঁরা তো কেউ দয়া করে যান নি গরীবের বাড়ী পায়ের ধুলো দিতে—

—ওঃ! এঁরা কেউ বুঝি আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে যায় নি? বটে! আপনি তা হ'লে বিনা নিমন্ত্রণেই এসে হাজির হয়েছেন বলুন? একেবারে সেই যাকে বলে রবাহূত অনাহূতোর দল—

সকলে হেসে উঠলো!—

মণীন্দ্রের মুখ চোখ লাল হ'য়ে উঠলো—সে বললে—না ঠিক তা নয়, তবে—

মণীন্দ্রের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুশীল বললে—হ্যাঁ, তবে—কর্ত্তারা কেউ নিমন্ত্রণ না করতে গে'লেও—একজন গিন্নীর কাছ থেকে জোর পরওয়ানা গেছলো—না? সে আমরা সবই জানি—

কথাটার মধ্যে এমন একটা অন্তর্নিহিত কুৎসিত ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন ছিল যে শুনে সবাই আর একবার উচ্চহাস্য করে উঠলো!

মণীন্দ্র অধিকতর আরক্ত হ'য়ে উঠে এ প্রসঙ্গটাকে বন্ধ করবার জন্য ব'ললে—জানেন যদি সবই, তবে আর সে কথা জিজ্ঞাসা ক'রে সময় নষ্ট করছেন কেন? লুচি ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে' যে! দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারে মনোযোগ দিন—

সুশীল একটু ক্রূর হাসি হেসে বললে—বিলক্ষণ! সে দিকে আপনার চেয়েও সজাগ দৃষ্টি আছে আমার,—কিন্তু তার আগে আপনাকে যে আর একটা কথায় মনোযোগ দিতে হবে!

মণীন্দ্র খেতে খেতে বললে—কী বলুন?

সুশীল বললে,—এ বাড়ীর মালিকরা ইচ্ছা করেন না যে আপনি বিনা-নিমন্ত্রণে এসে এঁদের অন্দরমহলে ঢু'কে বাড়ীর বউ-ঝীয়ের সঙ্গে প্রেম করেন!

মণীন্দ্রের আর খাওয়া হোলো না। সে হাত গুটিয়ে সুশীলের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কী বললেন?

সুশীল একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে বললে—কথাটা তো বেশ স্পষ্টই বলিছি—ওর মধ্যে না বোঝবার মতো কিছু নেই ত'—

নিমন্ত্রিতেরা সকলে আর একবার যেন উপহাসের অট্টহাসি হেসে উঠলো—

সুশীল এতে মহা উৎসাহিত হ'য়ে উঠে বললে—এই ধরুন না, আপনার ভগ্নীপতি সত্যেন বাবু কি বলেন? সম্পর্কে আপনি ওঁর সম্বন্ধী হ'লেও উনিও বোধ হয় কখনই ইচ্ছে করেন না যে আপনি ওঁর অল্পবয়স্কা সুন্দরী বিধবা বোনটির সর্ব্বনাশ করেন—সুহাস অবশ্য আপনাকেই চায়—কিন্তু—ও-ও ফ্!

মণীন্দ্রের বজ্রমুষ্টি প্রচণ্ডবেগে সুশীলের মুখের উপর এসে প'ড়ে বাকী কথাগুলো শুধু একটা আর্ত্তনাদের মধ্যে রুদ্ধ ক'রে দিলে—

সত্যেন ইংরাজীতে একপাশ থেকে বলে উঠলো—rightly served!

মণীন্দ্র সে কথা শুনতে পেলে কি না বোঝা গেলনা, কিন্তু ইতিমধ্যে তার আর একটা ঘুষী সজোরে এসে সুশীলের নাকের উপর পড়লো—এবং নাক মুখ তার' রক্তাক্ত করে দিলে!—

হৈ হৈ ব্যাপার! সকলেই উত্তেজিত হ'য়ে আসন ছেড়ে উঠে পড়লো এবং বেশ একটু দূর থেকেই সমস্বরে চীৎকার করে সুশীলকে ব'লতে লাগলো—উঠে আসুন মশাই, পালিয়ে আসুন,—খুন হবেন নাকি? —পড়ে' পড়ে' মার খাচ্ছেন কেন?—ইত্যাদি—

সুশীল উঠে পড়ে পালাবার একটা প্রাণপণ চেষ্টা ক'রতেই —মণীন্দ্র সিংহের মতো লাফিয়ে উঠে তার গলার টুঁটিটা টিপে ধরলে।

তখন সত্যেন এগিয়ে এসে বললে—enough! এইবার ছেড়ে দাও মণি!

মণি তখন সুশীলের গলা ছেড়ে ঘাড়টা ধ'রে কুকুর বাচ্ছার মতো তার মাথাটাকে নাড়া দিচ্ছেল.

হঠাৎ বাড়ীর ভিতর থেকে সুহাস বেরিয়ে এসে মণীন্দ্রকে ভর্ৎসনা করে ব'ললে—কি ক'রছেন ছেলেমানুষী! একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই আপনার? সমস্ত লোকের খাওয়া নষ্ট করলেন—ও পশুটাকে ছুঁতে একটু ঘৃণা বোধ হ'লো না?—

মণীন্দ্র সুশীলকে ছেড়ে দিলে। সুহাস সত্যেনকে বললে —দাদা, ওঁকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে এসো—

সুশীল কান্নার সুরে চীৎকার করে উঠলো—আমি থানায় যাবো। ওকে পুলিশে দেবো—

সত্যেন তাকে' জোর ক'রে ভিতরে টেনে নিয়ে গেল।

হরিমোহন এইবার এগিয়ে এসে উত্তেজিতভাবে মণীন্দ্রকে বললে—এ কিন্তু সত্যিই আপনার ভারী অন্যায়! আপনি অনিমন্ত্রিত এখানে এসে আমাদের নিমন্ত্রিত অতিথিকে

অপমান ক'রবেন—এ কি আপনার ব্যবহার? দেখুন তো সমস্ত লোকের খাওয়া নষ্ট করলেন?

রাগের মাথায় একটা বিশ্রী কাণ্ড করে ফেলেছে বলে মণীন্দ্র অত্যন্ত অপ্রতিভের মতো এই হঠকারিতার জন্য মার্জ্জনা চেয়ে—ক্ষতিপূরণ ক'রতে প্রতিশ্রুত হ'য়ে—সব শেষ বললে—কিন্তু, আনমন্ত্রিত হ'য়ে আমি তো আসিনি? সুহাস আমাকে—

বাধা দিয়ে হরিমোহন বললে—তিনি কে?—আমাদের আশ্রিতা বই ত নন্! আপনি চলে' যান্—এখনি এই মুহূর্ত্তে এখান থেকে চলে যান্। আপনার কোন কথা শুনতে চাইনি! আর কখন এখানে আসবেন না—যদি আসেন অপমান হবেন' ব'লে দিলুম—

হরিমোহন চলে গেল।

মণীন্দ্র সেখানে দাঁড়িয়ে নতমুখে কী ভাবতে লাগলো—তার সুন্দর মুখখানি তখন অপমানের তীব্র আঘাতে যেন নীলবর্ণ হ'য়ে উঠেছে!

ক্ষণকাল পরে ধীরে ধীরে সে তার মোটরে গিয়ে উঠলো—

সমবেত ভদ্রলোকদের মধ্যে থেকে কে যেন ব'লে উঠলো—একলা যেতে মন সরছেনা বুঝি?—

এর উত্তরে আর একজন বললে—হুঁ, তাই দেখছি! এদের রাঙাবৌকেও ডেকে দাও না, সঙ্গে যাক্—

মণীন্দ্রের কাণে তখন এ সব কোনও কথাই যাচ্ছিল না,—সে অন্য কথা ভাবতে ভাবতে—তার মোটরের সেল্ফ-ষ্টার্টার টিপে ইঞ্জিনকে সচল করতে না পেরে—প্রকাণ্ড লোহার চাবীটা হাতে ক'রে মোটর থেকে নামলো—

সমবেত জনতা সভয়ে চীৎকার ক'রে উঠে ঊর্দ্ধশ্বাসে চারিদিকে ছুটে পালালো। তারা মনে করলে মণীন্দ্র বুঝি এইবার সশস্ত্র হ'য়ে—তাদেরই আক্রমণ করতে আসছে!

ঈষৎ অবজ্ঞার সঙ্গে তাদের দিকে একবার চেয়ে দেখে মণীন্দ্র ইঞ্জিনে চাবীটা লাগিয়ে তার বলিষ্ঠ হাতের চাপে দু'তিন পাক দিতেই ইঞ্জিন গর্জ্জন ক'রে উঠলো—মণীন্দ্র ফিরে গিয়ে গাড়ীতে উঠে বসলো—এবং চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে গাঁয়ের পথে অদৃশ্য হ'য়ে গেল!

যাবার আগে দু'তিন বার পিছন ফিরে সে কার একখানি মুখ দেখে যাবার চেষ্টা ক'রেছিল; কিন্তু কাউকেই দেখতে পায় নি।

মণীন্দ্র চলে গেল বটে, কিন্তু ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হ'লো না।

হরিমোহন, গৌরমোহন এমন কি সত্যেনের সহস্র চেষ্টাতেও গাঁয়ের আর কাউকেই ডেকে এনে খেতে বসাতে পারা গেল না। তারা হরিমোহন ও গৌরমোহনকে স্পষ্টই ব'ললে—তোমাদের রাঙাবৌ যতদিন ও-বাড়ীতে থাকবে—আমরা কেউ তোমাদের বাড়ীতে পাত পাড়তে যাবো না! ওকে আগে বিদেয় করো তবেই তোমাদের সঙ্গে সামাজিকতা থাকবে—নচেৎ নয়! তোমাদের আস্কারা পেয়েই ত' বৌটো নষ্ট হ'য়েছে। ছুঁড়ীর এতবড় বুকের পাটা যে এই কর্ম্মবাড়ীতে—চিঠি লিখে তার মনের মানুষকে ডেকে আনতে সাহস করে! এমন বেলেল্লা কাণ্ড তো কখন শুনিনি!—লাজলজ্জার মাথা একেবারে চিবিয়ে খেয়েছে!—ছি ছি—কুলে কালি দেওয়া আর কাকে বলে?—

এই 'ছি ছি' রবটা দেখতে দেখতে সকলের মুখে মুখে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

মাসীমা বুক চাপড়ে ডুক্‌রে পিটে কেঁদে উঠলেন!—ওরে, এমন সর্ব্বনেশে মেয়েও ঘরে এনে পুরিছিলি বাবা! জাত ধর্ম্ম সব গেল—মানইজ্জৎ সব ডোবালে—বিদেয় কর্'—বিদেয় কর্'—আঙ্গুটীকে মুড়ো খ্যাংরা মেরে দূর করে' দে'—একেবারে গাঁয়ের বার করে দিয়ে আয়, ও পাপ আর একদণ্ড ঘরে' রাখিস্ নি—

এদিকে থানা-পুলিশের হাঙ্গামা করা থেকে সুশীলকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত ক'রে সত্যেন তাদের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে এসে যখন মন্দার মুখে সমস্ত ব্যাপার শুনলে—সে একটু যেন স্তম্ভিত হ'য়ে গেল—

মন্দা বললে—তুমি অত ভাব্‌ছ কেন, ঠাকুরঝীকে আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। এ অপমানের মধ্যে আমি কিছুতেই তাকে ফেলে রেখে যেতে পারবো না।

মন্দার প্রতি একটা অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় সত্যেনের চোখমুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। ক্ষণকাল সে নির্ব্বাক বিস্ময়ে পত্নীর মুখের দিকে চেয়ে রইল, তারপর দ্বিধা-বিজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—কিন্তু, সে কি যাবে মন্দা?

—সে ভার তুমি আমার উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকো—এই বলে মন্দা গেল সুহাসের কাছে।

সে ভেবেছিল গিয়ে দেখবে—সুহাস হয়ত' এ ব্যাপারে

নিতান্ত কাতর হ'য়ে পড়েছে—হয় ত এতক্ষণ কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে।—কিন্তু, সুহাসের ঘরে ঢুকে সে অবাক্ হ'য়ে গেলো! সে দেখলে সুহাস পরম নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে তার বাক্স গোছাচ্ছে। মন্দাকে দেখে সে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলে—কিগো বউদি, তুমি যে বড় এখনও রয়েছো?—পালাওনি এখনও?—

মন্দা প্রশ্নটা কি যে বলবে কিছু বুঝতে পারলে না। বিস্ময়-বিমূঢ়ার মতো সুহাসের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

সুহাস জিজ্ঞাসা ক'রলে—বাড়ী যাচ্ছো বুঝি বৌদি? রোসো ভাই, তবে একটা পেন্নাম করি—

সুহাস উঠে এসে গলায় আঁচল দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে মন্দাকে একটা প্রণাম করে পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় দিলে—

মন্দা দক্ষিণ হস্তে সুহাসের চিবুক স্পর্শ করে সেই হাতটি আপন অধরে ছুঁইয়ে একটা চুম্বনের শব্দ করে, বললে—আঃ—কী যে করো ছেলেমানুষী ঠাকুরঝী! আমাকে আবার এত পেন্নাম কেন? আমি তো তোমার চেয়ে বছর খানেক প্রায় বয়সে ছোট—

সুহাস বললে—তা হ'লে কী হয়? দাদার গলায় মালা দিয়ে যে মান্যে আমার চেয়ে বড় পদ নিয়ে বসে আছো—

—সে তো আর আমার অপরাধ নয়, সে জন্যে দায়ী তুমি। তুমি মালা দিতে চাইলে না বলেই না আমাকে ধরে নিয়ে এসেছেন তোমার জন্ম-জন্মান্তরের দেবতা—

সুহাস এ কথা শুনে চমকে উঠলো। মন্দার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তা' লক্ষ্য ক'রে মনে মনে খুশী হ'য়ে উঠলো। সে তখন একেবারে সুহাসের দুটি হাত ধরে তাকে কাছে টেনে নিয়ে—মিনতি করে বললে,—আমার কাছে আর লুকোসনি—আর লজ্জা করিসনি বোন্ লক্ষ্মীটি। একদিন কোন্ শৈশবে 'দাদা' বলে ডেকেছিলি ব'লে কি সেই মিথ্যেটাই আজীবন তোর কাছে সত্য হ'য়ে থাকবে। বড় হ'য়ে থাকবে? সেই ছেলে বেলার সম্বোধনটুকুর মর্য্যাদা রাখবার জন্যে তোর জীবন দয়িতকে কি চিরদিন তুই প্রত্যাখ্যান করবি—না সু এ হ'তেই পারে না—তুমি চলো আমার সঙ্গে,—তোমাকে আমি আজ নিয়ে যাবো—আমাদের বাড়ী। চলো তোমার সেই স্নেহের নীড়ে—তোমার আপন অধিকারে ফিরে! চলো ভাই, আমরা দুই বোন মিলে তাঁর সেবা করে ধন্য হবো—তোমার কাছে তাঁর সেদিনকার পাওনা মালাগাছটি আমি আজ তোমাকে দিয়ে তাঁর গলায় পরাবো। শাস্ত্র-মতে বিবাহের অনুষ্ঠান ক'রে আমি লোকনিন্দার কণ্ঠরোধ করবো—এসো তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও—এসো—এখানে আর না। ব'লে মন্দা সুহাসের হাত দুটি ধরে একটু আদরের ঝাঁকুনি দিলে—

এই ঝাঁকুনী খেয়ে সুহাস যেন কোন্ স্বপ্ন-লোক থেকে ফিরে এলো। নিদ্রোত্থিতের মতো বললে—কী বলছিলে বৌদিদি?

মন্দা সুহাসের মুখে একটা হাত চাপা দিয়ে বললে—আর বৌদি' নয়—খবর্দার! আজ থেকে আমাদের নূতন সম্বন্ধ হ'লো। আমি তোমাকে দিদি বলবো—কারণ, তুমি হ'চ্ছ আমার বড় বোন্ শুধু বয়সেই বড় নও, স্বামীর হৃদয়-দ্বারে করাঘাত করেছো তুমি আমারও আগে! কাজেই—আমি তোমার ছোট বোন্—তুমি আমাকে আজ থেকে নাম ধরে ডাকবে কেমন?—

ঈষৎ ম্লান হেসে সুহাস বললে—তোমার এই সদিচ্ছার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বৌদি, চিত্তের ঐশ্বর্যেও তুমি যে কারুর চেয়েই হীন নও, তোমাদের কাছ থেকে জন্মের মতো চলে যাবার আগে এ কথা জানতে পেরে আনন্দ আমার ধরছে না। ভগবানের কাছে কায়মনে প্রার্থনা করি তুমি সুখী হও, তোমার মনের এই মহানুভবতা যেন চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে—

এতক্ষণে সুহাসের দুই চোখ জলে ভরে উঠলো।

মন্দা সুহাস সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়ে উঠলো। ব্যাকুল হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—'জন্মের মতো চলে যাচ্ছি' মানে কি দিদি? তুমি কি আত্মহত্যা করবে নাকি?

—পাগল হ'য়েছো বোন্? এই সব অমানুষের কদর্য্য মনের কুৎসা কুরুচিকে গ্রাহ্য করবার মতো দীনতা তোমাদের সুহাসের মধ্যে এতটুকু নেই জেনো। দু'টি অনাত্মীয় স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যে নির্দ্দোষ বন্ধুত্ব স্থাপিত হ'তে পারে—এ যারা ধারণাই করতে পারে না—যে কোনও সম্পর্কীয় বা নিঃসম্পর্কীয় নরনারীর মধ্যে এতটুকু সৌহার্দ্দ্য সম্প্রীতি বা অন্তরঙ্গতা দেখলে—যারা ব্যভিচারের দুঃস্বপ্নে একেবারে আঁৎকে ওঠে—সেই সব পশুপ্রকৃতির নীচ দুর্ব্বল নির্ব্বোধ

লোকগুলোর শোচনীয় মানসিক অবস্থা দেখে আমি তাদের কথায় রাগ করতেও ঘৃণা বোধ করি!

সুহাসের প্রতি সম্ভ্রমে মন্দার চিত্ত পূর্ণ হ'য়ে উঠলো। সপ্রশংস দৃষ্টিতে সে তার মুখের পানে চেয়ে স্নেহগদ্গদ কণ্ঠে বললে—তবে কেন আমাদের কাছ থেকে তুমি জন্মের মতো চলে যাবে ব'লছো?—

—আমি আর এদেশে থাকবো না স্থির করেছি বৌদি'। এদের এই হাস্যকর ব্যাপারের জন্য নয় বোন্—তার অনেক আগে থেকেই আমি এ সঙ্কল্প করে রেখেছিলুম। এদের এই কলঙ্কের ডঙ্কা শুধু এইটুকুই বলে দিলে—'দিন আগত ওই!'—এই বলতে বলতে—সুহাসের দু'টি রাঙা পেলব অধরপুট অতি মধুর প্রসন্ন হাস্যে রঞ্জিত হ'য়ে উঠলো।

মন্দা জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় যাবে মনে করেছো?—

—সেটা এখনও কিছু স্থির করে উঠবার সময় পাইনি ভাই! তোমরা যে একেবারে অকস্মাৎ এ কুলটাকে নির্ব্বাসনের 'নোটিশ' জারি করলে কি না!

বলেই সুহাস আবার একবার স্নিগ্ধহাস্যে সহাস্য-মুখ হ'য়ে উঠলো।

মন্দা ভারী গলায় বললে—আচ্ছা বেশ ত'—যে ক'দিন না সেটা স্থির হয়, তুমি চলোনা কেন আমার কাছে থাকবে—

মন্দা ঘাড় নেড়ে বললে—উহুঁ! সে আর কিছুতে হবে না বৌদি। তোমাদের এই বহুকেলে পচা পুরোণো জরাজীর্ণ ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের অস্বাস্থ্যকর দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে আর আমি গিয়ে ঢুকবোনা ভাই। তোমরা এই যে আজ আমাকে বর্জ্জন করলে এ আমার দণ্ড নয় বোন্—এ আমার মুক্তি! অধঃপতিত নির্ব্বীর্য্য জাতির পঙ্কিল মনের গড়া এই নীচ বিধি-নিষেধপূর্ণ সমাজটাকে মেনে মেনে আমি এতদিন আমার মনুষ্যত্বকে আমার বুদ্ধিকে আমার আত্মাকে অপমান করছিলুম। সঙ্কীর্ণ মনের যে সব ক্ষুদ্রতা ঈশ্বরের প্রতিনিধি এই বিরাট মানুষকে শুধু ছোট আর হীন করে ফেলে—মিথ্যে ধর্ম্ম-ভয়ে তারই যূপকাষ্ঠে মাথা রেখে প্রতিদিন নিজেকে বলি না দিয়ে—আমি স্বাধীন সাম্রাজ্যের বলিষ্ঠ নীতির স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে নবজন্ম লাভ করে শক্তিশালিনী হ'তে চাই, সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর-শীলা হ'য়ে আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রতে চাই—

মন্দা এবার একটু যেন ক্ষুণ্ণ হ'য়ে বললে—অর্থাৎ তুমি জীবনকে উপভোগ ক'রতে চাও শুধু যথেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে বন্ধনমুক্ত থেকে!—বিবাহ করে স্বামী-পুত্র নিয়ে সংসারের শান্তিপূর্ণ আশ্রমে তোমার নারীত্বকে মাতৃত্বের গৌরবে সার্থক ও সুন্দর ক'রে তুলতে চাও না?

—ওই তো তোমরা মস্ত ভুল করো ভাই। যুগ-যুগান্ত ধ'রে পরাধীনতার দাসত্ব করে তোমরা স্বাধীনতার রূপটি পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়েছো—তাই ওর নাম শুনলেই তোমরা আজ যথেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার বীভৎস আকৃতি ছাড়া ওর শিব-সুন্দর সত্য মূর্ত্তিটি ধ্যানেও আনতে পারো না। কিন্তু, সে কথা যাক্—আমাদের নারীত্বকে মাতৃত্বের গৌরবে সার্থক ক'রে তুলবার সুযোগ কি তোমাদের এই থুত্থুরো বুড়ো সমাজটি দিতে চেয়েছে কোনও দিন? এরা তো আমাদের 'আদর্শ হিন্দু-বিধবা' সাজিয়ে—জীবনের সর্ব্ব আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে রেখে—আমাদের এ দুর্লভ মানব জন্মকে একেবারে ব্যর্থ ও আমাদের নারীত্বকে সম্পূর্ণ নিষ্ফল করে রেখেছে! অসহায় স্ত্রীলোকদের উপর এত-বড় নৃশংস অত্যাচার—এমন কঠিন নিষ্ঠুর শাস্তি আর কোনও দেশের কোনও সমাজে কি আছে? চীনের মেয়েরা যেমন আগে শিশুকাল থেকেই লোহার জুতো পায়ে এঁটে পা' আর বাড়তে না দিয়ে ছোট পায়ে'র গর্ব্ব ক'রতো—তোমরাও তেমনি ধর্ম্মের গিল্‌টি করা লোহার ছাঁচে পুরে আষ্টে-পৃষ্ঠে নিষ্পেষিত আমাদের মানব-আত্মাকে হত্যা করে তোমাদের হিন্দু-বিধবাদের দেবীত্বের গর্ব্ব করো—

অধীর হ'য়ে মন্দা বললে—তুই তো বিধবা-বিবাহের পক্ষ-পাতি—সু'—তবে কেন তুই নিজে বিবাহ ক'রে সুখী হ'তে চাইছিসনি ভাই? ছেলেবেলা থেকে যাকে তুই প্রাণের অধিক ভালোবেসে এসেছিস বোন্, আমি আজ তার সঙ্গেই তোর বিবাহ দিয়ে তোর এই ব্যর্থ জীবনটিকে সার্থক ও সুন্দর ক'রে তুলতে চাই।

গম্ভীর ভাবে সুহাস বললে—'বিবাহ' জিনিসটাকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি বউদি', সমাজহিতের জন্য ও-অনুষ্ঠানটির প্রয়োজন আছে বলে আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু বিধবাই বলো—সধবাই বলো—আর বয়স্থা কুমারীই বলো,—বিবাহ যেখানে শুধু তাদের একটা গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হিসাবে—অর্থাৎ কেবলমাত্র জীবনধারণের একটা সদুপায়

বলে গণ্য হয়—শুক পাখী-পড়ার মতো কেবল কতকগুলো মন্ত্র পড়ার আল্‌গা বাঁধন ছাড়া—নিবিড় প্রেমের সুদৃঢ় বন্ধনে যেখানে দুটি হৃদয় যুক্ত হয়না—সে বিবাহকে আমি সিদ্ধ বলে মনে করিনি। আমার কাছে প্রেমের দাবী প্রেমহীন বিবাহের চেয়ে অনেক বড়।

মন্দা মৃদু হেসে বল্‌লে—বেশ ত তুমি তোমার সেই দাবী নিয়েই তোমার প্রেমের ঠাকুরের ঘর করবে চলোনা ভাই—এমন ক'রে ভেসে বেড়ানোটা কি ভালো? লক্ষীটি, আমার কথা শোন—

—আমার অবহেলায় ফেলে আসা ধন আজ আর একজন পেয়ে ধনী হয়েছে দেখে প্রত্যর্পণের দাবী নিয়ে তার দ্বারে গিয়ে দাঁড়াবার মতো নির্লজ্জতা আর যার থাকে থাক্—তোমাদের সুহাসের যেন কখন তা না হয় বৌদি, এই আশীর্ব্বাদ করো।

মন্দার মুখখানা সহসা বিবর্ণ হ'য়ে গেল! কিন্তু পলকের মধ্যে সে আত্মসম্বরণ করে নিয়ে বললে—কিন্তু, তোমার ধন তো তোমারই আছে বোন্—আর একজন ত শুধু তার ভারবাহী হ'য়ে আছে বইত' নয়। তবে তা গ্রহণে তোমার বাধা কি?—

—তোমার কথাই যদি সত্য হয় বৌদি তবে সেই ত আমার পরম পাওয়া! সংসারের এই তুচ্ছ দেনা পাওনার চেয়ে সে যে অনেক বড় ভাই! প্রেমের নিবিড় আশ্লেষে অন্তরের মধ্যে যাকে এমন একান্ত ভাবে পাওয়া যায়, বাইরের স্থূল পাওয়ার প্রলোভনে এই দৈনন্দিন জীবনের সহস্র খুঁটি-নাটির মধ্যে আমি তাকে হারিয়ে ফেলতে চাইনি!

—তোর কথা আমি এইবার বুঝতে পেরেছি সুহাস। তুই তোর অসামান্যতার উচ্চশিখরে ব'সে—আদর্শের পায়ে আত্মবলি দিতে চাস্। আমরা সামান্য প্রাণী অতখানি মহত্ব আয়ত্ত করা তো দূরের কথা—ধারণাই করতে পারিনি—

মন্দার কণ্ঠস্বরে ঈষৎ একটু ব্যঙ্গের আভাস পেয়ে ব্যথিত চিত্তে সুহাস বললে—বৌদি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করতে পারবেনা এ আমি জানি. আর, সেই কারণেই আমি নীরবে বিদায় নেবার জন্যই প্রস্তুত হচ্ছিলুম—কিন্তু তুমি এসে এমন একটা অসম্ভব প্রস্তাব ক'রে বসলে যে, তোমার সে মহানুভবতায় আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলুমনা! তাই কতকগুলো প্রগল্‌ভতা ক'রে ফেললুম। কিছু মনে কোরো না, ভাই। তুমি শুধু না হয় এই কথাটা মনে করেই আমাকে মার্জ্জনা কোরো বোন্—যে, জীবনের প্রথম প্রভাতে তরুণ উষার অরুণচ্ছটায় দীপ্ত ভানুর মতো যে সুন্দর অতিথিটি আমার মন্দির-দ্বার হ'তে বিমুখ হ'য়ে ফিরে গেছে—আজ এই অবেলায় আসন্ন সন্ধ্যার ম্রিয়মান অন্ধকারে—তাকে আর তেমন ক'রে ফিরে পাওয়া যাবেনা জেনেই সুহাস তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে মূঢ়তার পরিচয় দিতে রাজি হলোনা—

ছি ছি—ঠাকুরঝী! না, না—তোমাকে এতটা ছোট মনে করবার মতো নির্ব্বোধ আমি নই—কিন্তু সে কথা থাক্—এখন উপস্থিত তুমি কোথায় যাচ্ছো বলো—যে ক'দিন না তোমার দেশান্তরে যাওয়ার কিছু ঠিক হয়, সে কদিন কোথায় থাকবে—না জানতে পারলে আমি ত' নিশ্চিন্ত হ'য়ে কাজল-গাঁয়ে ফিরতে পারবোনা—ভাই।

—এখন আমি যাচ্ছি আমার এক সমদুঃখভাগিনী সইয়ের কাছে, কারণ একমাত্র সে ছাড়া আর কেউ এ কলঙ্কিনীকে গাঁয়ের মধ্যে আজ ঠাঁই দিতে পারবেনা—তার পর সেখান থেকে শীঘ্রই অন্য কোথাও চলে যাবো।

—এ সইটি তোমার কে—জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

—তাকে কি তুমি চিনবে?—সে আমারই মতো একটি নিরপরাধিনী নির্য্যাতিতা মেয়ে!—প্রেমের মর্য্যাদা রাখবার জন্য হাসিমুখে সব ত্যাগ করে চলে এসেছে—!

—মাথা কিনেছেন!—সেই ছুঁড়ীই বুঝি তোমার কাণে বিষমন্ত্র দিয়েছে—

—ছিঃ বৌদি! আর পাঁচজনের মতো তুমিও তার সম্বন্ধে অমন ক'রে অশ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বোলোনা। যদি সময় হয় কখনও তবে তার কথা সমস্ত আমি তোমাকে জানাবো—শুনলে তুমিই তখন হয় ত বলবে—সে তোমাদের সীতার চেয়েও সতী—সাবিত্রীর চেয়েও পুণ্যবতী।

—আচ্ছা, বেশ, চলো তোমার সেই সীতা-সাবিত্রীর কাছেই তোমায় আমি নামিয়ে দিয়ে যাই—উনি গাড়ী নিয়ে অনেকক্ষণ থেকে তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রছেন—

সুহাস এ প্রস্তাবে আর কোনও আপত্তি করতে পারলে না। তার জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নিয়ে মন্দার সঙ্গে গিয়ে গাড়ীতে উঠলো।

গাড়ী যখন খানিকটা দূর এগিয়ে গেছে গৌরমোহন

ছুটতে ছুটতে এসে গাড়ীর মধ্যে কি একটা কাগজের মোড়ক ফেলে দিয়ে গেল।

মন্দা কৌতূহলী হ'য়ে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে খুলে দেখলে যে তার মধ্যে দশ খানা দশ টাকার নোট ভাঁজ করা রয়েছে। নিঃশব্দে সে নোটের তাড়াটা সুহাসের হাতে তুলে দিলে।

সুহাস সেটা নিয়ে সত্যেনের হাতে তুলে দিয়ে বললে—দাদা, ওদের ধন্যবাদ জানিয়ে তুমি এ টাকাটা ফেরত পাঠিয়ে দিও।

সত্যেন অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললে—কিন্তু, রাখলে বোধ হয় ভালো ক'রতে, তোমার হয়ত প্রয়োজন হ'তে পারে।

সুহাস হেসে উঠে বললে—তা যদি হয়, তাহ'লে তোমার কাছেই না হয় চেয়ে নেবো দাদা—ওদের ঋণ আর আমি বাড়াতে চাইনি—

সত্যেন এবার অধিকতর গম্ভীর কণ্ঠে বললে—এতদিন যে মুখ ফুটে কখনও কিছু চাইতে সাহস করেনি, সে কি তার সে ভীরুতা পরিহার করতে পারবে?

-কিন্তু এমন দুর্দ্দিন তো আমার আর কখনও হয়নি দাদা। তুমি যে আমার দুর্দ্দিনের বন্ধু।

সত্যেন এর উত্তরে আর কিছু বললে না। গাড়ী চলতে লাগলো। তিনটি আরোহীই গাড়ীর ভিতরে স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইল। হয় ত একই ভাবনার অতল সাগরে তিন জনেরই চিত্ত নিমজ্জিত হ'য়ে পড়েছিল।

সুহাসের সই অলকা যেখানে থাকে, সে জায়গাটাকে বলে চাঁপাদীঘি।

গাড়ী দীঘির পাড়ে এসে পৌঁছলো। প্রকাণ্ড সরোবর। কাকচক্ষুর মতো স্বচ্ছ জল কাণায়-কাণায় টলমল ক'রছে। তীরে অসংখ্য পুষ্পিত চাঁপার গাছ বহুদূর পর্য্যন্ত তাদের উগ্র সৌরভ বিকীর্ণ করছে। অজস্র ফুল ঝরে ঝরে দীঘির জলে পড়ে ভাসছে! সেই তীব্র সুগন্ধের মোহে দীঘির জলও যেন চম্পকসুবাসিত বলে মনে হয়। সুহাস এইবার তার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস টেনে চাঁপার মদির-সুরভি যেন আকণ্ঠ পান করে বললে—আঃ! ওই যে সইয়ের বাড়ী এইবার দেখা যাচ্ছে—ওই সবচেয়ে বড় চাঁপা গাছটার পাশে—ঝরঝরে তকতকে পরিষ্কার—ছবির মতো ছোট কুঁড়েখানি—

মন্দা যেন চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলে—সত্যিই কি তবে তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে না?

সত্যেন বললে—এখনও ভালো ক'রে ভেবে দেখো সুহাস, অবশ্য তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর ক'রে আমি তোমায় নিয়ে যেতে চাইনি, কিন্তু—

একটু ম্লান হেসে সুহাস বললে—দাদা, তোমার আশ্রয়ই যে আমার সবচেয়ে বড় আশ্রয় সে কি আমি জানিনি? কিন্তু তোমার কাছে স্বীকার করতে তো' লজ্জা নেই—যেতে আমার আর—সাহস হয়না ভাই। মনে কোরনা যেন যে তোমার ওই শান্ত সংযত সমাহিত চিত্তকে বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলবার স্পর্দ্ধা রেখে আমি এ কথা বলছি—আমার নিজের উপর আমি বিশ্বাস হারিয়েছি—তাই তোমার কাছ থেকে এ দুর্দ্দিনেও যদি দূরে থাকতে চাই, আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো।

গাড়ী এসে অলকার বাড়ীর সামনে দাঁড়ালো।

সত্যেন ও মন্দাকে প্রণাম ক'রে তাদের পায়ের ধুলো নিয়ে সুহাস গাড়ী থেকে নেমে অলকার কুটীর-দ্বারে গিয়ে ডাকলে—সই!

(ক্রমশঃ)

বর্ষ-বিদায়

শ্রীভোলানাথ ৫

হায়,
জানি না কোথায়
কালের অনন্ত স্রোতে ভাসি,'
সাথে লয়ে বসন্তের ঝরা পুষ্প রাশি
চলিয়াছ ওগো 'মধু', কোন প্রিয়তম গেহ পানে,
কাহার বরণ লাগি বর্ষের বর্ণ, গন্ধ, গানে
—পরাগ-পুটিত পর্ণপুট পূর্ণ করি'—
বিদায়ের গান গাও ? মরি !
ফুরালো কি কাজ
আজ ?

কহ
কি বেদনা বহ,
কাহার বিরহে মায়াবিনী ?
বেদনায়, করুণায় ভরা গো পাষাণী,
জগতের পুঞ্জীভূত পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখরাশি
বক্ষে তুলি' নিঃশব্দে চলেছ কোথা, মুখে মৃদু হাসি
মূর্ত্তিমতী কৃচ্ছ্রলব্ধ সাংস্কৃতা সম ?
কে সে বঁধু ?—মিনতি এ মম—
কোথা চলো ? বলো !
বলো !!

দেরী
নাই ; শুনি'—ভেরী
—তাপদগ্ধ বৈশাখের,—বাজে
প্রদীপ্ত দীপক রাগে, অগ্নিসেনা সাজে
সম্মুখে তোমার, হেরি'—তাতাইয়া আকাশ, বাতাস
জ্বালাইতে অর্ঘ্য তব, কামনার উত্তপ্ত নিশ্বাস
ছড়াইতে দিকে দিকে ; চল বিরহিণী
অভিসারে।—গোপনচারিণী,
চলা অভিনব
তব !

তব
কৃচ্ছ্র অভিনব !
মহাযোগী নীলকণ্ঠ সম
পান কর বিশ্ব-হলাহল, চিত্তে মম
বেদনার পূজা তবু পরাজয় মানে চিরদিন ;
বেদনায় মুহ্যমান, অপমানে হোয়ে থাকি হীন ;
ভালো, সেই ভালো ! ব্যথা দিতে ভোলো নাই
ওগো তাই চিনি তোমা',—তাই
ব্যথা স্বর্ণময়
হয়

জানি,
পূর্ণ পাত্রখানি,
ষড়ঋতু-রসে, যাও রাখি' ।
নিদাঘের তপ্ত দেহ বরষণে ঢাকি',
শরতের আগমনী-বাঁশী হেমন্তের হৈম মন্ত্রে
স্বপ্নময় করি', শীতের কুহেলী-ধূম্র-জাল-তন্ত্রে
পূর্ণ করি' বসন্তের সোনার স্বপন,
বেদনা ও আনন্দ-স্পন্দন
রাখো পাত্র ভরি' ;
মরি !

জ্বালো
স্মৃতিদীপ আলো ;
নব বরষের আগমনী—
গানে যেন নাহি ভুলি গো অমরা-রাণী
বিদায়ের ধ্যানমগ্ন মধুরিমা, অশ্রু ও উৎসবে
চিরদিন ভালোবাসি, স্মৃতি চুমি, বলি কম্প্র স্তবে
স্নেহসম বেদনার নিস্যান্দনী ধারা
ঢেলো কবি হবে আত্মহারা
দুর্লভ সে দানে
গানে

হিয়া
উঠে চমকিয়া
বাতাসের নিশ্বাসে নিশ্বাসে
বিদায়ের করুণ ক্রন্দন-সুর ভাসে ;
আত্মরত কল্পনার বিপুল গৌরব পড়ে লুটি'
সে সঙ্গীতে, মিলনের স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাব যায় টুটি',
অকস্মাৎ হেরি'—চলিয়াছ মায়া লোকে
কল্প-লোক ঘিরি' শুধু থাকে
সে-গানের শেষ
রেশ

অয়ি
স্বর্ণ-স্বপ্নময়ী !
ষড় ঋতু-গন্ধ, বর্ণ, রাগে
সাজিয়াছ মনোহর, অঙ্গে তব জাগে
বেদনা ও আনন্দের দীপ্তিময়ী বর্ণ-অলিম্পন !
অনন্তের অস্তাচলে পাতিয়াছ বিদায়-আসন
হেরি,' মধু-সংক্রান্তির রুদ্র নিশীথিনী,
বিদায় ব্যাকুল-বিরহিণী
মৌন, নির্নিমেষ !
শেষ

প্রথম

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

অবস্থা এককালে ভালই ছিল।

কিন্তু ও-জিনিষটা চিরকাল সমান যায় না। তাই একদিন ভাঙ্গন ধরল।

বড় ভাই স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বর্ম্মায় গেলেন চাকরি করতে; মেজ ভাই পশ্চিম জেলার কোনো এক স্ত্রীলোক নিয়ে ঘরকন্না পেতে বসল; কেবল, একা এবং অসহায় রয়ে গেল ছোট ভাই অবিনাশ। বিষয়পত্র বেচে যা কিছু মিলেচে, তা তিন জনে সমান ভাবেই ভাগ করে নিয়েচে। কিন্তু তাতে কতদিন চলে?

অবিনাশ ভাবনায় পড়ল। কি করবে—?

লেখাপড়া শেখেনি; শেখায়ওনি কেউ। না শিখুক, আহার-তৃষ্ণার অনুভূতি তার জন্যে এতটুকু কমেনি। কিন্তু, উপায় কি? অবশেষে উপায় মিলল; কিন্তু সেটা সদুপায় নয়। হাওড়ার একটা আড্ডায় নাম লেখাতে হ'ল।

রোস্তম খাঁ ওস্তাদ লোক। ভিড়ের মধ্যে কেমন করে পকেটে হাত চালাতে হয়, রাত্রে রিক্স-ওলা সেজে কেমন করে ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশ করতে হয়, ঐ সব সে দ্বিতীয় ভাগের গল্পের মত অবিনাশকে অতি সহজে বুঝিয়ে দিলে। শ্রদ্ধা-আপ্লুত চিত্তে সে রোস্তমকে গুরুর আসন দিয়ে বসল।

কে বলে পৃথিবীতে অন্নের অভাব, মানুষ না খেয়ে মরে—? অবিনাশ ভাবলে, এমন সোজা পথ থাকতে তারা ভিক্ষাই বা করে কেন, আর উপবাসে মরেই বা কেন?

বলা বাহুল্য, এ পথটাকে সে দূষনীয় মনে করে নি। মনে করলে হয় ত পা দিত না। কিন্তু মন নিয়ে কারবার করার অবসর তখন ছিল না। আর রোস্তম স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েচে, এই ঠিক পথ। ওদের আছে, আমাদের নেই। ওরা সহজে দেয় না, তাই জোর করে নিই, লুকিয়ে নিই। অন্যায় এতে নেই।

কদিন গেল। যেন ভাল লাগে না! কি বিশ্রী এখানকার আবহাওয়া, জঘন্য আলাপ, দুর্গন্ধ আলোচনা! অবিনাশের মন বিষিয়ে ওঠে, হাঁপিয়ে। মাকড়সার মত একদিন সে নিজেই নিজের চারিধারে এই বেড়াজাল রচনা করেচে, কিন্তু, হঠাৎ ওর মন এখান থেকে ছুটির জন্য লালায়িত হয়ে উঠ্‌ল।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন নিজেদের বাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। নতুন মানুষ এসেচে, নতুন মালিক। অবিনাশের দিকে কেউ চায় না, চেনেও না। চোখের কোল শুকনোই থাকে, বুকের মধ্যে একটা উদাস ভাবনা নিয়ে আড্ডায় ফেরে। অবিনাশের সমস্ত চিত্ত এখানকার কুশ্রী কদর্য্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ওঠে!

ও-পাশের ঘরে রোস্তম একটা মেয়েকে নিয়ে গজল জুড়েচে, একটা ডেক্‌চি উপুড় করে' করেচে তবলা। চন্দননগরের জলও ক' বোতল এসেচে বুঝি।

অবিনাশের কাণে সঙ্গীত সরস্বতীর আর্ত্তনাদ বেশ প্রবল ভাবেই এসে পৌঁছয়, কিন্তু ওর মন আজ এখানে নেই। চোখ বুঁজে ও ছুটেচে—রেঙ্গুন-যাত্রী জাহাজের পিছু পিছু বড়দার উদ্দেশে!

অদেখা, অপরিচিত সমুদ্রকে ওর গঙ্গার মত সঙ্কীর্ণ মনে হ'ল। ভাবলে, সাঁতরে হয় ত পার হয়ে যাবে; কিন্তু তখনই এল অভিমান। যে তাকে এমনি করে ফেলে গেল সম্পূর্ণ সহায়-হীনতার মাঝে, তারি কাছে যাবে সে অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে?

ছিঃ!

এমনি দ্বন্দ্বের মধ্যে গেল কত দিন। তার পর বেরিয়ে এল বেড়া-জাল ছিঁড়ে।

সেই অপরিচিত জনতার স্রোত, কিন্তু কারুর গাঁটের দিকে লুব্ধ দৃষ্টি স্থির করে রাখবার প্রয়োজন নেই; আর নেই খালি হাতে বাসায় ফিরে রোস্তমের তিরস্কারের ভয়।

পথের স্মৃতি

শিল্পী—শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

ফুটপাত বটে, কিন্তু দায়িত্ব-হীনতায় কোমল, বন্ধুর বুকের মত মধুর! মাথার উপর, মুখের উপর—আদিহীন আকাশ আর পাণ্ডুজ্যোতি তারা দল!

অবিনাশ যে মরে নি, এ কথা সে অনেক দিন পরে আবার বুঝতে পারে। কিন্তু চলে কি করে? অসদুপায় সে আর অবলম্বন করবে না; কিন্তু উপায়ের সোজা এবং সৎ-পথই বা খোলা কই! সঙ্গে যা ছিল তাও যে ফুরিয়ে এল!

অনেক ভেবে-চিন্তে পা-দুটোকে সম্বল করে চলতে সুরু করে দিলে—উত্তর-পূবের হিসেব না করেই। রৌদ্র-দগ্ধ আকাশের তলায়, জনহীন মাঠের বুকে, ছায়া ঢাকা পল্লীর পথে—নদীর পারে—যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াল!

চারিদিকে কি বিপুল আহ্বান!

বৈশাখের দু'পহরে রাখালের বাঁশরীতে কি ব্যাকুল কান্না! ইচ্ছে হয়, এমনি মাঠে মাঠেই কাটিয়ে দেয়। কিন্তু হাওয়ায় পেট ভরে না, তাই······

গ্রামের জমীদারের বাড়ী এসে আশ্রয় নিল। কিন্তু শান্তি কই? সমস্ত অন্তরাত্মা ওর শুধু কি দু' মুঠো ভাতের জন্যেই কেঁদে বেড়াচ্ছে? তা' ত নয়। এখানেও সেই রোস্তমের আড্ডার পুনরভিনয়। এখানেও রাত্রের অন্ধকারে সেই বিশ্রী হল্লা, মদের ছড়াছড়ি! কেবল মেয়েগুলো ওখানকার মত কুশ্রী নয়, ঘরগুলোও অমন বুক-চাপা নয়! কিন্তু এই কি সব—?

তাই আবার পালাতে হ'ল। দেউড়ীর দরওয়ান হরগোবিন্ বিশ্বাস করে' ছ' মাসের তন্‌খার টাকা ওরই কাছে রেখেছিল;—সেগুলি সমেত। মন যে একেবারেই সঙ্কুচিত হয়নি, তাও না, কিন্তু টাকা ওর চাই, কারণ যেতে হ'বে। হরগোবিনের আছে, ওর নেই; সে দেবে না কেন? অবিনাশ প্রথমে ধারই চেয়েছিল, সে দিতে স্বীকার হয় নি। এ তারি প্রতিশোধ।

আবার যাত্রা সুরু হ'ল। এবার আর প্রকাশ্য পথে দিনের আলোয় নয়, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে।

আকাশকে ঠিক আগের মতই দেখাল—তেমনি নীল, বিপুল! কিন্তু সে নীলিমা ওর মনকে আর স্নিগ্ধ করতে পারলে না। সমস্ত আকাশ যেন অবিনাশের অন্তরের মত··· নীচতায়, শঠতায় লীন হয়ে গেছে!

* * * *

অনেক দিন গেছে তার পর। গল্পের ভূমিকা শেষ হয়েচে।

মাঘ মাস শেষ হয়ে এল। বাতাসে একটা দুষ্টুমীর আভাস পাওয়া গেছে এবং আকাশের নীল যেন হঠাৎ আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে। পশ্চিমের একটা ছোট সহর এবং তারি মাঝামাঝি ছোটখাট বাড়ী একখানি। বাড়ীর বাসিন্দে সবে দুটী মাত্র লোক; একটি পুরুষ, অপরটি নারী। সোজা কথায় স্বামী-স্ত্রী।

এদের দু'জনের বয়সের মাঝখানে ফাঁক আছে অনেক-খানি, কিন্তু এর জন্যে এতকাল কেউ কিছুমাত্র অসুবিধা বোধ করে নি। ছোট বাড়ীখানি ঘিরে ছোট-বড় পাহাড়ের ঢেউ, মাঝে মাঝে শস্যে ভরা সমতল মাঠ! কবিতা লেখার উপকরণ প্রচুর, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর কেউই আজ অবধি ওই ব্যাধিটাকে বরদাস্ত করতে পারেন নি। তবু দিন কেটে গেছে।

বঙ্কিম আগে বাংলাতেই ছিলেন। কর্ম্ম-সূত্রে এই জায়গাটায় এসে পড়েচেন এবং সেই সঙ্গে সেরে এসেচেন দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের ভয়াবহ কাজটি। বঙ্কিমের স্বগ্রামের লোকগুলি আধুনিক প্রথানুসারে দ্বিতীয়-পক্ষ গ্রহণের প্রস্তাব শুনেই তাঁর বনে যাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। একদিন একটা উড়ো চিঠিও এসেছিল। 'রাত্রে পথে বাহির হইবেন না, হইলেও সাবধানে পথ চলিবেন। প্রতিপক্ষ লাঠিতে প্রচুর সর্ষপ তৈল মাখাইয়া রাখিয়াছে। বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম, তাহাদের লক্ষ্যস্থল আপনার শিরো-দেশের কেশ-বিরল অংশ!'

এ উৎপাত সত্বেও বঙ্কিম বিয়ে করেছিলেন। নব-বধূকে বাড়ী এনে বলেছিলেন, বুড়ো হয়েচি এ কথাটা অস্বীকার করি নে, কিন্তু তাই বলে তোমায় ভালবাসতেও যে পারব না, এ কথাও স্বীকার করি নে। অনু, আমি হ'লাম সেই দলের যাদের শুধু মাথার চুলের আর দাঁতেরই বয়স হয়, মনের নয়। আচ্ছা, তোমার কি বিশ্বাস, আমি তোমায় ভালবাসতে পারি না—?

অনু ছেলেমানুষটি ছিল না। হাসি গোপন করে বলেছিলো, পারো।

—আর তুমি? তুমি মনের দুঃখে বাংলা মাসিকের শরণ নেবে না ত? সত্যি করে বলো

অনু সত্যি করেই বলেছিল, না।

তার পর দু'বচর গেছে। স্বামীর সঙ্গে অনু বাঙ্গলা ছেড়ে এসেচে। সংসারে তারা দুটীমাত্র প্রাণী—অবকাশ ওদের সর্ব্বক্ষণ। কিন্তু এই অবকাশের মধ্যে অবসাদের ছায়া পড়েনি আজও। সংসারের কাজ সেরে অনু স্বামীর পাশটিতে এসে বসে।

বঙ্কিম হিসাবের খাতার প্রতি অখণ্ড মনোযোগ রেখে চীৎকার করে ওঠেন, দূরমপসর।

ভয় পেয়ে অনু বলে, কেন? কি করলুম?

কি কর্লে?

বঙ্কিম চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে, হাত পা ছড়িয়ে, অভিনয়ের ভঙ্গীমায় বলেন, কি কর্লে? তুমি কি জানবে অনুশীলে, তুমি কি করেচো? তুমি আমার দিবসের নিদ্রা, রাত্রির বিশ্রাম, হিসেবের অঙ্ক হরণ করেচো, আমার পঞ্চাশ বছর থেকে পঁচিশটে বচর হঠাৎ চুরি করে নিয়েচো। তুমি কি জানবে রোহিণী……না, না, অনুশীলে, তুমি কি জানবে! জিজ্ঞাসা করো, তোমার আঠারো বছরকে, তোমার……

হাত যোড় করে অনুশীলা বলে, অপরাধ হয়েছে, থামো। আর কখখনো জিজ্ঞাসা করবো না।

তা হ'বে না। তুমি আবার জিজ্ঞাসা করো, আমি বলি। বলতে বলতে আবার হিসেব ভুল করি এবং তার শাস্তি স্বরূপ তোমার কাছ থেকে……

—একটি মুষ্টাঘাত লাভ করো।

বলেই, অনুশীলা ঘর ছেড়ে পালায়। কারণ, দাঁড়িয়ে থাকলেই বঙ্কিম মুষ্টি-আঘাতের জন্য পীঠ বাড়িয়ে দেবেন।

এমনি হাস্য-কোলাহলে ওদের প্রচুর অবকাশ মাধুর্য্যে ভরে ওঠে। যৌবন-প্রান্তবর্ত্তী এই মানুষটীর মধ্যে প্রাণের এতখানি প্রাচুর্য্যে অনুশীলার মন গর্ব্বে ভরে ওঠে।

কিন্তু এ গেল পূর্ব্বকথা। উপস্থিত বর্ত্তমানে ফেরা যাক।

পূর্ব্বেই বলেচি এই সময়টায় এদেশের হাওয়ায় একটা ছেলেমানুষীর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল। এই সময়ই একদিন পুরোদস্তর বাবুর পোষাকে বছর পঁচিশ বয়সের একটি ছেলে এসে দাঁড়ালো বঙ্কিমের দুয়োরে।

বঙ্কিম বললেন, কি চান্—? বাঙ্গালী—?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি আপনার নাতি।

বঙ্কিম বল্লেন, মিথ্যে কথা। আমার এখন নাতি হ'বার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

আজ্ঞে তা' জানি আমি আপনার দৌহিত্র।

অর্থাৎ মেয়ের ছেলে। কিন্তু তুমি যে গোড়াগুড়িই ভুল করচ বাবাজী। আমার ছেলেমেয়ে কিছুই নেই। এখানে হ'বে না, অন্যত্র চেষ্টা করে দেখগে।

আপনার কাছেই এসেচি। আপনিই ত' কেষ্টনগরের বঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—?

—তাতেই কি প্রমাণ হয় তুমি আমার দৌহিত্র? তা হয় না। যাও।

আমি আপনার ভগ্নীপতির নাতি।

অর্থাৎ, অর্থাৎ আমার বোনের,—শৈলর। তোমার—নাম অভিলাষ—?

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র—

আর 'শ্রী'তে দরকার নেই। ভিতরে এস। অবিনাশই বটে!

বঙ্কিম অবিনাশকে সঙ্গে করে ভিতরে নিয়ে এলেন। অবিনাশ ক্ষুধাতুর জানোয়ারের মত চারিদিকে চাইতে লাগল! এই বাড়ীঘর, সাধারণ বিছানাপত্র, আসবাব… সব যেন তার কাছে অভূতপূর্ব্ব, অদ্ভুত!

বঙ্কিম অনুকে ডাক দিলেন। অনু বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে। সামনেই অপরিচিত এক বাঙ্গালীকে দেখে বিস্মিত হ'ল যতখানি, লজ্জাও পেলে ঠিক ততটাই। এঁটো হাতেই কাপড়খানা মাথায় তোলবার উপক্রম করছিলো, বঙ্কিম বললেন, ইটি,—আমার নাতি—তোমারও লজ্জার আবশ্যক নেই। এঁর আদর-আপ্যায়নের ভার তোমার হাতে দিয়ে আমি আপিস চললাম। এঁর পিতৃদত্ত নাম অবিনাশ, কিন্তু পরিচয় আছে আরও অনেক। সে সব তোমায় সময়ান্তরে বলব।

অনুশীলা বহুক্ষণ একটি কথাও বলতে পারল না। পরিচয় যা' শোনা গেল তাতে লজ্জা করা চলে না এবং এ কথাও ঠিক যে লজ্জা করলে চলবে না। কারণ এ' বাড়ীর সে একাই সব। হঠাৎ ওর মন খুসীতে ভরে উঠ্‌ল, তাদের স্বামী-স্ত্রীর বাইরেও যে পৃথিবীতে আরো কেউ, আরো কিছু আছে বা থাকতে পারে, এইটাই যেন তা'র আজকের আবিষ্কার! এতদিন সে স্বামীর সেবাই করেচে, আজ অন্য একটি লোক তার কাছে আত্মীয়তার দাবীতে এসে পড়েচে, তাকে সে বিমুখ করে কি করে—?

অনুশীলা নিজেকে প্রস্তুত করে ফেল্লে।

বললে, অমন আশ্চর্য্য হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকলে ত' চলবে না ভাই, হাত-পা ধোবে এস।

অবিনাশ চমকে উঠ্‌ল।......তাই ত, এমন বোকার মত সে দাঁড়িয়ে ছিল কেন? যেন হঠাৎ একটা চৌমাথায় এসে পথ হারিয়ে ফেলেছিল!

অপরাধীর মত মাথা নীচু করে অনুশীলার সঙ্গে সঙ্গে গেল এবং নিঃশব্দে তার আদেশগুলি পালন করলে। অনুশীলা তাকে রান্নাঘরে নিয়ে গেল। কাঠের উনান, দাউ দাউ করে জ্বলচে। আশে পাশে থালা বাটি, তরিতরকারি! অবিনাশ যেন কতকাল এ' সব দেখেনি, তাই দু' চোখ দিয়ে গিলতে লাগল।

কাছেই আসন পেতে অনুশীলা ঠাঁই করে দিলে। ছেলেটি চুপ করে আছে দেখে নিজেই বললে, তোমার আমার সম্পর্ক মুখ বুজে থাকার নয়, সঙ্কোচ ছেড়ে খেতে বসো।

অবিনাশ ঘাড় হেঁট করে খেতে বসলো।

অনুশীলা বললে, কোথায় তোমার দেশ, কি তুমি করো --কিছুই জানি না ভাই, কিন্তু আপনার মানুষ দেখলে চেনা যায়। তোমরা কোথায় থাক'?

অবিনাশ বলতে গেল, কলকাতায়। তখনই ভাবলে, কলকাতা সে অনেক দিন ছেড়েচে। কিন্তু তাতে কি? এমন মিথ্যা সে ত' রোজ একশবার বলে। তবে?

কি জানি! কিন্তু অবিনাশ পারলে না, অদূরের ওই মেয়েটির দিকে চেয়ে ওর মুখের মিথ্যে সগৌরবে মাথা হেঁট করলে। বললে, কোথায় থাকি তা' জানি না।

অনুশীলা বিশ্বাস করতে পারে না। কোথায় কখন্ থাকে জানে না—এমন লোকের সঙ্গে তার পরিচয় নেই। বিস্মিতের মত অবিনাশের দিকে চেয়ে রইল। অবিনাশ বললে, বিশ্বাস করা আপনার পক্ষে শক্ত হ'বে। কিন্তু দাদামশা'য় বোধ করি আমার কথা কিছু কিছু জানেন, সময়ান্তরে আপনাকে বলবেনও। অনুশীলা বুঝতে পারে না। বোকার মত বসে থাকে। শুধু মনে হয়, ছেলেটী অদ্ভুত! আরও অদ্ভুত ওর খাওয়া! যেন কতকাল অন্নের সঙ্গে পরিচয় নেই। ভাবলে ওর সব কথাটুকু এখনই জেনে নেয়, কিন্তু পাছে ব্যথা পায়, তাই নিঃশব্দেই বসে রইল।

সমস্ত দিন অবিনাশ ঘরের মধ্যেই বসে কাটালে। বিকেলের দিকে অনুশীলা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই জিজ্ঞাসা করলে, এখানে দেখবার জিনিষ ঢের, কিন্তু তুমি ত' একবারও বেরুলে না—?

অবিনাশ হাসলে। বললে, এতকাল এত বেড়িয়ে বেড়িয়েছি যে আর না বেরুলেও চলে। কিন্তু সেইটেই প্রধান কারণ নয়; বেরুইনি কারণ, তাতে বিপদ আছে।

বিস্ময়ে অনুশীলা কেঁপে উঠ্‌ল।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কিসের বিপদ?

অবিনাশ বললে, নিজের মুখে বলবার ইচ্ছে নেই। আজকের দিনটি আমার সমস্ত অতীতের সঙ্গে এমনই খাপছাড়া যে তার কথা তুলে এর মাধুর্য্যটুকু নষ্ট করতে সাহস হয় না। দাদামশায় এলে শুনবেন। খপরের কাগজে আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই বেরিয়েছে।

অনুশীলা আর কিছু জিজ্ঞাসা করলে না। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সংসারের বাকি কটা কাজ সেরে ফেলতে। কিন্তু সমস্ত কাজের মধ্যেও তার মন ঘুরে বেড়াল এই ছেলেটীর অজানা অতীতের উদ্দেশে।

কি সে?

অবিনাশ চুপ করে বসে থাকে। গোধূলির পড়ন্ত আলোয় দূর পাহাড়ের মাথাগুলি মুকুটের মত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে—অবিনাশকে ডাকে! কিন্তু বেরুবার পথ বন্ধ। বিছানায় বসে বসে বাড়ীর অটুট প্রশান্তিটুকু কৃপণের মত উপভোগ করে! কেমন স্বচ্ছন্দ অথচ কেমন সহজ! এতটুকু চীৎকার নেই, ব্যস্ততা নেই!... ..

এই শান্তি ও শৃঙ্খলা থেকে ও কত বিচ্ছিন্ন, কত একলা! তবু মনে মনে এর জন্য অজানা একজনের উদ্দেশে ও ধন্যবাদ জানায়।—যে তাকে একটি দিনের জন্য এই লোভনীয় শান্তি আর চমৎকার বিশ্রামের সুযোগ দিয়েছে!

রাতও কাটে;—চিন্তা ও উদ্বেগহীন—প্রথম রাত!

পরদিন।

বঙ্কিম আপিস যাওয়ার পর অনুশীলা বললে, সমস্ত শুনলাম। কিন্তু এ সব কি সত্যি? আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না।

অবিনাশ বললে, শুনলে হয়ত' হাসবেন, কিন্তু আমারও ইচ্ছে নয় যে বিশ্বাস করি। আমি নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে যাই যে আমিই এতবড় নাটকের কর্ত্তা! কিন্তু, মানুষের ইচ্ছার দাম প্রদীপের ক্ষীণ শিখাটির চেয়েও অল্প। এই দিনের আলোর মধ্যেও আমরা অন্ধকারে চলেচি, দয়াহীন নিয়তি হাত ধরে নিয়ে চলেচে। তাই ইচ্ছে না থাকলেও আমি বিশ্বাস করি যে এর মধ্যে এতটুকু মিথ্যে নেই।

অবিনাশের সব কথা অনুশীলা বোঝে না, কিন্তু ভারি ভাল লাগে ওর কথাগুলি। হঠাৎ চোখে জল এসে পড়ে।

অবিনাশ সেটুকু লক্ষ্য করে। ওর সমস্ত অন্তরাত্মা চীৎকার করে ওঠে, এ কি! এ কি!

বললে, আমার জন্যে কেউ কখনো কাঁদে নি। কেউ যে কাঁদে এও পছন্দ করি নে। মিছিমিছি মন খারাপ করবেন না।

অনুশীলা কাছে সরে এল। বন্ধুর মত অকৃত্রিম কৌতূহল দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার সমস্ত কথা জানতে চাই, বলো।

অবিনাশ বললে, সমস্ত কথাই ত' শুনেচেন।

না, সেই সব নয়। খপরের কাগজ আর পুলিশের ওয়ারেণ্ট শুধু বাইরের খপরই দেয়, কিন্তু সেটুকুই যে মানুষের সব এই কি তুমি বিশ্বাস করতে বলো?

তা বলি না। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে আমার এমনি অশ্রদ্ধা জন্মে গেছে যে সে সম্বন্ধে কোনো কথাই বলতে ইচ্ছে হয় না। তবু আপনাকে বলব।

অনুশীলা আকুল আগ্রহে অবিনাশের দিকে চেয়ে রইল।

—চুরি জিনিষটাকে একদিন সব চেয়ে ঘেন্না করতাম। তবু একদিন চুরি করলাম—এইটেই আশ্চর্য্য! এক দারওয়ানের গোটা পঞ্চাশেক টাকা নিয়ে পালিয়েছিলাম; সেইখান থেকে এর সুরু। টাকা কটা নিয়ে ভাবলাম, এতেই যেন চিরকাল কেটে যাবে! কিন্তু তা কাটলো না, কাটেও না। টাকা জিনিষটা বুনো পাখীর মত উড়তে জানে। অতি কষ্টে কলকাতায় পৌঁছলাম। একদিন এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা, এক সঙ্গে এককালে ইস্কুলে যেতাম। কিছু করচি না শুনে বললে, একটা দোকান করেচি টাইপ রাইটারের, কাজ করিস ত' চ'। তৈরি ছিলাম, আপত্তি করি নি! দিনকতক নিরুপদ্রবেই গেল। হঠাৎ একদিন খেয়াল হ'ল, একটা টাইপরাইটার লুকিয়ে বিক্রী করতে পারলে কিছু টাকা হয়। এই টাকাটা দিয়ে ভদ্রভাবে যা হয় করা যেতে পারে। তখনই ভাবলাম, না, বন্ধুর কাছে চেয়ে নেব টাকা। পরে ফেরৎ দেব। বললাম বন্ধুকে; কিন্তু সে রাজী হ'ল না। তার পর—একদিন একটা মাথায় করে সরে পড়লাম। দামী জিনিষ, মাত্র একশোটা টাকায় ছেড়ে দিয়ে—বোম্বাইয়ের টিকিট কাটলাম। টাকাগুলো নষ্ট করিনি, সেখানে গিয়ে মোটর হাঁকানো শিখলাম। লাইসেন্স বেরুল। কিন্তু কে জানতো যে সেই সঙ্গে গ্রেপ্তারি পরওয়ানাও বেরুবে! একদিন শুনলাম, খোঁজ হ'চ্চে। সেই দিনই বেরিয়ে পড়লাম পাঞ্জাবের দিকে। নাম ভাঁড়িয়ে নতুন লাইসেন্স করলাম। কিন্তু তা'তেও নিস্তার নেই, বন্ধুর উৎকণ্ঠা আমার পেছু পেছু লাহোরেও ছুটল। আবার চলতে সুরু করলাম। কিন্তু এবার হেঁটে। টাকা যা ছিল তা' পোষাকের জন্যে রাখলাম, কারণ সন্দেহ এড়াতে গেলে ওটা চাইই। হাঁটতে হাঁটতেই এখানে এসে পৌঁছলাম। শুনলাম, বাঙ্গালী এখানে একজনের বেশী নেই, যিনি আছেন তাঁর নাম, বঙ্কিম। হঠাৎ এই নামের একটি দূরাত্মীয়কে মনে পড়ল, এসে দেখলাম তিনিই বটে।

অনুশীলা যেন কথা বলা ভুলে গেছে! মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে রইল।

অবিনাশ আবার বললে, একবার একটা বদমায়েসের আড্ডায় ঢুকেছিলাম। সে আমায় শিখিয়েছিল, চুরি বলে সত্যিকার অপরাধ কিছু নেই। কথাটা স্বীকার করতে পারিনি বলেই তাদের দল ছেড়ে একদিন বেরিয়ে এসে

ছিলাম। তবু, আবার কেন চুরি করলাম—এইটেই বোধ হয় আপনার কাছে আশ্চর্য্য ঠেকচে। আমি নিজেও ভেবেচি, সত্যিই এটা কেমন করে হোল। উত্তরও যে পাইনি এমন নয়। কিন্তু সে আর বলবার ইচ্ছে নেই। নিজের অপরাধের গুরুত্ব লাঘব করবার জন্যে কোনো কৈফিয়ৎ খাড়া করতে আমার লজ্জা করে।

অনুশীলা বললে, লজ্জা করুক, আমায় বলতে হ'বে।

অবিনাশ তার মনের মধ্যে চমকে উঠলে! অনুশীলার কণ্ঠস্বরে কি স্বতঃস্ফূর্ত্ত দাবী!

বললে, আপনার কথা অবহেলা করবার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু কৈফিয়ৎটা অদ্ভুত কিছু নয়, অনেক দিনের পুরোনো। ইচ্ছেয় হোক আর অনিচ্ছেয় হ'ক, একবার মন্দের মধ্যে গিয়ে পড়লে তার প্রভাব কাটাতে একটু দেরী লাগে। একদিন, হাওড়ার আড্ডার রোস্তম যে বিষ আমার মনের মধ্যে ঢেলে দিয়েছিল, আজও তা' সুধা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু ভয় হ'চ্চে, সেদিন যেন সুদূর নয়।

—কেমন করে হ'বে? অনুশীলা সুধায়।

—আপনার সকল জিজ্ঞাসার উত্তর আমি দেব না। আমি নিজেই জানিনা সে কেমন করে হ'বে। তবু···কিন্তু, সে কথা থাক্।

একটি সপ্তাহ কেটেছে।

এর মধ্যে কাল কোথায় আশ্রয় নিতে হ'বে, কেমন করে দু'মুঠো অন্ন মুখে তোলা যাবে,—এ' সব প্রশ্ন একটি-বারের জন্যও অবিনাশের চিন্তারাজ্যে উৎপাত সুরু করেনি। পরিপূর্ণ সাতটি দিন ও রাত্রি কেটে গেছে অনুশীলার সামনে বসে গল্প করে, আর ঘুমিয়ে। ওই যে একদিন রোস্তমের আড্ডায় গাঁঠকাটার বৃত্তি অবলম্বন করেছিল, ও'রি গতি লক্ষ্য করে যে পুলিশের ওয়ারেণ্ট দেশদেশান্তরে ছুটচে—এ কথা অবিনাশ ভুলেই গেছে;—এই অপরূপ দিন ও রাত্রি কটি—সে তার মনের খাতায় সোণার অক্ষরে লিখে রাখবে।

সেদিন সন্ধ্যের পর বঙ্কিম আপিস থেকে ফিরলেন অপ্রসন্ন গম্ভীরমুখে। স্বামীর মুখের প্রত্যেকটি ভঙ্গিমা অনুশীলার পরিচিত, কিন্তু এ রূপ সে ইতিপূর্ব্বে দেখেই নি!

ভয়ে ভয়ে কাছে গিয়ে জিগ্‌গেস করলে, কি হয়েচে? আজ ফিরতে এত দেরী হ'ল যে?

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বঙ্কিম বললেন, অবিনাশকে বোধ হয় এখানে রাখা চলল না।

ভয়ে, বেদনায় অনুশীলার দু'চোখ জলে ভেসে গেল!

কেন? কেন?

ওর পিছনে পুলিশের ওয়ারেণ্ট আছে সে কথা তোমায় বলিনি?—সেই ওয়ারেণ্ট ওর সঙ্গে সঙ্গে এখানে এসে পৌঁছেচে!

সে কি!···কি হ'বে?—

কিছু হ'বে না। খোঁজ পেলে বেঁধে নিয়ে যাবে। যাও, এ' খবর হতভাগাকে জানিয়ে দিয়ে এস।

আমি বলতে পারব না। তুমি যাও।

বঙ্কিম নিজেই গেলেন।

বললেন, তোমার ওয়ারেণ্ট এখানেও এসেছে। তুমি আজই অন্য কোথাও যাবার ব্যবস্থা করো, নইলে ধরা পড়বার সম্ভাবনা।

অবিনাশ চোখ তুলতে পারলে না। মাথা হেঁট করে দ্বারাপার্শ্ববর্ত্তিনী অনুশীলার পায়ের দিকে চেয়ে রইল!

বঙ্কিম বললেন, ভেবে লাভ নেই। এখনই মনস্থির করে ফেল। তোমায় আশ্রয় দিয়ে বুড়োবয়সে আমি নিজেকে পর্য্যন্ত বিব্রত করতে চাই না।

বঙ্কিম চলে গেলেন।

অবিনাশ আর অনুশীলা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল! দুই'জনে যেন হঠাৎ বোবা হয়ে গেছে! অবিনাশ জানালার মধ্যে দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে—গাঢ় অন্ধকার!—পলায়নের কোনো অসুবিধে নেই। এলো-মেলো বাতাস বইচে।

কিন্তু, কোথায়?—

এতকাল সে উদ্দেশ্যহীন হয়েই পথে পথে ঘুরেচে, রাত্রির অন্ধকার তার পথ-চলাকে বাধা দিতে পারে নি। কিন্তু, আজ বাইরের ওই প্রগাঢ় অন্ধকারের দিকে চেয়ে ওর ভয় হয়!—ওই সীমাহীন অন্ধকার থেকে এই স্নেহ-লোক, কত দূর, কত বিচ্ছিন্ন!

অনুশীলার পায়ের নীচে মাথা নীচু করে বললে, হঠাৎ এসেছিলাম আবার হঠাৎই যেতে হ'ল। আবার কোনো দিন এ' পথে আসব কি না কে জানে, কিন্তু যেতে আমার এতটুকু ইচ্ছে নেই এ' কথা কে শুনবে!

অনুশীলা কেঁদে ফেললে। অবিনাশের মাথায় হাত রেখে জিগ্‌গেস করলে, কি করলে তোমার যাওয়া বন্ধ হয় তাই বলো, আমি তাই করবো।

জানোয়ারের মত পালিয়ে বেড়াতে আমার ভাল লাগে না, কিন্তু তার জন্যে পুলিশের ওয়ারেণ্ট নিরস্ত হয় না। সে চায় টাকা। দাদামশায় সেই টাইপরাইটারটার দাম আর খরচখরচা মিটিয়ে দিলেই হয় ত আমার যাওয়া বন্ধ হয়, কিন্তু সে অনুরোধ করবার সাহস আমার নেই!—ইচ্ছেও হয় না।

অনুশীলার মুখখানি প্রভাত-পদ্মের মত হেসে উঠল। বললে, আমি নিজে ওঁকে বলব।—কেন তুমি এমনি পালিয়ে বেড়াবে!

অবিনাশ আর ভাবতে পারে না। মূর্চ্ছাগ্রস্তের মত শুয়ে পড়ে। এও না কি তারি অদৃষ্ট!

কিন্তু টাকায় হয় না এমন জিনিষই নেই। অবিনাশেরও তাই যাওয়া হয় না।

অনুশীলার চোখের জলের বিরুদ্ধে বঙ্কিম কোনো প্রতিবাদই খাড়া করেন নি, নিঃশব্দে সমস্ত টাকা মিটিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে অনুকে জিজ্ঞাস করেছিলেন, নবেল-টবেল পড়তে সুরু করো নি ত' নতুন বৌ?—

কেন বল তো?—অনু জিজ্ঞাসা করেছিল।

কেন? অয়ি মূঢ়ে, তোমার এই অনুরোধটা যে অত্যন্ত আধুনিক ধরণের নভেলী কাজ এও কি বুঝতে পারো নি!

বটে! সন্দেহ ক'রো না কি!

তার আগে নিজেকে পাগল বলে সন্দেহ করতে হ'বে যে!

অবিনাশের মাথা থেকে ভাবনার পাহাড় নেমে গেল। কিন্তু, অনুশীলার নিষ্কলুষ মুখখানির দিকে চাইলেই দু'চোখ ওর জলে ভরে যায়।

এতখানি অযাচিত উৎকণ্ঠা ও অকুণ্ঠ সহানুভূতি তাকে আর কে দিয়েছে?

উদার আকাশের তলায় আর একবার ও নির্ভয়ে, নিরুদ্বেগে বেড়িয়ে নেয়, সন্ধ্যার আকাশে তারাগুলির সঙ্গে যেন নতুন করে চেনাচিনি হয়! যে তাকে এই ভাবনাহীন মুহূর্ত্তগুলি দিয়ে নিশ্চিন্ত করেচে, সে ঈশ্বর নয়,—নারী, এইটুকুই বারবার লোভীর মত উপভোগ করে।

অনুশীলা বলে, এতকাল এত বেড়িয়েছ, যে, আর না বেরুলেও চলে, কি বলো?—জীবনের ত' এখনো অনেক-খানিই বাকি, কিন্তু আবার কোনোদিন বাইরে থেকে ডাক আসবে না ত?

উত্তর দিতে অবিনাশের সাহস হয় না। চুপ করে থাকে।

অনুশীলা বলে, উনি বলছিলেন কলকাতায় ফিরে গিয়ে একটা কাজকর্ম্মের চেষ্টা করো। আমি বললাম, তা হ'বে না। অবিনাশ ছেলেমানুষ, কলকাতায় ওর আপনার লোকই বা কে আছে! তার চেয়ে এইখানেই একটা দেখে দাও—

খুসী আর গর্ব্বে অবিনাশের বুক ভরে ওঠে। ইচ্ছে করে ছেলেমানুষের মত অকারণেই একবার দিগ্বিদিকে ছুটে আসে।

অনুশীলা জিজ্ঞাসা করে, কেমন, রাজী ত'?—

একটা নূতন আশঙ্কা অবিনাশের বুক জুড়ে বসে। কেন এই উৎকণ্ঠা, এতখানি স্নেহ?...মনে মনে এগুলি সে উপভোগ করে, উত্তর দেবার সাহস হয় না।

আরও ক'দিন গেল!—

কিন্তু, অবিনাশের মনে অশান্তি ছেয়ে গেছে। অনুশীলার এই একান্ত শুভেচ্ছাগুলি কিছুতেই সে সহজ এবং কারণহীন বলে ভাবতে পারে না। ওর অন্ধকার মনের গুহায় যে আলোর স্পর্শটুকু অনুশীলার কাছ থেকেই এসে পৌঁছেচে, তারি মৃদু উত্তাপে সেখানে এক ক্ষুধাতুর জানোয়ার ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠে! যে সেবা, যে শুভ-কামনা, যে প্রীতি অনুশীলা তাকে দিয়েছে, তা'র বড় এবং বেশী কিছুর জন্য অবিনাশের সমস্ত মন হঠাৎ লালায়িত হয়ে ওঠে!

অবিনাশ নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে যায়, এ' আবার কি সুর! এর হাত থেকে কেমন করে সে নিষ্কৃতি পাবে?

এ' ক্ষুধা তার মনের মধ্যে এত অকস্মাৎ কে জাগিয়ে দিলে?

অনুশীলার ছায়াহীন নিষ্কলুষ মুখখানির প্রতি চাইবার সাহস তার হয় না, তার চরণের ছন্দে, দেহের ভঙ্গিমায় অবিনাশের চিত্ত-সিন্ধু হাজার ঢেউয়ে ভেঙ্গে পড়ে।

অবিনাশ নিজেকেই ধিক্কার দেয়।

মানুষ কি পশুর চেয়েও নীচে ?—

সে দিন মাঝ রাতে ঘুম ভেঙ্গে অনুশীলা দেখলে অবিনাশের ঘরের দোর খোলা—

অবিনাশ নেই!

ব্যাকুল হয়ে অনুশীলা বঙ্কিমের ঘুম ভাঙ্গালে। তা'র কথা শুনে বঙ্কিম উঠে বসলেন।

বললেন, পালিয়েচে। সমস্ত ঘরগুলো একবার ভাল করে খুঁজে দেখ. কিছু নিয়ে গিয়ে থাকে ত' পুলিশে 'ডাইরি' করতে হ'বে।

অনুশীলা কথা কইলে না। পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল।

বঙ্কিম নিজেই উপর-নীচে ঘুরে এলেন। একটি জিনিষও খোয়া যায়নি!

বললেন, আশ্চর্য্য, একটি জিনিষও না নিয়ে—

অনুশীলা নিষ্পলক চোখে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল। একদিন পুলিশের ভয়েও যে এই স্নেহনীড় ছাড়বার সাহস করেনি, আজই বা সে এমনি অকস্মাৎ কিসের আহ্বানে অন্ধকার অচেনা পথে পা বাড়ালে কে' জানে!

এই অন্ধতল, বন্ধুর পথ ধ'রে অবিনাশ এতক্ষণ কত দূরে, কোথায় চলেচে, চোখ বুজে অনুশীলা তাই ভাববার চেষ্টা করে।

বহুরূপী

শ্রীকল্যাণী দেবী

ওগো বহুরূপী শিখাও মানবে
তুমি কত ভাবে আছ এই ভবে,
স্নেহ প্রীতি চির-কল্যাণকামী—মানবের জ্ঞানব্যপি
চির চাওয়া মাঝে চির পাওয়া তুমি—যুগে যুগে বহুরূপী।
শৈশবে য'বে ছিনু অসহায়,
একান্তই য'বে ছিনু নিরুপায়,
কাহার যতনে গঠিত হইল অতি সুকোমল দেহ,
সে যে গো তোমার অতুল্য অপার অসীম মাতৃ-স্নেহ॥
যৌবন যবে ধীরে ধীরে আসে
কাহার পরশে হৃদয় বিকাশে,
কাহার সোহাগ আদরে আবেশে রাঙ্গিয়া উঠে এ প্রাণ,
ভাদ্রের ভরা নদী মাঝে সে যে ভেসে যাওয়া সারি-গান॥
সে যে গো তোমার প্রেমের মুরতি,
আমারে ঘেরিয়া করে রে আরতি,
মাধুরী আমার উঠে গো ফুটিয়া সারা দেহ মনে আপনি,
তব পরশনে এ জীবন-বীণে বাজে নব নব রাগিণী॥
মাতৃত্বে যবে ভ'রে উঠে প্রাণ
শুনি ভাষাহীন অমরার গান,
কাহার কোমল দেহখানি লয়ে বক্ষে ধরিয়া চুমি,
দেখি চেয়ে চেয়ে ওগো বহুরূপী সন্তানের রূপে তুমি॥
মাতা হে আমার বঁধু হে আমার
হে মোর বুকের নিধি।
আমি তুমিময় তোমাতেই লয়
হইবে সকলি বিধি॥

চীন

শ্রীভারতকুমার বসু

পৃথিবীর ইতিহাসে যতগুলি দেশ আছে,—বৈচিত্র্য ও বিশেষত্বের দিক দিয়ে চীন হচ্ছে তাদের মধ্যে একটী।···

শোনা যায় না কি যে, কোন লোক যদি একাদিক্রমে তিরিশ বছর চীনদেশে বাস করেন, তা হ'লেও তিনি চীনবাসীদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে এতটুকু জানতে পারবেন না।—এমনি অদ্ভুত এখানকার লোকদের প্রকৃতি!···কিন্তু সকলের চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যদি কোন বাইরেকার লোক এখানে খাঁটী চীনভাষায় নির্ভুলভাবে কথা কয়, তা হ'লে বিস্মিত ঈর্ষায় দলে দলে চীনবাসী তাকে ঘিরে দাঁড়াবে আর ব'লবে, "কী আশ্চর্য্য! এই বর্ব্বরটা অবিকল ভাবে আমাদের ভাষায় কথা কইছে কি ক'রে!"···

এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা আকাশের গ্রহ-সংখ্যার এক-চতুর্থাংশের সমান। এখানকার লোকেরা অল্পাধিক ৬০টী জাতিতে বিভক্ত। তারা ঠিক ততগুলি বিভিন্ন ভাষায় কথা কয়, যতগুলি এখানে আছে সহর এবং গ্রাম!··· বসবাস করবার জন্য তারা যা-জায়গা দখল ক'রে আছে, তা আয়তনে ইয়োরোপের চেয়েও বড়!

চীনদেশে প্রথম সভ্যতা আসে—খৃষ্ট জন্মাবার এক হাজার বছর আগে। কিন্তু এখনো পর্য্যন্ত সেখানকার এই সভ্যতা—জেরুজেলমের শাসনকর্ত্তা ডেভিডের সময়কার সংস্কার ও রীতির বাঁধন সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যেতে পারেনি!

১৯১২ সালে প্রজাতন্ত্র-শাসনের প্রতিষ্ঠার সময়ে সেখানে একটা নূতন নিয়ম প্রচার করা হয়। তাতে সেই সনাতন সভ্যতা আধুনিক জগতের ধারায় পরিমার্জ্জিত হয়! পূর্ব্বে বে-আইনিভাবে যে গ্রেপ্তার করা হ'তো, এবং পরিচিত ব্যক্তির প্রতি সম্মান দেখাবার জন্য মাথা থেকে টুপী খোলার অপরাধে লোকেরা যে কারারুদ্ধ হ'তো, উক্ত নিয়ম প্রচারের পর সে সব বন্ধ হ'য়ে যায়! চীনদেশের এখন একটা আইন-ই হচ্ছে এই যে, সেখানকার মেয়েরা মাথা থেকে টুপী তুলতে পারবে না! কিন্তু আশ্চর্য্য, চীন-রমণীরা যেখানে টুপীই ব্যবহার করে না, সেখানে এ আইন কেন?···

লোকে সাধারণতঃ চীন ব'লতে যা বোঝে, আসল চীন ঠিক তা নয়! বিদেশী শক্তির প্রভাবে ক্ষুণ্ণ এবং চুক্তিতে আবদ্ধ চীন-রাজ্যের বিশিষ্ট একটু অংশের চারিদিকে যে প্রচুর জমী ও গ্রাম ছড়িয়ে আছে, সেই-ই হচ্ছে প্রকৃত চীন!

সেখানকার লোকেরা একপরিবারভুক্ত হ'য়ে বাস করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাদের সম্বন্ধে কোন সূক্ষ্মবুদ্ধিমান লোক পরিপূর্ণ এবং সন্তোষজনক অভিজ্ঞতা আনতে পারেন না! তার একমাত্র কারণ হচ্ছে—তাদের দৈনিক জীবনের একান্ত বিচিত্রতা! যেহেতু, উত্তর-চীনে যে-ব্যাপারটী সত্য ব'লে সম্ভবপর হয়, দক্ষিণ-চীনে তা হয় একেবারে মিথ্যা! এমন কি, পূর্ব্বচীনবাসীরা পশ্চিমচীনবাসীদের রীতিনীতি পর্য্যন্তই জানে না!···

তাদের চিন্তা ও ধারণা আমাদের সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না! কিন্তু তা হ'লেও, সমস্ত পৃথিবীর কাছে তারা হচ্ছে সম্ভ্রম ও আদর্শের স্থল! আজ এই জাতীয় জাগরণের দিনে তাদের কাছে শেখবার জিনিষ প্রত্যেক লোকেরই যে আছে প্রচুর!···

পিতৃপুরুষের পূজা আর সন্তান-স্নেহ,—এই দুটী জিনিষ হচ্ছে চীনবাসীদের আসল ধর্ম্ম; আর তা তাদের জাতীয় ও সামাজিক জীবনের মর্ম্মস্থল!··তাদের কর্ত্তব্যই হচ্ছে,—কি চিন্তায়, কি কাজে, জীবিত পিতামাতাকে, অথবা মৃত পিতামাতার আত্মাকে পূজা করা। তার পর পিতৃপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধার নিবেদন জানানো! এই কর্ত্তব্য-পালনের ধারাবাহিকতায় তারাও তা হ'লে,—জীবিতাবস্থায় অথবা মৃত্যুর পর,—ভক্তির অর্ঘ্যে সম্মানিত হবে!···তাদের ধারণা যে, তাদের পিতৃপুরুষদের আত্মার পূজা না ক'রলে, তাদের অভিশপ্ত হতে হবে। এইজন্য উক্ত আত্মাদের প্রতি প্রত্যেক কাজে

অবসরেই খাদ্য নিবেদন করা হয়, আর বিশেষ যত্ন দেখানো হয়। যে সমস্ত গরীব আত্মার কোন জীবিত বংশধর থাকে না,—একটী জাতীয় বার্ষিক চাঁদায় তাদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়।

সেখানকার কোন লোকই নিজের ধর্ম্ম ত্যাগ করবার কল্পনা পর্য্যন্ত ক'রতে পারবে না; কারণ, তা হ'লে তাকে, এ জন্মে ত বটেই, পর জন্মেও—অপমান ও দুঃখের বোঝা

একটী উচ্চ বংশের সম্ভ্রান্তা মহিলা। এঁর পোষাকের আড়ম্বর লক্ষ্য করবার জিনিষ।

ম ায় নিয়ে ফিরতে হবে!...সেখানকার লোকরা বহুদেব-ব া। তারা অগ্নি, বায়ু, বরুণ ইত্যাদি দেবতার পূজা ক ার থাকে। ছোট্ট একটী কথা—'ফেংশুই'তে তাদের ে র পরিচয় দিতে পারা যায়। 'ফেংশুই'—এই কথাটী ে ব একটী অমানুষিক শক্তির বিষয় জানায়, যা অবিলম্বেই ি ও ক'রতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে,

চীন দেশের বাড়ীগুলি হচ্ছে সাধারণতঃ খুব নীচু আর একঘেয়ে! কিন্তু আজ পর্য্যন্তও কেউ কি সেখানে বাড়ী উঁচু ক'রে তৈরী ক'রতে পেরেছেন?—না, তা পারেন নি। কারণ, সেখানকার লোকদের ধারণা যে, ওইরকম ক'রলে আকাশের আত্মারা ক্রুদ্ধ হ'য়ে তাদের ওপর অত্যাচার সুরু ক'রবে!...ঠিক এইরকম সেখানকার ছোটখাটো সেতু তৈরী

আট বৎসর বয়স হ'তে এই রমণীর পা দুটীকে এক নিষ্ঠুর প্রথামত নির্ম্মমভাবে বেঁধে রাখা হ'য়েছে, যাতে তা বাড়তে পারবে না, আর, যাতে তার তনু-সৌন্দর্য্যের বিশেষত্ব ফুটে উঠবে।

হয় আঁকাবাঁকা ভাবে; আর ঘরের ছাঁচি হয় ওপরমুখো। কারণ, চীনবাসীদের ধারণা যে, মন্দ প্রেতাত্মারা সরল পথেই খুব দ্রুত যাতায়াত ক'রতে পারে। কিন্তু বাঁকা রাস্তা হচ্ছে তাদের চলার পক্ষে একান্ত অন্তরায়!...এই সমস্ত বাড়ী ও সেতু তৈরীর ব্যাপারে পাওয়া যায় খাঁটী চীনদেশের ছাপ!...

চীনা ভিক্ষুক। চীনদেশে এদের সংখ্যা এত বেশী যে, তাদের ব্যবসা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যবসাগুলির অন্যতম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের এক একটী ক'রে সর্দারও আছে।

সম্ভ্রান্ত বুদ্ধ-উপাসক। কিন্তু এঁরা অত্যন্ত অর্থ-লোলুপ ও নৈতিক চরিত্রহীন।

প্রসিদ্ধ চীন দার্শনিক কনফুসিয়াসের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম হচ্ছে চীনদেশের একটী প্রধান নৈতিক শক্তি। এই ধর্ম্ম প্রত্যেক চীনবাসীর কাছে অবশ্য-পালনীয় এবং তা তাদের কাছে তাদের অন্য ধর্ম্মের চেয়েও অনেক বড় ব'লে গণ্য হয়! চীনদেশের মঙ্গলের জন্য প্রায় দুহাজার বছর ধ'রে অনেক সাধু সেখানে এই ধর্ম্মের আদর্শ শিক্ষা দিয়ে এসেছেন লোকদের কাছে! এই ধর্ম্মের সার বস্তু হচ্ছে এই—বিচার এবং ন্যায়-চিন্তা নিশ্চয়ই শক্তিকে জয় ক'রবে!

এই আদর্শকে অনুসরণ ক'রেছে ব'লেই আজ চীন সমস্ত জগতের সামনে একটী বিরাট জাতিরূপে দাঁড়াতে পেরেছে!
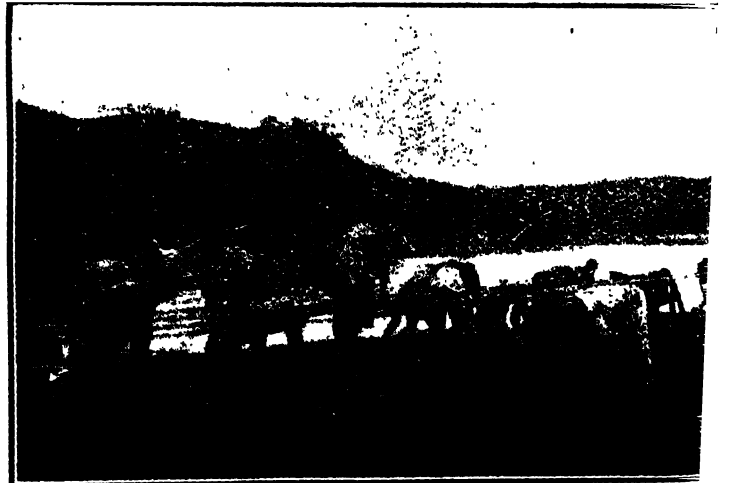
চীনা কুলীরা 'ইয়ানসী'-নদীর খরস্রোতের মধ্যে ভারী একটী জাহাজ দড়ির সাহায্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে! তাতে তারা মোটেই কষ্ট অনুভব ক'রছে

একজন বৌদ্ধ পুরোহিত। এঁর মাথার আবরণের নীচে চোখ দুটী হচ্ছে দৃঢ়তাব্যঞ্জক এবং গুটানো হাত দুটী ও গম্ভীর মুখ হচ্ছে দৃঢ় সঙ্কল্পের পরিচায়ক।

এই মেয়েরা পরিপাটী ক'রে নিজেদের কেশ-সজ্জা ক'রেও সন্তুষ্ট হয়নি। সেইজন্য তারা মাথায় চাপিয়েছে রাশিকৃত রংচঙে পশম। এতেই না কি তাদের সৌন্দর্য্য বেশী খোলে।

১৯১২ সালে কন্‌ফুসিয়াস্‌ প্রবর্ত্তিত এই ধর্ম্মের লোপ হয়। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত চীনদেশে স্কুল ইত্যাদির বার্ষিক জন্ম-দিবসোৎসবে এই ধর্ম্ম অনুযায়ী পূজার অনুষ্ঠান হয়।...

বৌদ্ধধর্ম্ম হচ্ছে চীনবাসীদের একটা নামমাত্র ধর্ম্ম। 'তেওস্ত' ধর্ম্মও (Taoism) তাই। এই দুই ধর্ম্ম সেখানকার লোকদের ওপর একটুও প্রভাব বিস্তার ক'রতে পারেনি—যদিও এই ধর্ম্মের সূত্রে সেখানে অনেক অনুষ্ঠানাদি হ'য়ে থাকে।...বৌদ্ধধর্ম্মের সার বস্তু —সেই দান ও সহানুভূতির চীনবাসীরা সমর্থন করে, কারণ তারা হচ্ছে, শান্তি প্রিয় জাতি।...যাই হোক, 'তেওস্ত' ধর্ম্ম এখন অনেকটা চীনদেশে জেগে উঠছে। তবে এটা কতকটা যাদুবিদ্যা শ্রেণীর অন্তর্ভূত!
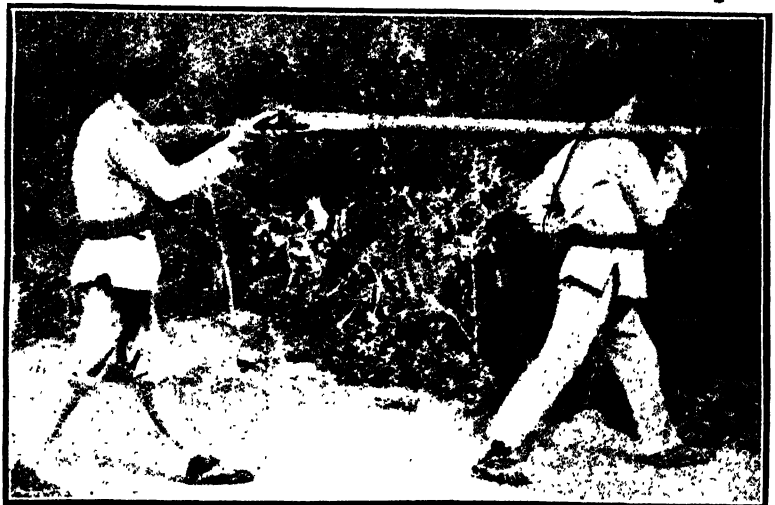
অদ্ভুত বন্দুক। এটীকে ব'হে নিয়ে যাবার জন্য দুটী লোকের দরকার হয়। আক্রমণের দিক দিয়ে এটী তত দামী হোক্ বা না-ই হোক, কৌতূহল জাগাবার বিষয়ে এটীর দাম আছে প্রচুর।

মধ্যাহ্ন-ভোজন।

সেখানে প্রায় ১০০০০০০০ গুলি চীন-বাসী হচ্ছে মুসলমান। আগে সেখানে গভর্ণমেণ্ট অফিসে কাজ নেবার জন্য একজন মুসলমান চীনবাসীর কোন বাধাই ছিল না। কিন্তু ১৯১২ সালে এই রকম প্রচার করা হয় যে, উক্ত কাজ কেবল পাবে ক্রিশ্চানরা। তার ফলে, ১৯২০ সালে চীনদেশে পাওয়া গিয়েছিল ২০০০০০০টী নেটিভ রোম্যান্ ক্যাথলিক্, আর, ৬০০০০০টী নেটিভ প্রোটেষট্যাণ্ট !...

কোন ভ্রমণকারী যদি চীনদেশে প্রথম বেড়াতে যান, তা হ'লে প্রথম দৃষ্টিতেই তাঁর চোখের সামনে যা ভেসে উঠবে, তা হচ্ছে সেখানকার অধিবাসীর অতি বিপুলতা !...যদি তিনি সেখানে সামনেই একটা খালি ভাড়াটীয়া গাড়ী দেখতে পান, তা হ'লে পর মুহূর্ত্তেই তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করবেন যে, প্রায় ৫০টী লোক

দণ্ডের আঘাতে ধ্বনি তুলে বুদ্ধ-পূজা।
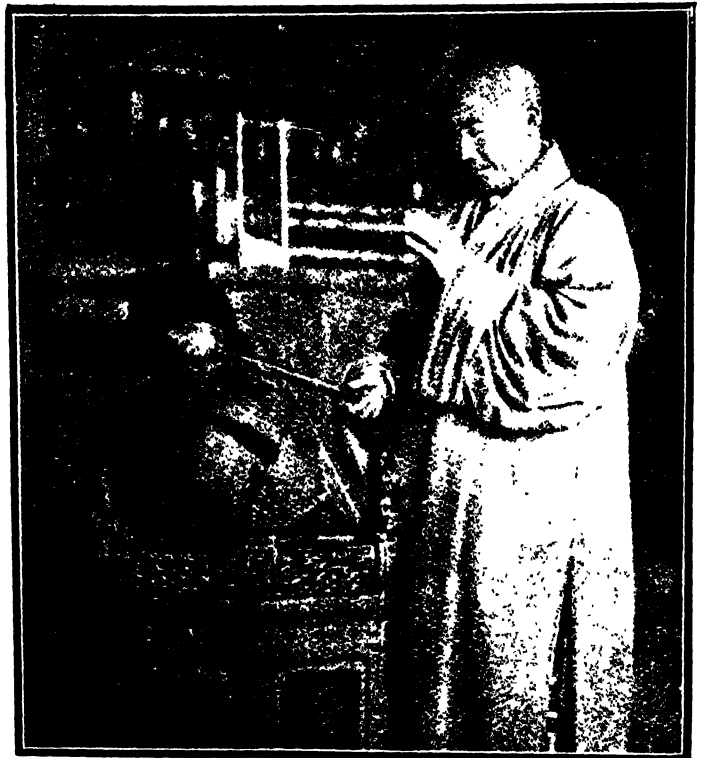
সাগরের উপর-ন্যান্‌কিনের ভিক্ষু-পরিবারের নৌ-ভবন

চীনদেশে ধূমপান করবার কোন বিশিষ্ট বয়স নির্দ্ধারিত নেই। কাজে কাজেই, এই ছেলেটীও তার উপযুক্ত 'সিগারেট্' বিনা বাধায় সুখে উপভোগ ক'রছে।

ক্রীতদাসী চীন-রমণীর বংশের গৌরব। জননীর ধারণা যে, কন্যা সন্তান কোন কাজেরই হয় না এবং সে দুরদৃষ্টবতী! এই জন্য এই ছেলেটীকে নিয়ে মা-বাপের ভারী আনন্দ।...অনেক পিতামাতা আবার দুষ্ট প্রেতের অশুভ দৃষ্টি হ'তে ছেলেকে বাঁচাবার জন্য, একটী মেয়ের নামে তাকে অভিহিত করে।

সেই গাড়ীটার ওপর, কোথা থেকে যেন এসে, চ'ড়ে ব'সলো!...

তারপর তিনি যদি ঘোড়ায় চ'ড়ে যেতে যেতে একটা বিজন মাঠের মাঝে নেমে পড়েন কোন পাথর কুড়োবার জন্য, তা হ'লে, ফিরেই তিনি দেখতে পাবেন যে, অগুন্তি ছেলে-

দুঃখের যাত্রাপথে অন্ধ গায়কের বাঁশী-বাদন।

মেয়ে-বুড়ো-যুবা, দাঁড়িয়ে অথবা ব'সে, চারিদিক হ'তে তাঁর কাজ বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখছে।

চীন দেশের সমস্ত ব্যাপারই যেন কেমনতরো! কিন্তু তা হ'লেও তা সমস্ত পৃথিবীর কাছে তার খ্যাতি অর্জ্জন ক'রেছে!...

এখানকার লোকদের মধ্যে আছে শান্তি, সামাজিকতা নম্রতা, সাধুতা এবং মানুষোচিত সমস্ত গুণ!...

এদের মনস্তত্ত্বের প্রধান বিশেষত্ব পাওয়া যায় এদের সম্ভ্রমের মধ্যে। সে এক বড় মজার কথা!...সকলের চেয়ে সেরা শাসনকর্ত্তা থেকে আরম্ভ ক'রে নগণ্য একটা ভিখারী পর্য্যন্ত কেউই এ থেকে বাদ যায় না!...

তাদের সম্ভ্রমের রহস্য হচ্ছে দু প্রকারের। প্রথম—সম্ভ্রম-লোপ। দ্বিতীয়—সম্ভ্রম-অর্জ্জন!

ইয়োরোপীয় সভ্যতার আওতায় মার্জ্জিত-রুচি-সম্পন্ন চীন-রমণী। এর ঘাঘ্‌রা ও পায়ের জুতা এ বিষয়ের যথেষ্ট পরিচয় দেয়।

নিম্নলিখিত উদাহরণ থেকেই এই রহস্যের সমাধান হবে।

ধরা যাক, শ্রীমতী চাউ হচ্ছেন একজন সম্পত্তিশালিনী বিধবা মহিলা। তিনি খুব মিতব্যয়ী! কিন্তু তাঁর ছেলে পো-হো হচ্ছে খুব খোরুচে! শ্রীমতী চাউ দেখলেন,—সর্ব্বনাশ! ছেলে যে রকমে খরচ ক'রছে, তাতে ত তাঁর মৃত্যুর আগেই সমস্ত অর্থ উড়ে যাবে! আর তা হ'লে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শবদেহের সাড়ম্বর সমারোহ হবে না! তাতে ত লোকচক্ষে তাঁর সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হবে!... অতএব—

অতএব তিনি নিজের মান নিজে রক্ষা ক'রবেনই ;—এবং তা তাঁর মৃত্যুর আগে তাঁর কফিন্ ইত্যাদি নিজে দেখে তৈরী করিয়ে !···

এবং তিনি ক'রলেনও তাই !···অতঃপর নতুন-তৈরী-

চাঁদ ধরবার জন্য বায়নার কান্না

হওয়া কফিন্‌টাকে খুব ভাল ক'রে সাজিয়ে, তার মধ্যে মাংস ও খাবার ইত্যাদি রেখে, শত শত বাহকের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি সেটাকে তোলালেন···সমস্ত সহর ঘোরাবার জন্য ! তার পর তিনি,—আত্মীয়-পরিজনের মর্ম্মন্তুদ আর্ত্ত-অশ্রুর ভিতর দিয়ে, কফিনের পিছনে পিছনে চললেন একটী শিবিকার মধ্যে ! এইভাবে তাঁর সম্ভ্রম রক্ষা হ'লো, এবং তাতে তাঁর আত্মীয়দেরও মান রইল !···

আর একটা উদাহরণ—

মনে করা যাক, কেউ নামক একটী ধনী চাষা একটী লোকের কাছ থেকে চোরাই মাল কিনেছে। ধরা প'ড়ে বিচারে তার শাস্তি হ'লো—৬০ ঘা বংশ-দণ্ড ! কিন্তু ইতি-পূর্ব্বেই শাস্তি হবে জানতে পেরে, কেউ টাকা দিয়ে 'লিন্' নামক একটী ভাড়াটীয়া লোককে ঠিক ক'রে রেখেছিল—তার বদলে শাস্তি নেবার জন্য !··· যথা সময়ে যথাস্থানে 'কেউ'কে শাস্তি দেবার জন্য আনা হ'লো। কিন্তু বংশ-দণ্ড তার পিঠে পড়বার আগেই, সে স'রে গেল, আর সেই মুহূর্ত্তে তার স্থান অধিকার ক'রলে 'লিন্' !···সঙ্গে সঙ্গে বাঁশের দারুণ আঘাত এসে প'ড়লো হতভাগ্য 'লিনে'র পিঠে ও পায়ে ! · এইভাবে প্রকৃত অপরাধী 'কেউ'র সম্মান রক্ষা হ'লো !···কিন্তু এই অদ্ভুত ব্যাপারের বিরুদ্ধে আইন কোন কথা কয় না ! চীন-দেশের এটীও একটী বিশেষত্ব ! ··

এখানকার লোকরা খুব কৌতুক-প্রিয় ! শোনা যায় যে, যদি কোন লোক চীনবাসীর মুখে একবার হাসি

বাড়ীর বাহিরে এনে পোষা পাখীকে পূরা আধ ঘণ্টার জন্য হাওয়া খাওয়াচ্ছে

ফোটাতে পারে, তা হ'লে সে তাকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই ক'রতে পারে ! একবারকার একটী ঘটনা।···

তখন একটী ইংরেজ চীনদেশের এক পল্লীর ভিতর দিয়ে আসছিলেন। সে সময়ে সেখানে বিদেশী-বিদ্বেষ পরিপূর্ণ

মাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি তখন কিনে আনছিলেন কতকগুলি কাগজের নকল মুদ্রা (সমাধি-ক্ষেত্রের কাজের জন্য)! এই মুদ্রাগুলি সুবিধার জন্য তিনি তাঁর ছাতির ভিতরে পূরে রেখেছিলেন!···পথে আসতে আসতে হঠাৎ তিনি একদল বদ্‌ চীনবাসীর দ্বারা বিশ্রী ভাবে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন। তাঁর ভয় হলো। অথচ উপায় নেই!...

বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রভাবাপন্ন চীনদেশ

যাই হোক, হঠাৎ তাঁর মাথায় একটী ফিকির এল। চলতে চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়েই তিনি তাঁর ছাতিটী খুলে ধরলেন তাঁর মাথার উপরে। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ কাগজের মুদ্রা ফুলঝুরীর মত ঝ'রে প'ড়লো তাঁর সারা গায়ে। কতকগুলি আবার সামনেই দু-একটী চীনবাসীর চিবুক ও কানে গিয়ে লাগলো! তিনি তখন অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্তের মতই ব্যস্ত স্বর তুলে তাড়াতাড়ি পূর্ব্বোক্ত চীনবাসীদের গা থেকে মুদ্রাগুলি আনতে গেলেন! চীনবাসীদের মনের ও মুখের ভাব তখন একেবারে বদলে গেছে!···তারা এই ব্যাপার দেখে অসীম কৌতুকে না হেসে থাকতে পারলে না। আর এই হাসিতেই বিজয় ক'রলেন পূর্ব্বোক্ত ইংরেজটী সেই দুর্ব্বৃত্ত চীনবাসীদের!

ফেরবার পথে আর তাঁকে কোন গোল-যোগের মধ্যে যেতে হয়নি!···

গেঁয়ো চীনবাসীদের জীবিকা-নির্ব্বাহের ব্যাপার হচ্ছে অত্যন্ত অদ্ভুত। সেখানে তাদের পুরো একটী সংসারের এক সপ্তাহের খরচ লাগে মোটে দু শিলিং!

অথচ তারা না কি এতে বেশ সুখে এবং স্বচ্ছন্দেই থাকে! আশ্চর্য্য!··

সেখানকার আর একটী ব্যাপার হচ্ছে আরও অদ্ভুত! সেখানকার প্রত্যেক লোকই জানে যে, দেনা করলে মাস শেষ হবার আগেই পাওনাদারকে তার টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে!·· কিন্তু এই ফিরিয়ে দেবার মত যথেষ্ট পুঁজি কারুর না থাকলে, পাওনাদারের অত্যন্ত দুর্ব্ব্যবহার স্মরণ ক'রে, তাকে তার বড় আদরের কোলের শিশুটীকে অগত্যা বিক্রী ক'রতে হবে!···এর-দ্বারা কিন্তু প্রমাণ হয় না যে, সন্তান-বাৎসল্য তাদের মোটেই নেই!· তারা তাদের ছেলে-মেয়ে, মা-বাপের প্রতি ভালবাসার দিক দিয়ে জগতের যে-কোন জাতির চেয়ে কোন অংশেই কম যায় না!···

চীনদেশের লোক-সংখ্যা এত বেশী যে, স্থানাভাবে অনেকে সাগরের ওপর নৌকাতেই তাদের বাসা বাঁধে! এবং সেখানে থাক—যতদিন বাঁচে ততদিন!...

চীনবাসীরা যে কত কষ্টসহিষ্ণু, তা বলা যায় না। সামান্য একটা দৃষ্টান্ত!—যদি কোন ৬ বছরের একটা ছেলে পথের মাঝে 'ক্রহাম্‌' গাড়ীর ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায়, আর ঐ গাড়ীর চাকা পর মুহূর্ত্তেই তার গায়ের ওপর দিয়ে সজোরে চ'লে যায়, তা হ'লে, চার পাশের লোকরা হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে তার

কাছে আসবার আগেই, সে ছুটে সেখান থেকে চম্পট দেবে!...

বিদ্যাশিক্ষার দিক দিয়ে সেখানকার লোকদের ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় অসাধারণ!...বছর কতক আগে ফুচাউ-দেশে একটা পরীক্ষায় ৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে সবাই ছিলেন ৮০ বছরেরও বেশী বয়সের!..আনুউই দেশে ৫৩টী পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩৫ জনের বয়স ছিল ৮০ বছরের বেশী, আর ১৮ জনের বয়স ছিল ৯০-এর বেশী!..

চীনদেশের শিল্প যেমন সুন্দর, তেমনি নিখুঁত! ...সেখানকার প্রত্যেক শিল্পীর মনের ধারণা হচ্ছে এই—"আমার জীবনে যদি আমি এই কাজটা শেষ ক'রে যেতে না পারি, তা হ'লে তা ক'রবে আমার ছেলে!"

বৃষ্টির 'মুষল-ধারা' চীনবাসীরা সহ্য করতে পারে না! তাই বোধ হয়, টিয়ানসিন (Tientsin) দেশে যখন ভয়ানক হত্যাকাণ্ড সুরু হয়, তখন ভীষণ বজ্রবৃষ্টির ভয়ে সামনের শিকার পরিত্যাগ ক'রে চীন-সৈন্যরা আশ্রয় নেবার জন্য পালিয়ে যেতে পথ পায়নি!..

চীনদেশের কিন্তু একটা বড় অপবাদ আছে। তা হচ্ছে—সাধারণের মনোবৃত্তির দীনতা!

তার একটা দৃষ্টান্ত—

ধরা যাক, পিকিং সহরে আলোর বার্ষিক খরচ পড়ে ২০০০০ পাউণ্ড। কিন্তু এই অর্থের অর্দ্ধেক নেন সেখানকার মন্ত্রী—তাঁর কমিশন্ স্বরূপ! তার পর বাকী অর্থের অর্দ্ধেক আবার নেন সেখানকার স্থায়ী সেক্রেটারী! তার পর যা বাকী থাকে তা যায় তাঁর অধীন লোকদের কাছে!...এই ভাবে হাত-ফেরতা হ'য়ে অর্থের পরিমাণ ক'মে এসে দাঁড়ায় সাড়ে সাত পেন্সে!...তখন একটী কুলীকে আলোর কনট্রাকট দেওয়া হয়! আর তাকে ব'লে দেওয়া হয় যে, সে যেন তেলের আলো জ্বালাবার বন্দোবস্ত করে! এই কুলী তখন উক্ত সাড়ে সাত পেন্স থেকে তার নিজের ২ পেন্স কমিশন বাদ দিয়ে নেয়!..

কিন্তু তেলের আলোতেও নিস্তার নেই! কারণ, পথ-

চীনদেশের চরম শাস্তি হচ্ছে—ফাঁসী অথবা খড়্গাঘাতে মৃত্যু। এই ঘাতক খড়্গের দ্বারা প্রায় বিশ হাজার অপরাধীর শাস্তি-বিধান ক'রেছে!

চীনদেশের সাধারণ শাস্তি। এইরকম সমচতুষ্কোণ ভারী একটা কাঠ অপরাধীর গলায় লাগিয়ে দেওয়া হয়। কাঠটী এত বড় যে, অপরাধী শুতেও পারে না, বা, পিছন দিকে হেলতেও পারে না।

দিয়ে চলা কোন ভিখারী কখন দেখে যে, রাস্তাটা অস্পষ্ট আলোয় ঝাপসা হ'য়ে র'য়েছে, আর কাছেও বিশেষ কোন লোক নেই, তখন সে আস্তে আস্তে গিয়ে প্রদীপাধার হ'তে তেলটী খেয়ে ফেলে!...

পুণ্য সঞ্চয় হবে ব'লেই যে সত্য কথা বলতে হবে, এ
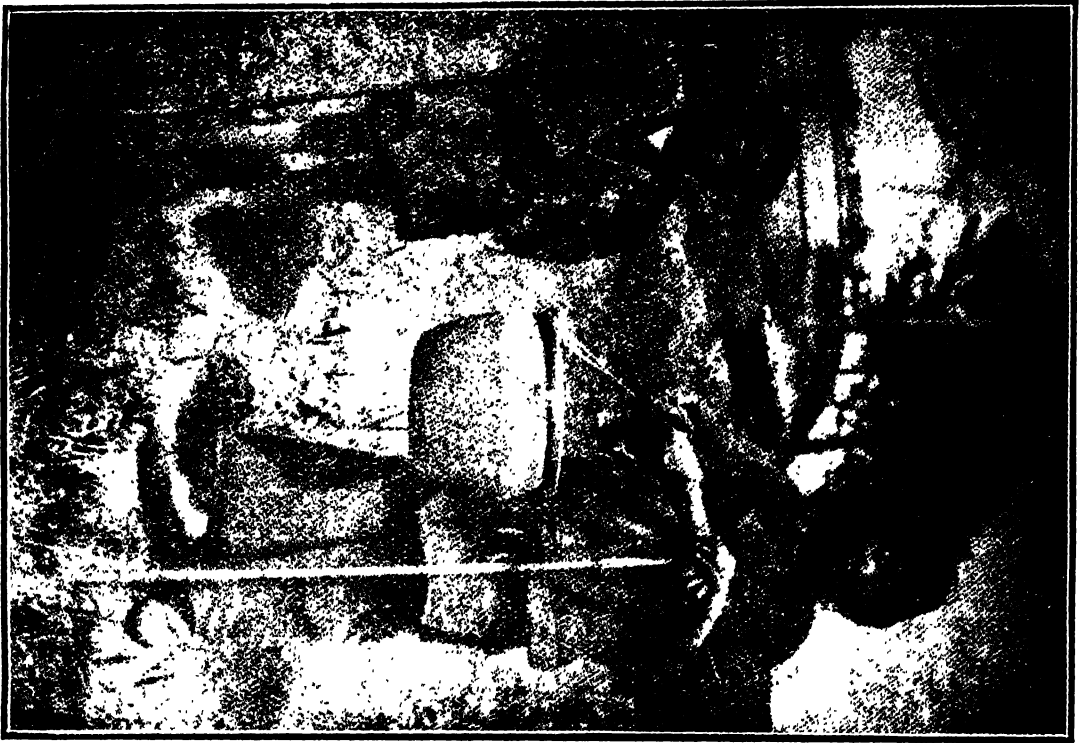
এই বালক-বালিকাদের মা ইচ্ছে ক'রেই তাদের দৃষ্টিহীন ক'রে দেয় যাতে তারা ভিক্ষা ক'রে জীবিকা চালাতে পারে। কিন্তু পরে দৃষ্টি ফিরে, পেয়ে এদের আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চোখ পেয়েও এরা ভিক্ষে ক'রতে ছাড়ে না, এবং সুবিধা পেলেই চৌর্য্যবৃত্তিও অবলম্বন করে।

নব-দম্পতী
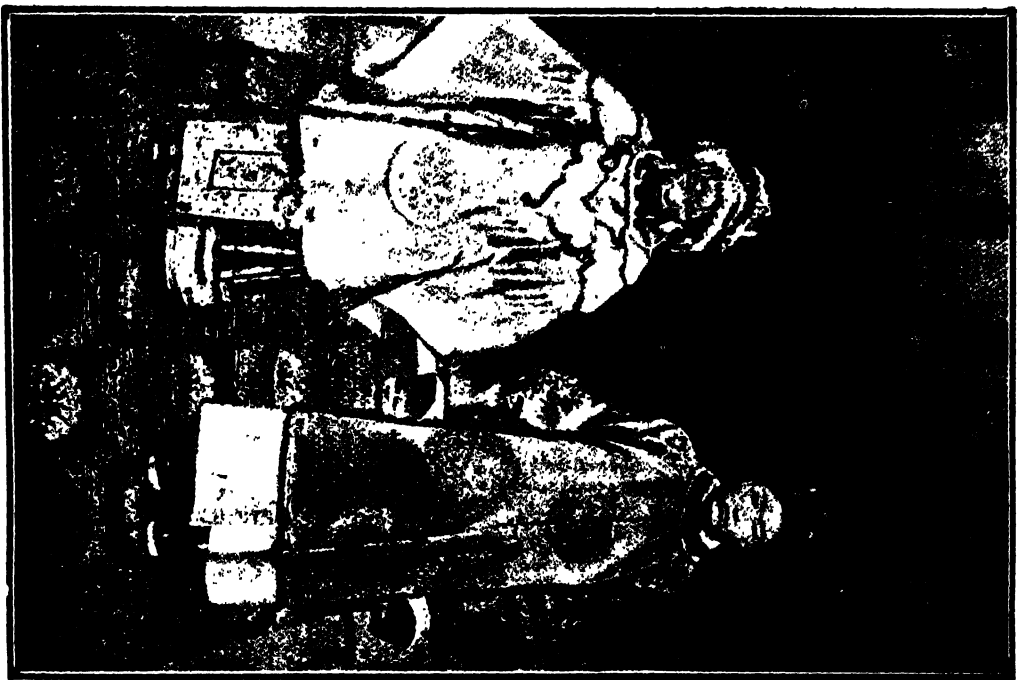
ধারণা চীনবাসীদের মধ্যে নেই। আর তারা মুখের ওপর বেমালুম মিথ্যে কথা ব'লতে পারে, যদি তাতে অপর লোক প্রতারিত হয়। এবং তা হ'লে সেই মিথ্যে কথা হবে তাদের কাছে এক মহা কৌতুকের বস্তু!... যেমন, যদি কোন লোক কোন অপ-রিচিত চীনাম্যান্‌কে ডাকতে যান, তা হ'লে সেই চীনাম্যান হয় ত নিজে এসেই তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রতে পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হয় ত ব'লতেও পারে যে, যাকে তিনি খুঁজছেন সে বাড়ীতে নেই!...

চীনবাসীদের বোধ-শক্তি অত্যন্ত কম। যদি কোন খান্‌সামা চালের "পিঠে"তে জায়ফল না দিয়ে থাকে, এবং তার মনিব বলে, "হ্যাঁ হে, 'পিঠে'তে জায়ফল দাওনি কেন?" তা হ'লে সেই খান্‌সামা তক্ষুণি উত্তর ক'রবে, "জায়ফল ছিল না।" মনিব ব'লবে, "এই ত সেদিন ছিল?"

উত্তর—"হ্যাঁ, সেদিন অনেক ছিল।"

প্রশ্ন:—"তা আমি জানি। কিন্তু আজ নেই কেন?"

উঃ—"আজ নেই।"

প্রঃ—"কি বলছ তুমি, ফুরিয়ে গেছে?"

উঃ—"নেই; ফুরিয়ে গেছে।"

প্রঃ—"বেশ ত! কিন্তু চাওনি কেন?"

উঃ—"না, চাইনি!"

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

চীনবাসীদের এই নির্ব্বুদ্ধিতার পাল্লায় প'ড়লে, বিদেশী লোকের পাগল হওয়া ছাড়া আর উপায় নাই!...

তাদের বোকামীর আর এক কিস্তি—একবার এক চীনবাসী-আমেরিকান্ মহিলা, বাজারের ধোলাইকর ব্যবসায়ীদের কাছে কাপড় কাচতে দিয়ে, কাপড়ের দুর্দ্দশা দেখে, অগত্যা একটী ধোলাই করবার 'টব্' কিনেছিলেন। টবটী কিনে, তিনি তাঁর চীনাম্যান্ চাকরকে তার সুবিধা ও

গৃহ-পালিত পশুর দড়ী ধরিয়ে ছেলেটীকে রেখে যাওয়া হ'য়েছে। পশুটী ছেলেটার অত্যন্ত কাছে আসতে সে (ছেলেটী) একটু বিব্রত হ'য়ে প'ড়লো বটে, কিন্তু ভয়ে দড়ী ছেড়ে দিয়ে পালালো না। এইটুকু ছেলের কর্ত্তব্য-জ্ঞান একটা লক্ষ্য করবার জিনিষ।

কেশ-বৈচিত্র্য। এই কেশ দৈর্ঘ্য ও ঘনতার জন্যই দ্রষ্টব্য।

ব্যবহারের কথা খুব ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলেন। চাকরটাও সব বুঝেছে ব'লে ভাব দেখালে। কিন্তু যথাসময়ে সে সেই

টব্‌টী পরিত্যাগ ক'রে, তার মনিবের কাপড় সজোরে আছড়ে কাচতে লাগলো—উঠানের মধ্যে দুটী শিলাখণ্ডের ওপর !··· তার তখনকার মনের কথাটী ছিল এই যে, বিদেশী পদ্ধতি খুব চালাকীতে ভর্ত্তি থাকতে পারে, কিন্তু তার পিতামহ, প্রপিতামহ এবং তস্য পিতামহ যে-নিয়ম আবিষ্কার ক'রে গেছেন, সেইটাই হচ্ছে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নিয়ম !···

চীনবাসীরা বিশ্বাসী কি না, এ কথার সরল উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নয়। কারণ, এ-বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে জাপানী ব্যাঙ্কওয়ালারা Ayesদের খুব পছন্দ করে। কিন্তু তবু তাদের নামে এ-রকম শোনা যায় যে, অমুক ব্যাঙ্ক থেকে তারা (সেখানে কাজ করবার সময়) এত বেশী টাকা চুরি ক'রে পালিয়েছে !···ঠিক এই ভাবে একটী চীনা লোক কোন ইংরেজের বাড়ীতে অনেক বছর ধ'রে কাজ ক'রে, অতুল সুখ-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকলেও, শেষে অনেক মূল্যবান জিনিষ নিয়ে স'রে পড়ে !···

একবারকার একটা ঘটনা—

কোন একটা লোকের এক পুরানো খান্‌সামা ছিল। ব্যবহারে এবং প্রকৃতিতে সে ছিল যার-পর-নাই সৎ। কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে এক পুলিশ-ইন্সপেক্টর তাকে গ্রেপ্তার ক'রতে এল। ইংরেজ ভদ্রলোক স্বাভাবিক ভাবেই এগিয়ে গেলেন তাঁর খানসামাকে রক্ষা ক'রতে। তখন ইন্সপেক্টর তাঁকে নিয়ে গেলেন সেই বাড়ীরই নিভৃত এক জায়গায় একটা 'পাতাল-ঘরে'। যেতেই, দেখা গেল, সেখানে র'য়েছে—মেকী মুদ্রা তৈরী করবার অনেক যন্ত্রপাতি !··· এই সবের সাহায্যে বে-আইনী ভাবে অর্থ উপায় ক'রে সেই খান্‌সামা ছুটীর সময়ে তার বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আমোদ উপভোগ করে !···

কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেকে চীনবাসী Ayesদের বলে সাধু এবং বিশ্বাসী !··· আশ্চর্য্য !···

স্রোতের ফুল

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ চন্দ

এক

আপনার অনবগুণ্ঠিত দেহবল্লরী লইয়া আলো-আকুল জ্যোৎস্না সবে নিখিলে রঙ্ ধরানো সুরু করিয়াছে। অলকাদের বাড়ীর লন্‌টাতে ঘাসের উপর সোণার স্রোত ঝল্‌কাইতেছিল !

যেখানে গোটাকয়েক্ মেলন এক সঙ্গে লাগানো হয়েছিল, সে জায়গাটা আধো-আলো, আধো-অন্ধকারে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। মেলনের মায়া অলকার অন্তরে রঙের রাজার বার্ত্তা বহিয়া আনিল। ··

অলকা ভাবিতেছিল, জীবন ভরিয়া যদি এই রঙের স্রোতকে স্পর্শ করা যাইত, তো বিংশ শতাব্দীর মরা মানুষ জীবনের রূপ-রস-গন্ধকে আবার আপনার করিয়া ফিরিয়া পাইত ! কিন্তু তা হইবার নয়। যেখানে মানুষ মনের খোরাক্ যোগাইবার এতটুকু উপক্রম করিয়াছে, সেইখানেই সন্দেহ আসিয়া পথ আগ্‌লাইয়াছে।···

সেদিন Statesman'এ ফোর্ডের লেখা একটা প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। অলকা প্রবন্ধটার ভিতর হইতে একটা তথ্য বাহির করিয়া ফেলিল—লক্ষ্মীর আদুরে দুলাল, ইয়াঙ্কি ফোর্ডের মতে, তিনি যাহা করেন, তাহাতে তাঁহার নিজের কোনই হাত নাই। অর্থ ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া হাতে যাহার ঘৃণা ধরিয়া গেছে, কলকারখানার কাজ যাহার কাছে নিত্যকার আলো-বাতাসের মতনই সহজ হইয়া গেছে, তাহার এ কী পরিবর্ত্তন ! মানুষ যেখানে মনে করে সব পাইয়াছি, সেইখানেই সে নিজেকে সবার চেয়ে বেশী করিয়া প্রতারণা করিতেছে। আমেরিকা অর্থের আলো-হাওয়ায় আ

আপনার পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাই মিকানিক্ ফোর্ডের বাণীকে অনেকখানি দরদ্ দিয়া অলকা গ্রহণ করিল।···

গেটের সামনে কার যেন একটা মোটরের হর্ণ বাজিল!

অলকার চিন্তা-স্রোতে বাধা পড়িতেই সে বিরক্ত হইয়া উঠিল। এখনই হয় তো অতিথিটীকে কলের পুতুলের মতন নানা কথার আবরণে অভ্যর্থনা করিতে হইবে! অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিয়া অলকা এক কপি London Mercury হাতের কাছে টানিয়া লইল। ছাপার হরফগুলি যেন তাহার চোখে অস্পষ্ট ঠেকিতেছিল—মনের কুহেলিতে বাহিরের জগৎটা বড়ই ঘোলাটে মনে হইতেছিল।

পর্দ্দার বাহির হইতে মৃদু-কণ্ঠে কে যেন কহিল—May I come in, Miss Mitter?

অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই যে তরুণীটি ঘরে ঢুকিল, সে চিত্রা। অলকা এই সময়ে চিত্রাকে পাইবে, ইহা একেবারেই আশা করে নাই। তাই অতর্কিত আনন্দের আতিশয্যে সে উঠিয়া গিয়া একেবারে চিত্রার গলা জড়াইয়া ধরিল।

চিত্রা অলকার গালে মৃদু আঘাত করিয়া বলিল—ভয়ানক lovely হয়ে উঠ্‌চিস্ যে তুই। বি-এ'তে ইংরিজী সাহিত্যে ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট আর যে রূপ তোর, ছেলেগুলো স্রেফ্ ক্ষেপে উঠেচে!

অলকার গাল একটু লাল হইয়া উঠিল। সে শুধু ক্ষণিকের জন্যে।

সাম্‌লাইয়া লইয়া কহিল—তাই না কি? তা বল্ তো, কোন্ ছেলেটী চিত্রা চ্যাটার্জ্জীর বাড়ী বয়ে এ messageটা দিয়ে গেছে?

—প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাও? কেন, আমার ভাইটীকে দেখেচো তো—রঞ্জিৎ রায়—যে গেল বছর এম-এ এগ্‌জামিনে ইংরিজীতে ফার্ষ্ট হয়েছিল প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে,—তার মুখেই শুনেচি অলকা মিত্তিরের সুখ্যাৎ!

—থ্যাঙ্ক ইউ! তা তিনি বাস্তবের এই অলকাটীকে দেখ্‌লে নিশ্চয়ই মত বদ্‌লে ফেল্‌বেন—এ ভাই আমি হলপ্ করে বল্‌তে পারি। এগ্‌জামিনে ফার্ষ্ট হলেই কিছু বিদ্যে গজায় না!

—শুনে সুখী হলুম্! তা একটা কথা, আমি এসেচি তোমাকে নেমন্তন্ন কর্‌তে······কাল দুপুরে আমার ওখানেই 'খানাপিনা'টা চল্‌বে, বুঝেচো?

অলকা মৃদু হাসিয়া বলিল—বাঃ! এইটেই যেন আমি expect কর্‌ছিলুম। আমার মনে হচ্ছিল কে যেন নেমন্তন্ন কর্‌তে······

চিত্রা কথাটা কাড়িয়া লইয়া চট্‌পট্ কহিল—আস্‌বেই আস্‌বে, কেমন? তা আর আস্‌বে না, যে bloom and beauty—শীগ্‌গিরই হয় তো শুন্‌ব যে, অলকা মিটার চিত্রা চ্যাটার্জ্জীর নেমন্তন্ন গ্রহণ না করে অন্য কারুর eternal invitation গ্রহণ করেছে!······

বিয়ে ব্যাপারটাকে অলকা চিরকালই একটু ভয়ের চক্ষে দেখিত। বি-এ পাশ করিলেও অলকা ওই বিষয়টা লইয়া কোনরূপ আলোচনা করিতে ভারি লজ্জা পাইত। যত রাজ্যের কুণ্ঠা আসিয়া তাহাকে অধিকার করিয়া বসিত—অথচ সে কেবলই একান্ত অকারণে।

মুখে কহিল—অশেষ ধন্যবাদ!······

রিষ্ট্ ওয়াচ্‌টার দিকে চাহিয়া বলিল—আমি সাড়ে এগারোটায় পৌঁছুবো। ততক্ষণে তুমি সেরে নিতে পার্‌বে তো?

—খুব, খুব। গিয়ে হয় তো দেখ্‌বে আমার মিষ্টারটী 'কিচেনে' ঢুকে রান্না কর্‌তে বসে গেছেন। ফাউলকারি যা রাঁধেন উনি, চমৎকার····· ঠাট্টা নয়, সত্যি বল্‌চি!

চিত্রা সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে লাগিল। পিছনে পিছনে অলকা।

—তা আমার মুখে ভাই জল এসে যাচ্ছে তোর মিষ্টারটীর রান্নার সুখ্যাৎ শুনে!

কৌতুক-উজ্জলা চিত্রা হাসিয়া জবাব দিল—কিন্তু তুই ভুলে যাচ্ছিস্ যে পরের ধনে নজর দেওয়াটা কিছু কাজের কথা নয়।

এম্‌নি কৌতুক-উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়া অলকা ও চিত্রা টেনিস্ লনটার পাশের লাল সুর্‌কির বাঁধানো পথ বাহিয়া গেটের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল। সোফেয়ার সুখন্‌লাল মেমসাহেবকে সেলাম দিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল।

—গুড্ নাইট্!

—গুড্ নাইট্ য়্যাণ্ড্ গুড্ ড্রিম্‌স্!

চিত্রার সিত্রোঁখানি হুঁস্ করিয়া নিঃশব্দে ছুটিল।

পিছনের ছোট্ট লাল আলোটা অনেকখানি দূর পর্য্যন্ত আত্মীয়তা জানাইয়া সেও বিদায় লইলে অলকা ঘরে ফিরিল।……

তাহার মনে অতীত আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল। ঢাকা ইডেন কলেজ হইতে পাশ করিয়া চিত্রা যখন বেথুনে থার্ড ইয়ারে ভর্ত্তি হইল, তখন অলকাই সবার আগে এই নতুন মেয়েটির সঙ্গে সহানুভূতি দিয়া মমতার সম্বন্ধ পাতাইয়া বসিয়াছিল। তার পর কত কাণ্ডই না তাহারা দু'জনে করিয়াছে—এক চোখ কানা ফিলজফির প্রফেসার মিঃ সোমের ক্লাশে নামটী মাত্র প্রেজেণ্ট্ করিয়া দুই জনে হোষ্টেলে পালাইয়া গিয়া কত রাজ্যের গল্পই না করিয়াছে! জীবন তখন মায়াময় হইয়া উঠিত··ছোটখাটো সুখ-দুঃখ মাথা তুলিতে না তুলিতে সমাধির সন্ধান লইত। বি-এ'তে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হইয়া দুনিয়ার চোখে তাহার দাম যতটা বাড়িল, তাহার চেয়ে ক্ষতিটা অলকার যে কত বেশী হইল, সে খবরটা আর কেহ জানুক বা না জানুক্ চিত্রা জানিত। তাই দার্জ্জিলিঙে চিত্রাকে পাইয়া সে যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল, মনে হইল একঘেয়ে, একটানা জীবনে অন্ততঃ কিছুটা আনন্দের আলিপনা দেখা দিয়াছে।……

উপরের অনন্ত আকাশের দিকে অলকার চোখ পড়িল—অন্তহীন আলোর সমুদ্র হইতে যেন করুণা ঝরিয়া পড়িতেছে। ওইটুকুন্ না হইলে বুঝি সৃষ্টি ধ্বংস হইয়া যাইত, মানুষের মন মাটীর মায়ায় আর আবদ্ধ থাকিতে পারিত না!……

গোটা কয়েক্ ডেজী ছিঁড়িয়া লইয়া অলকা উপরে উঠিল। ঘরের সব-কটা জানালাই খোলা, আলোর ঝলমলানিতে সমস্ত ঘরটা যেন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল।

অলকা ধীরে ধীরে গিয়া পিয়ানোয় বসিয়া ক্রুইট্জার সোনাটা বাজাইতে লাগিল। বাহিরে জ্যোৎস্না, ভিতরে অলকার আলো-আকুল তরুণ চিত্ত……

অলকার চাঁপার কলির মতন নরম আঙুলগুলি আপনা হইতে পিয়ানোয় প্রাণ আনিয়া দিতেছিল। অলকা আপনাকে যেন কোন্ সুর-লোকে পথ-হারা পথিক করিয়া ফেলিয়াছিল—সেখানে যেন অনন্ত সঙ্গীত, রঙের রাজত্ব, রসের রূপালী নৃত্য!

হাততালি দিতে দিতে বাবুয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিল। শুভ্র, সাদা দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল—বাঃ, নাৎনীর আমার কী চমৎকার হাত! অলকা পিয়ানো বন্ধ করিল।

বাবুয়ার দিকে স্মিতমুখে চাহিয়া বলিল—আজ বিকালে কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলে, বাবুয়া? মলের দিকে?

—না রে নাৎনী, বেড়াতে কোথাও যাইনি—আমাদের মেথর রামখেলনের মেয়েটার কলেরা হয়েছিল, তাকেই দেখতে গিয়েছিলুম। ডাক্তার ডাক্‌বার পয়সা নেই, তাই আমি নিজেই মেজর মান্‌রোকে ডেকে পাঠালুম্—আর সেবা-শুশ্রূষার জন্যে নিজেই রইলুম্!···

অলকার মুখে ভীতির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল।

বলিল—বাথ্‌রুমে গিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে ঘরে ঢুকেচো তো, বাবুয়া?

আবার সেই সুপ্রসন্ন হাসি।

—অলু-মা'র কী ভয়! আরে যম এলে কেউ ফেরাতে পারে? তা স্নান করে জামা কাপড় ছেড়ে ঘরে ঢুকেচি বৈ কি মা। ডাক্তার বল্‌লে out of danger তাই চলে এসেচি। উঃ—রামখেলনের বউটার সে কী মরা-কান্না!···

আকাশের দিকে একটা উদাস দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আপনার মনে বাবুয়া বলিল—বোঝেনা তো ওরা এ মাটীর খেলা। আর সব খুইয়েও কী আমি বুঝেচি?···

অলকার চোখ জলে ভরিয়া আসিতেছিল।

বৃদ্ধ তাহার ব্যর্থ অতীতকে অন্তরে অন্তরে আবার অনুভব করিতেছে···মায়া বুঝি আবার তাহার মন্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে। আপনার বলিয়া বাবুয়ার দুনিয়ায় কেহই নাই, থাকিবার মধ্যে আছে কেবল এই মিত্র-পরিবারটী। বাবুয়া ইহাদের লইয়া সংসারের হাটে ছিনিমিনি খেলে—অতীতটাকে নির্ব্বিবাদে বিসর্জ্জন দিতে চাহে। সময় সময় মনে হয় জয় করিয়াছি; কিন্তু পরক্ষণেই পরাজয়ের পদধ্বনি ঝনঝন্ করিয়া বিশ্বের বাতায়নে ব্যাকুল হইয়া বাজিয়া উঠে। সকল সংযম বাঁধ ভাঙ্গিয়া ছুটিয়া চলে, অন্তরে অন্তহীন একটা ক্ষুব্ধ হাহাকার চোখের জলে গলিয়া ঝরিয়া পড়ে!···

—দিদিমণি, খানা তৈরী হয়েচে!

বয়ের ডাকে অলকার চৈতন্য হইল।

অলকা পরম-স্নেহে বাবুয়ার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—বাবুয়া, খেতে যাবে চল !...

বাবুয়ার চোখের পানে অলকা চাহিতে পারেনা, সে চোখে যেন আকাশের অসীমতা বাসা বাঁধিয়াছে।

অলকা আবার বলে—বাবুয়া চল !

—অলু-মা, তুই খেতে যা ভাই...আমি দু'মিনিট্ পরেই যাচ্ছি। নার্সিং করে শরীরটা বড় সুবিধের লাগ্‌চেনা কি না, তাই একটু জিরিয়ে নিচ্ছি।

অলকা ভাবে বৃথা তাহার শত চেষ্টা,—বাবুয়ার চিত্ত-বিপ্লবে সান্ত্বনা বহিয়া আনিবার মত সঞ্চয় তাহার নাই।

বয়ের পিছন্ পিছন্ সে বাহির হইয়া পড়ে। বাবুয়ার জীবনের এই নির্ম্মম বাস্তবতাকে পরিহার করিতে পারিলে সে যেন বাঁচে !

ডাইনিং টেবিলে সেরাত্রে অলকা বসিল মাত্র। আঁখিতে তাহার নিরন্তর অশ্রু ছাপাইয়া উঠিতেছিল।

দুই

অলকার গাড়ী থামিতেই স্মিতমুখে চিত্রা বাহির হইয়া আসিল !

পিছনে পিছনে আসিলেন চিত্রার স্বামী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিষ্টার পি, আর্, চ্যাটার্জ্জী।

—অলকাকে অতিথিরূপে পাওয়া ভাগ্যের কথা হয়ে দাঁড়িয়েচে আজকাল। কী বল গো ?...চিত্রা স্বামীর দিকে মৃদু কটাক্ষপাত করিল।

মিষ্টার চ্যাটার্জ্জী সহাস্যমুখে যোগ দিলেন—Well, of course ! য়ুনিভার্সিটীর উজ্জ্বল রত্ন...

কথাটা শেষ হইতে না দিয়া চিত্রা কৃত্রিম অভিমানের সুরে কহিল—তোমার যে কী ! ছেলে হলে তো লোকে বলে রত্ন.—তার চেয়ে বরং বল সঞ্চারিণী দীপ-শিখা !

তিনজনেই হাসিয়া উঠিল।

অলকা ড্রয়িং-রুমের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া বলিল—হ্যাঁ, ঢের হয়েচে ! তোর কী বুড়ো বয়সেও চিত্রা ছেলে-মান্‌ষী গেলনা ? চলুন্, মিষ্টার চ্যাটার্জ্জী।...

সকলেই ঘরের দিকে পা বাড়াইল।

অলকা যেখানে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিত সেখানে সোসাইটীর কেতা-দুরস্ত ভাবে চলা-ফেরা করিতে মোটেই ভালোবাসিতনা। সে চিত্রাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীটার এ-ঘর ও-ঘর, বাগান, ব্যল্‌কনি সব ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিল।

দোতালায় দক্ষিণ দিকের রুমটার দরজা অর্দ্ধেক খোলা ছিল।

অলকা জিজ্ঞাসা করিল—ওই ঘরটাতে কে থাকেন, চিত্রা ?

চিত্রা হাসিয়া বলিল—তোকে আমার ভাই রঞ্জিৎ রায়ের কথা বলিনি ? সেই মহাপ্রভুটীই বই-বন্দী হয়ে প্রায় চব্বিশটী ঘণ্টা ওই ঘরটীতে আবদ্ধ থাকেন। তুই আস্‌বি শুনে গুড়িশুড়ি মেরে চুপ্‌চাপ্ বই নিয়ে পড়ছে...awfully shy !· তা চল্, তোর সঙ্গে introduce করিয়ে দিই, দুজনাই ইংলিশ লিট্‌রেচারে নাম করা স্কলার।...

এই বলিয়া চিত্রা সেই ঘরটীর দিকে অগ্রসর হইল।

অলকার মনে হইতেছিল পৃথিবীর যত রহস্য সব যেন ঐ ছোট্ট ঘরটুকুনের আনাচে কানাচে গুড়্‌গুড়্ করিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতেছে। সে মৃদু মৃদু পদক্ষেপে বান্ধবীর অনুসরণ করিল !

......রঞ্জিৎ তখন Conradএর একটা নভেলে মগ্ন। অলকা বইখানার নামটা দেখিয়া লইল Rover. Rover ? ওটা অলকার একখানা প্রিয় বই। কন্‌রেড্‌কে অলকার একজন উঁচুদরের আর্টিষ্ট্ বলিয়া মনে হইত, আজ তাই এই লাজুক ছেলেটীর ঘরে কনরেডের সাক্ষাৎ পাইয়া সে ভারি খুসী হইয়া উঠিল।

চিত্রার ও অলকার পায়ের শব্দে রঞ্জিৎ চম্‌কাইয়া উঠিয়া মুখ তুলিল।

চমৎকার ফর্সা রঙ দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়, তাহার উপর সেলুলয়েড্ ফ্রেমের চশ্‌মায় রঞ্জিতের তারুণ্যের দীপ্তি যেন সাত্‌শো গুণ বাড়িয়া গিয়াছিল।

সে স্বপ্নময় চোখ-দুটী তুলিয়া দুইজনকে দেখিবামাত্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা করিল। কিন্তু সে অভ্যর্থনায় কুণ্ঠার কাঁটা যেন পদে পদে তাহাকে বিঁধিতেছিল। ইহা অলকার চোখ এড়াইল না।

তিনজনেই চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলে পর চিত্রা কহিল—রঞ্জিৎ, ইনিই হচ্ছেন আমার বান্ধবী অলকা মিত্র, আর্...

অলকা চিত্রার কথা শেষ হইতে না দিয়া মৃদু হাসিয়া

কহিল—এ-রকম ফর্ম্যাল্ ইন্‌ট্রোডাক্‌শনের কিছু দরকার আছে কি রঞ্জিৎবাবু ?···চিত্রা স্রেফ্ 'সোসাইটী লেডে' বনে গেছে !···

রঞ্জিৎ একটা ফরাসী বইয়ের পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে সলজ্জকণ্ঠে বলিল - কিছু না, কিছু না ! ওর যত সব ফ্যর্ম্যালিটী !···

চিত্রা যখন দেখিল দুইজনে বেশ পরিচয় করিয়া লইয়াছে তখন সে ভাবিল যে এই সুযোগে খাবারের তত্ত্বাবধানটা করিয়া আসাই যুক্ত-সঙ্গত হইবে।

অলকার দিকে চাহিয়া চিত্রা বলিল—তা তোম্‌রা একটু গল্প-সল্প কর, আমি ততক্ষণে প্লেটগুলো arrange করিগে'।

অলকা হাসিয়া কহিল— তথাস্তু !

রঞ্জিৎ কন্‌রেডের গোটাদুয়েক্ বই অলকার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল—এগুলো আপ্‌নি নিশ্চয়ই দেখেচেন। Conradকে কিন্তু আমার খুব ভালো লাগে !...

অলকাও উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল—এ জায়গায় আপ্‌নার সঙ্গে আমি একমত। হ্যাঁ, Conradএর লেখা সবগুলো বই-ই আমার লাইব্রেরীতে আছে। এমন চমৎকার করে sea-life আর কেউ আঁক্‌তে পেরেছে বলে আমি জানিনা ·· Conrad পড়্‌তে পড়্‌তে মনে হয় আমি যেন তুলোঁর আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছি !···

অলকা বুক-শেল্‌ফ্‌গুলোর পানে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

ফ্লু্রেয়ার, ব্যল্‌জাক্, নোগুচি, গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা,বার্গস্ঁ, গতিয়ার, ফ্রাঁস, বেনাভাতে প্রভৃতির বইগুলি একটার পর একটা করিয়া সাজানো রহিয়াছে। বোকাট্‌চো'র ডিকামারণ-খানা পর্য্যন্ত বাদ যায় নাই। বইয়ের বস্তা দিয়া যেন রঞ্জিৎ একটা আলাদা ভুবন সৃষ্টি করিয়া সবার অগোচরে চুপ্‌চাপ্ বসিয়া আছে। বিশ্বের আইন-কানুন, কন্‌ভেন্‌শুন্ সব যেন এই ঘরটার সম্মুখে আসিয়া শ্রদ্ধায় তিন্-পা পিছাইয়া গেছে। এ লোকটা যেন বইয়ের বোঝার মাঝখানে একটা নয়া রাজ্য রচনা করিয়া নির্ব্বিবাদে বসতি করিতেছে ! মনের intensity না থাকিলে মানুষ নিজেকে এমন করিয়া supermanismএর আব্‌হাওয়ায় আনিয়া ফেলিতে পারেনা। শ্রদ্ধায় নত হইয়া অলকা মনে মনে এই [illegible] জানাইল।

—অলকা, খাবার তৈরী হয়েচে। শীগ্‌গির আয় ভাই, নইলে পোলাওটা জুড়িয়ে যাবে !···

—পোলাও ? চমৎকার ! আর কথা নেই, চল এক্ষুনি যাচ্ছি। পুঁথি-পত্তর্ ছেড়ে চলুন্ রঞ্জিৎ বাবু, এবারে ন্যুট্ হ্যম্‌সুনের "হাঙ্গার" আর ইয়োহেন বোয়েরের "গ্রেট্ হাঙ্গার" খানিক্‌ক্ষণের মতন ফেলে পেটের দিকে নজর্ দেওয়া যাক্ ! ··

রঞ্জিৎ চশ্‌মা জোড়াটা খুলিয়া লইয়া রুমাল দিয়া মুছিল।

তার পর স্মিতমুখে বলিল—হ্যাঁ, চলুন !···

সেদিন খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া অলকা যখন বাড়ী ফিরিল তখন দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। শীতের রৌদ্র দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার গায়ে গড়াইয়া পড়ে। অলকা বাড়ী পৌঁছিয়া দেখিল টেনিস্ লনটায় ছায়া পড়িয়া গিয়াছে !

* * * * চিত্রার ও মিঃ চ্যাটার্জ্জীর একটা টি পার্টিতে এন্‌গেজ্‌মেণ্ট ছিল !

বিকালের দিকে তাহারা বাহিরে চলিয়া গেলে ব্যল্‌কনির ধারে ডেক্ চেয়ার টানিয়া লইয়া ইজিপ্‌সিয়ান্ সিগারেট্‌গুলি রঞ্জিৎ একটার পর একটা করিয়া নীরবে নিঃশেষ করিতে লাগিল। তাহাদের সঙ্গে য়ুনিভার্সিটীতে দুই চারিটী মেয়ে যে না পড়ে এমন নয়, কিন্তু কেহই যেন অলকার কাছে লাগেনা, অলকার বিদ্যা ও বুদ্ধির কাছে তাহারা আপনা হইতে নিতান্তই যেন ছোট হইয়া যায় ! এমন করিয়া বুঝি আর কোন নারী রঞ্জিতের মনকে নাড়া দেয় নাই। নিজেকে সে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিল এ তাহার একটা ক্ষণিকের মোহ মাত্র। এ পর্য্যন্ত কত মেয়েই যে তাহাকে লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়াছে, তাহার সীমা-সংখ্যা নাই ; কিন্তু রঞ্জিতের চিত্ত-লোক এমন করিয়া অপরূপ রঙে রঙাইয়া আর কেহ আসে নাই ইহা নিশ্চিত। কি চমৎকার এই তরুণীটির ভালো-মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা, আর কত আপ্-টু-ডেট্ এই মেয়েটী ! সর্ব্ব অঙ্গ দিয়া যেন লাবণ্য ঝরিয়া পড়িতেছে। যে ফিকে হলুদের জাপানী খদ্দরের ব্লাউজ্‌টা সে পরিয়া আসিয়াছিল সেটার সঙ্গে গায়ের রং কী চমৎকার খাপ্ খাইয়াছে ! রঞ্জিতের ইচ্ছা করিতেছিল সুইমিং কস্‌টিউম্ পরাইয়া অলকার একটা ছবি তুলিয়া লয়,—নিখুঁত নিরাভরণ দেহখানির সৌন্দর্য্য তাহাতে মূর্ত্ত হইয়া এই তরুণীটিকে মায়া-ময়ী করিয়া তুলিবে।···

—হুজুর !

—ইধার চলা আও, মান্ !···

চাপরাশীটা সেদিনকার ডাকের চিঠিগুলি দিয়া গেল।

উহার মধ্যে একটা চিঠি পাইয়া রঞ্জিৎ ভারি উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সেখানা রেঙ্গুন য়ুনিভার্সিটীর ইংরাজীর অধ্যাপক-পদের appointment letter.

হাতের চুরুট্‌টা ফেলিয়া দিয়া সে ঘরে ঢুকিল। য়ুনিভার্সিটীর কাছে সম্মতি জানাইয়া তখনই সে এক চিঠি লিখিয়া দিল।

মিষ্টার চ্যাটার্জ্জী এবং চিত্রা ফিরিয়া আসিলে সেদিন দার্জ্জিলিঙের এই সুশোভন বাঙলোটী আনন্দে মুখরিত হইয়া উঠিল।

মিষ্টার চ্যাটার্জ্জী রসিকতা করিয়া কহিলেন—মিষ্টার রঞ্জিৎ রায়, you are undoubtedly a good brother-in-law, I fancy you will turn out a good professor-in-law too !

রঞ্জিৎ হাসিয়া বলিল—Professor-in-lawটী কী রকম জীব হে চ্যাটার্জ্জী ? দুনিয়ার সবাই ল' মেনে চলে, son-in-law থেকে daughter-in-law, বাদে তোমার প্রফেসার, বুঝেচো ?

চিত্রার মুখে এইবার কথা ফুটিল।

—বটে, কাল পেলে প্রফেসারী আর আজই তাদের মতন ভালো লোক আর দুনিয়ায় নেই এই ফতোয়া দেওয়া হচ্ছে। ওসব লেক্‌চার অলকার কাছে দিও ! ··

রঞ্জিৎ এবারে রীতিমত blush করিল।

বাহিরে গাম্ভীর্য্যের অভিনয় করিয়া কহিল—যত নন্‌সেন্স, তোমাদের আইডিয়া !

এই বলিয়া ঘরে ঢুকিয়া গায়ে একটা লেড্‌স'র পুলোভার চাপাইয়া ও হাতে হান্টিং ষ্টিক্‌টা লইয়া সে বেড়াইতে বাহির হইয়া পড়িল।

তিন

সেদিন সকালে অলকার মনটা কেন যেন অকারণ বড় খারাপ ঠেকিতেছিল !···

ঘণ্টা খানেক্ উপাসনা-ঘরে কাটাইয়া সে একটু ভালো বোধ করিল।

ইতিমধ্যে গায়ে বালাপোষ, গলায় কম্ফারটার্ ও পায়ে দুই জোড়া মোজা চড়াইয়া বাবুয়া আসিয়া হাঁকিল—অলু-মা, চল্ আজ টাইগার-হিলের sun-rise দেখ্‌তে যাওয়া যাক্ ! তা তুই পড়াশুনো তো আর আজ কর্‌ছিস্‌নে ?

শীতকে জব্দ করিবার জন্য বৃদ্ধ যে নানান্ উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছে, তাহারই দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া অলকা কহিল—বাবুয়া, তোমার মনে কী কবি হবার সাধ জন্মেচে. নইলে টাইগার হিলের দিকে এই শীতে ? কিন্তু ত্যাখো, অতগুলো জামা গায়ে চাপালে তো কবির মতন বেশভূষা করা হলনা ! এ সব ছেড়ে গায়ে ফিন্‌ফিনে আদ্দির পাঞ্জাবী চড়িয়ে এসো গে, আমিও ততক্ষণে ড্রেসিংটা সেরে নিচ্ছি।

গায়ে 'ফার'টা চাপাইয়া হাতে একটা সুদৃশ্য বেতের ছড়ি লইয়া অলকা বাহির হইয়া পড়িল। তাহার কেবলই চিত্রার কথা মনে হইতেছিল। গবর্ণমেণ্ট মিষ্টার চ্যাটার্জ্জীকে একেবারে কেন হঠাৎ সাতসমুদ্দুর তের নদীর পার ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া সব্‌ডিভিসনের সব্‌ডিভিসনাল অফিসার করিয়া দিল ! অলকার কর্ত্তৃপক্ষের উপর ভীষণ অভিমান হইতেছিল, কেন, আর দুটো দিন মিষ্টার চ্যাটার্জ্জীকে এখানে রাখিলে কী ব্রিটীশ-রাজত্ব অচল হইয়া যাইত ! চিত্রাদের বাড়ীটার সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে দেখিল সেটা এখন এক সাহেব Asst. Supdt. of Police অধিকার করিয়া বসিয়াছে। গেটে নাম লেখা দেখিল C. S. Buckner. I. P.

রঞ্জিতের চমৎকার ঘরটাকে হয় তো লোকটা 'গোসল-খানায়' পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছে, আর যদি সে করিয়াই থাকে তো তাহাকে দোষ দিবার কী আছে ? ওর সুবিধা-মত সব কিছু গুছাইয়া লইবে তো !

—গুড্‌মর্ণিং, মিস্ মিটার ! এই শীতের ভোরে কোথায় চলেছেন ?

মণি মজুমদার নতুন ব্যরিষ্টার হইয়া ফিরিয়াছে।

অলকার পিতার বন্ধু-পুত্র হিসাবে তাহাদের বাড়ীতে যাওয়া-আসা করে। অলকা কিন্তু মজুমদারকে আদৌ পছন্দ করিত না ! ব্যরিষ্টারী পাশ করিয়া আসিলে কী হইবে, না জানে লোকটা লেখা-পড়া···না জানে ভদ্রভাবে কথা কহিতে। অলকা সাবধানী হইয়া কেবলই লোকটাকে এড়াইয়া চলিত।

মজুমদারের কথার উত্তরে অলকা প্রশান্তমুখে জবাব দিল—একটু বেড়াতে চলেছি। আপনি কোন্ দিকে?

—আমি? আমার উদ্দেশ্য আর আপনার উদ্দেশ্য একই!

অলকা এবারে রীতিমত ভড়্‌কাইয়া গেল। মজুমদার না বলিয়া বসে যে সেও তাহাদের সঙ্গ লইবে। তাই অলকা তাড়াতাড়ি বলিয়া বসিল—আচ্ছা, আপনার আর সময় নেব না। গুড্‌ডে, মিঃ মজুমদার!

—গুড ডে, মিস্ মিটার!...

মণি মজুমদার চলিয়া গেলে অলকা যেন বাঁচিল। বিলাতে এতদিন থাকিয়া আসিল কিন্তু লোকটার কাল্‌চারের ধারা একটুকু বদ্‌লাইল না, সিনেমা আর সস্তা বিলাতী গল্পের বই ছাড়া কিছু সগজে উহার মাথায় ঢুকিতে চাহেনা।

রঞ্জিতের কথা আপনা হইতে অলকার মনে পড়িয়া গেল। কী তাহার অসাধারণ লেখাপড়া! সমাজে তো কত ছেলের সঙ্গেই তাহার আলাপ হইয়াছে; কিন্তু সব দিক্ দিয়া প্রতিভাবান্ রঞ্জিতের কাছে যেন কেহ লাগেনা।

বাবুয়া ও অলকা যখন বেড়াইয়া ফিরিল তখন সাড়ে ন'টা বাজিয়া গিয়াছে!

অলকার বাবা বিপত্নীক, রিটায়ার্ড সিভিলিয়ান্ বৃদ্ধ মিষ্টার মিটার বাগানে আপনার মনে পায়চারী করিতেছিলেন।

অলকাবা ভিতরে প্রবেশ করিতেই সস্নেহে কহিলেন—অলু-মা, তোমরা কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলে আজ ভোরে?

মা হারা মেয়ে বাবাকে মায়ের মতনই নিবিড় করিয়া ভালোবাসিত। পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কচি খুকীটির মতনই কহিল—টাইগার হিলের দিকে, বাবা! কী চমৎকার দেখ্‌তে···কে যেন আকাশের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। এতদিন দেখ্‌ছি তবু পুরানো মনে হয়না, কাল তুমি, আমি আর বাবুয়া তিনজনে যাব, বাবা!···জন্মিয়া অবধি পিতার অপরিসীম স্নেহে অলকার অন্তর ভরিয়া রহিয়াছে। মিষ্টার মিটার অতি সন্তর্পণে এই কন্যাটীকে আজ অবধি প্রতিনিয়ত অনন্ত কল্যাণ কামনা দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছেন। তাহাকে সহসা একটা দুঃখের খবর দিতে স্নেহ-কাতর বৃদ্ধের সাহস হইলনা।

মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—যাও মা, ব্রেক-ফাষ্ট্ শেষ করে এসো গে! বয় চায়ের জল ঠিক্ করে তোমার জন্যে বসে রয়েচে।

অলকা একটা রক্ত রাঙা গোলাপ ছিঁড়িয়া লইয়া সেটা পিন্ দিয়া কাপড়ে আট্‌কাইল, তার পর মনে মনে একটা বাঙলা গান গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিতে গাহিতে দ্রুত উপরে উঠিয়া গেল।

অলকা চলিয়া গেলে মিষ্টার মিটার বাবুয়াকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন—বাবুয়া, রঞ্জিৎ মারা গেছে জান?

বাবুয়ার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

সভয়ে বলিল—রঞ্জিৎ মারা গেছে?

দুইটী বৃদ্ধেরই আঁখির আগে এক ব্যথিতা তরুণীর ম্লান মুখ জাগিয়া উঠিল। অলকা এ দারুণ দুঃসংবাদ কী ভাবে গ্রহণ করিবে? বাবুয়া জানিত, অলকা রঞ্জিৎকে কতখানি শ্রদ্ধা করে, কতখানি ভালোবাসে! আজ তাই এই ভীষণ অপ্রত্যাশিত খবরটা শুনিয়া দুইটী স্নেহ-বুভুক্ষু চিত্তই সমান ভাঙ্গিয়া পড়িল।

মিষ্টার মিটার জিজ্ঞাসা করিলেন—কি করে এ খবরটা অলু-মা'কে দেওয়া যায়, বল তো বাবুয়া?

—না দিলে হয়না?

—না দিয়েই লাভটা কী হবে? আজ না জানুক্, কাল তো জান্‌বে। তা ছাড়া যা inevitable তাকে আমরা কী করে ফেরাতে পারি?

মিষ্টার মিটার বাবুয়াকে চিত্রার চিঠিখানা দেখাইলেন।

চিঠিখানা চাহিয়া লইয়া বাবুয়া ধীর পদক্ষেপে উপরে উঠিয়া গেল। অলকা ব্রেক্-ফাষ্ট্ শেষ করিয়া সবে তাহার লাইব্রেরীতে গিয়া ঢুকিয়াছে, এমন সময় বাবুয়া প্রবেশ করিয়া চিত্রার চিঠিখানা অলকার হাতে ছুঁড়িয়া দিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলেন—পাছে তাঁহার চোখের জল চঞ্চল হইয়া উঠে এই ভয়ে!···

* * * * *

বালিগঞ্জে ব্যারিষ্টার মিষ্টার বিনোদ মিটারের বাড়ীতে অলকা লণ্ডনে যাইবার পূর্ব্বে জামা-কাপড় গুছাইয়া লইতেছিল। রঞ্জিতের যে ফটোটা অলকা চিত্রার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়াছিল, সেটাকে বারবার মাথায় ঠেকাইয়া প্রণা

করিয়া সযত্নে কতকগুলি মখ্‌মলের কাপড় দিয়া মুড়িয়া এক-পাশে রাখিল। রঞ্জিতের সঙ্গে তাহার যে সম্বন্ধটী গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা আইনের বা সমাজের বিধানে বিবাহ না হইলেও যে বিবাহের চেয়ে বড় তাহা খুব ভালো করিয়াই অলকা জানিত।

—হ্যলো, অলকা—কদ্দুর হল তোমার? সব গুছিয়ে নিয়েছো তো?

—না সবটুকু কাজ এখনও শেষ কর্‌তে পারিনি, কাকাবাবু! মিনিট দশেকে I'll finish everything.

—হ্যাঁ, যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব সেরে নাও। ওগুলো তো আগে থাক্‌তেই জাহাজে পাঠিয়ে দিতে হবে···আর ছাখো তোমার বইয়ের বাক্সটায় King's College-এর লেবেল্‌টা লাগিও!

—আচ্ছা!

জাহাজে উঠিবার সময় অলকা জলে-স্থলে কেবল এক-জনারই পরশ পাইতেছিল—সে রঞ্জিৎ! জেটী হইতে চিত্রা, মিষ্টার চ্যাটার্জ্জী, বাবুয়া, কাকাবাবু, মিষ্টার মিটার, সকলেই রুমাল নাড়িতেছিলেন; কিন্তু অলকার আঙুলগুলি যেন নিঃসাড় হইয়া গেছে। যে জগতে সে মানুষ তাহার চেয়েও বড় আরেক্‌টা ভুবনে সে ঝাঁপ দিতে চলিয়াছে। কেন? তাহার কারণ অলকা নিজেও জানেনা, জানে কেবল এইটুকু যে বর্ত্তমানের পৃথিবীতে তাহার সুখ-দুঃখের কথা অতীতের সামিল্‌ হইয়া গেছে!

ভুবনের আনাচে কানাচে মানুষের মন লইয়া কোন্‌ দুষমণ্‌ নিত্যকাল এই ছিনিনিনি খেলা খেলিতেছে? তাহাকে অস্বীকার করিলে চলেনা?······

বিধাতার ভণ্ডামীর দিন শেষ হইয়া আসিল বলিয়া! মাটীর ঢেলা দিয়া এই খেলার খুসী ভাঙ্গিবেই ভাঙ্গিবে।···

অলকা দাঁতে দাঁত চাপিল!

বিবিধ-প্রসঙ্গ

সূফী কবি আবু সইয়্যদ ইবন আবিল খায়ের

মৌলবী মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন এম-এ

"বুতখানা ও কাবা হাম আখির একজা মিকশাদ" মন্দির ও কা'বা শেষে এক স্থানে মিলিত হয়।

সূফী কবিদের ধর্ম্মমতের ঔদার্য্য দর্শন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাঁহাদের আত্মা এই ধূলি-ধূসরিত মর জগতের বহু উর্দ্ধে অবস্থিতি করে। এই ধর্ম্মানুষ্ঠানের কলুষ-কালিমা তাঁহাদের পবিত্র হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহাদের প্রাণ যেন এই পৃথিবীর পঙ্কে প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় বিশ্ব-বিধাতার নৈবেদ্য!—ভালবাসার সুষমায় মণ্ডিত, দৃঢ় বিশ্বাসের আলোকে উজ্জ্বল।

এই জন্য তাঁহাদের মহফিলে মসজিদ ও মন্দিরে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। প্রণয়ের পথে এইগুলিকে তাঁহারা 'Stumbling Stone' (বাধা) বলিয়া মনে করেন। বিরহী প্রেমিকের নিকট সাধনার সুর-ভেদের কোন মূল্যই নাই। তাঁহারা উদ্‌ভ্রান্তের মত প্রিয়তমের পথে বাহির হইয়াছেন, প্রেমাস্পদের বাঁশীর সুরে আকুল হইয়াছেন,—তাঁহারা এই প্রেমের সাধনায় যখন সূফী আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়েন তখন প্রেমাস্পদের ও তাঁহার মধ্যে ব্যবধান-রেখা বিলীন হইয়া যায়, ভালবাসা-বিহ্বল সূফী বলিয়া উঠেন 'আমিই সেই',—আপনার উন্মত্ততাই তাঁহাকে মৃগ-কস্তুরীর মত আকুল করিয়া তোলে। সূফী কবিদের জীবনের ও সাধনার এই মূল রহস্য সঙ্কেত না জানিলে, তাঁহাদের হেঁয়ালীপূর্ণ কবিতা ও ততোধিক দুর্ব্বোধ্য জীবনযাত্রা-প্রণালীর সঙ্গে সম্যক পরিচয় অসম্ভব। এই কুক্ষিকাটী হরীতকীর ন্যায় হস্তগত না করিলে সূফী রাজ্যের গোলক-ধাঁধার প্রবেশ-পথের সন্ধানে ব্যর্থ-মনোরথ হইতে হইবে।

(২)

আবু সই'য়দ ফজলুল্লাহ, খোরাসান প্রদেশের অন্তর্গত খাওয়ারান জিলার প্রধান নগরী ময়হানাতে ৩৫৭ হিজরির ১লা মহরম (৯৬৭ খৃঃ ৭ই ডিসেম্বর) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আবুল খায়ের কিন্তু তিনি বাবু বুল-খায়ের নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি

ইস্‌লামের শরিয়ত ও তরিকতের সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল। তিনি ও অন্যান্য সুফীগণ প্রতি রাত্রিতে তাঁহাদের মধ্যে এক জনের গৃহে সম্মিলিত হইতেন। কোন অপরিচিত সুফী নগরে আগমন করিলে তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইতে আমন্ত্রিত হইতেন এবং আহারাদি গ্রহণের পর ও নামাজাদি অন্তে তাঁহারা 'সামা' (ধর্ম্মসঙ্গীত) শ্রবণে নিমগ্ন থাকিতেন। একদা বাবু ব'ল-খায়ের তাঁহার সুফী বন্ধুগণের সঙ্গে মিলিত হইতে যাত্রা করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার স্ত্রী অনুনয় করিয়া বলিলেন, "আবু সই'য়দকে সঙ্গে করিয়া লউন, তাহা হইলে সিদ্ধ পুরুষগণ তাহাকে প্রসন্ন দৃষ্টিদানে অনুগৃহীত করিবেন।" বু'ল-খায়ের বালককে যাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন। সঙ্গীত গাহিবার সময় উপনীত হইলে কাওয়াল আরম্ভ করিল,

"আল্লাহ্ দরবেশদের প্রেমদান করেন—প্রেমই দুঃখ; মরিয়া তাঁহারা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ করেন, তাঁহার প্রিয় হন। সদাশয় যে যুবক, সে মুক্ত চিত্তে জীবন দান করিবে (কিন্তু) দরবেশগণ পৃথিবীর জাঁক-জমককে গণনার মধ্যেই আনেন না।"

এই সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া দরবেশগণ ভাবোন্মত্ত হইয়া সমস্ত রজনী নৃত্য করিতে লাগিলেন। গায়ক এই গান এত অধিকবার গাহিয়াছিল যে আবু সই'য়দ অতি অনায়াসে উহা স্মৃতির মালায় গাঁথিয়া লইলেন। গৃহে প্রত্যাগত হইয়া পিতাকে প্রশ্ন করিলেন, "যে কয়েক ছত্র কবিতা শ্রবণে দরবেশ দল এতাদৃশ ভাবোন্মাদ হইয়াছিলেন উহার অর্থ কি?" তাঁহার পিতা বলিলেন "চুপ কর! উহার যে অর্থ তাঁহারা করিয়াছেন তাহা তোমার বোধাতীত, আর উহার অর্থে তোমার প্রয়োজনই বা কি?"

উত্তর কালে আবু সই'য়দ আধ্যাত্মিক উচ্চমার্গে আরোহণ করিয়া কখনও কখনও পরলোকগত পিতার এই উত্তর স্মরণ করিয়া বলিতেন, আজ বাবু বু'ল খায়ের জীবিত থাকিলে তাঁহাকে বলিতাম, তিনি যে সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছিলেন উহার অর্থ তিনি নিজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম ছিলেন না।

আবু সই'য়দ মুসলমান শিক্ষার প্রথম সোপান কোরাণ শরিফ পাঠ বিখ্যাত পণ্ডিত আবু মুহম্মদ আইয়ারীর নিকট সমাপ্ত করেন। আবু সই'য়দ আইয়ারীর নিকট ব্যাকরণ ও আবু'ল কাসেম বিশর-ই-ইয়াসীনের নিকট ইসলামের নীতি সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেন। এই দুই শিক্ষক মায়হানার অধিবাসী ছিলেন এবং শেষোক্ত ব্যক্তি বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। বিশরের নিকটেই তিনি নিষ্কাম প্রেমের দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং এই নিষ্কাম প্রেমই সুফী ধর্ম্মের ভিত্তি।

আবু সই'য়দ বলেন, একদা আবু'ল কাসিম বিশর-ই-ইয়াসিন আমাকে বলিয়াছিলেন "আবু সই'য়দ, খোদার সঙ্গে ব্যবহার করিতে লোভ ('তমা') ত্যাগ করিও। যতক্ষণ লোভ বর্ত্তমান থাকিবে ততক্ষণ একনিষ্ঠা (ইখ্‌লাস্) জন্মগ্রহণ করিতে পারে না। নিজের স্বার্থের জন্য যে উপাসনা সম্পাদিত হয় উহাকে মুজরীর জন্য কার্য্য সমাধানের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে; কিন্তু একনিষ্ঠা দ্বারা যে কার্য্য করা যায় উহা আল্লা'র

[illegible]

মেয়ারাজের দিন আমাকে বলিলেন, 'হে মুহম্মদ! যাহারা আমার নৈকট্য লাভ করিতে ইচ্ছুক তাহাদের সর্ব্বোত্তম উপায় হইতেছে আমি যে কার্য্যাবলী তাহাদের উপর ফরজ করিয়াছি তাহার সুসম্পাদন। আমার সেবক আমার অনুগ্রহ লাভের আশায় যে পর্য্যন্ত নফল কাজ করে, যে পর্য্যন্ত না আমি তাহাকে ভালবাসি; এবং যখন আমি তাহাকে ভালবাসি, তখন আমিই তাহার সাহায্যকারী, আমিই তাহার কর্ণ, চক্ষু এবং হস্তে[র] কাজ করিয়া থাকি—আমার মধ্য দিয়াই সে শ্রবণ করে, আমার মধ[্য] দিয়াই সে দর্শন করে।"

বিশর আবু সই'য়দকে কি প্রকারে আল্লার সেবা করিতে হয় তাহ[া] বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন এবং কি প্রকারে নফল কার্য্য দ্বারা আল্লা[র] ভালবাসা লাভ করা যায় তাহা প্রদর্শন করিলেন। তৎপরে তি[নি] নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র বলিলেন,

"প্রিয়তমের নিকট হইতেই খাঁটি ভালবাসার আগমন হয়। প্রিয়ত[ম] নিজের জন্য কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না। যে ভালবাসার একটা নির্দ্দি[ষ্ট] মূল্য আছে তাহা কি কখনও আকাঙ্ক্ষিত হইতে পারে? দানের চে[য়ে] দাতাই তোমার পক্ষে অধিক বাঞ্ছনীয়। পরশমণি যখন তোমা[র] অধিকারে রহিয়াছে তখন তুমি দান চাহিবে কি প্রকারে?"

অন্য একবার বিশর তাঁহার তরুণ ছাত্রকে কি প্রকারে জিক্‌র অভ্য[াস] করিতে হয় তাহা শিক্ষা দেন। তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তু[মি] কি আল্লার সঙ্গে কথা বলিতে চাও?" আবু সই'য়দ বলিলেন ' নিশ্চয়ই।" বিশর বলিলেন, যখন তুমি একা হইবে তখনই নিম্নলি[খিত] রুবাইয়াত ঠিক নির্দ্ধারিত সংখ্যায় উচ্চারণ করিবে—

"প্রিয়তমকে ব্যতীত আমি স্থির হইতে পারি না; আমার এ[...] তোমার দয়ার পরিমাণ করিবার শক্তি আমার নাই। আমার দে[হের] প্রতি কেশ যদি জিহ্বায় পরিণত হয়, (তাহা হইলে) আমার নি[কট] তোমার যে ধন্যবাদ প্রাপ্য, তাহার হাজার ভাগের এক ভাগও ত[...] আদায় করিতে পারিব না।

আবু সই'য়দ সর্ব্বদা এই কথাগুলি জপ করিতেন। তিনি বলিয়া[ছেন] "উহার ফলে মঙ্গলময় আমাকে অনুগ্রহ দান করিয়াছিলেন, তাহার [...] শৈশবেই আমার নিকট আল্লার রাস্তা উন্মুক্ত হইয়াছিল।" বিশর হিজরী (৯৯০ খৃঃ) ইহলোক ত্যাগ করেন। আবু সই'য়দ য[খন] মায়হানার কবরস্থানে গমন করিতেন তখন সর্ব্বদাই তিনি সর্ব্বাগ্রে ত[াঁহার] উস্তাদ সুফী ধর্ম্মের প্রথম দীক্ষাদাতা বিশরের কবর জিয়ারত করিতে[ন]।

আবু সই'য়দ বলিতেন যে প্রাগ্‌ইস্‌লামিক ৩০,০০০ কবিতার তিনি পরিচিত ছিলেন। শিক্ষার এই শাখা সমাপ্ত করিয়া বিখ্যাত আলিম ইবন হুয়ায়েজের ছাত্র আবদাল্লাহ্ অল-হুসরীর নিকট [...] হাদিস শিক্ষার উদ্দেশ্যে মার্ভ নগরে গমন করেন। তিনি হুসরীর [...] পাঁচ বৎসর পাঠাভ্যাস করেন। তৎপর তিনি মার্ভ পরিত্যাগ [...] সরখসে উপনীত হন এবং তথায় আবু আলী জাহীর প্রদত্ত (প্র[াতে]) কোরাণ, (দ্বিপ্রহরে) ফেকাহ, (অপরাহ্নে) হাদিস সম্বন্ধে ব[...] যোগদান করেন।

(৩)

আবু সই'য়দের সূফী গুরুপরম্পরার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

হজ্রত মুহম্মদ
|
হজ্রত আলী (৬৫১ খৃঃ)
|
হাসান বস্রী (৭২৮ খৃঃ)
|
হাবিব আজমী (৭৩৭ খৃঃ)
|
দায়ুদ তাই (৭৮১ খৃঃ)
|
মা'রুফ কারকী (৮১৫ খৃঃ)
|
সরী সক্তী (৮৬৭ খৃঃ)
|
জুনায়েদ বাগ্দাদী (৯০৯ খৃঃ)
|
মুরতায়েস বাগ্দাদী (৯৩৯ খৃঃ)
|
আবু নসর অল-সররাজ তূসী (৯৮৮ খৃঃ
|
আবু সই'য়দ ইবন্ আবি'ল খয়ের

আবু সইয়দ সূফী গুরুপরম্পরায় হজরত মুহম্মদ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছেন।

সূফী ধর্ম্মকে ইসলামের অঙ্গ বলিয়া পরিচিত করিবার উদ্দেশ্যেই পুরোভাগে ইস্লাম গুরুর নাম রহিয়াছে। সূফী দলই যে ইস্লামের গুপ্ত সাধনতত্ত্বের একমাত্র উত্তরাধিকারী এতদ্দ্বারা তাহাও প্রমাণিত হইতেছে। যাহা হউক আমরা এক্ষণে আবু সই'য়দের সূফী ধর্ম্মে দীক্ষা এবং সাধনার কথা বলিব। আবু সই'য়দ বলিয়াছেন "এক সময়ে আমি ছাত্র ছিলাম এবং সরখে অবস্থান করিতাম এবং পণ্ডিত আবু আলীর নিকট অধ্যয়ন করিতাম। একদা আমি সহরে যাইবার পথে নগর-তোরণের নিকটে লোকমান সরখীকে ভস্মস্তূপের উপর উপবিষ্ট দেখিলাম। আমি তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহার সেলাই দেখিতে লাগিলাম। তাঁহার তালি সেলাই সমাপ্ত হইবার পর তিনি বলিলেন "হে আবু সই'য়দ আমি তোমাকে এই খেড়কার তালির মধ্যে সেলাই করিয়া ফেলিলাম।' তৎপর তিনি গাত্রোত্থান করিয়া আমার হাত ধরিয়া সরখের সূফীদের খানকায় প্রবেশ করিলেন এবং অদূরবর্ত্তী আবুল ফজলকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন। আবুল ফজল আসিলে তিনি তাঁহার হাতে আমার হাত রাখিয়া বলিলেন "আবুল ফজল, এই যুবকের উপর নজর রাখিও, সে তোমাদেরই একজন।" শেখ আমার হাত ধরিয়া খান্কার ভিতরে লইয়া চলিলেন। আমি দহলীজে বসিলাম এবং শেখ একখানি কিতাব উঠাইয়া পড়িতে লাগিলেন। আমি অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম যে উহা কি পুস্তক হইতে পারে। শেখ আমার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া আমাকে বলিলেন, "আবু সই'য়দ! পৃথিবীতে এক লক্ষ চতুর্বিংশ সহস্র পয়গম্বর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন একই বাণী প্রচার করিবার জন্য। তাঁহারা মানুষকে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং তাঁহারই উপাসনা করিতে বলিয়াছিলেন। যাহারা মাত্র এক কর্ণ দ্বারা উহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাদের এক কর্ণ দ্বারা উহা প্রবিষ্ট হইয়া অপর কর্ণ দ্বারা বাহির হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু যাঁহারা সেই বাণী অন্তরে অনুভব করিয়াছিলেন, উহা তাঁহাদের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছিল এ শেষে মর্ম্মমূলে বাসা বাঁধিয়াছিল। তাঁহারা উহা পুনঃ পুনঃ উচ্চা করিতেন, শেষে তাঁহাদের সত্ত্বা এই বাণীময় হইয়া গিয়াছিল। এই শব্দে আধ্যাত্মিক অর্থ পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া তিনি এতাদৃশ আত্মনিয়ে করিয়াছিলেন যে তাঁহাদের স্থিতিহীনতা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান সম্পূর্ণরূ তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল।" ইহা বলিয়া তিনি আমাকে খুব শক্তভা ধরিলেন এবং সারারাত্রি নিদ্রা যাইতে দিলেন না। প্রভাতে আ নামাজ ও কালাম শেষ করিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শেখ সাহেবের নিং গমন করিলাম এবং আবু আলীর কোরাণ সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় যোগদ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি তাঁহার বক্তৃতা এই আয়ে অবলম্বনে আরম্ভ করিলেন—"বল আল্লাহ্! তৎপরে তাহাদিগে তাহাদের বোকামীতে করিতে দাও।"

এই কথা শ্রবণ করিবা মাত্র আমার বক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গে এবং আমি আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলাম। ইমাম আবু'আ আমার পরিবর্ত্তন দর্শন করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "গত রা তুমি কোথায় ছিলে?" উত্তরে বলিলাম 'আবুলফজল হাসানের নিকট তিনি আমাকে উঠিতে আদেশ করিলেন এবং আবুল ফজলের নিকট এ বলিয়া যাইতে আজ্ঞা করিলেন "সূফীর নির্দ্ধারিত পথ পরিত্যাগ করি এই বিষয়ে যোগদান করা তোমার পক্ষে অন্যায়।" আমি আনে উন্মাদ ও দিশাহারা হইয়া শেখের নিকট প্রত্যাগত হইলাম। আবু ফজল আমাকে দেখিয়া বলিলেন,

"মস্তাক শোদাই হামী নাদানী পাস্ ও পেশ।" "হে দুর্ভাগ্য যুব তুমি মাতাল হইয়াছ, তুমি সমস্ত বিষয় এখনও অবগত হও নাই।"

আমি বলিলাম "হে শেখ, তোমার কি আজ্ঞা?" তিনি বলিলে "ভিতরে আসিয়া উপবেশন কর এবং আমি যে শব্দ তোমাকে বলি দিতেছি তাহাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ কর, কেননা এই শব্দই তোম সাধন-পথের একমাত্র অবলম্বন।" এই শব্দ সাধনায় যাহা প্রয়োজ আমি দীর্ঘকাল তাঁহার নিকটে অবস্থান করিয়া তাহা যথাযথভা প্রতিপালন করিলাম। তৎপর একদিন তিনি আমাকে বলিলেন, " আবু সই'য়দ, এই শব্দাক্ষরের দ্বার তোমার নিকট উন্মুক্ত হইয়া গিয়াে এখন অসংখ্য আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ তোমার বক্ষে প্রবেশ করিবে এবং তু বিভিন্ন প্রকারের আত্মোপলব্ধি অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে।" এং পরে তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন "তোমার এখন আত্মোন্মাে অবস্থা! তুমি এখন এক নির্জ্জন স্থানের সন্ধান কর। তুমি যে তোমার নিজের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়াছ তেমনি এখন তোমা মানুষের নিকট হইতেও মুখ ফিরাইতে হইবে। তুমি ধৈর্য্যের সা খোদার ইচ্ছার উপর আত্মনিয়োগ করিও।" তখন আমি অধ্যয়ন পা ত্যাগ করিয়া ময়হানার বাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম এবং বাটীর উপাস গৃহের মেহরাবে নির্জ্জন বাস বরণ করিয়া লইলাম। সেই স্থানে অ সাত বৎসর বসিয়া একাদিক্রমে ক্রমাগত "আল্লাহ", 'আল্লাহ 'আল্লাহ' বলিতে লাগিলাম। যখন মানুষের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা হই

অবসাদ ও অমনোযোগিতা উদ্ভূত হইত, তখন একজন ভয়ঙ্কর সৈন্য অসি বর্শা হস্তে নির্জ্জন প্রকোষ্ঠের সম্মুখে উপস্থিত হইত এবং আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিত "হে আবু সইয়দ! বল, 'আল্লাহ্'"। এই মূর্ত্তির ভীতি আমাকে সমস্ত দিবা রজনী সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিত, কাজেই আমি আর নিদ্রালু বা অমনোযোগী হইতাম না। পরিশেষে আমার প্রতি অনুপরমাণু হইতে 'আল্লাহ্,' 'আল্লাহ্,' জেকের ধ্বনিত হইতে লাগিল।

আবু সইয়দের জীবনী লেখক "আসরার" গ্রন্থে বলিতেছেন যে আবু সইয়দ সাত বৎসর নির্জ্জন বাসের পর পুনরায় শেখ আবুল ফজলের নিকট গমন করেন। তিনি তাঁহাকে তাঁহার থাকিবার জন্য হুজরার অপর ভাগে এক প্রকোষ্ঠ নির্দ্দেশ করিয়া দেন, কেন না, তাহা হইলে তিনি আবু সইয়দের উপরে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে পারিবেন। এবং প্রয়োজনানুসারে নৈতিক ও তপস্যা সম্বন্ধীয় উপদেশ দিতে পারিবেন। কিছুদিবস পরে আবুল ফজল আবু সইয়দকে তাঁহার নিজের হুজ্‌রায় স্থানান্তরিত করিলেন এবং অধিকতর অন্তরঙ্গভাবে তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির উপর লক্ষ্য রাখিলেন। আমরা জানিনা তিনি কতদিন পর্য্যন্ত সরখের বিহারে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং নিজের মাতার সেবা শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এই স্থানে সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার পিতৃগৃহে একটী নির্জ্জন কক্ষে বাস করিতেন এবং অন্যান্য হুজরায় (সাধনাগারে) বিশেষতঃ মার্ভের পার্শ্বপার্শ্বস্থিত সুপ্রসিদ্ধ রেবাত-ই-কহনে যাতায়াত করিতেন। তিনি যে সকল আধ্যাত্মিক কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন নিম্নে তাহার কয়েকটী উল্লিখিত হইল :—

"তিনি অজু সম্পাদনে বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেন ; এমন কি একবার অজু করিতেই কয়েক ভাণ্ড পানি নিঃশেষিত করিয়া ফেলিতেন।

তিনি সর্ব্বদা তাঁহার সাধন প্রকোষ্ঠের দরজা ও দেওয়াল পানি দিয়া ধৌত করিতেন।

তিনি কখনও কোন দরজা বা দেওয়ালের উপর হেলান দিতেন না। বিশ্রামের জন্য তাঁহার দেহভার কোন কাষ্ঠ বা চৌকির উপর রাখিতেন না বা কুরসির উপর বসিতেন না।

তিনি সর্ব্বদা মাত্র একটী দীর্ঘ জামা ব্যবহার করিতেন, উহা ক্রমে ভারি হইয়া উঠিয়াছিল ; কেন না, উহার কোন স্থান ছিন্ন হইলেই তিনি তাহাতে তালি সংযোজিত করিতেন।

তিনি কখনও কাহারও সহিত ঝগড়া করিতেন না এবং বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না।

তিনি দিবসে কখনও কিছু আহার করিতেন না এবং একটুকরা রুটী ব্যতীত তিনি অন্য কিছু দ্বারা রোজা খুলিতেন না।

তিনি দিবসে বা রাত্রে নিদ্রা যাইতেন না, পরন্তু নিজের প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ থাকিতেন ; এবং তথায় তিনি দেওয়ালে মাত্র দণ্ডায়মান অবস্থায় রহিবার উপযোগী দৈর্ঘ্য ও প্রস্থযুক্ত একটী গর্ত্ত খুড়িয়াছিলেন এবং উহাতে একটী দরওয়াজা সংযোজিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি এই স্থানে প্রবেশ করিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিতেন এবং দণ্ডায়মান হইয়া জিকিরে আত্ম-তাহা হইলে অন্য কোন শব্দে তাঁহার মনোযোগের ব্যাঘাত করিতে পারিবে না এবং একনিষ্ঠভাবে তিনি ধ্যানে সমাহিত-চিত্ত হইতে পারিবেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার অন্তরের অন্তরালে লক্ষ্য রাখিতেন যেন সে স্থানে আল্লার চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা জাগিতে না পারে।"

কিয়ৎকাল পরে তিনি মানব সমাগম এমন কি মনুষ্য দর্শন সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি একাকী মরুভূমি ও পর্ব্বতোপরি ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং প্রায় মাসাধিককাল নিরুদ্দেশ হইয়া থাকিতেন। তাঁহার পিতা তাঁহার সন্ধানে বহির্গত হইতেন এবং পথিক ও জনমজুরের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তাঁহার সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিতেন। পিতার সন্তুষ্টির জন্য তিনি ফিরিয়া আসিতেন কিন্তু দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই মনুষ্যের উপস্থিতি তাঁহার নিকট অসহ্য বোধ হইত এবং অনতিবিলম্বে আবার তিনি মরু ও পর্ব্বতের বুকে লুকাইত হইতেন।

পিতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সত্ত্বেও তিনি রাত্রির পর রাত্রি পিতৃগৃহ হইতে পলায়ন করিতেন। তাঁহার পিতা স্বভাবতঃ পুত্রের নৈশ ভ্রমণে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং এক রাত্রে পুত্রের অগোচরে স্বল্প দূরে রহিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, "আমার পুত্র রিবাত ই-কহান পৌঁছা অবধি হাঁটিতে লাগিল এবং উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল। আমি তখন ছাদের উপর উঠিলাম এবং তাহাকে 'রিবাত' মধ্যস্থিত হুজরায় প্রবেশ করিয়া দুয়ার বন্ধ করিতে দেখিলাম এবং হুজরার জানালা মধ্য দিয়া কি ঘটে দেখিবার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। মেজের উপর দড়িসংযুক্ত একগাছি লাঠি পড়িয়াছিল। সে লাঠিটা উঠাইয়া লইয়া দড়ির এক প্রান্ত আপন পায়ের সঙ্গে বন্ধন করিল। তৎপরে হুজরার এক কোণে অবস্থিত একটী গর্ত্তের উপরে লাঠিটা স্থাপিত করিয়া নিজকে নিম্নে নিক্ষেপ করিল। তখন তাহার পদদ্বয় ঊর্দ্ধে এবং মস্তক নিম্নে অবস্থিত রহিল। সেই অবস্থায় সে কোরাণ আবৃত্তি করিতে লাগিল। প্রভাত না হওয়া পর্য্যন্ত সে সেই অবস্থায়ই রহিল এবং প্রভাত হইতেই তাহার সমগ্র কোরাণ আবৃত্তি শেষ হইল। তখন সে গর্ত্ত হইতে উপরে উঠিল এবং লাঠি যে অবস্থায় ছিল তাহাকে ঠিক সেই অবস্থায় রাখিয়া দিল। তৎপরে রিবাতের মধ্যস্থলে আসিয়া সে স্নান সমাপ্ত করিল। আমি তখন ছাদের উপর হইতে অবতরণ করিয়া অতি সত্বর গৃহে গমন করিলাম এবং তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিদ্রায় রহিলাম।"

আবু সইয়দের কঠোর আধ্যাত্মিক সাধনার অন্য প্রকার পন্থা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন "একদা আমি নিজেকে বলিলাম জ্ঞান, কর্ম্ম ও ধ্যান আমি যথেষ্ট সম্পন্ন করিয়াছি। আমি এক্ষণে এই সমস্ত হইতে দূরে থাকিতে চাই। আমি গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলাম, উহা লাভের একমাত্র উপায় হইতেছে দরবেশগণের ভৃত্যরূপে সেবা করা ; কেন না, 'আল্লাহ্ যখন কোন মানুষের মঙ্গল সাধন করিতে ইচ্ছা করেন তখন তিনি সেই

তাঁহাদের সেবাকে আমার কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম এবং তাঁহাদের সাধনা-প্রকোষ্ঠ, পায়খানা ও প্রস্রাব-স্থান পরিষ্কার করিতে লাগিলাম। আমি সুদীর্ঘকাল এই কার্য্যে নিযুক্ত রহিলাম, পরিশেষে ইহা আমার অভ্যাসে পরিণত হইল। তৎপরে আমি দরবেশগণের জন্য ভিক্ষা করিতে মনস্থ করিলাম, কিন্তু ইহা আমার নিকট অত্যন্ত কঠিন বলিয়া মনে হইল। আমার পক্ষে ইহা অপেক্ষা অত্যন্ত কঠিন কার্য্য ভার আর আমি কিছুই মনে করিতাম না। প্রথমে লোকে যখন আমাকে ভিক্ষা করিতে দেখিল, তখন আমাকে স্বর্ণমুদ্রা ভিক্ষা দিত; কিন্তু অনতি-বিলম্বেই উহা তাম্রমুদ্রায় পরিণত হইল এবং ক্রমান্বয়ে উহা একটী সুপারী বা কিস্‌মিসে পৌঁছিল। পরিশেষে উহাও মিলিত না। এক দিবস অনেকগুলি দরবেশের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু তাঁহাদের জন্য কিছুই ভিক্ষা মিলিল না। তাঁহাদের জন্য প্রথমে আমার মাথার পাগড়ী বিক্রয় করিলাম, পরে আমার জুতা বিক্রয় করিলাম,—এমন কি আমার জুব্বার 'হাশিয়া' কাপড় এবং তুলা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিলাম।"

মায়হানায় তাঁহার আধ্যাত্মিক শিক্ষার ফলে তিনি মাঝে মাঝে সরখে আধ্যাত্মিক আলোচনার আশায় আবুল ফজলের নিকট গমন করিতেন। 'আসরার' গ্রন্থকার বলেন যে আবু সই'য়দ পুনরায় আরও এক বৎসর কাল আবুল ফজলের শিক্ষাধীন ছিলেন। তৎপরে তিনি আবু আবদার রহমানের অস্‌সালামীর নিকট প্রেরিত হন এবং তিনি তাঁহাকে খেরকায় (চীবর) বিভূষিত করেন। খেরকা গ্রহণের পর তিনি সুফী দলের একজন গৃহীত সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইলেন। আল-সালামী নিশাপুরী বিখ্যাত আবু'ল কাসিম আল নস্‌রাবাদীর শিষ্য ছিলেন এবং নিজেও একজন সুপ্রসিদ্ধ সুফী ছিলেনন। তিনি 'তাবাকাতুল সুফীয়া" নামক একখানি গ্রন্থের রচয়িতা।

আবু সই'য়দ আলস'লামীর নিকট হইতে আবুলফজলের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন "এখন তোমার সকল শিক্ষা শেষ হইয়াছে। তুমি মায়হানায় ফিরিয়া যাও এবং মানুষকে আল্লার পথে আহ্বান কর, তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান কর, এবং সত্যের পথ দেখাইয়া দাও।" তাঁহার আচার্য্যের আদেশ অনুসারে তিনি মায়হান ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহার আশ্বাস সত্ত্বেও তিনি অধিকতর কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিশ্রমজনক উপাসনায় লিপ্ত হইলেন। এই সময়ে লোকে তাঁহার প্রতি কি প্রকার সম্মান প্রদর্শন করিত তাহা নিম্নের আলোচনা হইতে সম্যক বুঝা যাইবে।

তিনি বলিতেন "আমি যখন সুফীতত্ত্বে নূতন প্রবেশ লাভ করি তখন আমি নিজেকে অষ্টাদশ বিষয়ে লিপ্ত রাখিতাম। আমি অনবরত উপবাসে রহিতাম। আমি নিষিদ্ধ (হারাম) খাদ্য গ্রহণ করিতাম না। আমি একাদিক্রমে জিক্‌র করিতাম। আমি সমস্ত রাত্রি জাগরণে অতিবাহিত করিতাম। আমি আরামের জন্য কখনও ভূমিতে ঠেস দিয়া বসি নাই। আমি উপবেশন অবস্থায় ব্যতীত কখনও নিদ্রা যাই নাই। আমি কা'বামুখীন হইয়া বসিতাম। আমি কখনও কিছুর উপর হেলান দিই নাই। আমি কখন কোন সুশ্রী যুবক বা রূপসী স্ত্রীলোকের অনাবৃত মুখমণ্ডলের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করি নাই। আমি ভিক্ষা করি নাই। আমি সন্তুষ্ট ছিলাম এবং আল্লার ইচ্ছার উপরে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম। আমি সর্ব্বদা মস্‌জিদে উপবিষ্ট থাকিতাম, কখনও বাজারে গমন করি নাই; কেন না, হজরত মুহম্মদ বলিয়াছেন, বাজার সর্ব্বাপেক্ষা অপবিত্র স্থান এবং মস্‌জিদ সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র স্থান। আমার সমস্ত কার্য্যে আমি পয়গম্বরের অনুসরণ করিতাম। দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমি সমগ্র কোরাণ আবৃত্তি শেষ করিতাম। আমি চোখ থাকিতে অন্ধ, কর্ণ থাকিতে বধির এবং বাকশক্তি থাকিতে মূকের ন্যায় কালাতিপাত করিতাম। এক বৎসর কাহারও সহিত বাক্যালাপ করি নাই। লোকে আমাকে উন্মাদ বলিত; আমার তাহাতে আপত্তি ছিল না; কেন না, হাদিসে উল্লিখিত হইয়াছে 'কোন লোকের ঈমান সে পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হয় না যে পর্য্যন্ত না সে পাগল বলিয়া অনুমিত হয়।' পয়গাম্বর যাহা আদেশ করিয়াছেন বা যাহা করিয়াছেন বলিয়া আমি শুনিয়াছি, তাহা আমি নিজের জীবনে সম্পন্ন করিয়াছি। আমি গ্রন্থপাঠে জানিতে পারিলাম, যে ওহুদের যুদ্ধে হজরতের পা আহত হইয়াছিল; তজ্জন্য তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলীর উপর দণ্ডায়মান হইয়া নামাজে যোগদান করিয়াছিলেন; কেন না, পায়ের পাতা বেদনায় মাটীর উপর রাখিতে পারেন নাই। আমি তাঁহার অনুসরণ করিতে মনস্থ করিলাম এবং বৃদ্ধাঙ্গুলীর উপরে ভর করিয়া চারিশত রাকাত নামাজ শেষ করিলাম। আমি আমার জীবনে ভিতরে ও বাহিরে পয়গাম্বরের আদর্শানুসরণ করিতে লাগিলাম, শেষে এই অভ্যাস আমার প্রকৃতিসিদ্ধ হইয়া পড়িল। পুস্তকে আমি ফেরেস্তাগণের উপাসনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে যাহা পড়িয়াছিলাম, তদনুসারে নিজেও সেই প্রণালী অবলম্বন করিতাম। আমি পুস্তকে পড়িয়াছিলাম যে ফেরেস্তারা তাঁহাদের মস্তকের উপরে দেহ রক্ষা করিয়া উপাসনা করে। সুতরাং আমার মস্তক মৃত্তিকার উপরে স্থাপিত করিয়া পুণ্যময়ী আবুতাহিরের মাতাকে আমার পদের বৃদ্ধাঙ্গুলীর সহিত দড়ি সংযুক্ত করিয়া একটী খিলের সহিত বাঁধিয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিতে বলিলাম। একা নির্জ্জনাবস্থায় বলিলাম "হে প্রভু! আমি আমার নিজেকে চাহি না; আমার নিকট হইতে আমাকে পলাইতে দাও।" তৎপর আমি সমস্ত কোরাণ আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলাম। যখন আমি এই আয়াতে পৌঁছিলাম, "আল্লাহ্ তোমাকে তাহাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট মনে করেন কেননা তিনি সকল কথা শ্রবণ করেন এবং জানেন", তখন আমার চক্ষু হইতে রক্ত পতিত হইতে লাগিল এবং আমার আর সংজ্ঞা রহিল না।

আমার একটী সাধন-প্রকোষ্ঠ ছিল, আমি তাহাতে উপবেশন করিয়া আত্মভোলা হইয়া পড়িতাম। তথায় আমি আধ্যাত্মিক আলো প্রাপ্ত হইতাম এবং আল্লাহ্ আমার নিজের আত্মসত্তার অন্ধকার বিদূরিত করিয়া দিতেন। সর্ব্বনিয়ন্তা আল্লাহ্ প্রকাশ করিয়াছেন আমি ইহাও নহি উহাও নহি; ইহা তাঁহার অনুগ্রহ, উহা তাঁহার দান। এমন অবস্থায়

আমি বলিলাম "আমার চোখ খুলিতেই আমি তোমার রূপ নিরীক্ষণ করি। আমার গোপন কথা যখন তোমাকে বলি, তখন আমার সারা দেহ আত্মাময় হইয়া যায়। আমার মনে হয়, অন্যের সহিত কথা বলা আমার পক্ষে পাপ; কিন্তু তোমার সহিত আমি যখন কথা বলি তখন আমার কাহিনী আর বলা হয় না!" এই সময়ে লোকে আমাকে খুব প্রশংসা করিতে লাগিল। দলে দলে লোক আসিয়া আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সূফী ধর্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। আমার প্রতিবেশীগণ মদ্যপান পরিত্যাগ করিয়া আমাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল। এই শ্রদ্ধা এতদূর পৌঁছিল যে আমার পরিত্যক্ত একটী খরমুজের খোসা বিংশতি স্বর্ণ-মুদ্রায় ক্রীত হইল। একদা আমি অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতেছিলাম, আমার অশ্ব মল পরিত্যাগ করিল, লোকে সেই মল সংগ্রহ করিয়া লইল এবং মঙ্গল আশায় উহা দ্বারা মুখমণ্ডল ও মস্তক লেপন করিল। আমি তাহাদের সম্মানের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহি। মসজিদের এক কোণ হইতে বাণী আসিল, 'তোমার প্রভুই কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট নহেন?' (কোরাণ) আমার বক্ষঃ আলোতে উজ্জ্বল হইল এবং আল্লাহ্ ও আমার মধ্যে যে সকল যবনিকা ছিল তাহা ছিন্ন হইল। যাহারা এক দিন আমাকে সম্মান করিয়াছিল তাহারা এক্ষণে আমাকে পরিত্যাগ করিল, এমন কি কাজির নিকট গমন করিয়া সাক্ষ্য দিল, আমি কাফের। আমি যেখানেই যাইতে লাগিলাম সে স্থানেরই অধিবাসীগণ বলিতে লাগিল আমার শয়তানীর জন্য তাহাদের শস্য উৎপন্ন হইতেছে না। কোন একদিন আমি এক মস্জিদে বসিয়া ছিলাম, স্ত্রীলোকেরা ছাদে আরোহণ করিয়া আমার উপর আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিল; তখনও আমি শুনিতে ছিলাম "তোমার প্রভুই কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট নহেন?" জামায়াতের নামাজ হইতে লোকেরা আমাকে এই বলিয়া বিরত রাখিল "যে পর্য্যন্ত এই উন্মাদ মসজিদে থাকিবে সে পর্য্যন্ত আমরা নামাজ পড়িব না।" তখন আমি এই কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলাম, "আমি ছিলাম সিংহ, আমার অনুসরণের কথা ভীষণ নেকড়ে বাঘ অবগত ছিল। আমি সর্ব্বত্রই বিজয়ী হইয়াছি, কিন্তু যেদিন হইতে তোমার ভালবাসাকে আমি অন্তরের অন্তস্তলে বরণ করিয়া লইতেছি, সেইদিন হইতে পশু শৃগালের দল আমাকে আমার কানন-গুহা হইতে তাড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে।"

এই আনন্দ ও উল্লাসের পর শীঘ্রই ব্যথাপূর্ণ সঙ্কোচন (কব্জ) আসিল। আমি কোরাণ খুলিলাম এবং আমার দৃষ্টি নিম্ন আয়াতের উপর পতিত হইল, "আমি তোমাদের খাঁটি করিয়া লইবার জন্যই অমঙ্গল ও মঙ্গল দ্বারা পরীক্ষা করিব। তোমরা শেষে আমার নিকটই ফিরিবে।" (কোরাণ) আমার মনে হইল আল্লাই যেন আমাকে বলিলেন। "আমি তোমার পথে যে এই সকল নিক্ষেপ করিলাম ইহাও এক প্রকার পরীক্ষা। ভাল ও মন্দ যাহাই হউক, ইহা পরীক্ষা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভাল বা মন্দের নিকট মাথা নত করিও না, আমার সহিত বাস কর।" আর একবার অহংএর তিরোধান হইল—তাহারা অনুগ্রহ আমাকে ঢাকিয়া ফেলিল। (ক্রমশঃ)

তাম্রলিপ্ত ও কিরণ-সুবর্ণ

শ্রীসুরেন্দ্রলাল মৈত্রেয় বি-ই

গত অগ্রহায়ণ মাসের 'ভারতবর্ষে' তাম্রলিপ্ত ও কিরণ-সুবর্ণ সম্বন্ধে মল্লিখিত একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। বর্ত্তমান মাসে শ্রীযুক্ত শ্রুতিনাথ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ বি-টি মহাশয় উহার একটী প্রতিবাদ বাহির করিয়াছেন। অন্ততঃ একজন ভদ্রলোকও যে উহা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাতে আমি আনন্দ অনুভব করিয়াছি। আমার প্রবন্ধটি দেখিতেছি তাঁহার স্বদেশের 'আভিজাত্যে' আঘাত করিয়াছে—ইহাতে তিনি যথেষ্ট কটূক্তিও করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিবাদগুলির উত্তর আমি যথাসাধ্য নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

আমি লিখিয়াছি যে এই প্রদেশস্থ জমীগুলি "সাগরের mean level অপেক্ষা মাত্র ৫ হইতে ১০ ফিট উচ্চ।" শ্রুতিনাথ বাবু লিখিয়াছেন যে "এই সংবাদটী আদৌ সত্য নহে। রূপনারায়ণ নদের পার্শ্ববর্ত্তী নূতন বা পুরাতন চর সম্বন্ধে এটী সত্য হইতে পারে; কিন্তু অভ্যন্তরে বসত জমীর উচ্চতা দ্বিগুণের অধিক হইবে।" আমার মনে হয়, শ্রুতিনাথ বাবু সাগরের mean level কি জিনিষ হয় জানেন না, না হয়, তাঁহার স্বদেশীয় Level সম্বন্ধে তাঁহার কোনই জ্ঞান নাই। পুকুর কি ডোবা খুঁড়িয়া মাটি লইয়া প্রাঙ্গণ উচ্চ করিয়া তদুপরি গৃহাদি নির্ম্মাণ করিলে তাহার Level দেশের Level বলা যায় না—সাধারণ জমীর Level লইয়াই বিচার করিতে হয়। সুতরাং এই প্রকার জমী সম্বন্ধে আমার উক্তিটী সত্য কি না ইচ্ছা করিলে তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিতেন। যাহা হউক এ সম্বন্ধে বাক্‌বিতণ্ডা না বাড়াইয়া সকলের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ গবর্ণমেন্টের অনুমতি লইয়া তাঁহাদের দ্বারা প্রস্তুত Soadishi Ganga khali Drainage Projectএর Index mapএর একটী নকল এই উত্তরের সহিত প্রকাশের জন্য পাঠাইলাম। ইহাতে এক দিকে হলদী ও কাঁসাই নদী, উত্তরে উড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোড, পূর্ব্বে রূপনারায়ণ নদী ও দক্ষিণে তমলুক পর্য্যন্ত সাধারণ জমীগুলির Level দেখান আছে। এক্ষণে যদি কেহ আরও দক্ষিণে হুগলী নদী পর্য্যন্ত সাধারণ জমীগুলির Level জানিতে চাহেন, তবে তাঁহাকে সেঁওয়ালি Inspection Bunglowর সামনের বারান্দার উপর যে G. T. S. (১৬,৪৩) অঙ্কিত Bench mark দেওয়া আছে, তাহার সহিত সংযোগ করিয়া fly level লইয়া দেখিতে অনুরোধ করি। উপরি উক্ত Index mapএর Level গুলি তো বর্ণে বর্ণে আমার উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন করিতেছেই,—এই দক্ষিণ অংশের Level গুলিও আমার উক্তির সম্পূর্ণ সত্যতা প্রমাণ করিবে, ইহা আমার অভিজ্ঞতা হইতে আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। শ্রুতিনাথ বাবুর নিকট আমার বিশেষ অনুরোধ এই যে, "দেরো" ও নান্দীগ্রাম নামক স্থান, যাহা তিনি কিছুকাল পূর্ব্বে সমুদ্র-গর্ভ ছিল বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গেও fly level লইয়া দেখেন যে তমলুকের নিকটস্থ জমীগুলি এই সব স্থানের জমীগুলি অপেক্ষা ২।৪ ফিটের অধিক উচ্চ নহে। এই এই Index map সম্বন্ধে একটু বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, গবর্ণমেন্ট

তাঁহাদের চির-প্রচলিত P. W. D. Datum এর সহিত তুলনা করিয়াই জমীর Level লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—Mean Sea Level এর সঙ্গে তুলনায় এগুলি বুঝিতে হইলে, এই সব Level হইতে ১.৫০ বাদ দিতে হইবে ; তাহা হইলে Mean Sea সংশুদ্ধ Level পাওয়া যাইবে। উদাহরণ—যথা, যেখানে ৮.৭০ দেখান আছে সেখানে (৮.৭০—১.৫০) =৭.২০ M S. L. বুঝিতে হইবে।

দ্বিতীয়। শ্রুতিনাথ বাবু লিখিয়াছেন যে আমি লিখিয়াছি "জমীর স্তর সকল রকম স্থানেই ১০০ বৎসরে এক ফুট উঠিয়া থাকে," এ কথা সত্য বা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে।" বাস্তবিক আমি উহা লিখি নাই। যাহা লিখিয়াছি তাহা এই ; "পণ্ডিতেরা মনে করেন জমীর স্তর সাধারণতঃ ১০০ বৎসরে এক ফুট উঠিয়া থাকে," এবং ঐ প্যারাতে আমি Sub Recent alluvial formation সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম। পাঠকগণ দেখিবেন আমার 'সাধারণত' শব্দটীর স্থানে "সকল রকম স্থানেই" শ্রুতিনাথ বাবু লিখিয়াছেন। তাঁহার নিকট দুইটী বাক্যই একার্থ বোধক হইতে পারে, আমার নিকটে নহে, এবং Sub Recent alluvial formation সম্বন্ধেই যে উহা প্রযোজ্য এ কথা বোধ হয় পাঠকবর্গের অপর সকলেই বুঝিয়াছেন। আমার ঐ প্রকার উক্তির প্রমাণ স্বরূপ আমি কয়েকটী ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি।

(ক) পুণ্যভূমি প্রয়াগধামে একটী প্রকাণ্ড বট গাছ আছে। ইহাকে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুরা "অক্ষয় বট" (Undecaying Banian tree) বলিয়া থাকেন এবং এখানে পূজা ও শ্রাদ্ধাদি করেন। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ যখন এই স্থানে গিয়াছিলেন (৬৩৬ খৃঃ অঃ ৭ই ডিসেম্বর) তখন এই বৃক্ষকে তৎকালীন সহরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটী হিন্দু মন্দিরের সম্মুখে দেখিয়াছিলেন, ও তখন নদী সহর হইতে অন্ততঃ ১ মাইল দূরে একটী বিস্তৃত বালু চরের অপর পার্শ্বে ছিল। মহাম্মদ গজনীর, সময়ে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে লিখিত আবু রিহানের বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া ইহার কিছু কাল পরে রসিদ্উদ্দীন "জমাইত তোয়ারিখ" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, ইহাতে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম-স্থলে নদী-তীরেই এই বৃক্ষটী ছিল বলিয়া লিখিত হইয়াছে। তৎপর দিল্লীর বাদসাহ আকবর সাহের সময় ১৫৭২ খৃঃ অব্দে যখন এই স্থানে ইল্লাহাবাদ দুর্গ প্রস্তুত হয়, তখন প্রয়াগ সহরটী নদীর ভাঙ্গনে দূরে উঠিয়া গিয়াছিল, এবং কেল্লাটী এই বৃক্ষকে পরিবেষ্টন করিয়া নদীর সান্নিধ্যেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। বৃক্ষটী এখন ঐ দুর্গের অভ্যন্তরে ইংরেজ সরকারের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে। এক্ষণে উহার পাদদেশে গিয়া পূজা ও শ্রাদ্ধাদি করিতে হইলে সিঁড়ি দ্বারা প্রায় ১৪।১৫ ফিট নীচে যাইতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে গত ১৩০০ বৎসরে ঐ বৃক্ষের পাদদেশ ১৪।১৫ ফিট মাটির নীচে পড়িয়াছে। (১)

(খ) পুণ্যভূমি বারাণসীর নিকট সারনাথে ভগবান বুদ্ধদেব কিছুকাল অবস্থান করিয়া শিষ্যমণ্ডলীকে উপদেশ দিতেন, ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী ঐ পবিত্র স্থানটীর স্মৃতি-রক্ষার্থ একটী বেদী ও তদুপরি একটী স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। কিছুকাল পূর্ব্বে খননের দ্বারা ঐ স্থানটী আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ স্তম্ভের পাদপীঠটী উপরিস্থ জমীর Level হইতে (:) ২৯ ফিট নিম্নে পাওয়া গিয়াছে। ভগবান বুদ্ধদেব ৫২৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। এই ঘটনার সমসময়েই ঐ স্তম্ভটী প্রস্তুত হইয়াছিল, ইহাই পণ্ডিতগণের ধারণা ; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ২৪০০ বৎসরে ঐ বেদীর উপর ২৯ ফিট স্তর পড়িয়াছে।

(গ) পুরাতন পাটলিপুত্র নগরী আবিষ্কারের জন্য পাটনার সন্নিকটে যে খনন কার্য্য চলিয়াছিল তাহার ভিতর একটী অশীতি স্তম্ভ-বিশিষ্ট বিরাট কাষ্ঠ-নির্ম্মিত গৃহের ভগ্নাবশেষ পলিমাটির নিম্নে পাওয়া গিয়াছিল। "এই বিশাল গৃহের গৃহতল ভূপৃষ্ঠের ১৮ ফিট নিম্নে দেখা গিয়াছে। ডাঃ স্পুনার অনুমান করেন যে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের সমসাময়িক এই গৃহ, এবং খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে উহা বন্যায় বিধ্বস্ত হইয়াছিল (২)। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে ঐ শতাব্দী পর্য্যন্ত ঐ গৃহতল ভূপৃষ্ঠের সমতলেই ছিল। ইহা সত্য হইলে গত ১৯০০ বৎসরে ঐ স্থানে ১৮ ফিট স্তর পড়িয়াছে।

(ঘ) "সমতট" নামক স্থানে চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ (৩) ২০ মার্চ্চ ৬৩৯ খৃঃ অব্দে নিজে গিয়াছিলেন। এই নামের কোন স্থান আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। আমার প্রবন্ধ মধ্যে বলিয়াছি যে, সুবিখ্যাত কানিংহাম সাহেব যশোর মূরলীকে সমতট বলিয়াছেন। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র যশোরের নিকটস্থ বারবাজারকে সমতট বলিতে চাহিয়াছেন। অবস্থা বিবেচনায় ও নামের সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য পাইয়া আমি শঙ্কট নামক নিকটস্থ স্থানকে প্রাচীন সমতট বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছি। কিন্তু কোন প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারি নাই। অনেকে মনে করেন, সমতট একটী যৌগিক শব্দ, উহার অর্থ সমুদ্রপার্শ্বস্থ সমতল বেলাভূমি। এবং কামাটেপাড়া হইতে দূরত্ব ও দিক্ দ্বারা নির্দ্দেশ করিলে বর্ত্তমান যশোরের নিকটস্থ উক্ত প্রকার সমতল ভূমিই বুঝায়। বস্তুতঃ হুয়েন সাঙ যখন এদেশে আসিয়াছিলেন, তখন ইহাকে খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ, বলিষ্ঠকায় মনুষ্য অধ্যুষিত, অল্পোচ্চ তীর-বিশিষ্ট সমুদ্রপার্শ্ববর্ত্তী নিম্ন স্যাঁৎসেঁতে দেশরূপেই দেখিতে পাইয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন, সাগরের mean level একটী অপরিবর্ত্তনীয় সমতল ক্ষেত্র। ২০০০।৩০০০ হাজার বৎসরেও ইহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। ইহার বেলাভূমিগুলির Level যতদিন বেলাভূমিরূপে থাকে ততদিন প্রায় অপরিবর্ত্তনীয়ই থাকে। রামনগর, পিতাবনা, জুনপুট (কাঁথী মহকুমা), সুন্দরবন (২৪ পরগণা), ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে যে বেলাভূমি আছে উহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি উহার Level প্রায় সকল স্থানেই

---

(১) Cunningham's Ancient Geography of India—S. N. Mazumder, pp. 445-447

(১) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় C. I. E.

(২) ভারতবর্ষ ১৩২১ সাল পৃঃ ৭৭৮। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—পাটলিপুত্র।

(৩) Cunningham's Ancient India p. 477

৪ হইতে ৬ M. S. L.। যশোর যদি হয়েন সাহেবের সময় সমুদ্রকূলস্থ বেলাভূমি থাকিয়া থাকে তাহা হইলে উহার Levelও উপরিউক্ত সাগরের Levelএর অপরিবর্ত্তনতা হেতু ৪।৫ ছিল। এই যশোরের Circuit Houseএর প্রাঙ্গণে এক্ষণে যে G. T. S Bench Mark দেওয়া আছে তাহার উচ্চতা (১) ১৮·২০ M. S. L. এবং যশোর কলিকাতা রাস্তার সহিত খোলাডাঙ্গা কাঁচা রাস্তার যেখানে সংযোগ হইয়াছে সেখানে জমীর উপর B. M. হইয়াছে ১৭·৬৬ M S. L.। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সমস্তট তৎকালে বেলাভূমি থাকিলে এই ১৩০০ বৎসরে প্রায় ১৩ ফিট মাটির নিম্নে চাপা পড়িয়াছে। অর্থাৎ গড়ে ১০০ বৎসরে ১ ফুট স্তর পড়িয়াছে।

(৬) আমি এক্ষণে যে প্রমাণটী পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি তাহার সম্বন্ধে যথেষ্ট মতদ্বৈধের সম্ভাবনা আছে। কেননা আমাদের মাতা বসুন্ধরার বয়সের হিসাব ও স্তরের স্থূলত্ব লইয়া পণ্ডিতগণ মধ্যে ভীষণ মতানৈক্য দেখা যায়। কেহ বলেন জননী মাত্র ৬০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে সূতিকা গৃহ হইতে বাহির হইয়াছেন—কেহ বলেন মাতা ঠাকুরাণীর বয়সের গাছ পাথর নাই—কোটা কোটী বৎসর। (২) বিগত শতাব্দীর শেষভাগে আমাদের পঠদ্দশায় লর্ড কেলভিন ও সুবিখ্যাত টেট্ সাহেব তাঁহাদের চমকপ্রদ গবেষণার দ্বারা স্থির করেন যে জননীর গাত্রস্থিত কঠিন স্তর প্রায় কোটাধানেক বৎসর বা তাহারও কম কয়েক লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত আরম্ভ হইয়াছে এবং আমরা বর্ত্তমানে যে Tertiary নামধেয় ভূতাত্ত্বিক যুগে বাস করিতেছি, তাহা প্রায় ১ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা ঐ মতে আস্থা স্থাপন করিয়া শিক্ষা লাভ করিয়াছি. এই যুগ প্রারম্ভে ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান ভূতাত্ত্বিক ঘটনা হইতেছে হিমালয় পর্ব্বতের উদ্ভব, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে Indo Gangetic Plain formation. কেমন করিয়া এই দুইটী মহৎকার্য্য সমাধা হইতেছে—এবং ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ কি তাহা একটী বিরাট বিষয়—এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা আলোচিত হইতে পারে না। যাঁহারা এ বিষয় জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে Oldham সাহেব লিখিত "A Manual of Geology of India" গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। যাহা হউক, সিদ্ধান্ত এই যে, হিমালয় পর্ব্বত ও Gangetic plain formation একই সঙ্গে প্রায় পরস্পর সংবদ্ধ কারণে সংঘটিত হইতেছে এবং উপরিউক্ত মত অনুসারে উহা প্রায় ১ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে। এই Plainএর বিভিন্ন স্থানের Level, Great Trigonometrical Survey দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। নিম্নে ইহার ফল লিখিলাম।

ব্রহ্মপুত্র ভাগ।	গাঙ্গেয় ভাগ।
সাদিয়া—৪৪০ M. S. L.	বর্দ্ধমান—১০২ M S. L.
ডিব্রুগড়—৩৪৮ "	রাজমহল—৬৮ "
শিবসাগর—৩১৯ "	কাশী—২৫৮
বুড়ামুখ (তেজপুর)—২৫৬	এলাহাবাদ—৩১৯
গৌহাটী—১৬৩ "	আগ্রা—৫৫৩
গোয়ালপাড়া—১৫০ "	দিল্লী—৭১৫
	মিরাট—৭৩৯
	সাহারণপুর—৯০৭,

সাহারণপুর হইতে লুধিয়ানার রাস্তায় গাঙ্গেয় ও সৈন্ধ্য ভাগ মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থানের Level ৯২৪ ফিট M. S. L পাওয়া গিয়াছে। এবং এই স্থানই এই দুইটী ভাগ মধ্যে শিখর দেশ। (১) যে Levelএ এই সর্ব্বোচ্চ শিখর দেশ পাওয়া যাইতেছে তাহাই এই plain formationএর তৎকালীন পরিণতি বলিয়া মনে করিতে হইবে। এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে—কিঞ্চিৎ ন্যূন ১ লক্ষ বৎসরে Mean Sea Levelএর উপর ৯২৪ ফিট স্থূল স্তর সঞ্জাত হইয়াছে। উপরিউক্ত পাটলিপুত্র, সারনাথ ও প্রয়াগে প্রত্যক্ষ সত্য দর্শন করিয়া টেট্ সাহেব লিখিত বয়স গণনার সত্যতাও কতকটা উপলব্ধ করা যায়। ইহা হইতেও—১০০ বৎসরে ১ ফুট করিয়া স্তর পড়িতেছে দেখা যায়।

এক্ষণে শ্রুতিনাথ বাবু যে উক্তিটী করিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে কি প্রমাণ তাঁহার আছে—উপস্থাপিত করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

উপরিউক্ত স্তর-বিন্যাসের বয়স কেবল Indo-Gangetic Plain সম্বন্ধেই প্রযোজ্য—অপর কোথাও প্রযোজ্য নাও হইতে পারে। আমি আমার প্রবন্ধ মধ্যে যে Laterite ও লালমাটির কথা বলিয়াছি—এবং যাহা মেদিনীপুর ও চন্দ্রকোণা প্রভৃতি স্থানে দেখা যায় লিখিয়াছি—তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন কারণে উদ্ভূত হইয়াছিল এ কথা বলিয়াছি। পাঠকগণ যেন মনে না করেন—যে এখানেও ঐ নিয়মই প্রযোজ্য। বস্তুতঃ আমি মনে করি যে উহার একবার যে formation হইয়া গিয়াছে, তাহা আর বর্দ্ধিত হইতেছে না। কালপ্রভাবে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্তই হইতেছে।

তৃতীয়। আমি দেখিতেছি যে আমার উক্তি "এই দেশের মৃত্তিকা এত নরম ও পিচ্ছিল যে প্রকাণ্ডকায় হস্তী কেন, মানুষেরও অনেক সময় চলা-ফেরা করা কঠিন।" শ্রুতিনাথ বাবুর বিশেষ উপহাসের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে—কেননা তিনি কাশীজোড়া ও মহিষাদলের হস্তী সকলকে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করিতে দেখিয়া থাকেন। আমি একটীমাত্র কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি—সেটী এই যে, এই সব হস্তী

(১) Sheet No 79—Levelling of Precision in India.

(২) ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—পৃথিবীর বয়স।

(১) The highest level recorded by the Great Trigonometrical Survey between the Ganges and the Indus on the road from Saharanpur to Ludhiana, is 924 feet and this may be fairly taken as the summit level at the lowest part of the watershed between the Indus and the Ganges. p. p. 427-28—A. Manual of Geology of India by R. D. Oldham.

মানুষের মত স্বচ্ছন্দ বাসের স্থান কি তমলুক না ইহাদিগকে দড়ী দড়া দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হয় ও অঙ্কুশ মারিয়া চলা-ফেরা করাইতে হয়? ইহার উত্তরে তিনি কি বলিতে চাহেন? যে ঘটনাটি লইয়া আমি ঐ উক্তি করিয়াছি তাহা এই যে, মহাভারতে বলা হইয়াছে—যে তাম্রলিপ্তের রাজা ১০০০ সহস্র পর্ব্বত প্রমাণ কুঞ্জর মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রুতিনাথ বাবু নিশ্চয়ই কালিদাসের (১) রঘুবংশ পড়িয়াছেন। তাহাতে দেখিতে পাইয়াছেন যে তাঁহাদের দেশের কপিশা (কাঁসাই) নদী পার হইবার সময় রঘুর সৈন্য তথায় বহুকাষ্ঠ ও পাথর স্বভাবতঃ পাওয়া গেলেও "দ্বিরদ সেতু" দ্বারা পার হইয়াছিল। আশা করি তিনি যোগেশ বাবুর ইতিহাসখানিও পড়িয়াছেন। তাহাতে দেখিয়াছেন যে গঙ্গারিডি রাজ্যে (যাহা যোগেশ বাবু তাম্রলিপ্ত রাজ্যের সঙ্গে অভিন্ন মনে করিয়াছেন) বহুতর হস্তী পাওয়া যাইত (২)। এই সব অধীত বিদ্যা হইতে তাঁহার কি মনে হয় নাই যে তাম্রলিপ্ত রাজ যে ১০০০ সহস্র পর্ব্বত-প্রমাণ কুঞ্জর দিয়াছিলেন তাহা তিনি হরিহর ছত্র বা ময়ূরভঞ্জ হইতে খরিদ করিয়া দেন নাই? এগুলি তাঁহার রাজ্যে স্বচ্ছন্দে পাওয়া গিয়াছিল। সে রাজ্যটী কি তমলুক কি তাহার নিকটবর্ত্তী পলিপ্রধান স্থলে? এক একটী পূর্ণ বয়স্ক হস্তীর ওজন প্রায় ৮/ মণ, পর্ব্বত-প্রমাণ কুঞ্জর হইলে তাহার ওজন এক একটার ১০০/০ মণ হওয়া বিচিত্র নহে, ও পৃষ্ঠের বোঝা সমেত ৪টন বা ১১০/০ মণ হওয়াই সম্ভব। ইহারা চলিবার সময় প্রত্যেক পদ দ্বারা মাটির উপর প্রতি বর্গ ফুট প্রায় ১টন চাপ দেয়। এই চাপ লইয়া চলা-ফেরা করা যখন "তাম্রলিপ্তাখ্য" রাজ্য "লবণাকর" কি সমুদ্রগর্ভে ছিল তখন কি তাহাতে সম্ভব ছিল? গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশের পলিমাটিতে যে সমস্ত সৌধ নির্ম্মাণ করেন তাহার ভিত্তির নিম্নে মাটির উপর চাপ বর্গ ফুটে ১ টন করিয়া দিতেন, কিন্তু ভুয়োদর্শনের ফলে অধুনা ½ টনের বেশি বর্গফুটে allow করেন না। যদি তমলুক দেশ পাথরের দেশের মত ভারসহ হইত তবে শ্রুতিনাথ বাবু উল্লিখিত "বর্গভীমার" মন্দির তৈয়ার করিতে তাহার দেওয়ালগুলি ৯ ফিট পরিসর বিশিষ্ট ও তৎনিম্ন ভিত্তিমূল বৃহৎ কাষ্ঠ দ্বারা piling করিতে হইত না। এই নরম মৃত্তিকা বশতই কাঁথী মহকুমায় পিছাবনী ও রামনগরে Slince তৈয়ার করিবার সময় তাহার ভিত্তিমূলে শাল কাষ্ঠের Grillage Piling ব্যবহার করিতে হইয়াছিল।

তাহার পর "পিচ্ছিলের" কথা। শ্রুতিনাথ বাবু বোধ হয় অস্বীকার করেন না যে তাঁহার দেশ পলিমাটিতে তৈয়ারী—আবার ঐ দেশটী লবণাক্তও। ইহার সঙ্গে একটু জল সংযোগ হইলে কি হয় জিজ্ঞাসা করি? উপাধি দেখিয়া অনুমান করি যে তিনি শিক্ষকতা কার্য্য করেন—তাঁহার কোন ছাত্র যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত 'মহাশয়, ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলে হাতী পাওয়া যায়—হিজলী ও সুন্দরবনের জঙ্গলে পাওয়া যায় না কেন?' ইহার কি উত্তর দিতেন? আমার বিশ্বাস আমি যে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তিনিও তাহাই বলিতেন।

(১) কালিদাসের রঘুবংশম্ Canto IV
(২) মেদিনীপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মত।

শ্রুতিনাথ বাবু কতকগুলি বিখ্যাত পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহাদের অনেকের লেখার সহিত আমরাও কিছু কিছু পরিচয় আছে। কানিংহাম সাহেব ১৮৭১ সালে হুয়েন সাঙের ভ্রমণের স্থান সম্বন্ধে যে কাগজপত্র বাহির করেন তাহাই পরবর্ত্তী লেখকেরা প্রায়ই গ্রহণ করিয়াছেন। কানিংহাম সাহেবের সিদ্ধান্তের ভুল কয়েক স্থানে দেখা গিয়াছে ও পরবর্ত্তী কালে সংশোধিতও হইয়াছে। আমিও আমার প্রবন্ধ মধ্যে কানিংহাম সাহেবের সংশয়ের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি এবং তাঁহারই প্রদর্শিত পথে পুনরায় "তাম্রলিপ্ত" বন্দর অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কোন্ পণ্ডিতের কোন্ কোন্ বিষয়ে ভুল হইয়াছিল, যতদূর জানা গিয়াছে তাহা শ্রীযুত এস্. এন্. মজুমদার মহাশয় তাঁহার "Cunningham's Ancient Geography of India' নামক পুস্তকের প্রারম্ভেই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা হইতে দেখা যায় যে পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিতে গেলে ভ্রমপ্রমাদ অনেকেরই হয় এবং পরবর্ত্তী আলোচনার দ্বারা তাহা সংশোধিত হয়। ইহাতে মনীষীগণের নিন্দার বিষয় কিছুই নাই। তাঁহারা এরূপ বলিয়াছেন—ইহা কখনও ভ্রান্ত হইতে পারে না—এরূপ যুক্তি তর্কশাস্ত্রে স্থান পায় না।

মহাভারত ও পৌরাণিক আখ্যায়িকা।

মহাভারত ও পৌরাণিক যে সমস্ত উপাখ্যান "তাম্রলিপ্ত" সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ আছে, তাহা তমলুকের স্বপক্ষীয়েরা তমলুকেই আরোপিত করিবার এ যাবত চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে সেগুলি যদি বর্দ্ধমান (বর্ত্তমান হুগলী) জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রাম বা তাহাণ্ডতে আরোপিত করা যায় তবে মহাভারত নিশ্চয়ই অশুদ্ধ হইয়া যাইবে না। বরং যেগুলি নিতান্ত কুয়াশাচ্ছন্ন ও কণ্টকিত আছে, তাহার কতক কতক পরিষ্কার দেখা যাইবে। একটী উদাহরণ দিতেছি। হেমচন্দ্র অভিধানে "দামোলিপ্ত" বা "বিষ্ণুগৃহ" বলিয়া একটী দেশের নাম আছে; তাহা তাম্রলিপ্ত দেশের সহিত অভিন্ন। তাম্রলিপ্তের দামোলিপ্ত নাম কেন হইয়াছিল, এই প্রশ্নের সমাধানে কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে সম্ভবতঃ দামল জাতির প্রাধান্য ছিল বলিয়া এই দেশটীকে দামোলিপ্ত বলে। কিন্তু দামল জাতি কাহারা, তাহাদের আচার চরিত্র কিরূপ ছিল, এখন তাহারা কোথায় বাস করে, তাহার কোন সন্ধান ইঁহারা দিতে পারেন না। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি যে, এই দামোলিপ্ত শব্দের অর্থ "দামোদর" নদ দ্বারা লিপ্ত দেশ কি হইতে পারে না? দামোদরের অন্য পৌরাণিক নাম কি "বিষ্ণু" নহে? দামোদরের দ্বারা লিপ্ত দেশকে "বিষ্ণুগৃহ" বলিলে কি অন্যায় হয়? যাঁহারা বর্দ্ধমান জেলায় দামোদর নদ দেখিয়াছেন ও তাহার রীতি চরিত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, রাণীগঞ্জ হইতে এই নদটী বরাবর প্রায় পূর্ব্বমুখে বর্দ্ধমানের সন্নিকটে পাল্লাগ্রামের প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত গিয়া তথা হইতে একেবারে দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহাকে অনেক মূল্যবান কাগজপত্রে "The Great Sou-

therly bend of Damodar" বলে। দামোদর এই মুখে চিরকাল প্রবাহিত ছিল না। যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে, দামোদর নদটী বর্দ্ধমান সহরটীকে কেন্দ্র করিয়া ভাগীরথী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত বাহু দ্বারা যুগ যুগ ধরিয়া কালনা হইতে রূপনারায়ণ পর্য্যন্ত তালবৃন্তের ন্যায় একটী অর্দ্ধ-বৃত্তাকার ভূখণ্ড তৈয়ার করিতেছে। ইহার একটী শাখা এককালে কালনার নিকট ভাগীরথীতে মিলিত। তৎপর ৬০০।৭০০ বৎসর পূর্ব্বে একটী শাখা কুন্তি নাম গ্রহণ করিয়া সপ্তগ্রামের নিকট নৌ-সরাইতে মিলিত। ইহার আর একটী শাখা ৩০০ বৎসর পূর্ব্বেও উলুবেড়িয়ার ১ মাইল উত্তরে সিজবেড়িয়া গ্রামের নিকট মিলিত। ইহার আর একটী শাখা বর্ত্তমানে ফলতার সম্মুখে হুগলী নদীতে মিশিতেছে। বৈদেশিক নাবিকগণও উহাকে নানাস্থানে দেখিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের অঙ্কিত মানচিত্রে লেখা আছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, এই বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড যে দামোদর দ্বারা লিপ্ত তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না—ইহাকে "দামোলিপ্ত" বলিলে কি হেমচন্দ্রের অভিধান বা মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যায়? এই প্রকার দামোলিপ্ত দেশের ভিতরেই পুরাতন সপ্তগ্রাম ও তালাণ্ডু নামক স্থানগুলি অবস্থান করিতেছে। সুতরাং বিশেষ কষ্ট-কল্পনা না করিয়াও একটী দেশের আদর্শ খুঁজিয়া পাই যাহা তাম্রলিপ্ত বা তামা দিয়া লেপা দেশের সহিত সম্পৃক্ত এবং তাহাকে দামোলিপ্ত বলিলে ঐ শব্দের যৌগিক অর্থের কোন ব্যতিক্রম হয় না।

মানচিত্র

শ্রুতিনাথ বাবু কতকগুলি মানচিত্রের কথা উল্লেখ করিয়া গঙ্গানদী যে কালনার নিকট হইতে একটী শাখারূপে রূপনারায়ণ নদে আসিয়া মিলিত, এরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন। এ সমস্ত নাবিকগণের মানচিত্র; কখনও জরীপ করিয়া অঙ্কিত হয় নাই। ওগুলি Sketch মাত্র। Rennell সাহেবের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতেও মাপ জোপ হয় নাই। ডি ব্যারোর মানচিত্রে রূপনারায়ণ নদকে যে "গঙ্গা" বলিয়াছে—তাহা গঙ্গাখালি খালের নামান্তর মাত্র, এই খাল তমলুক সহরের নিকট রূপনারায়ণে মিশিয়াছে। বাস্তবিক তখন এই নদকে নানা নামে লোকে জানিত, তাহা বিদেশী বণিকদের মনে রাখা সম্ভব নহে। তজ্জন্য নিকটস্থ দানজাদা খালের নাম হইতে ডি ব্যারো এ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন মনে হয়। কালনার কাছে দামোদর নদের একটী শাখা "গাঙ্গুর" নামক নদী মিশিয়াছে। আর দামোদর নদ ও রূপনারায়ণ নদের চিরকাল নানা স্থান দিয়া সংযোগ আছে। এই জন্ত ডি ব্যারোর ভ্রান্ত হইয়াছে। রেনেল সাহেব বলিয়াছেন প্রাচীন নাবিকগণ ভ্রমক্রমে এই নদীকে "পুরাতন গঙ্গা" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। (১) বাস্তবিক স্থানের Level দেখিতে গেলে গঙ্গা নদীর পক্ষে বর্দ্ধমানের নিকট দিয়া প্রবাহিত হওয়া সম্পূর্ণই অসম্ভব।

(১) মেদিনীপুরের ইতিহাস পৃষ্ঠা ৩৩ শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু।

বর্ত্তমান সময়ের ইতিহাস

এইগুলি আলোচনা করিলে কয়েকটী বিষয় বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যথা—

(১) তামলুকের বা তথাকথিত তাম্রলিপ্তের রাজার কোন দানপত্র বা তাম্রশাসন কোথাও পাওয়া যায় নাই। ইহার কোন কারণ যোগেশ বাবু বা শ্রুতিনাথ বাবু পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত করেন নাই।

২। তামলুকের বা তাম্রলিপ্তের রাজাদের নামাঙ্কিত কোন মুদ্রা এ পর্য্যন্তও কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। যদি কখনও ইঁহারা স্বাধীন নরপতি থাকিতেন তবে কোন মুদ্রা থাকাই সম্ভব ছিল; তাহা কিছু নাই।

৩। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে কাঞ্চীপতি রাজেন্দ্র চোল সমস্ত রাঢ় দেশ, ও পুণ্ড্রবর্দ্ধন জয় করেন। তাঁহার এই জয়বার্ত্তা তিরুমালাই শিলালিপিতে খোদিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তমলুকের নাম নাই।

৪। অনঙ্গ ভীমদেব উড়িষ্যার রাজা থাকা সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কাসবাস নদী হইতে বড় দানই (বুড়ো দামোদর) নদ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ জয় করেন। তাঁহার এই জয়ের ফলেই "মাদলা পঞ্জীতে" এই দেশটীকে দণ্ডপাঠ ও বিশিতে বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ভিতর তমলুকের নাম নাই। শ্রুতিনাথ বাবু মনে করেন, তখন ইহা স্বাধীন রাজ্য ছিল এবং তাহা অনঙ্গ ভীমদেব জয় করিতে পারেন নাই। ইহার প্রমাণ—মাত্র অনুমান। এই মাদলা পঞ্জীর লিখিত বিশিগুলি পরে পরগণা নামে সরকারী কাগজপত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যথা :—

ময়না চোর	নাপোয়া চোর
তুরকা চোর	কাঁকরা চোর
কুড়ুল চোর	ভেলোয়া চোর
দাঁতুন চোর	নারাঙ্গা চোর
এগরা চোর	কামার্দ্দা চোর

কথা এই যে বিশিগুলির সহিত "চোর" শব্দটী কেন যোগ হইয়াছিল। কাঁথী ও বালেশ্বর জেলায় "চোর" বা "চোল" শব্দ সমুদ্র উপকূলস্থ লবণাকর জলাভূমিগুলিকে বুঝায়। এক্ষণে পাঠকবর্গকে মেদিনীপুর জেলার মানচিত্রখানি সম্মুখে রাখিয়া তাহার উপর ময়না, এগরা, দাঁতুন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানগুলি চিহ্নিত করিতে অনুরোধ করি। যদি ঐ স্থানগুলি অনঙ্গভীমদেবের সময় লবণাকর জলাভূমি থাকে তবে তমলুক মহকুমার দক্ষিণ পূর্ব্বাংশ ও কাঁথীর উত্তর পূর্ব্বাংশের অবস্থা সমুদ্রের মধ্যে হওয়াই সম্ভবপর হইয়া পড়ে। কাঁথীর পক্ষে একটী বিশেষ সুবিধার বিষয় আছে, তাহা ইহার বালিয়াড়ী। এই পর্ব্বতাকার বালুকা স্তূপ রসুলপুর নদীর মোহানা হইতে বালেশ্বর জিলার ভিতর চলিয়া গিয়াছে। ইহাই তৎসময়ে "মালঝিটা" দণ্ডপাট বলিয়া বর্ণিত ছিল মনে হয়। কিন্তু তমলুকের পক্ষে সে সুবিধা নাই; ইহা কোন বালিয়াড়ী পাহাড় দ্বারা সংরক্ষিত হইতেছে না। কল্পনাচক্ষে তখনকার অবস্থা দর্শন করিলে কাঁথার বালিয়াড়ীর উত্তরাংশে অনেকদূর

তমলুক সব ডিভিজনের Ground Levelর মানচিত্র

পর্য্যন্ত একটী Lagoon বা জলাভূমি ছিল বলিয়া বোধ হয়। ইহার প্রায় ৩৫০ বৎসর পর "দেশবাল বিবৃতির" লেখক জগমোহন পণ্ডিত মহাশয় তমলুককে "লবণানামাকর" বলিয়াছেন ও ইংরেজ রাজত্বের সময়ও তমলুকের অনেকাংশে লবণ উৎপন্ন হইত। এই লবণ তৈয়ার করিতে "খালিয়াড়ী" কাটিয়া জমীতে জল লইতে হইত। ইহার বিস্তারিত বিবরণ যোগেশ বাবুর ইতিহাসে দ্রষ্টব্য। সুতরাং যে দেশটী আধুনিক যুগেও অনেকাংশে জলা ছিল—তাহা ইহার ৫০০।৬৫০ বৎসর পূর্ব্বে অনঙ্গ ভীমদেবের সময় কি স্বাধীনরাজ্য ছিল বলিয়া মনে হয়?

৫। বাদশাহ আকবরের সময় রাজা টোডরমাল এই নব বিজিত দেশের রাজস্ব আদায়ের সুবিধাকর বন্দোবস্ত করিবার জন্য সমস্ত দেশগুলিকে বিভিন্ন "সরকারে" ভাগ করেন। ইতিহাসে লেখে ১৫৮২—১৫৯১ খৃষ্টাব্দ মধ্যে এই কার্য্য সম্পাদিত হয়। এই সময়ে সরকার মান্দারণের অধীন মহিষাদল নামক একটী মহাল ও একটী পরগণা দেখা যায় ও তমলুক নামে একটী মহাল সরকার জলেশ্বরের অধীন দেখা যায় (১)। দুইটী স্থানই পাশাপাশি অবস্থিত। উভয়েরই একদিকে রূপনারায়ণ নদ ও অপরদিকে হলদী নদী। কেমন করিয়া একটা গেল মান্দারণের ভিতর ও আর একটি গেল জলেশ্বরের ভিতর? এই প্রশ্নের সমাধান করিতে গেলে, মনে হয় হুগলী নদীর আধিপত্য তখন সরকার মান্দারণের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। ইহার ভিতর যে সমস্ত দ্বীপ উদ্ভূত হইত তাহাও ঐ সরকার তত্ত্বাবধান করিতেন। সম্ভবতঃ মহিষাদল পরগণা ও মহাল এইরূপ একটী দ্বীপ ছিল জন্য সরকার মান্দারণের অধীন হইয়া পড়িয়াছিল।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে "বর্ত্তমান হলদী নদী এই টেঙ্গরাখালি হইতে আরম্ভ হইয়া হুগলী নদীর সহিত (রেনেলের মানচিত্র অনুসারে) মিলিত হইয়াছে। তৎকালে ইহার যে অংশটী তমলুকের নিকট হইতে টেঙ্গরাখালি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, পরবর্ত্তীকালে উহা বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় পূর্ব্বোক্ত দ্বীপটি মেদিনীপুর জেলার ভূমিখণ্ডের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে। ঐ দ্বীপটি এখনকার সুতাহাটা ও মহিষাদল থানা।" সুতরাং আকবরের রাজস্ব বিভাগের সময়ে তমলুকের পার্শ্ববর্ত্তী মহিষাদল একটী দ্বীপ মাত্র ছিল। (২)

ইহার প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে গাশতল্ডির মানচিত্রে দেখা যায় যে, তৎকালে রূপনারায়ণ নদ দুইটী প্রশস্ত শাখায় বিভক্ত হইয়া হুগলী নদীর সহিত মিলিত হইত। এই দুইটী শাখার মধ্যবর্ত্তী ভূমিখণ্ড একটী দ্বীপের ন্যায় পরিলক্ষিত হইত। (৩) আমি এই প্রবন্ধের সঙ্গে যে Index map দিয়াছি তাহাতে দেখা যাইবে যে, পুরুষোত্তমপুর হইতে তমলুক পর্য্যন্ত কাঁসাই নদীর এখানে শাখা বিদ্যমান ছিল। গাশতল্ডির পরবর্ত্তী কালেও তমলুক একটী দ্বীপ ছিল। সুতরাং দেখা যায় যে আকবরের রাজস্ব বিভাগের কিছু দিন পূর্ব্বে তমলুকও মহিষাদল অপেক্ষা এ বিষয়ে বড় সৌভাগ্যশালী ছিল না।

জগমোহন পণ্ডিতের লেখা "দেশাবলী বিবৃতি"। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থখানির আবিষ্কর্ত্তা। তিনি লিখিয়াছেন যে, এইখানি ১৬০৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে পাটনা নগরের সুবাদার কি জায়গীরদার বিজল দেব নামে একজন চৌহান রাজার আজ্ঞায় লিখিত। ইহাতে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি আছে।

মণ্ডলঘট্ট দক্ষিণে চ হৈজলস্য চ হ্যুত্তরে।
তাম্রলিপ্তাখ্যা দেশশ্চ বাণিজ্যং চ নিবাসভূঃ॥
দ্বাদশ যোজনৈর্যুক্ত রূপনদ্যাঃ সমীপতঃ।
মৎস্যা গব্যানি যত্রৈব সম্পদ্যন্তে ভূশং নৃপ॥
কেচ দামলকে দেশং গায়ন্তি দেশবাসিনঃ।
লবণানামাকরশ্চ যত্র তিষ্ঠতি ভূরিশঃ॥
প্রণালী দ্বিত্রিকা তত্র সদা বহতি ভূমিপ।
মালংগনা মনুষ্যাণাং নিবাসং বসতি কিল॥
প্রায় সমুদ্রবেগশ্চ তাম্রলিপ্ত নদীষু চ।
দিবানিশং কদাচিন্ন বিশ্রাম্যতি মহীপতে॥

ঐতিহাসিক যুগে জগমোহন পণ্ডিত মহাশয়ের গ্রন্থেই প্রথমতঃ তমলুকের নাম "তাম্রলিপ্ত" পাওয়া যায়। কিন্তু তৎকালীন মোগল দরবারের কাগজপত্রে উহার নাম তমলুকই লিখিত ছিল। এ দিকে এই জেলার একজন বিখ্যাত পণ্ডিত মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী মহাশয় ১৫৭৭ খৃঃঅব্দে (১৪৯৯ শকে) তাঁহার প্রণীত চণ্ডীতে তমলুকই লিখিয়াছেন।

গোকুলে গোমতী নামা, তমলুকে বর্গভীমা
উত্তরে বিদিত বিশ্বমায়া।

জগমোহন পণ্ডিত মহাশয়ের গ্রন্থে মণ্ডলঘাট—"মণ্ডলঘট্ট", হিজলী—"হৈজল", এবং তমলুক—"তাম্রলিপ্ত", আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা দেখা যায়, উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের লিখিবার ভঙ্গীই হইতেছে নাম বিকৃত করিয়া লেখা। এমতাবস্থায় যখন দেশের পণ্ডিত ও সরকারী কাগজপত্রে ঐ স্থানের নাম তমলুক বলে, তখন একজন বিদেশীয় লোকের বৃত্তিভোগী পণ্ডিত মহাশয়ের কথা প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করা যায় না।

ত্রৈতিনাথ বাবু "বিশ্বকোষ" হইতে একটী নূতন শ্লোক সংগ্রহ করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন—

তাম্রলিপ্ত-প্রদেশশ্চ বণিজশ্চ নিবাসভূঃ।
দ্বাদশ যোজনৈর্যুক্তো রূপনদ্যা সমীপতঃ॥

পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক দেখিবেন যে জগমোহন পণ্ডিত মহাশয়ের উপরিউদ্ধৃত শ্লোকগুলির দ্বিতীয় ও তৃতীয় লাইনের সহিত "বিশ্বকোষ" ধৃত শ্লোকটীর অত্যাশ্চর্য্য মিল আছে। কেবল তাম্রলিপ্তাখ্যা দেশশ্চ স্থানে তাম্রলিপ্ত প্রদেশশ্চ আছে। ইহা প্রথম শ্লোকের হুবহু নকল জন্য ইহার অপর আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

এ সময়ের পরের ইতিহাসে তমলুকের নাম কেমন করিয়া তাম্রলিপ্ত হইয়াছে তাহার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পণ্ডিতপ্রবর

(১) মেদিনীপুরের ইতিহাস—শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু পৃ ১৩-১৫
(২) মেদিনীপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু পৃষ্ঠা ৩৩
(৩) ঐ ঐ ঐ

কানিংহাম সাহেব যে ভ্রমটী করিয়াছিলেন তাহাই বর্ত্তমান কালের ইতিহাসের ভিত্তি। কিন্তু দুঃখের বিষয় কানিংহাম সাহেব তমলুক যে হুয়েনসাঙ বর্ণিত তমোলিতির সহিত না দিকে না দূরত্বে মিল হইতেছে তাহা বলিয়া তাহার একটী কৈফিয়ত রাখিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান লেখকদের ভিতর সেরূপ সংশয়ের আভাস পাওয়া যায় না।

পুরাতন চিহ্ন

তমলুকে ও নিকটবর্ত্তী স্থানে মাঝে মাঝে পুরাতন মুদ্রা পাওয়া যায়—ইহা সমুদ্র হইতে উদ্ভূত সকল দেশেই সম্ভব। পাকা ইঁটের কাজ ও পাথরও নানা কারণে পাওয়া যাইতে পারে—কেননা তমলুকে রেশম ও লবণের কারবার জন্য স্থানে স্থানে কুঠী, ঘাট, Revetment ও ইমারতাদি তৈয়ার হইত, ও মাঝে মাঝে জলপ্লাবনে তাহা বিধ্বস্ত হইয়া নিকটস্থ খাল বা খাঁড়িতে নীত হইত। উহা পরে জমিতে পরিণত হইয়া তথায় পুষ্করিণী আদি খুঁড়িবার সময় পুনঃ প্রকাশ পাইতে পারে। যদি একটা সম্পূর্ণ সৌধ বা তাহার 'পোতা', 'সান', প্রভৃতি বাহির হইত, তাহা হইলে অনুসন্ধান করিবার বিষয় হইত। এ রকম কোন প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই।

বর্গভীমার মন্দির

ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সকলেই যে একমত তাহা নহে। গঠন-বৈচিত্র্য উহার বয়সের সম্পূর্ণ নিদর্শন নহে। কলিকাতার অনেক সৌধ Roman এবং Grecian Modelএ প্রস্তুত হইয়াছে; তাহা হইতে উহার বয়স ঐ সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে মনে করা নিশ্চয়ই ভুল। ঐগুলি কতখানি, ও কি প্রকারের, জব্য প্রস্তুত হইয়াছে—তাহাই উহার বয়সের নিদর্শন। আমার বন্ধু-বান্ধবের ভিতর অনেকেই ঐ মন্দিরটি দেখিয়াছেন। তাঁহারা ইহার বয়স ৩০০।৩৫০ বৎসরের অতিরিক্ত বলেন না। প্রাচীন কালে যখন Crane, Differential pulley প্রভৃতির ব্যবহার ছিল না, তখন ভারি কাঠ ও পাথর উত্তোলন জন্য মাটির দ্বারা ঘোরান Inclined Plane তৈয়ার করিয়া ঐ কার্য্য করা হইত। বড় বড় পাথরের প্রস্তুত মন্দিরাদিতে এই উপায়ই অবলম্বিত হইত। প্রস্তুত শেষে মাটির রাস্তাটি কাটিয়া মন্দিরের চারি পার্শ্বে রাখা হইত, ও তদ্দ্বারা চতুর্দ্দিকে বেদী তৈয়ার হইত। সুতরাং একটী বৃহৎ মন্দির প্রস্তুত করিতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটী পুকুর ও একটী বেদী আপনিই গড়িয়া উঠিত। এ প্রকার বেদীকে কেহ যদি বৌদ্ধ স্তূপ বলেন, বাধা দিবার কি উপায় আছে?

নৌকা

আমার কথা "এখানে এখন নৌকা যায় না" প্রতিনাথ বাবু অবিশ্বাস করিয়াছেন, কেননা—তিনি অনেক নৌকা তমলুকের নিকট দেখেন, যদিও ক্ষুদ্র ষ্টীমারখানি যাইতে পারে না। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে জাহাজ প্রস্তুতের কারবার সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় বিভিন্ন প্রকারের নৌকার বিভিন্ন নাম লোকের আর জানা নাই। এক "নৌকা" কথা দ্বারাই প্রায় সর্ব্বপ্রকার জলযানই বুঝাইতে হয়। আমি যে প্যারাতে ঐ উক্তিটী করিয়াছি, তথায় একটী বন্দরের ক্রমিক বিবর্ত্তনের বিষয় লিখিতেছিলাম এবং বলিয়াছিলাম "সে স্থানটী যদি নৌকা, জাহাজ, প্রভৃতির পক্ষে দুরধিগম্য হয়" ইত্যাদি এবং প্রসঙ্গের মাঝখানে ঐ উক্তিটী করিয়াছি। ইহা দ্বারা পাঠকগণের অপর সকলেই বোধ হয় বুঝিয়াছেন যে আমি এখানে যে "নৌকার" কথা বলিয়াছি তাহা জাহাজ জাতীয় নৌকা—ডোঙ্গা, শালতী, পানসী জাতীয় নৌকার কথা নহে। যেখানে ক্ষুদ্র ঘাটাল ষ্টীমারখানি যায় না—সেখানে মৎবর্ণিত নৌকাও যাইতে পারে না।

রাস্তা-ঘাট

ইহার বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক, কেন না District Gazetteerএ উহার সমস্ত সংবাদই আছে। পাঁশকুড়ার নিকট দিয়া উড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোড মাত্র ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তৈয়ার হইয়াছে—ও রূপনারায়ণ হইতে উলুবেড়িয়া অংশ ১৮২৯ খৃঃ অঃ শেষ হইয়াছে। এই রাস্তা অনেকদিন পর্য্যন্ত কাঁচা ছিল ও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মাত্র ইহাতে পুল নির্ম্মিত হইয়াছে ও metalling হইয়াছে। তমলুক হইতে পাঁশকুড়ার রাস্তা অনেকদিন পর প্রস্তুত হইয়াছে—কিন্তু খালগুলির উপর সাঁকো অনেকদিন তৈয়ার হয় নাই। তমলুক কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বেও একটী দ্বীপ ছিল ইহা এই প্রবন্ধ মধ্যে দেখাইয়াছি। তমলুক হইতে কাঁথীর রাস্তা মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তৈয়ার হইয়াছে—এ রাস্তায় বাণিজ্য-সম্ভার যাতায়াত করে না। Renell সাহেবের মানচিত্রে একটী কাঁচা রাস্তা ধনিয়াখালি হইতে আমতা ও বাগনান হইয়া তমলুক পর্য্যন্ত আসিয়াছে—দেখা যায়। আমি ঐ রাস্তা নারিট হইতে বাগনান পর্য্যন্ত দেখিয়াছি। উহা অপ্রশস্ত, এবং গরুর গাড়ীর উপযোগী নহে, এবং বর্ষাকালে প্রায় অচল হইয়া উঠে। রেনেলের ম্যাপে তমলুকে আর কোন রাস্তা নাই।

পুরাকীর্ত্তি

তমলুকে যদি হুয়েন সাঙ বর্ণিত মন্দির ও স্তম্ভ আদি আবিষ্কার করিতে হয় তাহা হইলে তাহার ভিত্তিমূল অন্ততঃ ২৫।৩০ ফিট নীচে দেখিতে হইবে। সে স্থানের Level ১৫'০।২০'০ হইয়া পড়ে এবং তাহার গৃহতল ও ১০'০।১২'০ প্রায় হইয়া পড়ে। যখন তমলুক বসিয়া গিয়াছে বলিয়া আধুনিক কোন ইতিহাসে নাই তখন এরূপ অসম্ভব মন্দিরাদি এদেশে নির্ম্মিত হইয়াছিল মনে করিবার কোন হেতু নাই।

বৈচিত্র্য

পুরাতন দেশের কি বৈচিত্র্য তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সেখানে প্রতিপদেই ধ্বংসের চিহ্ন দেখা যায় ও বহুদূর ব্যাপিয়া নানাবিধ বিষয়ের স্মৃতি-জড়িত স্থানের ইতিহাস পাওয়া যায়। মেদিনীপুর জেলায় চন্দ্রকোণায় এরূপ আছে—কিন্তু তমলুকে নাই। ইহাই আমার "তমলুক এত ক্ষুদ্র ও বৈচিত্র্য বিহীন" উক্তির অর্থ। এখন প্রতিনাথ বাবু যে অর্থই ভাবিয়া থাকুন। অলমিতি বিস্তরেণ

জীবনের মৌ-বনে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনের মৌ-বনে যৌবন-ফুলদল গেছে গো ঝলসি,'
ভাবের রঙিন আলো কাব্যের কাননে আর ওঠে
না উলসি'!
দক্ষিণা পবনের উদ্দাম দলনে,
কোন্ সে মরম-ময়ী নর্ম্ম-সখী বালিকার অস্ফুট ক্রন্দনে
ভেসে যায় জীবন যৌবন-হারা গান ?
ফেনিল সাগর-জলে কল-হাস্যে উচ্ছ্বসিয়া কে ধরে
গো সকরুণ তান!
লহরে লহরে তা'র বারে বারে প্রতিধ্বনি-সুরে,
জীবন-যৌবন-হারা গান জাগে অবিরাম অসীমের পুরে।
প্রাণের ঝরণা-স্রোতে ভেসে গেছে বাসনা-তরণী
কল্পনার খেয়া-তীরে,
আশার রঙিন রেখা আঁধারের পরতে পরতে
আবরিছে ধীরে ধীরে!
দূর হ'তে দূরান্তরে সেই খেয়া-তরী,
জীবনের মৌ-বনে যৌবন-ফুলদলে ভরি'
প্রকৃতির শ্যাম-কান্তি ভবন হইতে নিরালায়,
ফুল-কিশলয় ত্যজি' শ্রান্ত ক্লান্ত কপোতীর প্রায়
নিয়ে যায় নিঃশব্দ সঞ্চারে,
গভীর আঁধারে!
মলয়ের মৃদুল গুঞ্জন,
করে না শ্রবণে পশি আগেকার মত আর শ্রবণ-রঞ্জন!

হৃদয়-আকাশ ভরি' রূপালির দেয়ালী মেলায়
যেতে প্রাণ নাহি চাহে—দিগন্তের দুরান্ত দোলায়
তাই পুনঃ এসেছি ফিরিয়া,
জানি না গো কেমন করিয়া!
আবার ডেকেছে মোরে বার্দ্ধক্যের মিলন-মেলায়,
কুহেলি-গুণ্ঠন-তলে কে বসিয়া ডম্বরু বাজায়?
আশা-তরু ভগ্ন হায় দামিনীর কম্পন-সঞ্চারে,
কে চলে রে দৃপ্ত বেগে আবরিয়া চিত্ত-সবিতারে!

*

হেন অসময়ে হায় কেন মোরে ডাকিলি পাগল,
কেন রে ভাঙিলি মোর মানস-আগল?
কত স্মৃতি, কত প্রীতি, অফুরান কত গান সেই আগেকার
নিঃসাড়ে প্রবেশি' তা'রা অন্তঃপুরে আনাগোনা
করে না তো আর!
বুলাইয়া জ্যোছনার তুলি বারে বারে,
নাহি আঁকে আলিপনা হৃদয়ের দেউল-দুয়ারে
আকুল মাধবী-রাতে,—কানাকানি মেঘে মেঘে যবে
আলোর ফিনিক্ ফোটে যেমতি নীরবে!

*

মোর মন-মন্দিরেতে প্রভাত-রবির শঙ্খ বাজিবে
কি আর?
অম্লান আলোক-মালা কভু কি দুলিবে উচ্চ চূড়ায় তাহার
এ ভাঙা-মালঞ্চ ঘেরি! জ্যোৎস্না-স্নাত নির্ঝরের
অভ্র-ভেদী গানের লহরী
জীবনের উদয়াস্ত দুই তট ভরি,'
চির-জনমের তরে
মিশে যাবে হৃদয়-সায়রে
মনের গহন বনে ফুটিবে নয়ন-তারা বিরাজিয়া
নবীন ছটায়;
নাচিবে অরুণ-আলো জীবন-যৌবন-হারা
পারের ভেলায়!

আমীর আমানুল্লা

আমীর আমানুল্লা ও রাণী সৌরীয়া

আমীর আমানুল্লা

শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী বি-এ

শুনিয়াছি আশৈশব পার্ব্বত্য কাবুল
নির্ম্মম দুর্দ্ধর্ষ বীরে করিছে পালন ;
"ঋক্ষ" "সিংহ" দুই প্রান্তে গর্জ্জে অনুক্ষণ
কভু এরে কভু তারে দিতে হয় কোল।
জ্ঞানভীতি, কামলিপ্সা, দ্বন্দ্ব, মিথ্যা ভুল
অষ্টে পৃষ্ঠে স্বদেশেরে করেছে বন্ধন ;
স্বার্থান্ধ কাহারা তায় জোগায় ইন্ধন ;
হে নৃপতি, চিত্তে তাই ব্যথা দিল দোল ?

রাজা তুমি প্রজাতন্ত্রে চাহ আমন্ত্রিতে
দূর করি সমাজের সর্ব্ব কুসংস্কার !
তোমার তুলনা নাহি ইতিহাস-পাতে ;
হে প্রেমিক, তোমারে গো করি নমস্কার।

প্রেম আর সিংহাসনে বাধিলে সমর
তুচ্ছ করি রাজছত্র হইলে অমর।

মধ্যভারত

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

ইন্দোর

ইন্দোর ষ্টেসনে পৌঁছার সংবাদ দিয়েই পূর্ব্ব প্রবন্ধ শেষ করেছিলাম। এবার ইন্দোরের কথা বল্‌তে চেষ্টা করব।

ইন্দোরে গিয়েছিলাম প্রবাসী সাহিত্য-সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে যোগ দিতে; সেই জন্য আগে সেই সাহিত্য-সম্মেলনের কথা বলাই কর্ত্তব্য; তারপর ইন্দোর রাজ্যের মহারাণী অহল্যা বাঈয়ের নাম স্মরণ করে থাকে। সে কথা যথাস্থানে বল্‌তে চেষ্টা করব; এখন সম্মেলনের কথা বলি।

২৫শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার ইন্দোর ষ্টেসনে যখন গাড়ী পৌঁছিল তখন বেলা দশটা। মাঝের একটা ষ্টেসনে আমরা চা-যোগ-শেষ করে নিয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গী কাশী

সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিগণ (বাম হইতে দক্ষিণে)—শ্রীযুক্ত অনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (দর্শন), শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন (বৃহত্তর বাংলা), শ্রীমতী নির্ম্মল হাজরা (মহিলা অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী), শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী (মহিলা সমিতির সভানেত্রী), শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা (বিজ্ঞান), শ্রীযুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায় (মূল সভাপতি), শ্রীযুক্ত জলধর সেন (সাহিত্য), শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় রায় চৌধুরী (শিল্প), শ্রীযুক্ত অনুকুলচন্দ্র দাস (সঙ্গীত), শ্রীযুক্ত সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (ইতিহাস), শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু (অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি)

ইতিহাস। সে ইতিহাসও যেমন-তেমন নয়—ভারতবর্ষের একটী বরেণ্য রাজ্যের ইতিহাস,—যে রাজ্য প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী অহল্যা বাঈয়ের অতুলনীয় কীর্ত্তি-কাহিনীতে সমুজ্জ্বল—যে রাজ্যের নরনারী এখনও পরম ভক্তিভরে

হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বে এ অঞ্চলে অনেকবার এসেছিলেন। তিনি আমাদের ব'লে দিয়ে গেলেন যে, আমরা যেন গাড়ীর বাম দিকের দৃশ্যের দিকে দৃষ্টি রাখি, কারণ ইন্দোর রেলপথের
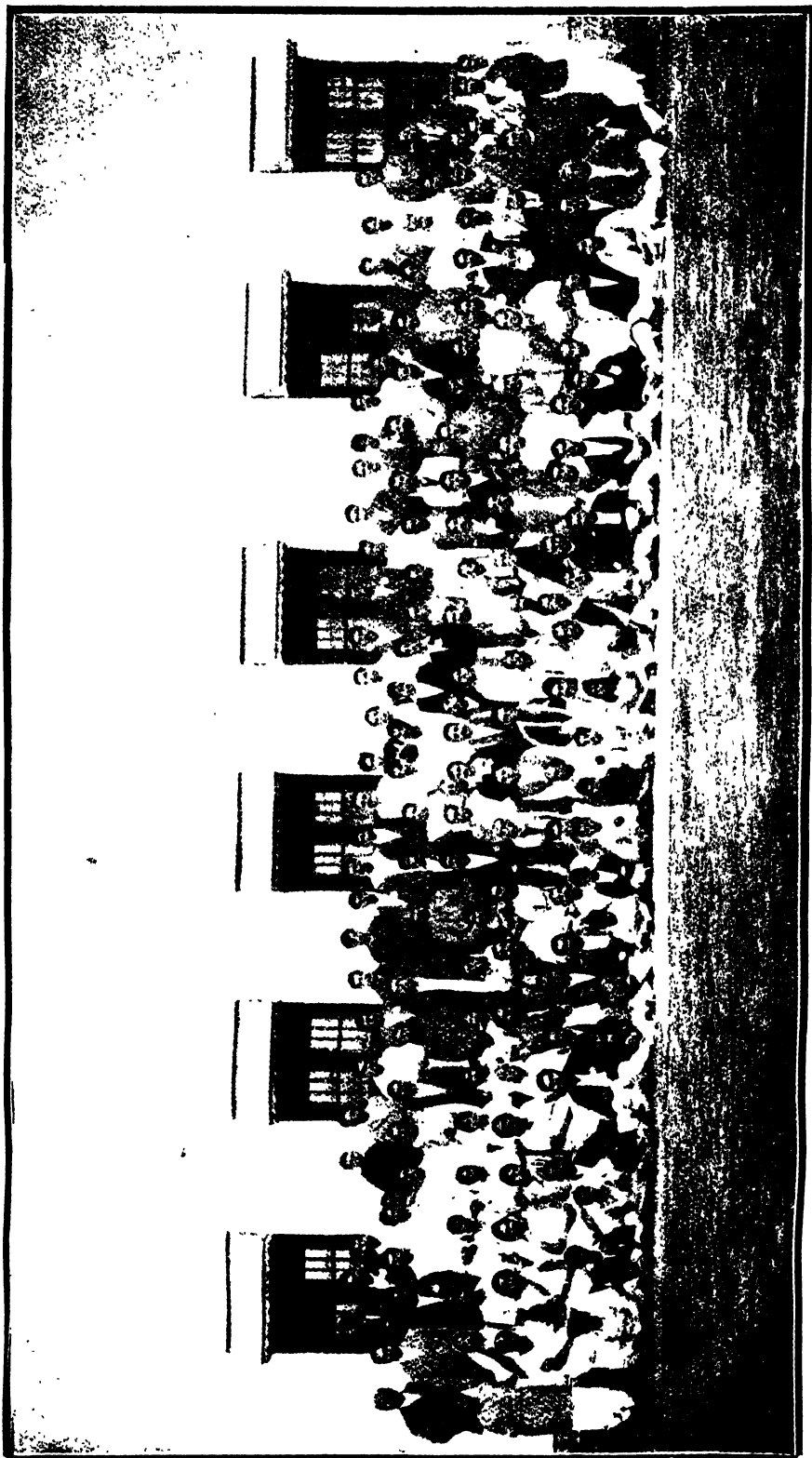
ইন্দোর সাহিত্য সম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গ

পুরাতন রাজপ্রাসাদ

এই দৃশ্য পরম রমণীয়। সত্যই তাই। রেলের রাস্তা সমতল ভূমি থেকে এত উচ্চ যে, নীচের দিকে চাইলে ভয় হয়—গাড়ী যদি একবার লাইন-চ্যুত হয়, তা হ'লে অনেক দূর নিচের খদে পড়ে আর খোঁজ খবর মিল্‌বে না, একেবারে সব শুদ্ধ বিসর্জ্জন হয়ে যাবে। এই ত সামান্য দূর পথ, ইহারই মধ্যে চারিটা টানেল ;—পাহাড় কেটে পথ তৈরী করতে হয়েছে। এই আলোর বিকাশ, আর দেখতে দেখ্‌তে সব অন্ধকার। সুড়ঙ্গগুলো খুব দীর্ঘ নয়। যাঁরা বোম্বাই থেকে পুনায় গিয়েছেন, তাঁদের মুখে শুনেছি যে সে পথে চব্বিশ পঁচিশটা এই রকম সুড়ঙ্গ আছে। সুপ্রসিদ্ধ মাও সহর পার হয়ে একটা জলপ্রপাতও দেখ্‌তে পাওয়া গেল। মাও ষ্টেসনে পৌছবার
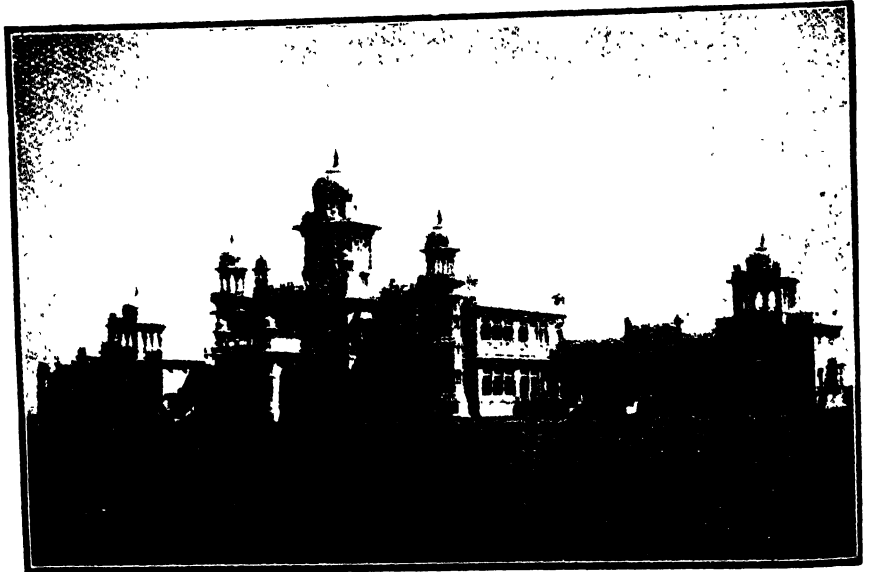
পূর্ব্বে দূর থেকে সহরটী দেখে আমার মনে হয়েছিল ঐ বুঝি ইন্দোর রাজধানী ; সুরেন্দ্রবাবু সে ভ্রম সংশোধন করে দিলেন। তবে এ কথা বল্‌তে পারি, মাও

ড্যালি কলেজ

সহরে এত কল-কারখানা, এত বড় বড় অট্টালিকা, এমন সুন্দর প্রশস্ত রাজপথ যে, নবাগতের পক্ষে এ

সহরটাকে ইন্দোর ব'লে ভ্রম করা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

ইন্দোর ষ্টেসনে আমাদের জন্য একদল স্বেচ্ছাসেবক অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা সংখ্যায় কুড়ি পঁচিশ জন হবেন;

মহারাজ শিবাজী রাও জি-সি-এস আই

তাঁদের মধ্যে তিন চার জন মাত্র বাঙ্গালী যুবক,—ইন্দোরের মেডিকেল স্কুলের ছাত্র, আর সবাই মারাঠী। আর উপস্থিত ছিলেন আমারই স্বগ্রামবাসী, গ্রামসম্পর্কে দৌহিত্র, ইন্দোর কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথ ধর এম-এ এবং এখানকার মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক শ্রীমান রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল এম-এস্‌সি, এম-বি। তাঁরা আমাদের পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন; স্বেচ্ছাসেবকরা আমাদের বাক্স বিছানা নিয়ে উধাও হয়ে গেল; আমরা ষ্টেসনের বিশ্রামাগারে গেলাম। সেখান থেকে টঙ্গায় আরোহী হয়ে সহরে প্রবেশ করা গেল; তাঁদের কাছেই শুনলাম আমাদের যেতে হবে মহারাজা শিবাজি রাও হাইস্কুলে। সেখানেই সকলের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছে; আর সেই স্কুলের প্রকাণ্ড হলেই সম্মেলনের অধিবেশন হবে; আমাদের আর হাঁটাহাঁটি করতে হবে না। মহিলা প্রতিনিধিরাও এই বিদ্যালয়ের এক অংশে থাকবেন, শিল্পপ্রদর্শনীও এই বিদ্যালয়ের কক্ষান্তরে বসবে। মূল সভাপতি এলাহাবাদ হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইন্দোর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর আতিথ্য গ্রহণ করবেন। আর খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা মহাশয় ইন্দোর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু মহাশয়ের স্কন্ধে আরোহণ করবেন। তা ছাড়া আর সকলে—স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে শিবাজী রাও স্কুলে অধিষ্ঠিত হবেন স্থির হয়েছিলো। আমাদের টঙ্গা যখন স্কুলের গেটের ভিতরে গেল, তখন দেখলাম, গেট থেকে স্কুলের অট্টালিকা পর্য্যন্ত পত্র-পুষ্প-

মহারাজ তুকাজী রাও (তৃতীয়)

পতাকায় সুসজ্জিত হচ্ছে। আমরা মনে করেছিলাম, স্কুলের বাড়ী—সে আর এমন কি বড় একটা ইমারত; কিন্তু স্কুলের গাড়ী-বারাণ্ডায় যখন আমাদের টঙ্গা পৌছিল, তখন চেয়ে দেখি, এত স্কুল নয়, এ একটা প্রকাণ্ড রাজ-প্রাসাদ। আমাদের

দেশের বড় বড় নামজাদা কলেজের বাড়ীও এর কাছে নগণ্য। এটাকে স্কুল না বলে, মহারাজ তুকাজী রাও হোলকারের বিশ্রামভবন বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকা নানা কারুকার্য্য ভূষিত; চারিদিকে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ; কক্ষগুলি সুসজ্জিত। ইন্দোরে যে কয়জন বাঙ্গালী প্রবাসী আছেন, সকলেই সেখানে উপস্থিত; তাঁরা আমাদের

মহারাজ যশোবন্ত রাও (দ্বিতীয়)

সকলকেই পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন। সে-দিনের গাড়ীতে আমরা প্রায় ত্রিশজন প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছিলাম। কেদারদাদা প্রমুখ সকলেই দ্বিতলে বড় বড় কক্ষ অধিকার করে বসলেন। অত সিঁড়ি ওঠা-নামা আমার পক্ষে কষ্টকর হবে বলে, সমিতির অধিবেশন হলের পার্শ্বেই একটি সুপ্রশস্ত কক্ষে নরেন্দ্রের ও আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হলো। অভ্যর্থনা সমিতি এই কক্ষে আটজন প্রতিনিধির অবস্থানের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। এ ব্যবস্থা উল্টে গেল, আমরা দুইজনেই সেই ঘর দখল করলাম। কয়েকখানা চারপাই, চেয়ার, বেঞ্চ টেবিল প্রভৃতি দিয়ে ঘর সাজান হয়ে গেল; আমরা চারদিনের জন্য সেই ঘরে গৃহস্থালী গুছিয়ে নিলাম। বলা বাহুল্য এ গোচগাছের মধ্যে আমি ছিলাম না। শ্রীমান্ নরেন্দ্র পাকা ওস্তাদের মত যেখানে যা করতে হয় করে ফেললেন; আর দণ্ডে দশবার আমার খবরদারী করতে লাগলেন—আমি একেবারে তাঁর নাবালক ছোট ভাই হয়ে গেলাম। তার পর চা ও মিষ্টান্ন-যোগ—তার আর দফাওয়ারী বিবরণ দিয়ে পাঠকদিগকে লুব্ধ করবো না। স্নানাহার শেষ করতে বেলা একটা বেজে গেল। আহার কিন্তু নিরামিষ; তা হলেও অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণের, বিশেষতঃ প্রতিনিধি-নিবাস বিভাগের সম্পাদক বৃদ্ধ দাদা নীলমাধব চট্টোপাধ্যায় ও পাকশালা বিভাগের সম্পাদক শ্রীযুত মোহিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় যে প্রকার মিষ্ট বচন পরিবেশন করলেন, তাতেই আমাদের পেট ভরে গেল। আর স্বেচ্ছাসেবক বিভাগের সম্পাদক শ্রীমান রুদ্রেন্দ্রকুমার এবং সাধারণ বিভাগের সম্পাদক শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ সর্ব্বক্ষণ হাজির। কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় শুনলাম আজ কয়দিন থেকে বাড়ী ঘরদুয়োর ছেড়ে এই সম্মেলনের সাফল্যকল্পে আত্মনিয়োগ করে বসে আছেন। এতগুলি সহৃদয় সাহিত্য-সেবক, প্রবাসী-বাঙ্গালীর প্রাণপণ চেষ্টায় এই সম্মেলন যে সর্ব্বপ্রকারে সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছিলো, সে কথা না বললেও চলে। আমাদের আহারাদি শেষ হওয়ার পর, শ্রীমান্ শৈলেন্দ্র বল্লেন—দাদাবাবু যত কষ্টই হয়ে থাকুক পথে, এখন আর বিশ্রাম করতে পাচ্ছেন না। এখনই লালবাগে মহারাজের প্রাসাদ দেখতে যেতে হবে। বিনা পাশে কেহই সে প্রাসাদ

দেখতে পান না। আমি পূর্ব্বাহ্নেই দশজনের পাশ নিয়ে রেখেছি। আজই দুটো থেকে চারটার মধ্যে প্রাসাদ দেখা শেষ করতে হবে। তখন আর কি করা যায়! ঘটনা এই কয় বছরের ভিতরে ঘটেছে যে, সেই মমতাজ বেগম, বাওলা-হত্যা, আমেরিকান রমণীকে, ভেতে তুলে দিশী নামকরণ করে বিবাহ, প্রভৃতি ব্যাপারে
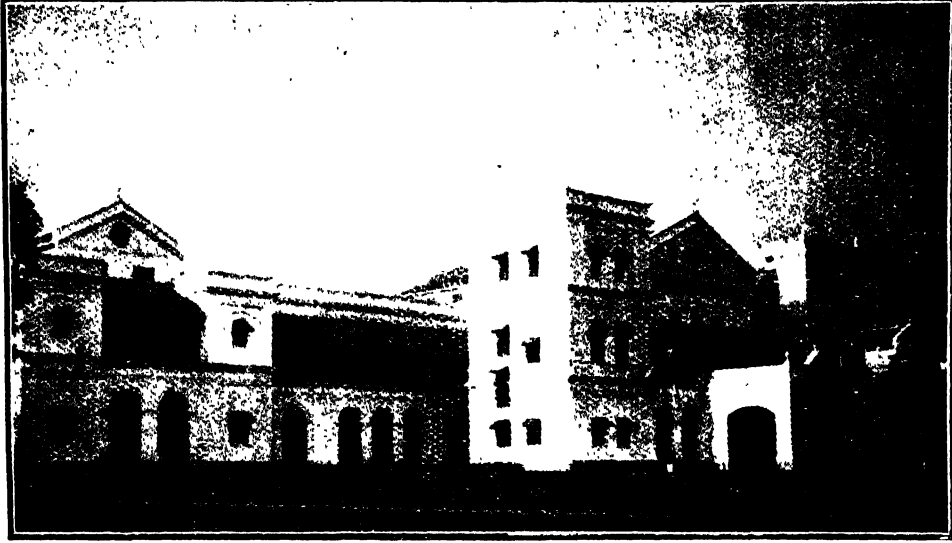
মহারাজা শিবাজী রাও হাইস্কুল

পথশ্রমের অবসাদ আর আমাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারল না; আমি, নরেন আরও পাঁচ সাত জন লালবাগের রাজপ্রাসাদ দেখতে তখনই বের হয়ে পড়লাম। এই লালবাগ প্রাসাদ সহর হতে তিন মাইল দূরে। যান সেই সনাতন। পশ্চিমের একা আর দক্ষিণের টঙ্গা—এদের আর উন্নতি হোলো না; সেই মান্ধাতার আমল থেকে একই ভাবে এরা বাহনের কাজ করে আসছে।

চারখানি টঙ্গা নিয়ে ইন্দোরের সেই ধূলি ধূসর পথ দিয়ে রাঙ্গা ধূলি উড়িয়ে চলতে লাগলাম। প্রাসাদের সম্মুখে গিয়ে সিংহদ্বার দেখে আমাদের কেমন যেন একটু অভক্তির উদয় হলো। ইন্দোর মহারাজের বাসভবনের সিংহদ্বার—আমরা মনে করেছিলাম কি যেন এক বৃহৎ ব্যাপার। ও হরি, এ একেবারে কলিকাতার বেলভেডিয়ারের লাটভবনের সিংহদ্বারের একটা নিকৃষ্ট অনুকরণ! মনটা সত্যসত্যই দমে গেল। বিশেষতঃ মহারাজ তুকাজী রাও হোলকার সম্বন্ধে এত অপ্রীতিকর আমাদের মন পূর্ব্ব থেকেই একটা বিতৃষ্ণায় ভরে ছিলো। রাজবাড়ীর প্রবেশ দ্বার দেখে সে বিতৃষ্ণা আরও বেড়ে গেল। তারপর রাজভবনে গিয়ে পাশ দেখানামাত্র রক্ষীগণ দ্বার
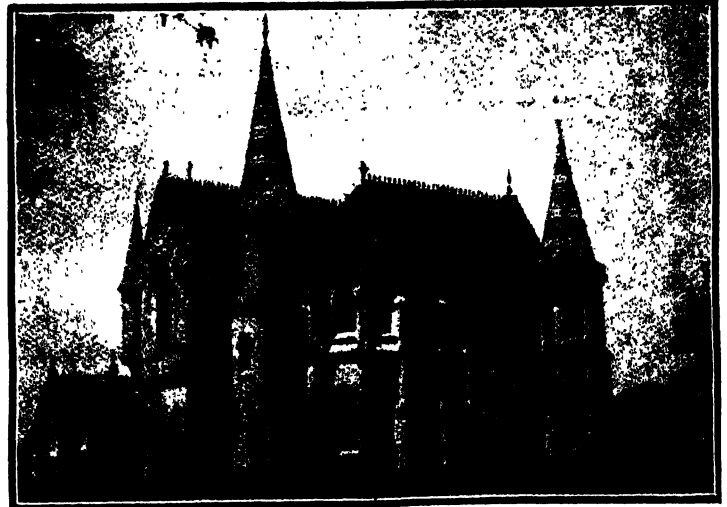
কিং এডওয়ার্ড মেডিক্যাল স্কুল

ছেড়ে দিল। তারা অনুরোধ করল, আমাদিগকে নগ্নপদে ও মস্তক আচ্ছাদন করে প্রাসাদে প্রবেশ করতে হবে। পদ নগ্ন করতে হবে কিন্তু শির নগ্ন চলবে না। শ্রীমান্ শৈলেন্দ্র

এ কথা পূর্ব্বেই আমাদের জানিয়েছিলেন। আমি 'উত্তরা'র সহকারী সম্পাদক শ্রীমান্ সুরেশ চক্রবর্ত্তীর কাছ থেকে একটা গান্ধীটুপী চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেইটা মাথায় চড়িয়ে রাজ-ভবনের সম্মান রক্ষা করা গেল।

প্রাসাদে রাজ-পরিবারের কেহই নাই। মহারাজ যশোবন্ত রাও হোলকার এখন অক্সফোর্ডে অধ্যয়ন করছেন। আর এক বছর পরেই দেশে ফিরে তিনি সিংহাসনে অধিরোহণ করবেন। মহারাণীরাও নানা স্থানে রয়েছেন। সুতরাং রাজপ্রাসাদ এখন কর্ম্মচারীদের দখলে আছে। রাজপ্রাসাদটী প্রকাণ্ড। প্রাসাদ-রক্ষকেরা আমাদের সেই বিশাল ত্রিতল প্রাসাদের প্রত্যেক কক্ষ দেখিয়ে নিয়ে বেড়াল। প্রায় সবগুলি ঘরই ইটালীয়ান মার্ব্বেল মণ্ডিত, বহু কারুকার্য্যশোভিত। দেখলে চক্ষু জুড়িয়ে যায়। নাচঘর, দরবার ঘর, বৈঠকখানা, শয়ন ঘর, স্নানের ঘর, ক্ষৌরকার্য্যের ঘর, এ যে কত তার সংখ্যা করা যায় না। অনেকগুলি ঘরে বহুমূল্য গালিচা বিছানো, অনেক বহুমূল্য ভাল ভাল ছবি দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে। সিংহদ্বার দেখে যে অভক্তি জন্মেছিলো, প্রাসাদের অভ্যন্তরভাগ দেখে মনে হলো রাজপ্রাসাদ বটে। বিলাতী ও দেশী আসবাবের সম্মেলনে প্রাসাদটী নয়ন-মনোহর হয়েছে। রাজ্য এখন পলিটিক্যাল এজেন্টের শাসনাধীনে থাকলেও তিনি মন্ত্রীগণের সাহায্য নিয়ে রাজ্যশাসন করছেন; এবং রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্য প্রাসাদাবলী যথারীতি সুসজ্জিত রেখেছেন।

রেসিডেন্সি

ক্রীশ্চান কলেজ

এই প্রাসাদ থেকে যখন বেরু-লাম, তখন চারটা বেজে গিয়েছে। এটি কিন্তু নূতন রাজ-প্রাসাদ, মহারাজ তুকাজী রাওএর আমলে নির্ম্মিত। এখান থেকে বেরিয়ে মহারাণী অহল্যাবাঈএর স্মৃতিমণ্ডিত পুরাতন রাজপ্রাসাদ দেখলাম। সে প্রাসাদে আর পূর্ব্বশ্রী নাই। ভেঙ্গে পড়ে নাই; কিন্তু সাজসজ্জা তেমন নাই। তবুও তা দেখবার মতন। কারণ এই প্রাসাদ থেকেই মহারাণী অহল্যাবাঈ রাজ্যশাসন করেছিলেন; এই প্রাসাদ হতেই তিনি যে অপূর্ব্ব শাসন-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, অনন্য-সাধারণ মহ

তুকাজী রাও হোলকার রাজ্যত্যাগী—অথবা নির্ব্বাসিত বল্লেও হয়। তিনি তাঁর নব-পরিণীতা আমেরিকার সহ-ধর্ম্মিণীকে নিয়ে এখন নাকি ফ্রান্সে বসবাস করছেন। এই সহধর্ম্মিণীর সেখানে একটি কন্যাসন্তানও হয়েছে। সিংহাসনের অধিকারী মহারাজ তুকাজী রাওএর পুত্র মহারাজকুমার

আদর্শ দেখিয়েছিলেন, ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র সমূহে যে অক্ষয়-কীর্ত্তি রেখে গিয়েছেন, কেদার বদরীনাথের যে রাজপথ নির্ম্মাণ ক'রে দিয়ে, লক্ষ লক্ষ ধর্ম্ম-পিপাসু হিন্দু নরনারীর তীর্থ-দর্শনের সুবিধা করে দিয়ে আজও শত-কণ্ঠের আশীর্ব্বাদ লাভ করছেন, সেই পুরাতন রাজপ্রাসাদের সম্মুখে নতজানু হয়ে প্রণাম করতে কার না ইচ্ছা হয়।

এই প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে বড়বাজার, ছোট-বাজার প্রভৃতি দেখে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়া গেল। তাই পাঁচটা বাজতেই আমরা স্কুলে ফিরে এলুম। তারপর চা ও মিষ্টান্ন-যোগ করে, সমাগত সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ও পুরাতন বন্ধুদের সম্বর্দ্ধনা করতেই সন্ধ্যা হয়ে এলো। তখন ডাক্তার রুদ্রেন্দ্রকুমারকে সঙ্গে নিয়ে আমি ও নরেন্দ্র আবার পদব্রজে বেড়াতে বের হলুম। এবং সহরের বাইরে মহারাণী চন্দ্রাবতী মহিলা-বিদ্যালয় পর্য্যন্ত গিয়ে ফিরে এলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়ায় বিদ্যালয়ের ভিতর যাওয়া হলো না। ফিরে যখন স্কুলের কাছে উপস্থিত হলাম. তখন দেখলাম, সমস্ত বিদ্যালয়টি ইলেকৃট্রিক আলোকমালায় সুসজ্জিত হয়েছে। তখন আর তাকে স্কুল বলে মনে হলো না; যেন একটি মায়াপুরী। তারপর আর কি—সে দিনের মত বিশ্রাম। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও দর্শনশাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের কীর্ত্তন গান শুনে বড়ই আনন্দ অনুভব করা গেল।

২৬শে ডিসেম্বর বুধবার প্রাতঃকালে আর কোথাও যাওয়া হলো না, কারণ এই দিনই সমিতির প্রথম অধিবেশন।

নানা স্থানের প্রতিনিধিগণের সঙ্গে আলাপ পরিচয় কথাবার্ত্তায় সময় কেটে গেল। পুরুষ ও মহিলা নিয়ে প্রায় শতাবধি প্রতিনিধি তখন পর্য্যন্ত এসেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিগত বৎসরে মীরাটে যে অধিবেশন হয়েছিলো, সেখান থেকে একজন প্রতিনিধিও আসেননি; অন্ততঃ সেবারের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করবার জন্যও একজনের আসা উচিত ছিল। কলিকাতা থেকে শ্রীমান্ নরেন্দ্র দেব, শ্রীমান্ হরেন্দ্রনাথ সিংহ ও আমি এবং খুলনা থেকে শ্রীযুক্ত অজিতানন্দ সেন এই চার জন ছাড়া আর কেউ বাংলা দেশ থেকে আসেননি; অথচ সম্পাদক প্রমথ বাবুর নিকট শুনলাম, বাংলা দেশে প্রায় দুইশত সাহিত্যিককে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠান হয়েছিলো। শাখা-সভাপতিগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় উপস্থিত হন নাই। মহিলা-সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ২৭শে তারিখের প্রাতঃকালে আসবেন ব'লে তার করেছেন। মধ্যাহ্ন বারোটার সময় অধিবেশনের সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল, কিন্তু সব গুছিয়ে নিতে দেরী হয়ে গেল। অধিবেশন আরম্ভ হলো বেলা দেড়টায়। প্রথমে কয়েকটি বালক গান গাইল। তারপর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁর অভিভাষণ পাঠ করলেন। এই অভিভাষণটী অতি সুন্দর হয়েছিল। তারপর স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত গোপাল-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীমান্ রুদ্রেন্দ্রকুমার পালের সমর্থনে সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করলেন। মধ্যস্থলের মঞ্চের উপর সভাপতি ও অভ্যর্থনা সভাপতির আসন ছিল। দক্ষিণ পার্শ্বের মঞ্চের উপর শাখা সভাপতিগণের আসন ও বামদিকে, যে সমস্ত মহিলা পর্দ্দার বাহিরে আসেন, তাঁহাদের আসন। মঞ্চের সম্মুখে একদিকে প্রতিনিধিগণ ও অন্যদিকে স্থানীয় দর্শকেরা আসন গ্রহণ করলেন। গ্যালারীতে পর্দ্দার আড়ালে পর্দ্দানসীন মেয়েদের আসন নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল। সভা পত্র-পুষ্প-পতাকায় সুন্দর সজ্জিত করা হয়েছিলো। দেওয়ালে মহারাজা শিবাজী রাও হোলকার ও নির্ব্বাসিত মহারাজা তুকাজী রাও হোলকারের তৈলচিত্র পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হয়েছিলো। মহারাজ তুকাজী রাওই তাঁর পিতার নামে এই অবৈতনিক স্কুল স্থাপিত করেছেন। এই স্থানে একটি কথা বলে রাখি; মহারাজ তুকাজী রাওএর চরিত্র সম্বন্ধে যত কলঙ্কই থাকুক, ইন্দোরের অনেক প্রতিষ্ঠান উনিই ক'রে দিয়েছেন; অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানও ওঁরই দ্বারায় হয়েছে।

সভাপতি মহাশয় যে অভিভাষণ পাঠ করলেন, তাতে সাহিত্যের কথা মোটেই ছিল না। সে কথা তিনি তাঁর অভিভাষণেও স্পষ্টই বলেছিলেন। প্রবাসী বাঙ্গালীদের উন্নতি-কল্পে কি কি করা কর্ত্তব্য, সভাপতির অভিভাষণে এই কথারই আলোচনা ছিল। সম্মেলনের মুখপত্র 'উত্তরা'কে নাগরী অক্ষরে ছাপাবার উপদেশও তিনি দিয়েছিলেন। তার পর মামুলী ব্যাপার—যাঁরা না আসতে পেরে দুঃখ প্রকাশ করেছেন তাঁদের পত্র পড়া হলো, বিষয়

নির্ব্বাচন সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হল। তার পরই সেদিনের মত সভাভঙ্গ হল। সাড়ে চারটায় আলোক-চিত্র গৃহীত হল। তার পরই বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির কোলাহল। আমি বরাবরই এই কোলাহল থেকে দূরে থাকি; তাই তখন আমরা টঙ্গা নিয়ে সহরের অন্য অংশ দেখতে গেলাম। আমরা অর্থে—নরেন্দ্র, খুলনার অজিতানন্দ বাবু, বুরহানপুর স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও আমি—এই চার জন।

ইন্দোরের প্রধান অংশ মহারাজা হোলকারের, অপর অংশ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের। এই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এলাকার মধ্যে রেসিডেন্সি। আমরা প্রথমে রেসিডেন্সির দিকেই অগ্রসর হলাম। পথে পড়লো—ইন্দোরের সর্ব্বপ্রধান ধনী স্বরূপদাসের প্রাসাদ। এ প্রাসাদ মহারাজের প্রাসাদ অপেক্ষা কোন অংশেই খাটো নয়; বরঞ্চ উদ্যান ও বৈঠকখানা মহারাজের প্রাসাদ অপেক্ষাও অধিকতর সুন্দর। তারপরেই রেসিডেন্সির সীমানায় গিয়ে সেনানিবাস, রেসিডেণ্টের বাড়ী, ড্যালি কলেজ, ও মেডিক্যাল স্কুল দেখলাম। এই মেডিক্যাল স্কুলে প্রায় তিনশত ছেলে পড়েন। তার মধ্যে বাঙ্গালী সতর জন। এই স্কুল নাগপুর, বোম্বাই ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত। ছাত্রদের প্রথম দুই পরীক্ষা এখানেই হয়। কিন্তু শেষ পরীক্ষা উপরিউক্ত তিন বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনওটিতে দিতে হয় এবং সেখান থেকেই উপাধি নিতে হয়। আমাদের শ্রীমান্ রুদ্রেন্দ্রকুমার এই বিদ্যালয়েরই অধ্যাপক।

সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরে দেখি, তখনও বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির কোলাহল শেষ হয় নাই। আমি আর বাসা থেকে বেরুবার সময় পেলাম না। পরদিন সাহিত্য-শাখার অধি-বেশন। প্রায় চল্লিশটা প্রবন্ধ এসেছে; সেগুলি সব যদি সভায় পড়াতে হয় তা হলে চাই কি, ডিসেম্বর মাসের বাকি কটা দিন সেখানেই কাটাতে হয়। তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সাহিত্য শাখার কাজ শেষ করতে হবে। আমি যা নিবেদন লিখে নিয়ে গেছলুম, তাই পড়তে একঘণ্টা সময় লাগবে, বাকি দু-ঘণ্টায় এই চল্লিশটি প্রবন্ধ পাঠ করতে হবে। অর্থাৎ কতকগুলিকে একবারেই বাদ দিতে হবে, কতক-গুলিকে পঠিত বলিয়া গৃহীত অর্থাৎ যে কথার কোনও অর্থই নাই, তাই করতে হবে। আর খালি পাঁচ সাতটিকে কবন্ধ করে কোন রকমে নিয়ম রক্ষা করতে হবে। আমার ত বলতে ইচ্ছা করে, কোনও সম্মেলনে প্রবন্ধ প্রেরণ—শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ! যাক্ রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত প্রবন্ধ নির্ব্বাচন করা গেল। এদিকে শ্রীমান নরেন্দ্র দেব সাড়ে আটটার সময় এখানকার থিয়েটারে নাচ দেখতে গেলেন। রাত্রি এগারটার সময় ফিরে এসে বল্লেন—ছাই নাচ, মাঝে থেকে একটি টাকা দণ্ড দিতে হলো।

২৭শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সারা দিনই সভা। প্রাতঃকালে বৃহত্তর বাংলা শাখার অধিবেশন। বারটা থেকে তিনটে পর্য্যন্ত সাহিত্য-শাখার অধিবেশন। তিনটে থেকে সাড়ে চারটা পর্য্যন্ত সাধারণ সভা। সাড়ে চারটায় প্রদর্শনীর সভা ও দ্বারোদ্ঘাটন। সন্ধ্যার পরেই বিজ্ঞানশাখার অধিবেশন। তারপর কীর্ত্তন। রাত বারটা পর্য্যন্ত কীর্ত্তনই চললো।

পরদিন ২৮শে ডিসেম্বর শুক্রবার প্রাতঃকালে ইতিহাস শাখার অধিবেশন। তারপর দর্শনশাখার অধি-বেশন। এই দুইটি শেষ হতেই বারটা বেজে গেল। তাড়াতাড়ি স্নানাহার শেষ করে অর্থনীতি শাখার অধি-বেশন। সাড়ে তিনটায় সে শাখার অধিবেশন শেষ। তখন আবার সাহিত্য শাখার অধিবেশন। যে কয়েকটি প্রবন্ধ পড়া বাকি ছিলো তা পড়া হয়ে গেলো। পাঁচটার সময়, বিদায় পালা আরম্ভ হলো। যথারীতি ধন্যবাদ আদান-প্রদানের পর—সপ্তম সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন শেষ।

এই সম্মেলন সম্বন্ধে আমার অতি সংক্ষিপ্ত কথায় যা দু'চারটা বাদ পড়ে গিয়েছে, আমার সৌভাগ্যক্রমে মহিলা-সভার সভানেত্রী, জয়পুর-প্রবাসিনী পরম স্নেহময়ী শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী তা পূরণ করে দিয়েছেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইখানে উদ্ধৃত করে দিয়ে সপ্তম সাহিত্য সম্মেলনের কথা আমি কোনও রকমে শেষ করলাম। কিন্তু ইন্দোরের কথা এবারেও শেষ হলো না। পারি ত বারান্তরে বলবো।

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী লিখেছেন:—

"ইন্দোর পৌছতে সবচেয়ে দেরী বোধ হয় আমাদেরই হয়েছিল। কাজেই ২৬শের যা' কিছু সে আর আমরা দেখতে পাইনি। আমরা পৌছলাম ২৭শে। এদিন ছিল সাহিত্য শাখার সভাপতি পূজনীয় শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের অভিভাষণ, তার পর অন্য প্রবন্ধ, রচনাদি পাঠ।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটী ছোট গল্প পাঠ করলেন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁরো চেয়ে ছোট একটী লেখা পড়লেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মেঘদূতের পূর্ব্ব মেঘের কথা পড়লেন। এ সব তো সময়ে মাসিক পত্রের পাতায় ভাল করে পড়তে পাওয়া যাবে। আমাদের যা' ভাল লেগেছিল,—আর ওখানকার কর্ত্তৃপক্ষ নতুন যা' করেছিলেন,—তাই আমাদের সম্মিলনীর একটুখানি কথা।

বাঙালী ওখানে খুবই কম, সম্ভবতঃ সব-শুদ্ধ ৪০ জনের বেশী নেই; কিন্তু ঐ ক'টী ঘর বাঙালীতে এখন সুন্দর আতিথেয়তার বন্দোবস্ত করেছিলেন যা' সত্যই আনন্দের। প্রতিনিধিদের থাকবার জায়গা হয়েছিল শিবাজী রাও বিদ্যালয়ে। তার উঠোন, বাইরের মস্ত খোলা জায়গা, প্রকাণ্ড বাড়ী নিয়ে প্রতিনিধিদের স্বচ্ছন্দে থাকবার কোনোই ব্যাঘাত ঘটেনি। আর ঐ-খানেই সম্মিলনীর অধিবেশনের স্থান হওয়াতে খাওয়া শোওয়ার সঙ্গে এমন সুবিধা হয়েছিল যে অনায়াসেই সব শাখায় সব সময়ে যোগ দেওয়া চলত। শিক্ষাবিভাগের অল্প কয়েকজন বাঙালী আর ঐ বিভাগেরই দুটী মাত্র বাঙালী মহিলা শ্রীমতী দাস ও শ্রীমতী হাজরা আর স্থানীয় জনকতক পরিবার মিলে যথেষ্ট আয়াস আর প্রীতির সঙ্গে সব ব্যবস্থা করেছিলেন, যাতে সম্মিলনীর আনন্দ উপভোগে কারুর অসুবিধা না হয়। অবশ্য সেই পরিমাণ কষ্ট তাঁরা নিজেরা পেয়েছিলেন, কেননা, তাঁদের বাড়ী যাওয়ার অবসর মিলত কি না সন্দেহ।

নতুন ছিল ওখানে শিল্প শাখার প্রদর্শনী। এটী অন্যত্র কোথাও আগে হয়নি শুধু তার জন্যও নয়,—সম্মিলনীতে প্রাদেশিক অধিবাসীর সঙ্গে প্রবাসী বাঙালীর যে এক ভাবাভাবী না হওয়ার জন্য একটী দূরত্ব থাকে, এই সূত্রে সেটী নষ্ট হয়ে যেন একটী সার্ব্বজনীন ভাব সৃষ্টি করেছিল। এইটীই ছিল ইন্দোর কর্ত্তৃপক্ষের বিশিষ্টতা। ওখানকার প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের এর পৃষ্ঠপোষকরূপে উদ্বোধন করবার কথা ছিল; তিনি অসুস্থ বলে আসতে না পারায় সম্মিলনীর সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় তার উদ্বোধন করেন। আর তাঁর অভিভাষণটী পড়া হয়। এই শিল্প-চিত্র প্রদর্শনীতে ওখানকার গণ্যমান্য অনেকেও জড় হয়েছিলেন। উদ্বোধনের আগে 'বন্দেমাতরম্' গানটী গাওয়া হয়েছিল। বাঙালীদে[র] সঙ্গে ওদেশবাসী আরও এদিক ওদিকের দু'চার জন[ও] বোধ হয় ছিলেন; তার মাঝখানে এই গানটী যেন একটী মনোরম গাম্ভীর্য্য এনে দিয়েছিল।

শিল্পশালাতে অনেক রকম সংগ্রহ ছিল। ছবি, রেখ[া] চিত্র, রেশম পশমে সেলাই করা ছবি, কাগজ কাপড় আঁ[কা] ইত্যাদি নানা রকমের শিল্প কাজে তিনটী ঘর ভরা ছিল। অনেক খ্যাতনামা চিত্রকরের অপ্রকাশিত, প্রকাশিত ছবি[ও] ছিল। বিদেশী চিত্রকরও ছিলেন, বাঙালীও ছিলেন তা[র] মধ্যে। তার অনেকগুলি ছবিই অত ছবির মাঝ থেকে[ও] বারে বারে চোখকে আকর্ষণ করেছে। ওখানকার বালিক[া] বিদ্যালয়ের মেয়েদের আঁকা ছবি আর রেশমে তোলা ক'[টী] কাজও খুব সুন্দর মনে হল। কুমারী ইন্দিরা রাও ব'[লে] একটী ওদেশী মেয়ে আর শ্রীমতী ইন্দিরা রায় নামে একটী মেয়ে—তাদের আঁকা ছবিটিও প্রদর্শনীতে পুরস্কার পেয়েছে। শেষেরটী কাশীর শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন রায়ের ভাইঝি। এদের শেখবার সুযোগ কতখানি আছে জানিনা—কিন্তু বয়সের তুলনায় মেয়েদের অনেক ছবিই ভালই লাগল। আশপাশের কাছাকাছি জায়গা থেকেও অনেক মে[য়ে] তাঁদের শিল্প কাজ ওখানে দিয়াছিলেন; আজমীরের মেয়ের[ও] কাজ ছিল। দু'চার জন ওখানকার মেয়েও বোধ হ[য়] প্রদর্শনী দেখতে এসেছিলেন,—ওঁদের ঘরের মেয়েদের শিল্প কাজও ছিল। কলিকাতা থেকে প্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন মহাশয় পূজনীয় জলধরর বাবুর একখানি ছবি, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দুইখানি ছবি, ও শ্রীযুক্ত শিবপদ ভৌমিক দুইখানি ছবি পাঠিয়েছিলেন।

এইদিন রাত্রেই বিজ্ঞানের সভাপতি শ্রীযুক্ত মেঘনা[দ] সাহা মহাশয়ের ও সঙ্গীতের সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষ[ণ] ছিল। গান ইত্যাদিও ছিল। পরদিন সকালে বাকি শাখ[া] ক'টীর অধিবেশন হয়।

লোক বেশী ইন্দোরে হয়নি। শুনলাম তার প্রধা[ন] কারণ কংগ্রেস, আর দূর-পথের কষ্ট। মেয়ে ১০।১২ জ[ন] বিদেশ থেকে এসেছিলেন, বোধ হয় কাছাকাছি কর্ম্মস্থা[ন] থেকেও দু'চার ঘরের মেয়ে এসেছিলেন, যাঁদের মধ্যে অনেকগুলি চেনা মুখও দেখলাম, অনেকদিন পরে অতদূরে যাঁদের দেখতে পাব মনে করিনি। অনেক মেয়ে

যেন ওর মাঝে বেশ আত্মীয়ার মতন হয়ে উঠেছিলেন। মনে হ'ল প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনী এই দূর প্রবাসে আমাদের প্রবাসী বাঙালী সম্মিলনও হয়ে উঠেছে। যে সব কর্ম্মচারীরা মফঃস্বলের যাঁরা একধারে একপাশে থাকেন, কাজের গতিকে তাঁদের আর তাঁদের বাটীর মেয়েদেরও এই ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়, মেলামেশা হয়, অনেক সময় কুটুম্বিতা আত্মীয়তার সম্বন্ধ বেরিয়ে আসে। সবশুদ্ধ একটা মধুর বিষণ্ণতা মিশ্র আনন্দের মিলন হয়। ৺বিজয়ার প্রণাম আশীর্ব্বাদ অভিবাদনেও একটা মিশ্রভাবে সুখ দুঃখ থাকে, কিন্তু এতে দেখা হবে কিনা মনে হয়ে গভীরতর বিষাদে মনকে আচ্ছন্ন করে। তাই এ তিনদিনও যেন জাতীয় দুর্গোৎসবের মতনই মনে হতে লাগল।

মহিলা সম্মিলনীতে এখানকার প্রায় সব বাঙালী মহিলাই জড় হয়েছিলেন ; কিন্তু শীগগীর ফেরবার তাড়া ব'লে তাঁদের সঙ্গে আলাপের আনন্দ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করেছি ; কাজেই তাঁদের পরিচয় নেওয়াও হয়নি। মহিলা সম্মিলনীতে একটী বেশ কথা উঠেছিল, তার সমর্থন প্রায় সব মেয়েই করলেন! তা' হচ্ছে মেয়েদের পিতৃ-সম্পত্তিতে আংশিক উত্তরাধিকার! আজমীরের একটী মহিলা এই বিষয়ে প্রস্তাব করেছিলেন। দেখলাম, অনেক মেয়েই শিক্ষা, উত্তরাধিকারের কথা, নিজেদের সুখ দুঃখের কথা, অন্তঃপুরের কোণে বসেও ভাবেন, আর আলোচনা করেন! একটী মহিলা মুসলমান দায়ভাগের কথাও উত্থাপন করলেন! একজন মেয়ে বল্লেন,—'আমাদের তো হাত নয়, পুরুষরা যে ছেলেদেরই দিতে চা'ন, মেয়েদের জন্যে মাথা ঘামান না'!

ইন্দোর দেশটী যেন বেশ স্নিগ্ধ মনে হ'ল। সহরের মাঝখান দিয়ে একটী নদী গেছে। রাজপুতানার উষর রুক্ষতার পর ওখানকার শ্যামল স্নিগ্ধতা আমাদের চোখে বেশ লাগছিল। ওখানে ঠাকুর দেবতা সুগঠিত, সুন্দর জৈনমন্দিরও আছে। কিন্তু দেরীতে যাওয়া আর শীগগীর ফেরাতে আমাদের ওখানকার কিছু দেখাও হয়নি, প্রবাসিনীদের সঙ্গে জানাশোনাও হয়নি। শুধু চোখের দেখার একটু তালিকা দিলাম। যাঁরা ভাল করে দেখেছেন তাঁদের কাছে সব পরিচয় আবার বোধ হয় পাওয়া যাবে।

প্রভাতের স্বপ্ন

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি-টি

ওকালতিতে হতাশ হইয়া মুন্সেফিতে নাম লিখাইয়াছিলাম। শ্বশুরের চেষ্টা, সরকারের দয়া ও কপালের জোর তিনটিতে মিলিয়া আমাকে ওকালতি হইতে মুক্তি দিয়া মুন্সেফিতে উন্নীত করিয়াছিল।

ইহা হইতে আমার অবস্থাটা আপনারা ঠিক প্রণিধান করিতে পারিবেন না, সেজন্ত আরও দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন।

উকিল আমি যে বাধ্য হইয়া বা উপায়ান্তর না দেখিয়া হইয়াছিলাম, তাহা নহে ; ইচ্ছা করিয়াই ঐ পথে গিয়াছিলাম। উকিল বা ব্যারিষ্টারেরাই দেশের নেতা, সরকারের সঙ্গে তাহারাই বাক্‌-যুদ্ধ করে, দেশের জন্ত বিত্তাদি তাহারাই ত্যাগ করিতেছে ;—এই সব দেখিয়া শুনিয়া ইচ্ছা করিয়াই উকিল হইয়াছিলাম। কিন্তু কিছুই সুবিধা করিতে পারিলাম না। মক্কেল না জুটায়, না আদালতের কাছে, না দেশের কাছে—কাহারও কাছে আদর পাইলাম না। এমন কি, বলিতে লজ্জা করে, বাড়ীতেও মর্য্যাদা কমিয়া গেল। আমার দাদা মিউনিসিপ্যাল আফিসের হেড ক্লার্ক। তিনি পর্য্যন্ত একদিন বলিলেন—ভাগ্যে আমিও উকিল হই নাই ; হইলে হয় ত দুই বেলাই অনশনে কাটিত!

মাসে তিন টাকা উপায় করিতে পারিতাম না ; এমন সময় মাসে প্রায় তিন শত টাকা উপায় সুরু হইলে কাহার না আনন্দ হয়? আমারও হইয়াছিল। হয় ত দিন কতক মনে অহং ভাবটা একটু বেশীই হইয়াছিল ; কারণ, উকিলদের মধ্যে বড়ই ছোট হইয়াছিলাম, আর মুন্সেফ হইয়াই সকলের

বড় হইয়া গেলাম। দেখিলাম, কেহই আমাকে চটাইতে চাহে না; আমি খুসী থাকি ইহা সবারই চেষ্টা। এ অবস্থাটা যখন সহিয়া গেল অহংকারের ভাবটাও তখন কমিল।

ওকালতি ক্ষেত্রে কোন কৃতিত্ব দেখাইতে পারি নাই; মুন্সেফিতে কিন্তু পারিলাম। আমার পদোন্নতি হইতে বিলম্ব হইল না। ক্রমশঃ একদিন সব্-জজ হইলাম।

সব্-জজ হইয়াও আমি মুন্সেফি চাল ছাড়ি নাই। রূপার বোতাম দেওয়া লংক্লথের কামিজ ও চীনাবাড়ীর আড়াই টাকা দামের জুতা পরিতাম। রাজপথের কঠিন মাঝখান দিয়া না চলিয়া, এক পাশ দিয়া চলিতাম; তাহাতে জুতার প্রাণ বাঁচিত। পাছে বহুমূত্র ধরে সেজন্য আলু ও মিষ্ট পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, রাত্রি না জাগিয়া সকালবেলা রায় লিখিতাম (আলোর খরচটাও তাহাতে বাঁচিয়া যাইত) ও সন্ধ্যার পূর্ব্বে খুব খানিকটা হাঁটিতাম। স্ত্রীর সংসর্গদোষে চায়ের বদ অভ্যাসটা করিয়া ফেলিয়াছিলাম; কিন্তু ভুলিয়াও কোন দিন বাহিরে চা পান করি নাই—পাছে বাড়ীতে কেহ আসিয়া পড়িলে ভদ্রতার খাতিরে তাহাকে আবার চায়ের পেয়ালা যোগাইতে হয়। ভিতরে স্বামী-স্ত্রীতে মুখোমুখি বসিয়া দুইজনে দুই পেয়ালা চা পান করিতাম। স্ত্রীর পেয়ালায় দু' চামচ চিনি, আমার পেয়ালায় আধ চামচ চিনি থাকিত। সাহেবদের প্রথামত চিনিটা নিজেরাই মিশাইয়া লইতাম—কাজেই বেশী হইবার জো ছিল না। ভগবানও সদয় ছিলেন, তাই সন্তানের মধ্যে চারটি পুত্র—কন্যা একটিও নহে। ছেলেদের কোন দিন চা দিই নাই; কারণ, চা যে বিষ সে জ্ঞান আমাদের ছিল।

গৃহিণী বড়লোকের মেয়ে। তাঁহার জন্য গহনা গড়াইতে কৃপণতা করি নাই; কারণ,গহনা ও টাকায় বড় বেশী প্রভেদ নাই। যেদিন মাহিনা পাইতাম, পারিলে সেই দিনই, নহিলে তার পর দিনই সংসারের খরচ বাদে সব টাকা ব্যাঙ্কে পাঠাইতাম। স্ত্রীর জন্য দামী গহনাও গড়াইতাম; কারণ আসলে তো আমি কৃপণ নহি—মিতব্যয়ী মাত্র। আর স্ত্রীকে গহনা দেওয়া ও ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখা, দুইই সমান নিরাপদ। হয় ত বা প্রথমোক্ত উপায়ই বেশী নিরাপদ; কারণ, ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া খরচ করা অতি সহজ, কিন্তু স্ত্রীর নিকট হইতে গহনা লওয়া একেবারে অসাধ্য না হইলেও অতি দুঃসাধ্য।

চিঠিপত্র খুব কমই লিখিতাম—কারণ সময় কই?—অর্থাৎ অনর্থক পয়সা খরচ করিয়া কি লাভ? দেশে খোড়ো বাড়ী পাকা করিবার পরামর্শ দাদারা দিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও আমরা নামে একান্নবর্ত্তী পরিবার; বাড়ী ঘর আপনার খরচে পাকা করিয়া নির্ব্বোধের মত তাহার ভাগ দিব কেন?

২

জীবনযাত্রা এই ভাবেই চলিতেছিল। একদিন একটা পরিবর্ত্তন ঘটিল।

শীতের প্রভাত। চা পান শেষ করিয়া রায় লিখিতে বসিতেছি, এমন সময় চাপরাসি ডাক লইয়া আসিল। সরকারি খামগুলি আগে ছিঁড়িয়া চিঠিগুলি পড়িলাম। তার পর একখানি বেসরকারি খামের চিঠি হাতে আসিল। বেসরকারি চিঠিপত্র এক আধখানা যাহা আসিত, তাহা শ্বশুরবাড়ী হইতে স্ত্রীর নামেই আসিত দেখিতাম। কিন্তু এখানি আমার নামে। সুন্দর ইংরাজী হস্তাক্ষরে শিরোনামায় আমারি নাম লেখা! কে লিখিল?

খামখানি ছিঁড়িয়া পত্র বাহির করিলাম। কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পত্র পড়িতে লাগিলাম। তাহাতে লেখা ছিল—

ছোট মামাবাবু।

আমরা অনেক দিন আপনার সংবাদ পাই নাই। আপনি, মামীমা ও দাদারা কেমন আছেন লিখিবেন। মায়ের শরীর ভাল নহে। আপনাকে দেখিবার জন্য মায়ের বড়ই ইচ্ছা করে,—কিন্তু আমাদের ফেলিয়া যাইতে পারেন না।

আপনি শুনিয়া সুখী হইবেন যে, আমি এবার ম্যাট্রি-কুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডিষ্ট্রিক্ট্ স্কলারশিপ পাইয়াছি। মায়ের ও বাবার ইচ্ছা যে আমি কলিকাতার কোন ভাল কলেজে আই-এ পড়ি। স্কলারশিপের টাকায় সমস্ত খরচ কুলাইবে না—এই একটা অসুবিধা। এখানকার স্কুলে বাবা এখন মাত্র ৪০৲ টাকা মাহিনা পান্; ছেলে পড়াইয়া আরও ১৫৲ টাকা—মোট ৫৫৲ টাকা উপায় করেন। ইহা হইতে যদি আমাকে আবার টাকা দেন, তাহা হইলে সংসারের কষ্ট হইবে।

আপনি যদি তিন চার মাসের জন্য আমাকে মাসিক দশটি টাকা সাহায্য করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া কলিকাতায় পড়িবার জন্য যাইতে পারি। এই তিন চার

মাসের মধ্যে আমি একটি টুইশান জুটাইয়া লইব—তখন আর আপনাকে সাহায্য করিতে হইবে না।

আপনার পত্র পাইলে তবে আমি কর্ত্তব্য স্থির করিব, সেজন্য শীঘ্র উত্তর প্রার্থনা করিতেছি।

আপনি ও মামীমা আমার কোটি কোটি প্রণাম জানিবেন। নিবেদন ইতি।

সেক—শ্রীহরিদাস বসু।

চিঠিখানি এক নিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিয়া আমি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণের জন্য আমি আমার পদগৌরব, অর্থপ্রীতি, সময়ের মূল্য—সব ভুলিয়া গেলাম। রায় লেখা ভুলিয়া গেলাম,—চাপরাশি পাশে দাঁড়াইয়া, তাহা মনে রহিল না। আমার প্রসারিত দৃষ্টির সম্মুখে খোলা চিঠিখানি পড়িয়া রহিল, মন চলিয়া গেল কোথায়—কোন্ ক্ষুদ্র এক পল্লীর নিভৃত প্রান্তে!

সেখানে এক অবোধ বালক কিছুতে তাহার দিদির সঙ্গ ছাড়ে না। যেখানে যাইবে এক শীর্ণ দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা তাহার স্থূলকায় ভাইকে কোলে করিয়া ছুটিবে। না লইয়া গেলে সে মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিবে। রাত্রে মা রান্না লইয়া ব্যস্ত—দিদি সেই দুরন্ত ছোট ভাইটিকে গল্প বলিয়া, গায়ে হাত বুলাইয়া ঘুম পাড়াইবে।

একদিন বাড়ীতে কত লোকজন, কত আলো,—শানাইয়ের বাজনায় চারিদিক মন্ত্রমুগ্ধ! বাজনা বাজাইয়া কত লোক আসিল—বর আসিয়া সভায় বসিল। কিছুক্ষণ পরে বর বাড়ীর ভিতর আসিল। তাহার ছোট্ট দিদকে বরের কাছে বসাইল, পুরোহিত ঠাকুর কত কি বলাইল;—ক্ষুদ্র বালক অবাক্ বিস্ময়ে সব দেখিল। পরদিন সবাইকে কাঁদাইয়া, নিজে কাঁদিয়া সেই বরের সঙ্গে দিদি চলিয়া গেল। ভাই কাঁদিয়া ভাসাইল!

দিদি নহিলে বালক খেলে না; সন্ধ্যায় দুষ্টামির জন্য মায়ের কাছে বকুনি খাইয়া দিদি দিদি করিয়া কাঁদিয়া শ্রান্ত হইয়া তবে ঘুমাইয়া পড়ে।

কয়েক দিন পরে আবার দিদি ফিরিয়া আসে,—আবার বালকের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে।

বালকের বয়স তখন ৯ বৎসর। একদিন বাড়ীতে কি একটা অন্যায় করিয়া শাস্তির ভয়ে সে এক প্রতিবাসীর দালানে স্তূপীকৃত ধানের বস্তার আড়ালে লুকাইয়াছিল। দিদি কতবার খুঁজিয়া গেল; মা আসিয়া রাস্তা হইতে নাম ধরিয়া ডাকিলেন, দাদা খুঁজিলেন—কেহই পাইলেন না। রাত্রি বাড়িয়া চলিল। তখন দিদির কি কান্না! ভ কি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাক্!—ও শিবু, আয় ভাই—তো মা, বাবা, দাদা কেউ কিচ্ছু বলবেন্ না; আয় ভা কোথায় আছিস্, আয়!

বালক আর থাকিতে পারিল না। তিরস্কারের ও প্রহারের ভয়—কিছুতে আর তাহাকে আটক রাখি পারিল না। দিদির কান্না শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দিদির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দিদি দুই হাত দি তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। কোলে তুলিয়া তাহা লইয়া বাড়ী ফিরিল।

আবার দিদি শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেল। ক্রমে তা নিজের ঘর-সংসার হইল, তাহাতে বদ্ধ হইয়া গেল। এদি ভাই বড় হইল, লেখাপড়া শিখিল, বিবাহ করিল, ও চাকুরীতে ঢুকিল। নিজের সংসারে সেও জড়াইয়া পড়িল

বায়স্কোপের ছবির মত ঘটনাগুলি আমার চো সাম্‌নে একে একে নৃত্য করিয়া গেল। সেই দিদির পাঁচটি মেয়ের পর একমাত্র পুত্র এতকাল পরে আম পত্র দিয়াছে। অতি কুণ্ঠিতভাবে তিন মাসের জন্য দ করিয়া টাকা চাহিয়াছে।

বুকের ভিতর কেমন একটা বেদনা বোধ করিলা চোখ দুটা যেন ফাটিয়া অনেককালকার হারানো দুর্ জল আসিতে চাহিল। তাহাতে চোখের কোণ দুটা ভিজিয়া আসিল মাত্র। বাহিরে কিছুই বুঝা গেল না।

আগের দিনই মাহিনা পাইয়াছিলাম। সংসার খর স্ত্রীর একটা নূতন অলঙ্কারের খরচ বাদে তিন শত ট আজই জমা দিবার কথা। মণিঅর্ডার ফর্ম্ একখানা দ্ব হইতে বাহির করিয়া তিন শত টাকাই তাহাতে লি ফেলিলাম ও কাল বিলম্ব না করিয়া তাড়াতাড়ি চাপর হাত দিয়া তখনি তাহা পোষ্টাফিসে পাঠাইয়া দিলাম;—জানি যদি আবার মত বদ্‌লাইয়া যায়! একখানি স্বতন্ত্র হরিদাসকে লিখিয়া দিলাম—যতদিন তাহার দরকার তত তাহাকে আমি খরচ পাঠাইব;—সে যেন নির্ভাবনায় প

হয় ত কথাটা আপনারা বিশ্বাস করিবেন না। করিবারই কথা। আমার নিজেরই বিশ্বাস হয় না যে মুন্সেফ হইতে সব্-জজ্ শ্রীশিবদাস মিত্র এক ভাগিনেয়কে এককালিন তিন শত টাকা দিয়া ফেলিয়াছি তা আপনারা কি করিয়া বিশ্বাস করিবেন। আপন দোষ কি?

স্ত্রী-স্বাধীনতায় ভারতের আদর্শ

অধ্যাপক শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার এম-এ, ডিপ্‌এড (এডিনবরা ও ডাবলিন)

স্ত্রী-স্বাধীনতা বলিতে—আমরা অনেকে হয় তো বুঝে ফেলবো যে পুরুষদের সঙ্গে সমানে ও অবাধে পথে ঘাটে হাটে বাজারে ঘরে বাইরে আফিসে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলা। কিন্তু এ ধারণাটা যে ভুল তা একটু ভাবলেই বুঝা যায়। যাদের দৃষ্টান্তে আমরা এখন এ দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতার আমদানী করছি—আমরা এখানে বসে ভাবি, বুঝি তাদের দেশে স্ত্রী পুরুষে অবাধ মিশ্রণ, অর্থাৎ সংসারের বাইরের কাজে-কর্ম্মে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নাই—পুরুষ বুঝি তার পুরুষত্ব ভুলে, আর স্ত্রী বুঝি তার স্ত্রীত্ব ভুলে গিয়ে সমান তালে মেলামেশা করে। কিন্তু কার্য্যতঃ তা নয়। স্ত্রী পুরুষের জাতীয় ধর্ম্ম যাবে কোথায়? তাই পারিবারিক সুখ বজায় রাখিতে মেলামেশার কতকগুলি বাঁধাবাঁধি অন্তরায় আছে। বিবাহিতা স্ত্রী বিশেষতঃ তার স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ততার জন্য কতকগুলি অন্তরায় নিজেই মেনে নিয়ে থাকেন। সেগুলি অবশ্য কুমারীরা তত মানেন না, বা একেবারেই মানেন না; কারণ, কুমারীদের তো একটা মাছ ধরবার চেষ্টায় থাকতেই হয়। সুতরাং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এ ঘাটে না জুটলে ও ঘাটে ছিপ্ ফেলেন। তবে ওদের সঙ্গে তুলনায় আমাদের কথা আলাদা। আমাদের সতীত্ব ও কুমারীর পবিত্রতার আদর্শ ই অবাধ-মিশ্রণ ব্যাপারে ওদের সঙ্গে আমাদের যত পার্থক্যের সৃষ্টি করেছে। স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রস্তাবে ভারতীয় নারীর সতীত্বের আদর্শ ই প্রশ্নটীকে জটিল করে তুলেছে। আমরা নিশ্চয়ই এ আদর্শ টীকে পায়ে ঠেলিতে পারব না; বরং নূতন আকারে জগৎকে দান করব। এখন বিলাতে স্ত্রী-স্বাধীনতার চতুঃসীমাটা কি তাই দেখা যাক। অনেক মহিলা পাঠিকা হয় তো সীমানা কথাটী শুনে আমার উপর খাপ্পা হয়ে উঠবেন। কিন্তু এ কথা বলাতে আমি কিছুই দোষ করি নাই; যেহেতু রাজনৈতিক কি সামাজিক সর্ব্ববিধ মুক্তিরই চতুঃসীমা আছে—সেই সীমানার মধ্যেই তো মুক্তি সফলতা লাভ করে, সত্য হয়। যেমন দেখুন, ইংরেজ পুলিশ জনবহুল লণ্ডন সহরে কেমন নিয়ম ও শাসন রেখে চুপটী করে ভদ্রলোকটীর মত দাঁড়িয়ে আছে—যেন কিছুই জানে না। সামাজিক আইন-কানুনও সেইরূপ স্ত্রী-পুরুষের মিশ্রণে নানারূপ বিধি নিষেধের ব্যবস্থা করে আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। মুক্তির প্রথম উন্মাদনার সময়ে হয় তো আমরা কেউ কেউ এ-সব কথা ভুলে যেতে পারি—এ কথা বলছি বলে কেউ যেন আমায় প্রত্নতত্বের যুগের কোন স্বর বলে মনে না করেন; তবে আমার কথা যে সব ঠিক তাও ভাববার ধৃষ্টতা আমার নাই, তবে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিরই, সত্য-মিথ্যা যাই হোক না কেন, তার মতটা বলবার অধিকার আছে, সেই ভেবে নিজের মনে যে কথাটীর উদয় হচ্ছে, এখন তাই একটু না বলে পারলাম না।

এখন বিলাতের স্ত্রী-স্বাধীনতার বিষয়ে একটু বলি। স্কটল্যাণ্ডে মেয়েরা স্বাধীন হয়েছে মাত্র ২৫।২৬ বছর। স্বাধীন হলেও এখনও পর্য্যন্ত তারা নিজেদের গণ্ডী বা যুথের মধ্যেই বেশী থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়ে ছাত্রীরা প্রায়ই গ্যালারির এক ধারে বসে; প্রায়ই ক্লাশের বাইরে মেয়েরা নিজেদের মধ্যেই জটলা করে। তাদের অনেকের পুরুষ ছাত্রদের সঙ্গে মেশবার ইচ্ছা থাকলেও দল ছেড়ে আসতে সব সময় সাহস পায় না। কেউ পরিচয় করে না দিলে কোন ছেলে কোন মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারে না। পথে ভদ্র মেয়ে হয় তো নিজের কাজে বা বেড়াতে চলেছে। সে সাধারণতঃ একা বাহির হয় না। খুব ভাল ঘরের মেয়ে হলে সে মা-মাসি-পিসি বা বড় বোনের সঙ্গ ছাড়া বাহির হয় না—ভাইএর সঙ্গে প্রায়ই বাহির হয় না, কিন্তু ফ্রান্সে হয়। বিবাহিতা প্রায়ই স্বামীর সঙ্গে বাহির হন। একা কর্ম্মগতিকে যে কোন মেয়ে বাহির না হয় তা নয়, তখন সে ব্যক্তি বিশেষের পানে রাস্তা চলবার সময় চায় না, মৃদুহাস্য বা কটাক্ষ করে না। অবিবাহিতা মেয়ে ভাল ঘরের না হলে বা রক্ষকশূন্যা হলে বা কোন অসদভি-প্রায়ী লোকের পালিতা কন্যা হলে, পথে ঘাটে যথেচ্ছা বিচরণ করতে পারে। এরা মুখে বেশী পাউডার ও ঠোঁটে রঙ দেয়। সে-সব লক্ষণ দেখেই শিকারীরা এদের চিনে নেন। অবশ্য সব লক্ষণের প্রধান লক্ষণ হল দৃষ্টি ও ভাবভঙ্গী বা ইঙ্গিত। ও দেশে কোন মেয়ে যদি কোন ছেলের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চায় তো ছেলে বুঝে যে মেয়েটীর তার সঙ্গে

আলাপ করতে বাধা নাই। রূপসীর কটাক্ষ লাভ যুবারা কা কথা—বৃদ্ধানাং সেখানে ভাগ্য বলে মনে করে; এক-জনের সৌভাগ্য উদয় হলে আর পাঁচজনে সসম্ভ্রমে সরে যায়। তবে এ-সব হল সমাজের দুষ্ট স্তরের জিনিস। এ সবের এ-দেশে আমদানী এমন কি নাটক-নভেলেও আমাদের করা উচিত নয়। ব্রিটিশ সামাজিক স্বাস্থ্য-সভা—যার সভ্য আমি একবার ছিলাম—ইংলণ্ডের মেয়েদের নিকট ব্যাকুল আহ্বান করছেন—যাতে তারা ইংলণ্ডের যুবাদের বিপথে যাওয়ার সহায়তা না করে' সুপথে ফিরিয়ে আনে ও এ প্রলয়-কালে সভ্যতাকে রক্ষা করে, ব্রহ্মচর্য্য-মন্ত্রে দীক্ষিত ও সঞ্জীবিত করে। সামাজিক স্বাস্থ্য-সভার কল্যাণে ব্রিটেনেও সেই ভারতীয় ব্রহ্মচর্য্যের বাণী মেয়েদের মধ্যে প্রচারিত হচ্ছে, সংযত মুক্তিকেই আবার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হচ্ছে। ভারত কি লোকের ভুলটারই অনুকরণে ব্যস্ত ও আত্মবিস্মৃত হবে, সে কি তার চির-উপাস্য আদর্শ জগতের নব মুক্তির সাধনা ও উন্মাদনার মধ্যে নিহিত করবে না? নিশ্চয়ই করবে।

অনেক অভিভাবক সে-দেশে মেয়েকে মেয়ে-বন্ধুর সঙ্গে ছেড়ে দেন—ভাবেন একেবারে নিরাপদ। মেয়ে-বন্ধু সঙ্গে থাকলে আর যুবার পানে ঢলে পড়বার ভয় নেই। কিন্তু তা নয়; যদি মেয়ে চঞ্চলা হয় ও রাস্তায় কারো আকর্ষণে পড়ে এবং অন্য মেয়েটী তার বন্ধুর ক্ষুধা বুঝে, তো সে নিজে একটু আড়াল হয়ে তাকে সুযোগ দেয় বা নিজেও একই পন্থা অবলম্বন করে। বাড়ী ফিরবার সময় মেয়ে দুটী আবার এক হয়ে ঘরে ফিরে এল – আহা, তাদের বিহার যেন কত নির্দ্দোষ! এ গেল অবশ্য অতি নিম্ন স্তরের মেয়েদের কথা। এরা সংখ্যায় খুব বেশীও নয়। এই সব জাতীয় মেয়েই আবার স্ত্রীপুরুষের ভিড়ে মেলা বা পর্ব্ব উপলক্ষে বাহির হয় ও পুরুষের গায়ে ঘ্যাঁশ দেওয়া জনিত সুখ অনুভব করে। তারা হগমেনের রাত্রিতে ভিড়ের চাপাচাপির মধ্যে পিষ্ট হওয়ার Sensation বা সুখের জন্যও বাহির হয়। কোন ভদ্র পরিবারই এ রকম ভিড়ে মেয়েদের যেতে দেন না। এই জাতীয় মেয়েকে টার্ট, হট্ কেক্ প্রভৃতি নানান রকম আখ্যা দেওয়া হয়। সাধারণতঃ সে-দেশে যে কোন ভদ্র পুরুষই কোন ভদ্রলোকের মেয়ের গায়ে গা ঠেকাতে লজ্জা বোধ করেন। আর সতীত্বের আরাধনার দেশে Exhibition বা প্রদর্শনী কিম্বা মেলা উপলক্ষেই হোক আর যে জন্যেই হোক, দিবসে বা সন্ধ্যার পর ঢলাঢলি কল্পনাই আমরা করতে পারি না। বিলাতের নকল করে গিয়ে আমরা যেন সে দেশকে এককাটি ছাড়িয়ে না যাই ছাড়িয়ে যাওয়ার ভয় বেশী; কারণ, এ-দেশে পুরুষেরা এখন বাইরে স্ত্রী-স্বাধীনতার স্বরূপটা ঠিক ধরতে পারেন নি ও পুলি আইনও তেমন কড়া বলে মনে হয় না। তা ছাড়া, আম নকলই বা করব কেন, আমরা আমাদের সমাজ-ধর্ম্মমূল সংযমগর্ভ স্বাধীনতা বিকশিত করে উন্মত্ত জগৎকে দান কর

সে-দেশে মা বাপ যে যুবার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দি ইচ্ছুক, কেবল সাধারণতঃ তারই সঙ্গে মেয়েকে কথা বল দেন বা সে বাড়ী এলে মেয়েকে দুয়ার পর্য্যন্ত তার অনুগ করতে দেন। কোন ভদ্রঘরের মেয়েই সেখানে অপরিচি লোক দুয়ারে ডাকলে দুয়ার খোলে না। আমরা হয় ভাববো যে বিলাতে যে কোন মেয়েকেই ডাকলে হয় সঙ্গে বেড়াতে চলে আসে। কিন্তু আলাপ থাকলে তা আসে না—যদি না বিয়ে করার ইচ্ছা থাকে অভিভাবকদের তা অনুমত হয়। এ গেল ভাল মেয়ে কথা অবশ্য। সে দেশে কোন ভাল মেয়েই যুবার কাছ থে পিতামাতার বিনা অনুমতিতে উপহার গ্রহণ করে না; যে জিনিস চাওয়া মেয়ের হীনতাই সূচিত করে। বাপ অনুমত না হলে বাড়ীর কোন মেয়েকে কোন আগ যুবার সঙ্গে অবশ্য সকলের মাঝেও এক টেবিলে বসে চা করতেও দেয় না—থিয়েটার দেখতে যাওয়া বা বেড়াতে যা তো দূরের কথা। সে দেশে স্বাধীনতার মাঝে বাঁধাবাঁ অনেক, আবার বজ্র-আঁটুনি ফস্কা গেরোও যে এ সেখানে লক্ষিত না হয় তা নয়।

আমার বলার উদ্দেশ্য এইটুকু যে, যে-দেশে স্ত্রী-স্বাধী অত বেশী, সে দেশেও তার সীমানির্দ্দেশ ও নিয় অনেক মোটামুটি হিসাবে। আমাদের সর্ব্বতোমুখী সামা মুক্তির সাধনার মাঝে আমরা ভারতের গঠনমূলক স আদর্শ ভুলে যেন পশ্চিমের মালিন্যমাখা স্থানবিশেষে গ উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতার আমদানী না করে ফেলি। যে ভ চিরকাল জগৎকে ধর্ম্মদান করে এসেছে, সে আজ উন্মা গ্রস্ত সভ্যতাব্যাধিমত্ত বিভ্রান্ত জগৎকে ধ্যানসংযত কর্ম্মে প্রতিফলিত সঞ্জীবনী নবমুক্তির পথ প্রদর্শন করুক

নিখিল-প্রবাহ

রাসায়নিকের কীর্ত্তি—

পিটার্সবার্গের কোনো প্রকাশ্য সভায় সে দিন এক ব্যক্তি বেশ স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিলেন যে, দীর্ঘ বাইশ বৎসরের অক্লান্ত গবেষণার ফলে তিনি কপির পাতা থেকে কয়লা প্রস্তুত করেচেন।

রাসায়নিক ওয়ারেণ এমলি।—ইনি কলার সার থেকে লেমনেড তৈরী করেচেন।

ডাক্তার ফ্রেডরিক বাজ্‌জিয়স। ইনি গাছপালার সার থেকে কয়লা প্রস্তুত করেচেন।

এই লোকটির নাম ফ্রেডরিক বাজ্‌জিয়স্‌—জার্ম্মানী এঁর দেশ। সে দিনের সেই সভাস্থলে কপির পাতা ও অন্যান্য গাছ-গাছড়ার সারকে ফ্রেডরিক সকলের সামনে পাত্রের মধ্যে পুরে সেটীর মুখ বন্ধ করেন; তার পর তা'র চারিধারে উত্তাপ দিতে থাকেন। উত্তাপ দেওয়ার পর, পাত্রের সমস্ত বাষ্প যখন দূর হয়ে গেল, তখন দেখা গেল—সেই পাত্রের মধ্যে যা' আছে তা' গাছ-গাছড়ার তরল সার নয়, ঠিক সেই পরিমাণ ওজনের কঠিন কয়লা!

প্রকৃতির উপর বিজ্ঞান কোনো দিন জয়ী হ'বে কি হ'বে না, তার চরম মীমাংসা আজও হয়নি, কিন্তু রাসায়নিক ফ্রেডরিক যা' কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রূপান্তরিত করতে পারেন, প্রকৃতি কয়েক সহস্র বর্ষেও তা পারে কি না সন্দেহ!

শুধু এই নয়, ও দেশের প্রতিভাশালী রাসায়নিকদের কেউ কয়লা থেকে তেল আবিষ্কার করেচেন, কেউ করেচেন কাঠের গুঁড়ো থেকে খাদ্য-দ্রব্য উৎপাদন—কেউ আবার কয়লা থেকে সাবান। সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে, ফ্রান্সের রাসায়নিক জেমস্‌ ব্যাসেট তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রে কয়লাকে হীরা-খণ্ডে রূপান্তরিত করেচেন এবং আমেরিকার ডাক্তার ওয়ারেণ এমলি কাঁচকলার সার থেকে 'লেমনেড্‌' তৈরী করেচেন।

এমনি ভাবে রাসায়নিকদের মস্তিষ্কের স্বপ্ন ধীরে ধীরে সত্যে রূপান্তরিত হ'চ্চে, এমনি করেই তুচ্ছ, মূল্যহীন জিনিষগুলি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠ্‌চে। আমাদের দেশের ভোজের বাজীতে এমনি রূপান্তরের স্থান আছে, ও-দেশের 'ব্লাক ম্যাজিক'ও একটা বড় আর্ট, কিন্তু আজকের রাসায়নিকরা যা' করলেন তা ধাঁধা নয়, চোখে দেখা এবং চোখে দেখানো সত্য।

পশ্চিম আশা করচে যে, নিত্যকার অন্ন-বস্ত্র আলো-বাতাসের জন্যেও একদিন তাকে রাসায়নিকের মুখ চাইতে হ'বে। সে কবে ?—বোধ করি দূর নয়।
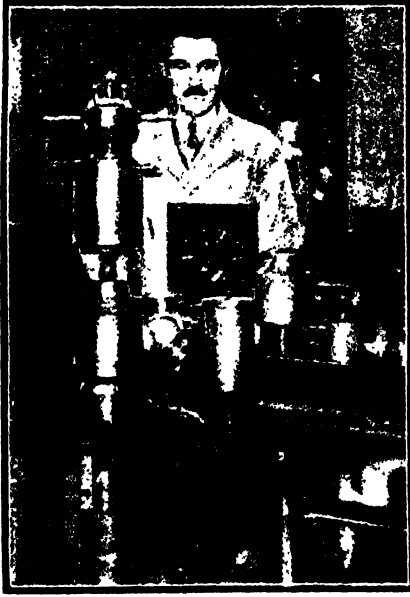
ফরাসী রাসায়নিক ব্যাসেট।—ইনি কয়লা থেকে হীরা প্রস্তুত করেচেন।

একটি মাত্র লোকের পরিশ্রমের ফল—

টি মার্টিন বিলেতের এক মোটর-চালক। কিছুদিন সে নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে ছিল। এই সময় তার ইচ্ছা হয় যে নিজের বাসোপযোগী একটি ছোটখাট দুর্গ সে নিজ হাতেই তৈরী

একটি মাত্র লোকের পরিশ্রমের ফল

করবে। তার পর কাজ আরম্ভ হয়। এগারো মাসের পরিশ্রমের ফলে মার্টিন তার কল্পনানুযায়ী এই বাড়ীটিকে ঠিক মধ্যযুগের দুর্গের মত করে গড়ে তুললে। এর ভিত্তি স্থাপনা থেকে শেষ কাজ পর্য্যন্ত সে একা নিজের হাতে সম্পন্ন করেচে।

পিসা স্তম্ভ—

পিসার জগদ্বিখ্যাত স্তম্ভটিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে নানাপ্রকার চেষ্টা চলচে। স্তম্ভটি মধ্যযুগে
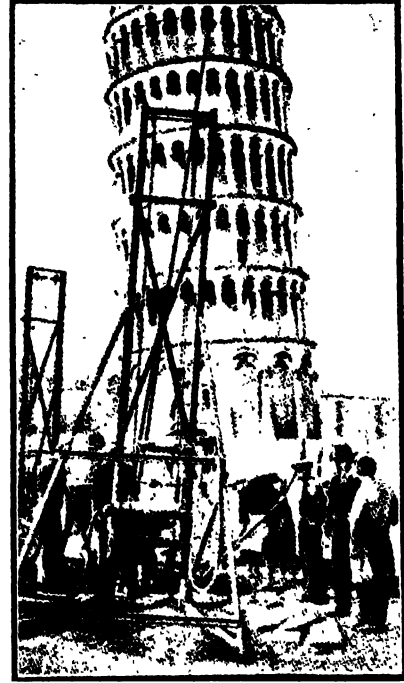
পিসা স্তম্ভ

অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়। বিশেষজ্ঞরা সিদ্ধান্ত করেচেন যে, এর গঠনকারীরা ইচ্ছা-ক্রমে এটিকে একপেশে ভাবে গড়েনি, নির্ম্মাণ কালে হয় ত কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনায় এমনি ভাবে হেলে পড়ে। তার পর থেকে ক্রমশই এটি হেলচে। এই থেকে অনেকে আশঙ্কা করচেন, এর পতনের আর বিলম্ব নেই। আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে পিসার এ গৌরব-চিহ্নটিকে রক্ষা করবার জন্যে তার চারিপাশে কংক্রিটের কাজ সুরু হয়েচে।

স্তম্ভটি আট খণ্ডে বিভক্ত এবং ১৭৯ ফীট উঁচু।

ব্যাঘ্রের দন্ত-চিকিৎসা—

'একদা' এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল'—কথা-মালার এ গল্প আমরা প্রায় সবাই জানি। সম্প্রতি বিলেতে এক বাঘের দাঁতের পীড়া জন্মানোয় সে বেচারা যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে চারিদিকে ছুটতে সুরু করে এবং সমস্যাটা ঠিক কথা-মালার সেই গল্পের মতই হয়ে দাঁড়ায়। কে তার চিকিৎসা

ব্যাঘ্রের দন্তচিকিৎসা

করবে? অবশেষে এক দন্ত-চিকিৎসক সাহস করে তার চিকিৎসায় অগ্রসর হন। ঔষধ প্রয়োগ কালে এই পশুর পালনকর্ত্রী তাকে ধরে রাখে এবং চিকিৎসক তার মুখের মধ্যে হাত চালিয়ে দিলেও সে কিছুমাত্র উপদ্রব করেনি।

ক্যামেরার কেরামতি—

চলচ্চিত্রের পর্দ্দায় আমরা কত অদ্ভুত জিনিষই না প্রত্যক্ষ করি, আর সেই সঙ্গে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাই। আসলে, সেই সব দৃশ্যগুলি—শুধু ছবি তোলার কৌশল ছাড়া আর কিছু না!

অনেক ছবিতে দেখা যায়, সমুদ্র-বক্ষে উন্মত্ত ঝড়ের মুখে একখানা জাহাজ ভেসে চলেচে। সমুদ্র উচ্ছ্বসিত, আকাশ কালিবর্ণ!···দেখে বিস্ময়ে, আনন্দে আমরা নির্ব্বাক্ হয়ে যাই। আসলে এই সব দৃশ্য তোলা হয় এক-টব জলের মধ্যে একটি খেলনার জাহাজ ভাসিয়ে। বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় টবের জলে ঢেউয়ের মত তোলা-পাড়া করে এবং এই টবও আমাদের স্নানের টবের চেয়ে কিছু মাত্র বড় নয়। কোনো ছবিতে

চলমান কার্পেটের উপর কৃত্রিম মানুষ

হয় ত দেখলাম, একজন লোক প্রকাণ্ড একটা অট্টালিকার কার্ণিসের উপর দিয়ে উঠে চলেচে। এ ক্ষেত্রে বাড়ীটা
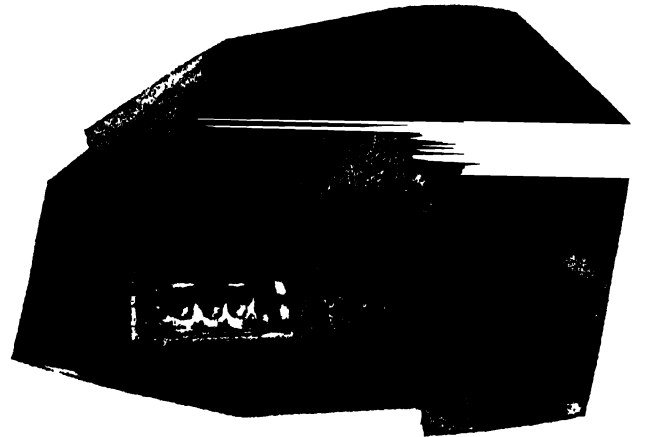
কৃত্রিম জাহাজ ও ঝড়

নকল ছোট বাড়ী ছাড়া অন্য কিছু নয়। ক্যামেরার সাহায্যে তার আকার বহুগুণ বর্দ্ধিত করে নেওয়া হয়।

ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কসের 'বাগ্‌দাদের চোর' ছবিখানায় এমন অনেক অদ্ভুত দৃশ্য আছে, যা' আমরা কল্পনাও করতে

পারি না। একটি দৃশ্যে দেখি, তিনটি মানুষ শূন্য পথে এক চলমান কার্পেটের উপর বসে উড়ে চলেচে। আসলে সেই তিনটী মানুষই নয়; ছোট ছোট পুতুল মাত্র।

ছবির জন্য প্রস্তুত একটি নকল-নগর ও অতিকায় অট্টালিকা শ্রেণী

কৃত্রিম সূর্য্যালোক—
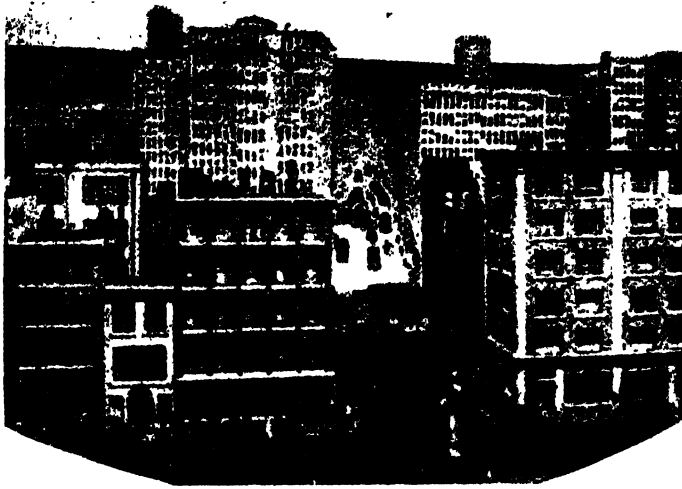
সূর্য্যের রশ্মি যে বিবিধ ব্যাধির পক্ষে কত বেশী উপকারী, আজকের দিনে তা আর আমাদের অজ্ঞাত নেই। শরীরের পক্ষে ভিটামিন যে উপকার করে, সূর্য্যের অলট্রা-ভায়োলেট রশ্মিতে ঠিক সেই উপকারই পাওয়া যায়। সূর্য্যালোক-চিকিৎসায় আজকাল ক্ষয়রোগ পর্য্যন্ত নিবারণ করা সম্ভব হ'চ্চে। কিন্তু আরও আশ্চর্য্যের কথা এই যে, অধ্যাপক ষ্টীন্ নামা কোনো ব্যক্তি বৈদ্যুতিক আলোর যোগাযোগে একপ্রকার কৃত্রিম সূর্য্যালোক সৃষ্টি করেচেন—যার দ্বারা উপরিউক্ত কাজগুলি খুব সহজেই সম্ভব হ'চ্চে। উপযুক্ত পরিমাণ ভিটামিন সংগ্রহ না করতে পারলে দীর্ঘায়ু হওয়া সম্ভব নয় বলে বৈজ্ঞানিক এই কৃত্রিম সূর্য্যালোকের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্যাদি ভিটামিনযুক্ত করে তুলচেন এবং সেগুলি সাধারণের কাছে বিক্রীও হ'চ্চে। যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসাও এতেই চলচে। এখানে সেই কৃত্রিম সূর্য্য ও তারি আলোয় যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসার ছবি দেওয়া হ'ল।

কৃত্রিম সূর্য্যালোক

কৃত্রিম সূর্য্যালোকে
যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসা।
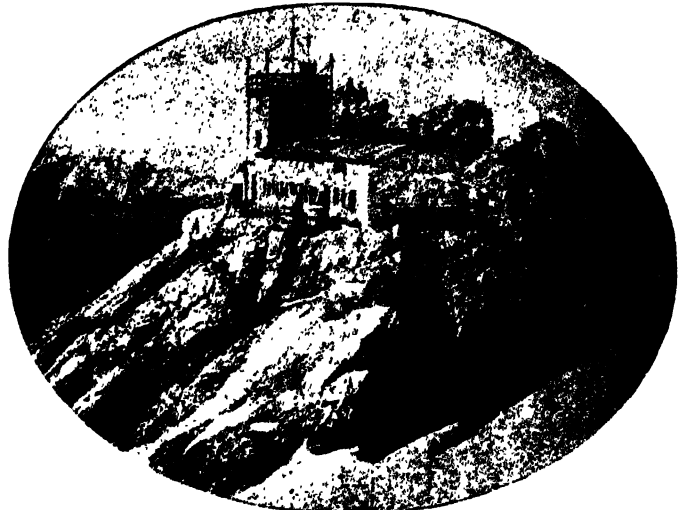
শূন্যে রেলপথ ও জাগ্‌স-পাইট হোটেল—

জাগ্‌সপাইট সহরে একটি নতুন হোটেল তৈরী হয়েচে। হোটেলটি জার্ম্মানীর সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত-চূড়ায়, সমুদ্রকূল হ'তে দুই মাইল উর্দ্ধে অবস্থিত। এই পর্ব্বত-চূড়ায় পৌছবার হাঁটা পথ নেই। সুতরাং হোটেলে পৌছবার জন্যে শূন্যে একটি তার লাইন স্থাপন করতে হ'য়েচে। এই শূন্যপথ দিয়ে, বৈদ্যুতিক ক্রিয়ায় একখানি গাড়ী যাত্রীদের নিয়ে যাতায়াত করে। এ শ্রেণীর রেল-পথ পৃথিবীর আর কোথাও আছে বলে জানা যায় নি।

হোটেলটি তৈরী হ'বার কালে, ঝড় বৃষ্টি ও অতিরিক্ত তুষারপাতের ফলে ছ'জন ব্যক্তির প্রাণহানি হয়। এই হোটেলটির অভ্যন্তরে এককালে আড়াইশ' লোকের আহার এবং বাসের ব্যবস্থা আছে। এই অদ্ভুত হোটেল ও অদ্ভুত রেলপথ নির্ম্মাণের খরচ পড়েচে ১,০০০,০০০ পাউণ্ড।

যাত্রীরা হোটেলে
যাচ্ছে

শূন্যে রেল পথ

জাগসপাইট হোটেল

কৃষি ব্যবসায় ও বাঙ্গালী যুবকের অন্ন-সমস্যা

আচার্য্য সার শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

যাঁহারা এই অনুষ্ঠানের উৎসাহদাতা তাঁহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ইঁহাদের মধ্যে এই জেলার কৃষি-কর্ম্মচারী রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র ইহার প্রাণ স্বরূপ। গত তিন দিন যাবৎ আমি তাঁহার আতিথ্য ভোগ করছি বলেই এ কথা বলছি না। আমি দেখেছি—তিনি এই এখানে, ওই ওখানে, এইভাবে সর্ব্বত্র বিরাজমান। তিনি তাঁর অসাধারণ দক্ষতার দ্বারা জনসাধারণের এবং জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্, জজ, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান, এমন কি খৃষ্টান ধর্ম্ম-প্রচারকগণের সহযোগিতা লাভ করেছেন। তিনি না থাকলে আজকের এই অনুষ্ঠান সম্ভব হত না, এ কথা ত সকলেই বলেছেন। তিনি অদ্ভুতকর্ম্মা—কাজ করার তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা। বাঙালীদের মধ্যে এইরূপ উৎসাহী, পরিশ্রমী ও কার্য্যপটু লোক খুবই বিরল। তিনি যে উত্তম ব্যবস্থাপক, এ কথা সকলকেই স্বীকার করতে হবে। তিনি সামনে আছেন—আর বেশী বলবো না—হয় ত তিনি লজ্জা বোধ করবেন।

আমি গত ৬০ বছরের বাংলার কৃষি-বিভাগের ইতিহাস আজ নখ-দর্পণে দেখছি। সার এস্‌লি ইডেন যখন বাংলার ছোটলাট ছিলেন, তখন তিনি বৎসরে ৫০০ পাউণ্ড খরচ করে' ২টী কৃষি-বৃত্তির প্রবর্ত্তন করেন। এই বৃত্তি দ্বারা বৎসরে দুইজন মেধাবী ছাত্রকে বৈজ্ঞানিক কৃষি-বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলাতে পাঠান হ'ত। ইঁহাদের জন্য সরকারের কম টাকা ব্যয় হয় নাই। বৎসরে এক এক জনের পিছনে খরচ হ'ত ২৫০ পাউণ্ড; তখনকার দিনের এক শত পাউণ্ডের মূল্য এখনকার তিন শত পাউণ্ডের সমান। প্রথমবার যান একজন মুসলমান ও একজন হিন্দু; মুসলমান ভদ্রলোকটী বেহারের সৈয়দ সহকৎ হোসেন। হিন্দু ভদ্রলোকের নাম—অম্বিকাচরণ সেন। তাঁহারা শিক্ষা লাভ করে' যখন দেশে ফিরে এলেন, তখন তাঁদের অর্জ্জিত কৃষি-বিদ্যা কাজে লাগাবার সুযোগ হ'ল না। তাঁরা হলেন তখন ষ্ট্যাটুটরী সিবিলিয়ান—জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট। তার পর ক্রমে ক্রমে গেলেন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মিঃ অতুল রায়, নৃত্যগোপাল মুখার্জ্জী ও ভূপালচন্দ্র বোস। এঁরা আমার সমসাময়িক। ফিরে এসে এঁদের অধিকাংশেরই করতে হল ডেপুটীগিরি। ব্যোমকেশ বাবু হলেন ব্যারিষ্টার; আর গিরিশ বাবু স্কুল মাষ্টারীর দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করতে লাগলেন। সুতরাং দেখতে পাচ্ছেন যে কৃষিশিক্ষার জন্য দেশের এতগুলো টাকা গেল "ন দেবায় ন ধর্ম্মায়"। বিলাতে শিক্ষালাভ করে সে শিক্ষা দ্বারা এ দেশের কৃষির কোন উন্নতি করা চলে না। বিলাতে প্রত্যেক ভদ্রলোক কৃষক ১০০ কিম্বা ২০০ একার জমি নিয়ে চাষবাস করে থাকেন। তাঁহারা শিক্ষিত ও বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী অবলম্বন করে চাষ করেন। আমাদের দেশের চাষীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড খণ্ড জমি; প্রায়েরই ১ বা ১॥ একার জমির বেশী হইবে না; এবং তাহারা নিরক্ষর। এজন্য বিলাতী চাষের প্রণালী ও আদর্শ এখানে চালান যায় না। দেশ, কাল, পাত্র না বিবেচনা করে, কেবল বিলাতী শিক্ষা আমদানী করলে তাহা ফলবতী হয় না। এ দেশের মধ্যেই যে-সব জায়গায় যে-সব চাষ-আবাদ উন্নত প্রণালীতে হচ্ছে, সে সকল জায়গা থেকে, তাহা শিখে এসে কয়েকটী গ্রাম নিয়ে বিভিন্ন কেন্দ্র করে' সেই ভাবে ফসল উৎপাদন করে' আমাদের চাষীদিগকে দেখাতে পারলেই দেশের কৃষিকার্য্যের প্রকৃত উন্নতি হবে। এজন্য বিলাত যাওয়ার কোন আবশ্যকতা নাই। এখন এ দেশেই রসায়নশাস্ত্র, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান শিক্ষার প্রকৃষ্ট বন্দোবস্ত আছে। এখানকার কৃষি শিক্ষার জন্য ও কৃষির উন্নতির জন্য এখানেই লোক পাওয়া যায়, দেবেনবাবুর মত লোকই যথেষ্ট।

আমার পাঁচ বার বিলাত যাওয়া হয়েছে; কিন্তু বিলাত-ফেরতা দেখলেই আমার মাথা গরম হয়ে উঠে। বিলাতী পোষাক পরে টুপি মাথায় দিয়ে গ্রামে যখন তারা যায় প্রজারা তাদের দেখে ভয় পায়—মনে করে, ইহারা বো হয় কোন প্রকার নূতন টেক্স বসাবার ফিকিরে এসেছে কৃষকদের উন্নতি করতে হলে কৃষকের পোষাক পরতে হবে তাদের সঙ্গে বাস করতে হবে—গ্রামের মধ্যে দু'চার বি

জমি নিয়ে উন্নত শ্রেণীর ফসলের চাষাবাদ করে' তার সুফল কৃষকদের দেখাতে হবে। তবেই ত নিরক্ষর চাষী ইহার উপকারিতা বুঝে চাষের নূতন প্রণালী অবলম্বন করবে। দেবেন্দ্রবাবুও আজ সকালে আমাকে এ কথা বলছিলেন যে, এ রকম বড় বড় কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা না করে' জমিদারগণের সহযোগে কৃষিবিভাগ যদি এক এক স্থানে ৫।৭ বিঘা জমি ৩।৪ বৎসরের জন্য নিয়ে কৃষিবিভাগের অনুমোদিত চাষবাস করে দেখাবার বন্দোবস্ত করেন, তবে কৃষকদের মধ্যে উন্নতশ্রেণীর ফসল, সার ইত্যাদির প্রচার অধিকতর হয়। এই সব জমি গ্রামের চাষীদের দ্বারা বর্গা

ফরিদপুর কৃষি-শালায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র হলচালনা করিতেছেন

চাষ করাতে হবে। তা' হলেই তারা নিজেরাই দেখতে পাবে যে কি করে তাদের ফসলের ফলনের চেয়ে অধিকতর ফসল পাওয়া যায়। উপস্থিত কৃষি ক্ষেত্রে কি ভাবে কাজ হচ্ছে, কত খরচ হচ্ছে, তা' তারা জানে না। তাদের ধারণা, অজস্র টাকা ব্যয় হচ্ছে, তবে এ-রকম ভাল ফসল হচ্ছে। কিন্তু গ্রামের মধ্যে তাদেরই জমিতে তারা যদি বর্গা চাষ করে, তাহলে এ সন্দেহ তাদের দূর হবে। আমি জানি না দেবেন্দ্রবাবুর এই পরামর্শ গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেন নাই কেন!

আবার বলছি, এই কাজ বিলাত-ফেরতাদের দ্বারা হবে না। তারা বৃথাগর্ব্বে ভরা, তারা দেবেনবাবুর নিকট পদানত হয়ে থাকতে পারে। বিলাত ফিরে এসে যদি তারা বড় বড় কলকারখানা করতে পারতো, আমার আপত্তি হত না। সার আর, এন, মুখার্জ্জি, কর এণ্ড কোং'র স্বত্বাধিকারীরা বিলাত-ফেরতা নয়। সার রাজেন্দ্রনাথ বিলাতের পাশ অথবা শিবপুরের পাশ করা ছাত্র হলে আমি দেশের দুর্ভাগ্য মনে করতাম। কারণ, তাহলে হয় ত তাঁকে আপনাদের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের, কিম্বা জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানের বৈঠকখানায় নিত্য হাজিরা দিতে হোতো। কিন্তু তিনি পাশ করেন নি বলে' তাঁকে তাঁর নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করতে হয়েছে।

সেদিন কলিকাতা কংগ্রেস প্রদর্শনীতে দেখলাম, একটা কাচের বাক্সের ভিতরে এক বিজ্ঞাপন একটি ৩০৲ টাকা মাহিয়ানার কেরাণীর কাজের জন্য। ইহা ফরওয়ার্ড ও ষ্টেটসম্যান কাগজে মোটে একদিন বার করা হয়েছিল—তাতেই এক হাজার প্রার্থীর দরখাস্ত এসেছিল এবং তাদের মধ্যে কতকগুলি M. A., M. Sc., B. A., B. Sc. প্রার্থী হয়েছিলেন, তাহার হিসাব রাখা হয়েছে। অবশ্য তাঁরা প্রার্থীদের নাম দেন নাই; কারণ, তাহা হইলে ভদ্রতার বিরুদ্ধতাচরণ করা হইত। রেলের কুলি মজুররাও ১৲ ১।০ দিন রোজগার করে; কলিকাতার অনেক বিড়িওয়ালা দৈনিক ২।৩৲ উপায় করে। কিন্তু বাংলার শিক্ষিত যুবকদের তাহাও জোটে না। আমি সব জায়গাতেই এক কথা বলে'

থাকি—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটদের মত কৃপাপাত্র দুনিয়ায় আর নেই। যে যত বেশী পুঁথিগত বিদ্যা আয়ত্ত করবে, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সে তত অনুপযুক্ত হয়ে উঠবে।

বারাকপুরে সেনানিবাস অর্থাৎ পল্টনের উপনিবেশ আছে। সেখানে প্রতি দু'বৎসর পর পর ৩০।৪০ বিঘা জমি নিয়ে সৈন্যদের তাঁবু খাটিয়ে পরিখা খনন করে বাস করবার বন্দোবস্ত করা হয়। তার পর পশ্চিমা দেশোয়ালী হিন্দু ও মুসলমানরা ৩০০০৲।৪০০০৲ টাকা সেলামী দিয়ে সারের জন্য তা কিনে নেয়। গোবরের চেয়ে মানুষের বিষ্ঠা আরও মূল্যবান। জাপানে বিষ্ঠা বাড়ী থেকে যেচে যেচে কিনে নিয়ে যায়। এই মাঠের ইজারা নেয় দেশোয়ালী হিন্দু ও মুসলমানরা আগেই বলেছি। আমাদের বাংলার মুসলমানরা এর ধার দিয়েও যায় না। তারা কলে চাকরী করে, আর ফোপর-দালালী করে' বেড়ায়। সেখানে হানেফ বলে একজন পশ্চিমা মুসলমান শাকসব্জী করে বড় পাকা বাড়ী করেছে। একবার দেখলাম, একজন হিন্দুস্থানী হিন্দু বিধবা স্ত্রীলোক স্তূপীকৃত বেগুন কপি প্রভৃতি করেছে, আর দালালরা এ'সে সহরে বেচবার জন্য কিনে নিয়ে যাচ্ছে। এখানকার জমি এতই উর্ব্বরা যে, বিনা সারেই বারো মাসে তের ফসল হয়; কিন্তু এ সবই করছে পশ্চিমে হিন্দু ও পশ্চিমে মুসলমান। বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান দুইই সমান বাবু। আজকাল আর ছাত্র বাবুদের ধোবায় চলে না—চাই বাবু-ধোবার দোকান, চুল-কাটবার দোকান, আর সন্ধ্যায় সিনেমা আর রেষ্টোরাঁ। ভাবুন দেখি, বাপ-মার টাকা কি ক'রে কোলকাতায় এরা অপচয় করছে? আগে তো তবু মেসের খাওয়া দাওয়ার ম্যানেজারী ও বাজারের জিনিষপত্র কেনা প্রভৃতি এরা নিজেরাই করতো। এখন বামুন ও চাকরের সঙ্গে চুক্তি কোরে কোনও প্রকারে দু'বেলা দু'মুষ্টি খাবার সংস্থান করে। কি অকর্ম্মণ্য জীবই এরা হয়েছে। বারাকপুরের হানেফ বড় না কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট বড়—আপনারা একেবার ভেবে দেখুন!
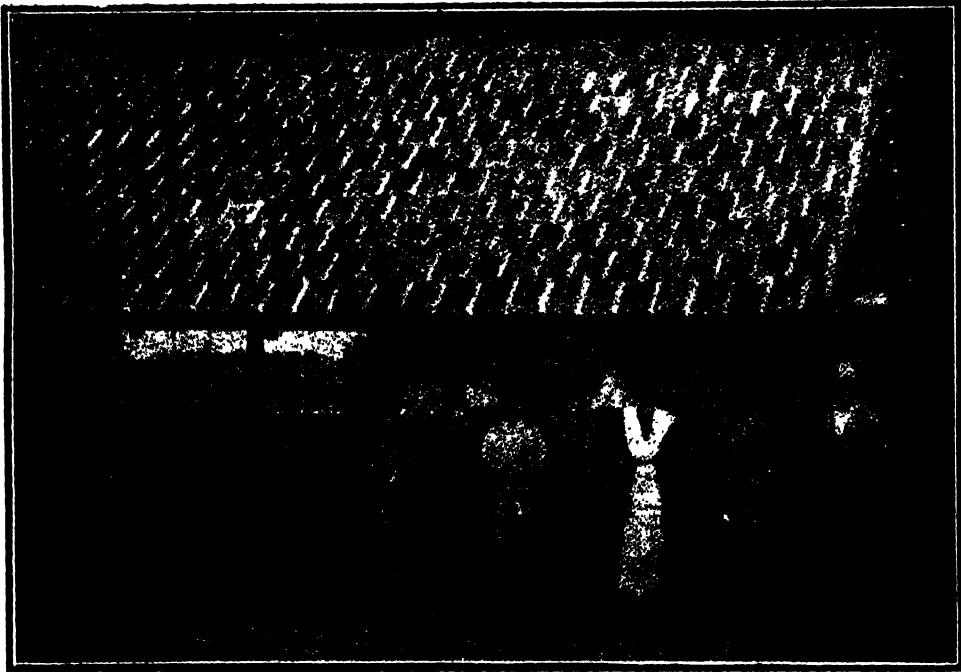
ফরিদপুর গো-শালায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

ফরিদপুর সহরকে টাউন না বলে গ্রামই বলা যায় কত ফাঁকা জায়গা আছে। প্রত্যেক বাড়ীতেই অন্ততঃ ২।[illegible] কাঠা, এমন কি, স্থানে স্থানে ২।১ বিঘা করিয়া জমি থাকি[illegible] পড়িয়া আছে! এই সহরটি প্রকৃত পক্ষে পদ্মা-গর্ভ থেকে উদ্ধৃত পলি-পড়া জমির উপর গড়া—যাকে বলে পদ্মা চরভূমি। মাটী খুব ভাল। আপনাদের বাড়ীর স[illegible] যে ২।৪ কাঠা জমি পড়ে আছে, তার কি ব্যবহার আপনা[illegible] করছেন? এই যে মালাটী আপনারা আমাকে দিয়েছে[illegible]

এর মধ্যে কি একটীও গোলাপ ফুল আছে?—আপনাদের বাড়ীর সংলগ্ন এক কাঠা জমিতে আপনারা ফুলের বাগান করতে পারেন না? এই কি আপনাদের উচ্চশিক্ষা? প্যারিসে প্রত্যেক রাস্তার মোড়ে মোড়ে সদ্য প্রস্ফুটিত সুগন্ধি ফুল পাবেন—বিলেতে লোকে একটা ফুলের তোড়ার জন্য এক গিনি দাম দিতে প্রস্তুত—বিশেষ করে যদি ফুলগুলো 'অর্কিড' হয়। আমি জিজ্ঞেস্ করি, আপনাদের এখানে বাগান করে যুঁই, চামেলী, গোলাপের গাছ কি লাগান যায় না? এ বিষয়েও মনু, কোরাণ বা শারিয়াতের কি নিষেধ আছে? মৌলবী তমিজুদ্দিন সাহেব বলুন না কেন? ছোট বেলায় দেখেছি প্রত্যেকের বাড়ীর সামনে এক একটী ফুলবাগান রাখার প্রথা ছিল। ভাবি—আমাদের হল কি? এই কি আমাদের উচ্চশিক্ষা? আপনারা যদি বলেন, এখানে কিছু জন্মায় না, তা আমি শুনবো না; কারণ, এই তিন দিন আমি এখানে ঘুমিয়ে কাটাচ্ছি না। আমি দেবেনবাবুর কাছে শিক্ষার্থী হিসাবে এসেছি; কিছু শিখে যাবো, নিজের চোখে কিছু দেখে যাবো, এই আমার মতলব। ২৫শে তারিখ বেলা তিনটের সময় আমি এখানে পৌছেছি—সমস্ত দিন অনাহারেই কাটিয়েছি বল্লেই হয়। পাঁচটার সময় আমি স্থানীয় গুরুট্রেণিং স্কুল দেখতে যাই। ঢুকেই দেখি, ২৫।৩০ জন ছেলে মাঠে কোদাল খুরপী নিয়ে সব্জী-বাগানে কাজ করছে, দেখে কতো আনন্দ হল কি বলবো! সবাই ভদ্রলোকের ছেলে। এঁরা সব প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক হবেন—এখন হাতে-হেতেরে শিক্ষা পাচ্ছেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে খুবই উৎসাহী। তাঁরই চেষ্টায় গুরুরা হাতে-কলমে কাজ শিখছে। দেবেন্দ্রবাবুর উৎসাহ এখানেও দেখলাম। তিনি মন্মথ বাবুকে এই কাজে যথেষ্ট উৎসাহ দিচ্ছেন, সাহায্য করছেন, এমন কি কৃষি-বিভাগ থেকে ১০০৲ টাকার যন্ত্রপাতি গুরুদের কাজের জন্য এই স্কুলে দিয়েছেন। এই গুরুরা এখান থেকে উন্নত শ্রেণীর চাষাবাদ নিজেরা হাতে-কলমে শিখে গিয়ে গ্রামের মধ্যে ঐ সকল শিক্ষা প্রচলন করবেন, এবং আমি শুনে সুখী হলুম যে, মন্মথ বাবুর ও দেবেন্দ্র বাবুর চেষ্টা সফল হয়েছে; কারণ, যে সকল গুরুরা এখান থেকে শিক্ষালাভ করে এখন গ্রামের মধ্যে শিক্ষকতা করছেন, তাঁরা কটকতারা ধান, কোইম্বাটুর আখ প্রভৃতির বীজ চেয়ে পাঠাচ্ছেন।

সেইদিনই টেপাখোলায় সখীচরণ বাবুর বাগান দেখতে গেলাম। দেবেন্দ্রবাবু অন্ততঃ একটী আদর্শ ছাত্র তৈরী করেছেন। সে হচ্ছে সখীচরণ বাবুর ভাইপো—ক্ষীরোদ। সখীচরণ বাবুর জায়গায় গিয়ে দেখলাম প্রায় এক বিঘাতে আখ হচ্ছে। সেই আখ মাড়াই করে আবার গুড় হচ্ছে। কতক জমিতে আলু কপি ও অন্যান্য শাকসব্জী করা হচ্ছে। আর এই সব কাজ করছেন সখীচরণ বাবু নিজে ও তাঁহার ভাইপো। ভাইপোটী আবার এদিকে কলেজেও পড়ছেন। এখানেই আমি প্রথম দেখলাম যে, একটা আলু থেকে প্রায় এক সের আলু হচ্ছে। দেবেন বাবুর চেষ্টায় সখীচরণ বাবু মহারাজ প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর ও খাসমহল থেকে জমি পেয়েছেন। পরদিন দেবেন বাবু আমাকে নিয়ে গেলেন পুলিস সাহেব মিঃ হাকের বাড়ীতে। সেখানে দেখলাম, মিঃ হাক্ স্বয়ং বাগানেই দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ক্লাব বা আড্ডায় পরনিন্দা বা পরচর্চ্চা করতে যান না। অবসর সময়টুকু বাগান করেই কাটান। তিনি এক দিকে করেছেন ফুলের গাছ আর এক দিকে নানাপ্রকার শাকসব্জী। তার পর গেলাম সবডিভিসনাল অফিসার অভয়বাবুর বাড়ীতে। তিনি আমার ছাত্র। সেখানে দেখলাম, দেড় কাঠা জমির মধ্যে এত রকম ফসল করা হয়েছে যে, তাঁহার সমগ্র পরিবারের জন্য বাজার হতে তরকারী কিনতে হয় না। আবার কলাগাছও রয়েছে। তবু ত তিনি স্থায়ীভাবে কিছুই করতে পারেন না—পাছে সেক্রেটেরিয়েটের কলমের একটা খোঁচায় অন্য যায়গায় বদলী হয়ে যান এই ভয়ে। পলতায় আমাদের এনামেলের বাসনের কারখানায় একটা লাউ গাছে দুই শত কুড়টী লাউ হয়েছে দেখেছি। আমরা এমনি আলসে ও অকর্ম্মা হয়েছি যে, কিছুই পারি না। এ জাতি যে কেন বেঁচে থাকবে তাহার কারণ দেখান। এই কৃষিক্ষেত্রে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখেছি। 'কেমন আখ, তামাক হয়েছে আপনারা দেখেছেন কি? কত শাকসব্জী হচ্ছে, বাঁধাকপি ফুলকপি, বিলাতী বেগুন, শালগম ইত্যাদি। কিন্তু শুনলাম ফরিদপুরের বাজারে শালগম ও টোমাটোর (বিলাতী বেগুনের) খরিদ্দার পাওয়া যায় না। কি রকম সভ্যতা যে আপনারা আমদানী করছেন বলতে পারি না। অথচ, এখানে ১০০ খানা মোটর গাড়ী চলছে। ইংল্যাণ্ডে দেখেছি—সৌখিন

সম্ভ্রান্ত ভদ্র ঘরের মেয়েরা বড় বড় পাকা টোমাটো খায়। কিন্তু এখানে এ জিনিসটা অস্পৃশ্য। টোমাটোয় এ, বি, সি ভাইটামিন আছে। সাহেবদের প্রত্যেক খানায় তাদের ভোজন পাত্রে আপনারা টোমাটো দেখতে পাবেন। আমরা ভাবি—ইয়োরোপীয়ানরা অর্দ্ধসভ্য; কারণ, তারা কাঁচা জিনিস খায়। কিন্তু কেন খায়? খায় তারা আত্মরক্ষার সহজ সংস্কারের বশে; যেহেতু, যখন থেকে তারা কাঁচা জিনিস খেতে আরম্ভ করেছে, সে যুগ ভাইটামিন আবিষ্কৃত হবার অনেক পূর্ব্বের। শরীরের পুষ্টি সাধনের জন্য টোমাটো, শালগম, গাজর খাওয়া বিশেষ দরকার। আপনারা প্রত্যেকে ভাবেন আপনাদের ছেলেরা হয় জজ ম্যাজিষ্ট্রেট, না হয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বা উকিল বা ডাক্তার হবে। কেবল চাকুরে হয়ে একটা জাত কি বাঁচতে পারে? বাঙ্গালী জাতি কি কেবল একৃজামিনেশনে পাশ করবার জন্যেই সৃষ্টি হয়েছিল? চাকরী কটা লোকেরই বা জুটতে পারে? বাঙ্গলাদেশে যতগুলা আইন-কলেজ আছে, সেগুলা যত দিন না সমভূমি—মনে রাখবেন, উন্নীত নয়, সমভূমি—করে ফেলা হবে, তত দিন বাঙ্গলাদেশের কোন আশা-ভরসাই নাই। এ কথা দশ বছর হল বলেছিলাম। ১৯২২ সালে একবার বরিশালে যাই—সেখানে তখন ১২৫।১৫০ উকিল। একজন স্থানীয় শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হিসাব করে বল্লেন, গড়পড়তা তাদের প্রত্যেকের মাসিক আয় ১৫৲ টাকা। তিন বছর হল বগুড়ায় যেয়ে এক মাড়বারী পাটব্যবসায়ীর কাছে শুনলাম যে, তিনি তিন মাসে পাটের কারবারে পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ করেছেন। বগুড়ায় সকল উকিল ও মোক্তার মিলে সারা বছরে কি ৫০০০০৲ টাকা উপার্জ্জন করতে পারেন? সেবার অসহযোগ করে নেতারা যখন জেলে, তখন আমি ফরিদপুর জেলায় ভ্রমণে এসেছিলাম। আমার পিছেও সি, আই, ডি ছিল। এখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্টে গোপনে লেখেন—ডাক্তার রায় এখানে ভ্রমণ করতে এসেছেন। তিনি গোলমাল বাধাতে পারেন। তা হলে কি করা যাবে? কমিশনার উত্তরে লেখেন—ডাক্তার রায় যখন স্বদেশজাত খদ্দর প্রচারার্থে অর্থাৎ একটা দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য এসেছেন, তখন তাঁকে উৎসাহ দেওয়া উচিত। আমি বক্তৃতায় সব কথাই বলি; কিন্তু দণ্ড-বিধির ১২৪ক ধারা অর্থাৎ রাজদ্রোহের আইন বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা করি! সেবার মাদারিপুর গিয়ে আমাদের দেশী অনেক কাগজেই লিখে পাঠাই—মাদারিপুরের দৃশ্য দেখে আমার বুক দমে গেছে। কেন জানেন? নদীর এক পারে বড় বড় গুদাম—নাম লেখা রয়েছে নাগরমল। অন্য পারে আর্ম্মেনিয়ানদের গুদাম। এসব পূর্ব্বে দেশের তেলি ও সাহা সম্প্রদায়ের হাতে ছিল। অনুসন্ধানে জানলাম, গৃহবিচ্ছেদ ও গৃহবিবাদের ফলে ইহারাই এখন বর্ত্তমান অধিকারীদের হাতে তুলে দিয়েছে। ইংলণ্ডে ও স্কটল্যাণ্ডে দেখেছি, খুব প্রতিভা-বান ছেলেদেরই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পাঠানো হয়। আর আমাদের দেশের সকল ছাত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পাশের জন্য ছুটাছুটী করে। বার বার ফেল করলেও ঘুরে ফিরে পুনরায় পাশ করতে চেষ্টা করে। এই ফেল করাটা যেন একটা ভয়ানক আক্ষেপের বিষয়। অনেক ছেলে ফেল করে' আত্মহত্যা করেছে, কাগজে প্রায়ই দেখা যায়। আর অন্যান্য দেশে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফেল করে, জগতে কর্ম্মজীবনে তারাই সবচেয়ে বেশী সফলতা লাভ করে। যারা কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাট পার হয়নি, এমন কি এণ্ট্রান্স স্কুলেও ঢুকে নাই, তারাই জগতে অদ্বিতীয় হয়েছে। ৯।১০ বৎসর বয়সের সময় এডিসনের (গ্রামফোন প্রভৃতির আবিষ্কর্ত্তা) বাপ মারা যান। বিধবা মা তাকে অতি কষ্টে স্কুলে পাঠান, কিন্তু তিন মাস পরে শিক্ষক তার মাথায় গোবর ভিন্ন অন্য কিছু নাই বলে' তাহাকে স্কুল হ'তে ফেরত পাঠান। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে সেই হ'ল জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক যাদুকর। আমেরিকায় যিনি শাকসব্জীর রাজা তাঁহার নাম চার্লস্ সীব্রুক। একবৎসর তিনি ১২০০ একর জমিতে চাষ করে একলক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের শাকসব্জি পেয়েছিলেন। তিনি, বলতে গেলে, শাকসব্জি তৈরী করেন। তিনি কোন স্কুল বা কলেজে পড়েন নাই। পাঁচ বছর বয়সে তিনি কাজ আরম্ভ করেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের কাজ করতেন। তিনি এ রকম গুরু পরিশ্রম করতেন এই জন্য যে তিনি মনে করতেন, তিনি পরিশ্রম করতে বাধ্য। কৃষি সম্বন্ধে যত ভাল ভাল বইয়ের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন, সমস্তই তিনি কিনে ফেলেছিলেন। ২৫ বৎসর বয়সে তিনি ভাল রকমে বুঝতে পারলেন যে, (১) কৃষিক্ষেত্রে সেচের বন্দোবস্ত ভাল করে করা দরকার; (২) জমিতে উত্তম সার প্রয়োগ করা

দরকার; (৩) প্রত্যেক জমিতে বৎসরে একটা করে ফসল যথেষ্ট নয়। আমেরিকায় চাষীর কাজ ক'রে কতো যে ভদ্রলোক ধনী হয়েছে তা বলা যায় না। ১২টা বাজে—আপনারা হয় ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন—দেবেন বাবু আমাকে সে কথা মনে করিয়ে দিলেন। কিন্তু আমার আসল কথাটাই যে এখনও বলা হয় নি; সেটা হচ্ছে ফরিদপুরের ভূতপূর্ব্ব মিঃ বারো ও দেবেন্দ্র বাবুর প্রস্তুত বেকার সমস্যার কিছু মীমাংসা করবার ব্যবস্থা। আমি যে সেই ব্যবস্থা সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করবার জন্যই এখানে এসেছি, এ কথা আমি মিঃ এলিসকে লিখেছিলুম। বড় চমৎকার ব্যবস্থা। আর ৫টী যুবক যে ভাবে কাজ করছে, তাও বড় চমৎকার। বড় আনন্দদায়ক এই ব্যবস্থা। এ রকম ব্যবস্থা ফরিদপুরেই প্রথম। আপনারা ইহার সুযোগ সুবিধা ছাড়বেন না। প্রতি বৎসর এই কৃষিক্ষেত্রে ৫ জন শিক্ষিত যুবককে এক বৎসরের জন্য হাতে-কলমে কৃষি-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হবে পরে। খাসমহল থেকে বিনা সেলামাতে তাহাদের প্রত্যেককে ১৫ বিঘা করিয়া জমি কৃষিকার্য্যের জন্য দেওয়া হবে। এবং যন্ত্রপাতি কেনবার জন্য দুই শত টাকা দাদন দেওয়া হবে। এর চেয়ে সুবিধাজনক ব্যবস্থা আর কি হতে পারে? যদি যুবকরা এ সুযোগ গ্রহণ না করে তবে এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হবে। এ বৎসর যে ৫ জন এই কাজে এসেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই উচ্চবংশীয় হিন্দু। দুঃখের বিষয় একজনও মুসলমান নাই। আমি স্বচক্ষে দেখলাম, তারা নিজেরা লাঙ্গল চষছে, কোদাল মারছে, গোবর নিকুচ্ছে। এদের দেখে বড়ই আনন্দ পেলুম। আমাদের দেশে একটী প্রবাদ আছে যে, যে মাঠে নিজ হাতে কাজ করে, তাহার ফসল ষোল আনা, যে ছাতা হাতে কাজ করে তাহার আট আনা, যে বাড়ী বসে কাজ করায় তার অদৃষ্টে কোঁৎকা।

দেবেন বাবুই হচ্ছেন এই কৃষিক্ষেত্রের ও এই পরিকল্পনার জীবন ও আত্মা। এখানে বড় বড় দুটী স্কুল ও একটী কলেজ রয়েছে। কলেজেই বা কি তাহারা শিখে? দু'লাইন শুদ্ধ করে লিখতে পারে না। এই যে কলেজে সেক্সপীয়ার, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি পড়ে, তার দুচারটা গৎ মুখস্থ বলতে পারে? এই যে আমার এত বয়স হয়েছে তবুও ধরুন, হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, জুলিয়াস সীজার প্রভৃতি হতে অনেক গৎ আওড়াতে পারি। আমাদের ছেলেরা স্কুল কলেজে পড়ে হচ্ছে একেবারে গণ্ডমূর্খ। তারা চায় কেবল ডিগ্রির ব্যবহার। স্কুল, কলেজে আর কতটা শেখা যায়। আমি স্কুল কলেজে যা শিখেছি, নিজ চেষ্টায় তার শতগুণ শিখেছি। এই যে এখন আমি প্রায়ই বহু বহু দূরদেশে ভ্রমণ করে থাকি, তখনও আমার ট্রাঙ্ক দরকারী বইয়ে ঠাসা থাকে। যদি কোন ছাত্র নিয়মিত ভাবে রোজ দু'ঘণ্টা করে' পড়ে, তাহলে সে অনেক বিষয় শিখতে পারে। আমি সব জায়গায়ই বলে থাকি—কেউ যদি ঠিক সময়ে নিয়মিত ভাবে প্রত্যেক কাজ করে, তবে তার হাতে অনেক সময় মজুত থাকে। যুবকদের বলছি—তাঁদের অভিভাবকদের বলছি, অনুরোধ করছি তাঁরা এই ব্যবস্থার এর সুযোগ গ্রহণ করুন। ১৫ বিঘা জমি থেকে আরম্ভ করে' পরে নিজের পরিশ্রমের দ্বারা ৫০।১০০ বিঘা জমি পাওয়া যেতে পারে।

আর ফরিদপুরে সুবিধা কত! এখানকার জমি প্রায় বারো মাসই নরম থাকে—প্রায় রসের অভাব হয় না—এখানে প্রকৃতি দেবী একেবারে প্রসন্ন। কৃষিকর্ম্ম আর পশুপালন হাতাহাতি একসঙ্গে চালানো চাই। বিলাতে তাই দেখেছি; তা' না হলে চলে না। হালের বলদ ও দুধের জন্য গরু চাই। বাংলায় দুধ যে কত তা আমি বরাবরই বলে আসছি। সেবার লিনলিথগো কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে এ কথাই আমি বিশেষ করে বলেছিলাম; আমাদের দেশের গরুর দিকে তাকালে দুঃখ হয়। তারা ঘাস পায় না। সর্ব্বত্রই ঘাস দুর্লভ। একটু যত্ন করলেই প্রত্যেক গরু হইতে ৩৪ সের দুধ পাওয়া যায়। আমরা সামান্য চেষ্টা করে, কিছু কিছু ভুষি, কলাই, খেতে দিয়ে আমাদের সৈদপুর কলাশালায় যে কয়টী গরু আছে তা থেকেই ১ মণ দুধ পাই। বর্ষাকালে টাকায় মাত্র ২॥ সের দুধ পাওয়া যায়। গরু রাখলে কি খরচ পোষায় না? মাসে ১০ টাকার খোরাক দিলে প্রত্যেক গরু থেকে দৈনিক ৩।৪ সের দুধ পাওয়াই যায়। আর বলেছিলাম, জমিদাররা নিজেদের গ্রাম ছেড়ে প্রবাসে থাকলে তারাই দেশের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। জমিদাররা যতই অত্যাচারী হউক না কেন যদি তাহারা গ্রামে বাস করে, তবে এই অত্যাচারলব্ধ টাকা গ্রামেই ফিরে আসে। আমাদের জমিদাররা প্রজার রক্ত শুষে কলিকাতায় চৌরঙ্গিতে থাকবেন। রোল্‌স্ রয়েস মোটরে দৌড়বেন; আর গ্রামে

কেবল তাগিদ পাঠাবেন, টাকা পাঠাও, টাকা পাঠাও। এই ফরিদপুর জেলাতেই অনেক বড় বড় জমিদার আছেন, কালীকৃষ্ণ ঠাকুরদের জমিদারী, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরদের জমিদারী; মহারাজা মনীন্দ্র নন্দীর জমীদারী, পাইক পাড়ার জমিদারী। এঁরা সব্বাই কোলকাতায় থেকে নায়েব গোমস্তার দ্বারা জমিদারী রক্ষা করেন। এই নায়েব গোমস্তারা এঁদেরও নানা প্রকারে ঠকায়, প্রজাদের উপরেও অত্যাচার করে। জমিদাররা প্রজার দুঃখ দৈন্য জানতেও পারেন না। শুনে খুবই আনন্দ হ'ল যে দেবেন্দ্রবাবুর উৎসাহে ও চেষ্টায় মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর এই জেলায় তাঁহাদের জমিদারীর মধ্যে উন্নত ষাঁড় রেখে স্থানীয় গো-জাতির উন্নতির চেষ্টা করছেন; উন্নত কৃষি প্রণালী প্রবর্ত্তনের জন্য তাঁহারা দেবেন্দ্রবাবুর পরামর্শ গ্রহণ করছেন। আমি ইঁহাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কিন্তু আজ তাঁরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলে প্রজাদের কত উৎসাহ বাড়তো? তাঁরা নিজের চক্ষে প্রজাদের অবস্থা দেখতে পেতেন—তাদের অভাব অভিযোগ শুনতেন। আমি আশা করি, তাঁরা কৃষির উন্নতির জন্য আরও অধিক পরিমাণে অর্থ ব্যয় করবেন।

আর আপনাদের ধৈর্য্য নষ্ট করবো না—আপনারা আমাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন, কিন্তু আমারই আপনাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, কারণ আমি এখানে শিক্ষার্থী হয়ে এসেছি এবং অনেক জিনিষ দেখবার ও শিখবার সুযোগও আপনারা দিয়েছেন। সোদপুর থেকে তারিণীবাবুও এসেছেন। তিনি এম-এসসি পর্য্যন্ত পড়ে অসহযোগ করেছিলেন। এখন তিনি সোদপুরে আমাদের কলাশালায় থেকে সেখানে চাষবাসের উন্নতির চেষ্টা করছেন। কি করে গো-পালন করতে হয় এবং বৎসরের কোন্ সময় কি কি ভাবে কি কি কৃষি করতে হয় তাহা শিখতে তিনি এখানে দেবেন্দ্র বাবুর কাছে এসেছেন। তিনিও আপনাদিগকে তাঁহার ধন্যবাদ জানাবেন। ভগবানের কাছে, খোদার কাছে প্রার্থনা করি, আপনাদের এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সফল হউক।

---

* মৌখিক বক্তৃতার সারাংশ ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অশ্বিনীমোহন চক্রবর্ত্তী এম-এ কর্ত্তৃক অনুলিখিত। প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটনের সময় জেলার জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও তাঁহাদের কাহারও কাহারও পরিবারস্থ মহিলাগণ উপস্থিত ছিলেন। এই জন্য মাঝে মাঝে আচার্য্য রায় ইংরাজীতে বলিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সহকারী সম্পাদক শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ইংরাজী অংশ গুলির বাঙ্গলা তর্জ্জমা করিয়া দিয়াছেন।

"খাবারের" জন্মকথা

ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্-এম্-এস্

"খাবার" কাহাকে বলে?

"খাবার" কথাটি প্রাকৃত। আভিধানিক সংজ্ঞায় উহা এদেশে ব্যবহৃত হইলেও, চলিত কথায়, অন্ততঃ কলিকাতার সহরতলীতে, "খাবার" বলিলে, মোদকের দোকানে নানা জাতীয় যে মিষ্টান্ন ও ভাজা-খাদ্য প্রস্তুত অবস্থায় পাওয়া যায়, প্রধানতঃ তাহাদিগকেই বুঝায়। এবং এই প্রবন্ধে, "ময়রার দোকানের মিঠাই ও নোন্তা খাবারকেই" লক্ষ্য করিয়া বলা হইবে।

ইহার বিশেষত্ব কি?

দুনিয়ায় এত জিনিষ থাকিতে, আমি ময়রাকে লইয়া এত মাথা বকাই কেন? তাহার কারণগুলি সংক্ষেপে বলিতেছি:—

(১) নগদ-পয়সা ফেলিলে, মোদকের দোকানে মুখরোচক নানাজাতীয় খাদ্য তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়। সে সকল খাদ্য সকলে তৈয়ারি করিতে জানে না, এবং ঘরে-ঘরে, কালভদ্রে তৈয়ারী করিতেও যথেষ্ট ব্যয় পড়ে;—কাযেই,

ময়রার দোকানে ব্যতীত, রসনার তৃপ্তিসাধন করা অধিকাংশ লোকের পক্ষে অন্যথা অসম্ভব। এই জন্য, সহজে রসনার নানারূপ তৃপ্তিকর খাদ্য খাইবার লোভে লোকরা ময়রার শরণাপন্ন হয়—এবং তাহা অতি ব্যাপক ও ব্যাগ্র ভাবে!

(২) "জামাই-কুটুম্ব" বা "আত্মীয় স্বজন" আসিলে, ঘরে তৎক্ষণাৎ নানাজাতীয় ব্যঞ্জনসহ লুচি বা ভাত তৈয়ার করিয়া দেওয়া, সময় ও শ্রমসাপেক্ষ বলিয়া, অনেকে "দোকানের খাবার" দোকানে-ভাজা লুচি, ডাল, আলুর দম, এমন কি, ডিম ও মাংস খাওয়াইয়া, আত্মীয় স্বজনকে আপ্যায়িত করেন! এমন কি, বিবাহের "পাকা খাওয়ান"তেও দোকানের লুচি তরকারী প্রভৃতির ব্যবহার দেখিয়াছি। এ ব্যবস্থা আলস্য ও নীচতাজ্ঞাপক, সন্দেহ নাই।

(৩) আজকাল কলিকাতায় ত বটেই, কলিকাতার উপকণ্ঠেও, সহস্র রকম ব্যঞ্জনাদি দ্বারা অতিথির সংকার করিলেও, ২।৪টা "দোকানের খাবার" না দিলে, যেন গৃহস্থের সম্ভ্রম বজায় থাকে না এবং অতিথি-অভ্যাগতের যথেষ্ট খাতিরও করা হয় না—এমন একটা কদর্য্য ধারা দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

(৪) "দোকানের খাবার" গুলি যেমন সুদৃশ্য, প্রায় তেমনি সুস্বাদুও হয়—কাযেই লোভনীয়ও হয়। সুদৃশ্য দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া, লোকরা এইগুলি গলাধঃকরণ করিয়া থাকে। সকলের অভিজ্ঞতা কি তাহা জানি না, তবে ক্রিয়াকাণ্ডে, আমার নিজ ও পরিচিত যত জনের বাটীতে "খাবার" তৈয়ারি করান হইয়াছে, সকল স্থলে ময়রার দোকানের মত সর্ব্বাংশে অমন সুস্বাদু হয় নাই। এই জন্যও ঘরের-তৈয়ারি খাবার ফেলিয়া, অনেকে ময়রার দোকানের খাবারের প্রতি আকৃষ্ট হন।

মোদকদিগের কথা

জাতি-হিসাবে আমি মোদকদিগকে লক্ষ্য করিয়া কোনও কথা বলিতেছি না ; তবে কলিকাতায় যত মোদক দোকান সাজাইয়া বসিয়া থাকে, আমি তাহাদিগেরই কথা বলিতেছি। দুর্ভাগ্যক্রমে, আজ কলিকাতায় বাঙ্গালী মোদকের সংখ্যা অতীব কম—"হিন্দুস্থানী" "হালুইকরের" সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। এ প্রবন্ধে প্রধানতঃ বাঙ্গালী মোদককেই লক্ষ্য করিয়া কথা বলা হইবে ; যাহা বাঙ্গালীকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইবে, "হিন্দুস্থানী"দিগের পক্ষে তাহা বহুগুণে প্রযোজ্য।

কাঁচা অবস্থায় ও তৈয়ারি অবস্থায়—উভয় অবস্থাতেই খাদ্যদ্রব্য—পবিত্র জিনিষ বলিয়া পরিগণিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাযেই, যাহাদিগের হাতে খাদ্যদ্রব্য নাড়াচাড়া করিবার, প্রস্তুত করিবার, ও পরিবেশন করিবার ভার থাকিবে, তাহাদিগের সর্ব্বদাই অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত। কিন্তু অধিকাংশ ময়রার দোকানে যান, দেখিবেন, দোকানের মালিক হইতে কারীকর পর্য্যন্ত—সকলেই মূর্ত্তিমান ময়লা! যেমন দেহ নোংরা, তেমনি তাহাদের কাপড়ও নোংরা। তদুপরি, তাহাদিগের অভ্যাস আরো নোংরা। দাদ, চুলকানি, গরমীর ঘা ও মেহ নাই বা হয় নাই এমন লোক দোকানে অল্পই পাইবেন। পানের ক'ষ দুই আঙুলে মুছিয়া, নাক ঝাড়িয়া, ঘাম চাঁছিয়া, দাদ চুলকাইয়া, অস্থানের কণ্ডূয়ন নিবৃত্তি করিয়া, সরাসরি সেই হাতে, ইহারা খাদ্যদ্রব্য তৈয়ারি ও পরিবেশন করে। যদি কেহ দয়া করিয়া গামোছায় হাত পোঁছে, তবে, সে গামোছাও অত্যন্ত ময়লা। ইহাদের মাথার চুল বড় থাকে, আঙুলের নখ বড় থাকে, এবং ইহাদের পরিধেয় বস্ত্রাদির দুর্গন্ধে কাহার সাধ্য ইহাদের নিকটে যায়! এই জাতীয় জীবের হস্তে পাককরা মিষ্টান্ন জানিয়া-শুনিয়া নিতান্ত প্রিয়জনকেও আমরা খাইতে দিয়া গর্ব্ব ও আত্মপ্রসাদ অনুভব করি! আমরা কি সত্যই এতটা মরিয়াছি? তাহার উপর, যে দাস-দাসীরা নিজ বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা খাবার ঢাকিয়া আনে—সেটাও ভাবিবার কথা!!!

ময়রার দোকান

বাঙ্গালায় একটা কথা আছে—"বাহিরে কোঁচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচোর কীর্ত্তন"। এ কথাটি ময়রার দোকানের প্রতি বিশিষ্টরূপে প্রযোজ্য। ময়রার দোকানের বাহিরটা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এবং আলমারী ও গ্লাস-কেস দ্বারা সজ্জিত—যদিও অর্দ্ধেকগুলিতে কোনও কালে কাচ বসান হয় নাই। ডাঃ রাধাগোবিন্দ-করের পাল্লায় পড়িয়া সকল ময়রাকেই গ্লাস-কেস করিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ কেসে কাচ পরান থাকে না এবং বাহিরের দিকে কাচ থাকিলেও, সে সকল কেসের অপর

তিন দিক দিয়া ধূলা, মাছি, আরসুলা, পিপীলিকা ও ইন্দুরের অবাধ গতি থাকে। আমি স্বচক্ষে রসগোল্লার গামলায় নেংটি ইন্দুরকে সাঁতার দিতে দেখিয়াছি, এবং পিপীলিকা নাই, এমন রসও আজ পর্য্যন্ত দেখিলাম না। চক্ষে ধূলা দিবার জন্য—কুষ্ঠাঙ্গকে সুন্দর দেখাইবার জন্য—এই গ্লাসকেসের বাহার। লোকের চক্ষে ধুলা দেওয়া ছাড়া ইহার আর কি ব্যবহার আছে?

ভিয়ান-ঘরটি সর্ব্বনেশে স্থান। এখানে ধুলা আছেন, ঝুল আছেন, ইন্দুর-আরসুলা-মাকড়সা-পিঁপড়া আছেন—ছেঁড়া, ময়লা, দুর্গন্ধময় হাত শুকান ও পানের পিক্ মুছিবার ন্যাতা আছেন—গোবর আছেন—খামরা আছেন—ঝাটা আছেন—নাই কি? ভিয়ানের হাতা-খুন্তি-ঝাঁজার, বেলুন, লবণ-চিনি, সবই মাটিতে অবাধে রাখা হয়—আর সেই মাটির সঙ্গে অজস্র রাস্তার ধুলা পদধূলিরূপে মিশ্রিত হয়। সেই খানেই ময়লা গামলা, সেইখানেই আস্তাকুড়, সেই খানেই হাত ধোয়া পাত্র। সেখানে, ভিয়ানের সময়ে, কত পান-দোক্তা চলে, ও হাসির লহরের সঙ্গে ভিয়ানের কটাহে মুখামৃত বর্ষিত হয়; সেখানে তেলচিটা গামোছায় হাত মোছা, কড়া মোছা একত্রে সকল রকম মোছাই হয়। এবং সেই গামছাতে পানের কষ ও সিকনিও মোছা যে হয় না, তাহা হলফ করিয়া বলিতে পারি না।

এই ত গেল খাবারের দোকান। তাহার চারিপাশের সংবাদ কি? ময়লা-ফেলার টব (ডাষ্ট্-বিন্) বা আস্তাকুড় অনেক খাবারের দোকানের খুব নিকটেই থাকে। ময়লা-জলের (unfiltered) কল অনেক ভিয়ানঘরের হাতের গোড়াতেই থাকে। তাহা ছাড়া, সকল যায়গায় মাছি ও ধুলা উড়িয়া খাবারে অবাধে বসিতে থাকে। এ সকল কথা কোন্ করদাতা না জানেন এবং কর্পোরেশনের কোন্ কাউন্সিলার বা হেল্‌থ-অাফসার বা স্যানিটারী ইন্সপেক্টার না জানেন? কিন্তু সকলেই চোখ থাকিতে কানা ও কান থাকিতে কালা সাজিয়া সাংখ্যের পুরুষ হইয়া আছেন!

বর্ত্তমান চাক্‌চিক্যের যুগে, বিজলীবাতির আলোকে ও বাহিরের মাজা বাসন ও গ্লাসকেসের ঔজ্জ্বল্যে, তথা খাদ্য-দ্রব্যের সাজানর কারসাজিতে এবং খাদ্যদ্রব্যগুলির মনোহর দৃশ্যে সকলেরই মন ভুলাইবার চেষ্টা করা হয়। এতদ্ব্যতীত, হয় ত কোনও কোনও স্যানিটারী ইন্সপেক্টর বাবুদের বাড়ীতে কখনো খাবার উপঢৌকন যায় কি না, তাহা বলা যায় না।

অনেকে প্রণিধান করিয়া দেখেন না যে, ময়রার দোকান কত লাভের। যে অনুপাতে নিত্য অলিতে-গলিতে ময়রার দোকান গজাইতেছে, যে হারে প্রত্যেক ময়রার দোকানই অল্প সময়ের মধ্যে বাড়িয়া উঠে, ময়রার দোকানের লব্ধ দানে যে হারে কতকগুলি মন্দিরের সমৃদ্ধি বাড়িতেছে, এবং ময়রার দোকান কখনো ফেল হয় না—এসব কথাগুলি তলাইয়া বুঝিলে, বেশ বুঝা যায়, যে ময়রার দোকান অত্যন্ত লাভজনক। যে দোকানের লাভ এত বেশী, সে দোকান কেন এমন জঘন্য নরক-স্থান হইয়া থাকে?—বিশেষতঃ, যখন ময়রার দোকান বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের একটা প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তখন ময়রার দোকানের এই ভয়াবহ অবস্থা সমাজের লক্ষ্য করিবার বিষয়!

ময়রার খাবারের উপকরণ

(১) ছানা।—এদেশে, প্রধানতঃ, গরুর দুধেরই ছানা ব্যবহৃত হয়। ময়রারা অধিকাংশ স্থলে মাটা-তোলা দুধের ছানা ব্যবহার করে। এদেশে গরুর দুধের সমস্ত মাটাটা উঠাইয়া লইয়া, তবে গোয়ালা দুধ বেচে। মাটা হইতে গোয়ালারা ঘরে ঘৃত তৈয়ার করিয়া বেচে। যে ময়রারা ভাল দুধ কেনে, তাহারা গরম দুধে আগেকার দিনের ছানার জল দিয়া টাট্‌কা ছানা কাটাইয়া লয়। সেরকরা ছানার ওজনের হিসাবে, দুধের দাম দেওয়া হয়। ছানা কাটাইবার পরে, জলদেওয়া দুধের মত যে "ছানার জল" পাত্রে পড়িয়া থাকে, তাহাকে স্বতন্ত্র পাত্রে রাখিয়া দেওয়া হয়। এই জল, এবং গামোছায়-বাঁধা ওজন-চাপান ছানা হইতে যে জল ঝরিয়া পড়ে—উভয়কে একত্র করিয়া জালা বা কাঠের টব বা পিপায় রাখিয়া দেওয়া হয়। কালকাতায় সাধারণতঃ দুইবার ছানা কাটান হয়—প্রথম ক্ষেপ বেলা ছয়টা-সাতটা আন্দাজ এবং দ্বিতীয় ক্ষেপ, রাত্রি ২টা আন্দাজ। প্রত্যেকবারের জলটা জমাইয়া রাখা হয়। সেই জল চারটি কাযের জন্য ব্যবহৃত হয়; প্রথম কায—পরের বারে, ছানা কাটাইবার "দম্বল" (ঝাঁঝি) হিসাবে, সামান্য পরিমাণে ঐ জল কাযে লাগে। দ্বিতীয় কায—ঐ জলে যে মাটা ভাসিয়া উঠে, সেই মাটা তুলিবার ইজারা যাহার সঙ্গে থাকে, সে সেই জল

লইয়া যায় ; মাটা তুলিয়া লইবার পর, সেই মাটা ছোটখাট ময়রার দোকানে ও গরীবদের ঘরে ঘৃতের আকারে বিক্রীত হয়। তৃতীয় কায,—ঐ ছানার-জল বেশ টক্ হইয়া আসিলে, অনেক "ঘোলের সরবতের" দোকানে ঐ সরবতের জন্ত বিক্রীত হয়। চতুর্থ কায—গাভীকে মাটা-সমেত ছানার জল খাওয়াইলে গাভীর দেহ পুষ্ট হয় বলিয়া, উহা দুই-তিন আনা ছোট-কলস হিসাবে, বিক্রীত হয়

এক্ষণে ছানার সম্বন্ধে আরো গুটিকতক কথা বলা আবশ্যক। ছানা-নিংড়ান জল, কোন্ "নালী" বাহিয়া, কোন্ চৌবাচ্চায়, কি আকারে রক্ষিত হয়, তাহা বোধ হয় কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির স্বাস্থ্য-পরিদর্শকগণ বলিতে পারেন। আমরা যাহা জানি, তাহাতে "ঘোলের সরবতের" উপরে ঘৃণাই জন্মায় !

ময়রা মহাশয় ছানার সঙ্গে সুজি, ময়দা, চাউলের গুঁড়া ও বাসি-ছানা মিশ্রিত করেন।

তাহার পরে, যে সব ছানা বাহির হইতে কলিকাতায় আসে, তাহাদের কি অবস্থা হয়, তাহা কি হেলথ্-অফিসার মহাশয় আমাদিগকে জানাইয়া দিবেন ? খুব নামজাদা দু এক ঘর মোদক ব্যতীত, কলিকাতার বেশীর ভাগ ময়রাই মফস্বলের ছানা ক্রয় করে। এই ছানা গোয়ালার ঘরে পল্লীগ্রামে তৈয়ারি হইয়া, গামছা-বন্দী হইয়া, ঝুড়িতে চাপিয়া, রেলযোগে কলিকাতায় আসে। শীতকালে যত না হউক, গ্রীষ্মকালে, পাছে ছানা খারাপ হইয়া যায়, এই ভয়ে, বাঁক-শুদ্ধ ঝুড়ি খীড়কীর পুকুরে ডুবান থাকে;—গাড়ী দেখা যাইলে, তৎক্ষণাৎ, বাঁকশুদ্ধ ছানা উঠাইয়া, গোয়ালার চাকররা রেল গাড়ীতে উঠিয়া বসে। পল্লীগ্রামের পুষ্করিণী অধিকাংশই যে কি ভীষণ অবস্থাগ্রস্ত, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। আর পল্লীগ্রামের পুকুরমাত্রেই যে মানুষ থুথু ফেলে, মল ও মূত্র ত্যাগ করে এবং স্বয়ং ও গবাদিকে স্নান করায়—এ কথা বলাই বাহুল্য। কাযেই, একে গ্রীষ্মকাল, তাহার উপরে পাড়াগাঁয়ে আমাশয়, কলেরা লাগিয়াই আছে ;—কাযেই, কোথাকার কোন্ পুকুরের জলে ডুবান ছানা যে আমরা খাই, তাহা বলা যায় না।

(২) চিনি।—চিনিতে মাছি, পিঁপড়া, আরস্থলা অনবরতই পড়িতেছে। গুড়েতে থাকে না বা পড়ে না এমন জীবই নাই। আর সেই চিনি ও গুড়ে ময়রার খাবার প্রস্তুত হয়। মাছি, পিঁপড়া ও আরস্থলা বিষ্ঠা, থুথু,-গয়ার, পুঁয প্রভৃতিতে যে যায় নাই, এমন কথা কেহই বলিতে পারেন না। গুড়ে ইন্দুর পড়া কিছু বিচিত্র নয়—এবং তাহার প্রাণ বিয়োগের পূর্ব্বে, জীবটি যে সে গুড়ে মলত্যাগ করে না, এমন কথাও বলা যায় না। ১৯২৭ সালে অক্টোবর মাসে, ১২০০৯ টন্ গুড়ে মানুষ পড়িয়া মারা যায় ; হেলথ্ অফিসার সে গুড় মানুষের অখাদ্য বলা অপরাধে, করোনারের জুরীরা হেলথ্ অফিসারকে তিরস্কার করেন—কারণ, সে গুড়ের দাম প্রায় ৯ লক্ষ টাকা এবং সাহেব কোম্পানী তাহার মালিক এবং যে কুলি যুবকটি পড়িয়াছিল, তাহার চর্ম্মে নাকি পচন ধরে নাই। জুরীগণ এই গুড় একটু খাইয়া সৎসাহস ও সদ্দৃষ্টান্তের পথ খোলসা করিলেন না কেন ?

(৩) ঘৃত।—নানা জাতীয় চর্ব্বির সমষ্টিকে "ঘি" নামে ব্যঙ্গ করা পদার্থের বদলে, এখন "ভেজিটেবল্ প্রডাক্ট" প্রায় প্রত্যেক ময়রার দোকানে ব্যবহৃত হইতেছে। উক্ত"ভেজিটেবল্ প্রডাক্ট" যাহাই হউক না কেন, উহা সস্তা এবং গরম থাকিলে, উহার কোনও দোষ গুণ বুঝা যায় না। যত দিন ঐ জিনিষ বাজার-চলন না হইয়াছিল, ততদিন চিনাবাদাম তেল, মহুয়ার তেল প্রভৃতি যত বাজে তেলের সঙ্গে ছিটে ফোঁটা ঘিয়ের যোগ করিয়া, ময়রার দোকানের খাবার প্রস্তুত হইত। ঠাণ্ডা হইলে, ভেজিটেবল প্রডাক্ট মোমের মত শক্ত হইয়া যায়। নামে "ভেজিটেবল্" (অর্থাৎ বনস্পতিজাত) হইলেও, প্যারাফিনের মত ঐ জিনিষ কত দিন মানুষের পেটে সহ্য হইতে পারে ? অথচ সস্তা বলিয়া, প্রায় সকল ময়রাই অধিক লাভের লোভে উহা ব্যবহার করে।

(৪) সুজি ও ময়দা।—কস্মিন্ কালে ভাল জিনিষ ব্যবহৃত হয় বলিয়া শুনি নাই।

(৫) ক্ষীর।—রেলের কল্যাণে, টিনে পুরিয়া, "পশ্চিম" দেশ হইতে, বাসি, মাঠা তোলা, মহিষ দুধের "খোয়া ক্ষীর" প্রচুর পরিমাণে কলিকাতায় আসে। আর সেই ক্ষীর দিয়া যত "ক্ষীরের খাবার" প্রস্তুত হয়। তাই, ময়রার দোকানের সকল খাবারের চেয়ে, "ক্ষীরের খাবার"—যথা, বরফি, কালাকন্দ, ইত্যাদি—খাইয়াই বেশীর ভাগ স্থলে কঠিন উদরের পীড়া হইতে দেখা গিয়াছে। শুনিতে পাই,

ময়ান হীন খুব পাতলা রুটি তৈয়ারি করিয়া, দুধে মিশাইয়া জ্বাল দিলে "রাবড়ী" প্রস্তুত হয়।

(৬) ডালের ও বেসমের—যত খাবার হয়, তাহার মধ্যে খেঁসারির ডাল সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা বলিয়া, অপর ডালের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। আরহলা প্রভৃতির "নাদি" ঝাড়িয়া, দোকানের যত ক্ষুদ ও পাঁচ-মিশালি শস্যকে গুঁড়াইয়া, সবেদা ও বেশম তৈয়ার হয়। এবং ডালও ঐ রকম পাঁচ মিশালি ডাল ইত্যাদির সমষ্টি।

(৭) কালকাতায় দুপুর বেলা পরিস্কৃত কলের জল থাকে না—অথচ "ময়লা" (আন্‌ফিলটার্ড) জল সারাদিন থাকে। সেই জল অবাধে পাককার্য্যে ব্যবহৃত হইবার বাধা কি?

(৮) যাহারা "খাসা" বা "খামিরা" ঘরে প্রস্তুত করে, তাহারা উহাকে ভাল ভাবেই করে, কিন্তু কেনা খামিরার জন্মস্থান দেখিলে, আক্কেল গুড়ুম হয়। এক দিন হেল্‌থ অফিসার মহাশয় তাহা দেখিয়া চক্ষু ও নাসারন্ধ্রের সার্থকতা করিয়া আসুন না?

খাবারের বাসন ও পরিবেশন পাত্র

খাবারের দোকানের বাসনগুলি ছাই ও রাস্তার মাটি সংযোগে পরিস্কৃত হয়। তাও আবার অনেক সময়ে পা দিয়া মাজা হয়।

যে ঠোঙায় খাবার বিক্রীত হয় তাহার মাহাত্ম্য ১৩৩০ সালের "সংহতি" পত্রিকার ৩০৮—৩১০ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি বলিয়া, পুনরুল্লেখ করিলাম না।

যে পিত্তলের পাত্রে তবক দেওয়া বা না দেওয়া খাবার দিনের-পর-দিন সাজান থাকে, তাহাতে কলঙ্ক পড়ে। বহু-বার দোকানের মিষ্টান্ন উঠাইয়া দেখিয়াছি, খাবারের তলায় দু চার বিন্দু কলঙ্ক লাগিয়া আছে! এই কলঙ্ক বিষ—তাম্রের কষ। দোকানীদের বা ক্রেতাদের এদিকে হুঁস আছে কি? ময়রারা এক হাতে পয়সা গণিয়া দিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই হাতেই রসগোল্লা পরিবেশন করে—আবার রস মাখান হাতে অপরকে পয়সা গণিয়া দেয়। এই ভাবে কলঙ্ক এবং ময়লা প্রায় সকল খাবারেই মাখায়!!! কুষ্ঠব্যাধি ও অপর ব্যাধিগ্রস্ত কত লোকই পয়সা ঘাঁটে—আর সেই পয়সা ঘাঁটিয়া রসে হাত ডুবানোর অর্থ যে কি ভীষণ, তাহা আর খোলসা করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না।

উপসংহার

কি দেখিলাম? কি বুঝিলাম? যে জাতি নিজ দেহ-পুরস্থিত শ্রীভগবানের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত নিত্য দৈহিক যজ্ঞে এই দুষ্কারজনক জিনিষ নিবেদন করে, এবং বেমালুম এত বড় অত্যাচার সহরের বুকের উপরে নিত্য হইতে দেয়—সে জাতি কি জীবিত—না মৃত? যে দেশের কর্পোরেশনের অধিকাংশ কর্ম্মচারী ও সদস্যই এতদ্দেশীয় লোক, সে দেশের কর্পোরেশন কোন্ অজুহাতে এত বড় অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন?

ময়রাদের অপরাধ কি? খরিদ্দারের সংখ্যা নিত্যই বাড়িতেছে এবং "বি আইন" কতকটা পঙ্গু আইন। খরিদ্দার সস্তার মাল চায়। দোকানদার অখাদ্য দিয়া প্রচুর লাভ করিলেও, খরিদ্দার কখনো নিজের লাভ ক্ষতি খতাইয়া দেখে না। কিন্তু, যাঁহারা আমাদিগের স্বাস্থ্যের দোহাই দিয়া অর্থ শোষণ করেন, তাঁহারা ময়রার দোকান আরো ভাল করিয়া পরিদর্শন করিতে পারেন না? তাঁহারা লাইসেন্স দিবার সময়ে, "খাঁটি ঘৃত বা তৈল" ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করিতে কি পারেন না? আইন করিয়া, অথবা সাময়িক "বাই-ল" করিয়া, প্রত্যেক খাদ্যের ষ্টাণ্ডার্ড ওজন, ষ্টাণ্ডার্ড উপাদান ও দামের নিরিখ বাঁধিয়া দিতে পারেন না? দেশবাসী বহু কৃতবিদ্য লোক কর্পোরেশনে আছেন; কিন্তু কত বৎসর ধরিয়া খাদ্যের দোষ দফায় দফায় দেখাইয়া দিয়াও ফল পাইতেছি না কেন? দেশবাসীরা কি কর্পোরেশনের নিদ্রা ভাঙাইতে পারিবেন না?

রামদুলাল সরকার

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

এই পৃথিবীতে অন্ততঃ তিনটি লোকের জীবনে দেখিতে পাই, তাঁহারা প্রায় একই অবস্থার মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দিল্লীর দ্বিতীয় মোগল বাদশাহ হুমায়ুন শের শা কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া দেশ-বিদেশে পলায়ন কালে, পথিমধ্যে অমরকোট নগরে তাঁহার গর্ভবতী পত্নী হামিদা বানু বেগম একটি পুত্র প্রসব করেন। তিনি বিশ্ব-বিশ্রুত বাদশাহ আকবর। দ্বিতীয় ব্যক্তি মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। তিনিও যখন জন্ম গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার জন্মভূমি কর্সিকা দ্বীপে নানারূপ যুদ্ধবিগ্রহ ও বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল। নেপোলিয়নের পিতা ছিলেন সৈনিক। তৎকালে তাঁহাকে সামরিক প্রয়োজনে সর্ব্বদা ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে হইত। তাঁহার সাধ্বী পতিগতপ্রাণা পত্নীও তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। সেই সময়ে তিনি গর্ভবতী ছিলেন। একদিন ঝড়বৃষ্টি ও প্রাকৃতিক নানা দুর্য্যোগের মধ্যে পথিপার্শ্বে নেপোলিয়ন-জননী পৃথিবীর অদ্বিতীয় মহাবীরকে প্রসব করেন। আর, তৃতীয় ব্যক্তি আমাদের রামদুলাল সরকার।

বর্গির হাঙ্গামা

রামদুলালের পিতা বলরাম সরকার দমদমার নিকটবর্ত্তী রেকজানি গ্রামে বাস করিতেন। তিনি একজন গ্রাম্য গুরুমহাশয়। একটি ক্ষুদ্র পাঠশালার সামান্য আয়ে তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হইত। তখন বঙ্গদেশের অবস্থা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল—"বর্গি এল দেশে"র কাল। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে এক দিন রব উঠিল—বর্গি আসিতেছে। রেকজানি গ্রামবাসীরা নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশে পলায়নপর হইল। বলরাম সরকার তাঁহার গুর্ব্বিণী পত্নী সহ পলায়ন করিতেছিলেন, —পথিমধ্যে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে তাঁহার পত্নীর প্রসব-বেদনা উপস্থিত হয়। সেই প্রান্তরে নিতান্ত নিরাশ্রয় অবস্থায় রামদুলাল জন্মগ্রহণ করেন।

এই তিন ব্যক্তির পরবর্ত্তী জীবনের কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিলে ইঁহাদিগকে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ বলিতেই হয়।

গ্রাম্য গুরুমহাশয় বলরাম সরকারের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না, অতি কষ্টে তাঁহার দিনপাত হইত। বর্গির হাঙ্গামার অবসানে দেশে শান্তি স্থাপিত হইলে, বলরাম সস্ত্রীক গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তৎপরে তাঁহার আর একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। ইহার কিছু দিন পরে বলরামের পত্নী বিয়োগ হয়। পত্নীর মৃত্যুর পর বলরামও বেশী দিন জীবিত থাকেন নাই। শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া রামদুলাল তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগিনীর হাত ধরিয়া কলিকাতায় আসিয়া তাঁহাদের মাতামহ রামসুন্দর বিশ্বাসের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

মাতামহাশ্রয়ে

রামসুন্দরের অবস্থা আরও শোচনীয়—ভিক্ষাবৃত্তি তাঁহার উপজীবিকা ছিল। তাঁহার পত্নীও শারীরিক পরিশ্রম করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া স্বামীর সাহায্য করিতেন। এত কষ্টের উপর তিনটি শিশুর লালন-পালন ভার তাঁহাদের স্কন্ধে পতিত হইল। তাঁহারাও ভগবানের এই দান অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করিলেন—তাঁহাদের কর্ত্তব্য-পালনে অবহেলা করিলেন না।

এই ভাবে কিছুকাল অতিক্রান্ত হইলে ভগবান তাঁহাদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন—রামদুলালের মাতামহী হাটখোলার বিখ্যাত ধনী দত্ত-পরিবারে, মদনমোহন দত্তের সংসারে পাচিকার কর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তথায় রামদুলালেরও আশ্রয় মিলিল।

শিক্ষালাভ

এতদিন রামদুলাল শিক্ষালাভের কোন সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু গুরুমহাশয়ের পুত্রের স্বভাবতঃই শিক্ষানুরাগ ছিল। বোধ হয় ইহা বংশানুক্রমের ফল। মহদাশ্রয়ে নিজ চেষ্টায় রামদুলাল অল্প স্বল্প শিক্ষালাভ করিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি চলনসই গোছের বাঙ্গলা ও ইংরেজী এবং হস্তলিপি অভ্যাস করিতে সমর্থ হন। লেখা-পড়া শিখিতে তাঁহাকে যে কিরূপ আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহাও দ্রষ্টব্য। তৎকালে কাগজ বা শ্লেটের

ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হয় নাই—শিশুগণ প্রথমে ঘরের মেঝেয় খড়ি দিয়া দাগা বুলাইত। পরে তালপত্রে লিখিতে শিখিত। তালপত্রে হাত পাকিলে কলাপাতায় প্রোমোশন হইত। এখনও আলতাগোলা কালিতে কদলীপত্রে বিজয়া-দশমীর দিন দুর্গা নাম লিখিবার প্রথা আছে। দরিদ্রা পাচিকার দৌহিত্র পরান্ন-ভোজী, পরাশ্রয়ী বালকের তালপাতা বা কলাপাতা ক্রয় করিবার কড়ি জুটিত না। তাই বালক রামদুলাল 'বাবুদের' ছেলেদের ব্যবহৃত পরিত্যক্ত পাতাগুলি ধুইয়া তাহাতেই লিখিতে অভ্যাস করিতেন। অর্থাৎ তাঁহার metal ভাল ছিল; এবং এইরূপ ভাল metal যাহাদের—কোন বাধা-বিঘ্ন বা অসুবিধা তাহাদের উন্নতি লাভে অন্তরায় ঘটাইতে পারে না। কেবল আমাদের রামদুলাল বলিয়া নহে, সকল দেশের সকল জাতির দরিদ্র অথচ অধ্যবসায়ী বালকরা এই-রূপে বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। বিদ্যাশিক্ষায় রামদুলালের এইরূপ আগ্রহ দেখিয়া প্রভু মদনমোহন সন্তোষ লাভ করিয়া তাহার বাটীর বালকগণের গৃহশিক্ষকের কাছে রামদুলালকে পাঠ লইবার অনুমতি দিলেন এবং গৃহশিক্ষককেও রামদুলালকে শিক্ষা দিবার জন্য আদেশ করিলেন।

কর্মজীবনে প্রবেশ

যৎকিঞ্চিৎ বাঙ্গলা, ইংরেজী, শুভঙ্করী ও গণিত শিক্ষা করিয়া এবং কলাপাতায় লিখিতে অভ্যাস করিয়া রামদুলাল অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিতে বাধ্য হইলেন। প্রভুর নিকটে তাঁহার আবেদন জানাইলে, মদনমোহন তাঁহার আপিসে রামদুলালকে শিক্ষানবীশ রূপে গ্রহণ করিলেন। মদন-মোহনের আশ্রয়ে থাকিয়া নন্দকুমার বসু নামক অপর একটি যুবকও তাঁহার আপিসে শিক্ষানবীশী করিত। একদিন আহারাদির পর উভয়ে আপিস যাইবার জন্য বাসা হইতে বাহির হইলেন। কিন্তু ঝড়বৃষ্টির দরুণ অগ্রসর হইতে না পারিয়া পথ হইতে ফিরিয়া আসিলেন। এবং অপর কোন কাজ হাতে না থাকায় নিদ্রাভিভূত হইলেন। মদনমোহন আপিস হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহাদিগকে নিদ্রিত দেখিয়া, হয় ত তাঁহাদের জ্বর হইয়াছে ভাবিয়া, স্নেহবশতঃ রামদুলালের গায়ে হস্তার্পণ করিলে, তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন. এবং সম্মুখে প্রভুকে দেখিয়া লজ্জিত ও ভীত হইয়া নত মুখে রহিলেন। মদনমোহন তাঁহাদের আপিসে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা অকপটে স্বীকার করিলেন যে, ঝড়বৃষ্টির জন্য তাঁহারা আপিস যাইতে পারেন নাই। মদনমোহন বলিলেন, ঝড়বৃষ্টিকে ভয় করিয়া কর্ত্তব্যে অবহেলা করিলে তাঁহারা কোন দিন মানুষ হইতে পারিবেন না। এই একটি মাত্র উপদেশই রামদুলালের পক্ষে যথেষ্ট হইল। অতঃপর তাঁহার সমগ্র জীবনে রামদুলাল আর কোন দিন আলস্যকে প্রশ্রয় দেন নাই। ক্রমে তিনি অকুণ্ঠ কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রভুর মনস্তুষ্টি সাধন করিলে, মদনমোহন তাঁহাকে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে বিল-সরকারের কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন।

বিল-সরকারী

বিল সাধিবার জন্য রামদুলালকে নানা স্থানে গমন করিতে হইত, ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্রে ক্লেশ পাইতে হইত, সময়ে সময়ে বিপদের সম্ভাবনাও ঘটিত। কিন্তু তিনি কোন কষ্টকে কষ্ট বলিয়া মনে করিতেন না,—প্রাণপণে কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতেন। একদা তিনি দমদমার এক সাহেবের নিকট টাকা আদায় করিতে গিয়াছিলেন। ফিরিতে রাত্রি হইয়া যায়। তখনকার দিনে এই সকল স্থান নিরাপদ ছিল না। বিশেষতঃ রাত্রিকাল, এবং সঙ্গে অনেক টাকা। রামদুলাল মহা বিপদে পড়িলেন। পথে দস্যু-তস্করের ভয়। গৃহস্থ-বাড়ীতেও আশ্রয় লওয়া নিরাপদ নহে—টাকার সন্ধান পাইলে গৃহস্থও যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার পূর্ব্বক টাকাগুলি গ্রহণ করিবে না, তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। এরূপ অবস্থায় উপায়ান্তর না দেখিয়া রামদুলাল নিজ বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া পথিপার্শ্বস্থ এক বৃক্ষতলে টাকার থলির উপর মাথা রাখিয়া শয়ন পূর্ব্বক বিনিদ্র ভাবে রজনী যাপন করিলেন, এবং প্রত্যূষে যাত্রা করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রভুকে টাকা দিলেন। রাত্রিতে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন না করায় মদনমোহন বিলক্ষণ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। এক্ষণে রামদুলালের মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদোন্নতি করিয়া দিলেন, এবং দ্বিগুণ বেতনে সিপ-সরকারের কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। এত দিন রামদুলাল যে পাঁচ টাকা করিয়া বেতন পাইতেছিলেন.

তাহা হইতে কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া এক শত টাকা একটি কাঠের গোলায় জমা দিয়াছিলেন। তাহা হইতে তাঁহার কিছু কিছু মুনাফা হইত। সেই টাকা তিনি তাঁহার দরিদ্র বৃদ্ধ মাতামহের সাহায্যার্থ প্রদান করিতেন।

সিপ-সরকারী

সিপ সরকারের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া রামদুলালের জ্ঞান-স্পৃহ চিত্ত প্রচুর খোরাক প্রাপ্ত হইল। কর্ম্মসূত্রে রামদুলালকে নিয়ত জাহাজে গমন করিতে হইত। এই সূত্রে কলিকাতা হইতে ডায়মনহারবার পর্য্যন্ত সর্ব্বদা তাঁহার গতিবিধি ছিল। তিনি সুন্দর ভাবে চটপট ইংরাজী বলিতে পারিতেন। ইহাতে জাহাজের গোরা সাহেবদের সঙ্গে কথাবার্ত্তার সুবিধা হইত। নদীপথে ভ্রমণ কালে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে বিপদেও পড়িতে হইত। কয়েকবার নৌকাডুবির ফলে পাঁচ-সাত ক্রোশ সন্তরণ করিয়া তাঁহাকে জীবন রক্ষা করিতে হইয়াছিল। সে যাহা হউক, এত কষ্ট সহ্য করিয়া সিপ-সরকারের কার্য্য করিয়া জাহাজী ব্যাপারের সকল তত্ত্ব তিনি অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। এই জ্ঞান পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহার সৌভাগ্যের সূত্রপাতের মূল কারণ হইয়া পড়িয়াছিল। জাহাজ সংক্রান্ত কোন তত্ত্বই তাঁহার অগোচর ছিল না। এই বিষয়ে তিনি এতাদৃশ নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন যে, কোন জাহাজ দেখিবামাত্র, এমন কি, তাহার নাম শুনিবামাত্র, তাহার মাল সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করিয়া লইতে পারিতেন। কোন জাহাজ মাল সহ জলমগ্ন হইলে তিনি তাহার আনুমানিক মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেন, এবং সেই জাহাজ জল হইতে উত্তোলন করিয়া তাহার মাল উদ্ধার করা সম্ভবপর কি না তাহাও তিনি বলিতে পারিতেন। তৎকালে গঙ্গা-গর্ভের অবস্থা নাবিকদের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন হয় নাই। সেই জন্য মধ্যে মধ্যে জাহাজ জলমগ্ন হইতই। একদিন একখানি জাহাজ ভাগীরথী গর্ভসাৎ হইলে, সে জাহাজে কি পরিমাণ মাল আছে, জাহাজ কিরূপে উদ্ধার করিতে পারা যাইবে, তাহার কত মাল পাওয়া যাইবে, তাহার মূল্য কত হইতে পারে, এই সমস্ত বিষয় তিনি মনে মনে নির্দ্ধারণ করিলেন। কয়েক দিন পরে মদনমোহন দত্ত তাঁহাকে চৌদ্দ হাজার টাকা দিয়া টালা কোম্পানীর নিলামে কিছু জিনিস কিনিতে পাঠাইলেন। রামদুলাল টালা কোম্পানীর আপিসে গিয়া দেখিলেন, প্রভুর নির্দ্দিষ্ট মাল তাঁহার সেখানে পৌঁছিবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তখন সেই পূর্ব্বোক্ত জলমগ্ন জাহাজখানির ডাক হইতেছে। রামদুলাল ঐ জাহাজের যে আনুমানিক মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তদপেক্ষা অনেক অল্প টাকায় ডাক হইতেছে দেখিয়া, তিনিও ডাকিতে আরম্ভ করিলেন, এবং চৌদ্দ হাজার টাকায় বিলক্ষণ সুলভে সেই জাহাজ তিনিই ডাকিয়া লইলেন। ইহার অনতিকাল বিলম্বে একজন সাহেব ব্যস্ত ভাবে সেই নিলামী জাহাজখানি ডাকিবার জন্য উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, সে জাহাজ বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, ক্রেতা রামদুলাল পার্শ্বের কক্ষে বিশ্রাম করিতেছেন, এবং তিনি একজন সামান্য সিপ-সরকার মাত্র। সাহেব রামদুলালকে ভয় দেখাইয়া কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু রামদুলাল ভয় পাইবার পাত্র নহেন, তিনি সাহেবকে জাহাজ বিক্রয় করিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে অনেক কষাকষির পর ক্রয় মূল্যের উপর এক লক্ষ টাকা লাভ পাইয়া রামদুলাল সাহেবকে জাহাজ ছাড়িয়া দিলেন।

সৌভাগ্য-সূচনা

অনন্তর তিনি একলক্ষ চৌদ্দ হাজার টাকা লইয়া নিতান্ত অপরাধীর মত কুণ্ঠিত ভাবে প্রভু সকাশে উপস্থিত হইয়া সমগ্র ঘটনা আমূল নিবেদন করিলেন, এবং প্রভুর বিনা অনুমতিতে এই অপকর্ম্ম করিয়া ঘোর অন্যায় করিয়াছেন ভাবিয়া, একলক্ষ চৌদ্দ হাজার টাকা প্রভুর সম্মুখে রক্ষা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

প্রভু ত একেবারে অবাক্! মাসিক দশ টাকা বেতনের সামান্য সিপ-সরকার মাত্র! সে ত ১৪০০০ টাকা তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়া একলক্ষ টাকা সহজেই আত্মসাৎ করিতে পারিত! তিনি কিছু জানিতে পারিতেন না, জানিলেও কিছুই করিতে পারিতেন না। সামান্য সরকারের ধর্ম্মবুদ্ধি কত প্রবল, লোভ সংবরণের শক্তি কত অসামান্য! এরূপ চরিত্রবল যাহার, তাহাকে তিনি কি বলিবেন, অনেকক্ষণ ভাবিয়া পাইলেন না—বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে রামদুলালের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন!

কিন্তু যেমন ভৃত্য, তেমনি প্রভু! এরূপ ধর্ম্মপরায়ণ ভৃত্যের প্রভু অনুদার হইতে পারেন না। কিছুক্ষণ পরে মদনমোহন বলিলেন, "রামদুলাল, এ টাকা আমার প্রাপ্য নহে। আমার প্রাপ্য চোদ্দ হাজার টাকা আমি লইলাম। এই লক্ষ টাকা ভগবান তোমাকেই দিয়াছেন। তোমার টাকা তুমিই লও।" বলিয়া তিনি মুনাফার এক লক্ষ টাকা রামদুলালকে প্রদান করিলেন। মদনমোহন যদি এই লক্ষ টাকা নিজে লইতেন, তাহা হইলে কোন অন্যায় হইত না, কেহই তাঁহাকে কিছুই বলিতে পারিত না। কারণ, তাঁহার টাকাতে তাঁহারই নামে নিলামে জাহাজ কেনা হইয়াছিল। সুতরাং ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ ইহা তাঁহারই প্রাপ্য ছিল। তিনি উহা রামদুলালকে দান করিয়া যেমন নির্লোভতা, তেমনি উদারতা প্রদর্শন করিলেন—ভৃত্যের যোগ্য প্রভুর পরিচয় দিলেন।

সেকালের বাঙ্গালী চরিত্রে মহত্ত্বের এরূপ নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। আজকাল ইহা বড় দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। জাতির পক্ষে ইহা দুর্লক্ষণ বলিতে হইবে। আধুনিক বাঙ্গালী সমাজে স্বার্থবুদ্ধির কাছে ন্যায়বুদ্ধি পরাজিত হইতেছে। ভগবান বাঙ্গালীকে এই দুর্নিমিত্ত হইতে রক্ষা করুন!

রামদুলাল এই এক লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং স্বাভাবিক সততার বলে অচিরে বাণিজ্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া প্রচুর অর্থলাভ করিতে লাগিলেন। তাঁহার চারিখানি বাণিজ্য-তরী দেশবিদেশে যাতায়াত করিতে লাগিল। আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যে বণিক সমাজে তিনি অগ্রগণ্য হইয়া উঠিলেন। আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফিলিপাইন, চীন প্রভৃতি দেশের বণিক-সম্প্রদায় রামদুলালকে বঙ্গদেশে তাঁহাদের প্রাতানাধ স্বরূপ গণ্য করিতে লাগিলেন। বাণিজ্য-প্রধান স্থান মাত্রেই, বিশেষতঃ আমেরিকায়, তাঁহার অতুলনীয় সম্মান ও প্রতিষ্ঠালাভ হইল।

স্ত্রীভাগ্যে ধন

রামদুলালের এই সুখ-সৌভাগ্যের মূলে ছিল—হিন্দু সংস্কারানুসারে বলিতে হয়—তাঁহার স্ত্রী। "স্ত্রীভাগ্যে ধন" এই বাঙ্গলা প্রবচনটি রামদুলালের জীবনে সার্থক হইয়াছিল। কারণ, নিলামে জাহাজ ক্রয় করিয়া লক্ষ টাকা লাভ করিবার কয়েক মাস মাত্র পূর্ব্বে মূলাযোড় গ্রামে রামদুলালের পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। তাহার পর হইতেই তাঁহার সৌভাগ্যোদয় হয়। সেইজন্য পয়মন্ত বলিয়া নববধূর অত্যন্ত প্রশংসা হইয়াছিল। বস্তুতঃ রামদুলালের পত্নী পরমা সুন্দরী, সুলক্ষণা, লক্ষ্মীস্বরূপিণী মহিলা ছিলেন। তৎকালীন বঙ্গ মহিলাদের ন্যায় তাঁহার হৃদয় অতি কোমল ছিল, পরের দুঃখ দেখিলে তিনি অত্যন্ত দুঃখানুভব করিতেন, এবং সাধ্যমত দুঃখীর দুঃখ মোচনের চেষ্টার ত্রুটি করিতেন না। স্বামী যেমন অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, পত্নী তদ্রূপ মুক্ত-হস্তে দান করিতেন। রামদুলাল বিবিধ পণ্যের একচেটিয়া ব্যবসায়ে অর্থলাভ করিতেন। একবার তিনি এক প্রকার মূল্যবান বনাতের একচেটিয়া ব্যবসায় করিবার জন্য বাজার হইতে ঐ বনাত সমুদায় ক্রয় করিয়া গুদামজাত করিলেন। একদিন তিনি দেখিলেন, অনেক ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নান করিয়া মাঘ মাসের প্রভাতে ঐরূপ বনাত গায়ে দিয়া পরম আরামে শীত নিবারণ করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন। রামদুলাল ভাবিলেন, তবে কি বাজারে এখনও ঐরূপ বনাত পাওয়া যায়? সেদিন তিনি আপিসে গিয়াই দালালদের তিরস্কার করিয়া জানাইলেন, ঐ বনাত এখনও বাজারে পাওয়া যাইতেছে। এই বলিয়া তিনি বাজার হইতে সমস্ত বনাত ক্রয় করিতে দালালদের আদেশ করিলেন। দালালরা সমস্ত দিন বাজারে ঘুরিয়া একটুও ঐ বনাত প্রাপ্ত না হইয়া অপরাহ্ণে রামদুলালকে এই কথা জানাইল। তিনি তখন অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার দয়াবতী পত্নী গঙ্গাস্নাত ব্রাহ্মণগণের শীতনিবারণার্থ প্রায় সমুদায় বনাত দান করিয়া ফেলিয়াছেন। আর একবার রামদুলাল কিছু উৎকৃষ্ট চিনি ক্রয় করিয়া গুদামজাত করিয়াছিলেন—অভিপ্রায়, চিনির মূল্য বৃদ্ধি হইলে ঐ চিনি তিনি বিক্রয় করিবেন। তাঁহার অনুমান অনুসারে যথা সময়ে ঐ চিনির মূল্য বৃদ্ধি হইল, এবং তিনি উচ্চ মূল্যে তাঁহার সংগৃহীত চিনি এক সাহেবকে বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু ওজন দিবার সময় গুদামে মাল পাওয়া গেল না।

সৌভাগ্যের শনি!

ব্যাপারটা হইয়াছিল এই—রামদুলালের পত্নী তিন মাস কাল বাটীতে পুরাণ পাঠ করাইয়াছিলেন। পুরাণ-কথ

শুনিবার জন্ম এই তিন মাস তাঁহার বাটীতে বহু শ্রোতার আগমন হইত; অনেক মহিলাও পুরাণ শুনিতে আসিতেন। তখন গ্রীষ্মকাল। কথা শেষ হইলে রামদুলাল-পত্নী সমাগত শ্রোতা ও শ্রোত্রীমণ্ডলীকে ঐ চিনির সরবৎ পান করাইতেন। তিন মাস ধরিয়া এই ভাবে সরবৎ প্রস্তুত হওয়ায় গুদামের চিনি প্রায় শেষ হইয়া সামান্ত মাত্র অবশিষ্ট ছিল। উচ্চ লাভে মাল বিক্রয় করিয়া মাল দিতে না পারায় সাহেব ক্রেতার কাছে রামদুলালকে বিলক্ষণ অপদস্থ হইতে হইল এবং ক্রেতার ক্ষতিপূরণ করিতে হইল। কোথায় তিনি অত্যন্ত লাভবান হইবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা না হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল দেখিয়া, রামদুলাল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং প্রচণ্ড ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া স্ত্রীকে অনেক তিরস্কার করিয়া অবশেষে কহিলেন—তুমি আমার সৌভাগ্যের শনি!

লক্ষ টাকা জরিমানা!

রামদুলাল-পত্নী নতমস্তকে নীরবে স্বামীর সকল তিরস্কার সহ্য করিতেছিলেন; কিন্তু শেষের উক্তি তাঁহার অসহ্য হইল। কোন পতিপ্রাণা বঙ্গ-রমণী এরূপ উক্তি সহ্য করিতে পারেন না,—তিনিও পারিলেন না—ক্রোধে অধীরা হইয়া কহিলেন, বটে! আমাকে বিবাহ করিয়া দশ টাকা মাহিনার সিপ-সরকার তুমি—ঐশ্বর্য্যের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছ—আমি তোমার সৌভাগ্যের শনি! এই বলিয়া তিনি শয়নাগারে গিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন!

রামদুলাল স্বভাবতঃ কোপন স্বভাবের লোক ছিলেন না—তিনি বিনয়ী, মিষ্টভাষী, মধুর স্বভাবের লোক ছিলেন। তাঁহার পত্নী যে কিরূপ সাধ্বা, পতিপরায়ণা, স্নেহশীলা রমণী তাহাও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। স্ত্রীকে ক্রুদ্ধা হইতে দেখিয়া, ক্রোধবশতঃ তিনি যে কঠিন উক্তি করিয়াছেন তাহা স্ত্রীর প্রাণে অত্যন্ত বাজিয়াছে দেখিয়া, রামদুলাল অনুতপ্ত হইলেন, এবং স্ত্রীর শয়ন-কক্ষের রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে গিয়া তাঁহার ক্রোধ-শান্তির নিমিত্ত অনেক সাধ্য-সাধনা, অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলেন না। অবশেষে এক লক্ষ টাকা জরিমানা দিয়া স্ত্রীর ক্রোধ-শান্তি করিতে সমর্থ হইলেন!

দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ

রামদুলালের হৃদয়ে পত্নী-প্রেমের অভাব ছিল না—স্ত্রীকে তিনি খুবই ভালবাসিতেন। কিন্তু সন্তান-কামনা ততোধিক প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ, তিনি এত যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন, তাহা ভোগ করিবে কে? তাঁহার স্ত্রীর গর্ভে একটি কন্যা ও একটি পুত্র জন্মিয়াছিল। পুত্রটি কিন্তু জন্মান্ধ ছিল; সেও আবার সাত বৎসরের অধিক জীবিত ছিল না। পুনরায় পুত্র মুখ সন্দর্শনের আশায় তিনি অনেক দিন অপেক্ষা করিলেন। কিন্তু আর সন্তান লাভের আশা না দেখিয়া গোপনে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিলেন, এবং দ্বিতীয়া পত্নীকে বাড়ীতে না আনিয়া অন্যত্র রক্ষা করিলেন। এই পত্নীর গর্ভে তাঁহার আশুতোষ ও প্রমথনাথ নামে দুই পুত্র ও পাঁচটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রদ্বয় যথাক্রমে ছাতুবাবু ও লাটুবাবু নামে পরিচিত ছিলেন।

দানশীলতা

রামদুলাল যেমন অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দান-ধ্যানও করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যহ আপিসে তিনি নিয়মিত ভাবে ৭০ টাকা দান করিতেন। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা কালে তিনি উক্ত কলেজের গৃহ-নির্ম্মাণ তহবিলে ৩০০০ টাকা দান করেন। মান্দ্রাজে একবার দুর্ভিক্ষ হওয়ায় তিনি লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। একবার তিনি এক ইংরেজ বণিককে তেত্রিশ লক্ষ টাকা ঋণ দান করিয়াছিলেন। সাহেব এই ঋণের সামান্ত অংশ মাত্র প্রত্যর্পণ করিতে পারিয়াছিল, অক্ষমতা বশতঃ আর পারে নাই। রামদুলাল অনাদায়ী টাকা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ইহা ঠিক দান না হইলেও পরোক্ষ ভাবে দানেরই সমতুল্য ছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহার গোপন দানের সংখ্যা ছিল না, সুতরাং তাহার পরিমাণ করাও সম্ভব নহে। তিনি প্রত্যহ চারিশত দরিদ্রকে অন্নদান করিতেন। তিনি বেতনভোগী লোক নিযুক্ত করিয়া অভাবগ্রস্ত লোকদের অবস্থার সম্বন্ধে অনুসন্ধান পূর্ব্বক এমন গোপনে তাহাদের অভাব মোচন করিতেন যে, কোথা হইতে টাকা আসিল তাহা তাহারা জানিতেও পারিত না। পীড়িত দুঃস্থ লোকদিগের চিকিৎসা ও ঔষধের ব্যবস্থা দিবার জন্য তিনি কয়েকজন বেতনভোগী চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

বিধাতার ইঙ্গিত

একদা এক উন্মাদ-বলিয়া-পরিচিত লোক একটি মৃত পারাবত আনিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া বলিল, এই পারাবত মরিয়া গিয়াও তাহার দেহ দিয়া অসংখ্য পিপীলিকার আহার যোগাইতেছে। আর তুমি কেবল অর্থ সঞ্চয় করিয়া যাইতেছ। মৃত্যুর পর অর্থ কি তোমার সঙ্গে যাইবে? রামদুলাল বুঝিলেন, ইহা বিধাতার ইঙ্গিত। বিধাতা বাতুলের মুখ দিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সেই দিনই তিনি বেলগাছিয়ায় এক অতিথিশালা ও সদাব্রত স্থাপন করিলেন। এবং তথায় প্রত্যহ সহস্র সহস্র ক্ষুধাতুরকে অন্নদানের ব্যবস্থা করিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার নিজ গৃহেও প্রত্যহ পাঁচশত অতিথির সেবার ব্যবস্থা ছিল।

সেকালের হিন্দু ভদ্রলোকরা আদালতে গিয়া হলফ করিতে অত্যন্ত নারাজ ছিলেন। কৃষ্ণপান্তি, রামদুলাল প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুরা হলফ করিবার ভয়ে অর্থী বা প্রত্যর্থীরূপে আদালতে যাইতে চাহিতেন না। এই সুযোগে দুষ্ট লোকরা তাঁহাদিগকে প্রতারিত করিতে ছাড়িত না। একবার এক ব্রাহ্মণ ২৪০০০ টাকা পাওনার দাবী করিয়া দেওয়ানী আদালতে রামদুলালের নামে এক মিথ্যা অভিযোগ উপস্থাপন করে। রামদুলালের নিকটে প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণের কোন টাকা পাওনা ছিল না, বরং সে নিজে রামদুলালের কাছে টাকা ধারিত। কিন্তু মামলা করিলে রামদুলালকে আদালতে গিয়া হলফ করিয়া ঋণ অস্বীকার করিতে হইত, এবং হয় ত ব্রাহ্মণকে জালিয়াতির ফেরে পড়িতে হইত। এই ভয়ে রামদুলাল ব্রাহ্মণের মিথ্যা ঋণ স্বীকার করিয়া ঐ টাকা দিয়া মোকর্দ্দমা মিটাইয়া ফেলেন।

সরকারী কর্ম্মচারীরা বৃদ্ধ বয়সে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বৃত্তি লাভের অধিকারী হন। রামদুলাল তাঁহার কর্ম্মচারীদের বৃদ্ধ বয়সে তদ্রূপ বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার মাসে দেড় সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইত। দেব-দ্বিজে তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর অসাধারণ ভক্তি ছিল। রামদুলাল কাশীধামে ত্রয়োদশটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে তাঁহার পত্নী তুলাপুরুষ দান করেন; অর্থাৎ তিনি স্বর্ণ-রৌপ্যাদি ধাতুর সহিত তুলিত হইয়া ঐ সকল দ্রব্য ব্রাহ্মণগণকে দান করেন।

চরিত্র মাধুর্য্য

রামদুলাল এতাদৃশ অর্থ উপার্জ্জন করিলেও বিলাসিতার ধার ধারিতেন না। তাঁহার বেশ-ভূষা, আহার বিহার সাদাসিধা রকমের ছিল। আর একটি অনন্যসাধারণ মহৎ গুণের পরিচয় তাঁহার জীবনে দেখিতে পাই। যে মদনমোহন দত্তের আশ্রয়ে তিনি বিদ্যাশিক্ষা করিয়া অন্ন সংস্থান করিয়াছিলেন, ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়া তিনি তাঁহার সেই পূর্ব্বাবস্থা বিস্মৃত হন নাই। ধনগর্ব্ব তাঁহার হৃদয়ে কখনও স্থান পায় নাই। মদনমোহন দত্ত যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন রামদুলাল তাঁহাকে প্রভু ও নিজেকে ভৃত্য বলিয়া মনে করিতেন। এবং সেই প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ নিজ হৃদয়ে চির-জাগরূক রাখিবার জন্য ক্রোরপতি রামদুলাল ভৃত্যের বেশে নগ্নপদে প্রতি মাসে মদনমোহন দত্তের নিকট হইতে চিরানুগত ভৃত্যের প্রাপ্য দশ টাকা বেতন লইয়া আসিতেন! বলুন দেখি পাঠক, ইহাতে কি তাঁহার সম্মানহানি হইত? বরং আমার মনে হয় এ জগতে এরূপ মহত্ত্বের তুলনাই হয় না। ক্রোরপতি রামদুলাল, সমাজে মহামাননীয় রামদুলাল, বাঙ্গলার রথচাইল্ড রামদুলাল, ইয়োরোপীয় ও মার্কিন বণিক সমাজের বঙ্গীয় প্রতিনিধি রামদুলাল যখন ভৃত্যবেশে প্রভুর নিকট গিয়া তাঁহার মাস-মাহিনা দশটি টাকার জন্য মাসান্তে নিয়মিত ভাবে হাত পাতিতেন, তখন, সেই টাকা দিবার সময় প্রভু মদনমোহন দত্তের মনের ভাব কিরূপ হইত তাহা আমি কল্পনা-নেত্রে দেখিতে পাইতেছি, এবং আমার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যাইতেছে। এই মহত্ত্ব কেবল বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালীতেই সম্ভবে। এবং সেই বাঙ্গলা দেশের একজন ক্ষুদ্র বাঙ্গালী বলিয়া আমিও গৌরব বোধ করিতেছি।

সন ১২৩১ সালের ২০শে চৈত্র, ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রেল ৭৩ বৎসর বয়সে গঙ্গাতীরে রামদুলাল দেহরক্ষা করেন। মৃত্যুকালে তিনি এক কোটী তেইশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া যান। পাঁচ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে তাঁহার আদ্য-শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়। এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে হস্তী, অশ্ব, পাল্কী প্রভৃতি দান করা হইয়াছিল। কাঙ্গালী বিদায় করিতে তিন লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল।

সাময়িকী

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে, এমন কি বঙ্গের বাহিরেও, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা ও সাহিত্যিকগণের পরস্পর মিলনের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সূত্রপাত হয়। কাশীমবাজারে ১৩১৪ বঙ্গাব্দে সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়, এবং তাহার পর এই একুশ বৎসরে ইহার সর্ব্বসমেত ১৭টী অধিবেশন হইয়াছে। বিগত ১৩৩২ বঙ্গাব্দে বীরভূমে সম্মিলনের শেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহার পর নানা অনিবার্য্য বাধা বিঘ্ন বশতঃ সম্মিলনের আর কোন অধিবেশন হয় নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ ও বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের আদর্শে ভারতের নানা স্থানে সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইতেছে। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা। অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য ও অনাড়ম্বর হৃদ্যতার আবেষ্টনে সাহিত্যিক সমস্যার আলোচনায় সাহিত্যের প্রভূত উপকার হয়। এরূপ আলোচনায় সাহিত্যিকদিগের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের হানি হয় না, পরন্তু লেখন সৌষ্ঠব বৃদ্ধি, রুচি মার্জ্জন, পরমত-সহিষ্ণুতার বৃদ্ধি হয় ও এক যুগের সমস্ত জাতীয় সাহিত্যিক আদর্শের একটি স্পষ্ট মূর্ত্তি প্রকাশ পায়। বঙ্গীয় ১৩৩০ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই ভারতী-সম্মিলনের অধিবেশনগুলি প্রায় ক্ষুদ্র, বৃহৎ নগরেই হইয়া আসিতেছিল। ঐ বৎসর সমবেত সাহিত্যিকগণের ভক্তি-উপহারে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি সাহিত্যের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। পর বৎসর ১৩৩২ বঙ্গাব্দে আধুনিক বঙ্গের অন্যতম সাহিত্য-গুরু রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি রাধানগরে সম্মিলনের আর একটি অধিবেশন হয়। বিবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও বহু সাহিত্যসেবী সেই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। পল্লীর স্নিগ্ধ শ্যামল ক্রোড়েই বঙ্গভারতীর জন্ম ও পল্লী-কবিগণের যত্নেই তাহার শৈশব অতিবাহিত হইয়াছে। আজিও সুদূর নিভৃত পল্লীতে বঙ্গসাহিত্যের বহু অমূল্য রত্ন লুক্কায়িত আছে ও উদ্ধারাভাবে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে বসিয়াছে। পল্লীবাসীদিগের মধ্যে সাহিত্যানুরাগ উদ্বুদ্ধ করাই এগুলিকে রক্ষা করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। সে জন্য আমাদের মনে হয়, বঙ্গের পল্লীগ্রামই বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের প্রশস্ত ক্ষেত্র। এতদুদ্দেশ্যে এ বৎসর বাঙ্গলার অন্যতম অমর কবি ও হাওড়া জেলার গৌরব-রবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জন্মভূমি মাজু গ্রামে মাতৃভাষাসেবী ও সাহিত্যিকগণকে সাদরে বরণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আগামী গুড-ফ্রাইডের অবকাশ সময়ে ১৬ই ও ১৭ই চৈত্র এই সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির বিজ্ঞাপনে প্রকাশ যে শ্রীযুক্ত কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মূল সভাপতি, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য শাখা, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার ইতিহাস-শাখা, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত দর্শন শাখা ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি হইবেন। এই বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইবার পর বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ কানাডায় গমন করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার স্থানে অপর কোন খ্যাতনামা সাহিত্যিককে মূল সভাপতি পদে বরণ করিতে হইবে। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি এ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই। আমাদের আশা হয় এবার মাজুতে অনেক সাহিত্যসেবীর সমাগম হইবে।

ভারত সরকারের ১৯২৯-৩০ সালের বাজেট বাহির হইয়াছে। এ বৎসরে অর্থ-সচিব আশ্বাস দিয়াছেন, নূতন কোন ট্যাক্স বসান হইবে না; কিন্তু ভবিষ্যতে যদি আবশ্যক হয় তাহা হইলে যে কি করিবেন তাহা স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলেন নাই। ভারত-গবর্ণমেণ্টের তহবিলে আলোচ্য বর্ষে ৭৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবার সম্ভাবনা। অর্থ সচিব আশা দিয়াছেন, এ টাকাটা এ বৎসর রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা হইতে পূরণ করা হইবে। আর যদি ঘাটতি না পড়ে ত ভালই; আর যদি পড়ে, তা হইলে আগামী বৎসরে তিনি নূতন কর বসাইবার প্রস্তাব করিবেন। কর্ত্তাদের যাহা মনে আছে তাহাই করিবেন! ভবিষ্যতের ভাবনা না ভাবিয়া আয় বৃদ্ধির পথ বাজেটে যাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহার একটু আলোচনা করা যাউক।

এ বৎসর মোটর তেলের উপর গ্যালন-প্রতি চারি আনার স্থলে ছয় আনা শুল্ক ধার্য্য হইল। ইহাতে ৮৩ লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি হইবে। ইহাতে গরীব লোকদের পকেটে হাত পড়িবে না। যাহাদের পড়িবে, তাহাদের যে বিশেষ কিছু ক্ষতি হইবে, তাহা বলিতে পারি না। মোটর গাড়ী বড়লোকদের সখের জিনিষ। তাহার ব্যবহারের তেলের দর বাড়িলে আর কমিলে কি। তবে ইহাতেও একটা কথা হইতেছে—আজকাল ভারতের সর্ব্বত্র মোটর বাস ও মালবাহী মোটর লরী চলিতেছে। লরীগুলার কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম। তেলের দাম বাড়াতে মোটর বাসদের আয়টা বোধ হয় কিছু কমিবে। যাক্ সে কথা, টাকাটা যে রাস্তা সংস্কারের ফণ্ডের জন্য আলাহিদা করিয়া রাখা হইবে, তাহাতে আমরা আশান্বিত হইয়াছি। ভারতের রাস্তা-ঘাটের উন্নতি করা যে খুব প্রয়োজনীয়, সে কথা আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না।

গভীর দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এই বাজেটে লবণশুল্ক বা ডাকমাশুল কিছুমাত্র কমে নাই। দরিদ্র ভারতবাসী একবেলা শাকান্ন যে খায়, তাহা লবণ সাহায্যে খাইয়া থাকে। এমন সর্ব্বজন-ব্যবহার্য্য লবণের উপর শুল্কের হার যথাসম্ভব কমান উচিত; কিন্তু এই কয় বৎসরে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি সে দিকে পড়ে নাই। ডাকমাশুলের হার বাড়িয়া যাওয়ায় সরকারের আয় বাড়িয়াছে সত্য, কিন্তু গরীবেরা যাহারা প্রাণের দায়ে দ্বিগুণ মাশুল দিতে বাধ্য হয়, তাহাদের দিকটা একটু ভাবিয়া দেখা কি উচিত নয়? অর্থ সচিব আশা করেন, এ বৎসরে এই দুই বিভাগের জন্য সরকারের কিছু লোকসান হইবে। লবণশুল্কের কথার আলোচনা করিতে গিয়া অর্থ-সচিবকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, আকস্মিক ও অনিশ্চিত কারণের জন্য এইরূপ ঘটিবে। আমরা তাঁহাকে একটা কথা বলিতে চাই—রেলের ভাড়া কমাইয়া দেওয়ায় যাত্রীসংখ্যা বাড়িয়া আয়ের পথ যেমন সুগম করিয়া দিয়াছে, তিনিও তেমনই যদি খাম পোষ্টকার্ডের দাম কমাইয়া দেন, অন্ততঃ পূর্ব্বে যেমন ছিল তেমনই রাখেন, তাহা হইলে গরীব লোকেরা দূর দূরান্তরের আত্মীয় স্বজনদের খবরাখবর বেশীবার লইয়া সরকারের আয়ের পথ বাড়াইয়া দিবে। কিন্তু আমাদের এ অরণ্যে রোদন কি অর্থ সচিবের কর্ণে পৌঁছাইবে?

বাজেটে আয় ত কমে নাই, ব্যয়ের ঘরে কিন্তু টাকাটা বেশ বাড়িয়া গিয়াছে। শাসন-বিভাগের জন্য ১১৮ লক্ষ টাকা বেশী বরাদ্দ হইয়াছে ও বিলাতে ভারত-সচিবের নূতন প্রাসাদের জন্য ২৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। এ সকল খরচ দুঃস্থ ভারতবাসী অপব্যয় বলিয়া মনে করে। মাথা-ভারি বাড়ী তৈয়ারী করিলে যেমন তাহা অল্প দিনের মধ্যে ভূমিসাৎ হইয়া যায়, খরচা-ভারি শাসন-কার্য্যেও তেমনই শাসন-যন্ত্রটাকে বিকল করিয়া দেয়।

দেশীয় লোক পরিচালিত সংবাদ-পত্রগুলি একবাক্যে সামরিক ব্যয় কমাইবার কথা বলিয়া আসিতেছে। কিন্তু সরকার সেদিকেও অবহিত হন নাই—ফলে ব্যয়টা কিছুই কমে নাই। সরকারের কমাইবার ইচ্ছা বলবতী হইলেও কার্য্যে কিছুই হইয়া উঠিতেছে না; কারণ, সময়ের সঙ্গে তালে তালে পা ফেলিয়া ত চলিতে হইবে—আধুনিক রণনীতির আদর্শ ত অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। তবে অর্থ-সচিব আশা দিয়াছেন সামরিক ব্যয়ের জন্য যে ৫৫ কোটী টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা হইতে কোন কোন দিকের খরচ কমাইয়া, উড়োজাহাজ প্রভৃতি রাখিবার জন্য যে অতিরিক্ত ১০ কোটী টাকা খরচ হইবে, তাহা চালাইয়া লইবেন। সাধু! সাধু! তবে আসল কথাটা অর্থ সচিবের মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সামরিক ব্যয় বাবদ কোন টাকা উদ্বৃত্ত হইলে, সে টাকা সাধারণ তহবিলে ফেরৎ যাইবে না; ঐ টাকা প্রয়োজন মত তাঁহারাই ব্যয় করিবেন। ভারতের টাকা গৌরীসেনের টাকা। সামরিক বিভাগের যেরূপ প্রয়োজন তাহা কর্ত্তারা সেইভাবেই খরচ করিবেন। এ-রকম বেপরওয়া হুকুম চাহিতেও সামরিক বিভাগের একটু লজ্জা হইল না দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

বাঙ্গলা সরকারের বাজেট বাহির হইয়াছে। প্রতি বৎসরই যেমন আয়ের ঘর অপেক্ষা ব্যয়ের ঘর বাড়িয়া যায়, এবারেও সেইরূপ হইয়াছে। কাজেই সরকার বাহাদুর প্রয়োজনীয় কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছেন না,

যদিও তাহাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা রহিয়াছে, কিন্তু করিবেন কি,—টাকা কোথায়? মাননীয় মার সাহেবকে স্বীকার করিতে হইয়াছে, অনেকগুলি মতলব আছে, কিন্তু সেগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে টাকার দরকার। সেগুলির পেছনে বৎসর বৎসর টাকা খরচ করিতে হইবে। আর এরূপ করিতে পারিলে দেশের ও দশের মহোপকার সাধিত হইতে পারে। কিন্তু কি করা যাইতে পারে—আমাদের বাৎসরিক আয়ের চেয়ে খরচ বেশী। যতদিন না এরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে ততদিন কিছুই হইবে না।

বেশ কথা! এ খুব বড় স্বীকারোক্তি। কিন্তু আমরা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি, অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে কি করিয়া? দেশে শিল্প-বাণিজ্যের নূতন পন্থা উদ্ভাবিত হইতেছে না যে তাহার উপর নূতন শুল্ক বসিয়া আয়ের পথ বাড়িবে। দেশের যে সকল আয়ের পথ পূর্ব্ব হইতে আছে, সেগুলিও ত উন্নত পদ্ধতিতে চালিত হইয়া আয়ের পথ বাড়ায় নাই বা দেশের উৎপাদিকা শক্তিও ত বাড়ে নাই। তবে আয়ের পথ বাড়িবে কি করিয়া? এক বাড়িতে পারে নূতন ট্যাক্সের প্রচলন করিয়া, কিন্তু বাঙ্গলাদেশে আর নূতন ট্যাক্স বসাইলে কি বাঙ্গলাদেশ সে টাকা দিতে পারিবে? যে দেশে আয়ের টাকা হইতে দেশ শাসন চালাইবার ব্যয় সঙ্কুলানই করিতে পারে না সে দেশের সরকার দেশের অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থাই বা কি করিয়া করিবে, আর দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের অধিক পরিমাণে উৎপাদন, প্রচলন ও বিস্তার করিবে কি করিয়া? আর অর্থসচিবের এই বাজেটের উপর দেশের লোকের আস্থা থাকিবেই বা কেমন করিয়া? আসল কথা হইতেছে, দেশের ও দশের মহোপকারী কার্য্যসমূহের দিকে যদি সরকার অবাহত হইতে না পারেন, তা হইলে সরকারের উপর লোকের আস্থা থাকিবে না।

ব্যবস্থা-পরিষদে বোলশেভিক বিতাড়ন বিল সম্পর্কে সরকার পক্ষ ৬১—৫০ ভোটে জয়লাভ করিয়াছেন। সে দিন সভায় নির্ব্বাচিত উপস্থিত সদস্য সংখ্যা ছিল—৬৬ জন। তাহার মধ্যে ৫০ জন বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেন; আর ১৫ জন সরকার পক্ষে ভোট দেন; তাঁহাদের মধ্যে ১৩ জন মুসলমান ও ২ জন হিন্দু। সরকার পক্ষে আরও যে ৪৬ জন ভোট দেন, তাহাদের মধ্যে ২৬ জন সরকারী কর্ম্মচারী, ১০ জন ইয়োরোপীয় সদস্য ও ১৯ জন সরকারের মনোনীত বেসরকারী সদস্য। সরকারী, মনোনীত বেসরকারী ও ইয়োরোপীয় সদস্যগণ সবই সরকারের পক্ষে—তাঁহাদের বিষয়ে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু যে সকল নির্ব্বাচিত সদস্য সরকার পক্ষে যোগ দিয়া এই বিলের সমর্থন করিয়াছেন, তাঁহাদের অপূর্ব্ব দাস-মনোবৃত্তির কথা চিন্তা করিয়া আমাদের হতাশ হইতে হয়। যাঁহারা তাঁহাদের নির্ব্বাচিত করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি তাঁহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন—তাঁহারা দেশের বিশ্বাসঘাতক। জনসাধারণের প্রতিনিধির মুখোস পরিয়া দেশবাসীর সর্ব্বনাশ যাহারা করে, তাহাদের অপরাধের সীমা নাই। আর, যে সকল নির্ব্বাচিত সদস্য ঐ দিন ব্যবস্থা-পারষদে অনুপস্থিত ছিলেন—তাঁহাদের নির্ব্বাচনমণ্ডলী হইতে তাঁহাদের এই ঔদাসীন্যের জন্য তাঁহাদের নিকট হইতে কৈফিয়ত চাওয়া উচিত এবং উপযুক্ত কৈফিয়ত না পাইলে, তাঁহাদের সদস্য-পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য করান দরকার। কারণ, তাঁহারা জনসাধারণের কল্যাণ সাধনের প্রতিশ্রুতি দিয়া জাতীয় সন্ধিক্ষণে আপনাদিগকে দূরে রাখিয়াছিলেন। এই বিল সিলেক্ট কমিটির হাত ঘুরিয়া পুনরায় ব্যবস্থা পরিষদে আসিবে। তখন প্রত্যেক দেশের সন্তানকে এই বিলের উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। সফলতা লাভের জন্য নিজদিগকে প্রস্তুত করিতে হইবে। জয় দ্বারা এবারকার কালিমা যাহাতে ললাট হইতে মুছিয়া যায়, তজ্জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীর তাহাদের নির্ব্বাচিত সদস্যকে এখন হইতে এই বিষয়ে সচেতন করা আবশ্যক।

ডাঃ মুঞ্জের ভারতীয় বালকদিগের জন্য বাধ্যতামূলক শরীর-বিদ্যা ও সামরিক শিক্ষার প্রস্তাবের স্থানে কর্ণেল ক্রফোর্ডের সংশোধন প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হইয়াছে। সংশোধন প্রস্তাবটি এই:—"স্কীন কমিটি ভারতীয় যুবকদের সম্বন্ধে যে ত্রুটির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা দূরীভূত করিবার উদ্দেশ্যে এই পরিষদ সপারিষদ বড়লাটকে অনুরোধ করিতেছেন যে, স্কুল ও কলেজে অধ্যয়নকারী ১০ হইতে ১২ বৎসর বয়স্ক ভারতীয় বালকদের জন্য তিনি

অবিলম্বে বাধ্যতামূলক শরীর-বিদ্যা ও ড্রিল শিক্ষার ব্যবস্থা করুন এবং ছোট বন্দুক ব্যবহারে উৎসাহিত করান।" দেশে চোর ডাকাতের দল দিন দিন বাড়িতেছে; অথচ তাহাদের অত্যাচারে বাধা দিবার ক্ষমতা ও উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র দেশবাসীর নাই। ছাত্রদের স্বাস্থ্য হীন হইতে হীনতর হইতেছে, তাহাদের প্রতিকারকল্পেও সরকারের দৃষ্টি নাই। যাহা হউক এই প্রস্তাবটিও যে গৃহীত হইয়াছে —তাহাও সুখের বিষয়। এখন যাহাতে সত্বর প্রত্যেক প্রদেশের প্রতি স্কুল-কলেজে কার্য্যতঃ ইহা প্রতিপালিত হয়, আশা করি, সে বিষয়ে সরকার উপযুক্ত দৃষ্টি দিবেন।

(১) শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ

এবারকার কংগ্রেস-প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ ছিল অধ্যাপক ফাড়কের কলা-ভবন। এখানে জীবন্ত সঞ্চরণশীল মোমের মূর্ত্তি সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। শিল্পের দিক দিয়া এগুলি যেমন নিখুঁত সুন্দর, তেমনি উচ্চ ভাবের প্রেরণা দিতেও পারিয়াছে। এ সকল মোমের মূর্ত্তির ভাব-ভঙ্গী, চালচলন এমন স্বাভাবিক যে, মনে হয় না ইহারা প্রাণহীন। এখানে দশটী দৃশ্য দেখান হইয়াছিল।

ভাস্কর ও শিল্পী ফাড়কে বোম্বাই প্রদেশের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী। চারুশিল্পে ও তক্ষনবিদ্যায় তিনি জগতের ভাস্কর ও শিল্পীদের মধ্যে আপনার নাম ও স্থান করিয়া লইয়াছেন। লণ্ডনের ওয়েম্বলী প্রদর্শনীতে এবং আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া প্রদর্শনীতে এই সকল চিত্রের মধ্যে মাত্র চারিটী চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল, এবং যাঁহাদের ঐগুলি দেখিবার সুবিধা ও সুযোগ হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে ঐগুলির উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। অনেক প্রসিদ্ধ কলাবিৎ য়ুরোপের এই শ্রেণীর মোমের উৎকৃষ্ট চিত্রের সহিত এগুলির তুলনা করিয়া মুক্তকণ্ঠে এগুলির প্রশংসা করিয়াছেন। এগুলি ভাবের দিক হইতে সে দেশের চিত্র অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ, তা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

সাহিত্য জাতীয় জীবনের মুকুর। কবি ও সাহিত্যিক যেমন নূতন ভাবের সন্ধান দিয়া জাতিকে উন্নতির পথে অগ্রসর করেন, তেমনই চিত্রকর ও ভাস্কর জাতীয় ভাবের

প্রেরণা চিত্রের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়া অল্লায়াসে সাধারণের মনে সেই ভাব জাগরূক করিয়া রাখেন। দশখানি চিত্রের মধ্যে অন্ততঃ ৮ খানি চিত্রে স্বদেশ-প্রীতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেশকে ভালবাসিবার এই নূতন পন্থা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে নূতন শিল্পের প্রচলন করিয়া অধ্যাপক ফাড়কে ভারতের মধ্যে চির-স্মরণীয় হইয়া রহিলেন। আজকালকার অন্ন-বস্ত্রের অভাব দূর করিবার একটী নূতন পন্থা তিনি দেখাইয়া দিলেন। এদিকে আমাদের তরুণ শিল্পীদের মনোযোগ আমরা আকৃষ্ট করিতে চাই। নদীয়া কৃষ্ণনগরের মাটির জীবন্ত পুতুল বা জীবজন্তুর মূর্ত্তি আর তেমন বাহির হইতেছে না—বাঙ্গলার প্রাচীন মন্দির-গাত্রে পুরাণোক্ত দেব-দেবীর নানা-ভাবের নানা চিত্র ইষ্টকের উপর উৎকীর্ণ হইয়া দর্শকের আর বিস্ময় উৎপাদন করে না। উৎসাহের অভাবে শিল্প ও শিল্পীর দল লোপ পাইয়া যাইতেছে। এমন সময়ে নূতন শিল্পের সন্ধান পাইয়া আমরা অধ্যাপক ফাড়কেকে বরণ করিয়া লইতেছি। তিনি নূতন নূতন ভাবের প্রেরণা তাঁহার নির্ম্মিত চিত্রের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হউন।
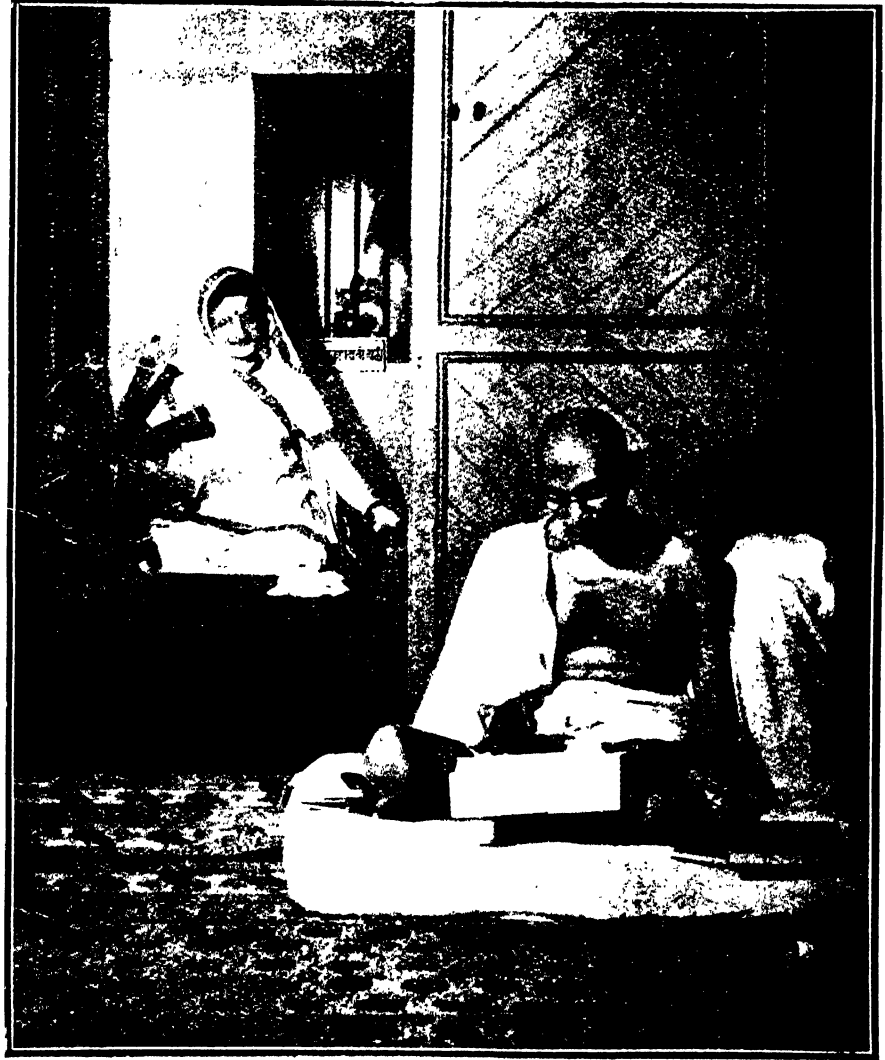
(২) মহাত্মা গান্ধী আত্ম-জীবনী রচনায় ব্যাপৃত

এইবার আমরা তাঁহার প্রদর্শিত চিত্রগুলির আখ্যান বস্তুর পরিচয় দিব—(১) লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির। এখানে দেবতার সম্মুখে একজন পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করিতেছেন ও জনৈক সাধু তাহা শুনিতেছেন। শ্রোতা ও বক্তার আন্তরিকতা ও ধর্ম্মপ্রাণতা যেন সজীব হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেশকে বড় করিতে হইলে দেশবাসীকে মানুষ হইতে হইবে, আর ধর্ম্ম ছাড়া ভারতের কোন কিছুই চলিতে পারে না। দেবতা ভক্তের নিকট যে নামেই পূজিত হউন, তিনি সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের প্রতীক ছাড়া আর কিছু নন। ধর্ম্মকে ছাড়িয়া জাতীয়তার বিকাশ সম্ভবপর নয়, তাই অধ্যাপক প্রথমেই এই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। (২) দ্বিতীয় দৃশ্যে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার আত্ম-জীবন-চরিত রচনায় ব্যাপৃত। এখানে মহাত্মাজীর তন্ময়তার ভাব অপূর্ব্ব! জগতের কোন দিকেই তাঁহার লক্ষ্য নাই,

এমন কি তাঁহার বড় সাধের চরকায় একজন ভদ্র-মহিলা যে তাঁহার সমক্ষে সূতা কাটিতেছেন সেদিকেও তাঁহার লক্ষ্য নাই! এমনই ভাবে চিত্ত-নিরোধ করিয়া সংসারের সকল দিক হইতে বিক্ষুব্ধ চিত্তকে একমুখী করিতে না পারিলে কি জগতে বড় কোন কিছু করিতে পারা যায়? (৩) সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর দৃশ্য হইতেছে হাসপাতালে মহাত্মাজীর অস্ত্রোপচার। এমন জীবন্ত চিত্র যে চিত্রের ভিতর দিয়া দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে আমরা ইতঃপূর্ব্বে তাহার কল্পনা করিতেও পারি নাই। অস্ত্রোপচার টেবিলে উপর প্রিয়তম পুত্র চিত্তরঞ্জনের মৃতদেহ ধরিয়া রহিয়াছেন। আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতেছেন—এখনও বুঝি তাঁর দেহে প্রাণের একটু ক্ষীণ ধারা বহিতেছে—আশা ও নিরাশার অপূর্ব্ব চিত্র মাতার মুখে ফুটিতেছে—একবার মাতার মুখে আশার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতেছে—বুঝি তিনি চিত্তরঞ্জনের বক্ষস্পন্দন অনুভব করিলেন, পরমুহূর্ত্তে নিরাশ হইয়া একেবারে বিষাদাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। মুখের ভাবের এই পরিবর্ত্তন যে দেখিবার জিনিষ তাহা আর কাহাকেও কি বলিয়া দিতে হইবে? এই করুণ দৃশ্যে আত্মীয়-স্বজনের বিয়োগ-

(৩) হাঁসপাতালে মহাত্মা গান্ধীর অস্ত্রোপচার

মহাত্মাজী শায়িত। যন্ত্র-সাহায্যে তিনি শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিতেছেন। ডাক্তার অস্ত্রোপচার করিতেছেন। প্রদীপ নিবিয়া গেল, অন্ধকারের ভিতর নার্স অদৃশ্য হইলেন এবং পর্দ্দা ঠেলিয়া আবার সেখানে আসিলেন। ডাক্তার ও প্রহরী নিজ নিজ স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন। বাস্তব দৃশ্যের এরূপ অনুকরণ সর্ব্বথা প্রশংসার্হ। (৪) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে ভারতমাতার শোক, এই হৃদয়-বিদারক চিত্রে ভারতমাতা আপনার দুই হস্তের দুঃখ মনে জাগিয়া উঠে। ভারত-মাতার চিত্র উচ্চে ৯ ফিট। (৫) কারাগারে মহাত্মাজী চরকা কাটিতেছেন। সূতা কাটিয়া স্বরাজলাভ যে করিতে পারা যায়, যাহা মহাত্মাজী বক্তৃতা দিয়া, হিসাব-নিকাশ করিয়া দেখাইয়া ভারতবাসীর চক্ষু খুলিয়া দিতে পারিতেছেন না—শিল্পী মল্লিনাথ চিত্রের সাহায্যে তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। (৬) বোম্বাইয়ের সব্জী ও ফলবিক্রেতাগণ। (৭) প্রাচীন ও নবীন। (৮) বোরকা-পরিহিতা একজন

ভদ্র মহিলা, তাঁহার দক্ষিণ দিকের আয়নার উপর দৃষ্টি ফেলিয়া আপনাকে একজন হিন্দুমহিলা বেশে দেখিতে পাইতেছেন। শিল্পী এখানে হিন্দু ও মুসলমানের ভিতর কোনরূপ যে পার্থক্য নাই তাহাই দেখাইয়াছেন—উভয়েই যে ভারতমাতার সন্তান। (৯) কোন এক রাজনীতিক সভায় লোকমান্য তিলক বক্তৃতা দিতেছেন। (১০) অনুসন্ধান আফিস। চিত্র দেখিলে হাস্য সংবরণ করিতে পারা যায় না। সদানন্দ সেক্রেটারী মহাশয় টেলিফোনের শব্দ শুনিয়া যন্ত্র কাণে ধরিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে তাহা টেবিলের উপর রাখিলেন। তাহার পর তাঁহাকে দেখিবামাত্র আপনা আপনি হাসিতে হইবে। তাঁহার মুখ-চোখের ভাব এত সুন্দর, যেন তিনি একজন হাস্যরসের অভিনয়ে সুদক্ষ অভিনেতা। কলিকাতাবাসী যাঁহারা এখনও অধ্যাপকের এই সকল অতুলনীয় কীর্ত্তি দেখেন নাই, তাঁহাদিগের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—চিত্তরঞ্জন এভিনিউএর ধর্ম্মতলা মোড়ের দিক হইতে কিছু দূরেই অধ্যাপক ফাড়কের তাঁবুতে গিয়া একবার দেখিয়া আসিয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন করুন। প্রবেশের মূল্য মাত্র চারি আনা। পয়সায় অপব্যবহার হইবে না এ কথা আমরা জোর গলায় বলিব। ফিরিয়া আসিয়া বলিতেই হইবে—অপূর্ব্ব! মনোরম! আর সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষ্যে লইয়া আসিবেন উগ্র স্বাদেশিকতা।

———

বিগত ২৮শে মাঘ রবিবার মহাকবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে মহাকবির স্মরণোৎসব হইয়াছিল। 'মধু-স্মৃতি' লেখক সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শান্তিপুর ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে অনেক ভদ্রলোক এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শান্তিপুরের খ্যাতনামা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রেয় এম-এ, বি-এল্ প্রমুখ ভদ্র-মহোদয়গণের চেষ্টায় এবার এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতা বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেও অনেকবার বলিয়াছি, এবারও বলিতেছি, কৃত্তিবাসের

(৪) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু, ভারতমাতার শোক

জন্মতিথিতে ফুলিয়া গ্রামে একটা মেলার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষতঃ ময়মনসিংহ প্রভৃতি কয়েকটি জেলায়, দুর্ব্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক অবলা অসহায়া বহুসংখ্যক রমণী যেমন ভীষণভাবে প্রতারিত, অপহৃত, নির্য্যাতিত ও ধর্ষিত হইয়া থাকে, তাহার বিবরণ অবগত হইলে ব্যক্তি-মাত্রেরই প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, এবং যে সমাজ ইহার প্রতিকারে অসমর্থ, তাহার প্রতি ধিক্কার জন্মে। এই পাপাচারের গতি প্রতিহত করিতে না পারিলে নারীত্ব, সতীত্ব, মাতৃত্বের আদর্শ ক্রমশঃ সমাজ হইতে বিলুপ্ত হইবে, এবং সমাজের ভিত্তি পাপ-গহ্বরে নিম'জ্জিত হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষোভ ও পরিতাপের বিষয় এই যে, সমাজের পুরুষগণ নারীত্ব, সতীত্ব ও মাতৃত্বের এইরূপ লাঞ্ছনা ও অপমান নিবারণের জন্য সমুচিত চেষ্টার পরিবর্ত্তে সেই আত্মরক্ষণে অসমর্থা হতভাগিনীদিগকে আবার সামাজিক অত্যাচার ও অবিচারের গুরুভারে নিষ্পেষিত করিয়া আত্মশ্লাঘা অনুভব করিয়া থাকেন। হতভাগিনীগণ নরপশুদের কবল হইতে কোন প্রকারে মুক্তিলাভ করিয়া, পুনরায় ধর্ম্মসঙ্গত জীবন যাপন করিবার ব্যাকুল আগ্রহ লইয়া, পিতৃকুল বা পতিকুলের আশ্রয়প্রার্থিনী হইলে, প্রায়শঃ নৃশংসভাবে বিতাড়িত হইয়া থাকে; এমন কি ধর্ম্মানুমোদিত স্বাধীন জীবিকা দ্বারা আত্মপোষণ করিবার মানসে সমাজের এক কোণে মাথা গুঁজিবার স্থান চাহিলেও তাহা পায় না। সমাজের এই আত্মপ্রতারণামূলক নৈতিক দৌর্ব্বল্য ও অবিচারের ফলে, হতভাগিনীদের মধ্যে কেহ বা আত্মহত্যা দ্বারা লাঞ্ছনার হাত হইতে মুক্তিলাভ করে কেহ বা অন্যবিধ কোন সম্প্রদায় বিশেষের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক পুরাতন সমাজকে তীব্র অভিশাপের হলাহলে নিজ্জীব করিতে থাকে, কেহ বা পেটের দায়ে পাপস্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া সমাজবক্ষে সসম্মানে বিচরণশীল নরপিশাচগণের নরকের পথ পরিষ্কার করিতে থাকে। এরূপ অবস্থায় সমাজ যে ক্রমশঃ অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? সমাজকে যদি বাঁচাইয়া রাখিতে হয়, সমাজের স্থিতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য ন্যায় ও ধর্ম্মের যদি কোন আবশ্যকতা থাকে, তবে সমাজের মাতৃজাতির এই ভীষণ দুর্গতির প্রতি সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এই দুর্গতি নিবারণ কল্পে এক দিকে যেমন দুর্ব্বৃত্ত নরাধমদের কঠোর নিগ্রহ ও তাহাদের কবল হইতে নিগৃহীতাদের উদ্ধার সাধনের জন্য সর্ব্বদা বদ্ধ-পরিকর থাকা আবশ্যক, অন্য দিকে তেমনি, সেই সব রমণীগণ যাহাতে পুনরায় সমাজে ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে সুবিধা পায় এবং সেই ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত উপযুক্তরূপ আশ্রয় ও গ্রাসাচ্ছাদন এবং সুশিক্ষা পায়, তজ্জন্য সুবন্দোবস্ত করা আবশ্যক। সমাজসেবাব্রতী যুবকবৃন্দের কল্যাণকর প্রযত্নে প্রথমোক্ত কার্য্যদ্বয়ের জন্য কতকটা ব্যবস্থা হইতেছে বটে, কিন্তু শেষোক্ত কার্য্যদ্বয়ের জন্য ময়মনসিংহে কোন সুনিয়ত ব্যবস্থা হয় নাই। ময়মনসিংহ-বাসিগণের পক্ষে ইহা বড়ই লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই।

বিগত বৎসর ময়মনসিংহ ভূম্যধিকারী সভার বাৎসরিক অধিবেশনে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এই সব নিগৃহীতা, আশ্রয়-হীনা রমণীগণের আশ্রয়দানের উদ্দেশ্যে একটি নারীরক্ষাশ্রম এবং তৎপরিচালনকল্পে একটি স্থায়ী ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই অত্যাবশ্যক প্রতিষ্ঠানের জন্য অন্যূন এক লক্ষ টাকার প্রয়োজন। এই কার্য্যের মূল প্রস্তাবক সেরপুরের মহাপ্রাণ স্বনামধন্য জমিদার শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী মহাশয় কুড়ি হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, এবং আরও কতিপয় সদাশয় জমিদার ও ধনী ব্যক্তির প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। আমরা ভরসা করি, উদ্দেশ্যের গুরুত্ব বিবেচনায় সকলেই নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে অর্থ প্রদান ও সর্ব্ব প্রকার সাহায্যদান করিয়া অনতিবিলম্বে কার্য্যসিদ্ধির ব্যবস্থা করিবেন।

লণ্ডনে অনেক বাঙালী ছাত্র আছেন। অথচ তাঁহাদের পরস্পরের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মত কোনও সমিতি এত দিন লণ্ডনে ছিল না। অনেকদিন ধরিয়াই এখানকার বাঙ্গালী ছেলেরা এ রকম একটা সমিতির অভাব অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন। তাই ক'য়েকজনের উৎসাহে বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের চেষ্টায় গত ৫ই চৈত্র—১৮ই মার্চ্চ, এই সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা হয়। এর উদ্দেশ্য এই যে বাঙলাভাষী লোকদের একত্র করিয়া তাদের মধ্যে বাঙলা ভাষায় নানা রকমের প্রসঙ্গ আলোচনা করিবার সুবিধা

করিয়া দেওয়া। সম্মিলনীর অধিবেশনগুলি সাধারণতঃ দু'-সপ্তাহ অন্তর অন্তর হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রিয়লাল গুপ্ত, নলিনাক্ষ সান্ন্যাল, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, ও ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, অতি সুন্দর রকমে সমিতির কাজ চালাইয়াছেন। সভায় যে সমস্ত লঘু-গুরু বিষয়ের আলোচনা হইয়া গিয়াছে তার ক'য়েকটির নমুনা নীচে দেওয়া গেল। "বঙ্গীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্‌লা ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরাজী ভাষায় বিজ্ঞানাদি বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।" "বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জনীয়" "প্রাচ্য সভ্যতা প্রাচ্যের অর্থনৈতিক বিকাশের অন্তরায়" "আন্তর্জ্জাতিক শান্তি ও মানব-সভ্যতার উন্নতির উদ্দেশ্যে যুদ্ধবিগ্রহ সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জনীয়" "ভারতীয় নারীর আদর্শ" "ভারতে পল্লীসংগঠন" "ভারতে প্রজনন শাসনের প্রয়োজনীয়তা" "উত্তরাধিকারসূত্রে অর্থলাভ বিধিবিরুদ্ধ হওয়া উচিত।" এ সব বিষয়ের বাদানুবাদের ভিতর দিয়া আমাদের ছেলেদের মনস্তত্ত্বের খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়। "বিবাহ অনুষ্ঠান বর্জ্জনীয়" এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বেশীর ভাগ সভ্য মত দিয়েছিলেন। "প্রজনন-শাসনের প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে সকলেই একমত ও অধিকাংশ সভ্যই মনে করেন যে "উত্তরাধিকারসূত্রে অর্থলাভ বিধি-বিরুদ্ধ হওয়া উচিত।" লণ্ডনপ্রবাসী সমস্ত বাঙ্‌লাভাষী লোকদের সম্মিলিত করার ও নূতন ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন করার উদ্দেশ্যে গত ১৪ই অক্টোবর একটা উৎসবের আয়োজন হয়। এই উৎসবে প্রায় ৩০০ লোক উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ও তাঁহার পত্নী, লর্ড সিংহ, প্রভৃতি এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। এ কাজে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অনেকে সাহায্য করিয়াছিলেন। মেয়েদের মধ্যে—শ্রীমতী তটিনী দাসগুপ্তা ও শ্রীমতী মৃণালিনী সেনের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

চন্দননগরের খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও দানবীর শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের পরমারাধ্যা মাতৃদেবী, যাঁহার পুণ্যনাম-সংযুক্ত কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষা-মন্দির তাঁহার অভীপ্সিত নারী-জাতির কল্যাণার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বিগত ৬ই ফাল্গুন সোমবার রাত্রিশেষে তিনি ৺কাশীলাভ করিয়াছেন। তাঁহার মহান চরিত্রের বিশেষত্ব বলিতে ইহাই বলিতে হয়, যে সকল মহিলার আবির্ভাবে আজও দেশের এবং জাতির গৌরব-গরিমা সমুজ্জ্বল রহিয়াছে, ইনিও তাঁহাদেরই অন্যতম। ত্যাগ-সেবা ও পরোপকার ইহাই এই সরল-প্রাণা নারীর জীবনের ব্রত ছিল। অধুনা শিক্ষিতা নারী বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা তিনি ছিলেন না; কিন্তু নারীজাতির জীবন যাহাতে শিক্ষালোকে আলোকিত হইয়া মধুময় হয়, ইহা তাঁহার অন্তরের সাধ ছিল; এবং এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে তাঁহারই প্রভাবে আজ চন্দননগরে কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষা-মন্দির ও অঘোরচন্দ্র অবৈতনিক প্রাথমিক বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মশীলা দয়ার্দ্রহৃদয়া সাধ্বী নারী খুব কমই দেখা যায়। হরিহরবাবুদের তিন

স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাসী

সহোদর (হরিহর, শিবরাম ও দুর্গাদাস শেঠ) ও দুই সহোদরাকে রাখিয়া প্রায় ৬৭ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি তাঁহার অভীষ্ট দেবদেবী স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। নিত্যগোপাল প্রাথমিক অবৈতনিক বিদ্যালয় নামক ছেলেদের বিদ্যালয় ও নিত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির অথবা শম্ভুচন্দ্র সেবাশ্রমাদি প্রতিষ্ঠায়ও তাঁহার প্রভাব কম ছিল না। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র দুর্গাদাস-সম্পাদিত সাপ্তাহিক "স্বদেশী বাজার" প্রধানতঃ তাঁহারই উৎসাহে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি স্বদেশীর একনিষ্ঠ উপাসিকা ছিলেন, নিজে বিদেশী বস্ত্র ব্যবহার করিতেন না এবং চরকায় সূতা কাটা তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য ছিল।

আমরা হরিহর বাবু ও তাঁহার আত্মীয়গণের এই গভীর শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী রবিবার রাত্রি ৭॥০ ঘটিকার সময় অবসরপ্রাপ্ত ইন্‌কম্‌ট্যাক্স অফিসর স্বর্গীয় বিনয়ভূষণ সেন

স্বর্গীয় বিনয়ভূষণ সেন

মহাশয় তাঁহার অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা মাতাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া মাত্র ৫৭ বৎসর বয়সে, সহসা হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায়, ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ইনি অতি সাধারণ ভাবে কর্ম্মজীবন আরম্ভ করিয়া স্বীয় অধ্যবসায় ও প্রতিভার বলে অল্পকাল মধ্যেই অতি উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন। ঔদার্য্য, তেজস্বিতা ও অন্তরের সৌকুমার্য্যে ইনি সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। অধীনস্থ কর্ম্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি সকলেই তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইতেন। সরকারী কার্য্য করিয়াও যাঁহারা স্বাদেশিকতার প্রতি বৈরাগ্য প্রদর্শন করেন নাই, স্বর্গীয় বিনয়ভূষণ বাবু তাঁহাদের একজন। পৈতৃক বাসভূমি ত্রিবেণীর সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনে ইনি সর্ব্বদাই তৎপর ছিলেন। দেশহিতকর সর্ব্ববিধ প্রতিষ্ঠানের প্রতি তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় বিদ্যোৎসাহী, স্বদেশপ্রেমিক, সাহিত্যানুরাগী ও উদার বন্ধুর অভাব আমরা আজ অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছি; ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান তাঁহার আত্মার সদ্গতি করুন।
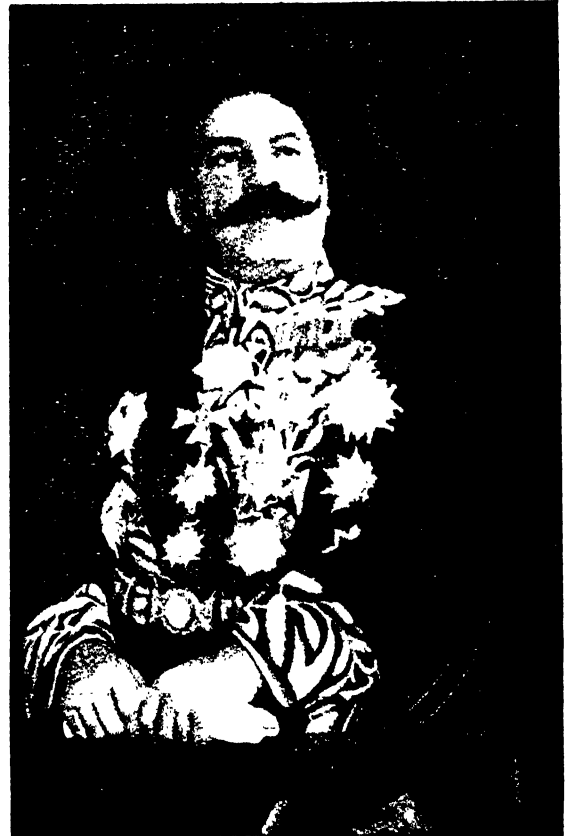
কাবুলের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা আলি আহম্মদ জান

কাবুলের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা আলি আহম্মদ জান আমীরত্ব লাভের জন্য বাচ্চা-ই-সাকোর সহিত যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তিনি পেশোয়ারে আশ্রয়

লইয়াছেন। আফগানিস্থানের প্রসিদ্ধ মহাবীর নাদির খাঁ ফ্রান্স হইতে বোম্বাই নগরে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে পেশোয়ার হইয়া খোস্তে গিয়াছেন। নাদির খাঁ এবং আলি আহম্মদ জান উভয়েই বলিতেছেন যে কাবুলের আমীরীর উপর তাঁহাদের একটুও লোভ নাই। তাঁহারা রাজা আমানুল্লাকেই পুনরায় সিংহাসনে স্থাপন করিতে চাহেন।

গত ২৪শে নভেম্বর শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত "গঠনের কাজ" সম্বন্ধে বিলাতের নবগঠিত সম্মিলনীতে তাঁহার স্বাভাবিক চিত্তাকর্ষক ভাষায় একটি বক্তৃতা দেন। সমিতির কাজ আরও বাড়িয়া চলিতেছে বলিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করা হইতেছে। তাই দিয়ে সমিতির কার্য্যক্ষমতা বাড়িবে বলিয়া আশা করা যায়। আপাততঃ এই সম্মিলনীর সভ্যদের জন্য একটি পুস্তকাগারের বন্দোবস্ত করা হইতেছে। উদ্যোগকারীগণ বাঙ্গালা দেশ থেকে এই কাজে উৎসাহ ও সাহায্য পাইবার আশায় তাঁহাদের স্বদেশবাসীর কাছে এই প্রতিষ্ঠানের ইতিবৃত্ত জানাইতেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মসচিব শ্রীবীরেশ গুহ, শ্রীলাবণ্যবালা দাস, শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন।

মহাত্মা গান্ধীজী রেঙ্গুন যাত্রার পথে রবিবার দিন কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। সোমবার রাত্রি সাত ঘটিকার সময় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বিদেশী বস্ত্র-সত্র ও বয়কট আন্দোলন সভার আয়োজন হইয়াছিল। কলিকাতার পুলিশ কমিশনার ১৮৬৬ সালের ৪র্থ আইন অর্থাৎ কলিকাতার পুলিশ আইনের ৬৬ ধারার ২ উপবিধি অনুসারে কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারীর উপর নোটিশ জারি করিয়াছিলেন যে, প্রকাশ্য জনবহুল রাজপথে অগ্ন্যুৎসব হইতে পারিবে না। ঐ ধারা এক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতে পারে না এই বিশ্বাসে মহাত্মাজী নিজের স্কন্ধে সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া এই যজ্ঞে হোতার কার্য্য করিয়াছিলেন; সেইজন্য মহাত্মাকে ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়কে পুলিশ গভীর রাত্রিকালে গ্রেপ্তার করিয়াছিল। তাঁহারা উভয়েই ৫০ টাকার ব্যক্তিগত জামিনে মুক্তিলাভ করেন।

জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মাজীর প্রতি পুলিশের এই দুর্ব্ব্যবহারে সমগ্র ভারত স্তম্ভিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছে। এমন কি বিলাতেও চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। মেসার্স শকলাৎওয়ালা শ্রমিকদলের সেক্রেটারী ম্যাক্সটন ও জন, ফেনার ব্রকওয়ে ও কর্ণেল ওয়েজউড্ প্রভৃতি রাজনীতিজ্ঞগণের মত যে ইহাতে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরও শক্তি লাভ করিবে, আন্দোলন সুপ্রতিষ্ঠিত ও সর্ব্বত্র সর্ব্ব শ্রেণীর মধ্যে প্রসারিত হইবে। মিঃ ম্যাক্সটন আরও বলেন, ইহার জন্য বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদীদের পরে অনুতপ্ত হইতে হইবে। দমননীতির প্রয়োগে ভারতবর্ষকে স্বরাজ-সংগ্রামে বিরত করিতে পারা যাইবে না। মিঃ ব্রকওয়েও বলিয়াছেন, বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবকে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সরাইয়া ফেলিতে না পারিলে যে গবর্মেন্ট টিঁকিতে পারে না, সে গবর্মেন্টের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

ছাত্রগণের মধ্যে সময়োচিত চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে; অনেক অভিভাবক ও শিক্ষক মনে করেন নেতৃগণ ছাত্রদিগকে রাজনীতি-ক্ষেত্রে আনিয়া তাহাদের নষ্ট করিতেছেন; তাঁহারা মনে করেন যে অধ্যয়ন ব্যতীত কোন দিকে মন দেওয়া ছাত্রগণের অমার্জ্জনীয় অপরাধ; তাঁহারা চান যে কোন উপায়ে সেই অতি পুরাতন শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা। ছেলেদের এই স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় তাহাদের অবাধ্যতা ঔদ্ধত্য তাঁহাদের বিসদৃশ লাগিতেছে। ভাইস্-চ্যান্সলার ডাঃ আর্কুহাট অধ্যাপক হিসাবে ছাত্রগণের জীবনের মনোভাবকে জানিবার ও বুঝিবার যথেষ্ট অবকাশ পাইয়াছেন; তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিতও সংশ্লিষ্ট নহেন; তাঁহার কন্‌ভোকেশন্-অভিভাষণ নির্ভীক ও সুস্পষ্ট। তিনি বলিতেছেন,—বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশবাসীর স্বার্থের অতি নিকট সম্পর্ক।—বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদিগকে নাগরিকের কর্ত্তব্য সম্পাদনের যোগ্য করিয়া প্রস্তুত করিতেছে কিনা তাহা আলোচ্য বিষয়। অনেকে দাবী করেন যে ছাত্রদের সাধারণ আন্দোলনে যোগদান কর্ত্তব্য—অপর পক্ষ বলেন যে রাজনীতির নামও যেন ছাত্রদের কর্ণে না পৌঁছায়। কিন্তু, উভয় মতই আমার পক্ষে অসম্ভব মনে হয়। আমি ইহা লইয়া বেশী আলোচনা করিতে চাই না—কেবল এইটুকু বলিতে চাই যে জীবনযাত্রার জন্য প্রস্তুত হওয়ার মধ্যে রাজনৈতিক সমস্যার আলোচনা

অন্তর্নিহিত। এইরূপ আলোচনায় ছাত্রদের যোগ দিতে না দিলে তাহাদের বিপ্লববাদী হইতে বাধ্য করা হয়। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে যে ভাবে তাহারা রাজনীতি-ক্ষেত্রে যোগ দিতে পারিবে, ছাত্রাবস্থায় রাজনীতি শিক্ষা করিতে হইবে বলিয়া, সেইভাবে রাজনীতি ক্ষেত্রে যোগ দিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। ছাত্রদের রাজনীতি শিক্ষা-রূপ সমস্যাটা ততটা প্রবল হইয়া উঠিত না যদি জনসাধারণের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও একটু বেশী সহানুভূতি ও সহযোগিতার ভাব থাকিত। ইহার পর নিয়মানুবর্ত্তিতার কথা বিবেচ্য। এই সমস্যাটি যেমন ব্যাপক সেইরূপ গুরুতর। তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা বহুদর্শী, তাঁহারা ছাত্রসমাজের চাঞ্চল্য দেখিয়া মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিতেছেন, ছাত্রসমাজ শাসনের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে; যে কোন উপায়ে হউক, তাহাদের মধ্যে নিয়মানুবর্ত্তিতার পুনঃ প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক। কিন্তু এক যুগের সহিত অপর এক যুগের তুলনা করা অত্যন্ত বিসদৃশ। সুকৌশল সহকারে এই নিয়মানুবর্ত্তিতা-সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। সেজন্য কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ ও সমাজের মধ্যে সংযোগ থাকা দরকার। ছাত্র ও শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের ভাব বর্ত্তমান থাকিতে এই সমস্যার মীমাংসা সম্ভবপর নহে।

কনভোকেশন সভায় বাঙ্গলার লাট সার ষ্ট্যানলে জ্যাক্‌সন্ ছাত্রগণকে যে সকল শ্রুতিমধুর উপদেশ দিয়াছেন, তন্মধ্যে দুই একটি কথা সর্ব্বসাধারণের প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে বহুদর্শিতা লাভ না করিলে শিক্ষা বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়ায়। আর শিক্ষা-লাভ না করিয়া কেবল বহুদর্শিতা অর্জ্জন করাতে কোন ফল নাই। শিক্ষার অভাবে বহুদর্শিতা কোন কাজে আসে না।

লাট সাহেবের আর একটি সুন্দর কথা এই যে, ছাত্র-গণের স্বাস্থ্যের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। প্রতি দশজন ছাত্রের মধ্যে মাত্র তিন জনের স্বাস্থ্য স্বাভাবিক। অর্থাৎ এই তিনজনকেও অতিরিক্ত বলশালী, অমিত স্বাস্থ্য সম্পন্ন বলা চলে না। আর সহস্র সহস্র ছাত্র নিবার্য্য ব্যাধিতে ক্লেশ পায়। ছাত্র সমাজের স্বাস্থ্যের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রমঙ্গল সমিতির সাহায্যে আবিষ্কার করাতে লাটসাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। আর বলিয়াছেন, এরূপ অবস্থায় বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং জনসাধারণ কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু ছাত্রসমাজের হিতাহিত সম্বন্ধে খোদ সরকার বাহাদুরেরও কি কিছু কর্ত্তব্য নাই? ছাত্র-সমাজ রাজনীতির চর্চ্চা করিলে সরকার বিরক্ত হন; পক্ষান্তরে ছাত্র-সমাজ স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িলে সরকারের তাহার প্রতিকার-কল্পে যথেষ্ট অর্থ-সাহায্য ও ব্যবস্থা করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

ভারত সরকারের একটি নিয়ম আছে—দেশের নিজস্ব শিল্পে সর্ব্বতোভাবে উৎসাহ দিতে হইবে। সম্প্রতি আসামের ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্টের পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতির জন্য খদ্দর ব্যতীত আর কোন বস্ত্র ক্রীত হইবে না। ইতঃপূর্ব্বে, সরকারী কার্য্যে আবশ্যকীয় লৌহের জন্য মাত্র ভারতীয় লৌহই ক্রীত হইবে এই মর্ম্মেও একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। আশা করি আসাম গবর্ণমেণ্ট কাউন্সিলে গৃহীত প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিবেন। আর আসাম ব্যবস্থাপক সভা যে সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন, ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতেও যে অচিরে অনুরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইবে, সে সম্বন্ধে আমাদের মনে একটুও সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালা দেশের সে-দিনের মন্ত্রীযুগলের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সদস্যের ভোটে পরি-গৃহীত হওয়ায় মন্ত্রীদ্বয় চৌষট্টি হাজারের মায়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে আরও কয়েকবার মন্ত্রীদিগের বেতন নামঞ্জুর করা হইয়াছিল, তাঁহাদের প্রতি অনাস্থার প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছিল, মন্ত্রীদিগকেও পদত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু, এবারের অনাস্থা প্রস্তাবের একটু বিশেষত্ব আছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে দ্বৈত-শাসনকে অচল ও ব্যর্থ করাই মন্ত্রীদিগের প্রতি অনাস্থা-জ্ঞাপনের উদ্দেশ্য ছিল; এবার কিন্তু সে উদ্দেশ্যে অনাস্থা-প্রস্তাব উপস্থাপিত ও গৃহীত হয় নাই,—এবারের ব্যাপার বলিতে গেলে ব্যক্তিগত, অর্থাৎ কোন এক মন্ত্রীর অযথা ও অসঙ্গত কার্য্যের জন্যই এই অনাস্থা-প্রস্তাব অধিকাংশ সদস্যের ভোটে গৃহীত হইয়াছে। এবার স্বরাজদলের কেহ এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে অগ্রসর হন নাই; যাঁহারা দ্বৈত-শাসনের পক্ষপাতী, সেই দলেরই একজন মুসলমান সদস্য এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন এবং সেই দলেরই অপর একজন মুসলমান সদস্য এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। এই উপলক্ষে মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মশরফ হোসেন সম্বন্ধে সদস্যগণ যে ব্যক্তিগত অভি-জ্ঞতা প্রকাশ করেন, তাহাতে মন্ত্রী মহাশয়ের প্রতি অনাস্থার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় কেহই বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হন নাই। তবে ব্যবস্থাপক সভার শ্বেতকায় ও গবর্ণমেণ্টের মনোনীত

সদস্যদিগের কথা পৃথক ; তাঁহারা চক্ষু মুদিত করিয়া সরকার পক্ষে যে নির্ব্বিচারে ভোট দিয়া থাকেন এবং এ ক্ষেত্রেও যে দিয়াছেন, তাহা না বলিলেও চলে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাঁহারা দ্বৈত শাসনের পক্ষপাতি, তাঁহারাই এবার এই অনাস্থা প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন গবর্ণমেণ্ট এবারও পুনরায় মন্ত্রী মনোনয়ন করিবেন। কিন্তু, এতদিন হইয়া গেল, গবর্ণর বাহাদুর এ বিষয়ে কোন চেষ্টা করিতেছেন, এমন কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না ; অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও গবর্ণমেণ্ট হস্তান্তরিত বিভাগ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন ; মন্ত্রীপদে অভিষিক্ত করিবার জন্য রাজহস্তী বাহির করা হয় নাই। যাঁহারা মন্ত্রীপদের জন্য লালায়িত, তাঁহারা যে নিশ্চেষ্ট আছেন তাহা নহে ; ঘোরাফেরা, মুলাকাৎ, সহি-সুপারিস যে চলিতেছে, সে সংবাদ অনেকেই রাখেন। শ্বেতাঙ্গ সংবাদপত্রগুলিও পুনরায় মন্ত্রী মনোনয়নের জন্য পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু, গবর্ণর বাহাদুর কোন প্রকার বাঙনিষ্পত্তি করিতেছেন বলিয়া শোনা যাইতেছে না। আর কয়েকমাস পরেই বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভার আয়ু শেষ হইবে ; এই অল্প কয়েক মাসের জন্য মন্ত্রী-মনোনয়ন করিয়া আবার সেই অনাস্থা-রঙ্গের পুনরভিনয় করা বোধ হয় গবর্ণর বাহাদুর সঙ্গত ও শোভন মনে করিতেছেন না। সেই জন্যই সরকার পক্ষ চুপ করিয়া আছেন। সাইমন কমিসনের নির্দ্ধারণের জন্য অপেক্ষা করাও বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়। সে যাহাই হউক, দ্বৈত-শাসন যে কিছুতেই কার্য্যকরী হইতে পারে না, এ কথা বারংবার সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে ; তবুও যে চৌষট্টি হাজারের লোভ কেহ কেহ সংবরণ করিতে পারিতেছেন না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় !

'ভারতবর্ষে'র শেষ ফর্ম্মা যখন ছাপা হইতেছে ; তখন আমরা একটী নিদারুণ সংবাদ পাইলাম,—'ভারতী' পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জামাতা, আমাদের পরমবন্ধু, খ্যাতনামা সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আর ইহজগতে নাই ; ২০শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার রাত্রি এগারোটার সময় নিউমোনিয়া রোগে তাঁহার দেহাবসান হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারাই মণিলাল বাবুকে জানেন ; এমন সৌম্যদর্শন, পরদুঃখকাতর বন্ধুকে হারাইয়া আমরা বড়ই শোক পাইলাম। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর বিয়োগের পর তিনি মাতৃহীন দুইটী পুত্র মোহনলাল ও শোভনলালকে বুকে করিয়া পত্নী-বিয়োগ-বেদনা সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন ; এতদিনে তাঁহার সকল শোকের অবসান হইল। তাঁহার পুত্রদ্বয় মোহনলাল ও শোভনলাল এই অল্প বয়সেই শিশু-সাহিত্য রচনায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, এই পিতৃ-মাতৃহীন বালকদ্বয় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া পিতার ন্যায় যশস্বী হোক, মণিলালের নাম রক্ষা করুক। মণিলালের পুত্রদ্বয় ও আত্মীয় স্বজনের এই গভীর শোকে আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। মৃত্যুকালে মণিলালের বয়স চল্লিশ বৎসরও হয় নাই।

মাঘ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' কলিকাতা প্রদর্শনীর অন্তর্গত মহিলা বিভাগ সম্বন্ধে যে মন্তব্য বাহির হইয়াছিল, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় সেই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথা কয়েকটী লিখিয়াছেন—'ভারতবর্ষে'র মাঘ মাসের সাময়িকীর লেখক মহাশয়ের মতে মহিলা বিভাগে নারী-শিল্প নিতান্ত 'অপ্রচুর', পল্লীশিল্প সংগ্রহে পরিচালকগণ একেবারে উদাসীন, এবং প্রেরিতশিল্পের মধ্যে মাহিস্য নারী-শিল্পই ছিল উল্লেখযোগ্য। বস্তুত এই বিভাগে ভারতবর্ষের বহু প্রদেশ এবং বাংলার বিভিন্ন জিলায় নারীগণকৃত বহুবিধ সুকুমার, উটজ ও হস্ত-শিল্প সংগৃহীত ও সুসজ্জিত হইয়াছিল। আরও আনন্দের বিষয় এই যে, জৈন মুসলমান পারসিক খৃষ্টান এবং হিন্দু সমাজের উচ্চ নীচ নানা শাখা সাগ্রহে শিল্পাদি প্রেরণ করায় এই বিভাগ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। বাংলা ব্যতীত কাশ্মীর, পাঞ্জাব, আগ্রা, অযোধ্যা, বিহার, আসাম, উৎকল, অন্ধ্র, মান্দ্রাজ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, বম্বে, গুজরাট, করাচী, সিন্ধু, ইন্দোর নারী শিল্প পাঠাইয়াছিল। হায়দ্রাবাদ নিজাম মহোদয়ের নিষেধাজ্ঞায় সেখানকার শিল্প হইতে মহিলা-বিভাগ বঞ্চিত হইয়াছে। বাংলার যে সকল জিলা হইতে নারী-শিল্প আসিয়াছে তাহার নাম—চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, ঢাকা, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, নদীয়া, চব্বিশ-পরগণা, হাওড়া, বীরভূম, বাঁকুড়া, পাবনা, রাজসাহী, বগুড়া, মালদহ, দিনাজপুর, দার্জ্জিলিং ; কলিকাতার বিদ্যাসাগর বাণীভবন, শিল্পভবন, সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতি, বসুকন্যাভবন, কএকটী খৃষ্টান স্কুল, সখায়াৎ স্কুল, গীতগ্রাম মক্তাব (এটী মফস্বলের) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সমূহও শিল্পাদি প্রেরণে পশ্চাৎপদ হন নাই। মহিলা-বিভাগে শিল্প-সম্ভার আদৌ 'অপ্রচুর' ছিল না ; পরিচালকগণ নারী-শিল্প-সংগ্রহে তৎপর ছিলেন বলা বাহুল্য মাত্র। পরিশেষে বক্তব্য এই, লেখক মহাশয় যে-সব শিল্প মহিলা বিভাগে না দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, অন্য কোনও প্রদর্শনীতে সেই সকল দেখান হইলে দেশবাসী উপকৃত হইতে পারে। শীঘ্রই ঐরূপ প্রদর্শনীর আয়োজন বোধ হয় অসম্ভব হইবে না।

দিক্‌শূল

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৯

গাড়ী যখন গয়া ষ্টেশনে পৌঁছল তখন বেলা প্রায় সাড়ে আটটা। নরেশ জানলার পাশে ব'সে জনাকীর্ণ প্ল্যাট-ফর্ম্মের লোক চলাচল দেখ্‌ছিল, একটি পরিপুষ্ট তৈলচিক্কণ-দেহ পাণ্ডা এসে গাড়ীর হাতল চেপে ধ'রে হাস্যোৎফুল্ল মুখে বল্‌লে, "হুজুর, একবার এখানে নেমে গেলে হয়না ?"

বক্ষ, বাহুদ্বয় এবং ললাট চন্দন-চর্চ্চিত, শিখায় একটি শ্বেত করবী বাঁধা, পদদ্বয় ধূলি-ধূসরিত, পরিধানে সদ্য-ধৌত থান ধুতি, কাঁধের উপর দিয়ে বক্রভাবে বিলম্বিত রেশমী চাদর, কক্ষে তিনখানা বাঁধানো খাতা এবং মুখে ও সমস্ত দেহ-ভঙ্গিমায় এমন নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ততার প্রকাশ যে, মনের মধ্যে অন্নাদি সংক্রান্ত সাধারণ সমস্যার কোনো উপদ্রব নেই, তা দেখ্‌লেই বোঝা যায়।

মুখে কিছু না ব'লে নরেশ মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালে।

নরেশের অশুভ ইঙ্গিতে কিছুমাত্র ভগ্নোৎসাহ না হ'য়ে প্রসন্ন মুখে পাণ্ডা বললে, "হুজুর গয়া হ'য়ে যাচ্ছেন অথচ বিষ্ণুপদ দর্শন ক'রে যাবেন না, সে কি ভাল কথা ? এ গাড়িতে গেলে কলিকাতায় বৈকাল পাঁচটার সময়ে পৌঁছবেন —আজ আর সেখানে কি কাজ করবেন হুজুর ? তার চেয়ে নেবে পড়ুন, বিষ্ণুপদ দর্শন ক'রে, প্রয়োজন থাক্‌লে পদচিহ্নে পিণ্ডদান ক'রে, সদ্য প্রস্তুত অন্ন আহার ক'রে একটু বিশ্রাম করবেন; তারপর বৈকাল চারটার গাড়িতে আপনাদের বসিয়ে দিয়ে যাব। গাড়ি গয়া থেকে ছাড়ে—ভিড় নেই ভাড় নেই—কাল প্রত্যূষে পাঁচটায় কলিকাতা পৌঁছবেন—সে কি মন্দ কথা হুজুর ? আর তা না ক'রে সমস্ত দিন অনাহারে রৌদ্রে ধূলায় কষ্ট পেতে—"

সরমার দিকে তাকিয়ে নরেশ মৃদুস্বরে বল্‌লে, "তোমার দিদি থাকলে এর সিকি কথাও বল্‌তে হ'ত না সরমা। তবে তোমার যদি ইচ্ছে হয় নাম্‌তে, তা হ'লে আমার আপত্তি নেই।"

সরমা মাথা নেড়ে জানালে তার ইচ্ছে নেই।

নরেশের সব কথা স্পষ্ট শুন্‌তে না পেলেও সে যে সরমার মতামত জান্‌তে চাচ্ছিল তা বুঝ্‌তে পাণ্ডার বিলম্ব হয় নি,—সরমার মাথা নাড়া দেখে ব্যগ্র হ'য়ে সে বল্‌লে, "কেন মা ?—তোমার স্বামী পুত্রের মঙ্গল হবে; তোমার নিজের অক্ষয় পুণ্যলাভ হবে। আশ্বিন মাস—শুক্লপক্ষ—পঞ্চমী তিথি—মঙ্গলবার—বিষ্ণুপদ দর্শনে ইহকাল পরকালের শুভ হবে।"

কিন্তু এত প্রলোভন দেখানোও নিষ্ফল হল,—সরমা সম্মত হ'ল না। তখন পাণ্ডা নরেশের পরিচয় নির্ণয়ের জন্য ব্যস্ত হ'ল; বল্‌লে, "হুজুরের নাম, মুরুব্বীর নাম, আর নিবাস জান্‌তে পারলে হুজুর আমার যজমান কি-না তা বহি থেকে দেখ্‌তে পারি।"

নরেশ বল্‌লে, "তোমার যজমান হ'লেও যখন নামব না, তখন কেন আর কষ্ট করছ ঠাকুর, অন্য যজমানের সন্ধানে যাও। এতক্ষণ তুমি অনর্থক সময় নষ্ট করলে।"

পাণ্ডার মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠ্‌ল, যার মধ্যে নৈরাশ্য-জনিত বিরক্তির লেশমাত্র চিহ্ন ছিল না; বল্‌লে, "না হুজুর, অনর্থক না। মানুষের মনে কি আজকাল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি আছে ? আমরা এম্‌নি ক'রে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগিয়ে তুলি। কতবার দেখেছি, 'না, না,' বলতে বল্‌তে ট্রেনে সিটি দিয়েছে, তখন লোকে জিনিসপত্তর নিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়েছে—এমন কি দু-তিন ষ্টেশন চ'লে গিয়ে ফিরতি ট্রেনে ফিরে এসেছে। ভগবানের কৃপা হ'লে তখন কি আপনি নিজেকে রুখ্‌তে পারবেন হুজুর ?"

এমন সময়ে 'কি পাণ্ডাজী, বাবুকে পাকড়াও করেছ না-কি ?' ব'লে একটি যুবক সহাস্যমুখে গাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে নরেশকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লে, "তা বেশ ত' নরেশ, নেমে পড় না।"

আগন্তুকের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে উৎফুল্ল মুখে পাণ্ডা

বললে, "নমস্কার ছিতীশবাবু, বাবু আপনার পরিচিৎ তো নামিয়ে নিন না।"

আগন্তুকের নাম ক্ষিতীশ;—সে হাসতে হাসতে বললে, "আমাকে তোমাদের মত একজন পাণ্ডা ক'রে নাও তা হ'লে এখনি নামিয়ে নিচ্ছি। কি বল নরেশ, তা হ'লে নামবে ত?"

সহাস্যমুখে নরেশ বললে, "নিশ্চয়।"

ক্ষিতীশ বললে, "ঐ দেখ—রাজী থাক ত' বল।"

পাণ্ডা বললে, "আপনি যদি আপনার কোয়লার কারবার আমাকে দিতে রাজী থাকেন ত আমিও পাণ্ডাগিরি আপনাকে দিতে রাজি আছি। এখন বাবু'কে নামিয়ে নিন্, পরে দেখা যাবে।" ব'লে নিজের বাক্-পটুতার রসাস্বাদে উচ্চ স্বরে হাসতে লাগল।

ক্ষিতীশ বললে, "কয়লার কারবার তোমাকে না দিয়েও নামিয়ে নিতুম—কিন্তু এ বাবু নামবার বাবু নয়। দেখচ না, হাওড়া পর্য্যন্ত গাড়ি রিজার্ভ রয়েছে—তুমি স'রে পড় পাণ্ডাজী।"

পাণ্ডা পাকা লোক,—ভবিষ্যতের প্রতি আস্থাবান, অনেক অনুরোধ উপরোধ ক'রে নরেশের নাম ধাম জেনে তার খাতায় লিখে নিলে, তার পর যাবার সময় ব'লে গেল, "গয়াধামে যখন আসবেন হুজুর, মনে রাখবেন আমার নাম মাধো পাণ্ডা ওয়লদ্ যদু পাণ্ডা।"

নরেশ স্মিতমুখে বললে, "আচ্ছা।"

পাণ্ডা বিদায় হ'লে নরেশ বললে, "তার পর ক্ষিতীশ, তোমার সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা। কয়লার কারবার করছ না কি?"

ক্ষিতীশ বললে, "অমনি সামান্য একটু করি। তা ছাড়া, চুণের কিল্‌ন্ আছে,—তার জন্যেও কয়লার দরকার হয়।"

"এই ট্রেনে কোথাও যাচ্ছ না কি?"

"যাব ব'লেই ষ্টেশনে এসেছিলাম, কিন্তু যে জন্যে যাচ্ছিলাম এখানে এসে খবর পেলাম তার জন্যে যাওয়ার দরকার নেই,—ঝরিয়া থেকে আমার কয়লার ওয়াগন্ রওনা দিয়েছে।"

নরেশ বললে, "ঝরিয়া থেকে তুমি কয়লা নাও?—মালাবার হিল্ কোল কনসার্ণের নাম শুনেছ?"

ক্ষিতীশ হাসতে লাগল;—বললে, "জমির চাষ করি আর জমিদারের নাম শুনি নি? আগে ত' ওদের কাছ থেকেই কয়লা নিতাম—কিন্তু কয়েক মাস থেকে এক বাঙ্গালী ছোকরা ম্যানেজার এসে সব সুবিধে গেছে—এখন মালের দামে মাল নাও, আর আগে ছিল পোন দামে পুরো মাল। তা যাই বল ভাই, ছোকরার বাহাদুরী আছে,—চুরীতে কোম্পানীটা উচ্ছন্ন যেতে বসেছিল,—এরি মধ্যে অবস্থা ফিরিয়ে দিয়েছে।"

"কোলিয়ারীটা কি রকম? বেশ বড় কোলিয়ারী?"

উচ্ছ্বাসের সহিত ক্ষিতীশ বললে, "বড় নয়? খুব বড়। দেশী কোম্পানী অত বড় আর একটা আছে কি না সন্দেহ।"

"ম্যানেজার কত মাইনে পায় জান?"

"জানি বৈ কি। উপস্থিত মাসিক পাঁচ শো টাকা পাচ্ছে—তা ছাড়া লাভের ওপর কি একটা অংশও বুঝি আছে। ধনা ওর কাজে এত সন্তুষ্ট হয়েছে যে, শুনছি শীঘ্রই হাজার টাকা মাইনে হবে। তা ছাড়া ভাল বাড়ি, মোটর কার, লোক-জন এ-সব ত আছেই। ভাগ্যবান পুরুষ বলতে হবে—তা নইলে এত অল্প বয়সে এত কম সময়ের মধ্যে এমন উন্নতি করতে পারে! কিন্তু তাও বলি ভাই, ভাগ্য নিজের গুণেই ক'রে নিয়েছে। যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি কৌশলী, তেমনি পরিশ্রমী—কোলিয়ারীটির পঙ্কোদ্ধার করতে কম বেগ পাবার কথা নয়। অন্য লোক হ'লে অসংখ্য শত্রু তৈরী ক'রে নিজে বিপদে পড়ত, কিন্তু এ সাপও মারে, লাঠিও ভাঙ্গে না। যারা ষড়যন্ত্র ক'রে এতদিন চুরী করত তাদের পরস্পরের মধ্যে এমন বিশ্বাস ভেঙ্গে দিয়েছে যে, চোরেরাই এখন হয়েচে পাহারাওয়ালা।" ব'লে ক্ষিতীশ হা হা ক'রে হাসতে লাগল।

মাঝের বেঞ্চিতে ব'সে সরমা উৎকর্ণ হয়ে ক্ষিতীশের কথা শুনছিল। ক্ষিতীশের কথায় রমাপদর কৃতিত্বের পরিচয় লাভ ক'রে দুঃখে আর আনন্দে তার হৃদয় উদ্বেলিত হ'তে লাগল। এই তার স্বামী! সুযোগের অভাবে এই স্বামীর এত শক্তি, এত যোগ্যতা, এত কর্ম্মপটুতা দুঃখ-দারিদ্র্যের ভস্মে প্রচ্ছন্ন ছিল! দুরবস্থার কুজ্ঝটিকাজালে যাকে নির্জ্জীব মেষ-শাবক ব'লে মনে হয়েছিল, কর্ম্মের রৌদ্রালোকিত প্রাঙ্গণে আজ দেখা গেল সে সুপ্তোত্থিত সিংহ। মনে পড়ল ভাগলপুরের কয়েক মাস পূর্ব্বের দীনতা-হীনতায় তমসাচ্ছন্ন

দিনের কথা, যখন পঞ্চাশ টাকা মাইনের চাকরীও সৌভাগ্যের সুবর্ণপ্রভায় রঞ্জিত প্রার্থনার বস্তু ব'লে মনে হ'ত। আজ তার জায়গায় পাঁচ শো টাকা মাইনে, বাড়ী, গাড়ি, দাস-দাসী! স্বামী-মহিমাগৌরবে সরমার হৃদয়ের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অনাবিল প্রসন্নতায় হিল্লোলিত হ'তে লাগল। মনে হ'ল আর সে তার মনের মধ্যে কোনো অভিমান, কোনো বিরূপতা, কোনো কঠোরতা রাখবে না,—পরিপূর্ণ আত্ম-নিবেদনের মধ্য দিয়ে আজ সে তার স্বামীর পৌরুষকে স্বীকার করবে, ঠিক যেমন তটোপনীতা স্রোতস্বতী মহাসাগরের মহিমাকে করে। স্বামী-সামীপ্য-আকাঙ্ক্ষায় সরমার মন চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল।

নরেশ জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার সঙ্গে ম্যানেজারটির আলাপ হয়েচে ক্ষিতীশ?"

ক্ষিতীশ বল্‌লে,—"হয়েচে।" তার পর একটা কথা হঠাৎ খেয়াল ক'রে সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, ম্যানেজারের বিষয়ে এত কথা তুমি জিজ্ঞাসা করছ কেন? চেন না-কি তাকে?"

মৃদু হেসে নরেশ বল্‌লে, "একটু চিনি। তোমার সঙ্গে আলাপ কি-সূত্রে হ'ল? কয়লা ত' এখন ও-কোলিয়ারী থেকে নাও না।"

ক্ষিতীশ বল্‌লে, "কেন নিই নে সেই অনুসন্ধানের সূত্রেই হ'ল। পুরোনো হিসেব মেটাবার জন্যে আমি একদিন ওঁর কুঠিতে গিয়েছিলাম, তখন প্রথম আলাপ হয়। তার পর উনি একবার সস্ত্রীক মোটরে গয়া আসেন বিষ্ণুপদ দর্শন করতে,—গয়া থেকে রওনা হবার সময়ে মোটর বিগ্‌ড়োয়।—আমি তখন দৈবাৎ সেখান দিয়ে মোটর ক'রে যাচ্ছিলাম, ভদ্রলোকের বিপদ দেখে দুজনকে আমার গাড়িতে ক'রে ষ্টেশনে পৌছে দিই। সে সময়ে একটু বেশি রকম আলাপের সুযোগ হয়। ভদ্রলোক এ-দিকে বিষম ষ্টাইলিশ—দুটি প্রাণীতে যাবেন ত' মোটে পাঁচ ছয় ঘণ্টার পথ—পুরো একখানা ফার্ষ্টক্লাস্ কামরা রিজার্ভ করবার জন্যে ব্যস্ত। আমি বল্‌লাম, গাড়ি এখান থেকে ছাড়চে, এম্‌নিই ত' খালি গাড়ি পাচ্ছেন—কেন মিছে ত্রিশ-বত্রিশ টাকা বেশি খরচ করবেন। তখন অগত্যা দু খানা ফার্ষ্টক্লাস্ টিকিট কিনে উঠে বস্‌লেন। ভয় কি জানো? পাছে পথে অন্য লোক উঠে বিশ্রম্ভালাপে ব্যাঘাত ঘটায়।" ব'লে ক্ষিতীশ উচ্চ স্বরে হাস্‌তে লাগল।

নিরতিবিস্ময়ের সঙ্গে নরেশ বল্‌লে, "তুমি বোধ হয় ভুল করছ ক্ষিতীশ, তুমি যাঁকে তাঁর সঙ্গে দেখেচ তিনি হয় ত তাঁর স্ত্রী নন, অপর কেউ।"

নরেশের কথা শুনে ক্ষিতীশ হাস্‌তে লাগল; বল্‌লে, "অপর হ'লে কি এক-জনের জন্যে কেউ গাড়ি রিজার্ভ করে, না, প্রত্যহ সন্ধ্যেবেলা তিথণ্ডা থেকে ধানবাদে মোটর ক'রে হাওয়া খাইয়ে নিয়ে যায়? অপরও নয়, পরও নয়,—নিতান্ত আপনার।"

চিন্তিতমুখে নরেশ বল্‌লে, "তা হ'লে ইনি অন্য কেউ হবেন; আমি যাঁর কথা ভাবছিলাম তাঁর স্ত্রী—আচ্ছা, এঁর নাম কি বল দেখি।"

ক্ষিতীশ বল্‌লে, "আর, পি, ব্যানার্জি,—বোধ হয় রমাপ্রসাদ বাঁড়ুয্যে।"

নামের মিল শুনে নরেশের মুখ কালো হয়ে উঠ্‌ল; ভগ্ন-কণ্ঠে বল্‌লে, "তা হ'লে নিশ্চয় তুমি ভুল করছ—স্ত্রী নয়, অপর কোনো আত্মীয়া।"

সরমার প্রতি দৃষ্টির ইঙ্গিত ক'রে ক্ষিতীশ বল্‌লে, "ঠিক যেমন ভুল করব বউদিদিকে অপর কোনো আত্মীয় মনে না করে তোমার স্ত্রী মনে করলে। আচ্ছা, বেশ ত হাতে পাঁজি মঙ্গলবার ক'রে লাভ কি, আমার সঙ্গীটিকে জিজ্ঞেস্ করছি; সে ত' তিথণ্ডার কাছেই বাস করে, কাজেই নাড়ীনক্ষত্রের খবর জানে।" ব'লে অদূরে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তিকে সম্বোধন ক'রে ডাক্‌লে। সে নিকটে এলে বল্‌লে, "আচ্ছা, গোপেশ্বর, মালাবার কনসার্ণের ম্যানেজারের সঙ্গে যে স্ত্রীলোকটি বাস করেন তিনি ম্যানেজারের স্ত্রী, না, অপর কোনো আত্মীয়া?"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে সহাস্য মুখে গোপেশ্বর বল্‌লে, "স্ত্রীই বটে, তবে শুক্লপক্ষের নয়, কৃষ্ণপক্ষের। কুমারপুঁথি কুঠির মুরলী বাঁড়ুয্যের বিধবা ভাইঝি;—সর্পাঘাতে মুরলীবাবুর মৃত্যুর পর থেকে এঁর কাছে আছে। আহা, মুরলীবাবু দেবতার মত লোক ছিলেন, আর তাঁর ভাইঝির কি কাণ্ড!"

নরেশ জিজ্ঞাসা করলে, "ম্যানেজারের নাম কি মশায়?"

গোপেশ্বর বল্‌লে "রমাপদ বাঁড়ুয্যে।"

একটু কি মনে মনে চিন্তা ক'রে নরেশ বল্‌লে, "মুরলী বাবু আর রমাপদ বাবু উভয়েই যখন বাঁড়ুয্যে তখন মেয়েটি ত

সম্পর্কে রমাপদ বাবুর ভগ্নী কিম্বা অন্য কোনো আত্মীয়ও হ'তে পারেন।"

নরেশের কথা শুনে গোপেশ্বর কিছু বল্‌লে না,—শুধু একটু হাস্‌লে।

এঞ্জিনের বাঁশি বেজে উঠল, এবং পরমুহূর্ত্তেই ট্রেন চল্‌তে আরম্ভ করলে। গাড়ির সঙ্গে খানিকটা যেতে যেতে ক্ষিতীশ বললে, "যত বাজে কথায় দশ মিনিট কেটে গেল, তোমার কোনো খবরই নেওয়া হ'ল না। ছেলেপিলে ক'টি নরেশ? এই একটিই না কি?" তার পর সরমার দিকে দৃষ্টি পড়ায় ব্যস্ত হয়ে বললে, "দেখ, দেখ, বউদিদি বোধ হয় ঢুল্‌ছেন,—প'ড়ে যেতে পারেন।"

গাড়ির গতি বেড়ে উঠেছিল,—"আচ্ছা, ভাই, আশা করি আবার দেখা হবে।" ব'লে ক্ষিতীশ প্ল্যাটফর্ম্মের উপর দাঁড়িয়ে পড়ল।

২০

ক্ষিতীশের কথায় নরেশ পিছন ফিরে দেখলে সরমা বেঞ্চির মাঝখান থেকে কখন স'রে গিয়ে এক প্রান্তে পাশের কাঠে ভর দিয়ে বসেছে; মাথাটা তার সমুখ দিকে একটু হেলে পড়া।

"সরমা!"

সরমা কোনো উত্তর দিলে না, শুধু অবসন্ন মাথাটা অতি সামান্য ন'ড়ে উঠল ব'লে মনে হল।

তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে সরমার মুখ তুলে ধ'রে নরেশ দেখলে চক্ষু অর্দ্ধনিমিলিত, ওষ্ঠাধর পাংশু নীলাভ। ধীরে ধীরে সরমার অনায়ত্ত দেহকে বেঞ্চের উপর স্থাপিত ক'রে জলপাত্র থেকে জল এনে মুখে চক্ষে বুলিয়ে দিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে নরেশ উচ্চ স্বরে ডাক্‌তে লাগল, "সরমা, সরমা!"

দু-চার বার ডাক্‌তে ডাক্‌তে সরমা একবার নরেশের দিকে চেয়ে দেখলে, তার পর সহসা বেঞ্চির গদিতে মুখ গুঁজে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কাঁদতে লাগল।

সম্মুখের বেঞ্চে ব'সে সরমার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলোতে বুলোতে স্নিগ্ধ কণ্ঠে নরেশ বল্‌তে লাগল, "ছি, সরমা, এত বুদ্ধিমতী হয়ে তুমি এমন অধীর হচ্চ কেন?—আমার কথা বিশ্বাস কর, নিশ্চয় এ সংবাদের মধ্যে কোথাও কোনো একটা ভুল আছে। সে মেয়েটি যে রমাপদর কোনো আত্মীয়া তা'তে কোনো সন্দেহ নেই। দেখচ না, তার কাকা শুধু ব্রাহ্মণই নয়—বাঁড়ুয্যেও। এ থেকে আমি যা অনুমান করছি তা খুব বেশি রকম সম্ভব ব'লে মনে হয় না কি? আমার কথা শোন, এ বিষয়ে একেবারে পাকা খবর না পেয়ে রমাপদকে দোষী মনে করলে তার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হবে।"

অনেক সান্ত্বনা বাক্যে, অনেক স্নেহ-সহানুভূতিতে কতকটা সুস্থ হ'য়ে কিছুক্ষণ পরে সরমা উঠে বসল, কিন্তু সে যে আর ধানবাদে নেমে রমাপদর বাসস্থানে যাবে না, সে বিষয়ে সুদৃঢ় সঙ্কল্প ব্যক্ত করলে।

নরেশ মাথা নেড়ে বল্‌লে, "না, না, এ তোমার আরো ছেলেমানুষীর কথা হচ্চে। এ কথা না শুনে যদি না যেতে তাতে তত দোষের হ'ত না, যত দোষের হবে এ কথা শুনে না যাওয়া। কোনো বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হ'লে তখনি তাকে অনুসন্ধানের দ্বারা নিঃসংশয় ক'রে না নিলে পরে অনর্থক অনেক গোলোযোগের সৃষ্টি হয়। অনর্থের মূল গোড়ায় উচ্ছেদ না করলে ভারি বিপদ। রমাপদ সে অঞ্চলে নতুন লোক—তার অথবা তার আত্মীয়-স্বজনের বিশেষ কিছু পরিচয় সে অঞ্চলের লোকেরা এত অল্প সময়ের মধ্যে পায় নি। সুতরাং বাইরের লোকের পক্ষে এ রকম একটা ভুল ধারণা করা কিছুই অসম্ভব নয়। তা ছাড়া যেখানে অপরিচয়ের কোনো কথা নেই সেখানেও এ-সব কথা সন্দেহের ওপর বিনা প্রমাণে বিশ্বাস করবার একটা দুষ্প্রবৃত্তি সাধারণ মানুষের মনে আছে। এ ব্যাপারটা আমাদের পক্ষে এমন বিষয় নয় যে, সহজে একে আমরা উপেক্ষা করতে পারি। চল আমরা দুজনে সেখানে যাই, তার পর সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখে স্বকর্ণে শুনে সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করি। মিথ্যা যদি হয় তা হ'লে ত কথাই নেই,—ভগবান না করুন, সত্যি যদি হয়, তখন তুমি তোমার ইচ্ছামত যা করতে বল্‌বে তাই আমি করব। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো অবস্থায় জোর ক'রে তোমাকে আমি ফেলে দেব না—এ বিশ্বাস মুহূর্ত্তের জন্যে কোনো দিন তুমি হারিয়ো না সরমা। সুকুমারীর মৃত্যুর পর থেকে তোমার মান-অপমানের কথা আমার নিজের মান-অপমানের কথা হয়েচে, এ তুমি অসংশয়ে মনে রেখো।"

সরমা বল্‌লে, "এ কথা শুনে সেখানে গিয়ে নিজেকে হীন করতে প্রবৃত্তি হয় না জামাইবাবু!"

নরেশ বল্‌লে, "না, এতে হীনতা কিছুমাত্র নেই—কারণ এ কথা মেনে নিয়ে সেখানে বাস করবার জন্যে তুমি যাচ্ছ না,—তুমি যাচ্ছ সে জায়গা তোমার পক্ষে বাস করবার উপযোগী আছে কি না তাই নির্ণয় করতে।"

একটু চুপ ক'রে থেকে সরমা বল্‌লে, "তার জন্যে আমাকে আর সেখানে নিয়ে যাবেন কেন,—আপনি একা গিয়েই ত' খবর নিতে পারেন।"

নরেশ বল্‌লে, "না, তা হয় না। মাথা ধরেছে তোমার—আমার কপালে ওষুধে কি উপকার হবে?—তুমিও যাবে।"

সরমা বল্‌লে, "মন না পরিষ্কার হওয়া পর্য্যন্ত আমি কিন্তু বাড়ীর মধ্যে ঢুকব না জামাইবাবু, গাড়িতে ব'সে থাকব।"

এ সর্ত্তে নরেশকে সম্মত হ'তে হ'ল।

তৃতীয় বেঞ্চিতে শুয়ে ঘিণ্টু অনেকক্ষণ থেকে ঘুমোচ্ছিল, সহসা ঘুম ভেঙ্গে উঠে ব'সে জানলা দিয়ে দ্রুত ধাবমান গাছপালা দেখে ব'লে উঠল "এল্ গারি!" অর্থাৎ রেলগাড়ী।

এ নিরুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার কোনো পথ ছিল না। সুতরাং নরেশ পুনরুক্তি ক'রে বল্‌লে, 'হ্যাঁ বাবা, এল্ গারি।" তার পর সরমাকে বল্‌লে, "তুমি গিয়ে ঘিণ্টুর পাশে ব'স সরমা,—জানলা দিয়ে ও না ঝোঁকে।"

সরমা উঠে গিয়ে ঘিণ্টুকে কোলে নিয়ে বস্‌ল, তার পর ক্রমশঃ তাকে বুকের উপর চেপে ধ'রে নিঃশব্দে অশ্রুপাত করতে লাগ্‌ল।

নরেশ এ রোদনে আর আপত্তি করলে না—কারণ সে জানে মন লঘু হয় চোখের জলের মধ্য দিয়েই;—ঘিণ্টু কিন্তু সরমার চোখে জল দেখে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠ্‌ল—ক্রমশঃ পা একটু একটু ক'রে নামিয়ে দিয়ে ঝুলে প'ড়ে 'বাবা যাই' 'বাবা যাই' ব'লে চীৎকার আরম্ভ করলে।

"এস বাবা, আমার কাছে এস" ব'লে নরেশ ঘিণ্টুকে কোলে ক'রে নিয়ে গিয়ে নিজের জায়গায় বস্‌ল।

কিছুদিন থেকে ঘিণ্টু, সম্ভবতঃ সুকুমারীর শিক্ষায়, নরেশকে বাবা ব'লে ডাকতে আরম্ভ করেছিল।

নরেশের কোলে ব'সে ঘিণ্টু কিছুক্ষণ একদৃষ্টে সরমার অশ্রু সিক্ত মুখের দিকে চেয়ে রইল; তার পর সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই ধীরে ধীরে বললে, "বাবা, মা দুটুটু।"

ঘিণ্টুর মুখ চুম্বন ক'রে নরেশ বল্‌লে, "হ্যাঁ বাবা, তোমার মা ভারী দুটটু,—মিছিমিছি তোমার বাবার ওপর রাগ ক'রে।"

এইটুকু বাক্যের মধ্যে যে অপরিমিত সোহাগ এবং সান্ত্বনা ভরা ছিল তা উপলব্ধি ক'রে সরমার চক্ষে অশ্রু-প্রবাহ বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠল,—নিমেষের জন্যে যেন রমাপদর প্রতি অভিমান, আকর্ষণ, অনুরাগ ফিরে এল—কিন্তু সে নিতান্তই নিমেষের জন্যে।

বেলা সাড়ে বারোটা আন্দাজ ধানবাদে উপনীত হয়ে ঈশ্বরের জিম্মায় ওয়েটিংরুমে জিনিসপত্র এবং ঘিণ্টুকে রেখে নরেশ ষ্টেশনের বাইরে এসে একটা ট্যাক্সি ডাকলে।

"তিথওা মালাবার হিল্ কোল কনসার্ণের কুঠি জান?"

ট্যাক্সিওয়ালা বল্‌লে, "জানি হুজুর, সব কুঠিই জানি। ব্যানার্জ্জি সাহেবের কুঠি যাবেন ত?" ব'লে গাড়ির দরজা খুলে দিলে। নরেশ এবং সরমা উঠে বস্‌লে বিরল-বৃক্ষ প্রান্তর ভেদ করে ঘুটিং-বাঁধানো যে পথ ঝরিয়া অভিমুখে চ'লে গিয়েছে তার ওপর দিয়ে গাড়ি দ্রুতবেগে ধাবিত হ'ল।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে রৌদ্রের উত্তাপে আর মনের উত্তেজনায় সরমার মুখমণ্ডল জবাফুলের মত আরক্ত হ'য়ে উঠল।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

স্বামী পূর্ণানন্দ প্রণীত "বেদ-বাণী—১৲
শ্রীসুধীরকুমার দাশ এম-এ প্রণীত "গল্পে উপনিষৎ"—২৲
শ্রীমতী শরৎকামিনী বসু প্রণীত "শ্রীশ্রীসদগুরু-কথামৃত"—১৲
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "পারুল"—৷৶৹
শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ প্রণীত "জাতিচ্যুত"—১৲
শ্রীদিগ্বিজয় রায় চৌধুরী প্রণীত মধ্যযুগের "ইউরোপীয় দর্শন"—২৲
মোহাম্মদ কোরবান আলী প্রণীত "শান্তিকর্ত্তা"—৩৲
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "বিনোদ হালদার"—২৲
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "শাঁখের করাত"—৷৹

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA.
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET. CALCUTTA.

Printer—NARENDRANATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

সিদ্ধার্থ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ
মহাশয়ের অনুগ্রহে

ভারতবর্ষ

বৈশাখ—১৩৩৬

দ্বিতীয় খণ্ড | ষোড়শ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

শ্রীঅরবিন্দের একটি কবিতা

চন্দ্রালোকে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

এ কবিতাটি ঋষিকবি শ্রীঅরবিন্দের "অহনা" কবিতা পুস্তকে "In the Moonlight" শীর্ষক কবিতাটির অনুবাদ। এ শ্রেণীর—অর্থাৎ গভীর-প্রেরণা-উদ্ভূত কবিতার বস্তুতঃ অনুবাদ হয় না। আমি বাস্তবিক অনুবাদটি করবার সময়ে মাঝে মাঝে এমন কি নিজেকে অপরাধী মনে ক'রেছি বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। তবু "অহনা" আমাকে এত গভীর আনন্দ দিয়েছে যে তার কিয়দংশও বাংলার পাঠক-পাঠিকাকে দেবার চেষ্টা করার প্রলোভন সংবরণ করতে পারলাম না। এ ত্রুটি আশা করি অমার্জ্জনীয় নয়। কিন্তু আমার শ্রম সবচেয়ে সার্থক মনে করব যদি এ কবিতাটি প'ড়ে অন্ততঃ কয়েকজনও মূল কবিতাটি পড়বার আগ্রহ বোধ করেন। কেন না, বলেইছি ত—শ্রেষ্ঠতম কবিতার অনুবাদ হয় না (গদ্যের তবু হয়)। আর সেই জন্যেই পাঠক-পাঠিকার কাছে আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—যে অনুবাদটি প'ড়ে কেউ যেন মূল কবিতাটি সম্বন্ধে কোনো স্থির সিদ্ধান্ত ক'রে না বসেন। মূল হ'তে কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত ক'রে দেবার উদ্দেশ্য—শুধু দেখানো যে অনুবাদ কত নিষ্প্রভ।

বস্তুতঃ শ্রীঅরবিন্দের "অহনা"র এ-শ্রেণীর কবিতাগুলি পড়তে পড়তে আমার প্রায়ই মনে হ'ত অনাগত যুগের কাব্য

সম্বন্ধে ঋষি কবির অনুপম ভবিষ্যদ্বাণী :—"The beauty and delight of all physical things illumined by the wonder of the secret spiritual self that is the inhabitant and the self-sculptor of form, the beauty and delight of the thousand-coloured, many-crested million-waved miracle of life made a hundred times more profoundly meaningful by the greatness and sweetness and attracting poignancy of the self-creating inmost soul which makes of life its epic and its drama and its lyric, the beauty and delight of the spirit in thought, the seer, the thinker, the interpreter of his own creation and being who broods over all he is and does in man and the world and constantly resees and shapes it new by the stress and power of his thinking this will be the substance of the greater poetry that has yet to be written"—……

(The Future Poetry)

কেননা সত্য কবিতা ত আর শুধু মিষ্ট ছাঁদে দুটো মিষ্ট কথা বলা নয়, সত্য কবিতার প্রাণ হচ্ছে :—"The spiritual excitement of a rhythmic voyage of self-discovery among the magic islands of form and name in these inner and outer worlds." (ঐ) যেহেতু Poetry and art are born mediators between the immaterial and the concrete, the spirit and life.

কেন যে হঠাৎ এ অনুপম কবিতাটির অনুবাদ-রূপ দুঃসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলাম সে সম্বন্ধে দু একটা কথা বলা দরকার মনে করছি।

শ্রীঅরবিন্দ সাধারণতঃ খ্যাত তাঁর দেশাত্মবোধের, দার্শনিকতার ও যোগের জন্য। কিন্তু তা ছাড়া তিনি যে একাধারে একজন কত বড় কবি, সাহিত্যিক ও সমালোচক সে-খবর খুব কম লোকেই রাখেন। সম্প্রতি তাঁর "অহনা"র কবিতাগুলি পড়বার আগে যে আমি নিজেই তাঁর কবিত্বের খবর রাখ্‌তাম না একথা লজ্জার সঙ্গেই স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি—(যদিও বৎসর কয়েক পূর্ব্বে তাঁর "The Future Poetry" নামক অপূর্ব্ব কাব্য সমালোচনাটি প'ড়ে বুঝতে দেরি হয়নি যে, এরকম শ্রেণীর গভীর অন্তর্দ্দৃষ্টিদীপ্ত সমালোচক প্রতি যুগে এক আধটার বেশি জন্মায় না)। বোধ হয় সেইজন্যেই "অহনার" কবিতাগুলি—বিশেষতঃ Ahana, Revelation, Rishi, Who এবং In the Moonlight—প'ড়ে এত গভীরভাবে মুগ্ধ হ'য়েছিলাম। এই সময়ে হঠাৎ একটা তীব্র প্রেরণা বোধ করি—শ্রীঅরবিন্দের ওজস্বিনী কবিতার কিছু রসও বাংলা ভাষার মধ্যে আমদানী করতে। সেই প্রেরণা ও উৎসাহের ফল আজ বাংলার পাঠক-পাঠিকার কাছে উপস্থিত করতে সাহসী হচ্ছি।

কবিতাটি শ্রীঅরবিন্দকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম—অবশ্য অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে। কেন না মনে হয়েছিল যে তিনি তাঁর আত্মমগ্ন সাধনার মধ্যে যদি বা অনুবাদটির উপর চোখ বুলিয়ে যাবার সময় পান—প্রকাশ করবার অনুমতি হয়ত না দিতেও পারেন। কিন্তু আমার সৌভাগ্যক্রমে তিনি শুধু যে কবিতাটি আদ্যন্ত মূলের সঙ্গে মিলিয়ে পড়েন তাই নয় একটি চিঠিতে আমার ভ্রমপ্রমাদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করে উৎসাহিত করেন। তাঁর সে চিঠিটি আদ্যন্ত নিয়ে দিলাম। তাঁর এ পত্রটি পাবার পরে আমি কবিতাটির যে যে স্থলে মূলের ভাব সুপরিস্ফুট হয়নি, সে সে স্থলে আমার ক্ষুদ্র সাধ্যমত একটু মার্জ্জিত করলাম ও শ্রীঅরবিন্দ যে চরণটির পরিবর্ত্তন করতে ব'লেছিলেন সেটি আদ্যন্ত পরিবর্ত্তিত ক'রে দিলাম।

চিঠিটি শ্রীঅরবিন্দ গত ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে লিখেন :—

Dilip

The only defect of your translation is that in a few places the meaning of the original has not come out fully. In one place there is a need of change, for there is actual misunderstanding of the sense.

"Are Nature's bye-laws merely meant to ground
A grandiose freedom building peace by strife."

"Ground" here means not to crush, but to make a ground or foundation for the freedom. What science calls laws of Nature, are not the

absolute or principal laws of existence, but only minor rules meant to build up a material basis for the life of the spirit in the body. On that has to be erected in the end, not a rule of material Law, but an immortal liberty,—not Law of Nature, but freedom of the spirit. The strife of forces which is regulated by these laws of Nature is only the battle through which man has to win the peace of the spirit. This is the sense.

These however are minor points of detail. Your version makes a fine poem and is a remarkable piece of work; it keeps with an extraordinary success the spirit and tone and force of the original.

চন্দ্রালোকে

গোধূলির শঙ্খঘণ্টা যদি বা মিলায়
লভে যেন বিরাম এ স্বপ্নবীথিতলে,
এলায়িত শীর্ষ যার মলয়ের গলে
দোলে—শুক্ল চাঁদিমার নয়ন নিছায়।

কী স্পন্দিত নীরবতা! না মানে বিধান
নিথর নিশার—শুধু সমীর মর্ম্মর,
শ্রান্তিহীন ঝিল্লীরব, অদূরে মুখর
বাপীবক্ষে দাদুরীর রূঢ় ঐক্যতান।

নিবিড় করিয়া তারা ধরে শুব্ধতায়,
ভরে আসে অমানুষী ব্যাপ্তি রজনীর;
থমকি নিখিল চাহে অর্ব্বুদ আঁখির
দৃষ্টিতে ঘেরিতে—এই শান্ত তরুছায়।

অনন্ত-ব্যাপিনী চিন্তা যেন অন্তহীন
তিমিরের প্রতি রন্ধ্র ভরিয়া প্রকটে
ব্যোমে ভীম শূন্য সম অনুভব তটে—
মর জীবনের স্বস্তি করি তুচ্ছ—লীন।*

যেই পথ চিরন্তন বাহি চরাচরে
চলে—আজি তাহে হয় মনে ছায়াসম;
ভুলি জগতের বোঝা, ভুলি বৃথা শ্রম,
দাসজীবনের গ্লানি মুষ্টিভিক্ষা তরে।*

রহে নভো ঘেরি, লয় কাল প্রাণে জিনি;
সসীম ইন্দ্রিয় সাথে চিন্তা সীমাহীন
যুগান্ত সাধনা পরে হয় পুন লীন—
বিভক্ত যেথায় হয় প্রাণ স্রোতস্বিনী।†

অগম্য সে-উৎস চির—কেহ নাহি জানে
নামে কোথা হ'তে হেথা চিরন্তনী ধারা;—
প্রকৃতি জটায় গঙ্গাবতরণপারা
ঊর্দ্ধাহৃত—বা পাতাল-অমা তারে আনে! ‡

সংশয়-কুহেলি-ঘেরা নরহৃদি মাঝে
দেবাসুর চির-শত্রু বাঁধা এক ডোরে;
যুঝে একে—চিরদিন জিনিয়া অপরে
হ'তে অরিন্দম নিত্য দ্বৈরথের সাজে।

দেহ ছাড়ি দেব মেলি নীলপাখা তার
ধায় ঊর্দ্ধে দীপ্তশিখা তৃষিত নয়ন;
অসুরের কূট ষড়যন্ত্র প্রাণপণ—
রাখিতে মাটিতে বন্দী স্বপন আত্মার।

অচিন্তিত স্বপ্নে ভরা চন্দ্রালোকচ্ছায়
ভাসে না কি সুবিপুল পরিধি তাদের
বনস্পতি-শীর্ষে ঐ? জীবন-চক্রের
আবর্ত্তন শুনি না কি সেই শুব্ধতায়?

---

* So boundless is the darkness and so rife
With thoughts of infinite reach that it creates
A dangerous sense of space and abrogates
The wholesome littleness of human life.

* The common round that each of us must tread
Now seems a thing unreal; we forget
The heavy yoke the world on us has set,
The slave's vain labour earning tasteless bread.

† Space hedges us and Time our heart o'ertakes;
Our bounded senses and our boundless thought
Strive through the centuries and are slowly brought
Back to the source whence their divergence wakes.

‡ The source that none have traced, since none can know
Whether from Heaven the eternal waters well
Through Nature's matted locks, as Ganges fell,
Or from some dismal nether darkness flow.

অঙ্কুর,—জীবন এই ; কিন্তু অবসানও
রাজে সেথা ? যুদ্ধ-সাঙ্গ হবে না কি তবে
কোনোদিন ? দু অরির কেহ নাহি হবে
জয়ী ? কৌমুদী কভু না হবে উষাম্লান ?

এ যুগ দিয়াছে পূজা মস্তিষ্কে চরম ;
দিয়াছে বিগত যুগ—পূততর কারে
অর্ঘ্য ; তবু এশিয়ার অন্তর মাঝারে
বিরাজেন ধ্যানী—অনাঘ্রাত পুষ্পসম !

শুনি তীক্ষ্ণ স্বর ঐ দৃপ্ত য়ুরোপের ;
"নিষ্ফল প্রেরণা ভিত্তিহীন আশাসম
উর্দ্ধগ অনল ঐ—ঘোর মতিভ্রম !—
"নিভে যায় আরোহিলে গিরি বিজ্ঞানের।" *

কহে : "পার্থিবের পথ বাহি নিত্য জাগি
"হও আগুয়ান বিকাশি সৌন্দর্য্যে—জ্ঞানে,
"আহরি বলিষ্ঠ ভক্ষ্যে—মূঢ় দুনয়ানে
"রেখো না বঞ্চিত স্বপ্ন মরীচিকা লাগি।"

সৌন্দর্য্য—বিজ্ঞান ?—হায় !—বল কোন্ আশে ?—
জানে না ত দীক্ষা প্রতীচির সে-সন্ধান
করে ধ্যানে মূঢ়-স্বপ্ন বলি অপমান
ধন, মদ স্তূপীকৃত করে চারিপাশে !

লভে—সে হারাতে ; মৃত্যু আসি শেষে ধেয়ে
শ্লথ করে দৃঢ়তম মুষ্টি ; করে ম্লান
ভুবনবিজয়ীরও বিহসিত নয়ান
পরিণামে অসহায় সে-ও শিশু চেয়ে।

তারপর ! হায়, সেথা শেষ সব গান !
কালদৈত্য-মৃত্যু—রহে যুগ যুগ ধরি
গুপ্ত - ভুক্তিতে ধরার মহিমা আহরি ;
তুচ্ছতম কীটে হরে অতিকায়-প্রাণ ! †

তারা নেভে আবর্ত্তিয়া, রবি জ্যোতিষ্মান্
ফিরে সে নিশায় যেথা জনম তাহার
মরীচিকা-কায়া যবে কোটি দেবতার
গ্রাসে হিম আঁধারের ব্যাদিত ব্যাদান।

দুই মৃত গ্রহ হ'তে জন্ম ধরণীর এ,
নর—শেষ পরিপূর্ণতম ফল তার ;
করাল শূন্যতা হ'তে জনমি আবার
স্থাণু হিম স্তব্ধতায় ফিরে সে অচিরে।

চকিত নিশ্বাস সম মোদের জীবন এ
নগণ্য বল্মীক সম—এ মুমূর্ষু যুগে,
ভাস্বর অতীতযুগ-শেষ রশ্মিটুকু এ
বেদন গহ্বর পাশে অপেক্ষে মরণে।

রক্তে, আঁখিলোরে সিঞ্চি প্রতিযুগ, ধাই
উজ্জ্বল আদর্শ যুগ তরে—শ্রান্ত পদে ;
সে ধাওয়ায় সৃজি শুধু নূতন বিপদে
স্থায়ী সর্ব্বনাশে লভি সুখ ক্ষণস্থায়ী।

অপমান অধীনতা রহে ঘেরি হায়,
মোহভরে করি পাপ—দহি দুখানলে
উৎকণ্ঠায়—পাছে মর বংশ পৃথ্বীতলে
হয় লুপ্ত—ধরার ভ্রূক্ষেপও নাহি তায় !

তার পর ?—নামি ধরাগর্ভে নিদ্রাছায়
চিরতরে—ছিনু তন্দ্রাহীন যার হিতে
সে-ও যায় ভুলে—শুধু বিস্মৃত হইতে
পরে—যবে সে-ও সাথে আসিয়া ঘুমায়।

কেন সহি শ্রম কোলাহল বার বার ?—
কেন দহি শঙ্কা ত্রাসে বাঁচি যতদিন ?
কেন দেই দুঃখ দেহে সংশয়ে মলিন ?—
মৃত্যু যবে পাপ পুণ্যে করে একাকার ?

মরণেতে শেষ যদি সর্ব্ব বৃথা শ্রম
কেন চেষ্টা মিছে ? কেন না চাহ আরাম ?
দিনে স্বর্ণোৎসবে মত্তি লভ না বিশ্রাম—
স্বল্প মধুটুকু পিয়ি—সম্বল চরম ?

---

* But Europe comes to us bright-eyed and shrill :
"A far delusion was that mounting fire,
' An impulse baulked and an unjust desire
"It faded as we ascend the human hill."

† And after ? Nay, for death is end and term.
A fiery dragon through the centuries curled,
He feeds upon the glories of the world
And the vast mammoth dies before the worm

চাহ যেই মোহিনীরে—উষ্ণ লালসায়
লহ না গো বক্ষে বাঁধি—যবে কারো তাহে
বাজিছেনা ব্যথা কোনো—অন্তর যা চাহে
যবে তাহা স্বপ্নসম—চকিতে মিলায়!

মধুময় প্রাণাসব; কর বাসনারে
বল্গাহীন—অপূর্ণ না রহে আশা যেন!
আকাশ অনন্ত যদি—কর ভাগ কেন?
বিলাও অজস্র স্বর্ণ বিলাস-আগারে।

সমাজ? নহে সে সৃষ্ট আমাদেরই তরে?
চাহে যদি ভোগ বাসনার চারিধারে—
প্রতি পদে বাঁধি বেড়া খর্ব্বিতে তাহারে—
দান চেয়ে তবে বহুগুণ অপহরে।

পরার্থে বিরতি?—হায়, বৃথা সেই বাণী
প্রচারে সংযম হেন—পরসেবা তরে
হারাইয়া হাসি দুদিনের—ক্লান্তিভরে
অনন্ত শয়নে বরি—কেন?—নাহি জানি!

মানবের সেবা? তাহে কিবা লাভ বল!
আমি যদি সুখ, তৃপ্তি, কিরণে বঞ্চিত?
রহিব অরুণালোকে চির পিপাসিত
ধরিতে পরের মুখে মোর শ্রম-ফল?

অতীত দেবের ভস্মে যেই নবদেব এ
নিজ জন্ম—মুমূর্ষু সে; আজি নহে কাল
হবে লুপ্ত চিরতরে, অস্ত আলোজাল
তাহারেও যাবে ভুলি হিম পরাভবে!

কী পুণ্য?—আনন্দ শুধু পুণ্যে আছে জাগি?
কিন্তু পাপ যদি প্রেয় মনে হয় মোর?
চার্ব্বাকের ভোগ-নীতি এ জীবন ভোর
কেন না বরিবে যে না স্বভাব-বৈরাগী?

স্বভাব নিয়ন্তা যদি—বাসনারই জয়;
শত উপচার তবে দিব বলি কেন
অজানা প্রতিমা পায়?—মধুমাখা হেন
প্রবৃত্তি-সম্ভোগ ছাড়ি—কুজ্ঝটিকাময়

যবে লক্ষ্য?—অবোধ্য বারতা বিজ্ঞানের!
পশু বলি গণে যারে কহে দেব হ'তে
আচরণে!—নশ্বরেরে উড়িতে মরতে
শাশ্বতের সম মেলি পাখা স্বরগের!

কহে: "ক্ষণিক অতিথি, জীবন মহান্ এ
জেনো চিরন্তন লাগি; অনাগত তরে
উপচিয়া জ্ঞানানন্দ দাও হর্ষভরে
বলি তব একমাত্র পুঁজি—বর্ত্তমানে।"

অমরতা করে আগে অস্বীকার—পরে
পূজে তারে যারে অবহেলিয়াছে মূঢ়
আকাস্মিক জ্ঞানে!—হাসে ধীর, অন্তর্গূঢ়
আত্মা অসম্বদ্ধ এ প্রলাপে কৃপাভরে!

এ নহে সত্যের মহাভিযানের গীতি—
স্বল্পারম্ভ ছাড়ি অনন্তের অভিসারে!
দীপ্তপাখা মেলি তার ব্যাপ্তি লভিবার এ
দেশকালমাঝে—নহে নহে হেন রীতি।

বস্তু-সত্য মাঝে তত্ত্বে রেখো না বাঁধিয়া
ঊর্দ্ধতর লোকে লক্ষ্য তার; অন্তরের
দীপে অস্বীকারি' স্থাণুসম পণ্ডিতের
আড়ম্বর মাঝে কভু রহে সে বাঁচিয়া?

সত্যে চাহি মোরা; বাধা ভয় গণিবু না;
লভিব সত্যেরে—নহে নহে বাচালতা!
পশু যদি হই—লব ইন্দ্রিয়পরতা;
দেব যদি—স্বরগের শুনিব মূর্চ্ছনা।

নহে বুদ্ধি সব; গূঢ় অন্তর দেবতা
প্রশ্ন-সমাধান তরে যুক্তিরে সৃজিয়া
রাজেন বুদ্ধির ঊর্দ্ধে; ওঠে নির্ঘোষিয়া
অস্ফুট আভাষে তাঁর মহিমা-বারতা।

অবচেতন সে?—মাত্র গূঢ়তম "আমি?"
নহে, নহে! গ্রহতারা চলে তারই বলে
ব্যোমমার্গে; জ্বালাময় সূর্য্যে সদা ঝলে
তাহারি বিভূতি—সেই চির-প্রাণস্বামী!

যৌবনের সমুদায় পরিপূর্ণতা লইয়া সার্থকতার সুখে সমস্ত অন্তরকে পরিপূর্ণ করিয়া সেও আপনাহারা হইয়া সেই সুখ-সাগরেই মগ্ন হইয়া রহিল। তার বিজয়ী চিত্ত শুধু সুরবাঁধা বীণার মত আপনি আপনি ঝঙ্কার তুলিয়া বাজিয়া বাজিয়া উঠিতে লাগিল, "আমি পেলাম! আমারই জয়! অবশেষে আমিই জয়ী হলেম!"

জ্যোৎস্নালোক ক্রমেই অপসৃত হইতে হইতে পৃথিবী হইতেই সরিয়া গেল, দিনের আলো ফুটিয়া উঠিল।

ঐ যে ষ্টীমার ঘাট দেখা যাইতেছে না? ঐ সেই তরু বীথি, যার মাঝখান দিয়া একটুখানি উপরে উঠিয়া গেলেই সেখানে পৌছান যায়। লাল ইটে গাঁথা সেই বিশেষ বাড়ীটীর ছাদের কার্ণিসের একটা কোণ না দেখা যাইতেছে!

আঃ—কোথা হইতে হঠাৎ একখণ্ড মেঘ জমিয়া উঠিল! ফোঁটা ফোঁটা করিয়া বৃষ্টিও যে আবার আরম্ভ হইয়া গেল! এ কি বিপদ! সলিল সতৃষ্ণনেত্রে নদীকূলে চাহিয়া দেখিল। নদীতীর জনশূন্য! হয় ত বৃষ্টির জন্যই সে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে আসিতে পারে নাই, নতুবা সে ত তার আসার সংবাদ তার করিয়া দিয়াছিল।

বাড়ীর সামনে আসিয়া সে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। কেহ কোথাও নাই, সাম্নের বারান্দায় উঠিতেই পরিচিত সেই কাঠের বেঞ্চি, কয়েকটা মাটীর গামলায় ডালিয়া ফুলের গাছগুলিতে জ্বলজ্বলে লালচে রংয়ের ডালিয়া ফুল চোখে পড়িয়া গেল। বেঞ্চির উপরে আরতির গায়ের গোলাপীরংয়ের চেক-কাটা র‍্যাপারখানা পড়িয়া আছে। তবে সে এতক্ষণ তাহারই আশাপথ চাহিয়া এইখানেই বসিয়াছিল, হয় ত বৃষ্টির জন্যই এই কতক্ষণ মাত্র উঠিয়া ভিতরে গিয়াছে!

দ্রুতপদে দ্বারের সন্নিহিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল —"আরতি!"

কেহ আসিতেছে পদশব্দে জানা গেল, কিন্তু যে আসিল সে আরতি নহে, তাহার ঝি রজনী।

সলিল একটুখানি আশাহত ভাবে তাহাকে প্রশ্ন করিল, "তোমার দিদি কোথায়?"

"দিদিমণি তো আপনার যাবার পরদিনেই এখান হ'তে চলে গিয়েছেন! আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি না কি!"

"চলে গিয়েছেন! কোথায় চলে গিয়েছেন?"

রজনীকে হতবুদ্ধি দেখাইল, সে কহিল, "তা তো আমায় তিনি কিছুই বলেন নি, শুধু এই বল্লেন,'বড্ড দরকার, আমাকেও যেতে হবে। তোমরা বাড়ী আগলে থাকবে। বাবু ফিরে না আসা অবধি আর কোথাও যেন যেওনা।' আমরা ভেবেছিলুম হয় ত আপনি যেয়ে পত্তর দেছেন, তাঁকে যাবার জন্যে, তাই যাচ্চেন।"

তার পর বাক্যহারা স্তব্ধ মানবের দিকে একখানা ডাকে আসা খামের চিঠি বাড়াইয়া দিয়া পুনশ্চ কহিল—

"এই চিঠি কালকে বিকেলে পিওনটা দিয়ে গেছে।"

সলিল পত্র লইয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল। তার চলন দেখিয়া বোধ হইল সে যেন কোন উঁচু জায়গা হইতে পড়িয়া গিয়া পা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, অথচ সেই ভাঙ্গা পা-খানাকে তার টানিয়া না লইয়া গেলেও তো নয়; তাই কোন মতে চলিয়া যাইতেছে।

আরতি পলাইয়াছে! ইহাকে পালানো বই আর কি বলা যাইতে পারে? কিন্তু কেন? কেন সে এমন করিয়া পলাইয়া গেল? সলিল কি তার সঙ্গে কোন মন্দ ব্যবহার করিয়াছিল?

পত্রখানা বাহির করিয়া সে পড়িতে লাগিল।

শ্রীচরণেষু—

অকৃতজ্ঞতার সীমা রাখিয়া গেলাম না যে মাপ চাহিব! তাই সেকথা তুলিলাম না। অনেক দেনার দায় ঘাড়ে চাপিয়াছে, আর জড়াইয়া ফেলা সঙ্গত নয় এটা বুঝিতেছি। যখন আমার পক্ষ হইতে পরিশোধের উপায় নাই।

সম্ভব হয়ত আমায় বিস্মৃত হইয়া যাইবেন, আর আমার সংবাদ লইবার চেষ্টা করিবেন না, আমি আপনার কৃপার অযোগ্যা এইটুকু মনে করিলেই ভোলা সহজ হইবে। বেশি কিছু বলিবার নাই।—প্রণাম।

আরতি

স্থিরনেত্রে সেই চিঠির কাগজখানার দিকে চাহিয়া সলিল বসিয়া রহিল। বিস্ময় যেন তাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। অথচ তার মনের ভিতরটা যেন ঝড়ের হাওয়ার মতন দ্রুত তালে ছুটিতে লাগিল। বারান্দার দিকে সে শূন্যনেত্রে চাহিয়া দেখিল, আরতির গায়ে দেওয়া সেই র‍্যাপারখানায় তার চোখ পড়িয়া গেল। তার ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া গিয়া সেখানাকে সে টুকরা টুকরা করিয়া

ছিঁড়িয়া পা দিয়া টানিয়া ফেলিয়া দেয়! ঐ চেয়ারখানায় সে সেদিনও যে বসিয়াছিল! ঐ ছোট্ট টেবিলটার উপর দোয়াতদানী রহিয়াছে ঐখানে বসিয়াই সে ঐ চিঠিখানা লিখিয়াছিল না কি? ঠিক তাই! এই বাড়ীরই কাগজ খামে তো এ চিঠি লেখা! ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, ঘড়ির কাঁটাটা আটটার ঘরে দাঁড়াইয়া অচল হইয়া আছে—হয় ত সেই দিন হইতেই—এইবার সে জ্বালাভরা অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া স্তব্ধ হইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

বৃষ্টি তখন বর্দ্ধিত বেগে খোলার চালের ছাদের উপরে চড় চড় বড় বড় করিয়া নানা ছন্দের তান দিতেছিল, বাতাস যেন বর্ষাদিনের আগমনী গাহিয়া উঠিতেছিল যে, বর্ষায় এ গৃহের বর্ত্তমান অধিবাসীর সহিত তার কোন সংশ্রবই থাকিবে না!

ভক্ত ভক্তি-আরাধনায় দেবপ্রতিমা গড়িয়া তাকে পূজা করে, মানসিক করে। তখন তার ভক্তির সীমা থাকে না। কিন্তু যদি তার সেই মানসিক কামনা সিদ্ধ না হয়—তবে যে পরিমাণে শ্রদ্ধাপূর্ণ বিশ্বাস লইয়া সে পূজারম্ভ করিয়াছিল, ঠিক সেই পরিমাণে মাপিয়াই তাহার অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিবেই বসিবে। তখন চাহি কি, সে সেই অভীষ্ট দেবতাকে পূজা অসমাপ্ত রাখিয়াই নির্দ্দয় হস্তে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেও উদ্যত হইয়া উঠে।

আরতির ঐ পত্র পাঠান্তে সলিলের মনের অবস্থাও ঠিক সেই রকমই হইয়া গেল। তার মনের অবস্থা তখন এতই ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছিল যে, সে যে কি করিবে, কেমন করিয়া তার এই মর্ম্মান্তিক হতাশার ও অবমাননার কিছুমাত্রও প্রতিশোধ দিতে পারিবে, সেই কথাটা সে যেন কোন প্রকারেই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। এতবড় অকৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসঘাতকতার স্থান যে এ সংসারের কোথাও থাকিতে পারে, এই কথাটা যদি সে ইতিপূর্ব্বে কোন দিন স্বপ্নেও ভাবিয়া রাখিত!

তার মুখের উপর আগুনে তাতানো লোহার চাবুক মারিয়াও যদি সে চলিয়া যাইত, তবু যেন তার চাইতে বেশি কিছু করা হইত না। এত বড় আঘাত তাকে দিতে পারিত না।

ঝিকে ডাকিয়া আলো দিতে বলিয়া একখানা যাহোক কিছু বই টানিয়া লইয়া সে সেখানার দিকে চাহিয়া গুম হইয়া রহিল। তার মনে হইল যদি সে একজন শিক্ষিত লোক না হইত, তাহা হইলে পুলিসে খবর দিয়া যে কোন একটা অপরাধের দায়ে ফেলিয়া এই মুহূর্ত্তেই তাহাকে ধরাইয়া আনিত। আরও যে কি না করিতে পারিত তাও ঠিক করিয়া বলা যায় না!

সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দেখিল যে তার মনের মধ্যে ঝড়টা তখন অনেকখানিই প্রশমিত হইয়া আসিয়াছে। আকাশেও মেঘ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়া তাহা গভীর নীলিমায় মণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। সূর্য্যালোকে তাহা দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে ও বৃষ্টির জলে ধোয়া ঝরঝরে গাছপালার উপর দিয়া শান্ত ও সুমিষ্ট ভাবে বাতাস বহিয়া যাইতেছে।

প্রতিদিনের মতই বারান্দায় আসিতেই রজনী চায়ের সরঞ্জাম লইয়া আসিল। আজ সে সে সব রাখিয়া দিয়া পূর্ব্বের মত চলিয়া গেল না, তৈরি করিয়া পিয়ালা ভরিয়া দিয়া একটুখানি দূরে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, উদ্দেশ্য হয় ত যে যদি বাবুর কোন দরকার থাকে।

চেয়ারে আসিয়া বসিতেই বারান্দার শেষপ্রান্তে গতরাত্রির বৃষ্টির জলে ভেজা ধূলা বালিতে মাখামাখি হইয়া আরতির সেই র‍্যাপারখানাকে পড়িয়া থাকিতে দেখা গেল। তার সেই দৃষ্টি আকর্ষণকারী কোমল ও উজ্জ্বল গোলাপী রং আর তাহাতে প্রায় নাই। জলে ধুইয়া মাটী-মাখা হইয়া তার সে পূর্ব্বশ্রী কোথায় চলিয়া গিয়াছে।—সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া সলিলের মনে পড়িল, গত কল্য এই র‍্যাপারখানাকেই সে আরতির উপরকার আক্রোশে টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া পায়ের তলায় ফেলিয়া দলিত করিতে চাহিয়াছিল। কি আশ্চর্য্য! তার সেই ক্রুদ্ধ চিত্তের খেয়ালটাকেই কি কোন্ এক অজ্ঞাত শ্রোতা শুনিয়া লইয়া তাহারই সেই অকৃত ইচ্ছাটাকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল? একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সে তাহার ব্যথিত দৃষ্টিকে টানিয়া লইল। একবার ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া গিয়া ঐ অনাদৃত অবলুণ্ঠিত বস্তুটাকে ধূলা ঝাড়িয়া তুলিয়া লয়,—হয় ত এখনও উহার মধ্যে তাহার গায়ের স্পর্শ ও গন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া গেলেও যাইতে পারে!

কিন্তু কিছুই না করিয়া সে নীরবে বসিয়া চা পান করিতে লাগিল। যেটা খাইল, সেটা ভাল লাগিতেছে অথবা তেতো লাগিতেছে, তার পর্য্যন্ত এতটুক খেয়াল করিল না।

রজনী সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিল "আর এক পেয়ালা দিই বাবু?"

স্বপ্নাভিভূত ব্যক্তির মতই অর্দ্ধ আচ্ছন্ন ভাবে সলিল উত্তর করিল, "না, আর না।"

চায়ের বাসনপত্র সরাইয়া রাখিয়া আসিয়া রজনী আবার একবার সেই রকম সঙ্কুচিত কুণ্ঠায় কোণঠাসা হইয়া দাঁড়াইল—

"বাবু!"

সহসা যেন চট্‌কা-ভাঙ্গা হইয়া সলিল মুখ ফিরাইল—

"আমাকে কিছু বলছো?"

মুখ নীচু করিয়া আঁচলের কোনটা পাকাইতে পাকাইতে রজনী তার কণ্ঠস্বরে কুণ্ঠা ভরিয়া লইয়া কহিল "আজ্ঞে আমি বলচি কি, আপনার কি এখানে এখন থাকা হবে! তা'হলে অব্দিশ্যি আমি আর কোথাও যাইনা। আর তা' নাহলে দত্তবাড়ী লোক খুঁজতে নেগেচে,—এই মাস কাবার থেকেই তানারা থাকতে বলে,—চাকরীটে ভাল। তাই বলছিনু যদি এ চাকরী আমার যায়ই, তাহলে তাদের কথা দে' রাখি যে—"

সলিল একটা চাপা নিশ্বাস মোচন করিল। তার গলার মধ্য দিয়া একটা বেদনার জমাট বাষ্প তার কণ্ঠস্বরকে সামান্য ক্ষণের জন্য চাপিয়া রাখিল, ফুটিতে দিলনা। তার পর ঈষৎ সামলাইয়া লইয়া অন্য দিকে চোখ রাখিয়া সে উত্তর করিল—

"চাকরী তুমি নিতে পারো,—আমি আজ না পারি কাল নিশ্চয়ই চলে যাব।"

রজনী একটু ইতস্ততঃ করিল—

"আপনি যে বলেছিলেন পুগা শীতকালটা এখানেই থাকা হবে? দিদি তো আমায়ও সেই কথাই বলেছিলেন—তা' কি হলোনা?"

"না"—বলিয়া উহাকে জবাব চুকাইয়া দিয়াই সহসা সলিল চমকিয়া উঠিল। তবে কি আরতির এই পলাইয়া যাওয়াটা পূর্ব্ব হইতে স্থিরীকৃত নয়? আকস্মিক? তাহার সহিত এখানে বাস করিতে সে যে অনিচ্ছুক ছিলনা, তাহা তাহার এই কথাতেই তো প্রমাণিত হইতেছে। তবে কি তার এই তাহাকে না বলিয়া চলিয়া যাওয়াতেই সে কোনপ্রকার সন্দেহ বা অভিমানে এমন করিয়া চলিয়া গেল? আশ্চর্য্য কি? হয় ত সে তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন প্রকার ভীষণ ভুল করিয়া ফেলিয়াছে। হয় ত তার এতখানি সহিষ্ণুতা সঙ্গত হয় নাই, হয় ত তার অন্তরের গোপন কথা বাহিরেও প্রচার হওয়া উচিত ছিল! হয় ত সমস্ত দোষ তাহার নিজের—আরতির কোনই দোষ নাই! এমন অবস্থায় পড়িলে কোন্ সতী নারী একজন পরপুরুষের আশ্রয়ে আশ্রিতা থাকিতে পারে? হায় হায়! কি ভুলটাই সে করিয়া ফেলিয়াছে! সে যে তাহাকে ভালবাসে না লিখিয়া গিয়াছে—নিশ্চয়ই সেটা তার প্রতি অভিমান! তীব্র অভিমানেই এমন কথা সে লিখিতে পারিয়াছে, নতুবা ভাল তাহাকে সে যে বাসে, তাহাতে তাহার মত তাহারও মনে কোনই সংশয় যে নাই, ইহা সুনিশ্চিত।

না! নারীর চরিত্র তার কিছুমাত্র আয়ত্ত হয় নাই! আর কেমন করিয়াই বা হইবে? সে তো কোন দিনই বাস্তব-নারার সংশ্রবে আসিতে পায় নাই। বিদ্যা যে তার পুঁথিগত।

একটা সিগার ধরাইয়া লইয়া সে বারান্দা হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে বাড়ীর সাম্‌নেটায় পাইচারী করিতে লাগিল। সূর্য্যতাপে তখন ঘাসের ও পাতার উপরকার বৃষ্টি-বিন্দুগুলি শুকাইয়া গিয়াছে। বাতাস গত রাত্রির বৃষ্টি-আর্দ্রতায় এখনও যথেষ্ট ঠাণ্ডা ভাবেই বহিতেছিল। নদীর ধারে বাঁশ ঝাড়গুলা সেই বাতাসে শন্‌শন্ শব্দ করিয়া উঠিতেছিল। একটা শিমুল-গাছের ঝোপে বসিয়া কোকিল ডাকিতেছিল। হয় ত সে ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতেছিল, এ বৎসরের মত এই আমার শেষ গান শুনিয়া লও। শীত আসিতেছে—এবার মলয় পর্ব্বতের চন্দনবনের মধ্যে আমার গানের আসর জমাইতে চলিয়াছি,—আর আমায় তোমরা শতবার সাধিলেও তোমাদের গান শুনাইতে আসিবনা। সেই সিগারটা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেলে আরও একটা সিগার ধরাইয়া লইয়া সলিল ধীর পদে নদীতীরে আসিয়া দাঁড়াইল।

নিশ্চয় তার বুঝিবার ভুল। এবার দেখা হইলে, সব কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলে, নিশ্চয় সে ভুল ভাঙ্গিয়া যাইবে আবার তাদের মধ্যে সন্ধি ও শান্তি স্থাপিত হইতে পারিবে নিশ্চয়ই তাই!

এ সংসারে এতটুকু অসাবধান হইবার অবসর মানুষের নাই। নিমেষের অন্তরালে কি যে লুকানো আছে কে জানেনা। একটু চোখ ফিরাইতে না ফিরাইতে, যে এতখানি কাছে ছিল সে দুজনার মধ্যে চকিতে সুদূর ব্যবধানে

সৃজন করিয়া দিয়া কোথায় যেন সরিয়া গিয়াছে! এই বিরহ নদীর কূলে বসিয়া তাহাকে কাঁদিতে রাখিয়া তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

কিন্তু না,—নিশ্চয়ই তার আশা-চন্দ্রমা এই দুদণ্ডের রাহু-গ্রাস হইতে চিরমুক্ত হইবে। এই চোখের আড়ালে তাদের প্রাণের আড়াল করিতে পারিবেনা। তার ভালবাসা তাকে একদিন জয়ী করিবেই করিবে।

২৩

কিন্তু বৃথা আশা। আরতির কোন সন্ধানই সে খুঁজিয়া পাইলনা। মাধবীর কাছে সে ত যায় নাই। তখন একান্ত হতাশ চিত্তে সে সুন্দরার বাড়ী আসিল।

সলিল যে শরীর মন লইয়া তার দিদির আশ্রয়ে আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, তাহাতে সুন্দরা রীতিমতই ভয় পাইয়া গেল। আরতি সম্বন্ধীয় কোন কথাতেই সে থাকিবেনা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা তার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। একে একে প্রশ্ন করিয়াই আরতির রহস্যময় পলায়নের সকল সংবাদই সে সংগ্রহ করিল এবং সসঙ্কোচে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিল; আর তো কিছুই তার করিবার নাই!

মঞ্জু সলিলকে দেখিয়া তার দিদির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—দিদি কেন এবারও আসিলনা, বলিয়া রাগ করিয়াছিল। তারপর তার সখা সখীদের মধ্যে পড়িয়া আবার অন্যমনস্ক হইয়া গেল। সুন্দরা তাহাকে নিজের ছেলের চেয়ে বেশি করিয়াই স্নেহযত্নে ভরাইয়া তুলিয়া ছিল। তার জন্য একজন ভাল মাষ্টার সে এরই ভিতর নিযুক্ত করিয়াছে।

কিন্তু সলিল যে মার কাছে না গিয়া তার কাছে পড়িয়া রহিল, ইহাতে সুন্দরা মনের মধ্যে ঠিক শান্তি পাইতেছিলনা। মা ছেলের এই পক্ষপাতিতাকে তার অপরাধ রূপেই গ্রহণ করিবেন, এই ভাবিয়া সে মনে মনে একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। মাকে সে সত্যসত্যই মার মতই ভালবাসিত। আর মাও যে তাকে কত ভালবাসেন, তাঁর একদিনের ত্রুটীকে যতবড় করিয়াই সে তার অভিমানাহত চিত্তে গ্রহণ করিয়া থাকুক না কেন, সেও সেটাকে না জানার ভান করিতে পারেনা। জ্ঞানোদয় হইতে আজ পর্য্যন্ত কোন দিনই সে মাতৃস্নেহের একবিন্দু অভাব বোধ করিতেই পারে নাই। নূতন ধরণের অলঙ্কার বস্ত্র গৃহসজ্জা যখন যা উঠিয়াছে, সে যত দামই হোক, আগে সে মার কাছেই উপহার পাইয়াছে। আজ সেই মা মনের দুঃখে যদিই নিজের বিমাতৃত্ব প্রচার করিয়া থাকেন, সুন্দরার ত উচিত নয় যে সেও তার প্রতিশোধে তাঁর সপত্নী-কন্যারূপে পরিবর্ত্তিত হয়।

একদিন সে সলিলকে বলিল "আমিই তোর শনি রে ভাই, আমার জন্যেই তুই অনর্থক এতটা দুঃখ পেলি।"

সলিল কহিল "তোমার দোষ কি দিদি! দোষ আমার এই কপালের।" এই বলিয়া সে নিজের কপালের উপর তর্জ্জনীর মৃদু আঘাত করিল।

সুন্দরা ম্লানমুখে মাথা নাড়িয়া কহিল, "ওসব কপাল-টপাল নয় রে ভাই! কর্ম্মই প্রবল। আমি যদি মুসুরী না যেতুম!"

সলিল ক্ষীণভাবে হাসিল, "তাহলেই বা কি হতো! সে বরং আমি না গেলেই হতো। সে ত আর ফিরবেনা দিদি, মিথ্যে তুমি দুঃখ করে কি করবে? প্রাক্তনই প্রবল। মানুষ তো একটা উপলক্ষ্য।"

এই কথায় সুন্দরা ঈষৎ ভরসা পাইয়া বলিয়া উঠিল, "আমিও তো তাই বলি সলিল, এসব যা হ'বার সে ত হয়েই গেছে। এখন আর ভেবে ভেবে শরীরপাত করে কি করবি বল? আর আমায় কি তুই মার কাছে চির অপরাধী করেই রেখে দিবি রে?"

সলিল যেন ঈষৎ বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "তোমার অপরাধটা কিসের দিদি?"

সুন্দরা একটা মৃদুশ্বাস মোচন করিয়া উত্তর করিল, "মা তো তাই জেনে রেখেছেন। যতদিন তুই বিয়ে না করবি সলিল, আমার এ কলঙ্ক তো আর ঘুচবেনা ভাই!"

শুনিয়া সলিল ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। তার পর সুগভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সে ঈষৎ হতাশ ভাবে উত্তর করিল, "সে কি আর আমি পারবো দিদি? বিয়ে আর কারুকে করা আমার পক্ষে আর যে সম্ভবই নয়। আমার এ জন্মটা এমনই করেই কাটাতে হবে।"

যে স্বরে সলিল এ কথা বলিল, সুন্দরার অশ্রুভারাতুর চিত্ত যেন তাহার ভার সহ্য করিতে পারিলনা,—তার চোখ দিয়া টপটপ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল। সে দেখিল, সলিলও তার সজল চোখ কোঁচার কাপড়ে মুছিয়া ফেলিতেছে। সুন্দরার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল। যে সলিলকে

এতটুকু কচিবেলা হইতে তারা দুই মায়ে-ঝিয়ে কখনও এতটুকু অভাবের ব্যথা জানিতে দেয় নাই, তার জীবনের এতবড় বিড়ম্বনার দুঃখ দেখা তার পক্ষে যেন অসহ্য হইয়া উঠিল। সে প্রাণপণে দাঁত দিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া ধরিয়া আত্মসম্বরণ করিল এবং তার পর যতখানি সম্ভব সহজ গাম্ভীর্য্যের সহিতই ভাইয়ের সেই হতাশোক্তির জবাব দিল,—

"তা বল্লে তো তোমার চলবেনা সলিল,—মা যে সতের বৎসর বয়সে সর্ব্বহারা হয়ে শুধু তোমার মুখ চেয়েই এতকাল প্রতীক্ষা করে রইলেন, সে কি তোমার কাছ থেকে এই ফিরিয়ে পাবার জন্যে? পিতৃ-পিতামহের জলপিণ্ড কি লোপ পাবে? বংশে আর একটা কেউ কি তোমার আছে?"

সলিলের দুঃখাভিহত চিত্ত যেন প্রতিঘাতে চঞ্চল হইয়া উঠিল। তার পর আবার তখনই আরতিকে মনে পড়িয়া তার বেদনাবিদ্ধ হৃদয় আবার যেন অঙ্কুশাহত হইল। সে সংশয় পূর্ণকণ্ঠে উত্তর করিল,—

"কিন্তু আমার মনে হয় দিদি, আর যাকে আমি বিয়ে করবো তাকে কোনদিনই ভালবাসতে পারবো না।"

ভাইএর হৃদয়ের গভীর বেদনার পরিচয়ে সুন্দরার চিত্ত আশঙ্কাহত হইলেও বাহিরে সে মনোভাব গোপন করিয়াই উত্তর করিল,—

"পাগল! কেন কি হয়েচে যে পারবিনা? সে যখন তোকে চায়না, এতই কি কাঙ্গালপনা করে তারই পিছনে ছোটা! না না, মার প্রতি তোমার সত্যিই বড্ড বেশি অত্যাচার করা হয়ে গ্যাছে, আর না, সময় থাকতে প্রতিকার করে ফেল। তাঁর পছন্দ মেয়েটীকে বিয়ে করো, আমাকেও কেন মিথ্যে মায়ের কোল থেকে বঞ্চিত করে রাখচো? আমারও আর ভাল লাগচেনা বাবু, মনটা কেবল মা, মা, করচে।"

সলিল কথা কহিল না। সুন্দরার এ কথায় তার মন সহসাই দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া উঠিল। আসল কথা, মানুষ বাস্তবিকই ছায়ার পশ্চাতে খুব বেশি দিন ধরিয়া ছুটিয়া ফিরিতে পারে না। আরতি যখন তাহাকে সুস্পষ্ট প্রত্যাখ্যান করিয়া চোরের মত পলাইয়া গেল, তার অত স্নেহ, অত আত্মত্যাগের কোন মূল্যই সে দিয়া গেলনা, তখন তার প্রতি একটা সুগভীর তীব্র অভিমানের জ্বালাও সে মনের মধ্যে অনুভব করিতেছিল। দু'একবার তার নিজেরই মনে হইয়াছে যে, আচ্ছা আরতি! যাও তুমি, তুমি কি মনে কর, তুমি না হলে আমার চলিবেই না! আমিও তোমায় দেখাতে পারি যে তোমার চেয়ে শতগুণে শ্রেষ্ঠ মেয়ে আমার স্ত্রী হ'বার জন্য লালায়িত!—কিন্তু আবারও কিন্তু তার ভদ্র চিত্ত এই হেয় চিন্তাকে সুদূরে ঠেলিয়া দিয়াছে।

কিন্তু এবার প্রতিশোধের দিক দিয়া নয়,—মায়ের প্রতি, বংশের প্রতি কর্ত্তব্যের যে বিস্মৃত অংশটাকে সুন্দরা আজ স্মরণ করাইয়া দিল, সেটা এই দ্বিধাগ্রস্ত আশাহত চিত্তকে অসাড় অঙ্গে তড়িৎ সঞ্চালনের মতই যেন সহজে স্মরণ করাইয়া দিল। বাস্তবিকই তাই। মায়ের প্রতি অন্যায় করা হইয়াছে। আর সেই মার পৃথিবীতে সে ছাড়া আর কে আছে?

দেড় বৎসরের অসহায় শিশুকে সেই মা মাতাপিতার উভয় কর্ত্তব্যের সহিত পালন করিয়া আজ তেইশ বৎসরের করিয়া তুলিয়াছেন,—সে কি এমন করিয়াই আঘাত পাইতে?—হতাশ হইতে?

সুন্দরার উৎসুক মুখের দিকে চাহিয়া সে কলের মতই উচ্চারণ করিল,—"তাহলে মাকে তাই করতে বলো..."

সুন্দরা মনে মনে আশ্বস্ত হইল, প্রকাশ্যে কহিল,—"আমি বল্লে তো হবে না সলিল, তোমায় নিজেকে গিয়ে বলতে হবে। না হলে মা মনে করবেন মার কথা না শুনে তুমি আমার কথায় রাজী হলে।"

ইহার পরদিন সলিল রাঘববাটীতে নিজেদের দেশে চলিয়া গেল।

সলিলের মার কাশী যাত্রা বন্ধ আছে। সলিল মার কাছে যে সময় চাহিয়া লইয়াছিল, তার এখনও দিন পনের বাকি। কাশীতে কিন্তু কেদার ঘাটের কাছে বাড়ী ভাড়া হইয়া গিয়াছিল। ঘরের মধ্যে মোট পুঁটুলি সবই বাঁধা।

সন্ধ্যাবেলা কাপড় কাচিয়া ঠাকুর ঘরে আরতি পূজার পর, সায়ংসন্ধ্যা সারা হইলে মহামায়া বাহিরে আসিয়া চিরদিনের অভ্যাসমত চশমার খাপ এবং হিসাবপত্রের খাতা প্রভৃতি সজ্জিত টেবিলের ধারে বসিতে গিয়াই নির্ব্বেদ ভরে সরিয়া আসিলেন। কিছুতেই আর মন যায় না। চিরদিনের কর্ম্মসংযম যেন এই কয় মাসে একেবারেই শিথিল হইয়া খসিয়া পড়িয়াছে। যার জন্য আজন্ম এতখানি করিলেন,

সেই যখন সেই মাকেই তুচ্ছ করিয়া নিজের সুখ খুঁজিতে উধাও হইয়া উড়িয়া গেল,—তখন আর কার জন্য এ ঘর সংসার! একতলার ছাদের একটা অন্ধকার-প্রায় কোণের মধ্যে একখানা শীতলপাটী হরি ঝি পাতিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। ধীরে ধীরে সেইখানেই আসিয়া এই অনুত্তীর্ণ সন্ধ্যাতেই দারুণ ক্লান্তিভরে তিনি শুইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ নীরব চিন্তাহীনতায় শুদ্ধ থাকিবার পর সহসা এক সময় অতি বিস্ময়ের সহিত তিনি জানিতে পারিলেন, তাঁর ব্যথা-জড় চিত্ত আর নীরব নাই, সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া কোন্ সময় হইতে তার একমাত্র স্মরণীয়কেই মনে মনে স্মরণ করিতেছে। সে ব্যাকুল উদ্বেগে আপনা আপনি বলিতেছিল, "কোথায় রৈলি, একটু চিঠি লিখেও জানাতে পারলি না, কি নিষ্ঠুরই হয়ে উঠ্‌লি সলিল!"

"হরি! মা কোথায় রে?" বলিয়া সলিল এই ছাদটারই প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল; ডাকিল "মা!"

"সলিল!" বলিয়া মহামায়া ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। তিনি যে ছেলের উপর রাগ করিয়া আছেন, ছেলে যে তাঁর কাছে অপরাধী, সে সব কথা তাঁর তখন আর মনে পড়িল না।

সলিল কাছে আসিয়া অন্ধকারে হাতড়াইয়া মার পায়ের ধূলা মাথায় লইল। গা ঘেঁষিয়া যেমন বসিত তেম্‌নি করিয়াই বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

"অন্ধকারে অসময়ে শুয়ে কেন মা? শরীর খারাপ হয়নি ত?"

পুত্রের এই স্নেহ-মধুর কণ্ঠ, এই উদ্বিগ্ন কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা মায়ের আহত চিত্তকে একান্ত উদ্বেল করিয়াই তুলিয়াছিল। সুপ্ত অভিমানের শিখাও হয়ত ইহাতে উর্দ্ধবেগে জ্বলিয়া উঠিতে পারিত, কিন্তু এ-সবকেই আড়াল করিয়া দাঁড়াইল মাতৃ স্নেহের অলঙ্ঘ্য শক্তি তার নির্ভুল অনুভব দৃষ্টি লইয়া! মহামায়া চকিত চমকে উদ্বিগ্ন হইয়া কহিয়া উঠিলেন,—

"এ তোর কি গলার সুর হয়ে গেছে সলিল! তোর কি কোন অসুখ করেছিল?"

সলিল অন্ধকারের আড়ালেও ঈষৎ আরক্ত হইয়া একটু থতমত খাইয়া জবাব দিল, "হ্যাঁ মা, শরীর ভাল যাচ্ছে না।"

মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কোথায় যে কি করে বেড়াচ্চিস, শরীর ভাল থাকবে কি করে।"

সলিল যাহা বলিতে আসিয়াছিল, তা বলিয়া ফেলিবার জন্য সে যেন আর দেরি করিতে পারিতেছিল না। অপরাধীর দোষ স্বীকারের মত কোন মতে সেটা একবার মুখ দিয়া বাহির করিয়া দিতে পারিলে তার যেন সমস্ত দায় চুকিয়া যায়। যতক্ষণ না বলা হইতেছে, না বলিবার জন্য প্রাণপণ বাধার চেষ্টা তার মন ত ছাড়িতেছেও না, এই অবসরে সে তাই তার দুর্ব্বল কণ্ঠস্বরে ঈষৎ হাস্যাভাস টানিয়া আনিয়া চোক কান বুজিয়া বলিয়া ফেলিল,—

"তাই জন্যেই তো এইবার তোমার কাছে বেড়ি পরতে এসেছি মা! সেই ডানা-কাটা পরীটিকে এনে আমার ডানা দুখানা কেটেই না হয় দাও, সব ল্যাঠা চুকে যাক।"

মহামায়া বিস্ময়ে ও আনন্দে ক্ষণকাল কথা খুঁজিয়া পাইলেন না।

সলিল কিন্তু এ নীরবতা সহ্য করিতে পারিতেছিল না। সে চাহিতেছিল, কোন কিছু—এমন কোন কিছু যাহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া সে তার এই দুশ্চিন্তা-পীড়িত দ্বিধাগ্রস্ত অনিচ্ছুক মনটাকে একেবারে তলাইয়া দিতে পারে। অপর পক্ষের অনাগ্রহের বাতাস লাগিতে দিলে তার এই প্রাণপণ চেষ্টা-অর্জ্জিত কৃত্রিম আগ্রহ যে এই মুহূর্ত্তেই ঝরিয়া পড়িতে সমর্থ তাই ভাবিয়া সে মনে মনে ঈষৎ একটু অস্বস্তি বোধ করিল। তার পর মাকে তখনও কোন বাঙনিষ্পত্তি করিতে না দেখিয়া পুনশ্চ একটু উচ্চ করিয়াই বলিল,

"তোমার বুঝি বিশ্বাস হচ্চে না? আমি কি তোমায় মিথ্যে বলি? না না মা, এমন করে আমায় ত্যাজ্য পুত্র করে রেখোনা, আমি সেই পরীই বিয়ে করবো, শুধু তুমি কথা কও—"

"বাবা আমার!"—বলিয়া মহামায়া এতদিনের সকল অভিমানের পুঞ্জ করিয়া জমান অশ্রু নির্ঝরটাকে অবাধে উৎসারিত করিয়া দিয়া দুই হাতে তার কল্পনায় হারানো নিধিকে বুকের উপর টানিয়া লইলেন।

সলিলের যে অশ্রুজলে তার চির স্নেহময়ী মায়ের বুক ভিজিয়া উঠিল, সে কিন্তু তার মায়ের পরে সন্তানের অভিমানই সবটা নয়। তার মধ্যের অর্দ্ধেকখানি সেই নির্ম্মা

পলাতকার বিরুদ্ধের নীরব অভিযোগ! মা কিন্তু তাহা জানিলেন না।

ক্ষণপরে ঈষৎ শান্ত হইয়া মহামায়া কহিলেন,—"কালই আমায় তুই সঙ্গে করে সুন্দরার বাড়ী নিয়ে চল সলিল! সে আমার ওপোর বড্ড অভিমান করে গ্যাছে, আমি নিজে গিয়ে তাকে ডেকে আনবো। তোর চেয়ে তাকে যে আমি আগে থেকে পেয়েছিলুম, আজ তোকে ফিরে পেলুম, সে আমার কই!"

২৪

সলিলের বিবাহে সমারোহের কোন অভাব হইল না, অভাব রহিল শুধু আনন্দের। সুন্দরা আসিল, যেন এর আগে কিছুই হয় নাই এম্‌নই করিয়াই সে ভাইএর বিবাহের উদ্যোগে মাতিয়া উঠিল। বধুর জন্য নূতন নূতন ফ্যাসানের গহনা কাপড় জ্যাকেট ব্লাউসের প্যাটার্ণ খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফরমায়েস করিতে লাগিল। গায়ে হলুদের তত্ত্বে দিবার জন্য আসন তাকিয়া রুমাল, জামার উপর নানা ছাঁচের কারিগরী সে নিজের হাতেই করিতে বসিল, গায়ে হলুদের দিন রং মাখিয়া সবার গায়ে রং মাখাইয়া সলিলের দৃঢ় গম্ভীর মুখেও ঈষৎ হাসির ক্ষীণ রেখা বারেকের জন্যও টানিয়া আনিয়াছিল। তথাপি একটুখানি আড়াল পাইলেই চোখ দিয়া তার জল যেন ঠেলিয়া আসিতে লাগিল। যা কিছু করিতেছিল, কেবলই মনে হইতেছিল, আজ যদি এসব সে আরতির জন্যই করিতে পারিত!

সলিলের মুখে আষাঢ়ের মেঘ সর্ব্বদাই যেন বর্ষণোন্মুখ হইয়া আছে, তার পুরুষের মর্য্যাদা হারাইয়া সেও গোপনে গোপনে কতবারই যে তার পতনোন্মুখ অশ্রুবিন্দুকে সম্বরণ করিয়া লইয়াছে তাহার হিসাব নাই। শরীর খারাপ বলিয়া স্নানাহার আলাপ আপ্যায়ন সে ত একপ্রকার বন্ধ করিয়াই দিয়াছিল। ছেলের মনের এ ভাব মহামায়ার কাছেও কিছুমাত্র অজ্ঞাত ছিল না, তিনিও গোপনে গোপনে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া দেবতার উদ্দেশে মিনতি জানাইতেছিলেন, এই যে নিজের সত্যের জন্য নিজের বংশে সন্তানের দিকে চাহিয়া দেখিলেন না, এর ফল যেন সুফল হয়। এর জন্য ভবিষ্যতে যেন তাঁহাকে অনুতপ্ত হইতে না হয়। মনে মনে আবার নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন, কেনই বা তা হইবে। অমন সুন্দরী শান্তস্বভাব মেয়েটি, এর পর ওর রূপেই যে সব ক্ষোভ ভুলে যাবে। ছেলে ত আর আমার তেমন নয়! এই ত মাকে কি ডিঙ্গোতে পারলে! সব ভাল হয়ে যাবে, ভগবান সব ভাল কর্ব্বেন।

ফুলশয্যার রাত্রে নিজের মনের একান্ত অশান্তি পূর্ণ দুর্ব্বলতায় সলিল নববধূর সঙ্গে একটীও বাক্যালাপ করিল না। বধূটী যে তার পাশেই আছে, সে কথাটাও হয় ত তার সর্ব্বক্ষণ মনে থাকিতেছিল না। দুএকবার শুধু বধূর অলঙ্কার-শিঞ্জন-ধ্বনিতে চকিত হইয়া উঠিয়া তার প্রতি দৃষ্টি পড়িলেই অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া একটা গভীর স্মৃতি-ব্যথা ভরা দীর্ঘশ্বাস স্বতঃই উত্থিত হইয়া আসিতেছিল। হায় আরতি! কোথায় তুমি? তোমার স্থানে আজ চোরের মত আসিয়া ঢুকিল 'এ' কে?

সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গিতেই সলিল টপ করিয়া খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। পাশের আল্‌না হইতে সার্টটা লইয়া গায়ে পরিতেছে—পরা হইলে বাহিরে যাইবে, এমন সময় ঝমর ঝম্ করিয়া একসঙ্গে চুড়ি বালা বাঁকের ঘুমুর ও পায়ের পাইজোর বাজার শব্দে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, তার নূতন বধূ বিছানায় উঠিয়া খাটে পা ঝুলাইয়া বসিয়াছে। মুখে তার এখন আর সেই সুদীর্ঘ ঘোমটা নাই,—চোখের উপর পর্য্যন্ত মাথার কাপড়টা নামানো আছে মাত্র। সলিল মুখ ফিরাইতেই তার সঙ্গে চোখে চোখে মিলিত হইলে সে ঈষৎ সলজ্জভাবে চোখ নামাইয়া লইল, কিন্তু মুখ ঢাকিল না। সলিল বরঞ্চ মুখ ফিরাইয়া লইয়া দ্রুতহস্তে সার্টের বোতাম আঁটিতে লাগিল,—এ ঘর হইতে বাহির হইয়া পলাইতে পারিলে আপাততঃ সে যেন বাঁচে। দিনের আলোয় ইহাকে এত কাছে দেখিয়া তাহার মনের মধ্যের অশান্তির ইন্ধন আবার যেন জোরের সঙ্গেই জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তার বুকের মধ্যের অর্দ্ধ-প্রশমিত অশান্তির ক্রন্দন কলরোলে জাগিয়া উঠিল।

"শোন"—

সলিল দোর খোলার জন্য হাতল ধরিয়াছিল, হাত ছাড়িয়া দিয়া সবিস্ময়ে মুখ ফিরাইল। এ সম্বোধন নিশ্চয়ই তাকে,—কারণ আর তো কেহ ঘরে নাই। কিন্তু এও কি সম্ভব?

দেখিল, নববধূ তার দিকে অসঙ্কোচে চাহিয়া আছে। সলিল ফিরিয়া দাঁড়াইতেই সে কহিল, "তুমি যাচ্চো?"

অগত্যা সলিল ফিরিয়া আসিল। খাটের কাছে আসিয়া ঈষৎ বিব্রত বিপন্নভাবে দাঁড়াইয়া কহিল, "না, কেন?"

বধূর গালদুটী পাকা ডালিমের মত লাল হইয়া উঠিল, সে দৃষ্টি নত করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল,—

"আমার সঙ্গে তো তুমি কোন কথাই কইলে না? কিন্তু আমি শুনেচি, সকলেই কয়।"

সলিল বিস্মিত কৌতূহলে তার নববিবাহিতাকে দেখিতেছিল। এর আগে একে সে সত্যকার দেখা দেখেই নাই। হ্যাঁ, সুন্দরী বটে! মা যে বলিয়াছিলেন, লক্ষের মধ্যে একটা—তা'ও অসম্ভব নয়। যেমন রং তেমনই নধর গঠন। চোখ দুটীকে পটলচেরা বা পদ্মপলাশ বলাও চলে। ঠোঁটের সূক্ষ্মতা কিসের সঙ্গে তুলনীয়—সলিলের হঠাৎ তা' মনে পড়িল না। তবে কবিরা বোধ করি গোলাপ-পাপড়ির সঙ্গেই এর উপমা দিতেন। তার বিদ্রোহের ঝটিকাক্ষুব্ধ বুকের মধ্যে ঈষৎ একটা বাসন্তী-শিহরণ বহিয়া গেল। স্মিতকৌতুকে মৃদু হাসিয়া সে উত্তর করিল "তাই না কি? সকলেই কয়? তা' তো আমি জানতুম না! তুমি কি করে জানলে?"

বধূ কহিল "কেন? আমার বন্ধুদের কাছ থেকে শুনেচি। তাদের বরেরা সব্বাই ফুলশয্যার রাত্রে প্রথমেই তাদের সঙ্গে কথা কয়েচে। তারা আমায় সমস্ত কথাই বলেচে কি না।"

সলিল কহিল "আহা! তা কি আমি জানি! কেমন করেই বা জানবো বল? আমার তো আর এর আগে একদিনও ফুলশয্যা হয় নি।"

কথাটা সে ব্যঙ্গ করিয়া হাসির সুরে আরম্ভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু শেষের দিকে তার গলার স্বরে একটা মৃদু কাঁপন দেখা দিয়াছিল। তার মনে পড়িতেছিল এর কত আগেই সে তার মানসী প্রিয়াকে উদ্দেশ করিয়া কত কথা, কত কল্পনা, কত কাব্যই না রচনা করিয়া রাখিয়াছিল। এ যদি আরতি হইত, তবে কি আজ তার কথার কোথাও আর শেষ থাকিত?—

স্বর্ণলতা ফিক্ করিয়া একটুখানি হাসিয়া ফেলিল। হাসিটী তার বড় মিষ্ট! দাঁতগুলি যেন মুক্তা গাঁথা! এমন নিখুঁত রূপসী বড় একটা চোখে পড়ে না। সে হাসিয়া বলিল "ফুলশয্যে আমারও তো আর আগে হয় নি। তবে আমার বন্ধুদের হয়েচে। তোমার বুঝি একটীও বন্ধু নেই?"

সলিল একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল "না"—

সহানুভূতিপূর্ণ হইয়া স্বর্ণ কহিল "ও:, তাই তুমি জানতে না।"

মনের মধ্যে সমাগত অশান্তির ভারটাকে জোর করিয়া চাপিয়া ফেলিয়া সলিল কৌতুক-স্মিতমুখে স্বর্ণর মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, তাদের বরেরা কি কথা বলেছিল, বল ত, শিখে নিই।"

স্বর্ণকে তার বড় ছেলেমানুষ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। বিদ্বেষ কমিয়া সহানুভূতি দেখা দিতে আরম্ভ হইয়াছিল।

স্বর্ণলতা একটু সলজ্জভাবে হাসিয়া ঈষৎ নড়িয়া চড়িয়া ভাল করিয়া বসিল। তার ঝুলানো পায়ে হয় ত ঝিন্‌ঝিনা ধরিয়া থাকিবে, পাখানাকে টানিয়া তুলিয়া খাটের উপরেই ছড়াইয়া দিল। সলিল দেখিল পদপল্লবমুদারম্' বলিয়া কোলের উপর যে পা'কে মুগ্ধ পুরুষে টানিয়া লয়, এ ঠিক সেই গড়নেরই পা বটে!

স্বর্ণ উত্তর করিল "সব্বাই কি এক রকম কথা বলে? যার যেমন ইচ্ছে হবে, তাই না সে বলবে? এ' ত ইস্কুলের পড়া নয়!"

বা:, রসিকতা করিতেও যে জানে! না:—যতটা ছেলেমানুষী দেখাইতেছে, ততটা হয় ত বা সে নয়! বেহায়া কি? তাও তো মনে হইতেছে না! বেশি সরল হয় ত?

সলিল তার সেই ছড়ানো পাখানার অনতিদূরে খাটের ওপরেই আসন গ্রহণ করিয়া এবার একটু কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, দু একজনের কথাই তো বল, শোনা যাক। পাখীরাও তো শুনে শুনে শেখে, আমাকেও না হয় একটু শিখিয়ে দিও।"

স্বর্ণ পা সরাইয়া লইয়া উহার কাছে আপনিই একটুখানি সরিয়া আসিল; মাথার কাপড়টা আরও একটুখানি কম করিয়া দিল। তার পর সলিলের যে ধুতীর অংশটা তার হাতের কাছে আপনা হইতে আসিয়া পড়িয়াছিল, তার কোঁচকান জরির পাড়টাকে টানিয়া টানিয়া সোজা করিয়া দিতে দিতে তার দিকে না চাহিয়াই বলিতে লাগিল, "তাহলে নিশীথবাবুর কথাটাই বলি। সে হচ্ছে আমার

চাঁপাফুলের বর। চাঁপাফুলকে তো বাসর ঘরে দেখেছ? তাকে দেখতে বেশ সুন্দর, নয়?"

সলিল বলিল, "তোমার মতন নয় তা বলে।" এটা সে ঠাট্টার ছলে নয় সত্য করিয়াই বলিল। যতই দেখিতে ছিল, এর রূপ তাকে বিস্মিত করিতেছিল।

স্বর্ণলতার গালদুটী লজ্জাজড়িত সুখের আভায় লাল হইয়া উঠিল। সে একটুখানি স্মিত হাস্যে সলিলের মুখে একটা মৃদু কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া এ কথার উত্তর করিল, "তা' না হলেও মোটের উপর তাকে দেখতে তো ভালই? ওর বর কিন্তু ঘুটঘুটে কালো।"

"আহা! সত্যি!" বলিয়া সলিল একটুখানি বিস্ময়ের অভিনয় করিল। মনের মধ্যে অবশ্য তার এর জন্য কোনই লোকসান বোধ হয় নাই।

বধূ উত্তর করিল "হ্যাঁ, খুবই কালো। শুধু তাই না, দেখতেও তাকে ভাল নয়। তাই জন্যেই সে ফুলশয্যার রাত্রে যেমন একলা হয়েচে, অমনই চাঁপা কে বলেচে, 'আচ্ছা, আমি যে এমন কুৎসিত, আর তুমি অত সুন্দরী, তা আমি তোমায় ছুঁলে তোমার ঘেন্না করবে না ত?" এই বলিয়া স্বর্ণলতা হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে পুনশ্চ কহিল,— "কিন্তু চাঁপাফুলকেও খুব মেয়ে বলতে হয়! তারও উত্তরটী যেন জোগান ছিল, সে কি বল্লে জানো? সে বল্লে, 'ঐ কালোর জন্যেই তো রাধা কুলমান ছেড়ে দিয়ে কালিন্দীর কূলে ছুটেছিল,—কালো কি এতই তুচ্ছ?' আচ্ছা, বেশ বলে নি?"

সলিল বলিল "বাঃ! খাসা বলেচেন তো! আচ্ছা আমিও না হয় ঐ কথাটাই তোমায় বলি? কি বল?"

স্বর্ণ হাসিয়া এবার ধুতির পাড় নাড়া ছাড়িয়া খাটের গদীর উপর চাপিয়া রাখা সলিলের ডান হাতের অনামিকায় সন্নিবিষ্ট হীরার আংটীটার হীরাখানা খুঁটিতে খুঁটিতে উত্তর করিল, "তা বল্লে মানাবে কেন? তুমি নিজেও যে সুন্দর!"

সলিল বিস্ময়ের ভান করিয়া কহিল, "আমি! সত্যি? নাঃ! কে বল্লে?" স্বর্ণ খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "আহা! তা' যেন জানেন না! বাড়ীতে তোমার এত বড় বড় আয়না, তারা কি তোমার সঙ্গে ছলনা করে? তুমি তো খুবই সুন্দর!"

সলিল ঈষৎ হাসিল, লজ্জায় তার কপোল ও ললাট রাঙ্গিয়া উঠিল। তার পর কহিল "তাহলে আমায় তোমার মনে ধরেচে?"

স্বর্ণর মুখ সলজ্জ হাস্যে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিল। সে তখন সলিলের সেই হীরার আংটীপরা আঙুলটার হীরার মতই উজ্জ্বল সাদা নখটাকে নখ দিয়া খুঁটিতেছিল, তদবস্থাতেই নতমুখে উত্তর করিল "কেন হবে না?"

এই কথা বলিয়া সে স্পন্দিত বক্ষে কিসের জন্য যেন একটু প্রত্যাশাপন্নভাবে ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। তার পর ক্ষণপরে যেন আশাহত এবং সুপ্রচুর বিস্ময়ান্বিত হইয়া একেবারে স্বামীর মুখের উপর বিস্ময়াহতবৎ চাহিয়া দেখিল। এত বড় একটা অভিব্যক্তির পরেও যে এমন শুদ্ধ অনড় নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে, এরকম ধারার কোন পুরুষের খবর এই মেয়েটীর বোধ করি বা তার বন্ধুমহল হইতে জানা ছিল না!

সলিলের মুখে চোখে একটা উৎকট বেদনার তীব্র ছাপ দাগিয়া উঠিয়াছিল। এই অনভ্যস্ত নারী-করস্পর্শে একদিকে তার পুরুষের দেহ মন যেমনই সুখ শিহরণে স্পন্দিত হইয়া উঠিতে গিয়াছিল, অমনই সঙ্গে সঙ্গে আর একটা হাতের ক্ষণস্পর্শ স্মৃতি তাহাকে আর এক দিক দিয়া অগ্নিময় স্মৃতির কশায় লাঞ্ছিততর করিয়া দিল। আরতি! আরতি! ওঃ পাষাণি! এতটুকু যদি দয়া করিতে! এত করিয়াও কি একবিন্দু ভালবাস নাই?—অথচ এই মেয়েটী দুদিন পাইয়াই তাহাকে পছন্দ করিতে পারিল! তবে সে তো তত কিছু মন্দ নয়! অত বেশি তুচ্ছ নয়!

স্বর্ণলতার মুখ ম্লান হইয়া গেল, সে নিজের হাতখানি অভিমানে সরাইয়া লইল। একটুক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে ধীরে ধীরে বলিল,—

"বুঝেছি, আমাকেই তোমার মনে ধরে নি।"

সলিল এবার চমকাইয়া উঠিল।—তড়িৎ-স্পৃষ্টের মতই সচমকে তার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, "সে কি! কে বল্লে? না না, তুমি এত সুন্দর, কেন আমার তোমাকে মনে ধরবে না?"

স্বর্ণ কহিল "তাহলে হয়ত আমি গরীবের ঘরের মেয়ে বলে তোমার আমাকে ঘেন্না করচে, তাই হবে। তাই জন্যেই"—

'তাই জন্যেই কি? এসব তুমি কোথায় পেলে?" সলিল কিছু বিব্রত হইয়া উঠিল।

স্বর্ণ ম্লান স্বরে কহিল "তাই জন্যে তোমার মনে সুখ নেই, বাসর ঘরে কারু সঙ্গে কথাই কইলে না। তোমায় এ পর্য্যন্ত একবারও হাসতে দেখিনি। কিন্তু আমরা যে গরীব, আমার বাপ নেই, সে কথা তো তোমরা আগে হ'তেই জানতে!"

সলিলের মুখ লজ্জারুণ হইয়া উঠিল। এ মেয়েটীকে যতটা ছেলেমানুষ বা সরল বোধ হইয়াছিল, ঠিক হয় ত এ তা' নয়! নিজের অধিকার এ দাবী করিতে জানে। সে বিপন্নভাবে কহিল "ছিঃ, ও কথা মনে করতে নেই! ও সব কিছুই নয়। শরীরটাই আমার ভাল নেই, তাই হয় ত কথা কইতে পারিনি বেশি।"

স্বর্ণ কহিল "সেই জন্যই বুঝি এখন বিয়ে করতে তোমার মন ছিলনা? সেও আমি শুনেচি, মার জন্যেই শুধু হলো।"

সলিল তখন ইহার কাছে সমধিক কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া নিজের সেই অপ্রকাশ্য লজ্জা চাপা দিবার জন্য উপায়ান্তরের অন্বেষণে ব্যাপৃত হইল,—

"আচ্ছা, তুমি কতদূর পড়াশোনা করেচ? স্কুলে যেতে বোধ হয়?"

সলিলকে কথা উল্টাইতে দেখিয়া স্বর্ণ ঈষৎ হাসিল, তার পর তার প্রশ্নের জবাবে বলিল, "ইস্কুলে গেলে খারাপ হয়ে যায় বলে বাবা তো আমাদের ইস্কুলে যেতে-দিতে দিতেন না। ঠাকুমার পিসি লেখা পড়া শিখে বিধবা হন, তাই জন্যে লেখাপড়া মেয়েমানুষকে আমাদের বাড়ী শেখানও হয় না। এই এখানে বিয়ে হবে বলে মাস খানেক আগে থাকতে আমায় পেরথম ভাগটা ধরানো হয়েছিল, তাইতে শৃগাল কৃষাণ এইগুলো অবধি আমার পড়া হয়েচে।"

ইহার পর আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিবার কথা সলিলের মনে আসিল না; এবং তার অল্পে অল্পে মন্দীভূত বিদ্বেষের জ্বালা পুনশ্চ পূর্ণ বেগে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গেল।

কিন্তু রূপজমোহ এবং স্বত্বাধিকারের প্রবলতম দাবী তার পূর্ব্ব নির্লিপ্ততাকে একটুখানি ক্ষয় করিয়া আনিয়াছিল। সেটুকুকে সে আর ভরাইয়া লইতে পারিলনা। মনটা একটু নরমই রহিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

সম্বন্ধবাদ

(Theory of Relativity).

শ্রীশশধর রায় এম-এ, বি-এল

(২)

ঘটনা বস্তুরই ঘটে। কিন্তু বস্তু পদার্থ কি? বস্তু অণু দ্বারা গঠিত। অণু ইলেক্‌ট্রণ্ দ্বারা গঠিত। ইলেক্‌ট্রণ্ ত তড়িৎ। অণুর কেন্দ্রস্থলেও তড়িৎই বিদ্যমান। বস্তুর অণুসকলের কেন্দ্রস্থলে যে প্রকার তড়িৎ, ঐ অণুর পরিধিস্থলে এবং মধ্যবর্ত্তী স্থানে তাহার বিপরীত প্রকারের তড়িৎ। কিন্তু সর্ব্বত্রই তড়িৎই। বস্তুর অণু যেন সৌরমণ্ডল। যেমন এই মণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে সূর্য্য এবং নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দূরে দূরে গ্রহগণ অবস্থিত, এবং যেমন ঐ গ্রহগণ সূর্য্যের চারিদিকে বৃত্তাভাস পথে ভ্রমণ করিতেছে, তেমনি বাস্তব অণুর কেন্দ্রস্থলে তড়িদণু এবং তাহা হইতে বিভিন্ন ব্যবধানে তড়িদণু সকল বিদ্যমান থাকিয়া কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। শেষোক্ত তড়িদণুকে ইলেক্‌ট্রণ্ বলে। এই ইলেক্‌ট্রণ্ সকল সময়ে সময়ে উল্কার মত ছুটিয়া স্বীয় ভ্রমণ-পথ হইতে বাহির হইয়া যায়।

দেখা যাইতেছে যে, বস্তুর অণু দ্বিবিধ তড়িদণু দ্বারাই গঠিত। বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ অধ্যাপক রিগি (Righi) বলেন যে—

Matter is made of Electrons and Electrons

are not matter in the ordinary acceptance of the term. *

বস্তুর অণু তবে তড়িদণুপুঞ্জ মাত্রই হইতেছে এবং সে তড়িদণু সকলও ইলেকট্রণ্। তড়িৎ তো বস্তু নহে। সুতরাং বস্তু অবস্তুই হইয়া গেল। তবে থাকিল কি? থাকিল কেবল গতি। এই নিমিত্তই বলিয়াছি যে বস্তু কেবল গতিমাত্রই। গতি বলিতে স্থান হইতে স্থানান্তর প্রাপ্তি বোধ করে। দ্রুত গতিই হউক, মন্দ গতিই হউক, গতি হইলেই তাহার একটি বেগ থাকে। এই বেগের হ্রাস-বৃদ্ধি না হইয়া সমভাব হইলে তাহাকে সমবেগ (১) বলা যায়; এবং বেগ নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় বাড়িলে তাহাকে বর্দ্ধিত বেগ (২) বলা যায়। গতি সরল রেখাক্রমে হইতে পারে। এরূপ গতিকে সরল গতি বলে। গতি অসরল রেখাক্রমেও হইতে পারে; অর্থাৎ বক্ররেখাক্রমে কিম্বা বৃত্তাকারে কিম্বা বৃত্তাভাসক্রমে হইতে পারে।

আর একটি কথা। যাহা এক ব্যক্তির সম্বন্ধে গতি, তাহা অন্য ব্যক্তির সম্বন্ধে গতি নাও হইতে পারে। কোন ব্যক্তি নৌকায় চড়িয়া নদী-স্রোতে সরলরেখাক্রমে সমবেগে ভাসিয়া যাইতেছে। নীরবে নিঃশব্দে স্থির ভাবে নৌকা স্রোতের দিকে ভাসিয়া চলিয়াছে। এক ব্যক্তি নদী-তীরে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতেছে। নৌকা ক্রমে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল; ক্রমে নৌকা, তাহার সম্মুখ হইতে দূরে সরিয়া গেল। তাহার সম্বন্ধে এই স্থানপরিবর্ত্তনই নৌকার গতি এবং প্রতি মিনিটে নৌকা যত হাত দূরে যাইতেছে তাহাই নৌকার বেগ। কিন্তু আরোহী নৌকায় যেখানে বসিয়া আছে, সেইখানেই বসিয়া আছে। নৌকা তাহার সম্বন্ধে কিছুমাত্র স্থান পরিবর্ত্তন করে নাই। সুতরাং তাহার সম্বন্ধে নৌকার কোন গতি নাই। ঐ আরোহী ব্যক্তি যদি চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাকে, তবে নৌকা যে চলিতেছে তাহাও সে বুঝিতে পারিবে না, কারণ নৌকা নিঃশব্দে স্থির-ভাবে সরল গতিতে সমবেগে চলিয়াছে। নৌকা নদী-তীরে বাঁধা থাকিলেও সে যেরূপ অনুভব করিত, এ ক্ষেত্রেও তদ্রূপই অনুভব করিতেছে। সে কোন প্রকারেই বুঝিতে পারিবে না যে নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে। সে বুঝিবে নৌকা স্থির হইয়া আছে। কিন্তু যখন সে চক্ষু খুলিয়া তীরের দিকে তাকাইবে, কেবলমাত্র তখনই সে বুঝিতে পারিবে যে নৌকা স্থির হইয়া নাই, স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে।

এই দৃষ্টান্ত হইতে দুইটি কথা বুঝা গেল;—প্রথমতঃ নৌকাখানি আরোহীর পক্ষে স্থির, কিন্তু তীরের ব্যক্তির সম্বন্ধে গতিবিশিষ্ট। দ্বিতীয়তঃ আরোহী নৌকায় বসিয়া চক্ষু মুদিয়া নৌকার গতি বুঝিতেই পারিল না; কিন্তু চক্ষু খুলিয়া তীরের দিকে তাকাইলে বুঝিতে পারিল। নচেৎ নৌকা যে গতি-বিশিষ্ট ইহা তাহার বুঝিবার কোন উপায় নাই।

এই দুইটী কথাকে একত্র করিয়া বলা যাইতে পারে যে, গতি স্বয়ং জ্ঞানগম্য নহে, অপর কিছুর সহিত সম্বন্ধ রাখে; এবং সেই অপর কিছুর সাহায্যে জ্ঞানগম্য হয়। ইহাকে মোটামুটি গতিবিষয়ক সম্বন্ধবাদ বলা যাইতে পারে।

আর একটী দৃষ্টান্ত দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। এ দৃষ্টান্ত ঠিক নৌকার দৃষ্টান্তের মত সহজ হইবেনা। এক নিষ্ঠুর ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে একটি গোলার মধ্যে বসাইয়া গোলার সহিত উত্তমরূপে আট্‌কাইয়া দিয়া প্রবেশদ্বার বন্ধ করিয়া দিল। বন্ধ লোকটি রুদ্ধ বায়ুতেও জীবিত থাকিবার শক্তি রাখে। তার পর ঐ নিষ্ঠুর ব্যক্তি কোন কলকৌশল দ্বারা গোলাটীকে সরল গতিতে ও সম গতিতে নিঃশব্দে অচঞ্চলভাবে চালাইয়া দিল। গোলাটি কিছুদূর চলিয়া গেল। এ স্থলে যে হতভাগ্য ব্যক্তি গোলার মধ্যে বন্ধ হইয়া বসিয়া আছে, সে বুঝিতেই পারিবে না যে এ গোলা চলিতেছে।

রেল গাড়ীতে যাইবার সময় অনেকেই ঈদৃশ দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন। গাড়ী যখন রেলের উপর দিয়া মন্দ গতিতে অথবা দ্রুতগতিতে শান্তভাবে ও নিঃশব্দে যাইতে থাকে, তখন আমরা পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষ, গৃহ অথবা তদ্রূপ কোন স্থির বস্তুর দিকে না তাকাইলে বুঝিতে পারি না যে গাড়ী চলিয়াছে। সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষাদির দিকে তাকাইলে বুঝিতে পারি যে গাড়ী চলিয়াছে। ষ্টেশন-প্লাটফর্ম্মের নিকট যখন ধীরে ধীরে নিঃশব্দে গাড়ী চলিতে আরম্ভ করে, তখন এই অবস্থাই হয়। বাহিরের দিকে না তাকাইলে বুঝিতে পারা যায় না যে গাড়ী চলিল।

---

* Modern Theory of Physical phenomena r plus, minus.

১. Uniform Velocity

২. Accelerated Velocity

এই ত গেল গতিশীল একটী বস্তুর কথা। এক্ষণে উপরের ন্যায় গতিবিশিষ্ট অর্থাৎ সরল ও সমগতিবিশিষ্ট দুইটী বস্তুর কথা বিবেচনা করা যাউক। তৎসহ উভয়ের সম্বন্ধে যে বস্তু স্থির প্রতিভাত হয় তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে। একটি পথের উপর একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সম্মুখ দিয়া সরল ও সমগতিতে একখানি রেলগাড়ী চলিয়া যাইতেছে। সেই সময় আকাশে একটী কাকও উড়িয়া যাইতেছে। ঐ দণ্ডায়মান ব্যক্তির নিকট যেরূপ গতি সরল এবং সমগতি বলিয়া বোধ হইবে, তদ্রূপ গতিতে ঐ কাকটী উড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু রেলগাড়ী হইতে যদি কেহ ঐ কাকের দিকে দৃষ্টি করে, তবে সে ঐ গতি কিরূপ দেখিবে? যদিও সে কাকের গতিবেগ এবং গতির দিক দণ্ডায়মান ব্যক্তি হইতে পৃথক দেখিবে, তথাপি সেও ঐ ব্যক্তির ন্যায়ই কাকের সরল ও সমগতিই দেখিবে।

এক্ষণে, পৃথিবী হইতে আকাশস্থ কোন পদার্থের স্থান নির্দ্দেশ করিতে উদ্যত হইয়াছি। কিরূপে করিব? পৃথিবী হইতে সে স্থানে যাইতে পারিলে সমস্ত দূরত্বটা হাতকাঠি দিয়া মাপিতে মাপিতে যাইতে পারিতাম। কিন্তু তাহা ত সম্ভব নহে। এ নিমিত্ত পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে যন্ত্র দ্বারা আলোকের সাহায্যে আকাশস্থ ঐ বস্তুটী দেখিয়া লইলাম; তৎপর আলোকের গতিবেগ গণনার সাহায্যে ঐ বস্তুটীর দূরত্ব নির্ণয় করা কঠিন হয় না। ক ও খ পৃথিবীর উপরে দুইটী অদূরবর্ত্তী স্থান। আকাশস্থ বস্তুটী গ। ক ও খ একটী সরল রেখার দুইটী প্রান্ত অনুমান করা যাইতে পারে, যদিও প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী গোলাকার। ক হইতে এবং খ হইতে গ-কে যন্ত্র সাহায্যে দেখিয়া লইলাম। সুতরাং "ক" এবং "খ"এর নিকট যে দুইটী কোণ পাওয়া গেল, তাহা কত ডিগ্রির কোণ তাহাও বুঝিতে পারিলাম। এক্ষণে গ হইতে পৃথিবীর উপর গঘ একটী লম্বপাত করিলাম কল্পনা করিলে গঘ রেখা কখ রেখার সহিত যে দুইটী কোণ উৎপন্ন করে সে দুইটীই সমকোণ। কগ এবং খগঘ দুইটী ত্রিভুজ; দুইটীরই কোণত্রয়ের এবং এক একটী বাহুর পরিমাপ আমরা জানি। সুতরাং গঘ রেখার মাপও আমরা গণনার দ্বারা স্থির করিতে পারি।

কিন্তু এভাবে স্থির না করিয়া অন্য ভাবেও করা যায়। আমরা পৃথিবীর কোন স্থানে, (ক স্থানেই হউক অথবা খ স্থানেই হউক) তিনটী সমতল ক্ষেত্র এরূপ ভাবে কল্পনা করিতে পারি যে, উহারা পরস্পরের সহিত সমকোণে অবস্থিত। পরে, আকাশস্থ ঐ বস্তুটী হইতে ঐ তিনটী সমতলের উপর তিনটী লম্বপাত করা হইল এরূপ কল্পনা করিতে পারি। এই তিনটী লম্ব রেখারই পরিমাপ আমরা পূর্ব্বের ন্যায় গণনার দ্বারা স্থির করিতে সমর্থ হই। ঐ তিনটী লম্বকে co-ordinate অথবা স্থান-নির্দ্দেশক লম্ব বলা যাইতে পারে। (৩)

বস্তুর স্থান এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। ঘটনা যখন বস্তুরই ঘটে, তখন ঘটনাস্থানও এইরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। মোটামুটী কথাটা এইভাবে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়।

এখন একবার পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিতে হইবে। আকাশস্থ কাকের স্থান নির্দ্দেশ করিতে পৃথিবীর কোন স্থান হইতে তিনটী co-ordinate বিবেচনা করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কাকের গতিপথের প্রত্যেক স্থান ঐ co-ordinate মূলেই নির্দ্দেশ করা যায়। পথিমধ্যে দণ্ডায়মান ব্যক্তি হইতে ঐ তিনটী co-ordinate কল্পনা করা গেল। ঐ ব্যক্তির সম্মুখস্থ রেলগাড়ীর গতিপথও তাহার সংলগ্ন ঐ তিনটী co-ordinate হইতে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। সুতরাং 'ঐ ব্যক্তি কাকের গতিকে সরল ও সমগতি দেখিতেছেন, রেলগাড়ীস্থ ব্যক্তিও কাকের গতিকে সরল ও সমগতি দেখিতেছেন," এ কথা সাধারণ সূত্রাকারে ব্যক্ত করিতে গেলে এইরূপে ব্যক্ত করা যায়:—সরল ও সমগতিবিশিষ্ট co-ordinate হইতে কোন বস্তু সরল ও সমগতিযুক্ত বোধ হইলে অপর co-ordinate হইতেও ঐ বস্তু সরল ও সমগতিযুক্ত প্রতিভাত হইবে, যদ্যপি এই শেষোক্ত co-ordinate পূর্ব্বোক্ত

---

৩ This (The Cartesian system of co-ordinates) consists of three plain surfaces perpendicular to each other and rigidly attached to a rigid body. Referred to a system of co-ordinates, the scene of any event will be determined (for the main part) by the specification of the lengths of the three perpendiculars or co ordinates which can be dropped from the scene of the event to those three plain surfaces—Einstein: The Theory of Relativity; English translation by Dr. Lawson, 5th. Edition, page 7.

co-ordinate-এর সম্বন্ধে সরল ও সমগতিবিশিষ্ট হয়। এই কথাই অন্য ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, দুইটী সরল ও সমগতিবিশিষ্ট co-ordinate শ্রেণী হইতে প্রাকৃতিক ঘটনা সকল একরূপই প্রতিভাত হইয়া থাকে। ইহাকেই আয়েনষ্টাইনের উদ্ভাবিত অথবা কল্পিত সম্বন্ধবাদের সংকীর্ণ অথবা বিশেষ বিধি বলা যায়।

উপরে যে নৌকার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে প্রতিভাত হইবে যে, গতি স্বয়ং জ্ঞাতব্য নহে, দ্রষ্টার অবস্থানের সহিত সম্বন্ধ রাখে। আর একটী বিধিও সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; তাহা এই :—

সূর্য্যরশ্মির গতিবেগের হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। ঐ রশ্মির উৎপত্তি-স্থানের গতির অথবা গতিহীনতার সহিত ঐ বেগের কোন সংশ্রব নাই।

এই দুইটী স্বীকার্য্য অবলম্বন করিয়া আয়েনষ্টাইনের উদ্ভাবিত সম্বন্ধবাদের বিশেষ-বিধি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই বিধিটীর সত্যতা সহজে প্রতিভাত হয় না। যদি বলি "একটী গতিহীন রেলওয়ে এঞ্জিনের অগ্রভাগে বসিয়া একটী বল (Ball) বেগে নিক্ষেপ করিলে এবং ঐ এঞ্জিনটী দ্রুতবেগে সম্মুখে অথবা পশ্চাৎ দিকে চলমান অবস্থাতেও তাহার অগ্রভাগে বসিয়া ঐ বলটীকে ঠিক পূর্ব্ববৎ বেগেই নিক্ষেপ করিলে উহার গতি-বেগ পূর্ব্ববৎই থাকিবে," তাহা হইলে কথাটী সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না। কিন্তু বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ Michelson ও Morley কৃত যান্ত্রিক পরীক্ষার ফল বিবেচনা করিলে অবশ্যই প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবী সূর্য্য-রশ্মির দিকেই অগ্রসর হউক অথবা তাহা হইতে দূরেই পশ্চাৎপদ হউক অথবা তাহার সহিত সমকোণেই ধাবিত হউক, ঐ রশ্মির বেগের তারতম্য হইবে না। এই পরীক্ষা স্মরণ করিলে উল্লিখিত বিষয়ের সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। ফলে আয়েনষ্টাইনের উদ্ভাবিত বিশেষ বিধিও স্বীকার করিতে হয়।

তাঁহার উদ্ভাবিত সম্বন্ধবাদের সাধারণ বিধি কেবলমাত্র সরল ও সমগতিবিশিষ্ট বেগের প্রতি প্রযোজ্য নহে; উহা বৃত্তাকার গতি কিম্বা বৃত্তাভাস গতি ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার গতি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। এই বিধি অবলম্বন করিলে বিস্তৃত গণনার দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, মাধ্যাকর্ষণ, তড়িৎ শক্তি, চৌম্বক শক্তি, তাপ ও আলোক প্রভৃতি সম্বন্ধে আমরা যে সকল বিধি-নিয়ম পাইয়াছি, তাহা ঐ সকল শক্তির কল্পনা না করিয়াও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সম্বন্ধবাদ সংক্ষেপে বলিতে গেলে গতিবেগেরই তত্ত্ব। সকল গতিই স্বয়ং জ্ঞাতব্য নহে, অপর কিছুর সহায়তা লইয়া জ্ঞাত হইতে হয়। ইহার সহিত সূর্য্যরশ্মির সম্বন্ধে উপর্য্যুক্ত বিধির যোগ করিলে জটিল গণনার দ্বারা বিশ্বের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে বিস্ময়কর তত্ত্ব সকল জ্ঞাত হওয়া যায়। তাহা যথাসম্ভব পরে বিবৃত করিব।

ব্রতচারিণী

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

১১

সে দিন আকাশে ঘন ঘোর মেঘ সাজিয়া আসিয়াছিল, থাকিয়া থাকিয়া কালো মেঘের গা বাহিয়া ঝর ঝর করিয়া বৃষ্টিধারা ধরার বুকে নামিয়া আসিতেছিল। আশ্বিনের প্রথম, বর্ষার সময় অতীত হইয়া গেলেও আকাশ এখনও পরিষ্কার হয় নাই। অদূরে কূলে কূলে পূর্ণা নদী তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিয়াছে। তাহার বুকের উপর দিয়া ছোট বড় কত নৌকা হেলিয়া দুলিয়া তরঙ্গের তালে তালে নাচিয়া যাওয়া আসা করিতেছে। ওপারের দৃশ্যটী তখন বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। কালো মেঘগুলি স্তর বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই স্তরের ফাঁকে ফাঁকে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইতেছে, একদিকে উঠিয়া নিমেষে অন্য পার্শ্বে ছুটিয়া লয় হইয়া যাইতেছে, আবার উঠিতেছে আবার মিলাইতেছে। নীচে ও-পারে এ-পারে বাবলা গাছগুলি প্রায় আগাগোড়া হরিদ্রা রংয়ের ফুলে সাজিয়া দাঁড়াইয়া আছে। উড়িতে উড়িতে শ্রান্ত

পাখী গাছের ডালে বসিবা মাত্র তাহার ভরে পাতা ও ফুল হইতে টুপ টুপ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে, কখনও বৃন্তচ্যুত ফুল খসিয়া পড়িতেছে। কালো মেঘের নীচে গাছভরা ফুল বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। উপরে কালো মেঘের স্তর, তাহার বুকে বিদ্যুতের খেলা। নীচে তাহারই ছায়া বুকে ধরিয়া নদী চলিয়াছে ; দর্শক-রূপে গাছগুলি দাঁড়াইয়া সেই অসীম সৌন্দর্য্য দেখিয়া লইতেছে।

ছোট বড় বাবলাগাছের মাঝখান দিয়া ঘাটে আসিবার সরু পথটী। দুধারে ছোট বড় জঙ্গলে পূর্ণ রেখার মত সেই সরু পথটী আঁকিয়া বাঁকিয়া আসিয়া নদীর বালুকাময় ঘাটে শেষ হইয়া গিয়াছে। ও-পারের গ্রামবাসিনীরা মাঝে মাঝে কলসী কক্ষে সেই সরু পথটী বাহিয়া আসিতেছে, নদীর কালো জলে ঢেউ দিয়া কলসী পূর্ণ করিয়া জল লইয়া মন্থর গতিতে সেই পথে ফিরিয়া যাইতেছে। এই পথটী কোথা হইতে আসিয়াছে তাহা জানা নাই। জমীদার বাটীর মেয়েরা ছাদে দাঁড়াইয়া অথবা জানালায় উঁকি দিয়া পথ দেখিতে পায়, মেয়েদের দেখিতে পায়, গ্রাম কোথায় তাহা দেখিতে পায় না। ইহাদের সম্বন্ধে তাহারা বিশেষ কিছু সংবাদ রাখে না। জানে এইটুকু—এখানে দাঁড়াইলে উহাদের দেখিতে পাওয়া যায়।

সীতা নীরবে খোলা জানালার পার্শ্বে বসিয়া শ্রান্ত-নেত্রে প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্য্যের পানে চাহিয়া ছিল। আজ তাহার মুখটা বড় গম্ভীর, তাহার চির-পরিচিত হাসি আজ মুখে ছিল না। দৃষ্টি তাহার বড় উদাস, এই অনন্ত সৌন্দর্য্য আজ সে যেন অনুভব করিতে পারিতেছিল না, শুধু দেখিয়া যাইতেছিল। আজ আকাশে যেমন নিকষ কালো মেঘ সাজিয়া আসিয়াছে, পৃথিবীর মুখের হাসি যেমন মুছিয়া দিয়াছে, বাড়ীখানার উপরও তেমনি বিষাদ অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। আকাশের মেঘ আবার কাটিয়া যাইবে, তরুণ সূর্য্যের অরুণ আলোয় ধরার মুখ আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, এ বাড়ীর উপর যে বিষাদ ঘনাইয়া আসিয়াছে, যে মেঘ সকলের হৃদয়াকাশে কঠিন হইয়া জমা হইয়াছে, তাহা কোন দিন কাটিয়া যাইবে ?

খানিক আগে বেশ একপসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়া এখন আকাশ থম থম করিতেছে। সন্ধ্যার দিকে আবার বৃষ্টি নামিবে তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। পথে ঘাটে জল জমিয়াছে। দিবাশেষে সেই জলের মধ্য দিয়া, পল্লীসুলভ তালপাতার ছাতা মাথায় রাখাল বালক গরু লইয়া গৃহে ফিরিতেছে,—তাহাদের গরু তাড়ানোর শব্দ কাণে আসিতেছে। কোন রাখাল বালক গান ধরিয়াছিল—

কেউ কারও নয় দেখ না চেয়ে
কবে ফুটবে আঁখি।

তাহার মেঠোসুরের গানটী বড় মধুর হইয়া কাণে বাজিতেছিল,। গায়ককে দেখিবার জন্য যতদূর দৃষ্টি চলে সীতা চাহিয়া দেখিল—দেখা গেল না।

গত বৎসর পূজার সময় জমীদার বাড়ীতে সখের থিয়েটার কর্ত্তৃক বিল্বমঙ্গল প্লে হইয়া গিয়াছিল। এক বৎসর অতীত হইয়া গেলেও গানগুলা এখনও এই পল্লীগ্রামে পুরাতন* হয় নাই।

গানটা সীতাও জানিত ; কিন্তু সে জানিয়া রাখা মাত্র। আজ এই রাখাল বালক কর্ত্তৃক মেঠোসুরে গেয় গানের একটী লাইন মাত্র যেমন ভাবে তাহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইল এমন আর কোন দিনই হয় নাই।

দোষ কাহারও নয়,—দোষ তাহার নিজের। সে স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিতেছে—ইহার জন্য কাহাকেও দোষী করা যায় না। সে কেন এখানে আসিল, কেন মাসীমার কাছে গেল না ? এখানে সে অজস্র আদর পাইতেছে, এত আদর যে তাহার অসহ্য। বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা জাগে—কাহার জিনিস কে লইতেছে ? সে কোথা হইতে আসিল, জ্যোতির্ম্ময়ের স্নেহময়ী মা ও দাদুকে কাড়িয়া লইল ? হয় তো তাহারই জন্য সে পর হইয়া গেল, তাহারই উপর রাগ করিয়া সে বহু দূরে সরিয়া গেল, যেখানে তাহার নাগাল পাওয়া যাইবে না।

অভিমানে সীতার চোখ দুইটী ছল ছল করিতে লাগিল,—কেন, সে তো বিবাহ করিতে চায় নাই,—সে নিশ্চয়ই ঠিক করিয়াছিল এমনই ভাবে জীবন কাটাইয়া দিবে। কেন, অনেক কুলীন-কন্যাই তো অবিবাহিত জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, কুলীন-কন্যার সে অধিকার সমাজে প্রশস্ত রহিয়াছে যে, উপযুক্ত পাত্রাভাবে তাহারা অবিবাহিতাও থাকিতে পারে। যতদিন সে না আসিয়াছিল ততদিন তো জ্যোতির্ম্ময় যায় নাই! আজ সে আসিয়াছে

দেখিয়া—পাছে তাহাকে বিবাহ করিতে হয় সেই ভয়ে পলাইয়াছে।

মনে পড়িল, আজ তাহার বাল্যসঙ্গিনী রমা একখানা পত্র দিয়াছে। পত্রখানা তাড়াতাড়ি একবার দেখিয়া লইয়া বাক্সের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছে, ভাল করিয়া সেখানা পড়াও হয় নাই।

জ্যোতির্ম্ময় যে সীতার নির্ব্বাচিত স্বামী তাহা রমা জানিত। ইহা লইয়া সে সীতাকে কত দিন কত বিদ্রূপ করিয়াছে। এখানে আসিয়াও সীতা তাহার বিদ্রূপ এড়াইতে পারে নাই। আষাঢ় মাসে বিবাহের কথা ছিল। বিবাহ যে হয় নাই ইহা আত্মীয়-বন্ধু সকলেই শুনিয়াছিল। অনেকে জানিয়াছিল, বিবাহ অগ্রহায়ণ মাসে হইবে, রমাও তাহা জানিত।

জ্যোতির্ম্ময়ের সংবাদ সে তাহার দাদার নিকট পাইত,—তাহার দাদা জ্যোতির্ম্ময়ের বন্ধু ছিলেন। জ্যোতির্ম্ময় যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে এবং দেবযানীকে বিবাহ করিয়া বিলাতে যাইবে, এই সংবাদে সে অতিরিক্ত রকম আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল এবং সীতাকে পত্র দিয়াছিল।

রমা লিখিয়াছে—

সত্যই আমি জ্যোতির্ম্ময় বাবুর পরিচয় পেয়ে ভারি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি সীতা। অমন সুন্দর আকৃতির ভিতরে যে এতটা গরল থাকতে পারে, ওর মধ্যে যে শয়তান বাস করতে পারে, তা আমার জানা ছিল না। এখন দেখছি যারা সুশ্রী তাদেরই মন বড় খারাপ। ওরা সব করতে পারে। আমরা সবাই জানি, জ্যোতি বাবু তাঁর বাগ্‌দত্তাকেই গ্রহণ করবেন, আমরা জানি—কি সৌন্দর্য্যে, কি শিক্ষায়, কোন অংশেই তুমি তাঁর অনুপযুক্তা নও। দুর্ভাগ্য তাঁর,—যে আজীবন কাল তাঁরই প্রতীক্ষায় বসে আছে, তাকে অবহেলা করে—দুদিনের পরিচিতা একটী মেয়েকে জীবনের সঙ্গিনীরূপে বরণ করে নিচ্ছেন। এর আভ্যন্তরিক পরিচয় তিনি পাননি, বাহ্যিক পরিচয় অতি সামান্য পেয়েছেন। এতে যিনি মুগ্ধ হয়ে যেতে পারেন—বোঝা যায়, কোন দিন তাঁর এ মুগ্ধ ভাব দূর হয়ে যাবেই। আর আজীবনকাল তাঁকে তাঁর এই ভুলের জন্যে কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এ রকম ভালবাসার পরিণাম এই রকমই হয়; হঠাৎ এত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে যে কূল ছাপিয়ে ছুটে যায়, আবার যখন শুকাবে তখন বিন্দুমাত্র থাকে না।

শুনলুম, তিনি না কি এই মেয়েটীকে এত ভালবেসেছেন যে, একে না পেলে তাঁর জীবন একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে। যে এতটুকু বেলা হ'তে স্বামীরূপে তাঁকে দেখছে, ভক্তি শ্রদ্ধা প্রেম যে হৃদয়ের মধ্যে জমিয়ে রেখেছে, তার সে অর্ঘ্য তিনি ঠেলে ফেললেন কেমন করে? কি নির্ম্মম অন্তঃকরণ এই পুরুষদের! এরা নারীর সুখ-দুঃখের পানে চায় না। নিজেদের সুখ-দুঃখ-বোধ তাদের এতই বেশী যে, তাই নিয়ে অধীর হয়ে থাকে। নারী যে ভালবেসে সব ছাড়তে পারে, এমন দৃষ্টান্ত আমাদের এ দেশে অনেক পাওয়া যায়। হিন্দুর ঘরের ব্রহ্মচারিণী বিধবারাই তা দেখাচ্ছেন। এই মরা ভারতের বুকে এই ত্যাগশীলা মায়েরা রয়েছেন বলেই ভারতের বুকে আজও একটু স্পন্দন অনুভূত হয়। ভারতের মেয়ে যে দিন ভালবেসে আত্মসুখ ত্যাগ করতে ভুলে যাবে, সে দিন ভারত একেবারেই মরে যাবে। এই দেশের পুরুষদের কেউ কেউ নারীকে বড় কম নির্য্যাতন করে না; কিন্তু নারী যেমন ভাবে সব সয়ে যায়, অন্য দেশের মেয়েরা কখনই সে রকম ভাবে সয়ে যায় না এই হচ্ছে অন্য দেশের মেয়েদের সঙ্গে এ দেশের মেয়েদের যা পার্থক্য। এর কারণ ভারতীয় নারীর একনিষ্ঠ প্রেম—যাকে সতীত্ব বলা যায়। এ কথা বলতে পারব না যে অন্য দেশের কোন মেয়ের এই একনিষ্ঠ প্রেম নেই। কিন্তু সে রকম মেয়ে খুবই কম দেখা যায়। পাশ্চাত্য দেশের মেয়েদের অধিকাংশ স্বামী মারা গেলে বিয়ে করতে পারে। অনেকে ক্রমান্বয়ে পাঁচ সাতটীও বিয়ে করে থাকে; অথচ সকলকেই এমন ভাব দেখায় যেন অত্যন্ত ভালবাসে। একে কি প্রেম বলা যায়? ভালবাসা দুই রকমের আছে; এক স্বর্গীয়, এর ধ্বংস নেই,—এ চির-কাল অটুট থাকে, ভালবাসার পাত্রের অভাবজনিত কোন ক্লেশ এতে অনুভব করা যায় না,—একেই প্রেম বলে। আর এক রকম আছে, অন্ত্যজ ধরণের, যাকে আমরা কামজ ভালবাসা বলি, যার জন্যে অনেক গৃহ শ্মশানে পরিণত হয়ে যায়। এই সব মেয়ে বাল্য হতে শিক্ষা পায় না—স্বামীকে দেবতা বলে শ্রদ্ধা ভক্তি করতে হয়। সেই জন্যে তারা স্বামীকে সাথী বলেই ভেবে নেয়; আর সেটা সাময়িক ও সাংসারিক বলেই ভাবে। ওরা অনেকে পরজন্ম বা আত্মার অস্তিত্ব

মানতে চায় না, এই জীবনটাকে যথেষ্ট ও শেষ বলে মনে করে—তারই ফলে তাদের এই অবনতি। এ দেশের মেয়ে ছোটবেলায় জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা পায়—স্বামী দেবতা, স্বামী পরম গুরু। বড় হয়েও এ শিক্ষা তাদের যায় না, মজ্জাগত হয়ে দাঁড়ায়। এ দেশ সতীর,—সতীত্ব এ দেশের মজ্জাগত জিনিস। এরা মরলেও একনিষ্ঠ প্রেমের সাধনা ত্যাগ করতে পারে না।

জ্যোতিবাবু তো সোজা পথ চিনে নিলেন। এখন তুমি কি করবে আমি তাই জিজ্ঞাসা করছি।

সীতা আর পড়িল না, পত্রখানা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া উদাস দৃষ্টিতে কোন দিক পানে চাহিয়া রহিল। অল্পে অল্পে তাহার চক্ষু দুইটী অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল,—ক্রমে চোখ ছাপাইয়া বর্ষার ধারার মতই ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

সে যে জ্যোতির্ম্ময়ের উপযুক্ত নহে তাহা তো বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই সে জানে। জ্যোতির্ম্ময়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট না জানিতে পারিলেও যে একটা আভাস পাইয়াছিল, তাহাতেই পিছনে সরিয়া গিয়াছিল; আর এক তিল অগ্রসর হইবার সাহস তাহার হয় নাই। সে নিজে তো বিবাহ করিতে চায় নাই। জ্যোতির্ম্ময় যখন অন্ধকার পূর্ণ মুখে বাড়ী হইতে চলিয়া গেল, তখন কতবার সে ভাবিয়াছিল, তাহাকে বলিবে —কেন সে ছুটী থাকিতেও চলিয়া যাইতেছে? তাহার জন্যই যে জ্যোতির্ম্ময় পলাইতেছে, তাহা সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিল। সে তখন বলিতে চাহিয়াছিল, জ্যোতির্ম্ময় এখানেই থাক,—সে না হয় মাসীমার কাছে চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু হায় রে, কথা মুখে আসিয়া মিলাইয়া গিয়াছিল,—কম্পিত চরণ দুইটী কিছুতেই দেহখানাকে জ্যোতির্ম্ময়ের সম্মুখে বহিয়া লইয়া আসিতে পারে নাই।

সে দেবযানীকে বিবাহ করিবে তা করুক না কেন, কিন্তু কেন সে কথা মনে করিতে অব্যক্ত যন্ত্রণায় বুকটা ফাটিয়া যায়? সে তাহার পূজার অর্ঘ্য সাজাইয়া দেবতার আসার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল,—শূন্য মন্দির পড়িয়া রহিল, দেবতা তো আসিল না, সে অর্ঘ্য লইল না। তাহার প্রেম-অর্ঘ্য পদাঘাতে ফেলিয়া দিয়া সে অন্য একটী নারীকে বরণ করিয়া লইতে চলিয়াছে। সেই নারীই তাহার জীবনের সঙ্গিনী হইবে। আর সে—অনাদৃতা, অপমানিতা নারী দূরে দাঁড়াইয়া তাহাদের পানে তাকাইয়া আজীবন ব্যর্থ বেদনা বুকে চাপিয়া নীরবে চোখের জল মুছিয়া যাইবে। ভগবান্—!

ভগবানকে ডাকিয়াই সে চমকাইয়া উঠিল,—না না, সে করিতেছে কি, ভগবানকে ডাকিয়া জ্যোতির্ম্ময়ের অমঙ্গল কামনা করিতেছে যে। সে সুখী হোক ভগবান, বিবাহিত জীবন তাহার সুখময় হোক। দাদুর আদেশে সীতাকে জীবন-সঙ্গিনী করিলে সত্যই তাহার জীবন শ্মশান হইয়া যাইত, তাহার মুখের হাসিও মিলাইয়া যাইত। সে দাদুকে যেরূপ ভয় করিত তাহাতে সীতা বা মা কেহই ভাবিতে পারেন নাই, মরিয়া হইয়া সে সেই দেবযানীকেই বিবাহ করিয়া ফেলিতে পারিবে। সীতা ভালবাসিয়াছে, তাহার একনিষ্ঠ প্রেম অর্ঘ্যরূপে দেবতার পায়ের তলায় নিঃশব্দে জড় হোক, দেবতা যেন জানিতে না পারে। সে তাহার জীবন-ভোর এমনই নীরবে সমস্ত জীবন ঢালিয়া পূজা করিয়া যাইবে,—তাহার সাধ, আনন্দ, হাসি সবই সে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিবে। জ্যোতির্ম্ময় তাহাকে বিবাহ না করুক, তাহাকে ঘৃণা করুক, তাহাতে কি আসিয়া যায়? শ্রীধর, হৃদয়ে বল দিয়ো, যেন সকল আঘাত সে নীরবে সহ্য করিতে পারে,—ব্যর্থতা যেন তাহাকে ছাপাইয়া না উঠিতে পারে। সীতা যেন বিচলিত না হয়, সীতা যেন ভাঙ্গিয়া না পড়ে, সীতা যেন অটুট হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে।

চকিতে মনে পড়িয়া গেল দাদুর কথা। সীতা তাহার সমস্ত অন্তরখানি দিয়া দাদুর বেদনা অনুভব করিল।

এই বৃদ্ধ,—কি না ছিল ইঁহার! একে একে সব হারাইয়াছেন, তবু ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই তো। বিক্ষিপ্ত মনটাকে কুড়াইয়া আনিয়া তিনি শ্রীধরের উপর ঢালিয়া দিয়াছেন, সব হারানোর ব্যথা দাগ দিয়াও দিতে পারিতেছে না,—স্থায়ীভাবে আসন লইতে পারিতেছে না। কি আশ্চর্য্য শক্তি এই বৃদ্ধের। অমনি শক্তি চাই প্রভু,—যেন কোন দুঃখ স্থায়ীভাবে হৃদয়ে স্থান না পায়।

সন্ধ্যার অন্ধকার মলিন ধরার বুকে আকাশের গা বাহিয়া ঝরিয়া পড়িল। আকাশের মেঘ জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। নদীর পশ্চিমে স্তরে স্তরে যে কালো মেঘটা জমিয়াছিল, ইহারই মধ্যে সেই স্তরগুলি সারা আকাশময় ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। বিদ্যুৎ আকাশের এক কোণ হইতে উঠিয়া আর

এক কোণ পর্য্যন্ত ছুটিয়া যাইতেছিল। মাঝে মাঝে গুম গুম করিয়া মেঘ ডাকিতেছিল।

সীতা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ফিরিল।

১২

সন্ধ্যার সময়টায় ঈশানী অন্য দিন আহ্নিকে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া যান, আজও আহ্নিক করিতে বসিয়াছিলেন বটে, সে বসাই সার—কেন না আহ্নিকের মন্ত্র তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

সীতা নিকটে আসিয়া বসিল; তাহার বিবর্ণ মুখখানার পানে তাকাইয়া ঈশানী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গিয়েছিলে মা?"

তিনি তাহার মুখের পানে তাকাইয়া আছেন দেখিয়া সীতা তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইল, বলিল, "আজকের আকাশটা ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল মা, তাই দেখছিলুম।"

ঈশানী বাহিরের পানে তাকাইয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "তাই বটে। তুমি মা আশ্চর্য্য হয়ে আকাশের শোভা দেখছিলে,—আমিও দেখছিলুম, কেবল ভিন্ন ভাবে—এই যা প্রভেদ। আমি দেখছিলুম, মেঘগুলো চারিদিক হতে উঠে আকাশের গায়ে জমাট বেঁধে দাঁড়ায়, আকাশে যখন তাদের আর স্থান হয় না, তখন ঝর ঝর করে ঝরে পড়ে আকাশের বুক পাতলা করে দেয়। আমার মনের মেঘ শুধু জমাট বেঁধেছে, ঝরতে পারছে না, তাই পাতলা হতেও পারছে না। আকাশের মেঘ পরিষ্কার হবে, আবার সূর্য্য উঠবে; কিন্তু এ সংসারের মাথায় অদৃশ্যাকারে যে কালো মেঘ এসে জমছে, এ মেঘ আর কখনও পরিষ্কার হবে না, সূর্য্যও আর উঠবে না।"

আনমনাভাবে তিনি খানিকক্ষণ বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিলেন; অন্তরের আবেগ গলা পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আসিয়াছিল, তাহা দমন করিতে খানিকটা সময় লাগিল।

একটু পরে শান্তভাবে হাসিবার চেষ্টা করিয়া উদাস ভাবে তিনি বলিলেন, "থাক্ গিয়ে, তার কথা মুখে আর না আনাই ভাল। একটু মনে করতে গেলে আগাগোড়া সব কথাই মনে পড়ে, অমনি মুখেও সেইসব কথা ছাড়া আর কোন কথা আসে না। যত যা এড়াতে চাই তত তাই এসে পড়ে, আর সব ভাবনা পড়ে থাকে। আশ্চর্য্য মানুষের স্বভাব।"

হায় রে মায়ের মন; তুমি মনে করিবে না তো কে মনে করিবে মা? যে সন্তানকে দশ মাস গর্ভে ধরিয়াছ, আপনার সুখ দুঃখ ভুলিয়া গিয়া যাহার সুখ দুঃখে সুখ দুঃখ অনুভব কর, সে যে তোমার সকল ভাবনার উপরে। কোথায় কিছু হইতেছে, কে কি করিতেছে, এ কথা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সন্তানের কথাই মনে জাগিয়া উঠে। তোমার চিত্ত যে তাহারই জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র। সেই সন্তানের কথা—"ভাবিব না" বলিলেই কি সব ফুরায় জননী?

সীতা ব্যথিতনেত্রে মায়ের পানে চাহিয়া রহিল,—অনেকগুলি কথা বলিবার মত ছিল, একটাও বলা হইল না।

ঈশানী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ বুঝি মায়ের সেলাই হয় নি? বাবা জিজ্ঞাসা করছিলেন, রুমাল কয়খানা শেষ হয়েছে কি না।"

কুণ্ঠিতা হইয়া সীতা বলিল, "এই যে মা, এখনই শেষ করে দেব। একখানার এক দিক বাকি আছে, আর সবগুলো হয়ে গেছে। আজই রাত্রে দাদুকে সবগুলো দিয়ে দেব এখন।"

ঈশানী বলিলেন, "হ্যাঁ, আজকেই দিয়ে ফেলো, আর—"

বাধা দিয়া সীতা বলিল, "দাদু তো আমায় আর কাছে রাখতে রাজি হন না মা। ওবেলা যখন খেতে বসেছিলেন, তখন জিজ্ঞাসা করলুম—কেন তিনি আমায় আর তেমন করে কাছে ডাকেন না; গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে গেলে বলেন—দরকার নেই। তিনি একটু হেসে বললেন, "ওরে পাগলী, যাদের বড় আপনার ভেবেছিলুম নিজের বলে বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছিলুম, তারা সবাই একে একে চলে গেল, তোর ওপরে আর কি আমি ভরসা রাখতে পারি? কে জানে কবে আবার তুইও সকল বাঁধন কেটে উড়ে কোথায় চলে যাবি। তখন যে বড় সাংঘাতিক অবস্থা হবে। তার চেয়ে আগে হতেই ব্যবস্থা করে রাখি। তাঁর কথা শুনে আর সেই হাসি দেখে আমি আর তাঁর কাছে থাকতে পারিনি, আর কাছেও যাইনি মা।"

ঈশানী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন; বৃদ্ধের মনের অবস্থা তিনি যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলেন। জীবনের শেষ সময়ে যে সময়ে মানুষ বিশ্রাম চায়, পুত্র পৌত্রে পরিবৃত হইয়া শান্তিতে বাকি দিন কয়টা কাটাইয়া দেয়, সেই

সময়ে এই বৃদ্ধ সব হারাইয়া হাহাকার করিতেছেন। আজ ভগবানের নাম করিতে মুখে ভাসিয়া আসে পুত্রদের নাম, ভগবানের চরণ ধ্যান করিতে মনে জাগিয়া উঠে পুত্রদের মুখ। যাহারা প্রথম জীবনে সব পাইয়া শেষ জীবনে সব হারায় বাস্তবিকই তাহারা বড় অভাগা।

বেদনাপূর্ণ কণ্ঠে সীতা বলিল, "আর যে কয়টা দিন দাদু বাঁচতেন মা, এ আঘাত পেয়ে আর বাঁচবেন না। কত আঘাত মানুষ সইতে পারে? একটা দৃঢ়-মূল গাছও ক্রমান্বয়ে আঘাতে মাটীতে পড়ে যায়,—মানুষ এত আঘাত পেলে কি বাঁচতে পারে? মূলে অবিরত আঘাত পড়ে জীবনী-শক্তি শিথিল করে দিচ্ছে, কোন সময় উপড়িয়ে পড়বে ঠিক নেই।"

ঈশানী উত্তর দিতে গিয়া পারিলেন না, দন্তে অধর চাপিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন।

সীতা বলিতে লাগিল, "আপনিই বা কম কি করছেন মা? এই যে খান না, আমাদের লুকিয়ে এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে চোখের জল মোছেন—"

ঈশানী রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "এটা মা তোমার একেবারে গড়ানো কথা। আমি কি অনাহারে থাকি, না সত্যই কাঁদি?"

সীতা মুখখানা অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া বলিল, সে কথা আমি শুনব না মা, নিজের চোখে যা দেখছি, তা মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে পারব না। খাওয়ার সময় অনেক দিন আপনাকে অর্দ্ধেক খেয়ে উঠতে দেখেছি, নিত্য আপনার—সর্দ্দি, শরীর খারাপ লেগেই রয়েছে। আমি সামনে থাকলে আপনি চোখের জল ফেলতে পারেন না, কিন্তু অনেক দিন রাত্রে এক ঘুমের পর হঠাৎ জেগে উঠে আপনার দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনেছি মা। আপনাকে ডেকে ডেকে তার পর আপনি যে উত্তর দিয়েছেন, গলার সুরেই জানতে পেরেছি—আপনি কেন অত ডাকের পর তবে উত্তর দিয়েছেন।"

ঈশানী হাসিবার চেষ্টা করিলেন, হাসি ফুটিল না, মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিল মাত্র। তিনি বলিলেন, "এই কথা? কিন্তু তুমি বুঝতে ভুল করেছ মা, ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরতে মানুষ নানা রকম শব্দ করে থাকে, ঘুমের ঘোরে যে উত্তর দেওয়া যায় তা তেমন স্পষ্ট হয়ে ফোটে না—যেমন জ্যান্ত অবস্থায় পাওয়া যায়।"

সীতা বলিল, "আচ্ছা যাক মা,—আপনি যে এমনি ভাবেই কথাগুলো কাটাবার চেষ্টা করবেন তা আমি জানি। বলবেন—ঘুমের ঘোরে নিঃশ্বাস ফেলেন, অসুখ করে বলে খেতে পারেন না, রাত্রে মোটে ক্ষুধা থাকে না—"

ঈশানী বলিলেন, "পাগলী, তোমার তাই মনে হয় মা? একদিন না হয় খেলুম না, এতদিন না খেয়ে মানুষ থাকতে পারে?"

সীতা বলিল, "আর কেউ পারে না মা, কিন্তু আপনি পারেন। লোককে বুঝাতে একটু দেরী হয় না মা,—খাওয়া ঘুম সবই বুঝানো যায়, বুঝান যায় না শুধু চেহারাখানা দেখিয়ে। আপনার যে চেহারা হয়েছে সেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, অন্যে তো দেখতে পাচ্ছে।"

ঈশানী অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন, "চেহারা চিতায় যাক মা, বিধবার আবার চেহারার কি দরকার? তাদের বেঁচে থাকাই ঝকমারী যে।"

সীতা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

১৩

একা ছাদের উপর বিহারীলাল শুইয়া পড়িয়া ছিলেন। রাত্রি হইয়া গিয়াছে। শুক্লা একাদশীর চাঁদখানা নীল আকাশের গায়ে ভাসিতে ভাসিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছে। শুভ্র আলোকে দশদিশি ভরিয়া গিয়াছে। বহু দূরে কোথায় কে জানে—একটা নাম-না-জানা পাখী অবিশ্রান্ত টিহু—টিহু বলিয়া চীৎকার করিতেছিল।

বিহারীলাল শুইয়া পড়িয়া উজ্জ্বল আকাশের পানে চাহিয়া ছিলেন।

মনে পড়ে—যৌবনে কবে এমনি চাঁদের আলো এই ছাদে থাকিয়া উপভোগ করিয়াছিলেন। সেদিন ছিল সম্মুখে কত আশা, অন্তরে ছিল কত উৎসাহ, আজ কিছু নাই।

হঠাৎ যেন তাঁহার সকল কাজের অবসান হইয়া গিয়াছে। উৎসাহ, আশা, আনন্দ সব চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার সত্তর বৎসর বয়স হইলেও এতদিন শ্রান্তি তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই, আজ এক দিক একটু শিথিল পাইয়া সে আসিয়া পড়িয়াছে, আর তাহাকে ঠেকাইবার যো নাই। জীবন-প্রবাহে একবার অবগাহন করিয়া তিনি যে যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, দ্বিতীয়বার অবগাহনের সঙ্গে সঙ্গে

সত্তর বৎসরের জরা বার্দ্ধক্য তাঁহাকে নিবিড় ভাবে জড়াইয়া ধরিয়াছে।

এই সেই বিহারীলাল যাঁহার কর্ম্মে এতটুকু শৈথিল্য ছিল না, তিনি এখন হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়াছেন। জীবন-তরণী যেদিকে হয় চলুক, না হয় ডুবিয়া যাক। দেওয়ান গোমস্তার হাতে সকল ভার তুলিয়া দিয়াছেন, বিষয়-সম্পত্তির উপর কেমন একটা বিতৃষ্ণা আসিয়া গিয়াছে।

সত্যই তো, আর কাহার জন্য সঞ্চয়? তাঁহার আয়ু নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে,—আর যে কয়টা দিন বাঁচিবেন, এইরূপেই কাটিয়া যাইবে। তাহার পর এই জমিদারী যাক বা থাক তাহাতে তাঁহার কি? নিদারুণ অভিমানে বৃদ্ধের হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছিল,—কেহ রহিল না, সকলেই তাঁহাকে ফেলিয়া একে একে সরিয়া পড়িল? তিনি আজীবনকাল কঠোর পরিশ্রম করিয়া ক্ষুদ্র কয়েক শত বিঘা জমী এত বড় করিয়া তুলিলেন কিরূপে, মহালের পর মহাল কিনিয়া গেলেন কেন? এ কি তাঁহার নিজেরই বাসনা তৃপ্তির জন্য, কাহারও ভোগ করিবার জন্য নয় কি?

শান্ত আকাশের পানে চাহিয়া বিহারীলাল ভাবিতে-ছিলেন, তাঁহার না ছিল কি। একদিন সবই তো ছিল, আজ কেহ নাই। হায় রে,—কেহ নাই এ কথাটা ভাবিতেও যে বুক ফাটিয়া যায়; কেন না এখনও তাঁহার বংশধর পৌত্র-পৌত্রী বর্ত্তমান; তথাপি তিনি হাহাকার করিতেছেন—কেহ নাই—আমার কেহ নাই।

"বাবা—"

বৃদ্ধ চকিতে কাপড়ের এক প্রান্ত দিয়া চোখের কোণে জমিয়া উঠা জল মুছিয়া ফেলিয়া শুষ্ককণ্ঠে উত্তর দিলেন, "কেন মা?"

ঈশানী দুধের বাটী তাঁহার নিকট নামাইয়া শান্তস্বরে বলিলেন, "দুধটুকু খেয়ে নিন বাবা!"

বিহারীলাল তেমনই শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, "আমি তো আগেই বলে দিয়েছি মা—আমি কিছু খাব না।"

ঈশানী রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তা কি হয় বাবা? একাদশী আপনি বরাবরই করেন তা জানি, কিন্তু দুধ ফল তো খান; কোনবার এমন নির্জ্জলা একাদশী করেন নি তো।"

কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল, প্রাণপণে সংযত করিয়া বিহারী-লাল বলিলেন, "করেছি বই কি মা, অনেকবার নির্জ্জলা একাদশী করেছি। প্রতাপ আমায় জল খেতে বাধ্য করেছিল। সে অনেক কালের কথা মা, একাদশীর দিনে আমার অসুখ হয়েছিল, প্রতাপ আমায় তার দিব্য দিয়ে জল খাইয়েছিল। সে আগে জানত না, আমি একেবারে কিছু খাই নে,—সেই দিনে প্রথম সে জেনেছিল। সে তার কি অনুনয় বিনয়—আমার পায়ের ওপরে মাথা রেখে নিঃশব্দে সে চোখের জল ফেলেছিল। তোমার শাশুড়ীর মৃত্যুর পর আমি যে ব্রত নিয়েছিলুম, সন্তানের চোখের জলে আমার তা ভেসে গিয়েছিল। তার পর সে চলে গেলেও তুমি, জ্যোতি আমার সামনে যখন দুধ ফল এনে দিয়েছ, পুতুলের মত তা নিয়েছি, খেয়েছি। আর কেন মা কল্যাণী, আর কেন আমায় যত্ন করে খাওয়াতে এসেছ? আমার ব্রত এখন পালন করতে দাও, আমায় পরিত্রাণ দাও।"

ঈশানীর দুইটী চোখ দিয়া নিঃশব্দে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। তিনি বিকৃতকণ্ঠে বলিলেন, "এখন তো ব্রতপালন করার সময় আপনার নেই বাবা, এই বুড়ো বয়সে নির্জ্জলা উপবাস—"

বাধা দিয়া মলিন হাসিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "কিছু হবে না মা। সারাদিনটা কেটে গেছে, সন্ধ্যেও গেছে, রাতটুকু বেশ কেটে যাবে। সীতা দুবার আমায় খাওয়াতে এসেছিল, ধমক দিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি; কিন্তু তোমায় তো তাড়াতে পারছিনে মা লক্ষ্মী। যার কল্যাণের জন্যে জল মুখে দিতুম, সে আজ কোথায়,—কোন্ জায়গায় বিশ্রাম করছে, আর তার জন্যে আমায় তো ভাবতে হবে না মা। যে অনুরোধ করেছিল, নিজেদের শুভাশুভ দেখিয়েছিল, সে আজ শুভাশুভের অতীত যে। যাও মা, দুধ নিয়ে যাও, রাতটুকু আমায় এমনিই থাকতে দাও।"

"বাবা—"

ঈশানীর কণ্ঠ একেবারে রুদ্ধ হইয়া গেল।

বিহারীলাল উত্তর দিলেন, "কেন মা?"

"তখন ঠাকুরপোর কল্যাণের জন্য নির্জ্জলা উপবাস করেন নি, এখন উপবাস করে আপনার নাতির অকল্যাণ করবেন? আপনার এই উপবাস দারুণ মনোকষ্টের জন্যে,—সে কষ্ট যে দিয়েছে সে আপনারই নাতি। বাবা, এ যে তারই অকল্যাণ করা, তার আয়ু এতে যে অর্দ্ধেক ক্ষয়ে যাবে।

সে ধর্ম্মত্যাগী হোক তা আপনি সহ্য করতে পারছেন—পারবেন, কারণ সে বেঁচে আছে; কিন্তু আপনি বেঁচে থাকতে সে চলে যাবে আপনি কি তাই ইচ্ছা করেন বাবা?"

পুত্রবধূ শ্বশুরের পদতলে আছড়াইয়া পড়িলেন শান্ত-স্বভাবা বধূ জীবনে কখনও শ্বশুরের সম্মুখে চোখের জল ফেলিতে পারেন নাই, জীবনে কখনও এমন ভাবে কথা কহিতে পারেন নাই। আজ পুত্রের অকল্যাণ ভয়ে মায়ের অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি যে মা, তিনি তো আর কিছু নহেন।

বিহারীলাল পা টানিয়া লইলেন; তাঁহার দৃষ্টি জগৎ ছাড়িয়া আকাশের পানে চকিতের মত গিয়া পড়িল। একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস তিনি কিছুতেই দমন করিতে পারিলেন না।

"ওঠ মা, আমি দুধ খাচ্ছি।"

ঈশানী চোখের জল মুছিতে মুছিতে উঠিলেন; দুধের বাটীটা শ্বশুরের হাতে দিতে তিনি এক নিঃশ্বাসে সবটুকু পান করিয়া ফেলিলেন।

পুত্রবধূর পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "হয়েছে তো মা, আর তো তোমার কথা বলবার রইল না। কিন্তু বুঝতে বড় ভুল করেছ লক্ষ্মী, জ্যোতি তোমার একারই নয়,—সে যে এ বুড়োর কতখানি তা তুমি ধারণা করতে পার নি। সে যে আমায় কতখানি দাগা দিয়ে গেছে, তাতে আমার বুকখানা কতখানি ব্যথায় ভরে গেছে, সে কথা তো মুখে আমি বলতে পারছি নে মা। ভাবি—ভগবান আমায় সব দিয়ে শেষকালটায় কেন এমন করে সব তাইতেই বঞ্চিত করলেন? এ পর্য্যন্ত প্রাণ ঢেলে যথাসাধ্য পরের উপকারই করে এসেছি, মন্দ তো কারও কখনও করি নি; তবে—" বলিতে বলিতে তিনি থামিয়া গেলেন। ঈশানী কোন্ দিকে চাহিয়া ছিলেন কে জানে, তাঁহার মধ্যে যে জীবন আছে তাহা বোধ হইতেছিল না।

"কিন্তু মা, এই বিষম পরীক্ষা। সময় সময় জ্ঞান হারালেও আবার যখন জ্ঞান ফিরে পাচ্ছি, তখন বেশ বুঝতে পারি, দয়াময় এবার তাঁর ভক্তকে শেষ পরীক্ষা করে দেখছেন—আমি তাঁকে ছাড়ি, না বংশের দুলাল বড় স্নেহের পৌত্রকে ছাড়ি। বড় কঠিন সময় মা,—একবার এদিক দুলছি, একবার ওদিক দুলছি।"

ঈশানী অস্পষ্ট সুরে কি বলিলেন বুঝা গেল না।

শান্তকণ্ঠে বিহারীলাল বলিলেন, "আমি আমার চিত্তকে কতকটা বশে এনেছি মা,—স্বার্থপরতায় অন্ধ হয়ে আমার বলতে যা কিছু রেখেছিলুম, সব শ্রীহরির পায়ে সঁপে দিয়েছি। আজ তার ধর্ম্মান্তর গ্রহণের দিন, এই রাত তার বিয়ের রাত মা—"

খানিকটা অন্যমনস্ক ভাবে তিনি অন্য দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর চক্ষু ফিরাইয়া পুত্রবধূর পানে দৃষ্টি রাখিয়া তিনি বলিলেন, "এইখান হতে আমি তাকে আশীর্ব্বাদ করছি, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি—তার জীবন সুখময় হোক। আমার সঙ্গে তার সকল সম্পর্ক উঠে গেছে, আমার পবিত্র ভিটেয় আর সে তার কলঙ্কিত চরণের দাগ ফেলতে আসতে পাবে না, আমার অতুল সম্পত্তি হতে একটী পয়সা সে পাবে না। ভগবান তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি দিন, সে নিজের জীবিকা নিজেই অর্জ্জন করবে। শুধু তোমার জন্যেই আমার একটু ভয় হচ্ছে মা লক্ষ্মী; আমি ভাবছি—আমার অন্তে সে যখন আসতে চাইবে, তুমি স্নেহে অন্ধ—তখন কি তাকে ঠেকাতে পারবে? হয় তো যে ভিটেকে আমি পবিত্র তীর্থ বলে জানি, সেই ভিটেয় তাকে আসতে দেবে, তাকে—"

আর্ত্তকণ্ঠে ঈশানী বলিয়া উঠিলেন, "না বাবা, ধর্ম্মত্যাগী এ ভিটেয় কখনই পদার্পণ করতে পারবে না। ভগবান না করুন—যদিই আপনি আমার আগে চলে যান—আপনার মর্য্যাদা আমি রাখব। আমি একদিন তার মা ছিলুম, আর তার মা নই। আমার ছেলে যেদিন ধর্ম্মত্যাগ করেছে, আমার সঙ্গে সেই দিনই তার সকল সম্পর্ক উঠে গেছে।"

"পারবে মা—এ দৃঢ়তা, এ সাহস বরাবর এমনই স্থির রাখতে পারবে তো?"

মাথা নত করিয়া শ্বশুরের পায়ের উপর দৃষ্টি রাখিয়া দৃঢ়কণ্ঠে ঈশানী বলিলেন, "পারব বাবা, আপনার আশীর্ব্বাদে আমি সব পারব।"

পুত্রবধূর মাথায় হাত রাখিয়া বৃদ্ধ ধীর কণ্ঠে বলিলেন, —"হাঁ, আমি আশীর্ব্বাদ করছি মা, আমার আশীর্ব্বাদ নিশ্চয়ই সফল হবে, তুমি সব পারবে। কতটুকু তখন ছিলে মা তুমি—যখন তোমায় আমি এনেছিলুম। তোমায় গড়ে তুলেছি আমিই—আমারই তেজ, গর্ব্ব আর নিষ্ঠা দিয়ে,—আমার কল্পনা তোমাতেই মূর্ত্তিমতী হয়ে ফুটেছে। তুমি মা

হতে পার ; কিন্তু মাতৃত্বের জন্যে যে আপনার সাহস, দৃঢ়তা, ধর্ম্মনিষ্ঠা হারানো—তা তুমি পারবে না। সার কথা মনে রেখো মা, জগতে কেউ কারও নয়। এই যে আমি আমার আমার করে মরি, কে আমার বল দেখি? কেউ আমার নয় ; তাই কেউ রইল না, সবাই চলে গেল। মা, মনে রেখে দিয়ো—কেউ সাথী হয় নি, কেউ সাথী থাকবে না,—সঙ্গে যাবে শুধু ধর্ম্ম পুণ্য ও পাপ, আর কিছু নয়। স্নেহের জন্যে ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ো না, ধর্ম্মের পায়ে স্নেহ বিসর্জ্জন দিয়েও জেনো—তোমার সে দেওয়া সার্থক হল।"

ঈশানী নিঃশব্দে তাঁহার পায়ের ধূলা লইলেন।

অনেকক্ষণ উভয়েই নীরব। অনেকক্ষণ পরে ঈশানী মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "নীচে যাবেন না বাবা, রাত অনেক হয়ে গেল ?"

বিহারীলাল বলিলেন, "যাব মা একটু বাদে ; সীতা কোথায় ?"

ঈশানী বলিলেন, "সেলাই নিয়ে হয় তো বসে ছ।"

বিহারীলাল একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সেই দিন হতে সে আর বড় একটা আমার কাছে আসে না।"

ঈশানী বলিলেন, "আপনিই না কি তাকে আসতে বারণ করেছেন বাবা ?"

বিহারীলাল অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর করিলেন, "হাঁ, বারণ করেছি—কেন করেছি জান মা? বড় মুখ করে তাকে এনেছিলুম ; তার মাসীমা যখন তাকে নিয়ে যেতে চাইলেন—তাঁকে জানালুম সে আমার পৌত্রবধূ হবে, আমার সংসারের সম্রাজ্ঞী হবে। বড় গর্ব্ব করেই কথাটা বলেছিলুম মা! আমার কথা যে রইল না এই ভেবে আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি। সে আমার সামনে এলে আমার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে,—মনে হয় কেন একে আনলুম,—তার মাসীমার কাছে পাঠিয়ে দিলেই ভাল হত। তার মাসীমা তাকে এতদিন সৎপাত্রে সমর্পণ করতেন, আমি না হয় সমস্ত ব্যয়টাই দিতুম। এখন এ মেয়ে নিয়ে আমি কি করব,—তার মাসীমা যখন আমায় জিজ্ঞাসা করবেন তখন আমি কি জবাব দেব ?"

ঈশানী চুপ করিয়া রহিলেন।

আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বিহারীলাল বলিলেন, "তার শিক্ষা তাকে এতটুকু মনুষ্যত্ব দান করলে না মা! সে বুঝলে না, আমি তার জন্যে যা নির্ব্বাচন করেছিলুম—তা যথার্থই কোহিনূর,—মাথায় রেখে গর্ব্ব করার জিনিস,—পায়ের তলায় ফেলে হেলা করে দলে যাওয়া যায় না। আমি বাইরের সৌন্দর্য্য দেখে ওদের মত মুগ্ধ হয়ে যাই নে, আমি দেখি ভিতরটা। আমি যাকে এনেছিলুম সে রাং নয়, সে সোণা। মূর্খ সে—তাই ঘরের পানে না তাকিয়ে বাইরে ছুটে চলে গেল।"

"মা—"

সীতার আহ্বান শুনিয়া ঈশানী উঠিলেন, "আপনি আর বেশীক্ষণ ছাদে পড়ে থাকবেন না বাবা, আমি নীচে চললুম। সীতাকে আপনার কাছে রেখে যাই, ওর হাত ধরে আসবেন।"

সীতার পানে তাকাইয়া তিনি বলিলেন, "তুমি বাবাকে নিয়ে এসো মা ; খুব সাবধানে এনো - দেখো যেন না পড়ে যান। একে বুড়ো মানুষ, তার পর সারাদিনের অনাহার।"

তাঁহার এই সতর্কতায় বৃদ্ধের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। বৈকালে তিনি নিজেই বহুকাল—আজ বোধ হয় পনের ষোল বৎসর পরে যখন ছাদে আসিবার কথা বলিয়াছিলেন, তখন ঈশানী অত্যন্ত সতর্কতার সহিত তাঁহাকে ধরিয়া ছাদে আনিয়াছিলেন। তিনি অতিরিক্ত বৃদ্ধ হইয়াছেন। বহুকাল পরে সিঁড়ি বাহিয়া ত্রিতলে উঠিতে পাছে অতিরিক্ত শ্রান্ত হইয়া পড়েন, কোথায় পা পড়িতে কোথায় পা পড়িয়া পাছে পড়িয়া যান, ঈশানী সেই ভয়ে ত্রস্তা হইয়া উঠিয়াছিলেন।

এই অতিবৃদ্ধের জন্য ঈশানীর মুহূর্ত্তমাত্র শান্তি ছিল না। মুখে তিনি প্রকাশ করিতে পারিতেন না—তাঁহার কার্য্যেই ব্যগ্রতা ফুটিয়া উঠিত। জ্ঞান হইয়া পিতা মাতা কি তিনি জানিতে পারেন নাই। শ্বশুর স্বয়ং যেদিন মা বলিয়া অষ্ট[illegible] বর্ষীয়া বালিকাকে বুকে তুলিয়া লইলেন, তাহার পর অফুর[illegible] স্নেহাদর ঢালিয়া দিতে লাগিলেন, সেইদিন হইতে তাঁহা[illegible] হৃদয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার সমব্যথার ব্যথী এই বৃদ্ধ আজ যে তিনি পুত্র হারাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বু[illegible] কতখানি ব্যথা বাজিয়াছিল, তাহার চেয়েও বেশী ব্যথা [illegible] এই বৃদ্ধের বুকে বাজিয়াছিল, তাহা তিনি বেশ বুঝি[illegible] পারিয়াছিলেন। নিজের কষ্ট ভুলিয়া তাই তিনি এই বৃদ্ধে[illegible] বেদনা দূর করিবার চেষ্টা প্রাণপণে করিতেছিলেন। এ বৃদ্ধে[illegible] জীবন-তরুর মূল যে শিথিল হইয়া গিয়াছে। যাওয়ার বে[illegible]

এতটা ব্যথা, এতটা কষ্ট লইয়াই যাইতে হইবে! এতটুকু সান্ত্বনা কি থাকিবে না, যাহা তাঁহাকে শেষ সময়টায় স্নিগ্ধতা দান করিতে পারে? ভগবান্!—ঈশানীর চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

সমস্ত দিন একাদশীর উপবাসে শ্রান্তদেহা ঈশানী নীচে চলিয়া গেলেন, তিনি আর বসিতে পারিতেছিলেন না।

১৪

সীতা ছাদের প্রাচীরের উপর ভর দিয়া দেখিতেছিল, চাঁদের আলো পৃথিবীর গায়ে পড়িয়া কি অপরিসীম সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়া দিয়াছে।

বিহারীলাল তাহার পানে তাকাইয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "সীতা, আমার ওপরে রাগ করে অতটা দূরে রইলি দিদি, আমার কাছে আসবি নে? জগতে একে একে সবাই আমায় যেমন করে ছেড়ে চলে গেল, তুইও তেমনি করে আমার এত কাছে থেকেও এড়িয়ে গেলি ভাই?"

বৃদ্ধের এই কথার মধ্যে এমন একটা সুর ছিল, যাহাতে সীতা আর দূরে থাকিতে পারিল না। তাঁহার পায়ের কাছে আসিয়া বসিয়া পড়িল। আপত্তি করিবার পূর্ব্বে তাঁহার পা দুখানা নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইয়া বলিল, "না দাদু, আমি তো নিজের ইচ্ছায় যাইনি। আপনিই তো সেদিন আমায় বলেছিলেন—আর আমার সামনে আসিস নে, তাই আমি আর যাই নে।"

"তুই এদিকে আয় দিদি; আমার মাথায় আগে কিছুক্ষণ হাত বুলিয়ে দে, তার পর পা টিপে দিস।"

তাহাকে মাথার কাছে বসাইয়া তাহার কোলে মাথা রাখিয়া তৃপ্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিহারীলাল বলিলেন,—"আঃ কি শান্তি এতে ভাই! বড় সাধ ছিল—তোর কোলে এমনি করে মাথা রেখে বড় শান্তিতে শেষ ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ব, কিন্তু সে সাধ আমার পূর্ণ হল না। ভবিষ্যৎ আমার কাছ হতে তোকে টেনে নিয়ে গিয়ে কোথায় ফেলবে তা কে জানে,—শেষ মুহূর্ত্তে এমন কেউ হয় তো থাকবে না, যার কোলে আমি মাথা রাখতে পারব।"

সীতা ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, "না দাদু, আমি চিরকাল আপনার কাছেই থাকব; আপনার শেষ সময়েও এমনি করে আপনার মাথা কোলে নিয়ে বসব—আপনার এ সাধ অপূর্ণ থাকবে না। আমি আপনাকে এ অবস্থায় ফেলে রেখে কোথায় যাব, কোথায় আর আমার আশ্রয় আছে?"

শ্রান্ত চোখের নিভন্ত-প্রায় দৃষ্টি জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল সীতার মুখের উপর ফেলিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "আর কি তোকে এখানে রাখতে পারা যাবে ভাই? কোন্ সাহসে পরের মেয়ে তোকে এখানে রাখব? বড় মুখ করে তোকে এখানে এনেছিলুম, আমার এই বড় দুঃখ রইল আমার মনের কোন সাধ মিটলনা। মানুষ আশা ছাড়েনা ভাই, মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মানুষ আশা করে সে মরবেনা, সে বাঁচবে। হায় রে মানুষ, হায় রে আশা—আশাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে; নইলে মানুষ থাকতনা—সবাই মরে যেত। দেখিস নি দিদি. আমার এক একটা যায়, আর একটার আশায় ভুলে থাকতুম। সব গিয়েও আশা ছিল—জ্যোতি মানুষ হবে, তোর সঙ্গে তার বিয়ে দেব, কিন্তু কিছুই হলনা। সব আশা মানুষ যখন হারায়, তখন সে আর কি বেঁচে থাকতে চায় রে ভাই?"

রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে সীতা বলিল, "আমি কোথাও যাবনা দাদু, আমার আশ্রয় এইখানে—আপনার কোলের মধ্যে ছাড়া আর কোথাও নেই।"

বিহারীলাল ধীরে ধীরে মাথা নাড়িলেন, "তাও কি হয়, পাগলি, তুই বললেও তারা শুনবে কেন? প্রথমেই তারা অনাত্মীয় আমার কাছে আসতে দেওয়ায় আপত্তি করেছিল, —জ্যোতির সঙ্গে বিয়ে দেব বলে এক রকম প্রায় জোর করেই তোকে এনেছিলুম। তারা নিশ্চয়ই শুনতে পাবে,—চাই কি সুশীলও আত্মীয় হিসাবে তাদের জানাবে—জ্যোতি অন্যকে বিয়ে করেছে। তখন তারা আমায় কি বলবে? আর এক মুহূর্ত্ত কি তোকে এখানে রাখবে? সে যে তোর মাসীমা—তার যে জোর আছে, আমার কি সে জোর আছে দিদি,—তুই যে আমার বড় আপনার হয়েও লোকের চোখে, লোকের বিচারে—পর।"

উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া সীতা বলিল, "হোক মাসীমা, আমি যাব না দাদু, আমায় আপনি জোর করে আপনার কাছে রেখে দেবেন।"

"জোর করে—"

বৃদ্ধের মুখে হাসি আসিল, "জোর কেমন করে করব ভাই? তোকে বিয়ে করতে হবে, সংসার পাততে হবে—"

হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া তাঁহার মাথা কোল হইতে নামাইয়া সীতা উঠিয়া গেল; একটা পার্শ্বের প্রাচারের ধারে গিয়া দাঁড়াইয়া সে গোপনে চোখ মুছিতে লাগিল।

দূর হোক বিবাহ—বিবাহ মানুষের একবারই হইয়া থাকে, দুবার হয় না। আত্মসমর্পণ করা যায় একবারই, দুবার করা যায় না বলিয়াই সীতা জানে। সোজা বুদ্ধিতে দাদু ভাবিতেছেন, বিবাহ না হইলে তাহার মনুষ্য জন্মটাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তিনি তো জানেন না, সীতার বিবাহ হইয়া গেছে। জগতে কেহ জানে না, জ্যোতির্ম্ময়ও জানে না—সীতা অন্তরে তাহাকেই স্বামী বলিয়া জানিয়াছে,—তাহাকেই সেখানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এ দেহ সে আর কাহাকেও দান করিতে পারিবে না, অন্তরে সে আর কাহাকেও স্থান দিতে পারিবে না।

কিন্তু এ কথা সে মুখ ফুটিয়া বলিবে কি করিয়া! কুলীনের ঘরে কত মেয়ে সেকালে অবিবাহিতা থাকিত, এই সব মেয়েরা সংসারের, দশের, দেশের কত কায করিত। দাদুই তো গল্প করিয়াছেন—তাঁহার এক পিসী চিরকুমারী থাকিয়া বৃদ্ধ বয়সে মারা যান। সীতা কি এই পুণ্যবতী কুমারীর আদর্শে জীবন যাপন করিতে অনুমতি পাইবে না? লোকে কথায় কথায় সে কালের দৃষ্টান্ত দেয়—বিবাহ বিষয়ে কেন দৃষ্টান্ত দেয় না?

যখন সে দাদুর নিকটে ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি উঠিয়া বসিয়া প্রাচীরে হেলান দিয়া সম্মুখের চাঁদের আলোয় স্নাত, বাতাসে দোদুল্যমান নারিকেল গাছের পাতাগুলির পানে চাহিয়া ছিলেন। সীতাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা গিয়েছিলি দিদি?"

তিনি লক্ষ্যও করেন নাই—সীতা অপর পার্শ্বে প্রাচীরের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল।

সীতা বলিল, "মনে হল মা যেন ডাকছেন, তাই ও-ধারে গিয়ে শুনছিলুম।"

একটু হাসিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "দাদুর কাছে এই মিথ্যা কথাটা বলতে একটুও বাধল না সীতা?"

সীতার মুখখানা লাল হইয়া গেল, সে উত্তর দিতে পারিল না, নীরবে পদাঙ্গুলী দিয়া মেঝেয় দাগ দিতে লাগিল—চোখ তুলিয়া বৃদ্ধের পানে সে আর তাকাইতে পারিল না।

বিহারীলাল নীরবে কতক্ষণ তাহার পানে তাকাইয়া রহিলেন, গোপনে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "চল ভাই, নীচেয় যাওয়া যাক। বড় ঠাণ্ডা পড়ছে,—বুড়ো মানুষ, হিমে থেকে শেষ কালে বাতের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠতে হবে। আমার হাতখানা একটু ধর সীতা, হাঁটতে গেলে হাঁটুতে বড় ব্যথা করে।"

মাস ছয় সাত আগে তাঁহার হাঁটুতে ব্যথা ছিল না। বৃদ্ধ বয়সে বাত হয় কথাটা শোনা কথার মত শুনিয়া আসিয়াছিলেন। উপযুক্ত পরিশ্রমের ফলে শরীর অপটু হয় না; উৎসাহময় জীবনে শ্রান্তি না থাকায় দেহটাকেও জড় পদার্থে পরিণত হইতে হয় নাই; কাযেই বাত এতকাল অগ্রসর হইতে পারে নাই। ফাঁকের ঘর পাইয়া সে এই আশ্বিন মাসেই আসিয়া পড়িয়াছে; এখনও শীতকাল সম্মুখে পড়িয়া।

সীতা সন্তর্পণে তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইল। সিঁড়িতে আলো ছিল, তাহারই সাহায্যে সীতা সাবধানে বৃদ্ধকে নামাইতে লাগিল। নামিতে নামিতে বিহারীলাল বলিতেছিলেন, "বাস্তবিক সীতা, তোকে আর কাউকে দিলে আমার চলবে না—তোকে এখানে আমার কাছেই থাকতে হবে। দেখ, যদি ইচ্ছা হয় তবে না হয় এই বুড়োকেই বিয়ে করে ফেল। না হলে তোকে কাছে রাখবার জন্যে সেই রকম একটী পাত্রের জন্যে এই বুড়ো বয়সে আমায় দৌড়াদৌড়ি করতে হবে। এমন পাত্র চাই যে ঘরে থাকবে—আর কোথাও তোকে পাঠাতে হবে না। তোকে তোর মাসীমার কাছে আর যে পাঠাব না সে জানা কথা; কেবল বিয়েটার জন্যেই যা ভাবনা। তা যদি ঘরে ঘরে হয়ে যায়, তা হলে বেঁচে যাই।"

সীতা জিজ্ঞাসা করিল, "বিয়ে না করলে কি হবে দাদু?"

তাহার মনের ভাব চতুর বৃদ্ধ সবই বুঝিতেছিলেন। তথাপি হঠাৎ বিস্মিত হইবার ভান করিয়া বলিলেন, "তা কি হয় পাগলি—বিয়ে করতেই হবে এই সংসারের নিয়ম।"

সীতা অন্ধকার মুখে বলিল, "সংসারের—সমাজের নিয়মে বিয়ে না করলে জাত যায়, না দাদু? আচ্ছা, তাই যদি হয় দাদু, তা হলে আপনার পিসীমার যে বিয়ে হয় নি, তাতে আপনার জাত গিয়েছিল?"

"সে যে উপযুক্ত ঘর, উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যায় নি?"

সীতা বলিল, "এও না হয় তাই ধরুন দাদু, মনে করুন,

উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না বলেই আমার বিয়ে হয় নি। আমি আপনার কাছে থেকে শুধু আপনার সেবা করব, শ্রীধরের পুজোর যোগাড় করে দেব, আর তো কিছুই চাইনে। আপনি আমায় বিদায় করবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন কেন, আমি আপনার কি করেছি বলুন তো ?"

তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল, আবেগটাকে চাপিবার জন্যই সে দন্তে অধর চাপিয়া ধরিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

"কিছুই করিস নি ভাই,—কিছুই করিস নি। তুই না থাকলে আমি এ আঘাতটা কিছুতেই সামলে উঠতে পারতুম না রে, একেবারেই ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যেতুম। তোর বিয়ে করতে হবে না, মাসীর কাছেও যেতে হবে না, এই বুড়োর অন্ধকার ঘর আলো করে তুই এখানেই থাক।

বৃদ্ধ একবার মুখ তুলিলেন ; দৃষ্টিক্ষীণতা হেতু বুঝিতে পারিলেন না—তাহার মুখখানার উপর পুলকের ঢেউ বহিয়া যাইতেছে কি না। (ক্রমশঃ)

বিশ্ব-সাহিত্য

'সেণ্ট জন'

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

"১৪১২ সালের কাছাকাছি ডমরমীর ক্ষুদ্র প্রদেশে একটী চাষার ঘরে জন জন্মগ্রহণ করে ; ১৪৩১ সালে উনিশ বছর বয়সে ডাইনী ও মায়াবী বলিয়া তাহাকে পোড়াইয়া মারিয়া ফেলা হয় ; ১৪৫৬ সালে নূতন করিয়া সমাধিস্থ করা হয় ; ১৯০৪ সালে মহামহিমান্বিতা উপাধি দেওয়া হয় এবং ১৯০৮ সালে পাদরীরা জনকে "The Blessed" বলিয়া স্বীকার করেন এবং ১৯২০ সালে জন খৃষ্টান জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঋষি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন।"

এই কয়েকটী তারিখ ও তাহাদের অন্তর্নিহিত ঘটনাগুলির মধ্য দিয়া বার্ণার্ড শ' Joan D'Arcএর যে জীবন-পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহার বিখ্যাত নাটক Saint John-এর মুখপত্রের প্রথমেই সংস্থাপিত হইয়াছে এবং এই কয়টী ঘটনার সংস্থাপনের মধ্য দিয়া তাঁহার নূতন চরিত্র-ব্যাখ্যানের ধারাটী প্রথমেই পাঠকের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। ডমরমির এই চাষার মেয়েটী য়ুরোপের তথা খৃষ্টান-জগতের ইতিহাসে এক অপূর্ব্ব রহস্যময় স্থান অধিকার করিয়া আছে। কত কবি, কত নাট্যকার, কত গল্প-রচয়িতা এই রহস্যময়ী কুমারীর সকরুণ জীবনকে লইয়া কত কাহিনী ও কাব্যের উপাদান গড়িয়া তুলিয়াছেন।

ডমরমীর এক নিভৃত পল্লীতে একটী আসন্ন-যৌবনা কৃষাণ-দুহিতা নিত্য তাহার উটজ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া দেখিত—বাহিরের পথ দিয়া জীর্ণ বেশে ক্লান্ত চরণে তাহার দেশের সৈন্যদল ফিরিয়া চলিয়াছে। মৃত্যু তাহাদের মুখে লেখা, পরাজয়ের অপমানে তাহাদের গতি মন্থর! প্রতিবাসী ইংরাজ আসিয়া ফরাসীর স্বাধীনতার সূর্য্যকে রাহুর মত গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। সেই পরাজিত সৈন্য-বাহিনীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া কিশোরী কুমারীর বুকে আপনার দেশ ও জাতি সম্বন্ধে নানা রকমের কল্পনা জাগিয়া উঠিত। সারা দিনের চিন্তার মধ্য দিয়া সে কখন আপনার যৌবনকে অবহেলা করিয়া, তুচ্ছ করিয়া, নিজেকে ফরাসী জাতির রক্ষাকর্ত্রী ভাবিত ; রাত্রে স্বপ্নের ঘোরে স্বর্গ হইতে সে নিত্য আদেশ শুনিতে পাইত—চিরকুমারী মেরী তাহাকে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যাইতে আজ্ঞা করিতেছে—স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ। স্বর্গের দেবদূত-গণের প্রতিনিধি হইয়া জন ফরাসী জাতিকে তাহার নেতৃত্বের অধীনে দাঁড়াইতে আহ্বান করে এবং বহু চেষ্টায় সত্যসত্যই যোদ্ধার বেশে জন ফরাসী সৈন্যদলকে পুনর্গঠিত করিয়া ইংরাজদের বিপক্ষে দাঁড়াইয়া ইংরাজ সৈন্যদের বিপর্য্যস্ত করে। জনের কথাবার্ত্তা শুনিয়া এবং তাহার স্বর্গ হইতে নিত্য প্রত্যাদেশের ব্যাপার লইয়া মধ্যযুগের খৃষ্টান পাদরীদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে সন্দেহ জাগে যে, জন মায়াবী ও ডাইনী ; তাহা না হইলে এই সমস্ত অঘটন সে কখনই ঘটাইতে পারে না। ফলে খৃষ্টান পাদরীগণের বিচার-সভায় জনকে মায়াবী বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয় এবং বিচারের ফলে তাহাকে জ্যান্ত অবস্থায় পোড়াইয়া মারিয়া ফেলা হয়।

বার্ণার্ড শ' জনের জীবনের এই সকরুণ ঘটনার মধ্য হইতে কয়েকটী নূতন তথ্য বাহির করিয়াছেন; জনের জীবন ও ইতিহাস তাঁহার সন্দেহবাদের প্রভূত খোরাক জোগাইয়াছে। তিনি মধ্যযুগের এই বিচারের মধ্যে কোনও বিস্ময়কর পদার্থ দেখিতে পান নাই। শ'র মতে ইতিহাসের প্রথম দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত এইরূপ ব্যাপার, হয় ত ইহার চেয়েও বীভৎস ভাবে সংঘটিত হইয়া আসিতেছে, এবং হয় ত অনন্ত কাল ধরিয়া এমনি চলিয়া আসিবে। প্রত্যেক যুগের প্রতিভা এমনি করিয়াই প্রত্যেক যুগে অবমানিত, নির্য্যাতিত হয়; শুধু নির্য্যাতনের ধারা ও পদ্ধতি সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে বদলাইয়া যায়। সাধারণ মানুষ আপনাদের অন্তরের নীচতা ও পঙ্গুতাকে সহ্য করিতে পারে না; যখনই কোনও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আসিয়া সাধারণের জীবনের সেই পঙ্গুতা, নীচতা ও অপরিপূর্ণতাকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়া ধরে, তখনই ক্ষুব্ধ জনতা আপনাকে লাঞ্ছিত মনে করে। তাহারা চায় না যে জগতে এমন একটা কিছু থাকিবে, যাহার অস্তিত্বে তাহাদের সমস্ত বোকামি ধরা পড়িয়া যাইতে পারে। তাই প্রত্যেক যুগে মানুষ যেমন মহামানবকে এক দিকে চাহিয়াছে—সেই মানব আবির্ভূত হইলেই কাল-বিলম্ব না করিয়া যুগ-প্রচলিত লৌকিক আচার, অনুষ্ঠান অথবা বিচারে তাহাকে পৃথিবী হইতে সরাইয়া দিয়াছে। এবং ইহাই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; এবং আরও সূক্ষ্মতর পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া এই একই ধর্ম্ম বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সভ্যতার মধ্যেও কাজ করিতেছে। জনের বিচারকদের মধ্য-যুগের অমানুষিক বর্ব্বর বলিয়া আত্মশ্লাঘা অনুভব করিবার মত কোন অধিকার বিংশ শতাব্দীর কোনও জাতির অথবা লোকের নাই। গত মহাযুদ্ধের সময় যদি পুনরায় জন আবির্ভূত হইয়া যে-কোনও জাতির প্রধান প্রধান সেনাপতিগণের সম্মুখে আসিয়া বলিত—আমার দৈব-বাণী শোন—আমি এই ভয়াবহ যুদ্ধ স্থগিত করিয়া দিব—আমার পতাকার তলে শ্রদ্ধায় সমবেত হও—তাহা হইলে প্রত্যেক সেনাপতি তাহাকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিবার হুকুম দিত; কিম্বা হয় ত সৈন্যদের উত্তেজিত করিবার অপরাধে তৎক্ষণাৎ কোর্ট-মার্শেল করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলা হইত। মহাযুদ্ধের সময় জন আসে নাই সত্য, কিন্তু দৈব-বাণী যে আসে নাই, তাহা নয়। যুদ্ধধূমের মধ্যে সে বাণীকে গর্ব্বিত শক্তি গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছিল; সেই বাণীর প্রচারকদের স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত ও কারাগারে রুদ্ধ করা হইয়াছিল, বালক বলিয়া ব্যঙ্গ করা হইয়াছিল।

বার্ণার্ড শ' জনের বিচারকদের ও বিচার-পদ্ধতির মধ্যে যে ধৈর্য্য ও বিচার-বুদ্ধি দেখিতে পান, তাহার অণুমাত্র তিনি এডিথ ক্যাভেলের বিচারকদের অথবা এডিথ ক্যাভেলের মূর্ত্তি স্রষ্টাদের মধ্যে দেখিতে পান না। জনের যাহারা বিচার করিয়াছিল, তাহাদের একটা বিচার-অনুষ্ঠানও করিতে হইয়াছিল; কিন্তু নার্স এডিথ ক্যাভেলকে যাহারা গুলী করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল, তাহারা তাহারও প্রয়োজন বোধ করে নাই। সুবিধাবাদী জনসাধারণ আপনাদের সুবিধার জন্য জনকে মারে—আপনার সুবিধার জন্য জনকে ঋষি বলিয়া পূজা দেয়। জনের মতই এডিথ উন্মাদ ছিল; গত মহা-যুদ্ধের সময় এই নারী প্রচার করে যে, "জাতীয়তাই সব নয়"; তাই ইংরাজ-রমণী হইয়াও শত্রু-মিত্র-নির্ব্বিশেষে যেখানে যে আহত ছিল, তাহার সেবা সে করিয়াছে; শত্রু-মিত্র-নির্ব্বিশেষে যাহাকে পারিয়াছে তাহাকে তাহার মাতৃত্বের আড়ালে লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। এডিথের অপরাধ—যে-কথা বিশ্বাস করিতে তখন স্বার্থান্ধ জাতিদের মনে কুশাঙ্কুর বিঁধিত, এডিথ তাহাই বিশ্বাস করিত এবং জীবনে তাহাই প্রচার করিত—"জাতীয়তা সব নয়।" জার্ম্মানরা এডিথকে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলে। এই ঘটনার সুবিধা লইয়া জার্ম্মানীর শত্রু পক্ষরা মহাধুমধামের সহিত নার্স এডিথ ক্যাভেলের মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিল—জার্ম্মান হৃদয়-হীনতার প্রতীক্ স্বরূপ; কিন্তু তাহারাও সেই মূর্ত্তির তলায় তাহার বাণীকে খোদিত করিতে ভুলিয়া গেল—অথবা স্বেচ্ছায় তাহা করিল না। নার্স এডিথ ক্যাভেলের মর্ম্মর-মূর্ত্তির তলায় লেখা হইল না—"জাতীয়তা সব নয়।"

সত্যকে সহজে গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি মানব-সমাজের মধ্যে নাই; তাই সত্যকে সে কোনও দিন ধরিতে পারিতেছে না। তাহার সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে সে সযত্নে আত্মপ্রবঞ্চনার বীজটীকে লুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছে তাই শ' বলেন যে, ছেলেদের কোথাও সমসাময়িক ইতিহাসের কথা শেখান হয় না। ইতিহাস আমাদের কাছে কো[ন] সুদূর অতীত যুগের ঘটনা—তাহার কোনও উপদেশ অথ[বা]

শিল্পী—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়
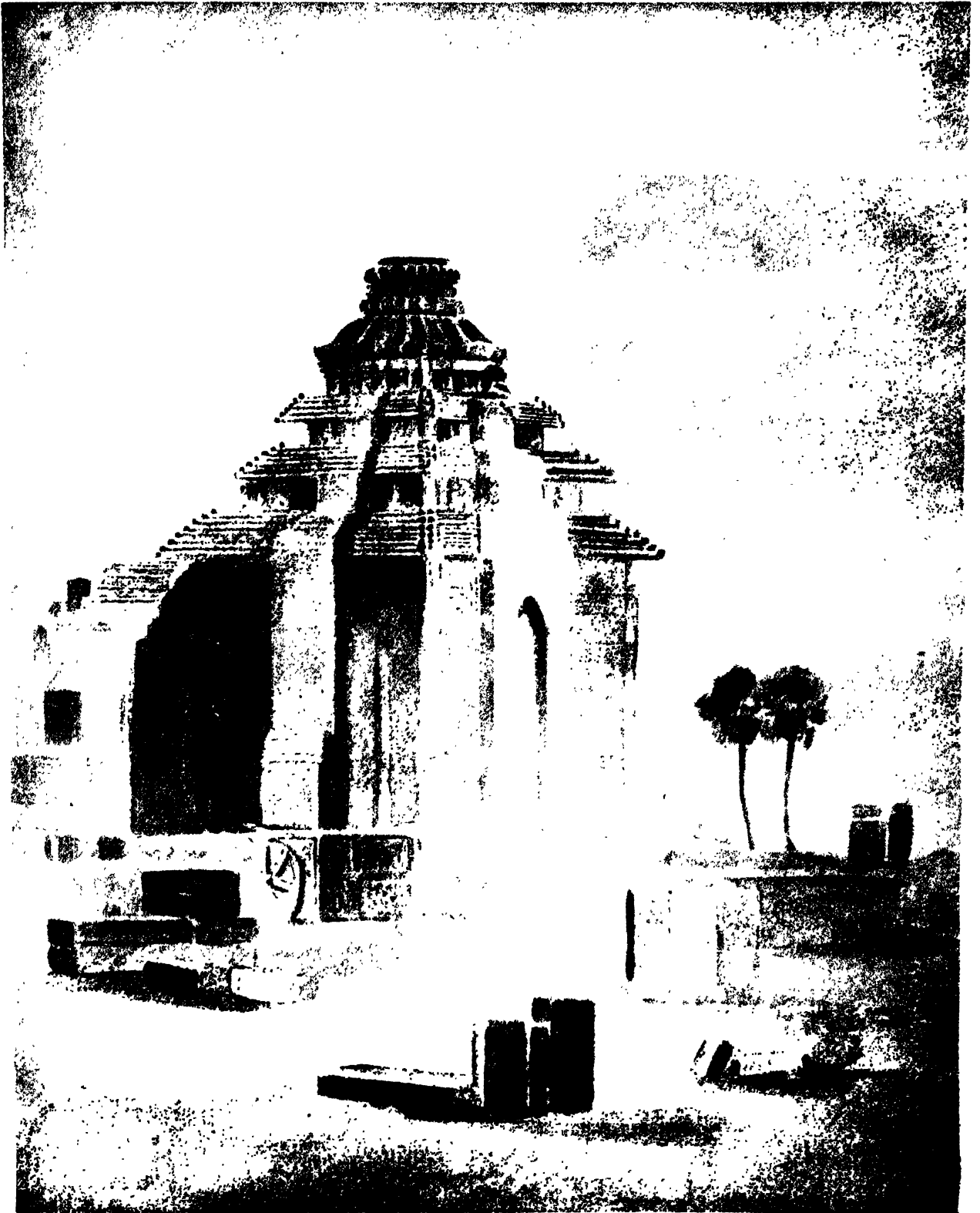
সেই সময়কার পারিপার্শ্বিকতার কোনও প্রভাব আর আমাদের উপর আসতে পারে না—এই নির্ভাবনায় আমরা ইতিহাস পড়ি। এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ঘটনা কালের অন্তরালে বিমলিন হইয়া যাইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে ইতিহাসের গৌরব দেওয়া হইবে না। শ' বলেন, "সেই জন্য আমাদের ছেলেদের নির্ভাবনায় ওয়াসিংটন সম্বন্ধে সমস্ত কথা শেখান হয়—লেনিন সম্বন্ধে সমস্ত মিথ্যা প্রচার করা হয়। ওয়াসিংটনের সময়েও ওয়াসিংটন সম্বন্ধে মিথ্যা কথা প্রচার করা হইত এবং ক্রমওয়েল সম্বন্ধে ইতিহাস রচনা করা হইত।"

এই পদ্ধতির মধ্য দিয়া মানুষ আপনার নিকট সাধু সাজিয়া চলিয়াছে; এমনি করিয়া সত্যকে সন্ধান করিতে আসিয়া মানুষ শুধু আত্ম-প্রবঞ্চনাই করিয়া চলিয়াছে।

বার্ণার্ড শ' তাঁহার সুবিখ্যাত নাটকের পরিশিষ্টে আর একটী দৃশ্য যোজনা করিয়াছেন; এই দৃশ্যটী, মনে হয়, সমগ্র নাটকের চিত্ত-ভূমি। যে ব্যক্তি জনের ফাঁসী দিয়াছিল, এবং যাহারা বিচার করিয়াছিল, এবং স্বয়ং চার্লস, সকলেই জনের জন্য অনুতপ্ত। জগৎ আজ জনকে মায়াবী বলিয়া স্বীকার করে না। জনের মর্ম্মর-মূর্ত্তি দিকে দিকে দেশে দেশে জাগিয়া উঠিয়াছে। খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকগণ জনকে ঋষি বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। এই অবস্থায় জনের সহিত চার্লস, তাঁহার বিচারকগণের সাক্ষাৎ। দূরে জনের মর্ম্মর-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া বিচারক বলিতেছে, "অন্ধ বিচারের নাগ-পাশ হইতে মুক্ত হইয়া আজ পৃথিবীর সকল বিচারক তোমার জয়গান গাহিতেছে—তুমিই সত্যদ্রষ্টা—তুমিই মর-জগতে জাগ্রত আত্মার বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছ।" যে ব্যক্তি পোড়াইয়াছিল, সে বলিতেছে, "জগতের শান্তি-দাতারা তোমার জয়-গান গাহিতেছে; কারণ, তুমিই জগতে প্রচার করিয়াছ যে মানুষের-দেওয়া কোনও নির্য্যাতন আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না।"

ধর্ম্মযাজক বলিতেছে, "জগতের সকল ধর্ম্মযাজক তোমাকে অভিনন্দন করিতেছে; কারণ, তুমি জগতের লৌকিকতার পঙ্ক হইতে অন্তরের বিশ্বাসকে ফুটাইয়া তুলিয়াছ।"

ফরাসী-রাজ চার্লস বলিতেছেন, "অক্ষম আজ তোমার বন্দনা-গানে তোমাকে স্বীকার করিতেছে; কারণ যে কার্য্য সে পারিত না, তুমি আপনার স্কন্ধে তাহা বহন করিয়াছ।" এই সমস্ত স্তুতি শুনিয়া জন বলিয়া উঠিল, "তোমরা আমাকে যে এ-রকম ভাবে স্মরণে রাখিবে, তা কে জানে! আমি ঋষি,—আমি সত্যই অঘটন ঘটাইতে পারি—আমাকে যদি তোমাদের প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে বল, আমি আবার মর-জগতে আবির্ভূত হই!" সহসা ঘরের মধ্যে গভীর অন্ধকার ছাইয়া আসিল; যে যার সকলেই নীরব রহিয়া গেল। জন বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তবে, তবে? তোমরা আমাকে এখনও গ্রহণ করিতে চাও না? আজ যদি আমি জন্মাই—তেমনি আমাকে পোড়াইয়া মারিবে?" ধর্ম্মযাজক বলিল, "ধর্ম্মোন্মাদদের মৃত থাকাই ভাল। আমাদের মানুষের চোখ ঋষি ও ভণ্ড ধরিতে পারে না। বিদায়!" ধর্ম্মযাজক চলিয়া গেল। জনকে ফিরিয়া পাইবার কোনও আগ্রহ না দেখাইয়া যে যার পথে আম্‌তা-আম্‌তা করিতে করিতে ফিরিয়া গেল। জনকে যখন পোড়াইয়া মারা হয়, তখন একজন সৈনিক তাঁহাকে দুইখানি কাঠ ছুঁড়িয়া দিয়াছিল—ক্রশ করিবার জন্য। জীবনে তাহার ঐ একমাত্র পুণ্য কাজ। সেইজন্য প্রত্যেক বৎসরে একদিন করিয়া সে নরক হইতে ছুটি পাইত। সেও সেখানে উপস্থিত ছিল। জন সর্ব্বশেষে সৈনিকটীর দিকে ফিরিয়া চাহিল। "কি, তুমিও আমাকে চাও না?" সৈনিকটী তাহার পূর্ব্বগামীদের নিন্দা করিয়া কি বলিতে যাইতেছিল এমন সময় দূরে গির্জ্জায় রাত্রি বারোটা বাজিয়া উঠিল। সৈনিকটী চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহারও ফিরিয়া যাইবার সময় হইল। জনের দিকে না ফিরিয়াই সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। সেই পরিত্যক্ত নির্জনতার মধ্যে ঊর্দ্ধে দুই হাত তুলিয়া জন বলিয়া উঠিল, "হে পরমেশ্বর, তুমি তোমার পৃথিবীকে সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছ; কিন্তু কবে, আর কতদিন পরে তোমার সুন্দর পৃথিবী তোমারই প্রেরিত পুরুষদের গ্রহণ করিবে? কবে? আর কত দিন পরে?"

এই ব্যথিত প্রশ্ন শ'এর সমস্ত সাহিত্য হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে; এবং শ'এর কঠিন মুখের দিকে চাহিয়া মনে হয়, এ প্রশ্নের কোনও উত্তর মানুষ দিতে পারে না—তাহার কারণ সে তাহা চায় না।

লুভারের মিউজিয়াম

(গ্রীক ভাস্কর্য্য)

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

গ্রীস ইয়োরোপীয় সভ্যতার আদি জননী। তাহার দর্শন, তাহার সাহিত্য, তাহার শিল্পকলা হইতেই ইয়োরোপের দর্শন সাহিত্য শিল্প উৎসারিত, পরিপুষ্ট, বিকশিত। গ্রীস হইতে সভ্যতার ধারা ইতালীতে আসিল; ইতালী হইতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী—ইয়োরোপের দেশে দেশে প্রবাহিত হইয়া গেল; আর্টের যে উজ্জ্বল সুন্দর প্রদীপটি গ্রীস জ্বালাইয়া দিল, তাহারি শিখায় ইতালী আলোকিত হইল, সেই আগুন পর্ব্বের পর পর্ব্বে সমস্ত ইয়োরোপে ছড়াইয়া পড়িল। সেই ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি রিনেসাঁর সময় আবার নবতেজে জ্বলিয়া উঠিল—ইয়োরোপে নবপ্রাণ সঞ্চারিত করিয়া দিল। অপূর্ব্ব অতুলনীয় ওই গ্রীসের আর্ট।

আরলেসে প্রাপ্ত ভেনাস

মিনার্ভা

কি করিয়া এই অনিন্দ্যসুন্দর আর্টের উৎপত্তি হইল, কোথায় এর উৎস, সে বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। এক দল বলেন, গ্রীকজাতি আসিবার পূর্ব্বে যে মাইনন্ সভ্যতা (Minoan civilisation) ছিল তাহারি আর্টের ধারা মন্দগতিতে বহিয়া আসিতেছিল,—গ্রীক আর্ট তাহারি নব রূপ, নব জাগরণ। অপর দল বলেন, মাইনন্ আ

গ্রীক আক্রমণের সময় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। গ্রীক আর্ট গ্রীকজাতির সম্পূর্ণ নিজস্ব সৃষ্টি, গ্রীকজাতির আত্মার সুন্দরতম প্রকাশ। অবশ্য তাহা ইজিপ্টের, বাবিলোনের ফিনিসিয়ানদের আর্ট হইতে অনুপ্রাণিত হইতে পারে।

অতি প্রাচীন কালে যিশুখৃষ্টের জন্মের ত্রিশ শতাব্দী পূর্ব্বে গ্রীস Achaeans নামে এক এসিয়া-ভূত জাতির বাসভূমি ছিল। প্রায় ১১০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে উত্তর হইতে জাতির এক শাখা এসিয়া মাইনর, থ্রেস, আটিকা অধিকার করে। এই শাখার নাম Ionian (আইওনিয়ান)। অপর দল Dorian (ডোরিয়ান) Peloponnese অংশ অধিকার করে। এই ডোরিয়ান ও আয়োনিয়ান দল আদিম জাতিদের সাহিত্য-শিল্প আত্মস্থ করিয়া যে নব সভ্যতার সৃষ্টি করিল, তাহাতেই গ্রীক আর্টের জন্ম হইল। দুই দলের কিছু প্রকৃতিগত

প্রেম ও আত্মা (কানোভা)

তরুণ উপদেবতা ফ্লুট বাজাইতেছে

হেলেনিক জাতি (Hellenic) গ্রীস আক্রমণ ও অধিকার করে। তাহারা আদিম জাতির লোকদের তাড়াইয়া দেয় অথবা নিজেদের মধ্যে আত্মসাৎ করিয়া লয়। ধীরে ধীরে এই জাতি ইতালী হইতে এসিয়া মাইনর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া অধিকার করিয়া এক নব সভ্যতা গড়িয়া ফেলে। হেলেনিক পার্থক্য ছিল। আয়োনিয়ানরা ছিল সুখপ্রিয়, শিল্পবিলাসী। তাই শেষাশেষি তাহারা জাঁকজমক ও আরাম ভালবাসিত; ডোরিয়ানরা ছিল দুঃখসহিষ্ণু, দৃঢ়, একটু বর্ব্বর। তাহাদের মধ্যে নিয়মনিষ্ঠা, শৃঙ্খলা, বৃহগঠনপ্রিয়তা বিশেষ ভাবে বিকশিত হইয়াছিল। আয়োনিয়ান ও ডোরিয়ানদের

প্রভেদ হচ্ছে এথেন্স ও স্পার্টার প্রভেদ। জাতির মধ্যে এরূপ বিভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন দল থাকাতে গ্রীক সভ্যতা শক্তিমান, বিচিত্র, পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

খৃষ্ট-জন্মের ছয় শতাব্দী পূর্ব্বে, গ্রীসের আর্ট তাহার সুন্দর বিশেষত্বময় রূপ লইয়াছে, পাঁচ শতাব্দী পূর্ব্বে গ্রীক আর্ট পরিপূর্ণতায় পৌছিয়াছে, তাহার গৌরবময় যুগ আরম্ভ হইয়াছে। আর খৃষ্ট-জন্মের দেড় শতাব্দী পূর্ব্বে রোমের অধিকারের সময় গ্রীক আর্টের অবনতির সময় আরম্ভ, অপূর্ব্ব সৃষ্টির শেষ। কিন্তু এই কয়েক শতাব্দী ধরিয়া গ্রীক

"সামোথ্রেস দ্বীপের জয়শ্রী"

আর্ট জগতের সভ্যতায় যাহা দান করিয়া গিয়াছে, তাহা অক্ষয়, অতুলনীয়। এই আর্টের মূলধন লইয়াই ইয়োরোপ তাহার আর্টের ঐশ্বর্য্য সৃষ্টি করিল।

কি মহাগুণে এই আর্ট সমস্ত মানব শিল্পকলার অভিব্যক্তি ও অগ্রসর গতিতে তাহার চিরপ্রভাব জারী করিয়াছে? গ্রীক আর্টের মর্ম্মবাণী হচ্ছে, সুন্দরকে একটি পরিপূর্ণ রূপ দিতে হইবে, শিল্পদ্রব্যের অন্তর্নিহিত আইডিয়াটির মধ্যে, ও তাহার প্রকাশ, তাহার রচনার মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য থাকিবে। ঐক্য ও লজিক এই দু'টি হচ্ছে গ্রীক আর্টের ভিত্তিভূমি, তাহার প্রধান দু'টি গুণ। গ্রীক আর্টে দেখি, তাহার মাত্রা, তাহার শান্তি, তাহার সকল স্তূপের ক্রমমিল, তাহার খুঁটিনাটির সূক্ষ্মকার্য্য, আবার তাহার সকল
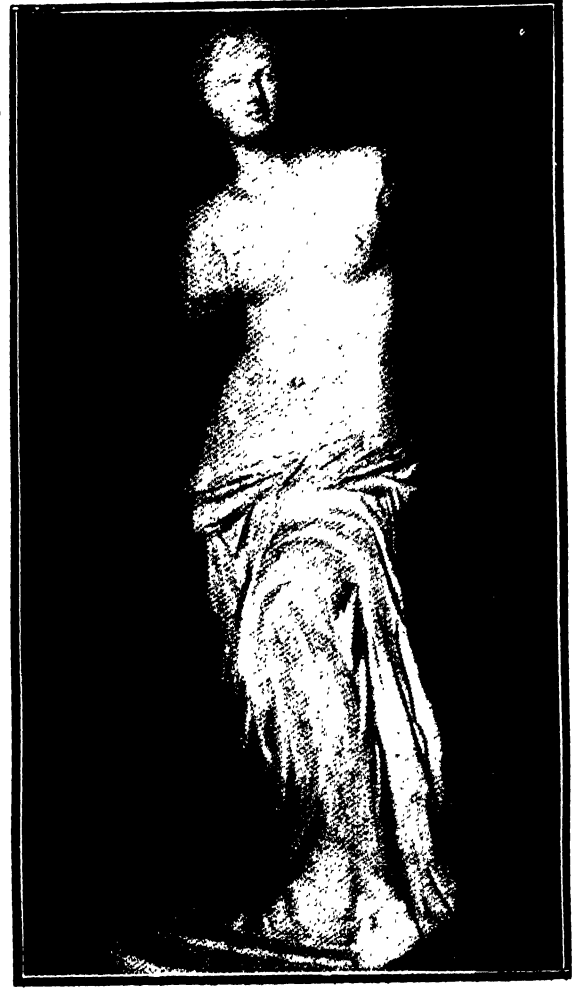
"মিলো দ্বীপে প্রাপ্ত ভেনাস"

ছোট অংশের সঙ্গতি,—এই সকল গুণে আর্ট অতি সুন সমন্বয়ে বাঁধা। এই ঐক্য, সকল অংশের সুন্দর সম্মিলনে এই একতান, সৌন্দর্য্যকে যেমন সহজ সরল, তেম্নি শক্তি আবেগরূপে প্রকাশিত করিয়াছে। গ্রীক আর্ট হ লজিক। সমগ্রের সহিত প্রতি ক্ষুদ্রের ঐকান্তিক মি গঠনের সহিত রূপের নিবিড় সংযোগ, তাহার এই

নির্ম্মাণ প্রণালীর নীতিগুলি যেন চিরন্তন সত্যের মত। আর্ট সৃষ্টির সব রীতি ও নিয়ম লজিকের সূত্রের মত চিন্তা করিয়া, বিচার করিয়া, পরীক্ষা করিয়া আবিষ্কার করা। বিশেষতঃ গ্রীক স্থাপত্যে গ্রীক আর্টের এই বিশেষত্বটি বিশেষভাবে প্রকাশিত। একটি গ্রীক মন্দির যেন প্রস্তরের একটি স্বর-সঙ্গতি, কি সুন্দর ঐক্যে বাঁধা। তার প্রতি ক্ষুদ্র

মৃগয়া দেবী ডায়না

অংশের সুর সমগ্র মূল সুরের সঙ্গে এক তারে বাঁধা, কোথাও একটু তাল কাটে নাই। কেবল গঠনের দিক দিয়া নহে, রূপের দিক দিয়া, সমগ্রতার দৃষ্টির দিক দিয়া দেখিলে একটি মন্দিরকে মনে হয় যেন পাথরের ছন্দোবদ্ধ কোন গ্রীক-কবির কবিতা।

ভারতবর্ষের মত গ্রীসেও ভাস্কর্য্য সাহিত্য, দর্শনের ও স্থাপত্যের পরে বিকশিত হয়। স্থাপত্যের শোভাসাধক অঙ্গ রূপেই ভাস্কর্য্যের প্রথম আরম্ভ। গ্রীক দেবমন্দিরের Frieze কোন পুরাণ কথা বা দেবীকাহিনী দিয়া কারুকার্য্য খচিত করিবার জন্যই ভাস্করের আহ্বান হয়। দেবমন্দিরে গ্রীক ভাস্কর্য্যের জন্ম হইল, ব্যায়ামাগারে তাহার পুষ্টি ও

"সাইকি" (প্রাদিএ)

পূর্ণতা হইল, মানব অন্তরের নারী-সৌন্দর্য্যানুভূতিতে তাহার সার্থকতা হইল।

গ্রীক ভাস্কর্য্যের ইতিহাস মোটামুটি চারিটি যুগে বিভাগ করা যায়

প্রথম, আদিম যুগ (ষষ্ঠ শতাব্দী খৃঃ পূঃ); দ্বিতীয়

আদর্শবাদের যুগ (পঞ্চম শতাব্দী খৃঃ পূঃ); তৃতীয়, স্বাভাবিক যুগ, (চতুর্থ শতাব্দী খৃঃ পূঃ); চতুর্থ, বাস্তবতার যুগ (তৃতীয় ও দ্বিতীয় শতাব্দী খৃঃ পূঃ)।

মন্দিরের Friezeতে নানা মূর্ত্তিময় কারুকার্য্য গঠনে আদিম যুগের আরম্ভ। এ যুগের বিশেষত্ব হচ্ছে মূর্ত্তি সব উদ্গাত, তাহারা সব পাশাপাশি সারি সারি বসিয়া,—আমরা কেবল সম্মুখ হইতে এক দিক দেখিতে পাই। মূর্ত্তিগুলি স্থূল, ভঙ্গীর মধ্যে বেশ সৌন্দর্য্য নাই, রূপকার সৌন্দর্য্যময় মূর্ত্তি গঠনে সাধনা করিতেছে, পূর্ণ সফলকাম হয় নাই।

আদর্শবাদের যুগ হচ্ছে গ্রীক ভাস্কর্য্যের স্বর্ণ-যুগ। এই যুগের তিনটি নাম আর্টের ইতিহাসে অমর—মাইরণ (Myron), পলিক্লিট (Polyclete) ও ফিডিয়াস (Phidias)। মাইরণ প্রথমে গত যুগের অঙ্কন রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আনিলেন। পলিক্লিট আদর্শ মানবদেহমূর্ত্তি গঠনের অনুশাসন স্থির করিলেন, তাঁহার আদর্শ মূর্ত্তি সমস্ত যুগের প্রামাণ্য মূর্ত্তি হইল; তাঁহার গঠন-নীতি অনুসারে তিনি দেহকে সাতটি সমান ভাগে বিভক্ত করিলেন। তার মধ্যে মাথাটি উচ্চতায় সমস্ত দেহের উচ্চতার এক-সপ্তমাংশ হইবে। ফিডিয়াসই গ্রীক ভাস্কর্য্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপকার। তিনি তাঁর মূর্ত্তিতে যেমন শক্তি, মহান ভাব আনিলেন, তেম্নি সামঞ্জস্যের শান্তি সুষমা আনিলেন। বাস্তব মানব দেহের আদর্শেই তাঁর মূর্ত্তি সব গঠিত; কিন্তু ভাস্কর আপন অন্তরের কোন সৌন্দর্য্য-স্বপ্ন সে বাস্তবতায়, সে কঠিন প্রস্তরখণ্ডে মূর্ত্তিমান করিলেন। তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর গঠন-সৌকুমার্য্য মানব-মূর্ত্তিকে যেমন দেবতা করিল তেম্নি দেব-মূর্ত্তিতে মানবশ্রী ভরিয়া দিল। কি সংযত, কি সুষমাভরা, কি ছন্দময় তাঁহার মূর্ত্তিগুলি। ফিডিয়াস ও তাঁর শিষ্যগণই এথেন্সের সুপ্রসিদ্ধ পারথেনোন (Parthenon) গড়িয়াছিলেন। পারথেনোনের ফ্রিজে (Frieze) চমৎকার মূর্ত্তিগুলি উদ্গাত করা আছে। এই ফ্রিজের এক টুকরা লুভারে আছে, কিন্তু সুন্দর অংশগুলি লণ্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে।

স্বাভাবিক যুগের রূপকারগণ পলিক্লিটের সব অনুশাসন, ফিডিয়াসের গঠননীতির বিরুদ্ধে চলিলেন, তাঁরা ধীরে ধীরে বাস্তবতার পূজারী হইতে চাহিলেন; পলিক্লিটের প্রামাণ্য মূর্ত্তি তাঁহারা মানিতে চাহিলেন না। এ যুগের শ্রেষ্ঠ বিপ্লব হচ্ছে নগ্না নারীর মূর্ত্তি গঠন। চতুর্থ খৃঃ পূঃ শতাব্দীর পূর্ব্বে গ্রীক ভাস্করগণ যে সব নারীমূর্ত্তি গড়িয়াছেন, তাহা সাধারণতঃ বস্ত্র-পরিহিতা; নিরাভরণা নারীদেহের সকল সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য এই যুগে রূপকারের অন্তরের সৌন্দর্য্য-পূজার সহিত মিশিয়া মূর্ত্তিমতী হইল নানা ভেনাস মূর্ত্তিতে।

তাহার পর গ্রীক আর্টের ধীরে ধীরে অবনতি হইতে লাগিল। তৃতীয় খৃঃ পূঃ শতাব্দে এথেন্স আর আর্টের রাজধানী নয়—তাহার স্থান আলেকজান্দ্রিয়া লইয়াছে।

"মিলোর ভেনাস" মাথা

বাস্তবতা আর্টে আসিল। তাহার ভাবাবেগ, অশান্ত ছন্দ, বেদনার উচ্ছ্বাস, দেহের সুখদুঃখের ভঙ্গীগুলিকে ভাস্কর রূপ দিতে মাতিয়া উঠিলেন। এই যুগের একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হচ্ছে—Laocoon.

এমন সুন্দর সব দেহের মূর্ত্তির আইডিয়া ভাস্কর কোথা হইতে পাইলেন, তাহার অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, গ্রীক যুবক যুবতীগণের সুগঠিত সুন্দর দেহ দেখিয়াই ভাস্করগণ

এই মূর্ত্তি সব গড়িয়াছেন। এইখানে গ্রীক আর্টের সঙ্গে গ্রীক জীবনের নিবিড় সম্পর্ক বোঝা যায়। গ্রীক ভাস্কর্য্যের সহিত গ্রীক 'ব্যায়াম-ক্রীড়া গভীরভাবে জড়িত। ব্যায়াম-ক্রীড়া গ্রীক সভ্যতার একটি অঙ্গ ছিল। মনের সহিত দেহের সামঞ্জস্যময় বিকাশ ছিল গ্রীক জীবনের আদর্শ। এই ক্রীড়া-চর্চ্চা নিছক স্বাস্থ্যের জন্য বা আমোদের জন্য নয়, ইহা গ্রীক-জীবনের শক্তির প্রাচুর্য্যের একটি প্রকাশ, তাহার আত্মার একটি পরম সুন্দর রূপ। বর্ত্তমান সময়ে স্বাস্থ্য-সঞ্চয়, শরীর-উন্নতির জন্য ব্যায়াম করা, জিমন্যাস্‌টিক করা, ড্রিল করা ইত্যাদি নানা উপায় আছে। গ্রীকরা এ সব একঘেয়ে, ক্রীড়া করিয়া তার পর স্নান করিয়া বাড়ী ফিরিত। মধ্যবয়স্ক লোকেরাও এই ক্রীড়াতে যোগ দিত; কারণ, গ্রীসে বৃদ্ধ ব্যতীত সকল নগরবাসীর পক্ষে সৈনিকবৃত্তি বাধ্যতামূলক ছিল। এই ক্রীড়াগারে সকলে প্রবেশ করিয়া প্রথমে নগ্নদেহ হইত। তার পর সমস্ত নগ্ন দেহে তেল ঘষিয়া মালিস করিত। তেল রগড়ানোর পর ব্যায়াম বা ক্রীড়া, তার পর স্নান, তার পর আবার তেল ঘষা। এই অনাবৃত দেহে নানা খেলা করিবার সময় প্রতি খেলোয়াড়কে ছন্দে তালে চলিতে হইত। খেলা করাটাও একটা মস্ত আর্ট ছিল,—দেহের ছোটার, চলার গতিতে ছন্দ থাকা চাই। অনেক সময় খেলার
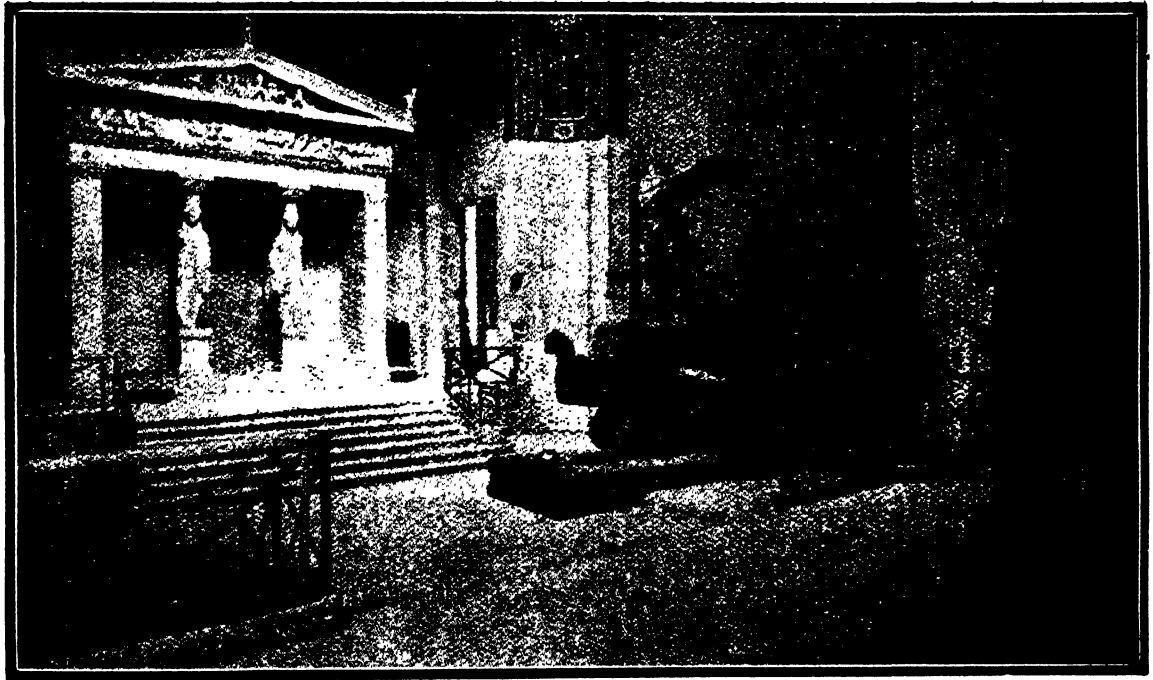
লুভারের মিউজিয়াম। সিঁড়ির এক কোণ

স্ফূর্ত্তিহীন শরীর-চর্চ্চা প্রথা পছন্দ করিতেন না। তাঁহারা চাহিতেন খেলার আনন্দ, ছন্দের সৌন্দর্য্য, নৃত্যের সুখ, গানের সুরের সহিত তাল রাখিয়া দেহের ভঙ্গীলীলা। প্রতি সহরে ব্যায়াম-ক্রীড়াগার (gymnasia) ছিল, এখানে নানাপ্রকার ব্যায়াম ও ক্রীড়া করিবার জন্য অনেক ঘর ও স্থান থাকিত। তাহার সহিত গরম ও ঠাণ্ডা জলে স্নানের ঘর ও তেল মাখিবার ঘর সকল থাকিত। সহরের প্রায় প্রতি যুবক সকালে দু'এক ঘণ্টা এই ব্যায়াম-ক্রীড়াগারে দৌড়ান, লাফান, চাকা ছোঁড়া, বল খেলা ইত্যাদি নানারূপ সঙ্গে বাঁশী বাজিত, তাহারি সুরের তালে তালে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া, সব গতিস্থিতি হওয়া চাই। দু'টি প্রধান ক্রীড়া ছিল নৃত্য ও বল-খেলা। গ্রীক নৃত্য বর্ত্তমান নৃত্যের মত যুগল-নৃত্য ছিল না; পুরুষদের নৃত্য সাধারণতঃ অনুকরণ-মূলক ছিল,—শিকারের বা যুদ্ধের সব গতিবেগ, ধাবন, আক্রমণ ইত্যাদির ছন্দ অনুকরণ করিয়া নৃত্য হইত, তাহার সাথে তাল রাখিতে ফ্লুট বাজিত। বল-খেলা খুব প্রিয় ছিল, মেয়েরাও এ খেলা খেলিত। তা ছাড়া, চাকা ছোঁড়া, বর্শা-ছোঁড়া, লাফান, দৌড়ান, মল্লযুদ্ধ ইত্যাদি নানা খেলা

ছিল। একটি সুন্দর খেলা ছিল জ্বলন্ত মশাল-দৌড়ে প্রতিযোগিতা। মেয়েরা অবশ্য পুরুষদের মত সব ক্রীড়া করিত না, তবে স্পার্টার মতন সহরে যুবতারাও যুবকদের মত ব্যায়াম-ক্রীড়া করিত। এই সব ক্রীড়ায় সুন্দর ভাবে সুরের সহিত তাল রাখিয়া ছোটা বা চলা বা দাঁড়ানো, সকল অঙ্গভঙ্গী করা প্রধান বিশেষত্ব ছিল। এই ছন্দের সৌন্দর্য্য আমরা গ্রীক মূর্ত্তিগুলিতে দেখিতে পাই।

ভাস্করগণ এই ব্যায়াম-ক্রীড়াগার হইতে নরদেহের সুগঠিত সুঠাম সামঞ্জস্যপূর্ণ সৌন্দর্য্যের পরিচয় পাইয়াছিলেন, সেই দেহ-সৌন্দর্য্যকে তাঁহারা পাথরের মূর্ত্তিতে চিরন্তন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই মূর্ত্তিগুলিতে শক্তির সহিত যে সুষমা, প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে সামঞ্জস্য, দাঁড়াইবার ভঙ্গী, যে সুন্দর রূপ, যে ছন্দ দেখিতে পাই, তাহা ভাস্করের কল্পনা বা স্বপ্নের সৃষ্টি নয়, তাহা গ্রীক যুবকগণের ক্রীড়াচর্চ্চার ফল, দেহের সৌন্দর্য্য-সাধনার রূপ। আমরা কাহারও সৌন্দর্য্য বুঝিতে তাহার মুখের সৌন্দর্য্যই বুঝি; অর্থাৎ তাহার দেহের অনাবৃত অংশের সৌন্দর্য্যই বুঝি, কিন্তু গ্রীসে ক্রীড়ারত যুবকগণ অনাবৃত থাকিত বলিয়া, তাহাদের সৌন্দর্য্য সমস্ত দেহের একতান বিকাশের রূপ। সেই রূপ গ্রীক রূপকারগণ অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

লুভারে গ্রীক ভাস্কর্য্যের যে সব সুন্দর মূর্ত্তিগুলি আছে তাহাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হচ্ছে "মিলোর ভেনাস" (Venus of Milo)। এই অনিন্দ্য-সুন্দরী নারীমূর্ত্তির বোধ হয় সমস্ত পৃথিবীর ভাস্কর্য্যে তুলনা নাই। মেলাস্ (Melos) দ্বীপে ১৮২০ খৃঃ অব্দে এই মূর্ত্তিটি খুঁজিয়া পাওয়া যায়। রূপকারের নাম অজানা। অনেকের মতে এ মূর্ত্তি খৃঃ পুঃ চতুর্থ শতাব্দীতে গড়া। বস্তুতঃ, সেই আদর্শবাদের যুগের সকল গ্রীক ভাস্করের অন্তরের নারী সৌন্দর্য্য-স্বপ্ন মিলিয়া সকলের রূপ-সাধনা দিয়া যেন এ মূর্ত্তিটি গঠিত হইয়াছে। এ দেবী ভেনাস নয়, এ কোন গ্রীক তরুণী, রূপকারের মনের সব মাধুরী দিয়ে গড়া। এর সংযত সুষমাময় সৌন্দর্য্যের সম্মুখে অন্তর কি গভীর সুধারসে স্নিগ্ধ হয়। এ মন-ভোলানো রূপ বটে, কিন্তু মন-মাতানো নয়, এ অতি সুগভীর। হাত দু'টি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তবু কি জীবন্ত, পরিপূর্ণ; দাঁড়াইবার ভঙ্গীটি কি শোভন, কোমরের কাছে ওই বাঁকান সমস্ত তনুবল্লরীকে কি সুন্দর ছন্দিত করিয়াছে! এ রক্ত-মাংসের নারী সৌন্দর্য্যের কি মহিমায় দাঁড়াইয়া, সম্মুখে আসিলে মাথা যেন সৌন্দর্য্য-পূজায় নত হইয়া পড়ে। কত শত বৎসর পূর্ব্বে মিলোর রাজপথে বা সমুদ্রতীরে বালুকায় কোন সূর্য্যকিরণোজ্জ্বল প্রভাতে কোন অজ্ঞাতনামা গ্রীক রূপকার কোন গ্রীক যুবতীকে কোন পরমসুন্দর দৃষ্টিতে দেখিয়াছিল,—তাহারা চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের পর কত কত বৎসর চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু সেই নারীর মন-ভোলানো পেলব রূপ শিল্পীর সাধনায় অক্ষয় কঠিন পাথরে অনন্ত জন্মলাভ করিয়া চির-অম্লান পারিজাতের মত সকল রসিকজনের সৌন্দর্য্যের স্বর্গপুরীতে কি স্নিগ্ধ মহিমায় আনন্দিতা। কত শত সৌন্দর্য্যপিপাসু অন্তর এই অপরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করে!

লুভারে আরও অনেকগুলি ভেনাস আছে। "আর্লেসের ভেনাস"টি (La Vénus d' Arles) সুন্দর। কোঁকড়ান চুলের খোঁপা-বাঁধা মাথাটি যেন মৃণালের ওপর পাপড়ি-মেলা পদ্ম; এক হাতে আপেল, সৌন্দর্য্য-প্রতিযোগিতায় সে যে বিজয়িনী হইয়াছে, তাহারি চিহ্ন। মূর্ত্তিটি রূপকার প্রাক্সিটেলের (Praxitéle) ধরণে, তাঁহার অথবা তাঁহার কোন শিষ্যের গড়া।

মৃগয়া দেবী ডায়নার মূর্ত্তিটিও কি সুন্দর! এক হাতে এক হরিণ-শাবক ধরিয়া অপর হাতে পিঠের তূণ হইতে একটি শর বাহির করিতেছেন, যেন ছুটিয়া যাইতে যাইতে ক্ষণিকের জন্য দাঁড়াইয়াছেন, এই ভঙ্গীটি কি গতিতে ছন্দেতে ভরা।

"এক তরুণ উপদেবতা ফ্লুট বাজাইতেছে" (A young Satyr playing the flute) মূর্ত্তিটি কোন তরুণ গ্রীক যুবকের সুন্দর সামঞ্জস্যময় দেহের রূপ, কোন ক্রীড়াগারে এই দেহ দেখিয়া ভাস্কর বিমুগ্ধ হইয়া আপন অন্তরের সাধনায় পাথর খুদিয়া এ মূর্ত্তি গড়িয়া গিয়াছেন।

"মিনার্ভা" (Minerva of Villetri) মূর্ত্তিটি গ্রীক নয়, এটি রোমীয়; ফিডিয়াসের একটি সুন্দরী মূর্ত্তির অনুকরণ রূপে এটির বেশ মূল্য আছে।

ইতালীয়ান ভাস্কর কানোভার (Canova, ১৭৫৭-১৮৮২) "প্রেম ও আত্মা (Love and psyché) ও ফরাসী ভাস্কর প্রাদিএর (Pradier, ১৭৯৪ ১৮৫২)র "সাইকি" (Psyche) এই মূর্ত্তিগুলিতে দেখি আঠারো

উনিশ শতাব্দীতেও ইয়োরোপীয় মূর্ত্তিশিল্প গ্রীক আর্ট দ্বারা প্রভাবান্বিত। সাইকি (Psyche) হচ্ছে গ্রীক পুরাণে মানবাত্মার প্রতীক। গ্রীসে "সাইকি"র মূর্ত্তি গঠিত হইত এক সুকুমারী তরুণীরূপে, তাহার দুটি পাখা থাকিত, পাখীর অথবা প্রজাপতির মত; কখনও বা প্রজাপতির মূর্ত্তিই "সাইকি"র রূপক মূর্ত্তিই হইত। সেজন্য কানোভা-গঠিত 'সাইকি'র মূর্ত্তির হাতে একটি প্রজাপতি।

আর একটি অপূর্ব্বসুন্দর মূর্ত্তির কথা বলিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিব। "সামোথ্রেসে-প্রাপ্ত জয়শ্রী" মূর্ত্তিটি ভাস্করের কি অসামান্য প্রতিভার পরিচায়ক! মূর্ত্তিটির গঠন-সময় আমরা জানিতে পারি, কারণ এটি এক নৌ-যুদ্ধ জয়ের গৌরব স্মৃতিরূপে তৈরী করা হইয়াছিল। প্রায় ৩০৫ খৃঃ পূঃ অব্দে টলেমির বিরুদ্ধে এক নৌযুদ্ধে বিজয় লাভে সামোথ্রেস দ্বীপে দেমেত্রিউস্ পলিওরসেত্ এই মূর্ত্তিটি স্থাপিত করান। লুভারে মূর্ত্তিটি ভগ্নরূপে আছে। তাহার মাথা নাই, হাত নাই, কেবল সুন্দরী দেহে দুটি ডানা, কিন্তু এই ভাঙা-মূর্ত্তিটি দেখিলেই মন সৌন্দর্য্যরসে অভিভূত হয়। দেহের ভঙ্গীতে কি গতির ছন্দ, ডানা দুইটি'তে কি গতির বেগ,—যেন বিজয়-লক্ষ্মীদেবী দুই পক্ষ বিস্তারিত করিয়া যুদ্ধ-জাহাজের ওপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, সকল যোদ্ধার মনে গতি-বীরত্বের সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। সাহসের সঙ্গে, আশার সঙ্গে, প্রাণ তুচ্ছ করিয়া এগিয়ে যাওয়ার, আনন্দে উড়িয়ে যাওয়ার ছন্দময় গতিবান রূপকে রূপকার কি সুন্দর আর্টে মূর্ত্তি দিয়াছেন।

জন্ম হ'তে জন্মান্তরে

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

১

অনন্ত-যৌবনা অয়ি পৃথিবী সুন্দরী
তোরে আমি ভালবাসি; দিবস শর্ব্বরী
তোর শ্যামাঞ্চল, তোর জলধারা-বেণী
তোর লোকালয়, তোর উচ্চ সৌধশ্রেণী,
তোর উষা, তোর সন্ধ্যা, তোর নিশিদিন,
আমার জীবন-পথে অনন্ত নবীন
গাহিছে আনন্দ-গীতি; তোর সুখ দুখ
জীবন-সংগ্রামে মোর ভরি' দিয়া বুক
করেছে মানুষ মোরে; অজ্ঞানতা সব
গিয়াছে টুটিয়া; তোর সকল বিভব
জীবন-মন্দির মোর পূর্ণ করি নিতি
শিখাইছে চারিদিকে জ্ঞান প্রেম প্রীতি
বিতরিয়া, প্রচারিতে বিশ্বরাজাদেশ
যুগে যুগে লোকে লোকে—ধন্য পরমেশ।

২

এত রূপ, এত শোভা, এত কলতান
এর মাঝে নাহি যদি মিলে ভগবান,
তবে আর কোথা পাব? কোন্ গুহামাঝে
নির্জ্জনে তোমারে জপি' মরণের সাজে,
কোন্ অরণ্যের হৃদ্য অন্ধ তমসায়
কাটায়ে জীবনখানি আলস্যে হেলায়
তোমারে খুঁজিয়া পাব? তোমারি রচিত
এই যে উদ্যানখানি, তাহাতে অঙ্কিত
তব চরণের দাগ প্রতি কুঞ্জমাঝে,
প্রতি পুষ্পবাটিকায়, প্রতি পুষ্পে রাজে
তোমার তনুর বাস; প্রতি কলতান
পূর্ণতর হ'য়ে আছে দিয়া তব গান;—
তোমারে ইহার মাঝে নাহি যদি পাই,
কোথা পাব তব সনে মিলিবার ঠাঁই!

৩

যেদিন শুনালে মোরে জীবন-সঙ্গীত
সেইদিন জাগি' উঠি' তব সে ইঙ্গিত
লইলাম শির পাতি, তাই আমি যাই
অনন্ত জীবন-পথে সদা গান গাহি'

সুখের দুখের ; কভু হাসি কভু কাঁদি ;
শত গ্রন্থি দিয়া মোর জীবনেরে বাঁধি'
তোমারি ইঙ্গিত মত খেলিয়া চলিতে
শিখিয়া নিয়েছি প্রভু ; তাই মোর চিতে
নাহি বসে কভু কোন বন্ধনের দাগ,
তোমার বন্ধনমাঝে মোর অনুরাগ,
অনন্ত যৌবন নিয়া রয়েছে বিকাশি ;
সুখ দুখ নাই মোর, তবু অশ্রু হাসি
নিয়েছে আপনা করি' তোমার খেলায়
আপনা ঢালিব বলি' অনন্ত লীলায়।

৪

সব চেয়ে বড় মোর এই অভিমান
তোমা সনে খেলিবারে পাই ; তব গান
আমার কণ্ঠেতে তুমি ঢালিয়া আপনি
করেছ পাগল মোরে ; তাই মনে গণি
আমি তব প্রয়োজন—মম কণ্ঠস্বরে
ঢালিয়া রাগিণী তব গাঁথ' যেই মালা
সে মালিকা পুনঃ দিয়া তব কণ্ঠ'পরে
মানি সুখ-অভিমান ; পৃথিবী চঞ্চলা
তার মাঝে তুমি মোরে করিয়াছ স্থির
তব নিজ কীর্ত্তি দিয়া ; আনন্দের নীর
ছিটায়ে আমার প্রতি অঙ্গে মনে প্রাণে
রচেছ বিরাট দুর্গ ; জীবন-সংগ্রামে
তাই মোর সব চেয়ে বড় অভিমান—
তোমা সনে খেলি আমি গাই তব গান।

৫

মহৎ করিয়া মোরে সৃজেছ আমায়
ওগো মহোত্তম ! এই বিরাট লীলায়
খেলিবার সাথী আমি, শিষ্য আমি তব,
তাই যত্ন করি' প্রতি পল নব নব
শিখাইছ কত যে সঙ্গীত ; হৃদি বীণে
কভু কি উঠিত তান তব স্পর্শ বিনে ?
তোমার পরশ বিনে যৌবনের টানে
উঠিত কি পুলক-হিল্লোল ? কলগানে
মুখরিত নিশিদিন জীবন-মন্দির
সে যে তব কণ্ঠরব ; সকল কন্দির
মাঝখানে ফুটাইয়া তোমার কমল
মম হৃদে ঢালিতেছ স্বপ্ন অবিরল ;—
নহি আমি নরকের কীট, ক্ষুদ্র জীব—
এ ভুবনে আমি তব রহস্য প্রদীপ।

৬

জীবন-মন্দিরে আমি যেদিন প্রথম
প্রবেশিনু শঙ্খ হাতে ওগো সর্ব্বোত্তম !
সেদিন তোমারে মোর পড়ে নাই চোখে,
আমারে আড়াল করি' রহস্য-আলোকে
ছিলে তুমি সম্বরি তোমায় ; বিশ্বময়
বুঝি নাই তব সঙ্গীতের তান লয়
করিতেছে প্রতি পল রহস্য সৃজন—
অনন্ত মুক্তির মাঝে সহস্র বন্ধন !
তাই মোর শঙ্খ দিত যেই সুর আনি'
ভাবিতাম সবি মোর নিজ কণ্ঠবাণী !
কিন্তু আজি রহস্যের ঘন যবনিকা,
নিমেষে সরায়ে ফেলি' তব আলোশিখা
অন্ধ আঁখি দুটী মম করিল উজ্জ্বল
তব গানে ভরি' শঙ্খ হইল সফল।

৭

প্রণয়িনী আমি তব, হে মোর জীবন !
তাই তব যাহা কিছু সকলি উত্তম
মোর কাছে ; সুখ দুখ ব্যথিত বেদনা
সকলেরে নমি আমি করি আরাধনা ;
তব জন্ম তব মৃত্যু তব ধ্বংস লয়,
সকলি সুন্দর মোর হে মহিমময় !
সব মাঝে দেখি আমি তব হাসিখানি,
শুনি তব অবিরাম প্রণয়ের বাণী
হে মোর প্রণয়ী, মম জীবনার্ঘ্যথালি
সাজাইয়া দেই আনি' পরিপূর্ণ ডালি
সুখ-দুখ-হাস-অশ্রু কুসুমের রাশে
তোমার চরণ-প্রান্তে ; যবে নিশি আসে
তব সনে বঞ্চি' সুখে মধু নিশীথিনী
আবার ভুবনে ফিরি তব প্রণয়িনী।

৮

কোটী বন্ধনের মাঝে খেলায়ে চাতুরি
ওগো চিরশিশু তুমি খেল লুকোচুরি
এ ভুবনে নিশিদিন ; ফেলি' যবনিকা
তারি পরে আঁকি' মিথ্যা বন্ধনের লিখা
আমারে ছলিতে চাও ; করি মোক্ষকামী
করিবারে চাও দূর মোরে অন্তর্যামী
তোমার সান্নিধ্য হতে ; তুমি নিশিদিন
যেথায় খেলিছ সুখে বিকার-বিহীন
মাখি' ধূলিরাশি দেহে, বিক্ষুব্ধ ব্যথায়
সুখে দুখে আনন্দেতে আমিও সেথায়
খেলিবারে চাই প্রভু ;—তব সৃষ্টি মাঝে
মোর আশে পাশে মোর ক্ষুদ্রতম কাজে
লক্ষ স্থানে তুমি যে গো আছ ধরা দিয়া,
সে কথা কেমনে আমি যাব পাশরিয়া।

৯

তোমারি নিবিড় মোহ জগতের সনে
রেখেছে বাঁধিয়া মোরে ; চিত্তে প্রাণে মনে
যেইস্থানে যেইখানে তোমার পরশ
মিলেছে জীবনে মোর, নিবিড় হরষ
করিছে আনন্দ দান ; মানবের মুখে
তোমারি রূপের ছায়া নেহারি যে সুখে,
তার ভাব, তার ভাষা, তার প্রেম প্রীতি,
তার হাসি, তার অশ্রু, সুখ-দুখ-গীতি
তোমারি বিপুল স্মৃতি জীবনের পথে
আনে যে বহিয়া সদা ; শত মনোরথে
শত আকাঙ্ক্ষায় শত কামনার মাঝে
খেলার বাঁশিটী তব ফিরি ফিরি বাজে ;—
সবারে ডুবায়ে তুমি অতি স্পষ্টতর
হ'য়ে আছ এ ভুবনে আনন্দের সর।

১০

তোমার অজ্ঞাতে আমি করিনি ত কিছু
তাই যেন মনে রয় ; মরীচিকা পিছু
ছুটিয়াছি সে ত প্রভু তোমারি ইঙ্গিতে।
সকলি ভরেছ তুমি তোমারি সঙ্গীতে
তাই ত বুঝেছি কিছু শ্রেয় প্রেয় নাই
এ নিখিল বিশ্বে মোর ; যেই দিকে চাই
তোমার ভঙ্গিমাখানি এমনি দুর্ব্বার
ফুটি উঠে ধীরে ধীরে নয়নে আমার
সব অন্তরালে ; তাই বিজনে নির্জ্জনে
পাতিনি আসন তব ; তব সৃষ্টি সনে
নিজেরে সহস্র করি' সহস্র মূরতি
জীবন-মন্দিরে মোর চাহিছ আরতি,
তব সে আকাঙ্ক্ষা হতে বঞ্চিতে আমায়
নাহি সাধ, তাই আমি আছি এ ধরায়!

১১

বন্ধনের মাঝে কভু বন্ধ নহি আমি
সেই শিক্ষা মোরে যেন দিও অন্তর্যামী
জন্ম হতে জন্মান্তরে ; তব বিশ্বমেলা
যেন মোর জীবনেতে তুলি চির খেলা
রাখে মোরে চির শিশু করি ; বিশ্বমাঝে
সকলি তোমার, গুপ্ত রহি সব কাজে
ফুটায়ে রেখেছ এই বিশ্বের কমল,
তাই এ ভুবনে সব হরষ-বিহ্বল।
আমি ত চাহি না মোর আঁখি দুটী মুদি'
ইন্দ্রিয়ের অন্তরের বাতায়ন রুধি'
বিশ্বের আলোক এই ঢাকিয়া আঁধারে
দৈন্যের মাঝার দিয়া লভিতে তোমারে ;—
সত্যময় প্রভু তুমি, তব এ ভুবন
তারি রূপ ধরি করে গৌরব সৃজন।

১২

অনবদ্য উষা যবে ধীর পাদক্ষেপে
নামি আসে ধরা'পরে, আলোক বিক্ষেপে
রঞ্জি' দেয় গগনের নিবিড় নীলিমা,
মোর শুধু মনে জাগে তোমার মহিমা,
বিপুল সৌন্দর্য্য তব ; সুস্নিগ্ধ পরশে
বিহঙ্গমকুল যবে পুলকে হরষে
গাহি' ওঠে এককালে সহস্র ঝঙ্কার,
মোর মনে ভাসে তব লক্ষ অলঙ্কার
তোমার বারতা সনে ; পুনঃ দিবাশেষে
সান্ধ্য রবি যবে ধীরে রক্তিম আবেশে

ঢলি' পড়ে অস্তাচলে—পরিশ্রান্ত সুরে
পুরবী রাগিণী তব মম অন্তঃপুরে
বাজি' ওঠে—এ আনন্দ-লোক ছাড়ি' হায়,
কোথায় লুটাব কোন্ আঁধারে ধূলায়।

১৩

তোমারে দেখেছি কবে কোন্ তরুতলে,
কোন্ স্রোতস্বিনী তীরে, কৌমুদীর গায়,
প্রাবৃট-পরশ-তৃপ্ত মঞ্জু তৃণদলে,
সিন্ধুর তরঙ্গমাঝে, দক্ষিণের বায়।
তোমারে পেয়েছি মোর দুখ-অশ্রু-জলে,
তোমারে ছুঁয়েছে মোর সুখান্বিত গান,
তোমারে হেরেছি আমি উষার আড়ালে,
আবার সন্ধ্যার মাঝে রক্তিম বয়ান।
তুমি উঠেছিলে হাসি' যবে এ ধরায়
আমি এসেছিনু নামি; রয়েছ গোপন
আমার মরণ মাঝে; উষায় সন্ধ্যায়
প্রতি পল হেরিতেছি তোমার স্বপন।
আমার কামনা মাঝে তব তৃপ্তি জাগে,
আমি ভালবাসি ধরা তব অনুরাগে।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন এম-এ

চণ্ডী

বৈদিক ও অন্যান্য প্রাচীন দেবতাগণ অপেক্ষা বঙ্গসাহিত্যে লৌকিক দেবদেবিগণেরই প্রাদুর্ভাব অধিক। কারণ তাঁহাদের পূজা-প্রচার জন্যই মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হইয়াছিল। এই সকল দেবতার মধ্যে অগ্রগণ্য চণ্ডী দেবী। মঙ্গলকাব্যে ইঁহার নাম মঙ্গলচণ্ডী। কতকগুলি বৌদ্ধ দেবদেবীকে ভাঙ্গিয়া তাহার সহিত বহু পুরাণ বর্ণিত চণ্ডিকার সম্মেলনে এই মঙ্গলচণ্ডীর পরিকল্পনা হইয়াছে। তাই এক দিকে যেমন বৌদ্ধ ধর্ম্মঠাকুরের সহিত ইঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়, অপর দিকে তেমনি আবার হর-প্রিয়া পার্ব্বতীর রূপভেদ ভাবে বর্ণিত। জনসাধারণের পূজা পাইবার জন্য এই নূতন দেবীকে নানা ছল-বল-কৌশল প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। তাই কথায় কথায় ছলনা ও প্রতারণা করা যেন ইঁহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন কবিগণ তাহার বর্ণনা করিতে গিয়া মধ্যে মধ্যে বেশ হাস্যরসের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। তাহা কোথাও সুস্পষ্ট, কোথাও বা ইঙ্গিত মাত্র।

চণ্ডী কর্ত্তৃক পণ্ডিতের ছলনা

"গোপীচন্দ্রের গানে" রাজা গোপীচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প করিয়া পণ্ডিত বা গণৎকারকে ডাকাইয়া যাত্রা করিবার শুভ দিন নির্ণয় করিতে বলিলেন। পণ্ডিত রাণীদের নিকট ঘুষ খাইয়াছিল,—সে পাঁজী-পুঁথি দেখিয়া বলিল, বারো বৎসরের মধ্যে শুভ দিন নাই। এই অসম্ভব কথা শুনিয়া গোপীচন্দ্রের সন্দেহ হইল; তিনি স্বয়ং গণনা করিয়া পণ্ডিতের চাতুরী ধরিয়া ফেলিলেন। তখন রাজা ক্রোধভরে পণ্ডিতকে চণ্ডীর মন্দিরে বলি দিবার আদেশ দিলেন। পণ্ডিতের ব্যাকুল প্রার্থনায় চণ্ডী সদয় হইলেন এবং শ্বেত মক্ষিকার রূপ ধারণ করিয়া পণ্ডিতের কাণে কাণে উদ্ধারের উপায় বলিয়া দিলেন। তদনুসারে পণ্ডিত রাজাকে বলিল, "আমার অনুপস্থিতি কালে আমার শিশু পুত্র পঞ্জিকা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল, তাই গণনায় ভুল হইয়াছে।" তখন পুনরায় গণনা করিয়া পণ্ডিত দিন স্থির করিয়া দিল এবং প্রচুর পুরস্কার লইয়া প্রস্থান করিল। পণ্ডিত ফাঁকি দিয়া চলিয়া যায় দেখিয়া চণ্ডী মনে মনে বলিলেন,—

"কাটির ব্যালা বেটা মানি গ্যাল পাঠা।
দান দক্ষিনা পাইয়া ভুলি জাইস মোর কথা॥
*   *   *   *
গালে চওড় দিয়া বেটার টাকা কাড়ি নিব॥
*   *   *   *
একগুণ শাস্তি তোর ত্রিগুণ করিব॥"

তখন চণ্ডী "বৃদ্ধ ব্রাহ্মণি হইল কায়া বদলাইয়া ॥

পাজি পুথি নইলে কত বগলে করিয়া।

তেপথা আস্তায় রহিল ধিয়ান ধরিয়া ॥

আগে পাচ কথা পণ্ডিত কিছুই না ভাবিল।

ঐ দিয়া পণ্ডিত বোড়া মারি দিল ॥"

পণ্ডিত সেই পথে আসিলে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী-বেশিনী চণ্ডী জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, সে রাজার নিকট প্রচুর পুরস্কার পাইয়াছে। বলিলেন—"এ সকলের আর মূল্য কি? রাজার মহলে এক শত রাণী আছে, রাজার গৃহত্যাগ কালে তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। তুমি ছোট রাণীটিকে চাহিয়া লও। রাজাকে গিয়া বল,—

"ওহে রাজা ওহে রাজা বিলাতের নাগর।

একশত রাণি ছাড়ও মহলের ভিতর ॥

আমার ঘরে ব্রাহ্মণি আছে সে বড় গ্যাদর।

রান্দাবাড়ার ভাস নাই চলনের পবিস্তর ॥

শিশুআ রাণিটাকে পণ্ডিতকে দান কর।

রান্দুনি করিয়া রাখি এ বার বৎসর ॥" *

নির্ব্বোধ পণ্ডিত তাহাই করিল। তাহার এই অসম্ভব কথা শুনিয়া রাজা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার আদেশে

"জে দিয়াছে দান দক্ষিনা সকলি ফেরত লইল।

ঘাড়ে হাত দিয়া পণ্ডিতক দরবার হইতে বাহির করি দিল ॥"

চণ্ডী কর্ত্তৃক ব্যাসের ছলনা

ব্যাস যখন মহাদেবের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া দ্বিতীয় কাশীর প্রতিষ্ঠা করিতে প্রবৃত্ত, তখনও অন্নপূর্ণা-রূপিণী এই চণ্ডীই জরতী-বেশে ব্যাসকে ছলনা করিয়া তাঁহার সকল আয়োজন ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন (ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল)।

চণ্ডী কর্ত্তৃক কালকেতুর ছলনা

আবার দেবী যখন ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন তখনও ছলনা করিতে ছাড়েন নাই। ব্যাধ কালকেতুর প্রতি চণ্ডী সদয় হইয়াছেন,—তাহাকে রাজ্য এবং ঐশ্বর্য্য দান করিতে হইবে। দেবতার পক্ষে এ অতি সহজ কাজ, কিন্তু তথাপি দেবী একটু ছলনা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ব্যাধের নিকট তিনি প্রথম দেখা দিলেন গোধিকা বেশে। তাহার পর ব্যাধ তাঁহাকে ধনুকের ছিলায় বাঁধিয়া আনিয়া কুটীরে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। তখন তিনি আবার রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া ভুবনমোহিনী নারীমূর্ত্তি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার রূপে ব্যাধের কুটীর আলোকিত হইয়া উঠিল,—
"তিমির ফেটেছে যেন তপন-তরাসে!" (কবিকঙ্কন চণ্ডী)

ব্যাধের স্ত্রী ফুল্লরা ত এই অপরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক্! পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে দেবী দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় আত্ম-পরিচয় দিলেন ;—

"রামা গো এতক্ষণে পরিচয় করি।

আমার করম দোষী বসি গুপ্ত বারাণসী

স্বামী মোর জনম ভিখারী ॥

কি কব দুঃখের কথা গঙ্গা নামে মোর সতা

স্বামী যারে ধরয়ে মস্তকে।

বরঞ্চ গরল খায় আমাপানে নাহি চায়

ভবন ত্যজিলুঁ সেই পাকে ॥

উগ্র আমার পতি হৈলাম অবলা জাতি

পাঁচ মুখে গালি পাড়ে কোপে।

একে সতিনের জ্বালা কত সহে অবলা

লাজে জলাঞ্জলি দিনু তাপে ॥ *

(কবিকঙ্কন চণ্ডী)

সরলা ব্যাধ-বধূ দেবীর প্রচ্ছন্ন পরিচয় না বুঝিয়া তাঁহাকে গৃহত্যাগিনী কুলবধূ ভাবিয়া রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি হইতে নানা দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গৃহে ফিরিবার জন্য অনেক বুঝাইল। দেবী তখন একটু রুষ্টভাবে বলিলেন—

"কুলের বহুরি আমি কুলের নন্দিনী।

আপনার ভালমন্দ আপনি সে জানি ॥

মোর উপদেশে বা তোমার কিবা কাজ।

আপনি সে রক্ষা করি আপনার লাজ ॥

আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে।

আনিল তোমার পতি বান্ধি নিজগুণে ॥

*

---

* বিলাতের নাগর=দেশের নায়ক বা প্রভু। গ্যাদর=অহঙ্কার। ভাস=শৃঙ্খলা। চলনের পবিস্তর=চাল-চলনের অত্যধিক পবিত্রতা, অর্থাৎ শুচি-বাই। শিশুআ=কনিষ্ঠ।

* ভারতচন্দ্র ইহারই আদর্শে "ঈশ্বরী পাটনীর নিকট অন্নদার আত্ম-পরিচয়" রচনা করিয়াছেন।

তুমি, যে বল সে বল আমি বীরে না ছাড়িব।
দিয়া আপনার ধন দুঃখ নিবারিব ॥
মোর এত জিজ্ঞাসায় তোর কিবা তোষ।
থাকিব দুজনে যদি নাহি কর রোষ ॥" (ঐ)

ফুল্লরার সন্দেহ এবার স্থির বিশ্বাসে পরিণত হইয়া উঠিল। সে সিদ্ধান্ত করিল যে কালকেতু এই কুলকামিনীকে ভুলাইয়া আনিয়াছে। নারী ত নিজমুখেই স্বীকার করিতেছে যে সে কালকেতুর সদ্‌-গুণে আকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছে এবং তাহাকে কিছুতেই ছাড়িয়া যাইবে না। সরলা ব্যাধ-বধূ এই লজ্জাহীনা কুলত্যাগিনীর কথায় ভয়, ক্রোধ ও ঈর্ষায় বিহ্বল হইয়া পড়িল,—কথার মারপেঁচ বুঝিল না। দেবী কিন্তু তাহার এই ব্যাকুলতা দেখিয়া মনে মনে বেশ আমোদ পাইতেছিলেন।

ফুল্লরা দেখিল স্ত্রীলোকটী সহজে ছাড়িবার পাত্রী নহে। সে তখন সুর বদ্‌লাইয়া, তাহার বারমাসের দুঃখের বিবৃতি করিয়া দেবীকে ফিরাইবার কৌশল করিল। কিন্তু ভবী ভুলিল না। অবশেষে ফুল্লরা রণে ভঙ্গ দিয়া গোলাহাটে কালকেতুর সহিত বুঝাপড়া করিতে চলিল। এইরূপে সরল ব্যাধ-দম্পতিকে বিস্তর বেগ দিয়া শেষে চণ্ডী আত্মপ্রকাশ করিয়া বর দান করিলেন।

চণ্ডী কর্ত্তৃক হরিহোড়ের ছলনা

অন্নদা-রূপিণী চণ্ডীর শাপে কুবেরের অনুচর বসুন্ধর নামক যক্ষ হরিহোড় রূপে মানব-জন্ম গ্রহণ করে। হরিহোড় অতি দরিদ্র, কাঠ ঘুটে কুড়াইয়া তাহাই বেচিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করে। অন্নদা তাহাকে বর দিতে আসিলেন, কিন্তু একটু ছলনা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি বৃদ্ধা-বেশে আসিয়া মাঠে কাঠ ঘুঁটে যাহা ছিল সব কুড়াইয়া একত্র করিয়া রাখিলেন। হরিহোড় বেচারী কিছু না পাইয়া 'হা হতোস্মি' করিতেছে, তখন অন্নদা তাহাকে দিয়াই কাঠ-ঘুঁটের মোট বহাইয়া লইয়া তাহার কুটীরে অতিথি হইলেন। এইরূপে বহু বিড়ম্বনার পর দেবী আত্ম-প্রকাশ করিয়া হরিহোড়কে বর দান করিলেন।

চণ্ডী কর্ত্তৃক লাউসেনের ছলনা

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলেও পার্ব্বতী লাউসেনকে বর দিতে গিয়াছেন, কিন্তু তাহাও সরল ভাবে নয়। লাউসেনের চরিত্র পরীক্ষা করিয়া তবে বর দিবেন, এই অভিপ্রায়ে তিনি স্থির করিলেন,—

"ধরি বেশ্যা বেশ অশেষ বিশেষ
লাস বেশ করি যাব।
যদি চিনে যায় না ভুলে মায়ায়
যাচিয়া যা চায় দিব ॥"

জগজ্জননী তখন মনোহর বেশ-ভূষা করিয়া সন্তানকে প্রলুব্ধ করিতে চলিলেন। এই বিসদৃশ দৃশ্য কবির কতদূর হীন রুচির পরিচায়ক তাহা বলাই বাহুল্য।

নিদ্রিত লাউসেনের শয্যায় বসিয়া পার্ব্বতী বলিতেছেন,—

"গা তোল গা তোল রায় নিদ্রা যাও কত।
যুবাকালে যেন বৃদ্ধ পুরুষের মত ॥
ভাগ্যের উদয় যত উঠি দেখ রায়।
শিয়রে সুন্দরী বসি পরিতোষ তায় ॥
নিদ্রায় আকুল রাজা নাহি নড়ে গা।
কঙ্কন ঝঙ্কারে ঘন ত্রিলোকের মা ॥

* * *

শুনে সত্বগুণে রায় সম্ভ্রমে উঠিয়ে।
অনুপমা সুন্দরী শিয়রে দেখে চেয়ে ॥

* * *

ঈশ্বরী কহেন ওহে চেয়ে দেখ কি ॥
তোমার ভাগ্যের কথা কত কব রায়।
আমি ভাগ্যবতী সতী ভেটিনু তোমায় ॥
কোন সুখে শয়ন সুন্দরা নাই কোলে।
কহিতে লাগিল মাতা মকরন্দ বোলে ॥"

তাহার পর অনেক কথা-কাটাকাটি হইল, দেবী এবারেও হেঁয়ালীর ভাষায় আপনার পরিচয় দিলেন,—

"মমতা না করে পিতা পাষাণ শরীর।
সতিনী চপলা আর কি কব পতির ॥
ভিক্ষুক ভক্ষণ ভাঙ্গ ভস্মগুলা গায়।
অল্প দুঃখে আমি কি এখানে আসি রায় ॥"

কিন্তু লাউসেনের নিকট দেবীর চাতুরী খাটিল না,—তাঁহা "ধ্যানবলে জ্ঞান হলো মাতা মহাদেবী।" দেবী তৎ তাঁহাকে অভিষ্ট বর দিয়া চলিয়া গেলেন।

পদ্মাবতী বা মনসা

সর্পের দেবতা পদ্মাবতী তাঁহার বিমাতা চণ্ডী দেবীর উপরেও টেক্কা দিয়াছেন। তিনি কতই না বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া ছল ও কৌশলের দ্বারা স্বকার্য্য সাধন করিয়া লইয়াছেন! প্রথমেই আমরা তাঁহাকে যে রূপে দেখিতে পাই, তাহাতে দেবীর চরিত্রে সুরুচি বা ন্যায়পরায়ণতার নিতান্ত অভাব দেখা যায়। চাঁদ সদাগর তাঁহার পূজা না করিলে পৃথিবীতে মনসা পূজার প্রচার হইবে না ;—কাজেই চাঁদকে কোনরূপে জব্দ করিয়া তাঁহার নিকট পূজা আদায় করা আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু চাঁদ শিবের অনুগৃহীত ভক্ত, তিনি মহাজ্ঞান বা মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র জানিতেন। তাঁহার এই মহাজ্ঞান হরণ না করিতে পারিলে সকল চেষ্টাই বিফল হয় দেখিয়া, পদ্মা চাঁদকে ছলনা করিতে চলিলেন। তিনি সুন্দরী যুবতীর রূপ ধারণ করিয়া বনমধ্যে কপট তপে বসিলেন এবং তাঁহার সহচরী নেতা মৃগী রূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। সেই মৃগীর অনুসরণ করিতে করিতে তপঃ-নিরতা সুন্দরীকে দেখিয়া—

"কামে বিমোহিত হৈয়া বলে সদাগর।
কি কারণে তপ কর দেহ না উত্তর॥"

(বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ)

পদ্মা মিথ্যা পরিচয় দিয়া বলিলেন, "আমার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর স্বামী সর্পদংশনে প্রাণ হারাইয়াছেন, তাই—

"আমি বিয়া না করিলু সেই অনুরাগে॥
মহাজ্ঞান জানে হেন পাই একজন।
তবে বিয়া করিবাম করিয়াছি পণ॥
মহাজ্ঞান জানয়ে সর্পের হয় বৈরি।
তবে সে ভগ্নীর ধার শোধিবারে পারি॥

* * *

একে ত পদ্মার মায়া আরো পাইল কামে।
হাসিয়া বলিল চাঁদ আকুল সঙ্গমে॥
আমি জানি মহাজ্ঞান সর্প পাইলে মারি।
তোমারই যোগ্য পতি শুনহ সুন্দরী॥

* * *

কন্যা বলে যত কথা কহ মহাশয়।
মহাজ্ঞান জান হেন কিমতে প্রত্যয়॥

* * * * *

চান্দ বলে মহাজ্ঞান শুন এক মনে।
আড়াই অক্ষর মন্ত্র কহি তব কাণে॥"

এইরূপ কৌশলে মহাজ্ঞান হরণ করিয়া,

"চান্দরে বলয়ে পদ্মা তুমি সুপুরুষ।
মহাজ্ঞান পায়্যা মনে পাইলুঁ সন্তোষ॥
মহাজ্ঞান দিলা মোরে না ভাবিলা আন।
এতেক বলিয়া পদ্মা হৈলা অন্তর্দ্ধান॥"

মনসার কৌশলে ধন্বন্তরি ওঝার মৃত্যু

এইরূপ প্রবঞ্চনার দ্বারা চাঁদ সদাগরের মহাজ্ঞান লুপ্ত হইল বটে, কিন্তু আরও একজন এই মহাজ্ঞান জানিত,—শঙ্কুর গাড়ুরী বা ধন্বন্তরি ওঝা। এই ওঝাকে মারিতে পারিলে তবে পদ্মা নিষ্কণ্টক হন। সুতরাং তাহাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিবার পরামর্শ স্থির হইল। পদ্মা গোয়ালিনী রূপ * ধারণ করিয়া "হেটে কালকূট দিয়া উপরে দধি সর" দধির পসরা সাজাইয়া চলিলেন। পথে ওঝার ছয়কুড়ি শিষ্য তাঁহার পথরোধ করিল।

"একে ত গোয়াল মায়্যা প্রথম বয়স।
বাক্য চাতুরি করি মিলাইয়া রস॥
ঠাম ঠমকা দিয়া দেয় হাতনাড়া।
মোহ গেল শিষ্য সব গাড়ুরীর পাড়া॥
পদ্মার কপট মায়া নারে বুঝিবার।
দধি দুগ্ধ খাইলেক লুটিয়া পসার॥

* * * * *

দধি দুগ্ধ নহে ইযে কালকূট বিষ।
খাইয়া ঢলিছে তারা ছয়কুড়ি শিষ্য॥

* * * * *

শিষ্যগণ সেই বিষাক্ত দধি খাইয়া মরিল, কিন্তু ওঝা মন্ত্রবলে তাহাদের বাঁচাইলেন। পদ্মা তখন ওঝার বাটীতে গিয়া তাহার স্ত্রী কমলার সহিত সই পাতাইয়া, * কৌশলে তাহার নিকট জানিয়া লইলেন যে "উদয় কালসাপ থাকে শিবের জটায়,"—তাহার দংশন ভিন্ন অন্য কিছুতেই ওঝার মৃত্যু নাই। তখন পদ্মা তাঁহার পিতা মহাদেবের নিকট

* রামবিনোদের মনসামঙ্গলে পদ্মা মালিনী বেশে বিষাক্ত মালার দ্বারা ওঝার শিষ্যগণকে বধ করিয়াছেন।

* [illegible]

হইতে উদয় নাগকে চাহিয়া আনিয়া ওঝার প্রাণবধ করিলেন।

এইরূপে নিষ্কণ্টক হইয়া পদ্মা চন্দ্রধরের ছয় পুত্রকে বধ করিলেন এবং চন্দ্রধরকেও নানারূপে লাঞ্ছিত করিলেন। চন্দ্রধরের সহিত মনসা দেবীর বহুকাল ধরিয়া এই যে বিবাদ চলিয়াছিল, তাহাতে আমরা পদে পদে দেবীরই শঠতার পরিচয় পাই। পক্ষান্তরে চন্দ্রধরের নির্ভীকতা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও নৈতিক বল দেখিয়া শ্রদ্ধায় হৃদয় ভরিয়া উঠে। পদ্মা নেপথ্যে থাকিয়া কেবল ছল-চাতুরীর দ্বারা চন্দ্রধরের উপর নানা অত্যাচার করিয়া যে আমোদ অনুভব করিয়াছেন, তাহা আমাদের উপভোগ্য নয়। বরং তাহাতে সেই লাঞ্ছিত বীরপুঙ্গবের প্রতিই আমাদের প্রগাঢ় সহানুভূতি জন্মে। কিন্তু মনসামঙ্গল কাব্যগুলি যে সময়ে রচিত ও গীত হইত, তখনকার লোকেরা মনসা-বিদ্বেষী চাঁদ বেণের নানা হাস্যকর দুর্দ্দশার বর্ণনা শুনিয়া প্রচুর আনন্দ অনুভব করিত সন্দেহ নাই।

মনসা কর্ত্তৃক চাঁদ সদাগরের লাঞ্ছনা

চন্দ্রধর শিবের আশ্রিত ভক্ত,—মেয়ে দেবতা মনসার প্রতি তাঁহার দারুণ আক্রোশ। "চেঙমুড়ী কানী" ভিন্ন পদ্মাকে তিনি অন্য কোন ভদ্র আখ্যা দিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার হেঁতালের লাঠীর আঘাতে মনসার ঘট চূর্ণ হইয়াছে, দেবীর কাঁকাল ভাঙ্গিয়াছে। তাই চন্দ্রধর দক্ষিণ পাটনে বাণিজ্য-যাত্রা করিলে পদ্মা তাঁহার সাত ডিঙ্গা ডুবাইয়া আংশিক প্রতিশোধ লইয়াছেন। তাঁহাকে যে প্রাণে মারিলেন না তাহা কেবল নিজ স্বার্থের জন্য। কারণ চন্দ্রধরকে দিয়া তাঁহার পূজা করাইতে পারিলে তবেই সংসারে তাঁহার পূজার প্রচার হইবে। চন্দ্রধর প্রাণে বাঁচিলেন, বহুক্ষণ জলে হাবুডুবু খাইয়া অতি কষ্টে তীরের নিকট আসিলেন, কিন্তু বিবস্ত্র বলিয়া জল ছাড়িয়া উঠিতে পারিলেন না। এ দিকে নিকটবর্ত্তী ঘাটে

"নাগরীয়া নারী সবে স্নান করে জলে।
বিবস্ত্র হইয়া সব বস্ত্র এড়ি কূলে॥
জলখেলা করে তারা বিবসন হৈয়া।
জলমধ্যে চান্দ রলে আওড়ে * থাকিয়া॥

(বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ)

অবশেষে লজ্জা নিবারণের জন্য

"শ্মশানের কানি তবে সাধু গিয়া পরে।
ভিক্ষা মাগি খাইতে গেল নগরে নগরে॥"

(ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল)

ভিক্ষা করিয়া কিছু চাউল পাইলে চন্দ্রধর একটা ভাঙ্গা কুটীরে আশ্রয় লইলেন; মনসা গণেশের ইঁদুর চাহিয়া আনিয়া তাহাকে দিয়া চাউল খাওয়াইলেন।

সেখান হইতে বাহির হইয়া সদাগর মনের দুঃখে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে পদ্মা নাপিত বেশে আসিয়া ক্ষৌরকার্য্য করিতে চাহিলেন। বলিলেন, তোমাকে ত ভদ্রলোক বলিয়া মনে হয়, সঙ্গে যদি অর্থ না থাকে, পরে এক সময়ে অবশ্যই পাইব। চন্দ্রধর সম্মত হইলেন। কপট নাপিত ডান দিকের দাড়ি কামাইল এবং বাঁদিকের গোঁফ। মাথাও কতক কতক কামানো হইয়াছে এমন সময়ে নাপিতের হাত লাগিয়া খুরির জল পড়িয়া গেল। চন্দ্রধরকে পুনরায় জল আনিতে পাঠাইয়া ছদ্মবেশিনী পদ্মা অন্তর্হিত হইলেন।

এদিকে—

"জল লৈয়া আসি চান্দ না দেখিল তারে।
খুরি হাতে পথে পথে নাপিত বিচারে॥
বিপত্তি কালে ত হয় বুদ্ধি বিপরীত।
যারে দেখে তারে বলে তুমি কি নাপিত॥
কোপ করি তারা সবে চড়ায় চান্দরে।
তুঞি বেটা কে নাপিত বলছিস্ কারে॥
অপমান পায়্যা চান্দ ধীরে ধীরে যায়।"

(বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ)

মনের দুঃখে চন্দ্রধর বনে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু সেখানেও নিস্তার নাই। বনের ভিতর ব্যাধগণ পাখী ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়াছেন,—

"আহার পাইয়া পক্ষী চলে মনসুখে।
চাঁদবেণে হায় হায় করে মনদুঃখে॥
সাধুর পাইয়া শব্দ যত পক্ষী উড়ে।
যতেক আক্টি * তারা চাঁদবেণে বেড়ে॥
চৌদিকে আসিল বেড়ি যত পক্ষীমারা।
চাঁদ বেণের টিকি ধরে সবে দেয় নাড়া॥

* আওড়ে—আবর্ত্তে। আক্‌টি—ব্যাধ।

না মার না মার বলে চাঁদ অধিকারী।
কোন দোষে মার ভাই নাহি করি চুরি॥
তাঁরা বলে কেন তুই পক্ষী দিলি তেড়ে।
কোথা হৈতে কাল আইলি তুই ভেড়ের ভেড়ে॥"

(ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল)

এইরূপ নানা দুর্গতি ভোগ করিয়া দৈবক্রমে চন্দ্রধর তাঁহার মিতা চন্দ্রকেতুর বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহার যথেষ্ট সমাদর হইল বটে, কিন্তু তখনও তাঁহার কুগ্রহের শান্তি হয় নাই। সেখানে মনসাদেবীর ঘট দেখিয়া তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল।

"চাঁদ বলে চেঙমুড়ি, করে মোর নৌকাবুড়ি,
লুকাইয়া আছ আসি হেথা॥
আমার মিতার ঘরে, রহিয়াছ মম ডরে,
এত তত্ত্ব আমি নাহি জানি।
মোর মিতা তোর তরে, কোন গুণে পূজা করে,
বর্ব্বর ভাড়াইয়া খাও কাণি॥
ভাঙ্গি মনসার বারি, কোপে চাঁদ অধিকারী,
লইয়া যায় হেতালের বাড়ি।
বুদ্ধি তার বিপরীত, দেখিয়া তাহার মিত,
মিতায় ধরিল দৌড়াদৌড়ি॥
* * * *
পাগল দেখিয়া তারে, কেহ ঢেকাঢুকি মারে,
কেহ মারে মাথায় ঠোকর।
ভাঙ্গিতে মনসা বারি, আসিয়াছ মোর বাড়ী,
ঢেকা মারি বাটীর বাহির কর॥"

(ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল)

আর একবার চন্দ্রধর এক ব্রাহ্মণের বাটীতে অতিথি হইলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করিয়া, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আহারে বসিলেন। দৈব দুর্ব্বিপাকে,

"ব্রাহ্মণের পুত্রবধূ পদ্মা নাম তান্।
সর্ব্ব সুলক্ষণা কন্যা বাম চক্ষু কাণ॥
বার বার আসে কন্যা অন্ন লৈয়া থালে।
ভ্রমজ্ঞান হৈল চান্দ মহাক্রোধে জ্বলে॥
বাম চক্ষু কাণ আর পদ্মা নাম শুনি।
মনে মনে বলে চান্দ এই লঘু * কাণী॥
চান্দ বলে লঘু কাণী তোর লাজ নাই।
মোরে না ছাড়িস তুই যেইখানে যাই॥
* * * * *
ক্রোধে উন্মত্ত সাধু সমার সাক্ষাতে।
নড় দিয়া যাইতে কন্যা ধরিল খোপাতে॥
চীকার দিল ব্রাহ্মণী সমা বিদ্যমানে।
চান্দরে বেড়িয়া ধরে সকল ব্রাহ্মণে॥
* * * * *
সকল ব্রাহ্মণে তবে একত্র হইয়া।
চান্দরে কিলায় ধরি বুকে হাঁটু দিয়া॥"*

(বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ)

এইরূপে চন্দ্রধর যে কত নিগ্রহ ভোগ করিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মনসা-মঙ্গলের কবিগণ চন্দ্রধরের দুর্দ্দশা বর্ণন করিতে বিশেষ আমোদ অনুভব করিতেন বলিয়া মনে হয়। তাই প্রত্যেকেই এইরূপ দুই চারিটী নূতন নূতন ঘটনার কল্পনা করিয়া তাঁহার দুঃখের ভরা বোঝাই করিয়া দিয়াছেন!

বহু কষ্ট ভোগ করিয়া চাঁদ সদাগর স্বদেশে ফিরিলেন, কিন্তু তথাপি নিস্তার নাই। বাটীর নিকটে আসিয়াও

"দিবসে না আইল সাধু লজ্জার কারণে।
লুকাইয়া চাঁদ বেণে রহে কলাবনে॥"

(ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল)

বিষহরি পদ্মা তাঁহার আর একটু নিগ্রহ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি দৈবজ্ঞের বেশে চন্দ্রধরের পত্নী সনকার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন।

"গণক বলেন শুন সনকা সুন্দরী।
সম্প্রতি তোমার বাটী আজি হবে চুরি॥
মাথায় নাহিক চুল পরিধান টেনা।
সাবধানে থাকিবে আসিবে এক জনা॥" (ঐ)

চোর ধরিবার জন্য যখন সকলে সতর্ক হইয়া আছে, তখন সন্ধ্যার সময়,—

কলা বন হৈতে বেণে উকি দিয়া চায়।
বাহিরে উঠানে দেখে নখাই * খেলায়॥

লঘু—হীন।

* সমার—সবার, সকলের। নড়—দৌড়। চীকার—চীৎকার

* চন্দ্রধরের শিশুপুত্র লক্ষীন্দর।

হেনকালে ঝেউয়া চেড়ী গেল কলাবনে।
চোরের আকৃতি তথা দেখে একজনে॥
ধাইয়া গিয়া ঝেউয়া চেড়ী সনকারে কয়।
কলাবনে কেটা নড়ে দেখে লাগে ভয়॥
শুনিয়া ধাইয়া আইল সনকা বেণণী।
কলাবনে কেটা নড়ে কর্ণ পাতি শুনি॥
কলাবনে চাঁদ বেণে খুসুর মুসুর করে।
লম্ফ দিয়া চেড়ী তখন ঘাড়ে গিয়া পড়ে॥
চোর চোর বলিয়া মারিল চড় লাথি।
বিনা পরিচয় নাহি অন্ধকার রাতি॥
মার খাইয়া সাধু বেণে হইল কাতর।
আর না মারিও চেড়ী আমি সদাগর॥
এতেক শুনিয়া তার রাখিল মারণ।
প্রদীপ আনিয়া মুখ করে নিরীক্ষণ॥" (ঐ)

মনসা কর্ত্তৃক বেহুলার লাঞ্ছনা

তাহার পর বেহুলার দুর্গতির পালা। বিবাহের পরেই লৌহ-বাসরে লক্ষীন্দরের সর্পদংশনে মৃত্যু হইল। বেহুলা মৃত পতিকে লইয়া কলার ভেলায় ভাসিয়া চলিলেন। পথে মনসাদেবী নানা বিঘ্ন ঘটাইতে লাগিলেন। নেতা ও নাগগণকে শকুনী, গৃধিনী, চিল, পেচক, বাজপক্ষী, শৃগাল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপে বেহুলার নিকট পাঠাইলেন, কিন্তু বেহুলা নির্ভয়ে সকল বিভীষিকা ও প্রলোভন অতিক্রম করিয়া চলিলেন। এক স্থানে,

"গোদা যথা মৎস্য ধরে ঘাটেতে বসিয়া।
তথায় বেহুলা আইল ভাসিয়া ভাসিয়া॥
দুই পদ ফুলা তার চারি নারী ঘরে।
সুধু ভাত খাইতে নারে নিত্য মৎস্য ধরে॥
* * * * *
বেহুলার রূপে গোদা হইল মূর্চ্ছিত।
কাকুতি মিনতি করে কথা বিপরীত॥"
(ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল)

এক গোদায় রক্ষা নাই, বংশীধর আবার তাঁহার পদ্মাপুরাণে একেবারে গোদার হাট বসাইয়াছেন! তাহার একটু ইতিহাস আছে—

"বীরসিংহ নামে রাজা রাজ্যের ঠাকুর।
তার দেশে যত গোদা খেদাইছে দূর॥
একে ত বিকৃতি গোদা আর কদাচারী।
ডাকাইত চোর ধাউর * আর পরদারী॥
এই দোষে মাথা মুড়ি চুণ কালী দিয়া।
নানা বিড়ম্বনা করি দিছে খেদাইয়া॥
অপমানে বাস করে বনমধ্যে আসি।
বড় শীতে মৎস্য ধরে নদীকূলে বসি॥
গোদার সহর সব গোদার বাজার।
দুই সন্ধ্যা হাট মিলে সকল গোদার॥"
(বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ)

কলার মান্দাসে ভাসিতে ভাসিতে বেহুলা যখন "গোদার বাঁক দেখিল সম্মুখে" তখন একে একে অনেকগুলি গোদা নদীর তীরে দেখা দিল। কাহারও

"মুখ ভরি গালে দাড়ি ভালে দীর্ঘ ফোটা।
দুই দিগের দুই মোছ যেন মুড়া ঝাঁটা॥'

কাহারও বা, "ভাঙ্গা ঘরে ঠিকা হেন দুই দন্ত খাড়া॥"
তাহারা "দেখিয়া সুন্দরী কন্যা জলে ভোর. মাজে।
ডাকাডাকি করে যেন ভাঙ্গা ঢোল বাজে॥" (ঐ)

গোদাদের একজন প্রধান চাঁই, তাহার নাম কালা গোদা।

"সুন্দরী দেখিয়া গোদা হাসে।
দেখিয়া মোরে সুন্দর, না পাইয়া অন্য বর,
আমারে বরিতে কন্যা আসে॥" (ঐ)
* * * * *

সে বেহুলাকে ডাকিয়া বলিল,—

"জাতে আমি রাজপুত, হালুয়া গোদার সুত,
কালা গোদা নাম যে আমার॥
ধনা মনা দুই ভাই, চৈতা গোদার জামাই,
হারু গোদা হয় তার শালা।
* * * * *
আমার যতেক গুণ, তোমায় কহিব শুন,
মোর ঘরে আস একবার॥
যত গোদা দিয়া সারি, আমারে থাকয়ে বেড়ি,
আর কত পাত্রমিত্র আছে।
* * * * *
ঘর খান আছে মোর দীর্ঘে পাঁচ হাত।
বাগুয়ার * বেড়া ছানি চালিতার পাত॥
উত্তম নলের ধাড়া তাহাতে বিছান।
উলু ছনে ভোর বান্ধি বালিশ শিথান॥
সকল যোগায় হেন আর নারী আছে।
তুমি মাত্র বসিয়া থাকিবা মোর কাছে॥" (ঐ)

কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া বেহুলা

"ইহ বাঁক ছাড়াইয়া করিল গমন।
প্রহরের পথ যুড়ি গোদার পাটন॥
এক গোদা ছাড়াইতে আর গোদা আসে।
একেবারে আসিলেক দশে বিশে ত্রিশে॥
সুন্দরী দেখিয়া গোদা নাচে উভ পায়।
মাটী থম থম করে গোদার নাচায়॥" (ঐ)

* ধাউর—ধূর্ত্ত।

* বাগুয়া—সুপারি গাছের শুষ্ক পত্র।

প্রাণ-সাধনায়

ঢঙ গজল-ঠুংরির—তেতালা *

কথা ও সুর—শ্রীদিলীপকুমার রায় স্বরলিপি—শ্রীমতী সাহানা দেবী

তোমায় বরণ না করিলে জীবন সাধনায়
তুমি মিটাবে কেমনে তৃষা অঝোর ধারায় ?

যদি মেলি আঁখি তব তরে কভু এ জীবন ভরে
পরে কিরণটি ছুঁতে ছুঁতে চকিতে লুকায়
সে যে চাহি নি তোমারে বলি প্রাণ-সাধনায় !

মোরা হৃদে নাহি বরি তোমা চাহি হেলাভরে ওমা
হেথা পেতে সে তোমারে নিতি এড়ায়ে কাঁটায়
যারে মেলে শুধু কাঁটাপথে প্রাণ-সাধনায় !

নাহি নিরবিলে কলরব দীপালি-মদিরোৎসব
ওগো তোমার পরশখানি ফোটে না যে হায়
শুধু মেলে তারে ঘরছাড়া প্রাণ-সাধনায়
না না তব আশাপথ চাহি যাব তরীখানি বাহি
ঐ ধ্রুবতারা যদি নাহি ফোটে বা উষায়
ঝলি উদিবে নিশি তিমিরে প্রাণ-সাধনায় !

---

* সুরটির মধ্যে গজল ও ঠুংরির ঢঙ মিশানো হইয়াছে। ইহার মূল ঢঙ খাম্বাজের—কিন্তু বাংলা খাম্বাজের নহে, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি পশ্চিমে খাম্বাজের এবং তৎসঙ্গে বেহাগ ও তিলককামোদও আছে। গজলের সহিত ইহার প্রভেদ এই যে এ গানের চারটি চরণের (Stanza) প্রত্যেকটির সুর আলাদা, এবং চলিত বাংলা গানের সঙ্গে প্রভেদ এই যে আসলে এ গানটির ধুয়া প্রথম লাইন নহে, প্রতি চরণের শেষের লাইনটি—অর্থাৎ "প্রাণ-সাধনায়"-যুক্ত লাইনটি। এই স্থলে গজলের সহিত ইহার আদল আসে। কিন্তু আসলে ইহা গজলও নহে, ঠুংরিও নহে, চলিত বাংলা গানের রীতিপন্থীও নহে। আশা করি স্বরলিপি-অভ্যস্ত গায়ক এ গানটির মধ্যে সুরের অভিনবত্ব সহজেই খুঁজিয়া পাইবেন। কেবল বক্তব্য এই যে স্বরলিপিতে তানাদি দেওয়া হয় নাই—তাহাতে শিক্ষার্থীর অসুবিধা ঘটে বলিয়া। তবে হিন্দুস্থানী ঢঙের গানের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন কোথায় কোথায় গানটির মধ্যে তানাদির অবকাশ আছে। বিশেষ করিয়া বেহাগের ও খাম্বাজের। ইতি—রচয়িতা।

II [পমা গরা]

{ সা ন্‌া | সা -া গা -া | -া গা মা -া | রা গা রগা মগা | রগা গরা সন্‌া সা |
তো মায় ব - র - - ণ না - ক - রি - - - - লে জী

[মগা রসা রা] [পা -া] [রগা -া] II
সরা গা গসা রা | -া -া গা মা | মগা রগা -া -া | -া রা }
ব - ন - - - - সা ধ না - - - - - য়

গরা গা | গপা -া ক্ষপা -া | -া পক্ষা পা -া | পা ক্ষা পা ক্ষা | পা মা গা -া |
তু মি মি - টা - - বে কে - ম - নে - - তৃ ষা -

গা -া গধা পপা | -া -া গা মা | মগা রা গা -া | রগা রা II II
অ - ঝো - - - র ধা রা - - - - - য়

সা সা | সা -া ন্‌সা গমা | পা পা পা -া | পা -া পা -া | -া পা পা -া |
য দি মে - লি - - আঁ খি - ত - ব - - ত রে -

পা -া পা -া | -া পক্ষা পা ক্ষা | গা ক্ষা গক্ষা ধা | -া ধা ধা পা |
ক - ভু - - এ জী - ব - ন - - ভ রে -

পা -া ক্ষপা না | -া ধা ধা পা | পা -া পা -া | -া পক্ষা ধপা ক্ষপা |
কি - র - - ণ টি - ছুঁ - তে - - ছুঁ তে -

গক্ষা -া গা -া | -া ক্ষা ধা -া | পধপা ক্ষা গা -া | । ।
চ - কি - - তে লু - কা - - য় - -

গা গা | গা ক্ষা গক্ষা ধনা | র্সর্সা না না ধা | পক্ষা পা ক্ষধা পপা | -া মা গা মা |
সে যে চা - হি - - নি ত - মা - রে - - ব লি -
যা রে মে - লে - - শু ধু - কাঁ - টা - - প থে -
শু ধু মে - লে - - তা রে - ঘ - র - - ছা ড়া -
ঝ লি উ - দি - - বে নি - শি - তি - - মি রে -

রগা -া রা -া | -া গা -া মা | মগা রা গা -া | রগা রা II II
প্রা - ণ - - সা - ধ না - - - - - য়

সা সা | সা -া সা -া | -া ন্‌া ধন্‌া -া | সা -া সরা -া | -া রা রা সন্‌া |
গূ ঢ় হৃ - দে - - না হি - ব - রি - - তো মা -

সা -া গা -া | -া গা গা মা | ঋগা -া গমা ধপা | মপা মা গা -া |
চা - হি - - হে লা - ভ - রে - - ও মা -

ঋমা -া মা -া | -া মা মা -া | মা -া গপা মমা | -া গা গা মা |
পে - তে - - সে তো - মা - রে - - নি তি -

ঋগা -া রা -া | -া গা -া মা | মগা রা গা -া | া া
এ - ড়া - - য়ে - কাঁ টা - - য় - -

সা সা | সা -া সা -া | ন্সা ন্া ধন্া -া | প্া -া ন্া -া | -া সা রা -া |
না হি নি - র - - বি লে - ক - ল - - র ব -

ঋগা -া রা -া | -া পমা গা -া | সা রা সরা গা | ঋগা রা সা ন্া |
দী - পা - - লি ম - দি - রো - - ত্ স ব

রা -া মা -া | -া মা মা -া | মা -া মা -া | -া গা গা মা |
তো - মা - - র প - র - শ - - খা নি -

ঋগা -া রা -া | -া গা পা মা | মগা রা গা -া | া া
ফো - টে - - না - যে হা - - য় - -

গা গা | গা -া গা -া | -া পা ধা -া | পা -া পধা নর্সা | র্রা র্সা র্সা -া |
না না ত - ব - - আ শা - প - থ - - চা হি -

নর্সা না ধনা -া | ধনা ধা ধা -া | ধা না পধা নর্সা | ধনা ধা পা র্মা |
- যা ব - - ত রী - খা - নি - - বা হি -

গা গা গা ধা | পধা পা পা -া | র্মা -া পা -া | র্মপা গা গা -া
- ধ্রু ব - - তা রা - না , হি - - য দি -

রা ঋা গরা ঋরা | ঋরা রসা ন্া সা | গা -া -া -া | া া
ফো - টে - - বা - উ ষা - - য় - -

"চাটু পুষ্পাঞ্জলি"

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কাব্যবিনোদ বি-এ

শ্রীশ্রীমদ্রূপ গোস্বামীর বহু লেখা ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি "ভক্তিরসামৃত সিন্ধু", "মথুরা মাহাত্ম্য পদাবলী", "হংসদূত", "উদ্ধবসন্দেশ", "অষ্টাদশকচ্ছন্দ স্তবমালা", "উৎকলিকাবলী", "প্রেমেন্দু সাগর নাটক চন্দ্রিকা", "লঘু-ভাগবৎ তোষিণী", "বিদগ্ধ-মাধব", "ললিত মাধব", "দানকেলী ভানিকা" ও "শ্রীশ্রীউজ্জ্বল নীলমণি" প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রায় অনেকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে; কতক অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। শ্রীরূপ বৈষ্ণব যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন; মহাপ্রভুর সম্প্রদায় মধ্যে তাঁহার আসন অতি উচ্চে ছিল। শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের অগাধ পাণ্ডিত্যই মহাপ্রভুর অধিক স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিল। শ্রীরূপের রচনায় একাধারে যে কাব্য, ভক্তি, রস, সাধনা, সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ও দর্শনের পরাকাষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়, তাহা সত্যই অতুলনীয়। শ্রীরূপ সাধক হিসাবে যেমন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অতি প্রিয় শিষ্য ছিলেন, পণ্ডিত ও লেখক হিসাবেও তাঁহার অসাধারণ খ্যাতি ছিল। শুধু তাঁহার প্রতিভা ও লেখনীর যোগ্যতা দ্বারাই তিনি গৌড়েশ্বরের প্রিয়পাত্র হইয়া "দবির খাস্" পদবী লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষরও অতি সুন্দর ছিল; শ্রীচৈতন্য তাঁহার হস্তাক্ষর দর্শনে প্রীত হইয়া বলিয়াছিলেন "শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাঁতি।" শ্রীরূপের লেখনীতে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি ও রস-মাধুর্য্যের যে অপরিসীম শক্তি নিহিত ছিল, তাহা বৈষ্ণব-সাহিত্য ও কাব্যকে চির সুন্দর করিয়া গিয়াছে। তাঁহার ন্যায় অকৃত্রিম বর্ণনাভঙ্গী, স্বচ্ছ ও তরল ভাষা, এবং ছন্দলালিত্য অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থাদির বিষয়ে বিশেষ কিছু বলিবার আছে বলিয়া মনে করি না। তবে তাঁহার যে সকল লেখা অদ্যাবধি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় নাই, তাহার বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

আমার মাতামহী ও অন্যান্য গুরুজনদিগের নিকট অনেকদিন পূর্ব্বে কতকগুলি সুন্দর স্তব-কবচ শুনিয়াছিলাম। স্তব-কবচগুলি এতই সুললিত যে, তাহা মুখস্থ করিবার লোভ আমিও সম্বরণ করিতে পারি নাই। মাতামহীর নিকট ঐ সকল স্তব-কবচের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম, সেগুলি শ্রীশ্রীমৎ রূপ গোস্বামী বিরচিত। শ্রীরূপ তাঁহার 'স্তবমালা'য় বহু সুন্দর সুন্দর স্তব রচনা করিয়াছিলেন। প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে ও অন্যান্য "সংগ্রহ-পুস্তকে' সংস্কৃত স্তবগুলির অনেক প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক স্তব অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রকাশিত হয় নাই। আমি মাতামহীদিগকে যেসকল স্তব আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে অধিকাংশই প্রায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত। তাঁহাদের নিকট সংস্কৃত স্তবগুলির যে অবিকল তর্জ্জমা শুনিয়াছিলাম, তাহাও অতি সুন্দর ও মধুর। এই তর্জ্জমাগুলিতেও ঠিক সংস্কৃত স্তবের ন্যায় শ্রীরূপের রচনা জ্ঞাপক উল্লেখ আছে। কিন্তু, সেই মনোহর বাঙ্গালা রচনাগুলি প্রায়ই প্রকাশিত হয় নাই। বাঙ্গালা স্তবগুলির লালিত্য সংস্কৃত অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে। বোধ হয় তর্জ্জমাগুলি দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। আমার মাতামহী প্রভৃতি ধারাবাহিকভাবে পরম্পরের আবৃত্তি শুনিয়া উহা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। আমার মাতামহ শ্রীশ্রীসনাতন ও রূপ গোস্বামী প্রভুগণের শাখা-বংশধর ছিলেন। তিনি মহা পণ্ডিত ছিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শনের চর্চ্চা করিয়া কাটাইয়াছিলেন। সেই ভরসায় ঐ সকল দুষ্প্রাপ্য বস্তুর উদ্ধার কামনায় তাঁহার ত্যক্ত পুরাতনের স্তূপ লইয়া অন্বেষণ করিতে বসিলাম। এই পুরাতনের স্তূপ মন্থন করিয়া যখন কয়েক খণ্ড জীর্ণ ও মলিন "তুলট" পাইলাম, তখন যে অপরিমেয় আনন্দে আমার মন ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহা বোধ হয় কলম্বসের আবিষ্কার-আনন্দ অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। মলিন 'তুলট' কয়খানির মধ্যে যে যে বিষয় আবিষ্কার করিলাম, তাহার একটী—"কবিরাজ গোস্বামী লিখিত কর্চ্চা"—শ্রীরূপ ও সনাতনের সংক্ষিপ্ত জীবনী; অপর এই "চাটু পুষ্পাঞ্জলি"।

গ্রন্থাকারে যে দুইখানি পাইয়াছিলাম তাহা পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। কর্চ্চা ও অন্যান্য কয়েকটী বিষয় "শ্রীরূপ সনাতনের জীবনী"তে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। সম্প্রতি সেই 'চাটু পুষ্পাঞ্জলি' বা শ্রীরাধার স্তব-কবচ উদ্ধৃত করিলাম—

শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ ॥

নব গোরোচনা গৌরীং প্রবরেন্দীবরাম্বরাং।
মণি স্তবক বিদ্যোতি বেণী ব্যালাঙ্গনা ফণাং ॥১॥
উপমান ঘটা মানপ্রহারি মুখ মণ্ডলাং।
নবেন্দু-নিন্দি ভালোদ্যৎ কস্তুরি-তিলকশ্রিয়ং ॥২॥
ভ্রূজিতানঙ্গ কোদণ্ডাং লোললীলালকাবলীং।
কজ্জলোজ্জ্বলতা রাজচ্চকোরী চারুলোচনাং ॥৩॥
তিল পুষ্পাভ নাশাগ্র বিরাজদ্বর মৌক্তিকাং।
অধরোদ্ধূত বন্ধুকাং কুন্দালি বন্ধুর দ্বিজাং ॥৪॥
সরত্ন স্বর্ণরাজীব কর্ণিকাকৃত কর্ণিকাং।
কস্তুরী বিন্দু চিবুকাং রত্নগ্রৈবেয়কোজ্জ্বলাং ॥৫॥
দিব্যাঙ্গদ পরিষ্বঙ্গলসদ্ভুজ মৃণালিকাং।
বলারি-রত্নবলয়-কলালম্বি কলাবিকাং ॥৬॥
রত্নাঙ্গুরীয়কোল্লাসি বরাঙ্গুলি করাম্বুজাং।
মনোহর-মহাহার-বিহারি-কুচকুট্মলাং ॥৭॥
রোমালি ভুজগীমূর্দ্ধ রত্নাভতরলাঙ্কিতাং।
বলীত্রয়ী লতাবদ্ধ ক্ষীণভঙ্গুর মধ্যমাং ॥৮॥
মণি সারসনাধার বিস্ফার শ্রোণিরোধসাং।
হেমরম্ভা মদারম্ভ স্তম্ভনোরুযুগাকৃতিং ॥৯॥
জানু দ্যুতি জিত ক্ষুদ্র পীতরত্ন সমুদ্গকাং।
শরন্নীরজ নীরাজ্যং মঞ্জীর বিরণৎপদাং ॥১০॥
রাকেন্দু কোটি সৌন্দর্য্য জৈত্রপাদ নখদ্যুতিং।
অষ্টাভিঃ সাত্ত্বিকৈর্ভাবৈরাকুলীকৃত বিগ্রহাং ॥১১॥
মুকুন্দাঙ্গ কৃতাপাঙ্গা মনঙ্গোর্ম্মি তরঙ্গিতাং।
তামারব্ধ প্রিয়ানন্দাং বন্দে বৃন্দাবনেশ্বরীং ॥১২॥
অয়ি প্রোদ্যন্মহাভাবমাধুরী বিহ্বলান্তরে।
অশেষ নায়িকাবস্থা প্রাকট্যাদ্ভুত চেষ্টিতে ॥১৩॥
সর্ব্বমাধুর্য্য বিঞ্জোলী নির্ম্মঞ্ছিত পদাম্বুজে।
ইন্দিরা মৃগ্য সৌন্দর্য্য স্ফুরদংঘ্রি নখাঞ্চলে ॥১৪॥
গোকুলেন্দুমুখী বৃন্দ সীমন্তোত্তংস মঞ্জরী।
ললিতাদি সখী-যুথ জীবাতুস্মিত কোরকে ॥১৫॥
চটুলাপাঙ্গ মাধুর্য্য বিন্দুন্মাদিত মাধবে।
তাতপাদ যশস্তোম কৈরবানন্দ চন্দ্রিকে ॥১৬॥
অপার করুণা পূর-পূরিতান্তর্ম্মনো হ্রদে।
প্রসীদাস্মিন জনে দেবি, নিজদাস্য স্পৃহাজুষি ॥১৭॥
কচ্চিত্ত্বং চাটুপটুনা তেন গোষ্ঠেন্দ্র সূনুনা।
প্রার্থ্যমান চলাপাঙ্গ প্রসাদাদ্দ্রসে ময়া ॥১৮॥
ত্বাং সাধু মাধবী পুষ্পৈ মাধবেন কলাবিদা।
প্রসাধ্যমানাং সিদ্যন্তীং বিজয়িষ্যামহং কদা ॥১৯॥
কেলি বিস্রং সিনৌ বক্র কেশবৃন্দস্য সুন্দরি।
সংস্কারায় কদা দেবি জনমেতং নিদেক্ষ্যসি ॥২০॥
কদা বিম্বোষ্ঠি তাম্বুলং ময়া তব মুখাম্বুজে।
অর্প্যমানং ব্রজাধীশ সূনুরাচ্ছিদ্য ভক্ষ্যতে ॥২১॥
ব্রজরাজকুমার-বল্লভাকুল সীমন্তমণি প্রসীদ মে।
পরিবার গণস্ততে কদা পদবী মেনোদরিয়সী ভবেৎ ॥২২॥
করুণাং মুহুরর্থ যে পরাং তব বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তিনি।
অপি কেশিরিপোর্যয়া ভবেৎ স চটুপ্রার্থনভাজনো জনঃ ॥২৩॥

ইমাং বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা জনো যঃ পঠতি স্তবং।
চাটুপুষ্পাঞ্জলিং নাম সঃ স্যাদস্যা কৃপাস্পদং ॥২৪॥
ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিনা বিরচিত চাটুপুষ্পাঞ্জলি স্তবরাজঃ সমাপ্তঃ ॥ *

মাত্র এই কয়েকটী ছত্রে শ্রীরাধিকার রূপ বর্ণনায় শ্রীরূপ যে অপরূপ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্যই অবর্ণনীয়। উপমা, পদলালিত্য ও অর্থগৌরব পরস্পর অপ্রতিহত থাকিয়া পাশাপাশি সমভাবেই প্রবাহিত হইয়াছে। বর্ণনাভঙ্গী প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমভাবেই চারু ও স্নিগ্ধ রহিয়াছে। তর্জ্জমাতেও ইহার কোন অঙ্গহানি হয় নাই। বরং সংস্কৃত অপেক্ষা বাঙ্গালা রচনার ভাষা অধিক স্বচ্ছ ও তরল বলিয়াই মনে হয়। ভাষা ও ভাবের সামঞ্জস্য এত চমৎকার যে বিবৃতির কোন স্থানেই অসংলগ্নতা বা নীরসতার

* শ্রীরূপের কোন ভক্ত তাঁহার এই চাটুপুষ্পাঞ্জলির সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় পাণ্ডুলিপিতে টীকাকার আত্মপরিচয়-জ্ঞাপক কোন উক্তিই করেন নাই। নিষ্প্রয়োজন বোধে টীকা প্রকাশ করিলাম না। যদি কাহারো প্রয়োজন হয় জানাইলে পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশ করিব।

সংস্পর্শ মাত্র হয় নাই। অথচ তর্জ্জমা ও সংস্কৃত উভয় রচনার মধ্যেই শব্দবিন্যাসের অদ্ভুত সাদৃশ্য ; যথা—

শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ ॥

নব গোরোচনা দ্যুতি শ্রীঅঙ্গে শোভয়ে অতি
নীলপট্ট সাড়ী শোভে যায়।
ভুজঙ্গিনী জিনি বেণি ফণি বিরাজিত মণি,
রত্নগুচ্ছ অতি শোভে তায় ॥১॥
জিনি উপমার গণ তুলনা নাহিক সম
শোভে যার শ্রীমুখমণ্ডলে।
চৌরস্ কপাল ঠান জিনিয়ে নবিন চান্দ
কস্তুরি তিলক ঝলমলে ॥২॥
কন্দর্প কোদণ্ড জিনি ভুরু যুগ সুবলনি
অলকা তিলক তদুপরি।
উজ্জল কজ্জল জিনি নেত্রযুগ চকোরিণী,
কটাক্ষ সন্ধান মনোহারি ॥৩॥
নাসা তিল ফুল আভা গজমুক্তা করে শোভা
বেসর সহিত মনোহর।
জিনিয়া বান্ধুলি ফুল অধরের দুটী কূল
যার শোভা কাম অগোচর ॥
কুন্দ পুষ্প সম পাঁতি জিনিয়া দন্তের জুতি
মুকুতা হইতে সুশোভিত।
তাহে রক্ত রেখাগণ চিত্র শোভে মনোরম
যাথে কৃষ্ণ উনমত চিত ॥৪॥
কর্ণে স্বর্ণ ঢেড়ী সাঝে নানা রত্ন তার মাঝে
অবতংস তাহার উপর।
চিবুকে কস্তুরি বিন্দু শোভে যার মুখইন্দু
গলে নানা রত্ন মনোহর ॥৫॥
পদ্মের মৃণাল জিনি বাহু যুগ সুবলনি
অঙ্গদ কঙ্কন শোভে তায়।
নিলমণি চুড়ী হাতে নানারত্ন শোভে তাথে
কৃষ্ণ মনোহংস বন্ধ যায় ॥৬॥
করাম্বুজে বরাঙ্গুলি তাহে নানা রত্নাঙ্গুরি
উল্লসিত করে যার শোভা।
মনোহর হার গলে নানা রত্ন তাহে মিলে
পয়োধর বেড়ি যার আভা ॥৭॥

নাভি হইতে লোমাবলী ঊর্দ্ধে যার শোভে ভালি
শিরে মণি যেন ভুজঙ্গিনী।
মধ্যদেশ ক্ষীণ অতি ত্রিবলি বন্ধন তথি
ভাঙ্গে পাছে সেই ভয় মানি ॥৮॥
বিস্তার নিতম্ব মাঝে ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাদি সাজে
রতনে জড়িত মনোহর।
সুবর্ণ কদলি জিনি ঊরু-যুগ সুবলনি
যার শোভা কাম অগোচর ॥৯॥
পীত রত্নের বাঁটা জিনিয়ে জানুর ছটা
সেই হয়ে যার গর্ব্বমান।
শরদের পদ্ম যেন জিনি যার শ্রীচরণ
নূপুরের ধ্বনি যার গান ॥১০॥
কোটি পূর্ণিমার চান্দ জিনিয়ে নখের ছান্দ
ঝলমল কিরণ যাহার।
সাত্ত্বিকাদি ভাবগণ আকুল যাহার মন
যাতে হয় বিগ্রহ তাহার ॥১১॥
যার কটাক্ষ কাম শরে কৃষ্ণ উন্মাদিত করে
মনো অব্ধির তরঙ্গ বাঢ়ায়।
হেন বৃন্দাবনেশ্বরি তারে বন্দো কর জুরি
কৃষ্ণপ্রিয়া গণানন্দি তায় ॥১২॥
মহাভাব মাধুরী যাহাতে উদ্গাম কারি
বিভ্ভল করায় অতিশয়।
অশেষ নায়িকাগণ যাতে হয় প্রকটন
অপরিমিত চরিত আশয় ॥১৩॥
সকল মাধুর্য্য যার পদনখে পরচার
নিছনি লইয়ে সবিশেষ।
নারায়ণের প্রিয়তমা সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য সীমা
স্ফুরে যার পদনখ পাসে ॥১৪॥
গোকুল নগরে কত ইন্দুমুখি শত শত
সীমন্ত মুঞ্জরি করি মানে।
ললিতাদি সখিগণ সাক্ষাৎ যার জীবন
মানে যারে পরাণের পরাণে ॥১৫॥
চঞ্চল কটাক্ষ কাম শরে কৃষ্ণ উন্মাদিত করে
যাহার মাধুর্য্য এক বিন্দু।
মাতাপিতা গুরুজন যার যসে প্রসন্ন
কুমদ সহিতে জৈছে ইন্দু ॥১৬॥

অপার সাগর পুরিত অন্তর
পরম করুণা যার।
হে দেবি রাধিকে এই যে দাসিকে
করি লেহ আপনার ॥১৭॥
নন্দের নন্দনে বিনয় বচনে
কত না সাধিবে তোরে।
তুহুঁ সে মানিনি প্রিয়বাণি শুনি
প্রসন্ন হইবে তারে ॥১৮॥
এ সব তোমার প্রেমের পসার
তাহে নানা উপচার।
হেন দিন হব সে সঙ্গে রহিব
সে লীলা দেখিব আর ॥
মাধবির ফুলে করি পুটাঞ্জলি
তোমারে সাধিবে কাণ।
কমকলা-নিধি রসের অবধি
বিধি কৈলা নিরমান।
তুমি কমলিনী তাহে স্বেদজানি
চামর করিব তোরে।
এমন জে তুমি কি বলিব আমি
প্রসন্ন হইবে মোরে ॥১৯॥
নানা লীলা ভরে রসের সায়রে
কেশ বেশ হবে দুরে।
হেন দিন হব সে সেবা করিব
এ কৃপা করিবে মোরে ॥২০॥
তব মুখাম্বুজে তাম্বুল এই জে
কবে সে পুরিব আমি।
নন্দসুত তাহা কাড়িয়া খাইবে
এ মতি করিবে তুমি ॥২১॥
নন্দের নন্দন তার প্রিয়জন
সীমন্তে যে মণি ধরে।
এমন জে তুমি কি বলিব আমি
প্রসন্ন হইবে মোরে ॥২২॥
পরিবারগণ আছে যত জন
তোমার প্রেমের দাসি।
সভার মাঝারে দাসিপদ মোরে
তুমি দেহ ভালবাসি ॥২২॥

বারে বারে বলি তুয়াপদ ধরি
বৃন্দাবন বিহারিনি।
যদি কৃপা কর এ দাসি উপর
ধর মোর এই বাণি ॥
কেশি রিপুজন প্রার্থন ভাজন
তুয়াপদ পরসাদে।
এই আসা মোর যদি পুর্ন কর
নিবেদিন দেবি রাধে ॥২৩॥
চাটু পুষ্পাঞ্জলি এই স্তবাবলি
যে জন করয়ে গান ॥
বৃন্দাবনেশ্বরি তারে কৃপা করি
দাসি পদ দেন দান ॥২৪॥

ইতি শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী বিরচিত "চাটু পুষ্পাঞ্জলি" স্তবরাজ সমাপ্ত।

তর্জ্জমার ৪, ১৯, ২২ ও ২৩ অনুচ্ছেদে মূল স্তব অপেক্ষা কিছু কিছু বেশী আছে। ভাষার আধিক্য থাকিলেও স্তব ও তর্জ্জমার মধ্যে কোনরূপ ভাব-বৈষম্য হয় নাই। স্তবের উক্ত অনুচ্ছেদগুলিতে যত অল্প ভাষায় ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, তর্জ্জমায় তাহা হয় নাই॥

শোভন উপমার সহিত প্রতি অঙ্গের সুচারু বর্ণনা দ্বারা কবি তাঁহার নিপুণ তুলিতে শ্রীরাধার একখানি নিখুঁত ছবি আঁকিয়াছেন। তিনি নব গোরোচনার সহিত শ্রীমতীর বর্ণের তুলনা করিয়াছেন। বেণী ভুজঙ্গিনীকে পরাস্ত করিয়াছে। শ্রীমুখমণ্ডল সর্ব্ব উপমার অতীত। নবীন চন্দ্র অপেক্ষাও সুন্দর ললাট। ভ্রূযুগল কামদেবের ধনু অপেক্ষাও সুষ্ঠু। নাসাগ্র তিলপুষ্পের ন্যায়। ওষ্ঠদ্বয় বান্ধুলি ফুল অপেক্ষাও সুন্দর। দন্ত পংক্তি কুন্দদলকেও পরাজিত করে। বাহু-যুগল মৃণালের ন্যায় ও করতল পদ্মের ন্যায় সুন্দর। নাভি হইতে সূক্ষ্ম লোমাবলীর রেখা উর্দ্ধে উঠিয়াছে। মধ্যদেশ অতি ক্ষীণ। নিতম্ব বিস্তৃত। উরুযুগল স্বর্ণকদলী অপেক্ষাও সুন্দর। শরতের পদ্ম অপেক্ষাও সুন্দর চরণ যুগল। নূপুরের ধ্বনি সঙ্গীতের ন্যায় মধুর। কোটি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল নখসমূহ। যাঁহার কটাক্ষ কামশর হৃদয় সাগর উদ্বেলিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে উন্মাদিত করে, এমন যে বিশ্ববিমোহিনী নারী মূর্ত্তি তিনিই শ্রীরাধিকা। প্রতি অঙ্গের রূপ অনুযায়ী কবি যোগ্য আভরণ কল্পনা করিয়াছেন। গাত্রবর্ণের

গোরোচনা দ্যুতি নীল সাড়ীতেই অধিক শোভনীয়॥ সৌন্দর্য্যের সহিত শ্রীরাধার পরাশক্তি ও ভাবাদিও সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার গুণকীর্ত্তনে প্রকটিত হইয়াছে। কবি আপনাকে শ্রীরাধার দাসীরূপে কল্পনা করিয়াছেন; কারণ, গোপীভাব লইয়া ভজনা করাই বৈষ্ণব সাধনার রীতি। তজ্জন্যই সাধক দাসিত্ব প্রার্থনা করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য জগতের রূপ বর্ণনায় দন্ত ও নখের সৌন্দর্য্যকে অতি উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। প্রাচ্য কবি এই স্তব-কবচের মধ্যে যে রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে দন্ত ও নখের বর্ণনা দেখিয়া আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে প্রাচ্য জগতের সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণেও নখ-দন্তকে বাদ দেওয়া হয় নাই বা কোন অংশেই হীন করা হয় নাই। দন্ত সৌন্দর্য্যকে কুন্দদলের সহিত ও নখসৌন্দর্য্যকে পূর্ণচন্দ্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সুতরাং আধুনিক জগতের সৌন্দর্য্য চর্চ্চায় যাহা উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছে, প্রাচ্য জগতের সৌন্দর্য্য-চর্চ্চাতেও যে তাহা একদিন বিশেষ আদরণীয় ছিল তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই॥

এই একটীমাত্র স্তবের রচনা-নৈপুণ্য হইতেই আমরা বুঝিতে পারি শ্রীরূপের কবিত্ব, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি, ভাব ও রস-মাধুর্য্য কিরূপ অসাধারণ ছিল। উপমা, অর্থগৌরব ও পদলালিত্য প্রভৃতি সর্ব্ব গুণই তাঁহার মধ্যে সমভাবে বর্ত্তমান ছিল। তাঁহার প্রতিভা বৈষ্ণব সাহিত্যকে সত্যই চির-সুন্দর করিয়া গিয়াছে॥ *

---

* Manuscriptএর ভাষা অবিকল রাখিবার উদ্দেশ্যে বর্ণাশুদ্ধি শোধন করা হইল না।

নর্ম্মদা *

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

কিশোরী, জলধিগর্ভে গৌরবপ্রসূতা,
চিররাজরাজেশ্বরী ভারতলক্ষ্মীর
আদিরাজসূয়যজ্ঞে, সসম্ভ্রম-বৃতা!
বক্ষঃস্থলে ঢেলে দিতে কুম্ভ ভরি নীর,
কোন্ অজানা অতীতে, নীতা অবনীতে
সপ্তর্ষির সপ্তশঙ্খ-ধ্বনি আবাহনে,
সপ্ত পুণ্য অভিষেক-বারিধারা সনে,
মর্ম্ম চির-ধৌত করি, দ্রব শুচিব্রতে!
কর্ম্মে ত্যাগ, ভোগে শান্তি, জ্ঞানে শর্ম্মপ্রদে!
পুণ্যশ্লোকা নর্ম্মসখী তুমি গো নর্ম্মদে!

যেথা পুণ্য-পাদপীঠ প্রথম কল্পিত,
অমর-সেবিত তব পুণ্যস্পর্শ স্থান,
কি ব্যথায়, কি পুলকে নিগূঢ় স্পন্দিত!
মূক তারে, তুমি, দেবি! কর ভাষা দান।
সুরে ছন্দে অভিব্যক্ত সে ব্যথা পুলক,
ভারতীর মর্ম্ম-আঁখি হ'তে অবিরল
সিত শোণ দুটিধারে দু'ধারে উছল;
অঙ্গে চিরশিহরণ অমরকণ্টক!
ব্যথায় গলিত শোণে জাহ্নবী সুখদা,
আর সিন্ধু দিল কোল, তোমারে নর্ম্মদা!

কিংবা ধরিত্রীর বুকে ছেদমত্যাহীন
অমরকণ্টক যাহা চিরবিদ্ধ-মূল,—
বিশ্বজীব-জন্ম ভাগ্য, নিঠুর, আদিম,
বেদনারহস্যগর্ভ অশরীরী শূল,—
তুমি সে কণ্টক বুঝি চেয়েছ তুলিতে
অকৃপণ, অকুণ্ঠিত সমবেদনায়;
তব যুগযুগান্তর-সিদ্ধ সাধনায়,
ধরিত্রীর নর্ম্মসখি! অয়ি ব্রতরতে!
কণ্টকের বীজ-উৎস হ'য়েছে কি দ্বিধা—
ব্যথারাগে শোণ, স্বচ্ছপ্রসাদে নর্ম্মদা!

বিপুল সৈকতে নগ্ন শুষ্কতার বুকে
শোণ-অশ্রুরেখাচ্ছলে ধরার রোদন!
কেকাচ্ছন্দে মৃগকেলি-কল্পিত কুহকে
বসন্তের ক্রীড়াশৈল বিচিত্র অঙ্কন,—
রেবাবরবধূ কত পল্লী মালবিকা,
রাখিল যেথায় শুভ্রমর্ম্মর বেদিকা
স্ফটিকের মত প্রেমে তিলে তিলে গড়ি;
তার মাঝে বাষ্পাকুল 'ধোঁয়াধারে' পড়ি,—
নীলক্ষৌম শিঙ্গারের মদনমহলে
ছায়া লেশাবেশ ল'য়ে মর্ম্মরমুকুরে,—
সৌম্য, স্বচ্ছ, দীপ্ত, তুঙ্গ শুভ্রতার হৃদে
কি গভীর স্নেহবর্ত্ম রচিলে নর্ম্মদে!

---

* মধ্যপ্রদেশে অমরকণ্টক পর্ব্বতের নিকটেই নর্ম্মদা ও শোণ বাহির হইয়াছে। যেখানে নর্ম্মদা প্রসিদ্ধ "মার্বেল রক্‌স" মাঝে প'ড়য়াছে, সেখানে নদীপ্রপাত—'ধোঁয়াধার'। উচ্চ ধবধবে মার্ব্বেলের মাঝখান দিয়া নর্ম্মদার স্থির, স্বচ্ছ, সুগভীর প্রবাহ। রাণী দুর্গাবতীর "মদনমহল" [illegible] চিত্তাকর্ষক বিবরণ দ্রষ্টব্য।—প্র. মু.

স্বামী বিবেকানন্দ

রায় শ্রীচুণীলাল বসু বাহাদুর সি-আই-ই

স্বামী বিবেকানন্দ জ্ঞান ও কর্ম্মের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আজ ভারতবাসী একাধারে তাঁহার এই যুগল-মূর্ত্তি আদর্শ রূপে বরণ করিতে সমর্থ হইয়া ধন্য হইয়াছে। আজ ভারতের সর্ব্বত্রই তাঁহার পবিত্র স্মৃতি পূজার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা অতি শুভ লক্ষণ। ইহার অর্থ এই যে ভারতবাসী তাহার ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনে পুনরায় আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছে। ভগবান আমাদিগের এই মঙ্গল চেষ্টার উপর তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন।

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি আমা অপেক্ষা ১ বৎসরের ছোট ছিলেন। আমি যখন মেডিকাল্ কলেজে থার্ড ইয়ার্ ক্লাসে পড়ি, তখন তিনি বি-এ পড়িতেন। আমার একজন নিকট আত্মীয় তাঁহার সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। এই বন্ধুর বাটীতে তিনি সর্ব্বদা আসিতেন এবং তথায় তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। সেই পরিচয় উত্তর কালে বন্ধুত্বে পরিণত হইয়া তাঁহার তিরোভাবের দিন পর্য্যন্ত আমাকে তাঁহার পবিত্র সঙ্গসুখলাভের আনন্দ প্রদান করিয়াছিল।

ছাত্রজীবনেই আমরা তাঁহার চরিত্রগত বিবিধ সদ্‌গুণের পরিচয় পাইয়াছিলাম। এই জন্য তাঁহার সহপাঠীগণের হৃদয়ের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান সহজেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত এবং তাঁহারা অনেক বিষয়ে তাঁহার মত ও নেতৃত্ব বিনা বিচারে অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইতেন। মানুষকে পরিচালন করিবার উপযুক্ত শক্তি দিয়াই যেন প্রকৃতি তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি আজন্ম ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারী পূত-চরিত্র ছিলেন। ছাত্রজীবনে তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে কাহারো কাহারো স্বভাব নিষ্কলঙ্ক ছিল না, কিন্তু তিনি তাঁহাদের সঙ্গে সর্ব্বদা একত্রে থাকিলেও তাঁহার চরিত্র কখন কোনরূপ মলিনতা-স্পৃষ্ট হয় নাই। তিনি আজীবন অধ্যয়নশীল ও জ্ঞানানুশীলনে রত ছিলেন। ছাত্র-জীবনেও আমরা তাঁহার এই বৃত্তি অনুশীলনের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ইতিহাস ও দর্শন চর্চ্চায় তাঁহার সাতিশয় অনুরাগ লক্ষিত হইত। বি-এ ক্লাসের পাঠ্য ইতিহাস ও মনোবিজ্ঞানের গ্রন্থ ব্যতীত তিনি এই দুই বিষয়ে অনেকানেক পাশ্চাত্য খ্যাতনামা গ্রন্থকারের গ্রন্থ বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বিভিন্ন মতামত সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বদা চিন্তা ও বিচার করিতেন। ইহার ফলে তাঁহার তর্কশক্তি ও বিচারবুদ্ধি সাধারণ ছাত্র অপেক্ষা অত্যধিক পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। তাঁহার প্রখর স্মৃতিশক্তি, তাঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডারের প্রাচুর্য্য, বিচারে অনেক স্থলেই তাঁহাকে অজেয় করিয়া তুলিত। বয়সে তিনি নবীন হইলেও অনেক প্রবীণ খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক পণ্ডিতগণ খ্রীষ্টধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদন-বিষয়ক বিচারে তাঁহার নিকট অনেক সময়ে অপদস্থ হইয়া যাইতেন। কিন্তু এই তীক্ষ্ণ তর্কশক্তি ও বিচারপ্রিয়তা ছাত্রজীবনে তাঁহার বিপদের কারণও হইয়াছিল। ইহার ফলে এক সময়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর ঘোর সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিত হইলে এবং তাঁহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগদান করিলেও তাঁহার এই বিষম সংশয় নিরাকৃত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে তিনি কিছুদিনের জন্য এক প্রকার নাস্তিক হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও, ঈশ্বর আছেন কি না, এই কঠিন সমস্যার সন্তোষকর সমাধানের জন্য একটা প্রবল আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদা তাঁহার অন্তরে জাগরূক থাকিত।

এমন সময়ে দক্ষিণেশ্বরের সাধু পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের জীবনের আশ্চর্য্য ত্যাগ ও ভক্তির কাহিনী এবং তাঁহার ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় অপূর্ব্ব ধারণা লোকমুখে শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন ও পরীক্ষা করিবার অভিলাষ তাঁহার মনে উদয় হইল এবং কালবিলম্ব না করিয়া সংশয়-বিক্ষিপ্ত অথচ

সত্যান্বেষী এই যুবক জিজ্ঞাসু হইয়া পরমহংস দেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। মাহেন্দ্র ক্ষণে গুরুশিষ্যের এই প্রথম মিলন সংঘটিত হইল ; ধর্ম্মজগতে ঐক্য-প্রতিপাদক অসাম্প্রদায়িক উদার মত প্রচারের ভিত্তি এই শুভক্ষণে স্থাপিত হইল।

পরমহংস দেবকে তাঁহার প্রথম দর্শন এবং নাস্তিকতার নাগপাশ হইতে তাঁহার মুক্তি লাভ কিরূপে ঘটিয়াছিল তাহা তিনি নিজের ওজস্বী ভাষায় যেরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই আমি এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি—

"I heard of this man, and I went to hear him. He looked just like an ordinary man, with nothing remarkable about him. He used the most simple language, and I thought, "Can this man be a great teacher ?" I crept near to him and asked him the question which I had been asking all my life. "Do you believe in God, Sir" ? "Yes", he replied. "Can you prove it, Sir ?" "Yes", he replied. "How ?" "Because I see him just as I see you here, only in a much intenser sense." That impressed me at once. For the first time, I had found a man who dared to say that he saw God, that religion was a reality, to be felt, to be sensed in an infinitely more intense way than we can sense the world. I began to come near that man, day after day, and I actually saw that religion could be given. One touch, one glance, can make a whole life change. I had read about Buddha and Christ and Mohammad, about all those different luminaries of ancient times, how they would stand up and say, "Be thou whole" and the man became whole. I now found it to be true, and when I myself saw this man, all scepticism was brushed aside."

"My Master."

গুরু-শিষ্যের এই শুভ মিলনে আমরা ঈশ্বরের মঙ্গল-হস্তের প্রভাব স্পষ্টভাবে দর্শন করিতেছি। বিবেকানন্দের মত প্রতিভামণ্ডিত শক্তিশালী পুরুষ জগতে নাস্তিকতাবাদ প্রচার করিলে সমাজের ঘোর অমঙ্গল ও অকল্যাণ সংসাধিত হইত। তাই ভগবানের মঙ্গলময় বিধানে এরূপ অপূর্ব্ব সংযোগ উপস্থিত হইল যে পূর্ণ জ্ঞানের সামীপ্যে অবিলম্বে অজ্ঞান তিরোহিত হইল, আলোকের সংস্পর্শে অন্ধকার চিরদিনের মত অন্তর্হিত হইল, বিশ্বাসের নিকট অবিশ্বাস পরাজিত হইল, সত্যের নিকট অসত্য মস্তক অবনত করিল। গুরু, স্বায় জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করিয়া "সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়" রূপ যে অমৃত উত্তোলন করিয়াছিলেন, এই মিলনের ফলে শিষ্য কর্ত্তৃক তাহা জগতের মানুষকে বিতরণ করিবার শুভ সংযোগ উপস্থিত হইল।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে কয়েকজন ধর্ম্ম-সংস্কারক ও ধর্ম্মপ্রচারক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, বেদ-বিদ্ পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি মহাপুরুষগণকে জন্মদান করিয়া ভারতবর্ষ চিরদিনের জন্য ধন্য হইয়াছেন। ইঁহারা কেহ বা বেদের, কেহ বা উপনিষদের ধর্ম্ম, প্রচলিত অপর সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া স্ব স্ব মত প্রচারে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের এই মহতী চেষ্টা এ দেশে ধর্ম্মসংস্কার সম্বন্ধে সম্প্রদায় বিশেষে যে বিশেষ সুফল প্রসব করিয়াছে, সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এই উনবিংশ শতাব্দীতে কেবল একজন মাত্র মহাপুরুষ বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যিনি সাধনাবলে প্রচলিত সকল ধর্ম্মের মধ্যেই সত্যের প্রতিষ্ঠা অভ্রান্তরূপে দর্শন করিয়া, "বিভিন্ন ধর্ম্মমত ঈশ্বর লাভের ভিন্ন ভিন্ন পথ মাত্র." এই মহাসত্য প্রচার করিয়া, পরস্পর বিবদমান ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে আবহমানকাল প্রচলিত বিরোধ খণ্ডন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের গুরু পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব এবং তাঁহার প্রচারিত এই সত্য জগতের ধর্ম্ম-ইতিহাসে পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের এক অপূর্ব্ব দান। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব ধর্ম্মপ্রচারক বা ধর্ম্ম-সংস্কারকগণ, যিনি যখন যে ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছেন, তিনি তাহার শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রচলিত অপর সকল ধর্ম্মমতের নিকৃষ্টত্ব প্রমাণ করিবার প্রয়াস

পাইয়াছেন। ধর্ম্মজগতে এত বিবাদ বিসম্বাদ, এত সঙ্কীর্ণতা, এত অসহিষ্ণুতা, এত নিরপরাধের নিগ্রহ, এত নৃশংসতা, এত শোণিতপাত, কেবল এই মত-বিরোধ হেতু সংঘটিত হইয়া আসিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বিবদমান ধর্ম্মজগতে সমন্বয় (Harmony) ও শান্তি স্থাপন করিবার জন্য বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই উদার সার্ব্বভৌমিক মহাসত্য প্রচার করিবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দকে শিষ্যরূপে স্বহস্তে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

ভারতবাসী হিন্দু ধর্ম্ম-বিশ্বাসে চিরদিনই উদারপন্থা। স্বামী বিবেকানন্দ সিকাগো ধর্ম্ম মহাসভায় সমাগত জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণের নিকটে হিন্দুর উদার ধর্ম্ম-মতের যে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহার সৌন্দর্য্য ও মহত্ব উপভোগ করিতে হইলে তাঁহারই কথায় ও তাঁহারই ব্যবহৃত ভাষায় তাহার পরিচয় প্রদান করা উচিত। তিনি বলিয়াছিলেন—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

"I am proud to belong to a religion which has taught to the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I belong to a religion in whose sacred language, the Sanskrit, the word *exclusion* is untranslatable. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and of all nations of the earth. We have gathered in our bosom the purest remnants of the Israelites, a remnant which came to Southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny, I belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings :—"As the different streams have

My Master "taught that a man ought to live in this world like a lotus-leaf which grows in water but is never moistened by water,—so a man ought to live in this world with his heart for God and his hands for work."

ঈশ্বর প্রেম সম্বন্ধে তাঁহার গুরুর উপদেশ ছিল যে তন্মধ্যে কামনার গন্ধ থাকিবে না ; প্রহ্লাদের অহৈতুকী ভক্তিকেই তিনি শ্রেষ্ঠ ভক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে স্বামী তাঁহার একটী বক্তৃতায় বলিয়াছেন—

"It is good to love God for hope of reward in this or the next world, but it is better to love God for love's sake, and the prayer goes— "Lord, I do not want wealth nor children nor learning. If it be thy will, I will go to a hundred hells but grant me this that I may love Thee without the hope of reward,—love unselfishly for love's sake."

স্বামী বিবেকানন্দ এই কর্ম্মযোগই স্বদেশে ও বিদেশে প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে ও কার্য্যে ইহারই উন্নত দৃষ্টান্ত তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রচারিত সেবা-ধর্ম্ম এই নিষ্কাম কর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দেশে এত অল্পদিনের মধ্যে এত অধিক প্রসার লাভ করিয়াছে। তিনি বলিতেন—ঈশ্বর কোথায়, ঈশ্বর কোথায়, বলিয়া চারিদিকে কেন তুমি বৃথা অন্বেষণ করিতেছ! তিনি ত তোমার সম্মুখেই অবস্থিত রহিয়াছেন। নিরন্নের মধ্যে, পীড়িতের মধ্যে, আর্ত্তের মধ্যে, পতিতের মধ্যে, অজ্ঞানীর মধ্যে, অস্পৃশ্যের মধ্যে, তোমার নারায়ণ উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশমান রহিয়াছেন। একবার জ্ঞান চক্ষু মেলিয়া তাঁহাকে দর্শন কর এবং এই সকল দরিদ্র-নারায়ণের পূজা ও সেবা করিয়া তোমার ইষ্টদেবের প্রিয় কার্য্য সাধন কর। তুমি ইহাদিগের দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হইয়াছ বলিয়া কখন অহঙ্কারে স্ফীত হইও না। ইহাদিগের সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছ বলিয়া আপনাকে ধন্য বলিয়া বিবেচনা কর এবং এই অধিকার লাভের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও।

সেবা-ধর্ম্মকে এরূপ স্বর্গের মাধুর্য্য ও মহিমায় অনুপ্রাণিত করিতে স্বামী বিবেকানন্দ ভিন্ন আর কেহ চেষ্টা করেন নাই। কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার একটী বক্তৃতায় বলিয়াছেন :—

"Karma yoga teaches how to work for work's sake, unattached, without caring who is helped and what for. The karma yogi works through his own, because it is good to work, and has no object beyond that. His station in this world is that of a giver, and he neve receives. He knows that he is giving but does not ask any thing back, and therefore he eludes the grasp of misery. The grasp of pain that comes, is the reaction from "attachment" (আসক্তি)—"The Ideal of a Universal Religion."

বর্ত্তমান যুগে গীতার উপদিষ্ট এই কর্ম্ম-যোগ প্রচার করিবার জন্যই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ চিরদিনই "কর্ম্মভূমি" বলিয়া জগতে সম্মান ও শ্রদ্ধার স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ভারতবাসী কর্ম্মের প্রকৃত আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া স্বার্থান্ধতা, আলস্য, অবসাদ, দীর্ঘসূত্রতা, নিশ্চেষ্টতা প্রভৃতি তামসিক গুণে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই মোহনিদ্রা হইতে স্বদেশ-বাসিগণকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্যই প্রচণ্ড শক্তিমান স্বামী বিবেকানন্দের আগমন। তাঁহার উন্নত আদর্শ ও উদ্দীপনা-মূলক উপদেশ লাভ করিয়া দেশে জীবনের সাড়া পুনরায় দেখা যাইতেছে ; দেশের লোকের তমোভাব কাটিয়া গিয়া তাহাদের মধ্যে সত্ত্ব ও রজো ভাবের লক্ষণ ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতেছে। দেশের লোক দেহ, মন ও আত্মার মধ্যে উপযুক্ত শক্তি লাভ করিয়া জগতে অপরাপর জাতির ন্যায় আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় জাতীয় জীবন উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য যে মহৎ কার্য্যের সূচনা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহারই সহায়তা করিবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে ভারতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব, তাঁহাদের আগমন ব্যর্থ হয় নাই। স্বামীজীর সহিত তাঁহার প্রিয় শিষ্যা সিষ্টার নিবেদিতার, রাজা রামমোহন রায়ের কার্য্য সম্বন্ধে একদিন যে আলোচনা হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে স্বামীজীর মত সিষ্টার নিবেদিতার পুস্তক হইতে এস্থলে উদ্ধৃত হইল—

"It was here, too, that we heard a long talk on Ram Mohan Roy, in which he (Swami Vivekanada) pointed out three things as

the dominant notes of this teacher's (Raja Rammohan Roy's) message, his acceptance of the Vedanta, his preaching of patriotism and the love that embraced the Mussulman equally with the Hindu. In all these things, he (the Swami) claimed himself to have taken up the task that the breadth and foresight of Rammohan Roy had mapped out."

"Notes on Some Wanderings with the Swami Vivekananda by Sister Nivedita."

দক্ষিণ ভারতে অস্পৃশ্য জাতির প্রতি হিন্দু সমাজ কর্ত্তৃক যে অবিচার ও অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়, তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তিনি অতিশয় মর্ম্ম-বেদনা বোধ করিতেন এবং ইহার প্রতীকার কল্পে তিনি যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা বহু পরিমাণে সুফল প্রসব করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের "অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের" আন্দোলনের মধ্যে তাঁহার উপদেশের মঙ্গল প্রভাব স্পষ্ট লক্ষিত হয়।

তিনি অস্পৃশ্যতার একান্ত বিরোধী ছিলেন। তিনি রহস্যচ্ছলে সর্ব্বদা বলিতেন যে, বর্ত্তমান কালে হিন্দুর হিন্দুত্ব তাহার "চৌকায়" (রান্নাঘরে) আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে!

এইবার তাঁহার স্বদেশ-প্রেম ও স্বজাতি বাৎসল্যের উদাহরণ স্বরূপ তাঁহার বক্তৃতা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধার করিয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করিব। ভাষার সৌন্দর্য্যে, ভাবের মহত্ত্বে, বর্ণনার উচ্ছ্বাসে এবং স্বদেশ-প্রেমিকতার আন্তরিকতায় ইহা সাহিত্য-জগতে অতুলনীয়।

"On India, forget not that your ideal woman is Sita, Savitri, Damayanti; forget not that your ideal of God is the great ascetic of ascetics Umanath Sankar! Forget not that your marriage, your wealth, your life are not for your sense enjoyment,—are not for your individual personal pleasure; forget not that from your very birth, you are sacrificed for the mother.······· Thou hero, take courage, be proud that you are an Indian,—say in pride, "I am an Indian, every Indian is my brother," say—"the ignorant Indian, the poor Indian, the Brahman Indian, the pariah Indian, is my brother!"; be clad in torn rags and say in pride at the top of your voice, "the Indians are my brothers,—the Indians are my life, Indian god & goddess are my God, Indian society is the cradle of my childhood, the pleasure garden of my youth, the sacred seclusion of my old age;—say, brethren,—"Indian soil is my highest heaven, India's good is my good" and pray day and night—"Thou Lord, Thou mother of the universe, vouchsafe manliness unto me—Thou mother of strength, take away my unmanliness and make me man."

Vivekananda

প্রথম ও শেষ

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

সোনারঙ্ পোঃ
(ঢাকা)
১৬ই বৈশাখ, বিকেল

এইমাত্র বেড়াতে বেরোবার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ এসে গেলো বৃষ্টি। আমার জান্‌লার পাশের পুরোনো পেঁপে গাছটার চিকৃরি-কাটা চিকণ পাতাগুলি হাওয়ায় দুলে'-দুলে' উল্টে' যেতে লাগ্‌লো। প্রথমে হীরের কুচির মত বড় বড় স্বচ্ছ বৃষ্টির ফোঁটা—যেন কতদূর থেকে ছুটে' আস্‌তে-আস্‌তে পেঁপে-গাছটার ওপর মুখ থুব্‌ড়ে পড়্‌লো; পরে এলো জাঁক-জমক হাঁকডাকে পৃথিবীকে অস্থির করে' বৃষ্টির মিছিল, সবুজ পাতাগুলো জলের ঝাপটে কালো হ'য়ে এলো, বিকেলের প্রচুর আলো কোথায় গেলো মিলিয়ে,—আকাশ থেকে নদী পর্য্যন্ত মেঘের ধূসর ছায়া শীত-সন্ধ্যার কুয়াশার মত ভারি ও ম্লান হ'য়ে নেমে এসেছে।

সুতরাং আমাদের বেড়াতে যাওয়া হ'ল না। সেই বেশেই আমার ঘরে ফিরে' এসেছি। জান্‌লার শার্সির কাঁচে বার বার বৃষ্টির ঝাপট্ এসে আছড়ে পড়ছে, তা'র পেছনে আমাদের বিস্তৃত আম-বাগানের শ্যামল ঘনতা রঙ্গমঞ্চের কালো যবনিকার মত চোখে এসে লাগ্‌ছে। ঘরের ভেতরে আলো কম; জান্‌লার কাছে একখানা চেয়ার নিয়ে এসে বস্‌লাম। খানিকক্ষণ বই নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌লাম, মন বস্‌লো না। তার পর হঠাৎ মনে হ'ল, আমার প্রিয়তমা নীলার কাছে যে চিঠিটা রাত্তিরে লিখ্‌বো ভেবেছিলাম, সেটা এখনি লিখে' ফেলি না কেন?

সেই চিন্তার ফল যে কি হ'ল, তা তো তুই প্রত্যক্ষই কর্‌ছিস্। যদি এই বৃষ্টিটা না আস্‌তো, তবে এতক্ষণ পদ্মার ধার দিয়ে সরু পথ ধরে' হেঁটে বেড়াতাম—শুধু-পায়ে। এখানকার লোকেরা জুতো-পরা মেয়ে দেখ্‌লে আঁৎকে উঠ্‌বে বলে' নয়,—নরম মাটির ওপর নরম পায়ের (আমার পা যে নরম, তা, তোর মুখেই শুনেছি) চাপ দিয়ে-দিয়ে চল্‌তে ভারি আরাম লাগে—তাই। এই চিঠি লিখ্‌তে অন্তত আরো ছ'টি ঘণ্টা দেরি হ'ত, এবং ইতিমধ্যে তোর কথা একটি-বারো মনে পড়্‌তো না। এই নতুন আব্‌হাওয়ার সঙ্গে ভাব কর্‌তেই সমস্ত সময় কেটে যেতো।

তুই শুনে' হাস্‌বি, কিন্তু এখানে আস্‌তে না-আস্‌তেই আমি পাড়াগাঁয়ের প্রেমে পড়ে' গেছি। সত্যি। এ-প্রেম যা'তে ব্যর্থ না হয়, সে-জন্য আমি উঠে'-পড়ে' লেগে গেছি। একটি মুহূর্ত্ত আমি অপব্যয় হ'তে দেবো না, এখান্‌কার মাটিতে প্রথম পা দিয়ে আমি এই করেছি পণ।

পূর্ব্বরাগ হয় তা'রো আগে। গোয়ালন্দ থেকে আমাদের স্টীমার তখন ছাড়্‌লো, যখন সূর্য্য উঠেছে, অথচ ভালো করে' রোদ ফোটে নি। গাড়ি থেকে নাম্‌বার সময় অসম্পূর্ণ ঘুমের অতৃপ্তিতে আমার মেজাজ খারাপ হ'য়ে ছিলো, কিন্তু স্টীমার খানিকক্ষণ চল্‌তেই ঠাণ্ডা হাওয়ায় আমার চোখের ঘুম ও মনের ক্লান্তি ধুয়ে' গেলো। ডেক্-এর রেলিঙে ভর্ দিয়ে দাঁড়িয়ে আমি ম্লান জলের ওপর লাল আলোর ঝিকিমিকি দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। তখনকার মত যদি আমি ইন্দ্রের মত সহস্রাক্ষ হ'তাম, তবু বোধ হয় আমার দেখে আশ মিটতো না।

এক সময় বাবা এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন। তাঁর স্বাভাবিক মাধুর্য্যের সঙ্গে বল্‌লেন, 'কিগো, আমাদের চা খাওয়া-টাওয়া হ'বে না?'

আমি তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্‌লাম, "আচ্ছা বাবা, এই পদ্মা নদী? রবি বাবুর পদ্মা?'

'না, রবি বাবুর পদ্মা ঠিক এ নয়। সে গেছে পাব্‌না জেলার ভেতর দিয়ে; নদী সেখানে সঙ্কীর্ণ, স্রোত প্রখর নয়। আমরা যে পথে যাচ্ছি, তাঁর বোট্ কখনো সে-পথে যাওয়া-আসা করেনি। এ পদ্মা অলসগমনা, ভীরু স্রোতস্বিনী নয়, এ গভীর গম্ভীর ও উদার—করুণা-বিতরণেও যেমন মুক্তহস্ত, অকল্যাণ-সাধনেও তেম্‌নি অকুণ্ঠ। তোরি মত। নদীর মধ্যে এ অভিজাত।'

'বাবা, নিজকে এমন করে' প্রশংসা কর্‌তে তোমার লজ্জা করেনা? আমি যে তোমারই মেয়ে।'

বাবা হাস্‌লেন। 'এ-কথা বলাতেই তা'র পরিচয় পেলাম।'

চা খেতে বসে' হঠাৎ আমার মনে এক উৎকট প্রশ্নের আবির্ভাব হ'ল। জিজ্ঞেস্ কর্‌লুম, 'বাবা, যেখানে যাচ্ছি, সেখানে চা কিন্‌তে পাওয়া যায় তো?'

রুটিতে জ্যাম্ মাখাতে মাখাতে বাবা বল্‌তে লাগ্‌লেন, 'এক ইংরেজ মহিলার একবার ভারতবর্ষে আস্‌বার কথা হয়। তিনি এখান্‌কার এক বন্ধুকে চিঠিতে জিজ্ঞেস্ করেন, "ক্যাল্‌কাটার পথে-ঘাটে কি দিনের বেলাতেও বাঘ ঘুরে' বেড়ায়?"

মা আমার পক্ষ নিয়ে বল্‌লেন, 'ওর আর দোষ কি, বলো? জন্মেও তো পাড়া-গাঁ চোখে দেখে নি!'

বাবা বল্‌লেন, 'যেন তুমিই দেখেছ! মা-মেয়ে দু'জনেরই গ্রাম-সম্বন্ধে যেটুকু ধারণা, তা তো শরৎবাবুর উপন্যাস থেকে নেয়া। তা ভালোই হ'ল। তোমাকে বিয়ে করেছি পর আর তো দেশে-যাওয়া হ'য়ে ওঠেনি—এবার তোমাকে সুদ্ধ দেখিয়ে আনা যা'বে। তুমি তো মুসৌরীর নামে ক্ষেপেছিলে, কিন্তু মুসৌরীতে পরেও যাওয়া যা'বে—আর, আসছে বছর বোধ হয়, যেখানে আমাদের বাড়ি ছিলো', সেখানে থাক্‌বে নদী, এবং তা'র ওপর দিয়ে চল্‌বে স্টীমার। বাড়িটে আমাদের বহুকালের—তিরিশ বছর ওটা দেওয়ান-গোমস্তার হাতে পড়ে' আছে, শেষ সময়ে আমাদের দেখে খুসিই হ'বে।'

মা জিজ্ঞেস্ কর্‌লেন, 'কেমন বাড়ি ?'

'কেমন ? দেখ্‌তে সাবেকী, কিন্তু কাজে আশ্চর্য্যরকম আধুনিক ! ঘরগুলো অত্যন্ত প্রশস্ত এবং উঁচু, অনেক জান্‌লা আছে ও সেগুলো বেশ চওড়া। ওপরে ওঠ্‌বার সিঁড়ি কাঠের। এমন কি, মেয়েদের ও পুরুষদের আলাদা স্নানের ঘর পর্য্যন্ত আছে। অর্থাৎ, বাড়িটাকে চৌরঙ্গীতে তুলে' নিয়ে আস্‌তে পার্‌লে বেশ বাস করা যায়। কাজেই, শ্রীমতী লীনা, তোমার সমস্ত আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক বলে' জেনো। হ্যাঁ—বল্‌তে ভুলেছি, সিঁড়ির পেছনে ছোট্ট একটা কুঠুরি আছে—চোরা কুঠুরি। বাইরে থেকে যেটা জাপানী পর্দ্দার মত দেখায়, সেটাই হচ্ছে দরজা—কৌশল না জান্‌লে কিছুতেই খোলার উপায় নেই। শুনেছি আমার প্রপিতামহের আমলে সেখানে মোহর রাখা হ'ত। তিনিই ঐ বাড়িটে করেন কিনা। তিনি কল্‌কাতায় এসে এক পাদ্রীর কাছে ইংরেজি শেখেন। ফলে ইস্‌ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে তাঁর একটা বড় রকম চাকুরি জুট' যায়—মাসে সত্তর টাকা বুঝি মাইনে। দশ বছরে তিনি যা উপার্জ্জন করেন, তা দিয়ে শুধু ঐ বাড়ি নয়, একটা প্রকাণ্ড এস্‌টেট্ গড়ে' তোলেন। চৌধুরীরা তখন ছিলো এ-মুল্লুকের সেরা জমিদার, কিন্তু সেই সময় থেকেই তা'দের পতন সুরু হয়। ঠাকুর্দ্দার আমলে আমাদের প্রতিপত্তি আরো বাড়ে, চৌধুরীদের নবাবী জাঁক-জমকের অবশিষ্ট থাকে শুধু প্রকাণ্ড চকমিলান বাড়িখানা। তখন পর্য্যন্ত দু' বাড়িতে যথেষ্ট রেষারেষি ছিলো - থাকারই কথা।'

যেন একটা গল্প শুন্‌ছিলাম, এইভাবে আমি বলে' উঠ্‌লাম, 'তার পর ?"

'তার পর বাবার আমলে সবি গেলো বদ্‌লে। বাবা ছিলেন ঠাকুর্দ্দার ছোট ছেলে, তাই পৈতৃক সম্পত্তির ওপর বিশেষ ভরসা না করে' তিনি চলে' গেলেন বিলেত—পাশ কর্‌লেন সিভিল্ সার্ভিস্। ফিরে' এসে দেখ্‌লেন, তাঁর অগ্রজ সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করে' নিরুদ্দেশ হয়েছেন। পরে জানা গেলো, তিনি হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্ব জান্‌বার জন্য জার্ম্মানিতে অবস্থান কর্‌ছেন। তিনি বাডেন্-বাডেন্ এ মারা যান্।

'অথচ বাবা বিদেশেই থাকতেন বলে' গ্রামের বিষয়-আশয়ের অবস্থা ক্রমশই কাহিল হ'তে লাগ্‌লো। তার পর তো পদ্মাই সব নিতে সুরু কর্‌লে। ফলে চৌধুরীদের সঙ্গে মনোমালিন্যটাও মুছে' গেলো। সীতাপতি চৌধুরীর সঙ্গে বাবার যথেষ্ট বন্ধুতা ছিলো। তাঁকে আমি ছেলেবেলায় বার-কয়েক দেখেছি। তিনি সমস্ত জীবন দেশেই কাটান্, কিন্তু অমন প্রতিভাদীপ্ত কপাল ও চোখ আমি কোনো মানুষের দেখিনি। মিকায়েলেঞ্জেলোর মুখের অবর্ণনীয় কারুণ্য ও তেজস্বিতা ছিলো তাঁর চোখে। তিনি বাজাতেন বীণ্—পুঁচকে সেতার বা এস্রাজ নয়—ও-সব তখনকার দিনে ছিলো না। অসংখ্য তারের ওপর তাঁর আঙুলগুলো যখন ঢেউয়ের মত অনায়াসে ভেসে বেড়াতো, তখন বাবার কোল ঘেঁষে বসে' মুগ্ধ হ'য়ে আমি তাকিয়ে থাক্‌তাম। মনে হ'ত, উনি যদি একবার ঐ আঙুলগুলো দিয়ে আমাকে স্পর্শ করেন, তা হ'লে আমি আগুনের মত দাউ-দাউ করে' জ্বলে' উঠ্‌বো।'

'উনি এখন খুব বুড়ো হয়েছেন—না ?'

'তখনো যুবক ছিলেন না, কিন্তু বার্দ্ধক্যের আগেই তাঁকে ধর্‌লে মৃত্যু। আমি তাঁর স্ত্রীকে দেখিনি, তাঁর একমাত্র সন্তান—তাঁর মেয়েই তাঁর দেখাশোনা কর্‌তেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেই মেয়ের কি হয়েছে জানিনে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে বাবা বল্‌লেন, 'সে যেন আর-এক জন্মের কথা ; তবু সীতাপতি চৌধুরীর কপাল আর চোখ আর আঙুল আজো মনে পড়ে।'

জানিস্ নীরু, এই সীতাপতি চৌধুরীকে দেখ্‌তে পাবো না ভেবে মনে-মনে আমার ভারি অভিমান হ'ল—বাবা যেন আমাকে ফাঁকি দিয়ে মস্ত একটা লাভ করে' ফেলেছেন, সে-লাভের যোগ্যতা আমারো কম ছিলনা। অপুত্রক সীতাপতি চৌধুরীর রক্তের বংশ তো শেষ হ'য়েই গেছে, কিন্তু বর্ত্তমান পৃথিবী থেকে তাঁর মনের বংশও যে লোপ পেয়ে গেলো, এই আমার দুঃখ। বাবার কথা শুন্‌তে-শুন্‌তে মনে হচ্ছিলো, বল্‌জাক্-এর পৃষ্ঠা থেকে কোনো চরিত্র নেমে এসে যেন আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়েছেন—সাত শো বছর ধরে' তাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা রাজত্ব করেছেন, প্রজাদের সঙ্গে নিছক প্রভু-ভৃত্য-সম্বন্ধ বজায় রেখে চলেছেন, বিয়ে করেছেন ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ রাজ-কন্যাদের—রূপে তাঁরা নিরুপমা। তার পর এলো মানুষের সভ্যতার প্রথম শত্রু—ফরাসী বিদ্রোহ। উন্মত্ত, বর্ব্বর জনসংঘ গিলোটিনের নীচে—শুধু ষোড়শ

লুইকে নয়, মানুষের শত-শতাব্দীর দুরূহ সাধনা-লব্ধ সৌন্দর্য্য-চর্চ্চাকে জবাই কর্‌লে। ওরা মাটির রাজত্ব কেড়ে নিলো, কিন্তু সাত-শো বছর ধরে' আলোকে সঙ্গীতে সৌন্দর্য্যে আনন্দে বিলাসিতায় যে-মন বেড়ে উঠেছে, তা'র প্রসার খর্ব্ব কর্‌বে কে? তাই সেই নায়ক গ্রহণ কর্‌লেন নির্ব্বাসন; রাজধানী থেকে বহুদূরে নিবিড় অরণ্যের মধ্যে এক ধ্বংসোন্মুখ প্রাসাদ, সেইখেনে আবদ্ধ হ'য়ে উৎসবের একটি রাত্রির মত দীর্ঘ জীবন কাটিয়ে দিলেন—মদের আর গানের নেশায়। সীতাপতি চৌধুরীর মনও সেই ধাতের—বহুমূল্য বিদেশী ফুলের মত কাঁচের ঘেরা টোপ্‌-দেয়া বাগানের ভেতর সেই মনকে অতি যত্নে লালন কর্‌তে হয়, তা'র স্পর্শ-অসহিষ্ণু সুকোমলতা তা'কে পরমদুর্লভ করেছে। আজকালকার দিনে আর এমন মেয়ে নেই, ভাই, যে সত্যিসত্যি ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়, এমন পুরুষ নেই যে দুই পদক্ষেপে স্বর্গ-মর্ত্ত্য অধিকার করে' তৃতীয় পা ফেল্‌বার যায়গা পায় না। রাস্তা থেকে শিলাবৃষ্টির হাওয়া দিচ্চে;—মহার্ঘ ক্রিসেন্‌থিমাম্‌-এর দরকার নেই আর; আমরা সব গাঁদা-ফুল বনে' গেছি;—ঝড়-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্মের যত উৎপাতই হোক্‌, অনাবশ্যক প্রাচুর্য্যে আমরা ফুটে' উঠ্‌বোই।

এতক্ষণে একেবারে অন্ধকার হ'য়ে গেছে, ভাই;—বেহারা কখন্‌ এসে যে লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে, টের পাই নি। ঘরের পক্ষে আলো যথেষ্ট নয়; দরজার কোণে, ভেল্‌ভেট্‌ এর ভারি পর্দ্দার আনাচে-কানাচে, হাল্কা নীল রঙে ছোপানো দেয়ালের গায়ে-গায়ে ভূতের মত অস্পষ্ট, অদ্ভুত সব ছায়ামূর্ত্তি এই ঝাপ্‌সা হল্‌দে আলোয় লুকোচুরি কর্‌ছে। ঘরের 'সীলিং' অনেক উঁচুতে—এই দুর্ব্বল আলো সেখানে যেতে-যেতে হাঁপিয়ে পড়ে, সেখানে তাকালে মেঘ-মলিন আকাশেরই এক টুকরো দেখ্‌ছি বলে' ভুল হয়। ঘরের মধ্যে একমাত্র উজ্জ্বল জিনিস হচ্ছে মেঝের গালিচাখানা—সূর্য্যাস্তের মত ঘোলা লাল। রঙচঙে খেলো বিলিতি কার্পেট্‌ নয়, পারস্যের বিখ্যাত গালিচা—পাথরের মত ভারি, অথচ মাখনের মত নরম। দিল্লীর নবাবের বেগমরা তাঁদের পদ্ম-কলির মত পায়ের পাতা এই-সব জিনিষের ওপর ফেল্‌তেন। না—তা'র চেয়েও উজ্জ্বল জিনিষ এ-ঘরে আছে; সে আমি। আমি যেখানে বসে' আছি, তা'র উল্টো দিকের দেয়ালে এক জোড়া দীর্ঘ আয়না;—লেখ্‌বার ফাঁকে-ফাঁকে নিজকে তা'দের মধ্যে দেখে নিচ্ছি। এই ঘরের নিষ্প্রভ ম্লানতার মধ্যে আমাকে রোদের মুখে জ্বলে'-ওঠা তরবারির মত স্বচ্ছ ও তীক্ষ্ণ দেখাচ্ছে;—খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাক্‌লে মনে হয়, আয়না যেন ফেটে পড়্‌বে। এই মৃদু আবছায়ায় আবৃত হ'য়ে ঝাড়-লণ্ঠনের নীচে বসে' এ-কথাই ভাবা সহজ যে আমি রাজকন্যা।

বাড়িটার বিশেষত্বই এই। তা'তে ঢুক্‌লেই মনে হ'বে চির গোধূলির রাজ্যে প্রবেশ কর্‌লাম। দিনের বেলাতেও ঘরগুলো ছায়া-ঢাকা, রঙের ও রেখার কোমলতায় শান্ত ও শীতল। সেখানে রোদের আস্‌তে বারণ; রাশি রাশি পর্দ্দাকে ফাঁকি দেয়ার জো নেই, সূর্য্যদেব কোনো ফাঁক দিয়ে যদি চুপি-চুপি দু'একটি ক্ষীণ রেখা পাঠিয়ে দিতে পারেন তো ঢের! ফলে, কোনো মন্দির বা গির্জ্জার অভ্যন্তরের মত এই ঘরগুলোরও আবহাওয়ায় এমন একটি অপূর্ব্ব শুচিতা, ও মেজাজে এমন চির-প্রসন্নতা আছে যে কিছুকাল এখানে বস-বাস কর্‌লে যে-কোনো লোকের ইন্দ্রিয়বৃত্তি কবি-তুল্য মার্জ্জিত সূক্ষ্মতা লাভ কর্‌তে পারে।

বিরাট বনস্পতির মত অটুট, অক্ষয় ও মহান্‌ এই বাড়ি; দূর থেকে প্রথম দেখেই এর গাঢ় ধূসর রঙ্‌ আর বলশালী দৃঢ়তার সুন্দর রুক্ষতা আমার ভালো লেগেছিলো। এর চারদিকে যদি খাল থাক্‌তো, আর তা'র ওপর টানা-সেতু, আর সেই সেতুর ওপর যদি সারাদিন অশ্বখুরধ্বনি শুন্‌তে পেতাম, তবেই যেন স্বাভাবিক হ'ত। এই অভাবটুকু আমাকে নিজের কল্পনা দিয়ে পূরণ করে' নিতে হচ্ছে, এবং সেই সঙ্গে আরো-একটা অভাব, সেই মানুষের অভাব, যা'কে দেখে আমার সমস্ত মন-প্রাণ একসঙ্গে কথা কয়ে' উঠ্‌বে; 'সে যে আমি, সেই আমি।"

রবীন্দ্রনাথ একেবারে আমাদের মাথা খেয়েছেন—না রে? ইতি—

তোর লীনা।

সোনারঙ্‌

২২শে বৈশাখ

ছি-ছি—তুই নীলা, তুই? তোর মনে এ-পাপই ছিলো তো আমায় আগে বলিস্‌নি কেন? আমার কাছে লুকোবার মত দুর্ম্মতিও তোর হ'ল!

কেন যে তুই আমার কাছ থেকে ব্যাপারটা আগাগোড়া গোপন করে' গেছিস্, তা-ও আমি জানি। আমি যদি এর একটু আভাসও পেতাম, তবে এই দুর্গতির পাঁক থেকে তোকে ছিনিয়ে তুলে' আন্‌তামই, কোনো লজ্জা বা ভয় আমাকে আড়ষ্ট কর্‌তো না। তোর চিঠি পাবার আগের মুহূর্ত্তেই কেউ যদি আমাকে এসে বল্‌তো 'নীলা বিয়ে কর্‌ছে', আমি তা'র মুখের ওপর হো-হো করে' হেসে উঠ্‌তাম। এত দেরি করে' জানালি! তা'র ওপর, কল্‌কাতার বাইরে আছি, আমার অনুপস্থিতি তুই এমন হীন প্রয়োজনে ব্যবহার কর্‌বি জান্‌লে—তা হ'লে সোনা-রঙের সকল সৌন্দর্য্য আমি না-হয় উপভোগ না ক'রেই মর্‌তাম, কিন্তু তোকে তো অকালমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পার্‌তাম!

সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে আমাকে তুই কেমন করে' ফাঁকি দিলি! তোর মধ্যে কখনো এমন-কিছু তো লক্ষ্য করি নি, যা'তে তোর সম্বন্ধে কোনো গুরুতর সন্দেহের উদয় হ'তে পারে! কিন্তু এতে আশ্চর্য্যই বা কী আছে? তুই কর্‌ছিস্ ব্যবসাদারি বিয়ে; বেণেরা যেমন সাত পাঁচ, আগু-পিছু, ডান্-বাঁ ভেবে-চিন্তে, সাড়ে-উনিশ জনের পরামর্শ নিয়ে চা-বাগানের শেয়ার না কিনে' রেঙ্গুন্ থেকে সেগুন-কাঠের চালান আনিয়ে তিনগুণ লাভের আশায় বসে' থাকে, তুইও তেম্‌নি দীর্ঘকাল চিন্তার পর কিনা বিয়ে-করাই ঠিক কর্‌লি! কারণ বিয়ে-করা নিরাপদ—জোলা বলেন, যুবতী স্ত্রীলোকের পক্ষে নানা দিক থেকেই নিরাপদ। জীবনের উচ্ছলিত গঙ্গায় যৌবনের প্রবল বাতাসের মুখে কল্পনার রঙীন পাল তুলে' দিয়ে আমরা দু'জন একসঙ্গে নাও ভাসিয়েছিলাম, তুই যে এত শীগ্‌গিরই ক্লান্ত হ'য়ে বন্দরের আশ্রয় খুঁজ্‌বি, তা ভাবি নি। এত তাড়ার কারণ কি? পাছে আইবুড়ো মর্‌তে হয়, এই ভয় নয় তো? না, জোলা-উল্লিখিত অন্য কোনো কারণে তোর সবুর সইলো না?

তোকে এই কথা লিখ্‌তে ঘৃণায় আমার নিজেরি গা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ছে। তোর সম্বন্ধে আমার এ-কথা ভাব্‌তে হচ্ছে! তা'র আগে সারা পৃথিবী কেন রসাতলে তলিয়ে গেলো না?

মুরারি বাবুর আমি অসম্মান কর্‌ছি নে। তিনি সুদর্শন ও অমায়িক;—তাঁর স্ত্রীত্বে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে তোর দৈহিক কোনো বিলাসিতারই হানি হ'বে না। কিন্তু তোর মন? তুই কি আমায় সত্যি করে' বল্‌তে পার্‌বি যে সেই ভদ্রলোকের সংস্পর্শে আসা মাত্র বিদ্যুৎ-বিদারণের মত অসহ্য আনন্দে তোর মনের আকাশ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠেছিলো? তা-ই যদি হ'বে, তবে তোর মুখের দিকে তাকাতে আমার চোখ কি ঝল্‌সে যেতো না? তা হ'লে সেই মুহূর্ত্তে পৃথিবী তোর কাছে নতুন করে' জন্ম নিতো;—প্রথম সূর্য্যোদয়ের অপূর্ব্ব জ্যোতির্লেখা হ'ত তোর গাত্রবাস। নিজের চেয়ে যে-প্রেম বড়, তা'কেও কি গোপন করা সম্ভব? তন্দ্রার জড়িমায় আচ্ছন্ন হ'য়ে মন্থর গতিতে দিনের পর দিন কেটে যায়—সুখ-দুঃখের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী এঁকে-এঁকে, লাভ-ক্ষতির হিসেব করে'-করে'। তারপর একদিন হয় প্রেমের আকস্মিক আবির্ভাব; টুক্‌রো-টুক্‌রো শান্তি দিয়ে মনের জন্যে যে-নীড় গড়েছিলাম, চক্ষের পলকে তা ছিঁড়ে' উড়ে' উনপঞ্চাশ বায়ুতে মিলিয়ে যায়, সমগ্র সত্তা সমুদ্র-মন্থনের মত দুঃসহ বেদনার আলোড়নে জেগে ওঠে, আত্মায় আগুন ধরে' যায়, তা'র দীপ্তি সর্ব্বাঙ্গে উচ্ছলিত হ'য়ে ঝরে' পড়ে;—দান্তের মত সকলকেই বলে' উঠ্‌তে হয়: 'সেই দেবতার দেখা পেলাম, যিনি আমার চেয়ে বলশালী; যিনি এসে আমার ওপর সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার কর্‌বেন।'

সেই দেবতার দেখা তুই পাস্ নি; সেই তীব্র দীপ্তিতে জ্বলে' উঠ্‌তে তোকে দেখি নি। আমাকে ক্ষমা করিস্ নীলা, কিন্তু তোদের এ-বিয়েতে আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌তে পার্‌লাম না।

আর যা-ই করিস্, দয়া করে' প্রত্যুত্তরে সংসার ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আমাকে সারগর্ভ উপদেশ দিতে বসিস্ না। সে-গুলো আমি জানি। এবং এ-ও মানি যে পাত্রবিশেষে তা'র সার্থকতা আছে। কিন্তু জানিস্ তো, সকলের জন্য সব কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু আমরা যেন আমাদের সাধ্যানুযায়ী মহত্তম কর্ত্তব্যকেই অবলম্বন করি, বিধাতা আমাদের দিয়ে এ-ই চান্। ধর্, রবীন্দ্রনাথ যদি অধ্যাপক হ'তেন, তা হ'লে খুব উচ্চ শ্রেণীর অধ্যাপকই হ'তেন—হয়-তো বাঙ্‌লা দেশের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক বলে' তাঁর নাম থেকে যেতো, কিন্তু পৃথিবীর পক্ষে সেটা কি খুব শুভ ঘটনা হ'ত? সংসার-ধর্ম্ম যেমন, অধ্যাপনাও তো তেম্‌নি একটা গুরুতর কর্ত্তব্য। কিন্তু বিধাতা যাঁকে বড় কবি হ'বার মাল-মশ্‌লা দিয়ে

পাঠালেন, তিনি যত ভালো অধ্যাপকই হোন্ না কেন, কর্ত্তব্য তাঁর সম্পন্ন হ'ল না ; যতদিন পর্য্যন্ত তিনি তাঁর কবিত্বশক্তির পরিপূর্ণতম ব্যবহার না কর্‌ছেন ততদিন তাঁর জীবন ব্যর্থই রয়ে' গেলো।

তুই কি স্বপ্নেও ভেবেছিস্, নীলা, যে বিধাতা তোর এ আচরণ ক্ষমা কর্‌বেন ? আমার সাম্‌নে এই কাগজের টুক্‌রোর মত স্পষ্ট করে' দেখ্‌তে পাচ্ছি যে নিজহাতে তুই তোর জীবনের সব চেয়ে বড় সর্ব্বনাশ কর্‌লি ! 'মাটি কাটি' যে-কোহিনুর লাভ করা যায়, তা দিয়ে কাগজ-চাপার কাজ দিব্যি চলে ; কিন্তু কাগজ চাপার ব্রতে কোহিনুর যদি তা'র জীবন উৎসর্গ করে তো তুই কি তা'কে প্রশংসা কর্‌বি ? তোকে দিয়ে বিবাহিত জীবনের সকল দায়িত্ব উৎকৃষ্ট রূপে সম্পন্ন হ'তে পারে—তা আমি অস্বীকার কর্‌ছিনে ; কিন্তু সাধারণ স্ত্রীত্ব ও মাতৃত্বের চেয়ে অনেক বড় ও সুন্দরতরো কর্ত্তব্যের উপযুক্ত তুই ;—তুই মহামূল্য বিরলজ্যোতি হীরকখণ্ড ; কাগজ-চাপাদের দলে ফার্স্‌ট্ ক্লাস্ ফার্স্‌ট্ হ'লেও নিজকে তুই অপমান বই কিছু কর্‌লি নে।

ছাখ্, কাঁশার গেলাশে অমৃত-পান করা চলে না, তা'র জন্ম চাই লক্ষদ্যুতি স্বচ্ছগাত্র স্ফটিক-ভাণ্ড। তেম্‌নি বড় প্রেম অনুভব কর্‌বার যোগ্যতা সকলের থাকে না ; সে সৌভাগ্য যা'দের হ'বে, বিধাতা তা'দের প্রকৃতিকে দুর্লভ ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ করে' দেন ; নিথর বায়ুমণ্ডলে অগ্নিময় পক্ষসঞ্চালন করে' তিনি যেখানে অবতরণ কর্‌বেন, সেই হৃদয়ের তাঁকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা কর্‌বার মত সৌন্দর্য্য ও প্রসার চাই ;—তা কি সকলের থাকে, ভাই ? যা'দের তা নেই, তা'দের জীবনে কোনো সংঘাতেরও স্থান নেই ; তা'রা বিয়ে করুক্, ঘর-সংসার দেখুক্, মোটর-চাপা পড়ার জন্ম জীবসৃষ্টি করুক্, তা'দের জন্ম কেউ যেন কোনো দুর্ভাবনা না করে। কিন্তু তুই যে আলাদা জাতের লোক ; সেই মহান্ অতিথি হয় তো একদিন তোর দুয়ারে আস্‌তেন, 'যিনি তোর চেয়ে বলশালী'। কেন তুই তাঁর জন্মে অপেক্ষা কর্‌লি না ?

তুই তো জানিস্, সে-অতিথির পদক্ষেপে আমার হৃদয়াঙ্গন এখনো মুখরিত হ'য়ে ওঠে নি ; কিন্তু যেদিন থেকে বুঝ্‌তে শিখেছি, সেইদিন থেকে তাঁর আগমনের জন্ম নিজকে প্রস্তুত করা ভিন্ন আমি অন্য-কোনো কর্ত্তব্য জানি নি। তিনি যখন আমাতে অবতীর্ণ হ'বেন, কোনো দিক দিয়েই যেন হতাশ না হন্, সেই জন্ম আমাকে দেহে ও মনে, বাক্যে, বুদ্ধিতে ও আচরণে অপরূপ সুন্দর হওয়া দর্‌কার। আমার সেই তপস্যায় তোকে পেয়েছিলাম সঙ্গী। তুই আমাকে মুগ্ধ করেছিলি ; তার পর যেদিন তুই আমার হাতের ওপর পায়রার বুকের মত নরম তোর হাতখানা এনে রাখ্‌লি, ভাব্‌লাম, দেবতা প্রসন্ন হ'লেন—আমার সাধনার প্রথম সিদ্ধি-রূপে লাভ কর্‌লাম তোকে।

দু'টি বটগাছের চারা পাশাপাশি রোপণ কর্‌লে, তা'রা বেড়ে ওঠ্‌বার সঙ্গে-সঙ্গে তা'দের ডালে ডালে, পাতায়-পাতায় যেমন অবিচ্ছেদ্য কোলাকুলি হ'তে থাকে—তেম্‌নি এই ছ' বছর ধরে' তুই আর আমি পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় অন্তরঙ্গতায় জড়িত হ'য়ে বড় হ'য়ে উঠেছি। আকাশেতে বাষ্পকণা আর সূর্য্যালোক দুই ই তো থাকে, কিন্তু দু'য়ের যখন মিলন হয় তখনই দেখা দেয় ইন্দ্রধনু। তুই আর আমি মিলে' সেই মনোহরণ ইন্দ্রধনু সৃষ্টি করেছিলাম ;—তা'রি অন্তরালে ছিলো আমাদের মনের সীমাহীন রাজত্ব—এক মুঠো নীল কাপড়ের মত কূলহীন, ক্ষয়হীন, মৃত্যুহীন আকাশ।

আমাদের এই বন্ধুতাই কি এবারের এ জন্মের পক্ষে যথেষ্ট ছিলো না, নীলা ? আমরা দু'জন না হয় চিরন্তন নেপথ্যে জীবন কাটিয়ে দিতাম—না-হয় চল্‌তো শুধু আয়োজন, শুধু সজ্জা—রঙ্গমঞ্চে নায়িকাদের আবির্ভাব না হয় না-ই হ'ত ! যা'কে আমরা বাস্তব বলি, সেখানে যদি শাদা খাতায় ধুলো জমে' ওঠে তো উঠুক ; আমাদের মনের যিনি কবি, তিনি তো নদীর জলে ভাঙা চাঁদের টুক্‌রোর মত শত-শত গীতি-কবিতার জাল বুনে' যাচ্ছিলেন ! সেই জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আস্‌বার কি প্রয়োজন ছিলো তোর ? হৃদয়ের রক্তে যাঁকে অনুভব করেছিস্, একদিন তাঁকে প্রত্যক্ষ কর্‌বিই, এইটুকু আশা কর্‌বার সাহস তোর হ'ল না ? আশা পরিপূর্ণ না হ'লেই যে তা ব্যর্থ হ'য়ে যায়, এমন তো নয়। কেরোসিন্ লণ্ঠনের অতি সত্য বাস্তবের চাইতে সূর্য্যোদয়ের অন্তহীন প্রতীক্ষাই কি বরেণ্য নয় ? সূর্য্য যদি কখনো দেখা না ও দেন্, তবু সেই ব্যর্থতা নেপোলিয়ন্-এর জীবনের ব্যর্থতার মতই মহান্। এই ব্যর্থতার মূল্য তুই দিতে পার্‌বি নে, এ আমি আশা করি নি।

কল্‌কাতায় আমি যত ছেলের সঙ্গে মিশেছি, তা'দের

অনেকের চোখের দৃষ্টিই আমার কাছে অনেক অনুক্ত কাহিনী উদ্ঘাটন করেছে। রূপে ও বিদ্যায়, বংশ-গৌরবে ও পদমর্য্যাদায় তা'রা নিকৃষ্ট নয়। কিন্তু আমার সব সময় মনে হয়েছে কোথায় যেন কি অভাব রয়ে' গেছে, আমাকে দেখাবার জন্যে এরা একটি বিশেষ ভঙ্গী অর্জ্জন করেছে; সেই ভঙ্গীটিই মনোরম, আদৎ লোকটি নয়। এরা যা'কেই বিয়ে করুক্, বিয়ের পর সেই ভঙ্গীটি যা'বে খসে', এবং তখন হরিমতির স্বামী আর তা'দের মধ্যে বিশেষ-কোনো পার্থক্য থাকবে না।

তোর মত আমি কোনো ভুল করবো না। স্বর্গে যাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হ'য়ে গেছে, পৃথিবীতে তা'র দেখা পাওয়া মাত্র আমি চিনে' নিতে পারবো। এক-এক সময় ইচ্ছে করে, মাদ্‌মোয়াজেল্ মোপ্যাঁর মত ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়ি—তাঁর অন্বেষণে। কিন্তু মন করে বারণ। ফুলের বুকে গন্ধের মত যাঁর অনুভূতি সমস্ত অন্তরাত্মা জুড়ে আছে, বাইরে তাঁকে কোথায় খুঁজবো? শুভলগ্ন যেদিন আসবে, দুয়ারে করাঘাত পড়বেই—বিজয়ী রাজার মত এসে তিনি আমাকে অধিকার ক'রবেন। আর, যদি তিনি নাই আসেন—নাই বা এলেন! তবু তাঁর প্রতীক্ষায় মুহূর্ত্ত জপ করে' আমরণ আমি জেগে বসে' রইবো—তুই দেখিস্।

তোর পূর্ব্বজন্মের বন্ধু
লীনা

— নং বীডন্ স্ট্রীট্,
কলিকাতা
১৮ই জ্যৈষ্ঠ

চির-প্রিয়তমা লীনা,

ওপরের ঠিকানা দেখেই বুঝবি যে ইতিমধ্যে গোত্রের সঙ্গে-সঙ্গে আমার গৃহও বদল হ'য়ে গেছে। এবং সেই জন্যই তোকে চিঠি লিখতে এত দেরি হ'ল। তামাসা মন্দ হ'ল না, কিন্তু তোকে নেমন্তন্ন করলেও তো তুই আসতিস্ না!

প্রথমেই তোকে জানানো দরকার যে বিয়ে করে' আমি মোটেও অসুখী হই নি। আমি জানি, সুখের নামে তুই নাসিকা কুঞ্চিত করবি। তোর মতে ও জিনিষটা পশুদের উপভোগ্য। কিন্তু সত্যি কি তাই, ভাই? কল্পনার আগুনের মেঘ তোকে ঘিরে' আছে বলে' শান্তদীপালোকিত গৃহকোণের স্নিগ্ধ মাধুর্য্য তোর চোখেই পড়লো না। সেখানে উন্মাদনা না থাক্, শান্তি তো আছে; উচ্ছলতা না থাক্, অস্বাস্থ্যও নেই। প্রতিদিন-কার সুখদুঃখের অজস্র রেখা-সম্পাত এই গৃহকে বিচিত্র করেছে; স্বর্গের অনিন্দ্য জ্যোতি সেখানে পড়ে না, কিন্তু এই পৃথিবীরই ফসলের ক্ষেত থেকে, গোধূলির আকাশ থেকে সোনার আলো সেখানে ঝরে' পড়ে,—অতসীর হাসির মত তা চির-পরিচিত হ'লেও চির-সুন্দর।

বিয়ে-করার জন্য কারো কাছে কোনো অপরাধ করেছি বলে' যদি আমার মনে হ'য়ে থাকে, সে তোরই কাছে। কিন্তু আমি তো যেমন ছিলাম, তেমনিই আছি, তেমনিই থাকবো। পরিবর্ত্তন যা-কিছু হয়েছে বা হ'বে, তা এত বাহ্যিক ও এত সামান্য যে সেই উপলক্ষ্যেই যদি তোর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হ'তে হয়, তবে স্বামী একদিন গোঁফ কামিয়ে বাড়ি এলে স্ত্রীর উচিত তা'কে চিনতে না পারা। তুই যেটাকে প্রকাণ্ডতম সর্ব্বনাশ বলে' ভাবছিস্, তা'র চেয়েও বড় সর্ব্বনাশ আমার হ'তে পারতো—বসন্ত হ'য়ে আমার মুখ কুৎসিত হ'য়ে যেতে পারতো। কিন্তু সেই আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে কি আমি তোর কাছ থেকে একটুও দূরে সরে' যেতাম? এই ঘটনাটাকেই বা অত বেশি প্রাধান্য দিচ্ছিস্ কেন? তোর বন্ধু এখনো তোর—সর্ব্বান্তঃকরণে তোর, চিরকাল তোর।

তুই যদি আমার অবস্থাটা একটু পরিষ্কার করে' ভেবে দেখতিস্ তবে তোর চিঠির উগ্রতা নিশ্চয়ই অনেক কমে' আসতো। এ-কথা তুই ভুলে' গিয়েছিলি যে তোর মত মা বাবার আশ্রয় আমার নেই; পরিজন বলতে আমার এক মামা, তা তিনিই বা কতকাল আমার ভার বইবেন? বি-এ পাশ-করার পর আমার পক্ষে দু'টি পথ খোলা ছিলো—ইস্কুলটিচারি আর বিয়ে। দুই-ই সমান। জলের কুমীরকে এড়িয়ে ডাঙার বাঘের মুখেই যদি আত্ম-সমর্পণ করে' থাকি তো এমন কি অপরাধ করেছি, বল্?

অবিশ্যি বিয়েটা তেমন-কিছু ভয়ঙ্কর ব্যাপারও নয়। সত্যি ভাই, হাওয়ায় উড়তে-উড়তে আমার ডানা বুজে' এসেছিলো; একদিন সুদূরস্পর্শী ভবিষ্যতের বন্ধ্যা অনিশ্চয়তার দিকে তাকিয়ে ক্লান্তিতে আমার দুই চোখ আচ্ছন্ন হ'য়ে এলো, ব্যাকুলভাবে হাত বাড়াতে প্রথম যাঁর

হাতের সঙ্গে হাত ঠেক্‌লো, তিনিই মুরারি বাবু। ভাব্‌লাম, মুরারি বাবু হ'লেই বা দোষ কি ?

এখন ভেবে দেখ্‌ছি, মোটের ওপর ভালোই করেছি। মুরারি বাবুকে ভালোবাস্‌তে না পারি, তাঁর প্রতি মধুর মমতা জন্মেছে—এবং এই মমতাই হয়-তো কোনোকালে আমাকে প্রেমের অমরাবতীতে পৌঁছিয়ে দেবে। তিনি আমাকে ভালোবাস্‌তে না পেরে থাকেন, অপরিসীম স্নেহ করেন - এবং মা-কে হারিয়েছি পর থেকে এই স্নেহ জিনিষটির ওপর আমার লোভ সব চেয়ে বেশি। তা-ই পেয়ে আমি তৃপ্ত। সে-প্রেম আমাদের মধ্যে নেই, যা'তে প্রিয়র পায়ের শব্দ শুন্‌লে বুক টিপ্‌টিপ্ করে' ওঠে, তা'র একটুখানি হাতের লেখা দেখলে শরীরের সমস্ত রক্ত উঠে' আসে মুখে। এখানে প্রবল আবেগ-ঝঙ্কার, দুরন্ত মাতামাতি নেই; এখানকার কুঞ্জ-কুটীরে মৃদু মমতার কোমল-মলয়-সমীরের নিত্য-সঞ্চালন। মুরারি বাবু লোক ভালো; শিষ্টতায় মিষ্ট-আচরণে বিনয়-বচনে তিনি বাস্তবিক ভদ্রলোক-আখ্যার উপযুক্ত। তাঁর প্রকৃতি কুয়োর জলের মত; কালভেদে উষ্ণতা ও শৈত্য দুই-ই তা'র গুণ। চাকর-বাকরদের আদেশ কর্‌বার সময় তাঁর কণ্ঠস্বরে রুক্ষতা আসে না, এবং নাটুকেপণা না করে'ও তিনি স্নেহশীল হ'তে জানেন। এই ধরণের লোকের সঙ্গে তাল রেখে চলা খুব সহজ, স্বীয় ব্যক্তিত্বের লেশমাত্র হানি না করে'ও তাঁর সঙ্গে নিজকে খাপ খাইয়ে নে'য়া যায়। এইভাবে জীবন তো বয়ে' চলুক্;— স্বপ্ন যদি কিছু থেকে থাকে, সে তো আমার আছেই।

শুনে' খুসি হ'বি, এ-বাড়িতে একটা পিয়ানো আছে। মুরারি বাবু শুধু যে বাজাতে জানেন তা নয়, ইয়োরোপীয় সঙ্গীত-সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানও প্রখর। তা ছাড়া, লাইব্রেরি-ঘরে ঢের বই আছে, এবং তা'র বেশির ভাগই কবিতা। এবং সেই বইগুলির পৃষ্ঠা ময়লা।

আমার সম্বন্ধে যা-কিছু জান্‌বার মত, তা তোকে জানালাম তোর এই এক মাসের সব খবর জান্‌তে উৎসুক,

নীলা

সোনারঙ্

নীলরাণী, ২০শে জ্যৈষ্ঠ

সর্ব্বগুণসম্পন্না বন্ধু আমার—দোষের মধ্যে শুধু এই যে তোর চিঠিগুলো বড্ড ছোট হয়। এ-হিসেবে তুই একেবারে বৌদ্ধ; হিন্দুধর্ম্মের চমৎকার আড়ম্বর, বর্ণ ও ধ্বনির অপূর্ব্ব প্রাচুর্য্য তোর মধ্যে নেই; কথার ভেতর দিয়ে নিজকে তুই যতটা প্রকাশ করিস্, নীরবতার মধ্যে নিজকে আড়াল করিস্ তা'র চেয়ে বেশি। মনে করিস্ নি যে তোর বিবাহিত জীবনের আরো বৃত্তান্ত জান্‌তে আমার কৌতূহল হচ্ছে, কারণ সে-বিষয়ে এমন-কিছু তুই বল্‌তে পার্‌বি নে নিশ্চয়ই, যা আমি জানি নে বা ভাব্‌তে পারি নে। আর, যদি বা কিছু থাকে, তা তোর মুখেই শোনা যা'বে; চিঠির মস্ত একটা অসুবিধে এই যে পত্রলেখক প্রতিটি কথার সঙ্গে-সঙ্গে তদনুযায়ী মুখভঙ্গী খামে পুরে' পাঠাতে পারে না; কণ্ঠস্বরেই ওঠা-নামা কম্পন-বিকৃতি ইত্যাদি আছে, হাতের লেখার ও-সব বালাই নেই। মুখের চেহারা, গলার স্বর ও বক্তব্য বিষয়—এই তিনে মিলে' হয় গল্প-বলা; চিঠিতে গল্পটি আসে সেজে-গুজে ভদ্রলোক হ'য়ে, কিন্তু হারাই বলা-কে। প্রেমের কবিতা-পড়া ও প্রেমে-পড়ায় যেমন পার্থক্য, চিঠি ও মুখের কথাতেও তেম্‌নি। তোর মুখামৃত পান কর্‌বার জন্য না-হয় একদিন তোর বীডন্ স্ট্রীট্ এর বাড়িতেই যাওয়া যা'বে— কি বলিস্ ?

কারণ আমাদের শীগ্‌গিরই কল্‌কাতায় ফিরে' যাবার কথা হচ্ছে। পুজো অবধি এখানে থাক্‌বার কথা ছিলো— বাবা বল্‌ছিলেন, এই যখন শেষ, তখন দেখা-শোনা আলাপ-পরিচয় শুধু চোখ কানের নয়, মনেরও হোক্। কিন্তু ইতিমধ্যে খবর এলো যে এক মাম্‌লার তদ্বির কর্‌তে বাবার যেতে হ'বে বিলেত। মধ্য-প্রদেশের এক রাজার সম্প্রতি মৃত্যু হয়েছে; তাঁর ছেলে নেই; কাজেই সিংহাসনপ্রাপ্তি নিয়ে তাঁর অনুজ আর খুল্লতাতে ঘটছে বিরোধ। ব্যাপার জটিল;—পার্লিমেণ্ট এও এ-নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, এবং ইণ্ডিয়া-অফিসের পরামর্শ নিতে অনুজের পক্ষ হ'য়ে বাবা জুলাইর মাঝামাঝি পাড়ি দিচ্ছেন। তাই বড় জোর আর মাস-খানেক আমরা এখানে আছি।

ঐ যাঃ—আসল খবর দিতেই ভুলে' গেছি। বাবার সঙ্গে আমিও বিলেত যাচ্ছি। বাবা নিজে থেকেই বলেছেন। দিন তিন-চার আগে এক সকালবেলায় তিনি এসে আমার ঘরে উপস্থিত। বিশেষ-কোনো কাজের কথা না থাক্‌লে সকালবেলাতে তিনি বাড়ির কারু সঙ্গে দেখা করেন না; তাই জিজ্ঞেস্ কর্‌লাম, 'কি খবর, বাবা ?'
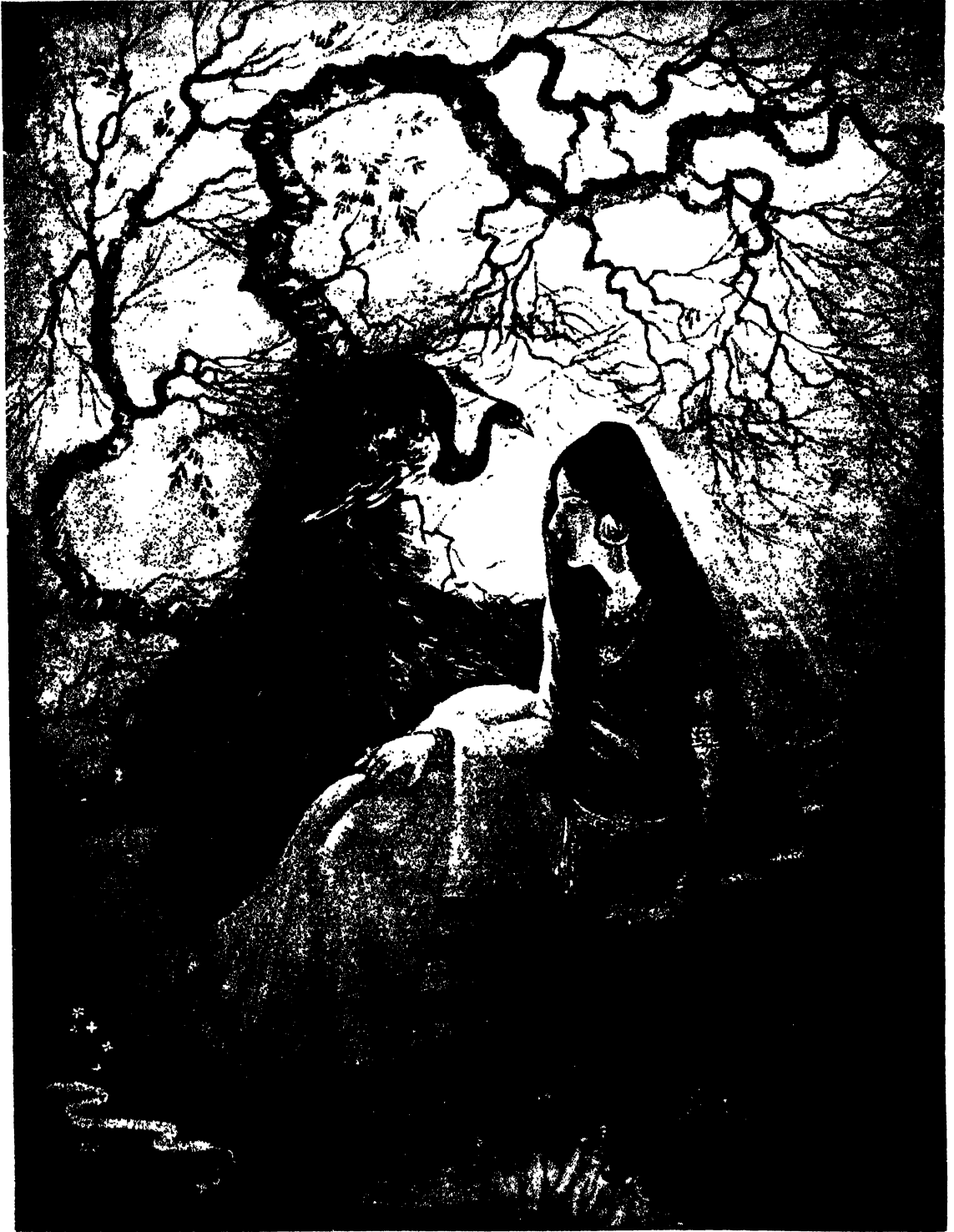
ব্যর্থ পূর্ণিমা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস

BHARATVARSHA HALFTONE & PRINTING WORKS CALCUTTA

প্রত্যুত্তরে বাবা তাঁর আসন্ন বিলেত-যাত্রার কথা বল্‌লেন। অবশ্য এই সংবাদের সঙ্গে আমার কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আবিষ্কার কর্‌তে না পেরে আমি বল্‌বার জন্য কথা খুঁজ্‌ছিলাম, এমন সময় তিনি আবার বল্‌লেন, 'তুইও আমার সঙ্গে চল্‌ না!'

তখন এ-ই ভেবেই আমার আশ্চর্য্য লাগলো যে এ কথা আমার মনে কেন আগে উদয় হয় নি? বল্‌লাম, 'বেশ তো। বোসো না।'

বাবা একটা নীচু কাউচ্‌-এর মাঝখানে বসে' পড়্‌লেন। আমি তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস্‌ কর্‌লাম, 'আমি যাবো? কেন?'

'প্রধানত বেড়াতে। গৌণত আমার সঙ্গী হ'য়ে। যে-উপলক্ষ্যে যাচ্ছি, তা'তে কাজ স্বল্প, অবসরই প্রচুর। তা ছাড়া, যাওয়া-আসার দেড় মাস একেবারে ফাঁকা। এবং সে-বয়েস এখন আর আমার নেই, যা'তে নতুন লোকের সঙ্গে চট্‌ করে' আলাপ করে' নে'য়া যায়। সে-প্রবৃত্তিও নেই। কাজেই তোকে নিতে চাচ্ছি। মাস তিনেকের ব্যাপার;—এ-ক'টা দিন তোর মা হায়দ্রাবাদে তাঁর ভায়ের কাছে বা কল্‌কাতায় আমাদের বাড়ীতে থাক্‌তে পারেন—যেমন তাঁর খুসি। আমার অভিপ্রায় এইটুকুই; তোর যদি আরো কোনো থাকে, আমায় জানাতে পারিস্‌।'

'আমার যাওয়াই যদি ঠিক হ'ল, তবে মাস-তিনেকের মধ্যেই ফিরে' আস্‌তে হ'বে, এমন-কোনো প্রয়োজন বা আকর্ষণ তো আমার দেশে নেই।'

বাবা হেসে বল্‌লেন, 'আচ্ছা বেশ, অক্‌স্‌ফার্ড-এ তা হ'লে তোর ভর্ত্তির ব্যবস্থা করি। সময়টাও ঠিক পড়েছে। না প্যারিস্‌?'

'বাবা, তুমি আমার মনের কথা কি করে' হুবহু বুঝ্‌তে পারো, বলো তো? আমি যে অক্‌স্‌ফার্ড্‌-এর কথাই ভাব্‌ছিলাম!'

এমন তময় গোলাপী এলো আমার কোকো-র পেয়ালা নিয়ে। জিজ্ঞেস্‌ কর্‌লাম, 'এক পেয়ালা খা'বে, বাবা?'

'আন্‌তে বল্‌।'

কোকো খেতে খেতে বাবার সঙ্গে অনেক বিষয়েই আলাপ হ'ল। বহুকাল কথা বলে' ও শুনে' অমন সুখ পাই নি। অমন প্রাণ-খোলা সরল, অথচ স্বচ্ছ ও পরিষ্কার কথা বাবার মুখেও কম শুনেছি। তিনি আমাকে যা বল্‌লেন, তা'র সারসঙ্কলন কর্‌লে মোটামুটি এইরকম দাঁড়ায়।

'দেখ্‌তে তো পাচ্ছিস্‌, মনুষ্যজাতি ক্রমেই অবনতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। তা'র কারণ শুধু এই যে মানুষে মানুষে প্রভেদ লোপ পেয়ে যাচ্ছে। রাজা ও প্রজায় আস্‌মান্‌-জমীন্‌ ফারাক্‌ আর নেই, সমাজপতিদের দিন গেছে, সমাজ-চালনায় আজকাল সবারি সমান দাবী। গৃহেও তেম্‌নি পিতা তা'র অবিসম্বাদিত কর্তৃত্ব হারিয়েছে। একজন বাদ্‌শাহকে ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্যের অধিকারী কর্‌বার জন্য জন-গণ আর পশুতুল্য জীবন যাপন কর্‌তে রাজি নয়;—সবাই মোটামুটি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ কর্‌বে, বর্ত্তমান যুগের এই হয়েছে লক্ষ্য। ফলে হয়েছে কি, উৎকৃষ্ট বলে কোনো জিনিষ আর থাক্‌ছে না—সবই মাঝারি। আশী টাকা তোলার আতর আজকালকার বাজারে বিকোয় না, কারণ তা কেন্‌বার মত সঙ্গতি কারুরই নেই; ন' আনা দামের অগুরুর খুব চল্‌—যা রাণী থেকে কেরাণী পর্য্যন্ত সবাই কিন্‌তে পারে।

'এই উৎকর্ষের অভাব দেখ্‌বি সবখানেই। পাঁচ টাকা দিয়ে বই কিনে' দু' দিন বসে' বিরাট উপন্যাস পড়্‌বার সময় ও সামর্থ্য নেই কারো; আট আনা পয়সা খরচ করে' দু'ঘণ্টায় সেই বইখানা ফিল্‌ম্‌-এ দেখে আস্‌বে। এমন দিন হয়-তো আস্‌বে, যখন কেউ আর বই লিখ্‌বে না; জনমণ্ডলীর শিক্ষা ও আমোদের ভার ন্যস্ত হ'বে ফিল্‌ম্‌-ওয়ালাদের ওপর; তাঁরা অবিশ্রান্ত খেলো রসিকতা আর শস্তা ন্যাকামির পসরা বহন করে' জনগণের সঘন করতালি লাভ কর্‌বেন। কবিতা পৃথিবী থেকে উঠে যা'বে, কারণ সবাই তা বোঝে না, গান আর ছবি একেবারে লুপ্ত হ'বে, কারণ ও-সব বোঝবার মত কান বা চোখ যাঁদের আছে, তাঁদের সংখ্যা হাজার করা একও নয়। সেই বৈচিত্র্যহীন জগতে মানুষের স্থূলতম প্রবৃত্তিগুলি ছাড়া সব যাবে মরে'; ফলে সব মানুষই এক রকম হ'য়ে যাবে—অর্থাৎ, মানুষে আর কলে খুব বেশি তফাৎ থাক্‌বে না।

'স্থূলভতার এই নব্য-তন্ত্রে আমাদের কোনো স্থান নেই—তোর আর আমার। আশা করি নিজের সম্বন্ধে তুই সম্পূর্ণ সচেতন। তোর রক্তের মধ্যে যে-শ্রেষ্ঠতার বীজ

আছে, এবং এতদিনকার শিক্ষা ও অনুশীলন যা'র বিকাশের সহায়তা করেছে, আশা করি তুই তার অমর্য্যাদা কর্‌বি নে। আত্ম-সমর্পণের একটা প্রবল মোহ আছে—সেটাও সুলভ। তোর পক্ষে তার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারা উচিত। বিশেষত আমাদের দেশে এ ভয় খুব বেশি। আমরা পরাধীন ও সেন্টিমেণ্ট্ল্ জাত; একটু কিছু হ'লেই 'জয় মা' বলে' বন্যায় গা ঢেলে দিতে পার্‌লেই আমরা খুসি। তুই আর আমি সব ক্ষণিকের উত্তেজনার ওপরে; জীবনে ও আচরণে, বুদ্ধিতে ও চিন্তায় আমরা মহার্ঘ সৌন্দর্য্যের উপাসক; বাঙলা দেশ আমাদের মনের মাতৃভূমি নয়, এবং দৈবাৎ আমরা দু' শতাব্দী পরে জন্মগ্রহণ করে ফেলেছি!'

বাবার কথা শেষ পর্য্যন্ত শুনে' আমি বল্‌লাম, 'বৃথাই আমাকে এত কথা বল্‌লে বাবা। বিয়ের চিন্তা এখনো আমার মন থেকে ঢের দূরে। এবং যদি কখনো সে-চিন্তার উদয় হয় তো যথাসময়ে তোমাকে তা জ্ঞাপন কর্‌তে ভুল্‌বো না।'

'সে আমি জানতাম। কিন্তু তুই যখন বিলেতে পড়্‌তে যাওয়া ঠিক কর্‌লি, তখন তোকে এ-কথা না বলেও পার্‌লাম না।—বুঝলি তো?'

'বুঝেছি বই কি। কিন্তু আজকাল যে বাঙালী ছেলেরাও মেম বিয়ে ক'রে' আসে না, বাবা!'

বাবা শুধু বল্‌লেন, 'বুদ্ধিমতী মেয়ে আমার!'

কাজেই দেখতে পাচ্ছিস্, জুলাইর মাঝামাঝি আমরা দেশ ছাড়ছি, তাই মাসখানেকের মধ্যেই কল্‌কাতায় ফেরা দরকার। জাহাজে ওঠবার আগে তোর সঙ্গে অল্প কয়েক দিনের জন্যে দেখা হবে, এবং সেই ক'টি দিনের প্রতি আমি উৎসুক হৃদয়ে তাকিয়ে আছি। তিন চার বছরের মত তোর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হ'বে এবার—ফিরে এসে তোর একেবারে গৃহলক্ষ্মীরূপ না দেখি, তা হ'লেই বাঁচি। এ ক'টা বছর আমি আর যা ই করি, হৃদয়বৃত্তি চর্চ্চা কর্‌বার অবকাশ পাবো না—যদি অবিশ্যি কোনো ইংরেজ ছোক্‌রার প্রেমে না পড়ে' যাই।

ঠিক ঐ কাজটিই যেন আমি না করি, বাবা সেদিন স্পষ্ট করে' তো এ-কথাই বলে গেলেন। আমার মনের কথা যদি জিজ্ঞেস্ করিস্ তো বল্‌তে পারি, সে-ভয় আদৌ নেই। জানি, তিনি সর্ব্বক্ষণ আমার কাছে-কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তবু তাঁকে দেখতে পাই নে কেন? আমরা দু'জন অন্ধকার রাত্রিতে মশাল হাতে নিয়ে অসংখ্য নর-নারীর মধ্যে পরস্পরকে খুঁজে বেড়াচ্ছি;—কতবার হয়-তো পরস্পরকে পাশ কাটিয়ে গিয়েছি, অন্ধকারে চিনতে পারি নি। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে মশালের আলোকে তাঁর মুখ তারার মত জ্বলে উঠবে, অম্‌নি সব সংশয় দূর হবে; সকল অন্বেষণের হ'বে পরিসমাপ্তি।

বাবা আমার ঘর থেকে চলে' যাওয়ার পর সেদিন অনেকক্ষণ চুপ করে' শুয়ে' ছিলাম, হঠাৎ কি মনে হ'ল, জানিস্? মনে হল, আর দেরি নেই—সে শুভ-মুহূর্ত্ত সমাগতপ্রায়, আমার এই বিলেত-যাত্রার প্রস্তাবনা যেন তা'রি দূত-রূপে এসেছে। এই যে আমি তিন-চার বছরের মত তাঁকে পাবার সম্ভাবনা অতিক্রম কর্‌তে উদ্যত হয়েছি—এত বিলম্ব কি তিনি সইবেন? কলম্বাস্-এর সেই অকস্মাৎ আবির্ভূত বিহঙ্গশ্রেণীর মত আমার এই প্রবাস-যাত্রার সঙ্কল্প যেন পরম-আকাঙ্ক্ষিত উপকূলের নিকটবর্ত্তিতা নির্দ্দেশ কর্‌ছে; নিজের তপোবলে তাঁকে আবিষ্কার কর্‌বার আনন্দ আমাকে দান কর্‌বেন বলে'ই সেই স্বয়ম্প্রকাশ আত্ম-গোপন করে' আছেন।

এখানকার এই নির্জ্জনতায় নিজকে বড় বেশি প্রাধান্য না দিয়ে উপায় নেই। এখানে আমিই আমার একমাত্র সঙ্গী। নিজের মনের এই-সব চঞ্চলতা নিয়ে বিলাস কর্‌তে-কর্‌তে সন্দেহ হয় যে আমি এদের প্রতি যতটা মূল্য আরোপ কর্‌ছি, সে মূল্য অন্য লোকেও দিতে প্রস্তুত কিনা। কল্‌কাতায় ফিরে যেতে ইচ্ছে কর্‌ছে; আমার মনের এই অস্পষ্টতম গতি-বিধিগুলো তুই একাই বুঝতে পার্‌তিস্। নিজের ওপর বিশ্বাস যখন টল্‌মল্ করে' উঠছে, তখন তোর চোখের প্রশান্ত নির্ম্মলতার দিকে তাকিয়ে হয়-তো আশ্বাস পেতাম। আকাশ আর পদ্মানদীকে নিয়ে দিন কাটাতে কাটাতে মন আমার হাঁপিয়ে উঠেছে।

এই কথা লিখ্‌তেই মনে পড়্‌লো যে কাল্‌কে বেশ মজার একটা ব্যাপার হ'য়ে গেছে। সকাল থেকেই হাওয়ার তাড়া খেয়ে আকাশে মেঘগুলো ছুটোছুটি করে' বেড়াচ্ছিলো। দুপুরটি ছিলো ছায়া-ঢাকা, স্নিগ্ধ। বৃষ্টি নেই, অথচ বাতাস বেশ জোরে বইছে। ধুসর আকাশ আর সজল বায়ুতে মিলে' মনের ওপর যে একটি কোমল আবেশের সঞ্চার

করে, তা কাটিয়ে ওঠ্‌বার জন্য আমি টমাস্ ব্রাউন্-এর 'রিলিগিয়ো মেডিচি' পড়্‌তে বস্‌লাম। কিন্তু প্রথম কয়েক লাইন্ পড়ার পর মন ও চোখ দুই-ই ক্লান্ত হ'য়ে এলো। দূর ছাই—বরঞ্চ বাইরে থেকে খানিকক্ষণ ঘুরে' আসি। আমাদের বড় দীঘিটার জল মেঘের ছায়ায় কালো হ'য়ে নিশ্চয়ই কূলে-কূলে টল্‌মল্ করে' উঠ্‌ছে!—বইখানা হাতে করে'ই বেরিয়ে পড়্‌লাম।

দীঘিটা আমাদের বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে। তিনটে বড়-বড় আঙিনা পেরিয়ে সুবৃহৎ দুর্গা-মণ্ডপ—বহু-কালের অব্যবহারে ম্লান। তার পর কয়েক ঘর মালী-বাড়ি—আমাদেরই রায়ৎ। সেই বাড়ি-গুলো পেরিয়ে খানিকটা ফাঁকা-জায়গা;—বিকেলে মালীর ছেলেরা ওখানে হা-ডু-ডু খেলে। তার পর দীঘি—মস্ত দীঘি, ওপারে পানের বরজ একটা,—এধারে বাঁধানো ঘাট। সারা গ্রামের পানীয় জল এই দীঘি থেকে সরবরাহ হয়। ঐ ঘাটে দাঁড়িয়ে পদ্মার রূপালি ঝিকিমিকি চোখে পড়ে। লোকে বলে, মাটির তলা দিয়ে পদ্মার সঙ্গে এই দীঘির গোপন যোগাযোগ আছে; তাই এর জল অত মিষ্টি।

সকাল-সন্ধ্যায় এই দীঘিতে লোক-চলাচলের অভাব হয় না; কিন্তু এই ভর-দুপুরবেলা চারদিক শূন্যতায় ঝাঁ-ঝাঁ করছে; এত নীরব যে চড়ুই পাখীদের ডানার ঝাপ্‌টানিও শুন্‌তে পাওয়া যায়। বাঁধানো ঘাটের নীচের দিকটার একটা সিঁড়িতে বসে' আমি হাতের বইখানা খুল্‌লাম।

হাওয়ার দাপটে দীঘির জল ছোট-ছোট ঢেউ তুলে' আমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়্‌ছিলো; তা'দের ছল্‌ছলানি শুন্‌তে-শুন্‌তে কি আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছিলাম, না আমার মন বইয়ের মধ্যেই ডুবে' গিয়েছিলো, তা এখন বল্‌তে পারবো না। কিন্তু হঠাৎ জলের মধ্যে ভয়ানক একটা তোলপাড়ের শব্দ শুনে' আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম। তাকিয়ে যা দেখ্‌লাম, তা এই:

আমি যেখানে বসেছিলাম, তা'র একটু দূরে একটা জামরুল-গাছ, তা'র কয়েকটা পত্র-ঘন শাখা সামনের দিকে ঝুঁকে' পড়ে' দীঘির জল-স্পর্শ করতে উদ্যত হয়েছে;—মাঝে-মাঝে দু'একটা শুকনো পাতা টুপ্‌টাপ্ করে' খসে' পড়ছে। সেই গাছের আড়ালে লুকিয়ে একটা লোক বসে' ছিপ্ দিয়ে মাছ ধরছে—এতক্ষণে আমার চোখে পড়্‌লো। এইমাত্র বোধ হয় বেশ বড় রকমের একটা মাছ টোপ্ গিলেছে। এদিকে লোকটা প্রায় মাটিতে শুয়ে' পড়ে' মাছটাকে ডাঙায় তুলে' আন্‌বার চেষ্টা করছে; ওদিকে আবার মাছটাও এই মর্ম্মান্তিক বন্ধন থেকে ছাড়া পাবার জন্য নিদারুণ ছট্‌ফটানি সুরু করে' দিয়েছে। তা'রি ফলে ঐ তোলপাড়।

আমি যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম, ততক্ষণে আমাদের মৎস্য-শীকারীর হয়েছে জয়; মস্ত একটা রুই মাছ ডাঙায় পড়ে' হাঁপাচ্ছে এবং লোকটা উবু হ'য়ে তা'র মুখ থেকে বঁড়্‌শির টোপটা খসাচ্ছে। মুহূর্ত্তে আমার অধিকার-বৃত্তি সজাগ হ'য়ে উঠ্‌লো; লোকটার কাছে এগিয়ে এসে আমি রুক্ষ-স্বরে বল্‌লাম, 'এই, তুমি এ দীঘি থেকে মাছ ধরছো যে বড়? জানো—'

কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে লোকটা আমার দিকে মুখ ফেরালো, এবং সঙ্গে-সঙ্গে আমি চুপ করে' যেতে বাধ্য হ'লাম। আশ্চর্য্য রকম বড় ও পরিষ্কার দুই চোখ মেলে সে একবার আমার দিকে তাকালো;—সে-দৃষ্টিতে তিরস্কারের তীব্রতা ও করুণা-ভিক্ষার নম্রতা দুই-ই দেখ্‌তে পেয়েছিলাম। তার পর চোখ নত করে' মৃদু মেঘ গর্জ্জনের মত গম্ভীর-কোমল স্বরে সে বল্‌লে, 'আমার মতন দুর্ভাগ্যকে অপমান করা আপনার সাজে না।' 'আপনার' কথাটির ওপর জোর দিয়ে বল্‌লে।

আমি একটু অপ্রস্তুতই হ'য়ে গেলাম। লোকটা ততক্ষণে ছিপটা সম্পূর্ণ খসিয়ে নিয়ে আবার বল্‌লে, 'এ-দীঘি আপনাদের, এ-মাছের ওপরও আপনারই অধিকার। আপনার যদি দরকার থাকে তো বলুন, নইলে মাছটাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দি।'

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, 'তা'র মানে?'

'আমি মাছ খাই নে।'

না জিজ্ঞেস্ করে' পারলাম না, 'তবে—তবে ধরেন কেন?'

'এম্‌নি। সময় কাটাতে।—আপনি তা হ'লে চান্ না মাছটা?' বলে' তিনি সেটাকে পা দিয়ে আস্তে একটু ঠেলে দিলেন। অর্দ্ধ-মৃত রুই গড়াতে-গড়াতে জলে গিয়ে পড়্‌লো। মাছটা পায়ের কাছে অগভীর জলে খানিকক্ষণ ছট্‌ফট্ করে' তলাকার সমস্ত কাদা ওপরে পাঠিয়ে দিলে; তার পর

যেই একবার গভীর জলের আশ্রয় পেলে, অম্‌নি সব গেলো শান্ত হ'য়ে।

ভদ্রলোকের আচরণে ও কথাবার্তায় আমি ক্রমাগতই আশ্চর্য্য হচ্ছিলাম, কিন্তু সব চেয়ে বড় বিস্ময় পেলাম তখন, যখন তিনি উঠে' দাঁড়ালেন। পুরুষ জাতকে যদি সুন্দর ও কুৎসিত এই দুই দলে বিভক্ত করতে হয়, তবে তাঁকে কুৎসিত না বলে' উপায় নেই। কিন্তু তিনি খর্ব্বাকৃতি হ'লেও ক্ষুদ্রদেহ নন্। প্রশস্ত, বলিষ্ঠ কাঁধের ওপর সিংহের মত প্রকাণ্ড, তেজ-ব্যঞ্জক মাথা; দীর্ঘ বাহুর কঠিন সরলতায় পৌরুষের রুক্ষতা, কিন্তু হাত দু'খানা নারী-সুলভ, মুখের চেয়ে তা'দের রঙ্ ফর্সা। পরিচ্ছন্ন নখগুলিতে রক্ত যেন ফেটে পড়্ছে।

সিংহের মত সেই মাথায় শিশুর মত স্বচ্ছ ও করুণ চোখ; আমার দিকে একবার পরিপূর্ণ দৃষ্টি ফেলে নত-মস্তকে যেন আমার কথা-বলার অপেক্ষা করতে লাগ্‌লেন। বল্‌লাম, 'এক মাসের ওপরে আমি এখানে আছি, কিন্তু আপনাকে কখনো দেখেছি বলে' তো মনে পড়্ছে না।'

'আমার এ অনিচ্ছাকৃত অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌বেন, কারণ আমি কাল মাত্র এখানে এসেছি।'

কথাটা আমার কানে ব্যঙ্গের মত শোনালে। হেসে বল্‌লাম, 'আপনার স্পর্দ্ধা আছে। আমার কথাটা অভিযোগ নয়।'

ভেবেছিলাম, আমার এ-কথা শুনে' ভদ্রলোক যা'বেন চটে,' কিন্তু চটা দূরে থাক্, তিনি তাঁর স্বভাবত মৃদু কণ্ঠস্বর আরো নামিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন, 'কাল এখানে এসেই শুন্‌লাম, আপনারা এসেছেন। আপনারা সমাজের শীর্ষতুল্য; আমার উচিত ছিলো কাল্‌কেই এসে আমার অভিবাদন জানিয়ে-যাওয়া, কিন্তু তিন দিন রেলে-জাহাজে কাটিয়ে আমি পথশ্রমে ক্লান্ত ছিলাম। আমার এই আপাত-অবহেলার জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।' বলে' ঈষন্নত মস্তক তিনি আরো অবনত কর্‌লেন।

মুখের এই অতিরিক্ত বিনয়ের অন্তরালে মনের যে-অসম্ভব অহঙ্কার প্রচ্ছন্ন ছিলো, তা আমার আত্মসম্মানে ঘা দিলে। অসহিষ্ণুভাবে বলে' উঠ্‌লাম, 'তা'র কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিলো না।'

বলে'ই দ্রুত পদক্ষেপে সেখান থেকে চলে' আস্‌ছিলাম, কিন্তু অল্প একটু যেতেই সেই ভদ্রলোক এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন। না থেমে বল্‌লাম, 'বলুন্।'

চল্‌তে-চল্‌তে তিনি বল্‌লেন, 'অপরাধ গ্রহণ করবেন না, কিন্তু আপনার হাতের বইখানা যদি একদিনের জন্য আমাকে ধার দেন্, তবে কাল্‌কে আর আমাকে আপনাদের দীঘিতে অনধিকার-চর্চ্চা করতে আস্‌তে হয় না।'

তাচ্ছিল্যভরে বল্‌লাম, 'কিন্তু ও তো গল্পের বই নয়!'

ভদ্রলোক উৎফুল্লস্বরে বল্‌লেন, 'না, নয়। কিন্তু গল্পের মত সুখপাঠ্য ও কবিতার মত ছন্দশীল। আপনার হাতে যে বইখানা দেখ্‌ছি, তা'র চেয়ে তাঁর 'Urn Burial' আরো চমৎকার। পড়েছেন নিশ্চয়ই?'

হঠাৎ থেমে গেলাম। তার পর ফিরে তাঁর মুখোমুখী হ'য়ে দাঁড়াতেই তাঁর মুখের এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষ্য কর্‌লাম। এইমাত্র যা উৎসাহে ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় উজ্জ্বল ছিলো, আমার দৃষ্টি তা'র ওপর পড়্তেই লজ্জায় ও আশঙ্কায় তা মলিন হ'য়ে এলো। বল্‌লাম, 'এই নিন্।'

বইখানা নেবার জন্য তিনি যে-হাতখানা বাড়ালেন, তা'র আঙুলের ডগাগুলো একটু-একটু কাঁপ্‌ছিলো। বইখানা তাঁর হাতে দিয়ে আমি আমার মধুরতম হাসি হেসে বল্‌লাম, 'আচ্ছা, নমস্কার।' বলে' দু'হাত একত্র করে' কপালে ঠেকালাম।

প্রতি নমস্কার করে' তিনি বল্‌লেন, 'আমার সৌভাগ্য!' কিন্তু ও দু'টি কথা তিনি যে-গাম্ভীর্য্যের সহিত উচ্চারণ কর্‌লেন, তা'তে আমার মনে হ'ল, তিনি ধ্বনিবহুল সংস্কৃত ভাষায় বল্‌লেন, 'কৃতার্থোঽহং দেবি!'

বাড়ি ফিরে' এসে মনে হ'ল যে ভদ্রলোকের সম্বন্ধে অনেক জরুরি কথাই জানা হয় নি। নাম জিজ্ঞেস্-করাটা অবিশ্যি আধুনিক আদব কায়দার অনুযায়ী নয়;—কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই এ-গ্রামেরই লোক, নইলে আমাদের সম্বন্ধে অমন সম্ভ্রম-সহকারে কথা বল্‌বেন কেন? আর অত জান্‌বেনই বা কি করে'? ওদিকে আবার তিন দিন রেলে-জাহাজে কাটিয়ে এলেন;—অত দূরে কোন্ দেশ? বোম্বে? পণ্ডিচেরী? রেঙ্গুন? অত দূর দেশে কি করেন তিনি? অরবিন্দর শিষ্য বা সব্যসাচীর পকেট্-সংস্করণ নন্ তো? অথচ টমাস্ ব্রাউন্-ও পড়া আছে! আধুনিক যুগের কোনো সাহিত্য-সম্রাট্ হ'লে একটুও আশ্চর্য্য হ'তাম

না; কিন্তু এই সেকেলে লেখকের অদ্ভুত ভাষা ও তা'র চেয়েও অদ্ভুত চিন্তার রসোপভোগ করতে পারে, এমন লোকও আজকালকার দিনে আছে?

আসল কথা এই যে এই মৎস্য-শীকারীর সম্বন্ধে আমি বিষম কৌতূহল অনুভব কর্‌ছি। তাঁর বাড়ি কোন্ দিকে, জিজ্ঞেস্ করতে ভুল হ'য়ে গেছে; আশা কর্‌ছি, শীগ্‌গিরই একদিন এসে তিনি বইখানা ফেরৎ দিয়ে যা'বেন।

তুই তো মানব-চরিত্রের একজন মস্ত বড় সমঝদার;—আমার চিঠি পড়ে' এই ভদ্রলোকের একটা চরিত্র চিত্রণ লিখে' পাঠাতে পার্‌বি? যদি সুযোগ হয়, আসলটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখ্‌বো। ইতি—

তোর লীনা।

সোনারঙ্
২২শে জ্যৈষ্ঠ

নীলা,

বইখানা দিতে তিনি নিজে আসেন নি; আজ সকালে একটা চাকরকে দিয়ে সেখানা ফেরৎ পাঠিয়েছেন। কিন্তু অন্যমনস্কভাবে বইখানা একবার খুল্‌তেই তা'র মধ্যে আবিষ্কার কর্‌লাম ডাকঘরের ছাপ-আঁকা খালি একটা খাম—ওপরে নাম লেখা 'শ্রীবিদ্যাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়'—এবং ঠিকানা কলম্বোর। খামখানা বোধ হয় পেইজ্-মার্ক্ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিলো, তার পর আর স্থানান্তরিত করতে মনে ছিলো না।

কোনো অপরিচিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে তা'র নাম-ধাম-বিবরণ জান্‌বার প্রথা আমাদের দেশে আছে। প্রথম দু'টি দৈবাৎ জান্‌তে পেরে তৃতীয়টি জান্‌বার জন্য আমার কৌতূহল আরো বেড়েই গেলো। কলম্বোটা অবিশ্যি দুর্ব্বোধ্য নয়—অন্ন-অন্বেষণে আজকাল মানুষ কোথায় না যেতে পারে? কিন্তু তাঁর ঐ নাম—মধুসূদনের কোনো পদের অংশ-বিশেষের মত গুরুগম্ভীর তাঁর ঐ নাম আমাকে চঞ্চল করে' তুল্‌লো।

মনে হ'ল, ও-নাম যেন আমার অচেনা নয়; এক কালে যে ঐ নামের সঙ্গে আমার খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিলো, এখন তা ভুলে' গেছি। অথচ, ও-নামের কাউকে কখনো চিন্‌তাম কিনা, না কারো মুখে শুনেছি বা কোনো বইতে পড়েছি—হাজার চেষ্টা ক'রেও তা মনে কর্‌তে পার্‌লাম না। জানিস্ তো, আমাদের স্মরণ-শক্তি কি অদ্ভুতরকম খামখেয়ালী; সাধারণ অবস্থায় তা'র মধ্যে সামান্য একটু শ্লথতা খুঁজে' পাবি নে; দশ বছর আগেকার কোনো ঘটনাও অনায়াসে বিবৃত ক'রে-যাওয়া যায়; কিন্তু যদি কেউ হঠাৎ 'নির্নিমেষ' বানান জিজ্ঞেস করে' বসে, বা 'Sorrows of Satan'-এর লেখিকার নাম জান্‌তে চায়—তা হ'লেই হয় মুস্কিল। এবং যে-হেতু 'বিদ্যাপতি'-নামের ইতিহাস জান্‌তে আমার মন উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে, সেই জন্যই সুযোগ বুঝে' আমার স্মৃতি-শক্তি দিতে সুরু কর্‌লেন ফাঁকি, এবং দুপুর পর্য্যন্ত আমি অসহ্য যন্ত্রণায় কাটালাম। সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐ নামের বৈষ্ণব কবির কথাও আমার একটিবার মনে পড়্‌লো না। কিন্তু তা'র পরেই আমার প্রশ্নের উত্তর মিল্‌লো। আমার তখনকার বিস্ময়টা তুই সহজেই অনুমান কর্‌তে পার্‌বি, দুপুরে খেতে বসে বাবা যখন বল্‌লেন:

'লীনা, পর্‌শু বড় দীঘির ধারে তোর যার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো, তিনি সীতাপতি চৌধুরীর দৌহিত্র।'

এতক্ষণ যে-নামরহস্য আমাকে পীড়া দিচ্ছিলো, বাবার কথা শোনামাত্র তা জলের মত পরিষ্কার হ'য়ে গেলো। মনের দরজায় কোথায় যেন একটা খিল পড়ে গিয়েছিলো, তা চট করে' খুলে গেলো—এবং সঙ্গে সঙ্গে এখানে আস্‌বার দিন স্টীমারে বাবার মুখে যে-সব কথা শুনেছিলাম, তা'রা হৈ-চৈ করে' ফিরে' আস্‌তে লাগলো। 'সীতাপতি'-নামের সঙ্গে সাদৃশ্যের জন্যই যে ঐ ভদ্রলোকের নাম আমার চেনা চেনা ঠেক্‌ছিলো, তা এতক্ষণে বুঝলাম।

'কি করে' জান্‌লে, বাবা? মানে, আমার সঙ্গে যে দেখা হয়েছিলো, সে-খবর?'

'তাঁরই মুখে শুন্‌লাম। আজ সকালবেলা ডাকঘরে দেখা। আমি চিন্‌তে পারি নি। উনিই প্রথমে নমস্কার করে' বল্‌লেন, "ভালো আছেন তো?"

"তা আছি। কিন্তু আপনাকে তো—"

"আমাকে চিন্‌তে পার্‌ছেন না? পার্‌বার কথাও নয়। কিন্তু আপনার সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে আমার দু'বার দেখা হয়েছে।"

'আপাদমস্তক তাঁকে নিরীক্ষণ কর্‌লাম। আশা করে-ছিলাম, মুখের কোনো রেখায় বা দেহের কোনো ভঙ্গীতে

বহুদিনের বিস্মৃত কোনো ক্ষণিক পরিচয়ের আলো জ্বলে' উঠবে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হতাশ হ'তে হ'ল। ভদ্রলোক আমার অকৃতকার্য্যতা লক্ষ্য করে' বল্লেন :

"আপনার লজ্জিত হ'বার দরকার নেই, কেননা, প্রথমবার দেখা হয় মাদুরা রেলোয়ে স্টেশনে—নিশাকালে। আপনি যে-গাড়ি থেকে নাবছিলেন, আমি সেই গাড়িতে উঠছিলাম। দ্বিতীয়বার আপনাকে দেখি কল্কাতায় রামমোহন লাইব্রেরিতে—স্টেলা ক্রাম্রিশ-এর বক্তৃতা হচ্ছিলো।"

'আমি হেসে উঠ্তে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তিনি বল্তে লাগলেন, "আর পরশু দিন আপনার মেয়ের সঙ্গে—হ্যাঁ, এক রকম পরিচয়ই হয়েছে।"

'আমি কিছুই বুঝতে না পেরে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তখন তিনি তাঁর মাছ-ধরা থেকে বই ধার নেয়া পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা খুলে' বল্লেন।

'আদ্যোপান্ত শুনে' আমি বল্লাম, "সত্যি? কিন্তু লীনার দোষ কি, বলুন? ও তো আপনাকে চেনে না! ঐ দেখুন্—আপনার পরিচয় জিজ্ঞেস করতে আমিও ভুলে' গেছি।"

'পোস্টমাষ্টার বাবু এতক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে আমাদের কথাবার্ত্তা শুন্ছিলেন; এইবার তিনি আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার কর্‌বার জন্য এগিয়ে এলেন। তাঁর মুখ থেকেই আমি বিদ্যাপতি বাবুর পরিচয় শুন্লাম।

'বিস্মিত হ'তে হ'ল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল যে তাঁর মুখের ওপর সীতাপতি চৌধুরীর সেই আশ্চর্য্য চোখ দু'টি আমি প্রথম দেখেই কেন চিন্‌তে পারি নি? বাল্যকালে আমার কল্পনায় যিনি শুধু ঈশ্বরের চেয়ে ছোট ছিলেন, সেই সীতাপতি চৌধুরীর একমাত্র রক্ত সম্পর্কিত ও উত্তরাধিকারীকে দেখলাম,—মনে হ'ল, এ যেন আমার কত বড় সৌভাগ্য।'

এইখানে বাধা দিয়ে আমি জিজ্ঞেস কর্‌লাম, 'তখন আমার হ'য়ে তুমি খুব ক্ষমা চাইলে তো?'

বাবা হেসে বল্লেন, 'ও-সব লৌকিকতার কোনো প্রয়োজন তাঁর কাছে ছিলো না। তাঁকে বল্লাম, "আপনাকে দেখে আমার মন আজ আনন্দিত হ'য়ে উঠছে, কারণ আপনার সঙ্গে এমন-একজনের স্মৃতি বিজড়িত, যিনি আমার সমগ্র জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছেন।"

'ঐ কেতাবী ভাষায় তুমি কথা কইলে বাবা?'

'বক্তব্য বিষয়টা যখন বইয়ে লেখবার মত হয়, তখন ভাষাটাও সেই অনুসারে তৈরি হ'য়ে ওঠে বই কি!'

'তাই নাকি? যাক্—তার পর?'

'তার পর আমরা দু'জন ডাকঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলাম। অনেক আলাপ হ'ল। সাংসারিক ব্যাপারে সীতাপতি চৌধুরীর ঔদাসীন্য সব চেয়ে মারাত্মক হয় তাঁর মেয়ের পক্ষে। একমাত্র মেয়ের প্রতি অত্যধিক স্নেহবশত তিনি তাঁর বিয়ে দিতেই ভুলে' যান্। পিতার মৃত্যুর পর এই চতুর্ব্বিংশতিবর্ষীয়া কন্যা আবিষ্কার করলেন যে পৃথিবীতে এখন তিনি সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়।'

এইখানে মা বলে' উঠ্লেন, 'কী সর্ব্বনাশ!'

'কিন্তু সৌভাগ্যবশত সীতাপতি চৌধুরী তাঁর সঙ্গীত-দক্ষতা মেয়েকে দিয়ে গিয়েছিলেন; ফলে তিনি কল্কাতায় এক গানের ইস্কুলে'—

মা বল্লেন, 'কিন্তু দেশের বিষয় সম্পত্তি?'

'জানোই তো, তোমার শ্বশুরের পূর্ব্বপুরুষদের কল্যাণে তা'র নামে মাত্র অস্তিত্ব ছিলো। তা ছাড়া, শুধু অর্থ হ'লেই মেয়েদের চলে না। তদ্ব্যতীত যা প্রয়োজন, তা তাঁর ভাগ্যাকাশে অনতিবিলম্বেই উদিত হ'ল।

'জিজ্ঞেস কর্‌লাম, 'কে সেই ভাগ্যবান?'

'এক দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট সাহিত্যিক। বিয়ে করে' তাঁর অর্থকষ্ট ঘুচলো। কিন্তু সে-সুখ তাঁর কপালে বেশিদিন সইলো না। বছর তিনেক পর তিনি গেলেন মারা। বিদ্যাপতি বাঁড়ুযে তখন এক বছরের শিশু।'

মা রুদ্ধস্বরে বলে' উঠ্লেন, 'তার পর কি হ'ল?'

'হ'বে আবার কি? সেই সাহিত্যিকজায়া কত ক করে' যে ছেলেটিকে মানুষ করে' তুল্তে লাগলেন, ত সহজেই অনুমেয়। কিন্তু বিদ্যাপতিবাবু ও-প্রসঙ্গ যেন এড়িে গেলেন মনে হ'ল—সম্প্রতি তাঁর মাতৃ-বিয়োগও হয়েে কিনা! মা-র অবিশ্যি যথেষ্ট বয়েস হয়েছিলো, কিন্তু বিদ্যা পতিবাবু বোধ হয় এই অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনাকে এখ পর্য্যন্ত ক্ষমা করে' উঠতে পার্‌ছেন না।'

মা ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বল্‌লেন, 'কী যে বলো! আর-কেউ নেই যা'র—'

'হ্যাঁ, সত্যি। একান্ত স্বজনহীনতা যে কত বড় দুর্ভাগ্য, তা আমাদের বুঝতে পারার কথা নয়।'

'তা এই বিদ্যাপতিবাবু কি কর্‌ছেন এখন?' মা শুধোলেন।

'কলম্বোর এক বৌদ্ধ মিশনারী কলেজে ইংরেজি সাহিত্য পড়ান্‌ ও মাঝে মাঝে ছুটী পেলে এইখেনে আসেন। জানো তো, আমাদের জন্যই আজ তাঁর এই দুরবস্থা। তাঁর কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আমি লজ্জিত হ'য়ে উঠ্‌ছিলাম; আমার পূর্ব্বপুরুষেরা আমার ঘাড়ে যত অন্যায়ের ঋণ চাপিয়ে গেছেন—মনে হচ্ছিলো, তা যেন আমার শোধ করা উচিত।'

মা হাস্‌তে-হাস্‌তে বল্‌লেন, 'সে-উদ্দেশ্যে কি কর্‌লে তুমি?'

'চল্‌তে-চলতে যখন আমাদের দুজনের দুদিকে যাবার সময় হ'ল, আমি একটু থেমে বল্‌লাম, "যদ্দিন এখানে আছি, আপনার সঙ্গলাভের জন্য নিশ্চয়ই আশা কর্‌তে পারি?"

'তিনি অল্প একটু হেসে বল্‌লেন, "আপনাদের যদি তাই অভিরুচি হয়, আমার কোনো মতান্তর নেই, জান্‌বেন।"

'ফলে আমি তাঁকে নিমন্ত্রণ করে' এসেছি। আজকে রাত্তিরে।'

আমি বলে' উঠলাম, 'আজকেই?'

'হ্যাঁ, আজকেই। তোর মত জিজ্ঞেস্‌ কর্‌বার সময় ছিলো না, কিন্তু তোর কোনো আপত্তি নেই নিশ্চয়ই?'

'না, না—আপত্তি কিসের?' সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম, বিদ্যাপতিবাবু ঐ কথাটা অমন করে বল্‌লেন কেন? 'আপনাদের যদি তাই অভিরুচি হয়, আমার কোনো মতান্তর নেই, জান্‌বেন।' 'আপনাদের' কেন? আর, 'আমার কোনো মতান্তর নেই, জানবেন,' এ-কথার মানে তো শুধু সম্মতি নয়, বরং সাধারণ ভাষায় তর্জ্জমা কর্‌লে তা অনেকটা এইরকম দাঁড়ায়: 'যা অনিবার্য্য, তা'র সঙ্গে সংগ্রাম করা চলে না; বিনা দ্বিধায় তা'র হাতে আত্ম-সমর্পণ করা ভিন্ন উপায় নেই।'

সে যাই হোক্‌, আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে বিদ্যাপতিবাবু স্বয়ং আবির্ভূত হ'বেন, আপাতত এই আশা করা যাচ্ছে। এবং এইমাত্র খেয়াল হ'ল যে এখনো আমার সাজসজ্জা বাকি। সুতরাং—যদিও তোকে আরো অনেক কথা বল্‌বার ছিলো আজকের মত এইখানেই ইতি।

তোর লীনা।

—নং বীডন্‌ স্ট্রীট্‌
২৩শে জ্যৈষ্ঠ

লীনা,

আজকেই তোকে চিঠি লিখতাম না, কিন্তু পর-পর তোর দুখানা দীর্ঘ চিঠি পেয়ে তোর সম্বন্ধে আমি এতদুর উৎকণ্ঠিত হয়েছি যে বিস্তর কাজের মধ্যেও তোকে দু'চার কথা লেখবার সময় করে' নিতে হচ্ছে।

আমি তোকে সাবধান করে' দিতে চাই, লীনা—তোর ঐ নব পরিচিত বিদ্যাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে। তোর চিঠি দু'খানা পড়ে' তাঁকে আমি যেমন চিনেছি, আমি তাঁর আজন্ম-পরিচিত হ'লেও তার চেয়ে ভালো চিন্‌তাম না। যে-দুর্ভাগ্য তাঁর মা কে ক্ষমায়, নম্রতায়, সহনশীলতায় মধুর করে তুলেছিলো, সেই দুর্ভাগ্যই তাঁকে হিংস্র, স্বার্থপর ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ করে' তুলেছে। এটা অবিশ্যি তাঁর অপরাধ নয়; নারী ও পুরুষের প্রকৃতিগত পার্থক্যই এখানে। দৈব-দোষে বিদ্যাপতি বাবু যে-সব দুঃখ-কষ্ট পেয়েছেন বা পাচ্ছেন, সেগুলো মেনে নেবার মত উদারতা বা কাটিয়ে-ওঠার মত শক্তি তাঁর নেই; খাঁচায় অবরুদ্ধ চিতাবাঘের মত তিনি ছট্‌ফট্‌ করে' বেড়াচ্ছেন;—এবং ভাবছেন, অন্য কাউকে অসুখী কর্‌তে পার্‌লে বুঝি তাঁরো শান্তি হ'বে। তাঁর যে-প্রচণ্ড অহঙ্কারের ফলে তাঁর মুখের প্রায় প্রত্যেকটি কথা বিদ্রূপের মত শোনায়, সে-ই তাঁর চরিত্রের কলঙ্ক, কারণ অতখানি অহঙ্কারের যোগ্যতা তাঁর নেই। এবং তিনি তা জানেন। জানেন বলে'ই প্রকাণ্ড অভিমানের ভান করে' লোক চক্ষে তিনি সেই অভাব পূরণ কর্‌তে চান্‌। যেটা অহঙ্কার বলে মনে হয়, আসলে সেটা তাঁর ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স।

এ-কথা অবিশ্যি ঠিক যে প্রথম-দর্শনে এই ধরণের লোকের মস্ত একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, এবং বিপদ সেই কারণেই সমূহ। শোনা যায়, বায়রণকে প্রথম দেখে ইংল্যাণ্ড্‌এর সুন্দরীবৃন্দ সবাই মনে-মনে বলে' উঠ্‌তেন, That pale face is my fate.' তুই কি অস্বীকার কর্‌তে পার্‌বি যে

এ-ক'দিন ধরে তেম্‌নি একটা চিন্তা তোর মনে আনাগোনা কর্‌ছে? কিন্তু ঐ কথাটা বাঙ্‌লায় বল্‌তে গেলে কি হয়, জানিস্?—'ঐ মুখই আমার কাল হ'বে।' কারণ সেই মহিলাদের পক্ষে বায়রণ্‌ যে কালই হ'তেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ কি? বায়রণ্‌-এর জাতের লোকেরা উগ্র,দয়াহীন, বে-পরোয়া—এঁরা না কর্‌তে পারেন, এমন কাজ নেই। তাই তাঁদের সংশ্রব বর্জ্জনীয়। সাপের মত এঁরা আকর্ষণ করেন—তা'র ফল হয় মর্ম্মান্তিক। বিদ্যাপতিবাবু ঐ শ্রেণীর মানুষ; প্রতিকূল অদৃষ্ট ও নির্ব্বান্ধবতা তাঁকে রুক্ষতরো করেছে। আমার মনে হয়—মনে হয় কী? নিশ্চয়ই—তিনি এরি মধ্যে তোর ওপর অনেকখানি মোহ বিস্তার করেছেন; কিন্তু তোর মনের স্বাভাবিক মোহ-বিমুখতা ও বুদ্ধির অত্যুজ্জ্বল তীক্ষ্ণতা শেষ পর্য্যন্ত তোকে রক্ষা কর্‌বেই, এই বিশ্বাসে নির্ভরশীল, তবু তোর জন্য উদ্বিগ্ন ও তোর চির-কল্যাণকামী বন্ধু,

নীলা।

সোনারঙ্‌
২৫শে জ্যৈষ্ঠ

প্রাণাধিক নীলা,

তোর সংক্ষিপ্ত—অর্থাৎ সম্যকরূপে ক্ষিপ্ত—চিঠিখানা পেয়ে আমি কিন্তু মোটেও বিচলিত হই নি। তোর কল্যাণ-কামনার জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু আমার দিক থেকে এটুকু বল্‌তে পারি যে বিপদ এখনো ততটা ঘনিয়ে আসে নি। সুতরাং তোর মহামূল্য উৎকণ্ঠার বাজে খরচ কর্‌তে নিষেধ কর্‌ছি। জমিয়ে রেখে দে—কোনোকালে কাজে লাগ্‌তে পারে।

অথচ ইচ্ছে কর্‌লে তোর কথারও যে উত্তর না দিতে পারি, এমন নয়। প্রথমেই একটা পুরোনো নীতিবাক্য উচ্চারণ কর্‌তে হচ্ছে। সে হচ্ছে এই যে শয়তানকে (এবং বায়রণ্‌কে) যত কালো করে' আঁকা হয়, তত কালো সে নয়। তুই যদি বলিস্‌ যে ও-কথা বলার কোনো মানে হয় না, তা হ'লে আমি বল্‌তে বাধ্য হ'ব যে বিদ্যাপতিবাবুর সঙ্গে ঐ দুই মহাপুরুষের চরিত্রগত কোনো সাদৃশ্যই নেই। ডন্‌ জুয়ান্‌ বা মেফিস্‌টোফিলিস্‌-এর অংশ নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নি। উপন্যাসের নায়কের যে-কয়েকটি বড় বড় ছাঁচ আমাদের চোখের সাম্‌নে আছে, তা'র কোনোটির মধ্যেই তিনি পড়েন না। বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের চোখ-ঝল্‌সানো প্রখরদীপ্তিত্ব বা কবি-রামচন্দ্রের মর্ম্মস্পর্শী কারুণ্যের মন-ভোলানো মধুরতা—কোনোটিই তাঁর নেই। তাঁর মধ্যে সে-মদিরতার অভাব, যাতে তাঁ'কে দেখামাত্র মনের নেশা ধরে' যেতে পারে।

তার পর অহঙ্কার। বিদ্যাপতিবাবু অহঙ্কারী বটে, কিন্তু কে বল্‌বে সে-অহঙ্কারের যোগ্যতা তাঁর নেই? মানুষের মর্য্যাদা-নির্দ্ধারণের সত্য উপায় যা-হয়েছে নয়, যা-হ'তে-পার্‌তো। তিনি দরিদ্র, এ হচ্ছে সাংসারিক সত্য, কিন্তু তা'র চেয়ে বড় সত্য হচ্ছে এই যে দারিদ্র্য তাঁকে মানায় না। সেই জন্যই তাঁর মন বাস্তব অবস্থাকে অতিক্রম করে' যায়। অদৃষ্টের বিরুদ্ধে নিস্ফল অভিযোগ কর্‌তে তিনি অভ্যস্ত নন্‌, কিন্তু তা'র প্রতিকূলতাকে স্বীকার করে' নিয়ে মনের জন্মগত উদারতাকে খর্ব্ব কর্‌তে তিনি নারাজ। ভাই, স্বভাব যাঁকে বড় করেছে, তাঁর জাত মার্‌বে কে?

এই আত্ম-শ্লাঘা যদি তাঁর সর্ব্বস্ব হ'ত, তা হ'লেও তোর ব্যাখ মেনে নিতে আমার কোনো আপত্তি ছিলো না। উগ্র লাল রঙয়ের গোলাপ দৃষ্টিকে পীড়া দিত, যদি না তা'র আশে-পাশে শ্যাম-পত্রগুচ্ছের ম্লানিমা দেখ্‌তাম। তেম্‌নি একটি স্বভাবজাত বিনয়ের কোমলতা তাঁর গর্ব্বকে সুদৃশ্য করেছে। এবং ঐ দু'টি জিনিষ তাঁর মধ্যে এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে তা'দেরকে বিচ্ছিন্ন করে' দেখ্‌বার উপায় নেই। ইলেক্‌ট্রিক্‌এর কোন্‌ তারে নেগেটিভ্‌ আর কোন্‌ তারে পজিটিভ্‌ শক্তি যাতায়াত কর্‌ছে জানি নে, কিন্তু এটুকু নিঃসন্দেহে বল্‌তে পারি যে দু'য়ের সম্মিলনেই পরম-বাঞ্ছিত আলোর উৎপত্তি।

বলাই বাহুল্য, ইতিমধ্যে বিদ্যাপতিবাবুর সঙ্গে আরো দেখা হয়েছে. এবং আমার কাছে তিনি যেমন মনে হয়েছেন, তা'র সঙ্গে মিলিয়ে তোর বর্ণনা পড়েছি। যে-সব অসামঞ্জস্য চোখে পড়্‌লো, তা তোকে জানালাম।

সে-রাত্রে নিমন্ত্রণ-রক্ষা কর্‌তে তিনি এসেছিলেন—আস্‌বেনই বা না কেন? আহারান্তে নীচের হল্‌-ঘরটিতে আমরা সমবেত হ'লাম। বাবা আমার বেহালাটার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে' বল্‌লেন, 'আপনাকে এর চেয়ে উচ্চশ্রেণীর কোনো যন্ত্র দিতে পার্‌ছি না বলে' ক্ষমা কর্‌বেন।'

বিদ্যাপতিবাবু তাঁর অভ্যাস মত একবার বাবার মুখে তাকিয়ে, তার পর নিজের প্রসারিত করতলে দৃষ্টি সংবদ্ধ করে' বল্‌লেন, 'দুর্ভাগ্যবশত, আমি বাজাতে জানি নে।'

বাবা বল্‌লেন, 'একেবারেই নয়? আশ্চর্য্য!'

'হ্যাঁ, আশ্চর্য্যই। আমার মাতামহ তাঁর কন্যাকে যে-অদ্ভুত শক্তির অধিকারিণী করে' যান্‌, তা তাঁর—অর্থাৎ সেই কন্যার—সঙ্গে-সঙ্গেই লুপ্ত হ'ল। সেই প্রতিভার উত্তরাধিকারী হ'বার মত সৌভাগ্য নিয়ে তাঁর পুত্রের জন্ম হয় নি।'

বাবা বল্‌লেন, 'বাস্তবিক। আপনার মা-র কথা আমার স্মরণ হয় না, কিন্তু চৌধুরী মশায়ের আত্ম-বিস্মৃত মুখের লাবণ্যচ্ছটা আর কারো মুখে দেখ্‌বো না ভাব্‌লে দুঃখ হয়।'

মা জিজ্ঞেস্‌ কর্‌লেন, 'কিন্তু আপনি গান গাইতে পারেন নিশ্চয়? গায়কদের মতই তো মার্জ্জিত ও মসৃণ আপনার কণ্ঠস্বর।'

বিদ্যাপতিবাবু আবার দৃষ্টি আনত করে' বল্‌লেন, 'দুর্ভাগ্যবশত, আমার সম্বন্ধে আপনার এই অনুমান সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।'

তার পর তাঁর সেই আশ্চর্য্য, উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি বাবাকে, মা-কে পরিভ্রমণ করে' অবশেষে আমার ওপর এসে নিবদ্ধ হ'ল। আমার দিকে তাকিয়েই বল্‌তে লাগ্‌লেন:

'দেখুন্‌, প্রতিভাসম্পন্ন হ'বার প্রচুর সম্ভাবনা আমার ছিলো; কিন্তু গ্রহবৈগুণ্যের ফলে সব গেলো ব্যর্থ হ'য়ে। পিতৃগণের পুণ্যফলের কিছুই আমাতে এসে বর্ত্তালো না। আমার বাবা ছিলেন লেখক;—কেমন লিখ্‌তেন, সে বিষয়ে আলোচনা করা আমার মানায় না, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের অনেক ওপরে তিনি তাঁর সাহিত্যকে স্থান দিয়াছিলেন, এ-কথা সগর্ব্বে বল্‌তে পারি। আমার এক কাকা ছিলেন—তাঁকে আমি কখনো দেখি নি। সতেরো বছর বয়েসে তিনি পালিয়ে প্যারিসে চ'লে যান্‌—ছবি-আঁকা শিখ্‌তে। কালে চিত্রকর ও ভাস্কর-হিসেবে ও-দেশেও সুনাম অর্জ্জন কর্‌তে তিনি সক্ষম হন্‌। বছর দুই পূর্ব্বে তাঁর মৃত্যু হ'লে প্যারিসে যে-শোকসভা আহূত হয়, তা'র সভাপতি ছিলেন রোদ্যাঁ।

'আমারো গীতি-কুশল, কবি বা চিত্রকর হওয়া উচিত ছিলো, কিন্তু হ'তে পারিনি বলে'ই আমার হয়েছে মুস্কিল। তাঁদের কাছ থেকে আমি তদুপযোগী প্রাণ ও কল্পনাশক্তি পেয়েছি, কিন্তু পাই নি প্রকাশের ক্ষমতা। প্রতিভাশালী স্রষ্টাদের জ্যোতির্ম্মণ্ডল বেষ্টন করে' যে-সব অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ ও নিকৃষ্ট লোক বিরাজ করে, আমি তা'দের একজন। এরা নিজেরা স্রষ্টা না হ'লেও স্রষ্টার ঠিক নীচেই এদের আসন, কারণ সৃষ্টির সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণতম-রূপে উপভোগ করার ক্ষমতা এদেরই আছে। যেমন আমি। আমার নিজের অযোগ্যতা দেখ্‌লেন তো, কিন্তু ছবি, কবিতা বা গান আমার চাইতে বেশি ভালোবাসে, এমন লোক নেই।'

এই দীর্ঘ বক্তৃতার আসল উদ্দেশ্য যে কি, তা এতক্ষণে বোঝা গেলো। এবং তা'র ফল যে কি হ'ল, তা বুঝ্‌তেই পার্‌ছিস্‌;—বেহালাটা আমাকেই হ'ল বাজাতে।

যতক্ষণ বাজাচ্ছিলাম, বিদ্যাপতিবাবুর সেই আশ্চর্য্য, উজ্জ্বল চোখ ধারালো তীরের ফলকের মত আমার মুখের ওপর বিদ্ধ হ'য়ে ছিলো। সে-দিকে না তাকিয়েও আমি তা বুঝতে পার্‌ছিলাম। মানুষের অমন চোখ হয় ভাই?—যে-চোখে কখনো পলক পড়ে না, প্রশান্ত গভীরতায় যা পাষাণের মত স্থির হ'য়ে গেছে! আমার সমস্ত মুখ যেন জ্বালা করে' উঠ্‌লো; স্পষ্ট অনুভব কর্‌লাম, আমার হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দ্রুত স্পন্দিত হ'য়ে বুক থেকে সমস্ত রক্ত মুখে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

হঠাৎ বাজ্‌না থামিয়ে আমি উঠে' দাঁড়ালাম। কিন্তু বিদ্যাপতিবাবুর সঙ্গে চোখোচোখি হওয়ামাত্র তাঁর কঠিন দৃষ্টিতে অমন তরল চঞ্চলতা এলো কি করে'? দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনিও উঠে' দাঁড়ালেন।

নীলা, আমার এই বিবরণ পড়ে' তুই যা ইচ্ছে তা ভাব্‌তে পারিস্‌, কিন্তু আমার সম্বন্ধে কোনো দুশ্চিন্তা করিস্‌নে, এইমাত্র অনুরোধ। শ্যালট্‌-বাসিনীর মত বাস্তবের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মায়া-মুকুরের ভেতর দিয়ে, আমি পৃথিবীটাকে দেখি নি, একদিন বিষণ্ণ-সুরে বলে'ও উঠ্‌বো না, 'I'm half-sick of shadows' আমার ল্যান্স্‌লটকে যদি আমি দেখে থাকি, দিনের আলোয় শাদা চোখেই দেখেছি। প্রত্যুষের অস্পষ্ট আলোয় জ্বরের ঘোরে-দেখা-স্বপ্নের কুহেলি-আবরণে ক্ষণবিহারী ছায়ার মত দেখা দিয়েই

তিনি অপসৃত হ'বেন না ; তাঁর আবির্ভাব হ'বে সূর্য্যোদয়ের মত মহিমান্বিত, মৃত্যুর মত সংশয়াতীত ও সুনিশ্চিত। সেই মোহ তিনি বিস্তার কর্‌বেন না, বুদ্ধি যা'তে ঘোরালো হ'য়ে আসে। অন্ধকার নিরবয়ব ও অস্পষ্ট বলে'ই কুৎসিত, কালো বলে' তো নয়। সূর্য্য উঠলে তা'র আলোয় যেমন পৃথিবীর সুগঠিত ও সুসমঞ্জস সৌন্দর্য্য আত্ম-প্রকাশ করে, তেম্‌নি তাঁর স্পর্শে আমার দেহ মন ও আত্মা থেকে ঘুমের যবনিকা উঠে' যা'বে ; শুধু ইন্দ্রিয়ের চেতনায় বা হৃদয়ের অনুভূতি-তেই নয়, বুদ্ধির মমতাহীন প্রখর উজ্জ্বলতাতেও তাঁকে লাভ কর্‌বো—কোথাও কোনো ফাঁকি থাক্‌বে না। এর নাম তো মোহ নয় ভাই ; বরঞ্চ তাঁর প্রেম যখন মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণার মত বুকে এসে বাজবে, তখনই সকল মোহ থেকে মুক্তি লাভ কর্‌বো, লাভ কর্‌বো নব-জন্ম।

লীনা।

সোনারঙ্‌
৩২শে জ্যৈষ্ঠ

নীলা,

কাল রাত্তিরে পৃথিবীর সব চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার হ'য়ে গেছে ; তাই মনের মধ্যে তা একটুও ঝাপ্‌সা হ'য়ে যাবার আগেই তোকে লিখ্‌তে বসেছি। নিছক ঘটনা-হিসেবে দেখ্‌তে গেলে তা তেমন বিস্ময়কর মনে হ'বার কথা নয়, কিন্তু তা'র ফলে আমার মধ্যে যে-পরিবর্ত্তন এসেছে, আশ্চর্য্য সেইটি। এতদিন যে-যবনিকা মৃদু হাওয়ায় থেকে-থেকে কাঁপ্‌ছিলো মাত্র, কাল আমার চোখের সাম্‌না থেকে তা উঠে' গেছে, এবং রঙ্গমঞ্চের ওপর আমারই জীবন-নাট্য অভিনীত হচ্ছে, দেখ্‌লাম। সেই দিকে তাকিয়ে নিজকে আবিষ্কার কর্‌লাম, ও অভিনন্দন জানালাম। কারণ সেই আমি সব চেয়ে আশ্চর্য্য।

এখানে যখন আমাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'য়ে যায়, কল্‌কাতায় লোকে তখন বেড়াতে বেরোয়। আহার ও নিদ্রার মাঝখানে সময়ের সুবৃহৎ ফাঁকাটা আমরা তিনটি প্রাণীতে মিলে' গল্প-গুজব করে' ভরে' তুলি। কিন্তু কাল মা-র শরীর অসুস্থ ছিলো, তাই আমাদের সভাটি বসে নি। বাধ্য হ'য়ে ওপরে নিজের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিতে হ'ল। ঝাড়-লণ্ঠনের যতই চাক্‌চিক্য থাক্‌, সে-আলো বৈঠকখানারই উপযোগী, শোবার বা পড়্‌বার ঘরের নয়। জানালার ধারের টেবিলে বসে' মোমের আলোয় আমি বই পড়্‌তে লাগ্‌লাম। সমস্ত পল্লী ঘুমিয়েছে।

কতক্ষণ পড়েছিলাম, ঠিক বল্‌তে পার্‌বো না ; কিন্তু মনে আছে, একটা মোমের আধ-খানার বেশি পুড়ে' গিয়েছিলো। কাজেই অনুমান কর্‌ছি, তখন রাত বারোটার কম হ'বে না। বুঝ্‌তে পার্‌লাম, এখন শয্যাগ্রহণ কর্‌লে সঙ্গে-সঙ্গেই নিদ্রাকর্ষণ হ'বে ; তাই গল্পের বহু-পরিচিত নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গত্যাগ কর্‌তে কষ্ট হ'লেও বইখানা মুড়ে' আমি চেয়ার ছেড়ে উঠ্‌লাম।

খোঁপার কাঁটাগুলো খুল্‌তে-খুল্‌তে আমি জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। খানিকক্ষণ আগে এক পশ্‌লা বৃষ্টি হ'য়ে গিয়েছিলো, এখন আকাশের মেঘ কেটে চাঁদের মুখ দেখা দিয়েছে। দশমী বা একাদশীর চাঁদ রয়েছে আমার মাথার ওপরে—জানালা থেকে তা'কে দেখ্‌তে পাচ্ছি না, কিন্তু তা'র নীল আলোয় আমাদের আম্র-কানন চুপচাপ দাঁড়িয়ে স্নান কর্‌ছে, কাছের গাছগুলোর ভিজে পাতারা ঝির্‌ঝিরে হাওয়ায় সঞ্চালিত হ'য়ে ঝিকিরমিকির করে' উঠ্‌ছে। আমার জানালার নীচে আলো-ছায়ায় মিশে' অদ্ভুত আব্‌ছায়ার জাল বুনে' চলেছে, পেঁপে-গাছটার পাশে এক টুক্‌রো ছায়া এইমাত্র নড়ে' উঠ্‌লো।

কিন্তু ঐ ছায়াটাই কি সোজা হ'য়ে উঠে' দাঁড়িয়েছে ? তা'র ফাঁকে-ফাঁকে শাদা কাপড়ের মত ও কী দেখা যাচ্ছে ? যাক্‌—এতদিনে বোধ হয় একটা আসল ভূতের দেখা পাওয়া গেলো ? হাওয়ায় দু'একটা এলোচুল উড়ে' এসে আমার চোখে-মুখে পড়্‌ছিলো ; হাত দিয়ে তা'দেরকে সরিয়ে আমি মুখ বাড়িয়ে নীচের দিকে তাকালাম।

বিদ্যাপতিবাবু ফির্‌ছিলেন বোধ হয় ;—আমার দিকে দৃষ্টি পড়্‌তেই থম্‌কে দাঁড়ালেন।

বিস্ময়ের প্রথম আঘাত কাটিয়ে উঠ্‌তে-না-উঠ্‌তেই অসংখ্য প্রশ্ন একসঙ্গে আমার মনকে আক্রমণ কর্‌লে : এর মানে কি ? গোলাপীকে তুল্‌বো ? উনি কি এ-পথ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন ? বাবাকে ডাক্‌বো ? এত রাত্তিরে কোথায়ই বা যাবেন ? আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে' পড়্‌বো ? কিন্তু—

এতক্ষণে এই অতি সরল সত্যটা আমার মনে উদয় হ'ল

যে বিদ্যাপতিবাবু আমাকে দেখ্‌বার জন্যই ঐখেনে এসে দাঁড়িয়েছেন, এবং সম্ভবত বহুক্ষণ যাবৎই দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু কেন? নিশ্চয়ই আমাকে এমন কোনো কথা তাঁর বলার ছিলো, জ্যোছ্‌নার নেশায় সারা পৃথিবী ঝিমিয়ে না এলে যা বলা যায় না—আমার প্রতিটি হৃৎ-স্পন্দন চীৎকার করে' এই কথা বলে' উঠ্‌লো। সেই কথা আমার শোনা চাই। ভাব্‌বার সময় নেই; যে-কোনো মুহূর্ত্তে তিনি ঐ পথের মোড়ে অদৃশ্য হ'য়ে যেতে পারেন। মনে হ'ল, সেই কথাটি না শুন্‌তে পার্‌লে আমার পৃথিবী চির-কালের মত বন্ধ্যা হ'য়ে যা'বে। সেই শুভ-লগ্ন বুঝি এলো, যা'র জন্য এতকাল অপেক্ষা করেছি; এ যদি বৃথা বয়ে' যায়, তবে এ-জন্মের মত আমার মনের বৈধব্য ঘুচ্‌বে না।

এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি, নীলা, যে বাইরে উপস্থিত হ'তে-পারার আগে আমি অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে নেবে, মাঝের হল্‌টা পেরিয়ে নিজ হাতে পেছন দিক্‌কার প্রকাণ্ড ভারি দর্‌জাটা খুলেছিলাম। কিন্তু তখন মনে হয়েছিলো যেন ইচ্ছে করা মাত্র আমি হাওয়ায় উড়ে' এসে সেখানে পড়্‌লাম।

দরজার ঠিক বাইরে সিঁড়ির ওপর আমি দাঁড়ালাম। বিদ্যাপতিবাবু যন্ত্র-চালিতের মত আমার দিকে এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌লেন। সিঁড়ির গোড়ায় এসে কি ভেবে যেন একটু অপেক্ষা কর্‌লেন—তার পর আমার ঠিক নীচের সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালেন।

অস্ফুটস্বরে আমি জিজ্ঞেস্ কর্‌লাম, 'আপনি? এ-সময়ে? কেন?'

মৃদু অথচ স্পষ্ট কণ্ঠের উত্তর শুন্‌লাম, 'কাল চলে' যাচ্ছি। তাই আপনাকে দেখ্‌তে এসেছিলাম।'

কি বল্‌ছি, নিজে তা বুঝ্‌তে-পারার আগেই আমি বলে' উঠ্‌লাম, 'কাল যাচ্ছেন? অসম্ভব।' কথাটা নিজের কানেই বিসদৃশ শোনালো। একটু অপ্রতিভ হ'য়ে হাস্‌বার চেষ্টা করে' তাড়াতাড়ি বলে' ফেল্‌লাম, 'কিন্তু সময়টা কি খুব সুনির্ব্বাচিত হয়েছে, বিদ্যাপতিবাবু? আপনার বিবেচনাকে ধন্যবাদ!'

'আমি তো আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আসি নি, আপনাকে দেখ্‌তে এসেছিলাম শুধু। দূর থেকে দেখে চলে' গেলেই আমার তৃপ্তির সীমা থাক্‌তো না; আপনার সঙ্গে যে কথা বল্‌তে পার্‌ছি, এ আমার আশাতীত সৌভাগ্য।'

'দুঃখের বিষয়, এ-সৌভাগ্য আমার পক্ষেও সমান উপভোগ্য হচ্ছে না। পাশের ঘরে চাকর বাকরেরা শুয়ে' আছে;—তা'রা যদি কেউ—"

'নিরর্থক আপনি আশঙ্কা কর্‌ছেন। আমি তো চলে'ই যাচ্ছিলাম—কেন আপনি এলেন?'

বলে' তিনি যাবার জন্য পা বাড়ালেন, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে হাওয়ার মত স্বরহীন অথচ তীব্রস্বরে আমি ডাক্‌লাম, 'শুনুন্।'

বিদ্যাপতিবাবু আমার দিকে যে মুখ ফেরালেন, তা ভূতের চেয়েও ম্লান। নীচের সিঁড়িতে না নেবে যতটা সম্ভব তাঁর কাছে সরে' এসে আমি বল্‌লাম,—না, বলি নি, কারণ আমার গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরোয় নি;—আমার নিশ্বাস-পাতের সঙ্গে এই কথা উচ্চারিত হ'ল: 'কাল্‌কেই যাচ্ছেন? সত্যি?'

বিদ্যাপতিবাবুর বিবর্ণ মুখ মুহূর্ত্তের জন্য উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো, দেখ্‌লাম। ভীরু একটি হাসি লাজুক আলোক-রেখার মত তাঁর ঠোঁটের কিনারে একটু খেলা কর্‌লে, তার পর তাঁর দুই চোখের শ্যামল গভীরতায় ঝাঁপ দিয়ে খানিকক্ষণ ঝল্‌মল্ করে' নিজকে হারিয়ে ফেল্‌লে। অত্যন্ত সহজভাবে, প্রায় লঘুকণ্ঠেই তিনি বল্‌লেন, 'এ-কথা আমাকে কেন জিজ্ঞেস্ কর্‌ছেন? জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যাঁর নির্দ্দেশ মেনে-চলায় আমার জীবনের একমাত্র চরিতার্থতা, একটু আগেই তিনি নিজমুখে বলেছেন যে কাল আমার যাওয়া অসম্ভব।'

'তাঁর ওপর আপনার বিশ্বাস যদি এম্‌নি অন্ধ, তবে যাবার সংকল্প করার আগে তাঁর পরামর্শ নেন্ নি কেন?'

'বিশ্বাস অন্ধ বলে'ই কোনো প্রশ্ন কর্‌বার প্রয়োজন হয় নি। জান্‌তাম, তাঁর যা অভিপ্রেত, তা হ'বেই; আমার কোনো চেষ্টার অপেক্ষা তিনি রাখ্‌বেন না। হ'লও তাই।'

'তবে জান্‌বেন, তিনি এই মুহূর্ত্ত থেকে আপনার সমস্ত জীবন দাবী কর্‌ছেন।'

হঠাৎ বিদ্যাপতিবাবু নতজানু হ'য়ে আমার সাম্‌নে বসে' পড়্‌লেন। তাঁহার উত্তোলিত, উদ্‌গ্রীব বাহু এড়াবার জন্য

আমি বিদ্যুৎ-গতিতে সরে' যেতেই আমার শাড়ির আঁচলটা পড়্‌লো লুটিয়ে। বিদ্যাপতিবাবু দুই হাতে সেই আঁচল কুড়িয়ে নিয়ে তা'তে মুখ ঢাকলেন।

ঈষৎ অবনত হ'য়ে আমি তাঁর চুলের ওপর হাত রাখলাম। ধীরে-ধীরে তিনি মুখ তুল্‌লেন—সিংহের মত প্রকাণ্ড মাথায় হরিণের চোখ—আশ্চর্য্য উজ্জ্বল চোখ—জ্যোছ্‌না আর অশ্রুজল একত্র হ'য়েও সেই দু'টি চোখকে উজ্জ্বলতরো কর্‌তে পারে নি। দু'খানা আয়না মুখোমুখী রাখলে যেমন তা'রা পরস্পরের সংখ্যাহীন ছায়া সৃষ্টি করে, তেম্‌নি আমাদের দৃষ্টি পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হ'তেই তা'র ভেতর দিয়ে আমরা নিজেদের অনাদিবিস্তৃত অগণন মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ কর্‌লাম;—সময় যখন শিশু, তখন থেকে আরম্ভ করে' আজ পর্য্যন্ত আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের কাহিনী। এক মুহূর্ত্ত কেটে গেলো—শত সহস্র শতাব্দী। বিদ্যাপতিবাবু আবার আমার আঁচলে মুখ ঢাকলেন। সেইণ্ট্‌ ভেরনিকার রুমালে যীশুর মুখের ছাপের মত আমার ঐ বস্ত্রাঞ্চলে যদি আজ তাঁর মুখচ্ছবি দেখ্‌তে পেতাম, তা হ'লে আমি একটুও বিস্মিত হ'তাম না।

পনেরো মিনিট্‌ আগে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে যে নেমে এসেছিলো, সে আর ফিরে' এলো না; তা'র শূন্য স্থান যে অধিকার করেছে, শেলির মত সে সুন্দর ভাই, দেবতার মত সে অনির্ব্বচনীয়। বিশ্বের সকল কবিদের অপরূপ আনন্দ ও বেদনা, কল্পনা ও অনুভূতি আমার মনে নেবুর রসে লেখা ছিলো; এতদিন তা পড়্‌তে পারি নি, কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে প্রেমের আলো জ্বলেছে, তা'র উত্তাপে সেই লেখা উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে ফুটে' উঠেছে। নিজকে আবিষ্কার কর্‌লাম, ভাই;—এর চেয়ে রোমাঞ্চকর ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে লেখে নি।

আমাদের এই বিবাহকে আশীর্ব্বাদ কর্‌বার জন্যই বিধাতা সেই অল্প একটু সময়ের জন্য আকাশ থেকে করেছিলেন জোছনার পুষ্পবর্ষণ;—নইলে ওপরে এসে আমি বিছানায় শোবামাত্র আকাশ ভেঙে কেন নাব্‌বে বৃষ্টি? জলের ধারা যে গান কর্‌তে-কর্‌তে পৃথিবীতে নামে, আমার আগে কেউ কি তা জেনেছে? দুপুর রাতে অন্ধকার ঘরে একা শুয়ে'-শুয়ে' কিছুতেই ঘুমুতে-না-পারাটি যে কত মিষ্টি, তা তা প্রথম উপলব্ধি কর্‌লাম।

আজ সকালবেলা চোখ মেল্‌তেই পৃথিবীর সঙ্গে আমার প্রথম শুভ-দৃষ্টি হ'ল। পুকুরের নীচের পাঁক থেকে আরম্ভ করে' আকাশের স্ফটিকাভ নীলিমা পর্য্যন্ত এমন-কিছু নেই, যা আমার ভালো না লাগ্‌ছে। এমন কি, গোলাপীর উঁচু দাঁতও আজ ক্ষমা কর্‌তে পার্‌ছি।

এই পর্য্যন্ত লিখেছি, এমন সময় লেখায় বাধা পড়লো। বাবা পাশের বারান্দা দিয়ে তাঁর নিজের ঘরে যাচ্ছিলেন; আমার দরজার কাছে এসে কি মনে করে' থেমে দাঁড়ালেন। উৎফুল্লকণ্ঠে ডাক্‌লাম, 'এসো, বাবা।'

বাবা এলেন। তার পর তাঁর মুখে যা শুন্‌লাম, তা এই:

এইমাত্র তিনি বিদ্যাপতিবাবুর বাড়ি থেকে ফির্‌ছেন। দেওয়ান্‌জীর সঙ্গে মহালের দেখা-শোনা কর্‌তে বেরিয়েছিলেন, ফের্‌বার পথে পড়লো সেই বাড়ি। ভাবলেন, বিদ্যাপতিবাবু অনেকদিন আসেন না, একবার খোঁজ নিয়ে যাওয়া যাক্‌। গিয়ে দেখলেন, বিদ্যাপতিবাবু জ্বরে অচেতন হ'য়ে পড়ে' আছেন, তাঁকে দেখে চোখ মেল্‌লেন, কিন্তু চিন্‌তে পার্‌লেন বলে' মনে হ'ল না। চাকরের মুখে শুন্‌লেন যে তিনি কাল সন্ধ্যের একটু পরেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান্‌। যখন ফিরেছেন, রাত তখন আর বেশি নেই, এবং জামা-কাপড় সব বৃষ্টিতে এমন ভিজেছে যে মনে হয়, এইমাত্র তিনি নদীতে ডুব দিয়ে এসেছেন। কাপড় বদ্‌লাতে-বদ্‌লাতে চাকরকে বল্‌লেন, 'আমার বোধ হয় জ্বর হ'ল রে।' তার পর সেই যে বিছানায় পড়লেন, এ-পর্য্যন্ত আর-একটি শব্দও উচ্চারণ করেন নি। বাবা কপালে হাত রেখে বুঝলেন, জ্বর খুব বেশি, এবং সম্ভবত চেতনাও ঘোলাটে হ'য়ে গেছে। বাবা তৎক্ষণাৎ নিজের হাতে-লেখা চিঠি দিয়ে একটা লোককে পাঠিয়ে দিয়েছেন তারপাশায়—সরকারী ডাক্তারকে ধ'রে আন্‌তে। অবিশ্যি নৌকোই যখন এ-অঞ্চলের একমাত্র যান, তখন ডাক্তারবাবুর আস্‌তে-আস্‌তে বিকেল। বাবা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় চাকরটাকে যথাসাধ্য সাহস ও ভর্‌সা দিয়ে মনুষ্যত্বে পুনর্প্রতিষ্ঠিত ক'রে এসেছেন, কিন্তু দুপুরবেলায় তাঁকে আর-একবার যেতে হ'বে, কারণ তিনি—হাঁ, তিনি একটু শঙ্কিত হ'য়ে পড়েছেন বই কি।

পরে বাবা বল্‌লেন, 'বিদ্যাপতিবাবু কাল সারা-রাত কোথায় যে ছিলেন, এবং কি ক'রেই বা বৃষ্টিতে ভিজ্‌লেন,

সে এক রহস্য। বোধ হয় কাছের কোনো গ্রামে গিয়েছিলেন নেমন্তন্নে—বা কোনো কাজে—ফের্‌বার পথে মাঠের ওপর পান্ বৃষ্টি—সেখান থেকে নিকটতম আশ্রয়ও হয়-তো মাইল-খানেক দূরে। আর ঐ শেষ-রাত্তিরে কাছাকাছি বাড়ি-ঘর থাক্‌লেই বা কি? স্বগৃহে উপস্থিত হ'তে-না-পারা পর্য্যন্ত কোনো আশ্রয়ের আশা নেই।—অথচ, আজ নাকি তাঁর এখান থেকে চলে' যাবার কথা ছিলো।'

বাবার কথা শুন্‌তে-শুন্‌তে আমি মনে-মনে কি ভাবছিলাম, জানিস্? আমাদের এখান থেকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছতে কোনো মতেই আধ ঘণ্টার বেশি সময় লাগবার কথা নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথও বোধ হয় আধ ঘণ্টা ধরে' 'নব-ধারা-জলে' স্নান কর্‌তে বারণ কর্‌বেন। তা'র ফলেই এই জ্বর। প্রভুর অনুপস্থিতিতে ভৃত্য সন্ধ্যা থেকেই সুখ-নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন, তাই রাত-একটাকে নিশান্ত বলে' তিনি স্বচ্ছন্দে ভুল করেছিলেন।

বল্‌লাম, 'আমাকেও নিয়ে চলো না, বাবা—তাঁকে দেখে আসি।'

'তুই যাবি?' এই দু'টি কথায় বাবা অনেক প্রশ্নই জিজ্ঞেস্ কর্‌লেন। অসঙ্কোচে উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ, যাবো। কারণ আজকে যে তাঁর এখান থেকে যাওয়া হ'ল না, সে-জন্য আমিই দায়ী।'

বাবার চোখ সংশয়ের মেঘে মলিন হ'য়ে এলো—কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য। পরক্ষণেই দেখলাম, সেই দৃষ্টি সত্যবোধের পরিচ্ছন্ন দীপ্তিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে।

'তোমার কাছে একটা অনুরোধ আছে, বাবা।'

'কি, লীনা?'

'তোমার বিলেত-যাত্রার সঙ্গী-রূপে আর-একজনকেও নাও না।'

বাবা হাসিমুখে বল্‌লেন, 'বনবাসে যাওয়া তত দুঃখের নয়, লীনা, সমাজের মাঝখানে একঘরে হ'য়ে-থাকা যত। দু'টি লোক যখন পরস্পরের কাছে সমস্ত পৃথিবীর চেয়ে বড় হ'য়ে ওঠে, তখন তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি যে কতখানি বাহুল্য, তা আমি জানি। সেই তৃতীয় ব্যক্তির স্থান অধিকার করে' নিজকে লজ্জা দিতে আমি রাজি নই। তোরা পরের জাহাজে আসিস্. আমি বরঞ্চ এই সুযোগে তোদের রবিঠাকুরের বইগুলো পড়ে' ফেল্‌বো। হ্যাঁরে, রবিবাবুর বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ পড়া যায় তো?'

'কিন্তু বাবা, আমার প্রতি তুমি বড্ড অবিচার কর্‌ছ।'

'কেননা, নিজের প্রতি সুবিচার কর্‌তে হচ্ছে। "তৃতীয় ব্যক্তি"র দুর্ভাগ্য জানি বলে'ই আমার এত ভয়। আমার কথায় বিশ্বেস না হয়, তোর মা-কে জিজ্ঞেস্ করে দেখিস্।'

আমিও হেসে ফেল্‌লাম।—'তোমার সঙ্গে তর্কে কে কবে জিতেছে, বাবা?'

'কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তর্কটা যে আদৌ আমার সঙ্গে হচ্ছিলো না। তুই তর্ক কর্‌ছিলি নিজের সঙ্গে, এবং এই আত্ম-বিরোধে মানুষ সর্ব্বদা হার্‌তেই চায়।'

বলে' বাবা আমার ললাট চুম্বন কর্‌লেন।

জানিস্ লীনা, বিদ্যাপতিবাবুর এই অসুখের খবর শুনে' আমার একটুও দুশ্চিন্তা বা উৎকণ্ঠা হচ্ছে না। এখানেও আমি বিধাতার অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ দেখতে পাচ্ছি। এই রোগ মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁকে আমার একান্ত নিকটে এনে দিয়েছে; সাধারণভাবে দিন কাট্‌লে এই প্রকাশ্য অন্তরঙ্গতায় উপনীত হ'তে বহুদিন কাট্‌তো। সেই দীর্ঘকালের ব্যবধান বিধাতা নিজ হাতে দিলেন সরিয়ে; কাল রাত্রে যিনি ঐটুকু সময়ের জন্য আকাশ ভরে' পাঠিয়েছিলেন জোছনা, এই রোগও তাঁরি দান, মিলনতীর্থের দীর্ঘপথকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য তাঁরি একটা কৌশল। যা-কিছু হচ্ছে, তা'র মধ্যে সেই চির-মঙ্গলের পরম শুভেচ্ছা দেখতে পাচ্ছি।

আজ আর আমার মনে কোনো বিরোধ, কোনো সংশয় নেই; সুদৃঢ় বিশ্বাস ও আত্ম-নির্ভরতার পরিপূর্ণ শান্তিতে তা শরতের আকাশের মত শুদ্ধ ও সমাহিত। এমন কি, বিদ্যাপতিবাবুকে দেখতে যাবার জন্য কোনো অধীর উৎসুকতা নেই পর্য্যন্ত। কেননা, যা অবশ্যম্ভাবী, তা তো ঘটেছে, আমার আজন্ম-তপস্যার ফল-লাভ আমি করেছি;—দেবতা দিয়েছেন বর। এই বর আমি যখনি ব্যবহার করি নে কেন, একবার যা পেয়েছি, চিরকালের মত তা পেয়েছি; তা ফিরিয়ে-নেয়া—যিনি বর দিয়েছেন, তাঁরো অসাধ্য।

লীনা।

সোনারঙ্

১লা আষাঢ়

নীলা,

তারপাশা থেকে যে ডাক্তার এসেছিলেন, তিনি বল্লেন যে বিদ্যাপতিবাবুর চিকিৎসার ভার-নে'য়া তাঁর সাহসে কুলোয় না, বিদ্যাতেও নয় বোধ হয়। বল্লেন—বুকে সর্দ্দি বসে' গেছে, নিউমোনিয়ায় দাঁড়াতে পারে, তাই কল্‌কাতা নিয়ে-যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সুতরাং কাল আমরা সবাই কল্‌কাতা রওনা হচ্ছি—এবং এই খবর দিতেই তোকে এ-কার্ড্‌খানা লিখ্‌লাম। বুঝ্‌তে তো পার্‌ছিস, আমার পক্ষে বাড়ি থেকে বেরোনো সম্ভবপর হ'বে না—তুই-ই আসিস্, পর্‌শু সকালেই আসিস্। সোনারঙ্ বছর-খানেকের মধ্যেই নাকি পদ্মার জলে তলিয়ে যা'বে, ইহজীবনে তা'কে আর দেখবো না, কিন্তু আমার স্মৃতির পৃথিবীতে তা আনন্দ-উজ্জ্বল ক্ষয়-হীন আয়ু লাভ কর্‌লো।

লীনা।

লীনার জীবনের যে-অংশের অভিব্যক্তি আনন্দে সৌন্দর্য্যে করুণতায় উজ্জ্বলতম, তা'র পরিচয় এই চিঠিগুলিতে আপনারা, আশা করি, যথেষ্ট নিবিড় করে'ই পেয়েছেন। কিন্তু তা'র জীবনের চরম পরিপূর্ণতার কাহিনী আপনারা এখনো শোনেন নি। সে-কথা বল্‌বার ভার আমার নিজেরই নিতে হচ্ছে বলে' আপনারা অপরাধ গ্রহণ কর্‌বেন না।

দশুই আষাঢ় ভোরবেলা টেলিফোন্-এর আওয়াজে নীলার ঘুম ভেঙে গেলো। বিছানা থেকে হাত বাড়িয়ে সে সেটা তুলে' নিলে। তার পর নিম্নলিখিত-রূপ কথাবার্ত্তা হ'ল :

'কে? কে আপনি?'

'আমি।'

'ও, লীনা? কি খবর সব? ডাক্তার-নীলরতন কাল বিকেলেও এসেছিলেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'নর্স্-দু'জন কাল্‌কেও সারা-রাত ছিলো?'

'দু'জন নয়, চারজন।'

'নতুন আরো আনানো হয়েছিলো? কেন? তোর মা-র শরীর ভালো আছে তো?'

'মা ভালোই আছেন।'

'কাল সারাদিনেও আমি একবার যাবার ফুর্‌সৎ করে' উঠতে পার্‌লাম না;—হঠাৎ আমার এক দেওর সস্ত্রীক এসে উপস্থিত হয়েছেন—তাঁদের নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। আজ যাবো। দশটা-নাগাদ তোর গাড়িটা একবার পাঠাতে পার্‌বি?'

'তোর আস্‌বার দর্‌কার নেই।'

'কেন?'

'বিদ্যাপতিবাবু এইমাত্র মারা গেলেন। না, তোর আস্‌বার দর্‌কার নেই।'

আমার চারদিকে সহস্র কৌতূহলী কণ্ঠের প্রশ্ন শুনতে পাচ্ছি; 'তার পর কি হ'ল? তার পর?'

কিন্তু তার পর আবার কি? লীনাকে আপনারা যতটুকু দেখেছেন, তা'তে তা'র ঐ মর্ত্ত্যাতীত জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিকেই দেখেছেন, এবং সেই অতি-দুর্ল্লভ আভাই যেন আপনাদের মনের চোখে নেশার মত লেগে থাকে। লীনা আপনাদের চোখে দীর্ঘজীবী নয়, উজ্জ্বলজীবী হোক্, এই আমার আন্তরিক কামনা। অনুরাগবতী উষসীর লাজরক্ত মহিমার অন্তে গোধূলির বিষণ্ণ, ধূসর ম্লানতা তো আছেই; কিন্তু আমরা—আমি ও আপনারা—আমাদের সমস্ত মন-প্রাণ ভরে' উষসীকে পান কর্‌লাম, আমাদের কাছে তার পর আর-কিছু নেই।

তবু কোনো পাঠিকা জিজ্ঞেস্ কর্‌তে পারেন—লীনা কি তা'র বাবার সঙ্গে বিলেত গিয়েছিলো? না, বিলেতে সে যায় নি, অক্‌স্‌ফোর্ড এ ভর্ত্তি হওয়াও তা'র কপালে আর হ'ল না। তবে? তবে আবার কি? জলপাইগুড়ির একটা মেয়ে-ইস্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদ খালি ছিলো, সে সেটা নিয়ে নিলে। শিক্ষয়িত্রী? কেন? টাকার অভাব তো তা'র—! না, টাকার জন্যে নয়, বাঁচবার আশায়। তা টাকার জন্যেও খানিকটা বটে;—কারণ সে মনে কর্‌তো যে তা'র বিয়ে হ'য়ে গেছে, এবং বিয়ের পর পিতৃগৃহের ওপর মেয়েদের যখন আর অধিকার নেই, তখন নিজের সংস্থান সে নিজেই কর্‌তে চায়। কিন্তু সত্যি-সত্যি সে কি আর বিয়ে করে নি? তা করেছিলো বই কি—বিয়ে না করে' কোনো মেয়ে সারা জীবন কাটাতে পারে? কিন্তু অনেকদিন পর—পুরো একটি বছর। পরের বছর দশুই আষাঢ় তারিখে তা'র বিয়ে হয়। কা'র সঙ্গে? কা'র সঙ্গে আবার? ঐ ওখানকারই—অর্থাৎ জলপাইগুড়ির—এক উকীল, নাম রসময় ঘোষাল। লীনার বাবা প্রতিজ্ঞা করেছেন বটে যে জীবনে আর তিনি মেয়ের মুখ দেখবেন না, কিন্তু তা'র মা বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন। নীলারও নেমন্তন্ন হয়েছিলো, কিন্তু সে আস্‌তে পারে নি; কারণ তখন তা'র প্রথম সন্তান অত্যাসন্ন।

চৈতন্যদেবের তিরোধান

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

ফাল্গুন মাসের "ভারতবর্ষে" শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় "শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাবসান" সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ঈশান নাগর প্রণীত অদ্বৈতপ্রকাশ, লোচনদাস প্রণীত চৈতন্যমঙ্গল এবং জয়ানন্দ প্রণীত চৈতন্যমঙ্গল, এই তিনখানি গ্রন্থ হইতে দীনেশবাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রথের সময় নৃত্য করিতে করিতে চৈতন্যদেবের পায়ে ইট বিঁধিয়া যায়, এ জন্য তিনি গুণ্ডিচাবাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন; সেখানেই আষাঢ়ী শুক্লা সপ্তমীতে তিনি দেহত্যাগ করেন; এবং সেখানেই তাঁহাকে সমাধি দেওয়া হয়। গুণ্ডিচার মন্দির মধ্যে দরজার পার্শ্বে যেখানে শ্রীচৈতন্যদেবের চরণচিহ্ন বর্ত্তমান আছে, তাহার নীচেই তাঁহার পবিত্র দেহ সমাহিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত তিনখানি গ্রন্থ হইতে এই মত কতদূর সমর্থিত হয় দেখা যাউক।

ঈশান নাগর লিখিয়াছেন—

একদিন গোরা জগন্নাথে নিরখিয়া।
শ্রীমন্দিরে প্রবেশিল হা নাথ বলিয়া॥
প্রবেশ মাত্রেতে দ্বার স্বয়ং রুদ্ধ হৈল।
ভক্তগণ মনে বহু আশঙ্কা জন্মিল॥
কিছুকাল পরে স্বয়ং কপাট খুলিলা।
গৌরাঙ্গাপ্রকট সভে অনুমান কৈলা॥

জগন্নাথদেবের মূল মন্দিরের নাম শ্রীমন্দির। গুণ্ডিচা-মন্দিরকে শ্রীমন্দির বলা হয় না। অতএব ঈশান নাগরের অদ্বৈত-প্রকাশ অনুসারে চৈতন্যদেব জগন্নাথদেবের মূলমন্দিরে প্রবেশ করিবার পর অদৃশ্য হইয়া যান। আপত্তি হইতে পারে যে, আষাঢ়ী শুক্লা সপ্তমীতে শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধান হইয়াছিল। সে সময় জগন্নাথদেবের রথযাত্রা হয়। এ জন্য বিগ্রহ মূল মন্দিরে থাকিবার কথা নহে, গুণ্ডিচাবাড়ীতে থাকিবার কথা। কিন্তু ঈশান নাগরের উক্তির সহিত ইহার কোনও বিরোধ নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, জগন্নাথকে দর্শন করিয়া মহাপ্রভু শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। অর্থাৎ গুণ্ডিচাবাড়ীতে জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া মহাপ্রভু মূল মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মূলমন্দিরেই যদি জগন্নাথদেবের বিগ্রহ থাকিত, তাহা হইলে গ্রন্থকার বলিতেন যে, মহাপ্রভু মন্দিরে প্রবেশ করিয়া জগন্নাথদেবকে দর্শন করিলেন।

মহাপ্রভুর তিরোধান সম্বন্ধে ঈশান নাগরের অদ্বৈত-প্রকাশ গ্রন্থে আর কিছু পাওয়া যায় না। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে এইরূপ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়—

হেনকালে মহাপ্রভু কাশীমিশ্র ঘরে।
বৃন্দাবন-কথা কহে ব্যথিত অন্তরে॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া সে চলিলা মহাপ্রভু।
এমত ভকত সঙ্গে নাহি দেখি কভু॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া জগন্নাথ দেখিবারে।
ক্রমে ক্রমে গিয়া উত্তরিলা সিংহদ্বারে॥
সঙ্গে নিজজন যত তেমতি চলিল।
সত্বরে মন্দির ভিতরে উতরিল॥
নিরখে বদন প্রভু দেখিতে না পায়।
সেইখানে মনে প্রভু চিন্তিলা উপায়॥
তথন দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট।
সত্বরে চলিয়া গেল অন্তরে উচাট॥
আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিঃশ্বাসে॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর সে কলিযুগ আর।
বিশেষতঃ কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন সার॥
কৃপা কর জগন্নাথ পতিত পাবন।
কলিযুগ আইল এ দেহ ত শরণ॥
এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগত রায়।
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায়॥
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥
গুঞ্জা বাড়ীতে ছিল পাণ্ডা যে ব্রাহ্মণ।
কি কি বলি সত্বরে সে আইলা তথন॥

বিপ্রে দেখি ভক্তে কহে শুনহ পাড়িছা।
ঘুচাহ কপাট প্রভু দেখিতে বড় ইচ্ছা॥
ভক্ত আর্ত্তি দেখি পাড়িছা কহয়ে তখন।
গুঞ্জা বাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন॥
সাক্ষাতে দেখিল গৌর প্রভুর মিলন।
নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্বজন॥
এ বোল শুনিয়া ভক্ত করে হাহাকার।
শ্রীমুখচন্দ্রিমা প্রভুর না দেখিব আর॥

*   *   *   *

শ্রীপতাপরুদ্র রাজা শুনিল শ্রবণে।
পরিবারসহ রাজা হরিল চেতনে॥

উদ্ধৃত অংশের ৬ষ্ঠ এবং ৮ম পংক্তিতে সিংহদ্বার এবং মন্দির শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, মহাপ্রভু সিংহদ্বারে উপস্থিত হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। এখানে কোন্ সিংহদ্বার এবং মন্দিরকে লক্ষ্য করা হইয়াছে? আমাদের মনে হয় যে, এখানে মূল মন্দিরের সিংহদ্বার এবং মূল মন্দির বুঝিতে হইবে। কারণ গুণ্ডিচাবাড়ী অপেক্ষা মূল মন্দির সমধিক প্রসিদ্ধ; এবং গুণ্ডিচাবাড়ীর প্রধান দ্বারের সম্মুখে যদিও সিংহের প্রতিমূর্ত্তি আছে, তথাপি গুণ্ডিচাবাড়ীর সিংহদ্বার অপেক্ষা মূল মন্দিরের সিংহদ্বার অনেক বেশী বিখ্যাত। সমগ্র বর্ণনাটি পড়িয়া এইরূপ ব্যাপার হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়—মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শন করিবার জন্য সিংহদ্বার দিয়া মূল মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সে সময় রথযাত্রা হইয়াছিল বলিয়া জগন্নাথদেব মূল মন্দিরে ছিলেন না, গুণ্ডিচাবাড়ীতে ছিলেন। ভাবের আবেশে মহাপ্রভুর বোধ হয় সে জ্ঞান ছিল না, তিনি মূল মন্দিরেই জগন্নাথদেবের দর্শন পাইবেন ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু মূল মন্দিরে প্রবেশ করিয়া,—"নিরখে বদন প্রভু দেখিতে না পায়,"—জগন্নাথদেবের বদন দেখিবার জন্য প্রভু চাহিলেন, কিন্তু দেখিতে পাইলেন না। তখন মহাপ্রভু মনে মনে দেহত্যাগ করিবার উপায় স্থির করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা অনুসারেই মন্দির-দ্বার আপনা হইতে রুদ্ধ হইল। আর মহাপ্রভু,—"সত্বরে চলিয়া গেল অন্তরে উচাট"—দুঃখিত অন্তঃকরণে শীঘ্র চলিয়া গেলেন। মন্দিরের দ্বার যখন বন্ধ ছিল, তখন বুঝিতে হইবে যে মহাপ্রভু অলৌকিক উপায়েই মন্দির হইতে চলিয়া গেলেন। কোথায় গেলেন তাহা পরবর্ত্তী বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায়। ইহার পরে দেখিতে পাই যে, মহাপ্রভু বলিতেছেন, "কৃপা কর জগন্নাথ পতিতপাবন" এবং হাত তুলিয়া আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন। ইহা হইতে বোঝা যায় যে মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের বিগ্রহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। তখন "আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবস,"—অতএব রথযাত্রা হইয়াছে, জগন্নাথদেব গুণ্ডিচাবাড়ী গিয়াছেন। সুতরাং বন্ধ দ্বারের মধ্য হইতে চৈতন্যদেব অলৌকিক উপায়ে গুণ্ডিচাবাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং জগন্নাথকে আলিঙ্গন করিতে গিয়া জগন্নাথ বিগ্রহে বিলীন হইয়াছিলেন। ব্যাপারটি অলৌকিক বলিয়া বর্ণনা স্থলে স্থলে অস্পষ্ট; যেন ইঙ্গিতে বলা হইতেছে। গুণ্ডিচা-বাড়ীর মধ্যে তখন একজন পাণ্ডা ছিলেন; তিনি এই ব্যাপার দেখিতে পান, এবং কি হইল কি হইল বলিয়া শীঘ্রগতিতে আসিয়া যেখানে চৈতন্যদেবের ভক্তগণ দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেইখানে (মূল মন্দিরে) উপস্থিত হন। ভক্তগণ তখনও ভাবিতেছিলেন, বন্ধ দ্বারের মধ্যে বুঝি চৈতন্যদেব আছেন। এজন্য পাণ্ডাকে দ্বার খুলিতে বলিলেন। পাণ্ডা বলিলেন তিনি স্বচক্ষে দেখিলেন গুণ্ডিচাবাড়ীতে চৈতন্যদেব জগন্নাথ-দেবের বিগ্রহে বিলীন হইয়া গেলেন। ভক্তগণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন। যথাসময়ে রাজা প্রতাপরুদ্র এই সংবাদ শুনিলেন এবং শুনিয়া অজ্ঞান হইয়া গেলেন।

ঈশান নাগরের বর্ণনা এবং লোচনদাসের বর্ণনায় বিশেষ কোন বিরোধ নাই। ঈশান নাগর বলিয়াছেন, মন্দিরের দরজা বন্ধ হইয়া গেল; যখন খুলিল তখন দেখা গেল, মহাপ্রভু অদৃশ্য হইয়াছেন। লোচনদাস একটি অতিরিক্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সে ঘটনা এই যে, গুণ্ডিচাবাড়ী হইতে একজন পাণ্ডা ছুটিয়া আসিয়া বলিল যে, সে দেখিয়াছে যে, গুণ্ডিচাবাড়ীর মধ্যে চৈতন্যদেব জগন্নাথদেবের বিগ্রহে বিলীন হইয়া গেলেন। কিন্তু উভয় গ্রন্থেই দেখা যায় যে, ভক্তগণের সম্মুখে চৈতন্যদেব মূল মন্দিরেই প্রবেশ করিয়া-ছিলেন, মূল মন্দিরের দ্বারের পার্শ্বেই ভক্তগণ দাঁড়াইয়া ছিলেন, এবং সেখানে থাকিয়াই তাঁহারা বুঝিলেন যে, চৈতন্যদেব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। লীলা সম্বরণ করিবার অব্যবহিত পূর্বের মুহূর্ত্তে যদি চৈতন্যদেব গুণ্ডিচাবাড়ীতে জগন্নাথদেবের বিগ্রহ সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা কোন অলৌকিক উপায়ে। বৃত্তান্তের যে অংশ লৌকিক তাহা হইতে ইহা

পাওয়া যায় যে, অন্তর্দ্ধান করিবার পূর্বে চৈতন্যদেব শ্রীমন্দির বা মূল মন্দিরের মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছিলেন,—গুণ্ডিচা-বাড়ীতে নহে।

ঈশান নাগর বা লোচনদাস মহাপ্রভুর তিরোধানের পূর্বে তাঁহার কোনও শারীরিক অসুস্থতার উল্লেখ করেন নাই। জয়ানন্দর চৈতন্যমঙ্গলে অসুখের উল্লেখ আছে। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—

আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে।
ইটাল বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে॥
অদ্বৈত চলিলা গৌড়দেশে।
নিভৃতে তাহারে কথা কহিল বিশেষে॥
নরেন্দ্রের জলে সর্ব পরিষদ সঙ্গে।
চৈতন্য করিল জলক্রীড়া নানারঙ্গে॥
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে॥
পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্বকথা।
কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্বথা॥
নানাবর্ণে দিব্যমাল্য আইল কোথা হৈতে।
কণো বিদ্যাধর নৃত্য করে রাজপথে॥
রথ আন রথ আন ডাকেন দেবগণ।
গরুড়ধ্বজ রথে প্রভু করি আরোহণ॥
মায়াশরীর তথা রহিল যে পড়ি।
চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি॥

রথযাত্রার সময় নৃত্য করিতে করিতে চৈতন্যদেবের পায়ে ইট লাগে। তাহার পরেও তিনি ভক্তগণ সঙ্গে নরেন্দ্র সরোবরে স্নান এবং জলক্রীড়া করিয়াছিলেন। ষষ্ঠীর দিন পায়ে খুব ব্যথা, এজন্য তাঁহাকে "টোটায়" শয়ন করিতে হয়। পরদিন রাত্রে অনেক স্বর্গীয় কুসুমের মাল্য কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল, রাজপথে বিদ্যাধর নৃত্য করিতে লাগিল, দেবগণ "রথ আন" "রথ আন" বলিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন, রাত্রি দশ দণ্ডে (প্রায় রাত্রি দশটার সময়) চৈতন্যদেব গরুড়ধ্বজ রথে চড়িয়া বৈকুণ্ঠে গেলেন, তাঁহার মায়ার শরীর পড়িয়া রহিল।

জয়ানন্দর বর্ণনা ঈশান নাগর এবং লোচনদাসের বর্ণনা হইতে ভিন্ন। ঈশান নাগর এবং লোচনদাস কোনও অসুখের কথা লেখেন নাই। জয়ানন্দ বলেন, পায়ে ইট লাগিয়া মহাপ্রভুর পায়ে খুব ব্যথা হইয়াছিল, এজন্য তাঁহাকে শয্যা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ঈশান নাগর এবং লোচনদাস বলেন, মহাপ্রভু শ্রীমন্দিরে গিয়া প্রবেশ করেন, তাহার পর অদৃশ্য হইয়া যান। জয়ানন্দ বলেন, মহাপ্রভু "টোটাতে" দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গীয় রথে চড়িয়া বৈকুণ্ঠে চলিয়া যান, তাঁহার দেহ পড়িয়া থাকে। কিন্তু সে দেহের কি ব্যবস্থা হইল জয়ানন্দ তাহা বলেন নাই।

জয়ানন্দের মতে যে "টোটাতে" চৈতন্যদেব দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, সে "টোটা" কোন্ স্থান? পায়ে ব্যথা হইয়া শয্যা গ্রহণ করিতে হইলে মহাপ্রভুর যে বাসস্থান নির্দিষ্ট ছিল সেইখানে আশ্রয় লওয়াই স্বাভাবিক। আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, জয়ানন্দ এই গ্রন্থে নানা স্থলে চৈতন্যদেবের পুরীস্থ বাসভবনকে 'টোটা' নামে নির্দেশ করিয়াছেন।

সিন্ধুতটে চৈতন্য বিশ্রামস্থান টোটা।
তাঁহারে পাঠাও ভোগ অন্ন ব্যঞ্জন পিঠা॥

(বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ প্রকাশিত চৈতন্যমঙ্গল, উৎকলখণ্ড ১০০ পৃঃ)

এই কথা কহিয়া বসিলা টোটাশ্রমে।
মাল্যচন্দন মহাপ্রসাদ দিল যথাক্রমে॥

(ঐ পুস্তক ১০০ পৃঃ)

জগন্নাথের আজ্ঞা টোটা চল গৌরচন্দ্র।

*　　*　　*

টোটাতে চলিলা প্রভু গদাধর সাথে॥

(ঐ পুস্তক ১০৫ পৃঃ)

ঐ গ্রন্থের ১০৯ পৃষ্ঠায় আছে যে, চৈতন্যদেব ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে এবং মার্কণ্ডেয় সরোবরে স্নান করিয়া স্বর্গেশ্বর, যমেশ্বর, গুণ্ডিচামণ্ডপ প্রভৃতি যাবতীয় মন্দির দর্শন করিয়া ভক্তগণের সহিত টোটাতে অবস্থান করিলেন।

একে একে চৈতন্য দেখিল নীলাচলে।
টোটাএ রহিলা পার্ষদগণ মেলে॥

ঐ গ্রন্থের ১২৫ পৃষ্ঠায় আছে যে, সার্বভৌমের সহিত বিচারের পর মহাপ্রভু তাঁহাকে ষড়ভুজ রূপ দর্শন করাইলেন। সার্বভৌম মহাপ্রভুকে চৈতন্যাষ্টক প্রভৃতি শ্লোক দ্বারা স্তব করিলেন। তাহার পর—

টোটাকে চলিলা চৈতন্য গোসাঞি সত্বরে।
সার্বভৌম গেলা জগন্নাথ দেখিবারে॥

বস্তুতঃ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ আলোচনা করিলে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, গ্রন্থকার সর্ব্বত্র মহাপ্রভুর নীলাচলস্থ বাসস্থানকে 'টোটা' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, এবং সেইখানেই, জয়ানন্দের উক্তি অনুসারে, চৈতন্যদেবের লীলার উপসংহার হয়।

দীনেশবাবু অদ্বৈতপ্রকাশ এবং দুইখানি চৈতন্যমঙ্গলের বর্ণনা মিলাইয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, গুণ্ডিচা মন্দিরের মধ্যেই চৈতন্যদেবের প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল ; কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টা সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। রথযাত্রার সময় গুণ্ডিচামন্দিরে দূর-দূরান্তর হইতে সমাগত সহস্র সহস্র যাত্রীর ভীড় থাকে, দিবসে পাঁচ সাতবার ভোগ দেওয়া হয়,—রোগীর পরিচর্য্যা করিবার স্থান তাহা নহে। রোগের সময় নির্দিষ্ট বাসস্থানে না রাখিয়া মহাপ্রভুকে জনসমাগম-বিক্ষুব্ধ কোলাহল-মুখরিত স্থানে রাখিবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা যায় না। পায়ের ব্যথা একেবারেই কিছু খুব বাড়িয়া উঠে নাই। আঘাত লাগিবার পরেও মহাপ্রভু নরেন্দ্র-সরোবরে স্বাভাবিক অবস্থার ন্যায় জলক্রীড়া করিয়াছিলেন। হয় ত সে রাত্রে বিশ্রামের পর পরদিন ব্যথা খুব বাড়ে। আর যদি এমনই হইত যে হঠাৎ গুণ্ডিচাবাটীর নিকটে তিনি চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে শিবিকা করিয়া বাসস্থান পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া এমন কিছু কঠিন কার্য্য হইত না।

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন, "জয়ানন্দ ১৫৪০ খৃঃ অব্দে তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন, ইহাতেও উল্লিখিত আছে আষাঢ়ী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে চৈতন্য গুঞ্জাবাড়ীতে অদৃশ্য হইয়া যান।" জয়ানন্দর চৈতন্যমঙ্গলে মহাপ্রভুর যে তিরোধান-বৃত্তান্ত আছে, তাহা আমরা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। তাহাতে গুঞ্জাবাড়ীর নামোল্লেখ নাই। "টোটার" উল্লেখ আছে। সেই টোটাকে গুঞ্জাবাড়ী বা গুণ্ডিচাবাড়ী মনে করিবার কোন কারণ নাই। প্রত্যুত, এই টোটা শব্দে মহাপ্রভুর বাসস্থানই বুঝিতে হইবে। কারণ ইহাই স্বাভাবিক, এবং জয়ানন্দ অনেক স্থলে এই অর্থে টোটা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, আমরা পূর্ব্বে তাহা দেখাইয়াছি। দীনেশবাবু পুনশ্চ লিখিয়াছেন, "জয়ানন্দ লিখিয়াছেন.—* * * * তিনি (মহাপ্রভু) উত্থানশক্তি রহিত হইয়া গুঞ্জাবাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।" সেই এক ভুল। মহাপ্রভু গুঞ্জাবাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই, টোটাতে অর্থাৎ তাঁহার বাসস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। দীনেশবাবু আবার লিখিয়াছেন "লোচনদাস লিখিয়াছেন, মন্দিরের দরজা বন্ধ, বহু ভক্ত তাঁহার দর্শনেচ্ছায় তথায় ভীড় করিয়াছিলেন। কিন্তু পাণ্ডারা দরজা খোলে নাই।* * *বহু আবেদন নিবেদনের পর দ্বার মুক্ত হইল—তখন এক পাণ্ডা আসিয়া বলিল, 'গুঞ্জাবাড়ীতে প্রভুর হৈল অদর্শন। সাক্ষাতে দেখিল গৌরপ্রভুর মিলন'॥" লোচনদাসের বর্ণনা আমরা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। পাণ্ডারা দরজা খুলিতে চাহে নাই, বহু আবেদন নিবেদনের পর দ্বার মুক্ত হইল,—এ সকল কথা লোচনদাস লিখেন নাই। শ্রীমন্দিরে যখন মহাপ্রভু এবং ভক্তগণ আসিয়াছিলেন, তখন সেখানে কোন পাণ্ডাই ছিল না,—কারণ, তাহা রথযাত্রার সময়, পাণ্ডারা তখন গুণ্ডিচাবাড়ীতে। তাহার পর গুণ্ডিচাবাড়ী হইতে একজন পাণ্ডা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিপ্রে দেখি ভক্ত কহে শুনহ পড়িছা।
ঘুচাহ কপাট প্রভু দেখিতে বড় ইচ্ছা॥
ভক্ত আর্ত্তি দেখি পড়িছা কহয়ে তখন।
গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন॥

দীনেশবাবু বলিতেছেন, মন্দিরের দ্বার খোলা হইল, তাহার পর পাণ্ডা আসিল। কিন্তু লোচনদাস তাহা বলেন নাই। পাণ্ডা যখন আসিল তখনও দ্বার খোলা হয় নাই, তাই ভক্তগণ তাহাকে দ্বার খুলিতে বলিল। লোচনদাসের বর্ণনা পড়িয়া বেশ বোঝা যায়, পাণ্ডা বদ্ধদ্বার মন্দিরের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসে নাই, তাহা সম্ভবও নহে। পাণ্ডা অন্য স্থান হইতে আসিয়াছিল। অর্থাৎ এই সকল ব্যাপার মূল মন্দিরে ঘটিয়াছিল, পাণ্ডা গুঞ্জাবাড়ী হইতে আসিয়া বলিল, "গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন।" লোচনদাস পূর্ব্বে বলিয়াছেন, সিংহদ্বার দিয়া প্রভু মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সেখানে জগন্নাথদেবকে দেখিতে পাইলেন না তখন দরজার কপাট বন্ধ হইল, মহাপ্রভু সত্বর চলিয়া গেলেন। ইহা হইতে বেশ বোঝা যায় যে মূল মন্দিরেই এই সকল ব্যাপার ঘটিয়াছিল।

দীনেশবাবু কয়েক স্থলেই মূল মন্দিরকে ভুল করিয়া গুঞ্জাবাড়ী বা গুণ্ডিচাবাড়ী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আর এক স্থলে তিনি লিখিয়াছেন, "বহুক্ষণ গুঞ্জাবাড়ীর দ্বার

অর্গলবদ্ধ থাকে।” কিন্তু আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে, লোচনদাস মূল মন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকার কথা লিখিয়াছেন, গুণ্ডাবাড়ীর নহে। দীনেশবাবু পুনশ্চ বলিয়াছেন, “জয়ানন্দ বলিয়াছেন, ‘ঐ দিন তিনি (মহাপ্রভু) জগন্নাথের নিকট হইতে গরুড়ধ্বজ রথে চড়িয়া স্বর্গারোহণ করেন।” কিন্তু জয়ানন্দ যে বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন (আমরা তাহা পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি) তাহাতে ইহা পাওয়া যায় না যে, মহাপ্রভু জগন্নাথের নিকট হইতে মহাপ্রয়াণ করিয়াছিলেন। তাহাতে শুধু আছে যে মহাপ্রভু “টোটাতে” আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং পরদিন স্বর্গীয় রথে চড়িয়া বৈকুণ্ঠ গমন করিলেন। এই টোটা যে মহাপ্রভুর বাসস্থান (কাশী মিশ্রের বাটী) তাহা আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি। কিন্তু দীনেশ বাবু বলেন যে, এই টোটা হইতেছে গুণ্ডিচাবাড়ী। এরূপ মনে করিবার তিনি এই সকল কারণ দিয়াছেন,—

(১) তখন রথযাত্রার সময় জগন্নাথ গুণ্ডিচাবাড়ীতে ছিলেন,

(২) মহাপ্রভু নরেন্দ্র-সরোবরে স্নান করিয়াছিলেন,—এই সরোবর গুণ্ডিচাবাড়ীর নিকটে,

(৩) গুণ্ডিচাবাড়ীর নাম ছিল আইটোটা

(৪) মুরারিগুপ্তের চরিতামৃতে গুণ্ডিচাবাড়ী পুষ্পবাটী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, —টোটা মানেও পুষ্পবাটি।

গুণ্ডিচাবাড়ীকে জয়ানন্দ বা অপর কেহ কখনও টোটা শব্দে অভিহিত করিয়াছে, তাহা দীনেশবাবু দেখান নাই। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, জয়ানন্দ বরাবর চৈতন্যদেবের বাসস্থানকে টোটা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, অন্য কোন স্থানকে শুদ্ধ টোটা শব্দে নির্দেশ করেন নাই। গুণ্ডিচাবাড়ীর নিকট মহাপ্রভুর পায়ে আঘাত লাগে এবং পরদিন তিনি গুণ্ডিচাবাড়ীর নিকটে নরেন্দ্র-সরোবরে স্নান করেন। এ কারণে সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, তিনি গুণ্ডিচাবাড়ীতেই আশ্রয় লইয়াছিলেন। গুণ্ডিচাবাড়ীকে আইটোটা বলিত, দীনেশবাবু ইহা কোথায় পাইলেন? চৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্যলীলা অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে দেখিতে পাই

এইমত মহাপ্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আইটোটা হইতে সমুদ্র দেখে আচম্বিতে॥

গুণ্ডিচাবাড়ী হইতে ত সমুদ্র দেখা যায় না। চৈতন্য-চরিতামৃতের দুইটি বিভিন্ন সংস্করণ দেখিলাম, দুইটিতেই এই পাঠ আছে। মুরারিগুপ্ত গুণ্ডিচাবাড়ীকে পুষ্পবাটী বলিয়াছেন, এবং টোটা মানে পুষ্পবাটী;—ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, জয়ানন্দ গুণ্ডিচাবাড়ীকেই লক্ষ্য করিয়া টোটা শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। বিশেষতঃ যখন জয়ানন্দ অন্যত্র সর্বদা মহাপ্রভুর বাসস্থানকে টোটা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, মহাপ্রভু তিরোধানের পূর্বে গুণ্ডিচাবাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা প্রবেশ করিয়াছিলেন, ইহা কোন গ্রন্থ হইতে সমর্থন করা যায় না। অতএব দীনেশবাবুর অপর সিদ্ধান্ত যে গুণ্ডিচাবাড়ীতে তাঁহার সমাধি হইয়াছিল, ইহাও টিকিবে না। ইহা কেবলমাত্র দীনেশ বাবুর অনুমান। ইহা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। মন্দির মধ্যে সমাধি দেওয়ার প্রথা হিন্দুদের মধ্যে নাই। পুরীর বৈষ্ণব মন্দিরে ইহা আরও অস্বাভাবিক। বিশেষতঃ, রথযাত্রার সময় যখন গুণ্ডিচাবাড়ীতে অসাধারণ জনতা হয় তখন এরূপ ব্যাপার সম্পূর্ণ অসম্ভব। গুণ্ডিচাবাড়ীতে মহাপ্রভুর যে পদচিহ্ন আছে, উহা যে তাঁহার সমাধিস্থল নির্দেশ করিতেছে, ইহা মনে করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। সেখানে মহাপ্রভুর নিয়মিত পূজা হয় না।

দেখা যাইতেছে যে মহাপ্রভুর তিরোধান সম্বন্ধে চারিটি উক্তি বা জনশ্রুতি আছে। দুইটি অলৌকিক (১) তিনি জগন্নাথের অঙ্গে বিলীন হইয়াছিলেন; (২) তিনি গোপীনাথের অঙ্গে বিলীন হইয়াছিলেন। অপর দুইটি স্বাভাবিক (১) তিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন; (২) পায়ে আঘাত লাগিয়া তিনি শয্যাগত হন এবং পরদিন প্রাণত্যাগ করেন। প্রথম দুইটি অলৌকিক হইলেও অনেক ভক্ত বিশ্বাস করিবেন। তিনি সমুদ্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন এ কথা কোন গ্রন্থে নাই। তাঁহার লীলাবসানের পর তাঁহার দেহের কি হইল, এ বিষয়ে কোনও জনশ্রুতি না থাকায় এবং সারারাত্রি সমুদ্রে মগ্ন থাকিবার পর বাঁচিয়া ওঠা অনেকটা অলৌকিক বলিয়া অনেকে এই মত পোষণ করেন। পায়ে আঘাত লাগিয়া প্রাণত্যাগ করেন এ বর্ণনা খুব স্বাভাবিক। অধিকন্তু মহাপ্রভুর তিরোধানের মাত্র ৭ বৎসর পরে যে গ্রন্থ রচনা হয়, তাহাতে এই বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। এই সকল কারণে এই উক্তিটির গুরুত্ব খুব বেশী। এক্ষণে কথা উঠিতে পারে যে, যদি তিনি

নিজ বাসস্থানে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে তাঁহার দেহের কোথায় সমাধি দেওয়া হইয়াছিল ? আমাদের মনে হয় তাঁহার বাসস্থানেই তাঁহার দেহের সমাধি দেওয়া হইয়াছিল। ইহাই স্বাভাবিক। সম্ভবতঃ গম্ভীরার মধ্যেই তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান। চৈতন্যদেবের ভক্তগণের মধ্যে এই স্থানটি বোধ হয় সর্বাপেক্ষা পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। এখানে প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে চৈতন্যদেবের পূজা হয়। অতএব চৈতন্যদেবের যদি কোথায়ও সমাধি থাকে, তাহা ইহাই। জয়ানন্দর বর্ণনার সহিত ইহার বেশ মিল হয়। তবে কেন এ কথা সকল ভক্তের নিকট প্রচারিত হয় নাই, তাহা আমি বলিতে অক্ষম। চৈতন্যদেবের তিরোধান ভক্তদের নিকট অত্যন্ত হৃদয়-বিদারক। কিরূপ হৃদয়-বিদারক তাহা জয়ানন্দর নিম্নলিখিত পংক্তি কয়েকটি হইতে জানা যায়,—

> অনেক সেবক সর্প দংশাইয়া মৈল।
> উল্কাপাত বজ্রাঘাত ভূমিকম্প হৈল॥
> নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি শুনি।
> বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্চ্ছা গেল শচী ঠাকুরাণী॥

এরূপ শোকাবহ বলিয়া ভক্তরা বোধ হয় ইহার আলোচনা করেন নাই ; এজন্যই বোধ হয় চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই। আলোচনার অভাবে কালক্রমে সঠিক বৃত্তান্ত লোকে বিস্মৃত হইয়াছে।

দীনেশবাবুর আর একটী ভ্রমের উল্লেখ করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তিনি বলিয়াছেন যে, সমুদ্রে ঝাঁপ দিবার পর মহাপ্রভু "আনুমানিক সার্দ্ধ দুই মাস জীবিত ছিলেন।" কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃত পড়িলে বোধ হয় যে মহাপ্রভু ইহার পর প্রায় নয় মাস জীবিত ছিলেন। কারণ শরৎ কালে সমুদ্রকে যমুনা ভ্রম করিয়া রাসলীলার ভাবে বিভোর হইয়া চৈতন্যদেব সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের প্রথম সংস্কৃত শ্লোকে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে,—

> শরজ্জ্যোৎস্না সিন্ধোরবকলনয়া জাত যমুনা—
> ভ্রমদ্ধাবন্ যোঽস্মিন্ হরিবিরহতাপার্ণব ইব।
> নিমগ্নো মূর্চ্ছানঃ পয়সি নিবসন্ রাত্রিমখিলাং
> প্রভাতে প্রাপ্তঃ স্বৈরবতু স শচীসূনুরিহ নঃ॥

শরৎ কালের জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত সমুদ্র দেখিয়া মহাপ্রভু তাহাকে যমুনা বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন। তিনি সেই ভ্রমে ধাবিত হইয়া সমুদ্রের জলে পড়িয়াছিলেন,—যেন শ্রীকৃষ্ণের বিরহসন্তাপসাগরেই নিমগ্ন হইয়াছিলেন। সমুদ্র-জলে নিমগ্ন হইয়া তিনি অজ্ঞান হইয়া গেলেন এবং সারা রাত্রি সেই অবস্থায় কাটাইলেন। প্রাতঃকালে মহাপ্রভুর ভক্তগণ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইল। এহেন মহাপ্রভু আমাদিগকে রক্ষা করুন।

ঐ পরিচ্ছেদের তৃতীয় পয়ার এইরূপ—

> শরৎকালের রাত্রি সব চন্দ্রিকা উজ্জ্বল।
> প্রভু নিজগণ লইয়া বেড়ান সকল॥

অতএব আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসে এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। চৈতন্যদেবের তিরোধান হয় আষাঢ় মাসে। সুতরাং সমুদ্রে পড়িবার অন্ততঃ নয় মাস পরে তাঁহার তিরোধান হয়। ইহার মধ্যে মহাপ্রভু জগদানন্দকে নদীয়া পাঠাইয়াছিলেন, অদ্বৈত প্রভু তরজা প্রহেলী রূপ সমাচার পাঠাইয়াছিলেন, বৈশাখের পূর্ণিমাতে উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে কৃষ্ণের দর্শন পাইয়া মহাপ্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতএব উভয় ঘটনার ব্যবধান সার্দ্ধ দুই মাস হইতে পারে না।

শেষ-প্রশ্ন

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১৮)

চারিদিকে চাহিয়া কমল স্তব্ধ হইয়া রহিল। ঘরের এ কি চেহারা! এখানে যে মানুষে বাস করিয়া আছে সহজে যেন প্রত্যয় হয়না। লোকের সাড়া পাইয়া সতেরো আঠারো বছরের একটি হিন্দুস্থানী ছোক্‌রা আসিয়া দাঁড়াইল; রাজেন্দ্র তাহার পরিচয় দিয়া কহিল, এইটি শিবনাথ বাবুর চাকর। পথ্য তৈরি করা থেকে ওষুধ খাওয়ানো পর্য্যন্ত এরই ডিউটি। সূর্য্যাস্ত হতেই বোধ করি ঘুমোতে সুরু করেছিল, এখন উঠে আস্‌চে। রোগীর সম্বন্ধে কোন উপদেশ দেবার থাকে তো একেই দিন্‌ বুঝতে পারবে বলেই মনে হয়। নেহাৎ বোকা নয়। নামটা কাল জেনে গিয়েছিলাম কিন্তু ভুলে গেছি। কি নাম রে?

ফগুয়া।

আজ ওষুধ খাইয়েছিলি?

ছেলেটা বাঁ হাতের দুটা আঙুল দেখাইয়া কহিল, দো খোরাক খিলায়া।

আউর কুছ খিলায়া?

হ,—দুধ ভি পিলায়া।

বহুত আচ্ছা কিয়া। ওপরের পাঞ্জাবী বাবুরা কেউ এসেছিল?

ছেলেটা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, শায়েদ দো পহরমে একঠো বাবু আয়া রহা।

শায়েদ? তখন তুমি কি করছিলে বাবা, ঘুমুচ্ছিলে?

কমল জিজ্ঞাসা করিল, ফগুয়া, তোর এখানে ঝাড়ুটাড়ু কিছু আছে?

ফগুয়া ঘাড় নাড়িয়া ঝাঁটা আনিতে গেল, রাজেন্দ্র কহিল, ঝাঁটা কি করবেন? ওকে পিট্‌বেন না কি?

কমল গম্ভীর হইয়া কহিল, এ কি তামাসার সময় রাজেন? মায়া-মমতা কি তোমার শরীরে কিছু নেই?

আগে ছিল। ফ্ল্যাড্‌ আর ফ্যামিন রিলিফে সেগুলো বিসর্জ্জন দিয়ে এসেচি।

ফগুয়া ঝাঁটা আনিয়া হাজির করিল। রাজেন্দ্র বলিল, আমি ক্ষিদের জ্বালায় মরি, কোথাও থেকে দুটো খেয়ে আসিগে। ততক্ষণ ঝাঁটা আর এই ছেলেটাকে নিয়ে যা' পারেন করুন, ফিরে এসে আপনাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে যাবো। ভয় পাবেননা, আমি ঘণ্টা দুয়ের মধ্যেই ফিরবো। এই বলিয়া সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গেল।

সহরের প্রান্তস্থিত এই স্থানটা অল্পকাল মধ্যে নিঃশব্দ ও নির্জ্জন হইয়া উঠিল। যাহারা উপরে বাস করে তাহাদের কলরব ও চলাচলের পায়ের শব্দ থামিল। বুঝা গেল তাহারা শয্যাশ্রয় করিয়াছে। শিবনাথের সম্বাদ লইতে কেহ আসিলনা। বাহিরে অন্ধকার রাত্রি গভীর হইয়া আসিতেছে, মেঝেয় কম্বল পাতিয়া ফগুয়া ঝিমাইতেছে, সদর দরজা বন্ধ করিবার সময় হইয়া আসিল, এমনি সময়ে রাস্তায় সাইক্লের ঘণ্টা শুনা গেল, এবং পরক্ষণেই দ্বার ঠেলিয়া রাজেন্দ্র প্রবেশ করিল। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া এই অল্পকাল মধ্যে গৃহের সমস্ত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পরে, হাতের ছোট পুঁটুলিটা পাশের টিপায়ের উপর রাখিয়া দিয়া কহিল, অন্যান্য মেয়েদের মত আপনাকে যা' ভেবেছিলাম তা' নয়। আপনার পরে নির্ভর করা যায়।

কমল নিঃশব্দে ফিরিয়া চাহিল। রাজেন্দ্র কহিল, ইতিমধ্যে দেখ্‌চি বিছানাটা পর্য্যন্ত বদ্‌লে ফেলেচেন। খুঁজে পেতে না হয় বার করলেন, কিন্তু ওঁকে তুলে শোয়ালেন কি করে?

কমল আস্তে আস্তে বলিল, জান্‌লে শক্ত নয়।

কিন্তু জান্‌লেন কি কোরে? জানার তো কথা নয়।

কমল বলিল, জানার কথা কি কেবল তোমাদেরই? ছেলেবেলায় চা' বাগানে আমি অনেক রুগীর সেবা করেচি।

তাই তো বলি। এই বলিয়া সে আর একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া কহিল, আস্‌বার সময় সঙ্গে করে সামান্য কিছু খাবার এনেচি। কুঁজোয় জল আছে দেখে গিয়েছিলাম। খেয়ে নিন, আমি বস্‌চি।

কমল তাহার মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিল, কহিল, খাবার কথা তো তোমাকে বলিনি, হঠাৎ এ খেয়াল হোল কেন?

রাজেন্দ্র বলিল, খেয়াল হঠাৎই হোল সত্যি। নিজের যখন পেট ভরে গেল, তখন কি জানি কেন মনে হ'ল আপনারও হয়ত ক্ষিদে পেয়ে থাক্‌বে। আস্‌বার পথে দোকান থেকে কিছু কিনে নিয়ে এলাম। দেরি কর্‌বেননা, বসে যান্‌। এই বলিয়া সে নিজে গিয়া জলের কুঁজাটা তুলিয়া আনিল। কাছে কলাই-করা একটা গ্লাস ছিল, কহিল, সবুর করুন, বাইরে থেকে এটা মেজে আনি। এই বলিয়া সেটা হাতে করিয়া চলিয়া গেল। এ বাড়ীর কোথায় কি আছে সে কালই জানিয়া গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া সন্ধান করিয়া এক টুক্‌রা সাবান বাহির করিল, কহিল, অনেক ঘাঁটা-ঘাঁটি করেছেন, একটু সাবধান হওয়া ভাল। আমি জল ঢেলে দিচ্চি, খাবার আগে হাতটা ধুয়ে ফেলুন।

কমলের পিতার কথা মনে পড়িল। তাঁরও এম্‌নি কথার মধ্যে বিশেষ রস-কস ছিলনা, কিন্তু আন্তরিকতায় ভরা। কহিল, হাত ধুতে আপত্তি নেই, কিন্তু খেতে পারবোনা রাজেন। তুমি হয়ত জানোনা যে, আমি নিজে রেঁধে খাই, আর এই সব দামী ভালো-ভালো খাবারও খাইনে। আমার জন্যে ব্যস্ত হবার আবশ্যক নেই, অন্যান্য দিন যেমন হয়, তেম্‌নি বাসায় ফিরে গিয়েই খাবো।

তা' হলে আর রাত না ক'রে বাসাতেই ফিরে চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসিগে।

তুমি এখানেই আবার ফিরে আস্‌বে?

আস্‌বো।

কতক্ষণ থাক্‌বে?

অন্ততঃ কাল সকাল পর্য্যন্ত। ওপরের পাঞ্জাবীদের হাতে কিছু টাকা দিয়ে গেছি, একটা মোকাবিলা না ক'রে নোড়বনা। একটু ক্লান্ত, তা হোক্‌। এতটা অযত্ন হবে ভাবিনি। উঠুন, এদিকে গাড়ী পাওয়া যাবেনা, হাঁটতে হবে। ফেরবার পথে মুচীদের বস্তিটা একবার ঘুরে আসা দরকার। দু-ব্যাটার মরবার কথা ছিল, দেখি তারা কি করলে।

কমলের আবার সেই কথাই মনে পড়িল, এ লোকটার অনুভূতি বলিয়া কোন বালাই নাই। অনেকটা যন্ত্রের মত। কি একটা অজ্ঞাত প্রেরণা ইহাকে বারম্বার কর্ম্মে নিযুক্ত করে,—কর্ম্ম করিয়া যায়। নিজের জন্য নয়, হয়ত কোন কিছু আশা করিয়াও নয়। কাজ ইহার রক্তের মধ্যে, সমস্ত দেহের মধ্যে জল-বায়ুর মতই যেন সহজ হইয়া আছে। অথচ, অন্যের বিস্ময়ের অবধি থাকেনা, ভাবে কেমন করিয়া এমন হয়। জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা রাজেন, তুমি নিজেও তো ডাক্তার?

ডাক্তার? না। ওদের ডাক্তারি-ইস্কুলে সামান্য কিছু-দিন শিক্ষানবিসি করেছিলাম।

তাহলে ওদের দেখ্‌চে কে?

যম।

তবে তুমি করো কি?

আমি করি তাঁর তদ্বির। তাঁর গুণ-মুগ্ধ পরম ভক্ত আমি। এই বলিয়া সে কমলের বিস্ময়-অভিভূত মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া একটু হাসিল, কহিল, যম নয়, তিনি যমরাজ। বলিহারি তাঁর প্রতিভাকে যিনি রাজা বলে এঁকে প্রথমে অভিবাদন করেছিলেন। রাজাই বটে। যেমন দয়া তেমনি সুবিবেচনা। বিশ্ব-ভুবনে সৃষ্টিকর্ত্তা যদি কেউ থাকে, এ তাঁর সেরা-সৃষ্টি, আমি বাজি রেখে বল্‌তে পারি।

কমল আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি পরিহাস কোরচ রাজেন?

একেবারে না। শুনে সতীশদা মুখ গম্ভীর করে, হরেনদা রাগ করে বলেন আমাকে সিনিক, তাঁদের আশ্রমে সকলে মিলে তাঁরা কৃচ্ছ্র ব্রতধারী, সংযম, ত্যাগ ও নানাবিধ অদ্ভুত কঠোরতার অস্ত্র শস্ত্র শানিয়ে তাঁরা যম-রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। অতএব, মনে করেন আমি তাঁদের উপহাস করি। কিন্তু তা' করিনে। দুঃখীদের পল্লীতে তাঁরা যাননা, গেলে আমার বিশ্বাস আমারই মত পরম রাজ ভক্ত হয়ে উঠবেন। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে মৃত্যু-রাজার

গুণগান করবেন, এবং অকল্যাণ মনে করে তাঁকে গাল দিয়ে আর বেড়াবেননা।

কমল কহিল, এই যদি তোমার সত্যিকার মত হয় রাজেন, তোমাকে সিনিক বলাটা কি দোষের?

রাজেন্দ্র কহিল, দোষের বিচার পরে হবে। যাবেন একবার আমার সঙ্গে মুচীদের পাড়ায়? গড়া-গড়া পড়ে আছে,—আজকের ইনফ্লুয়েঞ্জা বলেই শুধু নয়, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, যে কোন একটা উপলক্ষ তাদের জুট্‌লেই হ'ল। ওযুধ নেই, পথ্যি নেই, শোবার বিছানা নেই, চাপা দেবার কাপড় নেই, মুখে জল দেবার লোক নেই,—দেখে হঠাৎ ঘাবড়ে যেতে হয় এর কিনারা আছে কোথায়? তখনি কুল দেখ্‌তে পাই, চিন্তা দূর হয়, মনে মনে বলি ভয় নেই, ওরে ভয় নেই,—সমস্যা যতই গুরুতর হোক্‌, সমাধান করবার ভার যাঁর হাতে তিনি এলেন বলে। অন্যান্য দেশে কতকটা বোঝা থাকে রাজার স্কন্ধে, কিন্তু আমাদের এ দেব-ভূমি, তাই সমস্ত ভার নিয়েছেন একেবারে রাজার রাজা স্বয়ং। এক হিসেবে আমরা ঢের বেশি সৌভাগ্যবান। কিন্তু কোথা থেকে কি সব কথা এসে পড়ল। চলুন, রাত হয়ে যাচ্ছে। অনেকটা পথ হাঁট্‌তে হবে।

কিন্তু তোমাকে তো আবার এই পথটা হেঁটেই ফিরতে হবে?

তা' হবে।

তোমার মুচীদের পাড়া কত দূরে?

কাছেই। অর্থাৎ এখান থেকে মাইল-খানেকের মধ্যে।

তা'হলে তোমার পা-গাড়ী কোরে ঘুরে এসোগে,—আমি বস্‌চি।

রাজেন্দ্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, সে কি কথা। আপনার যে দু'দিন খাওয়া হয়নি।

কে দিলে তোমাকে এ খবর?

ওই যে খেয়ালের কথা হচ্ছিল, তাই। কিন্তু খবরটা আমি নিজেই সংগ্রহ করেচি। আস্‌বার সময়ে আপনার রান্নাঘরটা একবার উঁকি মেরে এসেছিলাম, রান্না ভাত মজুদ, পাত্রটির চেহারা দেখ্‌লে সন্দেহ থাকেনা যে সে গত রাত্রির ব্যাপার। অর্থাৎ দিন দুই চলেচে নিছক উপবাস। অতএব, হয় চলুন, না হয় যা এনেচি আহার করুন। আজ স্বপাকের অজুহাত অবৈধ।

অবৈধ? কমল একটু হাসিয়া কহিল, কিন্তু আমার জন্যে তোমার এত মাথাব্যথা কেন?

তা' জানিনে। কারণ নিজেই অনুসন্ধান করচি, সম্বাদ পেলে আপনাকে জানাবো।

কমল কিছুক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিল, তাহার পরে কহিল, জানিয়ো, লজ্জা কোরোনা। পুনরায় কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, রাজেন, তোমার আশ্রমের দাদারা তোমাকে অল্পই চিনেচেন, তাই তাঁরা তোমাকে উপদ্রব মনে করেন। কিন্তু আমি তোমাকে চিনি। সুতরাং আমাকেও চিনে রাখা তোমার দরকার। অথচ, তার জন্যে সময় চাই, সে পরিচয় কথা-কাটাকাটি করে হবেনা। একটুখানি স্থির থাকিয়া পুনরায় কহিল, আমি নিজে রেঁধে খাই, একবেলা খাই, অতি দরিদ্রের যা' আহার,—সেই একমুঠো ভাত-ডাল। কিন্তু এ আমার ব্রত নয়, তাই ভঙ্গ করতেও পারি। কিন্তু দিন দুই খাইনি বলেই নিয়ম লঙ্ঘন আমি কোরবনা। তোমার স্নেহটুকু আমি ভুলবনা, কিন্তু কথা রাখতেও তোমার পারবোনা রাজেন। তাই বলে রাগ কোরোনা যেন।

না, বলিয়া রাজেন চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল।

কি ভাবচো বল ত?

ভাব্‌চি, পরিচয়-পত্রের ভূমিকা অংশটুকু মন্দ হলনা। আমিও দেখ্‌চি সহজে ভুল্‌তে পারবোনা।

সহজে ভুল্‌তেই বা আমি তোমাকে দেব কেন? এই বলিয়া কমল হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল। কহিল, কিন্তু আর দেরি কোরোনা, যাও। যত শীঘ্র পারো ফিরে এসো। ঐ বড় আরাম-চৌকিটায় একটা কম্বল পেতে রাখবো,—দুচার ঘণ্টা ঘুমোবার পরে যখন সকাল হবে, তখন আমরা বাসায় চলে যাবো,—কেমন?

রাজেন্দ্র মাথা নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা। ভেবেছিলাম রাত্রিটা বোধ হয় আমাকে আজও জেগে কাটাতে হবে। কিন্তু ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেল, স্বামীর শুশ্রূষার ভার নিজের হাতেই নিলেন। ভালই। ফিরতে বোধ করি আমার দেরি হবেনা, কিন্তু ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়বেননা যেন।

কমল বলিল, না। কিন্তু এই লোকটি যে আমার স্বামী এ খবর তোমাকে দিলে কে? এখানকার ভদ্রলোকেরা বোধ করি? যে-ই দিয়ে থাক্‌, সে তামাসা করেছে।

মুচীদের পাড়ায় যাদের তুমি দেখতে যাচ্ছো তোমার কাছে তাদের চেয়ে বেশি ইনি আমার নয়। বিশ্বাস না হয়, একদিন এঁকে জিজ্ঞেসা করলেই খবর পাবে।

রাজেন্দ্র কোন কথা কহিলনা। নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

শিবনাথ ঠিক যেন এই জন্যই অপেক্ষা করিয়াছিল। পাশ ফিরিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল, জিজ্ঞাসা করিল, এই লোকটি কে? শুনিয়া কমল চমকিয়া গেল। কণ্ঠস্বর স্পষ্ট, জড়তার চিহ্নমাত্র নাই। চোখের চাহনিতে তখনো অল্প একটুখানি ঘোর আছে বটে, কিন্তু মুখের চেহারা প্রায় স্বাভাবিক। অসমাপ্ত নিদ্রা ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিলে যেমন একটু আচ্ছন্ন-ভাব থাকে তাহার অধিক নয়। এতবড় রোগের এত সহজে ও এত শীঘ্র যে সমাপ্তি ঘটিয়াছে কমল হঠাৎ তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলনা। তাই উত্তর দিতে তাহার বিলম্ব হইল। শিবনাথ আবার প্রশ্ন করিল, এ লোকটি কে শিবানি? তোমাকে সঙ্গে করে ইনিই এনেছেন?

হাঁ। আমাকেও এনেছেন, এবং তোমাকেও সঙ্গে করে যিনি কাল রেখে গিয়েছেন, তিনি।

নাম?

রাজেন্দ্র।

তোমরা দুজনে কি এখন এক বাড়ীতে থাকো?

সেই চেষ্টাই তো করচি। যদি থাকেন আমার ভাগ্য।

হুঁ। ওকে এখানে এনেছো কেন? আমাকে দেখাতে?

কমল এ প্রশ্নের জবাব দিলনা, চুপ করিয়া রহিল। শিবনাথ আর কোন প্রশ্ন করিলনা, চোখ বুজিয়া রহিল। বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটার পরে শিবনাথ জিজ্ঞাসা করিল, আমার সঙ্গে তোমার আর কোন সম্বন্ধ নেই একথা তুমি কার মুখে শুন্‌লে? আমি বলেচি এই কি লোকেরা বলে নাকি?

কমল ইহার জবাব দিলনা, কিন্তু এবার সে নিজেই প্রশ্ন করিল, আমাকে যে তুমি বিয়ে করোনি সে আমি না বিশ্বাস করে থাকি তুমি তো করতে, চলে আসবার সময় এ কথাটা বলে এলেনা কেন? তোমাকে আট্‌কাতে পারি, কেঁদে-কেটে মাথা খুঁড়ে অনর্থ ঘটাতে পারি এই কি তুমি ভেবেছিলে? এ যে আমার স্বভাব নয়, সে তো ভালো করেই জান্‌তে? তবে, কেন করোনি তা?

শিবনাথ কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া বলিল, কাজের কঞ্ঝাটে, ব্যবসার খাতিরে দিনকতক একটা আলাদা বাসা করলেই কি ত্যাগ করা হয়? আমি তো ভেবেছিলাম—

শিবনাথের মুখের কথা অসমাপ্ত রহিয়া গেল। কমল থামাইয়া দিয়া বলিল, থাক্‌, থাক্‌, ও আমি জান্‌তে চাইনি। কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই সে নিজের আকস্মিক উত্তেজনার লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া আপনাকে শান্ত করিয়া লইয়া অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি সত্যিই অসুখ করেছিল?

শিবনাথ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, সত্যি না তো কি?

কমল বলিল, সত্যিই যদি এই, আমার ওখানে না গিয়ে আশুবাবুর বাড়ীতে যেতে গেলে কিসের জন্যে? তোমার একটা কাজ আমাকে ব্যথা দিয়েছে, কিন্তু অন্যটা আমাকে অপমানের এক-শেষ করেছে। আমি দুঃখ পেয়েচি শুনে তুমি মনে মনে হাস্‌বে জানি, কিন্তু এই জানাটাই আমার সান্ত্বনা। তুমি এত ছোট বলেই কেবল নিজের দুঃখ আমি সইতে পারলাম, নইলে পারতাম না।

শিবনাথ চুপ করিয়া রহিল; কমল তাহার মুখের প্রতি নির্ণিমেষে চাহিয়া কহিল, জানো তুমি আমার সব সইলো, কিন্তু তোমাকে বাড়ী থেকে বার করে দেওয়াটা আমার সইল না। তাই এসেছিলাম তোমাকে সেবা করতে, তোমার মন ভোলাতে আসিনি।

শিবনাথ ধীরে ধীরে কহিল, তোমার এই দয়ার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ শিবানি।

কমল কহিল, তুমি আমাকে শিবানী বলে ডেকোনা, কমল বলে ডেকো।

কেন?

শুন্‌লে আমার ঘৃণা বোধ হয় তাই।

কিন্তু একদিন ত তুমি এই নামটিই সবচেয়ে ভালো-বাস্‌তে! এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে কমলের হাতখানি লইয়া নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করিল। কমল চুপ করিয়া রহিল। নিজের হাত লইয়া টানাটানি করিতেও তাহার কুণ্ঠা বোধ হইল।

চুপ করে রইলে, উত্তর দিলেনা যে বড়?

কমল তেম্‌নিই নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

কি ভাব্‌চো বলতো শিবানি?

কি ভাব্‌চি জানো? ভাব্‌চি, মানুষ কতবড় পাষণ্ড হলে তবে একথা মনে কোরে দিতে পারে।

শিবনাথের চোখ ছলছল করিতে লাগিল, বলিল, পাষণ্ড আমি নই শিবানী। একদিন তোমার ভুল তুমি নিজেই জান্‌তে পারবে, সেদিন তোমার পরিতাপের সীমা থাক্‌বেনা। কেন যে একটা আলাদা বাসা ভাড়া করেছি—

কিন্তু আলাদা বাসাভাড়া করার কারণ তো আমি একবারও জিজ্ঞেসা করিনি? আমি শুধু এইটুকুই জান্‌তে চেয়েছিলাম, এ কথা আমাকে তুমি জানিয়ে আসোনি কেন? তোমাকে একদিনের জন্যেও আমি ধরে রাখতামনা।

শিবনাথের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, কহিল, জানাতে আমার সাহস হয়নি শিবানী।

কেন?

শিবনাথ জামার হাতায় চোখ মুছিয়া বলিল, একে টাকার টানাটানি, তাতে প্রত্যহই বাইরে যেতে হতে লাগ্‌লো, পাথর কিন্‌তে, চালান দিতে ষ্টেসনের কাছে একটা কিছু—

কমল বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া দূরে একটা চৌকিতে বসিল, কহিল, আমার নিজের জন্যে আর দুঃখ হয়না, হয় আর একজনের জন্যে। কিন্তু আজ তোমার জন্যেও দুঃখ হচ্চে শিবনাথবাবু।

অনেকদিনের পরে আবার সে এই প্রথম তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিল। কহিল, ত্যাখো, নিছক বঞ্চনাকেই মূলধন ক'রে সংসারে বাণিজ্য করা যায়না। আমার সঙ্গে হয়ত তোমার আর দেখা হবেনা, কিন্তু আমাকে তোমার মনে পড়বে। যা' হবার তাতো হয়ে গেছে, সে আর ফিরবেনা, কিন্তু ভবিষ্যতে জীবনটাকে আর একদিক থেকে দেখবার চেষ্টা কোরো, হয়ত, সুখী হ'তেও পারবে। লক্ষ্মীটি, ভুলোনা। তোমার ভাল হোক্, তুমি ভালো থাকো এ আমি আজও সত্যিসত্যিই চাই।

কমল কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিল। আশুবাবু যে কেন তাহাকে সরাইয়া দিলেন, কি যে তাহার যথার্থ হেতু, এত কথার পরেও সে এতবড় আঘাত শিবনাথকে করিতে পারিলনা।

বাহিরে পা-গাড়ীর ঘণ্টার শব্দ শুনা গেল। শিবনাথ কোন কথা না কহিয়া পুনর্ব্বার পাশ ফিরিয়া শুইল।

ঘরে ঢুকিয়া রাজেন্দ্র চাপা গলায় কহিল, এই যে সত্যিই জেগে আছেন দেখ্‌চি। রুগী কেমন? ওষুধ টষুধ আর খাওয়ালেন?

কমল হঠাৎ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল, ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

রাজেন্দ্র অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া কহিল, চুপ্। ঘুম ভেঙে যাবে,—সেটা ভালো না।

না। কিন্তু তোমার মুটীরা কর্‌লে কি?

তারা লোক ভালো, কথা রেখেচে। আমার যাবার আগেই যম-রাজের মহিষ এসে আত্মা দুটো নিয়ে গেছে, এখন ধড়দুটো তাদের মিউনিসিপ্যালিটির মহিষের হাবালা করে দিতে পারলেই খালাস। আরও গোটা আষ্টেক শুমচে, কাল একবার দেখিয়ে আন্‌বো। আশা করি প্রচুর জ্ঞানলাভ কর্‌বেন। কিন্তু আরাম-চৌকির ওপর আমার কম্বলের বিছানা কই? ভুলে গেছেন?

কমল বিছানা পাতিয়া দিল। আঃ—বাঁচ্‌লাম, বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া রাজেন্দ্র হাতলের উপর দুই পা ছড়াইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল। কহিল, ছুটো-ছুটিতে ঘেমে গেছি,—একটা পাখাটাখা আছে নাকি?

কমল পাখা হাতে করিয়া চৌকিটা তাহার রাজেন্দ্রর শিয়রের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, আমি বাতাস কর্‌চি, তুমি ঘুমোও। রুগীর জন্যে দুশ্চিন্তার কারণ নেই, তিনি ভাল আছেন।

বাঃ—সব দিকেই সুখবর। এই বলিয়া সে চোখ বুজিল। (ক্রমশঃ)

মোটরে তিন হাজার দু'শো মাইল—শ্রীবিনয়কুমার দাস

ক্লক টাওয়ার হইতে ফোর্ট, বন্দর,

প্রথম পর্য্যায়

কলিকাতা হইতে বোম্বাই

১৮০০ মাইল

প্রথম দিন

BUZZ OFF!

পূজাবাড়ীর নহবতে আগমনীর প্রথম সুর বাজ্‌বার আগেই যাত্রীদের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন BUZZ OFF!! এবার যাত্রা বহু দূরে,—বোম্বাই হয়ে মাদ্রাজ।

রাস্তার বিজ্‌লী-বাতিগুলি পুরাদমে জ্বল্‌ছে, পাড়াপড়্‌সীরা তখনও অঘোরে ঘুমিয়ে, এ-রকম সময় আমাদের মোটর-খানি নিস্তব্ধে হাওড়া ছাড়্‌ল।

শ্রী রা ম পু রে ভোর হ'ল। পূব-আকাশটা ভাল করে রঙ্গে ওঠ্‌বার পূর্ব্বেই চন্দননগর। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ব্যাণ্ডেলের নির্জ্জন বনপথ, পুরাতন পর্ত্তু-গীজ গীর্জ্জা ইত্যাদি পার হয়ে মেমারীর দিকে যখন গাড়ী ছুটেছে, এমন সময় পিছনের সিট্ থেকে—এই যাঃ!

শ্রীমতীর অনেক-কিছু-ভরা এ্যাটাচি-কেস্‌টী ও আয়সী যে বাড়ীতে। পিছন ফিরে তাঁকে সান্ত্বনা দিলাম—ও-দিকে কিছুর অভাব নেই

মানচিত্র
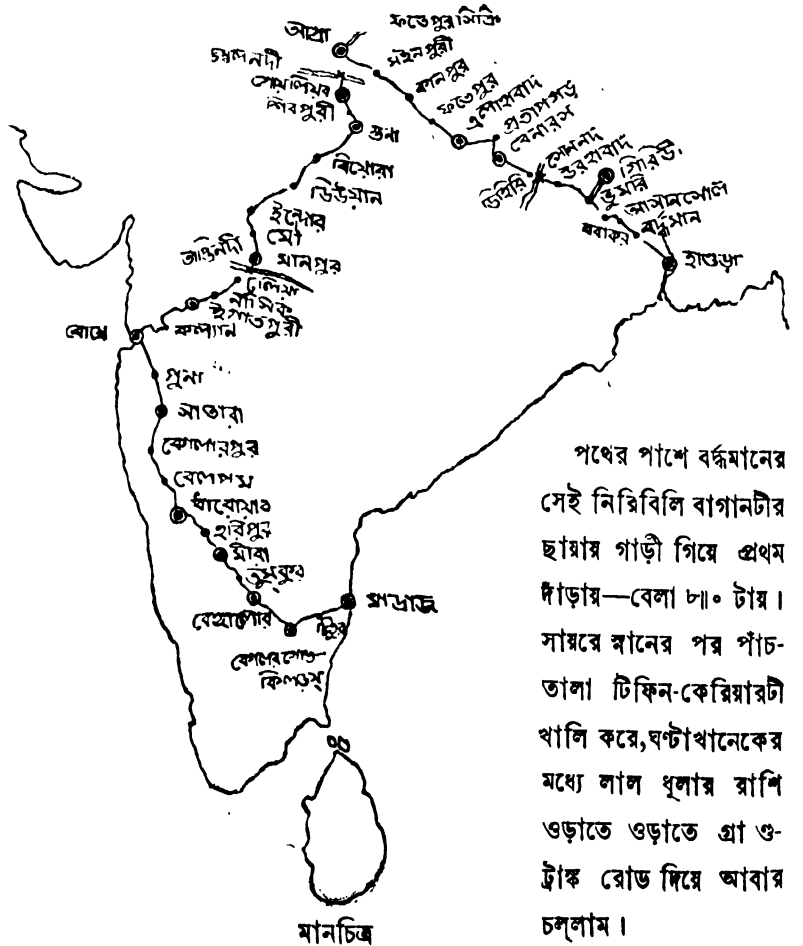
পথের পাশে বর্দ্ধমানের সেই নিরিবিলি বাগানটার ছায়ায় গাড়ী গিয়ে প্রথম দাঁড়ায়—বেলা ৮৷৷০ টায়। সায়রে স্নানের পর পাঁচ-তালা টিফিন-কেরিয়ারটী খালি করে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে লাল ধূলার রাশি ওড়াতে ওড়াতে গ্রা গু-ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে আবার চল্‌লাম।

সেলার্স-হোম প্রভৃতির সাধারণ দৃশ্য—বোম্বে

অগ্রগামী মোটর-সাইকল-বিহারী ইংরাজ-দলের ভীষণ বিপদ ঘটেছে দেখ্‌লাম—১১৪ মাইলে। গাড়ী থামান হ'ল। শুন্‌লাম তাঁরা তখন ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে যাচ্ছিলেন, এমন সময় একটা পাথরে লেগে গাড়ী ঠিক্‌রে, ঝোপ টপ্‌কে, এক শুক্‌নো ঝরণার ওপর গি'য়ে পড়েছে। ফলে শরীর রক্তাক্ত—গাড়ী চুরমার।

একজন বেশী রকম জখম হয়েছেন। বেচারী দাঁড়াতে পার্‌ছিলেন না—তবু হাসি মুখ। মালপত্র চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। উগ্র পানীয়ের অভাবে, ঠাণ্ডা জল দেওয়া হ'ল। আইডিন ও ব্যাণ্ডেজ? সেও বাড়ীতে এ্যাটাচি-কেসে রয়ে গেছে। · বেশ!

তাঁদের একটী সঙ্গী এগিয়ে পড়েছেন, সুতরাং দেরী না করে আসানসোলের দিকে জোরে গাড়ী ছাড়া হ'ল—তাঁকে খবর দিতে।

কিছুদূরে গিয়েই দেখা হ'ল। বন্ধুদের বিপদের কথা শুনে বেচারী হতভম্ব হয়ে ফির্‌লেন। আমরা আসানসোলে এসে, পেট্রলের দোকান থেকে AMBULANCE পাঠাবার জন্য ফোন করে দিলাম।

বন্ধুবর শ্রীযুত ঘোষ Steeringএ বস্‌বার জন্য, এবার আমাকে নেমন্তন্ন কর্‌লেন।

চড়াই উৎরাই আরম্ভ হয়েছে। শরতের চোখ-জুড়ান নীল আকাশের গায়ে ধুসর পাহাড়গুলি দেখা দিয়েছে, স্পষ্ট ও অস্পষ্টভাবে। রাস্তাটী কোথাও খুব সিধে, কোথাও বা এঁকে-বেঁকে লুকিয়ে পড়েছে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে। গাড়ী ঘণ্টায় ৪০।৪৫ মাইল বেগে ছুটেছে।

এত আনন্দের ভিতরও সেই সাইকল-যাত্রীদের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে মাঝে মাঝে মনটা নিরানন্দে ভরে উঠ্‌ছিল। তাঁদের দীর্ঘ সুখ-যাত্রা সুরু না হতেই যে শেষ! এ যেন সপ্তমীতে বিসর্জ্জন!

১৯৬ মাইলে নির্জ্জন নিমিয়াঘাটের ডাক বাংলোটী বাঁয়ে রেখে ডান দিকে পরেশনাথ পাহাড়ের উচ্চ শিখরের মন্দিরের চূড়াটী দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমরা ডুম্‌রীর (২০২ মাইলে) বড় রাস্তা ছেড়ে ডাইনে গিরিডীর পথ ধর্‌লাম।

মনটা যদিও খালি সাম্‌নের দিকে ছুটেছে, তবু, এখানে বাবা মার কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে এগুতে ইচ্ছা হচ্ছে না। ডুমরী থেকে গিরিডী ২৬ মাইল মাত্র।

গিরিডী পৌঁছিলাম বিকাল ৪॥০টায়। আজ মোট ২২৮ মাইল হ'ল। উশ্রী নদীর ধারে সেই সাদা বাড়ীটিতে একটী সান্ধ্য-উৎসবের সৃষ্টি হল—আমাদের আগমনে।

মেজভাই ধীরেন্দ্রকুমার ধীরভাবে কয়েক দিনের জন্য এখানে ঘর-সংসারে মন দিয়েছিলেন; কিন্তু এই মুসাফির দলের সঙ্গ দোষ তাঁকে ঘরছাড়া করবার জন্য ব্যাকুল করে তুল্‌ল। সুতরাং ড্রাইভার সেলামত মিঞাকে আগ্রা পর্য্যন্ত ট্রেনে পাঠিয়ে তাঁকে সঙ্গী করে নেওয়া হ'ল। ছোট মেয়ে হাসি এখানে তার ঠাকুরমার কাছে রইল। এখান থেকে চল্‌লাম আমরা মোট ৬ জন। লগেজও চল্‌ল অনেক।

ছোট ভাই প্রভাতের উৎসাহে, হাওড়া থেকে সন্ধ্যার ট্রেনে, "ভুলে-আসা" জিনিষগুলিও এসে পড়্‌ল—আমাদের এঞ্জিনিয়ার বাবুর মারফতে। তিনি ছুটীতে দেওঘর যাচ্ছিলেন।

দ্বিতীয় দিন

রাত্রে বৃষ্টি সুরু হ'ল। বাদ্‌লার শেষ রাতে সুধাংশু ভায়ার নিজের তৈরী বাঁশের বাঁশীটীতে রামকেলীর মূর্চ্ছনা যখন কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছিল—তখন আবার Buzz off!

ভোরের আলো-আঁধারে দূর থেকে দেখ্‌লাম, বাড়ীর আর সকলে, আমাদের চলন্ত গাড়ীটীর দিকে তখনও চেয়ে গেছে। আর নানুকুমে সুবর্ণরেখার ধারে সেই বাংলোটীতে সব প্রিয়জনেরা আছেন!—আমার শ্রীমতীই এই বিভ্রাটের মূল। কোথায় তাঁর বোনটী ছুটীতে বাড়ীতে গিয়ে একটু বিশ্রাম-সুখ সম্ভোগ করবেন—তা না, এ কি?

ফাঁকা রাস্তা। দেখ্‌তে দেখ্‌তে বারহি, চৌপারাণ, পার হয়ে চোবি (২৮৫ মাইল) এসে পড়লাম। গয়ার রাস্তা ডানদিকে।

নিরালা পথের ধারে বনভোজন হ'ল। খাবার গিরিডী থেকে তৈরী করিয়ে আনা হয়েছিল। তার পর সেরঘাটী ছেড়ে ঔরঙ্গাবাদে পেট্রল ভরে নেওয়া হ'ল—আর সঙ্গে

কাশীর সাধারণ দৃশ্য

রয়েছেন। মায়ের প্রাণটী হয় ত তখন এই অশান্ত সন্তানদের কল্যাণ-কামনায় রত!

মেঘলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীরগুলিকে একটু কাঁপিয়ে তুল্‌তেই সুধাংশু ভায়া ক্ষেপে উঠ্‌লেন—"overcoat চাই। হাওড়ায় তার করা হোক"। ভাগো সেদিন রবিবার—বাগোদরের টেলিগ্রাফ অফিসে উঁকি ঝুঁকি মেরে তিনি গম্ভীর-ভাবে ফিরে এসে—গাড়ীতে বস্‌লেন। গাড়ী চল্‌ল।

হাজারিবাগের সাদা রাস্তাটী দেখে সেজদির মনটা যেন একটু কেমন কেমন করছে মনে হ'ল;—ঐ রাস্তাটাই তো হাজারিবাগ হয়ে পাহাড়ের গা ঘুরে রাঁচীর দিকে চলে নেওয়া হল ডজন দুয়েক সিদ্ধ ডিম ও ফ্লাস্কে গরম চা। বারো মাইল এসে শোন-ইষ্ট-ব্যাঙ্ক। শোন নদ এখানে তিন মাইল চওড়া। যদিও জল কম, কিন্তু নরম বালার চড়া যেন—অফুরন্ত। কাজেই সকলের মতে রেলওয়ে-ট্রাকে গাড়ী পার করা গেল।

সহকারী ষ্টেশন মাষ্টারকে অনেক তোয়াজ করে গাড়ী-খানি বুক্ করা গেল। অঙ্গীকার কর্‌লেন সাম্‌নের মালগাড়ীতে ট্রাক্‌টী এখনি জুড়ে দেবেন। আমরা নিশ্চিন্ত মনে মালগাড়ীর ছায়ায় কম্বল পেতে চিঠি লিখ্‌তে আরম্ভ কর্‌লাম—'প্রাণপণে'।

অ্যাঁ—মালগাড়ী যে ছেড়ে দিলে? ছুটে পাশের সিগ্‌নল কেবিন থেকে 'ফোন' কর্‌লাম—ব্যাপার কি? উত্তর হ'ল—"ট্রেনটা বেজায় লম্বা-বাড়্‌তি গাড়ী জুড়তে সাহস হোলো না।" উপায় নেই। এঁরা তো আমাদের নিকট আত্মীয় নন্—সুতরাং পরের ট্রেনটার জন্য এক ঘণ্টার ওপর অপেক্ষা কর্‌তে হ'ল।

নীচে নদী ও দূরে রোটাস্‌গড়ের পাহাড়গুলি দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেলা তিনটায় সকলে মিলে, সেই খোলা মোটর ট্রাকখানি চ'ড়ে—'পরপারে' এলাম।

উট ও গরুর পালের সঙ্গে ঘন ঘন দেখা হচ্ছে—আর দুই চারটি জীব দলছাড়া হয়ে হঠাৎ গাড়ীর সাম্‌নে এসে পড়াতে মাঝে মাঝে সংঘর্ষের আশঙ্কা হতে লাগ্‌ল। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, সুদূর রংপুর ইত্যাদি স্থানে প্রাণীগুলিকে তারা বিক্রি কর্‌তে যাচ্ছে। পথের ধারের নিমগাছের নীচের ডালপাতাগুলি প্রায় নিঃশেষ কর্‌তে কর্‌তে এই উটের সারগুলি চলেছে।

আশে-পাশে গ্রামগুলির সন্ধ্যা-প্রদীপ মিটি মিটি করে জ্বলে উঠ্‌ল। পথের ধারের ইঁদারাগুলি থেকে হিন্দুস্থানী
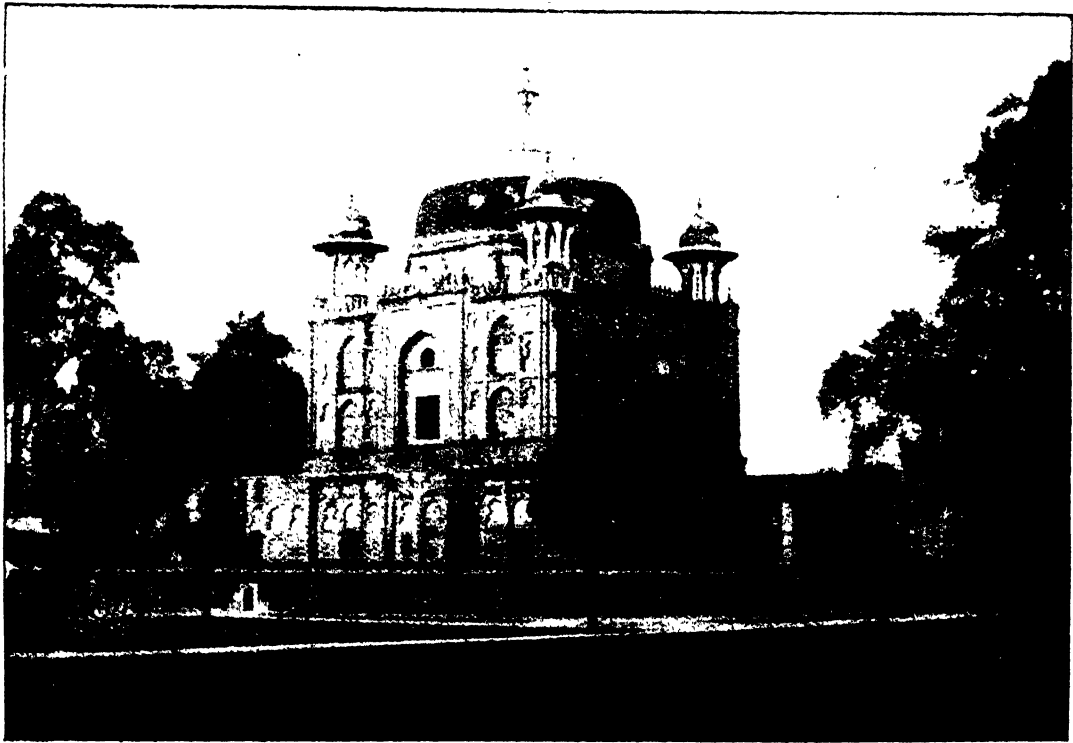
খসরুবাগ—এলাহাবাদ

এই রেলওয়ে পুলের উপর দিয়ে মোটর যাতায়াতের ব্যবস্থার জন্য Automobile Association of Bengal থেকে suggestion পাঠান হয়েছে। দেখা যাক্ কি হয়।

তার পর সাসারামে সের সাহের সমাধি-মন্দির দূর থেকে দেখ্‌লাম। মনে পড়্‌ল এই সুদীর্ঘ সুন্দর পথটি তাঁরই তৈরী—আর তাঁর সময়েই না কি টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত!

এবার মোহানিয়ার দিকে গাড়ী চলেছে। ৩৯৫ মাইলে কর্ম্মনাশা নদীর পুল এল।

বধূরা মাথায় বড় বড় গাগরী করে জল নিয়ে ফির্‌ছে। ওস্তাদ দিনুদার প্রিয়—"পানিয়া ভর্‌নেকো যাওয়ে ও ব্রজনারী" গানখানি তখন খুব মনে পড়্‌ছিল, কিন্তু গাইতে সাহস হচ্ছিল না—পিছনের ভয়ে! তা'ছাড়া ব্রজধাম যে এখনও বহু দূরে—এই তো সবে মোগলসরাই!

সাদা ধব্‌ধবে ও তেলা-চক্‌চকে concreteএর রাস্তাটী আমাদের বেণারসের দিকে নিয়ে চল্‌ল। মনে হচ্ছিল—সব পথটী যদি এ-রকম হত! কিন্তু তা তো হয় না। তুমি যে —"বিষাদের পাশে রেখেছ হরষ, আঁধারের পাশে আলো।"

সন্ধ্যা ৭টায় কাশীধাম। আজ মোট ২৪৪ মাইল এলাম। রাত্রিটা ঘোষভায়ার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে কাটান গেল।

তৃতীয় দিন

সকাল ৭॥০টায়—সুদীব সিধে রাস্তা না ধরে—যৌনপুর-প্রতাপগড় পথে মাইল ৫০ ঘুরে—বেলা দুইটার সময় ফাঁপামৌ পুলের উপর দিয়ে এলাহাবাদ পৌঁছান গেল।

এলাহাবাদ। ভার্গাজী বড় অমায়িক লোক। তাঁর হোটেলে ডেরা নিলাম। তখনি গাড়ী Gilbert কোং'র Ford Service Stationএ নিয়ে যাওয়া হল। ছুটীর দিন কারখানা প্রায় বন্ধ, তবু Mr. ও Mrs. Gilbert নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে, আমাদের ফর্দ্দমত—গাড়ী সাফ-সুতরো, তেল, জল, হাওয়া ইত্যাদি দেওয়ার কাজগুলি যত্নের সহিত করিয়ে দিলেন অল্পক্ষণের মধ্যে—ও বিনা পারিশ্রমিকে।

তাজমহল—আগ্রা

United Provinceএর Road map কেনবার জন্য Allahabad Automobile Associationএর সেক্রেটারী মহাশয়ের কাছে Mr. Gilbert নিয়ে গেলেন; কিন্তু ম্যাপ যোগাড় করে দেওয়ার ব্যস্ততার চেয়ে, তাঁর আমাদের সম্বন্ধে অমনোযোগের ব্যস্ততাই যেন প্রবল দেখলাম। স্বদেশবাসীর এ-সব কাজে এই রকম উদাসীনতা বড়ই লজ্জাকর মনে হচ্ছিল। ভদ্রলোকটীর কাছ থেকে ম্যাপের চেয়ে U. P. র পথের একটু পরিচয় ও কিঞ্চিৎ উৎসাহ-বাণী আমরা আশা করেছিলাম। যা'হ'ক Mr. Gilbert কারখানায় ফিরে এসে তাঁর নিজের ম্যাপখানি আমাদের দিয়েছিলেন।

সন্ধ্যায় সহরটি ঘুরে নিয়ে সঙ্গমের কাছে যাওয়া হ'ল। যমুনার কূলটী নিস্তব্ধ। কালার বাঁশীর পরিবর্ত্তে সঙ্গী চশমা-ওয়ালার বাঁশী করুণ সুরে বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোষজার usual নাসিকাধ্বনি—ছি ছি যমুনা কি ভাবল?

চতুর্থ দিন

সারা রাত্রি ঝুপ ঝাপ বৃষ্টি। শেষের দিকটা আরও চেপে এল। কিন্তু যাত্রী-যাত্রিণীদের উৎসাহ-অনল সহজে নেববার নয়। রাত্রি ৪॥০টায় স্নানাদি সেরে নিয়ে তাড়াতাড়ি Luggae-carrierএ মালপত্র বাঁধা হল। আমাদের বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে ভর্গাজী মুচ্‌কে হেসে বল্লেন "So this is your pleasure trip?" কিন্তু তাঁর হাসিটী মুখে মিলিয়ে যাবার আগেই আমাদের গাড়ী অন্ধকারে তীর বেগে পাড়ী জমালে—কানপুরের দিকে।

বৃষ্টিটা আজ যেমন ঝম্‌ঝমে—মেঠো হাওয়াটাও তেমনি কন্‌কনে। গদির উপরে বিছান রঙ্গীন কম্বলগুলি আজ গায়ের ওপর শোভা পাচ্ছে। Side curtainগুলি সব আঁটা। Wind screenটী জোর করে সাঁটা খাঁজে-খাঁজে।

পথটাও খুব পথিক-বিরল। গাড়ীর speedometreএ ৪৫।৫০।৫৫ পর্য্যন্ত দেখাচ্ছে। ইচ্ছা হচ্ছে আরও জোরে—আরও জোরে! এ যেন একটা বিকট নেশা। মনে হয়—মিনিটে মাইল কেন? আধ মিনিটে গেলে ভাল হয়। নূতন মডেল Ford গাড়ীটীর আজ অগ্নি-পরীক্ষা!

পিছন থেকে কে বল্লেন—"আর কেন? Accelator থেকে এবার পাখানি দয়া করে সরাও। যাত্রা কি তাঁদের মত এখানেই শেষ করবে?" সুধাংশুভায়া

হেসে গেয়ে উঠলেন—"আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে!"

দেখতে দেখ্‌তে মুরতগঞ্জ, ছেড়ে ফতেপুরে এসে গাড়ী থামান হ'ল। পিছনের লগেজগুলি ক্যানভাস ঢাকা সত্ত্বেও ভিজে ঢোল হয়ে গেছে। সেগুলি ভাল করে আবার বেঁধে নেওয়া হচ্ছে, এমন সময় সাম্‌নের বাড়ী থেকে ওদেশী একটী ভদ্রলোক ভিজতে ভিজতে বেরিয়ে এসে বল্‌লেন—"Can I do anything for you?" ধন্যবাদ দিয়ে—এগুলাম। বিদেশীর মধুর ব্যবহারটী সকলের বড্ড ভাল লাগল।

আরও ৩০ মাইল—আজফ্‌পুর। সেখান থেকে ২০ মাইল পরে এল কানপুর। হাওড়া থেকে ৬২৪ মাইল। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে সহরটী দেখে শুনে—পেট্রল বোঝাই করে—আবার রওনা হওয়া গেল—সেই দুর্য্যোগে।

মাইল দশেক এগিয়ে, পেছনের একখানি টায়ার বেজায় রকম ফেটে গিয়ে অচল হ'ল, কোলিয়ানপুরের Experimental ফারমটীর সামনে। ভিজে ভিজে Stepney লাগিয়ে নিয়ে চল্‌লাম।

৫১ মাইলের পর গুরসাহিগঞ্জ এল। সেবার মোটরে দিল্লী যাবার সময় রাত্রের বিশ্রামটুকু এখানে করেছিলাম। তিন বৎসর পূর্ব্বের এক কন্‌কনে শীতের রাতটীর কথা আজ মনে পড়ছে। আর মনে পড়ছে, সেই ফুটফুটে ছোট্ট মেয়ে "রূপরাণী"র কথা, যে তার কচি হাতের ব্যস্ত-নিপুণতা দিয়ে সুদূর প্রবাসে এই ক্ষুধার্ত্ত মুসাফিরদের গরম পুরী-তরকারী খাইয়ে তৃপ্ত করেছিল।

তার বাবার পুরীর দোকানটী এখনও সেই রকমই রয়েছে—কিন্তু সেই ছোট মেয়েটী? তার স্থানটী আজ শূন্য দেখ্‌লাম। তার খবর নেবার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল—কিন্তু যদি তার কুশলের পরিবর্ত্তে, কোন ব্যথার সমাচার থাকে? তার গরীব বুড়ো বাপ—হয় ত একটু ভুলে আছে;—না থাক্‌—জেনে কাজ নেই!

আজকার সন্ধ্যাটা শ্রাবণের অশ্রুঝরা সন্ধ্যার মত মনে হচ্ছে। যেদিকে চাই—খালি অন্ধকার। আকাশে অন্ধকার, বাতাসে অন্ধকার—সারা দুনিয়াটাতে অন্ধকার যেন ঘনভাবে জমাট বেঁধে আস্‌ছে। আর সেই অন্ধকারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে কর্‌তে আমাদের গাড়ীটা একটা পাগলা দৈত্যের মত ভীমবেগে ছুটেছে—ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে চোখ দু'টো জ্বেলে!

অনেক পরে পরে এক একটা গ্রাম বা সহর পাওয়া যাচ্ছে। আবার মাঠ—আবার অন্ধকার! কসে পাশের পর্দ্দাগুলি আঁটা সত্ত্বেও সকলে ভিজে যেন "মাদ্রাজী আমসত্ব"—কেন না এত দুর্য্যোগেও সকলের মনের মিষ্টতা পুরো রকমই ছিলো।

দিল্লীর সেই পরম বিজ্ঞ ডাক্তারটীর কথা আজ মনে পড়ছে, যিনি গম্ভীরভাবে বলেছিলেন—"মশাই, ট্রেন কি ছিল না?" সে কথার জবাব সেদিন দিতে পারিনি—আজও দিতে পারব না!
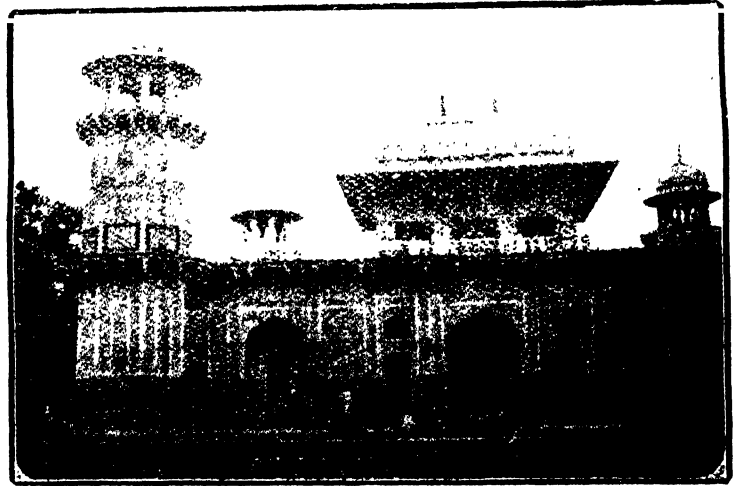
ইদ্‌মদ্‌উদ্দৌলার সমাধি

বেওয়ার, ভোঁগাও, মইনপুরী ছাড়িয়ে সিখোয়াবাদ এল ৭৬০ মাইলে। আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—যে-রকম করে হোক, আজ রাত্রে আগ্রা পৌঁছিতেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে এঞ্জিনটারও শক্তি-পরীক্ষা হয়ে যাচ্ছে। কোন্ সেই রাত থাক্‌তে যাত্রা করা হয়েছে—কয়েকবার অল্পক্ষণ থামা ছাড়া এই ২৭৩ মাইল বেচারী এক টানা চলে আস্‌ছে। আর ৩৭ মাইল ছুটতে পার্‌লেই ব্যস্—আজকার মত ছুটী!!

ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে যমুনার ধারে এসে পড়লাম। পার হলাম, ষ্ট্রেচি পুলের উপর দিয়ে। আগ্রা—

রাত্রি ১০॥টায়। আজ মোট ৩১০ মাইল আসা হল। মন্দ কি ?

আগ্রা হোটেল। পূজার ছুটী—বজায় ভীড়। হল্, বারাণ্ডার ফাঁকা যায়গাগুলি পর্য্যন্ত ঘিরে কামরায় পরিণত করা হয়েছে। সারি সারি লোহার খাট। কয়েকটী বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে এখানে দেখা হ'ল। সেলামতও গিরিডী থেকে ট্রেনে এসে এখানে আমাদের সঙ্গে মিল্‌ল।
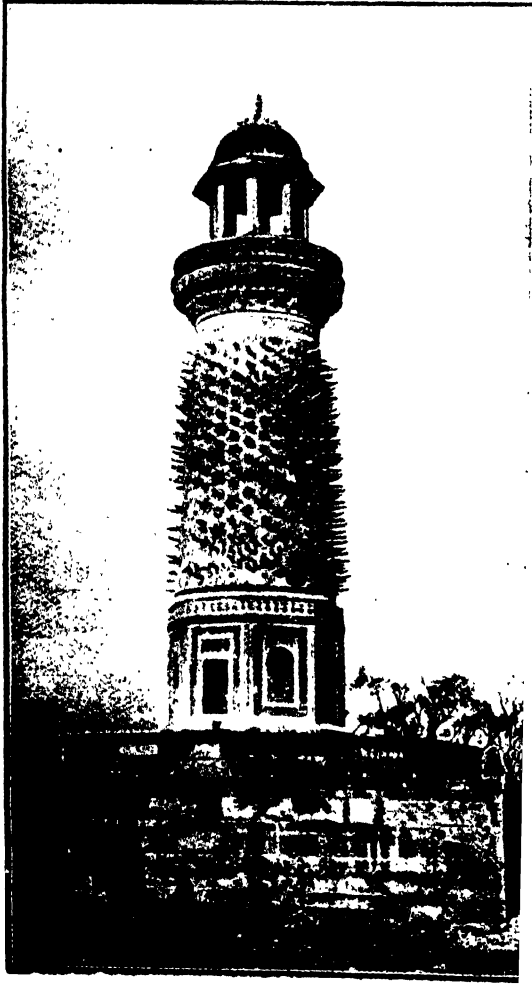
হিরণ মিনার (ফতেপুর সিক্রি)

দশমীর ভোর। তখনও বৃষ্টির বিরাম নেই। তাই বাদল ধারার সুরে সুর মিলিয়ে কে আস্তে আস্তে গাইছেন—

"আজ সকাল বেলার বাদল আঁধারে
আজ মনের বীণায় কি সুর বাঁধা রে
ঝর ঝর বৃষ্টি কলরোলে
তালের পাতা মুখর করে তোলে
উতল হাওয়া বেণু বনে লাগায় ধাঁধা রে।"

কম্বলের ভেতর থেকে মুখ বার করে ঘোষজা চেঁচিয়ে উঠলেন—Buzz off! এখানে কেউ নেই, খালি শাল-বন—Hurry up children! Off from your nests! উঃ—কি বেরসিক ?

কিন্তু আজ তাঁর কথা শোনে কে—সুধাংশুমোহনের বাঁশীও সঙ্গ নিলে—গান চল্‌ল—

"মন যে আমার পথ হারানো সুরে
সকল আকাশ বেড়ায় ঘুরে ঘুরে
শোনে যেন কোন্ ব্যাকুলের করুণ কাঁদা রে!"

তাজমহল। তোমায় দেখে যে আশ মেটে না। শরতের প্রাতে, মাধবী রাতে, গোধূলির ম্লান ছায়ায়—সব সময়ই তোমার রূপ যে অপরূপ! আজ এই ঘনঘটার দিনে, তোমায় দেখাচ্ছে—যেন একটী সদ্যস্নাতা শুক্ল-বসনা নবীনা সুন্দরীর মত!

তোমার দিকে তাকিয়ে কি আর দেখ্‌ব? তোমার অঙ্গসৌষ্ঠব, তোমার কান্তি, সে তো দুনিয়ার সেরা—জগৎ-বিখ্যাত। আজ খালি মনে পড়্‌ছে—একটি মহান্ প্রাণ, একটি মহান্ প্রেমের কথা। বেগম মমতাজ, নারী জগতে তুমিই ধন্যা! আর ধন্য সেই প্রেমিক—যে মনের লুকান জিনিষটীকে ব্যক্ত করতে পেরেছে—এ-রকম অতুলনীয় ভাবে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেলা একটায় হোটেলে ফেরা গেল। স্নান ও আহারাদি সেরে আগ্রা ফোর্টে। তখনও অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ঝরছে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘুরে ঘুরে ভাল করে সব দেখে নেওয়া গেল। কতই দেখ্‌লাম—কিন্তু মস্‌জিদের পাশে সেই ছোট ঘরখানি দেখে দুঃখী শাহজাহানের বুক-ফাটা ব্যথার কথা খালি মনে পড়্‌ছে! দুনিয়ার মালিক তাঁর খাতার পাতাগুলি কি নির্ম্মম ভাবেই উল্টে যান—সকলের অজ্ঞাতসারে!

মানবের সব দর্প, সব গর্ব্ব, সম্রাটের বিশাল সাম্রাজ্য ছায়াবাজীর মত নিমেষে শূন্যতায় কিরূপ মিশে যায়, তা চোখের সামনে আজ দেখ্‌তে পাচ্ছি। আজ যেন দেখ্‌ছি

থালি একটা নীরব শূন্যতা—যমুনার কূলে কূলে ছুটে বেড়াচ্ছে।

পঞ্চম দিন

পরদিন। বৃষ্টি থেমেছে—তবু আকাশখানির উপর দুরন্ত কাল মেঘের দল ছুটোছুটী করছে। আমরাও খুব সকালে, লাল রাস্তাটী ধরে ছুট দিলাম—২৫ মাইল দূরে ফতেপুর সিক্রির দিকে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ছোট পাহাড়ের উপর আকবর সাহের স্বপ্ন-রাজ্যের নহবতখানার প্রথম ধাপটীর সাম্‌নে এসে আমাদের গাড়ীখানি দাঁড়াল।

আগ্রার মত এখানেও গাইড এসে আমাদের আক্রমণ কর্‌ল। এদের সাহায্যে শীঘ্র দেখা শেষ হয় বলে, রফা করে একজনকে সঙ্গে নেওয়া হ'ল। গাইড-বুকের সাহায্যেও দেখা চলে, তবে তাতে সময় বেশী যায়—কারণ এখানে কোনো জায়গা বা বাড়ী চিহ্নিত করা নেই—যার দ্বারা গাইড বই দেখে যাত্রীরা কোন্‌টা "যোধ বাই প্রাসাদ" বা কোন্‌টা "বীরবলের আস্তানা" নিজেরাই চিনে নিতে পারেন। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এখানে এ বিষয়ে মনোযোগী হলে দর্শকের অনেক সুবিধা হয়।

ঘণ্টা দুই ঘুরে ও "পাণ্ডা সাহেবকে" তার পারিশ্রমিকের দ্বিগুণ বকিয়ে—নহবতখানার উচ্চ চূড়ায় গিয়ে সকলে বস্‌লাম। ফুর্‌ফুরে বাতাসে অল্পক্ষণেই সব ক্লান্তি দূর হল। এখানে হাওড়ার দুটী বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা—ফলে বিপুল 'পুলক-ধ্বনি'!

৪৫ মিনিটের মধ্যে দলটী সিকান্দারায় এসে হাজির। আকবর সাহের সমাধি-মন্দির। তাঁর মহান প্রাণের মহানতম পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সেই আড়ম্বরহীন শুভ্র মর্ম্মর-প্রস্তরের সমাধিটীতে।

যিনি ইচ্ছা কর্‌লে জগতের উৎকৃষ্ট মণি-মাণিক্যে তাঁর সমাধি উজ্জ্বল করাতে পার্‌তেন—তিনিই বল্‌লেন এটীকে এরূপ 'সামান্য' ভাবে তৈরী কর্‌তে। এই মাত্র তাঁরই আদেশে গঠিত বহুমূল্য মুক্তাখচিত ফকিরের সমাধি দেখে এলাম ফতেপুর-সিক্রিতে।

সত্যই সম্রাট তিনি—যিনি সম্রাট হয়েও দীন ফকির! তাঁর নানা সদ্‌গুণ ও উদারতার কথা ভাবলে চোখে জল আসে।

আজ মনে পড়ছে, নাটকের সেই দরবারটীর ছবি। স্বদেশ-প্রেমিক রাণা প্রতাপ বন্দী হয়ে সম্রাটের সুমুখে। সম্রাট বল্‌ছেন "রাণা, তুমি মাত্র মুখে আমার বশ্যতা স্বীকার কর—তা'হলেই আমি তোমার বন্ধু";—কিন্তু রাণা নিজের মুক্তির চেয়ে দেশের স্বাধীনতা যখন চেয়েছিলেন—তখন সেই উদার-প্রাণ চেঁচিয়ে বলে উঠেছিলেন—"প্রতাপ, তোমার বীরত্ব দেখে ভেবেছিলাম, তোমার আসন আমার সম্মুখে—এখন দেখছি, তোমার আসন আমার উচ্চে—বহু উচ্চে!" কিন্তু আজ—?

তার পর সিকান্দারা ইত্যাদি অনেক কিছু দেখে

হজরৎ সেলিম চিস্তি ফকিরের সমাধি

হোটেলে ফির্‌লাম। হোটেলের মালিক দত্ত মহাশয়ের নিজের তত্ত্বাবধান ও যত্নে এত বেলাতেও ঘৃত সংযোগে গরম ভাত ও ৮।৯টা তরকারী আমরা পেয়েছিলাম; এবং শেষে দধি মিষ্টান্নেরও অভাব হয়নি।

তাঁদের আদর-আপ্যায়নে তুষ্ট হয়ে—হোটেলের দীর্ঘায়ু কামনা কর্‌তে কর্‌তে আমরা আগ্রা ছাড়্‌লাম। প্রোগ্রাম মত ধীরেন্দ্রকুমার ট্রেণে দিল্লী হয়ে হাওড়া ফির্‌লেন—ফ্যাক্টরীর কাজের তাড়ায়—হাওড়ার বন্ধু দুটীকে সঙ্গী করে। সেলামত আমাদের সঙ্গে চল্‌ল।

আগ্রা বা ফতেপুর-সিক্রিতে যা সব দেখ্‌লাম তার বিবরণ দিয়ে আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি কর্‌বার ইচ্ছা নাই। তবে এটুকু বলে রাখি যে, আগ্রা ও আশে-পাশের সেরা জিনিষগুলি ভাল করে দেখে সম্ভোগ কর্‌তে হ'লে—আমাদের মত এ রকম আমেরিকান ধরণে দেখ্‌লে চলে না। একটু বেশী করে সময় নিতে হয়। অবশ্য আমাদের এ tripটা কতকটা "লম্বা দৌড়" দেওয়া গোছের—তাই ভাল করে দেখ-শোনাটা ভবিষ্যতের জন্য মুলতবী রাখা যাচ্ছে।
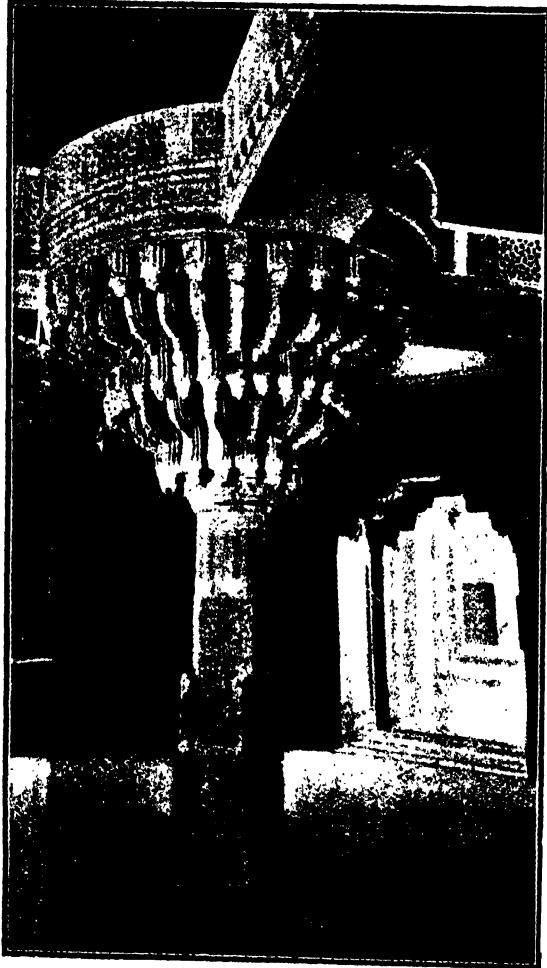
'খাসমহল'—(ফতেপুর সিক্রি

এখানকার সোনা রূপার embroidery, কার্পেট, আসল ও ঝুটা শ্বেত প্রস্তরের আশ্চর্য্য রকম সৌখিন কারুকার্য্য, দেশের একটা গৌরবের জিনিষ। তা ছাড়া ভাল জুতার কারখানা ও তুলার কলও অনেকগুলি আছে।

কানপুরে কাটা টায়ারটা vulcanize করিয়ে ও পেট্রল ভরে নিয়ে, আগ্রা গোয়ালিয়র পথে পড়লাম বিকাল ৩-২০ মিনিটে। আগ্রা পর্য্যন্ত পথটা জানা ছিল—এবার সম্পূর্ণ অজানা পথে চলেছি। তবে A. A. B Guide Book, Route chart, ও Survey of Indiaর ম্যাপ ইত্যাদি সঙ্গে থাকায় ঠিক পথ খুঁজে নিতে বেশী মুস্কিল হচ্ছে না। দূরে রেললাইনটাও কতকটা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

তবে এক মস্ত মুস্কিল ঘটাচ্ছে—অসংখ্য গরু ও মহিষের পাল। ৮০০ মাইলের ওপর আসা হল, কিন্তু মিনিটে মিনিটে গরুর পাল এ-রকম পথ আট্‌কায় নাই আর কোথাও।

মোটরে চড়ে গরুর গাড়ীর মত যাওয়াটা সেলামত মিঞার মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না, তাই সে মাঝে মাঝে বিষম হুম্‌কি দিয়ে উঠছিল ও বারণ না করলে, তার হাতের মজবুত লাঠিটি হয় ত গরুর দলের অনেক অধিকারীর পিঠে পড়্‌ত।

এই হাজার হাজার গরু ও মহিষ শুন্‌লাম আগ্রায় বিক্রি হতে যাচ্ছে। এ বৎসর অনাবৃষ্টির জন্য এ-ধারের চাষিদের বড়ই দুরবস্থা—তাই চাষের প্রধান সম্বল গরু ও মহিষগুলি বিক্রি করে পরিবারবর্গের আধ-মরা প্রাণগুলি কোনমতে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার জন্য এই ব্যবস্থা। এগুলি প্রথমে কসাই-খানায় যাবে—পরে চামড়াগুলি যাবে ট্যানারীতে!...উত্তম! অতি সন্তর্পণে ৩৮ মাইল আসা হ'ল—জাজাও—মানিয়া পার হয়ে ঢোলপুরে। রাস্তার পাশেই এক মস্ত মেলা বসেছে। এখানেও গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি বিক্রি হচ্ছে দেখ্‌লাম। এখানকার রাজপ্রাসাদ, দুর্গ ইত্যাদি দর্শন-যোগ্য; কিন্তু সাম্‌নেই চম্বল নদী, তাই আর কোথাও যাওয়া হ'ল না।

সন্ধ্যার ঠিক পূর্ব্বেই চম্বলের তীরে এলাম। এখন পুল নেই। নৌকায় পার হতে হবে। একটী ইংরাজ টুরিষ্টের সঙ্গে এখানে দেখা হ'ল - ঝান্সির ওদিক থেকে আস্‌ছেন। তাঁর কাছ থেকেও সাম্‌নের পথের সংবাদ নেওয়া হ'ল।

ও-পারের নৌকার জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। সুধাংশু ভায়া নদীতে হাত মুখ ধুতে গেলেন—কিন্তু ফিরে এলেন চোখ দুটী প্রায় কপালে তুলে। তাঁর গমনে খুসী না হয়ে, একটী মস্ত প্রাণী না কি জলটাকে ভীষণ ভাবে আন্দোলিত করে—গভীরে ডুব দিয়েছে।

শুনে সকলে হেসে উঠ্লাম, কিন্তু মাঝ-নদীতে বন্দুকধারী কুমীর-শিকারী-দলের সঙ্গে দেখা হতে—তাঁর কথায় কতক বিশ্বাস হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোষজা নৌকা থেকে গাড়ীর উপর গিয়ে বস্‌লেন—গম্ভীর ভাবে। অনেক টানাটানি করেও গাড়ী থেকে নৌকায় নামাতে পারা গেল না। পরে যখন নৌকার অদূরে সত্যসত্যই একটী সুবৃহৎ প্রাণী ভেসে উঠ্‌ল, তখন দলের একজন চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—ঐ—রে—এ—এ—অর্থাৎ 'এবার বুঝি ধর্‌লে।' যা হ'ক ও-পারে গিয়ে যখন মাথা গুণে দেখা হ'ল—ছ'জন "ঠিক্ আছে", তখন সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে—গাড়ী নামাবার ব্যবস্থায় লেগে যাওয়া গেল।

নরম বালী। গাড়ী নামার চেয়ে না নামাও ভাল ছিল মনে হচ্ছে। মাঝি-মোল্লা ও পথিকের দল হেঁইও হেঁইও শব্দে টানাটানি আরম্ভ কর্‌লে। এঞ্জিনও গোঁ গোঁ শব্দে টান্‌ছে—কিন্তু গাড়ী যে নড়ে না। ঘোষজা Steeringএ ছিলেন—আর আত্মসম্বরণ কর্‌তে পার্‌লেন না—চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—"এই জন্যই তো আগ্রা থেকে সকাল সকাল বেরুতে বলেছিলাম।" তাঁর মেজাজ দেখে আমরাও চাকায় হাত লাগালাম। গাড়ী চলল। এবার মাঝিদের সন্তুষ্ট কর্‌তে অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও—অসন্তুষ্ট রেখে, আমরা একাদশীর রূপালী জ্যোৎস্নার বন্যায় গা ভাসান্ দিলাম।

সন্ধ্যা ৭॥০টা। গোয়ালিয়র এখনও ৩০ মাইল। পথটা বড় নিরিবিলি লাগ্‌ছে। উঁচু নীচু বালিয়াড়ী—গাছ-পালা খুব কম। মাঝে মাঝে উলু বা বেনার ঝোপ। কাছে বা দূরে গ্রামের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। মরুভূমির মত খালি ধূ ধূ—সকলে নীরবে শান্ত প্রকৃতির শান্তিময় সৌন্দর্য্যে মগ্ন। জীবনের এই নীরব মুহূর্ত্তগুলি কেন রোজ আসে না? এলে হয় ত অনেক ভাল হ'ত!

গাইড বইয়ে লিখ্‌ছে মাইল দশেক এগুলে একটা গ্রাম পাওয়া যাবে, কিন্তু দশ মাইল এসেও কোন জনমানবের সাড়া-সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে না। দূরে খালি ময়ূরদলের মাঝে মাঝে অদ্ভুত চীৎকার শোনা যাচ্ছে। সাদা খরগোসগুলি 'বেপরোয়া' ভাবে রাস্তার ধারে লুকোচুরী খেল্‌ছে ও গাড়ীর Head lightএর তীব্র আলোয় ধরা পড়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় রয়ে যাচ্ছে। এমন সময় একটী মাঝারি গোছের নেক্‌ড়ে বাঘ—একবার আলো দুটীর দিকে উদাসভাবে চেয়ে রাস্তার এধার থেকে ওধারে গম্ভীরভাবে চলে গেল। ঘোষজা Steeringটা কঠিন মুষ্টিতে ধরে ততোধিক গম্ভীর-ভাবে চুপি চুপি বল্লেন—"দেখ্‌লে ভায়া? ওই জন্যই তো সকাল সকাল বেরুতে বলেছিলাম।" তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মেয়েদের মধ্যে কে বল্লেন—"কারণ?—'যেখানে সন্ধ্যা হয় সেইখানেই বাঘের ভয়' বোলে না কি?" তার একটু পরেই এক বুড়ো পাথককে বন্দুক নিয়ে সেই পথে একলা যেতে দেখ্‌লাম।

রাত ৯॥০টায় গোয়ালিয়র Light Railwayর পাশের রাস্তা ধরে সহরে ঢুকলাম। হঠাৎ একটি ভদ্রলোকের কথা মনে হল—যাঁর সঙ্গে বৎসরখানেক পূর্ব্বে এক ঘণ্টার জন্য ট্রেণে আলাপ হয়েছিল। তাঁর কার্ডখানি নোট-বহির একধারে বেদরকারী কাগজের টুক্‌রার সঙ্গে পড়ে ছিল।

উটের গাড়ী—দিল্লী

সেখানি' বাতির আলোয় খুঁজে বার করে—সাম্‌নের একটী বাড়ীতে মিঃ প্রধানের ঠিকানা জিজ্ঞাসা কর্‌লাম। তাঁরা রাস্তার অপর পাশের বাড়ীখানি দেখিয়ে দিলেন।

তার পরমুহূর্ত্তে প্রধান সাহেব গাড়ীর পাশে এসে হাজির। যেন এক ভৌতিক কাণ্ড ঘটে গেল! এবার তাঁর বাড়ীতে ওঠবার জন্য বিশেষ অনুরোধ। আমরা মেয়েদের নিয়ে পারতপক্ষে কারও বাড়ী উঠব না এ রকম স্থির ছিল, সুতরাং তাঁকে অনেক বুঝিয়ে পরিত্রাণ পেলাম। তিনি সঙ্গে একটী লোক দিলেন—মহারাজা সিন্ধিয়ার পার্ক হোটেলটী দেখিয়ে দেবার জন্য। হোটেলটী সহরের শেষ প্রান্তে, সঙ্গে লোক না মিলে খুঁজে নিতে বহুত দেরী হয়ে পড়ত।

আজ সুধাংশু ভায়ার গতিক বড়ই মন্দ। পাঁচটী woolen

Muffler, দু'খানা শাল ও একখানা কম্বল পাট করে পেটে জড়িয়ে তিনি "গড়াঢরচন্দ্র" হয়ে বসে আছেন। আর মুহুর্মুহু—। ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে—ভায়া আজ রাত্রেই মহারাজের হাঁসপাতালের 'ক—ওয়ার্ডে' প্রবেশাধিকার লাভ কর্‌বার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন। তাঁর দিদিরা তাড়াতাড়ি "পালসেটিলা" দিলেন ও শীঘ্র ঘুমিয়ে পড়তে বল্‌লেন।

ঘণ্টাখানেক পরে গরম পুরী-তরকারী, চাট্‌নী ও গোলাপ গন্ধ রাবড়ীর সুগন্ধে যখন হোটেলের ঘরখানি আমোদিত করে তুলেছে—তখন সুধাংশু ভায়া তন্দ্রা ভেঙ্গে আস্তে আস্তে উঠে বস্‌লেন। তাঁর দিদিরা বল্লেন—"কি, উঠলে যে? কোন কষ্ট হচ্ছে কি?" তিনি সহজ ভাবে বল্লেন—"না, এমন বিশেষ কোন কষ্ট নেই, তবে ক্ষিদেতে শরীরটাকে বেজায় জখম করে তুলেছে. বোধ হয় কিছু খাওয়া দরকার।"
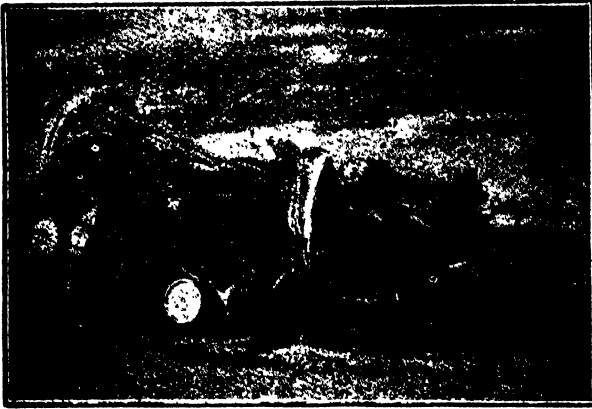
ধুলিয়ায় ভীষণ দুর্ঘটনা

তাঁর কথা শুনে দেওয়ালের টিকটিকি পর্য্যন্ত অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল। তিনিও উত্তরের অপেক্ষা না করে—একখানা চেয়ার টেনে বসে গেলেন—টেব্‌লে!

ষষ্ঠ দিন

গোয়ালিয়র সহর। পরদিন সকালে পার্কে বেড়িয়ে, ৮॥০টায় রাজবাড়ী দেখতে গেলাম। অনুমতি-পত্র দরকার। মিনিট ২০।২৫ অপেক্ষা করার পর শুন্‌লাম, দেওয়ানজী এখনও বিছানায়—তবে শীঘ্রই ওঠবার আশা আছে। তখন অনেক ধন্যবাদ দিয়ে আমরা হাঁসপাতালের দিকে চল্‌লাম।

বাড়ীগুলি এখানকার বড় চমৎকার। প্রায় অধিকাংশই পাথরের ও oriental designএর। হাঁসপাতালটী বেশ বড় ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। শাড়ীর ওপর over-all পরা ওদেশী নার্সগুলি ব্যস্তভাবে রোগী-রোগিনীদের সেবায় রত। তাঁদের কর্ম্ম-কুশলতা ও সেবার আগ্রহ দেখে বড় আনন্দ হ'ল।

তার পর স্কুল-কলেজ ইত্যাদি দেখে, স্বর্গীয় মহারাজাদের "ছত্রী" (memorial) দেখ্‌তে গেলাম। এক এক ছত্রীর ভিতর এক এক রাজার প্রস্তর-মূর্ত্তি, তৈল-চিত্র ইত্যাদি সুন্দর ভাবে সাজান রয়েছে। মূর্ত্তির নীচে শিবলিঙ্গ স্থাপিত। রাজাকে দেবতার ওপর বসাতে এই প্রথম এ দেশে দেখলাম।

আমরা হ্যাটগুলি খুলে মন্দিরে ঢুকেছিলাম, কিন্তু প্রহরীরা খালি-মাথায় রাজমূর্ত্তির সাম্‌নে যাওয়াতে একটু অভিযোগের সুরে টুপি মাথায় পর্‌তে বল্‌ল। খোলা মাথায় কারও সাম্‌নে দাঁড়ান বুঝি ওদেশে অবজ্ঞার চিহ্ন।

ছত্রীগুলির বাগান বেশ সুরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে দেখলাম। এসব ছত্রীতে প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যায় নটীদের নৃত্যগীত হয়ে থাকে। স্ত্রীলোকদের বস্‌বারও ব্যবস্থা রয়েছে—দ্বিতলে। কতকটা চিক্ আঁটা—বাকিটা সব খোলা। মোটের ওপর এখানে তত পর্দ্দা নেই মনে হচ্ছে।

আমাদের যত্ন করে সব দেখানর জন্য প্রহরীটাকে কিছু দেওয়া হ'ল—কিন্তু সে বিনীতভাবে জানালে "হুকুম নেই।" আরও অনেক ঘুরে কতক দেখে-শুনে ও 'অনেক কিছু' দেখতে বাকি রেখে বেলা ১২॥০টায় হোটেলে ফির্‌লাম।—পথে পেট্রল ভরে নেওয়া হ'ল। আশঙ্কায়, পেট্রলভরা আর একটী বাড়তি টীন এখানে কিন্‌লাম। পেট্রল ১॥০ টাকা গ্যালন।

হোটেলের আহারাদির ব্যবস্থা খুব সুন্দর—তবে সব নিরামিষ। লোকগুলি বেশ বিনয়ী। খুব আদর যত্ন কর্‌ল।

এখানকার জেলে উৎকৃষ্ট কার্পেট প্রস্তুত হয়। গোয়ালিয়র পটারীর চিনা মাটী ও porcelainএর দ্রব্যাদি সকলেরই পরিচিত।

১২-৪৫ মিনিটে গোয়ালিয়র ছাড়লাম। আধ ঘণ্টার মধ্যে এক লোকালয়-বর্জ্জিত দেশে এসে পড়া গেল। গাছপালা আস্তে আস্তে প্রায় অদৃশ্য হ'ল। খালি প্রান্তরের পর প্রান্তর—শুকনো নীরস কাল পাহাড়ের পর পাহাড়—আর রাস্তার পর লম্বা রাস্তা একলাটী নির্জ্জীবের মত পড়ে আছে—এঁকে বেঁকে। পাশ দিয়ে সরু রেল লাইন, কিন্তু সারাদিনে

একখানিও ট্রেনের সঙ্গে দেখা হ'ল না। ষ্টেশনগুলি যেন ঘুমাচ্ছে। তখন খালি মনে হচ্ছি'ল—

"এ পথ গেছে কোন্‌খানে তা কে জানে তা কে জানে,
কোন্ পাহাড়ের পারে, কোন্ সাগরের ধারে,
কোন্ দুরাশার দিক পানে
তা কে জানে তা কে জানে ?"

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যাচ্ছে—সেই একই মন-উদাস-করা দৃশ্য !

ঘণ্টা তিনেক পরে, সাম্‌নে একখানি মোটর আস্‌ছে দেখে একটু আশা হ'ল ও ইসারা করে গাড়ী থামান হল। দেখি, একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক—স্থানে স্থানে prospecting করে বেড়াচ্ছেন—কোম্পানীর কাজে। কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে আলাপ করা হ'ল। আমাদের এই লম্বা tour এর কথা শুনে তিনি খুব উৎসাহিত কর্‌লেন।

৭৮ মাইল এসে সিপ্‌রী (শিবপুরী) পেলাম। এ নামটা ইতিহাসেও পাওয়া যায়—কয়েকটী যুদ্ধ এখানে হয়েছিল। এটী গোয়ালিয়র রাজ্যের একটী ছোট খাট সহর। এখানে কাজের হুড়োহুড়ী বা গাড়ীঘোড়ার দৌড়াদৌড়ী মোটে নেই দেখ্‌লাম। বেশ সহজ আরামে সকলে যেন জীবনযাত্রার অনুকূল স্রোতে গা ভাসিয়ে চলেছে।

পেট্রল নেওয়া হচ্ছিল, এমন সময় রঙ্গীন ঘাগরা পরা (গোয়ালিয়রের পোষাক) এক বুড়ী ভিখারিণী হাত পেতে দাঁড়াল। মেয়েরা একটা পয়সা দিতে সে অসন্তুষ্ট হয়ে বল্‌ল—"আরে একঠো পয়সা ?" ভাবে মনে হ'ল যে আরও কিছু না দিলে পয়সাটা সে ফেরৎ দিতে প্রস্তুত। ভিখারিণীর এ-রকম 'আমিরী' মেজাজ মন্দ লাগল না।

ছোটনাগপুর পার হবার পর থেকেই সাধারণ লোকের অবস্থা বাঙ্গলাদেশের সাধারণের চেয়ে যেন অপেক্ষাকৃত ভাল বলে মনে হচ্ছে। আমাদের চাষিদের একখানা ভাল ১০ হাতি ধুতি খুব কম জোটে ; কিন্তু এ ধারের চাষিরা কাপড় পাঞ্জাবীর ওপরও সাদা ধবধবে বা রঙ্গীন ১২।১৪ হাত পাগড়ী সকলেই পরে দেখছি। মেয়েদের পোষাকের আরও বাহার। রঙ্গীন ঘাগরা বা পেসোয়াজ,—জ্যাকেট, তার ওপর একখানি করে সুন্দর ওড়না।

ঝান্সি এখান থেকে ৬০ মাইল। আগ্রা গোয়ালিয়র পথে ঘুরে না এসে, কানপুর ঝান্সি-সিপরি পথে এলে ১২৩ মাইলের ওপর কম হ'ত—কিন্তু এই ক' মাইলের জন্য আগ্রাটা বাদ দিতে মেয়েরা রাজী হলেন না। তাই এত ঘুরে আসা।

আরও ৬২ মাইলের পর সন্ধ্যা ৬—১৫ মিনিটে গুনা এলাম। এটীও গোয়ালিয়র রাজ্যের একটী ছোটখাট সহর। ডাক বাংলোতে ওঠা হ'ল। বাংলোটী একটী মনোরম স্থানে তৈরী। বেশ বড় ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আস্‌বাবপত্রও সব ঝর্‌ঝরে-তক্‌তকে !

চৌকিদারকে রান্নার ব্যবস্থা কর্‌তে বলে' বাংলোর সাম্‌নে ফুলবাগান ঘেরা লাল মাঠটির ওপর আরাম কেদারায় চায়ের আড্ডা জমিয়ে বসা গেল। আজ মোট ১৪০ মাইল এগোনা হয়েছে। রাস্তা খুব ভাল ছিল। Speedometreএ মোট ১১৭৩ মাইল উঠেছে।

সন্ধ্যার পরই মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হল। রাত ১০টায় চৌকিদার "খানা তৈয়ার" বলে ডাক দিল। সেই বাদলায় খানা হল গরম ভাত, ডাল, ফাউল কারি, চাট্‌নি—ও শেষে গোয়ালিয়র সহরের "কিঙ্কর সিংএর" দোকানের 'আবার খাবো' রাবড়ী।

আমাদের মধ্যে একজন, (নাম কর্‌লে হয় ত চটে যাবেন) তিনি এগুলির মধ্যে অনেক কিছু খান না, সুতরাং পরলোকের বাগানের মালীকে, তার জন্য সুন্দর একটী 'Vegetable Garden' তৈরী রাখবার অনুরোধ জানিয়ে—সকলে আধ ঘণ্টার জন্য নির্ব্বাক হয়ে পড়লেন !

সপ্তম দিন

পরদিন সকাল ৭॥ টায় গুনা বাজারের লোকগুলি আমাদের ইন্দোরের পথে যেতে দেখল।

ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে পার্ব্বতী নদীর ধারে এলাম। নীচু পাথরের পুলের (Causeway) ওপর দিয়ে পার হওয়া গেল। পুলে নদী পার হওয়ার জন্য জুলাই থেকে অক্টোবরের মধ্যে গাড়ী পিছু ২।৵০ টোল নেয়। আজ ২৭এ অক্টোবর, সুতরাং আমাদের কিছু লাগল না।

ওখান থেকে প্রায় ২২ মাইলে এসে ঘোরাপাচার নদী। এখানেও Causeway আছে। আরও ৩০ মাইল পরে আতনার নদীর Causeway পেলাম।

বর্ষা ছাড়া এ-সব নদীতে জল খুব কমই থাকে; আর বর্ষার সময়ও ২।৪ দিনের মধ্যে জল নেমে চলে যায়। তাই উঁচু পুল তৈরী করবার দরকার হয় না। তবে বর্ষার সময় পুলের পাশের নীচু থামগুলি ডুবে গেলে, তখন গাড়ী, মোটর যাতায়াত করতে দেওয়া হয় না; কারণ বর্ষার প্রবল জল-স্রোতে পুলের কতকটা প্রায়ই ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়—অতএব জলের ভেতর কখন কি ব্যাপার ঘটছে জানতে পারা যায় না বলে—এই ব্যবস্থা।

আরও ১৮ মাইল এসে সারঙ্গপুরে "কালী সিন্ধ" নদীর ধারে গাড়ী থামান হল। দাঁড়াতে না দাঁড়াতে সব জায়গার মত এখানেও একটী ছোট খাট ভীড়ের সৃষ্টি হ'ল। ছোট ছেলে-মেয়েও তার মধ্যে অনেক। মেয়েরা তাদের সঙ্গে ভাব করে নিয়ে খেজুর, লজেন্স, বিস্কুট ইত্যাদি বিতরণ সুরু করলেন।

কয়েকজন মুসলমানও সেই ভীড়ে রয়েছেন দেখলাম। আলাপ করে জানলাম—ওখানে অনেক মুসলমানের বাস। হিন্দু মুসলমানে বেশ সদ্ভাব। মসজিদের সামনে বাজনা বাজান, বা অন্য সব খুঁটী-নাটী নিয়ে ভায়ে ভায়ে ঝগড়া করবার কোন প্রয়োজন তাঁরা আজ পর্য্যন্ত বোধ করেননি। কয়েকটী হিন্দুও উৎসাহিত ভাবে তাতে সায় দিলেন।

তাদের কথা শুনে আনন্দে প্রাণ ভরে উঠল। মনে হল—ভগবান কবে সব ভারতবাসীকে নিয়ে এই রকম একটী 'সুখী পরিবার' গড়ে তুলবেন?

তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, নদী পার হওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়া গেল। Causewayর উপরে তখনও এক হাঁটু জল—স্রোতও খুব বেশী। খুব সাবধানে চালিয়েও Air Pipeএর মধ্য দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল কারবুরেটারের ভেতর ঢুকে—এঞ্জিনকে অচল করে দি'লে। আমরা সেই স্রোতে, জুতো মোজা খুলে—'Buzz off' বলে গাড়ী ঠেলতে লেগে গেলাম।

আমাদের ব্যাপার দেখে নদীর ঘাটে জল-আনতে-আসা, পেশোয়াজ-পরা সুন্দরীরা ওড়নার ফাঁকে ফাঁকে একটু হেসে নিলেন। আর আমাদের এঁরাও দেখলাম তাতে যোগ দিয়েছেন। মনে বড় দুঃখু হল!

সেই কোন্ সকালে খোকাদের পাশ-বালিসের মত তিনখানি রুটী, তদুপযুক্ত মাখন, সের দুই আলু সেদ্ধ, দেড় ডজন ডিম, বারো পেয়ালা চা, আর পৌনে এক টীন জ্যাম মাত্র খাওয়া হয়েছে—তার পর পথে খেজুর, চকলেট, কলা ও লজেন্স ছাড়া আমাদের কিছু 'জলগ্রহণ' হয়নি,—তাই ক্ষুধায় আধমরা হয়ে—সকলে গাড়ী থামাতে বল্লেন।

ডাক-বাংলায় উঠে রান্নার জন্যে সময় দিতে কেউ রাজী নন্—সুতরাং কাছে কোন বন নেই বলে, 'মাঠ ভোজনের' ব্যবস্থা করা গেল।

আজ Emergency Ration অর্থাৎ দুর্দ্দিনের রসদ বার করা হয়েছে। চিঁড়ে-মুড়কি-কলা-চিনি-নুন-পাতিলেবু ও জল। তাই নিমেষের মধ্যে কোথায় উবে গেল। কয়েকটী কমলালেবু অসময়ের জন্যে রাখা হয়েছিল—সুধাংশু ভায়া কাতরভাবে তাঁর দিদিদের বল্লেন—"এর চেয়ে অসময় আর কবে আসবে? ও-গুলো হাতে হাতে একটা করে দিয়ে দিন। গাড়ীর বোঝাও কমে যাক্!"—যা হক এ-বেলার মত কোনমতে 'পিত্ত রক্ষা' করে, আবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বেরিয়ে পড়া গেল।

মাক্সী, ডিউয়াস্ ইত্যাদি ছাড়িয়ে ইন্দোরে পৌছিলাম বেলা চারটায়। পোষ্ট-অফিসে চিঠি ফেলবার জন্য থামা হ'ল। একটী ওদেশী বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে, অল্পক্ষণের মধ্যে কি কি দেখা যেতে পারে জেনে নিলাম।

এখানে পৌছে, প্রথম যেটী চোখে পড়ল, সেটী হচ্ছে এদেশের স্ত্রীলোকদের স্বাধীনতা। অবশ্য ও-দিকে কয়েকটী মুসলমান-প্রধান স্থান ছাড়া মোটামুটী পর্দ্দা কম আছে দেখলাম, কিন্তু এখান থেকে বোম্বাই, মহীশূর, মাদ্রাজ পর্য্যন্ত মেয়েরা যে রকম অবাধে ও স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা করেন দেখছি, তাতে আমাদের বাঙ্গলা দেশের মেয়েদের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করে, নিজেরাই লজ্জিত হয়ে পড়লাম। এমন কি কয়েকটী মেয়েকে সাইক্লে করে যাতায়াত করতে দেখলাম।

সুগঠিত দেহ। রঙীন শাড়ীখানি সারা অঙ্গটীকে চমৎকার ভাবে ঢেকে রেখেছে। পায়ে Sandal, অবগুণ্ঠন-মুক্ত কবরীতে সৌরভে ভরা তাজা ফুলের মালা। মুক্ত আলোকে, বাতাসে ও স্বাধীনতার সুমিষ্ট আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠা, স্বাস্থ্য সম্পদ-শালিনী ওই রমণীর সমাজ—এদেশে যেন ভগবানের একটি বিশেষ আশীর্ব্বাদ স্বরূপ!

কোথাও দলে দলে, কোথাও একাকিনী এঁরা চলেছেন;

কিন্তু পথের সামান্য মুটেটি পর্য্যন্ত অন্য ভাবে এঁদের দিকে তাকায় না। আস্তে আস্তে সবই সয়ে যায়।

বাঙলা দেশের স্ত্রীলোকদের অবস্থায় আন্তরিক দুঃখিত হয়ে শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য পি, সি, রায় মহাশয়, তাঁর অনেক বক্তৃতায় বাঙ্গলার বাইরে এ সব দেশের মেয়েদের স্বাধীনতা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের কথার উল্লেখ করে, প্রায়ই সুখ্যাতি করে থাকেন। এমন কি অনেক সভায়, তাঁকে স্কুল কলেজের ক্ষীণাঙ্গী "মা লক্ষ্মী" ও "দিদিমণির" দলকে সম্বোধন করে এ সব কথা বল্‌তে শুনেছি। কিন্তু খালি "দিদিমণিদের" দোষ কি বলুন?

নানান্ ব্যবসা-বাণিজ্যপূর্ণ সহরটী ও দর্শনযোগ্য কয়েকটী যায়গা ও ছত্রী তাড়াতাড়ি দেখে নিয়ে, ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে Mhow-এর পথে পড়্‌লাম।

নীরস কালো পাহাড় ও খেজুর বনের আড়ালে সোনার থালাটী ধীরে ধীরে নেমে যাবার কিছু পরেই—ত্রয়োদশীর রূপার থালাখানি তেপান্তরের মাঠের শেষ প্রান্তটি থেকে উঁকি মার্‌তে লাগ্‌ল। আমরাও ১২ মাইল পেরিয়ে Mhow এ এসে হাজির হলাম।

এটী ইন্দোর রাজ্যের ভিতর একটি বড় Cantonment town. তৃতীয় মারহাট্টা যুদ্ধের পর ১৮১৮ সালে মান্দেশরে ইংরাজরাজ ও ইন্দোররাজের মধ্যে যে সন্ধি হয়, সেই সন্ধি-মূলানুযায়ী এখানে একটি ইংরাজ সেনানিবাস বরাবরের জন্য স্থাপিত হয়েছে।

টমির দল অর্দ্ধাঙ্গিনীদের নিয়ে ঘোরা-ফেরা কর্‌ছে। মেটে রং হ্যারি ডিক্ এরাও ততোধিক বুক ফুলিয়ে রাস্তা কাঁপিয়ে চলেছে। দোকানে দোকানে কেরোসিনের আলো, কোথাও বা Petromax রাতকে দিন করে জ্বল্‌ছে।

চা ও রাত্রের আহারীয়ের ব্যবস্থার জন্য গাড়ী দাঁড় করান হয়েছে। পথে পায়চারি কর্‌ছি', এমন সময় হুকুম-চাঁদজী (মাড়োয়াড়ী) রাম রাম জানিয়ে দোকানে বস্‌তে আহ্বান কর্‌লেন। শুন্‌লাম, এই সুদূর দেশেও অনেক বাঙ্গালী আছেন। অধিকাংশই এখানের নানা অফিসে কাজ করেন। দুর্গা পূজা হয়েছিল। অনেক গোরা এখানে থাকে ইত্যাদি। তার পর আমাদের বাড়ী কোথায়—কতদূর যাব—গাড়ী কেমন চল্‌ছে—টায়ার কটা ফেটেছে ইত্যাদি। শেষে আলাপ জমে ওঠাতে, আমাদের জলযোগ করাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লেন। আমি খুব খুসী হয়েছি জানিয়ে ও তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে একখিলি পান নিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লাম। ওদিকে রাত্রিও হয়ে আস্‌ছিল।

এবার আরও অগ্রসর হওয়া নিয়ে ঘোষভায়ার সঙ্গে তর্ক বিতর্ক সুরু হ'ল। জ্যোৎস্নার মন-মাতান আলোয়—সুদূরবাসিনী প্রকৃতি দেবীর সৌন্দর্য্য উপভোগ কর্‌বার ইচ্ছা
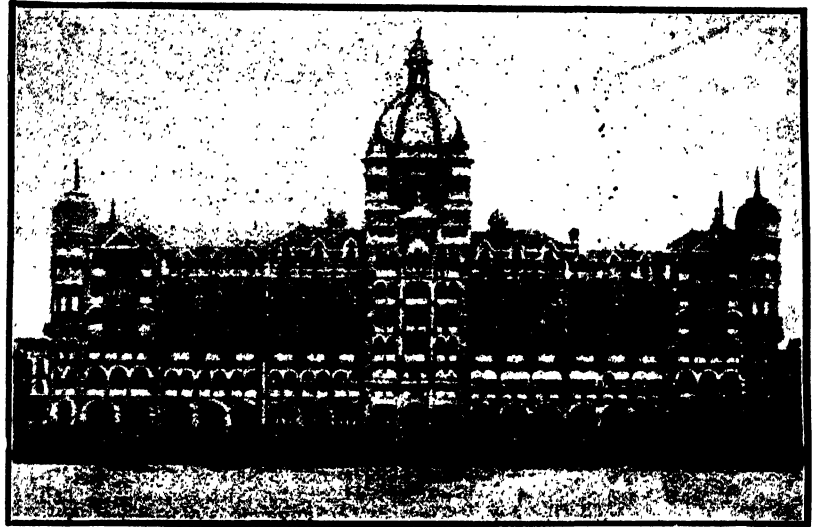
তাজমহল হোটেল—বোম্বে

সকলেরই; কিন্তু ঘোষজা বেঁকে বস্‌ছেন—কারণ? কারণ সেই পুরাতন "যেখানে সন্ধ্যে হয় সেইখানেই——",—না আর বল্‌ব না।

যাহ'ক অনেক কাকুতি মিনতি করে—সাহস দিয়ে,—'তাতিয়ে'—তাঁর মত করান হ'ল, তার পর Mhow ছাড়্‌লাম।

১৪ মাইল পরে মানপুর গেলাম। রাত ৮টা বেজেছে। ফুটফুটে চাঁদের আলো ছেড়ে ডাক-বাংলোর ঘরগুলির ভেতর ঢুকতে ইচ্ছা কর্‌ছে না। ইচ্ছা হচ্ছে আরও এগুনো যাক্। কিন্তু "গাইড্ কিতাবে" লিখ্‌ছে—"The Ghats here call for careful driving, as the

road is narrow with acute bends" সুতরাং আর এগোনো যুক্তিসঙ্গত নয়। তাই মানপুর ডাক-বাংলোতে রাত্রিবাস সাব্যস্ত হ'ল। ঘোষজাও সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেল্‌লেন।

এখানে ডাক-বাংলোর বুড়ো চৌকিদারটি এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। ক্লান্ত যাত্রিদের শ্রান্তি দূর কর্‌বার জন্ম তাড়াতাড়ি কোথায় ব্যবস্থা কর্‌বে—তা না, ব্যস্তভাবে ভাড়া চুক্তির খাতাখানি এনে হাজির কর্‌লে ও তার পাওনার টাকাগুলি আগেই চুকিয়ে দিতে বল্‌ল। কারণ বুড়ো মানুষ—হয় ত ভোরে উঠ্‌তে পার্‌বে না—আর আমরাও হয় ত তাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সরে পড়্‌ব, এই তার আশঙ্কা।

অন্ধকারে রাঙ্গা চোখ দেখাতে না পেরে—যখন কড়া সুর ধরা হ'ল, তখন সেলাম করে—খাতাখানি তার ঘরে রেখে আলো, জল, বিছানার ব্যবস্থা ও চেয়ার টেবল টানাটানি কর্‌তে লেগে গেল। আমাদের পরে মনে হ'ল, হয় ত বেচারীকে কোনো মহাপ্রভুরা এসে ঠকিয়ে গেছেন—তাই তার এই সাবধানতা।

যা'হক, Mhow থেকে আনা খাবার খেয়ে—কম্বলমুড়ি দিয়ে, সারাদিনের এই ১১৬ মাইল লম্বা পথটার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়্‌লাম।

ঘুম ভাঙ্গতেই দেখি, সেজদি ও শ্রীমতী সেই ভোরে এক মস্ত টি-পার্টির অনুষ্ঠান করে ফেলেছেন। আর ও-দিকে সেলামত মিঞাও যাত্রার উদ্যোগে ব্যস্ত। আমরাও কৃত্রিম ব্যস্ততা দেখিয়ে সদলে বসে গেলাম—চায়ে।

অষ্টম দিন

নলিনী যখন তার প্রিয় সখীটির সাথে বিদায় আলিঙ্গনে বিভোর—এমন সময় চৌকিদারকে ডেকে পাওনা চুকিয়ে দিয়ে, পাহাড়ের গায়ে আঁকা-বাঁকা, ঢেউ-খেলান রাস্তাটীতে নেমে পড়লাম—খুব সাবধানে—ধীরে ধীরে।

মাইল ১২ আস্‌বার পর গুজরি এল। এখানে "মাণ্ডুর" ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাবার একটী রাস্তা আছে।

আরও ১২ মাইল ছুটে, কলঘাটে নর্ম্মদা নদী পেলাম। সেই ছেলেবেলার ভূগোলে পড়া নর্ম্মদা—আজ তার তীরে এসে হাজির। একটি সুন্দর পুলের উপর দিয়ে পার হওয়া গেল—তবে অম্‌নি নয়, ২৲ টাকা সেলামী দিয়ে। এ তবু ভাল। ২৲ টাকা দিয়ে নৌকায় নদী পার হওয়ার চেয়ে—এ শতগুণে ভাল। অনেক ঝঞ্ঝাট ও সঙ্কটের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। সময়ও অনেক বাঁচে।

তার পর লম্বা ৭৮ মাইল চালিয়ে ২॥০ ঘণ্টার মধ্যে সাভালদায় তাপ্তি নদীর কিনারে এসে পৌছান গেল। নদীটী চওড়ায় অনেকখানি। পথের আশে-পাশের গ্রাম থেকে ডিম, দই ইত্যাদি কেনা হ'ল। ডিমের দাম কল্‌কাতার চেয়ে বেশী। দই টাকায় দশ সের হিসাবে পাওয়া গেল—তবে মাঠা তোলা দুধের, নিশ্চয়ই।

এবার নদী পার হওয়ার সমস্যা। নৌকার পুল বর্ষায় ভেঙ্গে গেছে, এখনও মেরামত হয় নাই; সুতরাং খেয়া নৌকায় পার হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

এখানে গাড়ী নৌকায় তুল্‌তে যথেষ্ট বেগ পেতে হল। ধ্বস্‌ভাঙ্গা উঁচু পাড়ের কোল দিয়ে, অনেকটা জলের ওপর দিয়ে চালিয়ে নৌকায় ওঠ্‌বার আল্‌গা তক্তাখানির পাশে আসা হ'ল। এবার এই so-called gangwayর ওপর দিয়ে নৌকায় গাড়ী চড়াতে হবে। আল্‌গা তক্তা একটু এদিক ওদিক হলেই চক্ষুস্থির! তা ছাড়া একটু অসাবধান বা nervous হলে মালপত্র সমেত গাড়ীর ও চালকের অবগাহন স্নান,—হয় ত বা আরও বেশী কিছু!

যাহ'ক, নিরাপদে গাড়ী নৌকায় চড়িয়ে দিয়ে, মহিলাদের প্রচুর আপত্তি সত্বেও, নৌকার পিছনে ভাসান কাঠের সেই পাটাতন অবলম্বন করে সাঁতার ও স্নান কর্‌তে কর্‌তে অপর কূলে পৌছান গেল। আমাদের মধ্যে একজন সহজে এই জলে স্নান কর্‌তে চান্ নি—শেষে মাঝিরা জলে কুমীর নেই বলে কানে হাত দিয়ে হলপ কর্‌তে, তবে তিনি ইষ্ট দেবতার নাম নিয়ে নদীতে স্নান করেছিলেন। তবে জলে নেমে নয়—মাঝিদের লোটায় জল তুলে!

গাড়ী-পারের সমস্যা গিয়ে—এবার অন্ন-সমস্যা এল। যদি কোন ডাক-বাংলোয় উঠে খানার হুকুম দেওয়া যায়, তা হ'লে বাকি বেলাটুকু "খাওয়াতেই" কেটে যাবে, "যাওয়া" আর হবে না। দিনে ৩০০ না হ'ক অন্তত ২০০।২৫০ মাইল না গেলে যেন কিছু যাওয়াই হ'ল না মনে হয়। তাই সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে, আজও "মাঠ ভোজনের" ব্যবস্থা করা হ'ল।

ইয়োরোপে এ রকম মোটরে সফর কর্‌লে, এখানের মত আহারের চিন্তা বা সে-জন্ম অযথা সময় নষ্ট কর্‌তে হয় না।

ব্যবধান

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মিত্র

২০।২৫ মাইল অন্তর একটা না একটা সহর বা বড় গ্রাম পাওয়া যায়, সুতরাং যে কোন Inn (সরাইখানা) বা রেস্ত্রাঁতে, জীবনধারণের এই প্রধান কাজটী আধ ঘণ্টার মধ্যে সেরে নেওয়া যায়। এখানে ডাক-বাংলোয় সেটা অন্ততঃ ২।৩ ঘণ্টার কমে হয় না। অবশ্য আগে 'তার' করলে কতকটা শীঘ্র হতে পারে বটে, কিন্তু মোটরে—ঠিক সময়ে পৌছানর তো কোন স্থিরতা নেই!

যা হ'ক, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তাপ্তি-তীরের একটি গাছ-তলা থেকে আমরা আবার "Buzz off করলাম,—জামা-কাপড়ে লাগা, তীরের মত সাংঘাতিক একরকম চোর-কাঁটা ছাড়াতে ছাড়াতে। তাপ্তির তীরে পৌছাবার কিছু পূর্ব্বেই বোম্বে প্রেসিডেন্সি আরম্ভ হয়েছে।

২৭ মাইল পরে "ধুলিয়া" সহর এল। রেল ষ্টেশন কাছেই। সহরের ভিতর দিয়ে মাত্র ১২ মাইল বেগে যাচ্ছি, এমন সময়, বছর তিনেকের একটী ফুটফুটে ছোট্ট ছেলে, গালভরা হাসি নিয়ে, খেলতে খেলতে হঠাৎ একেবারে চাকার সামনে এসে পড়ল।

প্রাণপণে four wheel brake কষেও যখন দেখলাম আর তাকে বাঁচাতে পারছি না, তখন মরিয়া হয়ে গাড়ী অন্য দিকে swerve করে দিলাম—কিন্তু সর্ব্বনাশ! এ কি! এদিকেও যে এক বৃদ্ধা প্রাচীরের পাশে বসে কি বেচ্ছে!

চারখানি চাকা এক সঙ্গে বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, এক বিকট শব্দ করে, রাস্তাটা অনেকখানি চেঁচে, বুড়ীর বুকের ঠিক সামনে গিয়ে গাড়ী থেমে গেল। দেখি প্রাচীর ও সামনের চাকার মধ্যে আন্দাজ দেড় হাত মাত্র ব্যবধান—মাঝে স্তম্ভিতা বুড়ী!!

মুহূর্ত্তের মধ্যে শরীর বেয়ে দরদরিয়ে ঠাণ্ডা ঘাম ছুটে গেল! পরমেশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে—রুমালে কপাল মুছলাম। আজও ভেবে ঠিক করতে পারিনি, সে যাত্রা, কি করে সে দুটী প্রাণী, এ-রকম আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পেয়েছিল।

সেদিন যদি কোন বিপদ ঘটত, শুধু আমাদের এ টুরের সব আনন্দ যে বিষাদময় তিক্ততায় ভরে উঠত তা নয়—হয় ত জীবনে আর কোনো দিন 'টুরে' বের-বার ইচ্ছা হ'ত না!

মালিগাঁওয়ে এল ৩১ মাইল পরে। এখান থেকে ইলোরা ও অজন্তা গুহায় যাবার রাস্তা আছে। সময়াভাবের জন্য দুঃখিত মনে ও-সব দেখবার ইচ্ছা মনেই দমন করতে হ'ল। ইলোরা গুহা এখান থেকে মাত্র ৭৮ মাইল।

চন্দোরের পাহাড়গুলি আস্তে আস্তে এগিয়ে আসতে লাগল। চন্দোর ইন্দোর রাজ্যেরই ভিতর। আধ ঘণ্টার মধ্যে রাস্তাটী ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের পাদদেশ থেকে আস্তে আস্তে চূঁড়ায় এসে হাজির হ'ল। ওপর থেকে পশ্চিম খান্দেশ 'প্লেটোখানি' বড় মনোরম দেখাচ্ছে। Deccan Trap এর পাহাড়গুলির চূঁড়া সব চেপ্টা দেখছি। এক অদ্ভুত রকমের। দেখতে দেখতে একটি সুন্দর উপত্যকায় নেমে এলাম। ঘন বনের মাঝে, সাদা ধবধবে, নাম-না জানা এক ফুলের গন্ধে দশদিক ভরে রয়েছে। যেন—"নন্দন কানন ভুবন মাঝে"—

গাড়ী থামিয়ে অনেকক্ষণ ধরে সে মাধুর্য্য উপভোগ করেও যখন মনটা তৃপ্ত হল না, তখন কানন লুঠ করে, শ্বেত-পুষ্প স্তবকে গাড়ীখানি ভরে নিয়ে, আবার আমরা চলতে লাগলাম। মনে হচ্ছে এ চলা যদি না-ই ফুরায়, তাতেই বা ক্ষতি কি?

কিছুদুর যাবার পর দেখি, পাহাড়ের গায়ে একখানি নূতন মোটর গাড়ী হাত পা ভেঙ্গে, বেজায় রকম কাৎ হয়ে পড়ে আছে। দেখে আমাদের ভাবের নেশা চট্ করে ছুটে গেল। কাছের গ্রামের একটী স্ত্রীলোককে ৭।৮ দিন যাবৎ ঐ ভাঙ্গা গাড়ীর পাহারায় রেখে, গাড়ীর যাত্রীরা ডুলী করে ধুলিয়া ফিরেছেন শুনলাম। ভোরের অন্ধকারে তাঁরা এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন; হেড লাইটে পথের বাঁকটী ঠিক ঠাওরাতে না পেরে গাড়ী বিপথে গড়িয়ে চলে আসে। ভাগ্যক্রমে একটু নীচেই একটা মোটা গাছের গুঁড়িতে গাড়ীখানি আট্‌কে গিয়ে, সে যাত্রা যাত্রীরা আধ-মরা হয়ে কোন মতে প্রাণে বেঁচেছেন।

আমরা দেখে শুনে "রাম নাম" করতে করতে গোদাবরী তীরে রামচন্দ্রের সেই প্রিয় স্থানটীতে, দেড় ঘণ্টার যায়গায় তিন ঘণ্টায় এসে হাজির হলাম!

নাসিকটী বড় মনোরম লাগছে। বনবাসের সময় শ্রীরামচন্দ্রেরা এই স্থানে বহুদিন ছিলেন। এ তীর্থটী পশ্চিম ভারতের "বারাণসী"। সুন্দর নারায়ণ মন্দিরের ভিতর একটী স্নিগ্ধ অন্ধকার কোণে বসে আছি। সুমধুর বাদ্য ও সুললিত সঙ্গীতে মন্দিরটী মুখরিত হচ্ছে। ধূপ ধূনার সুগন্ধে

চারি দিক আমোদিত। বিচিত্র রঙ্গীন বেশ-ভূষায় ও পুষ্পে সজ্জিত হয়ে রবিবর্ম্মার আঁকা ছবির মত, পূজারিণীরা দলে দলে মন্দিরে ও প্রাঙ্গণে আসা-যাওয়া কর্‌ছেন। কেউ বা গলবস্ত্র হয়ে মাটিতে লুটিয়ে, দেবতার কাছে সুখ-দুঃখ-আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাগুলি প্রাণ খুলে নিবেদন কর্‌ছেন। মাঝে মাঝে ভিখারী বালক ও ভিখারিণীদের কলরব এমন শান্তিময় স্থানটীকে অশান্তিতে ভরে তুল্‌ছে। আঙ্গিনায় নানান্ রঙ্গের ফুল, ফুলের মালা ইত্যাদি পূজার উপকরণ স্তরে স্তরে বিক্রয়ের জন্য সাজান রয়েছে। চারিদিক ঝর্‌ঝরে-তক্‌তকে।

ওধারে, সোনালী রূপালীর চওড়া-আঁচলা-আঁটা নানা রঙ্গের নানা পাড়ের সুন্দর সুন্দর শাড়ী বিক্রয় হচ্ছে দেখে—প্রমাদ গুণলাম। ভাগ্যে ওদিকে শ্রীমতী মন্দিরের স্থাপত্য-শিল্পকলা পরিদর্শনে ব্যস্ত ছিলেন—এদিকে নজর পড়ে নাই, তাই সে যাত্রা রক্ষা পাওয়া গেল। নচেৎ নিমেষে অনেকগুলি রূপার চাক্‌তি হয় ত আমার ব্যাগ থেকে লাফিয়ে কাপড়ওয়ালার থলিতে গিয়ে প্রবেশ কর্‌ত ও সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর মালের ভারও কিছু বাড়ত।

যদিও এটুকু যায়গার মধ্যে প্রায় ১২০০ ঘর ব্রাহ্মণ পাণ্ডার বাস, কিন্তু এখানে (কামাখ্যা ছাড়া) অন্যান্য তীর্থের মত পাণ্ডার দৌরাত্ম্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠ্‌তে হল না।

যা হ'ক, সন্ধ্যা নেমে আস্‌ছে দেখে—অন্যান্য সব মন্দির দেখার আশা ত্যাগ করে, আমরা গোদাবরীর পুলের উপর দিয়ে রাজা দশরথের লক্ষ্মী ছেলে দুটীর অতীত বনবাস কাহিনীটী ভাবতে ভাবতে ইগাতপুরীর সন্ধ্যা-ছায়ায় ঢাকা পথটীতে নেমে পড়লাম।

পূর্ণিমার চাঁদ গাছের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মার্‌ছে। ছায়ার আঁধার ভেদ করে, রূপালি থালার টুক্‌রাগুলি গাড়ীর ধুলা-ধূসরিত অঙ্গখানির ওপর ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে পড়ছে।

এবার যেন একটি স্বপ্ন-রাজ্যের নিরালা পথ দিয়ে গাড়ীখানি ধীরে ধীরে চলেছে। ঘর-ছাড়া হয়ে পর্য্যন্ত এ-রকম একটি রাত কখনও পাইনি। মনে পড়ল, আজ কোজাগর পূর্ণিমা। শরতের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার আলোয় সারা ভুবন হাস্‌ছে। দু' পাশে উঁচু পাহাড়গুলি অনাসক্ত সন্ন্যাসীর মত প্রশান্ত ভাবে যেন কার ধ্যানে মগ্ন।

কি যে একটি মাধুরী—কি যে একটি শান্তি এখানে বিরাজিত, তা ব্যক্ত কর্‌বার ভাব বা ভাষা খুঁজতে গিয়ে সব গুলিয়ে যাচ্ছে। খালি মনে আস্‌ছে—সেই প্রাণ-মাতান জ্যোৎস্নারাশি—সেই পথ—সেই পাহাড়—সেই বন—সেই নিস্তব্ধতা! আজ কঠিন হৃদয়টাও ব্যাকুলভাবে গেয়ে উঠ্‌ছে—

"বার বার যত বার তোমায় ছেড়ে যেতে চাই
ঘুরে ফিরে কেমন করে তোমার হাতে পড়ে যাই—"

দু' হাজার ফিট উঁচু "থালঘাট" পাহাড়ের গায়ে ইগাৎপুরী ডাক-বাংলোটী যেন একটী স্বপনপুরী! সাম্‌নে ফুলের বাগান। কাছে মলয় পাহাড়। তাই বোধ হয় শীতের দিনেও আজ মলয় হিল্লোল বইছে!

সুধাংশু ভায়া ফুল-বাগানে একটা আরাম কেদারায় শুয়ে ভাঁজছিলেন—

"এমন চাঁদিনী মধুর যামিনী
সে যদি গো শুধু আসিত,
পরাণে এমন আকুল পিয়াসা
সে যদি গো ভালবাসিত"।

বাংলোর ভেতর থেকে সমস্বরে চীৎকার হয়ে উঠল—সাবাস্!

হিন্দু হোষ্টেল হলে তাঁর বন্ধুরা হয় ত এতক্ষণ "চাঁটি চাঁটি" শব্দে সকলে ধেয়ে আস্‌তেন; কিন্তু এ দলের সকলের সঙ্গেই তাঁর অতি মধুর সম্পর্ক, তাই ভায়া সে যাত্রা নিস্কৃতি পেয়ে গেলেন। আর তাঁর দিদিরাও ওদিকে ঘুমিয়ে পড়েছেন, তাই রক্ষা!

নবম দিন।

পরদিন সকাল নয়টায় বোম্বায়ের পথ ধর্‌লাম। এ পথটীও বেশ মনোরম। শিলং-দার্জ্জিলিংএর মত পাহাড়ের গা ঘুরে ঘুরে রাস্তাটী নেমে গেছে। অতিরিক্ত সাবধানে গাড়ী চালাতে হচ্ছে। রাস্তা ২০০০ ফিট থেকে ১৭৮ ফিটে নেমেছে ভাসিন্দ গ্রামে।

মাঝে মাঝে জি, আই, পির লাইন—টানেল্ ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। "Irish Bridge" পাওয়া যাচ্ছে অনেক। bridge মানে এখানে ঠিক পুল নয়—রাস্তার ওপর দিয়ে পাহাড়ের জল নিকাশের নালা বিশেষ। তবে পথটী জলের স্রোতে ধুয়ে খারাপ হয়ে না যায়, সেই জন্য নালাগুলি

পাথর দিয়ে বাঁধান। খুব সতর্কতার সহিত না চালালে স্প্রীং ভাঙ্গবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে।

যদিও স্প্রীং ভাঙ্গল না বটে—তবে Irish Bridgeএ ধাক্কা খেয়ে একটি টিউব জখম হওয়ায় চাকাখানি বদ্‌লাতে হ'ল।

৩২ মাইলে সাহাপুর ও ৫১ মাইলে ভিওয়ান্দি পেলাম। এখান থেকে কল্‌সেট বন্দরের রাস্তায় না গিয়ে কল্যাণের পথ ধর্‌লাম। যদিও এ রাস্তায় ১৪ মাইল বেশী ঘুরতে হল, কিন্তু "কল্‌সেট বন্দরে" সোয়ারের জন্য অপেক্ষা করা ও খেয়াতে পার হওয়ার ঝঞ্ঝাট থেকে পরিত্রাণ পাওয়া গেল।

থানা এল। প্রচুর ধূলিপূর্ণ রাস্তাটি ছোট্ট সহরটীর

মল ব্যালাড পায়ার—বোম্বে

মাঝ দিয়ে বোম্বায়ের দিকে চলে গেছে। এটি পুরাকালে পর্ত্তুগীজদের একটি আড্ডা ছিল। পরে মাহারাট্টাদের কাছ থেকে সুরাট সন্ধির পর এঁরা হস্তগত করেন।

তার পর পুণার রাস্তা বাঁয়ে ফেলে creekএর ছবির মত দৃশ্যগুলি ডানদিকে দেখতে দেখ্‌তে এগুতে লাগলাম।

কল্‌কাতার গড়িয়াহাট রোডের মত দুধারে আমগাছ ঢাকা রাস্তায়, আরও ২৪ মাইল ধুলা ওড়াবার পর দাদার-এর ভিতর দিয়ে বোম্বাই সহরে ঢুক্‌লাম।

এখান থেকে ferro-concreteএর সুন্দর রাস্তা কয়েক মাইল পেলাম। এ-রকম রাস্তা মোগলসরাই-বেণারস পথে কতকটা পেয়েছিলাম। বোম্বাই Improvement trust-এর স্কীমে এদিকে অনেক নূতন রাস্তাঘাট ও বাড়ীঘর গড়ে উঠছে। তবে সুন্দর বাড়ীগুলির সব সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়েছে অসংখ্য ventilator pipeএর জন্য।

প্যারেল এল। কাছে ও দূরে বড় বড় তুলার কল দেখা যাচ্ছে। বার্মিংহামের মত অদ্ভুত রঙের দোতালা ট্রামগুলি সহরের শ্রী বিশ্রী করে ঢং ঢং শব্দে চলেছে। এক-তালা ট্রামগুলিরও হাড়-পাঁজরা বেরোনো।

বৃহৎ বপু মোটরবাস ছুটোছুটী কর্‌ছে। আদি যুগের ঘোড়ায় টানা "ভিক্টোরিয়ার" গাড়োয়ান-গুলি, ভাড়া না জোটায়, গালে হাত দিয়ে বসে, ট্যাক্সি ও বাসওয়ালাদের মুণ্ডপাত কর্‌ছে। মোটরের সার wind screenএ ফুলের গুচ্ছ বা মালা দুলিয়ে যথেচ্ছ গতিতে পথিকদের প্রাণ মোটরাতঙ্কিত কোরে ছুটোছুটী কর্‌ছে। মালিকদের গাম্ভীর্য্যের মাপে, তাঁদের Bank Balance এর পরিমাণ অনুমান হচ্ছে।

মোড়ে মোড়ে ট্র্যাফিক্ পুলিসগুলি, নীল পোষাক পরে তেল-চুক্‌চুকে টেড়িটীর ওপর হল্‌দে (?) টুপিটী বাঁকিয়ে, পটিহীন পায়ে sandal জুতো পরে, নবীন অধিকারীর যাত্রাদলের ইয়ার ছোক্‌রাদের মত হাত তুলে তান ধর্‌ছে। ইলেক্‌ট্রিক রেলওয়ে সোঁ সন্ সন শব্দে সহর ভেদ করে ছুটেছে।

থ গুজরাটী, মারহাটী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, মাড়োয়ারী,

পার্সী, ইংরাজ, ফরাসী জার্ম্মান, রাশিয়ান, ফিরিঙ্গী, চীনে জাপানী ইত্যাদি কত হরেক রকম লোকই দেখছি। বাঙ্গালী ভায়াও দেখলাম অনেকগুলি, তবে কয়েকজন ছাড়া অধিকাংশই যেন "পার্সী"-ভাবাপন্ন—"কে কার কড়ি ধারে" গোছের!

একটা জিনিষ এখানে খুব সম্ভোগ কর্‌ছি, সেটা হচ্ছে এখানকার দেশী ব্যবসায়ী ও কল-কারখানা-ওয়ালাদের আধিপত্য। সহরের উৎকৃষ্ট স্থানে উৎকৃষ্ট বাড়ীগুলি অধিকাংশই তাঁদের দেখলাম।

আর একটি জিনিষ আগেই বলেছি—সেটা স্ত্রী-স্বাধীনতা।

ব্যবসা-বাণিজ্যের একটা খর স্রোত সহরের ভেতরে অবিশ্রান্ত ভাবে বয়ে যাচ্ছে—তা কিছুক্ষণ ঘুর্‌লে বেশ বুঝতে পারা যায়। কি এক ব্যস্ততা—কি একটা নেশায় সকলে মস্‌গুল। বাঙ্গালী যুবক ভায়ারা দলে দলে কবে এই স্রোতে গা ভাসান দেবেন, খালি সেই কথাই বার বার মনে হচ্ছে।

বহুত খুঁজে Y. M. C. A এর কাছে একটি decent দেশী হোটেল পেলাম। সেখানেই ডেরা নেওয়া হ'ল। Y. M. C. A র সহকারী সম্পাদক বল্লেন "আপনি অবিবাহিতা হলে এখানে থাক্‌বার বেশ সুবিধা হ'ত।" কিন্তু—!
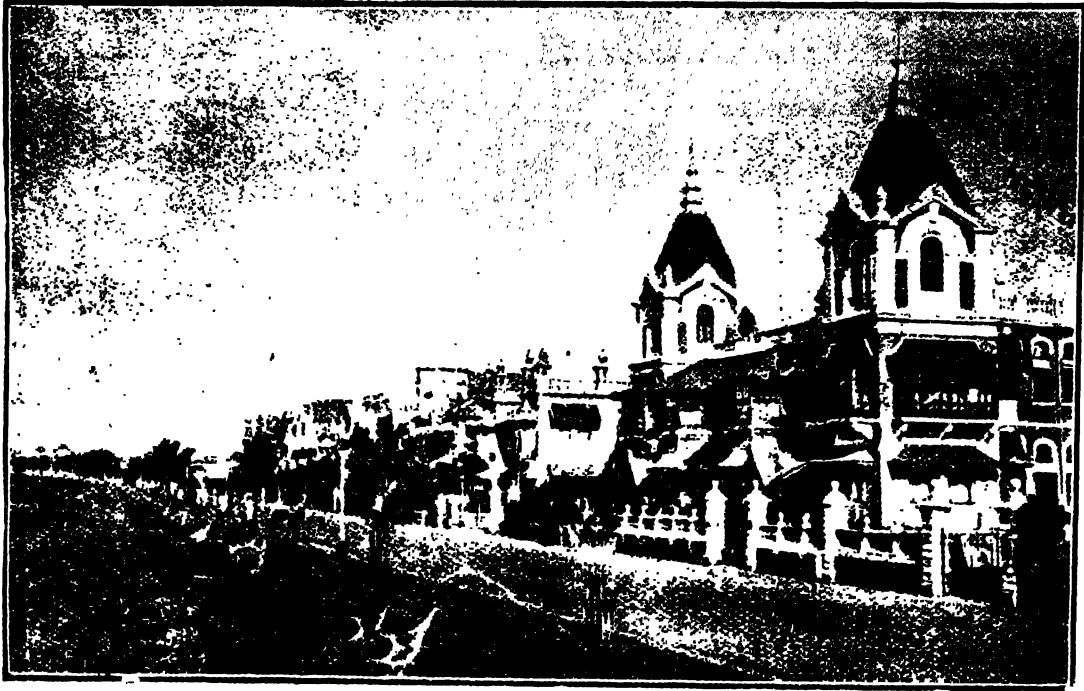
কোলাবা—বোম্বে

তবে এদের এ স্বাধীনতাটা, ইয়োরোপের মেয়েদের স্বাধীনতার মত তত উৎকট নয়। বেশ যেন একটু শীলতা—একটু মিষ্টতা—একটু সলজ্জ ভাব মাখা। একটু যেন সেই অতীতের সীতা—দময়ন্তী যুগের মেয়েদের স্বাধীনতার মত! বড় ভাল লাগল!

তার উপর সেই ব্যালার্ড পীয়ার, এ্যপোলো বন্দর, ডক্ কোলাবা, ফোর্ট; সেই মালাবার হিল, Gate wry of India, সেই তাজমহল হোটেল ও সেই আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা সমুদ্দুর!

ফোর্ড কোংর অফিসে আমাদের খুব সম্বর্দ্ধনা, ফটো তোলা ইত্যাদি হ'ল। গাড়ীখানিও ভাল রকম করে tune up ও পরিষ্কার করে এঞ্জিন-তেল বদ্‌লি করে দিলেন বিনা খরচায়।

ঘোষজার ছুটী ফুরিয়ে এসেছে। আর একহাজার মাইল মাত্র যেতে পারলেই—মাদ্রাজ। আফিসে ছুটীর জন্য তার করলেন। উত্তর এল "Too much pressure of work after holidays. Return at once." পরের চাকরী! ধেৎ!

সুতরাং আগের প্রোগ্রামের মত, মহিলারা ওঁর সঙ্গে ফিরলেন। শ্রীমতীকে সহজে মত করাতে পারিনি ;—তহবিল অনেকটা খালি করে—বম্বের ভাল-মন্দ জিনিষ কিছু ঘুস দিয়ে—তবে তাঁকে মত করাতে হয়েছিল।

গাড়ীর speedometreএ বোম্বাই পৌঁছান পর্য্যন্ত (নানা সহর বেড়ান নিয়ে) ১৮০৫ মাইল দেখাচ্ছে। আসতে মাট নয় দিন লাগল। অবশ্য শুধু দিনের বেলা চালিয়ে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে ফেলতে, সুধাংশুভায়া—হাসতে হাসতে, ও সেলামত মিঞা—কিছু না করতে করতে—আবার ঘরছাড়া হয়ে "Buzz off!" বলে মাদ্রাজের পথে পাড়ী জমালাম !!

এবার মনে হচ্ছে, আপনাদের একটু মুখ বদলান দরকার। তাই এখান থেকে মাদ্রাজ-যাত্রার ডায়েরী ও পথের কাহিনী লেখার ভার, এবং বাঁশিটী সুধাংশুমোহন ভায়ার হাতে
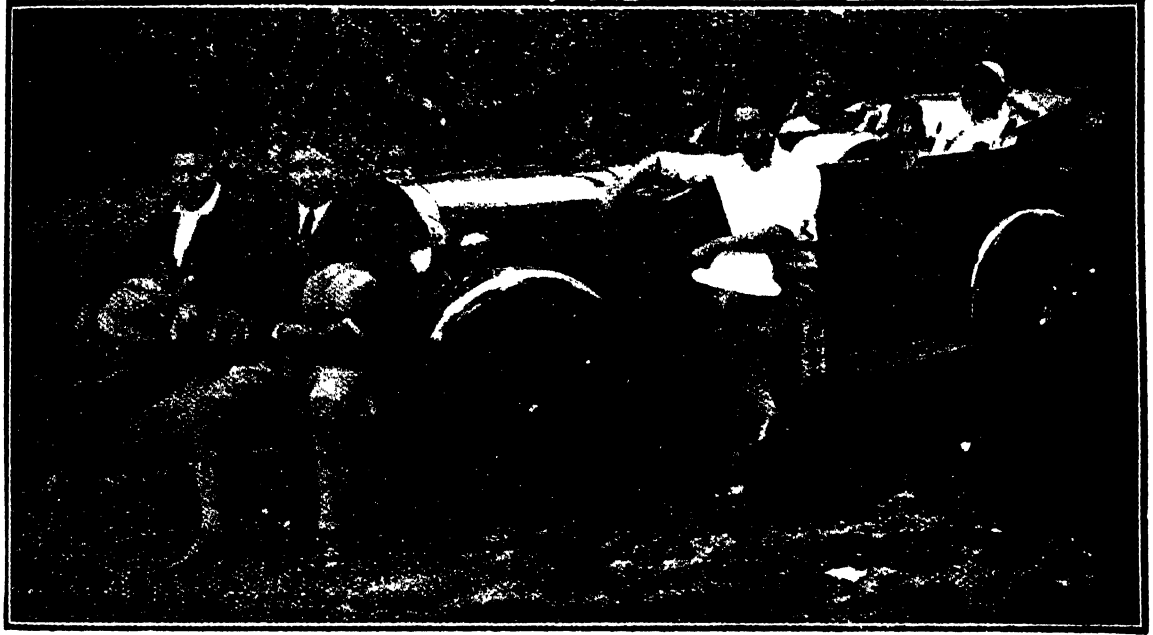
বাম্পারের উপর—(সুমুখে) লেখক, পাশে—শ্রীযুক্ত ঘোষ, Steeringএ—ধীরেন ভায়া,
পিছনের সীটে—(১) সেজদি, (২) হাসি (ছোট্ট মেয়ে), (৩) শ্রীমতী, Foot-boardএ—সুধাংশু ভায়া

কলকাতার A. A. B, বোম্বায়ের Western Automobile Association এর সম্পাদককে পরিচয়-পত্র দিয়েছিলেন। ইনি মাদ্রাজ পথের Route sheet ও একখানি সুন্দর গাইড বই আমাদের উপহার দিলেন।

যেদিন বিকাল সাড়ে চারটায় "কলিকাতা মেলের" পূজা-স্পেশ্যালখানি শ্রীমতী, সেজদি ও ঘোষভায়াকে নিয়ে কলকাতার দিকে ছুটল ঠিক তার দুদিন পরেই আমি—দিয়ে, কলম ছেড়ে, নিশ্চিন্ত মনে আমি steeringএ বসলাম।

আশা করি, ভায়ার কাব্যি-রস-ভরা লেখনী অনেক নূতন নূতন ভাব ও রসের সঞ্চার করে আপনাদের সুখী ও তৃপ্ত করবে।

তা হ'লে—আসি ?

(ক্রমশঃ)

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের অন্ন-সমস্যা-মীমাংসা

শ্রীহলধর বর্দ্ধন

গত চৈত্র মাসের "ভারতবর্ষে" শ্রদ্ধেয় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের "কৃষি ব্যবসায় ও বাঙ্গালী যুবকের অন্ন-সমস্যা"-শীর্ষক প্রবন্ধ পড়লুম। বর্ত্তমান বাঙ্গলায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জীবনে অন্ন সমস্যা সত্যই একটা জটিল সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তাই প্রবন্ধের শিরোনামটি দেখে—বিশেষ ক'রে আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ ব'লে—অতি উৎসুক চিত্তে সেটি প'ড়েছিলুম; আশা ক'রেছিলুম, অন্ন-সমস্যা সমাধানের একটা সহজ ও সুনিশ্চিত পথের নির্দ্দেশ এর মধ্যে পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রবন্ধটির আদ্যোপান্ত মনোযোগ সহকারে প'ড়ে দেখলুম, তা'র কিছুই নেই। আছে শুধু ফরিদপুর জেলার কৃষি কর্ম্মচারী রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের প্রশংসাবাদ এবং অসহায় শিক্ষিত যুবকদের কটু নিন্দা।

চতুর্দ্দিকে শুনতে পাওয়া যায়, বাঙ্গলাদেশে গভর্ণমেণ্টের যে-সকল কৃষিক্ষেত্র আছে, সেগুলি এক-একটি শ্বেত-হস্তী বিশেষ। তা'রা বহুদিন প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে, কিন্তু তা'দের কোনোটিতেই লাভ হওয়া দূরে থাক, প্রতি বৎসর যে টাকা ব্যয় হয়, তা'র অর্দ্ধেকও আয় হয় না। কৃষিবিভাগের ছাপানো বার্ষিক বিবরণীতে দেখলুম, দেবেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের কৃষিক্ষেত্রেও কোনো বৎসর এর ব্যতিক্রম হয়নি। কৃষি-কার্য্য একটা কারবার বিশেষ,—অপর সকল কারবারেরই মতন এ কাজে টাকা খরচ ক'রে টাকা উপার্জ্জন ক'রতে হয়। কিন্তু ব্যয়ের চেয়ে আয় যদি বেশী না হয়, তবে লোকে কি সাহসে সে কাজে অগ্রসর হবে? বিঘায় পঞ্চাশ টাকা খরচ ক'রে যদি পঁয়ত্রিশ টাকার পাট জন্মায়, বা তিরিশ টাকা খরচ ক'রে পঁচিশ টাকার ধান জন্মায়, তাহলে সে পাটের গাছ যত মোটাই হো'ক এবং ধানের শীষ যত লম্বাই হো'ক, কেউই তা'তে ভুলবে না। তাই ফরিদপুর কৃষি-ক্ষেত্রের আখ, তামাক, ফুলকপি, বাঁধাকপি ইত্যাদির আকারের বর্ণনা না ক'রে যদি আচার্য্য মহাশয় বা রায় সাহেব মহাশয় সেগুলির আয়-ব্যয়ের একটা সঠিক ও বিস্তৃত বিবরণ উক্ত প্রবন্ধে দিতেন, তাহলে সেটা যথার্থ কার্য্যকরী ও শিক্ষাপ্রদ হ'তো। বিলাত-ফেরতারা যাঁর কাছে পদানত হ'য়ে থাকতে পারে, এ-হেন রায় সাহেব মহাশয়ের কৃষিক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক কৃষিজ্ঞান লাভ ক'রে যে-সকল ভদ্র যুবক চাষবাসে লেগেছেন, তাঁদের অন্ততঃ দু'-চার জনের নাম ধাম ও চাষের একটা সঠিক লাভালাভের হিসাব যদি প্রবন্ধটির কোথাও থাকতো, তাহ'লে তা'তেই অনেক কাজ হ'তো।

বেকার শিক্ষিত যুবকদের চাকরীর সন্ধানে বৃথা ঘুরে না বেড়িয়ে চাষবাস ক'রতে আজকাল সকলেই পরামর্শ দিচ্ছেন। বাইরে থেকে এ কথা শুনতে বেশ লাগে। কিন্তু ব্যাপারটার ভেতরটা যদি কেউ ভাল ক'রে তলিয়ে দেখেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে, শুধু চেষ্টার অভাবই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একমাত্র অভাব নয়। চেষ্টার অভাবের চেয়ে অনেক বড় নানা প্রতিবন্ধক আছে, যেগুলি উত্তীর্ণ না হ'লে সাধারণ ভদ্রলোকের পক্ষে চাষবাসে নামা কার্য্যতঃ সম্ভব নয়। অভিজ্ঞতার অভাব, মূলধনের অভাব, সুবিধাজনক জমীর অভাব, সদ্য উপার্জ্জনের প্রয়োজন, এ সকল বড় সহজ প্রতিবন্ধক নয়। ধান, পাট, গম, ছোলা প্রভৃতি যে-সকল ক্ষেত্রজাত ফসল সাধারণতঃ চাষীরা আবাদ করে, সে-সব ফসলের আয়-ব্যয়ের যদি একটা সূক্ষ্ম হিসাব করা যায়, তাহলে দেখা যায় যে, খরচ-খরচা বাদে সে-সকল চাষে কোনো মোটা রকম লাভ হয় না। চাষারা স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, ভাই, বোন প্রভৃতি পরিবারের সকল লোক মিলে মাঠে খেটে চাষ-আবাদ করে। ভাল ক'রে হিসাব ক'রে দেখলে বোঝা যায়, তাদের মজুরীটুকুই কার্য্যতঃ চাষের লাভ। কিন্তু বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায় ভদ্র চাষীর পক্ষে সপরিবারে মাঠে খাটা সম্ভব নয়; সুতরাং মজুর-খরচা দিয়ে তা'কে সকল কাজ করাতে হবে। সে-সকল খরচা বাদে ভালরকম লাভ ক'রতে হ'লে ভদ্র চাষীদের ক'রতে হবে তরি-তরকারী, আখ, আলু প্রভৃতি বেশী লাভের চাষ—

যা'কে ইংরিজীতে বলে intensive cultivation। এ-সকল ফসলের চাষ সাধারণ নীচু এঁটেল জমীতে হয় না, দোঁয়াশ ভাঙ্গা জমী চাই। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে intensive cultivationএর জমী সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না; কারণ, এখানকার বারো আনারও বেশী জমী ধান-জমী। তার পর এ চাষে বেশী মূলধনের প্রয়োজন হয়, সে মূলধন সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের নেই। আবার, সহরের বা রেল-ষ্টীমার ষ্টেশনের কাছাকাছি না হ'লে এ-সকল চাষে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা নেই; কারণ, শীঘ্র বিক্রয়ের সুবিধা না থাকলে তরি-তরকারীর মত পচনশীল জিনিষের চাষ বিপজ্জনক। তা'র পর, আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতিই এমন যে, চাষের কণামাত্র জ্ঞান আমরা স্কুল-কলেজে পাই না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কেরাণীই তৈরী হয়, কৃষিজীবী তৈরী হয় না। এই অকেজো শিক্ষা-পদ্ধতির জন্য দায়ী শিক্ষিত যুবকেরা নয়—দায়ী আচার্য্য মহাশয়ের মত গণ্য, মান্য, বিজ্ঞ ব্যক্তিরাই। তাঁরা সমবেত চেষ্টা ক'রলে আমাদের প্রয়োজনের অনুযায়ী শিক্ষা-পদ্ধতি নিশ্চয়ই প্রবর্ত্তিত হতে পারতো, এখনও পারে। কৃষি-জ্ঞানের কণামাত্রও পুঁজি না নিয়ে সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকেরা কী সাহসে চাষে নামবে! অবশ্য চাষে নেমে লেগে থাকলে ধীরে ধীরে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা যায় বটে, কিন্তু আচার্য্য মহাশয় নিশ্চয়ই জানেন যে, আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশেরই অবস্থা "অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণঃ," সদ্য উপার্জ্জন না ক'রলে তাঁদের হাঁড়ি চড়ে না। তা'র পর আর একটা মস্ত বড় প্রতিবন্ধক—বিক্রয়ের অসুবিধা। আমার ভালরকম জানা চার-পাঁচজন উচ্চ-শিক্ষিত ভদ্র যুবক চাকরীর চেষ্টা না করে প্রথম থেকেই আন্তরিক আগ্রহে চাষে নেমেছিলেন, ফসলও বেশ ভালই হয়েছিল; কিন্তু যখন সেই মাল বিক্রয়ের জন্য ব্যাপারী বা ফোড়ের কাছে গেলেন, তখন তা'রা এমন দর হাঁকল যে, তাঁদের বিশেষ কিছুই লাভ থাকে না। আমাদের দেশে যে দরে বাজারে জিনিষ বিক্রয় হয়, সে দরের দ্বারা চাষীর লাভের হিসাব করা যায় না; কারণ, লাভের বারো আনাই মারে ব্যাপারী, দালাল ও ফোড়েরা। এই দুর্ভাগ্য অবস্থার একমাত্র সমাধান হয় সমবায় বিক্রয় সমিতি প্রতিষ্ঠিত ক'রে। সমস্ত অবস্থা ভাল করে ভেবে দেখলে বেশ বোঝা যায় যে, ভদ্র যুবকদের চাষ করার পথে এই রকম ছোট-বড় নানা প্রতিবন্ধক আছে। সে সকলের বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়, বর্ত্তমান অবস্থায় সেই-সকল বাধা উত্তীর্ণ হবার সুযোগ ও সামর্থ্য অধিকাংশ ভদ্র যুবকের নেই। তা যদি থাকতো, তাহলে বেকার ব'সে না থেকে অন্ততঃ দু-দশ জন শিক্ষিত যুবক চাষবাসে নেমে জীবিকা অর্জ্জন ক'রতেন।

তা'র পর অর্থনীতির দিক দিয়ে একটা মস্ত বড় ভাববার কথা আছে—ভদ্র যুবকের চাষবাস করাই বেকার-সমস্যার চরম মীমাংসা কি না! বাঙ্গলা দেশে সাধারণ কৃষকদের চাষের জমীর পরিমাণ এত অল্প যে, যদি শিক্ষিত সম্প্রদায় গিয়ে তা'র ওপর পড়ে এবং কল-কব্জা বসিয়ে চাষবাস ক'রতে সুরু ক'রে দেয়, তাহলে তার ফলে ভদ্র যুবকদের বেকার-সমস্যা ঘুচে গিয়ে বেকার কৃষক-দলের সৃষ্টি হ'তে পারে। সুতরাং জমীর ওপর ভিড় না বাড়িয়ে দেশে শিল্পের প্রবর্ত্তন ক'রে কৃষকদের উৎপন্ন অগণিত কাঁচামালকে পাকামালে পরিণত করা বোধ হয় বেকার-সমস্যার সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ এবং কল্যাণকর মীমাংসা। আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতিকেও এমন ক'রতে হবে, যা'তে শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে ভদ্র যুবকরা সেই সকল শিল্প-কর্ম্ম করতে সমর্থ হয়।

বালিকা-দেবী

শ্রীজ্যোৎস্নানন্দ সেন

ওগো ও বালিকা, কে তব আঁকিল
অমন মুখের ছবি!
কত কাল ধরি' কত মালা গাঁথি'
তোমাকে সাজাল কবি।
হরিণ-নয়নে চকিত চাহনি
কত যে জাগাল ব্যথা,
গোলাপী অধর সুরে বেঁধে দিল
তাদের মরম কথা।
মৃণাল-ভুজের স্নিগ্ধ পরশে
তাদের কাঁপন লাগে,
অঙ্গের শোভা দিবানিশি ধরি'
তাদের মরমে জাগে।

ওগো ও বালিকা, তুমি তো এলে না
এ রূপে আমার কাছে;
কুণ্ঠা যে বাড়ে মরমে আমার
সরল রূপের মাঝে।
হাসিটী তোমার সরলতা-মাখা,
বাসনা জাগান নয়;
কথা কও তুমি খেলাধুলা নিয়ে,
কামনা নাহিক তায়।
কবিগণ যত গেঁথেছিল গাথা
আজি কোথা সবে তারা?
পুরুষ যে তব ভাঙ্গে সরলতা, —
করে আজি রূপ-হারা!

শাস্ত্রকারেরা গড়িল সত্য
মিথ্যা মরমে ঢাকি—
নারী নিলে সাথী ধর্ম্মের পথে
সব পড়ে' যায় বাকী।
বালিকা মূরতি ভাঙ্গিল তোমার
নিদয় নিঠুর হ'য়ে;
ছিনিমিনি খেলা খেলিল তোমার
সরল হৃদয় নিয়ে।

ফিরে যত দোষ দিল তব নামে
অন্তরে কালিমা মাখি;
আমি যে গো জানি অন্তর আমার,—
তুমি তো সরলা সখী।

ওগো ও বালিকা, কয়েছো যে আজ
তোমার মরম কথা,
কোমল সরল ক'রেছ আমারে
দূর ক'রে সব ব্যথা;
শিখায়েছ তুমি কেমনে তোমার
হাতটী ধরিতে হয়,
রূপের আলোটী জ্বালায়ে দিয়েছ
লাজে মহিমাময়।

গরবে আমার ভ'রেছে হৃদয়
মরমে লেগেছে সুর—
লাজে রাঙ্গা রূপ হীন ক'রি নেই,
তবু তো হই নি দূর!
কম্পিত বুকে দিই নি ক আমি
এতটুকু ব্যথা কভু
মরম আমার ভেঙ্গেছিল যদি
জানিতে দিইনি তবু।

জয়ের গর্ব্বে ভ'রেছে হৃদয়
ভয় গেছে আজ চলি;
প্রেমের প্রতিমা ধ'রেছি যে বুকে
কত না আদরে তুলি।
নাই বা শুনিলে গোপন কথাটী
ওগো ও বালিকা দেবি!
বিধাতা করিল তোমারই তরে
আমারে আজিকে কবি॥

চীন

শ্রীভারতকুমার বসু

(২)

চীনাবাসীরা তাদের সন্তানদের ভালবাসে যেমনি, তাদের প্রতি নিষ্ঠুরও হয় তেমনি! সমাজপ্রিয়তা ও সদ্ব্যবহার হচ্ছে চীনবাসীদের মস্ত গুণ! কিন্তু তা সত্ত্বেও সুবিধা পেলে পাড়া-পড়সীদের প্রতি তারা তীব্র ব্যঙ্গোক্তি ক'রতে ছাড়ে না! এইতেই না কি তারা প্রচুর আনন্দ পায়! সেখানে দুর্ভিক্ষ ও জলপ্লাবনের ব্যাপার ঘটে প্রায়ই। সে সময় অসংখ্য লোকের কষ্টের সীমা থাকে না। অবস্থাপন্ন লোকেরা তখন দুঃস্থদের সাহায্য করে। এ সাহায্যের মূলে কিন্তু তাদের কোনই আন্তরিকতা থাকে না। যা থাকে, তা হচ্ছে ধর্ম্মপ্রবণতা! কারণ, তাদের ধর্ম্ম-গুরু কন্‌ফ্যুসিয়াস্ দয়া দেখাবার জন্যই উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন! অতএব তা অবশ্যই প্রতিপাল্য!…

চীনদেশের ছোট-খাটো অপরাধের বিচার কোর্ট পর্য্যন্ত গড়ায় না। কারণ, এই সমস্ত অপরাধের শাস্তি দেবার জন্য প্রত্যেক পাড়াতেই একটা ক'রে পাণ্ডাদের দল থাকে। শাস্তি দেবার ভার তারাই নিজেদের হাতে তুলে নেয়! এবং তখনকার ব্যাপারে তাদের আইনকেই চরম ব'লে ব্যক্ত করে।…উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, খুবই সামান্য কোনো অপরাধের জন্য আসামী শাস্তি পেতে পারে দুই কিম্বা তিন হাজার বার বাঁশের আঘাত! এ সম্বন্ধে প্রতিবাদ করবার কারুরই কিছুই নেই!…চীনদেশে

বৈকালিক ভ্রমণ

চীন-রাজপথের জনারণ্য

জেলখানার সংখ্যা হচ্চে প্রচুর! কয়েক বছর আগে সেখানকার গভর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব ক'রেছিলেন যে, ঐ সমস্ত জেলখানা এইবার প্রত্যেক পাড়াতে পাড়াতে উঠিয়ে আনা হোক! সেখানকার শিক্ষিত ব্যক্তিরা কিন্তু এই প্রস্তাব সমর্থন ক'রতে পারেন নি! তাঁরা বলেন যে, জেলখানা ওই-রকম ভাবে উঠিয়ে আনলে, অপরাধীর সংখ্যা তাতে আরও দশ গুণ বাড়বে এবং যে সমস্ত লোক খাবার ও থাকবার স্থান পাচ্ছে না, তাদের ওতে প্রকারান্তরে খুবই উপকার হবে!…

চীনদেশের রাস্তাগুলি খুবই অপ্রশস্ত! বর্ষাকালে সেগুলি ছোট-ছোট খালের আকার

ধারণ করে, বললে অত্যুক্তি হয় না!…এই সব রাস্তার ঠিক ধারেই যাদের বাড়ী, তাদের মনস্তত্ত্ব অদ্ভুত! · বাড়ীর

ভাগ্য-পরীক্ষা!
বরাত অনুযায়ী কলের-নম্বরে ওঠা মিষ্টান্ন-সংখ্যা বিতরণ!

সামনের দিক যতই জীর্ণ হ'য়ে যাক না কেন, তার মেরামৎ করবার কল্পনা কখনো তারা করে না! এবং তাদের বাড়ীর সামনেকার রাস্তাকে বে-ওয়ারিশ বস্তুর মতই তারা নিজেদের কাজে লাগাতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না!…উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, বাড়ীর সামনে রাস্তার উপর কেউ এক গাড়ী মাল নিয়ে এল। এই মাল যতক্ষণ না নামিয়ে সরানো হচ্ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উক্ত গাড়ীর পিছনে রাস্তার সমস্ত লোকজন-গাড়ীঘোড়া দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য!…কেউ আবার রাস্তার মাঝখানেই চুণ, সুরকির 'তাগাড়' তৈরী ক'রতে আরম্ভ করে। সে সময়ে সে ভ্রূক্ষেপও করে না যে, তার সেই কাজের জন্য রাস্তার অপর যাত্রীর অসুবিধা হচ্ছে কি না!…কেউ কেউ রাস্তার উপরে অভিনয় করবার জন্যে ষ্টেজ বাঁধবার কল্পনা করে। কেউ আবার বাড়ীর জামা-কাপড় এনে রাস্তার উপর শুকোতে দেয়! অনেক সময়ে নাপিতও এসে রাস্তার মাঝখানে বসে যায়—ক্ষৌরকার্য্য করবার জন্যে! তার পর, প্রয়োজন হ'লে রাস্তার মাঝখানে কাঠুরিয়ার কাঠ কাটা ত আছেই!…এ সমস্ত ব্যাপারে কিন্তু প্রতিবাদ করবার কারুরই এতটুকু কিছুই নেই!…অর্দ্ধ-শিক্ষিত চীনবাসীদের মনস্তত্ত্ব অদ্ভুত! তাদের কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা যায় যে, উপস্থিত শাসনতন্ত্রের ব্যাপার সে কি রকম বুঝচে, অথবা, গভর্ণমেণ্ট যা প্রস্তাব ক'রেছেন, সে সম্বন্ধে তার কি মত,—তা হ'লে অত্যন্ত বিস্ময়ে সে প্রশ্নকারীর মুখের দিকে চেয়ে' বিরক্তিতে মুখখানাকে কেমনতরো ক'রে তৎক্ষণাৎ উত্তর দেবে, "এ সম্বন্ধে আমার মাথা ঘামাবার ত মোটেই দরকার নেই! যারা এ বিষয়ে চিন্তা ক'রবে, গভর্ণমেণ্ট তাদের মাইনে দিয়ে নিযুক্ত ক'রেছেন!" কিন্তু তাদের এই বিস্ময় চরমে ওঠে তখন, যখন তারা দেখে যে,

বাদ্যকর

তাদের দেশে নতুন আসা এক ইংরেজ মহিলা ব্যাট্ নিয়ে টেনিস্ বল্ খেলছে!… অবাক হ'য়ে তারা তখন বলে, "কী মুস্কিল! ওই মহিলাটী এত দৌড়াদৌড়ি ক'রে মিছিমিছি কষ্ট পাচ্ছে কেন? মাত্র তিনটে হাফ্-পেনি দিলেই ত একটা মুটে সমস্ত দিন ধ'রে ওঁর কাজ ক'রে দিতে পারে!" …কিমাশ্চর্য্যম্ অতঃপরম!…

চীনবাসীরা অত্যন্ত স্বদেশপ্রিয়! কাজের জন্য বাধ্য হ'য়ে যে-কোন চীনবাসী যে-কোন বিদেশেই থাক না কেন, তার অন্তরে রাতদিন এই ইচ্ছাটীই জেগে থাকে যে, সে যেন তার স্বদেশে এসে মারা যায়, আর, সেইখানেই তার কবর হয়!…এই জন্যই অপরাধী চীনবাসীদের প্রতি চরম এবং ভয়ঙ্করতম শাস্তি হচ্ছে—স্বদেশ হ'তে বহু দূরস্থ কোন স্থানে নির্ব্বাসন!…তার এই নির্ব্বাসিত জীবনে সমস্ত স্বাধীনতাই সে পেতে পারে। কিন্তু যদি সে ভুলক্রমেও কোনো দিন তার স্ত্রী পুত্র অথবা প্রিয়জনকে দেখবার ও চিঠি লেখবার চেষ্টা করে, তা হ'লেই তার প্রাণদণ্ড হবে! চীনবাসীরা তাদের স্বদেশকে এত ভালবাসে যে, যদি কোন বিদেশী সেখানে আসে, তা হ'লে তারা ভাববে যে, সে যেন তাদের দেশের ক্ষতি করবার জন্যই এসেছে! এই কারণেই তারা সেই বিদেশীকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে।…

চীনদেশের রমণী-রহস্য একটী জানবার মত জিনিষ।…সাধারণতঃ 'রমণী' ব'লতে সেখানে বোঝায় পুরনারীকে। এই নারী ও তার স্বামীর মধ্যে একটী সুন্দর সম্বন্ধ থাকলেও, নারীর স্থান বরাবরই পুরুষের নীচে! এবং পিতৃপুরুষের পূজা-ব্যাপারে পুরুষের সঙ্গে নারী কখনো যোগ দিতে পারবে না। চীনবাসীরা স্পষ্টাস্পষ্টিই বলে

গণৎকার

দাসীর রুচি অনুযায়ী প্রত্যেক অভিজাতা চীন-রমণীই এইভাবে কেশবন্ধন করান্!

ভেল্কী খেলা

যে, নারীর কাজই হচ্ছে কেবল বাড়ীকে নিয়ে, আর, তারা আছে শুধু সন্তান প্রসবের জন্য।...

চীনদেশের হাজার হাজার লোক এক-রকম প্রায় অভুক্ত অবস্থাতেই থাকে বললেই হয়! এমন কতবার হয়, যখন কোন পরিবারের মধ্যে খাদ্য-অভাবে দু'তিনটী ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে মারা যায়। হয় ত বেঁচে রইল আর

চীনা কুমারী

একটী শিশু কন্যা! এই রকম অবস্থায় সাধারণতঃ নিরুপায় হ'য়েই বাপ-মা ওই শিশু কন্যাকে হত্যা করে! কিন্তু ঘটনাচক্রে যদি সে হত না হয়, তা হ'লে সে বরাবরের জন্যই বেঁচে গেল।...কিন্তু এ বাঁচাতে মেয়েটীর সুখ এতটুকু নেই! কারণ, সে যে লালিত-পালিত হবে অত্যন্ত অবহেলা ও দৈন্যের ভিতর দিয়ে! তার জীবনের এই দুঃখ ও দৈন্য ঠিক ততদিন পর্য্যন্ত থাকবে, যতদিন পর্য্যন্ত না সে বিবাহিতা হ'য়ে পুত্রবতী হয়, এবং সেই পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তার বিবাহ দিয়ে পুত্রবধূ ঘরে আনতে পারচে!...বিবাহিত হ'য়েও সে যে সুখী হ'তে পারবে না, তার কারণ হচ্ছে এই যে, তার শ্বশুর ও শাশুড়ীর কাছ থেকে আদর ও ভর্ৎসনা এবং সুখ-দুঃখ নির্ভর করে তার পুত্রবতী হওয়া ও না-হওয়ার উপর!

পিতৃতর্পণ

পিতৃপুরুষদের আত্মার ব্যবহারের জন্য এই লোকটী এই সমস্ত কাগজের নকল-মুদ্রা কিনে মালার মতন ক'রে সেগুলোকে এক দড়ি দিয়ে গেঁথেছে! এই সমস্ত মুদ্রার নগদ মূল্য তিরিশ শিলিং! ওই সমস্ত কাগজের মুদ্রা এক একটী প্যাকেটের মধ্যে পুরে, সেগুলিকে পিতৃপুরুষদের করে উপর রেখে পুড়িয়ে ফেলা হয়! চীনবাসীদের ধারণা, এই রকম ক'রলেই তাদের পিতৃপুরুষদের আত্মা খুব সন্তুষ্ট হবে!

লোকচক্ষে মেয়ে-পুরুষের একত্র সমাবেশ চীনবাসীরা বরদাস্ত ক'রতে পারে না। যথা—সাত বছরের বেশী বয়সের মেয়ে তার ভাইয়ের সঙ্গে এক টেবিলের সামনে ব'সতে পারবে না!—বাপ কখনো একই ঘরে তার মেয়ের কাছে ব'সতে পারবে না! এবং একই আল্‌নায় মেয়ে ও পুরুষের জামা ও পোষাক ঝোলানো থাকবে না!

শিক্ষার দিক দিয়ে চীনা মেয়েরা বেশী দূর এগোয় নি! কারণ, যে ক'টা মিশন্ স্কুল সেখানে আছে, ছাত্রী সেইখানেই কেবল দেখতে পাওয়া যায়! তা'ও সংখ্যায় খুব বেশী নয়! চীনা মেয়েদের বাপ মা'রা বলেন, "মেয়েদের শ্বশুর-শাশুড়ীরা যদি তাঁদের পুত্রবধূদের শিক্ষিতাই দেখতে চান, তা হ'লে তাঁরাই সে বিষয়ে পরে চেষ্টা ক'রে দেখবেন! আমরা কেন শুধু শুধু এজন্যে মাথা ঘামাতে যাবো?"

কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এই যে, মেয়েদের মা-বাপ মেয়েদের যত শীগ্গির সম্ভব বিয়ে দিতে পারলেই যেন বাঁচে! কিন্তু দারিদ্র্যের জন্য যদি এই বিয়ে না হয়, মেয়ে তা হ'লে সাধারণের কাছে পণ্য বস্তুর মতই হ'য়ে দাঁড়াবে!...

চীনা মেয়েদের প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য হচ্ছে দৈহিক পরিশ্রমের কাজ করা! এই সমস্ত মেয়ে বিবাহিত না হওয়া পর্য্যন্ত সাধারণতঃ কখনো বাড়ীর বাইরে পা দেয় না!

'সাঙ্গাই'—দেশের রমণীরা কিন্তু এ আদর্শ হ'তে সম্পূর্ণ ভিন্ন! তারা হচ্ছে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন! তারা খুব উৎসাহের সঙ্গেই সাধারণ বক্তৃতা-সভায় মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেয় এবং স্বাস্থ্য-শিক্ষা-মন্দিরে যোগদান করে! কিন্তু 'পিকিং'য়ের মতন 'সাঙ্গাই'কে আসল চীন বলা যায় না! কাজেই, সেখানকার ব্যাপারের সঙ্গে আসল চীনের কোনই সম্বন্ধ নেই!...

চীনা মেয়েদের বিবাহের রহস্যটী হচ্ছে এই যে, তাদের বিবাহ হয় পূর্ব্ব হ'তে তাদের মা-বাপের বাগ্দানের ফলে, অথবা সাধারণ বিবাহ-পদ্ধতি অনুসারে। মেয়ের সঙ্গে তার ভবিষ্যৎ স্বামীর সাক্ষাতের, অথবা প্রেমে পড়বার কোন প্রশ্নই সেখানে আসে না। চীনা মেয়ের কাছে 'রোম্যান্স্' কথাটা একেবারেই অজ্ঞাত!...সুবিধা হ'লেও চীনা মেয়ে কখনো তার ভবিষ্যৎ স্বামীকে দেখতে পাবে না!...কিন্তু সকলের চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিবাহের সময়ে মেয়ের ভবিষ্যৎ স্বামী বিবাহের স্থানে উপস্থিত না থাকলেও চলতে পারে! হয় ত সে সময়ে সে পরীক্ষার জন্য পড়াশুনায় নিযুক্ত থাকতে পারে। কিন্তু তাতে বিবাহের কিছুই ক্ষতি হয় না!...সাধারণতঃ এই বিবাহ কোন পেশাদার ঘটকের মধ্যস্থতাতেই সম্পন্ন হয়। এবং তা হয়—পাত্র ও পাত্রীর খুব কচি বয়সে!...চীনদেশে এই-রকম একটী ধারণা আছে যে,' বিবাহের পূর্ব্বে মেয়ের সঙ্গে যদি তার ভবিষ্যৎ শ্বশুর-

আমোদ ও শিক্ষা—এই কলের চোঙা কানে লাগিয়ে ছেলেরা গ্রামোফোনের মতন শিক্ষাপূর্ণ কথা শুনছে।

অসি-ক্রীড়া।

বাড়ীর কোন ব্যক্তির হঠাৎ দেখা হয়ে যায়, তা হ'লে, বর ও কন্যা—উভয় পক্ষের লোকেরাই ভাববেন যে, এইবার শনির দৃষ্টি তাঁদের উপর প'ড়বে! কখনো কখনো উভয় পরিবারের মধ্যে কোনো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির মৃত্যু পর্য্যন্তও কল্পনা করা হয়।···এই কল্পনা অনুসারে, যাতে কোনো পরিবারের কোনো কিছু ক্ষতি না হয়, সেদিকে সাবধান হ'য়ে, কোনো মেয়ের মা-বাপ ই মেয়েকে তাদের এক পল্লীবাসী কোনো ছেলের সঙ্গে বিবাহ দেয় না!

শিকারী

এই বাজ-পাখী নিয়ে বন্য-পাখী শিকারে বেরিয়েছে। এই শিকারই চীনবাসীদের একটী প্রিয় প্রমোদ।

ফেরীওয়ালা

এই বৃদ্ধ এবং দুঃস্থ চীনবাসী একটা 'ট্রে' তে কিছু জিনিষ নিয়ে বেচতে যাচ্চে! সেই বিক্রয়-লব্ধ অর্থতেই তার জীবিকা নির্ভর করে।

চীনা চিকিৎসক ও তাহার ভৃত্য।

চীনদেশে পরীক্ষা দিয়ে কেউ কখনো চিকিৎসক হয় না। এই কারণে, প্রত্যেকেই যদি সেখানে নিজেকে ডাক্তার ব'লে পরিচয় দেয়, তা হ'লে প্রতিবাদ করবার তাতে কিছুই থাকতে পারে না।

বিবাহ হ'য়ে গেলে মেয়ের বাপ-মা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে; কারণ, এতদিনে যেন ভগবানের অসীম অনুগ্রহে তাদের গলা থেকে বিষম একটী ভার নেমে গেল। আর পাত্রের পিতামাতাও তখন খুব খুসী হয়; কারণ, এতদিনে তাদের সাংসারিক কাজে সাহায্য করবার জন্য তারা একটী লোক পেলে। কিন্তু তাদের এই আনন্দ দ্বিগুণ বাড়ে, যখন তারা স্মরণ করে যে, এরই ভবিষ্যৎ পুত্র তাদের মৃত্যুর পর তাদের কবরের পাশে ব'সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ক'রবে!···

নবপরিণীত চীনা স্বামী-স্ত্রীর মনস্তত্ত্বের বিশেষত্ব অদ্ভুত! ভবিষ্যৎ সুখের রঙীন কল্পনায় তারা অভিভূত হ'য়ে পড়ে না। কিন্তু তারা যে ক্রমশঃ পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ে, তা কেবল প্রকৃতির নিয়মেই! কিন্তু আশ্চর্য্যের উপর আশ্চর্য্যের কথা এই, তারা তাদের প্রতিবেশী অথবা বন্ধু-বান্ধবদের কাছে তাদের সেই সুখের জীবনের এতটুকু

কথা কখনো ভুলেও প্রকাশ করে না! বরং, স্ত্রী রাত-দিনই প্রত্যেক ব্যাপারের ভিতর দিয়েই সকলকে জানাতে চায় যে, সে তার স্বামীকে আদৌ ভালবাসে না!

ধান্যক্ষেত্রে মৎস্য-শিকার

এই লোকটী যেখানে মাছ ধ'রছে, সেটী পুকুর কিম্বা নদী নয়;—কিন্তু একটী ধানের ক্ষেত! এই ক্ষেতটী জলপ্লাবিত করবার পর, তাতে বিভিন্ন মাছের চারা ফেলেছিল!…
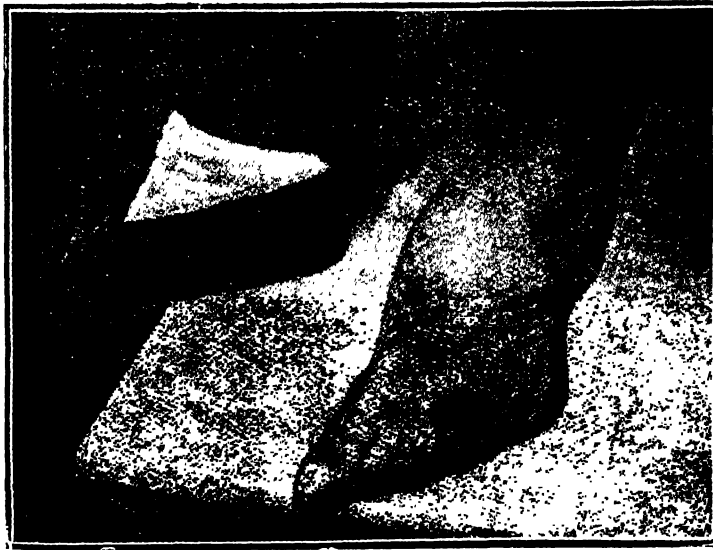
নারী-সৌন্দর্য্য!—চিরন্তন পদ্ধতি অনুসারে ছেলেবেলা হইতে আঁটুজুতা পরিয়ে চীনা নারীর পা এইরকম করা হয়।

চীন-দেশে শিশু-হত্যার সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। তার একমাত্র কারণ, সেখানকার লোকাধিক্য ও দারিদ্র্যের জ্বালা।…এই একই কারণে, কন্যা ও স্ত্রী-বিক্রয় সেখানে চলে খুব বেশী! এগুলি কিন্তু সম্পূর্ণ আইন-বিরুদ্ধ! এবং উক্ত বিক্রয়-ব্যাপার কোথাও দেখা গেলেই আইন মতে অপরাধীর শাস্তি হবে খুব কঠোর!… কিন্তু এই শাস্তির কঠোরতা জানা সত্ত্বেও উক্ত বিক্রয়-ব্যাপারের কিছুমাত্র অল্পতা সেখানে দেখা যায় না!

ভারী মাল বহন

প্রত্যেক চীনা কুলীই প্রত্যহ ২০০ পাউণ্ড (lb) ওজনের জিনিষ অনায়াসে ১০ মাইল পথ নিয়ে যেতে পারে।

সাধারণের চোখে চীনবাসীদের ঘরোয়া ব্যাপারে অপ্রকাশ্য কিছুই নেই! চীনাদের বাড়ীর দরজা রাত-দিনই হাট্‌-ক'রে খোলা থাকে! এবং যদি কোন পথিক রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে তাদের বাড়ীর ভিতরটী দেখতে ও সেখানে ব'সতে

ইচ্ছা করে, তা হ'লে গৃহস্বামী অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তাকে অভ্যর্থনা ক'রবে! এইতেই না কি তারা প্রচুর আনন্দ পায়! কিন্তু এ রহস্যের এইখানেই শেষ নয়! চীনা গৃহস্বামী তার বাড়ীর ঘরোয়া ঝগড়ার 'উপভোগ্য' ব্যাপারটী তার প্রতিবেশীদের দেখাতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না!·· এই ঝগড়ার জয়-পরাজয় সিদ্ধান্ত হয় খুব সহজেই। কারণ, যে সব চেয়ে জোরে চেঁচাতে পারবে, তারই জিত্! এবং এই চীৎকারই বাড়ীর বাইরেকার লোকদের সেখানে টেনে আনে। ঠিক এই ভাবে যদি কোন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কোন বিষয়ের আলোচনা হয়, তা হ'লে তৎক্ষণাৎ সেই খবরটী চারিদিকে রাষ্ট্র হ'য়ে প'ড়বে, এবং যেহেতু সাধারণের চোখে চীনবাসীদের ঘরোয়া ব্যাপারের কিছুই অপ্রকাশ্য নেই, সেই কারণে, দলে দলে বন্ধু-বান্ধবীরা এসে তাদের চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াবে!···বাড়ীর মধ্যে আত্মীয়-পরিবারবর্গের ভীড় যতই বাড়ে, চীনবাসীদের ততই আনন্দ! এই কারণেই বাড়ীর মধ্যে যদি কোথাও এতটুকু জায়গা থাকে, তা হ'লে তা তৎক্ষণাৎ বিবাহিত পুত্র, পৌত্র, ভাই ইত্যাদিরা অধিকার ক'রতে আসবে।

শবযাত্রা

ধনী চীনবাসীর মৃতদেহের শোভাযাত্রা
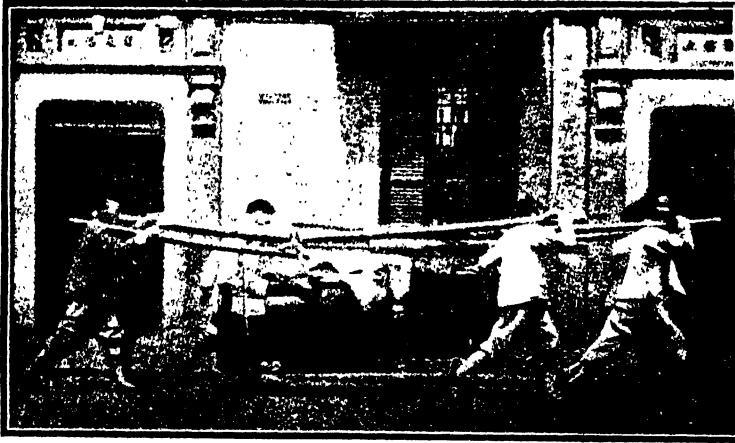
দরিদ্রের শব-সৎকার

গরীব চীনবাসীর মৃতদেহ বহন। এখানে আড়ম্বর কিছুই নেই, এবং ভাড়া-করা এই ছ'জন মুটে কাজ সারবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে!...

সাধারণ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে চীনবাসীরা মোটেই মনোযোগী নয়। তাদের বাড়ীতে যে-সব আসবাব-পত্র থাকে, মানুষের ব্যবহারের পক্ষে তা অত্যন্ত দীন!··· উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, যে 'কাঁসি'তে তারা খায়, সেই 'কাঁসিতে'ই তারা রান্না করে! তার পর তাদের বিছানার চাদর ত না থাকবারই মধ্যে; কারণ, তা অনবরতই বাঁধা দেওয়া হয়! চীনবাসীদের চরিত্রের আর একটী অপূর্ব্বত্ব,—তারা কখনো বালিশ মাথায় দিয়ে শোয় না, এবং, থান্-ইট, অথবা, কাঠের গুঁড়ি দিয়েই কাজ চালিয়ে নেয়।

চীনবাসীদের পোষাক বাস্তবিকই সুন্দর দেখতে। কিন্তু অনেক বিদেশী ব্যক্তিদের মতে, ওই সমস্ত পোষাক শীত অথবা গ্রীষ্ম কোনো কালেই ভাল ভাবে কাজে আসে না, এবং তা আরামদায়কও হয় না!···

চীনদেশে পশমের কাপড় একরকম অজ্ঞাত ব'ললেই হয়। এই কারণে, যদি কোন বিদেশী নতুন সেখানে যান, তা হ'লে তিনি হঠাৎ একদিন অত্যন্ত দুঃখিত এবং বিস্মিত হ'য়ে দেখবেন যে, তাঁর ভিতরকার পরবার পশমের ফতুয়াটী

কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেছে! বিশেষ দৃষ্টি এবং অনুসন্ধানের পর তিনি অবশ্য জানতে পারবেন যে, ওই অদৃশ্য হওয়ার কাজটী হচ্ছে তাঁর বাড়ীর চাকরের কীর্ত্তি! এই কীর্ত্তিটী সে ক'রেছিল,—ছুটীর দিনে ওই ফতুয়াটী সাধারণ বসনের উপর পরে তার পর-শ্রী কাতর বন্ধুদের সামনে গিয়ে রীতিমত 'চাল্' দেখাবার জন্য! · দৈনন্দিন খুঁটিনাটী ব্যাপারে চীনবাসীরা ইংরেজ হ'তে সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের! উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ইংরেজরা প্রত্যহ তাঁদের সখের কুকুরকে একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসেন! চীনবাসীরা কিন্তু ওদিক দিয়ে যায় না। তারা রোজ খুব কম আধ ঘণ্টা ধ'রে তাদের পোষা পাখীকে খাঁচার মধ্যে নিয়ে হাওয়া খাওয়ায়!···বিদেশীরা বন্ধুদের আপ্যায়িত করেন পরস্পরের কর মর্দ্দন ক'রে! কিন্তু একজন চীনবাসী তার কোনো বন্ধুর দেখা পেলেই, নিজের হাত দুটী নিজেই মর্দ্দন ক'রে প্রীতির পরিচয় দেয়!···সাধারণতঃ কোনো ইংরেজ কোনো বন্ধুর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ ক'রে ওঠবার সময় নম্র স্বরে বলে যে, সে তার বন্ধুকে খুবই কষ্ট দিয়ে গেল! কিন্তু একজন চীনবাসী ব'লবে, "না, আমি তোমাকে মোটেই কষ্ট দিইনি। তুমি খুবই নম্র! কিন্তু এ কথা আমি নিশ্চয়ই ব'লবো যে, তোমাকে আমি যথেষ্টই উদ্ধত ব্যবহার দেখিয়ে গেলুম!" যদি কোন চীনবাসীকে তার "সম্ভ্রান্ত এবং বিশিষ্ট" সন্তানদের কথা জিজ্ঞেসা করা হয়, তা হ'লে, তারা তৎক্ষণাৎ বেমালুম তাদের মেয়েদের কথা উড়িয়ে দিয়ে ব'লবে যে, তাদের "অত্যন্ত দুর্ভাগ্যগ্রস্ত" পুত্রদের সংখ্যা হচ্ছে মাত্র তিনটী!··যদি কোন ব্যক্তি কোনো চীনা গৃহস্বামীর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করবার পর, নির্দ্দিষ্ট সময়েরও বেশীক্ষণ ব'সে থাকেন, তা হ'লে গৃহস্বামী 'অত্যন্ত প্রয়োজন-বোধেই' আর এক পিয়ালা চা এনে অতিথিকে আপ্যায়িত ক'রবেন!···

কিন্তু চীনবাসীদের আর একটী বিশেষত্ব বেশ লক্ষ্য করবার জিনিষ! সাধারণতঃ প্রত্যেক বিদেশীই তাঁদের বাড়ীর সামনেকার ভাল দিকটাই বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখেন। এবং আবর্জ্জনাদি বাড়ীর পিছন দিকে ফেলে দেন। চীনবাসীরা কিন্তু এর ঠিক উল্টোটী করে। তারা বাড়ীর পিছন দিকটাই বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখে, এবং বাড়ীর সামনেকার ভাল দিকেতেই যত আবর্জ্জনা স্তূপাকারে জড়ো ক'রে রাখে!

চীনবাসীদের বই আরম্ভ হয় শেষের পাতা থেকে এবং তা পড়া হয় ডান দিক থেকে বাঁ দিকে! বইয়ের মধ্যে পাদ-টীকা লেখা হয় পাতার একেবারে উপর দিকে এবং পরিচ্ছেদের শিরোনামা লেখা হয় পাতার এক ধারে!

মৎস্য-শিকার

এই শিক্ষিত মাছ-শিকারী পাখী-গুলির গলা সরু দড়ি দিয়ে এমনভাবে বাঁধা আছে, যাতে তারা জলের মধ্যে থেকে মাছ ধ'রবে বটে, কিন্তু তা গিলে খেয়ে ফেলতে পারবে না। ওই মাছগুলি পরে তারা আপনা হ'তেই নৌকার মধ্যে রেখে দিয়ে যায়।

চীনদেশে বিদ্বানের খাতির সকলের আগে! এবং তিনি যদি অত্যন্ত দুরবস্থাপন্নও হন, তা হ'লেও, তাঁর সম্মান একটা রাজার চেয়েও ঢের বেশী!...

শিক্ষা-মন্দির সেখানে আছে প্রচুর। কিন্তু সেখানে শেখানো হয় মাত্র একটী জিনিষ! এবং তা হচ্ছে,—উপস্থিত জীবনের সঙ্গে বাহ্য-জগতের কি সম্বন্ধ, তারই শিক্ষা! চীনবাসীদের মতে, তাদের পুরাণ-অনুযায়ী এই বিষয়ের জ্ঞান অর্জ্জন ক'রতে পারলেই না কি অসীম খ্যাতি এবং সম্ভ্রমের অধিকারী হওয়া যায়! কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেখানকার ছেলেরা তাদের শিক্ষার প্রতিপাদ্য

বিষয়টীর অর্থ আদৌ বুঝতে পারে না, এবং শিক্ষকরা পর্য্যন্ত তা বোঝাবার কল্পনা কখনো করেন না! এই কারণেই, আট বৎসরের প্রায়-অজ্ঞান একটী ছেলে দুরূহ ওই ব্যাপারটী শিক্ষা ক'রে পাঁচ বছর পরে যখন বিদ্যালয় ছেড়ে দিয়ে আসে, তখন তার সে-সম্বন্ধে জ্ঞান যে কতখানি হয়, তা সহজেই অনুমেয়!...

১৯১৮ সালে কিন্তু নতুন গভর্ণমেণ্ট ছেলেদের শিক্ষার দিকে একটু নজর দিলেন। তাঁরা প্রচার ক'রে দিলেন যে, অতঃপর নৈতিক চরিত্রের উন্নতির দিকে সকলকে মনযোগী হ'তে হবে। এবং দৈহিক ও সামরিক শিক্ষাও

সদা-হাস্যমুখ

গ্রহণ ক'রতে হবে! এই প্রচারে অনেক দিনের পর সেখানকার ছেলেদের বাস্তবিকই অনেক উপকার হয়েছে!

চীনদেশে চিকিৎসকের সংখ্যা প্রচুর! তাদের দক্ষিণা নামমাত্র! সেখানকার লোকেরা অন্ধ ধারণাপূর্ণ কুসংস্কারের গোঁড়া ভক্ত! সেখানকার প্রত্যেক দরকারী এবং অ-দরকারী কাজেই গণৎকার ডাকিয়ে আলোচনা করা হয়। সে দেশের 'পাঁজী' ছাপা হয়—কেবল বিবাহ, মৃতব্যক্তির কাজ, এবং ভ্রমণ ইত্যাদি ব্যাপারের শুভ এবং প্রশস্ত সময় নির্দ্দেশ করবার জন্য! উৎসবাদির সময়ে ভাড়া-করা চেয়ার ইত্যাদির চাহিদা সেখানে বাড়ে খুব! এইজন্য তার মূল্যও হয় অত্যধিক! এই কারণে, অনেক চীনবাসী সে সময়ে ঠিক ক'রতে পারে না যে, খরচপত্তরের দিক দিয়ে সে সাবধান হবে, কি না! অনেকে আবার উৎসবের দু'তিন দিন আগে থাকতে সমারোহ ক'রে, অর্থের থলি নিঃশেষ করবার বিষয়েও চিন্তিত হয়!...

ডাক্তারী শাস্ত্রের বিজ্ঞান ও আর্টের দিক দিয়ে চীন দুহাজার বছর আগে যেমন ছিল, এখনো ঠিক তেমনিই আছে। এই ডাক্তারী বিদ্যাতে চীনবাসীদের মনস্তত্ত্বের অদ্ভুতত্ব চরমে ওঠে! তার একটী দৃষ্টান্ত নীচে দেওয়া হ'লো। তা প'ড়ে কিন্তু অবিশ্বাস করবার এতটুকু কিছুই নেই! কারণ, এক প্রত্যক্ষ-দর্শী নজীর দিচ্ছেন এইরকম—

একবার এক চীনবাসীর গলায় মাছের একটী কাঁটা সজোরে বিঁধে যায়! ব্যাচারীর চীৎকারে তৎক্ষণাৎ পিপীলিকার মত তার বন্ধু, আত্মীয়, প্রতিবেশী ইত্যাদি যে যেখানে ছিল এসে, তার চারিদিকে ঘিরে দাঁড়ালো। তাদের মধ্যে দু'এক জন তাদের সেই অল্প-বিস্তর ময়লাপড়া হাতের আঙুলগুলো তার মুখবিবরের মধ্যে চালিয়ে দিলে। কিন্তু অনেক চেষ্টা ক'রেও কাঁটাটী বের ক'রতে পারলে না! তখন একটী "সুঅভিজ্ঞ" চীনা চিকিৎসককে সেখানে ডেকে আনা হ'লো। চিকিৎসক মহাশয় গম্ভীরভাবে তাঁর নাকের উপর চশমাটী রেখে রোগীর ব্যাপারটী জানতে চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চারিদিক থেকে উত্তর এলো, "মাছের কাঁটা!"

উত্তর শুনেই বিজ্ঞভাবে চিকিৎসক প্রবর বললেন, "হুঁ, বুঝেছি!...কিন্তু যেহেতু ওই কাঁটাটী মাছের প্রকৃতিতে বিঁধেছে, সুতরাং তা বের ক'রতে হ'লে, মাছ-ধরবার উপায়টীই অবলম্বন ক'রতে হবে! কিন্তু মুখের মধ্যে ত জাল ঢোকানো যাবেনা! কাজেই, একটা মাছ-শিকারী পাখী আনতে হবে!—"

অবিলম্বেই একটী মাছ-শিকারী পাখী সেখানে আনা হ'লো। এবং রোগীকে খুব শক্ত ক'রে একটা চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা হ'লো। অতঃপর চিকিৎসক নিজের হাতে পাখীটার সেই লম্বা ঠোঁটটী ধ'রে বরাবর চালিয়ে দিলেন রোগীর গলার মধ্যে! অসহায়ের মত রোগী ছটফট্ ক'রতে লাগলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিরা—রোগ-শান্তি হবার আশায় একসঙ্গে উৎসাহপূর্ণ উচ্চ কলরব তুললে। যাই হোক, চিকিৎসকের 'নিপুণতায়' কাঁটাটী ভেঙে গেল এবং তা গলা দিয়ে নীচে নেমে গেল। চিকিৎসকও বিজয়ের গর্ব্বে সেস্থান পরিত্যাগ ক'রলেন।

খেলার পুতুল

শ্রীনরেন্দ্র দেব

১৭

একখানি রুমাল জলে ভিজিয়ে নিয়ে নাকের উপর চাপা দিয়ে সুশীল অনিলাকে নিয়ে গৌরমোহনদের ওখান থেকে বাড়ী ফিরছিল। সারাটা পথ সে গাড়ীতে গজর্ গজর্ ক'রতে লাগ্‌লো—নেহাৎ ওদের নিমন্ত্রণ-বাড়ী বলে কিছু ব'লতে পারলুম না, নইলে বাছাধনকে একবার ভাল ক'রে শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিতুম যে, ভদ্রলোকের গায়ে হাত তোলার মজাটা কি রকম! ঘুসি চালাতে আমরাও জানি; কিন্তু কি ক'রবো বলো,—পাড়াপ্রতিবাসী পাঁচজনে নিষেধ ক'রতে লাগ্‌লো তাই বাধ্য হয়ে আমায় হাতগুটিয়ে দাঁড়াতে হ'লো। নইলে সোনার চাঁদের মুখখানিকে একেবারে গুঁড়িয়ে থেঁতো করে দিয়ে আসতুম! আর ডাক্তারী করে খেতে হ'ত না!

অনিলা নীরবে তার কাপুরুষ স্বামীর এই মিথ্যা আস্ফালন শুনছিল এবং মনে-মনে হাসছিল।

হঠাৎ সুশীল অনিলাকে জিজ্ঞাসা করলে—তোমার মণিদা' আমাকে মেরেছে ব'লে তুমি খুব খুশী হ'য়েছো—না?

অনিলা এবারও কোনও উত্তর দিলে না। সুশীলের দিক থেকে মুখখানা ফিরিয়ে নিয়ে অন্য দিকে চেয়ে রইল, কিন্তু প্রচ্ছন্ন খুশীর একটা আভা যেন তার ভিতর থেকে বাইরে পর্য্যন্ত ঠিক্‌রে এসে পড়ছিল।

সুশীল এবার বিরক্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—কথার উত্তর দিচ্ছ না যে! যেন, কে কাকে বলছে?—

সুশীলের কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক রকম কর্কশ হ'য়ে উঠেছে শুনে অনিলা বললে—আপনার শাস্তি দেখে আমার খুশীটুকু যখন নিতান্তই ধরা পড়ে গেছে, তখন আর মিথ্যে তাকে লুকিয়ে আপনার সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষার কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে করি নি। আজ একজন সম্ভ্রান্ত মহিলাকে আপনি যখন অত্যন্ত নীচ কাপুরুষের মতো অপমান করছিলেন, তখন আমারই ইচ্ছা হচ্ছিল সেই মুহূর্ত্তে তার একটা কিছু প্রতিবিধান করবার! নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে সমাগত অতগুলো পুরুষমানুষের মধ্যে সেই নারীর পক্ষ নিয়ে কেউ আপনাকে নিরস্ত করছে না দেখে সমস্ত পুরুষ জাতের উপর আমার একটা ঘৃণা হয়ে যাচ্ছিল। একজন নিরপরাধিনী নিরুপায় ভদ্রমহিলার নামে যে প্রকাশ্যে বা গোপনে মিথ্যা কুৎসা রটাতে পারে, তাকে আমি অত্যন্ত নীচ, অভদ্র ও পশুতুল্য বর্ব্বর বলেই মনে করি। তাই, মণিদা' যখন আপনাকে সেই অন্যায় কার্য্য করার জন্য শাস্তি দিলে, তখন, সকলের চেয়ে বেশী খুশী হ'য়ে উঠ্‌লুম আমি—! মণিদা'র প্রতি শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় আমার অন্তর ভ'রে উঠেছে!

অনিলার মুখে এই সব অসহ্য স্পর্দ্ধার কথা শুনে ক্রোধে ক্ষোভে ও বিস্ময়ে সুশীল যেন ক্ষণকাল স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল। তার পর উত্তেজিত ভাবে বললে—আমি তখনই জানতুম এই রকম একটা কিছু ঘটবে। সাধে কি আর আমাদের শাস্ত্রকারেরা স্ত্রী-স্বাধীনতার এতো বিরোধী ছিলেন? 'ক্রোড়স্থ' নারীকেও তাঁরা বিশ্বাস করতে নিষেধ ক'রে গেছেন। সেই জন্যেই তো তোমাদের "অসূর্য্যম্পশ্যা" ক'রে রাখবার তাঁদের প্রাণপণ চেষ্টা ছিল।

সুশীলের মুখের কথারই প্রতিধ্বনি ক'রে যেন অনিলা ব'ললে—হ্যাঁ, 'অসূর্য্যম্পশ্যা' হ'য়ে না থাকলে যে আমাদের দৃষ্টিপথে আরও অনেক কিছু আকর্ষণের বস্তু এসে প'ড়বে এবং 'পতি' নামক ধ্রুবতারাটি থেকে লক্ষ্যচ্যুত হ'য়ে আপনাদের শাস্ত্রকারের কারখানায় গ'ড়ে তোলা সব 'ম্যানুফ্যাক্‌চার্‌ড্ সতী' পাছে কক্ষচ্যুতও হয়ে পড়ে, এবং তার ফলে আপনাদের সংসার-সৌরজগতের পাছে একটা ওলোট-পালট ঘটে যায়!—এই ভয়েই তো আপনারা কাপুরুষের মতো আমাদের সর্ব্বলোক-লোচনের অন্তরালে লুকিয়ে রাখতে সুরু করেছেন!

সুশীল ব'ললে—বুদ্ধিমান লোকমাত্রেই তাই ক'রে থাকে। নারী হ'চ্ছে পুরুষের ভোগের সর্ব্বপ্রধান উপকরণ। তাই সে তার আর পাঁচটা মূল্যবান সম্পত্তি যেমন সাবধানে রেখে

দেয়, তেমনি তোমাদেরও যদি রেখে থাকে, তাতে সে কিছু অন্যায় করেনি।

উত্তেজিত হ'য়ে উঠে অনিলা বললে—অন্যায় হয়নি? আপনাদের এই ন্যায়-অন্যায় বোধটাকেই আচ্ছন্ন ক'রে নীচ স্বার্থটাই যেদিন সবচেয়ে বড় হ'য়ে উঠেছিল, যেদিন আপনারা শক্তি হারিয়ে, সাহস হারিয়ে, বীর্য্যহীন—সৌন্দর্য্যহীন—কাপুরুষ হ'য়ে প'ড়েছিলেন, সেইদিন থেকে অক্ষম আপনারা নিজ নিজ জায়াকে রক্ষা করবার আর কোনও উপায়ান্তর না দেখে এই অমানুষিক হীনতার আশ্রয় নিয়েছিলেন! চোরের ভয়ে যেদিন থেকে আপনারা রত্ন, অলঙ্কার মাটীর নীচে পুঁতে রাখতে সুরু করেছিলেন আপনাদের সেই অধঃপতনের দিনেই আমাদের 'অসূর্য্যম্পশ্যা' 'পতিব্রতা' প্রভৃতি কতকগুলো বড় বড় নাম দিয়ে মাটীর নীচেয় পুঁতে রাখার মতো গৃহ-প্রাচীরের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে সুরু করেছেন! সেইদিন আপনারা আপনাদের 'সহধর্ম্মিণীকে' হত্যা ক'রে সোনার সীতার মতো বাধ্যতামূলক সতীত্বের একটা প্রাণহীন আদর্শ খাড়া ক'রেছিলেন—!

সুশীল একটা ধমক দিয়ে বলে উঠলো—থাম, থাম,—আর ডেঁপোমী ক'রতে হবেনা, সতীত্বের নিন্দে করে এমন নির্লজ্জের মতো অসতীপণার পরিচয় দিতে তোমার লজ্জা-বোধ ক'রছ না? তবু যদি না দেখতুম যে এখনও একজন সধবার মৃত্যু হ'লে তাঁর মাথার সিঁদুরটুকু—তাঁর পায়ের আলতাটুকুর জন্যে তোমাদের মধ্যে একেবারে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়!—

অনিলা এবার হেসে উঠে বললে—সে কি আপনি মনে ক'রেছেন সতীত্বের কোনও উচ্চ আদর্শের দিক থেকে আমরা ওটা করি? বৈধব্যের অসহায় অবস্থাটা আমাদের কাছে এমনিই ভয়ানক মনে হয় যে, যে নারী সেই দুর্ভাগ্যকে এড়িয়ে চলে যেতে পারে, আমরা তারই মতো সৌভাগ্যবতী হ'তে চাই! আমাদের এই সধবার সিঁদুর আলতা কাড়া-কাড়ি ব্যাপারটা শুধু এই কথাই সপ্রমাণ ক'রে দেয় যে পরমুখাপেক্ষী ও পরান্ন ভোজী হ'য়ে বৈধব্য জীবন যাপন করার চেয়ে মৃত্যুকেই আমরা শ্রেয় ব'লে মনে করি!

সুশীল বিদ্রূপের কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—ও! সেই ভয়ে বুঝি তোমরা স্বামীর জলন্ত চিতায় উঠে সহমরণে যেতে?—

অনিলা ব'ললে—ওটার মধ্যে আমাদের কোনোও হাত ছিল না ত'! ওটা আপনাদের সেই বর্ব্বর যুগের প্রথা! যেমন এখনও অনেক অসভ্য জঙ্‌লী জাতের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় যে—কেউ মরে গেলে তাকে দাহ বা কবর দেবার সময় সেই সঙ্গে তার বহুমূল্য আস্‌বাবপত্রও দিয়ে দেওয়া হয়; স্ত্রী ছিল তখনকার দিনে একটা আসবাবেরই সামিল, তাই মৃতের চিতায় তাকেও জোর ক'রে ধরে এনে আপনারা পুড়িয়ে ফেল্‌তেন পাছে সে সম্পত্তি মৃতের অবর্ত্তমানে আর কারুর ভোগে আসে!

—বেশ ক'রতেন—খুব ক'রতেন, বুদ্ধিমানের মতোই কাজ ক'রতেন—

ব'লতে ব'লতে সুশীল ক্ষণকাল চুপ ক'রে রইল। তার পর অতিরিক্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললে—এ সব বিদ্যে যে ওই বিলেত-ফেরত বাঁদরটির কাছেই তুমি শিখেছো তা বেশ বুঝতে পারছি। নইলে দেশে আবহমান কাল থেকে যে সব কল্যাণ-কর প্রথা চলে আসছে, তুমি কি না সেগুলোকে আজ একটা অন্যায়ের বিকৃত দৃষ্টিতে দেখতে সুরু করেছো?

—আবহমান কাল চলে আসছে বলেই অন্যায় কখন ন্যায় হ'য়ে উঠতে পারে না। দৃষ্টি আমাদের বরং সেই দিনই বিকৃত ছিল যেদিন গৃহকারাগারের চতুঃসীমানার মধ্যেই আমাদের স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পৃথিবীর গণ্ডী টেনে দেওয়াটাকে আপনাদের অত্যাচার ব'লে ধরতে পারিনি। চিরবন্দিনীর লৌহশৃঙ্খলকে যেদিন সতীত্বের জয়মাল্য বলেই ভুল ক'রে পরিছিলুম! তার ফলে এদেশের সমস্ত নারী-জাতটাই দেহে মনে পুরুষের একান্ত অধীন, এমন কি দাসীর চেয়েও তাদের পদানত হ'য়ে পড়েছে—

অনিলা চুপ করলে। তার চোখে মুখে এমন একটা কাতর অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো যে বেশ বোঝা যায় যে, সে যেন তার সর্ব্বাঙ্গে এই বন্ধন বেদনার একটা তীব্র জ্বালা অনুভব ক'রছে।

সুশীল ব'ললে—কিন্তু, কথাবার্ত্তা তো দেখছি বেশ মুরুব্বীর মতো! দাসীর মতো হালচাল তো এতটুকু কোথাও নেই—

অনিলা আর কোনও উত্তর দিলে না।

সুশীল আপনার মনে ব'কতে-ব'কতে চললো—তাই ত! তোমরা তো বড় মুস্কিলে ফেলবে তাহ'লে? তোমাদের

মতিগতি তো মোটেই ভালো ব'লে মনে হচ্ছে না!—এই বেলা তোমাদের একটু কড়া শাসনে দাবিয়ে রাখা দরকার দেখছি, নইলে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে তো আর আটকে রাখতে পারা যাবে না?

তার পর, সারাটা পথ দু'জনের মুখে আর কোনও কথা শোনা গেল না। পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাতে তারা যেন স্তব্ধ হ'য়ে রইল। অথচ, এ কথাটা তাদের কারুর মনেই একবারও এলোনা যে তারা সমভাবেই পরস্পর পরস্পরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। একের পতনে অন্যেরও ধ্বংস। একের অভ্যুদয়ে অপরেরও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

গাড়ী থেকে নেমে অনিলা যেই বাড়ী ঢুকতে যাচ্ছে—আনন্দ ছুটে এসে তার দিদিকে জড়িয়ে ধ'রে ব'ললে—শীগ্‌গির চলো দিদি, আমি গাড়ী নিয়ে এসেছি। বাবার বড্ড অসুখ, তোমায় দেখতে চাইছেন—

অনিলার মুখ শুকিয়ে গেল!—বাবার বড্ড অসুখ! সে আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব ক'রতে পারলে না। তাড়াতাড়ি ক্ষ্যান্ত ঠাকুরুণের কাছে ভাঁড়ারের চাবীটাবি বুঝিয়ে দিয়ে সে ধুলো পায়েই বাপের বাড়ী চললো।

সুশীল বললে—যদি ভালো থাকেন দেখো, তাহ'লে ওবেলা চলে এসো।

অনিলা ঘাড় নেড়ে স্বীকার জানিয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠলো।

ক্ষ্যান্ত সদ্‌ব্রাহ্মণের মেয়ে। অনাথা বলে অনিলা তাকে আশ্রয় দিয়েছিল। সে রাঁধুনীর কাজ ক'রতো বটে, কিন্তু অনিলা তাকে ঠিক্ দাসী চাক্‌রাণীর মতো দেখতো না, আত্মীয়ের মতো করেই তাকে কাছে রেখেছিল। ক্ষ্যান্ত প্রায় অনিলারই সমবয়সী, তাই সুশীলের সামনে সে মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে বেরুতো বটে, কিন্তু, কথা কইত না। কাজে কাজেই অনিলা যখন তার হাতেই আজ ঘর-সংসারের ভার দিয়ে রুগ্ন পিতার শয্যা-পার্শ্বে ছুটে গেল, ক্ষ্যান্ত ঠাকুরুণ একটু যেন বিব্রত হ'য়ে পড়লো। বাড়ীর কর্ত্তাটির ভাবগতিক যে তেমন সুবিধের নয় ক্ষ্যান্ত তার নারীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সেটুকু অনেক দিন আগেই বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু অনিলার অঞ্চলছায়ে সে নিজেকে বেশ নিরাপদে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে রেখেছিল। আজ তার সামনে থেকে সেই একমাত্র আশ্রয়টুকু যখন অকস্মাৎ সরে গেল—ক্ষ্যান্তর নিজেকে অত্যন্ত অসহায় ব'লে মনে হ'তে লাগলো। অনিলা এত তাড়াতাড়ি চলে গেল যে ক্ষ্যান্ত তাকে কিছু বলবারও অবকাশ পেলে না। কি যেন একটা অকল্যাণের আশঙ্কা তার সমস্ত মনটিকে আতঙ্কগ্রস্ত ক'রে রেখে দিলে।

সন্ধ্যের আগে ক্ষ্যান্ত একবার কানাই বেহারাকে দিয়ে সুশীলকে জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠালে যে—ছোট বাবু রাত্রে কি খাবেন?

কানাই ফিরে এসে বললে,—বামুনদিদি, বাবু আপনাকে ডাকছেন।

ক্ষ্যান্তর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। অনেক ভেবে, দ্বিধা-সঙ্কোচে-বিজড়িত-চরণ ক্ষ্যান্ত সুশীলের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

সুশীল বললে—ভিতরে এসো

ক্ষ্যান্ত তবু যেতে পারেনা। চুপ করে নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকে।

সুশীল বললে—তোমার কি লজ্জা ক'রছে আমার কাছে আসতে?

ক্ষ্যান্ত একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। এ তার লজ্জা না ভয়, সে নিজেই সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু বুঝতে পারছিলনা! ধীরে-ধীরে সে ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো।

সুশীল বললে—আমাকে তুমি এত ভয় করো কেন? আমি ত' ভয়ঙ্কর কিছু নই। আর একটু এদিকে সরে এসো—

ক্ষ্যান্ত আরও একপা' সরে গেল।

সুশীল বললে—রাত্রে কি খাবো কানাইকে দিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠিয়েছিলে—?

ক্ষ্যান্ত ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ।

এই ঘাড় নাড়াটি সুশীলের ভারী মিষ্টি লাগলো। ক্ষ্যান্তর সুস্থ সবল যৌবনপুষ্ট সুগঠিত তনু দুশ্চরিত্র সুশীলের লালসাকে প্রতিদিনই প্রলুব্ধ ক'রতো। সে আজ ক্ষ্যান্তকে কাছে ডেকে আনিয়ে তার আপাদ-মস্তক ভালো করে নিরীক্ষণ ক'রে—তৎক্ষণাৎ সঙ্কল্প ক'রে ফেললে—যা হয় হবে—একে চাইই!

খুব মিষ্টি গলায় বললে—দেখো, তুমি যদি অমন ক'রে ক'ণে বৌ'য়ের মতো থাকো, তাহ'লে তোমাকে নিয়ে ঘরকরা যে আমার পক্ষে মুস্কিল হ'য়ে পড়বে! অনিলা যে ক'দিন না বাপের বাড়ী থেকে আসে তোমাকে তার জায়গায়

এ বাড়ীর গিন্নী হ'তে হবে। কথা না কইলে চলবে কেমন করে?—আচ্ছা, তোমার নাম কি ক্ষ্যান্তবালা না ক্ষ্যান্ত-কুমারী— ?

ক্ষ্যান্ত অস্ফুট কণ্ঠে ব'ললে—ক্ষ্যান্তমণি।

—বাঃ! বেশ নামটি তো! ক্ষ্যান্তসুন্দরী না কি বললে? ক্ষ্যান্তমণি?—তা, ক্ষ্যান্তসুন্দরী ব'ললেও কিছু দোষ হয়না—তুমি যে সুন্দরী তা আয়নার সামনে দাঁড়ালেই বুঝতে পারবে—

ক্ষ্যান্ত এ কথা শুনে সভয়ে তিনপা' পেছিয়ে এলো—সুশীল সেটা লক্ষ্য করে বললে—কিন্তু আপাততঃ সেকথা থাক্—এখন সৌন্দর্য্য-চর্চ্চা রেখে কিছু ভোজ্য ব্যাপারের আলোচনা করা যাক্—যে জন্য তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। কেমন?

সুশীল একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—দেখো ক্ষ্যান্ত-মণি, তোমার স্বামী থাকলে তুমি তাকে যেমন ক'রে নিজের মনের মতো রেঁধে বেড়ে খাওয়াতে, তেমনি ক'রে তোমার যা প্রাণ চায় তাই আমাকে তৈরী ক'রে খাওয়াও। ধরো, তুমি যেন আমার স্ত্রী—আর আমি যেন তোমার স্বামী—

ক্ষ্যান্ত আরও খানিকটা পেছিয়ে এলো—

সুশীল হাসতে হাসতে বললে—ওকি? তুমি যে ক্রমেই পেছু হাঁটছো ক্ষ্যান্তমণি!—তোমার বুঝি ভয় ক'রছে আমার কাছে দাঁড়াতে? পাছে তোমায় বুকে টেনে নিয়ে মুখে একটা চুমো দিই—

ক্ষ্যান্ত উর্দ্ধশ্বাসে সে ঘর থেকে ছুটে পালালো। হাঁপাতে হাঁপাতে রান্নাঘরের একপাশে এসে বসে পড়লো।

সুশীল তার সঙ্গে অল্প দু'চারটি হাল্‌কা কথা ক'য়েছিল মাত্র, কিন্তু সেই কথাগুলোই এই তরুণী বালবিধবার চির-উপবাসী নিঃসঙ্গ অন্তরে স্বর্গলোকের যে স্বপ্ন-ছবিটি ফুটিয়ে তুললে—সে কথার কোনও সন্ধানই সুশীল পেলেনা। স্বামী নিয়ে সাধ-আহ্লাদ মেটাবার সুযোগ ক্ষ্যান্তমণির জীবনে কখনও আসেনি। সে কোন্ বিস্মৃত কৈশোরে তার বিবাহ হ'য়েছিল বটে, কিন্তু, স্ত্রী হবার যোগ্যতা অর্জ্জন করবার পূর্ব্বেই তাকে সীঁথের সিঁদুর মুছতে হয়েছিল এবং হাতের নোয়াও খুলতে হয়েছিল। কিন্তু, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কোনও একটি পুরুষের স্ত্রী হ'য়ে স্বামী নিয়ে ঘরকরণা করবার একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা তাকে নিয়ত পীড়িত ক'রতো—কিন্তু, হিঁদুর ঘরের বামুনের মেয়ের সে আশা ও বাসনার বিরুদ্ধে মনু ও রঘুর সংহিতা এবং স্মৃতির নিষেধে গড়া গগনস্পর্শী প্রাচীর আর সমাজের আরক্ত চক্ষুর ভয় তাকে ক্রমেই নিরাশার নিবিড় অন্ধকারে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

"ধরো তুমি আমার স্ত্রী, আর আমি তোমার স্বামী।—" হঠাৎ সুশীলের মুখে আজ এই কথাটা শুনে ক্ষ্যান্তমণির বুকের ভিতরের সেই বহুদিনের পোষিত আশা ও আকাঙ্ক্ষা সহসা যেন একটা দীর্ঘ অতৃপ্তির ক্ষুধা নিয়ে সুপ্তোত্থিত হ'য়ে উঠলো!

প্রাণপণ চেষ্টাতেও ক্ষ্যান্তমণি তার অন্তরের এ প্রচণ্ড প্রলোভনকে কিছুতেই দমন করতে পারলেনা।

"তোমার স্বামী থাকলে যেমন ক'রে তুমি তাকে রেঁধে বেড়ে আদর করে খাওয়াতে তেমনি করে—" সুশীলের এ কথাগুলোকে সে কোনও রকমেই উপেক্ষা করতে পারছিলনা। তার সমস্ত মন ছেলেবেলার সেই 'বর বউ' খেলার মতো আজ এই যৌবন মধ্যাহ্নেও তেমনি একটি মধুর খেলায় যোগ দেবার জন্য যেন লালায়িত হ'য়ে উঠলো।

ক্ষান্তমণি মনস্থির ক'রে উঠে প'ড়লো—দোষ কি তাতে?—দু'দিন একটু ছোট-বাবুকে নিজের স্বামী ভেবেই আদর যত্ন ক'রে দেখিনা—কেমন লাগে! এ সাধটুকু মেটাবা'র সুযোগ জীবনে আর কখন পাবো কিনা তা কে জানে?—

কোমর বেঁধে ক্ষ্যান্তমণি রান্নায় মনোনিবেশ করলে। কানাইকে ডেকে শুধু একবার খবর নিলে—ছোট-বাবু কি করছেন? কানাই ব'ললে—তাঁর নাকে বড় চোট্ লেগেছিল কোথায়—তাই একবার ডাক্তারের বাড়ী গেছেন, এখনি ফিরে আসবেন।

সুশীলের নাকে চোট্ লেগেছে শুনে ক্ষ্যান্তমণির প্রাণটা আজ যেন অকারণ একটু ব্যথিত হয়ে উঠলো।

ক্ষ্যান্তর রাঁধাবাড়া শেষ হয়ে গেল, তবু সুশীলের দেখা নেই। অধীর আগ্রহে ক্ষ্যান্তমণি আজ সুশীলের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করছিল। রাত্রি নটা বাজলো, দশটা বাজলো, তখনও সুশীল ফেরেনা দেখে ক্ষ্যান্ত যেন বেশ একটু উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠলো। যদি না আসেন? যদি না খান?—এত ক'রে ওঁর জন্য সব রাঁধলুম—এ কি পণ্ড হবে? কোথায় গেলেন? ফিরতে এত দেরী করছেন কেন? তবে কি

ডাক্তারের কাছ থেকে বেরিয়ে শ্বশুরকে দেখতে গেছেন? ছোট বউমা কি তাঁকে আটকে রাখলে?

এইখানে বলে রাখি, অনিলাকে বাড়ীর লোকজনেরা—সবাই ছোট বউমা বলেই ডাকে, কারণ সুশীলরা দুই ভাই, সুনীল আর সুশীল। সুনীল বড়, সুশীল ছোট। বাপ মারা যাবার পর ওরা দু'ভাই কিছুদিন একসঙ্গে ছিল, কিন্তু, সুশীলের সঙ্গে সুনীলের বনিবনাও হচ্ছিলনা ব'লে বড়বাবু বড় বৌমাকে নিয়ে সম্প্রতি পৃথক হ'য়ে গেছেন। কিন্তু, লোকজনেরা এখনও তাদের একমাত্র মনিবকেও ছোটবাবুই ব'লে এবং অনিলার 'ছোট বউমা' ডাকটাও এখনও বাহাল রয়ে গেছে।

ক্ষ্যান্তমণি ছোটবাবুর ফিরতে দেরী দেখে যখন আকাশ পাতাল ভাবছে, এবং কানাইকে একবার ছোট বউমার বাপের বাড়ী খবর নিতে পাঠাবে কি না মনে ক'রছে, সেই সময় সুশীল বাড়ী ফিরে এলো। ক্ষ্যান্তমণি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। খাবার ঘরে সুশীলের ঠাঁই করে দিয়ে সে ছোটবাবুকে ডাকতে গেল। এবার আর তাকে ঘরে ঢোকবার সময় খুব বেশী ইতস্ততঃ করতে হলোনা।

সুশীল তখন কাপড় চোপড় ছেড়ে মুখহাত ধুয়ে খেতে বসবার জন্য প্রায় প্রস্তুত হ'য়েই ছিল। ক্ষ্যান্তমণি ঘরে ঢুকতেই সুশীল একটু মৃদু হেসে বললে—কী গো, দ্রৌপদীর রন্ধনের পালা কি শেষ হ'য়েছে?—ক্ষিধেয় যে আর দাঁড়াতে পারছিনি ক্ষ্যান্তমণি!

ক্ষ্যান্ত একটু মৃদুস্বরে কেশে গলার জড়তাটুকু যেন ঝেড়ে ফেলে বললে—খাবার আমার অনেকক্ষণ তৈরী হ'য়ে গেছে, আপনারই তো ফিরতে দেরী হ'লো।

—হ্যাঁ, তা একটু হয়ে গেছে ক্ষ্যান্তমণি, তুমি কিছু মনে কোরোনা। কি করি বলো? শ্বশুর মশা'য়ের অমন বাড়াবাড়ি অসুখ শুনলুম, একবার না দেখতে গেলে অনেক কথা উঠতো! ভাগ্যিস গেছলুম। বুড়ো এ যাত্রা টেঁকে কি না সন্দেহ! অনিলা এখন কিছুদিন আর আসতে পারবেনা! অন্ততঃ বুড়োর যতদিন না ভালমন্দ একটা কিছু হয়। সে ক'দিন দেখছি—তুমিই আমার একমাত্র ভরসা—চলো যাই, খেয়ে আসি।

সুশীলকে খেতে বসিয়ে বহু যত্নে ও সমাদরে এটা ওটা সেটা পরিবেশন ক'রতে ক'রতে এবং সুশীলের মুখে তার রান্নার অজস্র প্রশংসা শুনতে শুনতে খুশী হয়ে ক্ষ্যান্তমণি জিজ্ঞাসা করলে—কানাই বলছিল, আপনার নাকে না কি বড় চোট লেগেছে, আপনি ডাক্তারের কাছে গেছলেন?—

—হ্যাঁ, সে বলো কেন? গ্রহের ফের আর কি! ডাক্তার বললে রাত্রে শোবার সময় 'হট্-কম্প্রেস্' দিতে হবে। তোমার খাওয়া দাওয়া চুকে গেলে একটু জল গরম করে নিয়ে এসো। তোমাকেই এসব করতে হবে, কি করবে বলো। যখন অস্থায়ীভাবে আমার স্ত্রীর পদ অধিকার করেছো তখন শুধু খাইয়ে দিলেই তোমার কর্ত্তব্য শেষ হবেনা, স্বামীর একটু সেবা শুশ্রূষা করাও যে স্ত্রীর ধর্ম্ম সেটা আশা করি জানো?—

লজ্জায় ও আনন্দে ক্ষ্যান্তমণির কর্ণমূল পর্য্যন্ত রাঙা হ'য়ে উঠলো।

খাওয়া দাওয়ার পর গরম জল করে নিয়ে ক্ষ্যান্তমণি যখন সুশীলের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করলে, তখন রাত্রি প্রায় বারোটা বাজে।

রান্নাঘরের কাপড়খানা ছেড়ে একখানা ধোপদস্ত কাপড় পরে ক্ষ্যান্তমণি একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ'য়েই ছোটবাবুর ঘরে গেছলো।

সুশীল ক্ষ্যান্তমণির সেই পরিচ্ছন্নতাটুকু লক্ষ্য করে বলে উঠলো—ইস্! গরম জলের পাত্রটি হাতে তোমাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে জানো?—ঠিক যেন সমুদ্র মন্থনের পর অমৃত ভাণ্ড হাতে নিয়ে লক্ষ্মী এসে আমার সামনে দাঁড়িয়েছেন!

ক্ষ্যান্তমণি জলের পাত্রটি ঘরের কোণে একটি টেবিলের উপর রেখে দিয়ে চলে আসছিল। সুশীল উঠে পড়ে তার পথ আগলে বললে—বাঃ! বেশ মজার লোক তো, চলে গেলে সেবাটা করবে কে? স্ত্রী হওয়া অত সোজা নয় ক্ষ্যান্তমণি!—

ক্ষ্যান্ত থতমত খেয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সুশীল আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধটা করে দিয়ে এলো।

খিল দেওয়ার শব্দে চমকে উঠে ক্ষ্যান্ত ব্যস্তভাবে বল্লে—ও কি ক'রলেন?—দরজা খুলুন! আমাকে যেতে দিন—ক্ষ্যান্তর চোখে-মুখে তখন একটা ভয়-ব্যাকুল কাতর ভাব ফুটে উঠেছে।

সুনীল হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বললে—"কোথায় যাবে মণি ? স্বামীকে একলা ঘরে ফেলে রেখে স্ত্রীর কর্ত্তব্য নয় অন্যত্র রাত্রি বাস করা। এও কি তোমাকে শেখাতে হবে মণি ?—তোমার 'ক্যান্তটার' আমি ক্ষান্ত দিলুম।—আজ থেকে তুমি আমার শুধু 'মণি'—আমার বুকের মণি—চোখের মণি—মাথার মণি—তোমায় যে আমি সেই প্রথম দিনই দেখে অবধি ভালবেসে ফেলেছি—

বলতে বলতে সুনীল এসে ক্ষান্তমণিকে তার ব্যাকুল বাহুবন্ধনের মধ্যে টেনে নিলে।

* * * *

ওদিকে পিতার রোগশয্যার শিয়রে বসে অনিলা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। রাত্রি অনেক হ'য়েছে বলে সবাই শুয়ে পড়েছিল। একা অনিলা বিনিদ্র বসে পিতার সেবা করছিল।

বৃদ্ধ চোখ মেলে একবার কন্যার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে ক্ষণকাল চেয়ে দেখে' ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন—অনু! এখনও জেগে বসে আছিস কেন মা ?—যা শুগে যা, দিন যার ফুরিয়ে এসেছে তাকে কি আর সেবার জোরে ধ'রে রাখতে পারবি পাগলী ?

অনিলার দুই চোখ জলে ভরে উঠলো। সে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলো—বাবা! তুমি চলে গেলে আমার কি হবে? আমার যে আর কেউ নেই—তুমি তো জানো ?—

রোগজীর্ণ দুর্ব্বল হাতখানি ধীরে ধীরে তুলে কন্যার চিবুক স্পর্শ করে মুমূর্ষু পিতা সস্নেহে বললেন—জানি মা, তুই স্বামী নিয়ে সুখী হ'তে পারিসনি, যাবার বেলায় আজ এই আক্ষেপটাই আমার সব চেয়ে বেশী বাজ্‌ছে যে তোর জীবনটাকে আমি নিজের বুদ্ধির দোষে নষ্ট ক'রে দিয়ে গেলুম। তখন যদি কারুর পরামর্শ না শুনে জোর ক'রে আমি তোকে মণির হাতে তুলে দিতুম—হয় ত, তোর মুখে সার্থক জীবনের স্নিগ্ধ হাসিটুকু দেখে নিশ্চিন্ত হ'য়ে যেতে পারতুম।

ভারী গলায় অনিলা বললে—বাবা, যা হবার হ'য়েছে, বিগত ব্যাপারের জন্য অনুতাপ ক'রে কেন আপনি কষ্ট পাচ্ছেন ? আমার অদৃষ্টে যা ছিল হ'য়েছে—আপনাদের দোষ কি ? যা হ'তে পারতো সেই সম্ভাব্যকে মিছে ভেবে দুঃখ পাওয়া ছাড়া আর তো কোনও লাভ নেই, যে সর্ব্বনাশের প্রতিকারের আর কোনো উপায় নেই—তার আলোচনা করা সম্পূর্ণ নিষ্ফল নয় কি ?—

—কিন্তু মনকে যে কিছুতেই বোঝাতে পারছিনি মা ?—ব'লে বৃদ্ধ অনেকক্ষণ চুপ করে চোখ বুজে পড়ে রইলেন, তার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে যেন আপনমনেই ব'লতে লাগলেন—এ কি জীবনব্যাপী দাসত্ব-শৃঙ্খল—যার মৃত্যু ছাড়া সমাপ্তি নেই—বিচ্ছেদ নেই—মুক্তি নেই! একটা বিবাহের অনুষ্ঠান হ'য়েছিল ব'লেই—আমি যা'কে ঘৃণা করি—তারই সঙ্গে আমায় আমরণ একত্র থাকতেই হবে—

বৃদ্ধ এবার যেন একটু উত্তেজিত হ'য়ে উঠেই ব'ললেন—না—না,—অনু, এ তুই মানিস্‌নি মা, মানিস্‌নি—এ শয়তানের বিধি,—বিধির বিধি এ কখনই নয়! এ যে মনুষ্যত্বের অপমান করা, আত্মার অপমান করা, আপনার স্বাধীন সত্ত্বার লাঞ্ছনা! আজ এই মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে আমি তোকে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাচ্ছি মা, হীনচেতা কুচরিত্র পাষণ্ড স্বামীকে পরিত্যাগ করলে কোনও পাপ তোকে স্পর্শ করতে পারবে না।

অনিলা উঠে গিয়ে তার পিতার পদধূলি নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে বললে—আমি আর কিছু চাইনি বাবা, আপনার এই শেষ দান আমার জীবনকে নিশ্চয়ই সার্থকতার সুযোগ এনে দেবে। আপনি বিশ্বাস করুন।

অনেকক্ষণ কথা ব'লে পিতা অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন দেখে, অনিলা একখানি পাখা নিয়ে বাবাকে বাতাস করতে লাগল এবং তাঁর গায়ে মাথায় সযত্নে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই বৃদ্ধ আবার ঘুমে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়'লেন।

সকালের দিকে বড় ছেলে কাছে আসতে বৃদ্ধ তাকে ডেকে বললেন—দেখো, আমি এ যাত্রা বোধ হয় আর সেরে উঠতে পারবো না। আমার আসন্নকাল উপস্থিত বলে মনে হ'চ্ছে। তুমি একবার তারিণী উকীলকে ডেকে পাঠাও—আমি একটা উইল করে যেতে চাই—

বাধা দিয়ে অনিলার দাদা বললে,—কে বলেছে আপনি সেরে উঠতে পারবেন না। ওসব হাঙ্গামা নিয়ে আপনাকে এখন মাথা ঘামাতে হ'বে না, ওতে আপনার অসুখ আরও

বেড়ে যাবে। আপনি আগে ভাল হ'য়ে উঠুন, তার পর উইল টুইল যা' করবার ইচ্ছে করবেন—

বৃদ্ধ একটু ম্লান হেসে বললেন—জীবন ক্ষণস্থায়ী, 'নলিনী-দলগত জলবৎ' এসব আমরা মুখেই খুব বলি বটে হে, কিন্তু ক'জন সেটা সত্য বলে বিশ্বাস ক'রে তার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে থাকি বলো? —আমাদের এই পারমার্থিক ও অধ্যাত্ম তত্ত্বাদীর দেশের অধিকাংশ লোকই মারা যান 'উইল' না করেই! ফলে, তিনি যাবার পর বাধে তার সম্পত্তি নিয়ে এক মস্ত বিরোধ! তাতে শুধুই যে কেবল সম্পত্তিক্ষয় ও অর্থনাশ হয়—তাই নয়, একটা পারিবারিক অশান্তিও চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পায়!—অথচ জড়বাদী বলে আমরা যাদের বরাবর অবজ্ঞা করি সেই ঐহিক সুখভোগপরায়ণ পাশ্চাত্য জাতিদের মধ্যে কোনও অল্প বয়স্ক যুবকের হঠাৎ মৃত্যু হ'লেও তার দেরাজের মধ্যে সে কিন্তু একখানা উইল তৈরী করে রেখে গেছে দেখতে পাওয়া যায়! যদি সেরেই উঠি, তবু উইল একখানা করে রাখতে দোষ কি বলো?—তুমি তারিণীকে ডেকে পাঠাও, আর মণিডাক্তারকে একবার খবর দাও। শুনিছি সে বিলেত থেকে না কি খুব বড় ডাক্তার হয়ে এসেছে—কে মণি বুঝেছো?—সেই আমাদের ওবাড়ীর পাশেই যারা থাকতো। যাও, আর অবাধ্যতা কোরোনা।

একটু বেলায় মণিডাক্তার এলো। অনিলার পিতা তার দু'টি হাত ধ'রে বল্লেন—বাবা, তোমাকে আমার চিকিৎসার জন্য ডেকে পাঠাইনি। যাবার আগে তোমার কাছ থেকে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে নিয়ে যেতে চাই। তোমাকে একদিন এ বাড়ীতে এসে অপমান হ'তে হ'য়েছিল—তোমার সে অমর্য্যাদা যেই ক'রে থাকনা কেন—তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার। প্রথম সে অন্যায়ের জন্য আমি তোমার ক্ষমা চাই, দ্বিতীয়—আমি তোমার ও অনিলার জীবন সার্থক ও সুখী হওয়ার পক্ষে বাধা দিয়ে যে ঘোরতর অন্যায় করিছি—যার জন্য তীব্র অনুতাপে আমার এই বিদায় বেলাটুকুও আঁধার ও বাষ্পাকুল হ'য়ে উঠেছে—আমি সে অপরাধের জন্যও তোমার কাছে মার্জ্জনা চাই—তুমি আমার অনুকে দেখো, তার ভার আমি আর কারুর উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে মরতে পারবোনা। আমি চলে গেলে—তুমি ছাড়া তার আর শ্রেষ্ঠতম বন্ধু কেউ থাকবে না।

খবর এলো তারিণীবাবু এসেছেন।

তারিণী উকীল ঘরে ঢুকতেই বৃদ্ধ বললে—তারিণী, ছেলেরা জানেনা যে আমি অনেকদিন আগেই উইল ক'রে রেখেছি, তোমায় ডেকেছি আমার সেই উইলে কিছু পরিবর্ত্তন করবার জন্য। আমার ইচ্ছা আমি ছেলেদের সঙ্গে আমার মেয়ে অনিলাকেও আমার বিষয় সম্পত্তির একটা সমান অংশ দিয়ে যাবো—

তারিণী উকীল বললে—কিন্তু, সেটা যে বেআইনী হবে। সন্তান বর্ত্তমান থাকতে পিতৃসম্পত্তিতে কন্যার তো কোনও আইনসঙ্গত অধিকার নেই!

—রেখে দাও তোমার আইন। ও একচোখো আইন আমি মানতে চাইনি,—বলি, আমি যদি উইল ক'রে তাকে লিখে দিয়ে যাই তাহ'লেও কি তোমাদের আদালত তাকে বঞ্চিত করতে পারে? সেও তো আমার সন্তান! ছেলে মেয়ের মধ্যে বিষয় বিভাগে আমি যদি কোনও প্রভেদ না রাখি—

তারিণী বললে—অবশ্য, আপনি যদি উইল ক'রে ভায়েদের সঙ্গে একটা সমান অংশ তাকে লিখে দিয়ে যান, তাহ'লে সে তা পাবে, আদালত কোনও বাধা দেবেনা, কিন্তু, তার প্রয়োজন কি? বেশ বড় লোকের ঘরেই তো আপনি মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। আমার সৎপরামর্শ যদি নিতে চান, তাহ'লে ছেলেদের পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে আর অন্য এক ঘরের অংশীদার জুটিয়ে দিয়ে যাবেন না। আপনার মেয়ে হ'লেও ভুলে যাবেন না যে সে আজ অন্য একঘরের বউ, বরং আমি বলি কি, তাকে যদি কিছু দিতে চান, তাহ'লে, তার নামে যে নগদ পঁচিশহাজার টাকা দিয়েছেন সেটা আরও বাড়িয়ে—না হয় পঞ্চাশ হাজারই ক'রে দিয়ে যান!

মণি ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা ক'রলে—তুমি কি বলো মণি?

মণীন্দ্র বললে—তারিণীবাবুর প্রস্তাব খুব সমীচীন। কন্যাকে সম্পত্তির অংশ দিয়ে বৈষয়িক জটিলতার সৃষ্টি না ক'রে তাকে দেয় সম্পত্তির মূল্য ধ'রে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। এই সম্পত্তি বিভাগের 'কুবিধির' জন্যে এ দেশের কত যে বড় বড় ঘর নষ্ট হ'য়ে গেল এবং যাচ্ছে তার আর সংখ্যা হয়না।

তারিণীবাবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন—'কুবিধি'

কি বলছেন? এ বিষয়ে তো আমরা ইংরেজের আইনের অধীন নই। এ একেবারে ভারতীয় হিন্দু বিধি—দায়ভাগ—

বাধা দিয়ে মণীন্দ্র বললে—ওই দায়ভাগের ভাগের দায়েই ত বাংলাদেশ আজ শ্মশান হ'য়ে গেছে! আমি জানি কেশবপুরে আমাদের মস্ত জমীদারী ছিল। বছরে তিনলক্ষ টাকা তার আয়! কিন্তু ঠাকুরদাদারা ছিলেন ছয় ভাই! একান্নবর্ত্তী পরিবারের অশান্তি বিষে জর্জ্জরিত হ'য়ে তাঁরা ছ'ভাই যেদিন ছ'জায়গায় পৃথক হ'য়ে গেলেন, দায়ভাগ এসে তাঁদের সম্পত্তিকেও ছ'টুকরো করে দিলে! এক এক ভায়ের আয় দাঁড়ালো তখন বাৎসরিক পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র! কাজে কাজেই তিন লক্ষ টাকা একত্র আমদানী হওয়ার দরুণ আমার প্রপিতামহ কেশবপুরে জলকষ্ট নিবারণ, অতিথিশালা ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, পাঠশালা ও ইস্কুল স্থাপন, বারো মাসে তের পার্ব্বণ এবং তদুপলক্ষে প্রচুর খাওয়া-দাওয়া, আমোদ প্রমোদ, দান ধ্যান, মেলা, উৎসব, কত কি অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করে কেশবপুরকে জীবন্ত রেখেছিলেন এবং সুসমৃদ্ধ ক'রে তুলেছিলেন। ছ'ভাই পৃথক হয়ে যেতেই সম্পত্তি ও তার আয় বিভক্ত হ'য়ে পড়লো ব'লে সঙ্গে সঙ্গে পৈতৃক সদনুষ্ঠানগুলো তাঁদের বন্ধ হ'য়ে গেল। তার পর, সেই ছয় ভাইয়ের প্রত্যেকের আবার যখন চার পাঁচটি হিসেবে একুনে প্রায় পঁচিশটি আরও নূতন সরিক জন্মালেন—অর্থাৎ আমার পিতা এবং পিতৃব্যরা যখন সম্পত্তি বিভাগ ক'রে নিলেন—তখন তাঁদের প্রত্যেকের বার্ষিক আয় দাঁড়ালো গড়ে দু'হাজার টাকা মাত্র। অর্থাৎ মাসিক দেড়শ' টাকার কিছু বেশী! এই অল্প আয় নিয়ে কেশবপুরে জমিদার বাড়ীর চাল বজায় রাখবার প্রাণান্তকর চেষ্টায় তাঁদের মধ্যে অনেকেই ঋণগ্রস্ত হ'য়ে ক্রমে সর্ব্বস্ব খুইয়েছেন এবং অন্নের চেষ্টায় উপার্জ্জনের জন্য দেশ ছেড়ে দেশান্তরে যেতে বাধ্য হ'য়েছেন। কাজে-কাজেই গত একশ বছরের মধ্যেই কেশবপুর ও তার জমীদার বংশের প্রায় উচ্ছেদ হ'য়ে এসেছে। অতএব আপনার 'দায়ভাগ'কে কু'বিধি না ব'লে কি সুবিধি ব'লবো বলতে চান?

তারিণীবাবু এর ভয়ানক রকম একটা কি যেন জবাব দেবেন, এমনিতরই তাঁর চোখ-মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল; কিন্তু রোগশয্যাশায়ী বৃদ্ধ তার আগেই বলে ফেললে—ঠিক বলেছো মণি! এ দেশের বহু অঞ্চলের ও বহু পরিবারের শোচনীয় পরিণামের মূলে আছে ঐ দায়ভাগের সুদর্শন-চক্র! যা একান্নবর্ত্তী পরিবারকে ইচ্ছামতো বাহান্ন টুক্‌রো ক'রে দেয়! কিন্তু সে তর্ক এখন থাক্,—মণিবাবা যখন মত ক'রেছে তখন তারিণী তুমি আমার মেয়ের সম্বন্ধে ওই ব্যবস্থাই ক'রো,—আর মণিকে আমি আমার উইলের একজন এক্‌জিকিউটর ক'রে যেতে চাই—নইলে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারবোনা—অনুকে আমার ছেলেরা ফাঁকি দিতে পারে। তারিণী তুমি এখন যা করবার করো—

তারিণীবাবু তৎক্ষণাৎ উইল পরিবর্ত্তন করে বৃদ্ধের অভিলাষ পূর্ণ করলেন এবং কার্য্য শেষ হ'তে বিদায় নিলেন।

মণীন্দ্রও অনিলার পিতাকে বেশ ক'রে পরীক্ষা ক'রে ঔষধের কাগজ-পত্র দেখে, এবং অনু যাতে না কষ্ট পায় সে বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখবে বলে বারম্বার তাঁর কাছে প্রতিশ্রুত হ'য়ে বিদায় নিলে।

প্রায় যখন সে নীচেয় নেমে গেছে, পিছন থেকে আনন্দ গিয়ে ডাকলে—দাদা!

মণি ফিরে দেখেই সে প্রিয়দর্শন বালকটিকে চিনতে পেরে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করলে। আনন্দ সেই ফাঁকে চুপি চুপি বললে—দিদি আপনাকে ডাকছে—আপনি তার সঙ্গে দেখা না ক'রে যেতে পাবেন না।

মণীন্দ্রকে আনন্দ প্রায় কি রকম টান্‌তে টানতেই অনিলার সামনে এনে হাজির করলে। অনিলা ব্যাকুল ভাবে মণীন্দ্রের দু'টি হাত ধরে শুধু বললে—ওগো, তুমি বাবাকে বাঁচাও!—

মণীন্দ্র অনিলাকে সান্ত্বনা দিয়ে সস্নেহ মিষ্ট বচনে বুঝিয়ে দিলে যে—সময় হ'লে কাউকে ধ'রে রাখা যায়না। পিতা কারুর চিরদিন থাকেনা—তোমারও থাকবেননা, কিন্তু, তুমি তাঁর অবর্ত্তমানে কোনও দিন নিজেকে অসহায় মনে কোরোনা—অন্ততঃ আমি যে কদিন বেঁচে আছি।

অনিলা আর কিছু না ব'লে শুধু ভূমিষ্ঠ হয়ে মণীন্দ্রকে একটি প্রণাম ক'রে তার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ছোঁয়ালে।

১৮

—হ্যাঁগা, ঠাকুরঝীর কি' সত্যিই কোনও খোঁজ খবর রাখবেনা তুমি?

মন্দা লাইব্রেরী ঘরে এসে পাঠরত সত্যেনকে অনুযোগের কণ্ঠে এই প্রশ্ন ক'রলে।

সত্যেন মন্দার মুখের দিকে ঔদাস্যভরা দৃষ্টি মেলে ক্ষণকাল চেয়ে দেখে বললে—তুমি তো জানো মন্দা—আমি কারুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখন হস্তক্ষেপ করিনি।

—কিন্তু, এ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না ক'রলে যে তোমার কর্ত্তব্যের ত্রুটী হবে প্রিয়তম! সুহাসদি' একটা ভুল ক'রে ব'সলো বলেই কি তুমিও তার প্রতি বিমুখ হবে?

—সুহাস ভুল ক'রলে কি ঠিক করলে—সেইটেই যে আমি এখনও ভালো বুঝতে পারিনি মন্দা!

—দেখো, সব বুঝেও তুমি মাঝে মাঝে এই যে কিছুই না বোঝার ছল ক'রো—এই জন্যই ত' আমি তোমার উপর রেগে যাই। আজ এক সপ্তাহের উপর হ'য়ে গেল সে যে কোথাকার কে এক অজ্ঞাতকুলশীলা সমাজ-পরিত্যক্তার আশ্রয়ে গিয়ে রয়েছে, এতে তোমার কি একটুও ব্যথা লাগ্‌ছে না ব'লতে চাও?

—আমি কিছুই ব'লতে চাইনি মন্দাকিনী, তুমি শুধু এই কথাটা মনে রেখো যে, ব্যথা তখনিই মানুষকে অধিকতর বেদনা দেয় যখন সে তার প্রতিকারের চেষ্টায় সচেতন হয়ে ওঠে।

—আর একটিবার তুমি শেষ চেষ্টা ক'রে দেখো, এই তোমার কাছে আমার একান্ত মিনতি প্রাণাধিক।—ব'লতে ব'লতে—নবীনা বধূর মতোই মন্দা দু'হাতে সত্যেনের কণ্ঠ বেষ্টন ক'রে আব্দারের সুরে বলতে লাগলো—

—এতবড় একটা প্রাণ সমাজের অন্যায় অত্যাচারে নিষ্পেষিত হ'য়ে জন্মের মতো নিষ্ফল হ'য়ে যাবে? ওগো, তুমি তাকে নিয়ে এসো—ফিরিয়ে নিয়ে এসো। তোমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সে কখনই ঠেলতে পারবেনা।

সত্যেন একটু ম্লান হেসে জিজ্ঞাসা করলে—কিসে বুঝলে? বরং সেদিন ত' স্বচক্ষেই দেখলে—সে আমার কথা রাখলেনা।

—তুমি তো আমার মুখচেয়ে তাকে তেমন ক'রে ব'লতে পারোনি?—যদি তেমন ক'রে ডাক দিতে পারতে, সাধ্য কি সুহাসের যে সে আহ্বান সে উপেক্ষা করে? জানি সে কঠিন—সে দৃঢ়মনা—কিন্তু পাষাণী তো নয়?—তোমার কাছে আসবার তার প্রধান বাধা ছিল সংসার, সমাজ, লোক-নিন্দা, অপবাদ;—কিন্তু আজ তো সেগুলো সবাই ভিড় ক'রে তার সঙ্গ নিয়েছে! সকল ভয় ত' তার ভেঙে দিয়েছে—সকল ভাবনা ত' কেড়ে নিয়েছে—

বাধা দিয়ে সত্যেন ব'ললে—মস্ত ভুল ক'রছো মন্দা,—তুমি যে বাধা-বন্ধনের উল্লেখ ক'রছো সুহাসের কাছে তারা কোনও দিনই দুর্লঙ্ঘ্য ছিলনা, দেখলে না—সেদিন অমন ভূমিকম্পেও সে এতটুকুও টলেনি? তোমার অনুমান যদি সত্য হ'তো, তাহ'লে অমন নির্ব্বিকার ভাবে সুহাস চাঁপা দীঘিরকূলে---তার সই অলকার বাড়ী না গিয়ে—আরও নিকটবর্ত্তী কোনও জলাশয়ে সলিল-সমাধি লাভের সাধনা ক'রতো।

—তবে কেন সে তোমার কাছে এলো না? কী তার বাধা?—বলোনা!

সত্যেন আর একবার পাণ্ডুর মুখে হেসে ব'ললে—সেটা তার কাছেই জিজ্ঞাসা ক'রে নেওয়া উচিত নয় কি মন্দা? আমি তার খবর কি জানি?

—তুমি সব জানো। তুমি বলো আমায়। সে যে কি হেঁয়ালীর মতো কথা কয় আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। তোমার মুখে শুনলে বেশ বুঝতে পারি!

সত্যেন ক্ষণকাল কি ভেবে বললে—দেখো, আমার মনে হয়, হয় ত আমার এ অনুমান ভুলও হ'তে পারে,—আমার কাছে আসার প্রধান বাধা তার—তুমিও নও, আমিও নই, সমাজও নয়—

—তবে? তবে কে?

—সে—সে নিজে!

অপরিসীম বিস্ময়ে তার ডাগর চোখদুটিকে বিস্ফারিত ক'রে মন্দা ব'লে উঠলো—সে নিজে?—সে কি? তুমি কি ব'ল্‌ছো প্রিয়?

মন্দার সেই বিস্ময়-বিমুগ্ধ মুখখানিতে একটি স্নেহ-চুম্বন এঁকে দিয়ে, কণ্ঠ হ'তে তার মৃণাল-বাহুলতার কোমল বন্ধন সযত্নে খুলে নিয়ে—পাশের একখানি চৌকীতে তাকে বসিয়ে, সত্যেন বললে, বুঝতে পারলেনা বুঝি?—আচ্ছা, এই-খানটিতে বোসো, তোমাকে আরও একটু স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে ব'লছি। দেখো, সুহাসের মনের মধ্যে প্রেমের যে সর্ব্বোচ্চ আদর্শটি আজ রূপ পরিগ্রহ ক'রেছে,—সে তার প্রেমাস্পদের সান্নিধ্যকে সভয়ে দূরে পরিহার ক'রে চ'লতে চায়! কেন জানো? পাছে প্রতিদিনের প্রাত্যহিক ব্যবহারের অসংখ্য

স্খলন পতন ত্রুটী বিচ্যুতির মধ্যে তার জ্যোতির্ম্ময় রূপটি মলিন হ'য়ে পড়ে! বাস্তবের স্থূলহস্তাবলেপনে পাছে তার কল্পরাজ্যের সেই সুন্দরের মূর্ত্তিটিতে কলঙ্কের দাগ লাগে!

মন্দা অসহিষ্ণুর মতো ব'লে উঠ্‌লো—কিন্তু, প্রিয়, তার এই আদর্শের পূজায় আনন্দ কোথায়?—যে প্রেমের সাধনায় সার্থকতার সুখ নেই—তৃপ্তির পরম শান্তিটুকু লাভ হয়না—সে ভালোবাসা ধন্য হবে কিসে?—

সত্যেন ব'ললে—তার ভালোবাসার গীতায় সম্ভবতঃ এই শ্লোকটাই সবচেয়ে বড় ক'রে লেখা আছে যে—"আমি শুধুই ভালবেসেই ধন্য ও সার্থক হ'তে চাই, আর কিছুই চাইনা!" তাই সে তার প্রাণের ঠাকুরকে দেবতার মতো দূর হ'তে ভক্তি করে,—মানুষের মতো আত্মীয় ব'লে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর ক'রতে চায়না; পিতার মতো শ্রদ্ধায় তার চরণতলে মাথা নত ক'রে দেয়, বন্ধুর মতো এসে সৌহার্দ্দ্যের সঙ্গে তার করমর্দ্দন করেনা! সংসারের আর সকলের মতো সুখে দুঃখে সে তাকে হাটের সঙ্গী ক'রে নিতে চায়না, বুঝলে?—

বালিকার মতো গ্রীবা দুলিয়ে ঘন-ঘন মাথাটি নেড়ে মন্দা বললে—উঁহু! একটা জায়গায় এখনও আমার খট্‌কা রয়ে গেল। দেখো, আমি আমার নিজের—নিজের কথা দিয়েই তোমাকে বুঝিয়ে বলি শোনো, নিঃশেষে আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে আমি তোমাকে ভালবেসেছিলুম,—নিজের হৃদয়-ভাণ্ডার উজাড় ক'রে আমার অন্তরের সমস্ত প্রেম আমি তোমারই পা'য়ে নিবেদন ক'রে দিয়েছিলুম,—তুমি আমাকে ভালোবাসো বা নাই বাসো,—আমি তোমাকে ভালবেসে সুখী হ'তে চেয়েছিলুম, সার্থক হ'তে চেয়েছিলুম, ধন্য হ'তে চেয়েছিলুম, কিন্তু, দশ বৎসরের একাগ্র সাধনাতেও আমার প্রেম সিদ্ধিলাভ ক'রতে পারেনি, প্রতিদিন ব্যর্থতার পীড়নে অশ্রু বিসর্জ্জন ক'রেছে—অতৃপ্তির হাহাকারের মধ্যে মাথাখুঁড়ে মরেছে! কিন্তু যেদিন—যে মুহূর্ত্তে—যে শুভক্ষণে তুমি আমার পানে ফিরে চাইলে—হে আমার ইহপরকালের দেবতা, তোমার প্রেমের সেই কণামাত্র পেয়েই আমার জন্ম জন্ম শতজন্ম যেন সার্থকতার মধ্যে জেগে উঠে ধন্য হ'য়ে গেল!

মন্দা সত্যেনের মুখের দিকে চেয়ে ক্ষণকাল যেন মুগ্ধ নেত্রে স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইল। সার্থক প্রেমের গৌরব ও আনন্দ-স্মৃতি যেন তার অন্তরের অন্তঃস্থলটিকে বিহ্বল ও উদ্বেলিত ক'রে তুলছিল!

একটু পরে প্রকৃতিস্থ হ'য়ে সে বললে—কিন্তু, প্রিয়তম, তোমাকে যদি না পেতুম তাহ'লে আমার ভালবাসা তো শুধু নিষ্ফল জীবন-বেলায়—কাতর প্রাণের পুঞ্জীভূত বেদনার ভারে নিষ্পেষিত হ'য়ে—তার শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতো। আমি আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এ কথা বেশ জোর করেই বলতে পারি যে, ভালবাসা যদি তার প্রতিদান না পায়, তাহ'লে সে তার প্রেমাস্পদকে যত ভালই বাসুকনা কেন, কখনই সার্থকতার তৃপ্তির মধ্যে ধন্য হ'য়ে উঠতে পারেনা!—আমি সেটাকে অসম্ভব ও অস্বাভাবিক বলে মনে করি।

সত্যেন একটু যেন ভারী গলায় বললে—তোমার কথা একবর্ণও মিথ্যা নয় মন্দাকিনী, কিন্তু, তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন, যে—সুহাসের ভাণ্ডারে তার পরাণ প্রিয়র—সারা শৈশব ও কৈশোরের অপরিমেয় অনাবিল স্নেহ প্রেম আজও অক্ষয় হ'য়ে জমা রয়েছে!

মন্দা সহসা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠ্‌লো—ওগো, জানি, জানি তাও জানি, কিন্তু, এও তো তোমাকে স্বীকার করতে হবে যে শৈশবের স্নেহে কৈশোরের প্রীতির ক্ষুধা মেটেনা, আবার কৈশোরের স্বপ্নেও তরুণের তৃপ্তি হয়না। যৌবনের চ'খে যে ফুটে ওঠে তখন এক রঙীন জীবনের নেশা! সে যে তখন প্রেমের সঞ্জীবনী সুধা পান ক'রে বাঁচতে চায়! তার মাদকতা—তার মত্ততা—যে তোমার শৈশব ও কৈশোরের নাগালের বাইরে!

নিশ্চয়! কেউ তা' অস্বীকার করেনা মন্দা! তুমি সত্য কথাই ব'লেছো। স্নেহ বলো, অনুরাগ বলো, প্রেম বলো, ভালোবাসা বলো, এসবেরই স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি ঘটে একমাত্র 'মধুর ভাবে' এসে পৌঁছতে পারলে। তখনই চিত্তের তপোবনে আজও সেই বেদোক্ত ঋষি-কণ্ঠ শোনা যায়—

"ওঁ মধু বাত ঋতায়তে—মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ -"

তখনই মানুষ মানুষকে ডেকে উঁচুগলা ক'রে বলতে পারে—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"—সেইদিনই সে বিশ্বের লোকের কাছে ঘোষণা করতে পারে—যে, এই নিখিলচরাচর-ব্রহ্ম কেবলমাত্র আনন্দ থেকেই উদ্ভূত হ'য়েছে!

ছুটতে ছুটতে গোকুল এসে খবর দিয়ে গেল—বড়মা, মামাবাবু এসেছেন। তিনি বেশ ভালই আছেন।

সঙ্গে সঙ্গে মণীন্দ্র এসে ঘরে ঢুকলো।

মন্দা তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিলে।

সত্যেন বলে উঠলো—কি হে, কোথায় ডুব মেরেছিলে এতদিন? সুশীলবাবুকে ঠেঙিয়ে কি পুলিশের ভয়ে ফেরার হ'য়েছিলে?—বহুকাল যে আর চুলের টিকিটি পর্য্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়নি? ব্যাপার কি?

মণীন্দ্র বললে,—এক ব্রহ্মারই শুনিছিলুম কোটি কোটি মন্বন্তরে এক একটি বৎসর গণনা করা হয়, তাঁর এক একটি পল অনুপল বিপলের মধ্যে আমাদের না কি হাজার হাজার বছর কেটে যায়! তোমারও দেখছি তাই! সাত দিন আসতে পারিনি—অমনি বহুকাল হ'য়ে গেল!

মন্দা বললে—সত্যি দাদা বড়ই ভাবিয়ে তুলেছিলে তুমি! সেই যে এক কাণ্ড করে ঠাকুরঝীর শ্বশুর বাড়ী থেকে চলে গেলে! তার পর কি মানুষকে মানুষের একটা খবরও দিতে নেই?

মণীন্দ্র বললে—আমিই নাহয় খবর দিতে পারিনি। বিশেষ ব্যস্ত ছিলুম। কিন্তু, কই, তোমরাও তো কেউ খবর নিতে পাঠাওনি আমার?

মন্দা বললে—একটা ভারী দুর্ঘটনায় আমাদের মন বড় খারাপ হ'য়ে রয়েছে দাদা, তাই তোমার কোনও খবর নিতে পারিনি, কিছু মনে কোরোনা—

মণীন্দ্র বললে—ও! তোরা বুঝি এরমধ্যেই শুনেছিস? তা' ও আর এমন কি দুর্ঘটনা মন্দোদরী, বুড়োর বয়েস তো বড় কম হয়নি! ঠিক সময়েই গেছে—

মন্দা চমকে উঠে বললে—সে কি? তুমি কার কথা ব'লছো দাদা?—কে গেছে?—

—কেন, তোরা কি তবে শুনিস্‌নি? আমাদের অনুর বাপটি যে কাল স্বর্গারোহণ করেছেন!

মন্দা খবরটা শুনে চুপ করে রইল।

সত্যেন জিজ্ঞাসা করলে—কত বয়স হয়েছিল তাঁর?

মণীন্দ্র বললে—তা' প্রায় সত্তর! আজ কালের তুলনায় গুড্ ওল্ড এজ্ বলতে হবে—এখন তো ষাট আর বড় একটা কাউকে পার হ'তে হচ্ছে না।

সত্যেন অন্যমনস্ক ভাবে বললে—হ্যাঁ তা বটে।

মন্দা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—যাক্!—অনির একমাত্র সংসারের বাঁধন যেটুকু ছিল তাও ঘুচে গেল! এইবার ছুঁড়ীটার কী যে হবে তা কে জানে? বাপ-অন্ত প্রাণ ছিল তার। পাছে তার বাবার মনে কষ্ট হয় এই ভয়ে সে তার জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখটাকেও মুখ টিপে সহ্য করছিল।

মণীন্দ্র বললে তার জন্যে বেশী ভাবিসনি মন্দা, সে খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে, এতবড় শোকেও সে খুব বেশী কাতর হ'য়ে পড়েছে বলে মনে হ'লনা! তাছাড়া, বুড়ো মরবার সময় মেয়েকে উইলে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে গেছে—আর শুনলে বোধ হয় আশ্চর্য্য হ'য়েযাবি—মরবার দিনকয়েক আগে আমাকে ডেকে পাঠিয়ে তিনি তাঁর বিষয়ের একজন একজি-কিউটার ক'রে গেছেন! সুতরাং, আমি যে কদিন বেঁচে আছি—তোমার বন্ধুর যে কোনও কষ্ট হবেনা এটা বোধ হয় তুমি বিশ্বাস করতে পারবে?

মহাউৎসাহিত হ'য়ে উঠে মন্দা বললে—নিশ্চয়, শুনে যে কতখানি নিশ্চিন্ত হলুম দাদা—কি বলবো! সে হ'চ্ছে তোমার ছেলে বেলার ক'নে। তাকে কত ভালোবাসতে তুমি সে তো আমরা জানি। অনুও 'মণিদা' বলতে অজ্ঞান হ'তো। এই সেদিন কতকাল পরে তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হ'তে তার কত আহ্লাদ! আজ যে দু'জনে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স'রে গিয়েও ঘটনাচক্রে আবার একত্র হ'লে, এবং তুমিই যে তার একজন অভিভাবক হয়ে দাঁড়ালে—এর মধ্যে আমি বিধাতার কল্যাণ হস্তের স্পর্শ দেখতে পাচ্ছি।

মণীন্দ্র একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললে—তোমার বন্ধুর সম্বন্ধে তো তুমি বেশ নিশ্চিন্ত হ'লে, এখন বলো দেখি আমার বন্ধুর খবর কি? সে ছোটলোক বেটারা 'সু'কে বোধ হয় খুব উৎপীড়ন ক'রছে—না?

—তার কথাই তো তোমাকে তখন বলতে যাচ্ছিলুম দাদা, তবে আর মন খারাপ হ'য়ে রয়েছে বললুম কেন?—তারা ঠাকুরঝীকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—!

মণীন্দ্র নিশ্চেষ্ট একখানা চেয়ারে বসে প'ড়ে চীৎকার করে উঠলো—এঁ্যা! কি বলছিস মন্দা? রহস্য করছিসনি ত?—

—না দাদা, এ নিয়ে রহস্য করবার মতো মনের অবস্থা আমাদের নয়। এটা নিষ্ঠুর সত্য।

মণীন্দ্র তবু যেন বিশ্বাস করতে পারলেনা। সত্যেনকে জিজ্ঞাসা করলে—হ্যাঁ হে, তাই না কি ?

সত্যেন গম্ভীরভাবে বললে—হ্যাঁ, কতকটা তাই বটে, তবে তাড়িয়ে দেবার অপেক্ষায় ব'সে না থেকে বুদ্ধিমতী সুহাস আগেই সেখান থেকে বেরিয়ে পড়েছে—

—কোথায় গেল ? তোমার এখানে এসেছে বুঝি ?

—না, সে সৌভাগ্য আমার বা তোমার বোনের কারুর ভাগ্যেই ঘটেনি। সে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে—

অধীর উত্তেজিত কণ্ঠে মণীন্দ্র প্রশ্ন করলে—কোথা ? কোথা সে ?

তখন মন্দা সুহাসের গৃহত্যাগের সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করে মণীন্দ্রকে শোনালে।

মণীন্দ্র অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে বললে—যাক্ ! তাহ'লে আমারই দুর্ব্বুদ্ধির জন্যই দেখছি তাকে ঘরছাড়া হ'তে হলো ! ছিঃ ছিঃ—হোয়াট্ এ স্ক্যাণ্ডাল্ !

বলতে বলতে মণীন্দ্র উঠে পড়ে টুপীটা মাথায় দিচ্ছে দেখে সত্যেন জিজ্ঞাসা করলে—ও কি ? এই এলে—এর মধ্যেই আবার কোথায় চললে ?

মণীন্দ্র যেন অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে বললে—যাই একবার সেই চাঁপাদীঘির অলকার বাড়ী। দেখি যদি বন্ধুকে ফিরিয়ে আনতে পারি—

সত্যেন বললে—কোথায় আনবে ?

—কেন, তোমাদের বাড়ী ?

—এ বাড়ীতে সে আর ঢুকবেনা বলেছে।

—তাহ'লে আমার বাড়ীতে নিয়ে যাবো—

—অর্থাৎ, তোমারই সম্পর্কে এসে যে কলঙ্কটা তার রটেছে—সেইটেকেই তুমি আরও ভালো করে প্রতিষ্ঠিত করবে ?

—কলঙ্ক তো রটেইছে সত্যেন, এবং সে তো সমস্ত গঙ্গার জলে ধুলেও আর মুছবেনা। দুর্নাম একবার রটলে আর তাকে ঠেকানো চলেনা।

—ঠেকানো না যাক্ অন্ততঃ তার প্রসার বৃদ্ধি না হ'তে পারে এবং আয়ুষ্কালও কমানো যায়—

—তবে কি আমার না-যাওয়াটাই তোমরা উচিত ব'লে মনে করো ?—'সুর' পক্ষে যেটা ভাল' বলে তোমরা মনে করবে, আমি তাই করতে রাজী আছি—

মন্দা বললে—না দাদা, তুমি কারুর কথা শুনোনা। তুমি এখনি যাও, পারো তো তাকে এই খানেই ধরে নিয়ে এসো—

সত্যেন বললে—তোমার একলা যাওয়া কিছুতেই হ'তে পারেনা। অন্ততঃ আমি কিম্বা মন্দা আমাদের যে কোনও একজনের তোমার সঙ্গে যাওয়া উচিত।

মন্দা বললে—তবে আজ থাক, বৃহস্পতিবারের বারবেলা, আজ আর গিয়ে কাজ নেই—কাল সকালে উঠে আমরা তিন জনেই গিয়ে তাকে ধ'রে নিয়ে আসবো—কেমন ?

মণীন্দ্র বললে—বেশ, তাই হবে—

সত্যেন বল্লে—তোমরা দুই ভাই বোনে যেও। আমি আর যাবো না।

মন্দা সত্যেনকে চোখের ইসারা ক'রে বললে—চুপ !

মণীন্দ্র বললে—কেন ? তুমি আবার বেঁকে বসলে কেন ? আলবাৎ তোমায় যেতে হবে—

মন্দা বললে—শুধু যেতে হবে ?—জোর করে তাকে ধ'রে আনতে হবে ওঁকেই গিয়ে ! উনি ভিন্ন এ আর অন্য কেউ পারবেনা।

—আচ্ছা সে কালকের কথা কাল হবে। এখন ওঠো, ডাক্তার সাহেবের জন্য একটু চায়ের ব্যবস্থা করো—

মন্দা উঠে চা আনতে গেল।

মণীন্দ্র এ সংবাদটা শুনে পর্য্যন্ত অত্যন্ত অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিল, তাই সত্যেন যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলে—যদি সুহাস না আসে ডাক্তার ? তাহ'লে কি করবে, কিছু ভেবে দেখেছো কি ?—মণীন্দ্র কিছু শুনতেই পেলেনা।

সত্যেন আবার একবার ঐ প্রশ্ন করাতে—মণীন্দ্র বললে—যেমন ক'রে হোক তাঁকে ফিরিয়ে আনতেই হবে ! না যদি আসতে চান তাহ'লে কি করা যাবে সে পরে ভাবা যাবে। গোড়া থেকে যদি অত ভাবতে পারতুম—তাহ'লে এতদিন আমি 'নিউটন' কিম্বা 'গ্যালিলিও' হয়ে উঠতুম। আমি শুধু এই বুঝি যে আমার জন্য যখন তাঁর এই বিপদ হয়েছে তখন আমাকে এর প্রতিকার করতেই হবে।

(ক্রমশঃ)

মধ্যভারত

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

ইন্দোর

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলেছি, ইন্দোরের কথা বলা শেষ হয়নি। তার অর্থ এ নয় যে, ইন্দোর ভ্রমণকাহিনী আরও বল্‌বার আছে। প্রথমে তিন দিন মাত্র ইন্দোরে ছিলাম, আর সে তিন দিনই সাহিত্য-সম্মেলন। তারই মধ্যে একটু-আধটুকু অবকাশ ক'রে নিয়ে সহরের চারিদিক যতটা পেরেছি দেখে নিয়েছি। সেই বিবরণই বিগত সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' দিয়েছি। এবারে আর তার জের মিটাতে হবে না—এবার ইন্দোরের ইতিহাস সম্বন্ধে অল্প দুই চারিটি কথা বল্‌ব। ইন্দোরের কথা বল্‌তে গিয়ে যদি প্রাতঃ-স্মরণীয়া, মহিমময়ী রাণী অহল্যা বাঈয়ের পবিত্র জীবন-কথা, তাঁর অতুলনীয় কীর্ত্তি-কাহিনী না বলি, তা হ'লে ইন্দোরের কথাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইন্দোর রাজ্য যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে, সে ত রাণী অহল্যা বাঈয়ের জন্যই এবং তাঁর শ্বশুর, ইন্দোর রাজ্যের স্থাপয়িতা স্বনামধন্য বীরবর মহারাজ মলহর রাও হোলকারের জন্যই। সুতরাং বীরকেশরী মলহর রাও হোলকার ও তাঁহার পুত্রবধূ রাণী অহল্যা বাঈয়ের জীবনের ইতিহাস অতি সংক্ষেপেও না ব'লে ইন্দোরের কথা শেষ করতে পারছিনে।

ইতিহাস কথাটা শুনে কেহ যদি এখানেই পড়া শেষ করতে চান, তা হ'লে তাঁদের কাছে আমার নিবেদন এই যে, আমি যে ইতিহাস বল্‌ব, তা উপন্যাস অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়, বরঞ্চ উপন্যাসকারও যে কথা বল্‌তে গেলে বাস্তব হবে না ব'লে একটু সঙ্কোচ বোধ করেন, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ইন্দোর রাজ্যের স্থাপয়িতার জীবন-কাহিনী তার চাইতেও মনোরম এবং বাস্তব ঘটনা।

আমরা যে সময়ের কথা বল্‌ছি, সে ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দ। এই সময় হোল নামে একটা গ্রামে খণ্ডুজী নামে একজন ক্ষত্রিয় বাস করতেন। জাতিতে ক্ষত্রিয় হলেও তাঁর অবস্থা এমন মলিন ছিল যে, তিনি পশুচারণ ও চাষবাস ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ করতেন এবং তাতেও তাঁর সংসারের অভাব মিট্‌ত না। এই দরিদ্র কৃষিজীবীর ঘরে ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে একটী শিশু জন্মগ্রহণ করে। শিশুর নাম মলহর রাও। মলহর রাওয়ের বয়স যখন চার-পাঁচ বৎসর তখন তার বাপ খণ্ডুজী মারা যান। এ অবস্থায় যা হয়ে থাকে, তাই হোলো, জ্ঞাতিরা নানা ছলে বিধবা ও নাবালকের যা সামান্য জমাজমি ছিল, তা আত্মসাৎ করতে লাগ্‌ল। বিধবা অন্য উপায় দেখ্‌তে না পেয়ে, স্বামীর ভিটার মায়া ত্যাগ করে পিতৃহীন বালকের হাত ধ'রে খান্দেশের অন্তর্গত তলোদেঁ নামক গ্রামে তাঁর ভ্রাতা নারায়ণজীর আশ্রয় গ্রহণ করলেন। নারায়ণজী একেবারে নিঃস্ব ছিলেন না। তাঁর কিছু জমিজমা ছিল; তা ছাড়া তিনি একজন মারাঠী সামন্তের অধীনে কতকগুলি অশ্বসৈনিকের অধিনায়ক ছিলেন। নারায়ণজী ভগিনী ও পিতৃহীন ভাগিনেয়কে আশ্রয় দিতে বিমুখ হলেন না। তিনি মলহরের লেখাপড়া শিখাবার কোন ব্যবস্থা না করে তাকে পশুচারণে নিযুক্ত করলেন; মলহরও রাখালী করতে আরম্ভ করল।

দুই তিন বছর এই রাখালীতেই কেটে গেল। একদিন দুপুর বেলায় পশুপাল মাঠে ছেড়ে দিয়ে মলহর একটা গাছের তলায় শুয়ে ছিল। সে যখন অঘোরে ঘুমুচ্ছে, সেই সময় তার মুখের উপর রৌদ্র পড়েছিল। সেই রৌদ্রের তাপ থেকে বালককে রক্ষা করবার জন্য একটা সাপ ফণা ধরে তার মুখখানিকে আড়াল করেছিল। অন্যান্য রাখালেরা এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখে ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিল, সাপটাকে তাড়িয়ে দিতে তাদের সাহস হোলো না। রোদ যখন একটু সরে গেল, সাপও তখন জঙ্গলে চলে গেল। সাপের এমন দয়ার কথা নূতন নয়,

আরও দু-দশজন সম্বন্ধে এমন গল্প শুনতে পাওয়া যায়; মলহরের মত তারাও রাখাল থেকে ভূপাল হয়েছিল।

অন্য রাখালদের মুখে এই আশ্চর্য্য ঘটনা শুনে নারায়ণজী এমন ব্যাপারের কোন কারণ নির্দ্দেশ করতে না পেরে গ্রামের যিনি দৈবজ্ঞ, তাঁর কাছে গেলেন; দৈবজ্ঞ অনেক গণনা করে এবং বালক মলহরের করকোষ্ঠী দেখে ভবিষ্যৎবাণী করলেন যে, এই ছেলে সামান্য নয়, এর ললাটে রাজযোগ লেখা আছে; মলহর দেশের রাজা হবে। নারায়ণজী কথাটা অবিশ্বাস করতে পারলেন না; শিবাজী মহারাজও ত সামান্য অবস্থা থেকেই এত বড় হয়েছিলেন! তিনি তখন মলহরকে রাখালী থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু লেখাপড়া শিখতে লাগিয়ে দিলেন। এদিকে মলহরের মনেও বিশ্বাস জন্মিল যে, সে বড়মানুষ হবে, প্রতিষ্ঠাভাজন হবে। হোলোও তাই। আঠারো বৎসর বয়সে মলহর রাও মাতুলের অশ্বারোহী সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হলেন। তাঁর মনে তখন উচ্চ আশা বলবতী। তাঁর যোগ্যতা দেখাবার সুযোগও অবিলম্বে উপস্থিত হোলো। একটী যুদ্ধে তিনি নিজাম-উল-মুল্কের একজন যুদ্ধবিশারদ সেনাপতিকে নিহত করায় তাঁর নাম চারিদিকে বেজে উঠল। তখন তাঁর মাতুল নারায়ণজী পরম সমাদরে তাঁকে নিজ কন্যাদান করলেন। মারাঠাদের মধ্যে মাতুল-কন্যাকে বিবাহ করা অশাস্ত্রীয় নয়।

মলহরের বীরত্বের কথা মারাঠা সমাজের নেতা ও অবিসম্বাদি অধিনায়ক পেশোয়া বাজীরাওয়ের কর্ণগোচর হোলো; তিনি মলহরকে নিজের সৈন্যদলে পাঁচশত সৈন্যের অধিনায়ক করে দিলেন। মাতুলের আশ্রয়ে প্রতিপালিত, মেষপালক, শৈশবে পিতৃহীন দরিদ্র বালক এখন মহাসম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হলেন। তখন তিনি আর মলহর রাও রইলেন না। হোল গ্রামে যে তাঁর জন্ম হয়েছিল, সে কথা তিনি ভোলেন নাই। তাই তিনি নিজের নামের সঙ্গে হোলকার কথাটা যোগ করে দিলেন। মারাঠা ভাষায় 'কার' শব্দের অর্থ অধিবাসী। মারাঠারা সকলেই নিজ নিজ নামের শেষে এমনই করে গ্রামের নামও যোগ করে থাকেন। এই মলহর রাও হোলকারই প্রসিদ্ধ হোলকার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

যখন মানুষের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়, তখন যে কোন্ দিক দিয়ে ভাগ্যলক্ষ্মী ঘরে প্রবেশ করেন, স্বয়ং গৃহস্থও তা জানতে পারেন না; মলহর রাওয়েরও তাই হোলো। তাঁর বীরত্বে ও শাসনকার্য্যে সন্তুষ্ট হয়ে বাজীরাও পেশোয়া ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে নর্ম্মদার উত্তর কূলের বারোটী প্রদেশ তাঁকে জাগীর দিলেন। তার পর মালব দেশ নিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে মারাঠাদের যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়েছিল, সেই যুদ্ধে মলহর রাও এমন বীরত্ব দেখিয়েছিলেন যে, বাজীরাও তাঁকে মালব দেশের সর্ব্ববিষয়ের কর্ত্তাপদে নিযুক্ত করেন। শেষে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করায় মলহর রাওয়ের সৈন্যদিগের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য বাজীরাও পেশোয়া তাঁকে ইন্দোর প্রদেশ জাগীর স্বরূপ প্রদান করেন। এই থেকেই ইন্দোর হোলকার রাজ্যের রাজধানী হয়, আর হোলগ্রামের দরিদ্র কৃষিজীবীর পুত্র সেই রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্তা হন। তার পর থেকে নানা বিবাদ বিসংবাদের, নানা আত্মকলহের, নানা যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়ে সামান্য ইন্দোর সহর ধীরে ধীরে সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগরীতে পরিণত হয়েছে। আর আমরা সেই ইন্দোরে প্রবাসী বাঙ্গালী সাহিত্য সম্মেলন করিতে গিয়েছিলাম।

মলহর রাও হোলকার বাহাদুরের অনন্যসাধারণ জীবন-কথা যদি আদ্যন্ত বলতে হয়, তা হলে একটা প্রকাণ্ড পুস্তক হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করবার সুবিধা হবে না; যেটুকু বলা হয়েছে, তার থেকেই সকলে বুঝে নিতে পারবেন যে, মলহর রাও হোলকার একটা মানুষের মত মানুষ ছিলেন। অতি সামান্য অবস্থা থেকে একটা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে হলে এবং তাকে মহারাষ্ট্র চক্রের মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থানে উপনীত করতে হ'লে যা যা দরকার, মলহর রাও সে সবই করেছেন; যুদ্ধবিগ্রহ করেছেন, দরকার হ'লে কূট নীতির আশ্রয়ও গ্রহণ করেছেন; অত্যাচারও যে করেন নাই, এ কথাও বলা যায় না। আবার এদিকে প্রজাপালন, শাসন ও সংরক্ষণে তাঁহার খ্যাতিও অসীম ছিল, দয়া দাক্ষিণ্যও তাঁহার অসীম ছিল। তাঁর সমগ্র জীবনকাহিনী যাঁরা জানতে চান, তাঁদের কৌতূহল চরিতার্থের জন্য আমরা সার জন ম্যাল্কম লিখিত মধ্যভারতের ইতিহাসের উপর বরাত দিয়ে এ কাহিনী এখানেই শেষ করলাম।

মলহর রাওয়ের কথা বলা শেষ করলাম, বলা ঠিক হোলো না; কারণ, যে মহীয়সী প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলার, রাজেন্দ্রাণীর পবিত্র জীবন-বৃত্তান্ত বলতে হবে, তিনি মহারাজ মলহর রাও হোলকারেরই পুত্রবধূ। কেমন করে এক দরিদ্র

পল্লী থেকে একটী দরিদ্র পিতার কন্যাকে কোলে করে এনে মলহর রাও তাঁর পুত্রবধূ পদে বরণ করে ইন্দোরের সিংহাসনে বসিয়ে গিয়েছিলেন, তা যে মলহর রাওয়ের রাজ্যলাভ বল্‌তে হবে, মহারাজ মলহর রাও মানুষ চিন্‌তে অদ্বিতীয় ছিলেন।

এখন যাঁহার অসামান্য জীবন-কাহিনী লিখে লেখনী
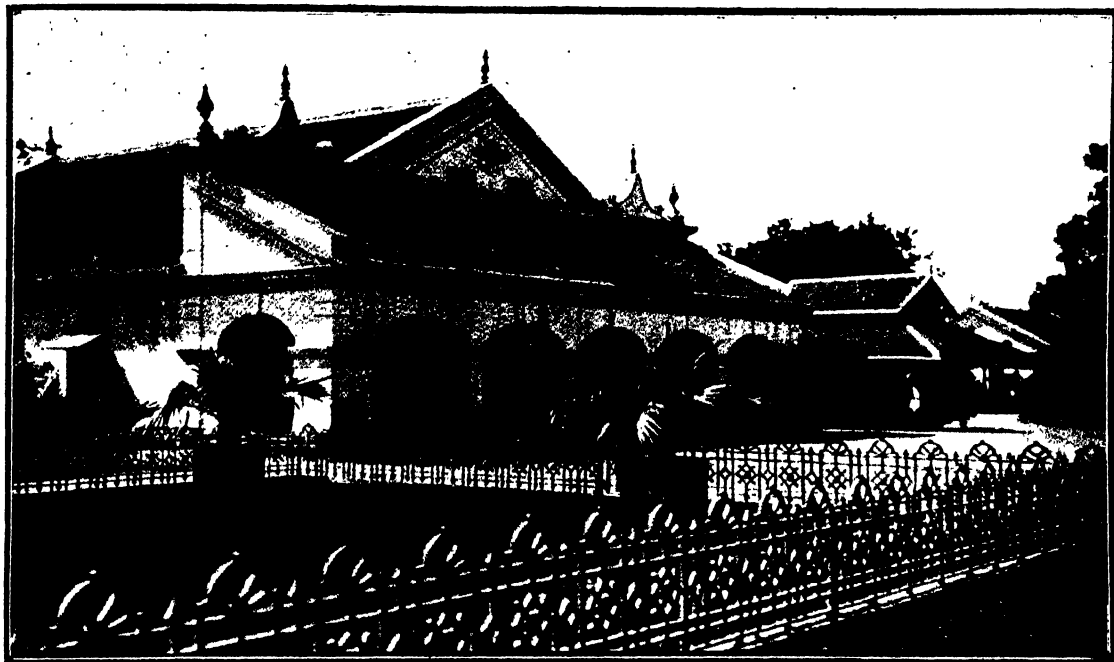
তুকাজীরাও হাসপাতাল

মহারাণী সরাই

অপেক্ষাও অধিকতর ঐশ্বর্য্য লাভ, সে কথা তিনিও অস্বীকার করেন নাই, যে কেহ সে অপূর্ব্ব কাহিনী পাঠ করবেন, তিনিও অস্বীকার করতে পারবেন না—সকলকে একবাক্যে পবিত্র করব, তিনি ইন্দোরের দেবী-স্বরূপিনী রাণী অহল্যা বাঈ—মহারাজ মলহর রাও হোলকারের পথে-কুড়িয়ে-পাওয়া অমূল্য রত্ন!

মল্হর রাও কোন স্থানে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরবার পথে পাথরডি নামে একটী ক্ষুদ্র উন্মুক্ত প্রান্তর। সময়ও অপরাহ্ন। রাজা আদেশ প্রচার করলেন যে, এই সুন্দর স্থানেই তাঁহারা সে

অহল্যাবাঈ ছত্রী

ছত্রীবাগ

গ্রামে উপস্থিত হন। সেই গ্রাম-প্রান্তে একটী মন্দির ছিল; মন্দিরের সুমুখে প্রকাণ্ড সরোবর, চারিদিকে দিনের মত বিশ্রাম করবেন। তাঁর সঙ্গের সৈন্যগণ সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ছাউনি করলেন। রাজ-

সরোবর তীরস্থ মারুতী দেবীর মন্দিরের চত্বরে গিয়া বসলেন।

দরিয়া মহল

গ্রামের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল; সকলেই সৈন্য, গাড়ী ঘোড়া, লোক লস্কর দেখবার জন্য মারুতী দেবীর মন্দির-সম্মুখে উপস্থিত হোল। গ্রামের যাঁহারা প্রধান ব্যক্তি তাঁহারা সকলেই সমাগত হয়ে রাজা মলহর রাওকে অভিবাদন করে তাঁর অনতিদূরে আসন গ্রহণ করলেন।

এই পাথরডি গ্রামে আনন্দ রাও সিন্দে নামে একজন দরিদ্র ক্ষত্রিয় বাস করতেন। তিনি দরিদ্র হলেও ধার্ম্মিক ও গ্রামের সকলের বিশেষ প্রীতি-ভাজন ছিলেন। তাঁর একটী কন্যা ছিল। গ্রামের গণকঠাকুর এই মেয়েটীর কোষ্ঠীবিচার ক'রে বলেছিলেন, অহল্যা রাজরাণী হবে। সকলেই এ কথায় উপহাস করেছিলেন; কিন্তু গণক-ঠাকুর বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছিলেন, জ্যোতিষ গণনা যদি মিথ্যা না হয়, তা হলে এ মেয়েকে রাজরাণী হতেই হবে।
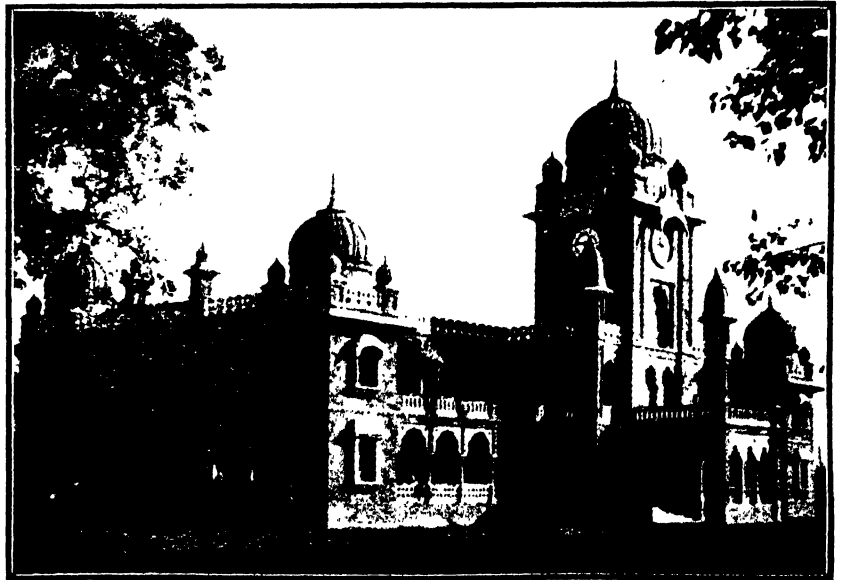
গণৎকার ত ভবিষ্যৎবাণী করেই খালাস, এদিকে অহল্যার দরিদ্র পিতা আনন্দরাও কন্যার বিবাহের জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন। একমাত্র মেয়েকে তিনি তৎকালোচিত লেখাপড়া

এডওয়ার্ড টাউনহল

শিখিয়েছেন, গৃহকর্ম্মে নিপুণা করেছেন, অতিথি অভ্যাগতকে দেবতাজ্ঞানে সেবা করতে শিখিয়েছেন, দরিদ্র-

কন্যাকে দরিদ্রের কষ্টে কাতর হতে শিখিয়েছেন। অহল্যা পরমাসুন্দরী না হ'লেও তার মুখে এমন একটা লাবণ্য ছিল যে, তাকে দেখ্‌লেই স্নেহ প্রকাশ করতে ইচ্ছা হোতো। গুণ ত মেয়ের সবই ছিল, কিন্তু আনন্দ রাওয়ের দারিদ্র্যই এত গুণের পথরোধ করে দাঁড়াল, বিনা যৌতুকে

মহেশ্বর রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার

মেয়ের বিয়ে এখনও হয় না, তখনও হোতো না। আনন্দ রাও কি ক'রবেন ?

এই সময় রাজা মলহর রাও পাথরডিতে এসে উপস্থিত হলেন। আর সকলের মত আনন্দ রাও-ও রাজ-সম্ভাষণে গেলেন এবং অদূরে যাঁহারা উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁদের কাছে গিয়ে বস্‌লেন। গাঁয়ে সৈন্যসামন্ত এসেছে, রাজা এসেছেন শুনে অহল্যাও দেখ্‌তে গেল। গ্রামের বালক-বালিকারা দূর থেকে হাতী ঘোড়া দেখ্‌তে লাগ্‌ল, মন্দিরের কাছে যেতে তাদের সাহস হোলো না। অহল্যা চেয়ে দেখ্‌লে যে, রাজার সুমুখে গ্রামের অনেক ভদ্রলোক ব'সে আছেন, তার পিতাও সেখানে আছেন। সে কিছুমাত্র ভয় না করে অগ্রসর হয়ে তার বাপের পাশে গিয়ে বস্‌ল।

রাজা মলহর রাও এই মেয়েটীকে নির্ভয়ে ধীরপদে আস্‌তে দেখে তার দিকে চেয়েছিলেন এবং তার লাবণ্যমাখা মুখ, অতি সহজ গতিভঙ্গী দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন, এ মেয়ে একটী রত্ন! তিনি মেয়েটীর নাম জিজ্ঞাসা করলে সে বিনীত ভাবে বলেছিল "আমার নাম অহল্যা বাঈ, আমি পূজনীয় শ্রীযুক্ত আনন্দ রাও সিন্দের কন্যা।"

মেয়েটীর কথা শুনে এবং তার মুখশ্রী দেখে রাজা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তার পর গ্রামের আর দশজনের কাছে শুন্‌লেন আনন্দ রাও তাঁরই স্বজাতি, মেয়েটীও সুলক্ষণা, গ্রামের সকলেই তাকে ভালবাসে। আনন্দ রাও দরিদ্র জন্য মেয়ের বিবাহের কিছুই করে উঠ্‌তে পারছে না। রাজা সব কথা শুন্‌লেন; কিন্তু নিজের মনোভাব প্রকাশ কর্‌লেন না। রাজধানী ইন্দোরে ফিরে গিয়ে শ্রীমতী অহল্যার সহিত তাঁহার একমাত্র পুত্র ও ইন্দোর রাজ্যের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী খাণ্ডে রাওয়ের বিবাহের প্রস্তাব প্রেরণ করলেন। দরিদ্র আনন্দ রাও হাতে স্বর্গ পেলেন, গণৎকারের ভবিষ্যৎবাণী সফল হোলো ইন্দোরের রাজলক্ষ্মী দরিদ্রের পর্ণকুটীর থেকে পরম সমাদরে, অতুল জয়োল্লাসের মধ্যে আসন গ্রহণ করলেন; শুভদিনে শুভ-বিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে গেল।

মাস কয়েক যেতে না যেতেই রাজা দেখ্‌তে পেলেন, তাঁর পুত্রবধূ অহল্যা অসামান্যা গুণবতী। কে বল্‌বে সে দরিদ্রের ঘরে জন্মেছিল? রাজ-অন্তঃপুরে এসে তার মনে কোন প্রকার গর্ব্বের উদয় হোলো না, এ সব ঐশ্বর্য্য তাকে একটুও প্রলুব্ধ করতে পারল না,—এ সব যেন তার জানা চেনা, তার ব্যবহার দেখে সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে গেল। শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা, স্বামীর পরিচর্য্যা, পুরবাসীদিগের তত্ত্বাবধান—এ সব যেন তার পূর্ব্বেই শেখা হয়েছিল। তার পর দুই দশ দিন যেতে না যেতেই অহল্যা তার শ্বশুরের দক্ষিণ হস্ত হয়ে পড়ল;—কি রাজকার্য্য, কি যুদ্ধবিগ্রহ, কি

সাংসারিক কার্য্য সমস্ত বিষয়েই অমন অতুল প্রতিভাশালী, বীরত্বে মহনীয় রাজা মলহর রাও স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, অহল্যার ন্যায় রমণী তিনি কখন দেখেন নাই। তাই

ক্যানেডিয়ান মিশন বালিকা বিদ্যালয়

তিনি সকল ব্যাপারে সকল কার্য্যে অহল্যার পরামর্শপ্রার্থী হলেন; অহল্যাও শ্বশুরের সমস্ত ভার মাথায় তুলে নিলেন।

বিধাতার বিধান কে খণ্ডন করবে? অবিমিশ্র সুখ বুঝি কাহারও হয় না। কেন হয় না, তা জানিনে। কিন্তু

হাইকোর্ট

যখন দেখি যারা জীবনে কোন গর্হিত কাজ করে নাই, ধর্ম্মাচরণ, জনসেবা, দরিদ্রের দুঃখ মোচনই যাদের জীবনের কার্য্য, অকস্মাৎ তাদের মাথায় বজ্র পড়ে, তাদের আনন্দের হাট ভেসে যায়, তাদের সুখের উৎস শুকিয়ে যায়! বিশ্ব-বিধাতার এ কি বিধান তিনিই জানেন। আমরা দেখে শুনে স্তম্ভিত হয়ে যাই, মোহবশে ব'লে বসি এ বিশ্ব-বিধানে দয়া নেই—দয়া নেই। কিন্তু তখনই কে যেন অলক্ষ্যে থেকে ব'লে বসেন, ওরে মূঢ়, ভুলিস্‌নে তিনি দয়াময়—তিনি দয়াময়!

রাণী অহল্যা বাঈয়ের ভাগ্যাকাশে ঘন-ঘটার সঞ্চার হোলো—প্রবল বেগে অকস্মাৎ অশনিপাত হয়ে তাঁর সকল সুখের আশা নির্ম্মূল হয়ে গেল;—তাঁর প্রিয়তম স্বামী জাঠ নামক এক দুর্দ্ধর্ষ জাতিকে দমন করতে গিয়ে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ

করলেন—অষ্টাদশ বৎসর মাত্র বয়সে রাজরাণী স্বামী-সুখে বঞ্চিতা হলেন—জীবনের আরম্ভ সময়েই তাঁর সুখের বাসা ভেঙ্গে গেল। সম্বল মাত্র একটী পুত্র ও একটী কন্যা—আর রইলেন পুত্রশোক-কাতর রাজা মলহর রাও।

অহল্যা তখন স্বামীর চিতারোহণের সঙ্কল্প ক'রলেন। কি সুখে আর তিনি এ সংসারে বাস ক'রবেন। তাঁহার এই সঙ্কল্পের কথা রাজা মলহর রাওয়ের কর্ণগোচর হ'বামাত্র তিনি পুত্রবধূর কাছে এলেন এবং চক্ষের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে বল্‌লেন, মা, এ তুমি কি করতে যাচ্ছ? তুমিই যে আমার একমাত্র অবলম্বন। আমি মনে করছি, আমার অহল্যা মারা গিয়েছে, তোমাতে আমার একমাত্র পুত্র খাণ্ডে রাও বেঁচে আছে। তুমিই আমার পুত্রকন্যা সব। এ বৃদ্ধকে ফেলে তুমি কোথা যাবে মা? আমার যে আর কেহ নাই। আমি অক্ষম হয়ে পড়েছি; তুমি গেলে আমি একদিনও বাঁচব না। পিতৃহত্যা কোরো না অহল্যা! রাজার এই কাতর বচন শুনে, অশ্রুসিক্ত নয়ন দেখে অহল্যা আর তাঁর সঙ্কল্প রক্ষা করতে পারলেন না; শ্বশুরের চরণ যুগল বক্ষে ধারণ করে তিনি চিতারোহণ সঙ্কল্প ত্যাগ ক'রলেন এবং সকল শোক-তাপ অন্তরের নিভৃত গুহায় স্বামীর চরণতলে সমর্পণ কোরে ইন্দোরের রাজ্যভার গ্রহণ করলেন—রাজা মলহর রাও সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করে নির্জ্জনে ইষ্টচিন্তায় নিমগ্ন হলেন। অহল্যার শাসন ক্ষমতা ও নিরপেক্ষ ব্যবহারে, দয়া দাক্ষিণ্যের পরিচয় পেয়ে প্রজাগণ তাঁহাকে দেবীরূপে পূজা করতে লাগল; অহল্যা সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করে রাজকার্য্য পরিচালন ও পুত্রকন্যাকে পালন করতে লাগ্‌লেন। কয়েক বৎসর এই ভাবে চালাবার পর রাজা মলহর রাও হোলকার পরলোকগত হলেন। যথাসময়ে পুত্র মালে রাও প্রাপ্তবয়স্ক হলে তার হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করে রাণী অহল্যা বাঈ ধর্ম্মকর্ম্মে মনোনিবেশ করলেন।

কিন্তু এতেও মহা বিঘ্ন উপস্থিত হোলো, আর সে বিঘ্ন একেবারে অভাবনীয়। অহল্যার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণা, সর্ব্বগুণ-শালিনী মায়ের গর্ভে ও খাণ্ডে রাওয়ের ন্যায় পিতার ঔরষে যে মালে রাওয়ের মত নৃশংস, অত্যাচারী, ব্যসনাসক্ত সন্তান জন্ম-গ্রহণ করতে পারে, এ কথা কেহ ভাবতেও পারে না। এ যে কেমন করে হয়, তাও কেহ নির্দ্দেশ করতে পারেন না। মালে রাও বল্‌তে গেলে শয়তানের একটা সং-স্করণ,—যেমন নিষ্ঠুর, তেমনই উচ্ছৃঙ্খল-চরিত্র, তেমনই অব্যবস্থিত-চিত্ত। তাহার জ্বালায় অহল্যা বাঈ একেবারে অস্থির হয়ে পড়লেন; নানা অত্যাচার ও অবিচারের সংবাদ তাঁকে ব্যথিত করে তুলল। এমন কি, এই নরাধম পুত্র মায়ের ধর্ম্মাচরণেও বাধা দিতে আরম্ভ করল। মাতা ধর্ম্মাচরণের জন্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করে আনেন, আর নরাধম পুত্র তাঁহাদিগকে অপমানিত ও বিড়ম্বিত করে বিদায় করেন। এই হতভাগ্য যুবকের নানা অত্যাচারের বিস্তৃত বিবরণ আর দিতে ইচ্ছা করে না; এক কথায়, এমন নরপশু রাজসংসারে কেন, গৃহস্থের গৃহেও অতি কম দেখ্‌তে পাওয়া যায়। রাণী অহল্যা বাঈ কি করবেন? পুত্রকে নানা সদুপদেশ দেন, অশ্রু বিসর্জ্জন করেন।
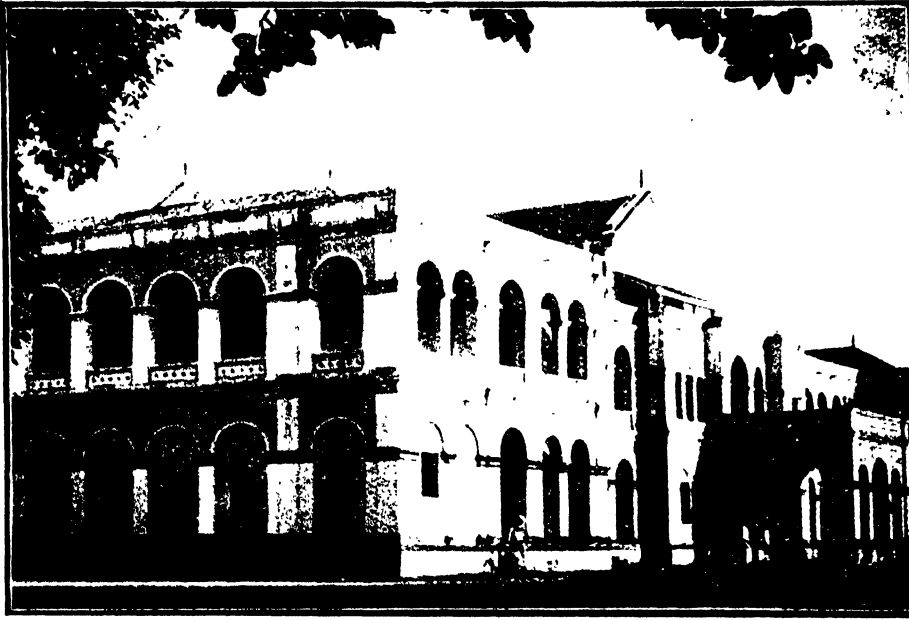
মতি ভবন

কিছুতেই কিছু হয় না—মালে রাওয়ের উচ্ছৃঙ্খলতা ক্রমেই বাড়তে লাগল।

সকলেরই একটা সীমা আছে—অত্যাচার অনাচারেরও আছে। মালে রাওয়ের অদৃষ্টে সেই সীমান্তকাল উপস্থিত হোলো। সে যে কি নিদারুণ ঘটনা, তা আর কি বলব।

একজন শিল্পী মালে রাওয়ের বিরাগভাজন হয়। সে লোকটা কোন অন্যায় কাজই করে নাই; তবুও ক্রোধান্ধ হয়ে মালে রাও তার মাথা কেটে ফেলবার আদেশ দেন। সে মরবার সময় বলে যায় "আমাকে যেমন বিনা অপরাধে বধ করলে, এর শোধ আমি নেব, আমি মরেও তোমাকে ছাড়ব না।"

সেই লোকটার মৃত্যুর পরই মালে রাওয়ের মাথা খারাপ হয়ে গেল। সে দিনরাত চীৎকার করত 'ঐ সে এলো আমাকে মারতে, রক্ষা কর, রক্ষা কর।' যখন তখনই এই বিভীষিকা তাকে উন্মাদ করে ফেলত, সে সেই শিল্পীর প্রেতাত্মা দেখে ভয়ে মৃতকল্প হোতো। পুত্রের এই কঠিন রোগের উপশমের জন্য অহল্যা নানা চিকিৎসার ত্রুটী করলেন না; তা ছাড়া শান্তি-স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি কত করলেন, প্রেতাত্মার তুষ্টি সাধনের জন্য যে যা বল্‌ল, তাই করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হোলো না; মহাপাপের মহাপ্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হোলো। দিন-রাত নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে একদিন মালে রাওয়ের পাপ জীবনের লীলাখেলা শেষ হয়ে গেল! রাণী অহল্যা বাঈকে পুনরায় রাজ্যের ভার গ্রহণ করতে হোলো। তিনি আবার পূর্ব্বের অপেক্ষাও অধিকতর যোগ্যতার সহিত শাসনকার্য্য পরিচালন করতে লাগ্‌লেন। অনেকে তাঁকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করবার পরামর্শ দিয়েছিল; কিন্তু তিনি তখন সে পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। স্ত্রীলোক হোয়ে কাহারও পরামর্শ না নিয়ে এত বড় রাজ্য শাসন করছেন, শুভানুধ্যায়ীদের অনুরোধ উপেক্ষা করে দত্তকপুত্র গ্রহণে অসম্মত হলেন, কুলোকের কি ইহা প্রাণে সয়। এ কুলোকের মধ্যে দুইজন সর্দ্দার—একজন গুপ্ত শত্রু, সে প্রধান রাজকর্ম্মচারী গঙ্গাধর যশোবন্ত; আর একজন পুনার পেশোয়া মাধব রাওয়ের পিতৃব্য রাঘোবা দাদা। এই লোকটা যেমন লোভী, তেমনই ক্রূর। এই মাধোবা দাদা গঙ্গাধর যশোবন্তের সহিত গোপনে ষড়যন্ত্র করে রাণী অহল্যা বাঈকে পত্র লিখ্‌ল যে, তার কিছু টাকার দরকার, ইন্দোর রাজকোষ থেকে তাকে টাকা দেওয়া হোক্‌। অহল্যা এই ষড়যন্ত্রের কথা পূর্ব্বেই জান্‌তে পেরেছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন ইন্দোর রাজকোষের অর্থ তাঁহার নহে, ইহা ইন্দোরের প্রজাদের গচ্ছিত ধন। তিনি এই ধন দীন দুঃখীদিগের মধ্যে বিতরণ করবার অধিকার পেয়েছেন। রাঘোবা দাদা যদি ইচ্ছা করেন, তা হলে যেদিন কাঙ্গালী বিদায় হবে, সেদিন উপস্থিত হোলে যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা পেতে পারেন।

এই কথা শুনে রাঘোবা দাদা একেবারে ক্ষেপে উঠ্‌লেন। কি, এত বড় অপমান! তখন তিনি অহল্যার দর্পচূর্ণ করবার জন্য সৈন্য সজ্জা করলেন এবং অহল্যাকে লিখে পাঠালেন যে, যুদ্ধ-ক্ষেত্রে তিনি এই অপমানের প্রতিশোধ নেবেন।

বেশ কথা! তপস্বিনী অহল্যা তখন রাজেন্দ্রাণী হলেন। চারিদিকে সংবাদ পাঠিয়ে যুদ্ধের আয়োজন করলেন; সকলকে সংবাদ দিলেন যে, এ যুদ্ধে তিনি সেনাপতির কাজ করবেন, নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবেন। তাঁর এই ঘোষণা শুনে দলে দলে লোক মহা উৎসাহে ইন্দোরের পতাকাতলে সমবেত হতে লাগল; চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠতে লাগ্‌ল "রাণী অহল্যা মাইকি জয়!"

যথা সময়ে রাজেন্দ্রাণী অহল্যা যুদ্ধ সাজে সজ্জিতা হয়ে বাণ-ভরা তূণীর ও ধনু গ্রহণ করে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হলেন। সৈন্যগণ বিপুল জয়ধ্বনি করে এই মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তির সম্মুখে আভূমি প্রণত হয়ে ইন্দোরের ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য অগ্রসর হোলো।

যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে অহল্যা রাঘোবা দাদাকে ব'লে পাঠালেন যে, সৈন্যসামন্ত পিছনে থা'কুক, তিনি সর্ব্বাগ্রে রাঘোবাদাদার সঙ্গে একাকিনী যুদ্ধ করতে চান। রাঘোবা দাদা এতটা মনে করেন নাই। তাঁর সৈন্যেরাও অহল্যার এই রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি দেখে ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। তখন যুদ্ধ আর হোলো না, রাঘোবাদাদার দল বিনাযুদ্ধেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলেন। রাণী অহল্যার জয় নিনাদে সমস্ত ইন্দোর রাজ্য পূর্ণ হয়ে গেল। তার পর আরও ছোট ছোট অনেক আপদ উপস্থিত হয়েছিল; সে সকলই সহজে মিটে গিয়েছিল।

এখন রাণী দেখ্‌লেন যে, এত বড় বিস্তীর্ণ রাজ্যের সমস্ত

কাজ তিনি একলা করে উঠতে পারছেন না, বিশেষ যুদ্ধ বিগ্রহ ত লেগেই আছে। সেই জন্য তিনি মলহর রাওয়ের আত্মীয়, পরম বিশ্বাসভাজন তুকাজী রাও হোলকারকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে তাঁর উপর যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজ্যরক্ষার ভার দিলেন এবং নিজে অন্যান্য সমস্ত কাজের ভার গ্রহণ করলেন। এতে তাঁর ধর্ম্ম-কর্ম্মের কোন ব্যাঘাত হোলো না। এই তুকাজি রাও হোলকারই অহল্যা বাঈয়ের মৃত্যুর পর ইন্দোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাঁহার বংশ এখনও ইন্দোরের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত।

এইবার রাণী অহল্যা বাঈয়ের দানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে আমার কথা শেষ করব। রাজ্যের আবশ্যক ব্যয় বাদে যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকত, সে সমস্তই তিনি ধর্ম্মকার্য্যের জন্য উৎসর্গ করতেন। জলাশয় ও পান্থশালা নির্ম্মাণ, দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা, রাজপথ নির্ম্মাণ তাঁহার নিত্যকার্য্যের মধ্যে ছিল। ইন্দোর রাজ্যে যে তিনি কত জলাশয় খনন করিয়ে দিয়েছেন, কত রাজপথ, কত পান্থশালা, কত দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়েছেন, তার সংখ্যা করা যায় না। তাঁর এ দান সুধু ইন্দোরের সীমার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না; কাশীর ও গয়ার শ্রীমন্দির দুইটী তাঁরই অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হয়েছিল। জগন্নাথ ক্ষেত্রে যাওয়ার যে রাজপথ আছে, তা অহল্যার ব্যয়েই নির্ম্মিত। কাশীর অহল্যা বাঈয়ের ঘাট ও মথুরার বিশ্রাম-ঘাটের মত সুন্দর ঘাট ভারতবর্ষে আর নাই বল্‌লেই হয়। দক্ষিণ অঞ্চলের অনেক দেবমূর্ত্তির স্নানের জন্য বহু বহু দূর থেকে প্রত্যহ গঙ্গাজল নিয়ে আসবার ব্যবস্থা তিনিই বহু অর্থব্যয়ে করেছিলেন। ভারতবর্ষের যে কোন তীর্থস্থানে তিনি গিয়েছেন, যে কোন সহরে তিনি গিয়েছেন, সেইখানেই জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে তিনি সকলের অভাব অসুবিধা দূর করবার জন্য অর্থ সাহায্য করেছেন। তিনি দেশের অশেষবিধ কল্যাণের জন্য ইন্দোরের বিপুল রাজভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

এই প্রাতঃস্মরণীয়া মহামহিমময়ী রাণী অহল্যা বাঈয়ের রাজধানীতে আমরা সাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষে গিয়েছিলাম। সেখানকার মুষ্টিমেয় প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের আদর আপ্যায়নের কথা আমি জীবনান্ত পর্য্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করব। ২৪শে ডিসেম্বর ইন্দোরে গিয়েছিলাম, তিনদিন সেখানে পরম সুখে বাস করেছিলাম, সাহিত্য চর্চ্চা, সঙ্গীতালাপ প্রভৃতিও হয়েছিল। ২৭শে ডিসেম্বর সম্মেলনের কার্য্য শেষ হ'লে রাত্রি দুইটার সময় আমরা মহাকবি কালিদাস ও রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনী দেখ্‌তে গিয়েছিলাম। পারি যদি, তা হ'লে উজ্জয়িনীর কথা পরে বল্‌বার চেষ্টা করব।

তুমি আমি এক দেহ এক প্রাণ এক মন

শ্রীহরিধন মিত্র

তুমি আমি এক দেহ এক প্রাণ এক মন
এক হ'য়ে মিশে আছি চিরকাল চিরদিন—
অসীম যুগের কাছে এ জীবন কতক্ষণ ?
আবার আমরা হব হৃদয়ে হৃদয়ে লীন।

বিধাতার গূঢ় সাধ পূরণ করিতে,
আমরা এসেছি হেথা ক্ষণকাল তরে ;
সীমা হ'তে চলিয়াছি বাসার্দ্ধের পথে
বিভিন্নতা থাকিবেনা কেন্দ্রের অন্দরে।

তোমার আমার মত প্রেমিক প্রেমিকা,
এ জগতে হেথা সেথা ছড়াইয়া আছে ;
আমাদের অংশ তারা, আমাদেরি প্রাণ,
দূরতা কমিবে সব মধ্যবিন্দু কাছে।

প্রেম যদি নাহি থাকে, নাহি থাকে প্রীতি,
প্রাণে প্রাণে নাহি থাকে ভালোবাসাবাসি,—
সৃজনের লক্ষ্য তবে ব্যর্থ হ'য়ে যায়
হয় তো "আমরা" তাই ধরণীতে আসি।

নিজেরা জ্বালায় জ্বলি, ক'রে যাই কাজ ;—
যাই পাষাণের প্রাণে ফুটাইয়া ফুল,
ধূলায় গড়িয়া যাই প্রেমের মন্দির,
মরু-বুকে দিয়ে যাই ধারা কুল কুল।

সাধারণ নরনারী আমরা ত নই—
দেবতার অংশ মোরা, দেবতারি প্রাণ ;
নরনারী আসে যাবে এই ধরণীতে
চালাইব সৃষ্টি মোরা হ'তে সেইখান।

নিখিল-প্রবাহ

চলচ্চিত্রে পৃথিবীর বিস্ময়—

বিশ্বের গ্রহ-উপগ্রহে কত বড় বড় বিস্ময়ই না লুকানো আছে! কিন্তু সাধারণে তার কতটুকু খোঁজ রাখে? যাঁ'রা গণিত-জ্যোতিষের ছাত্র বা পারদর্শী, তাঁদেরি এ' সম্বন্ধে অল্পাধিক জ্ঞান থাকা সম্ভব, আর বাকি সবাই 'অজ্ঞান তিমিরান্ধকারে।' কিন্তু গ্রহ-নক্ষত্র যে পৃথিবীর মস্ত সম্পদ; সাধারণে কি এর পরিচয় পাবে না?
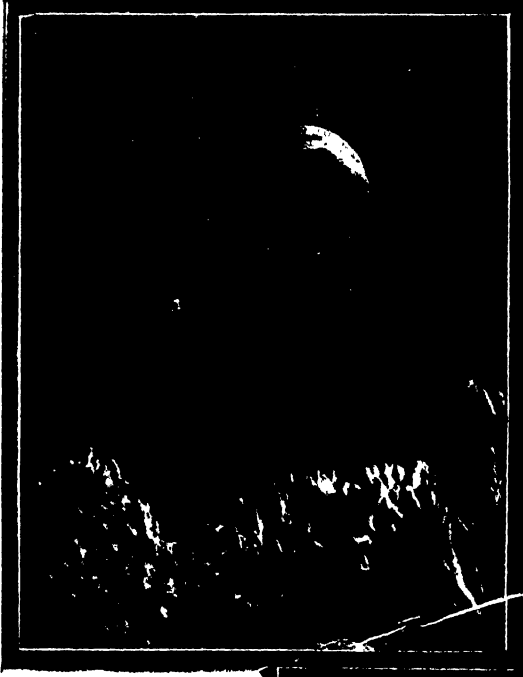
ইন্দ্র-গ্রহ হইতে পৃথিবীর দৃশ্য

বৃহস্পতি গ্রহ হইতে পৃথিবীর দৃশ্য

জার্ম্মাণী এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েচেন,—গ্রহ-উপগ্রহ এবং তাদের সঙ্গে পৃথিবীর কি সম্পর্ক একখানি চিত্র-নাট্যের মধ্যে দিয়ে জনসাধারণকে বোঝাবার চেষ্টা করে। সেই কথাই বলচি।

চিত্র নাট্যখানি সাত খণ্ডে সমাপ্ত এবং আগাগোড়াই অদ্ভুত ও অপূর্ব্ব-কল্পিত দৃশ্য-সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। এক খণ্ডে আমরা বায়ুলোকের উদ্দেশে যাত্রা করি। সেখানে অপার বিস্ময়!—দূর থেকে যে নক্ষত্রগুলিকে ক্ষুদ্র বিন্দু বলে মনে হয়, ছবির পর্দ্দায় তাদের কি বিশাল, কল্পনাতীত রূপ! শেষ খণ্ডে পৃথিবীর মৃত্যুর একটী কাল্পনিক রূপ দেওয়া হয়েচে। কখনো বা নীচে থেকে তুষার সমুদ্র ঢেউ তুলে পৃথিবীকে গ্রাস করবার চেষ্টা করচে, কখনো বা সহস্রধারায় অগ্নিবৃষ্টি হয়ে গ্রহ-চন্দ্র-তারা-ভরা এতবড় ধরিত্রীকে পুড়িয়ে দিতে চাইচে—অপরূপ দৃশ্য! আমরা এখানে পৃথিবী ও গ্রহ-নক্ষত্রের সম্বন্ধ বিষয়ক দুটি ছবির প্রতিলিপি দিলাম।

অপরাধী-নির্ণয়ের নূতনতম উপায়—

এতকাল প্রমাণ, সাক্ষ্য এবং কৌশলের সাহায্যেই অপরাধী নির্ণয় চলত। সম্প্রতি এ'সবের পরিবর্ত্তন হ'তে চলেচে। নিউ-ইয়র্ক পুলিশের এক চতুর গোয়েন্দা অপরাধী নির্ণয়ের জন্য একটি নূতন যন্ত্র প্রস্তুত করেচেন। কিন্তু এঁকে শুধু গোয়েন্দা বললে হয় ত ভুল হবে; কারণ, বিজ্ঞানেরও অনেক কিছুই এঁর জানা আছে; নইলে এমন একটা যন্ত্রের সৃষ্টি হ'ত কি না সন্দেহ! যন্ত্রটির কাজ কিন্তু শক্ত নয়।

ধরুন, তিনটি বিভিন্ন লোকের উপর আপনার সন্দেহ, অথচ, সঠিক প্রমাণের অভাবে কাউকেই জোরের সঙ্গে অভিযুক্ত করতে পারচেন না। এ'ক্ষেত্রে এই যন্ত্রটি আপনার পক্ষে

অপরাধী নির্ণয়ের নূতন উপায়

অপরিহার্য্য। কারণ, এই যন্ত্রপ্রয়োগের ফলে প্রকৃত অপরাধীর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া এত অস্বাভাবিক দ্রুত হয়ে ওঠে যে, তার অপরাধের প্রমাণ সংগ্রহ করতে আর খুব বেশী দেরি হয় না।

তালা ও সুইচ্—

নিউ-ইয়র্ক সহরের হোটেলগুলিতে ব্যবহারের জন্য নতুন রকমের তালা তৈরী হয়েচে। তালাটি দুয়োরের গায়ে বসানো

৮ তালা ও সুইচ্

থাকে। এর বিশেষত্ব এই যে চাবি ঘুরোবার সঙ্গেসঙ্গেই ঘরের ভিতরকার বৈদ্যুতিক বাতিগুলি পর্য্যন্ত এর সাহায্যে নিবানো যায়। আবার ঘরে ঢুকবার সময়, তালা খোলবার সঙ্গে সঙ্গেই ভিতরকার আলোগুলি জ্বলে উঠে। অন্ধকার ঘরের ভিতর আর সুইচ্ হাতড়ে বেড়াবার দরকার হয় না!

এট্‌নার অগ্ন্যুদ্‌গার—

পূর্ণ পাঁচ বৎসর এটনা শান্ত হয়ে ছিল। সম্প্রতি আবার তা'র অগ্নি উদ্‌গীরণে সেখানকার আকাশ ও ধরিত্রী রক্তাভ হয়ে উঠেছিল। এটনার কোনো একটা দিক বরাবর তুষারে আচ্ছন্ন ছিল, এবার সেই তুষার-আবরণ ভেদ করে আগুনের শিখা ছুটেছিল আকাশকে ধরতে। এই অগ্নি-শিখা ষাট ফিট পর্য্যন্ত উঁচু হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এবং তারি ফলে বহু বাড়ী-ঘর, ক্ষেত-খামার জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। দ্বাদশ দিন পরে এট্‌না আবার

এট্‌নার অগ্ন্যুদ্‌গার

যখন স্বাভাবিক মূর্ত্তি ধারণ করল, তখন সাত হাজার লোক গৃহহীন হয়েচে—আর দশহাজার একর ভূমি উষর মরুভূমিতে পরিণত হয়েচে। বৈজ্ঞানিক দল এর লাভা ও পাথর নিয়ে গবেষণা সুরু করেচেন, কিন্তু তাতে জগতের কোনো উপকার হ'বে কি না কে জানে!

হাত-ব্যাগের উপযোগী ছাতা—

বিলেতের মেয়েদের জন্য একপ্রকার ছাতা বেরিয়েচে। ছাতাটি বন্ধ করলে এক হাতের বেশী হ'বে না এবং সেই অবস্থায় তাকে একটি ছোট হাতব্যাগের মধ্যে পুরে রাখাও

হাত-ব্যাগের উপযোগী ছাতা

কিছুমাত্র কষ্টকর নয়। অথচ, খোলা অবস্থায় ঠিক সাধারণ ছাতার কাজ করে। হাতলের গায়ে একটি বোতাম আছে, সেইটি টিপলেই ছাতাটি বন্ধ করা যায়। ছাতাটিতে দু'রকমের আবরণ আছে। একটি সিল্কের আর একটি অন্যরকমের। বৃষ্টির সময় সিল্কের কাপড়টিকে ঢাকা দিয়ে অন্যটিকে ব্যবহার করা যায়।

আগুন নিবানোর নূতন উপায়—

বর্ত্তমান সভ্যতার দৌলতে ও-দেশের বাসগৃহগুলি এত উঁচু হয়ে উঠ্‌চে যে আগুণ নিবানোর জন্যে সেখানে নূতন উপায় উদ্ভাবন করতে হয়েচে। বর্ত্তমানে 'ফায়ার ব্রিগেডের' যে ব্যবস্থা আছে তাতে একটি চল্লিশতলা বাড়ীর উপরতলায় আগুণ লাগলে 'দড়ি-কলসি' নিয়ে সেখানে পৌঁছতে যথেষ্ট দেরী হ'বার সম্ভাবনা। কাজেই আমেরিকানরা ঠিক করেচে, অতঃপর, উড়ো জাহাজের দ্বারা ফায়ারব্রিগেডের কাজ হ'বে। প্রত্যেক বাড়ীর সঙ্গেই উড়ো ফায়ারব্রিগেড আপিসের টেলিফোনের সংযোগ থাকবে। খবর পেলেই তারা
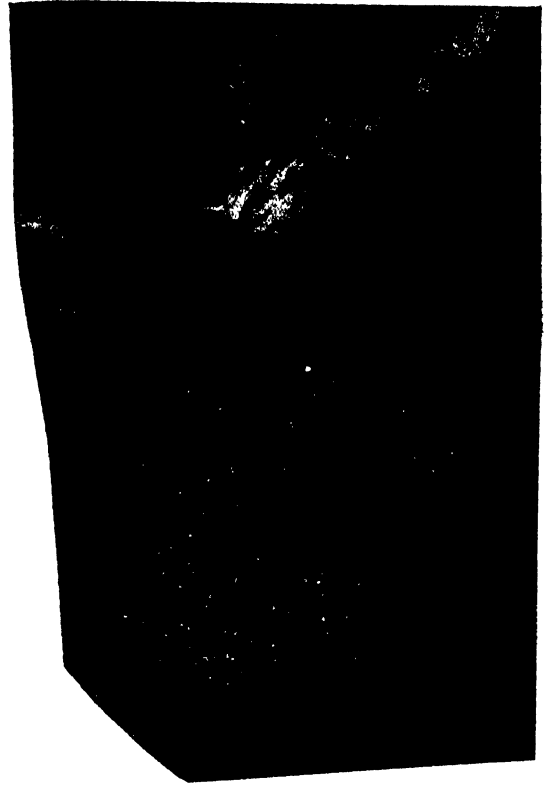
আগুন নিবানোর নূতন উপায়

ঘটনাস্থলে ছুটবে। এই উড়ো জাহাজগুলির অবশ্য জলবহন করবার ক্ষমতা থাকতে পারে না, কিন্তু আগুন নিবানোর উপযোগী বৈজ্ঞানিক মালপত্র এতে করে অনায়াসে অল্পকালের মধ্যে উপরে গিয়ে পৌঁছবে। এই মালমশলা, বোমার মত জিনিষের মধ্যে বন্ধ থাকবে এবং আগুনের উপর পড়লেই তা' তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাপিত হ'বে।

অগ্নি-ত্রাণকারীদের কাজ—

আগুনের হাত থেকে বিপন্নদের রক্ষা করবার সময় অগ্নিত্রাণকারীদের (Firemen) সময় সময় অনেক অসমসাহসিকতার পরিচয় দিতে হয়। এখানে যে দুটি ছবি দেওয়া হ'লো সে দুটিই তার পরিচয়। এর একটিতে একজন অগ্নিত্রাণকারী এককালে যথাক্রমে হাতে ও কাঁধে দুটি লোক নিয়ে একটি সরু কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠচে। কাঁধের লোকটির হাত দুখানি তা'র গলার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েচে যাতে সে পড়ে না যায়। দ্বিতীয় ছবিতে অগ্নিত্রাণকারী লোকটির এক হাতে একটি লণ্ঠন, অন্য হাতে একটি কুড়ুল; অথচ একটি লোককে তার বহন করতেই হ'বে। সেই জন্যে বিপন্ন লোকটির হাত ও হাঁটু এক করে বেঁধে, সেই জায়গাটিকে গলার মধ্যে নিয়ে কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'বার উপক্রম করচে।

অগ্নিত্রাণকারীদের কাজ

গরুড়ের বংশধর—

এই অতিকায় পাখীর মত ভয়ানক পাখী আর নেই বললেও চলে। বিষধর সাপগুলো পর্য্যন্ত এদের ভয়ে দিবারাত্রি অস্থির হয়ে থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার গভীর অরণ্যের মধ্যে এদের বাস। সাপই হ'ল এদের খাদ্য। ক্ষুধার উদ্রেক হ'লে তখন এরা ছোটবড়'র বিচার করে না, মুখে পুরে দেয়। সাপের মুখের বিষে এদের কিছুমাত্র ক্ষতি বা ভয় নেই। এরা বোধ হয় আমাদের পৌরাণিক গরুড়ের বংশধর।

অগ্নিত্রাণকারীদের কাজ

সর্প-ভুক পাখী

পথের আলো—

গাড়ি চালিয়ে চলেচেন, হঠাৎ সামনের আর একখানি গাড়ী থেকে একরাশ আলো এসে পড়ল আপনার গাড়ী ও চোখ-মুখের উপর। এ অবস্থায় ধাঁধাঁ লাগা এবং বিব্রত বোধ
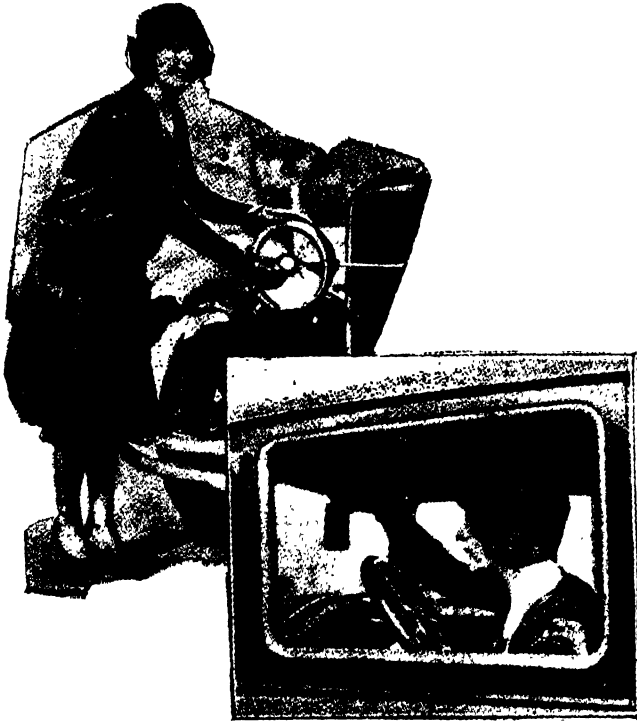
পথের আলো

করা কিছুমাত্র অসঙ্গত নয়। মোটর-চালকদের এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে ও দেশের গাড়ীগুলোতে এমনভাবে রঙীন কাচের বন্দোবস্ত করা হয়েচে, যাতে আলো শুধু প্রয়োজনমত পথেরই ওপর পড়ে,—অপর মোটরের চালকের গায়ে পড়ে তাকে বিব্রত না করে। তা ছাড়া গাড়ীর সামনেকার কাচে নূতন রকমের এক পর্দ্দার ব্যবস্থা করা হয়েচে, যার দ্বারা অপর মোটরের 'হেড-লাইটে'র আলো এসে আপনার চোখে পড়বে না, অথচ পথ দেখবার বাধাও কিছুমাত্র হ'বে না।

অতিকায় শূকর—

আফ্রিকায় এদের বাসভূমি। ছবি দেখলে এদের গণ্ডার বা অন্য কিছু বলে ভুল হ'তে পারে। আসলে কিন্তু শূকর। সামনের দাঁতগুলি এত দীর্ঘ যে দেখলে ভয় হয়। গায়ে ছাপকাটা দাগ আছে। শোনা যায়, এরাই না কি পৃথিবীর সবচেয়ে কদর্য্য জানোয়ার।

অতিকায় শূকর

নূতন হস্তচ্ছদ—

বৃষ্টির সময় হাত বার ক'রে পথিকদের ইঙ্গিত জানাতে হ'লে জলে মূল্যবান পোষাকের কিয়দংশ ভিজে

নূতন হস্তচ্ছদ

যাবার সম্ভাবনা। অথচ, মোটর চালাতে হ'লে পথে হাত না বার করেও উপায় নেই। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে ও-দেশের মেয়েরা হাতে একরকম আচ্ছাদন ব্যবহার করচেন। এতে হাত ভিজবার সম্ভাবনা ত' নেই-ই, বরং বৃষ্টি ধরে গেলে অতি সহজে গুটিয়ে ফেলবার উপায় পর্য্যন্ত আছে।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

বঙ্গ-সাহিত্যে যুগ-প্রবর্ত্তক বঙ্কিমচন্দ্র—"বন্দে মাতরম্" মন্ত্রদ্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র যেরূপ বিশ্ব-যোড়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র তাদৃশ প্রসিদ্ধি লাভ না করিলেও, সাহিত্যিক প্রতিভা যে তাঁহারও বড় অল্প ছিল না, তাহা তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়।

"বঙ্গদর্শনে"র কল্যাণে কাঁঠালপাড়া গ্রামটী বঙ্গবিশ্রুত, শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই পরিচিত। কাঁঠালপাড়ার চট্টোপাধ্যায় বংশ ঐ স্থানের আদিম অধিবাসী নহেন—তাঁহাদের পূর্ব্বনিবাস ছিল হুগলী জেলার দেশমুখো গ্রামে। এই বংশের রামহরি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মাতামহ রঘুদেব ঘোষালের সম্পত্তি উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করিয়া এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। ১৭৫৬ শকাব্দের বৈশাখ মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সঞ্জীবচন্দ্রের প্রকৃত নাম—সঞ্জীবনচন্দ্র। কিন্তু সংক্ষেপার্থ সঞ্জীবচন্দ্র নামে তিনি অভিহিত হইতেন। ক্রমে সেই নামই প্রচলিত হইয়া পড়ে।

শৈশবে কাঁঠালপাড়ায় একজন গুরু মহাশয়ের কাছে যথারীতি সঞ্জীবচন্দ্রের বিদ্যারম্ভ হয়। কিন্তু সে বেশী দিনের জন্য নহে। যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মেদিনীপুরের ডেপুটী কলেক্টার ছিলেন। সামান্য কিছুদিন গুরু মহাশয়ের কাছে বিদ্যাভ্যাসের পর সঞ্জীবচন্দ্র মেদিনীপুরে পিতার নিকট গমন করিয়া সেখানকার স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাকে কাঁঠালপাড়ায় ফিরিয়া আসিতে হইল। এবার তিনি হুগলী কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। কয়েক মাস পরেই কিন্তু আবার তাঁহাকে মেদিনীপুরে যাইতে হইল। এবারও তিনি মেদিনীপুর স্কুলে প্রবিষ্ট হইয়া তিন চারি বৎসর অধ্যয়ন করেন। তিনি জুনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন এমন সময়ে তাঁহাকে মেদিনীপুর ত্যাগ করিয়া জন্মভূমিতে প্রত্যাগমন করিতে হইল। এখানে আসিয়া আবার তিনি হুগলী কলেজে ভর্ত্তি হইলেন, এবং জুনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিন্তু পরীক্ষা দেওয়া ঘটিয়া উঠিল না। তাঁহার পিতা ইতোমধ্যে বর্দ্ধমানে বদলী হইয়াছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র পিতার নিকটে গমন করিলেন। কিছুদিন পরে বারাক-পুরে জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট গমন করিয়া সেখানকার জেলা স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু পরীক্ষার পূর্ব্বে পীড়িত হইয়া পড়ায় পরীক্ষা দেওয়া হইল না। ইহার পর সঞ্জীবচন্দ্র কোন স্কুলে পড়েন নাই, স্কুলের পরীক্ষাও দেন নাই; কিন্তু গৃহে রীতিমত বিদ্যা-চর্চ্চা করিতেন। এইরূপে ইংরেজী সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ইতিহাসে তাঁহার অসাধারণ অধিকার জন্মিল। অনন্তর পিতার অনুরোধে সঞ্জীবচন্দ্র কিছু দিন বর্দ্ধমানের কমিশনারের আপিসে সামান্য একটি কেরাণীগিরি করিয়াছিলেন। অবশেষে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরোধে কেরাণীগিরি ত্যাগ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন ক্লাসে ভর্ত্তি হইলেন। শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া তিনি আইন পরীক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অতঃপর পিতার চেষ্টায় ইনকমট্যাক্স আপিসে মাসিক আড়াই শত টাকা বেতনে এসেসরের পদে নিযুক্ত হন। কয়েক বৎসর এই চাকুরী করিবার পর তিনি চাকুরী ত্যাগ করিয়া গৃহে আসিয়া বসেন। কিন্তু প্রতিভাবান ব্যক্তি নিশ্চেষ্ট নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র নহেন। সঞ্জীবচন্দ্র প্রত্যহ কাঁঠালপাড়া হইতে কলিকাতায় আসিয়া প্রাচীন গ্রন্থাদি অনুসন্ধান পূর্ব্বক উপকরণ সংগ্রহ করিয়া Bengal Ryot নামক বিখ্যাত গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন। পুস্তকখানিতে চারিটি বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছিল—(১) বাঙ্গালায় প্রজাগণের পূর্ব্বাবস্থা; (২) ইংরেজের আমলে প্রজা বিষয়ক আইনের বিচার; (৩) ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে

দশ আইন ও (৪) প্রজা সম্বন্ধে কর্ত্তব্য। বইখানি প্রচারিত হইবামাত্র দেশময় সাড়া পড়িয়া গেল। রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী চাপম্যান সাহেব স্বয়ং কলিকাতা রিভিউতে ইহার সমালোচনা করিলেন এবং ইহারই পরোক্ষ ফলস্বরূপ ১৮৫৯ সালের দশ আইন রহিত হইয়াছিল বলিতে হইবে। আর দুইটি বড় বড় মোকদ্দমার নিষ্পত্তি এই পুস্তকের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল।

"বেঙ্গল রায়ট" গ্রন্থ পাঠ করিয়া তদানীন্তন ছোটলাট সাহেব সঞ্জীবচন্দ্রকে একটি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটগিরি চাকুরী দিলেন, সঞ্জীবচন্দ্র কৃষ্ণনগরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইলেন। দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় তখন রাজকার্য্য উপলক্ষে কৃষ্ণনগরে থাকিতেন। উভয়ের মধ্যে অচিরে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। তাঁহাদের সরস আলাপে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণনগরের শিক্ষিত সমাজ তাঁহাদের বাসায় গমন করিতেন, প্রত্যহ মজলিস বসিত। দুই বৎসর এইখানে পরম সুখে বাস করিবার পর বিশেষ একটা সরকারী কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়া সঞ্জীবচন্দ্রকে পালামৌ গমন করিতে হয়। কিন্তু সেখানে তিনি বেশী দিন থাকিতে পারেন নাই। সঞ্জীবচন্দ্র অতি সামাজিক লোক ছিলেন ; সেই নির্জ্জন জঙ্গলী দেশে, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, কোল, ভীল, সাঁওতালের সহবাসে তাঁহার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিল, তিনি পলাইয়া আসিলেন। কিন্তু যে অল্পকাল তথায় ছিলেন, তাহারা ফলে তিনি ছদ্ম নামে বঙ্গদর্শনে "পালামৌ" শীর্ষক কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধগুলি অতি সুন্দর এবং প্রচুর ভাবুকতা ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচায়ক।

ডেপুটিগিরি কর্ম্ম ব্যপদেশে তাঁহাকে যশোহর, আলিপুর, পাবনা প্রভৃতি স্থানে গমন করিতে হয়। ডেপুটিগিরিতে দুইটি পরীক্ষা দিতে হয়। প্রথম পরীক্ষায় তিনি কায়ক্লেশে উত্তীর্ণ হন ; কিন্তু দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। তাঁহার জীবনী-লেখক বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার মত নম্বর তিনি পাইয়াছিলেন, কিন্তু বেঙ্গল আপিসের কোন কেরাণী ইচ্ছাপূর্ব্বক ষড়যন্ত্র করিয়া ঠিকে ভুল করিয়া তাঁহাকে ফেল করিয়াছিলেন। ইহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিবার কোন উপায় নাই।

সঞ্জীবচন্দ্রের ডেপুটিগিরি চাকুরী গেল বটে, কিন্তু সরকার তাঁহাকে ডেপুটির বেতনে স্পেশিয়াল সবরেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত করিয়া বারাসতে পাঠাইলেন। এই সময়ে বাঙ্গলার প্রথম আদম-সুমারি হয়। সঞ্জীবচন্দ্র সেন্‌সাস কর্ম্মচারীদের তত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। ইহার পর সঞ্জীবচন্দ্র কিছুদিন হুগলীতে, এবং কিছুদিন বর্দ্ধমানে সবরেজেষ্ট্রারী করিয়াছিলেন।

বর্দ্ধমানে অবস্থিতিকালে সঞ্জীবচন্দ্র কাঁঠালপাড়ায় "বঙ্গদর্শন প্রেস" নামক ছাপাখানা স্থাপন করেন। তাঁহার অনুরোধে বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা হইতে বঙ্গদর্শন কাঁঠালপাড়ায় উঠাইয়া লইয়া গেলেন, সঞ্জীবচন্দ্রের প্রেসে উহা ছাপা হইতে লাগিল। ১২৭৯ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ হইতে ১২৮২ সাল পর্য্যন্ত বাহির হইয়া বঙ্গদর্শন বন্ধ হইয়া গেল। এক বৎসর পরে সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট হইতে বঙ্গদর্শনের স্বত্বাধিকার চাহিয়া লইয়া ১২৮৪ হইতে ১২৮৯ সাল পর্য্যন্ত নিজে সম্পাদক হইয়া পরিচালন করিয়াছিলেন। তাহার পর উহা চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া যায়। সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদকতাকালে বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণকান্তের উইল," "রাজসিংহ," "আনন্দমঠ," "দেবী চৌধুরাণী" প্রকাশিত হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত সঞ্জীবচন্দ্র স্বয়ং "জাল প্রতাপচাঁদ" "পালামৌ" "বৈদিকতত্ব" প্রভৃতি এই সময়ে বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করেন।

বর্দ্ধমান হইতে সঞ্জীবচন্দ্র যশোহরে বদলী হন। সেখানে কালেক্টর বার্টন সাহেবের সঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্রের অবনিবনাও হইতে থাকে। সঞ্জীবচন্দ্র বিরক্ত হইয়া বিদায় লইয়া বাড়ী চলিয়া আসেন। ইহার অল্প কাল পরে যাদবচন্দ্র স্বর্গারোহণ করেন। সঞ্জীবচন্দ্রও চাকুরী ত্যাগ করিয়া ছাপাখানা ও বঙ্গদর্শন কলিকাতায় উঠাইয়া আনিলেন। কিন্তু কর্ম্মশৃঙ্খলার অভাবে না ছাপাখানা, না বঙ্গদর্শন কিছুই চলিল না, এবং প্রথমে ছাপাখানা ও পরে বঙ্গদর্শন বন্ধ হইয়া গেল।

১৮১১ শকে বৈশাখ মাসে কলিকাতাতেই তাঁহার দেহান্ত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদকতা কালে কাঁঠালপাড়া হইতে সঞ্জীবচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন প্রেসে" মুদ্রিত হইয়া যখন বঙ্গদর্শন বাহির হইত, তখন সঞ্জীবচন্দ্রের নিজের সম্পাদকতায় "ভ্রমর" নামে একখানি ক্ষুদ্রকায় মাসিক পত্রও বাহির হইয়াছিল। কাগজখানি বেশী দিন চলে নাই। তবে যত দিন চলিয়াছিল, সুন্দর ভাবেই চলিয়াছিল। ইহার অধিকাংশ প্রবন্ধ

সঞ্জীবচন্দ্রের নিজের রচনা। আমরা বাল্যকালে পিতৃদেবের গ্রন্থশালা হইতে গোপনে বাহির করিয়া লইয়া অতি আগ্রহ সহকারে "ভ্রমর" পড়িতাম—এখনও মনে পড়ে। "কণ্ঠ-মালা" ভ্রমরেই পড়িয়াছিলাম। পরে মাধবীলতা, ও কণ্ঠমালা দ্বিতীয়বার পুস্তকাকারে পাঠ করিয়াছিলাম। পাঠক-পাঠিকা, কোন দরিদ্র গৃহস্থ ঘরের "পুঁটু"কে রাজপুত্রবধূ হইয়া সোণার থালিতে থৈ খাইতে দেখিয়াছেন কি? না দেখিয়া থাকেন ত "মাধবীলতা" পাঠ করুন! সুরসিক পাঠক, আপনার নবীনা সুন্দরী পত্নীর সদ্য-অলক্তক-রাগ-রঞ্জিত চরণ-যুগল দর্শন করিয়া আপনার কখনও মনে হইয়াছে কি—তিনি রক্ত মাড়াইয়া আসিলেন? শিশুকণ্ঠে কখনও "দেও না দেও না আগ কলে দেও না"—আধ আধ ভাষে মধুর সঙ্গীত কখনও শুনিয়াছেন কি? শুব্ধ নিশীথে দূরাগত সঙ্গীত শুনিয়া কখনও কাঁদিয়াছেন কি? অমাবস্যার রাত্রে থম্‌থমে অন্ধকারের সৌন্দর্য্য দেখিয়া কখনও মুগ্ধ হইয়াছেন কি? কণ্ঠমালায় এইরূপ বিচিত্র সৃষ্টির ছড়াছড়ি। মেঘ-দূতের কল্যাণে "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে"র সহিত বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেই পরিচিত। সঞ্জীবচন্দ্রের কল্পনাকুশল চিত্ত প্রথম আষাঢ়ের বারি-বিন্দুতে পরিণত হইয়া পরস্পরকে অনুরোধ করিত,—চল নামি, নিদাঘতপ্ত ধরিত্রীর বক্ষ শীতল করিতে চল নামি। বাঙ্গালীর বাহুতে এককালে বলের অভাব ছিল না,—কিন্তু এখন আর নাই। বাঙ্গালীর বাহুবল কিসে কমিল, কেন কমিল,—সঞ্জীবচন্দ্র সে অভাব তীব্র ভাবে অনুভব করিয়া তাঁহার "বাঙ্গালীর বাহুবল" প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিয়াছেন। সেই সঙ্গে আমিষ ও নিরামিষ আহারের তুলনায় সমালোচনা করিয়া অপর একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন।

১৯০৫-৬ খৃষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনের সময় যখন বাঙ্গালার নানা স্থানে বহু সংখ্যক অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হইতে লাগিল, তখন পুলিশের কৃপাদৃষ্টি উহাদের উপর পতিত হইল, এবং উহারা বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়া জল-বুদ্বুদের ন্যায় বিলীন হইয়া গেল। তখন আমরা মনে করিয়াছিলাম, উহা স্বদেশী আন্দোলনের পাল্টা জবাব—আন্দোলন দমনের প্রচেষ্টা। কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের জাল প্রতাপ-চাঁদ পড়িয়া জানিতে পারি, আমাদের ব্যায়াম-চর্চ্চার উপর পুলিশের স্নেহদৃষ্টি বরাবরই ছিল। সঞ্জীবচন্দ্র লিখিয়াছেন—"যাঁহাদের বিশ্বাস যে, ইংরেজ-প্রসাদাৎ ইদানীং বাঙ্গালায় কুস্তি (gymnastic) আরম্ভ হইয়াছে, তাঁহাদের ভুল। ইংরেজি শিক্ষায় ও শাসনে বরং আমাদের কুস্তি উঠিয়া গিয়াছে। প্রাতে বালকেরা স্কুলের পাঠাভ্যাস করে, কুস্তির অবকাশ থাকে না; ইতর লোকেরা কুস্তি করিলে তাহাদের প্রতি পুলিশের দৃষ্টি পড়ে, সুতরাং কুস্তি করা রহিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে দেখিয়াছি, ইতর লোকদিগকে কোন কার্য্যের ভার দিলে, তাহারা তাল ঠুকিয়া সম্মতি জানাইত। এখন আর সে তাল ঠোকা নাই, কারণ, সাধারণ লোকের মধ্যে আর সে কুস্তি নাই, সে বল নাই। অনেকের বিশ্বাস, আমরা চিরকালই এইরূপ দুর্ব্বল।" কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্র দেখাইয়াছেন, মোগলের আমলে বাঙ্গালীরা মোগলের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিত, পলাশীর যুদ্ধ বাঙ্গালীরাই করিয়াছিল। সঞ্জীবচন্দ্রের সময়েই যখন বাঙ্গালী দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তখন এখন যে আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে তাহা বিচিত্র নহে। অথচ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসবে বাঙ্গলার লাট সাহেবকে বাঙ্গালী ছাত্রের দৌর্ব্বল্য ও রোগজীর্ণ অবস্থার উল্লেখ করিয়া দুঃখ করিতেও দেখিতে পাই। ইহা হইতে আমরা কি সিদ্ধান্ত করিব, কোন্ পথে চলিব, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

জীবনের এক পাতা

শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। হিজলা পাহাড়ের ওপারে দিনান্তের ক্লান্ত রবি বিশ্রাম নিতে ডুব দিয়েছেন। তাঁর শেষ রশ্মিটুকু এখনও পাহাড়ের মাথা থেকে লুপ্ত হ'য়ে যায়নি। প্রখর রবির স্থান নিতে এসেছেন স্নিগ্ধ চন্দ্রমা। কাজলা পাহাড়ের পিছন থেকে সূর্য্য-ভীত চন্দ্রদেব একটুখানি মুখ তুলে উঁকি মেরে দেখছেন।

সাঁওতালপরগণার ছোট্ট সহর। আমি গিয়েছিলাম সেখানে বেড়াতে। বাড়ীতে আমার স্ত্রী আর একমাত্র ছোট মেয়ে চিত্রা। একটা ছোট বাড়ী ভাড়া নিয়েছিলাম পাহাড়ের ধারে সহরের প্রান্তে। বাড়ীটা যেন মড়ুঞ্চে পোয়াতীর একমাত্র ছেলে। সহরের গোলমাল এড়িয়ে নিজের নিঃসঙ্গ জীবনটা নির্জনতার মধ্যে কাটিয়ে দিচ্ছে শুধু প্রকৃতি মায়ের স্নেহের ভিতর দিয়ে। প্রকৃতি তার গলায়, হাতে, মাথায়, চুলে নানা মাদুলি, জড়িবুটি, তাগাতাবিজ, বেঁধে দিয়েছেন,—পাহাড়, বন, খাত প্রভৃতি বাড়ীর অঙ্গ-শোভা বাড়িয়েছে। সেইটুকুই তার শোভা। বাড়ীর সামনের লাল রাস্তাটা গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরের কোলে হারিয়ে গেছে।

বেড়িয়ে বাড়ী ফের্‌বার পথে হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়ালাম দূরাগত সঙ্গীতের সুরমোহে। সুরের অনুসরণ ক'রে একটা বাড়ীর সাম্‌নে এসে দাঁড়ালাম। বাইরে থেকে ঘরের ভিতর আলোয় দেখ্‌তে পেলাম—এক বৃদ্ধ এস্‌রাজ বাজাচ্ছেন, আর এক বালিকা গান করছে—"যমুনা পার গৈঁইয়া কানাইয়া"। রাধিকার বিরহ যেন বালিকার মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। গানের সুর গুম্‌রে গুম্‌রে কেঁদে উঠ্‌ছে, কখন আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌ছে। সঙ্গে সঙ্গে এস্‌রাজও গমকে মূর্চ্ছনায় কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে। আমি তন্ময় হ'য়ে বাইরে দাঁড়িয়ে শুন্‌ছি, এমন সময় একটা পুরুষ-কণ্ঠের স্বর আমার চমক ভাঙিয়ে দিলে। মন বিরক্ত হয়ে গেল। ফিরে দেখি একটা লোক বল্‌ছে—আমায় কিছু খেতে দেবে?

গানের স্বপ্নভঙ্গের বিরক্তি তখনও মন থেকে যদিও যায়নি, তবুও এই লোকটার চেহারা কেমন মনের মধ্যে একটু করুণার রেখা ফুটিয়ে তুল্‌লে। এ যেন সাধারণ ভিখিরীর মত নয়। কিন্তু কোথায় যে তার বিশেষত্ব তাও খুঁজে পেলাম না। মনটা একটু নরম হ'য়ে গেল। লোকটার বয়স অনুমান করা যায় না। দুঃখ-দারিদ্র্য ও সাংসারিক নির্য্যাতনে বয়সের যেন খেই হারিয়ে গেছে। দেখে ঠিক ছোটলোক ভিখিরী ব'লে মনে হয় না। চুলগুলো রুক্ষ, ময়লা আর লম্বা লম্বা। বহুদিনের অযত্নে শরীরের রং বদ্‌লে গেছে। চোখগুলো ভিতরে ঢুকে গেছে। কিন্তু তা হলেও বেশ ভাস্বর।

মনে দয়া হ'লো, তাকে বল্‌লাম আমার সঙ্গে এসো। সে সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ল। বাইরের ঘরে তাকে বসিয়ে ভিতরে খাবার আন্‌তে গেলাম। ফিরে এসে দেখি, সে দু'হাতে মুখ ঢেকে হেঁট হ'য়ে ব'সে আছে। লম্বা চুলগুলো মুখটাকে আরো নিবিড় ক'রে ঢেকে ফেলেছে। আমার পায়ের শব্দে মুখ তুলে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিজের মনে ব'লে উঠ্‌ল,—আর যে এমন করে দুর্ব্বহ জীবন বইতে পারি না ভগবান।

তার পর আকুল আগ্রহে খাবারগুলো খেয়ে ফেল্‌লে এবং আকণ্ঠ জল পান ক'রে স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌লে এবং দেয়ালে ঠেসান দিয়ে পরম তৃপ্তিতে বস্‌ল। ঠিক এমনি সময় চিত্রা ঘরে ঢুক্‌ল। সে চিত্রাকে দেখে আগ্রহে হাত বাড়ালে। চিত্রা ক্ষণিক থম্‌কে দাঁড়াল। তার পর ধীরে ধীরে তার প্রসারিত বাহুর মধ্যে ধরা দিলে। সে আকুল আগ্রহে চিত্রাকে বুকে চেপে ধর্‌লে। আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম। যে চিত্রা তার বাপ-মায়ের কোল ছাড়া আর কারো কোলে যায় না, তার এ কি পরিবর্ত্তন। এই পাগলাটার কাছে অবলীলাক্রমে নির্ভয়ে গেল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে আলাপ জমিয়ে তুললে। লোকটার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়্‌লো। সেও হাসি কান্নার মধ্যে দিয়ে চিত্রার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলে—দুজনে যেন কতদিনের পরিচিত।

আমার স্ত্রী বল্‌লে—দেখ, লোকটা আজ রাত্রে এই-খানেই থাক এবং থাক্‌। আহা বেচারী!

মেয়েরা যদিও সহজেই মুগ্ধ হয় ও গলে যায়, এবং এইটাই তাদের স্বভাবসিদ্ধ, তাহলেও আমি একটু আপত্তি তুললাম,—সে যে অপরিচিত। কিন্তু আমার আপত্তি তাঁর কাছে খাট্‌ল না—কোন্ পুরুষেরই বা খাটে। স্ত্রী স্মিতমুখে আহারের আয়োজনে চ'লে গেলেন। আমি এসে লোকটার কাছে বস্‌লাম। সে মুখ তুলে বল্‌লে একটা গল্প শুন্‌বেন, একেবারে সত্যি—নিজের জীবনকে সেই সত্যিকারের গল্পের মধ্যে একেবারে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে ফেলেছি—শুন্‌বেন?

আমি কৌতূহলী হ'য়ে সম্মতি জ্ঞাপন কর্‌লাম; সে বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে—

অলক্ষ্মী আর দুর্ভাগ্যদেবীর বরপুত্র হ'য়ে যখন জন্ম নিলাম, তখন অলক্ষ্যে বিধাতা-পুরুষ নিশ্চয় মনে মনে হাস্‌লেন; আর কপালে লিখ্‌লেন তো কিছুই না,—খালি কলমের উল্টো পিট দিয়ে খানিকটা কালি ধেবড়ে দিলেন বোধ হয়,—কারণ, একটা কিছু তো কর্‌তে হবেই তাঁকে। বাবাও সেই মোহে পড়ে নাম রাখ্‌লেন ভাগ্যধর। মা নাম রাখ্‌লেন ভাগ্যমন্ত। কিন্তু তাঁরা ঘুণাক্ষরেও তখন জান্‌তে পার্‌লেন না যে, তাঁরা দুজনেই পরে নিজেরাই নিজেকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন কর্‌লেন। তার পর দুটো বছর মায়ের কোলেই অজ্ঞান অবস্থাতেই, নিশ্চিন্ত সুখ ও শান্তির মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। দু'বছরের পর হতেই বিধাতার কালি ধেব্‌ড়ানোর ফল ফল্‌তে লাগ্‌লো। কারণ তিনি নিজেই তো জানেন না যে, কপালে আমার কী লিখেছেন। কাজেই জীবনটা গোড়া থেকেই খেই-হারানো সুতোর গুলির মত জট পাকিয়ে উঠ্‌লো।

দু'বছর বয়স হ'তে না হ'তেই মা সরে পড়্‌লেন,—বোধ হয় আমার দুঃখ পীড়নের আভাস পেয়েই। সেই হোল জীবনের যুদ্ধই বলুন আর যাই বলুন, তার আরম্ভ।

বছর ঘুর্‌তে না ঘুর্‌তেই নোতুন মা ঘরে এলেন। শুনেছি বাবা আপত্তি করেছিলেন। কারণ আমি না কি বংশের দুলাল বেঁচে। আমা হতেই তো বংশ রক্ষে হবে। কিন্তু তাঁর আপত্তি খাট্‌লো না। কারই বা খাটে, যেখানে মেয়ের বিয়ের দায় আর ছেলের বিয়ের আদায়। কাজেই সব আপত্তি ওজর বিফল হ'লো।

আমি না কি গোড়া থেকেই নোতুন মাকে ঠিক মা বোলেই নিয়েছিলাম—তখন তো আমি খুব ছোটই কি না, বোঝবার ক্ষমতা খুব কমই ছিল। শুধু না কি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, মা কেন ছোট হয়ে এল। উত্তর পেলাম বাপের বাড়ী গিয়ে ছোট হয়ে এসেছেন। তাতেই না কি আমার শিশু-মন সন্তুষ্ট হ'তে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করেনি। সেই হ'তে সব আব্‌দার তাঁর ওপর চল্‌তে লাগ্‌ল।

কিন্তু নোতুন মা ঠিক সেভাবে আমায় নিলেন না। কেন, তা তিনিই জানেন। এর একমাত্র কারণ বোধ হয়, আমাদের মেয়েদের ছেলেবেলা থেকেই চিরস্থায়ী ভাবে কানে ঢোকে যে, সতীনের চেয়ে সতীনকাঁটার খোঁচা বেশী। এই কাঁটার খোঁচা সত্যি তীক্ষ্ণ হোক আর নাই হোক, তা না বুঝেই কাঁটাকে নষ্ট কর্‌বার প্রচণ্ড চেষ্টা চল্‌তে থাকে। এই অবস্থাই বোধ হয় নোতুন মার আমায় ভাল না লাগার কারণ।

ছেলেবেলার দেওয়া নামটা যে মানুষের চরিত্রের উপর অনেক সময় খুব বেশী রকম প্রভাব বিস্তার ক'রে, তা আমি বড় হ'য়ে বুঝেছিলাম আমার নোতুন মাকে দিয়ে। তাঁর নাম ছিল তীক্ষ্ণা। তাঁর অন্তরের তীক্ষ্ণতার ক্ষুরধার আমি অন্তরে অন্তরে জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করেছিলাম।

ছোটবেলায় বাবার আদর যত্ন খুবই পেয়েছিলাম। তিনি না কি বুক থেকে আমায় নামাতেন না,—আমি যে সবে ধন নীলমণি। তাঁর স্নেহ যত্নে বড় হ'য়ে উঠ্‌লাম একটু। বাবা তখন দেশেই স্কুলে মাষ্টারী কর্‌তেন। কল্‌কাতায় একটা চাকরী পেয়ে প্রথমে তিনি একলাই গেলেন। পরে কিছুদিন বাদে সেখানে বাসা ক'রে আমাদের নিয়ে গেলেন—আমাকে, নোতুন মাকে ও আমার এক পিসিমাকে।

কল্‌কাতায় এসে বাড়ীতে হ'লো নোতুন মারই রাজত্ব। বাবা সমস্ত দিন আপিসের কাজে বাইরে থাকৃতেন, কাজেই নোতুন মার প্রতিপত্তিটা পুরোদমেই চল্‌তো আমাদের ওপর—আমার ও পিসীমার। পিসিমা ছিলেন ভালমানুষ—তিনি মুখ বুজে সব সহ্য কর্‌তেন। প্রথম প্রথম নোতুন মা একটু ভয়ে ভয়ে পিসীমার সঙ্গে ঝগড়া বা নিজের প্রতিপত্তি দেখা-

তেন। কারণ পিসীমা হয় তো বাবাকেবলেও দিতে পারেন এই ভয়। পিসীমা ছিলেন বাবার বড়। বিধবা বলে' আমাদের সংসারেই তাঁর শক্তি সামর্থ্য নিয়োগ করেছিলেন। নোতুন মা বাবাকেই একটু যা প্রথম প্রথম ভয় করতেন। কিন্তু সে ভয়টুকুও ক্রমশঃ দূর হ'য়ে গেল এইজন্যে যে, আমি তো বাবার কাছে কোন কথাই বলতে পারতাম না। কি জানি কেন বাবার সামনে গেলে ভাল ক'রে কথাই বলতে পারতাম না। অন্য ছেলেদের দেখতাম তারা বাপের কাছে কত আদর আব্দার পায়, আমি কিন্তু কোন দিনই তা পাইনি, এবং চাইতেও কি জানি কেন ভরসা হতো না। আর পিসীমাও বাবাকে কোন কথা বলতেন না—মুখ বুজে সব অত্যাচার সহ্য করতেন। জীবনের গোড়া হতেই দিনগুলো কেমন ছন্দহীন ভাবে কাটতে সুরু হ'লো। নতুন মার উপেক্ষা অনাদর ক্রমশঃ বেড়ে উঠতে লাগল।

সে দিন রাত্রে খেতে বসেছিলাম। বাবা আর আমি রাত্রে এক সঙ্গেই খেতে বসতাম তখন। সকালে আমি বাবার আগে খেতে বসতাম; কারণ, বাবা পরে খেয়ে আপিস যেতেন। আমি আগে স্কুল যেতাম। আমায় যে থালাটায় খাবার দেওয়া হয়েছিল সেটা একটু অপরিষ্কার ছিল। বাবার নজরে সেটা প'ড়ে গেল। তিনি ডাকলেন—দিদি, এদিকে এসো তো একবার। পিসীমার শরীর ভাল ছিল না ব'লে সেদিন তিনি রান্না করেননি, ওপরে শুয়ে ছিলেন। রান্নার কাজ তাঁরই একচেটে ছিল। কারণ নোতুন মার আগুনের তাত সহ্য হতো না এবং পিসীমার তা হ'লে কিছুই যে করবার থাকে না। অন্নের সদ্ব্যবহার তো তাঁকে করতেই হবে একটা কিছু কাজ ক'রে। পিসীমা নেমে এসে আমাদের খাবার কাছে দাঁড়াতেই বাবা বললেন—দেখ দেখি দিদি, এই থালায় মানুষ মানুষকে খেতে দিতে পারে। পরে একটু অনুযোগের সুরে বললেন—তুমি কেন একটু দেখ না। বলে' থালাটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আমায় বললেন—আমার সঙ্গে এক সঙ্গে খা।

নোতুন মা যে আমায় বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখেন না এটা বাবা জানতেন এবং সেই জন্যে কাজের ফাঁকেও আমার খোঁজ নিতেন। নোতুন মার স্নেহে যতটা উপেক্ষা ছিল এবং তার জন্য মনে যে ক্ষোভটুকু হতো, তা বাবার ক্ষণিক স্নেহেই মন থেকে দূর হ'য়ে যেতো। কিন্তু বাবার কাছে কোন অযত্ন পেলে আমার ক্ষোভের আর সীমা-পরিসীমা থাকতো না। এই রকম নানা খুঁটি-নাটির ভেতর দিয়ে বাবার স্নেহের সন্ধান পেতাম।

মা-মরা ছেলের না কি অভিমান খুব বেশী হয়। আমার অভিমানও খুব বেশী ছিল এবং এখনও অভিমান আমায় না-ছোড়-বান্দা হ'য়ে পেয়ে ব'সে আছে। আর এই অভিমানই হয়েছে আমার কাল। আমি যাকে ভালবাসি এবং যার কাছ থেকে ভালবাসার দাবী করি, তার কাছ থেকে এতটুকু উপেক্ষা বা অনাদর সহ্য করতে পারি না। মন তখনই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কেঁদে ওঠে—এ কি জ্বালা!

দিনগুলো ক্রমশঃ জট পাকিয়ে উঠতে লাগল। নোতুন মা যে বাবার মন কেমন করে বদলে দিতে লাগলেন তা বুঝতে পারলাম না। আমি বা পিসীমা কোনদিনই নোতুন মার বিরুদ্ধে কিছুই বাবার কাছে অভিযোগ করতে পারতাম না, আর সেটা ভালও লাগতো না। বয়সের প্রথম থেকেই আমার কেমন স্বভাব হ'য়ে গিয়েছিল যে, সমস্ত অত্যাচার উৎপীড়ন মুখ বুজে সহ্য করবো এবং নিজের কোন কাজের জন্য কাউকে মুখ ফুটে কখন কিছু বলবো না;—এখনও এগুলো পারি না। এর মূলেও বোধ হয় অভিমান।

বাবার স্নেহ ক্রমশঃ গুপ্তধারা ফল্গু হ'য়ে পড়লো। তার কারণ আমরা কোন অভিযোগ করতাম না, কিন্তু নোতুন মা সুযোগ সুবিধা পেলেই আমাদের নামে অভিযোগ করতে ছাড়তেন না। বাবার মন আমাদের ওপর বিরূপ হ'য়ে উঠতে লাগল, এটা ছেলে মানুষ হ'লেও বেশ বুঝতে পারছিলাম। আর সেইটেই হ'য়েছিল আমার সব থেকে দুঃখ। বাবার বিরক্তির ক্রমে ক্রমে নিদর্শন পেতে লাগলাম।

খুব কাশি হয়েছিল। সমস্ত দিনে রাতে কাশির আর বিরাম ছিল না। রাত্রে ঘুম হতো না। আমি যে-ঘরে শুতাম তার পাশের ঘরেই বাবা শুতেন। সেদিন রাত্রে কাশি একটু বেড়েছিল। আমার কাশির শব্দে বাবার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি চীৎকার ক'রে ধমকে উঠলেন—ওটাকে ঘর থেকে বের করে দাও না। আমি সঙ্কুচিত হয়ে পড়লাম। তার পর বাবা নিজে এসে বললেন—যা নীচে গিয়ে কাশগে, ব'লে ঘর থেকে বের ক'রে নীচে নামিয়ে দিলেন। অভিমান এসে আমার মনকে দু'পায়ে থেঁতলাতে লাগল। চোখ দিয়ে অশ্রুর ধারা, আমার রোধ করবার

সহস্র চেষ্টাতেও গড়িয়ে পড়্‌ল। নোতুন মার আঘাতের চেয়ে বাবার আঘাত যে বেশী জোরে ঘা দেয়। এখানেও দুর্জ্জয় অভিমান এসে আমায় অভিভূত ক'রে ফেল্‌লে।

পিসীমা যদিও রান্না কর্‌তেন তবুও তাঁর জোগাড় ক'রে নেবার অধিকার ছিল না। আমি সকালে খেয়ে স্কুলে যাবো এ নোতুন মা জান্‌তেন। তা সত্ত্বেও তিনি বেলা ক'রে নীচে নাম্‌তেন। পিসীমা যদি মৃদু অনুযোগ কর্‌তেন তো নোতুন মা ঝঙ্কার দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বল্‌তেন—কি কর্‌বো, আমার কাজ কি কোন গতরখাকী এসে ক'রে দেবে? সবই তো আমায় কর্‌তে হবে। ভাঁড়ার তো কারো হাতে দিয়ে বিশ্বাস নেই। নইলে করুক না সবাই। উনি বলেছেন খরচ কমাতে, কাজেই তো আমায় একলা সব দেখতে হয়। পিসীমার আর দ্বিরুক্তি কর্‌বার ক্ষমতা থাকৃতো না। তিনি অশ্রু গোপন কর্‌তেন। ভাত ময়লা হ'য়ে যাবে ব'লে আলু ভাতে পর্য্যন্ত দেবার অধিকার ছিল না। আমি কোন দিন শুধু ভাত কোন দিন বিনা ভাতে স্কুলে যেতাম। পিসীমার অশ্রু বাধা মান্‌তো না। আমি জোর ক'রে নিজেকে চেপে রেখে পিসীমাকে সান্ত্বনা দিতাম। ক্রমাগত আঘাত খেয়ে খেয়ে মন আমার আঘাত-সহিষ্ণু হ'য়ে পড়্‌ছিল। বাবার কানে সমস্ত কথা পৌঁছত না। পৌঁছলেও বিশেষ ফল হতো না। যেদিন আমি না খেয়ে স্কুলে যাই, সেদিন পিসীমা যখন বাবাকে এ কথা বল্‌লেন, তখন বাবা উত্তর কর্‌লেন—এক দিন যদিই ভাত না হ'য়ে ওঠে, তাতে এমন দোষ কি হয়েছে। এসে খাবে। সেইদিন হ'তে প্রায় রোজই ভাত হ'তে দেরী হতে লাগ্‌ল। পিসীমা প্রতিকার চেষ্টায় বিরত হ'লেন। আমি ক্ষুণ্নমনে উপবাস-ক্লিষ্ট হ'য়ে স্কুল চালাতে লাগ্‌লাম। মন ক্রমশ কষ্ট-সহিষ্ণু হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল; কিন্তু অভিমান জয় কর্‌তে পারলাম না।

ক্রমে পিসীমার হাত থেকে শুধু রান্নার ভার ছাড়া আর সমস্ত ভারই নোতুন মা নিলেন। কারণ পিসীমা না কি আমায় তরকারি প্রভৃতি বেশী ক'রে দেন এবং সেই জন্যে পরে সব কম পড়ে, কেউ খেতে পায় না। এই কথা শুনে লজ্জায় ঘৃণায় মন আমার কুঁক্‌ড়ে গেল। সেই থেকে কোন জিনিষ খেতে ইচ্ছে কর্‌লেও চেয়ে নিতে লজ্জা বোধ হতো। পরে এমন হ'য়ে গেল যে, কোথাও গিয়েই আর কিছু নিজের জন্যে চাইতে পারি না। আজও এ অভ্যাস বদ্ধমূল হ'য়ে আছে। মন্দ নয়!

নোতুন মার পরিবেশনের ধারা ছিল সর্ব্বজীবে সমান দয়া, তা কে জানে বড়, কে জানে ছোট। আমার ছোট দু'ই ভাই ও আমি যদি এক সঙ্গে খেতে বস্‌তাম তো, তারা ছোট হ'য়ে যে পরিমাণ জিনিষ পেতো, আমি বড় হ'য়েও ঠিক সেই পরিমাণ জিনিষ পেতাম। তারা যতটা খেতে পারে সেই পরিমাণ ভোজ্যই তারা পেতো, আমিও ঠিক তদনুরূপ কম। কাজেই ক্ষিদের অবস্থা আমার অসহনীয় হ'য়ে উঠ্‌তো। তবু মুখ ফুটে চাইতে পার্‌তাম না। আর চাইলেই বা দিচ্ছে কে। চেয়েও তো ফল পেলাম এমন যে, চাইবার লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে কর্‌ল।

আমি চিরদিন ডাল খেতে ভালবাসি। এ জেনেও নোতুন মা আমায় ইচ্ছে করেই ডাল কম দিতেন। আর এইটাই ছিল তাঁর আমায় উপেক্ষার ধারা। আমি যেটা চাই সেটা হ'তে ইচ্ছা করে আমায় বঞ্চিত করা; এবং আমি যা ভালবাসি সেটা আমায় না দেওয়া। ছোট ভাইদের ইচ্ছানুযায়ী জিনিষ তারা আমার সাম্‌নেই পেতো; কিন্তু আমি আমার ইচ্ছানুযায়ী জিনিষ পেতাম না। ছোট ভাইরা পেতো এতে আমি মোটেই দুঃখিত নই। আমার দুঃখ যে, আমিও তো বাড়ীর ছেলে—আমিই বা সমান অধিকার পাবো না কেন। নোতুন মা সে অধিকার দিতেন না এবং অভিমান আমায় সে অধিকার চাইতে দিত না। এমনি করে দু'দিক থেকে আমার পীড়ন চল্‌লো।

সেদিন খেতে বসে ডালের পরিমাণ কম দেখে সমস্ত সঙ্কোচ জয় ক'রে মৃদু কণ্ঠে একটু ডাল চাইলাম। নোতুন মা তীব্র স্বরে বল্‌লেন—আর ডাল কোথায় পাব। আর কারো খেয়ে কাজ নেই তুমিই গেলো। ব'লে হেঁসেলে যা ডাল ছিল সব এনে আমার পাতের কাছে রেখে দিলেন বাটি-শুদ্ধ। আমার চোখ ফেটে কান্না এলো। একবার মনে হলো, দূর হোক গে ছাই, ডাল মোটেই খাব না। কিন্তু পরক্ষণে দুষ্টুমি বুদ্ধি মাথায় এলো, দু'হাতে ডালের বাটি ধ'রে চুমুক দিয়ে সব ডাল নিঃশেষে শেষ ক'রে দিলাম; নোতুন মা বাবাকে বল্‌লেন, আমি সব ডাল হেঁসেল থেকে নিয়ে খেয়ে দিয়েছি। বাবা খুব মার্‌লেন। আমি অপ্রতিবাদে মার খেলাম, এ মিথ্যার প্রতিবাদ করবই বা কি।

বাড়ীর সমস্ত ফাইফরমাস্ আমিই খাট্‌তাম। তাতে আমি মোটেই ক্ষুণ্ণ নই। কিন্তু তার মধ্যের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিও ক্ষমার যোগ্য বিবেচিত হ'ত না, এইটাই ছিল আমার সব থেকে দুঃখ।

নানারকম পীড়ন আমার মাতৃস্নেহ-ক্ষুধাতুর মনকে আরো ব্যাকুল ক'রে তুল্‌তে লাগ্‌ল। সমস্ত অন্তরটা যখন একটু স্নেহ, এতটুকু যত্ন পাবার জন্য ব্যাকুল হ'তো, তখনই আস্‌তো তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ ও নানারূপ উৎপীড়ন। সেই সময় আমার অভিমানী অন্তর কান্নায় উদ্বেল হ'য়ে উঠ্‌ত। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে স্নেহ যত্ন হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে আমি খুব স্নেহ-ব্যাকুল হ'য়ে পড়েছিলাম। এই স্নেহের একটুখানি মিট্‌তো বাইরে থেকে। ভগবান একেবারে আমায় সকল রকমে নিঃস্ব করেন নি। বাইরে যার সংস্পর্শে আস্‌তাম সেই আমায় যত্ন স্নেহ করতো। এইটুকুই আমার স্নেহ-আকাঙ্ক্ষিত হৃদয়ে প্রলেপের কাজ কর্‌তো। আজও সময় সময় মন আমার এমন উদ্বেল হ'য়ে ওঠে কারণে অকারণে যে, কিছুতেই তাকে বাগ মানাতে পারি না। এমনি করেই কি দিনগুলো আমার কাট্‌বে। দুর্ব্বহ জীবনের বোঝা যে ক্রমশঃ আরো দুর্ব্বহ হ'য়ে পড়্‌ছে।

বাবা বদলী হ'য়ে অন্যত্র গেলেন। যাবার খবর আমি জান্‌লাম আমার ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে। বাবা বোধ হয় আমাকে জানানো দরকার মনে কর্‌লেন না। এমন কি, আমি কোথায় থাক্‌বো এ ব্যবস্থাও তিনি কিছু কর্‌লেন না; এমন কি, সে সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসাও কর্‌লেন না। আমাকেই সব ঠিক করে নিতে হলো। এখানেও দুর্জ্জয় অভিমান এসে আমায় আক্রমণ কর্‌লে। আমি পূর্ব্বেই চাকরী যোগাড় ক'রে নিয়েছিলাম নিজেই। কারণ বাবা আমার মত মূর্খের জন্য কাউকে অনুরোধ করাকে অপমান জ্ঞান করেন এটা নোতুন মার মুখে শুনলাম। এ সবগুলো তখন ক্রমশঃ আমার গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। তবুও অন্তরে অভিমানের তীব্রতা এতটুকুও কমেনি। হায় রে অভিমান, যার মা নেই তার এ অভিমান কেন? এর মূল্যই বা রাখে কে! অন্তরকে এত করে বোঝাই যে এ সাজে না, তবু সে বোঝে না। হায় মূঢ় অন্তর!

সন্ধ্যা হবো-হবো হয়েছে, মনটা সমস্ত দিন ভারাক্রান্ত হয়ে ছিল। এমন হয়ই প্রায় মাঝে মাঝে কারণে অকারণে। আপিস ফেরৎ যা' তা' ভাব্‌তে ভাব্‌তে সাইকেলে বাড়ী ফির্‌ছিলাম। শ্যামবাজারের পাঁচমাথানীর মোড়ে এসে মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। সামনে একটা মোটর এসে পড়্‌ল, আর তার পর আমার জ্ঞান নেই।

হাসপাতালে জ্ঞান হ'লো। মাথায় আঘাত লেগে মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। জ্ঞান হলেও জীবনের পূর্ব্বাপর ঘটনাগুলো মনে আন্‌তে পার্‌লাম না। হাসপাতালে মাসখানেক রেখে তারা আমায় পাঠিয়ে দিলে মানসিক চিকিৎসার হাসপাতালে। সেখানে যদিও বছর খানেক রইলাম তবুও ঠিক সজ্ঞান হলাম না। মধ্যে মধ্যে মাথার মধ্যে সব কেমন জট পাকিয়ে চিন্তাগুলো এলেমেলো ক'রে যায়। লোকে বলে আমি পাগল, পাগল হবার আর অপরাধ কি। এর পূর্ব্বে যে কেন পাগল হই নি এইটাই আশ্চর্য্য। আমার এই অসুস্থ অবস্থায় কেউ-ই আমার খোঁজ নেয় নি। আর খোঁজ নেবেই বা কে। যখন সুস্থ সবল কর্ম্মক্ষম ছিলাম তখনই কেউ খোঁজ করেনি, আর আজ! হায় রে আমার দুরাশা! তবে এটা খুব সত্যি যে, ভগবান আমায় একেবারে ছেড়ে দেননি। নানা রকম সাংসারিক উৎপীড়নের মধ্যেও তিনি সময় সময় নিজের সত্ত্বা আমায় গভীর ভাবে অনুভব করিয়ে দেন। তাতেই তো আমি এখনও মরিনি। নইলে এক এক সময় ইচ্ছে হয়, জীবনটাকে শেষ ক'রে এ জীবনের সব দেনা পাওনা মিটিয়ে দিই—তেল ফুরোবার আগেই নিবিয়ে দিই আলো। এখন আমার জীবনটা হয়েছে ঠিক ফুলদানীতে রাখা শুকনো ফুলের মত। তা'র না আছে সজীবতা, না আছে গন্ধ ও মাধুর্য্য। কেবল অযত্নে প'ড়ে আছে শুধু দূর ক'রে ফেলে দেবার প্রতীক্ষায়। অথচ একদিন তার আদরও যে ছিল না এমন তো নয়।

এমন ক'রে যে কত দিন কাট্‌বে তা জানি না। সব থেকে হাসির কথা কি জানেন, এত আঘাতেও আমার অভিমানের এতটুকুও ভাঙেনি। এই অভিমান নিয়েই তো হয়েছে আমার জ্বালা। কোথাও থেকে বা গিয়ে সুখ নেই। সামান্য ত্রুটিতেই অভিমান। আমার মত হতভাগ্য লোকের এ কি সাজে। আপনিই বলুন না।

প্রথম প্রথম লজ্জা এবং অভিমানে কারো কাছে কিছু চাইতে পার্‌তাম না। এখন যে যা দয়া ক'রে দেয় তাই

খাই, এখন চাইতে পারি না ভাল ক'রে। চাকরী গেছে, আমি যে পাগল। বলুন তো, এও কি আমার দোষ।

আজ আপনি যদি খেতে না দিতেন তো অভিমানে হয় তো দু'দিন উপবাসেই কাটাতাম—এমনি দুর্জ্জয় আমার অভিমান এখনও। জীবনের প্রভাত তো কুয়াশার মধ্যে দিয়ে কেটে গেছে, মধ্যাহ্নও যায় যায়। তার পর এই নিপীড়ন—এতোতেও কি আমার এই সব সাজে! কবে যে কার অপটু হাতের ঝঙ্কার দেবার বৃথা চেষ্টায় জীবনের তার ছিঁড়ে গেছে, তা এক ভগবানই বল্‌তে পারেন। দুঃখের আগুনে পুড়িয়েই তিনি মানুষকে খাঁটি করেন শুনেছি। কিন্তু আর যে পারি না—খাঁটি হতে আর চাই না, প্রভু। সব সুখ দুঃখের হিসাব মিটিয়ে দাও। তোমার পায়ে কোটি কোটি প্রণাম করি।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে আমার স্ত্রী এসে খবর দিলেন খাবার তৈরী। ভাগ্যধরের চোখের কোণে অশ্রুধারা। আমার চোখও সজল। চিত্রা ভাগ্যধরের কোলে চিত্রার্পিতের ন্যায় বসে। ঘরের হাওয়া দুঃখ-বেদনাহত।

সাময়িকী

'ভারতবর্ষে'র পাঠকগণ অবগত আছেন যে, কলিকাতা শ্রদ্ধানন্দ পার্কে মহাত্মা গান্ধী যে বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব করিয়াছিলেন, তাহার জন্য কলিকাতার পুলিশ কমিশনর মহাত্মাকে গ্রেপ্তার করিয়া পঞ্চাশ টাকা জামিনে ছাড়িয়া দেন। কলিকাতার পুলিশ আদালতে এই মামলার বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। মহাত্মাজি বিচারের দিন যে বর্ণনাপত্র দাখিল করেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, তিনি এক্ষণে আইন অমান্য করিতে প্রস্তুত নহেন; তবুও যে পুলিশ কমিশনরের নোটীস তিনি অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তাহার কারণ এই যে, যে ধারা অনুসারে পুলিশ নোটীস দিয়াছিলেন, শ্রদ্ধানন্দ-পার্ক সে ধারার বিধানের মধ্যে পড়ে না, অর্থাৎ শ্রদ্ধানন্দ পার্ক রাজপথ বা সাধারণের যাতায়াতের স্থান নহে। মহাত্মার পক্ষ সমর্থন করিতে যাইয়া বারিষ্টার শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্তও সেই কথাই বলেন। কিন্তু প্রধান প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট শ্রদ্ধানন্দ পার্ককে সাধারণের গতিবিধির স্থান বলিয়া মত প্রকাশ পূর্ব্বক মহাত্মা গান্ধী, শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় ও আর তিন জনের প্রত্যেককে **একটাকা** হিসাবে জরিমানা করিয়া আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। ইতি।

দিল্লীর রাষ্ট্রীয় পরিষদে যখন্ অর্থ-সচিব মহাশয় ভারতের বজেট পেস করেন, তখন তিনি লবণের শুল্ক ও খাম পোষ্ট-কার্ডের মূল্য হ্রাস সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থাই করেন নাই; লবণের শুল্ক যেমন একটাকা চারিআনা ছিল এবং খাম যেমন চারি পয়সা ও পোষ্টকার্ড যেমন দুই পয়সা ছিল, তাহাই স্থির রাখিয়াছিলেন। আমরা তখনই বলিয়াছিলাম, পরিষদের সদস্য মহোদয়েরা যতই চেষ্টা করুন, যতই বক্তৃতা করুন, যতই বাদানুবাদ করুন, ভবী ভুলিবার নয়। তবুও পরিষদের সদস্যগণ বিশেষ চেষ্টা করিয়া ভোটের জোরে লবণের শুল্ক একটাকা করিবার প্রস্তাব পাশ করিয়াছিলেন। সদস্য মহোদয়েরা পাশ করিলে কি হয়, বড় লাট-বাহাদুরের হস্তে যে ব্রহ্মাস্ত্র আছে, তাহা নিক্ষেপ করিলে রাষ্ট্রীয় পরিষদের সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবও অগ্রাহ্য হইয়া যায়। এ ব্যাপারেও তাহাই হইয়াছে; শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুরের সার্টিফিকেটে লবণের শুল্ক কমিল না—পাঁচসিকাই থাকিল। সেদিন পরিষদে অর্থ-সচিব মহাশয় এই কথা ঘোষণা উপলক্ষে বলিয়াছেন যে, লবণের শুল্ক পাঁচসিকা হইতে একটাকা করিলে সরকারের ছয়কোটী টাকা আয় কমিবে, অথচ গরীবদের প্রকৃতপক্ষে কোন উপকারই হইবে না। এই শুল্ক কম করিলে সেরকরা এক পাই মাত্র দর কমিবে; ইহাতে খুচরা খরিদদারদের কোনই লাভ হইবে না, তাহারা এখনও যে মূল্যে লবণ কিনিতেছে, শুল্ক কমিলেও সেই মূল্যে কিনিবে; সুতরাং, যাহাতে জনসাধারণের কোনই লাভ হইবে না, অথচ সরকারের বহুত টাকা আয় কমিয়া যাইবে, এমন কাজ করা কিছুতেই সঙ্গত নহে। অতএব লবণের শুল্ক পূর্ব্বের মত এক টাকাই রহিল। অর্থ-সচিব মহাশয়

যাহা বলিয়াছেন, তাহা যে অযৌক্তিক, এ কথা বলা যায় না; লবণের শুল্ক চার আনা কমিলে আমরা যে পয়সা দিয়া এখন লবণ কিনি, তাহা কমিত না, খুচরা খরিদদারের কোনই লাভ হইত না, দোকানদারেরা কিছু পাইত মাত্র, অথচ সরকারের ছয়কোটী টাকা আয় কম হইত। এই কম আয় পোষাইয়া লইবার জন্য সরকার হয় ত বিশেষ আবশ্যক কোন ব্যয় কমাইয়া দিতে বাধ্য হইতেন। সুতরাং ও চারি আনা কমিলেও আমাদের যা, থাকিলেও তাই।

নেপালী যুবতী রাজকুমারীর উপর হীরালাল আগরওয়ালা যে অত্যাচার করে, তাহা অসহ্য বোধ হওয়ায় নেপালী যুবক শ্রীখড়্গা বাহাদুর সিং হীরালালকে হত্যা করে এবং প্রকাশ্য আদালতে এই হত্যাকাণ্ডের সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করে। এই অপরাধের শাস্তি স্বরূপ খড়্গা বাহাদুরের প্রতি আট বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হয়। সে সময়ে নানা স্থান হইতে এই কারাদণ্ড হ্রাসের জন্য শ্রীযুক্ত বড়লাটের নিকট কৃপা ভিক্ষা করা হয়। পূর্ণ দুই বৎসর পরে শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুর খড়্গা বাহাদুরের মুক্তির আদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহার ছয় বৎসর কারাদণ্ড মাপ হইয়াছে। দেশের সকলেই ইহাতে আনন্দিত হইয়াছে।

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী প্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক এস, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানীর অন্যতম স্বত্বাধিকারী আমাদের পরম স্নেহাস্পদ হেমন্তকুমার লাহিড়ী কয়েক দিনের ইনফ্লুয়েঞ্জায় পরলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহার অমায়িক ও মিষ্ট ব্যবহারে যে-কেহ তাঁহার সম্পর্কে আসিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। হেমন্তকুমার দুই বৎসর বয়স্ক শিশু পুত্র, দুইটী কন্যা, পত্নী, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী এবং বহু বন্ধু-বান্ধবকে শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতির সম্মানার্থ কলিকাতার অধিকাংশ পুস্তকালয় তাঁহার শ্রাদ্ধ-দিবসে বন্ধ ছিল।

বৎসরে দুইবার সভা-সমিতির মরসুম লাগিয়া থাকে,—একবার বড়দিনের সময়, আর একবার গুড্‌ফ্রাইডের সময়। সেই প্রথা অনুসারে বিগত গুড্‌ফ্রাইডের চারিদিনের অবকাশ সময়ে বাঙ্গালা দেশে ও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে অনেকগুলি সভাসমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুরাটের হিন্দুমহাসভা, সভাপতি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়; কলিকাতার হিন্দুমহাসভা, সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়; বাঙ্গালা দেশে রঙ্গপুরে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন, সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়; ঐ স্থানেই বঙ্গীয় যুব-সম্মেলন, সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়; ঐ স্থানেই ব্যাঙ্কিং-সম্মেলন, সভাপতি শ্রীযুক্ত সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়; রাজসাহীতে বাঙ্গলার শিক্ষক-সম্মেলন, সভাপতি শ্রীযুক্ত সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়; ঐ স্থানেই সাহিত্য-সম্মেলন, সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন; হাবড়া জেলার মাজুতে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন, মূল সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর, সাহিত্য-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেন মহাশয়, বিজ্ঞান-শাখায় শ্রীযুক্ত ডাক্তার একেন্দ্রনাথ ঘোষ
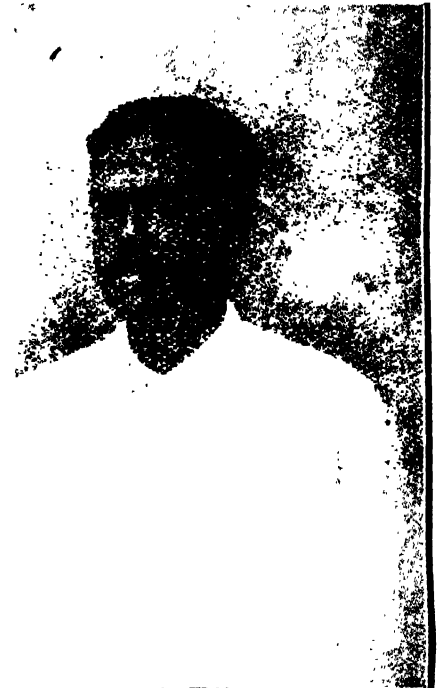
হেমন্তকুমার লাহিড়ী

মহাশয়, দর্শন-শাখায় শ্রীযুক্ত ডাক্তার সুরেন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত মহাশয়, ইতিহাস-শাখায় শ্রীযুক্ত ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার

মহাশয় ; ঐ স্থানেই হিন্দুসভা, সভাপতি শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ বিশী মহাশয়। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা ভবানীপুরে সাহিত্য-সমিতির উদ্যোগে বঙ্কিম-স্মৃতি-সম্মেলন, বেলিয়াঘাটা লাইব্রেরীর বার্ষিক উৎসব-সভা, দক্ষিণ বারাসতে অনাথ ভাণ্ডারের বার্ষিক উৎসব ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে ব্যোমকেশ-স্মৃতিসভা প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য। এতগুলি সভা, সমিতি ও সম্মেলনের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা 'ভারতবর্ষে'র পক্ষে অসম্ভব। আমরা অতি সংক্ষেপে উহারই মধ্যে দুই চারিটীর অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

প্রথমে মাজুর বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের কথাই বলি। মাজু হাবড়া জেলার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই গ্রামেরই অনতিদূরে কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের জন্মভূমি। ইতঃপূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশের বড় বড় সহরেই সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছে, মধ্যে কেবল একবার রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল, আর এইবার মাজু গ্রামে হইল। ইহার জন্য মাজুর অনুষ্ঠাতৃগণকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। যে সমস্ত সাহিত্যিক এই সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই অনুষ্ঠাতৃবর্গ ও স্বেচ্ছাসেবক-গণের আদর-আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। এই সম্মেলন উপলক্ষে কর্ম্মকর্ত্তাদিগের বিশেষ অসুবিধা ও উদ্বেগ সহ্য করিতে হইয়াছিল। প্রথমে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। তিনি কানাডায় চলিয়া যাওয়ায় মূল সভাপতি নির্ব্বাচনে, কি কারণে বলিতে পারি না, অযথা বিলম্ব হইয়া গেল। সম্মেলনের অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত হইল, রায় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর মহাশয় মূল সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি যে অভিভাষণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বাংশে তাঁহার ন্যায় প্রবীণ সাহিত্যিকের উপযুক্ত হইয়াছিল। তাহার পর বিভ্রাট উপস্থিত হইল বিজ্ঞান-শাখার সভাপতিত্ব লইয়া। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সম্মেলনের অধিবেশনের দুই তিন দিন পূর্ব্বে সংবাদ পাওয়া গেল, তিনি নিউমোনিয়া রোগে শয্যাগত। তখন কর্ম্মকর্ত্তারা ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষকে ধরিয়া বসিলেন। তিনি দুই দিনের মধ্যে তাঁহার অভিভাষণ প্রস্তুত করিয়া সভার কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। অত্যল্প সময়ের মধ্যে লিখিত হইলেও তাঁহার অভিভাষণ বিশেষ তথ্য-পূর্ণ হইয়াছিল। দর্শন-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের সেই সময়ে মাতৃবিয়োগ হইল। আমরা মনে করিয়াছিলাম, তিনি এ অবস্থায় সম্মেলনে যোগদান করিতে পারিবেন না; কিন্তু কর্ত্তব্যপরায়ণ সুরেন্দ্রবাবু নগ্নপদে সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার নানা তথ্যপূর্ণ সুন্দর অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে বিপদ উপস্থিত হইল সাহিত্য-শাখার সভাপতি লইয়া। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সাহিত্য-শাখার সভাপতি করা হইয়াছিল। ও-দিকে তিনি রঙ্গপুরে যুব-সম্মেলনেরও সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, ২৯শে ও ৩০শে মার্চ্চ তারিখে যুব-সম্মেলনের কার্য্য শেষ করিয়া সেই দিনই সেখান হইতে যাত্রা করিয়া ৩১শে তারিখে মধ্যাহ্নে মাজুতে উপস্থিত হইয়া সাহিত্য-শাখার সভাপতিত্ব করিবেন। কিন্তু তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, রঙ্গপুরে সমাগত প্রতিনিধিবর্গ তাঁহাকে তাড়াতাড়ি কিছুতেই ছাড়িয়া দিবেন না। তাহাই হইল। ৩১শে তারিখে তার আসিল যে, তিনি রঙ্গপুরে আটকাইয়া পড়িয়াছেন, মাজুতে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। তখন কি আর করা যায়। খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেন মহাশয় সাহিত্য-শাখায় একটী প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য সেদিন মাজুতে গিয়াছিলেন। সকলে মিলিয়া তাঁহাকেই সাহিত্য-শাখার সভাপতির আসনে বসাইয়া দিলেন এবং তিনি অগত্যা তাঁহার সেই প্রবন্ধটীকেই সভাপতির অভিভাষণ রূপে চালাইয়া দিলেন। এই সমস্ত কারণে মাজুর কর্ম্মকর্ত্তা-দিগকে যে বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িতে হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। যে ভাবেই হউক, মাজুর সাহিত্য-সম্মেলন শেষ হইয়া গিয়াছে। সভাপতি মহাশয়গণের অভিভাষণ মাসিক ও দৈনিক পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

মাজুর সম্মেলন উপলক্ষে একটী মহৎ অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইয়াছে। সভাপতি রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের জীবন কথা ও গ্রন্থাবলীর একটী সুসংস্কৃত, শোভন সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হউক। ভারতচন্দ্রের কতকগুলি গ্রন্থ বটতলার কৃপায় যে ভাবেই হউক, এতদিন চলিয়া আসিয়াছে; অপরেও এক-আধটা সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু, তাহার কোন খানিতেই যে ঠিক ভারতচন্দ্রের লেখা অনুসৃত হইয়াছে, তাহা মনে হয় না। এতদ্ব্যতীত অনুসন্ধান করিলে তাঁহার অপ্রকাশিত অনেক লেখাও পাওয়া যাইতে পারে। এই সমস্ত সংগ্রহ করিয়া একখানি সম্পূর্ণ ও সুসংস্কৃত গ্রন্থাবলি প্রকাশ করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য এ বিষয়ে এখন আর মতভেদ নাই। সুতরাং এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া শ্রদ্ধেয় দীনেশ বাবু প্রকৃত সাহিত্যিকের কার্য্যই করিয়াছেন। ইহার জন্য অল্লাধিক তিন হাজার টাকার প্রয়োজন। সভাস্থলেই ইহার প্রায় অর্দ্ধাংশ দান স্বাক্ষরিত হইয়াছে এবং একটী কমিটীও গঠিত হইয়াছে; দীনেশ বাবুই তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা আশা করি, আবশ্যক অর্থ অচিরেই সংগৃহীত হইয়া এই কার্য্য আরম্ভ হইবে।

ইহার পরই রঙ্গপুরের কথা বলিলেই ভাল হইত; কিন্তু কলিকাতার হিন্দু মহাসভার একটু বিবরণ এই স্থানেই দেওয়া সঙ্গত মনে করা গেল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে যে হিন্দু মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়। তিনি এই উপলক্ষে যেদিন কাশী হইতে কলিকাতায় আগমন করেন, সেদিন মহাসমারোহে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল; কিন্তু শেষ রক্ষা হয় নাই। তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের সংস্কারের জন্য যাহা করা কর্ত্তব্য,—অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন যে অবশ্য করণীয়, তাহা তিনি নানা প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া এবং হিন্দু জাতির বর্ত্তমান দুর্গতির জন্য যাহা কর্ত্তব্য, তাহার আলোচনা করিয়া তাঁহার উদারনৈতিক অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু, দ্বিতীয় দিনে এক মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় মহাসভায় এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, সমস্ত হিন্দুকেই 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে। উদারনীতির পক্ষপাতী এবং সংস্কার-প্রয়াসী হইলেও মহামহোপাধ্যায় মহাশয় এ প্রস্তাব মহাসভায় উপস্থাপিত করিতে দিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন; ব্রাহ্মণত্বপ্রয়াসী দল তাঁহাদের প্রস্তাব ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না; সুতরাং তর্কভূষণ মহাশয়কে সভাপতির আসন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইতে হইল। তাহার পর অপর একজনকে সভাপতি পদে বসাইয়া 'সকলেই ব্রাহ্মণ' এই প্রস্তাব গৃহীত হইল। সুতরাং কলিকাতার হিন্দু মহাসভা সকলকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করিয়া দিলেন—একেবারে চরম মীমাংসা হইয়া গেল।

এইবার রঙ্গপুরের কথা। সেখানে তিনটী অনুষ্ঠান হইয়াছিল,—একটী প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন, আর একটী যুব-সম্মেলন, আর একটী ব্যাঙ্ক-সম্মেলন। এ ছাড়া ছোটখাটো আরও কয়েকটী সামাজিক অনুষ্ঠান হইয়াছিল। প্রথমে যুব-সম্মেলনের কথাই বলি। এই যুব-সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত কালীপদ বাগ্‌চি মহাশয়, সভাপতি হইয়াছিলেন উপন্যাস-সম্রাট শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার অনতিদীর্ঘ অভিভাষণের এক স্থানে বলিয়াছেন—"বৈদেশিক শাসন আমাদিগকে অস্ত্রহীন ও দুর্ব্বল করিয়াছে সত্য, কিন্তু আমাদের আভ্যন্তরীণ ভেদ বৈষম্যই আমাদিগকে অধিকতর দুর্ব্বল করিয়াছে এবং প্রকৃত উন্নতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছে। এই হৃদয়হীন সমাজ, প্রেমহীন ধর্ম্ম, সাম্প্রদায়িক ও জাগতিক বৈষম্য, আর্থিক বৈষম্য এবং নারীর উপর হৃদয়হীন ব্যবহার—এই সবই আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কারণ।" দেশের দুরবস্থার এই যে কারণ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহা খাঁটি সত্য। এইগুলির প্রতিবিধান করিতে পারিলে যে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে, আমরা মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে পারিব, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। যুবকগণের দৃষ্টি যে এই দিকে সর্ব্বাগ্রে আকৃষ্ট হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধেও মতভেদ নাই।

রাজসাহী যুব-সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, কোন সংবাদপত্রে অদ্যাবধি তাহা প্রকাশিত হয় নাই, ইংরাজী কাগজে অভিভাষণের সংক্ষিপ্ত-সার মাত্র বাহির হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শরৎবাবুর সম্পূর্ণ অভিভাষণ না পাইলে, সে সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা অকর্ত্তব্য। এই জন্যই আমরা শ্রীযুক্ত শরৎবাবুর অভিভাষণের ইংরাজী বিবরণের উপর নির্ভর না করিয়া তাঁহার বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত মূল অভিভাষণ পাঠ করিবার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছি। যুব-সম্মেলনে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহার স্থূল মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল—যুব-আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলনকে পেষণ করিবার নিমিত্ত যুব-সঙ্ঘের সদস্য এবং শ্রমিক নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারে তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ। জাতীয় মুক্তি লাভই যুবকদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। তাহারা মুক্তি-পথের সকল বাধা বিঘ্ন অপসারিত করিবে। শ্রমিক ও কৃষকদিগের উন্নতির মধ্যে মুক্তির বীজ উপ্ত। শ্রমিকদিগের শিক্ষা-দীক্ষার ভার যুবকদিগকে লইতে হইবে। নানাপ্রকার ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যায়াম-চর্চ্চা দ্বারা দৈহিক উন্নতি সাধন। জাতীয় আন্দোলনকে ধ্বংস করিবার নিমিত্ত জাতীয়তা মূলক সাহিত্য ও পুস্তকাদির প্রচার বন্ধ করিবার জন্য তীব্র প্রতিবাদ। যাঁহারা সাম্প্রদায়িকতার ভাব পোষণ করিবেন, তাঁহারা যুব-সঙ্ঘের সদস্য হইতে পারিবেন না। জাতীয় আন্দোলনকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত সম্পূর্ণ ভাবে বৃটিশ পণ্য বর্জ্জন এবং সম্ভবপর হইলে বিদেশী দ্রব্য বয়কট। বয় স্কাউট দাস-মনোভাব বৃদ্ধি করে। বর্ত্তমান বয় স্কাউটদের শিক্ষা-দীক্ষায় একটি জাতীয় ভাবের দ্যোতনা থাকা চাই। নারীহরণ বন্ধ করিবার কাজে ছাত্রদিগকে যোগদান করিতে অনুরোধ। বাল্যবিবাহের নিন্দা এবং সহবাস সম্মতি বিল সমর্থন। যুবকদিগের পক্ষে বিবাহের বয়স ২৫ বৎসর এবং নারীর অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে। স্থায়ী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রতিষ্ঠা-কল্পে আয়োজন উদ্যোগ।

এইবার রঙ্গপুরের প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের কথা বলিতে হইবে। এই সম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়। তিনি অতি সুললিত ভাষায় তাঁহার অভিভাষণ গ্রথিত করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান সময়ে দেশের যে অবস্থা হইয়াছে তাহার বিবরণ ও তাহার প্রতীকারের উপায় সম্বন্ধে অতি স্পষ্ট ভাবে তিনি তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে আমরা ধন্যবাদ করিতেছি। এই প্রাদেশিক সম্মেলনে একটা আধটা নয়, একেবারে তেইশটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং সেগুলি যথারীতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই তেইশটী প্রস্তাবের যে কোন তিনটীও যদি কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলেই সম্মেলন সার্থক হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করিব। এবারের সম্মেলনে মূল ও প্রধান প্রস্তাবই সামাজিক। প্রস্তাবটী এই—যেহেতু অস্পৃশ্যতা সমূলে উৎপাটন করা ব্যতীত সঙ্ঘবদ্ধ ভারতীয় জাতি গঠন অসম্ভব, এবং যেহেতু বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হিন্দুসমাজে ছুঁৎমার্গ অতি ভয়াবহরূপে অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, সে কারণ সম্মেলনের অভিমত এই যে, অবিলম্বে জাতি গঠনের অন্তরায় স্বরূপ জাতিভেদপ্রথা প্রত্যেক হিন্দুর সচেষ্ট হইয়া দূর করা কর্ত্তব্য। অতএব দেখা গেল, রাষ্ট্রীয় সম্মেলন চান জাতিভেদ একেবারে তুলিয়া দিতে এবং তাহা হইলে, অস্পৃশ্যতারও কোন অস্তিত্ব রহিল না; হিন্দুমহাসভা প্রস্তাব পাশ করিলেন সকলকে 'ব্রাহ্মণ' নামে অভিহিত করা হইবে। আর একদল বলেন, হিন্দুর সমাজ-নীতি ও সমাজ-ব্যবস্থা একটা আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই মূল আদর্শকে বাদ দিয়া সমাজ সংগঠন চিন্তা করা যায় না। সে আদর্শ বর্ণাশ্রম বিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা বলি, বেশ ত; যাঁর-যাঁর মত চেষ্টা করুন না; শেষে যাহা হয় একটা ভাঙ্গা গড়া হইয়া যাইবে।

সৈন্যবিভাগে ভারতীয়দিগের নিয়োগ না হওয়ায় সরকারী নীতির প্রতিবাদ স্বরূপ মিঃ জিন্নার ঐ বিভাগের সমগ্র দাবী অগ্রাহ্যের প্রস্তাব ৬১—৪৪ ভোটে এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত না করার প্রতিবাদে মিঃ সানওয়াজের প্রস্তাবও ৩৭—৩৪ ভোটে ব্যবস্থাপরিষদে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু বড়লাট বাহাদুর সার্টি-ফিকেটের জোরে শাসন পরিষদ ও সেনাবিভাগের ঐ দুই বাতিল দাবী মঞ্জুর করিয়া আরও একবার দেখাইলেন যে, এই মেকী শাসনসংস্কার কতদূর ভুয়ো,—আসলে

ব্যবস্থাপরিষদের হাতে কোনই ক্ষমতা নাই। জনসাধারণ নির্ব্বাচিত সদস্যগণের শুধু—বক্তৃতা করিয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের সমালোচনা করিবারই ক্ষমতা আছে। তাঁহারা যে সকল দাবী নাকোচ করিবেন, ইচ্ছা করিলেই বড়লাট বাহাদুর সার্টিফিকেটের জোরে সে গুলিকে বাহাল করিতে পারেন। ব্যবস্থাপরিষদে জনমতের তো এই পরিণাম। ব্যবস্থাপরিষদকে জগতের সম্মুখে প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান বলিয়া বৃটেন ঘোষণা করেন। কিন্তু আসলে তাহার মতামতের কোন মূল্যই নাই; তথাপি এই অভিনব শাসন-সংস্কারের জন্য মাত্র এক বঙ্গদেশকেই বাৎসরিক ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে ১৯২৯-৩০ সালে এককোটী উনিশ লক্ষ একুশ হাজার টাকা। ১৯১৯-২০ সালে বাঙ্গালার শাসনযন্ত্র চালিত হইত সাতাশ লক্ষ তিরনব্বই হাজার টাকায়। ১৯২০-২১ সালে শাসনযন্ত্র পরিবর্ত্তনের ফলে খরচ বৃদ্ধি হইয়া দাঁড়াইল এককোটী একলক্ষ ছিয়াশী হাজার—অর্থাৎ শতকরা ২৬৪ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি হইল। এক্ষণে ব্যবস্থা পরিষদে সমস্ত দাবীর এক চতুর্থাংশমাত্র ভোটে দেওয়া হয়, বাকী তিন ভাগের সম্বন্ধে পরিষদের কোন হাত নাই। পরিষদ যে সকল দাবী অতি আবশ্যক বোধে অগ্রাহ্য করেন, তাহাও প্রত্যেক বারই বড়লাট মঞ্জুর করিয়া লন। সরকার ও প্রজাদের মতের যে কত প্রভেদ ইহাতেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের বজেট আলোচনা করিলে দেখা যায় যে সকল ক্ষেত্রেই অর্থাভাব। সকল সরকারী বিভাগেই যথেষ্ট ব্যয় সঙ্কোচ করা যায়। কিন্তু সে দিকে সরকারের মোটেই দৃষ্টি নাই। বিভিন্ন জাতি-গঠন-বিভাগ সমূহের উন্নতির জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট গুলি অর্থ সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের মুখ চাহিয়া থাকে। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলি মদ্যপানের কুফল হইতে জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য একে একে মদ্যপান বর্জ্জন নীতি ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু সরকার রাজস্ব হ্রাসের ভয়ে ঐ নীতি অগ্রাহ্য করিতেছেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট চীনে অহিফেন প্রেরণ বন্ধ করিয়া প্রায় দশকোটী টাকা রাজস্ব ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু রাজস্ব হ্রাসের অজুহাতে ভারতবাসীকে মদ্যপানের কুফল হইতে রক্ষা করিতে সরকার চান না। লাট-বাহাদুরের ব্যাণ্ডের জন্য বাৎসরিক খরচ ৬৫ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়। অথচ প্রতি বৎসরই অন্নাভাবে, জলাভাবে, চিকিৎসাভাবে—জ্বরে সাড়ে ৮ লক্ষ, কলেরায় ৬০ হাজার, বসন্তে ২৫ হাজার, আমাশয়ে-উদরাময়ে ২৫ হাজার, কালাজ্বরে ১৪ হাজার, যক্ষ্মায় ৭ হাজার, সর্পদংশনে, অনাহারে প্রভৃতিতে সর্ব্বসমেত মোট দ্বাদশলক্ষ লোক—অধিকাংশই শিশু, বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী—জাতির যাহারা জীবন, মেরুদণ্ড,—শমন-সদনে প্রেরিত হয়। প্রতিকারের উপায় নাই—কারণ সেই অর্থাভাব। বাঙ্গলার লাটবাহাদুরের দেহরক্ষীদলের ব্যয়—৩৪,০০০, ইহারা শোভাযাত্রার শোভা বৃদ্ধি করে। ইহারা না থাকিলে সরকারের মর্য্যাদার হানি হয়। এই টাকায় প্রায় সাড়ে বার লক্ষ রোগীর চিকিৎসা হইতে পারে। পূর্ণদায়িত্ব-সম্পন্ন শাসনব্যবস্থাই একমাত্র প্রতীকারের উপায়। তাই নেহেরু রিপোর্টে ভারতবর্ষ আসল গণতন্ত্রের দাবী উপস্থাপিত করিয়াছে। এই দাবীর পিছনে জাতিবিদ্বেষ নাই। তাহার মর্ম্মকথা—বড়লাট বা শাসন পরিষদ স্বেচ্ছামত কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না। জনসাধারণের প্রতিনিধিগণের মতে কার্য্য চালাইতে হইবে। তাহাদের সম্মিলিত মত লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে পারিবেন না। শাসনব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ব্যতীত এই সকলের প্রতীকার নাই।

রাজসাহীতে বঙ্গীয় শিক্ষক-সম্মেলনের যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়। সকলেই অবগত আছেন যে, শ্রীযুক্ত সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এক সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চেন্সেলর ছিলেন এবং বাঙ্গালা দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি অতি কমই আছেন; সুতরাং তাঁহাকে শিক্ষক-সম্মেলনের সভাপতি করা সর্ব্বাংশে উপযুক্ত হইয়াছিল। তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে শিক্ষকগণের অভাব অভিযোগ ও তাহার নিরাকরণের জন্য যাহা কর্ত্তব্য সে সকল বিষয়ে বিশেষ আলোচনা ছিল। গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী না হইয়া শিক্ষকগণ যদি স্বাবলম্বী হন, তাহা হইলে তাঁহাদের অনেক অসুবিধার নিরাকরণ হয়, এ কথাও সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বলিয়াছেন। তাঁহার

তথ্যপূর্ণ অভিভাষণের দিকে আমরা দেশের শিক্ষিত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

রাজসাহী সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন। যদিও এই সময়ে মাজুতে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হইতেছিল, তাহা হইলেও শিক্ষক সম্মেলনে যোগ দিবার জন্য যে সকল শিক্ষক উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই, বলিতে গেলে সকলেই, অল্পাধিক সাহিত্যসেবী। সুতরাং একই সময়ে দুই স্থানে সাহিত্য-সম্মেলন হওয়া অযৌক্তিক হয় নাই। সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের অভিভাষণ সুদীর্ঘ না হইলেও তথ্যপূর্ণ। তিনি সাহিত্য সম্বন্ধে কোন গভীর গবেষণা করেন নাই, করিবার প্রয়োজনও ছিল না; তিনি ভুলিয়া যান নাই যে তাঁহার শ্রোতৃবর্গ সাহিত্যিক হইলেও বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাই তিনি বলিয়াছেন—"আগে পর্য্যবেক্ষণ, না আগে গবেষণা, দর্শন আগে না মনন আগে, সে প্রশ্নের আলোচনা করিবার যোগ্যতা আমার নাই। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ইংরাজী শিক্ষার যুগে আমরা যে পরিমাণে পুঁথির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছি, ঠিক সেই পরিমাণেই আমরা পারিপার্শ্বিক জগতের দিকে অমনোযোগী হইয়া পড়িয়াছি। ছাপার পুঁথি পড়িতে পড়িতে আমরা প্রকৃতির বিচিত্র তথ্যপূর্ণ বিরাট গ্রন্থের অক্ষরের জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছি। অথচ এই লুপ্ত জ্ঞানের পুনরুদ্ধার করিতে না পারিলে পৃথিবীর সুধীসমাজে আমাদের স্থান হইবে কি করিয়া? শিশুর প্রথম শিক্ষার বিষয় অক্ষর-পরিচয় নহে, প্রকৃতি-পরিচয়। গাছের কথা, লতার কথা, ফুলের কথা, পাখীর কথা, তাহাকে প্রথম শিখাইতে হইবে, ক, খ-এর সঙ্গে সঙ্গে বা তাহারও পূর্ব্বে। ইংরাজীর বর্ণ-পরিচয়ের বই তাহার নিকট হইতে যত দূরে থাকে ততই মঙ্গল। তাহার শ্রবণ, দর্শন ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় গুলির সম্যক অনুশীলন করিতে হইবে পারিপার্শ্বিক জগতের সহিত পরিচয় করাইয়া।"

এইবার আর একটী সুন্দর প্রতিষ্ঠানের পরিচয় দিয়াই আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। এটী ২৪ পরগণার অন্তর্গত দক্ষিণ বারাসতের অনাথ ভাণ্ডারের বার্ষিক অধিবেশন। দক্ষিণ বারাসত একটী প্রসিদ্ধ পল্লী। এখানকার অধিবাসীগণ আজ তিন বৎসর হইল এই গ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের দরিদ্র ও অসহায়গণের যথাসাধ্য সাহায্যের জন্য এই অনাথভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। গ্রামের প্রবীণ ও যুবকগণের চেষ্টায় এই কয়বৎসর অল্প কয়েকজন দরিদ্র ও অসহায় বিধবা ও দুই চারিজন দরিদ্র ছাত্রের কিঞ্চিৎ সংস্থান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রতি মাসে যে দান পাওয়া যায়, তাহাতে উপস্থিত সাহায্যই চলে না বলিলে হয়, স্থায়ী ভাণ্ডার হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। আমরা আশা করি, গ্রামের অধিবাসী যাঁহারা বিদেশে সু-অবস্থায় বাস করিতেছেন, তাঁহারা তাঁহাদের গ্রামের এই সুন্দর পবিত্র প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইবেন।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যে সকল শ্রমিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে, ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহা বিশেষ কুদৃষ্টিতেই দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা এই সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত বলসেভিজমের সম্বন্ধ আছে। এই কারণ, গবর্ণমেণ্ট 'বলসেভিক বিতাড়ন আইন' নামে একটী আইনের খসড়া দিল্লীর রাষ্ট্রীয় পরিষদে উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং এই বিলটী যাহাতে সত্বরেই আইনে পরিণত হয়, তাহার জন্য যথোচিত চেষ্টা করিতেছেন। এই বিল সম্বন্ধে আলোচনাও আরম্ভ হইয়াছে। এদিকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে সকল শ্রমিক প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাদের নেতৃবর্গকে রাজবিদ্রোহী অপরাধে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং তাহাদের বিচার উত্তরপশ্চিমের মিরাট সহরে অতি শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। তাহার জন্য বিপুল আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। এই নেতাদের গ্রেপ্তার ও তাঁহাদের বিরুদ্ধে যে গুরুতর অভিযোগ আরোপ করা হইয়াছে, তাহার সহিত বলসেভিক আন্দোলনের বিশেষ যোগ আছে। এই জন্য কয়েকদিন পূর্ব্বে দিল্লীর রাষ্ট্রীয় পরিষদে যখন বলসেভিক বিতাড়ন বিলের সম্বন্ধে আলোচনার প্রস্তাব হয়, তখন পরিষদের সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত পেটেল মহোদয় বলেন যে, মিরাটের মামলা ও বর্ত্তমান বিল যখন একই ব্যাপার লইয়া, তখন দুইটীই একসঙ্গে চলিতে পারে না; হয় বিলের আলোচনা মিরাটের মামলা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ থাকুক, আর না হয় মিরাটের মামলা তুলিয়া লওয়া হউক, বিলের আলোচনা চলুক। তাঁহার এই অভিমতে গবর্ণমেণ্ট স্বীকৃত হন নাই; বড়লাট বলিয়াছেন, দুইটীই চলিবে এবং এ প্রকার ব্যবস্থা করিবার অধিকার সভাপতির নাই। আমাদের পত্রিকার এই অংশ যখন ছাপা হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে তখনও সভাপতি মহাশয় তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন নাই। সকলেই এ ব্যাপারের মীমাংসার কথা জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন।

দিক্‌শূল

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

২১

তিথওয়ায় উপস্থিত হয়ে কি ভাবে অনুসন্ধান আরম্ভ করবে,—প্রথমে রমাপদর গৃহে উপস্থিত হবে, না, পথে পল্লীবাসীদের কাছ থেকে সংবাদ আহরণ করবে, রমাপদর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে তাকে সমস্ত কথা স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করবে, না, গৃহের চাকর-বামুনদের কাছ থেকে সংবাদ জান্‌বার চেষ্টা করবে ইত্যাদি বিষয়ে নরেশ এবং সুরমার কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না, পরামর্শ ত হয়ই নি। সেই সব কথা ভাবতে ভাবতেই পথ শেষ হয়ে এল। নরেশ মনে মনে স্থির করলে 'ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে' নীতি অনুযায়ী যেমন অবস্থা উপস্থিত হবে তেমনি ব্যবস্থা করবে। সরমা নরেশের কর্ত্তব্য-বুদ্ধির উপর নির্ভর ক'রে ব'সে রইল।

রমাপদর বাংলোর কাছাকাছি এসে সরমা নরেশকে অনুরোধ করলে যে, গাড়ি যেন ভিতরে প্রবেশ না ক'রে রাজপথে অপেক্ষা করে, নরেশ প্রথমে ভিতরে গিয়ে সংবাদ জানবে, তার পর সে যেমন সংবাদ নিয়ে ফিরে আসবে তদনুযায়ী সরমার ভিতরে যাওয়া না যাওয়া স্থির হবে। কিন্তু বাংলোর সম্মুখে এসে উভয়ে দেখলে রাজপথ থেকে বাংলো বহু দূরে অবস্থিত, রাজ-পথে গাড়ি রাখ্‌লে রৌদ্রে অনেকখানি হেঁটে যেতে হয়। কি করা উচিত ভেবে ড্রাইভারকে আদেশ করবার সময় হ'ল না, গেট অতিক্রম ক'রে সবেগে গাড়ি বাংলোর কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করলে। সরমা বিপন্নভাবে নরেশের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "কি হবে জামাই বাবু?"

মৃদুস্বরে নরেশ বল্‌লে, "কি আবার হবে। তুমি না নেবে গাড়িতেই ব'সে থেকো।"

ততক্ষণে গাড়ি বাংলোর বারান্দার সম্মুখে এসে স্থির হ'ল।

আহারান্তে সরযু বারান্দায় একটা সবুজ রং করা বেতের ইজি চেয়ারে শুয়ে একখানা বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মোটরের শব্দে জেগে উঠে দেখলে গাড়ির ভিতর ব'সে দুজন অপরিচিত স্ত্রী-পুরুষ। স্খলিত আঁচলটা মাথার উপর তুলে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে ধীরে ধীরে সে এমন একটু আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল যেখান থেকে তাকে সম্পূর্ণ দেখা না যায়, অথচ অভ্যাগতদের প্রতি অমনোযোগী না হ'য়ে সে অপেক্ষা করছে তা' প্রকাশ পায়।

গাড়ির শব্দে একজন ভৃত্য বেরিয়ে এসেছিল, তাকে নরেশ জিজ্ঞাসা করলে, "এটা কি মালাবার হিল্ কোল্ কম্পার্ণের ম্যানেজার রমাপদ বাবুর বাড়ি?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"বাবু বাড়ি আছেন?"

"না হুজুর, সাহেব ত বাড়ি নেই, বেরিয়েছেন।"

"কখন আস্‌বেন বল্‌তে পার?"

ভৃত্য বললে, "আমি ত' ঠিক বল্‌তে পারি নে হুজুর, মা'কে জিজ্ঞেস ক'রে বল্‌ছি!" সরযুর সঙ্গে কথা ক'য়ে ফিরে এসে বল্‌লে, "সাহেব একটা খাদ দেখ্‌তে দূরে গেছেন, আজ সন্ধ্যায় যদি না আসেন ত কাল সকালে নিশ্চয় আস্‌বেন। আপনারা ত' ডাক গাড়িতে এসেছেন হুজুর?"

একটু বিস্মিত হয়ে রমাপদ বল্‌লে, "হ্যাঁ। তুমি তা কি ক'রে জান্‌লে?"

মৃদু হেসে ভৃত্য বল্‌লে, "আমি জানিনে হুজুর, মা ঠাক্‌রুণের অনুমান,—বল্‌লেন, ডাকগাড়ির সময়ে ট্যাক্সি ক'রে যখন এসেছেন তখন ডাকগাড়িতেই এসে থাক্‌বেন। আপনারা নেমে আসুন হুজুর।" তার পর ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, "করিম, জিনিস-পত্তর?"

ড্রাইভার বল্‌লে, "জিনিস পত্তর কিছু নেই।"

নরেশ সরমার দিকে চেয়ে দেখলে উত্তেজনায় সরমা জ্বল্‌ছে, আরক্ত মুখখানা অন্য দিকে ফিরিয়ে সে যেন নিঃশ্বাস রোধ ক'রে ব'সে রয়েছে। নরেশের ইচ্ছা ছিল যেরূপেই হ'ক সমস্যাটার একটা শেষ ক'রে যায়, কিন্তু সরমার তপ্ত মূর্ত্তি দেখে নামবার কথা তুলতেও সাহস হ'ল না, পাছে প্রস্তাবেই সরমা অত্যন্ত অপ্রীতিকর কোনো কাণ্ড ক'রে

বসে। বল্‌লে, "না, আমরা আর নামব না। যদি আর না আস্‌তে পারি ত তোমার সায়েবকে চিঠি দোবো।" তারপর ড্রাইভারকে গাড়ি চালাতে ইঙ্গিত করলে।

দূর হ'তে সরযূর মৃদু কণ্ঠধ্বনি শোনা গেল, "সাধু, শুনে যাও।"

ক্ষণকালের জন্য ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে ব'লে সাধুচরণ সরযূর নিকট উপস্থিত হ'ল, তারপর ফিরে এসে নরেশকে অনুনয়ের সহিত বল্‌লে, "হুজুর, মা বল্‌ছেন এমন সময়ে না নেয়ে খেয়ে চ'লে গেলে তিনি ভারি দুঃখিত হবেন —অন্ততঃ আজ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আপনারা সাহেবের জন্যে অপেক্ষা করুন।" তারপর গাড়ির পিছন দিক দিয়ে সরমার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বল্‌লে, "মা, আপনাকে মা নামবার জন্যে বিশেষ ক'রে বল্‌ছেন। ওই দেখুন উনি বেরিয়ে এসেছেন।"

সরযূর কুণ্ঠিত কণ্ঠধ্বনি শোনা গেল, "আসুন না!" এবার কিন্তু অনেক নিকটে।

নরেশ চেয়ে দেখলে মাথার কাপড়টা কপালের উপর একটু টেনে দিয়ে সরযূ গাড়ির পিছনের দিকে বারান্দার সীমান্তে এসে দাঁড়িয়েছে, মাত্র কয়েকটা সিঁড়ি নামতে বাকি। ত্রস্ত হ'য়ে সরমার দিকে তাকিয়ে সরমার রুষ্ট বিমুখ মুখের অবস্থা দেখে নরেশের মনে পড়ল গাড়িতে সরমার মূর্চ্ছিত হওয়ার কথা। তাড়াতাড়ি ড্রাইভারকে গাড়ি চালাতে আদেশ ক'রে স্খলিত কণ্ঠে সে বল্‌লে, "না, না, আমাদের নামবার সুবিধে হবে না।"

এ কথা সে কাকে সম্বোধন ক'রে বললে—সাধুচরণকে, না সরযূকে—তা ঠিক বোঝা গেল না, কিন্তু পরমুহূর্ত্তে গাড়ি চল্‌তেই যে তার যুক্ত কর ঊর্দ্ধোত্থিত হ'য়ে মিলিত হ'ল উপেক্ষিতা সরযূর প্রতি ত্রুটি মোচনেরই উদ্দেশ্যে, তা সরযূও বুঝলে।

গাড়ি কিছু দূর অগ্রসর হ'তেই সাধুচরণ দ্রুতবেগে তার পিছনে পিছনে ছুটল—"করিম! করিম! একবার থামাও!"

গাড়ি থাম্‌লে নিকটে এসে সাধুচরণ নরেশকে বল্‌লে, "মা আপনার নাম জান্‌তে পাঠালেন,—সাহেব এলে বল্‌তে হবে।"

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা ক'রে নরেশ বল্‌লে, "নাম বল্‌বার দরকার নেই,—একজন পরিচিত লোক দেখা করতে এসেছিল বল্‌লেই হবে।" তারপর ড্রাইভারকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লে, "চলো।"

কয়েক হাত অগ্রসর হ'য়েই কি ভেবে নরেশ পুনরায় গাড়ি থামিয়ে সাধুচরণকে ডাক্‌লে, "ওহে, একবার শুনে যাও।"

সাধুচরণ নিকটে এলে নরেশ জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার মা-ঠাক্‌রুণ সায়েবের কে হন?"

"মা-ঠাক্‌রুণ?—সাহেবের পরিবার হ'ন হুজুর।"

রমাপদ ও সরযূর সম্বন্ধ যে শুধু বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীরই নয়, পরন্তু একটা দুর্ভেদ্য রহস্যে আবৃত তা রমাপদর অনুচরবর্গও জান্‌ত, কিন্তু প্রভুর অপ্রীতিভাজন হবার আশঙ্কায় কখনো তারা প্রকাশ্যে সে কথা স্বীকার করত না, বিশেষত অপরিচিত ব্যক্তির নিকট।

একটু চিন্তা ক'রে নরেশ জিজ্ঞাসা করলে, "কতদিন হ'ল উনি এখানে এসেছেন?"

"তা'ত আমি বল্‌তে পারিনে হুজুর, আমি ধানবাদে কিরণবাবু উকিলের বাড়ি চাকরি করতাম, কিরণবাবু মারা যাওয়ার পর মাস দুই এখানে আছি। আমি বরাবরই মা-ঠাক্‌রুণকে দেখ্‌চি।"

মনিব্যাগ থেকে একটি পাঁচ টাকার নোট বার ক'রে সাধুচরণকে কাছে ডেকে নিয়ে অপরের অলক্ষ্যে তার হাতে গুঁজে দিয়ে মৃদুস্বরে নরেশ বল্‌লে, "এবার যখন এসে তোমার সায়েবের বাড়ি উঠ্‌ব তোমাকে ভাল ক'রে বক্‌সিস্ দিয়ে যাব।"

বর্ত্তমানের আনন্দে এবং ভবিষ্যতের আশায় সাধুচরণের মুখ উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ল। গাড়ি থেকে না নেমেই যদি পাঁচ টাকা হয়, তা হ'লে নাম্‌লে যে অন্ততঃ দশ টাকা হবে তা'তে আর সন্দেহ কি! কিন্তু সাধুচরণ নির্ব্বোধ নয়, সে বুঝ্‌লে এ ঠিক বক্‌সিসের টাকা নয়, এ লেন-দেনের টাকা; পরিতুষ্টির পুরস্কার নয়, প্রয়োজনের মূল্য। দূর থেকে সরযূ যাতে দেখ্‌তে না পায় এমন আড় ভাবে নোটখানা ট্যাঁকে গুঁজ্‌তে গুঁজ্‌তে প্রফুল্ল মুখে সাধুচরণ বল্‌তে লাগ্‌ল, "আস্‌বেন বই কি হুজুর!—আপনারা না আস্‌বেন ত' কে আস্‌বে?"

অতি মৃদুস্বরে নরেশ বল্‌লে, "একটি কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি—কাউকে যেন বোলো না।"

জিহ্বা এবং তালুর সাহায্যে বিস্ময়ব্যঞ্জক শব্দ-বিশেষ নির্গত ক'রে সাধুচরণ বল্‌লে, "রাম, রাম! তা-ও কখনো বলি হুজুর।"

"তোমার মা-ঠাক্‌রুণ সায়েবকে কি ব'লে ডাকেন?"

মনে মনে কি চিন্তা ক'রে সাধু বল্‌লে, "এমন কিছু ব'লে ...' ডাকেন না,—অম্‌নি ওগো, হ্যাঁ গো ব'লে ডাকেন।"

"আর তোমার সায়েব মা-ঠাক্‌রুণকে কি ব'লে ডাকেন ?"

সাধু স্থির করলে মাত্র পাঁচ টাকার পরিবর্ত্তে নিজের প্রয়োজনীয়তা একেবারে নিঃশেষ ক'রে দেওয়া ভাল হবে না; একটু চিন্তার ভান ক'রে বল্‌লে, "তা'ত ঠিক খেয়াল হচ্চে না হুজুর,—এবার ঠাওর ক'রে রাখ্‌ব।"

"তোমার মা-ঠাক্‌রুণের নাম কি ?"

"সরযূ।"

নরেশের মুখে ক্ষীণ হাসির দীপ্তি খেলে গেল; বল্‌লে, "তা' তুমি জান্‌লে কি ক'রে ? সায়েব তোমাকে বলেছেন, না মা-ঠাক্‌রুণ বলেছেন ?"

অপ্রস্তিত হ'য়ে সাধু বল্‌লে, "এখন মনে পড়েছে হুজুর! সাহেব মাঝে মাঝে মা-ঠাক্‌রুণকে সরযূ ব'লে ডাকেন।"

নরেশ বল্‌লে, "আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার।" তারপর ড্রাইভারকে গাড়ি চালাতে আদেশ দিলে।

সরযূর কাছে উপস্থিত হ'য়ে সাধুচরণ বল্‌লে, "না মা, নাম উনি বললেন না। বল্‌লেন, বোলো পরিচিত লোক দেখা করতে এসেছিল।"

সাধুচরণের কথা শুনে সরযূর মুখের মধ্যে চিন্তার একটা সুস্পষ্ট ছায়া দেখা দিলে; বল্‌লে, "আর কি-সব কথা হ'ল ?"

"আর তেমন কোনো কথা ত হয় নি মা।"

সরযূর মুখ কঠোরভাব ধারণ করল; তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বল্‌লে, "অতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু এই কথাটুকু হ'ল ? গাড়ি ছেড়ে দিয়ে ফের দাঁড় করিয়ে তোমাকে ডেকে কত কথা বল্‌লেন—সে কি সব এই কথা ? বল কি কথা হ'ল—মনে ক'রে ক'রে!"

মাথা চুল্‌কোতে চুল্‌কোতে একটু ইতস্ততঃ ভাবে সাধু বল্‌লে, "আপনি সাহেবের কে হ'ন জিজ্ঞাসা করছিলেন।"

"আর কি জিজ্ঞাসা করছিলেন ?"

ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে সাধু বল্‌লে, "আপনি সায়েবকে কি ব'লে ডাকেন জিজ্ঞাসা করছিলেন।"

"আর ?"

"আর,—আপনি কতদিন এখানে এসেছেন জিজ্ঞাসা করছিলেন।"

"আর কোনো কথা হ'য়েছিল ?"

সরযূর এ প্রশ্নের ভঙ্গীতে সাধুচরণ নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌ল; বল্‌লে, "না মা, আর কোনো কথা হয়নি।"

নীরবে ক্ষণকাল কি ভেবে সরযূ জিজ্ঞাসা করলে, "সেই মেয়েমানুষটি কোনো কথা জিজ্ঞেস ক'রেছিলেন ?"

"না, তিনি একটি কথাও জিজ্ঞাসা করেননি, বাবুটিই জিজ্ঞাসা করছিলেন।"

"কথাবার্ত্তা যখন হচ্ছিল তখন সে মেয়েমানুষটি কি করছিলেন ?"

"ঠিক সেই রকম ভাবে মুখ ফিরিয়ে চুপ ক'রে বসে-ছিলেন। আর মুখ যেন মা একখানা আগুনের চাকা—লাল টকটক্ করচে!"

সাধুচরণকে বিদায় দিয়ে সরযূ ক্ষণকাল সেখানে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবলে, তারপর সেই বেতের ইজি চেয়ারে আশ্রয় নিয়ে বইখানা খুলে পড়তে আরম্ভ করলে। একপাতা শেষ ক'রে পাতা উল্টে পড়তে গিয়ে দেখ্‌লে পূর্ব্ব পাতায় যা পড়েছে তার একটি বর্ণ মনে নেই; বিরক্ত হ'য়ে বইখানা রেখে দিয়ে নিজের শয়ন কক্ষে উপস্থিত হ'ল।

দিন কুড়িক পূর্ব্বে একজন ভ্রাম্যমান্ ফটোগ্রাফার ঝরিয়া অঞ্চলে এসেছিল, সে কুঠিতে কুঠিতে উপস্থিত হ'য়ে ফটো তুলে বেড়াচ্ছিল। তার অনুরোধে রমাপদকে একখানা ফটো তুল্‌তে হয়, এবং রমাপদর অনুরোধে অনেক ওজর আপত্তির পর সরযূরও একটা ফটো তোলা হয়। রমাপদ সেই ফটোর মধ্যে একখানা নিজের ছবি সরযূর ঘরে, আর একখানা সরযূর ছবি নিজের ঘরে টাঙিয়ে দিয়েছিল। রমাপদর ছবির সাম্‌নে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সরযূ কত কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে ছবিখানা দেখ্‌তে লাগল। ফটো তোলাবার জন্য পীড়াপীড়ির মধ্যে রমাপদর একটা কথা মনে পড়্‌ল। রমাপদ বলেছিল, 'তোমার মন যদি নানা রকম সংস্কার দিয়ে আচ্ছন্ন না থাক্‌ত, তা হ'লে তুমি আমি পাশাপাশি ব'সে একটা ফটো তোলাতাম সরযূ। তোমার আমার মধ্যে একটা যে মিলন ঘটেচে এ তুমি কিছুতেই স্বীকার করতে চাও না, পাছে সে মিলন অন্য কোনো রকম মিলনের মত মনে হ'য়ে বীভৎস ঠেকে, পাছে গলার হারকে গলার দড়ি ব'লে লোকে ভুল করে। তোমার আমার মিলন স্বামী-স্ত্রীর মিলন নয়, ভাই-বোনের মিলন নয়—এমন কি সখা-সখীর মিলনও নয়;—এ মানুষের

সঙ্গে মানুষের মিলন, আমাদের ক্ষেত্রে ঘটনাক্রমে একজন পুরুষের সঙ্গে একজন স্ত্রীলোকের। এর মধ্যে কাম নেই, হয় ত' প্রেমও নেই—তবু এ মিলন।'

রমাপদর ছবি দেখ্‌তে দেখ্‌তে কথাগুলো মনে প'ড়ে একটা গভীর অভিমানে ও দুঃখে সরযুর হৃদয় আলোড়িত হ'য়ে উঠল; মনে মনে বল্‌লে, 'কাম না থাকুক, প্রেম না থাকুক,—তবুও এর মধ্যে কত বড় বাধা আছে তা' ত জান না।' সরযুর শঙ্কাকুল বিক্ষুব্ধ মনের তিমিরাচ্ছন্ন পটে সে বাধার মূর্ত্তি ফুটে উঠ্‌ল একটা নীরব নিঃশব্দ লাল টক্‌টকে আগুনের চাকার মতো।

সরযুর মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ নির্গত হ'ল। সে দ্রুতপদে গিয়ে তার শয্যার উপর শুয়ে পড়ল। রমাপদর প্রতি অভিমান নিপীড়িত সাপের মত তার মনের মধ্যে পাক খেতে লাগ্‌ল,—'কেন তুমি সব কথা খুলে বলনি, কেন তুমি সব কথা গোপন করেছিলে?—একজন অসহায় নারীকে নিয়ে এ কি তোমার দুর্দ্দিনের খেলা!'

শয্যা ভাল লাগ্‌ল না। উঠে প'ড়ে সরযূ অস্থির হ'য়ে কিছুক্ষণ ধ'রে সমস্ত বাড়িময় ঘুরে বেড়ালো, বাড়ি নিলাম হ'য়ে গেলে আদালতের নোটিস্ পেয়ে দেনদার যেমন ক'রে ঘুরে বেড়ায় কতকটা তেমনি। তারপর দেহ ও মনে পরিশ্রান্ত হ'য়ে আবার শয্যার উপর লুটিয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে সাধুচরণ এসে বল্‌লে "মা, সেই বাবুটি আবার এসেছেন। আপনাকে একবার ডাকছেন।"

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দাস প্রণীত উপন্যাস "ভাবিনী"—১৷০
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দী প্রণীত "বিলাত ভ্রমণ"—২৲
শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত "বেতার যন্ত্র নির্ম্মাণ"—৷৵০
শ্রীযুক্ত মৃণালকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রণীত পৌরাণিক রঙ্গনাট্য "শিবের বর"—৷৵০
শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু প্রণীত উপন্যাস "নষ্টোদ্ধার"—১৷০
শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল প্রণীত স্বরলিপি সংগ্রহ "পথের বাঁশী"—৸০
পণ্ডিত কন্দর্পমোহন ভট্টাচার্য্য অনুবাদিত তুলসীদাস গোস্বামী কৃত "বিনয় পত্রিকা"—২৲

নিবেদন

আগামী আষাঢ় মাসে 'ভারতবর্ষে'র সপ্তদশ বর্ষ আরম্ভ হইবে

ভারতবর্ষের মূল্য মণিঅর্ডারে বার্ষিক ৬।৵০, ভি, পিতে ৬॥৵০, ষাণ্মাসিক ৩৷৵০ আনা, ভি, পিতে ৩।৵০। এই জন্য ভি, পিতে ভারতবর্ষ লওয়া অপেক্ষা **মণিঅর্ডারে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধাজনক।** ভি, পির টাকা বিলম্বে পাওয়া যায়, সুতরাং পরবর্ত্তী সংখ্যার কাগজ পাইতে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা। **২৫শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে টাকা না পাওয়া গেলে আষাঢ় সংখ্যা ভি, পি করা হইবে।** পুরাতন ও নূতন গ্রাহকগণ কুপনে কাগজ পাঠাইবার পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ কুপনে **গ্রাহক নং** দিবেন। নূতন গ্রাহকগণ **নূতন** বলিয়া উল্লেখ করিবেন; নতুবা টাকা জমা করিবার বিশেষ অসুবিধা হয়।

পুনশ্চ—এই ষোড়শ বর্ষকাল "ভারতবর্ষ" কি করিয়াছে, না করিয়াছে, তাহা পাঠক-পাঠিকা মহোদয়গণের অগোচর নাই—১৯২ খানি "ভারতবর্ষে" তাহার পূর্ণ পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। কেবল এক বৎসরের কথাই বলি—ষোড়শবর্ষে কিঞ্চিদধিক ২০০০ পৃষ্ঠা পঠিতব্য বিষয়, ৬০ খানি বহুবর্ণ চিত্র ও ন্যূনাধিক ৯০০ একবর্ণ চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ষোড়শবর্ষ পূর্ব্বে "ভারতবর্ষে"র আসন্ন আগমন-বার্ত্তা প্রকাশিত হইবামাত্র বঙ্গের সুধি-সমাজে যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা এই ষোড়শ বর্ষকালের মধ্যে একটুও হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই; প্রথম বর্ষ হইতেই "ভারতবর্ষ" যে শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব লাভ করিয়াছিল, আজও তাহা একটুও ম্লান হয় নাই। প্রতি বৎসরই "ভারতবর্ষে" কোন না কোন বিশেষত্ব বিকশিত হইয়াছে, পাঠক পাঠিকা মহোদয় মহোদয়াগণও সাদরে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। সপ্তদশ বর্ষের জন্য "ভারতবর্ষ" কিরূপ আয়োজন করিয়াছে, আমরা নিজ মুখে সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে চাহি না—বিগত ষোড়শ বর্ষের "ভারতবর্ষে"র কথা বিবেচনা করিয়া পাঠকগণ স্বয়ং তাহা অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন। কর্ম্মকর্ত্তা—"ভারতবর্ষ"

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA.
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET CALCUTTA.

Printer—NARENDRANATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকীল

জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৬

দ্বিতীয় খণ্ড | ষোড়শ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

দিব্য সত্য ও পন্থা

শ্রীঅরবিন্দ

গীতা অতঃপর সেই চরম ও পূর্ণ রহস্য, সেই এক তত্ত্ব ও সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করিতে চলিয়াছে,—সিদ্ধি ও মুক্তির প্রার্থীকে যাহাতে বাস করিতে শিখিতে হইবে, সেই এক ধর্ম্মকে অনুসরণ করিয়াই তাহার অধ্যাত্ম অঙ্গসমূহের এবং তাহাদের সকল প্রক্রিয়ার পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে হইবে। এই চরম সত্য হইতেছে বিশ্বাতীত ভগবানের রহস্য,—তিনিই সব এবং সর্ব্বত্র বিরাজিত; অথচ বিশ্ব এবং বিশ্বের সকল রূপ অপেক্ষা তিনি এত মহত্তর ও বিভিন্ন যে, এখানে কোন কিছুর মধ্যেই তিনি সীমাবদ্ধ নহেন, কোন কিছুই বস্তুতঃ তাঁহাকে প্রকট করিতে পারে না,—দেশ ও কালের মধ্যে যে সব বস্তু আবির্ভূত হইয়াছে এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ, এই সকল বুঝাইতে যে ভাষা প্রয়োগ করা হয়, তাহা তাঁহার অচিন্ত্য সত্তার স্বরূপ ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহে। অতএব আমাদের সিদ্ধিলাভের নীতি হইতেছে আমাদের সমগ্র প্রকৃতি দিয়া ভজনা এবং ইহার মূল অধিকারীর নিকট আত্মসমর্পণ। সব শেষে আমাদের এক পথ হইতেছে, এই সংসারে আমাদের সমগ্র জীবনকে (শুধু ইহার কোন এক অংশকেই নহে) অনন্তের দিকে একাগ্র ভাবে প্রবাহিত করা। এক দিব্য যোগের শক্তি ও রহস্যের দ্বারা আমরা তাঁহার অনির্ব্বচনীয় নিগূঢ় সত্তার মধ্য হইতে এই প্রতিভাসিক জগতের সীমাবদ্ধ প্রকৃতির মধ্যে আসিয়াছি। সেই যোগেরই এক বিপরীত প্রক্রিয়ার দ্বারা আমাদিগকে প্রতিভাসিক প্রকৃতির সকল সীমা অতিক্রম করিতে হইবে, এবং সেই

মহত্তর চেতনাকে ফিরিয়া পাইতে হইবে, যাহার দ্বারা আমরা ভগবানের মধ্যে, অনন্তের মধ্যে বাস করিতে পারিব।

ভগবানের যে শ্রেষ্ঠতম সত্তা তাহা অব্যক্ত—কখনও প্রকাশিত হয় না; তাঁহার যে সত্য শাশ্বত মূর্ত্তি তাহা জড়ের মধ্যে ব্যক্ত হয় না, প্রাণও তাহাকে ধরিতে পারে না. মনও তাহাকে চিন্তা করিতে পারে না,—অচিন্ত্যরূপ, অব্যক্তমূর্ত্তি *। আমরা যাহা দেখিতে পাই তাহা কেবল ভগবানের আত্মসৃষ্ট রূপ,—তাঁহার শাশ্বত রূপ, স্বরূপ নহে। এমন একজন আছেন, অথবা এমন এক সত্তা আছে, যাহা বিশ্ব হইতে ভিন্ন, অপ্রকাশ্য, অচিন্ত্য, এক অনির্ব্বচনীয় অনন্ত ভাগবত সত্তা,—অনন্ত সম্বন্ধে আমরা যতই বিরাট বা যতই সূক্ষ্ম ধারণা করি না কেন, সেই সত্তা সে ধারণার বহু ঊর্দ্ধে। এই যে-সকল জিনিষের সমবায়কে আমরা বিশ্বজগৎ বলিয়া অভিহিত করি, এই যে-সব বিরাট গতিশীলতার সমষ্টি যাহার কোন সীমানা আমরা নির্দ্ধারণ করিতে পারি না এবং যাহার বিভিন্ন রূপ ও প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা কোনও স্থায়ী বস্তু খুঁজিয়া পাই না, দাঁড়াইয়া ধরিবার মত কোন স্থান, স্তর বা কেন্দ্র খুঁজিয়া পাই না—সে-সব এই উর্দ্ধতন অনন্ত সত্তা কর্ত্তৃক প্রকট হইয়াছে, নির্ম্মিত হইয়াছে, বিস্তৃত হইয়াছে, এই অনির্ব্বচনীয়, বিশ্বাতীত রহস্যের উপরে সে সব বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। এক আত্ম-অভিব্যক্তির উপরে এই সব বিধৃত রহিয়াছে, তাহা নিজে অব্যক্ত, অচিন্ত্য। এই যে-সব সৃষ্টি অনবরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, চলিতেছে, এই সব জীব, সব ভূত, সব জিনিষ, সব জীবন্ত মূর্ত্তি,—ইহারা সকলে মিলিয়া অথবা স্বতন্ত্র ভাবে তাঁহাকে ধারণা করিতে পারে না। তিনি তাহাদের মধ্যে নাই, তাহাদের মধ্যে, তাহাদের দ্বারা তাঁহার জীবন ও কর্ম্মের লীলা চলিতেছে না,—ভগবান এই ভূতজগৎ নহেন। তাহারাই তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে, তাহাদেরই জীবন ও কর্ম্মের লীলা তাঁহার মধ্যে চলিতেছে, তাঁহা হইতেই তাহাদের সত্য উদ্ভূত; তাহারা তাঁহার ভূত (becomings), তিনি তাঁহাদের মূল সত্তা (being), মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ। অন্তহীন দেশ ও কালের মধ্যে এই যে সীমাহীন জগৎ, ভগবান তাঁহার সত্তার অচিন্ত্য দেশকালাতীত আনন্ত্যের মধ্যে ইহাকে এ ক্ষুদ্র ব্যাপার রূপে বিস্তৃত করিয়াছেন।

সব তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে, ইহা বলিলেও আবার বিষয়ের সমস্ত সত্যটা বলা হয় না, প্রকৃত সম্বন্ধটা সমগ্র ভা[বে] বলা হয় না; কারণ, এরূপ বলিলে ভগবানের উপর দে[শ]বাচক ভাব আরোপ করা হয়। কিন্তু ভগবান দেশ [ও] কালের অতীত †। দেশ ও কাল, অনুস্যূ[তি] (immanence) ও ব্যাপ্তি (pervasion) ও অতিক্রা[ন্তি] (exceeding)—এ-সব তাঁহার চৈতন্যের খেলা। তাঁহা[র] ঐশ্বরিক শক্তির এক যোগ আছে,—মে যোগঃ ঐশ্বরঃ,—সেই যোগের দ্বারা পরম ভগবান তাঁহার আপনার অন[ন্ত] আত্মরূপায়ণের মধ্যে নিজের নানা নামরূপের প্রকাশ করেন সে আত্মরূপায়ণ জড় নহে, অধ্যাত্ম,—জড়জগৎ সেই আত্ম রূপায়ণের কেবল বাহ্যিক প্রতিচ্ছবি মাত্র। তাহার সহি[ত] তিনি নিজেকে এক করিয়া দেখেন, তাহার সহিত এবং তাহা[র] মধ্যে যাহা কিছু আশ্রয় পাইয়াছে, সেই সকলের সহি[ত] ভগবান একীভূত হন। এই অনন্ত আত্মদর্শন তাঁহার সমগ্র আত্মদর্শন নহে (pantheist মতানুসারে ভগবানের সহি[ত] বিশ্বকে যে এক বলা হয় তাহা ইহা অপেক্ষা আরও সঙ্কীর্ণ)। এই আত্মদর্শনে তিনি যাহা কিছু আছে সবের সহিত এক, আবার সেই সঙ্গেই তিনি সেই সবের অতীত; কিন্তু এই যে আত্মা বা অধ্যাত্মসত্তার বিস্তৃত অনন্ততা যাহা বিশ্বকে ধরিয়া রাখিয়াও বিশ্বের অতীত, ভগবান ইহা হইতেও অন্য। তাঁহার বিশ্বচেতন অনন্ত সত্তার মধ্যে এখানে সব কিছুই রহিয়াছে, কিন্তু আবার সেইটিকেও ভগবানের বিশ্বাতীত সত্তা আত্মচেতনার এক সৃষ্টিরূপে ধরিয়া রহিয়াছে,—আমরা বিশ্ব বা সত্তা বা চেতনা বলিতে যাহা বুঝি, ভগবানের সেই বিশ্বাতীত সত্তা সে সকলেরই উপরে। ইহাই ভগবানের সত্তার নিগূঢ় রহস্য যে তিনি বিশ্বাতীত, অথচ তিনি একেবারেই যে বিশ্বের বাহিরে তাহাও নহে। কারণ এই সবের আত্মারূপে তিনি সর্ব্বত্র অনুস্যূত রহিয়াছেন; ভগবানের এক ভাস্বর মুক্ত

* ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ। গীতা ৯।৪

† ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ। ৯।

আত্মসত্তা,—মম আত্মা—সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে, সর্ব্ব ভূতের সহিত তাহার নিত্য সম্বন্ধ, তিনি কেবল আছেন বলিয়াই সকলে বিশ্বলীলায় আবির্ভূত হইতেছে,—ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ। এই জন্যই আমরা দুইটি তত্ত্ব পাইতেছি, সৎ (being) ও সৃষ্টি (becoming), স্বপ্রতিষ্ঠিত আত্মা এবং ইহার উপরে প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বভূত, ভূতানি, ক্ষর সত্তা এবং অক্ষর সত্তা। কিন্তু এই যুগল তত্ত্বের উচ্চতম সত্য এবং তাহাদের মধ্যে বিরোধের সমন্বয় কেবল সেইখানেই পাওয়া যাইতে পারে যাহা এই বিরোধের অতীত, তাহা পরম ভগবান, তিনি তাঁহার যোগমায়ার (অর্থাৎ অধ্যাত্মচেতনার শক্তির) দ্বারা আধার আত্মা এবং আধেয় সর্ব্বভূত এতদুভয়কেই প্রকট করিতেছেন। আমাদের অধ্যাত্মচেতনায় তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়াই আমরা তাঁহার সত্তার সহিত আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধের সন্ধান পাইতে পারি।

দার্শনিকের ভাষায় গীতার এই শ্লোকগুলির ইহাই অর্থ; কিন্তু তাহাদের ভিত্তি মানসিক যুক্তিতর্কের উপর নহে, পরন্তু অধ্যাত্ম উপলব্ধির উপরে। তাহারা সমন্বয় সাধন করে; কারণ, অধ্যাত্মচেতনার কতকগুলি সত্য হইতে তাহারা অখণ্ডভাবে উঠিয়াছে। জগতে গুপ্ত বা প্রকাশ্যভাবে যে পরম বা বিশ্বব্যাপী সত্তা, আমরা যখন তাহার সহিত নিজেদের সচেতন সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করি, তখন বহুপ্রকারের বিভিন্ন উপলব্ধি আমরা পাই, এবং ভিন্ন ভিন্ন লোকের বুদ্ধি এই বিচিত্র উপলব্ধির কোন একটি বিশেষ দিককে লইয়া জগতের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ধারণায় উপনীত হয়। প্রথমেই আমরা এক ভাগবত সত্তার অল্পই উপলব্ধি পাই,—তিনি আমাদের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও মহত্তর, আমরা যে জগতে বাস করিতেছি তাহা হইতেও তিনি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও মহত্তর— কেবল এইটুকুই, আর বেশী কিছু উপলব্ধি হয় না যতক্ষণ আমরা আমাদের বাহিরের সত্তার মধ্যে বাস করি এবং আমাদের চতুর্দ্দিকে জগতের প্রতিভাসিক (phenomenal) রূপটাই নিরীক্ষণ করি। কারণ, পরম ভগবানের যে পরম সত্য তাহা বিশ্বাতীত, এবং যাহা কিছু বাহিরের, প্রতিভাসিক, মনে হয় সে-সব স্ব-চেতন আত্মার আনন্ত হইতে ভিন্ন, মনে হয় তাহা এক নীচের সত্যের প্রতিচ্ছবি, হয় ত বা একেবারেই মিথ্যা ভ্রম, মায়া। যতক্ষণ আমরা এই ভেদজ্ঞান লইয়া চলি, ততক্ষণ মনে হয় যে, ভগবান বিশ্বের বাহিরে অবস্থিত। তিনি তাই, শুধু এই অর্থে যে যেহেতু তিনি বিশ্বাতীত সেইহেতু তিনি বিশ্বের মধ্যে এবং বিশ্বের সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহেন, কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, এই সব তাঁহার সত্তার বাহিরে; কারণ, সেই এক অনন্ত ও সত্য বস্তুর বাহিরে কিছুই নাই। ভগবান সম্বন্ধে এই প্রথম সত্য আমরা অধ্যাত্মভাবে উপলব্ধি করি যখন আমাদের অনুভূতি হয় যে, আমরা কেবল তাঁহার মধ্যেই বাস করিতেছি, তাঁহার মধ্যেই ঘুরিতেছি, ফিরিতেছি,—তাঁহা হইতে আমরা যতই বিভিন্ন হই না কেন, আমাদের অস্তিত্বের জন্য আমরা তাঁহারই উপরে নির্ভর করি—এবং এই বিশ্বজগৎও আত্মারই কেবল একটা প্রকাশ ও লীলা।

কিন্তু আবার ইহা ছাড়াও আরও উপরের অনুভূতি আমরা পাই যে, আমাদের যে আত্মসত্তা তাহা তাঁহার আত্মসত্তার সহিত এক। সর্ব্বভূতের এক আত্মা আমরা উপলব্ধি করি এবং সে সম্বন্ধে আমরা চেতনা ও দৃষ্টিলাভ করি। তখন আর আমরা বলিতে পারি না বা ভাবিতে পারি না যে, আমরা তাঁহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; কিন্তু বুঝি যে, স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তার আছে আত্মা (Self) এবং বহিঃপ্রকাশ (Phenomenon); আত্মাতে সকলেই এক, কিন্তু বহিঃপ্রকাশে সকলেই বিভিন্ন। কেবলমাত্র আত্মার সহিত একান্ত আবেগে যোগ সাধনা করিলে আমাদের এমনও অনুভূতি হইতে পারে যে, বহিঃপ্রকাশটা কেবল একটা স্বপ্নবৎ, অসত্য। কিন্তু, আবার দুই দিকেই সমান আবেগ হইলে আমরা একই সঙ্গে দুই রকম অনুভূতি পাইতে পারি, আত্মসত্তায় তাঁহার সহিত এক পরম ঐক্য উপলব্ধি করিতে পারি, অথচ উপলব্ধি হইতে পারে যে, আমরা তাঁহার সঙ্গে বাস করিতেছি, তাঁহার সহিত নানা ভাবে নিত্য সম্বন্ধে যুক্ত হইয়া রহিয়াছি, প্রকৃত পক্ষে আমরা তাঁহার সত্তা হইতেই উৎপন্ন।—এই বিশ্বজগৎ এবং বিশ্বজগতে আমাদের অস্তিত্ব এ-সবই আমাদের কাছে হয় ভগবানের স্ব-চেতন সত্তার এক নিত্য ও সত্য রূপ। এই অপেক্ষাকৃত নীচের সত্যে আমরা পাই তাঁহার সহিত পার্থক্যের সম্বন্ধ,—অনন্তের অন্য সমস্ত চেতন বা অচেতন শক্তির সহিত আমাদের পার্থক্যের সম্বন্ধ, বিশ্ব-প্রকৃতিতে তাঁহার যে বিশ্ব-আত্মা রহিয়াছে তাহার সহিত আমাদের ব্যবহারের সম্বন্ধ। এই সকল সম্বন্ধ বিশ্বাতীত সত্য হইতে বিভিন্ন, তাহারা আত্মার

চেতনার একটা শক্তির নীচের সৃষ্টি, এবং যেহেতু তাহারা বিভিন্ন এবং যেহেতু তাহারা সৃষ্ট সেইহেতু একমাত্র বিশ্বাতীত পরম বস্তুর উপাসকগণ এ সকলকে আংশিক বা সর্ব্বৈব ভাবেই মিথ্যা, মায়া বলিয়াই ঘোষণা করেন। অথচ এ-সকল তাঁহা হইতেই আসিয়াছে, তাঁহারই সত্তা হইতে উৎপন্ন রূপ,—মিথ্যা শূন্য হইতে তাহারা সৃষ্ট হয় নাই। কারণ, আত্মা সর্ব্বত্র যাহা দেখিতেছে, সে সবই সে নিজে এবং তাহার নিজের রূপ, তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন কিছুই নহে। আর ইহাও আমরা বলিতে পারি না যে, সেই মূল হইতে উৎপন্ন চৈতন্য শক্তির দ্বারা তাহারা সৃষ্ট অথচ সেই মূলে এমন কিছুই নাই যাহাতে তাহাদের ভিত্তি ও সার্থকতা, এমন কিছুই নাই যাহা তাঁহার সত্তার এই সকল রূপের সনাতন সত্য এবং উপরের স্বরূপ।

আবার অন্য এক দিকে যদি আমরা আত্মা ও আত্মার রূপ সমূহ এতদুভয়ের পার্থক্যের উপরে জোর দিই, আমাদের উপলব্ধি হইতে পারে যে, আত্মা সকলকে ধরিয়া রহিয়াছে,—সকলের মধ্যে অনুস্যূত; আমরা স্বীকার করিতে পারি যে, আত্মা সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তথাপি আত্মার রূপসমূহ, যে-সব আকারের মধ্যে আত্মা বিরাজমান, সে-সব যে আমাদের কাছে আত্মা হইতে বিভিন্ন বলিয়াই প্রতিভাত হইতে পারে, অনিত্যরূপ বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে, শুধু তাহাই নহে, সে-সব একেবারে অসত্য ছায়ামাত্র বলিয়াই মনে হইতে পারে। একদিকে আমরা উপলব্ধি করিতেছি সেই আত্মাকে, সেই অক্ষর পুরুষকে যিনি নিজের দৃষ্টির মধ্যে বিশ্বের ক্ষর লীলাকে চিরকাল ধরিয়া রহিয়াছেন, অন্যদিকে আমাদের এই অনুভূতিও হইতেছে যে, ভগবান আমাদের মধ্যে এবং সর্ব্বভূতের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছেন; এই অনুভূতিটি আগেকার অনুভূতি হইতে পৃথকভাবে হইতে পারে অথবা এক সঙ্গে হইতে পারে, অথবা মিশিয়া হইতে পারে। তথাপি আমাদের মনে হইতে পারে যে, বিশ্বজগৎ তাঁহার ও আমাদের চৈতন্যের একটা বাহ্য রূপ, অথবা একটা প্রতিরূপ বা প্রতীক যাহার দ্বারা আমরা তাঁহার সহিত সার্থক সম্বন্ধ সৃষ্টি করিতে পারি এবং ক্রমশঃ তাঁহার জ্ঞানে গড়িয়া উঠিতে পারি।—কিন্তু আবার অন্যদিকে, আমাদের আর এক প্রকার অধ্যাত্ম অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান হয় যাহাতে আমরা সব জিনিষকেই একেবারে ভগবান বলিয়া দেখিতেই বাধ্য হই,—এই জগতে এবং ইহার অগণ্য জীবের মধ্যে তিনি অক্ষররূপেই বিরাজিত নহেন, কিন্তু ভিতরে ও বাহিরে যাহা কিছু হইয়াছে সে সবই তিনি। তখন সবই হয় আমাদের কাছে এক দিব্য সত্য বস্তু যাহা আমাদের মধ্যে এবং জগতের মধ্যে আবির্ভূত হইতেছে। যদি কেবল এই অনুভূতিই হয়, তাহা হইলে আমরা সর্ব্বেশ্বরবাদীদের—(Pantheists) ঐক্য পাই,—সেই একই সব। কিন্তু, সর্ব্বেশ্বরবাদীদের অনুভূতি কেবল আংশিক অনুভূতি। এই যে বিস্তৃত জগৎ ইহাই ভগবানের সবখানি নহে, ইহা অপেক্ষা মহত্তর এক অনন্ত আছে যাহার দ্বারা ইহার অস্তিত্ব সম্ভব হইয়াছে। বিশ্ব ভগবানের সমগ্র চরম সত্য নহে, কেবল একটা আত্মাভিব্যক্তি, তাঁহার সত্তার একটা সত্য কিন্তু নীচের খেলা। এই সব অধ্যাত্ম উপলব্ধি,—প্রথম দৃষ্টিতে ইহাদের মধ্যে যতই বৈসাদৃশ্য বা বিরোধ দেখা যাউক, তথাপি ইহাদের সমন্বয় করা যায় যদি আমরা ইহাদের মধ্যে কোন একটিরই উপরে সব জোর না দিই এবং যদি আমরা এই সহজ সত্যটি স্বীকার করি যে, ভাগবত সত্তা বিশ্বজগৎ অপেক্ষা বড়, কিন্তু তথাপি সব সমষ্টিগত ও ব্যষ্টিগত জিনিষ সেই ভাগবত সত্তা ব্যতীত আর কিছুই নহে,—সকলেই তাঁহার প্রকাশক বলিতে পারা যায়, তাহাদের কোন অংশে বা সমষ্টিতে তাহারা সেই সমগ্র সত্তা নহে, তথাপি সে-সব তাঁহার প্রকাশক হইতে পারিত না যদি তাহারা ভাগবত সত্তার উপাদানে নির্ম্মিত না হইয়া অন্য কিছু হইত।—সেইটিই সত্য বস্তু; কিন্তু তাহারা তাহার প্রকাশক সত্য বস্তু *।

"বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" বাক্যের দ্বারা ইহাই উপলক্ষিত হইয়াছে; যাহা কিছু এই বিশ্বজগৎ, যাহা কিছু এই

* যদিও আমাদের মনের অনুভূতিতে চরম সত্যের পার্শ্বে এইগুলিকে অপেক্ষাকৃত অসত্য বলিয়াই অনুভূত হইতে পারে। শঙ্করের মায়াবাদে যে যুক্তিতর্ক আছে তাহা বাদ দিয়া, উহার মূলে যে অধ্যাত্ম উপলব্ধি রহিয়াছে তাহা ধরিলে দেখা যায় যে, উহা এই আপেক্ষিক অসত্যতা অনুভূতিকে লইয়াই বাড়াবাড়ি করিয়াছে। মনের উপরে উঠিলে আর এই গোলমাল থাকে না, কারণ সেখানে ঐ গোলমাল কখনই ছিল না। বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়, দার্শনিক সম্প্রদায় বা যোগপন্থার পশ্চাতে বিভিন্ন অনুভূতি রহিয়াছে, মনের ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে যে বিরোধ, গভীরতর অনুভূতির দ্বারা সে-সব বিরোধ দূর হইয়া যায় এবং অতিমানস অনন্তের ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য সাধিত হয়।

বিশ্বজগতে রহিয়াছে এবং যাহা কিছু বিশ্বের উপরে সে সমুদায়ই ভগবান। গীতা প্রথমে তাঁহার বিশ্বাতীত সত্তার উপরেই ঝোঁক দিয়াছে। নতুবা মানুষের মন তাহার চরম লক্ষ্যকে হারাইয়া ফেলিবে এবং কেবল বিশ্বের দিকেই চাহিয়া থাকিবে, অথবা বিশ্বের মধ্যে ভগবানের কোন আংশিক উপলব্ধিতেই আসক্ত থাকিবে। পরে গীতা তাঁহার বিশ্বসত্তার উপরে জোর দিয়াছে, যাহার মধ্যে সকলে চলিতেছে, ফিরিতেছে, কর্ম্ম করিতেছে। কারণ, ঐটিই বিশ্বলীলার সার্থকতা, ঐটিই ভগবানের বিরাট অধ্যাত্ম আত্ম-জ্ঞান, সেখানে ভগবান নিজেকে কাল-পুরুষ রূপে দেখিয়া তাঁহার বিশ্বব্যাপী কর্ম্ম করিতেছেন। তাহার পর গীতা বেশ জোর দিয়াই স্বীকার করিতে বলিয়াছে যে, ভগবান মানবদেহের মধ্যে দিব্য অধিবাসীরূপে অধিষ্ঠিত। কারণ, তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে অধিষ্ঠিত পুরুষ, এবং যদি এই অন্তর্যামী পুরুষকে স্বীকার করা না যায়, তাহা হইলে কেবল যে ব্যষ্টিগত সত্তার কোন দিব্য সার্থকতা থাকিবে না এবং আমাদের উচ্চতম অধ্যাত্মজীবন বিকাশের প্রেরণার শ্রেষ্ঠ শক্তি নষ্ট হইবে শুধু তাহাই নহে, পরন্তু সমাজের মধ্যে জীবের সহিত জীবের সম্বন্ধ থাকিয়া যাইবে ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ, অহঙ্কৃত। অবশেষে, গীতা বিশ্বের সকল বস্তুর মধ্যে ভগবানের প্রকাশ অতি বিস্তৃত ভাবেই দেখাইয়াছে এবং বলিয়াছে যে, জগতে যাহা কিছু আছে সে-সব এক ভগবানেরই প্রকৃতি, শক্তি ও চৈতন্য হইতে উদ্ভূত। কারণ, এই দৃষ্টিও ভাগবত-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে মূলতঃ প্রয়োজনীয়; এই ভিত্তির উপরেই মানুষ তাহার সমগ্র সত্তা ও সমগ্র প্রকৃতিকে ভগবদ্ অভিমুখী করে, জগতে ভাগবত শক্তির কার্য্য স্বীকার করে, তাহার নিজের মন এবং ইচ্ছাশক্তিকে দিব্য কর্ম্মের স্বরূপে রূপান্তরিত করিবার সম্ভাবনা স্বীকার করে,—সে কর্ম্মের প্রেরণা আসে উপর হইতে, সে কর্ম্মের দ্বারা বিশ্বের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, সে কর্ম্ম ব্যক্তির বা জীবের মধ্য দিয়াই সম্পাদিত হয়।

তাহা হইলে পরাৎপর ভগবান, বিশ্বচৈতন্যের পশ্চাতে অক্ষর পুরুষ, মানুষের মধ্যে ব্যষ্টিগত ভাগবত সত্তা, বিশ্ব-প্রকৃতির এবং তাহার সকল কর্ম্ম ও জীবের মধ্যে গোপন ভাবে সচেতন অথবা আংশিক ভাবে প্রকট ভাগবত সত্তা,—এ সকলই এক সত্য বস্তু, এক ভগবান। কিন্তু সেই একই পুরুষের একটি ভাব সম্বন্ধে যে সকল সত্য আমরা সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, তাঁহার অন্য ভাব সম্বন্ধে সে সত্য-গুলি প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিলে সে গুলি উল্টাইয়া যায় অথবা তাহাদের অর্থের পরিবর্ত্তন হয়। যেমন, ভগবান সব সময়েই ঈশ্বর; কিন্তু তাই বলিয়া আমরা চারিটি ক্ষেত্রেই তাঁহার মূল ঈশ্বরত্ব ঠিক একই ভাবে, একই অর্থে প্রয়োগ করিতে পারি না। বিশ্ব-প্রকৃতিতে আবির্ভূত ভাগবত সত্তা রূপে তিনি প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় ঐক্যের সহিত কার্য্য করেন। বলিতে পারা যায় যে, তখন তিনি নিজেই প্রকৃতি, কিন্তু সেই প্রকৃতির কার্য্যের মধ্যে থাকে এক অধ্যাত্ম-চেতনা যাহা পূর্ব্ব হইতে সব দেখিতে পায়, পূর্ব্ব হইতে সব সঙ্কল্প করে, ইচ্ছা করে, সব বুঝিতে পারে, নিজের বলে সবকে পরিচালিত করে, কর্ম্ম ও শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্মের ফল নিয়ন্ত্রিত করে। আবার সকলের শান্ত দ্রষ্টারূপে তিনি অকর্ত্তা, কেবল প্রকৃতিই কর্ত্তা। তিনি প্রকৃতিকে আমাদের স্বভাব অনুযায়ী এই সকল কর্ম্ম করিতে ছাড়িয়া দেন,—স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে; অথচ তিনিই ঈশ্বর,—প্রভু, বিভু; কারণ, তিনি আমাদের কর্ম্ম দেখেন, সমর্থন করেন এবং তাঁহার নীরব অনুমতির দ্বারা প্রকৃতিকে কার্য্য করিতে ক্ষমতা দেন। তাঁহার নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা তিনি পরাৎপর ভগবানের শক্তিকে তাঁহার সর্ব্বব্যাপী নিশ্চল অবস্থিতির ভিতর দিয়া প্রেরণ করেন এবং দ্রষ্টা পুরুষের সমভাবের দ্বারা সকল বস্তুতে উহার ক্রিয়াকে সমর্থন করেন। পরাৎপর বিশ্বাতীত ভগবান রূপে তিনিই সকলের মূল সৃষ্টিকর্ত্তা; তিনি সকলের উপরে, সকলকে আবির্ভূত হইতে বাধ্য করেন; কিন্তু তিনি যাহা সৃষ্টি করেন তাহার মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলেন না; অথবা তাঁহার প্রকৃতির কর্ম্মে নিজেকে আসক্ত করেন না। প্রকৃতির কর্ম্মে যে অলঙ্ঘ্য নিয়মানুবর্ত্তিতা তাহার পিছনে অধ্যক্ষরূপে রহিয়াছে তাঁহারই মুক্ত সত্তার ইচ্ছাশক্তি।—ব্যষ্টিগত সত্তায় অজ্ঞানের সময় তিনি আমাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভগবান, সকলকে অবশভাবে প্রকৃতির যন্ত্রে ঘূর্ণায়মান করেন, সেই যন্ত্রের অংশস্বরূপ অহং (ego) ঘুরিতে থাকে, সে অহং একটা বাধাও বটে আবার সেই সঙ্গে সহায়ও বটে। কিন্তু, যেহেতু প্রত্যেক জীবের মধ্যেই পূর্ণ ভগবান বিরাজ করিতেছেন, অতএব আমরা অজ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া এই অবশতার সম্বন্ধ ছাড়াইয়া উঠিতে পারি। কারণ, যে এক

আত্মা সবকে ধরিয়া রহিয়াছে তাহার সহিত নিজেদিগকে এক করিয়া আমরা সাক্ষী ও অকর্ত্তা হইতে পারি। অথবা আমরা আমাদের ব্যষ্টি সত্তায় আমাদের অন্তরস্থিত ভগবানের সহিত মানব-জীবের যাহা সত্য সম্বন্ধ তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, আমাদের প্রাকৃত অংশকে সাক্ষাৎ যন্ত্র বা নিমিত্ত করিতে পারি এবং আমাদের অধ্যাত্ম সত্তায় সেই অন্তর্যামী পুরুষের পরম, মুক্ত, আসক্তিহীন প্রভুত্বের ভাগী হইতে হইতে পারি। এইটিই আমাদিগকে গীতার মধ্যে স্পষ্টভাবে দেখিতে হইবে; কোন্ সম্বন্ধের ক্ষেত্র হইতে প্রয়োগ করা হইতেছে সেই অনুসারে একই সত্যের যে এইরূপ বিভিন্ন অর্থ হয় তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। নতুবা যেখানে বাস্তবিক কোন বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নাই সেখানে আমরা তাহা দেখিতে পাইব অথবা অর্জ্জুনের ন্যায় বলিতে হইবে, ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেণ বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।

তাই গীতা এই বলিয়া আরম্ভ করিল যে, ভগবান নিজের মধ্যে সবকে ধরিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু, তিনি নিজে কাহারও মধ্যে নহেন,—মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্বস্থিতঃ। আবার তখনই বলিল, "অথচ সর্ব্বভূত আমার মধ্যে অবস্থিত নহে, আমার আত্মা সর্ব্বভূতকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অবস্থিত নহে।" আবার যেন আত্মবিরোধ করিয়াই গীতা বলিয়াছে যে, ভগবান মানব-শরীরের মধ্যে রহিয়াছেন, মানব-শরীরকে আশ্রয় করিয়াছেন,—মানুষীম্ তনুম্ আশ্রিতম্। বলিয়াছে যে, কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের যে পূর্ণ সাধনা, তাহার দ্বারা আত্মার মুক্তি সাধিতে হইলে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই যে সব কথার পরস্পরের মধ্যে বিরোধ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়, বস্তুতঃ এরূপ কোন বিরোধই নাই। ভগবানের যে বিশ্বাতীত সত্তা তাহাই সর্ব্বভূতের মধ্যে অবস্থিত নহে, সর্ব্বভূতও তাহার মধ্যে অবস্থিত নহে। কারণ, আমরা যে ভগবান ও সর্ব্বভূতের মধ্যে প্রভেদ করি, তাহা কেবল প্রতিভাষিক জগতের লীলাতেই প্রযোজ্য। বিশ্বাতীত সত্তার সমস্তই শাশ্বত পুরুষ, এবং যদি সেখানেও বহুত্ব থাকে তবে সকলেই শাশ্বত পুরুষ। এক বস্তুর মধ্যে আর এক বস্তু থাকা, এইরূপ স্থানবাচক ভাব সেখানে প্রযোজ্য নহে; কারণ, বিশ্বাতীত যে পরম বস্তু তাহা দেশ ও কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে, ঈশ্বরের যোগমায়ার দ্বারা ইহজগতেই দেশ-কালের সৃষ্টি হইয়াছে। বিশ্বাতীত সত্তায় "এক সঙ্গে থাকা" (Co-existence) আধ্যাত্মিক, তাহা দেশ বা কালের অনুযায়ী "এক সঙ্গে থাকা" নহে, সেখানে অধ্যাত্ম ঐক্য ও মিলনই ভিত্তি। কিন্তু অন্য পক্ষে ব্যক্ত জগতে পরম অব্যক্ত বিশ্বাতীত সত্তা কর্ত্তৃক বিশ্ব দেশ ও কালের মধ্যে বিস্তৃত হইয়াছে, সেই বিস্তারে তিনি প্রথমে আত্মারূপে আবির্ভূত হন এবং সকলকে ধারণ করেন, —ভূতভৃৎ। তাঁহার সর্ব্বব্যাপী আত্মসত্তায় সর্ব্বভূতকে ধরিয়া থাকেন। এমন কি ইহাও বলা যাইতে পারে যে, পরমাত্মাই এই বিশ্বব্যাপী আত্মার ভিতর দিয়া বিশ্বকে ধরিয়া রহিয়াছেন; তিনি ইহার অ শ্য অধ্যাত্ম ভিত্তি এবং সর্ব্বভূতের আবির্ভাবের গুপ্ত অধ্যাত্ম কারণ। আমাদের মধ্যে গুপ্ত আত্মা যেমন আমাদের চিন্তা, কর্ম্ম, গতিকে ধরিয়া রহিয়াছে, সেইভাবে তিনিও বিশ্বকে ধরিয়া রহিয়াছেন। উপলব্ধি হয় যে তিনি মন, প্রাণ দেহে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তাঁহার উপস্থিতির দ্বারা তাহাদিগকে ধরিয়া রহিয়াছেন; কিন্তু এই যে ব্যাপ্তি ইহা চৈতন্যের একটা ক্রিয়া, ইহা জড় বস্তুর ব্যাপ্তি নহে; এই জড় শরীরও আত্মার চৈতন্যের একটা নিত্য ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এই দিব্য আত্মা সর্ব্বভূতকে ধরিয়া রহিয়াছে, সব তাহার মধ্যে অবস্থিত, মূলতঃ জড়ভাবে নহে, কিন্তু আত্মা অধ্যাত্মভাবে যে নিজেকে বিস্তৃত করিয়াছে তাহারই মধ্যে সকলে অবস্থিত। ঐ অধ্যাত্ম-বিস্তৃতিকে আমাদের জড়ানুগত মন ও ইন্দ্রিয় যে ভাবে দেখে তাহাই জড়জগতে বিস্তৃত দেশ ও কাল। বস্তুতঃ এখানেও সবই অধ্যাত্মভাবে পাশাপাশি, এক হইয়া বা মিলিত হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু ইহা মূল সত্য,—যতক্ষণ না আমরা সেই পরা চৈতন্যে ফিরিয়া যাইতে পারিতেছি, ততক্ষণ এ সত্য আমরা প্রয়োগ করিতে পারি না। ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা কেবল আমাদের মনের একটা ধারণা মাত্র হইয়া থাকিবে, কিন্তু, বাস্তব উপলব্ধিতে ইহার অনুরূপ আমরা কিছুই পাইব না। অতএব এই-সব দেশ-কাল-বাচক শব্দ ব্যবহার করিয়াই আমাদিগকে বলিতে হয় যে, এই বিশ্ব এবং বিশ্বের সকল বস্তু স্বপ্রতিষ্ঠ ভাগবত সত্তার মধ্যে রহিয়াছে, যেমন অন্য সকল জিনিষ আকাশের মধ্যে রহিয়াছে। তাই গুরু এখানে অর্জ্জুনকে বলিলেন "যেমন মহান্ সর্ব্বত্রগামী বায়ু আকাশে অবস্থিত, ভূতগণও সেইরূপ আমাতে অবস্থিত,

এই ভাবেই তোমাকে ইহা ধারণা করিতে হইবে।"* বিশ্বসত্তা সর্ব্বব্যাপী ও অনন্ত, এবং স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তাও সর্ব্বব্যাপী ও অনন্ত; কিন্তু স্বপ্রতিষ্ঠ অনন্ত হইতেছে অচল, স্থির, অক্ষর, আর বিশ্বসত্তা হইতেছে সর্ব্বব্যাপী গতি,—সর্ব্বত্রগঃ। আত্মা এক ভিন্ন বহু নহে; কিন্তু বিশ্বসত্তা সর্ব্বভূত রূপে নিজেকে প্রকট করিতেছে এবং মনে হয় যে, উহা সর্ব্বভূতেরই সমষ্টি। একটি হইতেছে সত্তা; অপরটি সত্তার শক্তি, তাহা সর্ব্বমূল, সর্ব্বাধার অক্ষর আত্মার সত্তায় চলিতেছে, সৃষ্টি করিতেছে, কর্ম্ম করিতেছে। আত্মা এই সকল সৃষ্ট বস্তুতে বা তাহাদের কোন একটিতে অবস্থান করে না, অর্থাৎ, তাহাদের কোন একটির মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে,—ঠিক যেমন এখানে আকাশ কোন রূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, যদিও সকল রূপ শেষ পর্য্যন্ত আকাশ হইতেই উৎপন্ন। সকল বস্তুকে একত্র করিলেও ভগবান হয় না বা ভগবানকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, যেমন সর্ব্বত্রগ বায়ুর মধ্যে আকাশ সীমাবদ্ধ নহে অথবা ঐ বায়ুর রূপ ও শক্তি সকলকে একত্র করিলেও আকাশ হয় না। তথাপি ঐ গতির মধ্যেও ভগবান রহিয়াছেন; তিনি বস্তুর মধ্যে অবস্থান করিতেছেন প্রত্যেক জীবের ঈশ্বর রূপে। তাঁহার পক্ষে এই দুই প্রকার সম্বন্ধই একই সঙ্গে সত্য। একটি হইতেছে স্বপ্রতিষ্ঠ আত্মসত্তার সহিত বিশ্বলীলার সম্বন্ধ, অপরটি অনুস্যূতি, বিশ্বসত্তার সহিত বিশ্বসত্তার নিজেরই বিভিন্ন রূপের সম্বন্ধ। একটি সত্য হইতেছে সত্তার, তাহা স্বপ্রতিষ্ঠ, নিজের অক্ষরতায় সকলকে ধরিয়া রহিয়াছে, অপর সত্যটি হইতেছে সেই সত্তারই শক্তির, তাহা সত্তারই আত্মগোপন ও আত্মপ্রকাশ-লীলাকে উদ্ভাসিত ও পরিচালিত করিয়া প্রকট হইতেছে।

পরাৎপর ভগবান বিশ্বসত্তার ঊর্দ্ধ হইতে নিজের প্রকৃতির উপর চাপ দেন, তাহার মধ্যে যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু এককালে ব্যক্ত হইয়া আবার অব্যক্ত হইয়াছে সে সবকে এক অনন্ত ঘূর্ণায়মান চক্রে পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট করেন।† বিশ্বমাঝে সকল সৃষ্ট বস্তু এই সৃষ্টিক্রিয়ার দ্বারা অবশ হইয়া চালিত হয়,—জগতের যে সব নিয়ম সর্ব্বভূত রূপে প্রকট ভাগবত সত্তায় বিশ্বলীলার ছন্দ প্রকাশ করিতেছে—সকল সৃষ্ট বস্তু সেই সব নিয়মের অধীনে পরিচালিত হয়। এই দিব্যপ্রকৃতির লীলাতেই জীব তাহার যাতায়াতের চক্র অনুসরণ করে,—প্রকৃতিম্ মামিকাম্, স্বাম্ প্রকৃতিম্। প্রকৃতির বিকাশের ক্রমানুসারে জীব কখনও এক রূপ, কখনও অন্য রূপ গ্রহণ করে; দিব্য প্রকৃতিরই একটা আবির্ভাব রূপে জীবের সত্তার যাহা ধর্ম্ম, জীব সকল সময়েই সেই স্বধর্ম্মের রেখা অনুসরণ করিয়া চলে, প্রকৃতির ঊর্দ্ধতন সাক্ষাৎ লীলাতেই হউক বা অধস্তন পরোক্ষ লীলাতেই হউক, অজ্ঞানেই হউক বা জ্ঞানেই হউক; কল্পের অন্তে জীব প্রকৃতির কর্ম্মলীলা হইতে তাহার অচলতা ও নীরবতার মধ্যে ফিরিয়া যায়। জীব যখন অজ্ঞান, তখন সে প্রকৃতির কল্পচক্রের অধীন, নিজে নিজের প্রভু নহে, কিন্তু প্রকৃতির বশে পরিচালিত,—অবশং প্রকৃতের্বশাৎ। কেবল দিব্য-চৈতন্যে ফিরিয়া গিয়াই জীব ঈশ্বরত্ব ও মুক্তি লাভ করিতে পারে। ভগবানও ঐ কল্প চক্রের অনুসরণ করেন, কিন্তু উহার বশে নহে, উহার প্রকাশক ও পরিচালক আত্মা রূপে, তাঁহার সমগ্র সত্তা উহাতে নিয়োজিত হয় না, কিন্তু তাঁহার সত্তার শক্তির দ্বারা তিনি উহাকে অনুসরণ করেন, পরিচালিত করেন। প্রকৃতির মধ্য দিয়া তাঁহার যে কর্ম্ম চলিতেছে সে কর্ম্মের তিনিই অধ্যক্ষ,—তিনি প্রকৃতির মধ্যে সঞ্জাত কোন সত্তা নহেন, কিন্তু তিনি সেই সত্তা যিনি অধ্যাত্ম সৃষ্টিকর্ত্তা রূপে প্রকৃতিকে সচরাচর বিশ্ব প্রসব করান।‡ তাঁহার শক্তিতে তিনি প্রকৃতির কর্ম্ম অনুসরণ করেন এবং তাঁহার সকল কর্ম্মের প্রবর্ত্তক হন বটে, কিন্তু তিনি আবার প্রকৃতির বাহিরেও বটেন, যেন প্রকৃতির বিশ্বলীলার উপরে বিশ্বাতীত ঐশ্বরিক সত্তায় অধিষ্ঠিত থাকেন, কোন বন্ধনহেতু অবশকারী বাসনার দ্বারা তিনি প্রকৃতিতে আসক্ত নহেন, অতএব তাহার কর্ম্ম সকলের দ্বারা বদ্ধ নহেন, কারণ তিনি সে-সব অপেক্ষা অনন্তগুণে বড় এবং সে-সকলের পূর্ব্ববর্ত্তী, কালের চক্রে যে-সব কর্ম্মপরম্পরা চলিতেছে, তাহাদের পূর্ব্বে, তাহাদের সমকালে এবং তাহাদের পরেও তিনি যেমন আছেন ঠিক

* যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥ ৯।৬

† প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥৯।৮

‡ ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥৯।১০

তেমনই থাকেন।* তাহাদের সকল পরিবর্ত্তনে তাঁহার অক্ষর সত্তার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। যে নীরব অধ্যাত্ম সত্তা বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, বিশ্বকে ধরিয়া রাখিয়াছে—তাহা বিশ্বের কোন পরিবর্ত্তনেই বিচলিত হয় না; কারণ, যদিও উহা ধরিয়া রহিয়াছে, তথাপি উহা ঐ পরিবর্ত্তিত লীলায় যোগদান করে না। এই মহত্তম পরাৎপর বিশ্বাতীত সত্তাও সে সকলের দ্বারা বিচলিত হয় না; কারণ, ইহা তাহাদের অতীত, চিরকাল তাহাদের উপরে রহিয়াছে।

কিন্তু আবার যেহেতু এই কর্ম্ম দিবা-প্রকৃতির কর্ম্ম,—স্বাম্ প্রকৃতিম্, এবং দিব্য-প্রকৃতি কখনও ভগবান হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না, দিব্য-প্রকৃতি যাহাই সৃষ্টি করুক না কেন তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই ভগবান অনুস্যূত আছেন। এই যে সম্বন্ধ ইহাই ভগবানের সত্তার সমগ্র সত্য নহে, কিন্তু আবার এই সত্যকে আমরা আদৌ অবহেলাও করিতে পারি না। তিনি মানবদেহের মধ্যে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন।† যাহারা এখানে ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, মানব-দেহের মধ্যে ভাগবত সত্তা প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে যাহারা তাঁহাকে অবজ্ঞা করে, তাহারা প্রকৃতির বাহ্য দৃশ্যের দ্বারা বিমূঢ় ও প্রতারিত হয়, তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না যে, অন্তরের মধ্যে ভগবান গুপ্ত রহিয়াছেন, অবতারে তিনি সজ্ঞানে মানবদেহ ধারণ করেন, সাধারণ মানুষে তিনি তাঁহার মায়ার দ্বারা প্রচ্ছন্ন থাকেন। যাঁহারা মহাত্মা, যাঁহারা অহংভাবের মধ্যে আবদ্ধ নহেন, যাঁহারা অন্তর্যামী ভগবানের দিকে নিজেদিগকে খুলিয়া ধরিতে পারেন তাঁহারা জানেন যে, মানুষের মধ্যে যে গুপ্ত আত্মা অপূর্ণ মানবীয় প্রকৃতিতে মানুষের মধ্যে আবদ্ধ বলিয়া মনে হয়, তাহা সেই একই অনির্ব্বচনীয় জ্যোতি যাহাকে আমরা সকলের উপরে পরাৎপর ভগবান বলিয়া পূজা করি। যেখানে তিনি সর্ব্বভূতের অধিপতি ও ঈশ্বর ভগবানের সেই পরম পদ তাঁহারা জানেন; অথচ তাঁহারা দেখিতে পান যে প্রত্যেক ভূতের মধ্যেও তিনি সেই পরাৎপর দেবতা এবং অন্তর্যামী ভগবান। বাকী যাহা কিছু সে-সবই বিশ্ব-মাঝে প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্য বিকাশের জন্য ভগবানের খণ্ড প্রকাশ, ভগবান নিজে নিজেকে খণ্ডিত করেন। তাঁহারা আরও দেখিতে পান যে, যেহেতু তাঁহারই প্রকৃতি বিশ্বে যাহা কিছু আছে সব হইয়াছে, অতএব ইহসংসারে প্রত্যেক বস্তুই মূলতঃ ভগবান ভিন্ন আর কিছুই নহে,—বাসুদেবঃ সর্ব্বম্. এবং তাঁহারা যে তাঁহাকে কেবল বিশ্বাতীত পরাৎপর ভগবান বলিয়া পূজা করেন শুধু তাহাই নহে; কিন্তু ইহ-সংসারে, তাঁহার একত্বে এবং প্রত্যেক পৃথক সত্তায় তাঁহাকে পূজা করেন।‡ তাঁহারা এই সত্য দর্শন করেন এবং এই সত্যকে অনুসরণ করিয়া তাঁহারা জীবন যাপন করেন, কর্ম্ম করেন; তাঁহাকেই তাঁহারা উপাসনা করেন, জীবনে অনুসরণ করেন, সকল বস্তুর ঊর্দ্ধে অবস্থিত সত্তা রূপে, আবার বিশ্ব-মাঝে অবস্থিত ভগবান-রূপে, এই দুই রূপেই তাঁহার পূজা করেন, কর্ম্ম যজ্ঞের দ্বারা তাঁহাকে সেবা করেন, জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে সন্ধান করেন, সর্ব্বত্র ভগবান ভিন্ন আর কিছুই দেখেন না এবং তাঁহাদের আত্মা এবং অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি সহ সমগ্র সত্তাকে তাঁহার দিকে তুলিয়া ধরেন। এইটিকেই তাঁহারা উদার ও প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া জানেন; কারণ, এইটিই পরাৎপর বিশ্বব্যাপী এবং ব্যষ্টিগত ভগবান সম্বন্ধে সমগ্র জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত পন্থা।§

* ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥৯।৯

† অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত মহেশ্বরম্ ॥৯ ১১
মহাত্মনস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥৯ ১৩

‡ জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥৯।১৫
মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥৯।৩৪

§ শ্রীঅরবিন্দের Essays on the esta (second series) হইতে তাঁহারই অনুমতি অনুসারে অনুবাদিত—

অনুবাদক—শ্রীঅনিলবরণ রায়

ব্রতচারিণী

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১৫)

বুদ্ধিমতী জয়ন্তী অনেক ভাবিয়া দেখিলেন, তিনি যদি এখনও রামনগরে না যান, ক্ষতি তাহাতে আর কাহারও হইবে না যতটা তাঁহার হইবে। ইভারও বয়স হইয়া গিয়াছে, সপ্তদশ বৎসরে সে পা দিয়াছে। আর কতকাল তাহাকে অবিবাহিতা রাখিতে পারিবেন? তাহা ছাড়া, ভ্রাতার সংসারে গলগ্রহরূপে পড়িয়া থাকাও যুক্তিযুক্ত নহে। সেদিন ভ্রাতৃবধূর সহিত রাধানাথ সেনের বাটী বেড়াইতে গিয়া তাঁহার মায়ের মুখে যে কথাটা শুনিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মর্ম্মে বিঁধিয়া আছে। রাধানাথ সেনের মাতা বহুদর্শিনী বৃদ্ধা। তিনি বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন, চিরকাল কি ভাইয়ের বাড়ী থাকা ভাল দেখায় মা? তোমার নিজের ঘর আছে, সংসার আছে, পরের সংসারকে আপনার বলে যতই টানতে যাও না কেন, তবু লোকেও বলবে,—নিজের মনও বলবে, এ পরের কায বই নয়। নিজের চালায় যদি পড়ে থেকে নুন-ভাত খাও সেও ভাল, সেও মানের মা, পরের অট্টালিকায় বাস করে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন উপচারে ভাত খাওয়া মানের নয়। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলেই সে পরের হয়ে গেল; কেন না, বাপ মা এ দেশে মেয়েকে দান করে থাকেন, তার ওপরে তাঁদের আর কোন অধিকার থাকে না। তোমার বাপের বাড়ীর ওপরে আর কোন জোরই নেই মা। এঁদেরও কথা নয় যে তোমাদের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করেন,—তবুও যেটুকু করছেন সে কেবল দয়া করে। সেখানে যেটা জোর করে নিতে পার, এখানে সেটা কতদূর কুণ্ঠিতভাবে চেয়ে নিতে হয় সেটা একবার ভেবে দেখ।

কথাগুলা যে যথার্থ তাহাতে কোন সন্দেহই ছিল না; সেইজন্যই তাহা জয়ন্তীর মনে দাগ দিতে সমর্থ হইয়াছিল। একদিন এমনি কথাই তিনি ঈশানীর মুখে শুনিতে পাইয়াছিলেন; কিন্তু সেদিন তিনি আঘাত পাইয়া আঘাতই দিয়াছিলেন, বিষ বর্ষণ করিয়াছিলেন, এই যথার্থ সত্য কথাকে তিনি কিছুতেই আমল দিতে চান নাই। এখন পরের মুখে সেই কথা শুনিয়া আঘাত পাইয়া তাঁহার অন্তরে সত্য জ্ঞান ফুটিয়া উঠিয়াছিল,—তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, এই নারীর কথাই ঠিক, ইহাতে এতটুকু সংশয় নাই।

কিন্তু যাইবেন কিরূপে? বহুবর্ষ পরে নিজে যাচিয়া সাধিয়া আবার সেখানে গিয়া দাঁড়াইবেন কোন্ লজ্জায়? ঈশানীর মুখে তীব্র বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিবে, তিনি ভাবিবেন,—হয় তো মুখ ফুটিয়া স্পষ্টই বলিবেন, এখন এলে কেন ছোটবউ? যখন আমি থাকতে বলেছিলুম তখন

থাকতে পারলে না,—এখন না ডাকতে চলে এলে, এর অর্থ কি?

কই, তাহারা তো একখানা পত্রেও যাইবার কথা কিছুই লেখে নাই। তিনি পত্র দেন তাহার উত্তর আসে মাত্র দুটি কথা, দেখার ইচ্ছা তাহাতে কিছুই লেখা থাকে না। এরূপ অবস্থায় নিজে সাধিয়া যাওয়া অত্যন্ত বিসদৃশ বলিয়া ঠেকে।

আচ্ছা, একখানি পত্র লিখিয়া তাহাদের মনের ভাবটা জানা যাক; তাহার পরে যাওয়ার ব্যবস্থা করিলে চলিবে।

তিনি তখনই পত্র লিখিতে বসিলেন।

সামান্য দু' চার কথায় পত্রখানা শেষ হইয়া গেল। তিনি জানাইলেন, রামনগরে তাঁহার একবার যাইবার ইচ্ছা আছে,—যদি সময় পান তাহা হইলে দু' চারদিনের জন্য ইভাকে লইয়া ওখানে যাইবেন। ইহাতে কাহারও আপত্তি আছে কি না।

তিনি যে স্থায়ীভাবে রামনগরে বাস করিতে যাইবেন, এ কথা কিছুতেই লিখিতে পারিলেন না। দুই চার দিনের জন্য যাইবেন,—যদি তাহাদের সেরূপ ইচ্ছা দেখিতে পান, তাহা হইলে সেখানে থাকিয়া যাইবেন; নচেৎ আবার এখানে চলিয়া আসিবেন—এই ভাল কথা।

অভিমানে তাঁহার হৃদয়খানা পূর্ণ হইয়া উঠিল, চোখেও খানিকটা জল আসিয়া পড়িল। অঞ্চলে চোখ মুছিয়া তিনি অন্যমনস্কভাবে কোন দিকে চাহিয়া রহিলেন। হায় রে, তিনি রাগ করিবেন, অভিমান করিবেন কাহার উপর? যাহার উপর রাগ অভিমান করিয়া থাকা চলিত, সে যে চলিয়া গিয়াছে।

নিজের দিকটা দেখিতে তিনি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। অধিকাংশ মানুষের স্বভাবই এই, তাহারা নিজেদের ভুল বা কোন ক্রটী দেখিতে পায় না, অথচ পরের ভুল ক্রটীগুলি তাহাদের চোখের সম্মুখে স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠে। জয়ন্তী নিজের দোষ কখনই দেখিতে পান নাই। তিনি জানিতেন, তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা সবই ঠিক হইয়াছে, কোথাও এতটুকু ক্রটী হয় নাই।

পত্রের উত্তর কয়েক দিন পরেই আসিল। ঈশানী নিজের হাতে উত্তর দিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন—তিনি পৃথিবীতে আসিয়া শুধু দিয়াই যাইতেছেন। এই নিঃস্ব ভাবে দানের পথে যদি এতটুকু কিছু কুড়াইয়া পান, তাহাই তাঁহাকে আমরণ কাল বড় শান্তি দিবে; বুকভরা দুঃখের মধ্যে সান্ত্বনা মিলিবে শুধু সেই দুদিনের পাওয়ার স্মৃতিটুকু। ছোটবউ দয়া করিয়া ইভাকে দু'দিনের জন্য রামনগরের মত পল্লীগ্রামে আনিবে বলিয়াছে, ইহাতে ঈশানী বড় আনন্দ পাইয়াছেন।

পত্রখানা পাইয়া জয়ন্তীর মুখখানা অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল; এ পত্রে তাঁহাকে এতটুকু শান্তি দিতে পারিল না। মনে হইতে লাগিল, এ পত্রখানা একটা খোঁচা বহন করিয়া আনিয়াছে। সেই খোঁচাটা তিনি বুকের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিলেন।

ইভা এই পত্রখানা পড়িয়া অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; উৎসাহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল, "কবে রামনগরে যাবে মা? আমার এখনি সেখানে যেতে ইচ্ছা করছে; দাদুকে, জেঠিমাকে, সীতাদিকে দেখতে ভারি ইচ্ছা করছে।"

মা একটা ধমক দিয়া বলিলেন, "যা যা, অতটা আনন্দ করতে হবে না। ভারি তো দাদু, জেঠিমা, যারা নিজেরা একখানা একখানা পত্র দিয়ে উদ্দেশ নেয় না—"

বাধা দিয়া ইভা বলিল, "কেন, এই তো জেঠিমা লিখেছেন রামনগরে যাওয়ার কথা?"

জয়ন্তী রাগতভাবে বলিলেন, "হাঁা, অমনি লিখেছেন কি না, আমি পত্র দিয়েছিলুম তারই এই উত্তর এসেছে। যেচে পত্র যাকে লেখা যায়, অন্ততঃ পক্ষে ভদ্রতার খাতিরেও তার একখানা উত্তর দিতে হয়। আপনার লোকের কি এই পত্র দেওয়া? যেতে চাইলুম,—পত্র দিয়েছেন, "আসতে পার।" "গরজে গয়লা ঢেলা বয়" বলে একটা যে কথা আছে না, এ ঠিক তাই বই আর কি। সর্ব্বস্ব নিয়ে নিজেরা ভোগ দখল করছেন, পাছে আমি গেলে ভাগ দিতে হয়—"

ইভা বলিয়া উঠিল, "ও কি মা, ও সব কি বলছ?"

আর্ত্তভাবে ইভা বলিল, "জেঠিমা কি ভোগ দখল করছেন মা? শুনেছ তো—দাদু দাদাকে ত্যাগ করেছেন, দাদা ব্রাহ্ম হয়েছেন সেই জন্যে। জেঠিমার আর আছে কে, দাদাকে তো আর নিতে পারবেন না। বিধবা মানুষ, একবেলা দুটো আতপচালের ভাত খান, দুবেলা দু'খানা কাপড় পরেন—তাও থান, এতে তিনি কি ভোগ করছেন মা?"

কথাটা হঠাৎ মুখ দিয়া বাহির হইয়া যাওয়ায় জয়ন্তীও বড় কম অপ্রস্তুত হইয়া পড়েন নাই। তথাপি সেই

অপ্রস্তুত ভাবটা চাপা দিবার জন্য মেয়েকে ধমক দিয়া বলিলেন, "তোর নিজের কায কর গিয়ে ইভু, আমায় বেশী বকাসনে বাপু, আমার মাথার ঠিক নেই। এর পরে কি বলতে কি বলে ফেলব, বুড়ো মানুষের কিচ্ছু ঠিক থাকে না।"

হাসিয়া উঠিয়া ইভা বলিল, "বুড়ো হয়েছ মা? চুল একটাও পাকল না, দাঁত একটাও পড়ল না, এর মধ্যে তুমি বুড়ো হয়ে গেলে? যদি তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে মানুষ বুড়ো হয় মা তবে তো কথাই নেই।"

হাসি চাপিয়া গম্ভীরভাবে জয়ন্তী বলিলেন, "বুড়ো নই তো কি? তোর মা আমি, এ কথা বলতেই হবে। বকাস নে ইভু—যা।"

ইভা বলিল, "আচ্ছা আমি যাচ্ছি, কিন্তু তুমি রামনগরে যাবে তো মা?"

জয়ন্তী পত্রখানা নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিলেন "কি করে বলব—যাব কি না। যে রকম পত্রখানার ধরণ দেখছি—"

"না মা, তোমার পায়ে পড়ি—যেতেই হবে। এবার রামনগরে গিয়ে আর কিন্তু কলকাতায় আসতে পারবে না। সকলেই বলে—আমার দাদু অতবড় জমিদার, অমন নামজাদা বড়লোক, তাঁর অতবড় বাড়ী, অত লোকজন সব থাকতে আমরা কেন এখানে এমন করে পড়ে থাকি। তাদের কথা শুনে আমার বড় লজ্জা হয় মা। সে দিন আমার এক বন্ধু অরুণা বোস আমায় একখানা খবরের কাগজে দেখালে—দাদু দেশের জন্যে কত টাকা দিয়ে যাচ্ছেন, যে যা চাচ্ছে তাকে তাই দিচ্ছেন, গভর্ণমেণ্ট হতে তাঁকে রাজা উপাধি দেওয়ার প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। দেখে গর্ব্বে আমার বুকটা ভরে উঠল। হ্যাঁ মা, যে দাদুর নাম সবাই করছে, আমি এমন দাদুর কাছ ছেড়ে কোথায় পড়ে আছি বল তো? পাড়া-গাঁ বলে যাকে তুমি চিরকাল হেলাই করে এসেছ, এই সহরের চেয়ে আমার যে সেই পাড়া-গাঁ বড় ভাল লাগে, বড় বলে মনে হয়। তুমি বলবে—সহরে থেকে আনন্দ পাওয়া যায়, আমি বলি—সহরে এতটুকু আনন্দ নেই, সহরে মুক্ত স্বাধীন জীবন নেই, স্বাধীনতা আছে পল্লীগ্রামে, তাই সেখানে আনন্দও যথেষ্ট পাওয়া যায়। সত্য কথা যে সেখানে ইলেক্‌ট্রিক লাইট নেই, ফ্যান নেই, কলের জল, ট্রাম, বাস—এত গোলমাল কিছু নেই। কিন্তু মা, সেখানে আছে পনের দিন অন্ধকারের পরে পনের দিন মুক্ত চাঁদের আলো যা সহরবাসীরা উপভোগ করতে পায় না; সেখানে আছে গাছের পাতায় বেধে ভেসে আসা শান্ত শীতল বাতাস, সেখানে আছে নদীর বুকের শীতল জল, সেখানে ট্রামের, বাসের, লোকের গোলমাল নেই, আছে পাখীর গান, বড় সুন্দর—বড় মধুর। সেখানে ঝোপে ঝোপে বনজ ফুল ফুটে ওঠে, মুক্ত বাধাশূন্য বাতাসে দুলে ওঠে, পাখীরা শ্যামল গাছের ডালে বসে গান গেয়ে ওঠে। কবে কোন্ কালে দেখেছি—আজ তা মনেও পড়ে না। গান মিলিয়ে গেলেও তার রেসটুকু মধুর হ'য়ে বুকে কেমন জেগে থাকে। আমার মনে সেই ছোটবেলায় দেখার স্মৃতি খুব ছোট হয়েও এখনও জেগে আছে। আজ মনে হয়—যেন সে সব স্বপ্ন দেখেছি। সেই জেঠিমা, সেই দাদু সেই রামনগর; গাছের ছায়ায় ভরা আঁকা-বাঁকা গ্রাম্য পথ। বাতাসে ঝির ঝির করে গাছের ঝরা পাতা পথের ওপরে পড়ছে, পথিকের গায়ে পড়ছে। আবার দেখতে ইচ্ছা হয় মা, আবার সেই গ্রামের বুকে ফিরে যাওয়ার বড় সাধ হয়।"

জয়ন্তী নীরবে কন্যার কথা শুনিতেছিলেন, তাঁহার মনেও বহুকালকার অতীত কথা জাগিয়া উঠিতেছিল। সে আজ আঠার বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, যেদিন তিনি রামনগরে গিয়া চারিদিককার বন জঙ্গল, ঝোপ দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। পিতা মাতা যে হাত-পা ধরিয়া তাঁহাকে জলে ফেলিয়া দিয়াছেন—প্রকাশ্য ভাবে ইহা বলিয়া ললাটে করাঘাত করিয়া তিনি কাঁদিয়াছিলেন।

একটা কথা মনে করিতেই অনেক কথা মনে পড়িয়া যায়। নিজের এই একটা দোষ চোখে ভাসিয়া উঠিতে পর পর সব দোষগুলি বায়স্কোপের ছবির মত মনে জাগিয়া উঠিল।

অনুতাপে বিদ্ধা জয়ন্তী ইহার পানে আর তাকাইতে পারিলেন না, কথা কহিতে গিয়া তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল,—"তুই বড় বেশী কথা বলতে আরম্ভ করেছিস ইভা, আগে তো এত কথা বলতিস নে। পল্লীগ্রামের সৌন্দর্য্য তো বড়, তার আবার এত বর্ণনা। কোন্ সেই ছোটবেলায় দেখেছিস, এখন তার কথা বলতে আর জ্ঞান থাকছে না; এখন যদি একটীবার দেখিস তা'হলে কখনো

এক দিনের জায়গায় দুটি দিন আর সেখানে থাকতে চাইবি নে। ওই যে বললি—নদীর শান্ত কালো জল,—মরে যাই আর কি তোর উপমা নিয়ে। সে কি নোংরা; দাম তার সমস্ত অংশ ভরে ফেলে সামান্য জল এমন পাঁশুটে আর দুর্গন্ধময় করে রেখেছে যে তার দিকে চাইলে আর খাওয়ার প্রবৃত্তি হয় না। তার পর চাঁদের আলো, সে আর কতটুকু বল দেখি? একমাত্র অন্ধকারের রাজত্ব সেখানে—সেই নিবিড় জমাট-বাঁধা অন্ধকারের পানে চাইলে বুকে রক্ত শুকিয়ে ওঠে। আর শ্যামল পাতায় স্নিগ্ধ বাতাসের কথা বললি যে ইভু—অমন বাতাস পাওয়ার চেয়ে জমাট গরমে পচে মরতে হয় সেও ভাল। সে বাতাস শুধু ম্যালেরিয়ার বীজাণুতে ভরা। তাতে আমাদের মত লোকদের সেখানে গিয়ে দু'দিন থেকে দু' বছরের জন্যে অসুখ বরণ করে নেওয়া। পল্লীগ্রামের তো সবই ভাল তোর চোখে,—কিছু মন্দ নয়,—তবু আরও যদি থেকে বলতিস।"

ইভা বড় গোপনে একটা নিঃশ্বাস ফেলিল মাত্র, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তবে থাক মা, সে অসভ্য নোংরা দেশে গিয়ে আমাদের কায নেই। এ আমরা খুব সুখে আছি। এই ফ্যানের হাওয়া, ইলেক্‌ট্রিক লাইট, কলের জল,—আমরা কেমন সুখে আছি। সেখানে অশিক্ষিত অসভ্যদের মাঝে গিয়ে আমাদের শিক্ষার গর্ব্বে আঘাত পড়বে, চাই কি—সঙ্গদোষে হয় তো আমরাও মন্দ হয়ে পড়ব। দাদা ওই জন্যেই ব্রাহ্ম হয়ে গেছে, ব্রাহ্ম মেয়ে বিয়ে করেছে,—দেশে আর যেতে হবে না, ভালই হয়েছে। কাল দাদার বিলেত যাওয়ার দিন। যখন তুলে দিতে যাব তখন বলব—তুমি খুব ভাল কায করেছ, দেশের যারা সুশিক্ষিত ছেলে তারা সবাই যেন এমনি করে। শিক্ষিত যে হবে সে ওই সব অসভ্য বর্ব্বরদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক লোপ করবে,—তা হোক না কেন দাদু অথবা বাগ্‌দত্তা স্ত্রী। আমিও যদি শিক্ষার অহঙ্কার করতে চাই, শিক্ষিতার গৌরব রাখতে চাই, তবে যেন পল্লীগ্রামে যাওয়ার কথা মুখেও আনি নে।"

দুপদাপ করিয়া সে ঘর কাঁপাইয়া চলিয়া গেল।

সে যে কতখানি অভিমানে পূর্ণ হইয়া কথাগুলো বলিয়া গেল তাহা জয়ন্তী বেশ বুঝিলেন। তাঁহার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল, দন্তে অধর চাপিয়া তিনি দুর্ব্বিনীতা কন্যার গমন-পথের পানে চাহিয়া রহিলেন।

ইভা যে কেমন করিয়া তাঁহার নিয়ম-পদ্ধতি এড়াইয়া গেল ইহাই না বড় আশ্চর্য্য কথা। তিনি পরের ছেলে জ্যোতির্ম্ময়কে আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন, নিজের মেয়ে ইভাকে পারেন নাই। তিনি তাহাকে যে পথে চলিতে উপদেশ দিতেন, সে ঠিক তাহার বিরুদ্ধ পথে চলিত,—তাঁহার মতকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিবার জন্যই যেন তাহার জন্ম হইয়াছে। মনে পড়ে স্বামীর কথা, তাঁহাকে তিনি কিছুতেই স্ব-মতে আনিতে পারেন নাই। জীবনের পথে স্বামী-স্ত্রীরূপে ক্ষণেকের তরে মিলিয়াও এই বিরুদ্ধ মতের জন্য উভয়ে উভয়ের নিকট হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন, জীবনে আর কখনও মিলিত হইতে পারেন নাই। এই মেয়েটীর মধ্যে পিতার সেই তেজ, সেই দর্প সবই জাগিয়াছিল, পিতার মতই সে মাতাকে দমনে রাখিতে চায়।

জ্যোতির্ম্ময় যখন দেবযানীকে বিবাহ করিবার কথা তুলিয়াছিল, সকলেই তাহার সমর্থন করিয়াছিল, ক'রে নাই কেবল ইভা। সে দৃপ্তা ব্যাঘ্রীর মত গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিল, জয়ন্তী কিছুতেই তাহাকে শান্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল, বিবাহের পূর্ব্বে যদি সে সুরেশবাবুর পরিবারে জানায়—জ্যোতির্ম্ময়কে তাহার দাদু এই অপরাধে ত্যাগ করিবেন, যে সম্পত্তি মূলে রহিয়াছে তাহা হইতে একটা পাইও জ্যোতির্ম্ময় পাইবে না—তাহা হইলে হয় তো একটা গোল বাধিতে পারে। বিহারীলাল নিষ্ঠাবান হিন্দু, হিন্দুত্ব রক্ষা করিতে তিনি যে পৌত্রকে পরিত্যাগ করিবেন এ জানিত সত্য কথা।

আজ কয়দিন হইল জ্যোতির্ম্ময়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহে নিমন্ত্রণ হইলেও জয়ন্তী ইভাকে যাইতে দেন নাই। কাল জ্যোতির্ম্ময় বিলাত রওনা হইবে, জয়ন্তীকে সে প্রণাম করিয়া গিয়াছে। ইভার সহিত দেখা হয় নাই—সে তখন বাড়ী ছিল না। জ্যোতির্ম্ময় বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়া গিয়াছে—যেন কাল ইভাকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়, সে দেখা করিয়া যাইবে।

ইভাকে বাল্যকাল হইতে সে কনিষ্ঠা ভগিনীর মতই স্নেহ করিত। ইভা অন্যায় দেখিলে বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিতে ভয় পাইত না। ইহার জন্য জয়ন্তী গোপনে ইভাকে শাসন করিতে গেলে সে তাঁহাকে এমন গরম ভাবে কথা

শুনাইয়া দিত যে তাহার উত্তরটা ঠিকমত দেওয়া যাইত না; অথচ সেই কথাগুলা অন্তরে তীব্র জ্বালা উৎপাদন করিত। দুর্ব্বিনীতা এই মেয়েটীকে লইয়া জয়ন্তী সর্ব্বদা শশব্যস্ত হইয়া থাকিতেন,—কি জানি, সে কাহাকে কখন কি বলিয়া বসে তাহার ঠিক নাই।

(১৬)

বিহারীলাল বালিসে হেলান দিয়া বিছানার উপর বসিয়া ছিলেন, সীতা মেঝের একখানা মাদুরের উপর বসিয়া সেজের আলোকে রাজা ভরতের উপাখ্যান পড়িয়া তাঁহাকে শুনাইতেছিল। বাহিরে শান্ত সন্ধ্যা ধীরে ধীরে সমস্ত পৃথিবীর গায়ে অন্ধকারের মৃদু প্রলেপ দিতেছিল। উপরে অন্ধকার আকাশে তেমনি ধীরে ধীরে একটী দুইটী করিয়া নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিতেছিল। বর্ষার মেঘ আকাশ ছাড়িয়া বৎসরের মত চলিয়া গিয়াছে, শরৎ আসিয়াছে। নীচে বাগানে শেফালিকা গাছে অসংখ্য ফুল ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহার মধুর স্নিগ্ধ গন্ধ বাতাস চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছে। পূজার আর বেশী দিন বিলম্ব নাই। আজ অমাবস্যার নিশি, কাল দেবীর বোধন বসিবার কথা। প্রতি বৎসর জমীদার-বাড়ীতে প্রতিপদে বোধন হইয়া থাকে, এ বৎসরও যে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রতাপ বর্ত্তমান থাকিতে এ বাড়ীতে পূজার আনন্দ অফুরন্ত ছিল। এক পূজা শেষ হইতে না হইতে আবার আগামী বৎসরের পূজার জন্য জিনিস সঞ্চয় আরম্ভ হইত। পূজার প্রতিপদের দিন হইতে মহা ধুমধাম পড়িয়া যাইত, কথকতা বসিত, চারিদিক হইতে লোকজন আসিয়া গ্রামে জমিত, গ্রাম টলমল করিত। বিখ্যাত যাত্রার দল, কীর্ত্তনের দল আসিয়া জুটিত। ষষ্ঠীর দিন হইতে যাত্রা আরম্ভ হইত, কীর্ত্তন আরম্ভ হইত, লোকে আশা মিটাইয়া কীর্ত্তন, যাত্রা, কথকতা শুনিত। এই আনন্দোৎসবের কর্ত্তা ছিলেন প্রতাপ, অন্তঃপুরে ছিলেন ঈশানী। স্বামী হারাইয়াও তিনি কর্ত্তব্যচ্যুতা হন নাই, শক্তি হারান নাই। অন্তঃপুরের সব কায তাঁহার হাতে। প্রভাত হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তাঁহার বিশ্রাম থাকিত না। বিহারীলাল সকল ছাড়িয়া দিয়া মহানন্দে শুধু সব দেখিয়া যাইতেন। লোকে প্রতাপের জয়গান করিত, মা লক্ষ্মী ঈশানীর নাম করিত, গুণ গাহিত,—শুনিতে শুনিতে বিহারীলালের দুইটী চোখ অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিত; পরলোকগতা পত্নীর কথা মনে পড়িত, পুত্রের কথা মনে পড়িত, তিনি গোপনে চোখ মুছিতেন।

তাহার পর প্রতাপ চলিয়া গেলেও জমীদার-বাড়ীর সে আনন্দোৎসব একেবারে লোপ পায় নাই, জ্যোতির্ম্ময় পিতৃব্যের এই কার্য্য-ভার নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিল। সে যদিও কোন ধর্ম্মে আস্থা স্থাপন করিতে পারে নাই, যদিও সে কিছুই মানিত না, তথাপি আনন্দের প্রধান অঙ্গ এই পূজার আয়োজন খুব উৎসাহের সহিত করিত। নিজে সে কোন দিনই প্রতিমার নিকট মাথা নত করিতে পারে নাই, তথাপি সে ইহার আকর্ষণও ছাড়াইতে পারিত না।

আবার সেই পূজা আসিয়াছে, কিন্তু কোথায় কে? কে আজ পূজার যোগাড় করিয়া দিবে, কে আজ বাহিরের সব ঠিক করিবে? ভিতরের ভারই বা লইবে কে? বৃদ্ধের হাঁটু ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, চলিতে গেলে থর থর করিয়া পা কাঁপে। চোখের দৃষ্টি একেবারে ঝাপসা হইয়া গিয়াছে, পরিচয় না দিলে আর কাহাকেও চিনিতে পারেন না। তিনি যে সকল কার্য্যের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন, আর কিছু করিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই।

পুত্র-বিয়োগ-বিধুরা মায়ের আর কিছু করিবার ক্ষমতা নাই; সে উৎসাহ নাই। তিনি কি অন্য অন্য বারের মত ক্ষীণ দেহ লইয়া শারীরিক দুর্ব্বলতা উপেক্ষা করিয়াও জোর করিয়া রন্ধনার্থ বসিতে পারিবেন? তাঁহার দেহ এবার এত দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে যে হাঁটিতে গেলে বুকের মধ্যে ধড়ফড় করে।

সীতা বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। সে গত বৎসর হইতে এখানে আছে। গতবারের পূজার বিপুল আয়োজন সে দেখিয়াছে। পূজা আসিতেছে এই আনন্দেই সে পূর্ণ হইয়া থাকিত। সে নিজের চোখে গত বৎসর যাহা দেখিয়াছে, এ বৎসরে তাহার কিছুই নাই। এ বৎসর আনন্দময়ী কি নিরানন্দ গৃহে আসিয়া নিরানন্দেই চলিয়া যাইবেন, আনন্দ কি বিতরণ করিবেন না?

আজ সে অনেকগুলা কথা বলিবে বলিয়াই বিহারী-লালের নিকটে আসিয়াছিল। কিন্তু একটা কথাও তাহার বলা হইল না। বিহারীলাল তখন নীরবে অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় স্বল্পান্ধকার আকাশের পানে চাহিয়া ছিলেন, দেখিতে-

ছিলেন—দিনের আলো কেমন করিয়া ধীরে ধীরে নিবিয়া আসে, অন্ধকার কেমন করিয়া পা বাড়ায়। তাঁহার জীবন কি এক ভাবে এক স্থানে থাকিয়া যাইবে, অস্তগমনোন্মুখ হইয়াও কি এ অস্ত যাইবে না? হায় রে, যে মৃত্যুকে চাহে না, মৃত্যু তাহাকেই চায়, তাহাকেই শীতল বুকে টানিয়া লইয়া চিরশান্তিময় হাত তাহার গায়ে বুলায়। যে চায় তাহাকে কেন লয় না? এ কি আশ্চর্য্য বিধান মৃত্যুর? সে বৃদ্ধকে রাখিয়া শিশুকে আগে গ্রহণ করে, পিতাকে রাখিয়া উপযুক্ত পুত্রকে কোলে টানে। কোথায় পুত্রের কোলে মাথা রাখিয়া পুত্রের মুখে হরিনাম শুনিতে শুনিতে বৃদ্ধ পিতা পরম শান্তিতে বিদায় লইবেন, পুত্র মুখে অগ্নি দিবে, পুত্র শ্রাদ্ধ তর্পণ করিবে,—তাহা না হইয়া পুত্র পিতার কোলে মাথা রাখিয়া চলিয়া গেল, তিনি পিতা হইয়া তাহার মুখাগ্নি করিলেন, পুত্রের শ্রাদ্ধ পিতা করিলেন? কি নিদারুণ মর্ম্মঘাতী কায!

নিদারুণ মর্ম্মব্যথায় বৃদ্ধ দুই হাতে দীর্ণ বুকখানা চাপিয়া ধরিলেন। এই তো সেই পৃথিবী, এখনও তো সেই একই চন্দ্র সূর্য্য নীলাকাশে ভাসিয়া উঠে। এই চন্দ্র সূর্য্য একদিন রাম-রাজত্বে ব্রাহ্মণের শিশু পুত্রের মৃত্যু দেখিয়াছিল। সে কোন্ অতীত যুগ,—সে কোন্ অতীত কাল, যে কালে মৃত্যুকেও বশ্যতা স্বীকার করাইতে পারা যাইত, মৃত্যুও পিতামাতা বর্ত্তমানে পুত্র হরণ করিতে ভয় পাইত?

"দাদু—"

হঠাৎ এই আহ্বানটা কাণে আসিতেই বৃদ্ধ সোজা হইয়া বসিলেন, হাত দুখানা শ্লথ ভাবে দুই দিকে পড়িয়া গেল। মনের গুপ্ত ব্যথা তিনি কাহারও সম্মুখে প্রকাশ করিতে চান না। কেহ যখন কমাইতে পারিবে না তখন এ প্রকাশ করিয়া লাভ কি? এ বেদনা তাঁহার গাম্ভীর্য্যের আড়ালে থাকিয়া যাক, কেহ যেন না জানিতে পারে।

মুখখানা যে অসহ্য যাতনায় বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তিনি নিজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। জোর করিয়া তিনি স্বাভাবিক অবস্থা মুখে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিলেন। কথা কহিতে গিয়া পাছে কণ্ঠস্বরের বিকৃত ভাব ধরা পড়িয়া যায়, তাই দুই চার বার কাসিয়া কণ্ঠস্বর ঠিক করিয়া লইয়া প্রচুর উৎসাহের অযথা ভান দেখাইয়া বলিলেন, "এই যে দিদি তুই এসেছিস। আমি ভাবছিলুম তোকে একবার ডাকতে পাঠাব এখনি। মনের টান একবার দেখেছিস ভাই,—যে যাকে ডাকে তাকেও ঠিক তার ভাবনা করতেই হবে এ জানা কথা। এই দেখ না তার প্রমাণ, যেমন আমি তোর কথা ভেবেছি অমনি তুই সশরীরে এসে পড়েছিস। একেই বলে মনের টান—অর্থাৎ কি না,—"

ঠিক উপযুক্ত কথাটা তিনি সময়মত খুঁজিয়া না পাইয়া মাথার টাকে হাত বুলাইতে সুরু করিয়া দিলেন।

কতখানি কৃত্রিমতার মধ্যে তিনি নিজেকে রাখিয়াছেন, কতখানি গোপনতার মাঝখান দিয়া এই কথাগুলিকে তিনি টানিয়া আনিতেছিলেন, তাহা সীতা বেশ বুঝিতেছিল। সে তাহার করুণ চোখ দুইটী দাদুর মুখের উপর তুলিয়া ধরিল। হায় রে, বৃথাই তাহার চোখে ধূলা দিবার আয়োজন করা। সে যে দিকে চাহিতেছে সেই দিকেই এই আত্মগোপনের বৃথা চেষ্টা। ঈশানী হয় তো কি কথা বলিতেছেন, বলিতে বলিতে থামিয়া যান,—সে কথাটা আর খুঁজিয়া পান না। আহারে বসিয়া হাতের ভাত হাতেই থাকিয়া যায়, কোন্ দিকে চাহিয়া কি ভাবেন কে জানে। সীতা যেমন বলে—"ও কি মা, খাওয়া বন্ধ করে কি ভাবছেন বলুন তো,—" অমনি তিনি চমকাইয়া উঠিয়াই হাসিয়া ফেলেন। সে কি হাসি? সে যে বুকের মধ্যে গুমরিয়া উঠা সেই কান্না, যাহা অনবরত বুকের মধ্যে গড়াইয়া বেড়াইতেছে। কান্নাকে হাসির আকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রকাশ করিলেও—যাহারা বুঝে তাহারা ইহাকে হাসি বলিতে পারে না।

তাহার পর এই মরণের দ্বারে উপনীত বৃদ্ধ, ইনিও সযত্নে আপনাকে অনেক দূরে সরাইয়া লইয়া গোপন রাখিতেছেন। সীতা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতেছে যে, দাদু আগে কোলাহলের মধ্যে জীবন কাটাইবার প্রয়াসী ছিলেন—হঠাৎ তিনি অত্যন্ত নির্জ্জনতার পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। নির্জ্জনে তাঁহার স্বরূপ তিনি প্রকাশ করিতে পারেন, সর্ব্বদা মুখোসের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু নির্জ্জনে থাকার চেয়ে তাঁহার বাহিরে কাযকর্ম্মের মধ্যে থাকাই যে ভাল ছিল। আগে যখন তিনি দিনরাত বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন, এই সব কথা ছাড়া তাঁহার মুখে

অন্য কথা ছিল না। তখন সীতাই কতদিন তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে, কতদিন বলিয়াছে.—"দাদু, চিরকালই কি বিষয়-কর্ম্ম নিয়ে কাটিয়ে দেবেন, একটু আধটু নিজের পারলৌকিক ভাবনা করুন, এ জন্মেই সব শেষ হয়ে যাবে না।" দাদু হাসিতেন, বলিতেন—"নিজের কায করব বই কি ভাই। আগে জ্যোতি আসুক, তোকে তার পাশে বসাই, তার পর তোদের জিনিস তোদের বুঝিয়ে দিয়ে আমি একেবারে বিশ্রাম নেব।"

সেই বিষয়ী দাদুর এই বিষয়-বিতৃষ্ণা সীতার মনে বড় আঘাত দিয়াছে। তিনি এখন সকাল হইতে বেলা বারটা পর্য্যন্ত ঠাকুর-ঘরে বসিয়া কাটান। সীতা রুদ্ধ দরজার ফাঁক দিয়া উঁকি দিয়া দেখে, সে তো পূজা করা নয়, সে নীরবে মর্ম্মবেদনা নিবেদন করিয়া দেওয়া। হাতের অর্ঘ্য হাতেই থাকিয়া যায়, চোখের জলে সচন্দন তুলসীপত্র ভাসিয়া যায়। হায় প্রভু, তাঁহার এই একাগ্রতা-পূর্ণ পূজা লইবার জন্যই কি তাঁহার আয়ুরেখা এত দীর্ঘ করিয়া টানিয়া দিয়াছ—যাহার পরিসমাপ্তি আজও হইল না!

সীতা একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল।

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "ঠিক মনের টানই বটে দাদু, সেই জন্যেই আমি এসেছি। আচ্ছা, কি জন্যে আমায় মনে মনে ভাবছিলেন একবার বলুন তো দেখি।"

বিহারীলাল বলিলেন, "ওই যে,—ওই বইখানা একটু পড়ে শুনাবার জন্যে। হায় রে, চোখে কি আর দেখতে পাই যে আপনি পড়ব? এই কিছুদিন আগেও চোখে বেশ দেখতে পেতুম, কাউকে একটু পড়ে দেওয়ার জন্যে আজকের মত খোসামোদ করতে হত না,—আর আজ কি না পরের খোসামোদ করে বই পড়িয়ে শুনতে হয়।"

সীতা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "আমি তো আপনার সেবার জন্যেই রয়েছি দাদু,—যখন যা দরকার পড়ে আমায় বললে আমি করে দেব।"

বিহারীলাল তাহার মাথায় হাতখানা বুলাইয়া দিতে দিতে হাসিয়া বলিলেন, "সে তো জানিই দিদি, তুই যে আমার সেবাদাসী। আপনার যারা তাদের তো পেলুম না, সেই জন্যেই ভগবান তোকে আমায় মিলিয়ে দিয়েছেন। আর বেশী দিন যে বাঁচব না তা বেশ বুঝেছি দিদি। এই পাঁজরায় ঘা খেয়েও বেঁচে ছিলুম, এবার ঘা পড়েছে বুকের এই জায়গায়; একেবারে হৃৎপিণ্ডের ওপরে, এ ঘা কি আর সামলাতে পারব রে? যে কয়টা দিন বেঁচে থাকি, তোকে দিয়ে নিজের সেবা পুরোদস্তর আদায় করে নেবই। মনে কিছু করিসনে ভাই,—তোর বুড়ো দাদুটা বড় দুষ্ট, নিজের পাওনা কড়াক্রান্তি হিসাবে আদায় করে নিতে চায়।"

তিনি বহুদিন পরে আজ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহার হাসিতে ঘরটা গম্-গম্ করিতে লাগিল। রাখাল সন্দিগ্ধভাবে দরজার বাহির হইতে মুখ বাড়াইল।

হাসি থামিলে বৃদ্ধ বলিলেন, "দেখছিস সীতা, আজ অনেক কাল পরে আমায় হাস্‌তে দেখে রাখাল বেটা উঁকি দিয়ে দেখলে, ভেবেছে—বুড়ো হয় তো পাগল হয়ে গেল। তাও যদি হতুম, সেও যে ভাল ছিল। কিন্তু পাগল হয় কারা জানিস? যাদের রক্ত গরম অর্থাৎ কাঁচা বয়স যাদের—হয় তো একটা আঘাত পেয়েই তাদের মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যায়। আমার কেমন করে হবে? এ রক্ত বড় ঠাণ্ডা, এ মাথাও ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, তাই আঘাতের পর আঘাতেও যেমন ছিলুম তেমনি রয়েছি।"

রাগের ভান দেখাইয়া সীতা বলিল, "আপনি যদি যা-তা বলেন তাহলে আমি চলে যাব দাদু।"

"না না দিদি, আর বলব না। তুই বইখানা ওখান হতে পেড়ে নে দেখি, পড়—আমি চুপ করে শুনি।"

সীতা বই লইয়া প্রদীপের কাছে বসিল। (ক্রমশঃ)

প্রাচীন ভারতে অবন্তি

ডাক্তার শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল, পিএইচ্-ডি

প্রাচীন ভারতের ক্ষত্রিয় রাজ্যরূপে বৈদিক যুগে অবন্তি প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। বৈদিক সাহিত্যে তাহাদের নামও পাওয়া যায় না। কিন্তু মহাভারতে দেখা যায়, বিশেষ শক্তিমান ক্ষত্রিয় রাজ্যগুলির ভিতরে অবন্তিও স্থান লাভ করিয়াছে।

হিন্দু সাহিত্যে অবন্তি

অবন্তির যুগ্ম সম্রাট বিন্দ এবং অনুবিন্দ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া দুর্য্যোধনের পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন। সুতরাং সমগ্র কুরুসৈন্যের এক-পঞ্চমাংশ অবন্তির দ্বারাই গঠিত হইয়াছিল (V, 19-24)। এই দুই সম্রাট বীরের শ্রেষ্ঠ উপাধি 'মহারথ' নামও লাভ করিয়াছিলেন (VIll, 5-99)। কুরুক্ষেত্রে সমবেত মহাযোদ্ধাদের স্তর বিভাগ প্রসঙ্গে ভীষ্ম এই দুইজন অবন্তি নরপতির সমরনিপুণতার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"আমার মতে যুদ্ধবিশারদ, মহাশক্তিসম্পন্ন অবন্তি নরপতি বিন্দ এবং অনুবিন্দ দুইজন শ্রেষ্ঠ রথী। এই দুইজন নরশ্রেষ্ঠ গদা, পক্ষযুক্ত বাণ, তরবারি এবং দীর্ঘ ভল্ল নিক্ষেপ দ্বারা শত্রু সৈন্য ধ্বংস করিবেন। যুদ্ধ করিতে যদি তাঁহারা ইচ্ছা করেন তবে মৃত্যু-দেবতা যমের ন্যায় এবং পশুপালের ভিতর ক্রীড়ামত্ত হস্তী-যূথের ন্যায় তাঁহারা বিভীষিকার সৃষ্টি করিবেন।" (V. 116, 5753, Cal. Ed.)। এই দুইজন নরপতি মহাযুদ্ধের বর্ণনায় বহুবার মহারথ নামে অভিহিত হইয়াছেন। ভীষ্মপর্ব্বে তাঁহাদিগকে মহারথ বলা হইয়াছে—'আবন্ত্যৌ চ মহারথৌ' (Vl. 19. 4504 and Vl. 114. 5293, 5309)। এই পর্ব্বেই অন্যত্র যখন তাঁহারা বিশাল কার্ম্মুক পরিচালনা করিতেছিলেন তখন তাঁহাদিগকে বলা হইয়াছে—আবন্ত্যৌ তু মহেষ্বাসৌ (Vl. 83. 3650, Vl. 94. 4195)। এই মহাযুদ্ধের বিবরণে জয়দ্রথের সঙ্গে সঙ্গে অবন্তি নরপতিদ্বয়ের নাম বহুবার উচ্চারিত হইয়াছে (V. 55. 2206; V. 62. 2426; Vl, 16. 6022; IX, 2. 72)। এই যুদ্ধে ইঁহারা বিশেষ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন; এবং এই যুদ্ধের বহু গৌরবময় ও বীরত্বসূচক কার্য্যের সহিত ইঁহাদের নাম সংশ্লিষ্ট হইয়া আছে। তাঁহারা ব্যক্তিগত বীরত্ব এবং সেনাপতিসুলভ সমর-নৈপুণ্যের দ্বারা এবং নানা রকমের অসংখ্য সৈন্যের দ্বারা কৌরবপক্ষের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছিলেন। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় অবন্তির বিন্দ এবং অনুবিন্দ অসীম সাহসে ভীষ্মকে সাহায্য করেন (Vl. 16. 622; 11. 17. 673, etc)। মহাবীর অর্জ্জুনকেও আক্রমণ করিবার নিমিত্ত তাঁহারা অনুজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন (Vl. 59. 2584)। অর্জ্জুনের ঔরসে এবং নাগরাজ-দুহিতার কন্যার গর্ভে যে মহাবল ইরাবতের জন্ম হইয়াছিল, অবন্তি সম্রাটদ্বয় তাঁহার সহিত বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করেন (Vl. 81. 3557; Vl. 83. 3650-3660)। তাঁহারা পাণ্ডব সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ করিয়াছিলেন (VI, 86. 3823)। সসৈন্যে তাঁহারা অর্জ্জুনকে পরিবেষ্টন করেন (Vl. 102) এবং ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করেন (Vl. 113. 5240)। দ্রোণ কৌরব সৈন্যের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিলে অবন্তির যুগ্ম সম্রাট বিন্দ এবং অনুবিন্দকে পাণ্ডবপক্ষের চেকিতান, বিরাট প্রমুখ শ্রেষ্ঠ বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখা যায় (Vll. 14. 542; 25. 1083; 32. 1416)। এইরূপে মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা মহাপরাক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এক বিবরণ অনুসারে তাঁহারা অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন (Vll. 99. 3691)। অন্য এক বিবরণ অনুসারে তাঁহারা ভীমের দ্বারা নিহত হন (Xl. 22. 671)। কর্ণ-পর্ব্ব এবং অন্যান্য স্থানেও অমিত-বিক্রম অবন্তি সৈন্যের—"সৈন্যম্ আবন্ত্যানাম"—উল্লেখ পাওয়া যায় (Vll. 113. 4408; Vill. 8. 235)।

মৎস্য পুরাণের মতে (ch. 43) অবন্তিরা হৈহয় বংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। হৈহয় বংশের সর্ব্বাপেক্ষা কীর্ত্তিমান রাজা ছিলেন কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন। এই মহাপরাক্রান্ত রাজার

একটি পুত্রের নাম ছিল অবন্তি। লিঙ্গ পুরাণ বলেন (ch. 68.) কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের এক শত পুত্র ছিলেন। এই একশত পুত্রের ভিতর শূর, শূরসেন, দৃষ্ট, কৃষ্ণ এবং যযুধ্বজ এই পাঁচজন অবন্তিতে রাজত্ব করেন এবং মহা যশস্বী হন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর মহাপুরাণে (ch. ix) এবং পদ্মপুরাণে অবন্তি প্রাচীন ভারতের একটি মহাজনপদ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণে আবন্ত্যখণ্ড নামে একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় আছে। এই অধ্যায়ে অবন্তি রাজ্যের পবিত্র এবং তীর্থস্থানগুলির বিবরণ আছে। স্কন্দ পুরাণ বলেন, ভগবান মহাদেব দানব-রাজ ত্রিপুরকে নিহত করিয়া মহাযশ অর্জ্জন পূর্ব্বক অবন্তি রাজ্যের রাজধানী অবন্তিপুরে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই জয়ের প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য অবন্তিপুরের নাম উজ্জয়িনী রাখা হয়। এই পুরাণের অযোধ্যা-মাহাত্ম্য নামক অধ্যায়ে (ch. 1) দেখা যায়, অবন্তির রাজধানী উজ্জয়িনীর ঋষিগণ রামের যজ্ঞে যোগদান করিবার জন্য সশিষ্য কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন (ch. 1)। অবন্তি রাজ-পরিবারের সহিত যদুবংশের যে বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, পুরাণসমূহে তাহার বিবরণও বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ ও অগ্নিপুরাণে (ch. 275) দেখা যায়, রাজ্যাধিদেবী নামে একজন যদুবংশীয় রাজকুমারীর সহিত একজন অবন্তি রাজপুত্রের বিবাহ হইয়াছিল। এই রাজ্যাধিদেবী যদু সম্রাট বাসুদেবের পঞ্চ ভগ্নীর মধ্যে একজন ছিলেন। বাসুদেব শূরের পুত্র। এই শূর অন্ধকের পুত্র ভজমানের বংশ হইতে উদ্ভূত। বিষ্ণুপুরাণ আরও বলেন যে রাজ্যাধিদেবীর গর্ভেই বিন্দ এবং উপবিন্দের জন্ম হয়। সম্ভবতঃ এই বিন্দ এবং উপবিন্দই মহাভারতের সেই বিন্দ এবং অনুবিন্দ যাঁহারা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মহাপরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন্।

বৈয়াকরণ পাণিনি তাঁহার একটি সূত্রে অবন্তির উল্লেখ করিয়াছেন—স্ত্রীয়াম্—অবন্তি কুন্তি-কুরুভ্যশ্চ (IV. I. 176) অর্থাৎ স্ত্রীনাম বুঝাইতে হইলে অবন্তি, কুন্তি এবং কুরু শব্দের শেষে যে বিভক্তির যোগের দ্বারা তাহাদের নৃপতিকে বুঝায় তাহা লোপ পায়। এই সূত্র অনুসারে পাণিনির মতে অবন্তী শব্দের অর্থে অবন্তিরাজের কন্যাকে বুঝায়।

মহাভারতের বনপর্ব্বে ঋষি ধৌম্য পশ্চিম ভারতের তীর্থ স্থানগুলির উল্লেখ প্রসঙ্গে অবন্তি রাজ্যেরও উল্লেখ করিয়াছিলেন—অবন্তিষু প্রতিচ্যাম্ বৈ (III. 89. 8354)। তিনি আরও বলেন যে পুণ্যতোয়া নর্ম্মদা অবন্তিরাজ্যের ভিতরেই অবস্থিত। বিরাটপর্ব্বের প্রারম্ভে নানা দেশের বর্ণনা কালে অর্জ্জুন পশ্চিম-ভারতের সুরাষ্ট্র, কুন্তি, প্রভৃতি রাজ্যের সঙ্গে অবন্তিরও উল্লেখ করিয়াছিলেন—"কুন্তিরাষ্ট্রম্ সুবিস্তীর্ণম্ সুরাষ্ট্রাবন্তয়স্তথা (IV. I. 12)। ভীষ্ম পর্ব্বে ভারতবর্ষের বর্ণনা কালে কুন্তি এবং অবন্তি রাজ্যের ভৌগোলিক সংযোগের পরিচয় পাওয়া যায়—কুন্তয়োবন্তয়শ্চ (VI. 9. 350)। বনপর্ব্বের নলোপাখ্যানেও অবন্তি সহরে গমনের জন্য একটি পথের কথা বর্ণিত হইয়াছে। (III. 61. 2317)। মিসেস্ রিজ্ ডেভিড্স্ বলেন, অবন্তি বিন্ধ্য-পর্ব্বতের উত্তরে, বোম্বাই-এর উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সময় ভারতবর্ষের চারটি প্রধান সাম্রাজ্যের ভিতর অবন্তি ছিল একটি। পরে ইহা মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। (Psalms of the Brethren, p-107. note i)।

অধ্যাপক রিজ্ ডেভিড্স্ বলেন—"এই প্রদেশের (অবন্তির) অধিকাংশ স্থানই সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। যে সব আর্য্য সিন্ধুর উপত্যকা দিয়া আসিয়াছিলেন এবং কচ্ছ উপসাগর হইতে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন তাঁহারাই এ প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন অথবা ইহাকে জয় করেন। অন্ততঃপক্ষে দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দে ইহার নাম যে অবন্তি হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। জুনাগড়ের রুদ্রদামনের শিলালিপি দ্রষ্টব্য। কিন্তু সপ্তম বা অষ্টম খৃষ্টাব্দ হইতে ইহা মালব নামে অভিহিত হয় (Buddhist India, p. 28)।

অবন্তির রাজধানী উজ্জৈন

মধ্য ভারতে গোয়ালিয়রের অন্তর্গত বর্ত্তমান উজ্জৈন (Ujjain) উজ্জয়িনী সহর। চর্ম্মনবতী (চম্বল) নদীর শাখা সিপ্রার তীরে এই নগর অবস্থিত ছিল। এই নগরই অবন্তি বা পশ্চিম মালবের রাজধানী উজ্জয়িনী। মৌর্য্য এবং গুপ্ত রাজাদের রাজত্বকালে এই নগরেই তাঁহাদের প্রতীচ্য প্রদেশসমূহের রাজপ্রতিনিধিরা বাস করিতেন। (Rapson's Ancient India, p. 175)

দীপবংশে দেখা যায় উজ্জেনী অচ্চুতগামী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। (Dipavamsa, Oldenberg Text. p. 57)। ওয়াটার্স (Watters) বলেন—অবন্তির রাজধানী উজ্জয়ন

সম্বন্ধে ইউয়ান্ চুয়াং (Yuan Chwang) বলিয়াছেন যে, সাধারণের বিশ্বাস এই স্থানটিই বিখ্যাত উজ্জৈন বা উজ্জেন। কোনও কোনও ধর্ম্মগ্রন্থে উজ্জৈন কনৌজের পশ্চিমে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কনোজ উজ্জৈন এবং বারাণসীর মধ্যে অবস্থিত (On Yuan Chwang, vol II, pp 250-251)।

এই চৈনিক পরিব্রাজকটি রাজধানী উজ্জয়িনীর চতুর্দ্দিকস্থ সমস্ত প্রদেশটিকেই উজ্জয়িনী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি ইহার নিম্নলিখিত বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন—"উজ্জৈনীর পরিধি প্রায় ৬০০০ লি এবং রাজধানী প্রায় ৩০ লি। লোকের আচার ব্যবহার এবং ভূমির উৎপাদন সৌরাষ্ট্রদেশের অনুরূপ। লোকের বাস খুব বেশী এবং প্রতিষ্ঠানগুলি সমৃদ্ধিশালী। অনেকগুলি মঠ আছে; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ধ্বংসোন্মুখ। মাত্র তিনটি অথবা পাঁচটি ভালো অবস্থায় আছে। এখানে প্রায় ৩০০ ভিক্ষু বাস করেন। মহাযান এবং হীনযান সম্বন্ধে তাঁহারা আলোচনা করেন। বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অনেকগুলি দেবমন্দিরও এখানে আছে। রাজা ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব। বিধর্ম্মীদের ধর্ম্মগ্রন্থে তাঁহার সুগভীর জ্ঞান আছে; কিন্তু সত্য ধর্ম্মে তাঁহার কোন আস্থা নাই। নগরের অনতিদূরেই একটি স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এইখানেই রাজা অশোক নরক (শাস্তির জন্য) নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন (Buddhist Records of the Western World, vol. ii. p. 270)।

অবস্থানের জন্য অবন্তি খুব বড় বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। এইখানে তিনটি রাস্তা সম্মিলিত হইতে দেখা যায়। একটি রাস্তা আসিয়াছিল শূর্পারক (সোপার) এবং ভৃগুকচ্ছ (ব্রোচ্) যাহার বন্দর সেই পশ্চিম উপকূল হইতে। দ্বিতীয় রাস্তা আসিয়াছিল দাক্ষিণাত্য হইতে। তৃতীয়টি আসিয়াছিল কোশলের (অযোধ্যা) শ্রাবস্তী হইতে। ইহা বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বড় একটি কেন্দ্র ছিল। হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদেরা প্রথম দ্রাঘিমা এই স্থান হইতেই নির্ণয় করেন এবং কালিদাসের নাটকাবলী এইখানেই বসন্তোৎসবের সময় ৪০০ খৃষ্টাব্দে রাজপ্রতিনিধির সভায় অভিনীত হয় (Rapson's Ancient India, p. 175)।

Periplus of the Erythraean sea (sec. 48) নামক গ্রন্থে উজ্জেন সম্বন্ধে একস্থানে নিম্নলিখিত উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্যারাইগ্যাজা (Barygaza) হইতে পূর্ব্বদিকে ওজেনি নামে একটি নগর আছে। পূর্ব্বে ইহা রাজধানী ছিল এবং এখানে রাজা বাস করিতেন। এই স্থান হইতে স্থানীয় ব্যবহারের জন্য অথবা ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে চালান দিবার জন্য নানা রকমের পণ্য ব্যারাইগ্যাজায় বহুল পরিমাণে প্রেরিত হইত। পণ্য-সম্ভারের ভিতর বহুবর্ণের প্রস্তর, চীনামাটির বাসন, সূক্ষ্ম মসলীন্, রঙিন কার্পাস এবং সাধারণ রকমের দ্রব্য সমুদায় ছিল। উর্দ্ধপ্রদেশ (Upper Country) হইতে প্রোক্লের (Proklais) ভিতর দিয়া উপকূলে চালান দিবার জন্য ইহা প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। এই উদ্ধৃত অংশটি হইতে বোঝা যায় যে বিক্রমাদিত্যের প্রায় দেড় শত বৎসর পরেও উজ্জেন সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগর ছিল। কেবল রাজধানীর গৌরব ও মর্য্যাদার কিঞ্চিৎ হানি হইয়াছিল মাত্র। পুরাতন সহর এখন আর নাই। কিন্তু নূতন নগরের এক মাইল দূরে ইহার ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায় (Mc Crindle, Ancient India as described by Ptolemy, p. 155)। ইহা হিন্দুদের সাতটি পবিত্র নগরের একটি এবং তাহাদের জ্যোতির্ব্বিদদের প্রথম দ্রাঘিমা (Ibid. p. 124)।

বৌদ্ধ সাহিত্যে অবন্তি

অবন্তি ভারতবর্ষের বিশেষ সমৃদ্ধিশালী রাজ্যসমূহের মধ্যে একটি ছিল। অঙ্গুত্তর নিকায়ে জম্বুদ্বীপের ১৬টি জনপদের মধ্যে অবন্তির উল্লেখ আছে। এই নগরে যে খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য্য ছিল, সাত রকমের মুক্তা যে এখানে পাওয়া যাইত এবং ইহার অধিবাসীরা যে ঐশ্বর্য্যশালী ও উন্নতিশীল ছিল, এই গ্রন্থে তাহারও উল্লেখ পাওয়া যায় (Anguttara Nikaya, Vol. IV, pp. 252, 256, 261)।

পালি ভাষায় বর্ত্তমানে হীনযান সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ রক্ষিত হইয়াছে। এই পালি ভাষা সম্বন্ধে সার চার্লস্ এলিয়ট বলেন—"পালি ভাষা সাধারণের ভাষা নয়, বরং সাহিত্যেরই ভাষা। সম্ভবতঃ ইহা মিশ্র ভাষার সমবায়ে উৎপন্ন এবং অবন্তি এবং গান্ধারেই ইহার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয় (Hinduism and Buddhism, Vol. I. p. 282)।"

যে ধর্ম্মকে আমরা এখন বৌদ্ধধর্ম্ম বলি অবন্তি প্রথম হইতেই তাহার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। এই ধর্ম্মের

কয়েকজন অনন্যনিষ্ঠ উপাসক হয় এইখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন না হয় এইখানেই বাস করিতেন। ইঁহাদের কয়েকজনের নাম প্রদত্ত হইল—অভয়কুমার (থেরগাথা ভাষ্য, ৩৯), ইসিদাসী (থেরীগাথা ভাষ্য, ২৬১-৪), ইসিদত্ত (থেরগাথা, ১২০), ধম্মপাল (থেরগাথা, ২০৪, সোণ কুটিকন্ন (Vinaya, Texts, II, 32, Theragatha, 369, Udana, V. 6) এবং বিশেষভাবে মহা-কচ্চান (Sainyutta Nikaya, vol. III. p. 9, vi, 117, Anguttara Nikaya, Vol. I p. 23, V. 46; Majjhima Nikaya, Vol. III, 194, 223) [Cambridge History of India, Vol I, p. 186]।

মহাকচ্চায়ন উজ্জেনীতে রাজা চণ্ডপজ্জোতের (চন্দ্রপদ্যোত) পুরোহিত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি তিন বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহাকেই রাজ-পুরোহিতের পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। একদা বুদ্ধের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাজা তাঁহাকে আনিবার জন্য মহাকচ্চায়নকে প্রেরণ করেন। সাতজন লোক সমভিব্যাহারে তিনি বুদ্ধের নিকট গমন করিয়াছিলেন। বুদ্ধ সেইখানেই তাঁহাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া মহাকচ্চায়ন এবং তাঁহার সঙ্গীরা ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম অবগত হন এবং অরহত্ব লাভ করেন। অতঃপর রাজার পক্ষ হইতে তিনি বুদ্ধকে বলেন "হে প্রভু! রাজা পজ্জোত আপনার চরণ বন্দনা করিতে এবং আপনার ধর্ম্মবাণী শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন।" ভগবান বুদ্ধ তাঁহাদের প্রচারের দ্বারাই রাজাকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন। বুদ্ধের দ্বারা এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তাঁহারা রাজার কাছে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহার আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করিয়া তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন (Psalms of the Brethren, pp 238-239)। এই ঘটনা হইতে বোঝা যায় যে মহাকচ্চায়ন অবন্তির অধিবাসী ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত দেশবাসীদের ভিতর উক্ত ধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ করেন। এই প্রচার কার্য্যে মহাকচ্চায়নের সাফল্যের পরিচয় দেশের রাজা চণ্ডপজ্জোতকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করার ভিতর দিয়াও আংশিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

অঙ্গুত্তর নিকায়ে বুদ্ধের শিষ্যগণের ভিতর মহাকচ্চায়ন মহাসম্মানিত ব্যক্তিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি যখন অবন্তিতে ছিলেন তখন কালী নামে একজন উপাসিকা তাঁহার নিকট গমন করিয়া একটি শ্লোক বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। শ্লোকটিতে প্রধানতঃ কসিণ সম্বন্ধেই আলোচনা ছিল। মহাকচ্চায়ন ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন (Anguttara Nikaya, Vol. V. pp 46-47)। ইঁহার অবন্তিতে অবস্থান কালে অন্যান্য যে সব ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল পালি ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ হইতে তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। সংযুক্ত নিকায় বলেন যে, মহাকচ্চায়ন যখন অবন্তিতে ছিলেন, তখন হালিদ্দিকানি নামক একজন গৃহস্থ তাঁহার নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে রূপধাতু, বেদনাধাতু সঞ্ঞা-ধাতু, সংখার এবং বিঞ্ঞান ধাতুর আলোচনাপূর্ণ একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি এই গৃহস্থ প্রশ্নকারীকে এই সমস্ত ধাতুর অর্থ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন (Samyutta Nikaya, Vol. III, p. 9. foll)। এই নিকায়তেই দেখা যায় যে মহাকচ্চায়ন যখন অবন্তিতে ছিলেন তখন এই অনুরক্ত এবং তত্ত্বান্বেষী গৃহস্থটি আবার মহাকচ্চায়নের নিকট উপস্থিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের নানা জটিল তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কিরূপে বিভিন্ন রকমের ধাতু হইতে বিভিন্ন রকমের ফস্‌সের সৃষ্টি হয়, বিভিন্ন রকমের ফস্‌স হইতে কিরূপে বিভিন্ন রকমের বেদনার সৃষ্টি হয়—এ সমস্ত সমস্যার মীমাংসাই তাহার প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহাকচ্চায়ন তাঁহার সংশয়ের মীমাংসা করিয়া দিয়াছিলেন (Samyutta Nikaya, Vol. IV, pp 115-116)।

ধম্মপদ ভাষ্যে থের মহাকচ্চায়নের জীবনী সম্বন্ধে আরও অনেক বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে দেখা যায়—এই থের যখন অবন্তিতে বাস করিতেছিলেন তখন বুদ্ধ অবস্থান করিতেছিলেন সাবত্থীর বিখ্যাত উপাসিকা বিশাখা মিগার মাতার গৃহে। এই সুদূর ব্যবধান সত্ত্বেও যখন বুদ্ধ ধর্ম্ম-উপদেশ প্রদান করিতেন, মহাকচ্চায়ন সেখানে উপস্থিত থাকিতেন। এই জন্য ভিক্ষুদিগকে তাঁহার নিমিত্ত একখানি আসন পৃথক করিয়া রাখিয়া দিতে হইত (Dhammapada Commentary Vol. II. pp 176-177)। এই ভাষ্যেই

দেখা যায় যে মহাকচ্চায়ন যখন অবন্তির কুররঘর নগরে বাস করিতেছিলেন তখন সোণো কুটিকণ্ণো নামক একজন উপাসক তাঁহার ধর্ম্ম বক্তৃতা শুনিয়া বিশেষ ভাবে মুগ্ধ হন। এই উপাসক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে চাহিলে তিনি তাঁহাকে দীক্ষা দান করেন (Ibid. Vol. IV, p. 101, c. f. also the Vinaya texts, S. B. E. pt. II. p. 32 foll.)। বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর তাঁহার উপদেশাবলী সংগ্রহ করিবার জন্য যখন তাঁহার শিষ্যগণ প্রথম মহাসভাতে সমবেত হইয়াছিলেন, তখন যস অবন্তির ভিক্ষুগণের নিকটে লোক প্রেরণ করিয়া সভায় যোগদান পূর্ব্বক ধম্ম এবং বিনয় কি, কোন বস্তু ধম্ম এবং বিনয় নহে, ধম্ম এবং বিনয় প্রচারের ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন (Vinaya Texts. pt, III, p. 394, c. f. Geiger, Mahavamsa, tr., p. 21)। এই সমস্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে অবন্তির পশ্চিম অঞ্চলে এই নূতন ধর্ম্মের অনুরাগী লোক অনেক ছিলেন এবং তাঁহাদের প্রভাবও সামান্য ছিল না। থের মহাকচ্চায়নের উৎসাহ এবং পরিচালনায় এই নব ধর্ম্মের শান্তি ও মুক্তির বাণী এই প্রদেশটির সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

থের ইসিদত্ত মহাকচ্চায়নের দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। যাত্রীদের জনৈক পথ প্রদর্শকের পুত্ররূপে তিনি অবন্তির বেলুগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে উপকূলের বন্দর হইতে অভ্যন্তরস্থ বাজারে যাইবার যে সব পথ আছে অবন্তি তাহারই একটা প্রধান পথের উপরে অবস্থিত। সুতরাং অবন্তিতে এই ধরণের পথপ্রদর্শক প্রচুর পাওয়া যাইত। চিত্ত নামক মচ্ছিকাসণ্ডের একজন গৃহপতির সহিত ইসিদত্তের বন্ধুত্ব হয়। অম্বাটক বনে সমবেত ভিক্ষুদের সহিত চিত্তগৃহপতি সক্কায়দিট্ঠি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। (Samyutta Nikaya, vol. IV, pp 285-288)। চিত্ত বুদ্ধের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ইসিদত্তকে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্মের নিয়মাবলীও একখণ্ড প্রেরণ করিয়াছিলেন এই সমস্ত পড়িয়া ইসিদত্ত এতই মুগ্ধ হন যে তিনি মহাকচ্চায়নের নিকট হইতে বুদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। যথা সময়ে তিনি ছয় প্রকারের অভিজ্ঞা অর্জ্জন করিয়াছিলেন (Psalms of the Brethren, 107)।

ধম্মপাল অবন্তির একজন ব্রাহ্মণের পুত্র। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাদুর্ভাবের সময় যাঁহারা উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন ধম্মপাল তাঁহাদেরই একজন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পাঠ শেষ করিয়া ধম্মপাল যখন ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তিনি একটি গুহার ভিতর একজন থেরকে দেখিতে পান। তাঁহার নিকট হইতে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাঁহার আস্থা জন্মে। অতঃপর তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া ছয় প্রকারের অভিজ্ঞা অর্জ্জন করিয়াছিলেন (Psalms of the Brethren, p. 149)। সোণ কুটিকণ্ণ অবন্তির একটি সভাসদের পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পরিবারটি এরূপ সমৃদ্ধিশালী ছিল যে তাঁহাদের এই তরুণ বংশধরটি কর্ণে কোটি টাকা মূল্যের রত্নালঙ্কার পরিধান করিতেন। এই জন্যই তাঁহার নাম কোটি বা কুটি-কণ্ণ হইয়াছিল। বড় হইয়া তিনি প্রচুর ভূসম্পত্তির অধিকারী হন। কিন্তু পার্থিব ব্যাপারের উৎপীড়নে পীড়িত হইয়া অবশেষে তিনি মহাকচ্চানের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মহাকচ্চান তাঁহার প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি সাবত্থীতে গমন করিয়া ভগবান বুদ্ধের আবাসে রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। পরের দিন প্রভাতে তাঁহাকে আবৃত্তির জন্য আহ্বান করা হয়। ১৬টি অট্ঠকের জন্য তিনি বিশেষভাবে প্রশংসিত হন। অতঃপর অন্তর্দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া তিনি অরহত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন (Psalms of the Brethren, pp. 202-203)।

পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধগণের সময় অভয়মাতা নাম্নী একজন থেরী বহু পুণ্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিস্স বুদ্ধের সময় তিনি বুদ্ধকে একহাতা অন্ন মহা আনন্দের সঙ্গে দান করেন। এই পুণ্যকর্ম্মের জন্য বহুকাল তিনি দেবলোকে বাস করিয়া সুখ উপভোগ করিয়াছিলেন। পরে ইনিই পদুমবতী নাম গ্রহণ করিয়া সভানর্ত্তকীরূপে উজ্জেনীতে জন্মগ্রহণ করেন। মগধের রাজা বিম্বিসার তাঁহার নিকটে গমন করিয়া তাঁহার সহিত একরাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ফলে মগধরাজের ঔরসে তাঁহার গর্ভে এক পুত্রের জন্ম হয়। এই পুত্রের নাম ছিল অভয়। অভয়ের বয়স যখন সাত বৎসর তখন তাহাকে রাজার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল (Therigatha Commy, p. 39)।

উজ্জেনীতে ইসিদাসী নামে একজন থেরী বাস করিতেন। ইনি উজ্জেনীর একজন শ্রেষ্ঠীর কন্যা। পিতামাতা তাঁহার

বিবাহও দিয়াছিলেন এক শ্রেষ্ঠীপুত্রের সঙ্গে। স্বামীর সহিত এক মাস বাস করার পর স্বামী তাঁহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেন। সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া ইসিদাসী থেরী জীনদত্তার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুনী-ব্রত অবলম্বন করেন। অতঃপর তিনি থেরী হইয়াছিলেন এবং অরহত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন (Therigatha Commy. pp. 260-261)।

মূসিল নামে উজ্জেনীর একজন গন্ধর্ব্ব বারাণসীতে গুত্তিল নামে অন্য এক গন্ধর্ব্বের নিকট সঙ্গীত শিক্ষার নিমিত্ত গমন করিয়াছিল। মূসিলের দেহের চিহ্নাদি দেখিয়া গুত্তিল বুঝিতে পারেন যে মূসিল অত্যন্ত অভদ্র ও অকৃতজ্ঞ স্বভাবের লোক। সুতরাং তিনি তাহাকে শিক্ষা দান করিতে অস্বীকৃত হন। অতঃপর মূসিল গুত্তিলের পিতামাতার সেবা করিতে আরম্ভ করে। তাহার সেবার দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া গুত্তিলের পিতামাতা তাহাকে সঙ্গীত শিক্ষাদানের নিমিত্ত পুত্রকে আদেশ করেন। পিতার আদেশে পুত্র অবশেষে স্বীকৃত হন। মূসিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও পরিশ্রমী ছিল। সুতরাং সহজেই সে সঙ্গীতবিদ্যা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়। এইবার সে গুরু অপেক্ষা অধিকতর যশ অর্জ্জনের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। এই উদ্দেশ্যে বারাণসীর রাজাকে সে একদিন তাহার সঙ্গীত-নৈপুণ্যের পরিচয়ও প্রদান করে। তাহার সঙ্গীত শুনিয়া রাজা তাহাকে চাকরী দিতে স্বীকৃত হন বটে, কিন্তু তাহাকে বেতন দিতে চান তাহার গুরুর অর্দ্ধেক। মূসিল ইহাতে অস্বীকৃত হইয়া বলে—সঙ্গীত বিদ্যায় সে তাহার গুরু হইতে কোন অংশে হীন নহে। সে তাহার গুরুকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ও আহ্বান করিয়াছিল ; কিন্তু বিচারে তাহারই পরাজয় হয়। রাজা তাহাকে ইহার পর সভা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন (Vimanavatthu Commy. p. 137, foll)।

জৈন সাহিত্যে অবন্তি

জৈন ধর্ম্মের বিখ্যাত প্রচারক মহাবীর অবন্তি প্রদেশে তাঁহার কৃচ্ছ্র সাধনের কোনও কোনও অংশ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। মহাবীর উজ্জয়িনীতে গমন করেন এবং সেখানকার শ্মশানে তপশ্চর্য্যা আরম্ভ করেন। এই তপশ্চর্য্যায় রুদ্র এবং তাঁহার স্ত্রী বাধা দিতে চেষ্টা করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়াছিলেন। দিগম্বর ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মতে এই প্রলোভন জয় করিয়া এবং বনে গমন করিয়া তপস্যার দ্বারা তিনি মনঃ পর্য্যায় লাভ করিয়াছিলেন (S. Stevens, The Heart of Jainism, p. 33)।

অবন্তি ও শৈব সম্প্রদায়

এইখানেই মহাকালের মন্দির নির্ম্মিত হয়। ভারতবর্ষের দ্বাদশটি বিখ্যাত শিবমন্দিরের ভিতর এই মহাকালের মন্দির একটি (S. Stevenson, The Heart of Jainism, p. 75)। অবন্তির অন্তর্গত উজ্জেনীতে লিঙ্গ-পূজকদের একটি মহাতীর্থ অবস্থিত। শৈব সন্ন্যাসীরা সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরিয়া বিশেষভাবে পাঁচটি সিংহাসনই পরিদর্শন করে (কহুর, উজ্জেনী, বারাণসী, শ্রীশৈলম্ এবং হিমালয়ে অবস্থিত কেদারনাথ) [Eliot, Hinduism & Buddhism, vol. II p. 227]।

অবন্তির রাষ্ট্রীয় ইতিহাস

পূর্ব্বেই রাজা চণ্ড পজ্জোতের (প্রদ্যোত) নামোল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁহার সময়েই বৌদ্ধধর্ম্ম অবন্তির রাজ-ধর্ম্মে পরিণত হয়। প্রদ্যোতেরা অবন্তির (পশ্চিম মালব) রাজা ছিলেন। তাঁহাদের রাজধানী ছিল উজ্জৈন সহর। শিশুনাগ বংশের পঞ্চম এবং ষষ্ঠ রাজা বিম্বিসার এবং অজাতশত্রুর মত, বৎস (বংশ) রাজ পুরু উদয়নের (উদেন) মত এবং কোশলের ইক্ষ্বাকু প্রসেনজিতের মত চণ্ড পজ্জোতও বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন (Camb. Hist. of India, vol. I. pp 310-311)।

বিল (Beal) সংগৃহীত চৈনিক বৌদ্ধ উপাখ্যানসমূহে রাজা চণ্ডপজ্জোতের উল্লেখ পাওয়া যায়। বোধিসত্ত্বের আবির্ভাবের উপযুক্ত স্থান লইয়া যখন আলোচনা হইতেছিল তখন Golden Mass বলিয়াছিলেন "মাবন্তি দেশে, উজ্জয়নী নামে নগর, রাজার নাম প্রদ্যোত, তাঁহার পুত্রের নাম পূর্ণ ; রাজার নিজের শক্তি অসীম।" প্রভাপাল উত্তর দিয়াছিলেন—"এ সমস্তই সত্য হইতে পারে ; কিন্তু রাজ্যের রাজা কোনও নির্দ্দিষ্ট আইনের দ্বারা পরিচালিত হন না, এবং ভাল বা মন্দ কার্য্যের একটা নির্দ্দিষ্ট পরিণাম আছে, একটা ভবিষ্যৎ অবস্থা আছে, তাহাতে বিশ্বাসবান নহেন।" (The Romantic Legend of Sakya Buddha, p. 29)। বুদ্ধের সময়ে মধুরার রাজা অবন্তিপুত্র নামে অভিহিত

হইতেন। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, মাতার দিক হইতে তিনি উজ্জেনের রাজবংশের সহিত সংযুক্ত ছিলেন (Carmichael Lectures, 1918 p. 53)।

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসেও উজ্জয়িনী বেশ বড় স্থানই অধিকার করিয়াছিল। প্রদ্যোতদের শাসনকালে ইহার শক্তি বিশেষভাবেই অনুভূত হয়। উজ্জেনীর রাজা পজ্জোতের নিকট হইতে আক্রমণের আশঙ্কা করিয়া অজাতশত্রু তাঁহার রাজধানী রাজগৃহকে সুরক্ষিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ধম্মপদের ২১-২৩ শ্লোকের ভাষ্যে কৌশাম্বী এবং অবন্তির রাজপরিবারে বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার একটি রোমাঞ্চকর আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে। একদিন রাজা পজ্জোত তাঁহার সভাসদগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তাঁহার অপেক্ষাও যশস্বী আর কোনও রাজা আছেন কি না। সভাসদেরা কহিলেন—কোশম্বীর রাজা উদেন যশঃপ্রভায় তাঁহার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই উত্তরে রাজা পজ্জোত রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন। একটি কাঠের হস্তী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার ভিতর ৬০ জন যোদ্ধাকে লুকাইয়া রাখা হইল। রাজা উদেন সুন্দর হস্তী খুব ভালবাসিতেন। দূতেরা গিয়া তাঁহাকে খবর দিল যে সীমান্ত প্রদেশের অরণ্য মধ্যে একটি অপূর্ব্ব সুন্দর হস্তী দেখা গিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া উদেন হস্তী ধরিবার মানসে অরণ্যে গমন করিলেন। এইখানে তাঁহার অনুচরবৃন্দ তাঁহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং তিনি পজ্জোতের বন্দী হইলেন। এই বন্দী অবস্থাতেই পজ্জোতের কন্যা বাসুলদত্তার সহিত উদেনের প্রণয় সঞ্চার হয়। অবশেষে একদিন রাজা পজ্জোত যখন বিহারের জন্য অন্যত্র গমন করিয়াছিলেন। উদেন তাঁহার প্রণয়িনীকে লইয়া হস্তীপৃষ্ঠে পলায়ন করিলেন। পলায়নের সময় চর্ম্মপেটিকাতে বহু মুদ্রা এবং সুবর্ণরেণু লইয়া যান। গৃহে ফিরিয়া কন্যাপহরণের বার্ত্তা শুনিয়াই পজ্জোত তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য দ্রুতগামী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সৈন্যদলকে নিকটে আসিতে দেখিয়াই উদেন মুদ্রার থলি শূন্য করিয়া রাস্তায় ঢালিয়া দিলেন। তাহারা মুদ্রা কুড়াইতে লাগিল। এই অবসরে উদেন কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া গেলেন। আবার তাহারা নিকটে আসিতেই স্বর্ণরেণুগুলি ছড়াইয়া দিলেন। তাহারা আবার স্বর্ণরেণু কুড়াইতে আরম্ভ করিল। এই অবসরে উদেন তাঁহার নিজরাজ্যে সৈন্যগণের ভিতর নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর অনুসরণকারীরা ফিরিয়া গেল এবং তিনি বাসুলদত্তাকে লইয়া বিজয়ী বীরের মত রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। ইহার পরেই মহাসমারোহে বাসুলদত্তাকে সাম্রাজ্ঞীর পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয় (Buddhist India, pp. 4-7)। মহাকবি ভাষ এই বিবরণটিই অন্যভাবে তাঁহার স্বপ্ন-বাসবদত্তা নাটকে বিবৃত করিয়াছেন।

খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতকে উজ্জেনী মগধের শাসনাধীনে আসে। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক রাজপ্রতিনিধিরূপে উজ্জেনীতে প্রতিষ্ঠিত হন (Smith, Asoka, p. 235)। পিতা বিন্দুসারের রাজত্বকালে অশোক যখন উজ্জেনীতে অথবা অবন্তির অন্তর্গত উজ্জেনীতে রাজপ্রতিনিধি ছিলেন, তখনই তাঁহার পুত্র মহিন্দ জন্মগ্রহণ করেন (Copleston, Buddhism, p. 181) অশোকের পৌত্র 'সম্প্রতি' উজ্জেনে রাজত্ব করিয়াছিলেন। জৈন উপাখ্যানে ইঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়। সুহস্তিন মহাগিরি-পরিচালিত জৈন সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট সভ্য। পূর্ব্বজন্মে 'সম্প্রতি' একজন ভিক্ষুক ছিলেন। তিনি এই সুহস্তিনের শিষ্যবর্গকে মিষ্টান্ন বহন করিতে দেখিয়াছিলেন। শ্বেতাম্বরেরা সম্প্রতি শকাব্দে এই বিবরণ প্রদান করেন (Sinclair Stevenson, Heart of Jainism, p. 74)। উজ্জয়িনীর রাজা বিখ্যাত বিক্রমাদিত্য সিদিয়ানদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইহার পরেই তাঁহার শাসন ভারতের অধিকাংশ স্থানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি হিন্দুর সাম্রাজ্য-গৌরবকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন (McCrindle, Ancient India, pp. 154-155)।

পরবর্ত্তী কালেও ভারতবর্ষের ইতিহাসে অবন্তির কোনও কোনও রাজপরিবারের উল্লেখ পাওয়া যায়। পালবংশের ধর্ম্মপাল অবন্তি, ভোজ, যবন প্রভৃতি উত্তর অঞ্চলের প্রতিবেশী রাজন্যগণের অনুমোদন অনুসারে ইন্দ্রায়ুধকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার স্থানে চক্রায়ুধকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন (Smith, Early History of India, p. 398)।

মালবের পরমার-বংশের বহু নাম পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। বিশেষভাবে এই জন্যই পরমার-বংশ অনেকের কাছেই সুপরিচিত।

মালব অবন্তিরই প্রাচীন নাম। এই বংশটি নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে উপেন্দ্র অথবা কৃষ্ণরাজের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। উপেন্দ্র আবু পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী চন্দ্রবতী এবং অচলগড় হইতে আগমন করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল হইতে এইখানেই তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা বাস করিতেন। এই বংশের সপ্তম রাজার নাম ছিল মুঞ্জ। তিনি তাহার জ্ঞান ও বাগ্মিতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি কেবলমাত্র কবিদেরই পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন না, নিজেও সুবিখ্যাত একজন কবি ছিলেন। বিখ্যাত ভোজ রাজা এই মুঞ্জেরই ভ্রাতুষ্পুত্র। ১০১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ধারার সিংহাসনে আরোহণ করেন। সে সময়ে ধারা মালবের রাজধানী ছিল। তিনি বিপুল গৌরবে প্রায় ৪০ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন (Early History of India, p. 395)। প্রায় ১০৬০ খৃষ্টাব্দে চেদি ও গুজরাটের রাজার সম্মিলিত আক্রমণে এই বহুগুণান্বিত সম্রাট পরাজিত হন এবং এই বংশের গৌরব বিলুপ্ত হয়। ইহার পর স্থানীয় রাজা হিসাবে এই বংশের অস্তিত্ব ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকেও বজায় ছিল। কিন্তু এই সময়ে তোমর জাতির আক্রমণে উহা সম্যকরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তোমরেরা আবার চৌহান রাজাদের হাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৩০১ খৃষ্টাব্দে এই চৌহান রাজাদের হাত হইতেই মুসলমানেরা এ দেশের সিংহাসন কাড়িয়া লইয়াছিলেন (Ibid, p. 396)।

প্রাচীন পূর্ব্বমালব প্রদেশ মধ্যপ্রদেশের সগর জেলায় অবস্থিত ছিল। র‍্যাপসন্ (Rapson) বলেন, মুদ্রাতে ছাপ দেওয়ার পদ্ধতি ঢালাই করার পদ্ধতির ভিতর দিয়া যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, পূর্ব্ব-মালবের রাজধানী ইরাণের মুদ্রায় তাহারই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই মুদ্রাগুলি সম-চতুষ্কোণ তাম্রখণ্ডে নির্ম্মিত। পাঞ্চ চিহ্নিত অথচ একই ছাঁচে ঢালাই করা মুদ্রাতে যে সব চিহ্ন পাওয়া যায়, ইহাদের প্রত্যেকটির গাত্রেও তাহারই অনুরূপ পরিকল্পনাসমূহ উৎকীর্ণ দেখা যায়। এগুলি বিশেষভাবে আরও এই কারণে উল্লেখযোগ্য যে, এগুলির ভিতর অবিমিশ্র ভারতীয় মুদ্রার চরম উৎকর্ষের পরিচয় নিহিত আছে। উজ্জেনে যে গোলাকার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহাদের কতকগুলি তাহারই সমশ্রেণীভুক্ত। ইহাদের গাত্রে একটি বিশেষ ধরণের 'ক্রুশ' ও গোলাকার চিহ্ন বিদ্যমান। প্রাচীন মালবের প্রায় সমস্ত মুদ্রাতেই এই চিহ্ন থাকায় উহা উজ্জেন চিহ্ন নামেই পরিচিত (Brown, Coins of India, p. 20)। প্রথম সাজাহানের সময় পর্য্যন্ত মোগলদের চতুষ্কোণ মুদ্রাগুলি এই উজ্জেনেই প্রস্তুত হইত (Ibid, p. 87)।

উজ্জেনের মুদ্রাগুলি সাধারণতঃ একটি বিশেষ চিহ্নের দ্বারাই পরিচিহ্নিত। কিন্তু কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য মুদ্রায় খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের ব্রাহ্মী অক্ষরে 'উজেনীয়' এই শব্দটিও উৎকীর্ণ দেখা যায়। মুদ্রাগুলি সাধারণতঃ একপৃষ্ঠে সূর্য্যচিহ্নযুক্ত একজন মনুষ্য মূর্ত্তির দ্বারা এবং অন্য পৃষ্ঠে 'উজ্জেন' চিহ্নে পরিশোভিত। কতকগুলি মুদ্রার একপৃষ্ঠে আবার বন্ধনী পরিবেষ্টিত বৃষমূর্ত্তি, অথবা বোধিবৃক্ষ, অথবা সুমেরু পাহাড় অথবা লক্ষ্মীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। উজ্জেনের কতকগুলি মুদ্রা চতুষ্কোণ এবং অন্যগুলি গোলাকৃতি (R. D. Banerjee, Pracina Mudra, p. 108)।

"দুনিয়া তখন বৃথাই শাসায়"

শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী বি-এ

ভোরের আকাশ ভালবেসে
রঙিন ঠোঁটে মধুর হেসে
হাঁকিয়ে তাহার স্বর্ণ কিরণ রথ
যখন খুঁজে দ্বারে প্রবেশ পথ ;

অমানিশার নীরবতায়
বিশ্ব বঁধু যখন জড়ায়
লক্ষ হীরার চুম্‌কি হাওয়া নীল শাড়ীখান গায়ে,
যায়না শোনা যে গান কাণে চলে গগন বেয়ে ;

কাজলা রাতের সুরের জালে
ঘুম না ধরা আঁখির কোলে
স্বপন যখন আপন মনে খেয়াল বুনে চলে,
চিত্ত পুটে আঁধার-আলোর জোয়ার-ভাঁটা খেলে ;

বসন্তের ঐ উতল হাওয়া
প্রিয়ার রঙিন লিখন পাওয়া
খুসী ভরা তরুণ মনের দীপ্ত মুখের হাস
যখন দ্বারে
বারে বারে
জানিয়ে যায় পাগলা মনের আনন্দ উচ্ছ্বাস ;

কুসুম বধূর চুমায় মাতাল
চৈতী হাওয়া সামলাতে তাল
হঠাৎ যখন পথের 'পরে
বন্ধু ভেবে জড়িয়ে ধরে,
বকুল বনে আমের শাখায়
কুহু যখন গানে মাতায়,
'বউ কথা কও'র করুণ কান্না
অসীম হাওয়া শোকের বন্যা
ব্যথার দ্বারে বুলায় জিয়ন কাঠি,
উদয় গিরি অনল ছোঁওয়া,
অস্ত শিখর রক্তে নাওয়া,
দেব বালাদের সান্ধ্য প্রদীপ জ্বলে একটী দুটী ;

দুনিয়া তখন বৃথাই শাসায়
রুদ্র আঁখি বৃথাই নাচায়
মন যে কোথায় ভেসে বেড়ায়
মনই কী ছাই জানে ?
শাওন নিশার বিজলী যেমন আঁধার বুকে চাবুক হানে
জীবন মরুর উষর পথে
তেমনি হঠাৎ সাঁঝে, প্রাতে
মুক্তি উৎস উথলে উঠে
স্নিগ্ধ পরশ বুলায়
দুনিয়া তখন বৃথাই শাসায়
শাসন দণ্ড বৃথাই দোলায়
মনের নাগাল পাবে কোথায় ?
মনই কী ছাই জানে !

মোটরে তিন্ হাজার দু'শ মাইল্

শ্রীসুধাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায়

স্বপ্ন দেখছি। পূজোর ছুটি। কয়েকটি বন্ধু মিলে দুপুর বেলায় বাড়ীর বাইরের ঘরে তাস খেলার আয়োজন হচ্ছে, এমন সময় কাণে এল বিনয় বাবুর গলা—"কি ভায়া—বোম্বাই সহরেই আস্তানা গাড়লেন না কি ?" ঘুম ত গেল ছুটে ; ধড়মড়িয়ে উঠে দেখি—সেলামৎ মিঞা অর্দ্ধেক জিনিস নীচে নাবিয়ে মোটর বেঁধে ফেলেছে, এবং বিনয়বাবু তাঁর খাকি হাফ্ পেণ্টের মধ্যে ঢোক্‌বার চেষ্টা করছেন। তখন 'ভোর' প্রায় সাতটা।

চটপট্ স্নান সেরে তৈরি হয়ে, রাও সাহেবের হোটেলের শেষ খাওয়া কোনও রকমে গলাধঃকরণ করে বেরিয়ে পড়লাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সহরের বাইরে পুণার রাস্তা ধরা গেল। সাম্‌নে ও পিছনে তিন্ চারখানা আরও টুরিষ্ট-কার চলেছে। একুশ মাইলের পথ 'খানা' পেরুতেই দেখি, মোড়ের মাথায় এক 'নীল' পাগড়ী হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মোটর থামাতে হ'ল। বাইশ হাজার দু'শ দুই নম্বরের গাড়ী না কি এ অঞ্চলে কখনও দেখা যায় নি—কাজেই সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। পরম গম্ভীরভাবে পুলিশ মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন—"গাড়ী কাঁহাসে আতা হায় ?" সেলামৎ মিঞা আরও গম্ভীরভাবে উত্তর দিল——ক-ল্-ক-ত্তা-সে ;—পুলিশের মুখের গাম্ভীর্য্য ছুটে গেল, চোখ কপালে তুলে বলে উঠল—'বাপ্‌রে'। তার পর আস্তে আস্তে সরে দাঁড়াল—মোটর আবার এগিয়ে চল্ল।

বেলা প্রায় * এগারটার সময় "খান্দালা" পৌঁছলাম। "খান্দালার" ঠিক্ আগেই ভোরঘাট পেরুতে হল। বেরিয়ে পর্য্যন্ত এমন স্নিগ্ধ শরতের সকাল আগে আর একদিনও পাইনি। ঝল্‌মলে সোনালী রোদ গাছের পাতা, পাহাড়ের গা, ঝরণার জল, আর রাস্তায় ছড়ানো পাথরের টুক্‌রোগুলো থেকে ঠিক্‌রে পড়ছিল। তিন্ হাজার ফিট্ উঁচু "খান্দালা"র রাস্তা থেকে চারিদিকের সারি সারি Deccan trapএর পাহাড়গুলো দেখে মনে হচ্ছিল, যেন আজ অনেক দিনের বর্ষার পর এম্‌নি রোদ পেয়ে তারা দলে দলে রোদ পোয়াতে বেরিয়েছে। ভোরঘাটের ঠিক্ নীচেই একজন ইংরাজ টুরিষ্টের সঙ্গে দেখা হল। তিনি মোটর থামিয়ে নিজেই এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করলেন! কথায় কথায় বল্লেন—"আপনাদের সঙ্গে 'ক্যামেরা' আনা উচিত ছিল, রাস্তায় খুব চমৎকার দৃশ্য পাবেন। তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম ; কিন্তু মনে হল—হায় রে, বেরিয়ে পর্য্যন্ত প্রতি দিন, প্রতি প্রভাতে, প্রতি সন্ধ্যায়, প্রতি জ্যোৎস্না রাতে, পথের প্রতি বাঁকে বাঁকে যে অবিরাম দৃশ্য ছুটে চলেছে, ফটোর ছোট্ট ফাঁকটুকু দিয়ে তার কতটুকুই বা ধরে রাখ্‌বো,—আর যেটুকুও বা ধরা পড়বে, তাও যে বিকৃতই হয়ে যাবে। ক্যামেরা না আনার জন্য এতটুকুও দুঃখ হল না।

রাস্তায় টাটার হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিকের এক ষ্টেসন পড়ল। সেই কোন্ পাহাড়ের ওপোর থেকে ঝরণার জল পাইপে করে চালান দিয়ে 'টারবাইন' ঘোরান হচ্ছে, আর সেখান থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়ে ষাট মাইল দূরে বসে সহরের আলো আর সমস্ত মিল্ চালাচ্ছে। খুব ভাল লাগ্‌ল।

পাহাড়ের পালা শেষ করে আবার সমতল ভূমিতে এসে পড়লাম। 'খান্দালা' ছেড়ে প্রায় আট মাইল দূরে দুহাজার বছরের পুরান বৌদ্ধ যুগের বিখ্যাত 'কার্‌লা কেভ্‌স্' আরেকটা পাহাড়ের উপরে। সেলামৎ মিঞাকে মোটরে রেখে আমরা দুজনে চল্লাম গুহা দেখ্‌তে—সঙ্গ নিল এক থুথ্‌ড়ে বুড়ো। প্রায় সাতশ ফিট উঁচুতে পাহাড়ের গা খুঁড়ে এই পাথরের গুহা তৈরি করা হয়েছিল,—বর্ষার সময় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের থাক্‌বার জন্য। মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা হল, আর তার দুপাশে দুটো দরদালানের মত আছে—

---

* খান্দালা স্থানটী বড়ই চমৎকার। আর এখানকার জল হাওয়া খুব স্বাস্থ্যকর বলে অনেকগুলি স্বাস্থ্যনিবাস (Sanitarium) আছে। বম্বে পুণার অনেক সহৃদয় ধনী লোক এখানে দাতব্য স্বাস্থ্যনিবাসও তৈরী করে দিয়েছেন দেখ্‌লাম। এ যায়গাটী বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্যতম 'মধুপুর-সিমুলতলা' গোছের মনে হচ্ছে। কয়েকটী ছোটখাট হোটেল ও ধর্ম্মশালা আছে।

অনেকটা গির্জ্জার মত দেখ্‌তে। হল, এবং দরদালানের মাঝে দুসারি পাথরের থাম। এই থাম্‌গুলি তৈরী করবার খরচ এক একজন 'শেঠ' দান করেছিলেন, তাই প্রত্যেকটি থামের ওপোর হাতীর মাথায় তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর মূর্ত্তি আছে। হলের শেষে বেশ বড় একটা স্তূপ; তার ওপোর ছাতার নীচে বুদ্ধের ভস্ম রাখা হয়েছিল। প্রধান গুহার চারিদিকে আরও অনেকগুলি গুহা আছে, ভিক্ষুদের থাক্‌বার জন্য—কিন্তু তাতে কোনও রকমের কারুকার্য্য নেই। 'কারলা কেভ্‌স'এর ওপর থেকে চারিদিকের সমতল ভূমির দৃশ্য এবং সেখানকার নির্জ্জনতা, আর বিশেষ করে সেই দুহাজার বছরের 'সঙ্গ' খুবই ভাল লেগেছিল।

কিন্তু একটি জিনিস দেখে দুঃখ হল। কারলা গুহায় ঢোক্‌বার ঠিক্ মুখেই একটি কালী মন্দির রয়েছে দেখ্‌তে পেলাম। অনুসন্ধান করে জানা গেল, সেটি বেশী দিনের পুরান নয়, এবং সেই মন্দিরে প্রায়ই বহু ছাগ বলি দেওয়া হয়;—অহিংসা বাণীর পুরোহিতের আশ্রমের চৌকাঠের ওপোর এ পরিহাস বড়ই কর্কশ ঠেকে।

এখানকার কিউরেটর মিঃ কারখারনিস্ আমাদের খুব ভাল করে সমস্ত দেখিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক এখানে গবেষণা করতে এসেছেন, আর থাকেন সেই পাহাড়ের ওপোরে একেবারে এক্‌লা। আমরা এতদূর থেকে আস্‌ছি শুনে আমাদের সেবেলা থেকে খেয়ে যেতে অনুরোধ করলেন, আর দুঃখ করে বল্লেন—"The one great lesson I have learnt here, is that, man cannot do without man." যাবার তাড়া ছিল, তাই তাঁর সে অনুরোধ রাখতে পারলাম না।

পরিদর্শন পুস্তকে নাম্ লিখ্‌তে গিয়ে দেখি, সার জন ও লেডি সাইমন কয়েক দিন আগেই এখানে এসেছিলেন, এবং পরিদর্শন পুস্তকে তাঁদের নাম লিখে গেছেন। কিউরেটর বল্লেন, সার জন খুব ভাল স্কেচ করতে পারেন এবং কারলা গুহার সমস্তটা নিজে স্কেচ করে নিয়ে গেছেন। যাক্, বেলা প্রায় দেড়টার সময় পাহাড় থেকে নেমে এসে আবার মোটরে চাপা গেল। সেই বুড়ো এতক্ষণ সমানে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিল,—এইবার হাত পেতে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করলাম, "তুম্‌কো কোন সাথ্‌মে যানে বোলা?" কিছুমাত্রও ইতস্ততঃ না করে হাসিমুখে উত্তর দিল—'পেট বোলা'। বাধ্য হয়েই পকেটের ভার কিঞ্চিৎ লাঘব করতে হল,—এমন সোজা উত্তর কম্‌ই শুনেছি।

আবার মোটর ছুটে চল্ল। বেলা দুটো আন্দাজ এক গাছতলায় বসে একমুঠো ঘী-ভাত খাওয়া গেল,—ভাগ বসালে দুই তিন্‌টি জিপ্‌সি ছেলেমেয়ে।

পাঁচটায় 'পুণা'।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে 'কাৎরাজ' ঘাট পাহাড়ের তলায় এসে পড়লাম। সন্ধ্যার আগেই এটা পেরুতে হবে, সূর্য্যি ডুব্‌লে এ রাস্তায় যাবার হুকুম নেই। আঁকা বাঁকা রাস্তা ধরে মোটর পাহাড়ে উঠতে লাগ্‌লই। ওপোরে উন্মুক্ত শরতের আকাশ—নীচে, দূর হতে দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়া নিবিড় শ্যামলতা,—সাম্‌নের শিথিল পথখানি যেন সেই কোন্ 'দুরাশার দিক্‌পানে' চলে গেছে। চারদিকের জনহীন নীরবতাকে আরও নীরব করে ধীরে ধীরে সন্ধ্যাখানি নেমে এল যেন কোন গোপন অভিসারিকার মত……।

সাতারার ডাকবাংলোয় পৌছলাম, সন্ধ্যা ৭॥০টা। খান্‌সামার খিত্‌মৎগারিতে সে রাত্রে সুপ্ থেকে পুডিং পর্য্যন্ত একটা Full course dinner (পুরো ভোজ) ভাগ্যে জুটেছিল।

পরদিন—।

রাত্রে সেলামৎ মিঞাকে বলা হয়েছিল, যেন আমাদের ভো-ও-ও-রে ডেকে তুলে দেয়,—তা বেচারীর আর কি দোষ। সেলামৎ মিঞা জানে যে ভোরে মুর্গী ডাকে;—কিন্তু দক্ষিণ ভারতের মুর্গীগুলো যে রাত তিন্‌টের সময় উঠে 'পাঁয়তাড়া' ভাঁজতে থাকে, সেটা বোধ হয় তার জানা ছিল না; কাজেই আমাদের রাত তিন্‌টের সময় তুলে দিল। আমরাও বেরিয়ে পড়লাম্ বেল্‌গমের পথে।

আজকের এই শেষরাতের যাত্রাখানি চিরদিন মনে থাক্‌বে। আকাশের কোণে হেলে পড়া অন্তিম চাঁদের ম্লান জ্যোতিখানি ঘুমন্ত পৃথিবীকে তখনও নিবিড় করে ঢেকে আছে। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় দূরের পাহাড়গুলো, পাশের বনের অন্ধকার, আর মাঝে মাঝে ছোট ছোট নদীর ধারে ঘুমন্ত গ্রামগুলি—সব মিলে যেন একটা অদ্ভুত (Fantacy) মায়াপুরী সৃষ্টি করেছিল। গান ধরা গেল—

"আমার রাত পোহালো,
শারদ প্রাতে আমার
রাত পোহালো।"

...হবার আগেই আমরা তেত্রিশ মাইলের পথ 'কদর'এ পৌঁছলাম। গাইড্‌বুক্‌এ লেখা আছে যে, এখানে একটা কাদার দুর্গ (mud fort) আছে। গ্রামশুদ্ধ লোক্‌কে হাঁকাহাঁকি করে জানিয়ে দেওয়া হল যে, আমরা অনেক দূর থেকে দুর্গ দেখতে এসেছি। একটি ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে উঁচু নীচু অনেকখানি সরু রাস্তা ধরে এগিয়ে একটা কাদার দেওয়াল দেখা গেল। যা বোঝা গেল,—কালের গতিতে আসল দুর্গটা বেমালুম উড়ে গেছে, মাঝখানে ধাপে ধাপে নেবে যাওয়া কতকগুলো পাথরের ঘর দেখতে পাওয়া গেল,—তার অনেকখানিই জলে ভরা। মনে হল এতক্ষণে নিশ্চয়ই ক্ষিদে পাওয়া উচিত ছিল। সাম্‌নের একটি লোককে খাবারের দোকানের সন্ধান জিজ্ঞাসা করাতে, সে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল যে এখানে ত ভাল খাবার পাওয়া যাবে না; কেন না, খাবারওয়ালারা সব গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে—এখানে বড়ই প্লেগ হচ্ছে।" কি সর্ব্বনাশ! শুনেই ত গলা কুটকুট্ করতে লাগল, এবং দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে সোজা তিরিশটি মাইল দৌড় দিয়ে তবে মোটর থামান হল। তখন যে বেশ ক্ষিদে পেয়েছে, তাতে সন্দেহ করবার কোনই কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না।

একটা ছোট পাহাড়ের তলায় মোটর ভেড়ান হল। স্পিরিট ষ্টোভ্ জ্বেলে গণ্ডা তিনেক ডিম্ আর কিছু আলু সেদ্ধ করতে দিলাম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আধটিন মাখন, একটিন জ্যাম্, আধবাক্স বিস্কুট, দেড়পোয়া খেজুর, আধসের আলুসেদ্ধ আর তিন্‌গণ্ডা ডিম্ বেমালুম্ উড়ে গেল। অতি ...ৎ একটি ঢেঁকুর তুলে বিনয় বাবু করুণ স্বরে বল্লেন—"কিছুই হল না।" আমিও ব্যথা জানালাম—আবার মোটর ছুটে চল্ল।

'কোল্‌হাপুর' পৌঁছলাম বেলা ১০টায়। বেশ বড় জায়গা, অনেক দোকান-পাট, মোটরকার, ধূলো এবং মহারাজের ...য়ে পুষ্ট অনেকগুলি ইংরাজের বসতি। এখানে পেট্রল বোঝাই করে নিলাম। খানিকদূর এগিয়েই সুন্দর আখের ক্ষেত,—ফল—আকণ্ঠ আখের রস পান। ...লা প্রায় দেড়টার সময় ঘটপ্রভা নদীর ধারে ...সে মোটর থামান হল। নদীতে বেশ করে স্নান করা ...ল। সঙ্গে ছিল চিঁড়ে; সেলামৎ মিঞা পাশের গ্রাম থেকে নিয়ে এল গরম দুধ আর মিষ্টি—আর কি চাই?

বেলগম পৌঁছতে প্রায় তিন্‌টে বেজে গেল। রাস্তা-ঘাট সব টুক্‌টুকে লাল, বাড়ীঘর সব টুক্‌টুকে লাল—(লৌহ-বহুল) পাথরের তৈরি, গাছপালায় ঢাকা বেলগম সহরটা বেশ লাগ্‌ল। আজ প্রথম ভেবেছিলাম যে বেলগমেই রাত্তিরটা কাটাব, কিন্তু সকাল সকাল এসে পড়াতে সে মৎলবটা বদ্‌লে গেল, আমরা ধারওয়ারের পথ নিলাম—এখান থেকে সাতান্ন মাইল দূর।

বিকেল হয়ে এল। রাস্তায় দেখি বনের পথ দিয়ে খুব বড় বড় একপাল মহিষ চলেছে, আর সেই মহিষ দলের শেষে একটা লাঠি এগিয়ে আসছে। কি ব্যাপার? যাহোক মহিষগুলো পেরিয়ে দেখি যে একটি দেড়হাত পরিমাণ ছোট্ট ছেলে একটা পাঁচহাত লাঠি কাঁধে করে সেই মহিষের দল চরিয়ে বনের পথ দিয়ে বাড়ী ফিরছে। বেচারী আমাদের সাহেবী পোষাক দেখে একটা মহিষের পেছনে লুকোবার চেষ্টা কর্‌ছিল, কিন্তু আমাদের হাস্‌তে দেখে ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এসে হাতদুটি জোড় করে ছোট্ট একটি নমস্কার করল—তার পরেই একগাল হাসি। ভারি মিষ্টি লাগ্‌ল।

দুধারে ঘন বনের মাঝখানে টুক্‌টুকে লাল রাস্তাখানির ওপোর আরেকটি সন্ধ্যা—কি সুন্দর! পশ্চিমের আকাশ-খানা ভরে কে যেন মুঠো মুঠো রাঙ্গা আবীর উড়িয়ে দিয়েছে। কলকাতা থেকে বেরিয়ে পর্য্যন্ত মানুষের তৈরি কত কীর্ত্তিই দেখ্‌লাম—মন কখনও শ্রদ্ধায়, কখনও বিস্ময়ে ভরে উঠেছে। কিন্তু প্রতিদিনের অই আনন্দে ভরা প্রভাতগুলি—এই মলিন সন্ধ্যাগুলির মত একটিবারের জন্য তারা মনকে এমন করে মুগ্ধ করতে পারেনি। টুরে বেরিয়ে আমরা সারাদিন পথ চেয়ে বসে থাকতেম এই চিরনূতন প্রভাত ও সন্ধ্যাগুলিকে একটু একটু করে উপভোগ করবার আশায়;—এইটিই ছিল আমাদের সবচেয়ে বড় আনন্দ।

মোটর খুবই আস্তে চল্‌ছিল, কিন্তু চারিদিকের একেবারে নীরব নির্জ্জনতার মধ্যে মোটরের সামান্য গতিটুকু এবং এঞ্জিনের ফুস্‌ফুস্ আওয়াজটাও কাণে এসে যেন বেসুরো বাজছিল—তাই বিনয়বাবু সুইচটা off করে দিলেন। আস্তে আস্তে মোটরটা থেমে গেল। সেই বনপথের ধারে তিন জনে কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না—সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আস্‌তে চমক ভাঙ্গ্‌ল।

সন্ধ্যার পরেই ধারওয়ারে এসে পৌঁছলাম। অনেকক্ষণ

বনের রাস্তা দিয়ে চলে হঠাৎ যেন একটা মেলায় এসে পড়লাম। চারিদিকে দোকান পাট, লোকজন, চেঁচামেচি; এবং বাজারের মোড়ে প্রায় পঁচিশখানা মোটর 'বাস্' যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করছে, দেখতে পেলাম। আমাদের গাড়ীখানা আসতেই চারিদিকে বেশ একটা সরগরম্ পড়ে গেল—নূতন Ford এখানে এখনও কেউ দেখেনি, কাজেই কত দাম, ঘণ্টায় কত মাইল পর্য্যন্ত রান্ করতে পারে, ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে অস্থির হয়ে উঠতে হল। একটা দোকান থেকে যাহোক কিছু খাবার কিনে নিয়ে সে রাত্রের মত আমরা ডাক্‌বাংলোয় আস্তানা গাড়লাম্।

ধারওয়ার ছেড়ে এক নূতন উৎপাতের সৃষ্টি হল। দক্ষিণ ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই রাস্তায় Toll (কর) আদায় করবার ব্যবস্থা আছে। রাস্তা দিয়ে মোটরে অথবা অন্য উপায়ে, এক জেলা থেকে অন্য জেলায় যেতে হলে দুই জেলার সীমানার ওপোর এই কর দিতে হয়। এই টাকা দিয়ে সারাবছর ধরে সেইসব রাস্তা মেরামত হয় বলে গুজব। সচরাচর বছরের প্রথমে,—নদীতে যেমন ঘাট নীলাম হয়, তেম্‌নি এইসব ঘাঁটি নীলাম হয়ে থাকে, এবং যারা নীলামে এগুলি ডেকে নেয় তারাই সারাবছর ধরে এই কর আদায় করে থাকে। রাস্তার মাঝখানে একটা বড় বাঁশের বা কাঠের গেট্ থাকে, সেগুলিকে Toll gate বলে। এরই ধারে কর-আদায়কারীটি একটা কুঁড়ের ভেতর চুপ্‌টি মেরে বসে থাকে, এবং 'শিকার' দেখ্‌লেই গেট্‌টি বন্ধ করে দিয়ে, একটা লাল নিশান নাড়তে থাকে। সচরাচর একটি মুদ্রা দণ্ড দিলে তবে নিষ্কৃতি। তবে কোনও কোনও গেট্‌এ বার আনা, আট আনাও বরাদ্দ আছে।

সাতারা পেরিয়েই আমাদের প্রথম 'টোল্' দেবার কথা, কিন্তু সেলামৎ মিঞা যেভাবে ঘরছাড়া করেছিল,—কর-আদায়কারীর গভীর নিদ্রা তখনও ভাঙ্গে নি; আর আমরাও বেচারীর ভোরের ঘুম্‌টা ভাঙ্গিয়ে তাকে শুধু শুধু কষ্ট দেওয়াটা খুব যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করিনি—কাজেই সে যাত্রা রক্ষা পাওয়া গিয়েছিল।

সকালে ধারওয়ার ছেড়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে 'হুবলি', 'বাঙ্কাউর', 'মোতিবেন্নুর', 'রানি-বেন্নুর', পেরিয়ে বেলা একটা আন্দাজ একশ মাইলের পথ 'হরিহর'এ এসে পড়লাম। 'ধারওয়ার' ছেড়ে পথটা পাওয়া গিয়েছিল একেবারে সোজা। কাজেই মোটরও ঘণ্টায় চল্লিশ,—পঁয়তাল্লিশ—পঞ্চাশ মাইল করে ছুটেছিল। হরিহরের ঠিক্ আগেই 'তুঙ্গভদ্রা' নদীর ব্রিজের ওপোর উঠ্‌লাম্। পোলের শেষে পৌছতেই আস্তে আস্তে গেট বন্ধ হয়ে গেল—সাম্‌নেই "লাল নিশান'। দুটি চক্‌চকে টাকা টং টং করে বাজিয়ে নিয়ে গেট-রক্ষক একখানি দুর্ব্বোধ্য তামিলি ভাষায় লিখিত রসিদ দিল। মনে মনে তার মুণ্ডপাত করতে করতে আমরা হরিহরএ ঢুক্‌লাম।

হরিহরটা হল মহীশূর রাজ্যের সীমানায়। একটু এগিয়েই এক তেমাথা রাস্তা পাওয়া গেল। মোড়ের মাথায় তামিলি ভাষায় লিখিত সাইন্‌বোর্ড থাকাতে সেটা বোধগম্য হল না। এখন কোন্ দিকে যাই? রাস্তার ধারে গাছতলায় একটা লোক ঘুমচ্ছিল। মোটরের হর্ণ, electric hooter আমাদের চেঁচামেচি এবং সেলামতের তম্বি,—এর কোনটাই যখন তার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাতে পারল না, তখন হতাশ হয়ে সাম্‌নেই সোজা এগিয়ে চল্লাম। একটু দূরেই কয়েকটি স্ত্রীলোক যাচ্ছিল, তাদের জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে আমরা ঠিক্ বাঙ্গালোরের রাস্তাই নিয়েছি।

যাক্! এখান থেকে বাঙ্গালোর মাত্র ১৭৩ মাইল। মনে মনে ঠিক্ করলাম এই কটা মাইল ত ৬।৭ ঘণ্টার মধ্যেই পাড়ি দিয়ে আজকেই বাঙ্গালোরএ পৌছান যাবে। কিন্তু ভগবান হয়ত মনে মনে আমাদের পকতা দেখে হাসছিলেন।

হরিহর ছেড়ে যে রাস্তায় পড়লাম, সেটাকে আর যাই বলা যাক না কেন, রাস্তা বলা চলে না। মনে হল নিশ্চয়ই পথ ভুল হয়েছে। গাইড বুক খুলে দেখি তাতে একদল টুরিষ্ট লিখছেন—'and once on the other side (of the river Tungabhadra) we struck a road, reminiscent of the war days in Flanders.—fifty miles of fat holes and deep ruts, claim to be the high way from Harihar, to within 20 miles of Chitaldoorg, and the joke of the thing is that we had to pay our first toll on this 'circus' road. হায় ভগবান! সবে এক মাইল এসেছি—এখনও উনপঞ্চাশের ধাক্কা!

সব কবিত্ব ছুটে গেল। সেই বড় বড় গর্ত্তওয়ালা মেঠো রাস্তার ওপোর পড়ে শুধু যে Ford সাহেবের তৈরি গাড়ীখানা

বিচিত্র ভঙ্গীতে নৃত্য সুরু করে দিল, তা নয়; ধারওয়ারের ডাকবাংলোয় সকাল বেলায় খাওয়া ডিমের ডালনা ও ভাত, এবং রাস্তায় খাওয়া ঘটি ঘটি জল সবগুলিই পেটের ভেতর মহা কলরব জুড়ে দিল। মোটরের দৌড় ঘণ্টায় ৬৷৭ মাইলে গিয়ে ঠেকল। বহু কষ্টে ও কয়েকঘণ্টা ধরে কোনও মতে ত পঞ্চাশটা মাইল পেরুন গেল, কিন্তু রাস্তা প্রায় সেই রকমই থেকে গেল। তার ওপোর গরুর গাড়ী। চক্‌চকে পেতল দিয়ে বাঁধান লম্বা লম্বা শিংওয়ালা মহীশূরী বলদগুলোর রকম সকম দেখে মনে হল, তারা আমাদের এই বিলিতি যানের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত নয়। তাই মোটরের আওয়াজ পেয়েই হয় গাড়ীর ওপোর নিদ্রিত গাড়োয়ান ও আরোহী শুদ্ধ রাস্তার মাঝখানেই তাণ্ডব নৃত্য জুড়ে দেয়, আর তা না হয়, সবশুদ্ধ উর্দ্ধপুচ্ছ হয়ে পথের পাশের চিনে বাদাম বা তুলো ক্ষেতের ওপর দিয়ে দৌড় মারে। কাজেই আমাদের একটু সাবধানেই এগুতে হচ্ছিল।

চিতলদুর্গ পৌঁছতে প্রায় চারটে বেজে গেল। এটা অনেক দিনের পুরান মহীশূর রাজ্যের একটা মাঝারি গোছের সহর। পাহাড়ের ওপর পুরান দুর্গ আছে এবং ঢুকতে ও বেরুতে দুটি টোল গেট বিরাজিত। চিতল দুর্গের পর রাস্তার দু' পাশের দৃশ্য পাওয়া গেল একেবারে নূতন রকমের। ছোট ছোট টুকরা থেকে আরম্ভ করে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর চারিদিকে ছড়ান। রাস্তার দুধারে খালি পাথর আর পাথর। সেই নিরস কাল জমীর ওপোরে গাছ-পালা এমন কি ঘাসটি পর্য্যন্ত ভাল করে গজায় না। চিতলদুর্গ থেকে কোলার স্বর্ণখনি পর্য্যন্ত চারিদিকের বাড়ী ঘর, পাঁচিল, এমন কি কোথাও কোথাও টেলিগ্রাফের পোষ্টগুলো পর্য্যন্ত এই ধূসর গ্রানিট পাথরে তৈরি দেখতে পাওয়া যায়।

একটু সকাল সকাল 'সীরা' পৌঁছে এইবার আমরা ডাঙ্গায় উঠে পড়লাম—অর্থাৎ ডাকবাংলোর আশ্রয় গ্রহণ করা গেল। আজকেই এই টানা হেঁচড়াতেও ২০৮ মাইল ঘোরা হয়েছে এবং কলকাতা ছেড়ে পর্য্যন্ত আড়াই হাজার মাইল।

মহীশূর রাজ্যের রাস্তাটা যেমন খারাপ, ডাকবাংলোগুলো তেমনি সুন্দর। অবশ্য বম্বে থেকে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত তিলের তেলের মহিমা কিঞ্চিৎ উৎকট ভাবেই বিরাজিত। 'সীরা'র ডাকবাংলোর চারিদিকটা রাত্রের অন্ধকারে বিশেষ কিছুই দেখতে পাইনি; আর সকালেও স্নান ইত্যাদি সেরে বাইরে বেরুতে কিছু দেরি হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু বাইরে এসে এক চমৎকার দৃশ্য চোখে পড়ল। বাংলোটা যে যায়গায়, তার চারিদিকের পার্শ্বটা অনেকদূর পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ঢালু হয়ে দিকচক্রবালে মিশে গেছে। বাংলোর প্রাঙ্গণে দাঁড়ালে এই সমস্ত একবারে চোখে পড়ে। এধারে গাছপালার প্রাচুর্য্য বেশী নেই, খালি মাট মাথর ছোট ছোট খেজুর ও অন্যান্য গাছ—মাঝে মাঝে দু'একটা গাঁ থেকে ধোঁয়া উঠছে। প্রাঙ্গণের লম্বা লম্বা গাছের ফাঁক দিয়ে এ দৃশ্যটা খুব সুন্দর লাগল। দুজনে অনেকক্ষণ ধরে উপভোগ করলাম।

'সীরা' থেকে একদৌড়ে বাঙ্গালোর যাট মাইলের পথ, বেলা দেড়টার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম।

বাঙ্গালোরে উপভোগ করবার প্রধান জিনিষ হচ্ছে, এখানকার আবহাওয়াটা—একেবারে চিরবসন্তের দেশ। অনেকখানি

অধ্যয়ন-রত মহীশূরী ছাত্র

অসমতল যায়গা-জুড়ে সহরটা ছড়ান। কয়েকটা কাপড়, সাবান ইত্যাদির মিল্ আছে, আর আছে, বিখ্যাত চন্দন তেলের ও চন্দন কাঠের কারখানা ও Tata Indian Institute of Science। বাঙ্গালোরটা খৃষ্টানদের একটি বড় গোছের আড্ডা, এবং বহু অবসর প্রাপ্ত ফিরিঙ্গির বাস

াকাতে যায়গাটাকে একটি "পিজরেপোল" বিশেষ করে ুলেছে।

সমস্ত দুপুর ধরে টো টো করে সহরটা ঘোরা গেল। বিকেলের দিকে বিজ্ঞান ইন্‌ষ্টিটিউটে উপস্থিত হলাম। টাটা ইনষ্টিটিউটএর পরিচয় বোধ হয় বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিদের নূতন করে দিতে হবে না। শুধু ভারতবর্ষে নয়, কয়েকটি বিষয়ে গবেষণার এমন আয়োজন পৃথিবীর মধ্যে খুব কম যায়গাতেই আছে, এবং এই ইনষ্টিটিউটএর জন্য সেই মহানুভব পুরুষ স্যার জাম্‌সেদজী টাটাকে শ্রদ্ধা না দিয়ে পারা যায় না। এখানকার অধ্যক্ষ ডাঃ ফ্রষ্টার এফ-আরএস্ (Dr. Froster F.R.S.) আমাদের পেয়ে খুব খুসী। বসে টুরের সমস্ত শুন্‌লেন ও তার পর অধ্যাপক ডাঃ গুহর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। সাত আটটি বাঙ্গালী ছাত্র এখানে আছেন গবেষণা করতে। সে রাত্রি তাঁদেরই আতিথ্য গ্রহণ করা গেল। এত দূরে এসে বাঙ্গালীর সঙ্গটা বাস্তবিকই দুর্ল্লভ, এবং তাঁরাও আদর যত্ন করেছিলেন খুবই। রাত্রের পর ক্লাব রুমে যাওয়া গেল। তাস্ দাবা, পিংপং, বিলিয়ার্ডস্ ইত্যাদির সুন্দর আয়োজন এবং বহু সাময়িক পত্র ও গল্পের বইয়ের সমাবেশ। পাশের ঘরে খুব ভাল একটা বেতার যন্ত্র রয়েছে। হঠাৎ কাণে এল—"This is Calcutta Station Calling—এবারে মিস্ প্রফুল্লবালা একখানি বাংলা গান গাইবেন। সেই দেড় হাজার মাইল দূর থেকে সেই গানখানি নতুন করে ভাল লাগ্‌ছিল। কিন্তু বেশীক্ষণ উপভোগ করা গেল না। হঠাৎ বম্বেতে এক বাইজী নাচ্‌তে সুরু করে দিলেন, তাঁর পায়ের ঘুঙুর ও সঙ্গে তবলার চাঁটি প্রফুল্লবালার গানটা মাটি করে দিলে। লাভের মধ্যে হল, এই বাইজীর নাচ ও কল্‌কাতার গান এর মাঝখানে পড়ে, আমরা মাঠে মারা গেলাম।

টাটা বিজ্ঞান মন্দির—বাঙ্গালোর

পরদিন সকালে তাঁদের কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে কোলার গোল্ড ফিল্‌ড্‌সের পথ ধরা গেল। পথে এসে বিনয় বাবুর খেয়াল হল যে বহু দিন আগে বিলেত থেকে ফেরবার পথে, জাহাজে একটি আইরিশ্ মেয়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল, একবার দেখা করে যেতে হবে। তিনি ভারতবর্ষে আস্‌ছিলেন বিয়ে করতে, এবং তখন তিনি বলেছিলেন যে বিয়ের পর তাঁরা বাঙ্গালোরেই থাকবেন।

টাটা বিজ্ঞান-মন্দিরের গ্রন্থাগার (পূর্ব্বার্দ্ধ)

বিয়ের আগে তিনি ছিলেন Miss Maguire কিন্তু বিয়ের পরে তাঁর নামের কি পরিবর্ত্তন হয়েছে, সেটা বিনয় বাবুর মনে ছিল না। কিন্তু তাতে কি হয়েছে,—খুঁজে বের করতেই হবে। দুজনেই Sherlock Holmes বনে গেলাম।

সাম্নেই এক চার্চ্চ দেখে ঢুকে পড়া গেল—পাদ্রী সাহেব হয় ত জান্‌তে পারেন। পাদ্রী সাহেব সব শুনে জিজ্ঞাসা করলেন,—'কোন্ চার্চ্চের লোক'? কি মুস্কিল! এ দেখ্‌ছি আর এক নূতন উৎপাতের সৃষ্টি হল। এখানে অনেকগুলি চার্চ্চের আবির্ভাব, এবং পরস্পরের মধ্যে সেই সম্পর্কে একটু 'আদা কাঁচ্‌কলা'র ভাব কিঞ্চিৎ প্রকট বলে মনে হল।

মাদ্রাজে মোটর-বিহারীগণ
Steeringএ—বিনয়বাবু দাঁড়িয়ে—লেখক
গাড়ীর ওধারে—"সেলামত মিয়া" (ড্রাইভার)

যাক্, আবার রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা আরম্ভ হল, এবং একটু 'ঝুনো' গোচের ফিরিঙ্গি দেখ্‌লেই, তাঁরা—বিয়ের আগে Miss Maguire নামের কোনও আইরিশ্ মহিলার সন্ধান জানেন কি না, সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চল্‌তে লাগ্‌ল। শুনে কেউ বল্লে 'না',—কেউ বল্লে 'হাঁ', এবং যারা হাঁ বল্লে তারা সকলেই একে একে আমাদের এক একটি ভুল ঠিকানায় পৌঁছে দিয়ে ধন্যবাদ নিয়ে সরে পড়ল। তিন্ ঘণ্টা ধরে চার্চ্চ, লোকের বাড়ী, ফটোগ্রাফারের দোকান, বাইবেল সোসাইটি ইত্যাদি ঘুরে ঘুরে যখন উৎসাহটা প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, তখন বিনয় বাবুর মনে হল, তাঁরা বোধ হয় Penticostal churchএর লোক। আবার ছোট্ ছোট্। এবার যাহোক্ খুঁজে নিতে বেশী দেরী হল না। Penticostal churchএর একটা অনাথ আশ্রমের ভার নিয়ে তাঁর স্বামী থাকেন,—তাঁর নাম মিঃ চেজ। তিনি আমাদের দেখে খুবই আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলেন এবং দু' মিনিটেই আমার সঙ্গে খুব আলাপ জমে গেল। ছোট্ট আড়ম্বরহীন সংসারটি কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এবং একটা সহজ সরলতার পরিচয় তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপেই চোখে পড়ে। ফুট্‌ফুটে দুটি ছেলে, প্রথমটা আমাদের একটু সন্দেহের চোখে দেখেছিল, কিন্তু মায়ের কাছে থেকে 'Uncle' বলে পরিচয় পেয়ে, এবং সঙ্গে সঙ্গে লজঞ্চুস, বিস্কুট, কমলালেবু ঘুষ পাওয়াতে, খুব ভাব হয়ে গেল। যাহোক, আরও ঘণ্টা দেড়েক ধরে অনেক পুরাতন গল্প হ'ল। শেষে "মিষ্টি মুখ" করিয়ে তবে তিনি আমাদের ছাড়লেন।
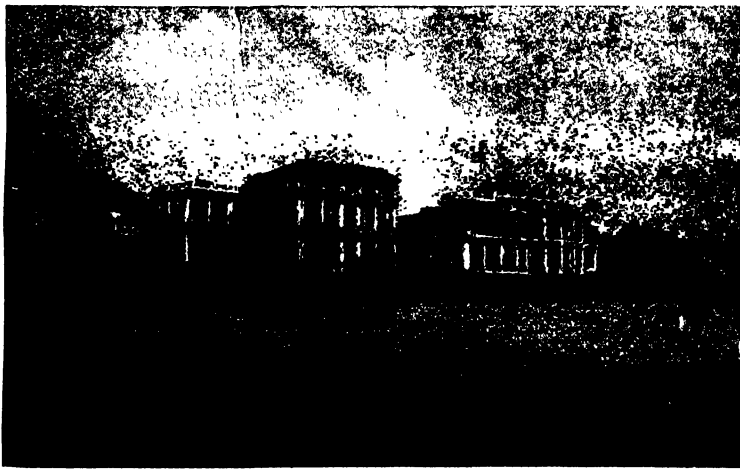
মাদ্রাজ আদেয়ারে থিয়জফিক্যাল সোসাইটির ভবন

বেলা প্রায় আড়াইটার সময় কোলার গোল্ড ফিল্‌ড্‌স্ পৌঁছান গেল। এখানে আমার এক বন্ধু থাকেন—শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু লাহিড়ী, Government cyanide Minesএর সরকারী রাসায়নিক। দুজনে হিন্দু হোষ্টেলে এক সঙ্গে ছিলাম। মোটর নিয়ে সোজা তাঁর অফিসে যাওয়া গেল। কার্ড পাঠাতে, বন্ধুবর মাথা চুল্‌কতে চুল্‌কতে বেরিয়ে এলেন,—মুখের দিকে তাকিয়েই অবাক্। বেচারি এমন

একটা ব্যাপার ভাব্‌তেই পারেন নি। খানিকক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লেন 'তার মানে' এবং সমস্ত 'মানেটা' বুঝে আপিস্ ফেলে আমাদের নিয়ে সোজা বাড়ীর দিকে ছুট্‌লেন।

এইবার কোলার স্বর্ণ খনি সম্বন্ধে কিছু বলা যাক্। এ

থিয়োজফিক সোসাইটির হল, আদেয়ার—মাদ্রাজ

সম্বন্ধে ভাল করে লিখ্‌তে গেলে, একটি পুঁথি বিশেষ হয়ে পড়ে। অল্প কথায় বল্‌তে গেলে—এখানে ২।৩ মাইল অন্তর পাঁচটা সোনার খনি আছে, এবং সব গুলিই জন টেলর (John Taylor) নামক ইংরাজ কোম্পানীর হস্তগত। প্রায় ৭০।৭৫ বৎসর আগে এঁরা প্রথম এখানে সোনাওয়ালা Quartz পাথর খুঁড়ে সোনা বের করতে থাকেন, তখন এই Quartz vein মাটির অল্প নীচেই পাওয়া যেত। তার পর খুঁড়তে খুঁড়তে এখন প্রায় সাত হাজার ফিট নীচে গিয়ে পড়েছে,—অর্থাৎ প্রায় দার্জ্জিলিং থেকে শিলিগুড়ি। কোলার গোল্ড ফিল্‌ডসের সোনার খনিগুলি পৃথিবীর মধ্যে প্রায় গভীরতম খনি। মাটির ওপোর থেকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চোঙ্গা (shaft) নাবিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর সেই চোঙ্গার ভেতর দিয়ে লোহার খাঁচায় করে কুলিদের নীচে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় ও পাথর টেনে ওপোরে তোলা হয়। (কতকটা ওঠানামার Lift এর মত)। এগুলি electric অথবা steam winding engineএ চলে। সচরাচর এই সব খনিতে নাবতে হলে পাশ লাগে এবং অন্ততঃ ৪৮ ঘণ্টা আগে কর্ত্তৃপক্ষকে জানাতে হয়। বন্ধুবর তার পরের দিন সকালেই আমাদের খনির নীচে নাম্‌বার বন্দোবস্ত করে দিলেন। তিনি যে খনিতে কাজ করেন তার নীচে সেদিন কি মেরামত হচ্ছিল, তাই পাশের খনিতে নামার ঠিক্ হল। মিঃ ডাস্তোনা বলে হিন্দু ইউনিভার্সিটির পাশ করা এক ভদ্রলোক এই খনিতে কাজ করেন—খুব চমৎকার ভদ্রলোক। তিনি আমাদের সকাল প্রায় সাড়ে নটার সময় নিয়ে আপিসে উপস্থিত হলেন। প্রথমেই দুজনকে দুখানি ছাপান কাগচে সই করতে হল যে, "নীচে নেমে যদি পাথর চাপা পড়ে অক্কা পাই অথবা হাত পা ভেঙ্গে ওপোরে উঠে আসি, ত তার জন্য কোম্পানী দায়ী হবেন না।" ঠিক্ কথাই ত, আমরা যদি কষ্ট করে মারাই যাই, ত কোম্পানী বেচারীকে বিপদে ফেলে আর কি সুবিধা হবে?

দুজনে ত গিয়ে খাঁচায় ঢুকলাম,—সঙ্গে মিঃ ডাস্তোনা

সমুদ্রতট—মাদ্রাজ

ও সেই খনির এজেণ্ট সাহেব। মিঃ ডাস্তোনা ও এজেণ্ট সাহেবটির হাতে আলো ও মাথায় শক্ত বাঁশের টুপী। মিঃ ডাস্তোনা তাঁর সঙ্গে দুজনের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ঘণ্টা বাজিয়ে cage পাতাল পুরীতে নামতে সুরু করল। ভদ্র-

লোকটী আমাদের টুরের বিষয়ে অনেক প্রশ্ন কর্‌লেন, ও ইতিপূর্ব্বে কোনো সোনার খনি দেখেছি কি না জিজ্ঞাসা কর্‌লেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ৭।৮ মিনিটের মধ্যেই আমরা চারহাজার দুশো ফিট নীচে এসে পড়লাম। এটা একটা নামবার ষ্টেসন। এখানে বেশ গরম বোধ হতে লাগল। চারিদিকে বহু সুড়ঙ্গ চলে গেছে অনেকদূর পর্য্যন্ত। সমস্ত যায়গাটা বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত এবং Blower fan চালিয়ে হাওয়া চলাচল করা হচ্ছে। এখানেই, air fan, electric generator, Steam engine, Telephone ইত্যাদি সমস্তই রয়েছে। এখান থেকে একটা ঢালু liftএ করে আরও চারশ ফিট নাম্‌তে হল—খাঁচার মধ্যে প্রায় শুয়ে পড়ে। আবার খাড়াই নামা প্রায় দেড় হাজার ফিট। এই ভাবে আমরা Shaftএর তলায় এসে পড়লাম। একটা Engineএ অত নীচু থেকে টান্‌তে পারে না বলে এই ব্যবস্থা। নীচে অসহ্য গরম, প্রায় ১১৮ ডিগ্রি মনে হচ্ছে। আর সেই গরমে পাথর তেতে আগুন হয়ে আছে। চারিদিকে অন্ধকার পাথরের সুড়ঙ্গ এবং তারই যায়গায় যায়গায় ঘর্ম্মাক্ত কুলির দল মোমবাতির ক্ষীণ আলোতে ছেনী হাতুড়ী নিয়ে পাথর কাটছে ও ঘন ঘন গুমটে-তেতে-ওঠা জল পান কর্‌ছে। সেখানে শুধু তাদের হাতুড়ীর খটাখট্ শব্দই সেই চির অন্ধকারটাকে সজীব করে রেখেছে। মিঃ ডাস্তোনা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন—'আশা করি আপনাদের সাধ মিটেছে?' তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বল্লাম্—'আর কিছু দেখ্‌বার নেই?' তিনি বল্লেন যে—'হাঁ, ইচ্ছে করলে আরও দুশো ফিট নামতে পারেন, সেখানে prospecting দেখ্‌তে পাবেন, তবে দড়ির সিঁড়ি করে নাম্‌তে হবে,—একটু বিপজ্জনক। Prospecting করা মানে, সচরাচর যেখান থেকে, অথবা যে পাথর থেকে সোনা পাওয়া যাচ্ছে, তা ছাড়া আরও নূতন কোনও সোনাযুক্ত পাথর পাওয়া যেতে পারে কি না, তার খোঁজ করা।

হাত-বাতির সাহায্যে খানিকদূর এগিয়ে একটা ভীষণ অন্ধকারময় গর্ত্তের মুখে এসে পড়লাম। তারই গা বেয়ে একটা তারের সিঁড়ি নেমে গেছে।

প্রথমে মিঃ ডাস্তোনা আলো নিয়ে নাম্‌তে লাগ্‌লেন। তার পর আমি ও বিনয়বাবু, সব শেষে একটা কুলি জলের flask নিয়ে নাম্‌তে লাগ্‌ল। এটা বাস্তবিকই বিপজ্জনক। কেন না, একজন যদি ঠিক্ মত পা না ফেল্‌তে পারে, তাহলে সকলকে নিয়ে একেবারে দুশো ফিট নীচে পাতাল সমাধি লাভ হবে।

নীচে ভীষণ গরম, আর সেই গরমে কুলীরা হাতুড়ী দিয়ে পাথর ভেঙ্গে ট্রলি করে টেনে নিয়ে খাঁচার মুখে এগিয়ে দিচ্ছে, আর সেখান থেকে সোজা ওপোরে উঠে যাচ্ছে। এই ভাবে তাদের রোজ আট ঘণ্টা করে কাজ করতে হয়। কুলীরা বল্‌ল, পাথর চাপা পড়ে এক আধটা লোক প্রায় রোজই মারা পড়ে, অথবা হাত পা ভেঙ্গে আসে। আর এই আট ঘণ্টা নরক ভোগ করার জন্য তারা আট আনা করে পয়সা দিন-মজুরি পায়। তিনটে shift বদ্‌ল করে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে অবিরাম এই কুবেরের কারখানা চল্‌ছে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিরাম নেই। এদের দুর্দ্দশা দেখে গা শিউরে ওঠে।

এবার ওপোরে ওঠবার পালা। নাম্‌বার সময় যা হোক করে নামা গিয়েছিল, কিন্তু এতক্ষণ সেই ভীষণ গরমে থাকার পর ওই মই বেয়ে দুশো ফিট্ উঠতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। ক্লান্তিতে হাত পা থর্ থর্ কর্‌তে লাগ্‌ল। ওপোরে উঠে শুনি, lift আস্‌তে প্রায় আধঘণ্টা দেরী হবে। এক যায়গায় কয়েকজন ইংরাজ মজুর কাজ করছিল, তাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দেওয়া গেল। তাদের মধ্যে অধিকাংশই Welshman। একজন ইটালিয়ানও আছে দেখ্‌লাম।

বসে বসে রবীন্দ্রনাথের 'গুপ্তধন' গল্পটা মনে পড়ে গেল —আমাকে যদি ওই সোনার রাজ্যে চব্বিশ ঘণ্টা থাক্‌তে হয়, ত নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যাব। যাহোক Telephoneএ অনেক হাতল ঘোরান ও হাঁকাহাঁকি করবার পর আস্তে আস্তে cage নেমে এল। আবার সেই রকম cage বদল করে উপরে উঠে আলো বাতাসের মুখ দেখে হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচ্‌লাম। নাম্‌বার সময় গরম কোট, মাফলার ইত্যাদি যেমন একে একে খুল্‌তে হয়েছিল—ওঠ্‌বার সময় একে একে সব পর্‌তে হ'ল; কারণ, এত গরম থেকে জামা খুলে ওপরে এলে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগ্‌বার সম্ভাবনা। পদস্থ কর্ম্মচারীদের ব্যবহারের জন্য কোম্পানী গরম ওভারকোট দিয়ে থাকেন। মিঃ ডাস্তোনা আমাদের তাঁর বাড়ীতে গিয়ে ঠাণ্ডা সরবৎ খাইয়ে বিদেয় দিলেন।

দুপুর বেলায় পূর্ণেন্দু ভায়ার কারখানায় পাথর থেকে

সোনা বের করবার ব্যাপারটা দেখতে যাওয়া গেল। সে এক বৃহৎ কাণ্ড। প্রথমে খনি থেকে নিয়ে এসে পাথরগুলোকে Stone crushing millএ নিয়ে ছোট ছোট প্রায় এক ইঞ্চি টুক্‌রো করে ফেলা হয়। তার পর সেই টুক্‌রোগুলো automatic trolly বোঝাই করে সারি সারি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হামানদিস্তায় ফেলে, জলের সঙ্গে কাদার মত করা হয়। তার পর আরও জল মিশিয়ে পাত্‌লা করে, বড় বড় তামার চাদরের ওপোর দিয়ে ফেলা হয়। এই চাদরগুলোর ওপোরে পারা মাথান থাকে,—সোনার রেণু সেই পারাতে আট্‌কে যায়, আর কাদা আর জল পাইপে করে চালান দিয়ে, খুব বড় বড় Tankএ জমা করা হয়। সচরাচর প্রায় ৮০ ভাগ সোনা এই পারার সঙ্গে মিশে যায়। তার পর সেই পারা নিংড়ে সোনা বের করে নেওয়া হয়। এই সোনা কতকটা Spongeএর মত দেখতে হয়, তাই একে Sponge Gold বলে,—এই সোনাকে গলিয়েই সোনার 'ইট' তৈরী করা হয়।

আমরা যে সময় গিয়েছিলাম সে সপ্তাহে সোনা গালান হয় নাই বলে সে Processটা বাদ পড়ে গেল। বাকি যে প্রায় ২০।২২ ভাগ সোনা জলের সঙ্গে চলে যায়, সেটুকু নিয়েই মারামারি। বড় বড় Tankএর মধ্যে এই 'সোনার সরবৎ' একটু থিতিয়ে গেলে, ওপোর থেকে জল্‌টা ফেলে দিয়ে, নিচের কাদাটার সঙ্গে Cynide Compound মিশিয়ে তা থেকে প্রায় সব সোনাই বের করে নেওয়া হয়। এই উপায়ে সোনা বের করাকে Cyanide Process বলে। বাকি যে ২।১ ভাগ সোনা কাদার সঙ্গে থেকে যায়, তারও নিস্তার নেই, সেগুলোকে পাইপে করে নিয়ে গিয়ে, দূরে পর্ব্বত প্রমাণ করে রাখা হয়েছে, কি জানি যদি ভবিষ্যতে, সোনা নিংড়বার কোনও নূতন উপায় উদ্ভাবিত হয়, তখন হয় ত এই ছিবড়েটাও কাজে লাগবে।

কোলার গোল্ড ফিল্ডস্‌এ দুদিন থাকতে হল। ভায়া ছ'মাস বাঙ্গালীর মুখ দেখেননি, অথবা বাংলা কথা বলেননি (এখানে ঝি চাকর, এমন কি মুচিটি পর্য্যন্ত চোস্ত ইংরাজিতে কথা বলে); কিছুতেই ছাড়লেন না, তার ওপোর এমন তোয়াজ করে রাখ্‌লেন যে, আর হুড়োহুড়ি করে এগুতে ইচ্ছে হল না। মাদ্রাজ ত প্রায় এসেই পড়েছি।

পূর্ণেন্দু ভায়ার কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে, এবং তার মুরগীকুল প্রায় ধ্বংস করে আমরা Kolar Gold Fields ছাড়লাম। গাড়ি ত প্রায় শেষই হয়ে এল, কাজেই দুঃখের ভাগটা এইবার আরম্ভ হল। কুড়ি মাইল যেতে না যেতেই ফোঁস্ করে সাম্‌নের একটা টিউব ফুটো হ'ল। তাড়াতাড়ি বদ্‌লে নিয়ে আবার এগুলাম। এইবার আরম্ভ হল Toll-gateএর উৎপাত। প্রতি ১০।১২ মাইল অন্তর 'লালনিশান'। সকাল থেকে ৮।৯ টাকা দণ্ড দিয়ে, এম্‌নি "টোলফোবিয়া" (Toll Phobia) জন্মে গেল যে এক যায়গায় দূর থেকে এক নিকশ কালো মাদ্রাজী 'সুন্দরীর' রাঙ্গা সাড়ীর আঁচলখানা হাওয়ায় উড়তে দেখে, Toll manএর নিশান ভেবে বিনয়বাবু রাস্তার মাঝখানেই হতাশ হয়ে মোটরটা থামিয়ে ফেল্‌লেন। রাম্! রাম্! এমন করে কি আর বেড়ান চলে?

বিকেলের দিকে আরেকটা টিউব Puncture হ'ল, কাজেই বিনয়বাবুর টুরের শেষাশেষি মোটরটাকে ঘণ্টায় ষাট্, পঁয়ষট্টি মাইল দৌড় করানর ইচ্ছেটা এবারকার মত চাপা দিতে হল। সারাদিন ধরে নানান বাধাবিঘ্ন এসে মেজাজটা খারাপ্ করে তুলেছিল। রাস্তার মায়ায় আবার সব দুঃখ ঘুচে গেল। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর প্রায় সমস্ত রাস্তাই লাল টুকটুকে, আর খুব সুন্দর করে রাখা। দুধারে তাল, নারকেল, দেবদারু, কুসুম গাছে ঢাকা, আর রাস্তার দুধার বেয়ে শরতের সবুজ ধানের সমুদ্র উপ্‌ছে পড়ছে—মাঝে মাঝে ছোট ছোট এক একটি গ্রাম নারকেল গাছে ঢাকা। আগ্রা ছেড়ে পর্য্যন্ত এতদিন ধরে প্রকৃতির 'অসমান' দৃশ্যের খেলাই দেখে এসেছি, আজ কিন্তু চারিদিকের এই 'সামঞ্জস্য'টাও (uniformity) নূতন করে ভাল লাগ্‌ল। আসেপাশের গ্রামগুলো থেকে সন্ধ্যা আরতির কাঁসর ঘণ্টা বেজে ওঠবার আগেই আমরা Ranipet, Poonamalle ইত্যাদি পেরিয়ে মাদ্রাজের Suburbএ এসে পড়লাম।

প্রথমে এক আধটা মোটর 'বাস্', তার পর ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট, তার পর বাগান-বাড়ী, অদ্ভুত-গোচের পর্দ্দা দেওয়া ট্রাম গাড়ী; সঙ্গে সঙ্গে মাথায় ঝুঁটি ও গলায় নেকটাই আঁটা, সাদা লুঙ্গি পরা মাদ্রাজীর দর্শন একে একে মিল্‌ল। Central ষ্টেসন থেকে কল্‌কাতায়, মাদ্রাজ

পৌঁছবার সংবাদটা দলের আর সকলকে টেলিগ্রাম করে দিয়ে আমরা ব্রড্‌ওয়েতে Y. M. C. A.তে গিয়ে উঠলাম্। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আকাশ ভেঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি এল।

কলকাতা থেকে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত Speedometreএ মোট ৩২০০ মাইল দেখাচ্ছে। সময় লাগ্‌ল ১৩৭ ঘণ্টা। অবশ্য এর মধ্যে প্রায় ৩২ ঘণ্টা (৬৪২ মাইল) নানা যায়গা ও সহর দেখার জন্য লেগেছে। পেট্রল খরচ হ'ল—প্রায় ১৬০ গ্যালন। মোবিল অয়েল ৪ টীন। ব্যাটারীর জন্য Distilled water ১ বোতল। Average Speed ঘণ্টায় মোটামুটী ২৪।২৫ মাইল ধরা যেতে পারে।

পথে ৫টী টিউব Puncture হওয়া ছাড়া এই দীর্ঘ ৩২০০ মাইলে গাড়ীতে একটী সামান্য আঁচড় পর্য্যন্ত লাগে নাই।

মহিশুর রাজ্যের সীমান্তে ৫০।৬০ মাইল ছাড়া কল্‌কাতা থেকে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত সারা পথটী মোটের ওপর ভালই বলা যেতে পারে। ডিহিরিতে শোন নদ, ঢোলপুরে চম্বল ও সাভালদায় তাপ্তি নদী ছাড়া সব নদীতেই পুল পেয়েছিলাম। বম্বে প্রেসিডেন্সীতে অনেকগুলি বড় বড় পাহাড় অতিক্রম করতে হয়েছিল।

মাদ্রাজে চার দিন ছিলাম। Neo Kamalavilas Hotelএ দুবেলা 'সরুপানি' ও তিলতেলে রান্না নিরামিষ আহার। সমুদ্রকূলে বসে ঢেউ গোণা, প্রোফেসর ডাক্তার বিমানচন্দ্র দে মহাশয়ের বাড়ীতে 'ভুরি-ভোজন', এডেয়ারে থিওজফিক্যাল সোসাইটী, মায়লাপুরে রামকৃষ্ণাশ্রম, Boy's Home ইত্যাদি পরিদর্শন। তাছাড়া "একোয়রিয়ম" গোপুরম্ কলেজ, ফোর্ট ইত্যাদি দেখা ও শেষ দিনে "সূর্য্যগেরণে" মাদ্রাজীদের 'সমুদুরে চান' "দেখেই পুণ্য সঞ্চয়" করে আমরা মাদ্রাজ ছাড়লাম। কলিকাতার প্রোফেসর ডাক্তার সেনের সঙ্গে এখানে দেখা হ'ল—ছুটীতে বেড়াতে এসেছিলেন। প্রবাসী আরও কয়েকটী বাঙ্গালীর সঙ্গে আলাপ হ'ল।

বম্বে থেকে Ford Automobiles (India) Ltd আমাদের আগমন সংবাদটা এখানকার Oakes & Coকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানে যেতে খুব যত্ন করে তাঁরা গাড়িটাকে পরিষ্কার করে দিলেন এবং মাদ্রাজ থেকে সেখানাকে জাহাজে করে কল্‌কাতা চালান দেবার ভারও তাঁরাই নিলেন। মাদ্রাজ থেকে মোটরে কল্‌কাতায় ফেরবার কোনও রাস্তা নেই, অনেক নদী পেরুতে হয় ও পোলও নেই। সেলামৎ মিঞাকে গাড়ী জাহাজে নিয়ে আস্‌বার ভার ও Oakes কোম্পানীকে গাড়ী বুক্ কর্‌বার ভার দিয়ে আমরা মাদ্রাজ মেলে চেপে বস্‌লাম। দুদিন ধরে হরেক-রকম সহর-গ্রাম, পাহাড়-পর্ব্বত, বন-উপবন মাঠ ময়দান, নদী-হ্রদ, পূজার সময় জলপ্লাবনে ভেসে যাওয়া রেল লাইন—ও পুলগুলি দেখতে দেখ্‌তে শুয়ে ও বসে কোমরে ব্যথা ধরিয়ে—হাওড়া ষ্টেসনে এসে পৌঁছান গেল। বম্বের ফেরত দলের সকলেই আমাদের জন্য হাঁ করে বসে ছিলেন। বাড়ীর সদর দরজার calling bell টিপ্‌তেই সকলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন—Buzz Off!

নারী

শ্রীআরতি দেবী

অর্পণা কিছুতেই স্বামীকে ক্ষমা করিতে পারিলনা। ব্যতিক্রমকে নিয়ম এবং আকস্মিক উত্তেজনাকে বহুপূর্ব্ব-কল্পিত স্বেচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা বলিয়া ধরিয়া লইল। সতীধর্ম্ম তাহার নিজের কাছে যতীধর্ম্ম অপেক্ষাও সুকঠোর ছিল বলিয়া সে যতীশের অপরাধকে পাপের গভীরতম পর্য্যায়ে ফেলিয়া আপনার অতি পবিত্র দেহ-মন লইয়া সঙ্কুচিত বিব্রত হইয়া পড়িল। স্ত্রী যদি সাধারণ রমণী হইত, যতীশ তাহা হইলে অপরাধ ক্ষালনের একবার চেষ্টা করিত; কিন্তু অর্পণার শুভ্র তপস্বিনী-সুলভ মুখের দিকে চাহিয়া তাহার নিজের অপরাধের বোঝা যেন সত্য ও শতগুণ ভারী হইয়া উঠিল—শিশু পুত্রকে পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে সে সাহস করিলনা।

পুনর্ব্বার পিত্রালয়ে ফিরিয়া অনুসন্ধিৎসু প্রতিবাসিনী-দিগের চিন্তার খোরাক দিতে বা নিজেকে কৃপাদৃষ্টিতে তুলিয়া ধরিতেও অর্পণার ইচ্ছা ছিলনা। নিঃশব্দে গাত্রবস্ত্রে শিশুকে জড়াইয়া সঙ্গী ভ্রাতার সহিত ফিরিয়া সে শ্বাশুড়ীর নিকট কলিকাতায় চলিল। একবার যতীশের ম্লান, কাতর মুখের দিকে তাকাইলনা; আহার্য্য-পেয় স্পর্শমাত্র করিলনা। অভিমানে সম্পূর্ণ নয় অপবিত্রতার আশঙ্কায় সতীর শুচিতা বাঁচাইয়া সে ফিরিয়া গেল। লজ্জিত মুখে মৌন ভাবেই সুরেশ গিয়া গাড়ীতে উঠিল। পশ্চিমে দ্বিপ্রহরের রৌদ্র তখন মাঠের মধ্যে রুদ্রতেজে রাজত্ব করিতেছে। সেই কঙ্করময় ধূসর প্রান্তরের দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে যতীশের দুই চক্ষে জ্বালা ধরিয়া গেল। জীবনের সমস্ত সুখ, শান্তি, আশা ঐ ছুটিয়া চলিতেছে--পশ্চাতে রসের লেশমাত্রও রাখিয়া যাইবেনা। দৃষ্টিপথ সম্মুখে বিরাট উষর মরুভূমির ন্যায় সমগ্র শূন্য ভবিষ্য জীবনটা তাহার মানসপটে বিভীষিকার ন্যায় ফুটিয়া উঠিল। সে দৃশ্যপটে প্রেমের সরক্ত আভা, শান্তির শুভ্রতা, সুখের নীলিমা, কোনো বর্ণ-বৈচিত্র্য নাই; দাম্পত্য-লীলার মাধুর্য্য, বহু-ঈপ্সিত বাৎসল্য রসের উচ্ছ্বাস-সম্মিলিত জীবন-যাত্রার সুখ দুঃখময় ঘটনাবলীর কোনো ঘাত-প্রতিঘাত নাই। বাহিরের অন্তহীন প্রকৃতির মতন তাহা সুকঠোর, গৈরিক, নির্ম্মম, কূল-উপকূল-শূন্য। প্রাণপণ বলে শরীরের সমস্ত শক্তি আয়ত্ত করিয়া যতীশ উঠিয়া দাঁড়াইল—ধরিতেই হইবে, বাঁচিতেই হইবে। পরক্ষণেই রৌদ্রতপ্ত বালুকাময় রাজপথ বাহিয়া সুদূর ষ্টেশন অভিমুখে ছুটিল।

মাড়োয়ারী হিন্দুস্থানী বেহারীর জনতা;—ক্বচিৎ এক-আধটী বাঙালীর মুখ। আবশ্যক ও অনাবশ্যক চঞ্চলতা, কোলাহল ঠেলাঠেলির মধ্যে পড়িয়া বিমূঢ় যতীশের সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। গৃহে ফিরিয়া বাঁচিবার লোভ হইল। বিচারকের সম্মুখে অপরাধীর ন্যায় হৃৎকম্পন। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় যতীশের পিঠে হাত দিয়া শ্যালক সুরেশ আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল "দিদি ওয়েটীংরুমে" বলিয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিল। যতীশ কোনো উত্তর দিলনা, প্রশ্নও করিতে পারিলনা, একটা লোহার বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িল। কত গাড়ী আসিল, ছাড়িল। ওঠানামা, ঠেলাঠেলি, কুলীদের চীৎকার, অপরিচিতের বিস্ময়-দৃষ্টি পরিচিতের সম্ভাষণের মধ্যখানে যতীশ মৃতের ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল। সুরেশ ভাগিনেয়কে ক্রোড়ে লইয়া গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া চাহিয়া রহিল। জানালার উপর রক্ষিত একখানি নারী-হস্তের সোনার চুড়ীগুলি অপরাহ্নের রৌদ্রে ঝিকৃমিক্ করিয়া অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। কলিকাতার গাড়ী ছাড়িয়া গেল। ম্লান গোধূলি; অবশেষে অন্ধকারময়ী সন্ধ্যা আসিয়া প্রকৃতির মুখাবরণ টানিয়া দিল। প্রহরের পর প্রহর কাটিতে লাগিল। যতীশ বসিয়াই রহিল।

দুই

অতি প্রত্যূষে অভ্যাসমত ঘুম ভাঙিতেই যতীশ চমকিয়া উঠিয়া বসিল। খোকারা ত আসিয়াছে। পরক্ষণেই ধক্ করিয়া বুকে একটা ধাক্কা লাগিল,—না আসে নাই, আর কখনো আসিবেও না।

গত দিবসের ঘটনা, যাহা রাত্রে অশুভ স্বপ্নের ন্যায় বিলীন হইয়া আসিতেছিল, তাহা পুনর্ব্বার সকল গ্লানি লইয়া চক্ষের সামনে ভাসিয়া উঠিল। পুনরায় নিশ্চেষ্টভাবে বিছানায় পড়িয়া যতীশ শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

গৃহের অপর কোণে গৃহস্বামিনীর জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত স্বতন্ত্র শয্যা। শুভ্র বালিশের ওয়াড়ের ঝালরটা ঈষৎ হাওয়ায় দুলিতেছে। পায়ের কাছে ভাঁজ করা সাদা সুজনী। মাথার কাছে ছোট টিপয়ে মোমবাতি, দেশলাই, হোয়াইটওয়ে হইতে কেনা একটী নাইট্ লাইট। অর্পণার নামে আসা খামে আঁটা একখানা চিঠিও রহিয়াছে। দিনে-রাতে, সন্ধ্যায়-সকালে পিতৃগৃহ-প্রবাসিনী পত্নীর আগমন উপলক্ষ্যে কত খুঁটিনাটি গোছানো,—কোন্ জিনিসটী তাহার চোখে ভাল লাগিবে সেই উৎকণ্ঠা।

দ্বারপথে ছায়া আসিয়া যতীশের চিন্তাস্রোতে বাধা দিল। বালক ভৃত্য কিষণ আসিয়া শুষ্কমুখে জানাইল, বেলা হইয়া গিয়াছে, বাবু কখন উঠিবেন, চা ভিজাইবে না কি। যতীশ চোখ বুজিয়া উত্তর দিল—চা নিয়ে আয় এখানে। শয়ন কক্ষে চা পানের কথা শুনিয়া কিষণ একটু বিস্মিত হইয়া চলিয়া গেল।

বাংলোর হাতায় ফটকের সম্মুখে দুইটী পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার গাছ পরস্পরকে প্রায়ালিঙ্গনে বাঁধিয়া পাপড়ী বৃষ্টি করিয়া কঠিন লাল কাঁকরের পথটীকে কোমল করিয়া তুলিবার

চেষ্টা করিতেছিল। অর্দ্ধপীত পেয়ালাটা শয্যার উপর রাখিয়া সেইদিক্ হইতে চোখ ফিরাইয়া যতীশ পুত্রের সুসজ্জিত ট্রেঙ্গার কট্‌খানি দেখিতে লাগিল। মশারী বিছানা সব শাদা—অর্পণা শাদা রং ভালবাসে। খোকা তাহারি পুত্র তাহারি আত্মজ। পত্নীর বিচ্ছেদ-বেদনা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া স্বামীর দুই চক্ষু সজল করিয়া তুলিল। অবশেষে পৌরুষের গর্ব্ব জয় করিয়া বহুক্ষণ রুদ্ধ জলধারা দুই গণ্ড বাহিয়া ঝরিতে লাগিল।

অকস্মাৎ কিষণের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—বাবু, মাইজী-লোগ আগিয়া। সম্ভাব্য অসম্ভাব্য সকলের গণ্ডী এড়াইয়া যতীশের হৃদয় লাফাইয়া উঠিল। পেয়ালাটা তাড়াতাড়ি নামাইয়া খাটের নীচে রাখিয়া সে দুই হাতে চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিতে গেল।

সুগন্ধে, চাঞ্চল্যে, হাসিতে গৃহ ভরাইয়া দিয়া কক্ষমধ্যে এক তন্বী শ্যামা সুন্দরী তরুণী ঢুকিয়া একরাশি কৃষ্ণচূড়ার পাপড়ী যতীশের মাথার উপর ঢালিয়া দিল। বিমূঢ় যতীশ চোখ হইতে হাত সরাইয়াই বিবর্ণ মুখে বসিয়া কহিল—"সুপর্ণা, তুমি!" তীক্ষ্ণ-মধুর কণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়া নবাগতা কহিল—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ আমিই—মায়া নই, মতিভ্রম নই, স্বপ্নলব্ধা ছায়া নই—এমন কি, ছোট বোনের বড় দিদিটীও নই। বাচ্চাটা কোথা গেল—সেও কি আর্লি রাইজার?"

আত্ম-সম্বরণ করিয়া যতীশ উত্তর দিল—"তা জানার সুবিধা হোয়ে উঠলনা ত, তবে departure বটে।" একবার ইচ্ছা হইয়াছিল মিথ্যা বল্লে, তাহারা আসে নাই। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, আর কয়েক দিন পরেই তাহার লজ্জার কাহিনী সর্ব্বাগ্রে এই মেয়েটীরই শ্রুতিগোচর হইবে। তা ছাড়া ঐ সরল উজ্জ্বল কালো চোখের সামনে মিথ্যা যেন আসিতে চায়না। বিস্মিতা সুপর্ণাকে ভাবিবার বা প্রশ্ন করিবার অবকাশ না দিয়া যতীশ বলিয়া চলিল—"কাল এসেছিলেন—আমার উপর ঘৃণায় তোমার দিদি চলে গেছেন।"

সুপর্ণার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, কালো চোখের স্থির গভীর দৃষ্টি যতীশের মুখের উপর রাখিয়া সে তাহার বিবর্ণ পাণ্ডুরতাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিল। বহুক্ষণ উভয়ে কথা বলিলনা। একজন নতমস্তকে বসিয়া রহিল, তাহার চোখ হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল মাটীতে ঝরিতে লাগিল। আর একজন তাহার করুণামৃত বৃষ্টিতে নীরবে তাহাকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল।

কতক্ষণ এই ভাবে ছিল,—হঠাৎ যতীশ পদশব্দে চকিত হইয়া দেখিল, সুপর্ণার স্বামী সত্যেন আসিতেছে। চেষ্টাকৃত হাসি টানিয়া, কণ্ঠস্বরকে স্বাভাবিক করিয়া, যতীশ সত্যকে অভ্যর্থনা করিল। সত্যেন যেন কিছুই লক্ষ্য করে নাই—চশমাটা মুছিতে মুছিতে বলিল—"দেখুন যতীদা, ওকে কতবার বল্লাম, এও কি সম্ভব—দিদি আগে মাউইমার কাছে না গিয়ে এখানে এসেছেন! আসল কথা কি জানেন—খোকাকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। এই যে আমাদের আসার নোটীস খামের আড়ালেই রয়ে গেছে।"

"সত্য, তুমি হঠাৎ কোত্থেকে?"

"দেখুন না, কাল সকালে বেণারস পৌঁছলাম—কত দিন আর একা ঘরে কড়িকাঠ গুণে থাকা যায়? জেঠিমা দুঃখ করতে লাগলেন—একদিন আগেই না কি দিদি সুরেশদার সঙ্গে চলে এসেছেন। ও বলে—দিদি বলেছে, আগে পাটনা নাম্‌বে। আমি বলি—তা কি হয়।"

"দেখুননা যতীশবাবু, দিদি এমন ঠকালে। এবার এমন জব্দ আমি করব।"

যতীশ যেন অকস্মাৎ হৃত চৈতন্য ফিরিয়া পাইল,—সত্যেন তবে কিছু জানেনা। সুপর্ণার দিকে একবার কৃতজ্ঞ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল—"হ্যাঁ ভাই, কিন্তু উনি ত নেই; তোমাদের কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়; কিন্তু আমি এত খুসী হয়েছি। সুপ, এই নারীবর্জ্জিত গৃহে আজ সিংহাসনটা তুমি নাও ভাই। সোমবারের আগে কিন্তু যাওয়া হবেনা, রোস্—রোস, চায়ের কথাটা বলে আসি—মহারাজ—মহারাজ—" যতীশ ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

সুপর্ণা মাথা তুলিয়া সত্যেনের দিকে এক অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল। সত্য দন্তে অধর চাপিয়া ঘাড় নাড়িল। কিষণের সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল পূর্ব্বেই। সুপর্ণা মাথার কাপড়টা ভাল করিয়া টানিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। "জামাইবাবু chargeটা আমায় দিলেন—চল্লেন নিজে। আজ কারো হুকুম নেই রান্নাঘরে ঢোকার। মহারাজ, তুমি বেরিয়ে এসো,—আমি মাইজীর বহিন্—আমি আজ রান্না করি, কেমন?"

মহারাজ হাসিয়া সোৎসাহে ঘাড় নাড়িল।

"তোমার বাবু কি খেতে ভালবাসেন বল ত, মাংস আর পায়েস—আবার রহর ডাল পুরীভি? এইবার স্বকীয়ের কোঠায় নামিতেছে দেখিয়া সুপর্ণা হাসিল; কহিল—"সত্যি না কি? এস ত, সব বলে দাও ত—কোথায় কি আছে আমি দেখি,—বাঃ, খাসা গোছান রান্নাঘর ত।"

তিন

বাড়ীর সামনেকার স্বল্প-পরিসর জমীটুকুতে দেশী ফুলের মধ্যে গোটা দুই লাল জবা ও রক্তকরবীর গাছ লাগানো ছিল। তাহারাই ছিল যতীশের জননী শৈলজার নিত্য পূজার উপকরণ।

আজিও ভোরে মৃদুস্বরে শ্রীকৃষ্ণের শতনাম আবৃত্তি করিতে করিতে তিনি পুষ্প চয়নে ব্যস্ত ছিলেন, গৃহদ্বারে আসিয়া শকট থামিতে বিশেষ কিছু না ভাবিয়াই তিনি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছিলেন। পরক্ষণে পুত্রক্রোড়ে পুত্রবধূকে নামিতে দেখিয়া বিপুল বিস্ময়ে পুলকে তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। সর্ব্বাগ্রে পৌত্রমুখ স্বামীকে দেখাইবার যে প্রবল ইচ্ছা মনের কোণে গোপন ছিল, তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া তিনি ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন; কিন্তু সন্তান-স্নেহের প্রাবল্যে তাহা অন্যায্য জানিয়া গোপন করিবার প্রয়াসই পাইতেছিলেন। আজ অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহা পূর্ণ হওয়াতে পুত্রবধূর উপর গভীর কৃতজ্ঞতায় বুক ভরিয়া উঠিল। সাজীটা গাছের ডালে আটকাইয়া রাখিয়া বধূর মাথায় হাত দিয়া কহিলেন, "না বলেই এলে মা হঠাৎ, ইষ্টিশানে না জানি কত কষ্ট হোল, গাড়ী পাঠানো হোলনা।"

নত হইয়া বধূ পদধূলি গ্রহণ করিয়া কহিল—"বিশেষ অসুবিধা হয়নি। গাড়ীর কাপড় ছুঁয়ে ফেল্লেন।"

"তা হোক্‌গে মা, আবার না হয় ছাড়ব। না—না, আমি আগে নই,—আগে তোমার শ্বশুর কোলে নিন। এস সুরেশ, ভিতরে এস,—তোমার আর অত লজ্জা করতে হবেনা। গাড়ীর কষ্টে একেবারে মুখ-চোখ বসে গেছে।"

"ওগো একবার দেখ কারা এসেছে।"

অতর্কিতে একটা শাঁখ বাজিয়া উঠিল। ভৃত্য দাসীর দলে চারিদিক ভরিয়া গেল। গৃহে যেন রাজ্ঞীর আগমন।

খাওয়া দাওয়ার পর দ্বিপ্রহরে অপর্ণা সুপ্ত পুত্রকে দাসীর ক্রোড়ে দিয়া ঘর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিতেই, শাশুড়ীর গলা পাইল। সম্ভবতঃ কোনো প্রতিবাসিনীকে পৌত্র দেখাইতে আসিতেছেন। "বৌমার বিচার-বুদ্ধির তুলনা নেই ঠাকুরঝি, আমি ত যতীর কাছেই আগে যেতে লিখেছিলাম,—তার শরীরটা ভাল না, আবার চোত মাস পড়ে যাবে। বুড়ো শ্বশুরকে না দেখিয়ে কি ওর তৃপ্তি আছে, না বলেই চলে এসেছেন। হ্যাঁ—বাপও পেন্সন নিয়ে সম্প্রতি কাশী গেছেন। ঐ ছেলে-বৌ-অন্ত প্রাণ—যতীর খোকা যে চোখে দেখবেন এ আশা ত গত বছর কারো ছিলনা।"

অপর্ণা ফিরিয়া ঘরে ঢুকিল।

শাশুড়ীর প্রতি ভালবাসার আধিক্য তাহার কোনো দিনই ছিল না। সে ধনী-কন্যা, স্বামীর আদরিণী, স্বাধীনা। প্রাপ্য ভক্তি, সম্মান সবই সে তাঁহাদের দেয়; কিন্তু হৃদয়ের সংস্পর্শ তাহাতে বড় থাকে না! কিন্তু শৈলজা তাহাতেই কৃত-কৃতার্থ। কন্যাহীন গৃহে বধূকে তিনি আত্মজার ন্যায়ই দেখিতেন।

পুত্রের জন্যই যে বধূর সব। সে তাঁহার সামান্য সেবা করিলেও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেন। অথচ দিবারাত্রি পুত্র পুত্রবধূর স্বাচ্ছন্দ্যবিধানই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। অপর্ণা সেই আদর তাহার প্রাপ্য বলিয়াই জানিত। আশৈশব অযাচিত ও অপর্য্যাপ্ত সম্ভ্রমের মধ্যে সে কাটাইয়াছে। জননী রাণী বলিয়া ডাকিতেন। কলেজে সহপাঠীরা উপহাস করিত—মহারাণী। শ্বশুরালয়ের মহিমা সে তাহার রাজকর বলিয়া জানিত।

আজ অন্তরাল হইতে শ্বশ্রূর এই স্নেহের অভিব্যক্তি তাহার হৃদয়কে ক্ষণিকের জন্য বিকল করিল। কিন্তু মিথ্যাভাষণের ন্যায় এই মিথ্যা শ্রবণও তাহার স্বভাবের বিরোধী। সুযোগ পাওয়া মাত্রই সে সংক্ষেপে শৈলজাকে জানাইয়া দিল যে, সে পূর্ব্বে পাটনায়ই গিয়াছিল, কোনো বিশেষ কারণবশতঃ তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিয়াছে। কারণটা যে গুরুতর ইহা ব্যতীত সে একটী কথাও বলিল না। জননী-হৃদয়ে কথাটা যে কতটা উৎক্ষোভের সৃষ্টি করিল, তাহা লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন সে বোধ করিল না। শৈলজাও বধূকে চিনিতেন এবং পরস্পরের হৃদয়ের ব্যবধান হৃদয়ঙ্গমও

বোধ হয় করিতেন। তিনিও বধূকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতে সাহস করিলেননা। ব্যাপারটা তাঁহার কাছে স্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল। অপরাধীর পক্ষ হইয়া বলিবারও কিছু নাই। জপের আসনে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন,—কাতর মাতৃহৃদয় প্রবাসী পুত্রের ম্লান মুখ স্মরণ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল।

চার

সত্যের সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিলনা। রুগ্নশয্যাগত পিতা, সংসার সম্পূর্ণ তাহারি ঘাড়ে। স্বামীর নিকট অপব্যয়ের সুযোগ না পাইয়া, কল্যাণী এইবার পুত্রের উপর দিয়া তাহার শোধ তুলিতেছিলেন। বছর চার পাঁচ মাত্র হইল সত্যেন ডাক্তারী করিতেছিল,—জননীর খরচের স্পৃহা মিটানর সাধ্য তাহার হয় নাই। তথনও সুতরাং সংসার খুব মসৃণ পথে চলিতনা।

সেদিনও সকালে একটু গোলমাল লাগিয়াছিল। সুপর্ণার মাস পাঁচ ছয় আগে একবার বেশী অসুখে অনেকগুলি টাকা ধার হইয়াছিল, এখনো তাহার কিছু কিনারা হয় নাই। মনটা তাহার ভাল ছিলনা। সুপর্ণাকে তাহার খুল্লতাত-জননী অপর্ণার মার কাছে মাসখানেকের জন্য পাঠাইয়াছিল, কিন্তু সংসার চলেনা। ঠাকুর ছাড়াইয়া তাহাকে আনিতে হইয়াছে। রাত থাকিতে উঠিয়া সেই সব বাসী পাট সারিতেছে,—ঠিকা ঝিটাও আজ আসে নাই। অপ্রসন্নমুখে চা খাইতে খাইতে সত্যেন সুপর্ণার কর্ম্ম নিরত কৃশ মূর্ত্তির দিকে চাহিতেছিল। এমন সময় বিরক্তমুখে দেখা দিলেন কল্যাণী। মনীশ ও বিমলাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, সত্য যেন সেখানে গাড়ী পাঠাইয়া দেয়। বিনাবাক্যব্যয়ে সত্য উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেছে। রন্ধনশালায় সুপর্ণার মুখ শুকাইয়া আছে।

সুখের অভাব কোনো দিনই তাহাদের পীড়া দেয় নাই; কিন্তু মাঝে মাঝে শান্তির জন্য দুজনে ব্যাকুল হইয়া উঠিত। জননী কল্যাণী কাজে কল্যাণের অভাবটা নামে বজায় রাখিয়াছিলেন মাত্র। তাঁহার সকল স্নেহমমতা ছিল কন্যা বিমলার প্রতি। পুত্র দুইটীকে তিনি বধূদের বিশেষ সম্পত্তি বলিয়া জানিতেন। এজন্য অভিযোগ, অনুযোগ, অশ্রুজলের অপ্রতুলতা ছিলনা,—আহারাদিও মাঝে মাঝে বন্ধ থাকিত। কনিষ্ঠা অনিমা পারতপক্ষে আসিতনা, সুপর্ণার যাইবার স্থান ছিলনা বেশী। তাহার নিজের আনন্দময় প্রকৃতি ও সত্যের ভালবাসা তাহার জীবনকে সহজ করিয়াছিল। সংসারের কথা সত্যকে সে কিছুই বলিতনা। কল্যাণীর তূণের তীক্ষ্ণতম বাণগুলি তাহার হাসির ও আনন্দের সহজ বর্ম্মে ঠেকিয়া বিফল হইয়া যাইত।

কল্যাণীর নিজের বধূ-জীবন কাটিয়াছিল সেকালে,—গৃহিণী-জীবন পড়িয়াছিল সেকাল ও একালের সঙ্গমে। কাজেই দুই দিক হইতে যে তিনি কেবল অসুবিধাটাই ভোগ করিলেন এই দুঃখ ছিল তাঁহার প্রবল। আর যতদূর পারেন—কথায় কাজে সেটাকে জাহির করাই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত।

মধ্যরাত্রে সকলের অনুমতি লইয়া স্বামীদর্শনে যাত্রা, এবং ভোরের আলো ফুটিবার পূর্ব্বেই পলায়ন, এই ছিল তাঁহার অভ্যাস। বধূরা যখন তখন ঘরে গিয়া ঢোকে, সন্ধ্যার পর সত্য ঘরে গিয়া ঢোকে, বাহির হইতে চায়না। বধূও নানা অছিলায় গৃহকর্ম্ম দিবসেই সারিয়া রাখে, তাঁহার অনুমতি না লইয়াই চুল বাঁধে, গন্ধ ঢালে। এগুলি তাঁহার চোখে অপরাধ বলিয়া ঠেকিত। নারীর স্বভাবই—যাহাকে ভালবাসি তাহাকে সর্ব্বতোভাবে আপনার করিয়া রাখিব। তাহার সমগ্র জগৎ আমাকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিবে,—অন্য চিন্তা, অন্য প্রেম তাহার হৃদয়ে স্থান পাইবেনা। আমিই হইব তাহার জীবনের একমাত্র আশ্রয়।

বধূ আসিলে জননী বিরূপ, ভগিনী ভ্রাতার উপর পরের মেয়ের আধিপত্য দেখিয়া ঈর্ষান্বিতা। বধূ শ্বাশুড়ীকে অনাবশ্যক, ভগিনীকে ভাগীদার বলিয়া জানেন। প্রকৃতির নিয়মকে পথ ছাড়িয়া দিবার মত উদারতা কাহারো নাই। যৌবনের দাবী ও জোরই বেশী—কাজেই বিজয়িনী বধূ। এমনি করিয়া তিন নারী-মূর্ত্তি মিলিয়া বাঙালীর দুঃখময় জীবনকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

পুত্রের প্রতি বিমুখ সমগ্র মাতৃস্নেহ গিয়া পড়িয়াছিল বিমলার প্রতি। কিন্তু সেখানেও ফল ভাল হয় নাই। শীতে গ্রীষ্মঋতুর আধিক্য বা গ্রীষ্মোচিত সময়ে বর্ষার প্রাবল্য জড় প্রকৃতির ন্যায় মানব-হৃদয়েরও অপকারী। যে কাল যে তন্ময়তা তাহার স্বামীর প্রাপ্য ছিল, সর্ব্বগ্রাসী

মাতৃস্নেহ তাহার পক্ষে বিরাট্ বাধা হইয়া মনীশ ও বিমলার মিলনকে মধুর করে নাই। বিমলার মনে স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির অভাব ছিল, স্বামীর হৃদয় লাভের জন্য বিন্দুমাত্রও ব্যাকুলতা ছিলনা। মনীশকে শয্যায় আশ্রয় দিয়া এবং তাহার গৃহকর্ম্মের ভার লইয়াই সে সকল কর্ত্তব্য হইতে ছুটী লইয়াছিল। এবং তাহার অজ্ঞাতসারেই, যথার্থ প্রাণের স্পর্শ না থাকাতে, এই সব কাজেও যথেষ্ট ক্রটী থাকিয়া মনীশকে ও পরিজনবর্গকে পীড়িত করিত। মনীশ নীরব হইয়াই চলিত—সেবা বা স্নেহের অভাবজনিত কোনো অনুযোগই সে করে নাই। পুত্র-কন্যার অযত্ন, কুশিক্ষাও তাহাকে বিচলিত করিতনা। অতি নির্লিপ্তভাবে সে অবসর সময়টা যথাসাধ্য বাহিরে বাহিরে কাটাইত।

কল্যাণী ইহাতে ইদানীং একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতেন। অথচ পুত্রবধূদের পদে পদে দৃষ্টান্ত দেখাইতেও ছাড়িতেননা। বধূদের উপকার হৌক্ বা না হৌক্ বিমলার উপকারের মধ্যে হইতেছিল, স্বামীর প্রতি সন্দেহ। স্বামী যেন পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক রাত্রে বাটী ফেরেন, সর্ব্বদাই অপ্রসন্ন। কিন্তু কল্যাণীর নিকট বর্ণনা ও মনীশের সহিত কলহ ব্যতীত অন্য প্রতীকারের কল্পনাও তাহার মনে আসেনা।

পাঁচ

রন্ধনশালার দাওয়ার উপর বিমলার শাশুড়ী বসিয়াছিলেন—ছোট বৌ কাছে বসিয়া ডাল বাছিতেছিল। সুসজ্জিতা বিমলাকে দেখিয়া বক্রস্বরে কহিলেন—"বড়বৌমা কোথাও যাচ্ছ না কি?"

বিমলা পুত্রের হাত ধরিয়া বকিতে বকিতে চলিল, উত্তর দিলনা। প্রশ্নকারিণীরও ছাড়িলে চলেনা; তিনি পুনরায় ঝাঁপিয়া উঠিলেন—"বলি সকালবেলাই এত সাজের ঘটা যে?"

এইবার সময় বুঝিয়া বিমলা ঘরে ঢুকিয়া বলিল "কোন সময়ই বা আপনার বাড়ী দাসীবৃত্তি থেকে ছুটী আছে, যে সাজ করব? মা আজ খেতে বলেছে ওবাড়ীতে আমাদের,—তা ধোয়া কাপড় পরলেই যদি সাজ করা হয়, বলুন, খুলে ছেড়ে রেখে যাই। এ বাড়ীর বৌয়েদের যে কত সুখ ঝরে গা দিয়ে তা তারা জানে।"

গৃহিণী জ্বলিয়া উঠিলেন,—কথাটা যেমনি মিথ্যা তেমনি পুরাতন।

কলেজের প্রোফেসরের মাহিনার চাইতে যে তাহার দাদার উন্নতির আশা ঢের বেশী, এ কথাটা বিমলার মুখে লাগিয়াই থাকিত। মনীশ মাহিনা মন্দ পায়না; কিন্তু স্ত্রীকে লইয়া স্বতন্ত্র হইতে রাজী হয়না,—ভায়ের পড়ার খরচ চালায়। এটা কল্যাণীর সঙ্গে সঙ্গে বিমলার গায়ে কাঁটার মত ফুটিত।

শাশুড়ী বেশ মিষ্টি সুরেই উত্তর দিলেন, "বাপের বাড়ী নেমতন্ন আছে তা আগে বল্লেই পারতে বাছা। তোমার মার মত ত আমার সস্তার চাল নয় যে রেঁধে রেঁধে রোজ ফেনে ঢালব। আর তুমি রাজনন্দিনী,—রাজবাড়ী গিয়ে সাজ্‌লেই পার। তোমার ভাইবৌদের হাল দেখেছি বাছা, ছেঁড়া কাপড় তালি দিয়ে ত এখনো পরনি।"

বিমলা স্বামীকে আসিতে দেখিয়া, স্বর নামাইয়া কি উত্তর দিল শোনা গেল না। মনীশ ঘরে ঢুকিয়া দরজাটা ভেজাইয়া দিল। বিমলা পুত্রের চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে কহিল, "আজ ওবাড়ী খাবার কথা আছে দুপুরে, সময় হবে কি?"

মনীশের মেজাজটা আজ প্রসন্ন ছিল, একটা সিগারেট দাঁতে চাপিয়া বলিল "নিশ্চয়ই—নেমতন্ন না কি? তোমার বৌদি যে চমৎকার মাংস রাঁধে—বিনা নেমতন্নেই রাজী আছি।"

"পরের বৌ রাঁধলে সব রান্নাই মিষ্টি লাগে গো—তায় যদি বয়স হয় অল্প। হেসে গায়ে ঢ'লে পড়তে জানিনা ত আমরা—তাই মনও পাইনা।"

মনীশ ভ্রূভঙ্গী করিয়া পত্নীর দিকে চাহিল, পরক্ষণেই একটা কৌতুকস্পৃহা দমন না করিতে পারিয়া হাসিল, "সত্যি তোমার বৌদি যেন একখানি স্থির বিদ্যুৎ। দিন দিন আরো সুন্দর হচ্ছে, আঃ আমি যদি—"

এইবার প্রায় জ্ঞান হারাইয়া বিমলা বাহির হইয়া গেল। "তাই বুঝি এত সকাল সকাল বাড়ী ফেরা,—এখনো একটা বাজেনি,—দাদা ত দুপুরে থাকেনা—রবিবারটা বৃথা যাবেনা।"

মনীশ হাসিতে হাসিতে ধূমপানে মন দিল।

ছয়
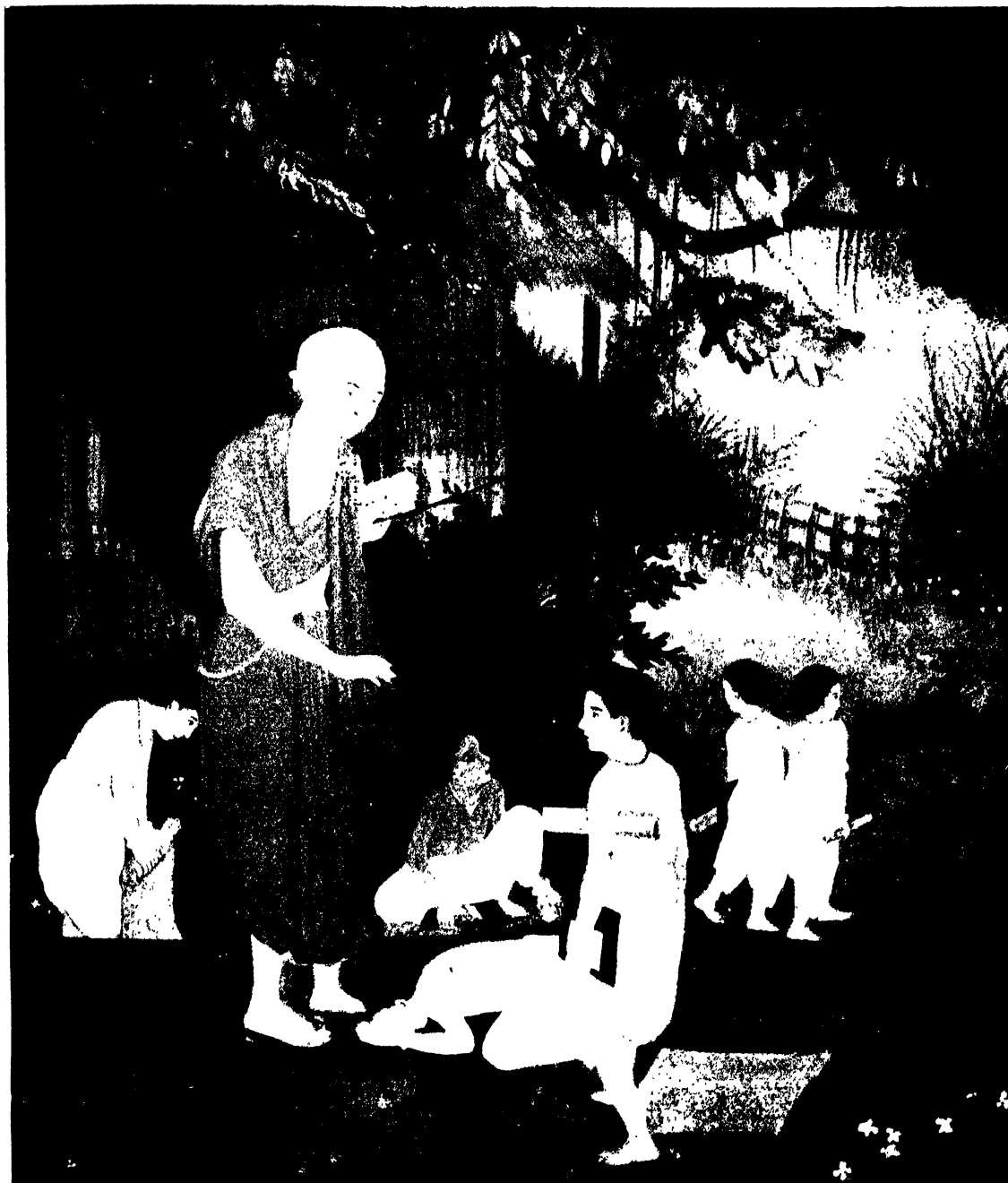
দুই হাতে ডেক্‌চীটা ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই সুপর্ণা মনীশের সহিত চোখোচোখি হইয়া বিব্রত হইয়া পড়িল। মাথায় অবগুণ্ঠন নাই, দুই হাত জোড়া,—মনীশের মুগ্ধ দৃষ্টিকে ভুল করিবারও জো নাই। না দেখার ভান করিয়া সে জানালার দিকে পিছন দিয়া হাঁড়ী নামাইয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিল। মনীশ ততক্ষণে পুষ্পিত যূথীঝাড়টার আড়াল হইতে বাহির হইয়া জানালার কপাট ধরিয়া দাঁড়াইয়াছে; বলিল, ভারী "চমৎকার গন্ধ বেরোচ্ছে।" সুপর্ণা উত্তর দিলনা। একটু অপেক্ষা করিয়া মনীশ কৈফিয়তের সুরে কহিল, "একটা সিগারেট খেতে এসেছিলুম এদিকে।" কড়াতে খানিক ঘি ঢালিয়া সুপর্ণা সেটাকে উনানে চাপাইল। তার পর ধীরে সুস্থে হাত ধুইয়া শুক্‌না লঙ্কার বোঁটা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে মুখ না ফিরাইয়াই উত্তর দিল "তাই না কি।"

মণীশ কি প্রশ্ন করিয়াছিল কি উত্তর আসিল, সব ভুলিয়া তখন সুপর্ণার দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার কম্বুকণ্ঠবিজড়িত স্বর্ণহার অগ্নিকিরণে চারিদিকে আলো ছড়াইতেছিল। কাণের দুল দুলিয়া দুলিয়া কপোল স্পর্শ করিতেছিল, মুগ্ধ মনীশের চোখে পড়িল সুপর্ণার প্রায় শিথিল কবরীর ফাঁকে ফাঁকে জড়ান শুষ্ক একখানি যূথীর মালা।

নিমেষে তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। শূন্য বক্ষের ভিতর একটা অভাব হাহাকার করিয়া উঠিল। যূথীতল ছাড়িয়া মনীশ বাগানের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। কল্যাণী একটা পাত্র হাতে ঢুকিলেন।

একটা শেফালী গাছের তলে রুমাল বিছাইয়া মনীশ সিগারেট ধরাইল। নিজের মনের যে খবর নিজের কাছেও অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে তাহা বিমলা জানিল কিরূপে? সুপর্ণা তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছে, সত্যই আকর্ষণ করিয়াছে, অস্বীকারের আর উপায় নাই। অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে এই ব্যর্থ বক্ষে মধুর বেদনা জাগাইয়া তুলিয়াছে। জীবনে বহু দিন পরে, নূতন আনন্দ আসিয়াছে, বক্ষে প্রাণে। কিন্তু সুপর্ণাকে ত মন তাহার একবার চাহে নাই। সুপর্ণার কল্পনা তাহার হৃদয় হরণ করিয়াছে। তাহার কবরীতে সেই শুকনো মালা-গাছি, বিগত মধুর যামিনীর প্রিয় মিলনের গোপন অমৃত মাখানো মালাগাছি, অকস্মাৎ তাহাকে বিকল করিল।

এক নারী, সুন্দরী যুবতী, মোহিনী তাহার প্রিয়তমের জন্য সযত্ন প্রসাধন শেষে মৃদু হাসিয়া কালো চুলে মালা দুলাইয়াছে, নিবিড় রজনীতে, নির্জ্জন গৃহে রূপ যৌবন হাসি গন্ধ গানে সোহাগে প্রেমের প্রদীপ জ্বালাইয়া দেবতার আরতি করিয়াছে। পূজা শেষে দেবতার চরণে উপহার দিয়াছে আপনার সুগঠিত সযত্ন সজ্জিত তনু-দেহখানি, উপহার দিয়াছে আপনার প্রেমে করুণায় কোমল হৃদয়টী। আর সে দেবতা কে? তাহার এই দেব-দুর্লভ উপচার গ্রহণ করিয়াছে কে? তাহারি মত একজন পুরুষ উদ্বেল বক্ষে তাহাকে ধরিয়াছে—অধরের রক্তিম হাসি পাণ্ডুর করিয়া দিয়াছে—সবল বাহু বন্ধনে তাহাকে বাঁধিয়া বিজয়ী বীরের মত তাহার বক্ষে মাথা রাখিয়াছে।

আর তাহার রাত্রির স্মৃতি কি অবর্ণনীয়, কি সুখময়!

জ্বর-তপ্ত অসুস্থ দেহে সে বিমলার শয্যায় আশ্রয় লইয়া-ছিল। বিমলা তাহাকে কামুক কুক্কুর বলিয়া উপহাস বাক্যে বিদ্ধ করিয়াছে। হৃদয়ে যাহা কিছু কোমল বৃত্তি ছিল সেই দিনই শুকাইয়া গিয়াছিল, বহু দিন বাক্যালাপ বন্ধ ছিল, অবশেষে লোকচক্ষে হেয়তা হইতে বাঁচিবার জন্য সে পুনরায় পত্নীকে স্বগৃহে লইয়া গিয়াছে।

দুই হাতে উত্তপ্ত মুখ ঢাকিয়া মনীশ ভাবিতে লাগিল,—আর সে কি দোষ করিয়াছিল ভগবান্, তাহার জীবন এমন ব্যর্থ করিলে কেন? যৌবন প্রভাতে সেও ত নয়নে উৎসাহ, বাহুতে শক্তি, হৃদয়ে আনন্দ লইয়া যাত্রা সুরু করিয়াছিল, বিবাহ বাসরে গৃহীত কম্পমান হাতখানিকে ধরিয়া সেও ত চির জীবন চলিতে প্রস্তুত ছিল। বন্ধুর পথে কতবার থামিয়াছে, ভীরু সুকুমার সঙ্গিনীর প্রতি সকরুণ স্নেহে কতবার অপেক্ষা করিয়াছে, কিন্তু সে আসে নাই। আজও ত তৃষিত বক্ষে সে চাহিয়া আছে। জীবন মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই সন্ধ্যা আঁধার নামিয়া আসিয়াছে। জাগিয়া আছে শুধু শূন্য জীবনের হাহাকার, সঙ্গীহীন প্রাণের নীরব ক্রন্দন।

সত্যর শয়ন কক্ষে খাটের উপর কাত হইয়া মনীশ শুইয়া ছিল, পানের ডিবা হাতে সুপর্ণাকে ঢুকিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সোজা হইয়া বসিল। ডিবাটা হাতে না দিয়া খাটের উপর রাখিয়া সুপর্ণা চলিয়া যাইতেছিল, মনীশ কহিল "চল্লেন যে?"

সুপর্ণা কহিল "বাঃ—কাজ নেই? গল্প করে না আর দুপুর বেলা।"

"খাওয়া হয়নি ?"

"না—কেন ?"

"কেন কি ? বেলা যে তিনটে বাজে। ওঁদের ত হয়ে গেছে।"

"উনি এখনো ফেরেন নি যে, রেঁধে বেড়ে কি আগে খাওয়া যায়।" সুপর্ণা ম্লান হাসি হাসিল।

মনীশও হাসিল, "তবু ভাল, আজ বুঝি অনাগত-ষষ্ঠীর উপোস আমি ভেবেছিলাম।" চকিতে সুপর্ণার হাসি মিলাইয়া গেল, কঠিন স্বরে হঠাৎ বলিয়া উঠিল "দেখুন, রসিকতার একটা সীমা আছে, সেটা ছাড়াবেন না।"

মনীশের মুখ কালো হইয়া গেল। স্বভাব-বিরুদ্ধ রূঢ়তা প্রকাশ করিয়া সুপর্ণাও লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল, অপ্রস্তত ভাবে ঘর হইতে বাহির হইতে গেল। পাঁচ-ছয় বছর তাহার বিবাহ হইয়াছে—এখনো সন্তানাদি হয় নাই। সুপর্ণার গভীর কামনা শিশু দেখিলেই মুখে চোখে ফুটিয়া উঠিত, মনীশের তাহা চোখ এড়ায় নাই। সত্য অত্যন্ত আধুনিক বলিয়া বন্ধু মহলে খ্যাত ছিল, কিন্তু হাসি বিদ্রূপের বেশীর ভাগটা সহ্য করিতে হইত সুপর্ণাকে। আজ অকস্মাৎ তাহার সরল উপহাসকে সে বাঁকা বুঝিবে, মনীশ ভাবে নাই—ক্ষমা চাহিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। রাগে ফুলিতে ফুলিতে ঘরে আসিয়া ঢুকিল বিমলা। সুপর্ণার দিকে একটা কঠিন দৃষ্টি হানিয়া বিদ্রূপচ্ছলে কহিল "কি গো উর্ব্বশী—আজ কি প্রেম করেই কাটাবে, তাতেই বুঝি পেট ভরেছে।" তাহার ইতর কথায় উভয়ে ক্ষণেক বিমূঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। বিমলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সাত

কল্যাণীর তিক্ত স্বভাব সে দিন আরো অপ্রসন্ন ছিল।

সদরালার বাড়ী নেমতন্ন, টানানে যাওয়া হবে না, ঢং দেখে আর বাঁচি না! মাথা ধরেছে সত্যর, তুই যাবি না কেন ? আর তার জন্যই ত যেতে বলা, ডেপুটী সদরালাদের সঙ্গে একটু খাতির রাখা ভাল। লাঠি খেলা শেখানর যে ধুম ছেলের, কোন দিন হাতে দড়া পড়বে। ওর আর কি, খুড়োয় আগুল বেঁধে দেবে টাকার, কাশী গিয়ে মজা মারবে। না গেলি না গেলি। খুকীও নেই কাছে, খেতে পায়না—ভাল মন্দ দুটো মুখে দিত—কপাল, কপাল। বকিতে বকিতে আলমারী খুলিয়া বধূর একখানা জরী পাড় শাড়ী বাহির করিয়া পরিয়া কল্যাণী খিড়কী দরজা দিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িলেন।

সমস্ত দুপুরটা নির্জ্জন বাড়ীতে সুপর্ণাকে পাইয়া সত্যর মাথাধরা আপনিই ছাড়িয়া গিয়াছিল,—তবুও পাশে বসিয়া কোমল হাতের হাওয়াটা বড় মিষ্টি লাগিতেছিল। একটু পরে অধীর হইয়া কপালের অডিকলোন-সিক্ত পটীটা ফেলিয়া দিয়া সে স্ত্রীকে কাছে টানিয়া লইল। টানাটানি করিতে করিতে সুপর্ণাকে জয় করিয়া মুখের কাছে মাথাটা নামান মাত্র, মিষ্ট অপরিচিত হাসিতে চমকিয়া উভয়ে সরিয়া গেল। সত্য চাহিয়া দেখিল, দ্বার পথে দাঁড়াইয়া মূর্ত্তিমতী এক ঋতু-উৎসব।

আট

দিন কাটিতেছিল। শৈলজার সাধের সংসারে ঘুণ ধরিয়াছিল। অভ্যাস মত গৃহিণী সকল গৃহকর্ম্মই সুসম্পন্ন করিয়া যাইতেন, কিন্তু তাহাতে না ছিল প্রাণ, না ছিল উৎসাহ। পদে পদে ত্রুটী পরিজনবর্গকে ব্যথিত ও বধূকে লজ্জিত করিয়া তুলিতেছিল। সেই সন্ধ্যার পর হইতে সে বড় শৈলজার ঘেঁস লয় নাই, আত্ম-সমাহিতা গৃহিণীও আর সে কথার উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলিকে সজাগ রাখিয়াছিলেন। পশ্চিমের ডাক আসিলে চকিত হইয়া উঠিতেন, অনেক সময় আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া উপরকার হাতের লেখাগুলি চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেন। দ্বারের নিকট গাড়ী থামিলে বিবর্ণ মুখে চকিত হইয়া দাঁড়াইতেন, নয়ন উজ্জ্বল হইত।

সেদিন প্রাতে চিত্ত অধিকতর বিকল ছিল। জপের আসনে ইষ্ট দেবতার মূর্ত্তি ভুলিয়া যতীশের কোমল প্রিয় মুখখানিই দেখিতেছিলেন—হে মহাদেব, এ কি করিলে ঠাকুর, তাঁহার যতী যে অতি দুর্ব্বল। একবার প্রলোভনে হয় ত ভুল করিয়াছে, দ্বিতীয়বারে যে সে নামিবে স্বেচ্ছায়। কিই বা তিনি করিবেন ? চির জীবন যে পুত্রকে স্বাধীন স্বতন্ত্র করিয়া মানুষ করিয়াছেন। স্বভাবজ দৌর্ব্বল্যের হাত হইতে যাহাতে সে মুক্ত হইতে পারে সেজন্য যে বিন্দুমাত্রও তাহার স্বাধীনতায় হাত দেন নাই। নিজের সুখ বা স্বার্থ ত তাঁহার কাম্য ছিল না। পুত্র পত্নী লইয়া পৃথক সংসারে থাকিলে দায়িত্ববোধে প্রবুদ্ধ হইবে এই আশায়, পরিজনের বিরক্তি,

স্বামীর অনিচ্ছা গ্রাহ্য করেন নাই, বিবাহের পরেই বধূকে যতীশের কর্ম্মস্থলে রাখিয়া আসিয়াছেন। শিক্ষিতা সুন্দরী বয়স্থা বধূ সুখেই সংসার করিতেছে এই-ই তিনি জানিতেন। উভয়ের হৃদয়ের যোগ এত অল্প, এত ক্ষীণ, এ ভয় ত তাঁহার ছিলনা।

চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। রান্নাঘরের ঝি কদম আসিয়া কহিল—"মা ভাঁড়ারের চাবীটা একবার দেবেন, বড় বৌদির চা'টা বোধ হয় ভাল হয়নি, খান্‌নি, আর একবার করে দেব ?"

জীবনে সর্ব্বপ্রথম বধূর প্রতি বিরক্তি বোধ হইল। শৈলজা কহিলেন "আমি কি জানি দেবে কি না দেবে।"

অপ্রত্যাশিত উত্তরে দাসী এতটুকু হইয়া গেল।

অপ্রতিভ হইয়া শৈলজা জিজ্ঞাসা করিলেন "বৌমা জল খেয়েছেন ?"

সাহস পাইয়া দাসী উত্তর দিল "না মা, বিরক্ত হয়ে উঠ্‌লেন—একখানি লুচীও ছোঁননি, বল্লেন শরীর ভাল নেই।"

মুহূর্ত্তে বিরক্তি ভাসিয়া গেল। তাড়াতাড়ি আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন, "চল দেখি, অসুখ বিসুখ করেনি ত ?" মনে ভাবিলেন, ওরে বোকা মেয়ে, স্বামী ছাড়িয়া কয়দিন শান্তিতে থাকিবি। কোন একটা ঘর হইতে শিশুর চপল হাসি ও পিতামহের উৎসাহবাণী ভাসিয়া আসিতেছিল। চকিতের জন্য শৈলজার মনের কোণে একটা কল্পনা লোভ দেখাইল, পরক্ষণেই চির দিন সত্যপ্রিয় চিত্ত দৃঢ় হইয়া গেল। নানা কাজে দিনমান কাটিল, সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে কম্প দিয়া প্রবল জ্বর আসিল, ছলনার আশ্রয় আর লইতে হইল না।

পরদিন প্রভাতে অপর্ণা শাশুড়ীর পথ্য লইয়া যখন ঘরে ঢুকিল, তখনও জ্বরের বিন্দুমাত্র উপশম হয় নাই—চক্ষু আরক্ত, দেহ অবসন্ন। যতীশের নিকট খোকার নাম দিয়া তার গেল—"ঠাকুরমার অসুখ—শীঘ্র এসো।"

জানালার পর্দ্দা সরাইয়া প্রভাতে শৈলজা পুত্রের আগমন প্রত্যাশায় চাহিয়া ছিলেন। হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, স্যুটকেশ হোল্ডঅল হাতে খানসামা মঙ্গল দাঁড়াইয়া আছে। অর্দ্ধ-অবিশ্বাসে আনন্দে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে রে ?"

ঘরে ঢুকিয়া পুত্র উত্তর দিল "আমি মা—কেমন আছ এখন ?"

"অনেক ভাল আছি বাবা। কৈ—শোফারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?"

খোঁজার সময় পাইনি মা—ছুট্টে চলে এসেছি।" দুই হাতে মাকে জড়াইয়া সে বুকে মাথা গুঁজিল। শৈলজা তাঁহার অশ্রু গোপন করিলেন।

"মা"—"কি বাবা ?"

"একটা কথা জিগ্‌গেস করি"—"কর।"

"সত্যি কি তোমার অসুখ করেছিল—না আমার চিঠি পেয়ে—"

"তোমার কোনো চিঠিই পাইনি ত এই মাস খানের উপর যতী ?"

"পাওনি ? মা তবে—তবে—আমার কথার উত্তর দাও ?"

"আমাকে কি কখনো মিথ্যে বলতে দেখিছিস্ জ্যোতি ?" উঠিয়া বসিয়া যতীশ সবেগে মাথা নাড়িল, "না, কিন্তু মা, আমি জানি, আমার জন্য তুমি সব পার। যাক্‌গে, আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম,—হয় ত আজ পাবে। যতক্ষণ না পাও, ততক্ষণ সুখে থাক মা।

কদম, কৈ রে, চা দিবিনা। না, পরে চান করবো।"

"যতীশ যা ঘরে যা।"

"এখানেই চা খাই মা।"

"পালা বল্‌ছি—যত রাজ্যের অখাদ্য খেয়ে আমার বিছানা ছোঁয়া।"

কদমের হাত হইতে চটী লইতে লইতে যতীশ মার প্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল।

"এত হিঁদু কবে থেকে হলে মা ?"

"তোদের জ্বালায় থাক্‌ল কৈ ? কদম খোকার-ঝিকে বাইরে থেকে ডাক্। দাঁড়া যতী, এই গোট ছড়া নে, খোকাকে শুধু হাতে দেখিস নে যেন।" হার খুলিয়া শৈলজা যতীশের হাতে দিলেন।

নয়

শ্রীচরণেষু,

মা, এক মাস হোলো তোমার কাছে কোনো চিঠি-পত্র লিখিনি। কেন যে লিখিনি মা, তা নিজেই জানি না। আমাকে ক্ষমা কোরো মা, ক্ষমা চাবার সাহস শুধু আছে তোমার কাছে—ক্ষমা আমার না চাইতেই পাওয়া আছে যে।

মা, আমার দোষ-গুণ, দুর্ব্বলতা, তুমি সব জান, তোমার কাছে কিছু লুকাবার নেই আমার মা,—আমি সত্যি পাপ করেছি। তোমার বৌএর কাছে মুখ তুলে দাঁড়াবার সাহস আমার নেই। নইলে তার কাছে আমি মাপ চেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতুম—আমার অপরাধের শাস্তি আমি চেয়েই নিতাম।

অনেক দিন আগে আমাদের চার নম্বর বাড়ীর ভাড়াটে প্রফুল্লবাবুকে মনে আছে কি মা? মাঝে তিনি চার পাঁচ বছর রেঙ্গুনে ছিলেন। বছর খানেকের কিছু কম হোল আমার নীচেই একটা বড় কাজ পেয়ে এখানে এসেছেন।

তখন এখানে কেউ ছিল না। যে কারণেই হৌক্, প্রফুল্লবাবু আমাকে খুসী করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। তাঁর বাড়ীটা খুব কাছেই,—এ-বাড়ীর out-houseটা দিয়ে তাঁর চাকরের ঘরে যাওয়া যায়। ওঁদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, প্রায়ই রাতে ওখানে খেতাম। তাঁদের বাড়ী দুটী মেয়ে আছে, বড়টীর স্বামী প্রায় সাত আট বৎসর নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। বিদেশে থাকার জন্যই হৌক্ বা যার জন্যই হৌক্, তাঁদের আচার-ব্যবহার আমার চোখে অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেক্‌ত প্রথম প্রথম। কিন্তু পরিচয় হবার পর সে ভাবটা আমার কেটে যায়। প্রায়ই তাঁরা আমার সঙ্গে বেড়াতে যেতেন। সুরুচি ভাল গাইতে পারতেন, আমার অর্গ্যানটা ব্যবহার করার অনুমতি চেয়ে নিয়েছিলেন। মহারাজের মুখে শুনতাম, রোজ দুপুরে এসে তিনি গান গাইতেন। আমার সঙ্গেও দু'একদিন দেখা হয়েছে।

মা, সমস্ত দোষ আমারই। আমার স্ত্রী ছিল, আমি পুরুষ, আমি উচ্চশিক্ষিত; কেমন করে যে তোমার ছেলে হয়ে এমন ভুল কর্লাম।

অফিসে এবং টাউনের লোকেদের মধ্যে প্রফুল্লবাবুর মেয়েদের খুব আলোচনা চল্‌ত—তাঁরা লোক-চক্ষে নিজেদের অতি সুলভ করে ফেলেছিলেন। মা, তখনো আমার মনে কোনো কুচিন্তাই আসেনি। কিন্তু ক্রমশঃ আমার নাম তাদের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আমার বন্ধুরা ইঙ্গিতে হাস্‌তে লাগল। মা, আমার লিখ্‌তে লজ্জা করছে, আমার তখন ভারী গর্ব্ব হোত। চিঠিটা বড় হয়ে যাচ্ছে,—আমি বুঝতে পাচ্ছি, তোমার শুচি মন সঙ্কুচিত হয়ে উঠ্‌ছে,—শেষ করি। সুরেশরা কোনো রকম খবর না দিয়েই এসেছিল। সেদিন রবিবার। বেড়িয়ে এসে দেখি, বাড়ীতে কেউ নেই,—সুরুচি আমার ড্রেসিং টেবলে বসে চুল বাঁধছেন। আমার লজ্জার কথা লিখ্‌তে আর পারিনা মা,—তাঁর বিশ্রী রসিকতায় সায় দিয়ে আমি হেসেছিলাম,—একবার দুবার লোলুপ হয়ে স্পর্শ করতে চেষ্টা করছিলাম। সেই সময় অপর্ণা এসে দাঁড়িয়েছে। সুরুচি তৎক্ষণাৎ পালিয়ে গেলেন, আর—আর তুমি কতখানি শুনেছ জানিনা মা,—আমরা দুজনেই দেখ্‌লাম, আলনায় কতকগুলি মেয়েদের জামা কাপড় ঝুলছে। তখনি ওরা চলে গেল।

এই আমার অপরাধ মা, আমি তোমার কাছে মিথ্যা কোনো দিন বলিনি, কোন দিন লুকাইনি,—বিশ্বাস কর, আমার লজ্জার কথা আমি একচুল কমাইনি। যদি চিঠির উত্তর দাও, মা, তোমার পায়ে মাথা রাখার অধিকার না কেড়ে নাও, তবেই কলকাতা যাব। ইষ্টারের ছুটীতে ত যেতে লেখনি?

আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই, ক্ষমা নেই?

তোমার যতী।

চিঠিখানা শৈলজা বধূকে পাঠাইয়াছিলেন,—শেষের প্রশ্নটা কাহার কাছে তাহা তিনি ঠিক্ বুঝিয়াছিলেন।

দশ

পরনে তার চাঁপা রংয়ের বহুমূল্য জর্জ্জেট সিল্কের শাড়ী,—বিলিতী কায়দায় স্প্যানিশ শাল জড়ানো,—সর্ব্বাঙ্গে হীরা জহরতের দ্যুতি। সত্য চাহিয়াই চিনিল—ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী।

"সুপর্ণা"—

"মাধবী চ্যাটার্জ্জী"—সুপর্ণা ছুটিয়া নবাগতাকে জড়াইয়া ধরিল।

"Mrs. Bannerje now if you please—" নবাগতা মাধবী আধুনিক কায়দায় মাথাটা নোয়াইল। সত্য সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নীকে সে দু'একবার দেখিয়াছিল, একবার তাহার বাটীতেও চিকিৎসার জন্য গিয়াছিল।

সুপর্ণার দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া মাধবী হাসিল, "ওঁকে আমি চিনি—সত্যেন বাবু ত? খোকার দাঁত ওঠার সময় একবার উনি গিয়েছিলেন। জানিস ত, সিভিল সার্জ্জনটী একটী আস্ত ইডিয়ট! রোগী দেখবেন কি আমার সঙ্গে ফ্লার্ট করবেন তাই ভেবে পাননা।" তার পর দুই বাল্যবন্ধুতে মিলিয়া হৃদয় উজাড় করিয়া ঢালিতে লাগিল।

"যে বছর ওফেলিয়া সেজেছিলি, তার পর আর দেখা কি হয়েছিল—না—না। সে ফটো একটা আমার কাছে আছে। মা গো মা দু' দুখানা চিঠির কোনো জবাব নেই—কেমন করে ছিলি ভাই? আমি যার সঙ্গে দেখা হয় তাকেই জিজ্ঞাসা করি—সুপর্ণার খবর জান কিছু,—সবাই ঘাড় নাড়ে। শেষকালে বিলেত চলে গেলুম্—জানিস, আমি music পাশ করেছি। এক বছর বিলেতে থাকা হোল। চলে আস্তে হোল তাড়াতাড়ি বড় ছেলেটাকে ইণ্ডিয়া-বরন্ করার জন্য। না রে না, বাণীর দাদাকে আমি বিয়ে করিনি—হ্যাঁ বড় পিসিমার দেওরের ছেলেকে। বিয়ের পরই দুজনে বিলেত যাই। উনি কিছু পরে ফিরে এলেন। কিন্তু ভাই, বড় শেষ সময়ে তোর সঙ্গে দেখা,—কদিনের মধ্যেই চলে যাচ্ছি। আজ যে এস্-ডি-ওর ওখানে আমার ফেয়ার-ওয়েল পার্টি ছিল। মিসেস্ এস্-ডি-ওটী একটী চীজ্—আমার মার বয়সী বুড়ী, সাজের যা ঘট',—যেদিন ও টক্কর খেয়ে পড়বে, সেদিন আধ পয়সার হরিলুট দিয়ে নিজেই খাব। তা না ত কি—ঐ দু'মোণী ভার কি ঐ বাক্‌স্কিনের হিলের সাধ্যি যে বয়। হ্যাঁ সত্যেনবাবু, আপনি ওঁর বাড়ী বিনা ফীতে দেখেন?"

"কি করে জানলেন বলুন ত?"

"আন্দাজী। ও ভদ্রমহিলা যে বিনা কারণে কাজ করেন এ আমার মনে হল না। আপনারা মাকে দেখেই ঠিক্ করলাম একটা নিশ্চয়ই বাধ্য-বাধ্যকতা আছে।"

"মার সঙ্গে দেখা হয়েছে আপনার?" ভীতস্বরে সত্য প্রশ্ন করিল।

"তাঁর কাছেই ত সুপর্ণার পরিচয় পেলাম। এস্-ডি-ওর বৌ খুব আমার ঢাক বাজাচ্ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ এক ঠাক্‌রেণ বলে উঠ্‌লেন, আমার বৌমাও কম নয়, একগাছা মেডেলেরই মালা আছে। শুনে একটু ঔৎসুক্য,—হিংসা মনে করিসনি ভাই—হোল। ফার্ষ্ট মুন্সেফের স্ত্রী এই সময় বলে উঠেন যে, হ্যাঁ মেয়ের মত মেয়ে সুপর্ণা, আপনার বৌ-ভাগ্যি ভাল।

তোর শাশুড়ী অমনি সুর বদ্‌লেছেন, "পটের বিবি নিয়ে সংসার করা যে কি তা ত কেউ বোঝে না।" লক্ষ্মীটি ভাই, রাগ করিস্‌নি, ওঁকে আমি এক আঁচড়েই চিনেছি। তার পর নিজের কথাতেই মেতে আছি,—তোর ছেলেমেয়ে কৈ ভাই? নিয়ে আয় দেখি।"

মুখটাকে একটু বিশ্রাম দিয়া মাধবী জরীর নাগরা জোড়া খুলিয়া চারিদিকে চাহিল। সুপর্ণা একটু হাসিয়া আলমারী খুলিয়া একজোড়া চটী বাহির করিয়া দিল।

মাধবী আরাম করিয়া বসিয়া হাত-পাখাটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে কহিল "কৈ, আন্।"

"নেই ত আনব কোত্থেকে।"

অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া মাধবী একটা ঠেলা মারিল—"যাঃ যাঃ, চালাকি করিসনি।"

"আরে কি পাগল, সত্যি নেই।"

পাখাটা থামাইয়া বিস্মিত নয়নে মাধবী একবার সুপর্ণার মুখে, একবার সত্যর মুখে চাহিল—"তাই জন্যে সুপর্ণা তোর এত শরীর খারাপ হয়েছে,—তুমি আর সেই সুপর্ণা নেই।"

তার পর গম্ভীর হইয়া সত্যর দিকে চাহিয়া কহিল, "That's not playing the game, সত্য বাবু। Why man, মাপ করবেন, ও যে মা হবার জন্য তৈরী হয়েছিল—মা ছাড়া অন্য কোনো roleএ আমরা ওকে কল্পনা করতে পারি নাই। থার্ডইয়ারে যখন স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়, মিসেস ক্যাম্পবেল ওকে বলে my girl, যাও, বিবাহ তোমার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, ভারতের মুক্তি তোমাদের মত মেয়েদের হাতে। বাচালতা মাপ করবেন সত্যবাবু, ও যে মা হবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে তা ওর মুখ দেখে বুঝতে পারছেন না।"

সত্য চমকিয়া চাহিল, সুপর্ণার চোখ মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, নিঃশ্বাস ঘন ঘন বহিতেছে। সত্যর দৃষ্টি এড়াইবার জন্য সে দ্রুতপদে পলাইল—যাইবার সময় মৃদুস্বরে বলিয়া গেল, "একটু চা-টা করি।"

সুপর্ণার প্রস্থানের পর মাধবী চুপ হইয়া গেল। সত্যও অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল। অপরিচিতা নারীর সহিত এই আলোচনা তাহার বাধিতেছিল,—অপরপক্ষের ন্যায় সহজ সুন্দর ভাব তাহার মধ্যে ছিল না।

নীরবতাটা অশোভন হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া মাধবী অন্য কথা পাড়িল।

"আচ্ছা আমাদের ওখানে আপনারা কখনো যান না—না সত্যবাবু? তা না হ'লে সুপর্ণা এখানে আছে, আর আমরা একটু টের পাইনি।"

"দেখুন, আমার পক্ষে আপনাদের ও সোসাইটীতে মেশা একটু দুষ্কর। একবার একটা পুলিশ কেসে সত্য সাক্ষ্য

দিয়ে বিপদে পড়েছিলাম ; সেই অবধি জাতে ঠেলা হয়ে আছি।"

"তাই না কি ? তা যদি বল্লেন—আমার চেয়ে Worse Political prisoner আর কে আছে ? শুধু তাই নয়, সামাজিক হিসেবেও ছুঁৎমার্গ বাঁচাতে বাঁচাতে মরলাম। এর বাড়ী যাওয়া হবেনা, ওখানে খাওয়া হবেনা, ওখানে বসা হবেনা, ওকে নেমন্তন্ন করতে পাবেনা,—বাপ রে, কি বিধি-নিষেধের লিষ্ট্। চোর দায়ে ধরা পড়া আর সরকারী চাক্‌রী একই কথা। নির্জ্জলা নিন্দা অথবা খাঁটী খোসামোদ খুব উঁচু দামে পাওয়া যায় ; কিন্তু মানুষ ত আমিও,—হাঁপিয়ে উঠেছি। এদিকে গেলে বলে Agent Provocator, ওদিকে গেলে চাক্‌রী নিয়ে টান।"

ন যযৌ ন তস্থৌ—মাধবী ভঙ্গী করিয়া অবস্থাটা দেখাইল।

সত্য হাসিতে লাগিল। হাওয়াটা কাটিয়া গিয়াছে বুঝিয়া মাধবী নম্র সুরে জিজ্ঞাসা করিল—"আমার কথায় রাগ করেননি ত সত্যবাবু?"

সত্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল -"আজ্ঞে না, কি বলছেন, —আপনি Friend, আপনার বলার ত অধিকারই আছে।"

"সে অধিকারের জোরেই বলেছি, সত্যবাবু। জানেন, একবার কলেজে ও ওফেলিয়া সেজেছিল, আর আমি হ্যাম্‌লেট। সেই থেকে ভারী ভালবাসা হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু এ কেন কর্চ্ছেন বলুন ত?"

"আমাদের পক্ষে সন্তান বেশী হওয়াটা বিলাসিতা বলে আমার বোধ হয়—" বাধা দিয়া মাধবী বলিল "নিশ্চয়, সবারি পক্ষে, কিন্তু একটা ভুল করচেন সত্যবাবু,—অপচয় অপব্যয়টাও যেমন বর্জ্জনীয়, কৃপণতাটাও ঠিক্ সেইরকম। সমস্ত জিনিষের একটা সুন্দর সীমা আছে। সেটা অবধি পৌছলে প্রকৃতিও তুষ্ট হন্, মানুষও সুখী হয়, তা মানেন ত?"

"আপনি কি বলতে চান কতকগুলি 'পপারের' সৃষ্টি করলে দেশে আমাদের—"

মাধবী জ্বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, তাই বলি। পপার আপনি কাকে বলেন সত্য বাবু? এই পপারের দলই লুইকে টেনে নামিয়েছিল, এই পপারের শক্তিই আজ রাশিয়া জয় করেছে। ভগবান করুন্, এই পপারের দলই বেশী হৌক্, তাদের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে সেই বুভুক্ষুর দলই স্বাধীনতার জন্য লড়বে, যাদের কিছু হারাবার নেই, যারা সব হারাতে প্রস্তুত।"

"দারিদ্র্যকে কি আপনি মানুষের পক্ষে উপকারী বোধ করেন? কিন্তু বেশী হয়ে পড়লে সেটাও অসহনীয় তা মানবেন ত?"

"মানব। কিন্তু সব জিনিসের মতন এই দারিদ্র্যতেও মেকী চল্‌ছে, ভেজাল মিশেছে। আমরা যদি খাঁটী গরীব হোতাম, তাহ'লে দারিদ্র্য বোঝা না হয়ে জীবন-যাত্রাকে হালকা করে দিত। কিন্তু বিদেশীর মাপ-কাটিতে মাপা এই দারিদ্র্য আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের আমাকে বড় পীড়া দেয়।

দারিদ্র্যের যে ভীষণ অবস্থা আমি পল্লীতে পল্লীতে দেখেছি, যেখানে গাছের পাতাও খাদ্য হয়ে ওঠে, মানুষ স্ত্রীকে বিক্রয় করে, বস্ত্রাভাবে স্ত্রীলোক লজ্জা বিসর্জ্জন দেয়, তার তুলনা কি আমাদের মধ্যে মিল্‌বে?

পাশের তেতালার সঙ্গে তুলনা করে নিজের কুঁড়েকে আস্তাবলের অধম মনে করি, কিন্তু ভুলে যাই—এই আস্তাবলে যীশু খৃষ্ট জন্মালেও জন্মাতে পারেন। আমি বিলাসে লালিত সত্যি, এসব কথা বলার অধিকার আমার নেই,— কিন্তু আমিও দরিদ্র বলে লজ্জিত মুখে থাকব যদি গভর্ণরের স্ত্রীর সঙ্গে টেক্কা দিয়ে পোষাক পরি।"

নিজের উত্তেজনায় লজ্জিত হইয়া মাধবী হঠাৎ থামিয়া গেল।

"নাঃ কথাটা ধরেছি যখন, শেষ করাই ভাল। সত্যবাবু, আপনারা দেশকে ভালবাসেন, তাকে স্বাধীন করা আপনাদের কল্পনা।

দেশ সেবার অধিকার আমার নেই, আমার দেওয়া ফুলে তাঁর পূজা চলবে না।

আমি দেশকে ফুল-দূর্ব্বা দিয়া পূজো করবনা সত্যবাবু, আমি দিয়ে যাব আমার দুটী ছেলেকে। তারা পূজো করবে বুকের রক্ত দিয়ে। আমি তাদের শিক্ষা দিচ্ছি নিজে, তাদের শিরায় শিরায় আমার কল্পনা, আমার শক্তি ঢেলে দিয়েছি। আমি তাদের মানুষ গড়ে তুলেছি। আর আপনি? আপনি কি দেবেন?

দুর্ব্বল শক্তিহীনা মা থেকে, যারা জীবনের অধিক সময়টা

সন্তানের জন্ম দিয়েই কাটায়, যারা বেঁচে বাঁচতে জানে না, মরার সময় মরতে চায় না, তাদের কাছ থেকে দেশ বেশী আশা করে না,—করে সুপর্ণার মত মার কাছ থেকে—যে মা হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে পৃথিবীতে এসেছে। আপনার বারুদ কৈ সত্যবাবু ?"

একটা ট্রেতে করিয়া খাবার ও চা লইয়া সুপর্ণা ঘরে ঢুকিল। তার পর সত্যর দিকে হাসিয়া চাহিয়া কহিল "ওগো ওর সঙ্গে তর্কে তুমি পারবেনা—ও বলে ডিবেটিংএ ফার্ষ্ট হোত। এখন এস ত বাপু, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা শুকিয়ে গেছে, ভিজাবি একটু।"

মাধবী লজ্জিত মুখে হাসিতে লাগিল। কথাবার্ত্তা এর পর সহজ পথেই চলিল। বায়ুকোণে যে মেঘটা দেখা দিয়াছিল, সুপর্ণার সরল হাসি তাহাকে হাল্কা করিয়া উড়াইয়া দিল।

মাধবী যখন বিদায় লইল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। সে রাত্রে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে যেন একটু দূরে দূরেই রহিল। সুপর্ণা বুঝিল সত্য ঘুমায় নাই, চোখ বুজিয়া আছে।

শরীর মন অত্যন্ত ক্লান্ত ছিল বলিয়া সেও আর কিছু বলিল না।

দিন দুই সত্য বাহিরে বাহিরে গম্ভীর হইয়া কাটাইল, স্ত্রীর কাছে মাধবীর গল্প করিলনা। সুপর্ণা বিস্মিত হইল, কিন্তু আরাম বোধ করিল। একবার খালি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "হ্যাঁগো, মাধবীরা চলে গেছে—সত্যি কবে গেল, কিছু ফটো পাঠায়নি ?

সত্য অন্যমনস্ক ভাবে কহিল—"না।"

এগার

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইয়া আসিতেছিল। বারান্দায় একটা লণ্ঠন ক্ষীণ আলো দিতেছিল। সত্য আসিতে আসিতে একটা হোঁচট্ খাইল। ময়দা-ভরা হাতে রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া সুপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "বই এনেচ ?"

সত্য মুখে কথা বলিল না, কিন্তু হাতের বইখানা তুলিয়া লোভ দেখাইল।

সুপর্ণা পিছন পিছন আসিয়া ঘরে ঢুকিল। সেজটা বাড়াইয়া দিয়া সত্য খাটের উপর বসিয়া বলিল, "আজ যে বড় সাহস দেখ্‌ছি—মা কোথা ?"

"বেড়াতে গেছেন গোঁসাই-বাড়ী। মা গো, আমি বল্লুম Growth of the Soilটা আন্‌তে—কি একটা কস্‌মো হ্যামিলটনের পচা 'কিপারস্ অফ্ দি হাউস' নিয়ে এসে হাজির,—এ আমার পড়া।"

কটি বেষ্টন করিয়া স্ত্রীকে কাছে টানিয়া সত্য হাসিল, "বিয়ের আগেই সব পড়ে ফেলেছিলে !!"

সত্যর মুখের উপর ময়দার হাত বুলাইতে বুলাইতে সুপর্ণাও হাসিল, "সন্দেহ হয় না কি মশাই ? তা আমি ত কপালকুণ্ডলা সাজিনি তোমার কাছে—বি বা-হ !!!"

স্ত্রীর হাসিতে সত্যেন হাসিলনা। অন্য দিন অপেক্ষা স্বামীকে গম্ভীর দেখিয়া সুপর্ণা হাসি থামাইয়া, তাহার মুখের উপর মুখ রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হোল গো ?"

জোর করিয়া একটু হাসিয়া সত্য কহিল—"সন্দেহ।"

"সত্যি ? আচ্ছা কি অদ্ভুত বিশ্বাস তোমাদের যে, কয়খানা Modern বই পড়লেই বুঝি Moral খারাপ হয় ? তোমার কথা অবশ্য বলছি না।"

কথাটা চাপা দিয়া সত্যেন কহিল,—"না রাণী, আমি জানি তুমি আগুনের চেয়েও পবিত্র। খাওয়া দাওয়ার কত দেরী গো ? আজ একটু সকাল সকাল সারনা। বাবার ভোজন হয়েছে ?"

"না—এখনো সাড়ে সাতটা বাজেনি। আর মার যে নটার আগে সন্ধ্যেই হয় না।"

"মার যদি রাতদুপুরে সায়ং-সন্ধ্যা হয়, তা'বলে তোমারও কি থাকতে হবে ? আজও ঝি আসেনি ত ?.........শোন।"

সুপর্ণা চলিতেছিল, মাথা ফিরাইয়া কহিল—"কি ?"

"শোন—আচ্ছা মা হবার তোমার খুব সখ, না ?"

"যাও—"

"সত্যি বল গো"

"মাধবী বুঝি তোমার মাথায় এ-সব ঢুকিয়েছে ?"

"না—কদিন থেকে আমি খালি ভাবছি, তোমার এই রকম শরীর খারাপ কেন হচ্ছে ? বলনা।"

অপরাধের সুরে সুপর্ণা কহিল "কার না থাকে গো ?"

"কিন্তু তোমার কথাটা বল।"

সলজ্জ হাসিভরা মুখখানি স্বামীর বক্ষে লুকাইয়া সুপর্ণা কহিল, "যাও।"

সত্য তাহার মাথাটা জোরে চাপিয়া ধরিল। ছোট্ট

কথাটী, কিন্তু সুরে ভাবে সত্যর মনে নিবিড় বেদনা জাগিয়া উঠিল।

খাওয়া দাওয়ার পর সুপর্ণা ঘরে সত্যকে দেখিতে না পাইয়া, সোজা ছাদে চলিয়া গেল।

চাঁদের আলোতে ছাদ ভাসিয়া গিয়াছে। কোন একটা গাছ হইতে অবিশ্রান্ত কোকিলের ঝঙ্কার আসিতেছিল। সমস্ত পৃথিবী মুগ্ধ হইয়া পড়িয়া আছে। সত্যেন অস্থির ভাবে পাদচারণা করিতেছিল, সুপর্ণাকে দেখিয়া হাত বাড়াইল। স্বামীর হাতে হাত দিয়াই সুপর্ণা চমকিয়া উঠিল, "ঈস্, তোমার হাত যে বড্ড গরম, অসুখ করেনি ত? পরশু যে বৃষ্টিতে ভিজেছ!" শঙ্কাতুর নারী-হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল,—কপালও যে গরম!

"না, জ্বর হয়নি, মাথাটা বড্ড ধরেছে। না—নীচে যাবনা।"

"তবে শোও, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দি।" সুপর্ণার কোলে মাথা রাখিয়া দুই হাত দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া সত্যেন ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, "রাণী, এমনি করে থাকা যায়না অনন্ত কাল অনন্ত দিন?"

"অমন করছ কেন গো? আমি ত এই তোমার কাছে রইচি।"

"ছেড়ে যাবেনা বল? আমি যদি ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য হয়ে উঠি কোন দিন? মনে হচ্ছে রাণী, এই যেন আমার তোমাকে শেষ পাওয়া।"

"কি পাগলের মত বক্‌ছ,—তোমার নিশ্চয় অসুখ করেছে,—কৈ কি কথা আছে বল্লেনা?"

"বলব—বলি," বহুক্ষণ উভয়ে চুপ করিয়া রহিল। বলি বলি করিয়া সত্যর মুখ ফুটিতেছিলনা। স্বামীর সঙ্কোচ দেখিয়া সুপর্ণা বলিল, "ওগো, কষ্ট হয় ত নাই বল্লে।"

সোজা হইয়া বসিয়া সত্য কহিল "না—বলি। প্রথমে ভেবেছিলাম চিঠিতে লিখে দেখাব; কিন্তু লজ্জা হোল—নিজের ভীরুতা ভেবে। রাণী, সুপর্ণা, আচ্ছা, তোমার মনে আছে কি—আমাদের ফুলশয্যা দেরীতে হয়েছিল কদ্দিন?"

সুপর্ণার সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল,—বিবাহ-জড়িত কোন রহস্য শুনিবে সে? বুকের উপর হাত রাখিয়া কোনো মতে উদ্বেল হৃদয় শান্ত করিয়া কহিল, "হ্যাঁ, তোমাদের প্রিন্সিপ্যাল কেদারবাবু তার করেছিলেন, কি চাক্‌রীর জন্য না?"

"তাই বলে আমি তখন তোমাদের বুঝিয়েছিলুম, কিন্তু আসল কথাটা তা নয়।

বাসী বিয়ের পর তোমাকে নিয়ে এখানে ফিরে এসে দেখি, কখানা চিঠি আছে পড়ে আমার নামে। চিঠির মধ্যে কতকগুলি কথা ছিল, তাই সত্যি না কি তাই খোঁজ করার জন্য গিয়েছিলাম। যা শুন্‌লাম, বা জান্‌লাম, তাতে দিনের আলো চোখের সাম্‌নে নিবে গেল। দুদিন পাগলের মত কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ছুটে বেড়িয়েছি—কিছুতেই কর্ত্তব্য ঠিক্ করতে পারছিলামনা। হতাশায় প্রথম মনে হল কোথাও পালিয়ে যাই, কিন্তু নিজের ভীরুতায় লজ্জা পেলাম। তাছাড়া রাণী, তোমার নেশা চোখে লেগেছিল, পারলুমনা। ফিরে এলুম। কি লেখা ছিল চিঠিতে শুন্‌তে চাও না?"

"নাই বা বল্লে এত কষ্ট যদি হয়। আমি তোমার ভালবাসা ছাড়া কিছুই জান্‌তে চাইনা।"

"কিন্তু আমার বলতেই হবে যে। মাধবী আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। সুপর্ণা, বাবাকে চিরকাল শয্যাগতই দেখেছ, আমি দেখেছি, কিন্তু কি রোগ তা মা কখনো বলেওনি, জোর করে আমিও খোঁজ করিনি। চিঠিগুলিতে লেখা ছিল, বাবার অতি বিশ্রী রোগ আছে। কলিকাতায় একজন কবিরাজের নাম ছিল, তার কাছে খোঁজ নিলেই জানতে পারব। খোঁজ নেওয়ার আগেই সব চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট হয়ে গেল। রাণী, দুদিন আগে চিঠিখানা পেলেও বিশ্বাস কোরো আমি তোমায় মুক্তি দিতাম। কিন্তু এম্‌নি দুর্ভাগ্য, এম্‌নি চক্রান্ত, আমার জীবনে সুখের স্বপন আরম্ভ হতেই ভেঙে গেল। ছুটলাম বড় বড় লোকের কাছে। সবাই স্থির নিশ্চয়, রোগ আমার নাই। আমার সন্তানদের কথা সন্দেহজনক। রাণী, কি যে অবস্থা আমার হয়েছিল।

বাবার লজ্জা-কলঙ্ক-কাহিনী, অপরিচিতা তোমাকে কেমন করে বলি। যদি তোমাকে হারাই, যদি তুমি ঘৃণায় সরে যাও। কিছুতেই পারলুমনা প্রিয়া।

তোমাকে স্তোক-বাক্যে বোঝালাম। আমার প্রেমে তুমি বিভোর হয়ে গিয়েছিলে, তুমি হাসিমুখে নিজেকে deny

করলে ; বল্‌লে ভার্য্যাং মনোরমাং মনোবৃত্ত্যানুসারিনীং। হয় ত করুণাও করলে ; হয় ত আমার উপর বীতশ্রদ্ধ হলে,—দারিদ্র্য-ভীরু অমানুষ, আত্মসুখপ্রিয়, পরিশ্রমবিমুখ।"

"না—না—না—"আর্ত্তস্বরে ক্ষীণ প্রতিবাদ আসিল।

"হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি যে সত্যই তাই। জীবনটা যে আমার একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা। কত উঁচু আশা, কত কল্পনা ছিল। আমার ছেলে—তাকে আমি একটা C. R. Das, একটা পি, সি, রায়, একটা জগদীশ বোস গড়ে তুলব। তোমাকে আমি যোগ্য মহিমা দেব—রাণীর মত তুমি থাক্‌বে—শুধু আমার জীবনে, হৃদয়ে নয়,—জগতের সাম্‌নে। সব ফুরিয়ে গেল গো। তোমার কাছে আমি গভীর অপরাধ করেছি, শাস্তি দাও রাণী।"

দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া কম্পিত চরণে সুপর্ণা উঠিয়া দাঁড়াইল। স্বামীর সম্মুখে গিয়া দুই হাতে তাহার নত মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া ক্ষণেক দেখিল। তার পর সত্যেনের মাথাটা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "তোমার কাছ থেকে এতদূরে রেখেছিলে এতদিন এ ত আমি ভুলেও ভাবিনি। আমাকে কি এতটুকু বিশ্বাস হয়নি তোমার ? তোমার সুখের ভাগী আর তোমার দুঃখের সঙ্গিনী কি আমি নই ? আমাকে আমার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করেছ কেন গো, তোমার কষ্ট কি আমি সইতে পারতুমনা, তার ভাগ নেতার অধিকার আমার নেই কি ?"

"হয় ত আছে রাণী, কিন্তু আমি দিতে পারিনি। তার শাস্তি আমি যথেষ্ট পেয়েছি। এই ছয় বছর ধরে কি অপরিসীম যন্ত্রণা আমি সহ্য করিছি, তা ত তুমি পাওনি দিনে দিনে তিলে তিলে। মাধবীর কথায় তাই আমার মনে হচ্ছে, কি অধিকার ছিল আমার তোমার জীবন বিফল করার—তুমি মা হবার জন্য জন্মেছিলে, তোমাকে আমি অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে বাধ্য হয়েছি। এই অভিশপ্ত বংশ বাঁচাতে আমি পারবনা। আমার কাছে যখন তুমি এসেছিলে, তখন তুমি আর এক রকম ছিলে। তোমার চোখে মুখে আনন্দ উছ্‌লে উঠ্‌ত ! আর আজ তুমি কি হয়ে গেছ ? এই দরিদ্র সংসারে দীনতম দাসীর মতন তোমার জীবন কাট্‌ছে—যে জীবন তৈরী হয়েছিল বাংলাদেশে আগুন জ্বালাতে, তার মুক্তির পথ-প্রদর্শক গড়ে তুলতে। তোমার জগৎ তুমি ভুলে গেছ, মুক্তি তোমার কাছে স্বপ্ন,—এই ছোট্ট ঘরের কোণে তুমি হাঁপিয়ে উঠেছ বায়ু অভাবে। বাধা দিয়োনা রাণী—তুমি আমায় ভালবাস আমি জানি, সেই ভালবাসায় তুমি বন্দী হয়ে আছ,—সুখে আছ তুমি ভাবছ। আমি কিন্তু জানি অন্য রকম। মাধবীর কথায় তোমার চোখের দীপ্তি তুমি দেখনি, আমি দেখেছিলাম। মা হওয়াটাই সার্থকতা নয় সে আমি জানি, জগতে প্রিয়া প্রণয়িনীর যায়গাও অনেক উঁচুতে। নেপোলিয়নের জোসেফিন ছিল। কিন্তু যে উঠবেনা তাকে ত ওঠাতে পারনি রাণী, কার জন্য উঠ্‌ব। ভবিষ্যতের আশা আমার ফুরিয়ে গেছে, অতীত আমার ভুলে যাওয়াই ভাল।

তোমার চোখে জল আস্‌ছে ; কিন্তু এইগুলি সত্যি কথা। আমাকে একটু কম ভালবাসলেনা কেন প্রিয়া ? নিজের কাজে অনুতাপ হচ্ছে,অনলশিখায় কি করেছি খেলা ?

তোমার chance আমি কেড়ে নিইছি। সুপর্ণা, তুমি Keepers of the House পড়েছ ?"

বিদ্যুৎবেগে স্ত্রী উঠিয়া দাঁড়াইল, "কি বলছ,—বলছ কি তুমি ?"

স্বামী উঠিয়া হাত ধরিল, "এ ত রাগের কথা নয় গো। তুমি মনে প্রাণে আমার আমি তা জানি। আমার আছ, আমারি থাকবে—ইতিহাসে এ বিরল নয়। আমি স্বামী, তোমার প্রভু—আমি বলছি, এ পাপ নয়, পাপ হতে পারে না।"

সবলে সুপর্ণা হাত ছাড়াইয়া লইল—"তুমি স্বামী, তুমি প্রভু,—তোমাকে আমি দেবতা বলে জানি,তাই এই অপমান করছ ? স্ত্রীলোককে তুমি খুব উঁচু বলে মান, এ কি তার পরিচয়—জান্‌বে কি করে—বুঝবার শক্তি তোমার কোথায় ? মা হতে চেয়েছিলাম শুধু তোমার সন্তানের জননী হবার লোভে। সে যে কি সুখ, সে যে কি অহঙ্কার, অলঙ্কার, তা ত জাননা,নয় ত অমন মাতৃত্বকে শতবার সহস্রবার ধিক্।"

পতনোন্মুখ কম্পিত দেহলতা সত্য ধরিয়া ফেলিল। স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া সুপর্ণা নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিল। আকাশে পাণ্ডুর চন্দ্রমা—ব্যথাতুর দম্পতীর নীরব বেদনার সাক্ষী হইয়া জাগিয়া রহিল।

বারো

রাত্রে দাবার আড্ডা হইতে প্রায় এগারোটার সময় ফিরিয়া মনীশ খাইতে বসিয়াছিল। নিকটে জননী

বসিয়া তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। ছোট-বৌমাকে আর একটু মাছ দিতে বলিয়া, কহিলেন, "আজ তোর শাশুড়ী এসেছিলেন।"

"তাই না কি,—বৌদি?"

"হ্যাঁ, তাকে আবার নিয়ে আসবে! ঠাকুরেণ নিজে স্ফূর্ত্তি করে বেড়ায় মেয়েটাকে একা ফেলে। আমরা বাপু অমন পারিনা,—আহা, বৌ নয় ত, সোনার লক্ষ্মী।" মনীশ উঠিয়া হাত ধুইতে গেল। নারী জাতির উপর তাহার গভীর শ্রদ্ধা সত্ত্বেও ঐ রমণীটীকে সে আন্তরিক ঘৃণা করিত। আর সে ঘৃণার সহিত একটু ভীতিও মিশ্রিত ছিল। যেদিনই কন্যা-গৃহে তিনি পদার্পণ করেন, সেই দিনই বিমলার নিকট হইতে মনীশের কিছু প্রাপ্য থাকে। তত্ত্বে উপহারে কল্যাণী জামাতাকে তুষ্ট করিবার জন্য কঠোর প্রয়াস পাইতেন, কিন্তু সতার কষ্টার্জ্জিত অর্থ এইভাবে পাওয়ায় মনীশের অত্যন্ত লজ্জাবোধ হইত। ভ্রাতৃবধূ পায়ের কাছে পান রাখিয়া গিয়াছিল, তুলিয়া লইয়া মনীশ বাহিরের ঘরে গিয়া ঢুকিল। আজ্ঞামত ভৃত্য শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিয়া আলো নিবাইয়া প্রস্থান করিল। ঘুম কিন্তু আসিল না। ক্রমশঃ বাটী নিস্তব্ধ হইয়া আসিল—তখনো বিমলার ঘরে ক্ষীণ আলোকরেখা দেখা যায়। মনীশের হৃদয় কোমল হইয়া আসিল,—বিমলা আজ এখনো জাগিয়া আছে। কি করিতেছে, হয় ত খুকী উঠিয়াছে কিংবা হয় ত—হয় ত —একটা সম্ভাবনার কথা মনীশের মনে উঁকি দিল,—হয় ত বিমলা তাহার জন্য জাগিয়া আছে। সেদিনকার ইতর কথায় হয় ত নিজে লজ্জিত হইয়াছে, কিন্তু সাহস করিয়া স্বামীর নিকট ক্ষমা চাহে নাই। সংকল্প ক্ষীণ হইয়া আসিল, করুণা আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল। দোষ ত বিমলার নহে, দোষ তাহার শিক্ষার, সমাজের। শিক্ষা তাহাকে দেওয়া হয় নাই, জননী অনবরত কুশিক্ষা দিতেই ব্যস্ত। অল্পবিদ্যাতে কতকগুলি কুৎসিত উপন্যাস পড়িয়া সে ফ্রয়েড-তত্ত্ব শিখিতেছে। আর মনীশ—সেও ত দোষ করিয়াছে। সত্য স্ত্রীকে সুখে রাখিতে পারে না বটে, কিন্তু তাহার ত চেষ্টার অবধি নাই। পাছে সুপর্ণার কষ্ট হয় এই ভয়ে কখনো আটটার পর ক্লাবে থাকে না, ছুটীর দিনে বাড়ী হইতে বাহির করা শক্ত। সেবার অসুখে ধার করিয়াও চেঞ্জে পাঠাইল। স্ত্রীকে আকর্ষণ করার জন্য সে ত কিছুই করে নাই। নাঃ—জীবনটা একবার নূতন করিয়া আরম্ভ করিতে হইবে। বিমলা ত তাহারি। তাহাকে খুসী করার জন্যই বিমলার সজ্জা, ভূষণ-প্রীতি—মূঢ় এই সাধারণ কথাটা সে ভাবে নাই। অধীর মনীশ সিগারেটটা ফেলিয়া দিল,—সত্যই ত সে অপব্যয়ী। এই সিগারেটটা না খাইলেই ত কয় মাসে বিমলার বহুদিন-প্রার্থিত দুলজোড়া হইতে পারে। মাথার বালিশটা হাতে করিয়া সে ভিতরে গেল।

বিমলা সত্যই জাগিয়া ছিল। মাথার গোড়ায় লণ্ঠন রাখিয়া একখানা উপন্যাস পড়িতেছিল। মনীশ একটা ধাক্কা খাইল,—কতবার সে বারণ করিয়াছে ছেলেদের মাথার অত কাছে কেরাসিনের আলো রাখিতে নাই। কিন্তু কিছু বলিয়া স্বপ্ন ভাঙিতে ইচ্ছা হইলনা, বিমলা আজ জাগিয়া বসিয়া আছে. বিমলা আজ তাহার জন্য সাজিয়া আছে। প্রীতিতে হৃদয় ভরিয়া উঠিল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার পরনের পাৎলা নীল রংয়ের শাড়ীখানি, গলা খোলা লেসের সেমিজ, চরণের অলক্তক, অধরের তাম্বুল-রাগ দেখিতে লাগিল!

বিমলা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মা মিথ্যা বলে নাই,—পুরুষগুলা কি হীন, প্রবৃত্তিপরবশ।

"বিমলা, আজ যে এখনো জেগে?"

"খুকী উঠেছিল, তোমাকে খুঁজছিল।"

"সত্যি?" আনন্দ-হাস্যে মনীশের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সবই আজ নূতন। খুকু ত দেখিলে চিরকাল পলাইয়া বাঁচে,—আহা, সেও যে বড় বকে। খুকীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া মনীশ নত হইয়া কন্যাকে আদর করিল। খুকু জাগিয়া বিস্ময়ে আনন্দে কলকণ্ঠে পিতার সহিত গল্পে মাতিয়া উঠিল।

"বাবু, আমা কাছে ছোও, খুকু কাছে ছোও।"

মনীশ সস্মিত মুখে বিমলার মুখে চাহিল—"অনুমতি পাব কি?"

বিমলা আয়নার সামনে প্রসাধনের উৎকর্ষ সাধন করিতেছিল। খুকীর পাশে আসিয়া শুইয়া পড়িল, রক্তিম অধর কুঞ্চিত করিয়া কহিল—আ-হা-হা।

রুদ্ধ হাসিতে তাহার বুক ভরিয়া গিয়াছিল,—খুকীর জন্যই যেন উনি শুতে চাচ্ছেন। লীলায়িত বাহুখানি তুলিয়া সে স্বামীকে আহ্বান করিল। মনীশ আসিয়া সেই হাতখানি হাতে জড়াইয়া লইল। একবার ওষ্ঠে ঠেকাইল।

"বিমলা, সেদিন ও-রকম খারাপ কথা বল্লে কেন ?"

"খারাপ আবার কিসে ? ও-সব লেখাপড়া জানা বাইজীদের আবার খারাপ আছে না কি ?"

"ছিঃ—" মনীশ বিমলার অধরে মৃদু টোকা দিল, "মেয়ে মানুষ হয়ে মেয়ে মানুষকে কি ঐ কথা বলে।"

"কেন বোলব না। তোমাকে ভোলানর চেষ্টা—সে কি আমি বুঝি না।"

"তোমার স্বামীকে যে-সে ভুলিয়ে নেয় এ ত বড় গৌরবের কথা নয়, ভোলাতে দাও কেন ? টেনে রাখনা কেন ?"

"এইবার দেখি কে নেয়। মা-ও ত তাই বলে—" অর্দ্ধ-পথে বিমলা থামিয়া গেল। মনীশ বিরক্ত সুরে কহিল, "এর মধ্যে আবার মা এল কোথেকে। দোহাই বিমলা, ওঁকে একটু ছাড়তে পারোনা।"

"জান "পরপারেতে" কি আছে ?"

"থাকুক্। আমি চাই শুধু তোমাকে।"

"কৈ চাও কৈ ? কতক্ষণ ত এসেছি।" কম্পিত বক্ষে উজ্জ্বল নেত্রে বিমলা স্বামীর নিকট সরিয়া আসিল।

স্ত্রীকে আলিঙ্গন করিয়া মনীশ কহিল "বিমল আমাকে ভালবাস ?"

"এই ত ভালবাস্‌ছি।" মনীশ বিমলার হাতে মাথা রাখিয়া তৃপ্ত মনে শুইয়া রহিল। বহুদিন পরে শান্তিময়ী নিদ্রা তাহার চক্ষে নামিয়া আসিতেছিল।

বিমলা অধীর হইয়া উঠিল। মায়াজাল কি সবই ব্যর্থ হইল ? স্বামীর চক্ষে দীপ্তি, বক্ষে লালসা কোথায় ? মার মারণ-মন্ত্র কি ফলিবে না ?

মনীশ চকিত হইয়া উঠিয়া বসিল। "কি বলছ বিমল, কি করছ ?" ক্ষোভে বিমলা কাঁদিয়া ফেলিল—"কৈ, আমাকে ভালবাসলেনা ?"

মনীশ হতাশ নয়নে পত্নীর দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর কম্পিত চরণে সরিয়া গিয়া বাতায়নে মাথা রাখিল। সমস্ত শরীর তাহার কাঁপিতেছিল।

"বিমলা ছাড়—ছাড় আমার হাত, ছুঁয়োনা আমাকে।" সবলে হাত ছাড়াইয়া লইয়া মনীশ আরো দূরে সরিয়া গেল। "এই তুমি—এই তোমার ভালবাসা! আমি যদি এই হোতাম ত তোমার উপন্যাসে আমাকে কি ব'লত বল ত ? অত্যাচারী পুরুষ, প্রেমের সম্বন্ধ জানেনা,—জানে শুধু স্ত্রীর শরীরকে, উপাসনা করে শুধু কামের। ছাড় আমাকে, আমার সুখের স্বপ্ন ভেঙে গেছে," ছুটিয়া মনীশ পলাইল।

নিস্ফল ক্ষোভে নৈরাশ্যে বিমলা দলিতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিতে লাগিল।

তেরো

জীবন-বীণার তারটী বড় বেসুরা বাজিতেছিল। অপরাধী বারে বারে ক্ষমা চাহিয়াছে, করুণাময়ী অশ্রুজলে মুখ ভাসাইয়া বারে বারে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিয়াছে ; কিন্তু তবুও মিলন-আলিঙ্গনের মাঝে ছোট্ট কাঁটা বিঁধিতেছিল। তারা যেমনি অলক্ষ্য, তেমনি তীব্র। প্রবল ঝড়ে তরুর বাহুবন্ধন হইতে আশ্রিতা লতা ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে. মৃদু বায়ু-ভরে লতা আন্দোলিত হইতেছে, শাখা নামিয়া নামিয়া দুলিতেছে, কিন্তু আর জড়াইতে পারিতেছেনা।

দুঃস্বপ্নময় কয়েক রজনী এমনি করিয়া কাটিল। যে রাত আগে সুপর্ণার আকাঙ্ক্ষা, সত্যর অপেক্ষা ছিল, তাহা দুজনারই পক্ষে লজ্জাকর হইয়া উঠিয়াছে। প্রতি সন্ধ্যায় সত্য ভাবে যে কি যেন হইয়াছে, আজ সেটা মুছিয়া যাইবে। সুপর্ণা আশায় থাকে, নিজেকে ধিক্কার দেয়। কিন্তু দুজনেই দূরে দূরেই রহিয়া গেল। এমনি সময় প্রলোভন আসিল মুক্তির রূপ ধরিয়া। অপর্ণার ছেলের ভাতে শৈলজার কাছ হইতে প্রথমে সুপর্ণার সাদর নিমন্ত্রণ আসিল—সঙ্গে সঙ্গে যতীশ।

সত্য অত্যন্ত আরাম বোধ করিল। সুপর্ণাকে পাঠাইতে কল্যাণী রাজী হইবেন কি না ভয় হইল, কিন্তু সাশ্চর্য্যে দেখিল কল্যাণীর অমত ত নয়ই, বরং আগ্রহ তাহার অপেক্ষা অধিকই। মনে একটু অনুতাপ হইল—মা ত তত খারাপ নন্। আপত্তি উঠিল খালি সুপর্ণার পক্ষ হইতে। সত্যেন না গেলে সে কিছুতেই যাইবে না। শাশুড়ীর সাদর অনুরোধ, বিমলার তীব্র বিদ্রূপ কিছুতেই তাকে টলাইতে পারিল না। অবশেষে যতীশ আসিয়া আপনার দৈন্য জানাইল ; কহিল, "সুপর্ণা, একটীবার চল অভাগ্যের এই অনুরোধ রাখ।" সুপর্ণা বুঝিল শৈলজার আদর ও যতীশের অনুরোধের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশা লুকাইয়া আছে। তাহাকে সম্মত হইতেই হইল।

যাত্রার পূর্ব্বদিন রাত্রে সত্য অনেকখানি দেরী করিয়াই শুইতে আসিল, কহিল—"কল ছিল।" সুপর্ণা জাগিয়া বসিয়া

ছিল, নানা কথার পর ইতস্ততঃ করিয়া বলিয়া ফেলিল, "ওগো নাই গেলাম, মার যেন কেমন কেমন দেখ্‌ছি।"

অত্যন্ত কড়াস্বরে সত্য বাঁকা জবাব দিল, "মার ত কিছুই তোমার ভাল লাগেনা সুপর্ণা; কিন্তু ভুলে যেওনা —তিনি আমার মা। আমার কাণে তাঁর নিন্দা একটু খারাপ শোনাবেই—যতই পাষণ্ড হইনা কেন।"

সুপর্ণা স্তম্ভিত হইয়া গেল। মনে মনে ভাবিল, যদি ভুলতে পারতুম—আহা! একবার মনে হইল যাইবেনা। কিন্তু ঔৎসুক্য, অনাগত নূতনের আনন্দ হৃদয় জয় করিয়া ফেলিল। যাবার আগে সত্য ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কবে আসবে?"

সুপর্ণা ললাটে সিঁদুর দিতেছিল, সত্যর কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিল। টিপ্‌টা বাঁকিয়া গেল, কহিল "যে দিন আন্‌বে।"

বাহিরে কল্যাণী তখন যতীশকে বুঝাইতেছিলেন "দেখ বাবা, ও চলে আস্‌তে চাইবেই। কিন্তু তোমরা একটু ধরে রেখ। শরীরটা বড় খারাপ হয়েছে, একটু যাতে ভাল হয়।" অশ্রুসিক্ত আনন তুলিয়া ধরিয়া সুপর্ণা মিনতি করিয়া কহিল, "ওগো, আমার বড় ভয় করছে।" সত্য চুম্বন করিল, কহিল, "পাগ্‌লী।"

কল্যাণীর যত্ন স্নেহ উথলিয়া উঠিল।

সকালে জল খাওয়া সত্যর কোন কালে অভ্যাস ছিল না; চা খাইয়া দাড়ী কামাইতেছিল, এমন সময় গরম লুচীর থালা লইয়া জননী আসিলেন। সত্যর ওজর আপত্তি কিছুই টেকিল না। সত্যেন পোষাক পরিতে লাগিল, তিনি লুচীর টুকরা মুখে তুলিয়া দিতে লাগিলেন। খান দুই খাইয়া সত্য কহিল "আর না মা, অম্বল হবে।"

করুণ কণ্ঠে কল্যাণী বিনাইয়া কহিলেন "তা তো করবেই। না খেয়ে খেয়ে নাড়ী যে মরে গেছে। রোগে খুলে খাচ্ছে, তা না হলে কি আর সকালে দুখানা লুচী করে দেব, তাও পারি না। বড় লোকের মেয়ে আমার গরীবের বাড়ী কত কষ্ট ক'চ্ছে—আর বলতে লজ্জা করে। বলি না যে তাও ত নয়। যাক্‌গে সে সব কথা।" উচ্ছিষ্ট থালাখানা হাতে করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। বাহির হইতে স্পষ্ট গলা শোনা যাইতেছিল, "নাও যে জান বাপু তাও ত নয়। এই ত সেদিন দিব্যি মনীশ এল, —হাসি গল্প রান্না খাওয়ানো কিছুই ত আমায় বলতে হোলোনা।"

সাইকেলটা এক হাতে ধরিয়া অপর হাতে পেণ্টুলনে ক্লিপ আঁটিতে আঁটিতে সত্য আসিল। কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ রে, বৌমার দিদির ঠিকানাটা কি রে? ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট—না?"

"হ্যাঁ, কেন।"

"তুই ইষ্টিশানে গেলে মনীশ এসেছিল দেখা করতে,—কত দুঃখু করতে লাগ্‌ল,—ঠিকানা চেয়ে গেছে।"

এক দিন, দুই দিন, তিন দিন কাটিয়া গেল, সুপর্ণার পৌছান খবর আসিলনা। কলিকাতা মাত্র ঘণ্টা তিনেকের রাস্তা,—সত্য অধীর হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে অভিমানে ফুলিতে লাগিল। কল্যাণী লক্ষ্য করিতেছিলেন সবই। চিঠি যে কেন সত্য পায় নাই, সে কারণটা একা তিনিই জানিতেন। প্রত্যহই মুখ ম্লান করিয়া একবার বধূর খোঁজ লইতেন।

তৃতীয় দিন রাত্রে সত্যর ধৈর্য্য সহনসীমা অতিক্রম করিয়াছিল। কালকের ডাকে পত্র না আসিলে কলিকাতা যাইবে, এইরূপ একটা সঙ্কল্প ঘোরাফেরা করিতেছিল মনের মধ্যে কল্যাণী তাহা বুঝিয়াছিলেন।

পুত্রের আহার স্থানে আসিয়া পাখা হাতে বসিলেন, "হ্যাঁ রে, বৌমা চিঠিটিঠি দেয়নি? কে জানে বাপু কেমন? যাবার সময় হাতে ধরে বল্লাম, বৌমা, শরীর ভাল নয়, গিয়েই চিঠি দিও। বেশী দিন থেকোনা। বিরক্ত হয়ে বল্ল, মাসখানেক জুড়িয়ে আসব। আপনার নিকটও এমন কিছু নয়, ঐ যতীশও ছেলে যেন কেমন কেমন। অবিশ্যি ভয়ের কিছু নেই, মনীশ কলকাতা গিছল, বল্ল ত এসে সব ভাল। তুই না হয় কাল একটা তার করে দে।"

সত্য উত্তর দিলনা। জননীর উপর ঘৃণায় তাহার চিত্ত বিরূপ হইল, কিন্তু অবিশ্বাস হইলনা।

এমনি করিয়া দিন কাটিতে লাগিল। একদিন কল্যাণী আসিয়া একখানা ফটো দিলেন, একটা গাছের ডাল হাতে বসিয়া সুপর্ণা, পিছনে দাঁড়াইয়া হ্যামলেট বেশে মাধবী। সত্য দুঃখিত হইয়া ভাবিল, সুপর্ণা ফটো পাইয়াছে ত তাহাকে লুকাইল কেন? মনে কীট ঢুকিল।

চৌদ্দ

সুপর্ণা আনন্দেই ছিল। শৈলজার যত্ন, অপর্ণার অকৃত্রিম ভালবাসা, যতীশের হাস্য পরিহাস তাহাকে অনেকটা ভুলাইয়া রাখিয়াছিল। সত্যর চিঠি আসিয়া

অবধি একখানা মাত্র পাইয়াছে ; কিন্তু সে ত প্রত্যহই দেয়। শাশুড়ীর পত্রেও জানিয়াছে সত্য ভাল আছে,—প্রায়ই মফঃস্বলে কল থাকে বলিয়া সত্য আজকাল বড় ব্যস্ত।

অপর্ণার খোকাও অনেকটা এর জন্য দায়ী।

সেদিন দ্বিপ্রহরে অপর্ণা ভাঁড়ারে ব্যস্ত ছিল। এই অবসরে শৈলজা ইঙ্গিতে সুপর্ণাকে ডাকিয়া লইলেন। নিজের ঘরে আসিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিলেন।

সুপর্ণা নতমুখে সমস্ত শুনিল। তাহার পর সজল চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু আমার বলাতে কি ফল হবে মাউইমা?"

"একবার বলে দেখ মা। তুমি শুধু এইটুকু তাকে বুঝিয়ে দাও মা, যে, যতী অন্যায় একবার করেছে, দ্বিতীয়বার যে সে আরো গুরুতর পাপ করবে, তখন কি বৌমার কর্ত্তব্যর হানি তাঁকে গ্লানি দেবেনা? তোমরা মা অনেক পড়াশোনা করেছ, অনেক বোঝ। কিন্তু আমি ভাবি, প্রথম অপরাধীর জন্য আলাদা আদালত আছে ইংরাজের, আর মানুষের প্রথম অপরাধ বৌমার এমনি অমার্জ্জনীয় বোধ হল কেন। তাছাড়া, খোকার জন্য ত তাঁদের নিজেদের সংযত হয়ে চলা উচিত। চকমকি ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে যে আগুন বেরোবে তাতে তার মুখই আগে কালো হবে।" শৈলজা উঠিয়া গেলেন, সুপর্ণাও দিদির সন্ধানে গেল।

বসার ঘরে একটা কৌচে বসিয়া অপর্ণা ভেলভেটের উপর একটা জরীর তাজমহল রচনা করিতেছিল, সুপর্ণাকে দেখিয়া কহিল "কোথা গিছলি, এই মিনারটা একটু শেষ করে দে না ভাই, আমি খোকনকে একটু দুধ খাইয়ে আসি।"

অপর্ণা খোকার সন্ধানে গেল। সুপর্ণা দুই চারি বার শেলাইর ব্যর্থ ও ভুল চেষ্টা করিয়া রাখিয়া দিল। লজ্জায় তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, দিদি কি ভাবিবে। আজ পাঁচ বছর সে এই সকল জিনিস চক্ষেও দেখে নাই। তাহার শিক্ষা, তাহার কলাকুশলতা খনির অন্ধকারেই রহিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা অপ্রিয় কথা তাহার মনে হইল—এই জিনিস কটীর দামে তাহাদের কয়দিন সংসার খরচ চলিত কে জানে। কথাটা মনে হইবামাত্র আত্মধিক্কারে তাহার মন সঙ্কুচিত হইল। সত্যেনের অপরিসীম ভালবাসার এই কি তাহার প্রতিদান! বিশ্বাসঘাতিনি, তোর সামান্য সুখের জন্য সে যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত! চিন্তার কশাঘাতে সুপর্ণা আপনাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল। তাহার ক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকাইয়া অপর্ণা আসিয়া বাহুতে একটা মৃদু আঘাত করিল—বিরহিনী!

কোল হইতে খোকাকে লইয়া সুপর্ণা নাচাইতে লাগিল—তোমার কটিতটের ধটী কে দিল রাঙিয়া—শিশু হাসিয়া মাসীর নাক মুখ খাইতে লাগিল, পুলক-স্পর্শে সুপর্ণা শিহরিয়া উঠিতে লাগিল।

"কেন অত ভাবছিস রে খুকী, তোর শাশুড়ী ত বার বার লিখ্‌ছে—থাক, থাক, আমার অসুবিধা হচ্ছে না। আর হলেই বা কি, কেনা ঝি ত নস্।"

সুপর্ণা উত্তর দিলনা। অপর্ণা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যর জন্য মন কেমন করছে?"

এ কি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে? সুপর্ণা অর্পণার পাশে আসিয়া বসিল, "তোমার মুখে এসব কথা কি দিদি?"

"কেন, আমার মুখে এসব সাজেনা না কি—অর্থাৎ পাপকে প্রশ্রয় দিইনা বলে আমি অমানুষ?"

"অথবা অনুভব না করেও বলতে পার—তুমি কবি।"

"কিন্তু দিদি, ঝি চাকরের সামনেও তুমি জামাইবাবুকে ছোট করছ যে এটা কি উচিত?"

"নিজের চাকর বামুনের কাছে, সমস্ত সহর-শুদ্ধ লোকের কাছে যে নিজেকে ছোট করেছে, তার আবার উচিত অনুচিত কি।"

সুপর্ণা নিরুত্তর হইয়া গেল।

অপর্ণার শুভ্র মুখ লাল হইয়া গিয়াছিল। "মা তাঁর ছেলের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন; কিন্তু আমার দিক্‌টা একেবারে ভাবছেন না। পাটনায় গিয়ে ঐ বাড়ীতে ঐ সব লোকের সামনে থাকা আর বেড়া আগুনে বাস করা সমান কথাই। তা ছাড়া পাপ করলে তা গোপন থাক্‌বে না, শাস্তি লোকে পাবেই।"

"শাস্তিটা কি বেশী গুরুতর হয়ে পড়ল না?"

"লেখা পড়া শিখে তুই একটা হস্তীমূর্খ তৈরী হয়েছিস সুপর্ণা। ভেবে দেখ, পতি-দেবতার যুগ আর আছে কি? আমি ঐ একই অপরাধ করতাম যদি, তবে সমাজ ও স্বামী আমার শাস্তির কি ব্যবস্থা করত! আমি ত তার চেয়ে বেশী করিনি।"

সুপর্ণা শান্ত স্বরেই উত্তর দিল, "না—মনে হয় না দিদি। আমি যদি ঐ অপরাধ করি, তবে বোধ হয় তিনি ক্ষমা করেন।"

অপর্ণা বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিল, "করে দেখিস এক-বার। বল্‌ছিস্ শুন্‌লেই ভালবাসা কর্পূরের মত উবে যাবে। তারা ভাল হয় ত বাসে, কেন বাসে জানিস—একান্ত নিজস্ব বলে। যদি এক মিনিটের জন্যও অন্য দিকে তাকাস, তবেই—"

"এ বিষয়ে তোমার হ্যাভেলক ইলিস কি বলেন দিদি?"

"যাই বলুক, সব তাতে হাসিস্‌নে খুকী,—যাই বলুক, তারা উভয় পক্ষের হয়েই বলে।

আমাদের লক্ষ্য কেবলমাত্র সেই লক্ষহীরার কাহিনীটা।"

"দোহাই দিদি, ঐ গল্পটাকে তুমি রেহাই দাও। ডামির মত পড়ে পড়ে গুলি খেয়ে ওর প্রাণ বেরিয়ে গেছে, ওর এখন গোর দেবার সময় হয়েছে। তোমার মত আধুনিকের কাছে গল্প করতে ভরসা হয় না, কিন্তু একটা সত্যহীরার গল্প জানি—করব?"

"ঢাকা-সাহিত্য নয় ত?"

"না ভাই, পাঁকের গন্ধ তোমার উঁচু নাকেই যে কেবল লাগে তা নয়, ভগবান ঘ্রাণেন্দ্রিয় বলে আমাদেরও একটা জিনিষ দিয়াছেন, মিউনিসিপ্যালিটীর কাজটা গোপনেই চলুক এ আমরাও বলি। শোন।

বিদিশা নগরে কোন এক রাজার আমলে বাস করত এক পরমা সুন্দরী নারী। রূপের তার সীমা ছিল না, গুণেরও না, তার পর ঐ যা যা গল্পে লেখে সবই। এখন স্বামী তার বিরূপ, চরিত্রহীন। চারিদিকে নানা প্রলোভন, অবশেষে স্বামীই একদিন একটা কুৎসিত প্রস্তাব আন্‌লে, যা শুন্‌লে আকাশে চন্দ্র সূর্য্য মুখ লুকাল, কিন্তু আমরা দিব্যি জলের মত পড়ে গেলুম। নারীর রাগে চোখ জলে উঠ্‌ল—ক্রমশঃ সন্ধ্যা নেমে এল, ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন প্রশ্নটার উত্তর দাও।"

"ঝাঁটা মার—"

"That's it, দিদি, That's it."

যাই বলিস দিদি ভাই, শিক্ষা সভ্যতা এগুলো আমাদের বাঙালী মেয়েদের হিলওলা জুতোর মত মোটে মানায় না। যেই না আঁতে ঘা পড়েছে, অমনি কোথায় বা তোর মার্জ্জিত রুচি, কোথায় বা তোর সুসভ্য বাণী,—বেশ দিব্য গ্রাম্য ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করে ফেললি।"

দুই ভগিনীতে হাসিয়া উঠিল। "কোন কথা সুপর্ণা তোর কাছে সীরিয়াস হতে পেলনা।"

"নয়? শোন আর একটা গল্প। একটা বই পড়ছিলাম দিদি। স্বামী স্ত্রীর দুজনের মধ্যে প্রগাঢ় ভালবাসা, মানে সত্যি সত্যি ভালবাসা। দুজনে গেছে একটা জাহাজে করে বেড়াতে। ষ্টীমারটা হোল তার স্বামীর এক বন্ধুর। পথি মধ্যে কিসে থেকে কি হোল – বন্ধুটী তার জন্য লোলুপ হয়ে উঠ্‌ল। স্বামীর স্ত্রীর উপর গভীর বিশ্বাস—স্ত্রী স্বামীর জন্য প্রাণ দিতে পারে। পূর্ব্বজীবনে স্বামীর একটা গভীর পাপ ছিল, সেই পাপের সংবাদ বন্ধুটী জান্‌ত—পুলিশে খবর দিলে ফাঁসী নিশ্চিত। এমন সময় স্বামী পড়ল অসুখে, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। সেই অবসর বুঝে বন্ধু খারাপ কথা বল্লে। হয় সতীত্ব নয় স্বামী—বল ত সে কি করবে? তার সতীত্ব রক্ষার জন্য স্বামী প্রাণ দিতে প্রস্তুত—নিজের প্রাণ হলে মেয়েটীও দ্বিধা করত না; কিন্তু এবার সমস্যা কঠিন। প্রশ্ন জাগল শুক্তি বড়—না মুক্তা।"

শেলায়ে একটা ভুল হইয়া গিয়াছিল। অর্পণা নিবিষ্ট মনে খুলিতে লাগিল, উত্তর দিলনা।

"মেয়েটী সে যাত্রা স্বামীকে রক্ষা করল, কিন্তু ডাঙ্গায় পৌঁছবা মাত্র আত্মহত্যা করল। তার স্বামীর কি কান্না। উপন্যাসকার মোড় ঘুরে গেছেন, লাল আলোর সিগনাল-টাকে ভেঙে ফেলেননি। কিন্তু দিদি, জীবনটা কি এমনি?"

"ভয় করে বোন্ ভয় করে। কিন্তু খুকী, সতীধর্ম্মটাও ত তুচ্ছ নয়।"

"নিশ্চয়ই না দিদি, স্বামী যে স্ত্রীলোকের সর্ব্বস্ব তা ত বুকের মধ্যেই জাগছে। কিন্তু সত্যধর্ম্ম আর পতিধর্ম্ম দুটো কি এক? একনিষ্ঠা জিনিসটা বেশী মূল্যবান না বিবাহ-রচিত গণ্ডীটা? একবারের পাপই কি মাপকাঠি?"

অপর্ণা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল—"বার্ণাড শ? কিন্তু ভাই, ছুটোর কোনো ছুতোই শুঁর নেই।"

"দিদি ভাই, জামাইবাবুকে ক্ষমা কর্ খবরের কাগজে তর্ক তুলিস, উপন্যাসে চোখের জল ফেলিস, খালি জীবনে যখন নিজের প্রশ্ন জাগে তখনি তোরা চুপ করে থাকিস,তখনি হেরে যাস। উপন্যাসটা জীবন ছাড়া তৈরী হয় না ভাই।"

"বাঙালী জীবনের ট্রাজেডী হোল সুপর্ণা—সব উপকরণ-গুলিই উপন্যাসের—খালি সেই ঘটনাগুলিকে যথোচিত উপসংহার না দেওয়ার ভীরুতা। ক্ষমা তাঁকে করতেই হবে আজ না হয় কাল।"

"তার কারণ"—

"ভীরুতা"

"নয় কক্ষণো না—তার কারণ ভালবাসা।" সুপর্ণার মুখে সত্যর মুখ জাগিয়া উঠিল।

পনেরো

উর্ণনাভ যেমন জাল বিস্তার করিয়া মক্ষিকাকে গ্রাস করে, কল্যাণীর চক্র তেমনি সত্যকে চতুর্দ্দিক হইতে বেষ্টন করিয়া ধরিতেছিল।

দুই ঘণ্টা ধরিয়া হলাহল উদ্গীরণ করিয়া কল্যাণী তাঁহার গরল নিঃশ্বাস ফেলিলেন। তোমার ইচ্ছা হয় সত্য, তুমি যাচাই করে নিও। বিমলার সঙ্গে সবারি সাম্নে কি কেলেঙ্কারীর ঝগড়াটা না করলে! ঝির মুখে ত হাত চাপা দেওয়া যাবেনা বাবা, পাড়ার লোকে যা নয় তাই বল্ছে। এই দেখ চিঠি। সত্য, আমি তোমায় বলে দিচ্ছি, আমার ধর্ম্মের সংসারে এ পাপ গোপন থাক্তে পারেনা, এর বিহিত তোমাকে করতেই হবে। ওরা হল কলকাতার ডাকিনী থিয়েটারওয়ালী।"

সত্য টলিতে টলিতে দরজাটা ধরিয়া ফেলিল—"মা, তোমার কাছে সুপর্ণা কি করেছে যে তুমি আমাদের এমন সর্ব্বনাশ করছ মা,—তোমার বুকে কি মমতা বলে কিছু জিনিস নেই? তুমি মিথ্যাবাদিনী, তার আমি অনেক প্রমাণ পেয়েছি, তবু এবার তোমায় অবিশ্বাস করতে পারছিনা, সন্দেহ এমনি বিষ। কিন্তু মা, জেনে রেখো, জগৎ-সংসার ছাড়তে রাজী আছি, তবু সুপর্ণাকে নয়। যদি সে কোনো ভুল করে থাকে, সে ভুল শুধরে দেবার ভার আমি নেব।"

চিঠিখানা পাইয়া সত্য বাহির হইয়া গেল। কল্যাণী কপালে করাঘাত করিলেন।

ইংরাজীপত্র :— চুঁচুড়া

সুইটহার্ট,

আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে জানিনা। কালকের দেখা যে কি আনন্দ দিয়েছে বলতে পারিনা। সুযোগ পেলেই দেখা করব। ঠিকানা জানালে উত্তর দিও। সে জিনিসটা পাঠালাম, তুমি গ্রহণ করলে সুখী হব।

চুম্বন ও ভালবাসা নাও।

তোমারি M.

সত্যর মাথা ঘুরিতে লাগিল। সুপর্ণা, সুপর্ণা, সুপর্ণা। এস এস প্রিয়া, এই সন্দেহের পাপ হইতে সত্যকে রক্ষা কর; তোমার সতীত্ব-জ্যোতিতে এই বিভীষিকাময় অন্ধকার দূর কর, ফিরে এস। সত্য আর সহিতে পারেনা।

না—না—সুপর্ণা, এসো না, এসো না,—দূর হইতে সত্য তোমায় বিশ্বাস করিয়া বাঁচুক। এই অভিযোগ যদি কণামাত্র সত্য হয় তবে সে বাঁচিবে কি করিয়া। সত্যের প্রশ্নের উত্তরে যদি তাহার মুখে স্বীকারের আভাস ভাসিয়া উঠে, সে তাহা সহ্য করিবে কি করিয়া। ভালবাসিতে সে জানে, ক্ষমা করিতে সে জানে—সুপর্ণা, তুমি নিজে কেন এ কথা আমাকে বলিলেনা? সত্যর পরাজয়-বাণী শুনিতে হইল আর একজনের মুখে?

পথ দিয়া দুইজন পথিক হাসিয়া চলিয়া গেল, খিড়কীর পুকুরে দুইটী পল্লীবধূ কলস নামাইয়া হাসিতেছে—সত্যের লজ্জার কথা কি তাহারাও জানিয়াছে? ভূপেন ডাক্তার সিভিলসার্জ্জন আজ তাহাকে সকালে কনগ্র্যাচুলেট করিয়াছে —"মশাই, স্ত্রীর দৌলতে খুব কপাল ফিরিয়ে নিলেন, কালেকটরের ওয়াইফ খুব রেকমেণ্ড করছেন।" ভূপেন ডাক্তারের হাসিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গিয়াছিল; হয় ত সে হাসির তলে এই ব্যঙ্গই প্রচ্ছন্ন ছিল।

সুপর্ণা শুধু আমার এই দুঃখই রইল—আমাকে তুমি বুঝিলেনা। আমাকে তুমি বিশ্বাস করিলেনা। আমি ত এ সাধ মিটাইতে পারিবনা জানিই, আমি ত হাসিমুখে তোমাকে মুক্তি দিতে চাহিয়াছিলাম। কেন আমাকে লুকালে প্রিয়া। আমি তোমার স্বামী, আমি তোমাকে রক্ষা করবই,—আমার কর্ত্তব্য, আমার প্রেম ত বিন্দুমাত্র কমে নাই। লোকলজ্জার হাত হইতে তোমাকে আমার বাঁচাইতে হইবেই। আমার কিসের পৌরুষ, কিসের প্রেম, প্রিয়াকে যদি রক্ষা করিতে নাই পারি? সুপর্ণা, এজন্যই সেদিন কাঁদিয়াছিলে, আমায় ক্ষমা করিয়াছিলে, নাহলে সে অপমান ত সতীর অসহনীয়!

ষোলো

শেষ রাত্রে একটা দুঃস্বপ্নে কাঁদিয়া উঠিয়াই সুপর্ণা ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল। পাশের খাটে অপর্ণা পুত্র ক্রোড়ে শুইয়া আছে। স্তিমিত আলোকে সুপর্ণা তন্ময় হইয়া দেখিতে লাগিল—একখানি সুকোমল হাত রেশমের গাত্রাবরণ হইতে বাহির করিয়া শিশু মাকে স্পর্শ করিয়াছে, আর একখানি হাত মাথা বেড়িয়া আছে। সুপর্ণার দুই চক্ষু সজল হইয়া আসিল। এই রাজ-ঐশ্বর্য্য, এই শান্তি, এই স্বামীপুত্র—অপর্ণার হৃদয়ে যেন একটুও রেখাপাত করে নাই। আপনার গৌরবে, ঐশ্বর্য্যে, সৌন্দর্য্যে গরীয়সী কমলাসনা। প্রশান্ত দুই চক্ষু, শুভ্র ললাট, ক্ষীণ ওষ্ঠাধর, স্পর্শ করে এমন কাহার শক্তি আছে। আর সে নিজে—অল্প কারণেই হাসিয়া আকুল, সামান্য সংসারের সামান্য উৎপীড়নেই আকুল, চঞ্চল নদীজলস্রোত। ফুল ফোটানোর পালা শেষ হইয়া আসিল, ফল ফলানোর আশা তাহার নাই, আপনাকে উজাড় করিয়া নিঃশেষ করিয়া প্রিয়তমের চরণে দিয়াছে,—ভাণ্ডার তার শূন্যপ্রায়। নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুপর্ণা উঠিয়া মৃদু চরণে বাহির হইয়া গেল। প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীরণ ধীরে ললাটে লাগিল,—ঘর্ম্মরেখা মুছিয়া সে বাগানে নামিয়া গেল।

শৈলজা ফুল তুলিতেছিলেন। অকারণে তাঁহাকে একটা প্রণাম করিয়া সুপর্ণা সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া কহিল—"দেখুন, আজ আমি যেতে চাই।"

শৈলজা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাহার দিকে চাহিলেন। সুনিদ্রার অভাবে তাহার চোখের নীচে কালির রেখা দেখা দিয়াছিল। "বেশ ত মা, তোমার যদি মন ভাল না লাগে, যতী দিয়ে আসবে।" মনে একটু ব্যথাও পাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে মনে এ কথাও আসিল—আহা, যতার প্রতি এত আগ্রহ যদি অপর্ণার থাকিত।

দুজনেই কথা না বলিয়া একটু ঘুরিলেন, সুপর্ণা ফিরিতে উদ্যত হইল।

দ্বিধা-সহকারে প্রৌঢ়া ডাকিলেন—"মা।'

"বলুন"—সুপর্ণা ফিরিয়া আসিল।

"মা-লক্ষ্মীর পয়ে সব শুনেছি সোনা হয়,—আমার কি এতই অপরাধ আমার কাঠে কি ফুল ফোটানো দেবীরও অসাধ্য?"

সুপর্ণার আকণ্ঠ রক্তিম হইয়া উঠিল, "কি যে আপনি বলেন মাউই-মা,—তবে জানবেন আমি চেষ্টার ক্রটী করব না, করছি না।" খোকা দাসী ক্রোড়ে আসিয়া দেখা দিল, মাসী ছুটিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া নাচাইতে লাগিল।

মধুর প্রকৃতি, মধুর জীবন, মধুমাখা কথা—আঃ, জীবন যদি এমনি করিয়া কাটিত। ভাবিতে ভাবিতে সুপর্ণা চলিল।

স্নানের ঘরের দ্বারে অপর্ণা দাঁড়াইয়া ছিল, সুপর্ণা লক্ষ্য করে নাই। অগ্রজা হাসিয়া কহিল, "বিরহে কি চোখ খারাপ হোল না কি?"

সুপর্ণা চমকিয়া কহিল "দিদি একটা জিনিস চাইব—দেবে?"

"তুই যদি আমাকে একটা জিনিস দিস্ ত দেব।"

"রাজী—আজকে যতীবাবুকে কিন্তু রাত্রে আমি ঘরে পৌঁছে দেব।"

"তুই তাহলে আর দিন সাতেক থাকবি?" ভগিনীর দুরবস্থার কল্পনা অপর্ণার মুখ প্রফুল্ল করিয়া তুলিল।

অত্যন্ত দ্বিধা, অতি অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুপর্ণাকে রাজী হইতে হইল। হৃদয় কিন্তু নিবিড় বেদনায় ভারী হইয়া রহিল।

কথাটা বলিয়া অবধি সুপর্ণার ভাল লাগিতেছিল না, এটা ওটা করিয়া মনটা যখন কিছুতেই হাল্কা হইল না, তখন কাগজ কলম লইয়া সে লিখিতে বসিল। পুনঃপুনঃ মিনতি জানাইয়া লিখিল, দিদিরা কিছুতেই ছাড়ে না—দিন সাতেক পরে সত্য যেন অবশ্য আসিয়া লইয়া যায়। সে নিজেই যাইবার খুব চেষ্টায় আছে অবশ্য। খোকন ভারী মিষ্টি হইয়াছে, 'মাছি' বলিতে পারে। দুই দিন গড়াইয়া সুপর্ণার বুকের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার হাতে ছাড়া আর কাহারো কাছে দুধ খায় না। দিদি এখনো সেই রকমই, জামাইবাবুর মন বড় খারাপ। খোকন আছে বলিয়া একটু টেঁকা যায়। হৃদয়ের যে ব্যাকুলতা জানাইতে পত্র লিখিতে বসিয়াছিল, সেই বেদনাটাই শিশুর কাকলী কাহিনীতে ঢাকা পড়িয়া গেল,—অভাগিনীর পত্র শেষ হইল। চিঠিখানা বার বাড়ীর লেটার বাক্সে নিজে হাতে দিয়া সুপর্ণা ভিতরে গেল। মালী একরাশ ফুল লইয়া আসিতেছিল। সুপর্ণা বুঝিল, সুখবর শৈলজার নিকট পৌঁছিয়াছে।

*   *   *   *

স্তব্ধ নিশীথ রাত্রি। জানালার সার্সীর উপর মুখ রাখিয়া এক হাতে কাপড়ের অঞ্চল চাপিয়া ধরিয়া সুপর্ণা অপর্ণার ঘরের ভিতর তাকাইয়া ছিল। কক্ষ-মধ্য হইতে কথাবার্ত্তা অস্পষ্ট ভাসিয়া আসিতেছে।

কোচের উপর বসিয়া অপর্ণা। উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে তাহার শুভ্র মুখ আরো শুভ্র দেখাইতেছিল। কার্পেটের উপর বসিয়া যতীশ তাহার কোলে মুখ লুকাইয়া আছে। অপর্ণা একটী আঙুল তাহার চুলের মধ্য দিয়া চালাইতেছিল।

"যাও শোওগে—"

যতীশের কথা শোনা যায়না। আরো নিবিড় করিয়া মুখ ঢাকিল।

"না—তুমি ঐ খাটে শোও। রাগ করিনি—ওঠ। পারবে না?"

যতীশ সোজা হইয়া দাঁড়াইল—"পারব; কিন্তু বল তুমি ক্ষমা করেছ।"

"করেছি বলছি ত।"

"তবে "

অপর্ণা একটু দ্বিধা করিয়া যতীশের ললাটে আপনার ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিল। শিশুর মত সহজ আনন্দে যতীশের মুখ আলোকিত হইয়া উঠিল। কোনো দিকে না চাহিয়া সে পাশের খাটে শুইয়া পড়িল। পশ্চাতে একটা শব্দে চকিত হইয়া সুপর্ণা পলাইতে গিয়া শৈলজার অঙ্গে গিয়া পড়িল। চুরি ধরা পড়িয়া গেল দেখিয়া লজ্জিতা শৈলজা সুপর্ণাকে বুকে টানিয়া চুম্বন করিলেন—"অখণ্ড পতিপ্রেম লাভ কোরো মা।"

বিদায়ের দিন সত্যই আসিল। অপর্ণার মুখ গম্ভীর, শৈলজা ও খোকার নয়ন সজল করিয়া সুপর্ণা বিদায় লইল। যতীশ রাখিতে চলিল।

অপর্ণা প্রস্তাব করিয়াছিল, আগাগোড়া মোটরে গেলে সেও যাইতে পারে। কিন্তু সুপর্ণার তত আগ্রহ না দেখিয়া দুঃখিত হইল। সত্যই সুপর্ণা সে কথাটা এড়াইয়া চলিতেছিল। ভগিনীকে আপনার দৈন্য, সংসারযাত্রার হীনতা জানাইতে তাহার প্রবৃত্তি হইতেছিলনা। তাছাড়া কল্যাণী কি বলিবেন, প্রথম অভ্যর্থনার মাধুর্য্যে উত্তেজিত হইয়া অপর্ণা যদি কিছু মন্তব্য করিয়াই ফেলে। একেই ত দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইয়া তাহাকে ভীত করিয়া ফেলিয়াছে।

আঠারো

দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা কামরায় সুপর্ণা ও যতীশ পাশাপাশি চেয়ারে বসিয়া গল্প করিতেছিল। কয়েক আসন দূরে বসিয়া একজন যুবক হাসিমুখে তাহার দিকে তাকাইয়া ছিল। হঠাৎ সেইদিকে চোখ পড়ায় সুপর্ণা মাথার কাপড় আর একটু টানিয়া চুপ করিয়া বসিল। মুখটা চেনা বোধ হইল। গাড়ী আসিয়া রিষড়া ষ্টেশনে ঢুকিল। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক একটী বৃদ্ধা ও অপর একটী অবগুণ্ঠনাবৃতা রমণীকে লইয়া ছুটাছুটী করিতেছিলেন। পিছনে সারি সারি শিশুর দল। একজন চীৎকার করিয়া উঠিল, "বাবা বাবা, খালি-খালি।"

প্রৌঢ় ছুটিয়া আসিয়া বাহিনী সমেত উঠিতে উঠিতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ইতোমধ্যে ভদ্রলোক ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

"মশাই মাপ করবেন—সেকেন ক্লাস বুঝতে পারিনি—ছেলে-মেয়ে নিয়ে পড়ে থাকতে হোত।"

সহৃদয় স্বরে যতীশ বলিল,—"বসুন মশাই, স্থির হোন। গার্ডকে বলে দিলেই গোল হবে না।"

"আজ্ঞে যে crew বেটারা মশাই,—শেষকালে গায়ের গয়না শুদ্ধ খুলে নিতে চায়,—অপমানের চূড়ান্ত।"

"অনর্থক ব্যস্ত হচ্ছেন কেন,—আমরা এতগুলো লোক থাকতে—সত্যি ত আর কিছু মগের মুল্লুক নয়।"

কয়েকজনে টানিয়া তাঁহাকে বসাইয়া দিল। ভদ্রলোক সঙ্কুচিত ভাবে ষ্ট্রীলট্রাঙ্ক টানিয়া তাহার উপর বসিলেন। শিশু কয়েকটী বসিয়া মহা উৎসাহে গদীতে হাত বুলাইতেছিল।

কাণের কাছে মৃদু গুঞ্জন শুনিয়া সুপর্ণা পাশে মুখ ফিরাইল। বধূটী অবগুণ্ঠন ঈষৎ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে। "আপনাদের নামা হবে কোথায়?"

"চুঁচড়া—আপনি কোথায় নামবেন?"

"সেওড়াফুলী;—ওঁর দোকান সেখানে কি না। সঙ্গে কে,—কর্ত্তা বুঝি? ছেলে-মেয়ে?"

লজ্জিত মুখে সুপর্ণা কহিল, "না, ভগ্নীপতি—বোনের বাড়ী থেকে যাচ্ছি শ্বশুর-বাড়ী—না, ওসব পাট নেই। এ সব কটী কি আপনার?"

"বেশ আছ ভাই—হ্যাঁ, আমারি বৈ কি, কোলের

তিনটী নিজের, ওগুলি আর-পক্ষের। বড়টী কলেজে পড়ে, সহরে থাকে।"

বৃদ্ধা এতক্ষণ পুঁটুলী গণিতে ব্যস্ত ছিলেন—বধূর দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"গলায় স্থতিকের মাদুলীটে গেল গেল।"

গাড়ী শুদ্ধ লোক চকিত হইয়া উঠিল—তাঁহার পুত্রও হাঁ—হাঁ—করিয়া উঠিলেন।

"বলি বৌমা, বাছা, নেকাপড়া শিকে তুমি না হয় খিষ্টান হয়েছ, তা বলে জাতজন্ম সব কি ভেসে গেছে? ঐ যে নটীর গা ঘেঁসে বসেছ, শোর-গোরু-খাওয়া কাপড়-চোপড়ে র‍্যাপার ঠেক্‌ল ত? উঠে এস বল্‌ছি এদিকে—ভদ্রলোকের মেয়েছেলে যে গাড়ীতে, সে গাড়ীতে এদের উঠতে দেয়—কি জানি বাপু, পুলিশ-টুলিশ সব মরেছে না কি?"

বলির পাঁঠার মত কাঁপিতে কাঁপিতে বধূ উঠিয়া দূরে চলিয়া গেল। স্থপর্ণার মুখ চোখ রাঙা হইয়া কালো হইয়া গেল, গাড়ী-শুদ্ধ লোক হাসিতে লাগিল—কেহ প্রকাশ্যে, কেহ মুখ সরাইয়া।

ক্রুদ্ধ যতীশ হাতের আস্তিন গুটাইয়া লাফাইয়া উঠিল। পাশের আরোহী বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী টানিয়া বসাইতে পারিলেন না, অপর সকলে মৃদু মৃদু হাসিল।

"জামাই বাবু" স্থপর্ণা যতীশের বাহু স্পর্শ করিল,—"মেয়ে মানুষের উপর হাত তুলবেন না কি?" তাহার মুখশ্রী স্বাভাবিক—প্রশান্ত দুই চক্ষু মেলিয়া সে সমবেত পুরুষ-মণ্ডলীর মুখে চাহিল।

উনিশ

রাত্রে আহার শেষে স্থপর্ণা ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, সত্যেন শোয় নাই। ইজিচেয়ারে বসিয়া কি পড়িতেছে। এক ফুৎকারে বাতীটা নিভাইয়া দিয়া পত্নী স্বামীর বক্ষে ঢলিয়া পড়িল।

সত্যেন প্রথমটা কিছু বলিল না, মুহূর্ত্তেক পরে বিস্মিতা স্থপর্ণাকে ঠেলা দিয়া কহিল "ওঠ, লাগে। কাজ আছে, আলো জেলে দাও।"

স্থপর্ণা উঠিল না। বরঞ্চ ভাল করিয়াই স্বামীর বক্ষে স্থান করিয়া লইল। সত্যেন কথা না কহিয়া হাত বাড়াইয়া দিয়াশালাই খুঁজিতে লাগিল। অবশেষে আলো জ্বালা হইলে স্থপর্ণাকে সরাইয়া মেঝেতে বিছানো পাটীতে গিয়া শুইয়া পড়িল।

স্বামীর ভাবান্তরে স্থপর্ণার চোখে জল আসিল। আসিতে বিলম্ব হইয়াছে, তাই এত রাগ! পুনরায় স্বামীর নিকট গিয়া বাহুমূলে মাথা রাখিয়া আপনার মনে বকিয়া যাইতে লাগিল। সত্য মুখের ঢাকাও খুলিলনা, কোন কথাও কহিলনা। "তুমি আন্‌তে গেলে না কেন? আমি কি এক যায়গায় গিয়ে—যাব, যাব, করে তাদের অস্থির করতে পারি, লজ্জা করে না? একখানা চিঠি বৈ আর লিখলে না।"

"আর, তুমি আসার আগে আরো সাত দিন দেরী বলে এক চিঠি দিয়ে কর্ত্তব্য শেষ করেছিলে ত?"

"সে কি, আমি রোজই প্রায় লিখেছি, তুমি কি পাওনি?"

"থাক্ আর মিথ্যা কথা বলতে হবেনা—ও আমি ঢের শুনেছি।" রাগিলে সত্যর জ্ঞান থাকিত না। অগ্নিতে আজ অতিরিক্ত ইন্ধন পড়িয়াছিল,—সত্যর এক বন্ধু ট্রেণের ঘটনা সালঙ্কারে বর্ণনা করিয়াছে, তাও সকলের সামনে।

সত্যর কণ্ঠ কঠিন হইয়া স্থপর্ণার বক্ষে বাজিল।

"দেখ, আমি এক আধটু মিথ্যে কথা যে সাংসারিক বিষয়ে না বলি তা নয়, কিন্তু তোমার সঙ্গে ত কখনো আমি প্রতারণা করিনি।"

"ওহে সাধু বিদুষী—এত fine line আমি টান্‌তে পারিনা, আমি হলাম পাড়াগেঁয়ে গরীব চাষাভূষো লোক। কলকাতার সভ্য নব্য ভগ্নীপতিও নই, সুন্দরী বিদুষী শালীও আমার নেই।"

স্থপর্ণা রাগিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু সংযত স্বরেই কহিল—"Please dear don't be vulgar."

সবেগে উঠিয়া বসিয়া সত্য কহিল—"হ্যাঁ, আমি vulgar ত বটেই, ননদের সঙ্গে তার স্বামী নিয়ে ঝগড়া করতে লজ্জা না করাটা বুঝি খুব সুসভ্যতা? তার কাছ থেকে স্বামীকে লুকিয়ে উপহার নেওয়া সভ্যতা সাধুতার নিদর্শন বুঝি?"

সত্যেন উঠিয়া চেয়ারে গিয়া বসিল। হতবাক্ স্থপর্ণা অধোমুখে বসিয়া রহিল। এই অভূতপূর্ব্ব আঘাতের কদর্য্য বীভৎসতা তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল, ঘৃণার ধিক্কারে তাহার রোমাঞ্চ হইতেছিল।

সত্যেন থামিল না। সে আশা করিতেছিল, সুপর্ণা কাঁদিবে, ক্ষমা চাহিবে,—বহু সাধ্য-সাধনার পর সে ক্ষমা করিবে। সুপর্ণার অশ্রুহীন জ্বালাময় চক্ষু তাহাকে আরো উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছিল। শিক্ষার মার্জ্জিত স্পর্শ লাভ করিয়াও কোথায় যেন একটু জন্মগত কুশ্রী রূঢ়তা তাহার থাকিয়াই গিয়াছিল—আজ সেটা আত্মমূর্ত্তি ধরিয়াছে।

সুপর্ণা অনেকবার সত্যেনকে রাগ করিতে দেখিলেও এ মূর্ত্তি নূতন দেখিল। তাহার সহজ সৌন্দর্য্যজ্ঞান, তাহার মার্জ্জিত রুচি, তাহার ভাবপ্রবণ হৃদয় একেবারে বিরূপ হইয়া গেল। সত্যেন যদি কোন দিন নতজানু হইয়া ক্ষমা চায় তবেই।

"বড়লোক বোনের বাড়ী পাত চেটে, ভগ্নীপতির বাড়ীতে গাড়ীতে ইয়ার্কী মেরে এক মাস পরে উনি বাড়ী ফিরলেন। খোকা, খোকা, কোন্ খোকার মায়াতে আটকেছিলে, তা কেউ বোঝে না। উনিই পয়সা খরচ করে বিদ্যে শিক্ষে করেছেন, আর আমরা ধান চাল দিয়ে। তার জন্য কোলকাতা যাবার দরকার কি ছিল, খোকা ত এখানেই পাওয়া গেছে।"

এইবার সুপর্ণা কাঁদিয়া ফেলিল—দিদি, দিদি।

কাঁদিতে দেখিয়া সত্য একটু থামিয়া গেল। তার পরে অপেক্ষাকৃত সংযত সুরে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল।

সুপর্ণা মুখে হাত চাপা দিয়া কাঁদিতে লাগিল—অবশেষে সত্য থামিলে মুখ তুলিয়া কহিল—"হয়েছে, না আরো আছে?"

"হয়েছে? কিছুই তোমার হয়নি, আমার বিছানায় তুমি উঠোনা।"

"বেশ, তাই হবে।" অশ্রু মুছিয়া সুপর্ণা উঠিয়া দাঁড়াইল।

দরজার খিল খুলিয়া মুহূর্ত্ত কয়েক দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিল, সত্য আসিল না—ফিরাইল না।

সুপর্ণা চলিয়া গেল। ঈষৎ লজ্জিত সত্যেন ভাবিল, যাই—ধরিয়া আনি। লজ্জা, আহত পৌরুষ বাধা দিল। অপরাধীরই আগে আসা উচিত। যাওয়া হইল না। সুযোগ সময় চলিয়া গেল।

কুড়ি

ওগো—

এক দিন কত মধুর নামেই না তোমাকে ডেকেছি—সখা, স্বামী, প্রিয়তম, কিন্তু আজ জোর করে কোনো নামেই ডাকতে পার্‌লামনা। হয় ত চেষ্টা করিওনি। তবে আজ মনে মনে অবিশ্রান্ত জপ করছি—আমি সুপর্ণা, আমি মানুষ, আমি সতী,—আমিই জগতে একমাত্র সত্য। তোমার বাহুবন্ধনে শুধু প্রিয়া বলে নয়, তোমার সংসারে বধূ বলে নয়,—আপনার জন্য আপনি আমি, একা আমি। আমি সুপর্ণা, তুমি সত্যেন। জগতের প্রতি মানুষের মধ্যেকার, নরনারীর মাঝের eternal সম্বন্ধ ছাড়া আমাদের দুজনের যোগসূত্র নেই,—বিবাহ ও প্রেমের গণ্ডী মুছে ফেলে তুমি আর আমি সমান planeএ এসে দাঁড়িয়েছি। যতবার জোর করে মনে করছি, ততবারই মন দুর্ব্বল হয়ে যাচ্ছে। শিরায় শিরায় যে রক্ত রয়েছে, মজ্জাগত হয়ে যে সংস্কার রয়েছে, তাকে এড়ানো আমার সাধ্য নয়, তাই সেটা ভেঙে ফেলতে চাই। স্বভাব-ভীরু-প্রকৃতি একবার প্রাণপণ চেষ্টা করে মরতে চায়—আমি না ফল ভোগ করলেও অপরে করবে ত।

এই অশান্তি চাপা দিয়ে জোড়াতালি দিয়ে জীবন কাটানো যেত, কিন্তু আমার সৌন্দর্য্যজ্ঞান বিদ্রোহ করছে।

একবার মনে হচ্ছে, যদি শুধু তোমার প্রিয়াই হোতাম, আমার মন্দির-দ্বারে যদি তুমি শুধু প্রেমার্ত্ত অতিথি হতে, তাহলে হয় ত এ সহ্য হোত, নিজের গৌরবে। কিন্তু তাতেও ফল হোতনা প্রিয়তম; রাণীর মতন রতন-আসনে বসে তোমাকে নিবিড় প্রণয়-শাসনে শাসন করতে করতেও নতজানু হতে হোত,—হে নাথ, কোরো মার্জ্জনা, কোরো মার্জ্জনা, বোল্‌তে হোত।

Dolls' houseটা জিনিস যত সোজা ভেবেছিলাম, তা এখন মনে হচ্ছেনা। যেটা অস্বাভাবিক মনে ভেবেছিলাম, দেখ্‌ছি, সেটাই কখন জীবনে সবচেয়ে আপন, স্বাভাবিক হয়ে পড়েছে। স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ-বোধটা এখনো রক্তে কাঁপন জাগিয়ে তুলছে। পাঁচ বছরে তুমি জীবনের সমস্ত হরণ করেছ। তোমাকে ছাড়া জীবন আমার কোথায়? ফল—সে ত তোমার কাছে উপহার মাত্র, —ফুল যে ফুটিয়ে তৃপ্ত হব, সে ফুল দিয়ে পূজা করব কার?

কিন্তু তোমার সঙ্গে কার জীবনই বা আমার কি রকম? আমি তোমার গৃহের বধূ হলে হতে পার্‌তাম তোমার সন্তানের জননী, আছি তোমার প্রিয়া।

বাইরে যে একটা তোমার মস্ত জগৎ আছে, সেটা আমার অবোধ্য, অগম্য।

সে জগৎ আমি চাইনা, তার উপর আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই। তাছাড়া, আমি জানি, তোমার আধুনিকতার একটা সীমা আছে। যখন পাড়ায় মেয়েদের স্কুল খোলা হোলো, আমাকে শিক্ষয়িত্রী হিসেবে তারা চাইল, তুমি দুদিন আমার সঙ্গে কথা কওনি, ভাত খেলেনা, তীব্র বিদ্রূপ কর্লে যে এর পর ত স্ত্রীর রোজগার খাব। আর এক দিন একটু বেশী গলাখোলা জামা পরে গাড়ীতে উঠেছিলাম, তুমি ছাড়িয়ে তবে ছেড়েছিলে। বিদ্রূপের ত কথাই নাই।

অথচ তুমি আধুনিক, তুমি আমাকে Cosmo Hamilton পড়াও।

সংসার, শাশুড়ী এবং শাশুড়ীর সংসারের অশান্তিগুলো অতি তুচ্ছ ছোট মনে করে শান্তিতে ছিলাম। সংসারকে বন্ধন মনে করে ভাবতাম যে, বন্ধনকে বন্ধন বলে জানার জন্য সেটা লোহারই হওয়া দরকার, এই ছিল আমার মনকে চোখঠারা প্রবোধ। কিন্তু যখন দেখলাম, এই সংসারই পায়ের বেড়ী না হয়ে হাতের কাঁকন হয়েছে, আমার জীবনে আঘাত তাঁর অঙ্গে আভরণ হয়ে সেজেছে; তখন মনটা ছোট হয়ে গেল, মনে হল আমি ভয়ানক ঠকে গেছি, বঞ্চিত হয়েছি। তোমার উপর অভিমান হল—অগ্নি সমক্ষে যে মন্ত্র পড়েছিলে, তা ত তুমি পালন করনি।

তোমার গৃহ ও গৃহস্থালীর প্রধান আসন আমাকে দেবে বলে সপ্তপদ গিয়েছিলে, প্রতিজ্ঞা করেছিলে—তোমার ও আমার হৃদয় এক হোক্; প্রতিশ্রুতি ছিল—আমি শ্বশুর-গৃহে সম্রাজ্ঞী হব। সে প্রতিজ্ঞার কি কোনো মূল্য নেই?

আমি কুমারী হৃদয়ের সমস্ত গোপন আশা আশঙ্কা আকাঙ্ক্ষা তোমাকে সঁপে দিয়েছিলাম। যে মন্ত্র আমি উচ্চারণ করেছি, তার প্রতি অক্ষর আমি পালন করেছি। স্ত্রীর পক্ষের মন্ত্র তত কঠিন নয় জানি,—তোমার আজ্ঞাপালন, শরীর সম্বন্ধে তোমাকে তুষ্ট করা অতি তুচ্ছ কথা; কিন্তু আমি কোন অংশেই তোমাকে fail করিনি। আর তুমি—তুমি তোমার কোনো প্রতিশ্রুতিই পালন করনি।

তোমার পিতার পাপের মূল্য কেন আমি দেব? তোমার মায়ের দাসীবৃত্তি আমার জীবনকে কি ভাবে সার্থক করবে? তোমার বোনের ছেলে মেয়ে মানুষ করা, তোমার ভগ্নীপতির পরিচর্য্যা করা ছাড়াও ত আমার জীবনে উচ্চ আদর্শ থাকতে পারত? আর সম্মানের কথা? তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পার, তার কারণ, রক্ষা করার সাহস তোমার নেই।

যে সাপ তোমাকে ছোবল মেরেছে—ভেবেছ, তাকে তুমি শান্ত হৃদয়ে ক্ষমা করলে? রামচন্দ্র সীতাকে ত্যাগ করেছিলেন, তুমি হয় ত তাঁর চেয়েও পত্নী-প্রেমিক,—ক্ষমা করেছ, লোকনিন্দা মাথায় করেছ আমার জন্য; কিন্তু তিনি রাবণকে ক্ষমা করেননি!

যদি আমাদের অপরাধী মনে করলে, তবে ক্ষমা করলে কেন? আমাকে ভালবাস? কিন্তু অপর পক্ষকে ভালবাসার কোনো কারণ নেই। আমাকে যদি অপবিত্র মনে কর, যে কুকুর তোমার ঠাকুর-ঘরে ঢুকেছে, তাকে শাস্তি দিলেনা!

তোমার ক্ষমা আমাকে ব্যথা দিচ্ছে,—বুঝতে পার্ছি, উদারতা হয় ত তোমার আছে; বীরত্ব কিন্তু নেই।

ভুল বুঝোনা—তোমার ভালবাসায় আমি সন্দেহ করছিনা। তুমি আমায় ভালবাস, কিন্তু তবু সন্দেহ করেছ, অপমান করেছ। আমি তোমায় ভালবাসি; কিন্তু শাস্তি তোমাকে আমার দিতেই হবে। আমি যাব, চিরজীবন ধরে তুমি তপস্যা কর—যখন শরীরের স্মৃতি শুদ্ধ ছাই হয়ে যাবে, তখন বুঝো তোমার সাধনা ফল পাবে।

আমি জানি, তুমি আবার বিবাহ করবে,—আজ হয় ত না, কিন্তু করবেই।

আমার গর্ব্ব, রইল আমার অভিশাপ; তাকে ঘিরে শুধু থাকবে তোমার কামনা,—প্রেম আমি হরণ করে নিয়ে চল্লাম।

ওগো দুঃখ পেওনা। কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি আমি—কিন্তু সে তরীতে বড় ঠেলাঠেলি লেগেছে, বাজে মানুষের বড় গোলমাল, আমাকে সেখানে ধরবেনা, আমি অত ছোট হয়ে সঙ্কুচিত জীবনে আর থাকতে পারবনা। আমি বিদায় নিলাম। যা সমস্ত এবং সমগ্র আমার প্রাপ্য ছিল, তা জগৎ ও সমাজ ভাগ করে নিয়েছে, তোমার যৌবনে তোমার জীবনে আমার রাজ-সিংহাসন রচনা হয়নি, দাসীর মতন কত দিন থাকব! তোমার প্রেমে শান্তি আছে, সুখ আছে, কিন্তু তোমার প্রেম দিয়ে ত আমার জীবন ভরাতে পারলেনা। দারিদ্র্য আমি হাসি মুখে নিয়েছি—সে

বিদুরের ক্ষুদ আমি সবারি সঙ্গে ভাগ করে নিতাম, কিন্তু তোমার জীবন সম্পূর্ণভাবে আমার করে আমি চাই। তা তুমি দিতে পারবেনা।

আশ্চর্য্য! আমরা আসব পিতৃগৃহ ছেড়ে সাগর-সঙ্গমে নদীর মত বাধা বন্ধন না মেনে, তোমরা তোমাদের Regulated জীবন থেকে এক চুল সরবেনা, এতটুকু আমাদের জন্য ত্যাগ করবেনা, তোমাদের পূর্ব্বজীবন পূর্ব্ব-প্রেম, কর্ত্তব্য সবই থাকবে—পরিবর্ত্তন হবে কেবল আমাদের! আমরা পিতামাতা ত্যাগ করব; কিন্তু তোমরা একটা উঁচু কথা আমাদের হয়ে বাপ-মাকে বললেই তাঁরা শিউরে উঠ্‌বেন। কিসের জন্য আসব, তোমরা আমাদের কি দেবে? প্রেম? বিবাহ না করেও প্রেম আমরা পেতে পারতাম। তোমাদের দেহ আমাদের চাইনা, সন্তান তোমরা চাওনা। প্রেমে আমাদের শরীর দিতে হবে স্বামীকে, শক্তি স্বাস্থ্য দিতে হবে স্বামীর জননীকে, ভক্তি দিতে হবে স্বামীর জন্মদাতাকে। কেন, কোন্ যোগসূত্রে?

আমি আজ মূক বাংলার মেয়েদের ব্যথাকে বাণী দিচ্ছি, আর আমরা সইবনা—আমরা সমস্ত কেবল তোমাদেরই দেব, এক কণা এর অপব্যয় করতে দেবনা। আমার শিরায় শিরায় আগুন উঠ্‌ছে—হয় ত অসংলগ্ন কি লিখলাম—বুঝে নিও। একটা কথা বলে যাচ্ছি—(আমাকে সন্দেহ করার এই শাস্তি)—ঐ চিঠিখানি মাধবীর লেখা, ফটোর সঙ্গে ছিল, তোমার "মার" সাধুতার নিদর্শন। আর তাঁর তোষকের বাঁ দিকে কতকগুলি চিঠি লুকানো আছে, যা আমি তোমাকে লিখেছিলাম কিন্তু পাওনি।

ওগো—আমার বন্ধু, সখা, প্রিয়তম, আমার চুম্বন তোমার ঐ কোঁকড়া চুলে—তোমার সজল দুই চোখে, তোমার উত্তপ্ত ললাট কপোলে। তোমার কাছে থেকে পেতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু দেবে কি না জানিনা। আমাকে ক্ষমা কর—তোমার জীবন যে আলো না করে অন্ধকার করে দিলাম। 'তোমার—ই'

ওগো না পারলাম না, একবার বাঁচ্‌তে ইচ্ছা করছে—তোমাকে একটা chance না দিয়ে যেতে পারছিনা। তোমার ব্যাগ থেকে মরফিয়ার শিশিটা নিয়ে সেখানে এটা রাখলাম, তুমি বুঝবে।

আজ রাতে তুমি বুঝে দেখ, কাল আমাদের বিয়ের তিথি—যদি রাতে এসে একবার ডাক তেম্‌নি করে সুপর্ণা বলে তবে—

তোমার ডাকের আশায় রইলাম বসে। সু—

১৪ই ফাল্গুন

দুপুরবেলা।

একুশ

সত্যর শরীর মন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরাকে কেবলমাত্র উত্তেজনার বশে দূরে রাখার উত্তেজনা ও ক্লেশ তাহাকে অত্যন্ত ব্যথিত ও পীড়িত করিতেছিল। সুপর্ণার বেদনাতুর শুভ্র মুখ, এলায়িত দেহলতার স্মৃতি ক্ষণে ক্ষণে তাহাকে বিকল করিয়া চক্ষে অশ্রু আনিতেছিল। পরক্ষণেই তাহার নীরব তর্কবিমুখ গম্ভীর মুখশ্রী অপরাধ সপ্রমাণ করতঃ স্বামী-গর্ব্বকে উত্তেজিত করিতেছিল। সুপর্ণাকে সে ভালবাসে, ক্ষমা সে করিবে, কিন্তু নারী বুঝুক্—দারিদ্র্য কেবলমাত্র হেয়তাই স্বীকার করে না, তাহার মধ্যেও মর্য্যাদা আছে,—পৌরুষ কেবল দুর্ব্বলতাকে ক্ষমা করে ভালবাসে বলিয়া, ভয়ে ভীরুতায় নহে। সত্যর প্রেম তুচ্ছ নহে, সেও সাধনা, অশ্রুজল সাপেক্ষ,—তাহাতে নিষ্ঠুরতা আঘাত নাই, কিন্তু বজ্রের কঠোরতা আছে। ফাল্গুনের সরস মধুর সন্ধ্যায় রোগীহীন শূন্য ঔষধালয়ে একাকী সত্যেনের মনে গভীর ব্যথা বাজিতেছিল। সুপর্ণা কেন এমন করিল। ঐশ্বর্য্যই কি জগতে সব? মাতৃমহিমাশূন্য জীবন কি এতই অসহনীয়? সুপর্ণা, সত্যেনের জীবন যে একতারার মত ক্ষীণ, সেই তারটাই তুমি ছিঁড়িয়া ফেলিলে! তন্ময় হইয়া সত্য ভাবিতেছিল, পথ দিয়া দুইটী যুবক যাইতে যাইতে আকুল হইয়া হাসিতেছিল,—ওরে সত্য, বৌকে কি পকেটে করে এনেছিস না কি?

লজ্জিত সত্য চমকিয়া চাহিল, তাহারা ততক্ষণে চলিয়া গেছে।

সোজা হইয়া বসিয়া নড়িয়া চড়িয়া দীর্ঘশ্বাসটা চাপা দিতে দিতে সত্য দেওয়ালের মাসপঞ্জীর দিকে চাহিল, ১৪ই ফাল্গুন, শনিবার,—কাল ১৫ই। সহসা একটা কথা স্মৃতি-পথে আসিয়া তাহাকে অবশ করিল।

তাহার বিবাহ-বাসরের মধুময়ী তিথি। গত বৎসর সুপর্ণা রাত্রে ফুলশয্যার শাড়ীখানি পরিয়া পুষ্পশয়নে তাহাকে

অভ্যর্থনা করিয়াছিল। ললাট বেড়িয়া শুভ্র যূথীর মালা, কণ্ঠ ছিল শূন্য। হাসিয়া সত্যকে আলিঙ্গনে বাঁধিয়া কহিয়াছিল "হারো নারী পিত কণ্ঠে ময়া বিচ্ছেদ ভীরুণা।"

সত্য পাগল হইয়া উঠিল—কাল—কাল ত সুপর্ণাকে বক্ষে টানিয়া লইতেই হইবে। কাল সে তাহার চক্ষের জল চুম্বনে চুম্বনে মুছিয়া দিবে; অপরাধিনীকে ক্ষমা করিবে, কাতরে বলিবে, "সুপর্ণা, আর এমন হবে না"—অভিমানিনীর নিকট নতজানু হইয়া মানভঞ্জন করিবে।

সশব্দে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া সে কহিল, "কম্পাউণ্ডার বাবু, আমি একটু মণিদের ওখানে যাচ্ছি, রুগী ত একটাও কাল থেকে আসেনি। বিশেষ urgent হলে খবর দেবেন।" মণি তাহার বন্ধু, প্রতি ফাল্গুনের পঞ্চদশী রজনীতে সে সত্যকে বাগানের ফুল উজাড় করিয়া দেয়। বন্ধুগৃহ হইতে সত্যেন যখন বাড়ী ফিরিল, তখন রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। শূন্য শয্যায় শয়ন করিয়া হাসিল,—কাল সুপর্ণা ঘরে আসিবেই, সে জানে আসিবেই,—তাহার পর আবার সেই একটানা মাধুর্য্য। একটু হাসিয়া সুখের সহিত সত্য আবৃত্তি করিল—Thanks for all the fallings out which all the more endear.

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া বাহির হইতেই সত্যর চোখে পড়িল সুপর্ণার ঈষৎ প্রফুল্ল মুখ। সুমিষ্ট হাওয়াতে তার কপালের উপরকার চুলগুলি উড়িতেছিল, চোখের কোণে গাঢ় কালি। কয়েক দিন পরে সত্য প্রথম তাহার দিকে চাহিয়া হাসিল, সুপর্ণা কৃতার্থ হইয়া গেল। বসন্তের আমেজ আর কোথাও ছিলনা—শুধু দূরের একটা গাছে অশ্রান্ত একটা কোকিল ডাকিয়া মরিতেছিল,—আমের মুকুলের মৃদু গন্ধ। সত্যেনের মুখে একটা কৌতুক-বাণী আসিতেছিল, "আজ রাতে সারারাত জেগে তোমার চোখ-মুখ আরো কালো করে দেব।"

অকস্মাৎ কল্যাণীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল,—দূর হইতে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন,—ত্বরিত পদে উভয়ে সরিয়া গেল।

কল্যাণী ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। কল কৌশলে কিছুই ফল ত হইল না; কেবল সার হইল দুর্নাম। হায় রে অদৃষ্ট!

সমস্ত দিন ধরিয়া তিনি সুপর্ণার উদ্দেশে মর্ম্মভেদী বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সুপর্ণা শুনিল, শুনিয়া হাসিল। আহা, বলিয়া নিন্। কাল যে আরো দুঃখ হইবে! কাল তাহার বিবাহ-তিথি, সত্যকে সে লিখিয়াছে, সে জানে কাল সত্য আর কোথাও থাকিবে না। স্বামীর প্রেমে তাহার সে বিশ্বাস আছে। বহুদিন পরে সুপর্ণা আগের মত হাসিয়া গৃহকর্ম্মে মন দিয়াছিল। চরণে তাহার হরিণীর চপলতা, চক্ষে বক্ষে কুসুমের আনন্দ, হৃদয়ে মধুর সঙ্গীত-রেশ। আনন্দ তাহার দ্যুলোক ব্যাপিয়া ঝরিতে চাহিতেছিল, বহুদিন-ভোলা গানগুলি পথ-ভোলা পথিকের মত চমকিয়া আসা-যাওয়া করিতেছিল। দুধ জ্বাল দিতে দিতে সে গুঞ্জন সুরে গাহিতেছিল "প্রেমের হাতে ধরা দেব তাই রয়েছি বসে।"

তাহার এই ভাবান্তর কল্যাণীকে জ্বালা দিতেছিল। বধূর প্রতি বিদ্বেষে, পুত্রের উপর ক্রোধে তিনি ছট্‌ফট করিয়া ফিরিতেছিলেন।

সত্য যখন খাইতে বসিল, তখন আসিয়া প্রহরীর ন্যায় বসিয়া রহিলেন। সত্য বুঝিয়া দুষ্ট হাসি হাসিয়া রন্ধনের একটু নিন্দা করিয়া আধ-খাওয়া করিয়া গেল।

বাইশ

কয়েক রাত্রি সুপর্ণা শয়ন-কক্ষে আসে নাই, ইহার মধ্যে সে হত-লক্ষ্মীশ্রী গৃহ নীরবে আপন অবস্থান্তর জানাইতেছিল। সার্সীতে ধুলা জমিয়াছে, টেবিলের উপরকার ফুলগুলি শুকাইয়া মরিতেছে। সত্যর ছাড়া কাপড় ধুলায় পড়িয়া আছে। চটী যোড়াতে কাদা মাখা।

মায়ে যেমন শিশুর সহিত লুকাচুরী খেলে, অবশেষে শিশু ক্রন্দনোন্মুখ হইলে মুখ বাহির করিয়া বলে—এই যে, এই যে আমি—সুপর্ণা তেমনি চারিদিকে হাসিয়া ব্যাকুলভাবে কহিল—না—না—এই ত, তোমাকে ছেড়ে কোথায় যাব। নতজানু হইয়া বসিয়া সে চটীযোড়া আঁচল দিয়া সযত্নে মুছিয়া আলনায় রাখিল। পরিষ্কার ধুতি আনিয়া কোঁচাইয়া রাখিল। ঘরখানাকে ঝাড়িয়া মুছিয়া তক্‌-তকে করিল। টেবিলের ঢাকা হইতে বিছানার চাদর সমস্ত বদলাইয়া কোণে ধূপ জ্বালিয়া গৃহের পূর্ব্বশ্রী ফিরাইয়া আনিল। এই ত তাহার "সীমাস্বর্গ"—এখানে যে সে "ইন্দ্রাণী।"

ঘর-ঝাঁট-দেওয়া আবর্জ্জনাগুলি ফেলিয়া দিয়া সুপর্ণা ভাবিতেছিল, একবার দেখি, বাগানে ফুল ফুটিয়াছে কি না। বাহির হইতে যাইবে, এমন সময় ঝি আসিয়া কহিল, একটা

মালী কোথা হইতে ফুল আনিয়াছে, বহুমাকে দেখিতে চায়। সুপর্ণার মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল,—সত্য ভোলে নাই,—এই প্রণয়-উপহার তাহার আশ্বাসবাণী,—সে আসিতেছে—আসিতেছে।

এই পুষ্পদূতের বাহককে সে কি দিয়া বিদায় দিবে। আজ জগতে তাহার কাহাকেও কিছু অদেয় নাই, কল্যাণীকেও সে আজ ক্ষমা করিতে পারে।

চুলের সোনার কাঁটাটা সে মালীর হাতে ফেলিয়া দিল।

বেলা শেষ হইয়া আসিতেছিল, সম্পন্নসজ্জা গৃহের দিকে একবার প্রফুল্ল দৃষ্টিপাত করিয়া নৃত্য-চপল চরণে সে ফিরিয়া আসিল।

তেইশ

দ্বিপ্রহরে আহারের পরই সত্য বাহির হইয়া আসিয়াছিল। কোন বারই এই দিনটী সে দিনের বেলায় বাড়ী থাকিতনা,—সে জানিত, সুপর্ণার অনেক উৎসব-মাঙ্গলিক আছে। তাহাকে বিব্রত করিতে চাহিতনা, একেবারে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিত। আজিও সে ডাক্তারখানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। বৃদ্ধ কম্পাউণ্ডার ত্রস্তে আসিয়া আশাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোনো কাজ আছে কি না। প্রভুর প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া সেও প্রীত হইয়াছিল।

হাসি চাপিয়া সত্য কহিল—"না, কাজ কৈ—আজ ত দুদিনের মধ্যে কেউই আসেনি।" বৃদ্ধকে নিরাশ করিতে তাহার বাজিতেছিল। দরিদ্র প্রভুর সামান্য আয়, তাহার উপর তাহার জীবন। ছিন্নবস্ত্র, অর্দ্ধমলিন পিরাণ। আর্দ্র কণ্ঠে সত্যেন জিজ্ঞাসা করিল, "গণেশবাবু, আপনার বড় মেয়েটীর বিয়ের কি হোল কিছু?"

জড়িত কণ্ঠে বৃদ্ধ উত্তর দিল, "কৈ, কিছু ত ভরসা দেখিনা ডাক্তার বাবু—একে কালো, তার উপর কিছু দিতে পারিনা। যে আসে সেই অপমান করে চলে যায়। তারা!"

সত্য চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বৃদ্ধ কহিল "বৌঠান বেতে একখানি গলার হার দিতে চেয়েছেন।"

সত্য কহিল "বেশ ত।" সে প্রকৃতই আনন্দিত হইয়াছিল। সুপর্ণা ঐ রকমই—এমন নরম মন। অথচ আজ পর্য্যন্ত গহনা গায়ে দেওয়া দূরে থাকুক্, সত্য তাহাকে পরিধেয়ই দিতে পারেনা। অপর্ণার ঐশ্বর্য্য যে তাহাকে লুব্ধ করিয়াছে তাহাতে বৈচিত্র্য নাই। সত্যর মাথায় একটা কল্পনা খেলিল,—সে সুপর্ণাকে আজ এমন একটা উপহার দিবে যাহাতে সে সত্যই তুষ্ট হইবে।

ডাক্তারখানা ছাড়িয়া সে বাজারে একটা গহনার দোকানে ঢুকিল। ব্যবসায়ী তাহার বাল্যবন্ধু। সত্যর কথা শুনিয়া পাশের ঘরে তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। ড্রয়ার খুলিয়া একটা ভেলভেটের বাক্স বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া কহিল, দেখ একবার। শরবিদ্ধ একটা হৃরতন ব্রোচ—হীরকগুলি জ্বলিয়া উঠিল। জিনিসটা বহুমূল্য; কিন্তু অধিকারিণী আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া বিক্রয় হইতেছে না।

কাহিনী শেষ করিয়া বন্ধু কহিল, "মাসে মাসে অল্প করে দিস্—superstition নেই ত?"

"নাঃ—কিন্তু বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতে পারবি—দরওয়ান নয়—ঝি দিয়ে?" একটা সাদা কার্ড তুলিয়া সত্য কি লিখিয়া ব্রোচটার গায়ে লাগাইয়া দিয়া, রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

কষ্ট? হ্যাঁ, কষ্ট স্বীকার করিতেই ত হইবে। যে শৃঙ্খল দিনরাত পরিয়া থাকিবে, তা সোনার করিয়া দিতে হইবে বৈ কি। ভাবিতে ভাবিতে সত্য চলিতেছিল; সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, গৃহে গৃহে মঙ্গল-শঙ্খ-নিনাদ, আর তাহারি সঙ্গে স্বপ্ন ভাঙিয়া বিশ্রী বেতালাসুরে একটা হারমোনিয়াম বাজিয়া উঠিল। সত্যেন চমকিয়া দেখিল, একটা বিশ্রী পল্লীতে আসিয়া পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া সে অন্য পথে চলিল। অর্থ উপার্জ্জন তাহার করিতেই হইবে, যেমন করিয়াই হোক্। এতাবৎ দরিদ্র-গৃহে পয়সা নেয় নাই, বরং সাধ্যানুসারে বিনামূল্যেই ঔষধ দিয়া থাকে। চিকিৎসা বিদ্যা সম্বন্ধে তাহার উচ্চ আদর্শকে খাটো করে নাই, লোকসেবাই তাহার প্রধান ইচ্ছা ছিল। অর্থলোভ সেখানে ঠাঁই পায় নাই। আজ একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। এই পল্লীরই এক অংশে কোনো ধনবতী নারী এক জঘন্য কার্য্যের বিনিময়ে সহস্রাধিক মুদ্রা উৎকোচ দিতে চাহিয়াছিল। সত্যেন শিহরিয়া ঘৃণাভরে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। আজ সেই ঘৃণা ম্লান দুর্ব্বল হইয়া গেল, নিজেকে মূঢ় বলিয়া সত্যেন ধিক্কার দিল।

পিছনে কে ডাকাডাকি করিতেছিল, সত্যেন ফিরিয়া দেখিল গণেশবাবু। বৃদ্ধ এক হাতে ডাক্তারী ব্যাগ ও অপর হাতে ছিন্ন ছাতাটি লইয়া ছুটিয়া আসিতেছেন। পিছনে সরকার গোছের একজন লোক।

সত্যেন শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল—তাহার যাইবার ইচ্ছা হইতেছিলনা। শ্রীরামপুর জমিদার-গৃহে আহ্বান। গণেশবাবু ব্যাকুল মুখে তাকাইয়া ছিলেন—তাঁহারো সঙ্গে যাইবার কথা আছে। একবার পরিচিত হইলে খ্যাতির ও অর্থের সুবিধা। সত্যেন অসম্ভব একটা ফাঁ হাঁকিল। হ্যাঁ—তাহাতেই রাজী।

"আজ রাতে ফেরা যাইবে ত ?" "বিলক্ষণ, মেলা ট্রেণ।"

গণেশবাবু দুই হাত কচলাইতে লাগিলেন। সত্য কহিল "চলুন।" বাড়ীতে খবর দিবার ব্যবস্থা করিয়া সত্য চলিয়া গেল—রাত্রে ১০টা নাগাদ ফিরিবে।

চব্বিশ

রন্ধন শেষ হইয়া গিয়াছিল। শ্বশুরের খাবার দিয়া আসিয়া সুপর্ণা শাশুড়ীর জন্য অধীর হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। রাত্রি গভীর হইয়া আসিয়াছে,—সত্য কখন আসিয়া পড়িবে,—তাহার যে সবই বাকী। ঝিকে দিয়া দুইবার সে ডাকাইল। শয্যা ত্যাগ করিয়া কল্যাণী আসিতেছিলেন, পথে একটা লোক দেখিয়া দাঁড়াইলেন। ডাক্তারখানার চাকর—বাবু বাহিরে গেছেন, রাত্রে ফিরিবেন, এই খবর দিয়া চলিয়া গেল। কল্যাণী দন্তে অধর চাপিয়া রহিলেন, বধূকে কিছু বলিলেন না।

পা দিয়া পিঁড়াখানা সরাইয়া তিনি ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন—"সাত-সকালে রাঁধাবাড়া সেরে গিলে কুটে বসে থাক বাছা, আমার ভাত বেড়ে ফেলে রাখগে। ছেলেকে ঘরছাড়া করলে তুমি আমার। তোমার হাতে আমি তাই জল খাই, আর কেউ হলে!" সুপর্ণা কিছু না বলিয়া বাড়া ভাতের থালাখানি ধরিয়া দিল। কল্যাণীর মুখে আজ কিছুই রুচিল না। রন্ধনকারিণীর ও তাহার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ নারীর চরিত্রের অকথ্য সমালোচনা করিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। নীরবে সত্যেনের খাবার লইয়া অশ্রুজল মুছিয়া সুপর্ণা ঘরে ঢুকিল।

ফুলে ফুলে শয্যা ফুলময়। ফুলদানীতে উন্নত রজনীগন্ধা হাসিয়া দুলিতেছিল—এই ত আসিতেছি। গোলাপের গাঢ় রক্তবর্ণ প্রদীপ আলোকে রক্তিমতর হইয়া কহিতেছিল—এই ত আসিয়াছি। একগুচ্ছ পাণ্ডুর কস্তুরী নিজের সৌরভে ঢলিয়া পড়িয়াছে—প্রিয় সমাগমে বিভোর।

গৃহমধ্যে স্তব্ধ হইয়া সুপর্ণা দাঁড়াইয়া ছিল, এও কি সত্য ? তার পরিধানে অতি সূক্ষ্ম রঙীন বস্ত্র তনুলতা ঘেরিয়া বেড়িয়া মাটীতে লুটাইতেছে। ললাট বেড়িয়া ক্ষুদ্র পুষ্পমাল্য, কণ্ঠ শূন্য, নিটোল বাহুতে বহুমূল্য বলয়। তাম্বূলরাগে আরক্ত ওষ্ঠ কাঁপিতেছিল। সত্য চলিয়া গেছে ? হায় রে প্রেম! প্রিয়ার সবচেয়ে বড় আহ্বানেও তুমি সাড়া দিলেনা। সুপর্ণা কি এতই সুলভ, এতই তুচ্ছ, এতই নীচ ? লজ্জায় সুপর্ণা আকর্ণ রাঙা হইয়া উঠিল। স্বামী হয় ত হাসিয়াছেন, সুপর্ণা তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া নত করিতে চায়। কি অপরিসীম লজ্জা! ছি ছি! এ কি ঘৃণা। সত্য তোমার ক্ষমা নাই।

না—না, এ কি করিতেছে! সত্যর প্রেমে সে সন্দেহ করে না, করিবে না, করিতে পারিবে না। সত্য আসিবে—আসিবে—আসিবে। আবেগে সুপর্ণা দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

দ্বারের বাহিরে কল্যাণী কাণ পাতিয়া ছিলেন। সমস্ত আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। রাস্তার ঝাউ-গাছগুলি ঝড়ের বেগে নত হইয়া পড়িতেছে,—সাঁ সাঁ করিয়া প্রকৃতির নীরব ভয়াবহতা ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছে। সুপর্ণার মৃদু ক্রন্দনধ্বনি তাঁহার কাণে পৌঁছিলনা। নিদ্রিতা ভাবিয়া ফিরিয়া গেলেন।

সুপর্ণার বুকের মধ্যে তুমুল ঝড় বহিতেছিল; একদিকে অতল অন্ধকার, অজানা ভবিষ্যৎ; কিন্তু শান্তি, শান্তি, পরম শান্তি। আর জীবনে—জীবনে মায়া—জীবনে প্রিয়তম—জীবনে সত্য।

না—না, সত্যকে সে শাস্তি দিতে পারিবেনা। সূর্য্যমুখীর মত তাহার জীবন যে ঐ একই সূর্য্যের আলোতে প্রদীপ্ত,—সেই তাহার প্রাণ, সেই তাহার সৌন্দর্য্য, সুখ। তরল পানীয় টলটল করিয়া লোভ দেখাইতেছিল। এ অতলে গীতগান কিছু না বাজে—শুধু শান্তি। সুপর্ণা উঠিয়া দাঁড়াইল, সে কি এতই ভীরু ? সত্যর প্রেম কি কিছুই নয় ?

জীবনে কি সে পরাজিত ? এ শিক্ষা ত সে কোন দিন পায় নাই। গেলাসটা ফেলিয়া দিবার জন্ম হাত বাড়াইল। দুয়ারের নিকট ঐ না পায়ের শব্দ,—হ্যাঁ, এই ত দরজায় শব্দ হইতেছে। চক্ষের জল মুছিয়া হাসিতে হাসিতে সুপর্ণা দ্বার খুলিয়া দিল। ঝি দাঁড়াইয়া—তাহার পিছনে রুদ্রমূর্ত্তি কল্যাণী।

"এই নাও গো—কোন্ নাগর পাঠিয়েছে—দেখ ত ঝি,ঘরে মানুষ আছে না কি। মা—মা, এই তোমার প্রবৃত্তি,—সাধে সত্য বলে পাঠিয়েছে আজ রাতে আসবেনা।" সুপর্ণা চাহিয়া রহিল—শরবিদ্ধ একটী হৃবতন ব্রোচ, তলায় সত্যেনের হাতে লেখা—ইংরাজী বাক্য—"সুপর্ণাকে—সত্যেনের হৃদয়।" খচিত হীরকের ন্যায় সুপর্ণার দুই চোখ জ্বলিয়া উঠিল—অবশেষে সত্য—না তোমার ক্ষমা নাই।

হাত বাড়াইয়া অলঙ্কারটা লইয়া সুপর্ণা অগ্নিময় চোখে বঙ্কিম গ্রীবায় দৃপ্ত মুখে চাহিল। তাহার পর সশব্দে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া একনিঃশ্বাসে গরলময় পানীয় নিঃশেষ করিয়া কাচপাত্র ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

ঝম্ ঝম্ ঝম্। আকাশ-ভাঙা বৃষ্টিধারা পৃথিবীকে ভাসাইয়া দিতে লাগিল। ঝটিকাভরে কোন্ একটা গাছ পড়িয়া গিয়াছিল, আশ্রয়হারা পাখীদের করুণ ক্রন্দন মাতৃহারা শিশুর ক্রন্দন-ধ্বনির ন্যায় নিশীথের অন্ধকার ভেদ করিয়া আকুল প্রকৃতিকে উন্মাদ করিয়া তুলিল। ঝঞ্ঝা যেন আজ পৃথিবীকে সমূলে বিনাশ করিবে তাই ধ্বংসের সংহারিণী মূর্ত্তি!

টলিতে টলিতে দরজা খুলিয়া রাখিয়া সুপর্ণা শুইয়া পড়িল। বক্ষে বস্ত্রে বিদ্ধ ব্রোচটার উপর দুই হাত রাখিয়া সে ডাকিতে লাগিল—এস, এস,—এক নিমেষের জন্ম এস, এস।

পঁচিশ

সত্য যখন শ্রীরামপুরে পৌছিল, তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে। ষ্টেশন হইতে রোগী গৃহ বহুদূরে। শ্রান্ত ঘোটক মন্থর-পদে চলিতেছিল। সত্যেন গাড়ীর কোণে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া ছিল। অন্ধকারে সঙ্গীদ্বয়কে দেখা যাইতেছিলনা। সুপর্ণা এতক্ষণ কি করিতেছে ? সত্য তাহা বেশ ভাল করিয়াই জানে। এতক্ষণ মা বোধ হয় খাইতে বসিয়াছেন। তাহার পর সুপর্ণা দুজনের খাবার বাড়িয়া ঢেকে রাখিবে। আসন পাতিবে। চারিদিক দেখিয়া আসিয়া ভাঁড়ারে চাবী দিবে। তাহার পর সত্যেনের বস্ত্রাদি ঠিক্ করিয়া ডিবা হইতে একটা পান মুখে দিবে। আর তিনটী রহিল—দুইটী সত্যেনের, একটী সত্য নিজে হাতে তাহাকে খাওয়াইয়া দিবে।

এতক্ষণে সুপর্ণা পা মুছিয়া খাটে উঠিয়াছে—হাতে তার উপন্যাস আজ নাই ; হয় ত আছে বলাকা বইখানা—সত্যেনের উপহার। সুপর্ণা কি পড়িতেছে ? ভুলি নাই—ভুলি নাই প্রিয়া ? এ যে তাহারি কথা।

গাড়ী আসিয়া ফটকে লাগিল।

জমীদার-গৃহে গৃহিণীর রোগ। কায়দা বাঁচাইতে বাঁচাইতে ঘড়ি বাজিয়াই চলিল। ঝিকে ডাকিয়া সরকার এত্তেলা দিল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে একটী যুবক বাহির হইয়া আসিল।

ওরে চা দে—বড় ঠাণ্ডা পড়েছে। এই যাঃ—বৃষ্টি বোধ হয় এল। আজ্ঞে, মার রোগ ত বিশেষ কিছু নয়—এই একটা nervous - এই মাথাধরাটা chronic কি বলেন,এত তাড়ার কি ছিল। ওটা বুঝলেন কি না মার whim আর দেখুন, এতে রাগের কি আছে ? উপযুক্ত ফী পাবেন,—আপনাদের ত এই কাজ। ওরে কাকেও বল মেয়েদের সরে যেতে—ডাক্তার বাবুকে বাড়ীর ভেতর নিয়ে যা। এই যে ব্যাগটা খুলে দিই। কড় কড় কড়াৎ করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিল। নিকটেই কোথাও বাজ পড়িয়াছে।

* * * *

এখুনি যাবেন, সে কি মশাই, এখনো রোগীই দেখলেন না,—আপনার কর্ত্তব্য-জ্ঞানকে বলিহারী। কি আপনার কাজ মশাই, একটী পয়সা পাবেননা—জোচ্চুরীর জায়গা পাননি। ঝনঝনাৎ করিয়া পকেট হইতে মুঠা মুঠা করিয়া টাকাগুলি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সত্য পাগলের মত গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

"কাগজে একটা চিঠি লিখে দিও ত হে—আস্ত পাগল—এরকম ডাক্তার—ওর কেরীয়ার আমি খাব।" ক্রুদ্ধ অপ্রসন্ন মুখে যুবক গর্জ্জন করিল। মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়া আসিল।

ছাব্বিশ

জনহীন পথ দিয়া সত্যেন ছুটিয়া চলিতেছিল। মাথার উপরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা, অন্ধকার রাত, অচেনা পথে পদে পদে আঘাত, প্রতি মুহূর্ত্তে বাধা। বাত্যাহত একটা বৃক্ষ-শাখা আসিয়া সবলে স্কন্ধে ঠেকিয়া দূরে ছিটকাইয়া পড়িল। জামার হাতা ছিঁড়িয়া রক্ত ঝরিতেছিল। গাড়ী সে পূর্ব্বেই

ছাড়িয়া দিয়াছে, মন্থরগামী শকট অপেক্ষা তার নিজের শক্তিতে বিশ্বাস।

চলিতেছে, চলিতেছে, এ চলার আর বিরাম নাই, শেষ নাই। এ পথ আর শেষ হয়না। সুপর্ণা, সুপর্ণা, কৈ, কোথায় সুপর্ণা, ঐ না ষ্টেশনের আলোক রক্ত চক্ষু মেলিয়া নন্দন কাননে প্রহরী দৈত্যের ন্যায় তাকাইয়া আছে! আর পারা যাইতেছে না—একটু, আর একটু।

"না, আজ রবিবার, ঘন ঘন ট্রেণ আর কৈ। একটা last train ১২-৫৫ মিঃ—চুঁচুড়া—২-১৫তে পৌছবে। Bus না Bus—এত রাতে মিলবেনা।" ব্যস্ত ষ্টেশন মাষ্টার চলিতে চলিতে বর্ষাতি মুড়ি দিলেন। বেঞ্চের উপর দেহ রাখিয়া চোখ বুজিয়া সত্য জপিতে লাগিল

"এই যাই—যাই—যাই—সুপর্ণা।"

বৃষ্টি আরো জোরে নামিল, বাত্যা নৃত্য করিতে লাগিল চারিদিক ঘেরিয়া।

রাত্রি প্রায় শেষ। অবসন্ন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। রাখিয়া গিয়াছে শুধু চারিদিকে ধ্বংসের লীলাবশেষ চিহ্ন। তখনও থাকিয়া থাকিয়া বাতাস বহিতেছিল, কাঁপিয়া কাঁপিয়া যেন প্রকৃতির দীর্ঘশ্বাস।

সবলে দরজা ঠেলা দিতেই খুলিয়া গেল।

পালঙ্কের উপর এলায়িত প্রিয় দেহলতা। ঐ ত তন্দ্রাঘোরে নড়িয়া উঠিল।

ব্যাকুল বক্ষে সুপর্ণাকে জড়াইয়া ধরিয়া সত্যেন আকুল কণ্ঠে ডাকিল—

রাণী—সুপর্ণা—সু—

বাণী আর বাহির হইতে চায় না। ব্যর্থ প্রয়াসে বার'বার শুধু মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন নীলাভ কপোল বাহিয়া কাতর অশ্রু-ধারা।

সহসা প্রাণপণ চেষ্টায় সুপর্ণা চীৎকার করিয়া উঠিল—

"ওগো, আমি মরতে চাই না।"

গতিস্থিতি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ওই যে শিশু ওই পুতলি
আনন্দের ওই মূর্ত্তিগুলি
ফুলের মত সাজায় ধরায়
        হাস্য যাদের মুক্তা ঢালে,
দুদিন পরে দুদিন পরে
ধীরে কোথায় যায়রে সরে,
কোথায় মিলায় দেব-শিশু হায়
        কোন্ দিগন্ত চক্রবালে!

২

ওই যুবা দল দৃপ্তবলী
চরণে যায় ধরায় দলি'
ছুটছে যাদের জীবন-তরী
        দমকা হাওয়ায় সবল পালে,
কোথায় তাদের পুলকধারা,
কোথায় তাদের গীতের সাড়া,
মায়া ময়ূর পক্ষী লুকায়
        কুহেলিকার কুহক জালে!

৩

ওই যে বুড়ার দলটী বসে
শুক্ল সন্ধ্যা নামছে কেশে,
সূর্য্য যাদের অস্তমিত
        চন্দ্র কিন্তু জ্বলছে ভালে,
কোথায় তারা যায়রে কোথায়
ঠাঁই ঠিকানা পাইনে যে হায়
লুকায় পিতামহের সারি
        কোন নেপথ্য অন্তরালে!

৪

এমনি করেই সমাজধারা
যুগ-যুগান্ত বিরামহারা,
টুটছে যেমন ফুটছে আবার
        কমল 'কালিদহের' খালে।
ভাগ্যবন্ত কেবল দেখে
কোথায় কমল কামিনীকে,
অমৃতেরি সন্ধান পায়,
        'শালিবানের' বন্দীশালে।

ইরাবতীর তীরে

শ্রীপরেশনাথ সেন বি-এ

ইরাবতীর দুই তীরে কোথাও এমন একটি সুন্দর পল্লী কিংবা এমন একটি সুন্দর শহর গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহার ভিতরে এতটুকু জাঁকজমক নাই, অথচ সৌন্দর্য্য আছে, ঐশ্বর্য্য আছে, বিশালতা আছে। সেই শোভা-সৌন্দর্য্যের মাঝে, সেই বিশালতার মাঝে গড়িয়া উঠিয়াছে এনানজঙ। নদীর তীরে পাহাড়ের প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানটি একদা গভীর অরণ্যে পরিপূর্ণ ছিল। যাঁহারা প্রথম বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা বৃক্ষ-

শ্রীযুক্ত বৈজনাথ সিংহ

পরিপূর্ণ উপত্যকা-ভূমিকে সুরম্য বাসভূমি করিয়া তুলিয়াছিলেন, নীরব নিথর বন-ভূমিকে প্রাণময় শহরে পরিণত করিয়াছিলেন। আজ যে পথে ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, য়ুরোপ ও আমেরিকার লোক দলে দলে ভ্রমণ করিতেছে, সে পথে চলিতে এক দিন এতটুকু হিংসা-দ্বেষ ছিল না। কে প্রথম ঐ পথ তৈয়ারী করিয়াছিলেন, কে প্রথম ঐ শহর গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সে কথা এখানে বিশেষ কিছু না বলিয়া, এ যুগের রাস্তা ঘাট, নরনারী, শহর ও পল্লীর কথাই বলা যাক্।

পথ চলিতে প্রথমে যে জিনিষটি দর্শকের চোখে পড়ে, সেটি হোলো এখানকার লোকদের চলিবার গতি ও
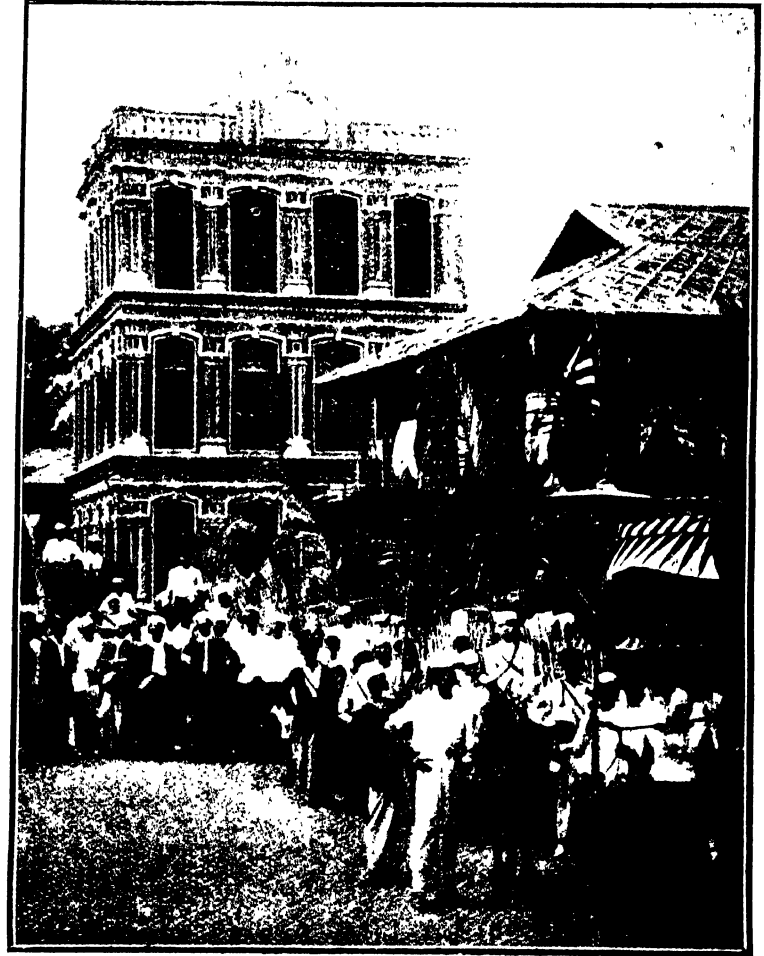
তৈলের খনির টুইঞ্জাদের এসোসিয়েশান

ভঙ্গী। গজগমনে চলিবার রীতি যদি এখনো কোথাও প্রচলিত থাকে, তবে এখানে আছে। কোথাও এতটুকু ব্যস্ততা নাই। সহজ গতিবিধির মধ্য দিয়াই সব কাজ চলিতেছে।

চিত্র-বিচিত্র ছাতা আর রঙীন রেশমী পোষাক পরিহিত নরনারীর পথ চলার সঙ্গে যেন একটি রংয়ের স্রোত পথের

পূর্ণকুম্ভ

উপর দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। পাহাড়ের উপর পথ যেখানে বেশ একটুখানি বাঁকিয়া গিয়াছে সেখানে যখন অবিরাম লোক-চলাচল হইতে থাকে, তখন ঐ পথটি সাতরঙা ইন্দ্রধনুর আকার ধারণ করে। ঐ দেশের লোকদের জীবনের আঁকবাঁকগুলিও ঠিক এমনি রঙীন ও রোমান্টিক। প্রতি দিনের পথ চলার ভিতরে যে বিশিষ্টতাটুকু আছে, তাহা উহাদের ঐ রোমান্টিক গতি।

তৈলের খনির স্বত্বাধিকারী টুইঙ্গাদের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির ভিতরে নূতন ও পুরাতন ধারার একটি চমৎকার সামঞ্জস্য রহিয়াছে। ঘরে বাহিরে তাহারা প্রাচ্য ভাবাপন্ন। টুইঙ্গারা যে স্থানটিতে বাস করে, সেই স্থানটির নাম টুইঙ্গি-মিঞ্জু। টুইঙ্গি-মিঞ্জুর স্থিতি ইরাবতীর তীরে সমতল-ভূমির উপর। ইহার একটি পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে মনে হয়, যেন সিটি অব্ প্যালেসের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। পথের দুই ধারে সুবৃহৎ অট্টালিকাগুলি বিলাসিতার চাইতে প্রয়োজনের দাবীই বেশী করিয়া জানায়। কারুকার্য্যময় কাষ্ঠনির্ম্মিত ঘরবাড়ীগুলি তকতকে। নির্ম্মাণকৌশলে চমৎকার শিল্প-নৈপুণ্য আছে। টুইঙ্গাদের ও অপরাপর লোকদের বাসগৃহ, গৃহসজ্জা ও যাবতীয় আসবাব-পত্রের ভিতরে বেশ একটুখানি তারতম্য আছে। মনোহারিত্বের চাইতে মাধুর্য্যকেই তাহারা বড় করিয়া দেখিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে কয়েকবার এখানকার প্রধান টুইঙ্গাজীর বাড়ীতে গিয়াছি, এবারও একদিন গিয়াছিলাম। প্রধানজী একখানি ফরাস বিছানায় বসিয়া আছেন, দেখিলাম। কক্ষটি সুসজ্জিত। গৃহসজ্জার জন্য প্রাচীন ও আধুনিক চিত্র আছে। পাশের কক্ষটিতে একখানি কারুকার্য্যময় টেবিলের উপর তাঁহার পিতার রচিত গ্রন্থাবলী অতি যত্নের সহিত সজ্জিত আছে। সেই কক্ষটিও সুসজ্জিত।

চাঁপাদোনের পথে

বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে এ্যাসোসিয়েশন গৃহের সুসজ্জিত তোরণ
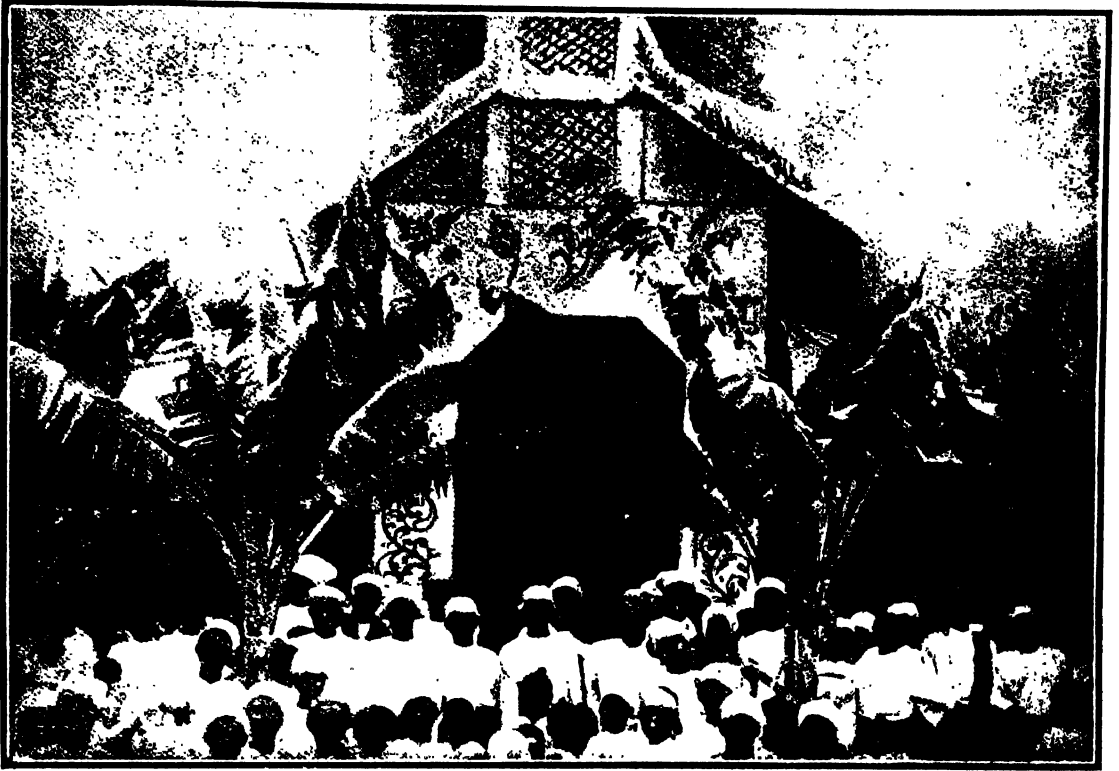
পুষ্পগুচ্ছ
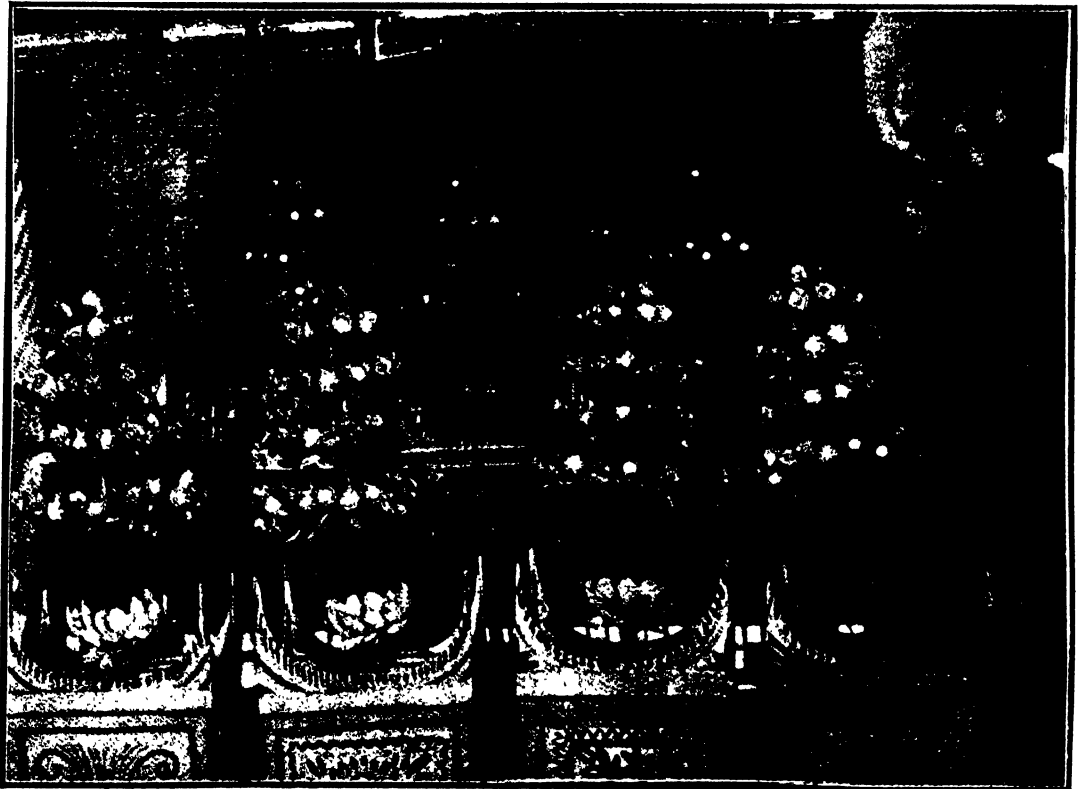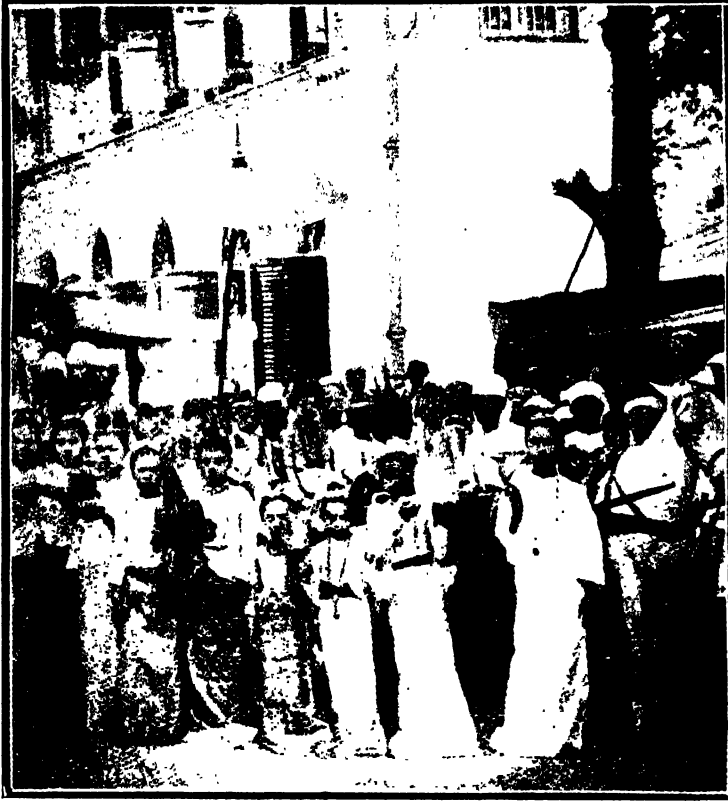
প্রধানজীর বাড়ী হইতে মেয়েরা অর্ঘ্য লইয়া বার্ষিক অধিবেশনে যাইতেছে

চলিতেছে। প্রধান টুইঙ্গাজী এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। ইহার বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যাবলীর ভিতরে তিনটি বিষয় প্রধান,—তৈলের খনির স্বত্ব রক্ষা করা, প্রাপ্ত-বয়স্ক টুইঙ্গাদের এ্যাসোসিয়েশনভুক্ত করা, এবং সর্ব্বোপরি সাহিত্যিক আলাপ আলোচনা করা। বার্ষিক অধিবেশনটিকে সাহিত্যিক উৎসব বলা চলে। বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি এবং সুধী সজ্জন এই উৎসবে যোগদান করেন।

এই সময়ে এ্যাসোসিয়েশন গৃহের প্রবেশ-তোরণটি অতি সুন্দর ভাবে সজ্জিত করা হয়। পুষ্পগুচ্ছ আল্পনা এবং মঙ্গলঘট ইত্যাদিতে পথটি নয়নানন্দকর রূপ ধারণ করে (সাজাইবার এই ধরণ-ধারণটি সম্পূর্ণ ভারতবর্ষীয় রীতিকে অনুসরণ করিয়া চলে বলিয়াই মনে হইল)। অধিবেশনের দিনে টুইঙ্গা বালিকারা অর্ঘ্য, পুষ্পগুচ্ছ ইত্যাদি বহন করিয়া আনে। স্বর্ণপাত্রে হীরকখণ্ড, পদ্মরাগ-মণি, কস্তুরী ও স্বর্ণমুদ্রা, এবং কারুকার্য্যময় রৌপ্য

সাধারণতঃ টুইঙ্গারা সরল ও বিশ্বাসী। আত্মসম্মানের দিকে তাহাদের তীব্র দৃষ্টি। আত্মসম্মান বাঁচাইতে বিনয় যেখানে লজ্জা পায়, শক্তি সেখানে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। ...আত্মকলহ হইতে সর্ব্বদা তাহারা গা বাঁচাইয়া চলিতে চায়। পাওনা থাকিলে টুইঙ্গারা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়া লয়। তাহাদের ভিতরে কেহ কেহ ঘোর অদৃষ্টবাদী।

টুইঙ্গাদের এ্যাসোসিয়েশনটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান। সভ্যদের আন্তরিকতা ও একতার প্রভাবে এই প্রতিষ্ঠানটির কাজ ভালই
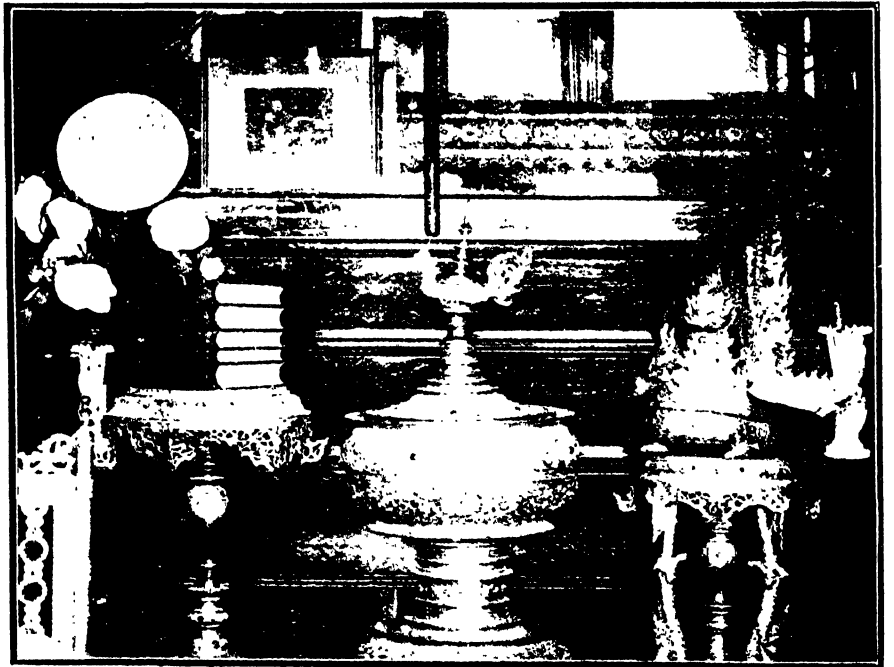
জলাধার

নির্ম্মিত কৌটায় সুগন্ধি ও চন্দনসার ইত্যাদি থাকে। ছোট বড় জলাধার গুলিতে 'পঞ্চ-পানীয়' (সুগন্ধ যুক্ত সুমিষ্ট পঞ্চরস) ইত্যাদি রাখা হয়। মাঙ্গলিক কার্য্যে উহাদের এই সমস্ত উপকরণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আছে, দেখিলাম।

সভাপতি যে মঞ্চের উপর আসন গ্রহণ করেন, তাহা পুষ্পগুচ্ছ দ্বারা সুশোভিত করা হয়। সমাগত সুধী সজ্জন বহুমূল্য গালিচা-পাতা বিছানায় বসেন। সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মাঙ্গলিক গান গীত হয়। তারপর গ্রন্থপাঠ। গ্রন্থপাঠের পর এ্যাসোসিয়েশনের আনুষঙ্গিক কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। ইহার পরে সাহিত্যিকগণ নানা রকমের প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই আসরে বালক-বালিকারা সমবেত ভদ্র লোকদিগকে চা, মিষ্টি ইত্যাদি দিয়া থাকে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে বয়োবৃদ্ধদের সম্মান দেখায়। তাহাদের উঠিবার কায়দা,

যুবক সঙ্ঘ
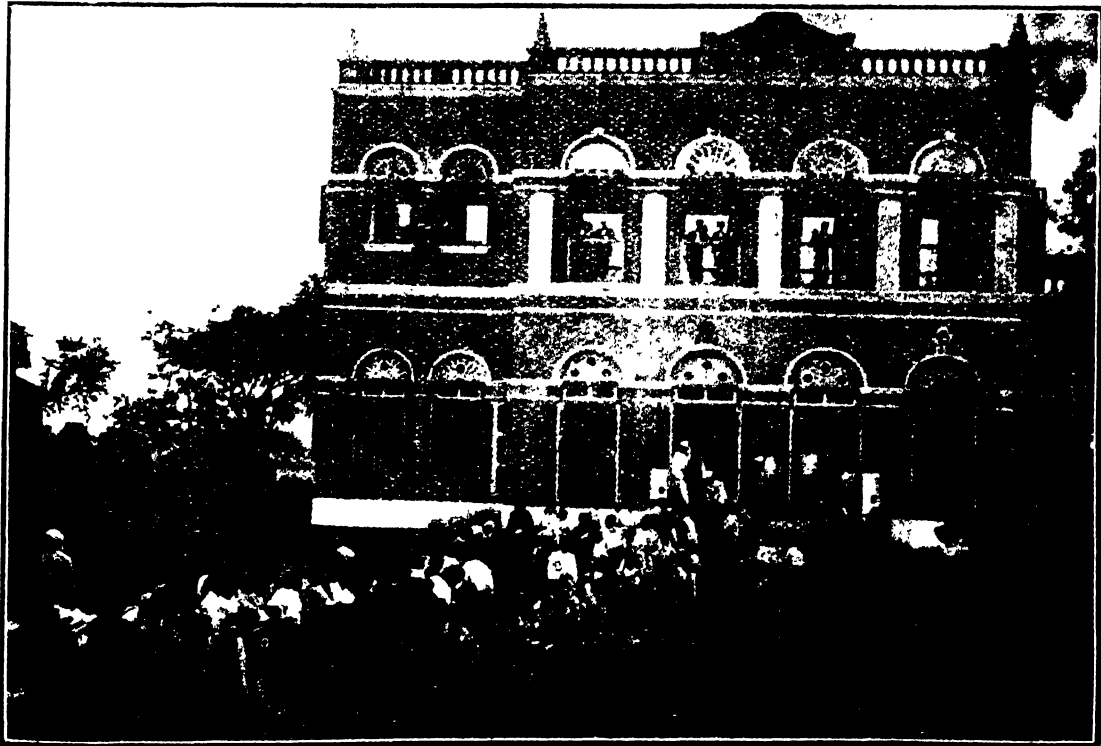
পল্লী-ভবন
(চাঁপাদোন)

বসিবার কায়দা এবং সম্মান দেখাইবার কায়দা ইত্যাদি সব-কিছুর ভিতর দিয়া অপূর্ব্ব লাবণ্য-শ্রী ফুটিয়া উঠে।

পূর্ণিমা তিথিতেই সাধারণতঃ অধিবেশন হইয়া থাকে। সেদিন রাত্রে যুবক সঙ্ঘের সভ্যগণ কন্সার্ট, গান ও ভেরাইটি এণ্টারটেন্‌মেণ্ট ইত্যাদি আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। রেঙ্গুণে ওয়াটার ফেষ্টিভ্যালের দিনে একখানি নাটক অভিনীত হইতে দেখিয়াছিলাম। এই সাহিত্যিক উৎসবের দিনেও "পুরুষ ও প্রকৃতি" নামক

প্রধানজীর বাড়ী হইতে একটী ছেলে ঘোড়ায় চড়িয়া বার্ষিক অধিবেশনে যাইতেছে

একখানি নাটক অভিনীত হইতে দেখিলাম। নাটকখানি শব্দসম্পদে ও ভাবসম্পদে অতুলনীয়।

আপার বার্ম্মায় যে কোন বড় উৎসব পূর্ণিমা তিথিতেই হইয়া থাকে। উহারা চাঁদের ভক্ত। স্রেফ্‌ জ্যোৎস্না হইলেও চলে না, পূর্ণিমার চাঁদ হওয়া চাই! সেই মধুর রজনীতে এক বন্ধু হয় তো (হয় তো কেন, নিশ্চয়ই) আর এক বন্ধুকে বলে, "ঐ দেখ, তোমার ঘরের পাশে চাঁদ উঠেছে। পূর্ণিমার চাঁদ! এসো আমরা দু'জনে ব'সে ব'সে দেখি।"...হয় তো ওটা একটা ভাব-বিলাসিতা মাত্র, অথবা সৌন্দর্য্যের সৌখীন উপাসনা! পূর্ণিমা রাত্রিতে এ দেশে ভাবের বন্যা বহিতে থাকে। দলে দলে লোক নদীর তীরে হ্রদের ধারে কেহ শুইয়া, কেহ বসিয়া ভাবের প্রাচুর্য্যে আত্মহারা হইয়া চন্দ্রকিরণ গায়ে মাখে! সুন্দর আইডিয়া!

সে যাই হোক্‌, এই উৎসবের মত বার্ম্মায় আর কোথাও এমন আয়োজন দেখি নাই। আপার বার্ম্মা ও লোয়ার বার্ম্মায় নানা বিষয়ের বিভিন্নতা আছে। উত্তরাখণ্ড হইতে ভারতবর্ষের দক্ষিণের শেষপ্রান্ত অবধি যেমন একটা স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য আছে, আপার বার্ম্মায়ও ঠিক তেমনি একটা স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য আছে। মাতা ও পুত্র, ভ্রাতা ও ভগিনী সকলেই নিজের বিশিষ্টতা বজায় রাখিতে চায়। সকলেরই একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। "বনিয়াদি" মনোভাব ও "বনিয়াদি" চাল-চলনের সব যায়গায় দেখা মিলা ভার। সুরম্য পাহাড় পর্ব্বতবাসী লোকদের এবং শ্যামল সমতল দেশের লোকদের মনোবৃত্তি ও চরিত্রগত বিশিষ্টতা সর্ব্বত্র সুস্পষ্ট। উত্তর ও দক্ষিণের এই যে পার্থক্য, ইহাতে সাহিত্য, শিল্প ও সভ্যতার সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে।

ইরাবতীর উপত্যকা ভূমির সুরম্য দৃশ্যাবলীর ভিতরে এমন একটা প্রাণের সরসতা রহিয়াছে, যাহার তুলনা নাই। স্মরণাতীত কাল হইতে ইরাবতীর তীরেই ছোট বড় শহরগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। দেশের অভ্যন্তর ভাগে সুন্দর ও প্রসিদ্ধ শহর অতি বিরল। অমরাপুরা, প্রোম, রেঙ্গুণ, মাণ্ডেলে ও এনান্‌জঙ এই পাঁচটি শহরে পৃথিবীর নানা দেশের লোক বাস করিতেছে। ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, য়ুরোপ ও আমেরিকার লোকের দেখা সকল শহরেই মিলে। এই শহরগুলি যেন কস্‌মোপলিটন্‌ শহর হইয়া দাঁড়াইয়াছে! এনান্‌জঙএ ভারতবাসীর সংখ্যাই অধিক।

খনিজ-সম্পদে ভরপুর বলিয়া এই স্থানটির এক দিকে যেমন ঐশ্বর্য্য বাড়িয়া উঠিয়াছে, অপর দিকে তেমন লোক সংখ্যা

গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে একটি ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন আছে,—সভাপতি শ্রীযুক্ত বৈজনাথ সিংহ (ইনি নাথসিংহ অয়েল কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টার)। সকল প্রদেশের ভারতবাসীকে এক সঙ্গে এক যায়গায় দেখিবার উপায় নাই। স্থানটি পাহাড় পর্ব্বতে ঘেরা বলিয়া লোকালয়গুলি স্থানে স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বার্ম্মা অয়েল কোম্পানীর আপিস বাংলা ও ঘরবাড়ীগুলি পাহাড়ের উপরে ও পাহাড়ের পাদমূলে। পাহাড়ের উপর বৃক্ষকুঞ্জের মধ্য দিয়া সুপ্রশস্ত রাস্তাগুলি শহরের কেন্দ্রস্থলে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

এ অঞ্চলে অশ্ব-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করাই প্রশস্ত। শান দেশীয় ঘোড়াগুলি শান্ত ও সহিষ্ণু। পাহাড় অঞ্চলের চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করিতে ঘোড়াগুলি ভারি ওস্তাদ। আমরা সুবিধা পাইলেই অশ্বারোহণে ভ্রমণে বাহির হইতাম। আমাদের সঙ্গী ছিল শ্রীযুক্ত বৈজনাথ সিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান বেদনাথ ও মহীনাথ।*

এবার বড়দিনের ছুটিতে (২৬শে ডিসেম্বর) শহরের উপকণ্ঠে চাঁপাদোন নামক একটি সুন্দর পল্লীতে আমরা বেড়াইতে গিয়াছিলাম। বেদনাথ ও মহীনাথ হিন্দুস্থানী বয় স্কাউটের পোষাক পরিয়াই অশ্বারোহণ করিল। আমি শান দেশীয় অশ্বারোহীদের মত একটি সাদা পাজামা পরিলাম। শান দেশীয় তাঁতের মোটা কাপড়ের তৈয়ারী পাজামাগুলি অশ্বারোহণের পক্ষে বেশ সুবিধাজনক। ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ানোটা আমাদের মনের একটা দুরন্ত খেয়াল নয়, এটা আমাদের রীতিমত অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে যাই হোক্, ইরাবতীর তীরে শ্যামল মাঠের সরল পথে চলিতে চলিতে মন বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। দূরবীণ দিয়া দেখিলাম, নদীর ওপারে কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি রথের চূড়ার মত সগৌরবে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। উপরে নির্ম্মল উজ্জ্বল আকাশ, নীচে ইরাবতীর তর্ তর্ প্রবাহ। শুভ্র কপোতগুলি সার বাঁধিয়া আকাশের

বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি ও কয়েকজন সাহিত্যিক

গায়ে গায়ে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। পাল তোলা নৌকাগুলি মৃদু মন্থর গতিতে সামনের দিকে চলিয়া আসিতেছে। এখান হইতে যাবতীয় দৃশ্য আলেখ্যের মতই সুন্দর দেখাইতেছিল।

সেদিনের সেই নাতিশীতোষ্ণ প্রভাতে উজ্জ্বল রৌদ্র আকাশে, ধরায় এক অপূর্ব্ব শ্রী দান করিয়াছিল। পল্লীর অদূরে ঐ পাহাড়ের চুড়া, বনভূমির বৃক্ষকুঞ্জ, আর ইরাবতীর স্বচ্ছ প্রবাহ সন্তোষজনক উজ্জ্বলতা লাভ করিয়াছিল।

'ফাও-ড' পল্লীতে গোয়ালা গোয়ালিনীর সংখ্যাই অধিক। পল্লীটির আঁচল ঘিরিয়া ইরাবতী প্রবাহিত হইতেছে। পোপা (এলিফেণ্টা) পাহাড় হইতে একটি গিরিনদী নামিয়া আসিয়া ইরাবতীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে।

---

* এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে যে, শ্রীযুক্ত বৈজনাথ সিংহ মহাশয়ের বাড়ীর ছেলেদের সকলের নামের সঙ্গেই একটি "নাথ" সংযুক্ত আছে। যেমন, বেদ-নাথ মহী-নাথ লক্ষ্মী-নাথ ইত্যাদি।

বহুদুর-বিস্তৃত তালীকুঞ্জ। তালীকুঞ্জের মধ্য দিয়া যে সরল সোজা পথটি চলিয়া গিয়াছে, আমরা সেই পথ ধরিয়া চলিলাম। পথে একটি পদ্ম-দাঘি দেখিলাম।

ইরাবতী তীরের অপর দৃশ্য (নৌকায় মহীনাথ ও বেদনাথ)

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে ইহাদের আশ্চর্য্য রকমের দৃষ্টি। বেদনাথ এসব দেখিয়া শুনিয়া, বিশেষতঃ 'পূর্ণকুম্ভ' গুলি দেখিয়া খুসী হইয়া বলিল, "আজ আমাদের যাত্রা শুভ! নতুন বছরটাও কাটবে ভালো।"

মহীনাথ বলিল, "তাই না কি!"

বেদনাথ বলিল, "হাঁ, আমার তো তাই মনে হচ্ছে।"

আমি বলিলাম, "বেশ, তাই হোক্।" তার পর কথা বলিতে বলিতে গিরিনদীর উপর দিয়া ঘোড়া চালাইয়া সামনের দিকে যাওয়া গেল। যাইতে যাইতে এমন একটি যায়গায় পৌছানো গেল যেখানে কেবল সারি সারি বৃত্ত। বৃত্তগুলি জলে পরিপূর্ণ। মহীনাথ বেদনাথকে বলিল, "তুমি এক লাফে এই বৃত্তগুলি পার হ'তে পারো?"— "নিশ্চয়ই পারি" বলিয়া বেদনাথ অবলীলা ক্রমে বৃত্ত-গুলি অতিক্রম করিল। গিরিনদী পার হইয়া

দীঘির শুভ্র স্বচ্ছ জলে দুই একটি পদ্ম ফুটিয়া আছে। (শীতের ভোরে পদ্ম! আশ্চর্য্য নয়, ফুটিতেও পারে)। দীঘির পারিপার্শ্বিক দৃশ্যগুলিও অতি মনোরম!

গিরিনদীর তীরে গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা যে খুব আশ্চর্য্যজনক তা' নয়, কিন্তু চমৎকার! দেখিলাম, জলসেচের ধারার মত একটি নির্ম্মল স্রোত বালির উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। কোথাও বালি কেবল বালি, যেন মরুভূমি!!! বালক-বালিকারা বালি সরাইয়া পানীয় জল সংগ্রহ করিতেছে। অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত যেন ইহার জলধারা প্রবাহিত হইতেছে; বালি জলকে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

বালি সরাইয়া বৃত্তাকারে খানিকটা যায়গা করিয়া লওয়া হয়, তাহাতে যে জল উঠিতে থাকে তাহা কলের জলের চাইতেও পরিষ্কার! এ অঞ্চলের সাধারণ লোকগুলির তুচ্ছ ব্যাপারেও সৌন্দর্য্যবোধ অতি প্রশংসনীয়। জল সংগ্রহ করিবার জন্ম যে বৃত্তটি রচনা করা হয়, তাহার
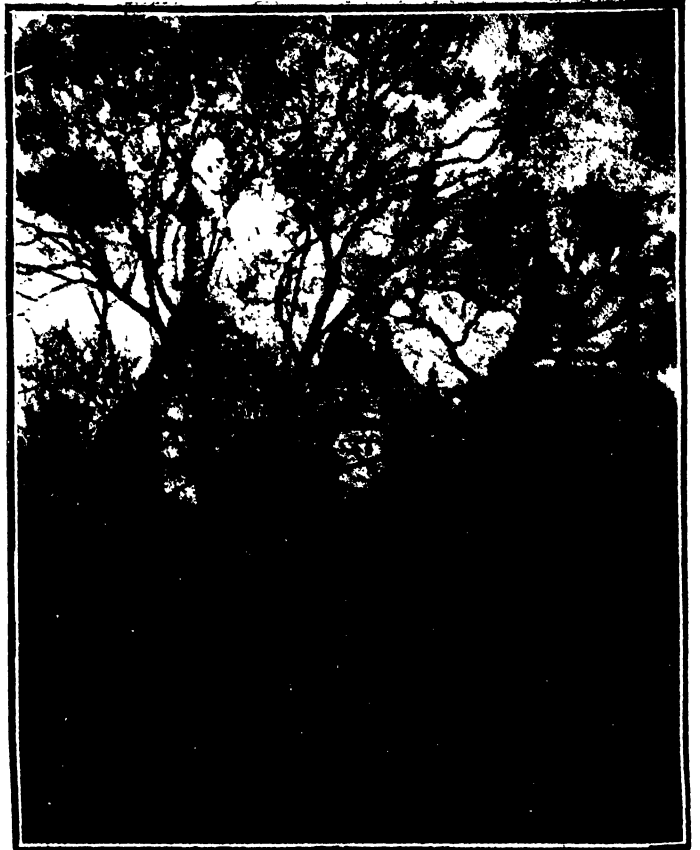
চাঁপাদোনের দিকে আসা গেল। চাঁপাদোনের প্রবেশ-পথে একটি সুন্দর তোরণ দেখিলাম। এই পল্লীতে প্রধান টুইঙ্গাজীর একখানি বাড়ী আছে। সেই বাড়ীতে পল্লী-সমিতির কাজ চলিতেছে। আমরা সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম।

চাঁপাদোনের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি স্তরে স্তরে পাহাড়ের সারি, বহুদূর বিস্তৃত বনভূমি, শ্যামল সমতল শস্যক্ষেত্র, শাল, তাল ও নারিকেল-কুঞ্জ, দৃশ্যের পর দৃশ্যের এই অপূর্ব্ব সমাবেশ মনের ও চোখের সাম্‌নে আলেখ্যের মতই সুন্দর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইরাবতী তীরের এই দৃশ্যগুলির ভিতরে এমন একটা প্রাণের সরসতা আছে, যাহার তুলনা নাই। ইরাবতী তীরের অধিবাসীরা স্বভাব শিশুর মত শোভা সৌন্দর্য্যের মাঝে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত। ইরাবতী প্রবাহের উপর দিয়াই দেশের জয়ের পথ।

উত্তরায়ণ

শ্রীঅনুরূপা দেবী

২৫

যে বৌকে অত কাণ্ড করিয়া ঘরে আনা হইল, তাহার সংস্কার ও সংগঠনের ভার মহামায়া পূর্ণোৎসাহেই নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছিলেন; এবং একান্ত ভাবেই তাহার শিক্ষায় মনোযোগী হইয়াছিলেন। স্বর্ণলতা প্রথম ভাগের মিশ্র বানানগুলি সবেমাত্র আরম্ভ করিয়াছিল, বেশি দূর তখনও অগ্রসর হইতে পারে নাই। মহামায়া নিজেই আহারাদির পর তাঁর স্বল্পবিশ্রাম অবসরে বধূকে লইয়া পড়াইতে বসিতেন। শুধু পড়ানই নয়,—নামতা, কড়াকিয়া, পনকিয়া প্রভৃতি ধারাপাতের প্রাথমিক শিক্ষা এবং সেই সঙ্গেই ইংরেজির A B C D ধরাইয়া, দশ দিনের মধ্যেই হায়রাণ হইয়া পড়িয়া, তাঁর বাড়ীর সবচেয়ে পুরাতন কর্ম্মচারীকে বধূমাতার শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়া দিয়া নিজে অবসর গ্রহণ করিলেন। এদিকে গান-বাজনা, সেলাই, বোনা ও সাংসারিক কাজ-কর্ম্মেরও শিক্ষা চলিতে লাগিল। এগুলি মহামায়া নিজের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া একজন শিক্ষয়িত্রী দ্বারা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিন্তু হইলে কি হয়—বৎসর কাটিলে দেখা গেল, বৌমার দ্বিতীয় ভাগের বানান দোরস্ত হইল না, ফার্ষ্টবুকের ঘোড়ার পাতা পর্য্যন্ত পড়া অগ্রসর হইয়া বারেবারেই পিছনে ফিরিয়া আসিতে লাগিল; এবং নামতায় ক্রমাগত ভুল করিতে করিতে দশের কোঠা পর্য্যন্ত উঠিয়াই ও-বিদ্যা আর কিছুতেই উপরের দিকে উঠিতে না চাওয়ায়, অগত্যা ঐখানেই ইতি করা হইয়া গেল।

মহামায়া তাঁর যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। শিক্ষকের পর শিক্ষক এবং শিক্ষয়িত্রীর পর শিক্ষয়িত্রী বদল করা হইতে লাগিল। দিন কতক ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষার জন্য একজন মেমকে পর্য্যন্ত রাখা হইল। কিন্তু স্বর্ণ মেম দেখিয়া এমনই জড়াইয়া যায় যে, তার যেটুকু বা বুদ্ধি-শুদ্ধিও থাকে, তাও যেন লোপ পাইয়া যায়। মেমের মুখের ইংরেজী তো দূরের কথা,—তার ভাঙ্গা বাংলার বুলিও সে একবর্ণ ধরিতে পারে না,—উল্টিয়া ভয়ে ভাবনায় ঘাবড়াইয়া তার মাথা ধরিয়া উঠে ও গা ঝিম্‌ঝিম্ করিতে থাকে। এমন কি, এই মেম-বিভ্রাট এড়াইবার চেষ্টায় সে নিত্য নিত্য রোগের অছিলা তুলিয়া বিছানায় শুইয়া থাকিতে আরম্ভ করিল। দেখিয়া শুনিয়া মহামায়া মেমকে বিদায় দিয়া আর একবার নিজের হাতেই বধূ-শিক্ষার মহাভার গ্রহণ করিলেন, এবং এবারেও সেবারের মতন অল্প দিনের মধ্যেই হালছাড়া হইয়া আবার স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। মনে মনে তাঁহাকে স্বীকার করিয়া লইতেই হইল যে, মুখের ও দেহের উপরটা আশ্চর্য্য সুন্দর হইলেই তার ভিতরের দিকটাও যে তেমনই সৌন্দর্য্যময় করিয়া সৃষ্টি করা থাকিবে, এমন কোন নিয়ম নিশ্চয়ই সৃষ্টিকর্ত্তার বিধানে করা নাই, এবং উপরের সৌন্দর্য্যের চাইতে ভিতরকার বুদ্ধি-বৃত্তিটাই সংসার চলিবার পক্ষে সমধিক প্রয়োজনীয়।

স্বর্ণলতাও এ বাড়ীতে আসিয়া যতটা আনন্দ বোধ

করিয়াছিল, কার্য্যক্ষেত্রে তার সে আনন্দটাতেও অনেকখানি গলদ ঘটিতেছিল। ছোটবেলা হইতে সে ঠাকুরমায়ের বিশেষ আদুরে। আমাদের দেশে আদুরে মেয়ের পরিচয় দিতে গেলে আমরা প্রায়ই বলি, অমুক এত আদরে মানুষ হয়েছে যে, জলঘটিটা কখনও গড়িয়ে খায়নি; তা স্বর্ণর বেলায় এই উপমাটা ঠিক চৌচাপটেই ঘটিয়াছিল। বাস্তবিকই সে তার বাপের বাড়ীতে কোনদিনই জলঘটিটা গড়াইয়া পান করে নাই,—আর কিছু করা তো দূরের কথা। একে বাড়ীর প্রথম মেয়ে, তায় অপূর্ব্ব সুন্দরী,—তার উপর কম বয়সেই বাপ মারা গেল। ঠাকুরমা পুত্র-শোকে গভীর উচ্ছ্বাসে প্রাণ-মন দিয়া পুত্রের স্মৃতিচিহ্ন বলিয়া ইহাকেই সর্ব্বান্তঃকরণে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। চির আদুরে স্বর্ণলতা এখন তাঁর চক্ষের মণি, বক্ষের পাঁজর হইয়া উঠিল। তার প্রশ্রয় ও প্রতিপত্তির সীমা রহিল না, এবং সেই অসম্ভব আদরে তাহাকে সব দিক দিয়া যেন পঙ্গু করিয়া রাখিল। অতখানি বয়স পর্য্যন্ত সে কখন নিজের হাতে ভাত খায় নাই। একলা ঘরে শুইলে পাছে ভূতের ভয়ে ডরাইয়া উঠে, তাই ঠাকুরমার গলা ধরিয়া তাঁকে পাশবালিস করিয়া না শুইলে তার ঘুম আসিত না। বঁটি, জাঁতি এই সব মেয়েলী অস্ত্রে পাছে সে কাটিয়া খুন হয়, সেই ভয়ে স্নেহময়ী ঠাকুরমা তাকে কোনদিনই ওসব স্পর্শ করিতে দেন নাই। বিধবা মা একাদশীর উপবাস করিয়া অসুস্থ শরীরে রান্না করিয়াছেন,—আইবুড় কচি মেয়ে পাছে পুড়িয়া যায়, সেই আশঙ্কায় মেয়ের ঠাকুরমা মেয়েকে কোন দিনই মায়ের এতটুকু সাহায্য করিতে পাঠান নাই, মাও কখন দাবী করেন নাই। এমনই করিয়াই নিরাপত্তিতে, নিরুদ্বেগে তার জীবনযাত্রা চলিতেছিল। কাজের মধ্যে ছিল পাড়া-বেড়ান এবং পুতুল-খেলা বা বৌ বৌ খেলা—আর না হয় তাস বা গোলকধাম। ঠাকুরমা যখনই কোন তীর্থে গিয়াছেন, উভয়তঃ আকর্ষণে অথবা কাঁদিয়া কাটিয়া স্বর্ণ তাঁর সঙ্গ লইয়াছে। যেখানে যেটা ভাল জিনিস পাইয়াছেন, সাধ্যাতীত হইলেও ঠাকুরমা নাত্নীর জন্য কিনিয়া দিয়াছেন। এর জন্য হয় ত তাঁর আফিং ও দুধের পয়সায় টান পড়িয়াছে। তাই স্বর্ণ জানিয়াছিল, পৃথিবীতে সে একটা বিশেষ দাবী লইয়াই আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এর সর্ব্বত্রই তার পাওনা আছে, দেনা নাই। তার পর ধনী-গৃহিণী মহামায়ার যাচিয়া সাধিয়া তাকে তাঁর বিদ্বান সুন্দর সুস্থ ছেলের জন্য বিনাপণে ঘরে আনায়, সেটা সম্পূর্ণরূপেই প্রমাণিত হইয়া গিয়াছিল। সমস্ত পরিবারের সঙ্গে স্বর্ণরও ইহাতে গর্ব্বের সীমা ছিল না; এবং সে তাঁদের মতই এর জন্য তার অনন্যসাধারণ সৌন্দর্য্যকেই পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দিয়াছিল।

কিন্তু এখানে আসিয়া স্বর্ণলতা সর্ব্বপ্রথম আঘাত খাইল তার নিজের স্বামীর কাছেই। যে সোনাকে দেখিলে তার বন্ধুদের স্বামীরা তার উপর হইতে তাদের চোখ ফিরাইয়া লইতে পারে না, পথে বাহির হইলে তাকে দেখার জন্য ভিড় জমিয়া যায়, সেই রূপসী স্বর্ণকে নিজের করিয়া লইয়াও তার স্বামী যেন তার দিকে চাহিয়া দেখার অবসর করিতেই পারিতেছিলেন না! এত কিসের তাঁর ব্যস্ততা বা নির্লিপ্ততা? সংসারের কাজকর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে আর যতই কেন না অজ্ঞ হোক, নব-বিবাহিত পুরুষদের সম্বন্ধে স্বর্ণলতা মেয়েটীর অনভিজ্ঞতা আদৌ ছিল না। তার মিতিন, সই, চাঁপাফুল, মিষ্টিহাসি, চাঁদের আলো এবং ফাগের রং কয়টী তার অভিজ্ঞতার কেন্দ্র,—এদের পরিচয় সে খুঁটিয়া খুঁটিয়া সবই পাইয়াছিল। কিন্তু তার নিজের স্বামীটীর সঙ্গে এদের মধ্যের কাহারও যেন কোনখান দিয়াই মিল ছিল না। তারা ফুলশয্যার রাতে নিজেরা যাচিয়া কথা কহিয়াছে,—অযাচিত হইয়াই স্ত্রীকে সোহাগ করে, ছুতায় নাতায় স্ত্রীর কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়ায়, সময়ে অসময়ে আড়াল পাইলেই একটী কথা, একটু হাসি, এতটুকু স্পর্শ বিনিময় করিয়া যায়। তাদের মনোজগতে যেন ঐ একটী তরুণী, একটী কিশোরী, বা যুবতীই 'সৃষ্টিরাদ্যা বিধাতুঃ'; যেখানে যা পায়, এরই জন্য সঞ্চয় করে, যেখানে যা দেখে, এরই কাছে নিবেদন করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হয়। সুন্দরী স্বর্ণলতার স্বামী কিন্তু ঠিক এ-রকম নয়, সেটা স্বর্ণ তার প্রথম শুভদৃষ্টির সময়েই আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিল। বাসরঘরে তার আর কোনই ভুল ছিল না। পাঁচজনে বলিল, বড়লোকের ছেলে—এ বাড়াতে এসে ওর ঘেন্না করচে;—সেও তাই বিশ্বাস করিয়াছিল; কিন্তু নিজে সে তার রূপবান স্বামীটীকে সম্পূর্ণভাবেই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। সে পুরুষের মধ্যে এর আগে এত ভাল চেহারা দেখে নাই; অথচ শুনিয়াছিল, তার বাপের চেহারা অত্যন্তই সুশ্রী ছিল,—সে নিজে তার বাপের মত দেখিতে হইয়াছে! নিজে রূপসী বলিয়া তার মনে একটু

সঙ্কোচ ছিল, পাছে তাকেও তার চাঁপাফুলের মত বর, কালো কুৎসিত বর আসিয়া আয়ত্ত করে। চাঁপা যা তার বরকে জবাব দিয়াছিল, সে হয় ত তা পারিত না, হয় ত কাঁদিয়া ফেলিত।

তা' শিবঠাকুর তো বরটী খুব ভালই দিয়াছিলেন। বয়স কম, চেহারা ভাল, ঐশ্বর্য্যও যথেষ্ট, জা ননদ পাঁচটা ঘরে নাই। ঠাকুরমাও তো এতদিন ধরিয়া ঠিক এই রকমটীই খুঁজিতেছিলেন,—কিন্তু সব হইলেও স্বর্ণর মনে একটা ভারী খুঁৎ রহিয়া গেল,—সেটা তার সঙ্গে সলিলের কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক খাপছাড়া ব্যবহার। এদিকে সে তাকে যত্ন স্নেহ না করে তা'ও নয়,—কথাবার্ত্তা বেশ সরস করিয়াই কয়; কিন্তু তবু যেন তার এই ব্যবহারের মধ্যে তার বন্ধু-পতিদের ব্যবহারের ছায়াপাত করে না। এ যেন আর এক ধরণের আর এক জগতের জিনিস। স্বর্ণলতার যেন এর সঙ্গে সঠিক পরিচয় ছিল না, আজও নাই। এর যেন একটা সীমা টানা আছে,—মাপ আছে,—গণ্ডী দিয়া এ যেন একটুখানি সঙ্কীর্ণতার মধ্যেই ঘেরা,—এদের বাহিরে তার যেন এতটুকুখানিও জায়গা নাই—এটা সে স্পষ্টই বুঝিতে পারে। সুন্দরা যখন আসে, সলিল কতখানি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া তার দিদির সঙ্গে অনর্গল কথা কয়,—হাস্যপরিহাস, গল্প-গানে দুই ভাই-বোনে কি মশগুলই হইয়া থাকে। মার সঙ্গে সলিলের কথার কখন শেষ হয় না। কত কট্‌মটে, খট্‌খটে শব্দ দিয়াই তারা যখন তখন মাতাপুত্রে বাক্যালাপ করে। এক এক দিন খাতাপত্র ও দেওয়ানজীকে লইয়া তাদের অর্দ্ধেক রাত্রিই কাটিয়া যায়,—স্বর্ণ বিছানায় জাগিয়া পড়িয়া স্বামীর প্রতীক্ষায় ছটফট করিতে থাকে,—মা হয় ত বারেবারেই ছেলেকে শুইতে যাইতে আদেশ দেন,—সলিলের দৃক্‌পাত নাই,—সে খাতা পড়িতেছে, মন্তব্য করিতেছে, মধ্যে মধ্যে হাসিয়া উঠিতেছে,—উঠিবার আগ্রহই নাই! হয় ত বিছানায় ঢুকিয়া চুপচাপ শুইয়াই পড়িল। নয় ত স্বর্ণর জাগ্রতাবস্থা জানিতে পারিয়া তার দিকে ফিরিয়া একটু আদর দেখাইয়া বলিল,—

"এত রাত অবধি তুমি জেগে আছ? এখন ঘুমাও। আমায় আবার ভোরে উঠে একটু কাজে যেতে হবে।"

অভিমানে স্বর্ণলতার গলা বুজিয়া চোখ ভরিয়া ওঠে, সে তার সকল প্রত্যাশা ভুলিয়া কাঠ হইয়া পড়িয়া থাকে।

এর উপর তার আরও বেশি জ্বালা হইয়া উঠিয়াছিল—তার শাশুড়ী। এই স্নেহময়ী শাশুড়ীই তো তাকে নিজে দেখিয়া আদর করিয়া কাছে আনিয়াছেন,—সে কি এই রকম করিয়া তাকে দগ্ধিয়া মারিবার মতলবে? এতখানি বয়সের মেয়ে সে, এখন কি না ছোট্ট একটী স্কুলের ছেলের মত সে দিন নাই রাত নাই, বই পড়িবে, নামতা বলিবে, শ্লেট পেনসিল লইয়া ক খ, এবং A B C লিখিবে! লজ্জায় যে মরিতে ইচ্ছা করে! মুখ দিয়া তার speed বা spleen শব্দটা হয় ত কিছুতেই বাহির হইতেছে না,—মাষ্টার মশাই কখনও নরমে কখনও গরমে বারবার করিয়া বলিয়া দিতেছেন,—হয় ত দরজার সামনে দিয়া সলিল একটুখানি টেপা হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল। রাত্রে দেখা হইলে হয় ত বা সেই রকমই ব্যঙ্গভরে মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"কি সোনা! Spleenটা আয়ত্ত হলো, না হলোই না?"—এই কি পত্নী-সম্ভাষণ? কোথায় তার মত সুন্দরীকে আদরে সোহাগে বুকে বুকে মুখে মুখে রাখিয়া মুগ্ধ চোখে চাহিয়া থাকিবে, তা' নয়, তার মূর্খতা লইয়া যখন তখন আভাসে ইঙ্গিতে পরিহাস ও তাচ্ছিল্য! স্বর্ণলতার আত্মাভিমান গুরুতর রূপেই আহত হইতে লাগিল। তার এত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সবই যেন এই শিক্ষা-শাসনের দ্বারা দিনে দিনেই নিরর্থক বোধ হইতে লাগিল। শাশুড়ীর প্রাণপণ চেষ্টা যত্নকে তার কঠোরতা বলিয়াই ঠেকিল,—তার মন তাঁর প্রতি একান্ত ভাবেই বিরূপ ও বক্র হইয়া উঠিতে লাগিল। সেও যথাসাধ্য তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর ধরিবার জন্যই তৈরি হইয়া রহিল। ইচ্ছা করিয়া সে তার শাশুড়ীর ত্রিসীমানার মধ্যেও যাইতে চাহে না। তিনি ডাকিয়া লইলেও তাড়াতাড়ি পলাইয়া আসে, ঝিয়েদের কাছে বলিয়া দেয়, "বল গে, আমি শুয়ে আছি, আমার শরীর ভাল নেই।" অথবা বলিয়া উঠে, "বাবা! একটু জিরোচ্চি, তাও সইলো না! বড়লোকের বাড়ী পড়ার চেয়ে গরীব হওয়া ভাল। চব্বিশ ঘণ্টা অত তাড়া থাকে না বাবু!"

মহামায়া বধুকে আরও সব শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রন্ধন-বিদ্যা শিখাইবার জন্যও চেষ্টা করিয়াছিলেন; স্বর্ণ কিন্তু ইহাতে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করিল। সে রান্নার কথায় একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে

বলিল "হ্যাঁ রাঁধবো, গোবর নিকোব, পাইখানা ধোব,—বড়-লোকের ঘরে এসে তো আমার সকল সুখই হয়েছে। রাঁদতে শিখলে এইবার বাড়ীর হাঁড়ি হেনসেলের ভার আমার গলায় এসে পড়ুক আর কি! আমি বাবু, রাঁদতে পারবো না।"

মহামায়া শুনিয়া মনের মধ্যে চটিলেও বাহিরে ধৈর্য্য হারাইলেন না, নিজে আসিয়া আদর করিয়া বধূকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, এ রান্না সে রকম নয়, তোমার ঘাড়ে কখন এত বড় সংসারের রান্নার ভার দিতে পারি? এ শুধু একটু একটু সৌখীন রান্না, খাবার করা—এ-সব ভাল ঘরের মেয়ে বৌকে শিখে রাখতেই হয়। সলিলকে সখ করে কোন দিন একটা রেঁধে খাওয়ালে, লক্ষ্মী মা আমার! সব তাতেই উল্টো করে দেখতে আছে কি?"

স্বর্ণ চোখ মুছিতে মুছিতে শাশুড়ীর দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া কাটা-কাটা করিয়া জবাব করিল—

"অত শেখার আমার দরকার নেই, আমি কি পুড়ে মরতে শেষে তোমাদের ঘরে এসেছিলুম? আগুন তাতে গেলে আমার মাথা ধরবে। রোজ রোজ মাথা ধরে আমার চুল গুলো সব উঠে যাক, যেমন আমার মার গেছে!"

মহামায়ার কথায় উপর কেহ কখন প্রতিবাদ করিতে ভরসা করে নাই; তাঁর পরিবারস্থ সকলেই জানিত—এইটাই তাঁর সবচেয়ে অসহ্য। বধূর কথায় মুখখানা তাঁর রাঙ্গা হইল, কিন্তু তিনি আত্মদমন করিয়া লইলেন, শান্ত কণ্ঠেই কহিলেন,—

"এ তোমার ভুল বিশ্বাস বৌমা! সামান্য একটু রাঁধতে গেলে কারু মাথা ধরে না, মাথার চুলও উঠে যায় না। দেখনি কি সুন্দরার মাথায় কত চুল, ও তো বাড়ীর সমস্ত জলখাবার নিজের হাতে না ক'রলে থাকতে পারে না,—হাজারো লোক থাক, নিজেই করে।"

স্বর্ণলতা এই তুলনা-মুলক আলোচনায় বিরক্ত হইয়া কহিল "আপনাদের অভ্যাস আছে, আমার নেই, কি করবো? আগুন দেখলে আমার ভয় করে। আমি পারবো না।"

আগের কালে অবস্থাপন্নের সংসারে দুস্থ আত্মীয়-আত্মীয়া অনেকেই আশ্রয় পাইত, এখনও কদাচিৎ পায়। মহামায়া তাঁর বাপকুলের এবং শ্বশুরকুলের অনেককেই তাঁর সংসারে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছিলেন,—শাশুড়ীকে এড়াইয়া স্বর্ণলতা তাঁদের মধ্যের কাহারও কাহারও সহিত সখ্য স্থাপন করিয়াছিল। শাশুড়ীর বিরুদ্ধে তাঁদের কাছে সে বেশ তীব্র করিয়াই সমালোচনা করিত। বলা বাহুল্য, সেগুলি তার শাশুড়ীর কর্ণগোচর হইতে বেশি দেরি হইত না। আবার মহামায়া সে-সব শুনিয়া যদি রাগ করিয়া কোন একটা কথাও বলিয়া উঠিতেন, তৎক্ষণাৎ সেটুকু বধূর কাণের গোড়ায় ফিরিয়া আসিত এবং সেই একটা কথার বিনিময়ে স্বর্ণ হাজারটা কথা শুনাইয়া দিত। এমনই করিয়া বৎসর না ঘুরিতেই মহামায়া তাঁর স্বখাত সলিলে ডুবিয়া রীতিমতই হাবুডুবু খাইতে খাইতে তীব্র অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন এবং ভগবানের কাছে নিয়ত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—যেন বধূর সুমতি হয়, যেন ইহাকে লইয়া সলিল অসুখী হয় না, তাঁহার সঙ্গে সে যে ব্যবহারই করুক, সলিলকে যেন দুঃখ না দেয়। কতবারই মনে পড়িয়াছে সুন্দরার সেই কথা—"তার মা নেই, সে তোমার হ'য়ে যাবে, এ বিয়েয় সলিলও সুখী হ'বে"—

কতবার ইচ্ছা হইয়াছে সুন্দরাকে আরতির সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া তার কি অবস্থা ঘটিয়াছে একটু জানিয়া লয়েন, কিন্তু লজ্জায় বাধিয়াছে। কতবার মনে হইয়াছে মেয়েটী সুখী হয় নাই। হয় ত তারই দীর্ঘশ্বাসে তাঁর সংসারে এই অশান্তি। কিন্তু উপায় কি? এ যে তাঁর সাধের কাজল! মুখ যদি আজ তাতে কালো হইয়া উঠে, কে কি করিবে? (ক্রমশঃ)

সমাজে অর্থসমস্যা ও স্ত্রী-সমস্যা

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র বি-এ, এটর্ণী-এট-ল

আহার ও কামচরিতার্থতার উপর জীব-জগৎ প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই দুইটী জীব-মাত্রেরই (উভয় যোনির জীব ছাড়া) মুখ্য অভাব। বিশ্রাম পাওয়া (নিদ্রা)ও আর একটী মুখ্য অভাব। উচ্চ জীবেদের সন্তানেরা অত্যন্ত অসহায় হইয়া জন্মায় বলিয়া মাতা কিম্বা পিতা বা উভয়ের ভালবাসা সাহায্য ও যত্ন না পাইলে তাহারা মরিয়া যায়; সুতরাং তাহাদের ভালবাসা পাওয়াও তাহাদের মুখ্য অভাব। যাহাদের সন্তানেরা অত্যন্ত অসহায় হইয়া জন্মায় ও বহুদিন অসহায় ভাবে থাকে, তাহাদের মাতা ও পিতা উভয়েরই ভালবাসা, সাহায্য ও যত্নের আবশ্যক হয়, তাহা না পাইলে মাতাদের ও সন্তানদের অত্যন্ত কষ্ট হয়, অনেকেই মরিয়া যায়। সভ্যতা বিকাশের সহিত মানুষের শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারাও আর একটী অভাব—এক্ষণে মুখ্য অভাবে পরিণত হইয়াছে। এই নিমিত্ত আচ্ছাদন ও আবাস স্থান পাওয়াও এখন আমাদের মুখ্য অভাব। এই সকল অভাব মোচন না হইলে মানুষ বাঁচিতেই পারে না। স্ত্রীলোকেরা মাতৃত্বের নিমিত্তও বড় লালায়িত; তাহাদের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাতৃত্বের উপযোগী করিয়া গঠিত। তাহারা মাতা হইতে না পাইলে তাহাদের জীবনই যেন ব্যর্থ হইয়া যায়। সুতরাং ইহা তাহাদের মুখ্য অভাবের ভিতর গণ্য। আমাদের অন্য সকল অভাবই গৌণ অভাব। আমাদের গৌণ অভাবের অন্ত নাই। সভ্যতা বিকাশের সহিত আমরা অনেক গৌণ অভাব পূরণ করিতে পারি বলিয়া, তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া, আমরা অনেকেই মুখ্য অভাবের ন্যায় তাহাদেরও বশবর্ত্তী হইয়া পড়ি। সেগুলি না পাইলেও আমরা সুখে থাকিতে পারি না। সুতরাং প্রধানতঃ যাহাতে সমাজের সকলেই মুখ্য অভাবগুলি পূরণ করিতে পারে তাহা দেখা উচিত; এবং যে পরিমাণে যে সমাজ সকল লোকের সেই মুখ্য অভাবগুলি পূরণ করিতে না পারে, সেই সমাজ তত অসম্পূর্ণ। কতকগুলি লোক তাহাদের অনেক গৌণ অভাব পূরণ করিবে আর বাকীগুলি তাহাদের মুখ্য অভাবগুলিই পূরণ করিতে পাইবে না—ইহা ন্যায়সঙ্গতও নয় এবং বাঞ্ছনীয়ও নয়। সকলেরই মুখ্য অভাবগুলি পূরণ করিয়া তবে গৌণ অভাব সকল পূরণ করা ও অন্য নানা দিকে উন্নতির চেষ্টা করা উচিত। এই মূল তত্ত্বটি স্মরণ রাখিয়া নানা প্রকার সমাজ গঠন পদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। অনেক প্রকার সমাজ গঠন পদ্ধতি এতাবৎকাল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে মূলতঃ ব্যক্তিতান্ত্রিক (individualistic) সমাজ এতাবৎ পাশ্চাত্য জগতে প্রবর্ত্তিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পাশ্চাত্যে বিশেষতঃ ইংলণ্ডে এই ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজের চরম বিকাশ হইয়াছিল। পাশ্চাত্য জগতের উন্নতি ও প্রভাব দেখিয়া আমরা সেই সমাজাদর্শ আমাদের সমাজ-গঠন-আদর্শ অপেক্ষা ভাল মনে করিয়া আমাদের পুরাতন সমাজ-গঠন ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি। তাই একবার দেখা যাউক, তাহাতে আমাদের কোন বিশেষ সুবিধা হইবার প্রত্যাশা আছে কি না।

দেখিতে পাওয়া যায় যে, পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য সমাজ ও অল্প-বিস্তর অনেক লোকই দারিদ্র্যভারে পীড়িত। তাহাদের জীবন-ধারণোপযোগী গ্রাসাচ্ছাদনই মিলে না। অপর দিকে অনেক লোক প্রভূত ধনশালী; তাহাদের ধনের ইয়ত্তা নাই—চেষ্টা করিয়াও তাহারা তাহাদের ধনের একাংশও ব্যয় করিতে পারে না। এইরূপ ধনবৈষম্য—এক দিকে মনুষ্যত্ব-নিষ্পেষণকারী দারিদ্র্য, অপর দিকে কুবেরাকাঙ্ক্ষিত ধনাতিশয্য সমাজের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর—ইহা সকল সমাজতত্ত্ববিদই স্বীকার করেন। এখনকার সমাজতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, ব্যক্তিতান্ত্রিক (individualistic), অবাধ প্রতিযোগিতামূলক (open competitive), অর্থ-প্রভাবগ্রস্ত (capitalistic), ব্যক্তিগত ধন স্বীকারী (recognizing right of private property) সমাজ মাত্রেই এইরূপ ধনবৈষম্য হইতে বাধ্য; এবং যতই যন্ত্র সাহায্যে দ্রব্য সকল প্রস্তুত করণের ক্ষমতা বাড়িতেছে,

ততই ধনবৈষম্য বাড়িতে বাধ্য। বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা সকল মানুষের সমান নয়। সুতরাং ধনবৈষম্য হইতে বাধ্য, এ কথা অনেকে বলিয়া থাকেন। এবং এই কথাটা স্বীকার্য্য হইলেও, একালের এইরূপ ভয়ানক ধনবৈষম্য যে কেবল বুদ্ধি, বিদ্যা বা অন্য ক্ষমতার তারতম্যের জন্য হয়, তাহা স্বীকার্য্য হয় না। বিখ্যাত ফোর্ড মোটরকার কারখানার অধিস্বামী ফোর্ড সাহেব যে পৃথিবীতে বুদ্ধি-বিদ্যায় বা কর্ম্ম-ক্ষমতায় অতুলনীয়, এ কথা বোধ হয় অল্প লোকই স্বীকার করিবেন। মাড়ওয়াড়ী ক্রোড়পতিরা যে ৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অপেক্ষা বুদ্ধি-বিদ্যায়, কর্ম্মকুশলতায় অনেক শ্রেষ্ঠ, তাহা বোধ হয় অল্প লোকই স্বীকার করেন। সুতরাং সমাজ গঠনের এমন কোন দোষ আছে, যাহার নিমিত্ত বুদ্ধি, বিদ্যা, কর্ম্ম-কুশলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের তারতম্য ছাড়াও অন্য কারণে এইরূপ ধনবৈষম্য হইতে পারে, তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। এইরূপ কেন হইতে পায় তদ্বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশে অনেক গবেষণা হইয়াছে ও হইতেছে। তাঁহাদের ভিতর অনেক মতদ্বৈধ আছে। যেগুলি বহু সমাজ-তত্ত্ববিদ মতবাদ হিসাবে স্বীকার করিয়াছেন, তাহার ভিতর নিম্নলিখিত মতটা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। আমাদের ব্যবহার্য্য সকল দ্রব্যের উপাদান পৃথিবী হইতেই উৎপন্ন। পৃথিবীর স্থল জল ও বায়ু কেহই নির্ম্মাণ করে নাই। বায়ু যেমন সকলেই সমভাবে উপভোগ করিতে পারে, যাহার যতটুকু শরীরের পক্ষে আবশ্যক, সে ততটুকু লয়, তাহার অধিক লয় না—বক্রী অন্য সকল জীবের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দেয়, পৃথিবীর জল ও স্থল সেইরূপ হওয়া সঙ্গত। কিন্তু বহুকাল হইতেই জমি কতক লোকের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে, সমুদ্রও কতকটা হইয়াছে। তাঁহারা নিজেরা যখন ব্যবহার না করেন, তখনও অন্য লোকদিগকে ব্যবহার করিতে দেন না; কিম্বা তাঁহাদের নিকট হইতে, জমি জল হইতে যাহা উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন হইতে পরে মনে হয়, তাহার কতক অংশ লইয়া তবে অন্য লোকদিগকে ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়। এই সম্প্রদায়ের সমাজ-তত্ত্ববিদেরা আরও এইরূপ বলেন যে, বহুকাল পূর্ব্বে এক শ্রেণীর লোক দলবদ্ধ হইয়া অন্য সকল লোকদিগকে বঞ্চিত করিয়া গায়ের জোরে পৃথিবীর কতক কতক অংশ দখল করিয়া লইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে যাহারা প্রধান তাহারাই ক্রমে রাজা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তাহাদের প্রধান প্রধান সহায়কেরা সামন্ত বা জমিদার-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। তৎকালে তাহারাই কেবল ধনী ছিল—বক্রী সকলেই দরিদ্র ছিল। এই ধনী সম্প্রদায়ের যাহাতে সুবিধা হয় বা তাহাদের মনের যাহাতে তৃপ্তি হয়, সেইরূপ কার্য্য যাহারা করে তাহাদিগের প্রতি তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া প্রভূত (অবশ্য তৎকালোপযোগী) পারিতোষিক দিতেন। সুতরাং এই শ্রেণীর লোকেরা অন্য সাধারণ লোক অপেক্ষা অধিক ধনী হইত এবং তাহারাই ক্রমে মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইয়া দাঁড়ায়। তাহার পর এইরূপ মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাহাদের সেই ধনী সম্প্রদায় হইতে প্রাপ্ত মূলধন সাহায্যে ব্যবসায় ইত্যাদি নানারূপ কার্য্য করিয়া অনেক ধন সংগ্রহ করিয়া, হয় তো তাহারা আবার সামন্ত বা জমিদার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যখন যন্ত্র সকল উদ্ভাবিত হইতে লাগিল, তখন যাহাদের সেই সকল যন্ত্র কিনিবার শক্তি আছে তাহারা তদ্দ্বারা অপরাপর লোকদিগের অপেক্ষা অধিক ধনী হইবার সুবিধা পাইতে লাগিল এবং তাহারাই উত্তরোত্তর ধনী হইতে লাগিল। পুত্রাদিরা আবার উত্তরাধিকার-সূত্রে পিতাদি দ্বারা উপার্জ্জিত ধনের অধিকারী হওয়ায়,—গুণবৈষম্যের ফলে ধনবৈষম্য হয়, এ কথার মূলে যদি পুরাকালে কোন সত্যও ছিল স্বীকার করা যায়, তথাপি তাহা একালে কোন ক্রমেই সত্য হইতে পারে না। কারণ, অতিশয় অপদার্থ ধনীদিগের সন্তানেরা পিতার প্রভূত অর্থের মালিক হইতেছে এবং তাহাদের ধনের অত্যন্ত অসদ্ব্যবহার করিতেছে দেখা যাইতেছে। আবার এই গরীব লোকদের সন্তানেরা শিক্ষা পাইবার অবকাশ ও সুবিধা না পাওয়ায় তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি মার্জ্জিত হইতে পায় না; এবং যাহাদের ধন আছে তাহারাই অধিকতর বুদ্ধিমান বিদ্বান ও কর্ম্মকুশল হইবার সুবিধা পাইতেছে ও পায় বলিয়াই ক্রমে এই অভিজাত সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে। এই অভিজাত সম্প্রদায় সচরাচর অপর সাধারণ লোক অপেক্ষা অধিক মার্জ্জিত বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন। অথবা কর্ম্মকুশলতার মূলেও এই ধনবৈষম্য। এখন আবার যাহাদের প্রভূত ধন আছে তাহারা তদপেক্ষা অল্প ধনীদের নিষ্পেষণ করিয়া অধিকতর ধনী হইবার সুবিধা পাইতেছে। ধরুন একজনের চালের দোকান আছে। তাহার মূলধন ২০০০০ টাকা। সে ব্যবসায় বেশ লাভবান

ছিল। তাহার পর আর একজন বিশ লক্ষপতি ধনী তাহার পার্শ্বে আর একটী চাউলের দোকান করিল। সেই বৎসরে সেখানে টাকায় ছয় সের করিয়া চাউল বিক্রয় না করিলে দোকান চলে না। কিন্তু যদি বিশ লক্ষপতি দোকানদার মনে করে তাহা হইলে এই বিশ হাজারপতি দোকানদারকে একেবারে উৎসন্ন দিতে পারে। সে ইচ্ছা করিয়া লোকসান করিয়া টাকায় ৬॥০ দরে চাউল বিক্রয় করিয়া অন্য দোকানদারকে সেইরূপ দরে বিক্রয় করিতে বাধ্য করিতে পারে—অল্প দিনেই তাহার মূলধন নষ্ট হইয়া যাইবে ও তাহাকে দোকান উঠাইয়া দিতে বাধ্য করিবে। পরে সে নিজে টাকায় ৫॥০ দরে চাউল বিক্রয় করিয়া নিজের লোকসান পূরণ করিতে পারিবে এবং আরও অধিক পরিমাণে লাভবান হইবে ও সকল লোকের ধন দোহন করিবার সুবিধা পাইবে ও পাইয়া থাকে। এই কারণে যাহারা অধিক ধনী তাহারা আরও অধিক ধনী হইবার সুবিধা পায় ও অপরাপর লোকদিগের ধন শোষণ করিতে পারে। এই স্থলে এই ধনী দোকানদার, তাহার বিদ্যাবুদ্ধি, পরিশ্রমশীলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের জোরে নয়, কেবল তাহার অধিকতর ধন থাকার জোরেই আরও অধিক ধনী হইবার সুবিধা পাইল; এবং যে অল্প ধনী, তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি, কার্য্যকুশলতা, পরিশ্রমশীলতার অভাবে নয়—কেবল প্রভূত ধনশালী প্রতিযোগী থাকার ফলেই সে সর্ব্বস্বান্ত হইল। এইরূপ পাশ্চাত্যে অধিক ধনবানেরা উত্তরোত্তর ধনবান হইয়াছে ও হইতেছে এবং গরীবদের অবস্থা উত্তরোত্তর অতিশয় মন্দ হইয়া পড়িয়াছিল। পাশাপাশি দোকানদারদের এইরূপ যাহা হয়, বিদেশী বহুধনী শিল্পীদের ও ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতায় আমাদের অল্পধনী শিল্পীদের ও ব্যবসায়ীদেরও কতক হইয়াছে ও হইতেছে। সেইজন্য দিন দিন আমাদের স্বদেশী শিল্প ও ব্যবসা অনেক উঠিয়া যাইতেছে ও তাহার পরিবর্ত্তে বিদেশী শিল্পের দ্বারা আমাদের অভাব পূরণ হইতেছে। ব্যক্তিতান্ত্রিক অবাধ প্রতিযোগিতা-মূলক ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্বীকারী সমাজে ধনীরা অধিক ধনী হইবার ও অপর লোকদিগকে শোষণ করিবার সুবিধা পাওয়ায়, এক দিকে ভীষণ দারিদ্র্য ও অপর-দিকে কুবেরা-কাঙ্ক্ষিত ধনশালিতা হইতে বাধ্য। এই নিমিত্ত প্রভূত ধনশালী গ্রেটব্রিটেন, যাহার রাজত্ব সমুদায় পৃথিবী বিস্তৃত, যাহার অর্ণবপোতে সকল সমুদ্র প্রমথিত, যাহার কারখানার ধূমে আকাশ সর্ব্বদাই আচ্ছাদিত, সেখানেও বার হইতে পনর লক্ষ (১৯২২ সালে প্রায় ১৯ লক্ষ) কর্ম্মক্ষম ও কর্ম্মপ্রার্থী লোককে প্রতিদিন রাজকোষ হইতে সাহায্য দান করিতে হয়। গ্রেটব্রিটেনের জনসংখ্যা প্রায় ৪৩০০০০০০; আমাদের জনসংখ্যা প্রায় ৬৮০০০০০০০। সুতরাং আমাদের দেশে যেখানে না আছে মূলধন, না আছে বাণিজ্যের আধিক্য, যেখানে আমাদের সমুদায় শিল্প প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত, যেখানে শতকরা ৯৩ জন নিরক্ষর, সেখানে কর্ম্মক্ষম সাহায্যপ্রার্থী দরিদ্রের সংখ্যা গ্রেটব্রিটেনের অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী হওয়াই সম্ভব। গ্রেটব্রিটেনে এইরূপ কর্ম্মক্ষম কর্ম্মপ্রার্থী লোক ছাড়া ১,০৫১,৩৫৮ বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে পেন্সন দেওয়া হয় এবং ১,৩২৫,৭০১ নিঃস্ব ব্যক্তিকে সাহায্য দেওয়া হয়। মোট দেখা গেল প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ লোককে সাহায্য দেওয়া হয়। দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থ গ্রেটব্রিটেনে কত টাকা বার্ষিক ব্যয় হয় তাহা পাঠকবর্গের গোচরার্থে Statistical abstract হইতে তুলিয়া দিতেছি। ১৯২৫ সালে ইংলণ্ডে নিঃস্বদিগের সাহায্যার্থ ৩৬,৮৪১,৭৬৮ পাউণ্ড, স্কটল্যাণ্ডে মোট ৩,১৬১,২৫৫ পাউণ্ড, অর্থাৎ মোট ৪০,০০৭,০২৩ পাউণ্ড ব্যয় হয়। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদিগের পেন্সনের নিমিত্ত ২৫,৯৪২,০০০ পাউণ্ড ব্যয় হয়। কর্ম্মক্ষম বেকারদের নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট হইতে ১৩,১৪৮,০৮৫ পাউণ্ড প্রদত্ত হয়, এবং শ্রমিক ও কর্ম্মদাতারা ২৬,৭২৩,৫৬১ পাউণ্ড দেন। শ্রমিকদিগের বাড়ী নির্ম্মাণার্থে ১৬,২৮১৯৫৬ (১৯২৩—১৯২৪), হাঁসপাতালের নিমিত্ত ৬,৩৪৭,৭০৪ পাউণ্ড খরচ হইয়াছে। পাগলদিগের সাহায্যার্থ ও পাগলা-গারদের নিমিত্ত ৮,১২৬,২৭৭ পাউণ্ড বাৎসরিক ব্যয় হয়। স্বাস্থ্য বীমার নিমিত্ত ৮,০৭৩০০০ পাউণ্ড রাজকোষ হইতে দেওয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষার নিমিত্ত ১৯২৩—১৯২৪ সালে ৫৭,৯১৭,২৫৪ পাউণ্ড ও পুস্তকাগারের নিমিত্ত ১,৬১৪,২৫৪ পাউণ্ড ব্যয় হয়। ইহা ছাড়া যুদ্ধে আহতদিগের জন্য ৬৬,৯১৬,২৬৮ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছিল। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, যুদ্ধাহত লোকদের নিমিত্ত যাহা ব্যয় হইতেছে, তাহা ছাড়া, অসহায় লোকদিগের সাহায্যার্থ প্রায় মোট ২১০,০০০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ২৭০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। এই তো গভর্ণমেণ্ট হইতে ব্যয়! ইহা ছাড়া

ধর্ম্মসম্প্রদায় হইতে বহু কোটী টাকা দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থ ব্যয় হয়। লোকরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভিক্ষুকদিগকে যাহা দান করে তাহাও যথেষ্ট। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় ব্যক্তি-তান্ত্রিক অবাধ প্রতিযোগিতামূলক ব্যক্তিগত ধনস্বীকারী ধনপ্রভাব-গ্রস্ত সমাজাদর্শ প্রচলিত ছিল। এইরূপ সমাজে ধনীগণ অধিকতর ধনী হইয়া নানারূপ নূতন কল-কারখানা স্থাপন করিয়াছিল এবং তৎকালের লোকেরা মনে করিত ইংলণ্ডের লক্ষ্মীশ্রীর মূল কারণ এইরূপ অবাধ-প্রতিযোগিতামূলক পূর্ণমাত্রায় ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজ-গঠন। তৎকালে গরীবদের সাহায্যার্থ পূর্ব্বোক্ত রূপে ব্যয় হইত না। আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর সেই কালের মতবাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহারা সেই বিলাতের সমাজ-আদর্শ উন্নতিকারক বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন এবং তাহারই প্রভাব এখনও জনসাধারণে বিস্তৃত হইয়া আমাদের পুরাতন সমাজ গঠনাদর্শ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্যে ঐরূপ সমাজে গরীব ও শ্রমিক সম্প্রদায়দিগের জীবন দুর্ব্বিষহ হওয়ায়, এবং ধনীরা নির্ধনদের নিষ্পেষণ করেন দেখিয়া, ও ঐরূপ সমাজের দোষ সকল প্রকটভাব ধারণ করাতেই পূর্ব্ব প্রচলিত মতবাদের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। Henry George লিখিত Progress and Poverty ও Karl Marx লিখিত Capital নামক গ্রন্থদ্বয় পূর্ব্ব-প্রচলিত মতবাদের পরিবর্ত্তনের প্রধান সহায়ক। এখন সমাজতান্ত্রিক (Socialistic) সমাজ-আদর্শের প্রভাব বিলাতে বিস্তৃত হইয়াছে এবং তাহারই ফলে গরীবদের দুঃখ মোচনার্থে পূর্ব্বোক্ত রূপে বহু ধন রাজকোষ হইতে ব্যয় হইতেছে ও গরীব ও শ্রমিক সম্প্রদায় সকল সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া Trade Union সকল গঠন করিয়া করিয়া শক্তিশালী হইয়াছে এবং ক্রমে রাজশক্তি অধিকার করিবার জোগাড় করিয়াছে। এই শক্তিশালী হইবার প্রধান উপায় সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া ও Trade Union করা, যাহার কার্য্য আমাদের জাতি-বিভাগ ও জাতিগত ব্যবসা দ্বারা সম্পন্ন হইত। যে পরিমাণে তাহাদের সুবিধার্থ এইরূপ ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে তাহা, এবং সকলে যাহাতে আহার আচ্ছাদন আবাস ও বিশ্রাম পায় তাহার বন্দোবস্ত করা সমাজের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে ও তাহা করা হইতেছে। পূর্ব্ব প্রচলিত ব্যক্তিতান্ত্রিক অবাধ-প্রতিযোগিতামূলক ব্যক্তিগত-ধনস্বীকারী সমাজাদর্শ যত দিন প্রবল ছিল, তত দিন এইরূপ ভাবে গরীবদের সাহায্য করিতে সমাজ যে বাধ্য তাহা স্বীকৃত হইত না। যাহারা খাইতে পায় না তাহারা অলস ও অকর্ম্মণ্য, তাহাদের নিজেদের দোষেই এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, নিজেদের কুকর্ম্মের ফলভোগ করিতেছে; তাহার অনেকাংশ যে সমাজ গঠনের দোষে তাহা স্বীকৃত হইত না এবং সমাজ তাহাদের জন্য কিছুই করিত না। এখন সকলের মুখ্য অভাব পূরণ করা সমাজে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে; সেই জন্য গরীবদের মুখ্য অভাব সকল মোচনার্থ এইরূপ ব্যয় হইতেছে। শিক্ষা পাওয়ার সুবিধা করিয়া দেওয়া কতকটা আমাদের মুখ্য অভাব আহার পাওয়ার অন্তর্গত; কারণ—শিক্ষিত হইলে তাহারা নিজেদের আহার পাওয়ার সুবিধা করিয়া লইতে পারে। বিশ্রাম পাওয়াও আমাদের মুখ্য অভাব; তজ্জন্য factory আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পীড়িতদিগের সেবা পাওয়া—ভালবাসা পাওয়া যে আমাদের মুখ্য অভাব তাহার অন্তর্গত। পূর্ব্বে এবং আমাদের সমাজে যাহারা সেই পীড়িতদের ভালবাসিত তাহারাই সেবা করিত। এখন তাহার পরিবর্ত্তে হাসপাতালাদি করিয়া সেই সেবা-কার্য্য করা হয়।

আমাদের রাজশক্তি ও রাজকোষ ইংরাজাধিকৃত। সুতরাং রাজকোষ প্রধানতঃ ইংরাজদের সুবিধার্থ ব্যয় হয়। তাহার পর বক্রী অংশ মধ্যবিত্ত ও ধনী সম্প্রদায়দিগের হস্তে। সুতরাং গরীবদের যাহাতে সুবিধা হয় তাহা দেখিবার কেহই নাই বলিলে হয়। সেই জন্য আমাদের দেশের গরীবদের অবস্থা এত শোচনীয় হইয়াছে যে দুর্ভিক্ষ আমাদের দেশে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে—নানারূপ মহামারী আমাদের নিত্যসহচর হইয়াছে—মৃত্যুতালিকা আমাদের দেশে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেক বেশী। বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতির দ্বারা শীঘ্র কিছু হইবার প্রত্যাশাও নাই—কারণ মূল ধনাধিক্য বশতঃ ও পূর্ব্ব হইতে পাশ্চাত্য দেশবাসীরা শিল্প কর্ম্মে অধিক পারদর্শী হওয়ায় ও শিল্প শিক্ষা পাইবার তাহাদের অধিক সুবিধা থাকায়—অবাধ বাণিজ্য থাকায়, বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতিতে রাজশক্তির যে সাহায্য পাইলে তাহার বিস্তার সম্ভব, আমাদের সে প্রত্যাশা নাই।

বিলাতে যেরূপে দরিদ্র ও দুস্থদিগকে সাহায্য করা হয়—তাহাদের প্রাণরক্ষা ও সুবিধার জন্য যত টাকা ব্যয় হয়, তাহা আমাদের রাজকোষেই নাই। বাঙ্গালার মোট রাজস্ব সাড়ে দশ কোটি টাকা—তাহারও অধিকাংশ Law & orderএর দোহাই দিয়া খরচ হইবেই—বক্রী অংশের অধিকাংশই নানা একান্ত আবশ্যক কার্য্যে ব্যয় হইতে বাধ্য। সুতরাং অতি অল্পমাত্র ধনই অবশিষ্ট থাকে যাহা গরীবদের জন্য ব্যয় হইতে পারে। অধিক কিছু করিতে গেলেই আরও নানারূপ টেক্স দিতে হইবে। একে তো এই টেক্স দিতেই আমাদের প্রাণান্ত হইতেছে, তাহার উপর আরও অনেকগুণ টেক্স দিতে হইবে। রাজশক্তির দ্বারা দারিদ্র্য মোচন করিতে গেলে তাহার কতক অংশ, কে কত টেক্স দিবে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে, টেক্স আদায় করিতে, তাহার আপিস্ আসবাব করিতে—তাহার হিসাব নিকাশ করিতে ব্যয় হইবে। তাহাদিগকে মোটা মোটা মাহিয়ানা দিতে হইবে,—তাহা না হইলে চুরী, ঘুষ, লোক নির্য্যাতন বন্ধ হইতে পারে না। আমরা পরাধীন বলিয়া ইহার অনেকাংশ ইংরাজ কর্ম্মচারীর করতলগত হইবেই। এই টেক্স কাহাকে কত দিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারণকালীন আমাদিগকে অনেক ফৈজিয়ৎ ভোগ করিতে হইবে। আবার এই টাকা যখন গরীবদের জন্য ব্যয় হইতে আসিবে, তাহারও অনেক অংশ অপব্যয় হইতে বাধ্য। এক অংশ যাইবে কোন্ স্থলে কত টাকা ব্যয় হইবে—সাহায্য প্রার্থীদের কে সাহায্য পাইবার উপযুক্ত—তাহা নির্দ্ধারণ করিতে। তাহার পর যাহাদের হাত দিয়া এই টাকা ব্যয় হইবে, তাহাদেরও মাহিয়ানা দিতে হইবে। এই সকল কর্ম্মচারীর আপিস বাড়ী ও সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি করিতে হইবে। এই সকল বাড়ী নির্ম্মাণে, সংরক্ষণে, পরিদর্শনে, মেরামৎ ইত্যাদিতেও অনেক টাকা ব্যয় হইবে। তাহার পর যে টাকা খাদ্য বা পরিধেয় বাবদ দেওয়া হইবে, তাহার কতক অংশ চুরী হইবে। জেলখানার কয়েদীর আহারার্থ যে টাকা ব্যয় হয়, সেই টাকার উপযোগী আহার কয়েদীরা পায় না তাহা সকলেই জানেন। তাহার উপর নিরাশ্রয় গরীবদের বাসার্থ গৃহ সকল প্রস্তুত করিতে হইবে; তাহাতেও বহু অর্থ ব্যয় হইবে। সেই সকল বাটী প্রস্তুত করণ, তাহার মেরামৎ, তাহার রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তও বহু অর্থ ব্যয় হইবে—কতক অংশ চুরী হইবে—চিরকালই পাবলিক ওয়ার্কসে এইরূপই হইয়া আসিতেছে। গরীবদের আশ্রয় দিতে গেলে তাহাদের দেখিবার জন্য, ব্যবস্থা করিবার জন্য, অনেক বেশ মোটা মোটা মাহিয়ানার কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইবে। তাহাদের জন্য থালা, ঘটি, বাসন, কাপড়, বিছানা, আসবাবপত্র প্রায়ই কিনিতে হইবে; সেইগুলির হিসাব নিকাশ রাখিতে হইবে। ইহার নিমিত্তও লোকজন আবশ্যক ও এই সকল জিনিষপত্র কিনিবার কালীন ও বদলাইবার কালীন কতক চুরী হইবে। সুতরাং যত টাকা লোকদিগকে টেক্স দিতে হইবে, তাহার অল্পাংশ মাত্র গরীবদের উপভোগে আসিবে। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, বিলাতে যুদ্ধাহতদিগের সাহায্যার্থ যে টাকা ব্যয় হয়, তাহা ছাড়া ২৭৩ কোটী টাকার অধিক দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থ বাৎসরিক ব্যয় হয়। আমাদের গরীবদের সংখ্যা বিলাতের অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী হওয়াই সম্ভব—সমান ধরিয়া লইলেও আমাদের প্রায় তত টাকাই আবশ্যক। বিলাতের জিনিস মহার্ঘ—তাহাদের শীত বস্ত্র বেশী আবশ্যক। সুতরাং তাহাদের ব্যয়ের দশমাংশ ব্যয় করিতে হইলে ২৭ কোটী টাকা হয়—অথচ আমাদের বাঙ্গালার মোট রাজস্ব মাত্র সাড়ে দশ কোটী টাকা। এত টাকা নূতন টেক্স স্থাপন করিয়া আদায় করা বা হওয়া অসম্ভব। যাহাদের আয় মাসে দুই শত টাকার অধিক তাহাদের আয়ের অর্দ্ধেক অংশ টেক্স করিয়া কাড়িয়া লইলেও বোধ হয় ২৭ ক্রোড় টাকা আদায় হওয়াও সম্ভব হয় না। অথচ আমাদের বাঙ্গালা দেশে, বিলাতে যে ৩৫০০০০০ লোককে সাহায্য দান করিতে হয় সেইরূপ নিদেন ৩৫০০০০০ লোক—যাহারা নিতান্ত অসহায় দরিদ্র—তাহাদিগকে কিরূপে খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিতে পারি, তাহা সকলেরই ভাবা আবশ্যক। পুরামাত্রায় ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজ আদর্শে আমাদের সমাজের পরিবর্ত্তন হইলে আমাদের গরীবরা বাঁচিতেই পারে না। রাজশক্তির দ্বারা দরিদ্রদের দুঃখ মোচন হওয়া অসম্ভব; কারণ, আমরা এত গরীব, আমাদের আয় এত কম যে, টেক্স স্থাপন করিয়া সেই টাকা সংগ্রহ করা অসম্ভব। বাঙ্গালার ১৯২৩—২৪ সালের ইনকম টেক্স দাতার সংখ্যা মাত্র ৫৩৫৪৯ (অর্থাৎ যাহাদের মাসিক আয় ১৬৬ টাকা)। ইহার মধ্যে ৫০০০এর উপর লোক বাঙ্গালায় বাস করে না।

তাহারা যে সকল আপিসে কার্য্য করে তাহার প্রধান কর্ম্মস্থল কলিকাতায় বলিয়া তাহাদিগকে বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। আবার ২১৬৫টি যৌথ কারবার আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, টেক্স বসাইয়া বেশী টাকা আদায় করা অসম্ভব। আমাদের দেশের গড়পড়তা মাসিক আয় ৫ টাকারও কম। কয়েদীর খাদ্যে গভর্ণমেণ্টের মাসিক ৭ টাকারও বেশী খরচ হয়। বাঙ্গালায় দশ শালের বন্দোবস্ত থাকায় জমির রাজস্ব বড় কম আদায় হয়। এখন তাহা তিন কোটি টাকা মাত্র। অনেকে তাই ওই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উঠাইতে বলেন। Simon কমিশনের সমক্ষে অর্থ-সচিব Marr সাহেবের ও স্যার প্রভাস মিত্রের সাক্ষ্যে প্রকাশ, মাত্র এক কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি হইতে পারে। সুতরাং রাজকোষ হইতেও গরীবদের বেশী কিছুকরা যাইতে পারে না। সুতরাং দেখা যায়, পুরামাত্রায় ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজ-গঠন আদর্শে আমাদের সমাজ গঠিত হইলে আমাদের গরীবরা একেবারে মারা যাইতে বাধ্য। মনে রাখিতে হইবে, সমস্ত বাঙ্গালা দেশটা ৭৬৮৪৩ বর্গমাইল। তাহাতে ১৩০টি সহর ও ৮৪৯৮১ গ্রাম আছে এবং মাত্র ৭৫৫ হাসপাতাল আছে—কলিকাতায় আরও ২৭টি হাসপাতাল আছে। ইহার অধিকাংশই নামে হাসপাতাল—সামান্য ভাবে দাতব্য ঔষধালয় মাত্র। গরীবদের রোগ হইলে তাহাদের সেবা করিবে কে? ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, বসন্ত, ওলাউঠা আমাদের নিত্য সহচর। শতকরা ৯৫ জনেরও অধিক লোকের ভাড়াটিয়া সেবিকা দ্বারা সেবা করাইবার ক্ষমতা নাই। তাহাদের দুর্দ্দশা কি বর্ণনাতীত হইবে না! দুঃখের বিষয়, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহা দেখেন না; ও সে বিষয়ে চিন্তা না করিয়া, সেই আদর্শেই জীবন যাপন করিতেছেন; ও সেই আদর্শই তাঁহারা ভাল মনে করেন ও বলিয়া থাকেন। আমাদের তরুণ তরুণীরা সেইরূপই শিক্ষিত হইতেছেন এবং সেই আদর্শেই আমাদের সমাজ গঠন চূর্ণীকৃত হইতেছে। প্রচুর অর্থ সচ্ছলতা থাকিলে ও স্বাস্থ্য থাকিলে, সুখের সময়ে ব্যক্তিতান্ত্রিক ভাবে থাকিলে হয় তো উপভোগের সুবিধা হয়; কিন্তু দুর্দ্দিনে ব্যাধির সময়ে তাহা যে কি ভীষণ—তাহা তাঁহারা দেখেন না। আজ হয় তো কাহারও বেশ চলিতেছে,—কাল কি হইবে, তাঁহার বংশধরের কি অবস্থা হইবে, তাহা কেহ ভাবেন না, ইহাই আশ্চর্য্য। এইরূপ করাকে সংস্কার বলা এই হতভাগ্য দেশেই সম্ভব। ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজ গঠনে আমাদের দারিদ্র্য-সমস্যা কিরূপ ভীষণ হইবে তাহা দেখাইলাম।

স্ত্রী-সমস্যাও কিরূপ ভীষণ হইবে ও পাশ্চাত্যে কিরূপ হইয়াছে, তাহাও দেখাইতেছি। যেখানে সকল লোককেই নিজের নিজের উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিতে হয়, সেখানে অনেক লোকই একেবারে বিবাহ করিতে পায় না; কারণ, সকল লোক কোন কালেই এত উপার্জ্জন করিতে পারে না, যাহাতে সে তাহার স্ত্রী-পুত্রাদিকে তাহার আকাঙ্ক্ষিত রূপে ভরণ পোষণ করিতে পারে, ও পরেও সেই রূপ করিতে পারিবে তাহার নিশ্চয়তা থাকে। অনেক লোকই অধিকতর উপার্জ্জন-ক্ষমতা পাইবার আশায় বহুকাল বিবাহ করে না। অনেকের ইতিমধ্যে যৌবন কাল দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যায়; অনেকের প্রৌঢ়কালও অবিবাহিত অবস্থায় কাটিয়া যায়। যৌবনই উপভোগের সময়। সেই সময়ই যদি কাটিয়া যায়, তখনই যদি জীবনের শ্রেষ্ঠ ও সার জিনিস ভালবাসা উপভোগ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে জীবনের সুখ—বিশেষতঃ গরীবদের—কি রহিল? ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্য কি আছে? ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজে এই দুর্ভাগ্য অধিক লোককেই ভুগিতে বাধ্য করা হয়। পরিণত বয়সে আর্থিক সচ্ছলতা কি এই ক্ষতি পূরণ করিতে পারে? যৌবন ত আর ফিরিয়া আসিবে না। হয় তো সে তাহার মনোমত স্থানে অর্থাভাবেই বিবাহ করিতে পারে নাই। ইতিমধ্যে হয় তো সেই স্ত্রীলোক অন্যত্র বিবাহিত হইয়াছে। এইরূপ প্রায়ই ঘটে। তখন তাহার হৃদয়ের ক্ষোভ কত তাহা কে দেখে? যদি বহু লোকই অবিবাহিত বা অনেক কালই অবিবাহিত থাকে, তাহা হইলে বহু স্ত্রীলোকও একেবারে অবিবাহিত বা বহুকাল অবিবাহিত থাকিতে বাধ্য হয়। যখন তাঁহারা বহুকাল অবিবাহিতা থাকেন, তৎকালে তাঁহাদের প্রকৃতিগত মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকায় প্রকৃতি তাহার পরিশোধ লয়—তাঁহাদের জীবন সরস রাখিবার মূল উৎস শুকাইয়া যায়—জীবনই শুষ্ক হয়। আবার বহুকাল অবিবাহিত থাকিতে হইলে অধিকাংশ স্ত্রীলোককে তৎকালে অর্থোপার্জ্জন করিয়া নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত করিতে হয়। এইরূপ অর্থোপার্জ্জন করিতে হইলে পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় কর্ম্ম করিতে হয়। স্ত্রীলোকরা প্রকৃতির নিয়মে পুরুষদের অপেক্ষা

দুর্ব্বল। সুতরাং পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় কর্ম্মক্ষেত্রে আসিতে হইলে তাহাদিগকে বিষম প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে হয়। তাহার উপর মাসিক রজো নিঃসরণকালীন তাহাদের একটা স্নায়বিক উত্তেজনা আসে,—শরীর দুর্ব্বল ও অবসন্ন হয়। তখন তাহাদের বিশ্রাম একান্ত আবশ্যক, সকল চিকিৎসকই ইহা স্বীকার করেন। সেই সময় বিশ্রাম না পাইলে তাঁহারা নানারূপ পীড়াগ্রস্ত হয়েন; রজোসংক্রান্ত নানারূপ ব্যাধি হয়। অথচ পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতার কর্ম্মক্ষেত্রে সেরূপ বিশ্রাম পান না। তন্নিমিত্ত এইরূপ কার্য্য করানতে তাহাদিগকে যে কত নির্য্যাতন করা হয়, তাহা কেহ দেখে না। তাহাদিগকে এইরূপ কার্য্য করিবার অধিকার দেওয়ায়, আর ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াকে ছেক্‌রা গাড়ী টানিবার অধিকার দেওয়ায় কোন প্রভেদ আছে কি না, তাহা পাঠিকারা বিবেচনা করুন। প্রাচীন হিন্দুদের চক্ষে ইহাকে তুল্যাধিকার দেওয়া বলা একরূপ নির্ম্মম পরিহাস ও ভীষণ প্রতারণা বলিয়া প্রতিভাত হয়।

আবার স্ত্রীলোকরা কর্ম্মক্ষেত্রে নামিলে বহুকর্ম্মপ্রার্থী হওয়ায় কর্ম্মীদের মাহিয়ানা কম হয়, কর্ম্ম সময়ের পরিমাণ ক্রমে বৃদ্ধি হয়। তজ্জন্যও আবার স্বাস্থ্যহানি হয়। এ কথা আমার কপোল-কল্পিত নয়, পাশ্চাত্যে ইহা হইয়াছে; এবং স্ত্রী স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে একজন প্রধান নেতা Ellen Key এবং অন্য অনেকেও সে কথা বলিয়াছেন। এইরূপে যাঁহারা নিজে উপার্জ্জন করিয়া নিজেদের ভরণ পোষণ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের আর গৃহস্থালীর কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না। পুরুষদের সহিত প্রতিযোগিতায় কর্ম্ম করিয়া তাহাদের প্রকৃতিতে পুরুষ-সুলভ কাঠিন্য আসিয়া উপস্থিত হয়; স্ত্রী-পুরুষদের ভিতর একটা বিদ্বেষভাব আসিয়া উপস্থিত হয়—পাশ্চাত্যে তাহা হইয়াছে এবং ক্রমেই ভীষণতর হইতেছে। এ সকল কথাও ওই Ellen Key তাঁহার বহু ভাষায় অনুবাদিত Love aud Marriage নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন। এবং তিনি আরও বলিয়াছেন যে, স্ত্রী-পুরুষদের পুরামাত্রায় আলাহিদা কর্ম্ম বিভাগ যেরূপ পূর্ব্বে ছিল তাহা না হইলে এই প্রতিযোগিতা, এই বিদ্বেষভাব কিরূপ ভীষণ হইবে তাহা বলা যায় না। ক্রমে স্ত্রীলোকদিগের মাতা হইবার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতাই লোপ পাইবে—অন্য কোনরূপ মাঝামাঝি বন্দোবস্ত হওয়া অসম্ভব। এইরূপ কাঠিন্য ও বিদ্বেষভাব হওয়ার ফলে, পরে তাহাদের বিবাহিত জীবনও সুখ ও শান্তিময় হইতে পারে না। আবার বহুকাল এইরূপে কর্ম্ম করিয়া জীবন যাপন করিয়া তাঁহারা তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়েন; নূতন করিয়া গৃহস্থালী ও মাতৃত্বের উপযোগী হওয়া তাঁহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। তদুপযোগী শিক্ষা ও পরের যত্ন করিবার অভ্যাসের অভাবে তাঁহারা মাতা হইবার অনুপযুক্ত হইয়া পড়েন—মাতৃত্বে আর তেমন সুখ পান না। সুতরাং পুত্র-কন্যাদের সহিত বহুদিন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিতে পারেন না! তদভাবে অপত্যদেরও সেরূপ পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি উদ্দীপিত হয় না। সুতরাং বৃদ্ধ বয়সে পুত্র-কন্যাদের আন্তরিক যত্ন ও সেবা পান না। তাহারা কাছেও আসে না। ভাড়াটিয়া সেবা ভিন্ন অন্য কিছু উপভোগের জিনিস থাকে না। আমাদের গরীব দেশে অধিকাংশ লোক তাহাও অর্থাভাবে পাইবে না, প্রায় সকলকেই নির্জ্জন কারাবাসের দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। এই জন্য বৃদ্ধ বয়স পাশ্চাত্যদের কাছে এত ভয়ঙ্কর। এদিকে মাতৃত্বের উপযোগী শিক্ষা ও অভ্যাসের অভাবে মাতার যেরূপ যত্ন করা উচিত, সে জ্ঞানের অভাবে অপত্যদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, অধিক শিশুর মৃত্যু হয়। অনেকেই বিবাহের পরেও নানা কারণে পূর্ব্বের মত কর্ম্ম করিয়া উপার্জ্জন করিতে থাকেন। সেরূপ কর্ম্ম করায় অপত্যদের সম্যক তত্ত্বাবধারন করিতে পারেন না। সুতরাং শিশুরা ভগ্নস্বাস্থ্য হয়, শিশুদের মৃত্যুর হারও বাড়িয়া যায়, শিশুদের দুর্দ্দশাও হয়। পাশ্চাত্যের অনেক দেশে শিশু-মৃত্যুর হার আমাদের দেশের অপেক্ষা কম বলিয়া পাঠকবর্গ এই কথাটা অতিরঞ্জিত মনে করিবেন না। বিলাতে যেরূপ সকল লোককে নানারূপ শিক্ষা দেওয়া হয়—গরীবদের সুবিধার্থ যে নানারূপ প্রতিষ্ঠান ও সুবিধা আছে, তাহা আমাদের নাই এবং তাহা করিবার সাধ্যও আমাদের নাই। আমাদের দেশে শতকরা ৯৫ জন একান্ত গরীব, তাহা মনে রাখিতে হইবে। যখন বিলাতে গরীবদের জন্য রাজকোষ হইতে এত খরচ হইত না, তখন তাহাদের শিশু-মৃত্যুর হার এখনকার দ্বিগুণ ছিল—যেখানে অবস্থাপন্নদের শিশু মৃত্যুর হার শতকরা আটটি ছিল, গরীবদের সেখানে ৩০টি ছিল (See Reo Usher's Book on Neo malthusianism)। আমাদের দেশে হাসপাতাল, শিশু-পরিচর্য্যালয় নাই বলিলেই হয়। সমস্ত ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষে মাত্র ৩৯৭২টি হাসপাতাল আছে। তাহাও

বেশীর ভাগ নামে মাত্র। সুতরাং আমাদের দেশে ওইরূপ প্রথা প্রচলিত হইলে শিশু-মৃত্যু অনেক বাড়িয়া যাইবেই।

যে সকল স্ত্রীলোক উপার্জ্জন করিয়া আসিয়াছে, তাহারা অর্থ বা সম্ভ্রম বা অন্য প্রলোভন সামলাইতে না পারায়, কিম্বা দুই জনের উপার্জ্জন ব্যতীত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা অসুবিধাজনক বলিয়া, অনেকেই পূর্ব্বের মত উপার্জ্জন করিতে থাকেন। তাহা করিলে, স্বামী স্ত্রীতে দুই জনে কর্ম্ম করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া জীবন সংগ্রামের নানা ঝঞ্চাট ও ভগ্নাশা লইয়া যখন গৃহে ফিরিবেন, তখন কে কাহাকে যত্ন করিবে? তখন পরস্পরের ব্যবহারে ও যত্নে স্নিগ্ধ হইবার প্রত্যাশা থাকে না। সেখানে তাহাদের শান্তি, তৃপ্তি, ভালবাসার অবসর কোথায়? তখন গৃহ আর গৃহ থাকে না, রাত্রি যাপনের বাসায় পরিণত হয়। সামান্য কারণে কলহ উপস্থিত হয়—বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। পাশ্চাত্য দেশে তাহা উত্তরোত্তর বাড়িতেছে দেখা যাইতেছে। বিবাহ বিচ্ছেদ বৃদ্ধি হইবার এবং বিবাহ সুখকর না হইবার আরও অনেক কারণ আছে।

যখন বহুকাল বিবাহ হইতে পায় না, তখন প্রকৃতির নিয়মে, ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রাবল্যে, অধিকাংশ লোকই নানাবিধ প্রকৃতিবৈধ বা অবৈধ উপায়ে কাম চরিতার্থ করিতে বাধ্য হয়। বিশেষরূপ ধর্ম্মভাব প্রবল না হইলে এবং বিশেষ শিক্ষা ও ঐকান্তিক যত্ন না থাকিলে, ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরোধ করা শতকরা ৯৯ জনের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। আমাদের দেশের মুনিঋষিদেরও পতন হইত। অবৈধ উপায়ে কাম চরিতার্থ করিলে নানা রূপ দুরারোগ্য ব্যাধি হয়—অজীর্ণ, নানারূপ স্ত্রীরোগ, শুক্রপীড়া, স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য, মাথাধরা, মাথাঘোরা, হিষ্টিরিয়া, নিউরেশথিনিয়া প্রভৃতি। এ কথা সকল ডাক্তারই একবাক্যে স্বীকার করেন। Freud প্রভৃতি মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরোধের যে নানারূপ বিষময় ফল হয় তাহা দেখাইয়াছেন। যদি এরূপ না করিয়া প্রকৃতি-বৈধ উপায়ে কাম চরিতার্থ করা হয়, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল—অধিক জারজ সন্তান, ভ্রূণ-হত্যা, যৌন ব্যাধি, অধিক বেশ্যাবৃত্তি, স্বাস্থ্যনাশ, অধিক শিশু-মৃত্যু। জার্ম্মানির বেভেরিয়ায় হাজার শিশু জন্মের ভিতর ১৫০টী, পর্টুগালে ১২১, সুইডেনে ১১৩টি জারজ সন্তান হয়, তাহা বিলাতের বিশ্বকোষে (Encyclopædia Brittanica) প্রকাশ। বার্লিন সহরে প্রায় হাজারের ভিতর দুইশতও হইয়াছে। পাশ্চাত্যে গর্ভনিরোধের নানারূপ উপায় করা হয়, তথাপি এইরূপ ভয়ঙ্কর অবস্থা। আমাদের দেশে সেরূপ উপায় সচরাচর জানা নাই। এইরূপ করিতে যে খরচ হয় তাহার সাধ্যও নাই। সুতরাং আমাদের দেশে আরও অধিক মাত্রায় হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সকল দেশেই জারজ সন্তানদের ভিতর শিশুমৃত্যু অধিক হয়—বিবাহিতদের সন্তানদের দ্বিগুণেরও অধিক। প্রথম কারণ, একা মাতা তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া উঠিতে পারে না, তাহারা তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে নিদারুণভাবে নির্য্যাতিত হয়। যে সকল পুরুষ অবস্থা ভাল নয় বলিয়া বিবাহ করেন না, অথচ অপর স্ত্রীতে সঙ্গত হয়েন, তাঁহাদের এই কার্য্যে কত কাপুরুষত্ব, কত নীচত্ব প্রবেশ পায়, তাহা একবার পাঠকবর্গকে অনুধাবন করিতে বলি। পুরুষমানুষ হইয়া তিনি ও তাঁহার স্ত্রী, দুজনের সমবেত চেষ্টায় অপত্য পালন করিতে সমর্থ নন বলিয়া বিবাহ করিলেন না, অথচ একটী স্ত্রীলোকের একার ঘাড়ে সেই ভার অকুণ্ঠিত ভাবে চাপাইলেন—সেই সন্তানের ও তাহার মাতার কিরূপ দুর্দ্দশা হইবে, তাহাদের জীবন কিরূপ দুর্ব্বিষহ হইবে, তাহা ভাবিবার আবশ্যক বোধ করেন না। আমাদের দেশে ইহা মহাপাতকের ভিতর গণ্য ছিল। পাশ্চাত্যে এই রূপ কার্য্য অনেকেই করে। অনেকে বলিয়া থাকেন, যতদিন স্ত্রীপুত্রাদিকে সম্যক প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা না হয়, ততদিন বিবাহ না করাই ভাল—তখন এইরূপ করাটাই বিধেয়;—স্ত্রীকে নানারূপ গৃহকার্য্য—দাসীবৃত্তি করান তাহাদিগের উপর ভয়ানক অত্যাচার বলেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইলে আমাদের এই গরীব দেশে কয় জন বিবাহ করিতে পারে? শতকরা ৫ জনের অধিকও নয়। তখন বাকী ৯৫ জন কি করিবে? তাহারা সকলেই কি ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মচারিণী থাকিতে পারে? বক্রী স্ত্রীলোকদিগকে কি বেশ্যাবৃত্তি বা জারজ সন্তানের ভার বহন করিবার দুর্ব্বিষহ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না? নিজের স্ত্রীকে কেবল বিলাসে রাখা, আর অন্য স্ত্রীলোকরা এইরূপ কষ্ট ভোগ করুক—তাহা কি স্ত্রীজাতির প্রতি অধিক সম্মান বা ভাল ব্যবহারের নিদর্শন, না নিজের অধিকতর স্বার্থপরতা বা

অহমিকার নিদর্শন, তাহা পাঠকবর্গকে অনুধাবন করিতে বলি। পাশ্চাত্য সমাজ এইরূপ ব্যবহার করেন এবং আমরা স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অত্যাচার করি বলেন, এবং তাঁহারা সসম্মান ব্যবহার করেন বলেন, এবং আমরা তাহা মানিয়া লই, এই আশ্চর্য্য।

এই জারজ সন্তানের ভার বহন করা দুঃসাধ্য বলিয়া অনেক স্ত্রীলোকই স্বভাবসুলভ মাতৃত্বের টান অবহেলা করিয়া ভ্রূণহত্যা করিতে বাধ্য হয়—অনেকেই সন্তান ত্যাগ করে এবং তজ্জন্য তাহারা মরিয়া যায়। পাশ্চাত্যে এই ভ্রূণহত্যা কত অধিক হয়, তাহা পাঠকবর্গকে দেখাইতেছি। ডেনভার সহরের শিশুঘটিত অপরাধের বিচারক জজ ডেনভার সাহেব তাঁহার বহুকালের অভিজ্ঞতার ফলে স্থির করিয়াছেন যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বৎসর ১,৫০০,০০০ ভ্রূণহত্যা হয়। ফরাসী দেশে Lyons সহরে যত শিশু জন্মায়, তদপেক্ষা অধিক ভ্রূণহত্যা হয়। Boncicaut হাসপাতালে যত শিশু জন্মায়, তাহার প্রায় আড়াইগুণ গর্ভস্রাবের case আসে। এক প্যারিশ সহরেই এক লক্ষের অধিক ভ্রূণহত্যা প্রতি বৎসরে হয়—অনেক বড় ডাক্তার বলেন। তাহার পর যৌনব্যাধি। ইংল্যাণ্ডে ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৭৫ জন এই ব্যাধি-গ্রস্ত হয়, তাহা Havelock Ellis সাহেব তাঁহার Psychology of Sex নামক বিশ্ববিখ্যাত পুস্তকে লিখিয়াছেন। ভারতবর্ষে দেশী সৈন্যের ভিতর যত যৌন ব্যাধি, ইংরাজ সৈন্যে তাহার দশগুণ বেশী। বিলাতের Royal Commissionএ প্রকাশ যে প্রতি বৎসর লণ্ডন সহরে ১২২৫০০ নূতন যৌন ব্যাধির case হয়—ইংল্যাণ্ডে ও স্কটল্যাণ্ডে ৮০০০০০ নূতন case হয়। তন্মধ্যে ১১৪০০০ গরমীর ব্যায়রাম। এই যৌন ব্যাধির ন্যায়, বিশেষতঃ গরমীর ব্যায়রামের ন্যায়, ভীষণ রোগ আর নাই বলিলেই হয়—ইহা সকল ডাক্তারই স্বীকার করেন। ইহা সংক্রামক ও দ্বিতীয়টীর ফল বংশগত—অপত্যেরা অনেকেই দৃষ্টিহীন, মূক, বধির, বুদ্ধিহীন, দন্ত ও গলার পীড়াগ্রস্ত, চিররোগী, বিকলাঙ্গ হয়। এই দুই ব্যাধির চিকিৎসা বহুকালব্যাপী ও বহুব্যয়সাপেক্ষ—আমাদের দেশে সে চিকিৎসা করাইবার শক্তি বেশীর ভাগ লোকের নাই। বিলাতে এই ব্যাধির উপশম ও বিস্তৃতি নিবারণ করিবার নিমিত্ত কোটী কোটী টাকা ব্যয় করিয়া কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না—আমাদের কি দুর্দ্দশা হইবে তাহা পাঠক-বর্গকে ভাবিতে অনুরোধ করি। শ্রদ্ধেয় বন্ধু বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় যিনি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে (বিশেষতঃ ছাত্রদের) বহু অন্বেষণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতা হইতে অনুমান করেন, শতকরা ২৫টী ছাত্র এই যৌন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে। বিবাহের বয়স যেরূপ বাড়িতেছে, এইরূপে বাড়িয়া যাইলে, তাহাতে আমাদের দেশ যে এই ব্যাধি দ্বারা কিরূপ প্লাবিত হইবে—সাধারণের কিরূপ স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

বিলাতে প্রকাশ্য ও গুপ্ত বেশ্যাবৃত্তি কিরূপ ভয়ঙ্কর হইয়াছে, তাহা এই সংক্রান্ত যে কোন পুস্তক দেখিলেই বুঝা যায়। যাহাদের সেরূপ গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর ও সুযোগ নাই, তাহাদিগকে লালা লজপৎ রায় লিখিত— Unhappy India পুস্তক পড়িতে অনুরোধ করি—তাহা লিখিয়া এই প্রবন্ধ আর বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। বিলাতের সমাজের দোষ দেখান আমার উদ্দেশ্য নয়—যাঁহারা বিলাতী আদর্শে আমাদের সমাজ-দেহ ভাঙ্গিতে চাহিতেছেন— যাঁহারা সে আদর্শ আমাদের অপেক্ষা ভাল মনে করেন— তাঁহাদিগকে, তাহাতে আমাদের কিরূপ ভীষণ দুর্দ্দশা হইবে, তাহাই দেখাইবার নিমিত্ত এরূপ লিখিতেছি। ভাঙ্গা সহজ কিন্তু গড়িবার উপায় নির্দ্ধারণ করা এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি কতটা আছে—তাহা বিবেচনা করিয়া তবে ভাঙ্গিতে হয়।

অধিক বয়সে যখন বিবাহ করা হয়, তখন দুই জনেই বহু স্ত্রী ও পুরুষের সহিত মিশিয়াছেন—অনেকের প্রতি আকর্ষণ হইয়াছে। পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের অভাবে বা আর্থিক বা অন্য প্রতিবন্ধক থাকায় হয় তো আকর্ষণের স্থলে বিবাহিত হইতে পায় নাই। অনেকে এইরূপ আকর্ষিত স্থলে উপগত হয়। আমেরিকায় যুক্ত-রাষ্ট্রের ডেনভার সহরের শিশু অপরাধের বিচারক লিণ্ডসে সাহেব তাঁহার লিখিত Revolt of Modern Youth নামক বিখ্যাত পুস্তকে তাঁহার ২৫ বৎসরের কর্ম্মোপলক্ষে অভিজ্ঞতার ফলে লিখিয়াছেন যে, ১৪ হইতে ১৭ বৎসরের যুবতীদের ভিতর নিদেন শতকরা ২০টীর চরিত্র-দোষ হইয়াছিল। পূর্ব্বে জার্ম্মানীতে সাধারণ লোকের

বিশ্বাস, কোন ১৬ বৎসরের অধিক বয়স্কা যুবতীই অক্ষতযোনি নাই, ইহা Havelock Ellis লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, ইংল্যাণ্ডের ষ্টার্ফোডসায়ারে বিবাহের পূর্ব্বে ছেলে হওয়া সেই প্রদেশের রীতির ভিতরই গণ্য। অন্যান্য অনেক স্থলে এইরূপ হয় তাহাও লিখিয়াছেন। তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল কি হয় তাহা একবার ভাবুন। আবার যদি সেরূপ উপগত না হয়েন, তথাপি সে ক্ষেত্রে সেই আকর্ষণকারী বা আকর্ষণকারিণীর ছায়া তাঁহাদের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া থাকে। এই আকর্ষণটা অনেক স্থলে কত গভীর, তাহা বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎ বাবু বহু পুস্তকেই দেখাইয়াছেন—সেইখানে মিলিত না হওয়ায় যে কি মহা দুঃখ, জন্মের মত জীবন কত বিষময় হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। এবং পরে যখন বেশী বয়সে বিবাহ করে, সে ক্ষেত্রে তাহাদের কিরূপ সুবিধা হইবে তাহা খতাইয়া দেখিয়া তাহারা বিবাহ করে। বিবাহিত জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে কলহ অবশ্যম্ভাবী; বিশেষতঃ বেশী বয়সে সকলেরই পৃথক ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে—অল্প বয়সের মতন পরের সহিত মিশিয়া যাইবার ক্ষমতা ক্রমেই লোপ পায়। একত্র ঘর করিবার পূর্ব্বে কেহ কাহাকে সম্পূর্ণ রকমে জানিতে পারে না—সুতরাং পরস্পরের স্বভাবের বা চরিত্রের নানা ভাবে অজ্ঞাত বা অপ্রত্যাশিত রূপ প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী—তন্নিমিত্ত কলহ আরও অধিক মাত্রায় হয়। তখন পূর্ব্ব আকর্ষণ স্মৃতি জাগরিত হয়—নিজেরা অপরের দ্বারায় প্রতারিত হইয়াছে—এইরূপ বিশ্বাস সহজেই আসে—সুতরাং সামান্য কলহও ভীষণ ভাব ধারণ করে,—বিবাহ সুখ ও শান্তিময় হয় না। এই জন্যই দেখা যায় যে, সকল ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজেই বিবাহ-বিচ্ছেদ মোকর্দ্দমা উত্তরোত্তর বাড়িতেছে।

এই ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজে বিবাহ সুখ ও শান্তিময় না হইবার আরও একটি বিশেষ কারণ আছে। সেখানে দুইজনেই পরস্পরের সঙ্গে বহুক্ষণই কাটাইতে বাধ্য হয়। যেমন ভাল জিনিষ—যাহা আমরা খাইতে বড় ভালবাসি, তাহা প্রত্যেক দিনেই বহু পরিমাণে খাইলে অল্প দিনেই তাহাতে বিতৃষ্ণা আসে, সেইরূপ স্বামী-স্ত্রীকে প্রত্যেক দিনই দিবারাত্রির বহু অংশ পরস্পরের সঙ্গে কাটাইতে হইলে অল্প দিনেই উহা বিতৃষ্ণাকর হইয়া পড়ে। এমন কি, বিবাহের পরেই উহারা মধুযামিনী যাপন (Honey moon) করেন, তাহারই ভিতর অনেক বিচ্ছেদ হইয়া যায়। যৌথ পরিবারে থাকিলে সেইরূপ পরস্পরের সঙ্গে অধিক কাল কাটাইতে আমরা বাধ্য হই না—সুবিধাও পাই না—তন্নিমিত্ত আমাদের ভিতর আকর্ষণটা বহুকালস্থায়ী হইতে পায়—আমাদের বিবাহিত জীবনের সুখ ও শান্তি তজ্জন্য কত ঋণী, তাহা আমাদের তরুণ তরুণীরা বুঝেন না। এই নিমিত্তই স্বামী-স্ত্রীতে বহু রকমের মতভেদ থাকা সত্ত্বেও, আমরা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া দিতে পারি, যাহা কেবল স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া আলাহিদা থাকিলে বিশেষতঃ পুত্র-কন্যাদি নিকটে না থাকিলে সচরাচর সম্ভব হয় না।

এই সকল নানা কারণে দেখা যায় যে, পাশ্চাত্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ মোকর্দ্দমা সর্ব্বত্রই বৃদ্ধি পাইতেছে। আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের অনেক স্থলে প্রতি বৎসরে যত বিবাহ হয়, তাহার অর্দ্ধেকের অধিক বিচ্ছেদ হইতেছে। মনে রাখিতে হইবে যে, অনেকে প্রকাশ্য কেলেঙ্কারীর ভয়ে, কোথাও বা বিবাহ-বিচ্ছেদ মোকর্দ্দমায় অর্থ ব্যয়ের জন্য, কোথাও বা অপত্যদের মুখ চাহিয়া অশান্তিময় গৃহেই বাস করেন বা কার্য্যতঃ পৃথক থাকেন—বিচ্ছেদ মোকর্দ্দমা হয় না; সুতরাং যত মোকর্দ্দমা হয় তাহার অপেক্ষা বহুগুণ অধিক বিবাহ দুই-জনের পক্ষেই দুঃখদায়ক হয়। সুতরাং নিজেরা পছন্দ করিয়া বেশী বয়সে বিবাহ করিলে দেখা যাইতেছে যে, ফলতঃ সেরূপ বিবাহ সুখকর হয় না। স্ত্রীলোকরা নিজের আকাঙ্ক্ষিত স্থানে বিবাহিত হইতে না পাইয়া বহুকাল একা একা থাকিবার কষ্ট সহ্য করিতে না পারায়, অনেক স্থলেই আর্থিক বা অন্য কোন সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বিবাহিত হইতে বাধ্য হন। এই জন্য মহাত্মা টলষ্টয় সাহেব তাঁহার Krentser Sonata নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্বকালে দাস-দাসীরা যেমন বাজারে বিক্রয় হইত, এখনও পাশ্চাত্যে স্ত্রীলোকরা সেইরূপই বিক্রীত হয়েন। আমাদের তরুণ-তরুণীরা ভাবেন, পরস্পরকে দেখিয়া জানিয়া বিবাহ করিলে বিবাহটা বড় সুখকর হয়; কিন্তু ফলতঃ যে তাহার ঠিক বিপরীত হয়, সেই অভিজ্ঞতা লাভ করিবার তাঁহাদের সময় ও সুবিধা হয় নাই। এই অধিক বিবাহ বিচ্ছেদ দেখিয়া অনেকে হয় ত বলিবেন, দুইজনে চুলোচুলি করার অপেক্ষা ফারখৎ হওয়া ভাল। তাঁহাদিগকে এই বিচ্ছিন্ন স্বামী-স্ত্রীর অপত্যদিগের দিকে

দৃষ্টিপাত করিতে বলি—তাহারা মাতা পিতার ভিতর একজনকে হারাইবেই। একজনের পক্ষে এই অপত্য প্রতিপালন করিতে কিরূপ বিপদগ্রস্ত হইতে হয়,—বিশেষতঃ যাহারা গরীব—আমাদের শতকরা ৯০,৯৫ গরীব—এবং অপত্যদের কিরূপ দুর্দ্দশা হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং এইরূপ বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়া সমাজের পক্ষে অমঙ্গলকর। মাতা পিতারা পুনরায় বিবাহ করিলে শিশুদের দুর্দ্দশা আরও বাড়িয়া যায়।

পাশ্চাত্যে এইরূপ ভ্রূণহত্যা, জারজ সন্তান, যৌন রোগ বৃদ্ধি দেখিয়া মাতৃত্ব নিরোধকারী উপায় অবলম্বন করিয়া যৌন মিলন হওয়াই বিধেয় এইরূপ মত অনেকের হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে এই মত প্রচলন করিবার নিমিত্ত সভা সমিতি হইতেছে। এইরূপ মাতৃত্ব নিরোধে প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়া হয়। তাহাতে কিরূপ স্বাস্থ্যহানি হয় তাহা প্রকাশ হইবার এখনও সময় হয় নাই। অনেক উদ্ভাবিত উপায়ের মন্দ ফল প্রকাশ হইয়াছে। লোকসংখ্যা যে কমিবে তাহা নিশ্চিত। এই জন্য ফরাসীদের লোকসংখ্যা অনেক দিন ধরিয়া অতি সামান্য বৃদ্ধি হইয়াছে। এবং তন্নিমিত্ত তাহারা জার্ম্মান ভয়ে এতাবৎ কাল ভীত ছিল এবং ইংলণ্ডের ও রুষিয়ার সাহায্য না পাইলে তাহারা যে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইত তাহা নিশ্চিত। এইরূপে যথেচ্ছা কাম উপভোগের ফলে লোকেরা যে অসংযমী হইবে তাহাও নিশ্চিত; আধ্যাত্মিক ও মানসিক অবনতিও যে অবশ্যম্ভাবী, তাহাও অনেক পণ্ডিত বলিতেছেন। অপত্য উৎপাদন ও প্রতিপালন হইতেই আমাদের সকল সদ্‌গুণের উদ্ভব ও বিকাশ হয়। আমাদের সকল পরার্থপর প্রবৃত্তিই তাহা হইতেই উৎপন্ন হয় (১৩৩২ সালের ভারতবর্ষের মাঘ সংখ্যা ২০০ পৃষ্ঠা দেখুন)। তাহাদের বিকাশ পথ ক্রমশই সঙ্কুচিত হইবে—স্বার্থপরতার পূর্ণ প্রকাশ হইয়া সকলেরই জীবন শুষ্ক ও মরুময় হইবে।

আমরা দেখিলাম, ব্যক্তিতান্ত্রিক সকল সমাজেই অনেক যুবতী স্ত্রীলোককেই প্রথমতঃ বহুকালই অবিবাহিত থাকিতে হয়। তাহাদের সংখ্যা শতকরা ২৫ হইতে ৪০টী। আমাদের ভিতর ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ে ইতিমধ্যেই ২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্কা ১০০০ স্ত্রীলোকের ভিতর ২৪৪টী অবিবাহিতা (See Census Report of Bengal Behar & Orissa 1911 P. 351)। যাঁহারা আমাদের বিধবাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া আমাদের সমাজকে স্ত্রীলোকদিগের নির্য্যাতনকারী বলেন, ও পাশ্চাত্যের অনুকরণ করিতে বলেন, তাঁহাদিগকে পাশ্চাত্যের এই সকল বয়স্থা অবিবাহিতাদের অবস্থার কথাটা ভাবিতে অনুরোধ করি। তাঁহারা কি প্রথম যৌবনারম্ভ হইতেই সেই বৈধব্য দশা ভোগ করিতেছেন না? যৌবনে প্রকৃতি কি তাঁহাদিগকে যৌন মিলনের জন্য ব্যগ্র করিয়া তোলে না? সেই সময়ে তাঁহাদের মনোমত যুবকদিগের প্রতি কি তাঁহারা ধাবিত হন না? সেই সময়ে তাঁহাদের মনোমত স্থানে মিলিত হওয়ার সুখের স্বপ্ন দেখেন না? তাঁহাদের অধিকাংশকেই কি বার বার বিফল মনোরথ হওয়া বা ভগ্নাশার—অথবা প্রত্যাখ্যানের অপমানের গুরুভার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে গোপন করিয়া রাখিতে হয় না? অনেকের কি তন্নিমিত্ত জীবন বিষময় হয় না? এই সকল অবিবাহিতা স্ত্রীলোকদিগকে বিধবাদেরই মতন কাম উপভোগ ও যৌন প্রেম হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়; অথচ বিধবাদের মতন সংযম ও আশা ত্যাগ শিক্ষার অভাবে তাহাদিগকে প্রকৃতি প্রতিদিন পুরুষদিগের সহিত সংমিশ্রণে প্রধাবিত করিতেছে। চতুর্দ্দিকে থিয়েটারে, চলচ্চিত্রে, নাটকে, নভেলে, যৌন প্রেমের উন্মত্ত উপভোগের চিত্র তাহাদের আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিতেছে; অথচ দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর মনের মানুষ পাইবার আশায় আশায়, ক্রমে ভগ্নাশায়—শেষে নিরাশায় যৌবন কাটিয়া যাইতেছে—অনেকের প্রৌঢ় কালও কাটিয়া যাইতেছে—জীবনও কাটিয়া যাইতেছে—ইহা কি গ্রীক পুরাণোক্ত Tantalus-এর নির্য্যাতন নয়? এইরূপে কিছুদিন কাটাইয়া, সংসারের নীচতায়, শঠতায়, অর্থদাস্যতায়, অবিশ্বাস্যতায় অনভিজ্ঞ তরুণীদের কতকাংশ কখন বা রূপে বিমোহিত হইয়া—কখন বা নিজেদের উদ্দাম কল্পনার্পিত গুণে আকৃষ্ট হইয়া নায়কদিগের দ্বারায় প্রতারিত হন এবং কতক বা আত্মহত্যা, কতক বা জারজ সন্তান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছেন; কতক বা তাহাদের মমতা ত্যাগ করিতে না পারায় অবশেষে বারবণিতা হইতে বাধ্য হন এবং যৌন রোগাক্রান্ত হইয়া সমাজে যৌন রোগের বিস্তার করিতেছেন। কতক অংশের বা মনের মতন মানুষ পাইবার আশায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের

পর বৎসর কাটিয়া যায়। ক্রমে যৌবনও কাটিয়া যায় দেখিয়া অবশেষে অর্থের বা অন্য প্রলোভন বা অন্যবিধ কারণে প্রণোদিত হইয়া অমনঃপূত বা চরিত্রহীন পাণিপ্রার্থীদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়া হৃদয়ের অন্তঃস্থলে নিজেদের দুঃখভার গোপন করিয়া অশান্তিময় জীবনযাপন করিতেছেন; অথবা অসহনীয় হইলে—বিবাহ বিচ্ছেদ আদালতের আশ্রয় লইতেছেন। কতক অংশ বা আশায় আশায় বৎসরের পর বৎসর কাটাইয়া ক্রমে ভগ্নাশায়—শেষে নিরাশায়—খিটখিটে মেজাজে ভালবাসা বর্জ্জিত জীবনে, শুষ্ক হৃদয়ে, আজীবন কুমারী অবস্থায় কাটাইয়া বৃদ্ধ বয়সে নির্জ্জন কারাবাস ভোগ করিয়া জীবনলীলা শেষ করিতেছেন। পাঠকবর্গ এই চিত্র বিকৃত-মস্তিষ্কের কল্পনা মনে করিবেন না—অনেক সহৃদয় পাশ্চাত্য চিন্তাশীল ব্যক্তি এই সত্য প্রকাশ করিয়াছেন। ফরাসী পণ্ডিতমণ্ডলীর সভ্য (member of the French Academy) ইউজিন ব্রিউঁ লিখিত Damaged goods, Three daughters of M. Dupaunt পড়িলে তাহা বুঝিবেন। এইরূপে পাশ্চাত্যে বহু স্ত্রীলোক তাহাদের দুই মুখ্য অভাব মাতৃত্বের সুখ ও ভালবাসা পাওয়া ও ভালবাসিতে পাওয়া বহুকাল বা চিরকাল পূরণাভাবে নির্য্যাতিত হয়—তাহাদের স্নায়ুমণ্ডলী বিকৃত হয়—তন্নিমিত্ত তাহারা আমোদ ও উত্তেজনা ও বিলাস-প্রবণ হয়। আমরা তাহাদের আমোদ ও বিলাসপ্রিয়তা দেখিয়া তাহাদিগকে সুখী মনে করি, কিন্তু তাহা যে বারবণিতাদের আমোদ ও বিলাসপ্রিয়তার মতন হৃদয়ের হাহাকার চাপা দেওয়ার চেষ্টা, তাহা দেখি না। এই অবিবাহিতাবহুল, প্রতারিতাবহুল, প্রেমহীনবিবাহিতাবহুল, পাশ্চাত্যেই কেবল মাতৃত্বে বিতৃষ্ণ ও পুরুষ-বিদ্বেষী স্ত্রীজাতি দেখা যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে, জীব জগতে আর কোথাও তো এরূপ মাতৃত্বে বিতৃষ্ণ পুরুষবিদ্বেষী স্ত্রীজাতি দেখা যায় না। ইহা যে কত ভীষণ, কত বহু ও দীর্ঘকালব্যাপী নির্য্যাতনের ফলে সম্ভব হইয়াছে, তাহা আমরা দেখি না। যেখানে যৌবনকালেও পুরুষরা আর্থিক অস্বচ্ছলতাজনিত ভীরুতায় স্ত্রীলোকদিগের প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ তুচ্ছ করে ও তাহাদের তৎকালসুলভ সর্ব্বত্যাগী ভালবাসা উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যায়—যেখানে পুরুষরা স্ত্রীলোকদিগের রূপ ও বাহ্যিক গুণ সম্ভোগপ্রার্থী—যেখানে বহু পুরুষই যৌন রোগগ্রস্ত, যেখানে স্ত্রীজাতির প্রকৃতিগত মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা ও ভালবাসাপ্রবণতা—যাহা তাহাদিগের জীবন সরস রাখিবার মূল উৎস—বহুকাল আশ্রয়াভাবে শুকাইয়া যায়, সেখানে যে প্রকৃতির পরিশোধে বহু স্ত্রীলোকই বিবাহে ও মাতৃত্বে বিতৃষ্ণ ও পুরুষবিদ্বেষী হইবে, অথবা অর্থদাস পুরুষদিগকে তাহাদের বিলাস সম্ভার যোগাইবার ও কাম উপভোগের সহায় মাত্র বিবেচনা করিবে ও পুরুষরা অপারগ হইলে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া অন্য কাহাকে আশ্রয় করিবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? পাশ্চাত্যে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ব্যবহার—তাহাদিগের মুখ্য অভাব মাতৃত্ব ও ভালবাসা হইতে বহুকাল বা চিরকাল বঞ্চিত করিয়া পুরুষদিগের সহিত বিষম প্রতিযোগিতায় কর্ম্ম করিতে অধিকার দেওয়ায়—আর আহার ও পানীয় না দিয়া তাহাদিগকে বিবিধ ভূষণে সজ্জিত করিয়া রাখায় কোন প্রভেদ আছে কি না তাহা পাঠিকাবর্গ বিবেচনা করুন। পাশ্চাত্যের কি অপার মহিমা! তাহাদের যেমন বাহ্যিক চাকৃচিক্যময় ভেজাল মাল এ দেশে প্রচলন হইয়াছে ও তাহাতে আমাদের দেশীয় শিল্পের ধ্বংস ও আর্থিক সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তেমনই তাহাদের সমাজ সম্বন্ধে আপাত-মনোহর অসার মতবাদে আমাদের সমাজসংহতি ধ্বংস হইতেছে ও তাহাতে পারিবারিক সুখ শান্তি নষ্ট হইতেছে ও আমাদের জীবন স্ফূর্ত্তিহীন প্রেমহীন ও দুর্ব্বিষহ হইতেছে।

খেলার পুতুল

শ্রীনরেন্দ্র দেব

১৯

পিতার শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাবার পর অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মন নিয়ে অনিলা স্বামীর কাছে ফিরে এলো।

আসবার সময় অনিলা এবার মনেমনে দৃঢ় সঙ্কল্প করে এসেছিল যে, সুশীলের সমস্ত দোষ মার্জ্জনা ক'রে সে তাকে অন্তরের মধ্যে স্বামী ব'লে গ্রহণ করবার জন্য একবার প্রাণ-পণে চেষ্টা ক'রে দেখবে। মনকে সে এই ব'লে বোঝাতে লাগ্‌লো যে শতকরা নিরেনব্বই জন হিঁদুর মেয়ে যা পারছে, সেই বা তা পারবেনা কেন? আপন মনের আদর্শের সঙ্গে তো মিলিয়ে তারা কেউ স্বামীকে পায়না—অথচ সেই স্বামীকে নিয়েই তো তারা অনায়াসে জীবনটা কাটিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে! এ কেমন ক'রে তাদের পক্ষে সম্ভব হয়?

অনিলা অনেক ভেবে স্থির ক'রলে যে তাদেরই মতো সে এবার স্বামীর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে শুধু তার স্বামীত্বটুকুকেই শ্রদ্ধা ক'রে নিজের প্রেমের পূজা নিবেদন করে দেবে। পনেরো আনা হিঁদুর মেয়েই যেমন ক'রে তাদের কুৎসিত কুচরিত্র স্বামীকেও দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে নেয়, সেও তেমনি ক'রে তার স্বামীরূপ উপদেবতাটিকে নারীর হৃদয়-মন্দিরের একমাত্র উপাস্য ইষ্ট-দেবতা ব'লে বরণ ক'রে নেবে!

কিন্তু, অনিলা পতিগৃহে এসে তার এই কঠোর সঙ্কল্পটুকুকে কার্য্যে পরিণত করবার মোটেই সুযোগ পেলেনা। প্রথম দিনই সুশীল তাকে জিজ্ঞাসা ক'রলে—কি গো! এবার যে আমার উপর বড্ড সদয় দেখছি! এত যত্ন তো কখনও পাইনি তোমার কাছে, বরং চিরদিন অবহেলাই ক'রে এসেছো! হঠাৎ একেবারে ভোল্ বদলে ফেল্‌লে যে! ব্যাপার কি?

অনিলা বেশ শান্তভাবেই বললে—হিঁদুর মেয়ের পক্ষে স্বামীর সেবা যত্ন করাটাই তো স্বাভাবিক। এর মধ্যে আশ্চর্য্য হবার তো কিছু নেই। বরং, এতদিন আমি তোমার প্রতি আমার কর্ত্তব্যটুকু যথোচিত পালন ক'রতে পারিনি ব'লে অপরাধী হ'য়ে আছি, আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো।

সুশীল ঘাড় নেড়ে বললে—উঁহুঁ! কিছু মতলব আছে নিশ্চয়!—"বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যম্ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ" অকস্মাৎ এতটা সতীসাধ্বী স্ত্রী হ'য়ে ওঠার পিছনে কিছু 'প্যাচ' আছে নিশ্চয়। এতদিন পরে হঠাৎ এমন কর্ত্তব্য-বুদ্ধি জেগে উঠলো কেন?

অনিলা এ কথা শুনে মনেমনে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠলেও সম্পূর্ণ সংযত হ'য়েই বললে—এতদিন একটা অন্যায় ক'রে এসেছি বলে' বরাবরই কি তাই ক'রতে হবে?

সুশীল বললে—দেখো, তুমি যে আমায় ভালবাসতে পারোনি—সে আমি জানি। কিন্তু সেজন্যে আমার একটুও দুঃখ নেই। কারণ, 'ভালোবাসা' বলে যে যথার্থই কিছু আছে এ আমি মোটেই বিশ্বাস করিনি। ও শুধু মনের একটা বিকৃত অবস্থা মাত্র! তাই, তোমার ভালোবাসার অভাব আমাকে কোনও দিনই পীড়া দিতে পারেনি। অস্থাবর সম্পত্তি হিসাবে তোমার উপর আমার যে একটা মালিকান স্বত্ব আছে এইটুকুই যথেষ্ট! ভালোবাসার অভাব আমার সইবে কিন্তু, তার এই ভানটা আমার কাছে একেবারেই অসহ্য!

অনিলা এবারেও অত্যন্ত বিনীতভাবে ব'ললে—ভালো-বাসার ভান তো আমি কিছু করিনি। এ তো শুধু আমি আমার দেশের আরও অসংখ্য মেয়ের মতো—আমার কর্ত্তব্যটুকুই করবার চেষ্টা করছি মাত্র! নইলে, 'প্রেম'কে তুমি যেমন স্বীকার করোনা, আমিও তেমনি প্রেমহীন বিবাহে স্ত্রীর উপর স্বামীর যে কোনও রকম স্বত্ব জন্মাতে পারে, এ কথা স্বীকার করিনা।

সুশীল বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে—কেন?—পুরোহিতের কাছে মন্ত্র পড়ে, অগ্নি ও শালগ্রাম শিলা সাক্ষ্য রেখে যেদিন তোমাকে আমি বিবাহ করিছি, সেইদিনই

তো তোমার উপর আমার একটা একচ্ছত্র অধিকার জন্মেছে।

এইবার অসহিষ্ণুর মতো ঘাড় নেড়ে অনিলা বললে—না! সেটা আপনার সম্পূর্ণ ভুল! কেবল মন্ত্র পড়িয়ে কোনও দিনই দুটি নরনারীকে একত্রে বেঁধে ফেলতে পারা যায় না। শালগ্রাম শিলা একটির বদলে যদি তেত্রিশ কোটীও আসে এবং অগ্নিশিখা যদি গগনস্পর্শীও হ'য়ে ওঠে তবুও দু'টি হৃদয় কখন একত্র হ'তে পারেনা যদি না তারা প্রেমের পরশ-মণির ছোঁয়া পায়!

—আরে, রেখে দাও তোমার প্রেমের পরশমণির ছোঁয়া! তোমাদের পরশমণি হলুম এই আমরা—পুরুষ! এদের ছোঁয়া পেলেই তোমরা ধন্য হ'য়ে যাও। তোমাদের ভালোবাসা একেবারে উথলে ওঠে! তা যদি না হ'তো তাহ'লে একটাও হিন্দু-বিবাহ সুখের হ'তো না!

—হিন্দু-বিবাহ যে অসুখের হয় না তার কারণ নিরুপায় হিন্দুনারীর বাধ্যতামূলক আত্মত্যাগ! সে নিজের ব্যক্তিত্বকে পতিরূপ আদর্শের পায়ে নিঃশেষে বলি দেয় বলে! হিন্দু বিধি ব্যবস্থার মধ্যে যদি বিবাহ বিচ্ছেদ আইন প্রচলিত থাকতো এবং হিন্দু নারীর যদি স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করবার কোনও যোগ্যতা থাকতো, তাহলে দেখতে প্রতি বৎসর বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা এদেশেই সব চেয়ে বেশী হ'য়ে উঠতো! কারণ এখনও এখানে বয়ঃপ্রাপ্ত পাত্র পাত্রীর পরস্পরের জন্য তাদের জীবনের সঙ্গী ও সঙ্গিনী নির্ব্বাচন ক'রে দেন এ দেশের অভিভাবকেরা! এরা যেন একটা চিরকেলে নাবালকের জাত!

সুশীল হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলে—বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা থাকলে তুমি বোধ হয় এতদিন আমাকে ত্যাগ ক'রে চলে যেতে? না?

অনিলা ব'ললে—আমার কথা ছেড়ে দিন্। কারণ, আমি মেনে চলি একমাত্র আমার মনের মানাকে! বিবাহ-বিচ্ছেদের আইন থাক বা না থাক্—যে মুহূর্ত্তে বুঝবো আমার আত্ম-সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে এখানে বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব সেই মুহূর্ত্তে আমি এখান থেকে চলে যাবো?—

—বলো কি? তুমি যে আমাকে একেবারে অবাক্ ক'রে দিচ্ছ!—স্বামীর সহস্র অত্যাচারেও হিন্দুনারী যে পতিকে ত্যাগ ক'রে চলে যায় এ রকম ত কখন শুনিনি!

—শোনেননি, তার কারণ, আপনারা এ কথাটা শুনতে চাননা ব'লে। স্বামীর অসহ্য অত্যাচারে বা শাশুড়ী ননদের উৎপীড়নে অনেক মেয়েই এদেশে গৃহত্যাগ বা দেহত্যাগ করতে বাধ্য হ'চ্ছে, কিন্তু আপনারা নিজেদের দোষ ঢাকবার জন্য—প্রকৃত কারণটাকে চাপা দিয়ে তাদেরই ললাটে কুলকলঙ্কিনীর ঘৃণিত ছাপ এঁকে দিচ্ছেন। জগৎ জানছে তারাই দোষী! আপনাদের অমার্জ্জনীয় অপরাধের কথা তো আর তাদের কাণে পৌঁছুতে দিচ্ছেন না।

সুশীল এবার বিরক্ত হ'য়ে উঠে বললে—আঃ, থামো! মেয়েমানুষের মুখে এই সব ডেঁপোমীর কথা শুনে আমার পা' থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে ওঠে! মেয়েদের সতীত্বের অভাব জাতি ও সমাজের দিক দিয়ে দেশের পক্ষে যতখানি ক্ষতিকর পুরুষের ঠিক ততটা নয়,—কারণ, পুরুষের দায়িত্ব খুব সামান্যই! কিন্তু, মেয়েদের সন্তান গর্ভে ধারণ ক'রতে হয় ব'লে তাদের দায়িত্ব গুরুতর এবং জীবনব্যাপী—

বাধা দিয়ে অনিলা বললে আপনি কি ব'লছেন? পুরুষের দায়িত্ব আমাদের চেয়ে একটুও কম নয়!—দুশ্চরিত্র পুরুষ কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্ত ও ভগ্নস্বাস্থ্য হ'য়ে শুধু নিজের ও নিজের বংশাবলীর নয় দেশের ও জাতিরও সমূহ অনিষ্ট ক'রে!—তাদের সবাইকে বাছাই ক'রে নিয়ে দেশ থেকে নির্ব্বাসিত ক'রে দেওয়া উচিত—

অনিলার এ আক্রমণ সোজা সুশীলকে গিয়ে আঘাত করলে। সে উত্যক্ত হ'য়ে উঠে বললে—পুরুষকে ব্যাধিগ্রস্ত করে কে?—সে তো তোমরাই! নির্ব্বাসিত যদি কাউকে করতে হয় তো দেশের কুলটাদেরই করা উচিত—

অনিলা হেসে বললে তাতে' কোনও ফল হবেনা। কারণ, আপনারা অবিলম্বে আবার একদল কুলটার সৃষ্টি করে নেবেন—! ওদের না হ'লে যে আপনাদের চলবে না! একনিষ্ঠতা শুধু নারীর পক্ষেই সম্ভব! কুলটা নারীও যেদিন' ভালোবাসে সেদিন সে তার বহুপরিচর্য্যাকে ঘৃণা ক'রতে শেখে। কিন্তু চরিত্রহীন পুরুষ জীবনান্তকাল পর্য্যন্তই নারীর সর্ব্বনাশের সন্ধান ক'রে ফেরে! তাই ভালোবাসার মর্য্যাদা নেই তাদের কাছে একটুও—

সুশীল পা ঠুকে বললে—সে ত নেইই!—তারা তো তোমাদের মতো সেন্টিমেণ্ট্যাল্ জীব নয়, তারা কাজের লোক, ভাব-বিলাসী নয়! মোট কথা, তোমরা নারী,

কোমল জাতি, চিরদিন পুরুষের অধীন হ'য়ে থাকতে বাধ্য। আমাদের সমান অধিকারের দাবী করাটা তোমাদের আজকাল একটা ফ্যাশান হ'য়ে উঠেছে বই ত নয়, নইলে, দেহে মনে শরীরের গঠনে এমন কি কণ্ঠস্বরে পর্য্যন্ত পুরুষের সঙ্গে তোমাদের শুধু যে একটা প্রকৃতি গত পার্থক্য আছে তাই নয়—তোমরা সকল দিক দিয়েই আমাদের চেয়ে দুর্ব্বল। ও চুলই ছাঁটো, ট্রাউজারই পরো, সিগারেটই খাও, আর হকীই খেলো, খোদার উপর খোদাগিরি করা চলবেনা! মেয়েমানুষকে মেয়েমানুষ হ'য়েই থাকতে হবে চিরদিন।

অনিলা এ কথার আর কোনও উত্তর না দিয়ে নিজের কাজে চলে যাচ্ছিল—

যাবার সময় সুশীল তাকে ব'লে দিলে—বামুনঠাকুরুণকে একটু চা' তৈরী ক'রে আনতে ব'লে এসেছিলুম, কি ক'রছে দেখো তো গিয়ে। চট্ করে তাকে পাঠিয়ে দাওগে!

অনিলা আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—এমন অসময়ে চা?

সুশীল একটু ঢোঁক গিলে বললে—হ্যাঁ, আজ শরীরটা বড় ম্যাজ-ম্যাজ করছে—আর একটু চা না খেলে জ্বর আসতে পারে।

অনিলা একটু ব্যস্ত হ'য়ে বললে—কই, আমাকে তো সে কথা কিছু বলেন নি? আমি এখনি চা ক'রে এনে দিচ্ছি—একটু আদার রস দিয়ে আনবো?

সুশী৷ ব'ললে—না—না, তোমাকে আর কষ্ট ক'রতে হবেনা। বামুনঠাকুরুণকে বলেছি, বোধ হয় চা এতক্ষণ তৈরী হ'য়ে গেছে;—তাকে নিয়ে আসতে বলো—

—আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসছি।

সুশীল বিরক্ত হ'য়ে বললে—আঃ! তোমাকে কে আনতে ব'লছে, তাকে পাঠিয়ে দাওগে!

অনিলা চলে গেল।

রান্নাঘরে গিয়ে দেখলে—বামুনঠাকরুণ এর মধ্যেই চা' তৈরী ক'রে ফেলেছে!

অনিলা বললে—বাবুকে চা দিয়ে এসো বামুনঠাকরুন—

ক্ষ্যান্তমণি একটু ইতস্ততঃ করে ব'ললে—তুমিই দিয়ে এসোনা দিদি, আমি ততক্ষণ লোকজনদের মোটা ভাতটা' চাপিয়ে দিই।

অনিলা গম্ভীর ভাবে বললে—ভাতটা পরে চড়িয়ো, আগে চা' দিয়ে এসো।

ক্ষ্যান্তমণি চা' নিয়ে একটু যেন দ্বিধা-জড়িত পদে উপরে গেল।

অনিলা এবার এসে পর্য্যন্ত ক্ষ্যান্তমণির মধ্যে কেমন যেন একটা ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রছিল। সুশীলের যখন তখন কারণে অকারণে বামুনঠাকুরুণকে ডেকে পাঠানো এবং হঠাৎ তার মাঝে মাঝে রান্না ঘরে এসে আবির্ভাব হওয়াটাও তার চোখে বড় নূতন রকম ঠেকছিল।

একটা বিশ্রী সন্দেহ তার মনে দু'একবার উকী মেরেছিল বটে, কিন্তু, অনিলা সেটাকে মোটেই আমোল দেয়নি।

রান্নাঘরে যেটুকু তার প্রয়োজনীয় কাজ ছিল শেষ হ'য়ে গেল, অথচ ক্ষ্যান্তমণি এখনও ফিরছে না দেখে, অনিলার মনে হ'ল—চা'য়ের বাটীটা উপরে পৌঁছে দিয়ে আসতে বামুন ঠাকুরুণের এত দেরী হ'চ্ছে কেন?

অনিলা কৌতূহলী হ'য়ে উপরে এসে যা দেখলে, তাতে একটা অসহ্য ঘৃণায় ও তিক্ত বিরক্তিতে তার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠলো।

সুশীল একখানা চেয়ারে ব'সেছিল। অনিলা দেখলে ক্ষ্যান্তকে আপন অঙ্কে টেনে নিয়ে সে তার অধরে চায়ের পেয়ালাটি ধ'রে, তাকে পান করবার জন্য সপ্রেম কটাক্ষে অনুরোধ করছে।

ক্ষ্যান্ত চা পানে আপত্তি ক'রছে, আবার মাঝে মাঝে এক আধ চুমুক খাচ্ছেও! উঠে পড়বার চেষ্টা ক'রছে—কিন্তু সুশীল বাহুবেষ্টনে তার কটিদেশ আলিঙ্গন ক'রে তাকে যখন জোর ক'রে টেনে বসাচ্ছে সে নিরুপায়ের মতো বসেও প'ড়ছে। তার চোখে মুখে একটা ভয় ও উদ্বেগের সঙ্গে একটা সার্থকতার আনন্দও যেন দেখা যাচ্ছিল।

অনিলা শুনতে পেলে চাপা গলায় ক্ষ্যান্ত ব'লছে—আঃ, কি করো? ছেড়ে দাও, আমি পালাই। তুমি বড় বেহায়া হ'য়ে উঠেছো। তোমার সামনে আর আসবোনা! ছোট বউমা জানতে পারলে আমি আর তাকে মুখ দেখাতে পারবোনা যে!—গলায় দড়ী দিয়ে ম'রবো কিন্তু!—

সুশীল মৃদু হেসে তার মুখ চুম্বন ক'রে ব'ললে—ছোট বউ তো এ বাড়ীর এখন তুমি। অনিলা তোমাকে মেনে

চলতে পারে এখানে থাকতে পাবে—নইলে তাকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবো—

অনিলা আর শুনতে পারলেনা। টলতে টলতে পাশের ঘরে চলে গেল। অপমানের একটা তীব্র জ্বালায় তার সমস্ত অন্তর বিদ্রোহী হ'য়ে উঠলো! নিজেকে নিজে সে বারম্বার ধিক্কার দিয়ে বলতে লাগল—ছি-ছি, এই বর্ব্বর ইতর পশুকে সে তার সতী-চিত্তের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্পণ ক'রতে উদ্যত হ'য়েছিল!

সে বাড়ীতে অনিলার আর একমুহূর্ত্তও থাকতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। সুশীলের মুখদর্শন করতেও তার ঘৃণা বোধ হচ্ছিল। সেই রাত্রে সে যে কি ক'রবে কিছু ভেবে ঠিক ক'রতে পারছিল না। ইচ্ছে হচ্ছিল—যেদিকে দু'চক্ষু যায় সেই পথে সে ছুটে চলে যাবে এখনি।—দূরে দূরে—বহুদূরে—এই নরক থেকে যতদূরে পারে সে পালিয়ে যাবে।

কিন্তু, আজ পর্য্যন্ত কখনও সে রাস্তায় পা' দেয় নি। কোথায় যাবে—কেমন করে যাবে—কিছুই সে জানে না। যদি এর চেয়েও কোনও বড় বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়ে! অনিলা সেই সম্ভাবনা কল্পনা ক'রে আতঙ্কে শিউরে উঠলো! হিন্দুনারী যে কত অসহায়া—কত পরনির্ভরশীলা—আজ যেন অনিলা সে কথা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে পারলে।

এখানে যে সে আর একদিনও থাকবেনা এটা একরকম স্থির ক'রেই ফেলেছিল, কিন্তু কোথায় যে যাবে সেইটেই অনিলা কিছুতে স্থির করতে পারছিল না।

একবার ভাবলে মামার বাড়ী চলে যাবে—কিন্তু তাদের অবস্থা এতো খারাপ যে সেখানে গিয়ে ওঠা মানে তাদের বিব্রত ক'রে তোলা। দাদার কাছে গিয়ে দাঁড়ানোও অসম্ভব! কারণ বাবা উইলে তাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে যাওয়াতে অনিলা বড় ভাইয়ের বিষদৃষ্টিতে পড়েছে! বিশেষ তার মণিদা'কে তার বাবা ষ্টেটের একজন একজিকিউটার করে যাওয়াতে, এর ভিতর অনিলার হাত আছে নিশ্চয়, এই মনে করে দাদা তার সঙ্গে বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। মণিদার কথা মনে হ'তেই তার হঠাৎ খেয়াল হ'লো—তাই তো! আমার এমন একজন পরমাত্মীয় থাকতে কি না আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো ভেবে অস্থির হ'য়ে পড়ছিলুম!

অনিলা তখনি টেবলের ধারে গিয়ে টেবল-ল্যাম্পটা জেলে নিয়ে আনন্দকে একখানা চিঠি লিখে দিলে—যেন কাল ভোরে উঠেই সে চলে আসে, বিশেষ জরুরি কাজ আছে।

চাকরের হাতে চিঠিখানা তখনি আনন্দকে পাঠিয়ে দিয়ে, স্যুটকেস্‌টা টেনে নিয়ে গোছাতে গোছাতে সে ভাবতে লাগলো—কিন্তু, মণিদা যদি তাকে আশ্রয় না দেয়! যদি দুর্নামের ভয়ে, কলঙ্কের আশঙ্কায়—তাকে তাড়িয়ে দেয়—! অনিলার সর্ব্বশরীর যেন ভিতর থেকে থর্‌ থর ক'রে কেঁপে উঠলো! মনে মনে ভগবানকে ডেকে সে যোড়হাত ক'রে বললে—দয়াময়! যদি এই চরম লাঞ্ছনাও শেষ পর্য্যন্ত অদৃষ্টে ঘটে, তাহ'লে আমার আত্মহত্যার অপরাধ নিওনা ঠাকুর! মণিদা আমায় বিপন্ন দেখেও যদি ঠাঁই দিতে বিমুখ হ'ন, তাহ'লে যে আর আমার লজ্জার অবধি থাকবেনা! তার পরও তো আর আমি বাঁচতে পারবোনা!

সে রাত্রে অনিলা আর কিছু খেতে পারলেনা। 'বড় গরম। কিছু খেতে ইচ্ছে নেই' এই ব'লে একখানা মছলন্দ পাটি আর একটা মাথার বালিশ নিয়ে সে ছাদে চলে গেল। ক্ষ্যান্ত একবার ছাদে এসে জিজ্ঞাসা করলে—এক গ্লাস নেবুর কি ঘোলের সরবৎ করে দেবো কি ছোড় দি?

অনিলা গম্ভীর ভাবে বললে—না, তুমি নেমে যাও। আর মনে ক'রে রেখো যে—তুমি এ-বাড়ীর রাঁধুনী, সুতরাং আমি তোমার দিদি হ'তে পারিনি!

ক্ষ্যান্তমণি অগত্যা নেমে গেলো, কিন্তু মনে মনে বিড় বিড় করে বকতে বকতে গেল—এত দর্প—এত অহঙ্কার কি সইবে?

এরই কিছুক্ষণ পরে অনিলা কি একটা জিনিস তার স্যুটকেসে রাখতে ভুলে গেছল বলে তাড়াতাড়ি যখন ছাদ থেকে নেমে তার ঘরে ঢুকতে যাবে এমন সময় হঠাৎ পথের মাঝখানে সাপ দেখে লোক যেমন আঁৎকে উঠে, তেমনি করেই অনিলা একটা দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে ও আতঙ্কে শিউরে উঠলো।

অনিলা দেখলে—সেই অতরাত্রে সুশীল ক্ষ্যান্তর দুটো হাত নিজের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে প্রায় একরকম তাকে জোর করেই টানতে টানতে তার শয়ন কক্ষে নিয়ে এসে ঢুকলো।

অনিলা আবার ছাদে ফিরে' গেল। সারা রাত আর

তার ঘুম হ'লোনা। স্বামীর চরিত্র ভালো নয় এ কথা সে পাঁচজনের কাছে কাণেই শুনেছিল, কিন্তু চোখের উপর তার চরিত্রের এ বীভৎস দিকটা সে কখনও দেখেনি। আজ তার বার বার মুমূর্ষু পিতার মৃত্যু শয্যার সেই কথা কটি মনে পড়তে লাগলো—"আমি তোকে আশীর্ব্বাদ করছি মা—হীনচেতা কুচরিত্র পাষণ্ড স্বামীকে পরিত্যাগ করলে কোনও পাপ তোকে স্পর্শ করতে পারবেনা।"

* * *

ভোর বেলা আনন্দ এসে হাজির। দিদি, তুমি আমায় ডেকে পাঠিয়েছো কেন ভাই ?

—ব'লছি আন্দু। আগে তুই শীগ্‌গির একখানা গাড়ী ডেকে নিয়ে আয়।

আনন্দ তখনি গিয়ে একখানা গাড়ী ডেকে নিয়ে এলো।

সুশীল তখনও ওঠেনি। অনিলা একখানা চিঠি লিখে রেখে চলে এলো—"আপনি আমাকে দূর করে তাড়িয়ে দেবার আগেই আমি স্বেচ্ছায় এ বাড়ীর নূতন ছোট বউকে আমার সমস্ত অধিকার ছেড়ে দিয়ে চল্লুম। ভগবান আপনাদের সুখী করুন।"

গাড়ীতে উঠে অনিলা আনন্দকে বললে—আমাকে মণিদা'র বাড়ী নিয়ে চল্।

মণীন্দ্র প্রত্যহ খুব ভোরে উঠে একঘণ্টা ধরে ব্যায়াম করে। সেদিন সবেমাত্র সে ব্যায়াম শেষ ক'রে, তার গৃহ সংলগ্ন উদ্যানে একটু বেড়াচ্ছিল, এমন সময় অনিলা আনন্দকে নিয়ে গাড়ী থেকে গিয়ে নামলো।

মণীন্দ্র তাকে সাদর অভ্যর্থনা করে বসালে। এমন ভোরের সময়ে হঠাৎ এসে হাজির হবার কারণ কি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে এবং অনিলার মুখে সমস্ত ব্যাপার শুনে বলে উঠলো—স্কাউণ্ড্রেল্! বেশ করেছো চলে এসেছো। কোনও ভদ্র স্ত্রীলোকেরই আর সে বাড়ীতে তার সঙ্গে একত্র বাস করা উচিত নয়—এমন কি তার পত্নীরও না।

অনিলা শুধু নীরবে ভূমিষ্ঠ হয়ে মণীন্দ্রকে প্রণাম ক'রে তার পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় দিলে।

অনিলা ও আনন্দকে বাড়ীতে রেখে একবার ঘণ্টাদুয়ের জন্য হাসপাতালে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে দিয়ে সুশীল বাড়ী ফিরে এসে তার 'ধড়াচুড়ো' খুলতে গিয়ে দেখে ঘরের আর সে বিশৃঙ্খল অবস্থা নেই। আলনাটি পরিপাটি ক'রে সাজানো। পড়বার ঘরে গিয়ে দেখে সমস্ত বইগুলি যে যার যথাস্থানে শেল্‌ফে গিয়ে উঠেছে—টেবিলের উপর আর স্তূপাকার হ'য়ে পড়ে নেই। ড্রয়িং রুমটিও একেবারে ঝক্ ঝক্ চক্ চক্ ক'রছে! দুটি নিপুণ হস্তের অক্লান্ত সেবার পরিচয় এই অল্পক্ষণের মধ্যেই সে-বাড়ীর চারিদিকে যেন জেগে উঠেছে!

মণীন্দ্রর চোখে এটা ভারী সুন্দর লাগলো!

মণীন্দ্র আন্দুকেও যেতে দেয়নি। আটকে রেখেছিল। খাওয়া দাওয়ার সময় যখন বাবুর্চ্চির বদলে অনিলা এসে আজ পরিবেশন করতে লাগলো এবং এটা খাও—ওটা নাও ব'লে জিদ্ ক'রতে লাগলো, মণীন্দ্র আর কিছুতেই তাকে নিষেধ ক'রতে পারলে না! অতিথি এসে তার বাড়ীর গৃহকর্ত্রী হ'য়ে উঠেছে—মণীন্দ্রর এত ভালো লাগছিল এটি—যে, সে চুপ ক'রে লক্ষ্মী ছেলের মতো অনিলার সমস্ত শাসন মেনে চলতে লাগলো!

বার বার আজ তার সেই ছেলেবেলাকার কথা মনে প'ড়তে লাগলো। সেদিন তো খেলাধূলোর মধ্য দিয়ে, এই কথাটাই তাদের মধ্যে পাকা হ'য়ে গিয়েছিল যে মণীন্দ্র হবে বর, আর অনিলা হবে ক'নে। মণীন্দ্র বাজনা বাজিয়ে এসে তাকে বিয়ে করে নিয়ে চলে যাবে!

মণীন্দ্র হঠাৎ প্রশ্ন ক'রলে—আচ্ছা অনু, আমাদের তো তুমি খুব খাওয়াচ্ছো—তোমার নিজের খাওয়ার কি ব্যবস্থা ক'রলে ?—বাবুর্চ্চির ছোঁয়া কিছু তো তুমি মুখে দেবেনা ?—

অনিলা বললে—কেন, তাদের অপরাধ ?

অপরাধ আমাদের কাছে কিছু নেই বটে, তোমাদের কাছে যে ওরা ম্লেচ্ছ—যবন—সুতরাং অস্পৃশ্য!

অনিলা হেসে বললে—তুমি কি ভুলে গেছো—আমি ছেলেবেলা থেকে বরাবর বাবার সঙ্গে বাবুর্চ্চির রান্নাই খেয়ে এসেছি। মা কত ব'কতেন, কিন্তু, আমি বলতুম তোমার ও ময়লা চিরকুট কাপড় পরা নোংরা জানোয়ার উড়ে কি পাঁড়ে বামুনের চেয়ে আমাদের আবদুল খান্‌সামা ঢের ভালো। কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ধোপদস্ত কাপড় পরা—রাঁধেও ভালো!—সে মত আমার আজও বদলায় নি ত' মণিদা!

মণীন্দ্র হাতের ছুরী কাঁটা ফেলে দিয়ে—উঠে দাঁড়িয়ে কোলের উপরের ঝাড়নখানায় হাত মুছে নিয়ে—অনিলার

একটা হাত ধ'রে ঘনঘন করমর্দ্দন করতে ক'রতে ব'লে উঠলো—ঠিক! অবিকল! আমারও মত তাই! সেই জন্যই তো তোমাকে ছেলেবেলা থেকেই আমার এতো ভালো লাগে অনু!

অনিলার হাসিমুখ সহসা অন্ধকার হয়ে উঠলো।

মণীন্দ্র সেটা লক্ষ্য করতেই তার মুখখানিও বিবর্ণ হয়ে গেল!

তাদের কারুর মুখে আর কথা নেই। তারা যেন রুদ্ধবাক্! বোধ করি হারানো শৈশবের যত বিগত সুখস্মৃতির বর্ত্তমান নিষ্ফলতা তাদের উভয়ের চিত্তকেই কাতর ক'রে তুলছিল।

খাওয়া দাওয়ার পর ড্রয়িংরুমে গিয়ে—গল্প ক'রতে ক'রতে সেই ঘরের সোফার উপরই আনন্দ ঘুমিয়ে পড়লো।

মণীন্দ্র তখন অনিলাকে ব'লছিল—আন্দুকে যদি কাছে রাখতে পারো তাহ'লে হয় ত' একটু সুবিধা হ'তে পারে এই, যে, তোমার নামে কলঙ্কটা রটতে একটু দেরী হবে—আর —বিশেষ কেউ জোর ক'রে কিছু বলতে সাহস করবেনা। তাছাড়া, জজকে তাদের স্বপক্ষে মত দেওয়াবার জন্য ব্যারিষ্টার বাবুরা যেমন মক্কেলদের কাছ থেকে ঘুস নেয়, তোমাকেও তেমনি একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে—নিন্দকদের কণ্ঠরোধ করবার জন্য!

মৃদু হেসে অনিলা প্রশ্ন ক'রলে—তুমি বুঝি লোক-নিন্দাকে খুব ভয় করো?—

চট্‌ক'রে মণীন্দ্র উত্তর দিলে—একটুও না! আমি তোমারই সুবিধার জন্য বলছি!—আমার নিজের দিক থেকে কোনও ভয় নেই!

—ওঃ! কিন্তু, এ কথাটা তোমার মাথায় আসছে না কেন—যে, যে মানুষ লোকনিন্দাকে ভয় করে—সে স্বামীকে ত্যাগ ক'রে তার বাল্য বন্ধুর আশ্রয়ে এসে উঠতে সাহস করে না!

অনিলা ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে আবার বললে—তবে, হ্যাঁ, তোমার দিক থেকে যদি কোনও বাধা থাকে—তাহ'লে—সেটা এইবেলা স্পষ্ট ক'রে খুলে ব'লো—আমি না হয় অন্য ব্যবস্থা করবো।

মণীন্দ্র একটু ইতস্ততঃ করে ব'ললে—দেখো অনু, তোমাকে সখী সচীব মিত্রের মতো সদা সর্ব্বদা কাছে পাওয়া এ যে আমার একটা কতবড় আনন্দের প্রলোভন—সে কথা তুমি তো জানোই!—আর তার জন্য আমি যে আমার সুনাম মূল্য দিতে এতটুকু কাতর নই এও তুমি জানো!—কিন্তু, এর মধ্যে ফ্যাসাদ বাঁধিয়েছে কি জানো—ঐ তোমার বাবার উইলের পঞ্চাশ হাজার টাকা! লোকে যে বলবে—টাকার লোভে আমি তোমাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছি—সেইটে আমার কিছুতে সহ্য হবেনা অনু!

অনিলা একটু ভেবে বললে—ভালো মুস্কিলে পড়িছি কিন্তু ওই টাকার জন্য! দাদা পর হ'য়ে গেলেন, আমার আর মুখ দেখেন না, কথা বলেন না, ওই টাকার শোকে!—এখন, তুমিও আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাচ্ছ, ঐ টাকার ভয়ে! আচ্ছা; টাকা যদি আমার নামে বাবার উইলে কিছু না থাকতো তাহ'লে কি তুমি আমাকে এ বিপদে আশ্রয় দিতেই একেবারে নিশ্চয়!

মণীন্দ্র গম্ভীর ভাবে ব'ললে—তুমি আমায় ভুল বুঝোনা অনু! আশ্রয় যদি তোমার কোথাও না থাকে, তাহ'লেও জেনো আমার কাছে তা বাঁধা আছে। লোকাপবাদের মিথ্যা কলঙ্কে কি যায় আসে? কিন্তু ঐ টাকার ব্যাপারটা আমাদের এই অযথা কলঙ্কের অমৃতকে মর্য্যাদাহীন এবং ঘৃণিত করে লোকসমাজে দাঁড় করাবে—এইটেই আমার ভয়! আমি চাই আমাদের এ স্বেচ্ছাকৃত কলঙ্কের মিথ্যা ইতিহাসকে ত্যাগের পুণ্যে গৌরবান্বিত করে রাখতে!

অনিলা ব'ললে—চলো, তোমার হাসপাতাল দেখে আসিগে। ও সব কথা পরে হবে।

লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে, মণীন্দ্র ব'ললে—ভালো কথা মনে করে দিয়েছো আমাকে! হাসপাতালে একবার যেতেই হবে। সকালে একটা 'সিরিয়স কেস' দেখে এসেছি!

আন্দুকে ডেকে তুলে মণীন্দ্র নিজের মোটরে বসিয়ে অনিলাকে পাশে তুলে হাসপাতাল দেখাতে নিয়ে গেল।

২০

—সই!

—কি ভাই?

—তোকে দেখে আমার হিংসে হ'চ্ছে!—

—দূর পোড়ারমুখী, আমার হিংসে অতি বড় শত্রুরাও

করে না। সমস্ত আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ঘরবাড়ী ছেড়ে এই এক সুদূর পল্লীপ্রান্তে একখানা পাতার কুটির বেঁধে অজ্ঞাতবাস ক'রছি। ওরে, এখানেও সবাই আমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখে, তা' জানিস্? সহজে কেউ আমার সঙ্গে মিশতে চায় না! তুই নেহাৎ ছেলেবেলা থেকে আমাকে জানতিস, চিঠিপত্র লিখতিস, খবরাখবর রাখতিস—তাই সইকে বুকে জড়িয়ে ধরতে ভয় পেলিনে—নতুন লোক হ'লে কি পারতিস?

—সই, তুমি আমার গা ছুঁয়ে বলো তো, এই যে সংসার সমাজ লোকসঙ্গ আত্মীয় বন্ধু পরিচিত সবাইকে ছেড়ে, ঘরবাড়ী ফেলে, এই সুদূরে নির্ব্বাসনে এসে আছো—এ কি তোমার ভালো লাগছে? ফেলে-আসা জীবনের জন্য মনে কি কোনও দিন এতটুকুও কষ্ট হ'চ্ছে না?

তাপসী গৌরীর মতো স্তিমিত নয়নে সুহাসের মুখের দিকে চেয়ে মধুচ্ছন্দে অলকা বলতে লাগলো—ভুলে যাচ্ছিস কেন সই, যে, এ অভাব শুধু একা আমারই নয়, আর একজনও আমার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে স্বেচ্ছায় সানন্দে এই নির্ব্বাসন বরণ করে নিয়েছে! এতে একটা মস্ত সুবিধে হ'য়েছে কি জানিস্—আমরা পরস্পরের সবচেয়ে বেশী নিকটতম হ'তে পেরেছি। তার সকল অভাব প্রাণপণে মেটাবার জন্য আমার নিয়ত যত্ন ও চেষ্টার বিরাম নেই। সেও দেখতে পাই সর্ব্বান্তঃকরণে আমাকে সুখে রাখবার সাধনায় মগ্ন হ'য়ে আছে! আমরা ত শুধু আজ পরস্পরের প্রণয়ী ও প্রণয়িনী নই! আমরাই যে উভয়ে উভয়ের আজ ভাই-বোন, পিতামাতা, বন্ধু, আত্মীয়, সংসার, সমাজ, সব সব! ওরে, জীবন যে এত সুখের হ'তে পারে এ আমার ধারণাই ছিলনা! কত যে আশঙ্কা, কত যে ভয়, কত যে দ্বিধায় পদে পদে জড়িত হ'য়ে নিজেকে আর ওঁকে দীর্ঘকাল জীবনের সকল আনন্দ থেকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছিলুম, সে ইতিহাস তো তুই সব জানিস! শুধু যে লোক-নিন্দা কলঙ্ক অপবাদ এরই ভয় ছিল—তাই নয়, আশে পাশের অন্যান্য প্রিয়জন, যারা আমাকে ভক্তি ক'রতো, ভালবাসতো, শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতো, সম্ভ্রম ক'রে চলতো, তাদের চোখে আমি হীন হয়ে পড়বো, তারা আমাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখবে—অবিশ্বাসিন, ভেবে অবজ্ঞা করবে—এইটেই ছিল আমার সব চেয়ে বড় বাধা! নইলে তুই তো জানিস ভালোবাসাকে আমি কোনও দিনই অপরাধ ব'লে মনে করিনি। এবং তা মনে করিনি ব'লেই এই মানুষটির অপরিমেয় প্রেমকে আমি বহু পূর্ব্বেই দেবতার আশীর্ব্বাদের মতো মাথা পেতে নিতে পেরেছি; সর্ব্বান্তঃকরণে আমার এই অন্তরের অন্তরতম লোকের ধ্যানের দেবতাকে—এই জন্ম-জন্মান্তরের মনের মানুষটীকে ভালোবেসে নিজের জীবন ধন্য ও সার্থক ব'লে মেনে নিতে পেরেছি! কিন্তু শুনে হয় ত হাসবি সই, একে বাস্তব জীবনে বরণ করে নিতে আমার বড় ভয় ছিল! কি জানি যদি দৈনন্দিন জীবনের প্রাত্যহিক খুঁটি নাটির মধ্যে এ প্রেম আমার ক্ষুণ্ণ হয়, ক্ষুব্ধ হয়! যদি সে আমাকে মনোজগতের বাইরে এই বাস্তব জগতের স্থূল সংস্পর্শের মধ্যে হারিয়ে ফেলে! যদি তার এ জীবন ভালো না লাগে—যদি আমার নিয়ত সান্নিধ্য তাকে ক্লিষ্ট ও পীড়িত ক'রে তোলে—এই সব দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনাকে আমি কিছুতেই মন থেকে দূর করতে পারছিলুমনা!

—তবে তুই কোন্ ভরসায় শেষে রায় মহাশয়ের হাত ধ'রে পথে বেরিয়ে পড়লি সই?

—তোমাদের এই পচা নোংরা জীর্ণ হিন্দু সমাজের বাধ্যতামূলক বৈধব্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার জন্যই শেষ পর্য্যন্ত আমি এই দুঃসাহস সঞ্চয় ক'রতে পেরেছিলুম। বৎসরের পর বৎসর সুদীর্ঘ দিবস সুদীর্ঘ রাত্রি ধরে যে আমার মুখ চেয়ে নিঃশব্দে অপেক্ষা করে রয়েছে—কী অধিকার আছে আমার তার জীবনকে ব্যর্থ করে দেবার, বল্? যে স্বামীকে আমি সে কোন্ শৈশবে দেখেছি বলে আজ আমার মনেও পড়েনা, যার স্নেহ ভালোবাসা বা আদর যত্ন দূরে থাক যার মূর্ত্তি পর্য্যন্ত আমার শত চেষ্টাতেও কখন স্মরণে আনতে পারিনি। তারই ধ্যানে অবহিত হ'য়ে আমায় সারাজীবন বৈধব্য ব্রত পালন করতে হবে—ইহ জন্মের সর্ব্ব সুখ সাধ আশা আকাঙ্ক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়ে—একি তোমাদের সমাজের অন্যায় অত্যাচার? কি পেয়ে—কিসের প্রলোভনে—কোন্ সে অপরাজেয় চিত্ত-বলে—নিজেকে এ জন্মের মতো বঞ্চিত ও ব্যর্থ ক'রে দেবার শক্তি পাবো বল্? আমার এ চিরকুমারী হৃদয়ের অস্ফুট কমল কোরক যে পরশমণির সংস্পর্শে এসে শোভায় সৌন্দর্য্যে প্রেমে ও আনন্দে সহস্রদলে বিকশিত ও সার্থক হ'য়ে উঠেছিল, আমার মিথ্যা বৈধব্যের ছদ্মবেশ চাপা দিয়ে তাকে ম্লান ও বিবর্ণ ক'রে তুলবার জন্য প্রাণপণে

সুদীর্ঘ সাধনা করেছিলুম। কিন্তু সে যে কতবড় একটা অস্বাভাবিক চেষ্টা—এ সত্য যেদিন মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি ক'রতে পারলুম, এই লোক-দেখানো বৈধব্যের ফাঁকি সেদিন আমার অন্তরে বাহিরে আমাকে যেন উপহাস ক'রে উঠলো। সমস্ত ভীরুতা দুর্ব্বলতা ও আত্ম-প্রতারণার মূলোচ্ছেদ ক'রে আমি সেদিন আমার প্রিয়তমের হাত ধরে চলে এলুম আমার জন্ম ও জীবন সুন্দর ও সফল ক'রে তুলতে!

—আচ্ছা, সই, রায়মশাই যদি তোর সঙ্গে প্রবঞ্চনা ক'রে তোকে দু'দিন পরে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মতো পরিত্যাগ ক'রে চলে যেতো তাহ'লে তুই কি করতিস?

একটু মৃদু হেসে চাঁপাদীঘির পানে তার চাঁপার কলি আঙুল দেখিয়ে অলকা বল'লে—ওই গভীর কালো জলে ডুব দিয়ে আমার সকল লজ্জার, সকল আক্ষেপের অবসান করতুম সই! নিষ্ফল নিরানন্দ জীবনের গুরুভারে নিষ্পেষিত হ'য়ে নিত্য তিলে তিলে মরার চেয়ে একদিন ঐ সলিল শয়নে আমার শেষ-সমাধি রচনা করতুম—সে মন্দ কী?

—সে দুর্দ্দিন যে তোমার কোনও দিনই আসবেনা, এ কথা জেনেই তুমি এসেছিলে, নইলে কখনই পারতেনা—

সুহাসের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে ক্ষণকাল চেয়ে দেখে অলকা বল'লে—কেন যে আসতে পেরেছিলুম সে কথা শুনলে কি তুই বিশ্বাস করতে পারবি?—তোর ওই রায়মশাই আমাকে অকপটেই ভালোবেসেছিল। প্রতিদানে সে শুধু আমার প্রেমটুকুই চেয়েছিল, আমার এ দেহটাকে সে কোনও দিনই কামনা করেনি। আমাকে সে আপনার পাশটিতে সহচরীর মতো পেতে চেয়েছিল বটে, কিন্তু শয্যাসঙ্গিনী করতে চায়নি সে কোনও দিনই! এই কাম-গন্ধহীন প্রেমের প্রভাবে ও দীর্ঘ কালের একনিষ্ঠ সাধনায় সে আমাকে জয় ক'রে নিয়েছে! আমার আবাল্যের সমস্ত অন্ধ ও ভ্রান্ত সংস্কারকে সে চূর্ণ ও বিদলিত করে দিয়েছে!

অলকা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল! কী যেন সে তখন আপন-মনে ভাবছে! তার চোখ দুটির তারায় তারায় সে যেন কোন স্বপ্নাবেশের রঙীন আভা ফুটে উঠলো! পেলব অধর প্রান্তে সস্মিত সুন্দর লাবণ্য! ধীরে ধীরে আপন-মনে সে বলতে লাগলো—সেই যেদিন প্রথম ওঁর কাছে আমি এলুম—সে তাঁর কি অপরিসীম আনন্দ! কোথায় রাখবেন, কি করবেন, কেমন করে আমাকে তিনি যোগ্য সম্মান ও সমাদরে পরিতুষ্ট করবেন,—যেন একেবারে শশব্যস্ত হ'য়ে পড়'লেন! সেদিন যদি তাঁর সে চোখ-মুখের অসহায় ভাব দেখতিস, তোর মনে নিশ্চয় ওঁর জন্যে মায়া হ'তো! রাত্রে যখন আমার জন্য তিনি পৃথক শয্যারচনা করে দিতে উদ্যত হ'লেন, হেসে বললুম—বন্ধু, আমার প্রাণের চেয়ে তো আমার দেহের দাম আমার কাছে বেশী নয়! তোমাকে যা দিয়েছি তার তুলনায় এ দেহটা তো অতি অকিঞ্চিৎকর —স্বামী!

সুহাস হেসে উঠে বললে—বুঝিছি, আর বলতে হবেনা—ওই এক 'স্বামী'তেই সব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে! তুমি যে কতবড় শক্তি নিয়ে জন্মেছিলে সে আমি ছেলে বেলা থেকেই জানতুম! তাই ত রায়মশায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মাথা নুয়ে পড়ে! এতবড় একটা প্রাণকে তিনি চির ব্যর্থতা ও নিষ্ফলতা থেকে রক্ষা ক'রে ধন্য ও কৃত কৃতার্থ করে দিয়েছেন—

—বা রে! আর আমি বুঝি তাঁর প্রাণটাকে একেবারে শ্মশান ও মরুভূমি করে দিয়েছি, না? তুমি ভাই দেখছি বড় একচোখো! এই কদিনের মধ্যে রায়মশায়ের একেবারে গোঁড়া ভক্ত হ'য়ে উঠেছো! আমাকে আর আমলই দাওনা—

—সই, তুই ভাই ভারী ঝগড়াটে! রায়মশাই ঠিক কথাই বলেন, তুই লোকের সঙ্গে দেখছি গায়ে প'ড়ে ঝগড়া করিস—

"—কিন্তু, ও সেটা কিছুতেই স্বীকার করতে চায়না! তুমি একটু ভালো ক'রে ওটা ওকে বুঝিয়ে দাও তো"—ব'লতে ব'লতে সুহাসের রায়মহাশয় সেখানে এসে উপস্থিত হ'লেন।

দীর্ঘকায় গৌরকান্তি সুদর্শন পুরুষ। দৃষ্টিতে তাঁর অতল গভীরতা, হাসিতে তাঁর স্নিগ্ধ শান্তি। সর্ব্ব অবয়ব হ'তে যেন একটা সৌম্য সংযত দৃঢ়তা ফুটে উঠছে! যৌবনের অপরাহ্নে এসে পা দিয়েছেন, তবু যেন তার দিব্য বিভা এই অসামান্য মানুষটিকে ছেড়ে যেতে চাইছেনা! তাঁর বাক্যে ও আচরণে এমন একটা সহজ সুকুমার আভিজাত্য চোখে পড়ছে যে, তাঁকে শ্রদ্ধা না ক'রে, ভালো না বেসে যেন থাকা যায় না!

সুহাস ও অলকা দুজনেই তাদের মাথার কাপড়টা একটু সামনের দিকে টেনে দিলে—সুহাস ব্যস্ত হ'য়ে চাঁপাতলা থেকে উঠে পড়ে রায়মহাশয়ের কাছে এগিয়ে এসে ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—কী হ'লো রায়বাহাদুর? খবর কি আমার কাজের? কিছু আশাপ্রদ মনে হ'লো কি?

—রায়মশাইকে তুমি যখন রায়বাহাদুর ক'রে দিয়েছো—তখন খবর তোমাকে আশাপ্রদ না যদি এনে দিতে পারি, সই, তাহ'লে আর বাহাদুরী থাকে কোথায়? নাও সব গোছ করে নাও, এখনি সন্ধ্যের গাড়ীতে তোমায় যেতে হবে।

অলকা বললে—হ্যাঁ গা, তা এখনি কেন? দুদিন পরে কি গেলে চলবে না?

রায়মহাশয় হেসে বললেন—না গেলেও কোনও ক্ষতি নেই। তুমি নেহাৎ একলাটি থাকো, সইটি কাছে থাকলে মন্দ হয় না।

—তা তো হয়না; কিন্তু এই একজনের বোঝা বইতেই তোমাকে যে রকম নাকাল হ'তে হচ্ছে, তার উপর আবার আর একটির ভার কি বলে চাপাই বলো?

—বোঝা হয়ত' তুমি নিজেকে মনে ক'র'তে পারো, কিন্তু সই কি তা করবে—হ্যাঁ সই?

সুহাস বললে—তোমাদের এ প্রণয়-কলহ মেটাতে গেলে আমাকে আজ গাড়ী ফেল হ'তে হবে ভাই, আমি চললুম সব গোছ-গাছ ক'রে নিইগে।

সুহাস চলে গেল কুটীরের দিকে।

অলকা ব'ললে—একে তোমার কেমন লাগছে বলোনা!

বেশ! তোমার 'সই' হবারই ঠিক উপযুক্ত বটে!

—যাও, তুমি আজকাল ভারী তোষামোদ ক'রে কথা ব'লতে শিখেছো! আচ্ছা, তুমি যে এমন ক'রে উঠে পড়ে লেগে সইয়ের জন্য এই কাজটা ঠিক ক'রলে—কিন্তু ও কি পারবে? গেরস্ত-ঘরের বিধবা বউ হ'য়ে ওর জীবনের এই এতদিন কেটেছে—এখন কি সেই সুদূর বিদেশে গিয়ে একলাটি থেকে ইস্কুল মাষ্টারী ক'রতে পারবে?

—খুব পারবে। মেয়ে ইস্কুলের নীচের ক্লাশে পড়াবার মতো বিদ্যে তোমার সইটির যথেষ্ট আছে। তাছাড়া, গানবাজনা শিল্পকার্য্য এ সবও মেয়েদের শেখাতে পারবে শুনে ইস্কুলের কর্তৃপক্ষরা খুব আগ্রহের সঙ্গে ওকে নিচ্ছে। আরও জনকতক মহিলা শিক্ষয়িত্রী তাদের আছে। মেয়েদের বোর্ডিংএ ও তাদের সঙ্গে একত্র থাকবে, খাবে। তাছাড়া, মাস গেলে মোটা মাইনে পাবে। এমন সুযোগ কি সহজে মেলে?

—তা হ্যাঁ গা, আমাকেও ঐ রকম একটা কিছু জুটিয়ে দাওনা—

—কেন, এর মধ্যেই কেন? দাঁড়াও আগে আমি মরি।

—যাও, তুমি ভারী দুষ্ট হ'য়েছো।

—তুমিই বা আমাকে ফেলে মাষ্টারী ক'রতে যেতে চাচ্ছ কেন? তোমার কি এখানে মন টিঁকছেনা—বড্ড কষ্ট হ'চ্ছে বুঝি অলোক?

রায় মশাই অলকার পাশে গিয়ে সুহাসের পরিত্যক্ত জায়গাটায় বসে পড়ে সাদর বাহুবেষ্টনে অলকাকে স্নেহ বন্ধনে আবদ্ধ করে জিজ্ঞাসা ক'রলে—কী করলে তোমায় সুখী করতে পারি তুমি আমায় বলে দাও অলক!

অলকা রায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে বালিকার মতো কাঁদতে লাগলো। সাশ্রু কণ্ঠে বললে—ওগো, আমার যে বড় ভয় করে—বুঝি এত সুখ এ অভাগিনীর সইবেনা। তোমার এই নিবিড় গভীর অপ্রমেয় ভালোবাসা আমাকে যে স্বর্গেরও দুর্লভ সম্পদে সৌভাগ্যবতী ক'রে তুলেছে। তাই, সদাই মনে হয় বুঝি হারাই হারাই!

আপন উত্তরীয় বাসে অলকার অশ্রু মুছে নিয়ে তার কম্পিত ওষ্ঠপুটে একটি সান্ত্বনার স্নিগ্ধ চুম্বন দিয়ে ধীরে ধীরে তার কপালে ও মাথার চুলের উপর হাত বুলিয়ে দিতে দিতে রায় বললে—যদি সেই দুর্দ্দিনই আসে অলক, আমার ডাকই যদি আগে আসে, এবং তোমাকে ফেলে রেখে যদি আমায় একাই চলে যেতে হয়, ভয় পেওনা প্রাণাধিক। তুমি তোমার সইয়ের কাছে চলে যেও। দু'জনে সেখানে একসঙ্গে বেশ থাকবে।

অলকা ব'ললে—আমার ব'য়ে গেছে কোথাও যেতে! তোমায় ছেড়ে আমি আর একদিনও বাঁচবো কি না!—যাও; তোমাকে আর ওসব অলক্ষণে অকথা কুকথা গুলো কইতে হবেনা। হ্যাঁ, ভাল কথা, সইকে কি ইস্কুলে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে তুমি?

—বা রে! আমিই কি মনে করেছো তোমাকে ছেড়ে আর একটি দিনও বাইরে থাকতে পারি? আমি গিয়ে ওকে

রেলে তুলে দিয়েই চলে আসবো। আজ আরও ছ'জন মহিলা শিক্ষয়িত্রী আর কয়েকজন ছাত্রী যাচ্ছেন। তোমার সইকে তাদের গাড়ীতেই তুলে দিয়ে আসবো।

—সেই ভালো। তোমার আর সইয়ের সঙ্গে গিয়ে কাজ নেই! যখন তোমাকে পাইনি,—তখন আমার দিন কাটতো একরকম—কিন্তু, আজ আর একদণ্ডও তোমার কাছ-ছাড়া হ'য়ে থাকতে ইচ্ছা করেনা! আমি যাই, সইয়ের জন্য খাবার দাবার একটা কিছু ব্যবস্থা করিগে—তুমিও হাতমুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নাও—ফিরতে তো রাত হবে!

অলকা রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হ'লো। রায় সুহাসের সন্ধানে গেল।

একটু সময় থাকতে—খাওয়া দাওয়া শেষ করে-জিনিস, পত্র সব যা কাজে লাগতে পারে ওখানে থাকতে হ'লে—সেগুলি সব গুছিয়ে বেঁধে নিয়ে গাড়ীতে ওঠবার আগে সুহাস অলকার গলা জড়িয়ে ধরে খুব খানিকটা কাঁদলে, তারপর মাথার দিব্য দিয়ে সে অলকাকে নিষেধ করে দিলে যে, যদি কেউ তাকে খুঁজতে আসে—সে যেন বলে—জানিনি। খবরদার কাউকে যেন তার ঠিকানা সে না বলে—এমন কি দাদা জানতে চাইলেও—না!

অলকা তিন সত্যি করে তবে মুক্তি পেলে। সুহাসকেও তার বদলে প্রত্যেক ডাকে চিঠি দিতে প্রতিশ্রুত হতে হলো। অলকা আর একটা কথা ব'লে দিলে—যেদিন যে মুহূর্ত্তে কাজে আর আনন্দ পাবিনে—দেহে মনে একটা অবসাদ আসবে—আমার কাছে ফিরে আসতে যেন লজ্জা বোধ করিসনি।

সুহাস চলে যাবার অল্পক্ষণ পরেই চাঁপাতলা মুখর করে একখানা মোটরের হর্ণ বেজে উঠলো। গাড়ী থেকে মণীন্দ্র নেমে এসে অলকার কুটীর-দ্বারে করাঘাত ক'রে ডাকলে—অলকাদেবী আছেন?

অলকা দ্বার খুলে এক অপরিচিত পুরুষকে তার নাম ধরে ডাকতে দেখে বিস্মিত হ'য়ে গেল! গম্ভীর ভাবে জানতে চাইলে—অলকাদেবীর সঙ্গে আপনার কি প্রয়োজন? আমারই নাম অলকা, আমাকে বলতে পারেন।

মণীন্দ্র একটু ইতস্ততঃ ক'রে বল'লে—আপনার এখানে কি আমাদের সুহাস আছে?

—কিছুদিন ছিল বটে, কিন্তু সম্প্রতি চলে গেছে।

—কোথায় গেছে ব'লতে পারেন?

—আপনি কে?

—আমি তার একজন হিতৈষী বন্ধু।

—ওঃ! আপনারই নাম বুঝি মণি বাবু? আপনিই কি ডাক্তার?

—হ্যাঁ।

—আপনি তার বন্ধু বলেই আপনাকে ব'লছি, কিছু মনে করবেন না। তার সন্ধান থেকে নিবৃত্ত হোন। সে কোথায় গেছে আপনাদের জানতে দেবেনা ব'লেই নিরুদ্দেশ হ'য়েছে। তবে—এইটুকু আপনাকে ব'লতে পারি যে, সে ভাল লোকের সঙ্গেই গেছে। জীবনে বোধ হয় কখনো কষ্ট পাবেনা।

মণীন্দ্র কাতরভাবে জিজ্ঞাসা ক'রলে,—কোনও সন্ধানই কি ব'লতে পারেননা?

অলকা এবার অধিকতর গম্ভীর হ'য়ে ব'ললে—পারলেও আপনাকে ব'লতুমনা। কারণ—আপনার বন্ধুত্বের দাম দেবার জন্যই তাকে তার সুনাম হারিয়ে সমাজ থেকে কলঙ্ক মেখে বেরিয়ে আসতে হ'য়েছে।

—সেই জন্যই তো আমি ছুটে এলুম। আমি তার প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে চাই! আমি তার প্রতিবিধান করতে চাই!

—সে সাধু সঙ্কল্প আপনি আপাততঃ পরিত্যাগ করুন। এ দেশটা বিলেত নয়! এখানে অসহায়া তরুণী বিধবার পুরুষ বন্ধুই হ'চ্ছে তার অসতীত্বের সব চেয়ে বড় নিদর্শন! আপনি যদি যথার্থই তার বন্ধু হ'ন, তবে তার সন্ধানে ঘুরে আর তার অধিকতর অনিষ্ট করবেননা। এ উপকার করা থেকে নিরস্ত হোন্।

মণীন্দ্র লজ্জিত হ'য়ে তার মোটরে ফিরে গেল। অলকা সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে তাকে হাত যোড় করে একটি নমস্কার জানিয়ে বললে—কিছু মনে করবেননা আপনি। একজন অপরিচিতা নারীর এই প্রগল্‌ভতা হয় ত আপনাকে ক্ষুব্ধ করবে। তবে, এইটুকু পর্য্যন্ত আশা আপনাকে দিতে পারি যে আপনি যদি সইয়ের যথার্থই শুধু বন্ধুত্বকামী হ'ন—যদি তার প্রণয়-পিপাসু না হন,—তাহ'লে সংবাদ সে আপনাকে যথা সময়ে দেবেই।

মুখখানা অন্ধকার করে মণীন্দ্র চলে গেল।

(২১)

ফুলের বাগানের ভিতর ইজি চেয়ারে বসে সত্যেন সকালের কাগজ পড়ছিল এবং গড়গড়ার নলটা মাঝে মাঝে মুখে তুলে এক একবার টেনে প্রচুর ধোঁয়া বার করে দিচ্ছিল।

কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎ সে চীৎকার ক'রে ডাকলে—মন্দা! মন্দা!—শোনো শোনো—চট্ করে—

মন্দা ত্রস্তা হরিণীর মতো ছুটে অন্তঃপুর থেকে বাগানে বেরিয়ে এলো। সত্যেনের কাছে এগিয়ে এসে সবিস্ময়ে প্রশ্ন ক'রলে—ব্যাপার কি?—বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে না কি?

সত্যেন হাসতে হাসতে ব'ললে—ডাকাত পড়েছে বটে, কিন্তু, আমাদের বাড়ীতে নয়, তোমার বন্ধু অনিলার বাড়ীতে! তার যথাসর্ব্বস্ব লুট হ'য়ে গেছে—এই কাগজে দেখলুম!—

—এ্যাঁ! বলো কি! সত্যি?—কই, কি—কি লিখেছে পড়ো তো—বলতে বলতে মন্দা সত্যেনের পাশে সেই ঘাসের উপর জানু পেতে বসে প'ড়ে সত্যেনের কাঁধটি ধ'রে তার কোলের উপরের খবরের কাগজখানার দিকে ঝুঁকে প'ড়লো।

সত্যেন তাকে প'ড়ে শোনালে—শ্রীমতী অনিলা দেবী স্বামী ও সংসার পরিত্যাগ ক'রে এসে আর্ত্তের সেবাব্রত গ্রহণ ক'রেছেন। ডাক্তার মণীন্দ্র বাবুর মারফৎ মহিলা হাসপাতালে তিনি এককালীন পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেছেন এবং যাবজ্জীবন সেখানকার একজন সেবা ও শুশ্রূষা-কারিণী হ'য়ে থাকবেন ব'লে প্রতিশ্রুত হয়েছেন।

মন্দা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ব'ললে—যাক্ বাঁচা গেল! —ব্যাপারটা হয় ত খুবই একটা বিশ্রী কিছু হ'য়ে দাঁড়াবে ব'লে আমার মনে ভারী একটা দুশ্চিন্তা ছিল—এ বেশ ভালই হ'লো। এখন ঠাকুরঝীর একটা কিছু সন্ধান পেলেই বাঁচি। কাল সন্ধ্যের পর তো দাদা একেবারে আধমরার মতো হ'য়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে গেল—সে নিরুদ্দেশ!

—তোমার দাদা এসে সুহাসের খবরটা দিয়ে গেল—আর অনিলার কথা কিছুই ব'ল্লেনা? বেশ মজার লোক তো? —খবরের কাগজ পড়ে তার খবর জানতে হ'লো আমাদের! আমি তাকে সেদিন অমন ক'রে নিষেধ ক'রে দিলুম যে তুমি একলা সুহাসের সন্ধান নিতে যেওনা, আমাকে ডেকে নিয়ে যেও—তাও সে শোনেনি।

তাড়াতাড়ি মন্দা ব'লে উঠলো—হ্যাঁ, সে কৈফিয়ৎটাও দাদা দিয়ে গেছে। বললে, তুমি সঙ্গে থাকলে না কি সে সুহাসকে ফিরে আসবার জন্য তেমন ক'রে অনুরোধ করতে পারবেনা—তাই তোমাকে সঙ্গে না নিয়ে একাই গেছলো।

—তার যেমন বুদ্ধি!

গোকুল এসে কতকগুলো ডাকের চিঠি দিয়ে গেল। তারই মধ্যে এক খানায় সুহাসের হাতের লেখা দেখে সত্যেন চেয়ারের উপর সোজা হ'য়ে উঠে বসে বললে—সুহাসের চিঠি এসেছে মন্দাকিনী।

মন্দারও চোখে-মুখে আগ্রহের যেন অন্ত ছিলনা!—বললে—কই! কি লিখেছে! পড়োনা শুনি!

সত্যেন চিঠিখানা খুলে ফেলে দেখলে খুব ছোট একখানি সংক্ষিপ্ত চিঠি। মনে মনে আগে সে চিঠিখানি সব পড়ে নিলে। তার পর চেঁচিয়ে মন্দাকে পড়ে শোনাতে সুরু করলে—

শ্রীচরণেষু—

—দাদা, এতদিন চাঁপা দীঘিতে রইলুম, কই একদিনও ত' আমার খবর নিতে এলেনা ভাই! বৌদিও তো কই একটা লোক পাঠিয়ে একদিনের তরে একটা উদ্দেশ নিলেনা। বুঝলুম, সমাজ যাকে বার করে দিয়েছে, আত্মীয়রাও তাকে পর করে দিতে বাধ্য হয়। তোমাদের আমি এ জন্যে কোনও দোষ দিইনি। তোমরা কী করবে বলো? সংসারে থাকতে হ'লে, সমাজের স্বৈরাচার না মেনে চলে যে কারুর উপায় নেই! বিগত জীবনে প্রতিদিন তা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিছি।

আজ আমি মুক্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচছি! চারিদিকে স্বাধীনতার সুস্থ আবহাওয়া আমাকে যেন একটা নবজীবনের স্পর্শ দিয়ে সজীব ক'রে তুলেছে। আমি নূতন ক'রে জীবন সুরু করলুম। একটি মেয়ে ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী হ'য়ে চললুম। আমার জন্যে তুমি কিছু ভেবোনা। আমার সই অলকার কাছে আমার সব খবরই পাবে।

আমার বন্ধুকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও প্রীতি অভিবাদন জানিও। কারণ এ মুক্তি পেয়েছি আমি তাঁরই দুর্নামের দানে! তুমি আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম ও ভালবাসা জানবে ও বৌদিকে জানাবে। ইতি—

তোমার
চিরস্নেহের সুহাস

পুঃ—কোথায় যাচ্ছি কী বৃত্তান্ত সে সব ঠিকানা দিয়ে পরে জানাবো। ইতি তোমার 'সু'।

শেষ

আমাদের সমাজ ও সাহিত্য

শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত

সমালোচকরা কেউ কেউ ব'লছেন, বাংলা সাহিত্যে প্রাণহীন, কৃত্রিমতাপূর্ণ সৃষ্টি প্রাচুর্য্য বেড়ে চলেছে।

কথাটি সর্ব্বতোভাবে সত্য নয় এবং সম্পূর্ণ মিথ্যাও নয়।

বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে প্রাণহীন ফাঁকা বস্তুর প্রাচুর্য্য দেখা দিয়েছে সত্য, কিন্তু এটা নতুন সত্য নয়। যেহেতু পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যকেও ঠিক এই অভিযোগে অভিযুক্ত করা যেতে পারে।

প্রাক্-আধুনিক সাহিত্যে, ভাষার বৈচিত্র্য, ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য এবং বাস্তবতাবাদ ও দুঃখবাদের কৃত্রিম অনুভূতি ছিল না সত্য,—কিন্তু অকৃত্রিম প্রাণস্পর্শতা, অনাবিষ্ট উন্মুক্ত দৃষ্টি-শক্তি এবং গভীর-অনুভূতি-সঞ্জাত সুন্দর রস-সৃষ্টির দিক্ দিয়ে, সে সাহিত্যও যে খুব বড় আসন নিতে পেরেছিল, এ কথা বলা চলেনা।

পূর্ব্বতন সাহিত্য, অতি অল্প দিন আগে পর্য্যন্ত, নির্ব্বিশেষে, অবিমিশ্র ভাবে আদর্শবাদ, নীতিবাদ, এই দু'টি মাত্র উপাদানকে একান্ত আশ্রয় করে' চরিত্র-সৃষ্টি ও রস-সৃষ্টি করে' গিয়েছে। সেইজন্য সে সাহিত্য অধিকাংশ স্থলেই, রস-সৃষ্টির দিক্ দিয়ে স্বচ্ছন্দোৎসারিত, সার্থক এবং প্রাণগতিপূর্ণ হ'য়ে উঠতে পারেনি। চরিত্রগুলি প্রায় সবই 'বইয়ের জীব'ই হয়েছে। বহির্জগতে কিম্বা মনোজগতে প্রায়শঃ ক্ষেত্রেই তারা অচল।

তৎসাময়িক জনসমাজে সে সাহিত্য আদৃত হ'লেও, সেই ফাঁকা নীতিবাদের নকল জরীর উজ্জ্বল দীপ্তি আজকের দিনে নিষ্প্রভ হ'য়ে গিয়েছে। তার যথার্থ মূল্য কতটুকু, রসবেত্তা সমাজে সে তথ্য আর অবিদিত থাকছেনা। কালের নিকষে কৃত্রিম ও অকৃত্রিমের মূল্য, একদিন-না-একদিন প্রমাণিত হয়ই। পুরাতন মাত্রেরই একটা মূল্য আছে মনে করে' আমরা অত্যন্ত ভুল করি। যার মূল্য আছে, তা' কোনও দিনই পুরাতন হয়না। তা' সাহিত্য-জগতে আভিজাত্যের মর্য্যাদা নিয়ে 'ক্ল্যাসিক' হ'য়ে বেঁচে থাকে। যেমন,—বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, সেক্স্‌পীয়ার, শেলি, গ্যয়্‌টে, কীট্‌স্ বেঁচে আছেন এবং থাকবেন। কারণ, সর্ব্ব কালের সাহিত্য-সভায় এঁরা চিরন্তন আসন গ্রহণ করেছেন। আমাদের দেশে, বর্ত্তমান শতাব্দীর সাহিত্যে, চিরন্তন প্রাণগঙ্গা অবতরণ করিয়েছেন—বিশ্ব-স্তুত কবি রবীন্দ্রনাথ, ও অপূর্ব্ব কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র।

বর্ত্তমান কালের তরুণ সাহিত্যে যেমন কৃত্রিম দরদ, কৃত্রিম অনুভূতি, কৃত্রিম দুঃখ-সুখের বাস্তব স্বপ্ন-রচনার প্রাবল্য দেখা দিয়েছে,—ভঙ্গীর কারু-কৌশল, ভাষার অভিনবত্ব ইত্যাদি বাহ্যিক বিচিত্র সৌষ্ঠবে এরা যেমন প্রাণবস্তুর দৈন্য ঢেকে রাখতে সচেষ্ট,—প্রাক্-আধুনিক সাহিত্যও ঠিক এই রকম কৃত্রিমতারই কারবার করে গেছে। তাই, সে সাহিত্যে কোনও দিন, রূপের মধ্য দিয়ে জীবনের সত্য আবেদনটি শিল্পীর অনাবিষ্ট অনুরাগের বর্ণে আরঞ্জিত, প্রাণ-দ্যোতনা-পূর্ণ হ'য়ে উঠতে পারেনি। পূর্ব্বতন-সাহিত্যও, রচনার মধ্যে, প্রাণাভিব্যঞ্জনার বিশেষ প্রচেষ্টা না করে' সামাজিক নীতিবাদ ও বৃহৎ আদর্শবাদের সাড়ম্বর ফানুষে সেই জীবনাভিব্যক্তির দৈন্য এবং ত্রুটি আবৃত রাখতে যত্ন নিয়েছেন। যে ত্রুটীর অভিযোগে আধুনিক সাহিত্যের স্থূল ইন্দ্রিয়বাদ ও প্রাণহীন উগ্র বাস্তবতাবাদ অভিযুক্ত হ'চ্ছে,—পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যেরও ত্রুটী আর এক দিক্ থেকে তার চেয়ে একটু কম নয়। মোটের উপরে আমাদের সাহিত্যে, প্রাণ-অভিদ্যোতক, সত্য-চেতনাযুক্ত, সার্থক বস্তুর অভাব প্রথম থেকেই রয়েছে। পরিবর্ত্তন হয়েছে তার দৈন্য-আবরণের উপাদান-পুঞ্জের।

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে বাদ দিয়েও এই উভয় যুগ-সাহিত্যের মধ্যে, এমন কয়েকজন প্রতিভাশালী, সার্থক স্রষ্টা আছেন, যাঁদের সৃষ্টির মধ্যে প্রাণের সাড়া ও রসের আস্বাদ অঙ্গাঙ্গী রূপে বর্ত্তমান। পূর্ব্বতন সাহিত্যের এবং আধুনিক সাহিত্যের সেই বিশিষ্ট রচয়িতাদের সৃষ্টি অবশ্য এ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়।

সাহিত্যে এই ফাঁকির বেসাতির মূল কারণ—আমাদের অতি জীর্ণ, রক্ষণশীল সমাজ, যে এই জাতির যৌবনকে হত্যা করে' তার মনুষ্যত্বকে লাঞ্ছিত ক'রেছে!

সামাজিক জীবন যাদের নিস্তেজ, নীরস, বৈচিত্র্যহীন, স্পন্দনশূন্য, পঙ্গু, অসাড়,—যে জাতি জীবনের মধ্যে প্রাণের সাড়া জাগিয়ে তোলাকে দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক বলে' মনে করে,—তা'রা সত্য ও সজীব সাহিত্য, প্রাণ-রস-পূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি ক'রবে কেমন করে'?

সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতায় এবং উপলব্ধিতে যাদের সৌন্দর্য্য, শিল্প বা রসের সাথে সাক্ষাৎ-পরিচয়ের কোনও সহজ পন্থা নেই,—তা'দের দ্বারা সাহিত্যে আর্ট ও রস-সৃষ্টি —কাল্পনিক কৃত্রিম সামগ্রী ব্যতীত অন্য কিছু হওয়া সম্ভবপর নয়।

প্রচুরতর অভাব ও বিবিধ ক্ষতির অজস্র ছিদ্রে আজ আমাদের সামাজিক জীবন এমনই দৈন্যময় অচল হ'য়ে উঠেছে যে, আর একে চাকা দিয়ে সচল করে' নেবার উপায় নেই। বরং দারিদ্র্য লুকাবার এই ব্যর্থ প্রচেষ্টা, এর দৈন্যকে যেন আরও হীনতায় মণ্ডিত করে' উপহাসাস্পদ করে তুলছে। কিন্তু তবুও অতি-পুরাতন সমাজ-বিধির জীর্ণ সর্ব্বাঙ্গে, অভাবের সহস্র ছিদ্রপুঞ্জ সংস্কারের প্রচেষ্টার চেয়ে ঢেকে রাখবার প্রবণতা আমাদের দেশে এখনও বেশী রকম বর্ত্তমান। সমাজের এই নগ্ন দারিদ্র্য যে একটুও গৌরবের পরিচায়ক নয়, বরং কুশ্রীতা ও লজ্জাহীনতারই পরিচায়ক,—এ বোধ যে পর্য্যন্ত না জাগবে এবং সমাজের জীর্ণতা-সংস্কারে যতদিন না এরা ব্রতী হবে, সে পর্য্যন্ত সাহিত্যেরও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির আশা দুর-পরাহত; যেহেতু সাহিত্য ও সমাজ এ দু'টি পরস্পরের মুখাপেক্ষী বস্তু। বিশেষ, জাতির সমষ্টিগত সংস্কার, বুদ্ধি, চৈতন্য, জ্ঞান, কল্পনা, রস ও রুচি—তাদের সমাজ এবং সাহিত্যকে গড়ে' তোলে। তাই এই দু'টি সামগ্রীর মধ্যে বিশেষ ঐক্যসূত্র অন্তর্নিহিত আছে।

যেখানকার সমাজে যে অবস্থা, সেখানকার সাহিত্যেও সেই অবস্থাই সুপরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। আমাদের দেশেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। এখানে, উন্নত ও সুন্দর সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য, স্রষ্টার যে সকল গুণ-উপাদান অবশ্য-প্রয়োজন, তা'র ত্রুটী ও অভাবের ছিদ্রগুলি ভরাট ক'রতে সাহিত্য স্রষ্টার তেমন প্রবণতা নেই, যেমন প্রবণতা দেখা গেছে ও দেখা যাচ্ছে—সেই ত্রুটী ও অভাবকে কৃত্রিমতার আবরণে ঢাকা দিয়ে রাখবার।

মৌলিকত্ব, ভাব-প্রাচুর্য্য, সত্যস্পর্শী অনাবিষ্ট কল্পনা-শক্তি, সূক্ষ্ম-অন্তর্দৃষ্টি, ঐতিহ্যমুক্ত (Free from the influence of tradition) সুদূর-প্রসারী চিন্তাশীলতা, গভীর অভিজ্ঞতা, সহজ-অনুভূতি,—সর্ব্বোপরি দেশ-কাল ও নিন্দা-স্তুতির অতীত সত্যোপলব্ধি,—এই সকল গুণ-উপাদান ব্যতীত, কোনও দেশে এবং কোনও কালে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। এর জন্য প্রতিভার সহিত সাধনারও প্রয়োজন। সাধনা ব্যতীত শক্তি কিম্বা প্রতিভা কিছুই প্রবুদ্ধ ও প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠতে পারেনা। এই সত্য সাধনা যতদিন না সাহিত্য-স্রষ্টাদের লক্ষ্য ও আরাধনার বস্তু হবে, ততদিন বোধ হয় বঙ্গবাণীর বরাঙ্গে—গিল্টি-করা সাহিত্যালঙ্কার ওঠা অনিবার্য্য। আবার এ কথাও স্বীকার ক'রতেই হবে, যে, তেমন সাধক ও সাধনা সম্ভব হয় দেশ-কালের অনুকূল আবহাওয়া এবং উপযোগী পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের গুণে।

কৃত্রিম-সাহিত্য-সৌধ-রচনা পূর্ব্বতন সাহিত্যেও চল্‌ছিল, আধুনিক সাহিত্যেও চলেছে। মিস্ত্রী বদলের সাথে সাথে মাল্‌মশলা ও রং ঢংয়ের বদল হ'য়েছে—এইমাত্র। এখনও প্রাণবন্ত সার্থক ও সুন্দর সাহিত্যের তাজমহল, তার রূপে-রসে-ব্যঞ্জনায়, সত্যে ও সুষমায় গড়ে' উঠতে বাকী আছে।

সামাজিক জীবনযাত্রায় আমাদের প্রাণ না থাকুক ভান আছে যথেষ্ট। এই ভান দীর্ঘ-শতাব্দী-ব্যাপী অভ্যাসের ফলে আমরা এমনি স্বাভাবিক করে ফেলেছি, যে, এখন এর প্রকৃত রূপটি চেনা কঠিন। সাহিত্যেও এই ছদ্ম সুনিপুণ ভানটিই ফুটে উঠেছে। এই ভানটুকুকেই আমরা আমাদের সত্যকারের দান ব'লে মনে করি।

যা' সত্য নয় বলে' উপলব্ধি করি, যার মধ্যে কল্যাণ নেই, প্রাণ-স্পন্দন নেই, রসাস্বাদ নেই বলে' বুঝতে পারি, —নির্ভীকতা ও নিষ্ঠার অভাবে, ঐতিহ্যের বন্ধন-প্রভাবে, প্রথা-আচারের চক্ষুলজ্জায় সেই পরম মিথ্যাকে আমরা আমাদের জীবনে সত্যের আসন দান ক'রতে বাধ্য হই। এই তো আমাদের বৃদ্ধ-প্রপিতামহের পূর্ব্বতন আমলের

সমাজবিধি-পূর্ণ বর্ত্তমান সামাজিক জীবনের সকরুণ ট্র্যাজেডি।

অকাম্যকে কাম্য বলে', পরিহার্য্যকে গ্রাহ্য বলে', অতৃপ্তিপ্রদকে তৃপ্তিকর বলে' স্বীকার করার এবং স্বীকার করাবার প্রাণান্ত প্রয়াস,—প্রাণ-সম্পর্ক-শূন্য ভানের কারবার,—এই তো আমাদের সঙ্কীয়মান-সমাজ এবং সঙ্কীয়মান সাহিত্যের স্বরূপ।

আধুনিক তরুণ সাহিত্যের বিক্ষোভ ও উচ্ছলতা, ভালো বা বড় জিনিষ না হ'লেও, লক্ষণ হিসাবে বিশেষ অমঙ্গলের নয়। বরং, এই উদ্দামতা, উচ্ছলতা, বিক্ষোভ চাঞ্চল্যের পরে যে পরম মুহূর্ত্তটি আসবে, সেই চেতন-জাগ্রত প্রশান্ত মুহূর্ত্তটির আভাস আমাদের মনে যেন একটু আশার সঞ্চার ক'রছে।

কাদাই ঘাঁটুক্, ধূলাই মাখুক্,—এরা অন্তরে একটা তীব্র অতৃপ্তি নিয়ে, নব নব সন্ধানের পথে যে অগ্রসর হ'য়ে চ'লেছে, তাতে ভুল নেই। এদের অন্তরের অতৃপ্তিই যে এদের সৃষ্টিকে সত্য ও সুন্দরের খোঁজে 'নেতি'র পথে এগিয়ে নিয়ে চ'লবে,—এ ভরসা হয় তো মিথ্যে না হ'তে পারে।

স্ব-রচিত সৃষ্টি-উপাদান ও সৃষ্টি-পদ্ধতির বর্ত্তমান রূপকে এরা চিরদিনের সত্য করে' তুলে' তারই মধ্যে নিজেদের বন্দী করে রাখতে স্পৃহাশীল নয়। আজ এরা যে বিষয়-বস্তু ও যে রসসৃষ্টি দ্বারা সাহিত্য-গঠন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'য়েছে—তারই মধ্যে সংকীর্ণ বৃতি রচনা করে' স্থিতিশীল হবেনা,—এ সত্য এদের যাত্রা-ভঙ্গীতেই সুপরিস্ফুট। আজকের সত্য চিরকালের অখণ্ডনীয় ও অপরিবর্ত্তনীয় সত্য নয়, তা' আজকেরই সত্য,—অনাগত ভবিষ্যতে রূপান্তর ঘ'টতে পারে,—এ ধারণায় ও স্বীকারে যাদের নীতি ও সংস্কার বাধা দিতে পারেনি,—তাদের সৃষ্টির সত্যের মধ্যে আজ যদি কোনও কলুষ, গ্লানি বা ভ্রান্তি ফুটে উঠেই থাকে, তার জন্য আমাদের বেশী চিন্তিত হবার প্রয়োজন বোধ করিনা। কারণ, তা'রা গতিশীল, স্থিতিশীল নয়। তা'রা সত্যের সন্ধানে যাত্রা ক'রেছে,—এমন কথা বলে' তাদের চলা বন্ধ করেনি যে, আমরা যা ছুঁয়েচি এর বাড়া সত্য নেই বা থাকতে পারেনা।

বঙ্গসাহিত্যে যে দু'জন বিরাট প্রতিভাশালী সাহিত্য-স্রষ্টা তাঁদের প্রদীপ্ত প্রতিভা-কিরণ বর্ষণ ক'রছেন, এঁদের সৃষ্টি-প্রতিভার মূল তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। তাঁরা এই দেশ, কাল ও সমাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে, সাহিত্য-লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে যে রত্নসম্ভার দান করেছেন ও ক'রছেন, তা' অপূর্ব্ব এবং অমূল্য সামগ্রী। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের এই প্রতিভা-উন্মেষের মূলে কি কি গুণ বর্ত্তমান আছে, তা' অনুসন্ধান করা আমাদের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ হ'তে পারে।

এই দু'জন স্রষ্টা, স্বাধীন সত্যকে এমনই নিবিড় ভাবে উপলব্ধি ক'রেছেন, যে, সেই উপলব্ধির আনন্দ এঁদের সকল বন্ধন, সকল বাধা ছাপিয়ে সাহিত্য-সৃষ্টিকে স্বতঃ-সার্থক করে' তুলেছে। তাই এঁদের সৃষ্টি, দেশ-কাল-সমাজের অন্তর্বর্ত্তী থেকেও, দেশ-কাল-সমাজ-অতীত বৃহত্তর সত্যকে ব্যাপকভাবে স্পর্শ ক'রতে পেরেছে। অর্থাৎ—এঁদের সৃষ্টির বিষয়বস্তুগুলি দেশ-কালেরই অন্তর্ভুক্ত এবং বর্ত্তমান সমাজের ক্রিয়া, চিন্তা, সমস্যা, দ্বন্দ্ব প্রভৃতির সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত;—কিন্তু তার রস এবং সত্য দেশ-কাল সমাজের প্রাচীরে মাথা ঠোকেনি, অবলীলাক্রমে পার হ'য়ে গিয়েছে। এই পার হওয়ার মধ্যে কষ্টের চিহ্ন বা প্রচেষ্টার চিহ্ন নেই—এমনই তার সহজ ব্যঞ্জনা ও স্বচ্ছন্দ গতিভঙ্গিমা।

সৃষ্টির রূপটিকে দেশ-কালের মধ্যে রেখে, রস ও সত্য-বোধটিকে দেশ-কাল ছাপিয়ে সহজের পানে নিয়ে যাওয়াতে এঁদের সাহিত্য এত সুন্দর, সত্য ও সমগ্র ভাবে সার্থক হ'য়ে উঠেছে।

এই দ্রষ্টাদ্বয়ের কল্পনা ঐতিহ্যমুক্ত, সত্যসন্ধানী। দৃষ্টি সূক্ষ্ম, অনাবিষ্ট ও উন্মুক্ত। তাই এঁদের কাছে এক দিক দিয়ে মানব-জীবনের অতি তুচ্ছতম ঘটনা ও ক্ষুদ্রতম বস্তুর সুখ দুঃখ আনন্দ-বেদনার বিচিত্র বর্ণরাগের সূক্ষ্মতম রেখাটিও সুস্পষ্ট পরিদৃশ্যমান হ'য়ে উঠেছে; আবার অন্য দিক দিয়ে চিরন্তন বৃহত্তর সত্যে মানবাত্মার যে বিচিত্র বিকাশ ও পরিণতি তারও বিরাট স্বরূপ উজ্জ্বল রূপে প্রতিফলিত হ'তে বাধা পায়নি। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ত্রিতন্ত্রী বীণায় সুর বেঁধে এঁদের সৃষ্টির সুরটি সুসঙ্গতি এবং সার্থকতা লাভ করেছে।

রক্ষণশীল পঙ্গু সমাজের অটুট বন্ধন-গ্রন্থি শিথিল ক'রতে হ'লে, সাহিত্যে কল্যাণময় সুদৃঢ় সত্যের ব্যুত্থান চাই।

অপর পক্ষে সাহিত্যকে সুন্দর ও সার্থক রূপে পেতে ইচ্ছা হ'লে সমাজকেও অন্ধত্ব ও অচলত্ব পরিহার করে' উদার ও প্রশস্ত হ'তে হবে।

আজ সাহিত্যকে খুলতে হবে বিষ-অচেতন সমাজের সর্ব্বাঙ্গের নাগ-পাশ,—ফণীর দংশন-ভয়ে ভীত হ'লে চ'লবেনা; সমাজকে খুলতে হবে সাহিত্যের কণ্ঠ হ'তে শ্বাস-রুদ্ধকর অগণিত কঠোর ফাঁস!—নইলে একদিন উভয়েরই মৃত্যু অবধারিত।

সেদিন ফরাসীদের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা বহন করে' এনে দিয়েছিল তার সাহিত্য। আজ রুশে'রও মুক্তি বহন করে' নিয়ে এসেছে, রুশের গত কয়েক বৎসরের সাহিত্য।

আদর্শবাদ ও নীতিবাদ উপেক্ষনীয় বিষয় নয়, বরং সাহিত্যে ও' দু'টি অপরিহার্য্য চিরন্তন সামগ্রী। তাকে অস্বীকার করা বা খাটো করা'র দুষ্প্রবৃত্তি আমার নেই। আমার মনে হয়, সাহিত্যে আদর্শবাদ ও নীতিবাদের যতটুকু ন্যায্য প্রাপ্য ছিল, তার চেয়ে অনেকখানি বেশী যায়গা তাদের অন্যায়রূপে দখল ক'রতে দেওয়া হয়েছে। সাহিত্যে এই অতিরিক্ত ফলিয়ে-তোলা আদর্শবাদ ও নীতিবাদ—তার সমগ্রতার হিসাবে অসমঞ্জস ভাবেই বেড়ে উঠেছিল বলে বোধ হয় বর্ত্তমান তরুণ সাহিত্যে তারই তীব্র প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠেছে।

কিন্তু তরুণ সাহিত্যও যদি এই একদিকে-ঝোঁকা অসামঞ্জস্যতার পথে চলে,—অর্থাৎ দারিদ্র্যবাদ, দৈন্যবাদ, দুঃখবাদকে স্বরূপের চেয়েও ফলাও করে' তুল্‌তে চায়—তা' হ'লে এ সৃষ্টিও যে অনতিকালে মৃতদেহের মতই আড়ষ্ট হ'য়ে উঠবে, সে কথা বোধ করি বলা বাহুল্য।

উদরকে অনশনে রেখে বা বিশেষ উপেক্ষা করে' হস্ত-পদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যায়াম-চর্চ্চার, স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য এবং শৌর্য্যশক্তি অর্জ্জনের, চেষ্টা ব্যর্থই হয়। আবার দৈহিক সমস্ত অঙ্গাবয়বের যথোপযুক্ত যত্নে অমনোযোগী হ'য়ে কেবলমাত্র উদরের প্রতি মনোযোগী হ'লেও সে মানুষ শীঘ্রই অপদার্থ হ'য়ে পড়ে। শরীরের সকল অবয়ব-যন্ত্রের আবশ্যকানুযায়ী যত্ন ও উৎকর্ষ-চর্চ্চা, তার সহিত অন্তরের প্রফুল্লচিন্তা, নিরুদ্বেগতা, আনন্দ প্রভৃতি,—মানসিক যন্ত্রের সুগম-ক্রিয়া—নির্দ্দোষ স্বাস্থ্য ও দৈহিক সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পক্ষে যেমন অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়,—সাহিত্যকেও স্বাস্থ্য-সুন্দর সতেজ করে' তুলতে হ'লে, অন্তর্ব্বহিঃ সর্ব্বাঙ্গীন সামঞ্জস্যতার মধ্য দিয়ে চ'লতে হবে। অতি-সংযমের মধ্যে যেমন সত্য পীড়িত হ'য়ে ওঠে, অসংযমের মধ্যে তেমনিই সে লাঞ্ছিত ও অবমানিত হয়।

মানব-মনের মানস-সরোবরেই সাহিত্যের অমল কমল বিকশিত হ'য়ে উঠেছে —"In the universe there is nothing greater than man, in man there is nothing greater than mind." দার্শনিক হ্যামিল্টনের কণ্ঠের এই বাণী আজ নিখিল বিশ্ব-সাহিত্যের মর্ম্মবীণায় অনুরণিত হ'য়ে উঠেছে।

জগৎ এবং জীবন হ'তে সাহিত্যের উদ্ভব, এবং এই দুটি-কেই কেন্দ্র করে' সাহিত্যে রূপ ও রসের সৃষ্টি। কামনা ও কুশ্রীতা, দুঃখ ও দৈন্য এদের অস্তিত্ব জগতে এবং জীবনে স্ফুটতর ও অস্ফুটতর ভাবে রয়েছে। যা' জগতে এবং জীবনে আছে, সাহিত্যেও তার স্থান আছে। কিন্তু এরাই যে সাহিত্যে বা জীবনে সমগ্রতার পরিচায়ক বৃহত্তম সত্য, তা' নয়। এর চেয়েও বৃহত্তর সত্যবস্তু যা,—সে সত্য যেন এর কাছে ছোট বা ম্লান হ'য়ে না যায়।

বিশ্বে আনন্দ ও দুঃখ, পুণ্য ও পাপ, ঐশ্বর্য্য ও দারিদ্র্য, সৌন্দর্য্য ও কুশ্রীতা, জরা ও যৌবন পাশাপাশিই বর্ত্তমান। এর মধ্য হ'তে সৌন্দর্য্য, যৌবন, আনন্দ, ঐশ্বর্য্যই যে শুধু সাহিত্যের বিষয়বস্তু হ'তে পারে—বিপরীতগুলি পারেনা, তা' সত্য নয়। বিশ্বের ভাল-মন্দ যা' কিছু—নিপুণ সাহিত্য-শিল্পীর হাতে প'ড়লে সুন্দরই হ'য়ে ওঠে। এই সৌন্দর্য্য তার বাহ্যিক সৌষ্ঠবে বা বিষয়বস্তু-নির্ব্বাচনের উপরে নির্ভর করেনা। নির্ভর করে গূঢ়ার্থ-ব্যঞ্জক প্রাণের আবেদনটি যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তোলার উপরে। সেইজন্য পুণ্যের চিত্রও অনিপুণ শিল্পীর হাতে অসুন্দর হ'য়ে ওঠে, এবং, পাপের চিত্রও নিপুণ শিল্পীর তুলিতে সুন্দর হ'য়ে ওঠে।

যেমন রসবিদ্ কলানিপুণ চিত্রকরের তুলিকায় জরার চিত্র, দারিদ্র্যের চিত্র, মরুভূমির চিত্রও পরমসুন্দর পদবী লাভ করে, এবং অনিপুণ চিত্রকরের আঁকা যৌবনের চিত্র, ঐশ্বর্য্যের চিত্র, শ্যাম-নিকুঞ্জের চিত্রও প্রাণের অভিব্যক্তির অভাবে—অন্তরস্থ ভাবরসের যথোপযুক্ত উৎসারণ-দৈন্যে—ব্যর্থ অসুন্দর প্রতীয়মান হ'য়ে থাকে।

"হৈ সবমেঁ সবহীতেঁ ন্যারা"—সেই পরমসুন্দর তিনি যে শুধু উষার সুষমায়, আকাশের নীলিমায় আছেন, তা' তো নয়, নিশার আঁধারে, ধরণীর ধুলার মধ্যেও যে তিনি র'য়েছেন। কোথাও তাঁর বিকাশ অধিকতর স্ফুট, কোথাও বা স্বল্প স্ফুট কিম্বা অস্ফুটই। কিন্তু অস্তিত্ব যে তাঁর সর্ব্বত্রই ও সবেতেই আছে, তার ভুল নেই। সুন্দর অসুন্দর সকলের মাঝে—সেই প্রাণ-স্বরূপ পরমসুন্দরকে যদি চিত্রকর তুলির টানে, স্থপতি ভাস্কর-যন্ত্রের মুখে, সাহিত্যিক লেখনীর অগ্রে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারেন, তা'হ'লে—অসুন্দর বিষয়বস্তু হ'তেও পরম সৌন্দর্য্য বিকশিত হ'য়ে উঠবে।

আজ বঙ্গ-ভারতী আশা-উৎসুক নয়নে প্রতীক্ষা ক'রছেন —সাহিত্য-মন্দির-তলে ভক্তদল পূজার সার্থক অর্ঘ্য বহন করে' আনবেন।

তরুণ উপাসক আনবেন,—যৌবনের প্রাণ-পর্য্যাপ্ত সজীব সৃষ্টি। তা'তে কামনার উর্দ্ধে প্রেম পরিস্ফুট হবে, কদর্য্যতার উর্দ্ধে সৌন্দর্য্য আসন নেবে, ভাঙবার শক্তির পিছনে বৃহত্তর গড়বার শক্তি অধিক চেতন-প্রবুদ্ধ সক্রিয় হ'য়ে উঠবে।

নারী উপাসিকা আনবেন—নারী-অন্তরের অন্তরঙ্গ বাণী বহন করে'। নারী-হৃদয়ের যে-সকল বিশেষতর নিগূঢ় অনুভূতি ও পরম সত্য, তাঁদের বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির আলোয় আঁধারে বিচিত্র রশ্মি-সম্পাত ক'রছে,—যা' পুরুষের উপলব্ধির অতীত, সেই সত্যকে অন্তর্গূঢ় লোক হ'তে কল্যাণ-প্রদীপে পথ দেখিয়ে সাহিত্য-লোকে মূর্ত্ত করে' ধ'রবেন।

দূরদর্শী, বয়োজ্যেষ্ঠ, ভক্ত,—সাহিত্য ও সমাজের লৌহশৃঙ্খল মোচনে সহায়তা ক'রবেন। সাহিত্য যাতে সুসমঞ্জস, স্বাস্থ্য-সুন্দর প্রাণবন্ত ও সার্থক হ'য়ে ওঠে, —সমাজ যাতে জড়তা ও সংকীর্ণতামুক্ত কল্যাণে সুখে স্বাস্থ্যে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হ'য়ে ওঠে, তারই যত্ন ও দায়িত্ব নেবেন। তরুণদের ক্রটী-বিচ্যুতি তাঁদের প্রশান্ত ক্ষমার স্নিগ্ধ শীলতায় যেন লজ্জিত হ'য়ে ওঠবার অবকাশ পায়।

চীন

শ্রীভারতকুমার বসু

(৩)

গত বারে চীনদেশের চিকিৎসা-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে লিখেছি। এবার চিকিৎসকের একটু পরিচয় দিলুম।

সেখানে যে কোনো ব্যক্তিই চিকিৎসক হ'তে পারে। এজন্য কোনো সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হয় না। যারা পেশাদারী চিকিৎসক হবার সুযোগ পায় না, তারা নিদেন্ সখের চিকিৎসক ব'লেও নিজেদের জাহির করে। তারা যে সমস্ত 'ঔষধ' ব্যবহার করে, রোগীর রোগ ভালো করবার পক্ষে তা একেবারে 'মন্ত্রশক্তিতুল্য' ফলপ্রদ! দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাক, ওয়াং নামক একটী নাপিত বাস্তবিকই বেশ সুস্থ দেহে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ একটী ডাক্তার তার সামনে এসে তার মুখের দিকে চেয়েই এমন কতকগুলি কথা ব'ললেন যে, ব্যাচারী ওয়াং অত্যন্ত চিন্তিত হ'য়ে প'ড়লো এইজন্যে যে, সে ভেতরে ভেতরে নিশ্চয়ই রোগে ভুগছে, অথবা শীঘ্রই সে দারুণ কোনো রোগে প'ড়বেই প'ড়বে! অসহায় ওয়াং তখন অত্যন্ত ভীত হ'য়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হ'লো, যদি তিনি তাঁর সেই বিখ্যাত, 'অমোঘ' "পিলে"র দ্বারা তার সেই 'ভয়ঙ্কর' রোগ সারাতে পারেন! ডাক্তার তখনি মহা ব্যস্ততায় তাঁর আগে থাকতেই সঙ্গে ক'রে আনা কতকগুলি 'পিল্' অর্থাৎ ওষুধের বড়ি ওয়াংকে বিক্রী ক'রলেন। ওয়াংও অবিলম্বে তার বাড়ীতে ছুটে গিয়ে পর্-পর্ সব ক'টা বড়ী-ই খেয়ে ফেললে। এবং তার ফলস্বরূপ আশ্চর্য্যের সঙ্গেই পরের দিন আবিষ্কার ক'রলে যে, সে যার-পর-নাই সুস্থ হ'য়ে উঠেছে!…তার এই 'সুস্থ হওয়ার' সঙ্গে সঙ্গেই চিকিৎসক প্রবরেরও খ্যাতি

ছাড়িয়ে গেল!...কিন্তু যে ওষুধ দিয়ে এই ডাক্তার প্রখ্যাত হ'লেন, তার রহস্যটী যদি ওয়াং জানতে পারতো, তা হ'লে, ডাক্তারের অবস্থা যে কি হ'তো, তা বলা যায় না! কারণ ওষুধগুলো ছিল স্রেফ্ ফাঁকী! সেগুলো ছিল ডাহা ময়দা-গোলা জিনিষ! এবং এই কারণেই, ডাক্তার বেশ নিশ্চিন্তই ছিলেন যে, ওয়াং যদি রোগ ভালো হবার আশায় এক সঙ্গে সবগুলো 'পিল্'ই খেয়ে ফেলে, তা হ'লেও ভয়ের কারণ কিছু নেই!...

চীনদেশের স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে কারুরই দৃষ্টি নেই। তার ওপর সেখানে আছে—প্রত্যেক ঘরে ঘরে লোকের দারুণ ভীড় এবং নোংরা স্বভাব ও নিয়মাদি! এইজন্যেই প্রধানতঃ সেখানে হয় অত—প্লেগ, রক্তামাশয়, ক্ষয়কাস, উপদংশ ইত্যাদি রোগের আধিক্য!...কিন্তু আশ্চর্য্য, এ সব লক্ষ্য ক'রেও, চীন গভর্ণমেণ্ট অনেক দিন পর্য্যন্ত স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে কোনো রকম আইন প্রচার করেন নি! অবশ্য ১৯১১ সালে চিকিৎসা-বিদ্যা সংক্রান্ত একটী ক'গ্রেস্ সেখানে ব'সেছিল। কিন্তু তা নাম মাত্র!...অবশেষে ১৯১৫ সালে আসল কাজ হ'য়েছিল নতুন-প্রতিষ্ঠিত একটী সঙ্ঘের দ্বারা। এই সঙ্ঘের নাম—"চীনের জাতীয় চিকিৎসা-সঙ্ঘ" (Chinese National Medical Association)।

চীনদেশে কোনো শবদেহের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার ব্যাপার হচ্ছে চীনবাসীদের জাতীয় জীবনের একটী প্রধান কাজ। এ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।—সাধারণতঃ সেখানে পিতৃপুরুষের পূজার উদ্দেশ্য হচ্ছে দুটী। প্রথম—বংশধরেরা মৃত ব্যক্তির নামের স্মৃতি অবশ্যই বজায় রাখবে! এবং দ্বিতীয়—বংশধরেরা মৃত ব্যক্তির প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখাবে! চীন-গুরু কন্ফ্যুসিয়াস্ও সন্তানদের জন্য পাঁচটী কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ ক'রে দিয়ে গেছেন। তা হচ্ছে এই—

প্রথম—সাধারণ ব্যবহারে শ্রেষ্ঠ সম্মান দেখাবে।

দ্বিতীয়—অনন্ত আনন্দ দেবার জন্য শুশ্রূষার দ্বারা সম্ভ্রম দেখাবে।

তৃতীয়—অসুখের সময় যার-পর-নাই আকুলতা দেখিয়ে মান্য ক'রবে।
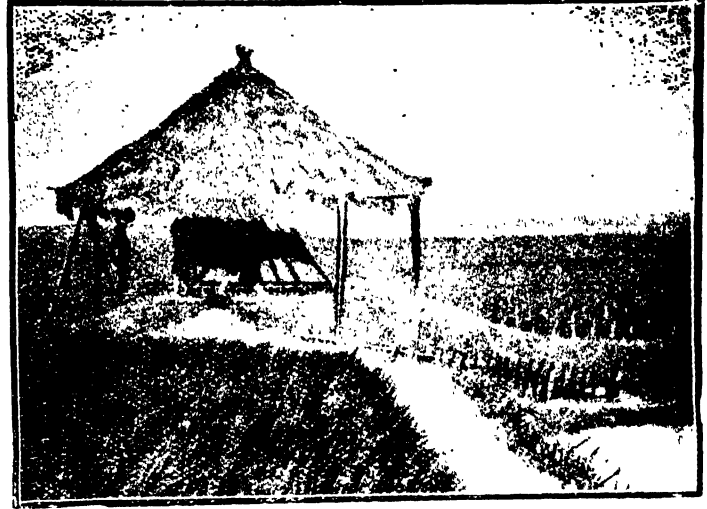
বলদের সাহায্যে জল "পাম্প" ক'রে ধানের ক্ষেতে দিচ্ছে।

পাশেই প্রবাহিত নদী থেকে জল তুলে ক্ষেতে সেচন ক'রছে।

চতুর্থ—মৃত্যুতে প্রচুর দুঃখ প্রকাশ ক'রে শ্রদ্ধা দেখাবে।

এবং পঞ্চম—প্রচুর আড়ম্বরের সঙ্গে আত্মত্যাগ দেখিয়ে ভক্তি দেখাবে!... এই পাঁচটী কর্ত্তব্যের মধ্যে প্রথম তিনটী কর্ত্তব্য সন্তান তার পিতার জীবিতকালে দেখাবার সুযোগ পায়। কিন্তু পিতার মৃত্যু হ'লে, শেষোক্ত দুটী

কর্ত্তব্যের দিক দিয়ে, পৃথিবীর চোখের সামনে সন্তানের যেন অগ্নি-পরীক্ষার সময় আসে। কারণ, যেন-তেন-প্রকারেণ উপযুক্ত আড়ম্বরের সঙ্গে সে তার পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন ক'রতে বাধ্য !···

ক্ষেত থেকে ধান তুলছে।
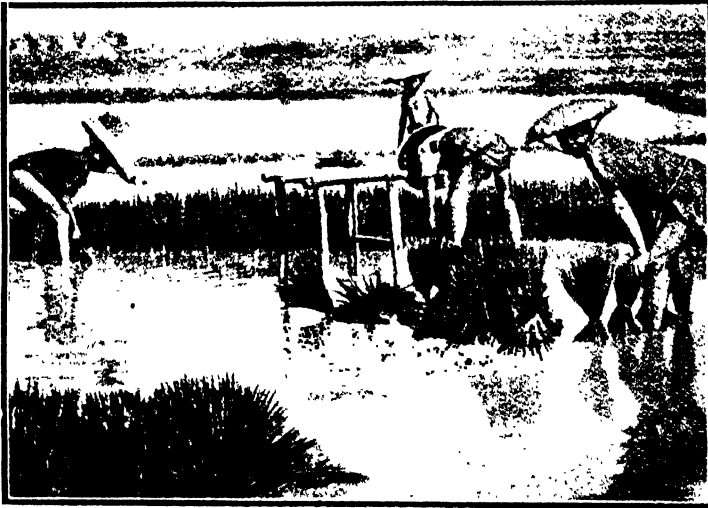
ধানের ক্ষেতে কৃষকদের কাজ।

পরিশ্রমের শেষে ঝুড়ির মধ্যে চাল রাখবার সময় কৃষকের আনন্দ।

এই ব্যয়সাধ্যতার জন্য, প্রয়োজন হ'লে, তাকে তার বাড়ীর জিনিষ-পত্র ইত্যাদিও বিক্রী ক'রতে অথবা বাঁধা দিতে হয়! এবং এজন্য যদি তার কিছু দেনা হয়, তা হ'লে সেই দেনা সে শোধ ক'রবে তার সারা জীবন ধ'রে!···

সাধারণতঃ বৃদ্ধ পিতা অথবা মাতার প্রতি সন্তানের উপযুক্ত উপহার হচ্ছে—একটা 'কফিন্' !···এই 'কফিন্'টাকে সমাধি-ক্ষেত্রের উপর রাখা হয়। এবং তাতে সন্তানের গর্ব্ব ও গৌরব বাড়ে! কিন্তু সন্তান যদি কোনো উচ্চপদস্থ চাকুরে হয়, তা হ'লে, পিতামাতার মৃত্যুতে তার প্রধান কর্ত্তব্যই হচ্চে—তার চাকরীতে অন্ততঃ তিন বছরের জন্য ছুটী নেওয়া এবং মা বাপের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা। যাই হোক, সমাধিক্ষেত্রে শবদেহ যে কবরস্থ করা হয়, তা করা হয় সন্তানের আদেশে নয়,—শবযাত্রীদের নির্দ্দেশ মত। কারণ, সন্তান তখন শোকে এতই অভিভূত হ'য়ে পড়ে যে, কবরের আয়োজন করবার মত তার মনের অবস্থা থাকে না মোটেই! এবং ঠিক এই কারণেই, অন্ততঃ ৪৯ দিন আগে থাকতে তথা-শবযাত্রীরা রীতিমত আড়ম্বরের সঙ্গেই শবদেহ সমাধিস্থ করবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে!

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আড়ম্বর অথবা অনাড়ম্বর কিন্তু সব সময়েই নির্ভর করে—মৃত ব্যক্তির ভালো অথবা মন্দ আর্থিক অবস্থার উপর! ভালো অবস্থাপন্ন কোনো ব্যক্তির কথা ধরা যাক। যদি তিনি আত্মহত্যা ক'রেও মারা যান, তা হ'লেও, অন্ততপক্ষে ৬০০ জন বাহক তাঁর কফিন্ ব'য়ে নিয়ে যাবে। তার পর তাঁর সম্মানার্থ রাজপথের উপর ক্ষণকালের জন্য কতকগুলি জমকালো স্তম্ভ বসানো হবে। বৌদ্ধ ও তেয়োস্ত্‌ধর্ম্মাবলম্বী বহু পুরোহিত সঙ্গে

সঙ্গে যাবে, যাতে না শবযাত্রীরা ভুল পথে চ'লে যায়!…তার পর শোকাতুর আত্মীয়-স্বজনের বিলাপ, বাদ্যকরের বাদ্য এবং রীতি-অনুযায়ী আতস-বাজীর খেলা, এ সব ত আছেই। অতঃপর মৃতদেহ সমাধি ক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হ'লে, কবর দেবার সময় মৃত ব্যক্তির জীবিত বেলায়-কেনা নকল কতকগুলি কাগজের মুদ্রা পুড়িয়ে ফেলা হয়, কারণ, এইরকম ক'রলে না কি মৃতব্যক্তির আত্মা পরলোকে গিয়েও ওই-সব মুদ্রা ব্যবহার করিতে পারবেন! উক্ত নকল মুদ্রা পুড়িয়ে ফেলা হয়, কিম্বা ছড়িয়ে দেওয়া হয়—শবযাত্রীদের ভীড়ের ঠিক পিছন দিকে। কারণ, তাতে না কি তখন দুষ্ট প্রেতাত্মারা ওই সমস্ত মুদ্রা কুড়িয়ে নিতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে, আর, এই সময়টুকুর মধ্যেই নির্ব্বিবাদে শবদেহ কবরস্থ করা হয়। মৃতদেহ যখন প্রথম সমাধি ক্ষেত্রে এনে ঢোকানো হয়, তখন অসংখ্য পতাকা-ধারী ছত্রধারী ব্যক্তিদের সঙ্গে অন্যান্য শব-যাত্রীরা একটী সুন্দর কোরাস্ গান গেয়ে ওঠে!…

মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর গৃহস্বামীর বাড়ীতে যে ভোজের আয়োজন হয়, তার বিশেষত্ব হচ্ছে অদ্ভুত! এই প্রকারের ভোজ সাধারণতঃ চাঁদা ক'রেই হয়। এবং এই ভোজে যোগ দিতে পারবেন একমাত্র তাঁরাই, যাঁরা তাঁদের পকেট থেকে আড়াই শিলিং ছাড়তে পারবেন! সুতরাং এই চাঁদাদাতা অর্থাৎ অতিথির সংখ্যা যতই বাড়বে, গৃহ-স্বামীর দুঃখের মধ্যেও ততই আনন্দ!··এই কারণে, অতিথিরা ত বটেই, গৃহস্বামীর আত্মীয়-স্বজন পর্য্যন্তও যদি উক্ত ভোজে যোগ দিতে আসেন, তা হ'লে তাঁদেরও প্রত্যেকটী জিনিষের জন্য দাম ধ'রে দিতে হবে!··এই ব্যাপারে গৃহস্বামীর দিক দিয়ে একটী ট্র্যাজিডির করুণতা আছে। কারণ

বাজিকর বালকের খেলা।
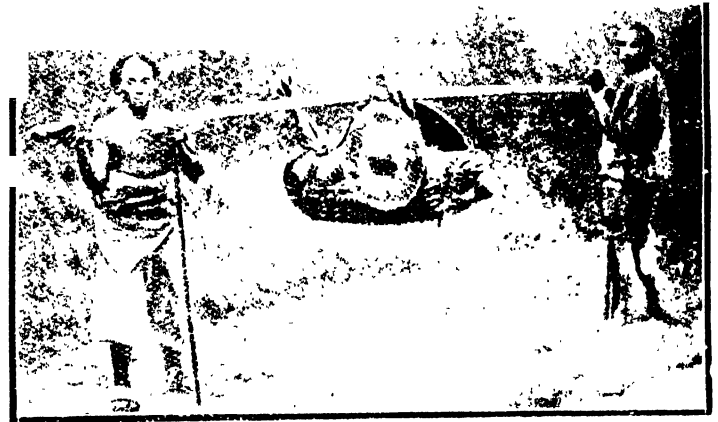
পদ্ধতি-অনুসারে এই শূকর শিশুকে বাজারে নিয়ে যাচ্ছে।

ঘোড়ার পায়ে 'নাল' পরাচ্ছে
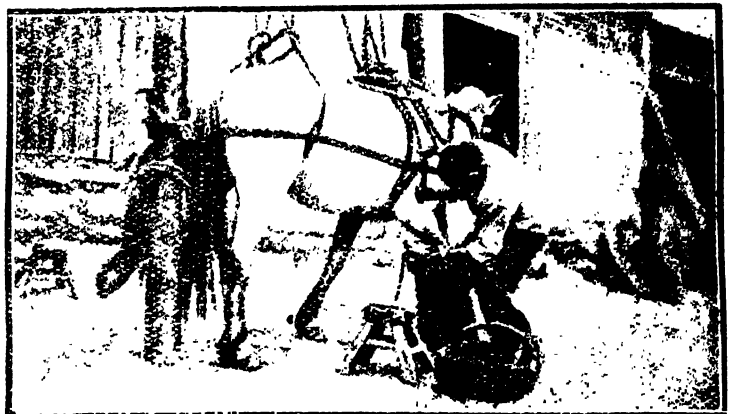
হয় ত, উক্ত গৃহস্বামী ওই ভোজের জন্য চাঁদায় পাওয়া সমস্ত অর্থ নিয়ে মার্কেটের দিকে চ'লেছেন—মাংস কেনবার জন্য। কিন্তু পথিমধ্যে তাঁর 'আহ্লাদে' আত্মীয়েরা এসে তাঁর কাছ থেকে সমস্ত অর্থই 'কেড়ে-কুড়ে' নিয়ে চ'লে

এই বৃদ্ধার মুখে পরিশ্রম ও দুঃখের চিহ্ন লেগে থাকলেও, বড়-আদরের পৌত্রকে কোলে করার সঙ্গে তার সমস্ত অন্তরটা শান্তি ও সুখে ভ'রে উঠেছে।

সকলের চেয়ে প্রিয়-আমোদের বস্তু—'পাইপে'র সাহায্যে ধূমপান ক'রছে।

গৃহস্থ-রমণী কাপড় তৈরী করবার জন্য সুতা কাটছে।

গেল। ব্যাচারী গৃহস্বামী কিছু ব'লতেও পারলে না, অথচ মুস্কিলে প'ড়লো বিষম! অগত্যা সে বাড়ী ফিরে এসে, নিজের তবিল্ থেকে অর্থ নিয়ে গিয়ে আবার মাংস ইত্যাদি জিনিষ কিনে নিয়ে এল। কিন্তু এ কিনে আনবার সময় পথে কোনো রকম বাধা উপস্থিত না হ'লেও, বাড়ীতে ফ্যাসাদ বাধলো প্রচুর! কারণ, অত্যন্ত দুঃখে ভোজের আগের দিন রাত্রে গৃহস্বামী আবিষ্কার ক'রলেন যে, তাঁর ভাঁড়ার-ঘর থেকে চোর সমস্ত মাংসই চুরী ক'রে নিয়ে পালিয়েছে। অতিথিদের জন্য রেখে গেছে মাত্র কতকগুলা শাক-সব্জী!... যাই হোক, এবার আর গৃহস্বামী নিজের ব্যাগ থেকে অর্থ বা'র ক'রে পুনরায় ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে

ইচ্ছা ক'রলেন না। অতঃপরের ঘটনা আর স্পষ্ট করে না ব'ললেও চলে।...

ধ'রে চীনভাষা শিক্ষা ক'রেও, কতকগুলি ভীষণ চীনা-শপথ ছাড়া আর কিছুই বাস্তবিক পক্ষে শিখতে পারে না!

টিয়েন্‌সিন্ দেশের একটী কারখানায় বিশ্ব-বিখ্যাত কার্পেটের কাজ হচ্ছে।

সুগন্ধি ধূপ জ্বেলে পুরোহিতের পূজা।

চীনদেশের কথ্য ভাষা হচ্ছে বিভিন্ন প্রকারের। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, সাঙ্গাই দেশের লোকেরা যে-ভাবে কথা বলে, ক্যাণ্টন্-অধিবাসীদের কাছে তা একেবারেই দুর্ব্বোধ্য! সুতরাং যদি কোনো বিদেশী সেখানে চীন-ভাষা শিখতে যান, তা হ'লে, তাঁর পক্ষে উচিত—মান্দারিন্‌দের ভাষা শেখা! এই ভাষারও তিনটী রকম আছে। কিন্তু তা হ'লেও, তত্রস্থ তিন ভাগের দুভাগ লোকও অন্ততঃ এই ভাষা বুঝতে পারে! কিন্তু এটা স্বীকার ক'রতেই হবে যে, চীন-ভাষা হচ্ছে শেখবার পক্ষে অত্যন্ত দুঃসাধ্য! আর এই জন্যেই, কোনো বিদেশী সারা জীবন
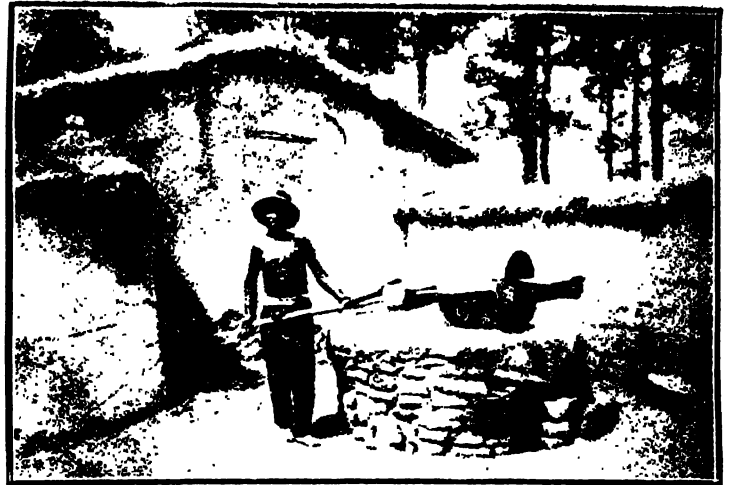
যন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে এই বালক তার পিতৃপুরুষদের প্রথা-মতো মাত্র একটা 'রোলারে'র চাপে চাল গুঁড়ো ক'রছে।

চীন-ভাষার উচ্চারণ হচ্ছে একটী মহা সমস্যা! কারণ, তার একটী কথার বিভিন্ন উচ্চারণ মতো, বিভিন্ন রকমের অর্থ প্রকাশ পায়! এ সম্বন্ধে কোনো এক বিশেষজ্ঞ নজীর দিচ্ছেন এই রকম যে, চীন-ভাষায় একটী কথা আছে। তার উচ্চারণ হচ্ছে—'চি'। কিন্তু দেখতে গেলে, চীন-ভাষায় সবশুদ্ধ ১৩৫টী কথা আছে, যাদের উচ্চারণ হচ্ছে—'চি'! প্রত্যেকেরই অর্থ বিভিন্ন রকম। কোনোটার মানে—অস্থির; কোনোটার মানে—মুরগীর ছানা; কোনোটার মানে—ধাক্কা দাও; এবং কোনোটার মানে—মনে রেখো! এক্ষেত্রে যদি কেউ 'চি' ব'লে একটা শব্দ উচ্চারণ করে, তা হ'লে, শ্রোতার পক্ষে আসল কথাটীকে বেছে নেওয়া বেশ একটু কষ্টকর হবে না কি? কিন্তু এর প্রতিবিধানের কোনই উপায় নেই! আশ্চর্য্য!...

চীনদেশের অন্যতম অদ্ভুতত্ব হচ্ছে তার প্রাদেশিক পরীক্ষা দেবার বাড়ীগুলি। সেখানকার 'হোনান্' নামক প্রদেশে প্রাচীর-বেষ্টিত এই পরীক্ষা দেবার বাড়ীতে প্রত্যেক ঘরে এক একটী পরীক্ষার্থী টানা ৯ দিন কাজ করবার জন্য অবরুদ্ধ থাকে। দুষ্ট প্রেতের অশুভ দৃষ্টি হ'তে রক্ষা পাবার জন্য এখানকার প্রত্যেক বাড়ীরই ছাঁচি হয় ওপরমুখো।...
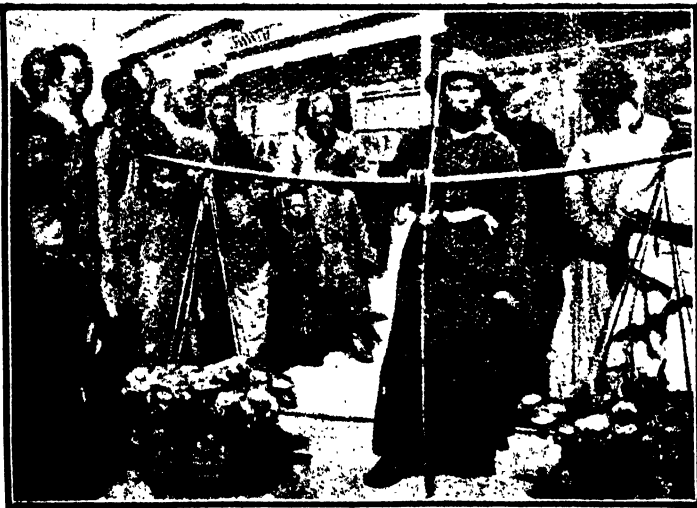
কৃত্রিম ফল ফেরি ক'রে বেচবার জন্য যাচ্ছে।

চীনদেশের লেখ্য ভাষা আবার এক নতুন জিনিষ! চীনবাসীরা যে ভাষায় কথা কয়, তা তাদের লেখ্য ভাষা নয়! তাদের লেখ্য ভাষা হচ্ছে তাই,—যার মধ্যে আছে 'পণ্ডিতী গন্ধ'! ঠিক এই কারণেই একটী চীনবাসী কোনো বিখ্যাত চীন কবির কবিতা শ্রোতাদের সামনে আবৃত্তি করবার সময় মুস্কিলে প'ড়ে যায়; কারণ, কেউ সে ভাষা বুঝতে পারে না! যদি চীন দর্শকরা তাদের কোনো ঐতিহাসিক নাটকের ঘটনার সঙ্গে আগে থাকতেই পরিচিত থাকে, তা হ'লে, থিয়েটারের মধ্যেও সে নাটকের অভিনয় তারা বেশ বুঝতে পারবে। কিন্তু তারা যদি
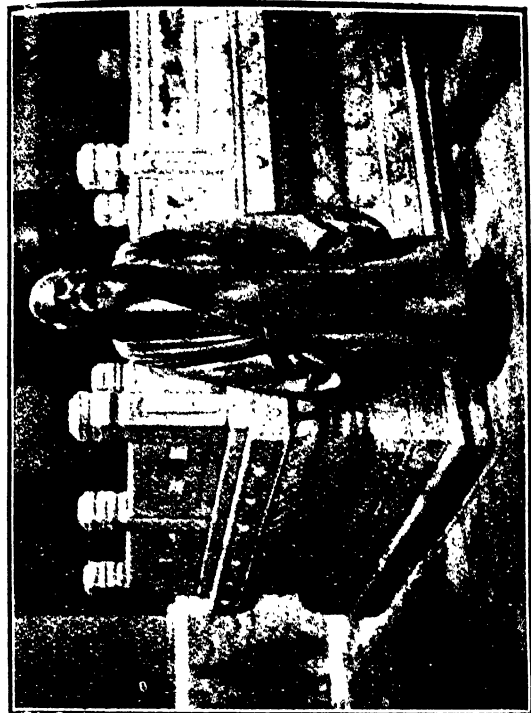
পিকিং নগরের লামাদের মন্দিরের পুরোহিত।

বাজিকর নয় তরবারী খেয়ে ফেলছে।

উদ্যানে চা-পান।

যান।
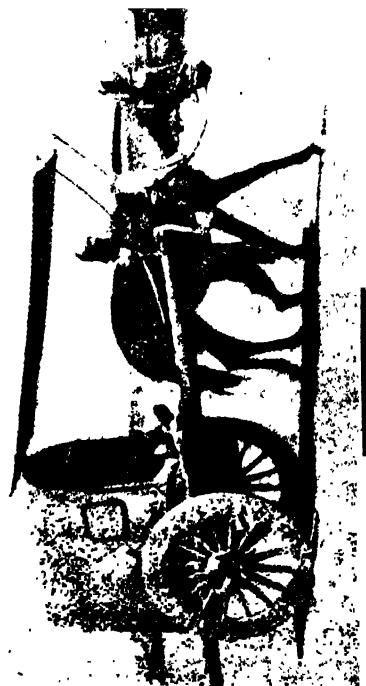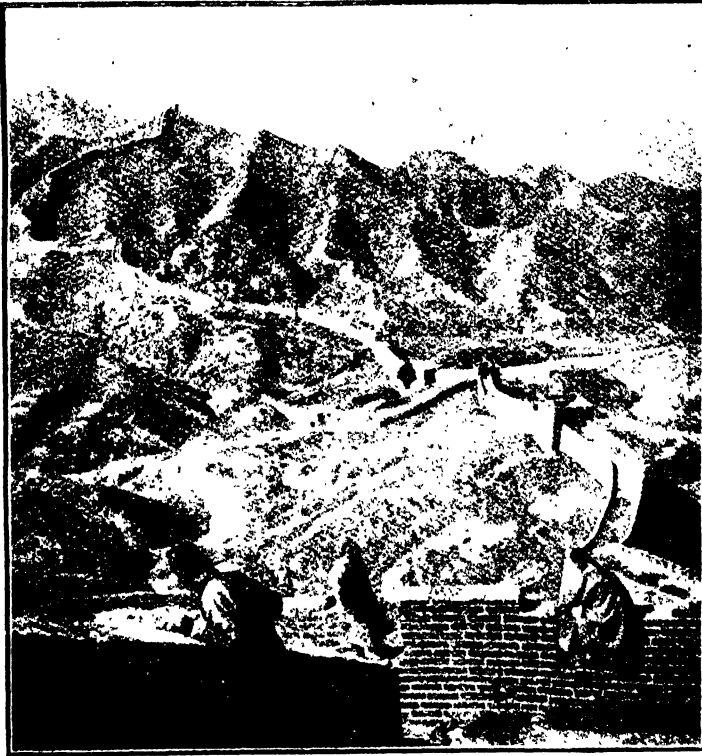
পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের একটী আশ্চর্য্য—চীনদেশের বিখ্যাত প্রাচীর। এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে ১৪০০ মাইল। এবং এটা এত চওড়া যে, এর উপর দিয়ে দুখানি গাড়ী পাশাপাশি বেশ ভাল ভাবেই চ'লে যেতে পারে।

এমন একখানি চীন নাটকের অভিনয় দেখতে যায়, যার বিষয়-বস্তু একেবারে আন্‌কোরা, এবং যার ঘটনা তারা আগে থাকতে কিছুই জানে না, তা হ'লে, সে নাটকের অভিনয় তাদের কাছে চীন ভাষাতে করাও যা, আর গ্রীক অথবা স্পেনিস্ ভাষাতে করাও তা! ··

চীনদেশে ডাক্তারী ওষুধের বিজ্ঞাপন যে ভাষায় লেখা হয়, তা সরকারী প্রচার-পত্রের ভাষা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন! সেখানকার ছাত্রেরা যে ভাষায় প্রবন্ধ লেখে, তা চীন ধর্ম্মগুরু কন্‌ফ্যুসিয়াসের গ্রন্থের ভাষা থেকে একেবারে পৃথক! ·····কিন্তু আশ্চর্য্যের উপর আশ্চর্য্যের কথা এই যে, অনেক প্রত্যক্ষদর্শী জোরের সঙ্গে এই কথা বলেন যে, অনেক চীনবাসীই তাদের নিজেদের দেশের মুদ্রাঙ্কন প'ড়তে পারে না এবং সেই মুদ্রার দাম ঠিক করতে পারে না!···সেখানে যে মুদ্রা ব্যবহার করা হয়, তার নাম টেল্ (Tael)। এই 'টেলে'র কিন্তু বিভিন্ন প্রকার আছে। 'সাঙ্গাইতে যে 'টেল্' চলে, 'ক্যাণ্টনে' তা চলে না। এবং Haikwanরা যে 'টেল্' ব্যবহার করে, চীনদেশের অন্যান্য স্থানে প্রচলিত 'টেল্' হ'তে তা পৃথক!···বিভিন্ন যায়গাতেই এই 'টেল্'এর মূল্য প্রত্যহই ব'দ্‌লে যায়। এই কারণে, টিয়েন্‌সিন্ দেশে যদি কোনো ব্যক্তি একটী চেয়ার কুড়ি 'টেল্' মূল্যে কিনতে যায়, তা হ'লে দোকানদার আগে মনে মনে গুণে নেবে যে, আজকে 'টেলে'র বাজার-দর কত! গণনার পর তার পোষালে, সে চেয়ার বিক্রী ক'রবে। ঠিক এই ভাবে যদি কোনো ব্যক্তি 'চেক্' ভাঙিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে 'টেল্' আনবার পর ছাখে যে, তার পরের দিনই তার দুর্ভাগ্য বশতঃ 'টেলে'র বাজার-দর রীতিমত বেড়ে গেছে, তা হ'লে, অত্যন্ত দুঃখে সে আপশোষ ক'রবে যে, কি লোকসানটাই সে দিলে! এইখানে ব'লে রাখি যে, 'টেল্' জিনিষটা
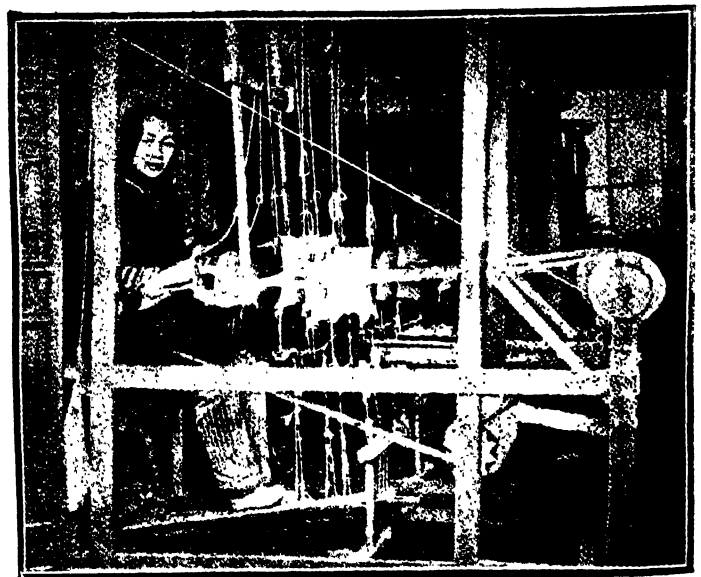
তাঁতে কাপড় বুন্‌ছে।

হ হাতী-ঘোড়া আর কিছুই নয়,—মাত্র একখণ্ড রূপোর পাত,—ঠিক আমাদের দেশের টাকার মতো। এর মূল্য সাধারণতঃ হচ্ছে পাঁচ শিলিং।…

চীনদেশে আর একটী মুদ্রা আছে। তার নাম "ক্যাস্"। "ক্যাস্"-জিনিষটী হচ্ছে তাঁবার একখানি ছোট্ট পাত্। তার মাঝখানে একটী ফুটা আছে। এমন ফুটা যে, যে-কোনো লোক অন্ততঃ একশ'টী "ক্যাস্" একটী দড়ীর সাহায্যে ঝুলিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সাধারণতঃ একটী "ক্যাসের" মূল্য হচ্ছে তিন পেন্স্।…

…থের পাশে ব'সে থাকা মুচির অগাধ চিন্তা।

মুচির কাজ।

চীনদেশে খাজনা-বৈষম্যের বিশেষ বালাই নেই। মাত্র চারটি কারণে খাজনা আদায় করা হয়:—

১ম। জমির কর।

২য়। প্রচলিত অনুষ্ঠানাদির কর।

৩য়। লবণের কর।

৪র্থ। একচেটিয়া গভর্ণমেণ্টের কর।

এ ছাড়াও সেখানে আর একটী কর আছে। বাইরে

সাঙ্গাইএর বৃদ্ধ ভদ্রলোকের পুস্তক-পাঠ

থেকে সেখানে যে-সব মাল্ আসে, তার জন্ত তার মূল্যের শতকরা দশ ভাগ কর দিতে হয়।…

কিন্তু এই খাজনা আদায় করার ব্যাপারটী হচ্ছে বেশ একটু নতুনত্ব-পূর্ণ। সাধারণতঃ সেখানে গভর্ণমেণ্ট নিয়োজিত যে-সব ব্যক্তি খাজনা আদায় করেন, তাঁরা হচ্ছেন 'অনাহারী' অর্থাৎ অনারারী চাকুরে। কাজেই, খাজনা আদায় করবার সময় করদাতাদের কাছ থেকে নিজেদের গণ্ডাটা (অবশ্য আইন বাঁচিয়ে) তাঁদের একটু পুষিয়ে নিতে হয় বৈ কি!…

চীনদেশে উচ্চপদস্থ চাকুরে এবং সঙ্গতি-সম্পন্ন ব্যক্তিরা ছাড়া আর সকলকারই আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়! সময় প'ড়লে প্রত্যেকেই দেনা করে,

এবং প্রত্যেকেই হয় মহাজন! সেখানে ঘরোয়া এই দেনার লেন্-দেনের ব্যাপারটা আরম্ভ হ'য়েছে ১৯১৪ সাল থেকে। এবং আজ পর্য্যন্তও তা বেশ ভিৎ-গাঁথা হ'য়েই র'য়েছে!...

কিন্তু সকলের চেয়ে মজার কথা হচ্ছে এই যে, যখনি কোনো চীনবাসী যে-কোন প্রকারে হোক, এক পাউণ্ড কিম্বা ওই রকম কোনো অর্থ জমাতে পারে, তখনি সে এমন একটা লোক খোঁজে, যাকে সে চড়া-সুদে তা ধার দিতে পারবে! চীনদেশে কোনো 'সেভিংস্ ব্যাঙ্ক' নেই। আর, তা থাকলেও, চীনবাসীরা তাকে বিশ্বাস ক'রতে পারতো কি না সন্দেহ!

চীনবাসীরা কোনো প্রকারেই তাদের অর্থ সঞ্চিত ক'রে রাখতে পারে না! কারণ, তা রাখবার মতো যায়গা তাদের বাড়ীতে নেই। অবশ্য এ কথার অর্থ এই নয় যে, উক্ত অর্থ নেহাৎ সঞ্চিত করবার উদ্দেশ্যে অন্ততঃ উঠানের নীচে পুঁতে ফেলবার জন্য এতটুকু মাটীও তাদের বাড়ীতে নেই! ও-কথা বলবার অর্থ হচ্চে এই যে, তারা ইচ্ছে ক'রেই অর্থ বাড়ীতে জমিয়ে রাখে না; কারণ, এই খবরটা জানতে পারলেই দলে দলে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীরা এসে উপর্য্যুপরি জিজ্ঞাসায় এবং প্রার্থনায় গৃহস্বামীকে অস্থির ক'রে তুলবে।...

চীনদেশে ঘরোয়া ঝগড়া লেগে থাকে প্রায়ই! এবং তা যেন অনেকটা খেলার প্রতিদ্বন্দ্বিতার মতো! কোনো পক্ষই এ বিষয়ে ছেড়ে কথা কয় না! কিন্তু সকলের চেয়ে মজার কথা হচ্ছে এই যে, কলহের সময়ে স্থায়ী মনোমালিন্য অথবা শান্তিভঙ্গ হবার সম্ভাবনা দেখলেই, উভয় পক্ষই পরস্পরের সঙ্গে আপোষে মিট্ ক'রে ফেলে।...

দায়িত্ব-জ্ঞান হচ্ছে চীনবাসীদের গার্হস্থ্য এবং জাতীয় জীবনের ভিত্তি-স্বরূপ! তাদের 'পিতৃপুরুষের পূজা' এবং 'সন্তানের ভক্তি'—এই দায়িত্ব জ্ঞান হ'তেই উদ্ভূত হ'য়েছে।...

সাইবিরিয়া হ'তে আনীত এই উটগুলি তাদের দীর্ঘ পথ-ক্লান্তির শেষে পিকিংয়ের ফটকে ঢোকবার সময় যেন আনন্দে ও গর্ব্বে মাথা উঁচু ক'রছে।

ধানের ক্ষেতে চাষ ক'রছে।

করাত্ দিয়ে কাঠ কাটছে।

একটি তুলার কারখানার কাজে নিযুক্ত এই বালিকাদের এই একচাকার গাড়ীর সাহায্যে তাদের কর্ম্মস্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

লেখাপড়ায় ডুবে-থাকা এই বালিকাগুলি বাস্তবিকই খুব সুখী। কিন্তু হায়, তারা মাতৃপিতৃহীনা।...

পথ ধারে নাপিতের র-কার্য্য

ইয়াং-সি-কায়াংয়ের তীরে ফেং-সিয়েন্ নামক স্থানে শ্যামল ঘাসে ভরা এবং সাদা ছাগলের সুন্দর বিহারে অতি মনোরম এবং শান্তিপূর্ণ এই সমাধি-ক্ষেত্র।...

চীনদেশের সামান্ত একটী গৃহস্থ থেকে আরম্ভ ক'রে সেখানকার সরকারী ব্যক্তিদের মধ্যেও এই দায়িত্ব-জ্ঞান আছে পুরোপুরিভাবে। প্রত্যেক সন্তান তার মৃত পিতা-মাতার দোষের জন্ম দায়ী। প্রত্যেক পিতা-মাতা তার মৃত সন্তানের দোষের জন্ম দায়ী। এবং প্রত্যেক গৃহস্থ তাদের পাড়ার চৌকিদারের দোষের জন্ম দায়ী। ও প্রত্যেক চৌকিদার তার এলাকা-ভুক্ত কোনো ব্যক্তির দোষের জন্ম দায়ী! এবং, যেহেতু এই দায়িত্ব হচ্ছে খুব কঠোর, অতএব কোনো ব্যক্তিরই এই ওজর ক'রলে চ'লবে না যে, কই, আমি ত অমুকের দোষের কথা একেবারেই জানতুম না! এবং এই না-জানার জন্মই অর্থাৎ দায়িত্ব-হীনতার অপ-রাধের জন্মই তাকে শাস্তি পেতে হবে উচিত-ভাবে!...উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক, চীনদেশের এক পল্লীতে গভীর রাত্রে একটী নির্জ্জন বাড়ীতে এক খুন হ'য়ে গেল! সেই পাড়ার চৌকিদার তখন দিব্যি আরামে (অর্থাৎ দায়িত্ব-জ্ঞানশূন্ম হ'য়ে) তার বাড়ীতে ঘুমো-চ্ছিল! ওদিকে আসল খুনী পালিয়ে গেল। কিন্তু বিচারে দায়ী করা হ'লো সেই চৌকি-দারকেই। এবং সে সাজা-ও পেলে উপযুক্ত-ভাবে!

চীনদেশের ব্যবসা এবং বাণিজ্য—উভয় দিক দিয়েই এই দায়িত্ব-জ্ঞান কথাটী সম্পূর্ণ-রূপে প্রযোজ্য!...সেখানকার প্রত্যেক ভিক্ষুক, খঞ্জ, পঙ্গু এবং অন্ধদের এক একটী দায়িত্ব-জ্ঞানপূর্ণ সর্দ্দার থাকে। প্রত্যেক গৃহস্বামী এবং দোকানদার এই সমস্ত সর্দ্দারকে রাত-দিন প্রসন্ন রাখতে চেষ্টা করে। কারণ, এই সমস্ত মূর্ত্তিমান সর্দ্দারদের দ্বারা অসাধ্য কাজ কিছুই নেই! তাদের দ্বারা আর কিছু হোক বা না হোক, লোকসান হবার ভয় আছে প্রচুর-ই!

সেখানকার "বন্ধকী-দালালদের" (Pawn brokers) একটী ক'রে 'চাই' আছে। এবং
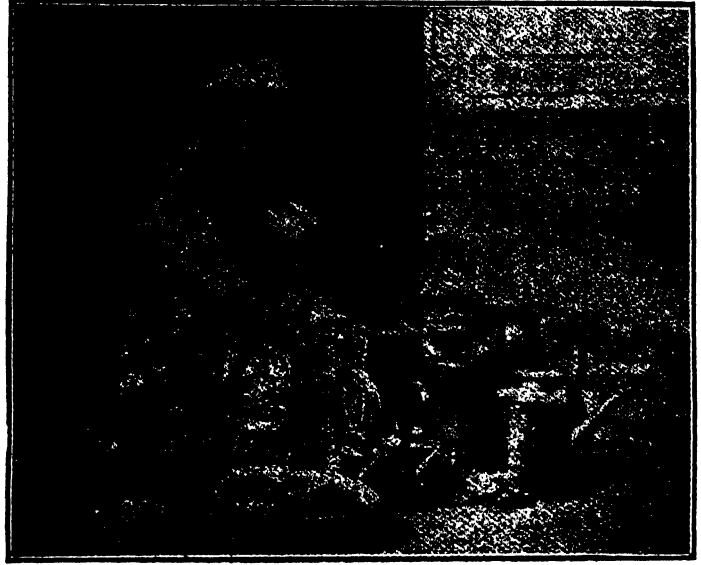
থালা ঘটি-বাটী সারানে-ওয়ালা।
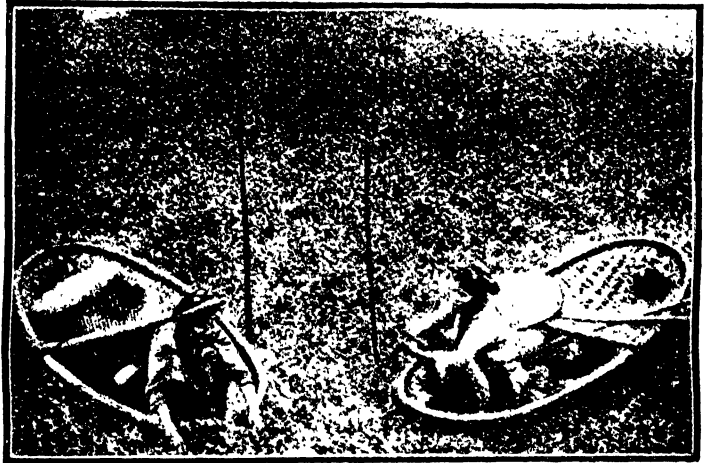
জলাভূমির উপর নৌকার সাহায্যে এক প্রকার জল-গুল্ম আহরণ ক'রছে।

প্রত্যেক কুলীর দলে থাকে একটী ক'রে দায়িত্ব-জ্ঞান-সম্পন্ন নেতা। এই নিয়ম আছে ব'লেই, যদি কোনো বিদেশী সেখানে যান এবং কতকগুলি ভৃত্য রাখতে ইচ্ছে করেন, তা হ'লে, প্রথমেই তাঁর সামনে এগিয়ে আসবে মাত্র একটা লোক। সে হচ্ছে তার দলস্থ ভৃত্যদের সর্দ্দার। সে বিদেশীর সঙ্গে

যন্ত্রের সাহায্যে ধান ভানছে।

সমস্ত কথাবার্ত্তা ক'রে যাবে, আর, তাঁর যতগুলা চাকর দরকার, এনে দেবে—সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে।

চিঠি-পত্রাদি লেখার ব্যাপার হচ্ছে সম্পূর্ণ সভ্যতার পরিচায়ক। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ৫।৬ বছর আগেও চীনদেশে এই সভ্যতার ব্যাপারটী ছিল একেবারে সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ!...

কিছু বছর আগে সেখানে রেল লাইনের প্রসার মাত্র ৭০০০ মাইল পর্য্যন্ত ছিল। এখন তার বৃদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু তাকে খুব বেশী বলা যায় না।

সেখানকার সমস্ত দেশে চিঠি-পত্রাদি পাঠাবার জন্য জাতীয় ডাকঘর তৈরী হয় ১৮৯৬ সালে। আজ সেখানকার ডাকঘরের অবস্থা অনেক উন্নত!

চীনদেশের প্রধান ব্যবসা হচ্ছে কৃষি-কাজ। পল্লীর মধ্যে এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে চাষ হচ্ছে না! আর, যেদিকেই তাকানো যাক, দেখা যাবে যে, অগণ্য কুটীর এবং গোলাবাড়ী আশে পাশে মাথা তুলে আছে।... চাষের কাজে চীনবাসীদের মাথা যেমন খেলে, অন্য কোনো কাজেই তা খেলে না। এবং একটী চীনবাসী সামান্য একটা লাঙল ও একটা কুড়ুল নিয়ে যে-রকম সুন্দর চাষ ক'রতে পারে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যেও অনেক দেশের অনেক লোক তা ক'রতে পারবে না! কিন্তু এইভাবে কাজ করবার সময় চীনবাসীরা যা পরিশ্রম করে, তাকে সামান্য বলা যায় না কখনোই!...কিন্তু এই পরিশ্রম ক'রতেই তারা ভালবাসে, এবং এইতেই তারা

রমণীর ভূমিকায় চীন-অভিনেতা। চীন-রঙ্গালয়ের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, সেখানকার সমস্ত রমণীর ভূমিকাই পুরুষদের দ্বারা অভিনীত হয়।

আনন্দ পায় প্রচুর!...যদি কোনো কর্ম্মরত চাষাকে ধান কিম্বা মটর ক্ষেত থেকে এনে, নাম-না-জানা কোনো সুন্দর ফুলের বাগানে ছেড়ে দেওয়া হয়, তা হ'লে প্রথমটা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে সে ফুলগুলার দিকে তাকিয়ে থাকবে!

কিন্তু একটু পরে সেই ফুলের বাগান আর তার ভাল লাগবে না, এবং সে তার সেই পুরোনো ক্ষেতেই ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হবে!

প্রত্যেক চীনবাসীই কাজ ক'রতে ভারী ভালবাসে। মাঠের কাজে তাদের কোনো প্রয়োজন না হ'লে, তারা কেউ সমুদ্রের উপর ব্যবসার জন্য মাছ ধ'রতে যায়। কেউ বা "ডকে"র মুটে হয়। কেউ বা পার্ব্বত্য-পথযাত্রীদের 'গাইড্' হয়। আবার কেউ বা সহরে অথবা পল্লীতে কুলীর কাজ করে!...

পুরুষদের মতো সেখানকার মেয়েরাও অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রতে পারে। ধানের ক্ষেতে, কি মটর ক্ষেতে,—সর্ব্বত্রই—মাত্র দুমুঠো অন্নের জন্য সেই সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কি কষ্টটাই না তারা সহ্য করে! অদৃষ্টের পরিহাস একেই বলে না কি?

দুর্ঘটনা

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

কলিকাতার দক্ষিণাংশের যে সুপ্রশস্ত রাজপথটি দক্ষিণের দিকে চলিয়া গিয়াছে, সহরের প্রায় সীমান্তে, সেই রাস্তার উপরে একখানি সুদৃশ্য বাঙলো ছিল। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন—ছিল; আজও আছে কি না তা আমি জানি না—থাকিতেও পারে; না থাকিতেও পারে।

বাড়ীটির হাতার ভিতরে সুন্দর একটি ফুলের বাগান। গড়িয়াহাটার পথে যিনিই যখন গিয়াছেন তখন এই বাড়ীখানির ও তৎসংলগ্ন পুষ্পোদ্যানটির শোভা ও সৌন্দর্য্যের প্রশংসাই করিয়াছেন।

যে সময়ে আমার আখ্যায়িকা আরম্ভ, তখন শীতান্তে বসন্ত সূচিত হইতেছে। বাগানটিতে অজস্র ডালিয়া ফুটিয়া আছে, কোনটি লাল, কোনটি গোলাপী, কোনটি পীত, কোনটী নীল। সমতলভূমিতে ডালিয়া যে এত বড় হইতে পারে, এই বাগানে দেখিবার পূর্ব্বে তাহা আমার জানা ছিল না।

এই পথে মোটরে বেড়াইতে যাইবার সময়ে নলিনী সতৃষ্ণ-নয়নে বাগানটির পানে চাহিয়া চাহিয়া চলিয়া যাইত। জানি না-কেন, ডালিয়া নামটির জন্য অথবা তাহার সৌন্দর্য্যেরই জন্য, নলিনী ফুলের মধ্যে ডালিয়াকেই বেশী ভালবাসিত। শৈশব, বাল্য, কৈশোর সে সিমলা-শৈলে অতিবাহন করিয়াছে। পার্বত্য-প্রদেশের ডালিয়ার সৌন্দর্য্য যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, সে রূপ ভুলিবার নহে। সমতল ভূমিতে সে ডালিয়া জন্মে না—নলিনী অনেক বাড়ীতে, অনেক বাগানেই অনেক ডালিয়া দেখিয়াছে, কোনটিই তাহার চোখে ধরে নাই। এই বাগানখানিতে ডালিয়া দেখিয়া শুধু মুগ্ধ হইল যে তা নয়—তার সেই সুমধুর কৈশোর-স্মৃতি জাগিয়া মনের মধ্যে মধুরতার সৃষ্টি করিতে লাগিল।

নিত্য আসে, নিত্য দেখে, নিত্য চলিয়া যায়। একদিন দেখিল, প্রকাণ্ড ফটকটি খোলা রহিয়াছে, একটা মালী পিতলের ঝারি লইয়া বৃক্ষমূলে জল সেচন করিতেছে। নলিনী মোটর থামাইল। উড়ে মালীটা তাহার দিকে চাহিতেই চক্ষুরেঙ্গিতে তাহাকে ডাকিয়া বলিল—মালী, দু'টো বড় ডালিয়া দেবে আমাকে?—মালী ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া পার্শ্বরক্ষিত ব্যাগটি খুলিয়া একটি টাকা বাহির করিয়া বলিল—দেবে?

মালী এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল ও নিঃশব্দে কয়েকটি ডালিয়া আনিয়া তাহার হাতে দিল। বলা বাহুল্য নলিনীর হাতের গোলাকার দ্রব্যটি অদৃশ্য হইতে বিলম্ব হইল না।

অল্প কয়েকদিনের ভিতরে এমনই হইয়া দাঁড়াইল যে মালী শত কর্ম ফেলিয়া একটি সময়ে একগোছা সদ্যআহরিত ফুল লইয়া ফটকের সামনে দাঁড়াইয়া থাকিত এবং মোটরটি থামিবামাত্র এক গাল হাসিয়া, বারবার 'অবধাঁঢ়' হইয়া হইয়া গুচ্ছটি নলিনীর হাতে তুলিয়া দিবার জন্য ছটফট করিত। সে মাসের শেষে দেশে টাকা পাঠাইবার সময়ে মালী-পুঙ্গব আটাশটি টাকা বেশী পাঠাইতে পারিয়াছিল—

সে-মাসটা ছিল ফেব্রুয়ারী এবং আটাশটিই ছিল তার দিন।

নলিনী রোজই দেখিত, বাংলোর কাশ্মীরি বারান্দার প্রান্তে একখানি ইজিচেয়ারে একটি ইংরাজপুরুষ শুইয়া থাকেন। এতদিন আসিয়াছে, মোটর থামাইয়াছে, ফুল লইয়াছে, সেদিকেও চাহিতে হইয়াছে, প্রতিদিনই দেখিয়াছে, পুরুষটি ঠিক একইভাবে শুইয়া, একদিকেই চাহিয়া থাকেন; ইহার ব্যতিক্রম কখনও হয় নাই। লোকটি কে, গৃহস্বামী কি-না, রুগ্ন, অথর্ব অথবা কি, তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল যে হইত না, তাহা নহে; কিন্তু সে-ভাব সে দমনই করিত। একদিন কিন্তু পারিল না। সাহেব তাহার চিরদিনের আসনটিতে ছিল না, সেইদিন মালীকে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া জানিয়া লইল, সাহেবের নাম নাইট, সে অকৃতদার। সাহেবের খুড়া মস্ত বড় লোক ছিল, মরিবার সময়ে এই ভাইপোকে অনেক টাকা দিয়া গিয়াছে, সাহেব এই বাড়ীটি করিয়া একলাই এখানে বাস করে। একটি সমবয়স্ক পুরুষ-বন্ধু ছাড়া সাহেবের আর কেহ নাই. সাহেব মদ খায় না, কাহারো সঙ্গে মেশে না, কোথাও যায় না। আজ রবিবার, তাই সকাল-সকাল সেই বন্ধু আসিয়াছে, ঘরে বসিয়া দু'জনে গল্প করিতেছে।

নলিনী গাড়ীতেই বসিয়া ছিল, কি-যেন কি মনে হইল, দ্বার খুলিয়া নামিয়া পড়িল। ফটকের কাছে আসিয়া একবার বাগানটি, একবার সুসজ্জিত বাঙলোখানি দেখিয়া লইয়া আবার গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। ঠিক এই সময়ে দুই বন্ধু কথা কহিতে কহিতে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল; তাহাকেও দেখিল, বোধ করি তাহারই সম্বন্ধে দুইচারিটা কথাও হইল। নলিনী গাড়ী চালাইয়া দিল। মালী এই সময়টায় রোজই হাত যোড় করিয়া, হাত কচলাইয়া, মাথা নাড়িয়া কত সাধুবাদ করিত, শুনিতে সে-সব কি ভালই লাগিত; কিন্তু আজ কোন কথাই কাণে গেল না। ঐ দুই বিদেশী তাহার সম্বন্ধে না-জানি-কি আলোচনা করিয়াছে, হয়ত এখনও করিতেছে মনে হইতে কাণ হইতে মাথা পর্য্যন্ত ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল।

ডালিয়া যে আর কোথাও মিলে না, যে মূল্যে পুষ্পস্তবক সে গ্রহণ করে, বাজারদরের চেয়ে তাহা যে খুবই সুলভ, তাহা নহে; তবু যে রোজ আসিত, একটি মুদ্রার বিনিময়ে ক্ষুদ্র তোড়াটি লইয়া যাইত, পুষ্পের মনোহারিত্ব তাহার একমাত্র কারণ নহে। মালী যে জয়ধ্বনি করিত, আশীর্বচন উচ্চারণ করিত, নলিনীর কাণে প্রাণে সে যে কি ঝঙ্কার তুলিত, তাহা সেই জানে! ধনীর দুলালী, রূপযৌবন-শালিনী, ইচ্ছায় হৌক, অনিচ্ছায় হৌক, পুরুষের প্রশংসমান দৃষ্টি ও মনোযোগ সর্বদাই প্রাপ্ত হইতে হয়; কিন্তু এই ভাষা-জ্ঞানহীন অনক্ষর উড়িয়ার মুখের আত্মপ্রশংসাটুকু ও কৃতজ্ঞতায় ভরা দৃষ্টিটুকুর মধ্যে কি-ছিল, জানি না, লোভ সে কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিত না। তাই আর আসিবে না সঙ্কল্প করিয়া পরদিন বাড়ীর বাহির হইলেও, গড়িয়াহাটার পথে চলিবার সময় সোফেয়ার যখন পরিচিত গৃহখানির সম্মুখে আচম্বিতে গাড়ী থামাইয়া বামহস্তে দ্বার খুলিয়া দিল, তখন সঙ্কল্প ভুলিয়া গিয়াই নলিনী নামিয়া পড়িল। কিন্তু আজ আর মালী ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল না; একেবারে সামনে আসিয়া পড়িতে দেখিল, তৎপরিবর্তে ঠিক তেমনই একটি তোড়া হাতে লইয়া সেই ইংরাজপুরুষটি দাঁড়াইয়া আছেন—যাঁহাকে দিনের পর দিন সে ঐ কোণায় আরাম কেদারায় শুইয়া থাকিতেই দেখিয়াছে! সাহেব দুই পা অগ্রসর হইয়া 'সু-সন্ধ্যা' জ্ঞাপন করিয়া হাসিমুখে কহিল—আমার মালীটা বিশেষ কাজে বাইরে গেছে, আপনি যে ডালিয়ার ভক্ত তা আমি তার কাছেই শুনেছি! নিত্যকার তোড়া প্রস্তুত, লইতে দ্বিধা করবার কোনই কারণ নাই।—বলিয়া সসম্ভ্রমে ঈষৎ নতমস্তকে তোড়াটি বাড়াইয়া ধরিল।

ধন্যবাদ।—বলিয়া নলিনী ফুল গ্রহণ করিল।

সাহেব বলিল—এ বাগানে অনেক ফুল সারা বছরই ফোটে, আমার কাছে এতদিন তার কোন সার্থকতা ছিল না, আজ··

কথাটা বলিতে সাহেব ইতস্ততঃ করিল; কিন্তু নলিনী তাহার বক্তব্য বুঝিয়া আগে-ভাগেই বলিয়া উঠিল—আপনি ফুল পছন্দ করেন না?

সাহেব দ্বিধাযুক্ত স্বরে বলিল—এখন পছন্দ করি। যদি কিছু না মনে করেন, বাগানটি আসিয়া দেখুন না একবার!

বোধ হয় ভদ্রতা রক্ষার জন্য এ-অনুরোধের পরে, নলিনী ভিতরে না আসিয়া পারিল না। সাহেব বেহারাকে ডাকিয়া কহিল—মেম্-সাব্ বাগিচা ঘুমেঙ্গে।—বেহারা 'মেম সাহেবে'র উদ্দেশে একটি দীর্ঘ সেলাম করিয়া পথ দেখাইয়া সাহেবের

পাশে পাশে চলিতে লাগিল। লালকঙ্করাস্তৃত পথে বেড়াইয়া বেড়াইয়া সাহেব নলিনীকে বাগানটি দেখাইল। বেড়ান শেষ করিয়া একটি বেঞ্চের ধারে আসিয়া সাহেব দাঁড়াইয়া ভেষ্ট-পকেট হইতে একখানি কার্ড বাহির করিয়া নলিনীর হাতে দিয়া বলিল—আপনি ফুল ভালবাসেন, যখন ইচ্ছা যত ইচ্ছা ফুল লইয়া যাইবেন তাহাতে আমি খুসীই হইব। কিছুমাত্র কুণ্ঠার কারণ নাই।

নলিনী ক্রমেই সাহস সঞ্চয় করিতেছিল, কার্ডখানি নাড়িতে নাড়িতে বলিল—মিষ্টার নাইট; আপনার বাড়ীতে আপনি একলা থাকেন?

নাইট হাসিল, বলিল—yes, মিস্...

নলিনী বলিল—আমার নাম মিস্ সেন।

বয় আসিয়া কহিল—হুজুর, চা...

নাইট বলিল—মিস্ সেন, আমি জানি না, ভদ্রতা হইবে কি-না অনুরোধ করা, কিন্তু আপনি যদি একটু চা খান, আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইব। আমাকে আপনি আপনাদের একজনই মনে করিবেন, আমিও বাঙ্গালী!

তা ছাড়া আর কি বলুন? আমার ঠাকুর্দা বিলাতী ছিলেন বটে, কিন্তু আমার বাবা এই বাঙ্গালাদেশে জন্মিয়াছিলেন, আমিও এই বাঙ্গালাদেশে জন্মিয়াছি, আমার মা'ও ছিলেন, এই বাঙ্গলাদেশেরই একটি মেয়ে—কাজেই আমি বাঙ্গালী ছাড়া আর কি বলুন?

একটু থামিয়া আবার ধীর কণ্ঠে বলিল—অনুমতি করেন ত, এই বাগানেই চা আনিতে বলি?

এত কোমল, এত করুণ সে আবেদন, নলিনী 'না' করিতে পারিল না। বয় চলিয়া গেল, এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যেই টেবিল, চায়ের সরঞ্জাম আনিয়া সেখানে সাজাইয়া দিল। বয়ই চা প্রস্তুত করিতে উদ্যত হইয়াছিল, নলিনী বলিল—তুমি সরো, আমি করিতেছি।

কথাবার্ত্তা আর বিশেষ কিছুই হইল না; নলিনী চা প্রস্তুত করিয়া নাইট্‌কে দিল; নিজেও খাইল, তার পর বিদায় লইল। নাইট পূর্ব্ববৎ ধীর, মধুর ও করুণ স্বরে বলিল—কাল এই সময়ে আবার দেখা পাইব ত?

নলিনী বলিল—আসিব।

ফটকের কাছে আসিয়া, বিদায়ের সময় নাইট বলিল—আপনার জন্য তোড়া প্রস্তুত থাকিবে মিস্ সেন। দেখিতেছেন ত, বাগানের ডালিয়া দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। কেন বাড়িতেছে, জানেন মিস্ সেন? আপনাকে আনন্দ দিবার জন্যই গাছ যেন তাহার শক্তি উজাড় করিয়া ফুল সৃষ্টি করিতেছে!

সারাটা পথ নলিনী এই কথা কয়টি ভাবিতে ভাবিতে চলিল—ভাষায় ত নয়ই, ভাবেও নাইট এতটুকু অসম্মানও তাহার করে নাই। অধিকন্তু একটিবারও সে সাধারণ পুরুষদের মত অভদ্রভাবে হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহে নাই এবং তাহার দৃষ্টি অথবা মনোযোগ আকর্ষণ করিবার এতটুকু চেষ্টাও করে নাই। কোন পুরুষের এ পরিচয় সে এ পর্য্যন্ত পায় নাই। এ পরিচয় যেমন অভিনব, তেমনই আনন্দদায়ক। উদার এবং উদার বলিয়াই অধিকতর চিত্তাকর্ষক।

এক সপ্তাহ পরের কথা।

নাইট জিজ্ঞাসিল—তোমাকে মিস্ সেন না বলিয়া লিলি বলি যদি তুমি কি আমাকে ক্ষমা করিবে না?

নলিনী হাসিয়া বলিল—তাহাতে তোমার কোন অপরাধ হইবে না, কাজেই ক্ষমা করিবার দরকারও হইবে না। কিন্তু লিলি কেন? আমার নাম ত তোমাকে বলিয়াছি!

হ্যাঁ, নলিনী, সে'ও ত পদ্মের নাম! পদ্মকে আমরা লিলি বলি। 'নলিনী' কথাটি মিষ্ট কি-না তুমি বলিতে পার, বাঙ্গালাভাষা আমি জানি না; কিন্তু 'লিলি' বড় মিষ্ট! যেমন সুন্দর তুমি, তেমনি মিষ্ট হইবে তোমার নামটি; কিন্তু তোমার আপত্তি নাই ত?

না, আপত্তি কিসের?

নাইট বলিল—লিলি, চা দিতে বলি?

বল! আমি বাড়ীতে আজ চা খাই নাই।

কেন?

নলিনী মাথা নীচু করিয়া কহিল—তোমার এখানে খাইব বলিয়া!

নাইটের মুখখানি প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; প্রফুল্লকণ্ঠে কহিল—লিলি, কি বলিয়া আমি আমার অন্তরের আনন্দ জ্ঞাপন করিব, তাহা আমি বুঝিতেছি না!

নলিনী নতনেত্রে চা প্রস্তুত করিতে লাগিল।

লিলি, তুমি এখান হইতে প্রত্যহ এইদিকে কোথায়

যাও বল ত? তোমার কোন আত্মীয়ের বাড়ী আছে বুঝি?

না, আমি তোমাদের স্বপন-সায়রে গিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকি!

স্বপন-সায়র কি, লিলি?

তোমাদের লেকের নাম আমি স্বপন-সায়র দিয়াছি, তা বুঝি জান না মিষ্টার···

লিলি, তুমি আমাকে রবার্ট বলিয়া ডাকিও। রবার্ট নাইট্। ভাল কথা, লেক্ কি খুব সুন্দর, লিলি?

সে কি মিষ্টার রবার্ট,—তুমি লেক্ দেখ নাই?

রবার্ট ম্লান কণ্ঠে কহিল—না, লিলি! আমাকে তুমি দেখাইবে?

নলিনী ঝোঁকের মাথায় বলিল কেন দেখাইব না? চল, আজ আমার সঙ্গে?—পরমুহূর্ত্তেই কি-যেন-কি ভাবিল, বলিল—কিন্তু কেন দেখ নাই, তোমার বাড়ীর ত খুবই কাছে রবার্ট!

রবার্ট হতাশ কণ্ঠে কহিল—কেন দেখি নাই লিলি! সে কথা তোমাকে আর একদিন বলিব। কিন্তু আমার সঙ্গে যাইতে তোমার কোন আপত্তি নাই ত লিলি? কেহ দেখিলে তোমার নিন্দা হইবে না ত?

নলিনী এ কথাটা আগে ভাবে নাই! কিন্তু প্রস্তাবটা এতদূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে যে এখন সে কথার আলোচনা বৃথা ও অভদ্রতা। বলিল—নিন্দা কিসের? রবার্ট, তুমি জান, আমি—আমরা পর্দানশীনা নহি।

কিন্তু তোমাদের সমাজে···

আমাদের কোন সমাজ নাই রবার্ট, আমরা কাহারও সহিত মিশি না। আমি আর মা দু'জনে 'একলাই' থাকি সংসারে।

তোমার বাবা?

নলিনী গদ্গদকণ্ঠে কহিল—শৈশবেই আমি পিতৃহীন, রবার্ট। এক মা ছাড়া সংসারে আমার কেহ নাই। বাবা হিন্দু হইয়াও ক্রীশ্চান বিবাহ করিয়াছিলেন, সকলেই আমাদিগকে তাই ত্যাগ করিয়াছে রবার্ট।

তবে তোমাকে আমার স্বধর্মী বলিয়া মনে করিতে পারি কি লিলি?

না। বাবা হিন্দু ছিলেন বলিয়া মা নিজেকে হিন্দু বলিয়া থাকেন; আমিও আমাকে হিন্দু-কন্যা বলিয়া মনে করি।···চল রবার্ট, সন্ধ্যা হইয়া আসিল।

লেকের তীরে মোটর হইতে নামিয়া নলিনী বলিল—দেখছ রবার্ট, কি সুন্দর! ইলেকট্রিক আলোর মালা পরিয়া ধীর-সমীরে আমার স্বপন-সায়র কেমন নাচিতেছে, দেখ! দেখ দেখ, জলে দ্বীপের গাছপালার ছায়া পড়িয়া এই থানটা কি চমৎকার দেখাইতেছে!

নাইট্ নীরব।

নলিনী বলিল—চল রবার্ট, ঐ দিকে যাই, ওদিকটা আরও সুন্দর!

নাইট্ মৃদুকণ্ঠে কহিল—কোন্ দিকে লিলি?

ঐ দিকে, যেদিকে মসজিদ আছে।

লিলি, তুমি আমার হাত ধরিয়া লইয়া যাইতে পারিবে কি? নহিলে আমি ত যাইতে পারিব না।

নলিনীর ওষ্ঠাগ্রে প্রশ্ন জাগিয়াছিল, কেন রবার্ট? বোধ করি তাহা বুঝিতে পারিয়াই রবার্ট নাইট্ কহিল—দোষ আছে লিলি?

না, দোষ কি! এস।·· দেখ রবার্ট, কি সুন্দর! এত সৌন্দর্য্য আমি আর দেখি নাই।—বলিয়া নলিনী তাহার হাত ধরিল। কি কোমল সে স্পর্শ। নাইট্ মুহূর্ত্তের জন্য কাঁপিয়া উঠিল, তারপর নিঃশব্দে চলিল।

মসজিদের সামনে বেঞ্চে বসিয়া নলিনী বলিল—রবার্ট, মসজিদের ছায়াটি জলে কি সুন্দর দেখাইতেছে দেখিতেছ?

রবার্ট বলিল—না। আমি শুধু তোমাকেই দেখিতেছি, লিলি!

নলিনী হাসিয়া বলিল, ভুল করিতেছ রবার্ট! চাহিয়া দেখ, জলে তারার ছবি দেখ, আলোর ছবি দেখ, গাছের ছায়া দেখ, ছোট চাঁদখানি জলের ভিতর হইতে পদ্মের মত মুখখানি বাহির করিয়া উঁকি মারিতেছে দেখ!

নাইট্ জিজ্ঞাসিল—কে উঁকি মারিতেছে বলিলে?

চাঁদ! আজিকার চাঁদ খুব ছোট।

ছোট হইয়া গিয়াছে, লিলি!

কেন?

তোমার সামনে বলিয়া!

নলিনী কৃত্রিম কোপভরে কহিল—যাও, তুমি বড্ড বেরসিক! সৌন্দর্য্য দেখিতে জান না।

রবার্ট ম্লান কণ্ঠে কহিল—আমি যে দেখিতে পাই না, লিলি! আমি যে অন্ধ!

নলিনী লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—অন্ধ!

রবার্ট বলিল—ইয়োরোপের মহাযুদ্ধের এই উপহার লইয়াই আমাকে ফিরিতে হইয়াছে লিলি!

ইলেকট্রিকের তীব্র আলো আসিয়া রবার্টের মুখখানির উপরে পড়িয়াছিল, নলিনী সেই সুকুমার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। সাধারণ মানুষের মতই চোখ দুটি বটে; কিন্তু আজ সে দুটি চোখে-চোখে বুকে-বুকে দেখিতে দেখিতে নলিনী দেখিতে পাইল, তারা দুইটি যেন আভাহীন, দীপ্তি-হীন, দৃষ্টিহীন!

নলিনীর হৃদয়খানি যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। মনে পড়িল, প্রথম পরিচয়ের দিনেই রবার্ট বলিয়াছিল, এ বাগানে এত যে ফুল ফোটে, তাহার কাছে কোন দামই তাহার নাই।

রবার্ট বলিল—কিন্তু তার জন্য দুঃখ করি না লিলি। কোন দিন করি নাই, আজও করি না, কেবল এই দুঃখ তোমায় আমি দেখিতে পাইতেছি না। এত কোমল তোমার করস্পর্শ, এত করুণ তোমার কণ্ঠস্বর, এত মধুর তোমার ব্যবহার, না জানি তুমি কত কোমল, কত সুন্দর, কত মধুর। অন্ধ আমি, তোমাকে আমি দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু ··

নলিনী-দলের অভ্যন্তরে যেন ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছিল; যেন কিসের একটা ক্ষুধা তীব্র হইয়া উঠিতেছিল; বলিল—থামিলে কেন রবার্ট?

বলিব? লিলি, যদি তুমি অভয় দাও, বিরক্ত হইবে না।

বিরক্ত হইব কেন, রবার্ট, তুমি বল!

লিলি, আমার দৃষ্টিহীন এই চোখে আমি যে তোমাকে কি সুন্দর দেখিতেছি, তাহা তোমাকে আমি কেমন করিয়া বুঝাইব!

নলিনীর বামহাতখানি রবার্টের দুই করপুটের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল; কখন যে সেহাতখানি তাহার অজ্ঞাতেই টানিয়া লইয়াছে, তাহার কঠিন করতলে চাপিয়া ধরিয়াছে, কখন্ যে রবার্টের চোখের জল পড়িয়া পড়িয়া সেই হাতখানি ভিজিয়া গিয়াছে, নলিনী তাহা জানিতে পারে নাই। এক-সময়ে, সেদিকে চোখ পড়িতেই রবার্টের মুখের পানে চাহিয়া দেখিল, দুইটি ধারা নিঃশব্দে গণ্ড বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

বুকের ব্লাউজের ভিতর হইতে রুমাল বাহির করিয়া নলিনী সেখানি রবার্টের হাতে দিয়া বলিল—মুখখানি মুছিয়া ফেল রবার্ট।

রবার্ট বলিল—অন্ধের চোখের জলের জন্য ভাবিও না, লিলি, চিরদিন আপনি ঝরে, আপনি শুকায়, আজও আপনি শুকাইবে, থাক্!

না, না, মুছ—বলিতে বলিতে সে নিজেই রুমাল দিয়া মুখ মুছাইয়া দিল। দিতে দিতে, নলিনী সেই নীলাভ নয়ন দুটির পানে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, এ কি অদ্ভুত বিস্ময়! কে বলিবে, ঐ দুটি চক্ষুতে দৃষ্টি নাই? কে বুঝিবে, রবার্ট অন্ধ!

রবার্ট জিজ্ঞাসিল—লিলি, কাছে কি লোক আছে?

কাছে নাই, রবার্ট, তবে উহারা হাঁ করিয়া এইদিকেই চাহিয়া আছে।

রাতও হইল, চল, লিলি, বাড়ী যাই।

নলিনীর কেন-জানি-না উঠিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। কিন্তু দূরের ঐ লোকগুলা যে-ভাবে তাহাদের গো-গ্রাসে ভক্ষণ করিতেছে, তাহাতে একদণ্ড বসিতেও ভাল লাগে না; বলিল—চল।

চলিতে চলিতে নলিনী বলিল—ঐখানে ইংরাজ পুরুষ ও নারীদের একটি ক্লাব আছে, শুনিতেছ ত, পিয়ানো বাজিতেছে, হয়ত তোমার কত চেনা লোক আছে, চল, সেইদিক দিয়া যাই।

রবার্ট বলিল—যাইতে চাও, চল; কিন্তু আমার চেনা লোক কেহ নাই, কাহাকেও চাহিও না আমি। এইটুকু পথ আমি তোমার সঙ্গেই যাইতে চাহি লিলি।

লেকের আলোকিত তটবেষ্টন করিয়া যে পথটি চলিয়া গেছে, তাহারই ধারে ধারে বেঞ্চে কত নর-নারী বসিয়া বিশ্রাম্ভালাপ করিতেছে—বাঙ্গালী আছে, ইংরাজ আছে, পাকড়ী-পরা মাকড়ী-কাণে মাড়োয়াড়ীও আছে। নিঃশব্দে পথটুকু অতিক্রম করিয়া মোটরের কাছে আসিতেই সোফেয়ার

সামনের দ্বার খুলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। ফিরিবার পথে নলিনী নিজেই ড্রাইভ করে। আজও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। নিজে গাড়ীতে উঠিয়া হাত ধরিয়া রবার্টকে তুলিয়া লইয়া ষ্টিয়ারিং ধরিতেই রবার্ট বলিল—লিলি, আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি।

নলিনী বলিল—কি-রকম ?

তোমার ফুলের মত হাত দু'খানি ষ্টিয়ারিং ধরিয়াছে, না ?

হ্যাঁ! আমিই চালাইব, রবার্ট।

'নাইট্-কোটে'র সামনে গাড়ী থামিল। ওদিক দিয়া নামিয়া আসিয়া, নলিনী রবার্টকে হাত ধরিয়া নামাইয়া সঙ্গে করিয়া বারান্দায় বসাইয়া, বলিল—শুভ-রাত্রি রবার্ট।

শুভ-রাত্রি লিলি!

নলিনী সিঁড়ি বাহিয়া নামিতেছে, রবার্ট ডাকিল, লিলি!

কি রবার্ট ?

কাল দেখা পাইব ?

কবে না আমি আসি রবার্ট ?

কাল আসিবে ?

এ কথা কেন ?

অন্ধ বলিয়া ঘৃণা করিবে না ?

ছি! রবার্ট! ওকথা কি বলিতে আছে ?

শুনিতে শুনিতে রবার্ট দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাত বাড়াইয়া নলিনীর একখানি হাত ধরিয়া প্রায় মুখের কাছেই তুলিয়াছিল, তখনই ছাড়িয়া দিয়া বলিল—শুভরাত্রি, লিলি শুভরাত্রি!

নলিনীর পিতা ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টে বড় চাকরী করিতেন, তাঁহাকে দিল্লী-সিমলা করিয়া বেড়াইতে হইত। তখন হইতে সেই দিকে নলিনীদের হিতৈষী বন্ধু-বান্ধব দুই চারিজন ছিলেন। তাঁহাদেরই একজন চিঠিপত্র লিখিয়া খোঁজ খবর লইতেন। সম্প্রতি তাঁহার চিঠি আসিয়াছে, তিনি তাঁহার বন্ধুকন্যা-সহ মিসেস সেনকে সিমলায় আসিতে বলিয়াছেন। কিসের জন্য এই আহ্বান, পত্রে তাহা স্পষ্ট লিখিত না থাকিলেও মাতা ও দুহিতা, কাহারই তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। মাতা যে স্বর্গগত স্বামীর এই বিশিষ্ট বন্ধুটির সঙ্গে সে বিষয়টার আলোচনা অনেকদিন হইতেই করিতেছেন, কলেজের বোর্ডিং হইতে ছুটীর সময়ে বাড়ী আসিয়া নলিনী সে খবর পাইত। বন্ধু লিখিয়াছেন, আমি আপনাদের জন্য ছোটখাট বাড়ী একটি খুঁজিতেছি। পাওয়া গেলেই টেলিগ্রাফ করিব, আপনারা চলিয়া আসিবেন। সংবাদ সুরুচিকর, তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু খবরটা নলিনীর একেবারেই ভাল লাগিল না। সেই একটা উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়া থাকা যেন কেমন-কেমন মনে হইতে লাগিল। মিষ্টার আয়ার বিলাত হইতে আসিয়া নূতন চাকরীতে ঢুকিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ছুটি পাওয়া সম্ভব নহে, ইহা পিতৃবন্ধু পূর্ব্বেই জানাইয়াছিলেন; কাজেই আয়ার-পক্ষী শিকারের জন্য ইহাদিগকেই ফাঁদ, জাল প্রভৃতি লইয়া সেখানেই যাইতে হইবে, ইহা যেন অত্যন্ত অরুচিকর বলিয়াই নলিনীর মনে হইল। কিন্তু উপায় নাই, মাতা টেলিগ্রামখানি পাইবার অপেক্ষায় আছেন মাত্র।

আকাশে আজ মেঘ করিয়াছিল, দুপুরবেলা একটু বর্ষণও হইয়াছে, নলিনীর মনখানিও আকাশের মতই আজ মেঘে ভরা। বাহির হইবার ইচ্ছাও আজ ছিল না; কিন্তু অপরাহ্ন বেলায় গ্যারেজের পানে চক্ষু পড়িতেই নলিনী আর পারিল না—সোফেয়ারকে গাড়ী আনিতে বলিল। মাতা বলিলেন—মেঘ করে রয়েছে যে নলিনী!

তা হোক্, বৃষ্টি হ'বে না মা!

কিন্তু বেশী দেরী করিস্ নে।

নলিনী কোন কথা না বলিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

রবার্ট তাহার হাত ধরিয়া কাশ্মীরি বারান্দায় চেয়ারে বসাইতেই, নলিনী বলিল—রবার্ট, আমি ত চলিলাম।

কোথায় লিলি ?

সিমলা।

সেখানে কেন ?

নলিনী উত্তর দিল না; নত-নয়নে টেবিল-ক্লথটির কারুকার্য্য দেখিতে লাগিল। রবার্ট জিজ্ঞাসিল—সিমলায় কেন লিলি ? ওঃ, বুঝেছি! কবে যাবে ?

শীঘ্র!

রবার্ট তাহার দৃষ্টিহীন দৃষ্টি মেলিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল; তারপর দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—ভগবান তোমাদের সুখী করুন, লিলি। তুমি সুখী হও, লিলি তুমি সুখী হও।

দীর্ঘ ঋজু দেহখানি যেন কাঁপিতেছিল। যে চক্ষে দৃষ্টি

নাই, কটাক্ষ নাই—সে দৃষ্টিও যেন দুঃখে ম্লান হইয়া পড়িতেছিল।

নলিনী তাহার হাতটি ধরিয়া বলিল—বস, রবার্ট।

রবার্ট বসিয়া বলিল—এ আমার অন্তরের কামনা লিলি, তিনি তোমাকে সুখী করিবেন। আর না করিবেন বা কেন? এমন সুন্দর, এমন মধুর, এমন দয়ার আধার করিয়া তিনি যাহাকে গড়িয়াছেন, তাহাকে সুখী তিনি করিবেনই, লিলি, নিশ্চয় করিবেন।

কিন্তু রবার্ট, আমার যাইতে ইচ্ছা নাই।

রবার্ট চমকিয়া উঠিল; বলিল—কেন?

ভাল লাগে না। কিন্তু আমি ত স্বাধীন নই। আমি যদি স্বাধীন হইতাম, দেখিতে।—একটু থামিয়া আবার বলিল—আমার মা'র ইচ্ছাতেই আমায় চলিতে হয়, রবার্ট!

সুখী হও, লিলি, সুখী হও। কিন্তু—কিন্তু তোমার এই কাণা-বন্ধুকে তুমি ভুলিয়ো না। যখনই এদেশে আসিবে, যদি বাঁচিয়া থাকি, একবার করিয়া এই অন্ধকে দেখিয়া যাইয়ো লিলি, তোমার কাছে আমার এই শেষ মিনতি রহিল।—কথাগুলা বলিতে বলিতে রবার্টের মাথাটা কোলের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল; সে যেন চোখের জল গোপন করিবারই চেষ্টা করিতেছিল।

কিন্তু একজনের চোখের জলের কল্পনাতেও আরেক-জনের চোখে যে জল আসিয়া পড়ে, পড়িতেও পারে, সংসারে সে ইতিহাস নূতন নহে। নলিনী তাহার হাতখানি হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া চাপিতে চাপিতে বলিয়া ফেলিল—কিন্তু রবার্ট, আমি যাইতে চাহি না, যাইতে আমার ভাল লাগে না। যে দেশে আমি জন্মিয়াছি, যে দেশে আমার প্রিয়জনদের বসতি, সে দেশে ভগবান আমার জন্য এতটুকু স্থান কেন রাখিলেন না, তাই শুধু আমি ভাবি!

বয় আসিয়া টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম সাজাইয়া দিয়া গেল; সে দিকে কাহারও লক্ষ্য ছিল না। নলিনী বলিতে লাগিল—রবার্ট, তুমি আমাকে সুখী হইবার আশীর্বাদ করিয়াছ, তুমি জান না, সুখ আমার ভাগ্যে আর নাই! আমার সুখের আরম্ভ ও শেষ এইখানেই!

অন্ধ দেখিল না, অন্ধ বুঝিল না, অন্ধ অনুমান করিতেও পারিল না কি ঝড়, কি ভীষণ বাত্যা বহিয়া যাইতেছিল, সেই দুইটি নয়ন কোণে, সেই সুগৌর তরুণ আননে! সে আপনার মনে ভাব গদ্গদ কণ্ঠে কহিল—না, বন্ধু না, তুমি সুখী হইবে। এত সুন্দরী তুমি, এত গুণবতী তুমি, ভগবান তোমাকে নিশ্চয়ই সুখী করিবেন।

বয় বোধহয় কাছেই কোথাও ছিল, আসিয়া বলিল—চা-পানি মেম্ সাব্!

ঈষৎ লজ্জিত হইয়া নলিনী চা প্রস্তুত করিয়া রবার্টকে দিয়া বলিল—রবার্ট, আজই হয়ত তোমাকে আমার শেষ চা করিয়া দেওয়া।

রবার্ট বলিল—কেন লিলি, কালই ত যাইবে না?

না; কিন্তু আর আসিব না।

রবার্ট কোন কথা বলিল না; চা ঠাণ্ডা হইতে লাগিল; টিন ভর্ত্তি সিগারেট পুড়িয়া মরিবার জন্য হতাশে মরিতে লাগিল; রবার্টের হুঁস নাই। নলিনী বলিল, চা খাও রবার্ট!

খাই—বলিয়া রবার্ট পেয়ালা তুলিয়া লইল।

আর এক পেয়ালা দি?

দাও। কিন্তু আমার ইচ্ছা করিতেছে, আমি নিজের হাতে তোমাকে এক পেয়ালা চা করিয়া দিই—তুমি খাও।

নলিনী সাগ্রহে কহিল—দাও না রবার্ট, শেষ দিন আজ, খাইয়া যাই!—বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল।

রবার্ট বয়কে ডাকিয়া আর একপাত্র জল আনিতে বলিল এবং আস্তে আস্তে ছেঁকুনিটা, চামচখানি, দুধের পাত্র, চিনির বাটী খুঁজিয়া লইয়া, নিজহস্তে এক পেয়ালা চা প্রস্তুত করিয়া ডাকিল—লিলি!

নলিনী একদৃষ্টে অন্ধের যত্ন-পরায়ণ, সেবানিপুণ হাত দুখানির দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। বসিয়া ছিল বটে কিন্তু তাহার বুকের ভিতরে যে তরঙ্গ উত্থিত হইতেছিল, তাহার সন্ধান কে রাখিল? রবার্টের আহ্বানে জ্ঞান ফিরিয়া আসিতেই তাহার দুই চক্ষু ছাপাইয়া হুহু শব্দে জল ঝরিয়া পড়িল।

রবার্ট আবার ডাকিল—লিলি?

কি?

স্নেহকোমলকণ্ঠে রবার্ট বলিল—চা খাও লিলি।

আজ শনিবার না-লিলি? রাত এখন ৮টা, না? যতদিন

বাঁচিয়া থাকিব, শনিবার রাত্রি ৮টার কথা আমি ভুলিব না, লিলি !

চায়ের বাটী টানিয়া লইয়া, লিলি অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে কহিল—এই আমার শেষ খাওয়া রবার্ট !—বলিয়াই সে টেবিলের উপর হইতে সূক্ষ্ম রেশমের রুমালখানি তুলিয়া মুখের মধ্যে গুঁজিয়া ধরিল।

ঘড়িতে সাড়ে আট-টা বাজিল ; নলিনী বলিল, চল্লুম রবার্ট !

রবার্ট সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়াইয়া উঠিল।

নলিনী পুনরপি কহিল—চল্লুম রবার্ট !

রবার্ট নতমুখেই দাঁড়াইয়া ছিল ; কহিল—জগদীশ্বর তোমাকে সুখী করুন, লিলি।

গাড়ী ফটকের বাহিরে, একটু দূরেই ছিল—নলিনী অগ্রে অগ্রে, রবার্ট পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়াছে, সামান্য দূরে বেহারাটাও আসিতেছে, গাড়ীর কাছে একটা যায়গায় আলো কিছু কম ছিল, নলিনী সেইখানে দাঁড়াইয়া পড়িয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল—"রবার্ট, এই গড়িয়াহাটার পথে এ জীবনে আর কোন দিন আমি চলিব কি-না জানি না ; তোমার ঐ ঘরেও আর কোন দিন আসিব কি-না জানি না, কিন্তু দিনের পর দিন বছরের পর বছর এই পথে তোমাকে চলিতে হইবে ; ঐ ঘরে তোমাকে বাস করিতেই হইবে। নিষ্ঠুর, পাষাণ, আমার পাষাণ সেই দিন মনে করিবে কি, যে এই পথে, এই ঘরে কে একজন নারী তোমার মুখের একটি কথা শুনিবার জন্য ছটফট করিয়া মরিয়াছে, সে কথাটি তুমি তাহাকে বল নাই—মনে করিবে কি পাষাণ, তোমার এতটুকু একটি আদরের জন্য নারী দিনের পর দিন অধীর আগ্রহে তোমার পানে চাহিয়া চাহিয়া ফাটিয়া মরিয়াছে, সে আদর তুমি তাহাকে দাও নাই ? মনে তোমার পড়িবে কি রবার্ট ?" নলিনী কাঁপিতেছিল, আজ আর চালকের স্থানে গেল না ; কোন মতে, কম্পিত পদে ভিতরে বসিয়া পড়িয়া মুখ ঢাকিয়া বলিল—চালাও।

মুহূর্ত্তের মধ্যে ষ্টার্ট হইয়া গেল, গাড়ী চলিল—রবার্ট তখনও সেইখানে দাঁড়াইয়া। একটু দূর গিয়াই নলিনী গাড়ী ব্যাক্ করিতে হুকুম দিল ; কাছে আসিয়া বলিল, রবার্ট এখনও দাঁড়াইয়া আছ ? বাড়ী যাও, চল, আমি তোমার হাত ধরিয়া ঘরে রাখিয়া আসি।

রবার্ট বলিল—না, লিলি তুমি যাও, তোমাকে দেখিতে পাইলাম না অন্ধ আমি এইখানে দাঁড়াইয়া তোমার গাড়ীর শব্দটুকুই প্রাণে গাঁথিয়া লই !

কথাগুলিতে নলিনীর অন্তঃস্থল দুলিয়া দুলিয়া উঠিল ; নলিনী আকুল আগ্রহে রবার্টের হাত দুটা চাপিয়া ধরিয়া ডাকিল—রবার্ট, রবার্ট, রবার্ট, সাড়া দাও রবার্ট !

রবার্ট স্খলিতস্বরে কহিল—বিদায় নলিনী বিদায় ! চিরবিদায়, লিলি, চিরবিদায় কিন্তু জগদীশ্বর তোমাকে সুখী করুন ! God bless you !!!

বন্ধু কি উদ্দেশ্যে সংবাদটি প্রচার করিয়াছিলেন বলিতে পারি না কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে প্রকাশ হইল যে সম্পত্তিশালী রবার্ট নাইটের 'নাইট কোর্টে' এক নেটিভ-নারীর আবির্ভাব হইতেছে, সেই মুহূর্ত্তেই যে সকল শ্বেতাঙ্গিনী রবার্টকে hopeless ভাবিয়া চিরবিদায় লইয়াছিলেন, তাঁহারা আর একবার বিপুল-উদ্যমে বহুবিধ তীক্ষ্ণ অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া রবার্ট-রূপ শিকার শিকারে গড়িয়াহাটার বন্য পথে প্রধাবিত হইলেন। বেচারী রবার্ট এই কয়দিনেই কিরূপ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, বেচারীর বোধ করি ভাল খাওয়া দাওয়া হয় না, বেচারীর কি নিঃসঙ্গ অবস্থা, আহা, দুঃখী রবার্টকে একটু দেখা-শুনা করেই বা কে ! লেখক হলপ করিয়া বলিতে পারেন, রবার্টের দুঃখে তাঁহাদের চোখের নীচে তখন মলমলের আস্ত আস্ত কোরা থান ধরিলেও সেগুলি জল-কাচা হইয়া যাইত।

রবার্ট প্রশান্তমুখেই তাহাদিগকে বিদায় দিয়া বলিল, সে আগামী বৃহস্পতিবারেই বিলাত চলিয়া যাইবে।

কেন রবার্ট, বিলাতে কি জন্য ? বিলাত দেশটা ত ভাল নয়। সেখানে ত তোমার কোন আত্মীয়স্বজন নাই ! সেখানে ত কেবল কষ্টই পাইতে হইবে রবার্ট !

রবার্ট উত্তরে শুধু এই কথাই জানাইল, যে তাহার সংকল্প স্থির—পরিবর্ত্তনের কোন সম্ভাবনা নাই।

কানা লোকগুলার স্বভাবই ঐ "একগুঁয়ে গোছের" ! হতাশ 'অলি'র দল আবার স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিল।

বারান্দার আলো নিবাইয়া দিয়া রবার্ট নীরবে, নির্জ্জনে বসিয়াছিল, সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, বন্ধুর আসিবার কথা—বন্ধুর হাতে বাড়ী বাগান, বিষয় আসয়ের ভার দেওয়া হইয়া

গিয়াছে—আজ বুধবার, কাল এ সময়ে রবার্ট এ-গৃহে আর থাকিবে না, হয়ত কোনদিনই আর ভারতবর্ষের বাঙ্গালাদেশের মাটীতে পা দিবে না, আজ এ গৃহে, এ দেশে, তাহার পিতার, তাহার মাতার, তাহার নিজের জন্মভূমিতে আজই শেষ রাত্রি যাপন, অন্ধ আজ দৃষ্টিহীন চক্ষু মেলিয়া যেন শেষ বারের মত, জন্মের মত প্রিয়—সুপ্রিয় জন্মভূমির আকাশ দেখিয়া লইতেছে; আজ প্রিয়—প্রিয়তম বাসভূমিখানিকে দেখিয়া লইতেছে!

মালী আসিয়া কহিল—হুজুর মেম্ সাহেব এই দিক দিয়ে মোটরে ক'রে গেলেন।

শব্দ অনুসরণ করিয়া রবার্ট মুখ ফিরাইল, কথা বলিল না।

মালী বলিতে লাগিল—তাঁরাও তিন দিন পরে দিল্লী যাবেন হুজুর!

মেম-সাহেব তাহাকে সাহেবের কথা, সাহেবের খাওয়ার কথা, বাগানের ফুলের কথা, যত কথা, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ও সে যে যে উত্তর দিয়াছিল, সবই কহিল; কেবল দশ টাকার নোট্ প্রাপ্তির কথাটা কি-জানি কেন গোপন করিল। যদিও জানিত, সাহেবই যখন চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইতেছে, তখন আর রাগ করিবে না, তবুও সে কথাটা বলিল না। বোধ করি উড়িয়ার আত্মসম্মানে আঘাত লাগিবে বলিয়াই কথাটা গোপন করিল।

রবার্ট জিজ্ঞাসা করিল, আমি যে কাল যাইব, তুমি মেম-সাহেবকে বলিয়াছ?

না হুজুর! হুজুরের কি কালই যাওয়া হইবে?

রবার্ট বলিল—তুমি মেম-সাহেবের বাড়ী জান?

'জী হুজুর!' জানিবারই কথা, দৈনিক এক মুদ্রা লভ্য যাহার নিকটে হয়, তাহার বাড়ীর কেন, হাঁড়ীর খবর রাখে না, এমন উড়িয়া উড়িষ্যায় নাই।

আমি তোমার কাছে একখানি চিঠি রাখিয়া যাইব, কাল রাত্রে সেই চিঠি মেম-সাহেবকে দিবে। তোমাকে আমি ভাল বখশিস্ দিব ও বন্ধুকে বলিয়া যাইব, তিনি কোন ভাল যায়গায় তোমার একটি কর্ম করিয়া দিবেন।·· আলো জ্বাল, আমার লিখিবার টেবিল আন।

মালী সুইচ্ টিপিয়া আলো জ্বালিল, বেহারাকে ডাকিয়া লিখিবার টেবিল বাহির করিয়া আনিল। সাহেব চিঠি লিখিয়া, মালীর জিম্মা করিয়া দিল ও দুইখানি দশ টাকার নোট্ দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া, গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত গড়িয়াহাটার পথে পায়চারি করিয়া বেড়াইল।

যে পত্রের প্রেরক বিশ টাকা পুরস্কার দেয়, প্রাপক না-জানি কত দিবে, ভাবিতে ভাবিতে মালীর রাত্রি যাপন করাই দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু দিনের বেলা কাজ-কর্ম ফেলিয়া রাখিয়া বাড়ীর বাহির হইতে তাহার সাহস হইল না। ভয় সাহেবকে ততটা নয়; সাহেব অন্ধ, কে আছে না-আছে দেখিতে পায় না, সাহেবের বন্ধুকেই ভয়! জিনিষ পত্র বাঁধা-ছাঁদা হইতেছে, ডাকিয়া কাহাকে না পাইলে বন্ধু-সাহেব 'অন্নাত্য' করিবে কাজেই মালী সন্ধ্যার অপেক্ষায় রহিল;—অতি কষ্টেই যে রহিল, একথা বলিবার কি কোন প্রয়োজন আছে? সন্ধ্যা হইবামাত্র পত্র-সমেত সে মেম্‌সাহেবের কুঠির উদ্দেশে রওনা হইয়া পড়িল।

নলিনী সন্ধ্যা স্নানটি সারিয়া, গোলাপী রঙের সামিজের উপর নীলাম্বরী শাড়ীখানি পরিয়া লাল মখমলের জুতাটি পায়ে দিয়া সবেমাত্র বাহিরের ঘরে ঢুকিয়াছে, হাস্যোজ্জ্বল আননে মালীর প্রবেশ। মাটীতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিয়া পত্রখানি মেম্‌সাহেবের হাতে দিয়া পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল।

নলিনী সোফায় বসিয়া চিঠি পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে তাহার গৌর আননে তপ্তরক্ত স্রোত ছুটিল, রক্তিম মুখমণ্ডল স্বেদসিক্ত হইল—চিঠি পড়া শেষ হইল না, নলিনী শ্রান্ত-অবসন্নের মত সোফায় এলাইয়া পড়িল—সম্বদ্ধ ওষ্ঠা-ধরের মধ্য হইতে ক্ষীণকণ্ঠে একাক্ষরের একটি শব্দ বাহির হইল—"মা।"

মালী বিপদ গণিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে সরিয়া পড়িবার ইচ্ছাই করিয়াছিল; পরে কেন-জানি-না, দয়া পরবশ হইয়া সে বাড়ীর বেহারাকে দিদিবাবুর কাছে পাঠাইয়া দিয়া গেল।

জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে, মাতা কন্যার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসিলেন—ও কি রবার্টের চিঠি?

হ্যাঁ! তুমি দেখ নি?

না বাছা। কি লিখেছে রবার্ট?

তুমি পড় না-মা।

তুই পড় বাছা, আমি শুনছি।

নলিনী পড়িল—

—"বিদায়ের সময় আসিয়াছে, চিঠি লেখাও শেষ হইল। তুমি থাকিবে ভারতের এক প্রান্তে, আর আমি থাকিব পৃথিবীর আর এক কোণায়। এর পর আমিও তোমার কোন খবর পাইব না, তুমিও আমার খবর জানিবে না। এর পর তোমার মনের কথাও আমি জানিব না, তুমিও আমার মন বুঝিবে না। জীবনের সেই ভীষণ সময়ই ত আসিতেছে। এর পর ছটফট করিয়া মরিব, মনে হইবে কেন ডাকিলাম না, কেন বলিলাম না! তাই এই কয় মাস যে কথাটি বুকের ভিতরে চাপা দিয়াই রাখিয়াছি, আজ একবার, শেষবার, জীবনের মত শেষবার সেই ডাকটিই ডাকিয়া নিই—

প্রিয়তম! প্রিয়তম!! আমার প্রিয়তম!!!"

নলিনী নলিন-নয়ন দু'খানি মুদিত করিয়া বলিল—মা শেষের ঐ ছত্রটি রক্ত দিয়ে লেখা!

রক্ত দিয়ে?

এই দেখ-না মা!

মা শিহরিয়া উঠিলেন; বুকের মধ্যে, স্মৃতি-পটে অতীত দিনের এক চিত্র ফুটিয়া উঠিল। সে এক হিন্দু-যুবার জন্য তিনিও বুকের রক্তে লিপি রচনা করিয়াছিলেন!

নলিনী পড়িতে লাগিল:—

"কিন্তু কেন ডাকি নাই প্রিয়তম, তা কি তুমি বুঝিবে না? আমি যে অন্ধ প্রিয়তম! অন্ধকে ত সবাই ঘৃণা করে, অবজ্ঞা করে; অন্ধকে লইয়া সংসার করে কয়জন প্রাণাধিক! কিন্তু তোমাকে আমি ভালবাসি, প্রিয় আমার, সোণা আমার, অন্ধের নয়নের মণি আমার, তোমাকে কত যে ভালবাসি, তাহা জানাইবার সুযোগ পাইলাম না। এই চিঠি যখন তোমার হাতে পৌঁছিবে, ওভারল্যাণ্ড মেল্ তখন হয়ত বাঙ্গালাদেশ অতিক্রম করিয়াই চলিয়া যাইবে। চলিলাম, প্রাণাধিক আমার, সর্ব্বস্ব আমার, চলিলাম, তোমার ভালবাসাই এ-জীবনে প্রথম পাইলাম, ইহাই প্রথম, ভগবানের কাছে কামনা করি ইহাই যেন শেষ হয়। চলিলাম, প্রিয়তম, চলিলাম! তুমি সুখী হও! আশীর্বাদ করি, প্রাণাধিক আমার, তুমি সুখী হও। তোমারই রবার্ট।"

নলিনী চিঠিখানির উপরে মুখ রাখিয়া ফুলিতে ফুলিতে কাঁদিতে লাগিল। আর মাতা? তাঁহার সম্মুখে সেই সুদূরের চিত্রখানি ক্রমেই স্পষ্টতর হইয়া আসিতেছিল। যেদিন, খৃষ্টান-সমাজ, আত্মীয়-স্বজন সকলকেই করিয়াই উপেক্ষা তিনি তাঁহার হিন্দু প্রেমাস্পদকে জীবন দেবতারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নলিনী ডাকিল—মা।

মা মেয়ের মুখখানি বুকের উপরে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—কেন মা?—ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন—বিলেত যাচ্ছে লিখেছে না? ওভারল্যাণ্ড মেলে যাবে ত? বস্ ত মা, আমি টাইম-টেবলটা আনি!

নূতন টাইম টেবল্ ঘরেই ছিল, মা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—ওভারল্যাণ্ড মেল্ দশটা রাতে ছাড়ে—আধঘণ্টা দেরী আছে, পৌঁছুতে পারব না আমরা? বেহারা, মোটর!

নলিনী সোফেয়ারকে সরাইয়া দিয়া নিজেই গাড়ী ছুটাইল। রাজধানীর রাজবর্ত্ম তখন নির্জ্জন, যান-বাহনের ঝাঁপাঝাঁপি হ্রাস পাইয়াছে, নলিনীর হাতে গাড়ী আজ নক্ষত্রকে পরাস্ত করিয়া ছুটিতেছে। আজিকার পরে এ গাড়ী যদি ভাঙ্গিয়াও যায়, চালন-শক্তি যদি তাহার চিরতরে বিলুপ্তও হয়, তাহাতেও নলিনীর কোন ক্ষোভ, কোন দুঃখ নাই, কোনকালে হইবেও না।

হাওড়া পুলের মুখে পাহারাওয়ালার দীর্ঘ হস্ত প্রসারিত হইবামাত্র গাড়ী থামাইতে হইল; নলিনী হস্তেঙ্গিতে তাহাকে কাছে ডাকিয়া ব্যাগ খুলিয়া পাঁচটি টাকা দিতেই, প্রসারিত হস্ত সঙ্কুচিত হইয়া গেল—নলিনীর গাড়ী এক নম্বর প্ল্যাটফরমের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

নীলরঙের সুন্দর গাড়ীখানি, জানালায় জানালায় কেবলই সাদা মুখ! প্ল্যাটফর্ম্মেও তাই। কোন কালো মুখের স্থান যেন সেখানে নাই। মাতা গাড়ীতেই বসিয়া রহিলেন, নলিনী প্ল্যাটফর্ম্মে ঢুকিয়া শেষ হইতে দেখিতে দেখিতে চলিল—চক্ষু যেন পলকহীন, নাসিকা যেন নিঃশ্বাসহীন, বক্ষ যেন স্পন্দনহীন—কেবল সকল শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার চরণ দুটিতে!

জানালায় জানালায় কত সমারোহ, কত ফুলের মালা, ফুলের তোড়া, কত রুমাল, মেঘ ও জোছনা, হাসি ও কান্নার কত অভিনয়, কত ভাবই ব্যক্ত হইতেছে—একটি জানালার কাছে কেবল একটিমাত্র ইংরাজ দাঁড়াইয়া, কোন আড়ম্বর নাই, কোন সমারোহ নাই—নলিনী সেইদিকে ছুটিল!

—রবার্ট!

গাড়ীর ঘণ্টা পড়িল।

নলিনী সামনে আসিয়া ডাকিল—রবার্ট!

লিলি!

নলিনী দু'হাতে তাহার মুখখানি টানিয়া ধরিয়া কাঁধের উপর ধরিয়া বলিল—নেমে এস রবার্ট, নেমে এস!

পার্শ্বে যে রবার্টের বন্ধু দণ্ডায়মান, নলিনী তাহার অস্তিত্ব যেন ভুলিয়াই গিয়াছিল।

প্লাটফরমে যে অগণিত নর-নারী দাঁড়াইয়া, এটা যে হাওড়া-ষ্টেশনের প্লাটফরম, সকল কিছুই সে বিস্মৃত হইয়াছিল; রবার্টের গণ্ডের উপর স্বীয় কপোল ন্যস্ত করিয়া আকুল কণ্ঠে ডাকিল—এস, রবার্ট!

কিন্তু আমি যে অন্ধ, লিলি!

আমারই কোন্ চোখ্ আছে রবার্ট! তাহা হইলে কি আর এত কষ্ট পাই? আর কোন কথা নয়, নেমে এস রবার্ট!

রবার্ট বলিল—ভুল করিও না, লিলি! অন্ধকে লইয়া ··

নলিনী বলিল—ভুল আগে করিয়াছি, আজ সে ভুল আমি ভাঙ্গিব রবার্ট, তুমি এস! আমার এ চোখ দু'টাকে তোমার সামনে, নিজের হাতেই আমি গালিয়া ফেলিব, তুমি এস! মা গাড়ীতে বসিয়া আছেন, এস রবার্ট, আর দেরী নয়, গার্ড পাখা নাড়িতেছে, এস।

আবার ঘণ্টা দিল, এঞ্জিন বাঁশী বাজাইল—নলিনী দুই বাগ্র বাহুর বন্ধনে প্রিয়তমকে জড়াইয়া ধরিয়া যখন নীচে নামাইল, গাড়ী চলিতে সুরু করিয়াছে ও রেলকর্ম্মচারীদের মধ্যে "গেল, গেল" রব উঠিয়াছে!

* * *

ষ্টেশন মাষ্টার আসিয়া রবার্টের বন্ধুকে বলিল—এখনি একটা দুর্ঘটনা ঘটিত!

বন্ধু ম্লানহাস্যে কহিল—যাহা ঘটিল, তাহার চেয়ে সে দুর্ঘটনা কখনই বেশী বড় হইত না।

ষ্টেশন-মাষ্টার শ্বেত ও কৃষ্ণ বিলীয়মান যুগলের দিকে চাহিয়া কৃপাব্যঞ্জক ধ্বনি করিয়া কহিল—Right! তাহাই বটে!

বঙ্গ ভাষার সহিত 'পালি' ভাষার সংমিশ্রণ

শ্রীঅমিয়ময় দাস বি-এ

"অহিংসা পরমো ধর্ম্ম"—এই নীতি প্রচার করিয়া এশিয়া মহাদেশে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বুদ্ধদেব যে একদিন সকলকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু নিদর্শন এখনও আমরা চীন, জাপান, সিংহল, বর্ম্মা প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী নর-নারীতে প্রাপ্ত হই। বুদ্ধদেব নিজে কিছুই লিখিয়া যান নাই; তিনি যে-সব উপদেশ দিয়া যান, সেই সব উপদেশ তাঁহার পরবর্ত্তী শিষ্যগণ লৌকিক ভাষায় লিখিয়া রাখেন।

কেহ কেহ বলেন তাঁহার উপদেশগুলি 'পালি' ভাষায় লিখিত হয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আমরা প্রথমতঃ এই "পালি" শব্দ খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে 'মহাবংশে'র ভাষ্যকার 'বুদ্ধঘোষের' জীবনীর মধ্যে দেখিতে পাই। সেখানে 'পালি' শব্দে বুদ্ধদেবের নীতিপূর্ণ 'উপদেশ-বাণী' এবং বৌদ্ধগণের 'পবিত্র টীকা টিপ্পনী' বুঝাইতেছে; যথা—১। "পালিমত্তম্ ইধাসিতম্" ('পালি' প্রাচীন উপদেশের সঙ্কলন); ২। পালিম্ তির তম্ অগ্গহনি (বুদ্ধঘোষের ভাষ্য—বৌদ্ধ সাহিত্য 'পালির' ন্যায় পবিত্র ধর্ম্মোপদেশ)।

আবার আজকাল কেহ কেহ এই 'পালি' অর্থে বুঝেন—যে ভাষা 'পল্লী' অর্থাৎ 'পাড়াগাঁ' হইতে আসিয়াছে। তাঁহারা বলেন 'পাড়াগেঁয়ে' কিম্বা লৌকিক কথোপকথনের যে ভাষা তাহার নামই 'পালি'। কোন কোন ভাষাতত্ত্ববিদ্ বলেন, "বুদ্ধদেব এবং তাঁহার শিষ্যগণ যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছেন, এই সমস্ত উপদেশ ক্রমান্বয়ে যে শ্রেণী বা পঙ্‌ক্তির মধ্যে পড়িয়াছে তাহার নামই 'পালি'।" পুণার অধ্যাপক "ধর্ম্মানন্দ কোশম্বি" বলেন—"'পালি' শব্দ 'পাল' (রক্ষা বা বজায় রাখা) এই ধাতু হইতে আসিয়াছে। এখন

দেখা যাউক, 'পালি' কি রক্ষা করিতেছে? পালিতে শুধু বুদ্ধদেবের 'বাণী' রক্ষা করা হইয়াছে—এই দেখিতে পাই।" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন—"যেমন গ্রীকদিগের উচ্চারণের প্রভাবে এক সময়ে 'পাটলিপুত্র,—'পালিবোথ্র'—'পালিপুত্রো' বা পালিপুত্তো নামে উচ্চারিত হইত, সেই প্রকার 'পালি' যে মগধের রাজধানীর ভাষা তাহা কেন না উচ্চারিত হইবে? এমন কি এখনও বিহারে 'পালি' নামে যে এক দেশ আছে তাহা দেখিতে পাই।"

যাহা হউক, এই 'পালি' ভাষা যে বৌদ্ধগণের প্রিয় এবং পবিত্র ভাষা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে এই ভাষার সহিত 'মগধের' বিশেষ সংযোগ আছে। কারণ, বুদ্ধদেব 'মগধে' আসিয়া নানা বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং এই ভাষায় 'উপদেশ' দিয়াছিলেন। সেইজন্য ইহাকে 'মাগধী' ভাষা বলে।

আমরা দেখিতে পাই, এই 'পালি' ভাষা খৃ, পু, ২০০ হইতে ২০০ খৃ, প, এর মধ্যে 'লিখিত ভাষা'রূপে পরিণত হইলেও, ৬০০ খৃ, পু, হইতে ২০০ খৃ, প, পর্যান্ত ইহার যে প্রকার প্রাচীনত্ব ছিল, সেই প্রকার 'ভাব' ইহার মধ্যে ছিল খুব—বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। পরে এই ভাষা যখন ২০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 'সৌরসেনী', মহারাষ্ট্রী, জৈন, অর্দ্ধ মাগধী প্রভৃতি ভাষার সহিত প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিল, তখন এই 'পালি' ভাষার বিশেষ উন্নতি হয়। এই সময়ে উত্তর ভারতের নানা প্রকার উপকথা প্রভৃতি এই পালি জাতকের মধ্যে স্থান পায়। সেই জন্য আমরা 'পালির'—সুম্‌সুমার জাতক, সিহাম্প জাতক, বক জাতক প্রভৃতির—পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, কথাসরিৎসাগরের বানর মকর কথা, সিংহচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভ কথা, বক ও মৎস্যের উপাখ্যানের সহিত সাদৃশ্য দেখিতে পাই। এই সময়ে বুদ্ধদেবের শিষ্যগণ—বোধিসত্ব, সমবধান অতীত বস্তু, প্রত্যুৎপন্নবস্তু প্রভৃতি বুদ্ধদেবের সুক্ষ্ম বাণী বিশদ রূপে ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন; উত্তর-পশ্চিম ভারতের, পশ্চিম ভারতের এবং মধ্যভারতের বৌদ্ধ মঠের ভিক্ষুগণ বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে নানা প্রকার টীকা, টিপ্পনী, ভাষ্য প্রভৃতি রচনা করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেন। সেই সময়ে মৌর্য্য-বিলুপ্ত হয়। তাই 'পালি' ভাষা এই সময়ে উত্তর ভারতের সর্ব্বপ্রধান ভাষায় পরিণত হয়। ভাষার উন্নতি হইতে গেলে নানা প্রকার শব্দের ও ভাবের সহিত মিলিত হইতে হয়। সেই জন্য এই 'পালি' ভাষার মধ্যে আমরা উত্তর পশ্চিম ভারতের অনেক "পৈশাচী" (১) শব্দ—গুজরাটী, মালয়লাম, সিংহলী শব্দ ও ভাব দেখিতে পাই। ইহার পর 'পালি' যখন সম্পূর্ণ লিখিত ভাষায় পরিণত' হইল, তখন সংস্কৃতর প্রভাব আস্তে আস্তে প্রবেশ করিয়া পঞ্চম শতাব্দী হইতে ইহাকে ক্রমান্বয়ে একপ্রকার কৃত্রিম লিখিত ভাষায় পরিণত করিতে লাগিল। তাহার আভাষ আমরা সিংহল, ব্রহ্ম, এবং শ্যাম দেশের লিখিত পালি ভাষায় দেখিতে পাই। এখন এই সব দেশের ভাষা কেবলমাত্র সংস্কৃতের সাহায্যে আয়ত্ত করা যাইতে পারে।

আমরা এখন দেখিতেছি(২) মাগধী ভাষা হইতে বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, মৈথিল, মাগহী, ভোজপুরীয়া, নাগপুরীয়া প্রভৃতি ভাষা আসিয়াছে। কিন্তু এই 'মাগধী' ভাষা যে একসময়ে 'পালি' ভাষা হইতে পরিপুষ্টি সাধনের জন্য যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিল, তাহা আমরা অশোকের সমসাময়িক মগধের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে ছোটনাগপুরের রামগড় পাহাড়ের যোগীমর গুহায়(৩) "সুতনুকা শিলালিপি" হইতে বেশ বুঝিতে পারি।

মগধের সহিত বাংলার সংস্রব আজ নূতন নহে,—বহুদিন হইতে আচার-ব্যবহারের, ভাব-ভঙ্গিমার আদান-প্রদান চলিয়া আসিতেছে। এমন কি, মগধের এক প্রদেশ—'মগধ-কাম-গৌড়' খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার

১। Frankfurter, Handbook of Pali

(২) The Origin & Development of the Bengali Language by Dr. S. K. Chatterjee, M.A. (Cal), D. Lit. (London).

(৩) সুতনুকা নামা দেবদাসিক ঐ
তম কাম ঐথ বালানসেয়ে
দেবদিন এ নাম লুপদখে॥

'দেবদিন্ন' নামে সকল বিদ্যায় পারদর্শী বারাণসীর একজন সুপুরুষ 'সুতনুকা' নামে দেবগণের পরমাসুন্দরী নর্ত্তকীকে ভালবাসিতেন। (Annual Report, Archæological Survey of India.

মধ্যে চলিয়া আসিতেছিল। যে 'পালি' ভাষা এক সময়ে মাগধী ভাষার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল—সেই ভাষা যে এই 'মাগধী' ভাষা হইতে উদ্ভূত 'বঙ্গভাষাকে' নানা প্রকার ভাব ও শব্দের দ্বারা গঠন করিবে—তাহা আর আশ্চর্য্য কি? এখন দেখা যাক্ কোথায় কি ভাবে (৪) বঙ্গভাষার শব্দ 'পালি' ভাষা হইতে আসিয়াছে।

পালি অট্‌ঠি হইতে বাংলা আঁটি বা আঁঠি শব্দ আসিয়াছে।

পালি উন্‌হ, উদ্‌ধন হইতে বাংলা উন্‌হন বা উনুন আসিয়াছে।

পালি ওর (এইধার) হইতে বাংলা ওর নাই (কুল নাই) আসিয়াছে, প্রাচীন বাংলাতে এই 'ওর নাই' উক্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

পালি গোনা (গরুসকল) শব্দ সিংহলে এখনও ব্যবহৃত হয়। এই 'গোনা' শব্দের প্রাচীন বাংলাতেও প্রয়োগ দেখিতে পাই।

পালি 'চঙ্গোট' হইতে বাংলা 'চাঙ্গাড়ি' (বাঁশের ঝুড়ি) বা 'চ্যাঙ্গাড়ি' শব্দ আসিয়াছে।

পালি 'দুম্' বাংলা দুমা বা 'ডুমা' (আকগাছ)। মেদিনীপুর জেলায় 'দুমা' আকগাছ অর্থে এখনও ব্যবহৃত হয়।

পালি 'নেলা' হইতে বাংলা 'নেলা ক্ষেপা' আসিয়াছে। এখানে 'নেলা' মানে সরল প্রকৃতির লোক, পালিতে এই (৫) 'নেলা' শব্দ দেখিতে পাই।

পালি 'বাদ'—বাংলা 'বাদ্যি' (বাজনা)— "ঢাকের 'বাদ্যি' অনেক দূর হইতে শোনা যায়।"

(পালি) পাঁচন যট্‌ঠি—(বাংলা) 'পাঁচন বাড়ি', যথা "পাঁচন বাড়ি নিয়ে রাখাল মাঠে চলছে।"

পালি পেকখুন—বাংলা পেকম বা পেখম, যথা "ময়ূরটা কি সুন্দর পেখম ধরেছে।"

পালি 'বাট'—বাংলা বোঁটা।

পালি 'বিচিকিচ্ছা'—বাংলা 'বিচিকিচ্ছি', বিতিকিচ্ছিরি (খারাপ) প্রভৃতি শব্দের সাধারণ ভাবে প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

পালি 'হেট্‌টা' বাংলা 'হেঁট', যথা "সে মাথা হেঁট্ করে রহিল।"

পালি 'সম্মা'—বাংলা 'সমান'।

পালি 'ছবি' (চর্ম্মরোগ)—(বাংলা) 'ছুলি' বা 'ছলি' শব্দ আসিয়াছে।

পালি 'উদুম্বর'—বাংলা 'ডুমুর' (একপ্রকার ফল)।

এই প্রকার পালিভাষার নানা প্রকার শব্দ বাংলার মধ্যে মিলিত হইয়াছে। এমন কি আমরা 'পালির' ভাষা পদ্ধতি (idiom) বাংলার মধ্যে দেখিতে পাই।

(১) পালিতে যেমন—ভত্তম্ বদ্ধতি (বাড়); দেবারম্ (দ্বার) দেতি; কদ্দম্ (কাঁদা) বন্ধিত্বা; না পারেমি; সতিম্ (স্মৃতি) করিস্সতি; তম্ এব হোতু (যথেষ্ট হয়েছে) প্রভৃতির প্রয়োগ আছে, বাংলাতেও ঠিক সেই প্রকার ভাত বাড়; দোর দাও; কোমর বেঁধে; পারব না; মন দাও; হো'কগে যাক্;—ইত্যাদি প্রয়োগ পালির প্রভাবে আসিয়াছে।

(২) পালিতে যেমন—রট্‌ঠা রথম্ (এক স্থান হ'তে অপর স্থান); পদাপদম্, অল্লাপ সল্লাপ; হুরাহুরম্; ফলাফলম; প্রভৃতি প্রয়োগ—'জোর' (emphasis) দিবার জন্য এক শব্দের পুনরায় উল্লেখ করা হইয়াছে—সেই প্রকার বাংলাতেও—'এখান এখান, পায়ে পায়ে; আলাপ সালাপ; হুড়াহুড়ি; ফলাফল ইত্যাদির প্রচলনে 'পালির' ছায়া পড়িয়াছে।

(৩) বাংলাতে আমরা অনেক সময়ে 'শব্দের ওলট পালট' (metathysis) দেখিতে পাই। এখনও পর্য্যন্ত বাংলার অনেক স্থানে শ্মশানের পরিবর্ত্তে মশান, পিশাচের পরিবর্ত্তে পিচাশ, টেক্সো, বাক্সোর পরিবর্ত্তে টেস্‌কো, বাস্‌কো প্রভৃতি উচ্চারিত হইয়া থাকে, এই প্রকার উচ্চারণের বিশেষত্ব পালি ভাষা হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ পালিতেও আমরা ঠিক এই প্রকার metathysis দেখিতে পাই, যথা সংস্কৃত উপানহ—পালি উপাহন, সংস্কৃত মশক পালি মকস্ ইত্যাদি।

---

৪ The History of the Bengali Language by Prof. B. C. Mazumdar.

৫ Buddha Ghosa's Commentary on Digh-Nikaya.

চাটুয্যে-বাড়ী

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

প্রথম পরিচ্ছেদ

চাটুয্যে-বাড়ী ও চাটুয্যে-বংশ

কালীদহের চাটুয্যে-বাড়ী বনেদী বাড়ী। সহরেই বল আর গাঁয়েই বল, একটু নজর করে দেখলেই দেখতে পাবে, এক-একটা বাড়ীর এক-এক রকম ধাৎ আছে, স্বভাব আছে, ধরণ ধারণ বা ভঙ্গী আছে। আমাদেরই মত কেউ বেশ হাসিখুসী; কেউ ভারিক্যি গুরুগম্ভীর, কেউ সাজগোজে ফুল্ বাবু, কেউ নিতান্তই আটপৌরে সাদাসিদে শান্তশিষ্ট সদাশিব গোছের, কেউ থানপরা মনমরা বিধবার মত করুণ, আবার কেউ বা রাগী ভয়াবহ ভ্রূকুটিকুটিল। চাটুয্যে-বাড়ী অট্টালিকা-সমাজে বড় রাশভারী লোক, যেন উপকথার যক্ষিণী বা পাড়ার কুঁদুলে গোমড়ামুখী রুক্ষে মাসী। এ যেন হাজার বছর আগেকার কোন্ অতীত যুগের স্তূপ, হিমাচলের মত পুরান ও শক্ত, উদাস ও গম্ভীর; সুন্দর অথচ ভীষণ। তার শ্যাওলা-ঢাকা কালো চেহারায়, তার কারুময় সারি-বাঁধা থামে, তার আকাশ-ছোঁওয়া পাঁচিলে, তার দীঘির নিথর কাকচক্ষু জলে, তার নারকেল তালের ঘন ছায়ায়, নিম ও বাঁশঝাড়ের সর্সর্ থর্থর্ কাঁপায়, তার পথের দিকে পিছন করে বসার ভঙ্গীতে কেমন যেন গা ছম্ছম্ না করে পারে না। ভূতের গল্পের মত চাটুয্যে-বাড়ার একটা টান আছে, মানুষ এ বাড়ীতে বড় একটা পা দিতে চাইত না, গেলে পালাই পালাই করতো; আবার ঐ গাছপালায় পুকুরে দেবমন্দিরে গড়থাইয়ে রহস্যময় চাটুয্যে-বাড়ীর দিকে সবার উন্মুখ কৌতুহলও ছিল খুব।

বিশেষতঃ আমাদের মত ডানপিটে ছেলে-পুলেদের চোখে এ বাড়ীর রূপ ছিল দু' রকম,—দিনের বেলা বরাভয়-প্রদা দেবতার, আর রাত্রে যক্ষিণীর। আকন্দ, কন্টিকারী, বন-চাঁড়াল, ময়নাকাঁটা, চালতা গাছে ও ঝোপে ঘেরা মজা গড়খাই হামাগুড়ি দিয়ে পার হয়ে রোজ ভর দুপুর বেলায় আমরা দু' তিনজনে ঐ পরম রহস্যে ঘেরা ছায়া ঢাকা মায়াপুরীতে ঢুকে পড়তাম। বাড়ীতে বকুনা খাবার ভয় আর সামনে নারকেলী কুল বা কাঁচামিঠে আমের দুর্জ্জয় লোভ। পদ্মনাল ও কল্মীর দলে ঢাকা দীঘির ধারে ধারে রাঙা পদ্মের টান; তা' ছাড়া ঐ মদনমোহনের দ্বাদশ-চূড়া মন্দিরের পেছনে ঐ বনটুকুর মধ্যে ফলসা গাছ আছে, নটকান আছে, পীচ আছে, কালজাম আছে, কামরাঙা আছে, নোনা চালতা আনারস বৈঁচি আমড়া—কি নেই? ঝোপে ঝোপে কাঠমল্লিকা, কামিনী, টগর, থোয়ে থোয়ে বেল সাদা হয়ে ফুটে থাকে। শিশু-প্রাণের জন্যে এই সব মারাত্মক টান তো ছিলই,—আর ছিল কালীর টান। তখন সে দশ বছরের এতটুকু রোগা ফুটফুটে ছেলে। তার দাদা মহিমারঞ্জন তখন বেঁচে; তপু তখনও জন্মায় নি। কালী অতটুকু ছেলে হ'লেও তখনও তার মধ্যে এক আধটুক পাগলাটে ছিট ছিল। অল্প কারণে, কখনও বা প্রায় অকারণে রেগে যেত; এবং সে অবস্থায় প্রাণের মায়া ছেড়ে দিক্-বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে ইট ছুঁড়তো, মানুষের হাতে কামড়ে দিয়ে রক্তের নদী বইয়ে তবে ছাড়তো। আর কিছু হাতের কাছে না পেলে একটা কেরাসিনের টিন বা দেবদারু বাক্সে ছুরি মেরে মেরে রাগের জ্বালা মিটিয়ে ধুপ করে গিয়ে বিছানার ওপর শুয়ে পড়তো।

অপঘাতে, অকাল-মৃত্যুতে, বিধির ও কনেবৌএর কোপে এবং অভিশাপে এত বড় আত্মীয়-স্বজনভরা সুখের পুরী আজ জনশূন্য হয়ে এক মাত্র কুলপ্রদীপ কালীপ্রসন্নে এসে ঠেকেছে। এই পঁয়ত্রিশ-সাঁইত্রিশ বছর বয়সে এখন কালী দেখতে আর এক রকমটি হয়েছে,—ছিপছিপে, রোগা, গৌরবর্ণ, লম্বামুখ, টানা টানা চোখ,—যেন ঠাকুরমার গল্পের পথহারা রাজপুত্র—কোথা দিয়ে পথ ভুলে কল্পনার দেশ থেকে আমাদের বাস্তবের জগতে এসে পড়েছে,—যেন মেঘদূতের শাপভ্রষ্ট বিরহী যক্ষ,– যেন কৃশতনু অনাহারী লক্ষ্মণ। এ পরিবারের সবাই কেমন অধাতুস্থ ও অস্বাভাবিক, ওদের কেউ যেন অপঘাত ছাড়া সোজা মরণ মরতে জানে না,

—সে রকম বেঁচে বা মরে সুখই বুঝি পায় না। আজ ক' পুরুষ থেকে এই রকমই হয়ে আসছে। কাশীর বাবা মহেশ্বর চাটুয্যে ছিলেন আধপাগল, মারা যান জলে ডুবে। মা অচিন্ত্যময়ী ছিল জন্মরুগী, মারা যায় বিষ খেয়ে। কাশীরা তিন ভাই; বড় মহিমারঞ্জন ছিল বেজায় বদরাগী মারকুটে মানুষ,—আজ সাত বছর হ'ল নসিবপুর মহালের সেই চৌদ্দ খুনী মামলায় তার ফাঁসী হয়। মেজ বিমলারঞ্জন ছিল অল্পভাষী উদাসীন, মনমরা মানুষ,—সতর বছর বয়সে সে হয় নিরুদ্দেশ। কাশীর বড় দিদি স্বর্ণপ্রভা শ্বশুরবাড়ী থেকে এসে এই বাড়ীতেই ঐ বুড়ো বকুল গাছটায় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছিল। আর দু' পুরুষ এগিয়ে গেলে দেখা যায়, কাশীর ঠাকুর্দ্দা ভবানীপ্রসাদ ছিলেন দুর্দ্দান্ত কাপালিক,—কবন্ধ শবের ওপর প্রতি সন্ধ্যায় বাবমারীর শ্মশানে এক লক্ষ মন্ত্র জপ করে তিনি অন্ন গ্রহণ করতেন। তাঁর এই বামাচার সাধনার আসনটি যোটাবার সম্বন্ধে অতি ভয়াবহ সব গল্প কিম্বদন্তী হয়ে আছে। তস্য পিতা নটহরি ছিলেন দেবীচৌধুরাণীর সমসাময়িক,—ডাকাতের সর্দ্দার। এই চাটুয্যে-পরিবারের শাখা-প্রশাখা ধরে যেখানেই যাওয়া যায়, কোনখানেই ঠিক সহজ মানুষ পাওয়া যায় না। কেউ বলে এই যক্ষিণীর মত বাড়ীর গুণেই মানুষগুলো এ-রকম, কেউ আবার বলে এতগুলি বাতিকগ্রস্ত মানুষের আশ্রয়দোষেই বাড়ীখানা এ-রকম অপয়া।

আরও একটা কারণ আছে শোনা যায়, যার জন্তে চাটুয্যে-বংশে না কি এমন নির্ব্বংশ হবার অভিশাপ অর্শেছে। জনরব আছে, নটহরি ঠাকুর চন্দনার গোঁসাইদের এক রূপলাবণ্যবতী মেয়ের অসাধারণ রূপে মুগ্ধ হয়ে আর কোন উপায়ে না'পেরে বিয়ের ভরা বাসর থেকে তাকে লুট করে আনেন। নটহরির দ্বারা নির্য্যাতিতা সেই মেয়ে পথে যেখানে পাল্কী থেকে লাফিয়ে জলে ডুবে মরে, সেইখানটাকে এখনও লোকে কনে বউএর দ' বলে। মরবার আগে আগুনের শিখার মত রূপসী ও তেজস্বী সেই কনে-বৌ শাপ দিয়ে যায়, যে, চার পুরুষে এই চাটুয্যে-বংশ নির্ব্বংশ হবে। সেই থেকে এই রাক্ষসী বাড়ী কাশীর কুলের মানুষগুলিকে একে একে খেয়েছে। সবাইয়ের ঘাড় ভেঙে এখন বিয়েপাগলা কাশীর তিনটি বউকে মেয়ে চতুর্থটির জন্ত না কি ওৎ পেতে রয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চাটুয্যে-বাড়ী ও কাশীপ্রসন্ন

কাশীপ্রসন্ন ও এই চাটুয্যে-বাড়ী যেন এক গোত্রের একই ধাতুর গড়া জীব। দু'জনে কোথায় মিশ খেয়েছে বলে দু'জনেই দু'জনকে ধরে আজও টিঁকে আছে। কাশী সদাসর্ব্বদা রূপার গড়গড়ায় তামাক খায়, বেশ একটু খামখেয়ালী, সহজে রেগে যায়, সহজে মেতে যায়, আবার কখন কখনও একেবারেই গুম হয়ে থাকে। আমাকে সে বড় মানে, দেখলেই লাফিয়ে উঠে বলে, "দাদা যে, হ্যা হ্যা হ্যা, এস দাদা, এস, আজ আমার সুপ্রভাত।" তার চোখের চাউনী কেমন ফ্যালফেলে, হাসিটা একেবারেই ক্ষ্যাপাটে, নইলে চেহারাখানি বেশ পারসী রাজপুত্তুর গোছের। তার গায়ে পড়ে আলাপ-আপ্যায়নের জ্বালায় পাড়ার লোকে কখন কখন অতিষ্ঠ হয়, বকেও সে বেজায় বেশি।

কাশীর আর কোন পাগলামী নেই,—এক পাগলামী বিয়ে করা। সে এক সর্ব্বনেশে ব্যাপার। বিয়ে তো নয়, নারীহত্যা। খুলে বলি। সবাই জানে, এ বাড়ীতে বউ বাঁচে না,—আজ আট দশ বছরে এদের তিন ভাইয়ের দশটি বউ একে একে গঙ্গাজলী হয়েছে। মহিমারঞ্জনের ছিল চার সংসার, নসিবপুরের হাঙ্গামার আগেই তারা একে একে চিতায় ওঠে। নিরুদ্দিষ্ট বিমলারঞ্জনের দু'বার বিবাহ হয়—তারাও আজ আর ইহ সংসারে নেই। কাশীরও তিনবার হয়ে গেছে। এক একটি চিতা নিভে—আর বিয়ের রসনচৌকী, নহবৎ বসে। এই কুলনাশা রাক্ষসী বাড়ী, কুলের যে যেখানে ছিল সবাইকে খেয়ে, শেষে একে একে বউগুলির ঘাড় ভেঙ্গে নিশ্চিন্ত হয়েছে। এখন একা কাশী। কিন্তু এই পাতলা গৌরবর্ণ ক্ষ্যাপাটে মানুষটার কোথায় কি আছে কে জানে যা' দাঁতের মাঝে ভাঙতে গিয়ে কালীদহের চাটুয্যে-বাড়ী চমকে আছে।

পাগলা কাশীরও রোখ—বিয়ে করবেই, আর বাড়ীখানারও রোখ—কাশীর বউ এলেই তিন মাসের মধ্যে তাকে খেয়ে আবার নিশ্চিন্ত মনে আকাশে ঝাউপাতার কালো চুল এলিয়ে পা ছড়িয়ে বসবে। তবু এই সর্ব্বনাশা কুলে মেয়ে দেবার প্রস্তাবের অভাব নেই। এক [illegible]

ওপর এত বড় বাড়ী, ব্যাঙ্কে টাকা, জমিজমা,—কন্যাকর্ত্তাদের প্রাণের দায়, জাতের দায়, তার ওপর লোভ যে আবার সব চেয়ে বিষম দায়।

নিশুতি অট্টালিকা,—দ্বাদশচূড়া মন্দির, দীঘি, নারকেল-বাগান, কাছারী-বাড়ী, সবই এক রকম নির্জ্জন নিশুতি,—দু'একজন ছাড়া আমলা গোমস্তা বড় একটা নেই; থাকার মধ্যে বুড়ো চাকর মাধব, দূর সম্পর্কের মামা গঙ্গাধর ও দেউড়ীর দ্বারওয়ান তেওয়ারীজী। কেবল বারবাড়ীতে দু' একটি ঘরে সন্ধ্যার পর আলো জ্বলে,—সেইখানে তার বেহালা সেতার আলবোলা ঝাড় লণ্ঠন ফরাস তাকিয়া সরঞ্জাম নিয়ে কাশীপ্রসন্ন বাস করে। মামার কাজের মধ্যে থক্ থক্ করে অহর্নিশি কাশা ও খড়ম পায়ে সংসারের তদারকে ভিতর বাহির করা,—মাধবের কাজ আহার নিদ্রা ভুলে কাশীর সেবা,—আর তেওয়ারীজীর কাজ পাকা মাথা দুলিয়ে চারপাইয়ে বসে তুলসীদাসী রামায়ণ পাঠ। আজ বছর দুই কাশীর গৃহশূন্য, আবার বিয়ের কথা চলছে। এক দিকে কনে বউএর শাপ, আর অন্য দিকে কাশীর জেদ, পিছনের কোন গোপন অদৃশ্য জগতের শক্তি ও দৃশ্য জগতের এই ক্ষ্যাপা মানুষে এই টানাটানি, এই টাগ্ অব ওয়ার—ফলে আবার কার প্রাণ যায় দেখ।

কাশীকে একরকম পাগলই বলতে হবে। কারণ, কাজের মধ্যে তার দুই কাজ,—একবার করে বিয়ে করা, আর স্ত্রীকে চিতায় তুলে দিয়ে ঘরের দোর বন্ধ করে যোগসাধনা। তার প্রাণ-নদীতে জোয়ার এলেই সে ভেসে যায়, আর ভাটা পড়লেই সে ডাঙায় ওঠে। কিছু দিন ধরে দিন নেই রাত নেই অন্ধকার ঘরে খিল দিয়ে আসন প্রাণায়ামের কৃচ্ছ্রসাধনার পর তার অন্তর্জ্জগতের নন্দী-ভৃঙ্গী-শাসিত তপোবনে হঠাৎ বসন্ত দেখা দেয়, তার মন-বিহঙ্গ কত কি মিঠা ঝঙ্কারে সুর লহরে সাধ আকাঙ্ক্ষার গানে আকাশ ভরে ডেকে ওঠে। তার হৃদয়-নদ ভাবের ঢেউ-ভাঙা জলে ফুলে ফেঁপে অকূল পারাবারের মত দেখায়। কোথা থেকে অহেতুক কান্না অকারণ ভালবাসার টান অনর্থক খুঁজে বেড়াবার ত্বরা তাকে ঘর বাহির করে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। তখনই সে বোঝে তার সঙ্গিনী চাই, আর একলা থাকলে চলবে না, তাকে তা' হ'লে পাগল হয়ে যেতে হবে। এ কি বল দেখি? এ কি ঐ নরখাদক বাড়ীর ক্ষুধা, না, কাশীরই পাগল প্রাণগিরির বর্ষাঢালা কামনার ঘোলা জলের বন্যার ঢল নামা? আমার বোধ হয় দুইই। ঐ ভুখা বাড়ী-রাক্ষসীও আহার চায়, আর কাশীর প্রাণ-ব্যাঘ্রও শিকার খোঁজে,—ওরা দু'জনেই একই পাতালপুরীর যক্ষ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিয়ের ঘোঁট ও অসুরাশ্রয়

কালীদহ আর কদমপুর পাশাপাশি গ্রাম,—মাঝে বাবলা, আশশ্যাওড়া, গাব গাছে, আর গুলঞ্চ ও কুঁচলতায় ছাওয়া কেয়া ফনীমনসা আর শেয়াল কাঁটায় দুর্ভেদ্য ঐ নবী পীরের কবরডাঙ্গাটুকু। ছেলেবেলায় কাশী আর আমি খেলার সাথী ছিলাম,—বড় হয়ে কানপুরে প্রফেসারী নেবার পর বহু দিন দেশে আসিনি। এবার গ্রামে পৌঁছেই কাশীর বিয়ের ঘোঁটের মধ্যে পড়ে গেলুম। কদমপুর রাজসাহী থেকে বেশি দূর নয়, এখানেও তরুণদের নতুন আদর্শের আঁচ লেগেছে। অভিলাষ গ্রামের ছেলেদের চাঁই,—চল্লিশ বছরের আধপাগলা কাশীর সঙ্গে সে পনর বছরের দুর্গা-প্রতিমার মত মেয়ে তাপসীর কিছুতেই বিয়ে হতে দেবে না, এই নিয়ে ঘোঁট। এক দিকে অভিলাষ, নিকুঞ্জ, পরিমল, শশিভূষণ, মোনা, ভূতো, ঘুণ্টু, আদি চতুর্দ্দশ রথী; আর অন্য দিকে গ্রামের বুড়োর দল। অভিলাষ আমাকে ধরে পড়লো,—কাশীকে বোঝাতে হবে।

পাগল ঘাঁটানো কোন কালেই সুখকর ব্যাপার নয়। আমি তাই এদিককার সমাজের সমাজপতি দুর্গাগতি ন্যায়রত্নের বাড়ী গিয়ে প্রথমটা উঠলুম। দুর্গাগতি গ্রামের সবার রাঙা ঠাকুর্দ্দা, তাপসীদের তিনিই অভিভাবক,—এ অঞ্চলে তাঁর যোগসিদ্ধ পুরুষ বলে খ্যাতি আছে। সংস্কৃতে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, অতি সৌম্য রূপ, বিশাল দীর্ঘাকার চন্দন-চর্চ্চিত মূর্ত্তি, রাঙ্গা আয়ত চোখ, কথার ধরণ একটু নাটুকে। আমি ও অভিলাষ প্রণাম করে বসতে, তিনি পুঁথা থেকে মুখ তুলে একটু হেসে ডাকলেন, "তপু, ও তপু, পান দিয়ে যা'। তার পরে বাবাজীবন, এতদিন পর দুর্ভাগিনী পল্লীমাকে মনে পড়েছে?"

তপু পানের বাটা নিয়ে এল। ওর আসল নাম কাঞ্চন-মালা,—ডাক নাম তাপসী। তা' ওর এই [illegible]

সার্থক হয়েছে,—কাঞ্চনমালাই বটে,—দুধে আলতায় ছিপছিপে লম্বা শরীরখানি তার কাঞ্চনমালাই বটে; কিন্তু এ স্বর্ণহার যেন কোন্ দেবতার পূজার বেদীর উপর দুলছে। মেয়ের মুখে অত রূপের মাঝেও টান নেই, এ যেন শীতল ছবি, পাথরে কোঁদা প্রতিমা, তাপসী উমার সদ্যস্নাতা তপোমগ্ন রূপ; তেমনি শান্ত, তেমনি শুচি, তেমনি ইহবিমুখ। আমার সঙ্গে অভিলাষকে দেখে রাঙা ঠাকুর্দ্দা আমাদের অভিপ্রায় বুঝেছিলেন, খপ্ করে তপুর হাতখানা ধরে টেনে কোলের কাছে বসিয়ে বললেন, "দেখো প্রবোধ, মা আমার সাক্ষাৎ উমার অংশ, ছেলেবেলায় এক সন্ন্যেসী ওকে হাত দেখে বলেছিল ও রাজরাণী হবে; তোমরা সব ইংরিজিনবিশ ইয়ং বেঙ্গল, এ-সব মান না,—কিন্তু এ সত্যি। হ্যাঁ, মা, তোর রাজপুত্তুরকে দেখে চিনবি তো? য়্যাঁ?"

তপু যেমন শান্ত তেমনি সপ্রতিভ, ঠাকুর্দ্দার কথায় তাঁর গা ঘেঁসে বসে একটু ম্লান হাসি হাসলো মাত্র। খদ্দরের চাদরখানা ভাল করে কাঁধের ওপর ফেলে অভিলাষ বললো, "আপনার কাছে কিন্তু এটা আমরা মোটেই আশা করি নি, রাঙা ঠাকুর্দ্দা। এ কাজ কি শোভন হচ্ছে, না ধর্ম্মসঙ্গত হচ্ছে?"

তাড়াতাড়ি খুব জোরে একটিপ নস্য নিয়ে ঠাকুর্দ্দা তপুর চিবুকে হাত দিয়ে তার মুখ তুলে বললেন, "বল্ মা, তুইই এ কথার উত্তর দে। মা আমার কত রূপে কত ঘটে আস্‌ছিস্ দানব দলনে—যত অশুভ যত অকল্যাণ নাশ করতে কত বার জন্ম নিচ্ছিস, আমার পাগলা কাশীর অশুভ তুই নাশ করবি নে মা? পাষাণী পাষাণের মেয়ে তার সর্ব্বনাশ বসে বসে দিব্যি দেখবি,—হ্যাঁ মা, বল্, তুইই বল্?"

অভিলাষের সাঙ্গপাঙ্গ সবাই উস্‌খুস্ করছে,—মেয়েটির সামনে কেউ ভাল করে কথাটা পাড়তে পারছে না। তপু কিন্তু প্রায় অপলক শান্ত চক্ষে একদৃষ্টে ঠাকুরদার দিকে চেয়ে বসে আছে, যেন পাথরের কোঁদা রূপ, ওর যেন লজ্জা সঙ্কোচ মানব-ধর্ম্ম—কিছুই নেই। আমি সকলের অস্বস্তি দেখে বললুম, "এরা আপনাকে কিছু বলতে চায়।"

ঠাকু। বেশ বেশ, যাও মা, আমার পুজোর জোগাড় কর গে, আজ আমরা দু'জনে অন্নপূর্ণার মন্দিরে পুজোয় বসবো। কেমন?

তপু উঠে চলে গেল, যেন যন্ত্র-চালিত, যেন কি মন্ত্রপূত সচল যজ্ঞশিখা,—এত বাতাসেও অকম্পিত, অম্লান, উর্দ্ধশিখ।

অভি। এইটুকু মেয়ে, এত রূপ, এত গুণ, আর ঐ চারবরে প্রায় চল্লিশ বছর বয়সের ক্ষ্যাপা কাশী, তার চেয়ে ওকে মেরে ফেলুন না।

এতক্ষণে সব ছেলেরা নড়ে চড়ে বসে একটা অস্ফুট গুঞ্জন তুললো,—কেউ বললো, "এ স্ত্রীহত্যা," কেউ বললো, "এ কিছুতেই হতে দেব না," কেউ বললো, "ছি ছি"। রাঙা ঠাকুর্দ্দা তাঁর কান-অবধি টানা আরক্ত চোখ মেলে হাত নেড়ে বললেন, "তোমরা ভায়া বোঝ কোর্টসিপ আর প্রেম, নারী-পুরুষের চরম উদ্দেশ্য ঐ যৌন সম্বন্ধ,—বিয়ে মানে ঐ আদিরস—"

অভি। আদিরস তো রয়েছে; স্বামী স্ত্রীর ধর্ম্ম তো প্রেমেরই ধর্ম্ম, ওটা বাদ দিতে চান?

ঠাকু। শৌচাদি ক্রিয়াও তো রয়েছে। তা' বলে সেটাকে তো মুখ্য করা চলে না। ধর্ম্ম বলছো? ধর্ম্ম? ধর্ম্মের কি বোঝ? তোমার ধর্ম্ম যা, ঐ নিরু নাপিতের ধর্ম্ম কি তাই? বেল গাছে বাতাবী লেবু ফলাবে বাবা? এই যে এতবড় এ মেয়ে কি বস্তু, তা দেখ্‌ছো না? দুনিয়ার চক্র ঘুরছে, এর শক্তিকে তোমাদের দু'পাতা লজিকের প্যাঁচে গো-টু-হেল্ করে দিয়েছ ভেবে মনে করেছ সে শক্তি সত্যিই নেই? সত্যি সত্যিই নেই?

অভি। আমাদের বুদ্ধি, নীতিজ্ঞান, ভাল মন্দ বিচার—এও তো সেই শক্তিরই দান?

বাইরে খটাখট পায়ের শব্দে সবাই ফিরে দেখলো স্বয়ং কাশী। সুগৌর বর্ণ, একেবারে তপ্ত কাঞ্চন যাকে বলে। সরু লম্বা মুখ, ধারাল নাক, পাতলা রাঙা ঠোঁট, যেন তাম্বুল-রাগরক্ত, ছাগল দাড়ি, কপালে নীল শিরা জেগে রয়েছে, বড়ই রোগা, কিন্তু তেমনি খরখরে, দুর্দ্দম, সাহসী ও তেজস্বী,—যেন প্রাণের বিদ্যুতে ভরা সোনায় গড়া মানুষ,—কেবল চোখ দু'টো ফ্যাল্‌ফ্যালে, কেমনতর অনির্দ্দিষ্টতারক, অস্বাভাবিক রকম উগ্র ও জ্বলজ্বলে। আমায় দেখে সে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বসে পড়লো, বললো, "য়্যাঁ, য়্যাঁ, দাদা! দেশে এসেছ আর এখনও আমার কাছে যাও নি? য়্যাঁ, কবে এলে! আজ, কাল, য়্যাঁ, তাই তো, ঠিক তেমনিটি আছো, শুধু একমাথা টাক। চলো চলো, আমার ওখানে চল,

আজ ওখানে খাবে। হা হা হা, ভুতুড়ে বাড়ী, লক্ষ্মীহীন গৃহ, কি জান দাদা, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। তা গৃহিণী আমি করবই। হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, ভূত! দেখে নেব কতবড় ভূত সে। আর ভূতের দোসর মানুষ, তোমরাও চলে এসো,—কে কোথায় আছ,—একদিকে তোমরা সবাই, আর একদিকে একা ক্ষ্যাপা কাশীপ্রসন্ন চাটুয্যে।" অভিলাষের দিকে কটমট করে চেয়ে সে কাণে তালা লাগিয়ে সশব্দে তাল ঠুকলো।

রাঙা ঠাকুর্দ্দা বসে বসেই সরে এগিয়ে এসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, স্নিগ্ধ হাসি হেসে বললেন, "আমি আছি তোর দিকে, কাশী, আমি আছি; শুধু আমার কথা শুনে চলিস্, তোর বাড়ী আমার তাপসী-মার পায়ের স্পর্শে দেব-মন্দির করে দেব।

কাশী একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ঠাকুর্দ্দার পায়ের ধুলো বার বার মাথায় নিতে লাগলো। কেমন আলগা উদ্বিগ্ন হাসি হেসে ফ্যালফেলে চোখে চেয়ে বলতে লাগল, "তুমি? তুমি আমার মহামুনি বশিষ্ঠ, তুমি আমার কুলের ঠাকুর, আমার স্বয়ং মদনমোহনের মানুষ রূপ, মানুষ বিগ্রহ বাবা, চল সবাই চল, আমার বাড়ী চল। দাদা এসেছেন আর আমার ভাবনা কি? দেখবে না, দাদা, আমার বাড়ী দেখবে না? কি রাজপুরী কি শ্মশান হয়ে গেছে, একবার দেখবে না? এ কার অভিশাপ বাবা, এ কার অভিশাপ, একটা মেয়ের? একটা মরা মেয়ের? তাতেই এত আগুন, এত বিষ,—মরা মানুষের এমন সোণার অযোধ্যা শ্মশান করা রাগ—য়্যাঁ? আর সে দুষ্কার্য্য তো ঠাকুর্দ্দা নটবর চাটুয্যে করেছিলেন, তার জন্যে কাশীকে উদ্বাস্ত করবি? য়্যাঁ য়্যাঁ য়্যাঁ!"

এই ক্ষ্যাপা মানুষটির মাঝে যেন কি মধু আছে। ছোট শিশু যেমন তার আধ আধ ভাষা ও রূপ নিয়ে মায়ের বুকের মধ্যে তোলপাড় বাধায়, হামাগুড়ি দিয়ে কোলে এসে ওঠে,—এ যেন আমার মর্ম্মের অন্তরে তেমনি করে ঢুকে এল। আমি নিঃশব্দে তাকে জড়িয়ে ধরে বসে রইলাম। অভিলাষরা নীরবে একে একে উঠে যে যার চলে গেল।

হঠাৎ আচমকা উঠে বসে কাশী বলে উঠলো, "আমি কিন্তু বলে রাখছি, সে কত বড় কনেবউ আমি একবার দেখে নেব। এতবড় বংশটাকে লোপ পাওয়ালে; য়্যাঁ—স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী, আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা, আমি কাশীপ্রসন্ন চাটুয্যে, নটহরি চাটুর্য্যের বংশ, মহিমারঞ্জনের ভাই,—এবার আমার যদি বউ মরে, তা হ'লে ঐ বাড়ী মায় ভিত উপড়ে ফেলে সেই ইট চুণ সুরকী গাড়ী বোঝাই দিয়ে কনে বৌএর দ' বুজিয়ে ভরাট করে দেব, তবে আমার নাম কাশী। আমার সঙ্গে চালাকী? মন্তর তন্তর যাগ যজ্ঞ যা' করবার বাবা করতে চান করুন, আমার কিন্তু এক অস্ত্র—বলং বলং বাহুবলং। ভগবানকে পেলে লাঠির চোটে আমি একবার টিট করে দিই। কনে-বৌ কেয়া চিজ হ্যায়?

ঠাকু। পাগল! বাতাসের সঙ্গে লড়াই করে পারবি কেন? ভগবান যেমন অপার অচিন্ত কর্ম্মা মহাশক্তির পারাবার হয়ে সর্ব্বত্র রয়েছেন অধোউর্দ্ধ ভরে অথচ তিনি নাগালের বার, এরা যে সেই জাতীয় ব্যাপার রে। সূক্ষ্ম শক্তির সঙ্গে লড়াই সূক্ষ্ম অস্ত্রেই হয়। তোর স্থূল লাঠি সেখানে পৌছবে কি করে? এই যে এত বড় চাটুয্যে বংশ ছারখার হয়ে গেল, সে কেবল ঐ বংশে মানুষগুলোর প্রাণভূমিতে এক দানবী শক্তির আশ্রয় হয়েছিল বলেই না। সেই শক্তিকে এই কুলের যে মানুষ জয় করবে, সেইই এ অসুরাশ্রয় ছাড়াতে পারবে,—এ বংশ রক্ষা করতে পারবে,—ঐ রাজপুরী আশ্রয়-দোষ-শূন্য করতে পারবে। সোণার কৌটায় যেমন রাক্ষসীর প্রাণ ধরা থাকে, সেই কৌটার কীটটাকে মারতে পারলে রাক্ষসী যেমন মরে বাতাসে মিলিয়ে যায়, কাশীতে তেমনি এই আশ্রয়ী শক্তির বীজ রয়েছে। কাশী, তোকে আমি তিনবার বলেছি, তিনবার আমার কথা রাখিস নি, তার ফলে তিনটি মেয়ের প্রাণ গেছে। কই, কি করলি, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে কোন্‌টাকে বাঁচাতে পারলি? এবার আবার বলি, তাপসী মা আমার ও তিন জনের চেয়েও শুদ্ধ অস্ত্র, এ মেয়ে ভোগের সামগ্রী নয়। একে ও-ভাবে স্পর্শ করবি নে, শুধু একে জীবন-সঙ্গিনী করে সোণার সিঁড়ির মত ব্যবহার করবি, ভোগের কাদা থেকে জ্ঞানপ্রেমের জ্যোতির ডাঙায় উঠবার জন্যে। তুই বাবা, দেবাসুরের দ্বন্দ্বভূমি হয়ে এমন ক্ষ্যাপাটে হয়ে গেছিস; একদিকে হ', দোটানায় থাকিস্ নে, দেবতার কোটে আয়, তা' হ'লে মা তাপসীর আধারে যে শক্তি রয়েছে, তা তোর সহায় হবে। চাটুয্যে-বাড়ী ও চাটুয্যে-বংশ অসুরাশ্রয়-মুক্ত হবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তাপসী

মানদা। ও তপি, এককাঁড়ি চাল নিয়ে কোথা যাস্? এই দেখো মেয়ের আক্কেলখানা একবার, কোথায় বুঝি এক বিটলে সাধু এসে জুটেচে, আ মলো যা। এমন করে তো আর চলে না, বাপু।

তপুরা ছিল বড্ড গরীব। তার মা মানদা তপুকে ছ' মাসেরটি কোলে নিয়ে বিধবা হয়। তার স্বামী সাগরচন্দ্র ইংরাজি শিখে বাপ-পিতামহের অবশিষ্ট আট দশ ঘর যজমান ছেড়ে দেয়। সেই থেকে তাদের দুরবস্থার আর অবধি ছিল না। সাগর কলকেতায় থেকে ছেলে পড়িয়ে মানদাকে মাসে মাসে আটটি টাকা পাঠাতো এবং নিজে সংস্কৃত কলেজে পড়তো। তারা কুলীন ব্রাহ্মণ, তার বাবা মাধবীনাথ বিদ্যাভূষণের নাম এ অঞ্চলে খুব,—অতবড় পণ্ডিত বড় একটা সচরাচর দেখা যায় না। তিনিও কেমন একরকম উল্টো মানুষ ছিলেন, নিজের শতাবধি ঘর যজমানের কাছে নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে সামান্য সাহায্য ছাড়া নিতেন না; অথচ তাদের কল্যাণে পূজায় পার্ব্বণে শান্তি স্বস্ত্যয়নে খাটতেন অবিশ্রান্ত। এমন ধর্ম্মপ্রাণ নির্লোভ মাটির মানুষ বড় একটা চোখে পড়ে না। তাঁর একমাত্র ছেলে সাগর যখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হয়ে বাড়ী এসে বাপের হাতে জলপানির টাকা দিল, এবং যজমানী ছেড়ে দিতে বাবাকে অনুরোধ করলো, তখন সেই প্রতিভায় ভাস্বর সুন্দর মুখশ্রী সদানন্দ ছেলেকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে মাধবীনাথ তাকে প্রতিশ্রুতি দেন, যে, সে উপার্জ্জনক্ষম না হওয়া অবধি তিনি মাত্র দশ ঘর যজমান রাখবেন, তার পর তাও ছেড়ে দেবেন। তার তিন বছর পরে মাধবীনাথের মৃত্যু হয়, আর তার আরও তিন বছর পর সংস্কৃত কলেজ থেকে এম্-এতে প্রথম হয়ে অধ্যাপকের চাকরী নিয়ে বাড়ী এসে সাগরও একদিন পূর্ণিমা রাত্রে হৃদরোগে মানদার কোলে দেহত্যাগ করে।

মানদা এই চল্লিশ বছর বয়সে এত দুঃখে দারিদ্র্যেও তপুর মতই সুন্দরী, যেন জগদ্ধাত্রীর প্রতিমাখানি। এত কষ্টে অভাবের মধ্যেও সে স্বামীর প্রতিজ্ঞা রেখেছিল, পাড়ায় ঘুঁটে বেচে ধান ভেনে বাড়ীর পিছনের জমিটুকুতে শাকসব্জী আজ্ঞে নিজে আধপেটা খেয়ে সে তপুকে মানুষ করেছে, কিন্তু যজমানের দান নেয় নি। মানদা নীরব মানুষ, দেখে মনে হয় বুঝি সাত চড়ে কথা কাড়বে না; কিন্তু ঐ বোবা মানুষটির মধ্যে কি আগ্নেয়গিরির দ্রব অগ্নিনদী আছে, তা' যে তাকে কখনও ঘাঁটিয়েছে সেই জানে। তার চোখ দু'টো যখন জ্বলে ওঠে, মুখখানা রাঙা হয়ে যায়, হাত পা ঠোঁট থরথর করে রাগে কাঁপতে থাকে, তখন রাঙা ঠাকুর্দ্দাও পালাতে পথ পান না। এ জীবনে দুঃখের সাগরে বসতি করে ঐ একটি মানুষের কাছে মানদা এ পর্য্যন্ত হাত পেতে সাহায্য নিয়েছে, সে ঐ ঠাকুর্দ্দা। ওরা দু'জনে ছেলেবেলাকার খেলার সাথী। কাশী থেকে সংস্কৃত শিখে আট বছর পর ফিরে এসে রাঙা ঠাকুর্দ্দা দেখেন, মানুর বিয়ে হয়ে গেছে। সেই থেকে ঠাকুর্দ্দার সংসার করা আর হয় নি। তাই এখন তপু ও মানদার সুদিন-দুর্দ্দিনের ভরসা তিনিই।

কাশীর বাড়ীখানার ঝিলের পিছন দিকটা যে নবীপীরের কবরডাঙা ছুঁয়ে আছে তারই গায়ে তপুদের বাড়ী। তপু মায়ের রূপের সঙ্গে স্বভাবটিও পেয়েছিল, সে যেন ম্লান সন্ধ্যার নীরব আকুতি, নির্জ্জন কোজাগরী পূর্ণিমা নিশির নিঃশব্দ প্রকাশ, মূক স্তব্ধ রক্তকমলের বনের বিজনতার মাঝে মগ্ন নিবিড় বিলাস। অধিকন্তু সে মায়ের মত রাগী নয়, বরঞ্চ শান্ত ধীর এবং রাঙা ঠাকুর্দ্দার মত ঠাকুর পূজার বাতিকগ্রস্ত। সে বনজঙ্গল ভেঙে খাল বিল সাঁতরে ফুল তুলে আনতো; কোথায় রে বক ফুল, কাঞ্চন, টগর, স্বর্ণজুঁই, কোথায় শ্বেতপদ্ম, লাল কুমুদ, পাঁশুটে জবা, ডবল রজনীগন্ধা, খুঁজে খুঁজে সে ঠাকুর্দ্দার পুষ্পাঞ্জলির যোগান দিত, চন্দন ঘষে আনতো, কোশাকুশি পঞ্চপ্রদীপ, ধূপদানি মাজতো, আর পূজার সময় গলায় আঁচল দিয়ে যোড় হাতে গদগদ ভক্তিরসে আর্দ্র হয়ে বসে থাকতো। রাঙা ঠাকুর্দ্দা তপুর দিকে চাইতেন, আর পূজা করতে করতে তাঁর মনে হ'ত, এই বালিকা রূপে মা এসে তাঁর পূজা নিচ্ছেন। বাল্যকালের আর একটি এমনি ছবি স্মৃতির পটে জ্বলে উঠে তাঁর বুক ভরে আনতো, পাড়া কাঁপিয়ে সিংহগর্জ্জনে তিনি হাঁক দিতেন, "জয় মা, আনন্দময়ি, মহামায়া সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী!"

লোকে ফিস্‌ফাস্ করে বলতো, ঐ ঠাকুর্দ্দা মেয়েটাকে কি তন্ত্রমন্ত্র করেছে, নইলে অতটুকু মেয়ে এমন বোবা হয়? ও

বয়েসে মানুষ খেলাধূলাও তো করে, সম-বয়সীদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টায় যোগ দেয়, দু'টো সোণা-দানা পরে। এ মেয়ে যেন কি, ঘুমের দেশের রাজকন্যা যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তপু ভয় কা'কে বলে জানে না, দিনে রাত্রে সন্ধ্যায় তার পদ্ম বা কুমুদের দরকার হ'লেই সে বনজঙ্গল ভেঙে চাটুয্যে-বাড়ীতে ছোটে। চাটুয্যেদের দীঘির কাজল-কালো জল তপুকে যেন টানে, ঐ ভাঙা সারনাথের স্তূপের মত বাড়ীখানা কি রহস্যের কৌটার মত তাকে হাতছানি দেয়, ঘৃতকুমারী পাথরকুচির বন মাড়িয়ে বেউড় বাঁশের ঝাড় ভাঙা মন্দিরগুলির দুয়ারে দুয়ারে এসে সে দাঁড়ায়। আর ভরা চোখে কালো পাথরের শিবলিঙ্গ ও হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তির দিকে চেয়ে থাকে। গাঁয়ে সাধু সন্ন্যাসী এলে তপুর সঙ্গে মায়ের ঝগড়া বেধে যায়; কারণ ভাঁড়ার ঘর থেকে চাল ডাল যা' হাতের কাছে পায় তপু নিয়ে সরে পড়ে; আর সেই সব উপঢৌকন আঁচলে করে সাধুর কাছে গিয়ে হাজির হয়। রাঙা ঠাকুর্দ্দার কাছে যখন তখন পয়সার জন্যে বায়না ধরে। আজ এই ব্যাপার নিয়েই মা তর্জ্জন করছিল, আর মেয়ে নিঃশব্দে সরে পড়ছিল।

কাশীদের দ্বাদশচূড়া মন্দিরে শুধু মদনমোহনের পূজা হ'ত, আর সব বিগ্রহের কাছে দু' চারটে ফুল নৈবেদ্য ফেলে দিয়েই গোবিন্দ পূজারী কাজ সারতো। এই মদনমোহনের নাটমঞ্চের কোণে একটি চোর কুঠুরী ছিল, তারই মধ্যে কাশী যোগসাধনা করতো। একদিন পড়ো বাড়ীখানায় ঘুরতে ঘুরতে তপুর কৌতূহল হয়, সে দেখবে—কাশীদা' ঐ ঘরটায় দোর দিয়ে কি করে। দুয়ারের ফাটলে চোখ রেখে তপু দেখে কাঠের মত সোজা হয়ে বসে কাশী চোখ বুজে রয়েছে। এইভাবে তিন ঘণ্টা কেটে যায়,—ভিতরে ধ্যানমগ্ন কাশী, আর বাইরে দরজার ফাটলে চোখ রেখে বসে তপু। এই দৃশ্য দেখতে তপু রোজ আসতো, কাশীদা'র শান্ত ধ্যানমগ্ন রূপ দেখতে তার বড় ভাল লাগতো। কি একটা মোহে তাকে ঐখানে পেয়ে বসতো, উঠতে দিত না। সে কিন্তু কেবল যতদিন কাশীপ্রসন্নের ঐ-রকম সাধনার বাতিক থাকতো ততদিনই,—কাশীও চঞ্চল হয়ে যোগ ছেড়ে বেরিয়ে পড়তো, আর তপুও সে অঞ্চল থেকে উধাও হতো।

রাঙা ঠাকুর্দ্দা একদিন কাশীর খোঁজে এসে এই অবস্থায় তপুকে ধরে ফেলেন। যেন কি চুরি করতে গিয়ে বামাল শুদ্ধ ধরা পড়েছে, এমনিভাবে লজ্জায় রাঙা হয়ে, লতার মত শরীরখানি আঁকিয়ে বাঁকিয়ে ঠাকুর্দ্দার হাত ছাড়িয়ে তপু পালিয়ে বাঁচে। তার পর থেকে ঠাকুর্দ্দা তপুকে নিয়ে ধ্যান শেখাচ্ছেন। এ বয়সে মানুষের মনটি থাকে—নরম পাঁক মাটি, যে রূপটি দাও নিখুঁৎভাবে সেই রূপই নেয়; যেন ফুটন্ত সূর্য্যমুখী, যে দিক দিয়ে আলো পায় সেই দিকেই আপনি ঘুরে দাঁড়ায়; নধর কচি বল্লরীর মত, যেদিকে আশ্রয় থাকে কচি লতাও সেইদিকেই আপনি এগিয়ে যায়। ধ্যানে বসতে না বসতে তপু নানা দৃশ্য, দেবতার রূপ, অপূর্ব্ব আলোয় আলো জগৎ, পাহাড়, নদী, আগুন, মন্দিরের চূড়ায় উষার সোণালী আলো, সোণার থালার মত চন্দ্র, সূর্য্য, মেঘের গায়ে বিদ্যুৎ—এমনই সব দেখতো। শুনে ঠাকুর্দ্দা বলতেন, "এসব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত, মা আমার ছিল মীরাবাঈ, ব্রজভূমের গোপিনী।"

একদিন বাসীপুকুরের কাজ সেরে গা ধুয়ে ভিজে কাপড়ে মানদা এসে দেখে—মেয়ে দেয়ালে হেলে দাঁড়িয়ে, তার চোখে ধারা বইছে, পলক নেই। "ও কি লো, তপি, ও কি? ওখানে অমন করে কাঁদছিস যে?" বলে মানদা তাড়াতাড়ি মেয়ের কাছে এল, গায়ে হাত দিয়ে দেখলে, শরীর অবশ কাঠ, ঠেলা দিলে পড়ে যায়। ধরাধরি করে মেয়েকে সে মাদুরে শুইয়ে দিল; চোখ খোলা কিন্তু পলক নেই, হাত পা এত শক্ত যে নোয় না। উতলা হয়ে মেয়েকে খানিকটা নেড়েচেড়ে মানদা ছুটে বেরিয়ে গেল,—রাঙা ঠাকুর্দ্দার কাছে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে একনিঃশ্বাসে বললে, "রাঙা ঠাকুরপো, শীগগির চলো, তপুর যেন কি হয়েছে?"

রাঙা। য়্যাঁ, কি হয়েছে, জ্বর হয়েচে?

মান। না গো না, তুমি শীগগির এসো বাপু, মেয়ে কাঠ হয়ে আছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক শুশ্রূষার পর তপুর দেহে সাড় এলো, সে চোখ মুছে উঠে বসলো। অনেক জিজ্ঞাসাবাদে যেটুকু জানা গেল তার মর্ম্ম হচ্ছে এই, যে, মায়ের কাছে খেতে এসে ওর হাত পা গা হঠাৎ কেমন ঝিম ঝিম করতে লাগলো, শরীরে যেন সব স্থির হিম হয়ে আসছে, একটা বড় ঢেউয়ে তাকে একবার আকাশে আর একবার পাতালে দোলাচ্ছে, তার পর চোখের কাছে প্রকাণ্ড সূর্য্যের প্রকাশ আর অমনি গাঁটেগাঁটে খট্ খট্ করে শব্দ হয়ে হয়ে হাত পা সব বন্ধ

হয়ে যেতে লাগল, নড়বার চড়বার শক্তি আর রইল না। মানদা তো ভেবেই সারা। রাঙা ঠাকুর্দ্দা চোখ ঘুরিয়ে হাত পা নেড়ে বলতে লাগলেন, "দেখছো কি, এ মেয়ে তোমার শুম্ভ-নিশুম্ভ-দলনী চণ্ডীর মহাশক্তিকে আধারে ধরবে, ক্ষ্যাপা বেটীকে এতদিন ডাকছি সে কি মিছেই,—এইবার ক্ষ্যাপা ছেলেকে দেখা দিতে ক্ষ্যাপা মা আমার আসছেন!" ঠাকুরদা' তপুর পা' দু'টো নিজের অবনত মাথার ওপর দিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্পর্শমণি

সেদিন আমায় কাশী ধরে বাড়ী নিয়ে গেল। প্রকাণ্ড বাড়ী, দিনেও নিশুতি নির্জ্জন, যেন সত্য সত্যই কি শক্তির কবলে আচ্ছন্ন। নির্জ্জনতা অনেক দেখেছি, এমন জমাট শুদ্ধ হিম গুরুভার শ্বাসরোধী নীরবতা কখনও উপলব্ধি করি নি। যেন এক পূর্ণযৌবনা কাঞ্চনমালার মত সুন্দরী কুমারী মেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে দম আটকে রয়েছে, সে মূর্চ্ছিত নিপীড়িত লাবণ্যরাশির ও রূপের বুঝি অবধি নেই—বিভীষিকাচ্ছন্ন আসন্নপ্রলয় জগতে যেন পূর্ণকলা চাঁদের মগ্ন হাসি। আমার কি হ'ল? আমি তো কস্মিনকালে কবি ছিলুম না, এত কল্পনার ও ভাবের ধার তো কখনও ধারি নি। বুঝি অতাতের কোন্ লুপ্ত রাজ-পুরীর বুকে তারই অস্থি পাঁজর দিয়ে এই তিন মহল প্রাসাদ গড়া; নাট-মন্দিরের মাথায় থরে থরে সাজান ছোটবড় হরিতকীর আকারের ঐ গুম্বজ, এক একখানা আস্ত পাথরে কুঁদে ফুলকেটে তোলা ঐ থামের সারি, তাদের গায়ে রাম লক্ষ্মণ সীতা হনুমানের রূপ,—সেতুবন্ধন, পঞ্চবটি, লঙ্কা-দাহের ছবি, দোলমঞ্চের রথের আকার গড়ন, দীঘির ঘাটের পাথরে অস্পষ্ট সংস্কৃত শ্লোক, চারধারের মজা গড়খাই, তার ধারে ধারে বনচালতা ময়নাকাঁটা ত্যালাকুচা বনধুঁধুলের ঘন সবুজ এলোমেলো জটাজালের মাঝে কত ভাঙা পাথুরে মূর্ত্তি। ঘুরে ঘুরে যত দেখি, ততই একটি বড় রূপসী, বড় বিপন্না বড় অসহায়, মেয়ের মত এই চাটুয্যে-বাড়ী আমায় যেন পেয়ে বসে, সেই যেন তার অন্তরের রূপ, কিসের ভয় আছে বলেই বাহির থেকে তাকে যক্ষিণীর মত দেখায়। বুকের মধ্যে একটা শক্ত কান্নার ডেলা যেন তাকে দেখে ঠেলে ওঠে,—আমি আশ্চর্য্য হয়ে ভাবি, আমার এ কি হল?

তার পর রোজ যেতাম, ঐ সবুজ গাঢ় বনের মাঝে অঞ্চলচাপা স্তব্ধ অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা অর্দ্ধজাগ্রতা করুণআঁখি বাড়ীটার মায়া আমায় টেনে টেনে নিয়ে যেত। কোথায় গেল আমার সমাজ সংস্কার, পাড়ার ঘোঁট, পাগলের ভয়, বিয়ের যূপকাঠে বলির জন্যে উৎসর্গিতা তাপসীর প্রতি করুণা। এই বাড়ীটাকে এই শ্বাসরোধী দানবী অত্যাচার থেকে বাঁচাতে হবে, ওকে ভূতের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিতেই হবে। ঐ বাড়ীই এ ঘটনার যেন প্রধান নায়িকা; কাশী, তাপসী, রাঙা ঠাকুর্দ্দা, অভিলাষ—এরা সব যেন বাইরের মানুষ, একটা মস্ত করুণ বিয়োগান্ত নাটককে মিলনান্ত করবার উপায় ও উপকরণ মাত্র।

পাড়ার ছেলেরা দিন দিন মারমুখো হয়ে উঠতে লাগল, তবু বিয়ের আয়োজন এগিয়েই চললো। অভিলাষ শাসালে, কাশীকে গুণ্ডা দিয়ে ঠ্যাঙ ভেঙ্গে খোঁড়া করবে; কাশী তার ছাগলদাড়ি নেড়ে হাত পা ছুঁড়ে সবাইকে শুনিয়ে এল—বিয়ের দশ দিন থাকতে সে শালবুনী মহাল থেকে এক শ' জন নমঃশূদ্র লেঠেল আনাবে, বরযাত্র বার হবে অভিলাষ মণ্টু ঘেণ্টুর কাঁচা মাথাগুলো নিয়ে ভাঁটা খেলতে খেলতে। আমায় সবাই ঠাওরালে traitor in the camp, অর্থাৎ গ্রামের উমীচাঁদ। প্রবোধ নাম বদলে নতুন নাম দিলে 'গো-বোধ সাণ্ডেল'। দু' দলের কচকচির জ্বালায় পাড়ায় পথহাঁটা দায় হয়ে উঠলো! বিয়ের যখন আর সাতদিন বাকি, তখন আরম্ভ হ'ল এক অদ্ভুত খেলা। যারা এই বিয়ের পক্ষে কোমর বেঁধে নামলো তাদের পিছনে যেন এক অদৃশ্য দুর্দ্দৈব ছিদ্র খুঁজে খুঁজে ছোঁক ছোঁক করে ঘুরতে লাগল। অন্নদা গ্রামসুবাদে কাশীর মামা হয়। স্বরূপগঞ্জের গোলা থেকে ভাল গোলাপ-সরু চাল নিয়ে বাড়ী পৌছে মামা ছাদ থেকে পা ফস্কে পড়ে গিয়ে পাঁজর ভেঙ্গে শয্যা নিল। পরের দিন গঙ্গাধর মামা কাঠ চেলানো তদারক করতে গিয়ে একটা কাঠের কুচি চোখে বিঁধে কানা হবার দাখিল। রাত্রে বগী ঝি কি দেখে আঁৎকে উঠে ভিরমী খেয়ে পড়লো, আর ঝাড়া দু' ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে মুখে গাঁজা ভাঙতে লাগল। দেখে শুনে সবাই তটস্থ,—কখন্ কার ভাগ্যে কি দুর্ব্বিপাক ঘটে।

লোহার সিন্ধুকের মধ্যে কাশীর মায়ের খুব দামী গয়না সব ছিল, বনমালী স্যাকরাকে তার মধ্যে থেকে একটি হারে

ধুকধুকিটি বসাতে দেওয়া হয়েছিল, বিয়ের ছ' দিন থাকতে সেই ধুকধুকিটি হাতে করে সারতে সারতে বনমালী ধনুষ্টঙ্কারে মারা গেল। তার পর সেই অগ্নিকাণ্ড! একদিন রাত্রে হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ শুনে আচমকা ঘুম ভেঙে ছুটে বেরিয়ে দেখি, উত্তর দিকের আকাশ লালে লাল, ধোঁয়ার কুণ্ডলে কুণ্ডলে আগুনের শিখা লকলক করছে, কাঁপছে, নিভছে, সাপের জিবের মত আকাশমুখো উঠছে। ঐ দিকে না তাপসীদের বাড়ী? খালি গায়ে চটি পায়ে সেই অবস্থায়ই ছুটতে ছুটতে গিয়ে দেখি, তাপসীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে একটা কলা-ঝোপের কাছে তার মা দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। লোকে লোকারণ্য, অভিলাষের দল কোমর বেঁধে আগুন নিভাতে ব্যস্ত। পাড়ার এবং আশে-পাশের পাঁচ দশখানা গ্রামের আপদে বিপদে তারাই এসে বুক দিয়ে পড়ে,—রোগীর সেবা করতে, মড়া-ফেলতে, শ্রাদ্ধে, বিয়েতে, পূজো পার্ব্বণে খাটতে, করতে কর্ম্মাতে, এই হুজুগে ছেলের দলই সবার ভরসা স্থল!

কোথা থেকে রাঙা ঠাকুর্দ্দা কাণ পর্য্যন্ত টানা ভাসা ভাসা চোখ দু'টি জবা ফুলের মত রাঙ্গা করে এসে পড়ে বললেন, "মা তপু, এ রকম করে তো আর চলবে না; আয় দিকিন আমার সঙ্গে, আমি সব ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি।" সেই ঘনঘোরা অমাবস্যার রাত্রি, বাঁশঝাড়, কলাঝোপ, বনতুলসী যজ্ঞডুমুর গাছে ঘেরা জোনাকীভরা বুনো পথ, আগে আগে রাঙা ঠাকুর্দ্দা, মাঝে তপু আর পিছনে আমি। আমরা পোয়াটাক পথ ভেঙে যখন চাটুয্যে-বাড়ীর দেবদারু-ঘেরা রাস্তায় গিয়ে উপস্থিত, তখন পূব দিক সবে ফর্সা হচ্ছে, পশ্চিম আকাশে ধ্রুব তারাটি রাজতিলকের মত—নবোঢ়ার কপালে স্বর্ণটিপটির মত জলজল করছে। ডাকাডাকিতে কালী লণ্ঠন হাতে এসে প্রকাণ্ড সিং দরজা খুলে দাঁড়াল, পাশে বাঁশের লাঠি হাতে পাকাচুল তেওয়ারীজী, ভিতরে দশ পনর জন কালো কালো নমঃশূদ্র লেঠেল ঘুম ভেঙে দালানে উঠে বসেছে।

রাঙা ঠাকুর্দ্দা, কালী, আমি আর তপু ভোরের আধ-আলো আধ-আঁধারে সেই জনবিরল তিন মহল প্রাসাদটি ঘুরে বেড়াতে লাগলাম; কালী এক রাশ মরচে-ধরা চাবীর গোছা নিয়ে একটির পর একটি ঘর খুলছে আর আমরা থেকে মোটা মোটা শেকলে সব ঝাড় ঝুলছে, কোনটি রূপার, কোনটি তামার, কত রকম রঙিন কাঁচ, সাদা সাদা বেলোয়ারী কাঁচের সারি সারি বাতিদান লাগানো; সমস্ত ছাদটা হীরার খনির মত জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। কোন ঘরে সারি সারি লোহার সিন্দুক, কোন ঘরে বাসন কোশনের কাঁড়ি লাগান, দেয়ালের গায়ে থরে থরে কলসের সারি, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যজ্ঞীর থালার পাহাড়, কাঁসার ঘটি, বাটি, রেকাবী, গাড়ু, সাজি, পঞ্চপাত্র, কোশাকুশি, দীপদান, ধুপদানী, হাতা, বেড়ী। কোন ঘরে সারি সারি মেহগনি কাঠের পালঙ, কোন ঘরে দেয়ালের খোপে খোপে তুলট কাগজের লাল সালু মোড়া পুঁথির থাক।

কোথা দিয়ে যাচ্ছি, কি যে দেখছি, আমার সেদিকে লক্ষ্য নেই, আমি কি দেখছি জান? তাকে কি দেখা বলবো? ঠিক দেখা নয়, তবু সে এক রকম দেখাই,—দেখার চেয়েও বুঝি স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ অনুভূতি। প্রত্যেকটি ঘরে যখন প্রথম পা দিচ্ছি, তখন যেন এক ধোঁয়াটে গুমোট স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়ার মাঝে পা দিচ্ছি, চার দিকে সেই বাতির অস্পষ্ট আলোর অন্ধকারের কোণে কোণে যেন গা ছমছম করা কি সব ওৎ পেতে রয়েছে। আর আমার পিছু পিছু রাঙা ঠাকুরদার হাত ধরে যেই তপু ঘরে আসছে অমনি সব পরিষ্কার। আশ্চর্য্য! সেই শান্ত রূপের ডালি মেয়ের স্পর্শে কি আছে কে জানে! তোমরা বসন্তের প্রথম সাড়া জাগানো উষার একটি শুচি স্নিগ্ধ সুখ-শীতল ভাব অনুভব করেছ কি? এ যেন ঠিক তাই। তপু আঁধার ছমছমে গুমোট বিভীষিকাচ্ছন্ন ঘরে পা দিতে না দিতে সব পরিষ্কার হয়ে গিয়ে তেমনি উষার মধুরতা স্বচ্ছতা অনুভূত হচ্ছিল, কোথায় যেন দেব-মন্দিরে পূজা হচ্ছে, ধূপ ধুনো গুগগুল জ্বেলেছে, রাশি রাশি ফোটা পদ্ম পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছে। তখনকার মত সেখান থেকে সেই বিভীষিকা দূরে সরে গিয়ে অন্ধকারে যেন ওৎ পেতে আছে। আমি ঠাকুর্দ্দার দিকে চাইলাম, রাঙা ঠাকুর্দ্দা শুনেছি যোগসিদ্ধ পুরুষ, এ তাঁর কোন কার-সাজি নয় তো।

বড় বড় চোখ মেলে আমার দিকে চেয়ে আমার পিঠে হাত দিয়ে রাঙা ঠাকুর্দ্দা একটু হাসলেন, বললেন, "না রে না, এ আমার তাপসী মায়ের স্পর্শের গুণ,—সাধে কি বলি

এই বাইরে দাঁড়াচ্ছি, মাকে নিয়ে ঐ ঘরটায় যাও দেখি।" আমি আগে তপুকে বাইরে রেখে নতুন খোলা ঘরটায় গেলাম, —কাশীতে আর আমাতে,—তপু ও ঠাকুর্দ্দা চৌকাঠের ওধারে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। ওহ্! সে ঘরের বিভীষিকা বলে বোঝানো যায় না। যেন ঘরের কোণে কোণে ক্রুদ্ধ অজগর ঘুরছে, যেন প্রেতপূর্ণ অমাবস্যার শ্মশান ভূমি, মড়কে উচ্ছন্ন স্তব্ধ জনহীন গাঁ। আমি নিজে গিয়ে তপুর হাত ধরে ঘরে নিয়ে এলাম, মেয়ের পদ স্পর্শ হতে না হতে সব পরিষ্কার!

এমনি সমস্ত বাড়ীখানা আমরা ঘুরে এলাম। তার পর বাগান, দীঘির পাড়, দ্বাদশচূড়া মন্দির, কাছারী-বাড়ী, দেবদারু-ঘেরা পথ, দালানের থামের সারি—সব মাড়িয়ে যখন কাশীর ঘরে এসে দাঁড়ালাম, তখন সকাল হয়ে বেশ পরিষ্কার হয়েছে। পূর্ব্বাচলে ভাঙা ভাঙা থরে থরে সাজানো মেঘের সভা, তার গায়ে সিঁদুরে, কোথায়ও গাঢ় গোলাপী, কোথায়ও বা ঘন বেগুণী রঙ; সবুজ নিম, ঝাউ, দেবদারু, কৃষ্ণচূড়া ও বকুল গাছগুলি উষার স্নিগ্ধ স্পর্শে ও আলোয় দাঁড়িয়ে সুখের আবেশে কাঁপছে।

আমরা বিদায় নেবার সময়ে কাশী রাঙা ঠাকুর্দ্দার পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়াল। আশ্চর্য্য! ওর চোখে আর সে ফ্যালফেলে দৃষ্টি নেই, সে মরা ছাগলের তারা উল্টোনো চোখের ভাব কেটে গেছে, উগ্রতা জুড়িয়েছে। কাশী দেখতে সুপুরুষ বটে, কিন্তু ওর মুখে আমি এমন রূপ কখনও দেখি নি। হাসি-হাসি মুখে সে বলে উঠলো, "বাবা, বিয়ে আমার দিচ্ছেন দিন, আমি কিন্তু সংসারে থাকবো না।"

ঠাকু'। সে আমি জানি। শ্রীরামচন্দ্রের স্পর্শে পাষাণী অহল্যা প্রাণ পেয়েছিল, তুমি স্পর্শমণি ছুঁয়ে নিজেকে খুঁজে পেলে কি আর এ সোণার বাটীতে গু-গুলে খাবে? সে আর আমি জানি নে বাবা?

পথে যেতে যেতে আমি জিজ্ঞেস করলুম, "হ্যাঁ, ঠাকুর্দ্দা, যা দেখলাম এ কি?"

ঠা। এই যে জগতে রয়েছি দেখছো, এ এক মহাশক্তির সমুদ্র, এতে কত ঢেউ, কত স্রোত, কত ঘূর্ণী, কত টাল-মাটাল বেগ বইছে, ঘুরছে, উঠছে, পড়ছে—তা' যার চোখ ফুটেছে সেই দেখতে পায়। এই যে সব মানুষ-জন দেখছো, এরা সব এসেছে এক এক শক্তির ভূমি থেকে, —কেউ উজ্জ্বল দেবলোকের বস্তু, কেউ কৃষ্ণ প্রাণস্তরের জীব, কেউ উজ্জ্বলে-কৃষ্ণে মিশানো, কেউ তপনের পীত মানস-ভূমির আলোয় গড়া। সবারই মানুষের মুখ হাত পা বটে, কিন্তু সবাই ঠিক মানুষ নয়, এক একটি শক্তির কেন্দ্র। এক এক মানুষের মধ্যে আবার কত ভাব আছে, কত রূপ আছে, দেবতা অসুর পশু পক্ষী পাশাপাশি ঘেঁসাঘেঁসি মেশামেশি হয়ে বাস করছে। এই পৃথিবীর সকল স্তরের সব জীবের সত্তা ও জ্ঞান একসঙ্গে এক দিস্তা কাগজের মত ভাঁজ করে হয়েছে মানুষ। দেখ না, কারু পদার্পণে দুস্থ সংসার লক্ষ্মীশ্রীতে ভরে যায়, কারু জন্মে দুঃখের অবধি থাকে না। এ সব ভাই এক মস্ত যাদুকরের খেলা—

"কি দেখো কমলাকান্ত
মিছে বাজী এ সংসারে
বাজীকর চিনলে না সে
তোমার ঘরে বিরাজ করে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দেবাশ্রয়

আরও পাঁচ বছর কেটে গেছে। কাশীর বিয়ের রাত্রের মহামারী কাণ্ড কালীদহে আজও কেউ ভোলে নি। সে তো বিয়ে নয়, যেন টালার হাঙ্গামা। বরযাত্রায় এসেছিল আশাসোটাধারী দু' শ লেঠেল, সাতখানা মটর গাড়ী—সবই কলকেতার আমদানী, কর্ণপুরের রাজাদের ষোলটা হাতী, আগে পিছে বিলাতী ব্যাণ্ড, আকাশ ভরে উল্কাপাতের মত আতসবাজী আর সাচ্চা জরির সাজে রাজপুত্রের বেশে কাশীপ্রসন্ন। চাটুয্যেদের পড়ো বনজঙ্গলে ভরা বাড়ীখানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে সেজেছিল অপরূপ; দুয়ারে দুয়ারে কদলীস্তম্ভ নারকেল আর পূর্ণকুম্ভ, মেঝেয় মেঝেয় আল্‌পনা, যেখানে সেখানে দেবদারু পাতার তোরণ, তাতে রাশি রাশি গাঁদা ও মল্লিকা ফুলের মালা আর চীনের ফানুস দুলছে, য়্যাসিটিলিন গ্যাসের আলোয় বাগান পথ ফটক ছাদ দিনের আলোয় আলো, সাত জায়গায় নহবৎ, প্রকাণ্ড সামিয়ানার তলায় বার জন পণ্ডিত ভাগবত পাঠ করছেন।

অভিলাষের দল আগেই হাল ছেড়ে দিয়েছিল,—এখন যেন টক্কর চলছিল ভূতে আর মানুষে। বিয়ের লগ্নের ঠিক

আগে তপুর সেই রকম অবস্থা হ'ল, তবু বিয়ে রুক্‌লো না। মাঝে একবার রাঙা ঠাকুর্দ্দা এসে নেড়ে চেড়ে তার জ্ঞান করিয়েছিলেন, তার পর আধঘণ্টা উৎরে গেলে মেয়ে সেই যে পীঁড়ির ওপর কাঠ হয়ে গেল, আর দু' দিন জ্ঞান হ'ল না। কনের বাড়ীতে মরা-কান্না উঠলো। নমো নমো করে সব স্ত্রী-আচার বাসী বিয়ে সেরে পরের দিন কাশী সেই নিশ্চল স্বর্ণপ্রতিমা পাল্কীতে তুলে নিয়ে বাড়ী এলো। পাল্কীও অন্দরের উঠানে নামানো হ'ল, আর পায়ের তলার মাটী কাঁপিয়ে ভূমিকম্পের মত গাছপালা দুলিয়ে চাটুয্যে-বাড়ীর ভিতর-মহল পড়ে গেল। কনের পাল্কীর কাছে একখানা ভারী বরগা পড়ে তিনজন বেহারা প্রাণ হারালো, তপুর কিন্তু গায়ে আঁচড়টিও লাগে নি। মাঝের মহলে উদ্যোগ আয়োজন হয়েছিল—তাই জন সাতেকের বেশি জখম হয় নি।

এই পাঁচ বছর পরে এখন আর সে চাটুয্যে-বাড়ী চেনা যায় না—নতুন ভিতর মহল উঠেছে। কাশী বিয়ের পরের বছরই নিরুদ্দেশ হয়। শুনি, সে এখন বদরিকাশ্রমে সন্ন্যাস নিয়ে আছে। তপুর একটি ছেলে হয়েছিল। এখন তাপসীর অদ্ভুত অবস্থা, বাহ্যজ্ঞান পুরো প্রায়ই থাকে না,—রাঙা ঠাকুর্দ্দা বলেন খুব উচ্চ অবস্থা। কেউ বলে হিষ্টিরিয়া রোগ। কলকেতা থেকে সাহেব ডাক্তার এসে দেখে গেছেন, তিনিও হিষ্টিরিয়া বলেই সাব্যস্ত করেছেন, তাঁর লম্বা চওড়া রায়ে অনেক কথাই আছে; যথা, epileptoid condition, cataleptic poses, hallucination, hyper-easthesia ইত্যাদি। আমি একবার দেখতে গিয়েছিলাম। তখন জ্ঞান আছে, আঁচলখানা কোমরে জড়িয়ে পায়চারি করছে, মুখ উৎফুল্ল, কি যেন আনন্দে ডগমগ অবস্থা। আমায় দেখে কাছে এসে সে এক অদ্ভুত ঢঙে দাঁড়াল,—হাতে যেন বরাভয়, পা দু'খানি নৃত্যের ছন্দে উন্মুখ, এক পা মাটিতে পাতা আর এক পা পিছন দিকে একটি আঙ্গুলের ছোঁয়ায় সুললিত ভঙ্গীতে বেঁকে আছে। ঠোঁটে অপূর্ব্ব হাসি, চোখে অপার প্রেম আর করুণা, সমস্ত লাবণ্যভরা দেহখানি মানুষের বলে বোধ হয় না, এত কোমল, এত অপার্থিব। যতক্ষণ ছিলাম দেখলাম কেবলি ঘুরছে, আর এক একবার নানা ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে হাসছে,—যেন কোন্ অপূর্ব্ব প্রতিভা—ভাস্করের কতকগুলি কারু-প্রতিমার কল্পনা,—যেন কোন্ সুর-অপ্সরার নৃত্য-লাস্যের নানা মাধুরীভরা ভঙ্গী। ওর মাঝে যেন সব দেবতারা আসছে যাচ্ছে; আর দেহখানি তাই ব্যক্ত করতে ত্রিভঙ্গিম, আভঙ্গিম নানা ঠামে রূপ আর ছাঁদের স্বপ্ন রচনা করছে। এ যদি রোগ হয়, তাহ'লে জগতের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর, নটী ও কবিরা রোগী।

আর চাটুয্যে-বাড়ী? সব ঘুরে ঘুরে দেখলাম, এ সে বাড়ী নয়, এ যেন এক নতুন সৃষ্টি, সেই উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে পড়া রূপের ডালি মেয়ে যেন অষ্টাভরণে সেজে নৃত্য করছে; যেন পূজার অঙ্গন, ভরা সুখের ও কল্যাণের শান্তসুখরসাস্পদ নীড়।

মধ্য-ভারত

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

উজ্জয়িনী

২৮শে ডিসেম্বর সন্ধ্যার পর ইন্দোরের সম্মেলনের কাজ শেষ হবে; আমরা একটু তাড়াতাড়ি রাত্রির আহার শেষ করে, তিন চার ঘণ্টা বিশ্রামের পর রাত দুইটার গাড়ীতে উজ্জয়িনী যাত্রা করব, আগে থাক্‌তে এই ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছিলাম। কিন্তু ভগবান এ রাত্রিতে আমাদের অদৃষ্টে নিদ্রা লেখেন নাই, ব্যবস্থা করে কি হবে? সম্মেলনের কাজ শেষ হ'তেই রাত্রি দশটা বেজে গেল। তার পর সংবাদ পাওয়া গেল, সে রাত্রির আহার্য্য প্রস্তুত হ'তে খানিকটা বিলম্ব হবে; কারণ, সেটী হচ্চে সম্মেলনের বিদায়-ভোজ—তার জন্য একটু বিশেষ আয়োজন হচ্চে। বিরাট ভোজে অন্য দিন আপত্তির কোন কারণ ছিল না; কিন্তু এ দিনে এমন ভোজের সদ্ব্যবহার করা ঠিক হবে না। সারারাত্রি যে জাগতে হ'বে, তা জানাই গেল। তার পর ভোর পাঁচটায় উজ্জয়িনী নেমে বেলা বারটার মধ্যে যা কিছু

দেখবার, সমস্ত শেষ করে স্নানাহার অন্তে দুটোর গাড়ী ধ'রে সন্ধ্যার সময় ইন্দোরে ফিরে আস্তেই হবে; তার পর দিন অতি প্রত্যূষে অর্থাৎ ভোর চারটার সময় আমাদের ধার ও মাণ্ডু দেখ্তে যাওয়ার সমস্ত আয়োজন হয়ে আছে। এ অবস্থায় বিদায়-ভোজটা হৃষ্টান্তঃকরণে উপভোগ করা গেল না।

ভোজ শেষ হতে বারটা বেজে গেল। একটার সময় স্কুল থেকে বের হ'লে দেড়টায় ইন্দোর ষ্টেসনে পৌঁছা যাবে। সুতরাং, নিদ্রার নিকট বিদায় গ্রহণ করে ঘণ্টাখানেক গল্প করেই কাটিয়ে দেওয়া গেল। তার পর ইন্দোরের সেই হিহিকার শীতের মধ্যে, যার যা গরম কাপড় ছিল, সব গায়ে জড়িয়ে, কম্বল কাঁধে ফেলে উজ্জয়িনী যাত্রা করা গেল।

এবার আমাদের দলে অনেক লোক। নামগুলো এখানেই বলি। ছেলে মানুষ হোলেও প্রথমে নাম করতে হবে শ্রীমান্ আনন্দমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের; কারণ, উজ্জয়িনীতে গিয়ে যাঁর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করতে হবে এবং যিনি উজ্জয়িনী-প্রবাসী একমাত্র বাঙ্গালী, সেই পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র এই আনন্দমোহন। হরিদাস বাবু সম্মেলন উপলক্ষে একদিনের জন্য ইন্দোরে এসেছিলেন; ফিরে যাবার সময় তাঁর এই পুত্রটীকে রেখে গিয়েছেন আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্য। ছেলেটীকে রেখে গিয়েও তাঁর কর্ত্তব্য শেষ হয়নি মনে করে তাঁর স্কুলের তিনটী বাঙ্গালী শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রভাতভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রমণীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্তকে সম্মেলনের শেষ দিনে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য পাঠিয়েছিলেন। এই ত উজ্জয়িনীরই চারি মূর্ত্তি আমাদের সঙ্গী। তার পর সঙ্গী হলেন নাগপুরের ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস, দেরাদুনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ রায়, হাজারীবাগ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গোরখপুরের শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত দিবাকর মুখোপাধ্যায়; এ ছাড়া শ্রীমান্ নরেন্দ্র ও আমি ত আছিই। সুতরাং বলতে গেলে আমাদের একটা রেজিমেণ্ট।

রাত দুইটার সময় গাড়ীতে উঠা গেল—যিনি যে গাড়ীতে স্থান পেলেন, তিনি সেখানেই উঠে পড়লেন। ঘণ্টা দেড়েক পরেই শীতে কাঁপতে কাঁপতে ফতেহাবাদ ষ্টেসনে গাড়ী বদল করে 'ফতেহাবাদ-চন্দ্রাবতীগঞ্জ' মিটার গেজ গাড়ীতে ওঠা গেল। ভোর পাঁচটা সাঁইত্রিশ মিনিটে উজ্জয়িনী—তখনও আঁধার কাটে নাই।

এই সেই উজ্জয়িনী! ছেলেবেলায় পিসিমার কোলের কাছে শুয়ে যে উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের কত কাহিনী শুনেছি—তাঁর সেই বত্রিশ সিংহাসনের গল্প, তাল-বেতালের কথা, বেতাল পঞ্চবিংশতির অপূর্ব্ব কাহিনী, তাঁর নবরত্নের সভা, আর সেই নবরত্নের শ্রেষ্ঠ রত্ন কালিদাসের কত গল্প। এই সেই উজ্জয়িনী যেখানকার মূর্খ কালিদাস না কি উষ্ট্র বানান করতে গিয়ে একবার 'র' বাদ দিয়েছিলেন, আবার সেই ভুল সংশোধন করতে গিয়ে 'ষ' বাদ দিয়েছিলেন; আর তারই জন্য লাঞ্ছনা ভোগ করে যেদিকে দুই চোখ গিয়েছিল, সেই দিকে গিয়ে এক বনের মধ্যে জ্ঞানবাপীর জল খেয়ে একদিনেই মহাকবি হয়ে গিয়েছিলেন। ছেলেবেলায় সেই গল্প শুনতাম, আর মনে হোতো এক দৌড়ে উজ্জয়িনী গিয়ে সেই জ্ঞানবাপীর জল যদি একটু খেতে পারতাম, তা হোলে আর স্কুলেও যেতে হোতো না, ভূগোলসূত্র, জ্যামিতি, ইতিহাস মুখস্থ করতে করতে হয়রাণ হবার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতাম, মাষ্টার মশাইদের বেতের ভয় আর থাকতো না—একদিনেই মহাকবি কালিদাস হ'য়ে পড়তাম। তার পর বয়স যখন বাড়লো, মহাকবির মেঘদূতে যখন পড়লাম, বিরহী যক্ষ আষাঢ়ের নবীন জলধরকে বল্‌ছেন—

> বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাং
> সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখো মাস্ম ভূরুজ্জয়িন্যাঃ।
> বিদ্যুদ্দাম স্ফুরিতচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং
> লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি।

আমার ভ্রমণসঙ্গী শ্রীমান্ নরেন্দ্র দেব তাঁর যন্ত্রস্থ মেঘদূত কাব্যের অনুবাদ করতে গিয়ে উপরের শ্লোকটীর যে অনুবাদ দিয়েছেন, তাও এখানে তুলে দিচ্ছি—

> তুমি যে উত্তরগামী
> সে কথা জানি হে আমি,
> উজ্জয়িনী কোন্ পথে
> জানি তাও বিধিমতে;

চলেছো আমার কাজে
এ কথাও বুকে বাজে,
তবু বলি কিছু বেঁকে
উজ্জয়িনী যেও দেখে।
সেখানে প্রাসাদশিরে
ভুলো না উঠিতে ধীরে,
পুরনারী সেথা যারা,
চকিত নয়না তারা
বিজলি চমকে চোখে,
আঁখি ঠারে মরে লোকে !
সে লোচন ফুলবান
যদি নাহি বিঁধে প্রাণ,
জনম-জীবন তবে,
সবই সখা বৃথা হবে !

সেখানকার পুর-ললনাদের বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত-চকিত লোচনের বিলোল অপাঙ্গ দর্শনে যদি তুমি চিত্ত-প্রসাদ লাভ করতে না পার, তা হোলে তোমার জন্মই বৃথা ! মহাকবির এই প্রলোভন-বাণী তখন, আমিও নবীন জলধর, আমার মনে যে ভাবের সঞ্চার করেছিল, এখন এই প্রবীণ বয়সে তার ক্ষীণ স্মৃতিটুকুও নেই বল্‌লে হয়—

সেই উজ্জয়িনীতে আজ উপস্থিত এই বৃদ্ধ বয়সে ! বিদ্যুদ্দাম-স্ফুরিত-চকিত লোচনের আকর্ষণ আর নেই; তবুও উজ্জয়িনী না দেখে ঘরে ফিরে যেতে মন চায়নি। আমাদেরও 'বক্রঃ পন্থা যদ্যপি', কারণ আমরা যাব অজন্তা দেখ্‌তে, উজ্জয়িনী যেতে হ'লে পথটা একটু বেঁকে যায় বটে, তবুও উজ্জয়িনী—মহাকবির পুণ্যস্মৃতি-পূত উজ্জয়িনী—তা না দেখ্‌লে 'লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি',—যদিও সে উজ্জয়িনী আর নেই !

নবীন জলধরকে মহাকবি তাঁর বড় সাধের উজ্জয়িনী দেখাবার জন্য প্রলুব্ধ করতে গিয়ে বলেছেন—

প্রস্ফুটিত কমলকলির
গন্ধ মেখে অঙ্গময়
উষার মুখে শিপ্রা নদীর
স্নিগ্ধ বাতাস যখন বয়,
সারসকুলের সরস কূজন
দূর সুদূরে নে যায় কত,
মুছিয়ে দে যায় সুন্দরীদের
নিশার গুরু ক্লান্তি যত !
প্রিয়াঙ্গনার তুষ্টি আশে
রাত্রি শেষে রসিক বঁধূ
মিষ্ট কথার সঙ্গে যেমন
অঙ্গে বুলায় পরশ-মধু

* * *

এগিয়ে যেও চণ্ডীনাথের,
পুণ্য চরণ সেবার তরে,
বিশ্বজনের অর্ঘ্য যেথা
নিত্য জমে ভক্তিভরে।
তোমায় দেখে অবাক্ হয়ে
ভাববে যত শিবের চর,
কে এলো ঐ তাদের প্রভুর
কণ্ঠসম বর্ণধর ?
সুন্দরীদের স্নানলীলাতে
কেশের সুবাস উথ্‌লে তোলা,
গন্ধাবতীর গন্ধবারি
পদ্মফুলের পরাগ-গোলা,
বইছে সেথায় মদির হাওয়া
কইছে কানে মনের কথা
কাঁপিয়ে তুলে ফুলের কলি
নাচিয়ে প্রতি কুঞ্জলতা।

* * *

নেহাৎ যদি গিয়েই পড়
সাঁঝের আগে ওদিক্ পানে
তিন ভুবনের তীর্থভূমি
চণ্ডীনাথের পীঠস্থানে,
থাক্‌বে সেথায় অপেক্ষাতে
ধৈর্য্য ধরে শান্ত মনে
দিনান্তে ভাই চোখের আড়াল
না হয় ভানু যতক্ষণে।
মহাকালের মন্দিরেতে
সন্ধ্যারতি করলে সুরু
আকাশপথে আনন্দেতে
গর্জ্জে উঠো গভীর গুরু ;

সেই আরতির লগ্নে যদি
কণ্ঠে তোমার মৃদঙ্গ্‌ বাজে,
ধন্য হবে তোমার ধ্বনি
শম্ভু সেবার পুণ্য কাজে

*   *   *

সাঙ্গ হলে সায়ংকালে
শম্ভুনাথের সন্ধ্যারতি
নাচবে যখন তাণ্ডব নাচ
আত্মভোলা বিশ্বপতি
তখন তুমি রক্তজবার
লাল্‌চে আভা অঙ্গে মেখে
নৃত্য মগন মহেশ্বরের
ঊর্দ্ধবাহুর গুচ্ছ ঢেকে
ছড়িয়ে দিও রুদ্র করে
মণ্ডলাকার তোমার কায়া,
সদ্য হত হাতীর ছালের
রক্ত-পাগল মিটিয়ো মায়া।
ভক্তজনের ভক্তি দেখে
পার্ব্বতীও তৃপ্তপ্রাণে
দৃষ্টি মেলি চাইবে সখা
নির্নিমেষে তোমার পানে।

(শ্রীমান্‌ নরেন্দ্র দেবের অনুবাদ)

সেকালের—সেই গৌরবোজ্জ্বল উজ্জয়িনীর শোভা-সৌন্দর্য্যের বিবরণ এই চাইতে ভাল করে কেউ কখন বলেন নি, বল্‌তে পারবেনও না; সুতরাং আমিও ঐ কবিতা কয়টি উদ্ধৃত করে দিয়েই সে-কালের উজ্জয়িনী-বর্ণনা শেষ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু একটী নবীন ঐতিহাসিক বল্‌লেন, সে কি হয়? উজ্জয়িনীর যে প্রকাণ্ড ইতিহাস আছে, মহাকবি কালিদাসের সময় যে এখনও নিঃসংশয়ে নির্ণীত হয় নি! এ কথা না থাকলে যে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নিতান্তই অসম্পূর্ণ হবে।

সুতরাং, আমার ভ্রমণের কথা আপাততঃ মুলতবী রেখে উজ্জয়িনীর বিবরণ বলাই ইতিহাস-সম্মত ব্যবস্থা।

প্রথমেই গোল লাগল মহাকবি কালিদাসকে নিয়ে। তিনি কবে জন্মগ্রহণ ক'রে ভারতবর্ষকে পবিত্র করেছিলেন, তা নিয়ে দিশী-বিদেশী পণ্ডিত-সমাজে মতভেদ আছে। তার পর তিনি বাঙ্গালী, না দক্ষিণী, না পাঞ্জাবী, এ নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে আলোচনা চল্‌ছে। কেহ বলেন, তিনি খাঁটি বাঙ্গালী,—এই আমাদের মুরশিদাবাদ জেলার কোন্‌ এক পল্লীতে না কি তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন; তাঁর লেখার মধ্য থেকে তার অনেক নজির পাওয়া যায়। যে সকল ফুল বাঙ্গালা দেশ ছাড়া আর কোথাও দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, কালিদাস সেই সকল ফুলের কথা বলেছেন; যে মাঙ্গলিক হুলুধ্বনি বাঙ্গালী পুরনারীরা ব্যতীত আর কোন দেশের রমণীরা করেন না, সেই হুলুধ্বনির কথা কালিদাস উল্লেখ করেছেন; ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব কালিদাস বাঙ্গালী। পল্লীকবি, উজানিনিবাসী শ্রীমান্‌ কুমুদরঞ্জন যে তাঁর জন্মভূমি উজানিকে উজ্জয়িনী ব'লে এখনও কেন উপস্থিত করেন নাই, তার কারণ নির্দ্দেশ করতে পারছিনে। আমার ত মনে হয়, কালিদাস ইংরাজ নহেন, ফরাসী নহেন, জার্ম্মাণ নহেন—আমাদেরই ভারতবাসী হিন্দুসন্তান; ইহাই আমাদের গৌরবের বিষয়, তা তিনি মুরশিদাবাদেরই অধিবাসী হন, আর আমেদাবাদেরই অধিবাসী হন। তবে ঐতিহাসিকেরা এই ব্যাপার নিয়ে অনুসন্ধান-কার্য্যে বিরত হবেন না, তা জানি; কিন্তু আমার এই অকিঞ্চিৎকর ভ্রমণ-কথার মধ্যে সে গভীর গবেষণা সম্ভবও হবে না; আমার শক্তি-সামর্থ্যেও কুলাবে না! আমি এই ব'লেই সন্তুষ্ট যে, কালিদাস হিন্দু, তিনি আমাদেরই দেশে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন এই আমাদের পরম গৌরবের কথা।

তার পর কালিদাস কবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তা নিয়েও মতভেদ আছে, এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি। এ গোলেরও সুন্দর মীমাংসা আমাদের বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ ক'রে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

"হায় রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল,
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল;
হারিয়ে গেছে সে সব অব্দ,
ইতিবৃত্ত আছে স্তব্ধ,
গেছে যদি, আপদ গেছে, মিথ্যা কোলাহল।"

অর্থাৎ কবিবর বল্‌ছেন—মেঘদূত আছে, রঘুবংশ আছে, কুমারসম্ভব আছে; সুতরাং কালিদাসকে আমরা পেয়েছি, তিনি অমর হয়ে আছেন; জন্মের সন-তারিখ দিয়ে আমরা কি করব? কবিশ্রেষ্ঠের যখন এই রায়, তখন সন-তারিখ

নির্ণয়ের ভার প্রত্নতাত্ত্বিকের উপর দিয়ে আমিও ও-কথাটা এখানেই শেষ করতে পারি।

এইবার উজ্জয়িনী রাজ্যের ইতিহাস! সেও বহুদিন পূর্ব্বের ব্যাপার হ'লেও ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে তা মুছে যায়নি। সেই ইতিহাস অতি সংক্ষেপে এখানে নিবেদন করছি।

উজ্জয়িনী রাজ্যের গোড়ার কথা জানতে পারা যায় না, সেটা ইতিহাসের আমলের বাইরে। তা হ'লেও হিন্দুরা ব'লে থাকেন যে, সৃষ্টির আদি থেকেই উজ্জয়িনী আছে। তন্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে যে, মহাদেব সতীদেহ বাহান্ন খণ্ডে বিভক্ত করলে সেই দেহের এক অংশ বাহুমূল এই উজ্জয়িনীতে পড়েছিল; সুতরাং ইহা একটা পীঠস্থান। তা ছাড়া বিক্রমাদিত্যের বাসস্থান ব'লেও উজ্জয়িনী প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

আর্য্যগণ যখন দাক্ষিণাত্যে আগমন করেন তখন তাঁরা এই উজ্জয়িনীতেই একটা বিশাল রাজ্য স্থাপন করেন। বৌদ্ধযুগেও উজ্জয়িনীর প্রাধান্য কমে নাই, এখানে একটা বৃহৎ বৌদ্ধ বিহার ও মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

উজ্জয়িনী সম্বন্ধে প্রামাণ্য ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দে। তখন উজ্জয়িনী মৌর্য্য-রাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল। এই নগরই তখন বিশাল মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পশ্চিমার্দ্ধের রাজধানী ছিল এবং রাজ-প্রতিনিধি এখানেই বাস করতেন। মহারাজ অশোক এই উজ্জয়িনীরই রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন এবং তাঁহার পিতার পরলোকগমনের সময় পর্য্যন্ত তিনি এই প্রদেশেরই শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

তার পরের প্রায় পাঁচশত বছরের কোন ইতিহাসই এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দের শেষ ভাগে উজ্জয়িনী ক্ষত্রপ রাজ্যের অন্তর্গত দেখতে পাওয়া যায়। তিন শত বৎসর এই প্রদেশ ক্ষত্রপ রাজ্যের অধীন থাকে এবং সে সময় উজ্জয়িনী একটী প্রধান বাণিজ্যস্থানে পরিণত হয়। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দের শেষভাগে উজ্জয়িনী মগধের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনাধীন হয়।

তার পর খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে উজ্জয়িনী কনোজরাজ হর্ষবর্দ্ধনের অধিকারভুক্ত হয়। ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু হইলে বহুদিন পর্য্যন্ত এই প্রদেশ একেবারে অরাজক অবস্থায় থাকে। তখন চারিদিকে মারামারি কাটাকাটি চল্‌তে থাকে। আজ একজন, আবার কয়েক বছর পরে আর একজন উজ্জয়িনী অধিকার করেন। অবশেষে এই রাজ্য প্রমারবংশীয় রাজপুতগণের হস্তগত হয় এবং নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দ পর্য্যন্ত প্রমারগণই এই রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করতে থাকেন। এই সময় এই রাজ্যের সমৃদ্ধি এত বর্দ্ধিত হয় যে, অনেকে এই সময়েই মহারাজ বিক্রমাদিত্যের আবির্ভাব হয়েছিল ব'লে মনে* করেন। কিন্তু, ঐতিহাসিকেরা এ কথা মান্‌তে সম্মত নন, কারণ ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে, যে বিক্রমাদিত্যের সময় নবরত্নের সভা হয়েছিল এবং মহাকবি কালিদাস যে নবরত্নের রত্ন ছিলেন, সে যে খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দের কথা। এই সকল পণ্ডিতের কথা কতদূর প্রামাণ্য তা ঐতিহাসিকেরা ঠিক করুন, আমি বিশ্বকবির ব্যবস্থা উল্লেখ করে পূর্ব্বেই সে কথা সেরে দিয়েছি।

মুসলমান ইতিহাস লেখকগণের মধ্যে আল্‌বেরুণির ইতিহাসেই উজ্জয়িনীর নাম প্রথম দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ১১৯৬—৯৭ অব্দে দিল্লীর বাদশা কুতব-উদ্দীন এই দেশ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। দিল্লীর আর এক বাদশা আল্‌টামাস্‌ ১২৩৫ খৃষ্টাব্দে উজ্জয়িনী পুনরায় আক্রমণ করেন এবং সুপ্রসিদ্ধ মহাকালের মন্দির ও অন্যান্য বহু মন্দির ভেঙ্গে ফেলেন; এমন কি তিনি মন্দিরাদি ভেঙ্গে ও ধনরত্ন নিয়েই সন্তুষ্ট হন নি, মহাকালের লিঙ্গমূর্ত্তি না কি দিল্লীতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে মূর্ত্তির অদৃষ্টে কি হয়েছিল, তা জান্‌তে পারা যায়নি।

খৃষ্টীয় ১৪০১ অব্দ থেকে ১৫৩১ অব্দ পর্য্যন্ত উজ্জয়িনী মালোয়ার সুলতানগণের অধিকারভুক্ত থাকে। তখন এখানে রাজধানী বা প্রতিনিধিগণের অবস্থান না থাকায় ইতিহাসে এ স্থানের নাম বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হয় নাই।

১৫৪২ অব্দে শেরসাহ মালোয়া জয় করেন এবং উজ্জয়িনীও সেই সঙ্গে তাঁহার দখলে আসে এবং সুরি সুলতান এই রাজ্য শাসন করেন। সুরি সুলতানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সুবিখ্যাত বাজ বাহাদুর এই রাজ্য অধিকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন; কিন্তু অল্প দিন পরেই বাজ বাহাদুর ১৫৬২ অব্দে সম্রাট আকবর কর্ত্তৃক পরাজিত হন এবং এই রাজ্য উজ্জয়িনী সরকার নামে মোগল রাজ্যভুক্ত হয়। ১৭৩৩ অব্দে সম্রাট মহম্মদ শার

সময়ে জয়পুরের মহারাজা সয়াজি রাও জয়সিং মালোয়ার শাসনকর্ত্তা হন। অবশেষে ১৭৪৫ অব্দে বাজীরাও পেশোয়া উজ্জয়িনীর শাসনকর্ত্তা হন এবং তার পর ১৭৫০ অব্দের সমকালে এই রাজ্য সিন্ধিয়ার রাজ্যভুক্ত হইয়াছে।

এইখানেই উজ্জয়িনীর ইতিহাস শেষ করলাম। এর পর আমার ভ্রমণ কথা বলতে গেলে প্রস্তাবটা বড়ই দীর্ঘ হয়ে পড়বে, কারণ, এখনও এত কাল পরে উজ্জয়িনীতে যা দেখ্‌বার আছে তা বড় কম নয় এবং তার বিবরণও অনেক। তবে আমি অত কথা গুছিয়ে না বল্‌তে পারলেও, যা একটু বল্‌তে চেষ্টা করব, তাও ত ছোট হবে না। কাজেই সে চেষ্টা এবারকার মত মুলতবী থাকুক।

অতএব ২৯শে ডিসেম্বর শনিবার ভোর পাঁচটা সাঁইত্রিশ মিনিটের সময় উজ্জয়িনী ষ্টেশনে নেমে সেই শীতে কাঁপতে কাঁপতে ওখানকার সর্ব্বজন-শ্রদ্ধেয় মাষ্টারজি শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবাস-ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করা গেল।

দিক্‌শূল

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

২২

গেট্ পার হয়ে নরেশের নির্দ্দেশক্রমে গাড়ি চল্‌ল ষ্টেশনের দিকে। কিছুদূর অগ্রসর হ'য়ে একটা ছায়া-শীতল গাছ-তলায় গাড়িটা দাঁড় করিয়ে নরেশ ড্রাইভারকে বল্‌লে, "তুমি ঐ শালগাছটার তলায় গিয়ে একটু অপেক্ষা কর, ডাক্‌লে তবে এসো।"

ড্রাইভার প্রস্থান করলে সরমার দিকে তাকিয়ে নরেশ বল্‌লে, "বিশেষ কিছু বোঝা গেল না সরমা,—গয়া ষ্টেশনে যে কথা শোনা গিয়েছিল তার, প্রমাণ বল্‌তে যা বোঝায়, তা কিছু পাওয়া গেল না।"

সরমা পাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে ব'সে ছিল; সেইভাবে অবস্থান ক'রেই বল্‌লে, "প্রমাণ বল্‌তে কি বোঝায় তা আপনি উকিল মানুষ আপনিই জানেন,—কিন্তু আমায় রেহাই দিন জামাই বাবু! আমি আর এ-রকম পারছিনে।"

সরমার কথা শুনে নরেশ মৃদুহাস্য করলে; বল্‌লে, "যে-রকম পারবে ব'লে মনে করছ সরমা, কার্য্যকালে দেখ্‌বে তা পারা এর চেয়েও কঠিন হবে। যে অশুভ এখনো অনিশ্চিত, তাকে যদি নিশ্চিত ব'লেই ধ'রে নাও, নিশ্চিত কি-না তা নির্ণয় করবার গ্লানিটুকু যদি স্বীকার না কর, তা হ'লে অশুভর আর বাকি রইল কি? এখনকার দু-তিন ঘণ্টার দুঃখ-কষ্টের উপর তোমার সমস্ত জীবনের দুঃখ-কষ্ট নির্ভর করছে তা বুঝতে পারছ ত?"

ক্ষণকাল নীরব থেকে সরমা বল্‌লে, "কিন্তু আপনি আর কি করবেন ব'লে মনে করছেন?"

হাত বাড়িয়ে সম্মুখ দিকে দেখিয়ে নরেশ বল্‌লে, "আপাতত ঐ যে বাঙ্গালী বাবুটি এ দিকে আস্‌চেন তাঁর কাছ থেকে কিছু খবর নেবার চেষ্টা করব।"

সরমা চেয়ে দেখ্‌লে অদূরে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক ছাতি মাথায় দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্চে। অসময়ে মহিলা আরোহী সহ একখানা মোটরকার পথ পার্শ্বে প'ড়ে রয়েছে দেখে কৌতূহলী দৃষ্টি মোটরকারের দিকে নিবদ্ধ।

লোকটি নিকটবর্ত্তী হ'লে নরেশ তাকে নিকটে আহ্বান করে বল্‌লে, "মশায় কি এই অঞ্চলেই বাস করেন?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

জামার গলা ছাড়িয়ে পৈতার একটু অংশ দেখা যাচ্ছিল; দেখ্‌তে পেয়ে নরেশ জিজ্ঞাসা করলে, "ব্রাহ্মণ?"

নরেশের দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে আঙুল দিয়ে পৈতাটা জামার ভিতর গুঁজে দিয়ে লোকটি বল্‌লে, "ব্রাহ্মণ!"

যুক্তকর ঊর্দ্ধে উত্থিত ক'রে নরেশ বল্‌লে, "নমস্কার। নামটি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

"আমার নাম শ্যামলাল কাঞ্জিলাল।"

অতি মৃদু হাস্যরেখায় নরেশের অধরপ্রান্ত রঞ্জিত হয়ে উঠ্‌ল; বল্‌লে, "বুঝেচি, কলকাতায় বড়বাজারের দিকে কাপড়ের কারবার আছে।"

ভদ্রলোকটি পুলকিত হ'য়ে মাথা নেড়ে বল্‌লে, "না মশায়, গরিব মানুষ, কয়লা অফিসে সামান্য কেরাণীগিরি করি, কাপড়ের কারবার কোথায় পাব? সে শ্যামলাল কাম্পিলাল অন্য কোনো লোক।"

নরেশ বল্‌লে, "কয়লা অফিসে কাজ করেন? মালাবার হিল্ কোল কন্‌সার্ণে?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

নরেশ বল্‌লে, "আপনাদের ম্যানেজার রমাপদ বাবুর সঙ্গেই দেখা করতে গিয়েছিলাম। শুন্‌লাম বাইরে গিয়েছেন, তাই ফিরে যাচ্চি—এ যাত্রায় আর দেখা হ'ল না।"

শ্যামলাল বল্‌লে, "তা এই রোদে ফিরে না গিয়ে একবেলা কুঠিতে অপেক্ষাও ত' করতে পারতেন। তিনি সন্ধ্যেবেলাই আস্‌বেন।"

"একা হ'লে তাই হয়ত কর্‌তাম; সঙ্গে স্ত্রীলোক নিয়ে সেখানে কেমন ক'রে অপেক্ষা করি বলুন?"

"কেন, সায়েবের স্ত্রী ত' রয়েচেন—তা হ'লে এঁর পক্ষে অপেক্ষা করা বিশেষ অসুবিধের হ'ত কি?"

"যিনি রয়েচেন তিনি যদি রমাপদবাবুর স্ত্রী হতেন তা হ'লে অসুবিধে হ'ত না—কিন্তু তিনি ত রমাপদবাবুর স্ত্রী নন্।" ব'লে নরেশ মুখ চক্ষের এমন একটা নিবিড় রহস্যপূর্ণ ভঙ্গী করলে যার অর্থ শ্যামলাল একটুও বুঝ্‌তে পারলে না।

বুঝ্‌তে না পারলেও শ্যামলাল সতর্ক হ'ল। যে ব্যাপার তার স্ত্রীপুত্র পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন যোগায়, সেই চাকরির স্থায়িত্ব বিষয়ে কোনোরূপ বিঘ্ন উৎপাদন করতে সে একেবারে নারাজ। বল্‌লে, "তা বল্‌তে পারিনে মশায়, আমরা জানি উনি সায়েবের স্ত্রী।" যদিও সরযূ সায়েবের আর যাই হ'ক, স্ত্রী নয়—এ কথা সে নিঃসংশয়ে জান্‌ত।

নরেশ বল্‌লে, "না, উনি সায়েবের দূর-সম্পর্কীয়া ভগ্নী।"

সরযূ এবং রমাপদকে অবলম্বন ক'রে যে কৌতুকাবহ রহস্য তিখণ্ডায় প্রচলিত ছিল এ কথা সে বিষয়ে একেবারে নূতন তথ্য। সুতরাং শ্যামলাল দুর্নিবার কৌতূহলের বশীভূত হয়ে এ কথাকে সহসা উপেক্ষা করতে পারলে না; বল্‌লে, "তা আপনি কেমন ক'রে জান্‌লেন?"

দৃপ্তস্বরে নরেশ বল্‌লে, "জেরা করবেন না কি? মুরলীধর বাঁড়ুয্যের নামটা নরেশ মনে ক'রে রেখেছিল; বল্‌লে, "রমাপদবাবু মুরলীধর বাঁড়ুয্যের আত্মীয় তা জানেন ত?"

শ্যামলাল বল্‌লে, "না, তা জানি নে।"

"আপনি যাঁকে রমাপদ বাবুর স্ত্রী ব'লে জানেন, তিনি মুরলীধর বাবুর বিধবা ভাই ঝি, তা জানেন?"

এ কথা শ্যামলাল জান্‌ত, কিন্তু এ কথার গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে সে মাথা নাড়া দিয়ে বল্‌লে, "না, জানি নে।"

ঈষৎ তীব্র স্বরে নরেশ বল্‌লে, "মুরলীধর বাবু কে ছিলেন তা জানেন? না, তাও জানেন না?"

শ্যামলাল স্থির করেছিল কোনো কথাই জানে ব'লে সে স্বীকার করবে না—শুধু নরেশ যে-টুকু বলে শুনবে। কিন্তু এতটা অজ্ঞতার অপযশে লজ্জিত হ'য়ে একটু ইতস্ততঃ ক'রে বল্‌লে, "তা জানি।"

"কে ছিলেন?"

"কুমারপুথি কুঠির প্রোপ্রাইটার।"

"কুমারপুথি এখান থেকে কত দূর?"

"মাইল চারেক।"

"সেখানে এখন কে থাকে?"

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে শ্যামলাল ইতস্ততঃ করতে লাগল।

অধীরভাবে নরেশ বল্‌লে, "বলুন, বলুন, শীঘ্র বলুন! আমি সব জানি, শুধু একটা কথা আপনাকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে জিজ্ঞেস্ করছি।"

শ্যামলাল বল্‌লে, "মুরলীবাবুর ছেলে বংশীধর।"

কুমারপুথি ও বংশীধর কথা দুটি মনে মনে একবার আউড়ে নিয়ে কোনো প্রকারে হাস্যরোধ ক'রে নরেশ বল্‌লে, "দেখুন দেখি, সব আপনি জানেন মাত্র দু ক্রোশের কথা—অথচ ভাল ক'রে অনুসন্ধান না ক'রে মুরলীবাবুর বিধবা ভাইঝিকে বলেন সায়েবের স্ত্রী! এ কথা আমাকে বল্‌লেন বল্‌লেন, আর কাউকে যেন বল্‌বেন না। সায়েবের কানে উঠ্‌লে আর রক্ষে থাক্‌বে না।"

শুনে শ্যামলাল শশব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌ল! একে ত' সতীশ রায় পিছনে লেগেই আছে, তার উপর এ কথা যদি রমাপদর কানে যায় তা হ'লে কি আর রক্ষা থাক্‌বে! করজোড়ে কাতরভাবে সে বল্‌লে, "দোহাই মশায়, দেখবেন দরিদ্র

নরেশ বল্‌লে, "নির্ভয়ে থাকুন, চাকরী যাবে না,—আর একান্তই যদি যায়, কোনো ভয় নেই, আমি জানতে পারলেই আপনাকে কল্‌কাতা নিয়ে গিয়ে কাপড়ের দোকান খুল্‌ব; আপনার নামের জোরে কারবার চল্‌বে। আচ্ছা এখন আসুন।"

নত হ'য়ে নমস্কার ক'রে শ্যামলাল মনে মনে নরেশকে অর্ব্বাচীন, বেল্লিক, ফাজিল প্রভৃতি সম্বোধনে অভিশাপ দিতে দিতে প্রস্থান করল।

ড্রাইভারকে ডেকে নরেশ জিজ্ঞাসা করলে, "কুমারপুথি কুঠি জানো?"

"জানি হুজুর।"

"আচ্ছা চল সেখানে—একটু জোরে।"

মিনিট দশেকের মধ্যে কুমারপুথি কুঠির কম্পাউণ্ডে মোটর প্রবেশ করল। একটা গাছতলায় গাড়িখানা রাখিয়ে নরেশ ড্রাইভারকে দিয়ে সংবাদ পাঠালে। বংশী তখন বৈঠকখানা ঘরে দোর জানলা বন্ধ ক'রে দিবা-নিদ্রা দিচ্ছিল। করিমের চীৎকারে জাগ্রত হয়ে ইতর গ্রাম্য ভাষা প্রয়োগ ক'রে হাঁক দিয়ে উঠ্‌ল।

ঈষৎ কঠোর অপ্রসন্ন স্বরে করিম বল্‌লে, "একবার বাইরে আসুন না মশায়! একজন বাবু আর একটি মেয়ে-ছেলে ট্যাক্সি ক'রে এসেছেন।"

'মেয়ে-ছেলের' কথা শুনে বংশী, শয্যা ত্যাগ ক'রে বাইরে বেরিয়ে এল। তীব্র দিবালোকে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে সরমার মূর্ত্তির যেটুকু অনুমান পেলে তা'তে আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না ক'রে ত্বরিত পদে মোটরকারের পাশে উপনীত হ'ল। নিদ্রাহত কুঞ্চিত চক্ষু তখনো ভাল ক'রে খুলছে না, কিন্তু এক মুখ হাসি হেসে বল্‌লে, "আসুন, নেবে আসুন। বৈঠকখানায় বস্‌বেন চলুন।"

নরেশ নমস্কার ক'রে বল্‌লে, "ধন্যবাদ। কিন্তু বেশিক্ষণ আপনাকে কষ্ট দেব না, দুটো কথা গাড়িতে ব'সেই সেরে নিই।"

"বিলক্ষণ? তাও কি কখনো হয়? ওনার কষ্ট হবে।" ব'লে বংশী গাড়ির হাতল ধ'রে খুলতে উদ্যত হ'ল।

বাক্যালাপ অভিপ্রেত নরেশের সহিত, কিন্তু দৃষ্টি এবং মনোযোগ সম্পূর্ণ 'ওনার' প্রতি। হাব-ভাব, ধরণ ধারণ কথাবার্ত্তা থেকে বংশীর প্রকৃতি বুঝে নিতে নরেশের একটুও বিলম্ব হ'ল না। গাড়ির দরজাটা টেনে ধ'রে ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে নরেশ বল্‌লে, "তুমি একটু ও-ধারে গিয়ে অপেক্ষা কর। আমি দু চার মিনিটে বংশীবাবুর সঙ্গে কথাটা সেরে নিই।"

গাড়ির দরজায় একটু টান দিয়ে বংশী বুঝতে পারলে শক্ত পাল্লা, আর কোনো কথা না ব'লে চুপ ক'রে রইল।

নরেশ বল্‌লে, "বিশেষ একটু সাহায্যের জন্যে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি বংশীবাবু। আমার একটি আত্মীয় ব্যক্তির মরণ-বাঁচন, অর্থাৎ চাকরী যাওয়া না যাওয়া, আপনার একজন আত্মীয়ের উপর নির্ভর করছে। এ বিপদে যদি উদ্ধার করতে পারেন তা হ'লে আপনার কাছে চির-কৃতজ্ঞ ত' থাক্‌বই, তা ছাড়া পাঁচ শ' টাকা আপনার হাতে দোবো আপনার ইচ্ছামত ব্যয় করবার জন্যে। আপনি রাজি হ'লে আড়াই শ টাকা কাল দিয়ে যাব। বাকি আড়াই শ টাকা কার্য্যোদ্ধার হ'লেই পাবেন।"

বংশী দেখ্‌লে এ কিস্তির মধ্যে প্রথম কিস্তির আড়াই শ টাকাই ধ্রুব এবং লোভনীয়। চির-কৃতজ্ঞতা অপদার্থ বস্তু, এবং দ্বিতীয় কিস্তির আড়াই শ টাকা অনিশ্চিত পদার্থ। বল্‌লে, "তা নিশ্চয়ই ক'রে দেবো—তবে পাঁচ শ টাকাটা আধা আধি না ক'রে প্রথমে তিন শ' পরে দু শ' ক'রে দেবেন দাদা। কিন্তু কে আত্মীয় বলুন ত? আমার ত' কয়েকটিই আত্মীয় আছেন যাঁরা চাকরী দেওয়া নেওয়ার মালিক।"

নরেশ বল্‌লে, "মালাবার হিল্ কোল কন্‌সার্ণের ম্যানেজার রমাপদ বাঁড়ুয্যে।" ব'লে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বংশীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

নরেশের কথা শুনে বংশীর মুখ কালো হ'য়ে উঠ্‌ল; বল্‌লে, "বুঝেচি!" তার পর রমাপদর উপর রুদ্ধ আক্রোশ সহসা এমন ভীষণ ভাবে জ্বলে উঠ্‌ল যে টাকার মোহ পরিত্যাগ ক'রে কঠিন স্বরে বল্‌লে, "সে পাপিষ্ঠর সঙ্গে আমার কোনো আত্মীয়তা নেই। কে আপনাকে বল্‌লে আত্মীয়তা আছে?"

চিন্তিত মুখে নরেশ বল্‌লে, "আপনার পিতা মুরলী বাবুর ভাইঝি ত' রমাপদ বাবুর কাছে রয়েচেন—সরযূ তাঁর নাম?"

ক্রোধাগ্নির যে-টুকু বাকি ছিল তা জ্বলে উঠ্‌ল সরযূর নামোল্লেখে; রমাপদর সহিত সরযূ বংশীদের গৃহ পরিত্যাগ

ক'রে আসার পর সরযূ ও রমাপদ সংক্রান্ত জনরব শুনে বংশীর পরিতাপের অন্ত ছিল না। যে সম্পদ রমাপদর হস্তগত হ'ল সে সম্পদ তার হস্তেই ছিল এই অনুশোচনায় সে অধীর হ'য়ে উঠেছিল। একটা বিকট মুখভঙ্গী ক'রে বংশী বল্লে, "যেমন রমাপদ আমার আত্মীয়, তেমনি সরযূ মুরলীবাবুর ভাইঝি! কি বল্‌ব, আপনি মেয়ে-ছেলে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন, নইলে ওই রমাপদটার কীর্ত্তির সব কথা বল্‌তুম আপনাকে।" ব'লে বংশী সরযূর সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী এবং রমাপদ সংশ্লিষ্ট পরবর্ত্তী ঘটনা এমন কুৎসিত ভাষা এবং ইঙ্গিতের সঙ্গে ব'লে গেল যে, 'মেয়ে-ছেলের' ত দূরের কথা, 'বেটাছেলে' নরেশেরও কান পীড়িত হ'য়ে উঠ্‌ল।

মনের এই বিরূপ কঠোর অবস্থাতেও এত জঘন্য স্বামী-নিন্দা সরযূর অসহ্য হ'ল,—সে একটু মুখ ফিরিয়ে মৃদু কিন্তু অধীর স্বরে বল্লে, "চলুন, চলুন, জামাইবাবু—এখনো কি যথেষ্ট হয় নি।"

নরেশ ড্রাইভারকে ইঙ্গিত করলে, ড্রাইভার এসে গাড়িতে ষ্টার্ট দিয়ে নিজের স্থানে বস্‌ল।

দরজার হ্যাণ্ডল্‌টা চেপে ধ'রে বংশী বল্লে, "কিন্তু আমি তোমাকে ব'লে দিলাম দাদা, পরে দেখে নিয়ো, এ সইবে না; আমার কাছ থেকে যেমন ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, ওর কাছ থেকেও কেউ তেম্‌নি ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। সে হ'ল একটা খাদের ম্যানেজার—চাক্‌রে, আর আমি হলাম প্রোপ্রাইটার—মালিক, সে কিসের জোরে আমার উপর টেক্কা দিতে আসে বলত দাদা!"

চিন্তিত মনে নরেশ বল্লে, "কলিকাল!" তার পর ড্রাইভারকে আদেশ দিলে, "চলো।"

মনের গভীর ক্ষতর বেদনায় বংশী টাকার কথা, এমন কি মেয়ে-ছেলের কথা পর্য্যন্ত, ভুলে গিয়েছিল। ট্যাক্সিটা কম্পাউণ্ড অতিক্রম ক'রে রাজপথে অদৃশ্য হ'লে তার চৈতন্য হ'ল; একটা বড় রকম হাই তুলে বাঁ হাতে তুড়ি দিয়ে নরেশকে একটা সুমধুর আত্মীয়তার সম্বোধনে সম্বোধিত ক'রে বল্লে, "মিছিমিছি দুপুরের ঘুমটা নষ্ট ক'রে দিয়ে গেল গা!" তার পর অলস-মন্থর গতিতে বৈঠকখানার দিকে অগ্রসর হ'ল।

২৩

বাইরে রাজপথে প'ড়ে নরেশ ড্রাইভারকে বল্লে, "চলো, আবার তিখণ্ডা কুঠি চলো।"

সরমা প্রবল ভাবে আপত্তি তুল্লে; বল্লে, "সেখানে যেতে ইচ্ছে হয় আপনি যান, কিন্তু তার আগে আমাকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিন। ঘিণ্টু আমার জন্যে নিশ্চয় কাঁদছে।"

দৃঢ়স্বরে নরেশ বল্লে, "কাঁদুক। তোমার জীবনের এ অত্যন্ত গুরুতর ক্ষণে ছেলে মানুষী ক'রো না সরমা। আমার বুদ্ধি বিবেচনার উপর তোমার যদি একটুও শ্রদ্ধা থাকে তা হ'লে আর ঘণ্টাখানেক সময় আমার উপর নির্ভর কর।"

নরেশের কঠিন মূর্ত্তি দেখে সরমা আর আপত্তি করতে সাহস করলে না; বল্লে, "তিখণ্ডায় আবার এখনি গিয়ে কি হবে?"

"সরযূর সঙ্গে কথা কইব।"

সরমা শশব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌ল; বল্লে, "আমি কিন্তু এবার ভিতরে যাবনা জামাইবাবু!"

নরেশ বল্লে, "আচ্ছা, তুমি বাইরেই থেকো।"

তিখণ্ডা বাংলোর সম্মুখে উপনীত হ'য়ে রাজপথে একটা গাছতলায় মোটর রেখে নরেশ একাকী বাংলোয় গিয়ে উপস্থিত হ'ল। দেখা হ'ল সাধুচরণেরই সঙ্গে। নরেশ বল্লে, "ওহে, তোমার মাঠাকরুণকে গিয়ে বল আমি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

এত শীঘ্র নরেশকে পুনরায় দেখে সাধুচরণ উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ল। পাঁচ টাকার নোট তখনো তার কটিদেশকে উত্তপ্ত ক'রে রেখেছিল; তাড়াতাড়ি বৈঠকখানাঘর থেকে একটা চেয়ার বার ক'রে নরেশের সম্মুখে রেখে বল্লে, "আপনি বসুন হুজুর, আমি এখনি খবর দিচ্ছি।"

সরযূ তার ঘরে শয্যার উপর শুয়ে ছিল, সাধুচরণ গিয়ে বল্লে, "মা সেই বাবুটি আবার এসেছেন। আপনাকে একবার ডাক্‌ছেন।"

ব্যগ্র হ'য়ে সরযূ শয্যা থেকে নেবে দাঁড়িয়ে বল্লে, "বাবুকে বৈঠকখানাঘরে বসাও,—আমি এখনি যাচ্ছি।"

সরযূর আগ্রহ দেখে সাধুচরণ উৎসাহিত হ'ল; বাইরে এসে নরেশকে বল্লে, "আপনার কোনো চিন্তা নেই হুজুর, আপনার যা-যা জান্‌বার দরকার সব আপনাকে ব'লে

দোবো। চলুন, বৈঠকখানায় বসবেন, তা হ'লে মার আপনার সঙ্গে কথা কওয়ার সুবিধা হবে।"

নরেশ বৈঠকখানায় গিয়ে আসন গ্রহণ করতেই পাশের একটা দোর অর্দ্ধ-উন্মুক্ত হ'ল। পরদার তলা দিয়ে সরযূর পা আর শাড়ির অংশ দেখা গেল।

নরেশ দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে; "দেখুন, আপনার যদি আপত্তি না থাকে তা হ'লে আপনার সঙ্গে একান্তে কথাবার্ত্তা হ'লেই ভাল হয়, কারণ—"

কারণ শোনবার জন্যে অপেক্ষা না ক'রে পর্দ্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে নরেশকে নমস্কার ক'রে সরযূ সহজকণ্ঠে বল্লে, "না, আমার আপত্তি নেই। সাধু, তুমি এখন যেতে পার।"

সরযূর প্রতিভাদীপ্ত অকুণ্ঠ লাবণ্যময় মূর্ত্তি দেখে নরেশের মন আশায় উৎসাহে ভাস্বর হ'য়ে উঠ্ল। স্বর্ণাঙ্কিত উজ্জ্বল কোষের মধ্যেও কখনো হয়ত মর্চে ধরা তলোয়ার থাকে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার মনে হল, এ স্বচ্ছ সৌন্দর্য্যের তলায় কলুষের স্থান নেই।

উভয়ে আসন গ্রহণ করলে নরেশ বল্লে, "অসঙ্কোচে কথা বল্বার অনুমতি পেলে কথাটা সহজ ভাবে আরম্ভ করি।"

পাশের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে সরযূ বল্লে, "অসঙ্কোচেই বলুন।" তারপর ঝুঁকে বাইরের দিকে দেখ্বার চেষ্টা ক'রে বল্লে, "আপনার সঙ্গে তখন যিনি ছিলেন তিনি কি গাড়িতেই ব'সে রইলেন?"

নরেশ বল্লে, "হ্যাঁ, তিনি বাইরে সরকারি রাস্তায় গাড়িতে ব'সে আছেন। তাঁর পরিচয় আপনাকে পরে দেবো, তার আগে আপনাকে দু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

সরযূ বল্লে, "তাঁর পরিচয় বোধহয় দেবার প্রয়োজন হবে না। তিনি রমাপদবাবুর স্ত্রী।"

বিস্ময়ে বিমূঢ় হ'য়ে নরেশ বল্লে, "আপনি কি ক'রে জান্লেন?"

সরযূ বল্লে, "অনুমানে।"

নরেশের মুখে প্রশংসা ও আনন্দের দীপ্তি ফুটে উঠ্ল; বল্লে, "আপনি যখন এতটা অনুমান করেছেন তখন আরো অনেক কথাই আপনি অনুমান ক'রে থাক্বেন, সুতরাং বেশি কথা আপনাকে বল্বার প্রয়োজন হবে না। যেটুকু হবে আপনার মত বুদ্ধিমতীর পক্ষে তা বুঝতে বেশি বিলম্ব হবে না।"

সরযূর মুখে দিনান্তের দিক্‌চক্রবালে ক্ষীণ বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মতো নীরব মৃদু হাস্য দেখা দিলে; বল্লে, "আপনার অনুমান কিন্তু ভুল হ'ল,—আমি বুদ্ধিমতী নই। জীবনে বুদ্ধিহীনতার কত যে পরিচয় দিলুম তার সংখ্যা নেই,—আরো হয় ত কত দিতে হবে!" ব'লে সরযূ দৃষ্টি নত ক'রে তার উদ্বেল চিত্তকে সংযত করতে লাগল।

নরেশের সদয় চিত্ত সহানুভূতিতে ভ'রে উঠ্ল; স্নিগ্ধ-স্বরে বল্লে, "তা যদি দিয়ে থাকেন ত' সেই আপনার জীবনের ট্র্যাজেডি। যার জীবনে যে ঘটনা ঘটা উচিত নয়, তার জীবনে সে ঘটনা ছাড়া ট্র্যাজেডি আর কি আছে?" তার পর নরেশ নিজের পরিচয় দিলে; বল্লে, "আমার নাম নরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি রমাপদর বড় ভায়রা-ভাই। গত সাত আট মাস রমাপদর স্ত্রী সরমা তার একটি শিশু পুত্র নিয়ে আমাদের সঙ্গে কাশীতে বাস করছিল। এই সাত আট মাসের ইতিহাস একটু শুন্লে আপনি সমস্ত কথাটা বুঝতে পার্‌তেন।"

সরযূ বল্লে, "আমাকে ক্ষমা করবেন নরেশবাবু; ও সাত-আট মাসের কোনো কথাই আমার জান্বার দরকার নেই। আপনি যে রমাপদবাবুর স্ত্রীকে নিয়ে উপস্থিত হয়েচেন, এই জানাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। যা কিছু জানবার আছে তা আপনার। আপনি বোধহয় প্রধানতঃ দুটি কথা জান্‌তে চান,—প্রথমতঃ রমাপদবাবুর সঙ্গে আমি কি সম্পর্কে বাস করছি; দ্বিতীয়তঃ, রমাপদবাবুর সংসার হ'তে আমার উচ্ছেদ সম্ভব কি-না।"

নরেশ বল্লে, "শুধু সম্ভব কি-না নয়,—উচিত কি-না। স্বত্বের স্তুতি যতই থাক্ না কেন, অধিকারকে আমি স্বত্বের চেয়ে নীচু স্থান দিই নে। স্বত্বের নিবাস দলীলপত্রের মধ্যে, অধিকারের আধিপত্য একেবারে বস্তু-দেহের উপর। এই দেখুন না কেন স্বত্বের দাবীতে সরমার অবস্থা এখন কম্পাউণ্ডের বাইরে গাড়ির ভিতর; আর অধিকারের মহিমায় আপনি এ বাড়ির গৃহকর্ত্রী।" ব'লে নরেশ হাস্‌তে লাগল।

সরযূ বল্লে, "ছাই এ অধিকার;—এর ওপর আমার

বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। যে অধিকারের মূলে স্বত্ব নেই সে অধিকার ত' জুলুম জবরদস্তি।"

সরযূর চিন্তাশীলতা এবং যুক্তিশীলতা দেখে রসগ্রাহী নরেশ মুগ্ধ হয়ে গেল; প্রশংসোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বল্লে, "দেখুন, লেখাপড়া আপনি কতদূর করেছেন তা জানি নে, কিন্তু আপনার আলোচনা-শক্তি দেখে নিজে লেখাপড়া ক'রে পটু হয়েচি ব'লে মনে মনে যে একটু অভিমান ছিল তা আজ গেল।"

নরেশের কথা শুনে সরযূর মুখ অপ্রতিভ হয়ে উঠ্‌ল। দুঃখার্ত্ত কণ্ঠে সে বল্লে, "আমি এত কথা কইনে, কিন্তু আজ, কি জানি কেন, কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারচি নে—অনবরত ব'কে মরচি। বাড়ি ফিরে গিয়ে আপনি মনে করবেন একটা বাচাল মেয়ের পাল্লায় পড়েছিলেন।"

শুনে নরেশ একটু হাস্‌লে; বল্লে, "হ্যাঁ, মনের যদি ভাল-মন্দ ভেদ করবার কিছুমাত্র শক্তি না থাকে, তা হ'লে।"

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে সরযূ বল্লে, "আসল কথাটা এবার বলি। আমার জীবনের একটু ইতিহাস শুন্‌লে আপনি বুঝতে পারবেন কেমন ক'রে এ সংসারে আমার প্রবেশ হয়েচে। তা ছাড়া, যে কথাটা আপনার প্রথমে জানা দরকার সেটাও সঙ্গে সঙ্গে জান্‌তে পারবেন; দ্বিতীয় কথাটার উত্তরও বোধহয় না দিলে চল্‌বে।" ব'লে সরযূ সংক্ষেপে তার সমস্ত জীবনের কাহিনী বিবৃত করলে;— বাল্যকালে পিতৃ-মাতৃহীন হওয়ার পর দুঃখে কষ্টে আট বৎসর মাতুল গৃহে অতিবাহন, বিবাহের তিন বৎসর পরে স্বামীর মৃত্যু, শ্বশুরালয়ে আশ্রয় না পাওয়া, মামীর বাড়িতে কিছুদিনের জন্য দুঃসহ আশ্রয়, তার পর মুরলীধরের আশ্রয়ে কুমার-পুথিতে পাঁচ বৎসর বাস, রমাপদর আবির্ভাব, সর্পদংশনে মুরলীধরের মৃত্যু, দেশ থেকে মুরলীধরের বিধবা পত্নী আসার দিনই রমাপদর গৃহে আশ্রয় নিতে বাধ্য হওয়া, তার পর রমাপদর সহিত নিত্যকার খুঁটিনাটির মধ্য দিয়ে জীবন যাপন, রমাপদর পারিবারিক জীবনের সংবাদের জন্য সরযূর অনুসন্ধিৎসা, রমাপদর অটল তূষ্ণীম্ভাব, ভাগলপুরে আশ্রম প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প কিছুই বল্‌তে বাকি রাখলে না। বল্লে, "সুতরাং আপনি বুঝতে পারছেন রমাপদবাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আশ্রয়দাতা আর আশ্রিতার। রমাপদবাবু যদিও তাঁর সহৃদয়তার জন্যে সে কথা স্বীকার করেন না, বলেন, মানুষের জীবন ঘটনার সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়, তাঁতে আর আমাতে যে একসঙ্গে বাস করছি তা অনিবার্য্য ঘটনার ফলে। তাই তিনি অতি সহজ ভাবে আমাদের এই মিলনকে গ্রহণ ক'রে আমাকে গৃহকর্ত্রীর পদ দিয়েছেন। এ অবশ্য তাঁর উদার সহৃদয়তার গুণে, কিন্তু আমার মনে হয় ভদ্রলোক মাত্রেরই, আপনি হ'লে আপনারও, এই আচরণ হ'ত।"

সরযূর জীবনের সকরুণ কাহিনী শুনে নরেশের চিত্ত বেদনায় ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠ্‌ল; আন্তরিক সহানুভূতির সহিত সে বল্লে, "আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় কতক্ষণেরই বা, হয়ত আধঘণ্টারও বেশি নয় কিন্তু, এই অল্প সময়েরই মধ্যে আপনার যে পরিচয় পেলাম তাতে প্রার্থনা করি, জীবনে যে সফলতা লাভ করবার আপনি সম্পূর্ণ যোগ্য সে সফলতা থেকে আপনি যেন আর বঞ্চিত না হন। বিশ্বাস করুন, আপনার জন্যে এ কামনা আমি ঠিক তেমনি ভাবে করছি, ছোটো বোনের জন্যে বড় ভাই যেমন ক'রে।"

নরেশের সহানুভূতির কথায় অতর্কিতে সরযূর চক্ষু হ'তে টপ্ টপ্ ক'রে কয়েক ফোঁটা জল ঝ'রে পড়ল; তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে চোখ মুছে সে বল্লে, "সফলতা বিফলতা ঠিক বুঝিনে নরেশবাবু। একটা খুব সত্যি কথা বলি কিছু মনে করবেন না। স্বামীর সঙ্গে তিন বৎসরের জীবনে যে সফলতা পাই নি—রমাপদবাবুর সঙ্গে তিন মাসের জীবনে তা বোধহয় পেয়েছি। এ কথা হঠাৎ শুনতে খারাপ লাগে, আসলে কিন্তু একটুও খারাপ নয়। সংসারে ফলের যেমন সংখ্যা নেই—মানুষের জীবনে সফলতারও তেমনি সীমা নেই।" একটু হেসে বল্লে, "তাই ব'লে যেন ভয় করবেন না, এ সংসার থেকে আমাকে উচ্ছেদ করতে আপনাকে কষ্ট পেতে হবে। দেহটা আশ্রয় নিয়েছে বটে এ সংসারে, কিন্তু মনের শেকড় এর মধ্যে ফেল্‌তে দিই নি।"

এ বিশ্বাস সত্য-সত্যই সরযূর মনে মনে ছিল, কিন্তু কথাটা যে কতদূর মিথ্যা তা তার নিজের কথায় নিজের কানে ঠেকবামাত্র সে বুঝতে পারলে এবং বোঝবামাত্র একটা মর্ম্মন্তুদ বেদনা তার মুখের উপর ফুটে উঠল যা সে কিছুতেই রোধ করতে পারলে না, এবং যা নরেশের সতর্ক দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভাবে ধরা পড়ল।

নরেশ বল্‌লে, "মনের একটা গুণ এই আছে যে, সে অপরের অবগতি এমন কি অনুভূতি থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে—দেহের অবশ্য সে গুণ নেই। তাই আমার মনে হয় মনের সম্পদ থেকে কিছুমাত্র নিজেকে বঞ্চিত না ক'রে আপনার দেহ এ সংসার থেকে উচ্ছিন্ন করতে হবে। কেন, তা একটা কথা শুনলে বুঝতে পারবেন।" ব'লে গয়া ষ্টেশনে সরযূ ও রমাপদ সম্বন্ধে যে কথা শুনে এবং পরে ঝরিয়ায় কয়েক স্থানে অনুসন্ধানের ফলে যে কথা জেনে সরমার মনে একটা সুতীব্র বৈরূপ্য উৎপন্ন হয়েচে তার কথা বল্‌লে।

নরেশ বল্‌লে, "সংশয় জিনিষটা যেমন সহজে মানুষের বিশেষতঃ মেয়ে মানুষের মনে শিকড় ফেলে, তেমনি শক্ত তাকে মন থেকে উপড়ে ফেলে দেওয়া।"

সরযূ বললে, "এ অবস্থায় ত কথাই নেই—কিন্তু সংশয়ের কোনো কথা না থাকলেও আমি এ সংসারে থাকতাম না। রমাপদবাবুর স্ত্রী এবং আমি দুই বিবাদী সুর না হ'লেও বাদী সুর হ'তে পারব না ব'লে আমারও বিশ্বাস। অতএব আমি প্রস্তুত—বলেন ত এখনি সরে পড়ি।" ব'লে হাস্‌তে গিয়ে চোখ ভিজে এল।

নরেশ বল্‌লে, "এখনি না হ'লেও আজকে নিশ্চয়ই। কিন্তু তার আগে আমার একটা প্রার্থনা একটা ভিক্ষা আছে। বাসা ভাঙ্গার পাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আমাকে আপনি দয়া করে বাসা বেঁধে দেবার অনুমতি দিন। রমাপদর আমি বড় ভাইয়ের মতো—আপনি যেমন রমাপদর সংসারে ছিলেন তেমনি আমার সংসারে থাকবেন। আমি বিপত্নীক, আমি অপুত্রক, আপনি আমাকে বড় ভাইয়ের পদে বরণ করুন—আমাকে অনুমতি দিন আপনাকে তুমি ব'লে সম্বোধন করবার, নাম ধরে ডাকবার।"

সরযূ স্তব্ধ নির্ব্বাক্ হয়ে নতনেত্রে বসে রইল, তার মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিলে, তার সমস্ত দেহ মৃদু মৃদু কম্পিত হ'তে লাগল। বৃহৎ বৈঠকখানা ঘর একটা অনির্ব্বচনীয় প্রত্যাশায় থম্ থম্ করতে লাগল। নরেশেরও মুখে আর কোনো কথা বার হ'ল না—সে নীরবে সরযূর স্তব্ধ মৌন মূর্ত্তির দিকে চেয়ে বসে রইল।

ক্ষণকাল পরে সরযূ ধীরে ধীরে তার আনত চক্ষু নরেশের দিকে তুলে মৃদুস্বরে বল্‌লে, "আচ্ছা।" তার পর আর্দ্র-কণ্ঠে বল্‌লে, "আমার আশ্রয়ের জন্যে এত ব্যস্ত না হ'লেও চল্‌ত। দেশে এত নদ নদী খাল বিল পুকুর থাকতে শেষ পর্য্যন্ত মেয়েমানুষের আশ্রয়ের অভাব হয় না। তবু আমি আপনার আশ্রয় নিলাম দাদা। আশ্রয় নিতে নিতে এত ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি যে এই বিনয়ের কথা কাটাকাটি করবার শক্তিও আর নেই।"

নরেশের মুখ আনন্দে দীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ল; প্রসন্নকণ্ঠে সে বল্‌লে, "আমি তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করলাম সরযূ!"

আর একদিনকার কথা মনে প'ড়ে সরযূর আবার চোখে অশ্রু দেখা দিলে। সেদিনও এমনি ক'রে রমাপদ সরযূর ভার গ্রহণ করেছিল।

স্থির হ'য়ে গেল সেইদিনই রমাপদ ফিরে আস্‌বার পূর্ব্বে সন্ধ্যার ট্রেণে সরযূকে নিয়ে নরেশ কলকাতা রওয়ানা হবে। নরেশ বল্‌লে, "এসব ব্যাপারে বিঘ্ন সব রকমে এড়িয়ে চলাই নিয়ম। রমাপদ ফিরে এসে কি গোলযোগ বাধাবে কে জানে। তাছাড়া সত্যি কথা বল্‌তে, তোমায়ো ওপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস নেই সরযূ। তুমি যে কত বড় একটা অভিনয় করছ তা কি আমি বুঝতে পারছিনে ব'লে মনে কর?"

সরযূ তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়ে মুখ ফিরিয়ে বল্‌লে, "আপনি এখানেই বসুন, আমি রমাপদবাবুর স্ত্রীকে নিয়ে আসি।" ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

২৪

বারান্দায় বেরিয়ে সরযূ দেখ্‌লে গেটের প্রায় সম্মুখেই রাস্তার অপর পার্শ্বে মোটরে সরমা ব'সে আছে। রৌদ্র-তপ্ত প্রাঙ্গণে খালি পায়ে নেবে প'ড়ে সে দ্রুতপদে মোটরের দিকে অগ্রসর হ'ল।

সরযূকে আস্‌তে দেখে সরমার হৃদ্‌স্পন্দন সুরু হয়ে গেল; কি করবে কি বল্‌বে ভেবে না পেয়ে সে তার আরক্ত উত্তেজিত মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে ব'সে রইল।

সরযূ এসে গাড়ির দোর খুলে পা-দানির উপর দাঁড়িয়ে সরমার হাত ধ'রে টান দিয়ে বল্‌লে, "আসুন। এ কি ছেলেমানুষী বলুন ত! আপনি এ বাড়ির কর্ত্রী, আর বাইরের লোকের মুখে একেবারে বাজে কতকগুলো ছাই-ভস্ম কথা শুনে বাইরে ব'সে আছেন! তার চেয়ে

সোজা এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেই ত' সব পরিষ্কার হ'য়ে যেত। আসুন!"

অদূরে করিম ছায়ায় বসেছিল, সরযূকে দেখ্‌তে পেয়ে ছুটে এসে বল্‌লে, "আপনি উঠে বসুন মেম-সায়েব, আমি গাড়ি ক'রে পৌঁছে দিচ্ছি।"

মেম-সায়েব সম্বোধন শুনে সরযূর বুকের মধ্যে ধক্ ক'রে উঠ্‌ল! কেই বা মেম-সায়েব, আর কেই বা সায়েব! দু-দিনের নাটিকার শেষে যবনিকা প'ড়ে গেছে তা এরা এখনো জানে না। বল্‌লে, "দরকার নেই। গাড়ি তুমি পরে নিয়ে যেয়ো, আমরা হেঁটেই যাব।"

এ অবস্থায় নিরুপায় বোধ ক'রে সরমা গাড়ি থেকে নেবে পড়্‌ল। বিশেষত করিম কাছে এসে দাঁড়িয়েছে তার সম্মুখে কিছু বলা যায় না, তাছাড়া বল্‌বেই বা কি।

সরযূ দক্ষিণ হাত দিয়ে সরমার বাম হাত ধ'রে গৃহের দিকে অগ্রসর হ'ল। যেতে যেতে বল্‌লে, "আমি আপনার স্বামীর আশ্রিত। আশ্রিত বল্‌তে যা বোঝায় সত্যি সত্যিই তাই; পরে আপনি তাঁর মুখে আমার সব কথাই শুন্‌তে পাবেন। আপনার স্বামীর যখন আমি আশ্রিত, তখন আপনারো আশ্রিত। আশ্রিতের প্রতি বিমুখ হ'য়ে থাক্‌বেন না।"

কিয়দ্দূর অগ্রসর হয়ে সরযূ বল্‌লে, "আপনি একেবারে মন পরিষ্কার ক'রে ফেলুন। এ ব্যাপারের মধ্যে গ্লানির এতটুকু কথা নেই। আমার এ কথা যদি পরে মিথ্যা ব'লে টের পান আমাকে এখানে ডেকে এনে আপনি এ বাড়ি ত্যাগ ক'রে চ'লে যাবেন,—জান্‌বেন আমার পক্ষে তত বড় দণ্ড আর কিছুই হবে না।"

সরমা একটা কিছু বলবার চেষ্টা করলে কিন্তু তার মুখ দিয়ে কথা বার হ'ল না। সরযূ বল্‌লে, "কতদিন আপনার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছি তিনি বিবাহিত কি-না—কোনো দিন স্পষ্ট ক'রে কিছু বলেন নি। আপনার অস্তিত্ব প্রথম জান্‌তে পারলুম আজ।"

নরেশ বারান্দায় বেরিয়ে দেখ্‌ছিল;—সরযূ ও সরমা সেথায় উপনীত হ'লে বল্‌লে, "পুণ্যের পুরস্কার যে এমন হাতে হাতে পাওয়া যায় তা জান্‌তাম না সরমা! তোমার স্বামী উদ্ধারের পুণ্যে সঙ্গে সঙ্গে আমার বোনটিকে লাভ করলাম। তুমি তোমার ঘর-সংসার বুঝে নাও—আমি সরযূকে নিয়ে আজ সন্ধ্যার গাড়িতে কলকাতা রওনা হচ্চি।"

সরমা এবার কথা কইলে; বল্‌লে, "সে কি ক'রে হবে জামাইবাবু? তিনি আসবার আগে, কোনো কথাবার্ত্তা না হ'য়ে—"

নরেশ সরমার কথা শুনে হাস্‌তে লাগ্‌ল; বল্‌লে, "আর হাসিয়ো না সরমা! দম্পতি-কলহের পরিণতি কেমন হয় তার নির্দ্দেশ শাস্ত্রে আছে,—সে লঘুক্রিয়া সামলাবার জন্যে আমাদের থাক্‌বার দরকার নেই। তারপর তোমার স্বামী এসে কি করবেন বলা যায় না ত'—ধর, যদি তিনি তোমাকেও আটকান আর এঁকেও না ছাড়েন তখন আমার ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ হবে। তাছাড়া এর মধ্যে একটি প্রগাঢ় যুক্তির কথা আছে। সরযূকে একেবারে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রো না, গাড়ি থেকে আস্‌তে আস্‌তে সরযূ তোমাকে যে কথাগুলি শোনাচ্ছিল তা শুনে একেবারে নিশ্চিন্ত হ'য়ো না। এমন চমৎকার কথা বলবার ক্ষমতা ওর আছে যে, যা ব'লে তাই বিশ্বাসযোগ্য ব'লে মনে হয়। সরযূ যখন যেতে রাজি হয়েচে, নিষ্কণ্টক হওয়ার সুবিধে হারিয়ো না।"

সরযূর মুখে হাসি দেখা দিলে; বল্‌লে, "দাদা, আপনার কাণ্ড দেখে আমি অবাক্ হয়েচি। দিনের বেলা যখন এই ব্যাপার, রাত্রে আপনি নিশ্চয় চোরকে চুরী করতে বলেন আর গৃহস্থকে সাবধান ক'রে দেন।"

এবার সরমারও মুখে হাসি দেখা দিলে; কিন্তু তখনি মুখ বিমর্ষ ক'রে বল্‌লে, "তবু ত' এখন ওঁকে নির্জ্জীব অবস্থায় দেখ্‌চেন; দিদি বেঁচে থাক্‌তে যদি দেখ্‌তেন—"

নরেশের মুখে বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠ্‌ল; বল্‌লে, "এখন বারুদে জল পড়েছে; কিন্তু সে-সব কথা উপস্থিত থাক্—আমি এখন চল্লাম সরমা, ষ্টেশন থেকে তোমার জিনিসপত্র আর মিণ্টুকে নিয়ে আস্‌তে। তুমি ততক্ষণে প্রস্তুত হয়ে থাক সরযূ।"

সরমা বল্‌লে, "আমিও আপনার সঙ্গে যাই জামাইবাবু।"

নরেশ বল্‌লে, "ক্ষেপেছ সরমা, রাজ্য ফিরে পেয়ে আর এক-পা নড়্‌তে আছে? তাছাড়া, দেখায় না ভালো। সরযূ মনে ভাববে—তার সাক্ষাতে যে-সব কথা বল্‌বার তুমি সুবিধে পেলে না—সেইসব কথা আমাকে বলবার উদ্দেশ্যে যেতে চাচ্চ।"

সরযূ হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, "দাদা, আপনি অদ্ভুত মানুষ! আপনি মরা মানুষকেও হাসাতে পারেন।"

সন্ধ্যার পূর্ব্বে নরেশ এবং সরমাকে ব'সে থেকে খাইয়ে নিজে সামান্য জল খেয়ে সরযূ যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'ল।

নরেশ বল্‌লে, "তোমার জিনিস পত্র সরযূ?"

সরযূ মৃদু হেসে উত্তর দিলে "আশ্রয় দেওয়ার সম্পূর্ণ পুণ্য থেকে আপনাকে একটুও বঞ্চিত করলাম না দাদা, বাড়ি পৌঁছে শুধু অন্ন দিলেই হবে না, বস্ত্রও দিতে হবে। মাস তিনেক আগে যে বেশ প'রে শুধু হাতে এ বাড়িতে এসেছিলাম, আজ ঠিক সেই বেশ প'রে চলেছি। আপনার বাড়ি গিয়ে তুলে রেখে দেব; যেদিন আপনার কাছ থেকে রেহাই পাব সেদিন আবার এই বেশ প'রে বেরিয়ে পড়ব।"

চাকর-বাকররা জড় হ'য়ে নিকটে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের ডেকে সরযূ বল্‌লে, "আমি আজ বাপের বাড়ি চল্‌লাম।" সরমাকে দেখিয়ে বল্‌লে, "ইনি তোমাদের মা। আমাকে যদি আর কখনো দেখ মাসিমা ব'লে ডেকো। ভগবান তোমাদের সুখে রাখুন।"

চাকররা সরযূর কথা শুনে কেঁদে ফেল্লে—মৈথিল পাচক হাউ হাউ ক'রে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লে, "বড় দুর্দ্দিন মা জী, বড় দুর্দ্দিন!"

নরেশ দুখানা দশটাকার নোট পাচকের হাতে দিয়ে বল্‌লে, "তোমাদের মা-জী বকসিস্ দিলেন—ভাগ ক'রে নিয়ো।"

অন্দরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সরযূ একবার চতুর্দ্দিক দেখে নিলে; তার পর দ্রুতপদে নিজের শয়ন কক্ষে প্রবেশ ক'রে দোর বন্ধ ক'রে দেওয়ালে টাঙানো রমাপদর ফটোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নির্নিমেষে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সহসা দুই হাতে টপ্ ক'রে তুলে নিয়ে বুকের কাছে নিয়ে এল—তার পর কি ভেবে ধীরে ধীরে মাথায় ঠেকিয়ে দেওয়ালে টাঙিয়ে দিয়ে গলবস্ত্র হ'য়ে প্রণাম ক'রে চোখ মুছে বেরিয়ে এল। তার পর কোনো দিকে আর না তাকিয়ে সোজা মোটরে গিয়ে বস্‌ল।

পর মুহূর্ত্তে মোটর নিজের ধূলিতে নিজেকে অদৃশ্য ক'রে ঝড়ের মত ষ্টেশনের দিকে ধাবিত হ'ল।

২৫

সেই দিনই রাত দশটার সময় রমাপদ তিথওয়ায় ফিরে এল। চাকরেরা সেদিনের ঘটনার কথা কিছু বল্‌লে না। ভিতরে প্রবেশ ক'রে রমাপদ ডাক্‌লে, "সরযূ, সরযূ!"

কোনো উত্তর পেলেনা—বিস্মিত হ'ল। এমন দিনে মোটরের শব্দ পেয়ে সরযূ বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়—আর আজ ডেকেও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না! এই দশটার মধ্যেই সরযূ ঘুমিয়ে পড়ল না-কি!

সরযূর ঘরে উঁকি মেরে দেখ্‌লে খাট নেই। গভীর বিস্ময়ে নিজের ঘরে প্রবেশ ক'রে দেখ্‌লে তার খাটের পাশে সরযূর খাটে মশারী ফেলা রয়েছে। তাড়াতাড়ি মশারী তুলে দেখলে তার মধ্যে সরমা আর ঘিণ্টু শুয়ে ঘুমচ্চে। যা দেখ্‌চে তাই ঠিক কি-না বুঝে দেখবার জন্যে চৈতন্যটাকে একবার নাড়া দিয়ে নিলে। একবার মনে করলে সরমাকে ঘুম ভাঙিয়ে তোলে; কিন্তু তা' না ক'রে বিমূঢ়ভাবে চেয়ারে গিয়ে ব'সে পড়ল। সামনেই টেবিলের উপর দেখ্‌তে পেলে একটা খামে মোড়া চিঠিতে বড় বড় অক্ষরে তার নাম লেখা। ল্যাম্পটা তাড়াতাড়ি জোর ক'রে দিয়ে খুলে দেখ্‌লে নরেশ লিখ্‌চে—কল্যাণীয়েষু, সরমাকে দিয়ে সরযূকে নিয়ে চল্‌লাম। সরমার মুখে সমস্ত অবগত হবে। প্রার্থনা করি, আজকের এই লেন-দেন তোমার এবং আমার উভয়ের পক্ষে শুভ হ'ক। ইতি—আশীর্ব্বাদ, শ্রীনরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিঠি প'ড়ে রমাপদ ক্ষণকাল স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল—তারপর টেবিলের উপর দুই হাত রেখে তার উপর মাথা গুঁজে কেঁদে ফেল্‌লে।

এ অশ্রুর কতক অংশ আনন্দাশ্রু কি না তা' কে জানে!

সমাপ্ত

রজনীকান্ত গুপ্ত

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

আজ আমি যাঁহার জীবনী আলোচনায় সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, তাঁহার সহিত আমার একটু পরোক্ষ কিন্তু অন্তরের যোগ রহিয়াছে। কথাটা বলা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হইতে পারে, কিন্তু যোগসূত্র অস্বীকার করিবারও ত উপায় নাই। তিনি বহুকাল পূর্ব্বে স্বর্গীয় হইয়াছেন, আর আমি আজিও মর্ত্ত্যজগতে বর্ত্তমান; তথাপি আমি তাঁহাকে আমার নিতান্ত আপনার জন মনে না করিয়া পারি না,—এবং বোধ হয় আমার ন্যায় আরও অনেকেরই তিনি আপনার জন। এই যোগসূত্রটি আর কিছুই নহে—স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, এবং বাঙ্গলা সাহিত্য সেবাই তাঁহার উপজীবিকা ছিল; এবং সর্ব্বোপরি, তাঁহার শ্রবণশক্তি তাদৃশ তীক্ষ্ণ ছিল না। এই তিনটি বিষয় তাঁহার সহিত আমার ক্ষীণ যোগসূত্র। এ সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছু আমার বলিবার নাই।

কবি গ্রে একমাত্র "এলিজি" লিখিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন। তারকনাথ গাঙ্গুলী মহাশয় "স্বর্ণলতা" লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। এরূপ আরও অনেক গ্রন্থকারের নাম করা যাইতে পারে, যাঁহারা এই ভাবে এক একটি রচনার জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থকার যদি আর কিছুই না লিখিতেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের অর্জ্জিত যশঃ একটুও ম্লান হইত না। "সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস" লিখিয়া রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ও তদ্রূপ অক্ষয় যশের অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহার আরও অবদান সত্ত্বেও এই বইখানিই তাঁহার যশোলাভের প্রধান কারণ।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জ মহকুমায় মত্তগ্রামে বঙ্গীয় ১২৫৬ অব্দের ২৯শে ভাদ্র তারিখে মাতুলালয়ে রজনীকান্ত জন্মগ্রহণ করেন। তেওতা গ্রামনিবাসী কমলাকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের তিনি পঞ্চম ও সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র। অতি শৈশবে রজনীকান্তের খুব সম্ভব একবার টাইফয়েড জ্বর হইয়াছিল; সেইজন্য তাঁহার শ্রবণশক্তির কিছু ক্ষীণতা ঘটে। এরূপ অবস্থায় সাধারণ লোক হইলে একেবারে অকর্ম্মণ্য ও জীবনে হতাশ হইয়া পড়িত। কিন্তু রজনীকান্তের প্রকৃতি সাধারণ লোকের প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র উপাদানে গঠিত ছিল। সেইজন্য তাঁহার জীবন বৃথা হয় নাই; এবং উত্তরকালে তিনি যশ, মান, অর্থ, প্রতিপত্তি—মানব জীবনের কাম্য সব কিছুই অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন।

তেওতা গ্রামে একটি মাইনর স্কুল ছিল, এবং রজনীকান্তের এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। ইহার ফলে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ অসুবিধা ঘটে নাই—যথাসময়ে তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। পরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। তাঁহার শ্রবণশক্তির ক্ষীণতা বশতঃ সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তাঁহার অধ্যয়নের একটু বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দেন। এই প্রকার সুযোগ লাভ করিয়া এবং নিজ অধ্যবসায় বলে রজনীকান্ত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়া তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। তৎকালীন এণ্ট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়া তিনি সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করেন। ইহার পর কিছুদিন বিশৃঙ্খল ভাবে কাটিয়া যায়। একবার তিনি কবিরাজী চিকিৎসা বিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—কবিরাজী চিকিৎসা-ব্যবসায় পরিচালন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ভাল না লাগাতে তিনি তাহা ছাড়িয়া দেন। অতঃপর তাঁহার সরকারী চাকুরী করিবার কথা হয়। কিন্তু সাহিত্য-চর্চ্চার জন্য তাঁহার জীবন গঠিত হইয়াছিল—কাজেই চাকুরীতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার একটা স্বাভাবিক অনুরাগ জন্মিয়াছিল। সেই অনুরাগ বশতঃ তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহার ফল স্বরূপ তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'জয়দেব-চরিত' রাজা সার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর-বিজ্ঞাপিত পুরস্কার লাভ করে। ইহা ১২৮০ সালের ঘটনা। তখন রজনীকান্তের বয়স মাত্র ২৪ বৎসর। ইহার দুই বৎসর পরে তাঁহার পাণিনি গ্রন্থ রচিত হয়।

ইহার অল্পদিন পরেই স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হওয়ায় ভূদেব বাবুর অনুরোধে তিনি এডুকেশন গেজেটে লিখিতে আরম্ভ করেন, ও তজ্জন্য কিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হইতে থাকেন। ১২৮৮ সালে 'বঙ্গবাসী' পত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে রজনীকান্ত বঙ্গবাসীর নিয়মিত লেখক-শ্রেণীভুক্ত হ'ন। ঐ বৎসর তিনি স্বর্গীয় কে, এম, ব্যানার্জ্জির চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষার অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত হ'ন; তৎপর বৎসর তাঁহার সঙ্কলিত সংস্কৃত সংগ্রহ-গ্রন্থ এণ্ট্রান্স পরীক্ষার্থীর পাঠ্যপুস্তক রূপে নির্দ্ধারিত হয়।

রজনীকান্ত স্কুলপাঠ্য বহু পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত "ভারতবর্ষের ইতিহাস—হিন্দু ও মুসলমান রাজত্ব" ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য ছিল। আমরা যখন ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়াছিলাম তখন আমাদিগকে এই গ্রন্থ হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাসের হিন্দু ও মুসলমান আমল এবং স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে ইংরেজের আমল অংশ অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল। এই ইতিহাস ব্যতীত তাঁহার আরও কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ ছিল। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি "সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস"। এই গ্রন্থ রচনা করিতে তাঁহাকে অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল—তাঁহার সামান্য আয় হইতে যৎকিঞ্চিৎ করিয়া সঞ্চয় করিয়া বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থ ক্রয় পূর্ব্বক তাহা অধ্যয়ন করিতে হইত। বহু বৎসর ব্যাপী পরিশ্রমের ফলে তাঁহার এই কীর্ত্তিস্তম্ভ বিরচিত হয়। বাঙ্গলা সাহিত্যে ইহা তাঁহার অমূল্য দান।

রজনীকান্তের আর একটি কর্ম্মক্ষেত্র ছিল—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ। এই পরিষদের প্রতিষ্ঠা হইতে তিনি ইহার উন্নতি সাধনের জন্য অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তাহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হইয়া দক্ষতা সহকারে দুই বৎসর উহা সম্পাদন করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্যের যে যৎসামান্য আদর হইয়াছে, রজনীকান্তকেই তাহার মূল বলিতে হইবে। কারণ, তাঁহারই আগ্রহে পরিষৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্যের অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রবর্ত্তনের জন্য আবেদন করেন; এবং পরিষদের প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ে আংশিক ভাবে গৃহীত হয়।

রজনীকান্তের চরিত্রের দুইটি বিশেষত্ব আমাদের চক্ষে পড়ে। একটি, তাঁহার অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ; দ্বিতীয়টি, তাঁহার প্রবল সাহিত্যানুরাগ। এই দুইটি আবার পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ বশতঃ তিনি এক দিকে যেমন সাহিত্যকেই তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ করেন, অপর দিকে তদ্রূপ তাঁহার স্বদেশানুরাগ তাঁহাকে স্বদেশের অতীত ও বর্ত্তমান গৌরবময় ইতিহাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত করে। বিদেশী লেখক ও ঐতিহাসিকদিগের পক্ষপাত-দুষ্ট একদেশদর্শী বিদ্বেষমূলক ইতিহাস হইতে স্বাধীন ভাবে গভীর গবেষণার ফলে প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ধার করিয়া তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির কলঙ্ক মোচন করেন। বর্ত্তমান কালে দেশে অনেক ঐতিহাসিক নব্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইতিহাস আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন,—তাঁহাদের চেষ্টায় বাঙ্গলার, তথা ভারতের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধারের অনেক উপকরণ ও উপাদান সংগৃহীত হইতেছে—রজনীকান্তকে এই ইতিহাস আলোচনার মূল প্রবর্ত্তক ও প্রথম পথপ্রদর্শক বলিতে পারা যায়।

১৩০৭ সালের বৈশাখ মাসে রজনীকান্তের হাতে ও পৃষ্ঠদেশে দুই তিনটি ব্রণ হইয়া তিনি কষ্ট পান। পৃষ্ঠের ব্রণটিকে ডাক্তাররা কার্বঙ্কল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু চিকিৎসায় তাহা ভাল হইয়া যায়। এই সময়ে তাঁহার "সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসে"র মুদ্রাঙ্কন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। এই গ্রন্থের শেষ ফর্ম্মা ছাপাখানায় দিয়া তিনি জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁহার পীড়িত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখিবার নিমিত্ত নিজ গ্রামে গমন করেন। সেখানে বাম হাতের তলে আরও দুই একটা ব্রণ হয়। অত্যন্ত অসুস্থ শরীর লইয়া ২৪শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এই ব্রণই তাঁহার কাল হইল—৩০শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার মধ্য রাত্রিতে পত্নী, এক পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া তাঁহার লোকান্তর ঘটিল। মনে হয়, যে "সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস" তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ, তাহার নির্ম্মাণ শেষ করিবার জন্যই যেন তিনি জীবিত ছিলেন—কীর্ত্তিস্তম্ভের নির্ম্মাণও শেষ হইল, তাঁহারও কাজ ফুরাইল।

আজ আমি সংক্ষেপে বাঙ্গলা সাহিত্যের সেই একনিষ্ঠ সাধকের জীবনী আলোচনা করিয়া ধন্য হইলাম।

নিখিল-প্রবাহ

সেন্‌ট্ জন গির্জ্জা—

নিউ ইয়র্ক সহরে একটি গির্জ্জা নির্ম্মিত হচ্চে। গির্জ্জাটির নামকরণ হয়েচে—সেণ্ট জন দি ডিভাইন। এই
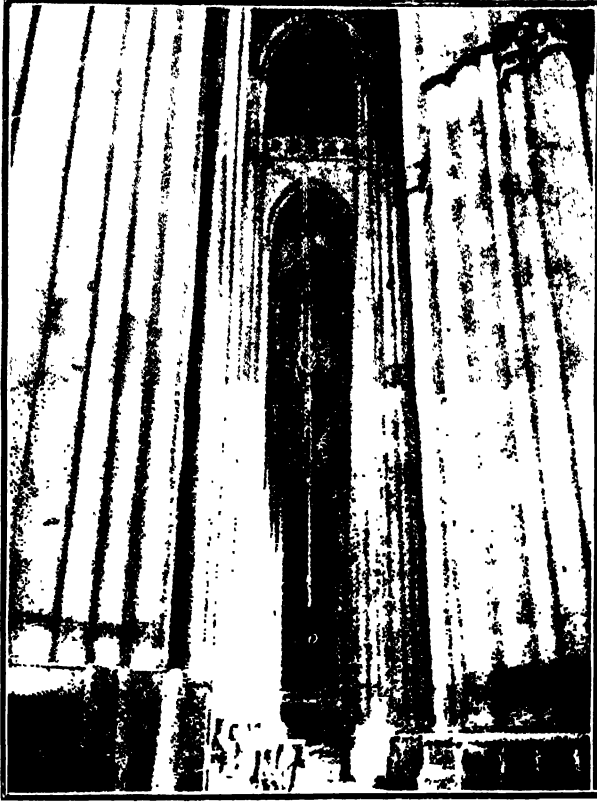
সেন্‌ট্ জন গির্জ্জা

গির্জ্জাটি নির্ম্মিত হ'লে পৃথিবীর সমুদায় গির্জ্জার মধ্যে আকারে এবং গঠন-সৌকর্য্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করবে। ১০৯,০০০ বর্গ ফীট পরিমাণ জমির উপর এর কাজ চলবে। বাহিরের জমীর পরিমাণে এটি দ্বিতীয় বৃহৎ স্থান নেবে। এই গির্জ্জার বিশেষত্ব তার মধ্যভাগ; ছিয়ানব্বুই ফিট তার প্রশস্ততা। গঠন-প্রণালী হিসাবে ত্রয়োদশ শতাব্দীর ফরাসী পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েচে। এই পদ্ধতিতেই বিখ্যাত নত্রাদেমের গির্জ্জা নির্ম্মিত হয়েছিল। নির্ম্মাতারা সেই প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণ করবার জন্যে বিশেষ ভাবে পরিশ্রম করচেন।

অদ্ভুত হোটেল—

জার্ম্মাণী তার প্রত্যেক কাজে একটি না একটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেবেই। সম্প্রতি ডার্টমণ্ডের নিকটবর্ত্তী কোনো হ্রদের বুকে জার্ম্মাণরা এক হোটেল নির্ম্মাণ করেচে। সৌন্দর্য্য ও সুবিধার দিক দিয়ে একে অতুলনীয় বলা যেতে পারে। হোটেলটি হ্রদবক্ষে জলের বুক থেকে উঠেচে; দেখলে মনে হ'বে, প্রকাণ্ড বোট যেন পক্ষ বিস্তার করে জলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। পরিক্রমণ করবার জন্যে উপরে ডেকের মত বিস্তৃত স্থান করা হয়েচে। আহার কক্ষ ব্যতীত এর মধ্যে নৃত্য-গীত ও খেলাধূলোর উপযোগী অনেক ঘর আছে। রাত্রে অসংখ্য বিদ্যুৎ-দীপাবলিতে এর শোভা যে অপূর্ব্ব হয়ে ওঠে, তা বোধ করি না বললেও চলে।

দ্বিতল রাস্তা -

রাস্তায় যান-বাহনের দৌরাত্ম্যে পথিকদের অনেক সময় অনেক রকমের অসুবিধা ভোগ করতে হয়। বড় বড় সহরে ত' প্রায়ই একাধিক দুর্ঘটনা এই কারণেই ঘটে থাকে। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে প্যারিসে নতুন রকমের রাস্তা তৈরী করার
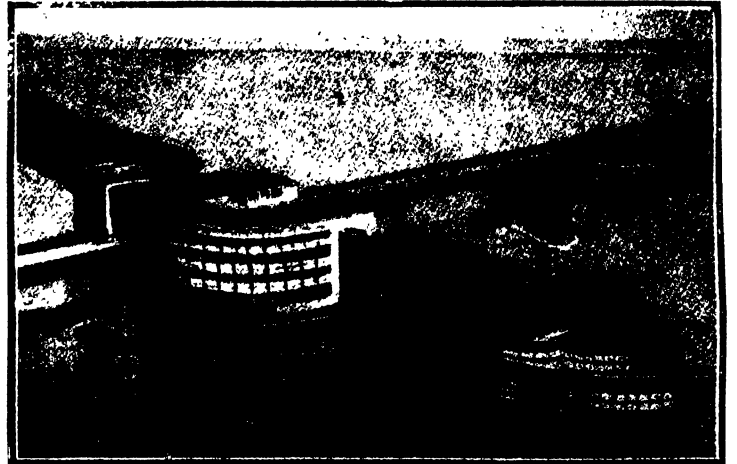
অদ্ভুত হোটেল

জল্পনা কল্পনা চলচে। রাস্তাটি দ্বিতল করা হ'বে। নীচের তলা দিয়ে গাড়ী ঘোড়া মোটর যাতায়াত করবে এবং উপরতলা হ'বে লোকজনের ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। রাস্তার একদিক থেকে আর একদিকে যেতে হ'লে লোকে কি করবে? মাঝে মাঝে সেতু নির্ম্মিত হ'বে; সেইগুলি পার হ'য়ে আর এক প্রান্তে পৌঁছুতে হ'বে।
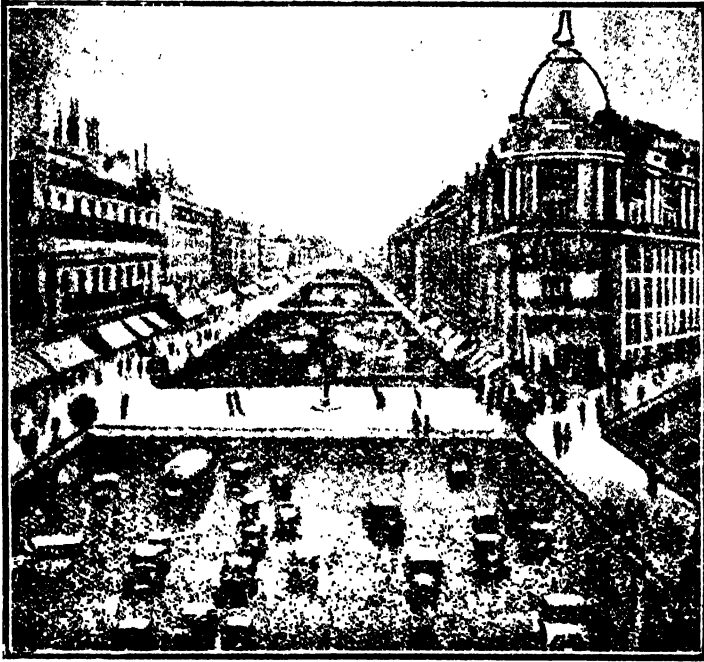
দ্বিতল রাস্তা

সুখ-শয্যা—

শীতপ্রধান দেশে উত্তপ্ত শয্যাই হ'ল সুখশয্যা। ঘরে আগুন রেখেই এতকাল শয্যাগুলি ওদেশে উত্তপ্ত করা হ'ত।

সুখ-শয্যা

সম্প্রতি জার্ম্মাণীর কোনো বৈজ্ঞানিক ঘরে আগুন না রেখেও শয্যাসুখ উপভোগ করবার ব্যবস্থা করেচেন। বৈদ্যুতিক যন্ত্রের ক্রিয়ায় এই উত্তাপ সৃষ্টি করা হয়েচে।—চুল শুকোবার যন্ত্র যেভাবে তৈরী হয়, এও অনেকটা সেই ভাবেই তৈরী হয়েচে।

কৃত্রিম পর্ব্বত-চূড়া—

সভ্য মানুষ বনের পশু ও পাখীকে ধরে এনে সঙ্কীর্ণ পিঞ্জরের মধ্যে পুরে রাখে, কিন্তু

কৃত্রিম পর্ব্বত-চূড়া

তার মধ্যে তারা সেই মুক্তির আনন্দ খুঁজে পায় না। একঘেয়ে বন্দী অবস্থার ফলে অনেকের মৃত্যুও হয়। এই সব কারণে, স্বচ্ছন্দচারী পশুরা যাতে নিজেদের মনোমত ছুটোছুটি করে বেড়াতে পারে—তার জন্যে স্যানডিগোর চিড়িয়াখানাতে কতকগুলি কৃত্রিম পর্ব্বত-চূড়া নির্ম্মাণ করা হয়েচে। দুরন্ত পশুরা ইচ্ছামত এই পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করে স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করে।

উল্কা-শিলা—

কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে রাশিয়ার মরুপ্রান্তরে আকাশ আলো করে' একটা বিকট অগ্নিশিখা দেখা গিয়েছিল. সেই আগুনের শিখা যখন মাটিতে নেমে এল, তখন হাজার মাইল দূরের মানুষও কেঁপে উঠ্‌ল। আগুন নিবলে দেখা গেল, পাথরের স্তূপে সমস্ত ভূমি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে; আর বড় বড় গহ্বর মুখ-ব্যাদান করে রয়েচে। তার পর কুড়ি বৎসর গেছে। বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা করে সম্প্রতি জানিয়েচেন যে, এগুলি সেই আগুনের শিখার সঙ্গে সঙ্গেই মাটীতে এসে পড়েচে। এগুলি আকাশেই ছিল।

উল্কা-শিলা ১)

উল্কা-শিলা (২)
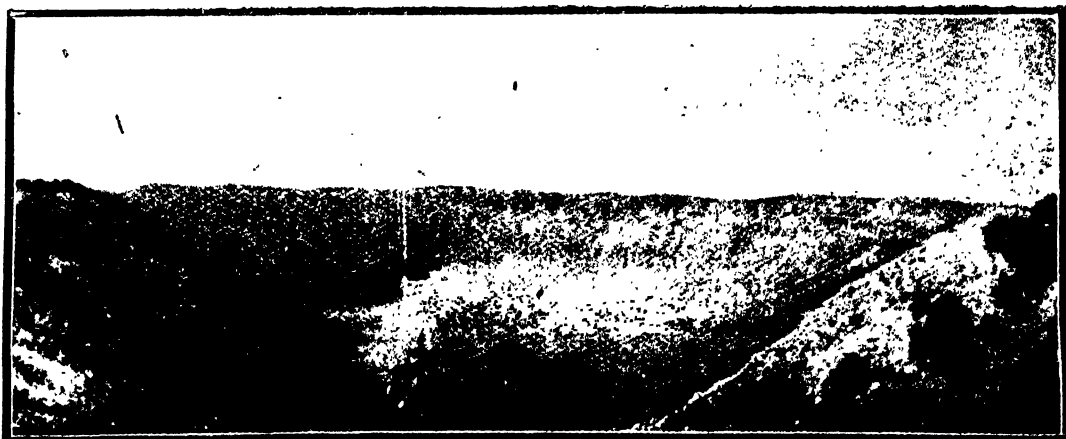
মোটর স্কী—

সুইজারল্যাণ্ড দেশ স্কী খেলার জন্যে বিখ্যাত, এ কথা ভারতবর্ষের পাঠক-পাঠিকার অজ্ঞাত নেই। মণীন্দ্রলাল বসু ইতঃপূর্ব্বেই তাঁর চিত্তাকর্ষক বিবরণীর ভিতর দিয়ে এর পরিচয় দিয়েছেন। শীতের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক বৎসর সেখানকার সেণ্ট্‌ শরিজে স্কী খেলা যেমন জমে ওঠে এমন আর কোথাও নয়। প্রত্যেক শীতেই খেলার মধ্যে কিছু না কিছু নূতনত্ব সঞ্চারের চেষ্টা করা হয়।
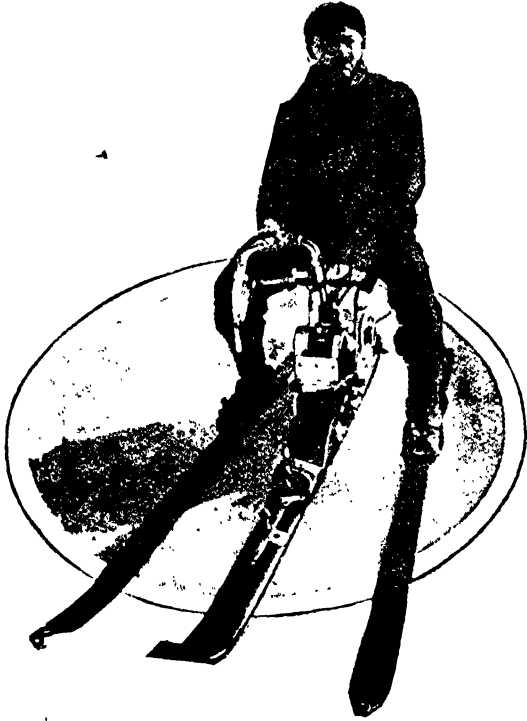
মোটর স্কী

গত বৎসর মোটর-চালিত স্কী ছিল সেবারকার নূতনত্ব। আরোহী দু' পাশে দুই পা রেখে মাঝখানে বসতে পারেন। কলকব্জা অতি সহজেই পরিচালিত করা যায়; কারণ, সেগুলি চালকের হাতের নিকটে অবস্থিত থাকে। এতে করে দ্রুত স্কেটিং খুব সহজসাধ্য হয়ে উঠে।

খোকার সুবিধে—

মাতৃস্তন্য পান ওদেশের শিশুদের ভাগ্যে আজকাল ঘটে না বললেই চলে। জননীরা ছেলেকে দুধ খাওয়াবার সময়টুকু অন্য কাজে নিয়োজিত করেন। এ ব্যবস্থা ভাল কি মন্দ সে আলোচনা এই স্বল্প স্থানের মধ্যে সম্ভবও না, উচিতও না। যাই হ'ক, বোতলে দুধ খাওয়ার পক্ষে ছোট ছেলেদের অনেক অসুবিধা আছে। হয় ধাত্রীকে বোতলটি ছেলের মুখের কাছে ধরে থাকতে হয়, কিম্বা সে কাজের সমস্ত দায়িত্ব যদি একা শিশুর উপরই ন্যস্ত করা হয়, তাহ'লে বোতলটি চূর্ণ করে—দুধটুকু নষ্ট করতে তার বেশী বিলম্ব হয় না। এই অসুবিধা দূর করবার উদ্দেশ্যে ওদেশে ছেলেদের দুধ খাওয়ানো সম্বন্ধে এই নূতন উপায়

খোকার সুবিধে

অবলম্বন করা হ'চ্চে। স্প্রিঙের তারের সঙ্গে বোতলটি আটকান থাকে। এই অবস্থায়, ছেলেরা বোতলটিকে ইচ্ছামত নাড়াচাড়া করলেও সহসা ভাঙ্গতে পারে না।

পৃথিবীর শিহরণ—

প্রত্যেক প্রাণবান বস্তুর মত পৃথিবীও সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়, অর্থাৎ শিহরণ অনুভব করে। এই শিহরণ কখনো কখনো এক ইঞ্চির এক সহস্রাংশ মাত্র হ'তে দেখা গেছে। সম্প্রতি এক নূতন যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েচে যার সাহায্যে সেই অতি-অল্প শিহরণটুকুও টের পাওয়া যাবে। শিহরণ অনুভব কালে ভূ-পৃষ্ঠের প্রকৃত অবস্থা যা হয়, তাকে একহাজার গুণ পরিবর্দ্ধিত করে তবে ফটোগ্রাফ গ্রহণ করা চলে। এই নূতন যন্ত্রের সাহায্যে জানা গিয়েছে, পৃথিবীর গায়ে আঘাত লাগলে, তার অনুভূতি অতিশয় দ্রুতবেগে
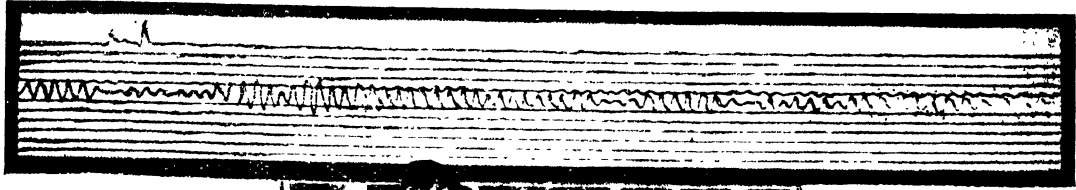
পৃথিবীর শিহরণ
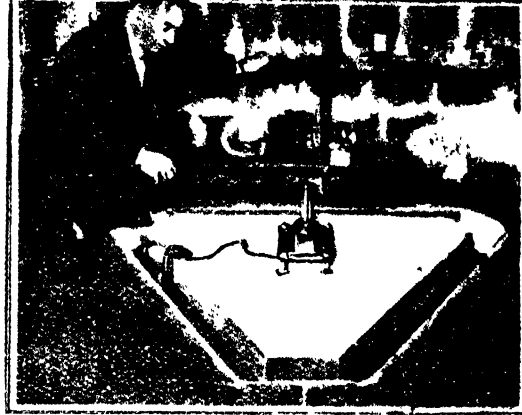
এক দিক থেকে আর এক দিক পর্য্যন্ত ছুটে যায়। সে গতি এত দ্রুত যে উড়োজাহাজেরও তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়ী হ'বার সম্ভাবনা নেই। এই নূতন যন্ত্র প্রস্তুত হওয়ার ফলে একটা সুবিধা হয়েচে এই যে, ভূ-পৃষ্ঠে আসন্ন কম্পন বা শিহরণ অনুভূত হ'বার পূর্ব্বেই অনেক সময় এরি সাহায্যে মানুষকে তার আসন্ন আগমনের কথা জানানো যেতে পারে।

টেলিফোনের সুবিধা বৃদ্ধি—

এতকাল টেলিফোন একটিমাত্র লোকের ব্যবহারের উপযোগী ছিল, অর্থাৎ এককালে কেবল একটি লোকই তার সাহায্যে কথা শুনতে পারতেন। কিন্তু বিদেশে সে ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়েচে। এখন দুটি লোক অনায়াসে এক সঙ্গে কথা-বার্ত্তা শুনতে পারেন। কিম্বা সে প্রয়োজন না হ'লে দুইটি যন্ত্র মাথার উপর ঝুলিয়ে (রেডিওর হেডফোনের মত) দুই কাণ দিয়ে শোনা যেতে পারে। এর উপকারিতা এই যে হাতটি এতে আটকা থাকে না; টেলিফোনের কথা কাণে শুনবার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন বোধ করলে কথাগুলি কাগজে লিখে নেওয়া চলে। যন্ত্রটি ইচ্ছা করলে পকেটে বহন করাও যায়। একমাত্র অসুবিধা এই যে একসঙ্গে দুটি লোকের কথা কইবার উপায় নেই। কিন্তু সে অসুবিধা বিশেষ মারাত্মক নয়।

টেলিফোনের সুবিধা বৃদ্ধি

কৃত্রিম মানুষ—

বিজ্ঞানের দৌলতে কত অসম্ভবই না সম্ভব হ'তে চলেচে। শেষে মানুষও তৈরী হ'ল। এই কৃত্রিম মানুষ চলতে পারে, এবং লোকের নির্দ্দেশ অনুসারে কাজও করতে পারে অনেক সময়। কেবল দুঃখের মধ্যে নেই এদের মনন শক্তি আর আত্মা। সে যাই হ'ক, যিনি এই যন্ত্র-চালিত মানুষ তৈরী করচেন, তাঁর নাম কাপ্তেন এ, জি, রবার্টস। ইনি ইংরাজ।

পাশের ছবিটিতে যে ছোটো ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে—সে পুলিশের কাজ চালাচ্চে। কিন্তু এও কৃত্রিম মনুষ্য-মূর্ত্তি। ওইখানে দাঁড়িয়েই সে গাড়ী ঘোড়া নিয়ন্ত্রিত করে। গাড়ীর দিকে মুখে ফিরিয়ে দাঁড়ালেই—তাকে থামতে হ'বে। পাছে গাড়ীচালক দেখতে না পায় এ জন্য সে ঘণ্টাও বাজিয়ে থাকে। তার পাশের মূর্ত্তিটীও যন্ত্র-নির্ম্মিত। এই ছবিতে দেখানো হয়েচে, কেমন করে ওই কৃত্রিম লোকটি মানুষের আদেশ পালন করে। একজন তাকে বসতে বলেচে এবং সে তারি চেষ্টা করচে। তৃতীয় ছবিতে এক যন্ত্র-চালিত নাপিত একজনের ক্ষৌর কর্ম্ম করচে। অদূরে দাঁড়িয়ে একজন তার কাজ লক্ষ্য করচে।—এই সমস্ত আশ্চর্য্য সৃষ্টি কেবল মাত্র বেতার-যন্ত্র, কথা কইবার যন্ত্র এবং আরও কয়েক প্রকার যন্ত্রপাতির সাহায্যে সম্ভব হয়েচে।

কৃত্রিম মানুষ

শোক-সংবাদ

যতীন্দ্রমোহন ঘোষ

গত ২৯শে ফাল্গুন ১৩৩৫, তারিখে কলিকাতা পুলিশ কোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব যতীন্দ্রমোহন ঘোষ লোকান্তরিত হইয়াছেন। হাওড়া জেলায় আমতার নিকটবর্ত্তী রসপুর গ্রামে ১২৭৮ সালের শ্রাবণ মাসে তিনি জন্মগ্রহণ

যতীন্দ্রমোহন ঘোষ

করেন। আমতা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি জেনারেল এসেম্বলী হইতে বি-এ পরীক্ষোত্তীর্ণ হন। বি-এল পাশ করিবার পর তিনি হাই কোর্টের উকীল হন। কিন্তু তাঁহার প্রধান কার্য্যস্থল পুলিশ কোর্ট। পুলিশ কোর্টে সারা জীবন ওকালতী করিয়া তিনি অর্থ, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। তিনি যেমন অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার সদ্ব্যয়ও তেমনি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উদ্যোগে আজমীরে বাঙ্গালী ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। শুকচরে কালী মন্দির ও শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া বিগ্রহের সেবার্থ তিনি দুই লক্ষ টাকার সম্পত্তি বিনিয়োগ করিয়া দিয়াছেন। তিনি অনেক অনাথা বিধবা ও দরিদ্র ছাত্রকে মাসে মাসে অর্থ সাহায্য করিতেন। অনেক ধর্ম্মানুষ্ঠানে তিনি মুক্ত হস্তে দান করিতেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৮ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার বিধবা পত্নী, চারিটি পুত্র ও দুইটি কন্যা বর্ত্তমান। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজন বর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

কুমার মন্মথকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, আই-সি-এস

গত ১৫ই চৈত্র শোভাবাজার রাজবংশের কুমার মন্মথকৃষ্ণ দেবের মৃত্যু হয়। তিনি ইংরাজী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে

কুমার মন্মথকৃষ্ণ দেব, আই-সি-এস

জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মেধাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সকল পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে গণিত ও পদার্থবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীতে ডবল অনারে বি-এ পাশ করিয়া আই-সি-এস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। সিভিল সার্ভিসে সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলা সুচারু রূপে শাসন করিয়া ১৯১০ খৃষ্টাব্দে দেড় বৎসরের ছুটী লইয়া বিলাতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিয়া আসেন। বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর বর্দ্ধমান জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট হন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে পুরী জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে যখন বালেশ্বর জেলা প্রবল বন্যায় প্লাবিত, তখন তিনি সেই জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট। সেই সময় তিনি প্রাণপণ শক্তিতে দরিদ্র ও বিপন্ন লোকদিগের সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি ছোট নাগপুরের অন্তর্গত মানভূম জেলার শাসনকর্ত্তা হন এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ভাগলপুর বিভাগের কমিশনার (Commissioner) হন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ৫ পুত্র ও ৩ কন্যা রাখিয়া ৫৪ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার যে সমস্ত জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, সেই সমস্ত জেলার অধিবাসিগণ তাঁহার মৃত্যুতে বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন।

অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র সিংহ এম-এ

গত ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে প্রেসিডেন্সী কলেজের উদ্ভিদ্বিদ্যার অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র সিংহ পরলোক গমন করেন। নদীয়া জেলার অন্তর্গত ময়েরহুদা গ্রামে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়।

শ্রীশচন্দ্র ১৯০০ খৃষ্টাব্দে রানাঘাট স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পাটনা কলেজে ভর্ত্তি হন। এখান হইতে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। সেখান হইতে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে একই বৎসরে বি এ, ও এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি Pusa Imperial Agriculture Institute হইতে স্কলার শিপ প্রাপ্ত হন। তৎপরে তিনি হাজারিবাগ St. Columbus Collegeএ Botanyর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেখানে অত্যন্ত যশের সহিত কাজ করিবার পর ১৯১১ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্নৌ ক্যানিং কলেজে যোগদান করেন। তৎপরে তিনি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করেন। এখানে ১৯ ৯

অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র সিংহ এম-এ

শাল পর্য্যন্ত বিশেষ প্রশংসার সহিত কাজ করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে Post Graduate Classএ Lecturer নিযুক্ত হন। তিনি উদ্ভিদ্বিদ্যার অনেক মৌলিক গবেষণা করেন এবং কয়েকটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধও প্রকাশ করেন। তিনি সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। বাঙ্গলা মাসিকে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতেন। শ্রীশচন্দ্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজ বন্ধ রাখা হয়।

প্রামাণ্যবাদ

অধ্যাপক শ্রীজানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য এম-এ

প্রামাণ্যবাদের অবতারণা যুক্তিশাস্ত্রের প্রচলন হইতেই ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে আরম্ভ হইয়াছে। ন্যায়ভাষ্যকার তাঁহার ভাষ্যে প্রথমে প্রামাণ্যবাদের অল্প আলোচনা করেন। যখন সংশয়বাদীর সংশয়জালে ভারতীয় প্রতিভা আচ্ছন্ন, তখন প্রমাণের প্রামাণ্য স্থাপনের জন্য মনীষার অবতার বাৎস্যায়ন লেখনী ধারণ করিলেন। জগতের পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান প্রমাণের সাহায্যে হইয়া থাকে; কিন্তু এই প্রমাণের স্বরূপ কি তাহা না জানিলে সেই সব তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ কোন মূল্য থাকে না। সেইজন্যই সর্ব্বপ্রথমে ন্যায়ভাষ্যকার প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় করিয়াছেন। প্রামাণ্য হইতেছে প্রমাণের ধর্ম্ম। এখানে প্রমাণ শব্দটী ভাববাচ্য নিষ্পন্ন। প্রমাণ ও প্রমা একই অর্থের প্রতিপাদক শব্দ। প্রমাণ বলিতে যথার্থজ্ঞান বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যে জ্ঞান দ্বারা আমরা বিষয় ও তাহার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারি তাহা প্রামাণ্য। আর প্রামাণ্য হইতেছে সেই প্রমার ধর্ম্ম। ন্যায়মঞ্জরীকারের ভাষায় 'স্বপ্রমেয়াব্যভিচারিত্বং প্রামাণম্' প্রমাজ্ঞান তাহার বিষয় পদার্থকে যাহা ও যেরূপ বলিয়া প্রকাশ করে পদার্থও তাহা ও সেইরূপ। ইহারই নাম প্রমা তাহার প্রমেয়ের অব্যভিচারী। আর এই অব্যভিচারিতার অন্য নাম প্রামাণ্য বা প্রমাত্ব। বাৎস্যায়ন অনুমান প্রমাণের সাহায্যে প্রমাণ মাত্রেরই প্রামাণ্য স্থির করিয়াছেন। আমরা এখানে সেই অনুমানের আলোচনা করিতে বিরত হইব। এই প্রবন্ধে প্রামাণ্যবাদের সকল কথা লেখা অসম্ভব। সুতরাং প্রামাণ্যবাদের কিছু অংশের আলোচনা করিয়া ক্ষান্ত হইব।

প্রামাণ্যবাদের আলোচনা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রমাণের প্রামাণ্য স্বতঃ না পরতঃ। এই স্বতঃ ও পরতঃ শব্দের ব্যাখ্যা পরে বিশদরূপে বিবৃত হইবে। পূর্ব্বোক্ত বিচারটী অল্প বিশদ করিলে বুঝা যায় যে, প্রামাণ্যের উৎপত্তি স্বতঃ না পরতঃ। প্রামাণ্যের জ্ঞপ্তি বা নিশ্চয় স্বতঃ না পরতঃ ও প্রামাণ্যের নিজকার্য্য করণ স্বতঃ না পরতঃ। এই তিনটী বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা হইলে প্রামাণ্যবাদের সম্যক্ আলোচনা সম্ভবপর হয়। কিন্তু মাসিক পত্রিকার এক সংখ্যার প্রবন্ধে এই তিনটী বিচারের অনতিবিস্তৃত আলোচনা অসম্ভব, সুতরাং এই প্রবন্ধে প্রামাণ্যের উৎপত্তি স্বতঃ না পরতঃ এই অংশটীর মাত্র আলোচনা করিব। এই অংশটীরও সম্যক্' আলোচনা করা অসম্ভব। কারণ গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণির প্রামাণ্যবাদের আলোচনা করিতে হইলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ আবশ্যক। সুতরাং এই প্রবন্ধে গঙ্গেশের মতের উল্লেখমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইব। এই প্রবন্ধে স্বতঃ প্রামাণ্যবাদের আলোচনা ও পরতঃ প্রামাণ্যবাদিগণের দূষণ ও স্বতঃ প্রামাণ্যবাদীদিগের উত্তরের আলোচনা করিব।

প্রথমে প্রামাণ্যবাদ বিষয়ে দার্শনিকদের যে সকল মতভেদ আছে তাহার উল্লেখ করা যাক্। সাংখ্যদের মতে প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য স্বতঃ, মীমাংসক ও বেদান্তিদের মতে প্রামাণ্য স্বতঃ ও অপ্রামাণ্য পরতঃ, বৌদ্ধদের মতে অপ্রামাণ্য স্বতঃ ও প্রামাণ্য পরতঃ ও নৈয়ায়িকদের মতে প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য পরতঃ। জৈনদের মতে অভ্যস্ত বিষয়ে প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য স্বতঃ; কিন্তু অনভ্যস্ত বিষয়ে উভয়ই পরতঃ। ন্যায়মঞ্জরী, পঞ্চপাদিকা-বিবরণ, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থসমূহে সাংখ্যসিদ্ধান্তে প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য স্বতঃ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু অনিরুদ্ধ বৃত্তিতে প্রামাণ্য স্বতঃ ও অপ্রামাণ্য পরতঃ বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আর এক কথা, বর্ত্তমানে সাংখ্যশাস্ত্রের যে কয়খানি প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহাতে মাত্র বেদের স্বতঃ প্রামাণ্য সিদ্ধান্তের কথা পাওয়া যায়; অন্য প্রমাণের স্বতঃ কি পরতঃ তাহার কিছুই উল্লেখ পাওয়া যায় না। প্রাচীন কোন কোন সম্প্রদায় শুধু বেদের প্রামাণ্য বিচার করিয়াছেন ও অন্য প্রামাণ্যের বিচার নিষ্ফল বলিয়াছেন। রামানুজ-সম্প্রদায়ের ন্যায় পরিশুদ্ধির প্রথমাধ্যায়ে আমরা এই ভঙ্গীর কথা পাই। যামুনাচার্য্যও বেদের স্বতঃ প্রামাণ্য স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। এই সকল দেখিয়া সাংখ্যের এ ক্ষেত্রে প্রকৃত সিদ্ধান্ত কি তাহা বুঝিবার উপায় নাই বলিয়াই বোধ হয়।

যাহা হউক বিবরণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে ও অনিরুদ্ধ বৃত্তি হইতে বুঝা যায় যে, সাংখ্যমতে প্রামাণ্য স্বতঃ।

প্রামাণ্যের স্বতঃ উৎপত্তি বলিয়া যে প্রামাণ্যের স্বাতন্ত্র্য, তাহা সকল মীমাংসকগণ স্বীকার করেন নাই। পার্থসারথি মিশ্র প্রভৃতি জ্ঞপ্তিপক্ষ আশ্রয় করিয়া শ্লোকবার্ত্তিকের স্বতঃ প্রামাণ্যবাদের তাৎপর্য্য দেখাইয়াছেন। যাহা হউক, পার্থসারথি মিশ্র ও তাঁহার সম্প্রদায় ভিন্ন কুমারিলের অন্য শিষ্য-সম্প্রদায় উৎপত্তিপক্ষেও প্রামাণ্যের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়াছেন। বেদান্তিদের সকল গ্রন্থেও উৎপত্তিপক্ষে প্রামাণ্যের স্বাতন্ত্র্য দেখা যায় না। প্রমেয় বিবরণ সংগ্রহকার তাঁহার গ্রন্থে প্রামাণ্যের স্বতঃ উৎপত্তি হয় কি না তাহার কোন বিচার করেন নাই। তাঁহার সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে জৈমিনি মতের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রামাণ্যের স্বতঃ উৎপত্তিবাদ সমর্থন করিলেও তাঁহার বেদান্ত মত কি তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না।

প্রামাণ্য স্বতঃ উৎপন্ন হয় এই বাক্যটীর নানারূপ অর্থ হইয়াছে। কুমারিল ভট্টের নানা শিষ্যসম্প্রদায় ছিল। এক এক সম্প্রদায় এক এক অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু সেই সব সম্প্রদায়ের মুখ্য প্রবর্ত্তক কে, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। কারণ তাঁহাদের গ্রন্থ বর্ত্তমানে বিলুপ্ত। আর যে সকল গ্রন্থে তাঁহাদের মতের উল্লেখ আছে সেই সকল গ্রন্থে তাঁহাদের কোন নাম উল্লেখ নাই। একদল বলেন যে, প্রামাণ্য স্বতঃ উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ এই জ্ঞানের প্রামাণ্য আপনার থেকেই জন্মায়, কোন কারণের সাহায্য লয় না। এইরূপ মতের প্রতিবাদ করিয়া প্রভাচন্দ্রাচার্য্য বলিয়াছেন যে, প্রামাণ্য যদি কোন কারণের অপেক্ষা না রাখে তাহা হইলে এই প্রামাণ্য নিয়মিত ভাবে প্রমাণকে আশ্রয় করিতে পারে না। কারণ যাহারা আপনার থেকেই উৎপন্ন হয় তাহারা কখনও অপরকে আশ্রয় করিয়া থাকে না। আর যদি অপরকে আশ্রয় করিয়া থাকাই প্রামাণ্যের স্বভাব হয় তাহা হইলে ইহা অবশ্যই কারণান্তরকে স্বীয় উৎপত্তির জন্য অপেক্ষা করে। এই জাতীয় আর একটী মত তত্ত্ব-সংগ্রহ গ্রন্থে দেখা যায়। সেইমতে প্রমাণের অর্থ পরিচ্ছেদকত্ব-রূপ শক্তি স্বাভাবিক। এই শক্তি যদি স্বভাবতই অসৎ হয় তাহা হইলে কোন কালেই তাহার সত্তা সম্ভবপর হয় না। আর এক কথা নিরপেক্ষত্ব হইতেছে প্রমাণত্বের ব্যাপক। সুতরাং সাপেক্ষত্ব হইতেছে ব্যাপকের বিরুদ্ধ। এই সাপেক্ষত্ব যেখানে আছে সেখানে প্রমাণত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং প্রামাণ্য কোন কালে সাপেক্ষ হইতে পারে না। এখন দেখা যাক্ এই স্বাভাবিক শক্তি বলিতে কি বুঝা যায়। স্বাভাবিক বলিতে নিত্য বুঝায় না নিজ নিজ কারণ হইতে উৎপত্তির পর অন্য কারণকে অপেক্ষা না করা।

মীমাংসকগণ বলেন যে ভাবপদার্থ সমূহ হইতে স্বতই নানারূপ শক্তিসমূহ নিয়মিতরূপে উদ্ভূত হইয়া থাকে। যেমন যে সকল কারণের যেমন রূপ আছে সেই সকল কারণ সেই সেই রূপ আপন কার্য্যেতে দিয়া থাকে।

মৃত্তিকাখণ্ড ঘটের কারণ; মৃত্তিকাখণ্ড স্বীয়রূপ ঘটকে দিয়া থাকে। কিন্তু জল আনিবার শক্তি মৃত্তিকাখণ্ডের নাই সুতরাং সেই শক্তি মৃত্তিকাখণ্ড ঘটকে দিতে পারে না। সেই শক্তি ঘটে আপনার থেকেই আবির্ভূত হয়। সেইরূপ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অর্থবোধক শক্তি না থাকিলেও আপনার থেকেই হইয়া থাকে। ইহার নামই স্বাভাবিক শক্তি। ইহার উত্তরে কমলশীল বলিতেছেন যে এইরূপ উক্তি প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নয়। কারণ এই নিয়ম অবলম্বন করিয়া বলা যাইতে পারে যে অপ্রামাণ্যও স্বতঃ নিষ্পন্ন, যেহেতু অপ্রমাণ্য হইতেছে বিপরীতার্থবোধক শক্তিবিশেষ। এই সকল শক্তি যদি ভাবপদার্থ সমূহ হইতে অব্যতিরিক্ত অর্থাৎ অভিন্ন হয় তাহা হইলে ভাব স্বরূপের মত হেতুর সহিত অভিসম্বন্ধ হইয়া ইহাদের আত্মলাভ হইয়া থাকে। সুতরাং কোনরূপেই স্বাভাবিকত্ব সম্ভবপর হয় না। আর এই সমুদয় শক্তি যদি ভাবপদার্থ হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে শক্তির সহিত ইহাদের সম্বন্ধ কোনকালেই সম্ভবপর হয় না, কারণ কোন অনুপকারক আশ্রয়ই হয় না। এই মতের বিস্তৃত আলোচনা তত্ত্বসংগ্রহে ও তাহার টীকায় অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন।

'প্রামাণ্য স্বতঃ উৎপন্ন হয়' ইহার অপর কি অর্থ হইতে পারে। ইহার অপর অর্থ প্রমেয় কমলমার্ত্তণ্ডে সম্ভাবিত হইয়াছে যে প্রামাণ্য নিজ সামগ্রী হইতে সমুৎপন্ন হয়। অর্থাৎ প্রামাণ্য সামগ্রী প্রামাণ্যকে উৎপাদিত করিয়া থাকে। ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, এইরূপ অর্থ স্বীকার করিলে স্বতঃ প্রামাণ্যবাদের মাহাত্ম্য কিছুই থাকে না, কারণ

পরতঃ প্রামাণ্যবাদীরও এই মত সুতরাং তাঁহারা স্বতঃ প্রামাণ্যবাদের দোহাই দিয়া সিদ্ধেরই সাধন করিতেছেন।

অপর এক দল মীমাংসক বলিয়া থাকেন যে এখানে স্ব শব্দের অর্থ স্বীয় অর্থাৎ আত্মীয়। অতএব এই মতে প্রামাণ্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে জ্ঞানজনক সামগ্রী হইতে। এই প্রামাণ্যের পক্ষে গুণ কারণ নহে। যদি গুণ কারণ হইত তাহা হইলে সর্ব্বত্রই গুণহীন দোষযুক্ত কারণ হইতে অপ্রামাণ্যের উৎপত্তি হইত—আংশিক অপ্রামাণ্যের উৎপত্তি হইতে পারিত না। পীত শঙ্খ প্রভৃতি জ্ঞান সর্ব্বাংশে মিথ্যা নয়। উহা হইতে শঙ্খের স্বরূপের যে জ্ঞান হয় তাহাকে কেহ মিথ্যা বলিতে পারে না। কিন্তু এই মতে প্রামাণ্য স্বতঃগ্রাহ্য নয়, যে হেতু জ্ঞানের নিজকে বা নিজের প্রামাণ্যকে প্রকাশ করিবার সামর্থ্য নাই; কারণ, অর্থ প্রকাশ করিয়াই জ্ঞানের প্রকাশ করিবার সামর্থ্য ক্ষীণ হইয়া যায়। এই মত বার্ত্তিকের অনুযায়ী কি না দেখাইয়াই ন্যায়রত্নমালাকার ক্ষান্ত হইয়াছেন।

আমরা দেখি এই মত কতদূর সঙ্গত। এই মতে নির্দোষ ইন্দ্রিয় প্রামাণ্যের জনক। কিন্তু পীতশঙ্খ-জ্ঞানের জনক নির্দোষ ইন্দ্রিয় নহে; সুতরাং পিত্তদোষ-দুষ্ট ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানে কিরূপে আংশিক প্রামাণ্য আসিতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যদি দোষদুষ্ট ইন্দ্রিয় হইতে এইরূপ জ্ঞান হইতে পারে, তাহা হইলে গুণহীন দোষদুষ্ট ইন্দ্রিয় হইতে এতাদৃশ জ্ঞান হইলে বিস্ময় প্রকাশের বা ত্রুটি দেখাইবার কিছু আছে বলিয়া বোধ হয় না।

অপর দল বলেন যে প্রামাণ্যের উৎপত্তি জ্ঞান হইতেই হইয়া থাকে, সুতরাং প্রামাণ্য স্বতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি প্রামাণ্য জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে অপ্রামাণ্যও কারণের দোষ-জ্ঞান বা বাধক-জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিতে হইবে। শুক্তিতে রজত-জ্ঞান কোন কালেই কারণ-দোষজ্ঞান বা বাধকজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় না, ইহা সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন। এই মত বার্ত্তিককারের অভিমতও নয়। সুতরাং এই মত অগ্রাহ্য।

প্রামাণ্য নিজে নিজের হেতু হইতে পারে না। প্রামাণ্যের কারণ রূপে কার্য্যোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে সত্তা আবশ্যক; ও কার্য্যরূপে সেই ক্ষণে প্রামাণ্যের অসত্তা প্রয়োজনীয়। একের এক ক্ষণে দুইটী পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সম্ভবপর হয় না। সুতরাং যে কোন পদার্থ নিজের কারণ হইতে পারে না। প্রমাণ জ্ঞান হইতে প্রামাণ্যের জন্ম বলা যায় না; কারণ, জ্ঞান গুণ—সুতরাং তাহা সমবায়ী কারণ হইতে পারে না—সমবায়ী কারণ মাত্রই দ্রব্য। এখন দেখা যাক, জ্ঞানসামগ্রী প্রামাণ্যের জনক কি না? প্রামাণ্য জাতি না অখণ্ড ধর্ম্মবিশেষ? প্রামাণ্যকে জাতি বলিলে উহার জন্ম হয় না। আর উপাধি বলিলে স্মৃতি ভিন্ন জ্ঞানের বাধের অত্যন্তাভাবের নাম প্রামাণ্য। অর্থাৎ স্মৃতি ভিন্ন যে জ্ঞান কখনও বাধিত, মিথ্যা প্রমাণিত হয় না, সেই জ্ঞানের নাম প্রমাণ; আর প্রামাণ্য হইতেছে সেইরূপ জ্ঞানের বাধের অভাব। এই অভাবের উৎপত্তি হয় না; সুতরাং স্বতঃউৎপত্তির কোন অর্থ হয় না। জ্ঞান-সামগ্রী জন্যত্ব বলিতে যদি প্রামাণ্যের স্বতস্ত্ব বুঝায়, তাহা হইলে অপ্রামাণ্যেরও স্বতস্ত্ব আসিয়া পড়ে। যদি বলা যায় যে কেবলমাত্র জ্ঞানসামগ্রী জন্যত্বই স্বতস্ত্ব, তাহা হইলে অপ্রামাণ্যের স্বতস্ত্ব থাকে না সত্য বটে, কিন্তু প্রামাণ্যের স্বতস্ত্বও থাকে না। কারণ দোষের অভাববিশিষ্ট জ্ঞানসামগ্রী জন্যত্ব না দোষের সহিত অবিশিষ্ট জ্ঞানসামগ্রী জন্যত্বই স্বতস্ত্ব। প্রথম ব্যাখ্যা স্বীকার করিলে স্বতস্ত্ব পরতস্ত্বের নামমাত্র হইয়া পড়ে, কারণ পরতঃ প্রামাণ্যবাদীরা ঐরূপই 'পরতস্ত্ব' স্বীকার করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় পক্ষেও দোষ একপ্রকারেরই। বিশেষদর্শন ভ্রমনিবৃত্তির প্রতি কারণ, আর বিশেষদর্শনের অভাব ভ্রমের প্রতিকারণ, সেইরূপ দোষ অপ্রমার প্রতিকারণ; সুতরাং দোষাভাবকে প্রমার প্রতি অবশ্য কারণরূপে স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং প্রামাণ্যের স্বতস্ত্ববাদ সুপ্রতিষ্ঠিত নহে।

স্বতঃ প্রামাণ্যবাদে প্রামাণ্যের উৎপত্তিতে কারকের অপেক্ষা আছে। কারক না থাকিলে জ্ঞানের উৎপত্তিই হইতে পারিত না। আর জ্ঞানের উৎপত্তি না হইলে জ্ঞান গতধর্ম্ম প্রামাণ্যও আকাশকুসুমের মত সৌরভ বিকীর্ণ করিত। সুতরাং আমরা স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ বলিতে বুঝিব যে সে তাহার উৎপত্তির জন্য কারক স্বরূপাতিরিক্ত গুণকে অপেক্ষা করে না। যদি তিন প্রকার উপলব্ধি থাকিত তাহা হইলে গুণ স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা ছিল। উপলব্ধি যখন মাত্র দুইপ্রকার—যথার্থ ও অযথার্থ, তখন গুণ স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। দোষযুক্ত ইন্দ্রিয় হইতে

অযথার্থ জ্ঞানের উদ্ভব হয়; আর যথার্থ জ্ঞানের উদ্ভব দোষহীন ইন্দ্রিয় হইতে। আর অপ্রামাণ্যের কারণ দুষ্ট ইন্দ্রিয়, আর প্রামাণ্যের কারণ নির্দ্দোষ ইন্দ্রিয়াদি। মীমাংসকেরা আরও বলেন যে গুণ স্বীকারের পক্ষে কোন প্রমাণ নাই। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে গুণ না মানিলেও প্রামাণ্য উৎপত্তির কোন হানি নাই; আর গুণ মানিবার পক্ষে কোন প্রমাণ নাই। গুণগুলি ইন্দ্রিয়াশ্রিত, আর ইন্দ্রিয় অপ্রত্যক্ষ; সুতরাং গুণ প্রত্যক্ষ দ্বারা গৃহীত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ অনুমানের সাহায্যে গুণের সত্তা প্রমাণিত হইতে পারে, তাহাও সম্ভবপর নয়; কারণ, ব্যাপ্তি জ্ঞান না হইলে অনুমান হয় না; গুণের সহিত কাহারও অবিনাভাব সম্বন্ধ নিরূপিত না হইলে ত আর গুণের সত্তা অনুমানগম্য হয় না। আর সেই গুণের সহিত সেই লিঙ্গের অবিনাভাব সম্বন্ধই বা কিরূপে জানা যাইবে? আর বেদেও গুণের কথা নাই যে শব্দ প্রমাণের দ্বারা গুণের অস্তিত্ব জানা যাইবে। আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে নৈর্ম্মল্যাদির কথা আছে বটে, কিন্তু তাহা ইন্দ্রিয়ের পরিচয় দেয় না, নির্দ্দোষতার জ্ঞাপকমাত্র। যেমন বস্ত্র স্বভাবতই শুভ্র, ধূলি প্রভৃতি সংযোগে মলিন হইয়া পড়ে, রজকের সাহায্যে তাহার মালিন্য অপসৃত হইলে সেই বস্ত্রকে অতি শুভ্র বস্ত্র বলা হয়, সেইরূপ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি স্বভাবতঃ নির্ম্মল; পিত্তদোষ দুষ্ট হইয়া পড়িলে আমরা চিকিৎসা করাইয়া থাকি ও নীরোগ হইলে সেই নির্দ্দোষ ইন্দ্রিয়গুলিকে নির্ম্মল বলিয়া থাকি। প্রকৃতপক্ষে গুণ বলিয়া কোন আগন্তুক ধর্ম্ম ইন্দ্রিয়গুলির নাই।

এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে জয়ন্তভট্ট, প্রভাচন্দ্রসূরি ও উদয়নের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জয়ন্তভট্ট অনুমানের সাহায্যে গুণের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। যে সকল কারক সম্যক্ জ্ঞানের উৎপাদক তাহারা নিজের স্বরূপ ছাড়া নিজের অন্য ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া সেই সব কার্য্য করিয়া থাকে—ইহাই হইল কারকের স্বভাব; যেমন মিথ্যা-জ্ঞানের উৎপাদক কারক নিজের স্বরূপ ভিন্ন অন্য দোষকে আশ্রয় করিয়া মিথ্যাজ্ঞান উৎপাদিত করে। জয়ন্তভট্ট আরও বলেন যে চিকিৎসা-শাস্ত্রে ইন্দ্রিয়ের যে চিকিৎসার দ্বারা দোষনাশভিন্ন উৎকর্ষ সাধিত হয় তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং গুণ অলীক নহে, উহা প্রমান্তের জনকসামগ্রী বিশেষ। প্রভাচন্দ্রাচার্য্য প্রমেয় কমলমার্ত্তণ্ডে বিশেষভাবে এই মীমাংসক মতের সমালোচনা করিয়া নৈয়ায়িক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। প্রামাণ্য যখন একটী বিশিষ্ট কার্য্য তখন ইহার বিশিষ্ট কারণ আছে, যেমন অপ্রামাণ্য একটী বিশিষ্ট কার্য্য তাহার বিশিষ্ট কারণ আছে। অর্থাৎ জ্ঞানের সামান্য কারণ দ্বারা প্রামাণ্যের উৎপত্তি হইতে পারে না যেহেতু জ্ঞান হইতে প্রামাণ্য অতিরিক্ত।

তাহার পর উক্ত জৈনাচার্য্য দেখাইয়াছেন যে গুণেরও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা আছে। তাঁহার মতে গুণ ইন্দ্রিয়বৃত্তি কি না? গুণ যদি ইন্দ্রিয়বৃত্তি হয়; তাহা হইলে দোষও ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইবে কি না? দোষ যদি ইন্দ্রিয়বৃত্তি না হয়, তাহা হইলে গুণই বা কেন ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইবে? যদি উভয়ই ইন্দ্রিয়বৃত্তি হয়, তাহা হইলে দোষের সত্তা যেভাবে প্রমাণিত হয়, গুণেরও সত্তা সেইভাবে প্রমাণিত হইবে। যদি বলা যায় দোষ গোলকবৃত্তি, সুতরাং তাহার সত্তা প্রত্যক্ষ প্রমাণ করিয়া দিতেছে, তাহা হইলে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, গুণও গোলকবৃত্তি, তাহার সত্তাও অপরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। যেমন লোকে কামল (ন্যাবা) রোগগ্রস্ত লোকের পিত্তাদি দোষ দেখিয়া থাকে তেমনিই উত্তমদৃষ্টিসম্পন্ন লোকের চক্ষু গোলকে লোকে নৈর্ম্মল্যাদি দেখিয়া থাকে। যদি বলা যায় যে নৈর্ম্মল্যাদি গুণ নহে দোষাভাব, তাহা হইলে তাহার উত্তরে উক্ত আচার্য্য বলেন যে, অভাব বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, উহা কোন না কোন ভাববস্তুর স্বরূপ; সুতরাং গুণ না মানিবার কোন যুক্তি নাই।

এখন আচার্য্য উদয়নের মত আলোচনা করা যাক্। ইঁহার মতে প্রমা জ্ঞানহেতু :হইতে অতিরিক্ত হেতুজন্য যেহেতু ইহা কার্য্যবিশেষ যেমন অপ্রমা। এখন ব্যাপ্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। যে যাহার কার্য্যবিশেষ সে তাহার সামান্য হেতুর অতিরিক্ত হেতু জন্য যেমন কলম-শস্যের অঙ্কুর। কলম-শস্যের অঙ্কুর একটী কার্য্যবিশেষ, ইহা কেবলমাত্র বীজ হইতে উৎপন্ন হয় না, কিন্তু বীজবিশেষ হইতে অর্থাৎ কলম-বীজ হইতে। সেইরূপ এই প্রমা কার্য্যবিশেষ সুতরাং ইহার পক্ষেও পূর্ব্ববর্ত্তী নিয়ম কার্য্যকরী হইবে; অর্থাৎ এই প্রমা জ্ঞানবিশেষ, সুতরাং জ্ঞানের সাধারণ কারণ হইতে ইহার নিষ্পত্তি হইতে পারে না, যেমন অপ্রমার জ্ঞানের সাধারণ কারণ হইতে অতিরিক্ত কারণের প্রয়োজন। ইহার

দ্বারা অতিরিক্ত গুণের সত্তা প্রমাণিত হইল। যদি বল যে প্রমাত্ব কেবলমাত্র জ্ঞানহেতু জন্য যে জ্ঞান হয় তাহাতে থাকে, তাহা হইলে প্রমাত্ব অপ্রমাতেও থাকিবে; কারণ অপ্রমারও উৎপত্তির প্রতি জ্ঞানের হেতু কারণ। কেহ বলেন যে দোষাভাবকেই অতিরিক্ত কারণ বলে স্বীকার করিব। অতিরিক্ত ভাবপদার্থ স্বীকারের কোনই প্রয়োজন নাই। উদয়ন তাহার উত্তরে বলিতেছেন যে, এইরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করা যাইতে পারে যদি সব সময়ই দোষগুলি ভাবপদার্থ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এইরূপ নিয়ম সর্ব্বত্র লক্ষিত হয় না। বিশেষাদর্শনরূপ দোষ রহিয়াছে। আর বিশেষের অদর্শন যদি দোষ না হয় তাহা হইলে সংশয় ও বিপর্য্যয় ঘটিতেই পাবে না। আর এই বিশেষের অদর্শন অভাব পদার্থ, সুতরাং তাহার অভাবকে ভাবপদার্থ বলেই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং প্রমার উৎপত্তির পক্ষে জ্ঞানহেতু হইতে অধিক ভাবপদার্থকে কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইল। এখানে বোধ হয় একটী কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রাচীন ও নবীন নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে গুণের স্বরূপ লইয়া পার্থক্য আছে। প্রাচীনদের মতে গুণ ইন্দ্রিয় বা গোলক বৃত্তি আগন্তুক ধর্ম্ম বিশেষ গুণ যেমন নৈর্ম্মল্যাদি। আর নবীনদের মতে প্রত্যক্ষস্থলে ভূয়োঽবয়ব ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ, অনুমান স্থলে সল্লিঙ্গ পরামর্শ প্রভৃতি গুণ।

বেদান্ত পরিভাষাকারের মতে গুণ স্বীকারের কোনই আবশ্যকতা নাই। কারণ কোনও অনুগত গুণ নাই যাহা ভূয়োঽবয়ব সকল প্রমার প্রতি কারণ হইবে। প্রত্যক্ষ স্থলে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ ও গুণ হইতে পারে না কারণ রূপাদি প্রত্যক্ষে ও আত্মপ্রত্যক্ষে তাদৃশ গুণ নাই, আর সেই রূপ গুণ থাকিলেও ভ্রমের উৎপত্তি দেখা যায়, যেমন পীত শঙ্খপ্রতীতি স্থলে। এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে জ্ঞানের সামান্য সামগ্রী জন্য যদি প্রমা হয় তাহা হইলে অপ্রমাও প্রমা হউক। কারণ অপ্রমার ও প্রতি জ্ঞানের সাধারণ সামগ্রী কারণ। ইহার উত্তরে পরিভাষাকার বলিতেছেন যে জ্ঞানের সামান্য সামগ্রী হইতে অধিক দোষাভাবকেও কারণ সামগ্রীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। তাহা হইলে প্রামাণ্যের পরতন্ত্র অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

ইহা আশঙ্কা করিয়া পরিভাষাকার বলিতেছেন যে আগন্তুক ভাব কারণকে অপেক্ষা করিলে অর্থাৎ কারণকূটের মধ্যে স্থান দিলে প্রামাণ্যের স্বতস্ত্বহানি হয়। শিখামণিকার স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন যে অদৃষ্ট প্রভৃতি ভাবকারণকে অপেক্ষা করিলে প্রামাণ্যের পরতন্ত্র হয় না। বেদান্ত পরিভাষাকার বিবরণ মতানুবর্ত্তী। কিন্তু তিনি এখানে তখনকার প্রচলিত মীমাংসা শাস্ত্র প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া বিবরণ সিদ্ধান্তের সহিত দৃঢ় বিরোধ করিয়াছেন। বিবরণে দোষাভাবকে কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। অন্যতোঽপি প্রামাণ্যস্য জ্ঞানেন সহ জন্মাভাবঃ "(বিবরণম্ ১০১ পৃঃ) বিবরণের মত চিৎসুখাচার্য্য যেভাবে গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে দোষাভাবকে কারণ বলিয়া স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন হয় নাই।

এখন বেশ বিচার করে দেখা যাক্, উদয়নের কথার উত্তরে বেদান্তাচার্য্যগণ কি বলিয়াছেন। রত্নদীপাবলিকার প্রামাণ্যের স্বতস্ত্ব নির্ব্বাহের জন্য অনুমান প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রামাণ্য জ্ঞানের হেতুমাত্র জন্যাশ্রিত যে হেতু ইহা অপ্রামাণ্য হইতে ভিন্ন হইয়া একমাত্র জ্ঞানের ধর্ম্ম, যেমন জ্ঞানত্ব। অর্থাৎ এই প্রামাণ্য জ্ঞান সামগ্রী দ্বারা কেবল উৎপন্ন যে জ্ঞান সেই জ্ঞানে থাকে যেহেতু—ইহা অপ্রামাণ্য হইতে ভিন্ন ও একমাত্র জ্ঞানের ধর্ম্ম। অপ্রামাণ্য জ্ঞানেও থাকে দোষেও থাকে। নয়ন প্রসাদিনী টীকাতে লিখিত আছে যে তদ্ভিব্যাধেরপি ধর্ম্ম ইতি ন জ্ঞানৈক ধর্ম্ম ইত্যর্থঃ'।

এই অনুমানটী আমাদের ভাল লাগে না, কারণ দৃষ্টান্ত হইয়াছে জ্ঞানত্ব। এই জ্ঞানত্ব দোষ জন্য অপ্রমাণ জ্ঞানেও থাকে। আর অপ্রমাণ জ্ঞানে যে জ্ঞানত্ব থাকেনা তাহাও বলা যায় না; কারণ তাহা হইলে অপ্রামাণ্য হইতে ভিন্ন এই অংশটী নিরর্থক বিশেষণ হইয়া পড়ে। আরও দুই একটী স্বতস্ত্ব-সাধক অনুমান আছে। সেইগুলিও নানা দোষ দুষ্ট। আদর্শস্বরূপ রত্নদীপাবলিকৃত অনুমানটী দিলাম। এই সব নিরস চর্চ্চায় আপনাদের অনেক বিরক্তির উদ্রেক করিয়াছি; তাহার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি। আর শুধু উদয়নের মতের সমালোচনা করিয়া নিরস্ত হইব।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে পরতঃ প্রামাণ্যবাদের সমর্থক বহু যুক্তি আছে। এখন পরতঃ প্রামাণ্যবাদিকে জিজ্ঞাসা করা যাক্, জ্ঞানব্যক্তির প্রমাব্যক্তি হইতে কোন ভেদ আছে কি না? যদি থাকে তাহা হইলে সেই মত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যক্তি জ্ঞান-

হেতু অতিরিক্ত হেতু জন্য নহে। আর যদি প্রমাব্যক্তি ও জ্ঞানব্যক্তি অভিন্ন হয় তাহা হইলে পরস্পর বিরুদ্ধভাষণ অতি সুস্পষ্ট হইয়া থাকে, কারণ জ্ঞানব্যক্তি জ্ঞানহেতু মাত্র জন্য ও প্রমাব্যক্তি যাহা জ্ঞানের হেতু নয় এইরূপ পদার্থ জন্য অর্থাৎ জ্ঞানই যাহা জ্ঞানের কারণ নয় সেইরূপ পদার্থ জন্য।

ইহার উত্তরে পরতঃ প্রামাণ্যবাদী বলিতে পারেন যে জ্ঞানব্যক্তির ও প্রমাব্যক্তির ভেদ না থাকিলেও বিজ্ঞানত্ব ও প্রমাত্ব রূপ ধর্ম্মের ভেদ আছে। যেমন একটী ঘটে দ্রব্যত্ব, পৃথিবীত্ব ও ঘটত্ব রূপ তিনটী ধর্ম্ম আছে ও সেই ভিন্ন ধর্ম্মগুলির বিদ্যমানতার জন্য বিভিন্ন প্রযোজকের আবশ্যক, সেইরূপ প্রমাব্যক্তি ও জ্ঞানব্যক্তি এক হইলেও প্রমাত্ব ও জ্ঞানত্বরূপ দুইটী বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রযোজক বিভিন্ন হেতুর প্রয়োজন আছে।

এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষি আশঙ্কা করিতে পারেন যে জ্ঞানের সামগ্রী যখন ঠিক করে নিরূপিত হয় না, তখন কি করে জ্ঞান সামগ্রীর অতিরিক্ত পদার্থ জন্য প্রামাণ্য উৎপন্ন হয় জানা যাইতে পারে। এইরূপ একটী মত নিতান্তই অসঙ্গত। এইরূপ বলিলে অপ্রামাণ্যের পরতস্ত্ব সিদ্ধান্তের শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইবে।

এখন প্রামাণ্যের স্বতস্ত্ব বলিতে কি বুঝা যায় দেখা যাক্। যাহা বিজ্ঞান সামগ্রী জন্য ও বিজ্ঞান সামগ্রী হইতে অতিরিক্ত জন্য তাহার যে অত্যন্তাভাব তাহাই প্রমার স্বতস্ত্ব এইরূপে জন্যও নিত্য প্রমার স্বতস্ত্ব নির্ব্বাধে থাকিতে পারে। প্রমার স্বতস্ত্বসাধকানুমান প্রাচীনেরা বলিয়াছেন তাহা চিৎসুখীতে সংগৃহীত হইয়াছে। সেই অনুমানটীর বিকৃতভাবে সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে মাধবাচার্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রমা বিজ্ঞান সামগ্রী জন্য ও বিজ্ঞান সামগ্রী হইতে অতিরিক্ত জন্য নহে যেহেতু ইহা অপ্রমা হইতে অতিরিক্ত যেমন পটাদি। এখানে পরতঃ প্রামাণ্যবাদিগণ উপাধি দেখাইয়া থাকেন। সেই সব কথার আলোচনা করিতে বিরত হইলাম। বিজ্ঞান সামগ্রী মাত্র হইতে প্রমার উৎপত্তি সম্ভব হইলে বিজ্ঞান সামগ্রী হইতে অতিরিক্ত গুণের বা দোষের কারণত্ব কল্পনা করিলে অত্যন্ত গৌরবগ্রস্ত কারণ কল্পনা করিতে হয়।

উদয়ন যে সমস্ত অনুমান প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার প্রতিহেতুও চিৎসুখীতে প্রদত্ত হইয়াছে।

স্বতস্ত্বের বিপক্ষে উদয়ন যে বাধক তর্ক প্রয়োগ করিয়াছেন যে প্রমা বিজ্ঞান সামগ্রীমাত্র জন্য যদি হয়—তাহা হইলে প্রমাত্ব জ্ঞানত্বের ন্যায় অপ্রমাতেও থাকিবে। ইহার উত্তরে বেদান্তাচার্য্যেরা বলেন যে প্রযোজকরূপে দোষ না থাকিলে প্রমাত্ব অপ্রমাতে থাকিতে পারে না। এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে দোষাভাব যদি কারণ না হয় তাহা হইলে কোন স্থলেও প্রমাত্ব থাকিতে পারে না। আর অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারাও জানিতে পারা যায় যে দোষাভাব প্রমার প্রতি কারণ। ইহার উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে শুধুই অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা কার্য্য কারণ ভাব নির্ণীত হয় না; কিন্তু অনন্যথাসিদ্ধ অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা কার্য্যকারণ ভাব জ্ঞাত হওয়া যায়।

কিন্তু দোষাভাব বিরোধী অপ্রমার প্রতিপক্ষতা করিয়াই ক্ষীণশক্তি হয়; আর তাহার কারণ হইবার সামর্থ্য থাকে না।

শ্লোক বার্ত্তিকে উক্ত হইয়াছে যে

তস্মাদ্‌গুণেভ্যোদোষাণামভাবস্তদভাবতঃ।
অপ্রামাণ্যদ্বয়াসত্বং তেনোৎসর্গোঽনপোদিতঃ॥

অর্থাৎ গুণ হইতে দোষের অভাব সাধিত হয়, আর দোষের অভাব হইতেই মিথ্যাত্ব ও সংশয়ত্বের অসত্তা সাধিত হয়। সুতরাং জ্ঞান সামগ্রীমাত্র হইতে প্রমার উদ্ভব হয়—ইহা কেহ খণ্ডন করিতে পারে না।

এখন আর একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে যে একই দোষাভাব অপ্রমার প্রতিবন্ধক ও প্রমার জনক হক্, যেমন একই সংস্কার অনুভবের নাশক ও স্মৃতির জনক। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে উক্ত স্থলে ঐরূপ ব্যবস্থা ভিন্ন আর কোন ব্যবস্থা সম্ভবপর নয়। কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে ঐরূপ কল্পনাবহ ব্যবস্থা স্বীকারের কোনই প্রয়োজন নাই। কারণ যখন কোনই অনুপপত্তি হইতেছে না তখন কারণের সংখ্যা বৃদ্ধিতে লাভ কি?

সাময়িকী

মন্ত্রী বর্জ্জন উপলক্ষে বাঙ্গলার গবর্ণর বাহাদুর অসময়ে বাঙ্গলার কাউন্সিল ভাঙ্গিয়া দিলেন। কাউন্সিলের স্বাভাবিক পরমায়ুও আর বেশী দিন ছিল না—বড় জোর আর ছয় মাস—আগামী নবেম্বর মাসে কাউন্সিল নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে আপনিই ভাঙ্গিয়া যাইত। কিন্তু এই ছয় মাস বিলম্বও সহিল না—লাট বাহাদুর কাউন্সিল ভাঙ্গিয়া দিলেন। উপলক্ষ—মন্ত্রী বর্জ্জন; কিন্তু সেটা নিতান্ত উপলক্ষ মাত্র। কারণ, মন্ত্রী বর্জ্জন প্রহসনের অভিনয় ইতঃপূর্ব্বে আরও কয়েকবার হইয়া গিয়াছে। সে সময়ে লোক মনে করিত, হয় ত বা বিলাতী পার্লামেণ্টের নীতির অনুসরণ করিয়া গবর্মেণ্টই বুঝি বা পদত্যাগ করেন। কিন্তু এ দেশ বিলাত নহে, ব্যবস্থাপক সভা পার্লামেণ্ট নহে, গবর্মেণ্টও নির্ব্বাচিত হ'ন না—সুতরাং পার্লামেণ্টারী নীতি যে এ দেশে খাটিতে পারে না, তাহা লোক বুঝে না। এবার কিন্তু অঘটন ঘটিল—কতকটা পার্লামেণ্টারী নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থাপক সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল।

এইরূপ অস্বাভাবিক ও অনিয়মিত ব্যাপার দেখিয়া নানা জনে নানা কথা বলিতেছেন। অন্য যিনি যাহাই বলুন, স্বরাজ্য দল যাহা বলিতেছেন, তাহা কতকটা যুক্তি-সঙ্গতই বোধ হয়। স্বরাজ্যদলের সিদ্ধান্ত এই যে, বিলাতী পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচন আসন্ন; এ দেশে দশশালা শাসন-সংস্কারের মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় নূতন সংস্কৃত শাসন প্রবর্ত্তনের সময়ও আগতপ্রায়। সাইমন কমিশন ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া বিলাত গিয়াছেন—এইবার তাঁহারা রিপোর্ট লিখিবেন, অর্থাৎ নূতন শাসনবিধি প্রণয়ন করিবেন। এ দেশের লোক যাহাতে সাইমন কমিশনের রিপোর্টের সমর্থন করে, পার্লামেণ্টে সেই রিপোর্ট যাহাতে গৃহীত হয়, তদুদ্দেশ্যে আটঘাট বাঁধিবার জন্য কাউন্সিল ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন সাধারণ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা হইল। এই নির্ব্বাচনের ফলে কাউন্সিলে যদি সরকারের পক্ষপাতী সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে, তাহা হইলে সকল দিকেই সুবিধা—সরকার সাইমন কমিশনের সহায়তায় নিজেদের মনের মতন শাসন ব্যবস্থা গড়িয়া লইতে পারিবেন। স্বরাজ্যদল এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কাউন্সিলে কংগ্রেস পক্ষীয় সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং আশা করিতেছেন—তাঁহারা যেরূপ উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন, তাহার ফলে ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস পক্ষীয় সদস্যের সংখ্যাধিক্য ঘটিবে। কিন্তু নির্ব্বাচন ব্যাপারটা অনেকটা জুয়াখেলার মত—শেষ পর্য্যন্ত কি যে ঘটিবে, পূর্ব্বাহ্নে তাহার কিছুই অনুমান করা যায় না, এবং সে বিষয়ে নিশ্চিন্তও হওয়া যায় না। আর, কাউন্সিলে কংগ্রেস পক্ষীয় সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেই বা কি আর না হইলেই বা কি—লাট বাহাদুরের হাতে 'ভেটো' বলিয়া যে ব্রহ্মাস্ত্রটি রহিয়াছে তাহা যত দিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তত দিন ব্যবস্থাপক সভায় দল বিশেষের সংখ্যা বৃদ্ধিতে কিছুই যায় আসে না। এই কাউন্সিল ভাঙ্গার ব্যাপারে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এবং অপেক্ষাকৃত অনুন্নত আসাম প্রদেশ পথ-প্রদর্শন করিয়াছে। বঙ্গদেশ না কি মহাজনের প্রদর্শিত পথেই চলিবার জন্য কাউন্সিল ভাঙ্গিয়া দিল। আবার শুনা যাইতেছে, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতিও একে একে কাউন্সিল ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিবে—শুধু এক একটা উপলক্ষের অপেক্ষা, এবং বলা বাহুল্য, উদ্দেশ্য সেই একই—কাউন্সিলে সরকার পক্ষে অধিক বল সঞ্চয় করা। এই রাজনৈতিক খেলার পরিণাম দেখিবার বিষয় বটে।

গত ২৫ শে চৈত্র সোমবার ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক বোমা বিভ্রাট ঘটিয়া গিয়াছে। বোলশেভিক-বিতাড়ন বিলের সম্পর্কে ব্যবস্থাপক সভায় আলোচনা স্থগিত রাখা সঙ্গত কি না, সে সম্বন্ধে প্রেসিডেণ্ট মিঃ প্যাটেল তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে সহসা বোমা গর্জ্জিয়া উঠিল—সভায় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। ব্যবস্থাপক সভার ভিতর সভায় অধিবেশনের সময় এরূপ বোমা নিক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্য কি, তাহা লইয়া দেশময় বিলক্ষণ অনুমান ও আলোচনা চলিতেছে। অনেকে মনে করিতেছেন, ইহা বিপ্লববাদীদের কাণ্ড। আবার কেহ কেহ

বলিতেছেন, ইহা কমিউনিষ্টদের কাজও হইতে পারে। বোমা নিক্ষেপের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, ইহা যে অসমসাহসিক কাণ্ড তাহাতে সন্দেহ নাই। বিলাত বা য়ুরোপ আমেরিকার কোন দেশ হইলে অবশ্য কথা ছিল না—সে সকল দেশে সকলই সম্ভব; এবং এরূপ কাণ্ড মধ্যে মধ্যে ঘটিতে শুনা গিয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে ইহা যে অস্বাভাবিক ও অসাধারণ ব্যাপার তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বোমা নিক্ষেপকারী সন্দেহে বি, কে, দত্ত ও ভগৎ সিংহ নামক দুইজন লোক গ্রেপ্তার হইয়া হাজতে বাস করিতেছে। ব্যবস্থাপক পরিষদের ব্যাপার ত এই। এদিকে আবার হিন্দুস্থান রেপাবলিক্যান আর্ম্মির ধরমরাজ নামক এক ব্যক্তির স্বাক্ষরযুক্ত এক চিঠি ব্যবস্থাপরিষদের কয়েকজন সদস্যের নিকটে আসিয়া পৌছিয়াছে। তাহাতে তাঁহাদিগকে হত্যা করিবার ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। এক ভদ্রলোক পরিষদ-বোমা-বিভ্রাটের আসামীদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, আসামীরা জেলের হাজতে অতি সুখে আছে—যেন শ্বশুরবাড়ীতে জামাই আদরে বাস করিতেছে। সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া একটা জটিল রহস্যে আচ্ছাদিত, দেখা যাইতেছে। মামলা আরম্ভ হইয়াছে।

—

ফরোয়ার্ড পাবলিশিং কোম্পানী লিকুইডেশনে গেল। কারবারে লোকসান হইলে অংশীরা যে স্বেচ্ছায় কোম্পানীকে লিকুইডেশনে দেন, ইহা সেরূপ লিকুইডেশন নহে। অবস্থার গতিকে বাধ্য হইয়া কোম্পানীকে কারবার গুটাইতে হইল। লিলুয়ার ট্রেণ দুর্ঘটনা উপলক্ষে ফরোয়ার্ডে প্রত্যক্ষদর্শীর পত্র বলিয়া যাহা ছাপা হইয়াছিল, তদুপলক্ষে কয়েকজন রেল-কর্ম্মচারী ফরোয়ার্ডের বিরুদ্ধে মানহানির যে অভিযোগ রুজু করিয়াছিলেন, সেই মামলার বিচারে হাইকোর্টের বিচারপতিরা ফরোয়ার্ডের বিরুদ্ধে দেড়লক্ষ টাকার ডিক্রি দেন। এদিকে ফরোয়ার্ডের প্রেস ও অন্যান্য সরঞ্জাম ঋণদায়ে আবদ্ধ। ক্ষতিপূরণ বাবদ এই দেড়লক্ষ টাকা প্রদান করিবার সামর্থ্য ফরোয়ার্ড পাবলিশিং কোম্পানীর নাই। এই জন্যই বাধ্য হইয়া কোম্পানীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল। ভূতপূর্ব্ব ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউজ প্রেস ফরোয়ার্ড কোম্পানীর প্রেস হইতে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হইয়াছে। ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় হইবার কোনই উপায় দেখা যাইতেছে না। অতএব দেশবন্ধু সি, আর, দাস মহাশয়-প্রবর্ত্তিত ও তাঁহার পবিত্র স্মৃতি-পূত "ফরোয়ার্ড" অকালে বিলুপ্ত হইল। তবে স্বরাজ্য-দলের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়ের নেতৃত্বে "লিবার্টি" নামক একখানি ইংরাজী দৈনিক, "বঙ্গবাণী" নামে একখানি বাঙ্গলা দৈনিক ও "নবশক্তি" নামে একখানি বাঙ্গলা সাপ্তাহিকপত্র প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। যদি কাগজ তিনখানি দীর্ঘজীবি ও স্থায়ী হয়, তাহা হইলে হয় ত 'ফরোয়ার্ড', 'বাঙ্গলার কথা' ও 'আত্মশক্তি'র স্থান পূরণ হইতে পারে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

—

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত প্যাটেল শেষে অসমসাহসিক কাণ্ড করিয়া বসিলেন—সরকারের স্পষ্ট অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে তিনি মত দিলেন যে, মীরাটের ষড়যন্ত্রের মামলা উপস্থিত থাকিতে, ব্যবস্থাপরিষদে বোলশেভিক বিতাড়ন বিলের আলোচনা চলিতে পারে না, শাসনবিধি অনুসারে সভাপতি রূপে একমাত্র তিনিই এই আলোচনা বন্ধ করিয়া দিবার অধিকারী; এবং সভাপতির ক্ষমতা পরিচালন করিয়া তিনি এই আলোচনা বন্ধ করিয়া দিতেছেন। বলা বাহুল্য, সরকার পক্ষ এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; পক্ষান্তরে সমগ্র দেশবাসী সভাপতি মহোদয়ের এই অকুতোভয়তার প্রশংসা করিতেছেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে—স্বয়ং বড়লাট বাহাদুর এক কথায় সমগ্র ব্যাপারটার চরম মীমাংসা করিয়া দিলেন—তাঁহার ব্যক্তিগত ক্ষমতার বলে সমগ্র বোলশেভিক বিতাড়ন বিলটিকে প্রায় অপরিবর্ত্তিত আকারে অর্ডিন্যান্স নামে ছয় মাসের জন্য আইনে পরিণত করিয়া দিলেন। যাহা ব্যবস্থা-পরিষদে অনুমোদিত হইয়া স্থায়ী আইনে পরিণত হইতে পারিত, তাহা অর্ডিন্যান্স রূপে ছয় মাসের জন্য বাহাল হইল। ফল কিন্তু সেই একই হইল। এই ছয় মাসে কত কি-ই না ঘটিতে পারে। ছয় মাস অন্তে যদি দেখা যায় যে আইনের প্রয়োজন তখনও আছে, তাহা হইলে পুনরায় তাহা ব্যবস্থা-পরিষদে উপস্থাপিত হইতে পারে, নচেৎ অন্য ব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে।

—

এইবার একটি সুসংবাদ দিব। আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতির পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি প্রথমে বাঙ্গলায়, পরে বিহার প্রদেশে বিচার বিভাগে কর্ম্ম করিতেন। তিনি ভাগলপুর, মুঙ্গের, দারভাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে সবজজের পদে নিযুক্ত থাকিয়া সাধারণের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। পরে পাটনা হাইকোর্টে কিছুদিন ডেপুটি রেজিষ্ট্রার ও অবশেষে রেজিষ্ট্রারের পদে কার্য্য করেন। অমর বাবুর আদি নিবাস ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত নিমতা গ্রামে। বহুদিন প্রবাসে থাকিয়াও তিনি তাঁহার জন্মভূমিকে কখনও বিস্মৃত হন নাই। আমরা তাঁহার এই পদোন্নতিতে সুখী হইয়া তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি।

রায় শ্রীযুক্ত অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর

বিগত ১৭ই বৈশাখ আশুতোষ কলেজ-গৃহে দক্ষিণ কলিকাতা বাসীদের একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের প্রস্তাবে, মিঃ পি, চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হরিদাস হালদার ও ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়-গণের সমর্থনে দক্ষিণ কলিকাতার সাহিত্যানুরাগিগণ বঙ্গীয়-সাহিত্যসম্মেলনের আগামী অধিবেশন সাদরে ও সসম্মানে আহ্বান করিতেছেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, পরিচালন সমিতির সম্পাদক এই নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত সভায় একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। তাহাতে মাননীয় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কোষাধ্যক্ষ ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ আহ্বানকারী মনোনীত হইয়াছেন। অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যের চাঁদা অন্যূন ৩৲ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ও বিভিন্ন কার্য্যকরী সমিতি শীঘ্রই গঠিত হইবে। অধিবেশনের বহুপূর্ব্ব হইতেই ভবানীপুরের সাহিত্যিকগণের এই আয়োজন সাফল্যেরই সূচনা করিতেছে। আবশ্যক সংবাদ ৩৫।১০ পদ্মপুকুর রোড ঠিকানায় আহ্বানকারীর নিকট—পাওয়া যাইবে।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীবিশ্বরূপ গোস্বামী বিরচিত "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা" গীতিকাব্য—২৷৹
শ্রীঅমলচন্দ্র সেন, এম-এ, বি-এল, প্রণীত "সমুদ্রগুপ্ত" কাব্যগ্রন্থ—১৷৹
শ্রীপার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত "ব্রহ্মচর্য্য-সাধনা"—১৷৹
শ্রীবিপিনচন্দ্র মজুমদার এম-এ, বি-এস সম্পাদিত "বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন"—১৷৵৹
শ্রীব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "পদ্মমধু"—২৲
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "ডাক্তারের পায়ে বেড়ী" ও "পে নীরক্তের হীরা"—প্রত্যেক—৸৹
শ্রীরমা দেবী প্রণীত "নির্ম্মাল্য"—৷৹
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত "বেতার গ্রাহক যন্ত্র"—১৲
শ্রীনৃপলাল দত্ত প্রণীত "মনে রেখো"—১৲
শ্রীহেমলতা দেবী প্রণীত "মেয়েদের কথা"—৷৹

নিবেদন

আগামী আষাঢ় মাসে 'ভারতবর্ষে'র সপ্তদশ বর্ষ আরম্ভ হইবে।

ভারতবর্ষের মূল্য মণিঅর্ডারে বার্ষিক ৬৷৵৹, ভি, পিতে ৬৸৵৹, ষাণ্মাসিক ৩৵৹ আনা, ভি, পিতে ৩৷৴৹। এই জন্য ভি, পিতে ভারতবর্ষ লওয়া অপেক্ষা **মণিঅর্ডারে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধাজনক।** ভি, পির টাকা বিলম্বে পাওয়া যায়, সুতরাং পরবর্ত্তী সংখ্যার কাগজ পাইতে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা। **২৫শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে টাকা না পাওয়া গেলে আষাঢ় সংখ্যা ভি, পি করা হইবে।** পুরাতন ও নূতন গ্রাহকগণ কুপনে কাগজ পাঠাইবার পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ কুপনে **গ্রাহক নং** দিবেন। নূতন গ্রাহকগণ **নূতন** বলিয়া উল্লেখ করিবেন; নতুবা টাকা জমা করিবার বিশেষ অসুবিধা হয়।

পুনশ্চ—এই ষোড়শ বর্ষকাল "ভারতবর্ষ" কি করিয়াছে, না করিয়াছে, তাহা পাঠক-পাঠিকা মহোদয়গণের অগোচর নাই—১৯২ খানি "ভারতবর্ষে" তাহার পূর্ণ পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। কেবল এক বৎসরের কথাই বলি—ষোড়শবর্ষে কিঞ্চিদধিক ২০০০ পৃষ্ঠা পঠিতব্য বিষয়, ৬০ খানি বহুবর্ণ চিত্র ও ন্যূনাধিক ৯০০ একবর্ণ চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ষোড়শবর্ষ পূর্ব্বে "ভারতবর্ষে"র আসন্ন আগমন-বার্ত্তা প্রকাশিত হইবামাত্র বঙ্গের সুধি-সমাজে যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা এই ষোড়শ বর্ষকালের মধ্যে একটুও হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই; প্রথম বর্ষ হইতেই "ভারতবর্ষ" যে শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব লাভ করিয়াছিল, আজও তাহা একটুও ম্লান হয় নাই। প্রতি বৎসরই "ভারতবর্ষে" কোন না কোন বিশেষত্ব বিকশিত হইয়াছে, পাঠক পাঠিকা মহোদয় মহোদয়াগণও সাদরে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। সপ্তদশ বর্ষের জন্য "ভারতবর্ষ" কিরূপ আয়োজন করিয়াছে, আমরা নিজ মুখে সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে চাহি না—বিগত ষোড়শ বর্ষের "ভারতবর্ষে"র কথা বিবেচনা করিয়া পাঠকগণ স্বয়ং তাহা অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন। কর্ম্মকর্ত্তা—"ভারতবর্ষ"

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA.
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET CALCUTTA

Printer—NARENDRANATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-প্রতিষ্ঠিত

ভারতবর্ষ

সচিত্র মাসিকপত্র

ষোড়শ বর্ষ

দ্বিতীয় খণ্ড

পৌষ ১৩৩৫—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬

সম্পাদক—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

প্রকাশক—শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্